ভারতবর্ষের

ষষ্ঠপঞ্চাশত্তম বর্ষ—প্রথম খণ্ড—প্রথম সংখ্যা

আষাঢ়—১৩৭৫

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

চিত্র সূচী

ভারতবর্ষের সূচী

ষষ্ঠপঞ্চাশত্তম বর্ষ—প্রথম খণ্ড – দ্বিতীয় সংখ্যা

শ্রাবণ—১৩৭৫

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

চিত্র সূচী

ভারতবর্ষের সূচী

ষষ্ঠপঞ্চাশত্তম বর্ষ—প্রথম খণ্ড—তৃতীয় সংখ্যা

ভাদ্র—১৩৭৫

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে পুরনো,
সবচেয়ে ভাল?

এগুলোর কোনটাতেই আমাদের দাবী নেই।
কিন্তু আমাদের গর্ব এই যে, আমরা

আপনার ব্যাঙ্ক

আপনার শুভেচ্ছাই
আমাদের সবচেয়ে বড় মূলধন। আমাদের
সবচেয়ে বড় পুরস্কার আপনার
সন্তুষ্টি।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস:
৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

আমরা
সেবার সাথে
দিই
আরও কিছু

স্বধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

আধুনিকতম উপন্যাস

সরোবর

সবেমাত্র প্রকাশিত হ'ল।

অভাবগ্রস্ত একটি ছোট্টসংসার—তার তরুণ দম্পতীর জীবনে পড়েছে নৈরাশ্যের ছায়া। দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগ তাদের দুটি মনের মাঝখানে এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর খাড়া ক'রেছে—তাদের পারস্পরিক আকুতিকে যেন সফল হ'তে দিচ্ছে না। জীবনের মূল্যায়নে তাহ'লে কি ঐশ্বর্যের স্থানই সব চেয়ে উচ্চ? 'সরোবর'-এ পাওয়া যাবে তারই উত্তর।

দাম—২'৭৫

—প্রকাশিত হইয়াছে—

অধ্যাপক ডঃ শ্রীবিমলকান্তি সমদ্দার, এম. এ, ডি-ফিল্,
কর্তৃক সম্পাদিত

বঙ্কিমচন্দ্রের

কপালকুণ্ডলা ৩৲

গিরিশচন্দ্রের

প্রফুল্ল ৪৲ জনা ৪৲

দ্বিজেন্দ্রলালের

চন্দ্রগুপ্ত ৪৲ সাজাহান ৪৲
মেবার-পতন ৪৲

সারগর্ভ ভূমিকা, চরিত্র-আলোচনা ও টীকাসহ ছাত্র-ছাত্রীগণের পক্ষে মূল্যবান ও অপরিহার্য সংযোজন।

ভারতবর্ষের সূচী

ষষ্ঠপঞ্চাশত্তম বর্ষ—প্রথম খণ্ড—চতুর্থ সংখ্যা

আশ্বিন—১৩৭৫

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

ভারতবর্ষের সূচী

ষষ্ঠপঞ্চাশত্তম বর্ষ—প্রথম খণ্ড—পঞ্চম সংখ্যা

কার্ত্তিক—১৩৭৫

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

ভারতবর্ষের সূচী

ষষ্ঠপঞ্চাশত্তম বর্ষ—প্রথম খণ্ড—ষষ্ঠ সংখ্যা

অগ্রহায়ণ—১৩৭৫

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

বিজ্ঞপ্তি

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী "ভারতবর্ষ" পত্রিকার মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়ক বিবরণ

১। প্রকাশনার স্থান—২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট), কলিকাতা—৬।

২। প্রকাশনার সময়-ব্যবধান—মাসিক।

৩। মুদ্রাকরের নাম—শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য
জাতি—ভারতীয়
ঠিকানা—২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট), কলিকাতা—৬

৪। প্রকাশকের নাম—শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য
জাতি—ভারতীয়
ঠিকানা—২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালি শ ষ্ট্রীট), কলিকাতা—৬

৫। সম্পাদকের নাম—(১) শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
জাতি—ভারতীয়
ঠিকানা—কামারহাটি, ২৪ পরগণা।
(২) শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়
জাতি—ভারতীয়
ঠিকানা—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

৬। যে সকল অংশীদার মোট মূলধনের এক-শতাংশের অধিক অংশের অধিকারী তাঁহাদের প্রত্যেকের নাম ও ঠিকানা—

(১) শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬, (২) শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬, (৩) শ্রীরমেন-কুমার চট্টোপাধ্যায়—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬, (৪) শ্রীদীপেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ওরফে শ্রীপ্রদীপ-কুমার চট্টোপাধ্যায়—২০৩।১।১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬, (৫) শ্রীমতী প্রভা দেবী—২০৩।১।১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬।

আমি শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি উপরোক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

১লা মার্চ্চ। স্বাক্ষর—শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য

লেখ-সূচী

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের

সতীশঙ্কর রায়ের সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা বলে কেউ বলে, তিনি ছিলেন পরোপকারী, পরের জন্যে অনেক কিছু করেছেন, বাড়ির চাকরকে অফিসের বেয়ারা ক'রে দিয়েছেন। কেউ বলে তিনি ছিলেন একজন ডাকাত, পরের ধন লুটেপুটে খাওয়াটাই ছিল তাঁর কাজ। লোকে তাঁকে ভয় ক'রতো যেন সাপ বা বাঘের চেয়েও বেশি। আবার কেউ বলে মেয়েদের নিয়ে তিনি অনেক ঘাঁটাঘাঁটি ক'রেছেন—ব'লতে গেলে একেবারে পোকা ছিলেন।

উৎপলের কাছে সতীশঙ্কর এক বিষম সমস্যা। কার কথা শুনে সে তাঁর জীবনী লিখবে? যে লোক প্রথম জীবনে দেশের জন্যে জেল খেটেছেন, পরবর্তী জীবনে অধিষ্ঠিত হ'য়েছেন যশ ও প্রতিষ্ঠার উচ্চ আসনে, তিনি আবার সহসা আততায়ীর হস্তে নিহতই বা হ'লেন কেন? এই "কেন" সম্বন্ধে তাঁর সুন্দরী তরুণী বিধবা স্ত্রী-ই বা

সৌম্যেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

মজার মজার খেলা

বিজ্ঞানের নানা রকম কল-কৌশলের সাহায্যে মজাদার খেলা দেখিয়ে সকলকে চমৎকৃত করার মত বই। শেখা ও খেলার কাজ একই সঙ্গে চ'লবে।

কিশোরদিকে উপহার দেওয়ার পরম উপযোগী।

নূতন ধরনের সাইজ। অসংখ্য ছবিতে ভরপুর।

দাম—৩

ভারতবর্ষের সূচী

ষষ্ঠপঞ্চাশত্তম বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড—১ম, ২য়, ৩য় সংখ্যা

পৌষ-মাঘ-ফাল্গুন—১৩৭৫

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

ভারতবর্ষের সূচী

ষষ্ঠপঞ্চাশত্তম বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড— ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

চৈত্র-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ—১৩৭৫-৭৬

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

লেখ-সূচী

আষাঢ়—১৩৭৫

প্রথম খণ্ড | ষষ্ঠপঞ্চাশত্তম বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

বিশ্বজগৎ ও ঈশ্বর ধারণা

শ্রীগুণধর পোদ্দার এম. এ,

'ঈশ্বর' শব্দটি 'ঈশ্‌' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন,—অর্থ শাসন করা, 'ঈশ্বর' শব্দের অর্থ—যিনি শাসন করেন, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রভু, শাসক ও নিয়ন্তা। সাধারণতঃ 'ঈশ্বর' অর্থে আমরা বুঝি তাঁকেই—যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা পালয়িতা ও সংহারকর্তা। "জন্মাদ্যস্য যতঃ" যা থেকে জীব ও জগতের উৎপত্তি, বৃদ্ধি, পরিণাম ও বিনাশ সাধিত হয়; যিনি বিশ্বপিতা, জগৎস্রষ্টা।

তিনি সমগ্র বিশ্বের কর্তা ও নিয়ন্তা। প্রত্যেক কার্যেরই একজন চেতন কর্তা থাকেন। কার্যদৃষ্টে কর্তার অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। কুম্ভ দৃষ্টে কুম্ভকারের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। বাসযোগ্য অট্টালিকা দৃষ্টে তার কর্তা বা নির্মাতার অস্তিত্ব অনুমিত হয়। যেহেতু অট্টালিকার মধ্যে কর্তার উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা (বাসযোগ্যতা) রূপায়িত হয়েছে। কুম্ভের মধ্যে কুম্ভকারের ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য (জল-আনয়ন) রূপ পেয়েছে। নির্মাতার ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য নির্মিত দ্রব্যের মধ্যে ব্যক্ত হয়, আর তাতে সচেতন কর্তার অস্তিত্বই প্রমাণিত হয়।

পরিদৃশ্যমান এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও একটি কার্য। জগৎ-রূপ কার্যে সর্বত্র উদ্দেশ্য অভিব্যক্ত। উদ্ভিদে, জীবে ও মানুষে—বিভিন্ন অংগ প্রত্যংগ অবয়ব ইন্দ্রিয়াদির সংখ্যা ও প্রকারভেদ—উদ্দেশ্য মূলক—নিজ নিজ উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন অনুসারে ক্রমবিকশিত হয়েছে। নিজ নিজ পরিবেশে ও

অবস্থায় বাসোপযোগী ইন্দ্রিয় ও অংগ-প্রত্যংগ উৎপন্ন হয়েছে। এই 'উদ্দেশ্য'—সচেতন সত্তার অস্তিত্বই সূচিত করে।

তা ছাড়াও—সমগ্র বিশ্বে নিয়ম ও শৃংখলা বিগুমান। বিশ্ব প্রকৃতিতে নিয়ম-শৃংখলা বিদ্যমান। প্রকৃতির রাজ্য বস্তুতঃ নিয়মেরই রাজ্য। এই নিয়ম—একজন সচেতন নিয়ন্তা ছাড়া সম্ভব নয়। সুতরাং বিশ্বনিয়ন্তা বা ঈশ্বর স্বীকার অপরিহার্য হয়ে পড়ে। প্রকৃতির নিয়ম বিশ্বনিয়ন্তারই রচনা। তাঁরই ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য বিশ্বপ্রকৃতিতে অভিব্যক্ত।

বিভিন্ন চিন্তাশীল ও দার্শনিকরা এই ভাবে Teleological argument দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এইরূপ Causal theory আরেকটি ঈশ্বর প্রতিপাদক যুক্তি।

প্রত্যেক কার্যবস্তুর-ই (effect) কোননা কোন কারণ (cause) আছে। বিনা কারণে কার্য ঘটে না। সমগ্র বিশ্বই এই কার্য কারণ নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। 'এই কার্য কারণ' কি? ধর—সম্মুখে একটি ঘট। এই সম্মুখস্থ ঘট একটি কার্য বস্তু (effect) এই ঘটের উৎপত্তি কী থেকে? মৃত্তিকা থেকে। ঘট—মৃত্তিকারই রূপান্তরিত অবস্থা। অতএব, মৃত্তিকা এখানে ঘটের 'কারণ' এবং ঘট হচ্ছে 'কার্য'। তেমনি hydrozen আর oxygen মিলিত হয়ে রাসায়নিক ক্রিয়ায় 'জলে' পরিণত হয়। এখানে 'জল' কার্য hydrozen-oxygen তার কারণাবস্থা। তিলে চাপ প্রয়োগে তৈল উৎপন্ন হয়। তিল ও তাতে চাপ-প্রয়োগ হচ্ছে তৈল উৎপত্তির কারণ। তৈল কার্য (effect); 'তিল' কারণাবস্থা। তা হলে দেখা যাচ্ছে—কার্য, কারণেরই রূপান্তর। কার্যকে বলা যেতে পারে—ব্যক্ত বা রূপান্তরিত কারণ; আর 'কারণ' হচ্ছে—অব্যক্ত বা অপ্রকাশিত কার্য। কার্য, কারণেই অব্যক্ত-আকারে সুপ্তাকারে নিহিত থাকে, কার্যে তা ব্যক্ত হয়, সম্প্রসারিত হয় মাত্র। তৈল তিলের মধ্যেই অন্য আকারে নিহিত আছে। নতুবা, তিল থেকে কখনই তৈল উৎপন্ন হতে পারতো না। যা নেই—তা কখনও উৎপন্ন হতে পারে না সৃষ্টি হতে পারে না। তা না হলে সবকিছু থেকেই সব তৈল বা জল উৎপন্ন হতে পারতো। বস্তুতঃ 'শূন্য' বা 'অভাব' থেকে কিছুই জন্মেনা, অভিনব কিছুই উৎপন্ন হয় না, হ'তে পারে না। নূতন সৃষ্টি বলেও কিছু নেই। আমরা যাকে সৃষ্টি বা ধ্বংস বলি—তা বস্তুর রূপান্তর মাত্র। কার্যাবস্থা—পূর্বগামী কারণাবস্থারই রূপান্তর।

এই কার্য কারণ নিয়ম—relative বা আপেক্ষিক। বর্তমানে যা কার্য—তাই আবার পরবর্তী অবস্থায় 'কারণ'। বিশ্বজগৎ নিয়ত পরিবর্তমান। বর্তমানে জগৎ যে অবস্থায় বিরাজ করছে, তা-ই হচ্ছে পরবর্তী রূপান্তরিত জাগতিক অবস্থার কারণ। আর বর্তমান জাগতিক অবস্থার কারণ হচ্ছে—তার পূর্বগামী জাগতিক অবস্থা (তরলাবস্থা)। সেই পূর্ববর্তী অবস্থার কারণ—তারও পূর্ববর্তী উত্তপ্ত গ্যাসীয় অবস্থা। এইভাবে কার্য-কারণ সম্পর্ক আপেক্ষিক এবং অন্তহীন।

কিন্তু এইরূপ অনির্দিষ্টভাবে 'অনবস্থা' চলতে পারে না। আমাদের এক 'মূল কারণ'কে স্বীকার করতে হবে—যা, 'সর্বকারণের কারণ' (causa sui), তিনিই ঈশ্বর।

* * * *

ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে যে সব যুক্তি দেখানো গেল—একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে সেগুলি একেবারে অখণ্ডনীয় নয়। ধর্মবিরোধীদের কাছে সে সব যুক্তি সন্তোষজনক হবে না। কেন না—ব্যবহারিক জগতের যে কার্য-কারণ-সম্পর্ক বিদ্যমান—তাকে ঠিক সেই ভাবেই গ্রহণ করলে, এই Emperical casual relation, কোথাও শেষ হ'তে পারে না। তা অনন্তকাল ধরেই চলবে। হঠাৎ কোথাও এক বিশেষ কারণে থেমে যেতে পারেনা, সুতরাং মূল কারণে পৌছান যায় না।

আর যদিও বা 'মূল কারণে' Causa Sui) পৌছাই তবু ঐ মূল কারণ যে সচেতনই হবে—অচেতন বস্তু হবে না—এ বিষয়ে প্রমাণই বা কি? সেই 'মূল কারণ' ঈশ্বর না হয়ে অচেতন বস্তুও তো হতে পারে। সুতরাং Causal theory দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না।

Teleolagical argument বা Design theory দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এই যুক্তিও একেবারে অকাট্য নয়। এতে বলা

বিশ্বনিয়ন্তার ইচ্ছাই ব্যক্ত। কিন্তু বস্তুতঃ আমরা এ জগতে একদিকে যেমন নিয়ম, শৃংখলা, সামঞ্জস্য ও সুষ্ঠু বিন্যাস প্রত্যক্ষ করি (যা অব্যক্ত বুদ্ধির কর্ম), অন্যদিকে তেমনি অনিয়ম, বিশৃংখলা, অসামঞ্জস্য ও সংঘর্ষও বিদ্যমান আছে। তাই জগতে শৃংখলা বা সুসংবদ্ধতা আছে না বলে বরং বলা উচিত,—"শৃঙ্খলা ও সুসংবদ্ধতায় পৌছানোর জন্য অদম্য প্রচেষ্টা চলছে।" -তাই দার্শনিক Bergson-এর মতে, এই মহাবিশ্বে এক অব্যক্ত শক্তি—Vital impetus, বিভিন্নভাবে—উদ্ভিদে, প্রাণীতে, মানুষে—নানাপথে, নানা উপায়ে নিজেকে আত্মপ্রকাশ করার জন্য অবিরাম সংগ্রাম করছে। এই Vital force কোথাও রুদ্ধ (জড় পদার্থে) কোথাও অল্প প্রকাশিত (যেমন উদ্ভিদে), আবার কোথাও স্পষ্ট-ভাবে ব্যক্ত (প্রাণীতে, মানুষে)। সারা জগৎ জুড়ে এই 'Elan Vital' নিজেকে ব্যক্ত করার জন্য, আত্মপ্রকাশের জন্য অবিরাম সংগ্রাম করে চলেছে।

Evolutionist বা বিবর্তনবাদীদের মতে সমগ্র বিশ্ব, Evolution-এর মধ্যে দিয়েই সর্বক্ষণ পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। ক্রমবিবর্তনেই, Protoplasm বা আমীবা-রূপী জীবের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। আদিম জীবও ক্রম-বিবর্তিত হয়ে উদ্ভিদে, প্রাণীতে, পশুপক্ষী ও সর্বশেষে মানুষে পরিণত হয়েছে। সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে—Evolution কখনও Unconscious বা mechanical হয় না। Evolution-র পেছনে রয়েছে—সুপ্ত চৈতন্যের আত্মপ্রকাশ করার অদম্য আকাংক্ষা—Vital urge. এই Potential ও Infinite Vitality-ই সমগ্র বিশ্বে ক্রম-বিকশিত হয়ে চলেছে অনাদিকাল থেকে।

এই Evolution-এর সূত্র ধরে, তার গতি ও প্রকৃতি বিচার করে Semual Alexander, এক অদ্ভুত মতের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বলেন, বিবর্তনের গতি সর্বদা ক্রমোন্নতির দিকে। এই ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে এভাবে ভবিষ্যতে এমন এক উন্নতম শ্রেষ্ঠ জীবের আবির্ভাব হবে—যা দেবতা বা ঈশ্বর (Deity) নামে পরিচিত হবে। অবশ্য এরকম ঈশ্বর বা Deity-র আবির্ভাব ঘটতে এখন অনেক সময়। বর্তমানে দেবতা বা ঈশ্বরের কোনও অস্তিত্ব নেই।

'ঈশ্বরের স্বরূপ' ও 'জীব-জগতের সংগে তাঁর সম্পর্ক' সম্বন্ধে বহু দার্শনিক মতবাদ প্রচলিত আছে।

Pantheistic মতে ঈশ্বর ব্যতিরিক্ত কোন অস্তিত্ব নেই। জগৎ ও ঈশ্বর—সত্য এবং এক ও অভিন্ন। তিনিই জগৎরূপে পরিণত হয়েছেন। দার্শনিক Spinoza, এই মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। জগৎ, ঈশ্বরের অভিব্যক্তি। God = World, World = God.

জগৎ ও ঈশ্বর সম্পর্কে Pantheistic idea-ও যুক্তির দ্বারা গ্রহণ যোগ্য নয়। ঈশ্বরই জগৎ হয়েছেন, ভাল কথা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—ঈশ্বর যদি পরিবর্তনশীল জগতে পরিণত হন, তবে স্বীকার করতে হয়, ঈশ্বর পরিবর্তনশীল। ফলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বই বাধিত হয়। তাছাড়া, ঈশ্বর যদি জগতেই পরিণত হন, তবে ঈশ্বর ব'লে বর্তমানে আর কিছু থাকলেন না। পূর্বে যিনি ঈশ্বর ছিলেন, এখন তিনি নিঃশেষে জগৎ হয়েছেন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব আর এখন নেই। ঈশ্বর পরিবর্তনশীল হওয়াতে, তিনি অনিত্য।

হেগেল, রামানুজ প্রভৃতি দার্শনিকগণের মতে, জীব, জগৎ ও ঈশ্বর—সবই সত্য। জীব ও জগৎ—ঈশ্বরের প্রকাশ। রামানুজ, জগৎ ও ঈশ্বরের সম্বন্ধকে পাঁচপ্রকার সম্বন্ধের সংগে তুলনা করেছেন। ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে রয়েছে—(১) অংশাংশী সম্বন্ধ—জীব ও জাগতিক বস্তুসমূহ তাঁর অংশ (Parts) আর ঈশ্বর হ'লেন অংশী (Whole) (২) শরীর-শরীরী-সম্বন্ধ (Body & Sole) :—জগৎ তাঁর শরীর, আর ঈশ্বর শরীরী বা বিশ্বাত্মা, (৩) অংগাংগী-সম্বন্ধ (Organism and its organs), (৪) বিষয়-বিষয়ীসম্বন্ধ (Subject and objeect)—জগৎ হচ্ছে বিষয় আর ঈশ্বর বিষয়ী এবং গুণ-গুণী-সম্বন্ধ (Snbstance and attributes). এতন্মতে জীব, জগৎ ও ঈশ্বর—এ তিনই সত্য ও নিত্য। ঈশ্বর সর্বগুণের আকর। তিনি অনন্ত-কল্যাণ-গুণসম্পন্ন।

বিচারে দেখা যাবে, শ্রীরামানুজের এই বিশিষ্টাদ্বৈত-মতবাদও সন্তোষজনক নয়। ঈশ্বরের অংশ হতে পারে না। সান্ত বা সসীম বস্তুই অংশ দ্বারা গঠিত হতে পারে। অনন্তের অংশ সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ আংশিক বা সার্বিক কোন পরিবর্তনই ঈশ্বরের স্বীকার করা যায় না। কেন না তাতে ঈশ্বরের নিত্যত্ব ও অপরিণামিত্ব স্বরূপ থাকে না। তৃতীয়তঃ জীব ও পদার্থের (matter) অনাদিত্ব

ও নিত্যত্ব উক্তমতে স্বীকার করা হয়েছে। ঈশ্বর ছাড়া অপর যে কোনও সত্তার সত্যতা স্বীকার করলেই তার দ্বারা ঈশ্বরের অনন্তত্ব ক্ষুণ্ণ হয়। শরীর-শরীরী সম্পর্ক দ্বারা শ্রীরামানুজ বোঝাতে চেয়েছেন—যেমন শরীরের পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও শরীরস্থ যে অন্তর্যামী আত্মা তা নিত্য ও অপরিণামীই থাকে, তদ্রূপ শরীররূপ বিশ্বজগতের পরিবর্তন হ'লেও, যিনি বিশ্বাত্মা—তাঁর কোনও পরিবর্তন নেই। অতএব বলা যায় "ঈশ্বর পরিণামী ও অপরিণামী উভয়ই।" কিন্তু এরূপ মতও সুমঙ্গমম নয়। দেহ-মন প্রভৃতি অনাত্মবস্তুই পরিণামী। শুদ্ধ আত্মা তো সর্বদাই অ-পরিণামী, অপরিণামীত্ব তাঁর স্বরূপ। এবং আত্মা, অনাত্মবস্তু থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুতরাং আত্মার একসংগে পরিণামিত্ব ও অপরিণামিত্বের ধারণা—ভ্রান্ত। এই ভাবে ঈশ্বরের পরিবর্তনশীলতা সিদ্ধ হয় না। "ঈশ্বর পরিণামী ও অপরিণামী উভয়ই"—এরূপ উক্তি স্ববিরোধী (Self-Contradictory). সুতরাং অগ্রাহ্য।

তিনি পরিণামী ও অ-পরিণামী—এইরূপ পরস্পর বিরোধী বিশেষণ একই সময়ে একই বস্তু সম্পর্কে প্রয়োগ করা যায় না। দুয়ের মধ্যে একটি অবশ্যই মিথ্যা হবে। একদিকে নিত্য, অনন্ত ও অখণ্ড ঈশ্বর—অন্যদিকে, অনিত্য পরিবর্তমান জগৎ—এই উভয়েরই সত্যতা স্বীকার করা যায় না।

তিনি অনন্ত, এক ও অদ্বিতীয়। 'অনন্ত' দু'টি হতে পারে না। দু'টি অনন্ত স্বীকারে, একটির দ্বারা অপরটি সীমিত হ'তে বাধ্য। ফলে উভয়ই সান্ত হয়ে পড়ে। এক পরিণামশীল সত্তার স্বীকারে তদতিরিক্ত আর কোন বস্তুর সত্তা স্বীকার করা যায় না। এক অখণ্ড মহাসত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করলে পরিণামশীল জগতের মিথ্যাত্ব অবশ্যস্বীকার্য হয়ে পড়ে।

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জগতের যেরূপ অনুভূতি আমাদের হয়, তা বস্তুতঃ প্রাতিভাসিক। বস্তুর স্বরূপ, ইন্দ্রিয়গ্রামের দ্বারা ধরা পড়ে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সত্যতা—আক্ষেপিক, সুতরাং প্রাতিভাসিক। পরম সত্যকে ইন্দ্রিয় প্রকাশ করে না। বস্তুর যা স্বরূপ আমাদের ইন্দ্রিয় তা প্রকাশ না করে (রঙিন কাচের মত) অন্যরূপে প্রকাশ করে। আর এক বস্তুকে অন্যরূপে (যা নয় তাই) প্রকাশ করার নামই 'অধ্যাস' (illusion).

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় একই ব্যক্তির নিকট অথবা একই বস্তু বিভিন্ন জনের নিকট ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়। একজনের রসনায় যা স্বাদযুক্ত অন্যের কাছে তা-ই বিস্বাদ, একজনের কাছে যা শ্বেতবর্ণ—আরেক জনের কাছে (পিত্তরোগী) তা-ই হলুদবর্ণ। একই বস্তু এক অবস্থায় উষ্ণ, অন্য অবস্থায় শীতল বোধ হয়। আবার মানুষ যেরূপ পৃথিবীর রূপ রস গন্ধ অনুভব করে পশু পক্ষী কীট পতংগের ঠিক সেই অনুভূতি হয় না; কেননা, মানুষের ও ঐ সব জীবের ইন্দ্রিয়ের অবস্থা ও গঠন প্রণালী অনেকটা ভিন্ন প্রকৃতির। অতএব পৃথিবীর রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ এক কথায় সর্ব প্রকার ইন্দ্রিয়ানুভূতিই, আপেক্ষিক—relative to the Constitution of organism. এই আপেক্ষিক জগতে আমাদের ইন্দ্রিয়ের বাইরে গিয়ে বস্তুর প্রকৃতস্বরূপকে পরম সত্তাকে (ultimate nature) জেনে আসার উপায় নেই। সুতরাং যে জগতের জ্ঞান আমাদের ইন্দ্রিয়, আমাদেরকে দেয়—তা প্রাতিভাসিক; ব্যবহারতঃ সত্য প্রতীত হ'লেও পরমার্থতঃ (in relaity) মিথ্যা, ভ্রমমাত্র।

জগতের সত্যতা কোনরূপেই গ্রহণ করা যায় না। সুখদুঃখময় জগৎ সত্য হ'লে ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব দোষ উপস্থিত হয়। তিনি বৈষম্যের স্রষ্টা ও নির্দয়—এই দুটি দোষ তাঁর আসে। তিনি নির্দয় ও নিষ্ঠুর—কেননা দুঃখ কষ্টের সৃষ্টি করেছেন, তিনি পক্ষপাতশীল যেহেতু কাউকে সুখী কাউকে দুঃখী করে সৃষ্টি করেছেন। কেউ তাঁর প্রিয়, কেউ তাঁর শত্রু। ফলে, সাধারণ জীবের মতই ঈশ্বরেরও রাগদ্বেষাদি দোষ প্রমাণিত হয়।

প্রতিপক্ষী বল্‌তে পারেন—জীবের সুখ-দুঃখের কারণ হচ্ছে স্বকৃত কর্মফল বা ধর্মাধর্ম। ঈশ্বর কর্মানুসারে ফলপ্রদান করেন মাত্র। সুতরাং দোষ জীবের—ঈশ্বরের নয়।

এরূপ উত্তরও সন্তোষজনক নয়। জীব সৃষ্টির পূর্বে তো নিশ্চয়ই কোন প্রকার বৈষম্য ছিল না। প্রাক্তন কর্মও নেই। সুতরাং সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থায় ছিল অবিভাগ—বা সাম্যাবস্থা। সৃষ্টির পূর্বে বৈষম্যমূলক কর্ম না থাকায় সুখদুঃখাদি বৈষম্যও সৃষ্টি হতে পারে না।

যদি বল—সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় সকল জীবে সাম্য থাকলেও পরে প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য অনুসারে জীব শুভাশুভ কর্ম করতে থাকে এবং তদনুযায়ী সুখ দুঃখ ফল ভোগ করে,—এ এ উক্তিও সংগত নয়। ঈশ্বর কেনই বা বিভিন্ন জীবকে ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য প্রদান করলেন ? সুতরাং এর দ্বারা ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্বদোষ, নির্দয়তা ও বৈষম্য দোষের পরিহার হচ্ছে না।

দ্বিতীয়তঃ—শরীর ধারণ কর্মফলেই হয়, এখন সৃষ্টির পরে শরীরাদি বিভাগ হ'লেই কর্ম—আবার কর্ম হলেই শরীর ধারণ কোন্‌টি কোন্‌টির কারণ, তা নির্ণয় অসম্ভব। এখানে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে।

তৃতীয়তঃ, সৃষ্টি-ধ্বংস সত্য হলে—'অকৃতাভ্যাগম' ও 'কৃতপ্রণাশ'—এই দুটি দোষ উপস্থিত হয়। সৃষ্টিতে মুক্তাত্মারও জন্মগ্রহণ ও সুখ-দুঃখাদি ভোগ এবং ধ্বংস বা প্রলয়ে 'কৃতপ্রণাশ' (অর্থাৎ সঞ্চিত কর্মবীজের বিনাশ)—যা অসম্ভব।

ঈশ্বর হীন, মধ্যম ও উত্তম প্রাণী সৃষ্টি করায় তাঁর বিষমকারিত্ব দোষ আসে। যদি বলা যায়—কর্মানুসারেই তিনি হীন, মধ্যম ও উত্তম প্রাণীসৃষ্টি করেন, তথাপি সেরূপ ঈশ্বর অসিদ্ধ। কেননা, সেরূপ স্বীকারে বলতে হয়—জীবের কর্মানুসারে ঈশ্বরের প্রবৃত্তি, আবার কর্মসকল, ঈশ্বরেচ্ছানুযায়ী—এ দুয়ের কোন্‌টি গ্রাহ্য তা নির্ণয় দুরূহ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে—জীব জগৎ ও ঈশ্বরের সত্যতা যুক্তির দ্বারা সুসমঞ্জসভাবে কোনমতেই ব্যাখ্যা করা যায় না। ইতিপূর্বেও দেখানো হয়েছে, জগতের সত্যতা স্বীকার করা যায় না। এবং আমরা দেখেছি—যুক্তির দ্বারা গ্রহণ যোগ্য নয় অথচ প্রতিভাত হয়—তা-ই প্রতিভাস (appearance)—ভ্রম (illusion), পরমার্থতঃ তা অসৎ, (non-existent),

শ্রুতিতেও কথিত আছে—'ব্রহ্মজ্ঞানে ভেদময় জগতের অবসান হয়। জগৎ সত্য হ'লে জ্ঞানে তা অপগত হবে কেন ? সত্যজ্ঞানে মিথ্যা বস্তুই বিনষ্ট বা অপগত হতে পারে—সত্য বস্তু নয়। রজ্জুজ্ঞানে মিথ্যা সর্পভ্রমই বাধিত হয় ; তদ্রূপ সত্য ব্রহ্মজ্ঞানে মিথ্যা জগৎ ভ্রমই বিদূরিত হতে পারে। জগৎ সত্য হলে, জ্ঞানে তা বিদূরিত হবে কি প্রকারে ? অতএব দেখা যাচ্ছে, যুক্তির দ্বারা এবং শ্রুতিবল দ্বারাও ভেদমূলক জগৎ ও ঈশ্বর ধারণার সত্যতা প্রতিপন্ন হয় না। ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে বহু যুক্তি তর্ক ও প্রমাণের দ্বারা অদ্বৈতবাদী শ্রীশংকরাচার্য এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন যে—জীব জগৎ ও ঈশ্বর ধারণা, ভেদমূলক, সুতরাং মিথ্যা—ভ্রমমাত্র।

এখন কথা হচ্ছে—ঈশ্বর মিথ্যা হতে পারে, জগৎ মিথ্যা হ'তে পারে, কিন্তু তা 'সোনার পাথর বাটি' 'বন্ধ্যাপুত্র' বা 'আকাশ কুসুমের' মত অলীক নয়। ভ্রম বা প্রতিভাস যেখানে—সেখানে তার পেছনে কোন সত্তা নিশ্চয়ই থাকবে—যা প্রতিভাত হচ্ছে। একেবারে অলীক বস্তুর ভ্রমও হ'তে পারে না। 'বন্ধ্যাপুত্র' বা 'সোনার পাথর বাটির' ভ্রম কোনো কালেই সম্ভব নয়। 'শূন্য' থেকে কোন প্রতিভাস হয় না। এক বস্তুকে অন্যরূপে গ্রহণ করার নামই অধ্যাস। এই অধ্যাস 'শূন্য' থেকে হয় না, হতে পারে না। বস্তুতঃ 'শূন্য' বলে কিছু নেই। ব্যবহারিক জগতে আমরা যাকে 'শূন্য' বলি, তা আপেক্ষিক।—কোন এক বিশেষ কালে ও স্থানে বিশেষ দ্রব্যের অভাব। Absolute nothing বা 'অত্যন্তাভাব' সম্ভব নয়। আকাশও 'শূন্য নয়। মহাকাশও যে 'শূন্য' নয়, total void' নয়—তা আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরাও স্বীকার করেন। মহাকাশও সত্তা দ্বারা পূর্ণ। সমগ্র বিশ্বই এক ও অখণ্ড সত্তা দ্বারা পূর্ণ—যা সব কিছুরই মূল কারণ। বিশ্বব্যাপ্ত এক অখণ্ড ও অনন্ত মহাসত্তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। জীব, জগৎ ও ঈশ্বর—সব কিছুই ভ্রম হ'তে পারে কিন্তু এই ভ্রমের পেছনে এক সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হয়—যা ভ্রম রূপে প্রতিভাত হচ্ছে।

এই অদ্বয় সত্তা এক এবং অনন্ত। নিত্য, নির্বিকার ও নির্বিশেষ। সর্বপ্রকার বিকার রহিত। এই অদ্বিতীয় অখণ্ড সত্তাই 'ব্রহ্ম'। এই অদ্বয় সত্তাই একমাত্র সৎ। ব্রহ্ম ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় সত্তা নেই। 'বহু' বা 'নানা'র অস্তিত্ব নেই—"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।" ব্রহ্ম ভিন্ন সত্তা না থাকায় 'বহু' 'নানা' বা ভেদের অস্তিত্ব নেই। ভেদজ্ঞান অজ্ঞানমূলক। 'মায়া' বশে, অবিদ্যা প্রভাবে জীব 'এক'কে 'বহু' রূপে দর্শন করে। ভেদময় জগৎ—নাম-রূপে বিভক্ত জাগতিক বস্তু সকল—মায়িক, অজ্ঞান-প্রসূত। ব্রহ্মজ্ঞানে মায়া বা অজ্ঞান বিদূরিত হ'লে সে

বুঝ্‌তে পারে—"সোঽহং"—'আমিই সেই'—এক ও অদ্বিতীয় সত্তা। তাই বেদান্তের উপদেশ—'আত্মানং বিদ্ধি।" তুমি নিজেকে জান—তুমিকে? তুমি উপলব্ধি কর—তুমিই সেই। "তৎ ত্বম্ অসি।"

এই অদ্বয় জ্ঞানে প্রেম ভক্তি বা ভগবৎ-উপাসনার স্থান নেই। 'তুমি আমির' কোন সম্পর্ক নেই। কে কার সংগে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করবে? কে উপাসনা করবে? উপাসনারবস্তুই বা কি থাক্‌তে পারে?—উপাসক ও উপাস্য সেখানে এক। ধ্যানের বস্তুই বা কি? ধ্যাতাই বা কে? ধ্যান, ধ্যাতা ও ধ্যেয়—সেখানে অভেদ। এই অদ্বয় জ্ঞানেই মুক্তি। অনাবিল শান্তি। এই 'মুক্তি'ও আবার লাভ করার বস্তু নয়। 'মুক্তি,' লাভ করতে হয় না। কেন না জীব সর্বদা মুক্তই আছে। 'মুক্তি'ই আত্মার যথার্থ স্বরূপ। 'বন্ধন—মিথ্যা, অজ্ঞান প্রভব। তাই প্রয়োজন শুধু—আত্মজ্ঞান। 'তুমি কী'—তা ই জান। অজ্ঞানের দ্বারা তুমি আত্মস্বরূপকে ভুলে গেছ—এই ভ্রম বা অজ্ঞানকে দূরীকরণ—আত্মস্বরূপের উপলব্ধি।

এই অদ্বৈতজ্ঞান—ব্যবহারিক জগতের জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাধারণতঃ জ্ঞান বললেই প্রশ্ন আসে—কার জ্ঞান? জ্ঞাতা কে? জ্ঞানের বস্তুই বা কি? জ্ঞাতাজ্ঞেয় ছাড়া শুধু জ্ঞান তো থাকৃতে পারে না। 'জ্ঞান' আছে, অথচ জ্ঞাতা নেই বা জ্ঞেয় বস্তুও নেই—এ হ'তে পারে না।

কিন্তু বলা হয়েছে—এই অদ্বয় জ্ঞান—জ্ঞাতাজ্ঞেয় ভেদ রহিত, ও নির্বিশেষ। এরই নাম 'শুদ্ধজ্ঞান'। এই জ্ঞানে জ্ঞাতা নেই, জ্ঞেয় নেই। জ্ঞাতা-জ্ঞেয়—সব এক, অভেদ। এখানে ভেদের মূল যে, 'আমি' বা অহং—সেও নেই। 'অহং অবিদ্যাপ্রভব, সর্বপ্রকার ভেদ সৃষ্টিকারী। অজ্ঞানপ্রভব এই 'অহংকার' বা আমি'-র বিনাশ হ'লেই—শুদ্ধ জ্ঞান (Pure conscionsucss)—জ্ঞাতাজ্ঞেয় ভেদ রহিত নির্বিশেষজ্ঞান। ইহা আত্মসত্তার বিনাশ নয়—আত্মসত্তায় প্রতিষ্ঠা, ব্রহ্মসত্তায় প্রতিষ্ঠা।

এখানে জিজ্ঞাস্য হচ্ছে—'আমি' কে ছাড়া জ্ঞাতাজ্ঞেয় ভেদহীন জ্ঞান কি সম্ভব? অদ্বৈত বেদান্ত বল্‌বেন—নিশ্চয়ই সম্ভব। গভীর (স্বপ্নহীন) নিদ্রাকালে—সুষুপ্তিতে [illegible] জ্ঞান থাকেনা। জ্ঞেয় বস্তুও থাকেনা। এই অবস্থাকে তুমি সম্পূর্ণ জ্ঞানরহিত বা অচেতন (unconscious) বল্‌তে পার না। কেননা, চৈতন্য বা জ্ঞান সুপ্তাকারে, অব্যক্তভাবে বিদ্যমান থাকেই। ব্রহ্মজ্ঞান এই শুদ্ধজ্ঞান স্বরূপ। সর্বপ্রকার ভেদরহিত এক অখণ্ড সত্তা। নির্বিশেষ নির্বিকার নিত্য ও অনন্ত।

এইরূপ 'শুদ্ধজ্ঞান' সম্ভব কিনা,—এ সম্পর্কে সংশয় প্রকাশেরকোন কারণ নেই। বাস্তববাদী ও আধুনিক বিবর্তনবাদীরাও যুক্তিসংগত ও সুসমঞ্জসভাবে অনুধাবন করলে শুদ্ধজ্ঞানের সম্ভাব্যতা অস্বীকার করতে পারেন না। অসম্ভব বা অবাস্তব ব'লে উড়িয়ে দিতেও পারেন না।

সর্বপ্রকার জাগতিক ভেদ, নামরূপের বিভাগ—Cosmic Evolution-এর পরিণতি। Coamic Evolution আরম্ভের পূর্বাবস্থায় ছিল—পূর্ণ সাম্যাবস্থা—a state of equillibr iam—Formless and undifferenced—Infinite Potentiatityl (অব্যক্ত অবস্থা)—যখন নামরূপে কিছুই ব্যক্ত হয়নি, সেই অব্যক্ত প্রকৃতি, চেতন বা অচেতন কোনরূপেই বিশেষিত হবে না। সে অবস্থা অনির্বচনীয়। সেই মূল কারণকে পূর্ণচেতন পুরুষ বলা যায় না; কেন না তা জড় পদার্থের কারণ। আবার অচেতনও নয়—কেননা, তা-ই জীবজগতে চৈতন্যরূপে অভিব্যক্ত হয়েছে। সেই অব্যক্ত মূল মহাসত্তা চেতন না অচেতন?—এরূপ প্রশ্নই অবান্তর। আলো, অন্ধকার, চেতন অচেতন—এই সব বিরোধীগুণ Evolutionএর পরিণাম—evolued quality, Evolved quality দ্বারা আমরা non-evolued Sfate, বা বিকার রহিত মূল অব্যক্ত অবস্থাকে বিশেধিত করতে পারি না। পরিবর্তিত বা বিবর্তিত গুণ ও কার্য পরিবর্তন বিবর্তনের পূর্বাবস্থায় প্রকাশিত থাকে না। কার্য্যের গুণ ও ক্রিয়া, কারণাবস্থায় পাওয়া যায় না। এইরূপ প্রত্যক্ষলব্ধ অভিজ্ঞতা দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারি যে—সেই অ-বিবর্তিত, নির্বিকার, অ-পরিণামী মূল সত্তা—আলোক নয়, অন্ধকার নয়, চেতন নয়, অচেতনও নয়। তা সর্বপ্রকার বিকাররহিত, ভেদরহিত, জ্ঞাতাজ্ঞেয় ভেদহীন। অরূপ ও নির্বিশেষ।

শংকরাচার্যের মতে এই অপরিণামী সত্তা—নিত্য, সর্বদা একরূপ। ব্রহ্মের কোনরূপ পরিবর্তন স্বীকার করা যায়

না—তিনি সর্বদা ও সর্বত্র স্ব-স্বরূপে বিরাজমান। সর্বব্যাপ্ত ও অনন্ত। এই এক ও অদ্বিতীয় সত্তায় নিখিল বিশ্ব পূর্ণ। তিনি অভেদ ও একমাত্র সত্তা। ভেদ, মায়া-কল্পিত। ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, সুন্দর-অসুন্দর, পাপ পুণ্য, স্বর্গ-নরক—সব প্রতিভাস, অধ্যাস মাত্র। 'বহু' বা ভেদ—অজ্ঞান প্রসূত ; মিথ্যা। বস্তুতঃ সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নেই। আমাদের শোক দুঃখ, ভয়, হিংসা-রাগ-দ্বেষের মূল কারণ—অজ্ঞান—মিথ্যাকে সত্য বলে মনে করা—আত্মস্বরূপকে বিস্মরণ। কে কার জন্য শোক করবে? রাগদ্বেষ বা মোহের কারণই বা কি? কে কাকে ভয় বা হিংসা করে?—যেখানে এক, যেখানে তুমি-আমির কোন প্রশ্ন নেই—যেখানে জ্ঞাতাজ্ঞেয় অভেদ।

তাই অদ্বৈত বেদান্তের উপদেশ—তুমি নিজেকে জান, তুমি কে? 'আত্মানং বিদ্ধি'—তুমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত। এক অখণ্ড ও অনন্ত সত্তা। সর্বব্যাপ্ত ও নিত্য। জীব, জগৎ ও ঈশ্বর—এ সব ভেদ মায়াকল্পিত—অজ্ঞান প্রসূত। এক অখণ্ড সত্তা ছাড়া অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নেই। অনন্ত বিশ্বই, সেই এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মসত্তায় পূর্ণ। আর তুমিই সেই অদ্বিতীয় সত্তা—"তৎ ত্বম্ অসি, শ্বেতকেতো!"

ব্যাহৃতি মন্ত্র

৺অসিতকুমার হালদার

(অপ্রকাশিত রচনা)

ওঁ মহা-শব্দ ব্যোমে করি নমস্কার।
'ভূ' মাঝে রস-রূপে করুণা অপার॥
'ভূব' বিশ্ব সৃষ্টি তাঁরি অনন্তের দ্যুতি।
'স্ব' তাঁরি আত্মরূপে করিলাম স্তুতি॥
সেই সবিতারে বরি ধন্য হই আমি।
ধন্য হই তাঁরি ঐশী তেজেরে প্রণমি॥
তাঁরি ধী-শক্তি মোরে দিল যাঁরা আনি।
প্রেরণায় স্পর্শ তারে নতশিরে মানি॥

অসংসারী [উপন্যাস] শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* * * * * * *

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

তের

টাঙ্গা থেকে নেমে সুটকেশটি হাতে ঝুলিয়ে দশাশ্বমেধ ঘাটের পাশ দিয়ে যে কতকগুলো সরু গলি বিশ্বনাথের মন্দিরের বিপরীত দিকে চলে গিয়েছে, তারই একটার মধ্যে সমীর প্রবেশ করলো, পেছন পেছন চলেছিল মুণ্ডিত মস্তক রেণু। দুজনেরই মনের মধ্যে কেমন একটা আতঙ্কের শিহরণ চলছিল। পিসিমা কেমন আছেন, কি মনে করবেন? বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ একটা মেয়েকে নিয়ে—। সমীরের মনে হোল, সে ভুল করেছে, একটা চিঠি দিয়ে এলেই ভালো করতো। কিন্তু চিঠি দেওয়ার ত সময় ছিল না। সে যে বৃন্দাবন, আগ্রা, প্রয়াগ এই সব ঘুরে এত দেরী করে আসবে, তা ত আর আগে জানতো না। এমন সময় রেণু ডাকল দাদা পেছন ফিরে সমীর বল্লে, কি?

রেণু বল্লে, আমার কি পরিচয় দেবেন দাদা? আমাকে কোথায় পেলেন, কেনই বা নিয়ে আসছেন?

সত্যি। ঠিক এই ধরণের কোন চিন্তা সে আগে করে নি। পিসিমার কাছে যাব, তার জন্য যে কোন রিহার্সাল দরকার, সে কথা সমীর ভাবতেও পারে নি, কিন্তু রেণু ত শেষ সময়ে খুব দামী প্রশ্ন করে বসেছে।

রাস্তায় কোন লোক নেই। সমীর পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লে, কি পরিচয় দেব বল?

রেণু একটু চুপ করে থেকে বল্লে, কাশীতে এসে সত্য কথাই বলবো। বলবেন যে, দিল্লীতে যে বাড়ীতে আপনি ছিলেন, আমি সেই বাড়ীতেই আশ্রয় নিয়ে ছিলুম, পরে তাদের অত্যাচারে সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হওয়ায় আপনি দয়া করে আমাকে এখানে নিয়ে এলেন।

একটু ভেবে নিয়ে সমীর বল্লে, আচ্ছা। ওরা আবার হাঁটতে লাগল।

দু'পা গিয়েই রেণু আবার ডাকলে, দাদা।

'কি' সমীর থেমে গেল।

রেণু বল্লে, আমার মনে হয়, বৃন্দাবন, আগ্রার কোন কথা না বলে শুধু প্রয়াগের কথাটুকু বল্লেই বোধ হয় চলবে, কি বলেন?

পূর্ব্বের ন্যায় সমীর এবারও উত্তর দিলে, আচ্ছা। আবার চলতে সুরু করে দিলে।

ডান হাতের বাড়ীর রোয়াকের ওপর ছোট্ট একটা শিব মন্দির দেখে সমীর থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বাঁ দিকের দরজার ওপর তীক্ষ্ণভাবে দৃষ্টিপাত করে বল্লে, বোধ হয় যেন এই বাড়ীটাই হবে। ওঃ, এমন সব এক রকমের বাড়ী!

রাস্তার আলো বাড়ীর সামনের নম্বরের ওপোর ঠিক ভাবে পড়ে নি, দেশলাই জেলে সমীর নম্বর দেখে খুসি হয়ে গেল, বল্লে, ঠিক হয়েছে, এই বাড়ীটাই; রাত্রে যে চিনে আসতে পেরেছি, এই ঢের। এই বলে বন্ধ দরজায় কড়া নাড়তে লাগলো।

একটু পরে ভেতর থেকে নারী কণ্ঠের উত্তর এলো, কেগা। সমীর বল্লে, দয়া করে একটু দরজাটা খুলুন না' আমি দোতলায় ভুবনেশ্বরী দেবীর ঘরে যাব। রেণু সমীরের পেছনে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ভেতরের নারীকণ্ঠ বিরক্ত হয়ে বল্লে, বাবারে বাবা দরজা যদি একটু বন্ধ করার উপায় আছে! রাতদুপুর পর্য্যন্ত নিস্তার নেই? তারপর সুরথ সুরথ বলে কে এক অজানা সুরথকে সেই বৃদ্ধা ডাকাডাকি সুরু করে দিলে।

কিন্তু সুরথের কোন সাড়া পাওয়া গেল না, পরিবর্তে দোতলা থেকে আর এক বৃদ্ধা হেঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে দিদি, এত ডাকাডাকি কেন?

সঙ্গে সঙ্গে নিচে থেকে পূর্ব্বের বৃদ্ধাটি বল্লে, ঐ তোমার কাছেই কে যেন এসেছে ভুবনদি', দরজাটা খুলতে হবে। আমার আবার বাতের শরীর, একবার শুলে আর উঠতে পারি না।

পিসিমা ভুবনেশ্বরী ওপোর থেকে বল্লেন, আমার কাছে! তবে বোধ হয়—আচ্ছা যাচ্ছি।

সামনের বাড়ী অর্থাৎ যে বাড়ীর রোয়াকে শিবমন্দির আছে সেই বাড়ীর একতলার একটা ঘরের জানালা খুলে একটা বুড়ো কাশতে কাশতে খুব খানিকটা নিষ্ঠীবন ছুঁড়ে ফেল্লে রাস্তার ওপোর। কে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, সে বিষয়ে তার আদৌ কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তারপর কিছুক্ষণ ধরে গলার ঘড়ঘড়ানি সাম্‌লে নিয়ে রাস্তার আলোয় দাঁড়িয়ে থাকা দুই মূর্তিকে দেখে জিজ্ঞাসা করলে, দাঁড়িয়ে কে ওখানে, কাকে চাও তোমরা?

সমীর সেদিকে চেয়ে দেখলে। রেণু মাথার কাপড়টা আর একটু টেনে দিলে। এ তরফের কোন উত্তর না পেয়ে বুড়ো বল্লে ভালো তো আপদ দেখছি, রাতদুপুরে দরজা ভাঙ্গাভাঙ্গি করছে, অথচ কথারউত্তর নেই। কে হে বাপু তোমরা, কাকে চাও?

সমীর বল্লে, আমরা এই বাড়ীতে এসেছি, ভেতর থেকে সাড়াও পেয়েছি।

বুড়ো দমবার পাত্র নয় বল্লে, তোমরা কি ভুবনেশ্বরীর কাছে এসেছো; তুমি কি ওর ভাইপো?

সমীর একটু বিস্মিত ভাবে বল্লে, হ্যাঁ।

বুড়া আর একবার জানালা দিয়ে ভালো করে দেখে বল্লে, তা ভালো, বেশ, বলে জানালাটা বন্ধ করে দিলে। এমন সময় এ বাড়ীর দরজাটা খুলে গেল এবং হাতে জলন্ত তেলের কুপি নিয়ে পিসিমা দেখা দিলেন।

সমীর বাড়ীর মধ্যে পা দিয়েই হেঁট হয়ে পিসিমাকে প্রণাম করলে, পেছন পেছন রেণুও এসে পিসিমাকে প্রণাম করতে যেতেই পিসিমা তাড়াতাড়ি দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বল্লেন, থাক্ থাক্ বাছা, ঐখান থেকেই ভালো।

রেণু হতভম্ব হয়ে উঠে দাঁড়াতেই পিসিমা ভাইপোকে বল্লেন, ওপোরে আয়। রেণুর দিকে চেয়ে বল্লেন, তুমি বাছা এ ধারের এই রোয়াকটায় আজ রাত্তিরে থাক, কাল সকালে তোমার যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে। বলে লম্পটা নীচু করে জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন। ভাঙ্গা রোয়াক, স্থানে স্থানে গর্ত হয়ে আছে, এবং চতুর্দিকে জল ছড়াছড়ি, মাঝে মাঝে কাদাও আছে।

সমীর বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল। পিসিমা একবারও জিজ্ঞাসা করলেন না যে, ও কে! প্রথম থেকেই এই রকম ব্যবহার, ব্যাপারটা কি? একটা ঢোক গিলে পিসিমার দিকে চেয়ে সমীর বল্লে, পিসিমা ও তবে—

থাক্, ওর গুণকীর্ত্তনে আর দরকার নেই, ওর পরিচয় আমি পেয়ে গেছি, ও আজ ঐখানেই থাকুক, তুই ওপোরে উঠে আয়।

সমীর রেণুর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে। রাস্তার আলোয় ওর পাংশুবর্ণ মুখখানা দেখে সমীর বড়ই বিব্রত বোধ করলে। পিসিমাকে অনুনয় করে বল্লে, পিসিমা, এই চলনপথে জলের ওপোরে কোন লোক কি সারারাত থাক্‌তে পারে—

ও! তা বাছা আমার এখানে ত খাট পালঙ্ক সাজানো নেই, যে রাজকন্যার জন্য সেগুলো সব এগিয়ে দেব। ওঃ সমীর, তোর বাবা অকলঙ্ক চরিত্র ছিল, তুই যে শেষে এভাবে নরকের দিকে এগিয়ে যাবি—বলেই ভুবনেশ্বরী তার দন্তহীন মুখে হাঁউমাউ করে কেঁদে ফেললেন।

পূর্ব্বের বাতগ্রস্ত বৃদ্ধাটি অল্প কুঁজো হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বল্লে, আর কেঁদো না ভুবনদি' আর কেঁদো না। কি করবে বল! বেশী বয়স অবধি ছেলেপিলেদের বিয়ে-থাওয়া না দিলে এই রকমই হয়। সমীরের দিকে চেয়ে বল্লে, তুমি বাবা কাজটা খুব ভাল করেছ কি? এক-জনের বাড়ী থেকে একটা কানী ঝিকে নিয়ে এভাবে দেশত্যাগী হওয়াটা কি তোমার মতন উপযুক্ত ছেলের শোভা পায়? রেণুর দিকে লক্ষ্য করে বল্লে, তুমিও তো আচ্ছা বেয়াড়া মেয়ে বাপু, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ? কেন

আজ রাত্তিরে তুই দশাশ্বমেদ ঘাটের সিঁড়ির ওপোর পড়ে থাকতে পারলি না। এটা ভদ্দরলোকের বাড়ী, এটা যে খান্‌কী-মাগীদের জায়গা নয়, তা কি তুই জানিস্ না? একতালার অন্যান্য ঘর থেকে আরও তিনটা বুড়ি কেউ গামছা পরে বুকে হাত চাপা দিয়ে, কেউ বা ঝোলার মধ্যে হাত পুরে মালা জপ করতে করতে, কেউ তার রূপার চশমাটা চোখে আঁটতে আঁটতে বেরিয়ে এলো। দু'তিন মিনিটের মধ্যেই সমস্ত ঘুমন্ত বাড়ীখানা কেচ্ছার গন্ধ পেয়ে লাফিয়ে জেগে উঠলো।

এতগুলো সমর্থক পেয়ে পিসিমা জেরা করার ভঙ্গীতে বল্লেন, হ্যারে সমীর, এই তিন দিন ধরে তুই কোথায় ছিলি? বলি দিল্লী থেকে কাশীতে আস্‌তে তিন দিন সময় লাগে?

সমীর প্রশ্নটা বুঝতে পারলে, কোথাও থেকে কোনো উপায়ে সমস্ত সংবাদটা পল্লবিত হয়ে পিসিমার কানে এসে পৌঁছয় এবং বন্ধুরা সকলেই এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হয়ে আছেন। রেণুর দিকে চেয়ে দেখলে, রেণু ঘাড় হেঁট করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ল্যাম্পের আলোয় তার চোখ-মুখ মড়ার মত সাদা ফ্যাকাশে বলে মনে হচ্ছিল।

সাহসে ভর করে সমীর বল্লে, পিসিমা, কোথা থেকে কে তোমায় কি খবর দিয়েছে জানি না, কিন্তু এইটুকু জেনে রাখো, যা শুনেছ, তা সত্যি নয়, আর তা ছাড়া আগে বসি, হাত মুখ ধুই, তারপর সব কথা বল্‌ছি। বল্‌বো বলেই ত এসেছি।

নরমসুরে পিসিমা বল্লেন, তা আয় না বাবা, ওপোরে আয়না, তোকে কি আমি কিছু বল্‌ছি, কিন্তু তোমার নবাবপুত্রী যে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, চলনপথে বস্‌তে বোধ হয় ওঁর অপমান হচ্ছে। রেণুর দিকে চেয়ে বল্লেন, কি করবো বাছা, ওপোরে আমার ঠাকুর আছে, সেখানে আমি তোমাকে কি করে উঠতে দিতে পারি বল? এবার ওর মাথার দিকে দেখে বল্লেন, ও, আবার মাথাও মুড়ানো হয়েছে! উঃ কত ভোলই যে জানা আছে, আমার ভাইপো, শুভ্র অকলঙ্ক পবিত্র, তার মাথাটা ত চিবিয়ে খেয়েছ, খেয়ে আবার নিজে মাথা মুড়িয়ে—

গামছা পরা বুকে হাত চাপা দেওয়া বুড়ী বল্লে, ঠিকই [illegible] ঢেলে দাও, বলেই ফোক্‌লা মুখে হা-হা করে হাস্‌তে লাগলো।

চশমা পরা বুড়ী বল্লে, মরণ আর কি, কেঁদে মরছে দেখ একবার। অন্য একজন বল্লে, তুমি তাহলে ঘোল তৈরী করে দাও, নইলে এত রাত্রে আবার ঘোল পাবে কোথায়?

বাতগ্রস্ত বুড়ী বল্লে, আমার মা ঘরে খানিকটা আমানি আছে, ঘোল না পেলে সেইটাই দিতে পারি। যে বুড়ি এতক্ষণ মালা জপ করছিল সে ঝোলা শুদ্ধ হাতটা মাথায় ঠেকিয়ে বল্লে, দুর্গা শ্রীহরি, ঘুম হয় নি বলে আপন মনে জপে বসেছিল, হঠাৎ এ কি পাপ রে বাবা! দুর্গা দুর্গা, এই বলে সে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লো।

রেণু খোলা দরজা দিয়ে আস্তে আস্তে বাইরে চলে গেল। সমীর তাড়াতাড়ি ওর পেছন পেছন এসে ডাকলে, রেণু-রেণু।

রেণু পেছন ফিরে বললে, আমি এই রোয়াকেই থাকি দাদা, আপনি বরং—

সমীর বল্লে, না, না তা কি হয়?

পিসিমা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বল্লেন, সমীর, বাবা সমীর, তুই কোথায় যাচ্ছিস্? ও মাগী ওর নিজের ব্যবস্থা ঠিক করে নেবে, ওদের জন্যে—

নিদারুণ রাগে সমীরের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছিল। মুখে কিন্তু কপট নম্রতা বজায় রেখে সমীর বল্লে, আস্‌ছি পিসিমা, বলে সুটকেশ হাতে করেই দরজা থেকে বেরিয়ে এলো। বেচারী সুটকেশটা নামাবারও সময় পায় নি।

পিসিমাও সঙ্গে সঙ্গে বেড়িয়ে এলেন, অন্যান্য বুড়ীরা ভেতরে এসে একসঙ্গে দল পাকিয়ে দাঁড়ালো। সকলেই সমীরকে ডাকাডাকি সুরু করে দিলে।

সমীর ঘুরে দাঁড়িয়ে অনুনয়ের সুরে বল্লে, পিসিমা, আজ রাত্তিরে আর গোলমাল কোরো না, আমরা যে কোনও জায়গায় আজ রাতটা কাটিয়ে দিয়ে কাল সকালে যা হয় করব'খন, বলেই বাড়ীর সিঁড়ি থেকে রাস্তায় নেমে পড়লো।

সমীর, ও বাবা সমীর, বল্‌তে বল্‌তে পিসিমাও সিঁড়ি থেকে রাস্তায় নাম্‌লেন। সামনের বাড়ীর সেই হাঁপানী ক্যাশিন বাড়ো পর্বের জানলাটা খুলে ভাঙা-গলায় ধমক

দিয়ে বল্লেন, আচ্ছা বেল্লিক ত হে, আমি তখন থেকে শুনছি তোমাদের বেহায়াপনা! কি রকম ছেলে হে তুমি। শিক্ষিত ভদ্রসন্তান, তুমি কিনা গিয়ে বাড়ীর একটা কানী ঝি মাগীকে বের করে এনে পিসিমার ঠাকুরঘরে ঢোকাতে চাও! ভাগ্যিস চিঠিখানা আগে এসে গিয়েছিলো। আর ভাগ্যিস্ ভুবনেশ্বরী চিঠিখানা আমাকে আগে থেকে পড়িয়েছিল, না হলে তুমি ত জাতি-ধর্ম্ম সব শেষ করে—

বুড়ো তার লম্বা বক্তৃতা শেষ করার আগেই আবার কাশতে সুরু করে দিলে। ওঃ, সেকি কাশী, যেন জীবন-মরণ পণ করে বুকফাটা কাশী কাশতে লাগলো।

সমীর তার জানলার দিকে একবার মাত্র চেয়ে দেখে সকলের সামনেই রেণুর হাতখানা ধরে জোর করে টান্তে টান্তে যেদিক দিয়ে এসেছিল সেই দিকেই চল্তে লাগলো। পিসিমা বাবা সমীর, বাবা সমীর বলে ডাকৃতে ডাকৃতে অল্প একটু এগিয়ে এসেই হাঁউমাউ করে কেঁদে রেণুর উদ্দেশ্যে যা'তা গালাগালি পাড়তে সুরু করে দিলেন। চশমাপরা বুড়ি বল্লে, ছেলের কিছুকি আর রেখেছে মা, ঐ ডাইনী মাগী ওকে একেবারে চিবিয়ে চুষে খেয়ে শেষ করে ফেলেছে। এর পর সমীরের কানে আর তেমন কোন ভাষা এসে পৌছালো না, কেবল একটা কোলাহল আস্তে লাগলো, আর গলির মোড় পর্য্যন্ত ওরা সেই বৃদ্ধের একটানা কাশীর আওয়াজটা স্পষ্ট শুনতে লাগলো।

বড় রাস্তার মোড়ে সরকারী দীপাধারের তলায় দুখানা সাইকেল রিক্সা ছিল। সমীর সোজা এসে একখানার ওপোর চড়ে বসে বল্লে, কোনো হোটেলে নিয়ে চল।

রেণু কি যেন বল্তে যাচ্ছিল। সমীর তাকে ধমক দিয়ে বল্লে, থামো। রিক্সাওয়ালাকে বল্লে, চালাও, যে কোন একটা হোটেলে নিয়ে চল।

দু'পা গিয়েই একটা চৌরাস্তার মোড়ে এক গাড়ী বারাণ্ডার তলায় দাঁড়িয়ে রিক্সাওয়ালা এক হোটেলের দরজা দেখিয়ে দিলে।

রিক্সাওয়ালাকে একটা সিকি ফেলে দিয়ে রেণুর হাত ধরে ওরা দুজনে হোটেলে ঢুকেই সামনের একটা চাকরকে বল্লে কামরা কামরা মিলেগা।

সে বাঙ্গালী, বল্লে, হ্যাঁ পাবেন। দোতলায় চেয়ার, টেবিল, পাখা ও আরসী দেওয়া একটা ঘরে এনে সে ওদের মুখের দিকে চেয়ে বল্লে; বাথরুম আছে হাত মুখ ধুয়ে নিন, আপনাদের খাবার নিয়ে আসি।

সমীর বল্লে, খাবার চাই না। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বল্লে, মানে খাওয়া আমাদের হয়ে গেছে। এখন শুয়ে পড়ি কাল সকাল থেকে তোমাদের হোটেলে খাবো।

বয় বল্লে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করবেন না?

আজ আর নয় কাল সকালে দেখা করবো।

বয় সন্দিগ্ধভাবে মাথা নেড়ে বল্লে, আচ্ছা। একটু থেমে বল্লে, এ ঘরের ভাড়া কিন্তু দৈনিক আট টাকা।

সমীর বল্লো আচ্ছা।

সুটকেশটা টেবিলের ওপোর রেখে পায়ের কাবলী চটীটা খুলে পাখাখানা পুরোদমে চালিয়ে দিয়ে হোটেলের খাটের ওপোর সমীর বসে দেখ্লে, রেণু চুপ করে দাঁড়িয়েই আছে। বিরক্ত হয়ে সমীর বল্লে, আর দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে। ঐ খাটখানা ঝেড়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো। না কি, কিছু খাওয়া-দাওয়া করবে।

শুষ্ককণ্ঠে রেণু বল্লে, না।

তবে শুয়ে পড়, আর দেরী করে লাভ কি? প্যাজ-পয়জার সবই ত গেল, এবার আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়।

চৌদ্দ

সমীর যে কতক্ষণ পরে ঘুমিয়ে ছিল, সে কথা তার মনে পড়ে না, কিন্তু ঘুমভাঙ্গার পর সে দেখলে ঘর অন্ধকার, জানলা দুটো আদৌ খোলা হয় নি, দরজার ছিটকিনি বন্ধ, পাখাটা পুরোদমে ঘুরছে, বাহিরে হয়ত ভোর হয়ে গেছে, কারণ লোকজনের শব্দ কিছু কিছু পাওয়া যাচ্ছে। একটু নড়ে চড়ে শুয়ে সমীর কাল রাত্রের সমস্ত ঘটনাটা আর একবার ভালো করে তলিয়ে ভেবে দেখ্তে চেষ্টা করলে। পিসিমার কাছে সমস্ত জিনিষটা বিকৃত বীভৎস করে কে এ ভাবে লাগালে? সাম্নের বাড়ীর বুড়োটা চিঠি পড়ে দিয়েছে, তাহলে এ চিঠি কে লিখ্লে। কই, কেউ ত এ বিষয় জানে না। তবে কি কোন সি আই ডি তার পেছনে লেগেছে! না, তা হতে পারে না, কারণ সি আই ডি হলে' তাকেই চ্যালেঞ্জ করতো, কোথায় কে পিসিমা আছে কষ্ট করে সেখানে চিঠি লিখ্তে যেতো না। তবে কি সদাশিবের কাজ? কিন্তু প্রথমতঃ সদাশিব জানে

না যে সে কোথায় যাচ্ছে, কি করছে, দ্বিতীয়তঃ পিসিমার বাড়ীর ঠিকানা ওরা পাবে কোথা থেকে? তারপর আরও এক কথা! ওর পিসিমা ত এরকম সাংঘাতিক প্রকৃতির লোক ছিলেন না। সাংসারিক জীবনে পিসিমার উদারতা ছিল অনেকখানি, আর দীর্ঘ দিন কাশীবাস করে পুণ্য-ধর্ম্ম করে তিনি কি এতই সংকীর্ণ, এমনই প্রাণহীন হয়ে পড়েছেন? কাল রাত্রে ওখান থেকে বেরিয়ে এসে সমীরের কিছুটা রাগ হয়ে ছিল রেণুর ওপোর, কারণ সেই ত চেয়েছিল পিসিমার কাছে কাশীতে যেতে। প্রস্তাবটা সে না করলে ত এই অপমান এই লাঞ্ছনা পেতে হোত' না। আচ্ছা, পিসিমা ওদের নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে যত খুসি গালাগালি দিতে পারতেন, চাই কি কান মলে দিতেও পারতেন, ঝাঁটার বাড়ী দু'ঘা বসিয়ে দিলেও সে আপত্তি করতো না, কিন্তু সকলের সামনে গোরগোল করে এরকম ছোটলোকী করলেন কেন? একবার মনে হোল, এখনই উঠে সে কেন পিসিমার কাছে যাক্ না, গিয়ে সব জিনিষটার একটা নিস্পত্তি করে আসুক না কেন, কিন্তু আবার মনে হোল, না, যে-পিসিমা একটা অসহায় মেয়েকে রাত দুপুরে কাশীর মত অজানা জায়গায় বার করে দিতে পারে, সে পিসিমার এমন কোন মনুষ্যত্ব আর নেই। যাতে করে তার কাছ থেকে কোন মীমাংসার আশা করা যেতে পারে। দূর হোক্ ছাই, এতকাল ত ছন্নছাড়ার মত ঘুরে ঘুরেই সমীরের জীবনটা কেটে গেছে, আবার না হয় সে ছন্নছাড়াই হয়ে যাবে, দরকার নেই তার পিসিমার স্নেহ, দরকার নেই তার চাকুরী জীবন, দরকার নেই তার কোন আশাপ্রদ ভবিষ্যৎ।

এরপর সমীর অনেকক্ষণ মড়ার মত পড়ে রইলো। বাড়ীর লোকজনদের শব্দ সাড়া বাড়তে লাগলো। দরজা জানালার ফাঁক দিয়ে দিনের আলোর রেখা দেখা দিলে। তখন সমীর সাহসে ভর করে ডাকলে রেণু।

রেণু বোধ হয় জেগেই ছিল, একডাকেই সাড়া দিলে, দাদা।

ঘুম হোল, প্রশ্নের মধ্যে অনেকখানি মমতা ছিল।

হ্যাঁ দাদা।

ওঠ, উঠে পড়।

এই যে উঠ্‌ছি কিন্তু উঠে কি হবে?

তাই ত ভাবছি। আচ্ছা বল দেখি, পিসিমাকে কে কি লিখেছে, যে পিসিমা অত ক্ষেপে গিয়েছেন।

রেণু বিছানার ওপোরে উঠে বসলো। বসে খুব ধীর ভাবে বল্লে, বোধ হয় আপনার বন্ধু সেই ভদ্রলোক আপনার সাইকেল নিয়ে ও বাড়ীতে গিয়ে সব কথা বলে এসেছেন, আর দিদিমণি পিসিমাকে সব জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন।

কথাটা শুনে সমীর ভাবলে, তাও ত হতে পারে। একটু থেমে বল্লে কিন্তু ঠিকানা ওরা পাবে কোথায়?

রেণু চুপ করে রইলো। সমীর বল্লে সে যাই হোক্, উঠে পড়, দরজা-টরজা খোল্। রেণু উঠলো, সুইচ টিপে আলো জ্বাললে, কিন্তু দরজা খুল্লে না। কেমন একটা অজ্ঞাত সঙ্কোচে যেন তার হাত চেপে ধরেছে। কি জানি কেন, সমীর নিজেও দরজা খুল্‌তে ঠিক চাইছে না। যেন দরজা খুল্‌লেই কাশীর সমস্ত সন্দিগ্ধ আবহাওয়া তাদের দুজনকে এখনই গ্রাস করে ফেল্‌বে।

সব শেষে সমীর উঠে জোর করে দরজাটা খুলে ফেল্লে। পাখাটা বন্ধ করে দিলে। যতটা সম্ভব সহজ হওয়ার চেষ্টা করে রেণুর কাছে এগিয়ে এসে বল্লে, খুব সহজ ভাবে ঘোরা ফেরা করবে, নইলে লোকে কিছু মনে করতে পারে। এরপর বাক্স থেকে তোয়ালে কাপড় বের ক'রে কলঘরে চলে গেল।

বেলা সাতটার সময় সমীর গেল ম্যানেজারের ঘরে। খাতায় নিজের নাম লিখে, রেণুর নাম লিখলে ভগ্নী বলে। কথায় কথায় জানিয়ে দিলে যে, বিধবা বোনকে নিয়ে প্রয়াগ আর কাশীতে ঘোরাতে এনেছে এবং এখানে দু'তিন দিন থাক্‌বে। এই ঠিক করে সমীর আবার নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখে রেণু পূর্ব্বের মতই শান্ত হয়ে হয়ে বসে আছে।

সমীর বল্লে কিরে, এখনও চুপ করে বসে আছিস্ যে। উঠে পড়। গঙ্গায় গিয়ে স্নান করবি না? স্নান করে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গিয়ে পূজো-টুজো করে কিছু খেতে হবে ত? কাল সেই এলাহাবাদে যা একটু খাওয়া হয়েছে, তারপর—

রেণু বল্লে, আপনি এখানেই খেয়ে নিন না দাদা, আমার জন্যে—

সমীর বল্লে, বাঃ কাশীতে এসে বিশ্বনাথ দর্শন না করেই খাবো? কি যে বলিস তুই? নে উঠে পড়।

রেণু ইতস্ততঃ করে বল্লে, সত্যি বল্‌ছি দাদা, আমার আর লোকালয়ে বেরুতে ইচ্ছে করছে না, বিশেষ করে আপনার সঙ্গে। তারপর গঙ্গার ঘাটে, কি বিশ্বনাথের মন্দিরে যদি পিসিমা কি ও বাড়ীর কোন লোকের সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যায় তাহলে—

তাহলে কি আর মাথাটা কেটে নেবে? যে যাই কিছু বলে বলুক রেণু, নিজের কাছে সাচ্চা থাকলে লোকের বলায় কি আসে যায়! আমি জানি এবং আমি বল্‌ছি যে, তোমার মত লোক হয়নি, হবে না। ঐ সব ধার্মিক লোকগুলো তোমার কাছে এসে শিখে যাক, ধর্ম্ম কাকে বলে। নে, ওঠ বলেই সমীর ওর পিঠে হাত দিয়ে ওকে ঠেলে তুলে দিলে।

আধঘণ্টার মধ্যে মুখ হাত ধুয়ে রেণু তৈরী হয়ে নিলে। দরজায় তালা লাগিয়ে ওরা দুজনে খালি পায়ে বেরিয়ে পড়লো দশাশ্বমেধ ঘাটের দিকে।

গঙ্গায় স্নান করতে ওদের শরীরের পনর আনা জ্বালা যেন জুড়িয়ে গেল। বিশ্বনাথের গলির মধ্যে রেণুর কি উল্লাস। দু'পাশে নানারকমের দোকান দেখ্‌তে দেখ্‌তে এসে ওরা ফুল বেলপাতা কিনে নিয়ে মন্দিরের মধ্যে ভিড় ঠেলে গিয়ে সেখানে অনেকক্ষণ ধরে পূজা করলে। তারপর ওখান থেকে বেরিয়ে এলো জ্ঞানবাপীতে। সেখান থেকে কূপের জল স্পর্শ এবং পান করে ফিরে এলো অন্নপূর্ণার বাড়ী। তারপর একরাশ প্রসাদী ফুল আর বেলপাতা নিয়ে বাইরে এসে গলির মোড়ের বড় দোকানটায় পুরী পেঁড়া এবং দুধ খেয়ে ওরা ফিরে এলো হোটেলে।

পথে আসতে আসতে রেণু বল্লে, দাদা, মিছামিছি ওখানে খরচ করে খেলেন কেন। হোটেলে খাবার দেবে না?

সমীর বল্লে, দেবে, কিন্তু তোকে ত দেবে না। কেন জানিস আমি যেমনই বল্লুম যে বিধবা বোনকে নিয়ে প্রয়াগ ঘুরে কাশীতে আসছি অমনি হোটেলওয়ালা বল্লে তাহলে উনি কি আমাদের ভাত খাবেন? আমার মনে পড়ে গেল, আমি বল্লুম, না, উনি দোকান থেকে ফল দুধ ইত্যাদি খাবেন। কেমন ভাল বলিনি।

প্রশংসনেত্রে রেণু সমীরের মুখের দিকে চেয়ে বল্লে ভালোই বলেছেন, ঠিকই হয়েছে। একটু হেসে আচ্ছা দাদা বিধবা বোন বলেই চিরদিন মনে রাখবেন ত এ জন্য হয়ত অনেক আঘাত সহ্য করতে হতে পারে?

সমীরের কথা শেষ হওয়ার পর একটু ভেবে রেণু বল্‌লে, বিধবা বোনেদের জন্য সকল দাদাকেই অনেক দুঃখ পেতে হয়। আমার মুখ চেয়ে সবটাই সহ্য করবার ক্ষমতা বিশ্বেশ্বর আপনাকে ঠিকই দেবেন।

হোটেলে ফিরে সমীর সেখানকার প্রাতরাশটাও ছাড়লে না। চা খাওয়া শেষ করে জুতো জামা পরে সে বল্‌লে, তুই বোস্ রেণু, আমি একটু ঘুরে আসি। দুপুরে এসে তোকে আর একবার ভালো করে খাইয়ে কাশীর বিখ্যাত জায়গাগুলো সব দেখিয়ে দেব।

রেণু ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো, বল্লে, দাদা—

সমীর ঘর থেকে বেরুতে যাচ্ছিল, ঘুরে দাঁড়িয়ে বল্‌লে কি?

আজই কি আমাদের জীবনের শেষ দিন?

কেন?

কাল কি হবে, কই সে কথা ত আপনি একবারও ভাবছেন না। আপনি কি চিরদিন ধরে আমাকে নিয়ে এইভাবেই হোটেলে থাকবেন?

হাস্‌তে হাস্‌তে সমীর বল্‌লে, তুই না আমার বিধবা ছোট বোন? তোর এসব ভাবনা কেন? যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি, ততক্ষণ এ সব চিন্তা করলে দাদার অকল্যাণ হয়, তা জানিস্? বলেই হাস্‌তে হাস্‌তে ঘর থেকে বাইরে এসে সে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিলে। তার জুতোর শব্দটা বারান্দার অপর প্রান্তে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

রেণু চুপ করে বসে রইলো। বসে বসে কত কথাই না তার মনে হতে লাগলো। প্রথম জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার পিতৃবিয়োগ হয়েছে, তারপর মামার বাড়ী কায়ক্লেশে পাড়াগাঁয়ে কোনরকমে ওদের চলে যেত।

তার মা, মামা, মামী কেউই তাকে দু'চক্ষে দেখতে পারতো না, কেবল এক দিদিমাই তাকে একটু যত্ন করতো। তারপর মাতৃবিয়োগ, সে কথা তার বেশ মনে আছে। একই সঙ্গে মা, মামা এবং তার নিজের মায়ের অনুগ্রহ হয়। মা যান সব আগে, পরের দিন মামা, তার প্রায় একমাস পরে সে সেরে ওঠে, কিন্তু একটি চোখ তার চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। গায়ের রঙ্ তার একেই ছিল কালো, অসুখ থেকে উঠে একেবারে যেন পোড়া কাঠ হয়ে গেল। দিদিমা রাতদিন কাঁদতেন, উঠতে বস্‌তে বলতেন পোড়ারমুখী মরতে পারলি না, তাহলেই জঞ্জাল মিটে যেত। তবু সে মরল না, দিদিমার যত্নে বড় হয়ে উঠ্‌লো। পাশের গাঁয়ের এক স্বদেশী ছোকরা জেল থেকে খালাস পেলে এই সর্তে যে, তাকে বিয়ে করতে হবে একমাসের মধ্যে। সেই ছেলেটি নিজে রেণুকে দেখে আগ্রহ করে বিয়ে করেছিল। বিয়ের কনে অবস্থায় রেণু যখন স্বামীর সঙ্গে প্রথম কথা কইতে যায়, তখন স্বামী বলেছিলেন, দেখ রেণু, তোমায় বিয়ে করেছি নিজে পছন্দ করে কেন জানো, কারণ তোমার ওপোর আমার কখনও মন বস্‌বে না, কারণ তোমার ওপোর কোন পুরুষের মন বস্‌তে পারে না। তুমি মনে রেখো, আমি চিরদিন দেশের জন্যে জীবন কাটাতে চাই, তবে পুলিশের খাতায় থাক্‌বে, আমি বিবাহিত। ওর কথা শুনে রেণু সেদিন শিশু-মনে বড়ই আঘাত পেয়েছিল, কিন্তু সেই স্বামীকেও সে পায়নি, অতি শীঘ্রই তাকে যে হারিয়েছে। বিয়ের কনে দিদিমার ঘরে ফিরে আসার পর আর তাকে শ্বশুরবাড়ী যেতে হয় নি।

রেণুর একে একে সমস্ত কথাই মনে পড়তে লাগলো। কোনটা স্পষ্ট, কোনটা ক্ষীণ,—অবজ্ঞাত জীবনের একটানা দুঃখময় কাহিনী। দিদিমার মৃত্যু, দিদিমার জ্ঞাতিদের কাছে নিতান্ত লাঞ্ছনাময় জীবন। উদয়াস্ত পরিশ্রম ও না-হক তিরস্কার, অনাহারে অথবা কদন্ন ভোজন। অনেকগুলি বছর ধরে একাদিক্রমে তিলতিল করে রেণুর অপমৃত্যু হয়েছে। শেষে একদিন তার সইমা এসে বললে রেণু, তোর একটা হিল্লে করে এলুম। ঐওপাড়ার ন'বাবুদের জামাই এসেছে দিল্লী থেকে। মস্ত লোক, অনেক টাকা, ছেলেপুলে কিছু নেই, মানে গৌরীর বর রে। আমি ঠিক করে দিয়েছি, গৌরী তোকে নিয়ে যাবে, ছোটবোনের মত যত্ন করে রাখবে, তুই তাদের কাজ-কর্ম্ম করে দিবি, সারা জীবন দুবেলা পেট ভরে খেতে পাবি, আর দেশ বিদেশে কত সব দেখবি, বেড়াবি, সুখে থাক্‌বি। যাবি ত?

রেণুর মামার জাঠতুত ভাজ অর্থাৎ যার আশ্রয়ে তখন সে ছিল, সে তখন বল্লে, নিলে ত? ঐ কানীর মুখ দেখ্‌লে অযাত্রা, ওকে আবার কেউ নেবে নাকি! পায়খানা সাফ করার জন্যও কেউ নেবে না।

রেণুর মায়ের ছেলেবেলাকার সই বুড়ী বলেছিল তুমি থামো বউ, ওর মত লক্ষ্মী মেয়ে খুব কমই হয়। কথা শুনে রেণুও সেদিন অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। সইমা যে তাকে এত ভালবাস্‌তো, তা ত সে এতদিনেও টের পায় নি। রেণু তখন জানতোই না যে, দালালী বা মাতব্বরী করার গন্ধ পেলে মানুষ যে মাল কাটাতে চায় তার সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। তা সে দালালীতে পয়সার সম্বন্ধ থাকুক আর নাই থাকুক।

তারপরের দিনেই রেণু তার পুরানো একখানিমাত্র কাপড় ও একটিমাত্র গামছা সম্বল করে সদাশিবের সঙ্গে যাত্রা করে। তদবধি প্রায় বৎসরকাল কৃপণ সদাশিব তাকে প্রতি বছর পূজার সময় মাত্র একখানা করে ধুতি কাপড় দিত। বাকী সারা বছর সে গৌরীর পুরাণো কাপড় জামা পরেই দিন কাটিয়েছে। জামা পরা সে দিল্লীতে এসে প্রথম সুরু করেছে। কিন্তু এতেই সে কত আনন্দে ছিল। এখানে ত দুবেলা সে পেট ভরে খেতে পেত, কেউ ত তাকে বকতো না আর কাজ সে যা করতো গৌরী আর সদাশিব তাতেই খুসি থাকতো, সুখ্যাতি করতো। এর চেয়ে বেশী কোন সুখ রেণু জানতো না, কাজেই দিল্লীতে কটা বছর সে কোন অভাব বোধই করে নি।

কিন্তু তারপর যে কোথা থেকে কি হয়ে গেল! সমীর এলো। গৌরী বল্লে সমীরবাবুকে ছোটদাবাবু বলে ডাকতে। তারপর গৌরীর সঙ্গে ছোটদাবাবুর সব ব্যাপার! মাগো মা! রেণু যেন লজ্জায় মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে যেতে চায়! দুঃখ কষ্ট যতই হোক, রাত্রে

একবার যেখানে হোক শুতে পারলেই এতদিন সে মড়ার মতো ঘুমাতো কিন্তু ছোট্‌দাবাবুর সঙ্গে দিদিমণির ব্যবহারগুলো যেন কি! ওকথা একবার ভাবতে সুরু করলে সারা রাতই রেণুর কেটে যেত, ঘুমের নামও আর মনে হোত না। কতবার সে গৌরীকে এ জন্য কত কথাই বলেছে। দিদিমণি কোনদিন হয়ত হেসেছে, কোন'দিন বা ভৎর্সনা করেছে, কোনদিন কথার কোন জবাব না দিয়েই অন্যদিকে চলে গিয়েছে। সেও বহুদিন বহুবার মনে করেছে, চুলোয় যাক্ গে, আমার কি,—কিন্তু ভাষা দিয়ে এ জিনিষ যত সহজে উড়িয়ে দেওয়া যায়, মন থেকে এ জিনিষ তত সহজে নস্যাৎ করা যায় না। কেমন একটা ঘৃণা, কি একটা লজ্জা অথচ কত বিপুল ও অমোঘ এক আকর্ষণ ছিল এইসব চিন্তার মধ্যে।

শেষে সেদিন আচার নিয়ে কি কাণ্ড! সেদিন আর রেণু স্থির থাকতে পারে নি। ব্রাহ্মণের ঘরের কুলবধূ গৌরী, তার এই কীর্ত্তি? রেণু কি করে সহ্য করবে! শেষে কিনা ছোট্‌দাবাবু এলো রান্নাঘরে। ছি ছি ছি এ আবার কি? রেণুকে জীবনে এমন মিষ্টি করে অনুনয় কেউ করেছে কি? বোধহয় তার চেহারাটাই তাকে বরাবর বাঁচিয়ে এসেছে, কিন্তু এবার? গৌরীর অপরাধকে লুকিয়ে রাখার জন্য অনুনয় করতে এসে রেণু যে কেমন করে সমীরের করুণাদৃষ্টিতে ধরা পড়ে গেল, ঠিক যে কখন কোন্ সময়ে রেণু ছোট্‌দাবাবুর শ্রীচরণে অজ্ঞাতসারে নিজেকে নিবেদন করে দিয়ে তার তিনসপ্তহকাল অদর্শন মুহূর্ত্তে মনে মনে তার চিন্তা করতে করতে তাকে একেবারে আপন করে নিয়েছিল, তা দুনিয়ার কেউই যেমন জানলে না, তেমনি সে নিজেও বোধহয় ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারে নি। কিন্তু গৌরীর বাড়ী ছেড়ে সে যমুনাতে এল কেন? এর ঠিক উত্তর রেণু কোন দিনই ভেবে পায় না। কিন্তু যখনই মনে হয়, এতদিন পরে ছোট্‌দাবাবু ফিরে এসে দিদিমণির ঘরে খাটের ওপর বসে—তখনই মনে হয় এ বাড়ীর চারিদিকে কে যেন বেড়া আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আগুনের হল্‌কা থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্য রেণু ঠিক দাবানলে ভীতা ত্রস্তা হরিণীর মত ছুটে পালিয়েছিল। ব্যাধের মুখে পড়বে, কি বাঘের পেটে যাবে, সে সব কথা চিন্তা করার সময়টুকুও সে পায়নি।

রেণু বসে বসে ভাবতে লাগ্‌লো গান্ধীঘাটের কথা! এই যমুনা, যমুনাতেই সে ডুবে মরার কল্পনা নিয়ে রাস্তার লোককে গান্ধীঘাট জিজ্ঞাসা করতে করতে ছুটে এসেছিল। এ ছাড়া সে করবেই বা কি? দিল্লীর আর কোন জায়গার নাম ত সে শোনেনি। শুধু গান্ধীকে পোড়ানো হয়েছিল গান্ধীঘাটে, মাত্র এইটুকুই সে শুনেছিল। কাজেই সে শ্মশানঘাট খুঁজে খুঁজে সেইখানেই দৌড়ে গিয়েছিল মরতে। তার মনে হয়েছিল কুতুব থেকে পড়ে মরার কথা, কিন্তু সে ত অনেক দূরে। মোটরে করে অনেকক্ষণ যাওয়ার পর তবে কুতুব। তারপর আবার শুনেছিল সেটা মুসলমানের জায়গা। এ জন্মে ত এই, তার ওপর মুসলমানের জায়গায় মরে আসছে জন্মে আবার—কিন্তু গান্ধীঘাটে তার মরা ত হলো না! রাত্রে গাছে উঠে গলায় ফাঁসী লাগিয়ে মরা যায় কি না, সেকথা ভালো করে ভাববার আগেই ছোট্‌দাবাবু গিয়ে হাজির! ওঃ কি ভালই না তাকে বাসে ঐ সমীর! তার জন্য কত অনুসন্ধান কত পয়সা খরচ শেষে কি অপমান লাঞ্ছনা, কিন্তু কই, তার ওপর ত কোন রকম ক্রোধ নেই। রেণুর চোখে জল এসে গেল। স্বামীর কথা মনে পড়ে গেল। সে বলেছিল, কোন পুরুষের মন তোমার ওপর পড়তে পারে না! মিথ্যে কথা কিন্তু—কিন্তু তার যে হাত পা বাঁধা, সে যে বিধবা! একটার পর একটা করে জলের ফোঁটা তার গাল বেয়ে মেঝেয় পড়তে লাগলো। সে বিধবা! সমীরের কোন প্রার্থনাই সে মেটাতে পারবে না। সমীর তাকে দিয়েই যাবে, পাবে না কিছুই। সমাজ তাকে হেয় করবে, নিজে সে উপবাসী থাকবে, সমীরের মন যাবে ভেঙ্গে, কিন্তু উপায় কি, সে যে বিধবা! ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা, বিশেষ করে তার বাবা ছিলেন শুদ্ধশ্রোত্রী ব্রাহ্মণ! তাঁর মেয়ে হয়ে—

চোখের জলে রেণুর দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে এলো, কিন্তু সে নিরুপায়। পাতানো বোন হয়ে কি চিরকাল থাকা যায়! সমাজ কি এটা বিশ্বাস করবে, সমীর কি এতে তুষ্ট থাকবে, বোনের মর্যাদা কি চিরকাল ওরা বজায় রাখতে পারবে! ভাবতে ভাবতে রেণুর মনে হোল, তার পক্ষে আত্মহত্যাই সবচেয়ে ভালো। দিদিমা বল্‌তো, 'মরবে সতী উড়বে ছাই,

তবেই তার গুণ গাই।' মরা ছাড়া তার অন্য কোন উপায় নেই, কিন্তু—

ঘরের দরজা খুলে প্রবেশ করলে সমীর। তার হাতে এক-ঠোঙা খাবার। রেণুর দিকে চেয়ে সে অবাক হয়ে বল্লে, এ-কি, একলা বসে বসে কাঁদছ কেন? কি হোল আবার?

রেণু তাড়াতাড়ি চোখ-মুখ মুছে নিয়ে বল্লে, না কাঁদিনি তো! কই কাঁদছি? বলেই তাড়াতাড়ি উঠে সমীরের হাত থেকে খাবারের ঠোঙা নিয়ে টেবিলে রাখতে রাখতে বল্লে, দাদা, আপনি এত খাবার আনছেন কেন বলুন ত।

আমার পেটুক বোনটির খাবার জন্যে, হাসতে-হাসতে সমীর উত্তর দিলে। তারপর গম্ভীরভাবে চেয়ারের ওপোর এলিয়ে বসে বলে, আর নয়, আজই কাশী ছেড়ে রওনা দিই চল। কাশীতে আবার মানুষ থাকে?

কেন দাদা? রেণু আর একবার লুকিয়ে মুখ মুছে নিজের খাটখানার ওপোর বসেই চট্ করে উঠে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে পাখাটা খুলে পূর্ব্বের স্থান দখল করলে। পূর্ব্ব প্রশ্নের ধুয়া ধরে আর একবার বল্লে, কেন দাদা, কি হোল কাশীতে?

নিজের চেয়ারের ওপোর খাড়া হয়ে বসে সমীর বল্লে, কি হোল? বলিস্ কি রে রেণু,—এত কাণ্ডর পরেও শেষে কি না তুই জিজ্ঞাসা করছিস্ কি হোল? ধন্যি এই মেয়েমানুষ জাতটা, উঃ। এত চট্ করেও ভুল্‌তে পারিস্ তোরা এমন সব মর্ম্মান্তিক অপমান! সমীর তা'র চেয়ারের ওপোর আবার এলিয়ে পড়লো।

সমীরের এই আবেগ দেখে রেণু একটু ঘাবড়ে গেল। ধীরে ধীরে বল্লে, যাক্‌গে দাদা, ওসব কথা মনে করে আর দুঃখ করবেন না। আমার অদৃষ্টই এই রকম—

সমীর বল্লে, আমি এখন এইমাত্র ওবাড়ী থেকেই আসছি। উঃ, কাশীবাস যে মানুষকে এমন অমানুষ, হিংস্র, বর্বর করে তোলে, তা আমি আগে জানতুম না।

রেণু ওর মুখের দিকে নিঃস্তব্ধেই চেয়ে রইলো!

সমীর বল্লে, আমি পিসিমাকে বল্লুম, পিসিমা যদি আমি খারাপই হতুম, তাহলে কি আমি রেণুকে নিয়ে তোমার কাছে আসতুম। তাকে বোঝালুম যে, আমি যা উপায় করি, তাতে একটা মেয়েকে নিয়ে ঘর ভাড়া করে থাকার ক্ষমতা আমার আছে, কিন্তু খারাপ নই বলেই আমি তোমার কাছে এসেছিলুম। আর তোর কথায় বল্লুম, যে তুই যদি খারাপই হতিস্, তাহলে কাশীবাস না করে অন্যত্র চলে যেতিস্, কিন্তু—

কিন্তু বলে সমীর থেমে গেল। রেণু একটু অপেক্ষা করে বল্লে, ওঁরা কি বল্লেন?

বল্‌বেন আবার কি? বল্লেন, ঐ কানীটার জন্যে মাথা ঘামিও না, ওকে কাশীর রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে গঙ্গা-স্নান করে চাকুরীতে ফিরে যাও। তাইতেই নাকি আমার ধর্ম্ম হবে। ওদের কথায় যেন মনে হয়, কানী, কুৎসিত এবং গরীব না হলে বোধ হয় ওরা এতটা আপত্তি করত না।

পিসিমা কি বল্লেন? রেণু ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলে।

পিসিমাই ত বল্লেন, আর বিশেষ করে পিসিমার সেই প্রিয় 'গুরুভাই', সেই হাঁপানী কাশীর বুড়োটা। সে বল্লে, ছেলেবেলায় তারও নাকি অনেক বদ্‌খেয়াল ছিল, কিন্তু এখন বাবা বিশ্বেশ্বরের কৃপায় সেসব নেশা কেটে গিয়ে—বলেই সমীর হেসে ফেল্‌লো। বুড়ো মরতে বসেছে, এখনও তার মন কিন্তু নরকের চেয়েও নোংরা হয়ে আছে। এমন সব কথা বল্‌লে, যা তোর সাম্‌নে উচ্চারণ করতেও পারবো না, অথচ পিসিমার কাছে সে দিব্যি বলে গেল।

একটু চুপ করে থেকে রেণু বল্লে, দাদা, একটা কথা বল্‌বো, শুনবেন কি?

বল্, শুনি।

রেণু চুপ করে রইলো।

বল্ না, চুপ করে রইলি যে!

শুনবেন ত? রেণু মুখ তুলে প্রশ্ন করলে।

শোনবার মতন হলেই শুনবো, সমীর অনেকটা নির্লিপ্তভাবেই উত্তর দিলে।

রেণু একটু থেমে যেন ভেবে ভেবে বলতে লাগলো। বল্লে, আমি বলছিলুম কি, পিসিমা যা বলেছেন তাই ঠিক। আপনি আপনার কাজে চলে যান, আর আমি এখানে দেখে শুনে কোথাও একটা কাজে লেগে যাই। যদি কখনও বিপদে পড়ি—

তাহলে দাদা বলে বোন হতে গিয়েছিলি কেন? তাহলে সদার বাড়ী কি অপরাধ করেছিল, সেখান থেকে মরার জন্যে গান্ধীঘাটে ছুটে গিয়েছিলি কেন?

রেণু চুপ করে রইলো। সমীর বল্‌ল, দেখ রেণু, আমি অনেক ভেবে দেখেছি। তোকে আমি ছাড়বো না। তোর মতো এমন মেতে আমি একটাও দেখি নি। তোকে আমি চিরদিন রাখবো, আজই তোকে দিল্লীতে নিয়ে যাবো। যে যাই কিছু বলুক, আমরা যত দিন বেঁচে থাক্‌বো, এক সঙ্গেই থাকবো, ভাই-বোন হয়েই থাক্‌বো। লোককে দেখিয়ে যাব যে পৃথিবীর সব মানুষই একরকমের নয়, অর্থাৎ শুধু মন্দ নিয়েই জগৎ নয়, এর মধ্যে ভালও আছে।

রেণু ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। সে তখন দুলছিল এক সন্দেহের দোলায়, কিন্তু মুখে কিছু বলতে তার সাহস হোল না। হঠাৎ সমীর লাফিয়ে উঠে পড়লো। ওর পিঠের ওপোরে একটা ফুলো-চড় মেরে বল্‌লে, নে, চটপট খেয়ে নে, আমিও হোটেল থেকে খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। তোকে একবার সারনাথটা দেখিয়ে নিয়ে বিকেলে বেণীমাধবের ধ্বজা, কেদারনাথ, দুর্গাবাড়ী ইত্যাদি সবগুলো দেখিয়ে রাতে যে ট্রেন পাই' তাতেই দিল্লী রওনা হই। আর বেশী অফিস কামাই করা চলবে না।

পিঠের ওপোর ওর হাত পড়তেই রেণু আজ শিউরে উঠলো।

[ক্রমশঃ

———

বিশ্বভাষা পরিক্রমা

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মালয় উপদ্বীপ একভাষী রাষ্ট্র; ভাষা নিয়ে গণ্ডগোলের আশঙ্কায় মালাই নেতা তুং কু আবদুল রহমান তামিল ও চীনা ভাষাকেও মালয়ে একদা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়েছিলেন; এক সময়ে ইংরেজি, মালাই, তামিল ও চীনা—চারটি ভাষাতে মালয়ের কাজ চলত; চীনাগরিষ্ঠ সিঙ্গাপুর এখন একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র; মালয়ে আর চীনা রাষ্ট্রভাষা নয়; সেখানে মালাই ও তামিল দুটি ভাষাই বহাল আছে বটে, কিন্তু ক্রমশ শুধু মালাই ভাষা প্রতিষ্ঠিত হবে, এমন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ইংরেজির স্থিতি নিতান্ত সাময়িক ব্যাপার।

মালয় উপদ্বীপ আর মালয়েশিয়া এক ভৌগোলিক সত্তা নয়; খাস মালয়ের সঙ্গে ভূতপূর্ব ব্রিটিশ বোর্নিও সংযুক্ত ক'রে এই নবীন মালয়েশিয়া রাষ্ট্রের জন্ম। মালয় আর ব্রিটিশ বা উত্তর বোর্নিওর ভাষা এক নয়। শ্যামদেশ বা থাইল্যাণ্ডের দক্ষিণে যে-মালয়, সেই ফেডারেশনের ভাষা মালাই হলেও বোর্নিও দ্বীপের ব্রিটিশঅধিকৃত উত্তরাঞ্চলের ভাষা স্বতন্ত্র। রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক কারণে মালাই যবদ্বীপীয় ভাষার সঙ্গে মিলিতভাবে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রভাষায় পরিণত। তাই ব'লে মালাই ইন্দোনেশিয়ার কোন অঞ্চলের ভাষা নয়। উত্তর বোর্নিও ভৌগোলিক দিক থেকে ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত।

ইন্দোনেশিয়া সোভিয়েট ইউনিঅন, চীন ও ভারতের মতো একটি বহুভাষিক, বহুজাতিক রাষ্ট্র; ভাষার ভিত্তিতে ইন্দোনেশিয়ার বিশ্লিষ্ট হওয়া উচিত; তা হলে মালাইকে ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের রাষ্ট্রভাষা করার আর কোন সার্থকতা থাকে না। ইন্দোনেশিয়ার যে রাষ্ট্রীয় ঐক্য, তাতে ইন্দোনেশীয় জনসাধারণের কোন কৃতিত্ব নেই। ঐ রাষ্ট্রীয় একতা নিতান্তই ডাচ্ সাম্রাজ্যবাদীদের দান। ডাচ্‌দের টলে যাবার পর ইন্দোনেশিয়ার একতার কোন ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সেখানে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের নানামুখী প্রণবতাও মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌ছে। রাষ্ট্রপতি সুকর্ণ অষ্ট্রোনেশীয় মহারাষ্ট্র গঠনের আশায় তাঁর "মাফিলিন্দো" পরিকল্পনা সফল করার উদ্দেশ্যে মালাইকে "বাহাসা ইন্দোনেশিয়া" করতে চেয়েছিলেন। ব্রিটেনের মালয়েশিয়া পরিকল্পনা তাঁর প্রচেষ্টার প্রত্যুত্তর। তাঁর পরিকল্পনা সফল করতে গিয়ে সুকর্ণ তাঁর সিংহাসন হারালেন। তাঁর জীবদ্দশায় মাফিলিন্দো রাষ্ট্র গঠিত হবে না। বস্তুত ভাষার ভিত্তিতে বহুধাবিভক্ত মালয়, ফিলিপিন ও ইন্দোনেশিয়ার পক্ষে এক রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া কোনদিন সম্ভবপর হবে না। ঐক্য ভেতর থেকে গ'ড়ে না উঠ্‌লে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া ঐক্য বেশিদিন থাকে না। এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বহুভাষিতা সত্ত্বেও যেটুকু রাষ্ট্রীয় ঐক্য এখনও দেখতে পাওয়া যায়, তা' স্থানীয় জনসাধারণের নিজেদের গ'ড়ে তোলা নয়, বহুনিন্দিত পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের দান। একথা ইন্দোনেশিয়ারপক্ষে যেমন, ভারতের পক্ষেও তেমন সত্য।

ভাষার ভিত্তিতে ইন্দোনেশিয়ার অন্তত দশটি রাজ্যে বিভক্ত হওয়া উচিত। জাভানিজ বা যবদ্বীপীয় বা কবি ভাষায় বহু লোক কথা বলে; সেই যুক্তিতে তাকে অবশিষ্ট ইন্দোনেশিয়ার ঘাড়ে রাষ্ট্রভাষারূপে চাপানো উচিত নয়। সুকর্ণের মতো জবরদস্ত নেতারও সোজাসুজি তা করার সাহস হয় নি!

সোভিয়েট ইউনিয়নে শতকরা ৫৮ জন রুশ, চীনে শতকরা ৬২ জন মান্দারিন, ইন্দোনেশিয়ায় শতকরা ৫৫ জন যবদ্বীপীয় ভাষা এবং ভারতে শতকরা .৫ জন হিন্দি মাতৃভাষারূপে ব্যবহার করে। তা সত্ত্বেও হিন্দি যে ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে সাময়িক স্বীকৃতি লাভ করেছে, তা ভারত-ইতিহাসের এক উৎকট বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। ভারতে যে বিভেদ প্রণবতা দেখা দিয়েছে, মাত্র এক

ভোটের সংখ্যাধিক্যে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করাই তার জন্যে দায়ী।

সিঙ্গাপুর এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন একটি রাষ্ট্র; ১৯৭১ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে ব্রিটেন অবশ্যই সিঙ্গাপুর থেকে তার শেষ সৈন্যটিও সরিয়ে নিতে প্রতিশ্রুত। তার পর সুয়েজ থেকে হংকং পর্যন্ত প্রসারিত এলাকায় যে বিরাট সামরিক শূন্যতার সৃষ্টি হবে তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্থানীয় এশীয় রাজ্যগুলির ওপর এসে পড়বে। জাপানের কবল থেকে যে-সিঙ্গাপুর রক্ষার জন্যে ব্রিটেনের উদ্বেগ ও অর্থব্যয়ের অবধি ছিল না, ভাগ্যের পরিহাসে ত্রিশ বছরের কম সময়ে সেই সিঙ্গাপুর চীনাদের হাতে চলে যাচ্ছে।

ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জও একাধিকভাষীদের রাজ্য; তাগালোগ ও বিসাইয়া সেখানে প্রায় তুল্যমূল্য; ইলোকানো অন্যতম উল্লেখযোগ্য ভাষা; এই তিনটির প্রত্যেকটিকে অবলম্বন ক'রে আলাদা আলাদা রাজ্য গঠিত হতে পারে।

ইন্দোনেশিয়াও সুমাত্রা, যব, বলি, সেলিবিস বা সুলাওয়েসি, সুন্দা দ্বীপাবলী ইত্যাদি নানা রাষ্ট্রে বিভক্ত হতে পারে। সেখানে এখন একদিকে রাষ্ট্রিক অখণ্ডতা সাধনের আন্দোলন চলেছে মালয়েশিয়ার অন্তর্গত উত্তর বোর্নিও, পোর্তুগিস তিমর, ব্রিটেন ও অষ্ট্রেলিয়ার অধীন অবশিষ্ট নিউ গিনি ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে। অন্য দিকে ভাষার ভিত্তিতে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনেরও আন্দোলন চলছে সুমাত্রা, সুলাওয়েসি প্রভৃতি অঞ্চলে। ডাচ্ নিউ গিনি বা নিউগিনি দ্বীপের পশ্চিমাংশ দীর্ঘকাল আন্দোলনের পর সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু পূর্ব নিউ গিনি বা ব্রিটিশ ও অষ্ট্রেলীয় নিউ গিনি এখনও ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয় নি। সমগ্র পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রায় দশ কোটি লোকের বাসস্থান; এর রাষ্ট্রিক বিন্যাস সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্যে ইন্দোনেশিয়া, ভূতপূর্ব ব্রিটিশ বোর্নিও, বর্তমান ব্রিটিশ নিউ গিনি এবং পাপুয়া বা অষ্ট্রেলীয় নিউ গিনি এলাকাগুলিকে মোট বারোটি ভাষাভিত্তিক রাজ্যে পুনর্গঠিত করা প্রয়োজন। সেখানে যে গৃহযুদ্ধ, ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা চলছে, মাত্র এই পথে তার অবসান আছে। সহস্র সহস্র দ্বীপে পরিপূর্ণ এই এলাকায় মাত্র একটি ঐক্য আছে—অষ্ট্রোনেশীয় ঐক্য। একই ভাষাগোষ্ঠীর লোক হওয়া ছাড়া এই বিপুলসংখ্যক দ্বীপসমষ্টির মধ্যে আর কোন ঐক্য নেই।

ফরমোসা বা তাইওয়ান দ্বীপকে চিআং-শাসিত চীনরূপে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে ধরতে হবে। তাইওয়ানের নিজস্ব ভাষা চীনের মূল ভূখণ্ডের ভাষা থেকে পৃথক্। সেখানে এখন খাস চীনের অধিবাসী বিরাট সৈন্যবাহিনী চিআঙের নেতৃত্বে জাঁকিয়ে ব'সে আছে। তাইওয়ান জাপানের কবল থেকে মার্কিনমিত্র চিআঙের হাতে গেছে বটে, কিন্তু ৭৯ বৎসর বয়স্ক ঐ বৃদ্ধ নেতার মৃত্যুর পর স্থানীয় চীনারা মূল ভূখণ্ডেরদিকেই আকৃষ্ট হবে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রে ছড়িয়ে থাকা অগণিত চীনাদের কথা বাদ দিলেও মূল মহাচীন রাষ্ট্রের বাইরে আরো দুটি চীনা রাজ্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর গ'ড়ে উঠল—তাইওয়ান ও সিঙ্গাপুর। সিঙ্গাপুরের দেড় মিলিঅন চীনার আন্তরিক আনুগত্য মূল ভূখণ্ডের প্রতি থাকাই স্বাভাবিক।

যদি কখনও চীনের সঙ্গে অবশিষ্ট বিশ্বের সামরিক কর্ণধারস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধ বাধে, তা হলে সিঙ্গাপুর থেকে হংকং পর্যন্ত বিস্তৃত সমস্ত দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার চীনা অধিবাসীরা মূল চীনা রাষ্ট্রের অনুকূলে পঞ্চম বাহিনীরূপে খুব ভালো কাজ করতে পারবে। ভারত-চীন উপদ্বীপ এককালে অষ্ট্রিকদের বাসভূমি ছিল। আজ এক ক্ষুদ্র কাম্বোদিআ ছাড়া এই অঞ্চলে অষ্ট্রিকদের আর কোন রাজ্য নেই। কাম্বোদিআর বাইরে মোন্-খ্মের ভাষাগুচ্ছের লোকদের অবস্থা চীন-তিব্বতীয় গোষ্ঠীর লোকদের চাপে লুপ্তপ্রায়। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার তাই বা থাই ও তিব্বতীয় গোষ্ঠীর লোকেরাও চৈনিক গোষ্ঠীর প্রচাপে ক্রমশঃ পীড়িত বোধ করছে। এশিয়া মহাদেশের মূল ভূখণ্ডের অদূরে দ্বীপময় এশিয়াতেও ক্রমবর্ধমান চীনাদের প্রতিরোধ করা অষ্ট্রোনেশীয় জাতিগুলির অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে বিশেষ প্রয়োজন।

বর্তমানে খাস ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্র দশটি প্রশাসনিক এলাকায় বিভক্ত; তাদের নামকরণ ভাষার ভিত্তিতে করলে এবং যবদ্বীপ থেকে বালি ও মাদুরা দ্বীপদুটিকে

আলাদা ক'রে নিয়ে আরও ছুটি রাজ্য গঠন করলে মোট বারোটি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়া যেতে পারে। বর্তমানের অপূর্ণ ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে উত্তর বোর্নিও, পোর্তুগিস তিমর ও ইঙ্গ-অষ্ট্রেলীয় পূর্ব নিউ গিনি সংযুক্ত হলেও বারোটি ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রের সংখ্যা ঠিক থাকবে।

এর পর ভৌগোলিক মহাচীন বা তিব্বতি ও চৈনিক ভাষাগুচ্ছের বিস্তারক্ষেত্রের কথা আলোচ্য। আবেগ-চঞ্চল না হয়ে আমাদের দেশের প্রত্যেক লোককে উপলব্ধ করতে হবে যে, চীন একটি বিরাট সাম্রাজ্য, এক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, যা বহু ভাষা ও জাতিকে পীড়িত ও গ্রাস ক'রে গঠিত। চীন নামে যে রাষ্ট্র আজ এশিয়ার বুকে প্রকাণ্ড বিস্ফোটকের মতো বিরাজমান, তা একটি একভাষী একজাতি রাষ্ট্র নয়। এর উদ্ভব বা সংগঠন বিশ্বকল্যাণের জন্যে নয়। বিশ্বমানবের পক্ষে চীনের একমাত্র উপযোগিতা এই যে, আজকের জগতে মার্কিন শক্তির বিরুদ্ধে চড়া সুরে কড়া কথা বলার সাহস এশিয়াতে এখন কেবল চীনেরই আছে। তা হলেও পৃথিবীর মানুষদের কল্যাণের জন্যে মহাচীন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব যতটা বাঞ্ছনীয়, তার চেয়ে বেশি দরকার এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিশ্লিষ্ট হয়ে ভাষার ভিত্তিতে তেইশটি রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া। তা ছাড়া প্রতিবেশী থাইল্যাণ্ড, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া ও সোভিয়েট এলাকার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিকে তাদের প্রাপ্য অঞ্চল সীমারেখা সংশোধনের দ্বারা ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। ভারতের কাছে চীন এক ইঞ্চি জমিও দাবি করতে পারে না। ভারত যদি কিছু দেয় তবে তা দেবে স্বাধীন তিব্বত রাষ্ট্রকে, পিকিংকে কখনই নয়। ভাষার ভিত্তিতে ভারতের কাছে পিকিঙের কিছু প্রাপ্য নেই।

এমন সব বাঙালি তরুণের অভাব নেই যারা দুর্ভাগ্য-বশতঃ মনে করে যে, চীন পৃথিবীর নিপীড়িত জনগণের মুক্তিবিধান করতে চায় এবং বাংলা দেশ যদি চীনের দ্বারা শাসিত হয় তা হলে ভালো ক'রে শাসিত হবে। জনসাধারণকে শোষণ করতে ব্যস্ত এমন সব সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের মধ্যে চীন একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। তার দ্বারা কোন পশ্চাৎপদ দেশের নিপীড়িত অধিবাসীদের মুক্তিলাভে সহায়তা হবার কোন আশা নেই।

চীন বলতে বা চীনা জনসাধারণ অর্থে বা চীনা ভাষা বোঝাতে সাধারণ বাঙালি ধ'রে নেয়, গোটা চীন প্রজাতন্ত্র বুঝি একটিমাত্র দেশ, সমস্ত প্রজাতন্ত্রবাদী জন-সাধারণ বোধ হয় ইংরেজ বা ফরাসির মতো একটি জাতি এবং একটিমাত্র চীনা ভাষা সর্বত্র কথিত। কিন্তু মাত্র পিকিঙের ভাষাকে চীনা ভাষা ব'লে বর্ণনা করা হয়, উত্তর চীনের অধিবাসী একটি জাতিকে সমগ্র চীনের অধিবাসী জাতি বলে ভুল করা হয়, এ'টি বিরাট সাম্রাজ্যকে, বহু বিজিত দেশের সমষ্টিকে এক মাতৃভূমি ভাবা হয়। প্রকৃত পক্ষে চৈনিক প্রজাতন্ত্র বা মাও-সে-তুঙের চীন তেরোটি বড় ভাষাভাষী খাস চীন, তিব্বত, সিনকিআং, জুঙ্গারিয়া, অন্তর্মঙ্গোলিয়া ইত্যাদি অঞ্চলের এক সাম্রাজ্যবদ্ধ রূপ। রুশ সম্রাট জারদের চেষ্টায় যেমন আজকের বৃহৎ রুশসাম্রাজ্য বা তথাকথিত সোভিয়েট ইউনিঅন গড়ে উঠেছে, তেমনি চীনা সম্রাটদের বহুযুগব্যাপী প্রয়াসে ঐ বৃহৎ চীনা সাম্রাজ্য গঠিত। রুশ ও চীনে আজ সম্রাটদের বদলে কমিউনিষ্টরা ক্ষমতা দখল করেছে ব'লে রুশ ও চীন আর সাম্রাজ্য নেই, এমন চিন্তা করা নির্বুদ্ধিতা। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর কমিউনিষ্ট শাসকেরা কি রুশে, কি চীনে অ-রুশ অ-চৈনিক অধীন জাতিগুলিকে মুক্তি দিয়ে পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা দান করেছে কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলেই সোভিয়েট ইউনিঅন ও প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করা যাবে।

রুশ সাম্রাজ্যে রোমানফ বংশের পরিবর্তে লেনিন ক্ষমতা হস্তগত করায় নবগঠিত সোভিয়েট ইউনিঅনে সম্রাটশাসনের অবসান ঘটলেও ক্ষুদ্র জাতিগুলির ওপর রুশ জাতির প্রভুত্বের অবসান হয়নি। চীন সাম্রাজ্যে মাঞ্চুবংশীয় সম্রাট হেনরী পুইই-র পতনের পর মান্দারিন-ভাষী পিকিঙের লোকদের সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের কোন পরিবর্তন হয় নি। জাপান এই অবস্থার সুযোগে পিকিঙের কর্তৃত্ব থেকে অবশিষ্ট চীনকে মুক্ত ক'রে এশিয়ায় নববিধান প্রবর্তন করতে চেয়েছিল। হেনরি পুয়ি নামে সম্রাট ছিলেন। ইউআন-শি-কাই, ফেং-উ-সিআং, চ্যাং-সো-লিন, সুন-ইআৎ-সেন, চ্যাং-সুএ-লিআং ডক্টর ওয়াং, চ্যাং-কাই-সেক, মাও-সে-তুং—এঁরা নামে

সম্রাট না হলেও কাজে অ-ম্যান্দারিনভাষী জাতিগুলির পক্ষে তা ছাড়া আর কিছু নন।

১৯৪১ সালে জাপান এশিয়ার পক্ষে যতটা ভয়ের কারণ ছিল, ১৯৬৮ সালে চীন অবশিষ্ট এশিয়ার পক্ষে তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়ের কারণ হয়ে আছে তার প্রধান কারণ, জাপানীরা স্বভাবে চীনাদের মতো ঔপনিবেশিক নয় ব'লে স্বদেশের বাইরে তারা তত প্রসার লাভ করে নি। কিন্তু দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে আর দ্বীপময় এশিয়ায় লক্ষ লক্ষ চীনা বসতি স্থাপন করেছে। সুতরাং এশিয়ার অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তার জন্যে চীনের ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রগুলিতে বিভক্ত হয়ে যাওয়া জরুরি দরকার, যদি মার্কিনি অভিভাবকতার অবাঞ্ছনীয় আশ্রয় নিতে না হয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, "বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?" জাপান ঐ ঘণ্টাটা বাঁধতে চেয়েছিল এবং কবি নোগুচি তার জন্যে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ চেয়ে অকারণে অন্যায়ভাবে তিরস্কৃত হয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ ও নেহ্রু চীনের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, ভাষাগত বিভাগ ও সাম্রাজ্যপদ্ধতির সংবাদ প্রায় কিছুই রাখতেন না; সুলভ আবেগের বশবর্তী হয়ে তাঁরা চীনের দুঃখে অকারণ অশ্রুসলিলে দু'নয়ন ভরিয়ে ফেলেছিলেন। নেহ্রুকে জীবিত থাকা কালেই তার জন্যে মর্মান্তিক অপমান সহ্য করতে হয়েছিল। বস্তুত চীনের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে হৃদয়ভঙ্গ তাঁর মৃত্যু ত্বরান্বিত করেছিল। জীবিত থাকলে রবীন্দ্রনাথও নিজের চীনপ্রীতির জন্যে অনুতপ্ত হতেন। আজ আবার চীনা বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার জন্যে এশিয়ার মুক্তিকাম জনগণকে তৎপর হতে হবে।

সমস্ত চীন প্রজাতন্ত্রকে ভাষার ভিত্তিতে স্বাধীন তেইশটি রাজ্যে বিভক্ত করা যায়। তাদের মধ্যে তেরোটি চীন-তিব্বতীয় ভাষাগোষ্ঠীর চৈনিক শাখার অন্তর্গত তেরোটি ভাষার ভিত্তিতে গঠনীয়; তিব্বতী শাখার তিব্বতি উপশাখার আটটি ভাষার ভিত্তিতে আরো আটটি রাষ্ট্র গঠন করা চলে। মাঞ্চুদের জন্যে আর একটি রাষ্ট্র অবশ্য গড়া যায়; সিনকিআঙে উইগুরদের জন্যে আলাদা স্বায়ত্তশাসনশীল ভাষাভিত্তিক এলাকা ইতিমধ্যে গঠিত। এ ছাড়া মঙ্গোলিয়ার অন্তর্মঙ্গোলিয়ার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। ভাষা-ভিত্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলিকে কোরীয়, মাঙ্গোলীয় কাজাক, উজবেক, তাতার, তাই, কিরগিজ, তাজিক ইত্যাদি এলাকাগুলি দেবার পর বর্তমান মহাচীনকে মোট তেইশটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করা যায়। এই রাষ্ট্রগুলির প্রত্যেকটিতে এক মিলিঅন বা তার বেশী লোক বাস করে। সবচেয়ে ছোট রাষ্ট্রে যেমন প্রায় এক মিলিঅন লোকের বাস, তেমনি সর্ববৃহৎ উত্তর চীন এলাকায় অন্তত চার শো মিলিঅন লোকের বাস।

এরপর মঙ্গোলিয়ার কথা বিবেচ্য। সোভিয়েট ইউনিঅন ও চীন থেকে সমস্ত মঙ্গোলভাষী এলাকা ফেরৎ পেলে অখণ্ড মঙ্গোলিয়া গঠন সম্পূর্ণ হবে। বুরিআত্-মঙ্গোল, কালমুক ইআকুত, তুভা প্রভৃতি জাতি মঙ্গোল শাখার অন্তর্গত হলেও এরা এখনও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের মতো লোকসংখ্যায় উপনীত হয় নি।

ভৌগোলিক ভারত বা ভারত উপ-মহাদেশ বাদে অবশিষ্ট এশিয়ায় মোট ৬৮টি একভাষী রাষ্ট্র গঠন করা যেতে পারে, এতক্ষণের অবশিষ্ট এশিয়া পরিক্রমায় সেটা দেখা গেল। আমাদের এই হিসেব থেকে রুশিয়াকে বাদ দিয়ে তুরস্ককে ধরা হয়েছে এবং তার কারণ আগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইউরোপে রুশিয়াসমেত তুরস্ক বাদে ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রের সংখ্যা যেমন ত্রিশটি হতে পারে, ভারত উপ-মহাদেশ বাদে অবশিষ্ট এশিয়ায় তেমনি তুরস্কসমেত রুশিয়া বাদে মোট ৬৮টি ভাষাভিত্তিক এলাকার সন্ধান পাওয়া যায়:—

(১) তুরস্ক (২) লেবানন (৩) আরব (৪) ইসরাএল (৫) কুর্দিস্থান (৬) ইরান (৭) আর্মেনিয়া (৮) আজের-বাইজান (৯) জর্জিয়া (১০) তাজিকিস্থান (১১) কির-গিজিয়া (১২) কাজাকস্থান (১৩) উজবেকিস্থান (১৪) তুর্কোমানিস্থান (১৫) বাশ্কির (১৬) চুভাশ (১৭) তাতার (১৮) জাপান (১৯) কোরিয়া (২০) ভিয়েৎনাম (২১) লাওদেশ (২২) কাম্বোদিয়া (২৩) থাইদেশ (২৪) শানরাষ্ট্র (২৫) কারেনিয়া (২৬) ব্রহ্ম (২৭) মালয় (২৮) সিঙ্গাপুর (২৯) তাইওয়ান (৩০) তাগালোগভাষী লুজন (৩১) বিসাইয়া-ভাষী মিন্দানাও (৩২) ইলোকানোভাষী অবশিষ্ট ফিলিপিন (৩৩) যব (৩৪) বালি (৩৫) মাদুরা (৩৬) বুগি (৩৭) বাতাক (৩৮) দাইআক বা বোর্নিও (৩৯) সুন্দা

দ্বীপমালা (৪০) আচিনিজ রাষ্ট্র (৪১) মেনাঙ্কাবুঅা (৪২) সাসাক (৪৩) মেনাদো (৪৪) পাপুয়া ৪৫) উত্তর চীন বা পিকিং-কেন্দ্রিক মান্দারিনভাষী প্রকৃত চীন রাষ্ট্র (৪৬) ক্যান্টন এলাকা (৪৭) সাংহাই এলাকা (৪৮) আময় (৪৯) সোয়াতাউ (৫০) হাক্কা (৫১) ফু-চাউ (৫২) ওয়েন-চাউ (৫৩) ইয়াংচাউ (৫৪) সুচুয়ান (৫৫) হান্কাউ (৫৬) নিংপো (৫৭) বু—উচ্চারণ অন্তঃস্থ ব-এর মতো (৫৮) তিব্বত (৫৯) চুআং (৬০) মিআও (৬১) ইং বা য়ি (৬২) পুয়ি বা পুইই (৬৩) তুং (৬৪) ইআও (৬৫) হুই (৬৬) সিনকিআং বা উইগুর জাতির রাষ্ট্র (৬৭) মাঞ্চুরিয়া (৬৮) মঙ্গোলিয়া।

এই রাষ্ট্রগুলির প্রত্যেকটি ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র বা অন্তত একভাষী রাজ্য হবে। কোথাও একভাষী অঞ্চল ধর্মীয় কারণে দুটি রাজ্যে পরিণত হয়েছে—যেমন, আরব ও লেবানন। কিন্তু তেমন সব ক্ষেত্রেও দুটি রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ধর্মাবলম্বী হলেও এক ভাষাভাষীই থাকছে। একভাষী এলাকা অন্যভাষী এলাকা থেকে পৃথক হয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের পর ধর্মীয়, ভৌগোলিক ও অন্য নানা কারণে আবার বিভক্ত হতে পারে—যেমন খ্রীষ্টানগরিষ্ঠ লেবানন সমভাষী সিরিয়া থেকে পৃথক্ হয়ে গেছে। তবু সেই বিভাগের পরও বিভক্ত খণ্ডগুলির প্রত্যেকটি একভাষী রাজ্যই থাকে। ইউ. এস. এ., ইউ. কে., অষ্ট্রেলিয়া, রোডেসিয়া, লাইবেরিয়া ইত্যাদি ইংরেজিভাষী রাষ্ট্র একভাষী হলেও ভৌগোলিক ব্যবধান ও অন্য নানা কারণে আলাদা রাজ্য হয়ে আছে। এশিয়াতেও একভাষী এলাকায় একাধিক রাষ্ট্রের এমন অনেক নমুনা চোখে পড়ে।

লোকসংখ্যা বাড়লে পরে আরও অনেক ছোট ছোট ভাষার ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠনের দাবি শোনা যাবে। বড় বহুভাষিক এলাকায় এমন সম্ভাবনা সব সময়ে থাকে। কয়েক দশক পরে সোভিয়েট ইউনিঅনে ও মহাচীনে তো বটেই, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ায় তেমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যাবে।

ইউরোপ ও বহির্বিশ্বের যে-অংশটাকে পাশ্চাত্য জগৎ বলা হয়, সেখানে ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রের প্রসার থেকে একটা ব্যাপার বোঝা যায়। যে সব অঞ্চল শিক্ষিত লোকের বাসভূমি, সে সব জায়গায় ভাষা তথা জাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্র বা একভাষী একজাতি রাষ্ট্র বা Mono-nation state সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু আফ্রো-এশীয় পশ্চাদ্বর্তী অঞ্চলে ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র এখনও সুদূরবর্তী। এশিয়ায় জাপান একভাষী একজাতি রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। রুশ ও মার্কিন শক্তিদুটি কিছু জাপানিভাষী এলাকা অধিকার ক'রে আছে বটে, কিন্তু জাপানের মতো এমন সংহত একভাষী একজাতি শক্তিশালী রাষ্ট্র সমগ্র বিশ্বেই দুর্লভ।

বিশ্বভাষা পরিক্রমায় আর একটা ব্যাপার সন্ধানীর চোখে পড়ে। কোন জাতিই নিজের এলাকায় ভিন্ন জাতীয় উপাদানকে বরদাস্ত করতে সম্মত হয় না। মানুষের পাকস্থলী যেমন মানুষের অথ দ্যকে জীর্ণ করতে না পেরে বহিষ্কৃত ক'রে দেয়, তেমনি কোন জাতি নিজেদের ভৌগোলিক অধিকারের মধ্যে বিদেশি জনসমষ্টির ভিন্ন জাতি ব'লে পরিচয় দিয়ে সমজাতিরূপে সম-অধিকার ভোগ সহ্য করতে পারে না। যে-কারণে বিখ্যাত বিপ্লবী রাসবিহারী বসু বলেছিলেন, "I want a general massacre of all the foreigners in India—আমি ভারতের সমস্ত বৈদেশিকদের সাধারণভাবে নিপাত কামনা করি," ঠিক সেই উত্তেজনায় অধীর হিটলার জার্মান রাষ্ট্র থেকে ইহুদিদের বিতাড়িত করেছিলেন। অল্পশিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে মিত্রশক্তির অনুকরণে হিটলারকে নাৎসি দানব আর রাসবিহারীকে ফ্যাশিষ্ট তাঁবেদার বলার রেওয়াজ আছে। কিন্তু দেখা যাক, বিজাতীয় ইহুদি উপাদান সম্বন্ধে সোভিয়েট ইউনিঅন ও চীনের মনোভাব কি রকম:—

"সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে যে কোন প্রকারের ধর্ম প্রচার করিতে দেওয়া হয় না। যেমন, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে জিহোভাপন্থী এক ধর্মসম্প্রদায় আছে। তাঁহারা সর্বপ্রকার রাষ্ট্রশক্তিই অস্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা কর্তৃপক্ষকে অস্বীকার করার মত প্রচার করেন, অরাজকতা প্রচার করেন, সোভিয়েত প্রথার বিরোধী রাজনৈতিক প্রচারকার্য চালান। তাঁহারা বিজ্ঞানচর্চারও বিরোধী। শিশুদের তাঁহারা বিদ্যালয়ে পাঠাইতে অস্বীকার করেন এবং অবাধ্যতার জন্ম শিশুদের উপর নির্মম পীড়ন চালাইয়া

থাকেন। এমন ঘটনাও দেখা গিয়াছে যে,বিদেশি গুপ্তচররা নিজেদের কুকার্যে জিহোভাপন্থীদের ব্যবহার করিয়াছেন। স্বভাবতই সরকারি সংস্থা এবং জনসাধারণ নিজেরাই জিহোভাপন্থীদের এই ধর্মপ্রচার সঙ্কুচিত করিয়া থাকেন।" (সোভিয়েত দেশ, ১৩শ খণ্ড, ১ম সংখ্যা, জানুআরি, ১৯৬২, পৃষ্ঠাসংখ্যা ৪।)

এই অংশটুকু পড়লে গ্যেবল্‌স ও আইখ্‌মান নির্মল হাস্যরসের উপকরণ লাভ করতেন!

যাঁরা সোভিয়েট ইউনিয়নের ইতিহাস পড়েছেন তাঁদের নিশ্চয় জানা আছে যে, সমগ্র সোভিয়েট এলাকার ইহুদিদের একত্র বসবাস করার জন্যে স্তালিন একদা সাইবেরিয়ায় বাইকাল হ্রদের তীরে এক অঞ্চল নির্দিষ্ট ক'রে দিয়েছিলেন। ঐ এলাকার নাম দেওয়া হয় "ইহুদি অঞ্চল।" জার-আমলে রুশিয়া পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলির মতোই ইহুদি-নির্যাতন বা pogrom-এর জন্যে কুখ্যাত ছিল। স্তালিন সে-অপবাদ মোচনের জন্যে এবং নাৎসি জার্মানির ইহুদি নির্যাতনের যে-দুর্নাম ছিল ঠিক তার বিপরীতে উপযুক্ত সুনাম অর্জনের আশায় সমস্ত রুশীয় ইহুদির একটা নির্দিষ্ট বাসস্থানের বন্দোবস্ত করলেন। তিনি আশা করেছিলেন, অন্তত সোভিয়েট ইউনিয়নবাসী সমগ্র ইহুদি জাতি Jewish Region বা ইহুদি অঞ্চলে গিয়ে বাস করবে। কিন্তু তিনিও ইহুদিদের ঠিক চিনতে পারেন নি। ইহুদিরা প্রথম প্রথম সেখানে গেলেও তাদের স্থায়ী লক্ষ্য ছিল কি ক'রে জর্দান নদীর দুই তীরে বাইব্‌লবর্ণিত এলাকায় নিজস্ব বাসভূমি গঠন করা যায়। সুতরাং প্যালেস্টাইনে ইহুদি বাসভূমি বা ইস্রাএল রাষ্ট্রের পত্তন হওয়ার পর রুশভূমির ইহুদিরা দলে দলে স্তালিনের নির্দিষ্ট এলাকা ছেড়ে ইসরাএলে পাড়ি দিল। তা ছাড়া সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের শ্যেনদৃষ্টির সামনে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়ে বাস করার পাত্র ইহুদিরা নয়। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেই বরং তাদের পঞ্চমবাহিনীসুলভ কার্যকলাপের সুবিধা। সুতরাং ইহুদিরা "ইহুদি অঞ্চল" পরিকল্পনা বানচাল ক'রে দিল। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে সোভিয়েট ইউনিয়ন সমেত সমস্ত পূর্ব ইউরোপে হিটলারের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে ইহুদি নির্যাতন ও ইহুদি বিতাড়নের ধুম প'ড়ে গেল।

পোল্যাণ্ড বহুকাল থেকে ইহুদি নির্যাতনের অপবাদ লাভ করেছিল। সাম্প্রতিক কালে ইহুদি সমস্যা সেখানে আবার প্রবল হয়ে উঠেছে। হিটলারকে ইহুদি নির্যাতনের অপবাদে কলঙ্কিত করার সময়ে এটা ভেবে দেখা মন্দ নয় যে, ইহুদিদের বিরুদ্ধে হিটলার যে-সব অভিযোগ এনেছিলেন, ঠিক সেই সব অভিযোগ সোভিয়েট কর্তৃপক্ষও করেছেন। ইহুদিদের বরদাস্ত করা পৃথিবীর কোন জাতির পক্ষেই সম্ভবপর হয় নি ব'লেই তাদের এক স্বতন্ত্র বাসভূমিতে একত্র ক'রে আবদ্ধ রাখা ভালো। তারা অবশ্য নিজেদের রাষ্ট্রের সীমারেখা সম্বন্ধে চূড়ান্তভাবে মনঃস্থির করতে অনিচ্ছুক যা আরবদের পক্ষে মর্মান্তিক ব্যাপার। হিটলারের মতোই আরবদেরও আজ এক অভিযোগ: ইহুদি রাষ্ট্রের সীমারেখা নিয়ত পরিবর্তনশীল।

গণতন্ত্রী চীন কি ভাবে ইহুদি-সমস্যা সমাধান করেছে দ্রষ্টব্য:—

"There was even a settlement of Chinese Jews in Honan until the middle of the nineteenth century. After the death of their Rabbi they became merged with the Chinese" ("China—all about it"-by Norman Freehill, pp. 34.)

"এমন-কি চীনা ইহুদিদেরও উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত হোনানে এক বসতি ছিল। তাদের ধর্মযাজকের মৃত্যুর পর তারা চীনাদের সঙ্গে মিশে যায়।"

শুধু ইহুদিদের নয়, জিপ্‌সিদেরও বিজাতীয় উপাদানরূপে কোন জাতি সহ্য করতে প্রস্তুত নয়। বিজাতীয় উপাদানগুলিকে বহিষ্কারের প্রক্রিয়া সর্বত্র সমান নয়। কামাল পাশার দ্বারা দীক্ষিত নবীন জাতীয়তাবাদী তুর্কি যখন দেখল যে অটোমান সাম্রাজ্য চিরকালের মতো লুপ্ত হয়েছে তখন তুরস্কের ভাঙন রোধ করার জন্যে সেখান থেকে অ-তুর্কি প্রত্যেক জাতির লোকদের নির্মমভাবে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। বুলগার, গ্রিক, আর্মানি, কুর্দ—কোন বৈদেশিকের সঙ্গে তুর্কিরা ভালো ব্যবহার করে নি।

শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নিজের ভাষা ও সাহিত্যের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি বৃদ্ধি পায়। তখনই প্রকৃত জাতীয়তাবোধ জেগে ওঠে। সে-বোধ ভাষার

ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন বহুভাষাবিৎ মনীষীর মুখেও শোনা যায়; হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন! ভারতীয় ভাষা ব'লে যখন কোন বিশেষ একটি ভাষা নেই তখন ভারতীয় জাতীয়তাবোধ জাগাবার চেষ্টা করা বৃথা। অবশ্যই শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতেও জাতীয়তাবোধ জাগবে। কিন্তু তখন তা ভারতীয় শেঠ সম্প্রদায়ের শোষণের অনুকূল অস্পষ্ট এক ভারতীয়তাবোধে আচ্ছন্ন থাকবে না। নির্দিষ্ট এক একটি ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধ নবোদিত সূর্যের প্রখর কিরণসম্পাতে রাজনৈতিক চেতনার নব দিগন্ত উদ্ভাসিত ক'রে তুলবে। এক জন ফরাসি ইউরোপীয়ও বটে, ফরাসিও বটে। কিন্তু যদি তাকে তার জাতি-পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হয়, তা হলে সে ফরাসি ব'লে আত্মপরিচয় দেয়, কখনও বলে না যে সে ইউরোপীয় জাতি। তেমনি একজন তামিল ভারতীয়ও বটে, তামিলও বটে। কিন্তু জাতিতে সে তামিল, ভারতীয় নয়। এই সহজ ব্যাপারটা অসাধু রাজনীতিজ্ঞদের নির্বোধ স্বার্থপরতার জন্যে জটিল হয়ে আছে।

ভৌগোলিক ভারতে ভাষাপরিক্রমা সুরু করার আগে বহির্বিশ্বের ভাষাভিত্তিক এলাকাগুলির হিসেব একবার স্মরণ করা যেতে পারে। আমরা দেখেছি যে ভাষার ভিত্তিতে বহির্বিশ্বে রাষ্ট্রসংখ্যা মোটামুটি এই রকম হবে:—

ইউরোপ (রুশিয়াসমেত)—	৩০
আমেরিকা—	৯
ওশিয়ানিয়া—	২
আফ্রিকা—	৪৪
অবশিষ্ট এশিয়া (তুরস্কসমেত)—	৬৮

যদি ভাষার ভিত্তির সঙ্গে ধর্মীয় বিসংবাদ ও ভৌগোলিক ব্যবধানের ব্যাপার হিসেব ক'রে দেখা হয় তা হলে আগামী কয়েক দশকের মধ্যে এই সংখ্যাগুলির সামান্য অদল-বদল হলেও বেশি নড়চড় হবে না।

বহির্বিশ্ব থেকে এবার আমরা ভৌগোলিক ভারতের দিকে অগ্রসর হবো। [ক্রমশঃ]
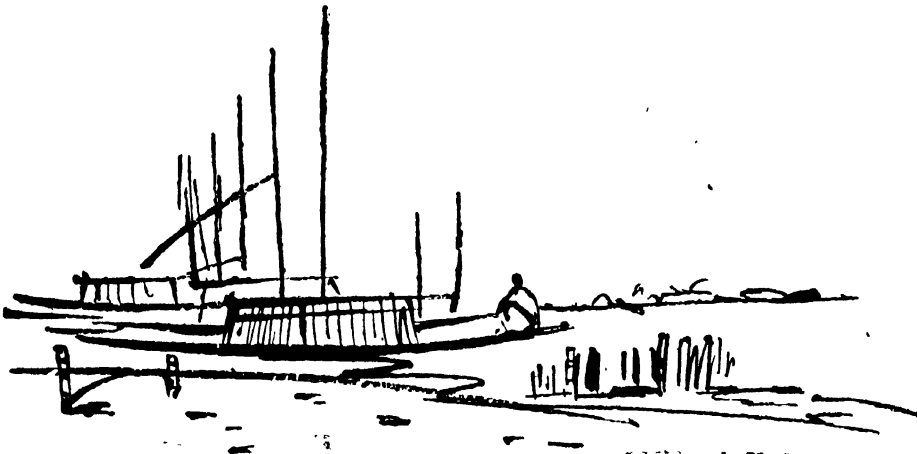
প্রাচীর

হারপদ দে

মা, আমার বাবা কোথায়? তাঁকে দেখতে পাই না কেন? আঃ খোকন চুপ করো।

না মা তুমি বলো বাবলু, পুতুলের বাবা কত ভালো, রোজ লজেন্স কিনে ছায়। আমার বাবা কবে আসবে মা,—

খোকন আমি কি তোমাকে লজেন্স কিনে দেই না। তোমাকে কত সুন্দর সাইকেল কিনে দিয়েছি, বাবলু পুতুলের ওরকম সাইকেল আছে?

খোকন খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তার সুন্দর মুখখানা কেমন যেন থমথমে দেখায়। তার বড় বড় দুটো চোখ যেন একটা অভিমানে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। মা বোঝাতে পারে না যে সাইকেল পেয়ে সে অসুখী নয় কিন্তু বাবলুর বাবা কেমন বাবলুকে সঙ্গে করে ঘুরে বেড়ায়, বাবলুকে নিয়ে পার্কে বল খেলে—পুতুলের বাবাকেও দেখেছে, কত বড় একটা গাড়ীতে করে পুতুলকে নিয়ে বেড়াতে নিয়ে যায়। ওরা ওদের বাবার সঙ্গে কত খেলা করে আর খোকন কোনদিন তার বাবাকে দেখলই না। এরকম কেন হয়? এ কেনর উত্তর খোকন পায় না। তাই আবার মাকে আস্তে আস্তে বলে, মা আমার বাবা এখন আসবে না না?'

নন্দিতা এবার আর ছেলের কথায় বিরক্ত হয় না। একটা উদ্যত বেদনা চাপা দিয়ে বলে,' আসবে খোকন, তিনি পরে আসবেন। "আমি বড় হলে আসবে মা? ছেলের কথায় নন্দিতা যেন সমাধানের ইঙ্গিত দে তে পায়। তাড়াতাড়ি খোকনকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, হ্যাঁ, তুমি বড় হলে আসবে বাবা। এখন ঘুমাও রাত যে অনেক হোল। খোকন আর কোন কথা বলে না। এক হাত দিয়ে মায়ের পিঠটাকে বেষ্টন করে ধরে চোখ বোঁজে।

অন্ধকার ঘরে নন্দিতার চোখে বন্যার স্রোত নেমে আসে। সে চোখে ঘুমের স্থান কোথায়? পিছনের জানালা দিয়ে এক ফালি রঙিন আলো ঘরে এসে ঢুকেছে। আলোটা জ্বলছে আর নিভছে। যেন আশা ও নিরাশার শঙ্কায় দোল খাচ্ছে। নন্দিতা জানে রাস্তার ওপারের দোকানের বিজ্ঞাপনের আলো সেটা; আর কিছুক্ষণ পরেই নিভে যাবে। রঙিন আলোর ঝলকানির মধ্যে সে কোন আশার ইঙ্গিত পায় না। সুনিশ্চিতের মধ্যে মানুষ যেমন তার নির্ভরতাকে আঁকড়ে থাকতে পারে, তেমনি সুনিশ্চিত সত্যের কঠোরতা মানুষকে যন্ত্রণাই দেয়, এ ক্ষেত্রে অনিশ্চিত সম্ভাবনার ভিতর কিছুটাআকাঙ্ক্ষা পোষণ করে বেঁচে থাকার আনন্দ আছে।

নন্দিতা জানে তার জীবনে শুভময়ের না আসাটা সুনিশ্চিত হয়েই আছে। তাইতো তার ভয়, খোকনকে সে কি উত্তর দেবে!

বিজ্ঞাপনের আলোটা নিভে গেছে। ঘরের ভেতর অন্ধকার থাকতেও নন্দিতা সব কিছু যেন স্পষ্ট দেখতে পায়। তার আর খোকনের দুজনের সংসারের খুঁটি-নাটি জিনিষ পত্তরের অবস্থান সম্বন্ধে সে ওয়াকিবহাল। পাশে শোওয়া খোকনের মুখখানাও নন্দিতা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। দ্বিধাহীন নিঃশঙ্কাতে ঘুমুচ্ছে সে। সামনের আশ্বিন মাসে ছ'বছর বয়স হবে খোকনের।

খোকনের দিকে তাকিয়ে ভাবতে ভাবতে আবার বুকটার মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠলো নন্দিতার। ছেলেকে কোলের দিকে টেনে নিয়ে আলতো করে চুমু খেল কপালে।

সেই সকাল সাড়ে নটায় অফিসে বেরুবার সময় খোকনকে পাশের ঘরের মনীষার কাছে রেখে যায়, আর

সারাদিন পরে সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরে তাকে কাছে পাওয়া। অফিসে কটা ঘণ্টা যে কি উদ্বেগ আর অশান্তি নিয়ে তার কাটে। মনে হয় খোকন যেন একা একা রাস্তায় নেমে গেছে। হেঁটে যাচ্ছে সামনের রাস্তা ধরে। ঘরের কেউ জানতে পেল না খোকনের চলে যাওয়া, আর খোকনের ঐ রাস্তা ধরে হেঁটে চলাটাও যেন নন্দিতার কেমন ভালো মনে হয় না।

মনে হয় ও যেন শুভময়ের খোঁজেই বেরিয়ে পড়েছে, কিন্তু খোকনের পেছনে একটা গাড়ী অত জোড়ে ছুটে আসছে কেন? না না গাড়ীটার ড্রাইভারকে তো তার ভাল মনে হচ্ছে না, তবে—তবে কী সে খোকনকে—চমকে ওঠে নন্দিতা আর এক মুহূর্তও তার অফিসে ভালো লাগে না। বড় সাহেবকে বলে ছুটি নিয়ে বাড়ী চলে এসেছে, বাড়ী এসে নিশ্চিন্ত হয়েছে সে। দেখেছে খোকন দিব্যি মনীষার কাছে ভাল মানুষটি হয়ে বসে রয়েছে। নন্দিতাকে দেখে মনীষা ঠাট্টা করে বলে কি গো অসময়ে, ছেলের জন্যে ভয় হলো বুঝি? ভয় নেই; তোমার ছেলের মত লক্ষ্মী ছেলে খুব কমই পাওয়া যায়।

নন্দিতা এ কথায় আশ্বস্ত হয়ে বলে না মাসুদি তোমার কাছে রেখে আমার কোন ভয়ই হয় না। আমি তো জানি তুমি ওকে কতখানি ভালবাস। নন্দিতা ভাবে সত্যি মাসুদির মত মেয়ের কাছে ঘরখানা পেয়েছিল এ যে তার কত বড় ভাগ্য তা বলার নয়। মনীষা ছিল বলেই সে নির্ভাবনায় খোকনকে তার কাছে রেখে অফিসে যেতে পারে। আর এও জানে মনীষা খোকনকে তার নিজের ছেলের মতই ভালবাসে।

এখন রাত যে কত হোল তার কিছুটা নন্দিতা আন্দাজ করতে পারছে। বোধ হয় একটা-দেড়টার মত হবে! রাস্তায় দু'এক খানা রিক্সা চলে যাওয়ার ঠুং ঠুং শব্দ অনেক রাত অব্দি পাওয়া যায়। কিন্তু এখন আর কোন শব্দই শোনা যাচ্ছে না। সব নিঝুম নিস্তব্ধ। শিয়রের জানালাটা দিয়ে বাতাস এসে মশারিটা কাঁপিয়ে দিচ্ছে। টেবিলের ওপর টাইম পিস্‌টা খুব ক্ষীণ আওয়াজ করছিল টিক্ টিক্ টিক্ টিক্। নন্দিতার আজ আর ঘুম আসছে না। হয় তো আসবেও না আজ। খোকনের প্রশ্নগুলি খুবই সঙ্গত। এ প্রশ্নের উত্তর দেবার কথা এর আগে কোনদিন সে ভেবে ছাখেনি। খোকন বড় হচ্ছে। আরও বড় হবে। তখন তার কাছে কিছুই অজানা থাকবে না। খোকন যদি তখন অভিমান করে নন্দিতার কাছ থেকে দূরে সরে যায়! তবে সে বাঁচবে কি করে, কী থাকবে তার?

না, খোকনের প্রশ্নের একটা উত্তর তৈরী করে রাখতে হবে এখন।

অথচ নন্দিতা ভাবে তখন কত সহজেই না সব কিছু মেনে নিতে পেরেছিল সে। এতটুকু দ্বিধা করেনি অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে এতটুকু ভয় পায় নি। নির্ভয়ে প্রতিবাদ করেছিল অন্যায়ের, আর তার ফল ভোগ করার কথা তাও মেনে নিয়েছিল সে তখন।

নন্দিতার আজ সে সব পুরানো দিনের কথা মনে পড়ছে কেন? কিছুতেই ভেবে পাচ্ছে না সে। আবার মন থেকে ঝেড়ে ফেলতেও পারছে না। সেদিনের ছবিগুলি চোখের সামনে ভেসে উঠছে একটার পর একটা ছায়াছবির মত।

শুভময়! তার স্বামী। এত রাতে এই অন্ধকার ঘরে শুয়ে থেকেও নন্দিতার হাসি পেল। কিন্তু পরক্ষণেই খোকনের দিকে তাকিয়ে ভাবলো সে তো মিথ্যেও নয়। সত্যিই তো শুভময় তার স্বামী। শান্ত মেজাজী সুপুরুষ শুভময়ের ছবিটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। খুব কম কথা বলতো সে। শুভময়ের দৃষ্টি ছিল ভীষণ তীক্ষ্ণ। মনের ভেতরটাও যেন সে দেখে নিতে পারতো আর শুভময়ের এই গুণগুলিই সেদিন নন্দিতাকে বেশী করে আকর্ষণ করেছিল। একই অফিসে চাকরি করতো তারা। খুবই কাছাকাছি। এই কাছাকাছি থেকে মাঝে মাঝে সন্ধ্যার ইডেনে পাশাপাশি হতো। দিদির সংসারে থেকে মানুষ নন্দিতা কিছুই দিদিকে লুকোতে পারতো না। জামাইবাবু ভদ্রলোকও খুব সরল। এদিক দিয়ে শুভময়ের অবস্থা অনেক ভালো ছিল। তার বাবা মা'ও জীবিত ছিলেন। কলকাতা সহরে ছিল নিজেদের বাড়ী। বিরাট ব্যবসা। কিন্তু যেদিন বিয়ের প্রস্তাব উঠলো তাদের মধ্যে, সেদিন নন্দিতা খুব স্পষ্ট করেই জিজ্ঞেস করেছিল শুভময়কে আমাকে যে বিয়ে করবে বলছো কিন্তু তোমাদের বাড়ীতে আমার

জায়গা হবে তো? শুভময়ের চোখে ছিল সেদিন রঙিন নেশা আর নন্দিতার ভালবাসাকে প্রত্যাখ্যান করাও হয়ত ছিল নীতিবিরুদ্ধ তাই একটু জোরেই বলেছিল, পাগল, বাবা আমাকে ত্যাজ্যপুত্র করে দেবে না? তার চেয়ে বিয়ে করলে যখন ত্যাজ্যপুত্রই হবো, তখন বাড়ীতে না জানিয়ে বিয়ে করে আলাদা বাসা করে থাকবো। অবশ্য বিয়ের পরে আমি বাবাকে জানাতে ভুলবো না। নন্দিতাও সেদিন আর কোন কথা বলতে পারে নি। তারও তখন ঘর বাঁধার সাধ হয়েছিল। রেজেষ্ট্রি করে বিয়ে করে ঘর বেঁধেছিল তারা, আজকের এই ঘরই ছিল সেদিনকার সেই ঘর। নন্দিতা ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। ঘর সেইখানাই রয়েছে। কিন্তু চাকরিটা নন্দিতাকে ছাড়তে হয়েছিল। কেননা সেই ঘটনার পর সেই অফিসে চাকরি করা কোন মেয়ের পক্ষেই বোধ হয় সম্ভব নয়। নন্দিতা আবার ভাবতে থাকে—দেখতে দেখতে বিয়ের একটা বছর পার হয়ে গেল। খোকন হলো। নন্দিতার তখন পরিপূর্ণ সংসার। দিদি জামাইবাবু বদলী হওয়ায় সুদূর পাঞ্জাবে যেয়ে বাস করছে। তাই পাশের ঘরের আজকের এই মনীষাই তখন তার অনেক আপন হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু সেই নন্দিতার সেই পরিপূর্ণ সংসারের মধ্যে তখন একটা বিভীষিকার রূপ নিয়ে হাজির হলো এক-কালের অফিস-সহকর্মী অজয় দত্ত। অজয়কে নন্দিতা ভালো করেই চিনতো, এক সাথেই যখন কাজ করেছে একদিন, কিন্তু অসুবিধা ছিল শুভময়কে নিয়ে। সে কোন দিনই অজয়কে ভালো চোখে দেখতে পারেনি। শুভময়ের সাথে অফিসের রাজনীতি নিয়ে চিরদিনের বিবাদ অজয়ের। তাই অজয়ের আসাটাকে নন্দিতা ভয়ের চোখে দেখতো। কিন্তু নন্দিতা যেদিন বুঝতে পারলো যে অজয়ের মনের মধ্যে ভালবাসার সাধ অনেক দিন থেকে তুষের আগুনের মতো জ্বলছিল, তার সেইজন্যেই মাঝে মাঝে সে নন্দিতার কাছে এসে থাকে, তখন নন্দিতা হাসবে কি কাঁদবে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। শুধু কঠিনভাবে অজয়কে সাবধান করে দিয়েছিল, সে যেন আর নন্দিতার কাছে না আসে। কিন্তু সেটা বোধ হয় বিধাতার অভিপ্রায় ছিল না। তা না হলে একদিন সন্ধ্যাবেলা শুভময়ের অনুপস্থিতিতে নন্দিতার কাছে অজয়ের প্রেম নিবেদন অত সরব হয়ে উঠবে কেন? নন্দিতা অজয়ের মুখ বন্ধ করতে পারেনি সেদিন। অজয়ের মুখ বন্ধ হয়েছিল শুভময়ের অকস্মাৎ প্রবেশে। শুভময়ের সেদিনের সেই কঠিন চেহারাটা আজও নন্দিতা ভুলতে পারেনি। শান্ত মেজাজী শুভময় সেদিন এক অন্য মূর্ত্তি ধরেছিল যার সঙ্গে নন্দিতার কোনদিনই পরিচয় ছিল না। সেদিন অজয় সম্বন্ধে এত বড় মিথ্যা কিছুতেই শুভময়কে নন্দিতা বোঝাতে পারেনি। আর বোঝাতে না পারার জন্য যতখানি না হয়েছিল দুঃখ, ক্ষোভটা হয়েছিল তার থেকেও বেশী। এরপর প্রায়ই শুভময়ের সঙ্গে নন্দিতার কারণে-অকারণে ঝগড়া হতো। একটা অসহ্য পরিস্থিতির উপর সংসারটা দুলতে লাগলো, যাকে মেনে নেওয়াও যায় না, আবার সহজে ত্যাগ করাও যায় না। কিন্তু সব কিছুর সমাধান একদিন শুভময়ই করে ফেললো। কোর্টে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করলো সে। খোকন তখন দেড় বছরের। খোকনের ওপর কোন দাবীই শুভময় করলো না। নন্দিতার কাছে সব কিছুই স্পষ্ট হয়ে গেছে। শুভময়কে বুঝতেও তার আর বাকী নেই। নন্দিতার কাছে যা ছিল ভাবনার অতীত, তাই শুভময় এক নিমেষে সম্ভব করে ফেলল কত সহজে। আর তার পিতৃ-হৃদয়ও যে কত বড় নিষ্ঠুর তাও খোকনকে পরিত্যাগের মধ্যে দিয়ে নন্দিতার কাছে ফুটে উঠলো। নন্দিতাও সেই সব ভেবে দেরী করলো না। শুভময়কে মুক্তি দিল সে নিজেই কোর্টে দাঁড়িয়ে। তার প্রতি শুভময়ের যা অভিযোগ ছিল তাকে নির্ব্বিবাদে সে স্বীকার করে নিল। নন্দিতার স্বীকারোক্তি শুনে সেদিন শুভময় বিজয়ীর হাসি নিয়ে ফিরে গিয়েছিল। কোথায়? সে কৌতূহল নন্দিতার মনে আর জাগেনি। এখন খোকনের বয়স ছ'বছর হতে চলল। খোকন এখন বড় হয়েছে; আরো বড় হবে। তখন? নন্দিতা যেন এতক্ষণে সম্বিত ফিরে পেল। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলো, অন্ধকারটা ফিকে হয়ে আসছে অর্থাৎ রাত্রি শেষ। নন্দিতার আর ঘুম হলো না। মনে মনে ভাবলো, খোকনের প্রশ্নের উত্তরটা তাকে তৈরী করেই রাখতে হবে এবং 'খুব' তাড়াতাড়ি। আজকের দিনটা ছিল রবিবার। তাই সকালেই নন্দিতা

খোকনের কাছে প্রস্তাব করেছে, উত্তরপাড়ায় মীরা মাসীর বাড়ী বেড়াতে যাবার জন্য। মীরা নন্দিতাদের অফিসেই চাকরী করে, ছুটির দিনে মাঝে মাঝে দুজনের বাড়ী দুজনে যাওয়া আসা করে থাকে। কিছুক্ষণ পরেই তারা দুজনে বেরিয়ে পড়লো উত্তরপাড়ার দিকে। সারাদিন মীরা মাসীর বাসায় কাটিয়ে গঙ্গার জল দেখে খোকনের খুব আনন্দেই কেটেছে, কিন্তু এখন বিকেলে উত্তরপাড়ায় স্টেশনের প্লাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে খোকনের মনটা যেন কেমন করে উঠলো। মীরা মাসীর ছেলে পন্টুর কেমন বাবা আছে বাড়ীতে, কি সুন্দর দেখতে পন্টুর বাবাকে। পন্টু বলল, কত ভালবাসে তাকে তার বাবা। কিন্তু খোকনের বাবা নেই শুনে পন্টু জিজ্ঞেস করলো, তোমার বাবা মরে গেছে? কিন্তু তার বাবা মরে যাওয়াটা কেমন, খোকন ভাল করে সেটা বুঝতে পারলো না আর তাই এখন মাকে একা পেয়ে প্রশ্ন করে বসলো—

মা, আমার বাবা কি মরে গেছে?

চমকে উঠলো নন্দিতা। এ কথা তোমায় কে বলল? ছিঃ ওকথা বলতে নেই।

কেন মা? পন্টুর কেমন বাবা আছে, বাবলু পুতুল সকলের বাবা আছে, আমার নেই কেন?

খোকন, তুমি ভীষণ দুষ্টু হয়েছো, তোমাকে কতদিন বলেছিনা, এ সব কথা বলবে না।

নন্দিতা কণ্ঠে গাম্ভীর্য্য এনে ছেলেকে থামাতে চাইলো কিন্তু ভেতরে ভেতরে খুবই দুর্বল বোধ করলো সে। একটু জল পেলে বোধ হয় ভাল হতো নন্দিতার। খোকনের মুখের দিকে চেয়ে দেখলো সে যেন ভয় পেয়েছে তার কথায়। কেমন অপরাধী অপরাধী ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ দুটো ছল ছল করছে খোকনের। নন্দিতা হঠাৎ হেসে ফেলে খোকনকে দুহাত দিয়ে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, দুর বোকা ছেলে, আমি কি তোমাকে বকেছি, শুধু বলেছি ও সব কথা যেখানে সেখানে বলতে নেই। তুমি বাড়ী চলো, আজ তোমাকে একটা সুন্দর জামা কিনে দেব।

খোকন এবার যেন একটু আশ্বস্ত হলো মার কথায়, মুখটাকে নন্দিতার দিকে ফিরিয়ে আস্তে করে বলল, এসব কথা শুধু বাড়ীতে বলতে হয় না মা?

নন্দিতা ছেলের মাথাটা মুখের কাছে টেনে নিয়ে কানে কানে বলল, হ্যাঁ বাবা এ সব কথা শুধু বাড়ীতে বলতে হয়।

ডাউন ব্যাণ্ডেল লোকালের আর সামান্য দেরী ছিল। প্লাটফর্মের শেষে সিগন্যাল লাইটটা নীল হয়ে জলছে। নন্দিতা ছেলের হাত ধরে প্লাটফর্মে এসে দাঁড়াল। কয়েক জন যাত্রী যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছে। উত্তরপাড়া ষ্টেশনের প্লাটফরম দুটো ষ্টেসন থেকে দূরে। গাড়ীরও আর দেরী নেই বোধ হয়, এখুনি এসে যাবে। নন্দিতা ষ্টেশনের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। হঠাৎ সে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। বুকটার মধ্যে যেন একটা হাতুড়ি পিটতে সুরু করল। পা দুটো অসম্ভব কাঁপছে। কি করবে নন্দিতা! সে যে স্পষ্ট দেখছে শুভময় ষ্টেসনের দিক থেকে ধীরে ধীরে প্লাটফর্মের দিকে এগিয়ে আসছে। আগের মত সে স্বাস্থ্য শুভময়ের নেই, মুখে কয়েক দিনের দাড়ি। নন্দিতা লক্ষ্য করে দেখলো, শুভময়ের চলনেও যেন একটা দুর্বলতার লক্ষণ। যেন ঝড়ের ধাক্কায় ক্ষত বিক্ষত আহত অঙ্গ এক শুভময় এ দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের আদর্শন। কেউ কারো কোন খবর জানে না, জানবার কথাও নয়। শুভময় সম্বন্ধে নন্দিতার কোন কিছু ভাববার অধিকার পর্য্যন্ত নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও নন্দিতার মনের মধ্যে আজ একটা বেদনার সুর গুমরে গুমরে উঠছে কেন? তার আর শুভময়ের মাঝখানে একটা মিথ্যার প্রাচীর খাড়া হয়ে রয়েছে বলেই কি?

শুভময় ধীরে ধীরে প্লাটফরমের উপর এসে ও প্রান্তেই দাঁড়িয়ে রইলো। নন্দিতাকে বোধ হয় দেখতে পায় নি সে। আবার চমকে উঠলো নন্দিতা মা, আমি কবে বড় হব?

তাড়াতাড়ি খোকনকে কাছে টেনে বলল, কেন তুমি তো অনেক বড় হয়ে গেছ।

তবে বাবাকে কেন দেখতে পাই না মা?

কি বলল! কি বলছে খোকন! নন্দিতা নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

প্লাটফর্মের ওপান্তে যে দাঁড়িয়ে আছে সে কি খোকনের জীবনে চিরদিন মিথ্যে হয়েই থাকবে? নন্দিতার দু'চোখ ভরে কান্না এল। একটা অন্ধ আবেগ তার বুকটার ভিতর

আকুলি বিকুলি করে উঠলো। নিজেকে আর আটকে রাখতে পারলো না নন্দিতা। প্লাটফর্মের উপর বসে পড়ে খোকনের কানের কাছে মুখটা নিয়ে চুপি চুপি বলল, খোকন তুমি তোমার বাবাকে দেখতে চাও?

হ্যাঁ মা আমি বাবাকে দেখবো, তার কাছে যাব। না খোকন তুমি তার কাছে যেতে পারবে না। শুধু দেখবে কেমন? খোকন কথা না বলে শুধু মাথা নাড়ল। তখন আঙ্গুল দিয়ে খোকনকে প্লাটফর্মের ও-প্রান্তে উদাস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ব্যর্থতার প্রতিমূর্ত্তির দিকে দেখিয়ে বলল, খোকন উনিই তোমার বাবা। খোকনের চোখে দারুণ বিস্ময়। নন্দিতা এবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে। বলল হ্যাঁ খোকন। কিন্তু পরক্ষণেই নন্দিতার খেয়াল হলো, খোকন ছুটছে।······নন্দিতা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো। •খোকন যেওনা, তুমি যেও না। কিন্তু ছোট্ট খোকন তখন অমিতবিক্রমে ছুটে চলেছে প্লাটফর্মের ও প্রান্তে।

কণ্ঠে তার নতুন সম্বোধনের সুরেলা স্বর। বাবা, বাবা! পেছনে নন্দিতার চীৎকার উঠলো, খোকন যেওনা, উনি তোমাকে চিনবেন না। তুমি দাঁড়াও--

নন্দিতার সমস্ত কথা চাপা পড়ে গেল ইঞ্জিনের হুইসেলে।• ষ্টেশনের সমস্ত কোলাহলকে স্তব্ধ করে মেল ট্রেনটা ঝড়ের বেগে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে। আর খোকন তখনও ছুটে চলেছে নতুন এক আবিষ্কারের দৃষ্টি নিয়ে শুভময়ের দিকে।

শ্রীগণেশ বাহনের জয়

ম্যানিলার এক খবরে প্রকাশ যে মধ্য ফিলিপাইনের সান ভিসেনটী দ্বীপের কাছাকাছি সমুদ্রে তিনজন জেলে ইঁদুর বাহিনীর হঠাৎ আক্রমণে নিহত হন। দেখা যায় হাজার হাজার ইঁদুর প্রায় আড়াই একর সামুদ্রিক এলাকা জুড়ে এগিয়ে আসছে এদের ছোট ডিঙি নৌকাটির দিকে। জেলেরা হঠাৎ এই দৃশ্য দেখে ভয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন। সম্পূর্ণ নিরস্ত্র এবং অসহায় অবস্থায় তিনটি জেলে ভাইকেই মৃত্যু বরণ করতে হয়।

আমার মনে হয় যদি একজন মাত্রও সমর বিশেষজ্ঞ কাবুলি বিড়ালও এই অসহায় জেলেদের পক্ষ সমর্থন করতো—তাহলে বোধহয় পৃথিবীবাসীকে এই রকম একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনার খবর শুনতে হত না।

মেধাবিনী ভারত ললনা

সম্প্রতি লণ্ডনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব মেধা-সৌন্দর্য্য প্রতি-যোগিতার এক আসরে বিজয়িনী হয়েছেন ভারতের দুই সুন্দরী তরুণী। প্রথম স্থান অধিকার করেছেন কুমারী ডোনা গোমেজ। বয়স উনিশ। দ্বিতীয় হয়েছেন কলকাতার এক তরুণী—কুমারী এসিনর লো। ব্রিটিশ ব্রডকাষ্টিং করপোরেশন এই প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তা।

শুনে আনন্দিত মনে এই দুইজন গরবিনী মেধাবিনীকে অনুরোধ করি যাতে তাঁরা শীঘ্রই মেধাচর্চ্চার কোন কলেজ খুলে তরুণদের হাতে-কলমে শিক্ষা দেন—প্রয়োজনবোধে মস্তিষ্ক ধোলাইয়ের কারখানাও খোলা যেতে পারে।

সোনার বিস্কুট

এতদিন সোনার পাথরবাটির কথাই জানতুম। সেদিন শুনলাম হাওড়া ষ্টেশনে গৌহাটীগামী এক ভদ্রলোকের সুটকেস হাতড়ে,কাস্টমস্ অফিসাররা নাকি সোনার বিস্কুট একেবারে পেটে হাত—দু'দশখানা সোনার বিস্কুটও যে হজম করবেন, তারও কোন উপায় নেই।

কাস্টমস্ অফিসার পরিবৃত হয়ে নির্দ্দিষ্ট জায়গায় যাবার সময় মা গঙ্গাকে দেখে হয়তো তার মনে পড়বে পুরনো কোন গানের কলি—'ও সোনারে, একটি কথা শুধাই শুধু তোমারে—'

এ চুল সে চুল নয়

কোথাও চুলোচুলি হওয়ার আশঙ্কা থাকলে আগে থাকতে সাবধান হওয়া উচিত। চুলের মুঠি শক্ত করে ধরে কারুকে শিক্ষা দিতে হলে নিজেকে আগে শিক্ষা করে নিতে হবে যে—এ চুল সে চুল কী না। কারণ পরচুল পরার কদর আজকাল এত বেড়ে গিয়েছে যে শেষ পর্য্যন্ত এই কলকাতাতেও তার ঢেউ এসে লেগেছে। চীৎপুর রোডে টেরেটিবাজারের কাছে পরচুলের দোকানগুলো আজকাল নাকি বেশ দু'পয়সা কামাচ্ছে।

যাইহোক কামান নিয়ে কথা— সে চুল কমিয়েই হোক আর বাড়িয়েই হোক।

ঢাকার জয়ঢাক

পূর্ব পাকিস্থান ঢাকার এক খবরে প্রকাশ, সেখানকার ভিক্ষাজীবীরা একসম্মেলনেমিলিতহয়েকয়েকটী প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন—প্রথম, ২৫ পয়সার কমে কোন ভিক্ষে দেওয়া চলবেনা। দ্বিতীয় ৪৫ সেকেণ্ডের বেশী কারুকেই দরজায় দাঁড় করিয়ে রাখা যাবে না। কর্তৃপক্ষ সংস্থার ঠিকানা যথাসাধ্য গোপন রাখার চেষ্টা করেছেন। কারণ তাদের আশঙ্কা সদস্যসংখ্যা নাকি অচিরেই বেড়ে যেতে পারে।

নামে ঢাকা হলে কি হবে—কিছুই ঢেকে রাখা গেল না। ভিক্ষুকদের জয়ঢাকের বাজনা শুনে গৃহস্থদের চোখ

বিশ্বের বৃহত্তম বিমানের ব্যোম বিচরণ

এই সেদিন বিশ্বের বৃহত্তম বিমান—গ্যালাকটি সি ৫এয়ের প্রথম ব্যোম বিচরণ সম্পন্ন হল। বিশ্ববাসী সবিস্ময়ে নীলাকাশে তাকিয়ে দেখলো সেই বিরাটকায় বিমানটীর দিগন্ত পরিক্রমা। লক্‌হিডের বিমানটির ওজন হবে পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড। দৈর্ঘ্যে প্রায় তিনশো ফিট এবং লেজের অংশের উচ্চতা প্রায় ছ'তলার সমান—মানে রীতিমত লেজ মোটা।

মানুষ বড় হলে যা হয়ে থাকে এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

পঁচিশ ঘণ্টায় একদিন

সম্প্রতি ক্যালিফোরনিয়ার বোডেগা মেরিন ল্যাবরেটরিতে জলজ প্রাণী নিয়ে গবেষণা করছেন তরুণ বিজ্ঞানী রিচার্ড বারকার। তাঁর গবেষণাগারের কৃত্রিম সমুদ্রে "পলিপ্লেপড" নামে এক শ্রেণীর জলজ-জন্তুর খোলসের উপর লক্ষ্য করলেন ক্যালসিয়ামের দরুণ এক-রকম রেখার সৃষ্টি হয়। এছাড়া বাৎসরিক জোয়ার ভাঁটা এবং তাপমাত্রার নানান পরিবর্ত্তনও রেখাসৃষ্টির কিছুটা কারণ। তিনি ধৈর্য্য ধরে লক্ষ্য করলেন যে এক বছর পূর্ণ হলেই রেখার সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ৩৬৫ অর্থাৎ প্রতিদিন একটী করে রেখার সৃষ্টি হচ্ছে। উৎসাহিত হয়ে বিজ্ঞানী বারকার সমুদ্রের গভীরে তল্লাসী চালিয়ে সংগ্রহ করলেন প্রাচীন পলিপ্লেপডের দেহের আবরণ। প্রায় ৮ কোটী বছর পূর্বেকার। গুণে দেখলেন তার গায়ের রেখার সংখ্যা ৩৭৬টী। অর্থাৎ তখন দিন হত ২৩ ঘণ্টার কাছা-কাছি সময়ে। এর চাইতে আরও প্রাচীন দেহাবরণ সংগ্রহ করে দেখলেন বছরে দিনের সংখ্যা ৩৯৯ অর্থাৎ দিন হত প্রায় ২২ ঘণ্টায়। অতএব বিজ্ঞানী বারকার প্রমাণ করতে চাইছেন যে ক্রমশঃ দিনের দৈর্ঘ্য বাড়ছে। এর ফলে আগামী কালের মানুষ হয়তো একদিন ২৪ ঘণ্টাকে পিছনে ফেলে রেখে ২৫ ঘণ্টায় একদিনের হিসেব করবেন। তারপর বাড়তে বাড়তে হয়ত একদিন একদিন হবে ৫০ ঘণ্টায়, তারপর ১০০ ঘণ্টায়; তারপর ২০০ ঘণ্টায়, তারপর হয়ত ছয় মাস ধরে চলবে রাত, আর ছয় মাস ধরে দিন!—একটি দিন ও রাত কাটতে লাগবে একটি বছর! নববিবাহিত ও নববিবাহিতারা ছয় মাস ধরে মধু যামিনী যাপনের সুযোগ পাবেন। আর যাঁরা রাত্রে পুরোনো গৃহিনীর পাশে শুতে ভয় পান তাঁরা ছয় মাস ধরে মহানন্দে দিবালোকে বাস করবেন। সুতরাং লাভ দু'পক্ষেই হবে। কিন্তু আমরা তখন থাকব কি?

লুপ লাইনে ভেজাল

খবরে প্রকাশ এক ভদ্রমহিলার লুপ লাইন অগ্রাহ্য করে সম্প্রতি এক নব-জাতকের জন্ম হয়েছে। জনতার তরফ থেকে আমি সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছি শিশুকে। এর আগেও এই রকম লাইন ভেঙ্গে অনধিকার প্রবেশ করার চেষ্টা হয়েছে কিনা জানি না। তবে প্রথম সফল—শিশুর আগমন উপলক্ষে কারও কারও মুখ চোখের রং পাল্টাচ্ছে বলে মনে হয়। "পরিবার পরিকল্পনা জিন্দাবাদ!"

এ নিশি রাতে ডাকে কে আমায়

সেদিন কালনার এক গ্রামের যুবককে সকাল বেলায় পার্শ্ববর্ত্তী বাগানের মধ্য থেকে অজ্ঞান অবস্থায় বাড়ীতে ফিরিয়ে আনা হয়। আগের দিন মধ্যরাত্রে তাকে নাকি 'নিশি'তে নাম ধরে ডাকাডাকি করে', সে ডাকে সে তৎক্ষণাৎ সাড়া দেয় এবং প্রায় তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ঘরের বাইরে বেরিয়ে যায়। এ ঘটনায় গ্রামে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং সবাই মিলে মন্ত্রসিদ্ধ নব নিশিকান্তের তল্লাসী চালাচ্ছেন। অবশ্য ডাকাডাকির ব্যাপারটা নতুন নয়, পারিবারিক জীবনে, সমাজ জীবনে, রাজনৈতিক জীবনে অর্থাৎ জীবনের সর্বদিকে সর্বসময়ে কোন না কোন হাঁকডাক্ চলছে অতএব আমাদের ভীত হবার কোন কারণ নেই। তবে হ্যাঁ, নিশীথে বলেই দুশ্চিন্তার কথা। অনেকে আছেন রাত্রে ডাকাডাকি কোন রকমেই বরদাস্ত করতে পারেন না, সে যে সুরেই হোক, আবার এমন অনেকেই আছেন যাঁরা সারাদিন অপেক্ষা করে থাকেন শুধু রাত নামার জন্তে। রাত যত গভীর হবে—ডাকাডাকির স্বর-গ্রাম তত উঠানামা করবে। এদের নাকি নিশিতে পাওয়া বলে। এ রোগের কি জড়িবটি লাগে আমার জানা নেই। তবে বিংশ শতাব্দীর মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে ভাবতে বিস্ময় লাগে যে আজও কেমন করে নিশিকান্ত সিদ্ধ ভৈরবের দল বেঁচে আছেন বিজ্ঞানের 'চোখে ধুলো দিয়ে। নিশীথিনী আর নিশিকান্তরা অমৃতের সন্তান!

জনসভার আদিসভা

আজ থেকে ১৭০ বছর আগে কলকাতার সাহেব পাড়ায় প্রথম জনসভার আয়োজন হয়েছিল। সেদিনটী ছিল ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই। মিটিংয়ের আহ্বায়ক ছিলেন তৎকালীন 'শেরিফ' উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের জন্যে চাঁদা তোলা। সেই সময়ে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে যুদ্ধ বাধার বিশেষ সম্ভাবনা। সাহেবদের কাছ থেকে চাঁদা বাবদ আদায় হয়েছিল প্রায় তিরিশ হাজার পাউণ্ড। এদের দেখাদেখি তৎকালীন বাঙালী সমাজের বিশিষ্ট নেতারা এগিয়ে এসে আর এক মিংটিয়ের আয়োজন করলেন এই বছরের ২১ আগষ্ট। এঁরাও সংগ্রহ করলেন একুশ হাজার টাকা। সব টাকাটাই ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হয় যুদ্ধের তহবিলে। সেই ১৭ই জুলাই থেকে যাত্রা সুরু করে জনসভার আর শেষ নেই। ফুলে, ফলে, বীজে ক্রমশই বেড়ে চলেছে। তবে আকারে প্রকারে কিছুটা তফাৎ হয়ে থাকতে পারে। আগেকার দিনে জনে জনে জমায়েত হয়ে শোভাবর্দ্ধন করে জনসভাকে জয়যুক্ত করতেন। এখনকার দিনে শোভাযাত্রা করে এসে জনতা শোভাহীন সভা করছে। সভার ধর্ম্মবিচারে জনসভার আদিযুগকে সত্যযুগ ধরলে এ যুগকে অনায়াসে ঘোরকলি বলা যায়।

ধর্ম্মঘটের প্রথম ঘটস্থাপনা

আজ থেকে ১৪১ বছর আগে কলকাতায় প্রথম ধর্ম্মঘটের সূচ। হয়েছিল। তখন শহরে হাওয়া গাড়ীর আমদানী হয় নি। ঘোড়ার গাড়ীর সংখ্যাও তেমন বেশী ছিলনা। একমাত্র অর্থবান্ জমিদার বাবুরাই তা ব্যবহার করতেন। কাজেই পাল্কীর চল তখন বেশী রকমই ছিল। এবং তৎকালীন পাল্কীবাহকদের বেশীর ভাগই ছিল উড়িষ্যা প্রদেশের লোক। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ২২ মে থেকে ২৬ মে পর্য্যন্ত পাল্কীবাহকরা পুলিশের হুকুমনামার বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট পালন করেন। তবে আনন্দের কথা তখন কোন সমিতি, নেতা বা—বাদ ছিলনা। কাজেই ধর্ম্মঘটের শুভ ঘটস্থাপনা করা এবং তা ভাঙ্গা—এ দুটোর মধ্যেই আজ আর কোন ফারাক নেই। জানতাম আগুনে পুড়লে সব কিছুই শুদ্ধ হয়। কিন্তু আজকাল মনেহয় ধর্ম্মঘটের ঘটগুলো বোধহয় ঠিকমত আগুনে পোড়ানো হয় না!

———

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রণীতম্ মহাভারতম্ শান্তিপর্ব

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

বঙ্গানুবাদ ঃ স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ভীষ্ম উবাচ

এতৎ তে রাজধর্মাণাং নবনীতং যুধিষ্ঠির।
বৃহস্পতির্হি ভগবান্ ন্যায্যং ধর্মং প্রশংসতি ॥ ১

ভীষ্ম বললেন—হে যুধিষ্ঠির! আমি তোমাকে যে উপদেশ দিয়েছি তা রাজধর্মরূপী দুধের নবনীত। ভগবান্ বৃহস্পতি এই ন্যায়ানুকূল ধর্মের প্রশংসা করেন।

বিশালাক্ষশ্চ ভগবান্ কাব্যশ্চৈব মহাতপাঃ।
সহস্রাক্ষো মহেন্দ্রশ্চ তথা প্রাচেতসো মনুঃ ॥ ২

ভরদ্বাজশ্চ ভগবাংস্তথা গৌরশিরা মুনিঃ।
রাজশাস্ত্রপ্রণেতারো ব্রহ্মণ্যা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৩

রক্ষামেব প্রশংসন্তি ধর্মং ধর্মভৃতাং বর।
রাজ্ঞাং রাজীবতাম্রাক্ষ সাধনং চাত্র মে শৃণু ॥ ৪

তা ছাড়া, ভগবান্ বিশালাক্ষ, মহাতপস্বী শুক্রাচার্য, সহস্রলোচন ইন্দ্র, প্রচেতস্ মনু, ভগবান্ ভরদ্বাজ, আর মুনিবর গৌরশিরা—তাঁরা সকলেই ব্রাহ্মণ ভক্ত এবং ব্রহ্মবাদী মুনি, রাজধর্মের প্রণেতা। তাঁরা সকলেই রাজার পক্ষে প্রজাপালনরূপ ধর্মেরই প্রশংসা করেছেন। হে ধর্মাত্মশ্রেষ্ঠ কমলনয়ন যুধিষ্ঠির, এই রক্ষাত্মক ধর্মসাধনের বর্ণন করছি, শোন।

চারশ্চ প্রণিধিশ্চৈব কালে দানমমৎসরাৎ।
যুক্ত্যাদানং ন চাদানমযোগেন যুধিষ্ঠির ॥ ৫

সতাং সংগ্রহণং শৌর্যং দাক্ষ্যং সত্যং প্রজাহিতম্।
অনার্জবৈরার্জবৈশ্চ শত্রুপক্ষস্য ভেদনম্ ॥ ৬

কেতনানাং চ জীর্ণানামবেক্ষা চৈব সীদতাম্।
দ্বিবিধস্য চ দণ্ডস্য প্রয়োগঃ কালচোদিতঃ ॥ ৭

সাধূনামপরিত্যাগঃ কুলীনানাং চ ধারণম্।
নিচয়শ্চ নিচেয়ানাং সেবা বুদ্ধিমতামপি ॥ ৮

বলানাং হর্ষণং নিত্যং প্রজানামন্ববেক্ষণম্।
কার্যেষ্বখেদঃ কোশস্য তথৈব চ বিবর্ধনম্ ॥

পুরগুপ্তিরবিশ্বাসঃ পৌরসংঘাত-ভেদনম্।
অরিমধ্যস্থমিত্রাণাং যথাবচ্চান্ববেক্ষণম্ ॥

উপজাপশ্চ ভৃত্যানামাত্মনঃ পুরদর্শনম্।
অবিশ্বাসঃ স্বয়ং চৈব পরস্যাশ্বাসনং তথা ॥ ১১

নীতিধর্মানুসরণং নিত্য মুত্থানমেব চ।
রিপূণামনবজ্ঞানং নিত্যং চানার্যবর্জনম্ ॥ ১২

যুধিষ্ঠির! গুপ্তচর রাখা, অন্যরাষ্ট্রে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করা সেবকগণ রাজার প্রতি ঈর্ষান্বিত হবার আগেই বেতন দেওয়া, যুক্তিপূর্বক কর আদায় করা, অন্যায়ভাবে প্রজার ধন আত্মসাৎ না করা, সৎপুরুষদের একত্রিত করা, বীরত্ব, কার্যদক্ষতা, সত্যভাষণ, প্রজার হিত চিন্তন, সরল বা কুটিল উপায়েও শত্রুপক্ষে ছিদ্র ঘটানো, পুরাণো বাড়ী মেরামত করা, জীর্ণ মন্দির সংস্কার করা, দীন দুঃখীদের দেখাশোনা করা, সময়ানুসারে শারীরিক ও আর্থিক দুই প্রকারের দণ্ড প্রয়োগ করা, সাধু পুরুষদের বর্জন না করা, কুলীন মানুষদের নিজের কাছে রাখা, সংগ্রহযোগ্য বস্তুদকল সংগ্রহ করা, বুদ্ধিমান্ পুরুষদের সেবা করা, পুরস্কার দ্বারা সেনাদের আনন্দও উৎসাহ বর্ধন; নিত্য নিরন্তর প্রজাদের দেখাশোনা করা, কার্য করতে গিয়ে কষ্ট অনুভব না করা, ধনভাণ্ডার বর্ধিত করা, নগররক্ষার পূরা ব্যবস্থা করা ও এ বিষয়ে অন্যের উপর নির্ভর করে না থাকা, পুরবাসী যদি নিজের বিরুদ্ধে জোট বাঁধে তাদের মধ্যে গোলমাল বাধিয়ে দেওয়া, শত্রু, মিত্র ও মধ্যস্থদের উপর যথোচিত দৃষ্টি রাখা অন্যে যেন নিজের কর্মচারীদের মধ্যে জোট পাকাতে না পারে তা দেখা, স্বয়ং নগর পরীক্ষা করা, কারো উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন না করা, অন্যকে আশ্বাস দেওয়া, নীতিধর্ম অনুসরণ করা, সর্বদা প্রযত্নশীল থাকা, শত্রুপক্ষ থেকে সাবধান থাকা, নীচকার্যে রত দুষ্ট

পুরুষদের সব সময় ত্যাগ করা উচিত,—এই সকলই রাজ্য রক্ষার উপায়।

উত্থানং হি নরেন্দ্রাণাং বৃহস্পতিরভাষত।

রাজধর্মস্য তন্মূলং শ্লোকাংশ্চাত্র নিবোধ মে ॥১৩

বৃহস্পতি রাজাদের পক্ষে উদ্যোগ কতখানি মহত্বপূর্ণ তা প্রতিপাদন করেছেন। উদ্যোগই রাজধর্মের মূল। এ-বিষয়ে যে শ্লোক রয়েছে শোন।

উত্থানেনামৃতং লব্ধমুত্থানেনাসুরা হতাঃ।

উত্থানেন মহেন্দ্রেণ শ্রৈষ্ঠ্যং প্রাপ্তং দিবীহ চ ॥১৪

দেবরাজ ইন্দ্র উদ্যোগ দ্বারাই অমৃত প্রাপ্ত হয়েছিলেন, উদ্যোগদ্বারাই অসুর সংহার করেছিলেন—উদ্যোগদ্বারাই দেবলোকে ও ইহলোকে শ্রেষ্ঠতা অর্জন করেছিলেন।

উত্থানবীরঃ পুরুষো বাগ্বীরানধিতিষ্ঠতি।

উত্থানবীরান্ বাগ্বীরা রময়ন্ত উপাসতে।১৫

যিনি উদ্যোগে বীর, তিনি বাক্য-বীর পুরুষদের উপর আধিপত্য করেন। বাক্যবীর বিদ্বানেরা উদ্যোগবীর পুরুষদের মনোরঞ্জন করেন ও উপাসনা করেন।

উত্থানহীনো রাজা হি বুদ্ধিমানপি নিত্যশঃ।

প্রধর্ষণীয়ঃ শত্রূণাং ভুজঙ্গ ইব নির্বিষঃ ॥১৬

যে রাজা উদ্যোগহীন, তিনি বুদ্ধিমান হয়েও বিষহীন সর্পের মত সর্বদা শত্রুদ্বারা পরাস্ত হয়ে থাকেন।

ন চ শত্রুরবজ্ঞেয়ো দুর্বলোঽপি বলীয়সা।

অল্পোঽপি হি দহত্যগ্নির্বিষমল্পং হিনস্তি চ ॥১৭

বলবান্ পুরুষেরও দুর্বল শত্রুকে অবহেলা করা উচিত নয়। অল্প অগ্নিতেও দগ্ধ করে, অল্প বিষও মারক হয়।

একাঙ্গেনাপি সম্ভূতঃ শত্রুর্দুর্গমুপাশ্রিতঃ।

সর্বং তাপয়তে দেশমপি রাজ্ঞঃ সমৃদ্ধিনঃ।১৮

চতুরঙ্গ সেনার এক অঙ্গমাত্র নিয়ে শত্রু দুর্গ আশ্রয় ক'রে সমৃদ্ধিশালী রাজার সমস্ত দেশ সন্তপ্ত করে তুলতে পারে।

রাজ্ঞঃ রহস্যং যদ্ বাক্যং জয়ার্থং লোকসংগ্রহঃ।

হৃদি যচ্চাস্য জিহ্মং স্যাৎ কারণেন চ যদ্ ভবেৎ ॥১৯

যচ্চাস্য কার্যং বৃজিনমার্জবেনৈব ধারয়েৎ।

দম্ভনার্থং চ লোকস্য ধর্মিষ্ঠামাচরেৎ ক্রিয়াম্ ॥২০

রাজার পক্ষে যে সব গোপনীয় রহস্য কথা, শত্রুর উপর [illegible] লোক সংগ্রহ করার কাজে বিজয়ের অথবা তাঁকে করার যোগ্য যে অসৎকার্য করতে হবে,—এ সকলই তাঁকে সরলভাবে গোপন রাখতে হবে। তিনি লোকসমাজে নিজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সর্বদা ধর্মকার্যের অনুষ্ঠান করবেন।

রাজ্যং হি সুমহৎ তন্ত্রং ধার্যতে নাকৃতাত্মভিঃ।

ন শক্যং মৃদুনা বোঢুমায়াসস্থান মুত্তমম্ ॥২১

রাজ্য এক বৃহৎ তন্ত্র। যিনি নিজের মনকে বশে আনতে পারেন নি, এমন ক্রূর স্বভাবশীল রাজা সেই বিশাল তন্ত্রকে সামলাতে পারেন না। তেমনি ভাবে যিনি খুব কোমলপ্রকৃতির লোক তিনিও তার ভার বহন করতে পারেন না। তাঁর পক্ষে রাজ্য বড় জঞ্জাল হয়ে দাঁড়ায়।

রাজ্যং সর্বামিষং নিত্যমার্জবেনেহ ধার্যতে।

তস্মান্মিশ্রেণ সততং বর্তিতব্যং যুধিষ্ঠির ॥২২

যুধিষ্ঠির! রাজ্য উপভোগের বস্তু। অতএব সর্বদা সরল ভাবেই তাকে রক্ষা করা যায়। তাই রাজার মধ্যে ক্রূরতা আর কোমলতা দুই ভাবেরই সম্মিশ্রণ হওয়া দরকার।

যদ্যপ্যস্য বিপত্তিঃ স্যাদ্ রক্ষমাণস্য বৈ প্রজাঃ।

সোঽপ্যস্য বিপুলো ধর্ম এবং বৃত্তা হি ভূমিপাঃ ॥২৩

প্রজার রক্ষা করতে গিয়ে যদি রাজার প্রাণও যায় তবু তাই তাঁর পক্ষে মহান্ ধর্ম। রাজাদের ব্যবহার ও আচরণ এরূপ হওয়াই উচিত।

এষ তে রাজধর্মাণাং লেশঃ সমনুবর্ণিতঃ।

ভূয়স্তে যত্র সন্দেহস্তদ্ ব্রূহি কুরুসত্তম ॥২৪

কুরুশ্রেষ্ঠ! এ রাজধর্মের লেশমাত্র আমি তোমার কাছে বর্ণনা করলুম। এখন তোমার যে-যে কথায় সন্দেহ হচ্ছে তা জিজ্ঞাসা কর।

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততো ব্যাসশ্চ ভগবান্ দেবস্থানোঽশ্ম এব চ।

বাসুদেবঃ কৃপশ্চৈব সাত্যকিঃ সঞ্জয়স্তথা ॥২৫

সাধু সাধ্বিতি সংহৃষ্টাঃ পুষ্পমানৈরিবাননৈঃ।

অস্তুবংশ্চ নরব্যাঘ্রং ভীষ্মং ধর্মভৃতাং বরম্ ॥২৬

বৈশম্পায়ন বললেন—হে জনমেজয়! ভীষ্মের একথা শুনে ভগবান্ ব্যাস, দেবস্থান, অশ্ম, বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ,

আনন্দে বিস্ফারিতবদনে ধন্যবা'দ জানিয়ে ধর্মাত্মশ্রেষ্ঠ পুরুষসিংহ ভীষ্মের ভূরি ভূরি প্রশংসা করতে লাগলেন।

ততো দীনমনা ভীষ্মমুবাচ কুরুসত্তমঃ।
নেত্রাভ্যামশ্রুপূর্ণাভ্যাম্ পাদৌ তস্য শনৈঃ
স্পৃশন্॥২৭

শ্ব ইদানীং স্বসন্দেহং প্রক্ষ্যামি ত্বাং পিতামহ।
উপৈতি সবিতা হ্যস্তং রসমাপীয় পার্থিবম্ ॥২৮

তারপরে কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির মনে দুঃখিত হয়ে, অশ্রুতে দুই চক্ষু ভরে ধীরে ধীরে ভীষ্মের চরণ স্পর্শ করে বললেন পিতামহ, এসময় ভগবান্ সূর্য নিজের কিরণ দিয়ে পৃথিবীর রস পান করে, অস্তাচল যাচ্ছেন। তাই আমি আপনাকে কাল আমার সন্দেহ জিজ্ঞাসা করব।

ততো দ্বিজাতীনভিবাদ্য কেশবঃ
কৃপশ্চ তে চৈব যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ।
প্রদক্ষিণী কৃত্য মহানদীসুতং
ততো রথানারুরুহুর্মুদান্বিতাঃ ॥ ২৯

তারপর ব্রাহ্মণদের প্রণাম করে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৃপাচার্য তথা যুধিষ্ঠির আদি মহানদী গঙ্গার পুত্র ভীষ্ম-জীর পরিক্রমা করলেন, তারপর নিজের নিজের রথে চড়ে বসলেন।

দৃষদ্বতীং চাপ্যবগাহ্য সুব্রতাঃ
কৃতোদকার্য্যাঃ কৃতজপ্যমঙ্গলাঃ।
উপাস্য সন্ধ্যাং বিধিবৎ পরন্তপা—
স্ততঃ পুরং তে বিবিশুর্গজাহ্বয়ম্ ॥ ৩০

আর দৃষদ্বতী নদীতে স্নান করে, উত্তমব্রতধারী শত্রুসন্তাপী বীর বিধি-পূর্বক সন্ধ্যা তর্পণ ও জপ আদি মঙ্গল কর কর্মের অনুষ্ঠান করে সেখান থেকে হস্তিনাপুরে চলে এলেন।

বিবর্ণ দেয়ালে

আবদুল ওয়াশে

অনেক অদ্ভুত ছবি জীবনের বিবর্ণ দেয়ালে
কেমন নিঃসঙ্গ কোলে। অশ্বত্থের মরা শীর্ণ ডালে
পরিত্যক্ত পাখীদের বাসা : অথচ পাখীর গানে
একদা মুখর ছিল এখানের একটু আকাশ
আজ সব ফাঁকা ফাঁকা। কিছুই তোলেনা আর কানে
মরা গাছ— যা খুশী বলুক আজ পাগল বাতাস।
অথচ এসব ছবি নিয়ে কি দারুণ উত্তেজনা,
একদিন জেগেছিল নীলামের হাটে, সে ঘটনা—
আষাঢ়ে গল্পের মত শোনাবে এখন—তাই আর,
অতীতের কথা টেনে এখানে আনিনে হাহাকার।
যেটুকু রয়েছে বাকী তা' দিয়ে কি আর কোনো ছবি
আঁকা হ'বে! ছড়াবে বিচিত্র রঙ ম্লান অস্তরবি
আহা যেন তাই হয়। জীবনের বিবর্ণ দেয়ালে
যে সব রয়েছে ছবি রঙ যেন লাগে তার গালে।

কঠোপনিষদের সাধন পথ

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

চতুর্বিংশতি মন্ত্র (১।১।২৪)

মন্ত্র :—এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং বৃণীষ,
বিত্তং চিরজীবিকাং চ।
মহাভূমৌ নচিকেত ত্বমেধি
কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি॥

অর্থ :—(যম আবার বলিতেছেন :—) "যদি ইহার তুল্য অপর কোন বর পাইতে ইচ্ছা কর, তাহাও প্রার্থনা কর। ইহা ছাড়া চিরজীবনের মত সুবর্ণ ও রত্নাদি প্রার্থনা কর। হে নচিকেতা, তুমি বিশাল ভূভাগের অধিপতি হও। আমি তোমায় (দিব্য ও লৌকিক) কাম্যবস্তু সমূহের ভোগে সামর্থ্য দিতেছি।"

ব্যাখ্যা :—পূর্ব্ব মন্ত্রে সাংসারিক জীবন ও সুখ সুবিধা দিবার সংকল্প যমরাজ জানাইয়া ছিলেন, এক্ষণে পার্থিব ও দিব্য (দেবভোগ্য) সকল বস্তু প্রদানের জন্য উৎসুক হইলেন। যদি নচিকেতার মন তুষ্ট হয়। এভাবে গরীব ব্রাহ্মণ সন্তানদের মন আকৃষ্ট হইতে পারিত। ঐশ্বর্য্য ও সুন্দরী ভার্য্যা পাইলে অনেক অসন্তুষ্ট মুনির চিত্ত বিভ্রান্ত হইত। কিন্তু নচিকেতা রাজবংশের সন্তান, দ্বিতীয়মন্ত্রে, তাঁহাকে "কুমার" বলা হইয়াছে। যখন তিনি "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা" (ঈশ-উপ, ১) মন্ত্র মতে সর্ব্বস্বত্যাগ হইলে বাহির হইয়াছেন, তখন সবই ত তাঁহার অন্তরে ভোগ হইয়া যায় নাই কি? এক্ষণে রাজসিক সম্পদও এমনকি সাত্ত্বিক বিভূতি পর্য্যন্ত তাঁহাকে আর আকর্ষণ করে না।

পঞ্চবিংশতি মন্ত্র (১।১।২৫)।

মন্ত্র :—যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্তলোকে
সর্ব্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।
ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্য্যা
ন হীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ।
আভির্মৎ প্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব
নচিকেতো মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ॥

অর্থ :—(যম এখন শেষবার অনুনয় করিতেছেন :—) "মর্ত্তলোকে যে যে কাম্য বস্তু দুর্লভ, সেই সমুদায় ইচ্ছানুসারে প্রার্থনা কর। এই যে সুখদায়িনী অপ্সরা গণ রথে আরোহণ করিয়া এবং বাদ্য যন্ত্র লইয়া (তোমার সম্মুখেই) উপস্থিত আছে, এইরূপ রমণী মনুষ্যের লভ্য নহে। মৎপ্রদত্ত ইহাদিগের দ্বারা তুমি নিজের সেবা করাও। হে নচিকেতা, মরণ বিষয়ে এইরূপ প্রশ্ন করিও না।"

ব্যাখ্যা :—নিষ্প্রয়োজন। "রথে আরোহণ করিয়া, বাদ্য যন্ত্র লইয়া রমণীগণ আছেন" বলিতে যমরাজ জানিতে চান যে নচিকেতার সংস্কারের মধ্যে এইরূপ ভোগবাসনা তাঁহার সূক্ষ্ম দেহে অবস্থিত হইয়া, তাঁহাকে মধুর সুরে আহ্বান করিতেছে কি না। ইহা যেন নচিকেতার অন্তর স্বীয় অভিরুচি অনুসারে অনুসন্ধান করাইবার জন্য যমের শেষ আবেদন।

ষড়্বিংশতি মন্ত্র (১।১।২৬)।

মন্ত্র :—শ্বোভাবা মর্ত্তস্য যদন্তকৈতৎ
সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্বং জীবিতমল্পমেব,
তবৈব বাহা স্তব নৃত্যগীতে॥

অর্থ :—(নচিকেতা এক্ষণে যম কর্তৃক যত প্রলোভন প্রদর্শিত হইল, তাহার উত্তরে বলিতে আরম্ভ করিলেন—) "হে যমরাজ! আপনার বর্ণিত ভোগ্যবস্তু সমুদায় কল্য পর্য্যন্ত থাকিবে কি না, তাহা অনিশ্চিত। উহারা মানুষের ইন্দ্রিয় সকলের শক্তি ক্ষয় করে। তাহা ছাড়া, সকলেরই জীবন ক্ষণস্থায়ী। অতএব বাহন (অশ্ব) সকল আপনারাই এবং নৃত্যগীত আপনারই থাকুক।"

ব্যাখ্যা :—২৩ হইতে ২৫ মন্ত্র পর্য্যন্ত যমরাজ অনবরত কত প্রকার কাম্য বস্তু নচিকেতার সম্মুখে উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে উপহার দিতে চাহিলেন। নচিকেতা যতই তাঁহার তৃতীয় বরের জন্য উদ্‌গ্রীব হ'ন, যমরাজ ততই

উত্তরে তাঁহাকে কত কি বর দিতে প্রস্তুত হ'ন। আয়ু, ধন, জন, সম্পত্তি, সম্মান কত কি বৈভব, কিন্তু নচিকেতার চিত্ত বিভ্রান্ত হইল না।

মনে হয়, যিনি আত্মতত্ত্ব জানিতে অভিলাষী হইবেন, তাঁহাকেও নচিকেতার মত এই সকল বিভূতিলাভের সুযোগ ও সুবিধা প্রত্যাহার করিতে হইবে। তবেই তিনি সাধনপথে অগ্রসর হইতে পারিবেন। নচিকেতার জীবনে যাহা হইয়াছিল, তাহা অন্যান্য সাধক ও মহাপুরুষদের জীবনেও যে হইয়া থাকে, তাহা বলা বাহুল্য। তাই নচিকেতা তাঁহাদের উপযুক্ত পূর্বগামীর ন্যায় বলিলেন, "হে যমরাজ; আপনি যাহা দিতেছেন তাহা লইলে পর, তাহার সঙ্গে দুঃখ, ব্যাধি, জরা, মৃত্যু সবই আমাকে আক্রমণ করিবে ও পীড়া দিবে; তবে এ সমস্ত লইয়া কি হইবে? এ সকলই ত অকিঞ্চিৎকর, অনিত্য, ক্ষয়কারী ও ক্ষণস্থায়ী। সাধু ও জ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন হিরণ্যগর্ভবোধ হইতে সমষ্টি জীবনের যে উপলব্ধি আসে তাহাও ত চিরস্থায়ী নহে। সবই নশ্বর, তবে আপনি বলুন, এ সব লইয়া কি হইবে? আমার সব সময়ই মনে হইবে, আপনি আমার মাথার উপর দাঁড়াইয়া আছেন মৃত্যু দণ্ড লইয়া। সময় হইলেই আমার পরীক্ষাময় জীবন আপনার অভিরুচিমত, শেষ হইবে। এবং তারপরও আপনার যেমন ইচ্ছা ঘটিতে থাকিবে।"

মন্ত্রে উক্ত শেষ পংক্তির প্রতি বিশেষ ধ্যান দিতে হয়। নচিকেতা বলিলেন, "আপনার অশ্ব ও নৃত্যগীত আপনারই থাকুক।" অশ্ব সকল যাহা আমাকে বহন করিবে বলিয়া দিতে চাহিতেছেন, তাহা আপনারই থাকুক। নৃত্যগীত, যাহা আমি অন্তরে বহন করিব বলিয়া, নৃত্যগীতকুশল রমণীবৃন্দ যেমন আপনি উপহার দিতে চাহিতেছেন, তাহাও আপনারই থাকুক।

নচিকেতার এই কথার অর্থ বড় গভীর। যাহারা আমাকে বহন করিবে (utilities) বা আমি যাহা বহন করিয়া সুখী হইব (Aesthetics) সবই ত আমাকে পরমুখাপেক্ষী করিবে। আমার নিজের মধ্যে স্থির থাকিতে দিবে না। আমার শ্রদ্ধায় ভাঁটা পড়িবে। তারপর তপস্যা, যজ্ঞ, আত্মদান প্রভৃতি নচিকেত-অগ্নিও আমার জীবনে জ্বলিবে না। সব আধ্যাত্মিক অভ্যাসই ছাড়িয়া যাইবে। তখন ত আমার সেই মৃত্যু, যাঁহার সম্মুখে আমি আজ নিজের পরাগতির সম্বন্ধে পূর্ণভাবে জানিতে চাহিতেছি, সবই ত আমাকে, আপনার দিকে, অসহায়-ভাবে টানিবে? তবে কেন দিতেছেন? যমরাজ!

আপনি আমার মিনতি শুনুন। যে মানুষ অপরকে বহন করে না বা অন্যের ভার হয় না, সে সঙ্গ দোষ রহিত হয়, তাহারই মোহ কাটিয়া যায়, সে বাহিরে বা অন্তরে সংসারের কোন কিছুর ডাক শুনে না, "নিশ্চল" ও "অচল" থাকিয়া "যোগরূঢ়" হইতে সক্ষম হয়। (ইহাই যে বুদ্ধি যোগের পরাকাষ্ঠা, তাহার জন্য গীতার মহাবাক্য, ২।২৩, বিশেষ দ্রষ্টব্য) নচিকেতার কথা, বিজ্ঞান সাহায্যে ভাল করিয়া বুঝিতে হয়। পাশ্চাত্য জ্যোতিষ অনুসারে চন্দ্রকে এই পৃথিবী আকর্ষণ করিয়া বহন করিতেছে ও সূর্য্যের আকর্ষণে নিজে চলিতেছে। ইহাকেই ভূগোল শাস্ত্রে বলা হয়, Rotation ও Revolution। তাই দুনিয়ার এত কষ্ট, এই দুই প্রকার টানের জন্য। দুনিয়ার মত, তাহার সংস্রবে থাকিয়া সংসারের জীব, সেই অভ্যাস প্রাপ্ত বলিয়া, তাহারই মত কষ্ট পায়। অর্থাৎ নিজে ঘুরে মরে ও অপরকে ঘুরাইয়া মারে। জাগতিক অনুকরণে জীবের নড়াচড়া ব্যবহারিক জীবনে যদি বা সত্য হয়, তাহা আধ্যাত্মিক জীবনে স্বীকৃত না হইলে "তুরীয়" অবস্থা সকলের পক্ষেই সহজে শিক্ষণীয় হয়। তাই পূর্ণতর আদর্শে চির প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, হিন্দু জ্যোতিষ প্রথম হইতেই শিক্ষার্থীদের জানাইতেন যে বিশ্বসৃষ্টির মূলকেন্দ্র ধরাধামের নড়াচড়া নাই, সে সম্পূর্ণ স্থির ধীর অবিচলিত ভাবে সর্ব্বদা রহিয়াছে ও তাহাকেই চন্দ্রসূর্য্য প্রভৃতি পরিক্রমা করিতেছে, তাহাদের নিজেদের অভ্যাস অনুযায়ী। হিন্দু জ্যোতিষ এই নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া, গ্রহনক্ষত্রাদি সম্বন্ধে সকল মীমাংসাই অঙ্কশাস্ত্র অনুসারে যথাযথভাবে নিরূপণ করিতে সমর্থ ছিলেন এবং সে বিষয়ে আজ অবধি জগতের কোন বৈজ্ঞানিক ভুল বাহির করিতে পারেন নাই। একথা সত্য হইতে পারে যে ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় হিন্দু জ্যোতিষকে ত্যাগপত্র দিয়া পাশ্চাত্য জ্যোতিষকে আপন বলিয়া বরণ করিয়াছেন বলিয়া এই দেশের জ্যোতিষশাস্ত্র ক্রমশঃ পিছাইয়া পড়িয়াছে, যদিও একদিন সে সারা বিশ্বের দ্বারা আদৃত ছিল। আমরা পরিশেষে শুধু এই কথাই বলিব যে হিন্দুর জ্যোতিষশাস্ত্র মানবের আধ্যাত্মিক জীবনের পরিণতির অনুকূল হইয়া চলে বলিয়া তাহাকে পূর্ণ স্বীকৃতিদান করিলে শিক্ষা প্রণালীর মধ্যে কোন প্রকার দ্বন্দ্ব কোনকালেই ধর্ম্মজীবনকে বিক্ষুব্ধ করিতে পারে না। ভারতের সংস্কৃতি ধরিয়া না চলিলে ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনের উত্তরাধিকারী হওয়া কঠিন হয় না কি? [ক্রমশঃ]

—
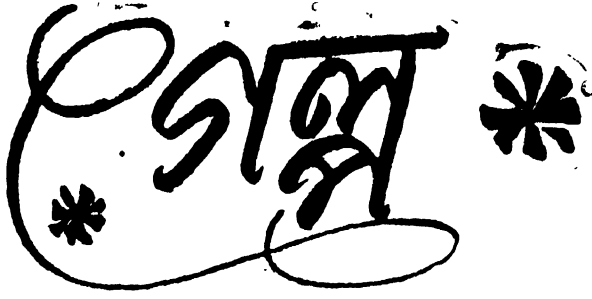
অপরাধ

প্রদীপকুমার খাজাঞ্চী

কোলকাতা থেকে বাধ্য হয়ে ছুটি নিয়ে বাড়ী আসতে হল অরুণাংশুকে। কেননা না এসে এর কোন উপায়ও ছিল না। সে তো চেষ্টা কমকরেনি, কিন্তু কোথাও যদি সে টাকা না পায় তবে কি করবে? অথচ টাকা তার চাই। আগামী দুদিনের মধ্যেই যে তাকে বি, এ, পরীক্ষার ফিস্ জমা দিতে হবে, নইলে—ভাবতেও পারে না অরুণাংশু সে কথা। গতদিন কটা অরুণাংশু শুধু ভেবেছে আর ভেবেছে কিন্তু অন্ধকার ছাড়া আলোর ক্ষীণতম রেখা কোথাও তার চোখে পড়েনি।

অরুণাংশু জানে তার বাবা আকণ্ঠ ডুবে আছেন ঋণের সমুদ্রে। তার ফিসের টাকা যোগাড় করতে গিয়ে হয়তো আরো কিছুটা তলিয়ে যাবেন তিনি। কিন্তু সব কিছু জানা সত্বেও তাকে আবার আসতে হল সেই বাবার কাছে হাত পাততে। অরুণাংশু ভাবে ভাগ্যিস ব্যারিষ্টার মুখার্জি দয়া করে তাকে গৃহশিক্ষকের পদটা দিয়েছিলেন। নইলে কবে তাকে ইতি টানতে হতো পড়ায়। নিজের বাড়ীর ছেলের মতই অরুণাংশু স্থান পেয়েছে মুখার্জি পরিবারে। অরুণাংশুর ছাত্রী সুজাতা এবার স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দেবে। সে নিজের পড়ার ক্ষতি করেও সুজাতার জন্য বেশী করে খাটছে, যাতে ভাল ভাবে সে পাশ করতে পারে।

আসবার সময় বারবার বলে দিয়েছে সুজাতা, "আগামী সোমবার দিন আমার জন্মদিন সেদিন যেমন করেই হোক আপনাকে কিন্তু আসতেই হবে মাষ্টার মশাই। না আসলে কিন্তু ভীষণ রাগ করবো।"

"নিশ্চয়ই আসবো।" হাসতে হাসতে জবাব দিল অরুণাংশু।

অরুণাংশুদের বাড়ীর পাশেই একজন নূতন ভাড়াটে এসেছেন। বিকেলে সেই বাড়ীর পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল তার বাবার নাম শুনে। পাড়ার আরো কয়েকজনের গলার শব্দও সে পেলো। অরুণাংশু শুনতে পেল, "আমি তো অত শতবুঝতেপারিনিমশাই নূতন আপনাদের এখানে এসেছি, কে ভাল কে মন্দ—তা' কি করে জানবো? ভদ্রলোক হাত জোড় করে এসে বল্লেন, 'আপনি টাকা কটা দিয়ে এবারের মত আমায় চালিয়ে দিন। মাইনে পেয়েই আমি শোধ করে দেব। দুদিনের মধ্যে ফিসের টাকা জমা দিতে না পারলে ছেলেটা পরীক্ষা দিতে পারবে না।' দেখলাম ভদ্রলোকের সমূহ বিপদ, তাই দিয়ে দিলাম টাকা কটা।" বল্লেন নূতন ভাড়াটে ভদ্রলোক।

"উপকার করেছেন, ভালই করেছেন কিন্তু টাকা ফেরৎ পাবার ইচ্ছা নিয়ে যদি করে থাকেন তবে খুব ভুল করেছেন আপনি।" অরুণাংশুদের পুরোনো প্রতিবেশী জগদীশবাবু বললেন চিবিয়ে চিবিয়ে।

"কিন্তু ভদ্রলোক যে বল্লেন মাইনে পেলেই—" তাকে থামিয়ে দিয়ে বিশুখুড়ো বলে উঠলেন "হ্যাঁ মাইনে উনি পাবেন ঠিকই তবে সে টাকা আপনার হাতে না এসে চলে যাবে কাবলীওয়ালা, বাড়ীওয়ালা আর মুদিওয়ালার পকেটে।"

"বলেন কি মশাই" নতুন ভদ্রলোক আকাশ থেকে পড়লেন যেন।

"তাছাড়া আর কি করবে বলুন মশাই, মাইনেতো পায় শ দেড়েক টাকা! তার মধ্যে এত দেনা শোধ করে হাতে কি আর কিছু থাকে? বাধ্য হয়ে আবার নতুন করে ধার করতে হয়।" বল্লেন জগদীশ বাবু।

বিশুখুড়োর গলার আওয়াজ আবার পাওয়া গেল, "আমরা পাড়ার সবাই তো অরুণের বাবার জ্বালায় অস্থির—তাই ভেবেছি একদিন এসে আপনাকে ঐ চিজ্‌টি সম্বন্ধে

সাবধান করে দিয়ে যাব। কিন্তু তার আগেই আপনি সেই ফাঁদে পড়ে গেলেন ?"

শুনতে শুনতে অরুণাংশুর মনে হল সে যেন শূন্যে ভাসছে। টলতে টলতে ফিরে এলো সে। তখন তার মাথায় দুনিয়ার যত উদ্ভট কল্পনা—তাই ঘুরে বেড়াতে লাগল।

*　*　*

কলকাতায় এসে প্রথমেই অরুণাংশু গেল ফিসের টাকা জমা দিতে। তারপর যে কয়টা টাকা বাঁচলো—তাই দিয়ে কিনে ফেল্‌লো এক সেট রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী। চোক কান বুঁজেই কিনল।

আজ সুজাতার জন্মদিন একটা কিছু দিতেই হবে।

যদ্দূর সম্ভব ওদের সাথে তাল মিলিয়ে তাকে চলতে হবে। তাতে যত হোঁচটই থাক না কেন।

কিন্তু ঐ সমস্ত কথা তখন ভাবছিল না অরুণাংশু। তার মনে শুধু উঠানামা করছিল বিশুখুড়ো আর জগদীশ বাবুর কথাগুলো. বহু চেষ্টাতেও মনটা কিছুতেই শান্ত করতে পারছে না সে।

চিন্তার আবর্তে ঘুরপাক খেতে খেতে কখন যে সে মিঃ মুখার্জির ড্রয়িংরুমে ঢুকে পড়েছে—তা সে বুঝতেই পারেনি চমক ভাঙল তার সুজাতার আহ্বানে।

"মাষ্টারমশাই এদিকে আসুন।" বলে হাসিমুখে এগিয়ে এল সুজাতা।

চমৎকার লাগছে আজ সুজাতাকে। পরনে সিল্কের শাড়ী, কপালে চন্দনের টিপ আর খোপায় জড়ানো বেলফুলের মালা।

অরুণাংশু লাল ফিতায় বাঁধা বইগুলি সুজাতার হাতে তুলে দিল। সুজাতাও শ্রদ্ধার. সঙ্গে গ্রহণ করল মাষ্টারমশায়ের স্নেহের উপহার। এবার অরুণাংশু চোখ ফিরালো ড্রয়িংরুমের অন্যদিকে। চোখ ঝলসে গেল তার। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যেন বিলাসিতার প্রতিযোগিতা লেগেছে। যেদিকে দৃষ্টি ফেরানো যায়, সেদিকেই চোখ ঝলসানো শাড়ী আর দামী স্যুটের সমারোহ। এক অদ্ভুত দৃষ্টি নিয়ে অরুণাংশু দেখতে লাগল, আর দেখতেই লাগল। চমক ভাঙল সুজাতার ডাকে "মাষ্টারমশাই, চলুন আমার উপহার দেখবেন। অরুণাংশুর জামার হাতা ধরে মৃদু টান দিল সুজাতা।

স্বপ্নোত্থিতের মত অরুণাংশু বল্‌ল, এ্যাঁ—ও হ্যাঁ চল।"

একটা ঘর ভর্তি হয়ে গ্যাছে উপহারে। পোষাক, বই, নানা রকম প্রসাধন সামগ্রী আর গয়না। খুব দামী লকেট লাগান একটা হারের দিকে তাকিয়ে অরুণাংশু বল্‌ল, "বাঃ চমৎকার তো!"

আনন্দে সুজাতার সুন্দর চোখ দুটি চক্ চক্ করে, "বাবা দিয়েছেন," বল্‌ল সে।

হঠাৎ সুজাতার বান্ধবী ধীরা এসে সুজাতাকে কানে কানে কি বলল, সুজাতা একবার তাকাল ধীরার দিকে, তারপরে আসছি বলে ধীরার সঙ্গে বাড়ীর ভিতর চলে গেল।

আর অরুণাংশু বিস্মিত দৃষ্টিতে হারটা দেখতে লাগল। তীব্র বৈদ্যুতিক আলোয় জ্বলছে লকেটে বসান হীরার টুকরোটা আর থেকে থেকে শ্বাপদের চোখের মত জ্বলে উঠছে অরুণাংশুর চোখ দুটো।

*　*　*

কদিন পর অরুণের বাবা একটা মোটা টাকার মণিঅর্ডার পেলেন অরুণের কাছ থেকে। তাতে লেখা আছে—

বাবা,

আশা করি আমাদের যত দেনা আছে—সব এ টাকায় শোধ হবে। তুমি টাকা পাওয়া মাত্রই প্রতিটি লোকের পাই পয়সাও মিটিয়ে দিও। কোথা থেকে টাকা পাঠালাম—তা' এখন চিন্তা না করে অনুরোধ মত কাজ করো। তারপর সব জানতে পারবে। আমার জন্য চিন্তা করো না।

ইতি—
অরুণ

অরুণের বাবা কিছুই বুঝতে না পেরে শুধু তাকিয়ে রইলেন হাতেধরা নোটের দিকে।

*　*　*

অরুণাংশু যে ঘরে থাকতো সে ঘরটা পরিষ্কার করছে চাকরেরা আর তাই ভাবলেশ হীন দৃষ্টিতে দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে সুজাতা। পৃথিবীটাকে বড় বেশী ফাঁকা লাগছে আজ সুজাতার কাছে। মনের মধ্যে গুমরে

গুমরে উঠছে আজ একটি অদৃশ্য কান্নার ঝড়। সুজাতা ভাবতেই পারছেন না, কি করে এ সম্ভব হল। যাকে সে মনের সবটুকু শ্রদ্ধা, প্রীতি উজার করে দিয়েছে, তার এই কাজ? মানুষের মন এত নীচ কি করে হয়? আর ভাবতে পারে না সে। কপালের দুপাশের রগদুটো তার দপ্ দপ্ করতে থাকে।

ধপ্ করে একটা শব্দ হতে চমকে উঠে সুজাতা। অরুণাংশুর বিছানা যখন সরিয়ে নিচ্ছিল চাকরেরা তখন হঠাৎ একটা নীল মলাটের সুন্দর বাঁধান খাতা তার ভিতর থেকে পড়ল। সুজাতা নিজের অজান্তেই এগিয়ে গেল খাতাটার দিকে। তুলে নিল হাতে। পাতা উল্টাতেই আশ্চর্য্য হল সুজাতা। অরুণাংশুর ডায়েরী! নিয়মিত ডাইরী লিখত অরুণাংশু।

কেন জানি হাতদুটো তার কাঁপতে লাগলো। বুকের মধ্যে অনুভব করল সে একটা ঢিপ ঢিপ শব্দ। চোরের মত খাতাখানা আঁচলের নীচে করে নিয়ে এলো নিজের ঘরে।

পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছে সুজাতা। এক একটা পাতা শেষ হচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে সুজাতার মনের উপর চাপছে এক একটা পাথর। পড়ে চলে, সে···

"আমার চোখ ঝলসে দিল লকেটের হীরাটা। মন শুদ্ধ পুড়িয়ে ছাই করে দিল। জ্ঞান, নীতি, বুদ্ধি উবে গেল অকস্মাৎ। সুজাতাদের ঐশ্বর্য্যের ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারতে লাগল দারিদ্র্য-জর্জরিত আমাদের সংসারের কঙ্কালসার রূপটা। নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না। বাবার অসহায় মুখ, বিশুখুড়ো আর জগদীশবাবুর কথাগুলি আমার মাথায় আগুন ধরিয়ে দিল। শেষ পর্য্যন্ত লোভেরই হল জয়।

সুজাতার কত সাধের জন্মদিনের উপহার। জানি বড় আঘাত পাবে সে। মনে মনে অনুভব করেছি তার কান্না, কিন্তু, তখন যা হবার হয়ে গ্যাছে। সংশোধনের আর উপায় নেই এখন। বারবার সুজাতার জন্য চোখ ছাপিয়ে কেন যে বন্যা নেমে এসেছে বুঝতে পারিনি। মনে মনে ঠিক করে ফেলেছি, যে অন্যায় করেছি তার শাস্তি নিজে গিয়ে মাথা পেতে নেব। নইলে কিছুতেই শান্তি পাব না!"

ডাইরীতে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো সুজাতা। তার চোখের সামনে ভেসে উঠ্লো অরুণাংশুর বর্তমান ছবি। পরনে নীল ডোরা কাটা মোটা কাপড়ের হাফ প্যান্ট আর একটা জামা। গলায় ঝুলানো কয়েদিদের নম্বর লেখা একটা চাক্তি।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটি)

রবিবার সকালে ৪৪ ইষ্ট এলম্ ষ্ট্রীটের 'দি বিবেকানন্দ বেদান্ত সোসাইটী'র বিবেকানন্দ মন্দিরে প্রার্থনা সভায় যোগ দেবার জন্য গেলাম। এই সংস্থার আধ্যাত্মিক নেতা বা গুরু হ'লেন স্বামী ভষ্যানন্দ। আসলে ইনি বাঙ্গালী। এই প্রতিষ্ঠানটী ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ১১ই জুন, ১৯৬৬ সালের প্রার্থনা সভার মুখ্য বক্তা হ'লেন সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও দর্শনের অধ্যাপক জর্জ বব্রানস্কী। বিষয়–উপনিষদ ও ভগবদ্গীতা। উদ্বোধন মন্ত্র উচ্চারণ করলেন স্বামী ভাষ্যানন্দ। পরে অধ্যাপকের বক্তৃতা শুরু হ'ল। তিনি টানা পঁয়তাল্লিশ মিনিট বেদ, উপনিষদ ও গীতার তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও রচনাকালের উপর বিশেষ জোর দিলেন। তিনি ভগবদ্ গীতার কাল নির্ণয় খ্রীষ্টজন্মের কয়েক শতক আগের কথাই বললেন। বক্তৃতার পর রেকর্ডে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর বেহালার সুর শোনানো হ'ল। তারপর স্বামী ভাষ্যানন্দ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের জুলাই মাসে আগমনের সুসংবাদ দিলেন। তিনি বোম্বাই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন বোর্ড এবং ট্রাষ্টীর সদস্য। তিনি ১৯৩৬ সালে রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী, ১৯৫৫ সালে শ্রীশ্রীসারদা মার শতবার্ষিকী ও ১৯৬৩-৬৪ সালে বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী মহোৎসবের সচিব ছিলেন। ভাষ্যানন্দ তাঁর সমাপ্তিভাষণ দিলেন ও পঙ্কজ মল্লিকের গাওয়া 'হিমালয়ের' উপর স্তোত্র বাজিয়ে শোনানো হ'ল। বক্তৃতার শেষে তিনি যখন শ্রোতৃবর্গের সঙ্গে আলাপ করছিলেন তখন তাঁর কাছে গিয়ে বললাম 'আপনার নামের মধ্যে যেন সংস্কৃতের একটা সুর শোনা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন বীবরাক্ষের সঙ্গে যেন খুব মিতালি। এই সংস্কৃত কেন্দ্রিক নামটী যেন রাশিয়ান ছাঁচে ঢালা। যেমন আমাদের দেশে কমলাক্ষ, সরোজাক্ষ, কপোতাক্ষী, মীনাক্ষী নামের অনুরূপ তোমার নাম বীবরাক্ষ অর্থাৎ বীবরের মত যার চোখ।'

—ঠিক ধরেছেন। তবে আমার চোখ বীবরের মত কিনা আপনি দেখুন। আমি তো আমার চোখ আয়না ছাড়া দেখতে পাবো না।

তখন তাঁকে তাঁর বক্তৃতার প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর যে আমি একমত নই এবং এ বিষয়ে ভারতীয় বিশেষজ্ঞেরা একমত নন সেই কথা বিশ্লেষণ ক'রে বললাম যে ভারতবর্ষে ঐতিহাসিক কাল নির্ণয়ের খোঁটা মারা হয়েছে বুদ্ধজন্মের সঙ্গে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছরের কিছু আগে। বুদ্ধদেবের সময় বৌদ্ধশাস্ত্র-গ্রন্থ লেখা হ'ত প্রাকৃত ভাষায়,—মুখ্যতঃ পালিতে। তার আগে সংস্কৃত ভাষায় শাস্ত্র রচনার ধারা প্রচলিত ছিল এবং পরেও কিছুদিন বিদ্যমান ছিল। মহাভারতের কাল যদি আড়াই হাজারের কম হয় তো বুদ্ধদেবের অমর কাহিনী ওতে কোথা না কোথাও লেখা থাকতো। তা' যখন নেই তখন বুঝতে হবে বুদ্ধজন্মের আরও আগে এই মহাভারত রচিত হয়েছিল। বহু-প্রচলিত নানা প্রাচীন উপনিষদের তরলসার (Made Easy) রচনা করলেন বেদব্যাস তাঁর ভগবত গীতায় যেটী মহাভারতের যুযুৎসু পটভূমিকায় বিবৃত হয়েছিল। বেদব্যাস নানা বেদকে তাঁর ব্যাসের মধ্যে অর্থাৎ আয়ত্তের মধ্যে এনেছিলেন তাই তাঁর নাম বেদব্যাস বা ব্যাসদেব। উপনিষদগুলো হ'ল বেদের জ্ঞানকাণ্ড।' অতএব উপ-

নিষদগুলোর কাল মহাভারতের কালের চেয়েও প্রাচীন। অর্থাৎ উপনিষদের কাল নির্ণয়ে আরও কম ক'রে কয়েক শতাব্দী বা সহস্র বছর পিছিয়ে যেতে পারে।

তিনি বললেন—আপনার কথায় যুক্তি আ'ছে।

বক্তৃতার শেষে কয়েকটা ছোট বেতের ধামা ভক্তজনের দান গ্রহণের জন্য লাইন ধ'রে হাতে হাতে চলতে ও কিছু অর্থসংগ্রহ হ'তে লাগ্‌লো। বোধ হয় এই মন্তব্য বক্তার ভাল লাগছিল না। স্বামীজি পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে বাংলায় সামান্য কথা হ'ল। তাঁকে আমার কার্ড দিলাম ও বললাম 'আপনারা নতুন বাড়ীতে উঠে যাচ্ছেন। কয়েকদিন এখানে থাকার সময় যদি আপনাদের কোন কাজে লাগি তো' বলতে কুণ্ঠা বোধ করবেন না। যদিও আমার এখানে স্থিতিপর্ব অল্পস্থায়ী। আমার সেবা করার ইচ্ছাকে কাজে লাগাবার তাঁর বিশেষ গা দেখলাম না। তিনি কার্ডের পেছনে ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর লিখে দিতে বললেন। আর বললেন, 'দরকার হ'লে খবর দেবেন।' ওখান থেকে বেরিয়ে চ'লে এলাম আমার হোটেলের কাছে Natural History Museum অর্থাৎ যাদুঘরে। সেখানে আজ বিনামূল্যে প্রবেশের দিন।

এই যাদুঘরে ঢুকতেই সামনে বিরাট হাতী শুঁড় উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। খোপে খোপে বিভিন্ন মরা জীবজন্তু। তাদের এমনি প্রাকৃতিক পরিবেশ এঁকে, তার সঙ্গে কিছুটা সত্যিকারের বনজঙ্গল রেখে পেছন থেকে আলো ফেলে মনোরম ক'রে তুলেছে। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের খোপে পেছনে আঁকা নীলাকাশ, খাল, সুন্দরী গাছ, বাঁশঝাড় আর তারই সামনে কয়েকটা সত্যিকারের বাঁশ বা প্লাষ্টিকের বাঁশ খাড়া করা ও বাঁশের শুকনো ও কাঁচাপাতা ফেলা। তার মাঝে লম্বা লম্বা ডোরাকাটা একটা বৃহৎ বাঘ হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে। আর ফ্লোরেসেন্ট আলোয় উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে প্রকোষ্ঠ। এইখানের একটা ঘরে মায়া সভ্যতার বহু সংগ্রহ রাখা হয়েছে। মায়া সভ্যতার দেশের নানা রঙিন সবাক চিত্র তুলে এনে দেখানো হচ্ছে মিনিট পাঁচ সাত ধ'রে। এত তথ্য ও জ্ঞানভাণ্ডার এই বৃহৎ অট্টালিকায় যে সেখানে কোন জিনিষই যেন বাদ পড়েনি। এখানে গবেষণা চলে। গবেষণা পুস্তক ছাপানো ও বিক্রী হয়। এখানের রঙিন ছবিও পাওয়া যায়। নীচের তলায় বিরাট কাফেটেরিয়া।

পরের দিন সকালে আমরা পরিদর্শন পর্বে বেরুলাম। ডল্টন্ সাহেব আটটা বাজবার কয়েক মিনিট আগে এসে নীচে অপেক্ষা করছিলেন। আমরা দুজনে চলেছি। আমি প্রশ্ন করলাম তোমাদের বিপরীতমুখী সিকাগো নদীর কাহিনীটা বল। আমাদের অফিসের কোন উপসচিব বলতেন কর্তারা আমায় জল উঁচু লিখতে বললে আমি তাই লিখে দেবো। সাদা কাগজে যা খুশী তাই লেখা সম্ভব কিন্তু যে উঁচু দিক থেকে জল নীচু দিকে আসতো সেই জলের মোড় ঘোরাতে বহু মাটী খুঁড়ে তুলতে হবে ও বিপরীত দিকে ঢাল দিতে হবে; তবেই ত তার মোড় ঘুরবে।

বিপরীতমুখী নদী:

—তবে বলি শোন। ১৮৮৫ সালের ২রা আগষ্ট কালো মেঘে নগরীর আকাশ ছেয়ে গেল। মুষলধারে বৃষ্টিপাত চলল—নিরবচ্ছিন্ন গতিতে। প্রবলধারা আর থামে না। তেসরা আগষ্ট পর্য্যন্ত চল্‌ল। বৃষ্টিপাতের মাত্রা দেখা গেল ৬·১৯ ইঞ্চি হয়েছে। অর্থাৎ সারা সহরে আধফুটের কিছু বেশী জল। সেই জল উঁচু জমি থেকে নেমে নাবাল জমিতে এসে পড়ছে যেখানে এক ফুট, দু ফুট, তিন ফুট গভীর জলের ঢল মিচিগন হ্রদের দিকে নেমে আসছে। যত নাবাল ততই গভীর জল। ভ'রে গেল রাস্তা, ভ'রে গেল ড্রেন। যত সব আবর্জনার ক্লেদ ও রোগবীজাণু নিয়ে বেগে চলেছে হ্রদের জলে মিশতে। হ্রদের জল হ'ল দূষিত। পানীয় জল যেখান থেকে তোলা হয় সেখানেও ঐ দূষিত রোগবীজাণুময় জল নিরুপায় হয়ে পানীয় জল হিসেবে তোলা হ'তে লাগলো। এই দারুণ দুর্যোগময় প্লাবন এনেছিল কলেরা রোগের বীজাণুপূর্ণ দূষিত জলধারা ও তার সংশোধনী ব্যবস্থা—The Metropolitan Sanitary District of Greater Chicago। সেই সংস্থা বুঝেছিল যে দূষিত নোংরা জলের ধোয়ানী পানীয়জলের আধারে ফেলতে দেওয়া উচিত নয়।

তাই স্থির হ'ল ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর ২৮ মাইল লম্বা ২৪ ফুট গভীর ও ১৬০ ফুট চওড়া একটা

খাল কাটা হবে যা 'লকপোর্টে'র কাছে Des Plaines নদীতে গিয়ে মিশবে। এই মানুষে কাটা খালের ঢাল হবে সাত মাইলে এক ফুট মাত্র। তাই নিয়ে যাবে সেকেণ্ডে ১০,০০০ ঘন ফুট জল। এই মাটী ও পাথর খোঁড়ার কাজে লেগে গেল ৮৫০০ লোক আট বছর ধ'রে। তুলে ফেললো ৮০ কোটী ঘনফুট মাটী ও ৩০ কোটী ঘনফুট পাথর। মাটী মানুষ দিয়ে কেটে সরানোর ব্যাপারে মহা সমস্যার উদ্ভব হ'তে নতুন মাটী-কাটা ও সরানোর যন্ত্র আবিষ্কার হ'ল। এই নতুন প্রক্রিয়ায় মাটী সরানো

•সিকাগোর বিশ্ববিদ্যালয়
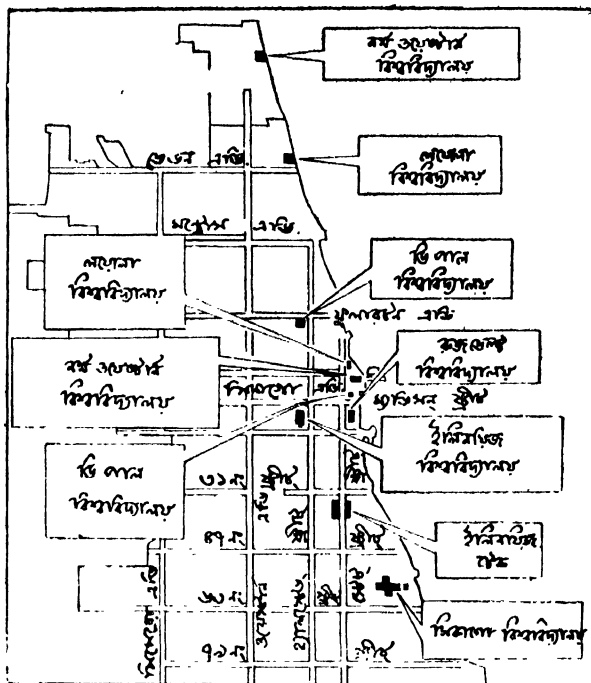
পদ্ধতিকে 'Chicago School of Earth Moving' বলা হয়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই জানুয়ারী নিরোধক গেট স্থাপনও করা হ'ল। তখন মিচিগান হ্রদের জল ঐ স্যানিটারী খাল দিয়ে বিপরীত দিকে ব'য়ে যেতে লাগলো। এই মাটী কাটার যন্ত্র ও প্রক্রিয়ার প্রয়োগে ভবিষ্যতে পানামা খাল কাটা সম্ভব হয়েছিল।

আমেরিকার সপ্ত-আশ্চর্য :

তাই এই খালটীকে আমেরিকায় সপ্ত আশ্চর্যের প্রথম আসন দিয়েছে। এই সপ্ত আশ্চর্যের তালিকায় আছে :

I. সিকাগোর ময়লা পরিশোধন ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা (Chicago's Sewage Disposal System, a Herculean task).

2. কলরেডো নদীর দীর্ঘতম জলবাহী সুড়ঙ্গ (Colorado' River Aqueduct, the largest man-made Canal of the World),

3. গগনচুম্বী এম্পায়ার ষ্টেট অট্টালিকা (Empire State Building, once a Sky Scraper).

4. গ্র্যাণ্ড কুলী আড় বাঁধ ও কলম্বিয়া অববাহিকার সেচ পরিকল্পনা (Grand Coulee Dam and the Columbia Basin Project : Irigation Marvel).

5. হুভার বাঁধ,—পৃথিবীর উচ্চতম বাঁধ (Hoover Dam, World's highest dam).

6. পানামা খাল—দুই মহাসমুদ্রের সংযোগ প্রণালী (Panama Canal, a cut linking two Oceans).

7. স্যানফ্রানসিস্কোর ওকল্যাণ্ড উপসাগর সেতু (San Fransisco-Oakland Bay Bridge. Unique over-water steel structure.

ফ্রাঙ্ক ডবলিউ চেসরো (Frank W. Chesrow) অছি সংসদের সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন :

'With the completion of the St. Lawrence Seaway Project, Chicago, The Metropolitan Sanitary District and the entire Illinois and Mississipi Valley areas are destined to experience development and expansion which will make our dynamic past a mere prologue to a magnificient future.'

মেট্রোপলিটন স্যানিটারী ডিষ্ট্রিক্ট অব গ্রেটার সিকাগো :

বর্তমানে এই মেট্রোপলিটন স্যানিটারী ডিষ্ট্রিক্ট অব গ্রেটার সিকাগো সংস্থা ৯১০টী নগরী, সিকাগো মহানগরী এবং গ্রামীন অঞ্চল ও ১৮টী পৃথক স্যানিটারী ডিষ্ট্রিক্টে ৮৫৮ বর্গমাইল স্থান জুড়ে প্রায় ৫০ লক্ষ লোকের ময়লা নিষ্কাশন ও শোধন কার্য্য করে। এতে আবার শিল্প নিঃসৃত উদ্বৃত্ত তরল পদার্থের সংশোধনী ভার নেওয়া হয়েছে তা' প্রায় ২৫ লক্ষ লোকের ময়লার সমান।

—তা হ'লে দেখা যাচ্ছে যে তোমাদের এলাকা আমাদের কোলকাতার এলাকার দুগুণেরও বেশী। কিন্তু

জনসংখ্যায় তোমরা কম। আখেরে বৃহত্তর কলকাতার জনসংখ্যা দাঁড়াবে দেড়-কোটি অর্থাৎ তোমাদের বর্তমান জনসংখ্যার তিনগুণ। ডলটন বললেন—"ঐ ২৮ মাইল খাল ছাড়া ছ'ফুট থেকে ২৭ ফুট পর্য্যন্ত ব্যাসের ময়লা বইবার মুখ্য পাইপ বসানো হয়েছিল। একথা জোর ক'রে বলা চলে যে সিকাগো হ'ল একমাত্র মহানগরী যেখানের সমুদ্রতট মানুষের পরিত্যক্ত দূষিত পদার্থের ও শিল্পের রাসায়নিক ক্ষতিকারক দ্রব্যে দূষিত নয়। পরে ক্রমে গ'ড়ে ওঠে অন্যান্য বিপরীতমুখী কাটা খাল, যার মোট দৈর্ঘ্য ৭১ মাইল ও যার জন্য ৯০ কোটী ডলার ব্যয় হয়েছিল। এখানে মুখ্য ময়লা পরিশোধনাগারের পরিশোধন ক্ষমতা দিনে ১৩০ কোটী গ্যালন, যেখানে সাড়ে সতেরো কোটী (১৭'৫) ডলার ময়লা শোধনাগার নির্মাণে লগ্নী করা হয়েছে।

"এখানে ৪টী বড় ময়লা শোধনাগার। এখানে Activated Sludge প্রক্রিয়াতে শোধনপর্ব চলে তার বিস্তৃত বিবরণ তোমায় দেবো না, তবে এটা শুনে খুশী হবে যে ময়লার থিতুনী অংশ শুকনো ক'রে দিনে ৫০০ টন প্রস্তুত হয় ও বাজারে সার হিসেবে বিক্রিও করা হয়। এই সংস্থা বছরে ২০ লক্ষ ডলার পায় এই সার বিক্রয় লব্ধ আয় থেকে।

"বাজারে এই সব সারের চাহিদা তেমন বেশী নয়; তাই ময়লার গাদ সংশোধন ও সংকোচনে নতুন পরীক্ষার জন্য F. J. Zimmerman কে এক পরীক্ষা চালাতে বলা হয়। তিনি এক নতুন পন্থা উদ্ভব করেন সেটী হ'ল Wet Air oxidation Method of Sludge Disposal। এটী হ'ল ঘন ময়লা পরিশোধনাগারের কঠিন তলানী ষ্টেনলেস ইস্পাতের পাত্রে চাপে রাখা হয়। তখন তাপমাত্রা থাকে ৪০০° F থেকে ৬০০° F। তলানী অংশের দাহ্য পদার্থ ভিজে থাকা সত্ত্বেও দগ্ধ হ'য়ে ভস্মে পরিণত হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উদ্ভূত তাপ নতুন বিক্রিয়া চালবার পরও উদ্বৃত্ত তাপে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়।

আমি বললাম—এতো তুমি ময়লা আর নোংরার যত্ন নেওয়ার ব্যাপারের কথা বললে। ময়লা জল এলো কোথা থেকে? তার-আগে পানীয় ও শিল্পের জলের কথা জানা দরকার।

—ঠিক বলেছ! কাল তোমায় জল সরবরাহের কর্তাদের কাছে নিয়ে যাবার কর্মসূচী, তখন তুমি এ বিষয়ে জানতে পারবে। একটা কথা বলা হয়নি সেটী হ'ল এখানের বাড়ী বাড়ী থেকে ছোট ছোট ময়লা জলের নল বসাবার দায়িত্ব প্রত্যেক নগরী ও মহানগরীর। সিকাগো মহানগরীতে প্রায় ৪ হাজার মাইল সুয়ার দু'লক্ষের বেশী Catchbasin ও প্রায় দেড়-লক্ষ 'নর গহ্বর' (Manhole) আছে। বছরে প্রায় ২৫ হাজার অসুবিধের নালিশ আসে, নিরীক্ষণ করতে হয় দু'লক্ষেরও বেশী বাড়ী। এটী সিকাগো নগরীর Water & Sewer Department-এর অধীন।

বৃহত্তর সিকাগোর জল সরবরাহ ব্যবস্থা:—

এখানে একটু মজার কথা বলি। সিকাগো মহানগরীতে ও অন্যান্য ৬১টী উপনগরীতে এই সংস্থা জল সরবরাহ করেন। উপনগরীর সীমান্তে এই জল এনে দেওয়া হয়, মোটা পাইপে ক'রে। তখন উপনগরী পরিচালনা-সংস্থা সুষ্ঠুভাবে নিজেরা পাইপ বসিয়ে ঘরে ঘরে প্রসারিত করেন। Water & Sewer Department জল মেপে দাম নেন। সিকাগো সহরে দৈনিক মাথা পিছু ২৬৬ গ্যালন জল ও উপনগরীতে ১৩৫ গ্যালন জল দেওয়া হয়। দিনে গড়ে ১৫ কোটী গ্যালন জল সরবরাহ করা হয় যেখানে কলকাতায় প্রায় দশ কোটী গ্যালন। গরমের দিনে ঘণ্টার সরবরাহের অনুপাতে সর্বাধিক মাত্রা হ'ল ১৯০ কোটী গ্যালন। মূল সিকাগোর জল সরবরাহের হার হ'ল ৯২ কোটী গ্যালন ও উপনগরীগুলোর ১৪ কোটী গ্যালন। জলের গুণ উদ্বর্মান রাখার জল পরীক্ষাগারে রাসায়নিক পরীক্ষা, বীজাণু পরীক্ষা, অনুবীক্ষণের সাহায্যে শৈবাল ও অনুজীবের পরীক্ষা ও ইলকট্রন অনুবীক্ষণের সাহায্যে জীবাণু ও মহাজীবাণু পরীক্ষা করা হয় বছরে ১৫৮৪ হাজারের বেশী জলের নমুনার রাসায়নিক পরীক্ষা ও ৪৫ হাজার জলের নমুনার বীজাণু পরীক্ষা হয়। এখানে ৬৬০ হাজার মীটার চালু আছে তার মধ্যে ১৮ হাজারের বেশী মিটারের গলদ বাড়ীর প্রাঙ্গনেই মেরামত ও কারখানায় ১৬ হাজারেরও বেশী মেরামত করা হয়। মিটার না নিয়ে জলসংযোগ আছে প্রায় সাড়ে-তিন লক্ষ বাড়ীতে।

সিকাগোর গণ গৃহ নির্মাণ ব্যবস্থা :—

'কালুমেট' ময়লা শোধনাগার থেকে ফিরবার সময় নতুন বহুতল বাড়ী ও চওড়া-রাস্তা তৈরীর ব্যাপার দেখিয়ে ডলটন্‌কে জিজ্ঞেস করলাম।

—এত নতুন নতুন বাড়ী কারা তৈরী করছে?

—এটী হ'ল সিকাগো 'হাউসিং অথরিটী'র কার্য্য-কলাপের পরিচয়। তোমার সাব্‌জাক ষ্ট্রীট ও স্টেট ষ্ট্রীটের সঙ্গমস্থলের কাছে যে নতুন বাড়ীগুলো পড়বে সে গুলোয় এক নতুন স্থাপত্যের পরিচয় রয়েছে। ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এরা ৩১,৪৬০টী গৃহ নির্মাণ করেছেন তার মধ্যে বর্তমান বছরে ১৭০০ বেশী বাড়ী নির্মাণে সমর্থ হ'য়েছেন। এই সংস্থার সম্পত্তির মূল্য হ'ল ৪৪৭, ৪৪৯, ৩৩২ ডলার। নিম্ন আয়ের লোকেদের ও বয়স্কদের জন্য আবাসের ব্যবস্থাই এদের মুখ্য কাজ। তাদের ভাড়া ধরা হয় বছরে প্রতি ৫৫ ডলার আয়ে মাসে ১ ডলার হারে। অর্থাৎ

বার্ষিক আয় (ডলারে)	মাসিক ভাড়া (ডলারে)
৩০০০	৫৫
৪০০০	৭৩
৫০০০	৯১
৫২০০	৯৫

গৃহের নানারকম পর্য্যায় আছে। একটী ঘর, দুটী, তিনটী, ৪টী ও ৫টী ঘরের বাড়ীতে মাসিক সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ ভাড়ার হার হ'ল

শোবার ঘরের অনুপাতে (সঙ্গে পায়খানা, স্নানঘর ও রান্নাঘর থাকবে)

	১ ঘর	২	৩	৪	৫	
সর্বনিম্ন ভাড়া	৩৬	৪১	৪১	৪৬	৪৬	ডলার
সর্বোচ্চ ভাড়া	১০০	১১০	১২০	১৩৫	১৫০	ডলার

যখন পরিবারের আয় বেড়ে যাবে তখনতাকে ঐ অল্পমূল্যের ভাড়ার বাড়ী ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র যেতে হবে। এরা তিন, চার ও পাঁচটী শোবার ঘরওয়ালা বাড়ী ৪১%, দুই শোবার ঘরের বাড়ী ৩৬% ; ১ শোবার ঘরের বাড়ী ২৩% হ'রে নির্মাণ করেছেন একটী শোবার ঘরের বাড়ীর চাহিদা কম।

বাড়ী ভাড়া বাবদ এঁদের আয় হ'ল ২৩০ লক্ষ ডলারের বেশী। অনাদায়ী রয়ে গিয়েছে মাত্র ১ লক্ষ ডলারের কিছু বেশী। বাড়ী বদল হয়েছে এখানে শতকরা দশ ভাগ। এদের কর্মশীলতার বিকাশক্ষেত্র ৬২টী জায়গা জুড়ে রয়েছে তাতে বহু বস্তী উচ্ছেদ, বস্তীবাসীর উন্নত গৃহের ব্যবস্থা, অনেক খালি জায়গার উন্নয়ন প্রভৃতিতে এদের কাজ বিস্তৃত।

এই নির্মাণ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সাহায্য রয়েছে। ১৯৬৫ সালে হাউসিং আইন (Housing Act) পাশ হওয়ায় 'সিকাগো হাউসিং অথরিটী' নতুন আইন বলে অন্যলোকের বাড়ী ভাড়া ও লীজ নিতে ও ভাড়া দিতে পারবেন। হাউসিং এজেন্সীর বাড়ীগুলোতে প্রায় এক লাখ চল্লিশ হাজারের বেশী লোক বাস করে। তাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেখানে ৮০০ অবৈতনিক শিক্ষক ৪৬টী শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এখানে স্কাউটিং, খেলাধূলা ও নিয়মিত যুব সম্মেলনের ব্যবস্থা আছে। বহু কিশোর ও যুবক নানা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আনন্দ পান।

অভিনব প্রণালীতে বর্ষার জল নিষ্কাশন :

তবে একটা মজার কথা বলি। একটী যুগল ঠিকেদারী প্রতিষ্ঠান (CHarza Engineering Co ও Bauer Engineering Inc) এক বিচিত্র পরিকল্পনা দিয়েছেন। তাতে বলা হয়েছে যে বর্ষার জল সিকাগোর অনেক নীচু জায়গা থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে পারে না; বেরুতে অনেক সময় লাগে। যার ফলে সহরের বেশ কিছু নাবাল অঞ্চলে প্লাবন ঘটে। যদি ঐ জল তাড়াতাড়ি কোথাও পাঠানো যায় তা হ'লে সমস্যার সমাধান সম্ভব। তাদের পরিকল্পনা হ'ল বড় বড় ব্যাসের খাড়া ও সমভূমিক দোতলা সুড়ঙ্গ সিকাগো শহরের তলায় খোঁড়া। কেননা যুদ্ধোত্তর কালে সুড়ঙ্গ খোঁড়ার ব্যয় দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে সঙ্গে না বেড়ে পুরোনো দামের শতকরা ৪০ ভাগে দাঁড়িয়েছে। বর্ষার জল বড় বড় খাড়াই সুড়ঙ্গ দিয়ে ভূমি থেকে প্রথম স্তরের সুড়ঙ্গের বিন্যাসের মধ্যে সঞ্চিত হবে; তা আবার দিনের বেলা

আরও নীচের তলায় সুড়ঙ্গের বিন্যাসে জল পড়ার সময় টারবিনের সাহায্যে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করানো হবে ও দিনের বিদ্যুতের বেশী চাহিদা কিছু মেটানো যবে।

আবার রাতের বেলা যখন বিদ্যুতের চাহিদা কম থাকে তখন উদ্বৃত্ত জল থিতিয়ে পাম্প ক'রে বৃষ্টির শেষে বাইরে ফেলে দেওয়া হয়। তাতে রাতের বেলা বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ে। সেই পরিকল্পনার ব্যয় অনুমিত হয় ৮৫,২০০,০০০ ডলার।

—এ-এক অভিনব মগজের বিচিত্র তরঙ্গ!

পরে জানা যায় যে এ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে ও কাজ হচ্ছে কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের দেশে কোন আশু প্রয়োজনীয় কাজও দ্রুত হয় না। কর্তাব্যক্তির কেবল মাসের পণ্য সংগ্রহ করে যোগ নিদ্রায় নয়ন নিমীলিত রাখেন। অর্ধশত বছর আগেকার বিশ্বকবির বাণী—

'হে মোর দুর্ভাগা দেশ। যাদের করেছ অপমান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।'

আজ এরা কারা? এ যে আমাদের দেশয়ালি ভাই বোনেরাই যে। গতির যুগে কেন এই মন্থর শম্বুকগতি? কেন এই আলস্য ও শিথিলতা?

সিকাগোর নবতম জলকল পরিদর্শন :

পরের দিন আমরা পৃথিবীর বৃহত্তম জলকল 'Central District Filtration Plant' দেখতে গিয়েছিলাম। ১৯৪৭ সালে South District Filtration Plant এর পর এটী নতুন সংযোজিত হ'ল। পৌ বাস্তুকার জন এরিকসনের মাথায় ১৯২৫ সালে এই পরিকল্পনার অঙ্কুর উপ্ত হয় তা' আজ চল্লিশ বছর বাদে পূর্ণরূপ গ্রহণ করেছে। এই জলকল থেকে ২৭ লক্ষ লোক জল পাচ্ছেন। এটীর সাধারণ পরিশোধন ক্ষমতা ৯৮ কোটী গেলন, সেটী উচ্চ হারে শোধন করলে ১৭০ কোটী গেলনেও উঠতে পারে। 'সাউথ ডিষ্ট্রিক ফিলট্রেশন প্লান্টে' শতকরা ৫০ ভাগ সম্প্রসারণ কাজ চলেছে। সর্বোচ্চ হারে জল সরবরাহ দিনে ২৫০ কোটী গেলন পর্যন্ত করা সম্ভব।

২০ ফুট ব্যাসের সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে জল এসে ৮ ফুট×১০ফুট চোদ্দটী স্লুইশ গেটের মধ্য দিয়ে ছাঁকনির ভেতর দিয়ে একটী Low Lift পাম্পের সাহায্যে ২১ ফুট উঁচুতে তোলা হয়; যাতে অভিকর্ষের ফলে ফিটকিরি, Fulo-silicic acid ও কার্বন মিশ্রিত জলের সঙ্গে মিশে কিছুক্ষণ থিতোবার পর ফিলটারের মধ্য দিয়ে গিয়ে বিরাট কলেবর বিশুদ্ধ জল সংগ্রহের আধারে জমা হয়। এই জলকলের প্রতি কোণে চারটী করে ষোলটী অবক্ষেপণ আধার আছে। এইখানে পলিপাতনের জন্য চার ঘণ্টা পর্যন্ত জল ধরে রাখা হয়। সেই থিতোনো জল ১০ একর বিস্তৃত ৯৬টী ফিলটারের মধ্য দিয়ে পরিশুদ্ধ হয়ে নীচে জমা হয়। প্রতি ফিলটার থেকে ১ কোটী গ্যালন করে জল দিনে পরিশুদ্ধ হয়। ৯৬টী ফিলটারের তলায় প্রায় ৬১ মাইল ৪ ইঞ্চি পাইপ বসানো আছে। স্বয়ংক্রিয় সুইচ টিপলেই ফিলটার কয়েক মিনিটে ধোয়া হ'য়ে যায়। এই সংগ্রহাধারের ধারণ ক্ষমতা ১১$\frac{১}{২}$ কোটী গ্যালন। তা' ছাড়া পাম্প করে নানা জায়গায় বিশুদ্ধ জল প্রেরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা আছে। কমপিউটার আছে, 'ডেটা লগার'-(Data Logger) ও আছে এখানে।

পরিদর্শন ব্যাপারটীকে একটু বৈশিষ্ট্য দেবার ও একই কথা বার বার বলা থেকে মুক্তি দিতে বক্তব্য টেপ রেকর্ড করা আছে। যেমনি চলতে চলতে বিশেষ এক জায়গায় এলাম, তখন পরিদর্শক একটী দেওয়ালের বোতাম টিপে দিলেন। তখন ওপর থেকে লাউডস্পীকারে সেখানের যন্ত্রের বিবরণ, এর বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজন প্রভৃতি নানা তথ্য ব'লে চলেছেন। যদি সব শোনার ইচ্ছা না থাকে বা এগিয়ে যেতে হয় তো বোতামটী আবার একবার টিপলে রেকর্ডের ফিতে পুনরায় বিপরীত দিকে গুটিয়ে আবার গোড়ায় চলে যাবে। আবার বোতামটি টিপলে আবার গোড়া থেকে ধারা বিবরণী শুরু হবে।

[ক্রমশঃ

———

পথের বাঁকে

মদন চক্রবর্তী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

নতুন পরিবেশে এসেছে সুহাস। প্রথমটা বেশ ভাল লাগল তার অজ পল্লীগ্রামে সবুজের সমারোহ উপভোগ করা চলে দু'চোখ ভ'রে।

গোবিন্দবাবুর ছেলে রাধাগোবিন্দবাবু সুহাসকে কোলকাতা অফিস থেকে সরাসরি পাঠিয়েছেন তাঁরই ইঞ্জিনিয়ার কুমুদবাবুর অস্থায়ী অফিসে।

সঙ্গের ব্যক্তিগত চিঠিটা সুহাস তুলে দিল কুমুদবাবুর হাতে।

কুমুদবাবু তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুলে পড়ে বলে উঠলেন, এ সময়ে অবশ্য আমাদের লোকের কোন দরকার ছিল না, তবে আপনি স্বয়ং মালিকের লোক, আপনার কথাই আলাদা।

বলে, তিনি সুহাসের মুখের দিকে একবার তাকালেন।

অপর দিক থেকে কোন সাড়া না পেয়ে, তিনি বললেন, দেখুন মশাই, আমি সাফ কথার মানুষ। চিঠিতে রাধাগোবিন্দবাবু লিখেছেন, লোকটি সৎ, ওকে ভাল করে কাজকর্ম বুঝিয়ে দেবেন আর ওকে নিজের নজরে রাখবেন। তা, মশাই আমি স্পষ্ট কথা বলে দিচ্ছি, আপনি সৎ কি অসৎ তাতে আমার কিছু যায় আসেনা। আপনি বুঝবেন আপনার কাজ।

আর কাজকর্ম যা, তা এখুনিই আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি আপনাকে। কোন অসুবিধে হবেনা আপনার। আর তা সত্ত্বেও যদি অসুবিধে বোঝেন, আপনি একশোবার এলে আমি হাজারবার বুঝিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে রাজী আছি। কিন্তু নিজের নজরে আপনাকে রাখতে পারবো না। কারণ আমি নিজের ওপরেই নিজে নজর রাখতে পারিনা।

বলে, তিনি সুহাসকে ডেকে নিয়ে গেলেন অস্থায়ী অফিসের অন্য একটা ঘরে।

ঘরটা মাঝারী আকারের। চার দেওয়ালে চারটি কাঁচ দিয়ে বাঁধানো বড় বড় ম্যাপ। মধ্যে কটা অর্দ্ধেক গোল আকারের টেবিলের সঙ্গে লাগোয়া চেয়ারে একজন সুশ্রী তরুণী বসে আছেন। তাঁর সামনে টেবিলের ওপর কতকগুলো ম্যাগাজিন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে পরে আছে। ঘরের মেজের ওপর দেওয়ালের কাছ ঘেঁষে সারি সারি কোচ্ সাজানো।

কুমুদবাবুকে দেখেই সুশ্রী তরুণীটি একটু নড়ে চড়ে বসলেন।

সুহাস বুঝল, তরুণীটি এখানেই চাকরী করেন।

কুমুদবাবু একটা ম্যাপের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, এইটাই গোল টাউন-শিপের ম্যাপ। চার মাইল সীমানা জুড়ে সরকারের অর্থের সহযোগিতায় এটা আমাদের গড়ে তুলতে হবে দশ বছরের মধ্যে।

বলে, তিনি ম্যাপের ওপর একটা কাঠি ধরে বিভিন্ন দাগের ওপর সেটা বসিয়ে বসিয়ে বলে যেতে লাগলেন, এটা একটা খাল। এটা বুঁজিয়ে ফেলতে হবে। ওর উত্তর দিকে ঐ যে দাগটা, ওখানে হবে একটা হাসপাতাল এই যে দাগটা, এখানে হবে একটা কলেজ। ওখানে স্কুল। সেখানে ডাকঘর, বাজার, পার্ক, ফুটবল খেলার ময়দান ইত্যাদি।

বলে, তিনি পাশের ও সামনের দেওয়ালের অন্যান্য ম্যাপগুলো দেখিয়ে বললেন, এটা গোল কোন্ কোন্ গ্রাম ভাঙ্গা পড়ল তার নক্সা। ওটা হচ্ছে ধান জমির নক্সা। আর সেটা হচ্ছে বড় বড় রাস্তাগুলো কি ভাবে

হবে, কিভাবে সব কটা রাস্তা এক জায়গায় এসে মিশবে তার নক্সা।

কুমুদবাবুর কথায় আর এই ঘরের পরিবেশে আনমনা হয়ে পড়ল সুহাস। ঘরটাকে মনে হল যেন সর্বগ্রাসী একটা যন্ত্র। আর সেই যন্ত্রের চালক যেন কুমুদবাবু সরল স্বাচ্ছন্দ্যে বলে যাচ্ছেন, গ্রাম ভাঙা হবে, মানুষের ক্ষুধার অন্নের জমিগুলো ছিনিয়ে নেওয়া হবে, শ্বাসরোধ করা হবে জীবন পণ্য চলাচলের কলধ্বনি তোলা ঐ খালটাকে মাটি চাপা দিয়ে।

সুহাসের মনে পড়ল তার গ্রামের সেই 'এল-সেপের' নতুন বাড়ীগুলোর কথা। স্মৃতি আর অস্তিত্বের স্নায়বিক দ্বন্দ্বে মোচড় খেল সুহাসের মন। বাতাসের শ্বাসশব্দ ছাপিয়ে বেদনার কথাগুলা যেন একসঙ্গে কলতান করে উঠল তাকে ঘিরে।

কুমুদবাবুর ডাকে বাস্তবের মুখোমুখি হল সুহাসের মন।

কুমুদবাবুর সঙ্গে সে আবার এল তাঁর অফিস ঘরে।

কুমুদবাবু বললেন, রাধাগোবিন্দবাবু লিখেছেন, শ'দেড়েক টাকার মত মাইনের একটা কাজ দিতে, আর আপনার থাকবার মত একটা ব্যবস্থা করে দিতে।

বলে, একটু চিন্তা করে তিনি আবার বললেন, তা হলে এক কাজ করুন। সুপারভাইজার অমিয় সান্যালের সঙ্গে আপনি কাজ করুন আর তারই ঘরের পাশে একটা ঘর আছে সেখানে থাকার ব্যবস্থা করে নিন। আপনি সামনের ঐ মাঠ ধরে সোজা চলে যান। মাইল খানেক গেলেই দেখবেন কয়েকটা টালি খোলার ঘর আর কয়েকটা ট্রাক, এঞ্জিন সব দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে খোঁজ করলেই পাবেন অমিয় সান্যালকে। আমি এখান থেকে টেলিফোন করে তাকে সব বলেও দিচ্ছি।

হাত তুলে নমস্কার করে সুহাস বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সামনের মাঠ ধরে অমিয় সান্যালের খোঁজে সে হাঁটতে সুরু করল।

বিরাট জায়গা জুড়ে চলেছে খোঁড়ার কাজ। জায়গায় জায়গায় পর্বত সমান উঁচু হয়ে মাটির স্তূপ দাঁড়িয়ে আছে। অসংখ্য লোকজন মাঠের চারদিক ঘিরে নানা কাজে ব্যস্ত। মাঠের ওপর দিয়ে ইট বোঝাই, মাটি বোঝাই কয়েকটা লরী চলে গেল সামনে দিয়ে।

সামনেই দেখা যাচ্ছে কয়েকটা ট্রাক, এঞ্জিন আর কয়েকটা বড় বড় মেসিন।

আর একটু এগোলেই ট্রাক, এঞ্জিন আর মেসিনের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল কয়েকটা খোলার ঘর।

সুহাস বুঝল কুমুদবাবুর বর্ণন অনুযায়ী ঐখানেই পাওয়া যাবে অমিয় সান্যালকে। নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে সুহাস অনেকগুলো লোককে কাজ করতে দেখল। তাদের মধ্যে একজনকে অমিয় সান্যালের কথা বলায় সে জানাল বাবু টেলিফোন ধরতে গেছে।

সুহাস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে লোক-জন, কাজকর্ম্ম সব দেখতে লাগল। টালির ঘরগুলো দেখে সে বুঝল এগুলো গ্রামবাসীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া প্রাণের ধন। গ্রাম ভেঙে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে সাময়িক ভাবে রাখা হয়েছে কতকগুলো ঘরকে নিজেদের সুবিধের কাজে লাগাতে। ওরই মধ্যে একটাতে বাস করতে হবে সুহাসকে। কত মানুষের কত স্মৃতি জড়ানো ঐ ক্ষুদ্র কুটির আর দুদিন পরেই ধূলিসাৎ হবে অন্যগুলোর মত। প্রয়োজনের খাতিরে সুহাস প্রয়োজনের দিন পর্যন্ত থাকবে অমিয় সান্যালের পাশে। তারপর যখন এই ফাঁকা মাঠ আদর্শ সহরের রূপ নেবে, বড় বড় ইমারৎ, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ডাকঘর, বাজার, খেলার মাঠ, নতুন নতুন মানুষের স্বপ্নদৃষ্টির ছন্দ পদক্ষেপে মুখর হয়ে উঠবে এ জনপদ, পক্ষীশাবকের মত অসহায় দৃষ্টি মেলে সহর-পেচকের দৃষ্টি অনলে শেষ নিশ্বাস ছাড়বে ঐ কুটিরগুলো, সুহাসকেও আবার পুরোণ বেশ পাল্টে নতুন হননের সন্ধান-সঙ্গী হয়ে দিন কাটাতে হবে, ঘুরে বেড়াতে হবে এক থেকে আর এক জায়গায়।

এমন সময় এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন সুহাসের কাছাকাছি। ভদ্রলোকের লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ চেহারা, পরণে ফুলপ্যান্ট, মাথায় সাহেবী টুপি। তার গৌর কান্তি দেখেই সুহাস অনুমান করল, ইনিই সম্ভবত অমিয় সান্যাল।

যে লোকটির কাছে সুহাস প্রথম অমিয়বাবুর খোঁজ করেছিল, সে সুহাসকে বলল, এই যে অমিয়বাবু।

সুহাস বুঝল, তার নিজের অনুমান মিথ্যে নয়।

অমিয়বাবুর কাছে পরিচয় দিতেই বললেন, এইমাত্র টেলিফোনে ইঞ্জিনীয়ারবাবু আপনার কথা জানালেন। ভালই হল, এবারে দু'জনে মিলে-মিশেই কাজকর্ম করা যাবে। কিন্তু আপনি তাড়াতাড়ি আপনার থাকার ঘরটা পরিষ্কার করিয়ে নিন। নইলে পরে অসুবিধেয় পড়বেন। লোকজন সব চলে যাবে। কাউকে পাবেন না।

বলে, তিনি অম্বিকা নামে একজনকে ডেকে সুহাসের সঙ্গে গিয়ে ঘরদোর ঠিক করে দিতে বলে সুহাসের উদ্দেশ্যে বললেন, এখন গিয়ে একটু ঠিকঠাক করে নিন, আমি এই ভিতের মাপটা ঠিক করেই আসছি। তারপর জমে বসে সুখ-দুঃখের গল্প করা যাবে।

অম্বিকার সঙ্গে সুহাস এসে ঢুকল, একটা ছোট ঘরে। মাটির ঘর। সিমেন্টের নতুন মেঝে। মাথায় টালির চাল।

ঘর-দোর পরিষ্কার করা বা গোছানোর কোন প্রশ্নই ওঠে না। অপরিষ্কার মেঝেটা অম্বিকা একটু পরিষ্কার করে দিয়ে সুহাসের হাতের ছোট পুটলিটার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অম্বিকা বেরিয়ে যেতে সুহাসও নিজের পুঁটলিটার দিকে একবার তাকাল। দুটো জামা, একটা কাপড় আর একটা গামছা হল পুঁটলিটার মূলধন। অগত্যা ঘরের এক কোণে সুহাস চুপচাপ বসে রইল।

আসন্ন রাত্রিবাসের সমস্যা একবার উঁকি দিল তার মনে। এ প্রশ্নকে মন থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করল সে। মনে পড়ল শ্রীপতের কথা। আওরাৎ না হয়ে মরদ হয়ে যখন সে জন্মগ্রহণ করেছে তখন এই সামান্য সমস্যার চিন্তায় বিচলিত হবার কোন কারণ নেই। বরং দেড়শো টাকার মাইনের চাকরী আর বাস করবার মত বিনা ভাড়ায় ঘর পাওয়াকে সে সৌভাগ্য বলেই মনে করল। এমনও হতে পারতো, এই অপরিচিত গণ্ড গ্রামে নিজের থাকার ব্যবস্থা করে এখানে কাজ করা। তা যখন হয়নি, মাত্র কটা দিনের ব্যাপার। দশ-বারোদিন আর মাস শেষ হতে বাকী। কিছু টাকা হাতে পেলেই আস্তে আস্তে সব গুছিয়ে নেবে সে। তারপর যখন সম্পূর্ণ টাকা হাতে পাবে, কাকীমাকে কিছু পাঠিয়ে দেবে আর রুণুকে আনবারও চেষ্টা করবে। এখানে অসুবিধে হলে, একটু গুছিয়ে নেবার পর অন্য জায়গায় ঘর ভাড়া নিয়েও রুণুকে সে নিয়ে আসবে, মানুষ করে তুলবে আশা পথের দিকে তাকিয়ে বসে থাকা মেয়েটাকে। তারপর সম্বলের আশা ইসারায় তাপসীর মত কাকীমার সংসারেও আনন্দের স্রোত এসে সুখী করবে রুণুকে, ঝুনুকে, বুলুকে।

অমিয়বাবু ঘরে এসে সুহাসকে মেঝেতে বসে থাকতে দেখে নিজের ভুল বুঝতে পেরে বলে উঠলেন, ও হো হো, আমিই ভুল করেছি। আপনার সঙ্গে কোন জিনিষ পত্তর নেই তো ঘর গোছাবেন কি? আমি আবার ব্যাচিলার কি না? ঘর দোর গোছাবার ব্যাপার খুব ভাল বুঝিও না। তবে নেহাৎ খালি মেঝেতে বসে থাকতে দেখে একটা বিছানার অভাব বোধহয় চোখে ধরা পড়ল। নইলে সংসার গোছাবার কি বুঝি?

বলে, একটু চুপ করে থেকে অমিয়বাবু বললেন, ওর জন্যে কোন চিন্তা নেই। আপনি তো অভিজ্ঞ লোক। ঠিকই গোছগাছ করে নেবেন। দু'টো একটা দিন যা কষ্ট। তা যদি মনে করেন, এই ব্যাচিলারের পাশে দু'চারটে দিন কাটিয়ে নিতে পারেন। তার বেশী অবশ্য আপনার ভালও লাগবেনা।

কথা শেষ করে, সুহাসকে চিন্তাগ্রস্ত দেখে, তিনি আবার বলে উঠলেন, ঘর সংসার ছেড়ে এলে প্রথম দু'এক দিন একটু কষ্ট হয়। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। অবশ্য আমার মত ব্যাচিলারের পক্ষে এসব উপদেশ দেওয়া বৃথা। তবু আপনার মনটাকে একটু চাঙ্গা করে না দিলে সুন্দর মুখের চিন্তায় চিন্তায় শেষে শুকিয়ে যাবেন।

অন্য দিক থেকে কোন সাড়া না পেয়ে, অমিয়বাবু সুহাসকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে এলেন। তারপর জামা প্যান্ট ছেড়ে লুঙ্গি পরতে পরতে বলে উঠলেন, আপনার জন্যে একটু চায়ের ব্যবস্থা করাই আর রাত্রে রান্নার ব্যবস্থাও করতে বলি। অবশ্য বৌদির অভাব পূরণ করতে পারবে না আমার 'ওয়াইফ্-ইন-ল'। তবু চেষ্টা করতে হবে তো? বলে, তিনি 'সুরো' 'সুরো' বলে বার দুই হাঁক ছাড়তেই আদিবাসী জাতীয় একটা অল্প বয়েসী ছোক্‌রা এসে ঘরে ঢুকল।

মিশ কালো তার গায়ের রঙ্। এমন কালো

সাধারণতঃ চোখে পড়ে না। নিটোল স্বাস্থ্য। মাথার চুলগুলো কোঁকড়ানো। দাঁতগুলো মুক্তোর মত ঝকঝকে।

সে ঘরে আসতেই অমিয়বাবু, সুহাসের জন্যে চা আর রাত্রে ভাতের ব্যবস্থা করে দিতে বললেন।

ছেলেটা সুহাসের দিকে একবার তাকিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অমিয়বাবু একটা কাঁচের গ্লাসে কুঁজোর থেকে জল ঢেলে নিয়ে বাইরে যেতে যেতে সুহাসকে বললেন. ঐ হল আমার 'ওয়াইফ-ইন-ল'। পছন্দ হয় ওকে?

বলে, সুহাসের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে, জলের গ্লাস হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

সুহাস বুঝল, ভদ্রলোক বেশ রসিক আর সৌখিনও বটে। ব্যাচিলার হলেও ঘর-দোর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বিছানা ও জিনিষ পত্তরের সমন্বয় থেকে বেশ একটা রুচির পরিচয় পাওয়াযায়। ফুলদানির সজীব ফুলগুলোতাঁর কোমল মনের কথাই ঘোষণা করে। 'ওয়াইফ-ইন-ল'ই বোধহয় প্রতিদিন ফুলগুলো পালটে দেয়।

সব দেখে শুনে বেশ ভালই লাগল সুহাসের। প্রতিদিনের সঙ্গী হিসেবে অমিয়বাবুকে পাওয়া তার সৌভাগ্য বলেই মনে হল।

চোখ মুখ ধুয়ে অমিয়বাবু ঘরে এলেন। কাঁচের গ্লাসটা পাশের ছোট টেবিলের ওপর রেখে, সুহাসকে বিছানার আরো কাছে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসতে বলে, চৌকীর ওপর হাত-পা ছড়িয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন।

তারপর সুহাসের দিকে পাশ ফিরে শুয়ে সুহাসের খুঁটিনাটি সব প্রশ্ন করে জানবার চেষ্টা করলেন।

সুহাস অকপটে সবই জানালো। কোথায় বাড়ী, আগে কি করতো, এখানেই বা এল কি ভাবে। শেষে সে জানালো, অমিয়বাবুর মত সেও ব্যাচিলার।

এ কথা শুনে অমিয়বাবু হো হো করে একগাল হেসে নিয়ে বললেন, তাই বলি, নইলে আমার পাশে আপনার স্থান হবে কেন?

বলে, একটু চুপ করে থেকে আবার তিনি শুরু করলেন, বয়সের দিক থেকেও আপনি আমি প্রায় সমানই হবো। সমসাময়িকদের জীবনটা লাইনে লাইনে দাঁড়িয়েই কেটে গেল। সেই যে পৃথিবীকে দু'চোখ খুলে দেখবার বয়েস থেকে চালের লাইন, চিনির লাইন, কেরোসিনের লাইন সুরু হয়েছে, আজও জীবন থেকে সেই লাইনের আধিপত্য ঘুচল না। ম্যাট্রিক পাশ করলাম, সাব ওভারসিয়ারী পড়লাম। কোথাও কিছু জুটল না। শেষে লাইনের হাত থেকে মুক্তি পাবার আশায় এই গণ্ড-গ্রামে এসেও কুলি-লাইন!

সুহাস বলল, তাহলে দু'জনেরই কপাল ঠোকাঠুকির যোগ্য জায়গায় এসে পড়েছি।

অমিয়বাবু বললেন, এটা হেসে এক কথায় উড়িয়ে দেবার জিনিষ নয় সুহাসবাবু। এটা চিন্তার বিষয়।

'ওয়াইফ-ইন্-ল' দু'কাপ চা দু'জনের হাতে দিয়ে গেল।

অমিয়বাবু ছেদ পড়া বক্তব্যকে পুনরায় পেশ করবার তাগিদে তাড়াতাড়ি চা খাওয়া শেষ করে, কাপটা পাশে রেখেই, সুরু করলেন, এই যে রোদে পুড়ে উদয়-অস্ত কুলি লাইনে পরিশ্রম করে মাইনে পাই মোট 'একশ' পঁচাত্তরটি' টাকা, তার মধ্যে একশটি টাকা গুণে বাড়ীতে পাঠাতে হয়। অবশ্য তাতেও বাড়ীর কোন উপকারই হয় না। আর বাকী টাকায় এই মাঠের ওপর জীবন কাটানো। এ জীবনের কি মূল্য আছে বলতে পারেন?

সুহাস একবার অমিয়বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলার কিছুই নেই। দু'জনের জীবন ইতিহাস যেন একই সুরে বাঁধা। এ যেন সীমাহীন প্রান্তরেদু'জনেই অশরীরী আত্মার প্রকোপে ভয় পেয়েছে মনে মনে, একজন চাইছে আর একজনের কাছে শক্তি সঞ্চয়ের আশ্বাস।

তবু এ দু'টো জীবনের মধ্যে যেন তফাৎ খুঁজে পেল সুহাস। তার মনে হল, এই মাঠের মধ্যে] একটা জীবন সূর্যের উদয় আর একটা জীবন সূর্যের অস্তের ইঙ্গিত নিয়ে যেন জেগে উঠেছে।

এই মাঠের মধ্যেই অমিয়বাবু জেগে উঠলেন হতাশা নিয়ে আর এই মাঠের মধ্যেই যেন শতাব্দীর সঞ্চিত আশা নিয়ে জেগে উঠছে সুহাসের মন। একজনের স্বপ্ন

টাউন-শিপের চারমাইল উঁচু নীচু মাঠময়। আর একজন এই মাঠেরই অশ্রুসিক্ত কুটিরে বসে আশা করছে ভবিষ্যতের আনন্দ-মুখর দিনগুলোকে যতদূর সম্ভব নিকটে আনার।

সুহাসকে চুপ করে থাকতে দেখে, অমিয়বাবু আবার বললেন, যে বয়সটা জীবনের সব চাইতে বেশী আনন্দ কুড়িয়ে নেবার বয়েস, সেই বয়সটা কেটে গেল বাঁচার সঙ্গে বাঁচার খোরাক জোটাবার সজ্ঘর্ষে। জীবন-সিঁড়ির প্রথম ধাপটা তৈরী হবার আগেই গেল সব মালমশলা ফুরিয়ে!

সান্ত্বনার সুরে সুহাস বলল, এখনও সময় আছে, কেন শুধু শুধু হতাশা এনে অকারণে ব্যথা পাচ্ছেন মনে। তার চাইতে সামনের দিকে চলার পথ খুঁজতে থাকুন।

অমিয়বাবু বললেন, আপনার এ কথাটার কোন অর্থ হয়না সুহাসবাবু। এই বয়েসে এসে সামনের জীবন কোন দিকে আর তার পথই বা কি বলা যায়না। আপনার নিজের জীবনও তার প্রমাণ।

সুহাস কি যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় 'ওয়াইফ্-ইন-ল' ছোট টেবিলটার ওপর দু'টো ডিসে গরম ভাত রেখে বাইরে বেরিয়ে গেল।

অমিয়বাবু বললেন, নিন্ সুহাসবাবু, জীবন-দর্শনের তত্ত্ব বাদ দিয়ে আগামীকালের জীবন সংগ্রামের জন্যে তৈরী হোন।

'ওয়াইফ-ইন-ল' আবার এসে দুবাটি তরকারী রেখে দিল ভাতের ডিসের পাশে।

অমিয়বাবু দু'টো চেয়ার টেনে নিয়ে সুহাসের সঙ্গে খেতে বসল।

সুহাস বলল, আপনার খাওয়ার আয়োজন বেশ ভালই এবং বেশ রুচিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

অমিয়বাবু বললেন, হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি নিরামিষ ঝোল আর ভাত খেয়ে শুয়ে পড়ুন, কাল সকাল থেকেই রুচি-জ্ঞানটা হাড়ে হাড়ে মালুম হবে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অমিয়বাবুর মুখের দিকে সুহাস তাকাল।

অমিয়বাবু বলে যেতে লাগলেন, এখন গরমের সময় বলে মাঠের কাজ চলে ভোর ছটা থেকে দশটা আবার বেলা একটা থেকে বেলা পাঁচটা। ছ'টায় কাজ সুরুর আগে আমাদের হাজরি খাতায় সই করতে হবে কুমুদ-বাবুর অফিসে গিয়ে। ফিরে এসে আমরা আবার কুলিদের হাজিরা নেব ঠিক ছটায়। তারপর লেগে যাব যে যার কাজে। আপনাকে অবশ্য একটু হাল্কা কাজই দেবো। নইলে প্রথম প্রথম অসুখে পড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। আপনি পেছনের ঐ খালটা বোঁজাবার কাজ দেখাশুনা করবেন। খালের ধারে দু'একটা বড় গাছ এখনও আছে—তার ছায়াটা পাবেন।

দু'জনেই খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল। তারপর দু'জনেই শুয়ে পড়ল বিছানায়, খুব ভোরে বিছানা ছেড়ে ওঠার সঙ্কল্প মনে নিয়ে।

[ক্রমশঃ

মেঘদূতে—মর্ত ও স্বর্গ

—বন্দনা চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্যে, বিশেষকরে সংস্কৃত সাহিত্যে, সকল কবির রচনার মধ্যেই কোনও না কোনও একটি লক্ষ্য আছে। কাব্যের মাধ্যমে সেই লক্ষ্যে উন্নীত হওয়াই কবির সাধনা।

কালিদাসের প্রায় সমস্ত রচনারই মূল উদ্দেশ্য এক। তাঁ'র কুমারসম্ভবে, শকুন্তলায়, মেঘদূতে তিনি একই কথা বলতে চেয়েছেন। তাঁ'র প্রত্যেক কাব্যের মধ্যেই এক গভীর পরিণতির ভাব আছে। "সে পরিণতি ফুল হ'তে ফলে পরিণতি, মর্ত হ'তে স্বর্গ পরিণতি, স্বভাব হ'তে ধর্মে পরিণতি।" রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—স্বর্গ ও মর্তের এই মিলন কালিদাস অত্যন্ত সহজেই করিয়াছেন। ফুলকে তিনি এমনি স্বভাবত ফলে ফলাইয়াছেন, মর্তের সীমাকে তিনি এমনি করিয়া স্বর্গের সহিত মিশাইয়া দিয়াছেন যে, মাঝে কোনো ব্যবধান কারো চোখে পড়ে না।"

কালিদাসের মেঘদূত কোন ধর্মের কথা নয়, কর্মের কথা নয়, পুরাণ নয়, ইতিহাস নয়। যে অবস্থায় মানুষের চেতন-অচেতনের বিচার লোপ পায় মেঘদূত সেই অবস্থার প্রলাপমাত্র। তবুও এই মেঘদূতের একটি লক্ষ্য আছে, সেই লক্ষ্য হ'ল "মর্তের চঞ্চল সৌন্দর্যময় বিচিত্র পূর্বমিলন হ'তে স্বর্গের শাশ্বত আনন্দময় উত্তরমিলনে যাত্রা।" সেই লক্ষ্য হ'ল "সমস্ত কাব্যকে এক লোক থেকে অন্য লোকে নিয়ে যাওয়া—প্রেমকে স্বভাবসৌন্দর্যের দেশ থেকে মঙ্গলসৌন্দর্যের অক্ষয় স্বর্গধামে উত্তীর্ণ করিয়ে দেওয়া।" তাই মেঘদূতের পূর্বমেঘে মেঘকে পৃথিবীর বিচিত্র সৌন্দর্যে পর্যটন করে উত্তরমেঘে অলকাপুরীর নিত্য সৌন্দর্যে উত্তীর্ণ হ'তে দেখা যায়। এই হ'ল মেঘদূতের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, পরিণতি। মর্ত হ'তে স্বর্গে পরিণতি।

সাধারণতঃ দেখা যায় যেখানেই যে কেউ স্বর্গ কল্পনা করেছেন সকলেই নিজ নিজ ক্ষমতানুসারে স্বর্গকে সৌন্দর্যের সার বলে কল্পনা করেছেন। পৃথিবীতে কত কি আছে, কিন্তু মানুষ সৌন্দর্য ছাড়া সেখানে এমন আর কিছু দেখে নি যা' দিয়ে সে তাঁ'র স্বর্গ গঠন করতে পারে। মানুষের কাছে স্বর্গ তাই সৌন্দর্যময় অসীম আনন্দলোক। সেখানে জরা নেই, দুঃখ নেই, মৃত্যু নেই—আছে শুধু নিরবচ্ছিন্ন অবর্ণনীয় সুখ—"অনির্দেশ্যসুখঃ স্বর্গঃ।" আমরা আনন্দের মূর্তি দেখি সৌন্দর্যে। আনন্দকে বাঁধা যায় না। তাই স্বর্গও সীমাহীন। সে অসীম কারণ তা'কে গণ্ডীতে বাঁধলে মানুষের মন আঘাত পায়। সে তাই শুভ্র, নিষ্কলুষ, সীমাহীন আনন্দলোক। মেঘদূতে ত্র্যম্বকের অট্টহাসের ন্যায় শুভ্র কৈলাস স্বর্গের পবিত্রতার প্রতীক। সেই কৈলাসের ক্রোড়ে অবস্থিত সৌন্দর্যময় অলকা শোকহীন, জরাহীন। তাই সে সুখস্বর্গভূমি। মর্তের নানা দেশ পর্যটনান্তে মেঘ এসে সেই অলকায় উপনীত হ'বে।

কিন্তু কেন এই মর্ত থেকে স্বর্গে যাত্রা? কিই—বা তা'র কারণ?

আসক্তি আমাদের চিত্তকে বিষয়ে আবদ্ধ করে রাখে। আসক্তি ছিন্ন হয়ে গেলেই পূর্ণ সুন্দর প্রেম আনন্দরূপে সর্বত্রই প্রকাশ পায়। আর সেই আসক্তি ছিন্ন হ'লেই মর্ত থেকে স্বর্গে যাওয়ায় মানুষের আর কোনও বাধা থাকে না। নিরন্তর ভোগের পর সেই বস্তুতে মানুষের আর আসক্তি থাকে না। তখন সে অন্য কিছু চায়। নতুন কিছু খোঁজে। একটা বিশেষ কিছুর জন্যে অভাব-বোধ করতে থাকে। যা' সে সহজেই পাচ্ছে তা'তে তা'র মন আর তৃপ্তি পায় না। সে আরও সূক্ষ্ম কিছুর বাসনা করে। বাসনা যতই সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতর থেকে সূক্ষ্মতম হ'তে থাকে ততই মানুষের কাছে স্বর্গের দ্বার খুলতে থাকে। অবশেষে নানা সাধনা নানা কৃচ্ছ্র-সাধনের মধ্যে দিয়ে সে অমৃতলোকে উন্নীত হয়।

মেঘদূতের মেঘ মানুষের মনের প্রতীক। মানুষের মন যেমন অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্ব, অনেক কামনা-বাসনা অতিক্রম করে সাত্ত্বিকপর্যায়ে পৌঁছাতে পারে, মেঘও তেমনি নানা নদ, নদী, গিরিশৃঙ্গ উপভোগ করে, বহু পর্বত,

অরণ্য, নদী, নির্ঝর, নগর, গ্রামের উপর দিয়ে অবশেষে হিমালয়ে এসে উপস্থিত হচ্ছে। এই হিমালয় দেবতাত্মা, ভারতবর্ষের উত্তর দিকে অবস্থিত। দেবতাদের আলয় এই হিমালয়েরই অংশ হ'ল কৈলাস। সেই কৈলাসেরই অঙ্কশায়িনী অলকাকে মেঘ দেখবে।

মানুষের মন যেমন ক্রমশঃ কামনা বাসনার তামসিক ভাব বর্জন করে সাত্বিকভাব ধারণ করে, মানুষের মনের এই গতির ছবি অতি নিপুণভাবে কালিদাস ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর মেঘদূতের পূর্বমেঘে, মেঘের চলার পথে। তাই পূর্বমেঘের প্রথমদিকে শৃঙ্গারপ্রধান শ্লোকের বাহুল্য থাকলেও পূর্বমেঘের শেষের দিকে তা' দৃষ্টিগোচর হয় না। আম্রকূট পর্বতের বর্ণনা থেকেই দেখা যায় শৃঙ্গার রস কবির মনকে আচ্ছন্ন করেছে। তা'রই মায়ায় পড়ে যেন কবি লিখছেন—

ছন্নোপান্তঃ পরিণতফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈ—
স্ত্বয্যারূঢ়ে শিখরমচলঃ স্নিগ্ধবেণীসবর্ণে।
নূনং যাস্যত্যমরমিথুনপ্রেক্ষণীয়ামবস্থাং
মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ শেষবিস্তারপাণ্ডুঃ॥

"পকাম্রকাননে তার প্রান্ত আচ্ছাদিত ;
আরূঢ় হইবে যবে সে গিরিশিখরে
তুমি অভিরাম-শ্যামবেণী-বিনিন্দিত,
সে অচল ব্যোমচর দম্পতী গোচরে
ধরিবে সুন্দর শোভা, যেন সে ধরার
পয়োধর মধ্যশ্যাম পাণ্ডুবিস্তার।

শৃঙ্গাররসের বর্ণনা আরম্ভ হ'ল। বাসনা মানুষকে যে কী পরিমাণ উন্মত্ত করে তুলতে পারে এর পর থেকে কবি একে একে তা'রই ছবি এঁকে চলেছেন। তাই দেখি যক্ষ কখনও মেঘকে বলছে—

তেষাং দিক্ষু প্রথিতবিদিশালক্ষণাং রাজধানীং
গত্বা সদ্যঃ ফলমপি মহৎ কামুকত্বস্য লব্ধা।
তীরোপান্তস্তনিতসুভগং পাস্যসি স্বাদু যস্মাৎ
সভ্রূভঙ্গং মুখমিব পয়ো বেত্রবত্যাশ্চলোর্ম্যাঃ॥

দয়িতার অধরসুধা পানের সমান মেঘ বেত্রবতীর তরঙ্গিত সুমধুর জল পান করে ধন্য হবে।

যক্ষ আবার বলছে—

বিশ্রান্তঃ সন্ ব্রজ বননদীতীরজানাং নিষিঞ্চ—
ন্নুদ্যানানাং নবজলকণৈর্যূথিকাজালকানি।
গণ্ডস্বেদাপনয়নরুজা ক্লান্তকর্ণোৎপলানাং
ছায়াদানৎ ক্ষণপরিচিতঃ পুষ্পলাবীমুখানাম্॥

কুসুমচয়ক্লান্তা যুবতীদের কপোলে ছায়া দান করে মেঘ ক্ষণকালের জন্য তা'দের সন্তোষ বিধান করবে।

কিন্তু মেঘকে কেবলমাত্র বেত্রবতীর মুখাস্বাদ ও পুষ্পলাবীদের আনন পরিচয় করিয়েই কবি ক্ষান্ত হচ্ছেন না।

মেঘকে তিনি সমস্ত প্রকার পার্থিব ভোগের সূক্ষ্মতম পর্যায়ে নিয়ে যেতে চান। যেখানে ভোগের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ নিরন্তর বিদ্যমান কবি মেঘকে সেইখানে নিয়ে যেতে চান। বাসনাকে পার্থিবলোক থেকে অপার্থিবলোককে উন্নীত করতে চান। পার্থিবজগতে নিরন্তর ভোগ করতে করতে মানুষের মন যখন ক্লান্ত হয়ে বলে 'আর চাই নে' তখনই তা'র মন হয় দেবসমাগমের উপযোগী। সেই সময় বাসনা যে তা'র মন থেকে একেলুপ্ত হয়ে যায় তা' নয়, কিন্তু সেই বাসনার স্বরূপ পরিবর্তিত হ'তে থাকে। মর্তলোকের মানবমনের বাসনার এই স্বর্গীয় পরিণতিই তা'কে স্বর্গের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। মরজগতে ভোগের মধ্যে ক্লান্তি আছে, বিচ্ছেদ আছে। স্বর্গীয় ভোগে ক্লান্তি নেই, বিচ্ছেদও নেই। সে ভোগের স্বরূপ অমৃতময়। তাই স্বর্গে অম্লান অবিচ্ছিন্ন আনন্দ নিরন্তর বিদ্যমান। সে আনন্দের সীমা নেই।

কালিদাসের মেঘদূতে যক্ষ যেন মনের মধ্যে এক অতৃপ্ত বাসনা পোষণ করছে। কোন কিছুতেই সে যেন তৃপ্তি পাচ্ছে না। পূর্বমেঘের প্রথম দিকে দেখা যায় যক্ষের ভোগী মন ভোগ করে তৃপ্ত হ'তে চাইছে। যখন যেটা তা'র সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে তখন সেইটেই তা'র মনকে কাড়ছে। এমনি করে তা'র মন নানার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু বাসনার চাকরি বড় দুঃখের চাকরি। এতে যে খাদ্য পাওয়া যায় তা'তে ক্ষুধা কেবল বাড়িয়ে তোলে এবং অজস্রের টানে ঘুরিয়ে মেরে কোন জায়গায় শান্তি পেতে দেয় না এই বাসনা যদি ঠিক জায়গায় না থামে, এই বাসনার প্রবলতাই যদি জীবনের মধ্যে সব চেয়ে বড় হয়ে ওঠে, তা' হ'লে মানুষের জীবন তামসিক অবস্থাকে

ছাড়াতে পারে না। বাহিরই কর্তা হয়ে থাকে, কোন-প্রকার ঐশ্বর্যলাভ তা'র পক্ষে অসম্ভব হয়। উপস্থিত অভাব, উপস্থিত আকর্ষণই তা'কে এক ক্ষুদ্রতায় ঘুরিয়ে মারে। তাই ক্রমশঃ দেখা যায় যে স্থূল বস্তুতে যক্ষের আর স্পৃহা থাকছে না। স্থূলের মোহ কাটছে। তা'র মন বহির্জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে এনে অন্তর্জগতে প্রবেশ করতে চাইছে। তা'র বাসনা ক্রমশঃ হচ্ছে সূক্ষ্মতর থেকে সূক্ষ্মতম। পার্থিব বস্তু ভোগ করতে গিয়ে সেই বস্তুর সঙ্গে পদে পদে তা'র ঘটছে বিচ্ছেদ। নৈরাশ্য তা'কে করছে আচ্ছন্ন। বহির্জগতের ঘাত-প্রতিঘাতে ব্যাকুল হয়ে সে তাই দেবতার আশ্রয় চাইছে। তা'র অভিলাষ ক্রমশঃ মানব থেকে দেবের পর্যায়ে উন্নীত হচ্ছে। দেবদেবীর মাঝে সে তা'র স্বর্গকে খুঁজতে চেষ্টা করছে। তাঁ'দের শাশ্বত প্রেম-বর্ণনায় সে তৃপ্তি খুঁজতে চাইছে। তাই শৃঙ্গারের চরম বর্ণনায় কবি সুখ পাচ্ছেন না। যক্ষ মেঘকে বলছে—

তস্যাঃ কিঞ্চিৎকরধৃতমিব প্রাপ্তবানীরশাখং
নীত্বা নীলং সলিলবসনং মুক্তরোধোনিতম্বম্।
প্রস্থানং তে কথমপি সখে লম্বমানস্য ভাবি
জ্ঞাতাস্বাদো বিবৃতজঘনাং কো বিহাতুং সমর্থঃ॥

সংলগ্ন বেতসশাখায় নীল বারিবাস করধৃতপ্রায় মুক্তজঘনা বালার অনুরূপ গম্ভীরা নদীর সম্ভোগান্তে প্রস্থান কালে মেঘের বিলক্ষণ কষ্ট হ'বে, সন্দেহ নাই।

কিন্তু কেবল ভোগের ছবি এঁকে কবি শান্তি পাচ্ছেন না। কারণ যক্ষের আত্মা যে কেবল পেতেই চাচ্ছে তা' নয়, সে না পেতেও চাইছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"সেই পাওয়াতেই মানুষের মন শান্তি পায় যে পাওয়ার সঙ্গে না পাওয়া জড়িত হয়ে আছে। যে সুখ কেবলমাত্র পাওয়ার দ্বারাই আমাদের উন্মত্ত করে তোলে না, অনেকখানি না-পাওয়ার মধ্যে যা'র স্থিতি আছে বলেই যা'র ওজন ঠিক আছে তা'কেই উচ্চ শ্রেণীর সুখ বলা যেতে পারে।" অনেকখানি না-পাওয়ার এই যে সুখ সমস্ত মেঘদূত জুড়ে তা'রই জন্য আকুলতা। জগতে পাওয়ার মতো পাওয়া তাই—যা'র মধ্যে অনির্বচনীয়তা আছে। সেই অনির্বচনীয়ের, সেই অবাঙ্‌মনসগোচরের আস্বাদের জন্যেই মেঘদূতের যক্ষের ব্যাকুল ক্রন্দন। সংসারের সমস্ত দম্ভস্পৃষ্টের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে তাই যেন বলছে—"কেবলই পেয়ে পেয়ে যে আমি শ্রান্ত হয়ে গেলুম, আমার না-পাওয়ার ধন কোথায়? সেই চিরদিনের না-পাওয়াকে পেলে যে আমি বাঁচি।" দেবতার মধ্যে সে তা'র না-পাওয়ার ধনকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাই যক্ষ বলছে—

অপ্যন্যস্মিংশ্চূলধরমহাকালমাসাদ্য কালে
স্থাতব্যং তে নয়নবিষয়ং যাবদত্যেতি ভানুঃ।
কুর্বন্ সন্ধ্যাবলিপটহতাং শূলিনঃ শ্লাঘনীয়া
নামন্দ্রাণাং ফলমবিকলং লপ্স্যসে গর্জিতানাম্॥

মহাকালের মন্দিরে এসে মেঘ মহাদেবের সন্ধ্যাকালীন পটহের কাজ করে তা'র গম্ভীর গর্জনের পূর্ণ ফল লাভ করবে। এই শ্লোকের পর থেকেই দেখা যায় শৃঙ্গারের সেই উদ্দামভাব আর নেই। সে ভাব ক্রমশঃই শিথিল হয়ে আসছে। কারণ কবি যক্ষের বহির্মুখী মনের ভাবকে অন্তর্মুখী করতে চাইছেন। যক্ষ তাই বলছে -

তত্র স্কন্দং নিয়তবসতিং পুষ্পমেঘীকৃতাত্মা
পুষ্পাসারৈঃ স্নপয়তু ভবান্ ব্যোমগঙ্গাজলার্দ্রৈঃ।
রক্ষাহেতোর্নবশশিভৃতা বাসবীনাং চমূনা—
মত্যাদিত্যং হুতবহমুখে সম্ভৃতং তদ্ধি তেজঃ॥

নিজেকে পুষ্পমেঘে পরিবর্তিত করে আকাশগঙ্গার জলে সিক্ত হয়ে মেঘ স্কন্দকে পুষ্পবর্ষণে স্নান করাবে। তারপর গুরুগম্ভীর গর্জন করে পার্বতীর স্নেহের ময়ূরটিকে নাচা'বে। সেই কথাই যক্ষ বলছে পরবর্তী শ্লোকে—

জ্যোতির্লেখাবলয়ি গলিতং যস্য বর্হং ভবানী
পুত্রপ্রেম্না কুবলয়দলপ্রাপি কর্ণে করোতি।
ধৌতাপাঙ্গং হরশশিরুচা পাবকেস্তং ময়ূরং
পশ্চাদদ্রিগ্রহণগুরুভির্গর্জিতৈর্নর্তয়েথাঃ॥

দেবমন্দিরে যেতে হ'লে মানুষ যেমন গঙ্গাস্নানে নিজেকে শুদ্ধ করে নেয় মেঘও তেমনি নিজেকে পবিত্র করে নেবে ব্রহ্মাবর্ত নামক দেবনির্মিত দেশের ছায়ায় অবগাহন করে। তাই কবি লিখছেন—

ব্রহ্মাবর্তং জনপদমথচ্ছায়য়া গাহমানঃ
ক্ষেত্রং ক্ষত্রপ্রধনপিশুনং কৌরবং তদ্ ভজেথাঃ।
রাজন্যানাং শিতশরশতৈর্যত্র গাণ্ডীবধন্বা
ধারাপাতৈস্ত্বমিব কমলান্যভ্যবর্ষন্মুখানি॥

তারপর মেঘ কনখলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। যেখানে

হিমালয় হ'তে অবতীর্ণা সগরপুত্রদের স্বর্গগমনের সোপানপংক্তিরূপসাধনস্বরূপা দেবী জাহ্নবী ফেনহাসে গৌরীর ভ্রুকুটীরচনাকে উপহাস করে শিশুচন্দ্র শোভিত শিবজটা মধ্যে কল্লোলধ্বনিসহকারে বিরাজমানা। তাই বলা হয়েছে—

তস্মাদ্ গচ্ছেরনুকনখলং শৈলরাজাবতীর্ণাং
জহ্নোঃ কন্যাং সগরতনয়স্বর্গসোপানপংক্তিম্।
গৌরীবক্ত্রভ্রুকুটিরচনাং যা বিহস্যেব ফেনৈঃ
শম্ভোঃ কেশগ্রহণমকরোদিন্দুলগ্নোর্মিহস্তা॥

এই শ্লোকের পর মেঘদূতের পূর্বমেঘে মানবপ্রেমের চিহ্নমাত্রও আর লক্ষিত হয় না। দেবতার চরণে প্রণতি জানাবার জন্যে কবি আকুল হয়ে উঠছেন। তাই যক্ষ সতত যোগিগণ পূজিত শিব পদচিহ্ন শোভিত শিলাকে ভক্তিভাবে প্রদক্ষিণ করবার জন্য মেঘকে অনুরোধ করে বলছে—

তত্র ব্যক্তং দৃষদি চরণন্যাসমর্দ্ধেন্দুমৌলেঃ
শশ্বৎসিদ্ধৈরুপচিতবলিং ভক্তিনম্রঃ পরীয়াঃ।
যস্মিন্ দৃষ্টে করণবিগমাদূর্দ্ধমুদ্ধূতপাপাঃ
সংকল্পন্তে স্থিরগণপদপ্রাপ্তয়ে শ্রদ্দধানাঃ॥

দেবদেবীর অধিষ্ঠানের পথে মেঘ চলেছে। তাঁদের মধ্যে যেন কবি অনির্বচনীয়তার আস্বাদ পেতে চাইছেন। তাঁদের মধ্যেই যেন তিনি স্বর্গের স্বাদ পেয়েছেন তাই যক্ষ কখনও মেঘকে অনুরোধ করছে মুরজধ্বনির ন্যায় গুরুগম্ভীর গর্জনে পশুপতির সঙ্গীতকার্য সম্পূর্ণ করতে, কখনও বা মিনতি করছে মণিতটে আরোহণের হরগৌরীর সোপানস্বরূপ সাধন হ'বার জন্য—

হিত্বা তস্মিন্ ভুজগবলয়ং শম্ভুনা দত্তহস্তা
ক্রীড়াশৈলে যদি চ বিচরেৎ পাদচারেণ গৌরী।
ভঙ্গীভক্ত্যা বিরচিতবপুঃস্তম্ভিতান্তর্জলৌঘঃ
সোপানত্বং কুরু মণিতটারোহণায়াগ্রযায়ী॥

এইভাবে কবি মর্তের সীমানাকে স্বর্গের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন। পার্থিব সৌন্দর্যকে অপার্থিবলোকের সৌন্দর্যের সঙ্গে একাকার করে দিয়েছেন। স্বর্গের সেই শাশ্বত সৌন্দর্যবোধকে কেবল ইন্দ্রিয়বোধের দ্বারা মেরে ফেলা যায় না, তা' বীণার অনুরণনের মতো চেতনার মধ্যে স্পন্দিত হতে থাকে, কখনও সমাপ্ত হতে চায় না।

গান

অজিত মুখোপাধ্যায়

পাহাড়-তলির গাঁয়ে;
দখিনে বনানী, ঝিরি ঝিরি গান—
ঝর্ণা গাহিত বাঁয়ে
পাহাড়-তলির গাঁয়ে।
সেথা ছিল যত শবরী শবর
তারি মাঝে রচি' একখানি ঘর
তুমি আমি মিলেছিনু সেই—
নির্জন-বন-ছায়ে।
পাহাড়-তলির গাঁয়ে।

প্রভাতী-ভজন, বিহগ-কূজন
বন-কুসুমের হাসি।
রাতের নিঝুমে ঝিঁঝিঁর-ঝুমুর
ঘুম-পাড়ানীয়া-বাঁশী।
নাচিত তটিনী তারি সাথে সাথে
তুমিও নাচিতে কত মধু-রাতে
বুকের সুষমা সরম হারা'ত—
নূপুর বাজিত পায়ে।
পাহাড়-তলির গাঁয়ে।

'মেঘদূত'-মহিমা

শ্রীসুধীর গুপ্ত

১

এক বর্ষ এক যুগ বিরহীর কাছে।
শরৎ—হেমন্ত গেলো বসন্ত—নিদাঘ,
তবু যক্ষ প্রেয়সীরে গাঢ় অনুরাগ
জানাতে পারে নি; এতে আশ্চর্য কী আছে!
যা'র তা'র কাছে প্রেমী সাহায্য কি যাচে!
অধিগুণাপন্ন চাই—প্রেমে মহাভাগ,
অতি-সূক্ষ্ম-সংবেদনে সতত-সজাগ;
নির্বাসিত, মেঘে তাই দৌত্য কি দিয়াছে?
অপুত্রক,—প্রিয়া-প্রেম-প্রাবল্য কি তাই
যক্ষে করে ধৈর্য্যহারা? ভার্য্যা-সর্ব্বস্বতা
আসে কি নিঃসঙ্গ চিত্তে পুত্র যা'র নাই?
কবি শুধু বোঝে গুপ্ত গূঢ় মর্ম্ম-কথা।
অভিশপ্ত প্রেমার্ত্তের মত্ত আইঢাই
থামাতে কি 'মেঘদূত' বহিছে বারতা?

২

দয়িতা অলকাপুরে বহুদূরে থাকে;
শত শত জনপদ মাঝে ব্যবধান;
দৈব-দোষে নির্ব্বাসিত দুঃখী যক্ষ-প্রাণ
প্রিয়া-প্রেম-স্মৃতি-স্বপ্ন কহিবে কাহাকে!
আষাঢ়ের মেঘে তাই বন্ধু ব'লে ডাকে;
পুঞ্জিত প্রেমের বার্ত্তা—কাব্য-অবদান
কহে তা'রে। সে-সন্দেশ ভুবন-বিমান
নিশি দিনমান বুঝি স্পন্দমান রাখে!
সমপ্রাণ সখা বিনা প্রেম-কথা আর
বুঝিবার সাধ্য কা'র! যক্ষ বুঝি তাই
অচেতন মেঘেরও বন্ধু বলিবার
ভাবে সমবিষ্ট এত! বিশ্বের সবাই
সর্ব্বকালে ভাগ্যবশে সখা হোলো তা'র।
পরস্পর যক্ষ-কথা শুনিয়া—শুনাই।

৩

প্রীতি দান শ্রেষ্ঠ দান; সেই প্রীতি-বলে
কালিদাসী 'মেঘদূত' ধন্য ধরাতলে।
সেই প্রীতি-বর্ষা-স্নাত চিত্ত-ভূমি যা'র
তা'রই পুষ্পে গন্ধ মধু মেলে অলকার।
রামগিরি-নির্ব্বাসনে সে-সুধার স্বাদ
হৃদয়ে বহিয়া আনে বিচিত্র সংবাদ।
সম্ভোগ ফুরায়ে যায়, সম্ভোগের সার—
প্রেমস্মৃতি সে তো নহে কভু ভুলিবার।
সেই-স্মৃতি বাণী-রূপ আচম্বিতে লভে।
প্রীতি-সার অনির্বাচ্য অনন্ত বৈভবে
চিত্তে চিত্তে চিরকাল করে ঝলমল।
ব্যবধানে নির্গলিত যত অশ্রুজল
তা'রই বাষ্পে 'মেঘদূত' বিশ্বে সৃষ্ট হয়,
রামগিরি—অলকারে করে প্রেমময়।

৪

শ্যাম-শোভা-স্নিগ্ধদিন, শান্ত শূন্য-লোক;
পৃথিবী নিবিষ্ট ধ্যানে; যেন দু'টি চোখ
গভীর প্রশান্তি ভরে রয়েছে মুদিত;
বস্তু-লোক পার হ'য়ে বস্তুর অতীত
বন্ধন-বিমুক্ত যেন হ'য়েছে হৃদয়।
অনন্ত ভাবের দেশে ল'য়েছে আশ্রয়।
মনে পড়ে, রামগিরি-সানু হ'তে ভেসে
'মেঘদূত' নিখিলের মর্ম্মের সন্দেশে
'অলকার' অবরোধ করিবে মোচন।
শাপ দগ্ধ বিরহীর শাশ্বত স্বপন
মূর্ত্তি লভে হেন দিনে; চিত্ত-বৃন্দাবনে
চির-প্রেম মত্ত হয় উত্তাল স্বপনে।
যক্ষ-ভাবে—রাধা-ভাবে এ কী সূক্ষ্ম মিল!
এ মিলেরই বার্ত্তা বলে বর্ষায় নিখিল।

———

শিল্পনগরীর পথে

অরুণা মুখোপাধ্যায়

বছর দুই আগে পূজোর ছুটিটা উপভোগ করতে গিয়েছিলাম শিল্পপ্রধান অঞ্চলে। ঐসব স্থানে যেটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তারই সারাংশ তুলে ধরছি বর্ত্তমান রচনাটিতে। হয়ত এই দু'বছ'র অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে বা হবেও তবুও পাঠক সমাজের কাছে পুরাতন বছরের অভিজ্ঞতা দিয়েই রচনা শুরু করলাম।

আমার এ যাত্রার প্রথম অঞ্চলটি ছিল কিন্তু বার্ণপুর; আসানসোল ষ্টেশন থেকেই যেতে হ'। অনেকদিন পর কলকাতা মহানগরীর বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে বেশ ভালই লাগল। খনি অঞ্চলের মধ্যবর্ত্তীস্থান শিল্পপ্রধান আসানসোলের মধ্য দিয়ে আমাদের গাড়ী ছুটে চললো। মধ্যে মধ্যে বহু স্তূপীকৃত কয়লা চোখে পড়লো। বহু শিল্পই এখানে গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে বার্ণপুর, কুলটি ও দুর্গাপুরের ইস্পাত নির্ম্মাণ শিল্প অন্যতম। মাইথন, পাঞ্চেত ও দুর্গাপুরের দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের বাঁধগুলোও সত্যিই অপূর্ব্ব। এ ছাড়া উষাগ্রামের Pilkington Glass Factory, Sen Raleigh' র সাইকেল শিল্পও উল্লেখযোগ্য। যাহোক ক্রমে আমরা বাজারে এসে পৌছলাম। বাজার অঞ্চলে লোকালয় একটু বেশীই দেখলাম।

একটু পরেই সুন্দর ছোটখাটো পরিষ্কার ঝরঝরে স্থান বার্ণপুরে এসে পৌছলাম। পাথরের গায়ে "Burnpur" চোখে পড়লো। 'Burnpur Boys' HighSchool ও পাশে একটা Primary স্কুল দেখলাম। ক্রমে ক্রমে একের পর এক রাস্তা চোখে পড়লো Tee Road, Club Road. The Crescent, The Ridge, Park Road, Pork Avenue ইত্যাদি রাস্তার নাম ঐ একই ভাবে পাথরের গায়ে লেখা আছে দেখলাম। কর্ম্মচারীদের আয়ের বিভিন্নতা (Scale) অনুযায়ী কোয়ার্টারগুলো ভাগ করা হয়েছে। শুনে মনটা একটু দমে গিয়েছিল। মনে পড়লো প্রাচীন সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের লেখা 'মেঘদূত' নামক প্রবন্ধের কথা—"পরস্পরের মধ্যে এক অশ্রু লবণাক্ত সমুদ্র ....।" যা'হোক এরপর Park Circle নামক রাস্তার কোয়ার্টারে এসে উপস্থিত হলাম। রাস্তাটা ভারী সুন্দর, পরিষ্কার ঝকঝকে সামনে পার্কের মাঝখানে ফোয়ারায় জল পড়ছে। গোল রাস্তাটার চারপাশ অসংখ্য গাছে ভর্ত্তি। রাধাচূড়া আর কৃষ্ণচূড়া গাছ অনেক দেখলাম। কোয়ার্টারের ভেতরেও অনেক বড় বড় গাছ দেখলাম। বোধহয় বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। ভিজে মাটি থেকে বেশ একটা মিষ্টি গন্ধ নাকে এসে লাগছিল। হঠাৎ চমকে উঠেছিলাম সেদিন, দূরে অনেক দূরে আকাশের দিকে চোখ পড়তে। হ্যাঁ, বার্ণপুরের লোহা তৈরীর কারখানার লোহা গলানোর ভীতিপ্রদ আগুন; সেই আগুন সেদিন দেখেছিলাম নিজের চোখে, ভয়ানক বটে। সমস্ত আকাশটাতে যেন কে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। কি ভয়ানক লাল! চোখ সরিয়ে নিয়েছিলাম শুনলাম Steel এর wastage অংশ আগুনের আকারে ঐভাবে ঢেলে দেওয়া হয়। পরে ঠাণ্ডা হলে পাথরের ছোট বড় স্তূপ (Slag) পরিণত হয়। কোয়ার্টার ও রাস্তার ধারেও ঐ ধরণের অনেক 'Slag' দেখা যায়। একটু পরেই আগুন ঢালা বন্ধ হলো।

ভারত পাকিস্থানের যুদ্ধের সময় প্রতিরক্ষার জন্য বার্ণপুর খুব সচেতন দেখলাম। প্রায় প্রতি বাড়ীতেই ট্রেঞ্চ ও Shelter rcon এর ব্যবস্থা দেখলাম ও রাশীকৃত বালির বস্তাও রাখা ছিল। মেয়েদেরও First aid training দিয়ে Home guard-এতে তাদের নাম লিখিয়ে দেশের কাজে প্রতিরক্ষার জন্য তৈরী করা হয়েছে বলে জানলাম। ভারতীয় জওয়ান ভাইদের জন্য প্রায় প্রত্যেকেই কিছু কিছু জিনিষ যেমন সাবান, বিস্কুট, tin-food, টফি, জ্যাম, গুঁড়ো দুধ ইত্যাদি অনেক কিছুই

পাঠিয়েছিলেন। ভারী ভাল লেগেছিল সেদিন। দেশের জন্য ঐক্যবোধ, সচেতনতা অনুভব করেছিলাম। ছোট্ট বাচ্ছাদেরও জওয়ান ভাইদের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলাম। উপহারের প্যাকেটে তাদের স্বহস্তে লেখা দেখেছিলাম—Long live Jawans-with the best wishes from your little sister অথবা brother ইত্যাদি আরো কত কি শিশুমনের সরল অনুভূতি।

বার্ণপুরে থাকতে গেলাম একদিন দামোদর নদীর ধারে বেড়াতে সূর্য অস্ত যা'বার ঠিক আগের মুহূর্ত্তটিতে। এখানে যাবার রাস্তাটি ভারী সুন্দর। দুপাশে ধানের ক্ষেত, দূরে প্রায় এক ধরণের কতকগুলো কোয়ার্টার; রাস্তার নাম 'River side Koad'. গাড়ী ছুটে চলেছে। দূরে পঞ্চকোট পাহাড় দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ গাড়ীর স্পীড কমে এল। বুঝলাম গন্তব্যস্থল নদীর ধারেই এসে পৌছেচি। সামনেই পড়ল Indian Iron and Steel Company-র প্রাইভেট পার্ক। গেট পার হয়ে ঢুকলাম। ঠিক হলো পার্ক দেখে নদীর ধারে যাব। জানা গেল আগে এটা জঙ্গলাকীর্ণ স্থান ছিল। পরে সুন্দর করে পার্ক করা হয়েছে। উঁচু-নীচু পথ দিয়ে আমরা হাঁটতে লাগলাম। মাঝে মাঝে সরু চলার পথ সর্পিল গতিতে চলে গেছে। জলে রাস্তা যাতে না ক্ষয় করতে পারে তার জন্য উঁচু টিলার তলায় 'Slag' গুলোকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। দূরে পঞ্চকোট পাহাড় বেশ স্পষ্টই দেখা যায়। সূর্য তখনও তার শেষ রক্তিম আভাটুকু ছিটিয়ে দিচ্ছিল আকাশের বুকে। পার্কে লোকজন খুব কমই ছিল। প্রকৃতির রাজ্যে সৌন্দর্য্য পিপাসুর সংখ্যা অল্প বলেই বোধ হয়। আরো এগিয়ে চললাম। গাছগুলো সুন্দর করে ছাটাই করা আছে। এখানেই water works আছে; কিন্তু ভেতরে প্রবেশের অনেক অসুবিধা বলে আর যাওয়া হলো না। ধীরেধীরে নদীরধারে গিয়েপৌছলাম। দামোদরনদী—শান্ত সমাহিত রূপেই একে সেদিন দেখেছিলাম। বহুদূরে পঞ্চকোট পাহাড়, পাহাড়ের কোল ঘেঁসে অসংখ্য গাছ, তার কোলে ধানের ক্ষেত আর তার পরেই দামোদর নদী। যেন একখণ্ড ছবি। ঠিক তখন গোধূলি লগ্ন; মাথার উপরে নীলাকাশ; মধ্যে মধ্যে তুলোর মত পেঁজা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে; নীচে দামোদর শান্তভাবে বয়ে চলেছে; দূরে পঞ্চকোট পাহাড়ের তলা অস্পষ্ট ধোঁয়াটে হয়ে উঠল। কাছাকাছি কোথাও কোন গ্রাম আছে। দামোদরের বুকে চরা পড়েছে। লোকেরা খেয়া পারাপার করছে। মাঝে মাঝে দূর থেকে মাঝিকেকারা যেনডাকছে। যাত্রীরা গ্রামে যাবার জন্য মাঝির আশায় অধীর প্রতীক্ষায় চরার বুকে বসে আছে দেখলাম। ভারী ভালো লেগেছিল সেদিন। ইট, কাঠ আর পাথর দিয়ে তৈরী মহানগরীর বাসিন্দা আমি। সেদিন ঠিক এমনি এক মুহূর্ত্তে দামোদরের তীরে দাঁড়িয়ে মনটা কেমন যেন ব্যথাভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল।' অন্তরে এক অসীম শূন্যতা অনুভব করেছিলাম। সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। মাথার উপর ইলেকট্রিকের আলো জ্বলে উঠল। দামোদরের বুকে আলোছায়ার খেলা চলল। সেদিন সেই মনোরম সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে এলাম River side Road-ধরে।

পরের দিন ষষ্ঠী। সন্ধ্যার সময় ঠাকুর দেখতে বেরোলাম। বার্ণপুরের ভেতর অনেকগুলো পূজো হয়। তবে আমরা সেদিন টাউন পূজো, ব্যাঙ্ক রোডের পূজো ও ভারতি ভবনের পূজোটাই প্রধানতঃ দেখলাম ও ঢাক ঢোলের মধ্যে পূজো দেখা শেষ করে সেদিনের মত বাড়ী ফিরে এলাম।

পরের দিন ভোর বেলায় ঠিক হলো সালানপুরে বেড়াতে যাব। এটিও শিল্পপ্রধান খনিজ অঞ্চল। যথাসময়ে যাত্রা শুরু হল। জি-টি-রোড পর্য্যন্ত বেশ ভাল। তারপরই সালানপুর যাবার রাস্তা; অসমতল কাঁকড় দিয়ে ভরা; তখনও রাস্তা তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ হয় নি। দুপাশে ঘন জঙ্গলের মত বুনো গাছ—দূরে অল্প অল্প ধানক্ষেত। সালানপুরে পৌছে, গেলাম ইটের কারখানা (Ceramic factory) দেখতে। দুধারে অনেক পাথর মাটি ও ইতস্ততঃ ছড়ানো কয়লাও রয়েছে। এখানে অনেক খনিও আছে। তবে তিনধরনের খনির মধ্যে আমরা একরকম খনিই দেখলাম। এসব খনিতে ভয়ের চিহ্ন কম। অর্থাৎ এসব খনিতে মাটির নীচে কেটে কয়লা, পাথর ও মাটি কুলীরা উপরে ঝুড়ি করে নিয়ে গিয়ে ফেলে। এখান থেকে এসব মাল ইটের কারখানায় যায়। আর এ ছাড়া বাকী দু'ধরণের খনির মধ্যে একরকম হলো নীচের দিকে

সিঁড়ি করা আছে আর অন্যটি হলো খনিতে যাবার লিফটের (lift) মত ব্যবস্থা আছে। শেষোক্ত এই খনিতেই explosion হবার ভয় বেশি। যাহোক আমরা এই সব খনি দেখার পর ইটের কারখানা প্রস্তুত পদ্ধতি দেখার জন্য কারখানার ভেতর প্রবেশ করলাম। এর মধ্যে laboratory বা গবেষণাগার আছে। এখানে কঁচামাল (raw materials) ও প্রস্তুত মাল (finished products) দেখে নেওয়া হয়। সাধারণতঃ ইট দু'প্রকারের হয় :—(১) fire bricks ও (২) insulating bricks বা fire resisting bricks, শুধুমাত্র fire clay দিয়েই ইট তৈরী হয়, ও কেবল Insulating bricks গুলো কাঠের কুচির সঙ্গে খুব সূক্ষ্ম মাটি অর্থাৎ China clay মিশিয়ে করা হয়। ইট তৈরীর পদ্ধতি দু'ধরণের :—(১) যন্ত্রের সাহায্যে ও (২) হাতে কাঠের ছাঁচ থেকে তৈরীর মাধ্যমে। প্রথমে ইট তৈরীর মশলাকে যন্ত্রের মুখে ঝুড়ি করে ফেলে দেওয়া হয়। পরে যন্ত্রের সাহায্যেই ভাল করে মেখে নেবার পর গরম হয়ে ইটের আকারে যন্ত্রের মুখ থেকে বাইরে আসে। এই যন্ত্রটি খুব বৃহৎ আকারের ও ঘণ্টায় প্রায় ১২০০ ইট প্রস্তুত হয়। এরপর এই ইটগুলোকে অন্য একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে মাটির নীচে থেকে পাইপের আগুনে ৭০ থেকে ৮০ ফারেনহাইটে ইটের জল টেনে দেওয়া হয়। এখানেই ইট বেশ শুকিয়ে ঝরঝরে হয়ে যায়। এরপর প্রকাণ্ড একটা গুদামের মত ঘরে (hot room) ইটগুলোকে ১৭০০ centrigrade উত্তাপে পোড়ানো হয়। এই hot room বা ভাঁটাঘরে দেখলাম কাঠের কুচি দিয়ে তৈরী ইটগুলোকে (Iusulating bricks)। fire clay দিয়ে তৈরী ইটের সঙ্গে বাক্সের আকারে সাজানো হয়েছে যাতে উত্তাপ বাইরে না যেতে পারে। কাঠের কুচি মিশ্রিত Insulating bricks বৈদ্যুতিক শিল্পেই ব্যবহৃত হয়। এগুলি খুব হাল্কা ও দেখতে মনোরম। Hot room বা ভাঁটাতে প্রায় ৯ দিন রেখে পোড়ানোর পর ২ দিন ঠাণ্ডা করা হয় ও অল্প ঠাণ্ডা করে নেওয়ার পর ঠাণ্ডা ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে আরো ঠাণ্ডা করার পর বাইরে নিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়। সুন্দর ফুলের আকারে, ঝাঁঝরির মত, ড্রেন পাইপের মত দেখতে ইত্যাদি নানাধরণের ইট দেখলাম। এই স্থান থেকেই ট্রলি করে ইট চালান দেওয়া হয় শিল্পপ্রধান অঞ্চলে। ইটগুলি সাধারণতঃ ৯" ইঞ্চি লম্বা, ৪½" ইঞ্চি চওড়া ও ৩" ইঞ্চি মোটা হয়ে থাকে। হাতে তৈরী করা ইটকে কারখানার লোকেরা বেশ সুন্দরভাবে পালিশ করছে দেখলাম জল ও রাবিশের সাহায্যে। হাতে তৈরী করা ইটের জন্য যে কাঠের ছাঁচ ব্যবহার করা হয় সেগুলিও এর কাছেই কাঠের কারখানায় তৈরী হয়। তবে এখানে শুনলাম ইটের মশলার (অর্থাৎ কাঁচা কয়লা, পাথর ও মাটি) উচ্ছিষ্টও অপচয় হয় না। রাস্তা তৈরীর কাজেও এ সব লাগে। যাহোক সেদিন কারখানা থেকে বাড়ী ফিরে এলাম ও পরের দিন বার্ণপুর ফিরলাম শান্তিনিকেতন যাবার উদ্দেশ্যে।

বেলা প্রায় ১১টার সময় যাত্রা করা হল শান্তিনিকেতনের পথে। আসানসোল থেকে Nunia ব্রীজ ও বিভিন্ন পথ অতিক্রম করে রানীগঞ্জ, সিংগ্রাম ব্রীজ, অণ্ডাল, তুমলা ব্রীজ পার হয়ে আমরা দুর্গাপুরে প্রবেশ করলাম। প্রথমেই চোখে পড়লো বহু সুন্দর সুন্দর নতুন কলোনী ; Coke oven-এর কারখানা চোখে পড়লো। শিল্পোন্নতির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৫ বছরের একটি পরিকল্পনা করেছেন ও Coke oven plant, বহু রাসায়নিক শিল্প, গ্যাস সরবরাহ পদ্ধতি ও thermal power plant এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। ১৩টি ব্রিটিশ কোম্পানীর সঙ্গে সংযুক্ত কেন্দ্রীয় সরকারের লৌহ ও ইস্পাতশিল্প সম্পূর্ণ হয়েছে বলে জানলাম। এটি বিভিন্নআয়তনের অসংখ্য লৌহপিণ্ড ingot steel উৎপাদনকরবে। দামোদরপরিকল্পনা হতে অতি অল্পব্যয়ে উত্তাপ সরবরাহের দ্বারা বহু শিল্প পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বারা পরিচালিত হয়ে গঠিত হয়েছে। শুনলাম দুর্গাপুরের সার উৎপাদনের কারখানার উৎপাদন ১৯৬৮ সালের মাঝামাঝি থেকে শুরু হবে। এখানে দুর্গাপুর ব্যারেজটি খুব সুন্দর। উঁচু মাটির টিলার উপর কেটে কেটে লেখা আছে "Drugapur Barrage"। দামোদর পরিকল্পনার এটি একটি অন্যতম যোগসূত্র। দুর্গাপুর Tourist Lodge ঠিক ব্যারেজের মুখোমুখি। অনেক গাছপালা দিয়ে ঘেরা এই স্থানটিকে ভারী মনোরম লেগেছিল সেদিন। দুর্গাপুর ছাড়িয়ে আমরা রাজবন্ধ ও পানাগড় থেকে বেঁকে বাঁদিকে বোলপুর শান্তিনিকেতনের

রাস্তায় পা দিলাম। ১৪ মাইল পরে অজয় নদী পার হলাম। রাস্তাটা ভারী সুন্দর; দুপাশে অসংখ্য গাছ; অনেক শাল গাছও চোখে পড়ল; পথের যেন শেষ নেই আর গাছেরও শেষ নেই—অসীম অনন্ত গাছ; গাছের সঙ্গে মিশে বাতাসও যেন ঠাণ্ডা। এইবার লাল মাটির সন্ধান মিললো। ছোট ছোট বাড়ী দেখলাম সবই লাল মাটির। এরপর ইলামবাজার পার হয়ে বোলপুরের পথ ধরে দেখতে দেখতে শান্তিনিকেতনে এলাম। সত্যিই অপূর্ব্ব নির্জন শান্তিপূর্ণ স্থান। শুনলাম এখানে মোট বৃষ্টির পরিমাণ ৫০"। শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর বহু পুরোনো স্মৃতিচিহ্ন দেখে মনটা কোন্ এক অতীতের গর্ভে সেদিন চলে গিয়েছিল। মনে হলো এই সেই স্থান যেখানে রবীন্দ্রনাথ একদিন স্বপ্ন দেখেছিলেন, সঙ্গীত রসে চারিদিক মুগ্ধ করেছিলেন আর কল্পনার রঙীন জালকে বাস্তবতায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তুলনামূলক ধর্ম্মগ্রন্থ, দর্শনশাস্ত্র, চৈনিকশাস্ত্র, ভারতীয় গ্রন্থ ও সূক্ষ্মচারুকলা অধ্যয়নের অপূর্ব্ব সুযোগ রয়েছে এই শান্তিনিকেতনে। সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে আমরা সেদিন শান্তিনিকেতনের ভেতর সাইকেল রিক্সাতেই পরিভ্রমণ করলাম। কলাভবন, চীনাভবন, ছেলেদের হোষ্টেল, লাইব্রেরী ও শান্তিনিকেতনের মধ্যে অনেক মাটির বাড়ীতে (ছাত্রদের আবাসস্থল) সুন্দর সুন্দর হাতের কাজ মাটির দেওয়ালে খোদাই করা আছে দেখলাম। গাছকেও কেটে এরা সুন্দরভাবে ভাস্করের কাজ করেছে চোখে পড়ল। শান্তিনিকেতনের ভেতরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সুন্দর বাড়ীখানা চোখে পড়লো। উদয়ন, মালঞ্চ ইত্যাদি বিভিন্ন বাড়ীগুলো দেখলাম। কবির নিজগৃহ উত্তরায়ণের পরিবেশটি ভারী সুন্দর। চারদিকে অসংখ্য গাছ—পাশে আম্রমুকুলের সারি দেওয়া বাগান, সামনে ছোট্ট একটা দীঘির মত জলের রেখা—তার মধ্যে পরপর কয়েকটা পাথর সাজানো—হয়তো বা কোনদিন কবি এসে দাঁড়াতেন। এখান থেকে আমরা ছাতিমতলায় এলাম। এটিও ভারী মনোরম—প্রকৃতি দিয়ে ঘেরা। এরপর শ্রীনিকেতনে প্রবেশ করলাম। বহু শত গ্রামবাসী এখানে কুটির শিল্পে নিযুক্ত আছে। শ্রীনিকেতনের উৎপন্ন সামগ্রী অপূর্ব্ব। শুনলাম বিশ্বভারতী বুধবার সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে ও রবিবারে পুরো কাজ চলে।

এখানে থাকবার পক্ষে বোলপুরের রেলওয়ে রিটায়ারিং রুম, Inspection Bunglow, ডাকবাঙলো, ধর্ম্মশালা, টাটা অতিথিশালা (guest house) ও শান্তিনিকেতন অতিথিশালা (guest house) বেশ ভাল।

আমরা সেদিন বার্ণপুর ফিরবার পথে বোলপুর রেলওয়ে রিটায়ারিং রুমেই চা পান শেষ করলাম।

পরের দিন পরেশনাথ পাহাড় ও তোপচাঁচী লেকে বেড়ানো ঠিক হলো। বেলা প্রায় ১১টা নাগাদ যাত্রা করলাম মোটরের পথে। বাংলা দেশের মধ্য দিয়ে আসানসোল, নিয়ামতপুর পার হয়ে জি টি রোড ধরে গাড়ী ছুটলো। পথের দুধারে আবার সেই অসংখ্য গাছ; গাঢ় সবুজ, ফিকে সবুজ, ধুসর সবুজ রঙের ধানের ক্ষেত; আবার কোথাও বা দূরে তালগাছের সারি; কোথাও আবার নদীর চড়ার বুকে বড় বড় ঘাসের গুচ্ছ। নানা দৃশ্য দেখতে দেখতে কুলটিতে এসে পৌছলাম। সুন্দর সুন্দর কোয়ার্টার এখানে। এরপর পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সীমারেখা বরাকর পার হয়ে এলাম। এখানে অনেক স্থানে লেখা আছে দেখলাম "Good bye Bengal", "Welcome Bihar"। অর্থাৎ বাংলা দেশ ছাড়িয়ে আমরা ধানবাদ জেলার চিরকুণ্ডা নামক স্থানে বিহারে প্রবেশ করলাম। এখানকার জমি অনেক রুক্ষ; গাছে গাছে সবুজের সমারোহ এখানে বিরল। পথের ধারে ট্রাকটর তৈরীর জন্য নির্ব্বাচিত স্থান দেখলাম। লেখা রয়েছে "New site for Construction of Tructors"। এরপর কুমারডুবী, মগমা, নিসরা, বারওয়া, গোবিন্দপুর, কেন্দ্রা, রাজগঞ্জ ইত্যাদি খনিপ্রধান ও শিল্পপ্রধান স্থান পার হয়ে এলাম। ঐসব অঞ্চলে অনেক চুণ, কয়লা পোড়ানোর স্থান চোখে পড়লো। খনির লোকেদের উদ্ধারের জন্য অনেক rescue place আছে। হঠাৎ দূরে ধানবাদ পাহাড়ের রেখা দেখে চমকে উঠলাম। অনেকখানি জুড়ে পরেশনাথ পাহাড় চোখে পড়লো। চোখ তার দেখার আনন্দে মেতে উঠল। ধীরে ধীরে তোপচাঁচী লেকে এসে পৌছলাম। বৃষ্টির অভাব হেতু জলও অনেক কম ছিল সেদিন। তোপচাঁচী

কলকাতা থেকে ১৮৯ মাইল, গোমো থেকে ৩ মাইল, ধানবাদ থেকে ২৮ মাইল ও পরেশনাথ পাহাড় (মধুবন) থেকে ২৪ মাইল। তোপচাঁচী লেক থেকেই প্রধানতঃ জল সরবরাহ করা হয় ঝরিয়ার কয়লাপ্রধান অঞ্চলগুলিতে। তোপচাঁচীর জলাধারের (Reservoir) সর্ব্বনিম্ন অংশ থেকে লেকটি বক্রাকারে গঠিত হয়েছে ২৭৫ মিটার (metres) উচ্চে। সাধারণতঃ অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারী মাসই উপযুক্ত সময়। পর্ব্বতবেষ্টিত বক্রাকারে শোভিত লেকটি সত্যিই ভারী অপূর্ব্ব। এরপর ঝরিয়া Water Boardএর Lake Houseএ এসে চা খেলাম। মোটর গাড়ীর জন্য ২৲ টাকা দিয়ে পারমিট কার্ড (Permit Card) নিতে হলো। তোপচাঁচীর ভেতরে গাড়ী রাখার জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট করা আছে। তোপচাঁচীর লেক-এ স্নান, কাপড়কাচা ও শিকার করা নিষিদ্ধ। এমনকি রান্না অথবা পিক্‌নিক্ করাও লেক অঞ্চলে নিষিদ্ধ; কেবলমাত্র "filter bed" অঞ্চলেই এসব চলে। গ্রীষ্মে সন্ধ্যা ৬টার আগে ও শীতকালে ৪-৩০ মিনিটের আগে তোপচাঁচী লেক হতে বার হয়ে আসা নিয়ম বলে জানলাম। তোপচাঁচী লেকে মাছ ধরতে হলেও Water Board হতে অনুমতি নিতে হয়। এখানে তোপচাঁচী ও গোমো আর পরেশনাথ ও তোপচাঁচীর মধ্যে বাস চলাচলের রাস্তা আছে।

সেদিন ফেরার সময় ঠিক করলাম মাইথন বাঁধ ও কল্যাণেশ্বরী মন্দির দেখে ফিরবো। বরাকর নদী পার হয়ে বিহারে মাইথন বাঁধ ১৯৫৭ সালে আমাদের প্রিয় নেতা পণ্ডিত নেহরু প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নদীর সর্ব্বনিম্ন অংশ থেকে এটি ১৬২ ফুট, লম্বা ১৫,৭১২ ফুট; জলাধার অঞ্চলটি ৪১ বর্গমাইল; মাইথনের fishing firm, poultry firm ও yard club আছে। ছোট ছোট নৌকার প্রতিযোগিতা এখানে অপূর্ব্ব। গত ১৯৫৮ সালের ১৫ই আগষ্ট বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ মাইথন বাঁধের প্রথম অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন করেন। ভারত ও প্রাচ্যের প্রথম Underground power Station হলো মাইথন বাঁধ। এখানকার D. V. C. guest House ও Rest House খুব সুন্দর। এখানকার নিকটবর্ত্তী রেলষ্টেশন হলো বরাকর ও আসানসোল।

ফেরবার পথে আমরা নামলাম কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে। কথিত আছে যে মানসিংহ বাংলা জয় করে ফের র পথে কল্যাণেশ্বরী মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরটি ভারী সুন্দর। এখানকার কল্যাণেশ্বরী মূর্ত্তি খুব ছোট ও উপরিভাগ সিঁদুর আবৃত। মন্দিরের পাশেই দামোদর নদী, এখানে কল্যাণেশ্বরীর পদচিহ্ন আছে।

এখান থেকে বার হয়ে আমরা বার্ণপুরে ফিরে এলাম। দেখতে দেখতে পূজোর কটা দিন বেশ আনন্দে কেটে গেল।

এবার এলো কলকাতায় ফেরার পালা। নির্দ্দিষ্ট দিনে আসানসোল ষ্টেশনে এলাম। ট্রেন ঠিক সময়টিতেই এল। উঠে পড়লাম একটা ব্যথা ভারাক্রান্ত মন সঙ্গে নিয়ে। হুইসিল বেজে উঠলো। ট্রেন ছেড়ে দিলো। পেছনে পড়ে রইলো শিল্প নগরী তার সব স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে।

ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ

পুষ্পদেবী, সরস্বতী, শ্রুতিভারতী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম পাদ

স্মৃত্যনবকাশদোষ প্রসঙ্গ ইতি চেৎ ন অন্যস্মৃত্যনবকাশ-
দোষপ্রসঙ্গাৎ। ২।১।১

স্মৃতির অনবকাশ হয় এতে সার্থকতা যে নাই
আপত্তি যদি করেন ইহাতে উত্তর তার এই
এ যুক্তি ঠিক নয়
গ্রহণযোগ্য নয়
শঙ্কর কন ঋষির প্রণীত গ্রন্থ যে স্মৃতি হয়
কপিলের সাংখ্য দর্শনেও জেন এই মত কথা কয়।
তবুও জানিও স্মৃতির হইতে শ্রুতি ঢের বড় হয়
পুরাণের বেদ অভ্রান্ত জানি সুধীজনে তাই কয়
বেদ গ্রন্থের তুলনা না হয়
এখানে বেদই স্থির নিশ্চয়
বহু পুরাণের ঘটনার মাঝে বেদ স্থির নিশ্চল,
বেদ অনুসারি চলো পথ সবে আলোকেতে উজ্জ্বল।

২।১।২

ইতরেষাং চ অনুপলব্ধেঃ

শঙ্কর কন অন্য দ্রব্য উপলব্ধির নয়
মহৎ ব্যতীত প্রধান জানিও কখনই নাহি হয়
মহৎ না ব্রহ্মে না পায়
ঊর্দ্ধে উঠিলে তবে তাঁকে চায়
সাংখ্য দর্শন ও স্মৃতি ইহাতেও ভেদ যদি কভু হয়
তবুও জানিও তুচ্ছে ত্যজিলে তবেই ব্রহ্মে লয়।

এতেন যোগ প্রত্যুক্তঃ ; (২।১।৩)

বৃহদারণ্যক উপনিষদেতে এই কথা জেনো হয়
ব্রহ্ম বিষয়ে সাধু সন্তরে জিজ্ঞাস নিশ্চয়
তাঁর খোঁজ আর বিচার যে করো
ধ্যান করো আর হৃদয়েতে স্মরো
বেদান্ত মাঝে সন্ধান করো যাহাতে তত্ত্ব জ্ঞান
তাঁহাকে চিনিলে তাঁহাকে জানিলে তবে তো পরিত্রাণ
যোগ দর্শনে শুধু জেনো নয় লহ কোরে আপনার
ব্রহ্মই ধ্যান ব্রহ্মই জ্ঞান তাহা ছাড়া নাহি আর

সকল ধ্যানের যেখানেতে লয়
সকল জ্ঞানের সেখানে উদয়
সেই ব্রহ্মেতে আপন জানিয়া আপন করিয়া নাও
প্রতি জীবে শিব হেরিবে তখন যেদিকে যখন চাও।

ন বিলক্ষণাৎ অস্য তথাত্বং চ শব্দাৎ

ব্রহ্ম জানিও জগতের এই অপাদান কভু নয়
ব্রহ্ম জগৎ এ দুয়ের মাঝে বিলক্ষণত্ব রয়
শ্রুতি বাক্যেতে ইহা জানা যায়
ব্রহ্ম জগৎ স্বভাব মিলায়
দেঁাহের মিলনে অপরূপ এই ইহার সৃষ্টি হয়
ব্রহ্ম নিত্য আনন্দ জেনো জগৎ দুঃখময়।
ব্রহ্ম চেতন অচেতন জেনো জগৎ এখানে হয়
শুদ্ধ ব্রহ্ম অশুদ্ধ রূপে জগৎ সৃষ্ট হয়
দোঁহে জেন দুই বিভিন্ন রূপ
বিস্মিত করি একেবারে চুপ
শুধু মন মাঝে ওঁকার রূপে ব্রহ্মই জেনো রয়
ব্রহ্মই এই সবার মাঝেতে শুধু আনন্দময়।

অভিমানি ব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম

(২।১।৫)

শঙ্কর কন বেদে কহিয়াছে কহে এই কথা জল
মাটি বলে ইহা অগ্নি বলিছে বলেছে না এ সকল
অভিমান হতে ইহার উদয়
জল বা অগ্নি কেহ বড় নয়
ব্রহ্ম হইতে জনম সবার ব্রহ্ম শক্তি সব
নিজ দেহ বলি অহংকারেতে হয় এর উদ্ভব।
তাঁর অনুগতি বিশেষ করিয়া শরণাগত গো হও
তিনি ছাড়া কেহ নহে আপনার তুমিও কাহারও নও
এই সার কথা মনে করি জ্ঞান
ছাড়ো আমি এই বৃথা অভিমান
এই অভিমানে সকল বিরোধ দুঃখ সৃষ্টি হয়
সবারে বুঝাতে জ্ঞানী সুধী জন উপমা দানিয়া কয়।

(ক্রমশঃ

গল্প

মহুয়ার মন

শক্তিপদ হাজরা

জীবনের গতি বিচিত্র পথে, দিকে দিকে,—তাই জীবন ঘটনাবহুল। জীবনের এই বিচিত্র ঘটনা কিছু বা বেঁচে থাকে স্মৃতিকে কেন্দ্র করে, কিছু বা বিস্মৃতির অন্তরালে যায় হারিয়ে। যা কিছু ঘুমিয়ে আছে স্মৃতিকে আশ্রয় করে হঠাৎ একদিন একটু চমক লেগে তা অবচেতন মনের পর্দার বাইরে এসে দাঁড়ায় নানা রঙ, নানা রূপ নিয়ে।

মহুয়ার সাথে এমনি করে হঠাৎ দেখা হয়ে যাবে ভাবি নি। ছুটিটা কলকাতায় কাটিয়ে কর্মস্থান দিল্লীতে ফিরে চলেছি। ট্রেনটা একটানা ছুটে চলতে চলতে বর্দ্ধমান জংশনে এসে থেমে গেল। সিগারেটটা ধরিয়ে সদ্যকেনা ইংরাজী নভেলের প্রথম পাতাটা উল্টেছি—

"আরে তুমি"—চমকে চোখটা তুলে একটি চেনা মেয়েকে দেখলুম অচেনা রূপের আবরণে।

"মহুয়া!"

মুহূর্ত কয়েক পরে চমক্ লাগা মনটাকে সচেতন করে বলি, "ভালো আছ তো? কোথায় চললে?"

একটু মৃদু হেসে মহুয়া আমার পাশে বসে বললে, "তুমি কেমন আছ বল?"

বললুম, "ভালো, কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব এখনো দাওনি।"

মহুয়া বললে, "ভালোই আছি, তা আমাকে দেখেই বুঝতে পারছ বোধহয়। জান, পুরীতে একটা ছোট্ট বাড়ী করেছি; বাড়ীটা ছোট কিন্তু সাজিয়েছি মনের মতো করে। গ্রীষ্মটা ওখানেই কাটাই।"

বললুম, "এতো বেশ ভালোই হ'ল সমুদ্রের উদার বক্ষের পাশে বসে তোমার কাব্য চর্চ্চা বেশ ভালোই চলবে।"

জলতরঙ্গের মতো হেসে বলল মহুয়া, জীবনটা কাব্য নয় বন্ধু; সময় কোথায় কাব্যচর্চা করার। আর তাছাড়া পার্টি-পিকনিকের আসরের কাছে কাব্যচর্চাটা অ্যালকোহলের পাশে ঘোলের সরবতের মতো পান্‌সে লাগে।"

মহুয়ার কথাগুলো যেন গরম সীসের মতো আমার কানের পর্দার ওপর এসে পড়তে লাগলো। আমার পাশে যে মেয়েটি বসে আছে এই কি সেই মহুয়া যে একদিন বলেছিল, "বন্ধু, জীবনটাতো একটা কাব্যের নদী; কখনো বা সে হেসে হেসে আনন্দের গান গেয়ে চলে, কখনো বা দুঃখের করালবন্যায় হৃদয় তটভূমিকে ক্ষতবিক্ষত করে তোলে।

মনে পড়ছে একটা জ্যোৎস্না রাতের কথা। সেবার পূজোর পরে মহুয়া আমার সাথে বেড়াতে গিয়েছিল। কোজাগরী পূর্ণিমার দিন সন্ধেবেলা এসে বসেছিলুম গঙ্গার ধারে; আমি আর মহুয়া—পাশাপাশি। আমার হাতটা ওর হাতের মধ্যে সেদিন টেনে নিয়ে বলেছিল, "এমন স্বপ্নময় প্রকৃতির মাঝে তোমায় আমায় যদি সারা জীবনটা কাব্যের সাগরে ভেলা ভাসিয়ে চলতে পারি তাহলে আমি আর কিছুই চাইনে এ জীবনে।"

সেদিনের কথাগুলো মনে পড়তে হঠাৎ ঠোঁটের কোণে হয়তো একটু বাঁকা হাসির ঝলক লাগলো। মহুয়া বোধহয় চেয়েছিল আমার মুখের দিকে তাই আমার ঠোঁটে হাসির রেখাটা ফুটে উঠতেই বললে, "কি হাসছ যে।"

বললুম "না,—এমনি হাসছি; অনেকদিন আগের একটা কথা মনে পড়ে গেল তাই! ও কথা যক্; তোমার 'মিষ্টার' কেমন আছে বললে না যে?".

—"ওর কথা আর বল কেন; এমন কাজ-পাগলা

মানুষ আমি জীবনে দেখিনি। শুধু কাজ, কাজ আর কাজ। আমি যে একটা মানুষ ঘরে রয়েছি তা যেন খেয়াল থাকে না।" একটু অভিমান ক্ষুণ্ণ গলায় বলল মহুয়া; তারপরেই হেসে বললে, "জান, একদিন কি মজার ব্যাপার হয়েছিল—সন্ধ্যাবেলায় আমি আর ও বসে আছি। ও একটা ইঞ্জিনিয়ারিঙের বই পড়ছিল আর আমি বুনছিলুম। হঠাৎ কি খেয়াল হ'ল বললুম, এ ভাবে মুখ বুজে বসে থাকার চেয়ে বনবাস ভালো। আমাকে সেখানেই পাঠিয়ে দাও না কেন?

"ওর কানে গিয়েছিল শুধু 'বনবাস' কথাটা; তাই হঠাৎ চমকে উঠে বললে; 'বনবাস, কার? কেন? কি জন্যে?

"বললুম, আমারই। এ ভাবে, নীরবে বসে থাকার চেয়ে বনবাস ভালো।

"কেন, কেন এই তো আমি রয়েছি—" ও ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো।

"বললুম, তুমি তো বই পড়ছো আমার সাথে একটা কথাও তো বলনি।

"ও, অভিমান!—বলে আমাকে কাছে টেনে নিয়ে সেদিন কি আদরই না করলে। সেরাত্রে ওর পাগলামীর কথা মনে হলে আজও—আমার ভীষণ লজ্জা করে নিজের কাছে।"

আমার বুকটা জ্বালা করে উঠলো; বুকের ভেতরে কে যেন কয়েক পেগ জ্বালাময় অ্যালকোহল ঢেলে দিলো। এই বেদনার মধ্যেও মনে পড়লো একটি মেয়েকে যার নাম ছিল 'মহুয়া'। সে একদিন আমাকে লিখেছিল—

"দুষ্টু আমার,

আর কারো নয় বলেই সাহস করে বলতে পারলুম যে তুমি আমার। তুমি আমায় অত আদর কর কেন? তোমার লেখনী যেভাবে কথা বলে আমার মন সেভাবে কথা বললেও লেখনী রচনা করে এক প্রাচীর। হৃদয়ের ভাব ভাষার প্রাচীরে হয় বন্দী।

"তুমি আমায় এমনি করে ডাকবেনা। নীল কাগজের চিঠিতে তার সবুজ রঙের ভাষা আমায় ভীষণ ভাবে হাতছানি দেয়। নীলের সাথে যে আমার বড় মিতালী—ঐ নীলের মাধ্যমে আমি শুনতে পাই সমুদ্রের গান।"

"তুমি আমায় এত আদর করে ডাক দাও আর তোমায় আমি এমন করে ডাকতে পারি নি। কি বলে তোমায় ডাকবো বলে দাও—লক্ষ্মীটি। আমি ভেবে পাচ্ছি নে।"

স্মৃতির ঝোলা থেকে কয়েকটা হীরে-জহরৎ খুঁজতে গিয়ে বর্তমানকে গিয়েছিলুম ভুলে। হঠাৎ মহুয়া প্রশ্ন করলে "কি, কথা বলছ না যে?"

মুখে একটু ক্লান্ত হাসি টেনে বলি, "তুমি সুখী হয়েছ জেনে খুশী হলুম।"

মহুয়া হয়তো আমার জবাব শুনে খুশী হ'ল, বললে, "তাই নাকি?"

কথার জবাব না দিয়ে হাসলুম একটু। মহুয়া যদি ওর নিজের কথার আনন্দে নিজে ডুবে না থাকতো তা হলে এ হাসির বেদনাটুকু ওর দৃষ্টি এড়াত না।

মহুয়া আবার বলে চলে, "জান, ও বলে,—'তুমি কাছে থাকলে আমি যেন সব কাজেই উৎসাহ পাই।' আমিও ব'লছি, বেশতো আমি তো তোমার কাছেই রয়েছি যতখুশী কাজ কর না।"

আমার মনে পড়ে গেল চার বছর আগের একটি চিঠির কথা। মহুয়া আমাকে লিখেছিল—"তোমাকে যে অনেক বড় হতে হবে দুষ্টু। তুমি অনেক বড় হও। মনে রেখো তোমার চলার পথে এতটুকু বাধা যাতে না আসে তাই নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তোমার হয়েছি। তোমার চলার পথে এতটুকু মালিন্য, হতাশার ছায়া যাতে না পড়ে তার জন্যই তো তোমার মাঝে আমার হারিয়ে যাওয়া।

"তুমি জীবনযুদ্ধে এগিয়ে যাও। পিছনে যা আছে থাকনা; তাকে অস্বীকার করার যেমন প্রয়োজন নেই—সেদিকে চেয়ে পিছিয়ে পড়বারও প্রয়োজন দেখিনা। সামনের দিকে চাও। ওখানে অনেক আলো; অনেক আশা, অনেক ভাষা, অনেক কথা। অনেক দূর থেকে একটি মেয়ে তোমার যাত্রাপথে প্রদীপ ধরে আছে। সে আলোতে দুস্তর বন্ধুর পথ হয়তো আলোকিত হবে না; কিন্তু তোমার যাত্রাপথকে সে আলো মঙ্গলময় করবে।"—

মনটা তোলপাড় করতে লাগলো; যেমন করে কালবোশেখীর রাত্রে আমবাগানের গাছগুলো। যে—

একদিন চেয়েছিল আমার চলার পথকে মঙ্গলময় করে তুলতে তার প্রেমের মঙ্গল-প্রদীপ জ্বালিয়ে, আর আজ সেই মহুয়া—

"জান" মহুয়া এখনো বকে চলেছে, "এবার গ্রীষ্মের সময় দার্জ্জিলিং বেড়াতে গিয়েছিলুম। কি আনন্দেই কাটলো দিনগুলো। তুমি তো কবি, তুমি যদি ওখানে যেতে তাহলে নিঃসন্দেহে কতকগুলো কবিতা লিখে ফেলতে।"

মনে মনে ভাবলুম, একদিন এমনি ছিল যখন একটি মেয়ের কোমল হাতের স্পর্শ আমার মনে যে ঝড় তুলতো তাই কিছুটা ঝরে পড়তো আমার কাব্যের রূপ নিয়ে। ধ্যানমৌন প্রকৃতির সৌন্দর্যকে সেদিন দেখতুম অন্য চোখ নিয়ে। প্রকৃতির সেই সৌন্দর্যের ঝর্ণাধারা আজো ঝরে কিন্তু আমার মনের দর্পণের চোখদুটো কবে যেন অজানাতেই ঝাপসা হয়ে গেছে তাই কোন প্রতিবিম্বই সেখানে মনোমুগ্ধকর রূপ নিয়ে আজ আর দেখা দেয় না।

মহুয়া বলে চলেছে তার দার্জ্জিলিং ভ্রমণের কাহিনী। আমার চোখ আছে জানালার বাইরে গাড়ীর পাশে পাশে ছুট-চলা রেললাইনের দিকে, মন ভেসে গেছে অতীতের তমসার মাঝে স্মৃতির আলোক বিন্দুগুলির সন্ধানে।

সে একদিন ছিল, এই মহুয়া যেদিন আমার মনে রোমাঞ্চের ঝড় তুলতো তার আবৃত্তি, গান আর মিষ্টি হাসি দিয়ে। সে স্বপ্নরঙ্গিন দিনগুলোর রেখাচিত্র হয়তো এখনো পাওয়া যাবে আমার ধুলোপড়া রোজনামচার ভেতর—কিন্তু তার মাঝে হয়তো আর কোন রঙই খুঁজে পাওয়া যাবে না—সেগুলো আমার মনে হয়তো লাগাবেনা কোন দোলা।

জীবনটা একটা নদীর স্রোত আমরা সেই স্রোতের মুখে কুটোর মতো ভেসে চলেছি। একদিন তীরভূমিতে দেখেছিলুম সুন্দর বনানী আর আজ তট-ভূমিতে রয়েছে উষর উপলখণ্ড।

—"কোন্ ষ্টেশন আসছে বলতো?" মহুয়ার কথায় চমকে উঠলো আমার অতীতচারী মনটা। পলাতক মনটাকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনলুম শাসনের লাগাম টেনে: বাইরের দিকে তাকিয়ে বললুম, "বোধ হয় আসানসোল।"

—"আরে এখানেই যে আমাকে নামতে হবে।" মহুয়া ব্যস্ত হবে বললে; তারপর একটু লজ্জিত হয়ে "দেখতো এতক্ষণ শুধু নিজের কথাই বলে গেলুম, তোমার কথা কিছুই জিজ্ঞাসা করা হ'ল না। বিয়ে করেছ?

ঝড়ের আগে বাঁশবাগানের মতো আমার মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। কোনরকমে সামলে হাল্কা গলায় বললাম "না সে সুযোগ আর হোল কই?"

সে কি বিয়ে করনি আজো? কেন?

কাউকে আঘাত করতে অভ্যস্ত নই কিন্তু কেন জানি না হঠাৎ বেরিয়ে গেল মুখ হতে "কেনর উত্তরটা আমার চাইতেও তোমার আরো ভাল করেই জানা আছে মহুয়া।

চমকে ও আমার দিকে ঘুরে তাকাল। চোখে চোখ রেখে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অল্পকাল।

তারপর জানলার বাইরের দিকে মুখটা ঘুরিয়ে নিল ধীরে ধীরে।

সিগারেট ধরালাম। জীবনের অনেকগুলো বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর আজও খুঁজে পাইনি।

"একটা কথা জিজ্ঞেস করব?"

যেন শুনতেই পায়নি আমার কথা। জানলার বাইরের দিকে তাকিয়ে একই ভাবে চুপচাপ বসে রইল। একটু পরে আস্তে আস্তে বলল "কি জিজ্ঞেস করবে তা জানি, কিন্তু না জেনে যখন জীবনের এতগুলো দিন কেটে গেছে তখন বাকী দিনগুলোও সেইভাবে কেটে গেলে ক্ষতি কি?

কিন্তু—?

মুখটা ঘুরিয়ে তাকাল। সুন্দর চোখ দুটো জলে টলমল করছে। ওর চোখে ফুটে উঠেছে অতীত দিনের হারিয়ে যাওয়া সেই ভাষা, যে ভাষায় ও একদিন বলেছিলো "এমন স্বপ্নময় প্রকৃতির মাঝে তোমায় আমায় যদি সারা জীবনটা কাব্যের সাগরে ভেলা ভাসিয়ে চলতে পারি তাহলে আমি আর কিছুই চাই না এ জীবনে।"

Please খুব অস্ফুটে বলল ও। যেন অনেকদূর

হতে, ওর চোখের জলের সমুদ্রের ওপার হতে ভেসে এল শব্দটা।

কিছুক্ষণের স্তব্ধতা। ট্রেনের গতি ধীরে ধীরে কমে আসতে লাগল। মনে হল যে প্রশ্নের উত্তর এতদিন ধরে শত চেষ্টা করেও খুঁজে পাইনি সে প্রশ্নের উত্তর কেউ কোনদিনই বোধহয় দিতে পারেনা। হয়ত কোন কিছুই আমি হারাই নি, সব কিছুই সঞ্চিত আছে আমার মহুয়ার মনের অতল গভীরে।

ট্রেন ততক্ষণে আসানসোল ষ্টেশনে 'ইন' করেছে।

———

অর্ঘদান

সুনীল রায়

আমি ঐ নীল আকাশের দিকে চেয়ে ভাবি
মাহুষের ছন্দোহীন জীবনের বিচিত্র চলচ্ছবি।
নীলাকাশে দেখি তারায় তারায় করিছে প্রণয় লীলা
ধরণীর বুকে চলিছে শুধুই হিংসা, দ্বেষের খেলা।
জ্যোৎস্না ভরা পূর্ণিমা রাত স্নিগ্ধ আলোক দিয়ে
ধরণীর বুক আলোকিত করে অসীম মমতা নিয়ে।
হে মানব—তোমার প্রাণেতে কেন জাগেনাকো সাড়া
তুমি কি জানো না তোমার জীবন শুধু মমতায় গড়া?

স্নেহ-প্রীতি-অনুরাগ-ভালোবাসা দিয়ে
এই ধরণীরে
তুমি কি পারো না নিতে জীবন গৌরবময় মধুময় করে?
জানো না কি ধরণী যে ঈশ্বরের প্রমোদ-উদ্যান
অসংখ্য সৃষ্টির মাঝে এই তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান।

তাঁর রূপে তুমি আজি জগৎসংসারে—হে মানব
আমার আমার বলে কর রেষারেষি, দানবের বীভৎস
উৎসব?
কে তুমি জানো না আজো রয়েছো যে গভীর তিমিরে
পূর্ণ তোমার মন মিথ্যা গর্বে, মিথ্যা অহংকারে।

একবার, শুধু একবার চেয়ে দেখো, মনের নিভৃত
বাতায়নে
প্রেমের অঞ্জলি নিয়ে শত শত পুষ্পরাশি এক ঐকতানে
খেলিছে আপন খেলা, হে মানব, ভুলে যাও,
ভুলে যাও সব
হিংসা-দ্বেষ-রেষারেষি-গর্ব-অহংকার, এক হয়ে সব
কর হে জীবন সুন্দর মহিমাময়, কর মহোৎসব।
তুমি শুধু নও তুমি, তোমার মাঝারে সৃষ্টি
খুঁজিছে আপন রূপ, তোমার সকল কৃষ্টি
দিয়ে কর হে উজ্জ্বল তারে, কর হে মহান!
নবরূপে আজি তুমি নব বীথিকায়, জীবনের কর
জয়গান
আপন পূর্ণতা দিয়ে এই ধরণীকে কর তব শেষ
অর্ঘদান

———
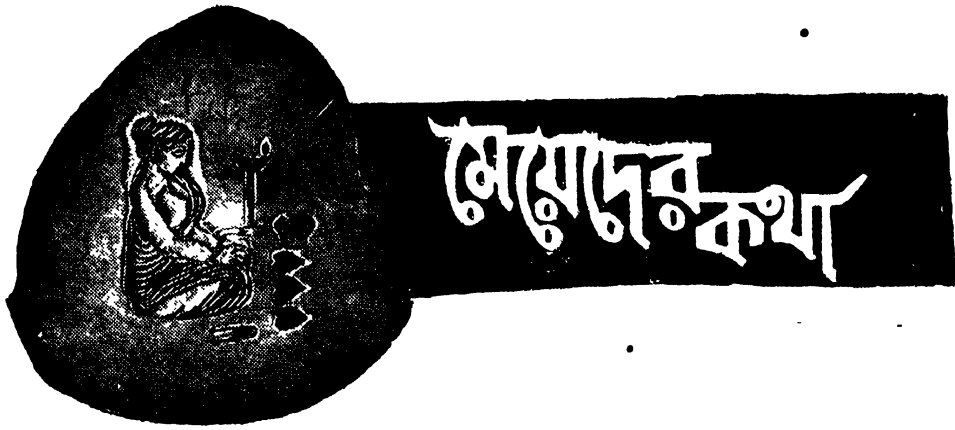
রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী

লীলা বিদ্যান্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

একটি গল্পে কবি বলেছেন মেয়েমানুষকে তার বাইরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাপ জোক দিয়ে মাপা চলে না। তার যে হৃদয় আছে।

কৈলাশ খুড়োর নাতনী কুসুমকে সে ছেলেটির কোনদিন সুন্দরী বলে মনে হয়নি। কিন্তু যেদিন সে তার অল্প বয়সের অসহিষ্ণুতা নিয়ে কৈলাশ খুড়োকে তার নিরীহ মিথ্যা গর্বের জন্য জব্দ করবার মতলব করল, এবং তার বাড়ীতে এক নকল লাটসাহেবকে এনে তার পূর্বপুরুষের মোহরের মালা আর দামী শাল নিয়ে চলে গেল, সেদিন কৈলাশ খুড়োর নাতনী তার নিরীহ ভালমানুষ দাদুর ওপরে ছেলেদের এই অত্যাচারে ব্যথিত হ'য়ে একটা পাশের ঘরে খাটের ওপরে শুয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছিল। এদিকে বুড়োকে এমনি জব্দ হ'তে দেখে হাসি চাপতে না পেরে ছেলেটি সেই পাশের ঘরে ঢুকে প্রাণ খুলে হাসতে গেল, তখন সে দেখতে পেল সে ঘরে খাটের ওপরে পড়ে কে একজন ফুলে ফুলে কাঁদছে। ওকে দেখেই সে মেয়েটি অশ্রুকাতর চোখে বিদ্যুৎ দৃষ্টি হেনে বলল আমার দাদামশাই তোমাদের কী করেছে, কেন তোমরা এমন করে তার পেছনে লেগেছ? তখন ছেলেটির মনে হ'ল ওর হাসি যেন মার খেয়ে ফিরে এল। সে বুঝতে পারল যে সে বড় কোমল জায়গায়, বড় কঠিন আঘাত করেছে। তখন সে পদাহত কুকুরের মতই সে ঘর থেকে বেড়িয়ে এল। এতদিন সে কুসুমের প্রতি কোন মনোযোগ দেয়নি, কারণ দেখতে সে সুন্দরী নয়। কিন্তু আজ তার ভালোবাসায় হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে......তার......মন ওর প্রতি আকৃষ্ট হ'ল। সে বুঝতে পারল যার হৃদয় আছে তাকে বাইরের কোন মাপ মাঠি দিয়ে মাপা চলে না।

হৃদয়ের গভীরতাই যে নারীর মূল্য এ কথা কবি লিপিকার একটি কাহিনীতেও বলেছেন।

রাজা বেরিয়েছেন রানীর সন্ধানে। সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে তিনি দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ালেন। কত না অসামান্য রূপসী রাজকন্যাদের তিনি দেখলেন। কারো বা বর্ণ শঙ্খের মত চিকন গৌর। কারো বা ভ্রূলতা ভোর বেলাকার দিগন্ত রেখার মতই বাঁকা কিন্তু তারা ওই ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীর কাছে কেউ বা জানায় ঐশ্বর্যের কামনা, কেউ বা প্রার্থনা করে প্রভাব ও পদগৌরব, রাজা তাঁর রানীকে খুঁজে পান না। অবশেষে এক বনের কাঠকুড়ুনি মেয়ের দেখা পেলেন তিনি। সে মেয়েটি বনের ফল-মূল দিয়ে তার আতিথ্য করল। রাজা তার সঙ্গে গেলেন বনের প্রান্তে তাদের কুঁড়েঘরে, যেখানে তার বুড়ো বাপ প্রতীক্ষা করে আছে সে ফিরে গিয়ে খাবার দেবে বলে। রাজা বিদায় নিয়ে গেলেন। সাত দিন পরে সেই কুঁড়ে

ঘরের দুয়ারে এল রাজহস্তী, রাজা এতদিনে তাঁর রানীকে খুঁজে পেয়েছেন।

কবির কথা এই যে মেয়েদের মধ্যে সেই হ'ল রাজরানী যার আছে হৃদয়ের ঐশ্বর্য্য। যে ভালোবাসে সে সেবা করে। বিদেশী অতিথিকে দেখে য'র মায়া হয়, বুড়ো বাপকে যে সেবা করে সেই মেয়েই রাজার যোগ্য রানী। আর যে মেয়েরা নিজের রূপের গর্বে মাতোয়ারা যারা কামনা করে ঐশ্বর্য্য কি প্রভাব-প্রতিপত্তি তাদের জাত আলাদা, তারা মেয়েদের মধ্যে সেরা মেয়ে নয়। তাদের যত রূপই থাক না কেন তবু তারা রাজরানী নয়। কবি অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের রাজকন্যাদের রূপের বর্ণনা দিয়েছেন কিন্তু কাঠকুড়ুনি মেয়ের বর্ণনা দিয়েছেন হৃদয়ের। যে মেয়ের হৃদয় আছে তার রূপ যদি নাও থাকে তার জন্ম যদি রাজার ঘরে না হয়ে দীনের পাতার কুটীরেও হয়, তবু মেয়েদের মধ্যে সেই হ'ল রাজরানী।

কবি মেয়েদের কল্যাণী গৃহিণী রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে তার সব শেষের গান তার পায়ে দান করেছেন, কিন্তু কবি এটা চাননি সে মেয়েরা বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা করবে না। তারা কেবলি বাসন মাজা আর রান্না করা নিয়েই দিন কাটাবে, লেখাপড়া শিখবে না এমন আদর্শ কবির ছিল না। কবি তাঁর নিজের সময়ের যে মেয়েদের দেখেছেন তারা অশিক্ষা ও অজ্ঞতার মধ্যেই কেমন করে দিন কাটায় তা দেখে কবির মন ক্ষুব্ধ হয়েছে। একটি ব্যাংগ কবিতায় কবি মেয়েদের দৈনিক জীবনের একটা সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন।

মেয়েরা একটা পচা এঁদো পুকুরে একটা ডুব দিয়ে ভিজে কাপড়ে বাড়ী ফিরে এসে তরকারী আর মাছ কোটে। তারপরে করে রান্না। পাঁচজনের পাঁচ রকম ফরমাসে হয় সে রান্না। রান্না-খাওয়ার শেষে দুপুরে বিশ্রামের একটুখানি অবকাশ। তখনো হয়ত ছেলেটা বিরক্ত করছে। তখন মা তার পিঠে দুম করে একটা কিল বসিয়ে দেয়। মেয়েদের পড়াশোনার কোন বালাই নেই। নেহাৎ পড়তে হয়ত পাঁজিখানা নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে রাখুক। আর আছে ছেলে-মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ করা। তাছড়া গুরু-পুরুতদের সঙ্গে ছেলের কল্যাণে শান্তি স্বস্ত্যয়ন করার পরামর্শও আছে। মেয়েদের জীবনের এই

দুর্গতিতে কবির মনে যে ক্ষোভ, ওই বর্ণনা থেকে তা ফুটে ওঠে। এটা মেয়েদের প্রতি কবির বিদ্রূপের বক্রোক্তি নয়, ও হ'ল কবির হাসির ছলে কান্না। এমনি ক'রে যেখানে কবির মন ব্যথিত ক্ষুব্ধ হয়েছে সেখানে তিনি ঠাট্টার ভাষায় কথা বলেছেন। তাই এই কবিতাটীর ভাষা বিদ্রূপের ভাষা। কবি নিজের স্বভাবের এই ধর্মের কথা বর্ণনা করেছেন তাঁর একটি কবিতায়। সেখানে তিনি লিখেছেন, গভীর সুরে গভীর কথা বলতে তিনি সাহস পান না, পাছে লোকে ঠাট্টা করে। তাই তিনি নিজের বেদনার কথা হাল্কা হাসির সুরেই বলেন।

কবি লিখেছেন মেয়েদের সন্ধ্যে বেলাটা কেমন করে কাটে। সন্ধ্যে বেলায় ছাদে বসে যখন বিধবা ননদিনী মালা জপ করে তখন বধূ তার কাছেও পাড়ার বোসগিন্নীর নামে কলঙ্ক রটনা কর'ত থাকে। আবার বোস গিন্নীর কানে যখন গিয়ে সেই খবর কেউ পৌঁছে দেয় তখন সে এসে স্বামীখাকী, ছেলেখাকী বলে তাকে গাল দিয়ে যায়।—

"স্বামী পুত্র খাওয়ার আশা তারে
যায় সে জানায়ে।"

এমনি করে নিন্দা কুৎসা রটনা আর ঝগড়া কোন্দলেই মেয়েদের জীবনের সন্ধ্যেগুলো কাটে।

কিন্তু কবির মনে ভরসা জেগেছে এই দেখে যে মেয়েদের এই অবস্থার পরিবর্তন হ'তে চলেছে। কবি লিখেছেন—আজকাল মেয়েরা জুতো মোজা ধরেছে, সেমিজ পরছে, আবার স্কুল কলেজের পথে যাত্রা করেছে। শাস্ত্র—যার অর্থ হ'ল মানুষের বুদ্ধিকে মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখবার জন্যে—ওরা সে বাঁধন যেন খুলতে চায়। এদিকে দেশের যারা বিজ্ঞ লোক, তারা মেয়েদের এই বুদ্ধি চালনার রাস্তা দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। তারা বলছে মেয়েদের অত বুদ্ধিচর্চা করা ভাল নয়। এতে দেশটা যে উচ্ছন্ন গেল!

কিন্তু কবি সেই বিজ্ঞ আতঙ্কগ্রস্ত লোকদের ভরসা দিয়ে বলছেন—ভয় কি? মেয়েরা লেখাপড়া শিখে বুদ্ধির চর্চা করে করুক, এদেশে তো "রমণী জন্মেছে বহু পুরুষদের বেশে।" মেয়েলী পুরুষের অভাব নেই এদেশে, যারা আকৃতিতেই পুরুষ কিন্তু অন্তরে মেয়েমানুষ। শাস্ত্রের

মহিমা এবং বুদ্ধির জড়তাকে তারা চিরদিন সুরক্ষিত করে রাখবে।

বিদ্যাসাগরের জননী ভগবতী দেবীর বর্ণনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—সংস্কারের বন্ধন মেয়েদের কাছে যেমন দৃঢ় আর কারো কাছে তেমন নয়। কবি দেখে মুগ্ধ হয়েছেন যে ভগবতী দেবী যেমন করে সংস্কারের বন্ধন কাটিয়ে লৌকিক ধর্মের চেয়ে বিশ্বের উদার নিত্য ধর্মের মহত্ব বুঝতে পেয়েছিলেন। তাঁকে যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন যে ধুমধাম করে বাড়ীতে দুর্গাপূজা করা হবে কি সেই টাকায় গরীব লোকদের খাওয়ানো হবে তখন তিনি বললেন পূজা করার চেয়ে গরীব লোকের উপকার করাই বেশী ভাল।

কবি বিশ্বাস করতেন অনেক সময়ে মেয়েরাই পারে কুসংস্কারের বন্ধন কাটিয়ে নবযুগের অগ্রদূত হ'তে। পুরুষের কুসংস্কারের বেড়া যত দুর্ভেদ্য মেয়েদের প্রাণ তার চেয়ে সহজে পরিবর্তনের বাণীতে সাড়া দেয়। "তাসের দেশ" এ কবি এ কথা বলেছেন।

তাতে কবি বলেছেন—দেশের মানুষগুলো সব যেন ছাপমারা তাস। কারো মধ্যে কোন বৈচিত্র্য, কোন স্বাধীন রুচি, স্বাধীন ইচ্ছার কোন অস্তিত্বই নেই। সমস্ত ওঠা বসা চলা ফেরা বাঁধা নিয়ম মতে চলেছে। এর মাঝখানে এল বিদেশী রাজপুত্র। তাসের দেশের মানুষদের সঙ্গে তার মেলে না। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই নিয়ে এল পরিবর্তন, করল নবযুগের সূচনা। তখন তাসের দেশের মানুষগুলো একে একে রাজপুত্রের কাছে ইচ্ছামন্ত্রে, দীক্ষা নিতে লাগল। তখন তাসের রাজা বলছে রাজপুত্রকে আমিও কি পারব ইচ্ছামন্ত্র দীক্ষা নিতে? তাকে রাজপুত্র বলল সন্দেহ করি, কিন্তু রাণী আছেন তোমার সহায়।

নারীরই সহায়তায় একদিন এ দেশের পুরুষ, শাস্ত্র ও সংস্কারের বন্ধন কাটিয়ে স্বাধীন চিন্তার পথে অগ্রসর হ'তে পারবে কবির এই আশা।

কবি তাসের দেশ বলতে আমাদের এই বুদ্ধি বিচার হীন অন্ধ শাস্ত্র-মানা দেশকেই দেখিয়েছেন। বুদ্ধির জগতে আমাদের যদি কোনদিন মুক্তি আসে, কুসংস্কারের মোহ যদি কোন দিন কাটে তবে তা ঘটবে মেয়েদেরই প্রেরণায় কবির এই বাণী। তাই তাসেদেররাজা যখন বিদেশী রাজপুত্রকে বলছে—তোমার কোন আবেদন আছে? তখন রাজপুত্র বলে—আছে, কিন্তু তোমার কাছে নয়। রাজা প্রশ্ন করে, 'তবে কার কাছে?' রাজপুত্র বলে—এই রাজকুমারীদের কাছে। পরিবর্তনের বাণীকে আপন প্রাণে বরণ করে নেবে নারী। নূতন যুগের বাণী প্রথম সাড়া জাগাবে নারীর হৃদয়ে।

তাসের দেশেই কবি বলেছেন নরনারীর মিলিত জীবনের গৌরবময় জয়যাত্রার কথা। হরতনী বলছে রুইতনকে, মনে পড়ে রাত্রে ধরেছি মশাল, দিনে বয়েছি জয়ধ্বজা—তোমার আগে আগে। চল বীর, আর একবার মরণ পণ করে বেরিয়ে পড়ি একি প্রাণহীন দিন, অর্থহীন রাত্রি।

মানুষের জীবনের ইতিহাস এগিয়ে চলেছে। হরতনী বলছে—"সামনে কী যেন কালো পাথরের বাধা, ভাঙ্গতে হবে।" এই বাধা ভাঙ্গার পথে, এগিয়ে চলার পথে, পথে পুরুষের সঙ্গিনী নারী। তার পথের আগে আগে তার মশাল ধরেছে নারী। তার জয়ধ্বজা আগে আগে বয়ে নিয়ে গেছে নারী। নারীর প্রেরণায় পুরুষ এগিয়ে চলেছে জীবনের জয়যাত্রার পথে।

আমাদের দেশ যখন হীন-গৌরব, দেশে বীর্য্য যখন সুপ্ত, বিঘ্ন বিজয়ের কঠিন পথের পাথেয় যখন আমাদের হাতে ছিল না, তখন কবি আমাদের বলেছেন যে এই অগৌরবে জীবন যাপন করে বেঁচে থাকার কোন অর্থ নেই। দেশের নারী ও পুরুষকে মিলিত জীবনের শক্তিতে এই জড়তাকে জয় করতে হবে। এই যাত্রা পথে পুরুষ ও নারী পরস্পরের সহায়। নারীকে পিছে ফেলে রেখে পুরুষ এগোতে পারে না।

[ক্রমশঃ]

———

সুপর্ণা দেবী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মেয়েদের তলপেটের গঠন সুঠাম-সুন্দর এবং সুস্থ-সবল রাখার উপযোগী যে সব সহজ-সরল ও 'ঘরোয়া' ব্যায়াম পদ্ধতির মোটামুটি হদিশ দেওয়া গতবারে দিয়েছি, এবারেও তেমনি-ধরণের আরো কয়েকটি ব্যায়াম-ভঙ্গীর প্রসঙ্গালোচনা করছি। সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের অবসরে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে কিছুক্ষণ এ সব ব্যায়াম-ভঙ্গীগুলি অভ্যাস-অনুশীলন করা আমাদের দেশের মেয়েদের পক্ষে তেমন খুব অসুবিধাজনক বা কঠিনসাধ্য ব্যাপার নয়।

তলপেটের সুঠাম-গড়নের উপযোগী পঞ্চম ব্যায়াম-ভঙ্গীটির অনুশীলন-রীতি হলো—সমতল মেঝে বা মজবুত খাট-তক্তাপোষের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে কোমরের দুই-দিকে দুই হাতের তালু দুটি রেখে কেবলমাত্র মাথা ও কাঁধের অংশটুকু শয্যায় ন্যস্ত করে সটান সিধাভাবে রেখে, পিঠ থেকে পদপ্রান্ত পর্য্যন্ত শরীরের নিম্নাংশটিকে আগাগোড়া উর্দ্ধে তুলুন এবং ধীরে ধীরে নিশ্বাস-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সাইকেল-চালানোর ভঙ্গীতে ক্ষিপ্রতালে দুই পা ক্রমাগত ঘোরাতে সুরু করুন অন্ততঃপক্ষে, বিশ-ত্রিশ বার। এমনিভাবে এ ব্যায়াম-ভঙ্গীটি প্রত্যহ আট-দশ মিনিট কাল নিয়মিত অভ্যাস করতে হবে।

তলপেটের গঠন-সৌষ্ঠবসাধনের উপযোগী ষষ্ঠ ব্যায়াম-ভঙ্গীর রীতি হলো—সমতল মেঝে বা শয্যার উপর নতজানু হয়ে ভূলুণ্ঠিত প্রণামের মতো অবস্থান এবং এমনিভাবে থেকে ধীরে ধীরে নিশ্বাস-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বার সময়, বুক ঠেকবে হাতে, চিবুক স্পর্শ করবে সমতল ভূমি বা শয্যাটিকে। এ ব্যায়াম-ভঙ্গীটিও প্রত্যহ অন্ততঃপক্ষে, পাঁচ-সাত মিনিটকাল নিয়মিতভাবে অভ্যাস করা দরকার।

তলপেটের সুঠাম-গড়নের উপযোগী সপ্তম ব্যায়াম-ভঙ্গীটির রীতি হলো—সমতল মেঝে বা শয্যার উপর দেহটিকে সটানভাবে রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে কোমরের দুই পাশে হাতদুটিকে সুপ্রসারিত করে মেলে দিন এবং পা দুটিকে উর্দ্ধে তুলে ন্যস্ত করুন ঘরের দেওয়ালের গায়ে—যেন দেয়াল বেয়ে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছেন, এমনি ভঙ্গীতে। এবারে ধীরে ধীরে নিশ্বাস-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দেওয়ালের গায়ে উর্দ্ধে-ন্যস্ত পদতল-দুটিকে পথ-চলার ভঙ্গীতে কয়েকবার ক্ষিপ্রগতিতে উপরে-নীচে ক্রমাগত চালনা করুন। এভাবে ব্যায়াম অনুশীলনের সময় লক্ষ্য রাখবেন—দুই পদতল যখন দেওয়াল বেয়ে উর্দ্ধপানে যাবে, তখন জঘনদেশও যেন সমতল শয্যা বা মেঝের স্পর্শ ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে উর্দ্ধে ওঠে এবং দেহের উপরাংশ—অর্থাৎ, কোমর থেকে মাথা পর্য্যন্ত দেহভাগ সটান ও সুদৃঢ় থাকে। তলপেটের গঠন-সৌষ্ঠব বর্দ্ধনের উপযোগী বিশেষ-ধরণের এই ব্যায়াম ভঙ্গীটিও প্রত্যহ অন্ততঃপক্ষে, পাঁচ থেকে দশ মিনিটকাল নিয়মিতভাবে অভ্যাস করা চাই।

এ সব ব্যায়াম-পদ্ধতির সাধনায় দেহ যে সুঠাম-সৌন্দর্য্যে ভরে থাকবে চিরদিন—একালের অভিজ্ঞ-বিচক্ষণ ধাত্রী-চিকিৎসক এবং রূপচর্চ্চাবিশারদেরা এমনি অভিমতই প্রকাশ করেছেন।

নারীর দেহ সুস্থ-সবল এবং সুঠাম-লাবণ্যে গড়ে তোলার উপযোগী সহজ সরল এবং উন্নত আধুনিক ব্যায়াম-পদ্ধতি প্রসঙ্গে আগামী সংখ্যায় আরো কিছু বলবার বাসনা রইলো।

———

এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্প প্রসঙ্গে

সৌদামিনী দেবী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

'ক্রশ-ষ্টিচ্' সূচীশিল্পের উপযোগী আরেকটি সৌখীন-সুন্দর নতুন-ধরণের 'নক্সার' নমুনা প্রকাশ করা হলো।
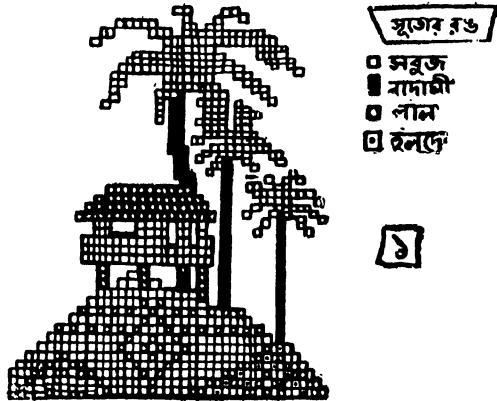
উপরের নক্সাটিতে গাছপালা-বাড়ীর যে নমুনাটি দেখানো হয়েছে, সেটি বিবিধ ধরণের সূচীশিল্প-সামগ্রী অলঙ্করণের কাজে ব্যবহার করা যাইতে পারে—যেমন ছোট ছেলেমেয়েদের ফ্রক, রম্পার, সান-স্যুট, হাওয়াই-শার্ট, নিকার বোকার, বিব্, স্কার্ফ, রুমাল ইত্যাদি। এ ছাড়াও এ নক্সাটীকে অনায়াসেই সৌখিন পর্দা, টেবিল-ক্লথ, টেবিল-ম্যাট্, ন্যাপকিন, কুশন কভার, মেয়েদের হাত-ব্যাগ, বটুয়া-থলি, বালিশের ওয়ার, টি-কোজি প্রভৃতি আরো নানান্ ধরণের ঘরোয়া এবং প্রিয়জনকে উপহার দেবার উপযোগী সুন্দর অভিনব সামগ্রী অলঙ্করণের কাজেও ব্যবহার করা যায়। তবে কিভাবে এবং কোন্ রঙের কাপড়ের উপর কি ধরণের রঙীন সুতোর সাহায্যে এ নক্সাটিকে সুন্দর-নিখুঁত ছাঁদে রূপদান করা যাবে, সে কাজটুকু অবশ্য সম্পূর্ণ নির্ভর করছে সূচীশিল্পানুরাগিণীদের ব্যক্তিগত রুচি, প্রয়োজন এবং কলা-দক্ষতার উপর। কাজেই এ সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা আর কর্তব্যের ভার তাঁদের নিজস্ব অভিরুচি, সুযোগ-সুবিধা এবং শিল্প-অভিজ্ঞতার উপর ছেড়ে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত বলেই ধারণা হয়।

তবে শিক্ষার্থীদের কাজের সুবিধার জন্য মোটামুটিভাবে হদিশ দেওয়া যেতে পারে যে—উপরের নক্সা-নমুনাটিকে যদি হাতীর দাঁতের (Ivory coloured) মতো হাল্কা সাদাটে—হলুদ বা ফিকে-নীল রঙের কাপড়ের উপর 'ক্রশ-ষ্টিচ' (Cros-stitch) সূচীশিল্পের কাজ করে ফুটিয়ে তোলা হয়, তাহলে নারিকেল গাছের পাতাগুলি রচনার জন্য সবুজ-রঙের এবং গাছের গুঁড়ির জন্য বাদামী-রঙের সুতো ব্যবহার করবেন। বাড়ীর ছাদের ও থামগুলির জন্য লাল-রঙের এবং দেওয়ালের জন্য বেছে নেবেন উজ্জ্বল-গাঢ় হলুদ-রঙের সুতো। বাড়ীর নীচেকার গাছের সারি রচনার জন্য—উপরের নক্সাটিতে যেমন হদিশ-চিহ্ন দেওয়া হয়েছে ঠিক তেমনি ধরণের রঙীন সুতো বেছে নিয়ে সূচীশিল্পের কাজ করলেই, হাল্কা সাদাটে-হলুদ কিম্বা ফিকে-নীল কাপড়ের 'পশ্চাৎপটের' (Background) উপর প্রতিলিপির নমুনাটি আগাগোড়া বেশ মানানসই ও মনোরম-সুন্দর ছাঁদের দেখাবে। আকাশের মেঘের টুকরোগুলি রচনার জন্য ধব্ধবে-সাদা রঙের সুতো ব্যবহার করবেন। এই হলো উপরের নক্সা-নমুনাটিকে সুচারু-ছাঁদে রূপদানের মোটামুটি হদিশ।

'ক্রশ-ষ্টিচে'র এই নক্সাটিকে রূপদানের সময়, সেলাইয়ের কাজের সুবিধার জন্য কাপড়ের উপর এক টুকরো কার্পেট (Carpet cloth) সুতো দিয়ে টেঁকে নিয়ে নক্সার নমুনা-অনুসারে যথারীতি একের পর এক 'ঘর-গুনে' বিভিন্ন রঙের সুতোর সাহায্যে নিখুঁত-পরিপাটিভাবে 'ক্রশ-ষ্টিচ্' সূচীশিল্প-পদ্ধতিতে ছুঁচের ফোঁড় তুলবেন। এমনিভাবে নক্সার নমুনাটিকে আগাগোড়া 'ক্রশ-ষ্টিচ্' সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে রচনার পর, কার্পেটের টুকরোটির টাঁকা-সেলাইটুকু সযত্নে খুলে ফেলে, সদ্য-মুক্ত কার্পেটের সুতোটি ধরে টানলেই ঐ কার্পেট-খণ্ডটি সহজেই হাতে উঠে আসবে, কিন্তু কাপড়ের বুকে নক্সার প্রতিলিপিটি পরিপাটি-ছাঁদে রচিত হয়ে যাবে। প্রসঙ্গক্রমে আরো বলে রাখা যেতে পারে যে এ-ধরণের 'ক্রশ-ষ্টিচ্' সূচীশিল্পের নক্সা-রচনার পক্ষে, সাধারণতঃ খদ্দর, দোসুতী, সেলুলা, ম্যাট্ বা ঐ জাতীয় মোটা-কাপড়ই বিশেষ উপযোগী হয়।

আগামী সংখ্যায় সৌখিন-সুন্দর এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্পের উপযোগী আরো কয়েকটি নতুন-ধরণের নক্সা-নমুনার পরিচয় দেবার ইচ্ছা রইলো।

[ক্রমশঃ

= বিবাহে উপহারের ইতিকথা =

বিবাহে উপহার দেওয়ার রীতি সারা পৃথিবীতে প্রচলিত। বিবাহে কন্যাকে উপহার দেন কন্যাপক্ষের লোক। আবার পতিগৃহে আগমনের পর নববধূকে নিমন্ত্রিতের দল উপহার দিয়ে যান। যিনি উপহার দিতে পারেন না তিনি নিজেকে হীন মনে করেন। নববধূকে উপহার দেওয়ার যে পদ্ধতি তার ইতিহাস বড় কলঙ্কিত। হিরোডোটাস লিখে গেছেন নাসামোনিয়ার লোকেদের কদর্য আচার সম্বন্ধে। নাসামোনিয়ান বর বিবাহের পর তার অতিথিদের প্রথমে নবপরিণীতার সঙ্গে মিলিত হতে দিত একজনের পর একজনকে। মিলনের পর প্রত্যেক অতিথি দিয়ে যেত উপহার। এই কদর্য রীতি থেকেই জন্ম নিয়েছে এযুগের নববধূ পতিগৃহে আসার পর উপহার দেবার রীতি। এখনও কোথাও কোথাও রীতি রয়েছে নববধূকে উপহার দেবার আগে চুম্বন করার। MIKEE রচিত Unchastity Sanctined by Religion and Mystic Fears গ্রন্থে আছে—

"But Herodotus is the most ancient authority on this subject. He describes the custom of Nasamonian peoples in his book IV, When a Nasamonian first married, he permitted all his guests in turn, to lie with his wife. Each guest gave her a present after intercourse, The residue of this custom in most societies of to-day is that when the bride arrives, they see her face, and give her some presents, at some places they kiss the bride and give her a present."

প্রাচীন কালের পৃথিবীতে যথা আর্মেনিয়া, লিভিয়া, সাইপ্রাস প্রভৃতি স্থানে পাত্রী অর্থাৎ ভাবীবধূ দ্বারা উপহার অর্জনের অনেক নজীর পাওয়া যায়। আর্মেনিয়ানগণ তাদের কন্যাদের ভেনাস দেবীর মন্দিরে উৎসর্গ করে দিত। কন্যাগণ দেবীর সেবকদের সংগে সংসর্গ দ্বারা অনেক উপহার লাভ করতে পারত। তারপর তার বিয়ের সময় মূল্য বেড়ে যেত। সে স্বামীর ঘরে অনেক উপহার নিয়ে পৌছত।

এদেশের অনেক সমাজে বরের নিকট-আত্মীয়দের উপহার দেওয়ার রীতি রয়েছে বিবাহ উপলক্ষে। কন্যাপক্ষকে সে উপহার দিতে হয়। নববধূর প্রতি উপহারদান যেমন বরপক্ষের অতিথিদের দৈহিক আশীর্বাদের সঙ্গে জড়িত, বরপক্ষের আত্মীয়দের দেওয়া উপহারের সঙ্গেও কন্যাপক্ষের পুরুষ আত্মীয়দের দেহ-আপ্যায়নের সম্পর্ক রয়েছে কি না কে জানে?

—সুবর্ণা ভট্টাচার্য

= ঋতুবসন্ত কবে আসে? =

নারীর প্রথম রজোদর্শনের বয়স দেশ ভেদে, আবহাওয়া ভেদে কিছু পৃথক হয়ে থাকে। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে ১১-১২ বছর বয়সেও প্রথম ঋতুদৃষ্ট হয়। শীত প্রধান দেশে হয় আরও পরে ১৫-১৬ বছর বয়সে। কিন্তু পাশ্চাত্যের কয়েকজন ডাক্তার তাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন যে কত বেশী বয়সে ঋতুদৃষ্ট হতে পারে তা কেউ সঠিক নির্ধারিত করে দিতে পারে না। ডাঃ পারফেক্ট বলেছেন তাঁর এক রুগিণী ৪৭ বৎসর বয়সে প্রথম ঋতু-দর্শন করেছিলেন। ডাঃ মার্কসের এক রুগিণীর ৪৮ বৎসর বয়সে প্রথম রজোদর্শন হয়। ডাঃ হোল্ডারফ্রাণ্ড

দেখেছেন এক মহিলার ৭০ বৎসর বয়সে রজঃস্রাব হতে। ডাঃ হয়ার বলেছেন তাঁর জানা এক মহিলার ৭৬ বৎসর বয়সে প্রথম ঋতুর উদয় হয়েছিল।

বেটার লেট ছান নেভার।

—সলিল মিত্র

= সগোত্র বিবাহের সম্ভাব্য বিপদ =

সগোত্র বিবাহ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। কিন্তু আজকাল অনেকে প্রেমে পড়ে সগোত্র বিবাহে আবদ্ধ হচ্ছেন। তাদের সন্তান-সন্ততির মধ্যে তেমন কোন দোষ দেখা যাচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে বরং ভাল ফল দেখা যাচ্ছে। সগোত্র বিবাহ ছাড়া যে-সকল নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহ শাস্ত্রসম্মত নয়, সে সকল ক্ষেত্রেও সম্পন্ন বিবাহের ফল খারাপ হচ্ছে না। ইহাতে অনেকের মন থেকে নিকটস্থিত রক্তের ভয় কমে যাচ্ছে! সগোত্র বিবাহের প্রতি বিরূপ মনোভাবকে অনেকে কুসংস্কার বলে মনে করছেন।

কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মুখে যে সকল কথা মাঝে মাঝে শোনা যায় তাতে সত্য সত্যই ঋষিবাক্যের কথা স্মরণ করতে হয়। সম্প্রতি একটী দম্পতির কথা জানা গেল যাদের তিনটি সন্তান জন্মের কয়েক বছরের মধ্যে মারা গিয়েছে থেলাসেমিয়া (thalassaemia) নামক রোগে। অথচ ওদের বিবাহ সগোত্র-বিবাহও নয়, শাস্ত্র-নিষিদ্ধ নিকট আত্মীয়ের মধ্যেও নয়।—যদিও স্ত্রী স্বামীর মায়ের দিকের দূরসম্পর্কীয়া। এই দূর সম্পর্কটুকুই এক্ষেত্রে বিপদের কারণ হয়েছে। পৃথিবীর অনেক প্রখ্যাত চিকিৎসকদের কাছে কোলকাতা ট্রপিক্যালের ডঃ জে, বি, চট্টোপাধ্যায়ের চেষ্টায় কেসটি উপস্থাপিত হয়েছিল—কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এইচ, লেহ্ম্যান; উটা উনিভার-সিটির ডঃ ম্যাক্সওয়েল, এম্, উন্ট্রোব। নিউ ইয়র্কের ডঃ কার্ল এইচ্ স্মিথ, ইউ এস্, এস্, আরের ডঃ ভি, এ, গেসিয়েভা, লণ্ডনের ডঃ সি, জ, মি ব্রিটেন, ভেলোরের ডঃ ডব্লিও আর সেণ্টার ওয়াল। সকলেই নিকট ও প্রায় নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহের বিপদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বিপদটা কি করে আসে তা বোঝাতে গিয়ে ডঃ এম এম উইন্ট্রাব লিখেছেন—বর্তমান ক্ষেত্রে যেখানে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে থেলাসেমিয়া মাইনরের বীজ মাত্র রয়েছে সেখানে স্বামী ও স্ত্রী কারোরই কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই। কিন্তু তাঁদের সন্তান যখন জন্মাবে তখন সে সন্তানের থেলাসেমিয়া মেজর রোগ হবার খুবই সম্ভাবনা—আর সে রোগ হবে গুরুতর।

ডঃ সেণ্টারওয়ালের মতে এক্ষেত্রে শতকরা ৭৫ ভাগ সম্ভাবনা রয়েছে সুস্থ শিশু জন্মাবার, আর ২৫% সম্ভাবনা রয়েছে রোগগ্রস্ত সন্তান জন্মের। যদিও প্রত্যেক দম্পতিরই সম্ভাবনা রয়েছে সম সংখ্যক পুত্র কন্যা-লাভের তথাপি কারো কেমন পুত্রই জন্মে, কারো কেবল কন্যা। এক্ষেত্রে শতকরা ৭৫ ভাগ সুসন্তানের সম্ভাবনা সত্ত্বেও পরপর তিনটি রোগগ্রস্ত শিশুর জন্ম হয়েছে দুর্ভাগ্যবশতঃ। ডঃ সেণ্টার ওয়াল সাবধান করে দিয়ে বলেছেন আলোচ্য দম্পতির স্বামীর বংশের ও স্ত্রীর বংশের মধ্যে বিয়ে হলে বিপদের সম্ভাবনা খুবই বেশী। যদি বিবাহ দিতেই হয় তবে পাত্র ও পাত্রী উভয়ের রক্ত পরীক্ষা করে তবে বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে সগোত্র বা নিষিদ্ধ সম্পর্কিতের বিবাহে কুফল হয় নি বলে শাস্ত্রীয় বিধান লঙ্ঘনের অপচেষ্টা নিরাপদ নয়।

—ললিতমোহন রায়

———

কারাগার

মীরা রায়

শৃঙ্খলিত কারাগারে মানবাত্মার সর্বাপেক্ষা হেয় লজ্জাপ্রদ স্থানে উৎপীড়িতের অসহায় বন্ধনের মাঝে বিশ্বের মুক্তিদাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। অন্ধকার কারাগারে সে মহান আবির্ভাবের কথা ঘোষণা করতে না ছিল একটি আলোকরশ্মি, না ছিল কোনও মাঙ্গলিক ধ্বনি। দীনাতিদীন ধূলির মাঝে জগতের নিভৃত কারাকক্ষে যে বিশ্বত্রাতার গোপন আবির্ভাব ঘটেছিল সেটি মানবিক ও আধ্যাত্মিক জগতে পরম অর্থবহ। ভাদ্রের রোহিণী নক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণাষ্টমীর মেধস্ বর্ণিত সেই মোহনিদ্রিত রাত্রি, বাহ্য প্রকৃতির দুর্যোগময়ী লীলা, এ সকলই নিপীড়িত আত্মার প্রচণ্ড-বিক্ষোভ প্রকাশের উপযুক্ত পটভূমিকা। প্রকৃতির তাণ্ডব-নৃত্যের সঙ্গে নিপীড়িত জীবের মুক্তিকামী ক্রন্দনধ্বনি মিশে যেন বিষ্ণুর যোগনিদ্রা ভাঙ্গিয়া সৃষ্টির রক্ষাকল্পে তাঁকে মানব দেহীরূপে ধরাধামে ঐ মহালগ্নে আহ্বান জানিয়েছিল। অন্যায়কে ধ্বংস করে ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য পরম সুন্দর ঈশ্বরকেও রুদ্রলীলার মাঝে, চরম শৃঙ্খলায়িত হীনতা দীনতার মাঝে আবির্ভূত হতে হয়েছে। দৈন্যের সব বন্ধন মুক্ত করে নবীন সৃষ্টির সূচনায় যে মুহূর্তটি নবজন্মের আগমন ঘোষণা করেছিল সেই লগ্নই জন্মাষ্টমীর শুভ লগ্ন। কংস কোন ঐতিহাসিক চরিত্র বিশেষ নয় এবং তথাকথিত কারাগারও সচরাচর দুষ্ট বন্দীশালা বা শৃঙ্খলাগার নয়। কংস শব্দের অর্থ আত্ম-সুখ, কংস একটি ইন্দ্রিয়সর্বস্ব লোভাতুর নিষ্ঠুর জীবসত্তার প্রকাশ বিশেষ। তার দুই স্ত্রীস্বরূপ নিত্যসহচরী অস্তি ও প্রাপ্তি. জগতে যা কিছু আছে (অস্তি) এবং যা কিছু পাবার (প্রাপ্তি) এসবই কংসের একচেটিয়া অধিকার অন্য কারোর এই দুই বিষয়ে যেন অধিকার থাকবার কথা নয়। এই অত্যাচারী আত্মসর্বস্ব কংসের নীতি বিধান বলে কোন বস্তু নেই, যুগ যুগ ধরে এই কংস নিত্যক্রিয়াশীল, এবং তার নিত্য সঙ্গী অহং অস্তি ও অহং প্রাপ্তির অহঙ্কারেরও বিনাশ নেই—পৃথিবী কখনও কংস শূন্য নয়। যেখানে ধর্ম মানবতা শাস্ত্র চরম অবহেলিত লাঞ্ছিত, যখন কংসের অনুচরবৃন্দ অর্থাৎ মানুষের স্বার্থপর চিত্তবৃত্তি সকল অন্যায় অধর্মের শেষ পর্যায়ে নেমে আসে, যখন হিংসা নিষ্ঠুরতার তামসী রাত্রিতে প্রকৃতি ক্ষুব্ধ রোষে প্রলয়ঙ্করী তখন বিশ্বের মুক্তিদাতা সর্ববন্ধন-হারী কংসারি শ্রীকৃষ্ণের পৃথিবীতে আবির্ভাবের প্রয়োজন ঘটে।

কংসের কারাগার বিশ্বনিখিলের সর্বপ্রকার বন্ধনের প্রতিভূস্বরূপ। মায়াজালপাশে কর্মের ভোগবন্ধনে, রিপু দলপীড়নে জীবাত্মা অষ্টপাশে বদ্ধ—এক বৃহৎ কংস কারাগারে সে নিত্য আবদ্ধ। শুধু জাগতিক বন্ধন নয় মানুষ নিজ দেহ-কারাগারেই অহরহ বন্দী। এই বন্দী-শালায় অতন্দ্র প্রহরী রয়েছে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য এই ষড়রিপুবাহিনী। এই প্রহরাবেষ্টিত মানুষের অবস্থা বর্ণনায় শ্রীভগবান্ বলেছেন,

> "আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ,
> ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থ সঞ্চয়ান্ ॥"
>
> ১৬ শ অধ্যায় শ্রীমদ্ভগবত গীতা

এই 'কারাগার' থেকে মুক্তি কামনায় জীবাত্মার নিরন্তর আকুলআবেদন নিবেদন চলছে। 'পঞ্চভূতেরফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে,' এই মুমুক্ষু ক্রন্দনের আবেদন সত্য ও সুন্দরের শক্তিকে জাগ্রত করে তোলে, তাই জীবাত্মাকে কংসের পঞ্চভূতের বন্দীশালা থেকে উদ্ধার করবার জন্য যে কংস-শক্তি স্বরূপের আবির্ভাব হয় সেই শক্তিধর মহানপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই সর্বজীবের বন্ধনদশা মোচনকল্পে কংস অধর্মকে বিনাশের জন্য সার্বজনীন জন্মাষ্টমীর সূচনা করে থাকেন। সে জন্মাষ্টমীর লগ্ন বিশেষ যুগের বিশেষ একটি দিন নয় এবং তথাকথিত কারাগারও কোন ঐতিহাসিক রাজপুরুষের নয়। রোহিণী নক্ষত্রের কৃষ্ণাষ্টমীর দুর্দ্দশাক্লিষ্ট তমোময়ী পৃথিবী, অনুরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত মোহ

জীবপ্রকৃতি এইগুলিই জন্মাষ্টমীর উপযুক্ত পটভূমিকা, এই মুহূর্তটি মহামানবের অভ্যুদয়ের উপযুক্ত লগ্ন।

দুর্নীতির শৃঙ্খলাবদ্ধ মানব দেহ কারাগারে বিশ্বত্রাতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব একান্তই কামনার বস্তু। সর্বলোকের অয়ন অর্থাৎ নর অয়ন নারায়ণ বিশ্বের একমাত্র অবলম্বন, তিনি অজর, অমর, তবুও যখন শৃঙ্খলের ভার, বন্দীত্বের অবমাননা জীবের অসহনীয় হয়ে ওঠে তখন তাঁর বাণী মূর্তরূপে প্রকটিত হয়—

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

জীব তার অন্তরাত্মাকে জাগৃতির মন্ত্রে আহ্বান জানায়, বৈদিক পুরুষসূক্ত মন্ত্রে সেই "সহস্রশীর্ষাপুরুষঃ সহস্রপাৎ" মহাপুরুষ মানুষের মাঝে জেগে ওঠেন, কংসের অশুভ শক্তি, কারাগারের বন্ধন সব বিলীন হয়ে যায়। সর্বকারণ ভূত-সেই মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ। তাঁর কংসবধের জন্য দেহ ধারণ করে যুগপরিক্রমরা অনন্তকালের জন্য এবং জন্মাষ্টমী তিথিটিও চির পুরাতন হয়েও নিত্য নূতন। এই দিনটি মানবাত্মার মুক্তি সূচনার স্মরণোৎসব বলে যুগে যুগে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হত। এইভাবে যুগাবতারের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বাণীতে বলেছেন:—

"Teachers of the law of love and oneness there must be, for by that way must come the ultimate Salvation."

প্রার্থনা

অনিলকুমার মোদক

না, এখুনি মৃত্যু নয়; হে রাজন্, দিনরাত্রি জুড়ে
সর্বদা ধ্বনিত চুপে এ-প্রার্থনা: আরো কিছুদিন
জীবন পার্থিব বায়ু আলো জল চেতনার সুরে
দীর্ঘায়ত হোক, ইচ্ছা—পরিশোধ হয়ে যাক ঋণ।

হে নিয়ন্তা, বর্ষে-বর্ষে, দিনে-রাত্রে, প্রহরে প্রহরে
বাঁচার মহান মূল্যে ভারাক্রান্ত হলুদ হৃদয়।
অনিসর্গ অভ্যাসত যতোটুকু সাহসের স্বরে
আমাদের লক্ষ্যপথে দিগ্‌দর্শী নক্ষত্র-নিচয়
বস্তুত উজ্জ্বল রাখে আহ্বানে মৌন অকাতরে—
দুর্লভ মুদ্রায় তারো মর্মস্পর্শী কর দিতে হয়।

সে যদি অক্ষয় হয়; হে মহান, মৃত্যু হ'লে পর
আমার অনেক জন্মে জমেছে যে হাড়ের পাহাড়
শুধু তার বিনিময়ে মুক্তিতে কি শান্তি অনশ্বর
এ-হৃদয় পূর্ণ করে পাবো আমি? অবরুদ্ধ দ্বার
সেই কম্প্র সংক্রান্তিতে মুক্ত হবে? সমৃদ্ধ বাসর
গড়া হবে আবশ্যিক সুষমায় যন্ত্রণার পাড়?

কলিকাতায় আবার অতিবর্ষণ—

জুন ও জুলাই মাসে কয়েক দফা অতি বৃষ্টির ফলে কলিকাতা ও শহরতলীর বহুস্থান ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। কসবা, হালতু, ঢাকুরিয়া টালিগঞ্জ, খিদিরপুর প্রভৃতি দক্ষিণাংশ এবং বেলগাছিয়া, কাশিপুর এবং বারাকপুরের কিয়দংশ জলপূর্ণ হইয়া কয়েকদিন জলাশয়ের রূপ ধারণ করায় একদিকে যেমন বহুসংখ্যক লোককে স্থানান্তরিত করার প্রয়োজন হইয়াছিল অন্যদিকে তেমনি রাস্তা, পুল প্রভৃতি নষ্ট হওয়ায় মানুষের যাতায়াত অসম্ভব হইয়াছিল।

কোনরকমে সেই অবস্থা শেষ হইবার পূর্বেই জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে ও আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে আবার অতিবর্ষণ হইয়া গিয়াছে। মানুষের দুঃখ দুর্দশার অন্ত নাই, কতবাড়ী যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে বা নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, সরকারের ও কলিকাতা কর্পোরেশনের টাকা এই ব্যাপারে জলের মত ব্যয় করা হইলেও বিশেষ সুফল দেখা যায় নাই।

কী উচ্চপদস্থ কী নিম্ন পদস্থ সকল শ্রেণীর মানুষ এ যুগে আর ঠিক মত কর্ত্তব্য করেনা। সহরে কয়েকটি নূতন পাম্প বসান হইলেও বহুস্থানে তিন চার দিন রাস্তার উপর জল জমিয়াছিল, কয়েকটি লাইনে তিন চারদিন ট্রাম না চলায় এবং বাসগুলি জলের মধ্যে চলিয়া অধিকাংস অকর্মণ্য হইয়া যাওয়ায় মানুষের দৈনন্দিন কাজ প্রায় বন্ধ হইয়া যায়।

একটা কথা আছে 'মারে কৃষ্ণ রাখে কে'। এবার গত তিন মাসে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র সেই কথা প্রযোজ্য বলিয়া, হাওড়া, শ্রীরামপুর, বারাকপুর প্রভৃতি উন্নত মহকুমাগুলি এবং বিরাট কলিকাতাসহর কখন এইভাবে বিপন্ন হইতে দেখা যায় নাই। এমনি তো সহর ও শহরতলীতে বাসস্থানের অভাব, তাহার উপর সকল নিম্ন ভূমি জলে ডুবিয়া যাওয়ার বহু অধিবাসীকে বহু দিন ধরিয়া স্কুল বাড়ী প্রভৃতি সাধারণ স্থানে চিঁড়া, মুড়ি, গুড় খাইয়া অতি কষ্টে বাঁচিয়া থাকিতে হইয়াছে! এ দুর্দশার জন্য বিশেষ করিয়া কাহাকেও দোষী করা চলেনা, তবে সাধারণ ভাবে সকল শ্রেণীর সকল মানুষ নিষ্ক্রিয় ও উৎসাহহীন হওয়াই ইহার মূল কারণ।

শতাধিক বৎসরের পুরাতন কলিকাতা শহর জল সরবরাহ, সেচব্যবস্থা, যানবাহন ব্যবস্থা প্রভৃতিতে পিছাইয়া থাকায় ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা যে কষ্ট পাইবে তাহা আর বিচিত্র কি। এসময়ে রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর অবশ্য সরকারী কর্ম্মচারীদের সাহায্যে যতটা সম্ভব প্রতিকারের জন্য প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন এবং এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বিশেষ অর্থও কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়াছেন কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাহা অতি সামান্য মাত্র।

পশ্চিমবঙ্গ আজ সকল দিক দিয়াই দারুণ বিপন্ন। সকল রাজ্যের অধিবাসী সর্বদাই পশ্চিমবঙ্গে আগমন করায় এবং পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ অর্থ অবাঙ্গালীদের হস্তগত থাকায় পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যা ভারতের সকল রাজ্য অপেক্ষা সঙ্গীন, তাহার উপর খাদ্যাভাব দিন দিন যে ভাবে বাড়িতেছে তাহাতে ধনী মানুষরাও উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারেনা।

বহু কলকারখানা ধর্ম্মঘটের ফলে বন্ধ থাকিলেও গত বৎসর খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের লোক হতাশ হয় নাই, কিন্তু এবারের তিনমাসের বন্যায় কোটি কোটি টাকার চাষ নষ্ট করায় ১৯৬৯ সালের খাদ্যাবস্থা সম্বন্ধে সকলেই চিন্তিত হইয়াছেন। এবিষয়ে সাধারণ মানুষের কিছুই করিবার নাই, যে কৃষকের বীজ ও সার দুইবার বন্যায় নষ্ট হইয়া গেল তাহার পক্ষে তৃতীয়বার চাষে উৎসাহ আসা সম্ভব নহে। তথাপি মানুষকে বাঁচিয়া

থাকিতে হইলে খড়ের কুটা ধরিয়া জলে ভাসার মত কাজ করিতে হইবে। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে এই অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া তাহাদের কর্ত্তব্য পালন করিতে অনুরোধ করি।

কয়েকটি জেলায় ভয়াবহ বন্যা—

গত ১লা আগষ্ট হইতে ৩রা আগষ্ট তিনদিন পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি জেলায় আবার অতি বর্ষণের ফলে যে দারুণ ক্ষতি হইয়াছে তাহার সমস্ত বিবরণ ৮ই আগষ্ট পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে মেদিনীপুর জেলা, তাহার প্রায় অধিকাংশস্থান বন্যার জলে ডুবিয়া গিয়াছে। খড়্গপুর হইতে কাঁথি যাইবার সুদীর্ঘপথ কয়েকদিন জলের তলায় থাকায় দুইপাশে লক্ষ লক্ষ গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, কত লক্ষ মানুষ যে গৃহহীন হইয়াছে তাহার হিসাব নাই। ঐ অঞ্চলে পালপাড়া কলেজে দোতলার ঘরে জল ঢুকিয়াছে অবশ্য ৬ই আগষ্ট হইতে সামরিক বাহিনীর লোকেরা নৌকা লইয়া ঐ অঞ্চলের বিপন্ন লোকদিগকে উদ্ধার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কলিকাতা হইতে ২০ খানি ও গয়া হইতে ৪০ খানি সামরিকনৌকা বিপন্নদের উদ্ধারের জন্য পাঠান হইয়াছে। জুন মাসের শেষে প্রবল বন্যায় বহু লক্ষ একর জমির চাষ নষ্ট হইয়া যায়। সেখানে আবার সারও বীজ সরবরাহ করিয়া দ্বিতীয় বার চাষ আরম্ভ হয়। আগষ্টের প্রথম ভাগের বন্যায় সদর, কাঁথি ও ঘাটাল মহকুমার বেশীর ভাগ জমির চাষ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অন্যান্য মহকুমায়ও ক্ষতি কম হয় নাই। ১৯৪৩ সালের প্লাবনের পর ২৫ বৎসরের মাথায় সমগ্র মেদিনীপুর জেলা আবার ক্ষতিগ্রস্ত হইল। বহু নূতন পথ ঘাট স্বাধীনতার পর নির্মিত হইয়াছিল। সেগুলি পুনর্নির্মাণ করিতে আবার কয়েক বৎসর সময় লাগিবে।

আগষ্ট মাসের প্রথম তিনদিনের বৃষ্টিতে হুগলী ও হাওড়া জেলা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমা এক মাস পূর্বেই কয়েকটি নদীর বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল। আগষ্ট মাসে সদর ও শ্রীরামপুর মহকুমার বহুস্থান ভাসিয়া গিয়াছে। ৫০ বৎসর পূর্বে যে সকল স্থানে বন্যায় ক্ষতি হইত এবার সেই সকল স্থান আবার ভাসিয়া গিয়াছে। কলিকাতার অতিনিকটে চণ্ডীতলা থানা, তারকেশ্বর থানা, হরিপাল, ধনিয়াখালি প্রভৃতিতে বহুগ্রাম ৪ঠা আগষ্ট হইতে কয়েকদিন জলমগ্ন ছিল। সেখানেও সামরিক নৌকা পাঠাইয়া উদ্ধার করিতে হইয়াছে।

হাওড়া জেলার আমতা থানায় বহুকাল বন্যা হয় নাই, এবার আমতা ও বাগনান থানার বহুসংখ্যক গ্রাম জল মগ্ন হইয়া যায়। হাওড়া আমতা প্রভৃতি মার্টিন কম্পানির রেল লাইন বন্যার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ট্রেনচলাচল ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া যায়। ২৪ পরগণা জেলার কাকদ্বীপ অঞ্চলেও অনেক স্থান জলমগ্ন হইয়া যায়। ফলে ঐ অঞ্চলেও ধানের চাষ নষ্ট হইয়া যায়।

তাহা ছাড়াও পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহ জেলায় আগষ্টের প্রথমে অতি বর্ষণের ফলে কয়েকটি নদীর জল বাড়ায় বহু গ্রাম জলে ডুবিয়া গিয়াছে ও বহু ঘরবাড়ী পড়িয়া গিয়াছে। ঐ অঞ্চলে ধানের চাষ খুব বেশী। অনেক স্থানেই ধানের দারুণ ক্ষতি হইয়াছে। ইহার পূর্বে আমরা নদীয়া, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার বহু স্থান জুলাইয়ের অতিবর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সংবাদ প্রকাশ করিয়াছি। সে সব স্থানে ধান চাষের কম ক্ষতি হয় নাই। সমগ্র ক্ষতির পরিমাণ এখনই হিসাব করা সম্ভব নহে।

গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে বন্যার তাণ্ডব

পশ্চিমবঙ্গে, আসাম ও রাজস্থানে বন্যার পর গত ৮ই আগষ্ট নাগাদ গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের কয়েকটি জেলায় ভীষণ বন্যায় অধিবাসীদের ক্ষতির সীমা নাই। প্রথম সংবাদেই প্রকাশ ঐ অঞ্চলে তিনশত লোক মারা গিয়াছে ও ১৫ কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। ১০ই পর্য্যন্ত কোন খবর নাই। ৬ বৎসর পূর্বে ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তাপ্তি নদীর উপর একটি পুল নির্মিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। পুলটি এখনি পুনর্নির্ম্মাণ করা প্রয়োজন।

ভারতবর্ষ শুধু বাহিরের শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় বিপন্ন নয়। প্রকৃতির এই শাস্তিতেও ভারতবাসী কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না।

রাজস্থানে আবার বন্যা

শুধু পশ্চিমবঙ্গে অতিবর্ষণ হইতেছে তাহা নয়। গত ৩১শে জুলাই রাজস্থানে চিতোরগড় ও উদয়পুর অঞ্চলে দারুণ বর্ষণের ফলে লোক মারা গিয়াছে। নীচুস্থান জলে

ডুবিয়া গিয়াছে এবং কোন কোন অঞ্চলে রেল চলাচল বন্ধ হইয়াছে। এ বৎসর কয়েকদিন পূর্বে ঐ অঞ্চলে আর এক দফায় অতিবর্ষণ হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গ নিম্নভূমি, কিন্তু রাজস্থান পাহাড় ও মরুভূমির দেশ। সেখানে এই অতিবর্ষণ অস্বাভাবিক।

মুঙ্গেরে খাদ্যে বিষক্রিয়া

গত ২রা আগষ্ট মুঙ্গের শহরের নিকট সুতারখানা গ্রামে এসামল হক্ নামে এক ধনী মুসলমানের বাড়ীতে ভোজ খাইয়া ২ জন তখনই মারা গিয়াছে ও ৭৩ জনকে অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। যে সকল কুকুর ঐ সকল খাদ্য খাইয়াছিল তাহারাও মরিয়া গিয়াছে। খাদ্য রন্ধনের সময় বিষ মিশিয়া গিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। এরূপ দুর্ঘটনা সচরাচর দেখা যায় না।

মিজোপাহাড়ে দারুণ খাদ্যাভাব—

আসামের পার্বত্য অঞ্চল বর্তমানে নানা বিপদের সম্মুখীন। মিজো পাহাড়ে মিজোরা বিদ্রোহ করায় ভারত সরকার বিদ্রোহ দমনে বহু বিদ্রোহী মিজোকে নিহত করিয়াছে। গত তিন বৎসর সেখানে খাদ্যোৎপাদন কমিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি ঐ অঞ্চলে অতিবৃষ্টিও হইয়াছে। বিদ্রোহের জন্য শান্তি-প্রিয় মানুষরা নিজ নিজ বাস-গৃহ ত্যাগ করিয়া এক এক অঞ্চলে আসিয়া বাস করিতেছে। যাইজল নামক স্থানে এরূপ অধিবাসীর সংখ্যা বাড়িয়াছে। সম্প্রতি তথায় ১২টাকা কিলো দরে চাল বিক্রয় হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য খাদ্যও দুর্লভ। এ সমস্যা কেন্দ্রীয় সরকারের। আজ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি স্থাপন করিতে পারে নাই। অধিকাংশ স্থলেই শাসন ব্যবস্থা ভাল নহে। কে তাহাদের রক্ষা করিবে?

ম্যানিলায় ভীষণ ভূমিকম্প

গত ২রা আগষ্ট ম্যানিলা সহরে ভীষণ ভূমিকম্পে একটি পাঁচতলা বাড়ী ধ্বসিয়া পড়িয়া যাওয়ার ফলে প্রায় একশত লোক ধ্বংসস্তুপে চাপা পড়িয়া মারা যায় এবং পাঁচশত জন চাপা পড়িয়া আছে বলিয়া মনে হয়। গত একশত বৎসরের মধ্যে সেখানে এরূপ ভূমিকম্প হয় নাই, ধ্বংসস্তুপের মধ্য হইতে হয়ত আরও মৃতদেহ বাহির হইতে পারে।

অভিনব হত্যা লীলা

নাইজিরিয়া একটি অতি ছোট দেশ, সেখানকার একটি বড় অংশ বৃটিশের অধীনে। তাহারা বৃটিশের সাহায্য লইয়া স্বাধীনতা সংগ্রাম করিতেছে। আর একটি অংশ বৃটিশ বিরোধী। সেখানে এমন খাদ্যাভাব যে, তাহার ফলে প্রত্যহ ৯৩ হাজার করিয়া শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এইভাবে ২০ লক্ষ শিশু মারা যাইবার উপক্রম। রাষ্ট্রসংঘ ও কিছু করিতেছে না। ফলে এই বিশ লক্ষ শিশু অনাহারে মারা যাইলেও আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। ইহাই রাজনীতির লড়াই।

পরিকল্পনার হিসাব

গত ৩১শে জুলাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে নতুন পরিকল্পনার আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য পরিকল্পনার জন্য বিদেশ হইতে টাকা ধার করা হইবে এবং পূর্ব্বের ধারও তাহার সুদ শোধ দেওয়া হইবে। এবার নূতন ব্যবস্থায় খাদ্য মজুত রাখার কথা আছে। সেজন্য ১৪০ কোটি টাকার খাদ্য সংগ্রহ করিয়া কেন্দ্রের অধীনে মজুত রাখা হইবে। দেশে দুর্ভিক্ষে যাহাতে লোক না খাইয়া না মরে সেজন্য মজুত শস্য রাখার ব্যবস্থা। প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া আজও দেশ জয়ী হইতে পারে নাই। তাহা ছাড়া পরিকল্পনার ত্রুটি এত অধিক যে, শেষ পর্য্যন্ত পরিকল্পনার সুযোগ পাওয়া যায় না। ১৯৬৮ সালের নানা স্থানে অতি বর্ষণের ফল কী দাঁড়াইবে তাহা আজ অনুমান করার উপায় নাই। পশ্চিমবঙ্গে পরিকল্পনা আশানুরূপ ফল দেয় নাই। সেজন্য ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সকলে শঙ্কিত হইয়াছে।

বাংলা দেশের বিপদ

পশ্চিমবঙ্গ আজ চারিদিক দিয়া বিপন্ন। পশ্চিমবঙ্গে পাঁচটি মেডিকেল কলেজ হইয়াছে। পূর্বে নির্বাচন কমিটি করিয়া কলেজে ছাত্র ভর্তি করান হইত। গত কয়েক বৎসর সে প্রথা তুলিয়া দিয়া প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে ছাত্র ভর্তি করা হইতেছে। ফলে যে কোন প্রকারে অবাঙ্গালী ছাত্ররা বেশী সংখ্যায় প্রবেশের সুযোগ পাইতেছে এবং বাঙ্গালী ছাত্রেরা প্রবেশাধিকারে বঞ্চিত হইতেছে। অবশ্য অবাঙ্গালী ছাত্রদের অর্থ অধিক, শুনা যায় তাহার জোড়েই তাহারা প্রবেশাধিকার পায়। পশ্চিমবঙ্গে ইঞ্জিনীয়ারদের মত ডাক্তারের সংখ্যা তত অধিক হয় নাই, গ্রামাঞ্চলে অনেক স্থানে এখনও ডাক্তারের অভাব দেখা যায়। যদি

কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা পরিবর্তন না হয় তাহা হইলে অচিরে পশ্চিমবঙ্গে ডাক্তারের অভাব দেখা যাইবে। স্বাস্থ্য-বিভাগের পরিচালক ডাঃ কনক সর্বাধিকারী মহাশয়কে আমরা এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করি।

বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপদ

সর্বত্র ছাত্র-চাঞ্চল্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিপন্ন করিতেছে। কলিকাতায় আশুতোষ কলেজ, শ্যামপ্রসাদ কলেজ, যোগমায়া কলেজ, স্কটিশচার্চ কলেজ প্রভৃতি ছাত্র চাঞ্চল্যের জন্য বন্ধ হইয়া আছে। বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়েও একদল ছাত্র কয়েক দিন ধরিয়া অবস্থান ধর্মঘট করায় অস্থায়ী ভাইস্ চ্যান্সেলার গত ১০ই আগষ্ট হইতে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। অধ্যাপনা, পরীক্ষাগ্রহণ প্রভৃতি সকল কার্য্যই আপাততঃ স্থগিত থাকিবে।

ইহাতে ক্ষতি কাহার হইবে বুঝিয়া দেখা উচিত। কর্ম্মীরা তাহাদের বেতন পাইবে, কিন্তু ছাত্রদের শিক্ষা বন্ধ থাকিলে তাহাদের শিক্ষা ব্যবস্থা অসমাপ্ত থাকিয়া যাইবে।

বীরবল শতবার্ষিকী

বাংলা সাহিত্যে ব্যারিষ্টার প্রমথ চৌধুরী 'বীরবল' নামে খ্যাত ছিলেন। পাবনা জেলার হরিপুরের দুর্গাদাস চৌধুরী মহাশয়ের প্রায় সকল পুত্রই অসাধারণ কৃতী হইয়াছিলেন, হাইকোর্টের জজ, ব্যারিষ্টার স্যার আশুতোষ চৌধুরী, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের জামাতা দেশকর্মী ব্যারিষ্টার শ্রীযোগেশ চৌধুরী, শিকারী ব্যারিষ্টার কুমুদনাথ চৌধুরী, খ্যাতনামা ডাক্তার মন্মথনাথ চৌধুরী ও সুহৃদ নাথ চৌধুরী প্রভৃতি প্রমথনাথের ভ্রাতা ছিলেন।

প্রমথনাথ কবিগুরুর অগ্রজ সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর আই, সি, এস-এর কন্যা ইন্দিরা দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইন্দিরা দেবীও সুলেখিকা ছিলেন এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিশ্বভারতী বিদ্যালয়ের সেবা করিয়া গিয়াছেন। কবিতা ও প্রবন্ধ লিখিয়া ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ যৌবনেই খ্যাতিলাভ করেন এবং নূতনভাবে ও ভাষায় সবুজপত্র নামে মাসিক পত্র প্রকাশ করিয়া সেকালে তরুণ শিক্ষিতদের বাংলা ভাষায় লিখিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন।

তাঁহার লেখা ৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাংলার জীবনে নব যুগ আনিয়াছিল। এমন কি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত প্রমথ চৌধুরীর ভাবে ও ভাষায় প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সন্তানাদি হয় নাই এবং ব্যারিষ্টারীতে অধিক মন না দেওয়ায় তিনি প্রভূত অর্থও উপার্জন করেন নাই, তথাপি তাঁহার দান বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে। পরিতাপের কথা বাঙ্গালী আজও বীরবলের স্মৃতি রক্ষার কোন ব্যবস্থা করে নাই। জন্ম শতবার্ষিক সমিতির উদ্যোক্তারা স্থায়ীভাবে সে ব্যবস্থায় মনোযোগী হইলে বাঙ্গালী জাতির একটি ঋণ পরিশোধ করা হইবে।

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীস্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েক মাস রোগভোগের পর মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ঢাকা জেলার অধিবাসী হইলেও কলিকাতার স্কুল-কলেজে পড়িয়া B. A. পাশ করেন। বাল্যকাল হইতেই চাকুরীর সঙ্গে তিনি গল্প ও উপন্যাস লেখা আরম্ভ করেন এবং ২৫ খানি উপন্যাস লিখিয়া সাহিত্য-জগতে যশস্বী হন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে চাকুরী ছাড়িয়া তিনি শুধু সাহিত্য সাধনায় নিজেকে নিযুক্ত রাখিয়াছেন। তাঁহার পুত্র, কন্যা ও স্ত্রী বর্ত্তমান।

———

কিশোর জগৎ

আর্ত্তের আহ্বান

শ্রীজ্ঞান

"অন্ন দাও, বস্ত্র দাও, আশ্রয় দাও"—এই রব উঠেছে আজ বাংলার চতুর্দ্দিকে, ভারতের বহু স্থানে। অভূতপূর্ব্ব বৃষ্টিপাতের ফলে গ্রাম বাংলা আজ জলময়, বন্যার জলে শুধু পুকুর, ডোবাই নয়—ক্ষেত, খামার, বাড়ী, ঘর সব কিছুই জলমগ্ন! শুধু গ্রামাঞ্চলেই নয়, মফঃস্বলের সহর ও সহরতলীগুলির অবস্থাও প্রায় অনুরূপ। এমন কি খাস কলিকাতা মহানগরীর আশে পাশে অনেকস্থানে এখনও জল জমে আছে, বহু বাড়ী-ঘর ধ্বসে পড়ে অনেকে হতাহতও হয়েছে।

একেই তো খাদ্য সংকটে দেশের অবস্থা সঙ্গীন, তার ওপর এল এই বন্যার ধ্বংস লীলা। একটি সংকট কাটতে না কাটতেই আর একটির আক্রমণ! অভিশপ্ত এই দেশের সুদিন বোধহয় আর কখনও আসবে না! কিন্তু ভবিতব্যের ওপর নির্ভর করে থাকলে তো চলবে না। আমাদের সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে এই সংকট থেকে, এই দুর্বিপাক থেকে উদ্ধার পাবার জন্য। এর জন্য কঠিন পরিশ্রম করতে হবে এবং সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। বাংলার দিকে দিকে এই যে হাহাকারের রব উঠেছে তা প্রশমিত করতে আজ সবাইকে একজোট হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। রাজনীতির ধূয়ো তুলে, নির্ব্বাচনের তাগিদে যদি বিভিন্ন মতাবলম্বীরা জোট বাঁধতে পারেন, তাহলে দেশের সাধারণ লোকের কষ্ট লাঘবে কেন দলমত নির্ব্বিশেষে সকলে এগিয়ে আসতে পারবেন না ?

যাই হোক, বড়রা আসুন বা না আসুন, তোমরা কিন্তু তোমাদের কর্ত্তব্য পালনে বিরত থেক না। তোমরা ছোট হলেও তোমাদেরও যথেষ্ট করণীয় রয়েছে দেশের এই দুর্দ্দিনে। তোমাদের ক্ষুদ্র সামর্থে যা সম্ভব সেই রকম সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এস দুঃস্থের কষ্ট লাঘবের জন্য। ক্ষুধিতের অশ্রু, আশ্রয়হীনের হাহাকার তোমাদের কোমল প্রাণকে নিশ্চয় ব্যথিত করে তোলে। তোমরা কিশোর-কিশোরীরা সকল দলমতের উর্দ্ধে। তোমরা দেশের ভাল, দেশের মঙ্গলই কামনা কর। দেশের দুর্দ্দিনে, লোকের বিপদে তোমাদের প্রাণ কেঁদে ওঠে। তাই তোমরা [illegible]ও, তোমাদের সামর্থ্য ক্ষুদ্র হলেও, সাধারণের উপকারের জন্য একজোট হয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতে,—তাই নয় কি ? তাই তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি দুঃস্থের দুঃখ দূর করতে বাংলার কিশোর-কিশোরীরা তোমাদের মঙ্গল হস্ত নিয়ে এগিয়ে এস। আর্ত্তের আহ্বানে এগিয়ে আসতে, সাড়া দিতে দ্বিধা কোর না।

মণির খনি

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

—আট—

নৃপেনের কাছে জয় পরাজয় দুই-ই ছিল সমান। পরাজয় যেমন তাঁকে ভাঙ্গতে পারত না—জয়ও তাঁকে তেমন গর্বিত করত না। বাইরের অন্ধকারে নিঃশব্দে ঘুরতে ঘুরতে তিনি সেদিনকার কথা মনে মনে বিচার করতে লাগলেন। বিশু ও তার দলবল যে কথনো কোন সৎকার্য্যে থাকৃতে পারে না সে বিষয়ে তঁার সন্দেহমাত্র ছিল না। তার উপর বাউলীর মধ্যে তাঁদের হত্যাকরার চেষ্টাই সে বিষয়ের অকাট্য প্রমাণ ছিল। শ্যামপুকুরের রাজকুমারকে ঘিরে কুহেলিকার যে জাল বিস্তৃত হয়েছে, নৃপেন কিছুতেই তা' সরাতে পারলেন না।

তিনি ভাবতে লাগলেন—"আজ সকালেই তো শুনেছি, শ্যামল চক্রবর্তী আর বিমল চক্রবর্তী অভিন্ন। আর আমি নিজেই তো শ্যামল চক্রবর্তীকে চিনেছি। এই বাগানবাড়ি—ওই রেডিয়ামের খনি—এ সবই তো তার। ছবি দু'খানাও বলে দিচ্ছে যে এখনই আমি শ্যামল চক্রবর্তীকে দেখেছি। দূর হোক্, এ সমস্যার সমাধানে আর কাজ নেই। কিন্তু বিশুরা কেন শ্যামলকে পেয়ে বসেছে সেটা আমায় দেখতেই হবে।"

দেবেশ এতক্ষণ চুপ করে ছিল। কিন্তু আর নীরব থাকৃতে পারল না। বলল—"নৃপেনদা তখন তুমি আমার মুখ চেপে ধরলে, কিন্তু কথটা বলছিলাম যে আমার মনে হয়—"

বাধা দিয়ে পরুষ কণ্ঠে নৃপেন বলল—"তোমার কি মনে হয় না হয় তাতে আমার কিছু যায় আসে না। সেই বাউলীটার কথা তুলে বিশুদের মত লোকের কাছে যে সকলকে অপদস্থ করতে পারে সে যে বুদ্ধিমানের মত কিছু ভাবতে পারে এটা আমি মোটেই বিশ্বাস করি না।"

নৃপেন এখানে একটি ভুল করলেন। তিনি যদি দেবেশের কথাটা শেষ পর্য্যন্ত শুনতেন তা' হলে হয়ত

কিছুক্ষণ পরে নৃপেন বললেন—"দেবেশ, এখন তো আর ফিরে যাবার ট্রেন নেই—অনেকটা রাতও হয়েছে। এমন পাড়াগাঁয়ে মোটর-গাড়ীও পাওয়া যাবে না। যখন এখানেই রাত কাটাতে হবে তখন বিশুদের আড্ডাটা একবার ভাল করেই দেখা যাক্ না।"

দেবেশ আনন্দিত হ'য়ে বলল—"বেশত, চলনা।" দেবেশ জানত যে বিজয়ী নৃপেন ভৌমিক অপেক্ষা পরাজিত নৃপেন ভৌমিক বদমায়েশদের অনেক বেশী শত্রু।

শ্যামপুকুর প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হতেই তারা দেখ্‌ল যে দোতলার একটা ঘরে আলো জ্বল্‌ছে। তারা জানালা ভেঙ্গে নীচের যে ঘরে প্রবেশ করেছিল সেখানেও আলো জ্বল্‌ছে দেখা গেল। বাড়ীর চারদিকে নিঃশব্দে ঘুরে তারা দেখ্‌ল কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই। ঘুরতে ঘুরতে তারা একটা গ্যারেজের কাছে এলো। দেখল সেখানে ট্রাক ও একখানা মোটর গাড়ী এবং একখানা মোটর সাইকেল সাজসরঞ্জাম সহ রওনা হবার জন্য তৈরী হয়ে আছে।

হঠাৎ নৃপেনের মনে হল কে যেন আস্‌ছে। কালবিলম্ব না ক'রে তিনি দেবেশকে টেনে নিয়ে পাশের একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। একটু পরেই তারা শুনতে পেল মোটর গাড়ী স্টার্ট নিয়ে ধ্বক্ ধ্বক্ শব্দ করছে।

মোটরগাড়ির আলোটা ঘুরে সেই ঝোপটার উপর পড়ল। সোফার যদি তেমন হুঁসিয়ার হ'ত তা'হলে তখনই দেখ্‌তে পেত যে নৃপেন ও দেবেশ সেই ঝোপটার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। সোফার নিশ্চিত মনে গাড়ীখানা নিয়ে একেবারে গাড়ী-বারান্দার সামনে দাঁড় করালো। তার পরক্ষণেই রঘু সদর দরজা খুলে সোফারকে কি যেন বল্‌ল। অমনি সোফার গাড়ী থেকে নেমে তার সঙ্গে সঙ্গে উপরে চলল। গাড়ী-বারান্দার আলোকে নৃপেন দেখলেন সে সোফার আর কেউ নয় কাহু স্বয়ং!

নৃপেন ও দেবেশ নিরুদ্ধ-নিশ্বাসে সেই দিকে চেয়ে রইল। একটু পরেই দেখা গেল বিশু, রঘু ও কাহু একজন লোককে ধরাধরি ক'রে ব'য়ে আন্‌ছে। মনে হ'ল লোকটি হয় মৃত, না হয় চৈতন্য হারা। লোকটিকে

পড়ল, নৃপেন তাতেই চিনলেন-সে শ্যামল চক্রবর্তী। মনে হল শ্যামলের মুখখানা একেবারে শাদা হয়ে গেছে। তার মাথাটি একপাশে ঝুলে প'ড়েছে।

নৃপেন খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌লেন,—দৃঢ়মুষ্টিতে দেবেশের হাত চেপে ধরলেন এবং তার কানের কাছে মুখ নিয়ে প্রশ্ন করলেন—রাজকুমার জীবিত না মৃত?

পরক্ষণেই ঘড়্‌ ঘড়্‌ শব্দে মোটরগাড়ী বাড়ির বাহিরে চলে গেল এবং বিশুও সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে দোতলায় উঠে গেল।

নৃপেন আর দেরী না করে দেবেশের হাত ধরে ছুটে চল্লেন, অস্ফুটস্বরে বললেন—"দেবেশ, ছুটে যাও মোটর সাইকেল নিয়ে এস—পার যদি রাজকুমারকে বাঁচাও। ওঁকে উদ্ধার কর।"

দেবেশ অন্ধকারের মধ্যেই মোটর গ্যারেজের দিকে ছুটে গেল। নৃপেনও সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ীবারান্দার দিকে ছুট্‌লেন। ইচ্ছা, এক দৌড়ে উপর তলায় উঠে বিশুকে আটকানো এবং যতক্ষণ না রাজকুমারকে পাওয়া যায় ততক্ষণ তাকে ধরে রাখা।

পরমুহূর্ত্তেই মোটর সাইকেলের ভট্‌ ভট্‌ শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে নৃপেন দরজার একপাশে নীরবে দাঁড়িয়ে পড়্‌লেন। তিনি যা ভেবেছিল ঠিক তাই ঘটল। মোটর সাইকেলের শব্দ পেয়েই ব্যাপার কি দেখবার জন্য বিশু তাড়াতাড়ি নেমে এসে দরজা খুলে ফেলল।

শিকার দেখ্‌লে বাঘ যেমন তার ঘাড়ে পরে নৃপেনও তেমনি বেগে বিশুর ঘাড়ে গিয়ে পড়্‌লেন। তাঁর প্রবল ধাক্কায় বিশু দরজা ছেড়ে দিয়ে একেবারে ঘরের মেঝেতে গিয়ে পড়ল। নৃপেনও বিদ্যুদ্‌বেগে ঘরে ঢুকেই প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হলেন। কিন্তু পকেটে হাত দিয়েই তাঁর মাথা ঘুরে গেল। কৈ রিভলবারটা তো পকেটে নাই! তবে কি ঝোপটার ভিতরে পড়ে গেছে!

মুহূর্ত্তের জন্য বিশু তীব্র দৃষ্টিতে নৃপেনের দিকে চেয়ে রইল। তার আর বুঝতে বাকী রইল না যে দেবেশ মোটর সাইকেলে মোটর গাড়ীর অনুসরণ করেছে। সে আরও বুঝল যে যারা মোটর গাড়ীতে গিয়েছে তাদের পরিচয়ও নৃপেনের অজ্ঞাত নয়।

এখানে!" পরমুহূর্ত্তেই দেওয়াল থেকে পুরাকালের একখানি দীর্ঘ তরবারি টেনে নিয়ে নৃপেনকে আক্রমণ করল। নিরস্ত্র নৃপেন কিছুক্ষণ কৌশলে এদিক ওদিক ক'রে বিশুর আক্রমণ ব্যর্থ করলেন; বুঝলেন বিপদ আসন্ন। একটু লক্ষ্য করে দেখ্‌লেন সেকালের একখানা লোহার ঢাল ও তীক্ষ্ণ কাঁটা বসানো লোহার দণ্ড দেওয়ালের গায়ে ঝুলছে। নৃপেন চক্ষুর নিমেষে ছুটে গিয়ে ওটা হাতে নিলেন।

দুজনের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হ'লো।

বিশুর তরবারি প্রায় চার হাত লম্বা ছিল জন্য তার পক্ষে দূর থেকে আক্রমণ করার সুবিধা হল। কিন্তু নৃপেনের দণ্ডটিও কম ভয়াবহ ছিল না। দণ্ডের মাথায় ছোটছেলের মাথার মত গোলাকার পিণ্ড—তারই গায়ে অনেকগুলি কাঁটা দণ্ডটিকে মারাত্মক ক'রে তুলেছিল। সুতরাং বিশুর ন্যায় জিঘাংসা পরায়ণ শত্রুকে প্রতিহত করা তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন হল না।

প্রথম আক্রমণগুলি ব্যর্থ দেখে বিশু আবার প্রাণপণ বেগে তরবারি ঘুরিয়ে নৃপেনের মাথা লক্ষ্য করে আক্রমণ করল। লোহার দণ্ডে লেগে সে আঘাত ব্যর্থ হল। নৃপেন তরবারি লক্ষ্য করে আঘাত করলেন; কিন্তু গুরুভার দণ্ডটির আঘাত ব্যর্থ হয়ে গেল। কিন্তু আঘাতের বেগে বিশু মেঝের উপর পড়্‌তে পড়্‌তেই উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু দণ্ডের কাঁটা লেগে তার বুক চিড়ে গিয়ে ফিনিক্‌ দিয়ে রক্ত ছুট্‌ল। বিশু চীৎকার ক'রে আহত বাঘের মত এমন বেগে তরবারি হাতে ধেয়ে এল সে তরবারির আঘাতে লৌহদণ্ডের কোন ক্ষতি না হলেও আঘাতের বেগে নৃপেন মাটীতে পড়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিশু ডান হাত দিয়ে নৃপেনের গলা টিপে ধরল। হাতের প্রবল চাপে নৃপেনের দম বন্ধ হবার উপক্রম হল। তিনি দণ্ডটী আস্ফালন করলেন বটে, কিন্তু আঘাত করতে পারলেন না। বিশু দণ্ডটী কেড়ে নিয়ে নৃপেনের মাথায় মারবার জন্য তুলল। নৃপেন দেখ্‌লেন যে, এবার আর তাঁর নিস্তার নাই। মরিয়া হয়ে দেহের সকল শক্তি দিয়ে বিশুর পেটে জোরে লাথি মেরে দিলেন। সেই লাথির ধাক্কায় বিশু দূরে ছিট্‌কে পড়ল।

আর আক্রমণ করার চেষ্টা করল না। নৃপেন কিছুটা অবাক হলেন। পরক্ষণেই দেখ্‌লেন ভূত দেখ্‌লে লোকে যেমন ভীত হয়, বিশুও ঠিক তেমনি হয়েছে। তার মুখের ভিতর দিয়ে শুক্‌নো জিভ্‌ বের হয়ে পড়েছে,—মাথায় চুল খাড়া হয়ে উঠেছে;—বিশু বেকুবের মত দরজার দিকে তাকিয়ে আছে!

নৃপেন লাফ দিয়ে বিশুর দিকে এগিয়ে যেতেই বিশু একটা ভয়ার্ত্ত চীৎকার করে উর্দ্ধশ্বাসে ঘর থেকে ছুটে পালালো। নৃপেনের দেহ-ও কাঁটা দিয়ে উঠলো—তিনি দেখ্‌লেন, সেই মুক্তদ্বারের সম্মুখে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। সেই মানুষটি যেন তার দু'খানা বাহু দু' দিকে বাড়িয়ে দিয়ে নৃপেনের দিকেই একদৃষ্টে চেয়ে আছে। অন্ধকারে তার দেহ থেকে যেন আগুন জ্বল্‌ছে।

বিহ্বলকণ্ঠে নৃপেন জিজ্ঞাসা করলেন—"কে আপনি? কি আপনি? কি চাই আপনার?"

নয়

সেদিন রাত্রিতে মরণযুদ্ধকালে অগ্নিময় একজন পুরুষকে দেখে ভয়ে বিশু পালিয়ে গেল। বিহ্বলকণ্ঠে নৃপেন আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করলেন—"কে আপনি? কি আপনি? কি চাই আপনার?"

আগন্তুকও বিস্ময়ে হতচকিত হয়ে গিয়েছিলেন এখানকার ঘটনা দেখে। তিনি উত্তর করলেন—

"আমি অমল চক্রবর্ত্তী। আপনি কে? কি হচ্ছিল এখানে?"

একটু আশ্বস্ত হ'য়ে নৃপেন বল্লেন—"আমি আপনাদের একজন বন্ধু।"

"রাজকুমার কি তাঁর বাড়িটা কোন সিনেমা কোম্পানীকে ভাড়া দিয়েছে নাকি? নইলে এখানে এসব কি হচ্ছে?"

নৃপেন বল্লেন—"আসুন অমলবাবু, আপনার ভাইয়ের বাড়িতে আমি আপনাকে সাদরে আহ্বান করছি। আসুন, অনেক কথা আপনাকে বলবার আছে।"

নৃপেন ও অমল একখানা ঘরে গিয়ে বসল। নৃপেনের কাছে সকল কথা শুনে অমল বলল—"তবে আমার গায়ে যে এত জলকাদা লেগেছে, এ বুঝি সেই রেডিয়ামের। আস্‌তে আস্‌তে আমি দেখ্‌লাম বটে যে একটা পাম্প চল্‌ছে আর বাউণ্ডারীর পথে হাঁটু সমান জল হয়ে গেছে। আমি আনমনে আস্‌ছিলাম, তাই পা পিছলে জলেকাদায় পড়ে যাই। শয়তান বিশু ভেবেছে, আমি একটা ভূত। তাই ভয়ে পালিয়েছে।"

নৃপেন বললেন—"আসুন, ওঘরের ছবি দু'খানা দেখবেন চলুন।"

যে ঘরে, বিমল এবং প্রশান্তর ছবি ছিল, উভয়ে সেইখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। অমল বলল—"হাঁ ঠিক। এইখানা বিমলের এবং এইখানা প্রশান্তর। তবে আমি দশবছর দেশ ছাড়া। আমি যখন যাই, তখন প্রশান্ত এতটা কালো ছিল না, ছবিখানা দেখ্‌লে কে বল্‌বে এটা প্রশান্তর বাবার নয়। তাঁরও ঠিক এমনি একখানা ছবি ছিল।

"তাহলে আপনি বল্‌তে চান যে প্রশান্ত কোন মতেই বিমল চক্রবর্ত্তী বলে নিজেকে চালাতে পারে না।"

"না। তার সম্ভাবনা ত দেখি না। দুজনের চেহারায় যে অনেক তফাৎ।"

নৃপেন বললেন—"এতক্ষণে আমার মস্ত একটা ভ্রম দূর হলো। আজ সন্ধ্যার সময় আমি তবে বিমলকেই দেখেছি, প্রশান্তকে নয়। আচ্ছা আসুন, একবার উপরে যাই। দেখি সেখানে কি পাওয়া যায়।"

দোতলায় উঠেই নৃপেন একটা সিন্দুক দেখ্‌তে পেলেন। বল্লেন—

"অমলবাবু কিছু মনে করবেন না। সিন্দুকটা আমায় এখনই খুলে দেখ্‌তে হবে।"

উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই নৃপেন চাবির মত একটা যন্ত্র দিয়ে সিন্দুকের তালা খুলে ফেললেন এবং সিন্দুকের ভিতরে হাত দিয়ে কী যেন খুঁজতে লাগলেন। সিন্দুকের মধ্যে দু'খানা দলিল ছিল। একখানা দলিলের মর্ম্ম এই যে শ্যামপুকুরের বাগানবাড়ি ও জমিদারী প্রশান্তকে দান করা হচ্ছে। দলিলে কারও কোন স্বাক্ষর ছিল না। আর একখানা দলিলে লেখা ছিল যে প্রশান্ত চক্রবর্ত্তী খনির স্বত্ব স্বামীত্ব বিশুকে বিক্রী করছে। মূল্যস্বরূপ সে যে কিছু পাচ্ছে তা দলিলে লেখা আছে। কিন্তু কি যে পাচ্ছে বা কতটাকা পাচ্ছে, তা লেখা নাই।

নৃপেন বললেন—"অমলবাবু! দেখুন দেখি এই সইটা কার? এ কি রাজকুমারের?"

অমল চক্রবর্ত্তী দলিলখানা হাতে নিয়ে ভালো ক'রে দেখে বললো—"হাঁ, বিমলদার সই-ই বটে। এই দেখুন না তাঁর হাতের লেখা। আমি তো সেদিনই তার চিঠি পেয়েছি।"

দলিলের লেখার সঙ্গে চিঠির লেখা মিলিয়ে দেখে নৃপেন বল্লেন—"হতেই পারে না। হস্তলিপি পরীক্ষার এতটুকু জ্ঞানও যদি আমার থাকে তাহলে ব'লব যে স্বাক্ষরটা জাল। এটা রাজকুমার বিমল চক্রবর্ত্তীর স্বাক্ষর নয়। যে লিখেছে সে একজন পাকা জালিয়াৎ বটে। কিন্তু তবুও ঠিক পারে নি।"

অমল উত্তেজিত হ'য়ে বলল—"জাল? তা হতে পারে। সে জন্য আমি ভাবছিনে। কিন্তু দেবেশবাবু এখনও ফিরে এলেন না কেন? আমি যে বিমলদার জন্য খুবই চিন্তিত হয়ে উঠেছি। চলুন, আমরাও না হয় তারই খোঁজে বেরিয়ে পড়ি।"

নৃপেন বললেন—"সে জন্য ভাববেন না। দেবেশের মত বুদ্ধিমান ছেলে সহজে দেখা যায় না। তার উপর আমার অসীম বিশ্বাস আছে। রাজকুমারকে সে উদ্ধার ক'রতে পারবেই।"

[ক্রমশঃ
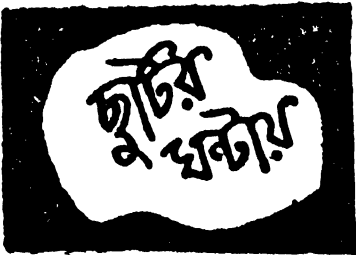
চিত্রগুপ্ত

গত সংখ্যায় তোমাদের বিজ্ঞানের বিচিত্র-রহস্যময় রাসায়নিক-প্রক্রিয়ার দৌলতে আজব-মজার যে 'আলোর রোশ্‌নির ভেল্‌কী' দেখানো'র কলা-কৌশলের হদিশ দিয়েছি, এবারেও অনেকটা ঠিক তেমনি-ধরণের আরেকটি নতুন খেলার কথা বলছি। এ খেলাটির নাম—'বহুরূপী-আলোর শিখা'। সরীসৃপ-গোষ্ঠীর গিরগিটিরই জাতভাই বহুরূপী জীবটিকে তোমরা সকলেই তো দেখেছো। কাজেই তোমরা সবাই জানো যে এই বহুরূপী-জীবের স্বভাবই হলো—গাছপালার ঝোপ-জঙ্গলে বা ইট পাথরের ঢিপির আড়ালে…অর্থাৎ, এরা যখন যেখানে আশ্রয় নেয়, সেখানকার পারিপার্শ্বিক-রঙীন-জিনিষের সঙ্গে অবিকল খাপ খাইয়ে অদ্ভুত-উপায়ে নিমেষের মধ্যে নিজেদের দেহের রঙ ঠিক তেমনি-ধরণে বদলে নিয়ে দিব্যি অনায়াসে আত্মগোপন করতে পারে।

'বহুরূপী-আলোর শিখা' খেলাটির কায়দাও অনেকটা প্রায় সেই ধরণের। 'বহুরূপী-জীব' যেমন শারীরিক প্রক্রিয়া-বিশেষের সহায়তায় প্রয়োজনমতো নিজের দেহের রঙ-বদলাতে পারে, 'বহুরূপী-আলোর শিখা' খেলাটিতেও তেমনি বিজ্ঞানের বিচিত্র-প্রক্রিয়ার দৌলতে জলন্ত-আলোর রোশ্‌নির রঙ বদলানো সম্ভব। কি করে—আপাততঃ, তারই পরিচয় দিই।

গোড়াতেই বলে রাখি—এ খেলা দেখানোর জন্য চাই—আবছা-অন্ধকার একটি ঘর। কারণ, খেলার আসরে আলোর প্রাচুর্য্য থাকলে, এ কারসাজি যে আদৌ জমবে না—সে কথা বলাই বাহুল্য।

আবছা-অন্ধকার খেলার আসরের ব্যবস্থা ছাড়াও, এ কারসাজি দেখানোর জন্য দরকার—টুকিটাকি গোটা কয়েক সাজ-সরঞ্জাম। আসরে দর্শকদের সামনে এ খেলা দেখানোর আগেই সকলের দৃষ্টির অগোচরে উদ্যোগ-পর্ব্বের আয়োজন সব সুষ্ঠুভাবে সেরে রাখাই ভালো।

খেলাটি দেখানোর জন্য যে সব সাজ-সরঞ্জাম জোগাড় করা প্রয়োজন, সেগুলি হলো—পলিতা ও স্পিরিট সমেত একটি স্পিরিট-ল্যাম্প (a spirit-lamp fitted with wick and filled up with Methylated Spirit), একবাক্স দেশলাই, গঁদের আঠার মতো থকথকে-ধরণে গুলে-নেওয়া অল্প একটু নুন-মেশানো জল (Salt-water Paste), একগোছা লাল-রঙের এবং আরেকগোছা বেগুনী-রঙের কাগজ কিম্বা কাপড়ের তৈরী কৃত্রিম ফুল (Scarlet-Red and Purple coloured Paper or cloth-made artificial flowers in two separat

bunches)। এ সব সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ হবার পর, আসরে খেলা-দেখানোর পালা। খেলা দেখানোর আগেই, নেপথ্যে ল্যাম্পের পলিতাটিকে নুন-জলের মিশ্রণ মাখিয়ে নিয়ে, সেটিকে আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে শুকিয়ে রাখবে।

আসরে দর্শকদের সামনে এ কারসাজি দেখানোর সময়, ঘরের দরজা-জানলা সব ভেজিয়ে বন্ধ করে রাখতে হবে—যেন আলোর এতটুকু কণাও না প্রবেশের সুযোগ পায়। তাছাড়া ঘরের জ্বলন্ত বাতিটিকেও নিভিয়ে দিতে হবে—আসরটি পুরোপুরি যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে।

এবারে দর্শকদের চোখের সুমুখে টেবিলের উপর স্পিরিট-ল্যাম্পটিকে সাজিয়ে রেখে, দেশলাই জেলেপলিতা-টিতে আগুন ধরাও। তারপর জ্বলন্ত-পলিতাটি আলোর রোশনিতে বেশ আভাময় হয়ে উঠলে, স্পিরিট-ল্যাম্পটিকে সাজিয়ে রাখো লাল-রঙের ফুলের গোছার কাছে। নুনের-মিশ্রণ-মাখানো জ্বলন্ত পলিতার শিখার রোশনিতে দেখবে—ফুলের লাল-রঙ বিজ্ঞানের রহস্যময়-বিধানে সম্পূর্ণ বদলে গিয়ে হলুদ-বর্ণে রূপান্তরিত হয়েছে। এমন আজব-কারসাজি দেখে দর্শকেরা যে বিস্ময়ে অভিভূত হবেন, তাতে আর সন্দেহ নেই।

অতঃপর, লাল-ফুলের গোছার সামনে থেকে নুনের মিশ্রণ-মাখানো জ্বলন্ত ল্যাম্পটিকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বেগুনী-রঙের ফুলের গোছার কাছে সাজিয়ে রাখো। এবারে আরো মজা!…'বহুরূপী-আলোর রোশনির' আজব-আভায়, বেগুনী-রঙের ফুলের গোছার বর্ণ নিমেষেই রূপান্তরিত হবে অপরূপ নীল-রঙে।

এই হলো, এবারের খেলাটির আসল মজা।

মনোহর মৈত্র

১। মজার হেঁয়ালী ঃ

তার আকারটি গোল—দেখতে অনেকটা ঠিক পৃথিবী কিম্বা বলের মতো। আমাদের চোখের সামনেই সেটি রয়েছে, অথচ তাকে ধরা-ছোঁয়া যায় না। তাকে চোখে দেখা যায়, আবার দেখা যায়ও না। তাকে একলা পেলে আমরা তুচ্ছ জ্ঞান করি, কিন্তু কারো পাশে থাকলে আর ঠেলে রাখা যায় না।…বলো তো—সেটি আসলে কি?

সুলতা মুখোপাধ্যায়

২। 'কিশোর জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা :

তিন অক্ষরের একটি শব্দ। তার শেষ বর্ণটি বাদ দিলে—প্রাকৃতিক জলাশয় বোঝায়। দ্বিতীয় অক্ষরটিকে বাদ দিলে বোঝায়—ছায়া…এবং প্রথম অক্ষরটিকে বাদ দিলে বোঝায়—জ্যামিতির সংজ্ঞা বিশেষ। বলো তো—শব্দটি কি এবং তার অর্থই বা কোন কথা বোঝায়?

রচনা : জোনাকী বাগচী (পূর্ব্ব-পুষ্টিয়ারী)

গত মাসের ধাঁধা আর হেঁয়ালির উত্তর :

১। নর্ত্তকী

২।
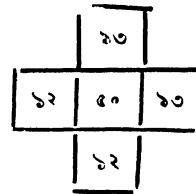
গতমাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

আনন্দ, পুষ্পেন্দু, শুভেন্দু, নির্ম্মলেন্দু ও মিনতি বসু (বর্দ্ধমান), নীলানন্দ, পরমানন্দ, কাঞ্চনমালা, চম্পকলতা ও কনকলতা সেন (কলিকাতা), পূরবী; সোমা, সুনীরা, সঞ্জীব, সন্দীপ ও হাবলু মুখোপাধ্যায় (হাওড়া), গোপেন, শিশির, ননী, শিবঘোষ, বাসুদেব, কেতকী, শ্যামলী, ছায়া, হৈমন্তী ও রূপা রায়চৌধুরী (নিউ দিল্লী), মানসী ও বরুণ রায় (কলিকাতা), কুণাল, অরুণ, অশোক, মদন, রথীন, দ্বিজেন ও গজু (কলিকাতা), কাকলী, কাননিকা, মাধবী, চারুলতা, সমীর ও সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় (বোম্বাই), জ্যোতির্ম্ময়, শান্তনু, বভ্রুবাহন ও নন্দিনী দত্ত (কলিকাতা),

কান্তা, বেণা, চন্দ্রিমা ও পুলকেশ পালিত (নবদ্বীপ), মঞ্জুলা ছন্দা, আশা, গায়ত্রী, লীলা সোমদেব, করুণাময়, চিন্ময় ও পল্টু সিংহ (কলিকাতা), অরণি, বিশাখা, সুনয়নী, অশ্বেশ, অমিয়, কাশীনাথ ও নবগোপাল (বিলাসপুর)। ছোটকু, মটকু, গাব্বু, জিতেন, নলিন, পটল ও কিরণ (কলিকাতা), মহেশ, পরেশ, অভিজিৎ, শ্রীমন্ত, অজয়, তারক, চামেলী, বকুল, পারুল ও খোকন (শিলিগুড়ি), নৃপেন, হরেন, রমেন, বরেন ও কুসুম গঙ্গোপাধ্যায় (রাঁচী), গোলাম কাদের ও সাকিনা মমতাজ (মুর্শিদাবাদ), রাতুল, রোহিণীকান্ত, সর্বেশ্বর, চন্দ্রনাথ ও কুঞ্জলাল (কলিকাতা)।

গতমাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে:

বৃন্দাবন ও রাধারাণী সাহা (ধুবড়ী)। চাঁদমোহন, অমলেশ, বীরেন্দ্র, অধীরকুমার ও কুমুদিনী মাইতি (ঝাড়গ্রাম)। ধীরাজ, দেবরাজ, বিরাজমোহন ও ব্রজরাজ গঙ্গোপাধ্যায় (গয়া), শোভন, মোহন ও শম্পা মজুমদার (কলিকাতা), পতিতপাবন, হরিধন, সত্যকাম, ধ্রুব ও অরিন্দম মিত্র (বৌরকেল্লা), কাকলী, অসিতা, রীতা, মালিনী, চিত্তপ্রিয়, দেশপ্রিয় ও আত্মনাথ বসু (কলিকাতা), বিশ্বনাথ ও দেবকীনন্দন সিংহ (গয়া). কুঞ্জবিহারী, নচিকেতা, তুষার, হিমা দ্রশেখর, চিরঞ্জীব, সঞ্জয়, সহদেব ও আশুতোষ (কলিকাতা), বনানী, তুষারিকা, গোরক্ষনাথ, ভূতনাথ ও মুন্না (দার্জ্জিলিং)। পরমেশ্বর, ভুবনেশ্বর, ত্রিলোকেশ্বর ও দেবযানী চক্রবর্তী (কলিকাতা), লালমোহন, ভুবনমোহন, লীনা, রীণা, বীণা ও টিঙ্কু ভট্টাচার্য্য (শিলঙ্), অলকেশ, পুলকেশ ও ত্রিদিকেশ হালদার (কলিকাতা), জোনাকী বাগচি (পূর্বপুঠিয়ারী),

---

পাহাড়ে

প্যাপেনকুমার ভট্টাচার্য্য

ওখানে পাহাড় ওখানে শান্তি নির্জন নীরবতা
ওখানে কান্না গেছে আর হারিয়ে গিয়েছে কথা।
সবুজ আঁচল আগাগোড়া যার ঢাকা দেওয়া থাকে শীতে
সে সব সতেজ পাইনের ছায়া পাহাড়ের কোনাটিতে
পেয়েছে আসন মোলায়েম আর ভাসা ভাসা যার সুর
পাতাদের ফাঁকে থেকে থেকে বাজে ভেসে যায় বহুদূর।
সামনে সুদূর সোনালী কেশর সূর্য্যের আনাগোনা,
উপত্যকায় সারাদিন ধরে থোলো থোলো ফেলে সোনা।
কখনো রৌদ্র কখনো চিকন বৃষ্টির ফোঁটা হয়ে
কখনো আবার ঝর্ণার জলে থেকে থেকে রয়ে রয়ে।
চলোনা আমরা ওখানের ওই সোনাঝরা পৃথিবীতে।
এখানের শত নীচতাকে ফেলে মর্ম্মর সংগীতে।
পাহাড়ের সাথে পাইনের সাথে ঝর্ণার সাথে মিলে
চলো মিশে যাই, নয় তো ওখানে, দূর আকাশের নীলে।

"কলেজের কলরব"

মহাশয়,

গত সংখ্যায় "কিশোর জগৎ" বিভাগে শ্রীজ্ঞান লিখিত "কলেজের কলরবে" লেখাটি পাঠ করে বিশেষ উপকৃত হলাম। 'উপকৃত হলাম' এই কথাটি লিখলাম এই জন্যে যে শ্রীজ্ঞান এই লেখাটির মধ্য দিয়ে আমাকে আমার অভিভাবকের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে যেন সচেতন করে দিয়েছেন। এর জন্যে তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁর স্বনাম ও ঠিকানা জানা থাকলে তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে পত্র লিখে ধন্যবাদ জানাতাম।

তিনি ঠিকই লিখেছেন যে স্কুলের গণ্ডী ছেড়ে ছেলে-মেয়েরা যখন কলেজের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে, তখন এই বৃহত্তর পরিবেশে এসে যদি তারা নিজেদের সামলে নিয়ে চলতে না পারে, তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই তারা কলেজের কলরবে নিজেদের স্বত্বা হারিয়ে ফেলে। স্কুলের শাসন থেকে ছাড়া পেয়ে তারা তখন পড়াশুনাকেই প্রধান কাজ মনে না করে অনেক বাজে কাজে, গল্পে-আড্ডায়, খেলা-ধুলায় নিমগ্ন হয়ে পড়ে নিজেদের অজান্তেই নিজেদের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে থাকে। তারপর পরীক্ষার সময় অনন্যোপায় হয়ে নানারূপ অসাধু উপায় অবলম্বন করে উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করে। ফলে অনেক সময় ধরা পড়ে শাস্তি পায়, আবার কখনও বা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে পরীক্ষা বানচালের চেষ্টা করে। এইভাবে তারা নিজেদের ভবিষ্যতকে নষ্ট তো করেই, অপরেরও যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে।

শ্রীজ্ঞান তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে এই তথ্যই অভিভাবকদের সামনে তুলে ধরে তাঁদের এবং অপরিণত মস্তিষ্ক কিশোর-কিশোরীদের সাবধান করে দিয়েছেন। সকল অভিভাবকেরও কিশোর ছাত্র-ছাত্রীদের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত।

আমার কন্যা কুমারী সুনন্দা বিশ্বাস এবার কলেজে ভর্তি হয়েছে। আমি ঐ লেখাটি পড়ার পর তাকে অনেক উপদেশ দিয়েছি এবং ভবিষ্যতে যাতে সে ঠিক পথে চলে, কলেজের কলরবে হারিয়ে না যায়, সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখব। আমার পুত্র শ্রীমান ·নন্দ বিশ্বাস আর বছর দুই পরে কলেজে ভর্তি হবে তার ওপরও আমাকে তখন যথেষ্ট নজর রাখতে হবে। আমি অনুরোধ করছি "ভারতবর্ষ"-র সকল পাঠকপাঠিকা অভিভাবক-অভিভাবিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রীজ্ঞান লিখিত ঐ "কলেজের কলরবে" লেখাটি পাঠ করতে। এতে তাঁরা যথেষ্ট উপকৃত হবেন।

বিনীত—

শ্রীসুবিনয় বিশ্বাস

কলিকাতা—৭

হৃদয় বদলের নৈতিক যুক্তি

মহাশয়,

হৃদবদলের প্রবর্তনকারী চিকিৎসক ডাঃ বার্ণার্ড প্রয়োজনের সময়ে হৃদযন্ত্র পাওয়া যায় না বলে বানরের হৃদযন্ত্র ব্যবহার করার কথা চিন্তা করছেন। তাতে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে অসংখ্য বানরকে হত্যা করতে হবে। ভগবানের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। তার দেহকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অন্য সব জীব জীবন দিয়ে কৃতার্থ হবে সে তো আর কথাই নয়। নৈতিকতার দিক থেকে এসম্বন্ধে প্রশ্ন করাই সম্ভব নয়। কিন্তু একটি

প্রশ্ন রয়েছে নীতিবিদ্‌দের কাছে, যাঁরা জীবনের যুদ্ধে পরাভূত হয়ে স্লেইবার্গের মত ছয়মাস অন্তর অন্তর হৃদয় বদলিয়ে বদলিয়ে শুধু নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চালু রেখে ডাক্তারদের জয়গানের উচ্চরোলের মাঝে বেঁচে আছেন তাঁদের প্রতি কি যথেষ্ট সুবিচার হচ্ছে? বেঁচে থাকার আনন্দ থেকে যাঁরা বঞ্চিত তাঁদের বাঁচিয়ে রেখে ঐসব জীবনের যাদুকর চিকিৎসকগণ জীবের প্রতি অবিচার করছেন না কি?

বিনীত—

কমল ভট্টাচার্য

কলিকাতা—৩

মহাকঙ্কাল নগরী কলিকাতা

মহাশয়,

কলিকাতা কর্পোরেশান ভারতবর্ষের বৃহত্তম কর্পোরেশান বলে শুনেছি। তবে যে উৎকর্ষে নহে তা' তার মতি-গতি, চলা-ফেরা, কাজ-কর্ম থেকেই বোঝা যায়। এমন আবর্জনা, অফিসে ও রাস্তায় আর কোথায়? সেখানকার আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার যাঁরা পরিচালক তাঁরা কি আবর্জনা প্রিয়? আবর্জনা ঘাঁটতে উৎসুক? তেমনি যারা বাইরে আবর্জনা সাফাইর কাজে নিযুক্ত তারাও আবর্জনা জমিয়ে কি সুখ পায়? আবর্জনার দুর্গন্ধ কি ওদের নাকে পৌছায় না? না এ দুর্গন্ধ না পেলে তাদের নিদ্রা ভাল হয় না, বা হজমের ক্রিয়াতে ব্যাঘাত ঘটে?

কলিকাতা মহানগরীতে এত লোক রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে এমন কেউ নেই যিনি এই ব্যধিতে জর্জরিত সংস্থাটির সংস্কার কার্য সম্পন্ন করতে সক্ষম? এমন কেউ নেই—যিনি কলিকাতার আবর্জনা কলঙ্কের অপনোদন করতে সমর্থ? যদি থাকেন তাঁর সত্বর আবির্ভাবের জন্য আমরা প্রার্থনা করছি।

বিনীত—

অশোক বসু

বাগবাজার, কলিকাতা—৩

পাকিস্তানের হাতে রাশিয়ান হাতিয়ার

মহাশয়,

পাকিস্তানের হাতে রাশিয়ান হাতিয়ার দেখে অনেক ভারতীয়ই মনঃক্ষুন্ন হয়েছেন। রাশিয়া ভারতের বন্ধু। তাঁহারাই কিনা যুদ্ধং দেহি ভাবাপন্ন পাকিস্তানকে অস্ত্র দিলেন!

তাই এদেশের অনেকে ক্ষুব্ধ হয়ে দিল্লীতে আন্দোলন করেছেন। ভাল কথা। কিন্তু চীন যখন পাকিস্তানকে অস্ত্র দিল, ইংরেজ, অ্যামেরিকা যখন পাকিস্তানকে অস্ত্র দিল, তুরস্ক, ইন্দোচীন যখন অস্ত্র দিল—তখন এইসকল আন্দোলনকারীরা কোথায় ছিলেন? তাঁরা তো তখন নাকে সর্ষপ তৈল দিয়ে ঘুমিয়েছিল বেশ। এখন তাঁরা এমন উঠে-পড়ে লেগেছেন কেন?

তাঁদের উচিত সরকারকে এমনভাবে প্রবুদ্ধ করা যাতে দেশ কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে এবং আণবিক অস্ত্র নিজে তৈরী করে অস্ত্রবলে মদোদ্ধত সমগ্র দেশকে ভয় না পেয়ে চলতে পারে। তখনই ভারতের ভয় ঘুচবে, কে কাকে অস্ত্র দিল বলে ভয়ে ভয়ে মরতে হবে না।

বিনীত—

অনুপ্রকাশ ঘোষ

বহরমপুর
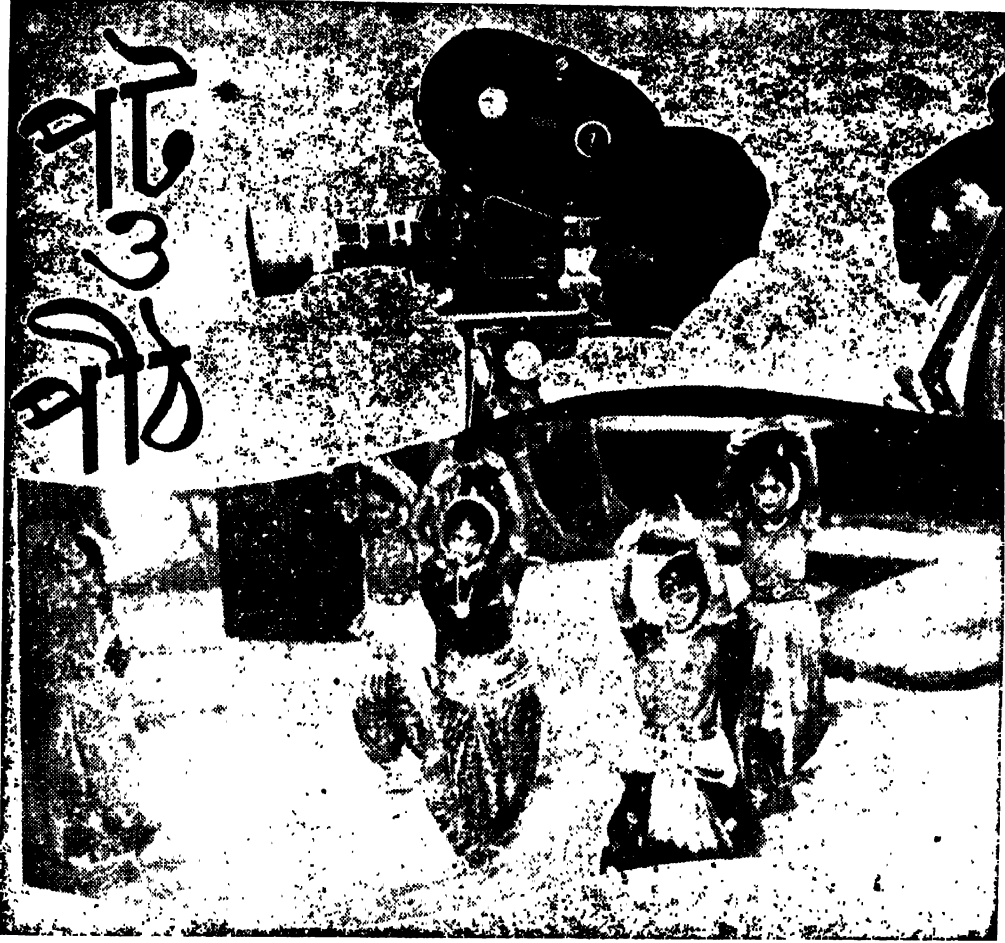
সংকট শেষে

শ্রী'শ'—

চলচ্চিত্র শিল্পের সমস্যা সমূহের সমাধান সাধিত হয়ে সংকট শেষের সূচনাসূচিত হয়েছে। চিত্র-প্রদর্শন-গৃহগুলির সবকটিরই দরজা এখন মুক্ত এবং নতুন চিত্রও অনেকগুলি মুক্তিলাভ করে চলচ্চিত্র দর্শক মনে আনন্দ ফিরিয়ে এনেছে। সংরক্ষণ সমিতি ও চিত্র-প্রদর্শনগৃহ মালিকদের বিরোধের নিষ্পত্তি হওয়াতে সকলেই আজ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছেন। উভয় পক্ষকেই আমরা আমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বিরোধের নিষ্পত্তি হয়েছে। এবারে সকলে একজোটে কাজ করে বিরোধকালীন যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা পূরণ করার জন্য উঠে পড়ে লাগতে হবে—লাগতে হবে বাংলা ছবির উন্নতির জন্য, আরও বেশী করে নির্মাণের জন্য, আরও ব্যাপক প্রচারের জন্য। বাংলা ছবি সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে, বাংলা ছবি গুণানুসারে সারা ভারতে অদ্বিতীয়, বাংলা ছবি ভারতের গর্ব, ইত্যাদি প্রশংসায় ভরপুর হয়ে থাকলে

চলবে না। মনে রাখতে হবে বাংলা ছবি আর্থিক দিক দিয়ে তেমন সাফল্য লাভ করতে পারে নি। পুরস্কার জিতে এনেছে বটে, কিন্তু অর্থ অর্জ্জন করে আনতে পারে নি—সম্মান লাভ করেছে বটে, কিন্তু অর্থবান তো হতে পারে নি! তাই বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের দিকে দিকে শোনা যাচ্ছে আজ অভাবের, অনটনের ক্ষুব্ধ কলরোল!

বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের এই দৈন্যদশাকে ঘোচাবার জন্য আজ সকলকেই—চিত্র সংশ্লিষ্ট ও অসংশ্লিষ্ট সকলকেই আজ তৎপর হতে হবে, সচেষ্ট হতে হবে, উপায় নির্দ্ধারণ করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী একাগ্র ও ঐকান্তিক পরিশ্রম করে কর্ম্ম করে যেতে হবে।

ভারতগৌরব এই শিল্পটিকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব শুধু বাঙ্গালীরই নয়—সকল ভারতীয়ের! এ কথাটা আজ সকলকেই অবধান করতে অনুরোধ করছি।

* * * * * *

প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে—নীপা চৌধুরী

অর্চনা বসু— গৌর লাহা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

মৌসুমী চ্যাটার্জিকে আমার খুব ভাল লাগে। পট ও পীঠ পাতায় ওর জীবনী দেখতে চাই। "পরিণীতা" কবে মুক্ত পাবে! মৌসুমীর আগামী ছবি কি কি? গত বৈশাখ সংখ্যা পট ও পীঠ দেখলাম ও নাকি ক্যামেরার কাজ শেখবার তালে আছে! সত্যি নাকি?

০ মাত্র একখানি ছবিতে অভিনয় করে মৌসুমী যেরকম জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তাতে ওর ভাগ্যকে অনেকেই হিংসা করতে শুরু করেছে। অবশ্যই ওর জনপ্রিয়তার উৎস হচ্ছে আপনাদের ভাল লাগা। জনপ্রিয়তার মত জীবন আগে ওর তৈরী হোক তবেতো জীবনী লেখার প্রশ্ন আসবে। "পরিণীতা" বোধহয় বর্ত্তমান বছরের শেষে মুক্ত পেতে পারে। হাউসের ঝামেলা না ঘটলে সঠিক কিছু বলা যাচ্ছে না। "পরিণীতা" ছাড়া পরিচালক সুশীল ব্যানার্জির আগামী ছবি "প্রথম প্রতিশ্রুতিতে" হয়ত মৌসুমীকে দেখতে পাওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া অন্য কোন ছবিতে ওর কাজ করবার কথা এখনও শুনি নি। অবশ্য বেশী ছবিতে কাজ না করাই উচিত। এক সঙ্গে অনেক ছবিতে কাজ করলে টাকাটা বেশী পাওয়া যায় ঠিকই কিন্তু অভিনয়ের দিকে একঘেয়েমি এসে যায়। ক্যামেরার কাজ কি বলছেন, ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রীর সব কটা ডিপার্টমেন্টের কাজ একসঙ্গে ও শেখবার তালে আছে বলে মনে হয় আমার।

* * *

কুমকুম ব্যানার্জী—যাদবপুর, কলিকাতা-৩২

তনুজার প্রথম ছবি কি? ওর বাবা ও মার নাম কি?

০ তনুজার প্রথম ছবি হচ্ছে হিন্দী ভাষায় "হমারী বেটী" ও বাংলায় "দয়া-নেয়া"। "হমারী বেটী" ছবিতে তনুজা এবং ওর দিদি নূতন দুজনেই চিত্রজগতে প্রথম পদক্ষেপ। ওদের মা হচ্ছেন একালের হিন্দি চিত্রজগতের খ্যাতনামা অভিনেত্রী শ্রীমতী শোভনা সমর্থ। বাবার নাম কুমার সেন সমর্থ। দুজনেই চিত্র পরিচালক। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি "হমারী বেটী"র পরিচালিকা ছিলেন ওর মা শোভনা সমর্থ।

* * *

মানিক রায়—মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা-৬

চার্লি চ্যাপলিনের প্রথম ছবি কি এবং কোন সালে নির্মিত হয়েছিল? বর্ত্তমানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালক কে?

০ চার্লি চ্যাপলিনের প্রথম ছবির নাম হচ্ছে "মেকিং এ

লিভিং" এক গীতের ছবি এবং ইংরাজী ১৯১৪ সালে নির্মিত হয়েছিল। বর্তমানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্র পরিচালক কে এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া খুবই শক্ত ব্যাপার। ভিন্ন লোকের ভিন্ন রুচি। আপনার যাকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয় আমার হয়ত তার ছবি মোটেই ভাল লাগে না। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমার ইংগমার বার্গম্যান ও ফেডরিকো ফেলিনিকে বর্তমানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পরিচালক বলে মনে হয়।

* * *

শিখা বসু—হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯

কাননদেবীর গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত "এই লভিনু সঙ্গ তব" গানের রেকর্ডখানি অনেক দোকানে খুঁজেছি. কোথাও পাইনি। কোথায় পাওয়া যেতে পারে বলতে পারেন? রেকর্ডখানির নম্বর দিতে পারলে ভাল হয়। কোনো ছায়া চিত্রে কি এই গানটি ব্যবহার করা হয়েছিল?

● কানন দেবীর 'লভ প্রেয়িং' রবীন্দ্রসঙ্গীতের কোন রেকর্ড আছে কি না জানি না, যদি থাকে তাতে খোঁজ করে দেখতে পারেন। নতুবা Columbia রেকর্ড কোম্পানীতে খোঁজ করুন। Recordটির নম্বর হচ্ছে VE 2562. অধুনালুপ্ত এম পি প্রডাকসন্সের "অনির্বাণ" ছায়াচিত্রে এই গানটি ব্যবহার করা হয়েছিল। কানন দেবীকে তো বাঙলাদেশের জনসাধারণ ভুলেই গেছেন, হঠাৎ তাঁর কথা আপনার মনে পড়ল কেন? এক্ষেত্রে অবশ্য আমি অভিনেত্রী কানন দেবীর কথা বলছি না,গায়কা কানন দেবীর কথাই বলছি। যে গানটির রেকর্ড আপনি খোঁজ করছেন সেই গানটি কাননদেবীর গানের একটি অন্যতম 'জুয়েল'।

* * *

অনুপম সেন শর্ম্মা—যতীন দাস রোড, কলিকাতা-২৯

একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছি কিন্তু কিছুতেই সুবিধে করতে পারছি না। মেয়েটি সাংঘাতিক রকমের Man hater, কি করা যায় বলুন তো?

● জিম করবেটের লেখা Man Eater of Kumayun বইখানা ওকে পড়তে দিন। দেখুন যদি আপনার দিকে ওর মতিগতি ফেরে।

* * *

শ্রীনিবাস চৌধুরী—ফিরোজ শা রোড, নিউদিল্লী-১

বর মজারে মা গরিবে, না চিরাগে না গুলে।
না পরে পরওয়ানা সুখাদ,না সদাঁয়ে বুলবুল
এই কবিতাটি কার লেখা এবং এর মানে কি?

● উর্দ্দু সাহিত্য ও কবিতা সম্বন্ধে আমার কোন কিছু জানা নেই। কিন্তু তাই বলে এ ক্ষেত্রে আপনি আমায় ঠকাতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে না। কবিতাটি সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের লেখা এবং সম্ভবত তাঁর কবরের ওপর উৎকীর্ণ করা আছে এটী। এর মানে হচ্ছে—

"দীনের কবরে ভুল করেও কেউ দিয়োনা ফুল দেয়াগ।
বুলবুলি না গায় যেন গান পতঙ্গ না পোড়ায় পাখ॥"

* * *

শঙ্কর মিত্র—কালিগঞ্জ গার্ডেনস, কলিকাতা-২৯

শ্রী"প" ও শ্রীকান্ত দুজনে তো একই লোক। কেন আর আমাদের সঙ্গে এ কম ছলনা করছেন?

● কলম হাতে নিয়ে দিব্যি করে বলছি আপনার ধারণা একেবারেই ভুল। বিশ্বাস না হয় একদিন পত্রিকা অফিসে এসে দেখে যেতে পারেন।

* * *

বিশ্বনাথ হালদার—রমেশ মিত্র রোড, কলিকাতা-২৫

চলচ্চিত্র অভিনয় করা শেখার কোন স্কুল আছে কি? আমি চলচ্চিত্রে অভিনয় করা শিখতে চাই।

● অভিনয় করাটা কি স্কুলে গিয়ে শিখতে হয় নাকি? পৃথিবীতে আজ অবধি ছোট বড় যত অভিনেতা বা অভিনেত্রী বেরিয়েছেন তাঁরা কেউ কোনদিন কোন স্কুলে গিয়ে অভিনয় শিখেছেন বলে আমার জানা নেই। যাইহোক এ কম কোন স্কুল আছে কি না আমি জানি না। আপনি বরঞ্চ ভারত সরকারের পুনা ইনষ্টিটিউট-এ খোঁজ করে দেখতে পারেন।

* * *

গীতা চৌধুরী—লেক রোড, কলিকাতা-২৯

বাংলা ছবিতে ন্যাকামিভরা গান শুনতে শুনতে বিরক্ত

হয়ে গেছি। গান বাদ দিয়ে কি বাংলা ছবি হওয়া সম্ভব নয়। গানের ছবি হলে অবশ্য আলাদা কথা। ওদেশে তো গান ছাড়াই কত ভাল ছবি হয়।

০ ন্যাকামিভরা অর্থহীন গান আপনারা শুনতে ভালবাসেন বলেই তা সৃষ্টি হয়। যেদিন হতে আপনারা আর শুনতে চাইবেন না সেদিন হতে এর সৃষ্টিও বন্ধ হয়ে যাবে। ওদেশে কেন, এদেশেও গান ছাড়াই অনেক ভালো ভালো ছবি তৈরী হয়েছে। নরেশ মিত্র পরিচালিত "অন্নপূর্ণার মন্দির", অজয় কর পরিচালিত "সাত পাকে বাঁধা" তার দু'একটি উদাহরণ।

* * *

সুপ্রিয় ব্যানার্জী—কদমকুঁয়া, পাটনা

উত্তমকুমারকে আমার ভাল লাগে। কি করা যায় বলুন তো ?

০ কিছু করা যায় না। সুপ্রিয়া হলেও বা একটা কথা ছিল।

* * *

শিবানী মৈত্র—নাগের বাজার, দমদম

আমি ভারতবর্ষের গ্রাহিকা নই, কিন্তু এর 'পট ও পীঠ' বিভাগের একজন নিয়মিত পাঠিকা। যদি দু-একটি প্রশ্ন করি উত্তর দেবেন কি ?

০ গ্রাহিকা না হলে উত্তর দেওয়া হবে না এরকম কোন নিয়ম আমাদের পত্রিকার নেই। স্বচ্ছন্দে আপনি প্রশ্ন পাঠাতে পারেন।

* * *

অরুণা সান্যাল—শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড, ঢাকুরিয়া

'পট ও পীঠ' পড়ে জানা গেল যে সুপ্রিয়া চৌধুরী হচ্ছেন বেণু, মৌসুমী চ্যাটার্জি হচ্ছেন ইন্দিরা, কিন্তু সুচিত্রা সেন কি জানালে খুসী হব। এবারের পুজোয় ওঁর আবার নতুন কোন গানের রেকর্ড বেরুচ্ছে কি ?

০ রমা সেন। বোধহয় না। ওপথ দিয়ে হাঁটবার

* * *

শমিত মজুমদার—কেয়াতলা রোড, কলিকাতা-২৯

আমাদের দেশে ভাল কার্টুন ছবি তৈরী হয়না কেন ?

০ এদেশের জলহাওয়া কার্টুন ছবির পক্ষে উপযুক্ত নয় বলেই বোধহয়। অনেক আগে নিউ থিয়েটার্স ও মন্দার ফিল্মস্ সে প্রচেষ্টা করেছিলেন কিন্তু দর্শকদের অভ্যর্থনার বহর দেখে তাঁরা ক্ষান্ত দিয়েছেন। তাছাড়া কার্টুন ছবির প্রয়োজনটাই বা কি ? ট্রামে বাসে পথে ঘাটে ঘরে বাইরে সর্বত্রই তো কার্টুনের ছড়াছড়ি !

* * *

মনোগোপাল বণিক—পোড়ামাতলা, নবদ্বীপ

আমি একজন ফিল্ম ডাইরেক্টার হতে চাই। কি ভাবে হওয়া যায় বলুন তো ? আপনি এ ব্যাপারে হেলপ্ করবেন ?

০ ফিল্ম ডাইরেকটার হওয়াটা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়, ও যে কেউ হতে পারে। আপনি লাখ তিনেক টাকা জোগাড় করে নিয়ে শিগগির চলে আসুন। খুব তাড়াতাড়ি আপনাকে ডাইরেকটার করে দিয়ে ছবি 'রিলিজ' করিয়ে দেব।

* * *

সুনীল চ্যাটার্জি—বেণিয়াপুকুর লেন, কলিকাতা

হিজিরা কেমন করে সৃষ্টি হল ? ওদের বর্তমান খবর কি ?

০ যেমন করে আমার মত একটি অনাসৃষ্টির সৃষ্টি হয়েছে। একমাত্র হিজিরাই বলতে পারে।

* * *

ভন্টু হাজরা—মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-২৬

আপনারা যাই বলুন, জংলী জানোয়ার প্রফেসার শাম্মী কাপুরকে আমার কিন্তু দারুন ভাল লাগে।

০ ওর চাইতেও আমার কিন্তু দারুন ভাল লাগে চিড়িয়াখানার বনমানুষদের।

সত্যপ্রিয় বসু—গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩

তরুণ রায়ের "আগন্তুক"-এর আগে ষ্টেজে আর কখনও দ্বৈত ভূমিকায় অভিনয় সম্ভব হয়েছে কি ?

০ হয়েছে। স্বর্গত ছবি বিশ্বাস অভিনীত ও পরিচালিত "ঝিন্দের বন্দী" ষ্টেজে একাধিক রাত্রি অভিনীত হয়েছে।

* * *

বরুণ চ্যাটার্জি—গিরীশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫

উত্তমকুমার নতুন কোন ছবি পরিচালনা করছেন কি ?

০ করছেন, ছবির নাম "আজ বসন্ত।"

* * * * *

সাগরপারের ধ্রুপদী চলচ্চিত্র

শ্রীনরেশচন্দ্র বসু

জার্মানী ১৯১৯

চলচ্চিত্র আজ সমগ্র পৃথিবীর বিস্ময়। এর আবিষ্কারের মূলে রয়েছেন পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিক, যাঁদের দীর্ঘদিনের সাধনা, নিত্য নিয়ত একে পূর্ণ থেকে পূর্ণতর করে তুলেছে এবং আজও তুলছে। নতুন নতুন পথে তার অগ্রগতি, নানান্‌ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তার শিল্পগত উৎকর্ষ বিধানের চেষ্টা নির্বাক যুগ থেকে সবাক যুগেও সমানভাবে চলেছে।

চলচ্চিত্র সম্পূর্ণরূপে বিদেশীয়দের দান। বিদেশের মাটিতেই এর জন্ম, বিদেশের আবহাওয়াতেই এ পরিপুষ্ট এবং চলচ্চিত্রের জীবনে প্রাণের জোয়ার আনতে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শিল্প রসিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পীর দানও এই প্রসঙ্গে অনস্বীকার্য।

এই বিভাগে বিদেশের কয়েকটি সর্বজনস্বীকৃত শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রের আলোচনা করবার এবং তাদের আংশিক রূপ প্রস্ফুটনে সাহায্য করব।

যুদ্ধ পূর্বোত্তর জার্মানীর অর্থাৎ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের শ্রেষ্ঠ চিত্র "দি ক্যাবিনেট অফ ডাঃ ক্যালিগারি"। ১৯১৪-১৮র মহাযুদ্ধ সারা পৃথিবীতে শুধু ধ্বংসই রেনি, মানুষের নীতিবোধ, ধর্মবোধের ভিত্তিমূলকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। মানুষের অহমিকা, মানুষের সর্বশক্তিসম্পন্ন হবার আকাঙ্ক্ষা মানুষকে কোথায় টেনে নামাতে পারে ইতিহাস তার জীবন্ত সাক্ষী। জার্মানির এই চিত্রটির উপর মহাযুদ্ধের এই প্রভাব বেশ ভালো ভাবেই পড়েছিল। এই চিত্রটির প্রযোজক এরিক পমারের কাছে একদিন দুইটি তরুণ কার্ল মায়ার ও হানস্ জানোইজ্ একটি গল্প নিয়ে এলেন তাঁকে শোনাবার জন্যে। প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেও অতি অল্প সময়ের মধ্যে এরিক পমার কাহিনীতে আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন এবং সুদক্ষ পরিচালক রবার্ট ওয়াইনের পরিচালনাধীনে এর চিত্ররূপ দিতে আরম্ভ করলেন। জার্মানীতে চিত্রটি প্রশংসিত হলেও জার্মানীর বাইরে অন্যান্য দেশে কয়েকটি ফিল্ম ক্লাবের মাধ্যমেই এর প্রদর্শন হয়, সেইজন্য নীরব ছবিগুলোর মতই এর গুণাগুণ সাধারণ লোকদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। ১৯২১ সালে স্যামুয়েল গোল্ড উইন্ আমেরিকায় এর একটা কপি আনিয়ে সাধারণ্যে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করলেন।

গল্পের যবনিকা উঠলে দেখা যায় একজন অপরূপ সুন্দরী স্ত্রীলোক মানসিক হাসপাতালে ভর্তি হতে এসেছেন। একজন স্বপনচারী (somnambuilist) মেয়েটির প্রিয়তমকে হত্যা করে তার ওপর পাশবিক অত্যাচার করবার চেষ্টা করেছিল। যদিও যবনিকা পতনের আগে দেখা যায় এই সকলই কাহিনীর বর্ণনা-কারীর উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনাপ্রসূত। ডাঃ ক্যালিগারী ছিলেন একজন উন্মাদ যাদুকর যিনি এই স্বপনচারীকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন এবং উন্মাদ আশ্রমের তিনিই পরি-

চালক। যিনি নিজে উন্মাদ এবং যাঁকে তাঁর কার্য্যকলাপ থেকে বিরত করা গেল, তিনিই কিনা প্রথমে উন্মাদগ্রস্তদের নিরূপণ করেছেন।

শিল্পগত নৈপুণ্যে অন্য কোন চিত্রের ওপর এই চিত্রটির প্রভাব সামান্য হলেও ভবিষ্যতে হলিউডে নির্মিত রূপকথা গল্পের ফ্যান্টাসী বা ইন্সিটিউসনের ক্ষেত্রে এর দান অপরিসীম। আলোকচিত্র পরিচালনা ছিল অতি উচ্চ স্তরের এবং ক্যামেরাও যে বাস্তবধর্মী চিত্র, দ্রুত সময় ক্ষেপ ও ক্ষেত্র নির্ণয়ে সাহায্য করতে পারে এই চিত্রে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। রোমান্টিক খেয়াল বা চাপল্য, কবির কল্পনা শক্তি এদের বিরুদ্ধে একদল চিরদিনই জেহাদ ঘোষণা করে এসেছেন। ডাঃ ক্যালিগারীতে কল্পনা তার মুক্তপক্ষ বিস্তার করে দিয়েছে আমাদের চমৎকৃত করতে। এবং এর প্রভাব M এবং The Dybbuse নামক দুইটী ক্ল্যাসিক চিত্রের উপর বহুল পরিমাণে পড়েছিল, যদিও অস্পষ্টভাবে। মানব মনের রোমান্টিকতা, প্রেম ও মৃত্যু, পাপ ও বিপুকে একই পাত্রে পরিবেশন করা হয়েছে। কিন্তু এই সত্য অস্বীকার করা যায় না যে বলাৎকার, হত্যা ইত্যাদি মানুষের আদিম প্রবৃত্তিগুলোকে যতই পোষাক-পরিচ্ছেদে ঢেকে সভ্য সমাজে বার করা হোক না কেন, সমাজের ওপর বিশেষ করে তরুণ সমাজের ওপর এর কুফল ফলবেই। কিন্তু তবুও বলবো "দি ক্যাবিনেট অব ডাঃ ক্যালিগরী" "ইজম্" এর বাহক হয়েও প্রকাশ ভঙ্গীর স্বকীয় বলিষ্ঠতার দ্বারা, এবং কাব্যের সুমধুর ঝংকার তুলে মানব মনের তন্ত্রীতে অনুরণন তুলতে বিলম্ব করে নি।

(ভবিষ্যতে এই সিরিজের অন্য দেশের শ্রেষ্ঠ চিত্র নিয়ে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল। পাঠকদের মতামত পেলে বাধিত হবো।)

* * * * *

— চিত্রলেখা —

মন মেজাজ এমনিতেই বিগড়ে ছিল লীলার তার ওপর বাসের ভিতরকার যাত্রীদের এই কোলাহল তার মেজাজটাকে আরও তিক্ত করে দিল। একটা বৃহৎ লোক একগাদা মালপত্র নিয়ে বাসে উঠে কনডাকটারের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়েছে। বাসগুলো যেন মাল বইবার গরুর গাড়ি! এদেশের লোকগুলোয় Civic sense বলে কোন পদার্থই যে নেই জীবনে আজ এই প্রথম অনুভব করল লীলা। ওদিকে ঝগড়াটা থামবার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না, আরও যেন বেশী করে জট পাকাবার দিকেই এগুচ্ছে। আর বাসের অন্যান্য যাত্রীগুলোও হয়েছে তেমনই কোথায় থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে তা নয় ক্রমাগত দু'তরফকেই সমানভাবে উস্কানী দিয়ে চলেছে। অপরকে লড়িয়ে দিয়ে নিখরচায় মজা দেখবার তাল! অত্যন্ত বিরক্তচিত্তে জানালার বাইরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসল লীলা।

দ্রুত অপস্রিয়মাণ সহরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চন্দ্রশেখর পাঠকের কথা মনে পড়ল। ফেলে আসা জীবনের কোন কিছুই সে মনে রাখতে চায় না তবু চন্দ্রশেখর পাঠককে একেবারে মন থেকে উপড়ে ফেলাও সম্ভব নয়। যেমন দাম্ভিক তেমনি অহঙ্কারী। যশোমতীর ব্যাপারে তিনি যা ঠিক করবেন তাই চূড়ান্ত বলে সবাইকে মেনে নিতে হবে! কেন? যশোমতীর কি নিজস্ব কোন ইচ্ছে অনিচ্ছে নেই? কমলাদেবী এই নিয়ে বলতে এসেছিলেন এক ধমকে তাকে চুপ করিয়ে দিয়েছেন চন্দ্রশেখর। মেয়েছেলে জাতটাকে তার ভাল করেই চেনা আছে। মেয়েদের আবার নিজস্ব সত্তা? স্ত্রীস্বাধীনতার বুলি যত ইচ্ছে বাইরে কপচাও গে যাও কিন্তু আমার কাছে নয়। শো কেশের সাজান পুতুলের সঙ্গে মেয়েদের কোনই তফাৎই নেই। একটা প্রাণহীন, অপরটা হাত পা নেড়ে চলে ফিরে বেড়ায় এই যা তফাৎ। যেভাবে

তাদের চালানো হবে সেইভাবেই চলবে তারা, চলতে তারা বাধ্য, এই হোল মোটামুটি চন্দ্রশেখর পাঠকের অভিমত মেয়েদের সম্বন্ধে। এই ধরণের লোকের ওপর কোন মেয়েরই শ্রদ্ধা থাকতে পারে না, হোলই বা সে—

"টিকিট"

চমক ভেঙে গেল লীলার। কনডকটারের ডাকে বাধ্য হয়েই এদিকে তাকে মুখ ফেরাতে হল। মুখ ফেরাতেই নজরে পড়ল আগেকার সেই বদখৎ লোকটার দিকে। লটবহর সামলাতেই ব্যস্ত। অন্য কোন দিকে তাকবার মত ফুরসৎও নেই। কি করে লোকটা! বোধহয় কোন ছোটখাট ব্যবসাটাবসা আছে! চন্দ্রশেখর পাঠকের মত লাভলোকসানের হিসেব কষতে কষতেই দিন কেটে যায়।

"টিকিট" তাগাদা দিল কনডাকটার।

অত্যন্ত বিরক্তচিত্তে পাশের দিকে হাত বাড়াল লীলা। পরমুহূর্ত্তেই চমকে ঘুরে তাকাল। সর্বনাশ, এ কি? কখন যে কাণ্ডটা হয়ে গেছে সে জানতেও পারেনি? ফাঁকা জায়গাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হল চোখের সামনে একটা কাল পর্দ্দা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে।

"কি হোল টিকিটটা দিন" অধৈর্য্যভাবে বলল কনডাকটার।

কোনরকমে একটু সামলে নিল। এদিক ওদিক একটুখানি দেখে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল "আমার—এটাচি কেশটা—পাচ্ছি না।

একটু সচকিত হল কনডাকটার। "এটাচি কেস? কোথায় রেখেছিলেন?" জিজ্ঞেস করল সে।

পাশের খালি জায়গাটার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করল লীলা "এইখানেই তো ছিল।"

"ছিল তো গেল কোথায়?" সামনের রড ধরে দাঁড়িয়ে থাকা একজন মাঝবয়েসি লোক জানতে চাইল।

পরমুহূর্ত্তেই একটা প্রচণ্ড রকমের হৈচৈ শুরু হয়ে গেল বাসের মধ্যে। মন্তব্যের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠল লীলা। যদিও এটাচি কেসটা চুরি গেছে তারই তবুও মনে হল সে যেন একটা মস্ত বড় অপরাধ করে ফেলেছে। হাত পা অবশ হয়ে এল তার। কি করবে ভেবে পেল না সে।

কোলাহল একটু কমলে কনডাকটার আবার তাগাদা দিল "কই টিকিটটা দিন! কোন কথাই কানে গেল না লীলার। শূন্যদৃষ্টিতে কনডাকটারেরদিকে তাকিয়েরইল সে!

দৃশ্য গ্রহণের আগে সহকারী আলোকচিত্র শিল্পী শঙ্কর দাস সুপ্রিয়া দেবীর মুখের আলোর সমতা পরীক্ষা করে দেখে নিচ্ছেন।

বদখৎ সেই লোকটি এবারে এগিয়ে এল। খিঁচিয়ে বলল কনডাকটারকে "টিকিটটা দিন, কোথেকে দেবেন শুনি? বাস হতে ব্যাগ চুরি হয়ে গেল আর উনি এলেন টিকিট আদায় করতে!"

কনডাকটারও ঝাঁঝিয়ে উঠল। "ব্যাগ চুরি গেল তো আমি কি করব? আমি কি মালের পাহারাদার নাকি! বাসে এরকম কাণ্ড হামেশাই ঘটছে। টিকিট না দিতে পারলে ওনাকে বাস হতে নামিয়ে দিতে হবে আমায়।"

"দিন দেখি একবার গাড়ি হতে নামিয়ে, আপনার ক্ষমতাটা কতদূর একবার দেখাই যাক!" রুক্ষভাবে বলল লোকটি।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন টিপ্পনি কাটল "অতই যদি দরদ তাহলে টিকিটের পয়সাটা আপনিই দিয়ে দিন না।"

ভিড়ের দিকে এবারে ঘুরে দাঁড়াল লোকটি। "কে বললে কথাটা, দেখি একবার তার মুখখানা।"

সমস্ত কিচির-মিচির এক পলকের মধ্যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। সবাই চুপচাপ। যে বলেছিল কথাটা তার মুখখানা অবশ্য আগেকার মতই নেপথ্যে রয়ে গেল।

আপন মনেই গজগজ করতে লাগল লোকটি। "এই মাগ্‌গী-গণ্ডার বাজারে দশ দশটা পয়সা সকালবেলাই গচ্চা, দিনটা ভালোয় ভালোয় কাটলে বাঁচি। যত সব অনাসৃষ্টি, হুঁ।"

কাঠ হয়ে বসে রইল লীলা। নির্বাক হয়ে শূন্যদৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল তার সামনের সবাক ঘটনার দিকে। কতক্ষণ যে সে এইভাবে বসেছিল তার খেয়াল নেই।

আমেদাবাদ ষ্টেশনের একটা বেঞ্চিতে বসে উদাসভাবে ট্রেনের আনাগোনা দেখছিল লীলা। কি করবে বা কোথায় যাবে কিছুই ভেবে পাচ্ছিল না সে। সবকিছু যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল তার। জীবনে প্রচুর টাকা নিয়ে সে একদিন ছিনিমিনি খেলেছে কিন্তু আজ এই সামান্য পাঁচ হাজার টাকার জন্যে যে তাকে এভাবে বিপদে পড়তে হবে এটা সে কোনদিনই ভাবতে পারেনি। হঠাৎ সে চমকে উঠল। চায়ের ষ্টলে দাঁড়িয়ে গল্প করছে শিবজি না? কিন্তু···না, অন্য লোক। বাঁচা গেল। আচ্ছা, এই অবস্থায় তাকে এইখানে এইভাবে বসে থাকতে দেখলে শিবজি কি ভাবত! যদিও ছেলেটাকে একটু ক্যাবলাজাতীয় মনে হয় তবুও তাকে একেবারে এড়িয়ে যেতে পারেনি যশোমতী। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেমন যেন একটু প্রশ্রয়ই দিয়ে এসেছে এতদিন। যশোমতীর কথা মনে হতেই কেমন যেন আগুন জ্বলে উঠল লীলার মাথার মধ্যে। চন্দ্রশেখর পাঠককে এই সংসারে যোগ্য প্রত্যুত্তর দেবার ক্ষমতা একমাত্র যশোমতীই রাখে। না, হার মানলে চলবে না—

"কি ব্যাপার, আপনি এখানে?" কে একজন প্রশ্ন করল।

চমকে ঘুরে তাকাল লীলা প্রশ্নকারীর দিকে। কাগজের মতই সাদা হয়ে গেল তার মুখ, এক ফোঁটাও রক্তের চিহ্নমাত্র নেই। বীরেন্দ্র যোশী কি করে—

বাসের সেই বদখৎ লোকটি তার লটবহর নামাতে নামাতে প্রশ্ন করল আবার "কত ছিল ব্যাগে?"

না, বীরেন্দ্র যোশী নয়। "তা প্রায় পাঁচ হা—শ পাঁচেকের মতন তো হবেই।" ঢোক গিলে আস্তে আস্তে বলল লীলা।

"ইস, অনেক টাকা তো; তা গেছেই যখন তখন আর তার কথা ভেবে খামোখা দুঃখ বাড়িয়ে লাভ কি বলুন?"

"হ্যাঁ, তা তো ঠিকই", একটু সহজ হবার চেষ্টা করল লীলা।

"দিনকালও হয়েছে যেমন, একটু অন্যমনস্ক হলেই দেখবেন কোনসময়ে হয়ত পরনের কাপড়খানাই কে খুলে নিয়ে চলে গেছে। ভাল কথা, আপনার নামটা তো জানা হয়নি" মালপত্র গুছোতে গুছোতে জিজ্ঞেস করল লোকটি।

বাসের ভাড়াটা ভদ্রলোকই দিয়েছিলেন। "লীলা নায়েক, আপনার? প্রশ্ন করল সে "শঙ্কর সরাভাই।" পকেট হতে নোটবইটা বার করে দেখতে দেখতে উত্তর দিল লোকটি।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। আপনমনেই নোটবইয়ের পাতাতে কি যেন সব লিখে চলেছে লোকটি। কেমন যেন অস্বস্তি লাগছিল লীলার। নিস্তব্ধটাকে ভাঙবার জন্যে একসময়ে জিজ্ঞেস করল "কতদূর যাবেন আপনি?"

"উঁ, কিছু বললেন নাকি?" নোটবইয়ের দিকে চোখ রেখে অন্যমনস্ক ভাবে বলল শঙ্কর সরাভাই।

"না, বলছিলাম কি যে কতদূর যাওয়া হবে আপনার?"

"এ্যাঁ! নোটবইটা এবারে যথাস্থানে রেখে একটু নিশ্চিন্ত হল শঙ্কর সরাভাই।" আমি? তা সেই মউলা অব্দি যেতে হবে আমা, আপনি কতদূর?

"আমি? কি বলবে ভেবে না পেয়ে বলে ফেলল লীলা আমিও তো ওইখানেই।"

"তাই বুঝি! যাক ভালই হোল", একটু যেন উৎফুল্ল মনে হল শঙ্করকে। তা এক কাজ করুন দিকি, এইখানে বসে আমার মালপত্রগুলো একটু পাহারা দিন চট করে আমি টিকিটটা করে আনি। আমার তো আবার সেই তিন নম্বরের ব্যাপার, আপনার?

"আমারও তাই", কিছু ভাববার আগেই বলে ফেলল লীলা।

ট্রেনের অসম্ভব ভীড় দেখে হতাশ হয়ে পড়েছিল লীলা। যাওয়া দূরে থাক কি করে গাড়িতে উঠবে সে এইটাই হোল একটা সমস্যা। এইরকম ভীড় ঠেঙিয়ে ট্রেনে উঠতে সে অভ্যস্ত নয়। তিন নম্বরে যে এইরকম কাণ্ড হয় তা কে জানত!

দেখা গেল শঙ্কর সরাভাই কিন্তু একটুও ঘাবড়ায়নি। নিজের একগাদা লটবহর নিয়ে তো উঠলই, লীলাকেও কায়দা করে টেনে তুলল কামরার মধ্যে। শুধু তাই নয়, একটা লোক শুয়েছিল রীতিমত ঝগড়া করে তাকে তুলে দিয়ে সেই জায়গায় লীলাকে বসিয়েও দিল। না, দেখা যাচ্ছে একেবারে বাজে মার্কা লোক নয় শঙ্কর সরাভাই। বোধহয় একটু আধটু ম্যাজিকও জানে। বেশ একটু কৃতজ্ঞবোধ করল লীলা।

আসল নাটকটা কিন্তু জমল দুটো তিনটে ষ্টেশন পেরিয়ে যাওয়ার পর। মূর্ত্তিমান আপদের মত চেকারের আবির্ভাব হল কামরার মধ্যে।

টিকিট চাইতে লীলা বলল "টিকিট! টিকিট তো আমার নেই।"

"নেই?" লীলার জামাকাপড়ের দিকে তাকিয়ে একটু যেন বিস্মিত হল চেকার। "বেশ, পরের ষ্টেশনে তাহলে আপনাকে নেমে আমার সঙ্গে যেতে হবে।"

"কোথায়?" ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল লীলা।

"ষ্টেশন মাষ্টারের ঘরে, উনি আপনাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।"

কানদুটো লাল হয়ে উঠল লীলার। "কেন?" প্রশ্ন করল সে।

এবারে ঝাঁঝিয়ে উঠল শঙ্কর সরাভাই। "কেন? বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়ে বেড়াবেন আবার প্রশ্ন করবেন কেন? লজ্জা করেনা আপনার? টিকিট কেনেননি কেন?"

"কি করে কিনব? বাসের ভিতরে আমার তো সব চুরি হয়ে গেল।" অসহায় ভাবে শঙ্করের দিকে তাকাল লীলা।

এবারে একটু থমকে গেল শঙ্কর। কথাটা তো মিথ্যে নয়। কিন্তু…একটা ভদ্রলোকের মেয়েকে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে টেনে নিয়ে যাবে এটাই বা কেমন ধারা কথা। অত্যন্ত রাগতভাবে পকেটের ভিতর হাত পুরল সে।

টিকিটের দাম তো দিতে হলই উপরন্তু পেনালটির টাকাটাও ফাউ দিতে হল। রাগে গজগজ করতে লাগল শঙ্কর। "সকালবেলায় কার মুখ দেখেছিলাম কে জানে? তখন হতে কেবলই গচ্চা দিতে হচ্ছে। এই মাগ্‌গীগণ্ডার বাজারে কড়কড়ে এতগুলো টাকা জলে গেল, না দেবায় না ধর্মায়।"

চুপ করে রইল লীলা। উত্তর দেবার মত কিই বা আছে তার! পকেট হতে নোটবই বার করে কি সব লিখতে লাগল শঙ্কর। বোধহয় সকাল হতে লীলার জন্যে কত গচ্চা গেল তারই হিসেব কষতে লাগল।

দুজনেই চুপচাপ। আস্তে আস্তে মেজাজটা একটু ঠাণ্ডা হল শঙ্করের। পাশের লোকটা উঠে যেতে বসবার একটু জায়গা পেল। নোটবইটা পকেটে পুরে খানিকক্ষণ মাথাটা চুলকোল। একবার বাইরের দিকে তাকাল।

পরে এদিকে ঘুরে লীলাকে জিজ্ঞেস করল "মউলাতে কাদের বাড়িতে যাবেন আপনি?"

"কাদের বাড়িতে? না, মানে—ওখানে একটা স্কুল আছে সেইখানে ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি।"

"ইন্টারভিউ দিতে? ও, তা পৌছতে পৌছতে তো রাত্তির হয়ে যাবে। থাকবেন কোথায়?"

"কোন একটা হোটেলে রাতটা কাটিয়ে দেব, একটা রাত্তিরের তো মামলা।"

"হোটেলে? জায়গাটাকে কি আপনি আমেদাবাদ শহর ভেবেছেন নাকি? একেবারে অজ পাড়াগাঁ ওটা, বুঝলেন!"

"তাহলে কি করব?" খুব দুর্বলভাবে জিজ্ঞেস করল লীলা।

খানিকক্ষণ কটমট করে তাকিয়ে রইল শঙ্কর। তারপরে বেশ একটু গরম মেজাজেই বলল "কি আর করবেন? সেই বাস থেকে তো দেখছি আমার ঘাড়েই ভর করে বসে রয়েছেন। এত সহজে কি আর আপনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে? তা দয়াকরে আজ রাত্তিরটা বাড়িতে থেকে আমার বাধিত করুন ওটুকুই বা আর বাকি থাকে কেন? কিন্তু সকালেবেলাই উঠে কেটে পড়তে

হবে মনে থাকে যেন, ব'সয়ে বসিয়ে অতিথি গেলাবার মত অবস্থা আমার নয়, বুঝলেন !"

শান্তশিষ্ট মেয়ের মতই ঘাড় কাত করে লীলা জানাল বুঝেছে। তারপরে একটু ভয়ে ভয়েই জিজ্ঞেস করল "বাড়িতে আপনার আর কে কে আছেন ?"

"কেন ? ট্রেন থেকে নেমে যে চুলোয় যেতে ইচ্ছে হয় চলে যাবেন, কেউ আপনাকে বাধা দেবে না। দিদির কাছে কি কৈ'ফয়ৎ দেব আমি ভেবে মরছি উনি হিসেব চাইতে এলেন বাড়িতে আমার কে কে আছে ? যত সব—

এক্ষেত্রে মুখে তালা দিয়ে রাখাই বাঞ্ছনীয়। মনে মনে ভাবল লীলা।

চুলোর দোরে অবশ্য যেতে হয়নি, শেষ অব্দি নিজের বাড়িতেই এনে তুলেছিল ওকে শঙ্কর। বাড়ি বলতে কুঁড়ে ঘর অবশ্যই, জীর্ণ দশা। সংসারের অবস্থা যে মোটেই স্বচ্ছল নয় এটুকু লীলা বুঝতে পেরেছিল।

একটু ফাঁকা জায়গায় বাড়ীটা, ষ্টেশন হতে অনেক দূরে। পৌঁছতে বেশ একটু রাতও হয়ে গেল।

দিদির জিম্মায় লীলাকে রেখে ঘর হতে বেরিয়ে গেল শঙ্কর। বোধহয় মুখ হাত ধুতেই গেল। ঘরের এক কোণে অত্যন্ত বিব্রত মুখে দাঁড়িয়ে ছিল লীলা। দিদি এগিয়ে এসে বললেন "অত ভাববার কি আছে ? গরীব দিদির কাছে যখন এসে পড়েছ তখন যা হয় একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। এই শঙ্কর শুনে যা একটু।"

ঘরে এসে ঢুকল শঙ্কর। অত্যন্ত বিরসবদনে বলল "কি বলছ ?"

"যা দেখি কস্তুরীদের বাড়ি থেকে আমার নাম করে দুখানা শাড়ী চেয়ে নিয়ে আয়।" চটে গেল শঙ্কর।

"পারব না, এত রাত্রে একমাইল হেঁটে গিয়ে কাপড় আনা আমার দ্বারা হবে না।"

"হবে না মানে ? মেয়েটা পরবে কি শুনি ?"

"তোমার যা কাপড় আছে তাই দাও। আজকের রাতটা চলে যাবে।"

রাগে এবারে ফেটে পড়লেন দিদি। "কি বললি তুই ?" নিজের থান কাপড়টা দেখিয়ে বললেন "আমার এই কাপড় মেয়েটাকে পরতে দেবো ? যা বলছি শিগগির, নিজে না পারিস বিহারীকে পাঠা।"

লীলার দিকে একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দুমদাম করে ঘর হতে বেরিয়ে গেল শঙ্কর। দিদি কাছে এগিয়ে এসে বললেন "তুমি কিছু মনে কোরো না। ও এরকম নয়, এমনিতে ওর মন মেজাজটা খুব ভাল নেই, ওই নড়বড়ে ব্যবসাটা নিয়ে ও কি যে করবে ঠিক করতে পারছে না।"

ইণ্টারভিউ অবশ্য পরদিন দেওয়া হল না, তার পরদিনও না, তার পরের দিনও না। শরীর খারাপ ও অন্যান্য অজুহাত দেখিয়ে পাশ কাটিয়ে যেতে লাগল লীলা। দিদি যতই লীলাকে প্রশ্রয় দিতে লাগলেন ততই রাগে জ্বলে যেতে লাগল শঙ্কর। বিহারী ও ভাগ্নেটাও লীলার দলে ভিড়ে গেছে। "কতদিন আর তোমার এইরকম অতিথি সেবা চলবে বলতে পার ?" দুম করে একদিন ও বলেই ফেলল দিদিকে।

"কেন ? ও থাকাতে তোর অসুবিধেটা কি হচ্ছে শুনি ?" বললেন দিদি।

"সে আর তুমি কি বুঝবে ! গিন্নির যোগাড় তো আমাকেই করতে হয়। কাল সকালেই বিদেয় কর ওই ঝনঝাটটাকে।"

"করব না, যতদিন ওর ইচ্ছে ততদিন ও থাকবে, বিদেয় করতে হলে আমাদের সবাইকে বিদেয় করে দে, তুইও বাঁচবি আমরাও বাঁচব।"

পাশের ঘরে শুয়ে শুয়ে সব কথাই শুনতে পাচ্ছিল লীলা। রূপসী বলে যথেষ্ট সুনাম আছে তার কিন্তু শঙ্করের ওসব দিকে কোন ভ্রুক্ষেপই নেই। তাড়াতে পারলেই যেন বাঁচে। কদিন ধরে দেখেও মানুষটা যে কেমন তা আজও বুঝতে পারে না লীলা। পুরুষমানুষ অনেক দেখেছে কিন্তু এরকম বদখৎ লোকের সংস্পর্শে এর আগে জীবনে কোনদিন আসেনি সে। মেয়েদের বেলায় সাধারণ ক্ষেত্রে পুরুষদের মনটা একটু নরমই থাকে কিন্তু এক্ষেত্রে সব ব্যাপারটাই যেন উল্টোরকমের ঘটেছে। এর আগে আরও জন চারেক পুরুষের সংস্পর্শে তাকে আসতে হয়েছে অনিচ্ছা সত্বেও, যারা যশোমতীর সামান্য একটু সঙ্গ পাবার

লোভে সবকিছুকে সহজেই উপেক্ষা করতে পারত। যশোমতীর অর্থের অথবা সম্পত্তির প্রতি তাদের যে কোন লোভ ছিল না এটুকু সহজেই বলা যায় কারণ প্রত্যেকেই যথেষ্ট বিত্তবান ও জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। পতঙ্গের মত যশোমতীর রূপের আগুনে পুড়তে এসেছিল প্রত্যেকেই, যদিও এ ব্যাপারে যশোমতীর নিজের কিছুই করবার ছিল না। কান্তিলালের জন্যেই বীরেন্দ্র যোশীর সঙ্গে আলাপ করতে হয়েছিল, কমলাদেবীর মতে রমেশ চতুর্বিদের মত ছেলে ত্রিভুবনে খুঁজে পাওয়া মুস্কিল, অতএব সেখানেও অনিচ্ছাসত্ত্বেও অভিনয় করতে হয়েছিল, ওদিকে বিশ্বনাথ যাজ্ঞিক, যার বাবার সাহায্য না পেলে আজ চন্দ্রশেখর পাঠক Textile king হতে পারতেন না, সুতরাং বিশ্বনাথ যজ্ঞিককে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠছে না, তার ওপর রয়েছে শিবজী, যশোমতীর সামান্য একটু মুখের কথা পেলেই পৃথিবীর সব অসম্ভবই এক মুহূর্তেই সম্ভব করে ফেলতে পারে। এদের সবায়ের সঙ্গে বন্ধুত্বের সহজ সম্পর্ক হতে পারে কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে কারুকেই স্থান দেওয়া যে সম্ভব নয় যশমতীর পক্ষে এই সহজ কথাটা কেউই বুঝতে চায় না। সবাই চায় তাদের ইচ্ছেমত যশোমতী চলুক। কিন্তু যশোমতী যে দাবার ঘুঁটি নয় খেলুড়ের ইচ্ছেমত সে যে চলবে না এই কথাটা ওদের এবারে ভাল করে বুঝিয়ে দিতেই হবে।

যশোমতীর চিন্তায় বর্তমান পরিবেশ হতে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল লীলা। হঠাৎ ওর চিন্তার জাল ছিন্ন হয়ে গেল খটাং খটাং একটা আওয়াজে। আওয়াজটা তাঁতঘর হতেই আসছে মনে হল। উঠে বসল লীলা। যা ভেবেছে তাই! কিন্তু এত রাত্রে তাঁত চালাচ্ছে কে? বিহারী ও রামু এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চয়। শঙ্করই বোধহয় তাঁত চালাচ্ছে। নিশ্চয়ই তাই। পৃথিবীতে ঐ একটি মাত্র জায়গা আছে যেখানে থাকলে রুক্ষ মেজাজের ঐ মানুষটি সম্পূর্ণ বদলে গিয়ে একজন অন্য মানুষ হয়ে ওঠে। কিন্তু কিই বা আছে ওখানে! গোটা তিনেক ভাঙাচোরা তাঁত। ওগুলোই হচ্ছে শঙ্করের আপনজন। নিজের ছেলের মতই ভালবাসে ও ওগুলোকে। ইচ্ছে থাকলেও ওঘরে ঢুকতে কোনদিন সাহস হয়নি লীলার; কিন্তু আজ এই মুহূর্তে কৌতূহল কেমন যেন আর বাগ মানতে চায় না। যে মানুষের বাইরের খোলসটা লীলাকে একপাও এগুতে দেয়নি তার অন্তরটা কেমন জানবার আগ্রহে তার মনটা ভয়ানক অস্থির হয়ে ওঠে।

তাঁতঘরের দরজার কাছে চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে লীলা। সাহসে ভর করে একটু পরে ভেতরের দিকে এগোয়। ঘরের অপর প্রান্তে বসে আপনমনেই বুনে চলেছে শঙ্কর। ম্লান আলোয় শঙ্করের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় লীলা। ধ্যানমগ্ন শঙ্করের দিকে তাকিয়ে লীলার মনে হয় জীবনে আজ এই প্রথম সে একটি পবিত্র মুখের ছবি দেখতে পেল। সে ছবি দেখবার সৌভাগ্য জীবনে এই মুহূর্তের আগে কোনদিন আসেনি, আর আসবেও কিনা কেউ জানে না। শরীরের সমস্ত রক্ত এসে ঢেউএর মত আছড়ে পড়ল বুকের মাঝে। অব্যক্ত একটা আনন্দের জোয়ারে ডুবে গেল তার সমস্ত সত্তা।

কতক্ষণ সে এইভাবে দাঁড়িয়েছিল তার মনে নেই। শঙ্করের ডাকে একসময় তার চমক ভাঙল। ওখানে এইভাবে লীলাকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শঙ্করও কম বিস্মিত হয় নি।

"ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছেন?

"দেখছি", কোনরকমে একটা ঢোঁক গিলে বলল লীলা।

"অতদূর হতে ভাল দেখতে পাবেন না।" বলল শঙ্কর। পরমুহূর্তেই আবার কাজের মধ্যে ডুবে গেল।

একটু আশ্বস্ত হল লীলা। মেজাজটা এখন বেশ ভালই আছে মনে হচ্ছে। আস্তে আস্তে ভেতর দিকে এগুলো। আরও দুটো তাঁতে খানিকটা করে শাড়ি বোনা রয়েছে, এখনও শেষ হয়নি। কাছে গিয়ে দেখে অবাক হয়ে গেল লীলা। ওর মনে হল একজন পাকা শিল্পী ছাড়া সাধারণ কাপড়ের বুকে এত চমৎকার নক্সা করা কারুর পক্ষে সম্ভব নয়।

যে তাঁতটায় বসে শঙ্কর কাজ করছিল সেটার কাছে এসে দাঁড়াল লীলা। একমনে লক্ষ্য করতে লাগল শঙ্করের কাজের ধারা। খানিকটা দেখবার পর ডিজাইনের অভিনবত্ব ও রঙের কম্বিনেশন দেখে বিস্ময়ের মাত্রা তার চরমে গিয়ে ঠেকল। যেন কোন যাদুকরের কাজ দেখছে বলে

মনে হল। খানিক পরে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করল "এই সমস্ত ডিজাইন কি আপনার করা ?"

কাজ করতে করতেই মাথা হেলিয়ে সায় দিল শঙ্কর।

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে লীলা বলল "একটা কথা বলব ?"

"কি ?"

"কটন চেম্বার্সের কমপিটিশানে আপনি কাপড় পাঠান না কেন ?"

"কি হবে পাঠিয়ে ! নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিল শঙ্কর।

"কেন ? প্রতিযোগিতায় জিতলে অনেক টাকা পাবেন। ব্যবসাটা ভালভাবে দাঁড় করাতে পারবেন।" একটু উত্তেজিতভাবে বলল লীলা।

"খুঁটির জোর না থাকলে ওসব জায়গায় কমপিটিশানে জেতা যায় না। আগের মতই শান্তভাবে উত্তর দিল শঙ্কর।

চন্দ্রশেখর পাঠকের কথা মনে পড়ল লীলার। উত্তেজনাটা ঝিমিয়ে এল। একটুখানি চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলল "তা ঠিক।"

হঠাৎ শঙ্কর প্রশ্ন করল "কটন চেম্বার্সের কমপিটিশানের কথা আপনি কোত্থেকে জানলেন ?"

প্রশ্নের আকস্মিকতায় প্রথমটায় একটু নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল লীলা, সামলে নিয়ে বলল "আমার এক বন্ধুর বাবার কাছে শুনেছিলাম।"

"ও," কাজের মধ্যে আবার ডুবে গেল শঙ্কর।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর কাজ দেখতে লাগল লীলা। একসময়ে বলল "আমাকে শিখিয়ে দেবেন !"

"কি ?" প্রশ্ন করল শঙ্কর।

"আপনার কাজ।"

ম্লান একটুকরো হাসি ফুটলো শঙ্করের মুখে। "আপনি এম,এ পাশ করে আমার কাজ শিখতে চাইছেন ? দেখছেন তো আমাদের অবস্থা ! দুবেলা দুমুঠো খাবারও সব সময় জোটে না। আর কিছুদিন পরে এসব পাঠ তুলে দিয়ে চাকরীর খোঁজেই আমাকে বেরতে হবে শেষ অব্দি।"

"না, না," আর্তনাদ করে উঠল লীলা, "কোন উপায়ই কি নেই ?"

একসময়ে আপনমনেই বলল "টাকা, কোথাও হতে যদি হাজার ত্রিশেক টাকা জোগাড় করতে পারতাম ! তাহলে আমিও দেখিয়ে—

তাঁতঘর হতে প্রায় দৌড়েই বেরিয়ে এল লীলা। নিজের ঘরে এসে বালিশের তলা থেকে রুমালে বাঁধা একটা ছোট পুঁটলী নিয়ে আবার বেরিয়ে গেল উত্তেজিতভাবে।

জড়োয়া গয়নাগুলোর জৌলুসে শঙ্করের চোখ যেন ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল। একদৃষ্টিতে ও গয়নাগুলোর দিকে তাকিয়ে বসেছিল। গয়নাগুলো একে একে শঙ্করের সামনে রেখে লীলা বলল "বেচে দিন এগুলো, যা টাকা পাওয়া যাবে তাই দিয়ে নতুন করে আবার শুরু করুন আপনার কাজ। থেমে গেলে চলবে না আপনার।"

নির্বাক হয়ে বসে রইল শঙ্কর।

"এই গয়নার জন্যে বা টাকার জন্যে কোনো কৈফিয়ৎ আপনাকে কাউকে দিতে হবে না কোনোদিন।

"কেউ কোনোদিন কোনো কৈফিয়ৎ চাইবে না আপনার কাছে। যেমন ভাবে ইচ্ছে, যেভাবে ইচ্ছে আপনি খরচা করুন, পেছিয়ে আসা চলবে না আপনার।"

একদৃষ্টিতে লীলার দিকে তাকিয়ে ছিল শঙ্কর। এ কোন্ লীলা ! গত কদিন যাবৎ যাকে দেখেছে সে এ লীলা নয়। আজ, যেন এই মুহূর্ত্তেই সে প্রথম আবিষ্কার করল লীলাকে, যে লীলা বুঝিয়ে দিল সে মোমের পুতুল নয় পুরুষের কর্ম্মসহচরী হবার দাবী তার জন্মগত।

"এভাবে হেরে যাওয়া চলবে না আপনার, জিততে আপনাকে হবেই।" কেমন যেন কান্নায় ভেজা শোনালো লীলার কণ্ঠস্বর।

বাইরের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল শঙ্কর। একসময়ে ধীরে ধীরে বলল "আপনার সাহায্যের জন্যে অশেষ ধন্যবাদ। আমি গরীব এটুকু ঠিকই, কিন্তু এত দীন এখনও হইনি যে আপনার যথাসর্বস্ব বেচে আমার নিজের অন্নের সংস্থান করতে হবে।"

অর্দ্ধসমাপ্ত কাপড়টার ওপর পরম স্নেহভরে হাত বুলোল শঙ্কর। যেন আদর করছে অত্যন্ত সন্তর্পণে পাছে আঘাত লাগে! বলল "জীবনের এতগুলো দিন যখন একাই যুদ্ধ করে এসেছি তখন এত সহজে হার স্বীকার করব না এটুকু আপনাকে কথা দিলাম। আপনার কথা আমার মনে থাকবে। আপনার সাহায্যের প্রয়োজনও আছে আমার জীবনে, কিন্তু আপনাকে সর্বস্বান্ত করে এভাবে সাহায্য আমি নিতে পারব না। প্রয়োজন যেদিন পড়বে সেদিন আমি নিজেই প্রার্থী হয়ে যাব আপনার কাছে, দূরে সরে থাকতে দেবনা।"

নিজের ঘরে ফিরে এসে বালিশে মুখ গুঁজে নীরব কান্নায় ভেঙে পড়ল লীলা। কেন যে তার এরকম ভয়ানক কান্না পেল ত সে নিজেও বুঝল না। জয়ের আনন্দে না পরাজয়ের গৌরবে? কে জানে!

দিন দুয়েক পরে চলে যেতে হল লীলাকে। ওখান হতে মাইল পঞ্চাশেক দূরে খেরাগাঁওতে একটা ভাল কাজের সন্ধান পাওয়া গেছে। অবশ্যই মাষ্টারীর কাজ। খুঁজে পেতে শঙ্করই কাজেরসন্ধানটা এনেছিল। খেরাগাঁওতে পৌঁছে দেবার জন্যে লীলাকে নিয়ে একসময়ে রওনাও হয়ে গেল শঙ্কর। যেতে ইচ্ছে করছিল না লীলার। কিন্তু না গিয়ে উপায়ও নেই। এভাবে কতদিন চলতে পারে! যাবার সময় দিদির, বিহারীর ও রাজুর ম্লানমুখ তাকে যেন আরও বিষণ্ণ করে তুলল। সামান্য কয়েক-দিনের পরিচয়ে দূরের মানুষ যে এত কাছাকাছি আসতে পারে জীবনে এই সর্বপ্রথম অনুভব করল সে।

চেক্‌টার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে শঙ্কর। স্পষ্ট পরিষ্কার সই রয়েছে যশোমতী পাঠক। টাকাটা আসলে দেবার কথা ছিল চন্দ্রশেখর পাঠকের কিন্তু ব্যাপারটা যে এইরকম দাঁড়াবে ভাবতে পারেনি শঙ্কর। কোন কথা না বলে চেক্‌টা সই করে মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়েছে যশোমতী। পঞ্চাশ হাজার টাকা যশোমতীর কাছে কিছুই নয়, কিন্তু এই একটি চেক তার জীবনের আমূল পরিবর্তন করে দিতে পারে এটুকু শঙ্কর ভাল [illegible] ব্যাপারটা খোঁজ নিয়ে দেখেছে ব্যাপারটা মোটেই বাজে নয়। শঙ্করকে চেনার মত মন যশোমতীর এখনও তৈরী হয়নি, নাইলে এতবড় ভুল সে এক্ষেত্রে করতে পারতনা এটুকু ঠিক। টাকার প্রয়োজন শঙ্করের খুব বেশী রকমেই আছে এটুকু অস্বীকার করবার উপায় নেই কিন্তু নিজের মনুষ্যত্বকে বিক্রি করে দেবে টাকার জন্যে এটাই বা যশোমতী কি করে ভাবতে পারল? অকারণে সহজ জিনিষকে ওরা এত জটিল করে তোলে…

বিশ্বনাথ যাজ্ঞিককে কোনরকমে বিদেয় করে নিজের ঘরে এসে চুপচাপ বসেছিল যশোমতী। কিছু ভাল লাগছে না। কাউকে সহ্য করতে পারছে না সে। সমস্ত হিসেব কেমন যেন তার গোলমাল হয়ে গেছে। লীলার কাছ হতে গয়না নিতে সেদিন শঙ্করের বিবেকে বেধেছিল কিন্তু যশোমতীকে টাকার জন্যে বিক্রি করে দিতে কোথাও তার এতটুকু বাধল না। লীলা গরীব বলে তার সামান্য সম্বলটুকু শঙ্কর নিতে পারেনি, যশোমতীর অনেক আছে বলেই স্বচ্ছন্দে তাকে টাকার জন্যে বেচে দেওয়া চলে এই বোধহয় শঙ্করের ধারণা। নীচ, ইতর, ছোটলোক, পঞ্চাশ হাজার টাকার লোভ সামলাতে পারল না শেষ অব্দি। এখন বোধহয় ওর ব্যবসাটা খুব ভালই চলছে! না চলবার তো কথা নয়। মনের মধ্যে অস্থির হয়ে ওঠে যশোমতী, একবার দেখে এলে হয় ব্যবসাটা কেমন জমেছে! গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সে। স্পীডোমিটারের কাঁটাটা ক্রমশঃ ওপরের দিকে উঠতে থাকে। দ্রুত, আরও দ্রুত যদি সে যেতে পারতো শঙ্করের কাছে?

জয়ের গৌরবটা একটু একটু করে চেখে দেখবে ভেবেছিল কিন্তু এভাবে যে তাকে হেরে গিয়ে ফিরতে হবে তা কে জানত? শঙ্কর বাড়ি ছিলনা, ওর দিদি যশোমতীকে এরকম অপমান করবেন তা সে কোনদিন চিন্তা করতেও পারেনি। ভেবেছিল এখন ওদের খুব স্বচ্ছল অবস্থা দেখবে, সেটা সম্ভব হয়েছে শুধু যশোমতীরই টাকায়, কিন্তু এখানে এসে সব হিসেব যেন গোলমাল হয়ে গেল আবার।

• • •

সংসারের দৈন্য আগের চেয়ে আরও প্রকট হয়েছে। কিন্তু কেন?

চন্দ্রশেখর পাঠক অবশ্য যশোমতীর মত বোকা নন যে বলেছেন বলেই এককথায় তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে দেবেন! যদিও সেদিনে যশোমতীর সামনে কোন আপত্তি তিনি করতে পারেননি। তাই পরদিন যখন তার অফিসে এসে চেকটা ফেরৎ দিয়ে গেল শঙ্কর তখন একটু বিস্মিত হলেও চেকটা ফেরৎ নিতে কোন আপত্তিও করেননি। যশোমতীর কাছে ব্যাপারটা তিনি চেপেই রেখেছিলেন কিন্তু শেষ অব্দি জেবার মুখে পড়ে সবকিছু স্বীকার করতে বাধ্য হলেন তিনি। মুখে সাহস দেখালেও আজকাল মনে মনে বেশ একটু ভয় করতে শুরু করেছেন যশোমতীকে। ইদানীং কেমন যেন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যশোমতী। কখন কি করে বসবে ঠিক নেই।

জিতে জিতে কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণা জন্মে গিয়েছিল যশোমতীর জেতার প্রতি। তাই ও চেয়েছিল হারতে। সহায় সম্বলহীনা লীলার কাছে যশোমতীকে হারতে হল শেষ অব্দি। একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেল যশোমতী। কি নিয়ে বেঁচে থাকবে সে? জীবনের কোন সম্বলই তো তার রইলনা শুধুমাত্র কয়েকটি রঙীন মুহূর্ত ছাড়া। বিশ্বনাথ, শিবজী, রমেশ, বীরেন্দ্র, এদের মধ্যে হতে যে কোন একজনকে বেছে নিতেই হবে শেষ অব্দি। কি যায় আসে! যে কেউ একজন হলেই হল। ওদের মধ্যে একজন হতে অপরজনের মধ্যে কোনই তফাৎ নেই। শুধু একটিমাত্র বাসনা একবার শঙ্করের সাথে দেখা হওয়া তার খুবই প্রয়োজন।

লীলার আজ খুবই প্রয়োজন শঙ্করকে। কিন্তু মউলা হতে ওরা কোথায় যে চলে গেছে কেউ জানেনা। যাবার আগে নিজের হাতে বোনা কাপড় লীলাকে উপহার দিয়ে শঙ্কর বলে গেছে জীবনের কাছে সে হার মানবে না, দিন একদিন আসবেই, সেদিন যত বাধাই আসুক না কেন লীলাকে তার কর্মসহচরী হয়ে এগিয়ে আসতেই হবে। নইলে সব আয়োজনই তার বৃথা হয়ে যাবে। শঙ্করের দেওয়া উপহার তার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে লীলা ভাবে শঙ্করের সহচরী হবার যোগ্যতা তার কতটুকু আছে! সে কি পারবে শঙ্করের উপযুক্ত হতে? মানুষটার যতটুকু পরিচয় সে পেয়েছে তাতে মনে হয়েছে যে তার ভালবাসার নদীর মতই। উপর হতে কিছুই বোঝা যায় না, অন্তরের মাঝে ডুব দিলে তবেই বোঝা যাবে তার গভীরতা কতখানি। তাই তাকে অপেক্ষা করতে হবে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এই সাবরমতীর তীরে, যেখানে একদিন দাঁড়িয়ে শঙ্কর তার ভালবাসার প্রথম স্বীকৃতি ও উপহার দিয়েছিল লীলাকে।

সাবরমতীর নদীর নামেই নামকরণ করেছেন পরিচালক হীরেন নাগ তাঁর আগামী ছবির। এখানকার ষ্টুডিওতে সুটিংয়ের পালা শেষ করে হঠাৎ কোথায় যে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন হীরেনবাবু খুঁজে পাচ্ছিলাম না। পরে খোঁজ পাওয়া গেল গুজরাটে গেছেন দলবল নিয়ে ছবির আউট-ডোরের দৃশ্য গ্রহণ করতে। আগে জানতে পারলে দলে ভিড়ে যেতাম। রথ দেখা ও কলা বেচা দুটো একসঙ্গেই হত। অবশ্য এ ছবির প্রযোজক প্রখ্যাত শব্দযন্ত্রী দেবেশ ঘোষ যা কেপ্পন লোক তাতে সঙ্গে গেলে যে আমার হাড়ে দুব্বো গজিয়ে ছেড়ে দিতেন এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই নেই। দরকার পড়লে হয়ত ধরে ক্যামেরার সামনে দাঁড় করিয়েও দিতেন। যা তিনি নিজের চেলা-চামুণ্ডাদের এ ছবিতে করেছেন। অবশ্য শেষ অব্দি ব্যাপারটা বুমেরাং হয়ে গেল। একটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করাবার জন্যে হীরেনবাবু কোন একজন লোককে মনে মনে এঁচে রেখেছিলেন। সুটিংয়ের দিনে দেখা গেল সে লোকটির কোন পাত্তাই নেই। ক্যামেরা খাটিয়ে লাইটিং করে সবাই বসে আছেন। এদিকে সময়, সময় মানে টাকা, নষ্ট হচ্ছে। আরও খানিকক্ষণ দেখে দেবেশবাবু বললেন "হীরেন, আজকের সুটিং না হওয়ার দরুন যে টাকা লোকসান হবে সেটা তোমার মাইনে হতে কাটা যাবে। তুমিই যত নষ্টের গোড়া।" কোন উত্তর না দিয়ে হীরেনবাবু মেকআপ্ম্যান্ বসীর সাহেবকে ডাকলেন। বসীর সাহেবকে বুঝিয়ে দিলেন কি ধরণের চরিত্র মেকআপের মারফৎ রূপান্তরিত করতে হবে। বসির সাহেব সব বুঝে নিয়ে বললেন "কিন্তু আর্টিষ্ট কই?" এবারে হীরেনবাবু বললেন "দেবেশ, বসিরের সঙ্গে মেক্-আপ্ রুমে গিয়ে তাড়াতাড়ি মেক্-আপ্টা সেরে

ইয়ারকির সময় নয়, আমি মরছি—" বাধা দিয়ে হীরেনবাবু গম্ভীর গলায় বললেন "এ ছবির ডিরেকটার কে? আমি না তুমি?" ঘাবড়ে গিয়ে দেবেশবাবু বললেন "ইয়ে, মানে তুমি।" "Very good, then please carryout my order, মনে রেখ বিনা কাজে আমার যদি আজকের সময় নষ্ট হয় তাহলে তোমাকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।" বললেন হীরেনবাবু। এবারে আর কোন কথা না বলে সুড়সুড় করে বসির সাহেবের সঙ্গে মেকআপ রুমে চলে গেলেন দেবেশবাবু। এতক্ষণ সবাই কোনরকমে হাসি চেপে বসেছিলেন এবারে একসঙ্গে ফেটে পড়লেন। প্ল্যানটা অনেক আগে হতেই করে রেখেছিলেন হীরেনবাবু, কাউকে জানতে দেননি এই যা।

যাই হোক সুটিঙের ব্যাপারে কিন্তু কোন কার্পণ্য কোন দিনই করেন না দেবেশবাবু। আজও করেননি। চরিত্র বুঝে বুঝে এ ছবিতে শিল্পী নির্বাচন করছেন। যেমন বলা যায় কমল মিত্র, ছায়াদেবী, রূপক মজুমদার, প্রশান্তকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, মাষ্টার অরিন্দম, বঙ্কিম ঘোষ, দীপ্তি রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার এবং সুপ্রিয়া দেবী ও উত্তমকুমার। দু'একজন নবাগতাকেও সুযোগ দিয়েছেন ভাল চরিত্রে। সুর সংযোজনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে গোপেন মল্লিককে যার সুরে গান গাইবার জন্য বম্বে হতে কিশোরকুমারকে আসতে হয়েছিল। ক্যামেরাম্যান্ বিজয় ঘোষ তাঁর আগেকার সমস্ত ছবির কাজের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন এ ছবিতে, অবশ্য পরিষ্কার কাজের জন্যে বিজয়বাবুর এমনিতেই সুনাম যথেষ্ট আছে। টেক্কা দিয়েছেন কিন্তু শিল্পনির্দ্দেশক কার্ত্তিক বসু। বাংলা দেশের ষ্টুডিওর ভেতরে গুজরাটের পরিবেশ নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে। বাংলা দেশের এক নম্বর আর্ট-ডিরেক্টার বলতে যা বোঝায় কার্ত্তিকবাবু হচ্ছেন তাই। নিজের কাজ ছাড়া তাঁর আর কোনদিকে ধ্যান জ্ঞান নেই। আর সবায়ের ওপর এ ছবির নাড়ী ধরে বসে আছেন শ্রীবিষ্ণু পিকচার্সের প্রধান কর্ণধার শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত। উঁচু জাতের ছবির প্রযোজনা ও পরিবেশন করাটাই যার একমাত্র নেশা ও পেশা।

সাবরমতী ছবির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এর আগে গুজরাটের পটভূমিকায় ও গুজরাঠী চরিত্র নিয়ে বাংলা ভাষায় আজ অবধি কোন ছবি হয় নি। এইটাই সর্বপ্রথম। আমার মনে হয় যদি পরে এই ছবিকে গুজরাঠী ভাষায় 'ডাব্' করে গুজরাঠে রিলিজের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে বোধহয় প্রযোজক লাভবান হতে পারেন। বাংলাদেশের ছবির সর্বভারতীয় সুনাম আছেই। সে ক্ষেত্রে বাঙলা দেশের শিল্পী ও কলা-কুশলীদের দ্বারা নির্মিত গুজরাঠী ভাষার ছবি গুজরাঠীদের দেখতে যে আগ্রহ হবে এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই নেই। যদি সম্ভব হয় দেবেশবাবু এ ব্যাপারে একটু ভেবে দেখবেন।

—শ্রীকান্ত

শৈল চট্টোপাধ্যায়
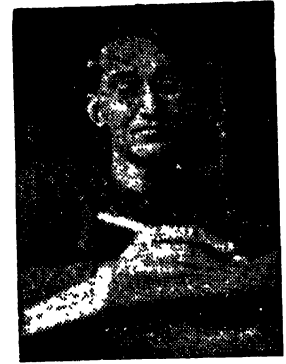
৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

—পঞ্চম টেষ্ট—

ইংলণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়ার পঞ্চম বা শেষ টেষ্ট শেষ হল। ওভাল মাঠে অনুষ্ঠিত এই টেষ্টের সমাপ্তির সঙ্গে ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার এই বৎসরকার টেষ্ট পর্য্যায়েরও সমাপ্তি হল। ইংলণ্ড দল এই টেষ্টে জয়লাভ করার ফলে এই পর্য্যায়ের ফলাফল অমীমাংসিত রয়ে গেল। অষ্ট্রেলিয়া প্রথম টেষ্ট জয়লাভ করে এগিয়ে ছিল। ইংলণ্ড পরে দু'টি টেষ্টে বিশেষ করে দ্বিতীয় টেষ্টে জয়লাভের মুখোমুখি হয়েও জিততে পারেন নি। কিন্তু এবারে সেই প্রথম টেষ্টের পরাজয়ের শোধ তুলে ইংলণ্ড তাঁদের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করল।

এই সদ্য সমাপ্ত পঞ্চম টেষ্টের ফলাফলের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় ইংলণ্ড দল জয়লাভ করার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে প্রাণপণ শক্তিতে এই টেষ্টে লড়েছে, এবং সেই জন্যেই প্রথম ব্যাটিং-এর সুযোগ সম্পূর্ণ গ্রহণ করে তাঁদের ব্যাটস্‌ম্যানেরা অমিতবিক্রমে খেলে ৪৯৪ রাণ সংগ্রহ করেছেন। অষ্ট্রেলিয়ার বোলিং-এর বিরুদ্ধে প্রায় পাঁচশ রাণ সংগ্রহ করা যথেষ্ট কৃতিত্বপূর্ণ বলা চলে। এই রাণ সংগ্রহের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ইংলণ্ডের ওপেনিং ব্যাটস্‌ম্যান্ জন এড্‌রিচ্-এর। ইনি ১৬৪ রাণ সংগ্রহ করেন ৪৬২ মিনিটে। এঁর এই রাণ সংখ্যার মধ্যে ২০টি 'চার' মেরেছিলেন অর্থাৎ বল বাউণ্ডারীতে পাঠিয়েছিলেন। এড্‌রিচ্ যখন ৩০ রাণ করেন তখনই উনি টেষ্ট খেলায় তাঁর নিজস্ব ২০০০ রাণ সংগ্রহ করার গৌরব লাভ করেন। ১৬৪ রাণ করার পর এড্‌রিচ্ চ্যাপেল্-এর একটি বল খেলতে গিয়ে মাথাটি কিছুটা উঁচু করে ফেলেন এবং বলের লাইন্ মিস্ করেন। বল তাঁর ব্যাটের পাশ দিয়ে ঢুকে মিডল্ ষ্টাম্পে আঘাত করে। দক্ষিণ আফ্রিকা-জাত ইংলণ্ড ব্যাটস্‌ম্যান্ বেসিল্ ড'লিভেরাও চমৎকার ভাবে খেলে ১৫৮ রাণ সংগ্রহ করেন। ড'লিভেরার খেলাও খুবই সুন্দর হয়েছিল। তিনি অনেক পরে খেলতে নেমেও এড্‌রিচ্‌কে পিছনে ফেলে দ্রুত রাণ সংগ্রহ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ১৫৮ রাণ সংগ্রহ করবার পর ম্যালেট-এর বলে ইন্‌ভেরারিটির হাতে 'কট্' আউট হন। টম্ গ্রেভনীও ৬৩ রাণ করে প্রশংসা অর্জন করেন এবং অ্যালান্ নটও দৃঢ়তাপূর্ণ ভাবে খেলে ২৮ রাণ করেন।

ইংলণ্ডের জয়

অষ্ট্রেলিয়া দল তাঁদের প্রথম ইনিংস আরম্ভ করে সুবিধা করতে পারেননি। দ্বিতীয় ওপেনিং ব্যাটস্‌ম্যান ইনভেরারিটি মাত্র এক রাণ করে জন স্নো-র দ্রুত বলে 'ক্যাচ' তুলে মিলবার্ণ-এর হাতে ধরা পড়েন। তারপর অষ্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ও ওপেনিং ব্যাটস্‌ম্যান বিল্ লরী ও আয়ান রেড্‌পাথ দৃঢ়তাপূর্ণ ভাবে খেলে অষ্ট্রেলিয়ার রাণ সংখ্যা

বাড়িয়ে নিয়ে চলেন। কিন্তু ফাষ্ট বোলার জন্ স্নো ও অফ্স্পিন বোলার রে ইলিংওয়ার্থ ভাল রকম বল করে ব্যাটস্ম্যানদের দাবিয়ে রাখেন। এই সময় আধ ঘণ্টায় মাত্র ১৩ রাণ করতে লরী ও রেডপাথ সক্ষম হন। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার বিপর্য্যয় সুরু হয় এবং রেড্পাথ ৬৭ রাণ করে স্নো-র বলে ইংলণ্ড অধিনায়ক কলিন্ কাউড্রের হাতে 'কট' আউট্ হন। এরপর আরও পাঁচটি উইকেট পড়ে কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক বিল্ লরী অধিনায়কোচিত দৃঢ়তায় দলের এই ভাঙ্গনের মুখে একাই প্রশংসনীয় ভাবে খেলতে থাকেন। কিন্তু লরী আউট হয়ে যাবার পর অষ্ট্রেলিয়ার আর কোনও ব্যাটস্ম্যানরা টিকতে পারেন নি। এবং শেষ পর্য্যন্ত এই টেষ্টে অষ্ট্রেলিয়াকে ইংলণ্ডের হাতে পরাজিত হতে হয়। ইংলণ্ডের এই জয় খুবই কৃতিত্বপূর্ণ হয়েছে বলা চলে।

— দক্ষিণ আফ্রিকাযাত্রী ইংলণ্ড দল —

ইতিমধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরকারী ইংলণ্ড ক্রিকেট দলের নির্ব্বাচন সমাধা হয়ে খেলোয়াড়দের নাম প্রকাশ করা হয়েছে। ৩৬ বৎসর বয়স্ক কেণ্ট কাউণ্টির কলিন্ কাউড্রেই অধিনায়ক নির্ব্বাচিত হয়েছেনএবং সহ-অধিনায়ক হয়েছেন উরসেসটার কাউণ্টির ৪১ বৎসর বয়স্ক টম্‌-গ্রেভ্নী। কাউড্রে খেলেছেন ১০১টি টেষ্ট এবং গ্রেভ্নী ৭৫টী টেষ্ট। অন্য খেলোয়াড়েরা হচ্ছেন :—কে, ব্যারিং-টন (সারে কাউণ্টি-বয়স ৩৮) খেলেছেন ৮২ টেষ্ট; জিয়োফ্ বয়কট্—(ইয়র্কশায়ার—২৮) ৩৫ টেষ্ট; ডেভিড্ ব্রাউন্ (ওয়ারউইক্শায়ার—৩৩) ৫ টেষ্ট; বি কোট্টাম্ (হ্যাম্পশায়ার—২৩) এখনও টেষ্ট খেলেন নি; জন্ এড্‌-রিচ (সারে—৩১) ৩১ টেষ্ট; কেথ্ ফ্লেচার (এসেক্স—২৪) ১ টেষ্ট; অ্যালান্ নট্ (কেণ্ট—২২) ৯ টেষ্ট; জন্ মারে (মিডলসেক্স—৩৩) ২১ টেষ্ট; রজার প্রিডক্স (নর্দাম্টন্‌-শায়ার- ৯) ১ টেষ্ট; প্যাট্ পোকক্ (সারে—২২) ৩ টেষ্ট; জন্ স্নো (সাসেক্স—২৬) ১৮ টেষ্ট এবং ডেরেক্ আণ্ডারউড্ (কেণ্ট—২৩) ৮ টেষ্ট। আর একটী স্থান এখনও অপূর্ণ রয়েছে। সেটী একজন ফাষ্ট বোলারকে নিয়ে পূর্ণ করা হবে বলে এম-সি-সি জানিয়েছেন।

ড'লিভেরা বাদ পড়লেন

এই নির্ব্বাচনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ্ টাউন জাত ইংলণ্ড ব্যাটস্ম্যান্ বেসিল ড'লিভেরার বাদ পড়া। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ সফরে ড'লিভেরা ব্যাটিং-এ বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি ঠিক কথা, কিন্তু ইংলণ্ডে তিনি বরাবরই ভাল খেলেছেন। বিশেষ করে অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সদ্য সমাপ্ত পঞ্চম টেষ্টে তিনি 'সেঞ্চুরী'ই শুধু করেননি, দ্রুতগতিতে রাণ তুলে ইংলণ্ডদলের জয়লাভের পথ সুগম করে তোলেন। কিন্তু এত করেও তিনি দক্ষিণ আফ্রিকাগামী দলে স্থান পেলেন না! বর্ণ বৈষম্যই কি এর কারণ? এ প্রশ্ন আজ সকল দেশের ক্রিকেট ক্রীড়া-মোদীদের মনে জাগছে।

ইংলণ্ড দলের নির্ব্বাচক মণ্ডলীর চেয়ারম্যান্ ডগ-ইনসোল বলেছেন—'আমরা মনে করি দলে আরও ভাল খেলোয়াড়দেরই পেয়েছি। নির্ব্বাচক কমিটি হিসাবে বিচার করে আমরা দেখেছি যে বাহিরে সফরের দিক থেকে তাঁকে (ড'লিভেরা) চৌকস খেলোয়াড়ের চেয়ে শুধু ব্যাটস্‌-ম্যান রূপেই গণ্য করা উচিত এবং তাঁকে কলিন্ মিলবার্ণ এবং সঙ্গের সাতজন ব্যাটস্ম্যানের মধ্যে ধরা হয়েছিল, কিন্তু কলিন মিল্বার্ণ-এর সঙ্গে তাঁকেও বাদ দিতে হয়েছে। এর সঙ্গে গ্লামরগ্যান্-এর ব্যাটস্ম্যান্ অ্যালান্ জোন্সও বাদ পড়েছেন।'

এম, সি, সি-র সেক্রেটারী চার্লী গ্রিফিথ্ বলেছেন—'দল নির্ব্বাচনের কোনও পূর্ব্বশর্ত্ত "দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট এসোসিয়েশন্" আমাদের ওপর আরোপ করেন নি। ক্রিকেট খেলার দিক থেকে এবং যাতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে পরাজিত করা যায় সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই দল নির্ব্বাচন করা হয়েছে এবং সবচেয়ে সেরা খেলোয়াড়দের নিয়েই সফরকারী দল গঠন করা হয়েছে।'

ড'লিভেরা নিজে কিন্তু খুবই আশাহত হয়ে পড়েছেন। ইংলণ্ডের নির্ব্বাচক মণ্ডলীর সভ্যরা যাই বলুন না কেন বিশ্ব জনমত কিন্তু মনে করছে ড'লিভেরার বাদ পড়ার প্রধান কারণ হল বর্ণবৈষম্য! তাই নতুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের জাতি বৈষম্যের একটি সেমিনারে বৃটিশ প্রতিনিধি টি, সি, প্ল্যাট্ও বলেছেন, "This is not Cricket!" তিনি এই সভায় এই প্রসঙ্গ

উত্থাপন করে বলেন যে এটি বৈষম্যমূলক আচরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। গুয়েনার প্রতিনিধি এন, বিসেস্বার বৃটিশ প্রতিনিধিকে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। ইরাণের প্রতিনিধি এম, গ্যাঞ্জি জাতি বৈষম্যের এবং এর সমর্থক দুষ্টচক্রের নিন্দা করেন। রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান্ শ্রীমতী ভায়োলেট্ আলভা এই বৈষম্যমূলক আচরণের নিন্দা করে বলেছেন যে এ অত্যন্ত লজ্জার কথা—"What a Shame!"

অবশ্য দক্ষিণ আফ্রিকার জোহেন্সবার্গ থেকে বলা হয়েছে যে ড'লিভেরার বাদ পড়ায় দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট মহল স্তম্ভিত হয়েছে। ড'লিভেরা নির্ব্বাচিত হলে অবশ্যই তাঁর জন্যে দক্ষিণ আফ্রিকার কঠিন বর্ণবৈষম্য মূলক নিয়মকানুনগুলি, যাতে হোটেল-রেষ্টুরেণ্ট প্রভৃতি স্থানে শাদা মানুষের সঙ্গে কালো চামড়ার লোকেদের এক সঙ্গে চলাফেরা করতে দেওয়া হয়না, তা শিথিল করে ড'লিভেরার তাঁর শাদা চামড়ার সহ-খেলোয়াড়দের সঙ্গে একত্রে আহার-বিহারের ব্যবস্থা করা হত বলেই দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট মহল বিশ্বাস করেন। কিন্তু যে যাই বলুন, ইংলণ্ড নির্ব্বাচক মণ্ডলি ড'লিভেরাকে বাদ দিয়ে তাঁদের নিজেদের যে মস্ত ক্ষতিসাধন করলেন তাতে সন্দেহ নেই, কারণ ড লিভেরা যদি দলে থাকতেন তাহলে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বৈষম্যমূলক আইনের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ তাঁর কৃষ্ণচামড়ার তলের মনে জমে আছে, তার স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্ফুরণ তিনিদেখাতে পারতেন দক্ষিণ আফ্রিকার মাঠেতাদের শ্বেতকায় বোলারদের নির্ম্মমভাবে পিটিয়ে খেলে—তিনি নিশ্চয়ই প্রমাণ করতে চাইতেন তাঁর কৃষ্ণ ভাইদের সামনে যে শাদা খেলোয়াড়দের চেয়ে কালো খেলোয়াড়রা মোটেই হীন নয়, তারাও শাদাদের তৈরী 'পীচে', শাদা বোলারদের পিটিয়ে সেঞ্চুরীর পর সেঞ্চুরী করতে পারে! কৃষ্ণকায়খেলোয়াড়রা যাতে এইরূপ গৌরবজনক খেলার গৌরবলাভ করতে না পারেসেইজন্যেইড'লিভারাকেকি বাদদেওয়াহল? তিনি দলে থাকলে জয়ের পথ সুগম হত জেনেও শুধু ঈর্ষার বশবর্ত্তী হয়েই কি তাঁকে নেওয়া হল না?—এই সকল প্রশ্নের সম্মুখীন ইংলণ্ডের নির্ব্বাচক মণ্ডলীকে হতেই হবে, আর আমরা বলব ইংলণ্ড মস্ত ভুলই করেছে। এতে তাঁদের দলের শক্তিও কমল এবং নির্ব্বাচনের নিরপেক্ষতা ও বর্ণবৈষম্যের সম্বন্ধে বিশ্ব-ক্রিকেট মহলে যে প্রতিক্রিয়া জাগছে এবং প্রশ্ন উঠছে তার জবাবদিহিও তাঁদের করতে হবে।

— 'মারদেকা' ফুটবল —

"মারদেকা" ফুটবল প্রতিযোগিতায় মালয়েশিয়া গতবারের যুগ্ম বিজয়ী বর্ম্মী দলকে ৩-০ গোলে পরাজিত করে বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছে। এই খেলায় হাফ্‌টাইম্ অবধি কোনও গোল হয় নি। তারপর ৫৩ মিনিট খেলা চলবার পর মালয়েশিয়ার লেফট্ উইং জুলকিফ্‌লি নরবিট একটি 'ফ্রি কিক্' থেকে চমকপ্রদভাবে হেড করে বর্ম্মী গোলের এক কোণ ঘেঁসে বলটি ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দেন। মাত্র তিন মিনিট পরেই সেণ্টার ফরোয়ার্ড শাহরুদ্দিন আবদুল্লা পেনাল্টি বক্সের কাছ থেকে বর্ম্মী গোলের একেবারে ডান দিক ঘেসে সট্ করে দ্বিতীয় গোল করেন। আবার ৬৮ মিনিটের মাথায় ইনসাইড রাইট্ এন্ থানাবলম্ রাইট্ ব্যাক আবদুল্লা নুরদিনের কাছ থেকে বল পেয়ে পেনাল্টি বক্সের ডান ধার থেকে গোল করেন। বর্ম্মা দল দ্বিতীয় গোলের পর থেকেই অবশ্য আক্রমণ করে খেলছিল এবং ৭২ মিনিটের সময় মালয়েশিয়ার গোল রক্ষক চৌ চী কিয়োং একটি বর্ম্মী ফরোয়ার্ড-এর প্রায় পায়ের ওপর থেকে বল ধরে ফেলেন।

এই কৃতিত্বপূর্ণ জয়লাভের ফলে মালয়েশিয়া আবার ৪০০০ ডলার মূল্যের "টুঙ্কু আবদুল রহমান" ট্রফী লাভ করল। ১৯৬০ সাল থেকেই মালয়েশিয়া এই পুরস্কার লাভ করে আসছে। সে বছর দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে যুগ্ম ভাবে বিজয়ী হয়েছিল এবং গত বছর বর্ম্মার সঙ্গে যুগ্ম বিজয়ী হয়ে এই ট্রফী লাভ করেছিল।

এই 'মারদেকা' প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ১২টি দেশের মধ্যে একমাত্র মালয়েশিয়াই অপরাজিত থেকে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। বর্ম্মা হয়েছে দ্বিতীয় এবং পশ্চিম অষ্ট্রেলিয় দল বৃষ্টিসিক্ত মাঠে ইন্দোনেশিয়াকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে তৃতীয় স্থান লাভ করেছে। চতুর্থ

স্থান পেয়েছে ইন্দোনেশিয়া এবং ভারতকে ১-০ গোলে হারিয়ে দক্ষিণ কোরিয়া লাভ করেছে পঞ্চম স্থান, আর ভারতের ভাগ্যে জুটেছে ষষ্ঠ স্থান।

ভারতের ভাগ্য ভাল নয়

এবারকার এই প্রতিযোগিতায় ভারত শক্তিশালী বর্মা দলকে পরাজিত করে সকলের মনে আশার সঞ্চার করেছিল। কিন্তু বিভাগীয় লীগে থাইল্যাণ্ডের মতন একটি দুর্ব্বল দলের কাছে এক গোলে হেরে গিয়ে ভারতের সমর্থকদের নিরাশ করেছে। এই খেলাটির আগে পর্য্যন্ত ভারত ও থাইল্যাণ্ড যে চারটি খেলা খেলেছিল তাতে ভারত লাভ করেছিল পাঁচ পয়েণ্ট এবং থাইল্যাণ্ড দুই পয়েণ্ট। এর আগে থাইল্যাণ্ড একটি খেলাতেও জিততে পারে নি। কিন্তু এই খেলায় ভারতকে হারিয়ে থাইল্যাণ্ড বিভাগীয় লীগে যুগ্মভাবে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সঙ্গে চতুর্থ স্থান লাভ করে।

থাইল্যাণ্ডের সঙ্গে এই খেলায় ভারত কিন্তু গোড়ার দিকে ভালই খেলছিল। এগার মিনিটের সময় সাদাতুল্লার একটি জোরাল সট্ থাই গোলরক্ষক চও ওন ল্যাম্ কোনও ক্রমে ফিরিয়ে দেন। এরপর একুশ মিনিটের সময় ইন্দর সিং-এর সেণ্টার থেকে রাইট্ আউট্ অশোক চ্যাটার্জী গোল করবার একটি সুন্দর সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বাইরে সট্ মারায় এই সুযোগটি নষ্ট হয়। সাঁইত্রিশ মিনিট খেলা চলবার পর পেনাল্টি সীমানার কাছ থেকে থাইল্যাণ্ডের লেফট্ ইন্ ক্রিয়েংসাক্ বাঁ পায়ের জোরাল সট্ মেরে ভারতের বিরুদ্ধে খেলার একমাত্র গোলটি করেন। গোল খাবার পর ভারতীয় দল প্রবল বেগে আক্রমণ চালায় বটে, কিন্তু তাদের দুর্ব্বল সটের জন্য এবং থাই গোলরক্ষকের দৃঢ়তায় ভারতের গোল করার সকল চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়।

দক্ষিণ কোরিয়ার কাছেও হারল

এরপর দক্ষিণ কোরিয়ার দলও ভারতকে ১-০ গোলে পরাজিত করল এবং এই পরাজয়ের ফলে ভারত পঞ্চম স্থান লাভেও বঞ্চিত হয়ে ষষ্ঠ স্থানে নেমে গেল। খুব অল্পসংখ্যক, প্রায় হাজার খানেক দর্শক সমক্ষে ভারত বনাম দক্ষিণ কোরিয়ার এই খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। বৃষ্টি পড়ে মাঠ বেশ ভিজে ছিল। দু'পক্ষই প্রায় সমান সমান ভাবে খেলা চালিয়ে যান। ২৪ মিনিটের সময় কোরিয় ফরোয়ার্ড বু উন্ জুং বেশ কাছ থেকে ভারতের গোলে একটি সট্ মারেন কিন্তু ভারতের গোলরক্ষক মুস্তাফা অনায়াসেই বলটি ধরে ফেলেন। ভারতীয় দলও পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে যান এবং আট মিনিট পরেই ভারতের লেফট্ ইন্ নাইমুদ্দিন ৩৫ গজ দূর থেকে কোরিয় গোলে তীব্র সট্ মারেন, কিন্তু কোরিয় গোলরক্ষক লী সাই ইয়োন্ বলটি ধরে গোল রক্ষা করেন। দু'মিনিট পরেই ভারতের লেফট্ আউট্ সাদাতুল্লার একটি সট্ও কোরিয় গোলরক্ষক ধরে ফেলে দলকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করেন। কোরিয় দলও আক্রমণ চালায় এবং ৪০ মিনিটের সময় কিম্ কি বোক্ এর একটি তীব্র সট মুস্তাফা 'পাঞ্চ' করে জালের ওপর দিয়ে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দেন। এর পরেই ভারত পাল্টা আক্রমণ করে ৪৩ মিনিটের সময় প্রায় গোল করবার মত অবস্থা করে তোলে। এই সময় ভারতের ইন্‌সাইড্ রাইট ইন্দর সিং সুন্দরভাবে 'ড্রিবল্' করে কোরিয় রক্ষণ ব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে এসে কোরিয় গোলে সট্ করেন, কিন্তু গোলরক্ষক লী বলটি 'পাঞ্চ' করে আবার মাঠের মধ্যে ফিরিয়ে দেন।

খেলার দ্বিতীয় ভাগে ভারতীয় আক্রমণ ভাগ কোরিয় দলের তুলনায় ভালই খেলে, কিন্তু তাঁদের সট-এর দুর্ব্বলতার জন্য গোল করতে সক্ষম হন না। কোরিয় আক্রমণ ভাগও গোল করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকেন এবং ৭৫ মিনিটের সময় পেনাল্টি সীমানার মধ্য থেকে লী একটি সুতীব্র সট্ সোজা মুস্তাফার দিকে মারায় ভারতীয় গোলরক্ষকের তা ধরতে কোনও অসুবিধা হয় না। এর পর ৮৭ মিনিটের সময় কোরিয়ার লেফট্ ইন্ লী হিউ টেক্ পেনাল্টি বক্স-এর ধার থেকে রাইট্ ইন্ কিম্ কি বককে একটি সুন্দর 'পাশ্' দেন এবং কিম্ সজোরে সট্ করে মুস্তাফাকে পরাজিত করে গোল করেন। এই একটি মাত্র গোলেই খেলার জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়।

ভারতীয় ফুটবল কোন্ পথে ?

এবারকার এই "মারদেকা" প্রতিযোগিতার ফলাফল

থেকে বোঝা গেল ভারতীয় ফুটবলের কিছুমাত্র উন্নতি সাধিত হয় নি। এক সময়কার এশিয় চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় ফুলবল দল ১২টি জাতীয় দলের এই প্রতিযোগিতয় মাত্র ষষ্ঠ স্থান লাভে সমর্থ হয়েছে! এর কারণ কি? ভারতীয় ফুটবলের মান কি ক্রমশই নিম্নগামী? স্বদেশে এত প্রতিযোগিতা, এত 'কোচিং'-'ট্রেনিং', এত জনপ্রিয়তা এবং দীর্ঘদিনের সাধনা সবই কি ব্যর্থ হতে চলেছে?—এই প্রশ্ন আজ ফুটবল ক্রীড়ামোদী জনগণের মনে জাগছে। ফুটবলের কর্ম্মকর্ত্তারা এর উত্তর দেবেন কি?

———

সম্পাদক—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্ ॥ ৯

(শ্রীশ্রীচণ্ডী)

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় সংখ্যা

ষষ্ঠপঞ্চাশত্তম বর্ষ

ডঃ রমা চৌধুরী

'জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তু তে॥"
(শ্রীশ্রীচণ্ডী, অর্গলা-স্তোত্র ২)

কি অনুপম এই মধুরমোহন শ্রীশ্রীমাতৃবন্দনা। এই একটী মাত্র বরেণ্য স্তুতিতেই কিন্তু শ্রীভগবান্, অথবা তাঁরই সঙ্গে অভিন্নাত্মা পরমা জননীর প্রকৃত স্বরূপ ও গুণাবলী সম্বন্ধে অতি সুন্দর আভাস পাওয়া যায়। যেমন, আমরা জানি যে, ভারতীয় দর্শনানুসারে, পরমেশ্বরের দুটী প্রধানরূপ—ভীষণ ও মধুর এবং বলাই বাহুল্য যে, পরিশেষে মধুর রূপটীই সগৌরবে অতিক্রম করে গেছে ভীষণ রূপটীকে। উপরের এই অনুপম শ্লোকটীতেও, এই সুন্দর চিত্র আমরা পাই। পরমা জননীকে এস্থলে এগারটী অনুপম বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে; তার মধ্যে কেবল তিনটি তাঁর ভীষণ রূপের দ্যোতক "কালী", "কপালিনী", ও "দুর্গা"। অর্থাৎ তিনি "কালী" অথবা প্রলয়কালে সর্বসংহারিণী"; "কপালিনী" অথবা, প্রলয়কালে ব্রহ্মাদির কপালহস্তে বিচরণ কারিণী; "দুর্গা", অথবা, দূরাতিদূরা; কঠিন নাতি-কঠিনা অতএব দুষ্প্রাপ্যা এবং আমাদের ভয়ের কারণ। কিন্তু অন্যপক্ষে, তিনি "জয়ন্তী" "মঙ্গলা, "ভদ্রকালী", "শিবা," "ক্ষমা" "ধাত্রী", "স্বাহা

(দেবপোষিণী), "স্বধা ("পিতৃপোষিণী)। এই গুলি সবই জগজ্জননীর অনন্ত অসীম স্নেহমমতা, কৃপা করুণার দ্যোতক।

পরমা জননীর এরূপ অসংখ্য কোমল মধুর গুণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হল "ক্ষমা"। "ক্ষমার" অর্থ কি? "ক্ষমার" অর্থ হল অন্যদের সকল দোষক্রটি, অন্যায়-অপরাধ সস্নেহে, কৃপাভরে মার্জনা করে নেওয়া। বদ্ধজীব আমরা প্রত্যহই এরূপ অসংখ্য দোষ ক্রটি, অন্যায় অপরাধ করে' চলেছি অহরহ, অজ্ঞানবশতঃ, পার্থিব বাসনা-কামনার প্ররোচনায়, কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ মাৎসর্য প্রমুখ-ষড়্‌রিপু কর্তৃক পরাজিত হয়ে। এই ভাবে, আমরা পরমা জননীর মঙ্গলময়, মধুরিমময়, মহিমময় সকল বিধিনিষেধ অমান্য করে, নিজেদের অন্তরঙ্গ বিবেকবাণী অবজ্ঞা করে; নিজেদের সত্তাগত দেবত্বকে অবমাননা করে, নামিয়ে ফেলি নিজেদের পশুদের স্তরে; পরমা জননীর সুপবিত্র রাজ্যেও, সত্য-শিব-সুন্দর-রাজ্যেও, আনন্দরসঘন-রাজ্যেও এনেফেলি পাপ-তাপ, ক্লেশক্লেদ মায়া-মোহ। কি অসহনীয় এই অবস্থা। অথচ পরম স্নেহময়ী, পরমকরুণাময়ী, পরমক্ষমাময়ী জগজ্জননী সে সমস্তই ক্ষমা করে' নিয়ে, আমাদের হস্ত ধারণ করে, আমাদের নিরন্তর মোক্ষের অমল-অভয়-অরুণ-পথে অগ্রসর করিয়েদিচ্ছেন সস্নেহে, আনন্দে, আগ্রহে, আনুগ্রহে—মহামাতৃলীলাগ্রন্থ শ্রীশ্রীচণ্ডীর এইটিইত মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

দর্শনশাস্ত্রের দিক্ থেকে অবশ্য এই অপূর্ব "ক্ষমা-তত্ত্বে"র বিরুদ্ধে বহুবিধ আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে। তাদের মধ্যে, দুটি প্রধান আপত্তি হল এই যে প্রথমতঃ স্বয়ং জগজ্জননী যদি জীবের অন্তর্যামিনী হন, সত্তাগত দেবতা হন, শাশ্বত পরি-চালিকা হন, তাহলে জীবের পাপ অন্যায়-প্রভৃতি করবার অবকাশ আর কোথায়? আমরা যা কিছু করছি, সবই ত তাঁরই করা। সেক্ষেত্রে, সংসারে এরূপ অসংখ্য দোষ-ক্রটি, অন্যায়-অপরাধ পাপ-কলঙ্কের উদ্ভব সম্ভবপর কিরূপে?

এই প্রশ্নটির সঙ্গে দর্শনশাস্ত্রের একটি মূলীভূত সমস্যাও বিজড়িত আছে। সেটি হল সুবিখ্যাত "freedom of will"র কঠিন সমস্যা। এস্থলে প্রশ্ন এই যে, সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী সর্বাধিনায়ক পরমেশ্বর যখন পৃথিবীর সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত করছেন তখন বদ্ধজীবের স্বাধীন ইচ্ছা ও স্বাধীন কর্মের সুযোগ সুবিধা কোথায়? তাহলে, স্বয়ং শ্রীভগবানই জগতের সকল পাপ-তাপ, অন্যায় অবিচার, পাপ-অপরাধের জন্য দায়ী, জীব নয়।

এর উত্তরে ভারতীয় দার্শনিকগণ তাঁদের সুপ্রসিদ্ধ "সাক্ষিতত্ত্বের" অবতারণা করেছেন। এই মতানুসারে সর্বশক্তিমান্, সর্বব্যাপী, সর্বাধিনায়ক হলেও পরব্রহ্ম স্বেচ্ছায় জীবের ক্ষেত্রে তাঁর এই সার্বজনীন প্রভুত্বকে সীমায়িত করেছেন; এবং সানন্দে তাঁরই লীলা সঙ্গী, তাঁরই মূর্ত প্রতিচ্ছবি, তাঁরই দ্বিতীয় স্বরূপ জীবকে স্বাধীন প্রবৃত্তি ও স্বাধীন কর্মের পূর্ণতম সুযোগসুবিধা দান করেছেন। এজন্য, তিনি জীবের অন্তরে অবস্থান করেও কেবল 'সাক্ষী" রূপে তার কাজকর্ম সমস্তই নিরীক্ষণই করছেন মাত্র, তার স্বাধীন ইচ্ছা ও কার্যকলাপের উপর নিজের কর্তৃত্ব, শাসন বা অধিকার কোনো-ক্রমেই না চাপিয়ে দিয়ে। তা না হলে ত জীব কেবল পরচালিত যন্ত্রই মাত্র হয়ে দাঁড়াবে, নিজের স্বাধীন-স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপেই বিসর্জন দিয়ে। সেক্ষেত্রে, জীব কিরূপে জগতে ব্রহ্মের প্রতীকরূপে বিরাজ করবে সগৌরবে? এই কারণে, ভারতীয় মতে, ঈশ্বরকর্তৃত্ববাদ ও জীবস্বাধীনতাবাদ পরস্পর বিরোধী ত নয়ই, বরং পরস্পর পূরক।

এই প্রসঙ্গে, দ্বিতীয় সমস্যা হল এই যে, জীব যদি স্বাধীন কর্তাই হয়, তাহলে সে নিশ্চয়ই নিজের কর্মের ন্যায্য ফল নিজেই ভোগ করবে সর্বক্ষেত্রেই—পরমেশ্বরের ক্ষমা বা করুণার মাধ্যমে সেই ফল ভোগ থেকে সে অব্যাহতি পাবে কেন?

এর উত্তরে ভারতীয় দার্শনিকগণ অবতারণা করেছেন তাঁদের আর একটি মূলভূত তত্ত্ব "ঈশ্বরানুগ্রহবাদের।" ঈশ্বরের করুণা কৃপা বা ক্ষমার অর্থ এই নয় যে, জীব তার নিজকৃত স্বেচ্ছা-প্রণোদিত কর্মের উপযুক্ত ফল ভোগ থেকে রেহাই পাবে। তার অর্থ কেবল এই যে ঈশ্বরের কৃপায়, সে সর্বপ্রথম অন্যায়কে অন্যায় বলেই বুঝতে পারবে; এবং ভবিষ্যতে সেরূপ অন্যায় থেকে বিরত থাক্‌বে পূর্ণ ভাবে। অন্যায়কে অন্যায় বলে'

বুঝ্‌তে পেরে' সেজন্য অনুশোচনা করাই হল পুণ্য-ধন্যমোক্ষ পথে প্রথম পদক্ষেপের উপায়স্বরূপ। পরম কৃপাময়ী, অশেষক্ষমাশীলা, অনন্তানুগ্রহদায়িনী পরমা জননী সেজন্য অহরহ অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন, ত্রিতাপদগ্ধ বাসনাকামনাকলুষিত জীবকে সস্নেহে আহ্বান করে বলছেন—

'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।'

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"

"হে অমৃতের সন্তানগণ। তোমরা সকলে শোন। "তোমরা ওঠ, তোমরা জাগো, তোমরা সেই শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যে উপনীত হও, মোক্ষলাভ কর।"

আজ এই পরমশুভ শ্রীশ্রীমাতৃপূজাকালে, শ্রীশ্রীমাতৃদেবীর এই মহাজ্ঞান যেন আমাদের দুঃখদৈন্যদলিত, ক্লেশ ক্লেদকলিত, মায়ামোহ মথিত জীবনে ব্যর্থ না হয়, এই প্রার্থনা। তাঁরই সাক্ষাৎ স্বরূপ-গুণ-শক্তির পূর্ণ অধিকারী আমরা—আমাদের অন্তর্নিহিত সেই ব্রহ্মস্বরূপ প্রকটিত করে তোলাই আমাদের জীবনসাধনা। সেই সাধনাই যেন আজ এই শুভলগ্নে সার্থকতম হয়, পরমক্ষমা-শীলা, পরমস্নেহঘনা, পরমকৃপাময়ী, জগজ্জননীর শ্রীচরণারবিন্দে আমাদের এই কাতর প্রার্থনা।

———

॥ শারদা বোধন ॥

শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী কাব্যপ্রাণ, কাব্যভাস্কর

আকাশের নীলে কনক কিরণ—সোনা ঝরা রোদ্দুর
দিগদিগন্তে মধুর ছন্দে ভাসে আগমনী সুর।
তটিনী তুলিয়া জলকলতান—
গাহিছে মায়ের আগমনী গান।
পুলকে, ছন্দে, হাসি আনন্দে—এহৃদয় ভরপুর;
কে আজি ছড়ায় আকাশের গায়, মুঠো মুঠো রোদ্দুর?

কাশের কেশর দোলে প্রান্তরে চঞ্চল চল বায়ু:
শিউলি শেফালি ঝরে পড়ে মা'র আলতা রাঙানো পায়।
গরবী করবী চম্পা চামেলি
হাসিছে পুলকে দুটি আঁখি মেলি'
ফুল কলিদের কানে কানে অলি কি বারতা কয়ে যায়
কচি তৃণদলে শিশিরবিন্দু জ্বলে মুক্তাহার প্রায়।

এসো মা জননী, দানব দলনী দানব দলিত দেশে—
দশহাতে ধরি' দশ প্রহরণ—দশ প্রহরিণী বেশে।
দানবেরা নাচে উল্লাসে আজো
মাগো চণ্ডিকা রণ সাজে সাজো।
বাজুক দামামা প্রলয় রাগিণী-এসো তুমি হেসে হেসে।
দানব দলিত লাঞ্ছিত দেশে দানব-দলনী বেশে।

মুখের অন্ন গ্রাসিলো যাহারা-করি হীন অবিচার,
আকাশে বাতাসে ধ্বনিছে যাদের রক্ত হুহুঙ্কার
গগন চুম্বি যাদের দাপট—
ভেঙ্গে দিলো তোর মঙ্গল ঘট
ছুটিছে যাদের রক্তশকট করি সবই চুরমার—
তুই মা তাদেরে করিবি কি ক্ষমা? বাজে না কি ব্যথা ভার?

জাগো মা জননী জাগো রুদ্রাণী প্রলয় বহ্নি জ্বাল্—
বঙ্গশ্মশানে জাগিয়া উঠুক শব রূপী মহাকাল।
জাগরণী সাড়া হৃদয়তন্ত্রে,
ভুবন ভরেছে বোধন মন্ত্রে,
অসুর পশুর বুকের রক্তে এপৃথিবী হবে লাল:
জাগো মা জননী, জাগো রুদ্রাণী প্রলয় বহ্নি জ্বাল্।

আর্ত্ত পীড়িত লাঞ্ছিত জাতি ঢালিছে অশ্রু লোর—
অসুর নাশিতে জাগো মা জননী আজিকে বোধন তোর॥

———

শাক্তপদাবলীর মাহাত্ম্য

অমরনাথ বসু

বাংলাদেশে শক্তিপূজা অনেক পুরোনোদিনের ঘটনা। আর্য্যকাল হ'তে নাকি এই শক্তিপূজার রীতিমত আয়োজন শুরু হয়েছে বলে শোনা যায়। এই শক্তিকে ? এর উত্তরে বলা হয় হিন্দু পুরাণের শ্রীদেবীগণ ছাড়া আর কেউ নন্। মনসা, শীতলা, চণ্ডী, কালী প্রভৃতি দেবীগণ এদের মধ্যে পড়েন।

এই শক্তি পূজার আচার অনুষ্ঠান থেকেই শাক্ত পদাবলীর শুরু। শাক্তপদাবলীতে আগমনীও বিজয়ার গার্হস্থ্য জীবনের স্নেহ সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে শাক্তভক্তগণ দেবীকে একান্ত নিভৃতে উপলব্ধি করেন ও সেই সঙ্গে অন্তরের একটি চিরসুন্দর স্নেহ মমতা তাঁদের মূর্চ্ছনায় আত্মপ্রকাশ করেছে। সে কারণেই শাক্তপদগুলি ভক্তহৃদয়ের এত আকর্ষণীয়। এ ছাড়া শাক্তকবিকণ্ঠে গীতগানগুলির মধ্যে একদিকে রয়েছে হৃদয়ের অপরূপ প্রসন্নতা আর একদিকে ব্যাপ্তির অনন্তবিভূতি। এ ছাড়াও শাক্ত কবিগণ যখন বুঝলেন সংসারের মায়া-মোহলাভা-লাভের মধ্যে থেকে কিছুতেই সাধনার পথ সিদ্ধ হয় না তখন তাঁদের নিজ অন্তর মান অভিমানে ব্যথিত হয়ে উঠে। সে কারণে মায়ের উপর অভিমান করে শাক্ত কবি গেয়ে উঠেন,—

"কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত,
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা পাক দিতেছ
অবিরত।"

এছাড়া শাক্তপদাবলীতে সর্বত্র একটা করুণসুর চোখে পড়ে। বাংলাদেশের মেয়েদের বিবাহিত জীবনের এই করুণ সুরটি বড় আকর্ষণীয়। ঘরের মেয়ের বিয়ে হ'লে সে পর হয়ে যায়। সে কারণে মার দুঃখেরও শেষ থাকে না। বিরহব্যথায় ব্যথিত মা'র অন্তর অপেক্ষা করে শরতের স্মরণীয় চারিটি দিনের জন্য। দুর্গোৎসবের চারটি দিন। যখন মেয়ে বাপের বাড়ি আসে আর মা'র অন্তর মেয়েকে দেখার আনন্দে মথিত হয়ে উঠে। ঠিক একই দৃশ্যই মা মেনকা আর কন্যা উমার মধ্যে দেখে থাকি।

মা'র চোখে উমা ছোট্ট মেয়ে। কৈলাসে সে কেমন করে থাকবে এই চিন্তায় তিনি সর্বদাই ব্যস্ত। অন্ধকারাচ্ছন্ন পাহাড়ে ঘেরা কৈলাসে সময়ে-অসময়ে ঝড় জল আসে, অসংখ্য দৈত্য-দানব ঘুরে বেড়ায়, তার উপর জামাই এর অবস্থাও ভাল নয়। ভিক্ষা ঘরে আনলে তবে উনুনে ভাত চড়ে। এমন সংসারে ছোট্ট মেয়ে উমাকে পাঠাতে মা'র অন্তর স্বভাবতই চঞ্চল হয়ে পড়ে। কে জানে কখন কি বলতে কি ঘটে যায়। সে কারণে মেয়ে বাপের বাড়ি এলে আর শ্বশুর বাড়ি পাঠাতে মা'র মন চায় না। পূজোর দিনগুলি আনন্দে কাটার পর মেনকাকে নবমীর রাত্রিকে উদ্দেশ্য করে বলতে শুনি,

"ওরে নবমী নিশি!
না হই ওরে অবসান!
তুমি অস্তে গেলে নিশি
অস্তে যাবে উমাশশী
হিমালয় আঁধার করে।"

যদি নবমীর রাত শেষ না হয় তবে উমাকে আর শ্বশুরবাড়ি যেতে হয় না। কিন্তু সময় অন্যের অপেক্ষা রাখে না। যথারীতি নবমীর রাত কেটে গিয়ে দশমীর সকাল উপস্থিত হয়। উমার চলে যাবার আসন্ন মহূর্ত্তটিকে আরও নিকট করে দেয়। উমা মা'কে প্রণাম করে বলে "তবে এবার যাই।" মা তখন উপদেশ দিয়ে বলেন—

"এসো মা এসো মা উমাবলো না আর 'যাই যাই।'
মায়ের কাছে হৈমবতী ওকথা বলতে নাই।"

এই ভাবে মা-মেয়ের বিচ্ছেদের করুণ সুর প্রকট করে তোলে। আর এ সুরের রেশ শাক্ত পদাবলীতে বিশেষরূপে ধ্বনিত। মেয়েকে শ্বশুর বাড়িতে পাঠানো কত বেদনাদায়ক, সে কথা শাক্তগীতিতে ভালো করে পেয়েছি। অন্যদিকে আবার মেয়ে যখন বাপের বাড়িতে আসে তখন মা'র অন্তরে যে আনন্দ ধ্বনিত হয় তার সুরও শাক্তসঙ্গীতে পাওয়া যায়। এ সুর শরতের আকাশ বাতাসকে মুখর করে তোলে। ঠিক একই রূপে রবি কবিকণ্ঠে গীত একটি কাঙালিনী মেয়ের শুষ্ক মুখ আর দুঃখের মধ্যে দিয়ে তার জীবন যাপন লক্ষ লক্ষ বাঙালীর

অন্তরকি এক অব্যক্ত বেদনারমূর্চ্ছনায় ভরেতুললো।

শাক্তপদাবলীতে মা ও মেয়ের এই পৌরাণিক সম্পর্ককে আশ্রয় করে বাংলাদেশে একটি ব্যথাহত-বাৎসল্যের সুর ধ্বনিত হয়েছে। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন শাক্তপদাবলীর আলোচনায় বলেছেন 'বাংলার-কুটিরের বালিকা-দুহিতাদের স্বামীগৃহে যাওয়ার পর মাতৃ-হৃদয়ের বিরহের হাহাকারকে করুণ রসের অফুরন্ত উৎস করিয়া যে সকল আগমনী গান পল্লীতে বহিয়া গিয়াছে, সেই আগমনী গানের আদিগঙ্গা হরিদ্বার এই প্রসাদ সঙ্গীত। আশ্বিন-মাসের ঝরা শিউলি ফুলের মত এই যে মাতৃ-মিলনের প্রত্যাশায় বালিকা বধূদের চক্ষুজল রাত্রিদিন ঝরিত, এই সকল আগমনীগানে সেই সকল অশ্রু রচিত হয়। উহা তৎকালিক বঙ্গজীবনের জীবন্ত বিচ্ছেদ রসে পুষ্ট।"

তৎকালীন বাংলাদেশে সমকালীন জীবন চেতনার মূর্ত্ত প্রতীক রূপে শাক্তপদাবলীর আবির্ভাব। সে যুগের সমাজ অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার ও ব্যভিচারের নিষ্ঠুরতায় কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। এই অসত্যের পথ থেকে মুক্তির সন্ধান শাক্তকবিগণের কাছে তখনো পর্য্যন্ত অজানা ছিল। সে কারণে শাক্ত কবিগণ হৃদয়ের সকল আকুতি মিনতি মহাশক্তি জগজ্জননীর পদপ্রান্তে নিবেদন করলেন।

এই জগজ্জননী করালকালী শুধু ধ্বংসের দেবী নন, তিনি ভক্তহৃদয়ের এক মূর্ত্ত প্রতীক। সর্বদাই তিনি ভক্তের জন্য বয়ে এনেছেন আশীর্ব্বাদ ভগিনী নিবেদিতা শাক্তপদাবলীর এই পরমাত্মা দেবী প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন "Kali appears to be symb l to him—a symbol of divine punishment, of divine grace and divine mother-hood।" শুধু শক্তি-রূপিণীরূপেই তাঁর আবির্ভাব নয়। তিনি একদিকে যেমন ব্রহ্মময়ী ও করুনাময়ী অপদিকে তেমনই অশিবনাশিনী। মা'র রূপ বর্ণনায় কবি কণ্ঠে এক অপূর্ব সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়েছে।

দশভুজা দেখি মায়ের ভেবেছো রূপের শেষ
অন্তরে দেখিলে আবার দেখিবে অনন্ত বেশ ;
অনন্ত প্রেমলোলুপা, কদাচিৎ চিৎস্বরূপা,
ক্বচিদাকাশ ক্বচিৎ প্রকাশ অনন্ত জগদাকারে,—
(গোবিন্দ চৌধুরী)

শাক্তপদাবলীর প্রায় সর্বত্র ভক্তের মান-অভিমান প্রকাশ পেয়েছে। সহস্র অনুযোগ সত্বেও মা যখন ভক্তের কাছে দেখা দেন না তখন ব্যথাহত ভক্তের কণ্ঠে বেদনার সুর জাগে :

মা বলে ডাকিস নারে মন,
মাকে কোথায় পাবি ভাই
থাকলে আসি দিত দেখা,
সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই।

শাক্তকবিগণের মধ্যে রামপ্রসাদের নামই সার্থক। তিনিই সার্থক শাক্তপদাবলী রচয়িতা, তিনি সে যুগের সমাজকে সংস্কারবিহীন হ'তে আবেদন জানিয়েছেন। মা'র পূজার জন্য জাঁকজমকের পরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ ভক্তির প্রয়োজনের কথা বলেছেন। সে কারণে তাঁর অন্তর মিশ্রিত গানগুলি যেমন "জাঁকজমকে করলে পূজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে॥" অথবা "তুমি জয়কালী বলি দেও করতালি, মন রাখ সেই শ্রীচরণে" সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে দেবতাকে ভক্তিসুধা পান করালে 'আধ্যাত্মিক জীবন যথার্থ সিদ্ধিলাভ করে। ভক্ত যখন আধ্যাত্ম মহিমায় একাত্ম হয়ে উঠেন তখন দেবতার সঙ্গে তাঁর পার্থক্য চলে না। তিনি কালীর শ্রীচরণেই ব্যথিত হৃদয়ের সকল আকুলতা নিবেদন করে গাইলেন "কাজ কি আমার গায়াকাশী, মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়াগঙ্গা বারাণসী।"

অষ্টাদশ শতকের দ্বার প্রান্ত থেকে কবি রামপ্রসাদ আগামীদিনের কল্লোলধ্বনি শুনতে পেয়েছেন। শাক্ত ইতিহাসে একদিকে যেমন মা মেয়ের করুণাঘন মধুর সম্পর্কের কথা জানতে পারি, অন্যদিকে রামপ্রসাদী সঙ্গীত দেবতা ও মানুষের সম্পর্ক আরো মধুর করে তুলেছেন। একটি সুনিশ্চিত স্থির বিশ্বাস যে মানুষের জীবনে কত গভীর স্নেহ-সম্পর্ক সৃষ্টি করে সে কথা আমরা শাক্ত ভক্তগণের কাছ থেকে জানতে পারি। সরল হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তি শাক্তপদামলীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। শুধু বাংলা দেশে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ক্ষেত্রেই নয়, সমগ্র সমাজ জীবনের অনু পরমাণু জুড়ে শাক্ত-পদাবলীর মাহাত্ম্য নানাগুণে বলীয়ান্।

ধর্মশাস্ত্রবিহিত তিথি

শ্রীবাণী চক্রবর্ত্তী, এম-এ, স্মৃতিতীর্থা

ধর্মকার্যে ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশ অপরিহার্য। স্মরণাতীত কাল হইতে এই ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশ ধর্মকৃত্যে অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে এখন কেহ কেহ এই নির্দেশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহেন। তাঁহারা কিছুদিন হইল পঞ্জিকাসংস্কারের নামে ধর্মশাস্ত্রের বিরোধিতা পর্যন্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তথাপি পশ্চিমবঙ্গ সরকার দৃগ্‌গণনার অশাস্ত্রীয়মত পরিত্যাগ করিয়া এবৎসর ৺দুর্গাপূজার ছুটীর দিন সম্পূর্ণ ধর্মশাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়াই ধার্য করিয়াছেন। এজন্য সরকার প্রকৃত ধর্মানুরাগিবৃন্দের নিকট ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

১৩২১ সালের ১৬ই পৌষ তারিখে কলিকাতার ব্রাহ্মণসভাগৃহে ভট্টপল্লীর পরমাচার্য পূজ্যপাদ স্বর্গীয় পঞ্চানন তর্করত্ন মহোদয় প্রমুখ পণ্ডিতবৃন্দের নেতৃত্বে দেশের স্মার্ত ও জ্যোতির্বিদ্‌গণের একসভায় সর্বসম্মতিক্রমে পঞ্জিকাসংস্কার সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহাতে বলা হয়—"অসতি ধর্মশাস্ত্রবিরোধে দৃগ্‌গণিতৈক্যসাধনমস্মাকং সম্মতম্" অর্থাৎ যদি ধর্মশাস্ত্রের সহিত বিরোধ না হয় তাহা হইলে দৃগ্‌গণনা আমাদের মনোনীত হইবে। তখন সর্বসম্মতিক্রমে গুপ্তপ্রেসাদি প্রাচীনমত যে ধর্মশাস্ত্র অনুসারে সিদ্ধ তাহা প্রমাণিত হয়। দৃগ্‌গণনাসম্মত বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা ধর্মশাস্ত্রের বিরোধী বলিয়াই তো পূর্বে ইহাকে "ফিরিঙ্গী পঞ্জিকা" বলা হইত। ১৩৫৭ সালে পুনরায় পণ্ডিতসভার উদ্যোগে যে সভা হইয়াছিল তাহাতে ভট্টপল্লীর প্রধান ধর্মশাস্ত্রাধ্যক্ষ মাননীয় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র স্মৃতিতীর্থ মহোদয়কে বোঝানো হইয়াছিল যে এই দৃগ্‌গণনা ধর্মশাস্ত্রের বিরোধী হইবে না। সেইজন্যই তিনি উহা গ্রহণে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই গণনা ধর্মশাস্ত্রের বাণবৃদ্ধি রসক্ষয়কে স্বীকার করে না—ইহা জানামাত্র শ্রীযুক্ত স্মৃতিতীর্থ মহোদয় তাহা ত্যাগ করিয়াছেন। আমি স্বয়ং ভট্টপল্লীতে যাইয়া তাঁহাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন যে শ্রীযুক্ত হরিচরণ স্মৃতিতীর্থের সমস্ত কথাই ভিত্তিহীন। ধর্মশাস্ত্রের সহিত দৃগ্‌গণনার বিরোধ হইতেছে বলিয়া শ্রীযুক্ত অধ্যাপক মহাশয় তাহা গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার সিদ্ধান্ত ছিল "অসতি ধর্মশাস্ত্রবিরোধে" অর্থাৎ ধর্মশাস্ত্রের সহিত বিরোধ না হইলে দৃগ্‌গণনা গ্রহণীয় হইবে। কিন্তু দৃগ্‌গণনা ধর্মশাস্ত্রের বিরোধী হইতেছে বলিয়াই তাহা ধর্মকৃত্যে গ্রহণযোগ্য নহে। ইহাতে ব্রাহ্মণসভার সিদ্ধান্তকে কখনই অমান্য করা হয় নাই। আর ধর্মশাস্ত্র পড়িয়া যে ব্যক্তি বাণবৃদ্ধি রসক্ষয়কে স্বীকার করেন না, তাঁহার পক্ষে ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে মতামত দেওয়া কখনই উচিত নয়। ধর্মশাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অশাস্ত্রীয় মত গ্রহণের ফলেই শ্রীযুক্ত হরিচরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের এই প্রকার মিথ্যাবাদ প্রচার করিতেও আজ বাধিতেছে না।

ধর্মশাস্ত্র বলিতে বুঝায় "শাসনাৎ শাস্ত্রং, ধর্মস্য শাস্ত্রং ধর্মশাস্ত্রম্"। অর্থাৎ যাহা শাসন করে তাহাই শাস্ত্র ধর্মের যে শাস্ত্র তাহাই ধর্মশাস্ত্র। এই ধর্মশাস্ত্রকেই স্মৃতি বলা হয়। এই স্মৃতিতে ৩টি প্রধান যুগ বর্তমান—সূত্রযুগ, সংহিতাযুগ ও নিবন্ধযুগ। বেদোক্ত কর্মকাণ্ডের বিষয়গুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে সূত্রের মধ্যে প্রণীত হইয়াছে। কিন্তু সংহিতার মধ্যে সেইগুলিই শ্লোকাকারে জনসাধারণের বুঝিবার সুবিধার জন্য অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। নিবন্ধ অর্থাৎ সংগ্রহ গ্রন্থ। সামাজিক পরিবর্তনের ফলে রীতিনীতিরও পরিবর্তন হয়। সুতরাং প্রাচীনস্মৃতির বচনগুলিকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা পরিবর্তন করিয়া সামাজিক রীতিনীতিতে একত্র সন্নিবিষ্ট করিয়া যে সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে তাহাই নিবন্ধ। এই নিবন্ধও ধর্মশাস্ত্রেরই একটি অংশ। সুতরাং নিবন্ধকারের বাক্যও ধর্মশাস্ত্রেরই বাক্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় ২০ জন ধর্মশাস্ত্রকারের নাম, পরাশর সংহিতায় ১৯ জন, বৃদ্ধগৌতমে ৫৭ জন, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার টীকাকার অপরার্কের টীকায় ৬৩ জন, শ্রীনাথাচার্য চূড়ামণির বিবেকার্ণবে

৬৩ জন ধর্মশাস্ত্রকারের নাম পাওয়া যায়। তন্ত্রবার্তিকে ১৮টি ধর্মসংহিতার নাম আমরা পাই। আবার বীরমিত্রোদয়ে ৮টি স্মৃতি, ১৮টি উপস্মৃতি এবং অন্যপ্রকার ২১টি স্মৃতির নাম দেখা যায়। নির্ণয়সিন্ধু, ব্যবহারময়ূখ ইত্যাদি শতসংখ্যক স্মৃতির নাম উল্লেখ করেন। কোথায়ও স্মৃতির সংখ্যা ৫৩ হইতে ১০০ পর্যন্তও পাওয়া যায়। সুতরাং শ্রীযুক্ত হরিচরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় শুধুমাত্র ১৯ জন ধর্মশাস্ত্র প্রযোজকের শাস্ত্রই ধর্মশাস্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিলেন কেন তাহা বুঝা গেল না। নিবন্ধকারগণ তো কখনই স্বকপোলকল্পিত বাক্য লেখেন নাই, সকল বিষয়েই তাঁহারা প্রমাণ উল্লেখ করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। আর ধর্ম কখনও চোখে দেখা যায় না, তাহা শাস্ত্রীয় নির্দেশ অনুসারেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং ধর্মশাস্ত্র যাহা নির্দেশ করিবে সেই অনুসারেই ধর্মের অনুষ্ঠান করা উচিত। নিবন্ধকারগণও তো ধর্মশাস্ত্রেরই প্রযোজক। অতএব তাঁহাদের বাক্যও প্রমাণ।

ধর্মকৃত্যের তিথিগণনা প্রাচীন জ্যোতিগ্রন্থ সূর্যসিদ্ধান্তের উপদেশ অনুসারেই হইয়া থাকে। কারণ তিথি প্রভৃতি গণনার বিষয় সূর্যসিদ্ধান্ত ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থে নাই। পরবর্তীকালে যেসকল জ্যোতিগ্রন্থে উহা দেখানো হইয়াছে, তাহা ঐ সূর্যসিদ্ধান্তেরই অনুসরণমাত্র। অতএব এই সূর্যসিদ্ধান্তগ্রন্থই একমাত্র প্রাচীন ও অভ্রান্ত জ্যোতিগ্রন্থ। এই গ্রন্থে বলা আছে—"মান্দং কর্মৈকমর্কেন্দ্বোঃ" অর্থাৎ মান্দ সংস্কার দ্বারা সংশোধিত সূর্য ও চন্দ্রের গতি হইতে তিথি নির্ণয় করিতে হয়। ঐ মান্দ-সংস্কার দ্বারা সংশোধিত তিথি দৃক্‌সিদ্ধ অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা গ্রাহ্য তিথি নয়। সূর্যসিদ্ধান্তে একথা স্পষ্ট করিয়াই বলা আছে এবং তাহা বহুভাবে আলোচিতও হইয়াছে। এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে দৃক্‌সিদ্ধবাদিগণও নিজেরা চাক্ষুষ দেখিয়া এই তিথি গণনা করেন না, তাঁহারা পাশ্চাত্যমতের অনুসরণ করিয়া থাকেন মাত্র। আবার পাশ্চাত্যমতবাদিগণের মধ্যে একদেশের গণনার সঙ্গে অপর দেশের গণনার সর্বস্থলে মিল থাকে না। যদি তাঁহাদের গণনা সর্বাংশে অভ্রান্তই হইবে, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন দেশের গণনায় বৈষম্য দেখা যায় কেন? আরও বিস্ময়কর ব্যাপার যে, বাংলাদেশের দৃক্‌সিদ্ধগণনায় এই বৎসরে কার্ত্তিকমাস মলমাস ও চৈত্রমাস ভানুলঙ্ঘিত হয়। কিন্তু বাংলাদেশের বাহিরে ঐ দৃগ্‌গণনায়ই চৈত্রমাস মলমাস এবং কার্ত্তিক মাস ভানুলঙ্ঘিত বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। তাহাতে দৃগ্‌গণায় নিজেদের দুইমতেই অমিল দেখা যাইতেছিল। আলিপুর আবহাওয়া কার্যালয়ের 'নটিক্যাল এল্‌ম্যানাক্' বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ শ্রীনির্মলচন্দ্র লাহিড়ী আনন্দবাজার পত্রিকায় যে প্রবন্ধ প্রচার করিয়াছেন তাহাতে ঐ দৃক্‌সিদ্ধবাদিগণের মধ্যে এই বিরোধ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তাহা নিরসনের জন্য শ্রীলাহিড়ী চৈত্রমাসকেই মলমাস বলিয়া প্রচার করিতে সকলকে নির্দেশ দেন। আবার সংস্কৃত কলেজে পঞ্জিকার মত পার্থক্যের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য যে বিচার সভা হইয়াছে, তাহাতে দৃক্‌সিদ্ধবাদিগণেরই নিজেদের দুইপক্ষে মলমাস লইয়া বিরোধের ফলে বঙ্গদেশের গণ্যমান্য কয়েকজন পণ্ডিতমহাশয় স্বমতের বিরুদ্ধ বলিয়া দৃক্‌সিদ্ধমত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন সুতরাং দেখা যাইতেছে যে দৃক্‌সিদ্ধবাদিগণের নিজেদের মধ্যে মত পার্থক্য তো আছেই, আবার তাঁহারা অনর্থক নিজেদের মত বদ্‌লাইতেও দ্বিধা করেন না। সুতরাং তাঁহাদের মত যদি অভ্রান্তই হইবে, তাহা হইলে প্রয়োজন অনুসারে মত পাল্‌টাতে পারেন কি করিয়া তাহা আমরা ভাবিয়া পাই না। সম্প্রতি বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়াছি যে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অঙ্কশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ডঃ এস্‌, কে, চক্রবর্তী ডি, এস্‌ সি, এফ্‌ এন্‌, আই, মহোদয় দৃগ্‌গণনাসিদ্ধ রাষ্ট্রপঞ্জিকা ও বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার গণনা ভুল বলিয়া প্রমাণিত করায় এখন আবার প্রাচীন সেই সূর্যসিদ্ধান্ত অভ্রান্ত বলিয়া তাহা হইতেই দৃক্‌সিদ্ধবাদিগণ তিথ্যাদি গণনা গ্রহণ করিতেছেন।

চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া গ্রহণ নিমিত্ত কর্ম করিতে হয় বলিয়া যে কোন উপায়ে চাক্ষুষ দেখিয়া অক্ষিনিমিত্তক কর্ম সাধন করিতে হয়। শাস্ত্রে আছে চক্ষু দিয়া রাহুর দর্শন হইলেই তাহাকে গ্রহণ

বলা হয়। এই জন্যই গ্রহণে দৃক্‌সিদ্ধ তিথির প্রয়োজন হয়। এই গ্রহণ বিষয়ে গণনার কোন প্রাধান্য নাই।

আর শ্রীযুক্ত হরিচরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় বলিয়াছেন স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দন প্রভৃতি বাণবৃদ্ধি রসক্ষয়ের ইঙ্গিত মাত্র করেন নাই। কিন্তু এখানে রঘুনন্দনের গ্রন্থ আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে বাণবৃদ্ধি রসক্ষয়ের কথা কত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দন মলমাসতত্ত্বের পর্যুদাসপ্রকরণে এবং শূলপাণি তাঁহার শ্রাদ্ধবিবেকে শ্রাদ্ধবেলাপ্রকরণে লিখিয়াছেন—"রাত্রৌ শ্রাদ্ধং ন কুর্বীত।" এখানে যদি নঞ্‌কে পর্যুদাস না বলিয়া প্রসজ্য প্রতিষেধ বলা যায়। তাহা হইলে "পূর্বাহ্নে মাতৃকং শ্রাদ্ধ অপরাহ্নে তু পৈতৃকম্‌" এই ব্রহ্মপুরাণ বচন দ্বারা পঞ্চধা বিভক্ত দিনের মধ্যে ৪ ভাগে ৪ প্রকার শ্রাদ্ধের কাল বলা হইল। কিন্তু বচনান্তরের সহিত একবাক্যতায় গৌণমুখ্যরূপে পূর্বাহ্ণ শ্রাদ্ধের ৬ মুহূর্ত যুক্ত কাল ও অপরাহ্ণ শ্রাদ্ধের ৫ মুহূর্ত যুক্ত কাল পাওয়া যায় বলিয়া ঐ বচনের দ্বারা তত্তৎকাল বিশেষে শ্রাদ্ধের বিধান বলা হয়। তাহাতে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ মধ্যাহ্ন কালেই কর্তব্য, দিনের যে কোন সময়ে উহা অনুষ্ঠেয় নয় ইহা প্রতীত হইতেছে। কিন্তু "উভয়দিনে মধ্যাহ্নাপ্রাপ্তৌ শ্রাদ্ধলোপাপত্তেশ্চ"—এই উক্তি দ্বারা উভয়দিনই মধ্যাহ্ন কর্তব্য যে বার্ষিক বা একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ তাহার লোপাশঙ্কা হইয়া পড়ে এবং ইহাতে বার্ষিক শ্রাদ্ধ বা একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ না হওয়ার ফলে প্রেতত্বমুক্তি হয় না। রঘুনন্দন এই মধ্যাহ্ন শ্রাদ্ধ মাত্রেরই লোপের কথা বলায় ধর্মকৃত্যের উপযোগী তিথির চরমক্ষয় যে তিন মুহূর্তের অধিক হয় না—তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

আবার রঘুনন্দন তিথিতত্ত্বে অমাবস্যাশ্রাদ্ধে লিখিয়াছেন—"যত্র পূর্বদিনে দিবাবাসরতৃতীয়াংশে সার্ধমুহূর্তমাত্রে অমাবস্যা, পরদিনে চ সার্ধদশম-মুহূর্তমাত্রে, তত্র চোভয় দিনে শ্রাদ্ধযোগ্যামাবস্যা ন প্রাপ্যতে তত্র তদন্তে চতুর্দশ্যন্তে নির্বিপেৎ শ্রাদ্ধং দদ্যাৎ"—ইহা দ্বারা অমাবস্যা তিথির চরমক্ষয় যে মুহূর্ত পর্যন্তই হয়, তাহার অধিক হয় না—তাহা তিনি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিলেন।

মৎস্য পুরাণের বচনে "অপরাহ্নে তু সম্প্রাপ্তে অভিজিদ্‌ রৌহিণোদয়ে" এস্থলে উদয় শব্দদ্বারা রঘুনন্দন শ্রাদ্ধতত্ত্বে 'উদয়াচলসম্বন্ধে' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। আর "ঊর্ধ্বং মুহূর্তাৎ কুতপাৎ" দ্বারা শ্রাদ্ধের মুখ্য ও গৌণকালে আপরহ্নিক শ্রাদ্ধের তিথি প্রাপ্ত হইলে সেই তিথিতে শ্রাদ্ধ কর্তব্য। অতএব ঐ কালটি তিথিখণ্ড বিশেষের নিয়ামক হইতেছে। সুতরাং এখানে রঘুনন্দনের মতে তিথির সম্পূর্ণ প্রাপ্তি বুঝাইতেছেনা, তিথিখণ্ডবিশেষই বুঝাইতেছে। এখানে যে খণ্ড অর্থ করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দনের অভিপ্রেত। আর তিথির এই খণ্ড অর্থ না করিলে মৎস্য পুরাণের দুই বচনে একই অর্থ করায় পুনরুক্ততা বশতঃ বিধ্যনুবাদ দোষ অপরিহার্য হইয়া উঠে। সূর্যসিদ্ধান্তগ্রন্থ এবং রঘুনন্দন প্রভৃতি নিবন্ধকারগণ 'বাণবৃদ্ধিরসক্ষয়' পদটি স্পষ্ট উচ্চারিত না করিলেও তাঁহাদের গণনায় বস্তুতঃ এই তিথিই স্বীকৃত হইয়াছে। সিদ্ধসাধন নিষ্প্রয়োজনবোধে তাঁহারা উচ্চারণ করেন নাই। শ্রীনিবাসাচার্য তাঁহার তিথিনির্ণয়কারিকায় বলিয়াছেন—"বাণবৃদ্ধিরসক্ষীণা গ্রাহ্যা নান্যা তিথিঃ কচিৎ।" বলা বাহুল্য যে ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশ মাত্রই বাণবৃদ্ধিরসক্ষয়ের উপর নির্ভর করিয়া পরিচালিত হইয়া আসিতেছে।

সুধীগণের বিচার-বিবেচনার জন্যই গ্রহণযোগ্য শাস্ত্রীয়মত প্রদর্শিত হইল। এ বিষয়ে বৃথা বাদ-বিতণ্ডার কোন ক্ষেত্র নাই।

——

বৈদান্তিক

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ওহে পণ্ডিত, পণ্ডিত, আছ না কি ?

বল্লভ ঘর থেকে চোখ কুঁচকে বেড়িয়ে এল। আগন্তুকের আগমনে সে যে খুসি নয় তা তার মুখ দেখেই বোঝা যায়। দাওয়ায় বেরিয়ে সে বল্লে, কি খবর ?

হাসি মুখে আগন্তুক রতিনাথ বল্লে, তারপ বল্লভ ভাই, আজ সকাল থেকে গুরুদর্শনের সৌভাগ্য কি তোমার হয়েছে ?

কেন ? গম্ভীর কণ্ঠে বল্লভের সংক্ষিপ্ত জিজ্ঞাসা।

এমনি বলছি হাসতে হাসতে রতিনাথ উত্তর দিলে। বল্লে, গুরু, দেবতা, পূর্ণব্রহ্ম, তাঁর স্বর্গরাজ্যের সংবাদ পেয়েছ কি না তাই শুধোচ্ছি গো।

দৃষ্টিতে কাঠিন্য এনে বল্লভ বল্লে, আমার কাজ আছে, বাজে কথা বলার সময় নেই। সে তার পর্ণকুটীরে পুনঃপ্রবেশের উপক্রম করলে।

রতিনাথ স্মিতহাস্যে বল্লে, যতই কাজ থাকুক ভাই, একবার যাও গিয়ে গুরুদর্শন করে এস, সেই সঙ্গে গুরুপুত্রকেও দেখতে পাবে গো। জীবন ধন্য হবে। রতিনাথ বিদ্রূপের হাসি হাসতে লাগল।

তীরবেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে বল্লভ বল্লে, তার মানে ? কি বলতে চাও তুমি ?

অন্তরঙ্গতার সুরে রতিনাথ বল্লে, যা বলতে চাই তা ত বলেইছি, ক'বার করে বলতে হবে ? না কি কানে খুব মিষ্টি লেগেছে বলে বা বার করে শুনতে চাও ?

চোখ পাকিয়ে বল্লভ বল্লে, নিজের চরকায় তেল দাওগে। আমার কাজ আছে, দাঁড়াতে পারব না। বল্লভ নিজের ঘরে ঢুকে গেল। রতিনাথ সানন্দে শীষ দিতে দিতে বল্লভ পণ্ডিতের উঠান থেকে বেরিয়ে গেল।

বেদান্তদর্শনের যে পুঁথিখানা বল্লভ পড়ছিল ঘরে ঢুকে নিজের আসনের ওপর বসে সেই পুঁথিতে পুনরায় মনঃসংযোগের চেষ্টা করেও বল্লভ পারলে না। প্রতিবেশী ও বর্তমানের শত্রু রতিনাথ কেন এসেছিল ? কি বলতে চায় ও ? ওর কথার মধ্যে আজ যেন কেমন একটা কদর্য শ্লেষ রয়েছে। কি ব্যাপার ? ভাবতে ভাবতে বল্লভ বিরক্ত হয়ে উঠল। পড়ায় আর মন দিতে পারলে না।

নাঃ, আজ কোন কাজই হোল না। বিরক্ত মনে পুঁথিখানা জড় করে সেখানাকে কপালে ঠেকিয়ে দড়ি বাঁধতে বাঁধতে বল্লভ খোলা দরজার দিকে চেয়ে দেখলে ব্রাহ্মণী জলের কলসী নিয়ে ঘরে ঢুকছে।

বল্লভের পুঁথি বাঁধা শেষ হোল। কলসীটা নামিয়ে তার ওপর মাটীর সরাখানা ঢাকা দিয়ে ব্রাহ্মণী কপালের ঘাম মুছে স্বামীকে প্রশ্ন করলে, ঐ লোকটা কেন এসেছিল ?

কে ?

তোমার বন্ধু গো, রতিনাথ। ওর জ্বালায় আমি সেই তখন থেকে কলসী নিয়ে বাইরে গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছি।

কেন এসেছিল ওই জানে, বিরক্তিভরা কণ্ঠে বল্লভ উত্তর দিলে।

ব্রাহ্মণী ঘনিষ্ঠ হয়ে সামনে বসল। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললে, হ্যাঁ গো, কি শুনছি সব ?

কি ? বিস্ময়ের পরিবর্তে বল্লভের প্রশ্নে বিরক্তিটাই সমধিক ফুটে উঠল।

ব্রাহ্মণী বল্লে, নতুন পুকুরে জল আনতে গিয়েছিলুম। ওখানে শুনলুম, গুরুদেবের বাড়ীতে নাকি এক সদ্যোজাত শিশু রয়েছে। গুরুদেব না কি বলেছেন, ছেলেটি ওঁরই।

মিথ্যে কথা, কে বল্লে ? বল্লভ গর্জন করে উঠল।

বল্লভের গর্জ্জনে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে ব্রাহ্মণী বল্লে, আমারও তাই মনে হয়। এ বোধহয় তোমাদের ঐ পিনাকী তান্ত্রিকের নতুন কোন ছলনা। ওদের জ্বালায় কি আমাদের গাঁ ছেড়ে পালাতে হবে না কি গো ?

পালাবে না আরও কিছু! বল্লভ উঠে দাঁড়াল।

তুমি যেন ঐ নিয়ে আবার হাঙ্গামা করতে যেও না, ভয়ে ভয়ে ব্রাহ্মণী স্বামীকে অনুরোধ জানালে।

আমি ত পাগল নই। বল্লভ ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের দাওয়ায় এসে দাঁড়াল।

সন্ধ্যা হতে বেশী দেরী নেই। দাওয়ায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে কি যেন মনে হোল। বল্লভ পুনরায় ঘরে ঢুকে দেখলে ব্রাহ্মণী কোন ফাঁকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। বাঁশের আলনা থেকে আধময়লা চাদরটা টেনে কাঁধে ফেলে বল্লভ ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

বল্লভদের গ্রাম ছাড়িয়ে দু'খানা মাঠ পার হয়ে লোকেশ্বর শিবের মন্দিরতলা ডাইনে রেখে শিবসায়র নামে যে ক্ষীণ জলধারা খালের মত প্রবাহিত, সেই শিবসায়রের ধারে একখানি মাত্র পর্ণকুটীরে বাস করেন মধ্যবয়সী পণ্ডিত ব্রহ্মপদ উপাধ্যায়। উপাধ্যায় চিরকুমার, বেদান্ত দর্শনে অসাধারণ পণ্ডিত, স্বহস্তে পাক করে মধ্যাহ্ন একবার মাত্র অন্নগ্রহণ করেন এবং ঐ প্রায়-জনশূন্য স্থানে একাকী বাস করেন। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও কোন অন্তেবাসী তাঁর নেই, শিষ্যও নেই, তবে বল্লভের ন্যায় কতিপয় ভক্ত বেদান্তের সমস্যা নিরাকরণের জন্য তাঁর কাছে যাতায়াত করে। তার গৃহ সম্বলের মধ্যে কতকগুলি অত্যন্ত মূল্যবান্ পুঁথি, যেগুলি তিনি তাঁর স্বর্গত গুরুর কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। এ ছাড়া আর কোন সম্বলই তাঁর নেই। এমন কি নিয়মিত গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত কোন ব্যবস্থাও নেই এবং সে বিষয়ে তাঁর কোন চিন্তাও নেই, কিন্তু মধ্যাহ্নের শাকান্ন ঠিকই জুটে যায়। শিক্ষিত, শাস্ত্র অনুরাগী ধনীগৃহে তাঁর প্রায়শঃই সাদর নিমন্ত্রণ হয়, সেখানে শাস্ত্র আলোচনা, বিদেশাগত পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ অথবা ঐরূপ কোন কাজ করার জন্য তাঁকে অত্যন্ত আগ্রহ সহকারেই ধনীরা আমন্ত্রণ করে নিয়ে যায়; এ ছাড়া মহারাজ কীর্ত্তিনাথের সভাপণ্ডিতের কাজও তিনি করেন। এঁদের সকলের কাছ থেকে যে দক্ষিণা এবং পরিধেয়াদি তিনি পান তাতেই তাঁর দিনগুলি অর্থনৈতিক নিশ্চিন্ততার মধ্য দিয়ে স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হয়। গ্রামে বাসকালে তিনি আপন মনেই শাস্ত্রপাঠে অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন, বাকী সময় কাটে লোকেশ্বর শিবমন্দিরে অথবা শিবসায়রের তীরে। বল্লভের ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তিরা যেদিন আসে সেদিন তিনি শাস্ত্র আলোচনায় বহু সময় অতিবাহিত করেন কিন্তু আগন্তুকদের কাউকেই তিনি ছাত্র বা শিষ্য বলে স্বীকার করেন না। তাঁর ধারণা তিনি নিজেই সকলের শিষ্য। কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী, অধমবর্ণের নিরক্ষর মানুষকেও তিনি নিজের গুরু বলে মনে করেন। সকলের ওপোরেই তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা, কারণ তাঁর বিশ্বাস তিনি সকলের কাছ থেকে সব সময়েই কিছু না-কিছু শিক্ষা করেন। এ হেন নির্ব্বিবাদী উপাধ্যায় এক বৎসর পূর্ব্বে তন্ত্রাধ্যায়ী পিনাকী-নাথের কোপকটাক্ষে পড়ে গেছেন। এক তর্কসভায় ব্রহ্মপদ তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অসারতা এবং আশাস্ত্রীয়তা সম্বন্ধে গভীরভাবে আলোচনা করেছিলেন। সেই থেকে পিনাকীর দল ওঁকে প্রকাশ্যে অবজ্ঞা করতে সুরু করেছে এবং শিষ্য রতিনাথ উপাধ্যায়ের কাছে ঘেঁষতে না পেরে উপাধ্যায়ের ভক্ত এই প্রতিবেশী বল্লভকে নানা ভাবে বিদ্রূপ করে গায়ের ঝাল মেটায়। রতিনাথ ও বল্লভ সমবয়সী এবং প্রতিবেশী, বাল্যে একই পাঠশালায় ওরা ছিল সহপাঠী, দু'জনের আর্থিক ও মানসিক প্রভেদ যথেষ্ট থাকলেও এক বছর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ওরা বন্ধুভাবেই কাটিয়েছে কিন্তু এই এক বছরের মধ্যে পুনঃপুনঃ গুরুনিন্দার ফলে বল্লভ ওরফে কৃষ্ণবল্লভ শাস্ত্রী রতিনাথকে আর সহ্য করতে পারে না। আজ কিন্তু রতিনাথ যে কদর্য্য ইঙ্গিত করে গেল এবং গৃহিণী যে জনশ্রুতি বল্লভকে জানিয়ে দিলে তাতে বল্লভ অতিষ্ঠ হয়ে এই সন্ধ্যাতেই চাদরখানা টেনে নিয়ে সত্য মিথ্যা যাচাই করার জন্য এক ক্রোশেরও অধিক দূরস্থ উপাধ্যায়ের বাটীর দিকে রওনা না হয়ে আর থাকতে পারলে না? রাত্রি আসন্ন জেনেও পরদিন সকালের অপেক্ষায় বল্লভ থাকতে পারে নি। বৈদান্তিকের স্থৈর্য্য হারিয়ে সে মাঠ ভেঙ্গে ছুটল উপাধ্যায়ের বাসস্থানের দিকে।

দুই

কিন্তু না এ'লেই বোধহয় ভাল হোত।

উপাধ্যায়ের পর্ণকুটীরের নীচু দাওয়ায় একটি স্ত্রীলোক

এক নবজাত শিশুকে বক্ষোদুগ্ধ পান করাচ্ছে। পথশ্রান্ত বল্লভ এই দৃশ্যে স্তম্ভিত হোল।

তবে কি উপাধ্যায় বাড়ী ছেড়ে চলে গেছেন? অন্য কেউ শূন্যঘর দখল করে বাস করছে!

অন্ধকারে অদূরে একজন পুরুষকে দাঁড়াতে দেখে স্ত্রীলোকটি প্রশ্ন করলে, কে গা? কে ওখানে?

ক্ষোভের প্রথম ঘোর কাটিয়ে বল্লভ বল্লে, উপাধ্যায় মশাই কি এখানে থাকেন না?

থাকেন। ডেকে দেব? নারী উত্তর দিলে।

উত্তরটি বল্লভের কানে যেন শূল বিঁধিয়ে দিলে। ক্ষণপরে সে উত্তর দিলে, না, থাক। বলেই বল্লভ পেছন ফিরলে। উপাধ্যায়ের মুখদর্শন করতে বল্লভের ইচ্ছামাত্রও রইল না।

কিন্তু এর পরই শোনা গেল উপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বর। ঘর থেকে বেরিয়ে উপাধ্যায় খোলা আকাশের স্তিমিত অন্ধকারে বোধ হয় কণ্ঠস্বরেই বল্লভকে চিনতে পেরে সাড়া দিলেন, কে, কৃষ্ণবল্লভ?

পেছন ফেরা অবস্থাতেই বল্লভ উত্তর দিলে, হ্যাঁ, চলে যাচ্ছি।

গুরুজী বল্লেন, যেও না, দরকার আছে।

গুরুজী দাওয়া থেকে নেমে বল্লভের কাছে এগিয়ে এলেন। বল্লেন, এত রাত্রে? কিছু কথা আছে?

না, বল্লভ চলতে সুরু করেছে।

ব্রহ্মপদ এগিয়ে ওর পাশে পাশে চলতে লাগল। পূর্ব্বের ন্যায় অতি অন্তরঙ্গতার ভঙ্গীতে বল্লে, এসেই চলে যাচ্ছ কেন ভাই?

যা দেখলুম তাতে আর আমার বলার কিছু নেই।

প্রশান্তকণ্ঠে ব্রহ্মপদ বল্লেন, চোখের দেখাটাই কি সব? অতিন্দ্রিয় বলেও ত কিছু থাকতে পারে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে বল্লভ বল্লে, ঐ স্ত্রীলোকটি কে? ঐ শিশুটি কার?

এতক্ষণে ওরা শিবসায়রের কাছাকাছি এসে গেছে। ব্রহ্মপদ বল্লেন, প্রশ্নটা এর আগেও কয়েকজন করে গেছে। ঐ প্রশ্নটা তুমি কি ভাবে করছ খুলে বলবে কি?

অর্থাৎ?

বল্লভ বিচলিত হোল। ঢোক গিলে বল্লে, আমার পূর্ব্বে যারা এই প্রশ্ন করেছিল, তারা আপনার মুখ থেকে কি উত্তর পেয়েছে?

উপাধ্যায়ের শান্ত মুখে ক্ষীণ হাস্যরেখা, মুহূর্ত্তকাল নীরব থেকে তিনি বল্লেন তাদের বলেছি, ওটি আমার ছেলে।

ঐ স্ত্রীলোকটি কে?

ঐ ছেলেটির মা।

উপাধ্যায়ের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে বল্লভ বল্ল আমি জানতুম আপনি চিরকুমার।

ঠিকই জানো, কোন ভুল নেই।

বল্লভ পুনরায় হাঁটতে সুরু করলে।

ব্রহ্মপদ বল্লেন, আর কোন প্রশ্ন নেই?

না।

বসবে না?

না।

আবার কবে আসবে?

আর আসব না।

বল্লভ এগিয়ে চলল। ব্রহ্মপদ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

শিবসায়রের ধার দিয়ে খানিকটা এগিয়ে লোকেশ্বরের মন্দিরকে বাঁয়ে রেখে আরও কিছুদূর গিয়ে বড় মাঠটাকে কোণাকুণি পার হয়ে ছোট্ট একটি গ্রাম। এ গ্রামে ভদ্রলোকের বাস নেই। আছে কতকগুলিমাত্র চালাঘর এবং সেই ঘরগুলি নিম্নস্তরের পতিতাদের বাসস্থান। সন্ধ্যার অন্ধকারে এদের ঘরে এক শ্রেণীর পুরুষের আগমন সুরু হয়। দুপুরেও কেউ কেউ অবশ্য আসে কিন্তু সন্ধ্যার পরেই এদের মূল কারবার। তা ছাড়া এ পাড়ায় বিশেষ উৎসব জমে উঠত তখনই যখন বিদেশ থেকে আসত লাল ঝুমুরের দল। তারা তিন চার রাত্রি ধরে তাদের পালা গান করত। যে যুগের কথা বলছি সে যুগে ঝুমুর গানটা খুবই জনপ্রিয় ছিল। এই ঝুমুর ছিল দু'রকমের। সাধারণ ঝুমুর গ্রামের মধ্য বদার আটচালায় অথবা হাটতলায় হোত, সেখানে গ্রামের সকলেই একত্রে ঝুমুর গান উপভোগ করত, কিন্তু অপর শ্রেণীর ঝুমুরকে বলা হোত আসল বা লাল ঝুমুর। লালঝুমুরের আসর গ্রামের মধ্যে হোত না,

দেওয়াও হোত না। লাল ঝুমুর হোত গ্রামের বাইরে এই রকম পতিতা-বস্তীতে অথবা একেবারেই লোকালয়হীন স্থানে,এবং সেই ঝুমুরের পৃষ্ঠপোষকও দর্শকথাকতেন গ্রামের বয়স্ক পুরুষরা যাদের যা-খুসি-করার অধিকার ছিল সর্ব্বসম্মত। বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে তারা লালঝুমুরের আনন্দ গ্রহণ করতেন। এই বস্তীর অস্তিত্বটা বল্লভের জানা থাকলেও এখানকার সান্ধ্য মূর্ত্তি সে কোন দিনও দেখে নি, কারণ এ অঞ্চলে সন্ধ্যার পর কোন দিনও সে আসে নি। উপাধ্যায়ের কাছে অথবা লোকেশ্বরের মন্দিরে ওদের যাতায়াত ছিল সকালের দিকে। শিবরাত্রিতে লোকেশ্বরের মন্দিরে যারা সারারাত কাটাত তারাও বিকেলে অথবা দুপুরে এই গ্রাম অতিক্রম করে চলে যেত এবং পরের দিন সকালে এই গ্রামের ওপোর দিয়ে ফিরে আসত। কাজেই বল্লভের মত লোক এই গ্রামের নৈশরূপ কোন দিনও দেখে নি। আজ সন্ধ্যায় যেন কেমন এক পাগলামির দুর্ব্বিপাক বল্লভকে এই গ্রামে পাকচক্রে টেনে এনে ফেলেছে।

এত সব কথা কিন্তু বল্লভের কিছুই মনে হয় নি। সে নিতান্তই শূন্য মনে কেমন একটা হতাশা নিয়ে বিভ্রান্তের মত পথ অতিক্রম করছিল, কোন দিকে দৃষ্টি দেবার মত মনই তার ছিল না। কেবল ভাবছিল অত বড় বৈদান্তিক, তার এই অধঃপতন!

হঠাৎ ওর পথের সামনে দু'হাত বাড়িয়ে কে একজন এসে দাঁড়াল। বল্লভ চমকে উঠল। কে?

গুরুদর্শন হোল? পান খাওয়া লাল দাঁতগুলো বার করে হা হা করে হাসতে লাগল রতিনাথ। বল্লে, তারপর বল্লভ-ভাই, গুরুপত্নীর পদরেণু লাভ করে এসেছ?

বল্লভ পাশ কাটিয়ে যেতে চেষ্টা করলে। রতিনাথ পথ আগলে দাঁড়িয়ে; কিছুতেই ছাড়বে না।

সর, পথ দাও, বাড়ী যাব, বল্লভ বল্লে।

তা ত' যাবেই, রতিনাথ উত্তর দিলে, এখানে সারা রাত থাকার মত ক্ষমতা তোমার নেই তা জানি, ট্যাকের জোর চাই, কিন্তু যা বলছি তার উত্তরটা আগে দাও। গুরুপত্নীকে কেমন দেখলে? দেখেছ?

দেখেছি, বল্লভ কোনমতে পালাতে চায়।

জানি না, জানতে চাইও না, বল্লভের কাটা উত্তর।

রতিনাথ পূর্ব্বের মতই পথ আগলে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগল, তুমি অবশ্য জান না, আর জানবেই বা কি করে, এতটা বয়েস ত খালি পুঁথি পড়েই কাটালে, কিন্তু আমরা ওকে সবাই জানি, ও হচ্ছে আমাদের পদ্মা কিনা পদ্মগন্ধা। মেয়েটার কি ডাঁটই-না ছিল সব সময় ভুরু কুঁচকেই থাকত। আজ ভোরবেলা যখন ওর ছেলে হোল তখন ও বল্লে, আমি এখানে পড়ে থাকব কেন? আমি যাব এই খোকার বাবার বাড়ীতে। এখন থেকে এ যার ছেলে সেই একে দেখাশোনা করবে, তোমাদের কাউকে, চাই না। সেই তখনই সব কথা জানাজানি হয়ে গেল। তখন বোঝা গেল অতবড় পণ্ডিত লোকটা গ্রামাঞ্চলে চতুষ্পাঠি না খুলে একলা ঐ লোকালয়হীন স্থানে কেন বাস করে! বুঝলে বন্ধু, সব লোককে সব সময় চেনাই যায় না।

আচ্ছা বেশ, এবার পথ ছাড় বল্লভ উত্তর দিলে।

তা ত ছাড়বই। তোমার মত বেরসিককে কে ধরে রাখতে চায় বল। কিন্তু ভাই একটা বিষয়ের মীমাংসা করে না দিলে তোমাকে ছাড়তে পারছি না।

কি? নিরুপায় বল্লভ রতিনাথের মুখের দিকে চেয়েই চোখ নামিয়ে নিলে।

রতিনাথ বল্লে, হাঁা। কথাটা হচ্ছে এই যে ডুবে ডুবে জল খাওয়া ভাল, না আমাদের মত খোলাখুলি ভোগ করা ভাল? লোক দেখানো চিরকুমার থাকা ভাল, না ডাক সাইটে বামাচারী হওয়া ভাল। কোনটা ভাল, সে মীমাংসা তোমাকে করতে হবে।

জানি না। অন্য কাউকে জিজ্ঞাসা কোরো।

হা হা করে হেসে রতিনাথ বল্লে, তুমি জানো না, তাহলে কে জানবে বল? আমদের এ তল্লাটে তোমার মত আর তোমার ঐ পূর্ণব্রহ্মের মত পণ্ডিত আর, কে আছে বল?

তবে পূর্ণব্রহ্মকেই জিজ্ঞাসা কোরো।

আরে আরে তাও কি হয় না কি? আসামীর কাছে বিধান নিয়ে কি সুবিচার করা যায়?

তুমি ছাড়বে, না কি?

তাতে সুবিধে হবে না। এ তল্লাটের লোক সবাই যদি তোমাকে মারতে আসে তাহলে আমি একা তোমাকে রক্ষা করতে পারব না। আর জান ত আমি ছাড়া এখানে তোমার আর কোন বন্ধু নেই।

স্থির কণ্ঠে বল্লভ বল্লে, শোন রতিনাথ, রাত হয়ে যাচ্ছে, আজ আমায় ছেড়ে দাও। পরে একদিন সময়মত তোমার কথার আলোচনা করা যাবে।

ভয় পেয়েছ? তবে যাও, আজ আর কিছু বল্লুম না।

বল্লভের ভেতরটা জ্বলে উঠল, ভয়? ঐ হতভাগা রতিকে ভয়? কিন্তু মুখে কিছু বল্লে না। অসতের ছোঁয়াচ থেকে সরতে পারলেই সে বাঁচে।

সেই অন্ধকারেই একটি স্ত্রীলোক পাশের কুটীর থেকে বেরিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে এল। স্ত্রীলোকটি বল্লে, কে গা ওখানে?

আমি র শ্বামী, আর আমার বন্ধু, তোমাদের ঐ পদ্মার ঠাকুরের প্রিয়শিষ্য বল্লভ? রতিনাথ উত্তর দিলে।

তা বাইরে কেন, বন্ধুকে ভেতরে এনে বসাও।

ও যে তোদের ঘেন্না করে, ও তোদের ছায়াও মাড়াবে না তা ত জানিস?

ছায়া মাড়াতে কড়ি লাগে গো, তুমি ভেতরে এস। সেই নির্লজ্জা অন্ধকারের মধ্যে সরে গেল।

শুনলে ত? তবে যাও ভাই, পরে আবার দেখা হবে। পথ ছেড়ে রতিনাথ সরে দাঁড়াল।

হন্ হন্ করে বল্লভ বাড়ীর দিকে এগিয়ে পড়ল। তার সর্ব্বশরীর তখন রাগে জ্বলছে।

তিন

যে কাহিনীটা বল্লভ সে রাত্রে শুনে গেল সেই কথাটাই লোকের মুখে মুখে সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। এটা বল্লভের কাছে যেন মর্ম্মান্তিক হয়ে দেখা দিল তেমনই মর্ম্মান্তিক হোল আরও কয়েকজনের কাছে কিন্তু পিনাকী তান্ত্রিকের দলের সকলেই উৎফুল্ল। এরা এই খবরটা নিয়ে সারা গ্রামে হৈ হল্লা ত চালালোই উপরন্তু এই কাহিনীর সঙ্গে নানাবিধ রং চড়িয়ে এক কুৎসিত পূর্ণাঙ্গ আখ্যায়িকাও সৃষ্টি করল।

কিন্তু যাকে নিয়ে এত আলোড়ন তার কোন সাড়া নেই। প্রশ্ন করলে উপাধ্যায় বলে নবজাতক ওঁর ছেলে, স্ত্রীলোকটি নবজাতকের গর্ভধারিণী। শান্ত, অমায়িক স্মিত-হাস্যে তিনি উত্তর দেন সমস্ত প্রশ্নকর্তাদের।

জনতার উৎসাহ ধীরে ধীরে নিবে এল। উপাধ্যায়ের শত্রুদের জয়ানন্দ স্তিমিত হোল, বন্ধুরা ক্ষোভ ও দুঃখে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল, উপাধ্যায়ভবনে লোকের গতিবিধিও বন্ধ রইল। উপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে একদল দাঁত বার করে হাসে, একদল নাক সিঁটকায় অন্যদল লজ্জায় ঘাড় হেঁট করে।

এই যখন অবস্থা, এমন সময় এক অপরাহ্ণে এক ঘোড়সওয়ার এসে হাজির হলো বল্লভের বাড়ীর সামনে। গ্রামশুদ্ধ সকলেই রাজবাড়ীর ঘোড়সওয়ারের আগমনে ত্রস্ত হয়ে উঠল। কি ব্যাপার!

মনে মনে অনেকখানি ভয় এবং দ্বিধা নিয়ে বল্লভপণ্ডিত অশ্বারোহী পাইকের সামনে এসে উপস্থিত হোল। বল্লভের স্ত্রী দুরু দুরু বক্ষে ঠাকুরদেবতার কাছে স্বামীর নিরাপত্তার জন্য আকুলভাবে কত কি মানৎ করতে লাগলেন, গ্রামের সকলেই আশঙ্কিত হয়ে খবরটা জানবার জন্য নেপথ্য থেকে উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল, কিন্তু সামনে আসাটা কেউই প্রয়োজন বোধ করল না। সকলেরই যুক্তি এই যে পাইক যখন বল্লভপণ্ডিতের নাম ধরে খোঁজাখুজি করছে আমাদের সামনে যাওয়ার কি দরকার। পরে ত শোনাই যাবে ব্যাপারটা কি?

ব্যাপার শুনে বল্লভ নিজেও বিস্মিত হোল। অন্য এক রাজ্য থেকে শাস্ত্র আলোচনার জন্য কয়েকজন পণ্ডিত আসছেন তাই আমাদের পরম ভট্টারক মহারাজ কীর্ত্তিনাথ কৃষ্ণবল্লভ শাস্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সেই আলোচনা সভায় অস্মদ্দেশীয় মুখ্য পণ্ডিতের আসন গ্রহণ করবার জন্য। অশ্বারোহী দূত বল্লভের হাতে রাজনির্দ্দেশ অর্পণ করে মুখে বল্লে আগামী শুক্রবারে সূর্য্যোদয়ের প্রথম প্রহরান্তে মহারাজের শিবিকা আসবে, আপনি সশিষ্যে যাত্রা করবেন।

রাজনির্দ্দেশ, রাজ-আজ্ঞা, বিশেষ করে মহারাজ কীর্ত্তিনাথের মত জবরদস্ত রাজার নিমন্ত্রণ, এটা নিমন্ত্রণ হলেও সমনের অধিক। যেতেই হবে, কিন্তু—

বল্লভের জীবনে এ সম্মান সে কোনদিনও পায় নি। এ সম্মান ছিল ঐ ব্রহ্মপদ উপাধ্যায়ের। ব্রহ্মপদর সঙ্গে বল্লভরা কেউ কেউ যেত এই পর্য্যন্ত।

সেই সব আলোচনা সভার কথা স্মরণ করে বল্লভ একদিকে যেমন আনন্দিত অন্যদিকে তেমনই সংকোচ বোধ করলে। বিদেশী পণ্ডিতরা এমন সব দুরূহ বিষয়ের অবতারণা করে এমনই জ্ঞানগর্ভ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিত যে সে আলোচনা সভায় বসে বল্লভ অনেক সময় হাঁপিয়ে উঠত। প্রতিপক্ষের কোন কোন যুক্তিকে সম্পূর্ণ অকাট্য বলেই মনে হোত ওদের, কিন্তু উপাধ্যায় মহাশয় অবলীলাক্রমে সেই সব যুক্তি খণ্ডন করে এমন সব শাস্ত্রবাক্য উচ্চারণ করতেন যা হয়ত বল্লভদের জানাই ছিল না। তর্কযুদ্ধে জয়লাভ করার পর বল্লভরা উপাধ্যায়ের কুটিরে বেশ কিছুকাল ধরে সেই সমস্ত বিষয় নতুন আগ্রহে অধ্যয়ন করে নিজেদের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করতেন।

কিন্তু আজ! আজ রাজসভা থেকে তারই ওপোর এই গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। কিন্তু কেন? তবে কি উপাধ্যায় মহাশয় এইরকম সভায় যোগ দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন, অথবা—অথবা তিনি পতিত হয়েছেন বলে তাঁকে এই রকম সভায় আহ্বান করা হয় নি।

বল্লভের মনটা কেঁদে উঠল। অত বড় পণ্ডিত ব্যক্তি, একমাত্র ভুলের জন্য এইভাবে তাঁকে বর্জ্জন করা! অথচ উপায় বা কি? মাথায় ঝাঁকি দিয়ে বল্লভ উঠে দাঁড়াল। ব্রাহ্মণত্বের সংস্কার বলছে ব্রহ্মপদ উপাধ্যায় মৃত কারণ সে পতিত, আবার বল্লভের অবচেতন মন এই যুক্তি মানতে ঠিক যেন প্রস্তুত নয়। অত বড় পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য কি এক কথায় নস্যাৎ হবে? এই দুই বিরোধী ভাবের কোন মীমাংসাই বল্লভের জানা নাই।

সারাদিন এবং সারাটি রাত আত্মদ্বন্দ্বের মধ্যে কাটিয়ে পরদিন সকাল প্রাতঃসন্ধ্যা শেষ করে বল্লভ রওনা দিলে ব্রহ্মপদর কুটীর অভিমুখে। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও কে যেন বল্লভকে জোর টেনে নিয়ে গেল। পতিতের মুখ-দর্শনেও পাপ, কিন্তু সেই পাপীর কি অমোঘ আকর্ষণ! বল্লভ সেই আকর্ষণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারলে না। এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করে সে এল তার প্রাক্তন গুরুগৃহে। গুরুই বটে, এক সময় তাঁকে গুরুর থেকেও শ্রদ্ধা সে দিত। তা ছাড়া জ্ঞানগুরু ত বটেই। সেটা যে অনস্বীকার্য।

হয়ে বল্লভ দেখলে পর্ণকুটীর অনেকখানি শ্রীসম্পন্ন হয়েছে। পূর্ব্বে যেখানে ঘাস-পাতা-আগাছার জঙ্গল ছিল। এখন সেখানে লাউ-কুমড়োর মাচা উঠেছে, পরিষ্কার নিকানো উঠানের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে গরু এবং বাছুর; বল্লভের মনে হোল গুরুগৃহে কোন কালেই গরু ছিল না, কারণ গো-সেবকের অভাব ছিল, এখন সে অভাব আর নেই। বল্লভের মনটা একদিক দিয়ে বিষিয়ে উঠল। নিজেকে সে বার বার ধিক্কার দিতে লাগল,—কেন, কেন সে এসেছে? একবার মনে হোল এখান থেকেই সে ফিরে যাবে, দেখা করার কোন প্রয়োজন নেই। এবং বোধ সে ফিরেই পড়েছিল, কিন্তু পিছন ফিরেই হঠাৎ এক জীর্ণ বস্ত্র পরিহিতাকে নারকেলের কতকগুলি পাতা-হাতে আসতে দেখে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হোল। সেই নারী কোনমতে নিজের পরনের জীর্ণ ক্ষুদ্র বস্ত্রটি গুছিয়ে নিয়ে সবিনয়ে প্রশ্ন করলে, কে আপনি, কাকে চান?

বল্লভ কোন উত্তর দেয় নি।

আপনি কি বাবার কাছে এসেছেন? সেই পুনরায় প্রশ্ন করলে।

বল্লভ সবিস্ময়ে ওর দিকে তীক্ষ্ণভাবে দৃষ্টিপাত করে বল্লে তুমি কে? বাবা বলছ কাকে?

ঠাকুরমশাইকে, নারী উত্তর দিলে।

মুখ নামিয়ে বল্লে, হাঁ ওর কাছেই এসেছিলুম। মনটা তার আনন্দে লাফিয়ে উঠেই পরক্ষণে স্তিমিত হ'ল। নারী ছলনাময়ী, বিশেষতঃ এই নারী!

তাহলে ভেতরে আসুন। উনি পূজোয় বসেছেন।

বল্লভের মনে হোল অপেক্ষা না করে ফিরেই যাবে, কিন্তু পারলে না। কি এক আকর্ষণে নারীর পিছন পিছন লতানে গাছের মাচারতলা দিয়ে কুটীরের দাওয়ার কাছে এগিয়ে গিয়েই দেখলে ব্রহ্মপদ পূজায় বসেছেন। তারই পাশে কোমরে দড়ি দিয়ে খুঁটীর সঙ্গে বাঁধা এক শিশু উপুড় হয়ে এদিক ওদিক হামা দিচ্ছে আবার শুয়ে পড়ছে।

শিশুকে দেখা মাত্রেই বল্লভের ভেতরটা জ্বলে উঠল। এই আমাদের বৈদান্তিক এবং এই তার পূজা! ভগবান্!

সেই স্ত্রীলোকটি রোয়াকের অপর প্রান্তে একখানি জড়িয়ে-রাখা চেটাই টেনে পেতে ধীরকণ্ঠে বল্লভকে বসার জন্য অনুরোধ করলে। বল্লভ হাত নেড়ে ইসারায় তাকে নিবৃত্ত করে উঠানেই দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে ব্রহ্মপদ বল্লভের দিকে চেয়ে স্মিতহাস্যে নীরবেই অভ্যর্থনা জানাল। তারপর যেন কিছুই হয় নি এমনই ভাবে পূর্ব্বের মত স্বভাবসিদ্ধ কণ্ঠস্বরে বললেন দাঁড়িয়ে কেন? বোসো!

বল্লভ তবুও দাঁড়িয়ে রইল।

ব্রহ্মপদ পূজার কাজ শেষ করে নিজের আসনে উঠে দাঁড়িয়ে অমায়িক মৃদুহাস্যে রোয়াকের অপর প্রান্তের চেটাইয়ের কাছে এগিয়ে এসে বল্লভকে বললেন, এসো, বসা যাক।

একদা যাকে গুরু বলে মনে মনে স্বীকার করেছিল তার সস্নেহ আহ্বান উপেক্ষা করতে না পেরে বল্লভ অনেকখানি সংকোচ নিয়ে কোন মতে উপাধ্যায়ের চেটাইয়ের ওপর বসল। দেখল, ঐ চেটাইয়ের শেষ প্রান্তে দেওয়ালের দিকে একটি বালিশও রয়েছে।

গুরুদেব বল্লভকে বললেন, কেমন আছ বল। সব কুশল ত?

পুরাতন অভ্যস্ত প্রশ্ন। এর অভ্যস্ত উত্তরটাই বল্লভের ওষ্ঠপ্রান্তে এসে গিয়েছিল, আপনার চরণপ্রসাদে সমস্তই মঙ্গল। কিন্তু সেই বহুদিনের বহু উচ্চারিত উত্তরটা বল্লভের মুখে আজ আটকে গেল। কোন উত্তর না দিয়ে ঘাড় নেড়ে নীরবেই তার কুশলবার্তা জানালে। পূর্ব্বের ন্যায় বল্লভ আজ ব্রহ্মপদর পদস্পর্শও করে নি। কিন্তু এইসব ছোটখাটো পরিবর্তন সম্বন্ধে ব্রহ্মপদ উদাসীন। সহজ স্বাভাবিক কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, বল কি সংবাদ, গ্রামের খবর কি?

বল্লভ একেবারেই কাজের কথায় এসে পড়ল। বললে, রাজবাটী থেকে কোন সংবাদ কি আপনার কাছে এসেছে?

কি বিষয়ে?

আগামী শুক্রবারে রাজবাটীতে তর্কসভা হবে।

উপাধ্যায় বললেন, শুনি নি।

বল্লভ বললে, জানি না কেন, মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র সশিষ্য আমাকে ঐ সভায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

সানন্দে সমর্থন জানিয়ে উপাধ্যায় বললেন, উত্তম সংবাদ। মহারাজের নির্ব্বাচনে ভুল হয় নি। একাজে এখন তুমিই একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি।

ঘাড় হেঁট করে বল্লভ নিবিষ্টচিত্তে চেটাইয়ের বুনন দেখতে লাগল।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে ব্রহ্মপদ বললেন, চিন্তা কিসের বল্লভ! শঙ্কিত হোয়ো না। কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।

চেটাইয়ের একটা কাঠি নখ দিয়ে খুঁটতে খুঁটতে বল্লভ বললে, পারব কি? এই শিক্ষিত মানী রাজবংশের মুখ্য পণ্ডিতের আসনে বসে সেই আসনের সম্মান রক্ষার মত বিদ্যা কি আমার আছে?

আছে, আমি বলছি আছে। কথাগুলোয় জোর দিয়ে ব্রহ্মপদ বল্লভকে সাহস দিলেন, বললেন, রাজার নির্ব্বাচন কখনও ভুল হবে না। রাজা দেবতার অংশ, মনে রেখো, এটা দেবতারই ইচ্ছা। সেই তাঁরই আহ্বানে তুমি তাঁরই সেবায় নিযুক্ত হয়েছে।

সেই স্ত্রীলোকটি দুখানি পাতায় একটি করে কলা এনে এদের সামনে রেখে একটি মাটীর ঘটীতে এক ঘটি জল দিয়ে কিছুটা দূরে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বল্লভের মনে হোল আজ উপাধ্যায় গৃহে খণ্ড বা শর্করা জাতীয় কোন মিষ্টান্নই পাওয়া গেল না। হয়ত মিষ্টান্ন এখন অন্যের ভোগেই ব্যয়িত হয়।

উপাধ্যায় বললেন, নাও বল্লভ, ওটুকুর সদ্ব্যবহার কর, বলে নিজে একটি কলা তুলে নিয়ে ছাড়াতে সুরু করলেন।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও বল্লভকে একটি কলা তুলে নিতে হোল।

সেই স্ত্রীলোকটি অল্প কেশে যেন গলা পরিষ্কার করে নিয়ে ডাকলে, বাবা—

বল্লভ চমকে উঠল। উপাধ্যায় সহজভঙ্গীতে মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন, কি? কিছু বলবে?

সসংকোচে স্ত্রীলোকটি বললে, এভাবে কতদিন চলবে বাবা? এবার আত্মপ্রকাশ করুন।

স্মিতহাস্যে উপাধ্যায় বললেন, সত্য স্বপ্রকাশ। তুমি ব্যস্ত হোয়ো না পদ্মা, নিজের কাজে যাও।

স্ত্রীলোকটি অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধীরে ধীরে শিশুটিকে বন্ধন-

মুক্ত করে কোলে নিয়ে বাইরের দিকে বেরিয়ে গেল।

কদলীভোজন শেষ করে বল্লভ বল্লে, উনি কি বলতে চাইছিলেন ?

কে ?

যিনি আপনাকে পিতৃসম্বোধন করলেন ?

অভ্যস্ত স্মিতহাস্যে উপাধ্যায় বল্লেন, ও কিছু নয়। একটু থেমে বল্লেন, বুঝলে বল্লভ, পৃথিবীর সবটাই দেবতার দান ও করুণা বলে মনে করবে। এই যে রাজবাটীর আহ্বান তুমি পেয়েছ, মনে রেখ, এ আহ্বান দেবতার এবং দেবতার কাজ ভেবে পরম নিষ্ঠায় তোমার কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। তোমার এবং দেবতার সম্মান রক্ষা করাই যদি দেবতার ইচ্ছা হয় তাহলে নিশ্চয়ই তুমি সসম্মানে উত্তীর্ণ হবে। আর দেবতার অন্যরূপ ইচ্ছা হলে সেই বিপর্য্যয়ও তুমি হাসিমুখে গ্রহণ করবে, কারণ মানুষ নিমিত্তমাত্র। যে দূর ভবিষ্যৎকে আমারা মানবীয় জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে দেখতে পাই না, ভাগ্য নিয়ন্তা সেই সুদূর পরিণতির দিকেই আমাদের চালিত করেন। আমরা চলব, বিনা প্রতিবাদে আমরা সকলেই আমাদের সেই চালককে অনুসরণ করব।

উপাধ্যায় উঠলেন। বল্লভও উঠল। রৌদ্রের তেজ বাড়ছে। সামনে একক্রোশ পথ। আর দেরী না করে বাড়ী ফেরাই সঙ্গত।

যাবার সময় হয়ত বা মনের ভুলেই বল্লভ উপাধ্যায়ের চরণস্পর্শ করেছিল। উপাধ্যায় স্তিমিত নেত্রে উচ্চারণ করেছিলেন, নারায়ণ, নারায়ণ।

চার

লাউকুমড়োর মাচার তলা দিয়ে ঘড়ে হেঁট করে কুটীরের বাইরে এসে বাড়ী যাবার পথ ধরবার সঙ্গে সঙ্গেই বল্লভ ঐ স্ত্রীলোকেটিকে দেখতে পেলে। ছেলে কোলে নিয়ে সেই নারী গাছের ছায়ায় একাকী দাঁড়িয়ে ছিল।

বল্লভ ঐ দিকে একবার চেয়েই নিজের পথে চলতে লাগল। মেয়েটি তাড়াতাড়ি বল্লভকে অনুসরণ করে অল্প কেশে বল্লভের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছিল। বল্লভ সেদিকে দৃষ্টিপাতমাত্র না করে হন্‌হন্ করে এগিয়ে চল্‌ল।

সেই স্ত্রীলোকটি এবার বল্লভকে ডাকলে। বল্লে, ঠাকুরমশাই, ঠাকুরমশাই।

বল্লভকে থামতে হোল। নিতান্ত বিরক্তি সহকারে মুখ না ঘুরিয়ে সামনের দিকে চেয়েই উত্তর দিয়েছিল, কি ?

দয়া করে আমার একটা কথা শুনবেন।

বল। বল্লভ তখনও পর্য্যন্ত ওর দিকে চেয়ে দেখে নি। ওর দিকে চাইতেও বল্লভের কেমন যেন ঘৃণাবোধ ছিল।

নারী ওর সামনে এসে দাঁড়াল। বল্লে, যে কথা না বল্লে চলছে না সেটাই বলার জন্য আমি আপনার অপেক্ষায় এখানেই রয়েছি। ক্ষমা করবেন।

এবার ওর দিকে চেয়ে বল্লভ বল্লে, বল।

ঘাড় হেঁট রেখেই সে ধীরে ধীরে বল্লে, ঠাকুরমশাইকে আপনারা সকলেই বর্জ্জন করেছেন, কিন্তু তিনি যে কত মহৎ, কত উদার তা আপনারা কেউই বুঝলেন না সেটাই বলার জন্য আমি এখানে অপেক্ষা করছি।

জানি। তোমার জানার বহু পূর্ব্ব থেকেই ওঁকে জানি, বল্লভের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

জানেন না, জানলে ওঁকে এভাবে ফেলে দিতে পারতেন না। একদা বহু পুরুষের সংশ্রবে যে নারীর দিন কেটেছে সেই নারী দৃপ্তভঙ্গীতে উত্তর দিলে। কিন্তু কেন, কেন ওকে সমাজ থেকে বর্জ্জন করলেন ? আমার জন্যই ত ?

রুষ্টনেত্রে বল্লভ উত্তর দিলে, ঠিক তাই।

আপনারা কি জানেন আমি ওঁর কে ? আমি ওঁর আশ্রিতা কন্যা।

কন্যা ? বল্লভের কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হোল বল্লে তোমাদের ছলনার সীমা নেই জানি, কিন্তু মিথ্যা ভাষণেরও সীমা থাকা উচিত। তুমি কি পতিতা নও ?

আগে ছিলাম, এখন নই। বাবা আমাকে আপন দুহিতারূপে গ্রহণ করেছেন।

উনি নিজমুখে বলেছেন, ও শিশু আমার পুত্র। বলে নি ? বল্লভ পরুষকণ্ঠে উত্তর দিল।

বলেছেন। আমরা সকলেই যেমন ভগবান লোকেশ্বরের সন্তান, তেমনি আমরা মাতাপুত্রে উভয়েই ভগবানের অবতার উপাধ্যায় মহাশয়ের সন্তান। কথাগুলো বলার

সময় নারীর চোখে মুখে যে স্ফুলিঙ্গ দেখা দিয়েছিল সেটা বল্লভের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

তোমার নাম কি? অপরাধীকে জেরার ভঙ্গীতে বল্লভ প্রশ্ন করে।

আমার নাম পদ্মাবতী।

তুমি পদ্মগঙ্গা নও। ঐ অখ্যাত বস্তীর পদ্মগঙ্গা?

ওখানে কেউ কেউ আমাকে পদ্মগঙ্গাও বলত।

তুমি এখানে কেন?

সে ইতিহাস দীর্ঘ। সেজন্য আমার অপরাধও কম নয়। কিন্তু সেই অপরাধে আমার মত লাভবান আজ কেউ নয়।

খুলে বল। শুনতে চাই সেই কাহিনী।

কোলে রাখা ছেলের হাত নাড়ায় পদ্মার মাথার কাপড় সরে গিয়েছিল। কাপড়টা ভালভাবে টেনে নিয়ে স্ত্রীলোকটি বল্লে, আপনার বন্ধু রতিনাথ এবং আরও কয়েকজন আমাকে বেশ কিছু দিন ধরে বলেছিলএই রকম অভিনয় করে ঠাকুরমশাইয়ের অপমান করতে। আমি একেবারেই রাজী হই নি, তারপর ওরা আমাকে অর্থলোভ দেখায়। বলেছিল এইভাবে ঠাকুরমশাইকে অপদস্থ করলে আমাকে প্রচুর অর্থ দেবে। তাতেও যখন রাজী হইনি, তখন আমাকে প্রাণভয় দেখিয়েছিল। যেদিন সকালে এই শিশু ভূমিষ্ঠ হয় সেদিন ওরা বলেছিল যে ওদের প্রস্তাবে রাজী না হলে ওরা শিশুপুত্রকে আমার সামনেই হত্যা করে আমাকে বিকলাঙ্গ করবে। আমি জানি ওরা সব পারে, এবং ঐ কাজ করলে আমার পক্ষ হয়ে কোতায়ালীতে খবর দেবারও কেউ থাকবে না। তাই শিশুর মুখ চেয়ে দুরু দুরু বুকে আমি ঠাকুরমশাইয়ের কাছে এসেছিলুম। ওরাও কয়েকজন দূর থেকে আমাকে অনুসরণ করেছিল। ভেবেছিলাম ঠাকুরমশাই আমাকে দেখামাত্রই বিতাড়িত করবেন। তাহলে ওদের দৃষ্টিতে আমার কোন অপরাধ আর থাকবে না, আমার শিশুকেও অপঘাতের হাত থেকে রক্ষা করতে পারব। কিন্তু এখানে এসে অবস্থা অন্যরকম হয়ে গেল।

এবার বল্লভের আগ্রহ এবং কৌতূহল সমধিক দেখা গেল। সে বল্লে, কখন এলে?

পদ্মা বল্লে, দিবা দ্বিপ্রহরে। সেইমাত্র ঠাকুরমশাই মধ্যাহ্নভোজন শেষ করেছেন। আমি এসে ওদের শিক্ষামত শিশুকে ঠাকুরমশাইয়ের পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে বলেছিলুম, তোমার ছেলেকে গ্রহণ কর। সেই সঙ্গে এ মাকেও চরণে ঠাঁই দাও।

উনি কি বলেছিলে?

উনি বলেছিলেন তুমি কে? কোথা থেকে আসছ? তোমাকে ত চিনি না। তখন আমি ওদের শিক্ষামত বলেছিলুম, রাজা দুষ্মন্তও শকুন্তলাকে চিনতে পারে নি; আমি তোমার শকুন্তলা এবং এই ভরত। কথাগুলো বলেছিলুম বটে কিন্তু ভয়ে তখন কাঁপছি। হয়ত চরম অভিশাপ দেবেন কিম্বা পদাঘাতে দূর করে দেবেন, কিন্তু বিশ্বাস করুন, এ ছাড়া ঐ শিশুকে বাঁচাবার অন্য কোন উপায় আমার ছিল না। আমি জানতুম, দূর থেকে ঐ সব যমদূতেরা আমার কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করছিল। আমি চাইছিলুম, অভিশাপ না দিয়ে উনি আমাকে পদাঘাত করে বিতাড়িত করুন। তাহলে ওঁরও কোন অখ্যাতি হবে না, আমিও ঐ নররাক্ষসদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাব।

পদ্মা নীরব হোল, বোধ হয় সেই চরম এবং পরম মুহূর্ত্তটিকে মনে মনে স্মরণ করছিল।

উনি কি বল্লেন? বল্লভ প্রশ্ন করলে।

উনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লেন, বেশ, ছেলে নিয়ে ঘরের মধ্যে যাও। বাইরে দাঁড়িও না, রোদে দাঁড়িয়ে তোমার কষ্ট হচ্ছে।

তারপর?

তারপর উনি আপন মনেই বলে উঠলেন নারায়ণ, নারায়ণ, যেমন ধারা মাঝে মাঝে এখনও বলেন।

তারপর?

তারপর আর কিছুই বলেন নি।

একটু থেমে পদ্মা বললে, কি জানি কেন, এইভাবে ওর কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত আশ্রয় পেয়ে প্রথমে চমকে উঠেছি, তারপর আমার মনটা আনন্দে ভরে উঠেছিল এবং স্বীকার করতে লজ্জায় মাটীর সঙ্গে মিশে যাই, আমি তখন এ কথাও ভেবেছিলুম যে অন্য সকল পুরুষের মত উনিও বোধ হয় আমাকে পেয়ে খুসিই হয়েছেন। সেই দিনই উনি ওঁর ভাঁড়ারের সমস্ত সঞ্চয়

আমাকে প্রয়োজনমত ব্যবহার করার অধিকার দিয়েছিলেন এবং নিজের জন্য একটা চেটাই এবং বালিশ নিয়ে বাইরের দাওয়ায় বেরিয়ে এসেছিলেন। ভেবেছিলুম, মৃত্যুতের অশৌচের জন্য উনি সাময়িকভাবে এই ব্যবস্থা করলেন এবং অশৌচান্তে উনি আমাকে গ্রহণ করবেন, কিন্তু ক্রমে ক্রমে ওর মাহাত্ম্য যখন প্রকাশ পেল তখন থেকে আমি সত্য প্রকাশ করার জন্য আকুলভাবে সুযোগ খুঁজছি, কিন্তু আজও পর্য্যন্ত এমন কাউকে পাই নি, যার কাছে সব কথা প্রকাশ করে বলা যায়। আপনাকে পেয়ে আজ তাই সব প্রকাশ করব বলেই পথ-রোধ করেছি।

তোমার সঙ্গে সেই প্রথম দিনেই ত আমার দেখা হয়েছিল। তখন তুমি এসব কথা কিছুই বলনি কেন?

ঘাড় হেঁট করে কাঁদো কাঁদো মুখে পদ্মা বললে তখনও ত বাবার মাহাত্ম্য আমার কাছে পরিস্ফুট হয় নি। তখনও ছিল—

সে থেমে গেল।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্লভ বললে, বেশ, শুনলুম। এবার আমায় ছাড়।

আমার কথা এখনও শেষ হয় নি। পাপিষ্ঠাকে কন্যা বলে গ্রহণ করে ওঁর যা ক্ষতি হয়েছে এবং হচ্ছে তার উপযুক্ত প্রতিকার করতে হবে আমাকে, আপনাকে আপনাদের সকলকে। এ না করলে ভগবান আমাদের কাউকে রেহাই দেবেন না।

কি প্রতিকার চাই?

ওঁকে সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমি দূর থেকে শুনেছি, আপনি বাবাকে বলছিলেন যে মহারাজ কীর্ত্তিনাথ আগামী গুরুবারে আপনার জন্য শিবিকা পাঠাবেন। আমি মহারাজের নাম শুনেছি, কিন্তু কোনও দিনও তাঁর চরণ দর্শন হয় নি। আপনি আগামী গুরু-বারেই মহারাজের কাছে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে যথোচিত ব্যবস্থা করুন, এই আমার প্রার্থনা।

চোখ কুঁচকে বল্লভ বললে, আজ সহসা আমার দেখা পেয়ে তুমি এই কথা বলছ, কিন্তু তুমি নিজের আগ্রহে গ্রামে গিয়ে একথা ত কাউকে বল নি। আমি যদি আজ না আসতুম?

ছেলের পিঠে হাত চাপড়াতে চাপড়াতে পদ্মা বললে, গ্রামে যাবার কথা আমি বহুদিন ধরেই ভেবেছি, কিন্তু আমি যে কত অসহায় তা ত আপনি জানেন না। গ্রামে যেতে গেলে আমাদের পুরাতন বস্তীর ওপোর দিয়েই যেতে হবে। ওখানে দিনে রাতে সব সময় কেউ না কেউ আছেই। ওরা আমাকে এখান থেকে বাইরে বেরুতে দেবে না। ওরা আমাকে বলেই রেখেছে, ওদের বিরুদ্ধা-চরণ করলে ওরা আমার ছেলেকে আমার সামনেই হত্যা করবে। মা হয়ে সেটা আমি সহ্য করব কিভাবে?

বল্লভ ভাবতে লাগল। পদ্মা বললে, অথচ কিছু একটা ব্যবস্থা না করলে পিতৃহত্যার পাপে পড়তে হবে।

মুখ তুলে বল্লভের দিকে চেয়ে বললে, আপনি জানেন, বাবা আজ কতদিন অন্ন গ্রহণ করেন নি?

কেন, সবিস্ময়ে বল্লভ প্রশ্ন করলে।

অভাবে।

সে কি?

ঠিক তাই। ওঁর ত কোন উপার্জ্জন নেই। শিষ্য, ভক্ত এবং রাজবাড়ী থেকে যে সমস্ত ভোজ্য আসত, তাই-তেই ওর দিন চলত; যেদিন থেকে ওঁর বদনাম রটেছে সেদিন থেকে সমস্তই বন্ধ হয়ে গেছে।

ঘাড় হেঁট করে পদ্মা বল্লে, কিছু অর্থ আমারও ছিল এবং এখনও আছে, কিন্তু সেই অর্থে ক্রীত কোন কিছু বাবা গ্রহণ করবেন না। সামান্য কলা শসা পিয়ারা এব আশে পাশে ঐ যে দেখছেন কিন্তু শাক তরকারী হয়েছে ঐ সিদ্ধ করে খেয়ে বাবার দিন চলছে, কিন্তু এ ভাবে উনি ক'দিন বাঁচবেন? তারপর পরিধেয় সব জীর্ণ হয়ে এসেছে। দু'চার মাস পরে সেও এক মহা সমস্যা হয়ে দেখা দেবে। আগামী বর্ষায় খড় না পেলে কুটীর ছাওয়া হবে না, তখন বাসস্থানের সমস্যাও প্রবল হয়ে দেখা দেবে এখনই এসবের উপযুক্ত প্রতিকার করতে হবে। না হলে উনি বাঁচবেন কি ভাবে?

উনি কি বলেন? বল্লভ ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলে।

উনি নির্বিকার। প্রশ্ন করলে বলেন, ভগবানের ইচ্ছা।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে বল্লভ বললে, তুমি রাজবাটীতে গিয়ে এ সব কথা বলতে প্রস্তুত আছ?

আছি কিন্তু একা যেতে পারব না, আপনার সঙ্গেও যাব না, তাহলে পথিমধ্যেই আপনার প্রাণসংশয় হবে। আপনি রাজবাটীতে সব কথা জানিয়ে উপযুক্ত প্রহরাধীনে আমাকে নিয়ে যাবেন, আমি সমস্ত কাহিনী অকপটে স্বীকার করে মহারাজ কীর্ত্তিনাথ আমাকে যে শাস্তি দেবেন সেই শাস্তি মাথা পেতে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি। কেবল একটি মাত্র প্রার্থনা, তিনি যেন আমার ছেলের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দেন।

তাহলে সেই ব্যবস্থাই করি।

করুন। ছেলেটিকে ধুলায় নামিয়ে পদ্মা গলবস্ত্র হয়ে বল্লভকে প্রণাম করে প্রশ্ন করলে, পদস্পর্শ করতে পারি?

কর। বল্লভ ওর মাথায় দক্ষিণহস্ত স্পর্শ করে মনে মনে কি আশীর্ব্বাদ করেছিল বল্লভই জানে।

পাঁচ

শুক্রবারে মহারাজভবনে তর্কসভা। মঙ্গলবার সকালেই বল্লভ এল রাজদর্শনে।

মহারাজ কীর্ত্তিনাথ বল্লভকে সসম্মানে আহ্বান করে পাশে বসিয়ে কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করলেন। যথারীতি সেই সমস্ত নিয়মিত আলাপ শেষ হবার পর বল্লভ বললে, মহারাজ, একটি বিশেষ বিষয় আপনার গোচরীভূত করার উদ্দেশ্যেই আজ এসেছি, না হলে একেবারেই শুক্রবারে আসতুম।

কি?

বল্লভ আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিষয়টি নিবেদন করতেই রাজা হুকুম দিলেন বিশেষ প্রহরী সমেত দুখানা শিবিকা পাঠাও ব্রহ্মপদ ভবনে। ওদের দুজনকে এখনই আসতে বল।

দ্রুতগতি শিবিকায় ওঁরা দুজনেই দণ্ড দুইয়ের মধ্যে রাজভবনে উপস্থিত হোল।

ব্রহ্মপদকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা করে আসন গ্রহণের অনুরোধ করার সময় মহারাজ কীর্ত্তিনাথ লক্ষ্য করলেন, উপাধ্যায় পূর্ব্বের তুলনায় অনেকখানি শীর্ণ হয়েছেন বটে কিন্তু তাঁহার মুখের ঔজ্জ্বল্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। স্মিতমুখে ব্রহ্মপদ আসন গ্রহণ করার পর মহারাজ পদ্মাবতীকে তাহার বিবরণ দিতে আদেশ দিলেন।

পদ্মাবতীর সারা দেহ এবং কণ্ঠস্বর কাঁপতে লাগল। কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে সমস্ত কাহিনী পদ্মা বলে গেল। সব শেষে পদ্মা নিবেদন করলে যে এই মিথ্যাচার অবলম্বনের জন্য সে নিজেও কম দোষী নয়। ব্যক্তিগত এবং অপত্যের স্বার্থের জন্যই সে এই ঘৃণিত কাজ করেছে, অতএব যে কোন দণ্ডই সে গ্রহণ করতে প্রস্তুত কেবল মহারাজের শ্রীচরণে তার একমাত্র অনুরোধ, মহারাজ যেন এই অবোধ শিশুর উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। শিশু নিরাপদে থাকলে পদ্মাবতী মৃত্যুদণ্ডেও কাতর হবে না।

ব্রহ্মপদর দিকে দৃষ্টি দিয়ে মহারাজ বললেন, পরম ভট্টারক উপাধ্যায়, আমার রাজ্যের একদা যিনি সভাপণ্ডিত ছিলেন তাঁর ওপর এই অত্যাচার হয়েছে শুনে আমি বড়ই মর্ম্মাহত হয়েছি, কিন্তু লোকমুখে শুনছিলুম আপনি ঐ শিশুকে আপনারই পুত্র বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। এটা কিরূপে বলেছিলেন জানতে পারি কি?

ব্রহ্মপদ বললেন, নিশ্চয়ই জানতে পারেন মহারাজ। শাস্ত্রে পাঁচ প্রকার পিতার উল্লেখ আছে। অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা, যস্য কন্যা বিবাহিতা, এঁরা সকলেই পিতা, তা হলে পুত্রও আট প্রকার। সেই হিসাবেই ঐ শিশু আমার পুত্র। আমি একথা বলিনি যে আমি ওর জন্মদাতা।

স্মিতমুখে মহারাজ পণ্ডিতবাক্য সমর্থন করলেন।

পদ্মা তখনও যোড়হস্তে দণ্ডায়মান। রাজঅমাত্য মহারাজকে বললেন ঐ পতিতার শাস্তি নির্দ্দেশ করুন মহারাজ।

মহারাজ কীর্ত্তিনাথ সকলের মুখের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলেছিলেন, ঐ নারী উপাধ্যায়ের কাছে অপরাধী, আমি উপাধ্যায়কেই অনুরোধ করব তিনি ওর শাস্তি বিধান করুন। যে শাস্তির নির্দ্দেশ তিনি দেবেন সেই শাস্তির ব্যবস্থাই আমি করব।

সকলেই উপাধ্যায়ের দিকে চেয়ে রইল। করুণভাবে উপাধ্যায়ের মুখের দিকে একবার মাত্র চেয়েই পদ্মা ঘাড় নামিয়ে নিলে।

স্থির অবিচল কণ্ঠে ব্রহ্মপদ বললেন, ও আমার কন্যা। কন্যার সকল অপরাধ সেই প্রথম দিনেই আমি মার্জ্জনা করেছি মহারাজ।

শিশুপুত্র? মহারাজ প্রশ্ন করলেন।

ও আমারই পুত্র, আমি ত পূর্ব্বেই বলেছি মহারাজ। ব্রহ্মপদর স্বর অকম্পিত উত্তর।

সভাকক্ষ সম্পূর্ণ নীরব। মহারাজ ইঙ্গিত করলেন, অদ্যকার সভা শেষ।

বল্লভ নিজের আসনে উঠে করজোড়ে সবিনয়ে নিবেদন করলে, আমার একটি আবেদন আছে মহারাজ।

ব্যক্ত করুন।

উপাধ্যায় মহাশয় যখন সসম্মানে নিরপরাধ, নিষ্কলঙ্ক প্রমাণিত হলেন তখন আগামী গুরুবারের তর্কসভায় তাঁকেই রাজপণ্ডিতের আসনদানের নির্দ্দেশ দিন মহারাজ। উপযুক্ত ব্যক্তিকেই উপযুক্ত ভারদিয়ে রাজসভারসম্মান রক্ষা করুন।

মহারাজ বল্লভের দিকে কিছুক্ষণ দৃষ্টিপাত করে বল্লেন, কৃষ্ণবল্লভ, রাজপণ্ডিতের আসন আমি তোমাকেই দিয়েছিলুম। এখন যদি উপাধ্যায়কে সেই আসনে বসাই তা হলে তোমার স্থান কোথায়?

আমার স্থান যথপূর্ব্বম্। আমি ওঁর শিষ্যরূপে সেই সভায় উপস্থিত থাকব মহারাজ।

তোমার উন্নতির কোন বাসনা নেই? গুরুগম্ভীর কণ্ঠে মহারাজ প্রশ্ন করলেন।

আছে মহারাজ, কিন্তু উন্নতকে অপসারণ করে নিজের উন্নতিকামনা কোনও দিনই করব না।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে অমাত্যের দিকে দৃষ্টি দিয়ে মহারাজ বল্লেন, মহামাত্য লিখে নাও, আজ থেকে আমার রাজসভায় দু'জন সভাপণ্ডিত থাকবেন। মুখ্য পণ্ডিত ব্রহ্মপদ উপাধ্যায় আর অবর পণ্ডিতকৃষ্ণবল্লভ শাস্ত্রী।

সভাস্থ সকলেই মহারাজার জয়ধ্বনি দিয়েছিল। অমাত্যকে মহারাজ বল্লেন, এই ব্যাপারে অন্যান্য অপরাধীদের বন্দী করে আগামী কাল রাজসভায় উপস্থিত করা চাই। আগামী কালই ওদের যথোচিত বিচার হবে, কারণ পরবর্ত্তী গুরুবারে সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক অবস্থায় পণ্ডিত ব্রহ্মপদ উপাধ্যায় তর্কসভায় আমাদের নেতৃত্ব করবেন, সহকারী থাকবেন অবর-পণ্ডিত কৃষ্ণবল্লভ।

সভা ভঙ্গ হো'ল।

বিবিক্ত

নচিকেতা ভরদ্বাজ

রাজহাঁস হয়ে আমি উদ্দাম সমুদ্রের জলে
ভেসে থাকতে চাই, আমি পুকুরের প্রাচীন পললে
অন্ধকারে চুপ করে পরিচিত পৃথিবীর ঘরে
সহজিয়া সুখ নিয়ে ঘুমিয়ে থাকব না।
আমার সকল সত্তা পুড়ে যাচ্ছে সময়ের জ্বরে,
আমি আর প্রত্যহের খুদকুড়ো সোনা
কুড়িয়ে ফিরব না।
এ সব অন্ত্যজ সুখে আর ভালো লাগছে না আমার!
তার চেয়ে সর্ব্বগ্রাস্ত ভীষণ আঁধার
আমাকে আবৃত করে রাখুক, ভোরের
অমল সূর্যের দীপ্ত সোনার মৃণাল
ঠোঁটে নিয়ে যাব অন্য দূরের আকাশে,
উড়ে যাব অন্য এক দীপ্ত আলোকের
অনন্ত সন্ধানে এক অসহ্য উত্তাল
প্রবল তৃষিত ব্যথা বুকে করে। ভীষণ প্রবাসে
আমার আর ভালো লাগছে না।
ভীষণ গতির স্রোতে—অসহ্য আলোকে মিশে গিয়ে
শোধ করে চলে যাব হৃদয়ের দেনা,
এই শব্দ, এ পাষাণ, চাল ডাল কিছু না এড়িয়ে
এমন কি রাতের হাস্নাহেনা।

সাকারোপাসক ভারতবর্ষ

শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পরম ব্রহ্ম ব্যক্ত ও অব্যক্ত। তাঁহার এক পাদ মাত্র ব্যক্ত। বাকী ত্রিপাদ সমস্তই অব্যক্ত।

শ্রুতি বলেন—

পাদোঽস্যবিশ্বাভূতানি ত্রিপাদাস্যামৃতম্ দিবি।

—ব্রহ্মার এক অংশে বিশ্বের ভূতগণ অবস্থান করে এবং ত্রিপাদ দিব্য অমৃতস্বরূপে অবস্থিতি করিতেছে।

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ

(গীতা ১০।৪২)

আমি একাংশ দ্বারা এ জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছি।

পরমব্রহ্ম এই দৃশ্যমান জগতে সর্বত্র এবং জগতের বাহিরেও সর্বত্র। তিনি নাই এরূপ স্থান নাই।

পাশ্চাত্য ভোগভূমির ঈশ্বরবোধ এবং প্রাচ্য ত্যাগভূমি ভারতবর্ষের ঈশ্বরবোধ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ভোগভূমির ঈশ্বর এ জগৎ সৃষ্টি করিয়া এই জগতের বাহিরে স্বর্গে তাঁহার সৃষ্টজীবের দ্রষ্টারূপে এবং উপাসনীয়-রূপে বর্তমান। কিন্তু ত্যাগভূমির ঈশ্বর এই জগতের শুধু স্রষ্টা ও দ্রষ্টা নন। তিনি এই জগতের সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বর্তমান বা এই জগতে যাহা কিছু তাহা তাঁহারই বিভিন্ন মূর্ত্ত প্রকাশ। তিনিই সব এবং সবই তিনি। তিনি বহুরূপে আমাদের অন্তরে বাহিরে সর্বত্র বর্তমান—তিনিই আমাদের অন্তরে আমাদের আশ্রয়, শরণ সুহৃদরূপে বর্তমান। তিনি বাহিরে পিতামাতা ভ্রাতা ভগিনী সখা কন্যা স্ত্রী প্রভু ভৃত্য প্রভৃতি বহুরূপে আবার আমাদের কর্মফল ভোগ নিমিত্ত শত্রু, হন্তারক, দাতা, বন্ধু প্রভৃতি রূপেও বর্তমান।

পাশ্চাত্য ভোগভূমির ঈশ্বর বলিতেছেন—"সৃষ্ট জীব! আমাকে বিশ্বাস কর, আমার আশ্রয়ে এস, আমি তোমাকে অনন্তজীবন, অনন্ত সুখ সমৃদ্ধি দিব।" প্রাচ্যভূমির ঈশ্বর আমাদের অন্তর্যামীরূপে বলিতেছেন 'তত্ত্বমসি।' তুমি আর আমি স্বরূপতঃ এক। তুমি বিষয়মুগ্ধ, ইন্দ্রিয়াসক্ত এজন্য নিজস্বরূপ বিস্মৃত হইয়াছ। তুমি অহংমদমত্ত হইয়া এই জগতের ভোক্তারূপে সুখলাভের জন্য আপনার সর্বব্যাপিত্ব ভুলিয়া যাহা কিছু করিতেছ তাহারাই ফলস্বরূপ সুখদুঃখ ভোগ করিতেছ। তুমি তোমার স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা কর। আত্মানং বিদ্ধি। আপনাকে জান। আপনাকে জানিলে আর কিছু জানিবার বাকী থাকিবেনা। তুমি শুধু তোমার দেহ ব্যাপী নও। তুমি অজর-অমর-অক্ষর-অব্যয়। যে আত্মা তোমার দেহ মধ্যে সেই আত্মা এই জীবজগতে সর্বত্র। "জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ"। জীবরূপে ব্রহ্ম সর্বত্র।

পাশ্চাত্য দর্শনের মূল কথা এই জীবজগতের স্রষ্টারূপে এবং ত্রাতা রূপে ঈশ্বরকে জানা। কিন্তু প্রাচ্য ভারতবর্ষের দর্শনের মূলকথা এই জীবজগতের অন্তরে বাহিরে সর্বত্র ভগবদ্দর্শন। এই জীবজগৎ ব্যক্ত ব্রহ্মের লীলাময় কর্মমূর্ত্তি এই বোধের স্ফুরণ।

অব্যক্ত ব্রহ্ম নির্গুণ অনির্দ্দেশ্য, অক্ষর। তাঁহার উপাসনা সম্ভব নয়। দ্বৈতভাব ভিন্ন উপাসনা হইতে পারে না। আমি উপাসনা করিতেছি এবং আমার একজন উপাস্য বর্তমান এই দুই ভাব উপাসনার মূলে। উপাস্য যদি অনির্দ্দিষ্ট, অচিন্তনীয়—তবে তাহার উপাসনা কি ভাবে হইবে?

পরম ব্রহ্মের একাংশ এই জীবজগতে ব্যক্ত হইয়াও অব্যক্তরূপে বর্তমান। আমরা এই দৃশ্যমান জীবজগতের বিভিন্ন মূর্ত্তি দেখি; কিন্তু, ইহা যে পরমব্রহ্মের লীলাময় কর্মমূর্ত্তি এই বোধ আমাদের নাই। সর্বভূতে এবং সর্বত্র ভগবদ্দর্শন সাধনসাপেক্ষ।

এই জীবজগতে পরমব্রহ্মের যে অংশ ব্যক্ত তাহার তিন ভাব—(এক) এক এবং অদ্বিতীয় পরমাত্মারূপে এই জগতের অন্তরে বাহিরে সর্বত্র (দুই) প্রতি-জীব শরীরে ঈশ্বর রূপে, নিয়ন্তা রূপে, গতি-ভর্তা-সাক্ষী-নিবাস শরণ-

সুহৃদ ও দ্রষ্টারূপে সর্বত্র (তিনি) অজ্ঞান মায়ামুগ্ধ জীবশরীরে ব্যষ্টিভাবে সুখ-দুঃখের ভোক্তারূপে সর্বত্র। ইনি জীবাত্মা।

পরমাত্মা যেরূপ অসঙ্গ ও অভোক্তা হইয়াও সমগ্র জীবজগৎএর ধারক হইয়া তাহার ভোক্তারূপে বর্ত্তমান, তদ্রূপ জীবাত্মা স্বীয় ক্ষেত্র মধ্যে স্বরূপতঃ অসঙ্গ ও অভোক্তা হইয়াও মায়াধীন হইয়া ভোক্তারূপে বর্ত্তমান।

পরমাত্মা এই জীবজগতের সকল শক্তির উৎস। তিনি পরমেশ্বরীরূপে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রী। তিনি যোগমায়ায় সমাবৃত থাকিয়া ভগবদ্‌জ্ঞানশূন্য জীবের নিকট প্রকাশিত হন না। তিনি লীলাময়ী। একভাবে লীলা হয় না। এজন্য তিনি একভাবে জীবকে মুগ্ধ করেন। আবার সাধনপন্থী হইলে অন্যভাবে জ্ঞানদান করেন। তাঁহার সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার কার্য তাঁহার লীলার প্রকাশ মাত্র। প্রাকৃত মায়ামুগ্ধ আমরা তাঁহার সংহারকার্যকে নির্দ্দয়তা বলিয়া মনে করি। আমরা জীবগণ আমাদের খাদ্য চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য পেয়রূপে যাহা প্রতিদিন গ্রহণ করিতেছি তাহা যেমন আমাদের নির্দ্দয়তার কার্য নহে তাহা আমাদের শরীরের পোষণ ও তোষণ নিমিত্ত তদ্রূপ এই জাগতিক প্রতিক্ষণের সৃষ্টি স্থিতি-লয় কার্য তাঁহার লীলাপ্রবাহের পোষণ ও তোষণ নিমিত্ত। তাঁহার নির্দ্দয়তা নহে।

পূর্বে এই দৃশ্যমান জগতে পরমব্রহ্মের তিনভাবে বর্ত্তমানতার কথা বলিয়াছি (১) অবিচ্ছিন্ন পরমাত্মরূপে (২) সকল জীবশরীরে ঈশ্বররূপে (৩) আত্মজ্ঞানবর্জিত জীবাত্মারূপে। তিনি এক এবং অদ্বিতীয় হইয়াও তাঁহার এই তিনভাব লীলাময়ের লীলার প্রকাশক।

প্রতি জীবে ঈশ্বর, স্বরূপতঃ নির্গুণ হইয়াও সগুণ। তিনি নিরাকার, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত হইয়াও সাধকগণের সাধনার সৌকর্যার্থে সাকার, নির্দ্দেশ্য ও ব্যক্ত। তিনি জীবশরীরে সাধনলভ্য। ভারতবর্ষের সাকার-উপাসনার মূলতত্ত্ব এখানেই।

কর্ম ভিন্ন এই জীবশরীর অচল। এজন্য গীতায় শ্রীভগবান্‌ কর্মত্যাগকে সন্ন্যাস বলেন নাই। কর্মফল ব্রহ্মে সংন্যস্ত করিয়া কর্ম করাকেই সন্ন্যাস বলিয়াছেন। প্রতি জীব শরীরে ঈশ্বর দ্রষ্টারূপে নিবাস-শরণ সুহৃদরূপে বর্ত্তমান। এজন্য এই শরীরকে ঈশ্বর মন্দিররূপে নিত্য পোষণ ও তোষণ কর্ত্তব্য। ঈশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত ধ্যান ধারণাদি কর্ত্তব্য। যিনি আমার আত্মবোধের মূলে তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়বর্গের তোষণ কি মানবতার পরিচায়ক? মানবেতর প্রাণী তাহাদের ভোগদেহ লইয়াই ব্যস্ত। তাহাদের কার্য একমাত্র আত্মরক্ষা ও দেহরক্ষা। মানবগণও যদি তাহাদের কর্মদেহ লইয়া শুধু আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার কার্যে তাহাদের মূল্যবান দেহের সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত করে, তাহা হইলে মানব ও পশুতে পার্থক্য কোথায় থাকিবে?

এজন্য প্রত্যেক মানবের সাধনা কর্ত্তব্য। সাধনা ভিন্ন মানবজীবন পশুজীবনের সমতুল্য। পরমযোগী শ্রীঅরবিন্দ বলেন "সাধনা ঠিক মানুষ করে না। মানুষের ভিতর দিয়ে সাধনা করেন মা পরমেশ্বরী নিজে। মানুষের মুখ্যকাজ হ'লো মা যাতে মানুষের মধ্যে বসে বিনা বাধায় কাজ করতে পারেন তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে তোলা। মা আমার ভিতরে বসে কাজ করতে বাধা না পান, সাধকের করণীয় হ'লো সেইটুকু।"

শ্রীঅরবিন্দের মতে আমাদের সাধনা হ'লো—আমাদের হৃদয়ে যিনি ঈশ্বররূপে বর্ত্তমান তাহাকে সাধিকারূপে মাতৃত্বে হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। আমার যিনি 'আমি' তিনিই তো ঈশ্বররূপে এই দেহে বর্ত্তমান। সুতরাং ঈশ্বরকে মাতৃত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করা বা আমাকেই মাতৃত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করা একই কথা। ইহা আমারই মাতৃভাবের সাধনা। আমার নিত্য শাশ্বত সনাতন স্বরূপ জানিবার সাধনা।

সাধনার প্রথম অঙ্গ উপাসনা। উপ (সমীপে) আসন (স্থিতি) উপাস্যের সামীপ্য গ্রহণ। নিরাকার বা অনির্দ্দেশ্যের ভাবনা সম্ভব হইলেও উপাসনা সম্ভব নহে।

এজন্য ভারতবর্ষের সাধারণ নরনারীর সাকার—উপাসনা। পরম ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান্‌, তিনি শুধু নিরাকার থাকিবেন সাকার হইতে পারিবেন না এই কথা বলা কি মূর্খতার পরিচায়ক নয়? সাকারও তিনি, নিরাকারও তিনি। সর্বরূপেই তিনি। যে সাধক যেরূপভাবে তাঁহাকে চায় তিনি তাঁহাকে সেই ভাবে ভজনা করেন। ইহা গীতায় শ্রীভগবানের কথা।

ভোগভূমি পাশ্চাত্যে যে মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত ছিল তাহা এক এবং অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মের প্রতীক বা প্রতিনিধিরূপে

ছিল না। তাহাদের অর্চনীয় দেবদেবী অতিরিক্ত শক্তি-ধারী মানব-মানবীরূপেই পূজিত ছিলেন। এজন্য এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর বোধের প্রকাশে সেই সকল দেবদেবী অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন।

কিন্তু ভারতবর্ষের মূর্তিপূজার মূলে এক এবং অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মের সত্তা বোধ। এজন্য ভারতবর্ষের মূর্তিপূজা শাশ্বত ও সনাতন। এই মূর্তিপূজার ভিত্তি সুদৃঢ়। সহস্রাধিক বৎসরের পরাধীনতার সময়ে বহু অত্যাচারেও এই মূর্তিপূজা ভারতবর্ষ হইতে উৎখাত হয় নাই বরং দৃঢ়মূল হইয়াছে। এই মূর্তিপূজার মূলে ভারতের সমস্ত জ্ঞান ভাণ্ডার—যাহার ক্ষুদ্রতম অংশও এ পর্যন্ত পাশ্চাত্য মনীষীগণ সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে আজিও সমর্থ হন নাই। 'ঈশাবাস্য ইদং সর্বং' 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্য যাহাদের বুদ্ধির অগোচরে, তাহাদের পক্ষে ভারতে প্রচলিত মূর্তিপূজার রহস্য হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা বাতুলতা।

পাশ্চাত্য জগৎ এই জগতের মধ্যেই সুখের সন্ধান করিতেছেন। তাহারা এক্ষণে এই ক্ষুদ্র পৃথিবী ভোগেই সন্তুষ্ট নন। তাহারা অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ ভোগের জন্য লালায়িত। যিনি ঋত, শাশ্বত, সনাতন এই জগৎ তাঁহার লীলা প্রকাশক নিত্য পরিবর্তনশীল অনৃত মূর্তি। যিনি নিত্য-অব্যয়-অক্ষর, এই জগৎ তাঁহারই অনিত্য জড় ক্ষর মূর্তি। যিনি আনন্দ স্বরূপ "রসবৈ সঃ"—এই জগৎ তাঁহার দুঃখগর্ভ আপাতঃ সুখ-মূর্তি। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম বহির্মুখী। এজন্য আমরা স্বাভাবিক ভাবেই বাহিরে বহির্জগতে সুখানুসন্ধানে ব্যস্ত। এই বহির্মুখী ইন্দ্রিয়গ্রামকে অন্তর্মুখী না করিয়া আনন্দস্বরূপ তাঁহাকে জানিবার চেষ্টা পশ্চিমমুখী থাকিয়া সূর্যোদয় দেখিবার চেষ্টার মত পণ্ডশ্রম।

ভারতবর্ষের সাকারোপাসনা বা মূর্তিপূজা অনৃতের মধ্যে ঋতের সন্ধান, অনিত্যর মধ্যে নিত্যের সন্ধান, পরম দুঃখের মধ্যে পরম সুখের সন্ধান। আমাদের অন্তরে বাহিরে সর্বত্র ভগবদ্দর্শন ভারতবর্ষের মূর্তিপূজার মূলে।

ভারতবর্ষের এক শ্রেণীর মনীষীগণ মূর্তিপূজাকে বাহ্যপূজা মাত্র মনে করিয়া ইহাকে 'অধমাধম' অর্চনা মনে করেন। তাঁহারা তাঁহাদের ধারণার পরিপোষক হিসাবে নিম্নলিখিত ঋষি বাক্যের অবতারণা করিয়া থাকেন—

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমোভাবো বাহ্যপূজাধমাধমঃ॥

—আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ চিন্তা উত্তম ভাব। মধ্যম ভাব তাঁহার ধ্যানধারণা। অধমভাব তাঁহার স্তব ও জপ। এবং অধমাধম (অধমেরও অধম) ভাব বাহ্যপূজা। এই বাক্যের মধ্যে সত্য নিহিত থাকিলেও ভারতবর্ষে মূর্তি-পূজার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। এজন্য মূর্তিপূজার উদ্দেশ্যে 'অধমাধম' কৌলিক ঘৃণিবাক্য বর্ষণ অন্যায়। শাস্ত্রবিধি অনুসারে মূর্তিপূজা করিলে ইহাকে 'অধমাধম বাহ্য পূজা' মনে করা যাইতে পারে না। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ। অতএব শাস্ত্র বিধি জানিয়া কার্য করাই শ্রেয়ঃ।

ভারতবর্ষের মূর্তিপূজার প্রথমেই পূজকের কর্তব্য—আচমন। আচমন মন্ত্র—"ওঁ তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।" জ্ঞানীগণ সর্বদা সর্বব্যাপী অনন্ত অসীম আকাশে সর্বত্র চক্ষুস্বরূপ সর্বব্যাপক বিষ্ণুর পরমপদ দর্শন করেন।" শ্রীভগবান্ যে সর্বব্যাপী এবং সর্বত্র দ্রষ্টা রূপে অবস্থিত তাহা আচমন মন্ত্রে পরিস্ফুট।

এই আচমন মন্ত্র পাঠ ও অনুধাবন করা কি ব্রহ্মসদ্ভাব নহে? সর্বোত্তম যে ভাব ব্রহ্মসদ্ভাব তাহা এই আচমন মন্ত্রের মধ্যেই বর্তমান। সুতরাং যিনি স্বয়ং সর্বব্যাপী ব্রহ্মভাবের ভাবনা না করিতে পারেন, তাহার পক্ষে মূর্তিপূজা সম্ভব হয় না।

তৎপরে পূজকের কর্তব্য আসনশুদ্ধি, জলশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, অঙ্গন্যাস, করন্যাস প্রভৃতি। এইগুলি দ্বারা বহির্মুখী ইন্দ্রিয়গ্রাম অন্তর্মুখী হয়। ইহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অনাবশ্যক।

তৎপরে পূজক যে দেবতার পূজায় ব্রতী সেই দেবতার ধ্যান করিয়া তাহার মানস পূজা করিবেন। যে দেবতার পূজা নিজকে তদ্রূপ মনে করিয়াই মানস পূজা করণীয়। শাস্ত্রে আছে "শিবং ভূত্বা শিবং অর্চয়েৎ "বিষ্ণুঃ ভূত্বা বিষ্ণুং অর্চয়েৎ।" স্বয়ং শিবভাবে ভাবিত না হইলে শিবপূজা নিষ্ফল। স্বয়ং বিষ্ণুভাবে ভাবিত না হইলে বিষ্ণুপূজা নিষ্ফল। সুতরাং এই ব্রহ্মসদ্ভাবরূপ উত্তমভাব মূর্তিপূজার প্রধানতম অঙ্গ। এই উত্তমভাব ধারণার জন্য ধ্যান কর্তব্য। যখন

যে দেবতার পূজা করিতে হয় তাহাকে মনোময়, প্রাণময়, সর্বইন্দ্রিয়ময়, সর্বভূতময়, সর্বময় চিন্তা করিতে হয়। ইহাই ব্রহ্মসদ্ভাব। ব্রহ্মসদ্ভাব ভিন্ন ধ্যান নিরর্থক।

তারপর স্তুতি জপাদি বাহ্য পূজা যাহা কিছু করণীয় সমস্তই ব্রহ্মভাবে ভাবিত হইয়াই করণীয়। সুতরাং মূর্ত্তি-পূজাকে বাহ্যপূজা মাত্র যাহারা মনে করেন তাহারা মূর্ত্তিপূজার শাস্ত্রবিধি জানেন না। মূর্ত্তিপূজায় দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয় এবং পূজা অন্তে বিসর্জন করণীয়। দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা—অব্যক্ত চৈতন্যকে ব্যক্তরূপে প্রতিষ্ঠা করা। তারপর পঞ্চোপচারে বা দশোপচারে বা ষোড়শ উপচারে সাধ্যমত পূজা করিয়া বিসর্জন। এই বিসর্জন সাধকের অন্তরে পুনঃসুপ্রতিষ্ঠিত করণ। বিসর্জন মন্ত্রে (দেবীপূজায়) "গচ্ছ দেবী মমান্তরং" এই বাক্য আছে। তীর্থস্থানে বা যে স্থানে দেবতা প্রতিষ্ঠিত আছে সে স্থানে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াই প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। সুতরাং সে স্থানে আর প্রাণপ্রতিষ্ঠা, আবাহন ও বিসর্জনাদি ক্রিয়া করণীয় হয় না।

ভারতীয় মূর্ত্তিপূজার সমস্ত বিধিগুলি অনুধাবন করিলে ইহা যে জড় পুতুল পূজা বা বাহ্যপূজা মাত্র নয় তাহা বুঝিতে কাহারও ক্লেশ করিতে হয় না। এই মূর্ত্তিপূজাকে "অধমাধম" বলা যে অজ্ঞানপ্রসূত ইহাও বুঝিতে কষ্ট হয় না।

তারপর ব্রহ্মসদ্ভাব সাধারণ মানবগণের জ্ঞানগম্য নহে। পরমব্রহ্মের যেটুকু এই দৃশ্যমান জগতে ব্যক্ত এবং যাহা জগতের বাহিরে অব্যক্ত উভয়েই আমাদের মত সাধারণ মানবগণের দুর্জ্ঞেয়। তথাপি তিনি এ জগতে সর্বব্যাপী এবং সর্বত্র দ্রষ্ট রূপে বর্ত্তমান এবং আমাদের অন্তরে পরমসুহৃদরূপে অবস্থিত ইহা আমাদের নিত্য উপাসনায় বা দেবতা পূজায় ভাবনার বাধা কোথায়? পরমহংসদেব পরমব্রহ্মকে মাতৃরূপে দর্শন করিতে পারিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরধামের প্রস্তরময়ী ৺মা ভবতারিণী যে চিন্ময়ী সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ঙ্করী পরমেশ্বরী এ সত্য পরমহংসদেবের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি মূর্ত্তি পূজাকে বা সাকার উপাসনাকে তাঁহার ভক্ত ও শিষ্যগণের হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে ইউরোপে [illegible] এবং পৃথিবীতে যে যে স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণমিশন আছে সেই সেই স্থানে নিত্যনৈমিত্তিক মূর্ত্তিপূজার ব্যবস্থা আছে। বর্ত্তমানে যাহারা অন্য ধর্ম্মাবলম্বী এবং মূর্ত্তিপূজাকে যাহাদের ধর্মমতানুসারে গ্রহণীয় নয়, তাহারাও সানন্দে মূর্ত্তিপূজায় যোগদান করিয়া পরমানন্দ লাভে সমর্থ হইতেছেন।

সাধকগণ বলেন—'ভগবান্ সর্বভূতে অবস্থান করিতেছেন ও তিনি সর্বত্র এবং সর্বব্যাপী দ্রষ্টারূপে অবস্থান করিতেছেন ইহাই পূর্ণজ্ঞান নয়। তিনিই স্বয়ং এ জগতে বহুরূপে অবস্থান করিতেছেন, তিনি ভিন্ন এ জগতে বা জগতের বাহিরে কোথায়ও কিছু নাই, এই জ্ঞানই পূর্ণজ্ঞান।

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

সুতরাং ভারতীয় পরমেশ্বর তত্ত্বের তিনটি বিশেষত্ব (১) তিনি এক এবং অদ্বিতীয় (২) তিনি এক এবং অদ্বিতীয় থাকিয়াই বহুরূপে বর্ত্তমান ও (৩) তিনি সাধনলভ্য সাধকগণ যেরূপে দর্শন চান সেইরূপেই তিনি দর্শন দান করেন।

আমরা যে শরীর প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে বহন করিতেছি তাহা আমার নিকট একটা দেহ মাত্র। কিন্তু এ দেহের মধ্যে কত কি আছে। কত রক্ত-রস-মেদ-মজ্জা-স্নায়ু-মস্তিষ্ক অস্থি-মাংস, হৃৎপিণ্ড যকৃৎ পাকস্থলী মূত্রাশয় প্রভৃতি কত যন্ত্র। কত জীবাণু এই শরীরের অভ্যন্তরে কার্য করিতেছে তাহা কি আমরা কখনও চিন্তা করি? আমরা কত বৃক্ষ পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি প্রতিক্ষণ দেখিতেছি ইহাদের মধ্যে কত শক্তি ক্রিয়মাণ তাহা কি আমরা কখনও জানিবার চেষ্টা করি? যাঁহারা এ সম্বন্ধে চেষ্টা করেন গবেষণা করেন তাহারাও কি এই সকল জীব বা বৃক্ষাদির শরীরে যে শক্তি ক্রিয়মাণ তাহার উৎস কোথায় তাহা কি ক্ষণমাত্রও চিন্তা করেন?

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোটী কোটী গ্রহ উপগ্রহ কিভাবে কাহার শক্তিতে বিঘূর্ণিত হইতেছে তাহা যেমন আমরা জানিতে ইচ্ছা করি না তদ্রূপ এ দেহরূপ ব্রহ্মাণ্ডও কি ভাবে কাহার শক্তিতে চলিতেছে জানিতে চাই না।

আমাদের অধিকাংশের উপাসনা বা মূর্ত্তিপূজায় আমাদের স্বার্থচিন্তা এবং স্বার্থসিদ্ধির অভিলাষ। এ

আমরা সমগ্র জীবন উপাসনা বা পূজার্চ্চনায় অতিবাহিত করিলেও ভগবৎ-দর্শন আমাদের ভাগ্যে সম্ভব হয় না।

শাস্ত্রে যে সকল দেব দেবীর ধ্যান বর্ণিত আছে, তাহা কোন ব্যক্তির কল্পনার বস্তু নয়। সত্যাশ্রয়ী সত্যদর্শী সাধকগণের সম্মুখে তাঁহাদের মানস মন্দিরে এক এবং অদ্বিতীয় ভগবান যেরূপে দর্শনদান করিয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন শাস্ত্রে সেই সকল রূপ ধ্যানে বর্ণিত আছে। ধ্যানানুযায়ী মূর্ত্তিগঠনে পূজায় ফললাভ ত্বরান্বিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে মূর্ত্তিকারগণ তাঁহাদের ইচ্ছামত মূর্ত্তিগঠন করিতেছেন—শাস্ত্রের কোন ধার তাহারা ধারেন না। পূর্ব্বে শাস্ত্রানুযায়ী মূর্ত্তিগঠন ও পূজা ছিল মুখ্য এবং উৎসব ছিল গৌণ। বর্ত্তমানে উৎসব হইয়াছে মুখ্য, পূজা হইয়াছে গৌণ। এজন্য শাস্ত্র ও শাস্ত্রবিধি অনেকে জানিতেও ইচ্ছা করেন না—যদি কেহ এসম্বন্ধে কিছু জানিয়া প্রকাশ্যে বলিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সংখ্যাগুরু উৎসবকামীর হস্তে লাঞ্ছিত হন। এজন্য সার্বজনীন মূর্ত্তিপূজায় ব্যভিচার অবাধে চলিতেছে। ইহার প্রতিকার অবশ্য বাঞ্ছনীয়।

যাঁহার ইচ্ছায় বা লীলামানসে এই জীবজগতের সৃষ্টি ও যিনি নিজে কর্মপরতন্ত্র বহুজীবরূপে এজগতে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছেন, আবার যিনি মন্ত্রাধীনরূপে আপনাকে আপনার প্রকাশ জন্য সমুৎসুক—তাঁহার মৃন্ময়ীমূর্ত্তি শাস্ত্রবিধি অনুসারে গঠন করিয়া ও পূজা করিয়া কেন চিন্ময়ী করিতে পারিব না? মনে প্রাণে ডাকিলে কেন তিনি দর্শনদান করিবেন না? যিনি পরমহংসদেবকে দর্শনদান করিতেন, তিনি কেন আমাদিগকেও দর্শন দিবেন না?

ব্যক্তিবিশেষের উপসনা গৃহকোণে, মনে ও বনে চলিতে পারে। কিন্তু মূর্ত্তিপূজা প্রকাশ্যে করাই বিধি। প্রকাশ্যে মূর্ত্তিপূজা বহির্মুখী সাধারণ মানবগণকে অন্তর্মুখী করিবার চেষ্টা করে। ভারতের সহস্র সহস্র সহর পল্লীঅঞ্চলে তীর্থক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর মূর্ত্তি এবং তথায় লক্ষ লক্ষ লোকের নিত্যনৈমিত্তিক সমাগম, ভারতের সাকার-উপাসনার সার্থকতা ঘোষণা করিতেছে।

দেবীপূজা আসিতেছেন। মা আমার "জটাজুটসমাযুক্তা অর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরা" হইয়া তিনদিনের জন্য কৈলাসশিখর হইতে মর্ত্ত্যধামে আসিতেছেন। এই কৈলাসশিখর যেরূপে বাহিরে, তদ্রূপ আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অবস্থিত। আমাদের অন্তর বাহির রুদ্ধ করিয়া এতদিন অতিবাহিত করিয়াছি। আসুন আমরা মনেপ্রাণে ডাকি—মা! মা! এস, দেখা দাও! প্রণাম গ্রহণ কর।

ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে॥
শরণ্যে! ত্র্যম্বকে! গৌরি! নারায়ণি! নমস্তুতে॥

———

সাধকের সাথে—৫

অমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

(বক্রেশ্বর ও তারাপীঠ)

পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় চারিটি পীঠস্থান—যথা ফুল্লরা (লাভপুর), কঙ্কালী (বোলপুর), নন্দিকেশ্বরী (সাঁইথিয়া) ললাটেশ্বরী (নলহাটী), এবং দুইটি বিশিষ্ট সিদ্ধপীঠ-বক্রেশ্বর ও তারাপীঠ অবস্থিত। শেষোক্ত দু'টিকে দর্শন করিবার বাসনা অনেক দিন হইতে ছিল, কিন্তু নানা কারণে উহা পূর্ণ হয় নাই। ১৩৭৪ সালে শীতের সময়েযাওয়ার প্রস্তাবে শ্রীমদ্ ভৈরবানন্দ পরমহংস মহারাজ শরীরের অসুস্থতা বশতঃ সম্মত হইতে পারিলেন না। পরে অন্যান্য কারণে যাওয়া স্থির করা হইল না। অবশেষে ২৬শে এপ্রিল যাওয়া স্থির করিয়া প্রোগ্রাম করা হইল মুগলসরাই প্যাসেঞ্জারের হাওড়া-সাঁইথিয়া থ গাড়িতে সিউড়ীতে যাইয়া ২৭ এপ্রিল ৬৮ শনিবার অমাবস্যায় প্রাতে মোটর যোগে তারাপীঠ দর্শন করা হইবে এবং ২৮শে এপ্রিল বক্রেশ্বর দর্শন করিয়া ২৯ তারিখে প্রাতে কলিকাতায় ফিরিব। ইহা জানিয়া মহারাজ সূক্ষ্ম শরীরে উক্ত দুই পীঠস্থানে ঘুরিয়া আসিলেন। যথা সময়ে আমরা অর্থাৎ মহারাজ, আমার জামাতা, পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্রী, আমার স্ত্রী ও আমি হাওড়া হইতে রওনা হইলাম।

রেলগাড়িতে মহারাজ বলিলেন, "তোমরা বক্রেশ্বর ও তারাপীঠে যাবে তাই আমি সূক্ষ্ম শরীরে স্থান দুটি দেখতে গিয়াছিলাম। বক্রেশ্বরে শ্যাম সুন্দর শর্মা নামে একটি বিদেহী আত্মার সহিত আমার পরিচয় হল। ইনি ত্রেতা-যুগের প্রথম পাদের সাধক। ইনি বক্রেশ্বরের বিষয়ে যাহা জানাইলেন তাহা প্রচলিত আখ্যান অনুযায়ী নয়। তারা পীঠে শ্রীশ্রীতারা মাতা বলিলেন, 'তোমরা অমাবস্যায় আমার পূজা করা স্থির করেছ তাহা হইবে না—সে দিন আমায় পূজা কর্ত্তে পারবে না। তুই সূক্ষ্ম শরীরে এসে অমাবস্যায় আমায় পূজা করিস্। আমি মাকে জানালাম সূক্ষ্ম শরীরে আবার, আসিয়া আমি তোমার পূজা কর্ত্তে পারব না। ইহাতে মা একটু রুক্ষ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিলেন। তিনি একটু অসন্তুষ্ট হয়েছেন মনে হল। তাই এ যাত্রায় কিছু গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা আছে" মহারাজের আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হইল। আমাদের গাড়ি দুই ঘণ্টার অধিক লেট হইয়া অণ্ডালে পৌঁছিল। সাঁইথিয়ার গাড়ি যথা সময়ে চলিয়া গিয়াছিল। অগত্যা থ গাড়িটা সাইডিং-এ থাকিল। শীঘ্র পৌঁছিবার জন্য ট্যাক্সী যোগাড় করিবার চেষ্টাও বিফল হইল। প্রাতে ৮টায় সাঁইথিয়ার দ্বিতীয় গাড়ির দ্বারা আমরা দুপুর বারটার পরে সিউড়ীতে পৌঁছিলাম, প্রোগ্রাম ও সকল ব্যবস্থা ভেস্তাইল এবং অনেক অসুবিধার পর আমরা সিউড়ীতে থাকিবার নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া পুনঃ নূতন ব্যবস্থা করিয়া বৈকালে মোটর গাড়িতে বক্রেশ্বর এবং পরদিন প্রাতে তারা দর্শন করিতে পারিলাম। তারামা যেরূপ মহারাজকে জানাইয়াছিলেন—অমাবস্যায় তাঁহার পূজা করা সম্ভব হইলনা।

বক্রেশ্বর প্রাচীন তীর্থস্থান। ইহার মাহাত্ম্য মহর্ষি বেদব্যাসের দ্বারা কীর্তিত হইয়াছে। প্রবাদ আছে মহামুনি অষ্টাবক্র এই স্থানে সিদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং সতীর দেহের অংশ মনঃ বাভ্রূমধ্য-স্থান, এখানে পতিত হইয়াছিল তাই ইহা একটি পীঠস্থান। দেবী মহিষমর্দ্দিনী আর ভৈরব বক্রনাথ এখানে আছেন। তীর্থস্থানটি অল্প উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত। অনেকগুলি দেবালয়, অধিকাংশ শিব মন্দির-রাস্তার দুই পার্শ্বে আছে। প্রতিষ্ঠাতাদের জীবদ্দশায় সম্ভবতঃ পূজাদি এবং কিছু দেখা শুনা করা হইত এখন কিন্তু পূজার বা কোন রূপ যত্নের চিহ্ন দেখা গেল না, এবং এগুলির অবস্থাও শোচনীয়।

একটি বড় দ্বার পার হইয়া আমরা প্রাঙ্গণে প্রবিষ্ট হইলাম। বামে উষ্ণ জলের কুণ্ডের বারি স্পর্শ করিয়া ডাইনে বক্রনাথ শিবের মন্দিরের মহাগর্ভে নামিয়া শিব লিঙ্গের দর্শন পূজাদি করিয়া মহিষমর্দ্দিনী দেবীর এবং অন্যান্য বিগ্রহগুলির দর্শন ও তপ্ত কুণ্ডগুলির জল স্পর্শ

করিলাম। এখানে ভূগর্ভ হইতে তপ্তবারি নির্গত হইয়া পাপহরা নাম্নী স্রোতস্বিনী এবং কয়েকটি তপ্তকুণ্ড সৃজিত হইয়াছে। তৃতীয় কুণ্ডটিকে পাবক কুণ্ড বলা হয়। ইহার জলের তাপমাত্রা ৬৭° (সেন্টিগ্রেড) এবং স্বচ্ছ বারিতে কুণ্ডের তলদেশ হইতে অত্যুষ্ণ জল ও বাষ্পের বুদ্বুদগুলির নির্গমন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য তপ্ত কুণ্ডগুলির জলের তাপমাত্রা ৬৭° অপেক্ষা নিম্নতর। বক্রেশ্বর পুরাণে তপ্ত সলিল হওয়ার কাহিনী বর্ণিত আছে। সংক্ষেপে উহা এইরূপ :—

সত্যযুগের পদ্ম কল্পের শেষে হিরণ্যকশিপু নামে দৈত্যরাজ কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া বর প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় বলশালী ও দুর্জ্জয় হইয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত দুর্বৃত্ত ও মদোন্মত্ত ছিলেন এবং তাঁহার অত্যাচারে স্বর্গে দেবতা যক্ষ, গন্ধর্ব কিন্নরাদি, এবং মর্ত্যে নরপালগণ অত্যন্ত উৎপীড়িত ছিলেন। তিনি শিবার্চনা তৎপর ছিলেন কিন্তু লক্ষ্মীশ নারায়ণের প্রতি সর্বদা দ্বেষী ছিলেন। বৈষ্ণব দেখিলেই তাহার উৎপীড়ন বা বধ তাঁহার নিকট অনিবার্য্য। কিন্তু তাঁহার আত্মজ প্রহ্লাদ মহাজ্ঞানী ও পরম বৈষ্ণব ছিলেন, এবং পিতার আদেশ অমান্য করিয়া হরিনাম পরায়ণ ছিলেন। ইহাতে হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত কুপিত হইয়া পুত্রকে নানারূপ পীড়িত করিতেন এবং তাঁহার প্রভূত প্রযত্ন সত্ত্বেও প্রহ্লাদের হরিভক্তি অটল দেখিয়া তিনি তাহার বধের নিমিত্ত বহুবিধউপায় অবলম্বন করিলেন। কিন্তু হরিভক্তির বর্মে রক্ষিত পুত্রের কোন রূপ ক্ষতি করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি যখন স্বহস্তে খড়্গ দ্বারা তাহারা মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন, তখন ভক্তের নিমিত্ত নারায়ণ জ্বালামালা সমাবৃত অদ্ভুত নৃসিংহ রূপ ধারণ করিয়া প্রদোষ সময়ে প্রকট হইয়া নিজের বজ্র নখের দ্বারা হিরণ্যকশিপুর দেহ বিদীর্ণ করিয়া তাহাকে বধ করিলেন। ইহার পর নৃসিংহদেবের দেহের জ্বালা উপশমিত না হওয়ায় তিনি উহা নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত ত্রিভুবনে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া, বক্রেশ্বর তীর্থে আগমন করিলেন। তথায় বক্রেশ্বরের আরাধনা করিয়া তাঁহার আদেশে তৃতীয় কুণ্ডে স্নানের ফলে জ্বালামুক্ত হইলেন।

তস্য যদ্যাপিতং তেজঃ তদ্বদিত্যাং বটে স্থিতং
তৎ ক্ষেত্রং পুণ্যদং নৃণাং ভক্তি-মুক্তি-প্রদায়কম্॥
অদ্যাপি চ নদী তপ্তা তত্রাস্তে মুনি সত্তমাঃ।
স্নানং দানং জপস্তত্র আনন্ত্যায়োপ কল্পতে॥
ততোহগ্নি কুণ্ডমেতদ্ধি জ্বালাকুণ্ডম্ ইতি শ্রুতম্।
(বক্রেশ্বর পুরাণ, ৩-অধ্যায়)

অবতারের পরিত্যক্ত তেজ বিস্তারিত হইয়া উত্তরে বটবৃক্ষে স্থিত হইল আর ঐস্থানে একটি স্রোত তদবধি প্রবাহিত হইতেছে। স্থানটি পুণ্যক্ষেত্র যেখানে স্নানদান জপাদি অধিক কল্যাণদ। কুণ্ডের দর্শনে পাপ নষ্ট হয়। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমাতে শ্রাদ্ধাদির বিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

কুণ্ডগুলির ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে এবং প্রত্যেকের সম্বন্ধ আখ্যায়িকাও আছে। বক্রনাথের মন্দিরের নিকটে শ্বেতগঙ্গা। এখানে শিবের সান্নিধ্যার্থ গঙ্গা কুণ্ডাকারে আছেন। বটবৃক্ষ ইহার উত্তরতটে অবস্থিত। এই বট প্রদক্ষিণ করিয়া একটি ছোট প্রস্তর খণ্ড ইহাতে বাঁধিলে মৃতবৎসা নারী জীববৎসা হন এইরূপ মাহাত্ম্যে কথিত আছে।

ব্রহ্মকুণ্ডটি ব্রহ্মার নির্মিত। কন্যার প্রতি সকাম দৃষ্টিপাতের অপরাধে চতুরাননকে শিব শূলের দ্বারা বিদ্ধ করেন। তিনি কুণ্ড নির্মিত করাইয়া, তাহাতে ত্র্যম্বক মন্ত্রে শিব-প্রীতির জন্য হোম ও আরাধনা করেন। ইহাতে শিব সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মাকে পাপমুক্ত করেন। এই কুণ্ডের বারি ব্যাভিচার জনিত পাতক হইতে মুক্ত করে।

সৌভাগ্যকুণ্ড সম্বন্ধে শিবকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইবার জন্য রূপ-লাবণ্যকামা পার্বতীর কঠোর তপস্যার আখ্যায়িকা বলা হয়। এই কুণ্ডে বিধিবৎ স্নানে নারী শিবের বরে সৌভাগ্যবতী ও পুত্রবতী হয়।

অগস্ত্য ঋষির ত্রাসে লবণ সমুদ্র এখানে আসিয়া একটি কুণ্ডে লুক্কায়িত ছিলেন। এই কারণে জল লবণাক্ত এবং কুণ্ডের নাম ক্ষারকুণ্ড হইয়াছে।

তপ্তজল স্রোত প্রবাহিত হইয়া যখন উৎস হইতে দূরে যায়, তখন ইহার তাপমাত্রা হ্রাস হওয়ার ইহা স্নান যোগ্য হয় এবং ঐ বারিতে স্নানে বাতাদি ব্যাধির উপকার হয়।

বিদেহী মুনি শ্যামসুন্দর শর্মা মহারাজের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহার অনুরোধে মহারাজ

আমাদের সকলকে সাথে লইয়া, কুণ্ডের উত্তর তটস্থ বিশাল বট বৃক্ষের নিকটে যাইয়া দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে বটের ভিতরে যেন কিছু দেখিতে লাগিলেন, আমি তাঁহার পার্শ্বে ছিলাম। তিনি আমাকে তাঁহার স্কন্ধে হস্তারোপণ করিয়া মার্গস্থ হইয়া বটের একস্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে বলিলেন। তখন আমি সেইস্থানে একটি কুব্জ বৃদ্ধের মূর্তি দেখিলাম। মহারাজ বলিলেন উনিই ত্রেতাযুগের শ্যামসুন্দর শর্মা। ঐস্থানে বটবৃক্ষের তলায় তিনি সাধনা করিতেন এবং যেখানে বক্রেশ্বরের স্থান দেখান হয়, তথায় তিনি শিবের আরাধনা করিতেন। তিনি মহারাজকে জানাইয়াছিলেন যে উহা অষ্টাবক্রমুনির সাধনস্থান নয়। যেহেতু তিনি কুব্জ ছিলেন তাঁহাকে বক্রমুনি বলা হইত এবং কালে বক্রমুনি হইতে নামান্তর হইয়া অষ্টাবক্রমুনির স্থান পরিচিত হইয়াছে। মহারাজের যোগশক্তির বলে আমার ঐ অদ্ভুত দর্শন হইয়াছিল।

কুণ্ডগুলির জলের তাপমাত্রা ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণ মহারাজ এইরূপ বলিলেন :—নৃসিংহ অবতার ঐ স্থানের সলিলে আটবার ডুব দিয়াছিলেন। প্রত্যেক ডুবের পর তাঁহার দেহের জ্বালা কম হওয়ায় আটটি কুণ্ডের জলের তাপমাত্রা ভিন্ন ভিন্ন। ব্যাপারটি সাধারণভাবে বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে সম্ভবতঃ তপ্ত বারির এক উৎস হইতে ভূ-গর্ভস্থিত বিভিন্ন মার্গের দ্বারা উষ্ণোদকের নির্গম ভিন্ন ভিন্নকুণ্ডগুলিতে হইতেছে এবং পথের তারতম্যানুসারে পথে তাপ হরণের স্বাভাবিক বৈষম্যের জন্য কুণ্ডগুলিতে জলের তাপমাত্রা ভিন্ন হইতে পারে।

বক্রেশ্বর তীর্থ ৫১ পীঠস্থানগুলির অন্যতম। সতীর দেহের ভ্রু-যুগলের মধ্যস্থান এখানে পতিত হইয়াছিল বলা হয়। মহরাজ কিন্তু এখানে কোন শক্তি-সত্তা অনুভব করেন নাই। মহিষমর্দ্দিনীর মন্দিরেও উহা অনুভূত হয় নাই। ইহাতে তিনি এবং আমরা সকলে বড় বিস্মিত হইয়াছিলাম। কারণ দেব-সত্তা থাকিলে, দেবতা মহারাজের দৃষ্টিগোচর নিশ্চয়ই হন, কখনও অন্যথা হয় না। সম্ভবতঃ কালের প্রভাবে পীঠস্থানটি এখন ভূগর্ভে কোথাও আছে আর উহার মাহাত্ম্যের বিকাশ বাহিরে কোথাও নাই। মহারাজ ঐস্থানে মাত্র বক্রেশ্বর শিব ও বিদেহী শ্যাম সুন্দর মুনির দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যদিও গ্রীষ্মের সময় এবং সিউড়ীর কষ্টকর গরমের দুর্নাম আমরা শুনিয়াছিলাম, আর প্রচণ্ড গরমের কষ্ট ভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু সেখানে কলিকাতা অপেক্ষা গরমের প্রকোপ কম পাইয়াছিলাম আর মোটের উপর সে সময় সিউড়ীতে যেখানে আমরা ছিলাম, সেখানে বেশ আরামেই ছিলাম।

পরদিন (২রা এপ্রিল) প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া আমরা একটি ট্যাক্সীতে তারাপীঠ দর্শনার্থ বাহির হইলাম। সিউড়ী হইতে দূরত্ব ৩৬ মাইল এবং অধিকাংশ পথ বেশ ভাল। মা তারা ও বিদেহী বামা ক্ষ্যাপা বাবা মহারাজকে শূন্যে দর্শন দিয়া আমাদের সাথেই চলিলেন।

হৃদ্‌রোগের পরে আমার পত্নী যদিও সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হন নাই এবং আমার অনিচ্ছায় তিনি এই যাত্রায় আসিয়াছিলেন, এই ভরসায় যে মহারাজ আমাদের সাথে থাকিবেন। তিনি পূর্বদিবসে বক্রেশ্বরের দর্শনাদি এবং পর দিবসে মন্দিরের সিঁড়ি ধরিয়া মা তারার, শিবের ও অন্য দেব-দেবীর দর্শনাদি করিতে পারিয়াছিলেন এবং মোটরে ভ্রমণের জন্যও বিশেষ কষ্ট তাঁহার হয় নাই। ইহাতে আমার একটু আশ্চর্য্য লাগিয়াছিল। কারণ আসিবার পূর্বেও মোটরে কলিকাতায় ভ্রমণে তাঁহার হৃদযন্ত্রে কষ্ট হইত, সিড়ি দিয়া উঠা তো দূরের কথা।

তারা-মার দর্শন ও পূজাদি করা হইল। দর্শনার্থীদের সংখ্যা অত্যধিক ছিল না, তাই তারামার অর্চনাদি ভাল ভাবেই করা সম্ভব হইয়াছিল। চন্দ্রচূড় শিবের দর্শন এবং মহাশ্মশানে পঞ্চমুণ্ডীর সিদ্ধদেবী, বামা ক্ষ্যাপা বাবার সমাধি মন্দিরাদি এবং অন্য মন্দিরের বিগ্রহগুলির দর্শন করা হইল।

তারাপীঠ দ্বারকা নদীতীরে প্রাচীন সাধন ভূমি। নদীর তটে মহাশ্মশান এবং উহার অনতিদূরে জীবৎকুণ্ড নামে পুষ্করিণী এবং তারামার মন্দির বিদ্যমান। স্থানটি অরণ্যের মধ্যে অবস্থিতির জন্য পুরাকালে ভয়াবহ ছিল। এখন লোকালয়, কিছু দোকান, দেবালয়, বাসা-মিশন আদি থাকায় এবং অনেক ভক্ত যাত্রী সমাগম হওয়ায় স্থানটি সজীব। পৌছিয়া প্রথম দর্শনেই স্থানটি ভাল লাগিল এবং মায়ের ও অন্যান্য বিগ্রহাদির দর্শন করিয়া সকলের

মনে আনন্দ এবং একটি অপার্থিব সত্তার বাতাবরণে প্রবিষ্ট হওয়ার ভাব অনুভূত হইয়াছিল। মা তারার দর্শন করিয়া এক অভূতপূর্ব আনন্দ এবং এক জাগ্রত মহাশক্তির সান্নিধ্য মনে হইতেছিল এবং মার নয়ন হইতে যেন অশেষ স্নেহ ও করুণা বর্ষিত হইতেছিল।

চন্দ্রচূড় শিবলিঙ্গে মহারাজ বেশ সত্তা অনুভব করিয়াছিলেন। বামাক্ষ্যাপা সিদ্ধসাধক ছিলেন আর প্রভূত অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর সান্নিধ্যে আসিয়া অনেকে তাঁহার কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। অনেকে বিপদ মুক্ত বা পূর্ণকাম হইয়াছিলেন। তিনি মহাশ্মশানটিকে পরিদর্শন করিতে মহারাজকে বিশেষভাবে বলিলেন। অন্য দর্শনাদির পর মহারাজ যখন মহাশ্মশানে প্রবেশ করিলেন, আমিও তাঁহার সাথে চলিলাম। এখানে একটি বৃহৎ শাল্মলী বৃক্ষ ছিল, যাহার তলায় বামাক্ষ্যাপা বাবা এবং তাঁহার পূর্ব্বে অন্য সাধকগণ সাধনা করিয়াছিলেন। সে বৃক্ষ এখন নাই, তবে যাহাকে বশিষ্ঠের সিদ্ধাসন বলা হয়, তাহা এখনও আছে এবং মহারাজ বলিলেন যে উহাতে এখনও প্রভূত শক্তি বিদ্যমান। ঐ আসনে প্রকৃত অধিকারী মাত্র বসিয়া সাধনা করিতে পারে, অন্য কেহ বসিয়া যদি সাধনা করে তাহলে তার অনিষ্ট হয় এবং সে আর উহাতে উপবেশন করিতে পারে না। ইহা বহুবার পরীক্ষিত বলা হয়। ভয়, উৎপাত, সংজ্ঞা হারান, মস্তিষ্কের বিকৃতি, ব্যাধি আদি অনধিকারীদের হইত- এইরূপ বলা হয়। এই আসনের শেষ অধিকারী ছিলেন বামাক্ষ্যাপা বাবা। বাবার সমাধিমন্দির তাঁহার নির্দিষ্ট সমাধিস্থানের উপর, নির্মিত হইয়াছে। বলা হয় ইহার নিম্নে কোন প্রাচীন নির্মাণের ভিত্তি আছে—যাহা তারামার প্রাচীন মন্দিরের ভিতের অংশ বলিয়া অনুমিত।

সিদ্ধাসনের নিকটে গাছপালার মধ্যে একটি স্থানকে দেখাইয়া মহারাজ বলিলেন, "এখানে একটি সিদ্ধপীঠ আছে"। ক্ষ্যাপা বাবার পূর্বে ঐস্থানে কালন র রমা তন্ত্র মুখোপাধ্যায় নামে এক সাধক সাধনা করিতেন। তিনি উচ্চকোটির সাধক ছিলেন, কিন্তু নির্বিকল্প সমাধি লাভ করিবার পূর্বে তাঁহার দেহান্ত হয়। ইনি সূক্ষ্ম শরীরে মহারাজের সম্মুখে প্রকট হইয়া তাঁহার সাধন স্থানটিতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন। আমাদের সাথে একটি স্থানীয় সাধু ছিলেন পথপ্রদর্শক রূপে। তিনি পথ দেখাইয়া মহারাজের প্রদর্শিত সিদ্ধ পীঠস্থানের নিকটে লইয়া গেলেন। মহারাজ ঠিক স্থানটিতে দাঁড়াইয়া আমাকে মার্গস্থ হইয়া, তাঁহার স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া উপস্থিত সাধককে দেখতে বলিলেন। আমি ধুম্রের ন্যায় কিছু দেখিলাম, স্পষ্ট কোন মূর্ত্তি বুঝিতে পারিলাম না। দেখিবার তেমন ইচ্ছাও ছিলনা, তাই মহারাজকে কিছু বলিলাম না। তিনি বলিলেন গৌরবর্ণ, ক্ষীণতনু, প্রৌঢ় ব্রাহ্মণের রূপে সাধক দাঁড়াইয়া আছেন। আমার মন তখন মহাশ্মশানের প্রভাবে অভিভূত ছিল, ঐ বিদেহী আত্মাকে দেখিবার আগ্রহ ছিলনা। পরে মহারাজকে যখন ইহা জানাইয়াছিলাম, তিনি বলিয়াছিলেন "আমাকে তখন বলেননি কেন, আরও স্পষ্ট দর্শন হতে পারতো"

শ্মশানে ভ্রমণকালে একটি ভস্ম ভূষিত আধাবয়সী সন্ন্যাসীকে দেখিলাম। তিনি কোন ক্রিয়াতে রত ছিলেন এবং পরে উঠিয়া নদীর দিকে গেলেন। তিনি গৌরবর্ণ, হৃষ্টপুষ্ট, জটাজুটধারী ছিলেন। সাধনা মণিপুরের উর্দ্ধে যায় নাই, এইরূপ মনে হইল। মহারাজ আর একটি সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছিলেন—আমি দেখি নাই, তিনি ইষ্ট সিদ্ধিপ্রাপ্ত ছিলেন।

একস্থানে একটি কয়লাদির স্তুপের উপরে দণ্ডায়মান একটি ১৮ বৎসরের বালককে দেখিলাম। সে দুই হস্ত উর্দ্ধে প্রসারিত করিয়া, তারস্বরে তারা নাম করিতেছিল। সে পয়সা চাইল। আমি তাহাকে কিছু না দিয়া চলিয়া যাইতেছিলাম, কিন্তু তাহার বদনমণ্ডলে চোখে চোখ পড়াতে থমকিয়া দাঁড়াইতে হইল, কারণ বালকটি অসাধারণ মনে হইল। জন্মান্তরের সাধনার আভাস যেন তাহার চাহনিতে প্রকাশিত হইতেছিল। তাই ফিরিয়া যাইয়া তাহাকে কিছু দিয়া, পুনঃ অগ্রসর হইলাম। মহারাজ একটু পশ্চাতে ছিলেন, তিনি যখন বালকের নিকটে আসিলেন, সে তাঁহার কাছে পয়সা চাহিল, বলিল, "দশ পয়সা দিতে হবে। পয়সা তোমার কাছে আছে, আমাকে দাও"। মহারাজ দিলেন, উপযুক্ত পাত্র জানিয়া তাহাকে দান দিয়াছিলেন। পরে আমাকে বলিয়াছিলেন, "বালকের গত জন্মের সাধনা বিশুদ্ধ চক্র পর্য্যন্ত আছে, এবং

উপযুক্ত শিক্ষা ও নির্দিষ্ট সাধনার দ্বারা সে যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারে।"

শ্মশানভূমিটি বেশ বড় এবং সাধনার জন্য ভাল মনে হইল। উহা কত সাধকের সাধনার স্থান। তাঁহাদের পুণ্যময় সত্তায় বাতাবরণ সেখানে চঞ্চল মনকে যেন স্থির করিয়া দেয়। তারাপীঠ স্থানটিতে আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম। মায়ের করুণাময়ী মূর্তি কত প্রাণে আশা ও সান্ত্বনা দিয়েছে ও দিতেছে।

এখানে বশিষ্ঠের সিদ্ধাসন নামে যে সিদ্ধপীঠ আছে, উহা মহর্ষিবশিষ্ঠের সাধনার আসন নহে। মহারাজ ইহা মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ বশিষ্ঠ নামে কোন সাধক উহার প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধনাতে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন হইতে ইহা বশিষ্ঠের আসন নামে প্রসিদ্ধ—এইরূপ অনুমান।

সিউড়ীতে ফিরিয়া আমাদের মধ্যে কয়েকজন বৈকালে মোটরগাড়িতে মেসেঞ্জোরে ময়ূরাক্ষী নদীর বাঁধ দেখিতে গিয়াছিল। প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং মানবের রচনার বৈশিষ্ট্যে স্থানটি অতি সুন্দর, মনোরম। পর্বতের গাত্রে নির্মিত বাংলা এবং বিহার সরকারের নিরীক্ষণ ভবনগুলিও সুন্দর এবং তথা হইতে সূর্য্যাস্তের শোভা বড়ই ভাল লাগিয়াছিল।

সিউড়ীতে ফিরিয়া, আহারাদি সারিয়া, রাত্রির গাড়িতে কলিকাতায় যাইবার জন্য ষ্টেশানে গিয়া জানিলাম গাড়ি লেট। অণ্ডালে পুনঃ পড়িয়া থাকিবার সম্ভাবনা সূচিত হইল। গাড়ি যখন সিউড়ীতে আসিল আমরা নির্দিষ্ট স্থানে উঠিয়া দেখিলাম যে গাড়ির বাথরুম দুটিতেই আলো এবং জল নাই। রেল কর্মচারিদের জানাইয়াও কোন ফল হইল না। পথে গাড়ি আরও লেট হইতে লাগিল। তখন মহারাজকে প্রশ্ন করিলাম, "তারামা কি এখনও অসন্তুষ্ট?" মহারাজ উত্তর দিলেন, "তিনি সন্তুষ্ট"। তাই আর কোন চিন্তা না করিয়া শয়ন করিলাম এবং ভোরবেলায় উঠিয়া দেখিলাম আমরা হওড়ায় নিকটবর্তী। হওড়ায় ঠিক সময়েই পৌঁছিলাম, আমাদের নির্দিষ্ট যানও উপস্থিত ছিল এবং আমরা যথাসময়ে বাড়িতে ফিরিলাম। মহারাজ মাকড়দহে চলিয়া গেলেন। তিনি অনুগ্রহপূর্বক আমাদের সাথে ছিলেন তাই আমরা দেবস্থানগুলির মাহাত্ম্য একটু বুঝিতে পারিয়াছিলাম এবং তাঁহার দিব্যদৃষ্টি দ্বারা আমরা মানবদৃষ্টির অগোচর কিছু কিছু বস্তুর বৃত্তান্ত তাঁহার মুখে শুনিতাম, আর যে কোন প্রশ্ন মনে উদিত হইত, তাহার সন্তোষজনক উত্তর পাইতাম। তাঁহার অনুগ্রহের জন্য আমরা তাঁহার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

আবেগের পুতুল

অরুণ দে

গলির ভেতরে ঢুকে কিছুটা এগিয়ে ফিরে তাকাল শিউলি। তারপর চমকে উঠে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

সে যা সন্দেহ করেছিল ঠিক তাই। অভদ্র ছেলেটা তাকে অনুসরণ করে গলির ভিতরে ঢুকে পড়েছে। কয়েকদিন ধরে একইভাবে ছেলেটা তাকে অনুসরণ করছে। সে কলেজ থেকে বেরুলেই ছেলেটা তার পেছনে হাঁটতে আরম্ভ করে। হাঁটতে হাঁটতে তাদের বাড়ীর দরজা পর্যন্ত আসে। অসীম ধৈর্য। মুখে কিন্তু সাড়া শব্দ করে না। শুধু সে ভয় পেয়ে পেছনে তাকালে মিষ্টি করে হাসবার চেষ্টা করে।

আজকেও সেই একই ব্যাপার। অদ্ভুত ছেলে। গুণ্ডা বদমাশ কিনা কে জানে। আজকালের মাস্তান টাইপের ছেলেও হতে পারে।

রাগে শিউলির গা জ্বলে যাচ্ছিল। কলেজের বইখাতা বুকে চেপে ধরে দ্রুতপায়ে বাড়ীর দিকে এগোতে লাগল সে। লম্বা গলিটার শেষে প্রান্তে তাদের বাড়ী।

কয়েক পা এগোতেই শিউলি পেছনে কাসির শব্দ শুনতে পেল। ছেলেটা খুক খুক করে কাসছে। তাকে জোরে হাঁটতে দেখেছেলেটা নিশ্চয়ই ইচ্ছে করে কাসছে। কি মনে করে থমকে দাঁড়াল শিউলি। আড়চোখে পেছনে তাকিয়ে দেখল ছেলেটা গুটি গুটি তার দিকে এগিয়ে আসছে।

ছেলেটা কাছে আসতেই তার দিকে আগুন-জ্বালা চোখে তাকাল শিউলী। বেহায়া ছেলেটা শিউলিকে থামতে দেখে বোধহয় পুলকিত হল। শিউলি বলল, "কি চাই?" ছেলেটা কি একটা বলতে গিয়ে শিউলির চোখের দিকে তাকিয়ে থতমত খেয়ে চুপ করে গেল।

ছেলেটার আপাদ-মস্তক দেখে নিল শিউলি। পরণে ট্রাউজার ও গায়ে বুশ-সার্ট। ঠোঁটের উপর পাতলা গোঁফ। বোকা বোকা চাহনি হাতে কি একটা বই। বয়স খুব বেশী নয়।

বাড়ীর কাছে এসে পড়ায় শিউলি সাহস পেয়ে বলল, "আপনি আমাকে রোজ অনুসরণ করেন কেন? আমাকে কলেজ থেকে বাড়ীর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দেবার জন্য আমার বাবা কি আপনাকে চাকর রেখেছে?"

ছেলেটার ডাগর চোখে বিস্ময়ের ছোঁয়া লাগল। সে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, শিউলি ধমকের স্বরে বলল, "থানায় যেতে ইচ্ছে হয় বুঝি? ফচকেমির আর জায়গা পেলেন না?"

ভয়ে কি লজ্জায় কে জানে, ছেলেটির চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। এমন সময় শিউলির দাদা শেখর বাড়ী থেকে বেরুল। দূর থেকে তাকে দেখতে পেয়ে "দাদা-দাদা" বলে চীৎকার করে ডাকল শিউলি।

ছেলেটা পালাবার জন্য পা বাড়াচ্ছিল।

শেখর কাছে আসতেই ছেলেটাকে দেখিয়ে একগাদা অভিযোগ জানাল শিউলি। খপ করে ছেলেটার হাত চেপে ধরল শেখর। শিউলিকে বলল, "তুই বাড়ী চলে যা। আমি ছোঁড়াকে পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে ছাড়ব।"

তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে পা বাড়াল শিউলি। বাড়ীর দরজার কাছে এসে একটা আর্তনাদের শব্দ শুনে ফিরে তাকাল। দেখল ছেলেটা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে শেখর তার গলাটা চেপে ধরে ঠাস ঠাস করে চড় কষাচ্ছে। গোলমাল শুনে পাড়ার আরও কিছু ছেলে সেখানে জড় হয়েছে। সকলেই ছেলেটাকে মারতে উদ্যত।

কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল শিউলির। তাড়াতাড়ি সে বাড়ীর ভেতরে ঢুকে পড়ল। একবার তার মনে হল এতটা ঝামেলার সৃষ্টি না করলেই হোত। ছেলেটা তাঁকে অনুসরণ করত সত্যি কিন্তু কোনদিন কোন অসম্মানজনক কথা তো বলে নি। এ যুগের রক-বাজ ছেলেদের মত তাকে দেখে গান গায় নি, শিস দেয় নি, কোন অশ্লীল মন্তব্য করে নি—শুধু বোকার মত পেছনে হেঁটেছে। ছেলেটাকে উপেক্ষা করলেই ভাল হোত। দাদা যা রাগী—এরপর থানা পুলিশের হাঙ্গামা না হয়।

নিজের ঘরে ঢুকে বইখাতা টেবিলের উপর রেখে আয়নার কাছে দাঁড়াল শিউলি। খোপাটা খুলতে লাগল। আয়নার ভেতর থেকে একটা মুখ ভেসে উঠল। সে মুখ বলল, "তোমার মুখ এত শুকনো লাগছে কেন শিউলি, তোমার কি হয়েছে ?"—"ওম্মা! আপনি কখন এলেন জামাইবাবু," বলে ফিরে তাকাল শিউলি।

শিউলির জামাইবাবু পুলকেশ হেসে বলল, "অনেকক্ষণ এসেছি। এসে শুনলাম তুমি কলেজ থেকে ফেরনি তাই বিরহে কাতর হয়ে কড়িকাঠ গুণছিলাম। কিন্তু তোমার ব্যাপার কি বলতো? অমন মুখ কালো করে বাড়ী ঢুকলে কেন? কলেজের মাষ্টারের কাছে বকুনি খেয়েছ বুঝি ?"

"না তা নয় অন্য ব্যাপার।"

"কি ?"

কিছুক্ষণ আগে যা ঘটেছে তা বর্ণনা করে শিউলি বলল —"দাদা ছেলেটাকে ঠ্যাঙাচ্ছে। ছেলেটা খুব বজ্জাত-তাই না জামাইবাবু ?"

—"ছেলেটার আর কি দোষ বল, দিনে দিনে তুমি চাঁদের কণার মত যেভাবে বেড়ে উঠছ তাতে বুড়ো বয়সে আমারই মাথা ঘুরে যায় আর সে তো যুবক। রূপের আগুন দেখলে পতঙ্গ তো ছুটে আসবেই।"

—"ধ্যেৎ। অসভ্য।"

কিছুক্ষণ পরে হাঁফাতে হাঁফাতে শেখর ঘরে ঢুকল। উৎসুক হয়ে শিউলি তার দিকে তাকাল। গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে শেখর বলল, "বাক্স থেকে আমাকে একটা ফর্সা জামা বের করে দে তো শিউলি, ছোঁড়াকে থানায় দিয়ে আসি।"

"এখনও ছেলেটা যায় নি বুঝি ?" বলল শিউলি।

"যাবে কি, ধোলাই-এর চোটে অন্ধকার দেখছে। পাড়ার বংকুকে বলেছি ছোঁড়াকে ধরে রাখতে। থানায় নিয়ে যাব। দে, জামা বের করে দে।"

পুলকেশ বলল, "থানা পুলিশ করাটা কি ভাল হবে? বাড়ীর মেয়ের ব্যাপার—থানা পর্য্যন্ত না গড়ানই ভাল।"

"কি বলছেন জামাইবাবু। এ সব ছেলের শিক্ষা হওয়া উচিত।"

"যথেষ্ট ঠ্যাঙানি তো হয়েছে আর শিক্ষা দিয়ে কি হবে।"

"ঠ্যাঙানিতে কিছু হয় নি। অদ্ভুত ছেলে। গুম মেরে মার খেয়ে গেল কিন্তু ছাড়া পাবার জন্য একটু কাকুতি-মিনতি পর্যন্ত করল না। ব্যাটাকে থানায় দেওয়াই দরকার।"

ঘরের জানালা থেকে গলির শেষে প্রান্ত পর্যন্ত দেখা যায়। শিউলি দেখল ছেলেটাকে ঘিরে কিছু লোক জমা হয়েছে। বিষণ্ণ মুখে ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে। মাথার পাশ দিয়ে রক্তের মত কি যেন গড়াচ্ছে। ছেলেটার চোখে চোখ পড়তেই জানালা থেকে সরে এল শিউলি। আশ্চর্য ছেলেটা তাদের বাড়ীর জানালার দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

"কি রে—জামাটা দে।" আবার বলল শেখর।

শিউলীর বাবা প্রিয়নাথবাবু ঘরে ঢুকলেন। তিনি রাশভারী লোক। গম্ভীর স্বরে বললেন, "থানায় যেতে হবে না। যথেষ্ট হয়েছে, ছেলেটাকে এবার ছেড়ে দাও শেখর। বলে দিও যেন এ পাড়ায় কোনদিন পা না দেয়।"

কি একটা প্রতিবাদ করতে গিয়ে বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল শেখর। তারপর ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পুলকেশ তুমি কি একবার শেখরের সঙ্গে যেতে পারবে? ও কি করতে কি করবে ঠিক নেই।"—বললেন প্রিয়নাথবাবু।

"কিছু ভাববেন না, আমি দেখছি, বলে শেখরকে অনুসরণ করল পুলকেশ।

প্রিয়নাথবাবু এবার মেয়ের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ শিউলির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার পর বললেন, "তুমি ছেলেটাকে আগে থেকে চিনতে ?"

"না বাবা।"

"তবে ও তোমায় অনুসরণ করত কেন?"

"আমি কিছু জানি না। ছেলেটা বোধ হয় খারাপ।"

"হুঁ। ছেলেটা খারাপ আর তুমি খুব ভাল—তাই না? প্রশ্রয় না পেলে কোন ছেলে কোন মেয়েকে নিয়মিত অনুসরণ করার সাহস পায় বলে আমি বিশ্বাস করি না। তোমার পথ চলার ভঙ্গীতে হয়ত ছেলেটার অনুসরণের প্রতি নীরব সম্মতি ছিল। ছেলেটা ছাড়া পেয়ে যদি নিজেই থানায় গিয়ে তোমার দাদার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, তবে জল অনেক দূর গড়াবে। কলেজে পড়ছ, বুঝে শুনে পথ চলবে—এটাই আমি আশা করি।", বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন প্রিয়নাথবাবু।

গালে হাত দিয়ে বসে রইল শিউলি।

প্রিয়নাথবাবু চলে যেতেই পুলকেশ ঘরে ঢুকে বলল, "অত আকাশ পাতাল কি ভাবছ?"

"কিছু না। ছেলেটাকে বুঝি ছেড়ে দিয়ে এলেন জামাইবাবু?"

"কি জানি, শেখর আমাকে দেখেই ভাগিয়ে দিল। আসল জায়গায় যেতেই দিল না। আমার এমন কপাল যে প্রেমিকটিকে একবার দেখতেও পেলাম না।"

"তবে আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?"

"পাশের ঘরে লুকিয়ে সব শুনছিলাম। তোমার বাবা চলে যেতেই ফিরে এলাম।"

"আমি আর কলেজে যাব না জামাইবাবু। বাবা মিছেমিছি আনাকে দু কথা শুনিয়ে গেল। দেখুন তো কি অন্যায়।"

"প্রেমিকটি আর অনুসরণ করবে না ভেবে মনের দুঃখে কলেজে যাওয়া ছেড়ে দেওয়া মোটেই উচিত হবে না। হয়ত রাস্তায় হঠাৎ দেখা হয়ে যেতে পারে।"

"যান, আপনার সবটায় ফাজলামি।"

"কলেজে দিন কয়েক তোমার এমনিতেই যাওয়া হবে না। আমি তোমাকে নিতে এসেছি। আমার ছোটছেলের কিছুদিন পরে মুখে ভাত, তোমার দিদি একা পেরে উঠবে না। তাই তোমাকে নিতে পাঠিয়েছে।"

"আমি একা যাব নাকি?"

"একা কেন? তুমি আমার সঙ্গে আগে যাবে তারপর উৎসবের দিন মা, বাবা, শেখর-সবাই যাবে।"

"বাবাকে বলেছেন? মত আছে?"

"হ্যাঁ। তাঁর অমত নেই। যদি ইচ্ছে কর আমার টালিগঞ্জের বাসা থেকে কলেজেও যেতে পার।"

"কবে যেতে হবে?"

যতই তাড়া দাও আজ আমি যাচ্ছি না। আজ এবাড়ীর জামাই-আদর ভোগ করে কাল সকালে রওনা হব। তোমার বাবার সেই রকমই হুকুম হয়েছে। তুমি যাবে তো?"

"বা রে—ভাগনের মুখে-ভাত আমি মাসী হয়ে না গিয়ে কি পারি? নিশ্চয় যাব।"

"আমি আগেই তা জানতাম। তোমার দিদি মিছেমিছি ভয় পাচ্ছিল। সে বলছিল তুমি নাকি খুব খেয়ালী মেয়ে। একবার না বলে ফেললে কিছুতেই হাঁ করান যাবে না। আমি কিন্তু জানতাম আমার কাছে সারাজীবন থাকতে পেল না বলে যার মনে কত দুঃখ সে দু'চারদিন আমার কাছে থাকবার সুযোগ পেলে ছাড়বে না।"

"থাক। তাও যদি আপনার মাথার অর্দ্ধেক চুল পেকে না যেত! একটা বুড়োর জন্য আমার হা হুতাশ করতে বয়ে গেছে।"

শেখরকে ঘরের দরজার কাছে দেখা গেল। পুলকেশ বলল, "কি হে, ছেলেটাকে ছেড়ে দিলে নাকি?"

"হ্যাঁ। আর এক চোট আড়ং ধোলাই দিয়ে ছেড়ে দিলাম। ছোঁড়ায় মুখ শুকিয়ে একেবারে আমসি হয়ে গেছে।" বলে একগাল হাসল শেখর।

* * *

দিদির বাড়ীতে এসে প্রথম দিনটা খুব হৈ চৈ করে আনন্দে কাটাল শিউলি। ভাগ্নে ঝণ্টুকে কোলে নিয়ে আদর করল, জামাইবাবুকে নানা কথায় রাগিয়ে মজা দেখল; কোমরে কাপড় জড়িয়ে দিদির সঙ্গে ঘরের কাজে লেগে গেল। বিকেলের দিকে দিদি জামাইবাবুর সঙ্গে নিউ মার্কেটে গেল। আসন্ন উৎসব উপলক্ষে ঝণ্টুর জন্য জামা-কাপড়, থালা-বাসন ইত্যাদি পছন্দ করে দিল।

জিনিষপত্র কেনাকাটা শেষ করে বাড়ী ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল। ঝণ্টু তখন মাসীর কাঁধে ঘুমে ঢলে

পড়েছে। বাড়ীতে ঢুকেই পুলকেশ তার স্ত্রীকে বলল, "ঝণ্টু আর শিউলিকে আগে খাইয়ে দাও ওদের খিদে পেয়েছে। ঝণ্টু তো ঘুমিয়েই পড়েছে ওর মাসীও হয়ত এখনই খিদের জ্বালায় কান্না জুড়ে দেবে।"

শিউলি বলল, "ইস আমি কচি খুকী কিনা। নিজের খিদে পেয়েছে তাই বলুন।"

শিউলির দিদি শোভনা বলল, "ঠিক বলেছিস, তোর জামাইবাবু ঐ রকম। রাত দশটার মধ্যে খেতে না পেলে ছেলেমানুষের মত লাফাতে থাকে।"

"এই দেখ মিছেমিছি বদনাম কোর না।" বলল পুলকেশ।

ঝণ্টুকে বিছানায় শুইয়ে দিল শোভনা। তারপর সন্থ কেনা জিনিষগুলো বোনকে গুছিয়ে রাখতে বলে রান্না-ঘরের দিকে পা বাড়াল। কয়েক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াল শোভনা। শুনতে পেল একটা গোঙানির শব্দ কোথা থেকে যেন ভেসে আসছে। স্বামীর দিকে ফিরে সে বলল, "শুনতে পাচ্ছ?"

"হুঁ, ব্যাপার কি বল তো? দোতলার ঘর থেকেই শব্দটা আসছে মনে হয়। শ্যামল কি অসুস্থ?" বলল পুলকেশ।

"হ্যাঁ। কাল থেকে জ্বর হয়েছে। কলেজের সিঁড়ি থেকে হঠাৎ নাকি পড়ে গিয়েছিল। সকালে ওর ঘরে গিয়েছিলাম, দেখলাম কাঁধে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। একা থাকে, বোধহয় যন্ত্রণায় ছটফট করছে। যাও একবার দেখে এস।"

"যাই।" বলে দোতলার দিকে গেল পুলকেশ।

দরজার কাছে এসে একতলা থেকে দোতলার ঘরের দিকে তাকাল শিউলি। কান পেতে শব্দ শুনল। তারপর বলল, "শ্যামল কে দিদি?"

শোভনা বলল, "দোতলার ঘরে নতুন ভাড়া এসেছে। খুব ভাল ছেলে! আমাকে দিদি বলে ডাকে। ও-ই তো এবার বি, এ পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হয়েছে। দেশ থেকে কলকাতায় এম, এ পড়তে এসেছে। একাই থাকে।"

ঝণ্টু হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে কান্না জুড়ে দিল। শোভনা তাড়াতাড়ি তাকে দুধ খাওয়াতে বসল। শিউলি সন্থকেনা জিনিষগুলো গুছিয়ে রাখতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে পুলকেশ ঘরে ফিরে এসে বলল, "তোমার নতুন ভাইটির অবস্থা তো খুবই খারাপ দেখলাম। জ্বরের ঘোরে ভুল বকছে।"

"তাই নাকি? একা থাকে, কি যে হবে।" বলল শোভনা।

"জ্বর বেশি হওয়ায় ভুল বলছে। ঠাণ্ডা জলে মাথা ধুয়ে দিলে হয়ত জ্বর কমত।"

"এক কাজ কর। তুমি একটু ঝণ্টুকে দেখ। আমি একবার শ্যামলকে দেখে আসি। দরকার হয় মাথা ধুইয়ে দেব। মা কাছে না থাকলে ছেলের এমন দশাই হয়।" বলে শোভনা তাড়াতাড়ি চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে দোতলার বারান্দা থেকে শিউলিকে ডেকে বলল, "এক বালতি জল চট করে নিয়ে আয়।" দিদির আদেশ মত জলের বালতি সমেত দোতলায় উঠে গেল শিউলি। শ্যামলের ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ভেতরে তাকিয়ে দেখল তার দিদি মানুষটার বিছানায় বসে মাথায় হাত বোলাচ্ছে।

বালতির শব্দ শুনে ফিরে তাকাল শোভনা। বোনকে ঘরের ভেতরে আসতে ইঙ্গিত করল। ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল শিউলি। শ্যামল তার অপরিচিত নয়। এই ছেলেটাই তাকে কয়েকদিন ধরে কলেজ থেকে অনুসরণ করত।

শ্যামলের মাথাটা দুহাতে উঁচু করে ধরল শোভনা। ঘরের কোণে যে গ্লাসটা পড়েছিল সেটা দেখিয়ে বোনকে বলল, "বালতিটা মাথার নিচে রেখে তুই ঐ গ্লাসটা করে আস্তে আস্তে মাথায় জল ঢাল। আমি মাথাটা ধরে থাকছি।"

বালতিটা এগিয়ে এনে গ্লাস হাতে শ্যামলের মুখের দিকে নীরবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল শিউলি।

"হাঁ করে কি দেখছিস। নে জল ঢাল। অসুস্থ মানুষের কাছে লজ্জা করবার কি আছে।" বলল শোভনা।

যন্ত্রচালিতের মত জল ঢালতে লাগল শিউলি।

শ্যামলের মাথা মুছিয়ে দিয়ে শোভনা বোনকে বলল, "তুই একটু এঘরে বোস। ছেলেটা অসুস্থ ঘরে কেউ

নেই, একজন থাকা দরকার। আমি তোর জামাইবাবুকে ডাক্তার ডাকতে বলে আসছি।"

"আচ্ছা। তাড়াতাড়ি এসো কিন্তু।"

"শ্যামলটা একেবারে ক্যাবলা। সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে বুড়ো মানুষ পড়ে যায় শুনেছি কিন্তু একজন যুবক যে কি করে আছাড় খায়। আশ্চর্য! এখন কি যে হবে।"

শিউলি অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করল। সে কিছুতেই বলতে পারল না যে শ্যামলের অসুস্থতার জন্য সে-ই দায়ী।

* * *

পরদিন দুপুর বেলা।

পুলকেশ অফিস চলে গেছে। শোভনা খাওয়াদাওয়ার পর ছেলেকে নিয়ে বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করছে।

শিউলি কি মনে করে গুটি গুটি দোতলায় উঠে গেল। শ্যামলের ঘরের দরজার কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়াল। উঁকি দিয়ে দেখল শ্যামল বিছানায় শুয়ে রয়েছে। কিছুক্ষণ দ্বিধার পর শ্যামলের ঘরে ঢুকল শিউলি। শ্যামল বিস্মিত-দৃষ্টিতে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বিছানায় উঠে বসে বলল, "আ প-নি!"

"এখন কেমন আছেন?" বলল শিউলি।

"ঠাট্টা করতে এসেছেন বুঝি?"

"না। কাল রাতে আপনি সবাইকে যেভাবে ভাবিয়ে তুলেছিলেন তা আমরাই জানি। জ্বর কমেছে?"

"হ্যাঁ, কিছু কম। কিন্তু কোথা থেকে কি মতলবে এসেছেন বলুন তো?"

"এ বাড়ীতে আপনি যাকে দিদি বলে ডাকেন আমি তার ছোটবোন। বেড়াতে এসেছি।"

"শুধু বেড়াতে? অন্য কোন মতলব নেই?"

"কেমন আছেন বললেন না তো?"

"ভাল আছি।"

"কাল রাতে ডাক্তারবাবু যে ওষুধ দিয়ে গেছেন তা তো টেবিলেই পড়ে আছে দেখছি। কিছু খান নি যে?"

"খাব।"

টেবিলের উপর একটা ওষুধের শিশি পড়ে ছিল। শিউলি তার থেকে একটা ট্যাবলেট বের করে শ্যামলের হাতে দিয়ে বলল, "নিন, খেয়ে ফেলুন।" শ্যামল অবাক হয়ে শিউলির মুখের দিকে তাকাল। শিউলি মুচকি হেসে বলল, "ভয় নেই। হাতে ধরে বিষ দিচ্ছি না খেয়ে নিন। খাবার জল আনব?"

"না। আমি নিজেই নিতে পারব।"

"থাক। আপনার যে সারা গায়ে ব্যথা তা আমি জানি। কলেজের সিঁড়ি থেকে হঠাৎ পড়ে গিয়ে খুব লেগেছে—তাই না?"

শ্যামল ভুরু কুঁচকে তাকাল। শিউলি একগ্লাস জল এনে বলল, ভয় নেই। দিদি-জামাইবাবুকে সত্যি কথা জানাব না। কিন্তু পৃথিবীতে এত মেয়ে থাকতে আপনি কেন যে আমাকে অনুসরণ করতেন ত কিছুতেই ভেবে পাই না।"

"আমি ও পাই না। বিশ্বাস করুন, আপনারা যা ভেবেছেন আমি সে স্বভাবের ছেলে নই। কিন্তু আপনাকে দেখলেই কি যে হত—কিছুতেই নিজেকে ধরে রাখতে পারতাম না। আমি সত্যি লজ্জিত।"

"আমিও কম লজ্জিত নই। দাদা বড্ড রগচটা মানুষ। আমি হঠাৎ ভয় পেয়ে দাদাকে ডেকে ফেলেছিলাম। বিশ্বাস করুন, দাদা অতটা নিষ্ঠুর হবে জানলে কখনও ডাকতাম না।"

"আপনার কথা কি শেষ হয়েছে?"

"কেন?"

"শেষ হলে আপনি যেতে পারেন। আমি একা বিশ্রাম করতে চাই।"

"ওমা, তুই এ ঘরে! আর আমি তোকে সারা বাড়ীতে খুঁজে বেড়াচ্ছি।"—ঘরে ঢুকে বোনের দিকে তাকিয়ে বলল শোভনা। তারপর একটু থেমে শ্যামলকে বলল, "জান শ্যামল, কাল রাতে তুমি যখন জ্বরে অচৈতন্য তখন শিউলি কিন্তু তোমার খুব সেবা করেছে।"

"থাক, তুমি আর বানিয়ে কথা বোল না। ঝন্টু কি করছে? চল নিচে যাই।"

"এতক্ষন তো বেশ দুজনে গল্প করছিলি আর আমি আসতেই চল নিচে যাই!"

"ভদ্রলোক কেমন আছেন তাই জানতে এসেছিলাম। শুনলাম ভালই আছেন। আর থাকার কি দরকার।" বলে ঘর থেকে চলে গেল শিউলি।

শোভনা বলল, "শিউলি যেন একটু রেগে আছে মনে হল—কি ব্যাপার শ্যামল?"

"কি জানি।" বলে বিছানায় শুয়ে পড়ল শ্যামল।

শিউলি ভেবেছিল শ্যামলের ঘরে আর যাবে না। কিন্তু সেদিন রাত্রেই তীব্র গোঙানির শব্দ শ্যামলের ঘর থেকে ভেসে আসছে শুনতে পেয়ে সে আর স্থির থাকতে পারল না। বিছানায় উঠে বসল। পাশে তাকিয়ে দেখল তার দিদি আর ঝণ্টু অঘোরে ঘুমোচ্ছে। পাশের ঘর তার জামাইবাবুর নাক ডাকার শব্দ হচ্ছে। বিছানা থেকে নেমে দরজার কাছে এসে কান পাতল শিউলি। দোতলার ঘর থেকে চাপা কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। অসহায় মানুষটা যন্ত্রণায় হয়ত ছটফট করছে।

"এই দিদি, দিদি।" বলে শোভনাকে ঠেলে জাগাল শিউলি। ঘুমে ফোলা ফোলা ভারি চোখের পাতা খুলে শোভনা বলল, "কি?"

"শ্যামলবাবুর ঘর থেকে কান্নার শব্দ আসছে।"

"তাই নাকি? হয়ত আবার জ্বর বেড়েছে কিম্বা অন্যকিছু। এত রাতে আর কি করা যাবে, কাল সকালে গিয়ে খোঁজ নেব।" বলে আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল শোভনা।

"একটা অসহায় লোক যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে আর তুমি পড়ে পড়ে ঘুমোবে? তুমি কি গো দিদি!

"তোর যদি অত দরদ হয় তুই যা। ঘুম পাচ্ছে—জ্বালাস না।" বলে চোখ বুজল শোভনা।

কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইল শিউলি। কি করবে কিছুই ভেবে পেল না। যন্ত্রণা-কাতর গোঙানির শব্দ ক্রমশ বাড়ছে বলে মনে হল।

কিছুক্ষণ পরে কি ভেবে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেল শিউলি।

শ্যামলের ঘরে আলো জ্বলছে। দরজা খোলা। ঘরে ঢুকল শিউলি। দেখল শ্যামল তার কাঁধের কাছটায় একটা হাত দিয়ে চেপে ধরে যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

"কি হয়েছে?" বলল শিউলি।

"কাঁধে ব্যাণ্ডেজের উপর ধাক্কা লেগেছে। বাথরুমে গিয়েছিলাম। বাথরুমটা অন্ধকার। ঘুম-চোখে ছিলাম, কাঁধে কিসে যেন ধাক্কা লাগল। বড় যন্ত্রণা হচ্ছে।"

"শুয়ে পড়ুন, আমি দেখি কি করতে পারি।"

"না না, আপনি যান। আপনার মুখ আমি দেখতে চাই না। আপনার জন্যই আমার এই অবস্থা। যান বলছি।"

শিউলি এক মিনিট থমকে দাঁড়াল। তারপর শ্যামলের কাছে এসে তাকে আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়ে দিল। কাঁধের উপর হাত বোলাতে লাগল। শ্যামলের কোন প্রতিবাদ শুনল না। বলল, "ঘুমোবার চেষ্টা করুন। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।"

"অত দরকার নেই। আপনি বরং এক কাজ করুণ। আমার বাক্সে একটা স্যারিডন ট্যাবলেট আছে, সেটা বের করে দিন।"

"কি ট্যাবলেট? তাতে কি যন্ত্রণা কমবে?"

"হ্যাঁ, খেলেই কিছুক্ষণের জন্য অন্তত যন্ত্রণা থাকবে না।"

"বাক্সের চাবি কোথায়?"

"জামার পকেটে।"

শিউলি বাক্স খুলে ট্যাবলেট বের করে শ্যামলকে খাইয়ে বলল, "এবার শান্ত হয়ে ঘুমোন তো।"

"আপনি যাবেন না?"

"আপনি ঘুমোলেই চলে যাব।"

"ও।" বলে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল শ্যামল।

দিন কয়েক পর।

আজ ঝণ্টুর অন্নপ্রাশন। সমস্ত বাড়ীটা উৎসব-মুখরিত হয়ে উঠেছে। সকাল থেকে পুলকেশের আত্মীয়স্বজনেরা জড় হয়েছে। সানাই বাজছে। নানা উপহারে ঘরের একটা দিক প্রায় ভর্তি হয়ে উঠেছে। যাকে উপলক্ষ্য করে এত আয়োজন সে কিন্তু নির্বিকার। ছোট হাত দিয়ে মুখের চন্দনের আলপনা বার বার নষ্ট করে দিচ্ছে।

শোভনার মা-বাবা আগেই এসেছিলেন। শেখর এল সন্ধ্যাবেলায়। এসেই ঝণ্টুকে মাথায় করে নাচতে আরম্ভ করে দিল। "ওরে ছেলে যে পড়ে যাবে—ও কি করছিস।" বলে শোভনা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল। ঝণ্টুকে কিন্তু একটুও বিচলিত মনে হল না। সে মামার মাথা ভিজিয়ে দিয়ে নির্বিকার চিত্তে আঙুল চুষতে লাগল। "বেটা একেবারে বেরসিক।" বলে মাথা থেকে ভাগ্নেকে নামিয়ে দিল শেখর। কিছুক্ষণ হৈ চৈ করে কাটাবার

পর শেখর বলল, "শিউলি কোথায়? তাকে দেখছি না যে?"

শোভনা আর পুলকেশ পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসল।

"কি ব্যাপার? শিউলি কোথায়?"—আবার বলল শেখর।

"বোধহয় দোতলার ঘরে আছে।" বলল পুলকেশ।

শোভনা বলল, "সেই কখন গেছে এখনও আসার নাম নেই। যা তো শেখর, শিউলিকে ডেকে নিয়ে আয় তো। একটা মেয়েলি-আচার, এর জন্য তাকে এখন দরকার হবে।"

"আহা—অন্য কাউকে দিয়ে কাজ চালিয়ে নাও না।" বলল পুলকেশ।

"না, নিজের মাসী ছাড়া সেকাজ হবে না।"

"তাহলে যাও শেখর। সিঁড়ি দিয়ে সোজা উঠে প্রথমে যে ঘর পাবে সেখানেই শিউলি নিশ্চয় আছে। যাও, ডেকে আন।"

শেখর সিঁড়ি দিয়ে তর তর করে উপরে উঠে গেল। শ্যামলের ঘরের দিকে যেতে গিয়ে জানলার কাছে তার পা আটকে গেল। জানালা দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেল সেই "ছেলেটা" শিউলির হাত ধরে কি যেন বলছে। দু হাসি শিউলির চাপা ঠোঁট ছুঁয়ে আছে।

অত ঠ্যাঙ্গানি খবার পরও যে কোন ছেলে এতট বেহায়া হতে পারে তা কল্পনাও করতে পারে নি শেখর রাগে তার গা জ্বলে যাচ্ছিল। মনে মনে ভাবল—আ আর সে ছাড়বে না, সোজা ছেলেটাকে কান ধরে থানা নিয়ে যাবে।

"এই, হাত ছাড়।"--শিউলির কণ্ঠস্বর ভেে এল।

"না ছাড়ব না। চিরদিন এই হাত ধরে রাখব।" অনুচ্চ উত্তর করল।

"চিরকাল! সত্যি?"

"তোমার আপত্তি আছে?"

"বাড়ীতে যদি মত না দেয়।"

"তোমার মত থাকলেই হবে।"

শিউলি আর একটা হাত ছেলেটার দিকে বাড়িয়ে দিল।

শেখর নিজের চোখ-কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। কি ভেবে শ্যামলের ঘরে আর সে ঢুকল না। সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে নীচে নেমে এল।

একটি ব্যর্থ প্রেমের কবিতা

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

"মেঘের পরে মেঘ জমেছে
আঁধার করে আসে
আমায় কেন বসিয়ে রাখ
একা দ্বারের পাশে…"

চমকে উঠলুম একটা সুরের অপূর্ব মূর্ছনায়।
এখানে এগান কে গাইছে ?
দেখলুম জানালার পাশ থেকে
একটি অপূর্ব রূপসী মৃদু হেসে গেল পালিয়ে।

সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী।
তিনি গেলেন এগিয়ে।
কথা বলার চেষ্টা করলেন সেই রূপসীর সাথে।
আমি রইলুম একটু আড়ালে।

ভেবে অবাক হলুম, কে হতে পারে ?
কে এ তরুণী ?
অপূর্ব যায় সুর। অপরূপ যার রূপ।
কাঁকের এ মানসিক হাসপাতালে ?

স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছিলুম হাসপাতালের
এক রুগীকে দেখতে।
দেখতে পেলুম কত রকম রুগী।
এমনটি তো আর কোথাও দেখিনি।

স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতেই তার চোখ
ছল ছল করে উঠল।
খানিক পরে নিজেকে সামলে নিয়ে
বললেন—উনি আমার মামী।

অনেক দুঃখের কথা।
আজ থেকে দশটি বছর আগে
এই তরুণীর গানের মায়া
ভুলিয়ে ছিল বাঙলার এক তরুণে,

যে তরুণ তার প্রেমিক হৃদয় নিয়ে
গিয়েছিল বিলেতে
ইন্‌জিনিয়ার হতে।

যাবার আগে কথা ছিল দুজনাতে
বিলেত থেকে ফেরার পরে
তাদের বিয়ে হবে।

বিলেত গিয়ে তরুণ লিখত কত চিঠি-
তরুণী তার দিন কাটাত গান গেয়ে
চিঠি পড়ে, কত সে মধুর চিঠি।

দিন যায়।
পড়া শেষ হয় তরুণের।
বিলেত ফেরৎ ইন্‌জিনিয়ার হয়ে
মস্ত বড় চাকুরী নিয়ে দিল্লী ফিরল সে।

তরুণীকে নিয়ে তার মা-বাবার
চিন্তার শেষ নেই।
কোথায় তাঁরা পাত্র পাবেন ?
কোথায় পাবেন টাকা ?

হঠাৎ কোলকাতারি
এক ব্যারিষ্টার গ্রামে এসে দেখল তরুণীকে,
বিয়ে করতে রাজী হয়ে গেল।
কিন্তু তরুণী!

সে তো আছে তরুণ কবে ফিরবে সে আশায়।
মা বাপ তার শুধোলেন ভাল করে।
তরুণ তারে করবে নাগো বিয়ে
বিলেত ফেরত ইনজিনিয়ার।
দাম কত তার।

বিয়ে হয়ে গেল,
গ্রাম ছেড়ে সে শ্বশুর ঘরে।
মনের আগুনে মন বুঝি তার পুড়ে।

দিল্লী থেকে ছুটি নিয়ে তরুণ এল গাঁয়ে,
অজানা এক আকুল টানে যেন,
তরুণীরই বাড়ীর দিকে ছুটল তরুণ বেগে,
কিন্তু তরুণী তো নেই,
তরুণীর মা জানালেন যে তারে,
তার সাথে যে বিয়ে হল
কোলকাতার এক ব্যারিষ্টারের।

তরুণ আর দাঁড়াতে পারল নাকো
ফিরে এল নিজের বাড়ী,
নিজের ঘরে ঢুকে
গুলি চালাল বুকে।

সে খবরটা পৌঁছল যথারীতি
দুঃসংবাদ চলে যেমন দ্রুত
আকস্মিক বিদ্যুতের বেগে,
তরুণীর কাছে কোলকাতাতে।

মনের আগুনে মন যার জ্বলে যায়,
তার মন এবার ভস্মীভূত হল,
বজ্রদহন যেমনি ভাবে জ্বলে
এক নিমিষে।
তারপরে সে ঠাঁই পেয়েছে
কাঁকের এ আশ্রমে।

———
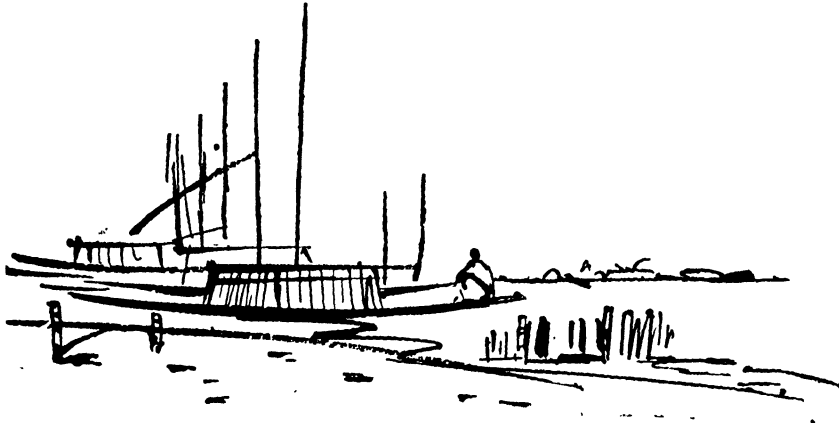
সংগীত ধারার বিবর্তন ও আধুনিক গান

শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সংগীতের ত্রিকোণ গ'ড়ে উঠেছে গীতিকার, সুরকার ও কণ্ঠশিল্পীর সহত্ব সমন্বয়ে। উপরন্তু কণ্ঠশিল্পীর সুরসৃষ্টি বিবর্ধন করেন, সহযোগী যন্ত্রসংগীত ও সংগতকার। প্রাচীন বাংলা সংগীতের প্রসিদ্ধির আদিপর্বে আমরা কীর্তন, ভজন, লোকসংগীত ও ভক্তজনের ভক্তিব্যঞ্জক, দেহতাত্ত্বিক ও অধ্যাত্মমূলক গানের সন্ধান পাই। বহু লোক-সংগীতের রচয়িতারা আজ বহুযুগের ওপারে যাঁদের প্রকৃত অনুসন্ধান আজও সম্ভব হয়নি। মহাজন পদাবলী-কার হিসেবে প্রাচীন বাংলা কাব্যের বহু মনীষী এ আসন অধিকার করে আসছেন যেমন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, কবিশেখর, বলরাম দাস, যদুনন্দন প্রভৃতি। তেমনি সংগীতরচয়িতা হিসেবে রামপ্রসাদ, নিধুবাবু, নীলকণ্ঠ, কমলাকান্ত, দাশরথি এবং বহু কবিওয়ালা বাংলা সংগীত জগতে এক বিশেষ অধ্যায় অধিকার করে আছেন। কণ্ঠসংগীত ও নৃত্য উনবিংশ শতক ও তার আগের যুগে স্থানীয় রাজা ও ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গের নৈশ আসরে আমোদ প্রমোদের আঙ্গিকরূপে ব্যবহৃত হ'ত। অপর এক স্থান ছিল কুৎসিত পল্লীর সংগীতপটীয়সীদের কণ্ঠে। সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারীদের সংগীত শিক্ষায় তদানীন্তন যুগে বিশেষ বাধা তো ছিলই উপরন্তু ছিল অশালীন ও সুরুচির পরিপন্থী। কীর্তনের সুর ছিল সেই আদি ও অকৃত্রিম। তবে বিভিন্ন অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পরিবেশনের এক বিশিষ্ট প্রথা ছিল, যেমন একই বাংলা ভাষায় বিভিন্ন অঞ্চলের উচ্চারণের জন্য ভঙ্গিমায় বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু একথা সঠিক জানা যায় না যে মহাজন পদাবলীর রচয়িতারা তাঁদের নিজেদের গানের সুর নিজেরাই আরোপ করতেন কিনা? তবে মহাজন পদাবলীর মুদ্রিত সংকলন গ্রন্থে বহুপদের উপর কোথাও 'বেলোয়াল', 'আশাবরী', 'গুর্জরী', প্রভৃতি সুরের নামের উল্লেখ আছে। তবে তাঁরা যে ভক্ত ছিলেন, ভাবুক ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তাঁরা যে স্বরচিত গান গাইতেন না তারও কোন প্রমাণ নেই। কেউ কেউ স্বরচিত গান গাইতেন তার গৌণ প্রমাণ আছে। প্রচলিত কিংবদন্তীর সূত্র ধরে দেখা যায় কবি বিদ্যাপতি লছমীদেবীর মানস তুষ্টির জন্য সংগীত সাধনা করতেন, তেমনি রজকিনী রামীর মন-স্তুষ্টির জন্য কত মধুর সঙ্গীতই না কর্ণকুহরে ঢেলে দিতেন চণ্ডীদাস সেই নিভৃত পল্লীর নির্জন সরসীর শান্ত পরিবেশে। শুধু গানের ভাষা মানুষকে ততটা মোহিত করতে পারেনা যতটা পারে তাকে দরদভরা কণ্ঠে হৃদয় দিয়ে সুরের প্রকাশে। কেন না মূর্খ রজকিনী চণ্ডীদাসের অধ্যাত্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা কি জানবে, যতটা জানবে কণ্ঠের মরমী সুর যা 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশে'। প্রত্যেক পদাবলী রচয়িতার রচনায় তাঁদের ব্যক্তিগত পরিচয় পদাবলীর শেষের দিকের ছত্রে সন্নিবিষ্ট থাকতো প্রতিটি গানের আন্তিক ভণিতায়। এখানেরই শ্রীরামপ্রসাদ স্বরচিত সংগীত আপন সুর আপন কণ্ঠে অতি দরদ দিয়ে গাইতেন নিভৃত নিশীথে ভাগীরথীর পুণ্য সলিল সম্মুখে। বিষ্ণুপুরের যদুভট্ট স্বরচিত সংগীত আপন সুরে গেয়ে গেছেন। বর্তমান যুগের দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ প্রভৃতি আপন কবিতায় ও গানে সুরারোপ নিজেরাই করে গেছেন। এমন কি বিখ্যাত গ্রামোফোন সংগীত রচয়িতা বিদ্রোহীকবি কাজী নজরুল ইসলামও আপনার গানে আপনই সুর দিতেন। বিংশ শতাব্দীর অর্ধশতক পর্যন্ত কবিই ছিলেন এই সংগীত সুরারোপের ঐতিহ্যের ধারক। যেভাবে ও যে পরিবেশে তিনি গীত রচনা করেছেন, মনের যে পরিস্থিতিতে, সেই ভাবের রূপ দেবার মৌল অধিকার তো তাঁরই এবং তিনিই তার বিশেষ যোগ্য একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু ফরমাসী ব্যাপারে ফরমুলাই আলাদা।

মুখ্য ব্যক্তি ছিলেন গায়ক। আগে গ্রামোফোন রেকর্ডে তাই গানের প্রথম কলি ও তার তলায় সুর ও

তার নীচে গায়কের নাম লেখা থাকতো। লেবেল অনুযায়ী চিনতে হবে গানের রেকর্ডের দাম। এই প্রথায় কিছু পরিবর্তন করে গানের কলির তলায় এল সংগীত রচয়িতার নাম ও তার নীচে গায়কের নাম। কেননা সংগীতকারের দাবী কিছু কম নয়। যদি না কবি সংগীত রচনা করতেন, তাহলে কোন্ গায়ক সেই গান করবেন? অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যিনি লেখক তিনিই গায়ক, তবে তাঁদের সংখ্যা অতি অল্প।

প্রাচীনকালে গ্রামোফোন রেকর্ডে স্বরচিত গান ও আবৃত্তি বোধহয় রবীন্দ্রনাথই প্রথম করেন। তারও আগে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একখানি কমিক গান রেকর্ড করেন গ্রামোফোন রেকর্ডে। তারপর আসেন অতুল প্রসাদ সেন, দিলীপকুমার রায়, কাজী নজরুল ইসলাম, গিরীন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি। এঁদের সংখ্যা অতি অল্প। গায়ক-গায়িকারা সাধারণতঃ আগেকার দিনে যে স্তর থেকে আসতেন সেখানে গানের মার্গ উর্ধ্বে ছিল না। মহিলা হলেই বারবণিতা, আর পুরুষ গায়করা ছিলেন যাঁদের লেখাপড়া কিছু হ'লনা এমন আড্ডাধারীরা। বংশে যাঁদের গানের ধারা ও নেশার ধারা রয়েছে তাঁরাই এলেন এই কর্মভূমিতে। প্রতিনিয়মের যেমন ব্যতিক্রম এখানেও তার ব্যতিক্রম রয়েছে। প্রাচীন গায়িকার মধ্যে ছিলেন মিস দাস্, পুরুষের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্র সংগীত গায়ক হরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল্; দিলীপ কুমার রায় প্রভৃতি।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে সংগীতের ধারা— সারা সমাজে ছেয়ে গেল। বহু সম্ভ্রান্ত ঘরের কৃতিমান ও কৃতিমতীরা এলেন সংগীত ও নৃত্য পরিবেশনের আসরে। সংগীতের মান হ'ল উন্নত। বাংলার বাইরের বহু প্রাচীন ঘরোয়ানার ওস্তাদরাও এলেন খ্যাতির পাদ-প্রদীপের পুরোভাগে। আখতারী বাই ফয়জাবাদী হ'লেন বেগম আখতার।

নির্বাক ছবির পর এলো সবাক ছবির যুগ, ছবিতে আবেদনের আর এক মহা সুযোগ এল কণ্ঠ সংগীতের মাধ্যমে। বহু চিত্রতারকা অভিনয়ে বহু পারদর্শিনী, কণ্ঠ ও সংলাপ তাঁদের মধুর কিন্তু সংগীতে বিশেষ অনভিজ্ঞতা। তাঁদের সাহায্য করতে সুকণ্ঠ গায়ক-গায়িকাদের উদ্ভব হল; তাঁরা চিত্রাভিনেতা ও অভিনেত্রীর ঠোঁট নাড়ার সংগে গান গেয়ে যান বা তাঁদের গানের সংগে সংগে অভিনেত্রীরা ঠোঁট নাড়িয়ে যান। ফলে বিশেষ এক পরিস্থিতির উদ্ভব হ'ল। গানের স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবের প্রেরণায় ও ব্যঞ্জনায় সংগীত রচনার যুগের হ'ল চির সমাপ্তি। কাহিনীর বিশেষ স্থানে গান জুড়ে দিতে হবে। হিন্দী ছবি হলে যুগল বা দ্বৈত গান; আর বাংলা হলে একক। সেই পরিস্থিতিতে কি সুর আরোপ করবেন তা স্থির করবেন আরেক সম্প্রদায়— অর্থাৎ সংগীত প্রযোজক বা সংগীতকারেরা; গায়ক-নায়িকারা নন। আমার মনে আছে প্রাচীন বিখ্যাত সংগীত গায়ক অঘোরনাথ চক্রবর্তীর প্রাচীন গ্রামো-ফোন রেকর্ডের গানে—"বিফল জনম, বিফল জীবন জীবনের জীবন না হেরে। খুঁজি সব ঠাঁই খুঁজিয়া না পাই কে হ'রে নিলে মনোচোরে।" আর "আনন্দবন গিরিজা পত্তনগৌরে' গানে আবহ সংগীতের কোন স্থানই ছিল না। দিলীপকুমার রায়ের পূর্বেকার গানে 'মুঠো মুঠো রাঙাজবা কে দিল তোর পায়' গানে নেই প্রখর সহসংগীতের প্রকাশ তারা এলে সুরসৃষ্টির জন্য হারমোনিয়াম ও তবলার ব্যবহার। নাচের গান ছাড়া তখনকারদিনে অর্কেস্ট্রা বাদ্যের প্রচলন ছিল না।

বর্তমানে সংগীত পরিবেশন পর্বে গুরুত্বের মান আমূল পরিবর্তিত হয়েছে। এখন মুখ্য ব্যক্তি হলেন সুরকার, তারপর এলেন সংগীত. শিল্পী ও গৌণ ব্যক্তি হলেন সংগীত রচয়িতা। বহু বাদ্যের সংযোজনায় সুরকার পরিবেশ অনুযায়ী সুরসৃষ্টি করলেন সেই সুরে কণ্ঠ দেবেন সংগীত শিল্পী। সেই সুরে ভাষা বসানোর দায়িত্ব সংগীত রচয়িতার। এক রকম গান লেখা হ'ল। সুরকার বল্লেন, 'এ হ'লনা; এ কথাটা চলবে না।' তাঁর তৃপ্তির জন্য আবার নতুন ভাষা প্রয়োগে নতুন গান বাঁধতে হবে। শ্রেণী বিভাগে যিনি ছিলেন বর্ণ প্রধান অর্থাৎ যিনি ভাবের অনুভূতিতে ভাষা দিতেন সেই কবি হলেন এই সংগীত মার্গের নিম্নস্তরে। এইভাব বিমগ্ন কবির ফরমাসী গান লেখা কি সম্ভব? উচ্চাঙ্গ কবিরা নিলেন প্রায় বিদায় এই সংগীত রচনার পর্ব থেকে।

গানের ভাষার সৃষ্টির জন্য তাঁরা আর কবি রইলেন না, হলেন সংগীত রচয়িতা। একমাত্র ব্যতিক্রম হ'ল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়দশকে 'কে মল্লিক' যিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে সবিনয়ে বলেছিলেন—"আপনার 'আমার মাথা নত ক'রে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে' এই গানটি আপনার সুরে আমি গাইতে পারবো না। গ্রামোফোন কোম্পানী কবির নির্দ্দেশে সে রেকর্ড তুলে নিতে বাধ্য হ'য়েছিলেন কিন্তু কে মল্লিক শিল্পীর স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপের নীরব প্রতিবোধ জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু এখন? কোন্ সংগীত রচয়িতা বলবেন—"এই লিখে দিলাম গান। আপনি উপযুক্ত সুরারোপ করুন। ভাষার মধ্যে যে রস পরিবেশন করতে চান তা' আছে এতে। নিজের কৃতিত্বে একে প্রতিষ্ঠিত করুন। সংশোধনমেকং ন করোমি।" এই নৈতিক অবনতির মান বিশ্লেষণে দেখা যায় এর কয়েকটি মুখ্য কারণ আছে। প্রথম—বর্তমান সংগীতকারদের কবি-খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি। সস্তা প্রচারের প্রচেষ্টায় তাঁরা সুরকার ও সুরশিল্পীর দরজায় ধর্ণা দেন ও নিজেদের বহুক্ষেত্রে ছোট করেন। এমনকি বয়োকনিষ্ঠ সংগীত রচয়িতা পরিচয়ের ঘনিষ্টতা ও যাতে তাঁর লেখা গান গীত হয় তার জন্য প্রয়োজন বোধে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অঙ্গ হিসাবে পদধূলি নিতেও দ্বিধাবোধ করেন না।

দ্বিতীয়তঃ সংগীত রচয়িতায় সুর সংযোজনার, সুর বিন্যাসের জ্ঞানের অভাব। নিজে তেমন উচ্চদরের সংগীত বিশারদ নন। এর ব্যতিক্রম ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুল প্রসাদ, দিলীপ রায়, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, জটিলেশ্বর প্রভৃতি। সঙ্গীতশাস্ত্রের অজ্ঞতা সুরকারদের দিয়েছে উপর-হস্ত। যার ফলে নিজেদের ক্রটীর দৈন্য স্বীকার ক'রে নিতে হয়।

তৃতীয়তঃ সুরের আবহাওয়া রচনায় বহু বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োগ নৈপুণ্যের প্রয়োজন। সেটী কোন সংগীত রচয়িতা বা সঙ্গীতকারের বাড়ীতে নিয়মিত ব্যবস্থা রাখা সাধারণতঃ সম্ভব নয়। যার ফলে সঙ্গীত রচয়িতাদের পিছনে হঠে যেতে হচ্ছে।

চতুর্থতঃ অর্থনৈতিক পরিবেশ। অর্থের প্রয়োজনে সস্তায় গান লিখে সুরকার বা সুরসাধিকার কাছে পৌঁছে দিতে যায় সঙ্গীত রচয়িতা বা তথাকথিত কবি। কেননা আরও তিনজনে সেখানে গিয়ে খোসামুদী ক'রে তাদের লেখা গান চালিয়ে দেবে এই আশঙ্কায়। অর্থাৎ আর একটু পরিষ্কার ক'রে বললে এই দাঁড়ায় যে সম্মানবোধের সংকোচন ও টাকার লাভ। একটী গান রেকর্ডে চালু হ'লে যদি 'রয়েলটী' হিসেবে চলে তা' হ'লে অর্থাগম রেকর্ড বিক্রীর সঙ্গে সঙ্গে চললো মাস মাইনের মত।

বাংলা সিনেমা সঙ্গীত জগতের বর্তমান রচয়িতাদের তুলনায় হিন্দী সঙ্গীত রচয়িতাদের অনেকের কবিখ্যাতি যে কিছু বেশী উচ্চমানের একথা অনস্বীকার্য।

কাব্যের সঙ্গে সুরের মিলন সাধন করতে গেলে কবিকে হ'তে হ'বে কিঞ্চিৎ সঙ্গীত বিশারদ। তবেই তা' জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন। তা' না হ'লে তাঁদের পরিচয় অপ্রকাশিতই থাকবে। কেননা বর্ত্তমান সাহিত্য পত্র-পত্রিকায় কাব্যগীতি মূলক কবিতার স্থান নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না। কবিতা হিসেবে যা প্রকাশিত হয় তা আধুনিক কবিতা। তা'রা অন্য শ্রেণীর মৌসুমী ফুল, জৌলুষ আছে, গন্ধ নেই। এরা দেবতার পূজায় লাগেনা; হোটেলের ফুলদানিতে মাঝে মাঝে স্থান পায়। তাতে সুরারোপ সহজসাধ্য নয়; কেননা তারা সুরের কক্ষায় আসেনা।

আজকাল বোম্বাই অঞ্চলে সুরকারের সংখ্যা অধিক। বাংলার বিখ্যাত সুরকারেরা নিজ মাতৃভূমি বাংলা দেশ ছেড়ে বোম্বাইয়ে গিয়ে খ্যাতির শিখরে উঠেছেন যা বাংলা দেশে হওয়া সুকঠিন ছিল কিনা বলা শক্ত। দেশের লোকের কাছে পরিচয়ের ঘনিষ্টতার জন্য যোগ্য মূল্যায়ন হয় না সত্য; তবে দেখা যায় বোম্বাইয়ে সুরকারেরা কেউ কেউ দুজনে মিলে সুর দেন। কেবল বাঙালীদের (যাঁদের একাধিকের মিলনের পরিণতি কলহে) শুধু একক সুরকারের খ্যাতি যেমন শচীন দেববর্মনের (ওখানে এস্, ডি, বর্মন বা বর্মনদাদা নামে পরিচিত), হেমন্ত মুখুজ্জে, সলিল চৌধুরী, জ্ঞান দত্ত সুধীন দাশগুপ্ত, অমল মুখার্জ্জি, রবীন চ্যাটার্জ্জি, শ্রীকান্ত, রাজেন সরকার, ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ, নচিকেতা ঘোষ, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ('শেষ তিনদিন'), কালিপদ সেন, দ্বিজেন চৌধুরী, কমল

দাশগুপ্ত, মানবেন্দ্র মুখার্জি, আশীষ খাঁ ('জতুগৃহ'), রথীন ঘোষ, ('মহাতীর্থ কালীঘাট'), শ্যামল মিত্র, রবীন চট্টোপাধ্যায়, অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, ভি, বাল্সারা, চিত্রগুপ্ত প্রভৃতি। কিন্তু অবাঙালীদের মধ্যে যাঁরা যুগ্মসুরকার হিসেবে খ্যাতি পেয়েছেন তাঁদের প্রধানেরা হ'লেন—শংকর-জয়কিশণ, কল্যাণজী-আনন্দজী, লক্ষ্মীকান্ত-পিয়ারীলাল প্রভৃতি।

ছায়াছবির মানদণ্ড নাকি বর্তমানে স্থির হয়, ছায়াছবির সঙ্গীতের সুরশিল্পী কে? তারপরে কণ্ঠ দিয়েছেন কারা? মূল ছবির প্রযোজকই বা কে? ছবির কাহিনী সম্বন্ধে কেউই সচেতন নন। এই রকম ভিত্তিতে দর্শকেরা ছবি পছন্দ ও বিচার করার পর ছবি দেখতে যান, এমনটী শুনেছি।

আগেকার দিনে সিনেমা জগতে প্রাধান্যের মাননির্ণয়ে প্রথমে কাহিনীকার পরে চিত্রনাট্য পরিচালক, সঙ্গীতকার, চিত্রগ্রাহক, সম্পাদক, শিল্প নির্দেশক, রূপসজ্জা, গীত রচনা, কণ্ঠসঙ্গীত প্রভৃতির ধারাবাহিক স্থান নির্দেশ ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বহু পরিবর্তনে আবর্তনে চিত্রজগতেও নানা পরিবর্তন এসেছে ও বর্তমানে চলেছে তা'র পরিচয় যা বর্তমানে দর্শক ও শ্রোতাদের অবিদিত নয়।

স্মরণে

সুধানন্দ

বিনা মেঘে বজ্রসম অকস্মাৎ হ'ল ইন্দ্রপাত।
সময়ের ঘণ্টাধ্বনি স্তব্ধ হ'ল চকিতে হঠাৎ।
প্রদীপের শিখাসম সমুজ্জ্বল জ্যোতি নির্বাপিত।
কর্পূরের খণ্ড যেন অসীমেতে হ'ল তিরোহিত।
ধরণীর ব্যাপ্তিমাঝে আসিল যে বিরাট শূন্যতা
স্তম্ভিত বিস্ময়ে ভাবি কেমনে হায় পূর্ণ হবে তা'!
বিরাট কর্মের যোগে প্রাণ তব ছিল সমর্পিত;
অসীম আনন্দধারা হৃদয়েতে নিত্য প্রবাহিত।
স্বাধীনতা সংগ্রামের তুমি ছিলে জ্বলন্ত পাবক,
নেতাজীর আদর্শের তুমি ছিলে বলিষ্ঠ সাধক।
ভক্তিরসে তুমি ছিলে সুবিনীত ভক্তি মার্গগামী।
প্রেমরসে ছিলে তুমি চিরন্তন প্রেমপূর্ণ কামী।
যে চলা নিস্পন্দ হ'ল কালের যাত্রার পথ পরে
বিস্ময় বিমূঢ় চিত্তে স্মরি প্রিয় কর্ম যোগীবরে।
আর তো পাব না ফিরে কাছে গেলে বুকে টেনে ধরা
শুনিব না ফিরে আর হাসিমুখে বাণী মধুক্ষরা।
কে আর বলিবে বল কাছে গেলে কাছেথাকিবার
ঐকান্তিক অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে সাধ্য কার?
কে আজ দায়িত্ব লবে অন্ধজনে আলোক দেবার
রামচন্দ্রপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত সদন সেবার?
ধর্মশীল শুধু নহ, করিয়াছ ধর্মের প্রসার
বঙ্গ সাহিত্যের ছিলে নিষ্ঠাবান শাখা কর্ণধার।
যৌবনে কবিতাবলী করিয়াছ প্রচুর রচনা
* 'দরবেশ' গুরু পাশে-পেয়েছিলে প্রচুর প্রেরণা।
নৃশংস ইংরেজ হস্তে পেয়েছিলে বিপ্লবী সন্দেহে
কত ক্রুর নির্য্যাতন, তীক্ষ্ণ বর্ষাঘাত নগ্নদেহে।
সে সব কাহিনী রবে ইতিহাসে লেখা স্বর্ণাক্ষরে
ত্যাগের জ্বলন্ত জ্যোতি অনির্বাণ রবে চিরতরে
বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা রাখি অসংখ্য প্রণামে
চিরশান্তি লভ তুমি শান্তিময় চিদানন্দ ধামে।

---

* শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য কিরণচাঁদ দরবেশ।

● শ্রীশ্রীরামচন্দ্রপুরের ঋষি, মহাকর্মযোগী শ্রীমৎ স্বামী শ্রী ১০৮ অসীমানন্দ সরস্বতীর নরলীলা সম্বরণে।

কথা সাহিত্য

শ্রীজয়দেব রায়

গল্প শোনার আগ্রহ বিশ্বের সব দেশের সব বয়সের সব লোকের। ছেলে-মেয়েরা গল্প শুনে শিক্ষা পায়। সেই সঙ্গে পায় অনাবিল আনন্দ। বড়রা হয়তো শিক্ষা পান না, কিন্তু আনন্দ আহরণ করতে তাঁদের নিশ্চয়ই অসুবিধা হয় না।

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই বোধহয় গল্প বলা প্রথম সুরু হয়। গল্পের মধ্যে নীতিকথা না থাকলে গল্প বলার প্রয়োজনই নেই বলে গল্পকারদের সাধারণ বিশ্বাস ছিল।

ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মশাস্ত্রের মাধ্যমেই গল্প বলা শুরু হয়। আমাদের সাহিত্যেরসূত্রপাত হয় প্রাচীন পুরাণ কাহিনীকে অবলম্বন করেই। সেসব গল্প লোকসমাজই রূপায়িত করেছে।

রামায়ণ ও মহাভারতই হচ্ছে আমাদের গল্প সাহিত্যের আদি উৎস। দুটিতেই মুখ্যতঃ নীতিকথা ও ধর্মকথা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

আজ পর্যন্ত ভারতীয় সাহিত্যের প্রধান উপজীব্যই হয়ে আছে এই সব চিরন্তন কাহিনী সূত্র। এইসব কাহিনীর মধ্য দিয়ে কতকটা গূঢ়ভাবে ধর্মোপদেশ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

গল্পগুলিতে একদিকে জাতবিচার, সামাজিক পার্থক্য, অহেতুক দেবদ্বিজে ভক্তি প্রভৃতি যেমন প্রকটিত, অন্যদিকে তাই ব'লে এই সব নীতি গল্পে সত্য, ন্যায় ও মনুষ্যত্ববোধের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতিও কোনরূপ বিকষিত হয় নি।

এরপর গল্প সাহিত্যের বিরাট ভাণ্ডার এসে পড়েছে বৌদ্ধধর্মের প্রসাদে। 'জাতক-কাহিনী' ভারতের তথা জগতের অন্যতম বিরাট কাহিনীভাণ্ডার—ভগবানবুদ্ধদেবের উপদেশাবলী সাধারণ জনগণের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য জাতকের গল্পগুলি বিরচিত। এগুলির প্রায় প্রতিটিতেই বুদ্ধদেবের একটি ভূমিকা আছে।

তাঁর গতজন্মের কাহিনী এসব গল্পে বলা হয়েছে। প্রতিবারেই তিনি কোন না কোন সৎকর্ম করেছেন, জীবে দয়া, অতিথিসেবা, আশ্রিতকে রক্ষা, পরার্থে আত্মদান প্রভৃতি নানা প্রকার হিতকর্মে তিনি আত্মত্যাগ করেছেন। আর নিজের জীবনের নিদর্শন দিয়ে চিরকালীন উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন।

জাতকের গল্পগুলিতে পশুপাখীকে জীবনদান করা হয়েছে, তারা মানুষের মতই সব ব্যবহার করেছে, তাদের মধ্যে মানুষের সমস্ত দোষগুণই সমভাবে বিদ্যমান। তারাও মানুষের মত ভালবাসতে পারে, যুদ্ধ করে, ঘৃণা হিংসা করে। বিভিন্ন মানুষের প্রতীক হিসাবেই যেন তাদের ব্যবহার করা হয়েছে।

জাতকের কথার ভঙ্গীতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় গল্প লেখা হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের মর্মবাণী বহন করে যারা গিয়েছিলেন দেশবিদেশে তাঁরাই এ সব বাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

সংস্কৃত সাহিত্যে 'হিতোপদেশে'র গল্পগুলি স্পষ্টত জাতকের অনুসরণ। প্রত্যেকটি গল্প ঐ একই ভঙ্গীতে পশুপক্ষীর জবানীতে নীতিকথা শোনানো হয়েছে। 'ঈশপস্ ফেবলসে'র গল্পগুলিও অনুরূপ ভঙ্গীতে রচিত। বস্তুতঃ পৃথিবীর সবদেশেই এই একই ধরণের কাহিনী প্রচলিত আছে।

বাইবেলের গল্পগুলিতেও ঠিক এইভাবে নীতিকথা শোনানো হয়েছে। বাইবেলের গল্পগুলি কিন্তু তেমন সুখপাঠ্য নয়, তাতে আধ্যাত্মিকার অংশ তেমন প্রবলও নয়, বিস্তৃতও নয়।

সব দিক দিয়ে 'আরব্য উপন্যাসের ও পারস্য উপন্যাসের গল্পগুলি অনেক বেশী সুমনোহর। আরব্য উপন্যাসের গল্প পুরো রূপকথার কাহিনী, নীতিকথা বাস্তবানুগ, অযথা হিতোপদেশ দেওয়ার ভঙ্গীটা তাতে নেই।

আলিবাবার গল্পে কোন অবাস্তবতা নেই। আলাদীন বা সিন্ধবাদের গল্পে তো রীতিমত বাস্তবতা সঞ্চারিত হয়েছে। অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী হিসাবে সিন্ধবাদের গল্প চিরকালীন হয়ে আছে। বাংলা সাহিত্যের চাঁদ সওদাগরের গল্পও এইভাবে বাংলার পল্লীসমাজে দূর নীলসাগরের হাতছানি দিয়েছে—

যাবই আমি যাবই বাণিজ্যেতে যাবই।
লক্ষ্মীরে হারাই যদি, অলক্ষ্মীরে পাবই॥

চাঁদ সওদাগর ও ধনপতি সওদাগরের গল্প বাংলা দেশের লোককথার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আর রীতিমত রোমান্টিক ও ডেয়ারিং অ্যাডভেঞ্চারাস।

সওদাগর কাহিনীগুলিতে দৈত্য-দানব ভূত প্রেত ও অলৌকিক ঘটনাবলীর সমাবেশ করা হয়েছে যথেচ্ছভাবে। রূপকথার মতো সেদিক দিয়ে গল্পগুলি শিশুপাঠ্য আখ্যায়িকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই ধরণের কাহিনী বত্রিশ সিংহাসনের গল্প, বেতাল পঞ্চবিংশতি ও কথাসরিৎসাগর। ধারাবাহিক অভিযানের কথাসূত্রের মালা। প্রতিটি গল্পের সঙ্গে অপর গল্পগুলি যূথবদ্ধভাবে গ্রথিত।

আধুনিক কথাসাহিত্যের সৃষ্টি ও প্রসারের আগে বাংলা সাহিত্যের সম্বল ছিল কতকগুলি পুরাণো লোক-কাহিনী, আর প্রাচীন সাহিত্যের ভগ্নাংশগুলি। তাই নিয়েই সেই সাহিত্য নাগরিকজনের মনোহরণ করেছিল। কিন্তু শিক্ষিত জনের সংখ্যা ছিল সীমাবদ্ধ, মনসামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, গুলেবকায়ুলী, হাতেম তাই বা গোপালভাঁড়ের 'কিস্‌সা'র মধ্যেই কাহিনীবস্তু সীমায়িত হয়েছিল।

কিন্তু গল্প শোনার ইচ্ছা যাদের ছিল তাদের জন্যে সেদিনের গল্পভাণ্ডার ছিল অনেক বিস্তৃত। লোককাহিনী, লোককথা, উপকথা, রূপকথা নিত্য নতুন তৈরি হত, সেগুলি কথকের মুখে মুখে এক অঞ্চল থেকে অঞ্চলান্তরে ছড়িয়ে পড়ত।

এসব গল্পের মধ্যে রূপকথাগুলি দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের কল্যাণে ও লোককথাগুলি লালমোহন দে-র যত্নে সংগৃহীত হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ কাহিনীই আজ বিস্মৃতির গর্ভে।

কতককতক কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে সেগুলি একবারে হারিয়ে যেতে পারেনি। এই ধরণের কিছু কিছু গল্প কথাসরিৎসাগর, বেতাল পঞ্চবিংশতি, রাজতরঙ্গিণীতেও ঠাঁই পেয়েছে। এসব গল্পের মধ্যে বাংলার সোঁদ মাটির মিষ্টি গন্ধ এখনও যেন রয়ে গিয়েছে।

রূপকথার গল্পের মধ্যে রাজারানী ও রাজপুত্র-রাজকন্যা থাকবেই। উপকথার সঙ্গে রূপকথার এটাই সবচেয়ে দ্রষ্টব্য পার্থক্য। উপকথাগুলির মতো রূপকথাও গ্রামের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সৃষ্টি, তাঁরাই অল্পবয়সীদের গল্প বলার সূত্রে এগুলি আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তৈরী করেছেন।

কিন্তু গল্পের বিষয়বস্তু নিত্য নূতন কাহিনীকারের হাতে নিত্য নূতন রূপ ধরেছে, সামান্য কাহিনী নানা অনুষঙ্গ অবলম্বন করে রমণীয় আখ্যানে পরিণত হয়েছে।

স্পষ্টতই এসব গল্পের রূপরঙ্গ কথকের কথনভঙ্গীর উপরই সর্বতোভাবে নির্ভর করছে। কথক সব সময় আগের কাহিনীসূত্র মনে না-ও রাখতে পারে, দ্বিতীয়বার বলার সময়ে কথক আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ করে আগের গল্প বলতে চাইতে পারে। এইভাবেই রূপকথা রূপ থেকে রূপান্তরিত হতে থাকে।

রূপকথার মাধ্য কাহিনীবৈচিত্র্য সঞ্চারের জন্য সাধারণ মানুষ এসে তাতে ভিড় করেছে, আর তাতেই যেন বাস্তবতা লাভ করেছে। আজকের গণতান্ত্রিক সমাজে রাজারানীর ঠাঁই নেই, তাই আধুনিক ছেলেমেয়েদের গল্পে গল্পে অতি সাধারণ নরনারীকেও যেন কতকটা বাধ্য হয়ে ডেকে আনতে হয়েছে।

উপকথার মতো ব্রতকথাও লোককথা ও কাহিনীর অন্যতম চিত্তাকর্ষক অঙ্গ। ব্রতকথা সম্পূর্ণরূপে অন্দর মহলের রচনা, নারী সমাজে নারী কথকের মধ্যেই বহুলাংশে আবদ্ধ। ব্রতকথা ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, অল্পবিস্তর পৌরাণিকতা তার মধ্যে আরোপিত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি স্ত্রীআচারকে অবলম্বন করে এক একটি ব্রত-পার্বণের বহিরঙ্গ রচিত হয়েছে। কুমারী ও সধবাদের মধ্যেই সেগুলি সীমায়িত, উপবাস, আলিম্পন, চালকলা প্রসাদ যেমন অন্য পূজার সঙ্গে বিজড়িত, ব্রত পার্বণের মধ্যেও সেগুলি সন্নিবিষ্ট। কিন্তু মূল আকর্ষণ একটি কাহিনী কথন।

একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী সবিস্তারে এই সঙ্গে বলা

হ', তার কথন ও ভক্তিভরে শ্রবণের উপরই ব্রতকথার সার্থকতা যেন সর্বতোভাবে নির্ভর করে আছে।

ব্রতকথা যেন কতকটা শঙ্কাভীতি সহকারেই শোনা হয় অমঙ্গলকে বিদুরিত করাই যেন তা শ্রবণের প্রধান উদ্দেশ্য। অবশ্য ধর্মের মূল আধার তো তাই—মঙ্গলের আবাহন অমঙ্গলের বিতাড়ন।

ব্রতকথার সঙ্গে জড়িত কাহিনীগুলিকে অবলম্বন করেই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হয়। বড় বড় দেব-দেবীকে নিয়ে যেমন রচিত হয়েছিল মঙ্গলকাব্য ছোট ছোট দেব-দেবীকে নিয়ে তেমনই রচিত হয়েছিল পাঁচালী। সত্যনারায়ণের পাঁচালী, শনির পাঁচালী রীতিমত আসরে বসে পরিবেশিত হত।

কিন্তু অন্দরমহলে শনিমঙ্গল বা শ্রীবৎস-চিন্তার উপাখ্যান অনেক হৃদয়স্পর্শী করে বলা হ'ত, তাতে থাকতো গৃহলক্ষ্মীর কল্যাণ স্পর্শ, যেমন ঘরোয়া, তেমনই মনোগ্রাহী। সতী চিন্তার আখ্যান শুনলে চিন্তাকর্মে কল্যাণীদের কল্যাণ হবে বলে বিশ্বাস ছিল—

শ্রীবৎস রাজার কথা ও শনির চরিত্র।
যেবা শুনে যেবা বলে সে পরম পবিত্র॥
কদাচ শনির বাধা তাহার না হয়।
শনির বচন ইথে নাহিক সংশয়॥

———

॥ শ্রাবণ-মেঘের কথা ॥

শ্রীসুধীর গুপ্ত

১

বহুদূর হ'তে আলোকের পথে
আসি ফুল, তব লাগি'
বনান্তরালে নীরবে থাকো কি
তুমি মোর অনুরাগী ?
মৌসুমী-মেঘ কখন্ উদিবে,
থাকো তাই বুঝি জাগি'।
নির্বাসিতা গো, তৃষিতা থাকো কি
বারি-কণা মোর মাগি' ?

২

অশ্রু সাগর বাষ্প-কায়ায়
করে বুঝি টলমল্।
কোন্ সে নিঠুর গড়িল তাহে গো
বিগলিত হিয়াতল।
চাতকের মত তুমিও চকিতে
চাহ কি ফটিক-জল ?

৩

মাটির মধু কি সঞ্চিত রাখো
রঞ্জিত দলে দলে ?
বাতাসের আগে বারতা কি পাও
বেপথু বক্ষ-তলে,—
কত জনপদ পাড়ি দিতে দিতে
আসে বঁধু কুতূহলে ?

৪

পুঞ্জিত প্রেম গলিয়া গলিয়া
পড়িবে পিয়াসী বুকে,—
ভাবিতেও বুঝি হাসি ফুটে ওঠে
পেলব পুষ্প-মুখে !
ঘুমে—জাগরণে বুঝি খনে খনে
কাঁপো থর-থর সুখে।

৫

নিঃশেষে ফুল নিজেরে সঁপিয়া
ঢেলে দিতে চাই সব ;
বক্ষে সতত বেজে ওঠে তা'রই
বিজয়-শঙ্খ-রব ;
বিজলি-ঝলায় ফোটে না কি তা'র
কান্তার-উৎসব।

৬

তুমি শুধু ফোটো কণ্টকময়
মৃণাল-দণ্ড 'পরে ;
তুমি শুধু ফোটো ওগো রূপময়ী
এ মাটিতে ক্ষণ তরে ;—
যাহে প্রিয় বলে—হবে না এমন
এ দীন মাটির ঘরে।

৭

বহু ব্যথা-ভরা বর্ষণ-বারি—
মৌসুমী-মায়া রাশি
তাই দিয়ে সখি, বহু দূর পথে
ভেসে ভেসে শুধু আসি,
মোর প্রেম দিয়ে ও-মুখে ফুটিয়ে
যেতে চাই প্রেম—হাসি।

৮

এর বেশী প্রেম আর কি চাহিবে ?
চাহিবার কি বা আছে।
নিজেরা সঁপিয়া বসুধা-বধূর
হাসিটুকু শুধু যাচে ;
প্রেম করে প্রীতি-নিবেদন
নিযুক্ত প্রেমের কাছে ;
আকাশ—ভুবন একাকার হ'য়ে
প্রেম-পথে মিলিয়াছে।
তোমারে হেরিয়া তুলি' মল্লার
হৃদয় আমারও নাচে।

আকাশের রঙ

কুমারবসু

মোড়ের মাথায় ল্যাম্পপোষ্টটার নীচে এসে বসল রূপচাঁদ। মাথাটা ভীষণ ধরেছে। ঘরের মধ্যে অসহ্য গরম। কি করা যায়? হাতে একটাও পয়সা নেই। কাল্লুর দোকানের দিকে চেয়ে হাঁক দিল একটা।

"এ রসীদ, ইধর একঠো চায় দে যা।"

সামনের দোকান থেকে জামা সেলাই করতে করতে সিরাজ বললে "ইধর ভি তো জরা ঘুমকে দেখ, হমলোক কোই হ্যায় নহী ক্যা?"

পান খেয়ে ছোপ-লাগা দাঁতগুলো বের করে হাসল রূপচাঁদ। বললে "তু কঁহাকা নওয়াব হ্যায় যো তুকে চায় পিলানা পড়েগা? দুকান খুলা হ্যায়, যাকর্ পী লে।"

বিড়িটায় শেষ টান মেরে ফেলে দিল সিরাজ। বললে "আচ্ছা, খ্যায়াল রখনা ইস্ বাতকো। মানিক অওর জোসেফ লাইন লগানে গয়্।"

এক লাফে উঠে এল রূপচাঁদ সিরাজের দোকানের কাছে। "তু শালা একদম্ ধোকাবাজ, কামকে বখ্ত রূপচাঁদ, অওর মৌজ উড়ানেকা বখ্ত মানিক অওর জোসেফ"। বললে রূপচাঁদ।

কাল্লুর দোকান হতে ছোকরাটা এসে চা দিয়ে গেল। গম্ভীরভাবে কাপটা তুলে নিয়ে সিরাজ একটা চুমুক দিল। বললে "কালুয়া আজ আচ্ছা চায় বনায়া, অওর একঠো মঙা লে।"

চটে উঠল রূপচাঁদ। "তেরা বাপকা দুকান হ্যায় ক্যা! যো অওর একঠো মঙালেঙ্গে?"

হাসল একটু সিরাজ। বললে "বিগড়তা কুঁ্য, মঙা লে, পয়সা হম দে দেঙ্গে।" ওর দিকে একটা বিড়ি এগিয়ে দিল সিরাজ।

বিড়িটা ধরিয়ে মেজাজটা একটু ঠাণ্ডা হল রূপচাঁদের। বললে "ক্যা বাত্ হ্যায়, অমীর বন গয়া আজ? মালকৌড়ি কুছ মিলা হ্যায় কঁহী সে?"

অর্দ্ধসমাপ্ত জামাটার দিকে মনোনিবেশ করে সিরাজ বললে "কাঁহে?"

"বোল না?"

"তেরা আঙ্গন মে যো বুডঢা ব্রাহ্মন ঠো হ্যায় উ আজ চারঠো রুপিয়া দিয়া। খ্যায়াল নহী রহতা ক্যা নাম হ্যায় উস্‌কা।"

"পূর্ণ কাকা?"

আরে হাঁ হাঁ, ওহী তেরা পুরনো কাকা, পিছলে সালমে কাপ্‌ড়া বনওয়াথে, রুপিয়া দিয়া ইস সালমে, একদম হারামী হ্যায়।"

কেন জানি হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল রূপচাঁদ। একই দালানের উল্টো দিকে বাস করেন পূর্ণকাকা, পূর্ণ ভট্‌চায। তাঁতিপুকুর বাজারের কাছে যে বড় শিবমন্দিরটা আছে তারই পূজারী। কায়ক্লেশে কোনরকমে দিন চলে। সংসারে তিনটি মাত্র প্রাণী। নিজে, মেয়ে বিমলা ও বছর চোদ্দ বয়সের ছেলে যতীন।

রূপচাঁদ যে বস্তিটায় থাকে সেখানে মুসলমান, হিন্দু, খৃষ্টান প্রভৃতি সব জাতই থাকে। ওর ভেতরে মন্দিরের পূজারী এসে ওঠাতে পাড়াতেঅনেকেই আপত্তিকরেছিলো, অবশ্য আপত্তিই করেছিলো, রাস্তাটা কেউ দেখিয়ে দিতে পারেননি। মাসিকপনেরো টাকা ভাড়াতে এক চিলতে এঁদো ঘর এত সস্তাতে আর কোথায় পাওয়া যাবে? পরে অবশ্য অন্যান্য ব্যাপারের মত ওটাও ধামাচাপা পড়ে গিয়েছিলো।

রূপচাঁদের বিশেষ কোন বালাই নেই। মিশন ষ্ট্রীটের মোড়ে "মিশন প্রেসে" দপ্তরীর কাজ করে শ খানেক টাকা পায়। মনের আনন্দে সিনেমা গ্যাখে, বিড়ি ফোঁকে মন মেজাজ যেদিন একটু বেশীরকম ভাল থাকে সেদিন দুপয়সা দামের তাজমহল মার্কা সিগারেটও খায়। আর সিরাজ দর্জি, মানিক ধোবা, মোটর মিস্ত্রি জোসেফ, রঘু পানওয়ালার সঙ্গে রাত অব্দি এই মোড়ের মাথায় বসে আড্ডা দেয়। বাঁকুড়া জেলার ছেলে। এখানে এ

এই জগাখিচুড়ীর মাঝে ও ভুলেই গেছে যে ও বাঙালী ছিল একদিন। নেহাৎ মাতৃভাষা বলেই হয়ত বাঙলা ভাষাটা এখনও মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বিপন স্ট্রীটের কলকাতার বহুদিনের পুরোনো কলিঙ্গা গির্জের খাতায় ওর নামটা এখনও লেখা আছে কিন্তু ভুলেও ও গির্জের ধারে কাছে কোনদিন ঘেঁষে না।

পূর্ণকাকাকে হারামী বলতে ও সিরাজের ওপর একটু চটল। কিন্তু বিশেষ কিছু বলল না। রাত্তিরের সিনেমা দেখাটা যদি মাটি হয়? জোসেফ ও মানিক লাইন দিতে গেছে। "আরে হারামী নহী, গরীব হ্যায় বিচারা।"

"গরীব তো হম্‌ভী হ্যায়, বোল হম্ কৌন্‌সা অমীর হ্যায়?"

ভাল লাগছে না, প্রসঙ্গটাকে এড়িয়ে যেতে লাগল রূপচাঁদ। "ছোড় ইয়ে সব ফালতু বাত, মানিক কহাঁপর লাইন লগানে গয়?" জানতে চাইল ও।

"পার্ক শো মে। তু জলদী খাকে আ জা, এক সাথিল চলেঙ্গে।

ঘরে গিয়ে হাঁক দিল রূপচাঁদ "পিসি খেতে দে।" কিন্তু কই পিসিতো ঘরে নেই! দালানটার উল্টোদিকে পূর্ণকাকার ঘর। সেদিকে একবার তাকাল।

ওঘর থেকে যতীন বেরিয়ে এল। বললে "তুমি নিজেই বেড়ে নিয়ে খেয়ে নাও। পিসির শরীর খারাপ, দিদির সঙ্গে গল্প করছে।"

হ্যারিকেনের আলোটা একটু বাড়িয়ে দিল রূপচাঁদ। যতীনের দিকে ফিরে তাকাল। ওর শুকিয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে বললে "তোর খাওয়া হয়ে গেছে?"

শুকনো মুখখানাকে আরও শুকনো করে যতীন বললে "না, আজ রান্না হয়নি, ঘরে কিছু নেই।"

রূপচাঁদের মায়া হল একটু। ওর যা ভাত আছে তাতে দুজনে ভাগ করে কোনরকমে খেয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু! ওপাশের ঘরে মানিকের বউটা কাপড় ইস্ত্রি করছে। দেখতে পেলে মুস্কিল হবে। শেষকালে হিতে বিপরীত না হয়ে যায়! ওদের জাতটা আবার—না থাক।

যতীনকে বললে "কিছু নেই কেন? তোর বাবাতো শুনলাম সিরাজকে টাকা দিয়েছে!

"রায় বাবুদের বাড়ি হতে পরশু ও মাসের টাকা কটা দিয়েছিল। কদিন ধরেই সিরাজ টাকার জন্যে বলছিল। গোটা কয়েক টাকা ছিল বাবা ওকে ধরে দিয়েছে।" বললে যতীন।

চুপ করে রইল রূপচাঁদ। সিরাজই বা কি করবে? সবায়েরই অভাব।

"একটা বিড়ি দাওনা রূপচাঁদদা।"

বিড়ি একটা আগিয়ে দিল রূপচাঁদ। বিড়িটা নিয়ে যতীন চলে গেল। বাইরে গিয়ে রহীমের দোকানে বসে ফুঁকবে। ওদের ঘরের দিকে একবার তাকাল রূপচাঁদ। কেরোসিনের কুপির আলোতে বিমলিদিকে দেখা যাচ্ছে। সাদা থান পরা। গায়ে কিছু নেই। আঁচলটা অসমতল বুকের ওপর জড়িয়ে রেখেছে। পিসিকে মাথা নেড়ে কি বোঝাচ্ছে।

থালাটা পেতে কাঁচের গ্লাসে জল গড়িয়ে নিয়ে রাখল রূপচাঁদ। হাঁড়ির ঢাকাটা খুললো। গোটাদুয়েক আলুও রয়েছে ভাতের সঙ্গে। আর কিছুই নেই। কি আর করা যাবে! আলু দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে থালার ওপর রাখলো। নুনের ভাঁড়টা কোথায় গ্যালো আবার!

"পিসি, নুনের ভাঁড়টা কোথায়?"

"উনুনের পাশেই আছে বোধহয়, খ্যাখনা।"

ভাঁড়টা যথাস্থানেই পাওয়া গেল। রূপচাঁদও আর দেরী না করে বসে গেল। দাঁতে একটা কাঁকড় লাগতেই মাথাটা ঝনঝন করে উঠল। খানিকটা ভাত মুখ হতে বের করে ফেলে দিল। জল খেল এক ঢোঁক। পিসিটাও যেমন! একটু ভাল করলেও তে পারতো!

ওঘর থেকে বিমলিদিকে দেখা যাচ্ছে। চুলগুলো উস্কোখুস্কো। কদিন মাথায় তেল পড়েনি কে জানে! কিন্তু বিমলিদিকে দেখলে মনেই হয়না বিধবা। রূপচাঁদের থেকে বোধহয় বছর তিনেকের বড় হবে। আচ্ছা, বিমলিদি আবার বিয়ে করেনা কেন? খেতে খেতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল রূপচাঁদ। বিমলিদি তার বউ হলে কেমন হয়! দাঁতে আরেকটা কাঁকড় লাগতেই চমক ভেঙে গেল রূপচাঁদের। ধ্যেৎ, কি সমস্ত যা তা ও ভাবছে! বিমলিদির কথা ওরকভাবে ভাবতে একটু লজ্জা করে রূপচাঁদের। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিমলিদির কথা ভাবতে ওর কেমন যেন ভাল লাগে।

থালাটা একপাশে সরিয়ে রাখল। পেট ভরল না। আরেকটু জল খাওয়া যাক। জলের গ্লাসটা মুখের কাছে তুললো। ঠোঁটের কাছে গিয়ে গ্লাসটা আটকে গেল। বিমলিদির আজ বোধহয় সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি! এত দূর থেকেও বিমলিদির ক্লান্ত চোখ দুটো যেন ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। চোখের কোলে কালি পড়েছে। মুখটা একদম শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। গ্লাসটা নামিয়ে রাখল রূপচাঁদ। কাল্লুর দোকান থেকে দৌড়ে গিয়ে কিছু পরটা ও ভাজি নিয়ে আসবে নাকি? কিন্তু—দূর, রূপচাঁদের কি মাথাটা গোলমাল হয়ে গেল নাকি? কাল্লুর দোকানের খাবার বিমলিদি খাবেই বা কেন?

হ্যারিকেনের আলোটা একটু কমিয়ে দিল। নাঃ, অনেক দেরী হয়ে গেছে, এবার যাওয়া যাক। সিরাজ হয়ত দোকান বন্ধ করে অপেক্ষা করছে। পূর্ণকাকার ঘরের দিকে এগিয়ে এল রূপচাঁদ।

"পিসি, আমি বেরুচ্ছি, ফিরতে একটু রাত হবে।"

"কোন চুলোয় যাওয়া হচ্ছে শুনি?"

একটা মিথ্যে কথা বানিয়ে ফেললো রূপচাঁদ। বললে "ইন্টালী মার্কেটের কাছে কাওয়ালী হচ্ছে, বেশী দেরী হবে না, বারটার মধ্যেই ফিরব।"

"দেরী হলে আমি শুয়ে পড়ব। দাওয়ায় রাত্রে পড়ে থাকতে হবে মনে রেখ।

বিমলা চুপ করে ওদের কথাবার্তা শুনছিলো। এবারে বললে "তাতে আর রূপচাঁদের আপত্তিটা কি? গরমের দিনে দাওয়াতেও আরামেই ঘুমুবে।" বলে হাসল একটু রূপচাঁদের দিকে তাকিয়ে।

রূপচাঁদও একবার তাকালো বিমলিদির দিকে। কিন্তু তক্ষুনী চোখদুটো মাটির দিকে নামিয়ে নিলো। কোন রকমে বললে "আমি চললুম পিসি।" একরকম দৌড়েই প্রায় চলে এলো বাইরে। এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। বিমলিদির সামনে যা লজ্জা করছিল! সিরাজ দোকান বন্ধ করে দাঁড়িয়ে যতীনের সঙ্গে গল্প করছে। রূপচাঁদকে ওই রকমভাবে প্রায় দৌড়ে আসতে দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সিরাজ তাকালো ওর দিকে।

কোন কথা বললে না রূপচাঁদ। শুধু বললে "জলদী

শো ভাঙল প্রায় বারটা। সিনেমা দেখে মনমরা ভাবটা কেটে গিয়েছিল রূপচাঁদের। বেশ খুসী মনেই মানিক, সিরাজ ও জোসেফের সঙ্গে গল্প করতে করতে বাড়ির দিকে চললো। পথ নির্জন। কচিৎ দু'একটা গাড়ি হেড লাইটটা জ্বালিয়ে শোঁ করে এদিক ওদিক বেরিয়ে যাচ্ছে। মল্লিক বাজারের কারখানাটা পেরিয়ে ওরা বিজলী রোডে ঢুকল। এ পথটা আরও নির্জন। বাঁদিকে ট্রাম কোম্পানীর প্রকাণ্ড কারখানা, গলা ছেড়ে গান ধরল জোসেফ। কেমন যেন অদ্ভুত লাগল রূপচাঁদের। ট্রামকোম্পানীর কারখানাটার দিকে একবার তাকাল। হয়ত ভাবল, দিনের শুরুতে মানুষ এখানে আসে জীবনটাকে দুটুকরো রুটির ঘুষ দিয়ে কি করে বাঁচিয়ে রাখতে পারে সেই ধান্দায়, আর দিনের শেষে যাঁ যার মেয়াদ খতম হয়ে গেলে মানুষ আশ্রয় নেয় গিয়ে ঐ কবরখানার মাটির নীচে। দুটোর মধ্যে সমতা রক্ষা করছে বোধহয় এই রাস্তাটা। তারাচাঁদ রঞ্জন যেমন সহজভাবে এগিয়ে চলেছে বিমলিদিও কি সেইরকম সহজভাবে এগিয়ে যেতে পারবে তার নিজের পথে? পারবে কি না কে জানে? উদাসভাবে কবরখানার পাঁচীলটার দিকে তাকিয়ে সিরাজকে বললে "বিড়ি ছোড় একঠো।"

সিরাজের বিড়ি থেকেই নিজের বিড়িটা ধরিয়ে নিল রূপচাঁদ। ওরা তখন এসে পৌঁছে গিয়েছিল বস্তিটার সামনে। দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু কাল্লুর দোকানটা খোলা রয়েছে। দোকানের ছোকরাগুলো ঘুমিয়ে পড়েছে। কাল্লু বসে বসে হাই তুলতে তুলতে হিসেব করছে। ল্যাম্পপোষ্টটার নীচে সিরাজ ও রূপচাঁদ বসল। মানিক ঘরে চলে গেল। কাল আবার দেখা হবে বলে জোসেফও চলে গেল। সিরাজ কাল্লুকে হাঁক দিয়ে বললো "এ কালুয়া, দো ঠো চায় হোগা?"

কাল্লু একটা হাই তুলে নিভে আসা বড় চুল্লীটার দিকে অলসভাবে তাকিয়ে বললে, "হোগা।"

চায়ের কাপটা তুলে একটা চুমুক দিল সিরাজ। রূপচাঁদকে বললে "থোড়ী আচ্ছা থা, দেখা ইক নাচনে ওয়ালীকী সাথ ইক অমীরকা ক্যায়সা মোহব্বত হে

"উ সব ঝুঠ হ্যায়, সিরিফ সিনিমামেই অ্যায়সা হোতা।" কাপটা নামিয়ে রেখে বললে রূপচাঁদ।

সিরাজ ওর দিকে একটা বিড়ি এগিয়ে দিল, বললে "হোগা সায়েদ, কৌন জানে?" তারপরে চায়ে আর একটা চুমুক দিয়ে বললে "লেকিন হাঁ, মধুবালা ক্যায়সা সীনা তুলকাকে নাচতী থী বোলতো? মুঝে তো পগলা বনাদিয়া।"

আকাশের দিকে বিড়ির ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে রূপচাঁদ বললে "আরে তুঝে ক্যা, মুঝে ভী তো—একটু চমকে উঠে সিরাজকে একটা ঝাঁকুনী দিয়ে বললে "উঁহাপর কৌন্ রোতা হ্যায় বোলতো?"

"কাঁহা?" ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল সিরাজ।

একটু দূরে যেখানে বস্তীর সরু গলিটা এসে শেষ হয়েছে সেখানে রহীমের পানের দোকানটা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। বস্তীর ছায়া এসে পড়েছে দোকানটার ওপর। জায়গাটা অন্ধকার। দোকানটার নীচে কে একজন বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আঙুল দিয়ে জায়গাটা নির্দেশ করল রূপচাঁদ।

সিরাজ কিছুক্ষণ চোখ কুঁচকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপরে চেঁচিয়ে বললে "কৌন্ হ্যায় রে উঁহাপর।"

অন্ধকার থেকে একটা গলার আওয়াজ ভেসে এল "আমি।"

"আমি কৌন? ইধর আ।"

দোকানের নীচে হতে উঠে এল যতীন। ওকে দেখে ওরা দুজনেই একটু অবাক হল।

"তু ওইপর ক্যা করতা থা? রোতা কুঁ?"

উত্তর দিল না যতীন। চুপ করে চোখ দুটো মুছতে লাগল। রূপচাঁদ বললে কি হয়েছে তোর?

কাঁদছিস কেন?

নখ খুঁটতে খুঁটতে যতীন বলল "দিদির কাছে পয়সা চেয়েছিলাম বলে ভীষণ মেরেছে। সকাল থেকে কিছু খাইনি। আমার খিদে পায়না নাকি? শুধু শুধু ও কেন আমায় মারলে?

কেন যে মারলে সে কথা যতীন না বুঝলেও রূপচাঁদ বুঝলে। সিরাজ ওর নিভে যাওয়া বিড়িটার দিকে তাকিয়ে ওদের কথা শুনছিলো। সব কথা বুঝতে না পারলেও হয়ত আন্দাজে কিছুটা বুঝেছে। ওকে টাকা চারটে না দিলে যতীনদের আরও দু-তিনদিন বোধহয় চলত। দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ রইল।

"রূপচাঁদদা।"

"কি" আকাশের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল রূপচাঁদ।

"একটা বিড়ি দাও না।"

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল রূপচাঁদ। সিরাজ ওর হাতটা চেপে ধরল। লুঙ্গির খুঁট থেকে দু'টো টাকা বের করল। রূপচাঁদ ওর দিকে তাকাল।

"ঘরমে খানেকা কুছ নহী হমকো কহ্‌নেসে হোতা। রূপ্‌য়াকি লিয়ে হম্ তগাদা দিয়া থা লেকিন হম কশাই তো নহী হ্যায়! উধর্ খানেকা রোটী নহী ইধর্ হম্ কা রোয়াবসে কহতা থা "তুমকো আজ্ হী রুপিয়া দে দেঙ্গে।" "তুঝকো হম্ কহথা না, উ ব্রামহন ঠো একদম হারামী হ্যায়।"

টাকা দুটো যতীনের হাতে গুঁজে দিল সিরাজ। বললে "লে, তেরা বাপকে দিয়ে দিবি।"

রূপচাঁদ ও যতীন হতভম্ব হয়ে সিরাজের দিকে তাকিয়ে ছিল।

"নাচিস্ ঠো দে" বললে সিরাজ। তারপরে যতীনের দিকে ঘুরে বললে "যা ঘরমে যাকে শো জা, রাত বহুৎ হো গই।"

খিদের দহন অনেক আগেই নিভে গিয়েছিল যতীনের। কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। টাকা দুটো পেয়ে ফুর্তি হল খুব। পাছে যদি সিরাজ মতটা আবার পালটে ফেলে এই ভয়ে বিন্দুমাত্র দেরী না করে ঘরের দিকে সোজা লাফাতে লাফাতে দৌড় দিল।

আরও কিছুক্ষণ বসে বসে গল্প করল ওরা দুজনে। গল্পটা অবশ্য মধুবালা বুক দুলিয়ে ছবিতে কি রকম নাচছিলো সেই বিষয়েই। একটু পরে সিরাজও চলে গেল। চুপচাপ কিছুক্ষণ একলা বসে রইল রূপচাঁদ। কিছুক্ষণ কি ভাবলো। তারপরে আস্তে আস্তে উঠে এলো কাল্লুর দোকানে।

গলিটা কি অন্ধকার। বস্তির মধ্যের বাড়ীটা কোঁদাকা

সব ইঁট যেন ভেঙ্গে দিয়েছে। খাবারের ঠোঙাটা হাতে নিয়ে উঠোনের মাঝে এসে দাঁড়াল রুপচাঁদ। চারদিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখল। নাঃ, সব শুয়ে পড়েছে। এক ভয় ছিলো একটু মানিককে, কিন্তু তারও শোধহয় এখন অর্দ্ধেক রাত। যতীনদের ঘরের দাওয়ায় উঠে এল। আস্তে আস্তে ডাকল "যতীন, এই যতীন।"

জেগেই ছিল যতীন। দরজাটা ভেজিয়ে রেখে বাইরে বেরিয়ে এল। "কি বলছ?"

"তোর বাবা জেগে আছে?"

"না, ঘুমিয়ে পড়েছে।"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো রুপচাঁদ। বললে "আয় আমার সঙ্গে"। ওর ঘরের দাওয়ায় উঠে এল ওরা দুজনে। যতীনের হাতে খাবারের ঠোঙাটা দিয়ে বললে "এইখানে বসে চুপচাপ খেয়ে নে, তোর খুব খিদে পেয়েছে, না?" আরও কি বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ ওঘরের দরজা খুলে বিমলিদিকে বেরিয়ে আসতে দেখে চমকে উঠল। বিমলিদি উঠোনে নেমে চারদিক চেয়ে খুঁজছে যতীন কোথায় গেল? চাপাস্বরে আস্তে আস্তে ডাকল "এই যতীন, কোথায় গেলি তুই?"

উত্তর দিতে বারণ করতে যাচ্ছিল রুপচাঁদ। কিন্তু তার আগেই যতীন বললে "এই তো আমি এখানে!"

রুপচাঁদের দাওয়ার দিকে এগিয়ে এলো বিমলা। যতীনকে বললে "তোর হাতে ওটা কি?"

"খাবারের ঠোঙা, রুপচাঁদদা নিয়ে এসেছে আমার জন্যে।" তারপরে বিমলার দিকে তাকিয়ে বললে "খাব দিদি?"

বিমলা কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইল। রুপচাঁদ মাথা হেঁট করে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে দাওয়ার মাটি খুঁড়ছিলো। হয়ত ভাবছিলো দৌড়ে গিয়ে ভটচায মশাইকে জিজ্ঞেস করে আসবে কি যে ওর নিয়ে-আসা খাবারগুলো খেলে যতীনের জাত যাবে কি না?

কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইল বিমলা। তারপরে আস্তে আস্তে যতীনকে বললে "ওখানে বসে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিগে যা। বাবাকে কিছু বলিসনি।"

এক ছুটে ওদের দাওয়ার দিকে চলে গেল যতীন। বললে না কিছু। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। রুপচাঁদ আরও তাড়াতাড়ি মাটি খুঁড়তে লাগল। ওর মুখে এসে বিমলার নিঃশ্বাস লাগছিলো।

"রুপচাঁদ।" খুব আস্তে আস্তে ডাকলো বিমলা।

মুখটা তুললো রুপচাঁদ। তুলতেই দৃষ্টিটা এসে পিছলে পড়ল বিমলার উদ্ধত বুকের উপর। চোখদুটা আবার মাটির দিকে নামিয়ে নিলো রুপচাঁদ। বললে "কি বলছ?"

মনে মনে একটু হাসলো বিমলা। রুপচাঁদের দুর্বলতা কোথায় ও জানে। বললে "যতীনের জন্যে খাবার নিয়ে এলি আমার জন্যে কিছু আনলি না?

হঠাৎ এতখানি নিবিড়ভাবে বিমলাকে কথা বলতে শুনে রুপচাঁদ মাথাটা তুললো। বিমলা বলেছিলো রুপচাঁদের লজ্জাটা ভাঙিয়ে দেবার জন্যেই "তোমার জন্যে আনলে তুমি খেতে?" জিজ্ঞেস করলো রুপচাঁদ।

"এনেই দেখতিস, আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?"

"কি?"

"সিরাজের কাছ থেকে টাকা ফেরৎ পাইয়ে দিলি, যতীনের জন্যে খাবার নিয়ে এলি, কিন্তু তুই হঠাৎ আমাদের এত কচ্ছিস ক্যানো?

সিরাজ যে নিজেই টাকা ফেরৎ দিয়েছে সেকথা ভাঙলো না রুপচাঁদ। কোনো উত্তর দিলো না। আগের মতই মাটি খুঁড়তে লাগল।

"বলবিনা! চুপকরে রইলি কেন?" আরেকটু কাছে এগিয়ে এলো বিমলা। রুপচাঁদ এবারে মুখটা তুলে বিমলার চোখের দিকে তাকাল। সেখানে কৌতুকের কোন আভাস ছিলো কি না অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারল না।

মাথাটা নামিয়ে নিয়ে বললে "জানি না।"

"বল না ভাই, লক্ষ্মীটি।"

মুখটা ঘুরিয়ে উঠোনের নিমগাছটার দিকে তাকালে রুপচাঁদ। বললে "ক্যানো আবার, এমনিই।" ও রূপে একটু চুপ করে থেকে বলে ফেলল "বিমলিদি তোমাকে তোমাকে আমার ভাল লাগে।" বলেই নিজের ঘরের দিকে তাড়াতাড়ি পালাচ্ছিলো, কিন্তু যেতে পারল না। বিমলার দুটো হাতই ওর গলাটা ততক্ষণে জড়িয়ে ধরেছে

চাঁদের। শিউরে উঠল উনিশ বছরের যুবক রূপচাঁদ। কোথা থেকে একটা গরম রক্তের ঢেউ এসে যেন ও শরীরের প্রতিটি আনাচে-কানাচে আছড়ে পড়ল। [illegible] রকমে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। নিয়ে আর দাঁড়োল না, এক দৌড়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কেমন যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না। [illegible] ওপাশে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। জামাটা খুলে [illegible] মেঝে দিল রূপচাঁদ। দরজার পাশে চাটাইটা [illegible] পড়ল। গরম লাগছে বড্ড। আস্তে [illegible] খানিকটা খুলে দিলো। [illegible] স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নিমগাছটা আগের মতই উদাসভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অজান্তেই দৃষ্টি [illegible] ঘরের দিকে। কিন্তু ও কী? উঠে [illegible] রূপচাঁদ। নিজের চোখকে বিশ্বাস করবে কি না বুঝতে পারল না। তার দেওয়া খাবার যতীনের সঙ্গে বিমলিদিও খাচ্ছে। যতীনের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। একটু জল খেয়ে ঘরে চলে গেল।

আরও খানিকটা পরটা ছিঁড়ে মুখে পুরল বিমলিদি। রূপচাঁদের মনে পড়ল বিমলিদির ও আজ [illegible] হয়নি। দৌড়ে গিয়ে কাল্লুর ঘুম ভাঙিয়ে [illegible] কিছু পরটা নিয়ে আসবে নাকি? বিমলার খাওয়া হয়ে গিয়ে-ছিলো। পাতাটা মুড়ে উঠোনের এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিল। খানিকটা জল নিয়ে [illegible]। চারদিক একবার দেখলো। তারপরে আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিলো।

ঘুম আসছে না রূপচাঁদের। মশাগুলো কানের কাছে শব্দ করে ঘুরপাক খাচ্ছে। কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ ছটফট করল রূপচাঁদ। বিমলিদির কথা বড্ড মনে হচ্ছে। ওর ঠোঁটদুটো কি খুব নরম! কেমন যেন গাটা শিরশির করে উঠল রূপচাঁদের।

কেন জানি হঠাৎ ওর সিনেমার কথা মনে পড়ল "মধুমালা ক্যায়সা সীনা ছলকাকে নাচতী থী বাতাও?" উঠে বসল রূপচাঁদ। বিড়ি ধরিয়ে একটা ঘন ঘন টান দিতে লাগল বিড়িটাতে। "মধুমালা ক্যায়সা সীনা ছলকাকে নাচতী থী [illegible]" [illegible]

বিমলিদির চাইতে ও ভাল? নাকি বাইস্কোপে ওরকম মনে হয়? মধুমালার ছবিগুলোকে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইন দিয়ে মারামারি করে দেখতে যায়, বিমলিদির খাবার পয়সা নেই, কেন? বিমলিদিও যদি বাইস্কোপ করে তাহলে লোকে মারামারি করে দেখতে যাবে? শেষ [illegible] বিড়িটাকে [illegible] ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শুয়ে পড়ল [illegible]। কে দেখতে বেশী সুন্দর ঠিক করতে পারল না [illegible]। আস্তে আস্তে চোখদুটো ওর বুজে এল। মধুমালা [illegible]? কে বেশী সুন্দর? বিমলিদি না মধুমালা?

পরদিন [illegible] ছুটি ছিলো। সকাল [illegible] করে কাটাল রূপচাঁদ। [illegible] জিজ্ঞেস করাতে বলল জর [illegible]। ওর বন্ধ দোকা-টার দিকে তাকিয়ে [illegible] ভাবতে লাগল রূপচাঁদ। ভেবে [illegible] চলে গেল তাঁতিপাড়া লেনের দিকে। ওখানে ওর বন্ধু পাঁচু থাকে। এক সঙ্গেই অফিসে [illegible]।

পাঁচু ঘরে ছিলনা। ওর মা বললে একটু আগেই কারা এসে ডেকে নিয়ে গেল যেন। "দেখ যদি বিজলী রোডের [illegible]"

[illegible] দিকে এসে দ্যাখে কয়েকজন ছোকরা [illegible] শুকনো চৌবাচ্চাটার পিছনে বসে কি করছে। ওদের দিকে এগিয়ে গেল রূপচাঁদ।

পাঁচু ছিলো সেখানে। রূপচাঁদকে দেখে একটু হাসল। বলল "কিরে তুই হঠাৎ?"

"তোর বাড়িতে গিয়েছিলাম।"

"দরকার আছে কিছু?" ময়লা তাসগুলো ভাঁজতে ভাঁজতে জিজ্ঞেস করল পাঁচু।

"না এমনিই ভাল লাগছিল না তাই ভাবলাম—"

"বসবি না কি? বরাৎটা একবার যাচিয়ে নে, দেখ যদি লেগে যায়?" কোচড়ের পয়সাগুলো সামলাতে সামলাতে বলল পাঁচু।

ওর পাশে বসে পড়ল রূপচাঁদ। "না, পকেট আজ খালি।"

"ধার নে।" ওর দিকে একটা টাকা এগিয়ে দিলে পাঁচু।

কিছুক্ষণের মধ্যে জমে গেল রূপচাঁদ। মন্দ হচ্ছে না! পাঁচু ওর পিঠটা চাপড়ে দিল একবার। চুপচাপ খেলে যেতে লাগল ওরা।

বেশ চলছিল। কিছুক্ষণ পরে একটা কাল রঙের "ভ্যান" এসে হাজির হল হঠাৎ রাস্তার মোড় ঘুরে। ওদের কাছে এসে গাড়ীটা থেমে গেল। একজন কনেষ্টবল নেমে ওদের দিকে এগিয়ে এল।

ছেলেগুলো লাফিয়ে উঠে এলোমেলোভাবে এদিক ওদিক ছুট দিল। রূপচাঁদ কেমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। কি মনে হতে হঠাৎ একটা লাফ মেরে কবরখানার পাঁচীলটার ওপর উঠে পড়ল। তারপরে আর একটা লাফ দিয়ে কবরখানার ভেতর দিকে নেমে গেল।

কবরখানার ভিতরে খানিকটা এগিয়ে গেল। শান্ত ও নির্জন জায়গা। দাঁড়াল রূপচাঁদ। চারদিকে সব নানা রকমের কবর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। একজন মালি একটা গাছের পাতা ছাঁটছিল। রূপচাঁদের দিকে একবার তাকাল। কিছু বলল না। কত লোক আসে! কেউ সময়ে, কেউ অসময়ে।

সামনেই একটা মার্বেল বাঁধানো কবর। বেশ একটু পুরানো। চারদিকে খুব নীচু লোহার রেলিঙ দেওয়া। কেউ বোধহয় এখন আর বিশেষ যত্ন নেয় না। পায়ের দিকটায় প্রচুর ঘাস গজিয়েছে। ছোট ছোট গোটকয়েক ফুলও হয়েছে ঘাসগুলোর মধ্যে। হলদে রঙের। দুটো একটা বাচ্চা প্রজাপতি এসে বসছে ফুলগুলোর ওপরে। একটু বসেই আবার ফুলগুলোর এদিক ওদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে। ফুলগুলো অল্প অল্প দুলছে।

আরও খানিকটা এগিয়ে গেল রূপচাঁদ। এদিক ওদিকে কিছুক্ষণ অলসভাবে ঘুরল। অদ্ভুত রকমের একটা নির্জনতা। এটাও বোধ করি একটা শহর! নির্জন শহর। কত লোক এখানে বাস করে?

ভাবল সে।

অনেকদিন আগে সে একবার এসেছিলো এখানে। জনের বাবাকে কবর দেওয়ার সময়। জনের বাবার কবরটা

একটা কবরের ধারে বসল রূপচাঁদ। চুপচাপ বসে রইল অনেকক্ষণ। অন্যমনস্কভাবে হলদে ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। কি ফুল ওগুলো কে জানে? কোন বুনো ফুল হবে হয়ত! দূরে কোথায় একটা ঘুঘু অলসভাবে ডেকে চলেছে। আচ্ছা, বিমলিদি যদি হলদে শাড়ী প'রে কেমন হয়! দেখতে বেশ ভালই লাগবে বোধহয়! কে জানে কেমন লাগবে? একটা বিড়ি খেলে মন্দ হয় না।

অন্যমনস্কভাবে পকেটে হাত দিতে গিয়ে চমকে উঠল রূপচাঁদ। যাঃ, এটা আবার কখন হোল? পকেটের পাস হতে অনেকখানি ছিঁড়ে গেছে। পুলিশের তাড়ায় পাঁচিল টপকাইবার সময়েই বোধহয় এই কাণ্ডটা হয়েছে! কিন্তু কি করা যায়? আর মাত্র একটি জামা আছে। সিল্কের একটা পুরাণো সার্ট। বছর দুয়েক আগে বড়দিনের সময় মল্লিকবাজারের চোরাবাজার হতে কিনেছিলো। কিন্তু···সিল্কের সার্ট পরে অফিস যাওয়া যাবে না। কি ভাববে লোকে? গেঞ্জি পরেও নয়। নাঃ, এই-টেকেই কোনরকমে সেলাই করে চালিয়ে নিতে হবে এখন। সিরাজটাও আসেনি আজ। ছেঁড়া জায়গাটায় দু'একবার হাত বুলালো সে।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর ভয়ে ভয়ে পিসিকে একবার দেখাল জামাটা। বুড়ি এমনিতেই ভাল দেখতে পায়না চোখে, তার ওপর জামা সেলাইয়ের কথা শুনে আরও চটে উঠল। সোজা জানিয়ে দিলে সেলাই টেলাই করতে পারবে না। কি করা যায়? নিজেই একবার চেষ্টা করে দেখি! ভাবল রূপচাঁদ। ছুচ সুতো নিয়ে দাওয়ায় এসে বসল।

কোনরকমে সুতোটা পরিয়ে অনভ্যস্ত হাতে দুটো একটা ফোঁড় দিল। নাঃ, ঠিক হচ্ছেনা।

যতীন এসে বসল কাছে।" "কি করছ?" বলল সে।

গম্ভীরভাবে রূপচাঁদ বললে "সেলাই কচ্ছি, বিরক্ত করিসনা, ভাগ এখান থেকে।"

নড়বার কোন লক্ষণ দেখা গেল না যতীনের। বসেই রইল। মাথাটা চুলকাল একবার।

"কি ?"

"একটা বিড়ি দাওনা।"

"বিড়ি নেই।"

এ টুক্ষণ চুপ করে রইল যতীন। "যাঃ, দেবে না তাই বল।" বলল সে। চলে যাচ্ছিল। কি ভেবে ডাকল তাকে রূপচাঁদ। "এই শোন্।"

"কি ?"

"রহীমের দোকান হতে এক বাণ্ডিল বিড়ি নিয়ে আয় আমার নাম করে। লাল সুতোর আনবি, বুঝলি!"

চলে গেল যতীন। আরও দু'একটা ফোঁড় দিল রূপচাঁদ। এঃ, একেবারে যাচ্ছেতাই হচ্ছে।

বিড়ি নিয়ে ফিরে এল যতীন। বাণ্ডিল হতে একটা বিড়ি বের করে নিয়ে বাকিটা রূপচাঁদকে দিল সে।

"এই যতীন ওখানে কি করছিস ?"

দুজনেই চমকে উঠল। বিমলিদি কখন এসে দাওয়ায় দাঁড়িয়েছে খেয়ালই হয়নি ওদের। হাতের বিড়িটা লুকিয়ে ফেলল যতীন। "না, এই রূপচাঁদদা সেলাই কচ্ছে তাই দেখছিলাম" বলল সে।

একটু কৌতুহলী হয়ে দাওয়া হতে নেমে এল বিমলা। এসে দাঁড়াল ওদের কাছে। রূপচাঁদ ঘাড় হেঁট করে এক মনে সেলাই করে যেতে লাগল। তাড়াতাড়ি ফোঁড় দিতে লাগল।

নাঃ, মহা মুস্কিল হল। দিদিটা এখানে এল কেন? বিড়িটা খাওয়া যাবে না। আস্তে আস্তে যতীন সরে পড়ল বাইরের দিকে।

আচমকা রূপচাঁদের হাত থেকে জামাটা কেড়ে নিল বিমলা। "দেখি দেখি কি রকম সেলাই জানিস তুই।"

জামাটা নেবার সময়ে বিমলার আঙুলগুলো ঠেকে গিয়েছিলো রূপচাঁদের হাতে। মনে হল বুকের ভেতর যেন খানিকটা নতুন রক্ত ছলকে পড়ল, মাটির দিকে চোখ রেখে তাকিয়ে রইল সে।

হঠাৎ চমক ভেঙে গেল। বিমলিদি খিলখিল করে হাসছে ওর সেলাই দেখে। "ওমা একি সেলাই হয়েছে! এই রকম করে কেউ সেলাই করে নাকি ?

কানদুটো লাল হয়ে উঠল রূপচাঁদের। একবার তাকাল বিমলার দিকে। পরক্ষণেই চোখ ফিরিয়ে নিল। হাসলে বিমলিদিকে বড় চমৎকার দেখায়। দুগালে ছোট দুটো টোল পড়ে। দাঁতগুলো কেমন ঝকঝকে।

ওর অদ্ভুত সেলাই দেখে হেসে অস্থির হল বিমলা। হাসতে হাসতেই রূপচাঁদের ঘরের দিকে চেয়ে বলল "ও পিসি এসে একবার দেখে যাও রূপচাঁদের কাণ্ড।"

ঘর হতে পিসির আওয়াজ ভেসে এল "ওর কথা আর বলিসনি বিমলি, সংসারের একটা কাজ যদি ওর দ্বারা হয়!"

নাঃ, অসহ্য, উঠে দাঁড়াল। একবার তাকাল বিমলার দিকে। বিমলাও তাকাল। চোখদুটো কৌতুকে নাচছে তখনও। বাইরের দিকে পা বাড়াল রূপচাঁদ। জামাটা বিমলার হাতেই রইল।

"এই, জামা নিয়ে যা, "ডাকল বিমলা। রূপচাঁদ শুনতে পেল কি না কে জানে? দ্রুতপায়ে বাইরে বেরিয়ে এল। দুপুরবেলা। পাড়াটা নির্জন। দূরে দুটো একটা ছেলে গুলি খেলছে। ল্যাম্পপোষ্টটার নীচে এসে বসল ও।

বিমলিদি হাসলে রূপচাঁদের মনের মধ্যে কিসের একটা জোয়ার যেন এসে ভরে যায়। আনন্দ না লজ্জা! কে জানে? যেখানে বিমলার আঙুলগুলো ঠেকে গিয়েছিলো সেখানে আলতোভাবে হাতটা ছোঁয়াল।

মানিকদের ঘরের টিনের চালের ওপর কতকগুলো কাক লাফালাফি করছে। ফুটপাথের এদিকে ছায়ায় খাটিয়া পেতে মানিক ঘুমোচ্ছে। ছোট একটা ইটের টুকরো নিয়ে মানিকের দিকে ছুঁড়ল রূপচাঁদ। টুকরোটা গিয়ে লাগল মানিকের কানে। ঘুমের ঘোরে একবার কানের কাছে হাত নাড়ল মানিক।

কাল্লুর দোকান হতে বেরিয়ে এল জোসেফ। বিড়ি ধরাল একটা। তারপরে এদিকে ফিরে কোথায় চলল। ল্যাম্প পোষ্টটার কাছাকাছি আসতেই রূপচাঁদকে দেখতে পেল। "এখানে বসে কি করছিস?" জিজ্ঞেস করল জোসেফ।

"কি আবার করব? এমনিই বসে আছি।" বলল রূপচাঁদ।

পাশে এসে বসল জোসেফ। ওর দিকে একটা বিড়ি এগিয়ে দিল।

"এখানে বসে থেকে কি হবে? চল ঘুরে আসবি।"

"যাবি কোথায়?" জানতে চাইল রূপচাঁদ।

"চল না, মরিয়মের কাছে। [illegible] মা একটা দিলে ওকে দিয়ে আসবার জন্যে। [illegible] আর আসব।"

মরিয়ম জোসেফের বোন। বিয়ে হয়ে গেছে ওর। মৌলালিতে থাকে।

তাড়া দিল জোসেফ্। "ওঠ্ ওঠ্, চট করে গিয়ে জামাটা গায়ে দিয়ে আয়।" ঠেলে তুলে দিল রূপচাঁদকে।

কি করা যায়! উঠতে হল। "তুই একটু বোস তাহলে, আমি আসছি।" ঘরের দিকে চলে গেল রূপচাঁদ।

ঘরে গিয়ে দ্যাখে পিসি ঘুমিয়ে পড়েছে। এদিক ওদিক খুঁজল। জামাটা পেল না। কি করবে ভাবছিল এমন সময় ওঘর হতে বিমলা বেরিয়ে এল। রূপচাঁদের দাওয়ার কাছে এসে দাঁড়াল।

"এই রূপচাঁদ।" ডাকল বিমলা।

ঘর হতে বেরিয়ে এল রূপচাঁদ। কাছে আসতেই বিমলা ওর গায়ে জামাটা ছুঁড়ে দিল। ওর দিকে একবার তাকাল রূপচাঁদ। বিমলা নিজেদের ঘরের দিকে চলে গেল।

জামাটা নিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল রূপচাঁদ। হঠাৎ মনে পড়ল বাইরে জোসেফ অপেক্ষা করছে। তাড়াতাড়ি পরে নিল জামাটা। ছেঁড়া জায়গাটার কাছে দেখল একবার।

সেই এবড়ো খেবড়ো সেলাইটা নেই। সুন্দর করে সেলাই করা রয়েছে। এত ভাল করে সেলাই করল কে? সযত্নে একবার হাত বুলোল সেলাইটার ওপর।

বিমলিদি বেরিয়ে এল আবার। ওর হাতে রূপচাঁদের ছুঁচসুতো। রূপচাঁদের ঘরের দিকে যাচ্ছিল কি মনে হতে দাঁড়াল।

"এই শোন, তুই কি বেরোচ্ছিস?" জিজ্ঞেস করলো বিমলা।

মাথাটা নাড়ল রূপচাঁদ।

"আমার একটা কাজ করে দিবি?"

"কি?" বলল রূপচাঁদ।

আঁচলের গিঁট খুলে একটা সিকি বের করল বিমলা। "ফেরবার সময় আমাকে দু আনার ডাল আর দু আনার আলু এনে দিবি লালার দোকান হতে?"

নিঃশব্দে ওর দিকে হাতটা বাড়াল রূপচাঁদ।

দিন দুয়েক পর। সন্ধেবেলা কাজ থেকে এসে সিরাজের দোকানে বসে অন্যদিনের মত আড্ডা দিচ্ছিল রূপচাঁদ। কিছুক্ষণ একথা সেকথার পর হঠাৎ সিরাজ বললে "কুছ অচ্ছা নেহী লগ্‌তা। চল্ কঁহীসে ঘুমকে আয়ে।"

"যায়েঙ্গে কঁহা?" জিজ্ঞেস করলো রূপচাঁদ।

গলাটা নামিয়ে এনে ওর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আস্তে আস্তে সিরাজ বললে "মল্লিক বাজারমে।"

বুঝতে পারল না রূপচাঁদ। হঠাৎ মল্লিক বাজারে বেড়াতে যাবে কেন?

হাসল একটু সিরাজ। "একদম বুদ্ধু হ্যায়, চল্ আজ তুঝকো একঠো নই চিজ দিখলায়েঙ্গে, মধুমালা জয়সী খুবসুরৎ।"

এবারে রূপচাঁদ বুঝলো সিরাজ কোথায় যেতে চায়। মুখটা একটু লাল হয়ে উঠল ওর। সিরাজকে বললে "তু যা, হম্ নেহী জায়েঙ্গে।"

কিন্তু আপত্তি বেশীক্ষণ টিকল না। সিরাজ ওকে প্রায় জোর করেই টেনে নিয়ে গেল। যেতে ইচ্ছে না হলেও কেমন যেন একটা কৌতূহল হচ্ছিল ওর।

সার্কুলার রোড দিয়ে মল্লিকবাজারে এসে পড়ল ওরা। ডান দিকে ঘুরল। বাজারটা বাঁ দিকে রেখে এগিয়ে চলল। গোরস্থানের চৌরাস্তা পার হয়ে গেল। এসে দাঁড়াল মোড়ের মাথায় চায়ের দোকানটার সামনে।

সারি সারি খোলার ঘর চলে গেছে রাস্তাটার অপর প্রান্ত অবধি ধরে। প্রায় প্রত্যেক ঘরের দরজার সামনেই দুটো একটা করে মেয়ে দাঁড়িয়ে। মাঝে মাঝে পুলিশের গাড়ি এসে পড়লে মেয়েরা সব বাড়ির ভেতরে সরে পড়ছে। আবার খানিক পরে এসে আস্তে আস্তে দরজার সামনে দাঁড়াচ্ছে।

অবাক হয়ে রূপচাঁদ তাকিয়ে দেখছিল। সিরাজের খোঁচা খেয়ে ওর চমক ভাঙল। ঘুরে তাকাতেই সিরাজ একটু হাসল।

"বুদ্ধু, কা তেরে উধর ক্যা দেখ্‌তা! ইধর্ দেখ্।"

ওরা যে চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিল তারই উল্টো দিকে চোখ ঘুরিয়ে ইশারা করল সিরাজ। ঘুরে তাকাল রূপচাঁদ। সামনের দরজায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একলা। কপালে কাঁচপোকার টিপ, চোখের নীচে একটা কাটা দাগ। শাড়ীটা এত টাইট করে পরেছে যে দেহের সঙ্গে প্রায় লেপটে রয়েছে। দেখলে মনে হয় খুবই ক্লান্ত। মেয়েটির চেহারা অবশ্য খানিকটা মধুমালার মতই।

আস্তে আস্তে সিরাজ বললে "হুঁ ? জানেকা মতলব হ্যায় ক্যা ?"

একটা ঢোঁক গিলে রূপচাঁদ বললে "নহী, তু যা, হম্ নহী জায়েঙ্গে।"

কি একটা বলতে যাচ্ছিল সিরাজ কিন্তু তার আগেই দেখা গেল আরেকজন লোক এসে সামনের মেয়েটির সঙ্গে কি কথাবার্তা বলছে। কোন কথা আর বলা হল না সিরাজের, অলস দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল। দুজনে খানিকক্ষণ কি কথাবার্তা হল তারপরে লোকটিকে নিয়ে মেয়েটি ভিতরে চলে গেল।

আধখাওয়া সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল সিরাজ। হতাশভাবে বললে "যাঃ শালা, দুসরা আদমী আকে ভাগা লিয়া।"

কেন জানি না এবার একটু খুসী হল রূপচাঁদ। একটা বিড়ি ধরিয়ে বললে "উ তেরা তকদীর মে নহী হ্যায়, চল ঘর চল।"

কিন্তু ফিরে যাবার ছেলে সিরাজ নয়। তার তিরিশ বছরের রক্তে তখন আগুন লেগেছে। আরেকজনের ঘরে গিয়ে ঢুকল সে। রূপচাঁদ একলাই ফিরে এল।

ফিরে এসে একলা কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরল। কিছু ভাল লাগছে না। রহীমের দোকানে গিয়ে একটা বিড়ি ধরাল। কি করা যায়! আস্তে আস্তে মানিকের ঘরে উঠে এল রূপচাঁদ। কাপড় ইস্ত্রি করতে করতে মানিক একবার তাকাল ওর দিকে। জোসেফও ছিল ওখানে। হাসল একটু।

ওদের সঙ্গে কিছুক্ষণ অলসভাবে গল্প করল রূপচাঁদ। বারে বারে কেন জানি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। কি ভাবছিলো সে কে জানে? মানিকের কাপড় ইস্ত্রি করবার তক্তাটার পাশে দেওয়ালের গায়ে একটা ছেঁড়া ছবি টাঙানো রয়েছে। খানিকক্ষণ সেদিকে আনমনে তাকিয়ে রইল ও। ছবিটা কার? ঝলমলে পোষাক পরা নাচের ভঙ্গিমায় বুক ফুলিয়ে উদ্ধতভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে মধুমালা। সিরাজের কথা মনে পড়ল। মুখ ফিরিয়ে এদিকে ইস্ত্রি গরম করবার বড় চুল্লীটার দিকে তাকাল রূপচাঁদ। চারদিকে আগুনের লাল আভা ছড়িয়ে রয়েছে। পান খেলে বিমলিদির ঠোঁটদুটোও আগুনের মত লাল হয়ে ওঠে মনে মনে ভাবলো রূপচাঁদ।

হঠাৎ মানিক বাইরের দিকে একবার তাকিয়ে বললে "সিরাজ কোথায় রে? দোকান বন্ধ দেখছি।"

চমকে মানিকের দিকে ঘুরে তাকাল রূপচাঁদ। সিরাজ কোথায় গেছে মানিক জানে না কি? মনে হল নিজেই যেন একটা দোষ করে ফেলেছে। আস্তে আস্তে বললে "কি জানি! কোথাও বেড়াতে গেছে বোধহয়?"

মল্লিকবাজারের সেই মেয়েটি ওরকম শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে ছিল কেন? বিমলিদি, মধুমালা, মল্লিকবাজারের সেই মেয়েটি সব যেন একসঙ্গে ভীড় করে এসে দাঁড়াল রূপচাঁদের উনিশ বছরের যৌবনের প্রথম সিঁড়িতে। দেয়ালে টাঙানো পোড়ামাটির টিকটিকিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ও।

কাপড়গুলো ইস্ত্রি করা শেষ হল। বাকিগুলো খেয়ে এসে করলেই চলবে। মুখ হাত ধুতে বাইরে বেরিয়ে গেল মানিক। জোসেফও উঠে দাঁড়াল। একটা আড়মোড়া ভেঙে বলল "যাই বাড়ি যাই, শরীরটা ভাল লাগছে না। তুই ঘরে যাবি না?"

ঘাড়টা নাড়ল রূপচাঁদ। তারপরে কি ভেবে জোসেফকে বললে "গোটা পাঁচেক টাকা দিবি? মাইনে পেলেই দিয়ে দেব।"

আচমকা টাকার কথা শুনে জোসেফ খানিকক্ষণ চোখ কুঁচকে ওর তাকিয়ে রইল। "কি করবি টাকা দিয়ে? বাইস্কোপে যাবি বুঝি?"

"নারে হাতে টাকা কড়ি নেই, কালকে রেশন আনতে হবে।"

কিছু বলল না জোসেফ। পকেট হতে টাকা বের

করে রূপচাঁদের হাতে দিল। টাকা কটা পকেটে পুরে রহিমের দোকানে এসে একটা বিড়ি ধরাল রূপচাঁদ। পকেটে হাত দিয়ে দেখল একবার টাকাগুলো ঠিক আছে কি না! কেমন যেন ভয় করছে ওর। এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে দেখল। তারপরে এগিয়ে গেল সার-কুলার রোডের দিকে।

সন্ধেবেলা ওরা দুজনে এসে মোড়ের যে চায়ের দোকানটায় সামনে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই আবার এসে দাঁড়াল রূপচাঁদ। এ পাড়ার বাজার এখনও বেশ ভালো ভাবেই চলছে। লোকজনের যাওয়া আসার শেষ নেই। একটু দূরে একজন টলতে টলতে এসে মত্তকণ্ঠে গান ধরল। একটা বিড়ি ধরাল রূপচাঁদ। সামনের দরজায় সন্ধেবেলার সেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। সঙ্গে আরও একটি মেয়ে রয়েছে। পাশের মেয়েটিকে কি বলল ও, দুজনেই হেসে উঠল। খানিকক্ষণ ওকে ভাল করে দেখল রূপচাঁদ। বিমলিদির লাল দুটো ঠোঁট, মধুমালার উদ্ধত যৌবন সব যেন একসঙ্গে এসে রূপচাঁদের মাথার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল। শেষ হয়ে আসা সিগারেটটায় একটা টান মেরে ফেলে দিল মেয়েটি। রূপচাঁদের দিকে নজর পড়ল ওর, হাসল একটু ওর দিকে তাকিয়ে। পকেটে একবার হাত দিয়ে টাকাগুলোর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হল রূপচাঁদ। কুণ্ঠিতভাবে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল মেয়েটির দিকে।

পরদিন সকালে ক্লান্ত শরীরটাকে টেনে তুলল রূপচাঁদ। কোনরকমে উঠে মাতালের মত টলতে টলতে মুখ ধুতে গেল। মুখ হাত ধুয়ে এসে দাওয়ার এক কোণে চুপচাপ হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসে রইল অনেকক্ষণ।

কাজে গিয়েও সারাদিন অস্বস্তিতে কাটল। কাজ থেকে ফিরে বাড়ীতে এসে কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইল। খানিক পরে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাইরে গিয়ে মোড়ের মাথায় চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি ফুঁকতে লাগল। কিছু ভাল লাগছে না। মুখ তুলে অন্ধকার হয়ে আসা সামনের আকাশের দিকে তাকাল। মনের মধ্যে কিসের চিন্তা তোলপাড় করছিল কে জানে?

দিন দশেক পরে মাইনে পেল রূপচাঁদ। জোসেফের দেনা ও আরও ছোটখাট দু'একটা দেনা মিটিয়ে দিয়ে ভাবল অনেকদিন সে মাংস খায়নি, আজ খানিকটা মাংস কিনে আনলে কেমন হয়? ভাবল যাই সিরাজকে সঙ্গে নিয়ে মাংস কিনে নিয়ে আসি। খানিকটা খুসী হয়ে উঠল সে। পিসিকে গিয়ে বলতেই বুড়ী গজর গজর করতে লাগল। "এই সন্ধেবেলা মাংস আনলে রাঁধবে কে শুনি?" ওর কথায় কান দিল না রূপচাঁদ। আপন মনে শিস দিতে দিতে বাইরে বেরিয়ে এল। এসে গ্যাখে যতীন বসে আছে সিরাজের দোকানে। দুজনে হাসতে হাসতে খুব গল্প করছে। খুসীটা উবে গেল ওর। যতীনের সঙ্গে সিরাজের "দোস্তী" কিসের?

চুপ করে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ওদের কথাবার্তা শুনল রূপচাঁদ। দিন কয়েক আগে কি একটা ব্যাপার নিয়ে সিরাজের সঙ্গে খুব মন কষাকষি হয়েছিল ওর। ভেবেছিল আজকে সব মিটিয়ে ফেলে আবার আগেকার মতই সিরাজের সঙ্গে মিশবে। কিন্তু ওখানে যতীনকে দেখে কেন জানি ওর মনটা একটা অন্ধ রাগে ভরে উঠল। আস্তে আস্তে মোড়ের মাথায় সরে এসে ফুটপাথের ধারে উবু হয়ে বসে একটা বিড়ি ধরাল।

পেছন থেকে এসে কে একজন কাঁধে হাত রাখল। মুখ ঘুরিয়ে গ্যাখে মাণিক। "চুপচাপ বসে আছিস কেন?" বললে মাণিক।

"এমনিই।"

"কি হয়েছে তোর? আজকাল এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াস কেন?"

চমকে উঠল রূপচাঁদ। মাণিক জানে নাকি? মুখটা তুলে ওর দিকে তাকাল রূপচাঁদ। রাস্তার আধা অন্ধকার আলোয় মাণিকের মুখ দেখে কিছুই বোঝা গেল না। আস্তে আস্তে বললে "কি আবার হবে? কিছুই হয়নি," তারপরে হঠাৎ কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললে "যতীনের আজকাল ওখানে অত আড্ডা কিসের রে?"

"কোথায়?"

সিরাজের দোকানটা দেখিয়ে দিল রূপচাঁদ। মাণিক সেদিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই বললে "ওঃ, যতনে যে আজকাল সিরাজের দোকানে কাজ করে।"

অবাক হয়ে রূপচাঁদ মাণিকের দিকে তাকাল।

তারপরে বললে "যাঃ, যতনে আবার কি কাজ করবে সিরাজের দোকানে!"

মাথাটা একটু চুলকে নিয়ে মাণিক বললে "কি জানি কি কাজ করে? বোধহয় হাতে হাতে এটা ওটা এগিয়ে দেয়, হয়ত ছোটখাট সেলাই টেলাই কিছু করে। এইতো পরশুদিন সিরাজ ওকে পাঁচটা টাকা দিল দেখলাম।"

যতীন সিরাজের কাছে চাকরী করছে? হাতের বিড়িটাতে টান দিতে ভুলে গিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে ধরল রূপচাঁদ। বিমলিদি যদি তাকে একবার বলত তবে কি সে যতীনের জন্যে তাদের অফিসের সাহেবকে বলতে পারত না! সাহেবের বাড়ীতে কাজ করবার জন্যে একটা বাচ্চা চাকর সাহেবের দরকার। রূপচাঁদ একটু ধরাধরি করলে হয়ত যতীনকেই নিত সাহেব।

মাণিক ওকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললে "এই, কি তুই ভাবছিস এতো? চল খানিকটা ঘুরে আসবি।"

"কোথায়?"

"চলনা, একবার কড়েয়ার দিকে যেতে হবে। মিশার সাহেবের কাপড়গুলো দিতে যাচ্ছি। দুজনে যাই চল।"

"চল।"

"তুই একটু বোস, আমি কাপড়গুলো বেঁধে নিয়ে আসি।" চলে গেল মাণিক। রূপচাঁদ বিড়িতায় টান মেরে ছাখে সেটা কখন নিভে গেছে। বিরক্ত হয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। মুখটা ঘোরাতেই সিরাজের দোকানের ওপরে দৃষ্টিটা গিয়ে পড়ল। ভাবল যতীনকে টেনে এনে গোটা কয়েক চড় কসিয়ে দেবে কি না! কিন্তু তার আগেই মাণিক এসে হাঁক দিল "এই রূপচাঁদ চল।"

দুজনে গল্প করতে করতে সারকুলার রোড ধরে যাচ্ছিল। বার বার আনমনা হয়ে পড়ছিল রূপচাঁদ। যতীনের কাজের জন্য কেন বিমলিদি ওকে একবার বললে না! আচ্ছা ও যদি নিজেই বিমলিদিকে গিয়ে বলে তাদের অফিসের সাহেবের একটা লোকের দরকার! তাহলে বিমলিদি কি খুশী হবে না?

হঠাৎ পাশ থেকে মাণিক বলে উঠল "চল, আজ রাত্তিরে সিনিমায় যাবি? ভাল ছবি এসেছে।" ওরা দুজনে তখন মল্লিকবাজার কবরখানার বড় গেটটা প্রায় পেরিয়ে এসেছে।

উৎসাহিত হয়ে মাণিক বললে "এই পার্ক শোতে, সাকী হচ্ছে," তারপরে চোখের ইশারা করে বললে "মধুমালার ছবি, যাবি?"

হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে যেতে সামলে নিল রূপচাঁদ। মাণিককে বলল "নাঃ, আজ শরীরটা ভাল নেই!"

মাণিক কি একটা ওকে বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই ওপারে মাংসের দোকানে দিকে নজর পড়াতে রূপচাঁদের মনে পড়ল যে পিসিকে সে মাংস কিনে নিয়ে যাবে বলে এসেছে। মাণিকের দিকে ঘুরে বললে "তুই যা সাহেবের কাছে, আমি যাবনা।"

"কি হোল তোর? যাবি না কেন?" বললে মাণিক।

"পিসিকে বলে এসেছি মাংস নিয়ে যাব। তাড়াতাড়ি না নিয়ে গেলে বুড়ী গজর গজর করবে আবার।"

"ও আচ্ছা, তবে তুই যা, আমি কাপড়গুলো দিয়ে পাড়াতে যাচ্ছি।"

"তাই দিয়ে আয়, আমি পাড়াতেই থাকব।" ট্রাম লাইন পেরিয়ে এপারে মাংসের দোকানের দিকে চলে এল রূপচাঁদ।

এপারে এসে পকেটে হাত দিয়ে টাকাগুলো বের করল। কতটা মাংস কিনবে ভাবল একবার। একটু আগে মানিক বলছিল সিরাজ যতীনকে পাঁচটা টাকা দিয়েছে ও দেখেছে।

টাকাগুলো পকেটে পুরে মাংসের দোকানে যেখানে ছাগলের কাটা মুণ্ডুগুলো পরপর সাজান রয়েছে সেদিকে তাকিয়ে রইল ও। কাটা ছাগলের চোখগুলো ঘষা কাঁচের মত হয়ে গেছে। মনে হল সেগুলো যেন রূপচাঁদের দিকে তাকিয়ে ঘাড় কাৎ করে ওকে জিব ভ্যাঙচাচ্ছে! মুখটা ফিরিয়ে নিল রূপচাঁদ।

দোকানের ওপরের টিনে কতকগুলো সিনেমার পোষ্টার মারা রয়েছে। সামনেই একটা বেশ বড় পোষ্টার রয়েছে। বেশ রঙচঙে। বোধ হয় সাকীর পোষ্টার। লাল রঙের পোষাক পরা একটি লোক ডানহাতে তলোয়াল নিয়ে বাঁ-হাতে একটি মেয়ের কোমর জড়িয়ে ধরে সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। যেন দুনিয়ার কাউকেই ও মেয়েটির কাছে ঘেঁসতে দেবে না। রূপচাঁদের মনে হল যেন পিছনে

দিয়ে বলছে ওকে "তফাৎ যাও, মধুমালা আমার, বিমলিদি আমার।"

হঠাৎ একটা হাসির আওয়াজে চমক ভেঙে গেল। দোকানের কশাইটি খুব হাসছে। পাশে আর একটি লোক, সম্ভবতঃ কশাইটির বন্ধু, তাকে কি বলছে আর কশাইটি খুব হাসছে। আবার দোকানের ওপরের পোষ্টার-টির দিকে তাকাল রূপচাঁদ। পোষ্টারের লোকটিও যেন হাসছে। গাটা যেন ঘুলিয়ে উঠল রূপচাঁদের। একটু এপাশে সরে এসে ওপারে কবরখানার মধ্যে কবরগুলোর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল।

জানোয়ারের মাংসের থেকে·········কি মনে হল রূপচাঁদের। কশাইয়ের দোকান ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে বাঁ দিকে ছোট একটি রাস্তা বাজারের মধ্যে দিয়ে গিয়ে একেবারে বাজারের পিছনের রাস্তায় গিয়ে পড়েছে যেখানে সিরাজের মধুমালা থাকে। কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা সেইদিকেই চলে রূপচাঁদ।

* * *

সময়ের লাইন ধরে একটার পর একটা করে এগিয়ে যেতে লাগল মালগাড়ির মত দিনগুলো। চৈত্রের গরম যেমন একদিন বেড়ে উঠলো তেমনি হঠাৎ আর একদিন কমেও গেল। গরমের ক্লান্তি ঘুচিয়ে সমস্ত গ্লানি ধুয়ে পরিষ্কার করে দেবার জন্যে ঝড়ের বেগে এসে হাজির হল শ্রাবণের ধারা। বৃষ্টিতে ভিজে মল্লিকবাজারে যেতে যেতে রূপচাঁদের মনে হল বিমলিদির চাইতে মধুমালা অনেক ভাল। মদের গ্লাসের মতই মধুমালার যৌবন হাতের মুঠোর ভিতরে সহজে ধরা যায়। হয়ত বা কিছুই ভাবলো না, কে জানে? কিন্তু শ্রাবণের ধারা হঠাৎ যেমন একদিন এসেছিল তেমনি হঠাৎই একদিন চলেও গেল। আর নিয়মিতভাবে মল্লিক-বাজারে যেতে যেতে একদিন সে পথ ছেড়ে রূপচাঁদও চলে এল রাত্রিবেলা লুকিয়ে তাঁতিপুকুর রোডের মোড়ে রসিক লাল দাসের ডিস্‌পেন্সারীতে। ওকে ভাল করে দেখে, পরীক্ষা করে গম্ভীরভাবে রসিক ডাক্তার বললে "ইন্‌জেক্‌সান্ দিতে হবে, সিফিলিস।"

* * *

ইন্‌জেক্‌সান্ নিয়ে ফিরছিল রূপচাঁদ। গলির মুখে আসতেই পাশের জানলা দিয়ে মানিক ডাকলে ওকে। মানিকের দোকানে উঠে এল রূপচাঁদ। "কোথায় ছিলি এতক্ষণ?" জিজ্ঞেস করলে মানিক।

"সিনেমায় গিয়েছিলাম, কেন?"

মানিক হাতের গরম ইস্ত্রিটা পাশে নামিয়ে রাখল। কাপড়টাতে জলের ছিটে দিতে দিতে বলল "জোসেফ কোথায় জানিস?"

চটে উঠল রূপচাঁদ। "জোসেফ কোথায় আমি কি করে জানব?"

কাপড়টা পাট করে রেখে মানিক বললে "চটছিস কেন? এদিকে আয় একটা কথা আছে।"

ইস্ত্রি গরম করবার বড় চুল্লীটা থেকে বিড়িটা ধরিয়ে নিল রূপচাঁদ। তারপরে এগিয়ে এলো মানিকের দিকে। "কি বলবি তাড়াতাড়ি বল!" একটু বিরক্তভাবেই বলল ও।

"বিমলিদি পালিয়ে গেছে।"

বিড়িটায় টান দিতে ভুলে গেল রূপচাঁদ। মনে হল ইস্ত্রি গরম করবার চুল্লিটা ফেটে গিয়ে তার ভেতরের জলন্ত কয়লাগুলো ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বিড়িটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মানিকের দিকে চোখ পাকিয়ে বলল "ইয়ার্কি মারবার—"

বাধা দিয়ে মানিক বললে "আরে শোন তো আগে, একটু আগে পুলিশ এসে আমাদের সব নানারকম জিজ্ঞেস করছিল। বিমলিদি নাকি জোসেফের সঙ্গে হাওয়া হয়েছে! বস্তির সবাই জানে। দুজনকেই পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশ তোরও খোঁজ কচ্ছিল।"

দরজার চৌকাঠটা ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল রূপচাঁদ। দেয়ালে টাঙানো পোড়ামাটির টিকটিকিটা আজও ঠিক তেমনিই রয়েছে। উদাসভাবে সেদিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল ও। চুল্লীটার পাশে একটা ছেঁড়া কাগজের ঠোঙা পড়েছিল। আস্তে আস্তে সেটাকে তুলে হাতের মধ্যে নিয়ে পাকাতে লাগল রূপচাঁদ।

"কি রে, চুপ করে আছিস কেন?"

"কি বলব বল!" আস্তে আস্তে ঠোঙাটার ভাঁজ

কিনে এনেছিলো এটা দিয়ে, ভাঁজ খুলে ছাখে ওটা একটা বইয়ের ছেঁড়া পাতা।

চোখটা কর্‌কর্‌ করতে লাগল। কিছু পড়ল নাকি চোখে? বইয়ের পাতাটা চোখের কাছে তুলে ধরল রূপচাঁদ। বাঙলায় কি যেন সব লেখা রয়েছে।

"কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছা এই, যেন এইরূপ তোমরা সদাচারণ করিতে করিতে নির্বোধ মনুষ্যদের অজ্ঞানতাকে নিরুত্তর কর। আপনাদিগকে স্বাধীন জান; আর স্বাধীনতাকে দুষ্টতাব আবরণ করিও না। কিন্তু আপনাদিগকে ঈশ্বরের দাসজ্ঞান। সকলকে সমাদর কর, ভ্রাতৃসমাজকে প্রেম কর—"

'কি হোল তোর? রাত অনেক হয়েছে বাড়ি যা।" কাপড় ইস্ত্রি করতে করতে বলল মানিক।

"এই যাই।" ওঃ, এটা বাইবেলের একটা ছেঁড়া পাতা। কেউ হয়ত বেচে দিয়েছিল বইটা। বইয়ের পাতাগুলো দিয়ে ঠোঙার কাজ চলছে। পাতাটা উল্টে দেখতে লাগল রূপচাঁদ।

"কেন না সমুদয় জাতি তাহার বেশ্যাক্রিয়ার রোষ মদিরা পান করিয়াছে, এবং পৃথিবীর রাজগণ তাহার সহিত ব্যভিচার করিয়াছে। এবং পৃথিবীর বণিকেরা তাহার বিলাসিতার প্রভাবে ধনবান হইয়াছে।"

পাতাটা হাতের মধ্যে মুচড়ে পাকিয়ে ধরল রূপচাঁদ। বিমলিদি জোসেফের সঙ্গে কোথায় গেল কে জানে? পাশের টিনের চেয়ারটায় বসে বাইরের দিকে তাকাল।

একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ভিজে রাস্তাটায় আলো পড়ে চক্‌চক্‌ করছে। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। কাল্লুর চায়ের দোকানটা এখনও খোলা রয়েছে। দোকানের ছোকরাগুলো বসে বসে গল্প করছে। সেদিকে তাকিয়ে রূপচাঁদ হাক দিল একটা "এ মক্‌বুল্, জরা ইধর্ তো শুন্ যা।"

মকবুল এল। "ক্যা হ্যায়?" বললে সে।

"রহিমোয়া কা দুকান্ সে হম্‌কো এক্ পাকিট্ সিগ্‌রেট লা দে, বোল রূপচাঁদ মাঙতা হ্যায়।"

"কেয়া সিগ্‌রেট?" জানতে চাইল মক্‌বুল।

"রাজমহল" ওকে তাড়া দিয়ে বললে "জল্‌দী যা, অভী দুকান্ বন্দ্ হো যায়গা।"

সিগারেট এনে দিয়ে গেল মক্‌বুল। প্যাকেটটা ছিঁড়ে একটা সিগরেট বের করল রূপচাঁদ। বাইবেলের ছেঁড়া পাতাটা দিয়ে চুল্লী থেকে আগুন নিয়ে সিগারেটটা ধরিয়ে নিল। পাতাটা ফেলে দিল চুল্লীর ভেতরেই। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল ছেঁড়া পাতাটা। জ্বলন্ত পাতাটার দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল রূপচাঁদ। জোরে সিগারেটে একটা টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লে। উঠে দাঁড়িয়ে মানিককে বললে 'ঘরে যাই, অনেক রাত হয়েছে।"

মানিকের ঘর থেকে নেমে এসে রাস্তায় একবার দাঁড়াল। তারপরে সিগারেটে একটা টান দিয়ে আপন-মনেই গেয়ে উঠল "আপ্‌নেকো ভরোসা হ্যায় তো ইক্ দাও লগা লে।"

বীরবল শত-বর্ষ পূর্তি

* * * * * *

সুধীর ব্রহ্ম

একটি বালিকাকে আজও মনে আছে। মেয়েটি ছিল শান্ত শিষ্ট আর ছিল কপাল জোড়া দুটি চোখ, নাক খাঁদা নয়, আর বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। পাঁচ বছর বয়সে যদি কেউ Love এ পড়ে তাহলে আমি তার লাভ-এ পড়েছিলুম—যুবকটি হলেন শ্রীপ্রমথ চৌধুরী যাঁর জন্ম শত বর্ষ আজ সর্বত্র পালিত হচ্ছে।

বাইশে শ্রাবণ বা ৭ই আগষ্ট রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিন এবং প্রমথ চৌধুরীর জন্মদিন। প্রাবন্ধিক শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর জন্ম ২৪শে শ্রাবণ ১২৭ (ইং ৭-৮-১৮৬৮) ও মৃত্যু তারিখ ১৬ ভাদ্র ১৩৫৩ (ইং ২-৯-১৯৪৬); বাংলা ভাষায় বিভিন্ন প্রবন্ধ পুস্তকে ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত তাঁর রচনা আজ তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে—'বীরবল' এই ছদ্মনামে তিনি আজ বঙ্গদেশে খ্যাত। কাব্যে, প্রবন্ধে এবং ছোটগল্পে তাঁর ত্রিমুখী প্রতিভা আজও আমাদের মনকে জাগায়। জন্ম শত বর্ষ স্মরণে বাংলা সাহিত্যে তাঁর দান এখানে উল্লেখ করি।

বাংলা গদ্য আধুনিকতার অগ্রদূত প্রমথনাথ। শুধু কেবল গদ্য রচনাই বা কেন জীবন চেতনার গভীরে তিনি বোধ হয় সবচেয়ে আধুনিক। ধ্যান ধারণায়, জীবন চর্চ্চায়, সাহিত্যে ও শিল্পে সর্ব্বত্রই একটি আধুনিক মনের স্বাক্ষর মেলে। ছাত্র হিসাবে তিনি বরাবরই প্রথম শ্রেণীর, ঠাকুর বাড়ীর সঙ্গে বিবাহ সম্পর্কে সম্পর্কিত প্রমথনাথ জীবনে ও সাহিত্যে একটি আশ্চর্য্য সুসংস্কৃত মননের উত্তরাধিকার আমাদের জন্য রেখে গেছেন। তাঁর রচনার সঙ্গে যার পরিচয় আছে, তাঁর প্রত্যহ জীবন চর্য্যার ইতিহাস যাঁরা জানেন, তাদের কাছে প্রমথনাথের জীবন ও সাহিত্য মিলে মিশে একটি জীবন্ত বিদ্রোহ বলে মনে হবে। কেবল যে গদ্যেই চলতি ভাষা প্রয়োগ করে এই সংস্কার মুক্তির ঘোষণা করেছেন তাই নয়, বহুধা বিচিত্র এই জীবনের নানা সমস্যা ও ভাবনা নিয়ে তিনি যে আলোচনা করেছেন, তাহা আজও বিস্ময়করভাবে আমাদের বর্তমান জীবন চেতনার অনুকূল। মূলতঃ তিনি সাহিত্যিক হলেও তাঁর সমাজচিন্তা ও নানা জীবন জিজ্ঞাসা আজও আধুনিক মনে চিন্তার উদ্রেক করে।

প্রমথ চৌধুরীর গল্পের বৈশিষ্ট্য হল সংলাপচাতুর্য্য, সূক্ষ্ম বুদ্ধি দীপ্ত টিপ্পনী। বিচিত্র চরিত্র কল্পনা, শিশুদের উপযোগী যেমন উপদেশপূর্ণ গল্প তেমন সামাজিক ব্যঙ্গ ও তৎকালীন বাংলাদেশে রাজনীতিকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিস্বার্থের ওপর বিদ্রূপ, প্রাচীন গ্রাম বাংলার কুসংস্কার বা ক্ষয়িষ্ণু জমিদারের হাবভাব চাল চলন ইত্যাদি। তাঁর গল্পে হৃদয়ের আবেদন অপেক্ষা কোন কোন চরিত্রের প্রতি বিদ্রূপের কটাক্ষ লক্ষণীয়। 'চার-ইয়ারি কথায়' রিণীর উগ্র রূপ চেতনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন।

"আমি এমন একটি যুবতীকে জানতুম যাকে রিণী রূপ দেওয়া যায়। আর যথার্থ নামছিল কাতি, ইংরেজি keats-এর ফরাসী উচ্চারণ" তিনি বলেন আমি idealst লেখক নই; তাই বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা গল্পের মধ্যে ফুটিয়ে তোলায় কোথাও কষ্ট কল্পনা নেই। তাঁর অনেক গল্পেপটভূমি বিলেত। তাঁর আত্মকথা পাঠে জানা যায় যে তিনি প্রথম জীবনে একটি বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। নীল লোহিতের আদি প্রেম গল্পে যে পাঁচ বছর বয়সে প্রেমে পড়ার কথা বলা হয়েছে, তার নায়িকার সন্ধান পাই উপরি লিখিত উদ্ধৃত অংশটিতে।

পদ্যের ক্ষেত্রে তিনি বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। সনেট পঞ্চাশৎ (১৯১৩) প্রথম চৌধুরীর সর্বপ্রথম গ্রন্থ। মধুসূদন থেকে আজ পর্য্যন্ত সনেটের যত রকম বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে প্রথম চৌধুরীর পঞ্চাশটি সনেট তার উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন '…বাংলায় এ জাতের কবিতা আমি ত দেখিনি। এর কোন লাইটি ব্যর্থ নয়; কোথাও

ফাঁকি নেই—এ যেন ইস্পাতের ছুরি, হাতির দাঁতের বাঁটগুলি জহরির নিপুণ হাতের কাজ করা, ফলাগুলি ওস্তাদের হাতের তৈরী তীক্ষ্ণধার হাস্যে ঝকমক্ করছে।...বাংলায় সরস্বতীর বীণায় এ যেন তুমি ইস্পাতের তার চড়িয়ে দিয়েছ।"

প্রমথ চৌধুরীর হাতে প্রবন্ধ হল হাতিয়ার—খাপখোলা তলোয়ারের মতো ঝকমকে ধারালো। প্রবন্ধে নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করার ষ্টাইল, ভারতের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত থেকে ফরাসী সাহিত্য পর্য্যন্ত নানা বিষয় বৈচিত্র্যের তুলনা নেই। প্রথম চৌধুরীর সমস্ত প্রবন্ধ থেকে বাছাই করা পঞ্চাশটি প্রবন্ধের দুই খণ্ড একত্রে প্রকাশ করছেন বিশ্বভারতী। তাঁর প্রবন্ধগুলির বিষয় সাধারণ লোকের বোধগম্য নয়। মুষ্টিমেয় পাঠকমণ্ডলীর নিকট তাঁর প্রবন্ধগুলি সমাদৃত হলেও জন সাধারণের কাছে প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য এখনও তেমন ভাবে এসে পৌঁছয় নি। ছোট গল্পের তুলনায় তিনি ঢের বেশী সংখ্যায় প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর লেখাগুলি সচরাচর প্রকাশিত হ'ত ভারতী, সাহিত্য, সবুজপত্র, বিচিত্রা, প্রবাসী ভারতবর্ষ, বসুমতী প্রভৃতি সাময়িক পুস্তিকাগুলিতে। এই কাগজগুলি কেবল অভিজাত মহলেই সমাদৃত। জনপ্রিয় উপন্যাসের যুগে প্রমথ চৌধুরী 'বারোয়ারি' (১ ২১) ছাড়া আর কোন উপন্যাস লেখেন নি। তাই বাঙ্গালী সাহিত্য রসিকরা প্রমথ চৌধুরীর পরিচয় আশানুরূপ পান নি। রবি-শরৎচন্দ্রের যুগে তাঁর রচনার গুণ স্বীকৃতি কেবল প্রচার পরিধির উপর নির্ভর করে না। আমি এখানে আলোচনা করছি তাঁর অভিভাষণ জাতীয় প্রবন্ধের কিছু অংশ উল্লেখ করে।

'যতদূর মনে পড়ে ১৩২৫ সনের প্রথম দিকের কোন এক সময় কোন গ্রন্থাগার উদ্বোধন প্রসঙ্গে মানব জীবনে গ্রন্থের প্রয়োজন প্রসঙ্গে তিনি একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়েছিলেন। তার মধ্যে এমন সব ভাবনা ও প্রোজ্জল চিন্তার প্রকাশ রয়েছে যা আজও আমাদের মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। এখানে তার কিছু কিছু অংশের আলোচনা করা যাচ্ছে।

তিনি ছিলেন একজন 'উদাসীন গ্রন্থকীট' অর্থাৎ কোন কোন লোক যেমন সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়ে বনে গমন করেন, তিনিও তেমনি সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়ে লাইব্রেরিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পুস্তকাগারের অভ্যন্তরে তিনি আজীবন সমাধিস্থ ছিলেন। তিনি বলেছিলেন বই পড়ার অভ্যাসটা বদ নয়। একথাটা মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দেওয়া আবশ্যক কেন না মানুষ একালে বই পড়ে না, পড়ে সংবাদপত্র। যে জাতির যত বেশি লোক যত বেশি বই পড়ে সে জাতি তত সভ্য। আনাতোল ফ্রাঁসের টাটকা বই পড়ি নি, একথা বলতে প্যারিসের নাগরিকেরা যাদৃশ লজ্জিত হয়েন সম্ভবতঃ কিপলিঙের কোন সদ্যপ্রসূত বই পড়ি নি বলতে লণ্ডনের নাগরিকেরাও তাদৃশ লজ্জিত হবেন; যদিচ আনাতোল ফ্রাঁসের লেখা যেমন সুপাঠ্য, কিপলিঙের লেখা তেমনি অপাঠ্য। সেকালের সভ্যতা ছিল অ্যারিষ্টোক্রাটিক আর একালের সভ্যতাহতে চাচ্ছে ডেমোক্রাটিক; সেকালে তাঁরা চাইতেন অসার, আমরা চাই বস্তু। তাঁরা দেখতেন মানুষের ব্যবহার, আমরা দেখতে চাই ভিতরটা। তাঁরা ছিলেন রূপভক্ত আমরা গুণমুগ্ধ। ক্লাসিক সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের তুলনা করলে, এ প্রভেদ সকলেরই চোখে পড়বে। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে দেখতে পাই কবি কি বললেন, তার চাইতে কি ভাবে বললেন তার মর্য্যাদা ঢের বেশী। ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি পশুরাও করে, তা ছাড়া আর কিছু করে না। কিন্তু দৈহিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা অপেক্ষা মনের বস্তু উপভোগ করবার ক্ষমতা আসে পুস্তক পাঠে।

কাল পরিবর্তনশীল। তথাপি আমরা মধুসূদনের কাব্য, বঙ্কিচন্দ্রের উপন্যাস পড়ি। বাংলা ও বাঙ্গালীর জীবনে বহুতর পরিবর্ত্তন ঘটেছে। এ যুগে সেই সব গ্রন্থ পড়ে আমাদের চিত্তে দোলা দেয় কেন? কারণ মানব মনে এমন কতকগুলি প্রবৃত্তি আছে যাহা কালে কালে নুতন রূপ পরিগ্রহ করে। তাই ক্লাসিক সাহিত্যিকের ভাবধারা, চিরন্তন মানব মনের অভিব্যক্তি অনুপ্রাণিত করে পরবর্ত্তী কালের সাহিত্যিকদের। আধুনিক যুগেও যেন দেখতে পাই আতস কাঁচের ভিতরে হাজার রঙের মেলার মধ্যে সাতটি রঙেরই বিচিত্র প্রতিবিম্ব। প্রেম বিরহ সৌন্দর্য্যবোধ মানুষের আদিমতম প্রবৃত্তি। দৈনন্দিন

জীবনে অনেক জিনিষ দুর্লভ ও অপ্রাপনীয়। সেই না পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় অন্তরে আসে হাহাকার, শিরায় শিরায় সৃষ্টি করে বেদনা। দুর্লভকে মানুষ পুস্তকের মাধ্যমে মুঠোর মধ্যে পায়। আমাদের অভিরুচি মত সার্থক করে তোলার অবকাশ একমাত্র সাহিত্যেই প্রকাশ করা চলে। তারই নাগালে মানুষ সৃষ্টি করে নিয়েছে মানুষের বেঁচে থাকার সম্পদ। মানুষের সীমায়িত শক্তি সাহিত্যের দর্পণে কেবল জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখে না, প্রত্যক্ষ করে জীবনের অনন্ত সম্ভাবনা ও প্রত্যাশার জগৎ, জীবনের সহিত সংযোগ রক্ষা করে চলাই সাহিত্যের ধর্ম্ম। তাই বলে সংবাদপত্র ও সমাজ জীবনের হুবহু প্রতিচ্ছবি শিল্পী মনের যাদুস্পর্শ আনে না বলেই তারা সাহিত্যিকের রচনার উপাদান হলেও সাহিত্য পর্য্যায়ভুক্ত নয়। সেইজন্যই আমরা দেখি 'সাহিত্যের মা যেমন করে কাঁদে, প্রকৃত মা তেমন করে কাঁদে না'। তাই বলে সাহিত্যের মায়ের কান্না মিথ্যা নয়।

মানুষের মনকে সবল, সচল ও সমৃদ্ধ করবার ভার আজকের দিনে সাহিত্যের উপরে ন্যস্ত হয়েছে। আমাদের শিক্ষিত সমাজের লোলুপ দৃষ্টি আজ অর্থের উপর পড়ে রয়েছে। সুতরাং সাহিত্য চর্চ্চার সুফল সম্বন্ধে আমরা অনেকেই সন্দিহান। যাঁরা হাজারখানা ল' রিপোর্ট কেনেন, তাঁরা একখানা কাব্যগ্রন্থও কিনতে প্রস্তুত নন। কেননা তাতে ব্যবসার কোন সুসার নেই। "নজির না আউড়ে কবিতা আবৃত্তি করলে মামলা যে দাঁড়িয়ে হারতে হবে, সে তো জানা কথা। কিন্তু যে কথা জজ শোনে না তার যে কোন মূল্য নেই, এইটেই হচ্ছে পেশাদারদের মহা ভ্রান্তি।" একটি বিশিষ্ট অভিজাত সভ্যতার উত্তরাধিকারী হয়েও ইংরেজি সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমরা ডেমোক্রেসির গুণগুলি আয়ত্ত করতে না পারি, তার দোষগুলি আত্মসাৎ করেছি। এর কারণও স্পষ্ট। ব্যাধিই সংক্রামক; স্বাস্থ্য নয়। বই পড়া ছাড়া ব্যাধি থেকে মুক্তির উপায় নেই।

"বই পড়ার শখটা মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শখ হলেও আমি শখ হিসাবে বই পড়তে পরামর্শ দিতে চাই না।" আমরা জাত হিসেবে শৌখিন নই তাই আমার পরামর্শ কেউ গ্রাহ্য করবে না; অনেকে তা কুপরামর্শ মনে করবেন, কেন না আমাদের এখন ঠিক শখ করবার সময় নয়। আমাদের এই রোগ শোকের, দুঃখ দারিদ্র্যের দেশে জীবন ধারণ করাই যখন হয়েছে প্রধান সমস্যা, তখন সে জীবনকে সুন্দর করা, মহৎ করবার প্রস্তাব অনেকের কাছেই নিরর্থক এবং সম্ভবতঃ নির্ম্মমও ঠেকবে। আমাদের বিশ্বাস শিক্ষা আমাদের গায়ের জ্বালা ও চোখের জল দুই দূর করবে। এ আশা সম্ভবতঃ দুরাশা; কিন্তু তাহলেও আমরা তা ত্যাগ করতে পারি নে, কেন না আমাদের জন্য চাই লাইব্রেরী। ও চর্চ্চা মানুষে কারখানাতেও করতে পারে না, চিরিয়াখানাতেও নয়।"

"আমার বিশ্বাস শিক্ষা কাউকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোকমাত্রই স্বশিক্ষিত। আজকের বাজারে বিদ্যার ক্ষেত্রে দাতা কর্ণেরও অভাব নেই কিন্তু যিনি যথার্থ গুরু, তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্‌বোধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে মুক্ত এবং ব্যক্ত করে তোলেন।" উদরের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের দেহ বাঁচে না, কিন্তু আমরা সকলে মানি যে, মনের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের আত্মা বাঁচে না। দেহরক্ষা অবশ্য সকলেরই কর্ত্তব্য কিন্তু আত্মরক্ষাও অকর্ত্তব্য নয়। মানুষের প্রাণ মনের সম্পর্ক যত হারায় ততই তা দুর্বল হয়ে পড়ে। যে জাতি যত নিরানন্দ, সে জাতি তত নির্জীব। একমাত্র আনন্দের স্পর্শেই মানুষের প্রাণ-মন সজীব সতেজ ও সরাগ হয়ে ওঠে। মানুষের জীবনের প্রয়োজনের উপর নির্ভর করেই পাঠের ইচ্ছা জেগে ওঠে। এখন আমাদের জানা প্রয়োজন কি কারণে মানুষের পাঠের ইচ্ছা জাগে। পাঠের আগ্রহ থাকলেই পাঠের ইচ্ছাকে জাগিয়ে তোলা যায়; বইপড়া কাজের পিছনে কি উদ্দেশ্য আছে? পাঠের প্রয়োজন নির্ভর করছে সামাজিক জীবনের পরিবর্ত্তনের উপর, যে পরিবর্ত্তনের ফলে মানুষের জীবনে এল নানা সমস্যা। পাঠের উদ্দেশ্য হলো নিজেকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। এধরণের পাঠ ব্যতীত মানসিক সমস্যার সমাধানের জন্য সৃষ্টি হল সত্যিকারের সাহিত্য। সুতরাং

সাহিত্যচর্চার আনন্দে দেশ সুদ্ধ লোক গুণজ্ঞ হয়ে উঠুক—গুণী ও গুণজ্ঞ উভয়ের মনের মিলনে জাতির জীবনী শক্তি বৃদ্ধি পাবে। মানব সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নানা ধরণের পাঠের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। মানুষের প্রয়োজনের ভিত্তিতে আধুনিক গ্রন্থাগার গড়ে উঠছে ও মানুষের পাঠের অভ্যাসের খোরাক যোগাচ্ছে। "লাইব্রেরীর মধ্যেই আমাদের জাত মানুষ হবে। সেইজন্য আমরা যত বেশী লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করব, দেশের তত বেশী উপকার হবে।"

আমি লাইব্রেরীকে স্কুল কলেজের উপরে স্থান দিই এই কারণে যে, এ স্থলে লোক স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে স্বশিক্ষিত হবার সুযোগ পায়; প্রতি লোক তার স্বীয় শক্তি ও রুচি অনুসারে নিজের মনকে নিজের চেষ্টায় আত্মার রাজ্যে জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। স্কুল কলেজ বর্ত্তমানে আমাদের যে অপকার করেছে, সে অপকারের প্রতিকারের জন্যে শুধু নগরে নগরে নয়, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। লাইব্রেরীর সার্থকতা হাসপাতালের চাইতে কিছু কম নয়। লাইব্রেরী হাসপাতালের চাইতে কম উপকারী নয়; কারণ আমাদের শিক্ষার বর্ত্তমান অবস্থায় লাইব্রেরী হচ্ছে একরকম মনের হাসপাতাল। একথা শুনে অনেকে চমকে উঠবেন, কেউ কেউ আবার হেসেও উঠবেন। কিন্তু আমি জানি, আমি রসিকতাও করছিনে, অদ্ভুত কথাও বলছিনে; যদিচ এ বিষয়ে লোকমত যে আমার মতের সমরেখায় চলে না, সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। অতএব আমার কথার আমি কৈফিয়ত দিতে বাধ্য। আমার বক্তব্য আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করছি, তার সত্য মিথ্যার বিচার আপনারা করবেন। সে বিচারে আমার কথা যদি না টেকে, তাহলে তা রসিকতা হিসাবেই গ্রাহ্য করবেন।"

শিক্ষা শাস্ত্রের একজন জগদ্‌বিখ্যাত ফরাসি শাস্ত্রী বলেছেন যে এক সময়ে ফরাসি দেশে শিক্ষা পদ্ধতি এতই বেয়াড়া ছিল যে, সে যুগে France was saved by her idlers: অর্থাৎ যারা পাস করতে পারে নি কিংবা চায় নি, তারাই ফ্রান্সকে রক্ষা করেছে। এর কারণ, হয় তাদের মনের বল ছিল বলে কলেজের শিক্ষা তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল, নয় সে শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করেছিল বলেই তাদের মনের বল বজায় ছিল। তাই এই স্কুল—পালানো ছেলেদের দল থেকে সে যুগের ফ্রান্সের যত কৃতকর্মা লোকের আবির্ভাব হয়েছিল।

পাস করা ও শিক্ষিত হওয়া যে এক বস্তু নয়, এ সত্য স্বীকার করতে আমরা কুণ্ঠিত হই। আমরা ভাবি, দেশে যত ছেলে পাস হচ্ছে তত শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে। বর্ত্তমান শিক্ষা যে সর্ব্বাঙ্গীন নয়—প্রকৃত শিক্ষা ব'লতে যা বুঝায় তাহা যে অনেক ভিন্ন আজ সেই শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কার সাধন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। যে শিক্ষা উত্তর জীবনে আমাদের কোন কাজে লাগবে না, আমাদিগকে আপনার পায়ের ওপর দাঁড়াবার সামর্থ্য দেবেনা, শরীরের সহিত যার সম্বন্ধলেশশূন্য সেই শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষার পদ্ধতি ঠিক উল্টো। এখানে ছেলেদের বিদ্যে গেলানো হয়, তারা তা জীর্ণ করতে পারুক আর নাই পারুক। এর ফলে ছেলেরা শারীরিক ও মানসিক মন্দাগ্নিতে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসে। একটা জানাশোনা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা পরিষ্কার করা যাক। আমাদের সমাজে এমন অনেক মা আছেন, যাঁরা শিশুসন্তানকে ক্রমান্বয়ে গোরুর দুধ গেলানটাই শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার ও বলবৃদ্ধির সর্ব প্রধান উপায় মনে করেন। গো-দুগ্ধ অতিশয় উপাদেয় পদার্থ, কিন্তু তার উপকারিতা যে ভোক্তার জীর্ণ করবার শক্তির উপর নির্ভর করে, এ জ্ঞান ও-শ্রেণীর মাতৃকুলের নেই। তাঁদের বিশ্বাস ও বস্তু পেটে গেলেই উপকার হবে। কাজেই শিশু যদি তা গিলতে আপত্তি করে, তাহলে সে যে ব্যাদড়া ছেলে, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। অতএব তখন তাকে ধরে বেঁধে জোরজবরদস্তি দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা হয়। শেষটা সে যখন এই দুগ্ধ-পান-ক্রিয়া হতে অব্যাহতি করবার জন্য মাথা নাড়তে, হাত পা ছুড়তে শুরু করে তখন স্নেহময়ী মাতা বলেন "আমার মাথা খাও, মরা মুখ দেখো, এই ঢোক, আর এক ঢোক, আর এক ঢোক" ইত্যাদি। মাতার উদ্দেশ্য যে খুব সাধু, সে বিষয়েয় কোন

সন্দেহ নাই যে ; কিন্তু এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে, উক্ত বলা-কওয়ার ফলে মা শুধু ছেলের যকৃতের পথ্য খান, এবং ঢোকের পর ঢোকে তার মরা মুখ দেখবার সম্ভাবনা বাড়িয়ে চলেন। আমাদের স্কুল কলেজের শিক্ষা পদ্ধতিটাও এই একই ধরণের। এর ফলে কত ছেলের সুস্থ সবল মন যে ইনক্যাণ্টাইন লিভারের গতাসু হচ্ছে তা বলা কঠিন। কেননা দেহের মৃত্যুর রেজিষ্টারী রাখা হয়, আত্মার মৃত্যুর হয় না। কিন্তু আমরা এই আত্মার অপমৃত্যুতে ভীত হওয়া দূরে থাক্ উৎফুল্ল হয়ে উঠি।

অতঃপর আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে বই পড়ার পক্ষ নিয়ে এ ওকালতি করবার, বিশেষতঃ প্রাচীন নজির দেখাবার কি প্রয়োজন ছিল? বই পড়া যে ভালো তা কে না মানে? আমার উত্তর সকলে মুখে মানলেও কাজে মানে না। মুসলমান ধর্মে মানবজাতি দুইভাগে বিভক্ত : এক যারা কেতাবি, আর এক যারা তা নয়। বাংলার শিক্ষিত সমাজ যে পূর্বদলভুক্ত নয় একথা নির্ভয়ে বলা যায় না ; আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় মোটের উপর বাধ্য না হলে বইস্পর্শ করেন না। ছেলেরা যে নোট পড়ে এবং ছেলের বাপেরা যে নজির পড়েন, সে দুইই বাধ্য হয়ে, অর্থাৎ পেটের দায়ে। একমাত্র উদরপূর্তিতে মানুষের সম্পূর্ণ মনতুষ্টি হয় না। বাধ্য হয়ে বই পড়ায় আমরা এতটা অভ্যস্ত হয়েছি যে কেউ স্বেচ্ছায় বই পড়লে আমরা তাকে নিষ্কর্মার দলেই ফেলে দিই। অথচ কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না, যে জিনিস স্বেচ্ছায় না করা যায়, তাতে মানুষের মনের সন্তোষ নেই।

ত্বমেকম্ শরণ্যম্

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

মান-অভিমান হে ভগবান্,
করি কেবল তোমার কাছে,
জানি গো এই মরুর বুকে
ছায়াতরু একটি আছে।
নদীর মতো অধীর হিয়া
চৌদিকে ধায় কল্লোলিয়া ;—
সাগর, তোমার সঙ্গ লভি,
তবেই তো তার প্রাণটা বাঁচে।
একটু কৃপা চেয়েছি যার—
দিয়েছে সে অনেক দাগা,
কল্পতরু, তোমার কাছে
এবার সুরু ভিক্ষা মাগা।
আমায় যারা তাড়িয়ে দিলে,
মর্ম আমার মাড়িয়ে দিলে—
মন্দ কী আর!—চূর্ণ তা'রা
ক'রলে আমার সকল শ্লাঘা!

সাঙ্গ এবার মাধুকরী ;—
যাবো না আর কাছেই কারো,
রইবো প'ড়ে চরণ-তলায়—
হয়তো বাঁচাও—নয়তো মারো
বাঘের-নাগের দংশে রাখো
সৃষ্টি এবং ধ্বংসে রাখো ;—
সাহারাতে জলের ধারা
ছুটিয়ে দিতে তুমি-ই পারো।
মুষ্টিতে আর তুষ্টি নাহি ;—
গোষ্পদে কি মিটবে তৃষা?
ধ্রুবতারার সঙ্গী যে জন—
আর কি তাহার হারায় দিশা?
বন্ধু-স্বজন ছাড়ছে যতো,
ভরসা মোর বাড়ছে ততো,
তোমার পায়ের পরশে মোর
উজল আমার অমানিশা!

হাত দেখা

শ্রীবিমলকুমার সুর

হাত দেখা বল্‌ত সাধারণতঃ বোঝায় হস্তচতুস্কোণে যে রেখাগুলি অঙ্কিত থাকে তা দিয়ে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বলা। অনেকেই এটা খেলা মনে করেন—যেন সব ধাপ্পাবাজী। এর মধ্যে যে কোন সত্য আছে বা থাকতে পারে সে সম্বন্ধে মোটেই বিশ্বাস করেন না, বরং উদাসীন। মজার বিষয় এই যে ব্যক্তিগত কোন অনুসন্ধান না করেই অবহেলার ভঙ্গীতে সারগর্ভ বক্তৃতা দেবার হাস্যকর চেষ্টা দেখা যায় অনেকের। মন্তব্য তাঁহারই সাজে যিনি বাস্তবিক অনুসন্ধান করে সত্যের কোন খোঁজ পান নাই। এমন লোক ত চখে পড়েনা। বরং যারাই এ বিষয়ে তলিয়ে দেখেছেন তাঁহারা এর অফুরন্ত উৎস দেখে চমৎকৃত হয়েছেন এইত দেখি। কাহারও কাহারও বা এই ধ্যান জ্ঞান হয়ে দাঁড়ায়। বাস্তবিক সত্যের সন্ধান না পেলে কোন লোকই এর গবেষণায় ডুবতো না। যাই হোক এ তো গেল তর্কের দিক।

হাত দেখাটা এত প্রাচীন, বিশেষ করে ভারতবর্ষে, যে আমাদের সমাজ ধর্ম্ম কর্ম্ম সব জীবনেই এর কথা আপনিই একে পড়ে। একটা শিশুও না বুঝে বলবে "হাত গুণে দেখুন না।" এককথায় ভাবে ও ভাষার মধ্যে এর স্থান রয়ে গেছে। ঠিক কবে থেকে আছে যে সম্বন্ধে কারুর জিজ্ঞাসা নাই। তারা ধরেই নিয়েছে, এমন একটা জিনিস আছে।

খানিকটা বৈজ্ঞানিক চিন্তা ধারা যাঁদের, তাঁরা মনে করেন, এটা নিছক ভুয়া, লোক-ঠকাবার ব্যবসা বা ফিকির মাত্র। হাতের রেখার সঙ্গে মানুষের জীবনের যে কণামাত্র সম্বন্ধ থাকতে পারে তা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না। এখন কাঁহারা বিশ্বাস করেন এবং কাঁহারা না করেন তা নিয়ে কোন শাস্ত্রের আসে যায় না। শাস্ত্র শাস্ত্রই থাকে। এই শাস্ত্রকে যদি মানুষ কাজে লাগাতে যায় তো তখন দেখবে এ শুধু শাস্ত্র নয় শস্ত্রও বটে, অর্থাৎ ক্ষমতার উৎস। দৈহিক ক্ষমতা নয়, জ্ঞানের ক্ষমতা।

জ্ঞান মানুষকে দেয় দৃষ্টি, আলো এবং পথপ্রদর্শন। কাজেই জ্ঞানকে নিজের গোঁড়ামিতে দূরে রাখলে ক্ষতি মানুষেরই, জ্ঞানের নয়।

অনেকে বলবেন "বেশ ত মশাই, দুটো প্রমাণ দেখাতে পারেন?" প্রমাণের প্রথম কথা এই যে যেমন পাঁচটা মানুষ পাঁচ রকমের হয় তেমনি পাঁচটা হাতও পাঁচ রকমের হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের যেমন বৈশিষ্ট্য আছে, প্রত্যেক হাতের তেমনি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। হাতের বৈশিষ্ট্য বলতে বোঝায় হাতের গড়ন এবং তার মুঠার মধ্যে যে রেখা অঙ্কিত আছে সেগুলির নক্সা এবং ধারা। কাজেই হাত দেখা মানে শুধু হাতের রেখা পড়া নয়। হাতের গঠন তার গোড়ার কথা। হস্তগঠনের পরিপ্রেক্ষিতেই হস্তরেখা পড়া হয়।

এখন হাতের গঠন বলতে কি বুঝি এই প্রশ্ন অনেকের মনে জাগবে।

হাতের গঠন ধরা হয় হাতের ভিতর এবং বাহির কী রেখায় সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, সম, বিষম, উচ্চ, নীচ, রুক্ষ, মসৃণ, শক্ত, নরম, মাংসল, হাড়সার, গোলাকার, চতুষ্কোণ, লম্বাটে, খর্ব্বাকার ইত্যাদি রূপ, চেহারা, ভাব ও আকার।

দেখা যায় এক এক আকৃতি এক এক বিশেষ প্রকৃতির দ্যোতক। এই ভাবে সাতটা প্রধান আকৃতি ঠিক করা হয়েছে। যথা আদিম, ব্যবহারিক, জ্ঞানী, শিল্পী, কর্ম্মশীল, অতীন্দ্রিয় এবং মিশাল।

আদিম হাত সাধারণতঃ শক্ত, কর্কশ। ছোট, মোটা আঙুলযুক্ত। নখগুলি ছোট শ্রীহীন, শক্ত। হস্ততল শক্ত, রেখাগুলি মোটা, ও আভাহীন। কয়েকটী মাত্র রেখা দেখা যায়। এ হাত শিক্ষা দীক্ষার অভাব দেখায়। মানসিক উৎকর্ষের অভাব এবং পাশবিক ভাবধারা অধিক। প্রবৃত্তি তাদের চালনা করে। কাজেই আদিম অবস্থায় মানুষের পরিচয় যা ছিল সেই ভাব ধারার বাহক। আজ-কালকার দিনে এটা পুরোমাত্রায় দেখা যায় না। সভ্যতার আলোক সত্ত্বেও যতটুকু আদিম স্বভাব পাওয়া যায় তাই এই হাতগুলি জানায়। সাধারণতঃ মোটা ভারী বুদ্ধিহীন একটানা কাজ যারা করে তাদের হাত এই রকম হয়ে থাকে।

ব্যবহারিক হাত সাধারণতঃ চৌকো হয় অর্থাৎ চারিদিক সরল রেখায় সীমাবদ্ধ। কোনদিক বেশী মোটা বা বেশী সরু নয়। অপর দিকে বেশী ফুলো বেশী হেড়ো হয় না। হাতের আঙুলগুলি পর্য্যন্ত গোলাকার না হয়ে চতুষ্কোণ আকারের, এমন কি নখ গুলিও চতুষ্কোণ হয়ে থাকে। ফলে তাঁরা সাম্যবাদী, ঝগড়া ঝাটি পছন্দ করেনা, সব বিষয়েই হিসাব করে চলেন। কিসে জাগতিক সুবিধে হয়, বিপদে পড়তে না হয় এই বিষয়েই খেয়াল বেশী। কাজেই এঁরা পুরাণপন্থী, সামাজিক, ধীর, স্থির, এবং ব্যবহারিক সুবিধা সামনে রেখে অগ্রসর হন। এঁরা কল্পনা বরদাস্ত করেন না, জ্ঞানের গভীরে চলে যেতে চাননা, শিল্প কলার ঝোঁকে ডাবেন না বা আদর্শবাদ বা শুধু কর্ম্মবাদ নিয়ে থাকেন না। সব দিকের সামঞ্জস্য রাখাই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। কাজেই তাঁদের হাতকে বলা হয়—ব্যবহারিক হাত। এঁদের হাতের বুড়ো আঙুল সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকার। রেখাগুলি সরল, সহজ এবং অল্প। নিয়ম কানুন শৃঙ্খলার মধ্যেই এঁদের জীবন বেশী কাটে। এঁরা থাকেন প্রয়োজন ও সমাজ নিয়ে। এঁদের ব্যবহার সাধারণতঃ সঙ্গত হয়। জগতে এঁদের প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত থাকে। এঁদের জীবন মাপা বলে, উন্নতিও মাপা হয়।

জ্ঞানী হাত—

সাধারণতঃ হেড়ো, লম্বাটে ; আঙুলগুলি সব কোন জিনিসের বাহিরেরদিক অপেক্ষা ভিতরের দিক্ আকর্ষণ বেশী করে। অর্থাৎ একটা জিনিসের উপকারিতা কি উদ্দেশ্য কি,প্রয়োজন কি এই নিয়েই মগ্ন থাকেন তার ভোগের দিকে নজর থাকেনা। আপেল যদি খান ত তার উপকারিতার জন্য খান খাবার লালসায় খাননা। তাঁদের মাথায় প্রশ্ন ঘোরে—কেন, কি, এই সব। কাজেই তাঁদের মনে প্রশ্ন, সন্দেহ, জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধিৎসা এই সব প্রবল। বিচার, বিশ্লেষণ করাই তাঁদের পরম প্রিয় এবং সহজ স্বভাব। এদের আসলে জ্ঞানলিপ্সা বেশী। তাই এঁদের হাতকে বলা হয় জ্ঞানী হাত। এঁরা সত্যের অনুসন্ধানে রত। বিলক্ষণ খুঁত্ খুঁতে। লোকের সঙ্গে মেলামেশা খুবই করেন, কিন্তু নিজেদের বৈশিষ্ট্য নষ্ট করেন না। সব সময় একটা স্বাতন্ত্র্য প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। এঁরা বেশী জ্ঞান্ কুড়ান্ বলে ধন কুড়াতে পারেন না। টাকা রোজগারের হাতই এঁদের নয়। টাকা খরচ করার plan-ই বরছেন বেশী। মানবতা ও উদারতা বেশী বলে, দেশ-হিতকর কাজে অর্থব্যয় করেন। এক কথায় টাকায় এদের মোহ কম। এঁরা প্যাঁচ বোঝেন ভাল প্যাঁচে এঁদের জুড়ি কেউ নাই। জ্ঞানী হাত ভাল হলে প্যাঁচবাজী পছন্দ করেন না। কিন্তু যাঁদের স্বভাব খারাপ তাঁদের জ্ঞানী হাত হলে তারা দুর্দ্ধর্ষ ধুরন্ধর।

শিল্পী হাত—

এ হাত সরল সহজ সাধারণতঃ গোলাকার, মাংসল এবং পুষ্ট। আঙুলগুলি মোটা থেকে ক্রমশঃ সরু হয়ে নখের দিকে শেষ হয়। আঙুল-গুলি গোলাকার, কোন খোঁচা থাকে না। এইসব লোক খুব বুদ্ধিমান্। টপ করে কোন জিনিস বুঝে নিতে এঁরা অদ্বিতীয়। সমাজে সংসারে—এঁদের হাস্য, মেলামেশা খুবই প্রাণস্পর্শী। সকলকেই সহজে আপনার করে নিতে পারেন। এঁরা ভাবপ্রবণ, স্নেহ ভালবাসা মমতা এঁদের বড় কথা। শিল্প কলায় অনুরাগ খুবই বেশী। সব সময় একটা উচ্ছ্বাস দেখা যায়। এঁদের ধৈর্য্য বড় কম। কাজেই একটা জিনিস ছেড়ে আর একটায় চলে যান্ যখনই বেকায়দায় পড়েন। লড়ে কোন

পরিবেশ সহায়ক হলে এঁদের সামনে দাঁড়ায় কে? কিন্তু সব দিন ত সমান যায় না। তাই শিল্পী হাতের লোক দুঃসময়ে পড়লে বড় বেকায়দায় পড়ে যান। তাঁরা সাধারণতঃ বর্ত্তমান নিয়েই থাকেন। অতীতের কথা ভাবেন না। ভবিষ্যতের সম্বন্ধে যতটুকু কল্পনা করেন তা কাজে লাগাবার উৎসাহ বা ধৈর্য্য তাঁদের নাই। শিল্পী হাত বলেই যে শিল্প জগতে বিরাট উন্নতি করেন তা ঠিক নয়। তার প্রধান কারণ, বড় হবার মূল যে ধৈর্য্য, সংযম, অবিশ্রান্ত চেষ্টা এসব তাঁদের অভাব থাকার দরুণ, বড় হবার শক্তি বা যোগ্যতা থেকেও দেখা যায় তারা বেশী বড় হন না, বা বেশী দিন উচ্চ অবস্থা বজায় রাখতে পারেন না। এক কথায় এঁদের brilliancy-ই এঁদের হানিকারক।

কর্ম্মশীল হাত—

এই হাতগুলি সাধারণতঃ বড় এবং চওড়া হয়। বিশেষ করে প্রত্যেক আঙুলের ডগা চওড়া থাকে। অর্থাৎ শিল্পী আঙুলের বিপরীত। এঁরা বড় কর্ম্ম প্রিয়। সব সময় একটা না একটা কিছু করছেন। বহির্জগতের আকর্ষণ এঁদের বেশী। কাজেই খেলাধুলা, ভ্রমণ, সন্তরণ, পর্ব্বত আরোহণ, ইত্যাদি সকল প্রকার আধিভৌতিক আকর্ষণ বেশী। তাঁরা সহজে হার মানেন না। নূতন চেষ্টা, নূতন উদ্যম, এঁদের এগিয়ে নিয়ে যায়। মাথা খাটিয়ে নূতন রাস্তাও বের করেন মন্দ নয়। ব্যবহারিক জগতে যতরকম সুবিধা তা কায়দায় করায়ত্ব করার দিকে এঁদের নজর বেশী। তাই আপনারা দেখতে পান কত কি নূতন আবিষ্কার, কাজ নিয়েই বেশী থাকেন বলে এঁদের কাজ-পাগলা বলা হয়ে থাকে। এঁদের হাত বিষম, অর্থাৎ একদিক মোটা একদিকে সরু। কাজেই সমতা বজায় রাখা এঁদের ধর্ম্ম নয়। এঁদের ভাবধারা অদ্ভুত ও উগ্র। গতানুগতিকের খাতির বেশী করতে পারেন না। এঁরাই জগতে বেশী নাম করে থাকেন।

অতীন্দ্রিয় হাত—

এই হাতগুলি খুব ছোট ও দুর্ব্বল, আঙুলগুলি লম্বাটে সরু ও দুর্ব্বল। এঁরা ব্যবহারিক জগতে অচল কারণ শক্তি, চেষ্টা, যোগ্যতা সবই কম। এরা পরমুখাপেক্ষী। বুদ্ধি এঁদের খুবই থাকে। অনেক জিনিস সহজেই আগে থাকতে জানতে পারেন বা উপলব্ধি করেন, সেই জন্যই এঁদের অতীন্দ্রিয় হাত বলা হয়। এঁরা আদর্শবাদী এত বেশী যে শুধু মুখের কথাতেই আদর্শ থেকে যায়। জীবন-সংগ্রাম করতে এঁরা সম্পূর্ণ অপারগ। এঁরা কল্পনা প্রবণ এবং এদের অনুভূতি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। এঁদের দেখা যায় একদিকে শিশুর সারল্য অপর দিকে শিশুর মত অনভিজ্ঞ ব্যবহার। সংসারে এঁদের সব সময়ই একটা খুঁটির প্রয়োজন। এঁরা স্নেহ, ভালবাসা ও সহানুভূতির কাঙাল। সাধারণতঃ মানুষ ভাল। নিজেকে বাঁচাবার সময় এরা অনেক সময় অত্যন্ত অসঙ্গত ও অযৌক্তিক ব্যবহার করে থাকেন। এদের প্রেম, স্নেহ, মমতা, সহানুভূতি দিয়ে চালনা করা উচিত। বেশী কর্কশ হলে এঁরা সহ্য করতে পারেন না।

মিশাল হাত—

ঠিক একটি বিশেষ আকারের হয় না। দুইটি বা তিনটি ধরণের সংমিশ্রণ হয়। কাজেই মিশাল হাত বলে। যে যে type একত্রিত হয় তাদের বৈশিষ্ট্যই প্রকাশিত হয় খাপছাড়া ভাবে। এই সব হাতের লোক খুব চালু। অনেক কিছুই জানেন, অনেক কিছুই করতে পারেন। রকমারি নিয়েই এঁদের জীবন। কাজেই সাধারণতঃ jack of all trades but master of none হয়ে থাকেন। যদি একটি বা দুটি জিনিসে অধিক মনোনিবেশ করেন তা'হলে দক্ষতা দেখাতে পারেন। কিন্তু সাধারণতঃ অম্বল চাকতে চাকতে পেট ভরে যায়, ভর পেটটা ভাল খাওয়া হয়না।

এই হোল মোটামুটি সাত রকমের হাত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে রেখাগুলি পড়তে হয় তবেই তাদের অর্থ সুস্পষ্ট হয়।

রেখার মধ্যে কতকগুলি আছে প্রধান কতক-গুলি গৌণ প্রধান রেখাগুলি যথাক্রমে হচ্ছে—জীবনী রেখা, মস্তিষ্ক রেখা, হৃদয় রেখা, ভাগ্যরেখা, যশঃ রেখা, স্বাস্থ্য রেখা, শুক্র বন্দনী।

গৌণ রেখাগুলির মধ্যে পড়ে বিবাহ রেখা, জ্ঞানী রেখা (solomon's sign), শনি চক্র (ring of Satun), গুহ্য ক্রস (mystic cross), মঙ্গল রেখা, প্রভাব রেখা ইত্যাদি। গৌণ হলেও

এদের অর্থ, প্রয়োজন গুরুত্ব বা প্রভাব কম নয়। এ ছাড়া অনেক রকম চিহ্ন দেখা যায় যথা শঙ্খ, পদ্ম গদা, চক্র। ছত্র, ধনু, মৎস্য, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, মন্দির ইত্যাদি এই চিহ্নগুলি ভারতীয় মতে বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ।

এই সব রেখা বা চিহ্নগুলির তাৎপর্য বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় করতলে উচ্চ নীচ স্থানের উপর। উচ্চস্থানগুলিকে ইংরাজিতে mount বলে, নীচ স্থান গুলিকে depression বলে। সমতল ক্ষেত্রের নাম plains, নিম্ন ক্ষেত্র যেমন ভাল নয় তেমনি অধিক উচ্চ ক্ষেত্র উগ্রতা তীব্রতা বা আধিক্য এনে ফল নষ্ট করে দেয়।

এবার রেখার কথা কিছু বলা যাক্। প্রত্যেক রেখা ঠিক নদীর মত। এদের উৎপত্তিস্থল আছে, গতি আছে এবং পরিসমাপ্তি আছে। কোথা থেকে উঠল, কেমন ভাবে অগ্রসর হোল এবং কী অবস্থায় শেষ হোল এইটাই বুঝতে যুগ কেটে যায়।

পুনরায় প্রত্যেক রেখার রং আছে, ঔজ্জ্বল্য আছে, শক্তি বা ক্ষীণতা আছে। প্রত্যেক রেখার নিজস্ব তাৎপর্য্য আছে। এক রেখা দৈহিক শক্তি, কোন রেখা মানসিক শক্তি, কোন রেখা নৈতিক শক্তির দ্যোতক। কাজেই এই ভাবে বহুদিক্ বিচার করে হস্তগণনা হয়ে থাকে। যাঁর যত পড়াশোনা, জিজ্ঞাসা, আগ্রহ, লক্ষ্য, অভিজ্ঞতা এবং বিচার শক্তি তারই উপর হস্তগণনার কৃতকার্য্যতা ততখানি নির্ভর করে। দুয়ে দুয়ে চার বলে যে ধারণা লোকে করে থাকে এটা ঠিক তা নয়। এটায় ব্যক্তিগত যোগ্যতা অনেকখানি অংশ গ্রহণ করে। কাজেই সকলের বিচার একরকম হয় না। আপনার কোন কথা বলার আগে কোন হস্তরেখাবিদ্ যদি আপনার স্বাস্থ্য শক্তি মানসিক যোগ্যতা ও ধারণা ইত্যাদি অনেক কিছু বলে দিতে পারেন কেবল হস্তপরীক্ষা করে তাহলে কি শাস্ত্রটাকে অবহেলা করা যায়? কাজেই বুঝে নিন্ এই শাস্ত্রের মূল্য কোথায়।

গান

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

তোমারেই যেন চেয়েছিনু বারে বারে
গোপন মনের মিলন-অভিসারে
মধু মলয়ার ছন্দে
বনমালতীর গন্ধে
শুনেছিনু যেন বাঁশীখানি তব মনের আকাশ-পারে।
জোছনায় ধোওয়া শরৎ-যামিনী শেফালির বাসেভরা
স্বপ্ন-মেদুর শুভ্র ধরণী হৃদয় উদাস করা;
এমনি সে এক নীরব নিশায়
ছুটে ছিল মন কোন্ সে দিশায়,
চেয়েছিল যারে উতলা পথিক পেল কি আজিকে
তারে।

সংকলন

বৈদ্যের যখন ব্যাধি হয়—

বৈদ্য অর্থাৎ চিকিৎসকেরাও দেহমনধারী জীব। সাধারণ মানুষের মত তাঁরাও আধি-ব্যাধিতে ভুগেন। যুক্তরাজ্যে এমন চল্লিশজন ব্যাধি-গ্রস্ত চিকিৎসক, যাঁদের মানসিক হাসপাতালে একাধিকবার প্রায় চার মাস করে রাখতে হয়েছে, তাঁদের নিয়ে দশবছর পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ চালানো হয়েছে। দেখা গিয়েছে:—

(১) অর্দ্ধেকের বেশী রুগী রোগমুক্ত হয়ে নিজ নিজ চিকিৎসা ব্যবসায়ে ফিরে গিয়েছেন।

(২) শিজো ফ্রেনিয়া যুক্ত একুশজন রুগীর মধ্যে বারজন সর্বসময়ের চিকিৎসা কার্যে নিযুক্ত হতে পেরেছিলেন।

(৩) যাঁরা চিকিৎসা ব্যবসায়ে ফিরে গিয়েছিলেন, তাঁরা তাঁদের কর্মব্যস্ততা ও জনসংযোগ সীমিত করে দিয়েছিলেন।

(৪) কয়েকজন চিকিৎসক তাঁদের সংসার পরিচালনার কাজ স্ত্রী কিংবা ব্যবসায়ে অংশীদারের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

স্ত্রীর হাতে গৃহ চালনার ভার যাঁরা ছেড়ে দেন তাঁরা আধিগ্রস্ত হলেও সত্যি সত্যি চালাক লোক বটে!

— শঙ্কর ঘোষ

সারা জগতে তরুণ বিক্ষোভে কেন?

বাংলাদেশে ছাত্রদের মধ্যে বিক্ষোভ ও উন্মাদনা দেখে যাঁরা ক্ষুব্ধ হচ্ছেন, তাঁদের দৃষ্টি বিশ্বের দিকে দিকে আকৃষ্ট হলে ভাল হত। তাঁরা দেখতে পেতেন, বিশ্বের সর্বত্র যেন তরুণসমাজ বিগড়ে গেছে। ফ্রান্স ও অ্যামেরিকার দিকে দৃষ্টি দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হবে। অ্যামেরিকার হিপি ও হুডলাম একাধারে দায়িত্বহীন যৌনলালসা-পাগল তরুণ-তরুণীর দল, অন্যদিকে আদর্শের ধ্বজাধারী বিশৃঙ্খল যুবকের দল—যারা এক মুহূর্তে অশ্বেতকায়দের নির্মূল করতে চায়,—বা যারা একমুহূর্তে কৃষ্ণকায়ের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যারা এই মুহূর্তেই জগতের সমস্ত দেশে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ়সংকল্প, বা যারা এক্ষুণি জগতে ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে চায়—বা যারা এক্ষুনি ভিয়েটনামের যুদ্ধ বন্ধ করতে কৃতসংকল্প। তাদের মত তরুণ-তরুণীরাই শুধু ফ্রান্স আর অ্যামেরিকা নয়, সমস্ত পৃথিবীতেই অশান্তি সৃষ্টি করছে, বিক্ষোভ করছে।

এর মূল কোথায়? মূল হচ্ছে গত অর্দ্ধ-শতাব্দীর প্রগতি প্রচেষ্টা—ঝড়ের বেগে অপরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা, আর তজ্জনিত "তৎক্ষণবাদ" বা ইনস্টেন্টিজম্"। কাজ ফেলে রাখতে পারবে না—এক্ষুণি করতে হবে। খেলাতেও সেই ভাব—'এ খেলা বাঁচার খেলা—এ খেলায় জিততে হবে।' না জিতলে খেলোয়াড় মার খাবে, তাঁবু পুড়বে।

'তৎক্ষণবাদ' কি ভাবে ছেলেমেয়েদের মধ্যে সংক্রামিত হচ্ছে? মিঃ রে প্রেমে পড়ে বিয়ে করেছেন লতিকা চ্যাটার্জিকে। লেডি চ্যাটার্জির হুকুমে ওঠ বস করেন মিঃ রে আই-এ-এস অফিসার। সেদিন মেয়ের জন্যে মিসেস রে একটা বিশেষ ধরণের খেলনা আনতে বলেছিলেন। মিঃ রে অফিস থেকে বাড়ী আসার পথে সেটা মনে করে আনতে পারেন নি। বাড়ীর দরজায় মা ও মেয়ে দাঁড়িয়ে। মিঃ রেকে খালি হাতে ফিরতে দেখে মিসেস্ রে জ্বলে ওঠেন। তাঁর মেয়ে কেঁদে ওঠে —"যাও, ফিরে যাও, নেকটাই খুলতে পারবে না, এক্ষুণি নিয়ে এসো মেয়ের খেলনা।" মিঃ রেকে ফিরে গিয়ে

খেলনা আনতে হলো তৎক্ষণাৎ। যে মেয়ের মা এমন, সে বড় হয়ে 'তৎক্ষণাৎবাদে'র জ্বালায় এমন না জলে পারে ?

—কমল ভট্টাচার্য্য

অ্যামেরিকান যুক্তরাষ্ট্রও একটি অনুন্নত দেশ!

ইউ-এস-নিউজের একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় অ্যামেরিকান যুক্তরাষ্ট্রও একটি অনুন্নত দেশ বলে বিবেচিত হয়েছে। অ্যামেরিকার এত অতুল ঐশ্বর্য সত্ত্বেও সেখানে দারিদ্র্য রয়েছে, বস্তী রয়েছে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বেকারীর সমস্যা রয়েছে।

দেশে দরিদ্রের সংখ্যা সাড়ে চার কোটি, দারিদ্র্যক্লিষ্টের সংখ্যা ৩ কোটি। (অবশ্য বছরে চারজনের কোনও পরিবারের আয় যদি ৩৩৩৫ ডলারের কম হয় তবেই তাকে দরিদ্র পরিবার বলে গণ্য করা হয়।)

২৫ জন সদস্যবিশিষ্ট একটি নাগরিক সংস্থার সমীক্ষায় ধরা পড়েছে এক কোটি অ্যামেরিকান ক্ষুধাক্লিষ্ট।

গৃহ-সমস্যা সম্পর্কে বলা হয়েছে ৮৫ লক্ষ গৃহের অবস্থা খুবই খারাপ। তাদের মধ্যে ৫৫ লক্ষ গৃহে জল নেই, স্নানাগার নেই, পায়খানা নেই!

তিন কোটি দারিদ্র্যক্লিষ্ট লোকের অনেকেই নিগ্রো। কিন্তু দুই-তৃতীয়াংশই হচ্ছে শ্বেতাঙ্গ। অনেকেই বৃদ্ধ, কিন্তু অর্দ্ধাংশই শিশু। অনেকেই গ্রামের অধিবাসী কিন্তু প্রায় অর্দ্ধেক সহরের বাসিন্দা।

পঁচিশ বছর বয়সের বেশী অ্যামেরিকানদের মধ্যে ৬ জনের মধ্যে একজন মাত্র ৮ বছরের চেয়েও কম স্কুলে পড়েছে, দুজনের মধ্যে একজন উচ্চবিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে নি।

বেকার মানুষের সংখ্যা ২৮ লক্ষ। এদের মধ্যে অর্দ্ধেকের চেয়ে বেশী নারী।

সকল অনুন্নত দেশের যে-সব সমস্যা অ্যামেরিকার সহরেরও তাই।—যথা ভিড়, অনাচার, অপরাধপ্রবণতা, জাতীয় বৈরিতা, বস্তী, আবর্জনা, আর চেঁচামেচি সবই রয়েছে অ্যামেরিকার সহরে।

অবশ্য ওদেশে দরিদ্র পরিবার বলে গণ্য করা হয় তাদেরই যে সব চারজনের পরিবারের আয় ৩৩৩৫ ডলারের কম, অর্থাৎ আমাদের হিসাবে মাসে প্রায় দেড় হাজার (১৫০০৲) টাকার কম!

অ্যামেরিকাসহ সমস্ত অনুন্নত দেশের মঙ্গল আমরা কামনা করি।

— শুভ চট্টোপাধ্যায়

কাছে // দূরে

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

অস্বস্তি বাড়ছে বই কমছে না একটুও শ্যামলের। ঘুমিয়ে পড়েছে সুবীর। তবুও ঘুম আসছে না চোখে। ঘুমুতে ইচ্ছে করছে না। সুবীরকে কাছে পেয়ে, বুকে চেপে ধরেছে। জ্বালা জুড়তে চেষ্টা করছে। পারে নি। পারছে না। আজকের রাতটাও বড্ড বেশী বেদনাকাতর মনে হচ্ছে যেন।

সুবীরের ঘুমন্ত মুখখানা দেখছে অপলক চোখে। হুবহু ইন্দ্রাণীর মুখ। ইন্দ্রাণীর ব্যাপার জানে না এখনো ছেলেটা কিচ্ছু জানে শুধু মায়ের অসুখ। বাইরে আছে। ভালো হলে ফিরে আসবে আবার এ বাড়ীতে।

বুকের জমাট ব্যথাটা নড়ে উঠল। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল শ্যামল। বাচ্চাটার জন্য একটুও কাঁদল না ইন্দ্রাণীর মন!

ছেলেটা জ্বলবে। হয়ত সারাজীবনই জ্বলবে। এ-জ্বলার হেতু ইন্দ্রাণী ছাড়া আর কেউ নয়। ইন্দ্রাণীকে কো দিন ক্ষমা করতে পারবে না শ্যামল। সুবীরও বোধহয় পারবে না।

যে ভবিতব্য এসে হাজির হয়েছিল শ্যামলের যৌবনে —সেই ভবিতব্য এসে উপস্থিত হল আবার সুবীরের জীবনে—মাত্র ন'বছর বয়সে। দু'জনের ভবিতব্যের ফলাফল এক হলেও, প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা।

একজনের জীবনযন্ত্রণা আত্মশুদ্ধির পথে টেনে নিয়ে গেছে। অন্যজনের ভিতরে ঘৃণা বিদ্বেষের বিষে ভরে থাকবে হয়ত জীবনভোর দু'টি জীবনের ব্যথা লাঘবের কোনো পথই দেখতে পাচ্ছে না শ্যামল।

অতীতের ব্যথার ওপর আর একটা ব্যথার বোঝা চাপল শ্যামলের নতুন করে। সুবীরের ব্যথা।

শত অনুরোধ সত্ত্বেও সম্পর্ক ছিন্ন করল ইন্দ্রাণী। যেটুকু ক্ষীণ আশা ছিল ফেরবার—সে টুকুও নিঃশেষ করে দিল আজ। ছেলেটার মুখের দিকে ফিরে তাকাল না মোটে। মৃন্ময়ের আকর্ষণটাই সব চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিল তার কাছে।

কলেজের সহপাঠী ছিল মৃন্ময় ইন্দ্রাণীর। অবস্থা বিপর্যয়ের জন্য বিয়ে করে নি ইন্দ্রাণীকে। চাকরি-বাকরি নেই বলে বিয়ে করতে চায়ও নি। শ্যামলকে বিয়ে করতে সেই নাকি মত করিয়েছিল। ওর উদার হৃদয়ের তুলনা মেলা ভার। নিজের বাগদত্তাকে অন্যের হাতে তুলে দেওয়া ওর মতো লোকের পক্ষেই সম্ভব। শ্যামল হলে এ-অসম্ভব সম্ভব হত না। মৃন্ময় অন্তর্দাহ উপেক্ষা ক'রে, মুখে হাসি টেনে, দিনের পর দিন সয়েছে শ্যামলকে। এতটুকু বিরক্তি প্রকাশ করেনি কোনো সময়ে। কিন্তু বিরক্তি প্রকাশ করেছে কুৎসিতমুখে শ্যামল। সইতে পারে নি একদম মৃন্ময়কে। প্রাণের টানে মৃন্ময় এসেছে দেখা করতে। লাঞ্ছিত অপমানিত হয়েছে। চূড়ান্ত অভদ্রতা করেছে শ্যামল। ব'ড়ীর ত্রিসীমানায় আসতে বারণ করে দিয়েছে। জলভরা চোখে নির্বাক মুখে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে মৃন্ময়।

তবু আবার এসেছে মৃন্ময়। এ-মানুষটার প্রেম ভোলা যায়না। ভুলতে পারবে না জীবনে ইন্দ্রাণী। সব যদিছাড়তে হয় তাকে ছাড়বে। স্বামীর অবস্থা ভালো ছাড়লে কোন দুঃখু কষ্টের বালাই-ই আসবে না। ছেলেকে ছাড়লে তার বাবার জন্যে যত্নের কোন ত্রুটিই হবে না। আর তা ছাড়া ছেলেকে মায়ের কাছ থেকে দূরে রেখে রেখে এমন অভ্যাস করিয়ে দিয়েছে ছোট থেকে শ্যামল—মা মরে গেলে, চলে গেলে কোনো রেখাপাতই করবে না তার মনে।

সহায় সম্বলহীন মৃন্ময়কে ত্যাগ করতে পারবে না ইন্দ্রাণী। চাকরি পেলে, তারই ঘরণী হতে হবে—এই চুক্তিই ছিল তার সংগে। অবিশ্যি মৌখিক চুক্তি। এখন চাকরি পেয়েছে মৃন্ময়।

ইন্দ্রাণীর মুখে সব শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেছল শ্যামল। মুখ দিয়ে কথা সরে নি একটাও প্রথমে। নিজেকে প্রকৃতিস্থ করতে সময় লেগেছিল কিছুক্ষণ। এতখানি উদ্ধত প্রকৃতির ইন্দ্রাণী—আগে একটুও টের পায় নি। বছরের পর বছর কেমন নিজেকে ছদ্ম প্রেমের আড়ালে রেখেছিল সন্তর্পণে। সময় বুঝে মুখোশ খুলেছে। ফণা ধরেছে।

ওর দংশনে শুচিশুভ্র বংশমর্যদা কালো হয়ে যাবে। ওর কলংকবিষে শ্যামলের জীবন, ভবিষ্যৎ বংশধর সুবীরের জীবন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে জ্ঞাতি-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের অন্তরের শ্রদ্ধাপ্রীতির আসন থেকে।

চোখের সামনে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের ভবিষ্যৎ দেখেছিল শ্যামল। শিউরে উঠেছিল অশুভ আশংকায়। দুরদুর করে উঠেছিল বুকের ভিতর। ইন্দ্রাণীর দু'হাত ধরে কাতর অনুনয় করেছিল, আসতে বারণ ক'রে দিয়ে ভুল করেছি। ক্ষমা কর। প্রতিবেশী-আত্মীয়-স্বজনের ঠাট্টাবিদ্রূপে তিষ্ঠাতে পারছিলাম না বাড়ীতে। তাই—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে, তীব্র-তীক্ষ্ণকণ্ঠে ব'লেছিল ইন্দ্রাণী, কোনো অজুহাত দেখিয়ে আর এ বাড়ীতে ধরে রাখতে পারবে না তুমি আমাকে। মৃন্ময়কে তাড়ানোর সংগে আমার মন-প্রাণ আত্মা চলে গেছে এ-বাড়ী থেকে তোমাদের কাছ থেকে।

: অন্ততঃ সুবীরের মুখ চেয়ে—

: সুবীর তোমার ছেলে—

কথা বলার ধরণ শুনে, মুচকি হাসি দেখে বুঝতে আর বাকি ছিল না শ্যামলের—কি বলতে চাইছে, কি ইংগিত করছে ইন্দ্রাণী। কুরূপ শ্যামলকে ঘৃণা করে ও। তাই ছেলেকেও বরদাস্ত করতে পারে নি কোনো দিন। আচার-ব্যবহারে বহু রকমে প্রকাশ পেয়েছে।

ইন্দ্রাণীর কথাবার্তায় দারুণ আঘাত পেয়েছে শ্যামল। কিন্তু ইন্দ্রাণীকে বিশ্লেষণ করতে ইচ্ছা ক'রেছে বারে বারে সে সময়। বিশ্লেষণীয় ছাঁকুনিতে এইটুকু ছেঁকে তুলতে পেরেছে শেষ পর্যন্ত—রূপসী ইন্দ্রাণী মা নয়, স্ত্রী নয়।

ইন্দ্রাণীকে আটকাতে পারেনি শ্যামল।

নানা অজুহাত দেখিয়ে, স্বামীর উচ্ছৃংখল জীবনের [illegible] শেষ অবধি সমস্ত সম্পর্কের যবনিকা টেনে দিয়েছিল ইন্দ্রাণী।

কোর্টে হাজির হয় নি শ্যামল। কোনো বাদপ্রতিবাদও করে নি।

*

সুবীরের একমাথা ঝাঁকড়া চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ধীরে ধীরে শ্যামল। দেওয়াল ঘড়ির আওয়াজে সচেতন হ'য়ে উঠল। রাত একটা। পূবমুখো ঘড়িটার দিকে মুখতুলে তাকাল একবার। মায়ের পছন্দ করে কেনা ঘড়িটা। ঘড়িটা দেখলে মনে হয়, বেঁচে আছে এখনো মা। টক্‌টক্ আওয়াজ কানে এলে, মায়ের বুকের শব্দই শুনতে পায় যেন। ছোটবেলায় মায়ের বুকে কান রেখে যেমন শব্দ শুনত—অবিকল সেই শব্দ।

শ্যামল মাকে হারিয়েছে তার নিজের দোষে।

বছর ষোল বয়স তখন। ঠাকুর ঘরে নিয়ে গেলেন মা। শিবের মাথায় হাত রাখতে বললেন। নিজেও হাত রাখলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলে যেতে লাগলেন—বলতে আমার লজ্জা নেই আর। তুমি বড় হ'য়েছ—আশা করি এ বাড়ীর সংসার বুঝতে পারছ। তোমার বাবা আজ নেই। তাঁর নামে বলা কিছু উচিত হবে না। তবুও বলতে হচ্ছে। তোমার বাবাকে নিয়ে কোনো দিন সুখী হইনি...............

মা প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন—সুরা আর রূপোপজীবিনীদের কাছ থেকে দূরে থাকতে। এবাড়ীর ছেলেদের রক্তে নাকি ওই দুটো নেশা দাপাদাপি করে বেড়ায়। কেউ রুখতে পারে নি কোনোদিন। রুখতে হবে শ্যামলকে। এবাড়ীর ধারা, আবহাওয়া একেবারে পাল্টে দিতে হবে। দৃঢ়গম্ভীর স্বরে বলছিলেন মা, পারবে নিজেকে সংযত করতে?

মাথা নীচু ক'রে মায়ের চোখে চোখ রেখে সম্মতি জানিয়েছিল শ্যামল—পারব।

মায়ের চোখে মুখে হাসির ঢল নেমেছিল কিছুক্ষণ। হঠাৎ পাথর কঠিন হ'য়ে উঠল মুখখানা মার।—যদি না পার—তোমাকে ক্ষমা করব না জেনে রেখো!

ক্ষমা করেন নি মা।

যৌবনের উদ্দাম-উত্তাল কামনার তরংগে হাবুডুবু

খেয়েছে শ্যামল। রাতে বাড়ী ফিরেছে কোনোদিন। কোনোদিন ফেরে নি। মা কখনো শাসন করেন নি। প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়েও দেন নি। বাড়ী ফিরলে সামনে এসে দাঁড়াতেন শুধু মুহূর্তের জন্যে। সরে যেতেন তখুনি আবার।

মায়ের চোখে চোখ মেলাতে পারত না শ্যামল। অনেক সময় নিজের ওপর বিতৃষ্ণা আসত। কিন্তু তবুও সুরা আর বারনারীদের আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারত না কিছুতেই। চেষ্টা করেও।

মুক্ত হ'ল একদিন সত্যিসত্যিই। মুক্তির বিনিময়ে চরম ক্ষতি স্বীকার করতেও হয়েছিল শ্যামলকে। সে ক্ষতি মহাক্ষতি। ধারণার বাইরে, কল্পনার বাইরে। অথচ রূঢ়বাস্তবের কি নির্মম শাসন!

গণিকার প্রণয়ীদের সংগে বচসা সুরু হ'ল একরাতে। —কোন ভাগ্যবান বেশী প্রিয় সুন্দরীর। হাতাহাতি থেকে লাঠালাঠি অবধি গড়াল। পরিণামে মাথা ফাটাফাটি রক্তারক্তি। শ্যামলের দল আবার অন্যদলের চেয়ে এককাঠি সরেস। তারা সুযোগ বুঝে প্রণয়সংগ্রামে ছুরি চালাতেও দ্বিধা করল না। জীবনসংশয় হ'য়ে দাঁড়াল আহতদের মধ্যে একজনের। পালাল বীরযোদ্ধারা। পালাল শ্যামলও।

বাড়ী এলো।

মায়ের শরণাগত হ'ল। অকপটে জানাল তার কীর্তি-কলাপ। ক্ষমা চাইল। এবারের মতো রক্ষে করলে—জীবনে ওপথ মাড়াবে না আর।

মনে হ'ল, মা যেন পাথর হ'য়ে গেছেন। নিস্পন্দ-নিস্তব্ধ নির্বাক।

পরদিন সকাল।

পুলিসে ছেয়ে গেছে বাড়ীর চতুর্দিকে। ইন্‌সপেকটর শ্যামলের খোঁজের জন্যে এলো মায়ের কাছে। গোপন-স্থান দেখিয়ে দিলেন মা নিজেই। ধরিয়ে দিলেন শ্যামলকে।

আহত ব্যক্তি মরেনি বেঁচে উঠেছিল অনেক ভুগে। অনেক দিনরাতে যমে-মানুষে টানাটানির পর। দলবল নিয়ে মেরে ফেলবার চেষ্টার অভিযোগে জেল হ'য়ে গেল শ্যামলের। মামলায় কোন সাহায্য করেন নি মা। বরং তাঁর কাছে যে সত্যি ব্যাপার বলেছিল শ্যামল—পুলিশের কাছে, কোর্টে জানিয়ে দিয়েছিলেন সব।

যেদিন জেল থেকে খালাস হ'য়ে বাড়ী ফিরল শ্যামল—সেদিনই শুনল, আগের রাতে আত্মঘাতী হ'য়েছেন মা। ঠাকুরঘরের হোমের আগুন নিজের পরনের কাপড়ে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ছেলের আত্মশুদ্ধি করানোর জন্যে দেবতার কাছে নিভৃতে আত্মবলি দিয়ে গেলেন মা।

শ্যামলকে সংশোধন করতে মা মরেও বেঁচে রইলেন চিরদিন। শ্যামলের মনেপ্রাণে শয়নে স্বপনে।

সুধীরের মা ইন্দ্রাণী ?

কামনার আগুনে আত্মাহুতি দিল।

বেঁচেও মরে রইল ছেলের কাছে।

নড়ে উঠল সুধীর। চোখ চাইল। ভোরের আলো পূবের জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকছে। ঝুঁকে পড়ল ছেলের কপালের ওপর শ্যামল। সুধীরের কপালে স্নেহচুম্বন এঁকে দিল। নিশ্বাসে নিশ্বাসে ব'লে উঠল—আমার মায়ের আশীর্বাদ নেমে আসুক তোমার কপালে। আমার মতো বিপথে যেতে যেন না হয় তোমাকে কখনো। তোমার ভাগ্য যেন আমার মতো স্ত্রী না হয় কখনো।

বাবার মুখের দিকে চেয়ে হাসছে সুধীর। কোমল দু'হাতে বেষ্টন করতে চাইছে বাবাকে। নিবিড় ক'রে বুকে চেপে ধরল সুধীরকে শ্যামল।

———

একটা পাপ

* * * * *

নাট্যকার মন্মথ রায়

[সহরতলীর রেলের গার্ড কৃপাণ বসুর বাসগৃহের রুদ্ধদ্বার শয়ন কক্ষ। রাত্রি। গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিল। সদ্য বিবাহিত কৃপাণের তরুণী স্ত্রী ইলা শয়ন কক্ষের উন্মুক্ত বাতায়নে দাঁড়াইয়া বাহিরে অন্ধকারের দিকে তাকাইয়াছিল। শিয়ালের ডাক এবং ঝিঁঝির কলরব। শয়ন কক্ষের সম্মুখে তাহার স্বামী কৃপাণের কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল। ইলা ইহাতে বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়িল।]

কৃপাণ॥ রাত দুটো বাজতে না বাজতেই কি ঘুমরে বাবা!

[সজোরে কড়া নাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকে ডাকিতে লাগিল।]

কৃপাণ॥ ইলা! ইলারানী! বলি শুনছো; ওগো—!

[কৃপাণের বিধবা মা কৃপাণের সামনে এসে দাঁড়াইলেন।]

মা॥ কি হলরে বাবা, বাড়ীতে ডাকাত পড়ল নাকি?

কৃপাণ॥ দেখতো মা, তোমার বৌমার কি কুম্ভকর্ণী ঘুম।

মা॥ তোর কড়া নাড়ায় পাড়ার লোকের ঘুম ভেঙে গেল—ঘরের বৌর ঘুম ভাঙছে না। কি জানি বাপু, নতুন বৌ—তার এত ঘুম কেনরে বাবা, [চেঁচাইয়া] বলি ও বৌমা—বৌমা! [কৃপাণকে] না বাবা নতুন বৌর চাল-চলন আমি ভাল বুঝছি না। জেগে ঘুমুচ্ছে।

কৃপাণ॥ [চেঁচাইয়া] বলি খুলবে না দরজা ভাঙবো?

[ইলা দরজা খুলিল; এবং মাথার ঘোমটা টানিয়া দিয়া একটু আড়ালে গেল। কৃপাণ ও মা ঘরে ঢুকিলেন।]

মা॥ তোমার যা চাল-চলন দেখছি বৌমা, লোকের কাছে এখন মুখ দেখানো দায়। একছার আমার রেল গার্ডের চাকরি, সারাদিন খেটে খুটে এসে বাড়ীতে যদি এই কুরুক্ষেত্র হ, তবে বল মা তারা দাঁড়াই কোথায়।

[মা চলিয়া গেলেন। কৃপাণ শয়ন ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল]

কৃপাণ। কি কেলেংকারী বলো তো! গার্ডের চাকুরী—রাতে ডিউটি থাকলে বাড়ী ফিরতে এমনি রাত হয়েই থাকে, তবু এই আশা নিয়ে ঘর পানে ছুটি—নতুন বৌ, রাত জেগে পথ চেয়ে বসে আছে। তা কিনা—

[ঘরের ভিতর সিগারেটের গন্ধ পাইল এবং বার কতক নাক টানিয়া নিঃসন্দেহ হইল]

কৃপাণ। ঘরে সিগারেটের গন্ধ পাচ্ছি।

ইলা। সিগারেট। কই, না তো!

কৃপাণ। হ্যাঁ। আমি কৃপাণ বোস। জীবনে কখনো সিগারেট ছুঁইনি। কাজেই তার গন্ধটা আমার নাকেই লাগবে বেশী। ইলা, বল ঘরে কে এসে ছিলো।

ইলা। তুমি বলছো কি?

কৃপাণ। (পুনরায় নাক শুঁকিয়া) হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ঠিক বলছি। এখনি এঘরে সিগারেট খেয়ে গেছে কেউ। এখনো তার কড়া গন্ধ পাচ্ছি। কে খেয়েছে সিগারেট? কে এসেছিল ঘরে? (বাতায়নটি উন্মুক্ত দেখিয়া) জানালাটা খোলা—(ছুটিয়া জানলায় গিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া চারিদিকে দেখিয়া) কে ওখানে? (কোন সাড়া না পাইয়া ইলার সামনে ফিরিয়া আসিয়া) ভেবেছিলে আমি রেলের গার্ড। রাতে নাও বা ফিরতে পারি। ভাগ্যিস ফিরেছিলাম তাই আজ ধরতে পারলাম—কেমন বৌ আমি ঘরে এনেছি।

ইলা। শোনো—শোনো—

কৃপাণ। কি আবার শুনবো? হাতে-নাতে ধরা পড়ে গিয়েও আবার কথা বলছো? (রাগের চোটে ছুটিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া চেঁচাইয়া ডাকিতে লাগিল) মা, মা, শিগগীর শুনে যাও।

[ইলা কাঠের মূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল]

কৃপাণ। আমি তখনি মাকে বলেছিলাম—সহরের মেয়ে ঘরে এনো না। মা তোমার রূপ দেখে মজে গেলেন।

[মায়ের প্রবেশ]

মা। কি বাবা, ব্যাপার কি?

কৃপাণ। অত কড়া নাড়াতেও দরজা খুলছিলো না তোমার বৌ কেন জানো?

মা। কেন বাবা?

কৃপাণ। ঘরে তখন লোক ছিল।

মা। সে কি?

কৃপাণ। হ্যাঁ মা। জানলা দিয়ে তাকে পাচার করে তবে দরজা খোলা হয়েছে।

মা। না, না, এ তুই কি বলছিস বাবা!

কৃপাণ। ঘরের ভিতর এসো মা। সিগারেটের গন্ধ পাচ্ছো? হ্যাঁ—এখনো তো রয়েছে।

মা। (নাক শুঁকিয়া) তাই তো! সিগারেটের গন্ধ তো! বৌমা, তোমার চালচলন ভালো বুঝিনি এটা সত্যি —কিন্তু তুমি যে এতদূর অধঃপাতে গেছ—ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

কৃপাণ। এই বৌ নিয়ে আমাকে ঘর করতে হবে মা?

মা। আগেকার দিন হলে মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে লাথি মেরে বের করে দিতেন এমন বৌকে কর্তারা। ছিঃ! ছিঃ! ঘেন্নায় মরছি। এখন কর্তা তুমি, যা করতে হয় করো।

কৃপাণ। এতক্ষণ আমি ওকে খুন করিনি কেন তাই ভাবছি।

মা। না—না—বাবা, ওসব খুন খারাপি থাক। হাতে দড়ি পড়বে—শত্রু হাসবে। রাত ভোর হোক, মানে মানে এ পাপ বিদেয় হোক বাপের বাড়ী। হ্যাঁ বাবা, কাল ভোরে ঐ কুলটার মুখ দেখতে হয়না যেন আমাকে।

ইলা। শুনুন মা, আপনার পায়ে পড়ছি, শুনুন।

মা। কি আবার শুনবো? ঐ চাঁদপানা মুখের দুফোঁটা চোখের জল দেখে কচি ছেলে তোমার কথায় ভুলতে পারে, আমি ভুলবো না। এক কাপড়ে এবাড়ী ছেড়ে চলে যাবে কাল সকালে।

[মা চলিয়া গেলেন। কৃপাণ দরজাটি বন্ধ করিয়া দিল]

কৃপাণ। কুলটা! মা ঠিকই বলেছেন।

ইলা। আমি কুলটা—একথা শোনার পর আর কিছু বলতে আমারও ঘেন্না হচ্ছে।

কৃপাণ। চোরের মা'র বড় গলা—আমাদের দেশে একটা কথা চালু আছে। কথাটা দেখছি মিথ্যে নয়। কিন্তু আমি ভাবছি এ-ই যদি তোমার মনে ছিল, এ বিয়েতে তুমি রাজি হলে কেন? যে বাবুটি, খুড়ি, যে দাদাটি আজ ঘরে এসেছিল, তাকে বিয়ে করতে বাধাটা ছিল কি? ও, বুঝেছি, দাদাটি হয়ত বেকার, তাই বাপ-মা'র হয়ত অমত হলো। আর তুমিও বুঝলে, আমার যখন রেল গার্ডের চাকরি—মাসের মধ্যে অনেক-গুলো রাত তোমার ঘরটা খালিই থাকবে—রথ দেখা হবে, কলা বেচাও চলবে।

ইলা। অভদ্র তুমি—ইতর তুমি! এক নিমিষে তোমাকে বুঝিয়ে দিতে পারতাম, তুমি আমাকে কতটা ভুল বুঝেছ। কিন্তু তোমাদের ইতরামিতে সে প্রবৃত্তি আর আমার নেই। রাত ভোর হবার অপেক্ষাও আমি আর করতে চাইনা। আমি চলে যাচ্ছি এখনি।

কৃপাণ। অত সহজে আমি তোমাকে ছাড়তে পারিনে ইলাদেবী। তোমার গুপ্ত প্রেমের কাহিনীটা আমি সবিস্তারে শুনে রাখতে চাই। কারণ তোমার নাগরটিকেও আমার জানা দরকার। অতীতটা উদ্ঘাটন করে দেবো।

ইলা। (চট করিয়া তাহার বিছানার তল হইতে এক তাড়া চিঠি বাহির করিয়া সে চিঠির তাড়া কৃপাণের দিকে ছুঁড়িয়া দিল) আমার অতীতটা যাই হোক, তোমার অতীতের চেয়ে বেশী চিত্তাকর্ষক নয়। তোমার ভালবাসার মিসেস ডলি পলের ঐ হৃদয় বিদারক চিঠিগুলো পড়েই তবে আমি একথা বলতে পাচ্ছি।

কৃপাণ। (চিঠির তাড়াটি তুলিয়া তাহা পকেটে পুরিল) হুঁ, চিঠিগুলো তবে পড়েছ—তার মানে, আমার বাক্সটাক্স সব ঘাটা হয়েছে।

ইলা। হ্যাঁ, তা হয়েছে। তবে নিশ্চিন্ত থাকো—কিছু হারায়নি। ডলি পলের সঙ্গে নানা পোজে তোলা তোমার মনোরম ফটোগুলোও যথাস্থানেই আছে। আচ্ছা, আমি তবে আসি।

[যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল]

কৃপাণ। দাঁড়াও। শোন।

ইলা। বল।

কৃপাণ। আমি বলছিলাম, কি, তুমি এভাবে চলে গেলেও কেলেংকারীটা কিছু কম হবেনা।

ইলা। হোক। উপায় কি ?

কৃপাণ। উপায় হয়ত এখনো আছে।

ইলা। আমি কুলটা—একথা শোনার পর আর কিছু আমি শুনতে চাইনা।

কৃপাণ। অতীত সবারই থাকে। আমারো আছে, তোমারও আছে। অস্বীকার করছি না, মিসেস ডলি পল, আমার জীবনে সত্যি সত্যিই একদিন এসেছিল ঝড়ের মতো। বিশ্বাস কর ইলা, আমার জীবনের সে ঝড়টা কেটে গেছে। আর কেটে গেছে বলেই আমি বিয়ে করতে পেরেছিলাম তোমাকে। এমনি একটা ঝড় হয়ত তোমার জীবনেও উঠেছিল। কিন্তু আজ যখন তুমি আমার সঙ্গে ঘর বেঁধেছ, তোমার মনের দোর—জানলাগুলো বন্ধ রেখে সে ঝড়টাকে ঠেকানোই কি উচিত ছিলনা ইলা ?

ইলা। তোমার একথাগুলো আমার শুনতে কেন যেন বেশ ভাল লাগলো। মনে হচ্ছে বেশ প্রাণখুলেই তুমি কথা কইলে।

কৃপাণ। তুমিও বলো। তুমিও প্রাণখুলেই আমায় সব বলো। এ যুগের যা ধারা তাতে আপোষ করে না চললে উপায় নেই। ভুল ভ্রান্তি মানুষের হয়—মানুষ যখন তা বোঝে, তাকে এড়িয়ে চলতেই চেষ্টা করে। চেষ্টাটা যদি আন্তরিক হয় জীবনের অনেক গরমিল দূর হয়ে যায়। প্রাণ খুলে যদি তোমার কাহিনীটা বল, হয়ত আবার আমরা একটা পথ খুঁজে পেতে পারি ইলা। (মনে হইল কৃপাণের কথাগুলি ইলার মনে দাগ কাটিল। সে ক্ষণকাল কি ভাবিল। তারপর হঠাৎ স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়াইল)।

ইলা। তুমি বসো, আমি বলছি, কিন্তু আমার একটু সময় লাগবে।

[ইলা চট করিয়া তাহার ক্যাশ বাক্সটি কাছে গিয়া চাবি দিয়া বাক্সটি খুলিল—খুলিয়া একটি সিগারেট কেশ হইতে একটি সিগারেট বাহির করিয়া উহা মুখে লইয়া দিয়াশলাই জ্বালাইয়া ধরাইল এবং সিগারেট টানিতে টানিতে স্বামীর সম্মুখে আসিল।]

কৃপাণ। (সবিস্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল) ইলা!

ইলা। বলো—

কৃপাণ। তুমি—তুমি সিগ্রেট খাও!

ইলা। (মাথা নাড়িয়া জানাইল—হুঁ।)

কৃপাণ। আমি আসবার আগে তবে তুমিই সিগ্রেট খাচ্ছিলে ?

ইলা। (মাথা নাড়িয়া জানাইল—হুঁ।) আমার দাদা ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানীর সেলসম্যান। নেশাটা ধরেছিলাম লুকিয়ে। বিয়ের পরও বদ অভ্যাসটা--

কৃপাণ। এত কাণ্ড হয়ে গেল, অথচ একথাটা একবার বললে না ?

ইলা। বলবার সময় দিলে কৈ ? আর, শাশুড়ীর সামনে এ কথাটা বলবারও নয়। বাঙালী ঘরের মেয়েদের এটা এখনো একটা পাপ।

কৃপাণ। কিন্তু আমার কাছেও তো চুপি চুপি বলতে পারতে!

ইলা। সারা জীবনে তুমি সিগ্রেট ছোঁওনি। আমি সাহস পাইনি।

কৃপাণ। ইলা! আমার ইলা!

(স্ত্রীকে বুকে চাপিয়া ধরিল।)

—যবনিকা—

বিচ্ছেদ

অরুণা মুখোপাধ্যায়

হঠাৎ নিকটে কোথাও একটা বিকট শব্দে বাজ পড়লো। চমকে ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসলো সুলতা। বন্ধ জানালার শার্সির ভেতর দিয়ে বিদ্যুতের ঝলক তার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। এই বর্ষণ মুখরিত শ্রাবণরাত্রে একা ঘরে সুলতার কি এক অজানা আতঙ্কে গা যেন শিউরে—উঠলো। বাইরের বারান্দার একটা জানলা এই সময় শব্দ করে খুলে গেল। সুলতা ভাবলো জানলাটা বোধহয় বন্ধ করা হয় নি। সে বিছানা থেকে নেমে ঘরের দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এল। আবার বিদ্যুৎ ঝলকে উঠলো। তার আলোতে জানলার কাছে এক ছায়া মূর্তিকে দেখল সুলতা! আতঙ্কে চীৎকার করতে গেল কিন্তু তার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোল না। সে কোনরকমে দেয়ালের দিকে হাত দিয়ে আলোর সুইচটা টিপে দিল। কিন্তু তার পরেই সে আগন্তুকের দিকে চেয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। সে কোনরকমে অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করলো—"তুমি, এভাবে, এসময়ে—তোমার তো আরো দুদিন পরে আসার কথা।" আগন্তুকের জলসিক্ত মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠলো। চিবিয়ে চিবিয়ে সে বললো—

"হ্যাঁ আমার দুদিন পরে আসার কথা ছিল বটে কিন্তু আমি দুদিন আগেই এসে পড়েছি, আর এই সময়ে আসাই আমি পছন্দ করেছি।"

এবারে ঝাঁঝিয়ে উঠলো সুলতা। বললো—"বুঝতে পেরেছি আমার উপর গোয়েন্দাগিরি করবার জন্যই এই সময় এইভাবে তুমি এসেছ। ছি ছি-ছি এইভাবে নিজের স্ত্রীকে সন্দেহ করতে তোমার এতটুকু লজ্জা হয় না।"

গম্ভীর মুখে সমরেশ উত্তর দেয়—"সন্দেহ করবার কিছু কারণ না থাকলে সন্দেহ কি আসে সুলতা?"

সুলতার মুখ যেন কালো হয়ে গেল। সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাতরোক্তি করে উঠলো—"না, না, এভাবে আর চলে না। যা হয় একটা কিছু ব্যবস্থা করা দরকার।" বলেই সে ঝটকা মেরে পাশের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে থাকা সমরেশের মুখ থেকেও ক্লান্ত উত্তর বেরিয়ে এলো—"হ্যাঁ, ব্যবস্থা একটা করতেই হবে।"

তারপর একদিন আদালতের কক্ষে সুলতা ও সমরেশের বিচ্ছেদ পাকাপাকি ভাবেই স্থির হয়ে গেল! কিন্তু কেন এই বিচ্ছেদ?

পারিবারিক জীবনের সমষ্টি হলো সমাজজীবন আর সমাজজীবনকে শ্রীমণ্ডিত করে গড়ে তোলাই আমাদের কর্তব্য; কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখতে পাই এই পারিবারিক জীবন প্রায় প্রতিগৃহেই নিয়ত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, অসংগত ব্যবহার অবিশ্বাস ও নিষ্ঠুরতার জন্য মাঝে মাঝে অসহ্য হয়ে ওঠে। দাম্পত্যজীবন ঠিক এর ফলেই অনেকের কাছে ভয়াবহ ও বিষময় আর এরই চরম পরিণতি রূপে স্বামী-স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের আশ্রয়প্রার্থী হয়ে ভিড় করে আদালতে। আদালতে এই ধরণের মামলা এখন প্রচুর; শিক্ষিত, অশিক্ষিত ধনী, মধ্যবিত্ত কেউ-ই এর মধ্যে থেকে বাদ পড়েন না। আদালতে এই ধরণের মামলার অনেক সময় বহুবছর ধরেও অবসান হয় না আবার কোথাও বা অল্পদিনের মধ্যেই এর পরিসমাপ্তি ঘটে। পাত্র-পাত্রী বহু কারণ নিয়েই আদালতে এই মামলা দায়ের করেন; তবে এর মধ্যে ব্যাভিচারিত্ব (adultery অথবা নিষ্ঠুর আচরণই (cruelty) বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই বিচ্ছেদের মামলার প্রধান কারণ হয়ে থাকে।

বর্ত্তমানে ১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইনে বিচ্ছেদের যে সব কারণ দেখানো আছে তার প্রত্যেকটি কতখানি গ্রহণ যোগ্য এ বিষয় নিয়ে আইনের দৃষ্টিতে আলোচনা করার আগে আমরা সাধারণভাবেসমাজগত চারটি কারণকে বিশ্লেষণ করব যেগুলি বিচ্ছেদের পক্ষে একান্ত সহায়ক। এখন দেখা যাক্ কেন এই বিচ্ছেদ ও 'কি কি কারণে' প্রথম কারণটির প্রসঙ্গে বলা যায় পরিবারে আর্থিক অস্বচ্ছলতা, দ্বিতীয়তঃ যৌথ পরিবারের বিলুপ্তি সাধন, তৃতীয়তঃ সামাজিক প্রগতিতে ধর্ম, জাতি ও বর্ণ বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে বিবাহের প্রবর্তন ও চতুর্থতঃ স্বামী ও স্ত্রীর মানসিক প্রকৃতির তারতম্য।

এখন প্রত্যেকটী কারণকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা যাক্। (১) বর্তমান আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য প্রায় বেশির ভাগ মেয়েকেই ঘরের বাইরে কর্মক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সমান প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হয়। এতে তাঁদের অবিরত কর্ম করার ফলে পুরুষ সুলভ এক প্রকার কঠিন ভাব আসে এবং একটা যেন প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের সৃষ্টি হয়। গোপন অথবা প্রকাশ্যে নিজেদের মধ্যে যে বিদ্বেষভাব জাগে তার প্রধান উৎস হলো এটি। এই প্রসঙ্গে বহু ভাষায় অনূদিত 'Love and marriage' নামক গ্রন্থটিতে Ellen Kev বলেছেন পূর্বের মত স্ত্রী পুরুষের পৃথক কর্মবিভাগ না হলে এই প্রতিযোগিতা, এই বিদ্বেষভাব এক ভীষণ রূপ ধারণ করবে। ক্রমে স্ত্রীলোকদের মধ্যে মাতৃভাব প্রবৃত্ত ও ক্ষমতার অবসান হবে। অন্য কোনরূপ মাঝামাঝি বন্দোবস্ত হওয়া অসম্ভব। এই ধরণের কাঠিন্য ও বিদ্বেষভাব বিবাহিত জীবনকে শান্তিময় করার একান্ত পরিপন্থী।

জীবন সংগ্রামের নানা ঝঞ্ঝাট ও ভগ্নাশা নিয়ে কর্মক্ষেত্র হতে যখন স্বামী, স্ত্রী উভয়েই ক্লান্ত দেহ মনে বাড়ী ফেরেন তখন সেখানে শান্তি, তৃপ্তি ও ভালবাসার অবসর কোথায়? বাড়ী ফিরে কর্ম্মী স্ত্রীকে 'সহধর্ম্মিণী' রূপে স্বামী পাবার ইচ্ছকরলে ক্লান্ত স্ত্রী তখন অনেক সময়ই নিজেকে অফিস কর্ম্মি মনে করে পুরুষের মতই একটু বিশ্রাম কামনা করে। বহু ক্ষেত্রেই সেখানে পরস্পরের মধুর ব্যবহার ও যত্নের অভাবে শান্তি নীড় গড়ে ওঠে না। সামান্য কারণেই অনেক ক্ষেত্রে রূঢ় কথা অথবা কলহ হয়। জলন্ত অগ্নির শিখা ক্রমেই প্রজ্বলিত হতে থাকে। এরই শেষ পরিণতি বিবাহ বিচ্ছেদ। কোমল প্রবৃত্তির আধার নারীহৃদয়ের এখানেই হয় অপমৃত্যু। অনেক সময় স্বামীর ছোট খাটো দোষত্রুটীও দিনের পর দিন স্ত্রী বিষাক্ত চোখে দেখতে আরম্ভ করে; সূক্ষ্ম সুকুমার বৃত্তি একান্ত অজ্ঞাতে নারীর হৃদয় হতে অন্তর্হিত হয়। বাইরের জগতে নিজের স্থান করে নিতে গিয়ে অনেক সময় সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অবচেতন মনে গৃহের সম্বন্ধকে অস্বীকার করে বসে; পারিবারিক পরিবেশে শান্তি না থাকায় ক্রমশই তা বিষাক্ত হয়ে ওঠে। বাইরের জগতে বিরাট কর্মক্ষেত্রে একটা নতুন চিন্তা, একটা নতুন চেতনা, একটা নতুন উদ্ভাবনীশক্তি তাকে বুদ্ধিবৃত্তিতে সজাগ করে তোলে। নতুন নতুন আইনের ব্যাখ্যার বিশ্লেষণের একদিন সে সমাধান করে ফেলে তার জীবনের চরম মুহূর্ত্তের সমস্যাটিকে। বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের প্রতিটি ধারাকে সে তখন অনুধাবন করে জীবনের জটিল গ্রন্থীকে সরল করার প্রয়াসে। অবশ্য এটি যেমন স্ত্রীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পুরুষোষের ক্ষেত্রেও সমভাবে এই একই সমস্যা বর্ত্তমান। সংসারের প্রতিটি কাজে স্ত্রীর সামান্যতম ভুলত্রুটিও অনেক সময় স্বামীর দৃষ্টি এড়ায় না। এই থেকেই দারুণ ক্রোধানল জলে উঠে স্বামীর মনে, আর তারফলেই শুরু হয় বাক্-বিতণ্ডা। বহু পরিবারেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্য এই ধরণের মনোভাব সুখী বিবাহ গঠনে একান্ত বিঘ্নস্বরূপ। আদালতে এক মামলার ক্ষেত্রে দেখেছি মধ্যবিত্ত পরিবারে একটি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে নিয়ত অন্তর্দ্বন্দ্ব হতে থাকার ফলে দুজনেই পৃথকভাবে সবাস করছেন। দোষের মধ্যে স্ত্রী সংসারের সব কাজ নিখুঁতভাবে করা সত্ত্বেও অনেক সময় স্বামীর কাজে একটু শৈথিল্য প্রদর্শন করে। এতেই ক্রুদ্ধ স্বামী আরো বেশিভাবে উত্তেজিত হয়ে স্ত্রীকে নানাভাবে গালি-গালাজ করে ও অনেক সময় প্রহার পর্য্যন্ত করতে উদ্যত হয়। দিনের পর দিন এইভাবে চলতে থাকায় অভিমানী স্ত্রী একদিন মনের ক্ষোভে বাপের বাড়ী চলে যায় ও সেই থেকে আজো অবধি কোন সম্পর্ক রাখেনি। শুনেছি স্বামী, স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার জন্য কোর্টে দরখাস্ত করেছে; স্ত্রী কিন্তু ফিরে আসতে চায় না জীবন উদ্বেগজনক হতে পারে এই আশঙ্কায়। আদালতে এই ধরণের মামলা

বহু দেখেছি। তবে অনেক সময় সৎপরামর্শ বা উপকারী বন্ধুর সহযোগিতায় অনেকে নিজেদের মধ্যে মিটমাট করে মামলা উঠিয়ে নেন।

আধুনিক যুগে বাইরের জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ থাকার ফলে স্বামী অথবা স্ত্রী হয়তো বা অন্য কারোর প্রতি আকৃষ্ট হন। পৃথক ব্যক্তিত্ব লাভ করে তাঁরা তখন যে জটিল অসুস্থ আবহাওয়া সৃষ্টি করেন তা থেকেই জন্ম লাভ করে অনেক সময় বিচ্ছেদের কারণটির—যার ভিত্তি হলো ব্যভিচারিত্ব বা adultry আদালতে এই ধরণের মামলা প্রচুর। একবার এক ভদ্রলোক তাঁর চাকুরীরতা স্ত্রীর বিরুদ্ধে বিচ্ছেদের মামলা নিয়ে আসেন ব্যভিচারিত্বের কারণকে ভিত্তি করে। স্ত্রী অবশ্য এরজন্য স্বামীর ছোট বংশ ও হীন মনকে দায়ী করে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ বলে দাবী করেন। বিচ্ছেদের অনেক মামলাতেই এই ধরণের কারণ থাকে।

এবারে দ্বিতীয় কারণটির প্রসঙ্গে আসা যাক্। (২) বর্ত্তমান ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য প্রীতির চাপে ও পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে যৌথ পরিবারের বিলুপ্তি সাধন ঘটার ফলে বিবাহিত জীবনে একদিকে যেমন সুখ ও সুবিধা আছে, ঠিক তেমনি বহুক্ষণ স্বামী ও স্ত্রী একত্রে সান্নিধ্য লাভ করার ফলে অনেক সময় একপ্রকার বিতৃষ্ণারও উদ্ভব হয়। যৌথ পরিবারে আগের দিনে মা ঠাকুমাদের আমলে বাড়ীর বৌয়েদের খুব কমই দিবাভাগে স্বামীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার সুযোগ থাকতো ও তারফলে পরস্পরের সান্নিধ্য কম লাভ হওয়ায় দাম্পত্যজীবনের আকর্ষণও স্থায়ী হতো। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যৌথ পরিবার দাম্পত্য প্রেমের মাধুর্যকে ক্ষুণ্ণ করে না; বরং বর্ধিতই করে। মানুষে মানুষে সাম্য, স্বার্থ বিসর্জন করে পারস্পরিক সহযোগিতা, কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি উচ্চাদর্শ যৌথ পরিবার-প্রথার ভিত্তি। এ ছাড়া রক্ষণশীল গৃহস্বামীর কর্তৃত্বাধীনে থাকায় অবিরত স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব হবার ভয় থাকে না।

এবারে তৃতীয় কারণটির পর্যায়ে অর্থাৎ সামাজিক প্রগতিতে ধর্ম্ম জাতি ও বর্ণবৈষম্যের বিলুপ্তি সাধন ঘটিয়ে যাঁরা বিয়ে করছেন তাঁদের আলোচনায় আসা যাক্। বর্তমান যুগে অনেকেই এই ধরণের তারতম্যকে অস্বীকার করে নিজেদের পছন্দমত বিয়ে করছেন; কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই অনেক সময় তাঁদের খেয়ালের জন্য অথবা কোন একটি গুণে অন্ধভাবে আকৃষ্ট হবার ফলে এই বিয়ে সংঘটিত হয়। ফলে বাস্তবতার সংঘর্ষে সামান্য কিছুদিনের মধ্যেই দাম্পত্যজীবনে ভাঙন ধরে। একবার মনে পড়ে এক ভদ্রলোক বিচ্ছেদের মামলা নিয়ে আসেন। ছেলেটি অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের। বাবা মায়ের অমতে নিজেই পছন্দ করে বিয়ে করে। মেয়েটি ধনীর ঘরের একমাত্র কন্যা। বিয়ের অল্পদিন পরেই সামান্য আয়ের দ্বারা সংসার চালানোমেয়েটির কাছে অসহ্য হয়ে পড়ে ও এই নিয়ে প্রায়ই বাক্‌বিতাণ্ড উপস্থিত হয়। এর কারণ অবশ্য প্রধানতঃ দুইটি: প্রথমতঃ বেশীবয়সে বিয়ে করার ফলে পৃথক ব্যক্তিত্ব অর্জ্জন করে অল্পবয়সের মতন পরের সঙ্গে মিশে যাবার ক্ষমতা তাঁদের লোপ পায় ও দ্বিতীয়তঃ অভিজ্ঞ বাবা মায়ের বিনা অনুমতিতে তাঁরা যে বিয়ে করেন সেটি অনেক ক্ষেত্রেই বংশ জাতি কুল ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে পাত্র পাত্রীর মানসিক গঠনের তারতম্য না দেখে হয় বলে পরবর্তী দাম্পত্য-জীবন হয়তো সুখের হয় না। পরস্পরের স্বভাবের বা চরিত্রের অজ্ঞান বা অপ্রত্যাশিত রূপ প্রকাশের সঙ্গেই কলহ আরও বেশী করে দেখা যায় তখন পূর্ব্বের আকর্ষণ-স্মৃতি জাগরিত হয়; নিজে বা অপরের দ্বারায় প্রতারিত হয়েছে এই বিশ্বাসে তাঁরা নিজেদের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ মামলার দ্বারস্থ হতে চান।

এই ধরণের মামলা প্রসঙ্গে একবার একটি মেয়ে আমার কাছে আসে। মেয়েটি ১৯৫৪ সালের বিশেষবিবাহ আইনে রেজেষ্ট্রি করে একটি ছেলেকে ভালবেসে বিয়ে করে গোপনে। বিয়ের পরে মেয়েটি বাবার কাছেই থাকে কুমারী মেয়ের মত কোন কথা না জানিয়ে। এর ৩'৪ মাস পরেই ছেলেটি যখন মেয়েটিকে স্ত্রীরূপে বাড়ীতে নিয়ে যেতে চায় মেয়েটি তখন যেতে অস্বীকার করে। ফিরে না যাবার অজুহাতে মেয়েটি বলে রেজেষ্ট্রি করার অল্পদিন পরেই মেয়েটি জানতে পেরেছে যে ছেলেটি দুশ্চরিত্র ও এখন স্বামী স্ত্রী রূপে বসবাস করা মেয়েটির পক্ষে অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে বিশেষ বিবাহ আইনে উভয়ের মত নিয়ে বিচ্ছেদ (Divorce by mutual consent) করার যে প্রথা আছে তা বিশেষ সহায়ক, অবশ্য যদি তাদের দুজনেরই

মত থাকে। কারণ স্বামীর চরিত্রে দোষারোপ করলে অনেক সময় স্বামী জেদের বশবর্তী হয়ে বিয়েকে স্বীকার করে স্ত্রীকে ফিরে পাবার জন্য আদালতে দরখাস্ত করেন। সুতরাং এ সব ক্ষেত্রে মনে হয় বাবা মায়ের অভিজ্ঞতা ও বিচার বুদ্ধি দ্বারা যে সব বিয়ে হয় তা অপেক্ষাকৃত সুখের। অবশ্য এ সব বিয়ের মধ্যেও মাঝে মাঝে দাম্পত্য জীবনে যে ভাঙন ধরে না তা বলছি না।

এবারে শেষ কারণ অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মানসিক বৈষম্য নিয়ে আলোচনা করা যায়। এটি একটি বিশেষ কারণ যা অপ্রকাশ্যভাবে দাম্পত্যপ্রেমে ফাটল ধরায়। যৌন সম্বন্ধকে স্বীকার করার পক্ষে স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই অনেক সময়ে বিভিন্ন মত পোষণ করে। এটির কারণ মেয়েদের দৈহিক ও স্বভাবগত বৈষম্য। Dr. Alfred Kinsey এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে পুরুষ ও নারীর মূলতঃ দৈহিক বৈষম্য থেকেই এটির উৎপত্তি।...... "No man knows what it feels like to be pregnant, ..."Men, on the otherhand, can be aroused quiekly,and by a variety of external stimuli that have little effect on women."

মেয়েরা সাধারণতঃ কোমল, মৃদু, অনুভূতিপ্রবণ ও লাজুক স্বভাব সম্পন্ন, কিন্তু পুরুষ বেশিরভাগই অগ্রগামী। এ সব ব্যাপারে অনেক সময় দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর স্বভাবগত বৈষম্য না বুঝে স্বামী যদি দিনের পর দিন ভুল বুঝতে থাকেন তবে অনেক সময় এর ফল বিষময় হয়ে দাঁড়ায়। এ সময় মানসিক কঠিন ব্যাধি ও এমন কি উন্মাদ রোগে অনেক সময় আক্রান্ত হয় স্ত্রী; তখন তাকে পাগল আখ্যা দিয়ে বিচ্ছেদের মামলা যে স্বামী আনেন না এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয় সমাজে।

১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইনে ১৩ নম্বর ধারায় বিচ্ছেদের কতকগুলি নির্দিষ্ট কারণ আছে:—যেমন ব্যভিচারিত্ব, ধর্মান্তর গ্রহণ, বিকৃত মস্তিষ্ক, সাংঘাতিক দুরারোগ্য কুষ্ঠ ও যৌন ব্যাধি, সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ, নিরুদ্দিষ্ট হওয়া ও দাম্পত্যজীবনের কর্তব্যে বিরত থাকা।

এখন দেখা যায় কারণগুলির প্রত্যেকটি কতটা গ্রহণযোগ্য। প্রথমেই 'ব্যভিচারীত্ব' কারণটির প্রসঙ্গে আসা যাক। মনে করুন যদি কোন এক অতীতে এই ধরণের কোন কারণ ঘটে থাকে তাহলেও কি এটি বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য? আইন কিন্তু সে কথা বলে না। বিচ্ছেদের দরখাস্ত দেওয়ার ঠিক আগেই এই ধরণের ঘটনা প্রমাণিত হওয়া চাই। এরপর আসে ধর্মান্তর গ্রহণের প্রশ্নটি। এটি কিন্তু দাম্পত্য প্রেমে সঙ্গত ও এই কারণটির উপর ভিত্তি করে বিচ্ছেদের মামলা অল্পই হয়। এরপর হলো বিকৃত মস্তিষ্কের কারণটি। এটিও বিচ্ছেদের পক্ষে এক বিশেষ কারণ যদি এটি চিকিৎসার অসাধ্য বলে প্রতিপন্ন হয়। কারণ বিকৃত মস্তিষ্ক সম্পন্ন পিতামাতার ভবিষ্যৎ বংশধরেরাও এ ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে সমাজ ও দেশের এক অপূরণীয় ক্ষতি। তবে এই কারণটি গ্রহণ করার পক্ষে একটু বেশিমাত্রায় সাবধানতার প্রয়োজন। অনেক সময় বিকৃত মস্তিষ্কের ইচ্ছাকৃতভাবে অপব্যবহার করা হয় দরখাস্তকারীর কৌশলে। এ ধরণের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের সাক্ষ্য, আদালতের অনুসন্ধান ও মতামত নিয়ে তবেই কারণটি গ্রহণযোগ্য কিনা দেখা উচিত। বর্তমান বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার যুগে চিকিৎসার অসাধ্য হলে খুব কম রোগই প্রতিপন্ন হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কুষ্ঠ ব্যাধিকেও বিচার করতে হবে। তবে যৌনব্যাধি প্রসঙ্গে বলা যায় যে এটি চিকিৎসার সাধ্য বা অজানিতে সংক্রামিত হলেও এটিকে বিচ্ছেদের অন্যতম কারণরূপে গ্রহণ করা যায়। কারণ এই কুৎসিত রোগাক্রান্ত পিতা-মাতার শিশুরা এই রোগ যে দেশে সংক্রামিত করবেনা তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এ ছাড়া অবশ্য সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ, নিরুদ্দিষ্ট হওয়া ও দাম্পত্যজীবনের কর্তব্যে বিরত থাকা এগুলিকেও বিচ্ছেদের গ্রহণযোগ্য কারণ বলে ধরা যেতে পারে।

বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করার আগে আমি একবার দেখব সমাজে বিচ্ছেদ যাতে না হয় (অবশ্য একান্ত যুক্তিযুক্ত কারণ ও আবশ্যক না হলে) তার জন্য প্রতিকার কি? সাধারণ দৃষ্টিতে এর কয়েকটি প্রতিকার আছে। যেমন:—

(১) বিবাহের অনুপযোগী দুর্বল, অক্ষম ও রুগণ ছেলের বিবাহ না দেওয়া; মানসিক অসুস্থ, নির্বোধ ও হাবা প্রকৃতির পাত্র-পাত্রীকেও বিয়েতে প্ররোচিত না করা উচিত। অনেক সময় এ ধরণের প্রকৃতি গোপন করে

বিয়ে দিলে পরবর্ত্তী দাম্পত্যজীবনে অনেক কুফল দেখা দেয়। একবার একটি মেয়ে আইনের পরামর্শ নিতে আসে। বিয়ের অল্পদিন পরেই সে জানতে পারে তার স্বামী হাবা প্রকৃতির। কোন কথই বুঝিয়ে বা গুছিয়ে বলতে পারে না। সমন্ত কথাতেই কেঁদে ফেলে বা গুরুগম্ভীর আলোচনার মধ্যে প্রচণ্ড জোরে হাসতে আরম্ভ করে। অথচ নিজের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে সচেতন। আমি তাকে এ বিয়ে নির্বুদ্ধিতার (idiocy) কারণকে ভিত্তি করে বাতিলযোগ্য বলে পরামর্শ দিয়েছিলাম।

(২) বিয়ের আগে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা ভাল করে বোঝাপড়া হওয়া উচিত। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কোন কথা গোপন না করে সব কথা বিশেষ করে সুখদুঃখের কথা পরস্পরকে বলা ভাল। এ ছাড়া চিকিৎসক উকীল ও ব্যবসা ও কর্ম্মসংক্রান্ত কাজে ব্যাপৃত সব স্বামীদেরই উচিত মাঝে মাঝে কর্ম্ম হতে অবসর নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া অথবা সামাজিক আমোদ উৎসবে পরিবার-ভুক্ত হয়ে যোগদান করা। মেয়েরা যে স্নেহ, মায়া, ভালবাসা স্বামীর কাছ হতে পাবার জন্য উন্মুখ থাকেন এটি তার সহায়ক। অবশ্য স্ত্রীদেরও উচিত স্বামীর কর্ম্মস্থলে মহিলা চিকিৎসক, মহিলা উকীল ও মক্কেল, মহিলা শুশ্রূষাকারী ও মহিলা সহকর্মীদের প্রতি সর্ব্বদাই সন্দেহের চোখে না দেখে নিজেদের মায়ের মত, বোনের মত ও মেয়ের মত মনে করে ব্যবহার করা ; এতে তাঁদের মন বহু পরিমাণে হাল্কা হয়ে যায় ; মানসিক ব্যাধিমুক্ত হয়ে তাঁরা সুখী পরিবার গড়ে তুলতে পারেন। স্বাধীন দেশের মেয়ে আমরা। পরিপূর্ণরূপে বেঁচে থাকতে গিয়ে আমরা যদি জীবনের ছোটখাটো তুচ্ছ কথা, লাভক্ষতি, বিবাদ বিসংবাদ ভুলে না গিয়ে যথার্থ শিক্ষার পথটিকে সহজভাবে গ্রহণ না করতে পারি তবে আলেয়াকে আমরা চিরদিনই আলো বলেই ভুল করব। এতেই ঘটবে নারী সমাজের অপমৃত্যু।

(৩) রেজেষ্ট্রি করে যে বিয়ে হয় তার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পাত্র-পাত্রী বাবা মাকে জানাতে ভয় পায় কেননা তারা জানে রক্ষণশীল বাবা মা এতে বাধা দেবেন। এক্ষেত্রে বাবা মায়েরও উচিত গোড়াতেই রূঢ় কথা বলে তাদের বাধা না দিয়ে প্রকৃত বন্ধুর মত দরদী মন নিয়ে সব দিক বিবেচনা করে অর্থাৎ ছেলেমেয়ের গুণাবলী, বংশপরিচয়, আর্থিক সংগতি ইত্যাদি চিন্তা করে তাঁদের মতামত দেওয়া উচিত। ছেলেমেয়েদেরও উচিত বাবা মাকে শুভাকাঙ্ক্ষী মনে করে তাঁদের মতকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা।

(৪ স্বামী অথবা স্ত্রী মানসিক অপ্রসন্ন হলে অথবা শারীরিক কাজে নির্জীবতা বোধ করলে চিকিৎসক অথবা মনস্তত্ত্ববিদের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

দাম্পত্যজীবনকে সুখময় করার প্রসঙ্গে Dr. Beck বলেছেন—"If each person is able to give enough of what the other needs emotionally, the marriage works. This does not mean that all of a person's needs must always be met. Nor must be giving and getting be alsolutely equal. It means that each spouse's basic needs must be satisfied enough of the time so that the ratio of satisfaction to frustration tolerable to both."

সুতরাং পরস্পরের প্রয়োজন অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করাই হলো দাম্পত্যজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এর জন্য অবশ্য আবশ্যক দরদী মন, আন্তরিকতা, বিশ্বাস ও নিঃস্বার্থ প্রেম।

বিদায় মাগি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

আমার যাবার সময় হল
তোমার কাছে বিদায় মাগি।
স্বাধীনতায় ধন্য হয়ে
রইলে তুমি সেই অভাগী।
কোথায় নিবিড় সে একতা ?
হৃদয় ভরা সে মমতা ?
ক্ষতি তারাই করছে,-যারা
জানায় তোমার অনুরাগী।

২

লোকোত্তর হায় সেই প্রতিভার
কোথায় পরিমণ্ডল গো ?
কোথায় সে বীর সিদ্ধ সাধক।
শুনছি কেবল কোন্দল গো।
কোথায় গেল ভারত জোড়া
সে সৌহার্দ আপন করা ?
কোথায় কৃচ্ছ্র শব সাধনা
তোমার তরে রাত্রি জাগি।

৩

চাইছে নাকি ভীমরুল হতে
চক্র রচা মৌমাছিরা ?
শুনছি ভেড়ার শৃঙ্গ হবে
যারা দেশের মুক্তা হীরা।
তপস্বীর অহিংস রাজ্য,
রইবে তবু অবিভাজ্য,
মহাজাতির মহা প্রয়াণ
দেখতে আমায় হবে নাকি ?
মাগো আমি বিদায় মাগি।

———

শোনাব আমার গান

প্রতীপ দাশগুপ্ত

আমার স্বপন ছিল নির্জন নিশীথে
শোনাব তোমায় গান,
যাব মোরা একসাথে বিজনে যখন
বেলা হবে অবসান।
তব বাঁশরীটি ল'য়ে যাবে সাথে মোর
সুদূরের উদ্দেশে,
এই ধরণীতে কেহ জানিবে না মোরা
কোথা যাব কোন্ দেশে ?

*

সন্ধ্যার সমীরণে সকল বিহগ
কুলায় ফিরিয়া আসে
পুলকিত কলরবে লঘু পাখা মেলি
স্নেহের শাবক পাশে।
কোলাহল একে একে ডুবে যায় সব
নীরবতা রাখে ঢাকি,
এই নীরবে নিবিড়ে তব লাগি সখা
ছলছলি ওঠে আঁখি।

*

এই গহনে গোপনে আঁধারের মাঝে
কণ্ঠে ওঠে যে ধ্বনি —
সেই সুরেলা ছন্দ আমার হৃদয়ে
উঠিবে গো রণরণি।
তুমি রবে মোর পাশে তখন তোমাকে
শোনাব আমার গান —
মরমের সেই গানে মুছে যাবে সব
বন্ধন অভিমান।

———
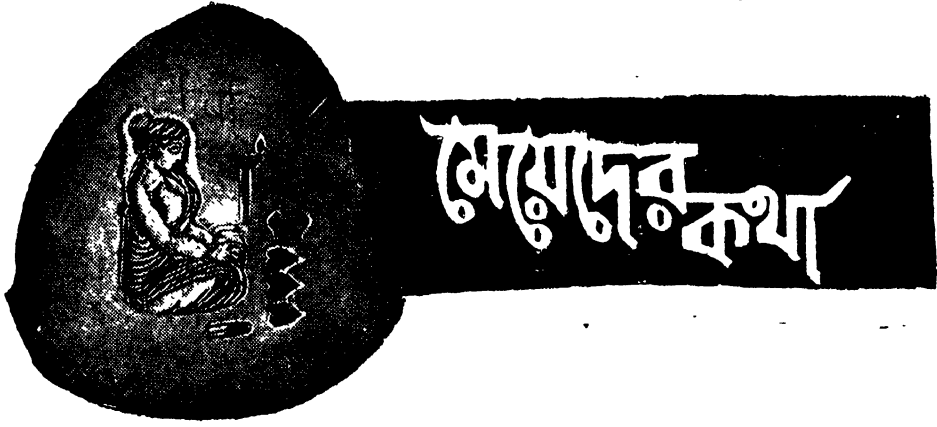
আলো / ছায়া

শ্রী যমুনা দেবী (ঘোষ)

সেদিন টিফিনের ছুটিতে মহুয়া এসে মালবিকাকে বল্লে,—"জান মালবিকা-দি, আজ আবার আমাদের বাড়ীতে কি কাণ্ড হয়েছে—।"

—"তোদের বাড়ীতে তো প্রায়ই একটা না একটা, হুজুক লেগেই থাকে। আজ আবার কি কাণ্ড ঘটল রে মহুয়া—"

—"সে ভাই আর বলো কেন? আমার পাশের ঘরে যে একজন প্রফেসর ভদ্রলোক আছেন জানো, তাঁর এক ছেলে এক মেয়ে—।

—"হ্যাঁ! হ্যাঁ! তারা আবার কি করলে? ভদ্রলোক তো খুব পোলাইট ম্যান—"

—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ! ভদ্রলোক খুব পোলাইট হলে কি হবে? তাঁর গুণধর পুত্রটি কালরাত্রে একটি মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে বল্লে—"মিতা বাবাকে নমস্কার করো।"

ভদ্রলোক তখন ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলেন। পুত্রের কণ্ঠস্বরে মুখ থেকে বইখানা নামিয়ে মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখলেন।

মেয়েটি ততক্ষণে কাছে এগিয়ে এসে নীচু হয়ে প্রণাম করতে যেতেই ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি পা-টা সরিয়ে নিয়ে পুত্রের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন,—"মেয়েটি কে মলয়—?"

—মৃদুস্বরে মলয় উত্তর দিলে,—"আমি বিয়ে করেছি।"

ভাই মালবিকা-দি তোমায় সে কি বলব! যেমনি না বলা আমি বিয়ে করেছি, অমনি যেন একটা প্রচণ্ড বজ্রপাত ঘটল ভদ্রলোকের গলা থেকে! চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে হাত দেখিয়ে, হুঙ্কার দিয়ে বল্লেন,—"এই মুহূর্তে আমার বাড়ী থেকে তোমরা বেরিয়ে যাও—আর এক সেকেণ্ডও আমার বাড়ীতে তোমার স্থান নেই।" ভাইবোনগুলো যেন সব ভয়ে কাঁটা।

পুত্র কিন্তু "পাদমেকং ন গচ্ছামি!" চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মালবিকা জিজ্ঞেস করলে,—"মেয়েটি তখন কি করলে?"

মেয়েটি কি আবার করবে। সে তো তখন ভয়ে বিস্ময়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে, কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ের মত।

ভদ্রলোক যেন বাঘের মত ক্ষেপে গেছেন। এখনও দাঁড়িয়ে আছ? আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবে না আমায় পুলিশ ডাকতে হবে? এখনও গেলে না? যাও বলছি—।

ছেলের মুখে কিন্তু একটা কথাও নেই। সে যেন হাবা-বোবা। তারপর এইভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর খুব আস্তে ধীরকণ্ঠে ডাকলে,—'বাবা আমি—

—"না! না! না! তোমার মুখে আমি কোন কথা শুনতে চাই না। আমার বাড়ী থেকে তুমি যাবে কি না আমি শুনতে চাই—?" সে কি গলার জোর—! ভদ্রলোকের হুঙ্কার দেখে আমারই ভয় করছিল।

মালবিকা জিজ্ঞেস করলে, ওরা তখন কি করলে?

—"কি আবার করবে? কিছুক্ষণ চুপ করে দু'জনে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর চলে গেল।

—"আচ্ছা মালবিকা-দি,—তুমি আমায় বলতে পার ভাই, এই যে পাশ্চাত্যের অনুকরণে বিবাহ করে সংসারে একটা অশান্তির বন্যা বইয়ে দেয়, এতে কি লাভ হয়? এ বিয়ের সার্থকতা কি?"

মালবিকা উত্তর দিলে,—"সার্থকতা কিছুই নেই মহুয়া! আসলে কি জানিস, এটা হলো আধুনিকতার যুগ-হাওয়া। পুরুষই বলো আর নারীই বলো সকলেই প্রগতিশীল। যুগ যেমন নটরাজের নৃত্যের তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে, নারীরও তেমনি তার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে অগ্রগতি হচ্ছে। শিক্ষায়, আচার অনুষ্ঠানে, পোষাক পরিচ্ছদে! সাজে-সজ্জায় নারী তার রুচির বিকাশ দিচ্ছে। কিন্তু নারীর এই রুচি শিক্ষা সংস্কৃতি ভালর পথেও যেমন অগ্রসর হচ্ছে, আবার মন্দের দিকে তেমনি এগিয়ে যাচ্ছে। এটা ভাল না মন্দ সে বিচার বিশ্লেষণ নেই। অধিকাংশ নারীই মন্দের দিকটা সৎ ও শ্রেয় বলে গ্রহণ করে। মুষ্টিমেয় নারী নীর থেকে ক্ষীর সংগ্রহ করে। কিন্তু প্রগতিশীল নারী তার বিচার বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে মেকিকেই কাঞ্চন জ্ঞানে ধরে বলেই আজ তাদের নৈতিক জীবনকে হারিয়ে ফেলছে। আজ দেশ ও সমাজ এতখানি অধঃপাতে নেমে যাচ্ছে কেন? তার কারণ হিন্দী সিনেমার অশালীন চিত্র দর্শনে তরুণ ও তরুণীর রুচি কিশলয়ের অনুকরণে তনুলতাকে সাজিয়ে প্রেমের বেসাতি করে তোলে। যেমন ভগবানকে পাবার মানসে বহুবিধ পন্থায় বিভিন্ন লোকে আরাধনা করে, তেমনি একই উদ্দেশ্য নিয়ে নানান ছন্দে বহুবিধ সজ্জায় তনুলতাকে করে তোলে সৌষ্ঠবযুক্ত। তারা বোঝে না এই কদর্যতা নারীর সম্মানে কতখানি আঘাত হানে। তাই তরুণ তরুণী, কিশোর কিশোরী, বালক বালিকারা স্কুল কলেজ পালিয়ে টিফিনের পয়সা সঞ্চয় করে ছুট দেয় ম্যাটিনী শো'তে সিনেমা দর্শনে। পয়সার অভাবে পাঠ্যপুস্তক বিক্রয়ে দ্বিধা করে না। অভিভাবকের তদারকে জানায় হারিয়ে গেছে। এরই দরুণ আসে পাশ্চাত্যানুকরণে বিবাহের আকাঙ্ক্ষা। সরকারের উচিত দেশকে বা সমাজকে রক্ষা করতে হলে; এই সব অশালীন ছবিগুলি আইন করে বন্ধ করে দেওয়া। তাই বলে, এই প্রগতির যুগে, আধুনিকতার নামে আমরা যে কত বড় মূল্যবান সৌধ হারাতে বসেছি, তা চেয়ে দেখবার অবকাশ আমাদের নেই। সেই জন্যই নারী তার নিজের ঐতিহ্যকে হারাতে বসেছে। তাই পাশ্চাত্য ভাবধারার ঢেউ নরনারীর জীবনকে করে তুলেছে বিষময়। নারীর জীবনে এসেছে সংঘাত। শান্তিময় স্থান হতে হয়েছে বিসর্জিত। যে নারীর কল্যাণ-স্পর্শে গৃহমন্দির হয় পবিত্র, মঙ্গলময়, সেই নারী আজ সেখান থেকে বহুদূরে সরে গেছে। বিসর্জিতা হয়েছে। শ্বশুর শাশুড়ী পরিজনবর্গের লক্ষ্মীরূপা বধূ নয়নের মণি হতে তারা কামনা করে না। তারা চায় স্বাধিকার। সেই জন্যই তাদের হৃদয়ে প্রেম বা ভালবাসার এতটুকু চিহ্নও থাকে না। থাকে না, ভক্তি, শ্রদ্ধা। থাকে শুধু আত্ম-ভোগ লালসা। তাই মানব হৃদয় থেকে স্নেহ, প্রীতি; ভালবাসা হারিয়ে পশুত্বের অতল তলে হারিয়ে যাচ্ছি আমরা মহুয়া—।"

—"না ভাই মালবিকা-দি, আমি তোমার কথাগুলো মেনে নিতে পারলুম না। কারণ বর্তমান যুগে মেয়েদের যখন পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে হয়, পুরুষদের সঙ্গে ছুটে গিয়ে ট্রাম, বাস ধরতে হচ্ছে। জজের সামনে দাঁড়িয়ে আর্গুমেণ্ট করতে হচ্ছে, অফিসে আদালতে পুরুষের পাশে কাজ করতে হচ্ছে; সেখানে কেন নারী পুরুষে সমান হবে না? আধুনিক যুগে, প্রগতিশীল

অন্তঃপুরচারিণী হয়ে পুরুষের পদদলিত হত সেই নারী আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। জগৎকে শ্রেষ্ঠ উপহার দানের প্রয়াস করছে। স্বকৃত উপার্জনে মনোরম আবাস গড়ে তুলছে। প্রাচীন যুগের নারীর মত অপরের মুখাপেক্ষী হচ্ছে না। নারীই আজ রাজ্য পরিচালনা করছে।”

হ্যাঁ মহুয়া, তুমি ঠিক কথাই বলেছ। নারী রাজ্যপরিচালনা কচ্ছে, আবার বন্দুক ধরে শত্রু তাড়াচ্ছে, কিন্তু সেটা ক'জন নারী? তুমি কি মনে কর কতকগুলো পুঁথিগত শিক্ষা গ্রহণ করে ডিগ্রীধারী হলেই শিক্ষালাভ হয়? শিক্ষা বলতে কি জানো? শিক্ষা আমি তাকেই বলি, যে শিক্ষা সমাজের সকল স্তরের সকল ক্ষেত্রের শিক্ষা গ্রহণ করে তাকেই বলি মানুষ হওয়া। শিক্ষা যদি সমাজকে, দেশকে রাষ্ট্রকে তার কল্যাণ হাতের পরশ দিতে না পারলে তবে সে শিক্ষাই নয়। তুমি মানুষ হয়ে সমাজকে শ্রেষ্ঠত্ব দান কর, তবেই তুমি মানুষ। তুমি বলছ মহুয়া নারী পুরুষের সমান অধিকার। কিন্তু সমান অধিকার হলেও নারী ভবিষ্যৎ বংশধরের জননী। সেই কারণেই পুরুষ প্রকৃতি এক নয়। প্রাচীনকালে কি নারী শিক্ষিতা ছিল না? তখন কি নারী ধনুর্বাণ হাতে যুদ্ধ করত না? কিন্তু সে নারী ছিল ধর্ম-পরায়ণা। তাই তারা শ্বশুর, শাশুড়ী, আত্মীয় স্বজন নিয়ে একক হয়ে থাকতে পারত। প্রাচীন কালে একান্নবর্তী পরিবার কত বড় সম্পদ ছিল। তাই তাদের প্রগতিশীল নারীর মত হা-অন্ন হা-অন্ন করে পথের ধারের হন্যার মত ঘুরে বেড়াতে হয় নি।

তবে হ্যাঁ! এরও একদিন পরিবর্তন আসবে। যেদিন যুগ স্থির শান্ত হয়ে দাঁড়াবে তখনই পরিবর্তন হবে। এখন তো যুগ অস্থির, চঞ্চল পদক্ষেপে বিচরণ করছে। তাই যুগের সঙ্গে পা এরাও এগুচ্ছে। ভারতীয় ভাব-ধারাকে ত্যাগ করে পরানুকরণে ব্যস্ত। কিন্তু যেদিন নিজের সমাজকে, নিজের ঐতিহ্যকে বুঝতে পারবে সেই দিনই এরা ময়ূরপুচ্ছ ত্যাগ করবে। সকলেই চায় জীবনে শান্তি! মধুর প্রীতি! কিন্তু বর্তমানে বাংলায় সেটার একান্তই অভাব। এর পরিবর্তন একদিনই হবেই। তখন জানতে পারবে জীবনের কতখানি মূল্যবান সম্পদ হারিয়ে ফেলেছে।"

হঠাৎ একখানি মুখ দেখা গেল। ছাত্রীদুটি চমকে উঠল— পামগাছটার আড়ালে বেঞ্চের ওপর কে বসেছিল— অশরীরী নয়, ছায়াও নয়, একটি মহিলা,—উঠে দাঁড়ালেন।

হ্যাঁ জাঁদরেল মহিলা, ডাঃ দীপান্বিতা ত্রিপাঠী—সাইকলজির অধ্যাপিকা, মৃদু হেসে বলে গেলেন,—সুন্দর আলোচনা,—কিন্তু ওটা আলোচনার মাধ্যমেই বন্দী থাকবে, না বাস্তবে রূপায়িত হবে? তোমাদের মাঝে কিন্তু তেমন লক্ষণ তো পাচ্ছি না—বলেই তিনি হন্ হন্ করে চলে গেলেন। ছাত্রীদুটী সলজ্জ দৃষ্টিতে তাকাল নিজেদের দিকে, কলেজ পরিচ্ছদের অভ্যন্তরে একটা শালিনতার মাঝে অশালিনতার ডাক উঁকি মারছে।

সুপর্ণা দেবী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আজকাল হামেশাই বিচিত্র-সোখিন শাড়ী, ব্লাউশ, চোলী, কাঁচুলী, সালোয়ার, কামিজ, কুর্ত্তা, ঘাগরা, ফ্রক, গাউন, পায়জামা-স্যুট, শর্টস্, স্ল্যাক্স্, কার্ডিগান্-জ্যাকেট, কিমোনো প্রভৃতি রকমারি পোষাকে মেয়েরা দেহশ্রী বর্দ্ধিত ও সুশোভিত করে থাকেন···তাছাড়া বসা, দাঁড়ানো, চলা-ফেরার বহুবিধ কায়দা-কানুনেও যথেষ্ট পটুতা লাভ করেছেন বটে, কিন্তু শুধু পোষাক-পরিচ্ছদ, গয়নাগাটি আর স্নো-পাউডার, রুজ-লিপ্‌ষ্টিক্-মাস্কারা, সুর্ম্মা-কাজল-সিঁদুর-আলতা-টিপ ইত্যাদি রূপ-সজ্জার উপকরণাদির দিকে নজর রেখে যত কিছুতেই অঙ্গ-বিভূষিত করা যাক না কেন—নারীর দেহ যদি সুস্থ-সাবলীল এবং সুঠাম-সুন্দর না হয় তো সবই মিথ্যা। লোকে যেমন নারীর পোষাক-পরিচ্ছদ এবং অঙ্গ-প্রসাধনের শ্রী-সৌন্দর্য্যের তারিফ করে, তেমনি দৈহিক গঠন-সৌষ্ঠবের পারিপাট্য-

সম্বন্ধেও রীতিমত সজাগ থাকে। কাজেই নিজের দৈহিক রূপ এবং গঠন-পারিপাট্য যাতে সুন্দর-সুঠাম-শ্রীমণ্ডিত থাকে, সেদিকে সচেতন-দৃষ্টি রাখা এবং নিয়মিত অল্প-বিস্তর ব্যায়াম-অনুশীলন করা একালের সুসভ্যা-শিক্ষিতা সকল সৌখিন-মহিলারই একান্ত কর্তব্য।

তাছাড়া নারী সন্তানের জননী এবং সুসন্তান-প্রসবের উদ্দেশ্যে তাঁদের প্রত্যেকেরই দৈহিক-স্বাস্থ্য অটুট-অক্ষুণ্ণ রাখা বিশেষ প্রয়োজন। দেহের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে হলে, পাকস্থলী এবং পেটের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সবিশেষ যত্ন নেওয়া আবশ্যক। কারণ, পেটের সুঠাম-গঠন ও পাকস্থলীর সুস্থতাতেই নারীর দৈহিক রূপ-সৌন্দর্য্য বিকশিত হয় অপূর্ব্ব-ধরণে। অন্যথায়—অর্থাৎ, অজ্ঞতা, ঔদাসীন্য, অবহেলা ইত্যাদির ফলে, পাকস্থলীর আভ্যন্তরিক-ক্রিয়াকলাপ, স্বাভাবিক-সুস্থতা এবং গঠন-সৌষ্ঠব যদি বিকৃত হয়, তাহলে শুধু দৈহিক রূপ-লালিত্যের অভাবই নয়, উপরন্তু সন্তান-প্রসবের সময়েও অনেক মহিলারই দুর্ভোগ-কষ্টের সীমা-পরিসীমা থাকে না... এমন কি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাণহানিরও যথেষ্ট আশঙ্কা ঘটে। তাই দেহকে সুঠাম-সুন্দর এবং সুস্থ-সবল রাখতে হলে, পাকস্থলীর যত্ন নেওয়া আবশ্যক। এ জন্য চাই—নিত্য-নিয়মিত ব্যায়াম-সাধন। নিয়মিতভাবে খেলায়-ধুলায়, দৌড়-ঝাঁপ-সাঁতারে পাকস্থলী সুছাঁদে গড়ে ওঠে...তলপেটের গঠন নিটোল ও মেদ বর্জ্জিত থাকে... পেট অযথা ঝুঁকে, ফুলে-ফেঁপে, বেড়ে কদর্য্য-বিরাট ভুঁড়ি গড়ে তোলে না।

আধুনিক শরীর-তত্ত্ববিদ্ ও অভিজ্ঞ-বিচক্ষণ চিকিৎসকদের মতে—পাকস্থলী আমাদের একটি প্রধান অঙ্গ। শরীরের যে-অংশে পাকস্থলীর স্থান, সে-অংশটি তেমন সুরক্ষিত নয়। অনেকের ধারণা, পাকস্থলীর কাজ শুধু খাদ্য পরিপাক করা। এমন ধারণা কিন্তু ঠিক নয়। আসলে, পাকস্থলীর কাজ কেবল খাদ্য পরিপাক করা নয়, দেহের সুঠাম গঠন নির্ভর করে এই পাকস্থলীর স্বাস্থ্যের উপর।

আমাদের পাকস্থলীর আবরণে অনেকগুলি পেশী আছে। যখন আমরা আহার করি, তখন এই সব পেশীর ব্যায়াম-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। কিন্তু দেহের গঠন সুঠাম-সুন্দর রাখতে হলে, শুধু এই সব পেশীর ব্যায়াম-ক্রিয়াটুকুতেই চলবে না...এছাড়াও চাই—নিত্য নিয়মিত-ভাবে কয়েকটি বিশেষ-ধরণের ব্যায়াম-ভঙ্গী অনুশীলন করা। এই ব্যায়াম-সাধনার ফলে, কোমর ও পেট মেদ-বাহুল্যে কদাকার-বিশ্রী হয়ে উঠবে না...তলপেট বেয়াড়া-ছাঁদে বেড়ে, ঝুঁকে, ঝুলে পড়বে না এবং বেঢপ-ধরণের ভুঁড়ি দেখা দেবে না। একালের অভিজ্ঞ-বিচক্ষণ শরীর-তত্ত্ববিদ্ রূপচর্চ্চা-বিশারদ আর চিকিৎসকেরা বলেন যে যাঁরা তাড়াতাড়ি আহার করেন এবং খাদ্যাদি ভালোভাবে চর্ব্বণ করেন না, সচরাচর দেখা যায়—তাঁরা নিতান্তই অজ্ঞতা বা অবহেলায় তাঁদের পাকস্থলীর যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে বসেন। এই কদভ্যাসের ফলে, অচিরেই তাঁদের স্বাস্থ্যহানি ঘটে এবং দেহের গঠনও ক্রমশঃ বিকৃত-কদর্য্য হয়ে ওঠে! তাই আধুনিক শরীর-তত্ত্ববিদ-চিকিৎসকেরা অভিমত প্রকাশ করেন যে পাকস্থলীটিকে মাঝে মাঝে বিশ্রাম দেওয়া প্রয়োজন। প্রতি মাসে অন্ততঃপক্ষে দু'দিন চর্ব্বচোষ্য বাদ দিয়ে শুধু স্বাস্থ্যকর-পানীয়—অর্থাৎ, ফলের রস, দুধ, সরবৎ প্রভৃতি পান করুন...সিদ্ধ শাক-শব্জী খান। তাহলে সহজে কোনো কোষ্ঠবদ্ধতায় কষ্ট পাবেন না এবং পাকস্থলীর অবস্থাও বেশ সুস্থ এবং ভালো থাকবে।

মেয়েদের পেটের গড়ন-সৌষ্ঠব যাতে ভালো হয়, তাঁদের দেহ কুশ্রী-কদর্য্য না হয়, তলপেটে অযথা মেদ-বাহুল্যের ফলে, ভুঁড়ি না দেখা দেয়—সে সম্বন্ধে সবচেয়ে উপযোগী বিশেষ-ধরণের কয়েকটি সহজ-সরল ঘরোয়া ব্যায়াম-বিধির মোটামুটি হদিশ দিচ্ছি। নিত্য-নিয়মিত এসব ব্যায়াম-ভঙ্গী অনুশীলনে, পাকস্থলী সুস্থ-স্বাভাবিক থাকবে সুদীর্ঘকাল...তলপেটে কস্মিনকালে চর্ব্বি জমবে না—কদর্য্য-কুৎসিত ভুঁড়ি দেখা দেবে না এবং বুক-পেট একাকার হয়ে দেহকে কদাকার করে তুলবে না। বরং, সকল দিক দিয়ে দেহখানি সুঠাম-সুছাঁদে গড়ে তুলে যে অপরূপ-মনোরম শোভা-শ্রী বিকশিত করবে, তাতে সকলেই বিমুগ্ধ হবেন। তাছাড়া অকাল-বার্দ্ধক্যেরও আশঙ্কা থাকবে না এবং শরীরও হয়ে উঠবে সুস্থ-নিরাময়, নিটোল-মজবুত।

আপাততঃ এই পর্য্যন্তই। আগামী সংখ্যায় পাকস্থলী

ও তলপেটের স্বাস্থ্য বজায় রাখা এবং দেহের সুঠাম-ছাঁদ দীর্ঘস্থায়ী করে তোলার উপযোগী সহজ-সরল ঘরোয়া-ধরণের বিশেষ ধরণের কয়েকটি ব্যায়াম-ভঙ্গীর হদিশ দেবার বাসনা রইলো।

[ক্রমশঃ

সূচীশিল্পের নক্সা-নমুনা

নিরুপমা দেবী

ঘর-সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের অবসরে যাঁরা নিজেদের হাতে সেলাই করে সৌখিন ও নিত্য আবশ্যকীয় নানা ধরণের সূচী-শিল্প-সামগ্রী বানাতে ভালবাসেন, বিভিন্ন রকমের বিচিত্র অভিনব সুন্দর-সুন্দর নক্সা-নমুনা বা pattern designs সংগ্রহের দিকে সচরাচর তাঁদের বিশেষ আগ্রহ থাকে। এবারে তাই তাঁদের সুবিধার জন্য

সহজসাধ্য এবং সরল ছাঁদের একটি ফুল-পাতার নক্সা-নমুনা প্রকাশ করা হলো।

পাশের ছবিতে ফুল-পাতার যে নক্সা নমুনাটি দেখানো হয়েছে, সেটী সৌখিন-সুন্দর 'ট্রে-ক্লথ (Tray-cloth) 'টি-ন্যাপ্‌কিন' (Tea Napking), 'টি-কোজি' (Tea Cosy), 'টেবিল-ম্যাট'—Table Mat), 'কুশন-কভার' (Cushion-Covers), বালিশের ওয়াড় (Pillow Cases), শিশুদের 'বিব্' (Bib), 'রম্পার' (Romper-Suit), 'ফ্রক' (Frocks], প্রভৃতি নানা ধরনের সূচী-শিল্প সামগ্রী অলঙ্করণের কাজে ব্যবহারোপযোগী হবে। এ নক্সাটিকে রঙীন সুতোর সাহায্যে "এমব্রয়ডারী' (Embroidery) সূচীশিল্পের কিম্বা রঙ বেরঙের কাপড়ের টুকরো দিয়ে বানানো 'এ্যাপলিক্ (Applique) সেলাইয়ের কাজ করে নিখুঁত পরিপাটী ছাঁদে অনায়াসেই বানানো যেতে পারে। পাশের ঐ ফুল-পাতার নক্সা নমুনাটিকে রূপদানের জন্য মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে সেলাইয়ের কাজ করতে হবে।

প্রথমেই সেলাইয়ের কাজের জন্য বাছাই করা কাপড়ের উপর নক্সা-নমুনার প্রতিলিপিটিকে সযত্নে বসিয়ে, সেটির নীচে একটুকরো 'কার্বন-পেপার' (Carbon-Paper) রেখে, নিখুঁত-পরিপাটি ছাঁদে পেন্সিলের রেখা টেনে নক্সাটিকে আগাগোড়া 'ট্রেসিং' (Tracing) করে নিতে হবে।

সুষ্ঠুভাবে 'ট্রেসিং' করে নক্সা-নমুনার প্রতিলিপিটিকে কাপড়ের উপর নিখুঁত-পরিপাটি ছাঁদে 'নকল' (copying) করে নেবার পর, সূচীশিল্পানুরাগিণীর পছন্দমতো বিভিন্ন রঙের 'রেশমী' (silk) বা 'পশমী' (woolen) সুতোর সাহায্যে সৌখিন-সুন্দর 'এমব্রয়ডারী' (Embroidery) অথবা ফুল-পাতার আকারে নানা ধরণের রঙীন-কাপড়ের টুকরো ছাঁটাই করে নিয়ে 'এ্যাপ্‌লিক্' (Applique) পদ্ধতিতে সেলাইয়ের কাজ সুরু করবেন।

ছুঁচ-সুতোর সাহায্যে সেলাইয়ের সময়—ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনিভাবে 'বাটন্‌হোল্-ষ্টিচ্' (Buttonhole Stitch) রীতিতে 'এ্যাপ্‌লিকের' কাজের জন্য ছাঁটাই-করা নানা ছাঁদের রঙীন-কাপড়ের টুকরোগুলির চারদিকের কিনারায় যথাসম্ভব 'ঘেঁষাঘেঁষি' বা 'Closer-Stitches' ধরণে সুতোর ফোঁড় তুলে সযত্নে সূচীশিল্পের উপযোগী কাপড়ের বুকে পাকাপাকিভাবে

গেঁথে নিতে হবে।

ফুলের পাপড়ি-দলের কেন্দ্রভাগ এবং পাতার শিরাগুলি রচনাকালে, উপরের চিত্রে দেখানো হদিশমতো 'ব্যাক্-ষ্টিচ' (Back-Stitch) পদ্ধতিতে তিন সারিতে সেলাইয়ের সূতোর ফোঁড় তুলে কাজ করবেন। পাতাগুলি রচনা করবেন ছবিতে দেখানো 'ফিশ্‌বোন্-ষ্টিচ' (Fishbone-Stitch) পদ্ধতিতে ছুঁচ-সুতোর ফোঁড় তুলে। প্রত্যেকটি পাতা রচনার সময়—ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনিভাবে পাতার প্রান্ত-ভাগ থেকে সেলাইয়ের ফোঁড়-তোলার কাজ সুরু করবেন এবং ক্রমান্বয়ে—একবার পাতার শিরা-রেখার বাঁ-দিক থেকে ডানদিকে এবং পরের বারে পাতার শিরা-রেখার ডানদিক থেকে বাঁ-দিকে পরিপাটি-ছাঁদে 'ফিশ্‌বোন্'-ষ্টিচ' (Fishbone-Stitch) পদ্ধতিতে সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে যেতে হবে।

সূচীশিল্পানুরাগিণীর অভিরুচি-মতো হালকা বা গাঢ় সবুজ-রঙের রেশমী বা পশমী সুতোর সাহায্যে পাতা এবং ফুলের ডাল রচনা করা যাবে। তবে যে কাপড়ের এই নক্সা-নমুনার প্রতিলিপি-রচনা করা হবে, সেটির সঙ্গে মানানসই ও সুন্দর দেখায়, এমনভাবেই ফুল, পাতা এবং ডাল প্রভৃতির জন্য রঙীন সুতো ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। ডাল-পাতার শিরা এবং কিনারাগুলি কালো অথবা মানানসই-ধরণের অন্য যে কোন রঙীন সুতোর সাহায্যেও বানানো যেতে পারে।

দূত

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

আমি জন-মানসের ভীতি বিহ্বল দৃষ্টি
আমি জন-মানসের অনাদি কালের চেতনা
আমি উদাত্ত বৈশাখ—বিপ্লবে আনি সৃষ্টি
আমি ভীষণ ভয়ঙ্কর—আঘাতে খোদাই
জীর্ণ-জরার বেদনা।
অচেতনে হানি চেতনের সংঘাত
মহাশক্তির মহা-প্রয়োগিত গুণে
জড়-অজড়ের দুস্তর ব্যবধান
বিলোপিত করি সৃষ্ট সংযোজনে।
ত্রিকাল-দর্শী মহাবিপ্লবী
সঙ্কেত নেন আশার অঙ্গুলিতে
মহা প্রলয়ের দিনে
ত্রিনেত্র সম্পাতে।
নব চেতনার মহা-জাগরণে
বিপ্লবী দূত আমি—মহৎ কিছুর মূলে
সংঘাত হেনে জাগরিত করি
মহাত্রিশূলীর শূলে।
আমি জন-মানসের ভীতি বিহ্বল দৃষ্টি
আমি জন-মানসের অনাদিকালের চেতনা

=সঙ্গীতের উৎপত্তি=

শ্রীতুলসীচরণ ঘোষ

সঙ্গীতের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে একটু আলোচনা প্রয়োজন। কেন না প্রত্যেক কার্য্যেরই একটি কারণ থাকে। সেই কারণ অন্বেষণ করিতে করিতে দেখা যায় যে একটি আদি কারণ আছে। এই আদি কারণ অন্বেষণ করিতে গেলে সেই মূল তত্ত্বে গিয়া পৌঁছাইতে হয়। কাজেই সেই মূল তত্ত্বের আলোচনা একটু প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বলা হয়েছে যে মধু ও কৈটভের মেদ হইতে মেদিনীর সৃজন। ভগবান অনন্ত নারায়ণ নিজ সৃষ্ট এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে আপনাতে উপসংহার করিয়া প্রকৃতি পুরুষ এবং কালাদি সমগ্র শক্তি সহকারে নিদ্রিতের ন্যায় শয়ন করেন। শ্রুতি সমূহ সৃষ্টি প্রতিপাদক স্তবের দ্বারা তাঁহাকে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন। যাহা হেতু, তাঁহার মধ্যে পুনঃ সৃষ্টির চিন্তা হেতু, তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা উদ্ভুত। এই কারণে ব্রহ্মাকে বলা হয় মন এবং তাঁহার বর্ণ রক্ত। কারণ রক্তবর্ণ হইল ক্রিয়াশক্তির দ্যোতক। তিনি উদ্ভুত হইয়া চতুর্দিকে ঘোর তমসাচ্ছন্ন দেখিলেন এবং কি করিবেন কিছু বুঝিতে না পারিয়া বেদ রচনা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে নারায়ণের দুই কর্ণ হইতে মল নির্গত হইল। সেই মল হইতে মধু ও কৈটভ দুই দৈত্য উদ্ভুত হইল। তাহারা দুই দিক দিয়া সেই পদ্মের চতুর্দিকে ঘুরিতে লাগিল। পদ্মের মধ্যে ব্রহ্মাকে দেখিয়া তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইল। ব্রহ্মার স্তবে নারায়ণের যোগনিদ্রা ভঙ্গ হইল। নারায়ণের সহিত তাহাদের পঞ্চ-সহস্র বৎসর যুদ্ধ হইল। কিন্তু কেহ কাহাকেও বধ করিতে সক্ষম হইল না। তখন তাহারা নারায়ণকে বলিল যে তুমি আমাদের নিকট বর লও। নারায়ণ বলিলেন তোমরা আমার বধ্য হও। তাহারা বলিল যেখানে কারণ সলিল নাই সেইখানে আমাদের বধ কর। তখন নারায়ণ তাহাদের নিজের উরুর উপর রাখিয়া বধ করিলেন। অর্থাৎ অঙ্গাঅঙ্গী। মধু ও কৈটভ হইল ধনাত্মক ও ঋণাত্মক শক্তি। কারণ মধু পাইলেই কীট নড়াচড়া করে। এই কারণে আমরা আনন্দ লোভেতেই সর্ব্ব কর্ম্ম ও সাধনা করি। কারণ আনন্দকোষই হইল জীবের প্রথম শক্তির বিকাশ বা মায়ার আবরণ। মেদ হইল স্নিগ্ধতার পরিমাণ নির্দ্দেশক। (মেদ মিদ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন অর্থে স্নিগ্ধ হওয়া)। এই তিনের অর্থাৎ মধু, কৈটভ ও পরিণামী মেদের সমন্বয়ে তিনি প্রাণশক্তি নিবেশ করিলেন। এবং পঞ্চ তত্ত্ব হেতু অর্থাৎ অবকাশ প্রদান ও বহন হেতু রূপ গঠন করিয়া রসাস্বাদ দ্বারা ধৃত হইয়া পরমাণু গঠিত। ইহাই হইল স্থায়ী পরমাণু। এই পরমাণু হইল দ্রব্য-ধাতু বিশিষ্ট গুণ-সংযুক্ত। জগৎ এই হিসাবে পরিচিত। কারণ পরিবর্ত্তনই জগৎ। গচ্ছতি ইতি জগৎ।

কার্য্যস্বরূপ পৃথিব্যাদি অংশের যে চরম অংশ অর্থাৎ যাহার আর অংশ হয় না, যাহা কার্য্যাবস্থায় থাকে না, যাহা অন্যের সহিত অসংযুক্ত থাকে এই হেতু সর্বদা বিদ্যমান থাকে তাহাই পরমাণু। এই পরমাণু সমষ্টি হইতে মানবের ঐক্যসম অর্থাৎ বিশ্ব একটী অবয়বী এরূপ জ্ঞান হয়। যাহার চরম অংশ পরমাণু। সেই পদার্থ অবস্থান্তর প্রাপ্ত না হইয়া একত্ব স্বরূপে অবস্থিত হইলে তাহাকে বলা হয় পরম মহৎ। ইহাতে বিশেষ বিবক্ষা বা ভেদ বিবক্ষ নাই। সেইকারণসমস্ত প্রপঞ্চই অর্থাৎ বিশ্বই পরম মহৎ পদবাচ্য। পরমাণু ও পরম মহান অবস্থার দ্বারা যাহা ব্যাপ্ত তাহাই আমাদের নিকট প্রবহমান কাল। এই কালই শক্তিমান ভগবান শ্রীহরির শক্তি এবং স্বয়ং অব্যক্ত হইয়াও ব্যক্ত পদার্থে ব্যাপিয়া আছেন অথচ স্বয়ং বিভূ অর্থাৎ সৃষ্টি আদিকার্য্যে দক্ষ। যে কাল এই জগৎ প্রপঞ্চে এই পরমাণু অবস্থা ভোগ করে তাহা সূক্ষ্ম আর যাহা সমষ্টি অবস্থা ভোগ করে তাহাকে পরম-মহৎ অর্থাৎ স্থূল কাল বলা হয়। এই স্থূল কালকেই খণ্ড করিয়া খণ্ড কালের উৎপত্তি। তাহাই জীবের বোধের উদয়। এই

বোধ হইতেই বাসনা ও কামনার উদ্ভব। বাসনা কামনা হইতে ইন্দ্রিয়াদির আবির্ভাব এবং ইন্দ্রিয়াদির আচরণশীল হইতে স্থিতি ও গতির মিলনে স্পন্দন। এই স্পন্দন হইতে বৈখরী শক্তির বিকাশ ধ্বনিত এই ধ্বনিই হইল "নাদ"। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ"।

নাদ অর্থে প্রণব "ওঙ্কার ধ্বনি"। এই "ওঙ্কার" তিনটী অক্ষরে গঠিত। যথা—'অ'—'উ'—'ম'। ইহারা সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের দ্যোতক। সৃষ্টি হইতে স্পন্দন, স্থিতি হইতে প্রবাহ ও লয় হইতে সীমাকরণ। এই স্পন্দন হইতে নৃত্যের উৎপত্তি; স্থিতি হইতে গীত—কারণ ধ্বনির প্রবাহই হইল গীত এবং লয় হইতে বাদ্য—কারণ বাদ্যই নাদকে সীমাকরণ করে। এই তিনের সমষ্টিই লইয়াই সঙ্গীত। এই জন্য সঙ্গীতকে তৌর্য্যত্রিক বলা হয়। এদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে যে আর্য্য ভারতের যাহা কিছু সংস্কৃতি, কৃষ্টি সবই এই তিনের সমষ্টি লইয়া। যেমন ত্রিতত্ত্ব, ত্রিগুণ, ত্রিদেব, ত্রিকাল, ত্রিমূর্ত্তি ইত্যাদি। অনাদি বাঙ্ময় শ্রুতিও এই নাদ বিদ্যার তনয়া। এই বিদ্যাময়ী শ্রুতির অপর নাম গন্ধর্ব-বেদ। ধ্বনিময় নাদ হইতে সঙ্গীতের সৃষ্টি।

অতএব দেখা যাইতেছে যে সঙ্গীত বলিতে নৃত্য, গীত ও বাদ্যকে বোঝায় অর্থাৎ নৃত্য, গীত ও বাদ্য এই তিনের সমাবেশকে সঙ্গীত বলা হয়। তবে কণ্ঠ-সঙ্গীতের প্রাধান্য হেতু গানকেই সঙ্গীত বলা হয়। সঙ্গীত অর্থে সম-গৈ-ক্ত অর্থাৎ গীত ও বাদ্য উভয়েই সমভাবে, সমচ্ছন্দে পরিচালিত হয় তখনই প্রকৃত সঙ্গীত সৃষ্টি হয়, শাস্ত্রকাররা বলেন নৃত্য বাদ্যকে অনুগমন করিবে, বাদ্য গীতকে অনুগমন করিবে কিন্তু গীতই হইবে প্রধান।

নাদ বলিতে আদিশব্দ "ওঙ্কার" বুঝায়। সঙ্গীতশাস্ত্র মতে "ওঙ্কার" বা "নাদ" সগুণ ব্রহ্ম। যখনই বলা হইল সগুণ ব্রহ্ম তখনই প্রশ্ন উঠে যে তাহা হইলে নিশ্চয় নির্গুণ ব্রহ্ম বলিয়া কিছু আছে। তাহা হইলে কি দুইটী ব্রহ্ম? না তাহা নহে। ব্রহ্ম "একামেবাদ্বিতীয়ম্"। যিনি সগুণ তিনিই নির্গুণ। ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমাদের কাহারও কোন জ্ঞান বা ধারণা নাই। কারণ তিনি প্রকৃতির উর্দ্ধে এবং তিনি অবাঙ্মনসোগোচর"। অর্থাৎ বাক্য মনের অতীত। যাহা বাক্য ও মনের অতীত তাহা প্রকাশ করা যায় না কারণ আমাদের যাহা কিছু জ্ঞান সবই এই প্রকৃতি জাত। সেই কারণ বেদে উপনিষদে তাহাকে "সৎ" "তৎ" ইত্যাদি শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা হয়। সে কিংস্বরূপ তাহা বলিতে পারে না। তথাপি আমরা আমাদের সীমিত জ্ঞান সহায়ে তাহাকে প্রকাশ করিবার নানা রকম প্রয়াস করি। নির্গুণ ব্রহ্ম তখনই বলি যখন কোন সৃষ্টি থাকে না। তখন তাহাকে কতকগুলি বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করিয়া বুঝিবার প্রয়াস করি। সেই কারণ বলা হয় তিনি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত। নিত্য কারণ তিনি ছিলেন, আছেন এবং থাকিবেন। যেহেতু তাঁহার ক্ষয় নাই কাজেই নিত্য। কোন কালিমা তাহাতে লেপন করা যায় না সেই হেতু শুদ্ধ এবং তিনি পূর্ণবোধ স্বরূপ সেই কারণ বুদ্ধ। এবং তিনি সীমিত নহেন সেই কারণ মুক্ত। এই নির্গুণ ব্রহ্মে যখন ঈক্ষণ হয় অর্থাৎ আমি এক বহু হইব—অর্থাৎ "একোহংবহুস্যাম্" ভাব জাগে তখন তাহাকে বলা হয় সগুণব্রহ্ম। এই সগুণব্রহ্ম তাহার নিজ শক্তিকে ঈষৎ পৃথক্ করেন বিন্দু রূপে এবং তাহার মধ্যে নিজেকে প্রতিফলন করেন রসাস্বাদ হেতু। এই যে বিন্দু এই বিন্দুর প্রসারই হইল নাদ। সেই কারণে বলা হয় নাদই ব্রহ্ম। এই নাদই হইল "ওঙ্কার"। "ওঙ্কার" অর্থে প্রণব। এই সগুণব্রহ্ম "প্রণব" সত্ত্বরজস্তমোগুণ যুক্ত হইয়া যাবতীয় রাগ ও রাগিণী সৃষ্টি করেন। শাস্ত্রকারগণ এই নাদকে—

"ন-কারং প্রাণ নামানাং দ-কারং অনলং বিদুঃ।
জাতঃ প্রাণাগ্নি সংযোগাত্তেন নাদোহভিধীয়তে।"

বলিয়াছেন। অর্থাৎ প্রাণবায়ুর সহিত সত্ত্বময়ী ইচ্ছা মূলাধারস্থ অপান বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া রজোগুণান্বিত হইয়া হৃদয়ে আঘাত করিয়া কণ্ঠনালী দিয়া বহির্গত হইলে তাহার অভিব্যক্তি হয় শব্দে এবং এই শব্দই তখন "নাদ" নামে অভিহিত হয়। অর্থাৎ সত্ত্বময়ী ইচ্ছার আঘাতে বায়ুতে কম্পন সৃষ্টি হয় ও তাহা নালী দিয়া বহির্গমনের সময় নিম্নোচ্চ কম্পনের তারতম্য হেতু তীব্র ও কোমল ধ্বনি বিশিষ্ট স্বরমূর্ত্তিতে প্রকটিত হয়। এই যে কম্পন-জনিত শব্দ ইহাই "নাদ" নামে অভিহিত হয়। সঙ্গীত শাস্ত্রকারগণ এই নাদের আবার বিভাগ করিয়াছেন। যথা—

"আহতোহনাহতশ্চেতি দ্বিধা নাদো নিগদ্যতে"

অর্থাৎ আহত ও অনাহত ভেদে নাদ দুই প্রকার। অনাহত ধন্যাত্মক ও প্রাণায়ামাদি যৌগিক এবং "আহত" নাদ হইল বর্ণাত্মক। এই বর্ণাত্মক নাদই ভাব প্রকাশক হইয়া জগতের সকল প্রাণীকে আনন্দধারা প্রদান করে। যথা—

স নাদস্ত্বাহতো লোকে রঞ্জকো ভবভঞ্জকঃ"

অর্থাৎ এই আহত নাদ পৃথিবীর সকল লোককে আনন্দ প্রদান করে।

এই নাদ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন—

আত্মনা প্রেরিতং চিত্তং বহ্নিমাহন্তি দেহজম্।
ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিতং প্রাণং স প্রেরয়তি পাবকঃ॥
পাবকপ্রেরিতঃ সোঽথ ক্রমাদূর্দ্ধপথে চরন্।
অতি সূক্ষ্মধ্বনির্নাভৌ হৃদি সূক্ষ্মং গলে পুনঃ॥
পুষ্টং শীর্ষত্বপুষ্টঞ্চ কৃত্রিমং বদনে তথা।
আবির্ভাবয়তীত্যেবং পঞ্চধা কীর্ত্যতে বুধৈঃ॥
কথং কণ্ঠে স্থিতঃ পুষ্টঃ স্যাদপুষ্টশ্চ শিরঃস্থিতঃ।
উদ্ধৃতে তত্র শিরসি সঞ্চার্য্যারোহি বর্ণয়োঃ॥"

আত্মা দেহস্থ বহ্নিকে জাগ্রত করিবার জন্য চিত্তকে প্রেরণ করে এবং সত্ত্বগুণময়ী ইচ্ছা পাবককে প্রেরণ করে। পাবক তখন সেই বায়ুকে উত্তপ্ত করিয়া ঊর্দ্ধপথে প্রেরণ করে। তখন নাভিস্থ অতি সূক্ষ্ম ধ্বনি হৃদয় দিয়া কণ্ঠে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে মস্তকে উত্থিত হয় এবং সেখানে পুষ্টি লাভ করিয়া পুনরায় গলদেশে আগমন করে। এই পঞ্চপ্রকার ক্রিয়ার দ্বারা ধ্বনি উত্থিত হয়। সেই ধ্বনি মস্তকে আহত হইয়া কণ্ঠনালী দিয়া বর্ণরূপী নাদে প্রকাশ পায়।

মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

"তস্য বাচক প্রণবঃ"

অর্থাৎ এই নাদের বাচক হইল প্রণব অর্থে ওঙ্কার পরব্রহ্মের প্রকাশক। এই জন্য শাস্ত্রকারগণ সঙ্গীত বিদ্যাকে সকল বিদ্যাপেক্ষা শীর্ষস্থান প্রদান করিয়াছেন। যথা—

পূজা কোটিগুণং ধ্যানং ধ্যানাৎকোটিগুণঃ জপঃ।
জপাৎ কোটিগুণং গানং গানাৎ পরতরং নহি॥"

এই নাদরূপী সগুণব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া নির্গুণ ব্রহ্মে উপনীত হওয়া যায়। এইজন্য গন্ধর্ব্ব বেদ বলিয়াছেন—

"ত্রিবর্গফলদাঃ সর্ব্বে দানাধ্যায়জপাদয়ঃ।
একং সঙ্গীতবিজ্ঞানং চতুবর্গসফলপ্রদম্॥"

অর্থাৎ দান ধ্যান ও জপে ত্রিবর্গ ফল পাওয়া যায় কিন্তু একমাত্র সঙ্গীতে চতুর্বর্গ ফল পাওয়া যায়।

সঙ্গীত দামোদর বলেন—

"ঋগ্‌ভ্যঃ পাঠাদভূদ্‌গেবং সামভ্য সমদ্যস্তত।
যজুর্ভিরভিনয়া জাতা রসাশ্চাথর্ব্বণঃ স্মৃতাঃ॥"

ঋগ্বেদ হইতে সঙ্গীতের উৎপত্তি, সামবেদের দ্বারা তাহার পুষ্টি, যজুর্ব্বেদের দ্বারা অভিনয় ও অথর্ব্ববেদের দ্বারা ইহার রস বিস্তার।

সেই কারণ বলা হয় সঙ্গীতই "রসো বৈ সঃ"। অর্থাৎ সঙ্গীতই হইল সকল রসের আধার।

এই সামগান তিনস্বরে—অর্থাৎ অনুদাত্ত, উদাত্ত ও স্বরিত হয়। এই উদাত্তাদি স্বর যথা—

অনুদাত্ত—মন্দ্র—র, ধ।
স্বরিত—মধ্য—স, ম, প।
উদাত্ত—তীব্র—গ, নি।

ইহা হইতে দেখা যায় যে সামগান সপ্তস্বরেই হইয়া থাকে।

সঙ্গীতের এই প্রথম স্বরকে ষড়জ্ বলিবার হেতু এই যে ষড়াঙ্গের চালনা হেতু এই স্বর উত্থিত হয়। ষড়াঙ্গ যথা—জিহ্বা, দন্ত, তালু, নাসিকা, কণ্ঠ ও হৃদয়। ইহা ময়ূরের কেকাধ্বনি তুল্য। ত্রিগুণাময়ী প্রকৃতি হইতে এই সপ্ত স্বরের উৎপত্তি।

এই সপ্তস্বরের ক্রমিক হইতে শ্রুতির উৎপত্তি। অর্থাৎ তীব্রতার তারতম্য হেতু অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম তরঙ্গে এক স্বর অন্য স্বরে পরিণত। এইরূপ যতগুলি সূক্ষ্ম তরঙ্গ স্বর স্তরে শ্রুতিগোচর হইতে পারে তাহাদিগকে শ্রুতি কহে। যথা—'শ্রুতির্নাম স্বরারম্ভকারাবয়বঃ শব্দবিশেষঃ।' অর্থাৎ শ্রুতি হইল স্বরারম্ভকারী শব্দ বিশেষ। এই শ্রুতি কি রকম—

যথাপ্লুচরতাং মার্গো মীনানাং নোপলভ্যতে।
আকাশে বা বিহঙ্গানাং তদ্বত্স্বরাগতাশ্রুতিঃ॥

মৎস্য যখন জলে চলে তাহার যেমন মার্গ উপলব্ধি হয় না, উড্ডীন বিহঙ্গের যেমন মার্গ উপলব্ধি হয় না সেই রূপ শ্রুতিও বোঝা যায় না। এই শ্রুতি সম্বন্ধে বিস্তারিত

আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

এই শ্রুতির বিভাগ হইল, অনুদাত্তে তিনটি, স্বরিতে চারিটী এবং উদাত্তে দুইটি এই মোট ২২টী শ্রুতি। এই সম্বন্ধে শাস্ত্র যথা

চতস্রঃ পঞ্চমে ষড়জে মধ্যমে শ্রুতয়োর্মতাঃ।

ধৈবতে ঋষভে তিস্রঃ দ্বে গান্ধারে নিষাদকে ॥

অর্থাৎ ষড়জ, মধ্যম ও পঞ্চমে চারিটি করিয়া, ধৈবত ও ঋষভে তিনটী করিয়া এবং গান্ধার ও নিষাদে দুইটী করিয়া। এই শ্রুতিগুলির নাম যথা—

তীব্রা, কুমুদ্বতী, মন্দা, ছন্দোবতী, দয়াবতী, রঞ্জনী, রতিকা, রৌদ্রী, ক্রোধা, বজ্রিকা প্রসারণী, মার্জ্জনী, প্রীতি, ক্ষিতি, রক্তা, সন্দীপনী, আলাপিনী, মদন্তী, রোহিণী, রম্যা, উগ্রা, ও ক্ষোধিনী।

পূর্ব্বে বলিয়াছি নাদই ব্রহ্ম এবং এই নাদ হইতে সকল সুরের সৃষ্টি। এই 'ওঙ্কার' ধ্বনি কিভাবে উচ্চারিত হয় অর্থাৎ সপ্ত সুরে না ত্রিস্বরে তাহা লইয়া বিশেষ মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন উহা ষড়জ ও মধ্যমে উচ্চারিত হয়, কেহ বলেন ঋষভ, ষড়জ ও পঞ্চমে ইত্যাদি। কাহারও সহিত কাহারও মতের মিল নাই। সেই হেতু কালচক্রের সাহায্য লওয়া সমীচীন বলিয়া মনে হয়। কারণ সবই কালেতে অবস্থিত। কালেই সৃষ্ট কালেই স্থিত এবং কালেতেই লয়।

কালচক্র ধরিয়া দেখিতে গেলে দেখা যে উহা সপ্ত সুরে উচ্চারিত হয়। কালচক্রে যাহা শ্রবণা নক্ষত্র তাহার সংখ্যা ২২ ও তাহা মকর রাশিতে অবস্থিত। মকর রাশির অধিপতি হইল শনিগ্রহ। শনিগ্রহ হইল নিজে সপ্ত। মকর রাশি হইল স্রোতস্বিনী সরস্বতী। সরস্বতী নিজে সপ্ত এবং তিনি সপ্ত সুরে বীণ বাজাইয়া বেদগান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত এই শ্রবণা নক্ষত্র আবার বৃষরাশিস্থ রোহিণী নক্ষত্রের সহিত সম্বন্ধ বদ্ধ। রোহিণীর নক্ষত্রের সংখ্যা হইল ৪। রোহিণী হইতে আরোহণ অবরোহণ বুঝায় এবং ইহার দেবতা ব্রহ্মা। ব্রহ্মা—বৃনহ্‌+মন—ক=বৃনহ্‌ অর্থে শব্দ করা। মন—মা+উন্‌ =মা অর্থে পরিমাণ তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে ব্রহ্মার চতুর্মুখ হইতে চারি বেদ নির্গত হয়। এই রোহিণী কন্যারাশিস্থ হস্তা নক্ষত্রের সহিত সম্বন্ধ বদ্ধ। হস্তার দেবতা দিনকৃৎ অর্থাৎ রবি। রবি হইতে রব। অতএব দেখা যাইতেছে যে ব্রহ্মা হইতেই সকল শ্রুতির উদ্ভব। এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে বৈদিক গায়ত্রী সপ্ত সুরেই উচ্চারিত হয়।

এই সপ্তস্বর মানব দেহে অবস্থিত। মানবদেহের মেরুদণ্ডের বহির্ভাগে বামে ও দক্ষিণে সূক্ষ্ম নাড়ী আছে। তাহাদের "ইড়া" ও "পিঙ্গলা" এবং তাহাদের মধ্যে যে সূক্ষ্ম নাড়ী আছে তাহার নাম সুষুম্না। এই হইল ব্রহ্ম নাড়ী। ইড়া হইল গঙ্গা, পিঙ্গলা হইল যমুনা এবং সুষুম্না হইল সরস্বতী। এই তিন নাড়ীর মিলন-স্থানকে প্রয়াগ বলা হয়। অর্থাৎ যুক্ত ত্রিবেণী। সুষুম্না নাড়ীকে বেষ্টন করিয়া নাদরূপী কুণ্ডলিনী শক্তি অবস্থিত। এই তিন নাড়ী হইতেই সকল স্বরের আবির্ভাব। এই তিন নাড়ীতে রবি, চন্দ্র ও অগ্নির গুণ নিহিত।

এই সপ্ত স্বর হইতেই সকল রাগ রাগিণীর উৎপত্তি।

রাগ অর্থে অনুরাগ অর্থাৎ যাহা চিত্তকে রঞ্জিত করে। রাগ—রনজ্‌+ঘঞ=ণ। রনজ্‌ অর্থে রং করা। রঞ্জ অর্থে চিত্ত বিনোদন। শাস্ত্র যথা—

যস্য শ্রবণমাত্রেণ রঞ্জন্তে সকলাঃ প্রজাঃ।

সর্ব্বেষাং রঞ্জনাদ্ধেতো স্তেন রাগঃ ইতি স্মৃতঃ ॥

অর্থাৎ যাহা শ্রবণে সকলের চিত্ত বিনোদন হয় তাহাই রাগ।

এই রাগের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। সেই জন্য এখানেও কালচক্রের সাহায্য ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

কালচক্রে আর্দ্রা নক্ষত্র হইল মিথুনাধিপতি এবং তাহার সংখ্যা হইল ৬। এই আর্দ্রানক্ষত্রের দেবতা শিব। শিবের এক নাম হইল নটরাজ। নটরাজ এই মিলনারম্ভের পূর্ব্বে এক মুখে একভাবে এক একটী গান করিলেন। দেবী তাহা শুনিয়া আনন্দে প্লুত হইয়া নিজে একটি গাহিলেন। নটরাজের পঞ্চমুখে পঞ্চ এবং দেবীর মুখকমল হইতে একটী, এই সর্ব্ব সাকুল্যে ছয় রাগের উৎপত্তি। শাস্ত্র যথা—

"সদ্যোজাতাচ্চ শ্রীরাগে বামদেবাৎ বসন্তকঃ।

অঘোরাদ্ভৈরবস্তৎপুরুষাৎ পঞ্চমোহ ভবৎ ॥

ঈশানাস্যান্মেঘরাগঃ নাট্যারম্ভে শিবাদেভূৎ।

গিরিজায়াঃ মুখাল্লস্যে নটনারায়ণো ভবেৎ ॥

অর্থাৎ হর পার্ব্বতীর মিলনের সময় দেব পঞ্চাননের সদ্যোজাত মুখ হইতে শ্রীরাগ বামদেব মুখ হইতে বসন্তরাগ, অঘোর মুখ হইতে মেঘ রাগ সকলের উৎপত্তি হইল। এই সকল শ্রবণে দেবী আনন্দে প্লুত হইয়া নিজে একটী গাহিলেন। তাহার নাম হইল নটনারায়ণ। এবং যেহেতু ইহা দেবীর মুখকমল হইতে নির্গত সেই হেতু ইহাকে নিগম রাগ কহে। আর দেবাদিদেবের মুখ হইতে যে সমস্ত রাগ আবির্ভূত তাহাদের আগম রাগ বলে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে সদ্যোজাত মুখ হইতে শ্রী-ইত্যাদি রাগ হইল কেন? তাহার কারণ যিনি সদ্যোদ্ভুত তিনিই সদ্যোজাত। সমুদ্র মন্থনে শ্রী-ই সদ্যোদ্ভুত। সেইজন্য সদ্যোজাত মুখ হইতে শ্রীরাগের উৎপত্তি। বামদেব অর্থে কন্দর্প এবং কন্দর্পের ক্রিয়া বসন্তে। সেই কারণ বামদেব মুখ হইতে বসন্তরাগের আবির্ভাব। অঘোর অর্থে যাহার ঘোর নাই অর্থাৎ যাহার বিকার নাই। সেই হেতু রাগভৈরবের প্রকাশ অঘোর মুখ হইতে। তৎপুরুষ অর্থে আদিপুরুষ অর্থাৎ যিনি ভূতনাথ—যাহা হইতে সকল ভূতের উৎপত্তি এবং যিনি সকল ভূতের অধিপতি। রাগ পঞ্চম এই তৎপুরুষ মুখ হইতে সৃষ্ট। ঈশান মহাদেবের সূর্য্যমূর্ত্তিজ্ঞাপক এবং সূর্য্য হইতেই মেঘের উৎপত্তি। সেই কারণ মেঘরাগের উদ্ভব ঈশান মুখ হইতে।

রাগিণী সমূহের উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রে বিশেষ কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র রাগিণী সমূহের নাম পাওয়া যায় এবং সে সম্বন্ধেও বিশেষ মতানৈক্য দেখা যায়। সেই কারণবশতঃ এখানেও কালচক্রের আশ্রয় লওয়া যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয়।

কালচক্রে সপ্তম স্থান হইতে ভার্য্যা ইত্যাদির বিচার হয়। মিথুন রাশির সপ্তম হইল ধনু রাশি। ধনু হইল শক্তির প্রতীক। এই ধনু রাশির অধিপতি অঙ্গীরাসুত বৃহস্পতি। বৃহস্পতি হইল বাচস্পতি এবং তিনি নিজে নাদ। বৃহস্পতির সংখ্যা হইল ছত্রিশ। সেইকারণ রাগিণী হইল ছত্রিশ।

এই ছত্রিশ রাগিণী কি কি তাহা রাগসমূহকে একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

১। শ্রীরাগ—বিষ্ণুশক্তি সম্পন্ন, ত্রিলোক ব্যাপ্ত, বিশুদ্ধ শ্বেতবর্ণ, সলিলোত্থিত। তাহাতে মধুর রস নিবদ্ধ ও তিনি পর্ব্ব পর্ব্ব করিয়া বৃদ্ধি পান।

এই ছয়শক্তি থাকা হেতু ছয় রাগিণীর উদ্ভব।

বিষ্ণুশক্তি হইতে—মালশ্রী
ত্রিলোকব্যাপ্ত হেতু—ত্রিবণী
বিশুদ্ধশ্বেত হইতে—গৌরী
সলিলোত্থিত বলিয়া—কেদারী
মধুররস হেতু—মধুমাধবী
পর্ব্ব পর্ব্ব বৃদ্ধি হেতু—পাহাড়ী

২। বসন্তরাগ—ইহাতে উন্মাদনী, সর্ব্বব্যাপী প্রবল ইন্দ্রিয়শক্তি আবদ্ধ। ইনি শৃঙ্গার-রসাত্মক ও দোলন জ্ঞাপক। এই ছয়প্রকার ভাবহেতু নিম্নোক্ত ছয় রাগিণীর প্রকাশ—

উন্মাদনী শক্তি হইতে—দেশী
ইন্দ্রিয়াদি হইতে—দেবগিরি
সর্ব্বব্যাপ্তি হেতু—বৈরাটী
প্রবলতা বশতঃ—টোরী
শৃঙ্গার হেতু—ললিত
দোলান হেতু—হিন্দোল

৩। ভৈরবরাগ অবিকারী শক্তিসম্পন্ন এবং তিনি সর্ব্বভূতে রত ও মস্তকে সমুদ্রোত্থিত চন্দ্র অবস্থিত। তিনি সকল গুণের আশ্রয় স্বরূপ হইয়া সকল চিন্তার অতীত। এই সকল ভাব থাকা হেতু নিম্নোক্ত ছয় রাগিণী সকলের আবির্ভাব।

অবিকারী শক্তি হইতে—ভৈরবী
সমুদ্র হইতে—বাঙ্গালী
চন্দ্র হইতে—সৈন্ধবী
সর্ব্বভূতেরত হেতু—রামকেলী
গুণাশ্রয় হেতু—গুণকেরী
সকল চিন্তার অতীত বলিয়া—গুর্জ্জরী

৪। তৎপুরুষ—ইনি হইলেন মহাপুরুষ। ইনি দেহস্থ বায়ু ও শব্দকে বেষ্টনকরত' শ্রবণেন্দ্রিয়ে অবস্থান করিয়া ভূর পালন কর্ত্তৃরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। এই সকল শক্তি হইতে নিম্নোক্ত রাগিণী সকলের বিকাশ—

প্রকাশ শক্তি হইতে—বিভাস
ভূ পালন কর্ত্ত হইতে—ভূপালী

দেহস্থ বায়ু হইতে—পটহংসিকা
শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে—কর্ণাট
মহাপুরুষ বলিয়া—মালবী
দেহস্থ শব্দ হইতে—পটমঞ্জরী

৫। মেঘ—সমুদ্র মন্থনকালে দাবানল উত্থিত হইয়া গণ হেতু কামাগ্নিতে রূপায়িত হইয়া দেহাকাশকর্ষণ হেতু নিম্নোক্ত রাগিণী সকল সৃষ্ট—

সমুদ্র হইতে—সায়েরী
মন্থন হইতে—বৈরাটী
দাবানল হইতে—হয়শৃঙ্গার
গণ হইতে—গান্ধারী
কাম হইতে—কৌশিকী
রূপান্তর হেতু—মল্লারী

৬। নটনারায়ণ—কামাদি প্রযুক্ত মৈথুন অভিলাষী মধুর অস্ফুট হর্ষধ্বনিযুক্ত কম্পন হইতে কামোদক নিঃসৃত হেতু নিম্নোক্ত রাগিণী সকলের বিকাশ।

কামোদক হইতে—কামোদী
মৈথুনাভিলাষী হইতে—আভিরী
কামাদি হইতে—সারঙ্গী
মধুর অস্ফুটধ্বনি হইতে—কল্যাণী
হর্ষোধ্বনি হইতে—হাম্বির
স্পন্দন হইতে—নাটিকা

এই সর্ব্বসাকুল্যে ছত্রিশ রাগিণীর সংমিশ্রণে যাবতীয় রাগ ও রাগিণী সৃষ্ট হইয়াছে।

এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ভারতীয় সঙ্গীতের ভিত্তি হইল বেদ এবং যুগযুগান্তর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। এই নাদ-বিদ্যার নাম গন্ধর্ব বেদ। ইহা অপৌরুষেয় এবং গুরুপরম্পরা ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। এই জন্য ইহা "অনাদি সম্প্রদায়সিদ্ধঃ"।

এই সমস্ত রাগ ও রাগিণী মানবকৃত নহে। ইহারা ভরত কি নারদ কি অন্যান্য ঋষি দ্বারা সৃষ্ট নহে। ইহারা অনাদি ও অপৌরুষের। মানব তাহার সুকৃতি ও সাধনার দ্বারা ইহা অর্জন করে। এই সমস্ত ঋষিরা তাহাদের তপঃ প্রভাবে এই বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া শিষ্য পরম্পরায় বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। কালের সহিত যেমন আমাদের সকল সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে সেইরূপ, সঙ্গীতেরও বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে এবং ঘটিবে।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ—
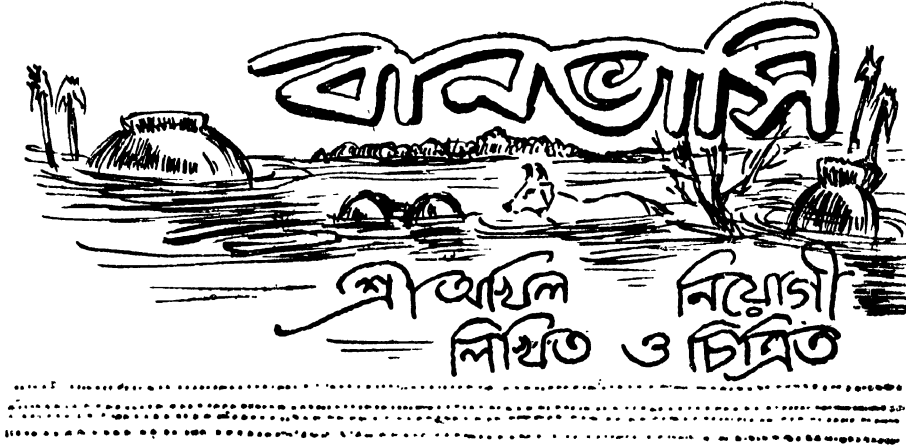
মাঝরাত্তিরে একটা শোঁ শোঁ শব্দ শুনে আমিনার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

আমিনার ঘুম খুব পাতলা। একটু পাতার খসখসানি, একটু বাতাসের শব্দ, লোক চলাচলের মৃদু আওয়াজ শুনলেই আমিনা সজাগ হয়ে ওঠে।

পাশে শোয়া মানুষটাকে ধাক্কা দিয়ে বল্লে শুনতে পাচ্ছিস্ কিছু? পানির শোঁ-শোঁ শব্দ না?

বদর আলি তখন ঘুমে কাতর। সারাদিন ক্ষেতে কাজ করেছে। বাড়ী ফিরে এক থালা ভাত পায়নি। পেয়েছে খান কয়েক শুকনো রুটি। ভালো করে ওর পেট ভরেনি। কিন্তু ঘুমে দু'চোখ ভরেগেছে। তাই আচম্কা আমিনার ধাক্কা খেয়ে বিরক্ত কণ্ঠে বল্লে, কেন মিছিমিছি জ্বালাতন করছিস? এত তোর ভয় কেন? একটা শুক্নো পাতার শব্দ হলে জড়িয়ে ধরিস্—

বদর আলি

আমিনাও চটে উঠল। —হুঁ! শুক্নো পাতা! কান পেতে ভালো করে শোন না! গাঙের পানির শোঁ-শোঁ কাতরানি আমি চিনিনে? গাঙের ধারে আমার ঘর ছিল তা জানিস?

বদর আলি ঘুমে জড়ানো গলায় বল্লে, সেই জন্মেই এমন গেছো ম্যাইয়্যা হয়েছিস্ আর যখন তখন সাঁতরে গাঙ পার হতে পারিস!

আমিনা সাপিনীর মতো ফোঁস্ করে উঠ্ল। ইস্ গেছো মাইয়া। আমি না এলে তোর ঘর সংসার মতো সামলাতো কে? আর পিটুলির মতো অমন সোন্দর মাইয়া পেতিস কোথায়?

ওদের পাশেই পিটুলি অঘোরে ঘুমুচ্ছিল। সেদিকে একবার হাত বাড়িয়ে বদর আলি বল্লে, হুঁ! সেকথা সত্যি। পিটুলি আমাদের সাত রাজার ধন মাণিক! বদর আলি আবার পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

কিন্তু কারো চোখেই আর ঘুম আসে না। দড়িতে বাঁধা একটা দানব যেন কেবলি ফুঁসে মরছে। শেষ রাত্তির থেকে আবার অঝোর ধারে বৃষ্টি সুরু হল।

বদর আলি আর আমিনা দাওয়ায় এসে দেখে রাত্তিরের অন্ধকারে মনে মনে যে ভয় দানা বেঁধেছিল তাই যেন পাখ্না মেলে ঘরের দরজায় এগিয়ে এসেছে।

শেষ রাত্তিরের আবছা আঁধারে সারা গ্রাম জল থৈ-থৈ করছে। আর সেই জল ভেঙে পাগলা পেশমটা সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে চীৎকার করছে—

লিখিব পড়িব মরিব দুখে
মৎস মারিব খাইব সুখে।

পেশন্নর

পেশন্নর এই পাগলামীতে কেউ হেসে এগিয়ে আসতে পারছে না! একটা অজানা আশঙ্কায় সবার বুকই দুরু দুরু করছে।

আমিনা একবার পিটুলির দিকে তাকালো। ছোট্ট ফুলের মতো মেয়েটা অঘোরে ঘুমুচ্ছে!

বাইরে একটানা বৃষ্টি পড়ে চলেছে।

গুড়গুড়ির মার তিনকুলে কেউ নেই। তবু সে মনে এতটুকু সোয়াস্তি পাচ্ছে না। কেবলি সে ঘর বার করছে। বানের জল যদি আরো উঠে আসে তাহলে সে কি করবে? কেউ জানে না, গুড়গুড়ির মার ঘরের মেঝেতে হাঁড়ি ভর্ত্তী রূপোর টাকা আছে। সারা জীবন ধরে সে শুধু সঞ্চয় করে গেছে। সংসারের দিকে তাকায় নি। স্বামীর স্বাস্থ্যের দিকে তাকায় নি। ছেলেমেদের প্রাণে ধরে পুরো পেট খেতে দেয় নি। শুধু পয়সা থেকেসিকি, সিকি থেকে আধুলি আর আধুলি থেকে টাকা জমিয়েছে। এক একটা টাকা হয়েছে আর গুড়গুড়ির মা আকুল তৃষ্ণা নিয়ে সেই দিকে তাকিয়ে থেকেছে। এইভাবে আজ বুড়ী গুড়গুড়ির মার আপনার বলতে কেউ নেই, কিন্তু এই জমানো টাকার নেশায় বুড়ী কোথাও যেতে পারে না। এমন কি তীর্থ-ধর্ম করতেও বুড়ীর কোনো আসক্তি নেই।

নটবর দাসের পরাণে আজ এতটুকু শান্তি নেই! চলে গেছে। কিছু ধানী জমি আছে। কষ্টে সৃষ্টে তাই দিয়ে নটবর সংসারের ছেঁড়া কাঁথায় তালি দিয়ে চলছিল। কিন্তু শেষ রাত্তিরের আবছা আঁধারে দাঁড়িয়ে ওর মনে হল,—এই আবোধ হাড্ডি সার ক্ষিধেয় কাতর ছেলেমেয়েগুলিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার জন্যেই বানের জল যেন হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে!

গুড়গুড়ির মা

নটবর কী করবে—কোথায় ওদের লুকিয়ে রাখ্‌বে ভেবে কূল-কিনারা পায় না!

জল যত বাড়ছে শাপলা ততই খিল্ খিল্ করে হাস্‌ছে। বানের জলের কলধ্বনির সঙ্গে ওর ভরা যৌবনের উচ্ছ্বাসের যেন একটা মিল আছে।

হাততালি দিয়ে শাপলা বলে, দেখেছ ঠাকুমা, দেখেছ? বানের জল ডোবা ছাড়িয়ে, উঠোন পেরিয়ে একেবারে দাওয়ায় আসতে চায়। ওরা যেন দু'হাত মেলে আমায় জড়িয়ে ধরতে চায়।

হাততালি দিয়ে শাপ্‌লা যেন আপন মনেই নাচতে থাকে।

ঠাকুমা কিন্তু শাপ্‌লাকে ধমক দিয়ে ওঠে। কিসে এত পোড়া মুখে হাসি আসে বুঝি না। তুই চুপ করে আমার পাশে এসে বোস দেখি। আমি তোর মাথায় দুর্গানাম জপ করি—

শাপ্‌লা কিন্তু এতটুকু দমেনা। তার ঠাকুমাকে হাসতে হাসতে উত্তর করে, এবার মা দুর্গা আসবার আগেই এই বানের জল আমাদের কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাবে—

—এই অলুক্ষণে কথা কেন বলছিস্ শাপলা? তোর প্রাণে কি এতটুকু ভয় ডর নেই?

শাপলা ওর ভরা দেহটাকে দুলিয়ে দুলিয়ে বলে, ভয়-ডর? আমার কিন্তু দেখতে ভারি ভালো লাগে। ওই যে কাদের ঘর বুঝি ভেসে যাচ্ছে। অমনি আমাকে যখন বানের জল ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ভাবতেই আমার মজা লাগছে ঠাক্মা—

ঠাক্মা এইবার মুখ খিঁচিয়ে ওঠে। বলে, আ মরণ! সাত পুরুষের ভিটে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে—আর তোর মজা লাগছে! তোর ওপর কোন অলক্ষ্মী ভর করেছে—এই আমি বলে দিলাম—

শাপলা কিন্তু এতটুকু দমে না। বলে, আচ্ছা ঠাক্মা, সারা জীবন ত তুমি লক্ষ্মীপুজো করলে। কাউকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলে? একে একে কোল খালি করে তোমার ছেলেগুলো ত সবাই পালিয়ে গেল। এখন বাকি রইল বুড়ি আর ছুঁড়ি।

নাতনীকে বকতে গিয়ে বুড়ী হু-হু করে কেঁদে ফেল্লে। জড়িয়ে ধরে নিজের মুখরা নাত্‌নীটিকে।

শাপলাকে বুকে চেপে ধরে বুড়ীর সে কি বুকফাটা কান্না!

বিরিঞ্চি আপন মনে বিড় বিড় করে কি বকে। ওর মুখের কথা—মনের কথা কেউ বুঝতে পারে না! বিরিঞ্চি শুধু নিজের সঙ্গেই কথা বলে।

—হুঁ। বান এসেছে। বান এসেছে তা হয়েছে কি শুনি? এতগুলো ধানী জমি, কিন্তু বুড়ো কিছুতেই নড়বে না। এই বান-ভাসিতে যদি বুড়ো ভেসে যায় তা হলে পাঁচসিকের হরির লুট দেবো। বান এসেছে, আবার বানের জল নেমে যাবে। কিন্তু বুড়ো যে কিছুতেই ঘাড় থেকে নাম্‌তে চাইছে না। দোহাই বানের জল, এইটুকু উপকার করে যাও—

সত্যি, সারাটা অঞ্চল জুড়ে যেন অলক্ষ্মীর ছায়াপাত হল।

বানের জল কমবার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। গরু বাছুর ছাগলছানা সব বানের জলে ভেসে যাচ্ছে। ধানের মড়াই ঠেলে বেরিয়ে যাচ্ছে, কেউ আট্‌কে রাখতে পারছে না! খড়ের আর ছনের ঘরগুলি নৌকোর মতো দুলতে দুলতে চলে যাচ্ছে। তার ওপর প্রাণের দায়ে ছোট ছোট ছেলেরা আশ্রয় নিয়েছে! কতক্ষণ তার ওপর টি্‌কে থাক্‌তে পারবে কে জানে!

ছেলে কোলে মায়েরা হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে বলির পাঁঠার মতো কাঁপছে;—কে তাদের উদ্ধার করবে কেউ জানেনা!

ছেলে কোলে মা বুকজলে

কয়েকটা কালো লোভী শকুন—ওদের মাথার ওপর দিয়ে কেবলি উড়ে বেড়াচ্ছে।

কখন যে ছোঁ মেরে বস্‌বে কেউ জানেনা। প্রাণ হাতে করে মরণের মুখে দাঁড়ানো কাকে বলে গাঁয়ের মানুষেরা এবার হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছে।

সারা পৃথিবীতে কি আর মানুষ নেই?

ওদের দেশের এই বানভাসির কথা কি কেউ জানতে পারে নি? কেউ কি এগিয়ে আসবেনা ওদের বাঁচাতে?

অবশেষে সাড়া পাওয়া গেল দিন তিনেক পর।

একদল লোক নৌকায় চেপে 'হৈ হৈ করতে করতে এসে হাজির হল।

ওদের রকম-সকম দেখে মনে হল, একটা ভারি মজার খবর পেয়েই ওরা ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে হাজির হয়েছে।

সঙ্গে রয়েছে ওদের চিড়ে আর গুড়।

নৌকোর লোকগুলো বল্লে, তোমাদের খিদের সময় চিড়ে গুড় দেবো। কাচ্চা-বাচ্চাগুলিকে নৌকোয় তুলে নেবো, জল সরে গেলে ঘর ছেড়ে দেবো। কিন্তু এক সর্তে—

এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপতেকাঁপতে বলে আবার সর্তটা কি শুনি ? প্রাণটা ত' আগে বাঁচুক—

নৌকোর লোকেরা বল্লে, আমাদের বিশ্বম্ভরদাকে কিন্তু ভোট দিতে হবে—

গাঁয়ের লোকগুলো দিশেহারা হয়ে গেল। মানুষ যেখানে পোকা মাকড়ের মতো মরতে বসেছে—সেই সময় ভোটের কথা মনে আসে কি করে ?

তবু গরজ বড়ো বালাই।

আগে প্রাণটা ত' বাঁচুক— !

তারপর ভোটই নাও, আর চোটই দাও, পরের কথা পরে। সব সর্তেই তারা রাজি।

হাতে-হাতে তারা চিড়ে গুড় পেয়ে গেল। কিন্তু ঘাড় বাঁকা লোকেরও অভাব নেই গাঁয়ে।

তারা বল্লে, ভালো রে ভালো, আমরা মরতে বসেছি, আর তাই নিয়ে তামাসা ! আগে আমাদের বাঁচাও, পেট পুরে খেতে দাও। বাচ্চা-কাচ্চার জান বাঁচাও, মানুষের কাজ করো। ভোটের কথা ভোটের সময় হবে।

কিন্তু লোকগুলোও নাছোড়-বান্দা। ওই এক গলা জলে দাঁড়িয়ে ভোটের কথার প্রতিজ্ঞা করতে হবে, তবে মিলবে চিড়ে গুড়।

ওরা নৌকোর ওপর নিজেদের দলের একটা নিশান উড়িয়ে দিলে। এই দলের লোক হও ত'—আমন্ত্রণ। নইলে তোমরা কেউ নয়।

এমনি ভাবে আর একদল এলো ঝাণ্ডা উড়িয়ে।

তারা বল্লে, আমরা এসে পড়েছি। তোমাদের আর কোনো ভাবনা নেই। তোমাদের বাঁচবার সোজা পথ আমরা দেখিয়ে দেবো। সব তোমার, শুধু চাবিকাঠিটা আমার। একটা টিপসই দিলেই হাতের মুঠোর মধ্যে সবকিছু খুঁজে পাবে।

আবার আর একদল অনাহারী মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ল তাদের নৌকোয়।

নানা কাগজের অফিস থেকে প্যান্ট পরে কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে এসেছে নানান জন।

মানুষ পেটের খিদেয় ধুকছে,—আর ওরা বলছে, বুক জলে দাঁড়িয়ে কাঁদো কাঁদো হয়ে দাঁড়াও। ছবি তুলবো আমরা। তোমাদের ছবি শহরের খবরের কাগজে ছাপা হবে। চারদিকে হৈ-চৈ পড়ে যাবে। তবে ত' টাকা পয়সা আসবে, ধুতি জামা-সাড়ি আসবে। আসবে বড়-লোকদের ভাঁড়ারঘর থেকে নানা রকম খাবার।

লোকগুলো কি বোকা, শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। সিনেমা ষ্টারদের মতো 'পোজ' দিতে পারে না !

সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি

আর একদল এসেছে কোন্ এক সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ থেকে। তারা বড় দেখে বজ্‌রা নিয়ে এসেছে। তার ভেতর নাচ-গান বাজনা হরদম চলছে। মাঝে মাঝে গাঁয়ের লোকদের খাবার বিলিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু সেই দানের দৃশ্যগুলি ক্যামেরায় তুলে নিচ্ছে। ওরা বলছে, সংস্কৃতিক সঙ্ঘ ত'! শহরে ফিরে গেলে এই সব ফটোর বিশেষ কদর হবে। সঙ্ঘের বার্ষিক বিবরণীতে এই জাতীয় ছবি সযত্নে মুদ্রিত হবে। সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের সভ্যরা চাষীদের বাড়ীতে মুরগীর খোঁজ করে বেড়াচ্ছে, আর পেলেই একেবারে জলের দরে কিনে নিয়ে ওদের কৃতার্থ করছে।

চাষীরা ভাবছে, এমনি ও জলে ভেসে যেতো, না হয় জলের দরে বিকিয়ে গেল। রামে মারলেও মরবো, আর রাবণে মারলেও মরবো।

ওদিকে শাপলার দাওয়ায় যেন একেবারে মেলা বসে গেছে। ওখানে ষ্টোভে করে সব সময় চায়ের জল গরম হচ্ছে। সরু ড্রেন পাইপ পরা নব্য যুবকের দল বিদেশী টিন খুলে ঘন দুধ আর নানা জাতের বিস্কুট সরবরাহ করছে। সেই সঙ্গে এগিয়ে দিচ্ছে পোটাটো চিপস্।

শাপলা ওখানে হয়ে উঠেছে—জন জাগরণের মক্ষীরাণী। ওর ফটো তোলা হচ্ছে নানান ঢঙে !

ঠাকুমা শুধু থেকে থেকে ভ্রূকুটি ক'রছে আর বিরক্তির সঙ্গে বলছে—মুখে আগুন! মুখে আগুন!

কোন আশ্রম থেকে স্বামীজীরা এসেছেন বন্যাত্রাণে সাহায্য করতে।

শাপলার ফাটা তোলা

কিন্তু তাঁরা একটি নীতি মেনে নিয়েছেন—

"Self help is the best help!"

সকাল থেকেই তাঁরা আত্মানুসন্ধানে তৎপর হয়ে আছেন। বাইরে কিছু কিছু পুরোণো কাপড় বিতরণ করা হচ্ছে বটে, কিন্তু নৌকোর অন্দর-মহল থেকে খাঁটি গব্য ঘৃতের সুবাস ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। যে সব গ্রাম একেবারে ডুবে যায় নি, ভক্তের দল সেখান থেকে জোগাড় করে নিয়ে আসছে—সদ্য পানানো দুধ। সরু চাল নৌকোর ভেতরেই আছে। কাজেই পরমান্ন রন্ধনের আর আপত্তি কোথায়?

কিছু কিছু ভক্তজন—যারা কায় মন-প্রাণ স্বামীজীদের সেবায় সমর্পণ করেছে—তারা যথাকালে কিঞ্চিৎ প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে না!

ও'দিকে মাঝে মাঝে আবার দুই রাজনৈতিক দলে ঠাণ্ডা-লড়াই চলছে।

কোন ঝাণ্ডাকে তুমি মানো—সেইটে শুনে তবে সাহায্য বিতরণ হবে।

প্রচুর জিনিস পাঠাচ্ছে—এই বন্যাত্রাণের সাহায্যের জন্য,—কিন্তু মাঝ পথে সব কিছু চাল-ডাল খাবার-দাবার আর জামা কাপড় সব এই রাজনৈতিক দলগুলির খপ্পরে গিয়ে পড়ছে।

স্বামীজী

কোন সর্তে এই সব জিনিস বিতরণ করা হবে?

মীমাংসার পথ অতি সোজা।

আমাদের ঝাণ্ডা মেনে চলো, আমাদের দলের দাদাদের ভোট দিতে রাজী হও,—সোনা মুখ করে তোমাদের হাতে সব কিছু তুলে দেবো।

ফেল কড়ি মাখ তেল আমি কি তোমার পর?

এই আন্দোলনের ফলে সাহায্যকারীদের মধ্যে যেন দুটো শিবির হয়ে গেছে!

অনেক সময় দুর্গতদের সাহায্য করা মাথায় গিয়ে উঠছে।

খণ্ডযুদ্ধ এখানে-ওখানে-সেখানে লেগেই আছে। সমস্যার সমাধান হবে—না, নিরন্ন অন্ন পাবে?

সর্বহারার দল তাই হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে কাঁপছে কখন বাবুদের বাক্‌যুদ্ধের মীমাংসা হবে,—কখন তারা দু'মুঠো চাল পাবে—এই তাদের প্রত্যাশা!

ওদিকে দেশের খবরের কাগজগুলি—রোজ বন্যা-পীড়িত জনগণের দুঃখে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে। নানা ঢঙের ছবি বেরুচ্ছে। কোথায় সাঁতরে, ক্ষুধার্ত জনতা ধেয়ে আসছে খাদ্যের লোভে; কোথাও মা খাল পার হতে গিয়ে কোলের সন্তানকে হারিয়ে ফেলছে জলের স্রোতে কোথাও বাপ আর ছেলেতে কাড়াকাড়ি চলছে সামান্য

ওদিকে শাপলা ভেসে যেতে চেয়েছিল বন্যার স্রোতের জলে।

. কিন্তু সে যৌবনের জোয়ারের কোন পাকে কোথায় যে তলিয়ে গেল—কোন দৈনিক কাগজে সে খবর ছাপা হ'ল না!

বানভাসিতে কে কোথায় কিভাবে অতল-তলে হারিয়ে গেল—মহাকালও তার হিসেব রাখতে পারে না।

শুধু একটা পাগ্‌লি বুড়ী আজও তার নাত্‌নীকে খুঁজে বেড়ায়!

লোকে বলে, ওই শাপ্‌লার ঠাকুমা!

ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ

পুষ্পদেবী, সরস্বতী, শ্রুতিভারতী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথমপাদ

দৃশ্যতে তু ২'১'৬

দেখা যাইতেছে একের হইতে অন্য সৃজন হয়
সৃজিত বস্তু আকার প্রকারে স্রষ্টার মত নয়
পুরুষ হইতে কেশ লোম হয়
বৃশ্চিকা হয় হইতে গোময়
ভেবে দেখো মনে কার্য্য কারণ একই যদি বা হয়
স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির মিল তবুও এক ত নয়
অরূপ ব্রহ্ম বল কি ভাষায় বর্ণিব রূপ তাঁর
বর্ণনাতীত অতুলন সেই চিত্ত চমৎকার
মিথ্যা তর্কে কোন লাভ নাই
কত বারে বারে করিতে যাচাই
ব্রহ্ম বা শ্রুতি এসব বিষয় তর্কাবসর নাই
সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টা তেমন দিশেহ সেজন ভাই।

অসৎ ইতি চেৎ প্রতিষোধমাত্র ত্বাৎ

২।১।৭

শঙ্কর কন যদি বল অসৎ প্রতিষেধ মাত্র হয়
ব্রহ্ম তাহলে জগৎ কারণ বলিয়া সকলে কয়
সৃষ্টির আগে কারণের মত
অসৎ জগৎ আছিল সতত
ব্রহ্মে পরশি অসৎ জগৎ পাইল পরিত্রাণ
পরশ রতনে পরশ করিয়া লোহযে স্বর্ণপ্রাণ।
কার্য্যের আগে কারণ জানিও সতত বিদ্যমান
সৃষ্টির আগে স্রষ্টার তাই কর তবে সন্ধান
সৎ কার্য্যবাদ বলি এরে কয়
জগতের মাঝে প্রকাশিয়া রয়
জগতের মাঝে জগৎ নাথের প্রকাশ দেখিতে হবে
তবে সার্থক জনম ভবেতে ব্রহ্মে লভিলে ভবে॥

[ক্রমশ

মাতৃরূপা বরাভয়া

শ্রীদিলীপকুমার রায়

রবীন্দ্রনাথ তাঁর "দুই বিঘা জমি" কবিতার একটি চরণে লিখেছেন : 'মা বলিতে প্রাণ করে আনচান চোখে আসে জল ভ'রে।" মনে আছে ছেলেবেলায় এ-কবিতাটি প'ড়ে চোখের জল ফেলে ছিলাম আর চোখে জল ভ'রে এসেছিল বিশেষ ক'রে এই চরণটা পড়বার সময়। ইংরাজী কবি লিখেছে—:

Breathes there the man, with soul so dead
Who never to himself has said ;
This is my own, my native land.

(Sir Walter Scott)

আছে ভবে কেহ কি এমন প্রাণহীন,
গায় নি যে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কোনোদিন ,
পুণ্য জন্মভূমি, তুমি আমার, আমার!

কিন্তু Motherland শব্দটি ইংরাজীতে সম্প্রতি চালু হ'লেও, কোনো ইংরাজকবি কোনোদিন জন্মভূমিকে 'মা' সম্বোধনে ডেকেছেন ব'লে জানি না। মা ডাকটি সর্ব দেশে সবার মুখেই বেজে ওঠে আনন্দ-আবেগে বটে, কিন্তু জগন্মাতাকে ঠিক শিশুর মতন সরল সুরে মা ব'লে নানা রাগে মিড়ে ছন্দে কোন সাহেব সাধক ডেকেছেন কি? মনে তো হয় না। কথা উঠতে পারে—ভগবানকে ভগবতীর মাতৃ উপাধি দেওয়া হয়েছে তো ক্যাথলিক খৃষ্টানের ভার্জিন মেরিকেও। মানি। কিন্তু এত আদর ক'রে ডাক দিয়ে তাঁকে ওরা কেউ আপন ক'রে নিতে সাহস পায় নি। ভার্জিন মেরীর "মাদনা" মাতৃমূর্তি অপরূপ নয় বলি না—কিন্তু তা শুধু খৃষ্টদেবের পরিবেশে। নিজের আপন জোরে—in her own right—খৃষ্টজননী চিরকুমারী মেরী সকলের মা হ'য়ে বসেন নি। ভগবতী—একশোবার। কিন্তু ঠিক মা-কে শিশু যেমন আকুল অন্তরঙ্গ সুরে ডাকে নিজের একান্ত আপন ব'লে বরণ ক'রে—আবদার অভিমান এমন কি কটূক্তি করতেও পেছপাও না হ'য়ে—তেমন সুরে কোনো ভক্ত খৃষ্টান ডাকতে ভরসা পেয়েছেন কি কোনো-দিন! "ব্লাসফেমি"-র পাপে নরকের ভয় আছে তো।

বিশেষ ক'রে বাংলাদেশে ভগবতীর মাতৃমূর্তি এক অপরূপ লাবণ্যে মাধুর্যে ফুটে উঠেছে। স্বদেশী যুগে তাই না বঙ্কিমচন্দ্র জন্মভূমিকে "মাতরম্" ব'লে বন্দনা করে সবার মন কেড়ে নিতে পেরেছিলেন—সম্ভবত: "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গ দপি গরীয়সী" স্তব থেকে আদি প্রেরণা পেয়ে। কিন্তু প্রেরণা এখানে খানিকটা অবান্তর বলা চলে এই জন্য যে, বাঙালী সাধক চিরদিনই ভগবতীকে "শিশু যেমন মাকে নামের নেশায় ডাকে" তেমনি "নানা ছলে" ডেকে এসেছেন অকুণ্ঠে সরল বরণে। নৈলে কি রামপ্রসাদ এমন অভিমান করতে পারতেন :

মায়ের এম্‌নি বিচার বটে,
(যে জন) দিবানিশি দুর্গা বলে তার কপালেই বিপদ ঘটে।

শুধু অভিমান নয়, বিদ্রোহের তর্জন ;

(মা) আমি নই আটাশে ছেলে
(আমি) ভয় করি না চোখ রাঙালে।

অনুযোগ করতেও বাধে না—মা যে, বাধবে কী দুঃখের,

মা আমায় ঘুরাবি কত
যেন চোখবাঁধা বলদের মত!

কী অপরূপ উপমা! ছবি নয়?

বিশেষ ক'রে বাংলাদেশে ছেলেবেলা থেকে ঠাকুরকে মা ব'লে সনাক্ত করতে কারুরই বাধে না। ঐতিহ্য—tradition-এর জোর কি সোজা জোর? মনে আছে কৈশোরে পিতৃদেব দ্বিজেন্দ্রলাল একদিন বিখ্যাত গায়ক

অন্ধ শরৎ-এর মুখে একটি গান শুনে এসেই পিঠ পিঠ বাঁধেন তার জুড়ি।

গানটি তিনি যে-সুরে গাইতেন পরিষ্কার মনে আছে:

'তারিণী গো মা, কেন মোষের সাথে এত আড়ি।
মানুষ মারলে টের'টা পেতে, যেতে হ'ত হরিণবাড়ি।

অমনি পিতৃদেব লিখলেন ঐ একই সুরে ছন্দে—

এবার তোরে চিনেছি মা, আর কি শ্যামা তোরে ছাড়ি!
ভবের দুঃখ ভবের জ্বালা পাঠিয়ে দিচ্ছি যমের বাড়ি।

শুনে সবাই মুগ্ধ হ'ত। বলত "আহা, শ্যামাসঙ্গীত কী মধুর রে!"

হবে না মধুর! একে ঠাকরুণ তার উপরে মা। সোনায় সোহাগা।

বাঙালীপ্রাণ তিনটি মূল সুরে ঠাকুরকে ডেকে এসেছে আবহমান কাল: কৃষ্ণ, শিব এবং শক্তি ওরফে কালী। এই সেদিনও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কমলাকান্তের গান গেয়ে সবাইকে মাতিয়েছেন।

সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনমোহিনী!
তুমি আপনি নাচো, আপনি গাও, আপনি দাও মা করতালি
অশান্ত কমলাকান্ত দিয়ে বলে গালাগালি!
সর্বনাশী ধরে অসি ধর্মাধর্ম দুটো খেলি।

এখানে জগন্মাতার দুটি রূপ: এক আনন্দময়ী—যিনি নিজের নৃত্যগীতেই বিভোর চিদানন্দে; দুই: ত্রিগুণাতীতা—তাই ধর্মাধর্ম, শুচি অশুচি, পাপপুণ্যের পার।

কিন্তু এ কি সহজ কথা—আদর করে মা-কে গালাগালি করা? গম্ভীরানন সাধকেরা জিভ কেটে বলবেন না কি—"চুপ চুপ! জগন্মাতা, আদ্যাশক্তি, সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়কারিণী......

কিন্তু এরই তো নাম আপন করা, আপন হওয়া। বৈষ্ণবদের মধ্যে এ রূপ মাধুর্য পাই কৃষ্ণের সখারূপে এসে সুদাম শ্রীদামের খাওয়া ফলের আঁটি মুখে দেওয়া, অথবা বালগোপালের গোপীদের ঘর থেকে ননচুরি করে মা যশোদার কাছে এসে ধমক খাওয়া। কুন্তীর অনুপম স্তব মনে পড়ে নাকি?

গোপ্যা দদে ত্বয়ি কৃতাগসি দাম তাবদ্
বক্ত্রং নিনীয় ভয়ভাবনয়া স্থিতস্য
সা মাং বিমোহয়তি ভীর পি য দ্বভেতি॥ (ভাগবত)

হৃদয়ে জাগে নাথ, আজ তোমার সেই জননী ভয়ে দুটি ভীত নয়ন,
করিয়া অপরাধ লভিবে আজ কোন শাস্তি—ভাবি' ম্লান নত আনন—
কী অপরূপ ছবি! অশ্রুসাথে কালো কাজল মিশি ঝরে! ভয়ও যাবে
নিয়ত করে ভয়—তাহার এ কী ভয়? তোমারে ভাবিতেও মন যে হারে।

গোপীরাও তাঁকে কি কম বকেছে—নিষ্ঠুর, ছল,কপট ইত্যাদি বলে কম মান করেছে? আরও এমন বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে ভগবান্ ভক্তের আপন হ'য়ে এলে কী ভাবে তার আবদার, আবেগ, ভর্ৎসনা——এমন কি কটূক্তিও সন হাসিমুখে।

কিন্তু তবু বোধ হয় বলা চলে যে, বাঙালী সাধকেরা জগন্মাতাকে যে-ভাবে বেপরোয়া হয়ে আপন করে নিয়েছে। সে-ভাবের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে, প্রথমতঃ এই জন্যে যে, ভগবতী আপন হ'য়ে সাধকের কাছে ধরা দেওয়া কোল দেওয়া মধুর না হয়েই পারে না; দ্বিতীয়তঃ তিনি যখন মা হয়ে আসেন তখন ছেলের হাতে মার খেতেও রাজী হন—এই মধুর হতে মধুর সেই ছবি!

কিন্তু রাজী হন কখন? না, যখন সাধক সত্যিই জগন্মাতার উপর ঘরোয়া সর্বংসহা মা-র আরোপ করতে শেখেন তাঁকে প্রাণের চেয়েও ভালোবেসে। এর একটি দৃষ্টান্ত দিয়েই এ-নিবন্ধের সমাপ্তি টানি—নৈলে কায়া বিপুল হ'য়ে পড়বে।

সাধক নরসিংহ রায়ের একটি গানের অস্থায়ীতে আছে:

মা ব'লে ডাকিস্ না রে মন, মাকে কোথা পাবি ভাই।
থাকলে এসে দেখা দিত, সর্বনাশী বেঁচে নাই।

কমলাকান্তও মাকে সর্বনাশী উপাধি দিয়াছেন, কিন্তু প্রাণে মারতে সাহস করেন নি এই মা-অন্তপ্রাণ সাধকটির মত। আমি এই চরণ দুটির নির্মল মধুময় সুরে আর্দ্র হেয়ে সম্প্রতি পাদপূরণ করি এইভাবে প্রথম অস্থায়ীটি গেয়েই গাই:

ঘনালে রাত আমরা জপি : ভয় কি কালই উঠবে রবি !
দেয় যে আলো বেসে ভালো করে তাকেই প্রেম সবাই।
রং যার আঁধার, নেই স্নেহ যার—কে চায় তার কোলে ঠাঁই।
কাঁদে শিশু : হায়, মা বিনা আমি যে কিছুই জানি না,
মা-র বুকে তাই জাগি, ঘুমাই, হাসি কাঁদি, নাচি গাই,
মা ছাড়া আর নেই কেউ—তার গায় নাকি প্রাণ :
মাকেই চাই।
মা বলে হাত বাড়িয়ে হেসে : কাঁদাই আমি
ভালবেসে।
অশ্রুমেঘে স্নেহে জেগে, রামধনু হাসির রঙাই।

কান্না-নিশার ব্যাকুলতার ভাবেই উষার সুর সাধাই।"

বাঙালীর প্রাণের তারে জগন্ময়ী শ্যামা মা-র এই যে আপন মা হয়ে আসা, ভালবেসে তাকে কাঁদিয়ে কোল দেওয়া—এ-বরদানের মাধুর্যের কি তুলনা আছে—বিশেষ যখন শিশুর মত রাগ করে মাকে সর্বনাশী বলে ডেকেও সাধ মেটে না, বলে "সর্বনাশী" বেঁচে নাই।"

ভগবানকে ভগবতীকে এমন আপন মনে করবার সাহস আছে কার? শুধু তার—যে তাঁকে ভালবেসেছে তেমনি সরল ঐকান্তিকতায় যেমন ভালবাসে মা-র কোলের শিশু তার মা-কে।

তিনি আর তুমি

শ্রীনীরদবরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভেবেছ ভুলিবে ভুলে সুখী হবে
এ জীবনে ভোলা হবে না।
যত দিন রবে জ্ব'লে পুড়ে যাবে
(তাঁরে) করিলে গো-অবমাননা ॥
জীবনে মরণে, চিরসাথী তিনি
সুখ দিতে পারে, সেই সুখের খনি
বিষয় বৈভব, বিষে ভরা সব
সার মাত্র শুধু যাতনা ॥
সংসারের মায়ায় মুগ্ধ হ'য়ে মন
পেলি কিরে কিছু মনের মতন ?
আশা না মিটিতে পরমায়ু শেষ
সুখ কভু ত হ'লো না ॥
শেষের দিনে সবে স'রে স'রে যায়
তিনি নাহি যান ছাড়িয়া তোমায়

জীবনে মরণে, চিরসাথী যিনি
তাঁহারে যেন গো ভুলনা ॥
তাঁহারে ভুলিলে অচল জীবন
জ্বালা যন্ত্রণা জীবনে মরণ
সংসার মাঝে তাঁরে ধ'রে থেকো
বিস্মরণ যেন হ'ওনা ॥
মায়া ঘুর্ণিপাকে পড়িয়াছ তুমি
এক ঔষধ বলে দিই আমি
স্ত্রী, পুত্র, কন্যা বিষয় বৈভবে
সব শিব জ্ঞানে ধরনা ॥
যাঁর লীলা খণ্ড, তাঁরই যে যোড়া।
তাঁরই ভেঙে দাও, দম্ভের গোড়া
তিনি আর তুমি, তুমি ও জগৎ
এক হ'য়ে বাজাও আনন্দ বাজনা

বিচিত্র বিশ্ব

বিশ্ব বন্ধু

সম্প্রতি টোকিও সহরে একটি অভিনব দুর্ঘটনা ঘটে যায়। দশ লক্ষ মৌমাছিকে একস্থান থেকে আরেক স্থানে পাঠান হচ্ছিল লরিতে করে। জনাকীর্ণ পথের মাঝে লরিটি হঠাৎ উলটে যাওয়ায় ঐ বিরাট মৌমাছি-বাহিনী রীতিমত ঘাবড়ে যায়। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে তারা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং যাকে সামনে পায় তাকেই হুল ফুটিয়ে আক্রমণ করে। এই ভয়াবহ আক্রমণের মোকাবিলা করবার জন্য এগিয়ে আসেন মৌমাছি রক্ষীবাহিনী পুলিশ এবং সাহসী পথচারীরা কিন্তু সুফল কিছু মেলেনি। কারণ হুলের বিরুদ্ধে লড়বার মত কোন অস্ত্র আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয়নি কোন বিজ্ঞানীর মাথা থেকে। কাজেই দু'ঘণ্টা ধরে ঘোরতর যুদ্ধ চলতে লাগলো দুপক্ষে। যানবাহন সম্পূর্ণ-ভাবে অচল হল। যে যেদিকে পারলো পালিয়ে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করলো। গুরুতরভাবে আহত হলেন ত্রিশজন। এরা এখন হাসপাতালে আরোগ্য হওয়ার দিন গুনছেন। আর যারা প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়া পেয়েছেন তাদের সংখ্যা জানা যায়নি। কিন্তু যুদ্ধের অবসান হয়েছে সম্পূর্ণ অভিনবভাবে। একটি রানী মৌমাছিকে সংগ্রহ করে এনে এই ভয়াবহ যুদ্ধে মানুষের দুরবস্থার কথা বোঝান হয়। তাতে তৎক্ষণাৎ সুফল মেলে। এই সুয়োরানীর আদেশ রক্ষার্থে ঐ বিরাট বাহিনীর প্রত্যেকটি সৈন্য দিব্যি সুড়সুড় করে লক্ষীছেলের মত নিজেদের লরীতে ফিরে যায় এবং মৌমাছিরক্ষী বাহিনী শেষে সুয়োরানীর জয় ঘোষণা করে লরিতে আবার যাত্রা শুরু করে।......তাই ভাবছিলাম এইরকম একজন প্রতাপশালী সৌভাগ্যবতী সুয়োরানী যদি এসে আমার আপনার ঘর আলো করত তাহলে গৃহযুদ্ধ কথাটা শুধু ডিক্‌সনারীতেই থেকে যেত। কিন্তু সে গুড়ে বালি।

নায়েগ্রা নায়ক

নায়কের নাম নিয়েল টমসন। বাড়ি মেক্‌সিকো বয়স উনিশ। ইনি বর্ত্তমান বিশ্বের সাঁতার-সফল-নায়ক দের অন্যতম। এই নিয়েল টমসনই বিশ্বের প্রথম ব্যক্তি যিনি নায়েগ্রার উত্তাল জলরাশি সাঁতরে পার হয়েছেন বলে দাবী জানান। ঘন সন্নিবিষ্ট গাছপালা এবং বড় বড় পাথরের ভেতর দিয়ে স্রোতস্বিনী নায়েগ্রা প্রবাহিতা। চওড়ায় প্রায় এক হাজার ফিট। টমসন প্রথম জলে নামেন মার্কিন সীমানা থেকে এবং বিপদ-সঙ্কুল ঐ জলরাশি ঠেলে কানাডা অঞ্চলে গিয়ে ওঠেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অভিনন্দনের বদলে মেলে হাতে হাতকড়া। কানাডা পুলিশ তাকে অভিবাদন জানায় আইন ভঙ্গের অপরাধে পাকড়াও করে। টমশন পুলিশ কর্তৃপক্ষকে তার বীরত্বের কাহিনী বর্ণনা করে বোঝাতে চেষ্টা করে যে এতে বিশ্ববাসীর আনন্দিত হওয়া উচিত। কিন্তু পুলিশ না শুনে ঘটনাটিকে নেহাতই গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দিতে চান। কিন্তু এতে টমসনের নায়কত্বে ভয়ানক আঘাত লাগে এবং তিনি বলেন মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের যে অঞ্চল থেকে তিনি প্রবলস্রোতা নায়েগ্রার দুরন্ত বুকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন সেখানে তিনি তার এই দুঃসাহসিক কাজের সাক্ষী স্বরূপ এক খণ্ড পাথর সাজিয়ে রেখে এসেছেন, ইচ্ছা করলে পুলিশ সেখানে গিয়ে তা দেখে আসতে পারেন। তিনি আরও বলেন যে আমেরি-কান জলপ্রপাতের কাছাকাছি স্থান থেকে জলে নামার দরুণ প্রবল বেগে তাকে প্রায় মাইল খানেক দূরে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এখন একটি তদন্ত কমিশনের

রায়ের উপর নির্ভর করছে টমসনের অভিনন্দন বা কারাবন্ধন। বিশ্বমঞ্চের উপর অভিনীত এই নাটকের শেষ দৃশ্যটী মিলনান্তক হলে দর্শকরা আশাতীত খুসী হবেন।

তব হৃদয়ং মম

যাক্ এতদিনে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আগে মানুষের হৃদযন্ত্র বিকল হলে গোটা মানুষটাকেই বরবাদ করে দিতে হত। প্রয়োজনবোধে:কোন গোধূলি লগ্নে আবার নতুন করে আরেক জনের হৃদয়ের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হত। এখন আর তার দরকার নেই। সেই পুরণো হৃদয়েই কাজ চলবে শুধু স্পেয়ার পার্টস কিছু কিছু বদলে নিতে হবে। মানে অকেজো বা পুরণো কলকব্জাগুলো একটু পালটে নেওয়া। যাতে গোটা মানুষটাকে বরবাদ না করে নতুন করে হৃদয়ের কাজে লাগান যায়। এই হৃদয় দেওয়া-নেওয়ার কাজ যাতে ঠিকমত চালু থাকে সেই উদ্দেশ্যেসম্প্রতিবোম্বায়ের এক হাসপাতালে হৃদ্যন্ত্রের স্পেয়ার পার্টস মজুদ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। বোম্বাইয়ের কে, ই, এম, হাসপাতালের কার্ডিয়ো-ভাসকুলার ও থোরাসিকা সেন্টারের ডাইরেক্টার ডাঃ জি, কে, সেন বলেন যে হৃদরোগীদের প্রয়োজনীয় স্পেয়ার পার্টস সরবরাহের উদ্দেশ্যে বোম্বাইয়ে একটি হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট রেজিস্ট্রেশন সেন্টার স্থাপন করা দরকার। ঐ সেন্টারের মাধ্যমে বিভিন্ন হাসপাতাল পরস্পরের প্রয়োজনে হৃদযন্ত্রের বিভিন্ন অংশ ও টিস্যু বিনিময় করবে এবং যে সব রোগীর হৃদ্বদল প্রয়োজন তাদের রক্ত ও টিস্যুর ধরণ ঐ সেন্টারে লিপিবদ্ধ করা থাকবে। কেপ টাউনে একটি আন্তর্জাতিক হার্ট ট্রান্স প্লান্ট স্থাপিত হবে যাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের হৃদবদল চিকিৎসার অগ্রগতি সম্বন্ধে রেকর্ড রাখা হবে। ডাঃ সেনের এই বিবৃতি বিশ্ববাসীর মনে বিরাট ভরসা এবং শান্তি এনে দিয়েছে। হৃদয়ঘটিত গোলমালে সহসা মৃত্যু হওয়ার আশঙ্কা এখন মাত্রায় অনেক কমে গেল। হৃদয়কে নতুন করে বাঁধিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাওয়ার জন্যে সবাই এবার কোমর বেঁধে দাঁড়াতে পারবে।

বাবা কেদারনাথের নিদ্রাভঙ্গ

উত্তর গাড়োয়ালের প্রায় ১২ হাজার ফিট উচ্চে অবস্থিত শ্রীকেদারনাথের মন্দিরের সঙ্গে দেশবাসীর সরাসরি টেলিফোনে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়েছে। সাধারণতঃ বাবার প্রসাদ মাহাত্ম্যে যে সব ভক্ত সন্ধ্যার পর এক বিশেষ তুরীয় অবস্থায় থাকেন, এই টেলিফোন ব্যবস্থায় তাদের খুবই উপকার হল। যখন-তখন ডাকলেই বাবাকে পাওয়া যাবে—শুধু নন্দীভৃঙ্গীর কাজই যা বাড়লো—ভক্তের সঙ্গে ভগবানের লাইনে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া। এসব দেখে আর আমারও এক আধবার ইচ্ছা করে সন্ধ্যার পর তেমন জায়গা দেখে আসন পেতে বসে বলি—জয় বাবা কেদারনাথের জয়।

যৌগিক ঘুম

আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্র আন্দোলনের নেতা স্বামী সত্যানন্দজী বর্তমানে বিদেশ সফর করে বেড়াচ্ছেন। উদ্দেশ্য গীতার উপদেশ প্রচার এবং বিভিন্ন ধরণের যোগ-শিক্ষা দান। স্বামীজি একটী নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন, লণ্ডনের ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এ্যাবিতে এই প্রথম একজন ভাতীয় সন্ন্যাসী খ্রীষ্টান জনসভায় ধর্মপ্রচার করেছেন। স্বামীজী সংস্কৃতে কয়েকটি শ্লোক সুর করে আবৃত্তি করেন এবং তার ভাষণে বলেন যে একমাত্র যোগ সাধনার মাধ্যমেই পূর্ব ও পশ্চিমে মিলন সম্ভব। যোগ আসলে ধর্ম নয় বা কোন সম্প্রদায়ও নয়। যোগ একটি বিজ্ঞান। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে বিশ্ববাসীর সকলের আজ যোগাভ্যাস করার দিন এসেছে। এরপর তিনি যোগাভ্যাসের আশ্চর্য্য ফল দেখান। দশ মিনিটের জন্যে তিনি উপস্থিত দর্শক-দের গভীর নিদ্রায় নিদ্রাভিভূত করেন। নিদ্রাভঙ্গের পর দর্শকরা অন্তরে গভীর শান্তি অনুভব করেন। স্বামিজীর জয় জংকার চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বালিশে মাথা রাখামাত্রই ঘুমিয়ে পড়ার টোটকাটা যদি স্বামিজী হতভাগা স্বামী নামক জীবদের বিতরণ করতেন তাহলে বেচারা স্বামীদের অন্ততঃ আরো কিছুদিন আয়ু বাড়তো।

ডাক্তার না ডাইনী ?

জামবিয়ার অধিবাসী মিঃ জি কাগোয়ে তানজনিয়ার একটি খবরের কাগজে একখানি মূল্যবান চিঠি প্রকাশ করেছেন। তার বক্তব্য হল তিনি নিজে কুসংস্কারাচ্ছন্ন নন এবং মোহিনী বিদ্যায় বিশ্বাস করেন না, তবুও তিনি

বলেছেন ডাইনি ডাক্তারেরা আশ্চর্য্য সব কাণ্ড করতে পারেন। এ বিষয়ে তিনি একটি অবিশ্বাস্য ঘটনার উল্লেখ করেন। একজন ডাইনি ডাক্তার তাকে বলেছিলেন—যে কয়েক মাইল দূরের এক খরস্রোতা নদীকে তিনি জলশূন্য করে ফেলতে পারেন! কাগোয়ে তার কথা হেসে উড়িয়ে দেন এবং শেষে তাঁকে চ্যালেঞ্জ করেন। তারপর সত্যমিথ্যা যাচাইয়ের জন্য তিনি তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে মধ্য রাত্রে সেই নদীর ধারে গিয়েছিলেন। নদী থেকে তাঁরা যখন মাত্র দুশ গজ দূরে তখন হঠাৎ প্রবলবেগে বাতাস বইতে সুরু করলো কাগোয়ে তখন পর্য্যন্ত ভয় না পেয়ে ঘটনাটিকে স্বাভাবিক ভাবে ধরে নিয়ে আরো এগোলেন, যখন মাত্র নদী থেকে আর কুড়ি গজ বাকি তখন চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পেলেন নদীর জল সব শুকিয়ে গেছে। কাগোয়ে ও তার বন্ধু সেই নির্জন নদী তীরে দাঁড়িয়ে ভয়ে কেঁদে উঠলেন। আর দাঁড়াতে ভরসা করলেন না—ছুটে পালিয়ে এলেন, এই ঘটনার ফল স্বরূপ তিনি তার প্রকাশিত চিঠিতে বলেছেন তানজানিয়ায় বিশেষ করে তাঁর দক্ষিণাঞ্চলে ডাইনী ডাক্তার আছেন যাদের রাজধানীতে ডেকে দক্ষতা আর অভিজ্ঞতা অনুসারে মাইনে দিয়ে অফিসে বসান উচিত। তাঁদের কাজ হবে দুর্ঘটনা রোধ করা প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর রোগ নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি। মিঃ জি কাগোয়ার পরিকল্পনা অনুসারে যদি ঠিকমত কাজ হয় তাহলে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাইনি বিদ্যায় ক্লাস খোলা যেতে পারে। সারা বিশ্বময় যদি কিছু ডাইনী বিদ্যা বিশারদ তৈরি হয় তবেই মঙ্গল—নইলে যে সব ডাইনী বর্তমানে পৃথিবীর ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের শেষ দিনটা এগিয়ে আনা যাবে না।

মেরীমাতার আবির্ভাব!

মনট্রিল শহরতলীর সেন্ট বার্নেরি ওপরের আকাশ-তারা মেরিমাতাকে (ভার্জিন মেরী) দেখতে পেয়েছিল দুটি ছোট ছোট মেয়ে যাদের বয়স সাত থেকে তেরর মধ্যে! মেয়েদের কথা অনুসারে জানা যায় যে মেরী মাতা নাকি তাদের সঙ্গে মৃদু ও মধুর ভাষায় কথা বলেছেন। মেরী মাতা তাদের বলেছেন তোমরা প্রার্থনা করবে। আমি আবার আগামী সাতুই অকটোবর ঠিক এই সময় এখানে আসব। তোমরা সেদিন সন্ধ্যার সময় এখানে উপস্থিত থেক। ওদের মধ্যে তিনটি মেয়ের মা মিসেস সেণ্ট জীন বলেন যে তার মেয়েরা তাদের বাড়ীর সামনে কিছু অলৌকিক ঘটনা দেখেছিল। আবহাওয়া অফিসের খবরে সেদিন বলা হয়েছে ঐদিন ঠিক ঐ সময়ে প্রচণ্ড ঝোড়ো হাওয়া দেখা দিয়েছিল। এই ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যাই হোক—বিশ্বাস করতে ক্ষতি কি? শাস্ত্রেই তো বলেছে বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। শোনা যায় আমাদের দেশেও ভাগ্যবানদের মাঝে মাঝে দেবতারা দেখা দেন। অবশ্য জাগ্রত অবস্থায় নয় স্বপ্নে। এবং কিছু মাদুলী, তাবিজ, কবচ, নিদেন কাছে এক আধটা শিকড়ও দান করে যান ভক্তদের এবং সেই স্বপ্নাদ্য উপহারই বাকী জীবনটা ভক্তদের মধ্যে সোনার ডিম প্রসব করতে থাকে। মনট্রিল শহরতলীর খুকীরা অবশ্য মেরী মাতার কাছ হতে সেরকম কোন উপহার পেয়েছে কি না এখনও অব্দি জানা যায়নি।

কিশোর জগৎ

পূজার প্রশ্ন

শ্রীজ্ঞান

বাংলা দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উৎসব, বাঙ্গালী হিন্দুর সব চেয়ে বড় পূজা অনুষ্ঠান দেবী দুর্গার এই মহাপূজার সময় আগত। এই সময় চারদিক ঘিরে যেন একটা আনন্দের মূর্চ্ছনা মঞ্জরিত হতে থাকে, আকাশে বাতাসে কি এক মধুময় আনন্দের শিহরণ যেন জাগে, মানুষের মনেও সেই আনন্দ অনুরণিত হতে থাকে; কি এক অনির্ব্বচনীয় সুখের পরশে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই মন যেন ভরপুর হয়ে যায়!

শরৎ কালের এই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য। রুক্ষ গ্রীষ্মের তাপ দহনের পর বর্ষার জলধারায় ধৌত হয়ে উষর মৃত্তিকা হয়ে ওঠে উর্ব্বর—ধরণীর রূপ হয়ে ওঠে শ্যামল, শোভন। সেই শ্যামলের স্পর্শে মানুষের মনও হয়ে ওঠে স্নিগ্ধ, শান্ত। আর এই অশুচি স্নিগ্ধ পরিবেশেই আগমন হয় দেবী দুর্গার। দানবকে দলন করে, দুষ্ট শক্তিকে ধ্বংস করে, মানবকে বরাভয় দান করবার জন্য মহামাতা মহামায়া যেন আবির্ভূতা হন সশরীরে পূজার মণ্ডপে মণ্ডপে। মাতার এই আগমনে সকল সন্তানরূপী মানুষের মনে আসে শান্তি শক্তি, সাহস, স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য। মায়ের আগমন সমস্ত অশুভকে দমন করে শুভময় করে তোলে জগৎকে। মহাপূজার হোমের পূত আগুনে, মঙ্গল শঙ্খের মঙ্গল ধ্বনিতে, ধূপ-দীপের স্নিগ্ধ সৌরভে, কাঁসর-ঘণ্টা-জয়-ঢাকের গম্ভীর নিনাদে সমস্ত অমঙ্গল যেন অপসারিত হয়ে চারিদিক হয়ে ওঠে মঙ্গলময়!

তবে আজকাল তা বোধহয় আর হয় না। কিন্তু এমন একটা সময় ছিল যখন সত্যই এই রকমভাবে দুর্গতিনাশিনী দেবী দুর্গার আগমন হত। আজ মনে হয় সেই সুসময়, সেই

শুভক্ষণ, সেই সুপবিত্র দিনগুলি আমরা বোধহয় চিরতরে হারিয়েছি। হারিয়েছি, কেন না আমরা হারাচ্ছি আমাদের ধর্ম্মকে, আমাদের শাস্ত্রকে, আমাদের পুরাণকে—আমাদের যা কিছু পূত, পবিত্র সব কিছুকে! কিন্তু কিসের মোহে আজ আমরা আমাদের এই সুমহান ঐতিহ্যকে, এই মহান ঐশ্বর্য্যকে হারাতে বসেছি? জড়বাদী পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে?.. সস্তা ইজমবাদের প্রচার কৌশলে?—এর উত্তর আমার জানা নেই। তোমরাই ভেবে দেখ। ভেবে দেখ কেন এই পূজার নামে এই প্রতিমা খাড়া করে রেখে শুধু জাঁকজমক, বাজি-বাজনা, নাচ-গান প্রভৃতির অনুষ্ঠান চলে? ভেবে দেখ আমরা কেন এই অশ্রদ্ধেয়, অশোভনীয় হুল্লোড় পূজার নামে করে চলেছি। আমাদের যদি ইচ্ছা হয় জাঁকজমক করবার, বাতি-বাজনার চমক দেখাবার, নাচ-গানের আসর বসাবার, তাহলে তার জন্যে আলাদা যে কোনও অনুষ্ঠানই তো হতে পারে। পূজার গাম্ভীর্য্যকে ম্রিয়মাণ করে দিয়ে, ধর্ম্মের অনুশাসনকে লঙ্ঘন করে, হৃদয়ের ভক্তি শ্রদ্ধাকে বিনষ্ট করে এই সব ব্যবহারের কি যুক্তি আছে? বিশ্বের অন্য কোনও ধর্ম্মের আচার অনুষ্ঠানে তো এই রকম হাল্কা জাঁকজমকের সন্ধান পাওয়া যায় না! তবে আমাদের এই সর্ব্বপুরাতন অতি প্রাচীন এই আদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান শুধুই জাঁকজমক সর্ব্বস্ব হবে কেন? এ প্রশ্ন আজ তোমাদের কাছে রাখছি, তোমরাই এর উত্তর দাও। কি হওয়া উচিত, আর কি না হওয়া উচিত তা তোমরা, ভবিষ্যতের দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন নাগরিকরাই স্থির কর ও অপরকে পথ দেখাও।

———

যেগুলো তারা নয়

গৌর আদক

তোমরা মাঝে মাঝে দেখতে পাও যে, তারার মত কি একটি জলন্ত বস্তু আকাশের বুক চিরে নেমে আসছে পৃথিবীর দিকে।. তখন তোমরা মনে কর যে, একটি তারা বুঝি আকাশ হ'তে খসে পড়ল; কিন্তু আসলে ওগুলো তারা নয়, ওগুলোকে বলে উল্কা। আজ যদি উল্কার মতন একটি তারা এই পৃথিবীর উপর খসে পড়তো তাহলে সেই তারা পৃথিবীতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই পৃথিবী পুড়ে ছারখার হয়ে যেতো। কারণ তারাগুলিও সূর্য্যের মতই এক একটি প্রকাণ্ড উত্তপ্ত বাষ্পময় গোলক বিশেষ। তারাগুলি আমাদের এই পৃথিবী হ'তে এত দূরে আছে যে আমরা তাদের উত্তাপ অনুভব করতে পারি না। পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটে যে তারাটি আছে, তা'র দূরত্ব হচ্ছে পঁচিশ লক্ষ কোটি মাইল। সূর্য পৃথিবী থেকে বহু কোটি মাইল দূরে আছে, তার থেকেও কোটি কোটি মাইল দূরে আছে এক একটি তারা।

তোমরা নিশ্চয়ই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথা জানো যে, প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেক বস্তুকে পরস্পরের দিকে টানছে; তবে যে বস্তু যত ভারী, সে বস্তু তত দ্রুত নিচের দিকে নেমে আসে। আগেই বলেছি যে তারাগুলি পৃথিবী থেকে অনেক বড়। সুতরাং তারার আকর্ষণ শক্তিও পৃথিবী থেকে অনেক বেশী কিন্তু তারার কোন আকর্ষণ শক্তিই নেই এই পৃথিবীর উপর; কারণ, তারাগুলি পৃথিবী থেকে এত দূরে আছে যে তা তোমরা কল্পনাই করতে পারবে না। সুতরাং তারা পৃথিবীকে এবং পৃথিবী তারাকে আকর্ষণ করতে পারে না। তারার মতন যে গুলি আকাশের বুকচিরে নেমে আসে এই পৃথিবীর দিকে, সেগুলি যে তারা নয় এখন বেশ ভালই বুঝতে পারছ।

আগেই তোমাদের বলেছি যে, ওগুলো উল্কা। উল্কাগুলি যে কি তাই বলি শোন···উল্কাগুলি হচ্ছে এক একটি বাষ্পীয় গোলক। যখন ওগুলোর উত্তাপ নষ্ট হয়ে যায়, তখন তা কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। ওগুলি বেশিরভাগই ছোট এত ছোট যে হাজার হাজার উল্কা পিণ্ডকে একটা মুঠির মধ্যে ধরে রাখাও যায়। তবে সবগুলিই ছোট নয়, এর মধ্যে আবার বড়ও আছে। কুড়ি পঁচিশ মন ওজনের উল্কাও এই পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়ে। পৃথিবী থেকে উল্কাপিণ্ডগুলির দূরত্ব এমন কিছু বেশী নয়, তবুও সাধারণ যে দূরত্ব দিয়ে পৃথিবীর সব কিছু মাপা হয় সেই সাধারণ দূরত্ব থেকে উল্কাগুলি আমাদের চেয়ে বহুদূরে আছে। সেইজন্য এইগুলি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না।

উল্কাপিণ্ডগুলি ঘুরছে সূর্য্যের চারিদিকে। এই রকম ঘুরতে ঘুরতে উল্কাপিণ্ডগুলি যখন পৃথিবীর খুব নিকটে এসে পড়ে তখন পৃথিবীর আকর্ষণে প্রচণ্ডবেগে পৃথিবীর দিকে ধাবিত হয়। পৃথিবীকে ঘিরে আছে বায়ুমণ্ডল। তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে দুটো বস্তুর সংঘর্ষণে জিনিষ দুইটি গরম হয়ে ওঠে; এবং অনেক সময় আগুনও দেখা যায়। বায়ুমণ্ডলেঘিরে আছে সারা পৃথিবী। পৃথিবীর প্রবল আকর্ষণে যখন উল্কাপিণ্ডগুলি পৃথিবীর দিকে ধাবিত হয়, তখন বায়ুমণ্ডলের সাথে সংঘর্ষণে সেগুলি গরম হয়ে ওঠে। গতির বেগ যত বাড়তে থাকে, ঘর্ষণও ততই জোর হতে থাকে। এর ফলে উল্কাপিণ্ডটি গরম হয়ে লাল হয়ে ওঠে এবং শেষে সাদা হয়ে তারার মতন দেখায়। তোমরা যখন দেখ যে একটি উল্কা আকাশের বুকচিরে নেমে আসছে পৃথিবীর দিকে, তখন সেটাকে কয়েক মুহূর্তে জ্বলন্ত অবস্থায় দেখতে পাও, তার পরই সেটা নিভে যায় বলে মনে হয়। কিন্তু আসলে ওটা নিভে যায় না, ওর জ্বলাটা শেষ হয়ে গিয়ে বাষ্পে পরিণত হয়।
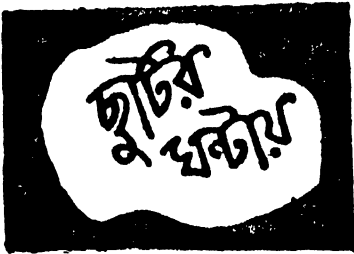
চিত্রগুপ্ত

এবারে শোনো—বিজ্ঞানের বিচিত্র রহস্যময় রাসায়নিক-প্রক্রিয়ার দৌলতে আরেক-ধরণের আজব-মজার কারসাজি দেখানোর কলা-কৌশলের কথা। খেলাটির নাম—'জলে-ভাসন্ত জ্বলন্ত-পদার্থের ভেলকী।'

ছুটির দিনে আত্মীয়-বন্ধুদের আসরে এ কারসাজি তোমরা অনায়াসেই দেখাতে পারো—টুকিটাকি কয়েকটি সাজ-সরঞ্জাম জোগাড় করে নিয়ে। এসব সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করা খুব একটা দুঃসাধ্য-কঠিন বা ব্যয়-সাপেক্ষ ব্যাপার নয় এবং খেলার কলা-কৌশল রপ্ত করতেও তোমাদের বিশেষ সময় লাগবে না। অথচ, আসরে দর্শকদের সামনে অভিনব-কৌতূহলোদ্দীপক এ খেলার কায়দা-কশরতী দেখিয়ে তোমরা সহজেই শুধু যে তাঁদের প্রচুর মজা আর আনন্দ দিতে পারবে তাই নয়, সবাইকে রীতিমত তাক লাগিয়ে স্তম্ভিত করে তুলতেও সক্ষম হবে। তাছাড়া তোমাদের কেরামতী দেখে তাঁরা যে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবেন—সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই।

আজব-মজার এই বিজ্ঞানের কারসাজি দেখানোর জন্য টুকিটাকি যে সব সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন, গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ, এ খেলা দেখাতে হলে, চাই—ছোট-ছোট কয়েকটি 'পোটাসিয়ামের' (Potassium) টুকরো এবং জল-ভর্ত্তি একটি মাঝারি-সাইজের গামলা।

ফর্দ্দমতো সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহের পর, আসরে দর্শকদের সুমুখে কারসাজির মজা দেখানোর পালা।

খেলা দেখানোর সময়, জল-ভর্ত্তি গমলাটিকে ঘরের সমতল মেঝে কিম্বা একটি টেবিল বা টুলের উপর সযত্নে বসিয়ে রেখে, সেই গামলার জলে ভাসিয়ে দাও—'পোটাসিয়ামের' ছোট ছোট টুকরোগুলি। পোটাসিয়ামের' টুকরোগুলিকে জলে ভাসিয়ে দেবার কিছুক্ষণ বাদেই দেখবে—বিজ্ঞানের রহস্যময়-বিচিত্র রাসায়নিক-প্রক্রিয়ার ফলে, প্রত্যেকটি ভাসন্ত টুকরো যেন আজব এক যাদু-মন্ত্রে জ্বলন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এবং সেগুলির অঙ্গ থেকে সুস্পষ্টভাবে বিচ্ছুরিত হতে সুরু করেছে অপরূপ ধরণের লাল আর বেগুনী রঙের অভিনব আভা! বলা বাহুল্য যে জলে-ভাসন্ত জ্বলন্ত-পদার্থের' এই আজব-কারসাজির মজা পরম-উপভোগ্য হয়ে উঠবে—আবছা-অন্ধকার ঘরের আসরে। কারণ, খেলার আসরে দিনের আলো কিম্বা বিজলী-বাতির রোশ্-নির প্রাচুর্য্য থাকলে, 'জলে ভাসন্ত জ্বলন্ত পদার্থের' রঙীন-আভা বিশেষ তেমন সুস্পষ্টভাবে নজরে পড়বে না। কাজেই এ কারসাজি দেখানোর সময়, আসরটি আগাগোড়া আবছা -অন্ধকার বা সল্পালোকিত থাকাই বাঞ্ছনীয়।

এমন অদ্ভুত কাণ্ডটি কেন ঘটে জানো?... :..ঘটে—বিজ্ঞানের বিচিত্র-বিধানে বিশেষ রাসায়নিক-প্রক্রিয়ার দৌলতে। অর্থাৎ, জলে-ভাসন্ত 'পোটাসিয়াম' পদার্থের

টুকরোগুলি বাতাসের সংস্পর্শে এসে সামান্য-উত্তপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমশঃ জ্বলন্ত-রঙীন ও লাল্‌চে-বেগুনী আভাময় শিখায় রূপান্তরিত হয়ে ওঠে এবং বিচিত্র উজ্জ্বল রোশ্‌নিতে অন্ধকারের মাঝে অপরূপ মায়া সৃষ্টি করে তোলে।

এবারের আজব-মজার খেলাটির এই হলো আসল রহস্য।

আগামী সংখ্যায় এমনি অভিনব-বিচিত্র ধরণের আরেকটি রাসায়নিক-প্রক্রিয়ার মজার কারসাজির পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

মনোহর মৈত্র

১। নামের হেঁয়ালী :

তিন আখরে নাম তার,
মানে—জনার্দ্দন।
প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে,
অর্থ—অনটন!
মাঝের অক্ষর দিলে ছেড়ে—
হয় চট্‌চটে…
শেষের অক্ষর ছাড়লে পরে—
একটা চোখ মোটে!

২। 'কিশোর জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা :

সপ্তাহে বারেক পাবে
আমার সাক্ষাত…
প্রতি মাসে একবার
হবে মুলাকাৎ!
তবু বৎসরেতে দেখা
সেই একবার…
কে আমি—বলো তো ভাই,
করিয়া বিচার?

রচনা : রাজা মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)

৩। পেলেই মরণ…অথচ বাজারে তাকে কিনতে পাওয়া যায় না! বলো তো—কি তার নাম?

রচনা : সুলতা দেববর্ম্মা (ইছাপুর)

গত মাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালির' উত্তর :

১। শূন্য বা zero (০)।
২। বিলম্ব।

গতমাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

রাণা, বুনা, লিপিকা ও গৌর মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)। রবিন রায় ও প্রভাত চক্রবর্ত্তী (বোম্বাই)। মিঠু, বুবু ও কল্যাণ গুপ্ত (কলিকাতা)। দোলন, পিন্টু ও ফনী সাহা (কলিকাতা। পুতুল, সুমা, হাবলু, টাবলু নিপু ও খোকা (হাওড়া)। অমিত, লাড্‌ডু ও কবি হালদার (লক্ষ্ণৌ)। পুটু, গৌরী, গুণময়, কিশোরী, সোনা ও ক্ষেত্রদাস চট্টোপাধ্যায় (গৌরহাটি)। কুলু মিত্র (কলিকাতা)। বাপি, বুতায়, পিণ্টু, সুমিতা, ও অশোক (বোম্বাই)। রিনি, রনি, আরতি ও পঙ্কা মুখোপাধ্যায় (কাইরো)। বিজু, বুজু টুকু ও স্নেহ আচার্য্য (কলিকাতা)। সুপর্ণা, অলক, তিলক, অমিয় ও অমিয়া রায় (কৃষ্ণনগর)। প্রশান্ত, রবি, ভাস্কর, কৃষ্ণলাল, বিশ্বদেব, ভুবন, অনিল, অভি, অমিতাভ বরুণ; সুধীশ, অরবিন্দ, তিনকড়ি ও ঘনশ্যাম (গড়িয়া)।

গতমাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

সলিল, সুধানন্দ, অন্নপূর্ণা, শ্যামলী, মৃণাল,গীতা, স্নিগ্ধা ও সুচেতা (হাজারিবাগ)। পটল, চন্দ্রিমা, বীরেন, রেখা, ভুপেন্দ্র, বিশ্বনাথ, অরিন্দম ও মাধুরী চৌধুরী (কলিকাতা) গোষ্ট, নবগোপাল; নৃপেন, বাসুদেব, চিন্ময়, দ্বিজেন্দ্র, রথীন্দ্র, মায়া ও শেফালী সেন (আসানসোল)। রাকানাথ, আশানাথ, উষানাথ, নিশানাথ ও মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা)। লাপু, বাচ্চু, দোলন, গোপা, চম্পা, কাদম্বরী ও ছন্দা নাগ চৌধুরী (দুর্গাপুর)। অচিন্ত্য, অনিন্দ্য, মাধুরী, সীতা, সবিত্রী ও পল্টু ঘোষ (কলিকাতা)।

রূপসী মডেল

মৈত্রেয়ী মুখার্জী

কালো, নিকষ কালো মুখটা। তবু সুন্দর! হ্যাঁ সুন্দর কালো পাথরের মূর্তি যেনও 'ও'র মুখেরদিকে তাকিয়ে মনে পড়ে, পূর্ণিমা রাতের শ্যামল মাঠের কথা। চোখ ?—চোখ দুটো যেন সেই শ্যামল মাঠের মাঝে এক জোড়া হ্রদ, চাঁদের আলো পড়ে উজ্জ্বল টলটলে। নীল আকাশের মেঘের ছায়া পড়ে 'ওর' চোখের কালো মণি দুটোর সৃষ্টি হয়েছে। অর্দ্ধ গোলাকার ছোট্ট কপালের ওপর কোঁকড়া কোঁকড়া চুলগুলো দেখে মনে হয় যেন দিগন্ত থেকে বিচ্ছিন্ন করে ঘিরে রেখেছে কালো কালো ঝোপের সারি, শ্যামল মুখটাকে। লম্বা গলা, রংটা যদি সাদা হতো তবে বলতাম হংসগ্রীবা। কিন্তু ওর রংটা কালো, তাই আর ঐ উপমা চলেনা। তবে কি 'ওর' গ্রীবা সুন্দর নয়! নিশ্চয় সুন্দর! অদ্ভুত সুন্দর। তবুও যখন কারো সঙ্গে তুলনা করতে পারলাম না তখন 'ওকে' একটি কথায় প্রকাশ করি,—অনন্যা। দেহটিও অপূর্ব ছন্দোময়ী, হাল্কা। হ্যাঁ হাল্কা! মনে হচ্ছে যতটুকু না হলে নয়, ততটুকু। আরসেই জন্যে 'ওকে' যেন একটু বিষাদাচ্ছন্ন মনে হচ্ছে। না, ঠিক বলা হলো না। বলা যায় দারিদ্র্য নিতান্ত গভীর তাকে জড়িয়ে ধরে ওর ঐ সুন্দর দেহের পেয়ালায় পরম প্রেমিকের মত চুমুক দিয়ে প্রায় নিঃশেষ করে ফেলেছে। তাই ওর বসে থাকার ভঙ্গীর মধ্যে যেন ক্লান্তি তার ছায়া ফেলেছে।

আর্ট কলেজের লাইফ স্টাডির ঘরে ঢুকে দেখতে পেলাম 'ওকে'। 'ওর' নাম জানিনা। কারণ 'ও' নতুন। নতুন না হয়ে পুরনো হলেও আমরা 'ওর' নাম জানতাম না কারণ ওরা মডেল। আমাদের কাছে ওরা শুধু একটি দেহ। ঐ দেহে প্রাণ আছে কিনা, নাম আছে কিনা, কোন ব্যথা যন্ত্রণা আছে কিনা আমরা জানি না, জানতে চাইও না। তবু কেন জানি না, এই নতুন মডেলটিকে দেখে, 'ওর' নাম জানতে ইচ্ছে করলো। এটা কি আমার সৌন্দর্যের আকর্ষণের ফল। না, সৌন্দর্য তো অনেক দেখলাম এই পাঁচটি বছরে, কলেজের ক্লাসে ক্লাসে। অনেক সুন্দর সুন্দর অনাবৃত দেহ আমি দেখেছি, কিন্তু এমন করে আকর্ষণ করেনি তো কেউ ? এই কালো মেয়েটার নাম জানতে ইচ্ছে করছে কেন ? শুধু নাম টুকুই নয়, জানতে ইচ্ছে করছে,—কেন 'ওর' চোখের ঘন পল্লবের ছায়ায় এমন উদাস করা দৃষ্টি। ঠিক তাই! 'ওর' বসে থাকার মধ্যে এমন একটা করুণ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছিল যা আমি আর কখনো দেখিনি। ওর ঐ করুণ সুন্দর দেহটা, মুখটা আমার কাজের বাধা সৃষ্টি করছে। ইজেলের সামনে রং তুলি নিয়ে বসে থাকলাম টিফিনের সময় পর্যন্ত। ক্যানভাস তার সাদা বুক নিয়ে, রং তুলির স্পর্শের জন্যে অপেক্ষা করে করে ব্যর্থ হলো। আর আমি শুধু মডেলের দেহাতীত করুণ সৌন্দর্য দেখে কাটিয়ে দিলাম এই তিনটি ঘণ্টা। কারণ মডেলের ঐ ক্লান্ত দেহটাকে দৃষ্টির ছুরি চালিয়ে 'ওর'দেহের মাংস,পেশী, হাড়কে কেটে কে টক্যানভাসের সাদা বুকে রংয়ের ছায়া আঁকতে ইচ্ছে করলো না। ঘণ্টা পড়লো,—টিফিনের ঘণ্টা। আমরা সকলে ক্লাস থেকে বেরিয়ে এলাম। মডেলের দেহে প্রাণের সাড়া জাগলো। যেন পাথর অহল্যা আবার রক্ত মাংসের দেহ ফিরে পেলো। অথবা—টিফিনের ঘণ্টা যেন সেই ঘুমন্ত রাজকন্যার জিওন কাঠি—যার ছোঁয়ায় প্রাণের স্পন্দন ধ্বনি জাগলো 'ওর' পাঁজরে।

ক্লাস থেকে বেরিয়ে সকলে ক্যান্টিনের সামনে লাইন দিলো। আমার ঐ হুল্লোড় ভালো লাগলো না, আমি ক্যান্টিনে আর ঢুকলাম না। কলেজের কম্পাউণ্ডে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। বিষাদ জিনিসটা বোধ হয় সংক্রামক, মডেলের বিষাদ যেন আমার মনের মধ্যে সংক্রামিত হচ্ছে। হঠাৎ দেখতে পেলাম, একটা গাছের তলায় বসে আছে, আমাদের মডেল। এখনো 'ও' তেমনি

নিশ্চল হয়ে বসে আছে। যদিও এখন অনেক জোড়া চোখ 'ওর' দেহের আউট লাইন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না, তবু 'ও' নিশ্চল হয়ে বসে আছে। 'ওর' চোখ যেন এই পৃথিবীর সীমানার মধ্যে নেই। ওর দৃষ্টি চলে গেছে অনেক দূরে। হয়ত 'ও' এখন যে জগতে রয়েছে, সেখানে এখানকার কোন দুঃখ, বেদনা, যন্ত্রণা নেই, কোন অনুভূতি নেই। অথবা ওর মন এখন যন্ত্রণার স্মৃতির মধ্যে ডুবে আছে, তলিয়ে গেছে তাই 'ও' এত নিশ্চুপ,।

কলেজের ক্লাসে এবং কম্পাউণ্ডের মধ্যে মডেলদের সঙ্গে কথা বলা নিষেধ। আর এ নিষেধ খুব কঠোর ভাবে মেনে চলা হয়। যদি কখনো কোন ষ্টুডেণ্ট মডেলের সঙ্গে কথা বলে তাহলে প্রফেসারদের শাসনের চেয়ে অন্য ছাত্রদের বিদ্রূপের খোঁচায় বেশী জখম হতে হয়। তাই ছাত্ররা মডেলদের এড়িয়ে চলে। কিন্তু আমি এসব কথা ভুলে গেলাম। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম 'ওর' কাছে।

"নমস্কার! আমি কি এখানে একটু বসতে পারি?' খুব কুণ্ঠিত গলায় আমি জিজ্ঞেস করি। আমার কথায় 'ও' চমকে উঠলো। আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো কিছুক্ষণ। 'ওর' চাহনিটা এখানের নয়, ও যেন অনেক দূরে থেকে আমায় দেখছে। আর আমার কথা শুনে মানে বোঝার চেষ্টা করছে। 'ওর' মনটা যেন এতক্ষণ এই পরিবেশ ছেড়ে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলো। হয়ত ওর মনটা বর্তমানকে অতিক্রম করে চলে গিয়েছিলো. 'ওর' কোনো সুখের অতীতকালে। কিছুক্ষণ বোবা চাহনিতে তাকিয়ে থেকে 'ও' জিজ্ঞেস করলো.—

"আমায় কি কিছু বলছেন?"

"হ্যাঁ। আমি কি এখানে একটু বসবার অনুমতি পেতে পারি!

নিশ্চয়ই বসতে পারেন। কলেজের এই কম্পাউণ্ড তো আপনাদেরই। আপনাদের আনন্দের জন্যে এইফুল গাছ। আপনাদের কাজের সুবিধার জন্যে এই বাগান, আপনাদের সাহায্যের জন্যে ঐ সবমর্মরমূর্তি। আর আমিও তো এখানে এসেছি আপনাদের আঁকার প্রয়োজনে। শিক্ষার সুবিধার জন্যে। আমার মত নগণ্য প্রাণীর কাছে কোন কিছুর জন্যে অনুমতি চাওয়ার দরকার আছে কি? যদিও 'ও' বাঙলা ভাষায় কথা বললো তবু 'ও'র কথা বলারমধ্যে দাক্ষিণাত্যের টান। আর কথা বলার মধ্যে এমন একটি ছন্দ এবং সুন্দর মিষ্ট সুর ছিলো, যে 'ওকে' সাধারণ একটি মডেল বলে মনে হলো না। মনে হলো জ্ঞান, শিক্ষা, কৃষ্টির সঙ্গে ওর পরিচয় আছে।

আমি ওর কথায় বসলাম। তারপর বললাম, "আপনি নিজেকে এত ছোট ভাবছেন কেন? জীবিকার প্রয়োজনে আপনি এখানে মডেল হয়েছেন,, তাতে কি আপনি মনুষ্যত্বের পর্যায়ে পড়েন না?"

"সেটা তো আমার থেকে আপনারাইবেশী জানেন। মডেলদেরআপনারাঘৃণার চোখে দেখেন। শুধু আপনারা, মানে ছাত্ররা নয় সমাজও আমাদের ঘৃণাকরে। আমাদের অপাঙক্তেয় করে রেখেছি।

আমি চুপ করে থাকি। কারণ ওর কথাটিকে অস্বীকার করতে পারার মত কোন যুক্তি খুঁজে পেলাম না। তারপর বললাম,—"সমাজের কথা, কি অন্যের কথা বলতে পারি না। আমি শুধু আমার কথা বলতে পারি,—আমি আপনাকে একটুও ঘৃণা করতে পারছি না।"

"সেটা আপনার মহত্ব। অথবা আমাদের ওপর আপনার অসীম করুণা।

"মহৎ আমি একটুও নই আর আপনাদের করুণা করতে যাব কেন? যাক্—আপনি কি কাজ করেন সেটা আমি এখন ভুলতে চাই। তার চেয়ে আমরা পরিচিত হই উভয়ে উভয়ের সঙ্গে। আমার নাম প্রবাহন চৌধুরী। আপনার পরিচয় জানতে পারি কি?

"শর্মিষ্ঠা,—শর্মিষ্ঠা রায়। সুদূর দাক্ষিণাত্য থকে আমি এসেছি।"

"হ্যাঁ। আপনার কথার মধ্যে দাক্ষিণাত্যের টান আমি লক্ষ্য করেছি। কিন্তু কি আশ্চর্য আপনি এখন সুন্দর বাংলা ভাষা শিখলেন কেমন করে?"

"আমি খুব ছোট বেলায় এখানে.চলে আসি বাবা মায়ের সঙ্গে। এবং যেখানে আমাদের বাসা ছিলো সেখানে সব বাঙ্গালী পরিবার। আমি ছোট বেলায় বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের সঙ্গেই খেলা করতাম।"

এতক্ষণ ও বেশ সহজ গলায় স্বাভাবিক ভাবেই কথা বলছিলো। ছোটবেলার কথায় ওর চোখে আবার সোনালীর ছায়া পড়লো। কেন 'ওর' মধ্যে এমন বিষাদের

ছায়া সব সময় বাসা বেঁধে আছে, জানতে ইচ্ছে করলো। কিন্তু মাত্র একদিনের পরিচয়ে জানতে চাওয়া খুব অস্বাভাবিক মনে হবে 'ওর' কাছে, আর আমার সম্বন্ধে খারাপ ধারণাও হোতে পারে। কিন্তু আমার সম্বন্ধে 'ওর' ধারণা খারাপ হোক এ আমি চাই না। আমার মন যেন 'ওর' সঙ্গে চিরকালের বন্ধুত্ব চাইছে। কিন্তু কেন? এর নাম কি প্রেম! না দরদ? 'ওর' ঐ সুন্দর ক্ষীণ দেহ, বিষাদের ঘনছায়া যুক্ত বিরাট চোখ, পৃথিবীর ওপর প্রচণ্ড অভিমানে বাঁকানো পাতলা ঠোঁট, আর সব মিলিয়ে এক দারিদ্র্যের শিকারে ক্ষত বিক্ষত একটি মন কি আমাকে আকর্ষণ করছে? জানি না। আমার মনের ইচ্ছের কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, তবে এটা বুঝতে পারছি আমার মন যেন সামাজিক নিষেধ মেনে চলতে চাইছে না। আমি জানিওনা মনের গন্তব্য স্থান কোথায়! শুধু চলছি মনের ইচ্ছানুযায়ী।

যাক্! এমন করে চুপচাপ বসে থাকা ভালো দেখায় না। কিছু বলা দরকার। আর বলার কথা অনেক ভীড় করে আসছে মনে। "আচ্ছা, আপনি এখানে মডেলের কাজ নেবার আগে কোথাও কি এই কাজ করেছিলেন?"

"না, এখানে আসার আগে আমি ক্যাবারে ড্যান্সার ছিলাম?"

"ওখান থেকে চলে এলেন কেন?"

পারিনা মাঝ রাত পর্যন্ত ঐ প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে এখন আর পারি না। নাচতে নাচতে হাঁপিয়ে পড়তাম। তাছাড়া ভালোও লাগতো না।"

ঢং ঢং করে টিফিনের শেষ ঘণ্টা বাজলো। শর্মিষ্ঠার চমক ভাঙলো। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো। আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললে,—"আমি যাচ্ছি, টিফিন শেষ হয়ে গেলো। ওঁরা ক্লাসে যাচ্ছেন।"

"হ্যাঁ চলুন। আমিও ক্লাসে যাবো।"

"আপনি কিন্তু একটাও লাইন টানেন নি, আপনার ক্যানভাস সাদা,—আসার সময়ে দেখে এলাম। শর্মিষ্ঠা যেতে যেতে একটু হেসে বললো আমায়।

ঠিক তাই। কেন জানি না আজকে আমার ছবি আঁকতে একটুও ভালো লাগছে না। আমি ওর পাশে পাশে চলতে চলতে বলি।

কেন? আজকের মডেল কি ছবির পক্ষে উপযুক্ত নয়? ভয়ে ভয়ে আমায় জিজ্ঞেস করে। যেন আমার রায়ের ওপর ওর জীবন মরণ নির্ভর করছে।

আমি অপ্রস্তুত হয়ে বলি,—না—না। বরং ছবির পক্ষে আজকের মডেল অনন্যা! তাইতো ভয় করলো ক্যানভাসে তুলির রেখা টানতে। আমার তুলি অক্ষমতা প্রকাশ করলো আজকের মডেলের ছবি আঁকতে।

শর্মিষ্ঠা লজ্জা পেলো। ওর ঐ বিষাদপূর্ণ মুখে লজ্জার অরুণ আভা ফুটে উঠলো, এখন ওকে আরো সুন্দর দেখালো। 'ও" মুখটাকে অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে বললো, আচ্ছা "আপনার ভয় করছে না?" শর্মিষ্ঠা প্রসঙ্গ পাল্টালো "—ভয়! ভয় করবে কেন?"

—এই কাজে বহাল করার সময় প্রিন্সিপাল আমাকে বলে দিয়েছিলেন,—ক্লাসে অথবা কলেজের কম্পাউণ্ডে কোন ছাত্রদের সঙ্গে মডেলদের কথা বলা নিষিদ্ধ। যদি কোন ছাত্র কথা বলে তাহলে তাকে শাস্তি পেতে হবে। তাই বলছিলাম,—এই কলেজের কম্পাউণ্ডে আমার সঙ্গে কথা বলতে দেখলে প্রিন্সিপাল আপনাকে শাস্তি দেবেন, আর আমার কাজটিও যাবে।"

"আমার কি আর এমন শাস্তি হবে? হয়ত বলবেন,—"

তুমি কলেজের নিয়ম ভঙ্গ করেছ, কলেজের অন্য ছেলেদের কাছে এটা একটা খারাপ উদাহরণ। আর কখনো অন্যায় কাজ করো না। এই সব কিছু কিছু মৃদু শাসন। ওর জন্যে আমি ভয় পাই না, তবে আপনার ক্ষতি হতে পারে সেই জন্যে একটু অসুবিধা বোধ করছি।" আচ্ছা নমস্কার। ক্লাসের কাছে এসে ওর কাছ থেকে দ্রুত পায়ে ক্লাসে ঢুকলাম। আমি ক্যানভাসের সামনে দাঁড়ালাম, মডেল বসলো, তার নির্দিষ্ট বেঞ্চে। আমি তুলি নিয়ে চেষ্টা করতে লাগলাম কিছু আঁকার জন্যে।

এমনি করে কয়েক ঘণ্টা পেরিয়ে ছুটির ঘণ্টা পড়লো। কলেজের ছাত্ররা সব হৈ হৈ করে বেরিয়ে এলো ক্লাস থেকে। যদিও স্কুলের ছেলেদের থেকে অনেক বড়, বয়সে এবং বুদ্ধিতে, তবুও এদের হৈ হুল্লোড় কিছু কম নয়।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের ঐ উচ্ছ্বাস দেখলাম,—তারপর ওরা চলে গেলে, কলেজ কম্পাউণ্ড থেকে বেরিয়ে বাস ষ্ট্যাণ্ডের দিকে চলতে লাগলাম) হঠাৎ দেখলাম

শর্মিষ্ঠাও এদিকে আসছে। 'ও' আমাকে দেখে একটু হাসলো। আমি ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম,—এখন আমরা কলেজ কম্পাউণ্ডের মধ্যে নেই, এবার আমার সঙ্গে কথা বলতে আপনার আপত্তি আর ভয় নেই তো?"

—"নাঃ! প্রিন্সিপালের ধমকানির ভয়—কাজ যাওয়ার ভয় নেই কিন্তু লোকজনের ভয়? আপনার বন্ধুরা যদি দেখতে পায় যে ছুটির পর আপনি একটা মডেলের সঙ্গে কথা বলছেন, ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তাহলে আপনাকে ঠাট্টা বিদ্রূপে বিব্রত করে তুলবে।"

—"করুক গে আমার ওতে কিছু এসে যাবে না। চলুন কোন রেষ্টুরেণ্টে গিয়ে বসা যাক, তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে।"

"না—না। আমার এখন সময় হবে না। আজ থাক আর একদিন যাবো!" শর্মিষ্ঠা সভয়ে বললো।

বুঝলাম একদিনের পরিচয়ে আমার সঙ্গে চা খেতে যাওয়াটা বরদাস্ত করতে পারছে না। আমি 'ওর' কথায় চুপ করে গেলাম।

—"কি হলো! আমার কথায় রাগ করলেন নাকি?"

নাঃ—রাগ করবো কেন? আপনি ঠিক বলেছেন। এই পরিশ্রমের পর এখন ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নেওয়া উচিত। আচ্ছা! চলি,—কাল আবার দেখা হবে। আমার বাস এসে পড়ায়, বাসে উঠে পড়লাম। বাসের জানলা দিয়ে দেখলাম,—শর্মিষ্ঠা আমার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ছে।

ওর হাত নাড়া আমার মনে এক আনন্দের শিহরণ জাগালো।

'ওকে' কি আমি ভালোবেসে ফেলেছি একদিনের পরিচয়ে?

না; ওর ঐ সংযত সুন্দর বিষাদময়ী মূর্তি দেখে আমার মধ্যে করুণা জাগলো? জানি না!

সারারাত আমি শর্মিষ্ঠার কথা চিন্তা করলাম আচ্ছন্নের মত। সকাল বেলা আর কোন কাজে মন দিতে পারলাম না,—বার বার ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ যেতে লাগলো! মন জানতে চাইলো;—কতক্ষণে ঘড়ির গলায় দশটা বাজার ঘোষণা শোনা যাবে? ন'টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে স্নান করতে গেলাম। তারপর খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম কলেজের পথে।

ক্লাশে ঢুকে দেখি, ক্লাস আরম্ভ হতে দেরী আছে। মডেল বসা বেঞ্চ খালি। একটু পরেই ক্লাস আরম্ভ হলো। মডেল এসে বসলো ধীর পায়ে তার নির্দিষ্ট জায়গায়। আমি দাঁড়ালাম আমার ইজেলের সামনে। নিবিষ্ট মনে মডেলকে ষ্টাডি করে নিখুঁতভাবে আঁকার চেষ্টা করতে লাগলাম। কারণ শর্মিষ্ঠাকে খুসি করা চাই। ওকে বোঝাতে চাই ওর মুখের ডোল কত সুন্দর, দেহের আউট লাইন কত নিখুঁত, যদিও ও কালো। কিন্তু যখনি ওর চোখের দৃষ্টির সঙ্গে আমার চোখ মিলেছে তখনি আমার হাতের তুলি কেঁপে উঠেছে অদ্ভুত এক শিহরণে। নিখুঁত ছবি আঁকা বোধহয় আমার হবে না। আসলে শর্মিষ্ঠাকে এমনভাবে বসে থাকতে দিতে আমার মন চাইছে না।

আজকেও টিফিনের সময়ে শর্মিষ্ঠা বসে আছে সেই গাছটার তলায়। আমি গিয়ে দাঁড়ালাম ওর পাশে।

"বসুন!" "ও" আজ নিজে থেকেই বললো।

আমি বসে পড়লাম 'ওর' পাশে। 'ও' যেন একটু সংকিত।

—"আজ আবার আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম!"

—"কে বললে আমি বিরক্ত হই! আমার বরং ভালো লাগে।"

—"তাই না কি! আমার সৌভাগ্য! আচ্ছা আপনি তো 'ক্যাবারে গার্ল ছিলেন! সেখানের কাজ প্রতি পলকে দেহটাকে উদ্দাম গতিতে ঘোরানো ফেরানো, নড়ানো চড়ানো। আর এখানের কাজ ঠিক তার বিপরীত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিশ্চল হয়ে বসে থাকা। এ যেন মরুভূমির প্রচণ্ড সূর্য্যের তাপের থেকে হঠাৎ উত্তরমেরুর বরফের মধ্যে ডুব দেওয়া। আপনার অসহ্য লাগেনা, —এমন করে বসে থাকতে?"

—"মানুষ সব রকম অবস্থাকে মানিয়ে নিতে পারে, তার প্রয়োজনে, এত শুধু বসে থাকা।"

—"ঠিক! তবে আপনার এই বিপরীত ইচ্ছাটা জাগলো কেন? জানতে ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে।"

—"মিষ্টার চৌধুরী! আমি কেন এখানে এলাম, কেন এমন নির্লজ্জের মত এই মডেলের চাকরি নিলাম,—তা জানতে গেলে আগে একটি দরদী মন চাই। যে-মন আমাদের ঘৃণা না করে, আমাদের যন্ত্রণার কথা উপলব্ধি করবে। আর সেই দরদী মন; দু'একদিন দূর থেকে দেখে হয় না। আমার মত অপাঙক্তেয়দের সম্বন্ধে কিছু জানার কৌতূহল না থাকাই ভালো নয় কি?"

—"আপনার যুক্তি ঠিক, নির্ভুল! আমার মত মাত্র দু'দিনের পরিচিতের এমন কৌতূহল না থাকাই ভালো। কিন্তু আমার এই জিজ্ঞাসা শুধু মাত্র কৌতূহল মেটানোর জন্যে নয়। আপনি বিশ্বাস করুন! আপনাকে দেখার মুহূর্ত থেকে আপনার প্রতি আমার সহানুভূতিশীল মনের জন্ম হয়েছে। আমি আমার মনের সমস্ত দরদ দিয়েই আপনার দুঃখের কথা জানতে চেয়েছি।"

—"আমার মনে যে দুঃখ আছে, আমাকে দেখেই আপনি বুঝতে পেরেছিলেন?"

—"হ্যাঁ পেরেছিলাম! আপনার চোখে, মুখে, বসার ভঙ্গীতে আমি বুঝতেপেরেছিলাম,—আপনার জীবনে প্রচণ্ড যন্ত্রণা আছে, যে যন্ত্রণার তাপে আপনি শুকিয়ে উঠছেন।"

শর্মিষ্ঠা তার দীঘল চোখ তুলে আমার দিকে তাকালো। 'ওর' চোখের নিবিড় কালো মণিদুটো আমায় যেন কৃতজ্ঞতা জানালো। তার সেই দৃষ্টির মধ্যে ছিলো, আমার প্রতি বিশ্বাসের ছায়া। আমার ভালো লাগলো। কত অসহায়, সম্বলহীন হলো, তবে আমার এই সামান্য কথাকটা তার মনে কিছুটা শান্তির প্রলেপ লাগতে পারে! 'ও' যেন সব অবলম্বন হারিয়ে তলিয়ে যাচ্ছে। আমার এই সামান্য সহানুভূতি মেয়েত যেন বাঁচার আনন্দ উপলব্ধি করলো।

কিছুপরে আমার মুখের ওপর থেকে 'ও' চোখ নামিয়ে নিলে, তারপর ফিসফিস করে বললো,—বলবো!—আমার জীবনের সব কথা আমি আপনাকে বলবো। সত্যি আমি চাইছি এমন একটি দরদী মন যার কাছে আমার যন্ত্রণার কথা বলে একটু সান্ত্বনা পেতে পারি একটু হাল্কা হতে পারি! আমার যন্ত্রণার কথা আমি আর আপন মনে চিন্তা করতে পারছি না। সত্যি!—আমি শুখিয়ে যাচ্ছি, যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছি! আমি মনে ভেবেছিলাম আমার কথা' কেউ শুনতে চাইবে না,—আমার যন্ত্রণায় কেউ সহানুভূতি জানাবে না।"

কান্নায় প্রায় বুজে এলো 'ওর' গলা। চোখের জল লুকোতে মুখটাকে আরো নীচু করে ফেললো।

—"থাক শর্মিষ্ঠা দেবী! সেই যন্ত্রণার কথা বলতে আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে, ও প্রসঙ্গ পালটানো যাক! আপনার অতীত আমার কাছে অজ্ঞাত থাক। আজ থেকে আমরা বন্ধু হলাম। আপনার পরিচয় যতটুকু জেনেছি তার বেশী আর জানতে চাই না!"

—"কিন্তু আমি যে বলতে চাই আমার অতীত জীবনের সব কথা!—তবে আজ নয়। এখানে বলার মত পরিবেশ নয়।" শর্মিষ্ঠা নিজেকে সংযত করে নিয়ে শান্ত গলায় বললো।

"—বেশ যেদিন আপনার বলার সময় হবে, সেদিনের অপেক্ষায় রইলাম।

হঠাৎ খেয়াল হ'লো—সামনে দাঁড়িয়ে দুটো ছেলে,—একটা শিস্ দিয়ে উঠলো, আর একটা কি জানি এক কটূক্তি করে উঠলো। আমার ক্লাসের ছেলে নয় বলে, আমাকে সামনাসামনি বাক্যবাণে আহত করতে পারলো না।

ওদের কথা শুনে শর্মিষ্ঠা শঙ্কিত হল। বললো,—

—"আপনাকে ওরা যা-তা বলছে,—আপনি উঠে যান। প্রিন্সিপালের কানে কথাটা গেলে, আপনাকে বকুনি খেতে হবে,—আমার চাকরি যাবে!" বলে ও নিজেই উঠে দাঁড়ালো।

আমিও আর কোন কথা না বলে উঠে দাঁড়ালাম। কারণ টিফিনের ঘণ্টা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিলো।

—"আবার ছুটির পরে দেখা হবে" বলে ক্লাসের দিকে পা চালালাম। পিছন ফিরে দেখলাম 'ও' আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওর দৃষ্টির মধ্যে সেই উদাস ভাব রয়েছে।

শর্মিষ্ঠা এসে বসার পর— আমি আমার ইজেলের কাছে এসে 'ওর' ছবি আঁকতে লাগলাম, আর মনে মনে বললাম—তোমাকে এমনভাবে আর বেশীদিন বসে থাকতে হবে না। যদিও জানি এ আমার মিথ্যে আশা।

ছুটির পরে আমি বাস ষ্টাণ্ডে দাঁড়িয়ে শর্মিষ্ঠার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কয়েকটা বাস ছেড়ে দেবার পর,—দেখলাম শর্মিষ্ঠা আসছে।

'ও' একটু হেসে বললো, "একি! এখনো দাঁড়িয়ে আছেন? এখনো বাস আসেনি?"

—"হ্যা এসেছিলো আমি উঠিনি।"

—"কেন?" শর্মিষ্ঠা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

—"টিফিনের সময় তো আপনাকে বলেছিলুম,—ছুটির পরে দেখা হবে!"

—"হ্যা বলেছিলেন, তবে আমি ভেবেছিলাম সেটা একটা কথার কথা বলেছিলেন।"

—"কেন? আপনি কি এমন কথার কথা বলে থাকেন নাকি?"

—নাঃ,—! আপনি দেখছি ভীষণ চটে গেছেন।

—"না চটবো কেন? আমি শুধু আপনার অভ্যাসের কথা জানতে চাইছি, কথা দিয়ে কথা না রাখার অভ্যাস আপনার আছে নাকি?"

—"না নেই। তবে আমার মত একটি মেয়েকে কথা দিয়ে,—সেটা মনে রাখা সম্ভব, আমি ভাবতে পারিনি।

—"বার বার নিজেকে ছোট করার দিকে আপনার এত ঝোঁক কেন?"

যাক,—এমনভাবে রাস্তায় কথা না বলে, কোথাও বসলে ভালো হয় না কি?

—"হ্যা তা হয়, তবে কোথায় বসা যায়? রেস্টুরেন্টে বসতে আমার ভালো লাগে না।"

—"তবে ঐ মাঠে গিয়ে বসি।"

—"ওখানে ভীষণ ভীড়। আমার কাছে এই বাস ষ্টাণ্ডে আর ঐ মাঠের কোন পার্থক্য নেই। তার থেকে,—যদি আপনার আপত্তি না থাকে,—তবে চলুন না আমাদের বাসায়? অবশ্য এরকম অসংগত প্রস্তাব করার সাহস পেয়েছি আপনার কাছ থেকে। আপনি আমায় বন্ধু বলে স্বীকার করেছেন!"

—"ঠিক বলেছেন! আপনার বাড়ীতেই যাওয়া যাক। কিন্তু আপনার বাড়ীর লোকেরা যদি কিছু মনে করেন?"

—"না, সে ভয় আপনার নেই। আপনাকে আমার বাড়ীতে অপমানিত হতে হবে না। আপনি নির্ভয়ে আসতে পারেন।"

পার্কসার্কাসের ট্রামে ও উঠলো আমিও উঠে পড়লাম ওর সঙ্গে।

সরু গলি, পুরাণো ভাঙ্গা বাড়ী, নড়-বড়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে আমরা এসে পৌছলাম ছোট্ট অপরিসর একটি ঘরে। ঘরের একপাশে একটা চৌকি পাতা, মাঝখানে দুটো টুল, দেওয়ালে টাঙানো একটি সেলফ, তার ওপর সস্তা কাপ প্লেট সাজানো, একটা পর্দা ঝুলছে ঘরের এক পাশে। মনে হয় ওখানেই রান্নার ব্যবস্থা হয়। পর্দা সরিয়ে এক বৃদ্ধা মহিলা বেরিয়ে এলেন আমাদের সাড়া পেয়ে।

—"ইনি আমার মা। আর মা ইনি হচ্ছেন আর্ট কলেজের ছাত্র, এঁদের ক্লাসে আমি বসি।" আমি হাত তুলে নমস্কার করলাম,...নমস্তে—বৃদ্ধা প্রতি নমস্কার করলো। তারপর হাসিমুখে বললো—বসুন বাবুজী। একটা টুল টেনে নিয়ে বসলাম। শর্মিষ্ঠা পর্দার ওপারে চলে গেলো কাপড় পালটাতে। বৃদ্ধা আমাকে বললেন—

—"তোমরা কলেজ থেকে এসেছ। আমি একটু জল খাওয়ার ব্যবস্থা করি গে।"

—"নাঃ নাঃ, আমার জন্যে ব্যাস্ত হতে হবে না, এখন আমি কিছুই খাবো না।" আমি ওঁকে বলি।

—"কেন বাবা! আমাদের হাতে খাবে না বুঝি?"

—"কেন খাবো না! হোটেল রেষ্টুরেন্টে খেতে পারলে আপনার এখানে খেতে আপত্তি থাকবে কেন? সে জন্যে বলছি না। আবার আমার জন্যে মিছামিছি কষ্ট করবেন! না, আমি তো এখনি বাড়ী গিয়ে খাবো।"

—"শর্মিষ্ঠার জন্যে তো করবো, সেই সঙ্গে তোমার জন্যে একটু বেশী করে করবো এতে আর কষ্টের কি।" বৃদ্ধা চলে গেলেন পর্দার ও-পাশে। আমি একলা বসে ঘরটা দেখতে লাগলাম। এইখানে ঢুকলেই বোঝা যাবে এ ঘরের মালিক গরিব, কিন্তু পরিচ্ছন্ন। রুচিবান বলব না, কারণ রুচিবান হতে গেলে অর্থের প্রয়োজন হয়। তাই বললাম পরিচ্ছন্ন।—হ্যা দারিদ্র্য এখানে বিরাট হাঁ মেলে আছে,—কিন্তু কুশ্রী করতে পারেনি

এখানের বাসিন্দাদের।

একটু পরে শর্মিষ্ঠা কাপড় বদল করে এসে বসলো একটা টুলের ওপর, কোলে একটা বাচ্চা। বছর দুয়েকের বাচ্চা। কি তার থেকেও কম হবে ওর বয়েস। আমি একটু অবাক হলাম,। কারণ এতক্ষণ পর্যন্ত এর অস্তিত্ব থাকতে পারে, একথা আমার মনের কোণে আসেনি। অথচ এটা কত স্বাভাবিক। মহিলা মাত্রেই মা হতে পারে। কিন্তু শর্মিষ্ঠা কালো—ঘনকালো, আর এই শিশুটি ফর্সা, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ বললেও যেন ওর রং সম্বন্ধে ঠিক বলা হয়না। মানে ভারতীয়দের ঠিক এতখানি রং হওয়া সম্ভব নয়। আমি বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে আছি দেখে শর্মিষ্ঠা বললো—

—আমার ছেলে রাঘবন্ গোমেশ।"

—তাই নাকি! এর কথা তো বলেন নি?

—"কারো কথাই তো আমি আপনাকে বলিনি।" শর্মিষ্ঠা হেসে বললে।

—"না তা অবশ্য বলেন নি। তবে আমি এ দিকটা একেবারে ভাবিনি। ওর বাবা কখন ফিরবেন?"

—"যে প্রশ্নের উত্তর আমি নিজেই জানি না, সে প্রশ্নের উত্তর আমি আপনাকে দিই কি করে! শর্মিষ্ঠার মুখে আবার বিষাদ তার ছায়া ফেললো গভীরভাবে।

—মানে ভদ্রলোকের আসার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই, আর সেই জন্যে আপনার মনে কোন সুখ নেই,—এই তো? আমি খুব হাল্কা করে বলি কথাগুলো।

—"ঠিক তা নয়। তিনি আর আমার কাছে আসবেন না। তিনি আবার বিয়ে করেছেন।"

আমি একটা প্রকাণ্ড ধাক্কা খেলাম। এবার বুঝলাম কেন 'ওর' মুখে ঐ বিষাদের ছায়া, ক্লান্তির ছায়া। বললাম—"দুঃখিত, সত্যি আমি ভীষণ দুঃখিত। কিন্তু কেন এমন হলো আমি বুঝতে পারছিনা। আপনি হিন্দু, এবং ভারতীয় হয়ে একজন পর্তুগীজকে বিয়ে করেছিলেন।" এটা নিশ্চয়ই আপনাদের নিজেদের ইচ্ছাতেই হয়েছিলো?

হঁ্যা, সহজ করে বলতে হয় মন জানাজানি হয়েই বিয়ে হয়েছিলো। আর আমার মনে হয় এই অসামাজিক বিয়ের জন্যেই এ বিয়ে বেশীদিন টেঁকে না। শর্মিষ্ঠা বললো। তারপর একটু থেমে আবার ফিসফিস্ করে অনেক দূর থেকে যেন বললো—সত্যি জোসেফের সঙ্গে যেদিন আমার বিয়ে হলো—সেদিন 'ও' বলেছিলো,—তোমাকে ছেড়ে আমি প্যারাডাইসে যেতে চাই না, তোমাকে ছাড়া আমি নিজেকে চিন্তা করতে পারি না।" কিন্তু আজ!—আজ কতোদিন হয়ে গেলো সে আমায় চোখের দেখাও দেখতে এলো না একবার, আমি ক-তদিন তাকে দেখতে পাইনি।"

শর্মিষ্ঠার গলায় বেদনার ঢেউ কেঁপে কেঁপে উঠলো। আমি ওর মনটাকে অন্যদিকে ফেরাবার জন্যে বাচ্চাটার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করতে লাগলাম,—"তোমার নাম কি খোকনবাবু?"

"ও বাংলা জানে না।" শর্মিষ্ঠা একটু লজ্জিত হয়ে বললো। আমি ওকে কিছু কিছু ইংরেজি শিখিয়েছি।"

আমি ইংরেজিতে ওর সঙ্গে একটু আলাপ জমাবার চেষ্টা করছিলাম,—এমন সময় শর্মিষ্ঠার মা চা আর কিছু জলখাবার আমাদের সামনে একটা ছোট টিপয়ের ওপর রাখলো। "নাও বাবা খেয়ে নাও, এ আমাদের দেশের খাবার আমি নিজের হাতে তৈরী করেছি।"

"হ্যাঁ খেয়ে নিন,—মায়ের ধারণা এই খাদ্যটির মত সুখাদ্য আর নেই জগতে।" শর্মিষ্ঠা মায়ের দিকে তেরছা করে চেয়ে বলে।

ওর মা রেগে যান, বলেন—'এমন খাদ্য আর নেই এ কথা আমি বলিনা, তবে এটি সত্যিই সুখাদ্য।

"নিশ্চয়ই খুব সুন্দর খেতে। আমি ওদের তর্ক থামাতে একটুখানি খেয়ে বলি।

ওর মায়ের মুখে খুসির হাসি ফুটে ওঠে, আর শর্মিষ্ঠার চোখে দুষ্টুমির চাহনি। আমি চুপচাপ খেয়ে চলি, যেন জীবনে আমি আর কখনো এমন খাবার খাইনি এমনভাবে। আমাদের খাওয়া হলে শর্মিষ্ঠার মা চলে যান বাচ্চাটাকে নিয়ে। আমরা দুজনে বসে থাকি চুপচাপ। আমাদের মধ্যে কেমন যেন একটা আড়ষ্টভাব এসেছিলো। আমরা সহজ হতে পারছিলাম না। পরিস্থিতি হাল্কা করতে আমি বললাম,—"আপনি ক্লান্ত, এসে আপনাকে বিব্রত করেছি।"

"আপনি তো নিজে আসেন নি, আমি আপনাকে

নিয়ে এসেছি। যদি বিব্রতবোধ করি, সে নিজের দোষে, আপনার কোন অপরাধে নয়। অতএব আপনার কিন্তু হওয়ার কিছু নেই। আমি একটুও বিব্রত নই বরং আপনি এখানে আসাতে একঘেয়েমির হাত থেকে বেঁচেছি, আজকের সন্ধ্যায় আমি কিছু নতুনত্বের স্বাদ পাচ্ছি।"

—"কিন্তু আপনি এখন যে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন এটাও ঠিক! আপনি এখন বিশ্রাম চাইছেন।

—"কেমন করে বুঝলেন?"

—"আপনার মুখ দেখে, আপনি কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছেন কথা বলতে আপনার কষ্ট হচ্ছে।"

—"ও: বুঝতে পেরেছি, এতক্ষণ চুপ করে ছিলাম বলে এ কথা বলছেন। ক্লান্তিতে চুপ করে নেই। আপনি আমাকে বন্ধু বলে স্বীকার করলেন, আমাদের বাড়ীতে এলেন এবং এই এতো সামান্য জিনিষ এত আগ্রহের সঙ্গে খেলেন, এতে যে আমার কতখানি আনন্দ হচ্ছে তা আমি কথায় প্রকাশ করার মত ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। সত্যি সত্যিই আমি ভীষণ খুসী হয়েছি, আর সেই খুসির জোয়ারে ভেসে চলেছিলাম আপন মনে এতক্ষণ তাই চুপ করে ছিলাম এর জন্যে আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ জানাব বুঝতে পারছি না।"

—"তার মানে আপনি আমাকে ঠিক বন্ধু ভাবতে পারছেন না।"

—"ছি: ছি: সেকি আমি এ কথা আবার বললাম কখন?

—"এই তো এক্ষুনি! বন্ধু বলে মেনে নিলে আমাকে ধন্যবাদ দেওয়ার কথা ভাবতে পারতেন না।"

হয়ত ভুল বললাম, মানে বলা উচিত ছিলো আপনার এই বন্ধুত্বের বিনিময় আমার কিছু দিতে ইচ্ছা করছে কিন্তু কি দিতে পারি? তাই তো চুপ করে ছিলাম আর ভাবছিলাম আমার দেওয়ার কিছুই নেই।

এবার আমি হেসে ফেলি,—"বলি আমি হার স্বীকার করছি, আপনার সঙ্গে কথায় আমি পেরে উঠবো না। আমায় উঠতে হবে কথায় কথায় অনেকটা সময় কাটিয়ে গেলাম। বাড়ীতে হয়ত চিন্তা করছে।

—"এটাই আপনার আসল কথা। আচ্ছা আসুন। আবার নিশ্চয়ই দেখা হচ্ছে?" ও আমাকে এগিয়ে দিতে বাস রাস্তা পর্য্যন্ত এলো। ওকে এখন বেশ খুশি খুশি মনে হচ্ছিল। খুসি কি শুধু শর্মিষ্ঠাই হয়েছিলো? আজকের সন্ধ্যাটা কি আমায় প্রচুর আনন্দ দেয় নি? হ্যাঁ দিয়েছে, প্রচুর আনন্দ পেয়েছি আমি আজকের এই সন্ধ্যায়। বাস চলতে আরম্ভ করলে শর্মিষ্ঠা আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে গেলো। মনের সব খুসির ভাবটা নষ্ট হয়ে গেলো।—শর্মিষ্ঠা!—শর্মিষ্ঠা এই নামটার সঙ্গে কেমন যেন মিল আছে ও মেয়েটির।

মহাভারতের দেবযানীর দাসী,—শর্মিষ্ঠা। এক অভিশপ্তা দাসীর ভেতরে বাস করতো উদার, মহৎ, কৃষ্টিসম্পান্না এক রাজকুমারী।

বাড়ী ফিরে সোজা নিজের ঘরে চলে গেলাম। কারো সঙ্গে দেখা হলে পাছে কথা বলতে হয় সেই ভয়ে। কারণ কোন কথা বলার স্পৃহা ছিলো না। জামা-কাপড় বদলিয়ে শুয়ে পড়লাম খাটে।

—"কি ব্যাপার শুয়ে পড়লে যে। এত দেরী করে ফিরলে তারপর চা না খেয়ে শুয়ে পড়লে, কি হলো তোমার ঠাকুর পো?" বৌদি এসে জিজ্ঞেস করলো অবাক হয়ে।

—"কই কিছুই তো হয় নি! এমনি' চা খেতে ইচ্ছে করছে না।

—"কেন সুজাতার ওখানে কি আজ জামাই আদর পেট পুরে খেয়ে এসেছ?

—"না সুজাতাদের ওখানে আমি যাই নি! তা ছাড়া দু'তিন দিন হলো 'ওর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি।

—"কি ব্যাপার। এখন কি অভিমানের পালা চলছে না কি? তাই বুঝি বিরহ যন্ত্রণায় একেবারে ক্ষিধে-তেষ্টা ভুলে ধরাশায়ী হয়েছ?"

—"না বৌদি, ওর সঙ্গে এই কদিন রাগারাগির কোন কথাই হয় নি যাতে 'ওর' মান হতে পারে।

বস্তুতঃ আমি 'ওর' কথা এ'কদিন চিন্তা করার অবসর পাই নি।

—"তাই নাকি! তবে কি তুমি দীক্ষা নিয়ে গৃহত্যাগ করে চলে যাওয়ার ফন্দী আঁটছো?

—"আপাততঃ তোমার বকর বকর থেকে মুক্তি পেতে চাইছি। আমি বিরহে গড়াগড়িও যাচ্ছি না আবার

গৃহত্যাগ করতেও চাইছি না। দোহাই তোমার তুমি এখন যাও, খাওয়ার সময় আমি নিজেই গিয়ে খেয়ে আসবো।"

—"বেশ বাবা যাচ্ছি। এখন নির্জন ঘরে শুয়ে শুয়ে শ্রীমতীর মুখ চিন্তা করো।" বকবক করতে করতে বৌদি চলে গেলো। সত্যি আমি আশ্চর্য হচ্ছি। সুজাতার কথা একবারো মনে হয় নি এই কদিন! শর্মিষ্ঠার কল্পনায় ডুবেছিলাম। নাঃ!—কালকেই সুজাতার সঙ্গে দেখা করবো। সুজাতার ওপর খুব অন্যায় ব্যবহার করা হয়েছে। এক ক্লাসে থেকেও ওর দিকে দৃষ্টি পর্যন্ত যায়নি তিন দিন। শর্মিষ্ঠার কথাই কেবল ভেবেছি, শর্মিষ্ঠার দিকেই কেবল তাকিয়ে থেকেছি। কিছুক্ষণ পরে খেয়াল হল সুজাতার কথা ভাবতে ভাবতে আবার কখন শর্মিষ্ঠার কথা ভাবতে আরম্ভ করেছি। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত দশটা বেজে গেছে। আশ্চর্য, এতোটা সময় শুধু শর্মিষ্ঠার চিন্তা করেই কাটিয়ে দিলাম!" তাড়াতাড়ি খাওয়ার ঘরের দিকে গেলাম।

—"কি মশাই ধ্যান ভাঙ্গলো?" তেরছা চোখে চেয়ে বৌদি বললো।

আমি কোন কথা না বলে খেতে বসলাম।

রাত্রে প্রতিজ্ঞা করলাম সুজাতার সঙ্গে দেখা করতে হবে।

পরদিন সকাল থেকেই কলেজ আমাকে কেবল আকর্ষণ করতে লাগলো। বেশ বুঝতে পারলাম কলেজ আমায় আকর্ষণ করছে না, এ আকর্ষণ শর্মিষ্ঠার।

শনিবার—ছুটোর ছুটি হয়ে গেলো। আমি সুজাতার সঙ্গে দেখা করার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। বাসষ্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে শর্মিষ্ঠার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

'ও' এসে দাঁড়ালো আমার পাশে।

—"আজ কোথায় যাওয়া যায় বলুন? আজ তো অনেক সময় আছে। আমি প্রশ্ন করি শর্মিষ্ঠাকে।

—"আমাদের বাড়ীতে।

—"রোজ রোজ আপনার বাড়ী গেলে আপনার মা অসন্তুষ্ট হতে পারেন।

—"আপনি আমার মাকে ঠিক বুঝতে পারেননি। সেইজন্যে এরকম কথা ভাবতে পারছেন। মা খুব অতিথি-বৎসল, বাড়ীতে কেউ এলে মা খুব খুসি হন। তাছাড়া আপনাকে মায়ের খুব ভালো লেগেছে, আপনি আমাদের বাড়ীতে গেলে মা খুব আনন্দ পাবেন।

—"বেশ তবে চলুন ব'ল" আমি ট্রামষ্টপেজের দিকে এগিয়ে যাই।

শর্মিষ্ঠার মা ঘুমুচ্ছিলেন, ওর ডাকে উঠে পড়লেন। চারিদিকে রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। ঠিক দুপুরবেলা এদের বিরক্ত করতে আমি খুব লজ্জিত হলাম। ওর মায়ের কাছে কথাটা বলতে, বললেন "কোন কাজ থাকেনা, কথা বলারও কেউ থাকে না, সেইজন্যে ঘুমিয়ে পড়ি। দুপুরে ঘুমানো অভ্যাস আমার ছিলো না।

—"মা,—একটু চা হবে?" শর্মিষ্ঠা বলে।

—"নিশ্চয়ই হবে, তোমরা একটু বসো আমি এখনি করে আনছি।"

'ওর মা চলে গেলেন পর্দার আড়ালে। বাচ্চাটা তখনো ঘুমুচ্ছে বিছানায়।

—"তারপর!—আপনার আঁকা কতোদূর এগুলো?"

—"কই আর এগুলো! শুধু আপনার কথা চিন্তা করতে করতে সময় কেটে গেলো।" আমার কথা শুনে শর্মিষ্ঠা কিছু না বলে মাথাটা নীচু করে রইলো। বুঝলাম আমার কথায় ও লজ্জা পেয়েছে। যদিও 'ওকে' অনেকের সামনে বসে থাকতে হয়, তবু 'ওর' মনটা সব ব্যাপারে নির্বিকার হতে পারে নি। চা খাওয়ার পরে আমরা আবার কথা বলতে আরম্ভ করলাম। সে সব কথার কোন মানে নেই, একটার সঙ্গে আর একটার কোন যোগাযোগও নেই। এমনি আবোল তাবোল গল্প করতে করতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে গেলো। শর্মিষ্ঠার মা আর রাঘবন বেড়িয়ে ফিরে এলো। ওর মা রান্নার ব্যবস্থা করতে লাগলেন রাঘবন ঘরের মেঝের ওপর বসে ছবির বই দেখতে লাগলো।

—"চলুন ছাদে গিয়ে বসি।" শর্মিষ্ঠা বললো।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে আমরা ছাদে উঠে এলাম। লাইটের আলোর প্রখরতা এখানে কম। আকাশের কোলে চাঁদের দেখা পাওয়া যাচ্ছে। শহরের কলরব নীচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। ছাদে তার রেশ ক্ষীণ হয়ে এসে যেন এক

রহস্যময় ছন্দের সৃষ্টি হয়েছে। রাতের এই ছাদটাকে মনে হচ্ছে যেন নদীর কিনারে বাদশাহের তৈরী পাথরের চত্বর, নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে নদী, সেই নদীর কলধ্বনি আমি শুনতে পাচ্ছি। আমি যেন কোন্ রূপকথার রাজ্যে চলে গেলাম, পার্কসার্কাসের রাস্তার আর বাড়ীর আলোগুলো তারার মত জ্বলছে, রাস্তার জনতার কল্লোল যেন নদীর কলস্বর, আমরা দুজনে বসে আছি পৃথিবীর থেকে বিচ্ছিন্ন দুটি আত্মা, আর সেই আত্মা দুটিকে চাঁদ তার আলোর ওড়না দিয়ে ঢেকে রেখেছে। বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অদ্ভুত এক অনুভূতিতে আমার মন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো।

—"প্রবাহন বাবু!"

—"উঁ! কি,—কিছু বলছেন আমাকে?" শর্মিষ্ঠার ডাকে আমার চিন্তার জাল ছিঁড়ে যায়।

—"হ্যাঁ,—! আচ্ছা, প্রথম যেদিন আপনার সঙ্গে দেখা হয়, মানে আলাপ হয়,—সেদিন আপনি আমার জীবনের কথা শুনতে চেয়েছিলেন। মনে আছে?"

—"আছে, এই তো মাত্র তিন চার দিনের কথা।"

—"কিন্তু কই এখন তো আর জানতে চাইছেন না?"

"না:—চাই না জানতে কারণ আপনি দুঃখ পান বলে, আপনার অতীত জীবন হয়ত আপনাকে দুঃখ দেয়। তাই আর আমি আপনার অতীত জীবনের কথা জানতে চাই না।

—"দুঃখ পাই ঠিক, কিন্তু দুঃখের কথা অন্যকে বলতে পারলে যন্ত্রণার উপশম হয় কিছুটা। আর সেদিন তো আপনাকে বললাম,—আমার অতীত জীবনের যন্ত্রণার কথা বলতে চাই এমন একজনকে, যে আমার যন্ত্রণার কথা উপলব্ধি করতে পারবে, আমার প্রতি সহানুভূতিশীল হবে। আমি একদম একলা, আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। আমি একটি দরদী মন চাইছি।"

রাত প্রায় নটা বেজেছে, আমাদের ছাদের এই-খানটা নির্জন, চাঁদের আলো আমাদের আদর জানাচ্ছে। দূরের বাড়ীর পাশে পাশে দু একটা ঝাকড়া গাছ প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে, আমি সেই রূপকথার অচিন দেশের রাজপুত্র, দৈত্যপুরীর বন্দী রাজকন্যা আমার কাছে বলছে—তাকে এই যন্ত্রণার বন্দীশালা থেকে মুক্ত করতে। আমি মোহগ্রস্ত। শর্মিষ্ঠা দূরের দিকে তাকিয়ে আছে, মনে হয় ও যেন অতীত দিনগুলোকে আর একবার দেখার চেষ্টা করছে।

"জানেন!—সেদিনও এই ছাদ এমন চাঁদের আলোয় ভরে গিয়েছিলো। জন্ আমায় বলেছিলো,—সে আমায় ভালোবাসে। আবেগে থর থর কণ্ঠে আমায় জন বলেছিলো, সে আমায় তার জীবনের সম্রাজ্ঞী করতে চায়। জানেন!—আজ আমার সে সব কথা মনে পড়লে হাসি পায়। কি প্রচণ্ড মিথ্যে কথা 'ও' আমায় বলেছিলো আর আমি 'ওর' স—ব কথা সত্যি বলে মেনে নিয়েছিলাম, আনন্দে গর্ব্বে আমি নিজের সব স্বত্বা হারিয়ে ফেলেছিলাম, নিজেকে নিঃশেষ করে, উজাড় করে দিয়েছিলাম এই মিথ্যাবাদী, চাটুকারের কাছে।"

শর্মিষ্ঠা হাসলো, এতো করুণ হাসি আর কখনো আমি দেখিনি। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে আবার বললো—"আচ্ছা আপনি নিশ্চয় জানেন, ঐতিহাসিক যুগে দাক্ষিণাত্যের মন্দিরে মন্দিরে বহু দেবদাসী ছিলো? তারা দেবতাদের নৃত্যারতি দেখাতো। সত্যি! সেই যুগে দাক্ষিণাত্যের দেবদাসীদের নাচ দেখতে বহু দেশ থেকে গণ্যমান্য ধনী ভদ্রলোক আসতো। ঐ নাচ খুব সাধারণ হাত পা ঘুরিয়ে নাচার মত সহজ ছিলো না। সব নাচই ছিলো ক্লাসিক। অনেক পরিশ্রম আর অধ্যবসায় ছিলো ঐ নাচের পিছনে। দাক্ষিণাত্যের ভারতনাট্যম্ আজ বিশ্বের দরবারে সম্মান পেয়েছে প্রচুর। এমনি এক দেবদাসীর গর্ভজাত ছিলেন আমার প্রমাতা। সেই সময় দেবদাসী প্রথা বিলোপ হতে চলেছে। আমাদের প্রপিতা একটি মন্দিরের এক কিশোরী দেবদাসীর নাচ দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। তারপরে মন্দিরে প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে তার বদলে সেই কিশোরী দেবদাসীকে নিয়ে আসেন এবং বিয়ে করেন, যদিও দেবদাসীকে বিয়ে করা ধর্ম বিরুদ্ধ কাজ ছিলো। এ বিয়ে তিনি গোপনে করেছিলেন। তারপর ক্রমে ক্রমে বংশ পরম্পরায় এরা সামাজিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলো। সেই দেবদাসীর গর্ভজাত সন্তান সন্ততির মধ্যে আমরা এক শাখা। নাচের নেশা আমাদের রক্তের সঙ্গে প্রবাহিত। বাবা ওখানে এক জন ছোট খাটো ব্যাবসায়ী ছিলেন। মা ছিলেন একটা ছোট

নাচের স্কুলের শিক্ষিকা। বিয়ের পর আমি যখন হলাম মা অসুস্থ হয়ে পড়লো, তারপর থেকে আর নাচ শেখাতে পারলেন না। বাবা যা উপায় করতেন তাতে আমাদের চলে যেত। কিন্তু কিছুদিন পরে বাবার ব্যবসায়ে খুব মন্দা দেখা দিলো। বহু টাকা লোকসান দিয়ে, বহু ধার দেনা হয়ে, বাবার ব্যবসা একেবারে বন্ধ হয়ে গেলো। আমি তখন ছোট। বাবা মা দুজনে ঠিক করলেন, কলকাতায় আসবেন। হাতে টাকা পয়সা যা অবশিষ্ট ছিলো সেই নিয়ে আমরা তিন জনে এখানে চলে এলাম। এখানে বাবার পরিচিত এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক ছিলেন। ভদ্রলোকের বদলীর চাকুরী ছিলো, আমাদের দেশে বদলী হয়েছিলেন, তখন বাবা-মায়ের সঙ্গে এই বাঙ্গালী পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। এই ভদ্রলোক তাঁর বাসার কাছে আমাদের একটা বাসা ঠিক করে দেন। তারপর অনেক চেষ্টা করে তাঁর জানা শোনা এক মারচেণ্ট অফিসে বাবার একটা চাকরি করে দেন। তারপর থেকে মোটামুটি ভাবে আমাদের দিনগুলো কেটে যাচ্ছিলো। আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন বাবা। মা ঘরে আমায় নাচ শেখাতে লাগলেন। আমার পড়াশুনার থেকে নাচের দিকে ঝোঁকে ছিলো বেশী। বোধ হয় সেই দেবদাসীর রক্তের ধারা এখনো শুকিয়ে যায় নি। যত বড়ো হতে লাগলাম নাচের নেশা আমার তত বাড়তে লাগলো। নাচতে আমি ভালোই শিখলাম একদিন বাবা, মাকে বললেন,—তাঁদের অফিসে একটা ফাংশান হবে। শর্মিষ্ঠার দু একটা নাচ থাকলে বেশ ভালো হয়, আমার মনে হয় 'ও' নাচে বেশ নাম করতে পারবে এককালে, আমার ইচ্ছে 'ও' এখন থেকে দু একটা চ্যারিটি ফাংশনে যোগ দিক। আমি ফাংশানের কর্মকর্তাকে বলেছি, তিনি নাচ দেখতে চেয়েছেন। মা কথাটা শুনে খুব খুশী হলেন, আর প্রচণ্ড উৎসাহে আমার নাচের তালিম দিতে লাগলেন। ফাংশানের কর্মকর্তারা আমার নাচ দেখে খুশী হলেন। প্রোগ্রামের তালিকায় আমার নাম থাকলো।

ফাংশানের দিন আমার বুকের ভেতর উত্তেজনার ঝড় বইছে। সারাদিন প্রায় কিছুই খেতে পারলাম না। মা বললেন দুপুর বেলা একটু বিশ্রাম করে নে। কিন্তু বিশ্রাম করার মত মনের অবস্থা আমার ছিলো না, ভয়ে আর আনন্দে আমার ভেতরে অশান্ত ঝড় বইছিলো। বিকেল হাওয়ার আগেই আমি মাকে তাড়া দিতে লাগলাম ও খানে যাওয়ার জন্যে। মা তাড়াতাড়ি সাংসারিক কাজ কিছু কিছু সেরে আমাকে নিয়ে ওখানে চললেন। বাবা তো আগেই চলে গিয়েছিলেন।

হাততালির প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেলো। আমার নাচের উদ্দামগতি ও ছন্দ বেড়ে চললো। ভারতনাট্যম্। নটরাজের ধ্বংসের আগুন ছড়াচ্ছে প্রতি পদক্ষেপে। পৃথিবী কাঁপছে পাতাল আরো তলিয়ে যাচ্ছে, স্বর্গরাজ্য আতংকে থর থর। কাঁপছে আমার পায়ের তলায় ষ্টেজের পাটাতন। আমার পায়ের ঘুঙুরের বোল যেন আগুন ছড়াচ্ছে। আমার দেহের দোলায় যেন ঝড়ের মাতন। কতক্ষণ নেচেছিলাম তার হিসাব ছিলো না। উইংসের পাশ থেকে ওয়ার্নিং বেল আমায় সচেতন করে দিলো, এবার থামাও সময় পেরিয়ে গেছে। আমার উদ্দাম গতি আস্তে আস্তে কমে এলো সমাপ্তির পর্য্যায়ে।—ড্রপসিন পড়লো। তখনো হাত তালির শব্দ আমার কানে সমুদ্র গর্জ্জন।

দর্শকেরা আমাকে অভিনন্দন জানাতে চাইলো। আমি আবার ষ্টেজে এসে দাঁড়ালাম রাশি রাশি ফুল এগিয়ে এলো আমার সামনে, অদ্ভুত এক আনন্দের শিহরণ আমার মনে সঞ্চারিত হতে লাগলো। দু হাতে গ্রহণ করলাম সেই বিপুল অভিনন্দন।

ফাংশনের শেষে পোষাক পাল্টাচ্ছি। এমন সময় বাবা ডেকে পাঠালেন। তাড়াতাড়ি আমার নিজের জামা কাপড় পরে বাইরে এলাম, বাবা দাঁড়িয়ে আছেন হাসি মুখে তাঁর পাশে দাড়িয়ে একজন অভাবনীয় যুবক। মাথায় বাদামী চুল, গায়ের রং দুধসাদা, মুখের পাশের সবুজ আর গণ্ডের গোলাপী রংয়ের সংমিশ্রণে এক আশ্চর্যজনক সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয়েছে যা দেখে আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম। শাঁখ-সাদা কপাল, মোটা বাদামী ভ্রু, নীল সমুদ্র দুই চোখে। তীক্ষ্ণ নাক, চাপা ঠোঁটে লাল কর্মচার ছোপ। আমি তাকিয়েই আছি ভুলে গেলাম বাবা আমায় ডেকেছেন।

"শর্মিষ্ঠা।—ইনি আমাদের অফিসের বড় সাহেবের সেক্রেটারি, মিষ্টার গোমেশ। তোমার নাচ দেখে ওঁর

খুব ভালো লেগেছে, তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন।

"নমস্কার! আমি নিজেকে সংযত করে বলি।

'ও' কোন রকমে হাত দুটো জড়ো করে প্রতি নমস্কার করার চেষ্টা করলো। তারপর আমায় ইংরিজিতে জানায় যে, একমাত্র ইংলিশ ভাষা ছাড়া আর কোন ভাষা জানে না। আমি তাকে ইংরিজিতে জানাই, তাতে খুব অসুবিধে হবে না, আমি একটু একটু ইংরিজি বলতে পারি। 'ও' খুব খুসি হয়। আমার নাচের প্রশংসা করলো অনর্গল ভাবে। আমি ভীষণ লজ্জা পেলাম। আমার ভেতরের ঘুমন্ত রাজকন্যা জেগে উঠলো বিদেশী রাজপুত্রের কথার শব্দে। আমার মনের ঘুম বোধ হয় সেই সময় প্রথম ভেঙে ছিলো। আমার হৃদয় কি এক অনাস্বাদিত স্বাদের সন্ধান পেলো সেই প্রথম।

এরপর থেকে গোমেশ প্রায় আসতো আমাদের বাড়ীতে, অফিস ছুটির পর, বাবার সঙ্গে। বাবার মত একজন নিম্নতম কর্মচারীর বাড়ীতে, গোমেশের মত একজন ঊর্দ্ধতন জগতের লোক আমাদের বাড়ীতে আসে এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে, এতে বাবা খুব গর্বিত মনে করতেন নিজেকে। মায়ের সঙ্গে ঠিক ছেলের মত ব্যবহার করতো, মায়ের হাতে ঐ ধোসার খুব প্রশংসা করতো এবং খুব উৎসাহ ভরে খেতো। মা আর বাবার খুব স্নেহের পাত্র হয়ে দাঁড়ালো গোমেশ। তারপর কবে জানি না গোমেশ আমার মনের সবখানি অধিকার করে বসেছিলো। রোজ বিকেলবেলা নিজেকে খুব সুন্দর করে সাজাতে চেষ্টা করতাম, নিত্য নতুন খাবার তৈরী করতাম। যেদিন গোমেস আসতো না সেদিন খাবার করার মানে খুঁজে পেতাম না, প্রসাধন করা ব্যর্থ হোত।

রবিবারের দুপুরে ও চলে আসতো। এখানে খাওয়া দাওয়া করে বিকেল বেলা আমাকে বলতো,—চলো একটু ঘুরে আসি। আমরা বেরিয়ে পড়তাম, ঘুরতাম এখানে ওখানে। হয়ত ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে গিয়ে বসতাম কোন পার্কে, মাঠে, কখনো বা রেষ্টুরেন্টে। খাওয়ার থেকে গল্পই হতো বেশী। বিশেষ দিনে গোমেশ আমার জন্যে আনতো ছোটখাটো প্রেজেন্টেশন। মা, বাবা [illegible] কোনো বাধা দিতেন না। ওঁদের মনে একটি মধুর আশা বাসা বেঁধে ছিলো। সেই মধুর আশা আমার মনেও স্বপ্নের জাল বুনেছিলো। আর গোমেশের মনে? গোমেশের মনে জেগেছিলো একটা নিষ্ঠুর চক্রান্ত। ওর মধ্যে প্রতারক বাসা বেঁধেছিলো। কিন্তু আমি বুঝতে পারি নি,—প্রবাহন। সত্যি আমি বুঝতে পারিনি ও একজন প্রতারক। আমার হৃদয়ের মধ্যে একটি মাত্র শব্দ ছিলো,—ভালোবাসি! গোমেশকে আমি ভালোবাসি! আমার ভালোবাসার সেই তীব্র মাদক, মাতাল করে দিয়েছিলো, তাই আমি বুঝতে পারি নি, গোমেশের ভালো বাসা শুধুমাত্র একটি নিষ্ঠুর অভিনয়।

শর্মিষ্ঠা দুঃখে, আবেগে এমন অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে আমার নামের পাশে বাবু বলতে ভুলে গেলো।

"সেদিনও ছিলো এমনি চাঁদের রাত।" শর্মিষ্ঠা আবার আরম্ভ করলো। "গোমেশের আমাদের বাড়ীতে রাতের খাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিলো। খাওয়ার পর আমি আর গোমেশ এই ছাদে উঠে এসেছিলাম। এমনি চাঁদের আলো আমাদের দুজনকে অভিনন্দন জানালো! আমরা পাশাপাশি অনেকক্ষণ বসে থাকলাম। তারপর গোমেশ আমায় ডাকলো,—শর্মিষ্ঠা!—ওর ঐ ছোট্ট ডাকটা যেন কি এক আবেগে কেঁপে উঠলো। অনেক বার অনেক ভাবে 'ও' আমায় ডেকেছে, কিন্তু আজকের ডাকের মধ্যে ছিলো অন্য সুর, যে সুর আমি গোমেশের গলায় এর আগে শুনি নি। ওর ডাক আমার দেহের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে এক মোহের সৃষ্টি করলো। আমি মন্ত্রমুগ্ধ হলাম। যেমন করে সাপুড়ের বাঁশীতে সাপিনী মুগ্ধ হয় ঠিক তেমনি করে আমি গোমেশের ডাক শুনে আবেশে থরথর করে কেঁপে উঠলাম। ওর ডাকের উত্তর দেবার শক্তি আমার ছিলো না। আমি চুপ করে বসে থাকলাম। গোমেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো। ওর সেই চোখের দৃষ্টিতে ময়াল সাপের প্রখরতা আমায় অবশ করে দিলো গোমেশ আস্তে আস্তে আমার কাছে, আরো কাছে সরে এলো, তারপর আমায় 'ও' বেঁধে ফেললো ওর বলি[illegible] হাতে! সেই হাতের চাপ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে লাগলো আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো, আমি অসহায়ের মত আত্মসমর্পন করলাম। যেন একটি হরিণকে এ[illegible] ময়াল সাপ পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দি[illegible]

চাইছে। জন ছাড়ো—জন আমায় ছেড়ে দাও! আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। তারপর ছাড়া পেয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললাম—জন তুমি ভয়ঙ্কর অন্যায় করলে, ভীষণ পাপ করেছ তুমি! হ্যাঁ এ পাপ জন! তুমি পাপ করলে।

নাঃ—! আমি কিছু মাত্র অন্যায় করিনি, পাপও করিনি। আমি তোমায় ভালবাসি,—আমি আমার ভালবাসা দিয়ে তোমায় অধিকার করলাম। শর্মিষ্ঠা!—তুমিই বলো—ভালবাসা কি পাপ?

গোমেশের প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারলাম না, কারণ উত্তর আমার জানা নেই। আমার মনেও ঐ একই প্রশ্ন!—ভালবাসা বড় না সামাজিক অনুষ্ঠান বড়ো? আমরা মনে মনে যখন এক আত্মা হয়ে গেছি তখন মিথ্যে সামাজিক পাপ পুণ্যের কথা কেন ভাবছি? তবুও পারলাম না গোমেশকে সমর্থন করতে। সংস্কার আমায় বাধা দিলো।

আমার কাছে কোন উত্তর না পেয়ে গোমেশ উঠে দাঁড়ালো। আমি ওকে হারানোর ভয় ওর হাত দুটো চেপে ধরলাম। বললাম,—গোমেশ চলে যেও না, আজকের এই ঘটনার পরে আমি তোমাকে যেতে দিতে পারি না। গোমেশ! কথা দাও, আমাকে তোমার সারা জীবনের সঙ্গী করে নিয়ে সামাজিক স্বীকৃতি দেবে?

'ও আমার কাঁধ দুটো ধরে একটু ঝাঁকানি দিলো তারপর একটু হেসে বললো,—তুমি একেবারে ছেলে মানুষ এতদিন ধরে আমার সঙ্গে মিশে তুমি কি বুঝতে পারলে না, যে আমার জীবনে তোমাকে ছাড়া আর কোন নারীর স্থান হবে না? তুমি আমায় একটুও ভালোবাসো না, একটুও বিশ্বাস করো না শর্মিষ্ঠা!

—"জন এ'কি কথা বলছো তুমি? তোমাকে দেখার পর থেকে আমি তোমাকে ছাড়া আর অন্য কিছু চিন্তা করতে পারি না, যেদিন তুমি আস না সে দিনটা আমার কাছে মিথ্যে হয়ে যায়, যেদিন তোমার কথা শুনতে পাইনা সে দিনটা আমার কাছে শব্দহীন বলে মনে হয়। আর তুমি বলছো আমি তোমায় ভালোবাসি না?"

—"তবে কেমন করে বললে, আমি তোমায় ফেলে পালাবো।"

"আমি সে কথা বলছি না, তবে আজ তুমি আমার বাবাকে বলে যাও, আমাদের সম্পর্ক যাতে সমাজ মেনে নেয় সেই ব্যবস্থা করতে,—মানে, মানে, তোমাকে বলতে আমার একটুও লজ্জা করছে না,—তুমি আজই বাবাকে বলো আমাদের বিয়ের কথা।

"বেশ চলো আমরা একসঙ্গে গিয়ে তোমার বাবাকে বলি।"

—"না—না, আমি যেতে পারবো না, তুমি গিয়ে বলো।"

—"কেন?—লজ্জা করছে? বেশ আমিই গিয়ে বলছি। হেসে আবার আমার কাঁধে একটু চাপ দিয়ে ও নীচে চলে গেলো। আমি চুপ করে স্থবিরের মত বসে থাকলাম। অনেকক্ষণ বাদে মা ছাদে উঠে এলেন। বললেন কি রে এখনো বসে আছিস্ ঘুমুতে যাবি না?"

"হ্যাঁ যাচ্ছি চলো। আমি নীচে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াই।

"শোন! গোমেশ আজ তোর বাবার মত চাইছিলো।"—কিরে, জিজ্ঞেস করলি না কিসের মত চাইছিলো? আমি চুপ করে আছি দেখে মা জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ বলো, কিসের মত চাইছিলো?

কেন তুই কি কিছুই জানিস না! মা আমার কাছ থেকে কথা আদায় করতে চায়। আমি চুপ করে থাকি। মা আবার নিজে থেকেই আরম্ভ করেন, "গোমেশ তোকে বিয়ে করতে চায়। আমি মুখ নীচু করে থাকি, কিন্তু মনে মনে জানতে চাই, বাবা কি বললেন।

—"তোর বাবা মত দিয়েছেন, খুব খুশী হয়েই মত দিয়েছেন। জাতে যদিও খৃষ্টান তবু ছেলে হিসাবে খুব ভালো, যেমন চেহারা তেমন ব্যবহার আর চাকরিটাও বেশ ভালো। ওর থেকে ভালো আমরা আশা করতে পারিনা। মা আপন মনে বকে যেতে লাগলেন।

"চলো নীচে যাবে না?" আমি প্রসঙ্গ পাল্টাই।

"চল্! সত্যি অনেক রাত হলো।" [ক্রমশঃ

পরিকল্পনা

‘[illegible]’

বাংলা চলচ্চিত্রের কিছু কিছু সমস্যার সমাধান সাধিত হয়েছে বটে, কিন্তু সংকট শেষ হয়েছে এ'কথা বলবার সময় ঠিক এখনও আসে নি। বাংলা চিত্রকে রক্ষা করবার জন্য, তার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য এবং তাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট অনেকেই যে সচেষ্ট হয়েছেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সচেষ্ট হয়েছেন এটা ঠিক কথা, কিন্তু তাঁদের চেষ্টা কতদূর এগিয়েছে, তাঁদের চিন্তা-ভাবনা-পরিকল্পনা কি রূপ নিয়েছে, তা আমরা এখনও জানতে পারি নি। তবে আমরা আশা করি তাঁদের প্রখর বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে তাঁরা বাংলা চলচ্চিত্রকে একটি সুনির্দ্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিত পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। তবে এই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া মানেই হচ্ছে বাংলা চিত্রের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি-সাধন করা এবং এই উন্নতি করতে হলে খুঁটিনাটির থেকে আরম্ভ করে সর্ব্ববিষয়ের সর্ব্ববিভাগের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করে যেতে হবে।

বাংলা ছবি দেশে বিদেশে প্রচুর পুরস্কার লাভ করেছে, বাংলা ছবির গল্প ভাল, বাংলা ছবির চিত্র-নাট্য ভাল, বাংলা ছবির রুচি আছে, বৈশিষ্ট্য আছে, ইত্যাদি আত্মতুষ্টিকর চিন্তাগুলি ছেড়ে দিয়ে বাংলা চিত্রের দোষ-ত্রুটিগুলির দিকেই নজর দিতে হবে এবং যতদূর সম্ভব সেইগুলিকেই একে একে দূর করতে হবে। সব সময় মনে রাখা দরকার যে চলচ্চিত্র বাজারও প্রতিযোগিতা-মূলক এবং দর্শক সাধারণ সবসময়েই তাঁদের মনোমত চিত্রই দেখতে চায়। কিন্তু এই মনোমত চিত্র প্রস্তুত করতে গিয়ে রুচিকে নামান চলবে না অথচ দর্শক সাধারণের মনের খোরাকও জোগাতে হবে এবং সেই সঙ্গে চিত্রের উন্নতিরও চেষ্টা করতে হবে। বাংলা চিত্রের প্রাজ্ঞ পরিচালকগণ, প্রযোজকগণ, কলাকুশলীগণ এবং সর্ব্বোপরী অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ সকলেই একথা জানেন এবং উন্নততর চিত্র নির্ম্মাণ করতে হলে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে, কি কি দোষ-ত্রুটি শুধরে নিতে হবে তা সকলেই অবগত আছেন জানেন বলে বিশ্বাস করি। তবুও কিছু কিছু তাঁদের স্মরণ পথে আনবার জন্যে

এখানে উল্লেখ করছি।

বাংলা ছবির প্রধান ত্রুটি মনে হয় তার গতি বড়ই মন্থর। বাংলা চিত্র সাধারণতঃ দেখা যায় চলে বেশ অলস মন্থরগতিতে—মন্দাক্রান্তা ছন্দে। কিন্তু হিন্দী বা অন্যভাষী চিত্রগুলির গতি বেশ দ্রুত এবং সেইজন্যে তা দর্শকমনকে আকৃষ্ট করে রাখে। হিন্দী চিত্রের গতি দ্রুত হলেও তা অতিমাত্রায় সঙ্গীত ভারাক্রান্ত বলে এবং দুর্ব্বল গল্পাংশ ও চিত্র-নাট্যে অসংলগ্নতার জন্য উন্নত পর্য্যায়ে পড়ে না। বাংলা চিত্র সেদিক দিয়ে অনেকাংশে ত্রুটিশূন্য বলা চলে। কিন্তু এই অলস, মন্থর গতি তাকে অনেক সময়েই হিন্দীচিত্রের পশ্চাতে ফেলে দিচ্ছে। তাছাড়া হিন্দী চিত্রের উন্নত ফোটোগ্রাফী এবং ব্যয়বহুল দৃশ্যপট ও কাশ্মীর, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি মনোরম স্থানের রঙ্গীন বহির্দৃশ্যের সঙ্গে বাংলা চিত্র প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু যে সব বিষয়ে হিন্দী চিত্রের ওপর টেক্কা দিতে পারবে সেগুলি অবশ্যই করতে হবে প্রতিযোগিতায় জিততে হলে।

এ ছাড়া আর একটি প্রধান বিষয়ে বাংলা ছবি মার খাচ্ছে। সেটি সকলেই বোঝেন এবং তা হচ্ছে অর্থোপার্জ্জনের দিক দিয়ে। বাংলা চিত্র যতই ভাল হোক এবং যতই দর্শক আকর্ষণ করুক, তার বক্স-অফিসের সাফল্য কিন্তু খুবই সীমাবদ্ধ। কারণ বাংলা ছবির দর্শক শুধুমাত্র বাঙ্গালীই এবং বাঙ্গালী প্রধান স্থানগুলিতেই বাংলা চিত্র চলে। সারা ভারতে বাঙ্গালীর সংখ্যা আর কত! কিন্তু হিন্দী ছবির দর্শক সংখ্যা ছড়িয়ে রয়েছে সমগ্র ভারতে এবং এমন কি বহির্ভারতেও। তাই হিন্দী চিত্র বক্স-অফিসের দিক দিয়ে বা আর্থিক সাফল্যের দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছে। এখন বাংলা চিত্রকে এই প্রতিযোগিতার বাজারে কি করে সাফল্য লাভ করতে হবে তা বিশেষ করে ভেবে দেখতে হবে।

আগেই বলেছি বাংলা চিত্রের গল্প, চিত্র-নাট্য, পরিচালনা, অভিনয় সব কিছুই হিন্দী চিত্রের চেয়ে উন্নত কিন্তু ভাষার বাধার জন্য অবাঙ্গালীরা বাংলা ছবি দেখতে আগ্রহী নয়। এখন এই ভাষার বাধাকে যদি দূর করা যায় তাহলে সর্ব্ব-ভারতীয় দর্শককুল বাংলা ছবি দেখতে নিশ্চয়ই আগ্রহান্বিত হবে এবং বাংলা চিত্রও অর্থোপার্জ্জন করতে পারবে। কিন্তু একে কি ভাবে করা যায়? এর দু'টি উপায় আছে। প্রথম, বাংলা ছবির দু'টি করে সংস্করণ করা অর্থাৎ একটি বাংলা ভাষী ও অপরটিতে হিন্দী "ডায়লগ্" দিয়ে হিন্দী ভাষী করা। আগে "নিউ থিয়েটার্স" এরকম অনেক ছবি করেছে। দ্বিতীয় উপায়টি হল এবং যেটি আমার মতে সহজ ও কম খরচের, তা হল যে সব বাংলা চিত্রে একটা সর্ব্বভারতীয় আবেদন আছে, সেইগুলির একটি করে সংস্করণ হিন্দী ভাষায় "ডাব্" করে, শুধু হিন্দী ভাষায় কেন, সম্ভব হলে তামিল, তেলেগু বা মারাঠি এমন কি ইংরাজী ভাষাতেও "ডাব্" করে ভারতের বিভিন্ন স্থানে এমন কি বহির্ভারতেও প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা। এতে ভাষা বোঝবার অসুবিধা না থাকায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের দর্শকদের বাংলা ছবি দেখতে কোনও অসুবিধা হবে না এবং আশা হয় সকল শ্রেণীর দর্শকই উন্নত বাংলা চিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হবেন এবং বাংলা চিত্রও বক্স-অফিসের দিক দিয়ে প্রভূত সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হবে। বাংলা চিত্রের নির্ম্মাতাদের এই বিষয়ে ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি।

"ডাবিং"-এর ব্যাপারে খরচা আছে এবং নানা অসুবিধাও আছে তা স্বীকার করি; কিন্তু এরকম না করতে পারলেও তো বাংলা চিত্র প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারবে না। যত ছবিই 'রিলিজ্' হোক তার দর্শক সংখ্যা বাঙ্গালী বলে অর্থাগমও হবে সীমিত, আর এই সীমিত অর্থে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের দুঃখ, দুর্দ্দশা কোনও দিনই ঘুচবে বলে মনে হয় না। তাই বাংলা চিত্র নির্ম্মাতারা এবং প্রযোজক-পরিচালকগণকে নতুন পথের সন্ধান করতে অনুরোধ জানাই। আশা করি তাঁরাও এ বিষয়ে চিন্তা করছেন।

* * * * *

প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে—নীপা চৌধুরী

বাদল সরকার—বেণীনন্দন ষ্ট্রীট-কলিকাতা

আমাদের দেশে কোন গায়কের জীবনী নিয়ে ছবি হয়েছে কি ?

০ ঠিক বলতে পারলাম না। দু'একজন গায়কের জীবনী নিয়ে গোটাকয়েক ডকুমেন্টারী ছবি হয়ে থাকতে পারে। পূর্ণদৈর্ঘ্য চিত্র হয়নি বোধহয়। তবে অনেক দিন আগে নিউ থিয়েটার্স সায়গলের জীবনী অবলম্বনে একখানা পূর্ণদৈর্ঘ্য হিন্দী ছবি তৈরী করেছিলেন, সে ছবি কলকাতায় রিলিজ হয়েছিল কি না বলতে পারিনা।

* * *

অমিতাভ ব্যানার্জি—মিডল রোড-কলিকাতা

"হাটে বাজারের পর অশোককুমার কি নতুন কোন বাঙলা ছবি করেছেন ? বৈজয়ন্তীমালাকে বাঙলা ছবিতে নামানোর সার্থকতা কি ?

০ আপাততঃ নতুন বাঙলা ছবিকরছেন না। বেশী পরিমাণে টিকিট বিক্রী হওয়া ছাড়া আর কোন সার্থকতা নেই।

* * *

অরুণা মিত্র—রাসবিহারী এভিনিউ-কলিকাতা

শুনেছি উত্তমকুমারের সাথে সুপ্রিয়া-দেবীর একটা 'ইয়ে-মতন' আছে। সত্যি না কি ?

০ ইয়ের খবর তো আপনারাই ভাল জানেন। খামোকা এইসব বাজে প্রশ্ন করে সময় নষ্ট করেন কেন ?

* * *

অণিমা মুখার্জি—শিবাজী পার্ক-দাদর, বম্বে

'পট ও পীঠ' বিভাগে "সাগরপারের" ধ্রুপদী চলচ্চিত্র" খুব ভাল হয়েছে। এটা Continue করবেন তো ?

০ আমরা ত সবসময়েই চেষ্টা করি ভাল জিনিষ পরিবেশন করতে। তবে এই ব্যাপারে সব কিছুই নির্ভর করছে নরেশবাবুর মর্জির ওপরে।

† † †

মাধবী মুখার্জি এখন কি কি ছবিতে কাজ করেছেন ?

০ অগ্নিযুগের কাহিনী, তীরভূমি, অদ্বিতীয়া, বিলম্বিত লয়, সূর্য্যশিখর প্রাঙ্গণে, দুরন্ত চড়াই, গড় নাসিমপুর, আপাততঃ এই কটা নামই মনে পড়ছে, বাকীগুলো পরে বলব।

† † †

নিলীমা ভট্টাচার্য্য—কনট প্লেস-নিউ দিল্লী

অরুন্ধতী দেবী পরিচালিত আগামী ছবি কি ? উনি কি এক সময়ে শান্তিনিকেতনের ছাত্রী ছিলেন।

০ রবীন্দ্রনাথের "মেঘ ও রৌদ্র।" হ্যাঁ।

* * * *

নিবারণ মাইতি—পূর্ণ মিত্র প্লেস-কলিকাতা

ব্যর্থ প্রেমিকের স্থান কোথায় ?

ছাঁদনাতলায়। সর্বরোগের মহৌষধ ঐখানেই পাওয়া যায়।

† † †

তপন মিত্র—লেক রোড-কলিকাতা

এককালের বেবী ষ্টার শার্লি টেম্পলকে আর কোন ছবিতে দেখতে পাওয়া যায় না কেন ? এলিজাবেথ টেলরের প্রথম ছবি কি ?

০ ছবি করার চাইতেও সংসার ধর্ম করাটা ওঁর আরও বেশী ভাল লাগে বলে। এলিজাবেথ টেলরের (A) মার্কা প্রথম ছবি হচ্ছে "The Conspirator."

* * *

অমিত হাজরা—রূপচাঁদ মুখার্জি লেন (কলিকাতা)

আপনারা যাই বলুন হিন্দি ছবি দেখতে আমার দারুণ ভাল লাগে।

০ হিন্দি ভাষায় কথা বলা, খাওয়া, শোয়া, বসা, ঘুমোনো, স্বপ্ন দেখা এগুলোও অভ্যেস করে ফেলুন। ওগুলোই বা বাকী থাকে কেন ? হয়ত

এর পরে একটা পুরস্কার টুরস্কারও পেয়ে যেতে পারেন।

* * *

কুন্তলা মুখার্জি—শালকিয়া, হাওড়া

আগামী দিনের ভারতবর্ষে বাঙালীর স্থান কোথায়?

০ মিউজিয়ামে অথবা চিড়িয়াখানায়।

* * *

রাজা চক্রবর্ত্তী—লালা রাজপত রায় সরণি (কলিকাতা)

বাংলায় রঙীন ছবি হয় না কেন?

০ আপনার প্রশ্ন ঠিক বুঝতে পারছি না। বাঙলা ভাষায় রঙীন ছবি এর আগে "শিকার" ও "কাঞ্চনজঙ্ঘা" হয়েছে। বর্ত্তমানে "চৈতালী" নামে একটি রঙীন ছবির তোড়জোড় হচ্ছে। বাঙলা দেশের ষ্টুডিওতে হিন্দি রঙীন ছবি 'মমতা' হয়েছে এবং বর্ত্তমানে "রাজগীর" হচ্ছে। কিন্তু বর্ত্তমানে বাঙলা ভাষায় রঙীন ছবি না করাই উচিৎ। একটা রঙীন ছবি করতে যা খরচা তাতে তিনখানা সাদাকালো ছবি করা যায়।

* * *

হেনা মিত্র—ডাক্তার লেন-কলিকাতা

শার্লটি ব্রন্টির "জেন আয়ার" গল্প অবলম্বনে কোন বাংলা ছবি হওয়া সম্ভব কি? আমার তো মনে হয় উপযুক্ত পরিচালকের হাতে পড়লে খুব ভাল ছবি হতে পারে।

০ খুবই সম্ভব। আপনার সঙ্গে আমিও এক মত। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি এই গল্পের সার্থক চিত্রায়ণ একমাত্র পরিচালক অজয় করের দ্বারাই সম্ভব। যাঁরা জিঘাংসা ছবি দেখেছেন তাঁরাই আমার সঙ্গে একমত হবেন।

* * *

কমলেশ রায়—লীলালয়-পাথরচাপটি-মধুপুর

সাহিত্যর ক্ষেত্রে শ্লীলতা ও অশ্লীলতার সঠিক সীমারেখাটা কোথায়?

০ আমি সাহিত্যিক নই সুতরাং এ প্রশ্নের উত্তরও দিতে পারলাম না। তবে পৃথিবীতে আজ বোধ কেউই এমন কি সাহিত্যিকরাও এর সঠিক সীমারেখাটা যে কোথায় তা বলতে পারেন নি। পারা সম্ভবও নয় বলেই আমার ধারণা।

* * *

ভরত রায় চৌধুরী—প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড-কলিকাতা

যৌবনের ধর্ম কি?

০ প্রচলিত অন্যায় নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা।

* * *

অরণ্য পাল—প্রতাপাদিত্য রোড-কলিকাতা

ইতিহাস হতে জানা যায় মিশরের রানী ক্লিওপেট্রার কোন সন্তান ছিল না। কিন্তু সিনেমায় দেখা গেল ক্লিওপেট্রা (এলিজাবেথ টেলর) তাঁর পুত্রসন্তানকে নিয়ে সিজারের সঙ্গে রোমে এসেছে। এটা কি করে সম্ভব হল?

০ ইতিহাস হতে আপনি যা জেনেছেন আমরাও তাই জানি। যতদূর জানা যায় ক্লিওপেট্রার কোন সন্তানাদি ছিল না। এবং ইতিহাস কখনো মিথ্যা কথা বলে না বলেই আমার বিশ্বাস। আমিও বুঝতে পারছি না বর্ত্তমানে সিনেমাতে ইতিহাসকে কেন এইভাবে বিকৃত করা হল। এর আগে ক্লেদেৎ কোলবার্ট অভিনীত "ক্লিওপেট্রা" ও ভিভিয়ান লী অভিনীত বার্নার্ড শ-র "সিজার এণ্ড ক্লিওপেট্রা" আমি দেখেছি। তাতে কোথাও এই ধরণের বিকৃতি পাইনি।

* * *

তারাপদ মিত্র—নলিনী শেঠ রোড কলিকাতা

রেডিওতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের এরকম এলোমেলো প্রোগ্রাম হয় কেন? এরকমও দেখা গেছে একই গান আজ একজন গায়ক গাইলেন আবার কাল আরেকজন গায়ক গাইলেন।

০ তাড়াতাড়ি যাতে আপনারা রবীন্দ্রসঙ্গীত ভুলে যান সেইজন্যে বোধহয় এইরকম প্রোগ্রাম করা হয়।

* * *

বিমল গুহ—শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট-কলিকাতা

বাঙলা ছবি ৭০ মিলিমিটার করা হয়না কেন?

০ ৩৫ মিলিমিটারেরই পয়সা জোটে না তায় আপনি ৭০ মিলিমিটার চাইছেন। বাঙলা ছবিকে নিজের দেশে আগে গৌরবের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করুন তারপরে এইসব চিন্তা করবেন।

❋ ❋ ❋

বুদ্ধদেব চৌধুরী—গ্রে ষ্ট্রীট-কলিকাতা

আপন জনের পর তপন সিংহের পরবর্ত্তী ছবি কি ?

০ হেমেন গাঙ্গুলী প্রযোজিত একটি বাংলা ছবি। প্রধান ভূমিকায় থাকবেন দিলীপকুমার ও সুমিতা সান্ন্যাল।

স্বপন হালদার—সূর্য্য সেন ষ্ট্রীট-কলিকাতা

বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য কি ?

০ কোন উদ্দেশ্যই নেই। আমরা বেঁচে থাকার জন্যে যা যা করি, নীচতা, ষড়যন্ত্র, প্রতারণা, আসলে সবটাই অর্থহীন কোন মানে হয় না। জীবন সত্যিই এত বড় নয়।

❋ ❋ ❋

অতীন রায়—যোগেশ মিত্র রোড-কলিকাতা

ভালবাসার পথে এত বাধা কেন ?

০ আসল ব্যাপারটা কি ? নায়িকা বেঁকে বসেছে না অভিভাবকরা রাজি হচ্ছেন না সম্পূর্ণ ?

* * * * *

— চিত্রলেখা —

ভৌতিক কোন ব্যাপারে আপনার কখনো কোন ক্ষতি হয়েছে কি ? আমার হয়নি। হয়নি তার কারণ বোধহয় এই যে ভৌতিক কোন ব্যাপারই আমি বিশ্বাস করি না। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন গাঁজা আর গুলের একত্র সমাবেশ বলে মনে হয় আমার। কিন্তু এই-রকম একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছিল একদিন পরিচালক অজয় করের জীবনে। যদিও গোটা ঘটনাটাকে উনি কাকতালীয় ছাড়া আর কিছুই ভাবেননি, কিন্তু অজয়বাবুর ছাত্র চিত্র-শিল্পী বিশু চক্রবর্ত্তী ঘটনাটাকে বিশ্লেষণ করেছেন সম্পূর্ণ একটা অন্য দৃষ্টিকোণ হতে যাতে হয় তো মনে হতে পারে আপনার যে মরার পরে ফিরে এসেও মানুষ প্রতিশোধ নেবার ক্ষমতা রাখে।

ঘটনাটা ঘটেছিল অবশ্য অনেক দিন আগে। "প্রভাতের রঙ" ছবির চিত্রগ্রহণ করবার সময়ে। আর, জি, কর হসপিটালের ছাত্রদের হোষ্টেলের একটি ঘরের "সেট" তৈরী করে চিত্রগ্রহণ চলছিল নিউ থিয়েটার্সের দু'নম্বর ষ্টুডিওতে। মেডিকেল ষ্টুডেন্টদের ঘর। অতএব মানুষের দেহের বেশ কিছু হাড়-গোড়, মাথার খুলি, এসব ঘরে থাকাটাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ক্যামেরা দিয়ে দেখে চিত্রশিল্পী বিশুবাবু সহকারী রেজাসাহেবকে বললেন মাথার খুলিটাকে একটু বাঁদিকে সরিয়ে দিতে। না হলে কমপোজিসনে ঠিক মত শুনছিলেন। বিশুবাবুকে ক্যামেরা দিয়ে আবার দেখতে বলে খুলিটাতে নিজেই হাত লাগালেন। একটু এদিক ওদিক করে খুলিটাকে বিশুবাবুর নির্দ্দেশ অনুযায়ী ঠিক জায়গাতে বসিয়ে দিলেন। বিশুবাবু O. K. বললে অজয়-বাবু ক্যামেরা থেকে উঠে যাবার পর অন্য একটা ব্যাপারে কিছুক্ষণ প'র বিশুবাবু ক্যামেরা দিয়ে আবার দেখ ত এসে চমকে উঠলেন। ক্যামেরার হাতলে রক্ত লেগে রয়েছে। কোথা থেকে এল রক্ত ? চারিদিকে একবার ভাল করে তাকালেন। সেটের প্রত্যেকটি লোক কাজে ব্যাস্ত। ব্যাপারটা ঠিক বোঝা গেল না। কাছেই বসে অজয়বাবু ছবির প্রধান শিল্পী বিশ্বজিৎকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন দৃশ্যটিকে বিশদ ভাবে বিশ্বজিৎও মন দিয়ে শুনছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন "একি, আপনার হাতে রক্ত এলো কোত্থেকে ?" নিজের হাতের দিকে তাকালেন অজয়বাবু। দেখা গেল অজয়বাবুর বাঁ হাতের একটা আঙুল বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। কখন যে কেটে গেছে তিনি জানতেই পারেননি। কিন্তু কাটলই বা কি ভাবে ? খোঁজ করে দেখা গেল টেবিলের ওপর খুলিটাকে সরিয়ে রাখবার সময়ই এই কাণ্ড-টা ঘটেছে। বোধহয় চোয়ালের ধারে বা নাকের গর্ত্তে লেগেই আঙুলটা কেটেছে। কিন্তু সবচাইতে আশ্চর্য্য ব্যাপার হল কখন যে কেটেছে অজয়বাবু জানতেই পারেন-

সবাই একটু আশ্চর্য্য হলেন। বিশুবাবু একটুখানি চিন্তা করে খুব গম্ভীরভাবে খুলিটার দিকে আঙুল দেখিয়ে অজয়বাবুকে বললেন "এই ভদ্রলোক যখন বেঁচে ছিলেন তখন বোধহয় আপনার কোন ছবিতে অভিনয় করবার জন্য কোন রোল চেয়েছিলেন, আপনি তখন দেননি, তাই মারা যাবার পর এতদিন পরে আজ সুযোগ পেয়ে উনি প্রতিশোধ নিলেন।" এতক্ষণ সবাই চুপ করে শুনছিলেন বিশুবাবুর কথা, এবারে সেটে হাসির ধুম পড়ে গেল। অজয়বাবুও আঙুলে ব্যাণ্ডেজ জড়াতে জড়াতে হেসে ফেললেন। বললেন "হতে পারে।"

ঐ ছবিতেই আর, জি, কর হসপিটালে বহির্দৃশ্য গ্রহণ করবার সময়ে আরও একটা কাণ্ড ঘটেছিল। এটা অবশ্য ভৌতিক ঘটনা নয়। ব্যাপারটা হয়েছিল কি হসপিটালের ডিসেকসান রুমে (শব-ব্যবচ্ছেদ গৃহ) সুটিং চলছিল। ছাত্ররা শব-ব্যবচ্ছেদ করছে এই দৃশ্যটির চিত্রগ্রহণ করা হচ্ছিল। আর, জি, করের ছাত্ররা ও শিল্পীরাও অংশ গ্রহণ করছিলেন দৃশ্যটিতে। সুটিঙের ব্যাপারে হসপিটাল কর্তৃপক্ষ সর্বরকমের সহযোগিতা করেছিলেন। অজয়বাবুর অনুরোধে ডিসেকসানের রুমে তারা গোটা বার শবদেহের ব্যাবস্থাও করেছিলেন। এখন মুস্কিল হোল শবদেহের উৎকট গন্ধে সুটিং করা দূরে থাকুক ঘরে টেকাই দায় হ'য়ে উঠল। অবশ্য একটু আধটু গা ছমছম যে করছিল না তা নয়। ছাত্রদের অবশ্য কোনই অসুবিধা হয় নি কারণ এ ধরণের গন্ধে তারা অভ্যস্ত। টেকনিসিয়ানরা খুবই অস্বস্তি বোধ করছিলেন। এখান হতে সরে পড়তে পাড়লেই বাঁচা যায় কিন্তু অজয়বাবুর ভয়ে সবাই মুখ চুন করে যথা সম্ভব দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অজয়বাবু ও বিশুবাবু অবশ্য নির্বিকার। এসব বাজে ব্যাপারে তাঁদের ভ্রুক্ষেপই নেই। ডিসেকসান রুমের অসুবিধার কথা সহকারী চিত্রশিল্পী নির্মলবাবু আগেই অনুমান করেছিলেন। বাড়ি হতে একশিশি অডিকোলন পকেটে করে নিয়ে এসেছিল। অডিকোলন দিয়ে রুমাল ভিজিয়ে নাকের কাছে বেঁধে বিশুবাবুর নির্দেশে আলো করছিলেন নির্মলবাবু। আলো করা হয়ে গেলে দু-একবার রিহার্সাল করে চিত্রগ্রহণ করা হবে। আলো করা হয়ে যাবার পর সহকারী পরিচালকদ্বয় হীরেনবাবু ও স্বদেশবাবু প্রমাদ গণলেন। এতক্ষণ তাঁরা দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবারে শব-ব্যবচ্ছেদ করবার টেবিলের কাছে গিয়ে শিল্পীদের ভাল করে দৃশ্যটি বুঝিয়ে দিতে হবে। অজয়বাবু ডাকলেন ওদের দুজনকে। কি করা যায়! অগত্যা নববধূর মত লাজনম্র স্খলিত চরণে এলেন দুজনে। গন্ধের গুঁতোয় চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসবার উপক্রম কিন্তু নিরুপায়। নির্মলবাবু লক্ষ্য করছিলেন ওদের দু'জনের ব্যাপারটা এবং উপভোগ করছিলেন ওদের দুজনের অবস্থাটা। শেষ অব্দি আর থাকতে না পেরে স্বদেশবাবু নির্মলবাবুর কাছে খানিকটা অডিকোলন চাইলেন। কিন্তু নির্মলবাবু নির্বিকারভাবে বললেন ডিরেকসান ডিপার্টমেণ্টকে এখন তিনি অডিকোলন দিতে পারবেন না, তাঁর নিজস্ব ডিপার্টমেণ্ট অর্থাৎ ক্যামেরা ডিপার্টমেণ্ট ছাড়া আর কাউকেই অডিকোলন তিনি দেবেন না বলে বিশুবাবুর রুমালে ও হাতে খানিকটা অডিকোলন ঢেলে দিলেন তিনি। স্বদেশবাবু দাঁড়িয়ে দেখলেন। শেষ অব্দি থাকতে না পেরে রেগে উঠে বললেন "এক নম্বরের হার্টলেশ লোক আপনি।" নির্মলবাবু নিজের হাতে খানিকটা অডিকোলন ঢালতে ঢালতে আগেকার মতই আবার নির্বিকারচিত্তে বললেন "যা ইচ্ছে বলতে পারেন। কোন্ জায়গায় সুটিঙ করতে হবে এটা তো আপনারাও আগে হতেই জানতেন। প্রস্তুত হয়ে যখন আসেননি তখন তার ফল ভোগ করুন। অগত্যা স্বদেশবাবু বিশুবাবুর কাছে দরবার করলেন অডিকোলনের জন্যে। বিশুবাবু বললেন "আমি দিতে বলছি কিন্তু ও দেবে কি না বলতে পারছি না।" বলে নির্মলবাবুকে ডাকলেন। নির্মলবাবুকে আশে-পাশে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। ব্যাপারটা বুঝে মজা করবার জন্যে তিনি আগেই সরে পড়েছেন। অজয়বাবু আবার তাগাদা দিলেন হীরেনবাবু ও স্বদেশবাবুকে "কি হোল, আপনারা ওখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? আর্টিস্টদের ভালকরে Sceneটা বুঝিয়ে দিন ও ডায়লগগুলো চেক করে নিন।" মহা মুস্কিলে পড়া গেল। অগত্যা হীরেনবাবু ও স্বদেশবাবু আবার নির্মলবাবুকে খুঁজতে বেরুলেন। ঘরের অপর প্রান্তে মানুষের দেহের বিভিন্ন অংশ প্রচুর পরিমাণে গাদা করা ছিল, নির্মলবাবু তারই কাছাকাছি ক্যামেরার বাক্সের ওপর বসে রিপোর্ট বই পরীক্ষা করছেন। হীরেনবাবু ও স্বদেশবাবু দুজনে দুদিক হতে চুপি চুপি গিয়ে চেপে

ধরলেন নির্মলবাবুকে। কিন্তু এত করেও তিছুতেই অভি-কোলন আদায় করা গেল না। অগত্যা শেষ অবধি নির্মলবাবুর সর্তেই রাজী হতে হল হীরেনবাবু ও স্বদেশ-বাবুকে। সর্তটা হল এই যে সুটিঙের পরে হীরেনবাবু ও স্বদেশবাবু ক্যামেরা ডিপার্টমেণ্টকে কাটলেট ও কফি খাওয়াবেন। কিন্তু কাজ উদ্ধার হয়ে গেলে যদি হীরেনবাবু ও স্বদেশবাবু ফাঁকি দেন অর্থাৎ কফি ও কাটলেট না খাওয়ান তাহলে কি হবে? এটা আবার একটা নতুন সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। শেষকালে অবশ্য প্রডাকসন ম্যানেজার ক্ষিতীশ রায়কে জামিন হতে হল তবেই অভিকোলন পাওয়া গেল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন হীরেনবাবু ও স্বদেশ-বাবু। অতঃপর নির্বিবাদে সুটিও করা হল। অবশ্য ক্যামেরা ডিপার্টমেণ্টকে প্রতিশ্রুতি মাফিক কাটলেট ও কফি খাইয়েছিলেন ওঁরা।

ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবটেরীর ক্যাণ্টিনে বসে পুরোনো দিনের এইসব ঘটনাগুলি শোনাচ্ছিলেন রেজাসাহেব। আগেকার মতই ক্যাণ্টিন আবার সরগরম হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকের মুখে একটা আশা ও উদ্দীপনার ছাপ। যুদ্ধের শেষে ঘরে ফিরে এসেছেন বাঙলার চলচ্চিত্র শিল্পসংরক্ষণ সমিতির যোদ্ধারা। অনেক ঝড়, ঝাপটা, গ্লানি, মনো-মালিন্য, অবসাদের ভিতর দিয়ে তাদের এতদিন চলতে হয়েছে, আশা করা যায় এবারে সব সংস্কার অবসান হবে। কিন্তু সহকারী পরিচালক মহেন্দ্র চক্রবর্তীর মনোভাব অন্য ধরণের। শত্রুকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত না করা অবধি তাকে তিনি বর্জন করে চলবেন এই হচ্ছে তার মোটামুটি নিয়ম। তাই চিত্রশিল্পী মনীষ দাসগুপ্ত মহেন্দ্র বাবুর চশমায় হাত দেবামাত্র মহেন্দ্রবাবু খুব গম্ভীরভাবে বললেন "মনীষ, আমার চশমায় হাত দেবার কোন অধিকার যে তোমার নেই বোধকরি এটা তুমি ভুলে গিয়েছ, কথাটা আজ তোমাকে আবার মনে করিয়ে দিলাম কিন্তু ভবিষ্যতে যেন কোনদিন আর মনে করিয়ে না দিতে হয়, আশা করি মহেন্দ্র চক্রবর্তীর কাজ ও কথা যে একই ধরণের এটা তোমার মনে থাকবে।" চশমাটা টেবিলের ওপর খুলে রেখে মহেন্দ্রবাবু গরম চায়ে ফুঁ দিচ্ছিলেন এমন সময় অন্যমনস্ক ভাবে মনীষবাবু মহেন্দ্রবাবুর চশমায় হাত দিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হল না। সহকারী চিত্রশিল্পী কালীবাবু বললেন "আঃ, মহেনদা, তুমিও যদি সবসময়ে এইসব পুরোনো কথা নিয়ে আমাদের দুঃখ দাও তাহলে কি করে চলে বলত? কিচেনে দেখে এলাম গরম গরম ডালপুরী ভাজা হচ্ছে।" মহেন্দ্রবাবু এবারেও খুব গম্ভীরভাবে বললেন "কালী, গরুদের সঙ্গে কথা বলতে আমি ঘৃণা বোধ করি, তাই তোমরা কথার কোন উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।" ব্যাপারটা এবারে আরও জট পাকিয়ে গেল আমার কাছে। শেষকালে ক্যাণ্টিন হতে বাইরে বেরিয়ে এসে তরুণ চিত্রশিল্পী দীপক দাসের শরণাপন্ন হতে হল।

ঘটনাটা ঘটেছিলো সিনেমা হাউসগুলোর সামনে পিকেটিং চলবার সময়ে। পরিচালক পিনাকী মুখার্জি দলবল নিয়ে ট্রান্সফার হয়েছিলেন বিজলী সিনেমায়। পিনাকীবাবুর জায়গায় পূর্ণতে তখন নতুন G. O. C. হলেন মহেন্দ্রবাবু। মনীষবাবু ও কালীবাবু বিজলীতে চলে গিয়েছিলেন পিনাকীবাবুর সঙ্গে। একদিন দুপুরবেলা ম্যাটিনি শোয়ের কিছু আগে কালীবাবু ও মনীষবাবু পূর্ণতে মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। কিন্তু গেটে মহেন্দ্রবাবু ছিলেন না। খোঁজ করাতে একজন বললে ওপরে বসন্ত কেবিনে গিয়ে দেখুন। ঠিক তাই। বসন্ত কেবিনে এসে দেখা গেল চশমাটি টেবিলের ওপর খুলে রেখে টেবিলের ওপর মাথা রেখে মহেন্দ্রবাবু ঘুমোচ্ছেন। কালীবাবু ও মনীষবাবুর মধ্যে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল। সময় হয়ে গিয়েছিল। দুজনে তাড়াতাড়ি ফিরে এসে বিজলী সিনেমাতে নিজেদের জায়গায় দাঁড়ালেন।

ওদিকে মহেন্দ্রবাবু ঘুম থেকে ওঠার পর হতে কেবলই ঝাপসা দেখছেন। চশমা না হলে উনি ঝাপসাই দেখেন। কিন্তু চশমার হদিশ কেউ দিতে পারল না। বসন্ত কেবিনের লোকেরাও তটস্থ হয়ে উঠল। তাদের কেবিন হতে পূর্ণর খোদ G. O. C.র চশমা চুরি যাওয়াটা একটা যা তা ব্যাপার নয় নিশ্চয়ই! একজন ছোকরা বয় সেদিনই নতুন কাজে লেগেছিল। নানাভাবে জেরা করে শেষ অব্দি দেখা গেল বোধহয় তারই কাণ্ড।

মহেন্দ্রবাবু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে খুব ঠাণ্ডাগলায় তাকে বললেন "ঠিক পাঁচমিনিট সময় তোমায় দিলাম, যদি এর মধ্যে নীচে আমাকে চশমাটা না পৌঁছে দাও তাহলে আমি থানায় যেতে বাধ্য হব।" বলে গটগট করে নীচে নেমে গেলেন। পনের মিনিট অপেক্ষা করবার পরও যখন চশমা এল না তখন মহেন্দ্রবাবু ভবানীপুর থানার দিকে রওনা দিলেন। বিজলী সিনেমার ঠিক পাশেই ভবানীপুর থানা। বিজলী সিনেমার সামনে দিয়ে যখন তিনি হনহন করে যাচ্ছেন তখন মনীষবাবু ও কালীবাবু বললেন "মহেনদা কোথায় যাচ্ছ?" কোন উত্তর না দিয়ে সোজা থানায় গিয়ে চশমা চুরির ডায়েরী করে পূর্ণতে নিজের জায়গায় ফিরে এলেন মহেন্দ্রবাবু। অপেক্ষা করতে লাগলেন পুলিশ কখন এনকোয়ারিতে আসবে। ওদিকে বসন্ত কেবিনেও সেই ছোকরা বয়ের অবস্থাও শোচনীয়। মালিক তাকে জবাব দিয়েছেন এবং এও বলে দিয়েছেন যদি সে চশমাটা না বের করে তাহলে তাকে পুলিশের হাতে দেওয়া হবে। সে বেচারা তো মহা মুস্কিলে পড়ে গেল। চাকরী করতে এসে একি ঝামেলা! ততক্ষণে ইভনিং শোয়ের সময় হয়ে গিয়েছিল। এমন সময় বিজলী হতে একজন লোক মারফৎ চশমা এসে পৌঁছল। বলল মনীষবাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন। মহেন্দ্রবাবু তৎক্ষণাৎ ছুটে ওপরে বসন্ত কেবিনে গেলেন। হাত জোড় করে বয়টিকে বললেন "ভাই তুমি কিছু মনে কোরোনা, না জেনে অনেক কড়া কথা তোমায় আমি বলেছি, দয়া করে তুমি আমাকে ক্ষমা করো। একজোড়া গরুর জন্যেই এই কাণ্ডটা ঘটেছে।" বলেই আবার ছুটলেন থানায় ডায়রীটা উইথড্র করাতে। এবারে থানাওয়ালারা চটে গেলেন। না জেনে শুনে যদি ভবিষ্যতে পুলিশের সঙ্গে এরকম ইয়ার্কি করতে আসেন মহেন্দ্রবাবু তাহলে ওনাকেই গারদে রাখবার ব্যাবস্থা করা হবে সাফ জানিয়ে দিলেন তারা। মহেন্দ্রবাবু চোখ মুখ লাল করে পূর্ণতে ফিরে এলেন। হিন্দু হয়ে গরু হত্যা করাটা মহা পাপের কথা এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি নিরুপায়। এই একজোড়া গরুকে তাঁকে হত্যা করতেই হবে।

পিনাকীবাবু একটা মিটিং এ্যাটেণ্ড করতে গিয়েছিলেন, রাত্রে ফিরে এসে সব ব্যাপারটা শুনলেন। মনীশবাবু ও কালীবাবুকে টেনে পূর্ণতে নিয়ে গেলেন। পিনাকীবাবুর অনুরোধে গরুদুটিকে সে যাত্রা হত্যা করা হল না কিন্তু মহেন্দ্রবাবু সাফ জানিয়ে দিলেন তার যে কথা সেই কাজ। ভবিষ্যতে এই জোড়া গরু তার চোখের সামনে যেন না আসে এবং কোনরকম কথা বলবার চেষ্টা যেন না করে। মনীশবাবু ও কালীবাবু মহেন্দ্রবাবুর পায়ে জড়িয়ে ধরলেন এবং পিনাকীবাবুও যথেষ্ট অনুরোধ করলেন কিন্তু শেষ অব্দি মহেন্দ্রবাবুকে তাঁর অটল সংকল্প থেকে কোনক্রমেই বিচ্যুত করা গেল না।

এইঅব্দি দীপকবাবু বলেছেন এমন সময় ক্যান্টিনের ভেতরে মহা সোরগোল পড়ে গেল। সবাই দৌড়ল ক্যান্টিনের দিকে। ভেতরে গিয়ে দেখি মনীশবাবু চোখ উল্টে পড়ে আছেন ও মহেন্দ্রবাবু অদূরে বোম্বাইয়ের প্রাণ মার্কা একটা পোজ নিয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছেন। কালীবাবু বলছেন "এটা তোমার অন্যায় মহেনদা, ডালপুরী খেতে চেয়েছিল বলে তুমি মনীশকে একেবারে মেরে ফেলবে এটা কেমন ধারা বাঙালে গোঁ?" মহেন্দ্রবাবু গর্জন করে বললেন "Shut up you গরু, মনীশকে মেরেছি বলে আমি খুবই Sorry কিন্তু ও যদি এই মুহূর্তেই মারা যায় আমি খুবই আনন্দিত হব।" ব্যাপারটা হয়েছিল মনীশবাবু অনেকক্ষণ ধরেই মহেন্দ্রবাবুকে অনুরোধ করছিলেন ডালপুরী খাওয়াতে, কিন্তু মহেন্দ্রবাবু পাত্তা না দেওয়ায় শেষ অবধি মহেন্দ্রবাবুর নামেই গোটা বার ডালপুরী অর্ডার দিয়েছিলেন মনীশবাবু। "পূর্ণ" হতে রাগটা এতদিন ধরে জমেই ছিল এবারে মহেন্দ্রবাবু আর সামলাতে পারলেন না। উঠে দাঁড়িয়ে মনীশবাবুর বুকের ডান দিকে (বাঁ দিকে নয়) গদাম করে একটি বিরাশী সিক্কা ওজনের ঘুষি কষিয়ে দিলেন। মনীশবাবু তৎক্ষণাৎ ভূমিশয্যা গ্রহণ করলেন। সবাই মহেন্দ্রবাবুকে বলতে শুরু করল যে খুবই অন্যায় করেছেন তিনি। শুনে কেমন যেন একটু দমে গেলেন মহেন্দ্রবাবু। সত্যি-সত্যিই যদি মনীশের একটা কিছু হয়ে যায় তাহলে খুবই কেলেঙ্কারী হবে। এমনিতে মনীশবাবুকে সবাই সমীহ করে চলে এমন কি বাড়িতে পর্য্যন্ত মনীশবাবুর দাদা মনীশ-বাবুকে দেখলে সিগারেট লুকিয়ে ফেলেন। ইতিমধ্যে ক্যান্টিনের ছোকরা বয় কেষ্ট গোটা বার গরম ডালপুরী

এনে হাজির করল টেবিলে। এবার মনীশবাবু উঠে বসলেন। গোটা দুয়েক ডালপুরী নিয়ে মহেন্দ্রবাবুর দিকে প্লেটটা আগিয়ে দিলেন। কি করবেন ভাবছেন এমন সময় কালীবাবু বললেন "মহেনদা বসে পড়, খামোখা ডালপুরী-গুলো ঠাণ্ডা করে কোন লাভ নেই।" বলে মহেন্দ্রবাবুকে টেনে বসিয়ে দিলেন। অতঃপর নির্বিবাদেই মুখরোচক গল্প সহকারে ডালপুরী খাওয়া চলতে লাগল। মিনিট কয়েক পরে মহেন্দ্রবাবু আরও গোটাকয়েক ডালপুরীর অর্ডার দিলেন।

যাক, সমস্ত ব্যাপারটা সে একটা মাত্র ঘুষির ওপর দিয়েই মিটে গেল দেখে আশ্বস্ত হলাম। মনীশবাবুর নেহাৎ বাঙাল রক্ত বলেই ঘুষিটা হজম করতে পেরেছিলেন আমি হলে সঙ্গে সঙ্গেই তৎক্ষণাৎ "ওঁ" হয়ে যেতাম। মনীশবাবু ডাকলেন তাঁদের টেবিলে আমাকে ডালপুরী খাবার জন্যে কিন্তু মহেন্দ্রবাবুর ঘুষির কথা ভেবেই ওদিকে এগোতে আর সাহস হল না। কি জানি বাবা⋯⋯!

ক্যান্টিন হতে বেরিয়ে গুটি গুটি এগোলাম। কাদের একটা Shooting চলছিল। ষ্টুডিওর অফিসের কাছা-কাছি আসতেই বাধা পড়ল। দাঁড়াতেই হল। কি একটা ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন পরিচালক হীরেন নাগ ও শ্রীমতী সুচিত্রা সান্যাল। হীরেনবাবু ডাকলেন। কাছে যেতেই হীরেনবাবু বললেন "আপনি তো মশাই সাংবাদিক লোক, বলুন দেখি সুমিত্তাদেবীর Latest খবর কি?" বিপদে পড়লাম। ঝুলি হাঁতড়ে কিছুই খুঁজে পেলাম না, অগত্যা একটু মাথা চুলকে স্বীকার করতেই হল নিজের অজ্ঞতা। হীরেনবাবু এবারে সুমিত্তাদেবীর দিকে তাকিয়ে বললেন "তাহলে আপনার Permission নিয়েই খবরটা জানিয়ে দিচ্ছি," সুমিতাদেবী বাধা দিয়ে বললেন "কই Permission তো আমি দিই নি।" হীরেনবাবু বললেন "ওই হোল আর কি, মেয়েরা আর কবে কোন ব্যাপারে খোলাখুলি Permission দেয় আপনিই বলুন? তাছাড়া এরকম একটা ব্যাপার কতক্ষণ আর চেপে রাখা যায়!" বলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন "চুপচাপ থাকলে কি হবে, চুপিচুপি উনি একটি কাণ্ড করেছেন, বুঝলেন।" আমি কিছু না বুঝেই সুমিতা দেবীর দিকে তাকিয়ে বোকার মত জিজ্ঞেস করলাম "তাই বুঝি?" সুমিত্তাদেবী মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন "আপনিও যেমন" হীরেনবাবুর কথা একবর্ণও বিশ্বাস করবেন না। হীরেনবাবু এবারে কপট গর্জন করে বললেন "বিশ্বাস করবেন না মানে! আপনি কি বলতে চান তপনবাবুর আগামী ছবিতে দীলিপকুমারের বিপরীত চরিত্রে আপনি অভিনয় করছেন না?" সুমিতা দেবীও এবারে রাগের ভান করে বললেন "হ্যাঁ করছি, আর আপনি যে একটা বিরাট খবর চেপে রেখেছেন সেটা তা হলে আমিও সবাইকে জানিয়ে দি?" এবারে হীরেনবাবু একটু বিব্রত বোধ করলেন মনে হল, ব্যাপারটা যে এরকম বুমেরাং হয়ে যাবে এটা তিনি অনুমান করতে পারেন নি, এবারে একটু করুণ নয়নে সুমিত্তাদেবীর দিকে তাকালেন তিনি কিন্তু হাজার হলেও সুমিতাদেবী একজন পাহাড়ী মেয়ে কাজেই সহজে মন ভিজবার কোনই সম্ভাবনা দেখা গেল না। আমার দিকে ফিরে সুমিতাদেবী বললেন "শুনুন, হীরেনবাবুর ছবি "চেনা অচেনা" তাশখন্দে এশিয়ান ফিল্ম ফেষ্টিভালে মনোনীত হয়েছে, এবারে আপনিই বলুন দেখি কোন্ খবরটার ওজনে বেশী, আমি তপনবাবুর ছবিতে দীলিপকুমারের বিপরীত অভিনয় করছি না "চেনা অচেনা" তাসখন্দে এশিয়ান ফিল্ম ফেষ্টিভালে মনোনীত হয়েছে; কোন্‌টা?" কাকে সন্তুষ্ট করব বুঝতে না পেরে আমি বললাম "দুটোই, তবে এক্ষেত্রে আপনার দিকের পাল্লাটারই ওজন ভারী।" প্রশ্ন হোল "কেন?" আমি বললাম "তার কারণ হচ্ছে "চেনা অচেনা" ছবিরও নায়িকা আপনিই, অতএব আপনার উচিৎ এই মুহূর্তেই আর ঝগড়াঝাটি না করে চটপট আমাদের চা বিস্কুট খাইয়ে দেয়া।" এবারে হীরেনবাবু সায় দিয়ে বললেন "ঠিক বলেছেন, বলেই সুমিতা দেবীকে বললেন "চা বিস্কুট কি হবে, তাড়াতাড়ি কোম্পানিটি থেকে চিকেন স্যাণ্ডউইচ ও প্যাটিস আনাবার ব্যবস্থা করুন।" এমনিতে হেরে গিয়ে চটে (?) ছিলেন তার ওপর আবার চিকেন স্যাণ্ডউইচ ও প্যাটিস? "বয়ে গেছে আমার" বলে সুমিতাদেবী রণে ভঙ্গ দিলেন।

হীরেনবাবুকে বললাম" দুটো ছবিরই তো কাজ প্রায় শেষ, নতুন, কি plan করেছেন? হীরেনবাবু বললেন আপাততঃ কোন plan করছি না, ভয়ানক tired লাগছে।

ভাবছি পুজোর পরে কিছুদিন বাইরে ঘুরে আসব।” “কতদূর যাবেন?” “জিজ্ঞেস করলাম। “ইচ্ছে আছে গোমুখীর দিকে যাবার তবে টীমের ক্যাপটেন যা ঠিক করবে।” টীমের ক্যাপটেন হচ্ছেন শিল্পনির্দেশক কার্তিক বসু। প্রত্যেক বছরেই একবার করে এঁরা একটা লম্বা সেফরে বেরোন, এবারেও তারই প্রস্তুতি হচ্ছে বুঝলাম।

নাচ জিনিষটা দেখতে কারুরই খারাপ লাগে না। বিশেষ করে নাচিয়ে যদি একজন Expert হন। ভেবেছিলাম একবার দেখা করেই সরে পড়ব কিন্তু কার্যতঃ সেটা হয়ে উঠল না। রিহার্সাল করতে করতে ঠিক লক্ষ্য করেছিলেন, ইসারা করে বসতে অনুরোধ করলেন, অগত্যা বসতেই হল। রিহার্সাল এর পরে নিজের মেক্ আপ্ চেক্ করে নিলেন। অতঃপর দৃশ্যগ্রহণের পালা। অবশ্য পুরো নাচটা এক শটে চিত্রায়িত করা সম্ভব নয়, খানিকটা অংশবিশেষ তখনকার মত চিত্রায়িত করা হল। পরের শটটি ক্যামেরাম্যান বিজয় দেকে বুঝিয়ে দিলেন। বিজয়বাবু আলো করতে শুরু করলেন। কিছুক্ষনের বিরতি পাওয়া গেল। এবারে নিজের জায়গায় এসে বসলেন উত্তমকুমার। জিজ্ঞেস করলেন কেমন লাগল?” এমনিতে নাচের বিষয়ে আমার যা জ্ঞান তা কাউকে বলবার মত নয় তার ওপরে টুইষ্ট নাচ? সত্যি কথাটা স্বীকার করলে সবাই দারুন বোকা, বলবে অগত্য নিজের মান বাঁচাবার জন্যে একজন পাকা সমঝদারের মত মাথা নেড়ে বললাম” সাংঘাতিক, এ ছবি হিট না হয়ে যায়না, একে টুইষ্ট নাচ তার ওপর নাচছেন উত্তমকুমার—“বাধা দিয়ে বললেন” থাক, বুঝতে পেরেছি, আর বলতে হবে না, চা খাবে?” বলে আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে দু কাপ চা আনতে বললেন। কিছুক্ষন একথা সেকথার পর বললেন” অভিনয় করছি, করবও, কিন্তু আজকাল মনের খোরাকটা ঠিকমত যেন পাচ্ছি না।” প্রশ্ন করলাম “কেন?” উত্তর দিলেন “আরও ভাল গল্প চাই, আরও ভাল ছবি হওয়ার খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আমাদের দেশে। ভাল ছবি, ভাল গল্প, পরিচালকদের কাছে হতে আমি আরও অনেক কিছু শিখতে চাই, কারণ এখনও অনেক কিছু জানা, অনেক কিছু শেখার বাকী রয়ে গেছে আমার। কতটুকুই বা জেনেছি? চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম” একটা জীবনে কতটুকুই বা জানা সম্ভব হয়? সাফল্যের স্বর্ণশিখরে দাঁড়িয়েও তো মনে হয় যে গোটা জীবনটাই যেন ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে, কিছুই জানা হয়নি এ জীবনে।” ঠিক তাই” বলে নিজের কাপটা নামিয়ে রাখলেন। বিজয়বাবু বললেন লাইট রেডি। “আসছি” বলে উঠে দাঁড়ালেন উত্তমকুমার। জিজ্ঞেস করলেন “কোন কাজ আছে নাকি?” বললাম” কিছুই না, বাড়ি পালাব ভাবছি।” ভীষণ বৃষ্টি নেমেছে, খানিক পরে যেও” বলে ক্যামেরার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

বাইরে সত্যিই ভীষণ বৃষ্টি নেমেছিল, অগত্য বসে বসে সুটিঙ দেখতে লাগলাম। ছবির নাম “আজ বসন্ত।” উত্তমকুমারের বিপরীতে থাকছেন তনুজা এবং তরুনকুমার। সঙ্গীত পরিচালনা করছেন শ্যামল মিত্র। খনিক পরে বৃষ্টি থামাতে বাইরে বেরিয়ে আসতে দেখা হল প্রখ্যাত মেক্ আপ্ ম্যান্ শ্রীঅনন্ত দাসের সঙ্গে। নিয়মমাফিক সিগারেট ও অফার করলেন। কিন্তু আমি এত সহজে ছাড়বার পাত্র নই। অনেকদিন ধরেই অনন্তবাবু “ভারতবর্ষের পাঠক পাঠিকাদের একটা উপহার দেবেন বলেছিলেন, কিন্তু আজ অবধি দেননি। অবশ্য উপহারের অর্দ্ধেকটা দিতে উনি সবসময়েই প্রস্তুত, কিন্তু আমার দাবী ১০০% একসঙ্গে দিতে হবে। ‘সময়ের অত্যান্ত অভাব” বলে উনি যতই বিব্রত হয়ে পড়েন ততই আমার দাবীতে আমি অবিচল থাকি দেখা যাক শেষ অবধি কে জেতে?

আমাদের সংগ্রামের প্রথম ধাপ আমরা পেরিয়েছি কিন্তু সংগ্রামের এখনও অনেকগুলো ধাপ আমাদের পেরোতে হবে। আগামী দিনের সংগ্রামের জন্যে আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। এবং সে সংগ্রামকে আমাদের আরও জোরদার করতে হবে কারণ সরকার বাংলা ছবির বাধ্যতামূলক প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন কিন্তু তাতে সময় কতটুকু বেঁধে দেওয়া হয়েছে তাতে বাঙলা ছবির কোন উপকারই হবে না। বরঞ্চ ক্ষতিই হবে বলা যায়। বছরে দশ সপ্তাহ প্রত্যেক সিনেমা হাউসগুলোতে বাঙলা ছবি দেখাতে হবে এই হচ্ছে সরকারের আইন। কিন্তু এই আইনের মধ্যেই রয়েছে বিরাট ফাঁকির রাস্তা।

কারণ এই আইনের সুযোগ নিয়ে যে কোন সিনেমা হাউস বছরে মাত্র দশ সপ্তাহ বাংলা ছবি দেখিয়ে বাকী সময়টা হিন্দি অথবা অন্য যে কোন ভাষার ছবি স্বচ্ছন্দে দেখাতে পারে। এবং এরই মধ্যে কিছু কিছু সিনেমা হাউস, যারা বাংলা ছবি বরাবরই প্রদর্শন করতেন তারা হিন্দি ছবির প্রদর্শন সুরু করে দিয়েছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে বাঙলা ছবি রিলিজের সমস্যা আগে যা ছিল এখনও তাই রয়েছে। বরঞ্চ সমস্যা আগের চাইতেও আরও ঘোরালো হয়েই দাঁড়াচ্ছে, বলা যায়। অতএব এ আইন আমরা মেনে নিতে পারি না এবং এই আইন বদলাতে হবে। বাংলা দেশে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রয়োজনেই এই আইন বদলানর প্রয়োজন। এর মধ্যে প্রাদেশিকতার কোন ব্যাপার নেই। সংগ্রামের প্রথম ধাপে আমরা পেরিয়েছি এবারে আমাদের এগোতে হবে দ্বিতীয় ধাপের দিকে। অতএব আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনারা প্রস্তুত হোন আগামী দিনের সংগ্রামের জন্য।" ২ই সেপ্টেম্বর ক্যালক্যাটা মুভিটোনের মাঠে চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতির এক বিরাট সভায় উপরোক্ত কথাগুলি বললেন সমিতির সেক্রেটারী শ্রীবিজয় চ্যাটার্জি। কথাগুলো অবশ্য ভেবে দেখবার মত। সরকারের আইনের সুযোগ নিয়ে যদি প্রদর্শকেরা বছরে মাত্র আড়াই মাস বাঙলা ছবি দেখিয়ে বাকি সময়টা হিন্দি ছবি দেখাতে শুরু করেন তাহলে বাঙলা ছবির একেবারে চিরকালের মত সমাধি হয়ে যাবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

সভার শেষে সমিতির প্রেসিডেন্ট শ্রীঅজিত বসু বললেন "আমার আর নতুন করে কিছু বলার নেই। যা কিছু বলার আমার আগেকার বক্তারা সবই বলে গিয়েছেন। অবশ্য প্রত্যেক সভার শেষে প্রেসিডেন্টকে কিছু বলতেও হয় এবং শ্রোতাদেরও তা শুনতেও হয়। কিন্তু আমি আপনাদের অপেক্ষা করাতে চাই না কারন রাত অনেক হয়ে গেছে এবং এক নম্বর ফ্লোরেতে পাতা পড়ে গেছে। সমস্ত বাধাকে উপেক্ষা করে সত্যাগ্রহী যেভাবে তাঁদের সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন তা বাঙলা দেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে থাকবে। সেই সংগ্রামীদের আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আজকের সভার সমাপ্তি ঘোষণা করলাম।

অতঃপর প্রীতিভোজের পালা। কলাকুশলী ও শিল্পীরা সব ফ্লোরের দিকে এগিয়ে গেলেন। চিত্রশিল্পি মনীষ দাসগুপ্ত তাঁর দলবল নিয়ে মাঠে বাজি পোড়াতে ব্যাস্ত হয়ে পড়লেন। একটু আধটু ভুল চুক হলেই সহকারী পরিচালক মহেন্দ্র চক্রবর্ত্তী সঙ্গে সঙ্গে "গরুগুলোর কাণ্ড দেখ" আপ্যায়নে ভূষিত করতে লাগলেন। খানিকক্ষণ বাজির খেলা দেখে বেরিয়ে আসছি এমন সময় পাকড়াও করলেন পরিচালক পিনাকী মুখার্জী অনেক রাত হয়ে গেছে ইত্যাদি অনেক অজুহাত দেখালাম কিন্তু পিনাকীবাবুর হাত থেকে কিছুতেই নিস্কৃতি পাওয়া গেল না। হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চললেন পিনাকীবাবু ভোজের আসরের দিকে।

—শ্রীকান্ত

সম্পাদক—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রথম খণ্ড

তৃতীয় সংখ্যা

ষষ্ঠপঞ্চাশত্তম বর্ষ

শ্রীঅরবিন্দ ও বিবেকানন্দের মতবাদ

শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য্য

শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাবের মহত্তর তাৎপর্য তাঁর সর্ব-যোগ-সমন্বয়ী একটি সাধনপন্থার মহাভাষ্য রচনা—The Synthesis of Yoga. এইব্যাপক সমন্বয়ী সাধনমার্গের অভিধা তিনি দিয়েছেন—'পূর্ণযোগ' (Intigral Yoga.)। রাজযোগের নৈতিক সাধনা ও আত্মিক মুক্তি, জ্ঞানকর্ম-ভক্তি মার্গত্রয়ীর আধ্যাত্মিক সিদ্ধি এবং সর্ব্বশেষে তান্ত্রিক-যোগের শক্তিসাধনা—এই সকলের মূল সূত্র অনুসন্ধান করে মিলিয়ে নিয়েছেন তিনি তাঁর যোগে।

শ্রীরামকৃষ্ণ একাধিক সাধনপন্থার অনুসরণ করেছিলেন ক্রমান্বয়ে এবং তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল প্রত্যেকের অন্তর্গত একটি মৌল সত্যের পরীক্ষণ। সব মিলিয়ে একটি সর্বাঙ্গীণ সাধনা মানবজাতির পক্ষে গ্রহণীয় কি না সে বিচারে তিনি অগ্রসর হন নি। অন্যদিকে একটি মৌল ঐক্য ছাড়াও শ্রীঅরবিন্দ প্রত্যেকটি যোগমার্গের স্বতন্ত্র সার্থকতা আবিষ্কার করেছিলেন। বহুমুখী যোগগুলির ক্রমিক বা এককালিক সাধনা একই ব্যক্তির পক্ষে একটিমাত্র জীবনে সম্ভব নয় বলেই তাদের মূল সূত্রগুলি মাত্র তিনি গ্রহণ করেছেন এবং এই মূল সূত্রের উপরে ভিত্তি করে গড়েছেন তাঁর পূর্ণযোগের রাজপ্রাসাদ।

একটি মানসোত্তর উর্দ্ধলোক থেকে অমৃতশক্তি ও দিব্য-

ভারতবর্ষ

করে। এই আধারের নিম্নতর উপাদানগুলি—দেহ-প্রাণ-মন-ক্রমশ ঊর্দ্ধমুখী হয়ে এই অতিমানসিক অবতরণকে বরণ করে নিচ্ছে। এই দ্বৈতের পূর্ণ মিলনের ফলে হবে মানবজাতির দিব্য রূপান্তর। মানব আধারের এই দেহ-প্রাণ-মন মর্তজীবনের সীমা ও অপূর্ণতাকে উত্তীর্ণ হয়ে রূপান্তরিত হবে অমৃতপাত্রে, মৃত্যু হবে তার ইচ্ছাধীন। শ্রীঅরবিন্দের এই রূপান্তর বিজ্ঞান বিবেকানন্দের যোগচেতনায় হয় তো একটি পূর্ব্বাভাসের রশ্মি ফেলেছিল, যার ফলে তিনি বলেছিলেন—

"যোগীরা……আপনাদের শরীরের উপাদান পর্যন্ত পরিবর্তন করিয়া ফেলেন। ইঁহারা নিজেদের দেহের পরমাণুগুলিকে এমন সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত করিয়া লন যে, তাঁহাদের আর কোন পীড়া হয় না।" —রাজযোগ।

বলা বাহুল্য, শ্রীঅরবিন্দের রূপান্তরবাদের সঙ্গে বিবেকানন্দের রূপান্তরবাদের এই তত্ত্বের পার্থক্য অনেক। যে অতিমানস শক্তির আবির্ভাবে এই রূপান্তর লাভ করবে তার পূর্ণ সংসিদ্ধি সেই শক্তির ও চেতনার পরিচয় বিবেকানন্দও পেয়েছিলেন। আলিপুর জেলের নিঃসঙ্গ সাধনার দিনগুলিতে একাই গীতা উপনিষদ পাঠ আর ধ্যান-ধারণা—তখনকার যোগজীবনের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের এই হল বাহ্য পরিচয়। সেদিন তাঁর অন্তর্জীবনে যে একজন মাত্র মহাপুরুষের আবির্ভাব তাঁকে পথনির্দেশ দিয়েছিল তিনি স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ।

শ্রীঅরবিন্দকে অতিমানসের স্তরে যাবার পথ নির্দেশ দিয়েছিলেন বিবেকানন্দ। এই অতিমানস (Supermined) শ্রীঅরবিন্দের যোগ ও দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য চেতনা-স্তর এবং রূপান্তর-শক্তি। সে কথা ভাবলে ভারতের এই দুই মহাজীবনের এই অন্তর্মিলন এক আশ্চর্য তাৎপর্য ব্যক্ত করে।

বেদান্ত-কেশরী বিবেকানন্দের ব্যক্তি-মহিমা স্বীকার করতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন—বিবেকানন্দের মতো এমন বীর্যবান্ পুরুষসিংহ আর জন্মায় নি।

জাতীয় জীবনের এক সঙ্কট-সন্ধিক্ষণে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দর আবির্ভাব। শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান মিশনারীদের উগ্র ধর্ম প্রচার ও হিন্দুধর্মের প্রতি আক্রমণাত্মক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। রামমোহন দেবেন্দ্রনাথের বেদান্তধর্মে ভারতীয় সাকার সাধনার দিকটি উপেক্ষিত হয়েছিল। সমন্বয়ের পর্ব্ব শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে। এই সর্ব্বাঙ্গীণ দ্বন্দ্বের সমাধান তিনি করেন, কোন যুক্তি দিয়ে নয়, ব্যক্তিজীবনের উপলব্ধিদিয়ে। খৃষ্টীয়ওভারতীয় সাধনপন্থ বৈদান্তিকওতান্ত্রিক যোগ,—সব মত ও পথের পূর্ণ সমন্বয়ের সূচনা হল তাঁর হাতে। আর গুরুদেবের এই সমন্বয়ী মন্ত্রকে স্বীকৃত করে বিবেকানন্দ প্রচার করলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ঐক্যের বাণী। পাশ্চাত্যের নব্যবিজ্ঞান ও ভারতের অধ্যাত্মজ্ঞান; পাশ্চাত্যের কর্ম্ম সিদ্ধি ও ভারতের ভাবসিদ্ধি—দুইয়ের মিলন হল বিবেকানন্দের বাণীতে। উত্তরপর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দের প্রাচী ও পশ্চাত্যের মিলন সাধনায় বিবেকানন্দেরই মূল সূত্রটি অনুসৃত হয়েছিল।

বিবেকানন্দ ছিলেন সর্ব্বোপরি যোগী, অধ্যাত্ম পুরুষ; শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তর সাধক। জীবন ট্রাজিডির-মৌল সমস্যাগুলির কোন লৌকিক সমাধানে তিনি বিশ্বাস করেন নি। জীবনবেদনার আমূল নিরসন একমাত্র সম্ভব হবে অধ্যাত্ম-মার্গে। দেশের দলিতবর্গের বেদনায় তিনি কাতর, তাদের সেবার জন্য, সাহায্যের জন্যে তিনি এগিয়ে গেছেন। পার্থিব সাহায্য বা উপকার নয়, একমাত্র অধ্যাত্মজ্ঞান দিয়েই পরের দুঃখের নিরসন করা সম্ভব। কিন্তু আর একজনকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান দেবার জন্য নিজেকে প্রথমে হতে হবে অধিকারী। এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেছেন: "যাঁহারা কর্ম্মযোগী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে কর্তব্যের ভাব একেবারে এড়াইতে হইবে। তোমার আমার পক্ষে কোন কর্তব্যই নাই।……বাস্তবিক একমাত্র কর্তব্য—অনাসক্ত হওয়া এবং স্বাধীন পুরুষের ন্যায় কার্য করা।"

শ্রীঅরবিন্দের জীবন সাধনায় এই পথটির উপর জোর দেওয়া হয়েছে আরো বেশি। শ্রীঅরবিন্দ জগৎ ও জীবনকে বৈরাগীর মতো ত্যাগ করতে চান নি। চেয়েছিলেন এদের গ্রহণ করেই রূপান্তরিত করতে। কিন্তু আধ্যাত্মিক মার্গ ছাড়া মানস সিদ্ধান্ত লব্ধ অন্য কোন পথে এই রূপান্তরের সম্ভাবনা তিনি দেখেন নি। তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন: "……মানস পক্ষপাতের সকল টান ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে, প্রাণের নিজস্ব লক্ষ্য, কাম্য, আসক্তির উপর অহংজাত মায়া মুছে ফেলতে হবে।"

অঘটনের সাধক সাধিকা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

দ্বিতীয়ার্ধ

রবিবার

তিন বৎসর পরে

ভাই প্রেমল,

কাল তোমার চিঠি পেলাম অনেক দিন পরে। প্রথমে খুবই আনন্দ হ'ল—কতদিন পরে তোমার চিঠি এল—কিন্তু তার পরেই হরিষে বিষাদ: এত ছোট চিঠি! তবে উপায় কি? তোমাকে যে একলা কত দিক সামলাতে হয় দেখে এসেছি তো স্বচক্ষেই! ঠাকুরের ভোগ রান্না, ধান বোনা, ছুতোরের কাজ করা, ফল ফুলের চাষ—সবার উপরে নানা অতিথির দেখা শোনা!

তার উপর দিনের পর দিন শুনছি—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধল ব'লে। সেদিন রেডিও-তে হিটলারের হুহুঙ্কারী ভাষা শুনলাম মূল জর্মানে। উ! জর্মান জনতাকে Herrenvolk ব'লে কী দম্ভ! এরূপ ক্ষেত্রে তোমাদের ঐ সুদূর অরণ্যে নিজের অন্নের ব্যবস্থা করা বুদ্ধিমানেরই কাজ বৈকি। কেবল আমার মনে একটা প্রশ্নের উদয় হয় প্রায়ই: হিটলার তো দেখছি এক বিভীষণ প্রলাপী—বদ্ধ পাগল! বুদ্ধিমান জর্মন জাত তাকে Fuehrer বরণ ক'রে নিল কেমন ক'রে? যা'হোক্ নিয়েছে যখন তখন সবাইকেও তো তটস্থ হ'য়ে থাকতেই হবে নাজিসমের-উত্তরে আর কোন একটা অনুরূপ হুহুঙ্কারী "ইসম্" খাড়া করতে। তুমি লিখেছ স্পিরিচুয়াল কম্যুনিজমের কথা। শুনতে কর্ণরোচক, কিন্তু "কম্যুনিসম্ শুনলেই কেমন যেন সভয় রোমাঞ্চ হয়। আমি সম্প্রতি রুষদের পুলিশ রাজ্য, চেকা, N. K. U. D. ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেকগুলি বই প'ড়ে বিষম ঘা খেয়েছি। যা পড়েছি তার সিকির সিকিও যদি সত্যি হয় তাহ'লে নির্ভরসা হ'য়ে বলতেই হয়, তোমাদের সুরে সুর মিলিয়ে, যে বনবাসই পন্থা ধানের চাষ ক'রে তথা চরকা কেটে। কেবল দুঃখ এই যে, বনবাসেও ফ্যাসাদ কিছু কম নয়। সেদিন ফের রামায়ণ পড়ছিলাম। সীতা যখন আবদার ধরলেন রামের সঙ্গে বনে যাবেনই যাবেন, তখন রাম তাকে বোঝালেন ভয় দেখিয়ে "বনে থাকা দারুণ কষ্ট সতী!"

শুধু হিংস্র বাঘ সিংহই নয় মাতা হাতীও আছে বড় ভয়ানক। কখনো দারুণ শীত কখনো অসহ্য গরম—'অত্যুষ্ণমতিশীতঞ্চ'—খাবার মেলা ভার—তার উপর 'সর্পাঃ সরীসৃপাশ্চান্যে বৃশ্চিকাশ্চ মহাবিষাঃ……পতঙ্গ-মক্ষিকা কীটা দংশাশ্চ মশকৈঃ সহ।' ললিতা বলত ডাঁশ মশার কথা—ত্রেতাযুগেও দেখা যায় বনে সে ভয় ছিল ষোলআনাই।

না, ঠাট্টা রেখে গম্ভীর হ'য়েই বলছি ভাই, আমার বনস্থলী ভালো লাগে, কিন্তু দুচারদিন। আশৈশব যে শহরে মানুষ হয়েছে সে কি বনকে সত্যিই আত্মীয় মনে করতে পারে? বৈচিত্র্য হিসেবে অবশ্য বন পাহাড় মরুভূমি সবই ভালো লাগে। কিন্তু হয়েছে কি জানো? আমি হ'লাম জন্মনদীচর। আর নদীর রানী হ'লেন গঙ্গা। না, শুধু রানী নয়—দেবীও বটে। আর কোন্ নদী

আছে যার উপাধি ত্রৈলোক্যবাহিনী ধর্মদ্রবী পতিতোদ্ধারিণী তাই তোমার আলমোরা প্রবাসকে আমি মনপ্রাণে অভিনন্দন করতে অক্ষম।

আমি এসেছি আজ ফিরে হরিদ্বারে। এখন আছি এক আশ্চর্য যোগীর আশ্রমে: শ্যামঠাকুরের গুরু আনন্দগিরি, আমার সঙ্গে আছে সতী—যার কথা তোমাকে বলেছিলাম তোমাদের আশ্রমে। তুমি যেমন স্বভাব-বৈরাগী তেম্‌নি সেও স্বভাব-বৈরাগিণী। অথচ স্নেহময়ী মা ও স্ত্রী—যেমন তুমি স্নেহময় বন্ধু ও পূর্ণশিষ্য তোমার গুরুমার। তবে তোমার কথা বলি মাঝে মাঝে। বলতে ভালো লাগে। কারণ আমার মনে হয় সে তোমাকে কতকটা বোঝে। আমাকে প্রায়ই উৎসাহ দেয় তোমার সংস্পর্শে এসে তোমার ছোঁয়াচে আমার দোমনা ভাবের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে। মাঝে মাঝে খুবই উৎসাহ পাই ভাবতে যে, শ্যামঠাকুর, আনন্দগিরি, মা ও তোমার স্নেহ পেয়েছি। কিন্তু তারপরেই মনে হয় তোমারই একটি কথা: "সাধুসঙ্গ, তাঁদের স্নেহ আশীর্বাদ শক্তি সবই শুভঙ্কর, কিন্তু সাধনা চাই ভাই, আর সব আগে ঐকান্তিক হবার সাধনা।"

কিন্তু এ-যুগের মানুষ আমরা—চিত্তবিক্ষেপের রাজধানীতেই যার বাস—একান্তী হব কোত্থেকে? তুমি কেমন ক'রে পারলে মাঝে মাঝে ভাবি। আনন্দগিরি বলেন তোমার আছে "পশ্যন্তী বুদ্ধি।" অর্থাৎ সেই বুদ্ধি যার দৃষ্টি অন্তর্ভেদী—তল পর্যন্ত না পৌঁছিয়ে যে ছাড়েনা। আমার তো নেই এমন কোনো সহজাত দৃষ্টি। আনন্দগিরি বলেন—আমার মধ্যে যে—আড়টুকু আছে সেটুকু কাটবে না গুরুর আবির্ভাবের আগে। তবে যেই হবে এ-আবির্ভাব—হবেই হবে আমার নানা অনর্থনিবৃত্তি, আমি দেখতে পাবই পাব যে, অঘটন এ যুগেও ঘটে গুরুশক্তির জাদুতে। আলমোরায় মা-ও বলতেন একথা—মনে পড়ে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—তাহ'লে আমি করব কী? অনাগত গুরুর পথ চেয়ে হাত পা ছেড়ে দিয়ে lotus-eater হ'য়ে ব'সে থাকব? আনন্দগিরি বলেন: "না, ব্যাকুল হ'তে হবে, কিন্তু ব্যস্তবাগীশ নয়।" তিনি আমাকে ঘড়ি ঘড়ি বৈদিক ধমক দেন: "ন ত্বরমাণেন লভ্যঃ"—ব্যস্ত হ'য়ে হাঁকুপাঁকু করলে আরো দেরি হবে। কাল বলছিলেন পুরীতে তাঁর এক বন্ধুর বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে তিনি হঠাৎ এক দুর্দান্ত স্রোতে ভেসে চ'লে যান। তাঁর সঙ্গে ছিল তাঁর নুনিয়া রক্ষী। সে বলল: "বাবু, হাঁকু-পাঁকু করবেন না শুধু জলে চিৎ হ'য়ে ভেসে থাকুন—যতক্ষণ না পাল্টা স্রোত এসে আপনাকে তীরের দিকে নিয়ে যায়। সাঁতার দিয়ে বাঁচতে গেলেই ডুববেন।" বন্ধু বাধ্য শিষ্যের মতন ভেসে রইলেন। নুনিয়া যা বলেছিল ফলল অক্ষরে অক্ষরে: খানিক বাদে তীরমুখী স্রোত এসে ফের ভাসিয়ে তাঁকে তীরে পৌঁছে দিল। এরকম অভিজ্ঞতা না কি আরো অনেকের হয়েছে—বললেন আনন্দগিরি। সে-নুনিয়া জানত তাই গুরু হ'য়ে বাঁচালো ডুবুডুবুকে। "এরি তো নাম সত্যিকার গুরু," বললেন তিনি, "মানে যাঁর কথা শুনতে ধাঁধা লাগলেও মানলে প্রাণ বাঁচে।" তুমিও বলতে—মনে পড়ে—যে, বাধাকে সহায় দাঁড় করানোই হ'ল যোগ—"কর্মসু কৌশলম্"। ডায়েরিতে লিখে রেখেছি: প্রেমল বলল আজ: "অহংবুদ্ধি ডিমের খোলা হ'লেও বাধা না হ'য়ে সহায়ই হয় যতক্ষণ না অহংশাবক সাবালক হ'য়ে খোলা ভেঙে বেরিয়ে পড়তে পারে। আনন্দগিরি ও তোমার জ্ঞানকে আমার কী যে হিংসে হয়!"

ভাই বলো আরো জ্ঞানের কথা। দাও এইরকম বিচিত্র উপমা। তুমি বলতে (এই যে ডাইরি)—প্রেমল বলল: "সব সময়ই যে ঠেকে শিখতে হবে এমন কোন কথা নেই। জ্ঞানের একটি মজা এই যে তাকে বরণ করলে অনেক কিছু দেখে বা শুনে শেখা যায়। একজন ধুনী জ্বালালে পাঁচজনের কাজে লাগবে না কেন?" খুব ভালো কথা: তাই তোমার উপদেশ আমি চাই আমার কাজে লাগাতে। বলো—কবে তুমি কী ক'রে ঝড়েও ধুনী জ্বালালে, কোন বাধা এড়িয়ে কেমন কৌশলে।

মা-র কথাও লিখো। তাঁর শরীর কেমন আছে? তাঁর স্নেহকেও আমি দৈবী করুণা বলেই বরণ করেছি ভাই। মহানুভব যাঁরা তাঁদের স্নেহ তো সত্যই বিধাতার আশীর্বাদ। এমনি আর একটি দৈবী আশিস পেয়েছি সম্প্রতি তিনমাস আগে—রমণাশ্রমে। রমণ মহর্ষিও সত্যিই আমাকে আশীর্বাদ করেছেন। রোজই আমার গান শুনতেন কী যে স্নেহে! তাঁকে দেখে আমারও মনে

হ'ত—সদাশিবই বটে : শান্তিসিদ্ধ জন্মসিদ্ধ,যিনি ভগবানকে "বেত্তি তত্ত্বতঃ"—অর্থাৎ জানার মত ক'রে জেনেছেন, দেখেছেন; চেখেছেন ডুবেছেন তাঁর মধ্যে। তবে মনে হত—আনন্দ গিরি, শ্যামঠাকুর, মোহন মহারাজ, মা, চিন্ময়ী মা সন্তজী এঁদের যেমন কাজের মানুষ মনে হ'ত (তোমার তো কথাই নেই) রমণ মহর্ষিকে দেখে তেমন ভরসা পেতাম না। মনে হ'ত না—তাঁকে মনের কথা বলা যায়, বা বললে তিনি বুঝবেন। অথচ কী শান্তিই পেয়েছিলাম তাঁর পায়ের কাছে ধ্যানে ব'স। সে-সময়ে অশান্তিতে আমার মন ছিল এত ক্ষত বিক্ষত যে সত্যিই ভাবি নি—সে-বিক্ষিপ্ত চিত্তে কোন নির্মল শান্তি নামতে পারে। ধ্যান তো হতই না, নাম করতে গেলেও আরো সংশয় আসত কালোমেঘের মতন—সব আলোই যেতনিভে। কিন্তু রমণ মহর্ষির পায়ের কাছে বসতে না বসতে যেন যুগের অশান্তি গলে শান্তিতে রূপ নিত। বাজিকরের বাজির মতন যেন।

একটা প্রশ্নের আমি জবাব পেলাম এই সূত্রে: যে যাকে আমরা বলি নৈষ্কর্ম্য তার মধ্যে দিয়ে মহাযোগীরা কর্ম করতে পারেন—আর যে-সে কর্ম নয়—অশান্তিতে শান্তি দেওয়া, নির্ভরসাকে ভরসা দেওয়া, সংশয়ীকে বিশ্বাস দেওয়া।

রমণ মহর্ষি আমাকে কৃপা করেছেন তাই। কী ভাবে চিঠিতে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, ফের যখন দেখা হবে তখন বলব। কিন্তু সে কবে? মা কি বলেন কিছু?

প্রণব সকালে রুগণদের সেবা করে চলেছে তো! ধনি৷ ডাক্তার! যে গ'শ্রমে এসে যেন ও আরো ফুলের মত ফুটে উঠল ডাক্তারি-বৃন্তে। ওর একটা কথা আমি ভুলব না: "ঠাকুরের করুণা ডাক্তারি ওষুধের মাধ্যমেই বা কাজ করতে পারবে না কেন?" পাদ্রে পিওর জীবনী পড়ছিলাম। থাকেন ইতালিতে। প্রার্থনা করে কত লোকেরই তো রোগ সারান। অথচ এক বিরাট হাসপাতালের পত্তন করেছেন তাঁর গ্রামে—গির্জার পাশে। তিনি বলেন: সার্জনের ছুরির পিছনেও ঠাকুরের করুণার আবির্ভাব হতে পারে। কিন্তু এ খতিয়ে যুক্তিরই কথা। তাই হয়তো মন সহজে একে সত্য বলে গ্রহণ করতে পারে।

অন্তরের বিশ্বাস ও মনের ইন্দ্রিয়ের প্রতীতি এ-দুয়ের স্বধর্ম সম্বন্ধে পাস্কাল একটি বড় চমৎকার মন্তব্য করেছেন; কালই পড়ছিলাম "La foi dit bien ce que les sens ne disent pas, mais non pas le contraire de ce qu'ils voient. Elee est au-dessus, et non pas conitre." আনন্দগিরিকে একথা বলতে তিনি এর অনুবাদ চাইলেন; আমি বাহাদুরি করে পদ্যে অনুবাদ করলাম—ভাষ্যই বলব:

> বিশ্বাস কয়ে বরণ সহজে তারে
> দেখে নি শোনে নি ইন্দ্রিয় কভু যারে:
> তা বলি' নয় সে বিরোধী ইন্দ্রিয়ের
> করে না অস্বীকার
> ইন্দ্রিয় বোধ দেয় যার সমাচার
> বিশ্বাস রাজে উপরের স্তরে, ইন্দ্রিয় জগতের
> স্বভাবে এ-দুই সন্ধানী সহযাত্রী এ-বসুধায়
> সতীর্থদের বিবাদ বলো কোথায়?

Faifh, indeed, attests what the senses do not, but not the contrary of what they testify to. Faith is above the senses—not at odds with them,

ললিতাকে এ ভাষ্য দেখিয়ে বোলো আমায় তারিফ করতে।

কিন্তু না, ঐ সঙ্গে তাকে বোলো যে তার কথা আমার কত যে মনে হয় কী বলব? গুরু শিষ্যের গুরু-গম্ভীর সম্বন্ধ দেখে দেখে আমার সত্যিই ভয় করত—তোমার সঙ্গে তার ঝুটোপুটি তর্কাতর্কি ও অবাধ ঠাট্টা-তামাসা দেখে সে-ভয় একটু কেটেছে। বলছিলাম কালই একথা আনন্দগিরিকে। কিন্তু সতী শুনে চোখ বড় বড় করে বলল: "সে কি মামাবাবু? গুরুর সঙ্গে তর্কাতর্কি হাসি ঠাট্টা? বলো কি? ললিতার ঘাড়ে কি একটি মাথা আছে, না গুটি পাঁচেক?"

কিন্তু আর প্রগল্ভতা নয়। এখুনি আনন্দগিরির ঘরে ধ্যানে বসতে হবে। নিখুঁৎ অনবদ্য গম্ভীর ধ্যান। বোলো ললিতাকে। ইতি স্নেহাধীন

অসিত।

পুঃ। মাকে আর একবার জিজ্ঞাসা কোরো কবে কিনি? সব থেকে জরুরি প্রশ্ন: তিনি সদ্‌গুরু তো? আমার গুরু দেখা দেবেন জানেন কি? আর গুরুই বা নইলে ধনে-প্রাণে মারা যাবে যে ভাই! ক্রমশঃ]

শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামীর শ্রীরূপ চিন্তামণির শ্রীরাধার রূপ স্মরণ

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃন্দাবনে যৌ রসিকৌ বিভাতঃ
পরস্পর প্রেমসুধা রসার্দ্রৌ
তয়োস্তড়িন্নিন্দরুচঃ কিশোর্য্যা
নীলাংশুকান্তঃ স্মর মন্দহাস্যম্

২

বেণীকৃতান্ কুঞ্চিতসূক্ষ্মকেশান্
চূড়ামণীমুজ্জ্বলপত্রপাশ্যম্
বক্রালকাং মৃত্তিলকং ললাটং
ভ্রুবৌ দিশা বঞ্জন রঞ্জিতা তে

৩

শ্রুতদ্বয়ং কুণ্ডলমঞ্জুচক্রি
শলাকিকে গণ্ডতলে মকরৌ
নাসাং সমুক্তামরুণাধরাষ্ঠৌ
দন্তাচ্চিষঃ সচ্চিবুকং সবিন্দুম্

৪

কণ্ঠত্রিরেখং ক্রমলম্বমানান্
হারায় তাং সৌ ভুজসাঙ্গদত্বম্
কফোণিকে কঙ্কণ চুড়িকাঢ্যা
সুলক্ষ রেখারুণপাণিপঙ্ক

৫

রত্নোর্মিকা অঙ্গুলিকা নখশ্রী
শ্রিতাঃ কুচৌ কঞ্চুলিকারুণাভৌ
নিষ্কং দলাভো দররোম পঙ্‌ক্তী
নাভিং কৃশং মধ্যযুতং ত্রিবল্যা।

৬

বিশ্রান্তরীয়োপরি নীলশাটি
মূরুদ্বয়ং জানুযুগঞ্চ জঙ্ঘে
গুলফদ্বয়ং হংসকনূপুরশ্রী
ভূতোর্মিকা অঙ্গুলিকা নখাংশ্চ।

বৃন্দাবনের কুঞ্জ বনে যেথায় থাকেন রসিকদুজন
পরস্পরের প্রেমসুধায় আর্দ্র বসে স্নিগ্ধ মগন
একজন তার বিদ্যুৎকান্তি কিশোরী অনিন্দ্যরুচি
নীলাংশুক পরিধানে মৃদুমন্দ হাসি শুচি।

২

মাথায় বেণীবক্র অলক কুঞ্চিত কালো কেশের দল
শিরের ভূষণ চূড়ামণি সম চূর্ণিত যেথায় কুন্তলতল
ললাটে তিলক শোভিছে মোহন শ্যামল শোভন বাহারে
ভুরুদুটিযেন রঞ্জিত যুগল স্মরণ করহ তাহারে।

৩

কর্ণে দোলে কুণ্ডল চারু মঞ্জু মঞ্জুল দীপ্তি
কন্দর্প দর্প শলাকা দুইটি গণ্ডে মাকরী তৃপ্তি
মুক্তাযুক্তানাসিকা দেখি যে দন্ত শুভ্র ইন্দু
রক্ত বর্ণ ওষ্ঠ-অধর চিবুকপ্রান্তে বিন্দু।

৪

তিনটিরেখায় কণ্ঠ তাহার কম্বুতুল্য অনিন্দিত
লম্বমান দোদুল হার যেথায় রয়েছে বিচিত্রিত
শঙ্খগ্রীবার নীচেতে শোভিছে ভুজযুগল কেয়ূর সহ
কফোণি কঙ্কণ চুড়িকাহস্ত রেখা সুলক্ষণ মৃদুবহ।

৫

রত্নখচিত নখর জ্যোতিতে দশটি আঙুল ঊর্মিময়
অরুণ বরণ বক্ষ-আবরণে অনত স্তন আরো শ্রীময়
শীর্ণকটির গভীরনাভি ত্রিবলি যে রোমযুক্তা
স্মরণ করহ সেই রমণীরে কামিনী অসংসক্তা।

৬

অন্তর্বাসের উপরে আছয়ে নীলাম্বরী শাড়ীটি তার
উরু জানু আর জঙ্ঘা দুইটি নিভাড়ি নিভাড়ি গমক যার
পায়ের গুল্‌ফে শোভিছে নূপুর তড়িত চকিত প্রভাতে
দশনখ চমকে যেথায় তিমির হরণ শোভাতে।

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীতম্ মহাভারতম্ শান্তিপর্ব

বঙ্গানুবাদ ঃ স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বৈশম্পায়ন উবাচ

ততঃ কল্যং সমুত্থায় কৃতপূর্বাহ্নিকক্রিয়াঃ।
যযুস্তে নগরাকারৈ রথৈঃ পাণ্ডবযাদবাঃ ॥১

বৈশম্পায়ন বললেন—জনমেজয়, তারপরে দ্বিতীয় দিনে প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করে পাণ্ডবগণ ও যাদবগণ পূর্বাহ্ণকালের নিত্যকর্ম সমাপ্ত করে নগরাকার বিশাল রথে চড়ে হস্তিনাপুর থেকে যাত্রা করলেন।

প্রতিপদ্য কুরুক্ষেত্রং ভীষ্মমাসাদ্য চানঘ।
সুখাং চ রজনীং পৃষ্ট্বা গাঙ্গেয়ং রথিনাং বরম্ ॥২
ব্যাসাদীনভিবাদ্যর্ষীন্ সর্বৈস্তৈশ্চাভিনন্দিতাঃ।
নিষেদুরভিতো ভীষ্মং পরিবার্য সমন্ততঃ ॥৩

হে নিষ্পাপ নরেশ। কুরুক্ষেত্রে গিয়ে, রথীশ্রেষ্ঠ গঙ্গানন্দন ভীষ্মের কাছে পৌঁছে তাঁকে সুখপূর্বক রাত্রিযাপন করেছেন কিনা এ সমাচার জিজ্ঞাসা করে ব্যাস আদি মহর্ষিকে প্রণাম করে, তাঁদের সকলের দ্বারা অভিনন্দিত হয়ে পাণ্ডবগণ ও শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মকে সব দিক থেকে ঘিরে তাঁর কাছে বসে পড়লেন।

ততো রাজা মহাতেজা ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্ভীষ্মং প্রতিপূজ্য যথাবিধি ॥৪

তখন মহাতেজস্বী রাজা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে বিধি-পূর্বক পূজা করে দুই হাত জোড় করে বললেন।

যুধিষ্ঠির উবাচ

য এব রাজন্ রাজেতি শব্দশ্চরতি ভারত।
কথমেষ সমুৎপন্নস্তন্মে ব্রূহি পরন্তপ ॥৫

যুধিষ্ঠির বললেন—শত্রুসন্তাপকারী ভরতবংশী নরেশ! জগতে যে রাজা শব্দ চলিত হয়েছে তার উৎপত্তি কি করে হল, তা আমাকে কৃপা করে বলুন।

তুল্যপাণিভুজগ্রীব স্তুল্যবুদ্ধীন্দ্রিয়াত্মকঃ।
তুল্যদুঃখসুখাত্মা চ তুল্যপৃষ্ঠমুখোদরঃ ॥৬
তুল্যশুক্রাস্থিমজ্জা চ তুল্যমাংসাসৃগেব চ।
নিঃশ্বাসোচ্ছ্বাসতুল্যশ্চ তুল্যপ্রাণশরীরবান্ ॥৭
সমানজন্মমরণঃ সমঃ সর্বৈগুণৈর্নৃণাম্।
বিশিষ্টবুদ্ধীন্ শূরাংশ্চ কথমেকোঽধিতিষ্ঠতি ॥৮

যাঁকে আমরা রাজা বলি তিনি সকল গুণেই অপরের সমান। তাঁর হাত, বাহু, স্কন্ধ, অপরের মতই, বুদ্ধি আর ইন্দ্রিয় সকলও অপরের মত তাঁর মনেও অপরের মত সুখ-দুঃখের উদয় হয়। রাজার মুখ, পেট, পীঠ, বীর্য, হাড়, মজ্জা, মাংস, রক্ত, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস প্রাণ, শরীর, জন্ম, মৃত্যু আদি সকলই অপরের মতই। আবার তিনি বিশিষ্ট বুদ্ধিশালী শূরবীরের উপর একাই কিরূপে নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করে থাকেন?

কথমেকো মহীং কৃৎস্নাং শূরবীরার্যসংকুলাম্।
রক্ষত্যপি চ লোকস্য প্রসাদমভিবাঞ্ছতি ॥৯

একা হয়েও তিনি কি শূরবীর আর সৎপুরুষে পূর্ণ এই সারা পৃথিবীকে কি করে পালন করেন, আর কি করে সমগ্র জগতের প্রসন্নতা কামনা করেন?

একস্য তু প্রসাদেন কৃৎস্নো লোকঃ প্রসীদতি।
ব্যাকুলে চাকুলঃ সর্বো ভবতীতি বিনিশ্চয়ঃ ॥১০

ইহা নিশ্চিতরূপে দেখা যায় যে একমাত্র রাজার প্রসন্নতায় সারা জগৎ প্রসন্ন হয়, একমাত্র রাজা ব্যাকুল হলে সমস্ত জগৎ ব্যাকুল হয়।

এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং তত্ত্বেন ভরতর্ষভ।
কৃৎস্নং তন্মে যথা তত্ত্বং প্রব্রূহি বদতাং বরঃ ॥১১

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এর কি কারণ? এ আমি যথার্থ-রূপে শুনতে চাই। বক্তাশ্রেষ্ঠ পিতামহ! এর সকল রহস্য আমাকে যথার্থরূপে বলুন।

নৈতৎ কারণমল্পং হি ভবিষ্যতি বিশাম্পতে।
যদেকস্মিন্ জগৎ সর্বং দেববদ্ যাতি সংনতম্ ॥১২

প্রজানাথ! সারা জগৎ যে এক ব্যক্তিকে দেবতার সমান মনে করে তার সামনে নত স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে তা কোন স্বল্প কারণে হতে পারে না। [ক্রমশঃ

কঠোপনিষদের সাধন পথ

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সপ্তবিংশতি মন্ত্র (১।১ ২৭)।

মন্ত্র— ন বিত্তেন তর্পনিয়ো মনুষ্যঃ,
লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ চেৎ ত্বা
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং,
বরস্তু মে বরণীয়ঃ স এব ॥

অর্থ—"মানুষ কখনও (ইহলোকে কিংবা পরলোকে) বিত্তের দ্বারা সন্তুষ্ট হইতে পারেনা। আপনাকে যখন দর্শন করিলাম (আমার মনে কামনা থাকিলে) আপনার দর্শনের ফলে বিত্তলাভ অবশ্যই হইবে, আর আপনি যতকাল প্রভুত্ব করিবেন, ততদিনই জীবনধারণও ঘটিবে। প্রার্থনীয় বর কিন্তু আমার উহাই।"

ব্যাখ্যা—নচিকেতার কথা এখনও ফুরায় নাই! মনুষ্যজীবনে বিত্তের প্রয়োজনীয়তা তিনি অস্বীকার করেন না। বিত্তের ইহলোকে সদ্ব্যবহার অনুযায়ী পর-লোকেও সদ্গতি হইতে পারে। কিন্তু বিত্তের চেয়ে চিত্ত বড়, চিত্তের পথেই সে পরম মঙ্গল লাভ হয়, তাহাই ভারতের পুণ্যবাণী। যে একবার জীবনে যমের সাক্ষাৎ পাইয়াছে, তাহার আধ্যাত্মিক জীবন পরিশুদ্ধ হয় ও সে "সংযত" ব্রতে প্রতিষ্ঠিত হয়। সংযম তাহাকে শুধু ব্রহ্মচারী করে না, ইহা তাহাকে যোগী হইতে উৎসাহ দেয়। যোগের শেষ কথা, ধারণা, ধ্যান ও সমাধির ঐক্যতানই সংযম (পাতঞ্জল যোগশাস্ত্র দ্রষ্টব্য)। সংযমে যোগ আরম্ভ, সংযমে যোগের শেষ। প্রথম জীবনে পার্থিব আকর্ষণে অবিচলিত থাকা যেমন সংযম; ঠিক সেইরূপ আধ্যাত্মিক জীবনের চরম উৎকর্ষ সাধিত হইলে ব্রহ্মপদে আত্মদানও সংযম বলিয়া গণিত হয় এবং তখন কৈবল্য লাভ হয়। বিত্ত বা বিভূতির দিকে দৃষ্টি যদি ফিরিয়া আসে তাহা হইলে আর কৈবল্য লাভ হয় না।. এ সব নিরর্থক কথা নহে। নচিকেতার পুরুষার্থের শক্তি আছে, তিনি যমকে আচার্য্যরূপে পাইয়া সংযমে চিরপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। আমরা বলিব, প্রত্যেক মানুষই নচিকেতার মত যমের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়া সংযমে বসবাস করিলে কঠোপনিষদের সাধন পথ লাভ করিবার অধিকারী হইবেন। তবে কি এই কারণেই কৃষ্ণ ভগবান্ গীতায় (১০ ২৯) বলিয়াছেন যে তিনি নিজেই যম ও তাঁহারই কৃপাকণা পাইলে মানুষ "সংযম" পাইতে পারে?

মোট কথা যে একবার সদ্গুরু লাভ করিয়াছে, সে বাক্য ও চিন্তায়, শোকে, দুঃখে কোন কালেই সদ্গুরুর সামীপ্য হারায় না। গুরু যখন সর্বদা সঙ্গে রহিলেন, সকল বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার মত বিত্ত তাঁহার আশীর্বাদে পাওয়া কঠিন হইবে না এবং আধ্যাত্মিক সাধনের জন্য যে পরমায়ু আবশ্যক হইবে তাহাও তাহার অনুগ্রহে লাভ হইবে। নচিকেতা যথার্থ শিষ্যের ন্যায় নিজ প্রশ্নে দৃঢ় রহিলেন। আত্মতত্ত্ব না জানিয়া তিনি ফিরিবেন না তাহা তিনি নিশ্চিত ভাবে স্থির করিয়াছেন।

অষ্টবিংশতি মন্ত্র (১।১।২৮)।

মন্ত্র— অজীর্য্যতামমৃতানামুপেত্য
জীর্যন্ মর্ত্যঃ ক্বধঃস্থঃ প্রজানন্।
অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতিপ্রমোদান্
অতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত ॥

অর্থ—স্বর্গাদিলোক অপেক্ষা নিম্নতর পৃথিবীতে জরাধীন এবং মরণশীল কোন ব্যক্তি, অজর অমরদিগের নিকট গমনপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে, (অর্থাৎ আত্মার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হইতে পারে) ইহা জানিয়াও অপ্সরাদিগের গীতি, ক্রীড়া ও সেই সম্বন্ধীয় সুখ অনিত্য ইহা সুবিদিত হইয়াও, অতি দীর্ঘ জীবনে আনন্দ অনুভব করিতে পারে কি?

ব্যাখ্যা—এই মন্ত্রে সাধক মনুষ্যের যথার্থ অবস্থা ঠিক-

রূপে নিরূপিত হইয়াছে। সপ্তলোকের মধ্যে স্বর্গের নীচে ভুবঃ ও তাহার নীচে ভূঃ লোকে মনুষ্য কালাতিপাত করে। সেখানে ত্রিতাপের লীলা অবিরাম চলিতেছে ও মানুষ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া কালের কোপে জর্জ্জরিত হইয়া মরিতেছে। নচিকেতা তাহাদেরই মধ্যে নিজেকে একজন গণ্য করিয়া বলিতেছেন যে তিনি যখন দৈববলে যমরাজের কাছে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিয়াছেন যে তাঁহার নির্দ্দেশ মত আত্মতত্ত্ব লাভ হইতে পারে, তখন তিনি এই শুভ অবসর কেমন করিয়া বৃথায় যাইতে দেন? নচিকেতা ইহাও জানেন যে সাধক যখন নিজের সাধনা দ্বারা ভৌতিক স্তর অতিক্রম করিয়া দৈবিক কেন্দ্রে উপস্থিত হন, যমের মত দেবতাবৃন্দ সহায়ক হন ও শ্রুতির উপলব্ধি সমূহ সহজ প্রাপ্য করিয়া দেন। এমন অবস্থায়, জীবন যতই রমণীয় ও গুরুর অনুগ্রহে দীর্ঘ হউক, নচিকেতা কেমন করিয়া নৃত্যগীত মুখরিত অনিত্য পার্থিব সুখ ও সেই ক্ষণভঙ্গুর অসৎ সঙ্গের ফলাফল, সন্তুষ্ট চিত্তে বরণ করিতে পারেন?

এই প্রসঙ্গে একটি নূতন কথা পাই, এই সংসারে দীর্ঘ জীবন লাভ করার চেয়ে, আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া অল্পকাল জীবিত থাকা ভাল। জীবনের মূল্য আয়ুতে নহে, কি সাধন হইল তাহার উপর নির্ভর করে। ইহলোকের সব সুখ স্বচ্ছন্দের সহিত ইহলোক পর্য্যন্ত ত্যাগ দিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে না জাগিলে আত্মতত্ত্ব কেহ আবিষ্কার করিতে পারেন না। মরণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, নচিকেতা মরিয়া হইয়া গিয়াছেন, আত্মার সম্বন্ধে জ্ঞান না পাইলে, আর তিনি বাঁচিতে চান না। তবু নিঃশব্দে "জয়গুরু" উচ্চারণ করিতেছেন।

[ক্রমশঃ]

সঙ্কল্প

ছায়া দেবী

ভীরুতাকে কভু করিনিকো ক্ষমা যতই থাকুক সে
নিবিড় অমা,
ঝঞ্ঝা গভীর রাতে!
সকল বাধাকে তুচ্ছ করিয়া, দিনু প্রাণ নব আলোয় ভরিয়া,
স্নিগ্ধ উষার প্রাতে।
সূর্য্য অস্ত! তবু জাগে আজ অরুণের রাঙা আভা
কুহক রচন!
উদাস নয়নে হেরি।
আর নাহি মোর কারো প্রয়োজন, বরমাল্যের বৃথা
আয়োজন,
শুনি বিদায়ের ভেরী।
বুঝি এরি নাম কঠিন সত্য? তবু মায়া কাঁদে হৃদয় মত্ত,
উৎসুক আঁখি মোর!
সন্ধানি ফেরে নিত্য নয়ন সিক্ত সজল, কামনা মগন
ছিঁড়িল প্রাণের ডোর।
উড়ে যাওয়া কোন্ স্বপনের পাখি! মিছে তারে ডোরে
বাঁধিয়া যে রাখি,
মম কল্পনা নীড়ে!
ওগো তাই হোক তবে তাই হোক, কার লাগি করি ব্যর্থ
এ শোক?
যাক যেবা যায় ফিরে।
মোর পথ রেখা, হলো সর্পিল বক্র কুটিল, নিবিড় তমসা
শাখা,
শুষ্ক নদীর কূলে,
আজো অকারণ বেদনা কুঞ্জে বাঁশী মূরছনা নীরবে গুঞ্জে,
আমার মরম মূলে!

রূপসী মডেল

মৈত্রেয়ী মুখার্জী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সারারাত অদ্ভুত এক তন্দ্রার মধ্যে কাটলো। শুধু গোমেশের কথাগুলো আমার চারপাশে গুন্‌গুন্ করতে লাগলো। ঘুমের মধ্যে শুধু মনে হয়েছে গোমেশের হাতের কঠিন চাপে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তারপর এল সেই শুভদিন,—যেদিন আমার সঙ্গে গোমেশের বিয়ে হয়ে গেলো। সেদিন আমার মনে হয়েছিল পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র আমিই সৌভাগ্যের অধিকারী, আমিই একমাত্র সুখী প্রাণী, পৃথিবীটাই স্বর্গ, স্বর্গ বলে আর কোন আলাদা জায়গা নেই, সে আছে শুধু মাত্র আমাদের দুজনের এই ছোট্ট ঘরটায়। প্রবাহন! তোমাকে বোঝাতে পারবো না সে কি এক অদ্ভুত আনন্দের, কল্পনার জোয়ারে আমি ভেসে চলেছিলাম। কিন্তু আমার সেই কল্পিত স্বর্গের স্থায়িত্ব হয়েছিলো মাত্র এক বছর। হ্যাঁ— প্রবাহন, আমি মাত্র এক বছরের জন্য একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী হয়েছিলাম। এই এক বছর গোমেশ আমায় সহস্রবার সম্রাজ্ঞী বলে অভিনন্দন জানিয়েছিলো। কত অসংলগ্ন কথায় কাব্যে ভরিয়ে রেখেছিলো আমায়। এত সুখ বোধহয় আমার ভাগ্যবিধাতা সহ্য করতে পারলেন না। আমি যে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবতী, আমার এই অহঙ্কার বিধাতা মেনে নিতে পারলেন না।

এক বছর পরে আমি মা হলাম। রাঘব এলো আমার কাছে। নতুন মা হওয়ার আনন্দে আমি সব কিছু ভুলে গেলাম। গোমেশের দিকে, নিজের দিকে দৃষ্টি দেবার কথা ভুললাম। আমার সারা মন জুড়ে আছে ঐ ছোট্ট অতিথি রাঘব। আমার শরীর আস্তে আস্তে খারাপ হতে লাগলো, গোমেশ মনে মনে ক্রুদ্ধ, বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগলো, কিন্তু এসব লক্ষ্য করার মত আমার মন ছিলো না। আমার শরীর খারাপ দেখে মা গোমেশের কাছ থেকে নিয়ে এলেন আমার শরীরের যত্ন নেবার জন্যে। আমি ভেবেছিলাম গোমেশ আপত্তি করবে, আমাকে ছেড়ে থাকতে, কিন্তু আশ্চর্য গোমেশ যেন খুব খুসি হলো, আমাকে মায়ের কাছে পাঠিয়ে। প্রথম প্রথম ভেবেছিলাম, আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে এই আশায় 'ও' এত খুসি। কিন্তু সে ভুল আমার আস্তে আস্তে ভাঙ্গতে লাগলো। কারণ 'ও'র ফ্ল্যাট আমাদের বাড়ী থেকে খুব বেশীদূর নয়,তবুও গোমেশ সপ্তাহে একবারও আসতো না। 'ও' এলে আমি অনুযোগ করলে,—বলতো সময় পাই না।

"কেন? কি কাজ তোমার এত? অফিস ছুটির পর তো তুমি একেবারে ফ্রী, আমি থাকতে তোমাকে টুকিটাকি কাজ কিছু করতে হত বাসার জন্যে। তবুও তুমি কত সময় পেতে, অফিসের পর আমরা দুজনে মিলে কত ঘুরে বেড়িয়েছি। আর আজ তুমি সপ্তাহে একবার এখানে আসার সময় পাও না?"

"দেখো তুমি আজকাল বড়ো ন্যাকামী করছো। তোমার কাছে বসে বসে শুধু গল্প করলে আমার চলবে? সংসারের খরচ বেড়েছে না কমেছে? তোমার জন্যেই তো কত টাকা বেরিয়ে গেলো তার ওপরে আবার ঐ একটা বাচ্চা। আমাকে আরো বেশী উপার্জ্জনের চেষ্টা করতে হবে না? আমি সন্ধ্যেবেলায় একটা টিউসনি নিয়েছি।" গোমেশ ভীষণ বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো।

ওর বলার ভঙ্গী আর ভাষা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। গোমেশ যে এমন রূঢ় হতে পারে, এমন বিশ্রী ভাষা ব্যবহার করতে পারে, আমি এতদিন কল্পনাও করতে পারি নি। অপমানে, দুঃখে আমার ভীষণ কান্না পেতে লাগলো। আমি আর কোন কথা না বলে উঠে চলে গেলাম গোমেশের কাছ থেকে। গোমেশ বেশীক্ষণ বসলো না, চলে গেলো। সারারাত আমি যন্ত্রণায় ঘুমুতে পারলাম না। আমার ভার কিএতো বেশী,যে গোমেশের বহন করতে কষ্ট হচ্ছে? ঐ বাচ্চাটার এমন কি খরচ, যার জন্যে

গোমেশের এত ভালো চাকরিতেও কুলচ্ছে না! ওকে আবার টিউশনী নিতে হয়েছে। আর টিউশনীতে এমন কি টাকা পেতে পারে, আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। তবে মন যেন বুঝতে পারছিলো, ঝড়ের সংকেত, যে ঝড়ে আমার সুখের সংসার ভেঙ্গে যেতে পারে। পরদিন মাকে বললাম—'আজ আমি গোমেশের ওখানে যাবো।'

—"এর মধ্যে যাবি? তোর শরীর তো এখনো ভালো করে সারেনি"।

—"না—সারুক আমি যাবো। স্বাস্থ্য আমার আর ভালো হবে না।"

—"ছি! এমন কথা বলতে নেই। বাচ্চা হলে এরকম অনেকেরই স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে, আবার ভালো হয়ে যায় কয়েকমাস পরে।"

—"তবে আর ভাবছো কেন? আমিও ভালো হয়ে যাবো। আমাকে আজ তুমি গোমেশের ওখানে যেতে দাও।"

—"বেশ!—যাও—!" মা একটু অসন্তুষ্ট হ'য়ে বললেন।

আমি বাবাকে ব'লে, যাওয়ার জন্যে তৈরী হলাম। বিকেলবেলা একটা ট্যাক্সী ডেকে একেলা রাঘবকে নিয়ে চলে গেলাম গোমেশের ফ্ল্যাটে। অফিস থেকে এসে গোমেশ আমাকে দেখে বিরক্ত হলো।

—"একি! তুমি আমাকে একটা খবর না দিয়ে এলে যে? কার সঙ্গে এলে, একলা?"

—"নিজের বাড়ীতে আসবো এতে আবার খবর দেবার কি আছে। আর আমি তো পথঘাট না চেনা গাঁয়ের মেয়ে নই যে একলা আসতে পারবো না।" গোমেশ আর কিছু বললো না। বাথরুমে ঢুকে গেলো। তারপর স্নান করে জামাকাপড় পরে বললো—"আমি বেরুচ্ছি, চাকরটা তো আছে, তোমার যা দরকার আনিয়ে নিও। টাকা রেখে গেলাম।"

—"কোথায় যাচ্ছ?"

—"তোমাকে তো বলেছি, আমি একটা টিউশনী নিয়েছি।"

—"আজকের দিনটা না গেলে কি নয়?"

—"না, আমায় যেতে হবে।"

গোমেশ চলে গেলো, বাচ্চাটাকে পর্যন্ত একটু আদর না করে। আমার বুকের মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ডটা কে যেন মুঠো করে চেপে ধরলো, আমি বসে পড়লাম খাটের ওপর। বুঝতে পারলাম না কি আমার অপরাধ। অনেক রাতে গোমেশ বাড়ী ফিরলো। বিশেষ কথা হলো না সে রাতে। সকালেও কিছু কথা হলো না। অফিস চলে গেলো তাড়াতাড়ি। আমি ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বসে থাকলাম। তারপর বাচ্চাটা কেঁদে উঠতে ওকে স্নান করিয়ে দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়ালাম, আমি কিছু না খেয়ে ওর পাশে শুয়ে পড়লাম। চাকরটা বার বার খাওয়ার জন্যে অনুরোধ করলো। আমি বলে দিলাম তুই খেয়ে নে, আমার ক্ষিধে নেই। সারা বিকেল গোমেশের পায়ের শব্দের জন্যে কান পেতে রইলাম। মনে আশা ছিলো গোমেশ এসে আমাকে খাওয়ার জন্যে অনুরোধ করবে, 'ওর' রুক্ষ ব্যবহারের জন্যে ক্ষমা চাইবে, বাচ্চাটাকে আদর করবে। কিন্তু কিছুই হলো না। গোমেশ বিকেলে বাড়ী ফিরলো না। আমি দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে খেয়ে নিলাম, কারণ একেই আমার শরীর খারাপ তার ওপর সারাদিন উপোষ করে মাথা ঝিমঝিম করছিলো। রাত প্রায় বারোটার সময় ও বাড়ী এলো। আমি উঠে ওকে খেতে দিতে গেলাম।

—"আমি খেয়ে এসেছি, খাবো না"। 'ও' বললো।

—"আচ্ছা বলতে পারো আমার কি অপরাধ, যে তুমি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছো?" বলতে বলতে আমার চোখের জল আর ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম না।

—"কি রকম ব্যবহার করছি?" বিরক্ত হয়ে বললো গোমেশ।

—"সেটা কি তুমি বুঝতে পারছো না? আজ দু'দিন আমি এখানে এসেছি, ভালো করে কথা পর্য্যন্ত বলছো না। ছেলেটার দিকে একবার ফিরেও তাকালে না। আজ বিকেলে বাড়ী এলেনা। এসব কি অস্বাভাবিক ব্যবহার নয়?"

—"কি করবো, ভীষণ কাজ পড়েছে অফিসে। তারপর আজ অফিসের এক বন্ধু জোর করে ধরে নিয়ে গেলো তাদের বাড়ীতে। তার বোনের জন্মদিন, সেই উপলক্ষে ওদের বাড়ীতে খেয়ে এলাম। আর বাচ্চা-টাচ্চা কোলে

নেয়া, আদর করা আমার পোষায় না।"

—"আচ্ছা জন! তোমাকে কি আবার আমি আগের মত কাছে পাবো? সেই অফিসের ভীষণ জরুরী কাজ ফেলে চলে আসতে আমাদের বাড়ীতে তারপর আমায় নিয়ে বেড়াতে যেতে! বন্ধুর হাজার রকম অনুরোধ উপেক্ষা করে চলে আসতে আমাদের কাছে চা খাওয়ার জন্যে!" আমি আকুল হয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকি উত্তরের আশায়, কিন্তু গোমেশ নীরব। এমন সময় বাচ্চাটা কেঁদে ওঠে।

—"যাও! তাড়াতাড়ি যাও, বাচ্চা কাঁদছে। আমি এখন ভীষণ ক্লান্ত, ঘুম পাচ্ছে। 'ওকে' কাঁদিয়ে আমার ঘুমের বারোটা বাজিও না।"

আমি চলে আসি বাচ্চাটাকে ঘুম পাড়াতে। তারপর 'ওকে' ঘুম পাড়িয়ে যখন আবার গোমেশের কাছে চলে এলাম তখন গোমেশ ঘুমিয়ে পড়েছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিরে এলাম বাচ্চার কাছে।

এমনি করে অত্যন্ত যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে দু'তিন মাস কেটে গেলো। একদিন গোমেশ আমায় বললো,—

—"শর্মিষ্ঠা—আমি সাতদিনের জন্যে দিল্লী যাচ্ছি, তোমার এখানে একলা থাকা উচিত নয় ঐ বাচ্চা নিয়ে। আমি বলছিলাম কি, তুমি বরং এই ক'টাদিন তোমার বাবার কাছে গিয়ে থাকো।"

—"দিল্লী যাচ্ছ! কেন?"

"এমনি!—ছুটি পেলাম সাতদিনের। আর অফিসের এক বন্ধু যাচ্ছে, আমায় খুব ধরেছে যাওয়ার জন্যে। জীবনটা বড় একঘেয়ে হয়ে গেছে, একটু ঘুরে আসতে চাইছে মনটা কোথাও থেকে।"

বুঝলাম আমাকে 'ও' আর সহ্য করতে পারছে না। আমার মধ্যে 'ও' কোন বৈচিত্র্যের স্বাদ পাচ্ছে না, আমি বড় পুরোণ হয়ে গেছি ওর কাছে। 'ও' তাই বৈচিত্র্যের স্বাদ গ্রহণ করতে যাচ্ছে নতুন দেশে।

মায়ের কাছে চলে এলাম রাঘবকে নিয়ে। গোমেশ দিল্লী চলে গেলো। মা জিজ্ঞেস করেছিলো,—গোমেশ হঠাৎ বেড়াতে গেলো কেন?

"—দরকার আছে ওখানে ওর এক আত্মীয় আছে [illegible]

মনে হয় গোমেশের দেখা পাওয়ার দূরত্ব কমছে। তখন কি ভাবতে পেরেছিলাম,—গোমেশকে কাছে পাওয়া আমার চিরকালের জন্যে হবে না। মায়ের কাছে আসার পর বারো তের দিন হয়ে গেলো, অথচ গোমেশের কোন খবর পাওয়া গেলো না। সাতদিন তো কবে পেরিয়ে গেছে। এখনো কি 'ওর' আসার সময় হলো না?

সেই দিন বিকেলে বাবা অফিস থেকে এসে জিজ্ঞেস করলেন—"গোমেশ এসেছে?"

—"কই না!" আমি উত্তর দিই।

—"সেকি! আজ তো গোমেশ অফিসে এসেছিলো তুই তো আমায় বলিস নি গোমেশ ইণ্টারভিউ দিতে গেছে?"

—"কে বললে ইণ্টারভিউ দিতে গেছে? আমি তো জানি 'ও' বেড়াতে গেছে। আর আজ অফিসে গেছে অথচ এখানে আসেনি, একটা খবর পর্যন্ত পাঠালো না এসব, এসব কি বলছো আমি বুঝতে পারছি না।"

—"তোকে বুঝি তাই বলে গেছে? দেখ,—'ও' হয়ত তোকে চমকে দেওয়ার জন্যে ঐ কথা বলেছে। এ চাকরিটার থেকে অনেক ভালো চাকরি ও পেয়েছে একেবারে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার নিয়ে তোকে দেখাবে বলে হয়ত আগে কিছু বলেনি।"

—"তাই হয়ত হবে!" আমি বললাম। কিন্তু মনে মনে ভাবতে লাগলাম—কেন এই লুকোচুরি। আগে তো জন এমন করতো না সামান্যতম ঘটনাও ক আগ্রহের সঙ্গে আমায় বলতো। আজ এই এত ব একটা ঘটনা আমাকে বললো না! আশ্চর্য্য—সত্যি আশ্চর্য্য!

আবার ভাবলাম, বাবার কথাই ঠিক আমাকে অবা করে দেয়ার জন্য, 'ও' আগে কিছু বলেনি। অ আর আজই হয়ত কলকাতায় পৌচেছে, অফিসে দে করার জরুরি দরকার তাই আমার সঙ্গে দেখা না ক অফিসে গেছে।

সন্ধ্যে বেলা গোমেশ এলো। আমার মনে আনন্দে জোয়ার বইলো। বাবার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা হলে বাবা প্রশ্ন করে সব জানতে চাইলেন। গোমেশ [illegible] কিছু বললো না। [illegible] উত্তর দিলো।

রাত্রে গোমেশকে জিজ্ঞেস করলাম, "কি ব্যাপার,—দিল্লীতে ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিলে একথা তো আমায় বলো নি?"

—"যদি না হয় সেই জন্যে বলিনি।"

—"যাক। চাকরিটা পেয়েছ তা?

—"হ্যাঁ।"

—এ পোষ্টার থেকে "ওটা" অনেক ভালো, মাইনেও বেশী, না?

—"হাঁ,—ভালো। এখন মাইনে বেশী না হলেও ভবিষ্যতে ভালো মাইনে হবে।

—"কবে জয়েন করতে হবে!

—"সামনের সপ্তাহ থেকে।

—"আমরা কবে যাচ্ছি?"

—"তোমাকে এখন নিয়ে যেতে পারবো না। কারণ বাসা ঠিক করতে সময় লাগবে। বাসা ঠিক হলে, কিছুদিনের মধ্যেই তোমাদের নিয়ে যাবো।"

—"তবে তোমার গিয়ে কাজ নেই। আমি এই চাকরিতেই চালিয়ে নেব। দেখ, রঘব হওয়ার পর থেকে তোমার কাছে আমি একবারে থাকতে পারছি না। দিল্লী গেলে তোমাকে কতদিন দেখতে পাবো না তার ঠিক নেই। তুমি দিল্লী যেতে পারবে না।" আমি জেদ করে বলি।

—"শোন, ছেলেমানুষের মত আবোল তাবোল বকো না। তুমি বাচ্চা খুকিটি নও যে আমায় ছেড়ে থাকতে পারবে না। এই অল্পটাকায় আমার চলবে না। জীবনে কোনরকমে অর্দ্ধাহারে থেকে, সস্তা জামাকাপড় পরে, মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে আমি পারবো না। আমায় বড় হোতে হবে। আমি জীবনটাকে সুন্দরভাবে উপভোগ করতে চাই। আর সেই জন্যে আমায় দিল্লী যেতে হবে।"

এতদিন পরে গোমেশের সঙ্গে আমার দেখা হ'লো, অথচ ওর কথার মধ্যে এতটুকু আবেগ নেই, এতটুকু সৌন্দর্য্য অথবা মিষ্টতা নেই। ও যেন সেই আগের গোমেশ নয়। যে গোমেশের কথায় কথায় ছিলো আবেগ, কাব্য, উচ্ছ্বাস আর মিষ্টি সুরের রিমিঝিমি সে গোমেশকে আমি হারিয়ে ফেললাম। এ গোমেশ যেন গোমেশের ছদ্মবেশে এক নিষ্ঠুর রূঢ় প্রকৃতির আর একটি লোক।

গোমেশ চলে গেলো। ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিয়ে গে[illegible] আমি আমার যা জিনিস পত্র ছিলো সব নিয়ে এলাম মায়ের কাছে। যাওয়ার সময় 'ও' বলে [illegible] একমাসের মধ্যে এসে আমায় নিয়ে যাবে। আমি গুণতে লাগলাম। যে বাচ্চার জন্যে আমি গো[illegible] কথা ভুলে গিয়েছিলাম, সে বাচ্চার দিকে ফিরেও তাক[illegible] না। রোজ সকালবেলা উঠে দিন পঞ্জির প[illegible] চোখ রাখি,—আর কতদিন বাকি আছে গো[illegible] আসার।

—"শর্মিষ্ঠা! গোমেশের চিঠি পেয়েছিস?" জিজ্ঞেস করলেন।

—"না!" আমি উত্তর দিলাম।

—"কেন বলতো? এতদিনে তার পৌ[illegible] খবরটাও দিতে সময় পেলেন?"

এর কি উত্তর দেবো? এই কথা আমার সাগরের ঢেউয়ের মত অনন্ত প্রশ্নের কলধ্বনি করে চ[illegible] অনবরত আমার শরীর দিন দিন আরো খারাপ হয়ে [illegible] লাগলো। বাবা, মা শান্তি পাচ্ছিলেন না। [illegible] মনেও কি এক অশুভ চিন্তার জাল বিস্তার করেছি[illegible] এর কিছুদিন পর,—বাবা অফিস থেকে এসে পড়লেন। মা ব্যস্ত হয়ে বললো—"কি হলো! [illegible] শুয়ে পড়লে যে? শরীর খারাপ নাকি?"

—"না শরীর আমার ঠিক আছে।" খুব [illegible] দেখালো বাবাকে।

—"তবে! হাত মুখ না ধুয়ে, কিছু না খেয়ে পড়লে যে?"

—"শর্মিষ্ঠা কোথায়?" বাবা মায়ের কথার উ[illegible] দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

—"ঐ তো, বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে আছে।" মা বল[illegible]

—"শর্মি। এদিকে আয় তো একবার।"

—"কি বাবা?" আমি বাবার ডাকে ঘরে জিজ্ঞেস করি।

—"আয় বোস, আমার কাছে।" বাবা আ[illegible] কাছে বসালেন।

—"দেখ,—শর্মি! তোকে খুব শক্ত হতে

তাকে লুকিয়ে লাভ নেই। এমনি করে গোমেশের চিন্তা নিয়ে মন খারাপ করে কোন লাভ নেই।"

—"বাবা···! কেন ?···কেন তুমি এমন কথা বলছো?" আমি অস্বাভাবিকভাবে চেঁচিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করি।

—"শোন! একটু ধৈর্য ধর। গোমেশ এখানে আর ফিরে আসবে না 'ও' তোকে ত্যাগ করেছে।"

—"কে বললে! মিথ্যে কথা – সব মিথ্যে কথা। জন আমায় ত্যাগ করতে পারে না। তা ছাড়া রাঘব! রাঘব তো ওর ছেলে! রাঘবকে ও কেমন করে ত্যাগ করবে?" আমি পাগলের মত হয়ে বলতে থাকি।

—"শোন! আমার কথা একটু ধৈর্য্য ধরে শোন। এ সব বলতে আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। তবু তোকে বলতে হবে। নইলে তুই মিথ্যে আশায় থেকে শরীর খারাপ করবি। গোমেশ আবার বিয়ে করেছে। বিশুদ্ধ খৃষ্টীয় মতে গোমেশ এক এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানকে বিয়ে করেছে। তোকে তো আমি হিন্দুধর্ম মতে বিয়ে দিয়েছিলাম। 'ও'র ধর্মে এটা একটা বিয়েই নয়। গোমেশ খৃষ্টান, আগুন আর পাথর সাক্ষী করে বিয়েটা'কে ও আইন সম্মত নয় বলে মনে করে।"

—"কিন্তু কবে? কবে ও বিয়ে করলো? আর সেই মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হলো কবে কেমন করে?" আমি কিছুক্ষণ পাথরের মত বসে থেকে বলি বাবাকে।

—"প্রায় ছ'মাস আগে আলাপ হয়েছিলো। ওর এক নতুন বন্ধুর বোন। তোকে যে টিউশনীর কথা বলতো, সেটা ঠিক নয়। ঐ মেয়েটির বাড়ী যেত। তারপর সেই মেয়েটির সঙ্গে দিল্লী গিয়েছিলো। ওখানে মেয়েটির এক আত্মীয় খুব বড় পোষ্টে কাজ করে। সেই আত্মীয়ের চেষ্টায় গোমেশ ইণ্টারভিউ পায় এবং চাকরিটাও হয়ে যায়। ঐ চাকরি পাওয়ার চেষ্টা করছিলো অনেকদিন ধরে। তারপর সেই মেয়েটিকে বিয়ে করেছে।"

আমি বাবার কথাগুলো শুনে পাথরের মত বসে থাকলাম। জানো প্রবাহন! স্বামীর অভিশাপে অহল্যা পাথর হয়ে গিয়েছিলো। আমি গোমেশের নিষ্ঠুরতায় পাথরের মত হয়ে গেলাম। কান্নাও আমার চোখে আসতো না। সংসারের কোন কিছুই আমার পাথর চোখে প্রতিফলন হতো না। রাঘবের কথা আমার পাথর বুকে জাগতো না। বাবা, মায়ের কথা আমার জড় পাথরের মস্তিস্কে চিন্তা করতে পারতো না। বাবা আমার এই দুর্ভাগ্যের জন্যে প্রচণ্ড দুঃখ পেলেন, আমি তাঁদের একমাত্র সন্তান, তাই এই দুঃখ বাবা সহ্য করতে পারলেন না। আমার জন্যে দুশ্চিন্তা করতে করতে তিনি বিছানা নিলেন। একেই ব্লাডপ্রেসার ছিলো তার ওপর এই আঘাত তিনি সহ্য করতে পারলেন না। এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরে বাবা অফিস থেকে ফিরে বিছানা নিলেন, আর উঠলেন না। সেই তাঁর শেষ বিছানা নেওয়া। বাবা সব সুখ দুঃখের পারে চলে গেলেন। নিষ্ঠুর শোক তার বিরাট ডানা বিস্তার করে আমাদের দুনিয়াটাকে অন্ধকার করে ফেললো। এতদিন আমি দুঃখে ভেঙ্গে পড়েছিলাম মা আমাদের সান্ত্বনা দিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু এবারে মা ভেঙ্গে পড়লেন, সংসারের অবস্থা একেবারে অচল হয়ে পড়লো। একটু জল দেবার মত কেউ নেই। এমন অবস্থায় যখন সংসার পৌঁছুলো তখন আমি শক্ত হয়ে শোকের বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। কারণ তখন আমাদের যে অবস্থা তাতে শোক করাটা বিলাসের পর্য্যায়ে দাঁড়ায়। মাকে বললাম—"মা কান্নার সময় আমরা অনেক পাবো, কিন্তু এখন বাঁচার সংস্থান আমাদের নেই, আগে আমাদের বাঁচার সংস্থান করতে হবে। মা, বলো আমরা কি করবো? বেঁচে থাকতে হলে সম্মানের সঙ্গে বাঁচতে হবে। আমরা সব অবলম্বন হারিয়ে ফেলেছি কেমন করে সম্মানের সঙ্গে আমরা বাঁচতে পারি?" মা আমার দিকে তাকালো,—সে চোখের দৃষ্টিতে কিছুই নেই, শুধু আছে সব হারানোর রিক্ত অসহায় দৃষ্টি।

সময়ের জোয়ারে বুঝি সব যন্ত্রণা ভেসে যায়। মা আবার উঠে বসলেন, আবার কাজে মন দিলেন। কিন্তু রসদ কোথায়? বাবা এখানে এসেছিলেন বেশী বয়েসে তাই স্থায়ী কাজ পান নি। অস্থায়ী চাকরি পেয়েছিলেন। মাইনেও খুব বেশী ছিলো না। যা পেতেন সঞ্চয় করেননি কখনো, আমাদের সুখে স্বচ্ছন্দে রাখতে সব খরচ করতেন। এ ভাবে বাবা হঠাৎ চলে যাওয়াতে আমরা

নিঃস্ব হয়ে গেলাম। আমরা দুজন তারপর বাচ্চাটার ভার। আমি কেমন করে বহন করবো? মা আচার তৈরী করে বিক্রী করতেন। কিন্তু তাতে কী আর এমন আয় হতে পারে যাতে এই তিন জনের সংসার চলতে পারে? বাড়ী জামা কাপড় ওষুধ-পত্র সব রকম খরচ তো আছে। আমি একটা কাজের আশায় এখানে ওখানে ঘুরতে লাগলাম। কিন্তু কে দেবে আমায় কাজ! লেখা পড়া খুব বেশী করিনি। জানা শোনাও নেই বিশেষ কোথাও, যার সহযোগিতায় কোন কাজ পেতে পারি। এমন করে ঘুরতে ঘুরতে একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হলো, সে বললো,—"তোমার ফিগার তো বেশ সুন্দর আর নাচতেও পারো,—তুমি যদি কাফে, ক্যাবারে 'ডান্সগার্লে'র কাজ করতে রাজি থাকো তাহলে আমি তোমায় একটা কাজ ঠিক করে দিতে পারি।"

প্রথমে ওর কথায় রাজি হতে পারি নি। তারপর যখন দেখলাম, জীবনে বেঁচে থাকতে গেলে চাই অন্ন, আর বস্ত্র, এবং একটা মাথা গোঁজবার ঘর। আর এগুলো পেতে হলে চাই টাকা। ক্যাবারের গার্ল হতে দোষ কি আছে? আমি তো অন্যায় কিছু করছিনা। পরিশ্রমের বিনিময়ে বেঁচে থাকার এবং বাঁচাবার চেষ্টা করছি।

একটা ছোট খাটো হোটেলে আমার কাজ ঠিক হলো। রোজ সন্ধ্যে বেলা হাজির হতাম, রাত প্রায় এগারো, বারোটা পর্যন্ত লাফালাফি করতে হতো। লাফালাফি বলছি এই জন্যে যে, নাচ বলতে যা জানতাম তার ধারে কাছে দিয়েও যায় না ওখানকার নাচ। দাক্ষিণাত্যের দেবদাসীর রক্তে আমার জন্ম নাচের তাল আমার দেহের প্রতিটি শিরায় শিরায়, সেই আমি ওই হোটেলের ফ্লোরে যে রকম নাচ নাচার তালিম পেলাম, সে নাচকে আমি লাফালাফি ছাড়া আর কিছুই বলতে পারি না।

এমনি করে কিছুদিন চললো,—কিন্তু ঐ কুরুচি পূর্ণ নাচ আমি সহ্য করতে পারছিলাম না। তা ছাড়া আমার অসুস্থ শরীর ঐ প্রচণ্ড পরিশ্রম মেনে নিতে পারছিলো না। অত রাত পর্যন্ত জেগে থাকাও আমার সহ্য হচ্ছিল না। তাই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লে মাঝে মাঝে বাজনার সঙ্গে ঠিকমত লাফালাফি বা দৌড়তে পারতামনা। কর্তৃপক্ষর কাছ থেকে অভিযোগ আসতে লাগলো। তারপর আমি বরখাস্ত হলাম কিছুদিন পর।

আবার চিন্তার অথৈ জলে পড়লাম, কেমন করে তিন জনের সংসার চালাবো?

"আচ্ছা! প্রবাহন তোমাদের ক্লাসে অজয় পাণ্ডে চেন"।

এতক্ষণ শর্মিষ্ঠার দুঃখ-গাথা শুনছিলাম, নিজের অস্তিত্বের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। হঠাৎ শর্মিষ্ঠার প্রশ্নে নিজেকে ফিরে পেলাম। তাড়াতাড়ি উত্তর দিলাম "হ্যাঁ ওকে চিনি কিন্তু আলাপ নেই। অজয়কে আপনি চেনেন?" শর্মিষ্ঠা আমাকে তুমি সম্বোধন করলেও আমি 'ওকে' আপনি বলতে ভুল করি না।

—"হ্যাঁ অজয় আমাদের বাড়ীর পাশে থাকে। ওর বোন সরযূর সঙ্গে আমার খুব আলাপ আছে। আমার অসহায় অবস্থার কথা সরযূ তার দাদার কাছে বলেছিলো। ওর দাদা একদিন আমাকে ডেকে বললো,—"যদি কিছু মনে না করেন তবে একটা কথা বলতে পারি।"

—"হ্যাঁ নিশ্চয়ই বলতে পারেন। আমি কিছুই মনে করবো না।"

—"দেখুন, আমাদের আর্ট কলেজে অনেক মেয়ে আছে যারা মডেলের কাজ করে। আমি বলছিলাম আপনি যদি আমাদের কলেজে মডেলের কাজ করতে রাজি হন তবে আপনাদের এই অচল অবস্থার কিছু উন্নতি হতে পারে।"

—"দেখুন,—আমার ভালো মন্দ বিচার করে কাজ নেয়ার মত সাংসারিক অবস্থা নয়। আপনি যদি ঐ কাজই ঠিক করে দেন, আমি খুব খুসি হবো।" তারপরের ঘটনা তো তুমি জানো।

আমি আজ আর নিজেকে মানুষের পর্য্যায়ে ফেলতে পারিনা। জানোয়ারের মত বেঁচে আছি। আমি যে মানুষ, একদিন যে বাবা, মায়ের স্নেহপুটে মানুষ হয়েছি একথা আমি ভুলতে চাই। ভুলতে চাই জনকে। সেই অপরূপ জন! যার প্রশস্ত কাঁধ, সরু কোমর, দীর্ঘ বাহু মহাভারতের অর্জ্জুনকে মনে করিয়ে দেয়। যার মুখের হাসি দেখলে গোলাপের কথা মনে পড়ে, যার চোখের দিকে তাকালে সমুদ্রের নীল বিশালতাকে দেখতে পেতাম,—সেই জনকে আমি ভুলতে চাই। কিন্তু পারছি কই?—জনকে

ভুলতে পারছি না। প্রতি মুহূর্তে আমার সমস্ত স্বত্বা জনের স্মৃতির তলায় তলিয়ে যাচ্ছে। আমি এই যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছিনা—জনকে হারানোর যন্ত্রণা আমার হৃদ্‌পিণ্ড পিষে ফেলছে। তবু দেখো আমি বেঁচে আছি, তবু দেখ আমি নিজেকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে সুন্দররূপে তোমাদের সামনে বসে থাকি। মরিনি, মরতে পারছি না। কিন্তু আমি মরতে চাই;—জনকে আমি ভুলতে চাই, মৃত্যু এসে আমার সব অনুভূতিকে ধ্বংস করে না দেয়া পর্যন্ত আমি জনকে ভুলতে পারবো না। কিন্তু কোথায় মৃত্যু? কবে আসবে? আমি যদি অনন্তকাল ধরে জনের জন্যে অপেক্ষা করি তাহলেও জন আসবে না, একথা আমি জানি;—কিন্তু মৃত্যু! মৃত্যুও কি আসবে না? আসবে,—প্রত্যেক মানুষকে সব যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিতে মৃত্যু তার শীতল দেহের স্পর্শ দেয়। মৃত্যু আসবে কবে, আমি তারই অপেক্ষায় শবরীর মতন বসে আছি।" আবেগে যন্ত্রণায়, শর্মিষ্ঠার কণ্ঠ বুঁজে এলো।—"প্রবাহন!—বলো কবে আসবে মৃত্যু যার স্পর্শে আমি ভুলে যাবো জনকে!" শর্মিষ্ঠার সব ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায় ও কাঁদে অঝোরে। তারপর হঠাৎ বলে ফিসফিস করে—"না—না! জনকে না দেখে আমি মরতে পারবো না। জনকে ছেড়ে আমি স্বর্গেও সুখে থাকতে পারবো না!"

এবার শর্মিষ্ঠার সব যন্ত্রণার উৎস দুকূল ছাপিয়ে ভেসে যেতে লাগলো,—'ও' কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। ছাদের নীচু আলসের ওপর মাথা রেখে যন্ত্রণায় ফোঁপাতে থাকে।

কবিরা বলেন,—ঝরণা কলহাস্যে নাচতে নাচতে ঝাঁপিয়ে চলে এক পাথর থেকে অন্য পাথরে। কিন্তু দেখছি,—ঝরণা প্রবল কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছে। শর্মিষ্ঠা কাঁদছে ফুলে ফুলে সাদা শাড়ীটা লুটছে, 'ও' ভেঙ্গে পড়েছে আলসের ওপর। চাঁদের আলোয় 'ও'কে দেখে মনে হচ্ছে—ও ঝরণা, হিমালয়ের থেকে ঝরে পড়ছে অতলে, হিমালয়ের বিরহে কাঁদছে।

আমি চুপ করে বসে থাকি। কি করতে পারি? শর্মিষ্ঠার যন্ত্রণার প্রলেপ দেবার শক্তি আমার নেই,—কারো নেই একমাত্র জন ছাড়া শর্মিষ্ঠা যেন দ্বাপর যুগের অনন্ত বিরহিনী রাধা। ওর কাছে একমাত্র পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, আমি!—আমি কে? আমি যেন ওর ললিতা সখী। আমি যে পুরুষ একথা শর্মিষ্ঠা ভুলেছে। আমি 'ওর' ললিতা সখী,—আমার কাছে প্রতিশ্রুতি চাইছে তার প্রিয়কে ফিরিয়ে আনার। যেমন করে রাধা ললিতা সখীর কাছে চেয়েছিলো। ঠিক তাই,—শর্মিষ্ঠার কাছে একমাত্র পুরুষ জন। আর কারো অস্তিত্ব নেই তার কাছে। কিন্তু আমি তো সত্যি ললিতা সখী নই! তাই ওর যন্ত্রণায় প্রলেপ দিতে বলতে পারলাম না—"জনকে আমি ফিরিয়ে আনবো।" চুপ করে বসে আছি—এমন সময় ওর মা এলেন।

"শর্মি!" খুব আস্তে ডাকলেন ওর মা।

মায়ের ডাকে শর্মিষ্ঠা উঠে বসে তাড়াতাড়ি। 'ও' লুকোতে চায় 'ওর' যন্ত্রণাকে কান্নাকে ওর মায়ের কাছে।

—"আবার তুই কাঁদছিস? তোর কেন এত দুঃখ। জন তো আছে, এই পৃথিবীতেই আছে, সুখে আছে। তুই যদি তাকে সত্যি ভালোবাসিস, তাহলে এতেই তো তোর শান্ত থাকা উচিত। জন বেঁচে আছে এটাই তো তোর সুখ, এ কথা কেন তুই মেনে নিতে পারছিস না। চিন্তা করে দেখ, আমার কথা,—তোর বাবা আজ পৃথিবীতে নেই আমি সে যন্ত্রণার সঙ্গে আর কোন যন্ত্রণার তুলনা করতে পারছি না।" খুব শান্ত গলায় আস্তে আস্তে কথাগুলো বললেন শর্মিষ্ঠার মা।

ওঁকে দেখে মনে হতে লাগলো জমে শক্ত হয়ে যাওয়া একবিন্দু অশ্রু যেন জমাট বেঁধে রয়েছে। ওঁর স্নিগ্ধতা এক ধরণের প্রশান্তি এনে দিচ্ছে।

আমি অবাক চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম, মা আর মেয়েকে। একজন দয়িতের কাছে অপমানিত, পরিত্যক্ত হয়েও সে দয়িতের কথা ভুলতে পারছে না, তার কথা চিন্তা করতে করতে দিন দিন ক্ষীণ হয়ে আসছে, যন্ত্রণার সাগর জলে ভাসছে। আর একজন তাঁর সঙ্গীকে চিরকালের মত হারিয়ে শান্ত স্থির মহিমাময়ী হয়ে পরম প্রেমের কথা বলছেন। যে প্রেমে, দেহকে চায় না, যে, প্রেমের মধ্যে নেই কোন বাসনা কামনা, সেই প্রেমের কথা। বলছেন সেই নিষ্কাম প্রেমিক হতে তাঁর মেয়েকে। কিন্তু কি এদের পরিচয়?

ঘৃণা করে। হিন্দু ধর্মের রক্ষকেরা বলবেন—"এরাই পাপ এরাই সমাজের কলঙ্ক। এরাই হিন্দু ধর্মের আদর্শকে রসাতলে পাঠাবার চেষ্টা করছে। এদের সংস্পর্শে যারা আসবে তারা নরকের স্থায়ী বাসিন্দা হবে। অতএব এদের পাঁকের মত ঘৃণা করো, এড়িয়ে চলো।"

শর্মিষ্ঠার মায়ের দিকে তাকিয়ে চিন্তা করছিলাম এই সব কথা।

—"প্রবাহন!"

চমকে উঠলাম 'ওর' মায়ের ডাকে। "আমায় কিছু বলবেন?" জিজ্ঞেস করি তাঁকে।

"হ্যাঁ বাবা, দেখ,—শর্মি তো পাগোল হয়ে গেছে। 'ও' সব কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছে, নাহোলে, তোমাকে এতো রাত পর্যন্ত এখানে বসিয়ে রেখে, নিজের দুঃখের কথা শোনায়?"

—"না—না! ও শোনাতে চায় নি, আমি জানতে চেয়েছিলাম। 'ওর' কোন দোষ নেই।"

—"যাক্‌গে! যা হবার হয়ে গেছে। এখন নীচে চলো, কিছু খেয়ে নিয়ে বাড়ী যাও। অনেক রাত হয়েছে বাড়ীর সকলে ভীষণ চিন্তা করছে নিশ্চয়ই।"

—"চলুন! সত্যি অনেক রাত হয়ে গেছে। আপনাকেও কষ্ট দিলাম,—এতো রাত পর্যন্ত খাবার নিয়ে বসিয়ে রাখলাম।"

—"না আমার কিছু কষ্ট হয় নি।" শর্মিষ্ঠার মা বললেন আমি আর কথা বাড়ালাম না। ওদের সঙ্গে নীচে নেমে এলাম। তারপর কিছু একটু মুখে দিয়ে বাড়ীর দিকে চললাম।

সকালে উঠে কলেজে যাবো না, ঠিক করেছিলাম। কিন্তু যত ঘড়ির কাঁটা এগুতে লাগলো, তত আমি অস্থির হতে লাগলাম। স্নান করে খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম কলেজের পথে। ভাবছিলাম—"মিষ্ঠা হয়তো আসবে না। ও এখনো জনের কথা চিন্তা করছে কি?

ক্লাশে ঢুকলাম, ক্লাশ আরম্ভ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। মডেল-বসা বেঞ্চে শর্মিষ্ঠা বসে। 'ওর' বসে থাকার ভঙ্গির মধ্যে ক্লান্তি আর বিষাদের ছায়া পড়েছে। 'ও' নিশ্চল! —অহল্যার মত পাথর-নিশ্চল। ওর চোখ জানলার দিকে ফেরানো 'ওর' চোখের দৃষ্টিতে শবরীর প্রতীক্ষা।

—

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সিকাগোর দর্শনীয় স্থান :--

সিকাগোর বিশেষ দর্শনীয় স্থান হ'ল হ্রদের ধারে সিকাগো বন্দরের সন্নিকটে ১। এডলার গ্রহাগার বা প্লানেটোরিয়াম, (২) শেড্ মীনাগার (৩) সোলজার ফিল্ড (Soldier Field) যার বিরাট এম্পিথিয়েটারে All Star Football, সিকাগো সঙ্গীত সম্মেলন প্রভৃতি বিশেষ সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। (৪) বাকিংহাম ফোয়ারা (৫) সিকাগোর Natural History Museum (৬) গ্রাণ্ড পার্ক (৭) আর্ট ইনষ্টিটিউট—এটী বহু পুরাতন ও নবীন শিল্পীদের শিল্পসম্ভারের সংগ্রহশালা। ৮) ম্যাক করমিক প্লেস্—এটী অধুনাতম প্রদর্শনশালা। (৯) তাছাড়া আছে Elk's জাতীয় স্মৃতিমন্দির, (১০) ব্রুকফিল্ড ও (১১) লিংকন পার্ক পশুশালা, (১২) ম্যারিনা সিটি, (১৩) প্রুডেনশিয়াল বীমাকোম্পানীর আকাশচুম্বী বাড়ী, (১৪) সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়, (১৫) ওয়াটার টাওয়ার (১৬) Museum of Science & Industry প্রভৃতি।

বিমান ক্ষেত্র :

এখানের ও' হেয়ার (O' Hare) বিমান বন্দর থেকে মাসে প্রায় সাড়ে সতেরো লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করে। মাসে প্রায় ৪২ হাজার বিমানের ওঠানামার পর্ব চলে। তেমনি এটী বিরাট রেলের জংশন। দিনে ২৬,০০০ মালগাড়ী এখানে বোঝাই ও খালাস হয়। এখানে পার্ক পরিচালনার ভার নিয়েছেন The Chicago Park District। এটী ৬,৭৪০ একর জমির উপর বিখ্যাত লিংকন পার্ক, গারফিল্ড পার্ক প্রভৃতির পরিচালনা কার্য চালান। সিকাগোতে অন্ততঃ হাজারটী সম্মেলন বছরে অনুষ্ঠিত হয়। সেগুলি মুখ্যতঃ সাড়ে তিন কোটী ডলার ব্যয়ে 'ম্যাক্‌করমিক প্লেসেই বসে। এখানে ৭৫০০ মোট রাখার ব্যবস্থা আছে। আর আছে প্রায় পাঁচলক্ষ বর্গফু ভূমি যেখানে প্রদর্শশালা খোলা যায়।

এল্‌ক জাতীয় স্মৃতিমন্দির :

তারপর আমরা এলাম Elk National Memoria এর অট্টালিকায়। এটীর প্রবর্তনের ইতিহাস হ'ল :—

"The Benevolent and Protective Order Elks of the United States of America w born in the minds and hearts of a sma group of devoted friends whose only selfi desire was for fraternal companionship a whose real aspiration was for an enlarg usefulness of these fellowmen.

তাই ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে নিউইয়র্কে Benevolent Protective order of Elks-এর আদর্শ হচ্ছে indicate the principles of charity, justi brotherly love and fidelity to promote welfare and enhance the happiness of members, to quicken the spirit of Ameri Patriotism, to cultivate good fellowship.'

এঁদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। গত মহাযুদ্ধের সময় ৭০,০০০ এল্‌ক যুদ্ধে যোগদান ক'রেছি আমাদের দেশে যেমন নানলজ্ (Lodge) আছে, ঠিক তেমনি। এর বাড়ীটি অতি সুন্দর এবং দেওয় গায়ে প্রাচীরচিত্র (Mural painting)-গুলি মনোহর। এই বিরাট অট্টালিকাটী একটী স্মৃতি মন্দি মত। বহু যাত্রী এটীর দর্শনার্থী হ'য়ে আসে।

এখানের আসবাবপত্র, চিত্র, মূর্তি। প্রভৃতি নানা বিষয়ের ওপর বিখ্যাত চিত্রশিল্পীরা এখানের চিত্র এঁকেছেন যেমন "Fraternal Justic"—"Blessed are the peace makers", "Charity" "The feast of the Mt. Olympus."

"B.essed are they that hunger and thirst after Righteousness." "Blessed are the pure in heart" এবং Armistice এদের অন্যতম।

লিংকন পার্কে Academy of Sciences & Meuseum of Natural History. Roosvelt রোডে দাঁড়িয়ে 'Adler Planatorium'এর কৃত্রিম আকাশে গ্রহ উপগ্রহের সন্নিবেশ সত্যই প্রাকৃতিক পরিবেশের আমেজ আনে।

এখানের 'সোলজারস্ ফিল্ডে' ১ লক্ষ দর্শকের বসার জায়গা আছে। ১৯৫৯ সালে St Lawreuce Seawayর কাজ সম্পূর্ণ হওয়ায় এটা পৃথিবীর বৃহত্তম ভূমিবেষ্টিত বন্দরের খ্যাতি অর্জন করেছে। এখানে ৪৩টী জাহাজ কোম্পানীর জাহাজ চলাচল করে।

সংবাদপত্র :

এখানে প্রাচীনতম সংবাদ পত্র হ'ল 'সিকাগো ট্রিবিউন' সিকাগো ট্রিবিউন (Chicago Tribund) সিকাগোর উন্নতির বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন "সিকাগো-বাসী পায়।

1. The highest average income ofthe worid.

2. The highel employment rate in the Nation. There is a labour shortage 100,000 in skilled job.

3. The greatest investment in future economic deveiopment of any metropolitan area in the country.

In short, Chicago can produce more, transport more, and sell more goods than any city in the world.

এ ছাড়া 'Times Herald' Daily News এবং TRIBUNE প্রভৃতি দৈনিক সংবাদ পত্রের মুদ্রণ সংখ্যা কয়েক লক্ষ করে।

রেলপথ ও স্থলপথ :

সিকাগোকে কেন্দ্র ক'রে প্রায় পঁচিশটী রেলপথ বাইরে চ'লে গেছে। এটী হ'ল পৃথিবীর বৃহত্তম ও অতি কর্মচঞ্চল রেল সংযোগস্থল। ১৯৬৫ সালে এখানে প্রায় বারো লক্ষ মালগাড়ী খালাস ও বোঝাই করা হয়েছিল। কুড়িটী ট্রাঙ্ক লাইনের এখান থেকে শুরু। সিকাগোতেই পূর্বগামী রেলপথের শেষ ষ্টেশন ও পশ্চিমগামী রেলপথের প্রথম ষ্টেশন। এখানে লস্ এন্জেলিস্, সানফ্রানসিস্কো, সল্টলেক সিটীর যাত্রীদের ডিট্রয়েট, টরন্টো প্রভৃতি স্থানে যেতে হ'লে গাড়ী বদল করতেই হবে। সহরের মাঝে বেশ কয়েক জায়গায় ষ্টেশন। ট্যাক্সি ক'রে ষ্টেশন বদল করার রীতি। ভীড়ের সময় ট্যাক্সি না পাওয়া গেলে ট্রেন ফেল করারও সম্ভাবনা আছে। এখানের বিখ্যাত রেলপথ হ'ল 'নর্থ ওয়েষ্টার্ণ', 'গ্রেট ওয়েষ্টার্ণ', 'নিউইয়র্ক সেন্ট্রাল', গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক', 'যান্তা ফী', 'নরফোক ও ওয়েষ্টান' 'মিলওয়াকী রোড', G.M. & O.R.R. I.C. R. R, P.A.R.R. B & O, C & O.R.R, C & E, I. R, R প্রভৃতি।

সিকাগোর বিশ্ববিদ্যালয় :

বিশ্ববিদ্যালয়ও এখানে বিশ্বব্যাপী। এই সহরে দশটী বিশ্ববিদ্যালয়। কলকাতার চেয়ে সামান্য বেশী অধিবাসীর সংখ্যা। তবে কলকাতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্র-ভারতী ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। আগে মাত্র কলকাতাই সবে ধন নীলমণি ছিল। আর এখানে (১) সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়, (২) ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়, (৩) ইলিনয় টেক্ (৪) লায়েলা বিশ্ববিদ্যালয়, (৫) নর্থ ওয়েষ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয় (৬) রুজভেল্ট বিশ্ববিদ্যালয় (৭) ডি পল বিশ্ববিদ্যালয়। তা ছাড়া ডি পল, নর্থ ওয়েষ্টার্ণ ও লায়েলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃথক তিনটী শাখা আছে। সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ডেমাগ্ সাহেব বাংলাভাষায় অধ্যাপনা করেন।

ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এক নতুন ধরণের বাড়ী তৈরী করেছে। বিরাট বড় প্লেট গার্ডার বড় বড় ইস্পাতের থামের উপর রেখে সেই প্লেট গার্ডার থেকে লম্বা লম্বা ইস্পাতের কড়ি ঝোলানো। ইস্পাতে যাতে মরচে না ধরে কালো রং করা। এটী নতুন স্থপতি 'Mies Vander Rohe'র পরিকল্পনা।

—আমি বললাম—ক্রুশ্চেভ এত ইস্পাতের অপচয় দেখলে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করতেন। যেখানে কংক্রীটে কাজ চলে সেখানে এত ইস্পাতের খরচ কেন?

বিবিধ:

সিকাগো পৌর শাসন ব্যবস্থার সুখ্যাতি আছে। তেমনি সিকাগোর পৌরবাসীদের উন্নয়ন ও আত্মোন্নতির প্রচেষ্টা অতি প্রবল। কাজেই তারা অর্থ নৈতিক উন্নতি করতে সমর্থ হয়েছে। এখানে নিগ্রো দের বিশেষ প্রভাব আছে সত্য। যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় সহরে থাকারই কথা যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীতে তাদের প্রভাব রয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সহর নিউইয়র্কে রয়েছে, রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মোটর নগরী ডিট্রেয়েটে।

সবচেয়ে বেশী ঘর নিয়ে হোটেল চালাবার পরীক্ষার জন্য সিকাগোর বৃহত্তম হোটেল 'The Conrad Hilton' স্থাপন করা হয়। এখানে ৩০০০ শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘর আছে। Hilton Hotels Corporation নামে ও Hilton International Co-র নামে এই 'হিলটন' হোটেলের পরিচালকরা পৃথিবীর ৬৩টী জায়গায় হোটেল চালান। কোন কোন শহরে একাধিক হোটেল আছে যেমন সিকাগোর The Pamer House ও The Conrad Hiton; তেমনি একাধিক হোটেল আছে লসএনজেলিস্, নিউ অরলিনস্, সানফ্রানসিকো, ওয়াশিংটন, প্যারিস, সাঁ হোয়েন ও হনলুলুতেও। এদের সবচেয়ে ছোট হোটেল হ'ল ১০০ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরের ব্রিটিশ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের 'বারবাডোজ' নগরীতে। সিকাগো-বাসীদের উদ্যম অদম্য, তাই ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর সাতাশ ঘণ্টা ব্যাপী যে অগ্নিকাণ্ড হ'য়ে গিয়েছিল যাতে ১৭,৪৫০ টী বাড়ী, ২৫০ জীবন, ১৬০০ দোকান, ২৮টী হোটেল ও ৬০টী শিল্পশালা, বহু সেতু ও সরকারী বাড়ী প্রভৃতি ধ্বংস হ'য়ে যায় তা' পরের বছরই তার অধিকাংশ মেরামত হয়ে যায়। সেই বহ্নিলীলার যেVoter Towerটী রক্ষা পেয়েছিল সেটী আজও অতীতের সাক্ষ্য হয়ে বিদ্যমান। বিপদের সময় সারা দেশ এমনকি বিদেশথেকেও নানাভাবে সাহায্য এসেছিল সে কথা সিকাগো কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, পুত্র রথীন্দ্রনাথকে কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী করার জন্য Urbana তে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শিল্প কলেজ' পাঠান। এই শিক্ষায়তনের উদ্দেশ্য ছিল 'To teach such branches of learning as are related to agriculture and mchgnic arts'। এখানে রবীন্দ্রনাথ মার্কিণ সফরে কিছুকাল থেকে তাঁর আমেরিকায় বক্তৃতার জন্য বহু ইংরাজি বক্তৃতা রচনা করেন।

সিকাগোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আব্রাহাম লিংকনের নাম যেমন জর্জ ওয়াশিংটনের ভার্জিনিয়ার সঙ্গে, অর্থ-নৈতিক ধুরন্ধর আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটনের সঙ্গে নিউ-ইয়র্কের, বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের সঙ্গে পেন্‌সিল্‌ভেনিয়ার। এখানেই গড়ে উঠেছিল নবীন স্থাপত্যের ধারা, ফ্রাঙ্কলয়েড রাইটের মত বিখ্যাত স্থপতির শিক্ষাকেন্দ্রে। সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার অধ্যাপনা হয়। Observer পত্রিকার সম্পাদক এলিজা, পি, লাভজয় (Elijah P. Lovejoy) দাসত্ব প্রথা সংরক্ষকদলের হাতে তাঁর দাসপ্রথা বিলোপের অনুকূলে প্রচারের জন্য ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে নিহত হন। আবার গত মহাযুদ্ধে ইলিনয়িস্ রাষ্ট্র একাই ন' লক্ষ (৯০০,০০০) লোক পাঠিয়েছিল ইউরোপ ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গনে।

সিকাগোর কথা বলতে গিয়ে মেয়র 'ডেলের' (Da ey) কথা না বললে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যাবে সিকাগোর কাহিনী। অদ্ভুত করিৎকর্মা এই ভদ্রলোক, অসাধারণ প্রতিভাও কাজ করিয়ে নেবার ক্ষমতা। সংবাদ পত্রেরলোক তাঁকেপ্রশ্ন করেছিল যেলোকে বলে আপনার এইপৌরশাসন ব্যবস্থাhenevolent dictatorshipউত্তরে তিনি বলেছিলেন ও সংজ্ঞা অযৌক্তিক। আমরা কোন কাজ করার আগে বিশেষজ্ঞ দিয়ে প্রস্তুত করিয়ে জনগণ দিয়ে সমর্থন করিয়ে কাজে নামি যেখানে দীর্ঘসূত্রতার কোন স্থান নেই। এখানের লোকেরা এক নায়কত্বও মাতব্বরি (dictatorship and bossiem) পছন্দ করে না। তাঁকে সিকাগোর মুখ্য সমস্যাগুলির কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন প্রথম হ'ল 'কর্ম নিয়োগ'—আমরা সবার জন্য পূর্ণ কাজ চাই। দ্বিতীয় হ'ল 'বাসস্থান'—যেখানে মার্কিন জীবনযাত্রার মান দণ্ড ভদ্রগোছের বাড়ী। তৃতীয় হ'ল পারস্পারিক মানবিক সম্বন্ধের বিভেদ দূর করা যেখানে আমরা উপযুক্ত লোককে নেতৃত্ব নেবার জন্য আহ্বান করব।

দেখা গেছে তাঁর সহকর্মী ও উপদেষ্টা মণ্ডলীর অধিকাংশ তরুণ ও যাঁদের বার্ষিক বেতন ২৫,০০০ ডলার থেকে ৩০,০০০ পর্যন্ত।

দাগ

—অশোক ঘোষ

খামটা ছিঁড়ে ফেল্লাম। চিঠিটা এসে পৌঁছেছে আজকের সকালের ডাকে। গোটা গোটা মেয়েলি হস্তাক্ষর। চেনা চেনা যেন। কোথায় কবে দেখেছি মনে পড়ছে না?

কিরণ ঠাকুরপো,

ঘটনাটা ছাপতে পারেন। আমার দিক থেকে আর বিশেষ কোনও আপত্তি নেই। তবে স্থান, কাল, পাত্র সম্বন্ধে উচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন আশা করি।

আর অধিক কি লিখব? আমরা সব একপ্রকার। খোকন ওর ক্লাস পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে। এবার ও ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফোর এ' উঠলো। খোকন প্রায়ই আপনার কথা বলে। আবার একবার আসবেন কিন্তু। তবে এবার সস্ত্রীক আশা করি। আর সব কুশল তো।

প্রীতি নেবেন।

ইতি

খামটার ওপর চোখ বোলাই। ডাকঘরের ছাপ শিলং।

শিলং—! স্মৃতি সোপান ধরে ফিরে যাই পেছনে ফেলে-আসা দিনগুলিতে। স্মৃতির আবর্ত্তনের ভেতর অস্পষ্টতার ছায়া ছায়া আলেখ্যর মধ্যে খুঁজে বের করতে চাই একটি মুখ—সে মুখ শান্তা বৌদির। মনে পড়ে, মনে পড়ে সেই শিলং। আর মনে পড়ে সেই পাইন বন। সেই এলিফ্যান্ট ফলস্। আর সেই জোয়াই রোডের পথ ধরে আঁকাবাঁকা চড়াই উতরাই দিয়ে গিয়ে সেই একখণ্ড স্বপ্নময় সবুজ পটভূমিকা। হ্যাপী ভ্যালির শান্ত নীড়, "হ্যাপী লজ্"। মনে পড়ছে শান্তা বৌদিকে কোমড়ে আঁচল গোঁজা কর্ম্মরত অবস্থায় ছোট্ট সংসারের টুকিটাকি কাজে। ছ'বছরের দুরন্ত ফুটফুটে ছেলে খোকনকে বাগানে ছুটোছুটি করে খেলা করতে। আর মনে পড়ছে কর্ম্মরত কমলেশকে মুখে পাইপ গুজে তাড়াতাড়ি করে গলার টাইটা বেঁধে 'নাটটা' ঠিক করে ব্যস্তভাবে অফিসের জিপে উঠে প্রতিদিনের কার্য্যসূচী নিয়ে মেতে উঠতে।

কিন্তু সে কথা থাক্। কমলেশের সাথে দেখাটা কিন্তু আমার আকস্মিকই হয়ে গেল গৌহাটি ষ্টেশনে। ডিব্রুগড়ে গিয়েছিলাম গভর্নমেণ্টের একটা অডিটিঙের ব্যাপারে গণ্ডগোল মেটাতে ইনভেষ্টিগেশানে। কাজটা নির্দিষ্ট দিনের তিন চারদিন আগেই শেষ হয়ে গেল। ভাবলাম এই ক'দিন আগে কোলকাতায় গিয়ে ছুটিটা উপভোগ করবো। আর অবসর সময়ের যা কাজ তাই করব—মাসিক পত্রিকাগুলির জন্যে গল্প লিখব। সুতরাং কাজ মেটার পর ফিরছিলাম। কিন্তু পথে কমলেশের সাথে দেখা গৌহাটিতে। আর কমলেশ জোর করে নিয়ে গেল তার বাড়ী শিলঙে। অন্য কেউ হলে প্রত্যাখ্যান করতাম। কিন্তু কমলেশের কাছে জোর খাটেনা। কারণ শুধু এই নয় যে কমলেশ আমার আজীবন স্কুলে-পড়া বন্ধু, আই, এস, সি-টাও একসংগে পড়া। তারপর অবশ্য ও গেল মেডিকেল লাইনে—আর আমি নিলাম কমার্সের লাইন। পরে ও চলে গেল বিলেতে। আর আমি কর্মজীবনের কুম্ভীপাকের তাগিদে তখন তলিয়ে যাচ্ছি। সুতরাং অনেকদিনের অসাক্ষাতে ভাটা পড়ে গিয়েছিল দু'জনের মধ্যে অনিচ্ছাকৃতভাবে। কিন্তু ওর কথা মেনে নিয়ে ওর কাছে আত্মসমর্পণ করার পেছনে আছে আরো একটি কারণ। কারণ কমলেশের কাছে আমি লজ্জিত। আর সেটা এইজন্য যে কমলেশের বিয়েতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারিনি আমি। যদিও সে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছিল, তবুও আমাকে একটা চাকরীর ইণ্টারভিউ দিতে চলে যেতে হয়েছিল দিল্লীতে। তারপর আর কোলকাতায় এসে দেখা হয়নি। কারণ এসে শুনলাম একটা ডাক্তারী চাকরী পেয়ে আর্মিতে সে নাকি চলে গেছে—শিলঙে। আশ্চর্য্য লেগেছিল। বাড়ী, ঘরদোর,

কোলকাতায় তার বাবা, মা; পৈতৃক অতো বড়ো ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ চলে গেল কেন?

যাক্, কোলকাতায় এসে যে লজ্জায় ওর কাছে মুখ দেখাতে পারছিলাম না সেটার হাত থেকে অন্ততঃ রেহাই দিল ও শিলঙে চলে গিয়ে।

চিঠি লিখে ওদের বিবাহিত জীবনে শুভ কামনা জানালাম। আর ক্ষমা চেয়ে নিলাম ওদের বিবাহ অনুষ্ঠানে আমার অনিচ্ছাকৃত অনুপস্থিতির জন্যে।

চিঠির উত্তরে কমলেশ দু'একটা অবান্তর কথার সংগে লিখেছিল, "তোর মত হতচ্ছাড়া যে হয়তো আমার বিয়েতে আসতে পারবে না এটা আমি আগেই অনুমান করেছিলাম। কারণ যে ছেলে নিজের বিয়ের ভয়ে বাড়ী থেকে হাওয়া হয়ে যায়, তার স্থিরতা সম্বন্ধে আর যাই হোক্, আমার কোন আস্থা রাখা উচিত নয়। যাক্‌গে, না হয় বিয়ের দিন উপস্থিত নাই ছিলি। চিঠি যে লিখেছিস্, মনে করি তাই আমার ভাগ্য। আশা রাখছি যে অন্ততঃ একবার ভুল করে- শিলঙে চলে আসবি। তবে দয়া করে আসবার আগে একছত্র লিখে জানাস্।"

তাই সেই কমলেশই জোর করে যখন নিয়ে যেতে চাইল ওর গাড়ী করে গৌহাটি থেকে শিলঙে, তখন "তথাস্তু" না বলে পারলাম না।

কমলেশের সংগে আমার যে পরিচয় বহুদিনের তা' আগেই বলেছি। কিন্তু ওখানে এসে আরো দু'টি নতুন প্রাণীর সাথে পরিচয় হল। একজন কমলেশের স্ত্রী শান্তা, আর অন্যজন ছ'বছরের ফুটফুটে ছেলে খোকন। না, বাবার মতনই রূপ পেয়েছে, আর মা'র মতন চোখ।

শান্তা বৌদির সংগে প্রথম পরিচয়ে শুধু এ'টুকুই মনে হয়েছিল সে শান্তাবৌদি সুন্দরী। কমনীয় মুখের ওপর একজোড়া কাজল কালো ভাসা-ভাসা চোখের দৃষ্টি নব-পরিণীতা বধূর সলজ্জ দৃষ্টির সংগে বুদ্ধিদীপ্ততায় সমুজ্জ্বল মনে হয়েছিল। কিন্তু শান্তা বৌদিকে আরো বেশী মনে হয়েছিল তাঁকে সংসারে কর্মব্যস্ততার চিত্রের সঙ্গে জড়িয়ে আর আজ এ'দিন' বাদে শান্তা বৌদিকে অপূর্ব মনে হল এই চিঠিটার মধ্যে দিয়ে তার পূর্ণ আলেখ্য দেখতে পেয়ে।

কিন্তু সে কথা যাক্। সেদিনের শান্তা বৌদির সেই আলেখ্যর সংগে জড়িয়ে রয়েছে আমার এই আখ্যান। সেদিন কমলেশের সংগে একলা বেড়াতে বেড়াতে বলে ফেল্লাম কথাটা—"হ্যাঁরে, তোর মানে,—ইয়ে—"

"কিরে তুই তো কখনো এত ফরম্যালিটি করতিস না আগে"—কমলেশ বলে।

"না মানে একটু ব্যক্তিগত"—একটু দ্বিধা করে বলি।

"তা হলে বলে ফেল্। আর বেশী দেরী করিস না। জানিসই তো ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমি চিরদিনই কি রকম ইন্টারেস্টেড্"—কমলেশ বলে।

সুতরাং বলে ফেলি—"একটা গুজব শুনেছিলাম—তোদের বিয়ের ব্যাপার নাকি একটা রোমান্টিক মেলোড্রামা?"

কমলেশ বোধহয় একটু চমকালো। না হয় আমারই চোখের ভুল। আস্তে আস্তে বল্ল—"রোমান্টিক মেলোড্রামা।" হাসলো একটু। আমার দিকে তাকিয়ে বল্ল—"হ্যাঁ, ওরকম একটা গুজব আমিও শুনেছি। দূর থেকে দেখলে ওরকমই মনে হয় অবশ্য। দোষ দেওয়া যায়না একদম। নিজেরও মাঝে মাঝে ও চিন্তা পেয়ে বসে। থাক্, এ'কথা আজকে আর নতুন করে আলোচনা করার সময় নেই। তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরি চল্। ওরা সব রেডি হয়ে রয়েছে। আজকে বের হতে হবে এ্যালিফ্যান্ট ফলস্ দেখ্‌তে"। বাড়ীর দিকে পা ফেলি দু'জনে।

দু'একদিন কেটে গেল দেখ্‌তে দেখ্‌তে হাওয়ায় ভাসা শরতের মেঘের মতো। যাবার তাড়া এসে পড়লো কাজের শহর থেকে। দু'দিন সবুর জানিয়ে থাকবার অবাধ্য ইচ্ছাটাকে মনের মধ্যে চেপে রাখতে হল সরকারী চাকরীর পরাধীনতার কাছে। সুতরাং কমলেশকে জানালাম, আর জানালাম কমলেশ গৃহিণীর কাছে।

অনিচ্ছাকৃত অনুমতি পেলাম কর্মস্থলে ফিরে যাবার। শিলং ছেড়ে যাবার শেষ দিনটি এসে উপস্থিত হল। আজই শিলঙের জ্যোৎস্নাঝরা শেষ রাত্রি। কালই ভোরে চলে যাচ্ছি গৌহাটি-কোলকাতাগামী প্লেন ধরবার জন্য।

রাত্রের খাওয়া শেষ হয়ে যাবার পর আমি আর কমলেশ দু'জনে এসে বসলাম ড্রইংরুমে। দু'জনে দু'টো সিগ্রেট ধরিয়ে তাকিয়ে রইলাম কাঁচের সার্সির ভেতর

দিয়ে জ্যোৎস্নাঝরা পাইন বনের দিকে। স্পন্দন জাগিয়ে যায় হিমেল হাওয়া পাইনের বুকে।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কমলেশ বলে ওঠে—"মানুষের এই জীবনটা একটা প্রহেলিকা—একটা অদ্ভুত জগৎ। আমরা প্রতিজন যাপন করে যাচ্ছি আমাদের প্রতিদিনের নিয়মমাফিক কাজ দুনিয়ার অফিসখানায়। কিন্তু আশ্চর্য্য কি জানিস্—আমরা নিজেরাই জানিনা আমাদের পর মুহূর্তে কি ঘটবে—জানিনা আমাদের ভবিষ্যৎ। যদি জান্‌তো মানুষ, তো জীবনরহস্যটা হয়তো অনেক সহজ হয়ে যেত। অবশ্যম্ভাবিটা হয়ে উঠ্‌তো হাস্যকর মিথ্যা। আর অসম্ভবটা হয়ে উঠ্‌তো হয়তো অনায়াসলব্ধ। অথচ কত সামান্য একটা ব্যাপারই ওলটপালট করে দিতে পারে সব।"

আমি ওর দিকে ফিরে তাকাই। প্রশ্ন করি—"যেমন ?"

"যেমন একটা দাগ"—সিগারেটের ধুঁয়োটা ছেড়ে কমলেশ বলে ওঠে—"একটা ছোট্ট আঁচড়, সুশীল রায় সুনন্দা বোস আর কৃষ্ণা গুহর জীবনপথকে অদ্ভুতভাবে পরিবর্ত্তিত করে দিল এক নূতন পথে।"

আমি সোজা হয়ে বসি। অলসভাবে ইজিচেয়ারটাতে শরীর এলিয়ে দিয়ে কমলেশ বলতে আরম্ভ করে······

* * *

সুশীল বসেছিল তার ঘরে। ভ্রূ কুঞ্চিত করে ইলেকট্রিক ওয়ালক্লকটার দিকে তাকিয়ে ভাবছিল—না, আজ আর যাওয়া হয়ে উঠলে'না। এত দেরী করছে।

খট্ খট্ খট্ লঘু পায়ে জুতোর শব্দ উঠলো সিঁড়ি দিয়ে। এ পায়ের শব্দের সংগে সুশীল পরিচিত। সুশীল নিজের বুকের স্পন্দন শুন্‌তে পেল। কিন্তু, না, ওকে সাজা দিতে হবে। সুশীল সোফাটায় গা এলিয়ে দিয়ে মট্‌কা মেরে পড়ে থাকে।

জুতোর শব্দটা ঘরের ভেতর এসে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। সুশীল ভয় পেয়ে গেল। তবে কি চলে গেল! চোখ চাইবে নাকি ?

না, ঐ খুব কাছেই আবার খস্‌খস্ শব্দ শুনতে পেল। মিষ্টি ল্যাভেণ্ডারের গন্ধটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো। একটা কোমল হাতের আলতো স্পর্শ পেল ওর কপালে।

না, এখনো সুশীল চোখ চাইবেনা। শাস্তি ভোগ করুক ও দেরী করে আসার।

ফিস্‌ফিস্ করে বেজে উঠ্‌লো—"সু—এই - সু, আমি এসেছি। লক্ষ্মীটি উঠে পড়ো।"

সুশীল তবু নিশ্চল। একটু স্তব্ধতা। তারপর উষ্ণ নিঃশ্বাস পড়লো সুশীলের মুখের অতি নিকটে।

না সুশীল আর চুপ করে থাকতে পারেনা। অস্থির হাতে আরো কাছে টেনে নিয়ে আসে একটি কমনীয় মুখকে।

কিছুক্ষণ পরে সুশীল রায়ের ডি-সোটো গাড়ীটা দেখতে পাওয়া যায় মধ্যমগ্রামের একটা বাগান বাড়ীর সামনে অপেক্ষা করতে। আজকের পিক্‌নিকের অংশীদার কেবল দু'জন—সুশীল আর সুনন্দা। আজকের গোধূলীর রঙিন মুহূর্ত্তটুকুকে মনের রঙে নিংড়ে উপভোগ করবে শুধু তারা দু'জনে।

সুশীল রায় আর সুনন্দা বোসের অবশ্য তা' করবার অধিকার আছে। আর সে অধিকারটুকু মেনে নিতেও রাজী হয়েছেন সুশীল রায় আর সুনন্দা বোসের পিতা-মাতা। সদ্য বিলেত ফেরৎ ডাক্তার সুশীলের হাতে নিজের একমাত্র কন্যা সুনন্দাকে সমর্পণ করতে সুনন্দার ইনজিনিয়ার পিতা সানন্দে সম্মত। সুশীলের পিতামাতার দিক থেকেও কোন বাধা আসেনি। শিক্ষিতা আলোক-প্রাপ্তা এমন একটি সুশ্রী মেয়েকেই যেন তাঁরা খুঁজছিলেন আপন করে নেবার জন্য তাঁদের বিলেত ফেরৎ ছেলের সংগে। তাঁদের এই অভিলাষের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেবার ব্যবস্থা তাই করা হচ্ছে আর মাত্র দু'মাস পরে। ইতিমধ্যে মিশুক না দু'জনে। দু'জনের মেলামেশায় আরো জেনে নিক দু'জনে দু'জনকে। আপনার করে নিক নিজের রঙের স্পর্শে। বলা তো যায়না—আধুনিক ছেলেমেয়ে তো! নিজস্ব একটা মতামত আর বিচারও তো আছে।

কিন্তু সুশীলের দিক থেকেও কোন আপত্তি শোনা যায়না। তাই শুভদিনটি ধার্য্য করার ব্যবস্থা করা হয়।

সন্ধ্যা হয়ে আসে। শীতের সন্ধ্যার সংগে কুয়াশার

আস্তরণ নেমে আসে ধরিত্রীর দেহটিকে ঘিরে ধীরে অতি ধীরে শিশির বিন্দুর মত।

গাড়ীতে এসে ওঠে সুশীল আর সুনন্দা। সুনন্দা ষ্টীয়ারিঙে হাত রেখে বলে—"আমি চালাব।"

সুশীল বলে—"থাক্‌না। সন্ধ্যা হয়ে গেল। কুয়াশাও নামছে। আজ না হয় থাক্। আমিই চালাই।"

তড়িৎস্পৃষ্টের মত হাত সড়িয়ে নিয়ে সুনন্দা বল্ল—"থাক্। জানা আছে কত তুমি ভালোবাস আমায়। নাহয় ভালো গাড়ী নাই চালাতে জানি। তা'বলে এই ফাঁকা রাস্তায় তোমার নতুন গাড়ীটা একটু চাল'লেই কী এমন ভীষণ অপরাধ হবে?"

সুশীল একবার শেষ চেষ্টা করে—"নন্দা, লক্ষীটি, রাগ করোনা। এত ঘন কুয়াশা যে আমিই ভালো করে দেখ্‌তে পারছিনা। তাই বলছিলাম—"

"থাক্। বুঝেছি। তুমিই চালাও।" সুনন্দা দূরে সড়ে গিয়ে বসলো।

অগত্যা সুনন্দাই শেষে ষ্টিয়ারিং নিয়ে বসলো।

গাড়ী চলতে সুরু করলো। কলহাস্যে আনন্দে চীৎকার করে সুনন্দা বল্ল—"এই জন্যেই 'সু' তোমাকে এত ভালো লাগে।"

কিন্তু যা' ভাবছিল সুশীল সেটাই শেষ পর্য্যন্ত ঘটলো। দমদম এয়ার পোর্টটার কাছটাতে এসে হঠাৎ সুনন্দা চীৎকার করে উঠলো।

গাড়ীর বাম্পার থেকে মাত্র পাঁচ ছ' হাত দূরে কুয়াশার আচ্ছাদনে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি।

চকিতে তাকিয়ে দেখে গাড়ীর স্পিডোমিটারের কাঁটা চল্লিশের ঘরে। সুনন্দার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

ভাববার সময় নেই।

এক ধাক্কায় সুনন্দার হাতটা ষ্টিয়ারিং থেকে সড়িয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে ষ্টিয়ারিংটা ঘুরিয়ে দিয়ে সুশীল তখন ব্রেকটার সবটুকু পা দিয়ে চেপে দিয়েছে।

একটা ভীষণ ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ীটা একদিকে কাৎ হয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

উইংগ্‌স্ গ্লাসটা দিয়ে সুশীল কোন রকমে বাইরে তাকিয়ে দেখে অনতিদূরে পাশে একটা কেউ পড়ে যাচ্ছে। হয়তো নামতে যাচ্ছিল। কিন্তু ততক্ষণে সুনন্দা অ্যাক্সিলেটর টিপে দিয়েছে। গাড়ীটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে আবার চলতে সুরু করলো।

"গাড়ী থামাও। নেমে গিয়ে দেখি কি হয়েছে"—সুশীল বলে।

"পাগল, তুমি কি ক্ষেপেছো? কেউ দেখে ফেল্লে রাস্তায় থামলে আর রক্ষ রাখবে না কি? ভাগ্যিস্ যায়গাটার আশেপাশে বেশী কেউ ছিলনা"—সুনন্দা ভীতত্রস্ত কণ্ঠে বলে।

"তবুও আমি ডাক্তার। যদি কিছু হয়ে থাকে আমাকে এক্ষুনি দেখতে হবে"—সুশীল বলে।

"দোহাই 'সু'—আমায় যদি এতটুকু ভালোবাস তবে ত' করতে পারবে না। তুমি কি ঐ কতকগুলো ক্ষ্যাপা উন্মত্ত লোকের সামনে আমাকে শাস্তিভোগ করতে তুলে দিতে চাও? না, না, তা' কক্ষণো হবেনা। তা' ছাড়া ব্যথা বেশী লাগেনি আমি বলছি। কারণ গাড়ীটা আমাদের ব্রেক দেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই থেমে গিয়েছিল"—সুনন্দা বলে।

সুশীল আর একবার ব্যর্থ অনুনয় করে।

অবশেষে গাড়ী এসে পৌছায় কোলকাতায় তাদের বাড়ীতে। সারাপথ সুশীল কোন কথা বলেনা। একটার পর একটা সিগরেট টেনে যায়। সুনন্দাকে তার বাড়ীতে নামিয়ে দেয়। গাড়ী থেকে নামবার সময় সুনন্দা ওর কাছে সরে আসে। সুশীলের হাতটা নিজের হাত দুটোর মধ্যে নিয়ে বলে—"প্লিজ। আজকের ঘটনাটা আর কাউকে বলে বসোনা। লক্ষীটি, যেটা হয়ে গেছে সেটা তো আর কেউ ইচ্ছেকরে করেনি। সুতরাং ওটার কথা মন থেকে মুছে ফেল"—জিজ্ঞাসুত্রস্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকায়।

সুনন্দার চোখে চোখ রাখে সুশীল। তারপর হাতে একটু চাপ দেয়। গাড়ী ছেড়ে দেয়।

* * * *

কিন্তু সব জিনিষ কি জীবনে ভুলতে চেষ্টা করলেই ভোলা যায়? জীবনচলার পথে যে জিনিষ একবার মনের কোমল তন্ত্রে আঘাত হেনে যায়, আগামী জীবনের চলার পথে এগিয়েও বারবার কখন আনমনে তার স্মৃতি ফিরে

আসে মনের দুয়ারে। মনের গোপনে আবার ওঠে আবর্ত্তন। ডাক্তাররা বলে, স্নায়বিক দুর্বলতা, আর মনস্তাত্ত্বিকেরা বলে কি ?

যাক্‌গে, যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম।

সুশীলও ভুলতে চেয়েছিল সে রাত্রির ঘটনা কিন্তু ভুলতে পারে নি।

সারারাত্রি নিজের সংগে যুদ্ধ করেছে। পারেনি। ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। কিছুতেই যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারেনি নিজেকে।

কেন সে ফেলে এল একজন আহাতকে নিরাশ্রয়ে পথের মাঝে? নাই বা সে নিজে গাড়ী চালাক। তবুও সে ডাক্তার। কেন নেমে যাযনি সে আহতের কাছে? লোকের হাতে নিপীড়ন বা অপমান কি তার সামান্য মনুষ্যত্ববোধকেও নিভিয়ে দিল? কি হবে যদি লোকটা মারা যায়? সারারাত ঘুমোতে পারে না সুশীল। সকালবেলা তাড়াতাড়ি স্নান করে খেয়েই বেড়িয়ে পড়ে হাঁসপাতালে। একদিনেই চোখের কোলদুটোতে কালি জমে যায়। কিন্তু হাঁসপাতালে বোধহয় আরো বিস্ময় জমা করা ছিল।

সিনিয়র ডাক্তার মিঃ অধিকারী সুশীলকে ডেকে বল্লেন যে কাল রাত্রিতে একটি মেয়ে মোটর এ্যাক্সিডেন্টে এমার্জেন্সীতে এসে উঠেছে। আজ কি রকম আছে তা' দেখে আসতে হবে সুশীলকে। সুশীল চমকে ওঠে।

ডাঃ অধিকারী বল্লেন—"কী হল?"

সুশীল জানায়—"না, স্যার, এমনি। আচ্ছা স্যার, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?"

ডাঃ অধিকারী সুশীলের দিকে তাকালেন। সুশীল কোন রকমে বল্ল—"আচ্ছা স্যার, এ্যাক্সিডেন্টটা কোথায় হয়েছিল?"

'দমদমেই হয়েছিল বলে তো জানালো"—ডাঃ অধিকারী জানান।

সুশীলের কানের পাশটা গরম হয়ে ওঠে। দুটো হাত দিয়ে সামনের টেবিলটা ধরে ফেলে।

ডাঃ অধিকারী জিজ্ঞেস করেন—"কি হে রায়। You look sick. Go and take some rest in your room. I think you need that. ঘুমটুম হয়নি নাকি ভালো?"

সুশীল কোনরকমে নড্‌ করে ঘর থেকে বেড়িয়ে যায়।

নিজের ঘরে গিয়ে সুশীল চুপচাপ করে কিছুক্ষণ বসে থাকে। তারপর বাথরুমে গিয়ে জলটল মুখে দেয়। তারপর ষ্টেথিস্কোপটা গলায় জড়িয়ে চলে এমার্জেন্সী ওয়ার্ডে।

কোণের দিকের বেডটায় শুয়ে আছে। দেখা সাঙ্গ হল। হাতটা ব্যাণ্ডেজ করা আছে। মনে হল রিষ্টের হাড়টা ডিসলোকেটেড্‌ হয়ে গেছে। মুখেও একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আছে। পড়ে যাওয়ায় মুখের একদিকটা কেটে গেছে। একটা ষ্টিচ্‌ করে জায়গাটা ব্যাণ্ডেজ করে রাখা হয়েছে। টেম্পারেচার বেশী নেই। আর সব নর্ম্যাল।

শুধু নর্ম্যাল হতে পারছেনা সুশীল। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মুখের মধ্যে খোলা দুটো কাজল কালো ক্লান্ত অসহায় চোখের দৃষ্টি ওকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলছে নিজের মনের কাছে। নিজেকে ও ক্ষমা করতে পারবে কি?

রিপোর্ট থেকে জানতে পেরেছে যে মেয়েটি একটি রেফিউজি মেয়ে। দমদমের কাছে কলোনীতে থাকে। আর্থিক অবস্থা এমন নয় যাতে আরো দু' একদিন হাঁসপাতালে রাখতে পারে ওর বাড়ী থেকে। কিন্তু থাকা ওর দরকার, সুশীল বোঝে।

একটু ভাবে। তারপর মন ঠিক করে ফেলে, না নিজেই সুশীল তুলে নেবে মেয়েটির ব্যয়ভার। ওয়ার্ড-ইনচার্জকে গিয়ে বুঝিয়ে বলে সে মেয়েটির যে ক'দিন দরকার ওকে হাঁসপাতালে রাখা হোক্। ওর যা চার্জ হবে তা' সুশীল দিয়ে দেবে। তবে যেন মেয়েটিকে এ' ব্যাপারে না জানানো হয়। হ'তো আপত্তি করতে পারে।

ওয়ার্ড'ইন-চার্জ মুচকি হাসেন একটু। তারপর বলেন—"দেখুন সুশীলবাবু, মেয়েটি কি আপনার কেউ হন?"

সুশীল অনুভব করে কানের পাশটা লাল হয়ে উঠেছে।

"না", সুশীল জানায়—"তবে এ'রকম অবস্থায় তো ওঁকে এ'রকম ভাবে ছেড়ে দেওয়া যায়না। আর্থিক

অবস্থা ভাল থাকলে ওঁর বাড়ী থেকে ওঁকে নিশ্চই রাখতো বেশ কিছুদিন। তা যাই হোক। এই পোড়া দেশে কেউ যদি কারো'র একটু উপকার করে তাতে আশা করি কারোর আপত্তি থাকতে পারেনা।"

একটু অপ্রস্তুত হয়ে ওয়ার্ড ইন-চার্জ বলেন "না, না, আপত্তি কি? সত্যিই মেয়েটিকে যে রকম আন্ আইডেন্টিফায়েড্ একটি কার্ ধাক্কা দিয়ে ফেলে পালিয়ে গেল, তা' কেবল বোধহয় আমাদের দেশেই সম্ভব। যাক্ আপনি যখন ওঁর ভারটা তুলে নিচ্ছেন তখন সত্যি ভাল কথা।"

"আন্ আইডেন্টিফায়েড কার!" আজ যদি মানুষের চোখ দু'টো শুধু মানুষের চামড়া ছুঁয়ে না গিয়ে তার ভেতরটাও দেখতে পেত, তা'হলে বড় সুন্দরকেও নগ্ন, কুৎসিত দেখাতো। ওয়ার্ড ইন্‌চার্জ আজ কেবল আমার অমূল্য উপকারটুকুই দেখলেন মনে মনে বলে সুশীল। কিন্তু যে ক্ষতিটা আমি মেয়েটির করেছি সেটার হিসেব তো তিনি মেলাতে পারলেন না। ওঁর কি দোষ! জগতের হিসাবখানায় প্রতিদিনের হিসেব মেলাতে পারেনি বোধহয় আজ পর্যন্ত কেউই।"

বিকেলের দিকে ওয়ার্ডটা ভিজিট করতে গেল যখন সুশীল, তখন মেয়েটির বেডের পাশে একটি ভদ্রমহিলার, একটি দশ এগার বছরের ছেলে, আর সাত আট বছরের একটি মেয়েকে দেখতে পেল।

একে একে সব বেডগুলো ঘেরে সুশীল গিয়ে দাঁড়াল মেয়েটির বেডের পাশে। রিপোর্টটা দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করলো—"এখন কেমন আছেন? কোনরকম কষ্ট হচ্ছে না তো?"

মেয়েটি ওর দিকে চোখ তুলে তাকালো। তারপর মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

পাশে বসা সেই ভদ্রমহিলাটি বলে উঠলেন—"কৃষ্ণা ভাল হয়ে উঠবে তো ডাক্তারবাবু?

"কৃ—ষ্ণা" নামটা জানতে পারলো সুশীল। "হ্যাঁ, ভয়ের কিছু নেই।"

"এই, দুষ্টুমি করে না খোকা,"—ভদ্রমহিলাটি বলে ওঠেন।

[illegible]

রাখা থার্মোমিটারটা তুলে দেখতে গিয়েছিল। সুশীল সস্নেহে কাছে ডাকে—"এস খোকা, কি নাম তোমার?"

খোকন সড়ে গিয়ে ভদ্রমহিলাটির কাছে দাঁড়ায়। ভদ্রমহিলাটি বলেন—"ওর নাম খোকন। আর মেয়েটির নাম নীপা। আমি কৃষ্ণার বৌদি হই। আর ওরা আমারই।"

পরে আরো আলাপ হল। জানতে পারল সুশীল যে কৃষ্ণার বাবা নেই। ওর দাদা একটি ফার্মের লোয়ার ডিভিসন ক্লার্ক। সুতরাং কৃষ্ণাকেও যোগাতে হয় সংসারের কড়ি। গানের গলা পেয়েছিল কৃষ্ণা। তাই ধরে-করে টিউশনি জুটেছে দু'একটা। ওর মতো ম্যাট্রিক পাশ রেফিউজী মেয়ে গলা আর রূপ সম্বল নিয়ে কোল-কাতার মত মহানগরীতে ইজ্জত বেচা ছাড়া ওর চেয়ে বেশী রোজগার করার প্রশ্ন ওঠেনা—একথাটা কৃষ্ণা জানে। তাই সে চেষ্টাটা ও ছেড়ে দিয়েছে।

সেদিন ও ফিরছিল সন্ধ্যেবেলা শ্যামবাজার থেকে একটা টিউশানি সেরে। কিন্তু বাস থেকে নেমে একটু এগোবার পরেই ঐ বিপত্তি।

অনুশোচনায় বিদ্ধ সুশীল জানাতে চেয়েছিল অনুযোগ। রুদ্ধ বেদনায় সেটা আরো আন্তরিকতার ভাষা পেয়েছিল।

"আপনি অযথা হয়তো গাড়ীর আরোহীকে দোষ দিচ্ছেন। আমারই দোষ হয়েছিল অমন কুয়াশায় অন্যমনস্ক হয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটায়।"

তবুও সুশীলের মন প্রবোধ মানেনি। মানতে পারেনি—যদিনা সে জানতো যে দোষের ভাগটা কতখানি তার নিজের।

জিজ্ঞেস করলো—"আপনি কি দেখতে পেয়েছিলেন গাড়ীতে কারা ছিলেন?"

সমস্ত পৃথিবীটা দুলছে ওর চোখের সামনে কৃষ্ণার উত্তরের উপর।

"না, খেয়ালই করিনি। আর খেয়াল যদি করবোই তো, গায়ে ধাক্কাই বা লাগবে কি করে?"

সুশীলের চোখে পৃথিবীটা আবার স্থির হয়ে গেল আগের মত।

যাক একটা সান্ত্বনা। ভগবান লজ্জার হাত থেকে

বাঁচালেন সুশীলকে। আর এই কথাটাই সুশীল বলছিল সুনন্দা কে, হাঁসপাতাল থেকে ফিরে সুনন্দার ড্রইংরুমে বসে।

সুনন্দা বল্ল—"হাউ ফানি! একটা রেফিউজি গার্ল নিজের অনাবধানতায় রাস্তা চলতে ধাক্কা খেয়েছে। তাও তো মরেনি! আঘাত লেগেছেও সামান্য কেবল হাতের হাড় সরে গেছে। তার জন্য এত! ও সমস্ত 'সিলি' ভাবনা রেখে দাও। আজকের সন্ধ্যেটা নষ্ট করোনা। মেট্রোতে আজকে নিয়ে যাবে বলেছিলে না সন্ধ্যেরশো'তে, চল এক্ষুনি।

সুশীল আনমনা প্রশ্ন করে "কি বই?" সুনন্দা উত্তর দেয়—"আশ্চর্য্য! এর মধ্যেই ভুলে গেলে? The Last Hunt."

সুশীল একদৃষ্টে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সুনন্দা বলে—"কি বল আবার?"

"না, কিছু না, চল।"

সিনেমা শেষ হয়। শো'র পর গাড়ীতে আসতে আসতে সুনন্দা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠে—"অচ্ছা, রবার্ট টেলর যে সিনটায় ষ্টুয়ার্ট গ্র্যানজারের সঙ্গে পাশাপাশি বন্দুক নিয়ে অতগুলো বাফেলোকে গুলি করে একটার পর একটা মেরে ফেল্ল— ওটা বীভৎস লাগেনি তোমার?"

সুশীল চুপ করে গাড়ী চালিয়ে যায়।

সুনন্দা বলে—"কি হল, আমার প্রশ্ন শুনলে?

সুশীল বলে—"হু, তা' বটে। কিন্তু কোন্ সময় সিন্‌টা দেখিয়েছে তা ভাবতে চেষ্টা করছি।"

"তার মানে কিছুই দেখনি তুমি বইটার। এ'রকম ক্লাইম্যাক্স সিন্ যে মনে করতে পারোনা···। যাক, আমাকে বাড়ী নামিয়ে দিয়ে যাও। আর শোনো, ইচ্ছে না হলে কোনদিন আর সিনেমায় যেতে হবে না দয়া করে আমার অনুরোধে।"

সুশীল অনুতপ্ত হয়। না জেনে হয়ত কখন আঘাত দিয়ে ফেলেছে সুনন্দার মনে। তাই বলে—"নন্দা, ভুল বুঝোনা। আজ সন্ধ্যায় হাঁসপাতাল থেকে ফিরে মাথাটা ধরেছিল। তাই হলে গিয়ে ছবিতে মন বসাতে পারিনি।"

সুনন্দা কথায় বাধা দিয়ে বলে, "হবেনা, সারাক্ষণ যদি হাঁসপাতালের ডিউটী খেটেও যেচে একজন রোগীর ভার তুলে নাও, তা' শরীরের আর দোষ কি ক্লান্ত হতে?"

সুশীল বলে, "তুমি ঠিক বুঝছোনা। আরো তো দু'এক দিন আছে ও আমাদের হাঁসপাতালে। এ'ক'দিন একটু দেখাশোনা করে নি। নিজের মনটা অন্ততঃ দুর্ঘটনার গ্লানি থেকে মুক্ত হোক্। তারপর একদম 'ফ্রি'। তখন কেবল তুমি আর আমি। যেখানে যেতে বলবে—এমন কি জাহান্নমে যেতে বল্লেও—at your service."

"যাও তুমি একটা বাচাল।"

* * * *

কিন্তু যত সহজ ভেবেছিল তত সহজে ফ্রি হতে পারলোনা সুশীল। হাতটা ঠিক হয়ে গেলেও কৃষ্ণার মুখের কাটা তখনো জোড়া লেগে গেলনা পুরোপুরি। যা হোক্ গালের একদিকে একটা প্লাষ্টার লাগিয়ে রেখে ওকে 'রিলিফ' করে দিল হাঁসপাতাল।

সুশীল পৌছে দিতে চেয়েছিল গাড়ী করে। কৃষ্ণার দাদা বৌ'দিও তাই ভালো মনে করেছিল। কিন্তু কৃষ্ণা রাজী হলনা। বল্ল—"থাক্, আপনাদের এমনিই অনেক কষ্ট দিয়েছি হাঁসপাতালে থেকে। আপনার সুপারিশে ফ্রি বেডে থেকে যে ঋণটুকু আপনার কাছে রেখে গেলাম আমরা সেটাকে আর বাড়াবার চেষ্টা করবোনা।"

সুশীল বল্ল—"উঁহু, একটু ভুল করলেন। যে ঋণটুকু আপনি আমার কাছে করেছেন্ বলে স্বীকার করছেন ওটা ঐটুকু মৌখিক স্বীকারোক্তিতে শোধ দিলে তো চলবেনা।"

"তবে!" বিস্ময়াবিষ্ট কৃষ্ণা জিজ্ঞেস করে।

"গান শোনাতে হবে একদিন।"

"গান!"—কৃষ্ণা ওর চোখের দিকে তাকায়।

"হাঁা," আপনার দাদা বৌদির কাছে আপনার গানের অনেক প্রশংসাই শুনেছি।

কৃষ্ণা হেসে বল্ল—"জানেন তো, আপন লোকেরা নিজেদের কানা ছেলেকেও পদ্মলোচন আখ্যা দেয়।"

"হুঁ, তা, দেয় বটে। কিন্তু সময় সময় সত্যিই পদ্ম-চোখ হয়। সে যাই হোক্, কবে শোনাচ্ছেন বলুন"—সুশীল বলে।

কৃষ্ণা এক মূহূর্ত্ত ওর মুখের দিকে তাকায়। তারপর বলে—"বেশতো, আসুন না এক দিন অবসর সময়ে। কিন্তু

বেশীক্ষণ থাকতে পারবেন না হয়তো। গানের চোটে পালাতে না হয়।

ওরা সকলে একসঙ্গে হেসে ওঠে।

দিন দুই মনটাকে বেশ হাল্কা বোধ করে সুশীল। ভারমুক্ত হয় যেন সুশীল। চপল চঞ্চলতায় দিনগুলো ভরে ওঠে সুনন্দার সাহচর্য্যে। দুই বাড়ীর পিতামাতা ব্যস্ত হন এবার দুটো হাত জোড়া করে দেবার তোড়জোড় করতে।

ঠিক এমন সময় ডাঃ অধিকারী সব ওলট পালট করে দিল। আরো স্পষ্ট করে বলা যাক্।

"রায়, ভাল কথা"—কথাপ্রসঙ্গে হাঁসপাতালে বল্লেন ডাঃ অধিকারী, "তোমার সেই পেসেণ্টটি যে এ্যাক্সিডেণ্টে ইনজিওর্ড হয়েছিল, সে এসেছিল কাল একবার তার মুখের ষ্টিচ্‌টা দেখাতে।

সুশীল তাকিয়ে থাকে।

"ওয়েল, উণ্ডটা শুকিয়েছে; কিন্তু আই ফিয়ার কাটা দাগটা বোধহয় 'হিল আপ,' হবেনা। the young lady shall have to bear the cruel mark of the accident,"

একটা অপারেশন ছিল। কোনরকমে অশান্ত মনটাকে শান্ত করে শেষ করলো সুশীল তার কাজটা। তারপরেই গাড়ী নিয়ে ছুটলো কৃষ্ণাদের বাড়ীর দিকে। আগে কখ না আসেন যদিও, তবু ঠিকানা লেখা থাকায় ঠিক খুঁজে বের করলো ওদের বাড়ী। দমদমের পোলটা থেকে বেশী দূরে নয়।

সুশীল যখন পৌছায, তখন কৃষ্ণা বেরিয়ে গেছিল একটা টিউশনিতে। দাদাও তার অফিসে। তবে কৃষ্ণার বৌদি ছিলেন। আর ছিল তাঁর ছেলেমেয়েরা। একটু পরেই কৃষ্ণার দাদা ফিরে এল অফিস থেকে।

কিন্তু কৃষ্ণার ফিরতে সন্ধ্যে সাতটা বাজলো। বাড়ীর ভেতর সকলের গলা পেয়ে দোরগোড়া থেকে চীৎকার করলো—"কি বৌদি! মজা হচ্ছে বুঝি সকলে মিলে। লুচি ভাজার গন্ধ পাচ্ছি। বলি আমাকে ফাঁকি দিয়ে নাকি?"

কিন্তু ঘরে এসে সুশীলকে দেখেই জিভ্‌ কেটে সুশীল ওকে দেখে মুচকি হাসলো।

কৃষ্ণার কানের ডগা পর্য্যন্ত লাল হয়ে উঠলো। সামলিয়ে নিয়ে বল্ল—"ওমা, আপনি! কখন এলেন? একটা খবর দিতে হয় তো?"

"হুঁ, খবর দিলেই হতো আর কি! যে রকম লুচি ভাজার প্রতি আপনার লোভ, আমার বরাতে লুচি খাওয়া আর হোত না বোধহয়।"

হাসির রোল ওঠে।

গল্পগুজবে কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর সুশীল অনুরোধ করে কৃষ্ণাকে গান শোনাতে। প্রথমে আপত্তি করলেও শেষ পর্য্যন্ত গাইতে বসতে হয়।

না, গলা আছে সত্যি কৃষ্ণার—স্বীকার করে মনে মনে সুশীল। বিকাশের সম্ভাবনা থাকলে আজ আর কলোনীর ছই দেওয়া ঘরে থাকতে হোত না। কিন্তু ভাগ্য যাকে বিরূপ করেছে, নির্বাসন দিয়েছে আপন ঘর থেকে বাইরে—পূর্ববাংলার স্নেহময় কোল থেকে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের দিশাহীন গহ্বরে, তাদের জীবনসঙ্গীতের যে সুর একবার হারিয়ে গেছে তা' কি আবার তারা খুঁজে পাবে?

"কি, ভালো লাগেনি তো? বল্লাম তখন শুনবেন না, পরে আক্ষেপ করবেন। এখন ঠিক হল তো তাই?"—কৃষ্ণা বলে ওঠে।

"আমি ভাবছিলাম কি জানেন? আপনার এত ভালো গলা, অথচ তা এতটুকু সীমার মধ্যে কেন আবদ্ধ থাকছে? আমি ভাবছিলাম যে কেন আপনি নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকবেন? নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করুন।"

আয়ত কালো চোখ দুটীতে ম্লান আভা নেমে আসে। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বল—"আপনি ঠিকই বলেছেন হয়তো। কিন্তু ভুলে যাবেন না যে এই বিশাল নগরীতে আমরা ঘরছাড়া একদল পথিক—নিষ্ঠুর কাল যাদের গায়ে নামাংকিত করে গিয়েছে উদ্বাস্তু বলে। যেখানেই যাই সেখানেই অনুকম্পা পেতে পারি; কিন্তু প্রতিষ্ঠা করবার মত সাহস তো আমাদের নেই।"

সুশীল চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বলে, "কিছু মনে যদি না করেন তো আমি একটা কথা বলতে পারি

কি ?" সকলে ওর মুখের দিকে তাকায়।

সুশীল বলে, "দেখুন, আমার এক বিশিষ্ট বন্ধুর একটা গানের বড় স্কুল আছে। সেখানে বহু ছাত্রছাত্রী গান-বাজনা শিখতে আসে। নামও আছে স্কুলটার যথেষ্ট। আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে, আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি সেখানে। আমার মনে হয় সেখানে আপনার একটা কাজ হবে যাবে নিশ্চয়ই।"

কৃষ্ণা দাদা ও বৌদির মুখের দিকে তাকায়। ওঁরা উৎসাহিত হয়ে বলে ওঠেন—"বেশ তো, এ তো খুব আনন্দের কথা। দেখুননা চেষ্টা করে।"

সুশীল বলে, "তা'ছাড়া একটু নামডাক হলেই আমার কয়েকজন জানা লোক আছেন, তাঁদের থ্রু দিয়ে রেডিওতে একটা ব্যবস্থা করে দেবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।"

কৃষ্ণা কিছু বলেনা। কেবল ভাসা ভাসা উজ্জ্বল চোখ দুটো তুলে ওর দিকে তাকায়।

দিন ঠিক হয়ে যায়। পরের শনিবার কৃষ্ণাকে নিয়ে যাবার জন্য সুশীল এখানে আসবে বলে জানায়।

যাবার আগে সুশীল একবার কৃষ্ণার মুখের ষ্টিচ্‌টা দেখাবার জন্য বলে।

আলোর নীচে এসে সুশীল কৃষ্ণার মুখটা তুলে ধরে। কাটা দাগটা ভালো করে নিরীক্ষণ করতে গিয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করে কখন ও দাগটা ছাড়া কৃষ্ণার মুখে অন্য কিছু যেন ও নিরীক্ষণ করছে। কৃষ্ণাও তার দুই চোখের একাগ্রদৃষ্টি দিয়ে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। সুশীল ওর চোখের দিকে তাকাতেই কৃষ্ণা চোখ নামায়।

"না, অন্যমনস্ক হলে চলবেনা"—সুশীল তার পরীক্ষা শেষ করে। "ভয়ের বা চিন্তার কোন কারণ নেই। কাটা জায়গাটা তো সব শুকিয়েছে। মিলিয়ে যেতে সময় লাগবে আরো কিছুদিন।"

বিদায় নিয়ে গাড়ীতে উঠতে উঠতে সুশীল বলে—"আচ্ছা, ঐ কথা রইল। শনিবার দুপুরে আসছি তা' হলে।"

শেষ পর্য্যন্ত কাজটা হয়ে গেল কৃষ্ণার। সপ্তাহে দু' দিন ক্লাস। শনিবার আর রবিবার। মাইনে সওয়াশো টাকা। অবশ্য ওরা গোড়ার দিকে অত দেয় না। পঁচাত্তর টাকা থেকেই সুরু করে। তবে কৃষ্ণার গানের গলা আর পদ্ধতি দুইই ভালো। আর বিশেষ করে সুশীল যখন রেকমেণ্ড করেছে। সুতরাং...।

যাই হোক্ প্রথমদিন আর ক্লাসটাস্ নিতে হলনা। সুতরাং তাড়াতাড়িই হয়ে গেল ছুটী।

সুশীল বল্ল—"চলুন, যখন তাড়াতাড়িই হয়ে গেল ছুটী, তখন আপনার চাকরী পাওয়াটা সেলব্রেট্ করা যাক্।"

"কি রকম ?"—কৃষ্ণা প্রশ্ন করে।

"গাড়ীতে তো উঠুন"—সুশীল উত্তর দেয়।

চা খেল ওরা আউটরাম ঘাটের দোতলায় রেষ্টুরেণ্টে ডেকে বসে। টাকাটা পে করতে চেয়েছিল কৃষ্ণা। বাধা দিয়েছিল সুশীল—"আজকের বিলটা আমিই দোব। কেননা আমি আজ হোষ্ট্। চাকরী তো হোল, এবার অন্য যে কোন নেমতন্নের জন্য অপেক্ষা করবো বরং।"

মৃদু ভৎর্সনা পূর্ণ দৃষ্টিতে হেসেছিল সেদিন কৃষ্ণা বৈকালিক সূর্য্যের রশ্মির মত। হাসিটা ভালো লেগেছিল সেদিন। কৃষ্ণা শুদ্ধকেও।

কেটে গেল একটা মাস। প্রায় প্রতি রোববার ছুটির দিনে একবার করে গিয়ে আসর জমিয়েছে সুশীল কৃষ্ণাদের ওখানে। আর লক্ষ্য রেখেছে কৃষ্ণার মুখের প্রতি। আশা রেখেছে যদি মিলিয়ে যায় দুর্ভাগ্যের চিহ্নটা। নাহলে চিরজীবন ধরে বহন করে বেড়াতে হবে ঐ ক্ষত নিজের মুখের ওপর। আর তার সঙ্গে বহন করে বেড়াবে সুশীল রায়ের অবিমৃষ্যকারিতার নিষ্ঠুর চিহ্ন। কৃষ্ণা শুধু সুন্দরী হতে পারে, কিন্তু নিষ্ঠুর দুর্ঘটনার চিহ্ন কলংকিত করে গেছে যে মুখকে তাকে যোগ্য মর্য্যাদা দেবে কি কেউ বিয়ের বাজারে ? এ প্রশ্ন অবস্তর।

তবু সুনন্দার কথামত—"সুশীল, তুমি বড় সেন্টিমেন্টাল।"

সুশীল নিজেও অনুভব করে তা। তবুও হেল্প্‌লেস। এতদিন ধরে ও আশা রেখেছে যে দাগটা অন্ততঃ মিলিয়ে যাবে কৃষ্ণার মুখ থেকে। কিন্তু কই ! এখনো তো মিলালোনা। অবশ্য এটা ঠিক অস্পষ্ট হয়ে গেছে অনেকটা। তবু আর দেরী করা চলেনা। তাই সুশীল

কৃষ্ণাকে একবার Skin Specialistএর কাছে শেষ পর্য্যন্ত নিয়ে গেল।

কৃষ্ণা যেতে চায়নি প্রথমে। বলেছিল—"কি হবে ওখানে গিয়ে? ডাক্তার বলবে—"হবেনা।" আমি বলছি—"দেখুন ঠিক তাই বলবে।"

সুশীল আশ্বাস দিয়েছিল, "না, আমি বলছি ওরা ঐ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। আমরা যা' বুঝতে পারিনা, ওরা তা' বুঝতে পারে। চামড়ার ব্যাপারে আমরা তো বিশেষ জানিনা। দেখো, মনে হচ্ছে ভালো হয়ে যাবে।"

কিন্তু, না। বহুক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে ডাক্তার বল্লেন —"দাগটা একটু পাতলা হতে পারে, কিন্তু মিলিয়ে দেবার কোন উপায় নেই। উণ্ডটা সত্যিই ডিপ্ হয়েছে।"

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে সুশীল বেড়িয়ে আসে কৃষ্ণাকে সঙ্গে নিয়ে।

কৃষ্ণা হেসে বলে, "আপনি এত চিন্তিত কেন? উণ্ডটা তো আর আপনি করেন নি। তা ছাড়া দেশ-বিভাগের ক্ষতই যাদের রেফিউজি বলে চিহ্নিত করেছে তাদের মুখে যদি ভাগ্য আর একটা চিহ্ন রেখে যায়, তা'হলে আর এমন কি বেশী হল?"

সারা পথ কোন বলে না সুশীল। কেবল কৃষ্ণাকে নামিয়ে দেবার সময় বলে, "কাল বিকেলে বাড়ী থেকো। আমি আসবো একবার। বিশেষ কথা আছে।" কৃষ্ণা একটু আশ্চর্য্য হয়ে তাকায় ওর দিকে। তারপর গাড়ী থেকে নেমে যায়।

* * *

পরেরদিন কৃষ্ণাদের বাড়ী পৌছাতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। বাড়ীতে ঢুকে কৃষ্ণার বৌদির কাছে শুনলো কৃষ্ণার মাথাটা ধরেছে। তাই শুয়ে আছে ঘরে। উঠতে পারছেনা।

"সে কি? খুব বেশী কি ধরেছে?"

"সে'রকম তো বল্ল"—বৌদি জানায়।

"কিন্তু এটা তো দেখা দরকার। 'সাইনাস' হলে এখনই চেক্আপ্ করা প্রয়োজন। চলুন, কোথায় দেখে আসি।"

কৃষ্ণার বৌদিও সত্যি একটু চিন্তিত হয়ে পড়ে। বলে "—হ্যাঁ চলুন। দেখেই আসুন।" কৃষ্ণা শুয়েই ছিল ঘরে ও'দের ঘরে ঢুকতে দেখে বেশবাস ঠিক করে উঠে বসলো।

সুশীল তাকিয়ে দেখে কৃষ্ণার মুখটা সত্যি ভার ভার লাগছে। চোখদুটো যেন লাল হয়ে উঠেছে। "থাক্ শুয়ে থাকো বরং। হাতটা দেখি। একটু পালস্টা দেখবো।"

ভার ভার গলায় কৃষ্ণা বল্ল—"থাক্না।" কৃষ্ণার বৌদি বল্ল—"থাম তো, তোমার সবটাতেই বাড়াবাড়ি। যা বলছেন তাই কর।"

কৃষ্ণা হাতটা বাড়িয়ে দেয়।

পালস্, গলা, নাক পরীক্ষা শেষ করে সুশীল বলে —"না, ভাববার বিশেষ কিছু নেই। 'সাইনাস্ না', সামান্য ঠাণ্ডা এক্সপোজার লেগেছে। এই প্রেস্ক্রিপ-সানটা করে দিচ্ছি। এটা আনিয়ে কয়েক দাগ খাইয়ে দিলেই হবে।"

"যাক্ বাঁচা গেল। আপনার চা করে আনি। আপনি ততক্ষণ কৃষ্ণার সঙ্গে গল্প করুন"—কৃষ্ণার বৌদি ঘর থেকে চলে গেল।

দু'জনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।

প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করে কৃষ্ণাই কথা বলে অস্বাভাবিক গম্ভীর গলায়—"ডাক্তার রায়, আপনার বোধহয় আর ঋণ বাড়ানো ভাল হবেনা।"

সুশীল চমকে ওঠে। প্রথমতঃ বহুদিন পরে 'ডাক্তার রায়' সম্বোধনে। আর তারপর ওর কথায়।

"কী বলছো তুমি?"

"হ্যাঁ, যা বলছি, ঠিকই বলছি। হাঁসপাতালে থাকার কালে আপনি যে লুকিয়ে দান করেছেন আমার খরচ সেটাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। তবে দেখুন, আমরা রেফিউজি গরীব হ'তে পারি, কিন্তু আত্মসম্মান বিক্রী করিনা। আপনার দান করার ইচ্ছে থাকে তো দাতব্য চিকিৎসালয়ে দান করুন। কিন্তু ঐ রকম লুকিয়ে দান করার মধ্যে কৃতিত্ব নেই। এটা একটা দাম্ভিকতা আর হীন প্রতারণা।"

"ও, হাঁসপাতালের খবর তুমি পেয়েছ। বেশ, আমাকেই নিজে বলতে হত একদিন। সে দায়মুক্ত হলাম। কিন্তু প্রতারণা বলছ কাকে?"—সুশীল প্রশ্ন করে।

কৃষ্ণা উত্তেজিত হয়ে ওঠে—"প্রতারণ ? আপনার প্রতিটি ব্যবহার, প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি কথা, প্রতিটি··· ।"

"থামো থামো, আর শুনতে পারছিনা। এ প্রশ্নের উত্তর আজ আমি তোমায় দেবনা। কারণ কারুর কথায় তুমি আজ উত্তেজিত। তবে জেনো কাউকে পরীক্ষা করতে হলে লোকের কথায় সম্পূর্ণ হয় না। নিজেকেই যাচাই করে নিতে হয়।" এই কথা বলে সুশীল উঠে পড়ে।

কিন্তু টেবিলের ওপর হঠাৎ একটি সাদা ভ্যানিটি ব্যাগ দেখে থেমে যায়। ঐ ব্যাগটা যে ও খুব ভালো করে চেনে। ঐ সোনার জলে কাজ করা 'S' অক্ষরটা। ওটা যে সুনন্দা বোসের ব্যবহৃত ভ্যানিটি ব্যাগ। কিন্তু ওটা এখানে এলো কি করে ? হঠাৎ একটা সন্দেহ মাথায় খেলে গেল।

সুশীল প্রশ্ন করলো—"ও ব্যাগটা কার ?"

কৃষ্ণা একটু চমকে উঠলো ওটা দেখে। তারপরেই বল্ল—"ওটা আমার এক বান্ধবীর।"

"কিন্তু আমি যদি বলি ওটা সুনন্দা বোসের। কিন্তু সুনন্দা কখন এসেছিল এখানে ?"

কৃষ্ণার ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত হয়—"যদি বলি একটু আগে ?"

সুশীল উত্তেজিত হয় আবার—"কি বলেছে ও তোমাকে ? সত্যি করে বলো।"

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে। তারপর শক্ত হয়ে বসে ঘাড় উঁচু করে কৃষ্ণা বলে ওঠে—"কি বলেছে সেটা আপনি নিজেই জিজ্ঞেস করে জেনে নিন্না আপনার সুনন্দা বোসের কাছে।"

এক মুহূর্ত কৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকে সুশীল। দেখে অস্বাভাবিক এক দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে কৃষ্ণা ওর দিকে। তারপরই এক ঝটকায় ভ্যানিটি ব্যাগটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে ওঠে সুশীল—হ্যা, কৃষ্ণা, সেই শুনতে যাচ্ছি আমি।"

* * * *

"তুমি গিয়েছিলে ওখানে ?"—সুশীল প্রশ্ন করে।

"কে বল্ল তোমায় ?" সুনন্দা উত্তর দেয়।

"ও সব বাজে কথা রাখ। যা বলছি তার উত্তর দাও। কেন গিয়েছিলে ?"

"কৈফিয়ৎ দিতে হবে নাকি ?"

"যদি বলি হ্যাঁ," সুশীল বলে।

"বেশ শোন। আমি গিয়েছিলাম কৃষ্ণা গুহকে জানিয়ে দিতে যে সে মস্ত বড় ভুল করতে যাচ্ছে। ভুল ভাঙ্গিয়ে দিতে গিয়েছিলাম তার এই কারণে যে সে জানতো না সুশীল রায়ের জীবনে যোগ হতে চলেছে সুনন্দা বোস বলে একটি মেয়ে। সেখানে তৃতীয় কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকতে পারে না।"

সুনন্দা থামলে সুশীল প্রশ্ন করে—"শুধু ঐ টুকুই কি তুমি তাকে বলেছো ? হাঁসপাতালের কথা বলনি কিছু ?"

"হু, তাও বলেছি। আর এও বলতে হয়েছে যে সেদিনের এ্যাক্সিডেন্টাও তুমিই করেছো। আর তার চিকিৎসার ব্যবস্থার ভারও দয়া করে তুমিই নিয়েছিলে।"

সুশীলের চোখ দুটো অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে উত্তেজনায় 'নন্দা, তুমি মিছে কথা বলেছ কেন ? কেন তুমি বল্লে আমি চাপা দিয়েছি ? উত্তর দাও। কেন তুমি জানালেনা যে গাড়ী তুমিই চালাচ্ছিলে !''

সুনন্দার দৃষ্টিটা স্তিমিত হয়ে গেল। ভীরুদৃষ্টিতে সুশীলের দিকে তাকায় একবার। তারপর কাছে ঘেসে এসে বলে—" 'সু' ও মিথ্যেটুকুর আশ্রয় না নিলে তোমার প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করবার আর কোন অন্য পথ ছিল না। শোনো সুশীল! ভুল বুঝোনা। আমাদের ভালবাসার সামনে ওটুকু মিথ্যে ধুয়ে মুছে যাবে জীবন থেকে। তা ছাড়া কৃষ্ণা গুহকে জানানো প্রয়োজন ছিল যে যেটাকে সে তোমার ভালবাসা মনে করছে, সেটা তোমার একটা খেয়ালী দয়া দাক্ষিণ্য একটা ভাগ্যপীড়িত রেফিউজি মেয়ের জন্য। বলো সুশীল, তুমি কি আমায় ভালোবাসোনা তেমন গভীর করে যে ভালবাসার জোয়ারে আমার এই সামান্য মিথ্যে ছলনাকে ভুলে যেতে পারবে ?"

এই তার নন্দা—সুনন্দা! আর দুটো মাস পরে ঘরে এসে উঠবে তার। আসছে মাসে আশীর্বাদ হবার কথা আছে। দুটো জীবন, দেহ, মন যাদের জড়িয়ে তৈরী করবে একটি অভেদ্য পথ। নতুন দিনের প্রভাতে

সে পথ আলোকিত হয়ে উঠবে। আবার সন্ধ্যায় অস্তায়মান সূর্যের স্তিমিত আঁধারে সে পথে সৃষ্টি করবে তিমির অবগুণ্ঠন। কিন্তু জীবন চলার সেই আলোছায়া ঘেরা পথে যে যোগাবে প্রেরণা, নিজের ভালোবাসার প্রদীপে পথ দেখাবে—সে কি এই নন্দা? অসম্ভব। যে মেয়ে অন্যায়কে ঢাকতে চায় ভালবাসার রঙিন আভরণে, ভালবাসার সর্ত্ত যেখানে অপরের প্রতিশ্রুতি যেখানে ভালবাসা নিক্তির ওজনে লেনদেনের এক বৈপণিক সম্পর্কে নেমে আসে, সেখানে ভালবাসা একটা মিথ্যে আবরণ,, একটা নগ্ন, স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, ভোগলিপ্সার শাব্দিক নামান্তর মাত্র।

"না, না সুনন্দা, ভালোবাসার কথা অন্ততঃ তুমি বলোনা। ভালবাসা কি সেটা তুমি নিজেই জানো না?"

"কি বলছো তুমি?" সুনন্দা বলে ওঠে।

"হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। ভালো হয়তো বেসেছ তুমি! কিন্তু সে আমাকে নয়, নিজেকে। আমার ভালবাসায় তুমি সন্দিহান। তাই মিথ্যের আবরণকে আশ্রয় করেছিলে ভালবাসার ছলনা দিয়ে। কিন্তু তুমি অনুভব করনি কোনদিন সে নিজের সত্তাকে লীন করে দিয়ে তবে ভালোবাসা যায় পরকে। নন্দা, তোমার মত রূপবতী, গুণবতী বড়লোকের একমাত্র মেয়ের পাত্রের অভাব হবে না বিয়ের বাজারে। কিন্তু ভালবাসার মিথ্যে আবরণ দিয়ে ঢাকা বিয়ের কলংকময় জীবন তিলে তিলে অতিবাহিত করার হাত থেকে তুমি আমায় মুক্তি দাও।"

সুশীল ছুটে এসে কোনরকমে গাড়ীতে ওঠে। গাড়ী ছেড়ে দেয়। তারপর অনেকটা এসে পরিচিত মোড়টা ঘুরে গাড়ীটা পোলের পাস দিয়ে আরো একটু এগিয়ে ঢুকে পড়ে নির্দিষ্ট গলিটাতে। সন্ধ্যার অন্ধকারের বুকে গ্যাসপোষ্টের আলোগুলো ইথারের বুকের জোনাকীর মত দপ দপ্ করছে। কিন্তু প্রতিদিনের চেনাপথ যেন আজ কেমন অজানা লাগছে!

না, যা ভেবেছে। কৃষ্ণা ওদের বাড়ী নেই। কৃষ্ণার বৌদি জানালো যে কৃষ্ণার কি হয়েছে কে জানে। আজ সেই সকালে না খেয়ে সে বেরিয়েছে আর এখন পর্যন্ত তার কোন খবর নেই। ওর দাদা তো তাই ওর খোঁজে বেরিয়েছে।

ঘরখানা হঠাৎ অন্ধকার মনে হল।

সন্ধ্যার কুয়াশার মত আচ্ছন্ন মন নিয়ে সুশীল হঠাৎ অনুভব করে সে বড়ো একা। এতবড় পৃথিবীতে পথ চল্‌তে চল্‌তে হঠাৎ যেন নিজের অস্তিত্ব কখন সে হারিয়ে ফেলেছে। ঐ আকাশের অন্ধকারের মত ওর জীবনের মধ্যে যেন নেমে এসেছে এক অতল অন্ধকার। সে অন্ধকার এত গভীর যে তার শেষ খুঁজে পাওয়া যায় না, কেবল অনুভব করা যায়, আর তাতে তলিয়ে যাওয়া যায় এক সীমাহীন শূন্যতায়। সেই সীমাহীন শূন্যতাই অনুভব করে সুশীল রায় আজ তার দেহমনের প্রতিটি অণুপরমাণু দিয়ে।

কোনরকমে ঘর থেকে বের হয়ে গাড়ীতে উঠে ছুটে যায় কৃষ্ণার গানের স্কুলে।

স্কুলের অধ্যক্ষ ও সম্পাদক ওর বন্ধুবর জানায়—আশ্চর্য্য ব্যাপার! আজ কৃষ্ণা গুহ কাজে ইস্তফা দিয়ে গেল। প্রশ্ন করলে বল্ল কোলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কি আর একটা চাকরী পেয়েছে তারই কাজে।

হ্যাঁ কাজটার কথা জানে বৈকি সুশীল। কৃষ্ণাই বলেছিল পাটনার কাছে একটা মাড়োয়াড়ীদের অনাথ আশ্রমে একটা গানের মাষ্টারের পদ খালি আছে। এমনি একটা এ্যাপ্লিকেশন ও নাকি করেছিল ও। কোয়ালিফিকেশন আর এক্সপিরিয়েন্স্ জানিয়ে। তাতে নাকি ওরা ওকে আমন্ত্রণ করেছে। কিন্তু ওদের মাইনে তো এখনকার চেয়ে কিছু কম। অবশ্য থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ওরাই করবে জানিয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণা তো বল্ল তাতে ওর পোষাবে না। "তা ছাড়া কোলকাতা থেকে এখন আমার যেতে বয়ে গেছে। থাক্‌গে এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার—কৃষ্ণা বলেছিল।

না, সুশীল কিছু ভাবতে পারে না। সুশীলের মনের শূন্যতার অংকে আরো একটা শূন্য যোগ হয়।

গাড়ীতে উঠে ক্লান্ত দেহ মনে ফিরে চলে নিজের বাড়ীর দিকে। গাড়ী চালাতে এত বেসামাল হয়নি বোধহয় জীবনে সুশীল কোনদিন। আর একটু হলেই ধাক্কা লাগতো মোড়ের মাথায় লাইটপোষ্টটার সঙ্গে। রাস্তার

ট্রাফিক পুলিশটা চীৎকার করায় খেয়াল হল। চমকে উঠে কোনরকমে সামলে নিল। বাড়ীর কাছে এসে যখন পৌছালো তখন ও অসীম ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়েছে। ওর পঁচিশ বছরের জীবনে আজই প্রথম বোধ হয় সুশীল উপলব্ধি করলো যে ও ক্লান্ত। অবসাদ নেমে আসছে ঝরা পাতার মত ওর দেহমনে।

কিন্তু গলির মোড়টা ঘুরে বাড়ীতে ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ হেড্‌লাইটের আলোতে চোখে পড়ে ক্লান্তপদে বেরিয়ে আসছে ওদের বাড়ীতে গেটের ভেতর দিয়ে—হাঁ, কৃষ্ণাই।

কিন্তু কৃষ্ণা তো কখনো ওর বাড়ীতে এর আগে আসেনি!

যাক্ পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইছিল। কিন্তু সুশীল ডাকে—"এই শোন। গাড়ীতে উঠে এসো।"

"কি বলার আছে এখান থেকেই শুনছি।"

গাড়ীতে ষ্টার্ট আর আলোটা বন্ধ করে দিয়ে সুশীল অনুনয় করে—আর কোনদিন আমি অনুরোধ করতে যাবোনা। আর হয়তো…।" ভারাক্রান্ত হয়ে আসে কথা।

কৃষ্ণা উঠে আসে।

"আমি তোমায় ভালোবাসি। শুধু এইটুকুই তোমায় বলতে চাইছি। বিয়েটা যদি ভালবাসা না মনে করে দাক্ষিণ্য মনে করো, তো করোনা। কিন্তু আমার ভালবাসাটা তুমি অবিশ্বাস করোন।" একটু স্তব্ধ থেকে আবার বলে—"ভালবাসা কি সেটা হয় তা আমি আগে জানতুম না। জানতুম না এই কারণে যে ভালবাসার জ্বালা অনুভব করিনি কোনদিন মনে। কাছে যখন ছিলে তখন বুঝতে পারিনি যে তোমায় আমি ভালবাসি। কিন্তু আজ যখন তুমি দূরে সরে গেছ, তখনি বুঝতে পারছি যে আমার মনটা তোমার কত কাছে সরে গেছে। ধরা ছোঁয়ার বাইরে দাঁড়িয়েও আজ যে তুমি আমার মনের সবটা জুড়ে আছো, এটাকে কি তুমি ভালবাসা না বলে মোহ বলবে? আর সবকিছুকে মিথ্যে বলে ধরতে পার তুমি, কিন্তু আমার এই ভালবাসাকে তুমি সন্দেহ করোনা।"

"না, না, সুশীল। তুমি ও কথা বলোনা"—থ থরিয়ে বোধহয় ক্ষণিকের। তোমার 'এ' মোহ সাময়িক। আমাকে ভুলতে চেষ্টা করো। তোমার মা'র কাছে শুনলাম তোমার আর সুনন্দার বিয়ে আর দু'মাস পরে। সুনন্দা তোমাকে সত্যি ভালোবাসে। ওর কথা থেকেই বুঝেছি। আর তা'ছাড়া……" বলতে গিয়ে চুপ করে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

সুশীল জিজ্ঞেস করে—"তা'ছাড়া, বলো, কি বলতে গিয়েছিলে?"

কৃষ্ণা বলে, "হাঁ, তা'ছাড়া তোমার সঙ্গে আমার অন্য কোন সম্বন্ধের প্রশ্নই ওঠেনা। কেননা……কেননা তুমি আমায় ভালোবাসলেও আমি যে তোমায় ভালোবাসি কে বল্ল?"

"ও এই কথা"—সুশীল হাসতে চেষ্টা করে "ও আমি জানি।"

অস্বাভাবিক জোর দিয়ে কৃষ্ণা বলে—"না, আমার মনের কথা কিছুই জানোনা তুমি। আমি এসেছিলাম তোমার টাকাটা ফেরৎ দিতে যে টাকাটা খরচ হয়েছিল তোমার আমাকে হাসপাতালে রাখার জন্য।"

কে যেন চাবুক মারে সুশীলের মুখে।

"আচ্ছা আসি" এই বলে কৃষ্ণা নেমে যায় গাড়ী থেকে। কিন্তু গাড়ী থেকে নামবার সময় কি একটা পড়ে গেল।

সুশীল তুলে দিতে যেতেই কৃষ্ণা হঠাৎ সেটা কেড়ে নিতে চায়। সুশীলের সন্দেহ হয়। ছিনিয়ে নিয়ে ওটা গাড়ীর ভেতরের আলোটা জেলে দেয়।

বিদ্যুৎ চমকের মত চমকিয়ে ওঠে সুশীল—"এ কি? আমার এ' ছবিটা তুমি কোথায় পেলে? এটা তো আমার ঘরের ড্রেসিং টেবিলে রাখা ছিল"—সুশীল বলে ওঠে।

"না, না ওটা আমাকে দাও"—কান্নাভেজা আর্তনাদ বেড়িয়ে আসে কৃষ্ণার গলা থেকে।

"কিন্তু শুধু ছবিটা দিলে কি তৃপ্তি পাবে?"

কৃষ্ণা কেঁপে ওঠে। কি বলতে যায়।

কিন্তু তার আগেই সুশীল রায়ের বলিষ্ঠ বাহু ঘিরে ধরেছে পাখীর মত নরম একটি নারী দেহকে। দৃঢ় আলিঙ্গনের বাঁধনে প্রথমে কয়েক মুহূর্ত কাঁপতে থাকে

নেয় সুশীলের বুকে। বসন্তের ফুলসম্ভারের ওপর নেমে আসে মধুপের মধুচুম্বন।

*   *   *

কমলেশ চুপ করে যায় তারপর। তাকিয়ে থাকি কাঁচের সার্সির ভেতর দিয়ে চাঁদের আলো পড়া দূরের পাইন বনের দিকে। শিরশির করে ঠাণ্ডাভেজা হাওয়া বইছে পাইনের ভেতর দিয়ে ইথার তরঙ্গের মত।

"কিন্তু তারপর?" প্রশ্ন করি আমি।

"এ প্রশ্ন অবান্তর—কমলেশ বলে।

"তবুও জানতে ইচ্ছে করে।"

"বেশ, তারপর যেমন হয়। মিলন হয় সুশীল আর কৃষ্ণার। তবে সুশীলের বাবা-মা গ্রহণ করতে পারেনি এমন একটি মেয়েকে পুত্রবধুরূপে। সুশীল অবশ্য তা জানতো।

দেওয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত বারোটা বাজলো।

"চল্, উঠে পড়্। তোকে ঘুমাতে হবে এখনই। কারণ কাল ভোরেই তোকে রওনা হতে হবে গৌহাটিতে প্লেন ধরবার জন্য।" কমলেশ উঠে পড়ে।

কিন্তু এ আখ্যানের শেষে একটু ছোট অংশ দিয়ে দিতে হয়। কেননা সেটার সঙ্গে ঐ চিঠিটার প্রসঙ্গটা জড়িয়ে আছে।

পরের দিন ভোরবেলা বিছানার পাশে রাখা বেড্-টি খেতে গিয়ে হঠাৎ তাকিয়ে দেখি একটুকরো কাগজ চাপা আছে।

কাগজের ভাঁজটা খুলে ফেলি। গোটা গোটা মেয়েলি অক্ষরে লেখা ফুটে ওঠে। বিস্ময়ভরা দৃষ্টি দিয়ে পড়ি—

কিরণ-ঠাকুরপো,

আপনার বন্ধুর কাছে শোনা আখ্যানটা গল্প বটে। তবে লক্ষ্মীটি, আপনার কলমের হাত থেকে ওটা রেহাই দিন।

হাসলাম মনে মনে। অস্পষ্টতাকে বড় বেশী স্পষ্ট করে দিল আপনার অজান্তে শান্তা বৌদি। সকালের গোছ-গাছের তাড়ায় আর দেখা বা কথা বলার ফুরসৎ হয়নি। খালি বিদায় নেবার সময় বল্লাম গাড়ী থেকে, "কমলেশ, তোদের সবার কথা চিরদিন মনে থাকবে।" তারপর শান্তা বৌদির দিকে ফিরে তাকালাম। দেখি আয়তদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। মুখটা শুকনো। একটু হেসে বল্লাম —"আপনার কথাও ভুলবোনা।

গাড়ীর কাঁচের সার্সির ভেতর দিয়ে মনে হল শান্তা বৌদির চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠ্লো যেন একটু। ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠ্লো একটুকরো হাসি। বাঁ গালের ওপর অস্পষ্ট কাটা দাগটার ওপর প্রভাতি সূর্য্যের আলোর সঙ্গে একটু রক্তিম আভা জেগে উঠ্লো যেন।

গাড়ী ছেড়ে দিল।

বহুদিন পরে আজ আবার সেই গোটা গোটা মেয়েলি হাতের লেখা শান্তা বৌদির চিঠি একটা পেলাম। একটু হেসে চিঠি লেখার কাগজ আর কলমটা টেনে নিলাম—চিঠির উত্তর একটা দিতে হবে।

———

বিশ্বভাষা পরিক্রমা

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

তুলনা

উত্তর, উত্তরপূর্ব আর উত্তরপশ্চিম—তিন দিকে পর্বতের প্রাচীর ; দক্ষিণ, দক্ষিণপূর্ব আর দক্ষিণপশ্চিম—তিন দিকে সুনীল লবণাম্বুধির বেষ্টন ; মধ্যবর্তী বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকার নাম ভারতবর্ষ। এই অঞ্চল একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সত্তা, এশিয়ার অন্যান্য অংশ থেকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক্। একে উপ-মহাদেশ বললে ভুল হয় না। ইউরোপের মতো এর একটি সাংস্কৃতিক সত্তাও আছে। তবে সাংস্কৃতিক দিক থেকে ইউরোপ যতটা অখণ্ড ও গাঢ়বদ্ধ, ভারতবর্ষ ততটা নয়। একটু তুলনা করলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে।

সমস্ত ইউরোপ ধর্মের দিক দিয়ে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ; সেই খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে রোমান ক্যাথলিক, প্রোটেষ্টেন্ট, গ্রিক অর্থোডক্স্ চার্চ ইত্যাদি শাখাবিভাগ ও শ্রেণীভেদ আছে বটে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুতর মতভেদ ও সংঘর্ষও আছে। তবু ইউরোপ এক ধর্মাবলম্বী। আলবানিয়া, ইউরোপীয় তুরস্ক ও সোভিয়েট রাষ্ট্রসংঘের কিছু মুসলমান আর পূর্ব ইউরোপের বিলীয়মান ইহুদিদের কথা বাদ দিলে সমস্ত ইউরোপ শুধু খ্রীষ্টানদের বাসভূমি। তুলনায় ভারতবর্ষে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান—অন্তত তিনটি বড় ধর্মের লোকদের বাস ; হিন্দুরা অসংখ্য বর্ণ ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত, মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের মধ্যেও সম্প্রদায়গত বিভেদ আছে। তা ছাড়া এদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান—এই দুই ধর্ম ও সম্প্রদায়ের বিরোধ ও সংঘর্ষের কাহিনী তেরো শতাব্দীর প্রাচীনতা অর্জন করেছে। পাকিস্থানের উদ্ভব এর জন্যে। কাশ্মীরসমস্যার জন্যেও এই ধর্মবিরোধ দায়ী। বাঙালি, পাঞ্জাবি ও সিন্ধি—এই তিনটি জাতির দ্বিখণ্ডিত বা ত্রিখণ্ডিত হওয়ার জন্যে এই ধর্মবিরোধ মুখ্যত দায়ী। আসাম ও তার সংলগ্ন পার্বত্য এলাকায় বিভিন্ন অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্যের দাবির মূলে খ্রীষ্টধর্ম ও তার সঙ্গে আসা প্রগতিশীলতা কতকটা সক্রিয় তো নিশ্চয়ই। তিনটি বড় ধর্মসম্প্রদায় ছাড়া এখানে ছোট ছোট আরো কয়েকটি ধর্মের লীলাখেলা চলছে। ভারতবর্ষ পুণ্যভূমি হোক বা না হোক, ধর্মভূমি তো বটেই। ভৌগোলিক ভারতে উত্তরপ্রান্তস্থ নেপাল হিন্দু রাষ্ট্র, দক্ষিণ প্রান্তস্থ সিংহল বৌদ্ধ রাষ্ট্র, পূর্ব ও পশ্চিম দুই প্রান্তের দুই পাকিস্থান ইসলামি রাষ্ট্র, মালদ্বীপপুঞ্জ ইসলামি রাষ্ট্র ব'লেই একভাষী বৌদ্ধ সিংহল থেকে পৃথক্, ভুটান বৌদ্ধ রাষ্ট্র, ভারতের আশ্রিত রাজ্য সিকিমও তাই, মাঝখানে মধ্যমণি খণ্ডিত হিন্দুগরিষ্ঠ তথাকথিত "ভারত" রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ। এ হল ধর্মীয় ঐক্যের বর্তমান রাষ্ট্রীয় অবস্থা।

ভাষার দিক থেকে বিচার করলে ফিন্-উগ্রীয় ভাষা-গোষ্ঠীর লোকদের কথা বাদ দিয়ে এবং তুরস্ককে এশীয় রাষ্ট্ররূপে গণনা ক'রে সমস্ত ইউরোপ ভারত-ইউরোপীয় বা আর্য শাখার ভাষাভাষী। ফিন্ল্যাণ্ড ল্যাপল্যাণ্ড, এস্তোনিয়া, মর্দোভিয়া, হুন্গারি, ইউরোপীয় তুরস্ক, তাতার, চুভাশ ও বাশ্কির অর্থাৎ উরাল-আলতায় ও ফিন্-উগ্রীয় সামান্য কয়েক মিলিয়ন লোকের কথা বাদ দিলে সব ইউরোপীয় ভাষার দিক থেকে একটিমাত্র গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, ইউরোপের মোট লোকসংখ্যার অনুপাতে ফিন্-উগ্রীয় আর উরাল-আলতায় ভাষাভাষী এলাকা ক'টির জনসংখ্যা অকিঞ্চিৎকর। পক্ষান্তরে ভারতে ভারত-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর লোকরা ছাড়াও দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর লোকরা বহুসংখ্যক ও বিশেষভাবে প্রভাবশালী। অষ্ট্রিক ও বোড়ো ভাষাগোষ্ঠীর লোকরাও একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। বোড়ো শাখার লোকেরা সংখ্যায় কম হলেও অত্যন্ত রাজনীতি-সচেতন ও স্বাধীনতাপ্রিয় ; তাদের মধ্যে একমাত্র নেওয়ারিভাষীরা ছাড়া অন্য সাতটি ভাষার লোকেরা

কোন না কোনরকম প্রশাসনিক স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে, অর্থাৎ তাদের পৃথক্ রাজনৈতিক সত্তা স্বীকৃত হ'য়েছে। ভুটান, সিকিম, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, মিজোরম, গারো পাহাড় জেলা, উত্তর কাছাড় ও মিকির পাহাড় জেলা —এই সাতটি এলাকা ঐ স্বীকৃতির প্রমাণ। অষ্ট্রিকরাও ঝাড়খণ্ড ও মেঘালয় প্রদেশ গঠনের দাবি তুলেছে। ছোট ছোট ও পশ্চাৎপদ দ্রাবিড় জাতিগুলির কথা বাদ দিলেও অন্তত চারটি বড় দ্রাবিড় ভাষার তথা জাতির স্বাতন্ত্র্য দিবালোকের মতো উজ্জ্বল। এই চারটি জাতির জন্যে চারটি অঙ্গরাজ্য দীর্ঘকাল থেকে গঠিত হয়ে আছে। অনার্য ভাষাগোষ্ঠীগুলি ছাড়া ভৌগোলিক ভারতে যে সব ভারত ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর লোক আছে তারা অর্থাৎ আর্যরাও ইরাণীয়-আর্য ও ভারতীয়-আর্য, এই দুই শাখায় বিভক্ত। ইরাণীয়-আর্যভাষী এলাকায় আফগান-ফার্সি, পশ্‌তো আর বালুচ ভাষা তিনটি উল্লেখযোগ্য। ভৌগোলিক ভারতের উত্তর-পশ্চিমপ্রান্তে এদের অবস্থান। এদের মধ্যে আফগান ফার্সি ভাষা আফগানিস্তান রাষ্ট্রের সরকারি ভাষা। পশ্‌তো ভাষাকে নিয়ে পাঠানিস্থান, আর বালুচ ভাষাকে নিয়ে বালুচিস্থান গঠনের আন্দোলন দীর্ঘকাল ধ'রে চ'লে আসছে। ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষে বালুচিস্থান একটি চিফ্ কমিশনার-শাসিত প্রদেশের মর্যাদা লাভ করেছিল। পাঠানরাও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নামে যে-গভর্নর-শাসিত প্রদেশ গঠিত হয়েছিল তাতে কতকটা সংহত হতে পেরেছিল। এখনও পশ্চিম পাকিস্থান থেকে সমস্ত বালুচ ও পুশ্‌তুন এলাকাদুটি নিয়ে দুটি স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের আন্দোলন চলছে। অবশ্য অখণ্ড বালুচিস্তান গঠনের জন্যে ইরানের সঙ্গে পাক-বালুচিস্তানের সীমারেখা সংশোধন দরকার হবে। অখণ্ড পাখ্‌তুনিস্তান গঠনের জন্যেও আফগানিস্তানের পাঠান এলাকাকে পাকিস্তানের পাঠান এলাকার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। ইরানীয়-আর্য শাখার এই তিনটি ভাষা ভৌগোলিক ভারতের অন্তর্ভুক্ত ব'লে ধরা হয়েছে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের আমল থেকে আওরংজেবের আমল পর্যন্ত প্রায় দু হাজার বছর সময়ের মধ্যে এই তিনভাষী এলাকা বারবার ভারতের সাম্রাজ্যিক সরকারগুলির অধীনে এসেছিল ব'লে। সিন্ধুনদকে ভারতের পশ্চিম সীমা ব'লে ধরলে ঐ তিনটি ভাষাভাষী এলাকা প্রকৃতপক্ষে ইরানভূমির মধ্যে পড়ে। অপর তিনটি ইরানীয়-আর্যভাষা ফার্সি, তাজিক ও কুর্দ এবং তাদের ভিত্তিতে গঠিত বা গঠনীয় রাষ্ট্রের কথা আগে অবশিষ্ট এশিয়ার ভাষাপরিক্রমা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ভাষার ভিত্তিতে ভারতে কোনরকম ঐক্যসূত্র গঠন করা কোন অঘটনঘটন পটীয়সী প্রতিভার পক্ষে সম্ভবপর নয়।

সুতরাং সংস্কৃতির দুটি বড় অঙ্গ ধর্ম ও ভাষার দিক থেকে ভারতবর্ষ ইউরোপের মতো ঘন পিনদ্ধকায়া নয়, এ নিয়ে তর্কের কোন অবকাশ নেই। তা নেই ব'লেই অনেকে ব্যাকুলভাবে ইংরেজি ভাষাকে স্বাধীন ভারতেও আন্তঃরাজ্য বা আন্তঃপ্রাদেশিক যোগসূত্ররূপে রক্ষা করতে চান। এ হল স্রোতে দাগ কাটার ব্যর্থ প্রয়াস। ইংরেজ শাসন ও ইংরেজি ভাষা ভারতবর্ষকে রাষ্ট্রীয় ঐক্য দিয়েছিল, কিন্তু ইংরেজ শাসনের অনুপস্থিতিতে ইংরেজি ভাষাকে আঁকড়ে ধ'রে রাখার যে-চেষ্টা অহিন্দিভাষীরা করছে, তা জলের লিখনের মতো ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য। যদি ভারতে আবার ইংরেজ শাসন বা ঐ ভাষী কোনও শাসন স্থাপিত হয়, কেবল তা হলে ভারতে ইংরেজি ভাষায় রাষ্ট্রভাষারূপে বর্তমান থাকার সম্ভাবনা আছে, না হলে একেবারে নেই।

সংস্কৃতকে সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রভাষা বা যোগসূত্র ব'লে কল্পনা করাও লোক-হাসানো ছাড়া আর কিছু নয়। ভারতে চারটি স্বতন্ত্র ভাষাগোষ্ঠী বর্তমান: অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, ভারত-ইউরোপীয় আর চীন-তিব্বতীয়। এদের মধ্যে সংস্কৃতকে কেবল ভারত-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর তথাকথিত আর্য বা ভারত-ইরানীয় শাখার ভারতীয়-আর্য উপশাখার পূর্বপুরুষ বা মূলভাষারূপে কল্পনা করা যায়। ভারতের সব ভাষাই মূলত সংস্কৃতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, এ-কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তা ছাড়া ভারতের যত লোক ইংরেজি ভাষা বোঝে, সংস্কৃত ততগুলি লোকেরও আয়ত্ত নয়। অতীতে সাধারণ লোকদের মধ্যে সংস্কৃত যোগাযোগের ভাষারূপে ব্যবহৃত হত না; সম্রাট অশোকের আমলেও যে তা হত না, তার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। ভবিষ্যতেও কোন দিন সংস্কৃত জনসাধারণের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্যে বা কাজ চালাবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে না।

প্রাক্-মুসলিম ভারতে সংস্কৃত শিক্ষিতজনের যোগসূত্ররূপে ব্যবহৃত হয়েছে এ-কথা অবশ্য ঠিক। কিন্তু সারা ভারতের লোকের "লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা" বা লিঙ্ক ল্যাঙ্গোয়েজ সংস্কৃত কস্মিন্ কালেও ছিল না, কোন কালেও হবে না।

লাতিন, গোথিক, স্লাভ বা প্রাচীন গ্রিক্—এই চারটি প্রাচীন ভাষার যে কোন একটিকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ ক'রে বর্তমান ইউরোপকে একটি অখণ্ড রাষ্ট্রে পরিণত করা চলে না। এ রকম পরীক্ষা মধ্য যুগে হয়ে গেছে। ভারতেও তেমনি ফার্সি, পালি, সংস্কৃত বা প্রাচীন তামিলকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ ক'রে একটি অখণ্ড রাষ্ট্র জাতীয় ভিত্তিতে গঠন করা যায় না। অবশ্য সাম্রাজ্যিক ভিত্তিতে একভাষী রাষ্ট্র ভারতে কয়েকবার গঠিত হয়েছে। যে-সব ভাষার ভিত্তিতে ভারতে একভাষী সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছে, তাদের মধ্যে ইংরেজি ও ফার্সির মতো দুটি বিদেশি ভাষাও আছে। কিন্তু ফার্সিভাষী মোগল সাম্রাজ্য বা ইংরেজিভাষী ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যকে জাতীয় রাষ্ট্র নিশ্চয় বলা চলে না।

সংস্কৃতির অন্যান্য অঙ্গের কথা বিবেচনা করলে দেখা যায়, ইউরোপ জীবনের সব ক্ষেত্রেই ভারতের তুলনায় ঢের বেশি সংহত; ভারত অনেকটা শিথিলবিন্যস্ত। ভারতীয় আহার্য সম্পর্কে সুনীতিকুমারের নিম্নোদ্ধৃত অভিমত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ :—

"সরষের তেল দিয়ে রান্না বাঙলার বৈশিষ্ট্য। অন্ধ্র দ্রাবিড় কর্ণাটে যেমন তিলের তেল দিয়ে রাঁধে, কেরলে যেমন নারকেল তেল দিয়ে ......পানীয় আর খাদ্যে ব্যবহৃত স্নেহদ্রব্য অনুসারে ইউরোপকে দুই ভাগে বিভাগ করা যায়—বিয়ার আর মাখনের দেশ, আর আঙুরের মদ আর জলপাই-এর তেলের দেশ। আমাদের ভারতবর্ষকেও ইউরোপের দুই খণ্ডের মতো দুটো ভাগে বিভাগ করা যায়—দাল-রুটি ঘিয়ের দেশ আর ভাত মাছ-তেলের দেশ। পাঞ্জাব, সংযুক্ত প্রদেশ, নেপাল, রাজপুতানা, মালব দেশ প্রভৃতি পড়ে প্রথম পর্যায়ে আর বাঙলা দেশ, উড়িষ্যা, মাদ্রাজের উপকূল প্রভৃতি পড়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে।" (ইউরোপ ১৯৩৮, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৮, ১২৬-২৭।)

খাদ্য পানীয় ও বেশভূষার দিক দিয়ে ইউরোপের ঐক্য আর ভারতের অনৈক্য এত বেশি প্রবল যে, চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার দরকার নেই। ইউরোপের মতো অত বেশি না হলেও ভারতবর্ষে একটা অন্তর্নিহিত সাংস্কৃতিক ঐক্য অবশ্যই আছে। কিন্তু যখন অধিকতর সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক ঐক্য সত্ত্বেও ইউরোপ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এক হতে পারে নি, তখন সমগ্র ভারতবর্ষে কেবল ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক অখণ্ডতার জোরে একটিমাত্র জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে, এ-আশা করা বাতুলতা মাত্র।

বস্তুত ভারতবর্ষ একটি অখণ্ড ভৌগোলিক সত্তা ও সামান্য পরিমাণে সংস্কৃতিগত ঐক্যসম্পন্ন হলেও এখানে বহু ভাষা, জাতি ও ধর্মসম্প্রদায়ের বাস হওয়ায় তার ওপর তীব্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও ভেদবুদ্ধি ঐ ভাষাভাষী জাতি ও ধর্মসম্প্রদায়গুলিকে পৃথক্ হবার প্রবণতা দেওয়ায় এখানে কোন বৃহৎ সামাজিক তথা রাষ্ট্রিক ঐক্য কোন সময়ে গ'ড়ে ওঠে নি। ধর্মের ভিত্তিতে জাতি গঠনের চেষ্টা এখানে সাফল্য লাভ করে নি। ভারতের সমস্ত হিন্দু এক জাতিতে পরিণত হয় নি, সমস্ত মুসলমানও এক জাতিরূপে গঠিত নয়। খ্রীষ্টান ও অন্যান্য ক্ষুদ্র সম্প্রদায় সম্বন্ধেও সেই কথা প্রযোজ্য। আর ভাষার ভিত্তিতে সমগ্র ভারতবর্ষে একটিমাত্র জাতি গঠনের কোন প্রশ্ন উঠতেই পারে না।

একটু ভেবে দেখলে বোঝা যায় যে, তথাকথিত ভারতীয় ঐক্য বলতে প্রকৃতপক্ষে কেবল হিন্দু ঐক্যকে বোঝায়। কিন্তু সর্বভারতীয় হিন্দু ঐক্য মোটেই খ্রীষ্টীয় ঐক্যের মতো একটি সুগঠিত ধর্মপ্রতিষ্ঠান বা চার্চের নিয়ন্ত্রণাধীন ঐক্য নয়; ধর্মের ক্ষেত্রেও হিন্দুরা কোন "চার্চ" কখনও গঠন করে নি। হিন্দু ঐক্য একটা অত্যন্ত অস্পষ্ট, প্রায় দুর্বোধ্য ব্যাপার। সামাজিক ক্ষেত্রে বর্ণভেদ ও অস্পৃশ্যতাবোধ সর্ব-ভারতীয় হিন্দু সমাজকে প্রবল সংহতি দান করে নি। সুতরাং ভারতীয় বা হিন্দু ঐক্য বলতে ইংরেজ ঐক্য বা বুলগার ঐক্য, জাপানি ঐক্য বা ফরাসি ঐক্যের মতো নির্দিষ্ট কিছু বোঝায় না। বৈদিক আর্যরা ঋগ্বেদ রচনার যুগে এক ভাষা, এক রকম আহার্যপানীয় এবং এক ধরনের বেশভূষার জন্যে এক জাতি ছিল এটা সম্ভবপর; কিন্তু আর্য-অনার্যমিশ্র পরবর্তী হিন্দুসমাজ বহু ভাষা বহুতর খাদ্যপানীয় ও বেশভূষার

পার্থক্যের জন্যে আজ আর একটিমাত্র জাতি ব'লে গণ্য হতে পারে না। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কালে এই জন্যে ভারতবর্ষে কখনও একজাতীয় একটিমাত্র রাষ্ট্র গ'ড়ে উঠতে পারে নি। যে দু' চারবার শতাব্দীকালের মতো স্থায়ী ঐক্য দেখা গেছে তা সাম্রাজ্যিক ঐক্য, জাতীয় ঐক্য নয়।

ভারতে সমস্ত মুসলমান একত্র হয়ে ভৌগোলিক ভারতে মুসলিম ধর্মের ভিত্তিতে একটি পাক বা পবিত্র জাতি ও পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনে উৎসাহী হয়েও বাস্তব ক্ষেত্রে কোন একটিমাত্র জাতি গঠন করতে পারে নি যদিও ইংরেজের সহায়তায় সামরিক ভাবে খণ্ডিত ভারত বা হিন্দুপরিষ্ঠস্থানের মধ্যে পাকিস্তান বা মুসলিমগরিষ্ঠস্থান রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে। পাকিস্থানও একটি বহুভাষী বহুজাতিক রাষ্ট্র, তার যা ঐক্য তা ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারলব্ধ ঐক্য, তাকে জাতীয় ঐক্য বলা যায় না। খণ্ডিত ভারত ও পাকিস্থান রাষ্ট্র দুটির ভেতর-থেকে-গড়ে-ওঠা জাতীয় ঐক্য নয়, বাইরে-থেকে-চাপিয়ে-দেওয়া সাম্রাজ্যিক ঐক্য।

ভাষার ভিত্তিতে এক এক অঞ্চলের সমস্ত হিন্দু-মুসলিম-খ্রীষ্টান ধর্মনির্বিশেষে এক জাতি, অন্যভাষী হিন্দু বা মুসলিম বা খ্রীষ্টানের সঙ্গে মিলে কোন ধর্মভিত্তিক জাতি ভৌগোলিক ভারতে গড়ে ওঠে নি। বরং ধর্মের ভিত্তিতে একভাষী জাতি দ্বিধা বা ত্রিধাবিভক্ত হয়েছে বা হতে পারে বটে। অর্থাৎ পাঞ্জাবি মুসলমান ও পাঠান মুসলমান মিলে এক পবিত্র পাক জাতি গঠিত হয় নি। পাঠান মুসলমান ও পাঠান হিন্দু মিলে এক পশতোভাষী পাঠান জাতি; আবার, পাঞ্জাবি হিন্দু, পাঞ্জাবি মুসলমান ও পাঞ্জাবি শিখ মিলে ইউনিয়নিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে মালিক খিজির হায়াৎ খানের আমলে যে পাঞ্জাবি জাতি গ'ড়ে উঠছিল তা এখন ত্রিধাবিভক্ত হয়ে পাঞ্জাবি মুসলমানগরিষ্ঠ পশ্চিম পাঞ্জাব এবং প্রথমে পাঞ্জাবি হিন্দুগরিষ্ঠ পূর্ব পাঞ্জাব নামে দুটি প্রদেশে পরিণত হবার পর পাঞ্জাবিভাষী পাঞ্জাব প্রদেশ এবং হিন্দিভাষী হরিয়ানা প্রদেশে পর্যবসিত হয়েছে। সুতরাং পাঞ্জাবিভাষী বৃহৎ পাঞ্জাবি জাতির মুসলিমগরিষ্ঠ অংশ পশ্চিম পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং অবশিষ্ট হিন্দুগরিষ্ঠ অংশের একাংশ পাঞ্জাবি ভাষা পরিত্যাগ ক'রে হিন্দিকে মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করায় সেই হিন্দুগরিষ্ঠ এলাকা আবার ভাষার ভিত্তিতে পাঞ্জাবি-গরিষ্ঠ ও হিন্দিগরিষ্ঠ দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে: অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আয়তনের পাঞ্জাব ও হরিয়ানা। এই নবগঠিত ক্ষুদ্র পাঞ্জাবে শিখদের বেশির ভাগ বাস করে বটে, কিন্তু এটিও হিন্দুগরিষ্ঠ রাজ্য, শিখগরিষ্ঠ নয়। এটির ভিত্তি পাঞ্জাবি ভাষা, শিখ ধর্ম নয়। আগের অখণ্ড পাঞ্জাবের মুসলিমপ্রধান বৃহত্তর অংশ পাঞ্জাবি ভাষাকে পরিত্যাগ ক'রে উর্দু ভাষাকে বরণ করেছে; হিন্দুপ্রধান অংশের একাংশ হিন্দিকে স্বীকৃতি দিয়েছে; হিন্দুশিখপ্রধান অবশিষ্ট ক্ষুদ্রাংশ পাঞ্জাবিকেই মাতৃভাষারূপে অঙ্গীকার ক'রে থেকেছে ব'লে এটিই এখন প্রকৃত পাঞ্জাব, অন্য দুটি অংশ উর্দুভাষী পশ্চিম পাকিস্থান ও হিন্দিভাষী হরিয়ানা। অর্থাৎ জাতিগঠনের ক্ষেত্রে ভাষা ও ধর্মের সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত ভাষারই জয় হয়েছে। ধর্ম একভাষী এলাকাকে দুভাগে ভাগ করেছে বটে কিন্তু অন্যভাষী এলাকাকে ধর্মের জোরে আর একভাষী এলাকার সঙ্গে মিলিয়ে এক রাষ্ট্রগঠন করলেও দুটি স্বতন্ত্র ভাষা ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীকে একজাতীয়তা দিতে পারে নি।

মহাভারতের সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতে একজাতীয়তার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ৩৬ বছর পরে ভারতবর্ষ আবার খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কৃষ্ণ নিজেও ভারতের রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় ঐক্য স্থাপন করতে পারেন নি। বরং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর নিজের বংশ ও তাঁর ভাগিনেয়বংশের মধ্যে ইন্দ্রপ্রস্থ ও হস্তিনাপুর বিভক্ত হয়ে পড়ে। মহাপদ্ম নন্দ যুধিষ্ঠিরের তুলনায় বেশি একরাট্ সম্রাট ছিলেন বটে, কিন্তু তিনিও ইংরেজশাসিত ভারতের মতো বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করতে পারেন নি, একজাতীয় ভারতরাষ্ট্র গঠন তো বহু দূরের কথা। পরবর্তীকালে মৌর্যবংশ, গুপ্তবংশ, খিলজি-তোগলক বংশ, মোগল বংশ এবং সবশেষে ইংরেজরা মোট পাঁচ বার ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যের অধীনে আনে। গত তেইশ শত বৎসরের মধ্যে প্রতি দফায় বড় জোর এক শতাব্দী ক'রে ঐ সাম্রাজ্যিক বন্ধনগুলি স্থায়ী হয়। এই যে পাঁচ বারের সাম্রাজ্যবন্ধন, একে একজাতীয় ঐক্য ব'লে চালানো

প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রতি ক্ষেত্রেই সাম্রাজ্যের নাগপাশ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ভৌগোলিক ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন জাতি আপ্রাণ চেষ্টা করেছে এবং অল্পদিনের মধ্যে মুক্তিলাভ ক'রে তবে ক্ষান্ত হয়েছে। সাম্রাজ্যগুলি যখন গঠিত হয়েছে তখন জনগণের সংর্থনে বা তাদের সচেতন সচেষ্ট সহযোগিতায় গ'ড়ে ওঠে নি। বরং প্রতি ক্ষেত্রেই রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাঞ্চী-কাবেরী কাব্যে উল্লিখিত বা রবীন্দ্রনাথ-বর্ণিত কাঞ্চী কর্ণাট যুদ্ধের মতো নিদারুণ লোকক্ষয়, অত্যাচার ও রক্তপাতের বীভৎসতার মধ্য দিয়ে ঐ সাম্রাজ্যিক ঐক্য এসেছিল। সম্রাট অশোক এই ব্যাপারটি বুঝেই কলিঙ্গ যুদ্ধের পর আর দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করেন নি।

ইংরেজরা একটিমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা একজন একাধারে রাজপ্রতিনিধি বা ভাইসরয় ও বড়লাট বা গভর্নর-জেনারেলের অধীনে যত বৃহৎ ভৌগোলিক ভারতীয় এলাকা শাসন করেছিল, মানতেই হবে যে, আগে আর কোন সাম্রাজ্যিক শক্তি তা করতে পারে নি। ইংরেজের অধীন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের শক্তি ভৌগোলিক ভারতের চতুঃসীমা অতিক্রম ক'রে উত্তরে, পূর্বে, দক্ষিণে ও পশ্চিমে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়েছিল। চন্দ্রগুপ্ত ও আওরংজেবের আমলে ভৌগোলিক ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বাইরে আফগানিস্তান ও বাদাখশানে মৌর্য ও মোগলদের কর্তৃত্ব স্থাপিত ও বিস্তৃত হয়েছিল বটে, কিন্তু খাস ভারতের দক্ষিণতম প্রান্ত অনধিকৃত ছিল এবং ভারতের বাইরে উত্তরে, পূর্বে ও দক্ষিণে তাদের কোন বহির্ভারতীয় অধিকার সম্প্রসারিত ছিল না। লর্ড ড্যালহাউসি যখন বলেছিলেন, "আমি হিন্দুস্থানকে সমভূমিতে পরিণত করব," তখন তিনি বৃথা গর্বোক্তি করেন নি। ইংরেজ জাতির সুদক্ষ ও কূটনীতিজ্ঞ পরিচালনায় একজনমাত্র একাধারে ভাইসরয় ও গভর্নর-জেনারেল সমগ্র ভৌগোলিক ভারত ও ব্রহ্মদেশ শাসন করেছেন এবং এশিয়া ও আফ্রিকার আরো কিছু দূরবর্তী এলাকায় কর্তৃত্ব করেছেন। নেপাল ও আফগানিস্তান এই এলাকার মধ্যে দুটি স্বাধীন রাজ্যরূপে ছিল বটে, কিন্তু তাদের স্বতন্ত্র পররাষ্ট্র দপ্তর বা পররাষ্ট্রনীতি ব'লে কিছু ছিল না। কাটমাণ্ড ও কাবুলে অবস্থিত ইংরেজ রেসিডেন্ট ভারত-সরকারের তরফ থেকে তাদের যথোপযুক্ত ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন। সিংহলকে "ক্রাউন কলোনি" রূপে বরাবর স্বতন্ত্র ক'রে রাখা হলেও তার ইংরেজ গভর্নর ভারতের বড়লাটের দ্বারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে নিয়ন্ত্রিত হতেন। ভৌগোলিক ভারতের বাইরের ব্রহ্মদেশ তখন ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ ব'লে গণ্য হত; মালয় ও সিঙ্গাপুর, এডেন ও বহ্‌রাইন ভারতের বড়লাটের দ্বারা দিল্লি থেকে নিয়ন্ত্রিত হত; ভারত মহাসাগরের দ্বীপ মরিশাস ও সিশিলিস, ব্রিটিশ পূর্ব আফ্রিকা বড়লাটের কতকটা আজ্ঞাবাহী ছিল; তিব্বতেও বড়লাটের প্রতিনিধির কথা শুনে চলত। তিব্বতের রাজধানী লাসার ডাকবিভাগ তখন কলিকাতার জি, পি, ও,-র দ্বারা পরিচালিত হত।

সুতরাং যতদূর ঐতিহাসিক দৃষ্টি যায়, ১৯০১ সালের মধ্যে কলিকাতাকে রাজধানী ক'রে ইংরেজরা যে বিরাট সাম্রাজ্য গঠন শেষ ক'রে ফেলেছিল, তার চেয়ে বড় ঐক্য-বদ্ধ ভারত ও সাম্রাজ্য আর কখনও কোন ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা শাসিত হয় নি। ভৌগোলিক ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ নিয়ে এবং আফগানিস্তানও তিব্বতকে প্রভাবিত ক'রে ঐতিহাসিক কালে ভৌগোলিক ভারতে স্থাপিত বৃহত্তম সাম্রাজ্য গঠনের কাজ ইংরেজেরা ১৭৫৭—১৯০১ সালের মধ্যে সমাপ্ত করে। ভৌগোলিক দিক থেকে ভারতবর্ষ বলতে যে ভূখণ্ডকে বোঝায় তার সমস্তটাই ব্রিটিশ ভারতের প্রভাবাধীন এলাকা ছিল। সিংহলকে একটি আলাদা রাষ্ট্ররূপে রাখা হয়েছিল। কিন্তু ভৌগোলিক ভারতের বহির্ভূত ব্রহ্মদেশ এই ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফরাসী ও পোর্তুগিজ ভারতের অকিঞ্চিৎ-কর আয়তন ও লোকসংখ্যার কথা এই হিসেব থেকে বাদ দিতে হবে। খাস ব্রিটিশ ভারতের অর্থাৎ কলিকাতা থেকে শাসিত ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকারের বাইরে ছিল ভৌগোলিক ভারতের এই ক'টি এলাকা:—

পোর্তুগিস ভারত, ফরাসি ভারত, আফগানিস্তান রাষ্ট্র, নেপাল রাষ্ট্র, ভুটান রাষ্ট্র, প্রোটেক্টরেট বা আশ্রিত সিকিম রাষ্ট্র, ইংরেজ-শাসিত সিংহল রাষ্ট্র মাল দ্বীপপুঞ্জ সমেত। এই এলাকাগুলির মধ্যে পোর্তুগিস ও ফরাসি ভারত ছাড়া আর সব ক'টির ওপরেই ব্রিটিশ ভারতের কেন্দ্রীয়

সরকারের প্রভাব বিস্তৃত ছিল। ভৌগোলিক ভারতের বাইরের ব্রহ্মদেশ এই কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন প্রদেশ ব'লে গণ্য হওয়ায় বাস্তবিকভাবে ব্রিটিশ ভারতের আয়তন ভৌগোলিক ভারতের প্রায় সমান ছিল। এ ছাড়া তিব্বতের ওপ'রও ব্রিটিশ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাব বিস্তৃত হয়।

১৮৫৮ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঐতিহাসিক ঘোষণার পর থেকে এই ব্রিটিশ ভারত রাষ্ট্র সাক্ষাৎভাবে ইংরেজ সরকারের দ্বারা শাসিত হতে থাকে। লর্ড কার্জন ১৯০১ সালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ গঠন ও কর্ণেল ফ্রান্সিস ইঅংহাজব্র্যাণ্ড তিব্বতের রাজধানী লাসা অধিকার করার পর এই রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যিক গঠন শেষ হয়। ১৯০১-৩৪ সাল পর্যন্ত সময়ে এই অখণ্ড ভারত যে-নিরুপদ্রব নিরাপত্তা, শান্তি ও সমৃদ্ধির মধ্যে শাসিত হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মধ্যবর্তী সময়ে ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও, তা ভারতের নামগ্রহণকারী বর্তমান খণ্ডিত রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠির সামর্থ্যের সম্পূর্ণ অনায়ত্ত।

১৯০১ সালে ব্রিটিশ ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ গঠিত হবার পর মর্টিমার ডুরাণ্ড ভারত-আফগানিস্তান সীমারেখা নির্ধারণ করেন। এর ফলে খাইবার গিরিসঙ্কট ব্রিটিশ ভারতের পশ্চিমতম সীমা ব'লে নির্দিষ্ট হয়। ডুরাণ্ড সাহেবের নির্ধারিত সীমারেখা "ডুরাণ্ড লাইন" নামে আন্তর্জাতিক ও ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এখনও এই ডুরাণ্ড সীমারেখা পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যবর্তী সীমারেখারূপে গ্রাহ্য। ১৯১১ সালে চীন-বিপ্লবের পর চীনে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটলে সাময়িকভাবে চীনের সামরিক কর্তৃত্ব বিস্তারের ক্ষমতা ক'মে যায়। কতকটা সেই সুযোগে ১৯১৪ সালে ম্যাকম্যাহন সাহেব ভারত-তিব্বত তথা ভারত-চীন সীমারেখা নির্ধারণ করেন। আজ পর্যন্ত সেই নির্ধারিত সীমারেখাই ভারত চীন সীমারেখারূপে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃত। আফগানিস্তান ডুরাণ্ড সীমারেখায় অসন্তোষ প্রকাশ করে; চীনও ম্যাকম্যাহন সীমারেখা মানতে ইচ্ছুক নয়। তবুও এই দুটি সীমারেখা ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে চীন ও আফগানিস্তানের সীমানা নির্ধারণ করছে। মধ্য দিয়ে ইরাণের একটি শহর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ১৯১১ সালে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হল। এই নতুন রাজধানী থেকে অখণ্ড ভারত যেমন শৃঙ্খলা ও নৈপুণ্যের সঙ্গে শাসিত হয়েছে, আগে-পরে আর কখনও সে-ভাবে এত বেশি দক্ষতার সঙ্গে এত বৃহৎ সাম্রাজ্য শাসন হয় নি। ইংরেজেরা ডুরাণ্ড ও ম্যাকম্যাহন সীমারেখার দ্বারা ভারতের যে চৌহদ্দি মেপে ছিল, আজও "অখণ্ড ভারত" বলতে মোটামুটি সেই এলাকাটাই বোঝায়। এই এলাকা একরাষ্ট্রভুক্ত করার ব্যাপারে কোন ভারতীয় নেতার কোন প্রভাব কখনও সক্রিয় হয় নি, সমস্ত কৃতিত্বটা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রাপ্য; ব্রিটিশ কূটনীতিজ্ঞ ও সামরিক নেতাদের দক্ষতার পরিচায়ক।

ইংরেজ গঠিত অখণ্ড ভারতের রাজধানী কলিকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হবার পর দিল্লি থেকে বড়-লাটের দ্বারা বৃহত্তর জগৎ প্রভাবিত হতে থাকে। তাঁর প্রেরিত এক এক জন রেসিডেন্ট নেপাল, ভুটান, সিকিম, আফগানিস্তান ও তিব্বতকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। সিকিম ও ভুটানকে স্বাধীন বলার কোন কথাই উঠত না। নেপালেরও পররাষ্ট্রবিভাগীয় স্বাধীনতা ছিল না। তিব্বত নামে মাত্র চীনের অধীন ছিল; কিন্তু সেখানে ব্রিটিশ-ভারতীয় প্রভাব ছিল অনেক বেশি। আফগানরা রুশ প্রভাবে কতকটা প্রভাবিত হলেও তাদের শাসক আমির ইংরেজ রেসিডেন্টকে ১৯১৯ সালের শেষ আফগান যুদ্ধের পর থেকে ভয় ক'রে চলতেন। ব্রহ্মদেশ ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত পুরো-পুরি এই ভারতের অন্তর্গত একটি প্রদেশ ছিল। সিংহল ও মালদ্বীপপুঞ্জও ব্রিটিশ শাসিত একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে কতকটা ভারতের বড়লাটের আওতায় থেকে ভারতের সঙ্গে এখনকার চেয়ে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ ছিল।

এই ভারত কি একজাতীয় রাষ্ট্র ছিল?

এই ভারত যে একজাতীয় রাষ্ট্র ছিল না তা বুঝবার জন্যে কারো বেশি মস্তিষ্ক চালনার আবশ্যকতা নেই। ইংরেজদের রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই ভারত রাষ্ট্রেরও সীমানা পরিবর্তন হচ্ছিল। হিন্দু মহাসভার মতে,

আর্য ভাষার প্রসারক্ষেত্রের পশ্চিম সীমার কথা বিবেচনা করলে এই ধারণা সত্য, কিন্তু বিশুদ্ধ ভৌগোলিক দিক থেকে এই ধারণা ঠিক নয়। ইংরেজরা সিন্ধু নদ পর্যন্ত অধিকার ক'রেও আরো পশ্চিমে এই জন্যে অগ্রসর হয়েছিল যে, ভারতের স্বাভাবিক পশ্চিম সীমা সিন্ধু নদের পশ্চিমের পর্বতমালা পর্যন্ত প্রসারিত না করলে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নিরাপদ হয় না। অর্থাৎ এই অধ্যায়ের প্রথমে আমরা ভৌগোলিক ভারতের যে সীমা নির্দেশ করেছি, যা ঐতিহাসিক প্রবর ভিনসেণ্ট স্মিথও নির্ধারণ করেছেন, সেই রেখা বরাবর ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্য প্রসারিত করাই ছিল ইংরেজ রাজনীতিবিদ্‌দের লক্ষ্য। ভাষার ভিত্তিতে বিচার করলে ভারতীয় আর্যভাষার পশ্চিমতম প্রান্ত যে সিন্ধুনদ, এ-কথা বৈদিক যুগ থেকে সত্য। সঙ্গে সঙ্গে একথাও নির্ভুল যে, যেমন ভাগীরথী নদীর উভয় কূলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ প্রসার ও পরিপুষ্টি, ঠিক সেই রকম ভাবে সিন্ধুনদের উভয় তীরে প্রাচীন ঋগ্বেদীয় আর্যজাতির বিশেষ বিস্তার ও সমৃদ্ধি সাধন হয়েছিল। পরে যখন বৈদিক আর্যদের কাছ থেকে অসুর প্রভাবিত ইরানীয় আর্যরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, মাত্র তখনই সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরবর্তী ভূখণ্ড ইরানভূমির অন্তর্গত ব'লে গণ্য হতে লাগল। তার আগে সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরেও ঋগ্বেদীয় তথা ভারতীয় আর্যদের সংস্কৃতিই প্রবলতর ছিল। তখন আর্য সংস্কৃতি বলতে ভারতীয়-আর্যভাষী সংস্কৃতিই বোঝাত। সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরের যে-ভূখণ্ড ইংরেজ তার ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিল সেখানে এখন ইরানীয়-আর্যভাষার প্রচলন এবং এই প্রচলন বৈদিক যুগ থেকে হলেও আর্যবিরোধ হবার আগে ঐ ভূখণ্ডে ভারতীয় আর্যজাতির প্রাধান্য ছিল। হিন্দুকুশ পর্বত পর্যন্ত এলাকা ভৌগোলিক দিক দিয়ে ভারতের স্বাভাবিক পশ্চিম সীমারূপে গ্রাহ্য হতে পারে। ইংরেজরা যদি মধ্য এশিয়ার দিকে অগ্রসর হয়ে খোটান ও কাসগর অধিকার করত, তাহলে আমরা সে-অঞ্চলকেও অখণ্ড ভারতের অন্তর্ভুক্ত ব'লে দাবি করতে পারতাম এই যুক্তিতে যে, এককালে সেখানে ভারতীয় আর্যদের বসতি আর্যদের হাতছাড়া হবার অনেক পরেও কাশ্মীরের উত্তর দিগ্‌বর্তী মধ্য এশীয় এলাকায় ভারতীয় আর্যদের বসতি অক্ষুণ্ণ ছিল এবং সেখানে ভারতীয়-আর্যভাষায় রচিত উৎকৃষ্ট সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছিল।

কিন্তু বর্তমান কালের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখন উদীচ্যদেশে বা কাশ্মীরের উত্তরের মধ্য এশিয়ায় সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মহাচীনের অধীনে তুর্কিস্থানীদের বাস। সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরের সমস্ত ভূখণ্ড ভাষার দিক দিয়ে ইরানীয় আর্যজাতির অধিকারভুক্ত। সাধারণ শত্রু ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করার প্রয়োজনে পাঠানরা অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল বটে, কিন্তু ভারত স্বাধীন হবার পর পাঠানভূমি বা পাঠানল্যাণ্ড বা পাঠানিস্থান বা পুশতুনিস্থান বা পশ্‌তো বা পুশ্‌তুভাষী এলাকা যে ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকবে এমন পরিকল্পনা পাঠানদের কখনও ছিল না। ইংরেজ ভারত থেকে সাম্রাজ্যবিস্তারের কাজে যতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হবে, ততদূর বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকাকে ভারত ব'লে দাবি করতে হবে, এই যুক্তি হাস্যকর। তা হলে ব্রহ্মকেও ভারত বলে দাবি করতে হয়। অথচ ভারত থেকে ব্রহ্মকে বিচ্ছিন্ন করার সময়ে সর্ব-ভারতীয় নেতারা কোন আপত্তি করেননি; ভারতীয় কংগ্রেসের ব্রহ্ম শাখায় কেবল ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয়রা সদস্য ছিল, বর্মীরা তাতে যোগ দেয়নি, তাদের ভারতীয় করলে কংগ্রেসের কোন উৎসাহ কখনও দেখা যায় নি। পরম কৌতুকের বিষয় এই যে, অখণ্ড ভারতের স্বপ্নে যাঁরা মশ্‌গুল, সেই জনসংঘ প্রভৃতি দল সিংহলকে কখনও তাঁদের প্রস্তাবিত অখণ্ড ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করার সাধনার কথা ভাবেননি। অথচ সিংহল ভৌগোলিক, ভাষাতাত্ত্বিক, ধর্মীয় প্রভৃতি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দিক—সব রকমে ভারতের অন্তর্গত, যা পাখ্‌তুনিস্থান মোটেই নয়।

পাঠানরা যে ভারতের অন্তর্গত থাকতে চায়নি, সে-সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে সৈয়দ মুজতবা আলির লেখায়:—

"আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তাই বুঝি আপনারা স্বাধীন আফগানিস্থানের অংশ হতে চান না? ভারতবর্ষ স্বাধীন

সব পাঠান একসঙ্গে চেঁচিয়ে বললেন, 'আলবৎ না। আমরা স্বাধীন রুস্তিয়ার হয়ে থাকব—সে মুল্লুকের নাম হবে পাঠানমুল্লুক।'

আমি বললুম, 'ভারতবর্ষের অংশ যখন হবেন না, তখন দয়া ক'রে রাশিয়ানদের আপনারাই ঠেকিয়ে রাখবেন।'

সবাই সমস্বরে বললেন, 'আলবৎ'। (দেশে-বিদেশে, পৃঃ ৪৭-৪৮)।

ইংরেজ গঠিত ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তার মধ্যে ছিল ইরানীয়-আর্যভাষী দুটি জাতি: পাঠান ও বালুচ; অর্থাৎ ইরানভূমির একাংশ সিন্ধু নদ অতিক্রম ক'রে দখল করা হয়েছিল; তারও পর-পারে ভৌগোলিক ভারতের শেষ প্রান্তের পশ্চিম সীমান্ত রাষ্ট্র আফগানিস্থান। আফগানিস্থান রাষ্ট্রের বর্তমান সীমানার মধ্যে আফগান জাতির লোকরা ছাড়া পাঠনরাও বহু সংখ্যায় বাস করে। পাঠান মুল্লুকের বুক চিরে চলে গেছে ডুরাণ্ড সীমারেখা- এই রেখার দুধারেই পশ্‌তো-ভাষীদের বাস। সুতরাং ডুরাণ্ড সীমারেখা রাজনৈতিক প্রয়োজনে ইংরেজ গঠিত ভারত-সাম্রাজ্যর পশ্চিম সীমা নির্দেশ করলেও তা কখনও ভৌগোলিক ভারতের স্বাভাবিক সীমারেখারূপে গণ্য হতে পারে না। হয় সিন্ধু নদ, আফগানিস্থানকে ভৌগোলিক ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমা বলে ধরতে হয়। বৈদিক-পৌরাণিক-মৌর্য-মোগল যুগে হেলমন্দ নদীতীরবর্তী গান্ধার বা কান্দাহার রাজ্য, হিন্দুকুশ পর্বতের সংলগ্ন আমুদরিয়া নদীর তীরবর্তী বাহ্লীক বা বালখ রাজ্য ভৌগোলিকভাবে ভারতসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তরূপে গণ্য হত। ইংরেজদেরও হিন্দুকুশ-আমুদরিয়া হেলমন্দ্‌ বরাবর সাম্রাজ্যবিস্তারের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মুখ্যত রুশ প্রতিকূলতার জন্যে তা সম্ভবপর হয় নি। ইংরেজ-অধিকৃত ভারতে তাই দুটি ইরানীয়-আর্যভাষী জাতিকে পাওয়া যায়। ইরানীয় আর্যভাষী আফগান জাতি ভৌগোলিক ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলেও ইংরেজগঠিত ভারতের বাইরে তাদের স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। ব্রিটিশ ভারতে ভারতীয়-আর্যভাষী জাতি ছিল ষোলটী; ভৌগোলিক ভারতে আছে আরো দুটী: নেপালি ও সিংহলি। দ্রাবিড় ভাষী চারটী বড় জাতি ব্রিটিশ ভারতে পাওয়া যায়। তা ছাড়া ছোট ছোট অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও বোড়ো জাতিগুলিকে একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। মনিপুরি ও নাগা জাতি দুটীকে ব্রিটিশ ভারতেও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং ব্রহ্মদেশ বাদে ব্রিটিশ ভারতে ইরানীয়-আর্য, ভারতীয়-আর্য, দ্রাবিড় ও বোড়ো ভাষাগোষ্ঠীর মোট অন্তত চব্বিশটি জাতি বর্তমান ছিল যারা আবার নানা ধর্মে বিক্ষিপ্ত। ঐ চব্বিশটি জাতিই ইউরোপীয় মানদণ্ডে চব্বিশটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের সামর্থ্যযুক্ত ছিল। কাজেই বর্ম্মা বা ব্রহ্ম বাদে অবশিষ্ট ব্রিটিশ ভারতকেও একজাতীয় রাষ্ট্র বলার মতো অসঙ্গত আর কিছু হয় না।

তিব্বত ও ব্রহ্মদেশকে ভৌগোলিক ভারতের বহির্ভূত ব'লে হিসেব থেকে বাদ দিলে দেখা যায়, ব্রিটিশ ভারতের বাইরে ভৌগোলিক ভারতে আরো পাঁচটী রাষ্ট্র ছিল: আফগানিস্থান, নেপাল, ভুটান, সিকিম ও সিংহল। এদের মধ্যে সিকিমকে ব্রিটিশ ভারতের আশ্রিত রাজ্যরূপে ধরা হত; বাকি চারটি রাষ্ট্র মোটামুটি স্বাধীন ছিল। এই পাঁচটী এলাকা বাদে অবশিষ্ট সমস্ত ব্রিটিশ ভারতে ভাষার ভিত্তিতে অন্তত চব্বিশটী জাতির অস্তিত্ব দেখা যায়।

[ক্রমশঃ

বাঙ্গলার বিস্মৃত নরপতি

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

বাঙ্গালার ইতিহাসে পাঠান শাসনকাল স্বাতন্ত্র্যকামী বাঙ্গালীর শাসনকাল বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানের মধ্যে স্বার্থ সমন্বয় সংস্থাপিত হইবার পর;—হিন্দু মুসলমানের সমবেত বাহুবলে এই স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং হিন্দু মুসলমানেরই সম্মিলিত প্রতিভা বলে বঙ্গভূমির সুখ সমৃদ্ধ উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সুলতান সুলেমানের (কররাণী) সেনাপতি কালাপাহাড়ের অত্যাচারে এই দুই সম্প্রদায়ের মিলন সেতু ভাঙ্গিয়া-খসিয়া-ভাসিয়া গেল। দুইদলের সমর কোলাহলে বাঙ্গালার আকাশ বাতাস কাঁপিয়া উঠিল।

রাজার অত্যাচার বৃদ্ধি না পাইলে সুখসুপ্ত প্রজা নয়ন মেলিয়া চারিদিক চাহিয়া দেখে না, তাহার হৃদয়ে নব জাগরণের স্পৃহা জাগরিত হয় না, তাই সুলতানের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ কালাপাহাড়ের অত্যাচারে হিন্দু জনসাধারণের প্রাণ যখন বিপন্ন হইয়া উঠিল (১) তখন মেঘমুক্ত রবির মত হিন্দু জনসাধারণের মনে মুক্তি কামনা জাগিয়া উঠিল। নব জাগরণের অরুণ উষালোকে উদ্বোধন সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে রাজা দেবীদাস বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। সে ইতিহাসকে কেবল হিন্দুর গৌরবের ইতিহাস বলিলে চলিবে না, তাহা অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিকারকামী প্রজার অভ্যুত্থানের ইতিহাস—তাহা বাঙ্গালী জাতির গৌরব মণ্ডিত কাহিনী।

সে আজ বহুদিনের কথা—মহারাজ বল্লাল সেনের রাজত্বকালে যে কয়েকজন বারেন্দ্রব্রাহ্মণ কৌলিন্য মর্য্যাদা পাইয়াছিলেন বাৎস্যগোত্রীয় ভীম ওঝা তাঁহাদের অন্যতম (২) কুলশাস্ত্রে জানা যায়—বল্লাল যখন নীচ জাতীয়া কোনও রমণীকে বিবাহ করেন, সেই সময় ইনি গৌড়নগরী পরিত্যাগ করিয়া আধুনিক পাবনা জেলার ছাতক গ্রামে আসিয়া বাস স্থাপন করেন (৩) মতান্তরে, তিনি বোয়ালিয়াতে বাস করিতে আরম্ভ করেন (৪) এই উভয় মতই কুলশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া লিখিত, উভয় মতই তর্ক কোলাহলে পূর্ণ। সেই সুপ্রাচীন কালে ভীম ওঝা যে কোথায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন, তাহা এখন যথাযথ ভাবে নির্ণয় করিবার উপায় নাই। অন্য কোনও লিখিত প্রমাণ না থাকায় কুলশাস্ত্রই এখন সামাজিক ইতিহাসের প্রধান অবলম্বন হইয়া আছে। কিন্তু যেখানে কুলশাস্ত্র অবলম্বনে লিখিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে, তখন বিশেষ বিবেচনার সহিত উহার মধ্যে একটীকে গ্রহণ করিতে হইবে।

জনশ্রুতি মূলক উপাখ্যানের মধ্যে কত ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত যে রূপান্তরিত হইয়া আছে, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। স্থান, কাল ও বিষয় ভেদে জনপ্রবাদও অতি সাবধানে বিচার করিলে তাহা হইতে অনেক সময়ে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হইয়া থাকে। ভীম কালিহাই বংশের প্রগতির সহিত (৫) এখনও শ্রুতির সংশ্রব দেখিতে পাওয়া যায়। এই জনশ্রুতি বোয়ালিয়াতেই ভীম ওঝার বাসস্থান নির্ম্মাণের আভাস দেয়। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজে "বোয়ালিয়ার সমাজ" নামক একটি প্রধান সমাজের উল্লেখ থাকাই তাহার প্রমাণ (৬) বোয়ালিয়া যে এককালে শিল্প সাহিত্যে, জ্ঞানে ধর্ম্মে সর্ব্বত্র খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, অধুনা জনশূন্য, বনজঙ্গলাকীর্ণ বোয়ালিয়ার দীর্ঘস্থানব্যাপী উচ্চমৃত্তিকা স্তূপ ও শৈবালাবৃত পুষ্করিণীসমূহ হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। কিছুদিন হইল এই বোয়ালিয়াতে শ্বেতপ্রস্তরে খোদিত একটি প্রাচীন হরগৌরী মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে. (৭) ইহাও এই গ্রামের প্রাচীনত্ব ও অতীত বৈভবের একটি নিদর্শন। তাই কুলশাস্ত্র ও জনপ্রবাদের

মধ্যে সামঞ্জস্য দেখিয়া মনে হয় ভীম ওঝা বোয়ালিয়াতেই আবাস নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মনে হয় উত্তরকালে বোয়ালিয়ার নিকটবর্তী ছাতক-গ্রাম প্রসিদ্ধিলাভ করায় গৌড়ের ইতিহাস লেখক ছাতককেই ভীম ওঝার বাসস্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ভীমের পৌত্র নারায়ণ ক্রমে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া বোয়ালিয়া অঞ্চলে ভূসম্পত্তি করেন। কুলশাস্ত্র কহিয়া থাকে যে নারায়ণ লক্ষ্মণ সেনের গুরু এবং পুরোহিত ছিলেন। লক্ষ্মণ সেন গুরু-পত্নীকে প্রণামী স্বরূপ সিন্দুর, শঙ্খ ও ধনরত্নাদিসহ আটটি পরগণা ব্রহ্মোত্তররূপে দান করেন; এই সিন্দুর ও শঙ্খ হইতেই সিন্দূরী ও শাখিনী নামে দুইটি পরগণার নামের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস (৮) কিন্তু নারায়ণ যে লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রদাতা গুরু ছিলেন তাহার কোনও প্রমাণ এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং কেবল মাত্র জনশ্রুতি মূলক কুলশাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া এতবড় একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত করা যায় না। কুলশাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া মাত্র এইটুকুই বলিতে পারা যায় যে নারায়ণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হিসাবে হয়ত কিছু ভূসম্পত্তি পাইয়াছিলেন এবং তাহা হইতেই এই জনপ্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে আবিষ্কৃত একটি চণ্ডীমূর্ত্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ একটি লিপিতে শ্রীনারায়ণ নামক একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির লক্ষ্মণ সেনের সময়ে অস্তিত্বের কথা জানা যায়। লিপিটী এইরূপ—

(১ম অংশ) শ্রীমল্লক্ষ্মণ
সেন দেবস্য সং ৩।
(২য় অংশ) মালদেব সুত অধিকৃত
শ্রীদামোদরে
ণ চণ্ডীদেবী সমারদ্ধা ওদ্ভ্রাদকণা।
(৩য় অংশ) শ্রীনারায়ণে ণ প্রতিষ্ঠিতেতি।" (৯)

ইহাতে লক্ষ্মণ সংবতের তিনসনে মালদেবের পুত্র অধিকৃত (অধিকারী) দামোদর চণ্ডীদেবীর যে প্রতিমা নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন নারায়ণ কর্ত্তৃক লক্ষ্মণ সম্বতের চারি সনে তাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। এই লিপিতে উৎকীর্ণ এক ব্যক্তির অস্তিত্ব দেখিয়া কুলশাস্ত্রের বিবরণকে অত্যুক্তি বলিয়া উড়াইয়া দিতে সাহস হয় না। এই লিপি হইতে কুলশাস্ত্রের মতের সমর্থন যোগ্য প্রমাণ পাইয়া নারায়ণকে লক্ষ্মণ সেনের গুরু এবং পুরোহিত বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

ইহার কিছুদিন পরে সমুদয় বাঙ্গালা জুড়িয়া এক অভিনব রাষ্ট্রবিপ্লবের সূত্রপাত হইল—পাঠানের বঙ্গ আক্রমণই তাহার কারণ। তারপর ধীরে ধীরে হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায় এক হইয়া বাঙ্গালী নাম ধারণ করিল। কিরূপে যে এই দুই যুদ্ধোন্মত্ত জাতির মধ্যে মিলন সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা আর আজ জানিবার উপায় নাই। যে কিছু প্রমাণ আছে, তাহাতে জানা যায়, "দিল্লীর অভিযানই বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানকে জাতিধর্ম্মের পার্থক্য ভুলাইয়া স্বার্থ সমন্বয়ে বাঙ্গালী করিয়া তুলিয়াছিল। বঙ্গভূমি কাহার হইবে, তাহার মীমাংসার জন্য দিল্লীশ্বর যখনই তাঁহার বাদসাহী সেনা লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন, তখনই বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান একবাক্যে বলিয়া উঠিয়াছে —বঙ্গভূমি বাঙ্গালী মাত্রের জন্মভূমি—স্বতন্ত্র, স্বাধীন (১০)।

কিন্তু কালাপাহাড়ের অত্যাচারে এই মিলন সেতু ক্রমে বঙ্গোপসাগরের অতল জলে ডুবিয়া গেল—বঙ্গমাতার শ্যামল ক্রোড়ে তাঁহার স্নেহ-পালিত সন্তানযুগল আত্মকলহে মগ্ন হইল। বাঙ্গালার বক্ষে মোগল ধীরে ধীরে তাহার স্থান করিয়া লইতে আরম্ভ করিল। ঠিক এই সময়ে অনন্তরামের বংশধর দেবীদাস স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন।

স্বাধীনতা ঘোষণা করা সহজ, কিন্তু তাহা রক্ষা করা কঠিন। বোয়ালিয়া সহজেই শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হইতে পারে বলিয়া দেবীদাস বোয়ালিয়া হইতে ছাতকে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন, এবং প্রাসাদের চারিদিকে মৃন্ময় দুর্গ রচনা করেন। বোয়ালিয়াতেও আর একটী দুর্গ নির্ম্মিত হইল। রাজধানী স্থানান্তরিত করায় দেবীদাসের সমর-কুশলতারই পরিচয় পাওয়া যায়। ছাতকের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক দিয়া আত্রেয়ী নদী প্রবাহিত ছিল,

একমাত্র পূর্ব্বদিক দিয়াই আক্রমণ করিতে হইত, ঐ একটী দিক সুরক্ষিত করিতে পারিলে ছাতক অজেয় হইয়া উঠিবে বুঝিয়া দেবীদাস ছাতকে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কারণ স্থলপথ সুরক্ষিত থাকিলে, রণতরী ভিন্ন ছাতক আক্রমণ করা ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। নদীমাতৃক দেশের অধিবাসী বাঙ্গালীর সহিত জলযুদ্ধে ভারতের অপর কোনও প্রদেশের লোক আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। সুতরাং ছাতকদুর্গ সুদৃঢ় করিবার চেষ্টা করা দেবীদাসের সমরকুশলতারই পরিচায়ক।

সে সময়ে নানা কারণে বাঙ্গালার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যস্থাপন করিবার এক অনুকূল সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে মোগল কর্তৃক বঙ্গ আক্রমণ সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত এই সময়ে পাঠান সেনাপতিগণের মধ্যে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় (১১) হিন্দু জনসাধারণের মনে স্বাধীন রাজ্যস্থাপন করিবার বাসনা উদয় হওয়া অসম্ভব নহে। সেই বাসনায় অনুপ্রাণিত হইয়া রংপুর অঞ্চলে কোচজাতীয় নরপতিগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন (১২) এবং সেই বাসনায়ই অনুপ্রাণিত হইয়া দেবীদাসও স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া সুলতান সুলেমান কররাণী কয়েক বৎসর বাঙ্গালার আভ্যন্তরিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারেন নাই। ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে মোগলের অধীনতা স্বীকার করিয়া যখন তিনি সেদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন দেবীদাস স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন। এই সময় সুলেমান উড়িষ্যারাজের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন তাঁহার সমুদয় সৈন্যবাহিনী তখন উড়িষ্যায়। কিন্তু সেই অবস্থাতেও তিনি একদল সৈন্য ছাতক আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন।

এই যুদ্ধে পাঠান পক্ষে সেনাপতি কে ছিলেন, তাহা জানা যায় না। তবে চাটমোহর অঞ্চলের অধিপতি মাসুম খাঁ এই সময়ে সুলেমানের সেনাপতি কালাপাহাড়ের সহিত যোগদান করায় (১৩) মাসুম খাঁ স্বয়ং এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। মাসুম খাঁ অতিশয় হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। "চাটমহরের মসজিদের প্রস্তর ফলকের যে পৃষ্ঠায় হিজরী ৯৮৯ অব্দে মাসুম খাঁ তাহার অপর পৃষ্ঠায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন হিন্দু শাস্ত্রোক্ত দেবমূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায় (১৪) ইহার দ্বারা মাসুম খাঁকে স্পষ্টতঃ হিন্দু মন্দির ধ্বংসকারী বলিয়া জানা যাইতেছে। সুতরাং মুসলমান সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণকারী হিন্দু নরপতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা তাঁহার মত হিন্দু-বিদ্বেষীর পক্ষে স্বাভাবিক। বিশেষতঃ তাঁহারই রাজ্যের পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য পরাক্রমশালী হইয়া উঠিলে তাঁহার পক্ষে ভবিষ্যতে ক্ষতিকর হইতে পারে ইহাও তিনি বুঝিয়াছিলেন। সেইজন্য তৎকর্তৃক পাঠান সুলতানের পক্ষ অবলম্বন করিয়া দেবীদাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা অসম্ভব নয় বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং সুলতানের সেনাপতি যিনিই হউন না কেন পাঠান বাহিনী মাসুম খাঁ কর্ত্তৃকই পরিচালিত হইয়াছিল বলা যাইতে পারে।

পাঠান সেনা জলপথে মহানন্দা ও পদ্মা বাহিয়া ছাতক আক্রমণ করিল (১৫)। মাসুম খাঁও বড়ল নদী বাহিয়া পূর্ব্ব হইতে ছাতক আক্রমণ করিলেন। নৌযুদ্ধের প্রারম্ভে পাঠান সেনা জয় লাভ করিতে আরম্ভ করিলেও তাহারা শেষরক্ষা করিতে পারিল না। বাঙ্গালী মাঝির প্রতাপে তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। হতাবশিষ্ট সৈন্য লইয়া পাঠান সেনাপতি পলায়ন করিলেন।

যুদ্ধে জয়ী হইলেও দেবীদাস আনন্দিত হইতে পারিলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে সুলতান নিশ্চিন্ত রহিবেন না। তাঁহার সমুদয় শক্তি তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবে। সেইজন্য তিনি রাজ্যের চারিদিকে দুর্গ নির্ম্মাণ, জলাশয় প্রভৃতি খনন করিয়া আরও বিপুলভাবে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও সৈন্য-বল বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

পরাজয় কাহিনী তাঁড়াতে পৌছিতেই বিপুল সৈন্য বাহিনী লইয়া পাঠান সেনাপতি উমরু খাঁ পুনরায় দেবীদাসের রাজ্য আক্রমণ করিতে যাত্রা করিলেন। ছাতকের নিকটবর্ত্তী যে স্থানে তিনি শিবির সন্নিবেশ করেন, তাহা আজিও "ঘোড়া-বাঁধার মাঠ" বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে। উমেরু খাঁ ক্রমে অগ্রসর হইয়া ছাতক অবরোধ করিলেন। "যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ক্রমে দুর্গে বহু লোকের সমাগম হওয়ায় খাদ্যাদির অপ্রতুল

দেখা দিল।" অবশেষে তিন দিন ঘোরতর যুদ্ধের পর দেবীদাস ও তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কার্ত্তিক রায় প্রাণ ত্যাগ করিলে পর ছাতকের পতন হইল। (১৬) দুর্গের পতন দেখিয়া নারাধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য রাজপরিবারগণ বিষ পানে জীবন শেষ করিলেন (১৭)।

পাঠান সেনার পক্ষে কিন্তু ছাতক রাজ্য অধিকার করার সাধ্য হইল না। যুদ্ধে দেবীদাস ও তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের মৃত্যু হইলেও চণ্ডীদাস, কালিদাস ও নরোত্তম নামক তিনপুত্র প্রভুভক্ত ভৃত্যের সাহায্যে ছাতক দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া (১৮) সামন্তগণের সহায়তায় সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক পাঠান সেনাকে বাধা দিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রবল বিক্রমে পাঠান সেনা পলায়ন করিল। তাই দেখিতে পাই মোগল রাজত্বকালেও রাজা কালিদাস ছাতকে রাজত্ব করিতেছেন (১৯) এবং মোগলের বিপক্ষতা করার জন্য পুত্রগণের সহিত মোগল সুবাদারের আদেশে নিহত হইয়াছেন (২০)।

দেবীদাসের অভ্যুদয় কাহিনী ইতিহাসের সর্ব্ববাদী সম্মত কাহিনী হইলেও আলোচনার অভাবে বিলুপ্ত হইতেছে। কোন্ সময়ে যে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং কোন্ সময়ে ও কোন্ তারিখে তিনি নিহত হন তাহা জানা যায় না; লিখিত ইতিহাসে সুলেমান করবাণীর রাজত্বকালেই তাঁহার অভ্যুদয় হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়, তাঁহার মৃত্যুও সুলেমান করবাণীর রাজত্বকালেই হইয়াছিল। ৯৭২ হিজরী বা ১৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে সুলেমান আকবরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং ৯৭৫ হিজরবীবা ১৫৬৭খৃষ্টাব্দে মোগলের সহিত সন্ধি করেন (২১)। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, সুলেমান আকবরের সহিত যুদ্ধেলিপ্ত থাকার সময়ে দেবীদাস স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এ অবস্থায় ৯৫৪ বা ১১৬৬ খৃষ্টাব্দে দেবীদাস স্বাধীন হইয়াছিলেন বলা যাইতে পারে। সুলেমান ৯৭৯ হিজরী বা ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যা জয় করেন এবং তৎপর পুনরায় ছাতক আক্রমণ করেন। সুতরাং ৯৮০ হিজরী বা ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে দেবীদাসের মৃত্যু হওয়া অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। যুদ্ধে দেবীদাস নিহত হইলেও পাঠানগণ সিন্দুরী রাজ্য অধিকার করিতে

রাজধানী অধিকার করিয়া বিদ্রোহী রাজাকে হত্যা করিয়া, অবশেষে কয়েকজন মাত্র বিদ্রোহীর ভয়ে যে পাঠান সৈন্য পলায়ন করিয়াছিল তাহা মনে হয় না। পাঠান সেনাপতিগণের মধ্যে অন্তর্বিরোধই ইহার কারণ। বাঙ্গালার সিংহাসন লইয়া সুলেমানের বংশধরগণের মধ্যে যে বিরোধ হয় (২১) তাহাতে পাঠান সেনাপতিগণ লিপ্তথাকায় বিদ্রোহিগণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে না পারাতেই দেবীদাসের পুত্রগণ তাঁহাদের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিতে পারিয়াছিলেন। ৯৮০ হিজরা বা ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দ সুলেমানের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে দেবীদাসের মৃত্যু হইযাছিল বলা যাইতে পারে। কারণ সুলেমানের মৃত্যুর দীর্ঘকাল পূর্ব্বে দেবীদাসের মৃত্যু হইলে তিনি তাঁহার অখণ্ড শক্তি লইয়া সিন্দুরী রাজ্যের উপর পাবিতেন। কিন্তু কার্য্যকালে তাহা না হওয়ায় সুলেমানের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে দেবীদাসের মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়াছি। এই অবস্থায় ১৫৭২ খৃষ্টাব্দের যে কোন সময়ে দেবীদাসের মৃত্যু হওয়া সম্ভবপর কিনা তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।

দেবীদাসের কীর্ত্তিকলাপ কালক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কালের ধ্বংসপ্রবণতায় কত রাজধানী, কত প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপই ত এই গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং ছাতকও যে সেই পথ অনুসরণ করিয়াছে তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। কিন্তু দেবীদাসের কাহিনীতো ইতিহাসের সে দিনের কথা এখনও পাঁচশত বৎসর অতীত হয় নাই। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ একেবারে বিলুপ্ত হইল কেন? ইহার একমাত্র কারণ এই যে, যে সকল পুরাতন কীর্ত্তি এখনও গর্বভরে মাথা তুলিয়া কালের করাল কবল হইতে আত্মরক্ষা করিতেছে, সেগুলি বহুযত্নে দীর্ঘ সময়ে এবং সুনিপুণ শিল্পী কর্ত্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। তাই তাহারা আজও বর্ত্তমান, কিন্তু ছাতকে দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার সময় দেবীদাসের সে সুযোগ ছিল না। তাহার পর তাঁহার পুত্রগণ মোগলের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় তাঁহারাও এদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে পারেন নাই। মুসলমান প্লাবিত বঙ্গদেশে মুসলমান নরপতির বিরুদ্ধে অসিধারণ করিয়া তাড়াতাড়ি দুর্গ ও রাজধানী নির্ম্মাণ করার জন্য তাঁহারা গঠন

পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। পাঠান সৈন্যের সহিত যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাড়াতাড়ি দুর্গ পরিখা ও দুর্গ প্রাচীর রচনা করিয়া তাহার ভিতরে কোন কোনরূপে রাজধানী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন মাত্র। এই জন্যই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ছাতকের প্রাচীন কীর্তিসমূহ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ছাতক দুর্গ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও তাহাতে এখনও বিশাল দীঘি ও শুষ্কপ্রায় পরিখা-গুলি বর্তমান আছে; ভগ্ন ইষ্টকস্তূপ ও দীঘির ইষ্টক নির্মিত ঘাটগুলিরও অভাব নাই। ইহারাও যে কবে লয় প্রাপ্ত হইবে কে বলিতে পারে।

পাদটীকাঃ—

(১, ৮, ১৭, ১৪, ১৩) পাবনা জেলার ইতিহাস —শ্রীরাধারমণ সাহা।

(২, ৪, ১৮) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু।

(৩, ১৯) গৌড়ের ইতিহাস—৺রজনীকান্ত চক্রবর্তী, বৃহৎ বঙ্গ ১ম—৪৮৯ পৃঃ।

(৬, ১১, ২১, ২২) বাঙ্গালার ইতিহাস ১ম ভাগ—৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

(৬) কুলশাস্ত্র দীপিকা—৺যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী।

(৭) বঙ্গবাণী ২৪শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯।

(৯) প্রবাসী চৈত্র ১৩১৯।

(১০) গৌড় কাহিনী—৺অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

[১২, ১৬] উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, পাবনা অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী।

প্রার্থনা

ক্ষিতীশ দাশগুপ্ত

তোমার আলোয় জ্বালিয়ে দিও
আমার প্রাণের প্রদীপখানি
সেই আলোরে ঝরণা ধারায়
ধুইয়ে দিও সকল গ্লানি
আমায় তুমি আপন ক'রে
সবার মাঝে রাখো ধ'রে
আমার প্রাণে বাজাও আসি'
তোমার মোহন বাঁশীখানি
নূতন করে জ্বালিয়ে দিয়ে
আমার প্রাণের প্রদীপখানি

তোমার লীলা ছড়িয়ে আছে
বিশ্বভুবন জুড়ে
ওরা আমায় ভুলিয়ে রাখে
রইলে তুমি দূরে
রিক্ত হ'য়ে তোমায় খুঁজি
হারিয়ে ফেলে সকল পুঁজি
সুরগুলি মোর পায়না তোমার
পায় চরণের পরশখানি
নূতন করে জ্বালাও এবার
আমার প্রাণের প্রদীপখানি।

সংকলন

নবযৌবন রসায়ন :

মানুষের যৌবন কত অস্থির -অস্থায়ী। আসতে না আসতেই ভোগবাসনা অপূর্ণ রেখেই ব্যধিগ্রস্ত দেহকে ছেড়ে সে চলে যায়। যৌবনকে ধরে রাখার জন্য মানুষের কত কালের সাধনা, কতকালের স্বপ্ন। কিন্তু কিছুতেই তা সম্ভব হয় না। যৌবন চলেই যায়।

ভোগ-ক্ষুণ্ণ-যৌবন যযাতি নিজের পুত্রের যৌবন ধার করে নিয়ে জীবন উপভোগ করেছিলেন। কি নিষ্ঠুর পরিহাস প্রকৃতির!

কিন্তু এযুগের যযাতির কানে আশার বাণী পৌছে গিয়েছে। যুগোশ্লাভিয়ার কজু পর্বতে যেখানে মার্শ্যাল টিটো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ করেছিলেন, সেখানে এমন একটা নির্ঝরিনী আবিস্কৃত হয়েছে যার জল 'নব যৌবন রসায়ন'। এই নির্ঝরিনীর খবর তুর্কের প্রাচীন পাশারা জানতেন। কেউ কেউ শতসহস্র বেগম নিয়ে ঐ নির্ঝরিনীর কাছাকাছি থাকতেন। জীবন ভোগের জন্যে এর জল বাদশাহের খুব কাজে লাগত নিশ্চিত।

নির্ঝরিণীর পাশের গ্রামের লোকরাও এর খবর জানে। তাদের ভাষায় এর জলের নাম মুস্কা ভোদা অর্থাৎ পৌরুষ-রসায়ন। তাদের মতে ইহা পরিবারে শান্তি আনে। এই নির্ঝরিণীর জল পানে পুরুষের রতিশক্তি বাড়ে, স্ত্রীলোকদের স্নায়ুদৌর্বল্য, অনিদ্রা, রক্তের উচ্চচাপ, যকৃতের ও হৃদয়ের গোলযোগ হ্রাস পায়। ইতিমধ্যেই ইহার খবর সারা জগতে ছড়িয়ে পড়েছে। এসোসিয়েশান্ ফর স্টাগ্লে [illegible] 'মুস্কা ভোদা'র একশ লক্ষ লিটার জল লিটার প্রতি ৫০ সেন্ট দরে কিনতে চেয়েছেন। নানা দেশের নানা শ্রেণীর লোকের কাছ থেকে মুস্কা ভোদার জন্য অনুরোধ আসছে। ষ্টাটগার্টের এক ভদ্রলোক কাতর হয়ে লিখেছেন : আমার বয়স ষাট, আর স্ত্রী আমার চল্লিশ বছরের ছোট। আমি ৭০% অকর্মণ্য। আমাকে কিছু জল পাঠান—বিবাহিত জীবনের কর্ত্তব্য যেন আমি পালন করতে পারি।

এমন কত কাতর অনুরোধ যাচ্ছে রোজ সেখানে। ভারত থেকেও গিয়েছে কিনা জানি না। তবে যাঁরা এখানে হোরমোন ট্রেটমেন্ট করে করে হায়রান হয়ে পড়েছেন তারা একবার মুস্কা ভোদার আশ্রয় নিলে—চৌরঙ্গী বা ফ্রীস্কুল ষ্ট্রীটের মত এলাকার অপ্সরীদের অবসর হয়ত আরও ভাল কাটত।

—সুবিমল সেন

পুনর্জ্জন্ম রহস্য :

হিন্দুরা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। বৌদ্ধ, জৈন, কবীরপন্থী তাঁরাও। কেবল ইসলামে আর খ্রীষ্টান ধর্ম্মে পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস নেই। হিন্দুদের সবাই যে পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন তা নয়। কিন্তু তাঁদের মধ্যেও অধ্যাপক এইচ, এন. বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধসমূহ ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করেছে। তাঁরা নূতন করে ভাবিত হচ্ছেন সত্যি কি তবে পুনর্জন্ম আছে? পূর্বজন্মের স্মৃতি কি সত্যি জাগা সম্ভব? অবশ্য অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় কেবল জাতিস্মরদের বিবরণ দিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু জাতিস্মর হওয়ার কোন উপায় আছে কিনা তা বলছেন না।

খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী কিছু লোক প্রাচ্য বিদ্যার চর্চার ফলে

জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন। শুধু তাই নয়, কি করে পূর্ব জন্মের কথা স্মরণপথে আনা যেতে পারে তার উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত আছেন। লণ্ডনস্থ 'সোসাইটি অব দি ইনার লাইট' প্রতিষ্ঠান পুনর্জন্মের বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে আনার জন্যে বিশেষ ধরণের চর্চার পদ্ধতি পর্যন্ত প্রচার করছেন। তার সাহায্যে পূর্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করা যায় কিনা উৎসাহী ও কৌতূহলী ব্যক্তিমাত্রেই তা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

—জ্যোতিপ্রসাদ রায়

রমণীয়া রমণী চরিত্র :

রমণীয়া রমণী। বেশভূষার বাহার কত। মাথার কেশে কতনা বেণী রচনার পারিপাট্য। পরিধানের পোষাকের দাম পাঁচ হাজার ডলার। হাতে কত হীরের আংটি। সেই রমণীই কিনা ধরা পড়লেন একটা মাত্র তিন ডলারের জিনিষ চুরির দায়ে এক দোকানে। এই ধরনের চুরি নিরোধ করা আমেরিকার বড় বড় দোকানীদের একটা মস্ত বড় সমস্যা। রমণীয়া রমণীদের এটা যেন একটা ফ্যাসান। কেউ কেউ ছোট ছোট ছেলে মেয়ে বা গভার্নেস নিয়ে আসেন এই বিনামূল্যে বস্তু সংগ্রহের চেষ্টায় সাহায্য করতে। তাঁরা সবাই আসেন বেশ ভাল ভাল ঘর থেকে, যেখানে প্রাচুর্য্যের অভাব নেই। খুব চতুর দোকানীরা ডিটেকটিভের সাহায্যে ওঁদের মাঝে মাঝে ধরে ফেলেন। এমন ছয়শত আটানব্বই জন ধৃত রূপসীকে নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছিল। তাতে দেখা গিয়েছে মাত্র তিনজন অল্প-বিত্ত ঘরের মেয়ে। তাঁরা সকলেই বস্তু তুলে নেন মজা করার জন্যে—দোকানীকে ঠকিয়েছেন বলে একটা কুৎসিত আনন্দও ভোগ করতে পারবেন বলে। কেউ বা প্রেমে বঞ্চিত হয়েছেন বলে দোকানীকে বঞ্চনা করে প্রতিশোধ নেন। কিন্তু ধরা পড়ে পুলিশের হাতে গেলে তাঁরা বড়ই মর্মাহত হয়ে পড়েন,—বুঝতে পারেন আসলে তাঁরা চোর। এর পরে আর চুরি করেন না।

কিন্তু তাঁদের ধরা পড়া বড় শক্ত। চিত্তের মত অদৃশ্য সম্পদকে যাঁরা হেলায় হরণ করে নিয়ে যান, দৃশ্য স্বল্পমূল্য বস্তু একটা দুটো অলক্ষ্যে তুলে নেবেন তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে?

—শিখা বাগচি

বাঙলাদেশের সভ্যতা :

অনেকের ধারণা বাঙলাদেশ সেদিন মাত্র তৈরী হয়েছে গঙ্গারপলিমাটীতে। ইহা সভ্যতায়ভারতের সর্ব্বকনিষ্ঠভূখণ্ড। এই বাংলাদেশের সাম্প্রতিক আবিষ্কারসমূহ প্রমাণ করে দিচ্ছে: একথা সত্য নয়। বাঙলার সভ্যতা সিন্ধুপ্রদেশের মহেঞ্জোডারো-যুগের সমসাময়িক। এ বিষয়ে অনেকে অনেক গবেষণা করেছেন। স্বামী শংকরানন্দ 'বঙ্গে মহেঞ্জোডারো সভ্যতার বিস্তার' গ্রন্থে লিখেছেন:—"বঙ্গে মহেঞ্জোডারোর এই সভ্যতা এখনও জীবন্ত। তাহার বিহারে এখনও বাঙালীরা সম্পূর্ণ মহেঞ্জোডারোর লোক। এবং বড়শী দিয়া মাছ ধরিবার যে কৌশল সিন্ধু উপত্যকাতে প্রচলিত ছিল তাহার সব কয়টী পূর্ব্ববঙ্গে এখনও প্রচলিত। ....এতদ্ব্যতীত কৃষি বাণিজ্য, স্থাপত্য, যানবাহন, ধর্ম্ম-সংস্কার, পরলোক সম্বন্ধীয় ধারণা এবং পারিবারিক উপাধিতে সিন্ধু প্রভাব বর্ত্তমান থাকিয়া প্রমাণিত করিতেছে যে মহেঞ্জোডারোর সমগ্র সভ্যতাটীই আনিয়া পূর্বাঞ্চলে তথা বঙ্গদেশে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে।"

বাঙালীর সভ্যতা কালকের মাত্র, এ ধারণা পরিত্যাগ করে পণ্ডিতরা গবেষণায় মন দিলে] আরও তথ্য উদ্‌ঘাটিত] হবে আশা করা যায়।

—দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়

—

কলঙ্ক

পরিমল ভট্টাচার্য্য

দুরন্ত মনের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে না পেরে শেষে একদিন বেরিয়ে পড়লাম দেশান্তরে। কিছু-দিনের জন্য আবার যাযাবরী বৃত্তির আস্বাদ। আজও আবাল্য লালিত এই ভ্রমণের নেশা থেকে মুক্ত হতে পারেনি এই মন। কোনদিনই রেহাই পায়নি ছন্দোহীনা এলোমেলো কল্পনার হাত থেকে। বিন্দু থেকে সিন্ধুর মত তার বিস্তার। বল্গাহীন কল্পনার এ নেশায় নিজেই বুঁদ হয়ে থাকি। অন্য কারও প্রবেশাধিকার নেই সে রাজ্যে। কারও শাসন বা অনুশাসনের ধার ধারে না সে। আমার মন আমার কল্পনা, আমার যুক্তি এসব কিছুই যেন একান্তভাবে আমার আপন।

এই কল্পনারই নেশায় চোখ বন্ধ করে বসে আছি চলন্ত ট্রেনের কামরায়। রাত এমন কিছু হয়নি, সন্ধ্যা উৎরে গেছে, তা প্রায় ঘণ্টাদুয়েক হবে।

কোন কাজ নেই, শুধু চুপ করে বসে থাকা। শীতের প্রকোপে কামরায় যাত্রী সংখ্যাও কম। তাই কল্পনার বিস্তার ক্রমশই বেড়ে চলেছে। এমন সময় কানে এলো—চা, চা-গরম। কল্পনা বিস্তারে ছেদ পড়লো। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ষ্টেশনটার নাম পড়বার চেষ্টা করলাম। আবার কানে এলো —'চা-বাবু, গরম চা।' প্রাণটা যেন চাঙা হয়ে উঠলো। এই একটি মাত্র বিলাসিতার পাঠ নিয়ে-ছিলাম কবে, কার কাছ হতে তা আমার নিজেরই মনে নেই।

১০টা পয়সার বিনিময়ে হাত বাড়িয়ে নিলাম চা-টা। পোড়ামাটির পেয়ালায় উত্তপ্ত যৌবন যেন টলমল করছে। বেশ একটা রোমান্টিক ভাব এলো মনে। অতি সমাদরে দু'হাতের মুঠোয় ভরে তপ্ত সঞ্জীবনীর সমুদ্রের কিনারায় আলতো-ভাবে আমার অসভ্য ঠোঁটজোড়া ঠেকালাম। দমকা একটা শিহরণ আমার দেহে ও মনে। কিন্তু পার মুহূর্তেই আমার অপকর্ম্মকৃত প্রায়শ্চিত্তের সূচনা হল। পেয়ালা শিল্পীর অসতর্ক মুহূর্ত্তের সৃষ্ট কলঙ্ক থেকে খানিকটা পোড়ামাটির কণা এসে ঠেকলো আমার জিবের ডগায়। মনে হল যেন গরল। থুঃ থুঃ করে ফেলে দিলাম মুখের দরজা গলিয়ে বাইরের দিকে। হঠাৎ পোড়া-মাটির বুক চিরে কার কান্না যেন ঠেলে বেরিয়ে এলো। বলে উঠলো—ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি। অমন করে দূরে সরিয়ে দিও না। তোমার দেহের প্রতি অণু-পরমাণুর সঙ্গে যে আমার অবিচ্ছেদ্য নাড়ীর টান। বুকটা আমার ধ্বক করে উঠলো। কে কথা কইলো? কার ভীরু হৃদয়ের অনুকম্পন পাচ্ছি আমার দেহে? তবে কি ওরাও কথা বলে? ঐ যে দূরে অন্ধকারে আত্মগোপন করে আছে ইট, কাঠ, পাথর, খাল, বিল, ধানক্ষেত, গাছপালা, পশুপক্ষী—সবাই কি কথা বলে?

কি জানি হয়তো বলে, আমিতো সর্বভাষাভিজ্ঞ নই, তাই খবর রাখি না। হয়তো বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে এসব ভাষা বোঝা তেমন কিছু শক্ত নয়—কেবল আমিই হয়তো আজ হঠাৎ এই ভাষা শুনে ফেললাম। সৌভাগ্যের অযাচিত দানে মনটা খুশীতে ভরে উঠলো। তাই অযথা সময় নষ্ট না করে কানটাকে সজাগ করে দিলাম পূর্ব্বশ্রুত কান্নার প্রতি।

পোড়ামাটির পেয়ালার মুখে অভিমানের সুর ধ্বনিত হল—কেন তুমি আমায় অনাদর করলে? আমার অপূর্ণতা কেন তোমার করুণায় বঞ্চিত হল? বল, জবাব দাও, কি চুপ করে রইলে কেন? কেন আমার জন্মদাতা দরিদ্র মৃৎশিল্পীকে অপমান করলে—জানো তুমি, আমি তার করুণ জীবনের একটি ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাত্রের একমাত্র সাক্ষী।

চমকে উঠলাম আমি। সর্ব্বগায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো, রহস্য ও রোমাঞ্চের বেড়াজালে কিছুক্ষণের মত বিহ্বল হয়ে পড়লাম। চোখের দরজায় খিল এঁটে দিলাম। কল্পলোকের দরজা খুলে গেল

মুহূর্ত্তে একঝলক দম্‌কা হাওয়ায়। বাতাস কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে বলে উঠলো—প্রেয়সী পেয়ালার শূন্য দেউলের বিরহ ধ্বনি বয়ে এনেছি বন্ধু—শুনবে?

কম্প্রবক্ষে, নম্র নেত্রপাতে হতবাক্ হয়ে রইলাম অচৈতন্য আত্মার মত। পেয়ালা বলে চললো তার জীবন কাহিনী। পাড়াগাঁয়েই আমার বাপের বাড়ী। এখানেতো শ্বশুরবাড়ী এসেছিলাম। কি চিনতে পারলে না আমার শ্বশুরকে?

ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটিয়ে তাকালাম প্রেয়সীর মুখের দিকে। উদ্দেশ্য আহত হল আমার। ও বললো—আর তুমি? তুমইতো আমার স্বামী। স্বয়ং যমরাজ শ্বশুর যখন আমার দেহের পাত্রে ঐ অমৃত সুধা ঢেলে তোমার লালসায়িত মুখের সামনে তুলে ধরলেন, তখনতো আমার তনুতে উত্তাল যৌবন টলমল্ করছে, পূর্ণকুম্ভ। ছিলাম কুঁড়ি হলাম ফুল, যৌবনের মদমত্তা। ভাবলাম নগদ দামে যখন আমায় কিনছে না জানি কত আদরেই না আমার এই যৌবনের মূল্য দেবে। ছাই মুখে আগুন তোমার মতন স্বামীর, অতসুখ আর সোহাগ কি আমার সইবে?

তবু অনেক আশা নিয়ে চেয়ে রইলাম তোমার চোখ দুটির পথ চেয়ে শুভদৃষ্টির আশায়। বললাম অন্তর দেবতাকে, হে দেব, আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে সহরের আচার ব্যবহার জানি না। কি ঐশ্বর্য্য দিয়ে স্বামীর মন ভোলাবো বলে দাও। আমিতো সহরের রঙিন কাপড়িস নই। গায়ের রংও দুধেরমত সাদা নয়। এমনকি দু'একটা লতাপাতার আঁচড় পড়েনি আমার গায়ে। দেখতে আমি একেবারে মেটে বা তামাটে। তার উপর অধরে রয়েছে জর্ম্মগত সূত্রে পাওয়া কলঙ্ক চিহ্ন। হে ভগবান, যেন দেখতে না পায় ও, দোহাই তোমার। কিন্তু ভগবান আমায় না দেখে তোমায় দেখলেন। তোমার ঐ রক্ত রঞ্জিত অসভ্য ঠোঁটজোড়া যখন আমার দেহসুধার উত্তাপ লালসায় এগিয়ে এল কাছে, তখন আমি কেঁপে উঠলাম ভয়ে। শিউরে উঠলাম দেখে যে, তোমার কোমল ঠোঁট দুটি নামছে ঠিক আমারি কলঙ্কের বাটে, স্পর্শ অনুভূতির ফল ফললো তৎক্ষণাৎ, ঘৃণায় তুমি মুখ ফিরিয়ে নিলে, জিহ্বাগ্রে তখনও তোমার গরলের স্বাদ। আমার দু'চোখ জলে ভরে এলো। মুহূর্ত্তে বৃথা হয়ে গেল আমার এই অনাঘ্রাত যৌবনভার। আমাকে দু'হাতের মুঠোয় ধরে জান্‌লা গলিয়ে বাইরে ফেলে দিতে যাচ্ছিলে, কিন্তু বলতে পারো—কেন? কি এমন অপরাধ করেছি তোমার কাছে? নয় আমি নিখুঁত সুন্দরী হতে পারিনি জন্মকালে, তাতে কি এমন অশুদ্ধ হয়েছি আমি?

আমার সৃষ্টিকর্ত্তা যে রাতে ভ্রূণ অবস্থা থেকে তিলে তিলে দেহের সঞ্চিত শক্তির সাহায্যে হাতের কারসাজি দিয়ে রূপান্তরিত করলেন আমায় মৃত্তিকার পেয়ালায়, সে রাতের দুঃখের ইতিহাস তোমার জানা নেই। কিন্তু আমি জানি সে রাত কত দুঃখ বেদনার শ্রাবণ ধারায় সিক্ত। কত মর্মান্তিক ছিল সেই রাতটী আমার শিল্পী বাপের কাছে।

ঘরের ভেতর মৃত্যু শয্যায় শুয়ে আছে, শিল্পীর রুগ্ণা স্ত্রী, ও-পারের ডাকের অপেক্ষায়। মহাকালের জপের মালায় বিগত সাতটী দিন যোগ হয়েছে, কিন্তু রোগীর সঙ্গে ওষুধের যোগাযোগ আজও করে উঠতে পারেন নি আমার সৃষ্টিকর্ত্তা। তবুও তার নিষ্ঠার অভাব নেই, কেমন করে আমাদের সন্ধ্যায় বেচে তার রুগ্ণা পরিবারেরচিকিৎসা করবেন, সেই চিন্তাই তাকে শিল্পসৃষ্টির প্রতিটি মুহূর্ত্তে প্রেরণা যুগিয়েছে।

উঠোনের এককোণে টেমির ক্ষীণ আলোকে গড়েছে তার মাটির মূক সন্তানদের, একের পর এক। কাঠের তক্তার উপরে থরে থরে সাজান। ঘরের ভেতর থেকে চাপা গোঙ্গানির আওয়াজ আসছে বাইরে। বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে সেখানে। ঠিক সেই অনাকাঙ্ক্ষিত সময়ে জন্ম হল আমার। ঘুরন্ত চাকির উপর দাঁড়িয়ে চোখ মেলে চাইলাম বাহির বিশ্বে। প্রাণ যেন জুড়াল। সামনে তক্তাটীর উপর আমার আগে পৃথিবীতে আসা ৯৯টী বোন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে হাসছে। আমিই এলাম ঠিক ১০০ নম্বরের হয়ে, বাপের অর্থ-রোজগারের পূর্ণতা নিয়ে। কিন্তু ঘটনা ঘটলো অন্যরকম।

বাপের হাতের সূক্ষ্মটানে ধীরে ধীরে আমি গড়ে উঠছিলাম। সারাদেহে আমার পূর্ণতার জোয়ার এসেছে। বাবা হাসিমুখে ডান হাতের মুঠোয় তুলে

ধরলেন আমার নাড়ী কাটা সুতো গাছটা। এমন সময় ঘরের ভেতর আর্ত্তনাদ করে কেঁদে উঠলো আমার বুড়ি ঠাকুরমা—ওরে বউমারে—কোথায় ফাঁকি দিয়ে গেলিরে—এক ফোঁটা ওষুধও যে তোর মুখে দিতে পারলুম না।

সর্বশরীর শিউরে উঠলো আমার। বাবা কোন রকমে নাড়ী কেটে আমায় বসিয়ে গেলেন এক পাশে ঠিক সেই সময়ে বাপের অসতর্ক হাতের চাপে আমার সুন্দর দেহে সৃষ্টি হল এই নিদারুণ কলঙ্কের। ঘরের ভেতর বাতাস ভিজে উঠলো দুটি অশান্ত হৃদয়ের কান্নায়। বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, সেদিন আমরা সেই একশো মাটির সন্তান অন্ধকারে তক্তার উপরে দাঁড়িয়ে কেবলি কেঁপে কেঁপে উঠেছি চাপা কান্নায়।

তাই বলছিলাম নিখুঁত আমি হতে পারিনি ঠিকই। তবু এ-অপরাধ আমার নয়, আমার শিল্পী বাপেরও নয়। তবে কেন আমায় ঘৃণায় দূরে সরিয়ে দিতে চাও? পার নাকি তোমার সহানুভূতির সোহাগে আমার দুর্মূল্য যৌবনকে ভালবাসার রঙে রাঙিয়ে তুলতে?

পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোকের কথায় চমকে উঠলাম—"ও মশাই, এত কি ভাবছেন, চা যে আপনার ঠাণ্ডা হয়ে গেল।" ভদ্রলোক কেমন যেন একটা সন্দেহের ভাব নিয়ে তাকিয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। ধীরে ধীরে বললাম—"চা ঠাণ্ডা করে খাওয়াই আমার অভ্যেস।" একটু নড়ে চড়ে বসলাম। ধীরে ধীরে দু'হাতের মুঠোয় ভরে চুমুক দিলাম ঠিক কলঙ্ক স্থানটির উপর। উঠলো অমৃত। মনটা আত্মপ্রসাদে ভরে উঠলো এই ভেবে যে এবার বোধহয় দেহের উত্তাপ দিয়ে মৃত্তিকার পেয়ালাকে অনেকখানি রাঙিয়ে তুলতে পেরেছি। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি ট্রেনটী দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে আগামী ষ্টেশনের দিকে।

——

মৃত্যুদিন

শিশির মজুমদার

স্নায়ু সব থেমে গেলে কি থাকে বাকি,
গোলাপী ফুসফুস যেন হাওয়াহীন খেলার ফানুস—
গতিহীন ধমনীর নদীগুলো সব
নিলয় অলিন্দে আর রক্তের ঢেউ তোলে নাকো,
স্পন্দন থেমে গেলে হৃৎপিণ্ডে কি থাকে বাকি—
চিরস্থির হিম সরিসৃপের মত এক বিশীর্ণ মানুষ।

অথচ সেদিনও ত' তারা বেঁচে ছিল,
নির্জন প্রাণের প্রান্তরে ছিল পৌষের গান,
সংঘাতের মহৎসবে বাঁচবার ব্যাকুলতা ছিল,
ছিল প্রেম নিষেধ হাওয়ার স্পর্শে ব্যথার আহ্বান,
বাঁচবার ছিল অঙ্গিকার,
অথচ আজকে কেন আকাঙ্ক্ষার নক্ষত্রেরা এত অন্ধকার,
আজ তবে কিসের সন্ধান!

পৃথিবীর থেকে আরো দূর কোন পথে
মহান্তক মৃত্যুর রথে
তারার মিছিলে মেখে আত্মার সব কলরব,
আকাশে প্রশান্তি যেন অন্ধকার হিম অনুভব,
সমুদ্র অশান্ত তবু মেঘ যেন আরও অসম্ভব,
শুধু অন্তহীন ঘুমের সত্য চোখ ভরে নিতে
পারিজাত ফুলের পাপড়িতে
নিশব্দে বিছিয়ে দিতে তাহাদের দেহ,
ব্যথার তরঙ্গে শুয়ে শুয়ে,
বেঁচে থেকে মৃত্যুর স্তবগান গেয়ে,
সব প্রেম সব গান আশা নিয়ে কেহ,
এলো মেলো হাওয়াদের সাথে
মৃত্যুর ধ্বনীঘন রাতে
স্মৃতির সৌগন্ধ নিয়ে তারা হল স্বর্গ-সম্ভব॥

সাধকের সাথে

মহাশয়,

আপনার ভারতবর্ষের শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত "সাধকের সাথে— " শীর্ষক ভ্রমণ কাহিনী পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলাম। রচনার ২য় অনুচ্ছেদে লিখিত অতি মানবীয় শক্তির বর্ণনা সত্য হইলেও বর্ত্তমান ভারতবর্ষের পাঠক-পাঠিকারা বিশ্বাস করিবেন একথা আপনারা কি বিশ্বাস করেন? আপনারা কি ভাবেন যে ভারতবর্ষের লোকেরা এতই অবোধ?

বক্তব্য মার্জ্জনা করিবেন।

—ইতি

—শ্রীদুর্গাচরণ নাথ

কলিকাতা—১৬

"পরিকল্পনা"

শারদীয় ভারতবর্ষের "পট ও পীঠ" বিভাগে শ্রী'শ' রচিত "পরিকল্পনা" রচনাটি পড়ে পরিতুষ্টি লাভ করতে পারলুম না।

প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বাঙলা ছবির স্থান জেনে চিন্তিত ও ব্যথিত হলুম। আমরা শিল্পের, কৃষ্টির বড়াই করি। আর ওদিকে আর্থিক ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ হয়ে পড়ি। শ্রী'শ' এই পশ্চাৎপদ হওয়ার বিপদ থেকে আত্মরক্ষার যে উপায় বাৎলে দিয়েছেন—তা পরীক্ষা করে দেখলে চিত্রনির্মাতারা যে সফলকাম হবেন তা অবশ্যই আশা করা যায়। চিত্রনির্মাতাদের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট হবে এই প্রত্যাশা দর্শকদের আছে। ইতি।

—শ্রীসুদর্শন রায়

কলিকাতা—১২

"পূজার প্রশ্ন"

শারদীয় ভারতবর্ষের কিশোর জগৎ বিভাগে 'পূজার প্রশ্ন' প্রবন্ধে শ্রীজ্ঞান একটি মৌলিক সমস্যার উল্লেখ করেছেন। সমস্যাটি সকলেরই জানা—সকলেরই দুঃসহ বিরক্তির সৃষ্টি হয় এতে— পুজোর নামে যে হুল্লোড়ের সৃজন হয় তার থেকে রেহাই পেতে কে না চান? কিন্তু অর্থহীন বেহায়াপনা থেকে রেহাই পাওয়া সোজা কথা নয়। শ্রীজ্ঞান এই বেহায়াপনা দূর করার দায় দায়িত্ব কিশোরদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু কিশোরদের উপর যে ধেড়েরা রয়েছে তাদের কে সামলাবে শ্রীজ্ঞান তার কথা ভেবেছেন কি? ইতি,

রামকৃষ্ণ আতর্থী

কলিকাতা—২৪

অসংসারী [উপন্যাস] শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* * * * * * *

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পনেরো

দিল্লী চকের পেছন দিকে মাদ্রাজীদের হোটেলে এসে উঠলো রেণু আর সমীর। মাদ্রাজী গোঁড়া ব্রাহ্মণগণ সব রকম ছুঁৎমার্গ বাঁচিয়ে এই হোটেলে কোনমতে আপন আপন ধর্ম্মরক্ষা করে দিনাতিপাত করেন। আবার আরও বেশী গোঁড়া যারা তাদের জন্যে এই হোটেলের দোতলায় কতকগুলো স্বতন্ত্র ঘর আছে, সেই সব ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন আছে রান্নাঘর এবং কল। এগুলোর ভাড়া কিছু বেশী এবং এদের আভ্যন্তরিন ব্যবস্থাও নিতান্ত সনাতন ও অস্বস্তিকর। এখানে মাছ মাংস একেবারে অচল, সেই-জন্যেই দিল্লীতে এই ভিড়ের বাজারেও এখানে সব সময়ই ঘর খালি পাওয়া যায়। এই সব ঘর চাওয়ামাত্রই ভাড়া করতে পারে হিন্দুরা, অন্যথায় দিল্লীতে সাধারণভাবে ঘর বা ফ্ল্যাট ভাড়া পাওয়া এ বাজারে একরূপ অসম্ভব। অনেক সময় খুব দামী হোটেল ছাড়া সাধারণ মেস্ বা বোর্ডিং-এও স্থান পাওয়া যায় না। সমীর মনে মনে ঠিক করেছিল যে, এই জায়গায় এসে উঠলে এখানে ঘরও পাবে এবং উপরন্তু এখানে বাঙ্গালীর নামগন্ধও নেই। কি জানি কেন, বাঙ্গালীদের মধ্যে রেণুকে নিয়ে থাকতে ওর কেমন যেন সংকোচ।

সদ্য ভাড়া করা এইরূপ এক প্রায়-অন্ধকার ঘরে রেণুকে বসিয়ে নিচে হাতমুখ ধুয়ে কিঞ্চিৎ খাদ্যের বন্দোবস্ত করে দিয়েই সমীর ছুটলো সদাশিবের বাড়ীর দিকে। একেবারে মরিয়া গোছের ভাব তার। ও বাড়ীতে যেতে আর ইচ্ছে তার হয় না, কিন্তু না গেলেও ত উপায় নেই। ড্রাইক্লিনিং-এর কাগজ থেকে সুরু করে অফিসের কার্ড পর্য্যন্ত সমস্তই যে ওখানে পড়ে আছে। হালফিল এখনই ফর্সা জামা প্যাণ্ট না হলে কি সাতদিনের ময়লা প্যাণ্ট পরে অফিস যাওয়া যায়। সাইকেলটাও দরকার, কারণ এখান থেকে অফিসটা তার অনেক দূর হয়ে গেল। তারপর প্রাণপণে চেষ্টা করতে হবে, কোন এক অবাঙ্গালী অঞ্চলে একটা বাসা যোগাড় করার জন্য, কারণ এই ঘরে বেশীদিন থাকলে টিবি হওয়াও অসম্ভব নয়।

বেলা তখন প্রায় এগারটা। সদাশিব নিশ্চয়েই অফিসে গেছে, বাড়ীতে আছে একমাত্র গৌরী।

ওঃ, সেই সাপের মত হিংস্র আর মাকড়শার ন্যায় কামুক পরস্ত্রী, যে কিনা একখানা মাত্র চিঠিতে সমস্ত কাশীর স্নেহাঞ্চলকে বিষ করে দিয়েছে। কি যে লিখেছিল, সমীর তা জানে না, চিঠি সে চোখেও দেখে নি, তবে পিসিমার কাছে সে শুনে এসেছে যে, তার বন্ধুর বউ চিঠিতে সব কিছুই জানিয়ে দিয়েছে।

ভাবতে ভাবতে সমীর এক টাঙ্গায় চড়ে বসলো। বললে, চালাও। মনে মনে নানারকম অভিনয় করতে লাগলো, শেষে ভাবলে সমস্ত কথা একযোগে অস্বীকার করে নতুন এক গল্প ফেঁদে তার জিনিষপত্তর নিয়ে যে ফেটে পড়বে।

সদাশিবের বাড়ীর মধ্যে টাঙ্গা নিয়ে প্রবেশ করলো। অতি পরিচিত বাংলোর বাইরের ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। রোয়াকে উঠে সমীর দরজায় ঘা দিতে সুরু করে দিলে।

পাশের ঘরের জানলার পরদা সরিয়ে গৌরী একটু উঁকী মেরে দেখতেই সমীর খুব আস্তে যেন কত সন্ত্রস্ত হয়ে ডাকলে, বৌদি।

গলার স্বর শুনে গৌরী তাড়াতাড়ি এ ঘরে

এসে দরজা খুলে দিলে। দরজা খোলা পেয়েই সমীর চট্ করে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজাটা ভেতর থেকে ভেজিয়ে দিলে; দিয়ে খুব মৃদুকণ্ঠে একরাশ মমতা নিয়ে প্রশ্ন করলে সদা কোথায়? কেমন আছ তুমি?

ম্লানভাবে গৌরী উত্তর দিলে, ভালো। তারপর নিজেকে একটু সাম্‌লে নিয়ে বললে, কি ব্যাপার তোমার? এদ্দিন ছিলে কোথায়? গৌরীও নিখুঁত অভিনয়ে জানাতে চায় যে, সে কিছুই জানে না।

সমীর এতক্ষণে নিজের বাক্স ও হ্যাসরস্যাক দখল করে আন্‌লায় ঝোলানো লুঙ্গি ও তোয়ালেটায় হাত দিয়েছে। গৌরী ওর ভাব দেখে যেন ভীত হয়েই প্রশ্ন করলে, ব্যাপার কি, জামাটামা ছাড়ো।

আস্তে আস্তে সমীর বললে, না, আমাকে এখনি পালাতে হবে। বাক্স খুলে তার মধ্যে তোয়ালে আর লুঙ্গীটা পুরতে পুরতে ভীতকণ্ঠে সমীর বললে, আচ্ছা, কোন পুলিশটুলিশ কেউ এসেছিল কি আমার খোঁজে?

এবার গৌরী সত্যিই ভড়্‌কে গেল। বললে, না ত, কেন?

সে অনেক কথা ভাই, পরে সুবিধে হয় ত বল্‌বো। আমি এখনই আমার জিনিষপত্র নিয়ে এখান থেকে পালাবো, আর যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তবে বোলো যে সে অনেকদিন হোল চলে গেছে।

তাহলে তুমি কাশীতে তোমার পিসিমার কাছে যাও নি, বিস্ফারিত নেত্রে গৌরী প্রশ্ন করলে।

কাশীতে? পিসিমার কাছে? একরাশ বিস্ময় নিয়ে সমীর প্রশ্ন করলে, বললে, না ত, পিসিমার কাছে যাবার কোন কথাই ত ছিল না। আমি একটা বড় রকম ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়েছি।

কি ফ্যাসাদ গো, গৌরী একেবারে ওর গায়ের কাছে এসে পড়েছে।

বাক্স, হ্যাসারস্যাক, বিছানা দরজার কাছে আন্‌তে আন্‌তে সমীর বললে, পুরানো বোমার মামলা আবার কি?

সেকি? এখনো সেই আগেকার হাঙ্গাম মেটে নি?

সমীর মুহূর্ত্তের জন্য গুলিয়ে ফেললে। বললে, তা ঠিক তাই এখান থেকে পালাচ্ছি, আমিও বাঁচব, সদাও বাঁচবে। না হলে সদার পর্য্যন্ত সরকারী অফিসের চাকরী নিয়ে টানাটানি হবে।

দরজা খুলে এদিক ওদিক চেয়ে সমীর টাঙ্গাওয়ালাকে ডাক্‌লে, বললে, সামান্ উঠাও। টাঙ্গাওয়ালা মাল তুলতেই সমীর বললে, আজ চলি ভাই, পরে হয়ত আবার দেখা হবে। একটু থেমে বললে, হাঁ, রেণু কোথায়? একগ্লাস জল দিতে বল ত!

গৌরী ওর মুখের দিকে তীক্ষ্ণভাবে দৃষ্টিপাত করে বললে, রেণু কোথায় জানো না?

না ত। সে নেই? সেই যে সেই গেছে, তারপর আর আসেনি নাকি?

না। বলেই গৌরী নিজে তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে পরক্ষণেই একগ্লাস জল এনে সামনে ধরলে।

সমীর সেই জলের গ্লাসটা এক চুমুকে নিঃশেষ করে গ্লাসটা ওর হাতে ফেরৎ দিয়ে বললে, চলি ভাই, বেঁচে থাক্‌লে আবার দেখা হবে।

বিকৃতকণ্ঠে দুর্গা নাম নিতে গিয়ে গৌরীর চোখে জল এসে গেল। সমীর তখন রোয়াকে বেরিয়ে পড়েছে। গৌরী আকুলভাবে ওকে ডাক্‌লে, বললে, একবার শোনত।

ব্যস্তভাবে সমীর আবার ঘরের মধ্যে ঢুক্‌লো। গৌরী খপ্ করে ওর জামাটা ধরেই দেওয়ালের পাশে সরে গিয়ে দুহাত দিয়ে ওর কোমরটা জড়িয়ে ধরে বললে, যখন যেখানে যেমন থাকো, খবর দিতে ভুলো না, আর বিপদ কেটে গেলে আবার এসো। আস্‌বে ত?

সমীর বিনা দ্বিধায় স্বীকার করলো, হ্যাঁ।

গৌরী ওকে তখনও ছাড়ে নি। আরও নিবিড়ভাবে চেপে ধরে ওর বুকের ওপোর মুখ লুকিয়ে অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে বললে, অনেক অপরাধই করেছি, যেখানে যাই কিছু শোনো আমাকে ক্ষমা কোরো, কিছু মনে কোরো না।

ওর পিঠে এবং মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে সমীর বললে, আচ্ছা। তারপর চট্ করে ওর হাত ছাড়িয়ে সমীর এসে সাইকেলটায় চেপেই টাঙ্গাওয়ালাকে বললে চালাও। বাংলোর গেট পার হওয়ার সময় সমীর পেছন ফিরে দেখ্‌লে কাঁদো কাঁদো মুখে গৌরী ওর দিকে একদৃষ্টে

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, নিখুঁত অভিনয়ের সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্যেও সমীরের মনে কোনো আনন্দ হোল না, বরং সমস্ত অন্তরটা কেমন যেন উদাস ও নিঃস্ব হয়ে গেল।

শূন্য মন নিয়ে টাঙ্গার আগে আগে সাইকেল চালিয়ে সমীর এলো ওর নতুন বাসাবাড়ীর দরজায়। পথে ড্রাইং ক্লিনিং থেকে কাচানো জিনিষগুলো তুলে নিয়ে আসতে অবশ্য ওর ভুল হয় নি। পকেট প্রায় খালি হয়ে এসেছে, আজই কিছু রেস্ত যোগাড় করে নিতে হবে।

বাসায় ফিরে ও অবাক্ হয়ে গেল। এইটুকু সময়ের মধ্যেই রেণু ঘর দোর পরিষ্কার করে রান্নাঘরের উনান নিকিয়ে নিজে স্নান সেরে তৈরী হয়ে বসেছে। মালপত্র তোলা শেষ হতেই রেণু বললে, দাদা, কিছু চাল ডাল যোগাড় করে দিন, চারটি ভাত ফুটিয়ে দিই, কদিন ধরে যা-তা খেয়ে খেয়ে আপনার শরীর খারাপ হয়ে পড়েছে।

সমীর ঘরের অবস্থা দেখে বললো বাঃ, বেশ তো গুছিয়ে নিয়েছিস্। তা যাক্, তুই তাহলে এগুলোও ঠিক করে রাখ, আর আমি এখনই অফিস যাবো, কাজেই এ বেলাতেও তোর হাতের ভাত আর জুট্‌বে না। বিকেল থেকে সব ঠিক হয়ে যাবে। বলেই যে তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে নতুন পোষাক পরে জুতোটা ঝেড়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। বললে পথেই দাড়ি কামিয়ে কিছু খেয়ে নেবো। তুই ভাবিস্ নি, আর দেখ, দরজাটরজা সব সময় বন্ধ করে রাখিস, বিকেলে এসে ঘর-গেরস্থালির কাজ করা যাবে।

অফিসে যেতে সমীরের খুব ভয় হচ্ছিল। ঠিক বোঝা গেল না, গৌরী ওর অফিসেও কোন চিঠিপত্র দিয়ে সেখানে নতুন কোন বিপদ সৃষ্টি করে রেখেছে কি না? তবে ভরসা এই যে গৌরী নিজে তেমন ইংরাজী বা হিন্দী লিখতে জানে না, যাতে করে, নিজের বিদ্যের সে অফিসে চিঠি পাঠাতে পারে। আর সদা কি এসব করবে? কে জানে?

অফিসে পৌঁছে এক কল্পিত কাহিনীর অবতারণা করে সমীর তার অফিসারের কাছে অনুপস্থিতির কৈফিয়ৎ দিয়ে স্বল্পেতে পার পেয়ে গেল। তার এই ছ-মাসের চাকরীজীবনে সে এমনই একটা বিশ্বাস তৈরী করে নিয়েছে টাকা পয়সা কিছু সংগ্রহ করে সে উঠে পড়ে লেগে গেল কোয়ার্টার্স পাওয়ার জন্য। এতদিন ধরে পরের বাড়ীতে থেকে চাকরী করেছি স্যার, যে বাড়ীতে ছিলুম সেখানে ঝগড়া ঝাঁটি হওয়ায় বাধ্য হয়ে সেখান থেকে বলে এসেছি এই ভাবে সে নিজের ঠিকানাটাও অফিসের ঠিকানা বই থেকে কাটিয়ে মাদ্রাজী হোটেলের ঠিকানাটা বসিয়ে দিলে। এই সব কাজ করতে করতেই বেলা তিনটে বেজে গেল।

অফিসে আসার পর থেকেই সমীরের মনে একটা বড় ভয় চেপে বসল। সদাশিব এই বাড়ীতেই পশ্চিম দিকের ব্লকে কাজ করে। অন্য বিভাগ হলেও বাড়ী ত এইটাই, তবে রক্ষা এই যে বাড়ীখানা বৃহৎ এবং সদাশিব সকালে এসেই নিজের চেয়ারটিতে বসে এবং ছুটী হলেই মাথা গোঁজ করে সোজা বাড়ী চলে যায়। এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করা তার মোটেই অভ্যাস নেই। কিন্তু তাহলেও যে গল্প সে গৌরীকে শুনিয়ে এসেছে, তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সদাশিবকে সব কথা বলা এবং অফিসে মান-সম্ভ্রম বজায় রেখে চলা—। সমীর যতবার একথা মনে করেছে, ততবারই সে ঘাবড়ে গিয়েছে। ওঃ, কি বিপদই যে হোল!

বেলা সাড়ে তিনটা নাগাদ ওর অফিসার চলে গেল। মিনিট পনেরো পরেই সমীর কাজকর্ম গুছিয়ে রেখে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়লো। বাসায় ফেরার কথা মনে পড়তেই ওর মনে হোল চাল ডাল চাই, এবং এতক্ষণে ওর উপলব্ধি হোল যে ওর রেশনকার্ড সদাশিবের কাছেই বরাবর থাকে। তাহলে নতুন কার্ড করাতে হবে, আর সদা যদি ওর কার্ডে মাল নিতে থাকে তাহলে আবার এক নতুন হাঙ্গামার সৃষ্টি হবে। সদা অবশ্য অযথা র‍্যাশন কিনে পয়সা নষ্ট করবে না, কিন্তু নিতেও ত পারে। তাহলে কি করা যায়! একবার মনে হোল, সদার কাছে গিয়ে তাকে আলাদা ডেকে সমস্ত কথা খুলে বলে র‍্যাশন কার্ডখানা চেয়ে নেয়। কিন্তু কেমন যেন এক সংকোচ এসে ওর সমস্ত বুদ্ধিকে ঘুলিয়ে দিলে। মনে হোল, সদাকে গিয়ে ও বলুক,—সদা, এই ত করেছি, তুই কিছু মনে করিস নি বউদিকেও এসব কিছুই বলিসনি, আর তুই একটা ভালো দেখে লোক রেখেনে, তার মাইনেটা আমিই

ও দিয়ে দেয়, তাহলে সদা খুশী মনেই ওর কথামত চলবে, নতুন কোন ফ্যাসাদ আর হবে না। কিন্তু, তবুও যেন কেমন একটা সঙ্কোচ! সদা কি বিশ্বাস করবে যে রেণুর সঙ্গে ওর অন্যায় কোন সম্বন্ধ নেই? আর বিশ্বাস যদি নাই করে তাতেই বা কি? এমন ত কত হয়। কিন্তু না, সদা হয়ত মনে করবে, হয়ত কেন, নিশ্চয়ই ভাববে—

আকাশপাতাল ভাবতে ভাবতে সমীর তার সমস্ত চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলে। কিন্তু শেষ কথা, র‍্যাশন কার্ড। ব্ল্যাকে যেন কোথায় চাল পাওয়া যায় বলে সে শুনেছিল; একবার ঠিক করলে দরকার নেই কাউর, ব্ল্যাকের চাল দিয়েই সে চালিয়ে নেবে। কিন্তু কোথায় যে ব্ল্যাকের চাল বিক্রী হয়, সেটা ত জানা দরকার।

ভাবতে ভাবতে সমীর এসে ক্যান্টিনে ঢুকলো। ভরপেট খেয়ে নিয়ে ক্যান্টিনের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে তাকে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে চালের কথা। সে তক্ষুনি রাজী হয়ে বল্লে, কি চাল? পোলাউয়ের ফাইন রাইস্?

লজ্জা গোপন করতে গিয়ে সমীর স্বীকার করে বল্লো, হ্যাঁ। অতঃপর আড়াইসের চাল সে ঠোঙ্গা করে নিয়ে বাসার দিকে রওনা দিলে।

মোড়ের মাথায় পুলিশ হাত দেখিয়ে দাঁড়িয়েছে। সমীরকে সাইকেল নিয়ে দাঁড়াতে হোল। পাশেই পুরাতন গির্জা। গির্জার সামনে বোর্ডের ওপরে ইংরাজীতে লেখা আছে পুরনো এক মামুলী উপদেশ, তার মর্মার্থ হোল এই যে, 'এক মিথ্যা বহু মিথ্যার ঘূর্ণিপাক সৃষ্টি করে।' লেখাটা এর আগে বহুবারই সমীরের নজরে পড়েছিল, আজও পড়লো; কিন্তু আজ এই পুরাতন উক্তি যেন তীক্ষ্ণ এক পেরেকের মত তার কলিজার মধ্যে আঘাতের পর আঘাত দিয়ে কে যেন ঠুকে ঠুকে বসিয়ে দিতে লাগলো। গৌরীর কাছে বলা গল্প, অফিসে বলা আর এক গল্প, ক্যান্টিন থেকে কালো-বাজারী চাল সংগ্রহ, এর পর আরও না জানি কত কি হবে। ভগ্নী হয়ে যে জন্মায়নি, বা গোড়া থেকে বোল-আনা বোনের স্থান যাকে দেওয়া হয়নি, তাকে বোন বলার একটি মাত্র সামান্য এবং হয়ত বা মহৎ মিথ্যারচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কোথা দিয়ে কেমন করে যে বিরাট এক মিথ্যার আবর্ত্ত গড়ে উঠ্ছে, সেই সমস্ত কথাটা এক নিমেষে সমীরের মনের ভেতর একসঙ্গে ভেসে উঠলো। পথচলার ইঙ্গিত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য সব গাড়ীর সঙ্গে সমীরও সাইকেল চালিয়ে এগিয়ে পড়লো বটে, কিন্তু পাতানো বোনের ওপর মনে মনে কেমন যেন বিরক্ত হয়ে উঠলো। ঘর গেরস্থালীর এই সব ঝক্কি পোয়াতে সে কোনদিনও ভালোবাসে না, পোয়াতেও বড় একটা হয়নি তাকে, কেবল আজও এই র‍্যাশন কার্ড আর ব্ল্যাকের চাল নিয়ে তাকে যে এমন বিব্রত হয়ে পড়তে হচ্ছে, এর মূলে ত ঐ পাতানো বোন ছাড়া আর কেউ নেই। পরের বাড়ী রান্না করে, বাসন মেজে খেত, তার আবার এত মান অভিমান কিসের—ভাবতে ভাবতেই সমীরের মনে হোল, ছিঃ, একটা অসহায় মেয়েকে আশ্রয় দিয়ে এরকম চিন্তা করাও পাপ। সাইকেলে যেতে যেতেই মাথায় দুটো ঝাঁকি দিয়ে, সাইকেলের ঘণ্টা বাজিয়ে সমীর নিজেকে প্রকৃতিস্থ করতে চেষ্টা করলে।

বাসায় ফিরে দরজায় ঘা দিতেই রেণু ঘরের দরজা খুলে দিলে। চাল ডাল তরকারী সমেত একটা পোঁটলা সদ্য কেনা ঝাড়নে বেঁধে সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে ঝুলিয়ে সেই সাইকেলটা সরু সিঁড়ি দিয়ে ঠেলে দোতলায় তুলে ঘরের দরজা খুলিয়ে একটা অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করে সমীর যখন দেখলে রেণুর মুখখানা কেমন ভারী হয়ে আছে, তখন হঠাৎ ওর মনটা নিদারুণ বিরূপ হয়ে গেল। মুখে কিছুই না বলে অফিসের পোষাক ছাড়তে ছাড়তে সে নজর করলে, রেণু রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

ঘরে একটা বসবারও জায়গা নেই, না চেয়ার, না খাটিয়া, না কিছু। আলোর সুইচটা টিপে দেখলে তখনও আলো নেই, অর্থাৎ এ বাড়ীতে বাড়ীওয়ালা ছ'টার পর মেন সুইচ খোলে। হতাশ হয়ে সমীর তার বিছানাবাঁধা হোল্ডঅলের ওপোর প্যাঁচার মত মুখ করে বসে রইলো।

রান্নাঘর থেকে রেণু বেরিয়ে এসে একটু চুপ করে দাঁড়ালো, পরে আস্তে আস্তে বললে, দাদা—

কি?

এবেলা রান্না করবো ত?

তা নইলে আর বাজার করলুম কেন ?

বাজার কই ?

ঐ সাইকেলে বাঁধা আছে, নিয়ে যাও।

রেণু সাইকেলে বাঁধা পোটলাটা খুলে নিয়ে বল্লে, বাসন কোসন তেমন কিছুই ত নেই, হাঁড়ি কড়া ত নাই, আর কয়লা বা কাঠও ত আনতে হবে, কিছু কেরোসিন তেল—

অন্ধকারেই বোঝা গেল সমীরের অসহায় মুখের বিরক্তি-ব্যঞ্জক ভাব। একটু চুপ করে থেকে সে বললে, তোর জন্যেই ত রান্না নইলে আমি ত হোটেলে খেয়ে নিতে পারি।

তবে তাই নিন না দাদা, আজ না হয় রান্নাবাড়া থাক।

কিন্তু তুই ত অনেকদিন ভাত খাস্‌নি, আজকেও দোকানের খাবার খেয়ে থাকবি ?

তা আর কি করবো ? আপনার ত কষ্ট হবে।

সমীর উঠে দাঁড়ালো। লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরা অবস্থাতেই মণি ব্যাগটা হাতে হাতে নিয়ে সে বললে, বাসন কোসন আর কাঠ-কেরোসিন এখনই নিয়ে আসি নইলে কাল সকালে আমার সময় হবে না, কাল সাড়ে সাতটার সময় বেরুতে হবে, আর হ্যাঁ, চা চিনি এ সবও ত কিনতে হবে।

রেণু নিরুত্তরেই ঘাড় নাড়লে।

সন্ধ্যে অবধি নানারকম বাজার করে প্রায় সাতটার সময় সমীর হাঁফ ছেড়ে একবাটী চা খেয়ে সবেমাত্র বসেছে, হোটেলের ম্যানেজার এসে দরজায় দাঁড়িয়ে ডাক দিলে। সমীর তাকে ঘরের মধ্যে আসতে বললে।

মুণ্ডিতশির বৃহৎ মাদ্রাজী ভদ্রলোক। ঘরে এসেই ইংরাজীতে প্রথম বললে, দেখুন মিষ্টার, আপনি ত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ?

সমীর ইংরাজীতে উত্তর দিলে, ইয়েস্‌।

সমীরের রঙিন লুঙ্গির দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে সে বললে, দেখুন ঐ সবগুলো আপনি এখানে যতদিন থাকবেন, ততদিন পরবেন না, কারণ ওতে আমার অন্য বোর্ডাররা বড়ই আপত্তি করে। প্রথমতঃ দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ ছাড়া আমরা কাউকে এ ঘরে রাখতুম না। আজকাল অন্য দেশের ব্রাহ্মণও রাখছি কিন্তু আপনি ত জানেন, এখানে যেমন মাছ মাংস ডিম ইত্যাদি চলে না, তেমনি ঐ সব মুসলমানী পোষাকও চলবে না ?

সমীরের একবার মনে হোল, সে বলে, যে কেন বাবা, প্যাণ্ট কোট যদি চলতে পারে, তাহলে লুঙ্গীই বা চলবে না কেন, কিন্তু নিদারুণ ক্লান্তির জন্য সে এখন তর্কের কথা না তুলেই বললে, আচ্ছা, এটা আর পরবো না।

এক কথায় স্বীকার হয়ে যেতে সে লোকটা খুসিও হোল, সঙ্গে সঙ্গে নিজের জয়গৌরবে স্ফীত হয়ে অন্য এক প্রশ্ন করে বসলো। বললে, আপনার সঙ্গে ঐ মহিলাটি যে রাঁধছে, ওটি আপনার কে ?

সমীর বললে বোন।

ও। তার 'ও' বলার ধরণে মনে হোল যে কথাটা বোধহয় যেন তার ঠিক বিশ্বাস করলে না।

সমীর ওর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য হাত তুলে বিদায় নমস্কার করলে।

ম্যানেজার কিন্তু তত তাড়াতাড়ি প্রতি নমস্কার করলে না একটু ভেবে বললে আপনি কি করেন এবং এ কামরায় কতদিন থাকবেন ?

সমীরের মনটা ভিতরে ভিতরে তেতো হয়ে উঠছিল। বললে, আমি দিল্লীতে চাকরী করি এবং কোয়াটার্স পেলেই উঠে যাবো। একটু থেমে বললে, এসব প্রশ্ন সকালে ভাড়া দেওয়ার সময় করলেই ত পারতেন।

ম্যানেজার বল্লে তখন আপনি ট্রেন থেকে ক্লান্ত হয়ে আসছেন, তাই তখন প্রশ্ন করিনি। আর তা ছাড়া আপনি লুঙ্গী পরে ঘোরাঘুরি করায় কয়েকজন বোর্ডার আপত্তি করেছে কি না তাই এ সব কথা জিজ্ঞাসা করছি।

পাশের রান্নাঘর থেকে তখন রান্নাবাড়ার শব্দ আস্‌ছে। ম্যানেজার সেদিকে একটু নজর দিয়ে বললে, আর দেখুন মাছ মাংস এ-বাড়ীতে চলে না, সে কথাটা ভালো করে মনে রাখবেন।

সমীর বললে আমি ত বলেছি, আমার বোন বিধবা, ও সব আমার ঘরে এখন চলবার উপায় নেই।

তবুও যেন ম্যানেজার কেমন অপ্রসন্নমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাওয়ার সময় শেষ কথা বলে গেল, চটপট কোয়াটার্সের ব্যবস্থা করে নিন, নইলে—

সমীরের মুখে এলো একবার বলে নইলে কি করবেন, কিন্তু সে কথা চেপে গিয়ে সে বললে, আচ্ছা।

ম্যানেজার চলে যাওয়ার পর সমীর কিছুক্ষণ ধরে ভাবতে লাগলো ম্যানেজারের আচরণ। এ সব কথা সে জিজ্ঞেস করে কেন?

রাত্রি প্রায় সাড়ে নটা নাগাদ রেণু এই ঘরের মধ্যে একখানা পুরাতন খবরের কাগজ আসনের মত করে পেতে কলাইয়ের থালা গেলাস ও বাটীতে সান্ধ্যভোগ ব্যবস্থা করে দিয়ে হাত ধুয়ে এসে বললে মাখন এসেছেন দাদা?

সমীর বললে, না। ক্ষুধার প্রাবল্যে সমীর খুব তাড়াতাড়ি খেতে লাগলো। ওঃ,আজ সারা সন্ধ্যা ধরে সে যে কি বিপুল পরিশ্রম করেছে, তা সেই জানে, রান্নার জন্য যে এত জিনিষ লাগে, তা একসঙ্গে মনে হলে সে হয়ত রান্নার ব্যবস্থা আজ করতই না। শুধু চাল ডাল কিনলেই হয় না, মশলা চাই, আবার গুঁড়ো মশলা, নইলে শিল নোড়া কিনতে হবে। নুন তেল চাই, আবার তেল নেওয়ার জন্য শিশি কিনতে হোল। ঘি এর জন্য বাটী চাই, কাঠ চাই, কেরাসিন চাই, সেই সঙ্গে কেরাসিনের বোতল। আবার উনানে বাতাস দেওয়ার জন্য পাখা দরকার; হাতা খুন্তি, শাঁড়াশী, ঘর ঝাঁট দেওয়ার জন্য ছাঁটা, ন্যাতাই যে কতগুলো লাগে, তার ঠিক নেই। যে পুরনো কাপড় খানা পরে রেণু সদাশিবের বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল সেই কাপড়খানা প্রায় পুরোপুরিই চলে গেল ন্যাতা করতে। জল রাখার জন্য একটা বালতি কিনতে হোল, সেই সঙ্গে ছোট একটা মগ। যে জিনিষ সমীর কখনও করে না, আজ রাত্রে খাওয়ার আগে সেই কাজই সে করেছে অর্থাৎ মনে মনে হিসেব করে দেখেছে. আজ বিকেল থেকে সংসার গুছোতে তার প্রায় চল্লিশটি টাকা খরচ পড়ে। ছেচায়ের কাপ ডিস এবং ছোট একটা ষ্টোভ থেকে খুঁটিনাটি কতই না জিনিষ! বাপ্, লোকে সংসারধর্ম করে কি করে!

খেতে বসার পর রেণু সামনে বসে বারবারই বলতে লাগলো, রান্না আজ মোটেই সুবিধার হয়নি। সমস্তই নতুন, ব্যবস্থাও কিছুই নেই, আপনার কত কষ্টই না হচ্ছে।

সমীর এ সবের কোন উত্তর না দিয়ে ঘাড় হেঁট করে খেয়েই গেল।

আহারান্তে রেণু বললে, সুপারী মশলা এনেছেন কি?

সে বললে না থাক, ওসব আর দরকার নেই।

থালা গেলাস তুলে নিয়ে জায়গা মুছে রেণু রান্নাঘরে চলে গেল। পরমুহূর্তেই এ ঘরে এসেবললো আপনারবিছানা পেতে দি'!

সমীর তখন সিগারেট ধরিয়েছে। বল্লে, দাও। বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে সামনের চলনপথে এসে দাঁড়ালো।

রেণু দ্রুত ঘরটা ঝাঁট দিয়ে জানলার তলায় হোল্ড-অল্ খুলে মেঝেতে সমীরের বিছানাটা পেতে দিলে। সমীর ঘরে এসে বল্লে, তোর জন্যে কি পেতেছিস্?

সে যা হয় করব এখন, আপনি শুয়ে পড়ুন।

সমীর কথার কোনো জবাব না দিয়ে নিজের বিছানা থেকে সতরঞ্চিটা বার করে মেঝের অপর দিকে ফেলে দিয়ে নিজের সুটকেশটা খুলে একখানা ধোপদুরস্ত চাদর বার করে বল্লে, এইটে ঠিক করে পেতে নে, আর বালিশ—বলেই নিজের ময়লা জামা প্যাণ্ট ইত্যাদির পুটলিটা ফেলে দিয়ে বল্লে, আজ এইটাই মাথায় দিয়ে শো, কাল তোর বালিশের ব্যবস্থা করে দেব।

রেণু নীরবে নিজের বিছানাটা পেতে রান্নাঘরে চলে গেল খেতে। সমীর শুয়ে শুয়েই বুঝতে পারলে রেণু খাওয়া শেষ করে বাসন মাজতে বসলো। তারপর রান্নাঘর বন্ধ করে এ-ঘরে এসে সমীরের আগ্রায় কেনা জলের জায়গাটা ওর মাথার কাছে রেখে নিজের সতরঞ্চিতে গিয়ে বসলো। খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বল্লে, দাদা আমার ওপোর খুব বিরক্ত হচ্ছেন, নয়?

কেন? সমীর প্রশ্ন করলে।

আমার জন্য আপনাকে কত কষ্টই না করতে হচ্ছে।

সমীর এ-কথার ঠিকমত উত্তর না দিয়ে বললে, বড় ঘুম পাচ্ছে, আলো নিবিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়।

রেণু নীরবে সমীরের আদেশ পালন করলো। প্যাণ্টের পুঁটলিটা গুছিয়ে মাথায় দিয়ে সে যখন শুলো, তখন হোটেলের অন্য সমস্ত অংশই বেশ নীরব হয়ে গেছে। অন্ধকারে নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে সমীর স্পষ্ট শুনতে পেলে, রেণুর একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো।

[ক্রমশঃ]

বিচিত্র বিশ্ব

বিশ্ববন্ধু

মাতৃগর্ভে অজ্ঞাতবাস

আমরা প্রেমের বা স্নেহের বহু উপন্যাস পড়েছি। যার মধ্যে কাছে দূরে থাকার মনোরম সব ঘটনা বহু নামজাদা লেখক নানান কায়দায় প্রাণবন্ত করে ফুটিয়েছেন। কিন্তু সম্প্রতি এক চুয়ান্ন বছরের মহিলার কাছে থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে এক বিশ্ব রেকর্ড স্থাপনের ঘটনা জানা গেল। মহিলার দেশ জামাইকা। সম্প্রতি এক ডাক্তারী পরীক্ষার পর তাঁকে জানান হয় যে তিনি সন্তান সম্ভবা এবং গত ন' বছর ধরে তিনি তাঁর সন্তানটীকে নিজের অজান্তে বয়ে বেড়াচ্ছেন। শিশুটী যে এত কাছাকাছি থেকেও এত দূরে তা তিনি কিছুমাত্র বুঝতে পারেন নি এবং কোন রকম অসুবিধাও ভোগ করেন নি। ডাঃ লিপলিয়ান চেঞ্জ ক্যানাডার মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের একটি পত্রিকায় ঘটনার বিচিত্র বিবরণ প্রসঙ্গে জানান যে এ রকম অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য ঘটনার সংখ্যা সারা বিশ্বে আজ পর্য্যন্ত মাত্র ২৭০টী ঘটেছে। গর্ভ-লুক্কায়িত সন্তানটীর এই বিচিত্র অজ্ঞাতবাসের কারণ এবং ভবিষ্যৎ আচরণ কি হতে পারে—এ বিষয়ে মাতা এবং ডাক্তাররা সম্পূর্ণ নীরব। একমাত্র যোগীপুরুষরাই ভদ্রমহিলার গর্ভ নাড়াচাড়া করে বলতে পারেন অবতার-টবতার কিনা।

এ্যান ইভনিং ইন নিউ ইয়র্ক।

বিক্ষোভ জানানোর আধুনিকতম পন্থা কি হতে পারে, তারি হদিশ দিয়েছেন জনকয়েক আধুনিক তরুণ-তরুণী। চেকোশ্লাভিকায় সোভিয়েট অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর উদ্দেশ্যে নিউ ইয়র্কের রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তরের সামনে চারজন সুন্দরী যুবতী এবং একজন স্বাস্থ্যবান্ যুবক একটি সুন্দর আকর্ষণীয় বিক্ষোভের সূচনা করেন। অপেক্ষমাণ জনতার সামনে এই পাঁচজন যুবক যুবতী ধীরে ধীরে একে একে দেহ থেকে পোষাকের আবরণ এবং লজ্জাবরণ খুলতে থাকেন। উপস্থিত জনতা এই দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে যান। বিক্ষোভকারীরা এই সময় একটী সোভিয়েট পতাকাও আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন। তাঁদের নগ্নদেহের সৌন্দর্য্যে আর কি কি পোড়ে, সে কথা কিছু জানা যায়নি। কিন্তু পুলিশ এসে পড়াতে এই রকম 'Adults only' মার্কা দৃশ্যটীর অভিনয় মাঝপথেই বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ কিন্তু বিক্ষোভকারী নায়ক-নায়িকাদের ধরতে পারেনি। কারণ পুলিশ আসার গন্ধ পেয়ে জামা কাপড় ইত্যাদি কোন রকমে দেহে জড়িয়ে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে তাঁরা সরে পড়েন। জনতাকে হাজার জিজ্ঞাসাবাদ করেও পুলিশ কোন সদুত্তর আদায় করতে পারেন নি। নাটকের অন্তর নিহিত রস একেবারে প্রাণের মূলে সঞ্চার হওয়াতে দর্শকরা বোধহয় কিছুক্ষণের জন্য নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের দেশে এ ঘটনা ঘটলে আমরা দশজনে মিলে এদের পাঁচজনকে বামা ক্ষ্যাপা দি গ্রেট নামে আখ্যা দিতে পারতাম। না না, কোন মহাপুরুষকে এর মধ্যে টেনে আনিনি। কথাটা ক্ষ্যাপা বামাদের উদ্দেশ্যেই বলতে চেয়েছি।

মা ষষ্ঠীর জয়।

বৈজ্ঞানিকদের ভাষ্য অনুযায়ী সারা পৃথিবীতে সব সময়ে প্রাণী জগতে যুদ্ধ চলছে। আমরা সবাই যুদ্ধরত। 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা'র আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা সর্বদাই আত্মরক্ষার কাজে ব্যস্ত। সম্প্রতি মা মনসা ভার্সাস্ মাষষ্ঠীর এক লড়াই জমে উঠে বিহারের সমস্তিপুরে। স্থানীয় জামা মসজিদের কাছে একটি বিরাট আকারের

গোখরো সাপ গর্ত্ত ছেড়ে বাইরে দিনের আলোয় বেড়িয়ে আসে। ঠিক সেই সময় কাছাকাছি এক ভদ্রলোকের বাড়ী থেকে একটি বড় পোষা বেড়ালও কি কারণে বাইরে বেরিয়ে আসে। ব্যস দুই মায়ের দুই জাঁদরেল ভক্ত সন্তান একেবারে মুখোমুখি। বেড়ালটী পাড়া কাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো গোখরো সাপের উপর। সাপও নানাভাবে প্যাঁচ কষতে লাগলো। দু'জনে আধ ঘণ্টা যুদ্ধ করার পর দেখা গেল, সাপটি ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় নিহত হয়ে পড়ে আছে। বেড়ালটী সগর্বে ম্যাও ম্যাও করছে আর জিব দিয়ে দিব্যি থাবা চাটছে। এমন সময় প্রিয়জনের বিরহ সইতে না পেরে সহমরণে এগিয়ে আসে নিহত সাপটীর জুড়ি। তুমুল বিক্রমে বেড়ালটী আবার ঝাঁপ দিল জুড়ি সাপটির দিকে। চললো আবার নতুন করে লড়াই। জুড়ি সাপটির মনের আশাও পূর্ণ হল, প্রিয়জনের পাশে দেহ রাখলেন। অপেক্ষমাণ দর্শকরা করতালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন 'জয় বিল্লিমায়িকী জয়'।

পিতা ধর্ম্ম, পিতা স্বর্গ… ?

এই সেদিন শেষরাতের কলকাতার শ্যামবাজার অঞ্চলের কাছাকাছি কোন পার্কে একটি ছোট করুণ নাটক অভিনীত হল। এক সাংবাদিক ভদ্রলোক সারা রাত কাজ করে শেষ রাতে হেঁটেই বাড়ী ফিরছিলেন। সারা রাস্তা ফাঁকা, জনমনিষ্যি নেই। ভদ্রলোক ঘুম জড়ানো চোখে কোন রকমে ক্লান্তচরণে এগিয়েচলেছেন ফুটপাথ ধরে। পার্কের কাছাকাছি আসতেই একটি ফুটফুটে চেহারার শিশু এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো—কটা বাজে ? ভোর হতে কত দেরী ? ভদ্রলোক চোখজোড়া কোনরকমে ফাঁক করে হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে বললেন—প্রায় তিনটে ভদ্রলোক চলেই যাচ্ছিলেন, হঠাৎ ব্রেনে ইলেক্ট্রিক শক্ খেয়ে সিধে হয়ে চোখ খুলে দাঁড়ালেন। চতুর্দিকে তাকালেন ভাল করে, শিশু একটি নয় দুটি। বড়টির বয়স সাত—ছোটটির ছয়। দুই ভাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ভদ্রলোক দেখেই বুঝলেন ছেলে দুটি রাস্তার নয় ঘরের। গায়ে হাফসার্ট এবং হাফ প্যাণ্ট। বাপ-মায়ের অযত্নলালিত চেহারা। জিজ্ঞেস করলেন এত রাতে তোমরা এখানে কি করছো ? ছোটটি উত্তর দিল—পার্কেরাতকাটাচ্ছি। ভদ্রলোক শুক্‌নো তালুটা জিব দিয়ে ভিজিয়ে ফের জিজ্ঞেস করলেন—তা এখানে কেন—বাড়ী নেই ? বাবা-মা নেই ? আছে—বাবা কাল সন্ধ্যেবেলা বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। সাইকেল চড়া শিখতে গিয়ে সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল —তাই বাড়ীতে ফিরতেই বাবা হুকুম করলেন—এক্ষুনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা। তাই তারা দু'ভায়ে পিতৃআজ্ঞা পালনার্থে রাম লক্ষ্মণের মত গৃহত্যাগ করে পার্কে চলে যায়। সারা রাত কিছু খেতে পায়নি। পার্কের অন্ধকারের মধ্যে নানা রকম বিপদ ওঁৎ পেতে থাকতে পারে। অনাকাঙ্ক্ষিত অভিজ্ঞতার ঝুঁকি মাথায় নিয়ে শিশু দুটিকে কোন শিশু গাছতলে রাত কাটাতে হয়েছে। সাংবাদিক ভদ্রলোক চশমাটা ভাল করে রুমালে মুছে সূর্য্যিমামা (বাবার শালা) উঠলে পর একবার বাড়ী ঢোকবার চেষ্টা করতে উপদেশ দিয়ে নিজের বাড়ীর দিকে হাঁটা দিলেন। বাবার শ্যালক দেখা দিলে বাবা কি করবেন জানি না। তবে একথা জোর গলায় বলতে পারি এই শিশুই হয়তো পরিণত বয়সে বাপের মুখে পিণ্ডি দিতে হেড অফিস গয়ায় রওনা হবে—ওঁ গয়া গঙ্গা গদাধর।

আফ্রিকায় রানীমেলা

এই সেদিনমাত্র স্বাধীনতা লাভ করলো আফ্রিকায় বৃটেনের সর্বশেষ উপনিবেশ সোয়াজিল্যাণ্ড। রাজার নাম সোভূজা এবং তাঁর আদরিনী রানীর সংখ্যা হল ১১২। স্বাধীনতা উৎসব পালনের দিন বিভিন্ন দেশের অতিথিরা নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল জাতীয় স্পোর্টস ষ্টেডিয়ামে। প্রায় ৬০ হাজার নরনারী উপস্থিত ছিলেন এই আনন্দানুষ্ঠানে। রাজার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী এই বিরাট রানীবাহিনীকে পুরোভাগে পথ দেখিয়ে সভাস্থলে নিয়ে আসেন এবং বিদেশী প্রতিনিধিদের সামনের দিকের নির্দ্দিষ্ট আসনগুলিতে বসতে দেন। রাজা সোভূজার এই বিপুল রানী সম্পদ দেখে বিশ্ববাসী আনন্দিতবোধ করবেন। তবে উপস্থিত জনতার মধ্যে কেরানীকুলের কোন প্রতিনিধি ছিলেন কিনা জানিনা, থাকলে বোধকরি এই দশা দেখে মূর্চ্ছা যেতেন।

মেকসিকো অলিম্পিকে ২০ হাজার মৎস্যের যোগদান

অলিম্পিকের প্রস্তুতিপর্বের একটি সংবাদে জানা গেল যে মেক্সিকো অলিম্পিকের কর্মকর্তারা মহা বিপদে পড়েছেন ক্ষুদে পানা এবং শ্যাওলাদের নিয়ে। যে নদীতে নৌকা চালনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে সেটি পানা ও শ্যাওলায় এমন ভাবে তাড়াতাড়ি ভরে যায় যে সেখানে অনুষ্ঠান হওয়া একেবারেই অসম্ভব। বৈজ্ঞানিক মতে নানান গবেষণা চালিয়েও কোন সুফল পাওয়া যায়নি। কিছুদিন হয়তো প্রথমে কমে যায়, কিন্তু দু'চার দিনের মধ্যেই তা আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। শেষে জাপানী মাছেরা মুস্কিল আসান করলেন। কর্ম্মকর্ত্তাদের অনুরোধে সেই পানা ও শ্যাওলাদের উজাড় করতে জাপান থেকে প্লেনে উড়ে এল এক বিশ হাজারী জাপানী মাছের ঝাঁক। সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য এই বিরাট মৎস্য বাহিনীই এখন নৌকাচালনা প্রতিযোগিতা যাতে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয় তার ভার নিয়েছেন। মাছের ক্ষুরে দণ্ডবৎ।

মেয়েদের ফ্যাশানের নেশা

মেয়েদের কোন জিনিষেই চিরকাল আসক্তি থাকে না। ক্ষণে ক্ষণে মত পাল্টায়। সাজপোষাকের ডিজাইন, কাটিং, কালার, নিত্য ব্যবহার্য্য বিলাস দ্রব্য, প্রসাধনের জিনিষ এমনকি আদরের স্বামীটি পর্য্যন্ত। কোন জিনিষই বেশীদিন মেয়েদের মন ভরাতে পারে না। তখন আবার নতুন ফ্যাশনের মোহে পড়ে। সভ্যতার আদি যুগ থেকে দেখা যায় মেয়েরা নিত্য নতুন ফ্যাশনের বিশেষ পক্ষপাতী। পুরুষকে তাই চিন্তা করতে হয়, গবেষণা করতে হয় কেমন করে নতুন নতুন ফ্যাশনের যোগান দেওয়া যায়। নতুন ফ্যাশনের তাগিদের পিছনে মেয়েদের মন কি চায়, কেন চায়, তারি তদন্তের জন্য বৃটিশ সরকার একটি তদন্ত কমিশনের ব্যয় বাবদ ১৪৩২ পাউণ্ড অর্থাৎ আমাদের টাকার হিসাবে প্রায় ২৬,০০০ টাকা খরচ করতে রাজি হয়েছেন। মেয়েদের মনের মতিগতি বুঝতে এটাকাটা খরচ করার পিছনে এমন কিছু বাহাদুরি নেই। তদন্ত কমিশনের রায়ে কি বলে, সেটা জানতে পারলে বিশ্বের যাবতীয় পুরুষই খুসি হবে।

পথের বাঁকে

মদন চক্রবর্তী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ভোরে ওঠার প্রতিযোগিতায় সুহাসই জয়লাভ করল। অমিয়বাবুকে ডেকে তুলে নিয়ে দুজনই যাত্রা করল কুমুদবাবুর অফিসের দিকে।

সমস্ত অফিস বাড়ীটাই বন্ধ। বাইরের ফালি বারান্দার মত একটা জায়গায় লম্বা একটা টেবিলের ওপর পড়ে আছে একটা খাতা। সেই খাতাটায় দু'জন নাম সই করে আবার হাঁটতে সুরু করল ফেরার পথে।

সুহাস শুনল, অফিস খোলে রোজ বেলা দশটায় আর বন্ধ হয় পাঁচটায়। তবে নামেই বেলা দশটা। অফিস ঠিক মত জমে উঠতে লেগে যায় প্রায় বেলা বারোটা। অফিসের সর্বময় কর্তা বলতে ঐ কুমুদবাবু। তারপরেই আছেন কতকগুলো এসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়ার। অফিস বাড়ীটা একরকম ধরতে গেলে ইঞ্জিনিয়ারদেরই। আর আছে কতকগুলো কেরাণী, টাইপিষ্ট ইত্যাদি জাতীয়। তবে তারা সকলেই মহিলা।

প্রথম দিকে ওভারসিয়ার আর সাব-ওভারসিয়ারদেরও বসার জায়গা ছিল ঐ অফিসঘরেই। পরে কি সব বিশেষ কারণে ওদের সরিয়ে দেওয়া হল অন্য জায়গায়।

অমিয়বাবু চুপি চুপি বললেন, ওপরওয়ালাদের ব্যাপারই সব আলাদা।

এখানকার সিমেন্টের বস্তা নিয়ে ওদের কি একটা গোপন কারবার চলে। তাছাড়া কয়েকটা মেয়েকেও নিয়ে নাকি কি ব্যাপার আছে ওদের। সেইজন্যে কাজের সুবিধের জন্যেই নাকি তাদের সরিয়ে দেবার প্রয়োজন হল মাঠের মাঝখানে।

সুহাস প্রশ্ন করল, রাধাগোবিন্দবাবুর কানে এসব খবর যায়না?

—ঠিক বলতে পারিনা। তবে রাধাগোবিন্দবাবুরও কিছু কিছু গোপন কাজের সাহায্যকারী হিসেবে এরাও কিছু কিছু সুবিধে করে নেয় আর কি।

—তাহলে আর দোষ দেবেন কাকে?

—না, দোষ জগতে কারুর নেই, দোষ শুধু আমাদের কপালের। নইলে দেখছেন না, সৎভাবে উদয় অস্ত পরিশ্রম করে যা বরাতে জোটে তা দিয়ে বাঙলা দেশের মত জায়গায় একটা মেয়েকে জীবনসঙ্গিনী করে আনতে পারলুম না। আর ওরা সব জলজ্যান্ত একটা করে স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও, নিত্যনতুন মেয়েদের সঙ্গে ফুর্তি করে কত পয়সা উড়িয়ে দিচ্ছে।

সুহাস বুঝল, অমিয়বাবুর জীবনের অনেক সাধ আহ্লাদ অপূরণ থাকার পাশ থেকেই এই অভাবের বেদনাটা হয়ত জেগে উঠেছে। এই খোলা সীমাহীন মাঠের ওপরেও অভাবের হাওয়া সঙ্কুচিত করল মানুষের মনকে। শুধু অর্থের অভাব নয়, জীবনধারণের প্রতিটি শাখাপ্রশাখার অভাব।

সুহাসের মনে হল, গোটা সহরের ছড়িয়ে থাকা সমস্তগুলো যেন কেন্দ্রীভূত হয়ে এই মাঠের ওপরে মর্মধ্বনি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অভাব কখন অলক্ষ্যে এসে ধাক্কা দিয়েছে দেশের বুকে। সেই অভাব পূরণ করতে মেয়েরাও এগিয়ে এসেছে। সে অভাবের পাশে এসে অনুভব করেছে রুদ্ধ হয়ে থাকা মনের অন্ত অভাবকে।

আবার সে অভাব পূরণ করতে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে আর এক অভাবের। সে অভাবের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে জীবনের মূল অভাব নাড়াচাড়া খেয়ে অন্ধ উদ্দামতায় ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। কাজের নামে মানুষকে করে তুলেছে যত অকাজের সঙ্গী।

এই অভাব বোধই মাঠের মধ্যেও অমিয়বাবুকে করে তুলেছে অভাবী, পাশেই অন্য অভাবের কারণগুলো প্রকট হয়ে ওঠায়।

অভাবের অনেক চেহারা জানা আছে সুহাসের। তার মনে পড়ল অভাবী পরিবারের তাপসীকে। সে নিজেই স্বীকার করেছে অভাব কি সর্বনাশা পথে ঠেলে দিয়েছিল তাকে।

অভাবী সংসারের জ্যেঠাইমাও ভেসে উঠল তার মনের দর্পণে। ষ্টিয়ারিং হাতে সর্দারজী যেন কটমট করে তাকিয়ে নিল তার দিকে। বোসবাবু যেন হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালো চরে-বেড়ানো ছাগলগুলোকে।

অভাব এসে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল ভবনাথবাবুকে। হরণ করে নিয়ে গেল তার সমস্ত মানবিক প্রবৃত্তিগুলোকে।

অভাবের অন্য চেহারাও সুহাস দেখেছে আদালতে। পিতা বিক্রী করেছে কন্যাকে। মা অসৎ পথে রোজগারের ইন্ধন জুগিয়েছে মেয়েকে। স্বামী অম্লান বদনে স্ত্রীকে তুলে দিয়েছে অপরের হাতে। অবগুণ্ঠনে ঢাকা স্ত্রী আদালতে এসেছে স্বামীর কাছ থেকে খোরাকীর টাকা আদায়ের জন্যে। পিতা ক্ষুধিত সন্তানের অসহ্য কান্নার ধ্বনি ভুলতে গিয়ে আছাড় দিয়ে মেরে ফেলেছে অবোধ শিশুকে।

সেই কেন্দ্রীভূত অভাবের পাশে আদালতে সৃষ্টি হল আর এক জাতের অভাব। মাত্র দু'টো একটা টাকার জন্যে একে অপরের হীনতাকে জাহির করে হেয় প্রতিপন্ন করতে লাগল সার্বজনীন দৃষ্টির কাছে।

ভবনাথবাবুর শেষ সিদ্ধান্ত নেবার এও একটা কারণ।

অভাবের অনেক চেহারা সুহাসের সামনে দিয়ে ঘুরপাক খেয়ে গেলেও, কেদার মাষ্টারের ডাঁটি ভাঙ্গা চশমার মূর্তিটা একবার উঁকি মারল তার দৃষ্টিপথে।

সুহাস ভাবল, এই দেশ জোড়া অভাবের পাশে কেদার ধাক্কায় তলিয়ে যাবার বিরুদ্ধে সোজা হয়ে চলার চ্যালেঞ্জ। আপাতঃদৃষ্টিতে বা সাময়িক আনন্দ-উল্লাসের করতালির জোয়ারের পাশে কেদার মাষ্টার পরাজয়ের প্রতীক হলেও, লোকচক্ষুর অন্তরালে সুস্থ সামাজিক নৈতিক বোধকে অঙ্কুরিত করার সাধনামন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে তাঁর মুখ দিয়েই। তারই পরাজয় পর্দার অন্তরালে জয়ের স্বরূপ প্রতিভাত হবার প্রস্তুতিপর্বে তিনি বলতে পেরেছিলেন, পেছন দিকে সরতে সরতে জিততে জিততে যাবো। সেই আশায় যদি তিনি একটিও উত্তরসাধককে এই অভাব ঘেরা দেশ-জোড়া ক্ষুব্ধ মনের ব্যধিগ্রস্ত সমাজে রেখে যেতে পারেন, তাহলে আজও আশা আছে, আমরা হারিয়ে যাবো না।

কুলি লাইনে এসে পড়ল সুহাস আর অমিয়বাবু।

বিভিন্ন ধরণের অসংখ্য জন-মজুর জমায়েৎ হয়েছে সেখানে।

তাদেরই একজনের হাত থেকে একটা বড় খাতা নিয়ে অমিয়বাবু নাম ডেকে ডেকে হাজিরা নিতে লাগলেন।

হাজিরা নেবার শেষে সুহাসকে দেখিয়ে তিনি সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, ইনি হলেন তোমাদের নতুন সুপার-ভাইজার বাবু। কাল থেকে তোমরা দলে দু'ভাগ হয়ে যাবে। কিছু লোক থাকবে আমার কাছে আর কিছু ওনার কাছে। আজ নাম ডাকা হয়ে গেলে, কাল থেকে উনি যে ভাবে কাজ করাবেন, সেইভাবে তোমরা চলবে বলে, তিনি সুহাসকে বললেন, আজ গোটাবিশেক লোক নিয়ে আপনি খালটা ভরাটের কাজে লেগে যান। লরী এসে খালের ধারে মাটি ফেলে দিয়ে যাবে, কুলিরা সেই মাটি কোদলে করে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলবে খালের জলে। কুলিদের সঙ্গে একটা সর্দার গোছের লোক দিয়ে দিচ্ছি, সেই সব বুঝে সুঝে ওদের খাটিয়ে নেবে। আপনি প্রথম প্রথম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখে বুঝে নিন।

বলে, অমিয়বাবু দলবল নিয়ে চলে গেলেন মাঠের একদিকে।

সুহাস লোকজন সমেত এসে দাঁড়াল খালের ধারে। পাশেই মাটির স্তূপ দাঁড়িয়ে আছে পর্বত সমান হয়ে। এই মাটি ধীরে ধীরে লেহন করে নেবে খালের ঐ স্বচ্ছ জল। তারপর অ্যাসফাল্টম্ পেভমেণ্টের রাজপথ ভুলিয়ে দেবে

সুহাস সর্দারের কাছ থেকে শুনল, এই খালের ধারের অসংখ্য কুটির ভাঙ্গা পড়েছে।

সে মনে মনে ভাবল, খালটা বুজিয়ে ভালই হচ্ছে। যাদের সরল জীবনগাথার সঙ্গে সহজ ভঙ্গীতে মিশে খালের স্বচ্ছ জল আনন্দের গর্বে স্ফীত হয়ে এগিয়ে যেতো আপন মনের ধীর গতিতে, তারাই যখন উৎখাত হল, উৎপাটিত হল জলের বুক থেকে, তখন এই ঝিমিয়ে পড়া খালের বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা নেই।

কুলিরা কোদাল দিয়ে মাটি কেটে কেটে একের পর এক ফেলতে লাগল জলের বুকে।

কিছুক্ষণ ঝুপঝাপ আওয়াজ চলার পর খালের বুক চিরে হঠাৎ একটা পায়ে চলার সরু পথ যোগাযোগ করিয়ে দিল এপারের সঙ্গে ওপারের।

কয়েকটা কুলি ওপারে চলে গেল শুক্‌নো গোছের ডাল সংগ্রহ করার বাসনা নিয়ে।

শুক্‌নো একটা বাবলা গাছের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সকলে। জ্বালানীর সুবন্দোবস্তের জন্যে।

সুহাসও একটু পরে সরু খালটা পার হয়ে গেল ওপারে। চতুর্দিকে ধু ধু করছে খোলা মাঠ। অনেক দূরের উঁচু রেলপথটা হাতছানি দিচ্ছে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবার। সুহাস অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অস্পষ্ট শব্দে অস্থায়ী মায়ার রেশ জাগিয়ে একটা ট্রেন চলে গেল উঁচু যায়গার ওপর দিয়ে।

সকালের আমেজী হাওয়ায় সুহাসের মনটা যেন নেচে উঠল। অনেক দূরে কয়েকটা গরু অবাধ স্বাধীনতায় ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক ওদিকে। ভাল লাগল সুহাসের। তার মনে হল, কাছাকাছি নিশ্চয়ই কোন গ্রাম আছে। আছে মানুষের শান্ত জীবনের বসতি। ব্যাচিলার মাঠটার পাশে হঠাৎ যেন নববধুর গৃহে আগমনের একটা মঙ্গল ধ্বনি বেজে উঠল সুহাসের কানে।

কাঠের ওপর ইস্পাত যন্ত্র পতনের বেরসিক আওয়াজে বাস্তবের দিকে ঘুরে এল সুহাসের দৃষ্টি।

কুড়ুল হাতে কয়েকটা কুলি শুক্‌নো দু'একটা গাছ কেটে ফেলার কাজে লেগে গেছে ইতিমধ্যেই। ঝোপঝাড় অগ্রাহ্য করে তারা চালিয়ে চলেছে ছেদন অস্ত্র।

সুহাস একটু এগিয়ে এল সামনের দিকে। সরু গাছটা কুড়ুলের ঘায়ে থুবড়ে পড়তেই একটা করবী চারা মাথা তুলে দুলে উঠল। কাটার নেশায় একটা কুলি অবহেলার কোপ দিয়ে শেষ করে দিল একটা করবী চারার শিশুত্বকে।

সময়মত করবী চারাটাকে বাঁচাতে গিয়েও থেমে গেল সুহাস। সবুজ পাড় শাড়ীর পাকে পাকে মনীষা একবার পাক্ খেয়ে উঠতে গেল সুহাসের স্মৃতির দৃষ্টিপথে। দৃঢ়তার সংযমে অতীতকে সে সরিয়ে দিতে চাইল মন থেকে। অতীতের ভাবালুতার বিলাসে সে ধ্বংস করতে চায়না বর্ত্তমানকে আর নষ্ট করতে চায়না সামনে এগিয়ে চলার বাস্তব পরিকল্পনাকে।

হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিকে অতীতের গর্ভে ফেলে দেবার অভিপ্রায়ে সে রুণুকে নিয়ে কল্পনার সৌধ রচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। রুণুকে সে এখানে আনবে। লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবে তাকে।

পুরো মাসের মাইনে পেয়েই সুহাস সত্যি সত্যিই রুণুকে সঙ্গে করে নিয়ে এল এখানে। গ্রামে সে ঢোকেনি, আগে চিঠিতে জানিয়ে ষ্টেশনে থেকেই নিয়ে এসেছে রুণুকে।

রুণু এসে নিজেও মেতে উঠেছে আর মাতিয়ে তুলেছে ক্ষুদ্র কুটির আর খোলা মাঠের পরিবেশকে।

আগের রুণু আর এখনকার রুণুর মধ্যে তফাৎ অনেক। এই খোলা মাঠটা রুণুর আগের অভাববোধকে অন্ততঃ দূর করতে পেরেছে।

সেই ছেঁড়া শাড়ী পরা ধাড়ী মেয়েটা যেন নতুন প্রাণ-প্রাচুর্য্যের ইসারায় কৈশোরের সাড়া পেয়েছে তার মনে। মানানসই সাজের অভিনবত্বে দাদার মনে উথলে ওঠে স্নেহের করুণা।

সুহাস আনন্দ পায় আর একজনের আনন্দে। আদরের ছোট বোন রুণু। কত দুঃখ কষ্টের মধ্যে পড়ে কত যাতনাকে নীরবে মেনে নিয়ে এতদিন চাপা মনটাকে গ্রামের বাড়ীতে সে অনাদরে ফেলে রেখেছিল প্রসারিত হবার সুযোগ না পাওয়া আবর্জনার মধ্যে। রুণুকে ঠিক চেনা যেতো না, যদি রুণু গ্রাম ছেড়ে না চলে আসতো।

রুণুর আসায় আর একটা অভাব দেখা দিল মাঠের

জীবনে। 'ওয়াইফ-ইন্-ল' কে চলে যেতে হল কুলি লাইনে পরিশ্রম নিয়ে আবার পূর্ব্ব জীবনে। কুলি লাইনের থেকেই সে এসেছিল 'কুকিং' লাইনে। কিন্তু রুণু আসাতে আর তার গ্রাম্য রান্নাশিক্ষার মশলার ভাগে সকলেই 'ডাইলিউটেড' হয়ে শেষ পর্য্যন্ত 'ওয়াইফ-ইন্-ল'কে আবার মাঠে 'ইন করিয়ে দিল।

ফাঁকি দেবার অভাবটা মাঠের ওপর দাঁড়িয়েই 'ওয়াইফ ইন্-ল' অনুভব করতে লাগল অধিক মাত্রায়।

সুহাস আর অমিয়বাবুর অভাববোধ দূর হওয়ায় তারা অধিক মাত্রায় আনন্দিত।

প্রাণচঞ্চলা কিশোরী আপন বেগেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। তাপসীর সংসারের পরিবেশটাকে রুণু যেন কিসের কৌশলে ধরে এনেছে মাঠের এই কুটিরের স্নিগ্ধ ছায়ায়। তাপসীর সুখের বর্ণনা শুনে সুহাস ভেবেছিল সংসারের এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত সুখটা দুর্লভ, ওটাকে কেনা যায় না, ওটাকে পাওয়া যায় না। ওটা বিধাতার বিশেষ আশীর্বাদে অমৃত ধারার মত যেন ঝরে পড়ে সৌভাগ্যের উন্নত শিখরে। সেই সৌভাগ্যের সুখানুভূতির আমন্ত্রণ বার্ত্তা রুণু এসে পৌছে দিল সুহাসের বন্ধ হয়ে থাকা মনের দুয়ারে। আজ রুণুর প্রাণখোলা আনন্দের পাশে থেকে সুহাস নিজেকে সুখী বলে দাবী করার শক্তি খুঁজে পেয়েছে যেন।

সুহাস তার অমিয়বাবুর খাওয়াদাওয়া ও পরিচর্য্যার ভার রুণু আপন হাতেই তুলে নিয়েছিল। এই কাজটুকু ছাড়া আর বিশেষ কিছুই করার ছিল না তার সারাদিনের মধ্যে। মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ানো দু'টো জীবের সাহচর্য পেতো সে অল্প সময়ের জন্যে। পরের দিন সকালের কাজের তাড়া খাওয়া ইত্যাদি মনের দাদা জীবটিকে সে মাঝে মাঝে রাত্রে খাওয়ার পর সঙ্গী হিসাবে পেতো কাছে অল্প সময়ের জন্য। সেই সময় রুণু সারাদিনের চিন্তার দাবীগুলোকে তুলে ধরত দাদার কাছে।

সুহাস ঝিমিয়ে-পড়া মনে আধবোজা অলস দৃষ্টিতে সেগুলো বোনের কাছ থেকে শুনে চলে যেতো পাশের ঘরে অমিয়বাবুর সঙ্গে বিছানার কোলে আশ্রয় নিতে।

ছুটির দিনে রুণুকে কাছে নিয়ে বসতো সুহাস। দু'জনেই মেতে উঠতো রঙিন কল্পনায়।

রুণুর কোলকাতা সহর দেখতে চাওয়ার দাবীটা অস্বাভাবিক নয়। দাদার কাছ থেকে কত কথা সে শুনেছে কোলকাতা সম্বন্ধে। বিশেষ করে তাপসীর গল্প আকৃষ্ট করেছে তার মনকে। কোলকাতার অনেক জিনিস সম্বন্ধেও সে কৌতূহলী।

মাঠের মধ্যে একাকিত্ব থেকে ধীরে ধীরে একটা অভাবও গড়ে উঠেছে তার মনে। সারাদিনের সঙ্গীর অভাব। মনের মত কাজের অভাব।

সুহাস ভেবেছিল বোনকে সে কোন কাজ করতে দেবেনা। এখানে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবে তাকে, আর কিছু কিছু টাকা পাঠিয়ে কাকীমাকে সাহায্য করবে। তারপর একটু স্বচ্ছলতা এলেই কাকীমা আর ঝুনু বুলুকে নিয়ে আসবে তার কাছে।

কিন্তু এই মাঠের মধ্যে রুণুর লেখাপড়ার তেমন কোন ব্যবস্থা করে ওঠা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। রোজগারের পরিমাণের মধ্যে কাকীমাকেও তেমন সাহায্য করা সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে কাকীমা খান দুই চিঠি পাঠিয়েছেন। তাতে রুণুকে দিয়ে রোজগারের কথাই উল্লেখ করেছিলেন বিশেষভাবে। রুণুও উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল চাকরী করার জন্যে।

কুমুদবাবুর অনুমতি নিয়ে সুহাস রুণুকে এনেছিল তার কাছে। কুমুদবাবু রুণুকে দেখতেও চেয়েছিলেন অনেকবার। তাঁকে বললে হয়ত রুণুর একটা কাজ হয়েও যেতে পারতো। কোন কাজ না জেনেও হয়ত রুণু বেশ কিছু মাস মাইনে আনতো সঙ্গে নিয়ে। কিন্তু সুহাস এদের ব্যাপার যা জেনেছে তাতে ওখানে নিজের বোনকে তুলে দিতে পারবেনা রোজগারের আশায়।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে সুহাস চিন্তা করে রুণুর কথা। রুণুকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার পথ অনুসন্ধান করতে থাকে সে।

রুণু অবশ্য কিছু বুঝতে দেনা কাউকে। রান্না-বান্না, ঘর সংসার গোছানো নিয়েই সে মত্ত থাকে। দাদাকে, দাদার বন্ধুকে খেতে দেয় সময়মত। দাদাকে কাছে টেনে নিয়ে বসিয়ে গল্প গুজবে ব্যস্ত হবার চেষ্টা করে মাঝে মাঝে। কোন সমস্যা নিয়ে সুহাস আলোচনা তুললে, রুণুই মাঝে মাঝে বলে ওঠে, ওঃ দাদাকে নিয়ে আর পারবার জো নেই। পড়াশুনা, মাকে আনা, সবই

হবে আস্তে আস্তে। এত তাড়াতাড়ি অত ভাবনা কিসের ?

কিন্তু সব কথার ফাঁকে রুণু মাঝে মাঝে মন থেকে এমন সব কল্পনা প্রসূত দাবী করে বসে দাদার কাছে, তাতে সুহাস বোঝে বোনের নিঃসঙ্গ মনটা যেন হাঁপিয়ে উঠছে মাঠের এই শুকনো হাওয়ার ছোঁয়ায়। তাছাড়া দাদার উদয় অস্ত পরিশ্রমের কথা চিন্তা করেই রুণু মাঝে মাঝে চাকরী করার আব্দার তোলে দাদার কাছে। আর কোলকাতা দেখতে চাওয়াটা তার নিতান্তই উৎসুক মনের দাবী বড় ভাইয়ের কাছে।

রুণু যে ভাব নিয়েই চলুক না কেন, সুহাস বোঝে মেয়েটা এক রান্না করার কাজ ছাড়া মনের উৎকর্ষের কোন খোরাকই পায়নি দাদার কাছে এসে।

এক রবিবার সকালে, সুহাস রুণুকে কাছে বসিয়ে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁরে রুণু, ক'মাস ধরে তো খালি ঝিয়ের কাজ করে যাচ্ছিস এখেনে, ভাল লাগছে তোর ?

রুণু বলল, বাড়ীতে ছিলুম দিন রাতের ঝি, এখানে কতকটা 'ঠিকে'র মত ধরতে পারো, খারাপ লাগবে কেন শুনি ?

সুহাস বুঝল, এগুলো রুণুর মনের কথা নয়। নেহাৎই শেখা বথা। কিংবা কাকীমার নির্দেশ অনুযায়ী দাদাকে খুশী রাখার চেষ্টার কথা।

সুহাস রুণুর মনের কথা ধরবার জন্যে সুরু করল, কোলকাতার গল্প।

সঙ্গে সঙ্গে রুণু সব কাজ ফেলে, সব ভুলে মেতে উঠল কোলকাতার গল্পে। ভাবখানা এই যে, এখনই কোলকাতায় যেতে পারলে সে ধন্য হয়ে যায়।

ইতিমধ্যেই সুহাস রুণুর মুখ থেকে কায়দা করে মনীষার ঠিকানাটা জেনেছিল। এবারে গ্রাম থেকে চলে আসার পর মনীষা গিয়েছিল গ্রামের বাড়ীতে। রুণুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় সুহাসের কথা শুনে সে রুণুর কাছে ঠিকানা দিয়ে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছিল যে দাদার সঙ্গে দেখা হলেই সে যেন সুহাসকে তার বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয় দেখা করার জন্যে।

সুহাস আরো জেনেছে, মনীষার অবস্থা এখন খুব ভাল। কোথায় যেন চাকরী করে সে তার জীবনের ধারা পালটে ফেলেছে।

রুণুর কথা চিন্তা করতে করতে সুহাসের মনে অনেক বার মনীষার কথা উঠেছে। রুণুকে যদি সেখানে রাখা যেতো, হয়ত রুণুর লেখাপড়া শেখার একটা ব্যবস্থা হতো। কিন্তু প্রতিবারই অতীতের সঙ্গে বোঝাপড়ায় সুহাস মন থেকে এ প্রসঙ্গকে সরিয়ে দিয়েছিল।

এ রবিবারে কোলকাতার গল্পে রুণু এমনই নেচে উঠল যে সব ভুলে গিয়ে সে বলেই ফেলল, আচ্ছা দাদা, তুমি আমাকে বলেছিলে যে তোকে এমন জায়গায় রাখবো যেখানে তুই রাতদিন খেলবি, গল্প করবি আর পড়া-শুনা করবি ? তুমি কি কোলকাতায় কোন জায়গায় রাখবে ভেবে এ-কথা বলেছিলে ?

একথা শুনে সুহাস মনে মনে একটু হেসে উঠে রুণুর মনোভাব বুঝতে পেরে বলে উঠল, চল রুণু তোকে আজই কোলকাতায় নিয়ে যাবো। সেখানে কিছুদিন তোর মনীষাদির কাছে রেখে দিয়ে তারপর দেখবো কি করানো যায় তোকে দিয়ে।

রুণু কথাটাকে ভাল করে যাচাই করে নেবার জন্যে উৎফুল্ল মনে বলে উঠল, তাহলে কি আজই নিয়ে যাবে ?

সুহাস মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে, রুণু একলাফে উঠে পড়ে তাড়াহুড়া করে সব কাজ সারতে লেগে গেল।

সুহাস উঠে দাঁড়িয়ে বোনের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, তুই তাড়াতাড়ি রান্না করে নে। খাওয়া দাওয়া চুকলেই আমরা বেড়িয়ে পড়বো। আমি ততক্ষণ কুমুদ বাবুর কাছ থেকে কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে আসি।

বলে, সুহাস বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। রুণু দ্বিগুণ উৎসাহে হাজার ক্রটির মধ্যে লেগে গেল কাজ চুকিয়ে ফেলার কাজ করতে।

রুণুকে ব্যস্তভাবে কাজ করতে দেখে অমিয়বাবু বলে উঠলেন, রুণুদির হঠাৎ এই রুহুঝুনু রবে কাজ করার তাড়া পড়ল কিসের ?

রুণু বলল, আজ আমি কোলকাতায় বেড়াতে যাবো।

এ কথা শুনে বিস্মিত হয়ে অমিয়বাবু প্রশ্ন করলেন,

কোলকাতায় বেড়াতে যাবে কার সঙ্গে ?

—দাদার সঙ্গে।

—কই, সুহাসবাবু তো আমাকে কিছু জানালেন না!

—গল্প করতে করতে হঠাৎ ঠিক হল কিনা, তাই দাদা আগে চলে গেলেন কুমুদবাবুর কাছে ছুটি নিয়ে আসতে।

—তা ক'দিনের জন্যে আমাদের এই জঙ্গল ফেলে কোলকাতায় থাকা হবে রুণুদির ?

—কিছুই ঠিক নেই, হয়ত থেকেও যেতে পারি কোলকাতায়।

—আমাদের এখানে কি ভাল লাগছিল না রুণুদির ?

—মোটেই না। আপনাদের রাতদিন এই মাটি-কাটা আর ইট সিমেন্টের হিসেবে হাঁপিয়ে উঠেছিলুম আমি।

দাদাকে তো এ সব কথা বলতে পারতুম না, মনে দুঃখ পাবেন ভেবে। আজ হঠাৎ কথা বলতে বলতে দাদার মুখ থেকেই বেরিয়ে পড়ল, চল তোকে কোলকাতায় নিয়ে যাবো।

অমিয়বাবু বুঝলেন, সুহাসবাবু ছোট বোনের বদ্ধ হয়ে থাকা মনটাকে একটু মুক্তির আলো দেখাতে নিয়ে চলে যাচ্ছেন এখান থেকে।

সামনের সমস্যার কথাগুলো ভেসে উঠল অমিয়বাবুর মনে। রুণু চলে যাবে। আবার' ওয়াইফ ইন্-ল' চলে আসবে কুলি লাইন থেকে 'কুকিং' লাইনে। অমিয়বাবু আগের মতই নির্দিষ্ট সময়ে কাজে যাবে, কাজ থেকে ফিরবে, সময়মত খাওয়া দাওয়া সারবে, ঘুমোবে, আবার চক্রাকারে রুটিন মাফিক মেতে উঠবে কাজে। তবু রুণু থাকবে না ভেবে মনটা তার শূন্যতায় ভরে উঠল। এখনিই তার মনে হল, এ কুটিরের সর্ব অস্তিত্বের মধ্যে রুণু যেন আর নেই। কে যেন এ মাঠের মায়ার আকর্ষণে এসে দু'দিনের খেলা ঘর তৈরী করে নিজের হাতেই তা ভেঙ্গে দিয়ে গেল অপসৃত মাটির ঢিপিগুলির মত।

সুহাস তাড়াতাড়ি ফিরে এসে অমিয়বাবুকে সামনে দেখতে পেয়েই বলে উঠল, দেখুন অমিয়বাবু, আপনাকে এখনও বলা হয়নি, আমি রুণুকে নিয়ে আজই কোলকাতায় চলে যাবো। বেচারা ছেলেমানুষ, এখানে সঙ্গী সাথী না পেয়ে একেবারেই হাঁপিয়ে উঠেছিল। ভাবছি ওখানে কোথাও কিছুদিনের জন্যে ওকে রেখে দিয়ে আসবো, কোলকাতা দেখার সখটা ও যাতে মিটিয়ে নিতে পারে।

অমিয়বাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, অত বড় মেয়েকে অবশ্য পরের বাড়ীতে ফেলে রাখা ঠিকও নয়। তবু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওকে নিয়ে আসবার চেষ্টা করবেন।

সুহাস বলল, মাত্র তিনদিনের ছুটিতে ওকে রেখে আসা ছাড়া কোন উপায়ও নেই। তাছাড়া ওর লেখা-পড়ার দিকটাও চিন্তা করে দেখতে হবে। তারপর আবার ছুটি পেয়ে তবেই না ওর কথা চিন্তা করা।

রান্নার পাঠ চুকে গেছে জানিয়ে স্নান করার জন্যে দু'জনকেই তাড়া দিল রুণু।

খাওয়া দাওয়ার পর্ব শেষ হতে রুণু আর সুহাস দু'জনেই বেরিয়ে পড়ল কোলকাতার উদ্দেশ্যে।

[ক্রমশঃ

———
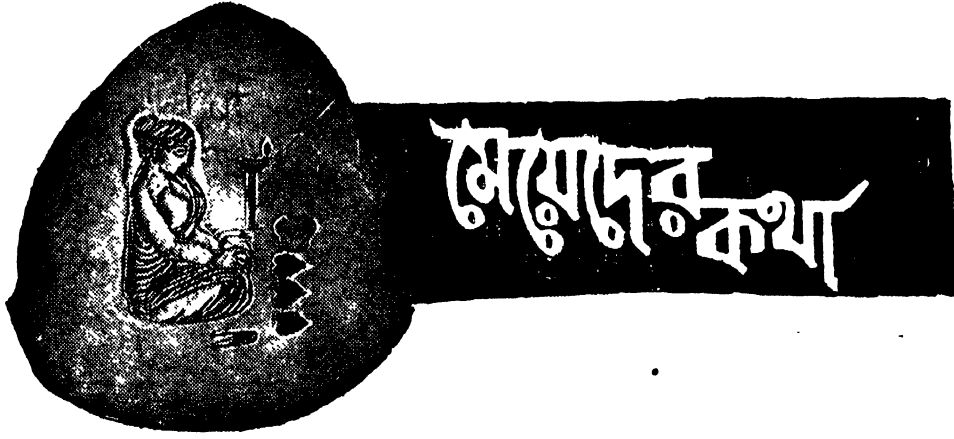
রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী

লীলা বিদ্যান্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কবির একটা মতবাদ এই যে মানুষ যাকে অবজ্ঞা করে পিছে রাখে, সে তাকেও পিছন দিক থেকে পিছে টেনে রাখে, সামনে এগোতে দেয় না। অমঙ্গল, অকল্যাণের মধ্যে যাকে রাখা হয় সে অন্যেরও মঙ্গল ও কল্যাণের পথে অন্তরাল রচনা করে রাখে। মানুষ যাকে অপমান করে একদিন তারই সঙ্গে তাকে সমান অপমান ভাগ করে নিতে হবে কবির এই বাণী। অপমান কবিতায় কবি এ দেশের আভিজাত্যাভিমানী মনুষদের সাবধান করেছেন। ঠিক এই কথাই কবি বলেছেন মেয়ে পুরুষের সম্পর্কের বেলায়। পুরুষ যদি মেয়েকে অপমান করে তাহলে সে নিজেও হীন হয়ে পড়বে।

চিরকুমার সভা নাটকে চন্দ্রবাবুর ভাগ্নি নির্মলা দাবী করেছে যে—তার মামা যে মহৎ ব্রত নিয়েছেন তাতে তাঁর সঙ্গে কাজ করবার অধিকার তার আছে। দেশের মঙ্গল করবার উদ্দেশ্য নিয়ে এই চিরকুমার সভার স্থাপনা। সভার সভ্যরা চির কৌমার্য্য ব্রত পালন করবে এই নিয়ম। নির্মলার দাবী নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে সভায় মেয়ে সভ্য নেওয়া চলবে কিনা। এই প্রসঙ্গে চন্দ্রবাবু বলেছেন—মেয়েদের আমরা আমাদের সমস্ত মহৎ প্রচেষ্টা থেকে দূরে রেখেছি বলে আমরা নিজেদের জীবনকে ঘরেবাইরেখণ্ডিত করেছি। এই জন্যেই আজ বাইরে গিয়ে যা বলি. ঘরে এসে তা ভুলে যাই, আমাদের বাইরে লজ্জা আছে কিন্তু ঘরে লজ্জা নেই। মেয়েরা যদি আমাদের মহৎ ব্রতের সঙ্গে যুক্ত থাকে তা হলে আমরা ঘরে এসেও নিজেদের আদর্শকেও খর্ব্ব করতে লজ্জা পাব। এই জন্য পুরুষের নিজের আদর্শকে উচ্চে রাখবার প্রয়োজনে নারীকে তার সমস্ত মহৎ প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত রাখতে হবে। মহৎ প্রচেষ্টা থেকে নারীকে দূরে রেখে কোন মহৎ কাজই সিদ্ধ হতে পারবে না। এ রকম করতে যাওয়া ঠিক যেন এক পায়ে চলতে চেষ্টা করা। তাতে খানিক দূর গিয়েই বসে পড়তে হয়। এই জন্যই আমাদের দেশের কোন মহৎ কাজ সুসম্পন্ন হয় না, অর্দ্ধেক পথেই তার অকাল সমাপ্তি ঘটে।

এই প্রসঙ্গে রসিক খুড়ো বলেছেন, মেয়েদের সম্বন্ধে আমার যেটুকু জ্ঞান তাতে এই বলতে পারি যে, হয় তারা কাজের সহায় হয়, নয় তারা বাধা দেয়। হয় সৃষ্টি, নয় প্রলয় এই হল নারীর প্রকৃতি। নারীকে সৎ কাজ থেকে দূরে রেখে অবহেলা করলে তার বাধা দেবার প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। সে তখন পুরুষকে প্রতি পদে বাধা দিতে থাকে। তাই মেয়েদের দলে টেনে নিলে যদি সাহায্য

বেশী না-ও পাওয়া যায় তবু বাধার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। কবি নারীর মনস্তত্ত্ব ভাল করে জানতেন। যেখানে সে পুরুষের সহকর্মিণী নয়, সেখানে সে তার পথের বাধা। চিরকুমার সভায় নির্মলার মধ্যে কবি দেখাতে চেয়েছেন যে মহৎ সামাজিক কাজে নারীর অধিকার ও কর্তব্য আছে। কিন্তু কবির মতে মেয়ে আর পুরুষের কাজ একই রকম হতে হবে তা নয়। এই জন্যেই স্ত্রী সভ্য নেওয়া নিয়ে শ্রীশের আপত্তির উত্তরে বিপিন বলছে—আমাদের ব্রত উদার, আমরা দেশের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল করতে চাই। আমাদের উদ্দেশ্য সঙ্কীর্ণ নয়। তাই এতে বিচিত্র প্রকৃতির বিচিত্র লোকের সাহায্যের দরকার হবে। দেশের কাজ একজন পুরুষ যেমন করে পারবে একজন নারী সে রকম করে পারবে না। তাই এ কাজে স্ত্রী আর পুরুষ দুজনকেই নিতে হবে। একজনকে নিলে আর একজনকে বর্জন করতে হবে, এমন কোন কথাই ওঠে না।

মেয়েরা কী ধরণের কাজ করতে পারে, তার একটা আভাসও কবি নির্মলার চরিত্রের দিয়েছেন। নির্মলা লোকদের অন্তঃপুরে গিয়ে মেয়েদের প্রাথমিক চিকিৎসার সম্বন্ধে শিক্ষা দেবে, এই জন্যে সে ডাক্তারের কাছে প্রাথমিক চিকিৎসা শিখে নেবে– চন্দ্রবাবুর এই প্রস্তাব। অবলাকান্ত নাম নিয়ে সভায় যোগ দিয়েছে শৈল। সেও চন্দ্রবাবুর কাজে অনেক সাহায্য করছে। কৃষি সম্বন্ধে যত সরকারী রিপোর্ট এই পর্য্যন্ত বেরিয়েছে তাতে জমিতে সার দেওয়া সম্বন্ধে একটি পুস্তিকা সংকলন করবার ভার চন্দ্রবাবু তাকে দিয়েছেন। পুরুষ সভ্যরা যখন আলস্য বশতঃ নিজের নিজের কাজ আরম্ভ পর্য্যন্ত করেনি, শৈল সেখানে অনেকখানি কাজ অগ্রসর করে দিয়েছে। ব্রতের প্রতি নিষ্ঠা মেয়েদের একটা স্বভাব। এই নিষ্ঠাকে যদি দেশের মঙ্গলের প্রতি নিয়োজিত করা যায় তাহলে মেয়েদের কাছে দেশ অনেক আশা করতে পারে কবি এ কথাই বলতে চান। মেয়েদের নিষ্ঠা পুরুষের চেয়ে বেশী। তার মন কম বিক্ষিপ্ত। মেয়েরা কাজে বেশী মনোযোগ দিতে পারে। শৈলর চরিত্র দিয়ে কবি এটা দেখিয়েছেন।

[illegible] আনন্দমঠে এই কথাই বলেছেন যে দেশের কাজে, মহৎ কাজে নারীর সহযোগিতা, তার বিভিন্ন প্রকৃতি, তার বিভিন্ন শিক্ষা—তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিভিন্নতার হিসাবে বিভিন্ন হবে।

শান্তি ছোটবেলা থেকে পুরুষের সঙ্গে মানুষ। সে অস্ত্রচালনা, ঘোড়ায় চড়া ইত্যাদি পুরুষের বিদ্যা শিখেছে। পুরুষোচিত ব্যায়াম করে তার শরীর শক্তিশালী ও কষ্ট-সহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। শান্তি এসে জীবানন্দের সঙ্গে বিপ্লব আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। সে যে মেয়েমানুষ তা কেউ জানে না। সে গাছে চড়ে, সে ঘোড়া ছুটিয়ে যায়, বিপ্লবের সমস্ত কাজে তার যোগ আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তার মন থেকে নারীসুলভ কোমলতা, মমতা দূর হয়ে যায়নি। সে কখনো হত্যা করেনি। তাই নির্জন বনের মধ্যে সাহেবকে দেখে শান্তি তার বন্দুক কেড়ে নিল, কিন্তু কিছু না করেই সে আবার বন্দুক ফিরিয়ে দিল।

জীবানন্দের মৃতদেহ খুঁজতে গিয়ে শান্তি সাধারণ মেয়েদের মতই কেঁদেই আকুল হ'ল। বাইরে পুরুষোচিত কাজ করেও তার নারীপ্রকৃতির কোন ক্ষতি হয়নি।

অন্যদিকে কল্যাণীও এই বিপ্লব আন্দোলনকে সমর্থন করেছে। এতে তারও সহযোগিতা আছে। কিন্তু সে তার নিজের প্রকৃতি ও শিক্ষা হিসাবে শান্তির থেকে আলাদা। সে গৃহস্থের কুলবধূ, বাইরের সংসার তার কাছে অপরিচিত। সে গৃহধর্ম জানে কিন্তু বীরধর্মে পুরুষের পার্শ্বচারিণী হতে সে অক্ষম। তাই সে মহেন্দ্রকে বিপ্লব আন্দোলনে যোগ দেবার অনুরোধ কোরে নিজে তার পথ থেকে সরে দাঁড়াতে চায়। আত্ম বিসর্জন করে সে মহেন্দ্রকে মুক্তি দিতে চায়। সে বলে—মেয়েমানুষ কাদা পোড়া কলসী, কাদা পোড়া কলসী নিয়ে কি কেউ সাঁতার কাটতে পারে? মেয়েমানুষের সঙ্গ পুরুষের বীর্য্যকে খর্ব করে, এই তার ধারণা।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে নারীই হল পুরুষের কাজের প্রেরণার মূল উৎস। নারীকে যদি পুরুষ তার কর্মক্ষেত্রে আহ্বান করে নেয়, তাতে তার কাজের বিঘ্ন হবে না, তার কাজের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হবে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে নারীর কাজ পুরুষের অনুরূপ নয়। নারীর প্রকৃতির বিশেষত্ব হিসেবে তার কাজ

পুরুষের থেকে আলাদা। এই জন্যেই নির্মলার বা শৈলর কার্যাসূচির মধ্যে পুরুষোচিত কোন কাজের উল্লেখ নেই। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ শান্তিকে মেয়েদের আদর্শ বলে মানতে রাজী নন। আবার কল্যাণীও তাঁর আদর্শ নয়। মেয়েরা পুরুষের মহৎ ব্রতে যোগ দেবে কিন্তু তাই বলে সে পুরুষ মানুষ হয়ে উঠবে না। মেয়েমানুষ তার সহজ কোমলতা সহজ শোভা থেকে বঞ্চিত হোক, সৌন্দর্য্যের পূজারী নারীর রূপে মুগ্ধ কবি এটা চাননি। বঙ্কিম চন্দ্রের মত রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় শান্তিকে পুরুষ বেশ পরাতে পারতেন না। আজকাল যে মেয়েরা পুরুষের মত পোষাক পরে ন্যাশনাল কেডেট কোরে যোগ দিয়ে কুচকাওয়াজ করছে আমার তো মনে হয় রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে এর প্রতিবাদ করতেন।

মেয়েপুরুষ একাকার হয়ে গেলে তাতে যে সমাজের কোন কল্যাণ হবে কবি এ কথা বিশ্বাস করতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে দুটো এক্সট্রিম বা বিপরীত প্রান্তসীমা দেখেছেন, সেখানে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন একটা স্বভাবের সঙ্গে সুসঙ্গত সহজ সামঞ্জস্য। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে হয় শান্তি নয় কল্যাণী, হয় একেবারে ঘোড়সওয়ার নয় ধর্ম-গ্রন্থ নিয়ে একেবারে গৃহকোণ নিবাসিনী। কিন্তু রবীন্দনাথের নির্মলা বা শৈলবালা শান্তিও নয় কল্যাণীও নয়। তারা পুরুষের সমধর্মী না হলেও সহকর্মী। বঙ্কিম-চন্দ্র দেবী চৌধুরানীতে প্রফুল্লর চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গেও এই রকম দুই বিপরীত প্রান্তসীমা দেখিয়েছেন। প্রফুল্লকে শিক্ষা দেবার জন্তে ভবানী পাঠক যে শিক্ষা-প্রণালী অবলম্বন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের চোখে নিশ্চয় অনেক যায়গায় তা বীভৎস বলে মনে হত। প্রফুল্ল মাথা নেড়া করে, পুরুষদের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করত। আবার অব-শেষে বঙ্কিমচন্দ্র দেখালেন যে যেদিন স্বামীর কাছ থেকে আহ্বান এল সেদিন প্রফুল্ল তার রানীগিরি ত্যাগ করে স্বামীর ঘরে ফিরে গেল। সেখানে গিয়ে সে খিড়কীপুকুরে একগলা ঘোমটা দিয়ে বাসন মাজতে বসল। যখন সাগর তাকে প্রশ্ন করল যে রানীগিরি ছেড়ে তার কি আর এ সব ভাল লাগবে, তখন সে বলল, এটাই যে মেয়েমানুষের ধর্ম। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন যে প্রফুল্ল তার বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে স্বামীকে গুরুতর বিষয়-কর্ম্মে সাহায্য করে, কিন্তু তার বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় একমাত্র স্বামী ছাড়া অন্য সবার কাছে গোপন থেকে গেল। মেয়েমানুষ হয়, একেবারে ডাকাত-দলের অধিনায়িকা, নয় তো খিড়কিপুকুরে বাসন মাজায় রত একগলা ঘোমটা টানা কুলবধূ। রবীন্দ্রনাথ হলে বলতেন এ দু'য়ের মধ্যে কোনটাই আদর্শ নয়। মেয়েমানুষ তার গৃহধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকেই সমাজ ধর্ম পালন করবে। সংসারের কর্ত্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে মহত্তর সামাজিক কর্ত্তব্যে তার সহযোগ থাকবে, কবির এই মত।

শান্তির চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন যে শান্তি জীবানন্দের সহচারিণী থেকেও ব্রহ্মচারিণী ছিলেন। কঠিন ব্রত সাধনের জন্য ব্রহ্মচর্য্য দরকার, এ রকম একটা মতবাদ শুধু আমাদের দেশে নয় সম্ভবতঃ সব দেশেই আছে। দেশ সেবার ব্রতে পুরুষ মানুষ অবিবাহিত থেকে কাজ করবে এই ধারণাকে সমালোচনা করেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চিরকুমার সভা' লিখেছেন। "চিরকুমার সভা' পড়লে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় ও একটা হাল্কা চপল লঘু প্রেমের কাহিনী, কিন্তু আসলে ওর বিষয় বস্তু হাল্কাও নয়, চপল প্রেমও নয়। দেশের সেবা যারা করবে তারা কি চিরকুমার থাকবে, নারী কি তাদের জীবনে কোন ঠাঁই পাবে না, এই প্রশ্ন নিয়েই কবির এই নাটক। নারীর সহযোগিতার মূল্য, তার দরকার, নারীর অসহযোগের বিঘ্ন থেকে ব্রতকে বাঁচিয়ে রাখা, এ সব কথা ছাড়াও কবি আরো বলেছেন যে প্রয়োজনের দিক ছাড়াও নারীর অন্য মূল্য আছে। সে হ'ল প্রয়োজনাতীত আনন্দ। নারীর সাহচর্য্যে, পুরুষ যে আনন্দ পায়, জীবনে তার মূল্য তুচ্ছ নয়। কোন্ স্বর্গের লোভে মানুষ নিজেকে এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত করবে? চিরকুমার সভার পূর্ণ বলছে—মুসলমানদের স্বর্গে হুরী আছে, হিন্দুদের স্বর্গে অপ্সরী আছে, চিরকুমার সভার স্বর্গে কি আছে? সে বলছে—কত পুণ্যে এই দুর্লভ মানব জন্ম পেয়েছি, আর কখনো পাবো কি না জানি না, যদি এই জীবনে হৃদয়কে তার পিপাসার জল থেকে বঞ্চিত করি, তবে অন্য কোথাও অন্য কিছু পাবো কি?

প্রয়োজনাতীত আনন্দের জন্যেই নারীকে পুরুষের দরকার।

পূর্ণ যখন নির্মলাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব জানিয়ে

চন্দ্রবাবুকে চিঠি লিখেছে, তখন সে লিখছে,—সভা থেকে যখন ঘরে ফিরে আসি তখন নিজকে নিঃসঙ্গ একাকী বলে বোধ হয়। কর্মের উদ্যম যেন আশ্রয়হীন লতার মত ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। নারী পুরুষের বল হরণ করে না, তাকে বল দান করে, তার উদ্যমকে সঞ্জীবিত কোরে তোলে কবির এই মত। নারীসঙ্গে বঞ্চিত পুরুষ তার কর্মে আনন্দ পায় না, এই জন্যে তার কর্মের উদ্যম চলে যায়। আনন্দিত প্রাণ নিয়েই মানুষ বেশী কাজ করতে পারে। নিঃসঙ্গ অবসন্ন প্রাণে কাজ করা যায় না। তাই 'চিরকুমার সভা'র অন্তে দেখি সব কুমারদেরই একটি করে কুমারীর সঙ্গে মিলন ঘটেছে। কবি লিখেছেন, গৃহস্থকে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা দেবার চেয়ে গৃহধর্মের আদর্শকে উন্নত করে তুললেই দেশের পক্ষে বেশী মঙ্গল হবে, তা'তে দেশহিত ব্রতে রত যে সভা, তার সভ্য সংখ্যাও বাড়বে এবং সভ্যদের কাজের ক্ষমতাও বাড়বে।

নারীর আনন্দময় রূপের কাছে পুরুষ কেমন করে হার মানে, তার সামনে প্রতিবাদের ভাষা ভুলে যায়, তার একটি সুন্দর ছবি কবি এঁকেছেন "চিরকুমার সভা"র একটি দৃশ্যে—সভায় তর্ক চলছে মেয়ে সভ্য নেওয়া হবে কি না, তার মাঝখানে এসে দাঁড়াল নির্মলা। কবি লিখেছেন —পুরুষের মাথায় অনেক সুযুক্তি থাকতে পারে কিন্তু সে গূঢ় অশ্রু করুণ ললিতকণ্ঠ ভাবের আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসে, সে সুকুমার কপোল দেখতে দেখতে আরক্তিম হয়ে ওঠে, সে আরক্ত অধর কথা বলতে গিয়ে শুধুই স্ফুরিত হতে থাকে তার সামনে দাঁড় করাতে পারে বেচারা পুরুষের হাতে এমন কি আছে? এই ভাবাবেগ, এই অশ্রু-করুণ কোমল কাতরতা এতে যে অভাবনীয় সৌন্দর্য্য দেখা দেয় তার সামনে পুরুষের সমস্ত যুক্তি যেন ভেসে যায় এই শোভা দেখতে দেখতে সে মুগ্ধ হয়, তর্ক করবার শক্তি আর তার থাকে না। সৌন্দর্য্যের সামনে সুযুক্তিকে হার মানতে হয়। সৌন্দর্য্যই যে সমস্ত যুক্তির চেয়ে বড় যুক্তি।

[ক্রমশঃ

রূপচর্চ্চা

সুপর্ণা দেবী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গত সংখ্যায় যেমন বলেছি, সেই প্রসঙ্গেরই জের টেনে মেয়েদের পেটের গড়ন-সৌষ্ঠব যাতে ভাল থাকে, তলপেটে অযথা মেদ-বাহুল্যের ফলে, কুশ্রী-কদর্য্য না হয়, পাকস্থলীর সুস্থতা আর দেহের সুঠাম-ছাঁদ দীর্ঘস্থায়ী করে তোলার উপযোগী বিশেষ ধরণের কয়েকটি সহজ-সরল ঘরোয়া ব্যায়াম-বিধির মোটামুটি হদিশ দিচ্ছি। নিত্য-নিয়মিতভাবে এসব ব্যায়াম-ভঙ্গী অনুশীলনে দৈহিক গঠন-লালিত্য মনোরম এবং পাকস্থলী সুস্থ-স্বাভাবিক থাকবে সুদীর্ঘকাল। তাছাড়া অকাল বার্দ্ধক্যের সম্ভাবনাও কম হবে।

পাকস্থলীর ও তলপেটের সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখার উপযোগী ব্যায়াম-বিধির প্রথম রীতিটি হলো—সমমেঝে কিম্বা মজবুত পালঙ্ক-তক্তাপোষের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে একত্রে জোড়া গেঁথে দুই পা উর্দ্ধে তুলুন—সিধাভাবে। তারপর দুই পা জোড়া গাঁথা ভাবে কিছুক্ষণ শূন্যে ঘোরান—চক্রাকারে। এমনিভাবে, অন্ততঃপক্ষে দশ-বারোবার, চক্রাকারে শূন্যে পা দুটিকে ঘোরানোর পর, উর্দ্ধপানেই সিধা-খাড়া রেখে ধীরে ধীরে দুই পা ফাঁক এবং পরক্ষণেই আবার দুটি পা একত্র সংলগ্ন করুন। এই হলো—প্রথম ব্যায়াম-ভঙ্গীটির রীতি। উল্লিখিত রীতি-অনুসারে এ ব্যায়াম ভঙ্গীটি নিয়মিতভাবে প্রত্যহ দশ-পনেরোবার অভ্যাস করা চাই।

দ্বিতীয় ব্যায়াম-ভঙ্গীর রীতি হলো—ঘরের সমতল-মেঝের উপর সিধাভাবে দাঁড়ান এবং কনুইয়ের অংশ ঈষৎ-মুড়ে হাত দুটিকে উর্দ্ধে তুলে মাথার পিছনে সংলগ্ন রাখুন।

তারপর ধীরে ধীরে নিশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দেহখানি—অর্থাৎ কোমরের কাছ হইতে বক্ষদেশ পর্য্যন্ত দেহাংশটুকু মাত্র একবার বাঁ-দিকে এবং পরক্ষণে ডান-দিকে মৃদু-ছন্দে অন্ততঃপক্ষে বিশ-বাইশবার ক্রমান্বয়ে বাঁকাতে থাকুন। তবে খেয়াল রাখবেন—এ ব্যায়াম-ভঙ্গীটি অনুশীলনের সময় কোমর থেকে পা পর্যন্ত শরীরের অংশ যেন সিধা-সটান ও সুদৃঢ় থাকে বরাবর। পাকস্থলীর সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থা বজায় ও তলপেটের গঠন সুঠাম-সুন্দর রাখার জন্য, এ ব্যায়াম-ভঙ্গীটিও নিত্য-নিয়মিতভাবে অনুশীলন করা একান্ত আবশ্যক।

তৃতীয় ব্যায়াম-ভঙ্গীটি অনুশীলনের রীতি হলো—সমতল মেঝে কিম্বা শক্ত-মজবুত খাট-তক্তাপোষের উপর দেহটি সিধা-সটান রেখে শুয়ে দুই পা এবং দুই হাত জোড়-গাঁথাভাবে উর্দ্ধে শূন্যপানে তুলবেন। তারপর ধীরে ধীরে নিশ্বাস-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দুই হাতের আঙুলের ডগা দিয়ে দুই পায়ের আঙুলের ডগা স্পর্শ করবেন। পরক্ষণেই আবার হাত ও পা পূর্বাবস্থায় সরিয়ে নেবেন। এবং ক্ষণেক স্থির থেকেই পুনরায় আগের বারের মতো ভঙ্গীতেই দুই হাতের আঙুলের ডগা দিয়ে দুই পায়ের আঙুলের ডগা স্পর্শ করবেন। এ ব্যায়াম-ভঙ্গীটিও প্রত্যহ নিয়মিতভাবে অন্ততঃপক্ষে দশ-পনেরোবার অভ্যাস করা চাই।

পাকস্থলীর সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখা এবং তলপেটে মেদ-সঞ্চয়ের সম্ভাবনা রহিত করার উপযোগী তিনটি বিশেষ-ধরণের ব্যায়াম-বিধির মোটামুটি হদিশ আপাততঃ দেওয়া হলো। দৈহিক স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ-অটুট এবং দীর্ঘস্থায়ী রাখার জন্ত আলোচ্য এই তিনটি রীতি নিত্য-নিয়মিত অভ্যাস-অনুশীলন করলেই যথেষ্ট উপকার হবে।

আগামী সংখ্যায় দেহের অপরাপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ-সুন্দর রাখার উপযোগী আরো কয়েকটি বিশেষ-ধরণের ব্যায়াম-রীতি অনুশীলনের মোটামুটি হদিশ দেবার বাসনা রইলো।

———

সূচীশিল্পের নক্সা-নমুনা

নিরুপমা দেবী

সূচীশিল্পানুরাগিনীদের সুবিধার্থে গত সংখ্যায় 'বটনহোল ষ্টিচ্'(Buttonhole-Stitch), 'ব্যাক্-ষ্টিচ্'(Back Stitch) এবং 'ফিশ্‌বোন-ষ্টিচ্' সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে রঙীন সুতোর সাহায্যে 'এমব্রয়ডারী' (Embroidery) আর রঙ বেরঙের কাপড়ের টুকরো দিয়ে 'এ্যাপলিক্' (Applique) কাজের উপযোগী সৌখীন-ছাঁদের ফুল-পাতার যে নক্সা-নমুনার (Pattern-Design) হদিশ দিয়েছি, এবারেও তেমনি ধরণের আরেকটি 'আলঙ্কারিক-চিত্র'(Decorative-motif) প্রকাশ করা হলো। তবে সূচীশিল্পের কাজ করে এবারের নক্সা-নমুনাটিকে নিখুঁত-পরিপাটি ছাঁদে রূপদান করতে যে তিনটি বিশেষ ধরণের সেলাইয়ের ফোঁড় তোলার পদ্ধতি অনুসরণের প্রয়োজন, সেগুলির নাম হলো 'স্যাটিন্ ষ্টিচ্' (Satin-Stitch), 'ষ্টেম-ষ্টিচ্' (Stem-Stitch) আর 'ক্রেটান-ষ্টিচ্' (Cretan-Stitch)। বিশেষ ধরণের এই তিনটি সূচীশিল্প-পদ্ধতি সম্বন্ধে বিস্তারিত-আলোচনা ইতি-পূর্ব্বেই বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে এবং এই বিভাগের নিয়মিত পাঠিকার অনেকেই সম্ভবতঃ ইতিমধ্যে সবিশেষ অভিজ্ঞতা ও সঞ্চয় করেছেন। কাজেই এ সম্বন্ধে পুনরালোচনা আপাততঃ নিষ্প্রয়োজন বলেই মনে হয়। নীচের ছবিতে 'ফল ও পাতার' (Leaf and Berry Spray) যে 'আলঙ্কারিক' (Decorative) নক্সা-নমুনাটি (Pattern-Design) দেওয়া হয়েছে, সেটি দেখলেই এই সব সূচীশিল্পানুরাগিনীদের কাজের পদ্ধতিটুকু বুঝে নিতে অসুবিধা ঘটবে না।

বলা বাহুল্য গতবারের মতোই এবারের এই সহজ সরল ছাঁদের 'ফল-পাতার' নক্সা-নমুনাটিও সৌখিন-সুন্দর 'ট্রে-ক্লথ'
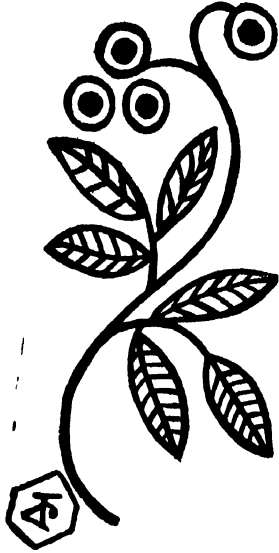
(Tray-Cloth), 'টি-ন্যাপ্‌কিন' (Tea-Napkin), 'টি-কোজি' (Tea-Cojy), 'টেবিল-ম্যাট' (Tab.e-mat), কুশন-কভার' (Cushion-cover), বালিশের ওয়াড়, কাঁথা, ছেলেমেয়েদের 'বিব্‌' (Bib), 'রম্পার' (Romper Suit), 'ফ্রক' (Frocks), প্রভৃতি নানা ধরণের সূচীশিল্প-সামগ্রী অলঙ্করণের কাজে অনায়াসেই ব্যবহার করা যেতে পারবে। এমন কি, মেয়েদের হাত-ব্যাগ (Ladies Vanity Bag), 'ষ্টোল্' (Stole), 'স্কার্ফ' (Scarf), ঘরের দরজা-জানালার সৌখিন-পর্দ্দা প্রভৃতি আরো নানান্ সামগ্রী অলঙ্কৃত করার পক্ষেও বিশেষ উপযোগী হবে।

সেলাইয়ের কাজের জন্য বাছাই-করা কাপড়ের উপর 'ফল-পাতার' এই নক্সা-নমুনাটিকে নিখুঁত-পরিপাটি ছাঁদে রূপদান করতে হলে, ইতিপূর্ব্বে গত সংখ্যায় যেমন হদিশ দিয়েছি, সেই পদ্ধতি মেনে চলবেন। অর্থাৎ প্রথমেই কাপড়ের উপর 'নক্সাটি' 'Tracing' বা 'নকল করে নেবেন। তারপর সূচীশিল্পানুরাগিণীর পছন্দমতো বিভিন্ন রঙের 'রেশমী' (Silk) বা 'পশমী' (Woolen) সুতোর সাহায্যে 'এমব্রয়ডারী' Embroidery) অথবা নক্সা-অনুযায়ী ফল-পাতার আকারে নানা ধরণের রঙীন-কাপড়ের টুকরো ছাঁটাই করে নিয়ে 'এ্যাপলিক্' (Applique) পদ্ধতিতে সেলাইয়ের কাজ সুরু করবেন।

ছুঁচ-সুতোর সাহায্যে সেলাইয়ের সময়—নীচের 'খ' চিহ্নিত ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনিভাবে 'স্যাটিন ষ্টিচ' রীতিতে রচনা করবেন—নক্সার অঙ্কিত ফলগুলি। ফল-পাতার আশেপাশের ডালপালাগুলিকে রূপদানের জন্য 'ষ্টেম্-ষ্টিচ' পদ্ধতিতে সেলাইয়ের কাজ করবেন এবং ক্রেটান ষ্টিচ' সূচীশিল্প-রীতিতে ছুঁচ-সুতোর ফোঁড় তুলে বানাবেন গাছের প্রত্যেকটি পাতা।

এ সব সেলায়ের ফোঁড় কিভাবে তুলবেন, উপরের ছবিটি লক্ষ্য করে দেখলেই, তার সুস্পষ্ট হদিশ মিলবে। প্রসঙ্গক্রমে, আরো একটি দরকারী কথা বলে রাখি। সেলাইয়ের কাজের সময় সর্ব্বদা খেয়াল রাখবেন—কাপড় আর বিভিন্ন ধরণের সুতোর রঙ যেন যথাসম্ভব মানানসই ও সুন্দর হয়।

আপাততঃ এই পর্য্যন্তই···বারান্তরে সূচীশিল্পের উপযোগী এমনি ধরণের আরো কয়েকটি সহজ-সরল নতুন নক্সা-নমুনার হদিশ দেবার বাসনা রইলো।

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীতম্ মহাভারতম্ শান্তিপর্ব

বঙ্গানুবাদ : স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ভীষ্ম উবাচ

নিয়তস্ত্বং নরব্যাঘ্র শৃণু সর্বমশেষতঃ।

যথা রাজ্যং সমুৎপন্নমাদৌ কৃতযুগেঽভবৎ ॥১৩

ভীষ্মদেব বললেন—হে পুরুষব্যাঘ্র, শ্রবণ কর, কিভাবে আদিতে সত্যযুগে রাজা, আর রাজ্যের উৎপত্তি হল সমস্ত বৃত্তান্ত তুমি একাগ্র হয়ে শোন।

ন বৈ রাজ্যং ন রাজাসীন্ন চ দণ্ডো ন দাণ্ডিকঃ।

ধর্মেণৈব প্রজাঃ সর্বা রক্ষন্তি স্ম পরস্পরম্ ॥১৪

প্রথমে কোন রাজ্য ছিল না, রাজা ছিল না দণ্ড ছিল না দাণ্ডিক ছিল না। প্রজারা ধর্মের দ্বারাই একে অন্যকে রক্ষা করত।

পাল্যমানাস্তথান্যোন্যং নরা ধর্মেণ ভারত।

খেদং পরমুপাজগ্মুস্ততস্তান্ মোহ আবিশৎ ॥১৫

হে ভারত! সব মানুষ ধর্মের দ্বারা পরস্পর পালিত ও পোষিত হত। কিছুকাল পরে লোকেরা পরস্পর সংরক্ষণ কাজে বড় কষ্ট অনুভব করল,—তাদের সকলের উপর মোহ আবির্ভূত হল।

তে মোহবশমাপন্না মনুজা মনুজর্ষভ।

প্রতিপত্তিবিমোহাচ্চ ধর্মস্তেষামনীনশৎ ॥১৬

হে নরশ্রেষ্ঠ! সমস্ত মনুষ্য যখন মোহের বশীভূত হয়ে পড়ল, তখন কর্তব্যাকর্তব্যজ্ঞানের অভাবে তাদের ধর্ম নাশ হল।

নষ্টায়াং প্রতিপত্তৌ চ মোহবশ্যা নরাস্তদা।

লোভস্য বশমাপন্নাঃ সর্বে ভরতসত্তম ॥১৭

হে ভারতভূষণ, কর্তব্যাকর্তব্যজ্ঞান নষ্ট হয়ে যাওয়াতে মোহের বশীভূত মনুষ্যগণ লোভের বশীভূত হল।

অপ্রাপ্তস্যাভিমর্শং তু কুর্বন্তো মনুজা স্ততঃ।

কামো নামাপরস্তত্র প্রত্যপদ্যত বৈ প্রভো ॥১৮

তারপর যে বস্তু তারা পায় নি তা পাবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল। এরই মধ্যে কাম নামক অপর দোষ তাদের ঘিরে ফেলল।

তাংস্তু কামবশং প্রাপ্তান্ রাগো নাম সমস্পৃশৎ।

রক্তাশ্চ নাভ্যজানন্ত কার্যাকার্যে যুধিষ্ঠির ॥১৯

যুধিষ্ঠির! কামের অধীন হবার পরে ঐ সকল মনুষ্যদের রাগ নামক শত্রু আক্রমণ করল। রাগের বশীভূত হবার ফলে তারা কর্তব্যাকর্তব্য জানতে পারল না।

অগম্যাগমনং চৈব বাচ্যাবাচ্যং তথৈব চ।

ভক্ষ্যাভক্ষ্যং চ রাজেন্দ্র দোষাদোষং চ নাত্যজৎ ॥২০

রাজেন্দ্র! তারা অগম্যাগমন, বাচ্য-অবাচ্য, ভক্ষ্য-অভক্ষ্য, তথা দোষ-অদোষ কিছুই ত্যাগ করল না।

বিপ্লুতে নরলোকে বৈ ব্রহ্ম চৈব ননাশ চ।

নাশাচ্চ ব্রহ্মণো রাজন্ ধর্মো নাশমথাগমৎ ॥২১

এইভাবে মনুষ্যলোকে ধর্মের বিপ্লব হয়ে যাবার পর বেদের স্বাধ্যায় লোপ পেল। রাজন্! বৈদিক জ্ঞান লোপ হবার পর যজ্ঞ আদি কর্মও নাশ হয়ে গেল।

নষ্টে চ ব্রহ্মণি ধর্মে দেবাংস্ত্রাসঃ সমাবিশৎ।

তে ত্রস্তা নরশার্দূল ব্রহ্মাণং শরণং যযুঃ ॥২২

এইভাবে বেদ ও ধর্মের নাশ যখন হতে লাগল, তখন দেবতাদের মনে ভয় এল। হে নরশার্দূল! তাঁরা ত্রস্ত হয়ে ব্রহ্মার শরণ নিলেন।

প্রসাদ্য ভগবন্তং তে দেবং লোকপিতামহম্।

ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে দুঃখবেগসমাহতাঃ ॥২৩

লোক পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করে দুঃখের বেগে পীড়িত সমস্ত দেবতা হাত জোড় করে বললেন—

ভগবন্ নরলোকস্থং গ্রস্তং ব্রহ্ম সনাতনম্।

লোভমোহাদি ভাবৈস্ততো নো ভয়মাবিশৎ ॥২৪

ভগবান্। মনুষ্যলোকে লোভ মোহ আদি দূষিত ভাব এসে সনাতন বৈদিক জ্ঞানকে বিলুপ্ত করে ফেলল। এরজন্যে আমাদের বড় ভয় উৎপাদিত হয়েছে।

ব্রহ্মণশ্চ প্রণাশেন ধর্মো বানশদীশ্বর।

ততঃ স্ম সমতাং যাতা মর্ত্যৈ স্ত্রিভুবনেশ্বর ॥২৫

ঈশ্বর! তিন লোকের স্বামী পরমেশ্বর! বৈদিক জ্ঞানের লোপ হওয়াতে যজ্ঞধর্ম নষ্ট হয়ে গেল। এরদ্বারা আমরা সকল দেবতা মনুষ্যের সমান হয়ে গেলুম।

অধো হি বর্ষমস্মাকং নরাস্তূর্দ্ধবর্ষিণঃ।

ক্রিয়া ধ্যুপরমাৎ তেষাং ততো গচ্ছাম সংশয়ম্ ॥২৬

মনুষ্য সকল যজ্ঞ প্রভৃতিতে ঘৃত আহুতি দিয়ে আমাদের জন্যে উপর দিকে বর্ষণ করত, আর আমরা ওদের জন্যে নীচের দিকে জল বর্ষণ করতুম, কিন্তু এখন ওদের যজ্ঞকর্ম লোপ পাওয়াতে আমাদের জীবন সংশয় হয়েছে।

অত্র নিঃশ্রেয়সং যন্নস্তদ্ ধ্যায়স্ব পিতামহ।

তং প্রভাবসমুত্থোঽসৌ স্বভাবো নো বিনশ্যতি ॥২৭

পিতামহ! এখন যে উপায়ে আমাদের কল্যাণ হতে পারে তা চিন্তা করুন, আপনার প্রভাবে আমরা যে দেব-স্বভাব প্রাপ্ত হয়েছিলুম, তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

[ক্রমশঃ

শবরী

জ্যোতির্ময়ী দেবী

নহে সতী শকুন্তলা দময়ন্তী সীতা
সাবিত্রী গান্ধারী নহে রাজার দুহিতা
রাজবধূ রাজরাণী ইতিহাসে লিখা
কথা-কাব্য সত্য লোকে জীবন নায়িকা।
ছিল না প্রাসাদ গৃহ ব্যসন বিলাস।
তবু তার এক সত্য আছে ইতিহাস।

কানে তার লাল ফুল, কবরীতে লাল
বনমালা। পরিধানে ও কিসের ছাল?
বল্কল অথবা বস্ত্র? কত যে বয়স—
জানিত না কবে মাটী করিল পরশ।
অরণ্য দুহিতা নারী শ্যামা চণ্ডালিকা,
নামটী কি ছিল তার কোথা নাই লিখা।
কে শুনালো কানে তার অজানা সে নাম
বনে আসে অযোধ্যার রাজপুত্র রাম।

২

শবরী থমকি শোনে। কানে বাজে নাম
যদি এই পথে বনে আসে সেই রাম।
পিতৃসত্যে রাজ্যত্যাগী বল্কল বসন
হাতে ধনুর্বাণ সাথে জানকী লক্ষ্মণ।
কথা তার কি ভাষায়। কোথায় সে দেশ
বনচরী নেত্রে নামে কিসের আবেশ।
কালো তনু রুক্ষ কেশ ধূলায় ধূসর।
ডেকে ফিরে যায় বন্ধু শবরী-শবর।
শবরী শোনে না কানে। সাজায় কুটীর
কার লাগি কাশ ফুলে? গোদাবরীনীর
গাগরী ভরিয়া আনে। বনে বনে ঘুরি
আঁচল ভরিয়া আনে বনের বদরী।
আশা ভাষা হীন স্বপ্ন বিচিত্র বিলাস।
সেই কথা এক সত্য লিখে ইতিহাস।

৩

কুটীর উপরে শুষ্ক তার লতা ফুল
গৃহকোণে শুকাইয়া যায় ফলমূল,
কলসে মলিন নিত্য হয় নদী জল,
ভাল প্রান্তে জেগে ওঠে রজত কুন্তল,
রেখা নামে আঁখি কোণে অধরের পাশে।
শবরী ভুলেছ বুঝি বর্ষ যায় আসে—
তনুরে ঘিরিয়া তোর প্রাণ পথ বাহি'।
অথবা জেনেছ বুঝি প্রেমে জরা নাহি।
কত দিনে কে ভাঙালো ধ্যান তাপসীর।
দাঁড়ায়ে আঁখির আগে—ওকে? রঘুবীর।
কি করিলে হে শবরী কি বলিলে নাম—
অথবা রাখিলে পায়ে বিমূঢ় প্রণাম।
তারপর? হে শবরী কি তাহার পর?
থেমে গেছে ইতিহাস। মেলে কি উত্তর।

কিশোর জগৎ

ছুটি

শ্রীজ্ঞান

পূজার ছুটি ফুরিয়ে এল। এই ছুটিই আমাদের সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে আনন্দের ছুটি। এই দীর্ঘ ছুটি ফুরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের অনেকেরই মন খারাপ হয়ে যায়,—তাই না? এই আনন্দময় দীর্ঘ ছুটিটা দেশভ্রমণে, আমোদ-প্রমোদে, আনন্দ-উৎসবে বেশ সুখেই কাটে। কত নতুন জায়গা দেখা হয়, কত নতুন বন্ধু হয়, কত নতুন কিছু শেখা যায়, জানা যায়। তারপর আবার ফিরে আসতে হয় সেই পুরাতন পরিবেশে—সেই পুরাণ রুটিনের মাঝে। স্কুল-কলেজের পাঠ আবার আরম্ভ হয় পুরদমে। পরীক্ষার পালা আবার এগিয়ে আসে ধীরে ধীরে। নানান সমস্যা-শঙ্কা, বিক্ষোভ-বিরোধে উত্তাল হয়ে ওঠে যুবসমাজ। শান্তি-অশান্তির পালা চলে ক্রমান্বয়ে। এ সব কিছুই যেন দৈনন্দিন জীবনের অন্তর্গত হয়ে পড়েছে—এই সব কিছু নিয়েই চলেছে আমাদের সমাজ। সুখের পর দুঃখ, শান্তির পর অশান্তি! বিশ্রামের পরই আবার পরিশ্রমের আহ্বান। ছুটির পরই আসে আবার ছুটে চলার ডাক!

কর্ম করবার জন্যই হয় জীবের জন্ম। সমস্ত জীবকেই, বিশেষ করে শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে, কর্ম করে যেতে হয় আমরণ। চলমান মেশিনের এবং কলকব্জারও বিশ্রামের দরকার হয়, তা নইলে তা বিকল হয়ে যেতে পারে। মানুষের জীবনেও তাই দরকার হয় ছুটির। এই ছুটি না থাকলে মানুষের মন ভেঙ্গে যেতে পারে, তার দেহও অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। তাই এই ছুটির ব্যবস্থা। এই ছুটিই মানুষকে যোগায় কাজের শক্তি। এই ছুটিই মানুষকে দেয় আবার পূর্ণোদ্যমে কাজ করবার প্রেরণা।

তাই ছুটি ফুরাল বলে মন খারাপ না করে আবার পূর্ণোদ্যমে কাজে লেগে যাও। ছুটি উপভোগ করে

তোমাদের দেহ-মন এখন সতেজ হয়ে উঠেছে। এই সতেজ শরীর নিয়ে তোমরা লেগে পড় তোমাদের আরাধ্য কর্মে নবীন উৎসাহে, নব উদ্দীপনায়, আর ছুটির ফল পূর্ণভাবে ভোগ কর সফল সাধনায়।

———

মণির খনি

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পরদিন প্রভাতেই বাউলীর প্লাস্পটী বন্ধ করে প্রাসাদের দরজায় তালা দিয়ে নৃপেন ও অমল কলকাতায় রওনা হল। পথে নৃপেন বল্লেন "নাম ভাঁড়িয়ে বিমলবাবু যেখানে থাক্‌তেন চলুন একবার সেই জায়গাটা দেখে আসি।"

অমল বলল-"চলুন; সেখানে গিয়ে আর নূতন কি খোঁজ পাবেন?

"পেতেও পারি, না-ও পেতে পারি। কিন্তু সকল দিকেই চোখ না রাখলে ঠক্‌তে হতে পারে।"

"বেশ ত, যাওয়া যাক্।"

নৃপেন যদিও প্রকাশ করলেন না, কিন্তু তথনো তাঁর মনে সন্দেহ ছিল যে একজন জাল বিমল নিশ্চয়ই আছে। সেই সন্দেহটা দূর করবার জন্যই তিনি তখন চেষ্টা করছিলেন। তিনি যেদিক থেকেই প্রমাণ সংগ্রহ করে সিদ্ধান্ত করতে চাচ্ছিলেন যে একজন জাল রাজকুমার আছে, সেই দিক থেকেই এমন সূত্র তাঁর হাতে আসছিল যে কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা কিছুতেই তা স্থির করতে পারছিলেন না। কথনো তাঁর মনে হচ্ছিল যে দলিলের স্বাক্ষরটা হয়ত সেই জাল রাজকুমারের কাজ আবার কথনো মনে করছিলেন যে আসল নকল কোন রাজকুমারই স্বাক্ষর করেনি, বিশু এবং তার দলের লোকের মধ্যে কেউ হয়ত রাজকুমারের নাম লিখে দিয়েছে এবং সেই জন্যই তাঁকে সরিয়ে ফেলা দরকার হয়েছে।

শ্রীরামপুরে পৌঁছে মিলের মেসের সম্মুখে আসতেই নৃপেন বিস্মিত হয়ে দেখলেন যে দরজার সামনেই বিমল চক্রবর্ত্তী দাঁড়িয়ে আছে! তাকে দেখে অমল উৎফুল্ল হয়ে বলল—"বারে! এই যে বিমলদা এখানে।" দুই ভাইয়ে তখন পরস্পর পরস্পরকে গভীর আলিঙ্গনে বদ্ধ করল। নৃপেন একেবারে বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন, কয়েকঘণ্টা আগে যাকে মৃতবৎ দেখলাম, দস্যুরা যাকে মোটরে তুলে নিয়ে পালালো—সে কেমন করে সুস্থদেহে এখানে এলো। তবে কি প্রশান্তকে দেখে মনে করেছিলাম বিমল? কি এ প্রহেলিকা!

নৃপেন কিছুক্ষণ হতভম্বের মত চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বললেন—"অমলবাবু, এর পরে আর আমার সন্দেহ করা উচিত নয়,—তবুও কেন যেন আমার সন্দেহ যাচ্ছে না। তাই বলছিলাম কি,হাতের লেখার পরীক্ষাটা একবার করা যাক্ না। আপনার পকেটেই তো বিমলবাবুর চিঠিখানা আছে। সেইটে দেখে দু'চার লাইন পড়ে যান, আর উনি লিখুন। মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে একজনের লেখা কিনা।"

নৃপেন আড়চোখে দেখলেন—বিমল চক্রবর্ত্তীর মুখ কালো হয়ে উঠেছে। সে একবার তাঁর দিকে, আর একবার অস্থিরভাবে অমলের দিকে তাকাচ্ছে। নৃপেন আবার বললেন—

"কি লিখতে রাজি?"

ক্ষুণ্ণতর অভিমান ভরা কণ্ঠে বিমল বলল—"একজন ভদ্রলোকের আত্মসম্মানের উপর যখন এত বড় একটা ঘা পড়ছে তখন রাজি হতেই হবে। কিন্তু মায়ের পেটের ভায়ের কথারও যাঁর কাছে মূল্য নেই—হাতের লেখায় প্রমাণ কি তাঁর কাছে বিশ্বাস যোগ্য হবে?

নৃপেন একটু থতমত খেয়ে বললেন—লেখা না লেখা সে আপনার ইচ্ছে।"

অমল বলল—"তা লেখ না দাদা—দু'ছত্র লিখলেই যদি সব গোল মিটে যায় লিখেই ফেল না। নৃপেনবাবুই তা হলে জব্দ হয়ে যাবেন।"

"তোরা সকলেই যখন বলছিস তখন লিখব বই কি। কিন্তু আমি যে কলমে যে কালিতে লিখি তাতেই আমায় লিখতে হবে। কলম বদলে গেলে হয়ত দু'চারটে অক্ষর অন্য রকম দেখাতে পারে। যে কাগজে তোর কাছে চিঠি লিখেছিলাম সে কাগজও তো চাই।"

বিমল ধীরে ধীরে উঠে পাশের একটা ডেস্কের কাছে গেল এবং দেরাজটি খুলে ডালাটা তুলল। ডালাটা বেশ ভারি। বাঁ হাতের ডালা ধরে ডান হাতে চিঠির কাগজ বের করল, কালির দোয়াত বের করল এবং কাগজ-পত্র ঘাঁটতে বলল—"আমার কলমটা। আমি ত বরাবর ডেস্কের এই কোণটাতেই রাখি।"

বিমল বাঁ হাতে ডেস্কের ডালাটা ধরে ডান হাতে কোটের পকেট খুঁজল, ফাউণ্টেন পেন পাওয়া গেল না।

অমল বলল—"কলমটা পাচ্ছনা বুঝি ?"

"না এই কালই ডেস্কে রেখেছিলাম। আর একবার দেখি পাই কি না।"

বিমল আবার কাগজপত্রের মধ্যে কলমটা খুঁজতে লাগলো—হঠাৎ ডেস্কের ভারি ডালাটা তার ডান হাতের তর্জ্জনীর উপর পড়ল। বিমল চীৎকার করে উঠলো।

নৃপেন ও অমল কাছে গিয়ে দেখল যে ডেস্কের ডালার চাপে বিমলের আঙুলটি একেবারে থেঁতলে গেছে এবং আঙুল দিয়ে রক্ত পড়ছে। বিমল কাতর স্বরে আর্ত্তনাদ করে মেঝের উপর বসে পড়ল; তার মুখ যেন ফ্যাকাশে জ্যোতিহীন হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ শুশ্রূষার পর বিমল যখন সুস্থ হল, তখন অভিমানভরা দুঃখের সাথে বলল—"আঙুলটা কেটে গেল, যাক্‌গে। কিন্তু আজ তো আর লেখার উপায় নেই। আমার লেখা মিলিয়ে দেখে উনি সন্দেহ মুক্ত হতে পারলেন না। এর চাইতে দুর্ভাগ্য আমার আর কি হতে পারে ?

নৃপেন অবাক্ হয়ে গেলেন। ভাবলেন এ ব্যাপারটার সব যদি ভান হয়, তা'হলে এমন অভিনয় তো জীবনে কখনো দেখিনি। কত বড় বড় অভিনেতা দেখেছি, মিথ্যার অভিনয়ে তারাও ত এমন সিদ্ধহস্ত নয়। এ কি শুধুই অভিনয় না সত্যি ঘটনা ?

নৃপেন প্রকাশ্যে বললেন—"আর লিখে কি হবে। আমরা ধরেই নিচ্ছি যে আপনি বিমল চক্রবর্ত্তী। তবে গোটা কয়েক কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবার আছে।"

গম্ভীরভাবে বিমল বলল—"বলুন।"

নৃপেন বললেন—"শুধু আমি নই—আপনার ভাই-ও সে কথাগুলি জানবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন। আপনি কি সত্যিই আপনার রেডিয়ামের খনিটা দান করেছেন ?"

"হ্যাঁ, করেছি বৈ কি! দানপত্রে স্বাক্ষর পর্য্যন্ত করেছি।"

অমল বলল—কি মশায়! আপনি না বলছিলেন যে ও স্বাক্ষর জাল ?

মৃদু হেসে নৃপেন বলল—"মুনিদেরও ত ভুল হয় আর আমি তো সামান্য একজন মানুষ। তবে একটা কথা জেনে রাখবেন, রাজকুমার যদি দানপত্র সত্যি সত্যিই সই করে থাকেন তবে ততটা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় বোধহয় জীবনে আর কখনও দেন নি। ইংলণ্ডের রাজার এত টাকা নেই যে ওই রেডিয়ামের খনিটা কিনে নিতে পারেন। জানেন ত এক গ্রেণ রেডিয়ামের দাম সাড়ে সতের লক্ষ টাকা! আধসের রেডিয়ামের ডেলায় সাত হাজার গ্রেণ রেডিয়াম থাকে। এখন ভাবুন দেখি খনিটার দাম কত হতে পারে! এমন একটা সম্পত্তি কি কোন সংসারী লোক হাতছাড়া করে! তবে যাক্ সে কথা। আপনার পাঁঠা—আপনি ঘাড়েই কাটুন আর ল্যাজেই কাটুন সে আপনার ব্যাপার।

রাজকুমার তার আহত আঙুলটির দিকে তাকিয়ে বললেন—"আপনি যদি সব কথা জানতেন—"

বাধা দিয়ে নৃপেন বললেন—"আমি ত তাই জানতেই চাই। আজে-বাজে গল্প বাদ দিয়ে সত্য কথাটুকু আমাকে বলবেন কি ?

বিমল মৃদুস্বরে বলল—"বেশ তাই হোক্। তবে আশাকরি আমাদের পারিবারিক ব্যাপারটা আর বাইরে প্রকাশ পাবে না। প্রশান্ত দিনে দিনে যে বয়ে যাচ্ছিল, তা আমি জানতাম না। জুয়া, ঘোড়দৌড় মদ এই সব নিয়ে মেতেছিল। যখনই তার টাকার দরকার হতো তখনই সে আমার কাছে এসে দাঁড়াত। আমি প্রশান্তকে বড্ড ভালবাসি। তার সব আব্দার রাখতেম। শেষে সে যে নিজেই রাজকুমার সেজে বসেছিল, তা আমি জানতে পাইনি। আমার নামে সে তখন যা খুসি তাই করতে আরম্ভ করল। বিশু, কানু, রঘু এসে তার দলে জুটে গেল। তাদেরই পাল্লায় পড়ে প্রশান্ত আমার নামে

জাল জুয়াচুরি পর্যন্ত করতে ছাড়লো না। এমনি করে তাকে ফাঁদে ফেলে বিশু আর তার বন্ধু দু'জন আমাকে ভয় দেখাতে লাগলো যে জেলে পাঠাবে। আমি দেখলেম বংশের মান মর্যাদা ডুবে যায়—আমি আর প্রশান্ত দু'-জনেই জেলে যাই—তখন বাধ্য হয়েই বেডিগামের খনিটা তাদের নামে লিখে দিয়ে মুক্তি নিতে হলো।"

নৃপেন মৃদু হেসে নিজের পকেট থেকে দলিলখানা বের করে একবার ভালো করে দেখলেন এবং পরক্ষণেই দলিল-খানা ছিঁড়ে ফেললেন।

বিমল চীৎকার করে উঠল—কচ্ছেন কি! কচ্ছেন কি! প্রশান্তর মুক্তির দাম যে ও-ই দনেপত্র! বিশু আমায় বলেছিল যে আমি যদি সই করে দি তা'হলে ওরা প্রশান্তকে নিয়ে অন্য দেশে রেখে আসবে। তার উপর কোন অত্যাচার করবে না।"

"তবে সেইটে তারা কচ্ছে কেন তা বলতে পারেন আপনি?

বিমল চক্রবর্ত্তী বিব্রত হয়ে উত্তর দিলেন—"তা কি জানেন নৃপেনবাবু, ওরা প্রশান্তর ব্যবহারে বড়ই উত্তেজিত হয়েছিল। প্রশান্ত বলেছিল, এক পয়সাও দেবে না—আদালতে গিয়ে সব কথা স্বীকার করবে, তাতে যদি জেলও হয়, তাও মাথা পেতে নেবে। বিশু দেখল যে আদালতে গেলে সবই কেঁচে যাবে, তাই হয়ত মার-ধোর করে থাকবে। আমি ও সব দিকে লক্ষ্য রাখিনি। আমার বংশ মর্যাদাকে আদালতের ধূলায় লুটিয়ে দিতে পারি আমি?

নৃপেন বললেন—"যা হবার তা হয়েছে। এখন আর সে জন্য চিন্তা করে লাভ নেই, তবে দেবেশ যখন ওদের পেছনে আছে, তখন বিশুর সাধ্য নাই যে প্রশান্তকে হত্যা করে, কি বিপদে ফেলে।

অমল কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বলল—"দাদা, ভগবানকে ধন্যবাদ দাও যে নৃপেনবাবু সেদিন খেলার মাঠে ছিলেন। তাইত আজ পথের ফকির হতে হতে বেঁচে গেলাম—শয়তানের হাতের ফাঁসি, তোমার গলায় উঠতে উঠতে খসে পড়লো।"

রাজকুমার হতভম্বের মত অমলের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন এবং পরক্ষণেই টেবিলের উপর মাথা রেখে কাতর কণ্ঠে বললো—হায়রে, এর আগে আমার মৃত্যু হলো না কেন? মনে হ'ল সে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

নৃপেনবাবু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রাজকুমারের দিকে তাকিয়ে থেকে ধীর পদে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেলেন। কেবলই তাঁর মনে হতে লাগলো—"কে তুমি? তুমিই কি রাজকুমার বিমল চক্রবর্ত্তী? প্রশান্ত চক্রবর্ত্তীই কি তুমি? দু'জন লোক আছে এর মধ্যে—দেখতে একই রকম। ঠিক যেন যমজ ভাই। কোনজন সত্যিকার রাজ-কুমার আমায় কে বলে দেবে?"

[ক্রমশঃ]
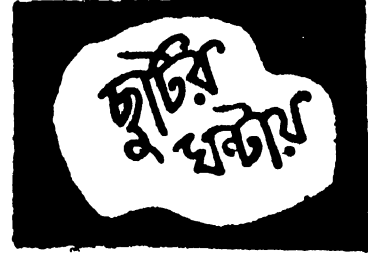
চিত্রগুপ্ত

এবারে শোনো—আরেক ধরণের আজব-মজার খেলার কথা। বলা বাহুল্য, এ খেলাটিতেও পরিচয় পাবে—বিজ্ঞানের বিচিত্র-রহস্যময় রাসায়নিক-প্রক্রিয়ার অভিনব কারসাজির। খেলাটির কলা-কৌশল রপ্ত করা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। তাছাড়া এ কারসাজি দেখানোর জন্য বিশেষ-ধরণের যে কয়েকটি রাসায়নিক-পদার্থ আর টুকিটাকি অন্য উপকরণ দরকার, সেগুলি জোগাড় করাও তেমন একটা দুঃসাধ্য বা ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার বলে মনে হয় না। কাজেই খেলার কায়দা-কানুনটুকু ঠিকমতো মকশো করে নিয়ে, ছুটির দিনে তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের আসরে আজব-মজার এই রাসায়নিক-কারসাজিটি দেখিয়ে তোমরা অনায়াসেই তাঁদের রীতিমত স্তম্ভিত করে দিতে পারবে।

এ খেলাটির নাম—"বর্ণ-বিহীন তরল পদার্থ মিশিয়ে নূতন ধরণের রঙ সৃষ্টির বিচিত্র কারসাজি" (Change of Colour by Colourless

Fluids)। অভিনব-কৌতূহলোদ্দীপক এই মজার কারসাজিটি দেখানোর জন্য যে সব সাজ-সরঞ্জাম দরকার, গোড়াতেই তার মোটামুটি ফর্দ্দ দিই। অর্থাৎ, চাই—একটুকরো লাল-রঙের বাঁধাকপি (a little Red Cabbage), এক কেটলী ফুটন্ত-গরম জল, স্বচ্ছ-কাঁচের তৈরী তিনটি গেলাস, এক পেয়ালা ফট্‌কিরি-গোলা জল (small quantity of solution of alum in a tea-cup), এক পেয়ালা 'পটাশ'-মেশানো জল (a little solution of Potash in a Cup), এক শিশি ম্যুরিয়াটিক্ এ্যাসিড' (a few drops of Muriatic Acid) এবং মাঝারি-সাইজের একটি গামলা কিম্বা বালতী।

এ সব উপকরণ সংগ্রহ হবার পর, আসরে দর্শকদের সামনে কারসাজির কায়দা দেখানোর সময় গোড়াতেই ঘরের মেঝে কিম্বা সমতল একটি টেবিলের উপর গামলা অথবা বালতী রেখে, সেটির মধ্যে লাল রঙের বাঁধাকপির টুকরোটিকে বসিয়ে দাও। তারপর গামলার মধ্যে সাজিয়ে-রাখা ঐ লাল-রঙের বাঁধাকপির টুকরোটির উপর এমনভাবে কেটলীর ফুটন্ত-গরম জল ঢালো যে সেটি যেন আগাগোড়া বেশ ভিজে টুপটুপে হয়ে ওঠে। বাঁধাকপির টুকরোটিকে ফুটন্ত-গরম জলে এমনিভাবে আগাগোড়া ভিজিয়ে রাখার কিছুক্ষণ বাদে গামলার জলটুকু বেশ জুড়িয়ে শীতল হয়ে যাবার পর, সেই জল ঢেলে ভরে নাও আসরের দর্শকদের চোখের সুমুখে স্বচ্ছ-কাঁচের তৈরী তিনটি গেলাস।

এবারে টেবিলের উপরে সাজানো সেই তিনটি গেলাসের প্রথমটির জলে মিশিয়ে দাও—ফট্‌কিরি-গোলা জল, (Solution of alum) দ্বিতীয়টিতে মেশাও—'পটাশ'-গোলা জল (Solution of Potash) এবং তৃতীয়টিতে মিশিয়ে নাও—'ম্যুরিয়াটিক্-এ্যাসিডের' কয়েকটি ফোঁটা (a few drops of Muriatic Acid)। তাহলেই দেখবে—বিজ্ঞানের আজব রহস্যময় রাসায়নিক-প্রক্রিয়ার যাদু-মন্ত্রে ধীরে ধীরে ক্রমশঃ প্রথম গেলাসের জলটুকু অপরূপ লালচে-বেগুনী (Purple) রঙে দ্বিতীয় গেলাসের জলটুকু উজ্জ্বল-অভিনব সবুজ (Bright Green) রঙে আর তৃতীয় গেলাসের জলটুকু দিব্যি-টুকটুকে রক্তাভ গাঢ়-লাল (Rich Crimson) রঙে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে।

'বর্ণ-বিহীন তরল-পদার্থ মিশিয়ে নতুন-ধরণের রঙ-সৃষ্টির বিচিত্র কারসাজি' খেলাটির আজব এবং আসল রহস্য। রহস্যের মর্ম্ম তো জানলে···এবারে তোমরা নিজেরা পরখ করে ছাখো বিজ্ঞানের এই আজব-মজার কারসাজিটি।

———

মনোহর মৈত্র

১। দেশলাই কাঠি সাজানোর হেঁয়ালী:

সমতল টেবিলের উপর ২০টি আনকোরা দেশলাই-কাঠিকে বুদ্ধি খাটিয়ে এমন কায়দায় সাজাও যে সেগুলির সাহায্যে যেন মোট ৭টি সমান-মাপের চার-চৌকা 'ঘর' (Square) রচিত হয়। এবারে সেই ৭টি সাজানো 'ঘর' থেকে এমন সুকৌশলে মাত্র ৪টি দেশলাই কাঠি তুলে নিয়ে আলাদা সরিয়ে রাখো যে মোট যেন ৪টি মাত্র সমান-মাপের চার-চৌকা 'ঘর' পড়ে থাকে। তবে খেয়াল রেখো—এই ৪টি 'ঘরের' আয়তন যেন না এতটুকু বেড়ে কিম্বা কমে যায়—এমনিভাবে ৪টি দেশলাই-কাঠি বাদ দিয়ে আলাদা সরিয়ে রাখার ফলে এবং কোনো কাঠি যেন বৃথা পড়ে না থাকে। এ হেঁয়ালির সমাধান যদি করতে পারো তো বুঝবো যে বুদ্ধিতে বেশ পাকা হয়ে উঠেছো তোমরা।

। 'কিশোর জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা:

দাঁত আছে—খাই নাকো,
এমনি বরাত···
মুখোস নইকো আমি,
নইকো করাত।

সবার ঘরেতে আছি—
ত্রি-বর্ণে গঠিত
মধ্য বাদে, সবাকারই
অতি-পরিচিত !

রচনা : কাশ্যপ রায় (কলিকাতা)

গত মাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালির' উত্তর :

১। কানাই
২। স
৩। খাবি

গতমাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

কাশীনাথ, নবকুমার, তরুণ, চিন্তাহরণ, নৃপেন, নব-গোপাল ও গোবর্দ্ধন (সোনারপুর), বিভা, শোভা, ছন্দা, রেণু, শ্যামসুন্দর ও দিব্যকান্তি চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা), গোপিকারমণ, রাধারমণ, শৈব্যা, মিতুল, পুতুল ও টুলটুল মিত্র (জামসেদপুর), অজিত, সুজিত. বিশ্বজিৎ, শিপ্রা, ফাল্গুনী, অরিন্দম, চন্দ্রিমা ও সুলেখা রায় (বারাণসী), লাট্টু, খট্টু, পল্টু, ছোটকু, নিণ্টু ও লিণ্টু (কলিকাতা), পটল, সুমনা, সুতপা, অটল ও রিনকু মিত্র (কাণপুর), আশীষ ও গোপা বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা), বৃন্দা, চন্দ্রা, লীনা, সুশোভন, সুমোহন ও রাজীব রায়চৌধুরী (কলিকাতা), শুকদেব, প্রশান্ত, গণেশ, অরুণ, সরোজ, বলাই ও মানসী সেন (নিউ দিল্লী), কালীপদ, শ্যামাচরণ, গোষ্ঠবিহারী, কাননিকা, কুসুমিকা ও মালবিকা ভট্টাচার্য (কলিকাতা), শিখা, রাকানাথ, উষানাথ, নিশানাথ, ও নন্দা বরাট (বর্দ্ধমান), বটুকেশ্বর, সর্ব্বেশ্বর, ভুবনেশ্বর ও ইন্দ্রাণী সাহা (কটক), ত্রিপুরাচরণ, ভৈরবনাথ, বন্দনা, চন্দনা ও কাটু (কলিকাতা), কাকলী, মেখলা, মৃণালিনী, ভুজঙ্গদেব, বুদ্ধদেব ও বাসুদেব বসু (বিলাসপুর), টুটু, পুটু, ছবি, মলা, বিলটু, নানকু, বুকুন, ছায়া ও গৌরী ঘোষ (কলিকাতা)।

গতমাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

কানু, ছোটন, মোহন, পিণ্টু, কান্তি, শান্তিলতা ও প্রীতিলতা ভৌমিক (ব্যারাকপুর), অপূর্ব্ব, শ্যামাকান্ত, রজনীনাথ, বনবালা, বাসন্তী ও অরুণাভ চৌধুরী (রাঁচী), গাবু, পিন্টু, শঙ্কু, মালতী, পূরবী, বাসবী, আশুতোষ ও নীহারবালা চক্রবর্ত্তী (কলিকাতা), বিশ্বনাথ ও দেবকী-নন্দন সিংহ (গয়া)।

গতমাসের একটি ধাঁধার উত্তর সঠিক দিয়েছে :

আইভি, পিপু, খুকু, পিকলু ও টিটু সেন (বোম্বাই), অশোক, অনাবিল, হেমেন্দ্র, রণেশ, পরমেশ ও সুচরিতা বটব্যাল (ঝাড়গ্রাম), ধীরেন, বীরেন, রণেন, হরেন ও কোয়েলী কানুনগো (কাটোয়া), লতু, কাকলী, কাঞ্চন-কুমার ও মোহনদাস বরাট (কলিকাতা), আভা, স্নেহময়, পুলকেশ, অলকেশ ও পরমেশ মহলানবিশ (কুলটি), অভি, কৃষ্ণলাল, অমিয়, তিনকড়ি, কমল, রাণা, রবীন, ভুবন, তিলক, বাহাদুর ও ছোটকু (কলিকাতা), টিপু, হায়দার, রাজিয়া, জাহানারা, আমিনা, ইকবাল ও খুরশীদ চৌধুরী (কলিকাতা), কানাই, মধু, মণিমালা, চারুলতা, চিন্তামণি ও বৃন্দা মুখোপাধ্যায় (রাউরকেল্লা), সুদেব, প্রভবদেব ও দেবাশীষ গুহ (কলিকাতা), ললিতমোহন, কেশবচরণ, কান্তিভূষণ, শ্রাবণী, শর্ব্বাণী ও শ্রীমন্ত রাহা (দুর্গাপুর), নন্দিনী, নবনীতা, মৃণাল, জহরলাল, অনৃত, মোহনলাল ও শ্রীনিবাস রায় (কলিকাতা)।

আর্য্য সঙ্গীতে শ্রুতি

শ্রীতুলসীচরণ ঘোষ

সঙ্গীতের উৎপত্তি নামক প্রবন্ধে আর্য্য সঙ্গীতে শ্রুতি কি এবং তাহাদের সংখ্যা কত সামান্যভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন, কেন না এই শ্রুতির জ্ঞান না হইলে আর্য্য সঙ্গীত সম্যকভাবে আয়ত্ত করা যায় না। আর্য্য সঙ্গীতে শ্রুতির প্রয়োজন এত অধিক যে তাহার সম্যক জ্ঞান না থাকিলে আর্য সঙ্গীত শিক্ষা করা বিড়ম্বনা মাত্র। এই শ্রুতির জ্ঞান সম্যক আয়ত্ত হইলে রাগ ও রাগিণী আপনা হইতেই মূর্ত্তিমন্ত হইয়া উঠে। এই জ্ঞানাভাব হেতু অধুনা আর্র্য সঙ্গীতের এত দুরবস্থা। শ্রুতি জ্ঞান সম্যক লাভ করিতে হইলে কালজ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ খণ্ড কালের ক্রীড়া সঙ্গীতে যে পরিমাণে অনুভূয়মান অন্য কোন বিষয়ে তত নহে। সামান্য চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখিলেই দেখা যায় যে কাল বিনা সঙ্গীত হয় না। ইহা সকলেরই জানা আছে যে ঠিক ঠিক কালিক নিয়মাবর্ত্তিতার সহিত স্পন্দন বর্ত্তমান না থাকিলে সঙ্গীতের ধ্বনি উৎপন্ন হয় না। Sound possesses the musical quality only if their frequency is rigidly regular otherwise it is mere noise.

সুতরাং কালজ্ঞান ভিন্ন আর্য্য সঙ্গীতের ক্রিয়া বিশেষ-ভাবে উপলব্ধি করা যায় না। এই কাল হইতেই সঙ্গীতের উৎপত্তি ও পরিব্যাপ্তি এবং কাল জ্ঞান ভিন্ন সঙ্গীত শিক্ষা করা বাতুলতা মাত্র। সেই জন্য কালের সহিত শ্রুতি কিরূপ ওতপ্রোত ভাব জড়িত তথাই আলো-চনা করা বিধেয়।

মহাভারতের উপাখ্যানে উল্লেখ আছে—যে দেবর্ষি নারদ দেবলোক হইতে মর্ত্তলোকে আগমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎকালে কহিলেন—৺গোলকে গিয়া দেখিলাম যে আচার্য বৃহস্পতি নারায়ণকে অর্দ্ধমণ্ডলাকারে প্রদক্ষিণ করিতেছেন।

ঘড়ির পেণ্ডুলামের গতি লক্ষ্য করিলেই স্থিতি ও গতি সম্মিলনকারী অর্দ্ধপ্রদক্ষিণ কি তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। ইহাই স্পন্দনের কারণ এবং স্পন্দন হইতে শব্দের উৎপত্তি। শব্দ হইতে বাক্ যাহা বৃহস্পতি নির্দ্দেশ করে।

ইহা সকলেরই জানা আছে যে ভৌতিক অণুর গতি ভিন্ন ধ্বনি নাই। সাধারণতঃ বায়ুর অণুগুলি ধ্বনিকে বহন করে এবং সেই অণুগুলির গন্তব্য স্থানের দিকে সদাই আগু পিছু স্পন্দন হয় যাহার কারণ বায়ুমণ্ডলে ক্ষণিক ও দৈশিক গুরুত্বের বিভিন্নতা হইতে বাক্যের উৎপত্তি। তাই দেবগুরু বৃহস্পতির অর্দ্ধমণ্ডলাকারে নারায়ণকে প্রদক্ষিণ।

বাচস্পতি বৃহস্পতি হইল বৈখরীশক্তি এবং বিষ্ণু হইল প্রাণশক্তি। বিষ্ণু—বিষ্+ণুক্ক। বিষ্—অর্থে ব্যাপা। যিনি ব্যাপ্ত হয়েন। প্রাণেরই ব্যাপ্তি হয়। আত্মার প্রাণশক্তি প্রভাবে বৈখরী ধ্বনির উৎপত্তি। প্রাণশক্তিই বাক্‌শক্তিকে পরিচালনা করে। ইহা একটু কালচক্রে অনুধাবন করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। গতিরূপ মকররাশি এবং স্থিতিরূপ কুম্ভরাশির সন্ধিস্থলে বসু নক্ষত্র ধনিষ্ঠা অবস্থিত।

কালচক্রে যাহা মকর ও কুম্ভরাশি তাহা কালরূপ শনি গ্রহের গৃহ। ধনু ও মীন রাশি তাহার দুই পার্শ্বে অব-স্থিত। তাহারা হইল বৃহস্পতির কক্ষ। শনির গৃহে শ্রবণ কার্য্যের নক্ষত্র শ্রবণা যাহার দেবতা নারায়ণ এবং বৃহস্পতি হইল বাচস্পতি অর্থাৎ বৈখরী শক্তি। আত্ম চেষ্টার তীব্র কষাঘাতে কণ্ঠনালীতে মৃদু আলোড়ন সৃষ্ট হয়। এই আলোড়ন হেতু যে মৃদু ধ্বনি নির্গত হয় তাহা কেবল মাত্র ধ্বনি বিশেষ। এই যে সঙ্গীত ধ্বনি যাহা শ্রবণে শ্রুত হইতে পারে তাহাই হইল শ্রুতি। কারণ শ্রুতি হইল শ্রু+ক্তি ণ। শ্রু অর্থে শুনা। অর্থাৎ স্বরা-বয়ব। সূক্ষ্ম স্বর বিশেষ। শ্রূয়ন্তে সা শ্রুতি।

এই স্বরোৎপত্তির প্রথমাবস্থায় যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাহাই শ্রুতি। মহাকবি মঘ বলিয়াছেন—

"শ্রুতির্নাম স্বরারম্ভকারয়কারশব্দবিশেষঃ।"

অর্থাৎ শ্রুতি হইল স্বরের আরম্ভকারী শব্দ বিশেষ।

নারদী শিক্ষা বলেন—

যথাপ্সুচরতা মীনাং মার্গো নোপলভ্যতে।

আকাশে বা বিহঙ্গানাং তত্তু স্বরাগতা শ্রুতি॥"

অর্থাৎ মৎস্য যখন জলে চলে তাহাদের মার্গ যেমন উপলব্ধি করা যায় না এবং আকাশে উড্ডীন বিহঙ্গেরও যেমন মার্গ বোঝা যায় না সেইরূপ স্বরান্তর্গত শ্রুতিও বোঝা যায় না।

সঙ্গীত দর্পণ বলেন—

"স্বরূপমাত্র শ্রবণান্নাদেং অণু ণনা বিনা

শ্রুতিরিত্যুচ্যতে। ভেদাস্তস্যা দ্বাবিংশতির্মতা॥"

অর্থাৎ অনুরণন বিনা যে ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয় তাহাই শ্রুতি। বিভিন্ন শ্রুতির সংখ্যা দ্বাবিংশ—যাহা শ্রবণা নক্ষত্রের সংখ্যা।

অনুপসঙ্গীত রত্নাকর বলেন—

শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্যত্বাদ্ ধ্বনিরেব শ্রুতির্ভবেৎ।"

অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য যে ধ্বনি তাহাই শ্রুতি।

সঙ্গীত বিলাস বলেন—

"প্রথমতন্ত্র্যামাহতায়াং যা ধ্বনিরুৎপদ্যতে সা শ্রুতিঃ।"

অর্থাৎ তন্ত্রে প্রথম আঘাত হেতু যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাহাই শ্রুতি।

এই সকল হইতে দেখা যায় যে অনুরণন রহিত শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য যে ধ্বনি উৎপাদিত হয় তাহাই শ্রুতি। এবং তাহাদের সংখ্যা দ্বাবিংশ। ইহা একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যেধ্বনির প্রথমাবস্থায় কণ্ঠে কম্পন সুস্পষ্ট ভাবে প্রকটিত হয় না সবে তাহার আলোড়ন সুরু হয়। এই আলোড়ন ক্রমে পুষ্টিলাভ করিয়া সংযত হইয়া ছন্দোযুক্ত কম্পনে পরিণত হইয়া যে নির্গত ধ্বনি কালিক অবস্থা হেতু মনোরঞ্জন করে তাহা স্বর নামে অভিহিত হয়। "স্বতঃ রঞ্জতি সা স্বরঃ॥"

"স্বয়ং যো রাজতে নাদঃ স স্বরঃ পরিকীর্তিতঃ।"

—শৃঙ্গাহায়

অর্থাৎ যে স্বয়ং ধ্বনিকে রঞ্জন করে তাহাই স্বর।

সঙ্গীতের স্বর কালিক নিয়মানুবর্ত্তিতার সহিত বায়ুর স্থায়ী স্পন্দনের দ্বারা ঘটিত হয়। এই স্পন্দন আমাদের কর্ণরন্ধ্রে বায়ুকে কম্পন করিলে আমরা স্বর অনুভব করি। এই কম্পনের সংখ্যা অধিক হইলে স্বর তারস্বর হয়। মন্দ হইলে মন্দ্র হয়। আপনারা সকলেই জানেন যে দুইটি বিভিন্ন স্বরের মিশ্রণে দুঃখানুভব বা সুখ সুভব ঘটিতেপারে। কোন এক স্বরের কম্পন সংখ্যা যখন অপর কোন এক স্বরের দ্বিগুণিত হয় তখন স্বর দুইটি সুখানুভবের সহিত একেবারে এক হইয়া মিশিয়া যায়। এই অবস্থায় দুইটী স্বরের মধ্যে আর্য্যগণ বলেন পার্থক্য অনুভবযোগ্য ২২টি শ্রুতি আছে।—তাহার যথা—

"তীব্রা, কুমুদ্বতী, মন্দা, ছন্দোবতী, দয়াবতী,

রঞ্জনী, রতিকা, রৌদ্রী, ক্রোধা, বজ্রিকা, প্রসারিণী

মার্জ্জনা, প্রীতি, ক্ষিতি, রক্তা, সন্দিপনী, আলাপিনী,

মদন্তী, রোহিণী, রম্যা, উগ্রা ও ক্ষোভিণী।"

সুশ্রাব্য স্বর বাহির হইবার পূর্ব্বে কণ্ঠ হইতে মৃদু শব্দ উত্থিত হয়। এবং ক্রমে তাহা পুষ্টিলাভ করিয়া সংযত ভাব অবধারণ করিয়া সুষ্ঠু ছন্দোযুক্ত ধ্বনিতে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ সমস্ত কাকলি ধ্বনি বিমুক্ত হইয়া সুশ্রাব্যরূপে নির্গত হয় এবং ইহাই হইল সঙ্গীতের প্রথম স্বর ষড়্জ। এবং এই যে স্বরসমূহ নির্গত হয় ইহারও একটা ক্রমিক রীতি আছে। যথা সঙ্গীত দর্পণ বলেন—

"হৃদি মন্দ্রো গলে মধ্যো মূর্দ্ধিতার ইতি ক্রমাৎ।

দ্বিগুণঃ পূর্ব পূর্ব্বাস্থদয় স্যাদুত্তরোত্তরঃ॥

এবং শরীর বীণায়াং দারব্যাস্ত বিপর্য্যয়ঃ।"

অর্থাৎ হৃদি মন্দ্র, কণ্ঠে মধ্য ও মস্তকে তার। এবং ইহারা উত্তরোত্তর দ্বিগুণ হয়। মন্দ্রের দ্বিগুণ মধ্য, মধ্যের দ্বিগুণ তার। মন্দ্রস্থানের স্বর সপ্তক মধ্যস্থানের দ্বিগুণিত হইবে এবং মধ্যস্থানের স্বর সপ্তক তার স্থানের দ্বিগুণিত হইবে। এই সমস্তই শরীর বীণায় হইয়া থাকে। অর্থাৎ কণ্ঠ সঙ্গীতে এই সমস্ত হয়। যন্ত্রে শ্রুতির বিলাস অন্যপ্রকার।

এই শ্রুতি সকলের সংখ্যা হইল ২২ এবং কালচক্রে শ্রবণা নক্ষত্রের সংখ্যাও ২২। এইখানে রবি থাকিলে বাক্‌দেবীর পূজা। দেবী সরস্বতীর সহিত শ্রবণা নক্ষত্রের সম্বন্ধ "সঙ্গীতের উৎপত্তি" নামক প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

স্বর স্থাপন নিমিত্ত শ্রুতি বণ্টনী সম্বন্ধে শাস্ত্র বলে—

"চতুঃশ্রুতি স্ত্রি শ্রুতিশ্চ দ্বিশ্রুতিশ্চ চতুঃশ্রুতিঃ।

চতুঃশ্রুতি স্ত্রিশ্রুতিশ্চ দ্বিশ্রুতিশ্চ যথ'ক্রমম্ ॥"

অর্থাৎ—৪, ৩, ২, ৪, ৪, ৩, ২ ॥

সঙ্গীত রত্নাবলী বলেন—

"চতস্রঃ পঞ্চমে ষড়জে মধ্যমে শ্রুতয়ো মতাঃ।

ধৈবতে ঋষভেতিস্রঃ দ্বে গান্ধারে নিষাদকে ॥"

অর্থাৎ পঞ্চম ষড়জ ও মধ্যমে চারিটী করিয়া শ্রুতি, ধৈবত ও ঋষভে তিনটি করিয়া এবং গান্ধার ও নিষাদ দুইটি করিয়া শ্রুতি।

এইভাবে স্বর সপ্তকে ২ টী শ্রুতি সকলকে বণ্টন করিতে হইবে।

সঙ্গীত দর্পণ বলেন—

তীব্রা কুমুদ্বতী মন্দাছন্দোবত্যস্ত ষড়জগাঃ।

দয়াবতী রঞ্জনী চ রতিকা চর্ষভে স্থিতাঃ ॥

রৌদ্রী ক্রোধা চ গান্ধারে বজ্রিকাথপ্রসরিণী।

প্রীতিশ্চ মার্জ্জনীত্যেতাং শ্রুতয়ো মধ্যমাশ্রিতাঃ ॥

ক্ষিতি রক্তা চ সন্দীপন্যালাপিন্যপি পঞ্চমে ॥

মদন্তী রোহিণী রম্যোত্যেতা ধৈবতেসংশ্রয়াঃ।

উগ্রাচ ক্ষোভিণীতি দ্বে নিষাদে বদতঃ শ্রুতি ॥

অর্থাৎ তীব্রা, কুমুদ্বতী, মন্দা ও ছন্দোবতী এই চারিধা শ্রুতি ষড়জস্বরে বসাইতে হইবে। দয়াবতী, রঞ্জনী ও রতিকা এই তিনটী শ্রুতি ঋষভে বসাইতে হইবে। রৌদ্রী ও ক্রোধা এই দুইটী শ্রুতিগান্ধারে বসিবে। বজ্রিকা, প্রসারিণী, প্রীতি ও মার্জ্জনী এই চারিটী শ্রুতিকে মধ্যমে বসাইতে হইবে। ক্ষিতি, রক্ত, সন্দিপনী ও আলাপিনী এই চারিটী শ্রুতিকে পঞ্চমে বসাইতে হইবে। মদন্তী রোহিণী ও রম্যা এই তিনটী ধৈবতে বসিবে এবং উগ্রা ও ক্ষোভিণী এই দুইটী শ্রুতি নিষাদে থাকিবে। এইভাবে ৪, ৩, ২, ৪, ৪, ৩, ২ একুনে মোট ২২টী শ্রুতি সপ্তস্বরে এইভাবে বণ্টন করিতে হইবে।

এই শ্রুতি ও স্বর স্থাপনা লইয়া বিশেষ মতানৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ শ্রুতির আদ্যে স্বরস্থাপনা করিতে বলেন আবার কেহ বা স্বরসমূহ শ্রুতির অন্তে বসাইতে বলেন। কাহারও সহিত কাহারও মতের মিল নাই এবং ইহা লইয়া সুধীসমাজে বিশেষ বাগ্‌বিতণ্ডা দৃষ্ট হয়। এই সকল মতদ্বৈধ হেতু এই বিষয় সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে কালজ্ঞান ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নাই। আর্য্যাদিবায় কালচক্র সহায়ে কালজ্ঞান বিনা কোন আর্য্যশাস্ত্র বোঝা যায় না। এই কালজ্ঞানের অভাব হেতু এত মতদ্বৈধ। সঙ্গীতে পণ্ডিতগণ আমাদের বৈদিক কালচক্রে কি নির্দ্দেশ করেন তাহা বুঝিতে প্রয়াসী হন না। কালজ্ঞান সহায়ে বুঝিতে চেষ্টা করিলে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না ও চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায়। সেই হেতু কালচক্রের সাহায্য পাওয়া সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হয়।

কালচক্রে মেষরাশি অবস্থিত প্রথম নক্ষত্র হইল অশ্বিনী। অশ্বিনী হইল সংজ্ঞা সুত। সংজ্ঞা উৎপন্ন না হইলে স্বর শ্রুত হইয়াছে বলা যায় না। সঙ্গীতের প্রথম শ্রুতি হইল তীব্রা। তীব্র কথাটী তীব্‌ ঋতু হইতে উৎপন্ন। তীব্‌ অর্থে স্থূল হওয়া। প্রাণের বিকাশ নিমিত্ত স্থূল হইয়া বৈখরী বাকের উৎপত্তি। ইহাই হইল সঙ্গীতের প্রথম শ্রুতি।

দ্বিতীয় নক্ষত্র হইল ভরণী। ইহার দেবতা যম— যাহা সংযমনী শক্তি নির্দ্দেশ করে। প্রাণবায়ুর সংযমন ভিন্ন স্বরোৎপত্তি হয় না। দ্বিতীয় শ্রুতি হইল কুমুদ্বতী। কু অর্থে পৃথিবী, শরীর। যারা সংযমন হেতু দেহকে মুদ্‌ অর্থাৎ হৃষ্ট করে তাহাই কুমুদ। ইহাই হইল সঙ্গীতের দ্বিতীয় শ্রুতি।

তৃতীয় নক্ষত্র হইল কৃত্তিকা। ইহার দেবতা অগ্নি। সংযমন হেতু অগ্নি উৎপন্ন হইয়া যাহা ধ্বনির মৃদুগতি দান করে তাহাই তৃতীয় শ্রুতি মন্দা। ইহা সকলেরই জানা আছে যে কালরূপী শনিগ্রহের অপর একটী নাম মন্দা। তৃতীয় নক্ষত্রের উদয়কালে ধ্বনিষ্ঠা নক্ষত্র মস্তকোপরি বিদ্যমান থাকে। ইহা চন্দ্রের জন্ম নক্ষত্র এবং চন্দ্রই মন।

বৃষরাশিস্থ চতুর্থ নক্ষত্র হইল রোহিণী যাহা আরোহণ ও অবরোহণ ক্ষমতা প্রদান করে। রোহিণীর দেবতা হইল প্রজাপতি যাহা বিশেষ করিয়া প্রজননকরায় বীজরোপণ নিমিত্ত। ইহাও চন্দ্রের জন্মনক্ষত্র। চন্দ্র আহ্লাদ কারক। তাই চতুর্থ শ্রুতি হইল ছন্দোবতী। ছন্দঃ শব্দটী চন্দ্‌ আহ্লাদিত করা বা ছন্দ্‌ আচ্ছাদন করা পূর্ব্বক অচ্‌ প্রত্যয়ে সিদ্ধ। শ্রবণ মননে যাহা প্রীতিপ্রদ তাহাই ছন্দ।

পঞ্চম নক্ষত্র হইল মৃগশিরা। ইহার দেবতা চন্দ্র। মৃগশিরা মার্গ ও দয়া নির্দ্দেশ করে। মার্গ সঙ্গীতে পঞ্চম শ্রুতি হইল দয়াবতী।

ষষ্ঠ নক্ষত্র হইল আর্দ্রা। ইহা মিথুন রাশিতে অবস্থিত। ইহার দেবতা হইল রুদ্র। যাহা পীড়াদায়ক হইতে পারে এবং পীড়া হইতে ত্রাণ করিতে পারে। যখন পীড়া হইতে ত্রাণ করিয়া আনন্দদায়ক ও প্রীতিকারক হইয়া অর্পিত করে তখনই ষষ্ঠ শ্রুতি রঞ্জনী। রঞ্জ অর্থে রং করা।

সপ্তম নক্ষত্র হইল পুনর্বসু। ইহার দেবতা হইল অদিতি। ইহা মিথুন রাশিতে অবস্থিত হেতু রমণ ক্রিয়ার জ্ঞাপক। সপ্তম শ্রুতি হইল রতিকা। রম্+ক্তি করিয়া রতি কথাটী উৎপন্ন।

অষ্টম নক্ষত্র পুষ্যা কর্কট রাশিতে অবস্থিত। ইহার দেবতা হইল বাচস্পতি বৃহস্পতি। অন্তঃজ্ঞানের নিমিত্ত ধ্বনির পুষ্টি। জ্ঞান দেবতা রুদ্র। অষ্টম শ্রুতি হইল রৌদ্রী।

নবম নক্ষত্র হইল অশ্লেষা। ইহাও কর্কট রাশিতে অবস্থিত। ইহার দেবতা সর্পা। নবম শ্রুতি হইল ক্রোধা। ইহার পরিচয় বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। সর্প কথাটী সৃপ্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। অর্থ হইল সরে সরে যাওয়া। এইখানেই ধ্বনির শ্লীষ্টগতির উপর লক্ষ্য হইল।

দশম নক্ষত্র হইল মঘা। ইহা সিংহ রাশিতে অবস্থিত। ইহার দেবতা পিতৃগণ। বেদে ইন্দ্রই পিতা এবং ইন্দ্রের একটা নাম মঘবন্। ইন্দ্রের অস্ত্র হইল বজ্র। বজ্র কথাটী বজ্ ধাতু অর্থে গমন করা—রক্। ইহা গতি নির্দ্দেশ করে। পূর্ব্বপুরুষের যাহাদের গতি ঘটিয়াছে তাহারাই পিতৃগণ। এইখানেই পূর্ব্ব সম্বন্ধ ধরিয়া গতির নির্ণয়। সেই কারণ দশম শ্রুতির নাম বজ্রিকা।

একাদশ নক্ষত্র হইল পূর্ব্বফাল্গুনী। ইহাও সিংহ রাশিতে অবস্থিত। ইহার দেবতা হইল ভগ। ইহা বাচস্পতি বৃহস্পতির জন্মনক্ষত্র। ইহাও বিস্তার, প্রসারণ, গমন, নির্গমন আদি নির্দ্দেশ করে। ভগ অর্থে ওষ্ঠও বোঝায়। রবের প্রসার নিমিত্ত একাদশ শ্রুতির নাম প্রসারিণী।

দ্বাদশ নক্ষত্র হইল উত্তরফাল্গুনী। ইহার দেবতা অর্যমা। যাহার নিকট অর্থী যাচ্ঞা করে। অর্যমা পিতৃজাতি ও কালধর—যাহা তর্পণ হেতু তৃপ্তি দান করে, ভোগ উৎপন্ন করে তাহাই অর্য্যমা। দ্বাদশ শ্রুতির নাম প্রীতি।

ত্রয়োদশ নক্ষত্র হইল হস্তা। ইহা কন্যারাশিতে অবস্থিত। ইহার দেবতা সবিতৃ। রব যখন প্রসবিত হইয়া পরিষ্কৃত ও শোভিত হয় তখনই ত্রয়োদশ শ্রুতি মার্জ্জনী। মার্জ্জনা অর্থে শোধন ও মৃদঙ্গধ্বনি।

চতুর্দ্দশ নক্ষত্র হইল চিত্রা। দেবতা ত্বষ্টা। যাহা ক্ষয় করিয়া বিচিত্রতার উৎপাদক তাহাই ত্বষ্টা। ইহাই বিশ্বকর্ম্মার ক্রিয়া। চতুর্দ্দশ শ্রুতি হইল ক্ষিতি। ক্ষিতি কথাটী ক্ষি ধাতু হইতে উৎপন্ন। ক্ষি অর্থে—ক্ষয় বা বাস করা। এইখানেই বিচিত্রতার উদয়।

পঞ্চদশ নক্ষত্র হইল স্বাতী। ইহা তুলারাশিতে অবস্থিত। স্বয়মেব আচরতি ইতি স্বাতী। ইহার দেবতা বায়ু। বায়ুভুক্ত ধ্বনি যখন মধুর সুশ্রাব্য হইয়া আসক্ত ও অনুরক্ত করে তখনই পঞ্চদশ শ্রুতি রক্তা। রক্তা কথাটী রনজ্ ধাতু অর্থে—রঞ্জন করা হইতে সিদ্ধ।

ষোড়শ নক্ষত্র হইল রাধা। যাহা আসক্তি হেতু উদ্দীপনা ঘটায়। ষোড়শ শ্রুতির নাম হইল সন্দিপনী। এইখানেই ভাবের উদ্দীপনা দেখিতে পাওয়া যায়। রাধা নক্ষত্র কালচক্রে রবি অর্থাৎ রবের জন্মনক্ষত্র। ভাবের উদ্দীপনা ব্যতীত কোন রবই সঙ্গীতে উদ্দীপনা সৃষ্টি করিতে পারে না। রবি হইতে রবের বিচার।

সপ্তদশ নক্ষত্র হইল অনুরাধা। ইহা বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থিত। ইহার দেবতা মিত্র। যাহা বিশেষ করিয়া পরিচয় প্রদান করে। মিত্র কথাটী মিদ্ ধাতু অর্থে স্নেহ করা হইতে উৎপন্ন। সপ্তদশ শ্রুতি হইল আলাপিনী। আলাপ কথাটী লপ্ ধাতু অর্থে ভাষন ও কথন হইতে উৎপন্ন। অনুরাধা নক্ষত্র হইল রবির জন্ম নক্ষত্র।

অষ্টাদশ নক্ষত্র হইল জ্যেষ্ঠা। ইহাও বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থিত। ইহার দেবতা ইন্দ্র। যাহা ইন্দ্রিয়ের প্রীতি নিমিত্ত মনকে মত্ত করে তাহাই অষ্টাদশ শ্রুতি মদন্তী। মদ্ ধাতুর অর্থে মত্ত করা।

ঊনবিংশ নক্ষত্র হইল মূলা। ইহা ধনুরাশিতে অবস্থিত। ইহার দেবতা নির্ঋতি। যাহার নিশ্চয়রূপে

করিবার ক্ষমতা থাকে তাহাই নিঋতি। শ্রুতির রোপণ আরোহণ ও অবরোহণ হেতুই এই বন্ধন ঘটে। উনবিংশ শ্রুতি হইল রোহিণী।

বিংশ নক্ষত্র হইল পূর্ব্বাষাঢ়া। ইহাও ধনুরাশিতে অবস্থিত। ইহার দেবতা তোয়া। যাহা বিস্তার শক্তি নির্দ্দেশ করে। বিস্তার হেতু বিংশ শ্রুতি রমণ যোগ্যা হইয়া রম্যা নাম লাভ করে। বিস্তারেই প্রতিষ্ঠা। সেই জন্য স্থলপদ্মের নাম রম্যা। রম্যা রাত্রিকেও বুঝায়। রমণ যোগ্য কালই রাত্রি।

একবিংশ নক্ষত্র হইল উত্তরাষাঢ়া। ইহার দেবতা বিশ্বদেব যাহা প্রবেশের ক্ষমতা প্রদান করে। এই কারণেই একবিংশ শ্রুতির নাম উগ্রা। যাহার তীব্রতা ও প্রখরতা হেতু বিশেষ করিয়া প্রবেশ শক্তি লাভ করে।

দ্বাবিংশ নক্ষত্রের নাম শ্রবণা। ইহা মকর রাশিতে অবস্থিত। ইহার দেবতা বিষ্ণু, যাহার ত্রিপাদ হেতু গতি বুঝায়। দ্বাবিংশ শ্রুতি হইল ক্ষোভিণী। ক্ষোভিত অর্থে চালিত, আন্দোলিত, ধর্ষিত ইত্যাদি। ইহার শক্তিতেই ভাবের আলোড়ন ঘটে।

আর্য্যসঙ্গীতে দ্বাবিংশ শ্রুতির সহিত কালচক্রে কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহা বুঝান হইল। এই শ্রুতি অবলম্বনেই আর্য্য সঙ্গীতে ভাব ও রসের বিকাশ।

ইহার পর এই শ্রুতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পরে করিবার বাসনা রহিল। [ক্রমশঃ

শ্রীবিমলকুমার সুর

অগ্রহায়ণ মাস কেমন যাবে ?

অগ্রহায়ণ মাসের গ্রহ সন্নিবেশ সাধারণের পক্ষে শুভকর নয়। বিশেষ করে যাঁদের আশ্বিন বা চৈত্রমাসে জন্ম তাঁদের ঝঞ্ঝাট ঝামেলা পোহাতে হবে বেশ খানিকটা। রবিগ্রহ বরুণগ্রহের বিপজ্জনক সামীপ্যে আসায় অনেক দেশের রাজশক্তিকে অনেক না জানা ঝঞ্ঝাট অসুবিধার আবর্তে এসে দিক্‌ভ্রান্তি ব্যতীত অনিশ্চিত দুরবস্থায় কাল কাটাতে হবে, বলে আশঙ্কা করা যায়। মঙ্গল প্রজাপতি শনি রাহু প্রভৃতি অশুভকর গ্রহগণ তাঁদের সহাবস্থান ও বৈর দৃষ্টির জন্য নানান্ স্থানে নানান্ ভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে। কাজেই অগ্রহায়ণ মাসে শীতের আমেজ পাওয়ার আনন্দ কতটা পাওয়া যাবে তা দেখবার কথা।

এখন ব্যক্তিগত যাঁর যে মাসে জন্ম, সেই হিসাবে যোগাযোগ লিখিত হইল।

বৈশাখ

ব্যয় বাহুল্য এমন কি ঋণগ্রহণ করতে বাধ্য হবার অবস্থাও অনেকে সম্মুখীন হবেন। জমা টাকার জমাট বাঁধিয়ে রাখা শক্ত। কয়েক থাবল তার উপর পড়ে কিছুটা হাল্কা হতে পারে। শত্রুনাশ হবে, তবে শত্রুপীড়ার দুর্ভোগ তার সঙ্গে কিছু-না-কিছু থাকবেই। বন্ধু ও পত্নীসংক্রান্ত মন্দ নয়। সন্তান স্থান কতকটা পীড়িত। বিদ্যাচর্চায় মন বসান শক্ত।

জ্যৈষ্ঠমাস

সন্তান স্থান মোটেই ভাল নয়। তাদের উপর অনেক দুর্ভোগ হঠাৎ এসে যেতে পারে। আয়ের দিক ভাল দেখি। কিন্তু আয়ের ধকল পোহাতে হবে শরীর দিয়ে। উদ্বেগটা সামলাবার চেষ্টা করবেন। একাগ্রতার বিশেষ অভাব হবে। নিজেও দুঃসাহস করে বিপদে লাফিয়ে পড়তে পারেন। বন্ধুস্থান ভাল।

আষাঢ় মাস

সাংসারিক বিশৃঙ্খলায় অস্থির হয়ে পড়বেন। মাতা জীবিত থাকলে এবং বৃদ্ধা হলে জীবনসত্তা আছে। সাধারণ ভাবে মাতার শারীরিক, মানসিক দুর্ভোগ হবে। বন্ধুদেরও বিপদ্ কম নয়, তাঁদের কাছ থেকে উপযুক্ত সাহচর্য্য এবং সাহায্য পাওয়া শক্ত। কর্মে ঝঞ্ঝাট খুবই। দায়িত্ব তো মাথায় অনেকদিন থেকেই রয়েছে। সন্তান সংক্রান্ত ভাল।

শ্রাবণ

টাকাপয়সা ভাল রোজগার করতে পারবেন। হঠাৎ ধনপ্রাপ্তিও হতে পারে। আবার পাওনা টাকা আদায় করতে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হবে। জ্ঞাতি-আত্মীয় সংক্রান্ত সুখের অভাব। ভ্রাতা ভগ্নীদের নানাবিধ অসুবিধা এমনকি বিপদ্‌ও ঘটতে পারে। সন্তানস্থানও সুবিধের নয়। নিজের বাহুতে আঘাত প্রাপ্তি হতে পারে। ছোটখাটো ভ্রমণ avoid করবেন।

ভাদ্র

অর্থনাশ অত্যন্ত। গলদেশের কোন অসুস্থতা হতে পারে, বিশেষ করে যাদের গলদেশ দুর্বল। আমোদাদিতে মনের ঝুঁকতি বেশী দেখা যায়। কাজেই কাজের ক্ষতি হতে পারে। বন্ধুপ্রীতি বাড়তে পারে এবং তাদের জন্য নিজের অসুবিধা পর্য্যন্ত ভোগ করতে হতে পারে। তাঁদের স্বাস্থ্যও প্রশংসনীয় দেখি না।

আশ্বিন

নানান্ ঝঞ্ঝাট না ভোগ করে উপায় নাই। মাথা গরম করবেন না। ধৈর্য্যই একমাত্র সম্বল। দৈবাশ্রয়ে বিশ্বাস থাকলে আরো ভাল কথা। অর্থ রোজগার খারাপ হবে না অনেক ঝঞ্ঝাট পোহালেও প্রতিষ্ঠা বজায় থাকবে বলে মনে করি।

কার্ত্তিক

অত্যধিক ব্যয় বাহুল্য। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল থাকবেনা। আয় ভাল হবে, কিন্তু ব্যয় বাহুল্য হেতু সেটা বিশেষ অনুভব করতে পারবেন না। আপনি কর্ম্মে তৎপর থাকতে পারবেন। আত্মীয়-স্বজন নিয়েও মানটা বেশী কাটতে পারে। বুদ্ধি স্বচ্ছ থাকবে. সাংসারিক ঝঞ্ঝাট ভোগ করতে হবে। সন্তান স্থানও সুবিধের নয়।

অগ্রহায়ণ

কর্ম্মযোগ্যতা দেখাতে পারবেন। অর্থ ভাগ্যও ভাল। রোজগার উত্তম। সন্তানস্থান ততটা ভাল নয়। উদর পীড়া ভোগ হতে পারে। নিজের বিদ্যাভ্যাসেও বাধা বিঘ্ন চলবে। সাহস সহকারে সামাজিক ও জনসাধারণের কাজে এগিয়ে যেতে পারেন। নিজেকে ছোট গণ্ডীর মধ্যে না রেখে বড় কর্ম্মক্ষেত্রে থাকলে আপনারই ভাল।

পৌষ

কর্ম্মে যোগ্যতা দেখাতে পারবেন। আয় ভালই হবে। মাতার স্বাস্থ্য ভাল দেখিনা। পিতৃদেবও বহু অসুবিধা ভোগ করতে পারেন। উপযুক্ত সন্তান থাকলে কিছুটা কৃতিত্ব দেখাতে পারে। বাড়ীঘর জমিজমা সংক্রান্ত কিছু আগ্রহ থাকলে চেষ্টা করে যাবেন।

মাঘ

কর্ম্মস্থান ভাল, তবে বদলী হতে পারেন। নিজের প্রতিষ্ঠা ঠিক থাকবে। আয় ভালই হবে, তবে সহজে নয়। সঙ্গীতাদি কলাবিদ্যায় অনুরাগ থাকলে, করুন ভাল করে। আত্মীয় স্বজনের জন্য মনটা ত গড়েই আছে। কিন্তু সে কারণে কতকটা অশান্তি ভোগ করতেই হবে।

ফাল্গুন

অর্থব্যয় চলবে, আগের চেয়ে বাড়বে তো কমবে না। আয় অবশ্য ভাল দেখি। ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি হবে। কর্ম্মে যোগ্যতাও দেখা যায়। ঝঞ্ঝাটও কিন্তু অনেক পোহাতে হবে। ভ্রাতা ভগ্নীদের কেহ বিপজ্জনক অবস্থায় পড়তে পারেন।

চৈত্রমাস

আপনার ঝঞ্ঝাট চলছেই। বরং অধিকতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভোগ করতে হতে পারে। পতি পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল দেখি না। সন্তান স্থান মোটামুটি। সাংসারিক বিশৃঙ্খলা অল্প স্বল্প হবে। সে জন্য চিন্তার কারণ নাই। যতটা সম্ভব সহযোগিতা করে নিজের কাজ গুছিয়ে নিন, তাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেকটা কমে যাবে।

স্বামী অসীমানন্দ—

পুরুলিয়া জেলার রামচন্দ্রপুর বিজয়কৃষ্ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী ৬৫ বৎসর বয়সে গত ১০ই আগষ্ট রাত্রিতে স্বর্গলাভ করিয়াছেন। তিনি ঐ অঞ্চলের এক ক্ষুদ্রগ্রামে দরিদ্র পরিবারের সন্তান। নাম ছিল সনৎ কুমার চক্রবর্তী। স্কুলে ভাল ছেলে থাকিলেও অতি অল্প বয়সেই মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করায় তাঁহার উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ হয় নাই। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি সমগ্র পুরুলিয়া জেলার আন্দোলনের নেতা হন এবং পরপর কয়েকবার কারাবরণ করেন। ঐ সময়ে তিনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়া বেদ, উপনিষদ, গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি বিষয়ে বাংলা ভাষায় কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

পরে মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র প্রভৃতির জীবনী লইয়া কয়েকখানি রাজনৈতিক গ্রন্থও রচনা করেন। তাঁহার লেখা আত্মজীবনী ও কয়েকখানি ভ্রমণ কাহিনী উপন্যাসের মতই সুখপাঠ্য। তিনি সর্বপ্রথম নেতাজীকে পুরুলিয়া জেলায় লইয়া যান ও জেলার নানা স্থানে তাঁহাকে দিয়া বক্তৃতা করান।

১৯৪২ এর আন্দোলনে বৃটিশ পুলিশের নির্য্যাতন তাঁহাকে মৃতপ্রায় করিয়াছিল এবং তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া নদীর ধারে ফেলিয়া দিয়াছিল। পরবর্তীকালে অন্নদা চরণ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য কবি সন্ন্যাসী কিরণচাঁদ দরবেশ এর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং রামচন্দ্রপুরে তিনদিকে পাহাড়ে ঘেরা জঙ্গলপূর্ণ একটি শ্মশানে বিজয়কৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

গত ১০ বৎসরের মধ্যে বহুবার ঐ আশ্রমে বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনে কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের শত শত সুধী সাহিত্যিক যোগদান করিয়াছেন এবং সকলকে তিনি পরম সমাদরে আহার ও বাসস্থান দান করিয়াছেন। নিজে লেখক বলিয়া সাহিত্যিকগণের প্রতি তাঁহার আন্তরিক প্রীতি ছিল।

আশ্রমে তিনি 'নেতাজী চক্ষু চিকিৎসালয়' নামে এক শত শয্যা বিশিষ্ট এক হাসপাতাল স্থাপন করিয়াছেন এবং তথায় একটি আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইয়াছে।

তিনি শতাধিক শিষ্য সঙ্গে লইয়া পদব্রজে একবার বৃন্দাবন, একবার পুরীধাম ও শেষবারে নবদ্বীপ গমন করিয়াছিলেন। পথে তাঁহারা নাম সঙ্কীর্তন করিতেন ও ভিক্ষালব্ধ অর্থে নিজেদের ভরণপোষণ করিতেন।

স্বামীজী একাধারে রাজনীতিক, সাহিত্যিক ও গঠনমূলক কর্মী ছিলেন। তাঁহার মত অক্লান্ত পরিশ্রমী সত্যনিষ্ঠ ধর্ম্মপ্রাণ লোক আজিকার জগতে বিরল। আমরা দেশবাসীর নিকট প্রার্থনা জানাই সকলের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা যেন স্বামীজীর আশ্রমকে অধিকতর সমৃদ্ধিশালী করিয়া তোলে।

অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায়—

বাংলার অন্যতম কৃতি সন্তান ডঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় গত ২৪শে আগষ্ট তাঁহার কর্মস্থল উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌ শহরে ৮০ বৎসর বয়সে এক সভায় বক্তৃতা করার সময় হঠাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার লোক, ও জীবনের প্রথম হইতে অসাধারণ প্রতিভার জন্য ভারতের সর্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছিলেন।

বহুদিন তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। তিনি ও তাঁহার অগ্রজ অধ্যাপক ৺রবিকুমার মুখোপাধ্যায় একই সময়ে ভারতের দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার হইয়াছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি অর্থনীতি সম্বন্ধে 'দরিদ্রের ক্রন্দন' নামে পুস্তক রচনা করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তাহার পর ইংরাজী ভাষায় তাঁহার ব বই প্রকাশিত হইয়াছে।

নির্ব্বাচন পিছাইয়া গেল—

পশ্চিমবঙ্গের অন্তবর্ত্তীকালীন সাধারণ নির্ব্বাচনের তারিখ নভেম্বর মাস হইতে পিছাইয়া ফেব্রুয়ারী মাসে ধার্য্য করা হইয়াছে। জলপাইগুড়ি, সিলিগুড়ি, দার্জিলিং প্রভৃতি জেলায় অপ্রত্যাশিত ও অভূতপূর্ব্ব বন্যার জন্যই এই তারিখ বদল করা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষও এই নির্ব্বাচন পিছাইয়া যাওয়ার যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছেন। রাজনৈতিক দলাদলি, অরাজকতা ও শান্তিভঙ্গ জনসাধারণের কেহই পছন্দ করেন না। নির্বাচনের সময় ঐ সকল সম্ভাবনা থাকায় সাধারণ লোকে শঙ্কিত হইয়াছিলেন। রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁরা যেন ফেব্রুয়ারী মাসের অন্তর্বর্তী নির্ব্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হইতে দেন।

বন্যায় সাধারণ দেশবাসীর কর্ত্তব্য—

এ বৎসর অতিবর্ষণ ও বন্যায় পশ্চিমবঙ্গে জলপাইগুড়ি সিলিগুড়ী, দার্জিলিং ও মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, বীরভূম, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পশ্চিমদিনাজপুর প্রভৃতি বহু জেলায় বহু মানুষের প্রাণহানি, কোটি, কোটি টাকার বাসগৃহ নষ্ট এবং বহু লক্ষ বিঘা জমির ফসল নষ্ট হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার অর্থাদি দান করিয়া বন্যার্ত্তদের দুঃখদুর্দশা দূর করিতে অগ্রসর হইয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল দুর্গত মানুষদের সকল প্রকারের সাহায্য করিবার জন্য দেশবাসীর প্রতি আবেদন জানাইয়াছেন।

১৩২০ সালে বর্দ্ধমানের বন্যায় জেলার একটি থানা নষ্ট হইয়া গেলে সারা দেশের তরুণের দল তাহাদের সাহায্য করিতে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং পরবর্তী কালে তাহাদের দ্বারা দেশে জাতীয়তাবাদ প্রচার সহজ হয়। তাহার ১০ বৎসর পরে উত্তর বঙ্গে দারুণ বন্যার পর আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু প্রভৃতির নেতৃত্বে দেশের যে সকল কর্ম্মী বন্যার্ত্তদের সাহায্যে শক্তি সামর্থ্য দান করিয়াছিল তাহাদের অনেকেই পরে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে সৈনিক হইয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে দেশবাসী তরুণের দলের ও বন্যা সাহায্য উপলক্ষ্য করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সারা দেশের অর্থ, বস্ত্র, সম্ভব হইলে খাদ্যাদি সংগ্রহে তৎপর হওয়া উচিত। আজ পশ্চিমবঙ্গের তরুণদিগের মধ্যে যে সঙ্ঘবদ্ধতা ও শৃঙ্খলার অভাব দেখা যাইতেছে তাহা দূর করিবার জন্য জনসেবার মধ্য দিয়া সকলের কাজে যোগদান করা প্রয়োজন।

রাজনীতির দলাদলিতে যুবকের দল আজ বিভ্রান্ত। কাজেই বন্যা সাহায্যের মত অরাজনৈতিক কাজের মধ্যদিয়া আমাদের সকলকে অধিকতর মেলামেশা করার সুযোগ গ্রহণ করা উচিত।

ছিটমহল সমস্যা

১৯৪৭ সালে তাড়াতাড়ি যখন পূর্ব্বপাকিস্থানকে বাংলাদেশ হইতে আলাদা করা হয় তখন সীমান্ত সমস্যা ভাল করিয়া সমাধান হয় নাই। তাহার পর গত ২১ বৎসর ধরিয়া পূর্বপাকিস্থান কর্ত্তৃপক্ষের সহিত পশ্চিমবঙ্গের কর্ত্তারা বৈঠকে মিলিত হইয়া এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু গত ১৪ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ পূর্বপাকিস্থানের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১২৩টি ছোট ছোট স্থান আছে। এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পূর্ব্বপাকিস্থানের ৭৪টি ছোট ছোট এলাকা আছে। এগুলির বিনিময় এখনও সম্ভব হয় নাই। এই ছোট ছোট জায়গাগুলিকে ছিটমহল বলা হয়।

কুচবিহারের নিকট বেরুবাড়িতে উভয় দেশের সীমানা চিহ্নিত করিবার সময় এই সকল তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। এই ১২৩ ও ৭৪টি ছিটমহলের অধিবাসীদিগকে গত ২১ বৎসর ধরিয়া নানা অসুবিধার মধ্যে বাস করিতে হইতেছে।

জহরলাল নেহরুর সহিত পাকিস্থানী নেতা ফিরোজ খাঁ নুনের এবিষয়ে যে চুক্তি হইয়াছিল তাহাও পাকিস্থান কর্ত্তৃপক্ষের অন্যায় জেদের ফলে কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। যুদ্ধ ব্যতীত এই সমস্যা সমাধানের অন্য কোন উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না।

পাকিস্থান চীনের সাহায্য পাইবার আশায় সর্বদাই ভারতের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। কিন্তু শান্তিকামী ভারত যুদ্ধ চায়না। কারণ যুদ্ধ বাধিলেই অযথা কোটী কোটী মানুষ মারা যাইবে ও কত কোটী টাকা খরচ হইবে তাহার হিসাব নাই!

রাষ্ট্রসঙ্ঘের নেতারাও রাশিয়া বা আমেরিকা বা ইংলণ্ড কেহই অগ্রসর হইয়া এই বিরোধ মিটাইতে আসিতেছেন

না। কারণ তাঁহারা জানেন, বিরোধ বাধিয়া থাকিলে তাঁহারা নিজে নিজে নানা দিক দিয়া উপকৃত হইবেন। তাঁহারা উভয় দেশকেই টাকা ধার দিয়াও যুদ্ধের সরঞ্জাম সরবরাহ করিয়া সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কাজেই ভারত পাকিস্থান সমস্যার কোনদিনই সমাধান হইবে বলিয়া মনে হয় না।

আসাম পুনর্গঠনে সঙ্কট—

আসাম উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত বলিয়া এবং ঐ রাজ্যে নাগা, কুকী প্রভৃতি বহু ধরণের বহু পার্বত্য জাতি বাস করে বলিয়া তথায় প্রশাসন সঙ্কট লাগিয়াই আছে। মণিপুর ও ত্রিপুরা পূর্বেই দুইটি ছোট ছোট রাজ্যে পরিণত হইয়াছে এবং ভারত গভর্নমেণ্টের অধীনে ঐ দুই রাজ্যে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন শাসন ব্যবস্থা চলিতেছে।

আসামে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে কয়েকটি পার্বত্য অঞ্চল লইয়া নেফা নামে (নর্থ ইষ্টার্ন ফ্রণ্টইয়ার এজেন্সী) একটি স্বতন্ত্র রাজ্য গঠিত হইয়া স্বাধীন শাসন ব্যবস্থা পরিচালনায় আছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মধ্য আসামেও কয়েকটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাজ্য গঠন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কেন্দ্রের মন্ত্রীসভায় আসামের প্রতিনিধি আছেন। তিনি ও কেন্দ্রের অন্যান্য মন্ত্রীরা শ্রীমতী গান্ধীর প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন। কিন্তু আসামের প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা ঐ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিরোধী। মুখ্যমন্ত্রী চালিহা প্রধানমন্ত্রীকে আসাম মন্ত্রীসভার অভিমত জানাইয়া দিয়াছেন। আসামের কংগ্রেস মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমতী গান্ধী যদি জোর করিয়া আসামে তাঁহার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে যান তাহা হইলে আসামে কংগ্রেস সংগঠন ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং দেশে অশান্তি সৃষ্টি হইবে।

আসামে বহু মুসলমান বাস করে ও তাহার ফলে প্রায়ই হিন্দু মুসলমান বিবাদ প্রকট হইয়া পড়ে। পার্ব্বত্য জাতি সমূহের স্বাধীনতা প্রাপ্তির আন্দোলন তো আছেই। যদি বিরোধ ক্রমেই বাড়িয়া চলে তাহা হইলে ব্রহ্ম ও চীন প্রভাবে আসাম ভারতের হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারে। আজ এই সমস্যার সমাধানে প্রধান মন্ত্রীকে একদিকে যেমন দৃঢ়তার সাহিত কাজ করিতে হইবে অন্যদিকে তেমনি ধীর ও স্থির হইয়া সকলকে সন্তুষ্ট হইয়া চলিতে হইবে। আমাদের বিশ্বাস শ্রীমতী গান্ধীর শক্তি ও বুদ্ধি তাঁহাকে এ বিষয়ে সুপথ প্রদর্শন করিবে।

ভারত-চীন সম্পর্ক সমস্যা—

ভারতবর্ষের একাংশ পাকিস্থানে পরিণত হইবার পর হইতেই পাকিস্থানের সহিত চীনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হওয়ায় এবং রাজনীতিতে ভারত ও চীনের মত সম্পূর্ণ বিপরীত থাকায় ভারতের সহিত চীনের সম্পর্ক সংস্থা দিন দিন সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম পাকিস্থান বিদেশের সাহায্য লইয়া ভারত আক্রমণ করিয়া কিছুই লাভবান হইতে পারে নাই। চীনারা পাহাড় ও জঙ্গলপূর্ণ তিব্বতদেশ আক্রমণ ও অধিকার করিয়া পাঁচ বৎসর পূর্বে ভারতকে আক্রমণ করিতেও সাহসী হয়। কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষ পূর্ব হইতে শক্তি সঞ্চয় করায় চীনাদের হটাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে।

ভারত ও চীন পাশাপাশি রাজ্য। উভয় দেশের প্রাচীন সংস্কৃতিতে মিলও আছে। এক সময়ে ভারত যেমন চীনদেশে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য লোক পাঠাইত চীনারাও নানাকারণে ভারতের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করিত। চীন এখন পৃথিবীর সভ্য ও সমৃদ্ধি দেশসমূহের অন্যতম। ভারত, আমেরিকা বা সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত বন্ধুত্ব বজায় রাখিয়া নানাভাবে উপকৃত হইয়াছে। চীনের সহিত বন্ধুত্ব পুনরায় স্থাপিত হইলে চীন ও ভারত উভয় দেশই লাভবান হইবে।

গত ৫ই সেপ্টেম্বর বিদেশী সাংবাদিকদের এক সভায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সেই সম্পর্কে স্থাপনের কথা বলিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে চীনের বর্ত্তমান যুগের নেতা মাও সেতুং এবং চৌ এন লাই কলিকাতায় আসিলে আমরা। চীন; ভারত মিতালির পরিচয় দেখিয়াছিলাম। জহরলাল নেহরুও চীনদেশে যাইয়া উভয় দেশের মধ্যে সংস্কৃতি ও বাণিজ্যের বিনিময়ের জন্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন। ইন্দিরাজীর নূতন চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হউক ভারতের সকল লোক ইহাই কামনা করে।

বৈমানিক নির্মল চক্রবর্ত্তী—

২৪ পরগণা বেলঘরিয়া দেশপ্রিয় নগরের সোনার বাংলা পল্লীর অধিবাসী শ্রীবঙ্কিম চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠপুত্র

শ্রীনির্ম্মল চক্রবর্ত্তী মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে মস্কোতে বিমান দুর্ঘটনায় মারা গিয়াছেন। নির্ম্মল দরিদ্র পিতা, মাতার সন্তান। স্কুল ফাইন্যাল পাশ করিয়া বৈমানিকের কাজ শিক্ষা করেন এবং অল্পদিন পূর্বে বিমান বিভাগে উচ্চপদ লাভ করেন। তাহার মৃত্যুতে চারটি ছোট ভাই সমেত একটি বড় পরিবার দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

রাজপুরে "বিপ্লবী-নিকেতন"—

যাঁহাদের চেষ্টায় ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে তাঁহাদের একদল এখনও উপযুক্ত বাসস্থানের অভাবে কষ্ট পাইতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সরকার হইতে রাজনৈতিক পেন্সন পান বটে কিন্তু বাসস্থানের অভাবে কষ্ট পাইতেছিলেন। সম্প্রতি তাঁহাদের জন্য ২৪ পরগণার রাজপুর গ্রামে দেড়বিঘা জমির উপর একটি বড় বাড়ী নির্মিত হইয়া ২০ জন বৃদ্ধ বিপ্লবীর থাকার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বাড়ীটির উদ্বোধন উৎসবে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আচার্য্য রমেশচন্দ্র মজুমদার সভাপতি এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ধরমবীর প্রধান অতিথি ছিলেন। প্রায় শতবর্ষ বয়স্কা বাসন্তী দেবী অসুস্থতার জন্য যাইতে না পারায় একটি বাণী প্রেরণ করেন।

যে কুড়িজন সেখানে স্থান পাইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আচার্য্য জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। জ্যোতিষদার বয়স এখন ৯০ বৎসর। ১৯০০ সালে তিনি বিপ্লব আন্দোলনে যোগদান করেন এবং পরে কারাদণ্ডের ফলে তাঁহাকে সরকারী কলেজে অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করিতে হয়। তিনি হুগলী চুঁচুড়ার অধিবাসী। বিবাহ করেন নাই ও দেখাশোনা করিবার মত আত্মীয়স্বজনও নাই। শেষ বয়সে তিনি যদি শান্তিতে জীবন কাটাইতে পারেন তবে তাঁহার ভক্তগণ তাহা দেখিয়া আনন্দিত হইবেন।

আমরা মাত্র জ্যোতিষদার কথাই উল্লেখ করিলাম। ঐ বিপ্লবীই সকলেরই বয়স ৭৩ বর্ষ-এর অধিক; নানাস্থানে অসুবিধা ও কষ্টের মধ্যে দিন কাটাইতেছিলেন। তাঁহারা বিপ্লবী নিকেতনে স্থান পাইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

দেশের তরুণের দলকে অনুরোধ করিব তাঁহারা যেন ঐ বাড়ীটিকে তীর্থস্থান বলিয়া মনে করেন এবং মধ্যে মধ্যে তথায় যাইয়া বিপ্লবী বীরদের দর্শন করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে প্রেরণা লাভ করেন।

ব্যারাকপুরে নূতন কলেজ—

২৪ পরগণা জেলার ব্যারাকপুর মণিরামপুরে ভোলানন্দ আশ্রমটি ক্রমেই অধিক জনহিতকর কার্য্যে অগ্রসর হইতেছে, প্রথমে একটি ভাঙা মন্দিরের স্থানে তিনটি নূতন মন্দির নির্মিত হয়। তাহাতে যথাস্থানে (১। মহাদেব। ২। রাধাকৃষ্ণ ও ৩। ভোলাগিরি ও মহাদেবানন্দগিরির) মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূজা হইয়া থাকে। তারপর মন্দিরের সামনে গঙ্গার উপর একটি বৃহৎ বিদ্যালয় গৃহ নির্মিত হয়। তাহাতে একটি নিম্ন বুনিয়াদী, একটি উচ্চ বুনিয়াদী ও একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় চলিতেছে। আর একটি গৃহে বালিকাদের একটি উচ্চ বিদ্যালয় হইয়াছে। মন্দির হইতে নিকটে একটি গৃহে 'স্বামী বিশুদ্ধানন্দ ছাত্রাবাস' নামে একটি বাড়ী নির্মিত হইয়াছে।

আন্দামান প্রত্যাগত প্রসিদ্ধ বিপ্লবী ঋষিকেশ কাঞ্জিলাল পরবর্তী কালে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বামী মহাদেবানন্দ গিরির শিষ্য হন এবং বিশুদ্ধানন্দ গিরি নাম গ্রহণ করেন তাঁহার তিরোধানের পর ছাত্রাবাসটি তাঁহার নামে পরিচিত করা হয়। তাহাছাড়া নিকটে একটি সুবৃহৎ বাংলো ক্রয় করিয়া সেখানে একটি টেক্‌নোলজিক্যাল স্কুল হইয়াছে ও তথায় সিভিল, মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রীক্যাল ইঞ্জিনিয়ারীং বিদ্যায় ডিপ্লোমা দেওয়া হইতেছে।

প্রায় দুই বৎসর পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের গভর্ণমেণ্টের অর্থ সাহায্যে দুইশত অনাথ শিশুকে লইয়া একটি অনাথ আশ্রম খোলা হইয়াছে ও তাহার কাজ ভালভাবেই সম্পাদিত হইতেছে।

গত ১৫ই আগষ্ট আশ্রমের নিকটে একটি নব নির্মিত সুবৃহৎ গৃহে মহাদেবানন্দ 'মহাবিদ্যালয়' নামে কলেজের উদ্বোধন হইয়াছে। কলেজে প্রি-ইউনিভারসিটি ও ডিগ্রী কোর্সের শিক্ষা দেওয়া হইবে। সমস্ত কার্য্যের পিছনে আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী জ্যোতির্ম্ময়ানন্দ গিরি কাজ করিতেছেন। তাঁহার কর্ম্মনিষ্ঠা ও দিবারাত্রি পরিশ্রম সকল শিক্ষালয়গুলিকে ধীরে ধীরে অগ্রগতির পথে লইয়া যাইতেছে।

স্থানটি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসগৃহের পাশেই অবস্থিত। পূর্বে ঐ অঞ্চলে গঙ্গার ধারে শুধু কয়েকটি ইটখোলা ছিল। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু আগমনের ফলে বারাকপুরের ঐ অংশ এখন জনবহুল হইয়াছে। এখন আর পূর্বের মণিরামপুর গ্রামকে চেনা যায় না।

স্বামী জ্যোতির্ম্ময়ানন্দের প্রতিষ্ঠানগুলি শুধু মণিরামপুরের নহে, ঐ অঞ্চলের বহু গ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থার অভাব দূর করিবে সন্দেহ নাই।

সম্মানসূচক ডি. লিট উপাধি—

গত ২৪শে আগষ্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্ত্তন উৎসবে দুইজন কৃতী বাঙ্গালীকে সম্মানসূচক ডি. লিট উপাধি দান করা হইয়াছে। (১) ডাঃ নীলরতন ধর। ইনি যশোহর জেলার অধিবাসী। কিন্তু প্রায় সারাজীবন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের অধ্যাপক আছেন। ইনি পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী ৺জীবনরতন ধরের ও কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ ডি. আর. ধরের ভ্রাতা। বহু বৎসর পূর্বে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইলে সন্তানাদি না থাকায় তিনি তাঁহার সঞ্চিত প্রায় ১০ লক্ষ টাকা কৃষিশিক্ষার উন্নতির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়াছেন।

(২) খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার পরিচয়ের প্রয়োজন নাই। কয়েক মাস পূর্বে তিনি সর্ব্বভারতীয় 'জ্ঞানপিঠ' পুরস্কার পাইয়াছেন। যাহার মূল্য এক লক্ষ টাকা। তিনি ডি, লিট. উপাধি পাওয়ায় শুধু তাঁহার গৌরব বর্দ্ধিত হয় নাই, বাংলার সাহিত্যিক মাত্রই ইহাতে গৌরবান্বিত হইয়াছেন।

আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করিব তাঁহারা শ্রীদিলীপকুমার রায়, শ্রীকুমুদরঞ্জন, শ্রীকালিদাস রায়, ডঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), শ্রীপ্রবোধ কুমার সান্যাল, শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতিকে এইরূপ সম্মানসূচক উপাধি দান করিয়া বাংলার সম্মান বৃদ্ধি করুন।

এবারের বাংলা এম, এ, পরীক্ষার ফল—

ভাদ্র মাসের প্রথম সপ্তাহে ১৩৬৭ সালের বাংলা এম, এ, পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। এবার মোট চার জন ছাত্র-ছাত্রী প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে মাত্র একজন ছাত্র। প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন শ্রীমতী ছন্দা ঘোষ। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন শ্রীমতী রমা ভট্টাচার্য্য ৪৮৯ নম্বর লাভ করিয়া এবং ৪৮৮ নম্বর পাইয়া শ্রীমান বিমল কুমার চট্টোপাধ্যায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। রামধনু পত্রিকার সম্পাদক অধ্যাপক ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুচেতা চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য শ্রীমান্ বিমল কুমার বিখ্যাত চিকিৎসক ডক্টর প্রভাকর চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র এবং ভারতবর্ষ পত্রিকার নিয়মিত লেখক অধ্যাপক শ্যামল কুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতা। তিনি বর্তমানে উলুবেড়িয়া কলেজে অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। উত্তীর্ণ সকল ছাত্র-ছাত্রীকে তাঁহাদের কৃতিত্বের জন্য আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

বিজয়ী বাংলা

শ্রী'শ'—

ভারতীয় চলচ্চিত্রকে ভারত সরকার স্বীকৃতি ও সম্মান দান করেছেন রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রদান প্রথা প্রবর্তন করে। ১৯৫৪ সাল থেকে আরম্ভ করে প্রতি বৎসরই এই পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে সেই বছরের নির্ব্বাচিত শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রটিকে। এই পুরস্কার রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক। এর আর্থিক মূল্য ছাড়াও এর সম্মান মূল্য যে কত বেশী তা অনেকেই ধারণা করতে পারেন। এই বৎসর থেকে শ্রেষ্ঠ কাহিনীচিত্র ছাড়াও শ্রেষ্ঠ পরিচালক, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী প্রভৃতি অন্য নানা বিভাগে আরও পুরস্কার দেওয়া আরম্ভ হয়েছে।

এ পর্য্যন্ত যত চিত্র পুরস্কার লাভ করে ধন্য হয়েছে, তার মধ্যে বাংলা চিত্রের সংখ্যাই সব চেয়ে বেশী। বাংলা চিত্র যে ভারতের অন্য সব ভাষী চিত্র সকলের চেয়ে গুণানুসারে শ্রেষ্ঠ, তা এই সর্ব্বভারতীয় পুরস্কার বিজয়ের থেকেই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় এবং এর জন্য বাংলা চিত্র-নির্ম্মাতারা গর্ব্ববোধ করতে পারেন। আন্তর্জাতিক পুরস্কারও ভারতীয় চিত্রের মধ্যে বাংলা চিত্রই বেশী অর্জ্জন ক'রে বহির্বিশ্বে ভারতীয় চলচ্চিত্রের সম্মান বৃদ্ধি করেছে।

অত্যন্ত আনন্দের কথা যে এ বৎসরও একটি বাংলা কাহিনী-চিত্র এই শ্রেষ্ঠ চিত্রের সম্মানে ভূষিত হয়ে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করেছে। এই চিত্রটি হচ্ছে "হাটে বাজারে"। চিত্রটি পরিচালনা করেছেন শ্রীতপন সিংহ এবং এর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন অশোককুমার ও বৈজয়ন্তীমালা। চিত্রটির প্রযোজক হচ্ছেন শ্রীঅসীম দত্ত। প্রযোজক শ্রীদত্ত নগদ পুরস্কার হিসাবে পাবেন ২০,০০০৲ টাকা এবং পরিচালক শ্রীসিংহ পাবেন ৫,০০০ টাকা। কিন্তু এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান আবার লাভ করেছেন বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় চিত্র-পরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায় তাঁর "চিড়িয়াখানা" চিত্রটির সুযোগ্য পরিচালনার জন্য। তিনিও ৫,০০০৲ টাকা পুরস্কার পাবেন।

বাংলা চলচ্চিত্রামোদীদের সবচেয়ে আনন্দের কথা যে বাংলা চিত্রজগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক উত্তমকুমার এ বৎসর শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার জয় করেছেন তাঁর "এন্টনী ফিরিঙ্গী" ও "চিড়িয়াখানা" চিত্রে অনবদ্য

অভিনয়ের জন্য। শ্রীমতী নার্গিস্ লাভ করেছেন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার "রাত আউর দিন" চিত্রে অপূর্ব অভিনয়ের জন্য। আর একটি বাংলা চিত্র অরোরা ফিল্মস প্রযোজিত ও বিজয় বসু পরিচালিত "আরোগ্য নিকেতন" আঞ্চলিক পুরস্কার লাভ করেছে। এই চিত্রটির প্রযোজক পাবেন ৫,০০০৲ টাকা এবং পরিচালক পাবেন একটি রৌপ্য পদক।

কাহিনীচিত্র বিভাগে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী চিত্রকে পুরস্কার দেওয়া এই বৎসর থেকে আরম্ভ হয়েছে। এবার এই পুরস্কার লাভ করেছে হিন্দীচিত্র "উপকার"। এই চিত্রটির প্রযোজক শ্রীআর, এন, গোস্বামী পাবেন ৫,০০০৲ টাকা এবং পরিচালক শ্রীমনোজকুমার লাভ করবেন একটি রৌপ্য পদক।

শ্রীমহেন্দ্র কাপুর "উপকার" চিত্রে তাঁর নেপথ্য গানের জন্য শ্রেষ্ঠ 'প্লে-ব্যাক্' গায়কের সম্মান লাভ করেছেন এবং শ্রীএম, কে, মহাদেবন্ "কণ্ডণ করুনাই" ("Kandan Karunai") চিত্রের সঙ্গীতের জন্য শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালকের স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই বৎসর থেকেই শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রী, শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক, শ্রেষ্ঠ নেপথ্য গায়ক, শ্রেষ্ঠ 'সিনেমাটোগ্রাফী' প্রভৃতির জন্য পুরস্কার প্রদান আরম্ভ হয়েছে। এ ছাড়া শাদা-কালো ফোটোগ্রাফী ও রঙ্গীন ফোটোগ্রাফীর জন্য শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছেন যথাক্রমে শ্রীরামচন্দ্রন "বোম্বাই রাত কি বহোমে" চিত্রের জন্য এবং শ্রীএম, এন, মালহোত্রা "হামরাজ" চিত্রের জন্য। প্রত্যেক পুরস্কারেই নগদ ৫,০০০৲ টাকার এবং একটি ফলক পাবেন শ্রেষ্ঠ ক্যামেরাম্যান্। শ্রেষ্ঠ চিত্র-নাট্য রচনার পুরস্কার ৫,০০০ টাকা লাভ করেছেন শ্রীএস, ডি, ফুরাম সদানন্দন "অগ্নিপুত্রী" চিত্রের চিত্র-নাট্য লিখে।

প্রামাণ্য (Documentary) চিত্রের মধ্যে সাতটি চিত্র জাতীয় পুরস্কার লাভে সমর্থ হয়েছে। এর মধ্যে পাঁচটি চিত্র 'ফিল্ম ডিভিসন্' কর্তৃক নির্মিত। চিত্রগুলি হচ্ছে: "Through the Eyes of a Painter" (শ্রেষ্ঠ Experimental বা পরীক্ষামূলক চিত্র), "Sandesh" (শ্রেষ্ঠ promotion বা উন্নয়নমূলক চিত্র), "India 1967" (শ্রীএস, শুকদেব প্রযোজিত শ্রেষ্ঠ তথ্য চিত্র), "Akbar" (শ্রেষ্ঠ শিক্ষণীয় চিত্র) এবং "I Am 20" (শ্রেষ্ঠ সামাজিক প্রামাণ্য চিত্র)। এ ছাড়া "Inquiry" এবং "Brown Diamond" চিত্র দু'টিও পুরস্কার লাভ করেছে।

কেন্দ্রীয় কমিটি নয়টি বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষী চিত্রকে সুপারিশ করেছেন। এই সব চিত্রের পরিচালকদের রৌপ্য পদকের সঙ্গে এইসব চিত্রের প্রযোজকদেরও নগদ ৫,০০০৲ টাকা পুরস্কার হিসাবে এইবার থেকে দেওয়া হবে। এই চিত্রগুলি হচ্ছে: বাংলা—"আরোগ্য নিকেতন"(প্রযোজক: অরোরা ফিল্ম করপোরেশন্ এবং পরিচালক শ্রীবিজয় বসু)। হিন্দী—"হামরাজ" (প্রযোজক-পরিচালক: শ্রীবি, আর, চোপ্রা)। মারাঠি—"সন্ত বাহাতে কৃষ্ণমাই" (প্রযোজক: শাহকরী চিত্রপথ সংস্থা এবং পরিচালক এম, জি, পাঠক)। পাঞ্জাবী—"সুতলেজ্ ডি কাণ্ডে" (প্রযোজক-পরিচালক: শ্রীবি, পি মহেশ্বরী)। ওড়িয়া—"অরুন্ধতী" (প্রযোজক: শ্রীধীরাম পট্টনায়ক এবং পরিচালক: শ্রীপি, কে সেনগুপ্ত)। তামিল—"আম্মালায়ম্" (প্রযোজক: সানবিম এবং পরিচালক: থিরুমালাই ও মহালিঙ্গম)। তেলেগু—"সুদীগুণ্ডলু" (প্রযোজক: চক্রবর্ত্তী চিত্র এবং পরিচালক: আদুরথী সুব্বা রাও)। মালয়ালম্—"আনভেসচু কানদেথি-ইল্লা" (প্রযোজক: রাভি, জেনারেল্ পিক্চার্স এবং পরিচালক: পি, ভাস্করণ)। কানাদ—"বঙ্গরাদ হুভু" (প্রযোজক ও পরিচালক: বি, এ, আরসা কুমার)।

আসামী ও সিন্ধী ভাষী কোনও চিত্রকে এবার পুরস্কৃত করা হয় নি। তাছাড়া শিশু চলচ্চিত্র বিভাগের চিত্রগুলির কোনটিই এবার পুরস্কার পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হয় নি।

এবারকার এই রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রদান উৎসব যে বাংলার চলচ্চিত্র মহলে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার করেছে তাতে সন্দেহ নেই। শ্রেষ্ঠ চিত্র, শ্রেষ্ঠ পরিচালক এবং বিশেষ করে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার শীর্ষ সম্মানে সম্মানিত হয়েছে এবার বাংলার চিত্র জগৎ। এ সম্মানে বাঙ্গালী মাত্রেই গর্ব বোধ করবেন এবং সবচেয়ে গর্ব্বিত হয়েছেন বাংলা চিত্রশিল্পের অর্থসঙ্কটে জর্জ্জরিত কলাকুশলীরা। তাঁদের

মৃঢ়, ম্লান মুখেই বিজয়ীর হাসি সবচেয়ে বেশী ফুটে উঠেছে, কারণ তাঁদেরই অক্লান্ত পরিশ্রমে ও ধৈর্য্যের পরীক্ষায় বাংলা চিত্র আজও সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করে অস্তিত্বই বজায় রেখেছে শুধু নয়, তার আর্থিক দৈন্যকে অস্বীকার করে, তার দুঃখকষ্টকে অবহেলা করে, তার সর্ব্ব ত্রুটি বিচ্যুতিকে অতিক্রম করে, নিজগুণে গর্ব্বিত হয়ে সগৌরবে মাথা উঁচু করে এগিয়ে চলেছে সে ভারত শ্রেষ্ঠের সম্মানের পর সম্মান লাভ করে! আন্তর্জাতিক সম্মানেও সে ভূষিত হয়েছে একাধিকবার। আমরা আজ সানন্দে অভিনন্দন জানাচ্ছি বাংলা চিত্র জগতের সর্ব্বস্তরের শিল্পীদের এবং বিশেষ করে শ্রীউত্তমকুমারকে, শ্রীসত্যজিৎ রায়কে, শ্রীতপন সিংহ ও শ্রীঅসীম দত্তকে এবং আমরা আশা করে থাকব এঁদের কাছ থেকে আরও উন্নততর শিল্প-কর্ম্মের, যার দ্বারা তাঁরা বিশ্বশ্রেষ্ঠের সম্মান লাভে সমর্থ হয়ে বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের সম্মানকে গগনস্পর্শী করে তুলবেন। এই সঙ্গে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি এ বৎসরের পুরস্কারপ্রাপ্ত সকল চলচ্চিত্রের প্রযোজক, পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রী ও কলাকুশলীদের।

* * * * *

প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন—নীপা চৌধুরী

লিপিকা মুখার্জি—কেয়াতলা রোড, কলিকাতা

একটি ছেলে ভালবাসে আমাকে কিন্তু তার কোন মতিস্থির নেই। আজ একটা চাকরী ধরে কাল সেটা ছেড়ে দিয়ে পরশু আর একটা চাকরী ধরে। মাঝে মাঝে আবার বলে চাকরী ছেড়ে ব্যবসা করবে। কি করা যায় বলুন তো?

০ আপনার প্রতি তার মতিটা স্থির আছে কিনা ভাল করে আগে যাচিয়ে দেখে নিন। তারপরে তাকে চাকরী অথবা ব্যবসা যে কোন একটাতে মতিস্থির করান।

* * *

অরুণাভ মৈত্র—মালঞ্চ, হালিসহর

আজকাল প্রায় প্রতিটি পত্রিকায় এত বিকৃত যৌন-বিষয়ক লেখার ছড়াছড়ি দেখা যায় কেন? যৌনতাকে আগে অশ্লীল মনে হত না কিন্তু ইদানীং এইসব লেখা পড়ার পর অশ্লীল বলে মনে হচ্ছে। এর কারণ কি!

০ পত্রিকার বেশী কাটতি হবার আশায় এই ধরণের লেখার এত বেশী ছড়াছড়ি ইদানীং দেখা দিয়েছে। যৌনতা কোনদিনই অশ্লীল নয়, কিন্তু তাকে স্থূল বিকৃত অবস্থায় যদি পরিবেশন করা হয় তাহলে কিছুদিন পরে পাঠকের রুচিবিকার হতে বাধ্য। আজকে যাঁরা এই ধরণের ব্যবসা করে দু'পয়সা রোজগার করতে চাইছেন তাঁরা ভবিষ্যতে প্রতিটি ছেলেমেয়ের মন বিকৃত করে দিয়ে যাচ্ছেন এবং এর পরে ছেলেরা মেয়েদের শুধুমাত্র ভোগের সামগ্রী ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারবে না, এবং এঁদের নিজের বাড়ির ছেলেমেয়েরাও এই বিকৃতিমত্ততা থেকে কোনদিনও রেহাই পাবে না।

* * *

শর্মিলা বিশ্বাস—হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা

ভগবানের সব চাইতে বড় ভুল কি?

০ মানুষ সৃষ্টি করা।

* * *

মন্দিরা চ্যাটার্জী—যোধপুর পার্ক, কলিকাতা

"দেহপট সনে নট সকলি হারায়" কথাটা কি সত্যি নাকি? কে বলেছেন কথাটা?

০ ১০০% ভাগ সত্যি। মহাকবি গিরিশ চন্দ্র।

* * *

সুষমা রায়—নাগের বাজার, দমদম

০ সুচিত্রাদিকে আমার দারুণ ভাল লাগে। আমি ওনার সঙ্গে একবারটি দেখা করতে চাই। দয়া করে

বাড়ীর ঠিকানাটা জানাবেন ?

০ দুঃখিত, বাড়ির ঠিকানা জানান সম্ভব নয়।

* * *

গীতা রায়—আয়ানাভরম, মাদ্রাজ

বাঙলা দেশেই বাঙলা ছবি দেখবার জন্যে শেষকালে বাধ্যতামূলক আইন করতে হল ? আমরা প্রবাসীবাঙালীরা বাঙলা দেশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকি এবং আমাদের যতটুকু সাধ্য দিয়েই চেষ্টা করি প্রবাসে বাংলার সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে। বাঙলার সাহিত্য, শিল্প, থিয়েটার, সিনেমা আমাদের তথা ভারতবর্ষের গৌরব বলেই এতদিন জানতুম। কিন্তু বাঙালী জাত কি শেষ অবধি তার নিজের মাতৃভাষাকে ভুলে গেল ?

০ তুচ্ছ বাঙলা ভাষা অথবা সাহিত্য শিল্প বা অন্যান্য সংস্কৃতি নিয়ে মাথা ঘামাবার মত বাজে সময় এখন বাঙালীদের নেই। বাঙালী এখন রাজনীতি নিয়ে ভয়ানক ব্যস্ত। নিজের ঘরে নিজেই আগুন লাগিয়ে বিদেশের নেতারা কি বাণী দিচ্ছেন এবং অন্যদেশে কি রকম সাংস্কৃতিক বিপ্লব চলছে এই গবেষণায় সে এখন ভয়ানক ব্যস্ত। বাঙলা ছবি দেখাবার জন্যে, বাধ্যতামূলক ধুতী পাঞ্জাবী, শাড়ি পরার জন্যে, বাঙলা বই পড়ার জন্যে বাঙলা ভাষায় লেখার জন্যেও বাধ্যতামূলক আইন করতে হবে। এবং সেদিন বোধ হয় খুব বেশী দূরে নেই।

* * *

মনোজ চ্যাটার্জি—বৃন্দাবন পাল লেন, কলিকাতা

উত্তম কুমারের প্রথম ছবি কি ?

০ কামনা

* * *

অরুণ দাসগুপ্ত—শরৎ বোস রোড, কলিকাতা

আপনি বিবাহিতা না কুমারী ?

০ যা ভাবলে আপনি মনে শান্তি পান আমি তাই।

* * *

কল্পনা মুখার্জী—বাবুরাম ঘোষ রোড, কলিকাতা

ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর সার্থকতা কি ?

০ ভারতবর্ষে সুস্থ মনের ভবিষ্যৎ নাগরিক গড়ে তোলা।

* * *

রূপা গাঙ্গুলী—মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উদয়শঙ্করের স্ত্রী শ্রীমতী অমলাশঙ্কর কি পূর্বে উদয়শঙ্করের ছাত্রী ছিলেন ? তখন তাঁর উপাধি কি ছিল ?

০ হ্যাঁ। অমলা নন্দী।

* * *

সুতপা বসু—মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা

এককালের বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী সাধনা বসুকে আজকাল আর কোন ছবিতে অথবা ষ্টেজে নৃত্য প্রদর্শন করতে দেখা যায় না কেন ? নৃত্য সম্পর্কিত ব্যাপারে তাঁর লেখা কোন বই আছে কি ?

০ শারীরিক অসুস্থতার জন্যেই তাঁকে শিল্পী জীবন হতে ছুটি নিতে হয়েছে। "শিল্পীর আত্মকথা" নামে তাঁর লেখা একখানা বই আছে, তবে তা নৃত্য সম্পর্কিত ব্যাপারে কি না জানি না।

* * *

নবকৃষ্ণ হাজরা—কানপুর—ইউ-পি

এক বন্ধুর সঙ্গে তর্ক হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ও সেক্সপীয়র নিয়ে। সে বলতে চায় রবীন্দ্রনাথ সেক্সপীয়রের চাইতেও বড়। আমার কিন্তু উল্টোটাই ঠিক মনে হয়। আপনার কি মত ?

০ রবীন্দ্রনাথ বড় না সেক্সপীয়র বড় এ বিচার করবার মত বিদ্যে আমার নেই। তবে বর্তমান (হু)যুগে সেক্সপীয়রের চাইতেও বড় হচ্ছে সেক্স এ্যাপীল্।

* * *

কানাই দাস—লাভপুর, বীরভূম

"তিন অধ্যায়"তে সুপ্রিয়া নাকি একখানা মার কাটারী গোছের নাচ নেচেছে ?

০ "তিন অধ্যায়" আমি দেখিনি, ছুরি-কাটারীর খবরও আমি রাখি না।

* *

সোমনাথ হালদার—প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড কলিকাতা

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাঙলা ছবি তো অনেকবার পুরস্কার পেয়েছে, তবু অনেকে বলেন বাঙলা ছবি দেখতে তাদের ভাল লাগে না। এর কারণ কি?

● কারণ কি তা আমি বলতে পারি না। বিদেশের লোক আমাদের ছবি দেখায় বোধহয় এই জন্যে যে প্রাগৈতিহাসিক কালেও পৃথিবীতে চলচ্চিত্র নামক বস্তুর অস্তিত্ব ছিল তারই প্রমাণ দিতে।

* * *

কৃষ্ণকলি বসু—ডোভার লেন—কলিকাতা

আমার কাকা বলছেন "চৌরঙ্গী" নামে এর আগে আরও একখানা ছবি হয়েছিল। আগেকার "চৌরঙ্গী" কতদিন আগে নির্মিত হয়েছিল এবং শিল্পী কারা ছিলেন জানান সম্ভব কি? আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে।

○ খুব সম্ভবত: আগেকার "চৌরঙ্গী" ১৯৪২ সালে নির্মিত হয়েছিল। শিল্পী ছিলেন স্বর্গীয় জ্যোতিপ্রকাশ, ছায়াদেবী, প্রমিলা ত্রিবেণী, ডাঃ হরেন ইত্যাদি। পরিচালক ছিলেন নবেন্দুসুন্দর ও সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। ছবিটি বাঙলা ও হিন্দী উভয় ভাষাতেই নির্মিত হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে চৌরঙ্গীর আকর্ষণ সে যুগে যেমন ছিল এ যুগেও তেমনিই আছে, একটুও কমে নি।

* * *

ইন্দ্রাণী বসু—যোধপুর পার্ক, কলিকাতা

"তিন অধ্যায়" ছবিতে দেখা গেল সুপ্রিয়া দেবী ষ্টেনোটাইপিষ্টের চাকরী করেন দিনের বেলায় এবং রাত্রিবেলা ক্যাবারেতে গিয়ে নাচেন। আমাদের দেশে এরকম ষ্টেনোটাইপিষ্ট-কাম ক্যাবারে ডান্সার চরিত্র তো আজ অবধি কোথাও দেখিনি।

○ না দেখেছেন তো ভারি বয়েই গেল। সিনেমাতে দেখতে পেয়েছেন তো তা হলেই হল! গল্পের গরু গাছে ওঠে শুনেছি কিন্তু সিনেমার গরু যে কোথায় ওড়ে সে একমাত্র শয়তানই জানে।

† † †

দেবু ব্যানার্জি—বৈষ্ণবঘাটা, যাদবপুর, কলিকাতা

পড়াশোনা করতে আমার একেবারে ভাল লাগে না। পয়সাকড়িও নেই যে কিছুর ব্যাবসা করি। কি করা যায় বলুন তো?

○ রাজনীতি করুন, আজকাল ঐ ব্যাবসাটা খুব ভাল চলছে।

* * *

প্রদীপ চ্যাটার্জি দেওঘর

সাহিত্যিকরা যদি নিজেদের গল্পের ছবি পরিচালনা করেন তাহলে সে ছবি কি রকম হবে? ধরুন রবীন্দ্রনাথ যদি চিত্র পরিচালক হতেন তাহলে ব্যাপারটি কি রকমের দাঁড়াত?

○ নিজেদের গল্প নিয়ে সাহিত্যিকদের ছবি পরিচালনা করা নতুন ব্যাপার নয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ও একসময়ে কিছুদিন চিত্র পরিচালক ছিলেন। ছবির মান কি ধরণের হয়েছিল জানিনা তবে কিছু কিছু ছবি খুব ভাল ব্যাবসাগত সাফল্য লাভ করেছিল। চলচ্চিত্র পরিচালকের খাতায় রবীন্দ্রনাথেরও নাম আছে। অনেকদিন আগে নিউ থিয়েটার্স "নটীর পূজা" নামে একখানা চিত্র প্রযোজনা করেছিলেন। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীরা। ছবির পরিচালক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। ১৯৩২ সালের ২২শে মার্চ ছবিখানি চিত্রা সিনেমাতে (বর্তমান মিত্রা) রিলিজ হয়েছিল।

† † †

অমিয় দত্ত—ব্যারাকপুর, কলিকাতা

"তিন অধ্যায়" ছবিতে দেখলাম সুপ্রিয়া দেবী দিনের বেলা টাইপিষ্টের চাকরী করেন, রাত্রিবেলা নাইট ক্লাবে নাচেন। ওতে এক একবার উনি যে রকম হেয়ার ষ্টাইল করেছেন তা করাতে প্রত্যেকবার অন্তত: ৫০—৬০ টাকা লাগে। একএকখানা শাড়ী পরেছেন সেগুলোর দাম অন্ততঃ তিনশ থেকে পাঁচশ টাকা হবে। যে চরিত্রে উনি অভিনয় করেছেন সে চরিত্র কত টাকা রোজগার করলে তবে ঐরকমভাবে লাক্সারী করতে পারে?

○ যে চরিত্রে উনি অভিনয় করেছেন তা কতটাকা মাসে রোজগার করে তা আমি জানিনা এবং ঐ রকমের লাক্সারী করবার টাকা কোথা হতে পায় তাও আমি বলতে পারব না। তবে সুপ্রিয়া দেবী একজন ভাল অভিনেত্রী এবং মাসে নিশ্চয়ই অনেক টাকা রোজগার করেন, অতএব নিত্য নতুন হেয়ার ষ্টাইল করাতে এবং দামী দামী শাড়ী পরাতে বাধাটা কোথায়? জানেন তো শাড়ী, গয়না, ফ্যাশান, এই নিয়েই মেয়েদের জীবন। ওদিকে নজর দেবেন না।

* * * * *

সাগরেরের ধ্রুপদী চলচ্চিত্র

শ্রীনরেশচন্দ্র বসু

স্বাধীনতোত্তর ভারতে জন্মগ্রহণকারী ছেলে মেয়েদের কাছে প্রমথেশ বড়ুয়া, উমাশশী বা সাইগল যেমন কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছেন, তেমনি পাশ্চাত্যের চলচ্চিত্রে মার্লিন ডিয়েঅট্রিচ, রামন নোভারো, ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস, ক্লদেৎ কোলবার্ট, বা গ্রীটা গার্বো নিজ দেশের সীমানা ছাড়িয়েও বিদেশের দর্শকদের নিকটও সম পর্য্যায়ভুক্ত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে কিন্তু গ্রীটা গার্বো-র সম্বন্ধে রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের কথার প্রতিধ্বনি করে বলতে হয়—"বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।" কিন্তু তাঁর আত্মগোপন করার ইচ্ছা এবং প্রচার বিমুখতা তাঁকে দর্শক সাধারণের নিকট রহস্যময়ী, মোহময়ী এক অপূর্ব্ব জনগণবন্দিতা নায়িকারূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সুইডেনের ষ্টকহলম্-এ গ্রিটা গাসতাফ্‌সান যেদিন প্রথম সূর্যের মুখ দেখেছিল, সেদিন কেউ কল্পনাও করতে পারে নি যে এই মেয়ে একদিন পৃথিবীর সেরা নায়িকাদের মধ্যে অন্যতমা হয়ে উঠবে। স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে ইতিহাসই তাকে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করতো। রাণী এলিজাবেথ বা ক্লিওপেট্রার চরিত্র তাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতো। পরবর্তী জীবনে "মেরী ওয়ালেস্কা" বা "কুইন ক্রিশ্চিয়ানা"র নাম ভূমিকায় অভিনয়কালে তাঁর চরিত্র চিত্রণে বাল্যকালের ইতিহাস পাঠের এই প্রভাব খুবই লক্ষণীয়। অল্প বয়সে পিতার মৃত্যুর পর অর্থাভাবে "পল বার্গসটম্ ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরে" একটা চাকুরী গ্রহণ করলেন। এখানে জুতো বা টুপির বিজ্ঞাপনের সঙ্গে তাঁর ফটো বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হ'লে তার বিশেষ ভঙ্গিমা পাঠকদের আকৃষ্ট করে।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন রিং একখানি শিল্প সংক্রান্ত ছবিতে গ্রীটাকে একটি ক্ষুদ্র ভূমিকায় অভিনয় করবার সুযোগ দেন। "পিটার দি ট্রাম্প" নামে এক কৌতুক চিত্রে একটি ছোট্ট ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে মনে হয় যে অভিনয় করবার জন্যও শিক্ষার প্রয়োজন। মিঃ এনাওয়াল নামে একজন বিখ্যাত নাট্যশিক্ষকের পরামর্শে সুইডেনের ড্রামাটিক স্কুলে তিনি ভর্তি হন।

সুইডেন ১৯২৪

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ। গ্রীটার জীবনে এক স্মরণীয় বৎসর। এক বসন্তের সন্ধ্যায় স্কুলের পরিচালক গুস্তাফ্ মোলান গ্রীটাকে চিত্রপরিচালক মরিজ ষ্টীলারের সাথে দেখা করতে বললেন। মরিজ ষ্টীলার তাঁকে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর "The Story of Gosta Berling" এর নায়িকা কাউন্টেস্ এলিজাবেথ ডোনার চরিত্রে রূপদান করবার জন্য চুক্তিবদ্ধ করলেন। গ্রীটার নাট্য বিদ্যালয়ের সহপাঠী মনা সরটেনসনও একটি ভূমিকায় নির্ব্বাচিত হলেন। নায়ক চরিত্রে রূপদানের জন্য নির্ব্বাচিত হলেন সুইডেনের রয়াল থিয়েটারের সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নট লারস্ হ্যানসন্।

পুরাতত্ত্ববিদদের উৎসাহিত হবার মত চিত্র ১৯২৪ সালের সুইডেনের "The Story of Gosta Berling", Selma Largerlof এর বিখ্যাত গ্রন্থের চিত্ররূপ এটি। পুরাতত্ত্বশালায় এর সম্পাদিত শব্দহীন রূপটী আরও বেশী আকর্ষণীয়। ১৯ ৪ সালে সুইডেনে পুনঃ সম্পাদিত ও সঙ্গীতযুক্ত এর রূপটি যদিও মূল চিত্র অপেক্ষা সংক্ষিপ্ততর কিন্তু তবুও এটি মূল উপন্যাসের প্রতি সুবিচার করেছিল। গস্তা বার্লিং এর নায়ক চরিত্রে রূপদান করেন লারস্ হ্যানসন। পানাসক্ত, অমঙ্গল আশঙ্কায় সর্বদা ভীত, তবুও মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই—চরিত্রের এই মূল সুরটুকু হ্যানসনের অভিনয়ে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু নায়িকা চরিত্রে সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন গ্রীটা। পূর্ণ দৈর্ঘ্যের চিত্রে তাঁর এই সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ। হলিউডের তথাকথিত চিত্রতারকাদের ন্যায় ভাসা ভাসা অভিনয় নয়, এ যেন অভিনয়ের মধ্যে আত্মমগ্ন হয়ে যাওয়া। শান্ত, সুন্দর, ধীর, স্থির, সংযত অভিনয়সৌকর্যে তিনি দর্শকদের চিত্তে চিরস্থায়ী আসন লাভ করলেন। সপ্তদশী গ্রীটার অবয়ব সর্ব্বত্র ষোল কলায় পরিপূর্ণ। যৌবন বর্ষার চার পোয়া বন্যার জল সে কমনীয় আধারে ধরেছে, কিন্তু উপচে পড়েনি। লাবণ্য চঞ্চল, কিন্তু সে লাবণ্যময়ী চঞ্চলা নয়; ধীর, স্থির, নির্বিকার প্রস্তর মূর্ত্তিবৎ। হ্যানসনের ন্যায় নায়ক এবং একদল সুদক্ষ অভিনেতা ও

অভিনেতৃদের মধ্যে গ্রীটাই কেবলমাত্র অল্প অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ছিলেন। Stiller এই দলটিকে নিয়ে একটি অপূর্ব উত্তেজনাময়, আবেগপ্রধান এবং ঘটনাবহুল চিত্ররূপ উপহার দিলেন। দুই একটি দৃশ্যের কথাই ধরা যাক্। নায়ক নায়িকা মৃত্যুর মাঝখান দিয়ে মাইলের পর মাইল ছুটে চলেছে, পশ্চাতে মৃত্যুর প্রতীকসম দলে দলে ক্ষুধার্ত নেকড়ের দল, সম্মুখে হিম শীতল হ্রদ ঠাণ্ডায় বরফ হয়ে গেছে···অথবা বিরাট শস্যগোলাকে ঘিরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে······এই সকল দৃশ্য এর পূর্ব্বে এরূপভাবে পরিকল্পিত বা গ্রহণ করা হয়নি। পরবর্ত্তী যুগের রাশিয়ান চিত্র Battleship Potemkin অথবা জার্মান চিত্র Metropolis এর আঙ্গিকের পূর্বাভাস এই চিত্রেই দেখা গিয়েছিল। পোষাক পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র তৎকালীন যুগের বৈশিষ্ট্য বহন করেছে। পার্থিব বস্তুতে মানুষের লালসা, আত্মাভিমান, কুসংস্কার এবং যৌবন তাড়িত নরনারীর নিরুত্তাপ শূন্যগর্ভ ভালবাসা, স্ত্রী পুরুষে অবাধ যৌন সংগ্রামের পরিণতি—ইত্যাদি ঘটনাবহুল একটি মেলোড্রামা যে শিল্পমণ্ডিত যুগোত্তর চিত্রে পরিণত হতে পারে তার নিদর্শন The Story of Gosta Ber ing. অবাস্তবতার ধ্বজধারী বা নিরুত্তাপ আধুনিকতাবাদীদের চোখে আঙুল দিয়ে রোমান্টিকতার অর্থ বা অভিজাত সম্প্রদায় যে বিলুপ্তির পথে তার কারণ এই চিত্র নির্দেশ করেছিল। এই চিত্রে নিজ ইতিহাসের মধ্যে মানুষের ইতিহাস গ্রন্থনা করার কৃতিত্বও অস্বীকার করা যায় না।

চিত্রটি প্রথম মুক্তি পেল জার্মানীর রাজধানী বার্লিনে। গ্রীটাও সকলের সঙ্গে প্রদর্শনীতে উপস্থিত। নিজের অভিনয় দেখতে দেখতে গ্রীটার শিরায় শিরায় স্পন্দন, নিমীলিত আঁখি পল্লব ভয়ে ভাবনায় ম্রিয়মাণ। কিন্তু জার্মানীর জনসাধারণ ও সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করলেন গ্রীটা। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই, কারণ গ্রীটার ভাষাতেই বলি—

The German people are not too much personal in their admiration. They admire your talent and your work but it ends there. They are interested in you as an artist not as a personality. কারণ জার্মাণ জাতির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য এই যে তারা শিল্প প্রতিভারই পূজারী, ব্যক্তি বিশেষকে নিয়ে তারা মাতামাতি করে না।

এই চরিত্র চিত্রণের পর গ্রীটা গাসতাফসান্ তাঁর চিত্রশিল্পের শিক্ষা গুরু মরিজ ষ্টিলারের পরামর্শক্রমে নাম পরিবর্ত্তনে করে হন গ্রীটা গার্বো।

ইতিমধ্যে হলিউডের মেট্রো গোল্ডউইন্ মায়ারের লুই বি মায়ার, ষ্টীলারকে চিত্র পরিচালনার জন্য চুক্তিবদ্ধ করেন এবং ষ্টীলারের পীড়াপীড়িতেই গ্রীটাকে আগামী চিত্রের জন্য গ্রহণ করতে সম্মত হন। পরবর্ত্তী ইতিহাস কারুর অজানা নয়। তাঁর অভিনয় প্রতিভার স্বীকৃতি এবং ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের New York FilmCriticsদের দ্বারা শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মান লাভ। গ্রীটা গার্বো অভিনীত এ্যানা কারেনিনা, মেরী ওয়ালেস্কা, ক্যামেলি, নিনচ্কা, টু ফেসেড ওম্যান, কুইন ক্রিশ্চিয়ানা, মাতাহারি, গ্রাণ্ড হোটেল, ডিভাইন ওম্যান, দি মিষ্টিরিয়াস লেডি, দি ফ্লেস এণ্ড দি ডেভিল ইত্যাদি চিত্র মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকদের মাঝে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল।

কিন্তু তার পরবর্ত্তী ইতিহাস আমাদের অজ্ঞাত। গ্রীটা গার্বো "মিষ্টীরিয়াস লেডি" সত্য সত্যই একদিন রহস্যময়ী উঠলেন, যেদিন তিনি চিত্রজগৎ থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়ে আত্মগোপন করলেন। আত্মসমীক্ষা না আত্মপ্রতারণার জন্য কে জানে?

*　　*　　*　　*　　*　　*

চিত্রলেখা

অনেকদিন আগেকার কথা। বোধহয় ১৯৫২, ৫৩, অথবা ৫৪ সালও হতে পারে। সঠিক বৎসরটা মনে নেই। ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে একটি ছবির সুটিং চলছিল। গ্রামের একজন দরিদ্র লোকের বাড়ি। দরিদ্রতার চিহ্ন গোটা বাড়িময় অতি প্রকটভাবে ফুটে রয়েছে।

গৃহকর্তা বৃদ্ধ হয়েছেন। কঠোর পরিশ্রম করে দারিদ্র্যকে পরাজিত করবেন এমন সামর্থ্য তার নেই। একমাত্র পুত্রের ওপর ভরসা করেছিলেন এক সময়ে, এখন আর করেন না। ছেলেও নিশ্চিন্তমনে যাত্রাদলে কেষ্ট সেজে বাঁশি বাজিয়ে এ গ্রাম ও গ্রাম ঘুরে বেড়ায়। এক্ষেত্রে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির দারিদ্র্যের কাছে আত্মসমর্পণ না করে উপায়ই বা কি? বড় মেয়েটি বিবাহযোগ্যা হয়েছিল। গ্রামের লোকের খবরদারির জ্বালায় শেষ অবধি নিজের বয়সের প্রায় দ্বিগুণ এক পাত্রের হাতে কন্যাটিকে সম্পর্ণ করেছিলেন। একজন দীন দরিদ্রের মেয়েকে বিনাপণে উদ্ধার করবার মত গরজ কারই বা পড়েছে? মেয়ের বৈধব্য সম্পর্কে তাঁর মনে কোনরকম সন্দেহ ছিল না। বিবাহের মাসখানেকের মধ্যেই বড়মেয়েও বিধবা হয়ে তার বাবার ধারণা যে একেবারে অভ্রান্ত তা প্রমাণ করতে পেরেছিল।

গৃহকর্তার ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন পরিচালক স্বয়ং। চিত্র ও মঞ্চের একজন সুপরিচিত প্রবীণ লোক তিনি। নায়িকার ভূমিকায় ছিলেন একজন উঠতি তারকা। ছবির বাজারে অল্পস্বল্প নাম তখন তার হয়েছে।

সেদিন একটি আবেগপূর্ণ দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ করবার তোড়জোড় চলছিল। নায়িকা মেকআপ রুমে ব্যস্ত ছিলেন। সেটে বসে চিত্রনাট্যের খাতাটি মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করছিলেন পরিচালক। প্রয়োজনমত সামান্য কিছু অদলবদল বা সংশোধনও করছিলেন। অদূরে চিত্রশিল্পী সেটে আলো করতে ব্যস্ত ছিলেন।

মেক আপ সেরে নায়িকা সেটে এলেন। পরিচালক দৃশ্যটি তাকে বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলেন। একবার, দুবার, তিনবার। প্রশ্ন করলেন নায়িকাকে দৃশ্যটি তার ভাল লাগছে কি না এবং কোথাও কোন অসঙ্গতি লাগছে কি না। নায়িকা চুপ করে রইলেন। কি বলবে তিনি? যিনি প্রশ্ন করছেন তার চেয়ে বড় নাট্যশিক্ষ বাঙলাদেশে যে আর নেই একথা কে না জানে?

চিত্রশিল্পী এসে জানালেন লাইট রেডি। চেয়ার ছে উঠলেন পরিচালক ও নায়িকা। ধীর পায়ে সেটের মং গিয়ে দাঁড়ালেন। সুরু হল রিহার্সাল। একবার, দুবার অভিনয় করতে করতে পরিচালক লক্ষ্য করলেন নায়িক কেমন যেন সহজ হতে পারছেন না। অভিনয় করছে ভাল ভাবেই কিন্তু কোথায় যেন কি একটা গোলমা হয়েছে। অন্যদিন তো এরকম হয় না। কাছে ডাকলে তিনি নায়িকাকে। "ব্যাপারটা কি বল দেখি? ি হয়েছে তোমার আজ? শরীর ভাল নেই নাকি?"

"না, শরীর তো বেশ ভালই আছে।" বললে নায়িকা। "তাহলে হয়েছেটা কি?" "আমি একবা মেকআপ রুমে যাব," বললেন নায়িকা। "কেন? মে আপ তো ঠিকই আছে!" বললেন পরিচালক। 'জামা বদলে আসব' বললেন নায়িকা 'কেন, জামায় আবার ি হোল?' জানতে চাইলেন পরিচালক। একটু ইতস্ত করে নায়িকা এবারে জামাটা দেখালেন পরিচালককে বুকের কাছে বেশ খানিকটা ছেঁড়া। 'ওঃ এই ব্যাপা একটু হাসলেন পরিচালক।

"তোমার অভিনয় না দেখে লোকে যদি তোমার ছেঁ জামার দিকে তাকিয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে তোমা অভিনয়ের মধ্যে তুমি প্রাণ সঞ্চার করতে পারনি। পূর্ণ আনতে পারনি তোমার অভিনীত চরিত্রের মধ্যে। তু মহারাণীর জাঁকজমকপূর্ণ বেশভূষা পরে অভিনয় করছ নগ্নদেহে অভিনয় করছ সেটা অবান্তর তোমার কাছে বেশভূষা কি রকম হবে সে দায়িত্ব অন্যলোকের হা দেওয়া আছে। তোমার কাজ হচ্ছে, যে চরিত্রে তু অভিনয় করছ সে চরিত্রের মধ্যে তোমার নিজস্ব সত্ত্বা সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়ে দেওয়া, তবেই পরিপূর্ণতা আসবে তোম অভিনীত চরিত্রের মধ্যে। শুধুমাত্র সংলাপ আউড়ে গে যে চরিত্রে তুমি অভিনয় করছ তার নিজস্ব রূপটি কো দিনই তোমার কাছে ধরা দেবে না। অভিনেতা অ

নত্রীর জীবনে একমাত্র এইটাই হচ্ছে ইষ্টমন্ত্র এইটে মনে রাখো।" কথাগুলি বললেন পক্বকেশ বৃদ্ধ পরিচালক নায়িকাকে উদ্দেশ্য করে।

যথাসময়ে সেদিন স্যুটিং হয়েছিল এবং স্যুটিং শেষ হয়ে যাওয়ার পরে একসময়ে ছবি সহরের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহেমুক্তি লাভও করেছিল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস পিছনে ফেলে রজত জয়ন্তী সপ্তাহকে অতিক্রম করেও আরও অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল সে ছবি। নায়িকার অভিনীত আরও অনেক ছবির মধ্যে এই ছবির অভিনীত চরিত্রটি সেদিন তার মুকুটের আরও একটি অন্যতম রত্ন সংযোজিত করেছিল।

পাঠক পাঠিকারা হয়ত ভাবছেন যে শুধুমাত্র পাতা ভরাবার উদ্দেশ্যে আমি একটি আষাঢ়ে গল্প ফেঁদেছি। আপনারা যা ইচ্ছে ভাবুন ঘটনাটী কিন্তু একবর্ণ মিথ্যেও নয়, অতিরঞ্জিতও নয়। উপরোক্ত ঘটনাটি যে ছবিতে ঘটেছিল সে ছবির নাম হচ্ছে "অন্নপূর্ণার মন্দির"। নায়িকার নাম—সুচিত্রা সেন, পরিচালকের নাম—নরেশ মিত্র।

নরেশ মিত্র আজ আর নেই। তাঁর নশ্বর দেহ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে অবসান হয়েছে একটি যুগের, যে যুগের একমাত্র শেষ উত্তরাধিকারী ছিলেন তিনিই। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে তাঁর ৮০ বৎসর বয়স পূর্ণ হয়েছিল। তাঁর জীবন এক বিরামহীন শিল্পসাধনার অপূর্ব নিদর্শন। জীবনের শেষ দিনগুলিতেও দেশবাসীকে তিনি তাঁর শিল্পীজীবনের উপহার দিয়ে গেছেন।

বাঙলাদেশের রঙ্গমঞ্চে সম্পূর্ণ একটি নতুন যুগের প্রবর্তন করেছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। এই ব্যাপারে তাঁর প্রধান সহযোগী ছিলেন নরেশ মিত্র। পাঁচ দশকব্যাপী মঞ্চ ও চিত্রলোকের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল অবিচ্ছিন্নভাবে।

১৮৮৮ সালের ১৮ই মে ত্রিপুরার আগরতলায় জন্ম হয়েছিল শ্রীমিত্রের। বি, এল পাশ করেন ১৯১৪ সালে। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে পরিপূর্ণভাবে যোগ দেন ১৯২২ সালে। রাজার ভূমিকায় শ্রীনবীন সেনের "কুরুক্ষেত্র" নাটকে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশ। নাটকটির অভিনয় হয়েছিল ইউনিভারসিটি ইনস্‌টিটিউটে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য ঐ একই নাটকে শিশিরকুমার ছিলেন অভিমন্যুর চরিত্রে।

এরপর ১৯২২ সালে তাঁকে আমরা দেখতে পাই মিনার্ভা থিয়েটারে। সাধারণ রঙ্গালয়ে সেই তাঁর প্রথম অভিনয়। ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "শ্যামাবামের স্বাদেশিকতা' নাটকে তিনি অভিনয় করেন। কয়েকরাত্রি অভিনয়ের পর নাটকটির অভিনয় বন্ধ করে দেন তৎকালীন ইংরেজ সরকার। এর পরে দ্বিজেন্দ্রলালের "চন্দ্রগুপ্ত" নাটকে চাণক্যের ভূমিকায় তাঁর পরবর্তী অভিনয়। পরে এই একই নাটকে শ্রীমিত্র বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন 'কাত্যায়ন' চরিত্রের রূপায়ণে। খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার শিখরে আরোহণ করেন. তিনি যে সব নাটকে অভিনয় করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: কর্ণার্জ্জুন, মহানিশা, বাঙলার মেয়ে, পতিব্রতা, চরিত্রহীন পথের সাথী, পুণ্ডরীক, কেদার রায়, বিসর্জন, গোরা, দুই পুরুষ। বিভিন্ন রঙ্গালয়ে এই সব নাটকগুলির অভিনয় হয়েছিল। পেশাদার মঞ্চে তাঁর শেষ অভিনয় বিশ্বরূপায় "সেতু" নাটকে।

চলচ্চিত্রের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ সেই নির্বাক যুগ থেকেই প্রথম ছবি ১৯২২ সালে। ছবির নাম "আঁধারে আলো"। তারপরে একে একে আসে মানভঞ্জন, চন্দ্রনাথ, নৌকাডুবি, দেবদাস। সব কটিই নির্বাক ছবি। প্রত্যেকটি ছবি তিনি পরিচালনা করেন ও অভিনয়ও করেন। "টাইপ" চরিত্র অভিনয়ে তাঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ। যেমন বলা যায় কাত্যায়ন (চাণক্য), জিতেন্দ্রনাথ ("বাঙলার মেয়ে") পানুবাবু ("গোরা") চরিত্রগুলি। বিশেষ করে বাঙলার মেয়েতে জিতেন্দ্রনাথ চরিত্রে অভিনয় করে তিনি সবচেয়ে বেশী তৃপ্তি পেয়েছেন। সবাক যুগেও তাঁর পরিচালিত প্রায় প্রত্যেকটি ছবিই জনপ্রিয় হয়েছে। যেমন বলা যায় গোরা, বাঙলার মেয়ে, স্বয়ংসিদ্ধা, বিদুষীভার্য্যা, কঙ্কাল, বৌ ঠাকুরাণীর হাট, নিয়তি, পণ্ডিতমশাই, অন্নপূর্ণার মন্দির, কালিন্দী, উল্কা।

শ্রীমিত্রের অভিনীত শেষ ছবি হচ্ছে "পরিশোধ"। ছবিটি এই বছরেই মুক্তিলাভ করেছে। মৃত্যুর তিন দিন আগেও তিনি মহাজাতিসদনে "সোনাই দীঘি" ও "বাঙালী" দুটি যাত্রা নাটকে অভিনয় করে দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছেন। তিনি ছিলেন একজন কর্মব্যস্ত

মানুষ। দক্ষিণ কলকাতার নিজের বাড়িতেই কর্মব্যস্ততার মাঝে তাঁর মৃত্যু নেমে এল সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে গত ২৫শে সেপ্টেম্বর, বুধবার।

শ্রীমিত্রের মৃত্যুতে বাঙলাদেশের মঞ্চ ও চিত্রশিল্পের যে দারুণ ক্ষতি হল তা কোনদিনই পূরণ হবে না। যেমন হয় নি শিশিরকুমার ভাদুড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভা দেবী, প্রমথেশ বড়ুয়া, জ্যোতিঃপ্রকাশ, ছবি বিশ্বাস এদের বেলায়।

আমাদের মা ঠাকুমাদের আমলে বালিকা বধুরা গান-টানের ব্যাপারে খুব একটা অভিজ্ঞ ছিলেন বলে জানা যায় না। কারণ তখনকার দিনে প্রায় বিয়ের পরেই তাঁদের সংসারের মধ্যে প্রবেশ করতে হত। আর নাচের ব্যাপার? সংসারের যাঁতাকলের মাঝে পড়ে একমাত্র চরকীনাচটাই নাচতে তাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন। এ ছাড়া অন্য কোন ধরণের নৃত্যকলার সঙ্গে তাঁদের কোন পরিচয় হবার অবকাশ তাঁরা কোনদিনই পেতেন না। কিন্তু সে রামও নেই এবং সে অযোধ্যাও নেই। যুগের হাওয়া সম্পূর্ণরূপে বদলে গেছে। তাই বোধহয় ইদানীংকালের বালিকা বধুরা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছেন। সম্প্রতি বোম্বাইয়ের শিবাজী পার্কে বেঙ্গল ক্লাব আয়োজিত এক পূজা মণ্ডপে বাঙলাদেশের বালিকা বধূ টুইষ্ট নৃত্য প্রদর্শ[ন] করে উপস্থিত সবাইকে এবং বোম্বাইবাসীদের একেবা[রে] হতবাক্ করে দিয়েছেন। নাচ দেখে ওখানকার অধি[]বাসীরা রায় দিয়েছেন যে ওর হবে। কি হবে সেটা অব[শ্য] এখনও জানা যায় নি। যথাসময়েই জানা যাবে। আগু[ন] কতদিন আর ছাইচাপা থাকে আপনারাই বলুন?

সাগিনা মাহাতো একটি বিচিত্র নাম। নামের চাইতে[ও] আরও বিচিত্র হচ্ছে চরিত্রটি। অনেকদিন ধরেই দিলীপ কুমারের ইচ্ছে ছিল বাঙলা ছবিতে নায়কের ভূমিকা অভিনয় করবার। সেই সুযোগ এবারে এসেছে। গৌ[র] কিশোর ঘোষ রচিত সাগিনা মাহাতো কাহিনী অ[ব]লম্বনে তপন সিংহ তাঁর নতুন ছবিতে হাত দিয়েছেন আগামী ডিসেম্বর মাস থেকেই বোধহয় সুটিং সুরু হ[বে] দিলীপকুমারের সঙ্গে থাকবেন সুমিতা সান্যাল ও অনি[ল] চ্যাটার্জি। প্রযোজক হেমেন গাঙ্গুলী এই সঙ্গে সা[য়রা] বানুকেও টেনে এনেছেন বাঙলা ছবির অভিনয়ের আ[স]রে একেবারে এলাহী ব্যাপার বলা যায়। সায়রা বা[নু] দিলীপকুমার, তপন সিংহ, হেমেন গাঙ্গুলী! দেখাই যা[ক] ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় শেষ অবধি।

—শ্রীকা[]

সম্পাদক—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস [illegible] প্রকাশিত।

প্রথম খণ্ড

চতুর্থ সংখ্যা

ষট্‌পঞ্চাশত্তম বর্ষ

অদৃষ্ট ও পুরুষকার

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

আমি প্রত্যেক হিন্দুধর্মানুশীলনকারীর নিকট একটি অনুরোধ করিতেছি। তাঁহাদিগকে "অদৃষ্ট" ও "পুরুষাকারের" মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ—(১) বুদ্ধির সাহায্যে জানিতে, এবং (২) হৃদয়ের সাহায্যে অনুভব করিতে বলিতেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, অদৃষ্ট ও পুরুষকারের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিলে, ধর্মানুশীলনে সহজেই উপকার পাওয়া যাইবে।

অদৃষ্ট ও পুরুষকারের মধ্যে সম্বন্ধ বিষয়ে সাধারণতঃ তিনটি মত প্রচলিত আছে।

প্রথম মত এই যে, অদৃষ্টই সর্বশক্তিসম্পন্ন। ঈশ্বর আমাদের অদৃষ্টে যাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই ঘটিবে। অদৃষ্টকে পরিবর্তন করইবার শক্তি কোন পুরুষকারের নাই।

দ্বিতীয় মত এই যে পুরুষকারই সর্বশক্তিসম্পন্ন। ঈশ্বর আমাদিগকে অসীম পুরুষকারশক্তি, অর্থাৎ কর্ম করিবার শক্তি দিয়াছেন। আমরা সৎ বা অসৎ কার্যে যে পুরুষকার ব্যবহার করি, তাহারই ফলে অদৃষ্ট সৃষ্টি হয়। আমরা আন্তরিকভাবে সর্বাত্মক পুরুষকার ব্যবহার করিলে আমাদের অদৃষ্ট পরিবর্তন করিতে পারি।

এই দু'টি মতের ভিতর কিছু পরিমাণ সত্য আছে, কিন্তু কোনটিই প্রকৃত সত্য নহে। আমাদের ধর্মশিক্ষকগণ আমাদিগকে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরতা আনাইবার জন্য,

প্রথম মতটি প্রচলিত করেন, এবং আমাদিগকে কর্ম-বিমুখতা ত্যাগ করিয়া পুরুষকারের সহিত ধর্ম অনুশীলন করিয়া ঈশ্বর লাভের চেষ্টায় প্রণোদিত করিবার জন্য, দ্বিতীয় মতটি প্রচলিত করেন।

তৃতীয় মত এই যে, ঈশ্বরের সৃষ্টিলীলায় অদৃষ্টের এবং পুরুষকারের বিশিষ্ট স্থান আছে, কিন্তু তাহাদের উভয়ের শক্তিই সীমাবদ্ধ, এবং তাহারা উভয়েই সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন কাজ করিয়া থাকে। ঈশ্বর যখন ইচ্ছা, যাহার সম্বন্ধে, ও যেভাবে ইচ্ছা, যে কোন ব্যক্তির অদৃষ্ট অথবা পুরুষকার পরিবর্তন করিয়া দিতে পারেন, এবং অনেক সময় পরিবর্তন করিয়া থাকেন।

এই তৃতীয় মতটিই প্রকৃত সত্য, এবং সামান্য আলোচনা করিলেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এই মতটি বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এই মত সমর্থন করিয়াছেন, এবং আমাদের প্রত্যেক ধর্মানুশীলনকারী এই মতটি মনে প্রাণে গ্রহণ করিতে পারিলে তাঁহাদেরও বিশেষ উপকার হইবে।

আমাদের অদৃষ্ট অত্যন্ত শক্তিমান্ ইহা সত্য। কিন্তু সাবিত্রী-সত্যবানের উপাখ্যান হইতেও অনেক ব্যক্তির জীবনের ঘটনা হইতে জানা যায় যে, ঈশ্বর নিজে অপ্রকাশ্য-ভাবে, অথবা তাঁহার প্রকৃত ভক্ত মহাপুরুষের দ্বারা অনেকের অদৃষ্ট পরিবর্তন করিয়া দিয়াছেন।

পুরুষকারও শক্তিমান। বহু ব্যক্তি পুরুষকারের সাহায্যে অত্যন্ত আশ্চর্য কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু, একটি উপমার দ্বারা আমাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আমাদের পুরুষকার সীমাবদ্ধ এবং সম্পূর্ণ ঈশ্বরের অধীন, এবং বৈজ্ঞানিক প্রমাণের দ্বারা এই সত্য বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ঐ উপমাটি এই—

এক ব্যক্তি তাঁহার একটি গরুকে ঘাস খাওয়াইবার জন্য একটি মাঠে লইয়া গেলেন। গরুটী যাহাতে যেখানে সেখানে না যায়, সেজন্য তাহার গলায় একটি দড়ি বাঁধিয়া দড়ির অন্য মুখ একটি খোঁটায় বাঁধিয়া খোঁটাটি মাঠের কোন স্থানে পুঁতিয়া রাখিয়া গেলেন।

১। ঐ গরুটি এই দড়ির সীমানার মধ্যে যেখানে যাইতে পারে ও ঘাস খাইতে পারে, কিন্তু ঐ সীমানার বাহিরে, কোথাও তাহার যাইবার বা ঘাস খাইবার ক্ষমতা নাই।

২। সেইরূপ ভগবান্ আমাদিগকে সীমাবদ্ধ পুরুষ-কার দিয়া পাঠাইয়াছেন। আমরা সেই সীমার মধ্যে ঐ পুরুষকার ব্যবহার করিতে পারি এবং করিয়াও থাকি। আমাদের মানসিক বৃত্তি অনুসারে আমরা ঐ পুরুষকার সৎকার্যে অথবা অসৎ কার্যে ব্যবহার করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ সীমাবদ্ধ পুরুষ-কারের অতিরিক্ত আমরা কিছু করিতে পারি না।

এই তৃতীয় মতটি যে প্রকৃত সত্য এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার অকাট্য প্রমাণ জ্যোতিষ-শাস্ত্র, যাহা বিজ্ঞানের একটি শাখা বিশেষ।

১। যে কোন ব্যক্তি জন্মাইবার পর যে কোন সময়ে, যে কোন প্রকৃত অভিজ্ঞ জ্যোতিষী তাঁহার রাশিচক্র গণনা করিয়া অথবা তাঁহার হস্তরেখা বিচার করিয়া নির্ভুল ভাবে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্ত ঘটনা ও সমস্ত প্রকার পুরুষকারের কথা বলিয়া দিতে পারেন। তিনি ভবিষ্যৎ জীবনে কোন্ প্রকার পুরুষকার কিভাবে ব্যবহার করিবেন, তাহাতে তিনি কতখানি সফলতা লাভ করিবেন অথবা নিষ্ফলতা ভোগ করিবেন, তিনি ধার্মিক কি অধার্মিক হইবেন, তিনি রোগী বা নিরোগ হইবেন, তিনি সুখী কি অসুখী হইবেন, তিনি পুরুষকার ব্যবহার করিয়া কবি, শিল্পী, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, উকিল, বিচারক, ব্যবসাদার প্রভৃতির মধ্যে কি হইবেন, কবে তাঁহার মৃত্যু হইবে তাহা সমস্তই জ্যোতিষ গণনার দ্বারা বলা যায় ও বলা হইয়াছে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রাশিচক্র বিচার করিয়া যে কোষ্ঠী প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা অক্ষরে অক্ষরে ফলিত, এবং তাঁহার মৃত্যুকাল আসন্ন বলিয়া কোষ্ঠিতে লেখা থাকায় ভারতবর্ষের নানা দেশের পণ্ডিত-গণ আসিয়া রাশি রাশি যাগযজ্ঞ করিয়াও তাঁহাকে বাঁচাইতে পারেন নাই। আমার ভ্রাতৃবধূর ভীষণ অসুখ হওয়ায় দক্ষিণ কলিকাতার একজন জ্যোতিষী তাঁহার মৃত্যুদিন দেড়মাস আগে বলিয়া দিয়াছিলেন, এবং ঠিক সেইদিনই তাঁহার মৃত্যু হয়।

সুতরাং, ইহাতে বোঝা যায় যে, আমরা যে পুরুষকার ব্যবহার করিয়া থাকি, তার পরিমাণ ও ফলাফল আমাদের

জন্মের সময় হইতে স্থির হইয়া আছে। অর্থাৎ আমাদের পুরুষকার সীমাবদ্ধ ও ঈশ্বরের সম্পূর্ণ ইচ্ছার অধীন।

২। জ্যোতিষ শাস্ত্র আরও বেশীদূর অগ্রসর হইয়া এই সীমাবদ্ধ পুরুষকার ও সীমাবদ্ধ অদৃষ্ট প্রমাণ করিয়াছে। "ভৃগুগণনা" নামক কাগজে প্রায় প্রতিদিন প্রতিক্ষণে মানুষের জন্মের রাশিফল ও তাহার ফলাফল লিপিবদ্ধ আছে। উহা শত শত বৎসর পূর্বে লেখা হইয়াছিল, এবং সেগুলি কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্ম বা জীবন সম্বন্ধে প্রস্তুত করা হয় নাই। ঐ কাগজগুলি প্রায় সারা ভারতবর্ষে ছড়ান আছে। কিন্তু, কাহারও নিকট, সকল সময়ের রাশিচক্র গণনা বা তাহার ফলাফল নাই।

(১) যাঁহার নিকট যে কয়খানি রাশিচক্র সম্বলিত কাগজ আছে, তিনি কেবল সেইগুলি সম্বন্ধে আক্ষরিক সত্য সংবাদ দিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকে মিথ্যা করিয়া বলেন যে, সকলের রাশিচক্র তাঁহাদের কাছে আছে। যদি কেহ এমন রাশিচক্র লইয়া তাঁহাদের কাছে যান, সে সম্বন্ধে তাঁহার ঐ কাগজ নাই, তিনি উহা গোপন করিয়া, নিজে গণনা করিয়া "ভৃগুগণনা" বলিয়া জানাইয়া দেন, এবং তাহার ফলে অনেক ব্যক্তি প্রতারিত হয়েন।

(২) আমার নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সন্ধানের জন্য আমি একজন ভৃগুগণকের কাছে যাই। তিনি আমাকে সম্পূর্ণ ভুল গণনা করিয়া দেন। তাহার কারণ এই যে, তাঁহার নিকট প্রকৃত ভৃগুগণনা ঐ রাশিচক্রে নাই।

(৩) আমি পরে আর একজন ভৃগুগণকের কাছে যাই, এবং আমি জিদ করায় তিনি আমাকে আমার পুত্রের রাশিচক্রের সহিত এক রাশিচক্রযুক্ত অনেকগুলি কাগজ দেখান। তিনি তাহা হইতে আমাকে যাহা বলিলেন তাহা আমার আশ্চর্য বোধ হইল। ঐ ভৃগুগণনা কত শত বৎসর পূর্বে হইয়াছিল তাহা কেহ জানেন না। কিন্তু তাহাতে লেখা আছে—

(ক) আমার ঐ পুত্রের তিন ভাই ও দুই ভগ্নি। এক ভাইয়ের রোজগার সর্বাপেক্ষা বেশী। এক ভগ্নিপতির রোজগার অত্যন্ত অধিক। ইহা সম্পূর্ণ সত্য।

(খ) আমার ঐ পুত্রের সর্বাপেক্ষা উচ্চ শিক্ষা হইবে, এবং তাহার পর একটি চাকুরী পাইবে। তাহার অল্প বেতন বলিয়া তাহার পছন্দ হইবে না। ইহা সম্পূর্ণ সত্য।

(গ) আমার ঐ পুত্র রাত্রে গৃহত্যাগ করিবে মনে করিয়াছিল, কিন্তু পরদিন ভোরে গৃহ ত্যাগ করিবে। ইহাও সম্পূর্ণ সত্য। তদুপরি লেখা আছে—

(ঘ) এই পুত্রের পিতার (অর্থাৎ আমার) বিবাহের পর উন্নত ধরণের লেখাপড়া হইবে। ইহা সম্পূর্ণ সত্য।

সুতরাং এই ভৃগুগণনা হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আমি জন্মাইবার বহু শত বৎসর পূর্বে স্থির হইয়াছিল যে,—

(১) আমার কি প্রকার লেখাপড়া হইবে, এবং কখন উহা ভাল হইবে।

(২) আমার কয়পুত্র, কয়কন্যা হইবে।

(৩) আমার পুত্র ও জামাতাগণের মধ্যে কয়জনের উপার্জন বেশী হইবে। সহৃদয় পাঠকপাঠিকাগণ একবার ভাবিয়া দেখুন, আমাদের পুরুষকার কতদূর পূর্ব নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ। যদি এই বিষয়টি মনে প্রাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়, তাহা হইলে স্পষ্ট বোঝা যাইবে যে—

(১) আমরা ঈশ্বরের হাতের খেলার পুতুল মাত্র, তিনি যেমন করাইতেছেন আমরা তেমনই করিতেছি—আমাদের মধ্যে যিনি ভাল কাজ করিতেছেন তাঁহার কোন কৃতিত্ব নাই, যিনি খারাপ কাজ করিতেছেন, তাঁহার কোন দোষ নাই। উভয়েই ঈশ্বরের নির্দেশে সৎ ও অসৎ কাজ করিতেছেন।

(২) আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সুখ দুঃখ, শান্তি-অশান্তিও ঈশ্বর পূর্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদের প্রাপ্ত দুঃখ ও অশান্তি আমাদের ঈশ্বরের ইচ্ছা-প্রদত্ত জানিয়া আমাদের যথাসাধ্য সহ্য করা উচিত, বৃথা ছটফট করা উচিত নহে।

তাই বলিতেছিলাম যে, অদৃষ্ট ও পুরুষকারের প্রকৃত সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে আমাদের নিজ নিজ পথে ধর্মানুশীলন অনেক পরিমাণে সহজ হইবে, কারণ তাহা হইলে আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টিলীলার একটি প্রধান অংশ বুঝিতে পারিব।

অঘটনের সাধক সাধিকা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

তিন মাস পরে

ভাই অসিত,

তোমার চিঠি পেয়েছি। কিন্তু উত্তর দেব দেব ক'রে দেওয়া হয় নি নানা কারণে। প্রধান কারণ—মা-র অসুখ খুব বেড়েছিল। তোমার মনে আছে হয়ত মা বলেছিলেন তোমাকে যে, ঠাকুর বাইরে তাঁকে বেশি দর্শন দিলে তাঁর দেহ থাকবে না? তোমার গানের দিন মা-র সেই দর্শনের পর থেকেই শরীর খারাপ হয়। নানা উপসর্গ একের পর এক। সে সব ব'লে কী হবে! শেষে কয়েক মাস আগে যখন তোমার চিঠি এল তখন সংকট অবস্থা। সুরথদা এসেছিলেন দিল্লীর এক হার্ট-স্পেশালিষ্টকে নিয়ে। তিনি কার্ডিওগ্রাম নিয়ে প্রণব যা বলেছিল তাই প্রতিধ্বনি করলেন। ইন্‌জেকসন দিতে চাইলেন, কিন্তু মা বললেন: "না ঠাকুর ডাকছেন। আর দেরি করা নয়।" আমাদের মন ভালো ছিল না বুঝতেই তো পারো। মা শুধু আমার জীবনের কেন্দ্রই তো নন—আমাদের এ ক্ষুদ্র আশ্রমটিরও খুঁটিও তিনি, চূড়াও তিনি। মা কিন্তু একথা মানেন না। বলেন বার বার একই কথা যে, তাঁর কাজ শেষ হয়েছে। তুমি গাইতে যে গানটি—যেটি ললিতা তোমার কাছে শিখেছিল—সেটি তিনি তার মুখে প্রায়ই শুনতে চান। সে গানটির শেষে আছে—

"কেন কারাগৃহে আছিস বন্ধ
ওরে ওরে মূঢ় ওরে অন্ধ?
ভূতের বোঝা ফেলে ঘরের ছেলে আয় চ'লে আয়
আমার পাশে"

মা প্রায়ই গুন গুন ক'রে গান এইআভোগটি, আর বলেন: "এই-ই ঠিক বাবা, এই-ই ঠিক—এখন আমি বুঝেছি যে, এখানে আমরা আসি শুধু তাঁরই একটি লীলা পোষ্টাই করতে, সেটি সাঙ্গ হ'লেই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে ঘুম যাবে তাঁর কোলে।"

কিন্তু ঠাকুর তাঁকে আরো দু'দিন হয়ত এই কারাগৃহেই রাখতে চান—ধন্যবাদ ঠাকুরকে! তাই কদিন মা একটু ভালো আছেন। সন্ধ্যায় মন্দিরে গিয়ে বসেন আমাদের আরতিতে। আর বলেন: "আহা! সে কী গানই গেয়ে গেছে রে! তাকে লিখে দিস—তার ভাবনা কী? সে গানের মধ্যে দিয়েই তাঁকে পাবে। যার গান শুনতে ঠাকুর নিজে নেমে আসেন, তার আবার ভাবনা? ফের লিখে দে—তার সময় হ'লেই গুরু তাকে ডেকে নেবেন। নেবেনই নেবেন।"

আনন্দগিরিও তোমাকে এই কথাই বলেছেন শুনে খুশী হলাম। তুমি তোমার সংশয়কে বেশি আমল দিও না। অবিশ্বাস আসে আসুক না। মা প্রায়ই বলেন যে, এ যুগের মানুষ ঘড়ি ঘড়ি মনের চাবি দিয়ে প্রেমের তালা খুলতে চেষ্টা করে ব'লেই তালাও খোলে না, চাবিও অপছন্দ হয়।

তবে আমার মনে হয় গ্রীক দার্শনিক প্লচিনাস বলেছেন একটি লাখ কথার এক কথা: "তর্ক থেকে আমরা পৌঁছই দৃষ্টির কোঠায়।" আনন্দগিরিকে আমার প্রণাম দেবে। কিন্তু আমার "পশ্যন্তী বুদ্ধি" যদি থাকেও তবে সে এখন সবে মিট মিট করে চাইতে সুরু করেছে।

দেখে অনেককিছু, কিন্তু ধাঁধা লাগে। তবে আমি বলি লাগুক না ধাঁধা? জিগ্‌স ধাঁধা খেলো নি? নানা কাটা কাঠের খেলা মনে হয় পাগলামি—কিন্তু সাজাতে সাজাতে ওমা! হঠাৎ দেখি একেবারে নিখুঁত নিটোল ব'সে গেছে এর সঙ্গে ও, ওর সঙ্গে সে—আর এমনভাবে যে কখনো কল্পনাও করি নি। আমাদের আশ্রমে নানা সাধু আসেন তাঁদের মধ্যে দুএকজনকেও ঠিক এই কথাই বলতে শুনেছি: যে, তাঁরা দেখতে পেয়েছেন যে, প্রতি হেঁয়ালিকে ধাঁধা মনে হয় ততক্ষণই যতক্ষণ মন দিয়ে ধাঁধার উত্তর খুঁজি। শেষে যখন মন নাজেহাল হ'য়ে হাল ছেড়ে দেয় তখনই ধাঁধার উত্তর মেলে। কিন্তু যে পথে চাই সে পথে নয়, সম্পূর্ণ অন্য পথে। পশ্যন্তী বুদ্ধি এই অকল্পনীয় পথের আভাষ পায় ব'লেই তার এত আদর। আনন্দ গিরিকে আমার প্রণাম জানিয়ে বোলো যে, আমি তাঁর আশীর্বাদ চাই যেন এ-বুদ্ধি দিয়ে দেখতে পাই গুরুর পায়ে শরণাগতির দিশাই "সত্যস্য সত্যং"। আমার জ্ঞানকে দেখে তোমার "হিংসে" হয় লিখেছ। প'ড়ে হাসি এল। আমি বলতে চাই—to return the compliment—যে আমার হিংসে হয় তোমার গানকে তথা প্রাণকে। গানকে—যে ঠাকুরকে টেনে আনে তাঁর বৈকুণ্ঠ থেকে, আর প্রাণকে যে পরকে আপন ক'রে নিতে পারে এত সহজে। তুমি আমাদের এত কাছে এসেছ এজন্যে আমাদের প্রেমের গুণগান করেছ। কিন্তু তোমার কাছে আসার ক্ষমতা কিছু কম চমকপ্রদ নয় জেনো। শুধু চুম্বকেই লোহাকে টানে না ভাই, লোহাও চুম্বককে টানে। এ উপমাটি আমার নয়—ললিতার। সে তোমার কথা প্রায়ই বলে—বলা য়—যেন আঁখর দিয়ে চলিয়ে তোলে তোমার প্রাণের সার গানের লীলাকে। রমণ মহর্ষিও তোমাকে আশীর্বাদ করেছেন তোমার এই সহজ শ্রদ্ধা ও সরল গ্রহিষ্ণুতার জন্যে। এ-বুদ্ধির যুগে এ দুটি গুণ তার বড়ই বিরল—শ্রদ্ধা করার ক্ষমতা আর গ্রহণ করার আগ্রহ। জীবনের র কুয়াশার মধ্যে দিয়েই এ-দুটি বাতি ধরে। তাই তুমি নির্ভরসা হোয়ো না হোয়োনা হেয়ো না। তুমিই একটি গান গাইতে রবীন্দ্রনাথের ললিতা তোমার কাছে শিখেছিল, মাঝে মাঝেই শোনায়—আমাদের তোমার উদাত্ত কণ্ঠকে মনে করিয়ে দিয়ে:

"নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে মন হবেই হবে,
যদি পণ ক'রে থাকিস সে-পণ তোমার রবেই রবে।"

কিন্তু মুস্কিল কি জানো ভাই? এ ধরণের ভরসা সত্যি দিতে পারেন কবিরা নয়, এমন কি বন্ধুরাও নয়—(যদিও সাধক বন্ধু তার নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে কিছুটা পারে নিরাশায় আশা লাগাতে)—পারেন কেবল সদ্‌গুরু। তাই ভাগবতে বলেছে: "গুরুর্বলক্ষোপনিষৎসুচক্ষু"—কিনা গুরু-রূপ সূর্যের কাছ থেকে পাওয়া উপনিষদের (কি না জ্ঞানের) চক্ষু লাভ করলে তবেই পরম দর্শন হয়।

তাই তো তোমাকে এত ক'রে বলি গীতার কথা—"নাত্মানম্ অবসাদয়েৎ"। নিরুৎসাহ হোয়ো না। আনন্দ গিরি, মোহন মহারাজ, শ্যামঠাকুর, মা, রমণ মহর্ষি, সন্তজী, চিন্ময়ী মা, আরো কত সাধুসন্ত তোমাকে আশীর্বাদ করেছেন ও করছেন তুমি হয়ত খবরও রাখো না। কিন্তু আমরা নানা সাধুর দূর থেকে আশীর্বাদ করার শক্তির কথা শুধু যে মানি তাই নয় জানি—প্রত্যক্ষ করেছি ব'লে। তাই তো আমি রমণ মহর্ষিকে দেখার বহু আগে ধ্যানে পেয়েছিলাম তাঁর সান্নিধ্য—সেকথা তোমাকে বলেছি। আরো বলতে পারতাম—কিন্তু বলব যেদিন তোমার গুরুলাভ হবে। উপনিষদের সেই শ্লোকটির কথা তোমাকে বলেছি—কিন্তু আবার বলি—(কারণ তা bears repetition):

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

এখানে আর একটি কথার 'পরে জোর দিতে চাই: যে উপনিষদে ঠিকই বলেছে যে, যার গুরু ও ইষ্টে ভক্তি আছে সে মহাত্মা। এ-যুগে মহাত্মার অর্থটা একটু বদলে গেছে! সেদিন সুরথদা লিখেছেন: ওদেশে কে great man—মহাত্মা—তার খবর নিতে ধুমধাম ক'রে লক্ষ লক্ষ জনগণমন-এর ভোট নেওয়া হয় সেকুলার—ডিমক্রটিক ঢঙে। ফল বেরিয়েছে আমেরিকার এক কাগজে যার দৈনিক গ্রাহক চার লক্ষ সত্তর হাজার। সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন চার্লি চাপলিন। রুষ দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাত্মা (ভোটে) নিশ্চয়ই স্টালিন। তবে মুস্কিল এই যে এদের দেহাত্ম হ'তে না হ'তে আঁ'রা সব [illegible]

জল্পনা কল্পনা চলছে আর—বেশি না—ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের মধ্যে রথে চ'ড়ে চাঁদে গিয়ে ঢু মেরে আসবে, আর এক পার্থিব ধূমকেতু। আসার সঙ্গে সঙ্গে অতীত যুগের সব মহাত্মার দীপ্তি নিভে যাবে এ নবোদিত মহাত্মার জ্যোতিধ্বজের পাশে: তবে ভরসা এই যে সেদিন তুমি আমি অন্ততঃ থাকব না, কাজেই সে মহানবযুগজয়ধ্বনিতে যোগ দিতে তোমাকে আমাকে বাধ্য করা হবে না। এও এক কম ভরসা নয় ভাই, কি বলো?

মার আশীর্বাদ নিও। আমাদের ভালোবাসা তো হাতের পাঁচ।

ইতি। তোমার স্নেহ-ধন্য প্রেমল

পুনশ্চ। এইমাত্র সুরথদার চিঠি পেলাম ঝুমেল থেকে। পেয়ে কী যে আনন্দ হচ্ছে কী বলব? মনে হচ্ছে ছুটে গিয়ে দেখি আমি তোমার নবরূপ। হ্যাঁ, সুরথদা লিখেছেন ললিতাকে। ললিতা সে চিঠিটির কাজ তোমাকে এই সঙ্গে পাঠাচ্ছে, কিন্তু ধরেছে, তার আগে সে তোমাকে "এক হাত নেবেই নেবে"। কি ভাবে নেবে সে-ই জানে। সে কখন কী ক'রে বসে—দেবা না জানান্তি কুতো মনুষ্যাঃ।

* * *

দাদু! দাদু! দাদু!

কেমন? বলি নি তোমাকে যে, তুমি যা নও তাই সাজতে ভালোবাসো? তুমি স্কেপটিক? তাহ'লে লজ্জাবতী লতাও বাবলা কাঁটা—প্রজাপতিও গঙ্গাফড়িং! বলতাম না তোমাকে যে, তুমি বাপীর মতনই বৈরাগী—তাই সংসারে সব থেকেও তার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারো না! তুমি যদি স্বভাবে অবিশ্বাসী হ'তে তবে এত সাধুসন্ত যোগী ঋষি—and last though not least, মা—কি তোমাকে এত ভালোবাসতেন? জানো, আমাদের আশ্রমে আমরা সহজে কাউকে বলি না "আস্তাজ্ঞে হোক।" আগে সুরথদার ছাঁকনি দিয়ে তাকে ছাঁকা হয়—তারপর সে কী দাঁড়ায় দেখে সুরথদা ছাড়পত্র দিলে তবে মা তাকে এখানে আসতে অনুমতি দেন। মা বলেন: বাজে হোমরাও-চোমরাও কি হুজুগেদের মন রাখতে গেলে ঠাকুরের মন পাওয়া যায় না। ভিড়ের হট্টমন্দিরে অট্টরবই হয় বংশীরব শোনা যায় না। আমাদের এখানে তাই আমরা সহজে কৌতূহলীদের আসতে দিইনা—খবরের কাগজকেও ঢুকতে দেওয়া হয় না, রিপোর্টার তো কা কথা। বাপী বলে: পাবলিসিটির জয়শঙ্খ মানেই ডিভিনিটির নবতন্ত্র। এহেন আশ্রমের মন্দিরে জাগ্রত রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহের সামনে যার বৃন্দাবনলীলা গানে * * * ঘটেছিল সে-সাধকের উপাধি স্কেপটিক? না, তবে যদি তখমার জন্যে বায়না ধরো তবে বড়জোর হাম্বাগ উপাধি মঞ্জুর করতে পারি।

না, ঠাট্টা না আর। সত্যি দাদু! কী যে আনন্দ হচ্ছে ভাবতে যে তোমার সম্বন্ধে ভুল ভাবি নি, ঠিকই ধরেছিলাম "এ রাম মনুষ্য নয়।"

উঃ! এক কথায় সব ছেড়ে উধাও হ'লে গুরুচরণে তাঁকে যা কিছু আছে সব নিবেদন ক'রে? দাদু! কথায় কথায় একে ওকে তাকে আমার ত্যাগী নাম দিই তাদের কৌপীনবস্ত্র দেখে। কিন্তু যার হাতে আছে সেই ত্যাগ করতে পারে। যে আজন্ম নিরন্ন সে ত্যাগী হবে কী ক'রে? বাপী আরো বলে: যে সত্যি ভোগ করেছে সেই পারে সত্যি ত্যাগী হ'তে। তাই যারাই নেংটি প'রে মৌনব্রতী বা উধ্বর্বাহু হ'য়ে ছাই মেখে গাল বাজিয়ে বোম্ ভোলা ব'লে হুঙ্কার দেয় তাদের বলা চলে না খাঁটি ত্যাগী। যেমন গিন্নির গাল খেয়ে যে গঙ্গোত্রী রওনা হয় তাকে বৈরাগী বলা চলে না। তুমি প্রায়ই বাপীর মাধুকরী করা দেখে ভয় পেতে, বলতে এ আমি পারব না। বাপী বলে: তুমি যা পারলে তা যারা মাধুকরী করে তারাও পারে না। কাজেই quits—শোধবোধ। তোমাকে ভারি দেখতে ইচ্ছে করে দাদু। মার এত অসুখ না হ'লে যেতাম চ'লে। কিন্তু মা প্রায়ই যাই যাই ক'রে এত দমিয়ে দিচ্ছেন যে নড়তে পারছি না এখান থেকে। তাই তুমি এসো দাদু। এখন না পারো দুদিন পরে—তোমার গুরুদেবের অনুমতি নিয়ে অবিশ্যি। এবার পড়ো সুরথদার চিঠি। প্রণাম প্রণাম প্রণাম দাদু

ইতি। তোমার স্নেহগর্বিতা ললিতা।

ললিতা দিদি!

আমি দিন কুড়িক আগে ঝুমেলে এসেছি। ভেবেছিলাম এখান থেকে শ্রীনগর ও পাহালগাঁ ঘুরে অমরনাথ যাব। কিন্তু ঝুমেলে এসেই স্বামী স্বয়মানন্দকে দেখে ম'জে গেলাম। চমৎকার লোক। একটু গম্ভীরাত্মা। ক'রে উদয় হবেন ভোটারদের চিত্তাকাশে। শুনছি না কি

কিন্তু বেরসিক নন তা ব'লে। অন্ততঃ আমি খুব হাসি গল্প করি। তিনি প্রেমলের মতন অট্টহাস্যে পাকা না হ'লেও হাসেন বেশ মন খুলে—আর মিষ্টি হাসি বৈ কি। সবচেয়ে ভালো লাগে তাঁর ভাগবতের ব্যাখ্যা। রোজ সকালেই শুনি। পণ্ডিত তো বটেই, কিন্তু সব আগে কবি। তাই ভাগবতের নানা বাণী এমন সরল ক'রে বলেন—অনেক শ্লোক আবার কবিতায় অনুবাদ ক'রে যে অসিতের কথা মনে করিয়ে দেয়। মনে পড়েছিল অসিত তাঁর কথা বলেছিল। তাঁকে সে দেখেছিল একবার প্রায় একবৎসর আগে—তোমাদের ওখান থেকে সোজা গিয়েছিল ডুমেলে। কিন্তু আমাকে লিখেছিল একটি চিঠিতে যে স্বামীজিকে খুব ভালো লাগলেও তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে মিশে বিশেষ তৃপ্তি পায় নি। বড় গম্ভীর সবাই। তাই ভয় খেয়েছিল।

তারপর আনন্দ গিরির ওখান থেকে চিঠি লেখে আমাকে যে দোটানায় কষ্ট পাচ্ছে। লিখেছিল—"প্রেমলকে লিখতে ভরসা হয় না সুরথদা। সংশয়ের নাম শুনলেই সে যেন বিমুখ হ'য়ে ওঠে। আমার মনে হয় দাদা, যারা স্বভাবে বিশ্বাসী তারা স্বভাবে সন্দিগ্ধদের কিছুতেই নেকনজরে দেখতে পারে না……ইত্যাদি।

তারপরই এখানে হঠাৎ স্বামীজির কাছে তার। আমি তখন সবে এসে ফিরছি—তোড়জোর বাঁধছি অমরনাথ যাব ব'লে। কিন্তু ওর তার পেয়ে আর বেরুতে পারলাম না। কারণ স্বামীজি বললেন আমাকে যে, ও বরাবরের জন্যেই আসবার অনুমতি চেয়ে তার করেছে। শুনে তো আমি থ! এই দুদিন আগেই তো লিখেছিল সন্দেহের দোলায় হাঁপিয়ে উঠেছে, আর—তবে এমনিই তো হয় দিদি। ওকে আমি ব'লেছিলাম—মা-ও তো বলেছিলেন যে, গুরুবরণ ওকে করতেই হবে এবং সে-গুরু নির্দিষ্ট আছেন। আমি কিন্তু ভাবি নি ও স্বামী স্বয়মানন্দকে বরণমালা দেবে। আমি ভেবেছিলাম—হয় প্রেমলের টানে মা-র চরণে আশ্রয় নেবে, নৈলে আনন্দগিরির। তবে ও মহাপুরুষকেই বরণ করেছে এবিষয়ে সন্দেহ নেই—ডুমেল আশ্রমে ও স্বস্তি পাবে কি না, ভরসা ক'রে বলতে পারি না। মরুক গে—আমাদের বাঁকা ঠাকুরটি কাকে যে কোন্ আঘাটায় নাস্তানাবুদ ক'রে হঠাৎ কোন্ ঘাটে টেনে তোলেন কেউ জানে না দিদি। কেবল একটি কথা আমরা সবাই জানি যে, 'নহি কল্যাণকৃৎ কাশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি'—অর্থাৎ যে আন্তরিক তাঁকে চাইবে তার গতি হবেই হবে। তাই আশা করি অসিত এখানে এসে স্বামীজির কাছে যা দরকার শুষে নিয়ে আশ্রমের অবান্তর যা কিছু বর্জন করবে—হংসৈর্যথা ক্ষীরম্ ইবাম্বুমধ্যাৎ—হাঁস যেমন জল থেকে ক্ষীর টেনে নেয়। (হাঁস অবিশ্যি সত্যিই কিছু পারে না এ-অসাধ্যসাধন করতে—তবে উপমায় পারে তো—আর অসিতও কবি - তাই ঠিক উপমাই এসে গেছে)।

যাহোক অসিত তার করার তিন দিন বাদে দিল্লী হ'য়ে সোজা এখানে এল সতীর মোটরে।

তার কাছে সব শুনলাম, সে দীর্ঘ কাহিনী ওর মুখেই শুনো তোমরা—কিম্বা চিঠিতে—আমি শুধু সংক্ষেপে জানিয়ে দিই খবরটা জানাবার ম'ত ব'লে। দিদি, সংসারে দিনের পর দিন কত কী-ই তো ঘটছে চার যোগফলে মানুষের হয় মানুষে নয় ভগবানে বিশ্বাস টলমল ক'রে উঠছে (যার যেমন স্বভাব তার বিশ্বাসও তো সেই ভাবেই তাকে দুলিয়ে তুলবে! (কেবল এমন অঘটন কালে ভদ্রে ঘটে যাতে ভাঁটিয়ে-যাওয়া বিশ্বাসে আবার জোয়ার জেগে ওঠে। অসিতের বৈরিগি হওয়াকে খানিকটা এই জাতের অঘটন বলা চলে। আনন্দগিরিকে ও বলেছিল: স্বয়মানন্দ স্বামীকে দর্শনের পর তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হ'লেও তাঁর কাছ থেকে কিছুই তো পায় নি—মানে হাতে আসে নি। শুধুই হারিয়েছে—মানে অনেক কিছুই যা আগে ভালো লাগত বিস্বাদ মনে হচ্ছে। এরূপ ক্ষেত্রে—বলেছিল অসিত—কিছু না পেলে সব ছেড়ে সন্ন্যাসী হয় কেমন ক'রে?

শুনে আনন্দগিরি শুধু বলেছিলেন: "অসিত, এ হ'ল ভগবানের সঙ্গে দর-দস্তুর করা—আগে কিছু দাও তবে ছাড়ব, নৈলে নয়। এ পথে বৈরাগী হওয়া যায় না।"

তার পর—বলল ও আমাকে—সারারাত ওর ঘুম হ'ল না চিত্তগ্লানিতে। সকালে উঠেই মনস্থির হ'য়ে গেল—আর ভুলেও করবে না দরদস্তুর। সব ছাড়বে এক কথায়—যাকে বলে to burn one's boats. স্বামীজীকে তার ক'রে দিল: "আমাকে গ্রহণ করতেই হবে গুরুদেব।

ভারতে ইংরেজগঠিত সাম্রাজ্য সম্বন্ধে কি বলেছিলেন, তা অনুধাবন করা যাক :—

'কোন ইউরোপীয় জাতির দ্বারা ভারতজয় ভারতের ক্রমোন্নতির জন্যে নিতান্ত আবশ্যক হয়েছিল। এমন কোন জাতির দ্বারা ভারতে সামুদ্রিক উপনিবেশ স্থাপন করা আবশ্যক, যে-জাতির লোক সংখ্যা অবিরাম নবীকৃত হবে। কেন-না, স্থলপথ দিয়ে যে কোন জাতিই আসুক না কেন, সে-জাতি সমস্ত দেশকে সভ্য ক'রে তুলতে পারবে না। নিজের কাজ সুসম্পন্ন হবার আগেই সেই সব অভিযাত্রীরা আবহাওয়ার কাছে হার মেনে দেশীয়দের সঙ্গে একত্র মিশে যাবে।

কিন্তু ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে কোন্ জাতির দ্বারা ভারত অধিকৃত হওয়া উচিত? ইউরোপের অন্যান্য দেশের চেয়ে ইংল্যাণ্ডই বেশি ধনশালী; সুতরাং ভারতে দরকারি মূলধন আনতে একমাত্র ইংল্যাণ্ড সমর্থ। ত্রিশ বছরের মধ্যেও হল্যাণ্ড সুমাত্রা দ্বীপের অন্তর্গত আচিন প্রদেশে শান্তি স্থাপন করতে পারে নি। আর বোর্নিও দ্বীপের যে-অংশ ওলন্দাজদের দখলে আছে, সেই অংশটিতে নরখাদকদের বসতি। এর কারণ কি? এর কারণ এই যে, ওলন্দাজরা ঐ সব দ্বীপের জঙ্গল আবাদ করার জন্যে, জলভূমির জল শোষণের জন্যে, রাজপথ ও রেলপথ নির্মাণের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করতে অক্ষম। ইংরেজের প্রভূত অর্থই ইংরেজকে ভারতের অধীশ্বর করেছে।

তা ছাড়া একমাত্র ইংল্যাণ্ডই সেই মনুষ্যজাতি গ'ড়ে তুলতে পারে যারা ভারত-জয় ও ভারত-শাসন করতে সমর্থ; সেই সব লোক, যারা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করার জন্যে কোন রকম সঙ্কোচ বোধ করে না অথচ নিজেদের শক্তির অহঙ্কারেও কখন উন্মত্ত হয় না। এই ভারতবিজয়ী জাতির সম্বন্ধে অতিরিক্ত ঔদ্ধত্য বা কঠোরতা আরোপ করা যায় না; কোন রকম অত্যাচার বা নৃশংসতার জন্যে তাদের নিন্দা করা যায় না। সেই সব লোক, যারা অল্প বেতনের বিনিময়ে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রচণ্ড সূর্যতাপ সহ্য করে, বনজঙ্গলের জ্বর রোগের আক্রমণ সহ্য করে—শুধু কয়েকটা দিনের জন্যে নয়, বরং খাল কাটার সময়ে, রেলপথ নির্মাণের সময়ে, বৈদ্যুতিক তারের জাল তৈরি করার সময়ে, বছরের পর বছর এই রকম সহ্য ক'রে থাকে। সেই সব লোক, যারা আবহাওয়ার করুণ অবসাদ ও এশীয় সমাজের প্রচলিত বিলাসের প্রলোভন অতিক্রম ক'রে থাকে। এ-কথা ঠিক যে, ইংল্যাণ্ডের ইংরেজরা ভারতপ্রবাসী ইংরেজদের আচার ব্যবহারে বিস্ময় বোধ করে। কিন্তু ভারতের ইংরেজদের চরিত্র ভালো ক'রে বুঝতে হলে ভারতের পর একবার সুমাত্রা ও জাভায় যাওয়া দরকার—যেখানে ওলন্দাজরা দেশীয় লোকদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়, দেশীয়দের মতো জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, দেশীয়দের মতো পরিচ্ছদ পরিধান করে।

অবশেষে বক্তব্য, সমস্ত ইউরোপীয় জাতিদের মধ্যে ইংরেজরা ব্যক্তিস্বতন্ত্র ও স্বাধীনতার পথে সর্বাপেক্ষা অগ্রসর; এই সব বাণীই ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ও বর্ণভেদ প্রথার উচ্ছেদ করতে সমর্থ। বর্ণভেদ পদ্ধতির পক্ষ সমর্থন করার ইংরেজদের কোন গরজ নেই। ভারতবাসীরা যদি জেদ ক'রে এ-বিষয়ে বাধা না দিত, তা হলে ইংরেজরা অনতিবিলম্বে জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ সাধন করত।

ভারতের একতা আস্তে আস্তে ছাড়া তাড়াতাড়ি কখনই হতে পারবে না; আর সে-একতা কোন এক পাশ্চাত্য রাজশক্তির প্রভাবাধীনে সংসাধিত হবে। ইংল্যাণ্ডই কি সেই রাজশক্তি? হ্যাঁ, তাই সম্ভব ব'লে মনে হয়। ইংল্যাণ্ডের প্রভাববশেই ভারত একতা লাভ করবে।

প্রথমতঃ, ভারত ইংল্যাণ্ডের অধিকারভুক্ত; অন্য জাতি অপেক্ষা ইংল্যাণ্ড রাজ্যশাসনের উপযোগী কতকগুলি গুণের পরিচয় দিয়েছে। ইংল্যাণ্ড এমন ধনশালী যে, একাকীই ভারতের মূলধন যোগাতে সমর্থ; ইংল্যাণ্ডের সামুদ্রিক প্রভুত্ব, সাম্রাজ্যের বিস্তার এবং এই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের প্রায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা—এর দ্বারাই ইংল্যাণ্ড ভারতকে একেবারে ইংরেজি ক'রে না ফেলেও অধিকারে রাখতে পেরেছে।

দ্বিতীয়তঃ, অন্য কোন রাষ্ট্রজাতির ভারত জয় করার ইচ্ছা আছে ব'লে মনে হয় না। এই উচ্চাভিলাষ রুশিয়ার থাকতে পারে; কিন্তু এই কঠিন বিজয় সাধনে রুশিয়ার কোন লাভ নেই। ভারতের মতো দরিদ্র দেশ পৃথিবীর মধ্যে আর একটিও নেই এবং রুশিয়ার কারখানায় এমন

কোন জিনিস প্রস্তুত হয় না যা রুশিয়া ভারতে পাঠাতে পারে। ভারতের ভৌগোলিক সংস্থান অবশিষ্ট এশিয়া থেকে স্পষ্টভাবে আলাদা। তা ছাড়া ভারতীয় সভ্যতার এমন একটা নিজত্ব আছে যে, ভারত এখনও অনেক দিন ঐ সভ্যতাকে বজায় রাখতে পারবে, রুশের সভ্যতার সঙ্গে কখনই মিশে যাবে না। ভারত কোন দূরদেশের উপনিবেশ রাজ্য হতে পারে কিন্তু কোন মহাদেশস্থ সাম্রাজ্যের অংশ হতে পারে না। ভারতের সমস্ত ইতিহাসে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

পরিশেষে বক্তব্য, ভারত ইংরেজের কাছ থেকে এমন একটা উদারনৈতিক শাসনতন্ত্র পেয়েছে যা রুশিয়ার স্বেচ্ছাশাসনতন্ত্রের বিপরীত। রুশিয়া ভারতে এলে মুদ্রা-যন্ত্রের স্বাধীনতা ও সভাসমিতির অধিবেশনের অধিকার হরণ করবে। রুশ সরকার ফিনল্যাণ্ড ও পোল্যাণ্ড-বাসীকে যা দেয় নি, তা কি ভারতবাসীকে দেবে? তা ছাড়া ভারতীয়দেরকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিয়ে ইংরেজ সরকার ভারত ও রুশিয়ার মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর গড়ে তুলতে পারেন।" (জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদ অবলম্বনে।)

এই ফরাসী মনীষীর দূরদর্শিতা প্রায় দিব্যদর্শনশক্তির তুল্য, এর বিশ্লেষণ সামর্থ্যের পরিচয় পেলে যে কোন পাঠক বিস্ময়মগ্ন না হয়ে পারবেন না। দুঃখের বিষয়, এঁর রচনার যে বিস্তৃত অনুবাদ দীর্ঘ ছয় বছর ধ'রে (বঙ্গাব্দ ১৩২১-২৬ ভারতী পত্রিকা) স্বনামধন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় করেছিলেন, তা কখনও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। এই অমূল্য রচনা লোকলোচনের অন্তরালে ভারতীর কয়েকজন শিক্ষিত পাঠকের চিত্তপ্রহর্ষ সাধন করলেও সাধারণ পাঠকসমাজ এর সাহায্যে কোন দিগ্-দর্শন লাভ করে নি।

ভৌগোলিক দিক থেকে একটি বিশিষ্ট সত্তা ভারত ইংরেজের অধীনে একটি রাষ্ট্রীয় সত্তায় পরিণতি লাভের পর তার সাংস্কৃতিক ঐক্যকে জাতীয় ঐক্য মনে ক'রে প্রস্তুত হবার আগেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা চাইতে গিয়ে মস্ত ভুল ক'রে বসে। এত বড় একটা সাম্রাজ্য চালাবার যোগ্যতা যে ভারতবাসীর আছে, ইতিহাসে তা কখনও প্রমাণিত হয় নি; বিশেষত মাত্র কয়েক বছর আগে ভারত খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ছিল; সুতরাং স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত হতে এবং তার চেয়ে বড় কথা, এত বড় সাম্রাজ্যকে ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধ রাখার শিক্ষা পেতে তখনও ভারত-বাসীদের অনেক দেরি ছিল। কিন্তু একটা অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী সহজেই ধর্মান্ধতা ও সুলভ উত্তেজনার দ্বারা পরিচালিত হয়ে ভুল করে।

প্রথমবারের ভুল রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের রূপ ধরলেও সে-ভুল তত মারাত্মক হয় নি। ১৮৫৭ সালের প্রতিক্রিয়াশীল পশ্চাদ্গামী সিপাহী বিদ্রোহ এই প্রথমবারের ভুল, যাতে পূর্ব ও দক্ষিণ ভারত একরকম যোগ দেয় নি। কিন্তু ১৯০৫ সালে যে অদূরদর্শী আন্দোলন সুরু হল তাই দ্বিতীয়বারের এবং সর্বাধিক ক্ষতিকারক ভুল। ইংরেজ-শাসিত অখণ্ড ভারতের সুদৃঢ় ঐক্য আমাদের অবিমৃষ্য-কারিতায় যতটা বিশৃঙ্খল ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, এমন আর কোন জাতির দ্বারা নয়। অরবিন্দ থেকে ১৯০৫-৪৫ সালের বাঙালী নেতারা যে কূটনৈতিক ভুল করেছিলেন ইংরেজের বিরুদ্ধে অকালে আন্দোলন আরম্ভ ক'রে, সে-কথা এখন শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই মনে মনে উপলব্ধি করছেন এবং কেউ কেউ মুখে স্বীকারও করেন। আর কয়েক বছরের মধ্যেই মাৎসিনির সাহেবের মন্তব্যের সত্যতা প্রকাশ্যে স্বীকৃত হবে। স্বনামধন্য কবি-সমালোচক-অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদার নির্ভীক স্পষ্টভাষণে স্বীকার করেছেন :—

"বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বাঙালি দেশমাতৃকার যে অকালবোধন করিয়াছিল, তাহাতে আত্মনাশের যজ্ঞাগ্নি জ্বালিয়া সে প্রায় ভস্মসাৎ হইয়াছে। আমি এই গ্রন্থে সেই নিদারুণ নিষ্ফলতা ও তাহার কারণ উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। কেবল ইহাই বলিয়াছি যে, নবযুগের সেই ধারা অতঃপর বিপর্যস্ত হইয়াছে, বাঙালির সেই সাধনা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছে।" (বাংলার নবযুগ—পৃষ্ঠা ১৪।)

মাৎসিনির সাহেব সম্ভাব্য স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বরূপ আগেই বুঝতে পেরে লিখেছিলেন :—

"ভারতবাসীরা অনতিবিলম্বে ইংল্যাণ্ডের জোয়াল নিজেদের স্কন্ধ থেকে ফেলে দেবে এবং জাপানিদের দৃষ্টান্ত অনুসারে নিজেদের রূপান্তরিত করবে। বিদ্রোহের পরিবর্তে একটা বিপ্লব ঘটবে।"

পরবর্তী কালে রাসবিহারী বসু ও সুভাষচন্দ্র এই পথেই যাত্রা করেছিলেন এবং জাপানিদের দৃষ্টান্ত ও সাহায্য, দুই-ই নিয়েছিলেন। মাঝেকিয়ের আরো দেখিয়েছিলেন : —

"ভারতবর্ষে একদল বৈপ্লবিক যে আছে তাতে সন্দেহ নেই—ইংরেজি বিদ্যালয়ের অল্পবয়স্ক ছাত্রবৃন্দ! তাদের মধ্যে অধিকাংশেরই একমাত্র অবলম্বন—সরকারি চাকরি। কিন্তু সরকার তো সকলকেই চাকারি দিতে পারেন না। যারা চাকরি পায় তাদের মধ্যে অধিকাংশের উন্নতির আশা অল্পই। যারা সর্বাপেক্ষা অনুগৃহীত, তারাও বড় চাকরি কখনই পায় না। এই সব হতভাগ্য উমেদার ও অসন্তুষ্ট কর্মচারীরা শেষে সংবাদপত্রের সম্পাদক, সভা-সমিতি-ওয়ালা ও জনবক্তা হয়ে দাঁড়ায়; তারাউপস্থিত রাষ্ট্রপদ্ধতির বদল চায়, পরিবর্তনের দাবি করে—সে-পরিবর্তন যাই হোক না কেন। কিন্তু সফলতা লাভ করতে হলে জন-বক্তাদের দলে জনসাধারণকে পাওয়া চাই। কিন্তু জনসাধারণ কৃষিক্ষেত্র সংক্রান্ত বা সামাজিক কোন উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রবিপ্লবে যোগ দিয়ে থাকে।"

বিপিনচন্দ্র পাল, গান্ধি প্রভৃতি নেতারা এই উদ্দেশ্যে কৃষকদের উত্তেজিত করার পথ গ্রহণ করেছিলেন। আজকের নক্শালবাড়ির আন্দোলনও এই পথে ধাবিত।

ইংরেজরা যখন বুঝতে পারল যে, ভারতবাসীদের সহযোগিতায় ভারত শাসন করা সম্ভবপর নয়, তখন তারা ভারতসাম্রাজ্য রক্ষাকরারূপ ব্যয়বহুল বিলাসিতা ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। রোমকরা যেমন আন্তর্জাতিক প্রতিকূলতার জন্যে এবং গৃহবিপ্লব সামলাবার জন্যে ব্রিটনদের কাতর আবেদন সত্ত্বেও ব্রিটেন ত্যাগ ক'রে চলে যায়, ইংরেজরাও তেমনি ভারতীয়দের বিপ্লবের ভয়ে ভীত না হলেও আন্তর্জাতিক প্রতিকূলতা ও অর্থনৈতিক দুর্দশার জন্যে সহসা ভারত ত্যাগ ক'রে চ'লে যায়। রাসেল ও চার্চিল দুজনেই তাঁদের গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে উপনিবেশ বিস্তারের চেষ্টায় ইংরেজরা প্রভূত ধনশালী হয়ে ওঠে; ঊনবিংশ শতাব্দীতেও ঐ সমৃদ্ধি মোটামুটি বৃদ্ধির মুখে ছিল; কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে দুটি বিশ্বযুদ্ধে পূর্ণ জয়লাভ সত্ত্বেও ব্রিটেন প্রায় দেউলিয়া অর্থাৎ অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। বিপ্লব করা তো দূরের কথা, পায়ে ধ'রে সাধলেও ভারতীয়রা ইংরেজদের নিজেদের ব্যয়ে ভারত রক্ষা আর বেশি দিন করাতে পারত কিনা সন্দেহ। বস্তুত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের অর্থনৈতিক দুর্দশাই ইংরেজের ভারত-ত্যাগের প্রধান কারণ; আন্তর্জাতিক প্রতিকূলতা দ্বিতীয় কারণ; তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতরক্ষার দায়িত্ব নেওয়া ইংল্যাণ্ডের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল; ভারতবাসীদের অসহযোগিতা অবশ্যই তৃতীয় কারণ, কিন্তু এটি গৌণ কারণ; সুতরাং গান্ধিপন্থীদের নিরুপদ্রব অহিংস আন্দোলনের ভয়ে তো নয়ই, সুভাষচন্দ্র বা আজাদ হিন্দ বাহিনীর লোকদের আন্দোলনের ভয়েও ইংরেজ ভারত ত্যাগ করে নি; বড় জোর এটুকু বলা যেতে পারে যে, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর অসহযোগিতার আশঙ্কা ইংরেজকে খানিকটা ত্বরান্বিত করেছিল। মাত্র এই ক্ষেত্রে নেতাজির প্রভাব সক্রিয় ছিল। অন্য সুবিধাবাদী নেতারা দশ-বিভাগ ক'রে জাতিদ্রোহিতার পরিচয় দিয়ে ক্ষমতালাভের চেষ্টামাত্র করেছিলেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের অন্য কোন দান যে ছিল না, লিওনার্ড মোস্লে, টম এড্-ওয়ার্ডস, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, এ্যালান ক্যাম্বেল-জনসন প্রভৃতির গ্রন্থ থেকে দলনিরপেক্ষভাবে যে কোন সত্যসন্ধ ঐতিহাসিক তা প্রমাণ করতে পারেন।

সাধারণ ভারতবাসী নিরক্ষর এবং শোচনীয়ভাবে অজ্ঞ; ভারতকে অখণ্ড রাষ্ট্ররূপে শাসন করায় ইংরেজের চেয়ে ভারতীয়ের স্বার্থই যে প্রবলতর, সে-কথা যাতে সে না বোঝে তার জন্যে আমাদের ব্যবসায়ী সংঘপরিপুষ্ট রাজনীতিজ্ঞ নেতাদের চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিলনা। ভারতের ঐক্য বা অখণ্ডতা রক্ষার জন্যে লর্ড ওয়াভেল বা লর্ড ইস্মের যেটুকু দরদ ছিল, ভারতীয় নেতাদের বোধ হয় সেটুকুও ছিল না। ভবিষ্যতে স্বয়ং মৌলানা আজাদ ও গান্ধীর রচনাবলী থেকেই জনসাধারণ সে-সত্য জানতে পারবে। আমাদের স্বাধীনতা লাভের প্রায় শতাব্দীকাল আগে ফরাসি ঐতিহাসিকরা ইংরেজের ভারত-ত্যাগের বিপদ সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন। কিন্তু বেশির ভাগ সাধারণ লোকের এই রকম ধারণা ছিল যে, কৃষক যেমন তার জমিদারকে খাজনা দেয়, ভারত থেকে তেমনি শত শত কোটি টাকা প্রতি বছর ব্রিটেনে রাজস্বরূপে

প্রেরিত হয়। ১৯৪৭ সালে কলিকাতা মহানগরীর প্রেসিডেন্সি কলেজের অর্থনীতির ছাত্রের মতো শিক্ষিত জনের মুখেও এই রকম ভুল ধারণা ব্যক্ত হয়েছে। ইংরেজের ভারত ত্যাগের পরিণাম যে প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে শোকাবহ হবে এ-কথা ফরাসি মনীষীরা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, ফজলুল হক, সিকান্দার হায়াৎ খান প্রভৃতি প্রবীণ ভাবনায়ক ও রাজনীতিবিদ্‌রা বুঝলেও ক্ষমতালোলুপ হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্যে তা স্বীকার করতে চান নি। এর জন্যে এই উপ-মহাদেশের ষাট কোটি জনসাধারণকে বিশ বছর ধ'রে অবর্ণনীয় দুর্গতি ভোগ করতে হয়েছে এবং আরো অনেক বছর দুর্ভোগ সইতে হবে। চার্চিল দেখিয়েছেন, ব্রিটনরা চতুর্থ শতাব্দীতে রোমকদের অধীনে যে আরাম, বিলাস ও স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করত, স্বাধীন ইংল্যাণ্ডে দেড় হাজার বছরের আগে তার ব্যবস্থা করা ইংরেজের পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। মাত্র উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংরেজের মতে প্রগতিশীল জাতি খাস ব্রিটনে সেই জীবনযাপনমান বা Standard of living প্রবর্তন করতে সমর্থ হয়। অনুরূপভাবে বলা যায়, ১৯৩৭-৩৮ সালে ইংরেজ আমলে ভারতে যে নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা ও অর্থনৈতিক মান ছিল, এখন এই উপ-মহাদেশে তার চিহ্নমাত্র নেই এবং বর্তমান ধারায় চললে আর কোন দিনই তা ফিরে আসবে না। যদি পঞ্চত্রিংশ শতাব্দীর আগে ভারতে আর সেই অবস্থা প্রকটিত না হয় তা হলেও বিস্ময়ের কিছু থাকবে না।

১৯০১-১৪ সালে ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে পূর্ণায়ত রূপ দেবার এবং তার উত্তর পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম সীমারেখা ম্যাকম্যাহন্ ও ডুরাণ্ডকে দিয়ে নির্ধারণের পর ইংরেজরা ভারতে সর্বোত্তম প্রশাসনিক ব্যবস্থা বহাল করে যার অভ্যন্তরীণ ও সীমান্ত সম্পর্কিত নিরাপত্তাবিধান বর্তমান ভারতের অধিবাসীদের স্বপ্নের অগোচর। ঐ সময়ে বাইরের কোন রাষ্ট্রের দ্বারা ভারত আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা পর্যন্ত লুপ্ত হয় পর পর তিনটি ঘটনার ফলে: রুশ বিপ্লব, জার্মানির পরাজয়, আফগানদের ওপর ব্রিটেনের চূড়ান্ত প্রভাববিস্তার। ১৯১৭-১৯ সালে এই ঘটনাগুলি ঘটে। দেশের মধ্যেও তখন লোকে পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চলাফেরা করত। ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারত নিজের এলাকার বাইরেও পশ্চিমে হিরাট থেকে পূর্বে লাশিও, দক্ষিণে ক্যাণ্ডি থেকে উত্তরে লাসা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে পূর্ণায়ত সাম্রাজ্য ও প্রভাবাধীন এলাকা বা Sphere of Influence-এর চরম সুখ উপভোগ করেছে। ১৯০৫ সালের পর মাত্র বারো বছরের মধ্যে এই সুদৃঢ় কাঠামো ধ্বংস করা হল। পৃথিবীর ইতিহাসে শুধু সাম্রাজ্যস্থাপনার ব্যাপারে নয়, রাষ্ট্রগঠনের প্রতিভার দিক থেকেও যে ব্রিটিশ ভারতের কোন কীর্তিগত তুলনা ছিল না তাকে কয়েক জন মূঢ় ধর্মান্ধ ও ক্ষমতালোলুপ নেতা জনসাধারণের অজ্ঞতার সুযোগে ধ্বংস ক'রে দিল।

১৯৩৫ সালের পর ব্রহ্মদেশ যখন ব্রিটিশ ভারত থেকে বিযুক্ত হয়ে সিংহলের মতোই একটি স্বতন্ত্র ব্রিটিশ-শাসিত রাষ্ট্রে পরিণত হল, তখন ভৌগোলিক ভারতবর্ষের বাইরের আর কোন এলাকা ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকল না, এই সময়ে অর্থাৎ নতুন ভারত শাসনবিধি অনুসারে যখন প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সেই ১৯৩৮ সালের রাজনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে ভৌগোলিক ভারতবর্ষের ভাষাগত পরিক্রমা সমাধা করলে দেখা যায়, ব্রিটিশ ভারত ছাড়া এই-উপমহাদেশে আরো পাঁচটি রাষ্ট্র আছে, যারা ঠিক ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র নয় কিন্তু যারা পরে ভাষার ভিত্তিতে সুবিন্যস্ত হতে পারবে প্রতিবেশী এলাকাগুলির সঙ্গে সীমারেখা সংশোধনের দ্বারা। এরা হচ্ছে মুখ্যত আফগান ফার্সিভাষী আফগানিস্তান বা ডুরাণ্ডরেখার পরপারে অবস্থিত আফগান ও পশ্‌তোভাষী এলাকা নিয়ে গঠিত রাষ্ট্র, তামিল ও সিংহলি ভাষা নিয়ে গঠিত সিংহল রাষ্ট্র, নেপালি ও নেওয়ারি ভাষা নিয়ে গঠিত নেপাল রাষ্ট্র, ভুটান ও ভারতের আশ্রিত রাজ্য সিকিম। এ-ছাড়া ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে অন্ততঃ চব্বিশটি উল্লেখযোগ্য ভাষা-ব্যবহারকারী জাতি তো রয়েছেই। জাতি ও ভাষা অনুসারে এই উপ-মহাদেশের রাষ্ট্রীয় বিন্যাস কেমন হওয়া উচিত, কেমন হতে পারে বা কেমন হয়ে চলেছে, সেই বিশ্লেষণ করার আগে সমগ্র ভৌগোলিক ভারতের স্বাতন্ত্র্যবোধসম্পন্ন ভাষাগুলির নাম উল্লেখ করা দরকার। অবশিষ্ট এশিয়ার ৬৮টি রাষ্ট্রের সঙ্গে এই ভাষাগুলির ভিত্তিতে গঠিত

রাষ্ট্রগুলির সংখ্যাও যোগ ক'রে নিলে বিশ্বের ভাষাগত পরিক্রমা রাষ্ট্রিক দিক থেকে সম্পূর্ণ হবে।

(১) আফগান (২) সিংহলি (৩) নেপালি (৪) নেওয়ারি (৫) ভুটিয়া (৬) সিকিমি—এই ছ'টি ভাষা ব্রিটিশ-শাসিত বা ব্রিটিশ প্রভাবাধীন এলাকার অন্তর্গত হলেও এরা ছিল ব্রিটিশ ভারতের বহির্ভূত। (৭) পাঠানি (৮) বালুচ (৯) সিন্ধ (১০) উর্দু (১১) কাশ্মীরি (১২) ডোগ্রি (১৩) পাঞ্জাবি (১৪) হিন্দি (১৫) কোসলি (১৬) মৈথিল (১৭) মগহি (১৮) ভোজপুরি (১৯) রাজস্থানি (২০) গুজরাতি (২১) মরাঠি (২২) উড়িয়া (২৩) বাংলা (২৪) অসমিয়া (২৫) মণিপুরি (২৬) নাগা (২৭) তেলুগু (২৮) তামিল (২৯ মলিয়ালি (৩০) কানাড়ি—এই চব্বিশটি হল উল্লেখযোগ্য ব্রিটিশ ভারতীয় ভাষা। সুতরাং ভাষাভিত্তিক স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠিত হলে ভারতবর্ষে অন্তত ত্রিশটি রাষ্ট্র গঠিত হবার কথা। কিন্তু কার্যত হবে আরো বেশ। তার কারণ ধর্মের ভিত্তিতে অন্তত চারটি একভাষী এলাকা দ্বিধা বা ত্রিধাবিভক্ত হতে বাধ্য। সে-বিশ্লেষণ দেবার আগে স্মরণ করা চাই যে, ব্রিটিশ ভারত ছাড়া ভৌগোলিক ভারতের আর পাঁচটি রাষ্ট্র ১৯৩৮ সালে যা ছিল ১৯৬৮ সালেও প্রায় তাই আছে। ইংরেজরা যাবার সময়ে মাল দ্বীপপুঞ্জ সিংহলিভাষী এলাকা হলেও সিংহলকে না দিয়ে মুসলিম ধর্মের ভিত্তিতে একটি ইসলামি রাষ্ট্র "মাল" গঠন করেছে এবং ভুটান খণ্ডিত ভারতের কাছে কিছু জমি ফিরে পেয়েছে। ব্রিটিশ ভারত দু ভাগে ভাগ হয়ে পাকিস্তান ও খণ্ডিত ভারত রাষ্ট্র দুটি গঠিত হওয়ায় এখন এই ভারতবর্ষের ভৌগোলিক এলাকায় আছে মোট আটটি রাষ্ট্র। এদের মধ্যে ভুটান, সিকিম ও মাল এখনও U. N. O.-র সদস্যপদ লাভ করে নি, কিন্তু করতে যাচ্ছে। ইতিহাসের গতি যে এখন ভারতের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তিকে বহুধাবিভক্ত করার দিকে অগ্রসর, পরবর্তী ঘটনাসমূহের বিশ্লেষণ থেকে তা প্রমাণিত হবে। ১৯৩৫ সালে সমগ্র ভৌগোলিক ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ এবং এশিয়া ও আফ্রিকার আরো কিছু কিছু এলাকা দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত; এখন খালি ভারত উপ-মহাদেশেই পাঁচটি পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র যারা জাতিপুঞ্জের সদস্য এবং তিনটি প্রায়-স্বাধীন রাষ্ট্র যারা রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ পেতে চলেছে। তা ছাড়া খণ্ডিত ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীর, নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, পাঠানিস্তান, পূর্ব বঙ্গ ইত্যাদি স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রগঠনের তুমুল আন্দোলনে সর্বদা সক্রিয় আছে।

১৯০৫ সালে কার্জন যখন বৃহৎকায় বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি বা তৎকালীন বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করলেন, তখন "পূর্ববঙ্গ ও আসাম" নামে যে-প্রদেশটি গঠিত হয়েছিল, গণ-উত্তেজনার বশবর্তী না হয়ে, সুলভ আবেগপ্রবণতায় দাপ্ত না ক'রে যদি মাত্র অর্ধ শতাব্দীকাল সে-প্রদেশটিকে কাজ করতে দেওয়া হত, তা হলে আজ পূর্ব ভারতে বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতির অধিকার অনেক পরিমাণে বেড়ে যেত। নাগা ও মিজো সমস্যার উদ্ভব তা হলে ঘটত কিনা সন্দেহ। অবশ্য ঐ প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হত; কিন্তু তারা বাঙালি মুসলমান; বাংলা ভাষার জন্যে তাদের গভীর দরদ তাদের আগে বাঙালি পরে মুসলমান ক'রে তুলত এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। ঐ প্রদেশটি সম্পূর্ণ বাংলাভাষী প্রদেশে রূপান্তরিত হতে পারত।

সুতরাং ১৯০৫ সালের আন্দোলন যাঁরা করেছিলেন, তাঁরা বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষার স্বার্থ বড় ক'রে না দেখে কেবল বাঙালি হিন্দুর কায়েমি স্বার্থ ও সরকারি চাকরিলাভের প্রশ্নটাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তার ফলে আজ ভাষার ভিত্তিতে অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র গঠন করা প্রায় শিবের অসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাষার ভিত্তিই প্রকৃত জাতীয়তার ভিত্তি; সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক ক'রে একদিন সমস্ত বাংলাভাষী লোক এক জাতিতে পরিণত হয়ে একটিমাত্র রাষ্ট্রে সংহত হবে নিঃসন্দেহ। কিন্তু তার আগে যে-কালস্রোতে বাঙালিকে ভাসতে হবে তার দৈর্ঘ্য আতঙ্কজনক।

স্বদেশি আন্দোলনের ত্রুটি দেখিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল যা লিখেছিলেন পরে রবীন্দ্রনাথ বহুভাবে তা সমর্থন করেছিলেন। প্রায় সাম্প্রতিক কালে আরো পরে মোহিতলালও তা স্বীকার করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টার মতো সাফল্যের সঙ্গে লিখেছিলেন :—

"যে ভাবে এই স্বদেশি আরম্ভ হইল, তা বাস্তবিক আমাদের দেশে স্থায়ী ও মঙ্গলজনক হবে কি না? সকলেই

আমার বিপক্ষে, আমি একা। কিন্তু একা 'শত সমকক্ষ শত সেনানীর!' আমি বলি, এই বিদ্বেষমূলক বয়কটের দ্বারা আমাদের পরিণামে সর্বনাশ হবে, ইহাতে আমাদের স্থায়ী কল্যাণ কোনো মতেও সম্ভব নয়। যাহারা আমাদের শিক্ষাগুরু—যাহাদের কৃপায় ও ইচ্ছায় আমাদের আজ এই কিছু উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে—তাহাদের প্রতি আমাদের এ-রকম অন্ধ বিদ্বেষ যত দিন সম্যক্ তিরোহিত না হইবে, ততদিন আমাদের প্রকৃত উদ্ধারের সহজ কোন উপায় আমি দেখি না। পার্টিশানের সময়ে আমি বলেছিলাম যে, এর একটা খুব ব্রাইট সাইড্ আছে। তোমরা তো তখন আমার উপরে খড়্গহস্তই ছিলে! সে-ভালোর দিকটা এই যে, একদিকে বাঙালি আসামিদের শিক্ষিত করুক, আর একদিকে বিহারীদের শিক্ষিত করুক।"

সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে সম্পূর্ণ শান্ত থাকায় ১৮৫৭-১৯০৫ সালে বাঙালি ইংরেজের প্রিয়পাত্র ছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাঙালির পক্ষে এই প্রিয়পাত্র থাকাটা বড়ই প্রয়োজনীয় ও সুবিধাজনক ছিল। একটি অনুন্নত পশ্চাৎপদ জাতির পক্ষে একটি শক্তিশালী জাতিকে মুরুব্বিরূপে পাওয়া বিশেষ সৌভাগ্যের কথা। ইংরেজের মুরুব্বিআনা বা পৃষ্ঠপোষকতা ভিন্ন বাঙালি জাতির উন্নতির সম্ভাবনা ছিল না। তাতে লজ্জারও কোন কারণ নেই। নাপোলেঅন বোনাপার্তের মুরুব্বিআনা ভিন্ন উনিশ শতকীয় ইউরোপের দুটি বড় জাতির একীকরণ ত্বরান্বিত হত না; উড্রো উইলসনের পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতীত পূর্ব-ইউরোপের কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভবই হত না। ১৯০৫ সালের আন্দোলনের ফলে ১৯০৫-৪৭ সালে বাঙালি ইংরেজের বিদ্বেষভাজন হয়ে পড়ে। তার ফলে ১৯৩৫-৪৭ সালে ভারত উপ-মহাদেশে যে রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনগুলি সাধিত হয়, বাঙালি তার সুফল লাভে একেবারে বঞ্চিত হয়।

১৯৩৫ সালে ব্রহ্মদেশকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঐ যে ভাঙন সুরু হল, তারপর ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সংসক্তি ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে। ১৯৩৮ সালে যখন নতুন শাসনবিধি কার্যকরী হল তখন যদি ভারতীয়রা ইংরেজদের সঙ্গে পূর্ণভাবে সহযোগিতা ক'রে প্রস্তাবিত ভারতীয় ফেডারেশন বাস্তবে সম্পূর্ণ রূপায়িত ক'রত, তা হলে পরে সর্দার পাটেল, ভি, পি, মেননের সাহায্যে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির সম্বন্ধে যে-ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, তা অনেক এগিয়ে যেত। কিন্তু ভারতের নেতারা তখনও "অহিংস" অসহযোগিতার ভাবটি পরিত্যাগ না করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বরের পর ব্রহ্মদেশ ইংরেজের হস্তচ্যুত হল। ১৯৪২ সালে ক্রিপ্স্ এবং ১৯৪৫ সালে ওয়েভেল সাহেবের প্রস্তাব দুটিও ভারতের অসহযোগী নেতারা গ্রহণ করলেন না। যিনি প্রথম স্বদেশি আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন, সেই শ্রীঅরবিন্দ তার জন্যে ভারতের নেতাদের অবিমৃষ্যকারিতার নিন্দা করেছিলেন; তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে ১৯০৫ সালের পথ ১৯৪০ সালে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ ক'রে প্রকাশ্যে এক ঘোষণা করেন; গোপনে ১৯১০ সালেই তিনি বিপ্লববাদ বর্জন করেছিলেন; ১৯৪২ ও ১৯৪৫ সালের ক্রিপ্স ও ওয়েভেল প্রস্তাব দুটাই শ্রীঅরবিন্দ সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন; কিন্তু গান্ধী ও সুভাষচন্দ্র দুটী প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করেন। তারপর ১৯৫৬ সালে মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবও অরবিন্দ-কর্তৃক গৃহীত কিন্তু গান্ধি-নেহরু কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। তার ফলে ভারতের সমূহ ক্ষতি হয়। ১৯৪৭ সালে গান্ধি নেহরু-জিন্না কর্তৃক মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাব গৃহীত হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ভাগ্য শোচনীয়ভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান ব্রিটীশ ভারত থেকে বিযুক্ত হবার পর এবং দিল্লী থেকে ভাইসরয় ও গভর্নর-জেনারেল কর্তৃক দক্ষিণ এশিয়া ও অন্য নানা স্থানের অ-ভারতীয় এলাকাগুলি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা নাকচ হবার পর দক্ষিণ এশিয়ার ব্রিটীশ ভারতীয় সাম্রাজ্য চূর্ণ হল। এর পর খণ্ডিত ভারতের হিন্দু গরিষ্ঠ অংশের পুনর্বিন্যাসের পালা সুরু হয়।

ধর্মের ভিত্তিতে যেমন ব্রিটীশ ভারত থেকে মুসলিম গরিষ্ঠ অংশকে পৃথক্ ক'রে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়, তেমন ব্রিটীশ সিংহল থেকে মুসলমগরিষ্ঠ মালদ্বীপপুঞ্জ স্বতন্ত্র থেকে যায়। তার ফলে ভৌগোলিক ভারতে ধর্মের ভিত্তিতে চারটি একভাষী এলাকা বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা আলাদা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। সিংহলিভাষী এলাকা বৌদ্ধ সিংহল ও মুসলিম মাল রাষ্ট্রে দ্বিধা বিভক্ত; বাংলা, পাঞ্জাবি ও সিন্ধিভাষী এলাকাগুলি হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের মধ্যে বিভক্ত। এর ফলে সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রীয় পুনর্বিন্যাস জটিল ও আয়াসসাধ্য হয়ে পড়েছে।

ক্রমশঃ

—

সমাধান

শ্রীসুনীলচন্দ্র সেন

খুড়তুত বোন তন্দ্রার বিয়ে। দু'বছর ধরে ছন্দা কলকাতা থেকে বহুদূরে স্বামীর কর্মস্থলে। স্নেহের টান ও ভালোবাসার দাবী দূরকে নিকট করতে চাইল। তন্দ্রা শুধু খুড়তুত বোনই নয়। বাপ মা মারা যাবার পর ছন্দা এই খুড়োখুড়ীর কাছেই মানুষ। এছাড়া ওদের বয়সেরও বেশী ফারাক্ নেই। দুই বোন না ব'লে দু'সখীও বলা চলে। তাই এ হেন তন্দ্রার বিয়েতে যোগ দেবার জন্য ছন্দার মন ছন্দোময় হয়ে উঠল। কিন্তু বাধ সাধল ডাক্তারের বাধা। ডাক্তার রায় দিলেন শরীরের এই অবস্থায় অতদূরের ট্রেণ জার্নিতে প্রাণ নাশের আশঙ্কা আছে। আমরা সবচেয়ে ভালোবাসি আমাদের জীবনকে। যদিও আমরা প্রায়ই এ বিষয়ে সজাগ নই। কারণে অকারণে আমাদের শরীরের অনেক ক্ষতি করি। কিন্তু যখনই প্রাণ নাশের আশঙ্কা দেখা দেয় তখনই আমরা সবরকম স্বাস্থ্যবিধি সাবধানে পালন করি। বাবলু আসছে। জীবনের প্রথম ফসল। নিজের এবং বাবলুর জীবনের টানে তন্দ্রার টানকে এড়াতে বাধ্য হল ছন্দা। তন্দ্রার বিয়েতে ছন্দার যাওয়া হল না। যথাসময়ে ঘর আলো করে বাবলু এলো। ধীরে ধীরে বাবলু বড় হল। বাবলুর যখন দু'বছর বয়স তখন কাকীমার চিঠি পেল ছন্দা। 'তন্দ্রার কি হয়েছে কিছু বুঝতে পারছিনা মা। দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। সব সময় কেমন মন মরা হয়ে থাকে। জানিনা ভগবান আমাদের কপালে কি লিখেছেন। ওর বিয়েতে তো তুই আসতে পারিস নি মা। আমার মনে হয় তুই একবার এলে ওর উপকার হতে পারে।' স্বামী নিখিল ছুটি পেল না। তন্দ্রার টানে ও কাকীমার চিঠির বার্তায় বাবলুকে নিয়ে ছন্দা পাড়ি দিল কলকাতায়।

বালীগঞ্জ। ট্যাক্সি থেকে তন্দ্রার দরজায় নামল ছন্দা। ট্যাক্সির হর্ণের শব্দ পেয়ে তন্দ্রাও ছুটে এলো গেটে। তখন প্রায়-সন্ধ্যা। গোধূলির ছায়ায় কেউ কারো মুখ ভালো করে দেখতে পেল না। অন্ধকারেই দুজন দুজনকে সজোরে জড়িয়ে ধরল। আলিঙ্গনের মধ্যেই উভয়ে উভয়ের কুশল প্রশ্ন বিনিময় করল। দু'টি তরুণী পাহাড়ী নদীর মত ঝরঝরিয়ে ঘরে ঢুকল। ঘরের আলোতে দু'জন দু'জনের মুখ পড়ে নিল। কুড়িবছরের তন্দ্রার বুড়ি রূপ দেখে ছন্দার মুখ শুকিয়ে গেল। কাকীমা যা লিখেছেন তা একটুও মিথ্যা নয়।

—তোর কি হয়েছে তন্দ্রা, আমাকে বল। আমার কাছে কিছু লুকোস না।

তন্দ্রার দু'টি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে সহানুভূতির স্বরে প্রশ্ন করল ছন্দা।

—আমার তো কিছুই হয় নি দিদি। তুই মিছামিছি ব্যস্ত হচ্ছিস কেন।

সহজ হবার চেষ্টা করে জবাব দিল তন্দ্রা। তন্দ্রার চোখ তন্দ্রালু।

—মেয়েদের মনকে মেয়েরা ফাঁকি দিতে পারে না তন্দ্রা। আমি শুধু তোর দিদি নই তোর সখীও। তোর দুঃখের কারণ আমাকে খুলে বল, দেখি আমি কোন সমাধান করতে পারি কি না। পরমেশবাবুকে কি তোর পছন্দ হয় নি? শুনেছি তিনি যেমন বিদ্বান তেমনি রূপবান।

তন্দ্রার দু'হাতে চাপ দিয়ে মনের চাপা কথা বের করবার চেষ্টা করল ছন্দা।

—আমার দুঃখ!

দুঃখের হাসি হাসল তন্দ্রা। তার দু'চোখের দু'কোণে দু'টি মুক্তাবিন্দু চিক্ চিক্ করে উঠল। তারপর ছন্দার হাতের মধ্যে মাথা রেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল তন্দ্রা। কান্নায় মনের গ্লানি সরে গেল। ছন্দার কাছে নিজেকে উন্মুক্ত করল তন্দ্রা।

—"তোদের জামাই বিদ্বান এবং রূপবান এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যে কোন পিতামাতার কাছে তিনি লোভনীয় জামাই। কিন্তু স্বামী হিসাবে তিনি অচল। তিনি বৈজ্ঞানিক। সারাদিন কলেজে এবং লেবরেটরীতে বিজ্ঞান চর্চা করে কাটান। মানুষ হিসাবে তিনি সরল ও অমায়িক। স্ত্রীর যে তাঁর কাছে কোন দাবী থাকতে পারে তা তিনি বোঝেন না। বুঝতেও চান না। কলেজ থেকে ফিরলে পর তাঁকে নিয়ে আমি রোজ সন্ধ্যায় লেকে বেড়াতে যেতাম। ইচ্ছা না থাকলেও বেড়াতে যেতে তিনি কোনদিনও বিশেষ আপত্তি করেন নি। তিনি আমার সঙ্গে বন্ধুর মত ঘুরে বেড়াতেন। আমি গা ঘেঁষে চললে তিনি সরে যেতেন। একদিন চাঁদনীরাতে আমরা লেকের ধারে একটা বেঞ্চিতে বসলাম। চাঁদ সারা আকাশে। লেকের জলের আয়নায় চাঁদের ছবি চক্‌চক্ ক'রে উঠল। আমাদের মাথার ওপরের গাছ থেকে দু'টি পাখীর আদরের কিচিরমিচির আমাদের কানে ভেসে আসছিল। আমাদের পাশের বেঞ্চিতে বসে দু'টি কলেজের ছাত্রছাত্রী ফাঁকে ফাঁকে নিজেদের মধ্যে আদর বিনিময় করে চাঁদনীরাতকে উপভোগ করছিল। আমার মনের কবি ও প্রেমিকা জেগে উঠল। আমি স্বামীর গা ঘেঁষে বসে হাত দু'টো জড়িয়ে ধরে বললাম, দেখো কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে; আর কেমন করে ওরা এদৃশ্য উপভোগ করছে। চাঁদের দিকে এবং পাশের বেঞ্চির ছাত্রছাত্রীর দিকে আমার স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। তিনি আমাকে একটু ঠেলে দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হাসিমুখে বললেন, 'ছেলেমানুষি কোরো না তন্দ্রা। আমাদের জীবনে অনেক মহৎ কাজ বাকী আছে। এভাবে মেয়েলি কবিত্ব করে সময় কাটানো আমাদের উচিত নয়।' কে যেন আমার মুখে ছাই লেপে দিল! সেদিন থেকে আমি আর ওঁর সঙ্গে লেকে বেড়াতে যাই না। তিনি আমার নারী-সত্তাকে অবহেলা করেছেন। বৈজ্ঞানিক হিসাবে উনি বাঁচতে চান, প্রেমিক হিসাবে নয়। তবুও আমি তাঁকে ভালোবাসি। সে ভালোবাসায় কোন খাদ নেই। কিন্তু তবুও তুই বিশ্বাস কর দিদি, আমার অজ্ঞাতে আমি ওঁকে প্রতারণা করেছি। আমি হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছি, 'Frailty, thy name is woman.' এখন আমি কি করি দিদি?"

ছন্দার হাত ধরে আবার ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল তন্দ্রা। তন্দ্রার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তন্দ্রাকে শান্ত করে বাকী কথাটা জেনে নিল ছন্দা।

—"ক'য়েক'দিন আগে আমার স্বামী বলে যান যে লেবরেটরী থেকে ফিরতে তাঁর অনেক রাত হবে। সেদিন অমাবস্যা। সন্ধ্যার থেকে আমার মাথাটা টিপ্‌টিপ্ করছিল। আমি একলাই লেকের এক বেঞ্চিতে গিয়ে বসলাম। চারিদিকে ঘন অন্ধকার। বিরাট লেকে থম্‌থমে ভাব। আঁধারের রূপ সেদিন আমার চোখে ধরা পড়ল। হঠাৎ অন্ধকার ভেদ করে আমার কানে ভেসে এলো, "এ কি তন্দ্রা, তুমি একলা এখানে বসে আছো কেন? পরমেশবাবু আজ আসেন নি?" আমার পাশে এসে দাঁড়াল প্রদীপ। প্রদীপের আলোতে পশ্চাৎ আলোকিত হল। বি, এ ক্লাশের সারা দু'বছর প্রদীপের সঙ্গে বহু সন্ধ্যা লেকে কাটিয়েছি। তোকে বলতে আমার লজ্জা নেই দিদি যে প্রদীপকে আমি ভালোও বেসেছিলাম। কিন্তু আমার বাবা আমার মঙ্গলের জন্য সাধারণ বি, এ পাশ প্রদীপের সঙ্গে আমার বিয়ে না দিয়ে বহু টাকা খরচ করে আমার বিয়ে দিলেন বিজ্ঞানের বিখ্যাত প্রফেসার পরমেশের সঙ্গে। সে অমাবস্যার সন্ধ্যায় প্রদীপের রূপ আমার চোখে আবার নতুন করে রূপায়িত হল। অন্ধকারেও আমার চোখ জ্বলে উঠল। হেসে প্রদীপকে আমার পাশে বসালাম। প্রদীপ ঠিক এতটা আশা করেনি। সাহস পেয়ে তার সাহস আরো বেড়ে গেল। সে আমার হাত দু'টো জড়িয়ে ধরে মুখের কাছে মুখ নিয়ে এল। বোধহয় প্রত্যাখ্যানের প্রতিশোধ নিল। মাথা ধরার যন্ত্রণায় ও অমাবস্যার অন্ধকারে আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। প্রদীপ চলে যাবার পর আমার মাথা ধরা সেরে গেল। শরীরটাও বেশ ঝরঝরে হয়ে উঠল। তখন আমি আমি বুঝতে পারলাম যে আমি আমার ভোলানাথ স্বামীকে প্রতারণা করেছি। ভূতপূর্ব প্রেমিককে আমি আবার ভালোবেসেছি। সেদিন থেকে আমার মনে ঝড় বইছে।

কালবৈশাখীর ঝড়। এখন আমি কি করব তুই বলতে পারিস দিদি ?"

তন্দ্রার চোখ দিয়ে দু'গাল বেয়ে বন্যা নামল।

ছন্দা বাবলুকে তার কোল থেকে নামিয়ে তন্দ্রার কোলে বসিয়ে দিল। তন্দ্রা বাবলুকে সজোরে কোলে চেপে ধরে চুমোয় চুমোয় তার গাল ভরে দিল। তার চোখের জলের বন্যা বাঁধে আটকে গেল।

—"তোর কোলে একটি বাব্‌লু এলেই তোর দুঃখের সমাধান হবে বোন। নারীত্বের পূর্ণতা যে মাতৃত্বে। দেখবি পরমেশবাবুও আর তোকে অবহেলা করতে পারবেন না। স্বামী-স্ত্রীর প্রেমের সফল পরিণামে বৈজ্ঞানিকের চোখে ফুটে উঠবে বিশেষ জ্ঞান।"

তন্দ্রার মুখে হাত বুলিয়ে বলল ছন্দা। চারচোখে হাসি ফুটে উঠল। বাবলুও খিলখিল করে হেসে উঠল।

কলেজ থেকে ফিরে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছন্দার শেষ কথাগুলো শুনতে পেল পরমেশ। ঘরে ঢুকে তন্দ্রার কোলে বাব্‌লুকে দেখে তন্দ্রার নবরূপে মুগ্ধ হল পরমেশ। তার মুখেও হাসি ফুটে উঠল।

কত যে তুমি মনোহর

গীতি সেনগুপ্ত

রাতে চাঁদের সুধা ঝরে—
তবু, তোমার সুরের সুধার তরে
আমার, মন যে কেমন করে॥

বনে কুসুমকলি ফোটে—
তবু, তোমার গানের ফুলের লাগি
আমার, পরাণ-অলি ছোটে॥

হারিয়ে যাবার লোভে—
আকাশ মাঝে দলে দলে বলাকারা ভাসে,
তবু, তোমার মাঝে হারিয়ে যেতে
আমার, মন যে ভালোবাসে॥

দিনে আলোর ধারা ঝরে—
তবু, তোমার রূপের আলোর ধারায়
আমার, দু'চোখ আছে ভরে॥

অরূপ রতন খোঁজে—
ডুবুরীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে অতল সাগরেতে
তবু, আমার এ মন চায় যে তোমার
মনের মুক্তো পেতে॥

কঠোপনিষদের সাধন পথ

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

উনবিংশতি মন্ত্র (১।১।২৯)।

মন্ত্র— যস্মিন্নিদং বি চিকিৎসন্তি মৃত্যো:
যৎ সাম্পরায়ে মহতি ব্রূহি নস্তৎ।
যোঽয়ং বরো গূঢ়মনুপ্রবিষ্টো
নান্যন্তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে॥

অর্থ—(নচিকেতা আত্মতত্ত্ব জানিবার জন্য ব্যাকুলচিত্তে শেষবার প্রার্থনা করিতেছেন :—) "হে যমরাজ! যে আত্মা সম্বন্ধে আছে কিনা লোকে সংশয় করিয়া থাকে এবং যে তত্ত্ব আবিষ্কার হয় মহান্ সাম্পরায় প্রসাদে, তাহাই আমাদিগকে বলুন (প্রথম ও দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি)। যে বর দুর্জ্ঞেয় অনু (আত্মা) মধ্যে উপস্থাপিত আছে তাহা হইতে ভিন্ন কিছু, নচিকেতা প্রার্থনা করেনা (তৃতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তি)।

ব্যাখ্যা—যমরাজকে এই মন্ত্রে মৃতব্যক্তি সম্বন্ধে সংশয় নিরাকরণের জন্য শেষবার কাতর অনুরোধ করা হইতেছে। যেমন কঠিন ব্যাধির বিষয় চিকিৎসকের অন্তরে শেষ পর্য্যন্ত সন্দেহের অবধি থাকে না, সেইমত মৃতব্যক্তি থাকে কিনা, তাহার অবস্থান সম্বন্ধে লোকের মনে সংশয় সহজে যাইবার নয়। লোকে কিছুই বুঝিতে পারেনা যে মানুষের স্থূল শরীর ও সূক্ষ্মদেহ অবসান হইলে তাহার আত্মা বলিয়া কিছু চিহ্ন থাকে কিনা।

স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম দেহের কিছুই অবশিষ্ট না থাকিলে সে অবস্থাকে মহান্ সাম্পরায় বলা হয়। কেবলমাত্র স্থূল শরীর বিনাশপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে শুধু সাম্পরায় বলা হয়। সাম্পরায় শব্দের অর্থ কি? পণ্ডিতেরা এক-কথায় বলেন, "পরলোক" (Hereafter)। আমরা সাধারণতঃ বুঝি যে পরলোক সৃষ্টি করে মৃত্যু। অথচ মৃত্যু জীবনের শেষে একটি ঘটনা বিশেষ বলিলে ঠিক বলা হয় না। গীতায় যখন বলা হইয়াছে, যদি মনে কর মানুষ নিত্য জাত হইতেছে ও নিত্য মরিতেছে ইত্যাদি (২।২৬) তখন নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারা সে জীবন সঞ্চয় করিতেছি ও ক্ষয় করিতেছি তাহা বলা হইতেছে নাকি? যদি ঠিক সেই কথা হৃদয়গ্রাহী না হয়, ইহা ত নিঃসন্দেহ বলা যায় যে মানুষ যখন জীবিত থাকে, তাহার জীবনের প্রথম ভাগে একটি অশান্ত স্রোত প্রবাহিত হয় তাহার আত্মা হইতে সংসারের দিকে। তাহাকেই আমরা ইহ-জীবন আখ্যা দিই। কিন্তু সেই ইহজীবন যখন ফুরাইতে থাকে, একটা পাল্টা শান্ত স্রোত দেখা দেয়, যাহা সংসার হইতে জীবনকে আত্মার দিকে ক্রমশঃ ফিরাইতে থাকে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, তখন মানুষ অনুভব করে, তাহার ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি যে আত্মা হইতে উদয় ও প্রকাশ হইয়াছিল তাহা সমস্তই সেই আত্মনিবাসেই ধীরে ধীরে অস্ত যাইতেছে। ঠিক সেইমত বিশ্বাসও, বিশ্বাত্মার মধ্যে বিদায় লইতে পারে, যেমন কোন আত্মীয়ের দেহ-ত্যাগ হইলে যে আত্মীয় তাঁহাকে ভালবাসিয়াছেন তিনি শেষবার তাঁহার আত্মায় সেই প্রিয়জনকে যথাসাধ্য কুড়াইয়া সঞ্চয় করিয়া রাখেন। সে যাহা হউক, ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি অথবা বিশ্বের ও এমন কি আমার প্রিয়জনেরও এইরূপে আত্মায় বিলীন হওয়াকে আমারই জীবনের মরণ-স্রোত বলা যায়। ইহাকেই শুদ্ধভাষায় সাম্পরায় বলা হয় এবং সাম্পরায় শক্তির প্রভাবে ইহা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। সাম্পরায় শক্তি, ধনী কি নির্ধন, জ্ঞানী কি অজ্ঞান এসব বাচবিচার করেন না, সবাইকে একইরূপে সমতার অবস্থায় লইয়া গিয়া নিস্তার দেন। তাঁহার দৃষ্টি প্রাকৃতিক জীবনের শেষে সবাইকে সমতার কুম্ভে নিক্ষেপ করা। তাই তাঁহাকে সাম্পরায় দেবী বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। স্থূল শরীরের মৃত্যুকে বা সাম্পরায়কে যদি "The Leveller" বলিয়া বিদেশীয় ভাষায় আখ্যাত করা

যায় তাহা হইলে মহান্ সাম্পরায় শক্তিকে "The great leveller" বলা অন্যায় হইবে না। তাঁহাতেই স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম দেহ সঙ্কুচিত হইয়া মহাসমতায় আত্মায় বিলীন হইয়া যায়। অতএব আত্মাকে পূর্ণভাবে জীবের শেষ আশ্রয় বলিয়া জানিতে হইলে মহান্ সাম্পরায় শক্তির অনুগমন করিলে তাহার সংবাদ পাওয়া যায়। এ শক্তি মানবজীবনে হঠাৎ কোথা হইতে আসিল? প্রকৃতিতে বা তাহার ঊর্দ্ধে, হঠাৎ কোথাও কিছু হয় না। সবই ক্রমবিকাশ বা বিবর্তনবাদের নিয়মে দেখা দেয়। ("যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী" অর্থাৎ যেখান হইতে আদি প্রবৃত্তি নিঃসৃত হইয়াছে (গীতা, ১৫।৪) বাণীতে বিবর্তনের পদচিহ্ন ধরিয়া নিবর্তনের সাধন মার্গ লওয়ার উল্লেখ দেখা যায়।) পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, মানবজীবন আনন্দের অভিযান। যতক্ষণ জগৎ সম্পর্কে আনন্দ পাই, ততক্ষণ ভোজন বা ভোগ হইতে আনন্দ গ্রহণ করি। অর্থাৎ তখন বুঝিতে থাকি, জাগতিক বস্তুতে বা ব্যক্তিতে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক আত্মা আমাকে আনন্দ (আমোদ) দেন ইহাই আত্মার অধিষ্ঠান তত্ত্ব। আবার যখন জীবসত্তায় ভজন অথবা নাচিকেত অগ্নিতে যজ্ঞ নিষ্পন্ন করিয়া আনন্দ পাই, তখন জানিতে পারি আত্মা আমারই আপন সত্তায় প্রেমে বা জ্ঞানে নিজেকে বিস্মৃত করিয়া আমাকে আনন্দ (প্রমোদ) পরিবেশন করিতেছেন। ইহাই আত্মার অধ্যাস তত্ত্ব। শেষে যখন ধরা যায় যে আনন্দ আর অন্তঃকরণেও বিম্বিত বা প্রকাশ হয় না, তখন বুঝা যায় যে বৈদ্যুতিক আলো যেমন নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া নিজ শক্তির ভাণ্ডারে ফিরিয়া যায়, সেইমত হঠাৎ নহে, ক্রমশঃ ধীরে ধীরে, সন্তর্পণে, জীবনের-আনন্দ কিরণের শান্ত প্রত্যাহার হইতে থাকে ও তাহা আত্মায় পরিণামে অন্তর্হিত হয়। ইহাকেই বলা হয় সাম্পরায় তত্ত্ব (পরে ১।২।৬ দেখুন)। প্রত্যেকটি তত্ত্বের ভিতর দিয়া একই শক্তি কার্য করে, অথচ তাহাদের প্রচেষ্টা অনুযায়ী সেই একই শক্তির বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন নাম করণ হয়, যেমন অধিষ্ঠান শক্তি, অধ্যাস শক্তি এবং পরিশেষে সাম্পরায় শক্তি। মুমুক্ষু নচিকেতা এক্ষণে কি করিয়া এই মহান্ সাম্পরায় শক্তির শরণ লইতে পারেন, যাহা সাধুজীবনে সমতায় প্রথম ধরা দেন ও অন্তে মহাসমতায় লইয়া গিয়া হিসাব নিকাশ করেন, তাহাই জানিতে চান, যাহাতে আত্মার অব্যয় নিবাসে পৌছাইয়া স্বগতভাবে, যিনি নয়নের ধ্রুবতারা তাঁহাকে নিঃশেষে দৃষ্টি প্রত্যর্পণ করিতে পারা যায়।

মন্ত্রের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে তাই নচিকেতা যমরাজকে এই মহান্ সাম্পরায় সম্বন্ধে "বলুন" বলিয়া খুব সংযতভাবে নিজ প্রতিষ্ঠা দৃঢ়ভাবে ধরিলেন। তিনি যে সমগ্র মানবজাতির পক্ষ হইতে প্রতিনিধি হইয়া এই তৃতীয় বর চাহিতেছেন তাহা সুস্পষ্ট করিলেন। অথচ এই প্রার্থনা যে মানুষের পক্ষ হইতে কিরূপ মর্ম্মভেদী ও তাহার সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে সক্ষম তাহাও তিনি তৃতীয় পঙক্তিতে জানাইলেন। আত্মা যখন আছেন, সকল বাধাবন্ধনের অতীত হইয়া আছেন, যাহা যমরাজের ইতস্ততঃভাব হইতে নচিকেতা ভাল করিয়া অনুমান করিতে পারিতেছেন, তাহা জানিবার কি উপায় নাই? তাহা জানিবার সাধনা কি মানুষের অসাধ্য? তাহা ব্যতীত নচিকেতা যে আর কিছু জানিতে চাহেন না। পরের বল্লীতে সেই আত্মতত্ত্বের পর্য্যালোচনা চলিবে এবং এই উপনিষদের শেষ পর্য্যন্ত প্রকারান্তরে ঐ একই সমস্যার নানাদিক হইতে সমাধান চলিবে। সাধক যখন নিজের বা অপরের শোকের মধ্যে অবসন্ন হইয়া সকলের জন্য পথ খুঁজেন তাঁহার পক্ষে প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত সবটুকু যথেষ্ট হইবে, প্রথম অধ্যায়ের শেষ দুইটি মন্ত্র তাহার ইঙ্গিত দিয়া থাকে। তারপর সাধক যদি নিজ জীবনে শান্তিতে আত্মচর্চা করিয়া আত্মার জ্ঞান ও বিজ্ঞান পূর্ণ মাত্রায় জানিয়া অমৃত হইতে অভিলাষী হন তাঁহার জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত, মীমাংসার চূড়ান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায় প্রথমবল্লী সমাপ্ত।

(ক্রমশঃ)

— — —

মহুয়ার নেশা

শ্রীসমীরণ রুদ্র

হুস করে একটা হলুদ বসন্ত পাখি কেঁদ গাছটার সরু ডালে কাঁপন তুলে উড়ে গেল নিমডিহার দিকে। পাখিটা ফিসফিসে বৃষ্টিতে ভিজছিল এতক্ষণ। ঠোঁট দিয়ে তার ভিজে পালক পরিষ্কার করছিল। আমার বাংলোর একটা তক্তপোষে শুয়ে শুয়ে আমি তাই দেখছিলাম আর জানলা দিয়ে শ্রাবণের বৃষ্টিভেজা সকালের সুবাস নিচ্ছিলাম আর পরম আলস্যভরে আমার দৃষ্টিকে মেলে দিয়েছিলাম বাইরের সবুজ বনে-পাহাড়ে। অনেকদিন আগেকার কথা লিখছি। তখন আমি কুমরী কাছারির তহসিলদার ছিলাম। এই কাছারি বাড়ি বা মাটির বাংলোর চারদিকে ঘন শালবন। হাতায় বড় বড় ঘাস। এদিক ওদিকে কেরাউন্দা ও পুঁটুসের ঝোপ ছিল। নিমডিহা জঙ্গলের কেঁদপাতার যে ইজারাদার সেই শশী পাঠকও থাকতো আমার কাছারির একটি ঘরে। কাছারিটা নিমডিহা ও কুলডিহার মাঝ বরাবর ছিল। সেদিন সকালেই পাঠক একটি সাঁওতাল কিশোরী মেয়েকে ধরে এনেছে বিচারের জন্য জন্য আমার কাছারি বাড়িতে। তার অপরাধ সে না বলে-কয়ে পাকা কেঁদফল ও মিষ্টি মহুয়া ফল একঝুড়ি কুড়িয়েছে। মেয়েটির চেহারা জল পাওয়া বোগেনভেলিয়া লতার মত ঋজু অথচ কমনীয় মাজামাজা রঙ্। চোখ দুটিতে কেমন একটা দুষ্টুমিভরা বুদ্ধিদীপ্ত চঞ্চলতা। জানালা দিয়ে আমি তাকেও বেশ দেখতে পাচ্ছিলাম। সকালের হাওয়ায় ছোট বড় শাল ও মহুয়া গাছের ভেতর দিয়ে কাঁপছিল সমস্ত প্রকৃতি, অজস্র নাম না জানা পাখির ডাকও শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু আর না; বিছানা ছেড়ে এবার আমি উঠে পড়লাম। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে সেই মেয়েটির কাছে গিয়ে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলাম "এই, কি নাম তোমার?" মৌসুমী পাখির মতো মিষ্টি ভিজে ভিজে গলায় বাইরের বৃষ্টির সঙ্গে হুবহু গলা মিলিয়ে সে বললে "মুন্নী।"

ভাল করে দেখলাম যৌবন ও কৈশোরের দুই আঙিনার মাঝের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে এই মুন্নী মেয়েটা। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম "তোমার মরদের (স্বামীর) নাম কি?" সে তেমি ঠাণ্ডা গলায় বললে "মংলু।" ধমক দিয়ে বললাম "চুরি করতে গিয়েছিলে কেন?" এবারও সে নির্লিপ্তকণ্ঠে বললে "না হলে খাব কি? স্বামী যে খেতে দেয় না।" ইজারাদার পাঠক বললে "ওর স্বামী ওকে ঘরে নেয় না হুজুর। সে অন্য বাড়ি অর্থাৎ মেয়ে নিয়ে আছে।"

সুরেশ দুবে ছিল আমার পাহারাদার। সে সেখানেই দাঁড়িয়েছিল। তাকে ডেকে বললাম "দুবে, তুমি এখুনি যাও এই মেয়েটীকে সঙ্গে করে নিয়ে ওর স্বামীর কাছে। বলবে একে যেন মংলু তার ঘরে নেয়, আর খেতে পরতে দেয়। ফের যদি মুন্নী চুরি করে আর ধরা পড়ে তাহলে দায়ী হবে কিন্তু মংলু আর সে জন্যে মংলুকেই আমি শাস্তি দেবো।" এই বলে আমি আর সেখানে দাঁড়ালাম না। ফের ভিতরে চলে গেলাম। আমার পাইক কুলডিহার পবন পাত্তরের বিধবা মেয়ে সুশীলা আমার রান্না করতো। সে তখুনি একটা ডিসে করে একটু হালুয়া ও এক কাপ গরম চা এনে হাজির হলো আমার জন্যে। ধুমায়িত চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে আমি এই সুশীলা নামক মেয়েটার শুভ্র সুন্দর পুষ্পিত রূপ যৌবনের দিকে চেয়েছিলাম। হ্যাঁ, এই বিধবা যুবতী সৎপতীদের একটা সৌম্যকান্তি যুবককে ভালবেসেছিল। সে এক মজার ঘটনা। পরস্পর পরস্পরকে ওরা সত্যিই ভালবাসতো। কিন্তু সৎপতীরা ছিল ব্রাহ্মণ। ওদের বাস ছিল নিমডিহায়। এই অবৈধ প্রণয় নিয়ে নিমডিহা গ্রামে আর কুলডিহা গ্রামে বেশ সোরগোল পড়ে গেল। কুলডিহার গ্রামবাসীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ও রুষ্ট হয়ে একদিন সেই যুবককে ধরে খুব মারপিট করে গ্রাম ছাড়া করে দিল। কেউ কেউ এমন কথাও বলে যে মারের চোটে ছেলেটা নাকি মরেই গেছল, তখন থানা পুলিশের ভয়ে তাকে

মন্দন পুকুরের জলে তাড়াতাড়ি ওরা পুঁতে রেখে দেয়। জামনী থানা ওখান থেকে অনেক দূর। লাশ আর তার পাওয়া যায় নি। অবশ্য সঠিক কিছু আমি জানি না কারণ তখন আমি চাঁপাশোল কাছারিতে ছিলাম। চা খাওয়া আমার হয়ে গেছল। শালবনের শিরায় শিরায় তখন বিষণ্ণ গানের সুর। সেই দিকে চোখ রেখে সুশীলাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম "তোমার প্রেমিক সতীশ সৎপতীকে কি তোমার মনে আছে?" সুশীলা শুধু সুশ্রী নয়, খুব সরল। খুব বুদ্ধিমতী। ম্লান হেসে সে বললে "মনে আবার নেই বাবুজী, তাকে কি কখনো ভুলতে পারি? দুজনে কত সকাল সন্ধ্যা ধানীঘাসের বনে বনে বুনো খরগোসের সঙ্গে দৌড়ছি। কেরাউগ্গার ঝোপে ঝোপে ও মহুয়ার নীচে নীচে প্রজাপতিদের সঙ্গে দুজনে কত খেলা করেছি। খাপু পাখিকে নকল করে ডাকাডাকি করেছি। রাতের অন্ধকারে জোনাকি গুণেছি। কোথায় হারিয়ে গেল সেইসব দিন! কি সুন্দর বাঁশি বাজাতো সতীশ। ও বাঁশিতে ফুঁ দিলেই আশ্চর্য একটা মিষ্টি সুর বেরিয়ে আসতো। কোথায় যে নিখোঁজ ও নিপাত্তা হয়ে গেল মানুষটা।" এই সময় সেই কেঁদগাছটা থেকে একটা খাপু পাখি ডাকছিল খাপু—খাপু—খাপু—খাপু—খাপু। ধরা পড়া মানার মত গলায় সুশীলা আবার বলল "আপনার কাছে গোপন করবো না কিছু। তাকে ভীষণ ভালবাসি বাবু। সেদিন তার সামনে ছিল খোলা মাঠ। জীবনকে বাঁচাবার তাগিদেই সে পালাচ্ছিল। লোকটা পড়ে গেল মাটিতে। ওরা তারই উপর নির্মমভাবে তাকে প্রহার করলে। জ্ঞান হতে সে কোথায় যে চলে গেল কেউ তা জানল না। আশ্চর্য! বাইরে তখন বৃষ্টি পড়ছে। চক্চকে নিটোল বৃষ্টির ফোঁটা। ঝরছে গেরুয়া রং-এর পথের ওপর। ঝরছে খোয়াইয়ের ওপর। এই সময় বাইরে গোঁসাইজীর গলার আওয়াজ শুনলাম। "জয়রাধে" ইনি ডুবড়ার ধ্রুব গোস্বামী। গান ধরেছেন তখন—

"হরিনাম কোথায় ছিল, কে আনিল রে?
হরিনাম স্বর্গে ছিল, মর্তে এলো রে।"

গোঁসাইজীর ভাঙ্গা মোটা গলা একতারার গুব-গুবাক বাজনার সঙ্গে বাতাসে ভেসে আসছিল। ইনি পথে পথে নাম বিতরণ করে বেড়ান।

আমাকে বাইরে আসতে দেখে গান থামিয়ে উনি বললেন "বাবুমশাই, আজ এবেলা আপনার এখানে আমার সেবা হবে।"

হেসে বললাম "হ্যাঁ তা আজ এখানেই দুটি খাবেন।" গোঁসাইএর আখড়া ডুবড়াতে। আমি এখানে থাকলে উনি মাঝে মাঝে এসে সেবা করে যান। গোঁসাই কাছারির বারান্দায় কম্বল বিছিয়ে বসলেন। পাঠক ও দুবে ওঁর কাছে ঘন হয়ে বসলো। জানি এবার ওরা চুপিচুপি আরম্ভ করবে গোঁসাইজীর তৃতীয় পক্ষের নতুন বোষ্টমী কৃষ্ণদাসীর কথা। আমি তৎক্ষণাৎ দপ্তর ঘরে গিয়ে বসলাম। আমার মনিব জমিদার রায় বাহাদুরের এই সমগ্র চাকলাতে বা এলাকাতে অনেকগুলি কাছারি-বাড়ি আছে। পনেরো ষোল মাইল অন্তর অন্তর এক একটি কাছারি। অন্যান্য কাছারির মত এই কুমরী কাছারিও পাকাবাড়ি নয়। এখানে পাশাপাশি চারটি মেটে ঘর, সামনে টানা বারান্দা, মাথায় খড়ের চাল। ভিত বেশ উঁচু। পিছন দিকে রান্নাঘর ও খানিকটা প্রশস্ত দাওয়া ও একটা কুয়া আছে। কুড়ি পঁচিশটি খড়-ছাওয়া কুঁড়ে ঘর নিয়ে এই কুমরী গ্রাম। এর একধারে নিমডিহা ও আর একধারে কুলডিহা গ্রাম। আর চারিধারেই শুধু জঙ্গল। কুলডিহা গ্রামে আমার পাইক পবন পাত্তর থাকে। তার মেয়ে সুশীলা সারাদিন কুমরীতে থাকে এবং রাত্রে আমার খাবার পরিবেশন করে দিয়ে তার বাপের সঙ্গে তাদের গ্রামে তাদের সেই কুঁড়ে ঘরে চলে যায়। রাত্রে সে কাছারিতে কখনো থাকে না। আমি যখন এখানে থাকি তখনই সে আমার রান্না ও যাবতীয় কাজ করে। অন্যসময় সে কারো রান্না করে না বা কাছারিতে আসে না। এই কাজের জন্য তাকে কিছু চাকরান জমি ভোগ করতে জমিদার থেকে দেওয়া আছে। এক একটি কাছারিতে আমাকে দশ পনেরো দিন কখনো বা কাজ বুঝে একমাস দুমাস পর্যন্ত থাকতে হয়। চারখানি ঘরের একটিতে আমি শুই, একটিতে কাছারির দপ্তর, একটিতে ইজারাদার ও পাহারাদার রাত্রে শোয় আর একটি অতিথি অভ্যাগত বা মালিক জমিদার কখনো এলে ব্যবহার করেন। অন্যসময় সেই ঘর খালি পড়ে থাকে। সব কাছারিতেই এম্নি ব্যবস্থা।

সব জায়গাতেই স্থানীয় পাইক, পাহারাদার আছে। যাক, আমি দপ্তর ঘরে গিয়ে এবারে কাজেকর্মে বসে গেলাম। থোকা, সেহা, ও চেকমুণ্ডি বা দাখিলা বই দেখতে লাগলাম। কোন্ প্রজার কাছে কতো খাজনা বাকি আছে, কার তামাদি হয়ে যাচ্ছে, নালিশ করতে হবে কার নামে। দেখতে লাগলাম এই সমস্ত হিসেব নিকেশ, জমা খরচ, আম লিচু ও কাঁঠালের বাগান জমা দেওয়ার ব্যবস্থা, শালের জঙ্গল বিক্রি করা ও মহুয়ার জঙ্গলের লিজ দেওয়া, ধান কাটা, সাঁজাধান আদায়, ধান বিক্রি, ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনি সময় হঠাৎ চুড়ির রিন্‌ঝিন্ শব্দে চোখ তুলে দেখলাম দরজার কাছে মুন্নী। মুন্নী আবার ফিরে এসেছে। ওর স্বামীকে ও ফিরে পেয়েছে কিনা তাই দেখলাম ও খুশীতে ভরপুর। ওর এক হাতে কতকগুলি বোগেনভেলিয়া ফুল আর এক হাতে দুটি বুনো খরগোস। কৃতজ্ঞতা মাখানো হাসি হেসে বললে "আমার স্বামী আজ সকালে এই খরগোস দুটি তীর মেরে শিকার করেছে তাই ম্যানেজার সাহেবের জন্য পাঠিয়ে দিল। বল্লাম "সুশীলার কাছে দিয়ে যাও।" মুন্নী লাজুক লাজুক পায়ে বোগেনভেলিয়া ফুলগুলি আমার টেবিলের ওপর আস্তে আস্তে রেখে দিয়ে সুশীলার কাছে ভিতরে খরগোস দিতে চলে গেল। তারপর একটুবাদে ফিসফিসে বৃষ্টিতে শালবনের ঝরা-ফুল-পাতা বিছানো গেরুয়া পথের বাঁকে ওর হলুদ শাড়ী আবার মিলিয়ে গেল। পাহারাদারকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম "মংলুর কাছে যে অন্য মেয়েমানুষটা ছিল তার কি গতি হলো?" দুবে বলল "তার নাম টুসুমণি হুজুর। সে সরেণ সাঁওতালের বৌ। সরেণ গতবছর শীতকালে মরে গেছে। তারপর থেকে টুসুমণি মংলুর কাছে এসে মংলুর ঘরেই থাকতো। আর টুসুমণি মংলুর ঘরে যাবার পর মংলু ঝগড়া করে মুন্নীকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। আজ আমি গিয়ে হুজুরের নাম করে খুব হাঁকডাক করতে টুসুমণি কাঁদতে কাঁদতে তার মা পানমণির কাছে চলে গেছে। ওকে তো হুজুর লখনা সাঁওতাল বিয়ে করতে চায়। লখনারও বৌ মরে গেছে। কিন্তু টুসুমণি মত করে না। এখন হয়তো মত করবে।" এই বলে দুবে চলে গেল। আমি আবার আমার কাজে মন দিলাম।

আগেই বলেছি জায়গাটা যেমন চারিদিকেই জঙ্গলে ঘেরা, অশোকগাছ, পলাশগাছ, শালগাছ ও মহুয়াগাছ, তেম্নি মানুষগুলোও মনেপ্রাণে জংলী। শহুরে জীবনের মাপা হাসি, মাপা চলা, আস্তে কথাবলা আর পদে পদে বাধা নিষেধ এখানে এসব বালাই নেই। এরা তা মানে না। এদের নগ্ন প্রাচুর্যতা আছে, জীবনের অনন্ত উচ্ছ্বাস আছে, আর জংলী আইনকানুন আছে। যাক এইবার যার ভারি পায়ের শব্দে আমি চোখ তুললাম, সে কোন মেয়ে নয়, সে একজন দুর্দম, দুর্গন্ধ, দুর্বার যুবক। এই গল্পের নায়ক! নাম তার শ্রীমন্ত রাণা। তার সেয়ানা ও সোমত্ত বৌকে হয় কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে অথবা সেই উঠতি বয়সের মেয়েটা তার ভরা ঘাটের মত ছলছলে যৌবন নিয়ে এর কাছ থেকে পালিয়েছে। অবশ্য সেই সময় আমি বাঘুয়া কাছারিতে ছিলাম। এই রাণাকে দেখতে মোটেই ভাল নয়। মানে বেশ খারাপ, অনেকটা মাঝারি সাইজের ভাল্লুকের মত। কালো, কালো, গাঁট্টাগোট্টা, সামনের পাটির দুটো দাঁত ভাঙা। চোখদুটো সবসময় জলজল করছে। একমাথা এলোমেলো কোঁকড়া চুল। সময় সময় ও বুনো কুকুরের মতই নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। বৌটাকেও সময় সময় নির্যাতন করতো। এখন এই শ্রীমন্ত রাণা আমাকে নমস্কার করে দরজার কাছে দাঁড়াল।

ওকে দেখে বললাম "তোমার চার বছরের খাজনা বাকি হয়েছে। বকেয়া টাকা না দিলে আমরা নালিশ করে তোমার জমি খাস করে নেবো।" সে তার কোঁচার খুঁট খুলে কয়েকটি টাকা আমার হাতে দিয়ে বলল "নালিশ করবেন না হুজুর। এই কটা টাকা নিয়ে তামাদিটা রক্ষা করুন। সামনের বছর সব মিটিয়ে দেব।" একটু থেমে সে আবার বলল "বৌটা আমায় অপমান করে পালিয়ে গেছে হুজুর। মনে তাই সুখ নাই। চাষে মন দিতে পারি নাই। তবে যার সঙ্গে পালিয়েছে তাকে ভালভাবে আমি জানি। সে হল রামনারান মারোয়াড়ির ছেলে সেই চালবাজ কাপ্তেন রামবিলাস সাউ। ওর বাপের চিল্কিগড়ে ধানকল আছে।"

আমি বললাম "তোমাকে এই বিয়ে করতে আমি মানা করেছিলাম। এই জন্য যে তোমার ঐ রোমশ

বুকের কাছে কোনও সুন্দরী মেয়ে ঘেঁষবে না। গৌরপাণ্ডবের মেয়ে চিল্কিগড়ের মেয়েস্কুলে কিছুদিন পড়েছে। দুশ্চরিত্র রামবিলাসের লালসাপূর্ণ চোখে তখনই পড়েছে. ওর নিটোল পুরন্ত গড়ন। ও হল পুরুষ-হ্যাংলা মেয়ে। তুমি ভুল করেছ। তুমি তেওয়ারীর মেয়ে কবুতরীকে বিয়ে করলে সুখী হতে। তাই বলেছিলাম আমি। এই মেয়ে কবুতরীর শাড়ি, গয়না ও টাকার প্রতি লোভ অত নেই।"

শ্রীমন্ত রাণার চোখদুটো হায়নার মত জ্বলে উঠল। ক্রুদ্ধ সাপের মত হিস হিস করে সে বলল "আমিও ওদের অত সহজে ছেড়েদেবো না হুজুর। আপনি হয়তো শুনেছেন একদিন একটা সামান্য ছোরা নিয়ে আমি চিতা বাঘের সঙ্গে লড়েছি। সেই ছোড়া নিয়েই ওদের আমি একদিন ঘায়েল করবো। রামবিলাসের বুকে আমূল বিদ্ধ করবো সেই ছোরা, প্রতিহিংসায় জ্বলছি আমি। প্রতিশোধ এর আমি নেবো। তবেই আমার শান্তি। তবেই আমার নাম শ্রীমন্ত রাণা। এর জন্য জেল, ফাঁসি যা হয় হোক, আমি তাতে কাতর নই।" আমি অবাক হয়ে বললাম "কি বলছ তুমি ওসব আজেবাজে কথা। ওদের কি করে তুমি নাগালে মানে বাগে পাবে? তাছাড়া রামবিলাস ধনী ব্যক্তি।"

সে বলল "রামবিলাস কুলডিহার জঙ্গলে মাঝে মাঝে আসে হুজুর সখের শিকার করতে। তার জীপ নিয়ে আসে। আশাও মাঝে-মাঝে আসে ওর সঙ্গে। আপনি তো জানেন এই জঙ্গলে ডেঙর পুকুরের ধারে দিনের বেলা যত রাজ্যের পাখির মেলা বসে, আর রাত্রে চিতল হরিণেরা ও অন্যান্য জানোয়ারেরা জল খেতে আসে। এখানে তিতির, কোচো পাখি, স্নাইপ,ডাক, বুনো হাঁস, ও বুনো মুরগী সবই পাওয়া যায়, হুজুর। একদিন সেই পুকুর ধারে বাগে পেলে আমিই শিকার করবো ওদের।" এই বলে সে আমায় নমস্কার করে চলে গেল। বৃষ্টি তখন থেমে গেছে। তবে সমস্ত আকাশ কৃষ্ণ বর্ণ। জঙ্গলের শাল ও তমালের মাথার ওপর মেঘ মেদুর ছায়া দোল খাচ্ছে। এই সময়, সুশীলা আমার কাছে এসে বলল "বেলা হয়েছে বাবু খাবেন আসুন।" তাড়াতাড়ি স্নান সেরে আসনে বসতেই সে ভাতের থালা ধরে দিয়ে গেল, থৈতালের তরকারি, ডিংলাভাজা আর বুনো খরগোসের মাংস, মাংসটা রেঁধেছিল ভাল। একটু ঝাল বেশী, তার সঙ্গে আদা, পেঁয়াজ রসুন বাটা আর আস্ত গোলমরিচ। খেয়ে উঠে আঁচিয়ে নিজের বিছানার ওপর আরাম করে বসে একটা সিগারেট ধরালাম। গোঁসাইজীর এর অনেক আগেই আহার সমাধা হয়েছে। তাঁর নিরামিশ আহার। গাওয়া ঘি, দুধ, কলা ও আতপ চালের ভাত তিনি, মৃদুকণ্ঠে তখন গাইছেন—

"শতেকো বরষ পরে, বঁধুয়া আইল ঘরে, রাধিকার অন্তরে উল্লাস।" সত্যই তা রাধা মানে আমাদের ঐ সুশীলা এই সময় আমার ঘরে এসে আমার পায়ের কাছে মেঝের ওপর বসলো। আমি ওর অন্তরের উল্লাসের পরিচয় যেন পেলাম, ও বলল "বাবু, সতীশ মরে নাই বাবু, সে বেঁচে আছে, সে ভাল আছে।"

আশ্চর্য হয়ে বললাম "সে কি, সে কোথায় আছে? তুমি তার খবর কি করে পেলে?"

ও হেসে বলল "বাবু, সে ডুবড়ায় গোঁসাইজীর আখড়ায় লুকিয়ে আছে। গোঁসাইজী আজ খাবার সময় সে কথা আমায় চুপিচুপি বল্লেন। সে আসবে বাবু আজ নিশি রাত্রে ঐ জঙ্গলে আমার সঙ্গে দেখা করতে। আবার সে আজ রাত্রেই ওখানের আখড়ায় ফিরে যাবে।" ভাবলাম এই মিলনের দূত তাহলে গোঁসাই ঠাকুর। তিনিই তাকে আশ্রয় দিয়েছেন। গোঁসাই তখন অন্য গান ধরেছেন "আজ রজনী হাম, ভাগে পোহাইনু, , পেখনু প্রিয়া মুখ চন্দ্রা।" গোঁসাইজী প্রায় সব সময়তেই গুন গুন করে গান করেন। বললাম "তোমার তাহলে তো খুব আনন্দ।"

লাজুক হাসির লাবণ্য লাগল সুশীলার মুখে। ও বলল "আমরা বিয়ে করে গোঁসাইজীর আখড়াতেই থাকবো বাবু। নচেৎ অন্য কোন ভিন্ দেশে চলে যাবো। এখানে আর থ কবো না।" এর পর পায়ে যেন নূপুর বাজছে এমনি ভঙ্গিতে সে ঘর ছেড়ে চলে গেল। ভাবলাম এই প্রেম কি পৃথিবীর দিকেই ছড়িয়েরয়ে গেছে—শহরে,গ্রামে, জঙ্গলে। কোথাও ফড়িঙে-কীটে,—কোথাও মানুষের বুকের ভিতরে, আর আমাদের সবার জীবনে। ভাবলাম বেতের লতার নিচে চড়ুয়ের ডিম যেখানে নীল হয়ে আছে, যেখানে নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বার বার তীরটিকে

মাঝে সেখানেও কি এই প্রেম ও পিপাসার গান? থাক এ কথা। সুরেলা দুপুর কাঁপতে কাঁপতেকখন্ যে ম্লান বর্ষা-বিধুর বিকেলে পৌঁছে গেছে তা আমি টেরও পাইনি। দেখলাম বেলাশেষেরবনভূমি আশ্চর্যরহস্যময় হয়ে উঠেছে।

বন ঝাউয়ের পাতা ঝিলমিল করছে। দূর থেকে বাহা-পরবের গানের সুর বাতাসে ভেসে আসছিল। আমি জানি ওখানে সাঁওতাল মেয়েরা নাচছে। তাদের খোঁপায় গোঁজা আছে রাঙা জবা ফুল। ছেলেরাও নাচছে তালে তালে। মাদল বাজছে। ধিতাং ধিতাং বলে। ধিনাক নাচন তিনা। একদল গাইছে গান যার ভাবার্থ হচ্ছে "আয়রে আয়, লগন বয়ে যায়।" ওরা নিশ্চয় হাঁড়িয়া খেয়েছে। জীবন যৌবনের যেন ঢল নেমেছে ওখানে। আমার সামনের পথ দিয়ে মুন্নী ও মংলুও চলে গেল ওখানে পরস্পরে কোমর জড়িয়ে ধরে। ওরাও নাচবে, গাইবে, আকণ্ঠভরে মহুয়ার রস খাবে। তারপর অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে আসবে। দেখতে দেখতে চারি পাশে ক্রমশঃ রাতের অন্ধকার নেমে এল। বাইরে ঝিঁ ঝিঁর ডাক। বাইরে সেই অন্ধকারের এখানে ওখানে এক এক ঝাঁক জোনাকী দল বেঁধে ওপরে নীচে নাচতে নাচতে ভেসে বেড়াচ্ছে। পাঠক একটু আগে বেরিয়েছিল জঙ্গলে, আমার রাত্রের খাবার জন্য দুটো বুনো মুরগী মেরে নিয়ে এই সময় ফিরে এল সে। বলল "জঙ্গলে আসবার সময় কয়েকটা শম্বর দেখলাম হুজুর। যদি শিকার করতে চান তো যেতে পারেন।" তুবে আমার ঘরে হারিকেন লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। আমি বিছানায় চুপচাপ বসে সিগারেট টানছিলাম। পাশেই আমার দুনলা বন্দুকটা পড়ে ছিল। রাতের একটা জাদুমন্ত্র আছে। মনটা কেমন অবসন্ন ও মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। দূরে কোথাও এক ঘাই হরিণীর ডাক মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছি। কাকে সে ডাকছে অমন করে? চারি পাশে বনের বিস্ময়। কোনো পুরুষ হরিণ কি শুনতে পাচ্ছে এই ডাক তার? মানুষ যেমন করে ঘ্রাণ পেয়ে আসে তার নোনা মেয়ে মানুষের কাছে তেমন করে সেই হরিণও কি ছুটে আসছে সেই ঘাই হরিণীর কাছে? হ্যাঁ, আমি টের পাচ্ছি। আমি যেন তার পায়ের শব্দ ঝরা পাতার ওপর শুনতে পাচ্ছি। সে আসছে। তার বুকে আজ আর কোন ভয় নেই। নিষ্ঠুর শিকারী কোথাও লুকিয়ে আছে সেই সন্দেহের আবছায়া নেই। আছে শুধু পিপাসা, আছে রোমহর্ষ। কারণ আজ সেই হরিণীর মুখের রূপে তার বুকে জেগেছে লালসা আকাঙ্ক্ষা ও সাধ। আমার মনে হল আজ সবদিকেই বুঝি এই প্রেম ও স্বপ্নের সাধ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। আবার আমার হৃদয়ে সেই অবসাদটা জমা হয়ে উঠল। ভাবলাম আমারও জীবনের কোনো এক বিস্ময়ের রাতে আমাকেও ডাকেনি কি কেউ এসে ঐ ঘাই হরিণীর মতো করে এমনি অস্পষ্ট জোছনায় আর সজল দখিনা বাতাসে? সেদিন আমার পুরুষ হৃদয় ঐ পুরুষ হরিণের মতো পৃথিবীর সব হিংসা ভুলে গিয়ে চিতার চোখের ভয়, জগতের দুঃখের কথা সব পিছনে ফেলে রেখে রেখে সেই মধুমতী নারীর কাছে নিজেকে চায় নি কি ধরা দিতে সেই বিস্ময়ের রাতে প্রেমের সাহস সাধ স্বপ্ন নিয়ে আজো কি আমি বেঁচে নেই। হ্যাঁ শীলা। আমার প্রিয়া শিলা আমায় ডেকেছিল। শীলা কোলকাতায় এখন থাকে। সেখানে সে চাকরী করে। সে আমায় ভালবাসে। একদিন আমাদের বিয়ে হবে। তার জন্যে আমি অপেক্ষা করে আছি। সেও আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। থাক এ কথা। রাতের খাবার খেয়ে এখন আমি বিছানায় শুয়ে পড়লাম। রাত কত হবে তা জানি না। হঠাৎ একটি শট্‌গানের আওয়াজে আচম্‌কা ঘুম আমার ভেঙে গেল। একি, এতরাত্রে বন্দুক ছোঁড়ে কে? কোনো শিকারী কি? আমার দুনলা বন্দুকটা হাতে নিয়ে আমি দৌড়ে ঘর থেকে বেরোলাম। দেখলাম ডেঙির পুকুরের ধারে হেডলাইট জ্বালিয়ে একটা জীপ দাঁড়িয়ে আছে। এঞ্জিনের একটানা ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বক্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। পরক্ষণেই তারা জীপটার স্টার্ট বন্ধ করে দিল। মনে সন্দেহ হল আশা আর রামবিলাস নয় তো? শম্বর শিকার করতে আসে নি তো? আমি নিঃশব্দে কেরাউঞ্জা ঝোপের আড়ালে আড়ালে বনের দিকে অগ্রসর হলাম। এক হাতে আমার টর্চ ছিল। অপর হাতে বন্দুক। এখন আকাশটা পরিষ্কার হয়েছে। একফালি চাঁদ উঠেছে আঁধারিয়ার দিকের আকাশে। বর্ষাসিক্ত বন পাহাড় চাঁদের ঘোলাটে আলোয় ভুতুড়ে ভুতুড়ে দেখাচ্ছে। তবে আমি একটা ছোট টিলার উপর দাঁড়ালাম।

তখন রাত নেমেছে গভীর হয়ে। চারিদিক সাঁ সাঁ করছে। চারিদিকে বিশাল বৃক্ষশ্রেণী। ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে যতখানি দেখা যায় আমি মাথা উঁচু করে করে দেখতে লাগলাম জীপটাকে। হ্যাঁ আশাই বটে। আশা আঁট-সাঁট করে শাড়ী পরেছে। চুড়ো করে চুল বাঁধা। ওকে একটা লেগহর্ণ মুরগীর মত দেখাচ্ছিল। তার পাশে বসে আছে রামবিলাস। রামবিলাস স্যুট পরেছে। হাতে রাইফেলটা ধরে আছে। ওকে একটা গ্রে-হাউণ্ডের মত দেখাচ্ছিল। জীপের সামনে পুরুষ হরিণটা মরে পড়ে আছে। রামবিলাস ওটাকে শিকার করেছে। আশা বলল "যাই বলো তোমার হাতের টিপ্ অব্যর্থ। এখন চলো দুজনে মিলে ধরে হরিণটাকে জীপে তুলি। তারপর ফেরা যাক। এদিকের জঙ্গলে আসতে আমার ভাল লাগে না।" রামবিলাস বলল "দাঁড়াও আগে ওর জোড়াটাকে মারি। তুমি ততক্ষণ কফি দাও।" আশা ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢেলে ওকে দিল। হঠাৎ নিকটে পাতার খস্‌খসানির শব্দে চমকে উঠলাম। আমাকে হতবাক করে দিয়ে জীপের দশগজ পিছনের পুঁটুস ঝোপ ঠেলে উঠে দাঁড়াল শ্রীমন্ত রাণা। ও কি ওখানে লুকিয়ে ছিল? কে জানে। ওর হাতে ধারালো চকচকে একটা ছোরা। চাঁদটা মেঘে ঢেকে গেছে আবার। দেখলাম রাণা অন্ধকারে ধীর পায়ে জীপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ওকে একটা রাতজাগা ক্ষুধার্ত ভাল্লুকের মত দেখাচ্ছে। এই সময় আশা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল "ভাল্লুক, ভাল্লুক।" আশা কি বিপদ টের পেয়েছিল, নাকি দেখতে পেয়েছিল রাণাকে? কে জানে! কিন্তু এক লহমার মধ্যে ঘটনাটা ঘটে গেল। রামবিলাস সেই ভাল্লুককে লক্ষ্য করে রাইফেল ছুঁড়ল, 'মার্জল' থেকে আগুনের হল্কা বেরুতে দেখলাম এবং তক্ষুণি কি একটা চাপা সংক্ষিপ্ত আওয়াজ করে শ্রীমন্ত রাণা পুঁটুসের ডাঁটাপাতা ভেঙে মাটিতে পড়ে গেল। আশার কণ্ঠ শুনলাম "চলো পালাই। কেউ এসে পড়বে দেখলে বিপদ হবে।" জীপটা তক্ষুণি ষ্টার্ট দিয়ে পালিয়ে গেল। হতবাক আমি কি করবো ঠিক করতে না পেরে যত তাড়াতাড়ি পারি আমার বন্দুকটা তুলে জীপের টায়ার লক্ষ্য করে গুলি করলাম। কিন্তু বুঝলাম গুলি লাগলো না। কারণ জীপটা দ্রুত পালিয়েই গেল। পুঁটুসের ঝোপ ঠেলে আমি রাণার কাছে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম সেই মৃত হরিণটার মত রাণারও জিভটা বেরিয়ে এসেছে। দাঁতে জিভটা কামড়ে আছে। প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ও মরে গেল। ওর তপ্ত রক্তের গন্ধের সঙ্গে পুঁটুসের উদগ্র গন্ধ সেখানে মিশে গেছে। কোথা থেকে এই সময় একটি টী টী পাখি এসে টীটিবৃটী-টীটীবৃটী-টিটীবৃটী করে মাথার উপর চক্কর মেরে বেড়াতে লাগল। সেই ভুতুড়ে রাতে টীটী পাখির ডাকে আমার মনে হল রাণার আত্মা প্রতিশোধ নেবার জন্যে জন্ম জন্ম ধরে এই বনে বুঝি গিয়ে ফিরে ফিরে আসবে। সেই গহন অরণ্যলোকের দিকে চেয়ে চেয়ে আমার মনে হল আমাদের মানুষের মনও এই গহন অরণ্যালোকের মত কত বিস্ময়ে ভরা। সেখানে নিত্য নতুন পথ হারানো আর পথ খুঁজে পাবার বিস্ময়। মনটার মত আশ্চর্য জিনিষ আর কি আছে? সেই ঘাই হরিণী তখনো থেকে থেকেই ডেকে উঠছে টাঁউ, টাঁউ, টাঁউ। সমস্ত সিক্ত বনে পাহাড়ে সে শব্দ ছড়িয়ে যাচ্ছে কোথায় কোথায়। রাস্তাটা একটি ঘুমন্ত সরীসৃপের মত শুয়ে রয়েছে নির্জীব হয়ে। মাঝে মাঝে এলোমেলো হাওয়া উঠছে বনে। যেন কত দীর্ঘশ্বাস, কত ফিসফিসানি। আমি বিষণ্নমনে এবার আমার মাটীর বাংলোতে ফিরতে উদ্যত হলাম। হঠাৎ সুশীলা ও সতীশ সৎপতীর কথা মনে হল। এই বনেরই কোথাও হয়তো ওরা দুজনে আজ মিলিত হয়েছে। সতীশ হয়তো এখন ওর কানে কানে বলছে "সুশীলা, তোমার বুক তো নয় যেন একটি আসকল পাখি,—নরম, উষ্ণ, আবেশে ধুক্‌পুক্ করছে।" সুশীলা হয়তো গোঁসাইজীর কাছে নতুন শেখা সেই গানটি গাইছে "বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে, দেখা না হইতে পরাণ গেল, এতেক সহিল অবলা বলে, ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে।)"

———

ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ

পুষ্পদেবী, সরস্বতী, শ্রুতিভারতী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

"অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাৎ অসমঞ্জসম"

২।১।৮

জগৎ যদি সে ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি তাহার হয়
ধ্বংসের কালে ব্রহ্মের মাঝে মিশে সেই নিশ্চয়
অপবিত্রের মালিন্য যত
তাঁহার পরশে শুদ্ধ সতত
যতই যুক্তি থাকুক ইহাতে সত্য কভু তা নয়
সত্যর মাঝে সবি সুন্দর উজ্জ্বল নিশ্চয়।
দেবতা স্বভাব পিতা হতে দেখি দানব পুত্র হয়
সেই মত জেন ব্রহ্মের মাঝে জগৎ সৃষ্টি রয়
ধুলাকাদা যদি মাথে হেথা কেহ
কালিমায় ভরে সুন্দর দেহ
স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির জেন তুলনা কখন নয়
সৃষ্টির মাঝে যাকিছু বিরাজে নিজে সে স্রষ্টা হয়।

ন তু দৃষ্টান্ত ভাবাৎ (২।১।৯)

শঙ্কর কন মাটি হতে দেখো ঘট সরা হাঁড়ি হয়
কিন্তু সবের ধ্বংস হলেও মাটি হয়ে মিশে যায়
ঘটের বর্ত্তুল আকার যেমন
মাটি হয়ে গেলে রহেনা তেমন
ক্ষুদ্রতা আর বৃহত্ত্ব সেই ঘটের সাথেই যায়
তেমনি ব্রহ্মে মিশিলে সকলে ব্রহ্মেতে লয় পায়।

স্বপক্ষ দোষাচ্চ (২।১।১০)

কন শঙ্কর জগৎ স্বভাব ব্রহ্ম স্বভাব নয়
অনিত্য সাথে নিত্য সত্য এক কি করিয়া রয়
প্রলয় কালেতে লয় যবে হয়
প্রকৃতিতে তাহা নাহি বর্ত্তয়
ব্রহ্মে মিশিলে ব্রহ্মের মাঝে সবি হয় একাকার
সাগরের মাঝে ঢেউএর মতই সাগরের রূপ তার।

(২।১।১১)

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপি অন্যথানুমেয় মিতিচেৎ ক্রম অপি
অবিমোক্ষ প্রসঙ্গঃ

তর্কের দ্বারা তত্ত্বের জেনো নির্ণয় নাহি হয়
যদি কেহ বলে আছে প্রয়োজন তবু জেন দোষ রয়
বেদ যে সত্য মনে জেনো সার
তর্কেতে শুধু মত বাড়ে আর
মুনি ঋষিগণ ধ্যান জ্ঞান যোগে বেদের তথ্য জানে
তর্কের দ্বারা যদি পায় জানো সত্য বেদের মানে।

এতেন শিষ্টা পরিগ্রহা অপি ব্যবখ্যাতা

২.১।১২

কন শঙ্কর সে সকল মত মনু ব্যাস নাহি লয়
সে সকল মত ও ব্যাখ্যা জানিও এই মত করা হয়
সাংখ্য দর্শনের কিছুটা অংশ
গ্রহণ করেন বৈদিক বংশ
পরমাণুবাদ সকল ঋষিরা মনের মাঝে না লয়
অণু পরমাণু স্রষ্টা ব্রহ্ম জেনো মনে নিশ্চয়॥

ভোক্তৃ আপত্তেঃ অবিভাগঃচেৎস্যাৎ
লোকবৎ। ২।১।১৩

শঙ্কর কন ভোক্তৃ বিষয়ে আপত্তি যদি হয়
ভোক্তা ভোগ্য এ দোহে বিভাগ সিদ্ধ জেনো না হয়
সাংখ্যবাদীরা তবু কভু কয়
ব্রহ্ম হইতে জগৎ যে হয়
তাহলে কেনবা এত রূপ নাম বিভাগ কেনবা হয়
উত্তরে সমুদ্রে ফেন তরঙ্গ বুদ্‌বুদ্ যথা রয়।

[ক্রমশঃ

———

বড়দাদা

অরুণ দে

অজানা আশঙ্কায় রঞ্জনের বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল সে। হাত থেকে টেলিগ্রামটা ছিটকে পড়ল।

যে পিয়ন টেলিগ্রাম নিয়ে এসেছিল সে ফিরে যেতে যেতে ইণ্টারন্যাশনাল লজ-এর গেটের সামনে থমকে দাঁড়াল। পেছন ফিরে তাকাল। তারপর ছুটে এল রঞ্জনের কাছে। বলল, "কি হল স্যার? কোন খারাপ খবর নাকি?"

ইতিমধ্যে 'ইনটারন্যাশনাল লজ' নামে মেস বাড়ীটার আরও অনেক বাসিন্দা রঞ্জনকে ঘিরে ধরল। বাসিন্দারা অধিকাংশ চাকুরীজীবী। অফিস যাবার জন্য তারা প্রস্তুত হয়ে বেরুতে যাচ্ছিল। পিয়নের চীৎকার শুনে রঞ্জনের কাছে এসে দাঁড়াল।

একজন রঞ্জনকে ঠেলা দিয়ে বলল, "কি হল মশায়! বাড়ী থেকে কোন খবর এসেছে নাকি?"

কোন কথা না বলে টেলিগ্রামটার দিকে দেখিয়ে দিল রঞ্জন।

কিছু লোকজন জড় হয়েছে দেখে পিয়ন তার কাজে চলে গেল। মেস-বাড়ীর বোর্ডাররা টেলিগ্রামটার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মেসের সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি মুখার্জীবাবু টেলিগ্রামটা হাতে তুলে নিয়ে পড়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন। অন্য বাসিন্দা শচীন টেলিগ্রামটা প্রায় কেড়ে নিল।

মুখার্জীবাবু বললেন, "ছেলেমানুষের মত ভেঙ্গে পড়লে তো চলবে না রঞ্জন। ওঠ। কলকাতায় যদি ফিরে যেতে চাও তবে আর দেরী কোর না।"

"বাবা বোধহয় আর বেঁচে নেই মুখার্জীবাবু"—প্রায় কান্নার স্বরে বলল রঞ্জন।

"দূর তা নয়। টেলিগ্রামে তো লিখেছে—ফাদার সিরিয়াসলি ইল। ষ্টার্ট ক্যালকাটা। হয়ত খুব অসুস্থ। যাও, কলকাতায় চলে যাও। বড় হয়েছ, বিদেশে চাকরী করছ। বাচ্চা ছেলের মত কোর না।"

...সকলকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল শচীন। হাসি থামতে রঞ্জনকে বলল, কিছু মনে করবেন না, আপনি একটি আস্ত ইডিয়ট। যে টেলিগ্রাম পেয়ে আনন্দে লাফিয়ে নাচতে আরম্ভ করা উচিত ছিল তা দিয়ে আপনি কিনা চোখ ছলছল করে ফেলেছেন।"

"কি রকম? টেলিগ্রামে আনন্দে নাচবার কি দেখলে?" ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন মুখার্জীবাবু।

শচীন একগাল হেসে বলল, "আরে মশায়—এই সব টেলিগ্রাম হল গিয়ে বাংলাদেশের মা বাবার অতি পুরাণ চাল। আমরা এলাহাবাদে থেকে মেড়ো বনে গেছি তাই ব্যাপারটা প্রথমে ধরতে না পেরে হকচকিয়ে গিয়েছিলাম।"

"এটা ইয়ার্কির সময় নয় শচীন।" গম্ভীর স্বরে কে একজন বলল—"আসুন মশায়। মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ করবেন না। চুল পেকে গেল আর টেলিগ্রামের ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না? রঞ্জনের বাবা অসুস্থ না ঘোড়ার ডিম। বাছাধন বাবার অসুস্থতার খবর পেয়ে যেমনি কলকাতায় ফিরে যাবে অমনি ওর বাবা ওকে ছাদনা তলায় টেনে নিয়ে টোপর মাথায় বসিয়ে দেবে—বুঝলেন? আমিও বিয়ের আগে আমার মা মৃত্যুশয্যায় বলে টেলিগ্রাম পেয়েছিলাম। ও সব কায়দা আমার খুব জানা আছে।"

মুখার্জীবাবু পাকা গোঁফের ফাঁক দিয়ে মুচকি হাসলেন। তাঁর মনে হল শচীনের ধারণা একেবারে অসম্ভব নাও হতে পারে। উপস্থিত অন্য অনেকের মুখেও কালো মেঘ সরে গিয়ে হাসি-হাসি ভাব ফুটে উঠল। একজন তো উল্লাসে কোমরে হাত রেখে নাচের ভঙ্গীতে এক চক্কোর ঘুরেই নিল।

—এই থামো—কি ফাজলামো হচ্ছে?—মুখার্জিবাবু বললেন।

তারপর কিছুক্ষণ পরে কি যেন ভেবে রঞ্জনকে বললেন, "ব্যাপার যাই হোক, তুমি কলকাতায় চলে যাও রঞ্জন। ভুলে যেও না তোমার বাবার অনেক বয়েস হয়েছে! অফিসে একটা ছুটির দরখাস্ত করে যাও। আমি সেটা দিয়ে আসব।"

রঞ্জন কি একটা বলতে যাচ্ছিল। মুখার্জীবাবু তাকে থামিয়ে আবার বললেন, "অবশ্য তোমার বাবা নিশ্চয় ভাল আছেন। তবু টেলিগ্রাম যখন এসেছে তখন যাওয়াই উচিত।"

একটু থেমে সকলের দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, "তোমরা কি বল?"

—"ও-সিওর। যেতে হবেই। অবশ্যই যাবে"—কে একজন বলল।

"তাহলে দেরী না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব··

মুখার্জীবাবু কথা শেষ না হতেই আরেকজন বলল,

"ইয়েস, ইয়েস—

"যেতে যদি হয় দেরীতে কি কাজ
ত্বরা করে তবে নিয়ে এস সাজ
হেম কুণ্ডল, মনিময় তাজ
কেয়ুর কনক হার।···

রঞ্জন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আপনারা ইয়াকি থামান। আমার মন সত্যি খুব খারাপ লাগছে। কিছু ভাল লাগছে না।"

"নেকু দি গ্রেট।" বলে শচীন ফোড়ন কাটল।

···ঘণ্টাখানেক বাদে কলকাতাগামী ট্রেণে উঠে বসল রঞ্জন। এলাহাবাদ ষ্টেশন ছেড়ে ট্রেনটা যতই এগোতে লাগল ততই নানা ভাবনার মেঘ তার মনের কোণে কোণে জমা হতে লাগল। যদি সত্যি কোন অঘটন ঘটে থাকে তবে সে কি করবে কিছুই ভেবে পেল না। মা আর ভাইবোনের মুখগুলি তার বুকে ভেসে উঠল। মনে পড়ল তার বাবাকে। সৌম্য শান্ত গরীব স্কুলমাষ্টার। বই পড়তে আর পড়াতে ভালবাসেন। অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী তিনি। দুঃখ দারিদ্র্যের কাঁটার মধ্যেও তার মুখের স্নিগ্ধ হাসি সর্বদা ফুটে থাকে। সে মানুষ কি সত্যিই নেই কিংবা অসুস্থ?

রঞ্জনের মনে পড়ল তার বাবা প্রতি চিঠিতেই রঞ্জনকে লিখত যে তার বিয়ের জন্য মেয়ে দেখা হচ্ছে। সে তার বাবাকে বিয়ের ব্যাপারে তার অনিচ্ছা অনেকবার জানিয়েছিল। বিয়ের কথা মনে হতেই কোমল স্নিগ্ধ একটা মুখ রঞ্জনের বুকে ভেসে উঠল। রমলার মুখ। কলকাতা থেকে চলে আসার পর থেকে সে রমলার অনেক চিঠি পেয়েছে। রমলা হয়ত তার প্রতীক্ষায় দিন গুণছে।

টেলিগ্রামটা যদি ছেলের বিয়ে দেবার ফাঁদই হয় তবে বাড়ীতে সব কথা জানিয়ে রমলাকেই বিয়ে করবে বলে স্থির করল রঞ্জন। তার মনে হল তার বাবা যদি জানেন যে রঞ্জনকে ঘিরে একজন মেয়ে বহুকাল ধরে স্বপ্নের জাল বুনছে তবে নিশ্চয়ই তিনি বিয়েতে আপত্তি করবেন না। বাবার কোমল ও উদার হৃদয়ের পরিচয় সে বহুবার পেয়েছে।

এসব নানা কথা মনে হতে ধীরে ধীরে রঞ্জনের মনের মেঘ অনেকটা কেটে গেল। কেমন যেন বিশ্বাস হল তার বাবা সম্পূর্ণ সুস্থই আছেন এবং বাড়ীতে তার বিয়ের আয়োজন চলেছে।

পরদিন সন্ধ্যায় ট্রেনটা কলকাতার হাওড়া ষ্টেশনে পৌছল। প্লাটফর্ম থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসল রঞ্জন। আশা ও আকাঙ্ক্ষায় তার মন তখন দুলছে। দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরের দিকে ছুটে চলল ট্যাক্সি।

ভবানীপুরে রঞ্জনদের ভাড়া-বাড়ী। বহুকাল ধরে একই বাড়ীতে বাস করছে। সেই বাড়ীর সামনে ট্যাক্সি যখন থামল তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। ট্যাক্সি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে রঞ্জন দেখল আশেপাশের অনেকগুলো বাড়ীর বারান্দা থেকে অনেকে তার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে। এর আগে সে যখন এলাহাবাদ থেকে কলকাতায় এসেছে তখন প্রতিবেশীদের বারান্দায় এত মহিলাদের ভীড় দেখেনি রঞ্জন। একটু অবাক হল সে। সকলে কৌতূহলী হয়ে নীরবে তার দিকে কি দেখছে কে জানে! পরিচিত মানুষগুলির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল রঞ্জন। তারপর তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভেতের

ঢুকে পড়ল। তিনতলা বাড়ী। অনেক ভাড়াটের বাস। তিনতলার দুটো ঘরে রঞ্জনেরা থাকে।

সিঁড়ি দিয়ে দ্রুতগতিতে তিনতলায় উঠে এল রঞ্জন। ঘরের মধ্যে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল।

ঘরের এককোণে তার মা মাথা নিচু করে পাথরের মূর্তির মত বসে আছেন। তাঁর পরণে ধবধবে থান কাপড়।

রঞ্জনের পায়ের শব্দ শুনে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকালেন তিনি। তার মুখ দিয়ে কোনকথা বেরুল না।

মার পাশে বসে আছেন প্রতিবেশিনী ইন্দুমাসীমা। তার মাথায় টকটকে লাল সিঁদুরের রেখা। ইন্দুমাসীমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে রঞ্জনের ছোট ভাই চন্দন। বছর সাতেক বয়স, শুকনো মুখ, রুক্ষ একমাথা চুল, চোখে কেমন একটা ভয়ার্ত বিষাদময় দৃষ্টি।

ঘরের অন্যদিকে রঞ্জনের দুই ছোটবোন—সুনন্দা ও সুমিত্রা কি যেন করছিল। দাদাকে দেখে দুজনেই হাতের কাজ থামিয়ে রঞ্জনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ওদের পরণে ফ্রক ও অন্য পোষাক ওদের মুখের মতই মলিন। দুজনের চোখে জলবিন্দু টলমল করছে।

সামনের দেওয়ালে টাঙ্গানো রঞ্জনের বাবার ফটো। সেদিকে তাকাল রঞ্জন। তার মনে হল সেই সৌম্য শান্ত মূর্তির মুখেও যেন এক বিষাদের ছায়া পড়েছে। অবাক হয়ে তিনি যেন রঞ্জনের মুখের দিকেই তাকিয়ে আছেন।

কান্নার মত কি একটা যেন রঞ্জনের গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠছিল। কি যেন বলতে যাচ্ছিল সে। হঠাৎ বুক-ফাটা আর্তনাদ করে উঠল সুমিত্রা। "বাবা নেই। নে-এ-এ ই" বলে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল সে চন্দন ছুটে এসে রঞ্জনকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। দাঁত দিয়ে ঠোঁটের একটা কোণা চেপে ধরলেন রঞ্জনের মা। পাথরের মূর্ত্তি যেন একটু কেঁপে উঠল।

কে যেন শক্তি যোগাল রঞ্জনকে। ভাঙ্গনের মুখে দাঁড়িয়ে সে নিজে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ল না। দুবাহু বাড়িয়ে ভাইবোনদের বুকে টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে "কাঁদিস না। ভয় কি। আমি আছি। আমি কান্নার স্বরে
"দূর তা নয় বাবা তো চিরকাল কারোই বেঁচে থাকে

একটু থেমে আবার বলল—"তোমরা সবাই এমন কাঁদলে বাবার আত্মা যে বড় কষ্ট পাবে। কাঁদতে নেই।"

ভাইবোনেরা কিছুটা শান্ত হবার পর মায়ের দিকে এগিয়ে গেল রঞ্জন। নিজের হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে নিলেন রঞ্জনের মা। শোকের আগুনে পোড়া মুখ আড়াল করলেন। স্তব্ধ হয়ে মায়ের কাছে বসে রইল রঞ্জন।

ইন্দুমাসীমা ধীরে ধীরে সব কথা জানালেন। রঞ্জনের বাবার মৃত্যু নিতান্ত আকস্মিক। কেউ এর জন্য প্রস্তুত ছিল না তিনি করোনারি থ্রম্বসিস রোগে মারা গেছেন। রাত্রে বাড়ী ফিরে খাওয়া দাওয়া সেরে বিছানায় শোবার মিনিট কয়েক বাদেই তিনি বুকে যন্ত্রণা হচ্ছে বলে উঠে বসেন। মাত্র মিনিট পাঁচেক যন্ত্রণায় ছটফট করে-ছিলেন। তারপর হঠাৎ তাঁর দেহ মৃত্যুর কোলে লুটিয়ে পড়ে। স্থির নিস্পন্দ দেহটার দিকে তাকিয়ে প্রথমে কেউ বুঝতেই পারে নি যে মানুষটা শেষনিঃশাস ত্যাগ করেছে।

পরদিন সকাল বেলায়ই রঞ্জনের কাছে টেলিগ্রাম পাঠান হয়েছিল। কোন কারণে সেই টেলিগ্রাম পৌছতে কিছু দেরী হওয়ায় রঞ্জন তার বাবাকে শেষ দেখা দেখতে পারল না। মৃতদেহ আজ সকালেই চিতার আগুনে ছাই হয়ে গেছে।

শব শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু সব শেষ হয় নি। আছে আচার, অনুষ্ঠান, আছে স্মৃতিভার।

একমনে ইন্দুমাসীমার কথা শুনছিল রঞ্জন। হঠাৎ তীক্ষ্ণ চাপা কান্নার শব্দে সে সচকিত হল। মা-র মুখ হাঁটুর আড়াল থেকে জোড় করে তুলে ধরল রঞ্জন। তার চোখ দুটো ফুলে রয়েছে। যেন হঠাৎ বয়স অনেক বেড়ে গেছে।

কি যেন বলতে গিয়ে রঞ্জনের ঠোঁটদুটো বারকয়েক কেঁপে উঠল। একটা অস্ফুট শব্দ করুণ রাগিণীর মত ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু স্পষ্ট করে কোন সান্ত্বনার কথা মাকে শোনাতে পারল না রঞ্জন।

সেদিন রাত্রে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল রঞ্জন। সে একটা মরুভূমির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিকে বিস্তীর্ণ বালির রাশির মধ্যে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ বালির ঝড় উঠে তার চোখ মুখ আচ্ছন্ন করে ফেলল। মরুভূমির মধ্যে উটে চড়ে কে যেন তাকে বাঁচাবার জন্য

ছুটে এল। উটটা কাছে আসতেই উটের আরোহী লাফিয়ে নেমে পড়ল। রঞ্জনকে উটের উপরে তুলে নিল। রঞ্জন অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকাল। লোকটার মুখ অবিকল তার বাবার মুখের মত। সেই শান্ত সৌম্যমূর্তি। মুখে মৃদু হাসি। ঝড়ের মধ্যে উটটা দ্রুতগতিতে ছুটতে লাগল। উটের পায়ের শব্দ আর হাওয়ার তীব্র সোঁ সোঁ আওয়াজেই যেন হঠাৎ রঞ্জনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে চোখ মেলে তাকাল। ঘরের চারিদিকে তরল অন্ধকার। একটা হ্যারিকেন এককোণে মিটমিট করে জ্বলছে। একটা ছোট হাত রঞ্জনের গলা জড়িয়ে আছে। পাশ ফিরে দেখল রঞ্জন তার ছোট ভাই চন্দন নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের মত তাকে আঁকড়ে ধরে ঘুমোচ্ছে। সবচেয়ে ছোটবোন সুমিত্রা তার পায়ের কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। কিছুটা দূরে সুনন্দা চন্দনের গায়ে হাত রেখে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে রয়েছে। অসহায় অল্পবয়সী প্রাণী কয়টিকে ঘিরে অন্ধকার ঘরটায় থমথম করছে।

বিছানায় উঠে বসল রঞ্জন। হ্যারিকেনের পলতেটা বাড়িয়ে দিল। অবাক হয়ে দেখল সুনন্দা চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

"এ কি! তুই ঘুমোস নি?"—বলল রঞ্জন।

"বড় ভয় করছে।" কাঁদ কাঁদ গলায় বলল সুনন্দা।

"ভয় কি আমি তো কাছে আছি।"

"তুমি আমাদের ছেড়ে আবার এলাহাবাদে চলে যাবে নাকি দাদা?"

"এলাহাবাদে? তা চাকরী রাখতে হলে যেতে হবে বৈ কি। তুই এখন ঘুমো। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিই, কেমন?"

"তুমি চলে গেলে আমরা কিছুতেই একা থাকতে পারব না। কিছুতেই না। মা কাঁদবে, চন্দন কাঁদবে—সবাই কাঁদবে।"

"আচ্ছা সে সব পরে ভাবা যাবে। তুই এখন ঘুমো। লক্ষ্মীটি, চোখ বোঁজ।"

বাধ্য মেয়ের মত চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগল সুনন্দা। রঞ্জন তার কাছে অনেকক্ষণ বসে রইল। নানা এলোমেলো চিন্তা তার রাতের ঘুম কেড়ে নিল। অসহায় ভাইবোনের, মায়ের এবং নিজের অজানা ভবিষ্যৎ তার কাছে স্বপ্নে দেখা ঝড়বিক্ষুব্ধ উষর মরুভূমির মত মনে হল।

* * *

একটা মাস রঞ্জনের জীবনের উপর দিয়ে ঝড়ের মত বয়ে গেল। পিতার পারলৌকিক কাজকর্ম—আচার, অনুষ্ঠান, শ্রাদ্ধ ইত্যাদির পর্ব শেষ হল। দূর থেকে এই উপলক্ষ্যে আত্মীয় স্বজন যাঁরা এসেছিলেন তারা একে একে সবাই বিদায় নিলেন।

রঞ্জন চারিদিকে তাকিয়ে ঝড়ের পরের স্তব্ধতা অনুভব করল। বুকের ভেতরটা হু হু করতে লাগল। যে মানুষটা চিরদিনের জন্য চলে গেছে তার স্মৃতি একটা ভারী পাথরের মত বুকের উপর চেপে আছে, মনে হল।

একদিন রঞ্জন দেখল তার মা ভোরবেলা গীতা পড়ছেন। সে লক্ষ্য করল সেখানে লেখা রয়েছে 'আত্মা অমর—মৃত্যু শুধু জীর্ণ বসন পরিত্যাগ'—সেই শ্লোকগুলি মা বার বার পড়ছেন। কিন্তু মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে তার মনে হল শাস্ত্রের স্তোকবাক্য মায়ের হৃদয়ে কোন সাড়া জাগাচ্ছে না।

শাস্ত্রকাররা বৃথাই অত শ্লোক লিখেছেন। আত্মার অমরত্ব সম্পর্কে লক্ষকোটি শ্লোক পড়লেও প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথা মন থেকে মুছে যায় না, নেভে না শোকের আগুন।

কিন্তু রঞ্জন নিজে বিলাপের অবকাশ পেল না। ছোট ভাইবোনদের কাছে সে এমন একটা মুখের ভাব বজায় রাখবার চেষ্টা করল যেন বিশেষ কিছুই হয় নি। তারা যাতে আগের মত স্কুলে যায়, বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করে—সেসব দিকে নজর দিল রঞ্জন।

এলাহাবাদে চাকুরীর ক্ষেত্রে সে ছুটির দরখাস্ত করে দিয়েছিল। হিসেব করে দেখল যে তার ছুটি প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। অনেকদিন ধরে সে ভাবছিল একবার রমলার বাড়ী যাবে। দুঃখের দিনে রমলাকে বড় বেশি মনে পড়েছিল। কিন্তু এতদিন সংসারের নানা ব্যাপারে বিশেষ ভাবে জড়িয়ে পড়ায় সে সময় ও সুযোগ পায়নি।

সেদিন বুধবার।

অন্যমনস্কভাবে পথে হাঁটছিল রঞ্জন। একটা রাস্তা

পার হচ্ছিল। দূর থেকে যে একটা গাড়ী ছুটে আসছে তা সে লক্ষ্য করে নি। নানা চিন্তায় সে মগ্ন ছিল। গাড়ীটা যখন খুব কাছে এসে জোরে হর্ণ দিল তখন সচকিত হল রঞ্জন।

গাড়ীটা রঞ্জনের একেবারে পাশে এসে থামল। গাড়ীটার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল রঞ্জন। কিন্তু কার সুমিষ্ট ডাকে সে ফিরে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে তার পা দুটো যেন রাস্তার সঙ্গে আটকে গেল। গাড়ীর পেছনের সিটে দরজার কাছে উঁকি দিয়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রমলা। রঞ্জনকে চিনেও যেন চিনতে পারছে না সে। রঞ্জনের মুণ্ডিত মস্তক, পরিবর্তিত পোষাক তাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে।

"তুমি!" কথাটা রঞ্জনের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

"উঠে এস—চট করে গাড়ীর ভেতরে এস। রাস্তায় গাড়ী দাঁড় করিয়ে রাখা যাবে না।" বলল রমলা।

এক পা এক পা করে এগিয়ে গেল রঞ্জন। গাড়ীতে উঠল। দরজাটা টেনে দিতেই গাড়ী আবার স্টার্ট দিল। রঞ্জনের মুখের দিকে কেমন যেন ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে রমলা বলল,—

"কি হয়েছে?"

"বাবা মারা গেছেন।"

"সে কি! হঠাৎ?"

"হ্যাঁ হঠাৎ। করোনারি থ্রম্বসিস।"

"ও।" বলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল রমলা।

তারপর আবার বলল, "আর একটু হলে কি সর্বনাশ হত বল তো। গুরুজন মারা গেলে অন্তত বছরখানেক খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হয়। আমার কপাল ভাল তাই তুমি বেঁচে গেছ।"

"আমি মরে গেলে তুমি কি খুব কষ্ট পেতে?"

"জানি না। কষ্ট হয় কিনা তা তোমার মাকে একবার জিজ্ঞাসা কোর। মা কেমন আছেন?"

"এই একরকম।"

"আমি তোমাকে এলাহাবাদের ঠিকানায় কয়েকটা চিঠি দিয়েছিলাম কিন্তু একটারও উত্তর পাই নি। তখনই আমার মন বলছিল হয় টুরে গেছ, নয় নিশ্চয় তোমার কিছু হয়েছে "

"কি হয়েছে ভেবেছিলে।"

"এতবড় সর্বনাশ হয়েছে সেটা অবশ্য কল্পনা করি নি।"

"তবে কি ভেবেছিলে?"

'সত্যি বলব? রাগ করবে না?"

"বল না।"

"ভেবেছিলাম, হয়ত কোথাও তুমি বিয়ে করেছ। এলাহাবাদে খুব বড় চাকরী কর—হয়ত কোন মেয়ের বাবা সুপাত্রে কন্যাদান করেছেন। আর মেয়েটি সুন্দরী দেখে তুমিও বিশেষ আপত্তি কর নি। হাসছ যে? ছেলেদের মোটেই বিশ্বাস করা যায় না।"

"তাই নাকি? আমাদের দেশের মুনিঋষিরা কিন্তু অন্য কথা বলেছেন।'

"কি বলেছেন?"

"শুনবে? তারা বলেছেন শ্মশানে ছাই না হওয়া পর্যন্ত মেয়েদের বিশ্বাস করতে নেই।"

"যে মুনি অমন কথা বলেছেন তিনি নিশ্চয়ই ব্যর্থ প্রেমিক ছিলেন। হতাশ প্রেমিকেরা মেয়েদের নামে নিন্দা রটাতে খুব ভালবাসে। আমি খুব জানি।"

"তাই নাকি? তাহলে কলকাতায় আমার অনুপস্থিতিতে অনেক কিছু জেনেছ—অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছ—তাই না?"

"ধ্যেৎ। অসভ্য।"

গাড়ীটা দেশপ্রিয় পার্কের কাছে মতিলাল নেহেরু রোডের ভেতরে ঢুকল।

মতিলাল নেহেরু রোডে রমলাদের বাড়ী। তার বাবা কি একটা কম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর। বিরাট বড়লোক। ধনীর কন্যা রমলার সাজসজ্জায় অবশ্য ঐশ্বর্য দেখাবার কোন প্রয়াস নেই। এক ধরণের বড়লোকের মেয়ে আছে যারা অসাধারণ বড়লোক বলেই অতি সাধারণ সেজে থেকে অ-সাধারণ হতে চায়—রমলা অনেকটা সেই পর্যায়ের। অবশ্য তার সাজসজ্জার দরকার করে না। তার স্নিগ্ধ লাবণ্যময় রূপ সহজেই চোখে পড়ে।

গাড়ীটা আরও কিছুটা এগোবার পর রঞ্জন বলল, "এবার আমি নেমে যাই।"

"সে কি! এত কাছে এসে আমাদের বাড়ী যাবে না?"—বলল রমলা।

"না। এই মাথা মোড়ান অবস্থায় কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না।"

"মা কিন্তু তোমার কথা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করে। তুমি এত কাছে এসেও আমাদের বাড়ীতে পা দাওনি জানলে মা খুব কষ্ট পাবে। চল, না।"

"আজ থাক।"

—"দ্যাখ, দুঃখ সকলের জীবনেই আসে কিন্তু দুঃখের কাছে যারা হার স্বীকার কোরে ঘরে বসে শুধু চোখের জল ফেলে তাদের দুঃখ বেড়েই যায়। তুমি পুরুষ মানুষ, দুঃখকে জয় করাই তো তোমার কাজ।"

—বাঃ বেশ গুরুগম্ভীর কথা বলতে শিখেছ তো। তোমাদের বাড়ী গিয়ে কি করব? তোমার সঙ্গে দেখা তো হয়েই গেল।"

"কতকাল পরে দেখা হল। এত তাড়াতাড়ি ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। চল না।"

গাড়ীটা কিছুক্ষণ পরে রমলাদের বাড়ীর গেটের সামনে এসে দাঁড়াল। সুসজ্জিত ড্রইংরুমে রঞ্জনকে বসিয়ে 'আসছি' বলে রমলা ভেতরে চলে গেল।

রমলার মা সুচরিতা দেবী একটু পরেই এসে রঞ্জনকে নানা সমবেদনার কথা শোনাতে লাগলেন। রঞ্জনের পিতৃবিয়োগে তিনি যে রঞ্জনদের সংসার সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ ও দুঃখ অনুভব করছেন সে কথা বার বার বোঝানর চেষ্টা করার পর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—

"তোমার অফিসের ছুটি আর ক'দিন?"

"বেশিদিন নয়। ভাবছি আরও একমাসের ছুটির জন্য দরখাস্ত করে দেব।"

"মা ভাই বোন—এদের কে দেখবে? সবাইকে এলাহাবাদে দিয়ে যাবে নাকি?"

"সে বিষয়ে খুব ভাবনায় পড়েছি। এখানে সবাই পড়াশুনা করছে। বছরের মধ্যিখানে এলাহাবাদে নিয়ে গেলে পড়াশুনার খুব ক্ষতি হবে; অথচ ভাইবোনদের এখানে যে কে দেখাশুনা করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। মা তো খুবই ভেঙ্গে পড়েছেন।"

"তাহলে সবাইকে তোমার চাকুরীস্থলে নিয়ে যাবে ভাবছ—তাই না?"

"সেইরকমই তো ভাবছিলাম কিন্তু সে ব্যাপারেও যে খুব সুবিধা হবে তা নয়। কারণ আমার 'টুরিং যব', সমস্ত ভারতবর্ষে ঘুরে বেড়াতে হয়। বছরের মধ্যে বেশির ভাগই বাইরে ঘুরে বেড়াই; এলাহাবাদে তো একনাগারে বেশিদিন থাকি না। এলাহাবাদ আমার হেডকোয়ার্টার তাই ঘুরে ফিরে আসি। তাছাড়া"—

"কি?"

"তাছাড়া মার মুখ দেখে মনে হয় বাবার স্মৃতিঘেরা কলকাতার এই বাসা যদি ছেড়ে চলে যেতে হয় তবে তাঁর খুব কষ্টই হবে। সবচেয়ে ভাল হত যদি কলকাতায় কোন চাকরী পেতাম। সেই চেষ্টাই করছি।"

—"হ্যাঁ সেই ভাল—তাহলে তো খুব ভাল হয়—খুব মজা হবে"—বলতে বলতে রমলা ঘরে ঢুকল। তার হাতে একটা ট্রেতে চা ও কিছু জলখাবার।

সুচরিতাদেবী ভ্রু কুঁচকে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি নিজের হাতে ট্রে নিয়ে এলে কেন? বাড়ীতে কি ঝি-চাকর নেই?"

রমলা কোন উত্তর না দিয়ে ট্রে রেখে রঞ্জনের দিকে চায়ের কাপটা এগিয়ে ধরে বললেন, "নাও।"

সুচরিতাদেবী বললে, "বুঝলে রঞ্জন, আমার রমলা আগের জন্মে খুব গরীব ঘরের মেয়ে ছিল। সব কাজ নিজের হাতে করার একটা বদভ্যাস ওর আছে। অথচ এসবের এজন্মে ওর তো কোন দরকার নেই। বাড়ীতে তো চাকরের অভাব নেই আর ভবিষ্যতের জন্যই বা ভাবনা কি। তুমি তো এলাহাবাদে বড় অফিসারের পদে কাজ কর।"

রঞ্জন কি একটা বলতে যাচ্ছিল। রমলা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "ঐ যা বলতে ভুলে গেছি। মা তোমার একটা ফোন এসেছে।"

"ফোন? কে ফোন করেছে?"

"ওই যে ও পাড়ার লতিকামাসীমা—তিনি। তোমাদের আজ নাকি সিনেমায় না কোথায় যাবার কথা ছিল তাই ফোন্ করেছেন। আমি ওনাকে অপেক্ষা করতে বলে ফোন্ রেখে এসেছি।"

"আচ্ছা যাচ্ছি। রঞ্জন, তাহলে তোমরা কথাবার্তা বল, আমি চলি," বলে সুচরিতাদেবী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

"বাব্বাঃ বাঁচা গেল।" বলে রঞ্জন ডিভানে গা এগিয়ে দিল।

রমলা গম্ভীর মুখে বলল, "তুমি আমার মাকে পছন্দ কর না—তাই না?"

"কে বলেছে?"—তাকাল রঞ্জন।

"মনে হয়।"

"মনে যা হয় তা অনেক সময়ই সত্য হয় না।"

"তা বটে—এই যেমন আমার মনে হয় তুমি আমায় খুব ভালবাস কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই সত্যি নয়।"

"কি করে বুঝলে?"

"বারে—তুমিই তো বললে, যা মনে হয় তা অনেক সময়ই সত্যি হয় না।"

"তাহলে আমিও তো মনে করি তুমি আমার জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে পার—সেটাও মিথ্যে—কি বল?"

"তা কেন হবে। আমি তো আর ও কথা বলি নি। এই শোন, তুমি কি সত্যি কলকাতায় চাকরীর চেষ্টা করছ?"

"হ্যাঁ।"

"আমার শুনে পর্য্যন্ত খুব আনন্দ হচ্ছে। কলকাতা ছেড়ে আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। এই, চাকরী পাবে তো?"

"চেষ্টা করছি। কলকতায় চাকরী পেলে সংসারটা সবদিক থেকে রক্ষা পায়। আমি নিজে দূরে থাকলে ভাই বোনেরা মানুষ হবে না। ওদের দেখাশোনার একটা লোক তো চাই। বাবা নেই। লোকে বলে বড় ভাই-পিতার সমান। সামনে আমার অনেক কর্ত্তব্য।"

"এই, ও রকম গম্ভীর-গম্ভীর কথা বোল না। আমার খুব হাসি পায়।"

"তুমি আমার দুঃখ বুঝবে না রমলা।"

"দুঃখ না বুঝলাম। দুঃখকে কি ভাবে ভুলিয়ে রাখতে হয় তা যদি বুঝি তাহলেই আমার যথেষ্ট হবে।

কিছুক্ষণ পরে সুচরিতাদেবী আবার ঘরে ঢুকলেন। বললেন, "আমি একটু বাইরে যাচ্ছি রঞ্জন তুমি যে কদিন কলকাতায় আছ মাঝে মাঝে এসো কিন্তু।"

"আসব", বলে হাসল রঞ্জন।

সুচরিতাদেবী ইসারায় রমলাকে ডাকলেন। রমলা তার সঙ্গে ঘরের বাইরে গেল। কিছুক্ষণ পরে ঘুরে এসে রঞ্জনকে বলল, "মুখ কালো করে কি ভাবছ?"

"ভাবছি—সে অনেক কথা—", বলল রঞ্জন।

"আমি জানি কি ভাবছ।"

"কি?"

"আমার কথা ভাবছ—তাই না?"

"বয়ে গেছে।"

"তবে কার কথা ভাবছিলে?"

"সে একজন—তাকে তুমি চিনবে না।"

"এই মিথ্যে, ভয় দেখিও না বলছি। আমি ছাড়া অন্য কারও কথা ভাবলে কিন্তু জন্মের মত তোমার সঙ্গে আড়ি করে দেব। খুব রাগ করব কিন্তু।"

"রাগ করে থাকতে পারবে?"

"ইস পারব না আবার। তোষামোদ না করলে কথাই বলব না। জান, এই রমলাদেবীর লোভে অনেক ডাক্তার, ইন্‌জিনীয়ার আজকাল এ বাড়ীতে যাতায়াত করছে।"

"তাই নাকি? তুমি তাদের কি বল?"

"বলি—সে অনেক কথা।"

"কিছু শুনি না।"

"বলি, আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি এন্‌গেজড্।"

"সত্যি?"

"বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? বেশ তাহলে বলি—রঞ্জন নামে একটা ডাকাত বহুকাল ধরে আমার পেছনে ঘুরছে। আমাকে জ্বালিয়ে মারছে। আমাকে সেই নাছোড়বান্দা লোকটার হাত থেকে রক্ষা করে গলায় মালা দিয়ে নিয়ে চলুন।"

রমলার বলার ভঙ্গি দেখে রঞ্জন হেসে ফেলল।

* * *

তিন ভাইবোন একসঙ্গে একই ঘরে পড়তে বসেছে। চন্দন তার ক্লাস ফোর-এর ইতিহাস বইখানা সামনে খুলে রেখে দুলে দুলে রামায়ণের কাহিনী পড়ছে। সুমিত্র ক্লাস সিক্‌স-এর একটা অঙ্ক বই খুলে খাতার উপর হিজিবিজি কাটছে। সুনন্দা পড়ে ক্লাস সেভেনে। সে স-রবে ইংরাজী কবিতা মুখস্থ করছে।

এমন সময় ঘরের দরজার সামনে রঞ্জনের মুখ দেখা গেল। তিন ভাইবোনই জানে মন দিয়ে পড়াশুনা ন

করলে দাদা খুব রাগ করে। রঞ্জনকে দেখে সবাই আরও দ্বিগুণ উৎসাহে চীৎকার করে পড়তে লাগল। সুমিত্রাও তাড়াতাড়ি খাতা বন্ধ করে অন্য একটা বই টেনে দুলে দুলে বলতে লাগল—আকবর ওয়াস এ গ্রেট কিং… আকবর ওয়াস এ গ্রেট কিং…

"এই ছোড়দি; অত চেঁচিও না। আমার পড়ার অসুবিধা হচ্ছে।" বলে চন্দন একবার রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে জোরে চীৎকার করে পড়তে লাগল—"রামচন্দ্রকে বনে যাইতে হইবে শুনিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ দুঃখে কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন, আমি জীবন থাকিতে তোমাকে ত্যাগ করিয়া অযোধ্যায় রাজ্যসুখ ভোগ করিতে পারিব না।…

সুনন্দা যেমন পড়ছিল তেমনই পড়ে যেতে লাগল।

রঞ্জন ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ওদের পড়া শুনল। সে সবেমাত্র বাজার করে ফিরেছে। হাতে তখনও বাজারের থলি ঝুলছে।

"দাদা, থলিটা কি মাকে দিয়ে আসব?"—পড়া থামিয়ে বলল সুনন্দা।

"না। তোরা পড়। আমিই মাকে দিয়ে আসছি।" বলে রঞ্জন রান্নাঘরের দিকে এগোল।

রান্নাঘরে গিয়ে দেখল তার মা উনুনের সামনে কড়াই-এর উপর কি একটা চাপিয়ে খুন্তি হাতে স্থির হয়ে বসে কি কি যেন ভাবছেন।

"মা"—ডাকল রঞ্জন।

"কি? ও বাজার এনেছিস," বলে এগিয়ে এসে থলিটা ধরলেন কমলাদেবী। একটা বড় ঝুড়িতে বাজার ঢেলে রেখে নিজের কাজ করতে লাগলেন।

রঞ্জনের মনে হল তার মা কেমন যেন যন্ত্রের মত হয়ে গেছেন। ছেলেমেয়েদের মুখ চেয়ে তিনি সংসারের নিত্যকর্ম নিষ্ঠার সঙ্গে করে যাচ্ছেন, কিন্তু তাঁর ভেতরে যেন প্রাণ নেই। কথা আগের চেয়ে অনেক কম বলেন। কোন কাজেই বুঝি আর কোন উৎসাহ নেই।

"চা খাবি?" বললেন কমলাদেবী।

"হ্যাঁ পড়ার ঘরে পাঠিয়ে দাও। আমি সেখানে বসছি।"

"আচ্ছা।"

"একটা কথা বলব মা?"

"তুমি সব সময় অত কি ভাব?"

"কি আর ভাবব—কিছুই না।"

"হয়ত ভাব তোমার ছোট ছেলেমেয়েদের কপালে অনেক দুঃখ আছে। তারা বাবার অভাবে মানুষ হবে না—তাই না?"

"ভগবান ওদের ভাগ্যে কি লিখেছেন তা তিনিই জানেন। তুই বিদেশে থাকিস। চন্দন তো শিশু। মেয়েদুটো বড় হচ্ছে। আমি একা মেয়েমানুষ কি করে সব দিক দেখব জানি না। তবে আমি আজকাল আর কিছু ভাবি না। ভেবে লাভ নেই।"

"মা তোমার দুঃখ হয়ত আমি ঘোচাতে পারব না, কিন্তু আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি আমি বেঁচে থাকতে তোমার ছোট ছেলেমেয়েদের কোনদিন কোন কষ্ট হবে না।"

"তা আমি জানি রঞ্জু। তুই-ই তো এখন সংসারের একমাত্র ভরসা। কিন্তু ভাবি—কি বা তোর বয়স—এই তো সবে পঁচিশে পা দিয়েছিস—এই বয়সে এতবড় সংসারের ভার মাথায় নিয়ে চলতে যে তোর বড় কষ্ট হবে। আর বিদেশে থেকে কি করেই বা এই সংসারের দেখাশুনা করবি।"

কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল রঞ্জন। "দাদা—দাদা"—ডাকতে ডাকতে ছুটে এল চন্দন।

"কি হয়েছে?" বলল রঞ্জন।

"দেখ না দাদা, ছোড়দি আমাকে পড়তে দিচ্ছে না। কেবল আমার সঙ্গে ঝগড়া করছে! আমাকে চিমটি কাটছে।" বলল চন্দন।

"চিমটি কাটছে?" মৃদু হেসে তাকাল রঞ্জন।

"এই দেখ না," বলে নিজের হাতটা তুলে ধরে চন্দন আবার বলল, "কি জোরে চিমটি দিয়েছে একেবারে লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। তুমি ছোড়দিকে বকে দাও।"

সুমিত্রার গলা শোনা গেল—"না দাদা, আমি কিছু করি নি। চন্দন আগে আমার বই কেড়ে নিয়েছিল।"

সুমিত্রা মেঘলা মুখ করে সামনে এসে দাঁড়াল।

কমলাদেবী বললেন, "তোরা সবাই মিলে দাদাকে জ্বালাস না।"

রঞ্জন চন্দনের হাত ধরে বলল, "চল। তোমরা সব পড়তে বসবে। দুষ্টুমি করতে নেই।"

"ছোড়দিকে কি বকবে না?"—চন্দন আবদারের সুরে বলল।

"এই সুমিত্রা—আর কখনও চন্দনকে মারবে না—বুঝলে? তুমি আমার কত ভাল বোন, লক্ষ্মী হয়ে চোলো—কেমন?"

"আমি তো লক্ষ্মী হয়ে চলি দাদা, চন্দনটা শুধু শুধু আমাকে রাগায়। ছোট ভাই দুষ্টুমি করলে বড় বোনের একটু সহ্য করতে হয়—তাই না দাদা?" বলে সুমিত্রা রঞ্জনের আর একটা হাত ধরল।

"হুঁ, চল পড়বে চল।"

পড়ার ঘরে এসে রঞ্জন দেখল সুনন্দা একমনে পড়ছে। চন্দন আর সুমিত্রা আবার বই নিয়ে বসে দুলে দুলে সরবে পড়তে আরম্ভ করল।

সুনন্দার কাছে বসল রঞ্জন। সুনন্দা চিরকাল পড়াশুনায় মনোযোগী।

"কি পড়ছিস?"—বলল রঞ্জন।

"ইংরেজী। ব্যাখ্যাটা বুঝতে পারছি না। বুঝিয়ে দেবে?"

"দেখি", বলে সুনন্দার বইটা টেনে নিল রঞ্জন।

"জান দাদা এবার বোধহয় আমি আর পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হতে পারব না।"

"কেন রে?"

"আমাকে বাবা রোজ পড়াত। সব বুঝিয়ে দিত। এখন তো আর বাবা নেই। কে আর রোজ রোজ পড়াবে।"

"কেন—আমি তো আছি। আমি পড়াব। তুমি ঠিক ফার্ষ্ট হবে।"

"তুমি তো দু'দিন বাদে এলাহাবাদে চলে যাবে—তখন?' ফার্ষ্ট গার্ল হলে ক্লাসের দিদিমণিরা আর আমায় ভালবাসবে না। আমি প্রাইজও পাব না।"

রঞ্জন ক্ষণকাল চুপ করে রইল। তারপর সুনন্দাকে 'ব্যাখ্যা' বোঝাতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে কমলাদেবী চা নিয়ে এসে রঞ্জনকে দিয়ে বললেন, "তোর নামে একটা চিঠি এইমাত্র এসেছে।"

"কই—দেখি।"

"এই যে", বলে আঁচল থেকে চিঠিটা বের করে দিলেন কমলাদেবী।

তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুলল রঞ্জন। তার চোখদুটো উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

"কার চিঠি রঞ্জু?" বললেন কমলাদেবী।

"মা আর কোন ভাবনা নেই। আমি বোধহয় কলকাতার একটা অফিসে চাকরী পেয়ে যাব। এটা ইণ্টারভিউ-এর চিঠি।"

"কলকাতায় চাকরী পাবি! সত্যি? ভগবান কি মুখ তুলে চাইবেন!"

"তুমি ভগবানকে একবার ডাকো মা। ভগবান তোমার কথা ঠিক শুনবেন। আমার এম, এ পরীক্ষায় রেজাল্ট খুব ভাল ছিল। আমি ঠিক চাকরীটা পেয়ে যাব। আমার মন বলছে আমি পাব।"

"কবে ইণ্টারভিউ দাদা?" বলল সুনন্দা।

"আগামী পরশু দিন। তোরা পড়। আমি চলি, এই অফিসের বড় সাহেবের বাড়ীতে গিয়ে তাকে একবার ধরতে হবে। বাবা মারা গেছেন শুনে আর এই মাথা মোড়ান চেহারা দেখে হয়ত তাঁর দয়া হবে। যাই।"

উঠে পড়ল রঞ্জন।

দাদা ঘরের বাইরে যেতেই সুমিত্রা চন্দনের দিকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বলল, "দাদা আমায় মোটেই বকে নি।"

চন্দন বই থেকে মুখ তুলে কি একটা বলতে যাচ্ছিল, কমলাদেবী তাকে থামিয়ে বললেন, "তোরা স্নান করতে যা। স্কুলে যাবার সময় হয়েছে।"

* * *

ইণ্টারভিউ-এর নির্দিষ্ট দিনে নিজেকে সব রকমে প্রস্তুত করে এ, জি, বেঙ্গল অফিসে গেল রঞ্জন।

বেলা প্রায় দুটোর সময় ইণ্টারভিউ-ঘরে তার ডাক পড়তে উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে গেল সে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মুখ কালো করে বেরিয়ে এল। ঘরের মধ্যে যাঁরা বসেছিলেন তারা তাকে কোন প্রশ্নই করেন নি। শুধু তার পরীক্ষার মার্কসীট একবার চেয়ে নিয়ে দেখেই

তাকে বিদায় করে দিয়েছেন। অথচ ও ঘরে যাবার আগে সে চাকুরী-প্রার্থী অন্য ছেলেদের মুখে শুনেছিল যে প্রশ্নবাণে সকলকে বিব্রত করে ফেলা হচ্ছে। তার মনে হল এ চাকরীর জন্য সে নিশ্চয়ই মনোনীত হয় নি।

পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে বিরাট অফিসটার গেটের বাইরে চলে এল রঞ্জন। সামনেই রাজ্যপালের প্রাসাদ। তার পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেছে সোজা দক্ষিণের দিকে। দুপুরের রোদ-ভরা পথে লোকজন খুব কম। সেই পথ ধরে সোজা হাটতে লাগল রঞ্জন। একবার তার মনে হল এই অফিসের বড় সাহেবের সঙ্গে গতকাল দেখা করে হয়ত সে ভুল করেছে। চাকুরীর উমেদার হয়ে আগে থেকে দেখা করার ফলেই হয়ত তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। হয়ত অন্য দশজনের মত সোজাসুজি প্রতিযোগিতায় নামলেই সে সফল হত। অতি চালাকের গলায় দড়ি বলে যে প্রবাদ আছে হয়ত তা মিথ্যে নয়।

রাজ্যপালের প্রাসাদ ছড়িয়ে এসেমব্লি হাউস পেরিয়ে রেডিও অফিসের পাশ দিয়ে আনমনে হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা এগিয়ে গেল রঞ্জন। নানা এলোমেলো ভাবনার মেঘ তার মনের আকাশে ভাসছিল।

"পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ"—হঠাৎ মেয়েলি কণ্ঠস্বর শুনে পেছনে ফিরল রঞ্জন। দেখল রমলা দাঁড়িয়ে আছে। মুচকি-মুচকি হাসছে।

"আরে—তুমি এখানে!" বলল রঞ্জন।

"আমি? এসেছিলাম—ধর তোমাকে খুঁজতে বেরিয়েছি।"

"সত্যি কথা বল না।"

"সত্যিই কথাই বলছি। তোমার আজ ইণ্টার-ভিউ-এর কথা ছিল, তুমি বলেছিলে তাই এখানে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। বুঝলেন মশাই?"

"তাই বল।"

"কিন্তু তুমি কেন এদিকে সত্যি করে বল না—কোথায় গিয়েছিলে? আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে রেডিও অফিসে তুমি বোধহয় কবিতা পাঠ করতে এসেছিলে—তাই না? তোমার তো কবিতা লেখার অভ্যাস আছে।"

"আছে নয়, ছিল।"

"ঐ একই কথা। প্রথমদিকে আমাদের যখন আলাপ হয়েছিল তখনতুমি আমায় প্রায়ই কবিতা পড়ে শোনাতে। কবিতা শুনতে আমার কি বিরক্তিই না লাগত—জ্বালাতন হয়ে যেতাম অথচ ভাল মানুষের মত মুখ করে বলতেই হত—আপনি চমৎকার কবিতা লেখেন রঞ্জনবাবু—প্রথম-দিক কিনা! মনে পড়ে?"

"হ্যাঁ। কিছুই ভুলি নি। আমি বড্ড বোকা ছিলাম। তুমি যে কবিতা ভালবাস না তা অনেককাল পরে বুঝেছিলাম।"

"কবিতার থেকে কবিকে আমি অনেক বেশি ভাল-বাসতাম। কিন্তু এদিকে কেন এসেছিলে বললে না তো? লোকে বলে ডানা-কাটা পরীরা রেডিও অফিসে যাতায়াত করে—তাদের সন্ধানে বুঝি?"

"আমার উপর তোমার সন্দেহ কোনকালেই গেল না।"

"ভালবাসার উষ্ণতা যতদিন থাকে ততদিন সন্দেহ যায় না।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ গো মশায় তাই। এই, বল না কাকে নিয়ে কবিতা লিখে পড়তে এসেছিলে?"

"কবিতা পড়তে আসি নি রমলা, নিতান্ত গদ্যময় ব্যাপারেই ঘুরে বেড়াচ্ছি। ইণ্টারভিউটা দিতে এসে-ছিলাম। দূরে সেই বড় লাল বাড়ীটায়—ওখানে আজ আমার ইণ্টারভিউ ছিল।"

"কি হল—চাকরী কি হবে।"

"না, কোন আশা নেই।"

"ও সেইজন্যেই শুকনো মুখে অমন করে আনমনে হাঁটছ। তুমি একটুতেই ভেঙ্গে পড় কেন? আশা ছাড়তে নেই। কি চাকরীর জন্য এসেছিলে?"

"সামান্য কেরাণীর চাকরী। তাও হল না।"

"কেরাণীর চাকরী? যাক, না হয়েছে খুব ভাল হয়েছে। ও সব ছোট চাকরীর দরকার নেই। ভাগ্যিস এসেছিলে, তাই দুজনায় দেখা হয়ে গেল। চল ইডেন গার্ডেনে ঘুরে আসি।"

"এখন বেড়াবার মত মনের অবস্থা নয় রমলা।"

বেড়ালেই মনের অবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। চল।

কতদিন দুজনে এক সঙ্গে ঐ স্বর্গোদ্যানে বেড়াই নি। এই, যাবে না ?"

"তোমার আজ কলেজ নেই নাকি ?"

"হ্যাঁ। এখনও ও দুটো ক্লাশ করার সময় আছে। যাব না। তোমাকে ছেড়ে প্রফেসারদের প্যানপ্যানানি শুনতে আমার বয়ে গেছে। এই চল না। কোথায় ছেলেরা বেড়াতে যাবার জন্য মেয়েদের সাধাসাধি করে আর আমার কপাল দেখ, আমিই তোমাকে তোষামদ করছি।"

"তুমি আমাকে দুর্ভাবনার হাত থেকে ভুলিয়ে রাখতে চাও-তাই না রমলা ?"

"ভোলা মনকে আবার ভোলাব কি ! বাক্যবাগীশ মশায়, এবার কি একটু পা বাড়াবে ?

মৃদু হেসে রঞ্জন রমলার হাত ধরে বলল, "চল।"

* * *

বিষাদের ছায়া নেমে এসেছে রঞ্জনদের ভাড়াটে বাড়ীটায়। আজ রঞ্জনের এলাহাবাদে ফিরে যাবার দিন। কলকাতায় কোন চাকরী সে জোগাড় করতে পারে নি। তাই ভাইবোন আর মাকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দিয়ে সে একাই যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। তার চাকরীটা এমনই যে এলাহাবাদকে কেন্দ্র করে সারা ভারতবর্ষে ঘুরে বেড়াতে হয়। সার্ভের কাজে একজায়গায় বেশিদিন থাকতে পাবে না। তাই সংসারের আর সকলকে নিয়ে গিয়ে বিদেশে ঘুরে বেড়ানোর থেকে পরিচিত কলকাতায় রেখে যাওয়া ছাড়া সে আর অন্য কোন উপায় খুঁজে পায় নি। কলকাতার বাসা ছেড়ে যেতে যে কেউ ইচ্ছুক নয় তাও সে বুঝতে পেরেছে। তার উপায় নেই, তাকে যেতেই হবে। চাকরী মধ্যবিত্তের প্রাণকেন্দ্র সেটা ছেড়ে দিলে সংসারটাই ডুবে যাবে।

এলাহাবাদ থেকে যথাসম্ভব মার কাছে টাকা পাঠিয়ে দেবে ঠিক করেছে রঞ্জন। আর যদি সম্ভব হয় তবে আবার সে কলকাতায় ফিরে আসবে—সে ভরসাও মাকে দিয়েছে।

জিনিষপত্র গুছিয়ে খাওয়া দাওয়া শেষ করে বসেছিল রঞ্জন। বাড়ীর একজন ভাড়াটে হাওড়া ষ্টেশনে তাকে নিয়ে যাবার জন্য ট্যাক্সী ডাকতে গিয়েছে। চন্দন আর সুনন্দা দাদাকে ঘিরে বসে আছে। ওদের মুখ মলিন। চোখ ছলছল করছে। ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে সুমিত্রা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

পিতৃহারা ভাইবোনদের দিকে তাকিয়ে রঞ্জনের বুক ভেঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। সকলকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দেবার বৃথা চেষ্টা করল সে।

একবার পেছন ফিরে দেখল তার মা ঘরের এককোণে যেখানে ঠাকুর দেবতার আসন পাতা আছে সেখানে পাথরের মূর্তির মত বসে আছেন। দিশাহারা দৃষ্টি তাঁর চোখে। পাথরের দেবতার মতই তিনি নির্বাক নিস্পন্দ।

'ট্যাক্সি এসে গেছে।"—কে যেন বলল।

রঞ্জন উঠে দাঁড়াল। চন্দন কি মনে করে দাদাকে প্রণাম করল। সুমিত্রা আর সুনন্দাও মাথা নত করল। হঠাৎ চন্দনের তীক্ষ্ণ কান্নার আওয়াজে সারা ঘরটা যেন কেঁপে উঠল। নিজেদের চোখে হাত চাপা দিল দুই বোন।

"কাঁদিস না"—বলতে গিয়ে রঞ্জনের চোখ দুটো কেঁপে উঠল। নিজেকে সামলে নিয়ে সে ধীরে ধীরে বলল, "মা, আমি যাচ্ছি। কাছে এস। তোমায় প্রণাম করব।"

পূজার আসন থেকে উঠে এক পা এক পা করে এগিয়ে এলেন কমলা দেবী। চন্দনকে কাছে টেনে নিয়ে মেয়েদের বললেন, "যাবার সময় কাঁদলে অমঙ্গল হয়। তোরা চোখের জল মোছ।"

রঞ্জন মাকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই কমলাদেবী তার হাত চেপে ধরলেন। ছেলের হাতের কড়ে আঙুলটা আস্তে আস্তে কামড়ে ছেড়ে দিলেন। তাঁর শুষ্ক চোখ থেকেও দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে নিচে নামতে লাগল রঞ্জন। একহাতে বাক্স বিছানা অন্য হাতে চন্দনকে ধরে সে নামছিল। অন্য সকলে তাকে অনুসরণ করছিল।

গেটের বাইরে এসে থমকে দাঁড়াল রঞ্জন। ট্যাক্সিটা হর্ণ দিচ্ছে। একজন পিয়ন কাঁধে ঝোলা নিয়ে তাদের বাসার দিকে এগিয়ে আসছে।

গেটের সামনে এসে পিয়ন দাঁড়াল। একটা বেদনা-

কাতর বিদায় দৃশ্যের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল।

কি মনে করে রঞ্জন জিজ্ঞাসা করল, "আমাদের কোন চিঠি আছে নাকি?"

"হ্যাঁ, রঞ্জন বোসের নামে একটা রেজেষ্ট্রি চিঠি আছে।" বলল পিয়ন।

চিঠিটা নিয়ে রঞ্জন দেখল খামের উপর সরকারী অফিসের ছাপ রয়েছে। কাঁপা হাতে তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুলল সে। তারপর আনন্দে চীৎকার করে উঠল, "মা, আমাকে যেতে হবে না। আমি কলকাতায় চাকরী পেয়ে গেছি।"

কমলাদেবী শূন্যদৃষ্টিতে তাকালেন।

রঞ্জন আবার বলল, "মনে নেই কি মা সেই যে ইণ্টারভিউ দিয়েছিলাম সেই চাকরীর এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার এসেছে। আমি ভেবেছিলাম ওখানে চাকরী হবে না কিন্তু হয়েছে। ভগবান আমাদের বাঁচিয়েছেন।"

আনন্দে লাফিয়ে উঠল ছোট ভাইবোনেরা।

ট্যাক্সির ড্রাইভারকে ফিরে যেতে বলে বাড়ী ফিরে এল রঞ্জন।

কিন্তু বেশিক্ষণ বাড়ীতে থাকতে পারল না। একটা মুখ তার বুকে ভেসে উঠল। মনে পড়ল সেদিনের সন্ধ্যার কথা। রমলার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। রঞ্জন এলাহাবাদে চলে যাবে শুনে রমলার মত হাসিখুসী মেয়েও ভিজে চোখে রুমাল চাপা দিয়ে মুখ লুকিয়েছিল।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি ট্রাম ধরল রঞ্জন। সুখবর রমলাকে না জানান পর্য্যন্ত সে স্বস্তি পাচ্ছিল না। ট্রামে উঠে তার মনে হল ভবানীপুর থেকে বালীগঞ্জ যেন হাজার মাইল দূরে। পথ তার কিছুতেই শেষ হতে চায় না।

ট্রাম থেকে নেমে মতিলাল নেহরু রোডের দিকে হাঁটছিল রঞ্জন। পথেই রমলার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। হাতে একটা খাতা নিয়ে মাথার দুপাশে দুই বেণী দুলিয়ে রমলা কলেজে যাচ্ছিল। রঞ্জনকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

"কি ব্যাপার—অমন ছুটতে ছুটতে কোথায় চলেছ?" বলল রমলা।

"তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম।" রঞ্জন হাঁফ ছাড়ল।

"আমার কাছে? এই অসময়ে? কাল না তুমি বলেছিলে আজ সকালের ট্রেণে এলাহাবাদে চলে যাবে—উঃ মানুষকে খুব বোকা বানাতে শিখেছ। ভারী অসভ্য তুমি। জান কাল সারারাত আমার ঘুম হয় নি। কেন মিথ্যে কথা বলেছিলে?"

"মিথ্যে নয় রমলা, এলাহাবাদে যাওয়াই ঠিক ছিল কিন্তু আর দরকার হবে না। আমি কলকাতায় চাকরী পেয়ে গেছি।"

"বল কি! সত্যি?"

"আগামী সোমবার নতুন চাকরীতে যোগ দেব। এবার থেকে আমরা একই কলকাতায় থাকব।"

"কি মজা—কি মজা"—ছেলেমানুষের মত হেলেদুলে বলল রমলা।

তার চোখ দুটো খুসীতে চিক চিক করে উঠল। তারপর একটু থেমে আবার বলল, "এই, তোমার সঙ্গে কথা বলব না।"

"কেন! কি হল?"

"সু-খবর আনলে সঙ্গে মিষ্টি আনতে হয় তাও জান না। আমার জন্য কিছু আন নি—আমি রাগ করব।'

"চল এখুনি দোকানে খাইয়ে দিচ্ছি।"

"উঁহুঁ। যাব না।"

"কেন?"

"সেদিন তোমাকে এক পা নড়াতে আমাকে কতবার অনুরোধ করতে হয়েছিল মনে আছে কি? অন্তত তার দ্বিগুণবার যদি আমাকে সাধাসাধি কর তবে যাব কিনা ভেবে দেখতে পারি।"

"লক্ষ্মীটি চল।"

"উঁহু। কখনই না।"

"এরকম করছ কেন? সেদিন আমার মন ভাল ছিল না। দোষ স্বীকার করছি চল। অনেক কথা আছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে হবে না।"

"চল", বলে রমলা পেছন ফিরে তার বাড়ীর রাস্তা ধরল।

"একি! উল্টোদিকে চললে যে!", বলে দুপা এগিয়ে গিয়ে রমলার পাশে দাঁড়াল রঞ্জন।

রমলা মুচকি হেসে বলল, "আগে আমাদের বাড়ী চল। কলকাতায় তোমার চাকরী হয়েছে শুনলে মা খুব খুসী

হবে। আর—

"আর কি?"

"আর···লজ্জা করে বলা যায় না।"

রমলা বাড়ী পৌছে ড্রইংরুমে রঞ্জনকে বসিয়ে বাড়ীর ভেতর দিকে ছুটল। ঘরের জিনিবপত্রের দিকে ঘুরেফিরে দেখতে লাগল রঞ্জন। সব কিছু আজ তার কাছে কেমন যেন নতুন আর সুন্দর মনে হচ্ছিল। ঘরের এককোণে ছোট আলমারীর উপর রাখা হরগৌরীর যুগল মূর্তিটায় রঞ্জনের চোখ আটকে গেল।

কিছুক্ষণ পরে সুচরিতাদেবী হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকলেন। বললেন,

"সুখবর—খুবই আনন্দের খবর তোমার কলকাতায় চাকরী হয়েছে। শুনে আমি সত্যি খুব খুসী হয়েছি রঞ্জন।"

"সবই আপনাদের আশীর্বাদ।"—মৃদু হেসে বলল রঞ্জন।

"কোন্ অফিসে চাকরী পেলে?"

"এ, জি, বেঙ্গল।"

"অফিসের নাম শুনে আমি কিছু বুঝি না বাপু। চাকরীটা কি? নিশ্চয় বেশ উঁচুদরে চাকরী—কি বল?"

"না। সামান্য কেরানীর চাকরী।"

"কেরানীর চাকরী! মাইনে কত?"

"দুশ টাকায় আরম্ভ।"

"মাত্র দুশ টাকা। আমাদের বাড়ীর ড্রাইভার তো প্রায় দুশো টাকা মাইনে পায়। তুমি এ কি বলছ! এ চাকরী তুমি নেবে?"

"হ্যাঁ।"

"এলাহাবাদে তুমি তো বড় অফিসার ছিলে—সেখানে তো অনেক বেশি মাইনে পেতে—তাই না?"

"তা পেতাম। এখানে মাইনে কম হলেও, সকাল বিকেল টিউশন করব। কলকাতা শহরে টিউশন করে আমি কয়েক শ রোজগার করতে পারবে।"

"টিউশন ভরসা করে জীবন চালাবে? জানি তুমি খুব ভাল ছাত্র ছিলে—এম, এ পাশ ছেলের পক্ষে টিউশন পাবার সম্ভাবনাও আছে কিন্তু অফিসারের পদ ছেড়ে কেরানীর পদ এক পাগল ছাড়া আর কেউ নেয় না।"

"এছাড়া আমার উপায় নেই। আমি এলাহাবাদে চলে গেলে আমাদের সংসার ভেসে যাবে। ছোট ভাই-বোন আর মাকে দেখবার আমি ছাড়া কেউ নেই। শুধু টাকাই তো সব অভাব দূর করতে পারে না, লোকেরও দরকার হয়। আমি কাছে না থাকলে আমার ভাইবোনকে কে মানুষ করবে? সবাই চায় আমি কলকাতায়ই থাকি।"

"কিন্তু তোমার নিজের ভবিষ্যৎ তুমি কি ভাববে না?"

"ভবিষ্যতের কথা জানি না। তবে বর্তমানের কর্তব্য যদি না করতে পারি, যদি শুধু নিজের স্বার্থের কথা ভাবি তবে আমি যে মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলব। অসহায় ভাইবোন বিধবা মা—এদের উপর আমার দায়িত্ব আছে, কর্তব্য আছে, দূরে থেকে সে কর্তব্যের হাত থেকে আমি পালাতে চাই না। চাকরী যখন পেয়েছি এখানেই থাকব।"

"কিন্তু এত অল্প মাইনে—

"বললাম তো অফিসে মাইনে কম হলেও আমি সারাদিন খেটে সেই অফিসারের মাইনে রোজগার করব। দরকার হলে পার্টটাইম কোথাও চাকরী নেব, টিউশন করব। আপনি আমাকে নিরুৎসাহ করবেন না।"

"তোমাকে এতকথা বলার আমার দরকার ছিল না। হয়ত বলা উচিতও নয়। কিন্তু কি করব আমার মেয়ের ভবিষ্যৎ তোমার সঙ্গে বাঁধা রয়েছে বলেই আমাকে ভাবতে হচ্ছে। এ বাঁধন ছিঁড়তে না পারলে রমলার ভবিষ্যৎ দেখছি অন্ধকার।"

"এ আপনি কি বলছেন!

"ঠিকই বলছি। শোন রঞ্জন, আমরা বড় ঘরের মানুষ, আমাদের একটা সামাজিক মর্যাদা আছে। আমরা একটা কেরাণীর হাতে মেয়ে দিতে পারি না।"

"কেন রমলা যে আমাকে—

"হ্যাঁ অফিসার রঞ্জনের উপর রমলার দুর্বলতা ছিল কিন্তু কেরাণী রঞ্জনের উপর তা নাও থাকতে পারে। তুমি যদি ইচ্ছে করে কেরাণী হতেই চাও তবে তোমাকে রমলার আশা ত্যাগ করতে হবে।"

রঞ্জন কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সুচরিতাদেবী আবার বললেন, "আমরা জামাইকে গাড়ী বাড়ী সবই দেব ঠিক করে রেখেছি। কিন্তু সে জামাই

আমাদের উপযুক্ত হলে তবেই দেব। তুমি নিজের ভবিষ্যৎ আর একবার ভেবে দেখ। রমলাকে আমি সব কথা বুঝিয়ে বলব। আমার মেয়ে সরল কিন্তু বোকা নয়।"

কি একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল রঞ্জন। তার মনে হল পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। ডিভানের নরম গদির উপর বসে পড়ল সে।

"কি হল ?" বললেন সুচরিতাদেবী।

"কিছু নয়। রমলাকে একবার পাঠিয়ে দিন।"

"তাকে আমি ভেতরের ঘরে বসিয়ে এসেছি। তার কাকা এসেছেন তার সঙ্গে কথা বলছে। আমি চললাম। তুমি ভেবে দেখ।"

"রমলা আসবে না ?"

"আসতে চাইবে কিন্তু আজ আমি তোমার সঙ্গে তাকে দেখা করতে দেব না। তোমার উত্তর পেলে আবার দুজনায় দেখা হবে।"

ঘর থেকে গটমট করে বেরিয়ে গেলেন সুচরিতাদেবী।

কিছুক্ষণ নিষ্প্রাণ পুতুলের মত বসে রইল রঞ্জন। দূর থেকে রমলার গলার স্বর শুনতে পেল। সে তার কাকে কি যেন বলছে। স্পষ্ট করে বোঝা গেল না।

রমলার প্রতীক্ষায় কিছুক্ষণ কাটাল রঞ্জন। শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে উঠে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে গেটের বাইরে বেরিয়ে এল। রমলাকে কোথাও দেখতে পেল না।

রাস্তা ধরে কিছুটা এগোতেই কে যেন তার নাম ধরে ডাকল। ফিরে তাকাল রঞ্জন। রমলাদের বাড়ীর ড্রাইভার তার দিকে এগিয়ে আসছে। সতর্ক দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকিয়ে ড্রাইভার রঞ্জনের হাতে এক টুকরো চিঠি গুঁজে দিয়ে চলে গেল।

মতিলাল নেহেরু রোড পেরিয়ে এসে চিঠিটা খুলল রঞ্জন। ছোট্ট চিঠি তাড়াতাড়িতে হাতের লেখা একেবেঁকে গেছে। রমলা লিখেছে—"কালকে বিকেল চারটের সময় আমার কলেজের গেটে তোমার জন্য আমি অপেক্ষা করব। এসো কিন্তু।"

* * *

ফিরে সে রাত্রে কিছুতেই রঞ্জনের ঘুম এল না। বিছানায় শুয়ে সে ছটফট করতে লাগল। এক-দিকে রমলার আশা ত্যাগ করা তার কাছে নিজের বুকের পাঁজরাগুলো ভেঙ্গে ফেলার মতই বেদনাদায়ক মনে হল। অন্যদিকে অসহায় ছোট ভাইবোন আর বিধবা মায়ের মলিন মুখ তাকে বিচলিত করে তুলল। কি করবে কিছুই সে স্থির করতে পারছিল না।

অন্ধকারে বিছানায় উঠে বসল সে। হ্যারিকেনের সলতেটা জ্বালিয়ে অনেকক্ষণ ধরে রমলার ছোট চিঠিটা বার বার পড়ল। চিঠিটা যেন একটা প্রলোভনের মত তাকে ডাকছে।

এ সংসারে সব মেয়ে ভাল হওয়ার চেয়ে সুন্দরী হতে বেশি চায়, সুখী হতে বেশি চায়। রমলাও কি তাই চাইবে না ?

কি মনে করে কিছুক্ষণ পরে চিঠিটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল রঞ্জন; ভাবল, সে রমলার সঙ্গে দেখা করতে যাবে না। কিন্তু পরদিন নির্দিষ্ট জায়গায় না গিয়ে পারল না রঞ্জন। কে যে তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। অবশ্য নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় আধঘণ্টা পরে রমলার কলেজের গেটের কাছে পৌঁছল রঞ্জন।

রমলা তখনও দাঁড়িয়ে আছে। রঞ্জনকে দেখে হাসতে হাসতে এগিয়ে এল রমলা। বলল, "এই, এত দেরী করলে কেন ? আমার উপর রাগ করেছ বুঝি ?"

"না তো।"—হাসবার চেষ্টা করল রঞ্জন।

"কর নি তো ? যাক, বাঁচা গেল। আমি তো ভেবে ভেবে মরছি। মা সেদিন আমাকে কিছুতেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে দিল না। কি করব বল।"

"চল, কোথাও বসি।"

"লেকে যাবে ?"

"না। সামনে যে পার্কটা রয়েছে, ওখানেই চল।"

"ও: ওখানে ? মোটেই রোমাণ্টিক জায়গা নয়। গাছ নেই, নদী নেই, কিচ্ছু নেই। কাঠের বেঞ্চিতে বসতে আমার ভাল লাগে না।"

"ঘাসের উপর বসব।"

"এই, অমন গোমরা মুখ করে আছ কেন। একটু হাস, যেখানে বলবে সেখানেই যাচ্ছি। লক্ষীটি একটু মিষ্টি হেসে বল না।"

পার্কের একটা কোণায় এসে বসল দুজনে। দুজনেই নীরব রইল কিছুক্ষণ।

একদল ছেলে তাদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কি একটা মন্তব্য ছুঁড়ে দিল। তারা চলে যেতে মুখ তুলল রঞ্জন। বলল, "কি ভাবছ?"

"ভাবছি তুমি একটা গোঁয়ার গোবিন্দ।"

"তার মানে?"

"মানে আর কি। সব কথার মানে থাকে না।"

"তোমার মার কাছে সব কথা শুনেছ?"

"হুঁ। খুব মন দিয়ে শুনেছি।"

"কি ঠিক করলে -"

"কোন্ বিষয়ে?

"আমি কেরাণীর চাকরী নিলে তোমার আশা কি সত্যি আমাকে ছাড়তে হবে?"

"নিশ্চয়ই।"

"তুমি কি ঠাট্টা করছ?"

"বা রে! নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে তুমি ঠাট্টা করতে পার—আমি পারি না।"

"তবে কি এতদিন শুধু আলেয়ার আলো দেখে ভুলেছি। তুমি কি আমায় ভালবাস না রমলা?"

"এই, ওরকম কাঁপা কাঁপা রোমান্টিক গলায় কথা বোল না। আমার কেমন যেন হাসি পায়। দেখ, ভালবাসা আজও আমার আছে। কিন্তু বিয়ে আর ভালবাসা তো এক জিনিষ নয়। বিয়েটা সামাজিক ব্যাপার কিংবা বলতে পার বৈষয়িক ব্যাপার—আর ভালবাসা ব্যক্তিমনের বিষয়। যাকে ভালবাসি তাকেই বিয়ে করতে হবে এমন কোন কথা নেই। সামাজিক মর্যাদা হারিয়ে ভালবাসা যায় না।"

"এসব কি তোমার নিজের মনের কথা—নাকি তুমি তোমার মা-র কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি করছ?"

কথাটা শুনে কেমন যেন চমকে উঠল রমলা। কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে রঞ্জনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তার মুখে বিষাদের ছায়া নেমে এল। ধীরে ধীরে সে বলল, "রঞ্জন, একটা কাজ করতে পারবে?"

"কি?"

"আজ রাত্রেই আমাকে নিয়ে কলকাতা থেকে অনেক দূরে কোথাও পালিয়ে যেতে পারবে?"

"কি সব আবোল তাবোল বকছ?"

"আমাকে দয়া কর রঞ্জন। তোমার থেকে আমাকে দূরে সরিয়ে দিও না, আমাকে কোথাও নিয়ে চল।"

রমলার ভিজে কণ্ঠস্বর শুনে অবাক হয়ে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল রঞ্জন। নীরবে মাথা নত করল রমলা।

"চুপ করে আছ যে? কিছু বল।" বলল রঞ্জন।

"কি বলব। আমি কাল সারা রাত ভেবেও তোমাকে শেষ কথা কি বলব ভেবে পাই নি। তুমি যা ভাল বোঝ কর।"

"আমিই বা কি করব। বাবা মারা গেছেন। বড় ছেলে হিসাবে তাঁর ছেলেমেয়ে—আমার মা—এদের উপর আমার তো একটা কর্তব্য আছে। বিধবা মায়ের মনে দুঃখ দেবার কাজটা তো মনুষ্যত্ব নয়।"

"সব মানি। কিন্তু মনুষ্যত্বের দেবতার তো এক চোখ অন্ধ নয় রঞ্জন। তাদের উপর তোমার কর্তব্য আছে কিন্তু আমার উপর কি তোমার কোন কর্তব্যই নেই? তোমার উপর আমার কি কোন দাবী নেই? ওরা তোমার মুখ চেয়ে আছে—ওদের কষ্ট দিলে তোমার মনুষ্যত্ব নষ্ট হবে। কিন্তু আমি যে এতকাল শুধু তোমারই পথ চেয়ে অপেক্ষা করছি আমাকে ত্যাগ করাই কি তোমার মনুষ্যত্ব? আমার এতকালের স্বপ্ন, আশা, আকাঙ্ক্ষা সব চুরমার করে ভেঙ্গে ফেলাটাই কি তোমার কর্তব্য? আমি কি দোষ করেছি?"

রমলার কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এল। রঞ্জন বলল,

"রমলা একি! তোমার চোখে জল!"

"অবাক হচ্ছ—তাই না?" বলে আঁচল দিয়ে চোখের কোণা মুছে নিল রমলা।

বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। পার্কের আলোগুলো এক এক করে কে যেন জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। কয়েকটা চামচিকে কোথা থেকে উড়ে এসে দুজনার মাথার উপর ঘুরতে লাগল। অনন্ত আকাশে লক্ষ কোটি যোজন দূরের তারাগুলো অনিমেষ দৃষ্টিতে দুজনার দুর্বল মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে উঠে দাঁড়াল রমলা। বলল, "আজ

চলি। আবার কবে দেখা হবে জানি না। কিছু ভাল লাগছে না।

রঞ্জনও উঠে দাঁড়িয়ে রমলার একটা হাত নিজের বুকের কাছে নিয়ে বলল, "কি করব এখনও কিছু বুঝতে পারছি না। কিন্তু যাই করি আমাকে তুমি ভুল বুঝ না রমলা।"

* * *

শীতের রাত্রি। রাত প্রায় দশটা। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে চলেছে। গায়ের চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে নিল রঞ্জন। টিউশন শেষ করে সে ক্লান্ত পায়ে বাড়ী ফিরে চলেছে। আশে পাশের বাড়ীর জানালা দরজা বন্ধ। কোথায় যেন রেডিওতে করুণ রাগিণী বাজছে। গলির রাস্তা আবছা অন্ধকার। একটা কুকুর একপাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে।

চলতে চলতে নিজের ভাগ্যের কথা ভাবছিল রঞ্জন। বাবার মৃত্যুর পর তার জীবনযাত্রার পদ্ধতি যেন হঠাৎ কোন্ যাদুমন্ত্রে আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আজকাল ভোর না হতে সে টিউশন সেরে প্রায় দশটার সময় বাজার করে থলি হাতে বাড়ী ফেরে। সকালের টিউশন সেরে বাজারটা তাকেই করতে হয়। মেয়েরা বড় হচ্ছে দেখে মা তাদের দোকানে পাঠাতে চান না। চন্দনের পড়াশুনার ক্ষতি হবে মনে করে রঞ্জন তাকে সকালে বাজারে যেতে দেয় না। বাড়ীতে বাজার নামিয়ে স্নান করে কোনরকমে নাকে মুখে দুটো গুঁজে সে অফিসে ছোটে। অফিসের পর আবার সেই টিউশন! বাড়ী ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায়।

জীবনটা কেমন যেন একঘেয়ে হয়ে গেছে। তবু ভাইবোনদের হাসিভরা মুখ—তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে সে উৎসাহ পায়। ওরা বড় হয়ে গেলে—মানুষ হয়ে গেলে তাকে আর এত কষ্ট করতে হবে না—ভাবে রঞ্জন।

রঞ্জনের চিন্তাসূত্র ছিন্ন করে "ঘেউ-ঘেউ" একটা চীৎকার ভেসে আসে। কুণ্ডলী পাকিয়ে যে কুকুরটা শুয়ে ছিল সে রঞ্জনকে পাশ দিয়ে যেতে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করছে। কুকুরটা রঞ্জনের পায়ের কাছে এসে ঘ্রাণ নেয়। তারপর পরিচিত মানুষ বুঝতে পেরে আবার নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়ে।

একটু থেমে আবার চলতে সুরু করে রঞ্জন। গলিটা পেরিয়ে একটা চওড়া রাস্তায় এসে পড়ে। রাস্তার এদিকে ত্রিকোণ ছোট নফর কুণ্ডু পার্ক। পার্কের দক্ষিণ দিকে রঞ্জনের বাড়ী।

বাড়ীটা চোখে পড়তেই দ্রুতপদে হাঁটতে লাগল রঞ্জন। নিজের বাসায় পৌঁছে দরজার কড়া নাড়ল।

কমলাদেবী দরজা খুলে দিলেন। দমকা ঠাণ্ডা বাতাস খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে তাঁর পাকা চুলে আঁচড় কেটে গেল।

তিনি বললেন, "ইস কি ঠাণ্ডা পড়েছে। তোর চাদরটা তো ছিঁড়ে গেছে রঞ্জন। একটা নতুন কিনলে পারিস।"

"কি যে বল মা। চন্দনের একটা গরম জামা দরকার তাই কিনতে পারছি না। নিজের জন্য কিনব কি করে?" —বলল রঞ্জন।

দরজা বন্ধ করে কমলাদেবী বললেন, "চন্দন তো আর রাত্রে বাইরে যায় না। ওর এখন না হলেও চলবে। কিন্তু তোর যে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।"

"আমার কিছু হবে না। আমার মোটেই শীত করে না।" বলে রঞ্জন ঘরের ভেতরে ঢুকল।

চন্দন আর সুমিত্রা ঘুমিয়ে পড়েছে। লেপের তলা থেকে উঁকি দিল সুনন্দা।

"কি রে—এখনও ঘুম আসেনি?"—হাতের ছাত্রপাঠ্য বইটা টেবিলে রাখতে রাখতে বলল রঞ্জন।

"তুমি বাড়ীতে না ফেরা পর্য্যন্ত ঘুম আসে না দাদা।"

"খাওয়া হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ। মা জোর করে আমাদের আগে খাইয়ে দেয়। কতদিন বলেছি দাদা বাড়ী ফিরলে একসঙ্গে খাব কিছুতেই শোনে না।"

"আমার ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায় কিনা তাই খাইয়ে দেয়। যাক, এবার ঘুমিয়ে পড়।"

হাতমুখ ধুয়ে রান্নাঘরে এগিয়ে গেল রঞ্জন। কমলাদেবী ভাতের থালা সাজিয়ে সামনে রাখলেন।

খেতে খেতে মাছের বাটিটায় হাত দিয়ে লাফিয়ে উঠল রঞ্জন—"একি করেছ মা!"

"কি হল ?"—উৎসুক হয়ে তাকালেন কমলাদেবী।

"এতবড় মাছের টুকরোটা আমায় দিয়েছ কেন ? চন্দন, সুমিত্রা, সুনন্দা—ওদের নিশ্চয়ই খুব ছোট টুকরো দিয়েছিলে—তোমার একটুও বিবেচনা নেই।"

"তুই এত খেটে মরছিস তোর স্বাস্থ্য তো রাখতে হবে।"

"ওসব বাজে কথা আমি শুনতে চাই না। ওরা ছেলেমানুষ ওদেরই ভাল জিনিষটা আগে দরকার।"

"আজ দিয়েছি যখন খেয়ে নে।"

"কিন্তু ভবিষ্যতে একথা খেয়াল থাকে যেন।"

"থাকবে।"

রঞ্জন বাটী থেকে মাছের ঝোল ঢেলে নিয়ে ভাত মাখতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে কমলাদেবী আবার বললেন, "একটা কথা তোকে বলব ভাবছিলাম।"

"কি ?"—মুখ তুলে তাকাল রঞ্জন।

সুনন্দার স্কুলে তিনমাসের মাইনে বাকী পড়েছে। স্কুল থেকে নাকি নাম কেটে দেবে।"

"সে কি! সুনন্দা তো আমাকে কিছুই বলে নি। তুমি কিছু ভেবো না মা। আমি যেমন করে পারি এমাসেই টাকা যোগাড় করে মাইনে দিয়ে দেব।"

খাওয়া শেষ হতে রঞ্জন ঘরে ফিরে এসে দেখল সুনন্দা ঘুমিয়ে পড়েছে। চন্দনের গায়ের উপর থেকে লেপটা ঘুমের মধ্যে সরে গেছে। লেপটা চন্দনের গায়ে টেনে দিয়ে নিজের বিছানায় বসল রঞ্জন।

রান্নাঘর ধুয়ে মুছে মার এঘরে ফিরতে কিছু দেরী আছে বুঝতে পেরে রঞ্জন একটা চারমিনার সিগারেট ধরাল।

কিছুক্ষণ পরে সিগারেটের শেষ টুকরোটা ঘরের বাইরে ফেলে দেবার জন্য সে জানালা খুলল। সামনের পার্কের দিকে সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়তে গিয়ে চমকে উঠল সে। দেখতে পেল পার্কের এককোণে ঘাসের উপর একজোড়া যুবক যুবতী কাছাকাছি বসে আছে। শীতের রাত্রি উপেক্ষা করে দুজনে কূজনে মত্ত।

সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত প্রায় বছর খানেক আগেকার একটা দৃশ্য তার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

...তখন সন্ধ্যা হয় হয়। মেয়েদের কলেজের সামনে একটা পার্ক। সেখানে ঘাসের উপর সে আর রমলা বসে আছে। রমলার চোখ ছল ছল করছে। রঞ্জন যেন স্পষ্ট শুনতে পেল রমলা বলছে—"আমার এতকালের স্বপ্ন, আশা, আকাঙ্ক্ষা—সব ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলাটাই কি তোমার কর্তব্য ? আমি কি দোষ করেছি ?"

তারপর একবছর কেটে গেছে। রঞ্জন আর কোনদিন রমলার সঙ্গে দেখা করে নি। রঞ্জনের বুক ভেদ করে একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল। তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ করে দিল সে।

ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল। মনে হল যে শূন্য মরুভূমির উত্তপ্ত হাওয়া তার বুকের মধ্যে হু হু করে বইছে। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এল না। ভোরের দিকে সে একটা আশ্চর্য স্বপ্ন দেখল। রমলাকে তাদের বাড়ীর বারান্দায় কে যেন বেঁধে রেখেছে। রমলা সেখানে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে তাকে ডাকছে। রমলার মুখ মলিন, বসন ছিন্নভিন্ন, চোখে জল টলমল করছে, মাথার রুক্ষ চুলগুলো এলোমেলো—হাওয়ায় উড়ছে।

ঘুম ভাঙ্গতে অনেকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল রঞ্জন। তার মা তারও আগে ঘুম থেকে উঠে ঘরে কি যেন কাজ করছিলেন। ছেলেকে বসে থাকতে দেখে তিনি বললেন, "অমন থ' হয়ে বসে আছিস কেন ? হাতমুখ ধুতে যাবি না ?"

মায়ের কথায় যেন সম্বিৎ ফিরে পেল রঞ্জন। বলল, "যাচ্ছি।"

"যা। আমি ততক্ষণ চায়ের জল চাপিয়ে দিচ্ছি।"

চা পর্ব শেষ করে প্রাত্যহিক নিয়ম অনুযায়ী টিউশন করার জন্য বাড়ী থেকে বেরুল রঞ্জন। কিন্তু ছাত্রের বাড়ীতে যাওয়া হল না। কে যেন তাকে অন্যদিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে সে দেখল যে সে মতিলাল নেহেরু রোড দিয়ে হাঁটছে! রমলাদের বাড়ীর দিকে এগিয়ে চলেছে।

রমলাদের বাড়ীর দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল রঞ্জন। দরজা বন্ধ। হাত বাড়িয়ে কড়া নাড়ল রঞ্জন। পরক্ষণেই তার ইচ্ছা হল সে পালিয়ে যায়। কিন্তু পালান

আর হল না। একজন অপরিচিত লোক দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করল, "কাকে চান ?"

"ইয়ে—মানে রমলার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।"

"রমলা! ও নামে এ বাড়ীতে তো কেউ থাকে না।"

"সে কি! এটা তো রমলাদের বাড়ী।"

"ও বুঝেছি। আপনি বাড়ীওয়ালার মেয়ে রমলার কথা বলছেন। কিন্তু তারা তো এখানে নেই।"

"নেই!"

"না। রমলার বাবা অনেকদিন আগে কলকাতা থেকে দিল্লীতে বদলী হয়ে গেছেন। চাকরীর ব্যাপার—বুঝলেন কিনা—অমন জায়গাবদল হয়েই থাকে। তিনি তাঁর পরিবারের সবাইকে নিয়ে চলে গেছেন। যাবার সময় বাড়ীটা আমাদের ভাড়া দিয়ে গেছেন।"

ক্লান্ত পায়ে বাড়ীটার দরজা থেকে সরে এল রঞ্জন। কিছুক্ষণ উদ্‌ভ্রান্তের মত রাস্তার এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াল।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই তার খেয়াল হল—দ্বিতীয় টিউশন করার হয়ে গেছে। যন্ত্রচালিতের মত ছাত্রীর বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল সে। ছাত্রী তৃপ্তি কলেজে পড়ে। তার বইপত্র নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করল রঞ্জন। কি একটা ইংরেজী কবিতা বোঝাতে গিয়ে কি সব বলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে তৃপ্তি বলল, মাষ্টারমশায় "আজ আপনার কি হয়েছে ?"

"কেন ?" অবাক হয়ে তাকাল রঞ্জন।

"আপনাকে কেমন যেন অন্যমনস্ক লাগছে। আপনার কি শরীর খারাপ ?"

"হ্যাঁ। বড় ক্লান্ত।"

"তবে আজ পড়ান থাক। আজকে বরং আপনি বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম করুন।"

"না। তেমন কিছু হয়নি। পড়াতে পারব।"

"থাক না। একদিন না পড়লে কিছু ক্ষতি হবে না," বলে উঠে পড়ল তৃপ্তি।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে আবার রঞ্জনের রমলার কথা মনে পড়ল। সে ভাবল এতদিনে রমলা নিশ্চয়ই কোন ভাগ্যবানের ঘর আলো করে আছে। কোথাও গড়ে তুলেছে সুখের নীড়।

সুন্দরী মেয়ে তিনজন স্বামী চায়—একজন বড়লোক স্বামী – যে তাকে টাকা দেবে; একজন রূপবান্ স্বামী—যে তাকে ভালবাসবে; একজন নিষ্ঠুর স্বামী যে তাকে কষ্ট দিতে পারবে—কোথায় যেন এমন একটা প্রবাদ শুনেছিল রঞ্জন। আজ সেই কথাটাই আবার তার স্মরণে এল।

* * *

কয়েক বছর পর।

সাপে যেন হঠাৎ ছোবল দিয়েছে এমন একটা যন্ত্রণার ভাব রঞ্জনের চোখে মুখে ফুটে উঠল।

যে জুতোটা এইমাত্র তার দিকে চন্দন ছুঁড়ে মেরেছে সে দিকে কেমন যেন অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল রঞ্জন। রাগে দুঃখে তার শরীর থর থর করে কেঁপে উঠল। সে চীৎকার করে বলল, "তোর এত বড় সাহস হয়েছে—তুই আমাকে জুতো ছুঁড়ছিস ? তোর পিঠের চামড়া আমি খুলে নেব।"

"মুখ সামলে কথা বল দাদা। এখন আর আমি ছোট নই। এখন আর তোমার পরোয়া করি না।" বলে চন্দন গটমট করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। তার অফিসের সময় হয়ে গেছে। স্কুল-ফাইনাল পাশ করার পর রঞ্জনই অনেক চেষ্টায় তাকে চাকরী জুটিয়ে দিয়েছিল।

জুতোটার দিকে আবার ফিরে তাকাল রঞ্জন।

মুহূর্তে যেন কি হয়ে গেল। আজকাল রঞ্জন যেন কেমন খিটখিটে মেজাজের হয়ে গেছে। আগের দিন চন্দনকে পাড়ার রকে বসে একজন মেয়ের প্রতি অশ্লীল মন্তব্য করতে শুনেছিল রঞ্জন। সে সম্বন্ধেই আজ সে চন্দনকে ধমকিয়ে তার কানদুটো মলে দিয়েছিল। চন্দন যে বড় হয়ে গেছে—এখন যে তার গায়ে হাত তোলা উচিত নয়—এসব কিছুই তার মনে হয় নি। দাদা হিসাবে ছোটভাইকে শাসন করতে গিয়েছিল সে। পরিণতিতে রঞ্জন যে তাকে জুতো ছুঁড়েমারবে—একথা সে কল্পনাও করে নি।

চন্দনের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতেই রঞ্জনের খেয়াল হল তারও অফিসের সময় হয়ে গেছে। উঠে দাঁড়াল

সে। রান্নাঘরের দিকে গেল। রান্নাঘরে মাকে দেখতে পেল না।

"সুমিত্রা"—ডাকল রঞ্জন।

কি যেন করছিল সুমিত্রা। "আমাকে ডাকছ", বলে কাছে এসে দাঁড়াল।

"মা কোথায় রে ?"

"মা তো ভোরবেলা দক্ষিণেশ্বরে গেছে। আজ সেখানে কল্পতরু উৎসব।"

"কখন আসবে ?"

"বোধহয় সন্ধ্যার আগে নয়। তুমি বোস। আমি ভাত দিয়ে দিচ্ছি।"

"না, আজ কিছু খাব না।"

"কেন ?"

"ক্ষিদে নেই।"

"তুমি তো জান চন্দন রাগী। ওকে না মারলেই পারতে। তাহলে ও অতটা রেগে যেত না। অবশ্য জুতোটা তো তোমার গায়ে লাগেনি।"

রঞ্জন কোন উত্তর দিল না। অফিসের জামা জুতো পরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল।

অফিসের টেবিলে বসে কিছুতেই কাজে মন দিতে পারছিল না রঞ্জন। অডিট রেজিষ্ট্রারটা সামনে খুলে রেখে আনমনে কি যেন ভাবছিল। বুকের ভেতরে কোথায় যেন যন্ত্রণা হচ্ছে। শরীরটা ভাল নেই।

"ও মশায়, গালে হাত দিয়ে কি ভাবছেন ?"—বড়বাবু রঞ্জনের টেবিলের কাছে এগিয়ে এলেন।

"কিছু না। বুকটা কেমন যেন ব্যথা করছে তাই বসে আছি।" বলল রঞ্জন।

"বসে থাকলে তো অফিস চলবে না। কাজে হাত দিন।" বললেন বড়বাবু। তারপর একটু পরে কি ভেবে আবার বললেন, "বুকের কোন্ জায়গায় ব্যথা করছে ?"

"ডান দিকে।" বলল রঞ্জন।

"ব্যথার আর কি দোষ বলুন। ও তো হবেই। এতটা বয়স হল বে' থা' কিছুই তো করলেন না। আজ বুকে ব্যথা, কাল মাথা ধরা—এসব লেগেই থাকবে। আচ্ছা আপনি বিয়ে করেন না কেন ?"

"এমনি।"

"এমনি ? কোথাও বোধহয় প্রেম-টেম চালাচ্ছেন কিন্তু বাড়ীতে মা হয়ত সেখানে বিয়ে দিতে রাজী হচ্ছেন না—কি বলেন ?"

"না, সেসব কিছু নয়।"

"আচ্ছা আপনার মা নিশ্চয়ই আপনার বিয়ে দেবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন অথচ আপনি রাজী হন না—তাই না ? মাকে আর কতদিন কষ্ট দেবেন, এবার বিয়ে করে ফেলুন তাহলে দেখবেন কাজেও খুব মন লাগবে। অফিসে এসে গালে হাত দিয়ে বসে থাকতে হবে না।"—বলে বড়বাবু নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন।

অডিট রেজিষ্ট্রারটা টেনে নিল রঞ্জন। পকেট থেকে কলমটা বের করে লিখতে গিয়ে হঠাৎ তার একটা কথা মনে হল।

বড়বাবু এইমাত্র যা বলে গেলেন তা সত্যি নয়। এতকাল হয়ে গেল মা তাকে কোনদিনই বিয়ে দেবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন নি। বছর খানেক আগে কে যেন তার বিয়ে দেবার কথা মার কাছে তুলেছিল, মা খুব একটা উৎসাহ দেখান নি। তবে কি মা তাকে তার অন্য সন্তানদের মানুষ করার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে ? মা কি তার প্রতি নিষ্ঠুর ভাবে উদাসীন ?

পরক্ষণেই বিবেকের দংশন অনুভব করল রঞ্জন। তার মনে হল মায়ের সম্বন্ধে সে যা ভাবতে যাচ্ছে তা কল্পনা করাও পাপ, অন্যায়। আজ তার মন ভাল নেই বলেই হয়ত সে আবোল তাবোল ভাবছে।

হঠাৎ দমকা কাশির বেগ আসতে রঞ্জনের সব চিন্তা ভেসে গেল। খুক খুক করে বারকয়েক কেশে উঠল সে। মনে হল যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। এক হাতে বুক চেপে ধরে সে কাশতে লাগল।

"কি হল মশায় ?"—বড়বাবু আবার উঠে এলেন।

"হঠাৎ কাশিতে জ্বালাচ্ছে।" বলল রঞ্জন।

"হঠাৎ কোথায় ? মাসকয়েক ধরেই তো দেখছি আপনি প্রায়ই খুক খুক করে কেবলই বুড়োমানুষের মত কাশেন। জ্বরটরও হয় নাকি ?"

"হ্যাঁ, রোজ রাত্রের দিকে জ্বর-জ্বর হয়।"

"চমৎকার। মা জানেন ?"

"না। বাড়ীতে কিছু বলি নি।"

"ডাক্তার দেখাতে পারেন না? শেষে কি টি, বি, ধরাবেন?"

"টি, বি!"

"অসম্ভব কি। দিবারাত্রি যে খাটুনি খাটেন। কেবল টিউশন আর টিউশন। খাওয়া দাওয়া নিশ্চয়ই তেমন কিছু পরে না। চলুন আজ অফিসের শেষে আপনাকে একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।"

"আপনি আমাকে খুব ভালবাসেন বড়বাবু।"

"মোটেই নয়। আপনার মত হাবাগোবা অপদার্থ লোককে কেউ ভালবাসতে পারে না। অসুস্থ হয়ে ছুটি নিলে সেকসনের কাজের ক্ষতি হবে তাই আমার গরজ। নিন, কাজে হাত দিন। শরীর খারাপ বলে কাজে ফাঁকি দেওয়া চলবে না।"

বড়বাবু আবার নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন।

রঞ্জনের পাশের টেবিলে সহকর্মী পরিমল এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে কাজ করছিল। বড়বাবু চলে যেতেই সে রঞ্জনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'শুনুন।"

"কি?"—তাকাল রঞ্জন।

"একটু কাছে আসুন—জোরে বলা যাবে না।"

"কি ব্যাপার?"

"একটু সাবধানে থাকবেন। বড়বাবুটি কিন্তু একটি মাল।"

"মাল! তার মানে?"

"ওনার একটা কুৎসিত ধেড়ে মেয়ে আছে সেটাকে আপনার গলায় ঝুলিয়ে দেবার জন্য আপনার উপর দরদ দেখাচ্ছে। সাবধান।"

রঞ্জন মৃদু হেসে এবার কাজে মন দিল।

বিকেলের দিকে বড়বাবু রঞ্জনকে জোর করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ ধরে ডাক্তার রঞ্জনকে পরীক্ষা করলেন। জ্বর, কাশি ইত্যাদি উপসর্গ কতদিন ধরে তার শরীরে আছে তা জানার পর জিজ্ঞাসা করলেন, "কোনদিন কাশির সঙ্গে মুখ দিয়ে রক্ত পড়েছিল কি?

"রক্ত?" বলে কিছুক্ষণ ভাবল রঞ্জন। মনে পড়ল অনেকদিন আগে শুকনো রক্তের দলা মতন কি একটা যেন গলা থেকে একবার বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু সেটা সামান্য ব্যাপার মনে করে সে উপেক্ষা করেছিল। কথাটা সে ডাক্তারকে জানাল।

ডাক্তার বললেন, "অবশ্য গলা থেকে রক্ত অনেক কারণেই বেরুতে পারে। সর্দির ধাত থাকলে অনেক সময় টনসিল থেকেও রক্ত বেরোয়। সে যাই হোক একবার এক্সরে করে বুকের ছবি নেওয়া দরকার।"

"এক্সরে করতে হবে! তবে কি আপনি সন্দেহ করছেন যে আমার টি, বি,-ই হয়েছে।" হতাশভাবে তাকাল রঞ্জন।

"ঘাবড়াবেন না। টি, বি, আজকাল এমন কিছু ভয়ঙ্কর রোগ নয়। অনেক চিকিৎসার পথ আছে। লোকে ভাল হয়ে যায়। তবে এক্সরে করে ছবি না পাওয়া পর্যন্ত আপনার কি হয়েছে তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। অবশ্য আমার খুবই সন্দেহ হচ্ছে যে রোগটা আপনাকে ধরেছে।"

"ধরেছে!"—প্রায় আর্তনাদ করে উঠল রঞ্জন।

"আপনার জীবনের যে ইতিহাস শুনলাম তাতে অত্যধিক খাটুনি এবং উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে এ ধরণের রোগ হওয়া অসম্ভব নয়। তবে এতে নার্ভাস হবার কিছু নেই।"

বুকের এক্সরে করে ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে এল রঞ্জন। দুদিন বাদে বুকের ছবি পাওয়া যাবে। দুদিন পরে জানা যাবে তার ভাগ্যে কি আছে। বড়বাবুকে বিদায় দিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল রঞ্জন। রাজ্যের ভাবনা তার বুকের মধ্যে ভারী পাথরের মত চেপে বসল।

সে কর্মক্ষম না থাকলে মা আর ভাইবোনদের ভবিষ্যতে কত কষ্ট হতে পারে সেকথা ভেবে বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। সুনন্দা সবেমাত্র বি-এ পরীক্ষা দিয়েছে—কত উজ্জ্বল স্বপ্ন ওর বুকে—কে ওকে দেখবে? সুমিত্রা এখনও কাঁচা মনের মেয়ে। বাবা নেই, দাদাও যদি মাথার উপরে না থাকে তবে না জানি কত বিপদ আসতে পারে। যে চন্দনের উপর সে সকালবেলা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল তার জন্যেও কেমন যেন কষ্ট হতে লাগল। রঞ্জনের মনে হল চন্দন যে খারাপ ব্যবহার করেছিল সে অপরাধ অনেকটা বুঝি তার নিজেরই। সে ছোটভাইকে ঠিকমত মানুষ করতে পারে নি। মার কথা

ভাবতেই রঞ্জনের চোখ দুটো ছল ছল করে উঠল। নিজেকে বড় অসহায় মনে হল।

বাড়ী ফিরে সে ঘরের এককোণে গম্ভীর হয়ে বসে রইল।

কিছুক্ষণ পরে কমলাদেবী চা নিয়ে এসে বললেন, আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরলি যে! টিউশনিতে যাস নি?"

"না," ছোট করে জবাব দিল রঞ্জন।

"চা খেয়ে নে। সঙ্গে কিছু জলখাবার দেব?"

"না।"

"সব সময় অমন মুখ গোমরা করে থাকিস কেন? অনেক বড়ভাই-ই তো সংসার চালায় তারা ভাইবোনকে বোঝা মনে করে না।"

"আমি করি সে কথা তোমাকে কে বলেছে?"

সুনন্দা কিছুটা দূরে দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, "বলতে হবে কেন দাদা, মুখ দেখলে আমরাও বুঝতে পারি। আমরা তোমার গলগ্রহ। গিলতেও পারছ না—গলা থেকে নামাতেও পারছ না।"

"একথা কেন বলছিস—কি করেছি তোদের? আজকাল শরীরটা ভাল নেই তাই মাঝে মাঝে খিটখিট করি। দুটো কড়া কথা বলে ফেলি। আমার মুখেরভাষাই কি সবই আমার বুকের ভেতরটা কি তোরা দেখতে পাস না?"

"খুব দেখতে পাই।" বলে ব্যঙ্গের হাসি হাসল সুমিত্রা। সেও ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখ তুলে তার দিকে তাকাল রঞ্জন। একটু পরে চোখে পড়ল চন্দন দরজার কাছ দিয়ে যাচ্ছে।

রঞ্জন ডাকল—"চ-ন্দ-ন।"

ধীরে ধীরে এগিয়ে এল চন্দন। তার মুখে বিরক্তির ভাব ফুটে উঠেছে। সে বলল, "আবার আমায় ডাকছ কেন?"

"আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নে চন্দন। কি জানি যদি তোকে প্রাণখুলে ক্ষমা না করতে পারি তবে হয়ত তোকে অমঙ্গল স্পর্শ করবে। তা আমি কি করে সহ্য করব। আমি তোকে বুকে করে মানুষ করেছি।"

"কি সব বাজে বকছ। ক্ষমা চাইব কেন?"

"আর সময় পাবি না চন্দন। পরে অনুশোচনা হবে। আর সময় নেই। আমি আর বাঁচব না।"

"কেন—তোমার কি হয়েছে?"

"আমার রাজরোগে ধরেছে, টি, বি, হয়েছে।"

"বল কি!"

"হ্যাঁ, ডাক্তার তাই সন্দেহ করছে। আজ ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম—এক্স-রে করিয়েছি। দুদিন বাদেই রিপোর্ট পাব। তখন আর সন্দেহ থাকবে না।"

ঘরের মধ্যে হঠাৎ যেন বজ্রপাত হল। সভয়ে ভাইবোনেরা দাদার মুখের দিকে তাকাল। সুমিত্রা বলল, "দাদা তবে তুমি ঐ কাপটায় আর মুখ দিও না। রোগটা ছোঁয়াচে।"

অভুক্ত চা কাপসমেত তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিল সুনন্দা।

"হ্যাঁ, কাপটা নিয়ে যা। আমার নিশ্বাসে বিষ আছে।" বলল রঞ্জন।

চন্দন, সুমিত্রা ও সুনন্দা আতঙ্কিত হয়ে ঘর থেকে পালিয়ে গেল। হঠাৎ তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন কমলাদেবী। রঞ্জন তাকে কি একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সে অবসর হল না। তিনি রঞ্জনকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলেন।

* * * *

দু'দিন পর।

ডাক্তারখানা থেকে এক্স-রে প্লেট আর রিপোর্ট হাতে নিয়ে ক্লান্ত পায়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল রঞ্জন। সন্দেহের শেষ হয়েছে, উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করার আর কিছু নেই। টি, বি, রোগের বীজাণুগুলি অনেকদিন ধরে তার বুকের ভেতর কয়েকটা ছিদ্র করে ফেলেছে।

রোগ নির্ণীত হবার পর কি করবে গত দুদিন তা আগেই ভেবে স্থির করে রেখেছিল রঞ্জন। ছোঁয়াচে রোগ নিয়ে আর বাড়ী ফিরবে না। সংসারের আর দশজনকে সে বিপন্ন করবে না। কলকাতা থেকে বহুদূরে শিলিগুড়িতে যে টি, বি, স্যানাটোরিয়াম আছে সেখানে গিয়ে চিকিৎসা করাবে। সেখানে পৌঁছে বাড়ীতে চিঠি লিখে নিজের কথা জানিয়ে দেবে।

হাওড়া ষ্টেশনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে রঞ্জনের মনে হল সে যেন এক মরুভূমির পথ ধরে এগিয়ে চলেছে অজানা ভবিষ্যতের দিকে। মা আর ভাইবোনের মুখ বার বার রঞ্জনের বুকে ভেসে উঠতে লাগল। আজ যখন সে বাড়ী

থেকে বেরুচ্ছিল তখন সবাই থমথমে মেঘলা মুখ দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। কিছুটা চলে আসার পর রঞ্জন এক-বার বাড়ীর দিকে ফিরে তাকিয়েছিল—কমলাদেবী তখন চোখে আঁচল চাপা দিয়েছিলেন। তাঁর শরীরটা বার বার ফুলে ফুলে উঠছিল।

"ও মশায়—অন্ধ নাকি? পথ দেখে চলতে পারেন না?"—কে যেন বলল।

একটা গাড়ী প্রায় ঘাড়ের কাছে এসে শব্দ করে থেমে গেল। লাফিয়ে দু'পা সরে গেল রঞ্জন।...

...হাওড়া ষ্টেশনে রঞ্জন যখন পৌছল তখন শিলিগুড়ি যাবার ট্রেণ ছাড়বার জন্য হুইসেল বেজে উঠল। তাড়া-তাড়ি ট্রেণের দিকে এগিয়ে গেল রঞ্জন। ট্রেণটা অল্প অল্প চলতে সুরু করেছে। যে কামরা সামনে পেল তাতেই লাফিয়ে উঠে পড়ল রঞ্জন।

ট্রেণের সীটে বসতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। নিজের চোখদুটোকে সে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না।

ট্রেণের লম্বা বেঞ্চের একপাশে জানালার কাছে রমলা বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। পাশেই তার মা সুচরিতাদেবী।

ট্রেণ থেকে নেবে যাবে কিনা একবার ভাবল রঞ্জন। কিন্তু ট্রেণ ততক্ষণে দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে। লাফিয়ে পড়া ছাড়া নামবার আর কোন উপায় নেই।

রঞ্জনের মনে হল কামরাটা যেন তার সামনে দুলছে। কাঠের দেওয়ালে হাত রেখে নিজেকে সামলে নিল সে। দেওয়ালে তার হাত লেগে শব্দ হল। সেই শব্দে ফিরে তাকাল মা আর মেয়ে। রমলা অপলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল।

সুচরিতাদেবী বললেন, "রঞ্জন না?"

"হ্যাঁ, আমি।"

"কোথায় যাচ্ছ?"

"শিলিগুড়িতে। আপনারা কতদূর যাবেন?"

"আমরা পরের ষ্টেশনেই নেমে যাব। আমার বোন ওখানে থাকে। বেড়াতে যাচ্ছি। উনি রিটায়ার করার পর থেকে অনেককাল কলকাতায় আছি। আর ভাল লাগে না। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোস।"

ফার্ষ্ট ক্লাসের ছোট কামরা। রঞ্জন লক্ষ্য করল রমলা ও তার মা ছাড়া আর কেউ কামরায় নেই। বেঞ্চের উপর জায়গা অনেকটা খালি। তবু পরিচিত মানুষদের কাছ থেকে কিছুটা দূরে সরে বসল রঞ্জন।

সুচরিতাদেবী আবার বললেন, "তোমাকে বলতে বললাম কিন্তু ভেবেছিলাম যদি কোনদিন দেখা হয় তবে পারলে তোমাকে খুন করব।"

"কেন!"

"আমার মেয়ের জীবনটা তুমিই নষ্ট করে দিয়েছ রঞ্জন। রমলা বে থা' কিছুই করল না। একটা অজ পাড়াগাঁয়ে মাষ্টারী করে। একা থাকে। ছুটিতে কলকাতায় এসেছিল। আমি মেয়েটাকে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছি।"

রঞ্জন কি একটা বলতে যাচ্ছিল, সুচরিতাদেবী হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "চোখে কি একটা উড়ে এসে পড়ল। যাই একবার বাথরুম থেকে চোখটা ধুয়ে আসি।" সুচরিতাদেবী বাথরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন।

রমলা আর রঞ্জন নীরবে কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর রঞ্জন ডাকল—"রমলা।"

"বল।"

"কেমন আছ?"

"বেঁচে আছি।"

"আমাকে কি একেবারে ভুলে গেছ?"

"ভুলবার অনেক চেষ্টা করেছিলাম। থাক সে কথা। তুমি কত রোগা হয়ে গেছ! তোমাকে যে আর চেনাই যায় না।"

"রোগা তো হবই—আমার যে টি, বি হয়েছে।"

"এই, মিথ্যে ভয় দেখিও না। এতকাল পর দেখা হল এখন ওরকম বলতে নেই।"

"মিথ্যে নয় রমলা।"

"প্রমাণ?"

"এই দেখ", বলে পকেট থেকে ডাক্তারের রিপোর্টটা বের করে দিল রঞ্জন।

রমলা কাগজটা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখল। তারপর পড়তে আরম্ভ করল। দাঁত দিয়ে ঠোঁটের একটা কোণা চেপে ধরল। তারপর হঠাৎ উঠে এসে রঞ্জনের হাত চেপে ধরে বলল, "তুমি নিজের এ কি সর্বনাশ

করেছ। আমি যে স্বপ্ন দেখতাম তুমি অনেক বড় হয়েছ—জীবনে জয়ী হয়েছ…”

“আমাকে ছুঁয়ো না। আমার নিশ্বাসে বিষ আছে।” বলে দু'পা পিছিয়ে গেল রঞ্জন।

“কিন্তু তুমি একা কেন? একা কোথায় চলেছ?”

“উতলা হোয়ো না রমলা। সব বলব। স্থির হয়ে একটু দূরে বোস। পরের ষ্টেশনে তুমি নেমে যাবে। আর হয়ত এজীবনে দেখা হবে না। তাই আজ সব কথা তোমায় বলে যাব।”

রমলা বসল না। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রঞ্জনের জীবনের ইতিবৃত্ত শুনতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে সুচরিতাদেবী বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন।

রমলা আর রঞ্জন কথা বলছে দেখে অনেকটা দূরে একটা জানালার কাছে বসলেন। বাক্স থেকে একটা বই বার করে পড়তে আরম্ভ করলেন।

সময়ের কাঁটা এগিয়ে চলল।

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রেনের গতি ধীরে ধীরে মন্থর হয়ে এল।

কি একটা ষ্টেশন এসে গেছে। কুলিরা ছুটোছুটি করছে, ফেরীওয়ালাদের চীৎকার শোনা যাচ্ছে।

ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লেন সুচরিতাদেবী। একজন কুলিকে ডেকে তার কাঁধে মালপত্র দিয়ে ধীরে ধীরে নামতে নামতে বললেন, “নেমে এস রমলা।”

রমলা কেমন যেন পাথরের মূর্তির মত বসেছিল। মায়ের ডাক শুনে সে চোখ তুলে তাকাল।

সুচরিতাদেবী প্লাটফর্মে নেমে দেখলেন রমলা তখনও নামে নি। মেয়ের উপর বড় মায়া হল তাঁর। ভাবলেন, যেটুকু সময় আছে দুটো কথা বলে নিক।

তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে তীক্ষ্ণ আর্তনাদের মত ট্রেনের হুইসেল বেজে উঠল।

সুচরিতাদেবী তাড়াতাড়ি রমলার কামরার জানালার কাছে গিয়ে বললেন, “তোমার কি কোন আক্কেল নেই রমলা? ট্রেন যে ছেড়ে দিল। চট্ করে নেমে এস।”

“আমি নামব না মা।”

“সে কি!”

“আমি ওকে অসুস্থ অবস্থায় একা ছেড়ে দিতে পারব না মা।”

ট্রেনটা চলতে সুরু করল। হতবুদ্ধি হয়ে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে রইলেন সুচরিতাদেবী।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বাফেলো

সিকাগো থেকে সন্ধ্যার বিমানে এলাম বাফেলো মহানগরীতে। এটী নায়েগ্রা জলপ্রপাতের খুবই কাছে। এটী নিউইয়র্ক প্রদেশের এক বিশিষ্ট সহর যার উন্নতি বর্তমানে কিছু মন্থরিত হয়েছে। নিউইয়র্ক মহানগরীর পরই নিউইয়র্ক রাষ্ট্রে এর দ্বিতীয় স্থান। 'বাফেলো সুয়ারেজ অথরিটী'র অধিকর্তা 'সুয়ার' সাহেব সস্ত্রীক এসে বিমানবন্দরে যে হাজির হবেন এটা আমার ধারণা ছিল না। তাঁকে আমার শুভাকাঙ্ক্ষী সংস্থা থেকে আমার বাফেলো আসার মামুলী পরিচয়পত্র আগেই ছেড়েছিলেন ও তার একটী ক'রে কপি আমায় সিকাগোর হোটেলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বিমান থেকে নেমে আমার টোরণ্টো যাবার বিমানের হদিশ করছি 'মোহক বিমান কোম্পানী'র কাউন্টারে দাঁড়ানো তরুণীটীর সঙ্গে, তখন এক ভদ্রমহিলা আমার পেছনে এসে জিগ্যেস করলেন—'আপনি কি মিঃ চ্যাটার্জি।'

আমি বললাম—আজ্ঞে, আমিই। কেন বলুন তো?

আমি শ্রীমতী সুয়ার। সুয়ার সাহেব আপনারই সন্ধানে ওধারে গেছেন।

আমাদের দুজনকে কথাবার্তা কইতে দেখে সুয়ার সাহেব এসে বললেন—আমি মিঃ সুয়ার। আপনি নিশ্চয় মিঃ চ্যাটার্জি।

ঠিক ধরেছেন। তবে একথা আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে শ্রীমতীর অদ্ভুত বুদ্ধিমত্তা। আমি একজন অচেনা অজানা বিদেশী। উনি কিন্তু আবিষ্কার করেছেন আমার মত নগণ্য একজন সামান্য মানুষকে।

আমার ব্যাগটা সুয়ার সাহেবের মোটরের পেছনে চড়িয়ে আমরা তিনজনে চললাম সুয়ার সাহেবেরই ঠিক-করা স্ট্যাটলার হোটেলে। আমার ব্যাগ ঘরে রেখে নীচে নেমে এসে আমরা লাউঞ্জে ব'সে গল্প শুরু করলাম। এ গল্প চললো রাত এগারটা পর্যন্ত। আগেই রাতের আহার বিমানে সেরে নিয়েছিলাম। ওঁরাও খাওয়া-দাওয়া ক'রে এসেছিলেন। অতএব কারুর আহারের তাড়া নেই ও বাড়ী ফেরারও তাড়া নেই।

আগামী কয়েকদিনের কর্মসূচীর প্রসঙ্গে তিনি বললেন 'কাল সকালে হোটেলে জলকল সংস্থা থেকে লোক আসবে তোমায় নিতে।' পরে কোথায় কোথায় যেতে হবে তাও বললেন। পৌরভবন ও স্ট্যাটলার হোটেল রাস্তার এপার ওপার বললেও চলে। কাজের জায়গা ও থাকার জায়গা পাশাপাশি হওয়ায় আমার বেশ মনঃপূত হয়েছিল, কেননা গতায়াতের পথে অকারণ সময় নষ্ট হবার সম্ভাবনা নেই। সকালে উঠে বেলা আটটা পর্যন্ত লাউঞ্জে অপেক্ষা ক'রে চলে গেলাম 'সুয়ার' সাহেবের অফিসে। তিনি আশ্চর্যান্বিত হ'লেন। বললেন 'জলকল সংস্থা থেকে কেউ কি যায়নি?'

তিনি সংবাদ নিলেন। হাঁ, তাদের একজন ইঞ্জিনিয়ার তো গেছে। যাই হ'ক খানিকটা পরে সেই ভদ্রলোক এলেন সুয়ার সাহেবের ঘরে; সেখান থেকে আমায় পরিদর্শনে নিয়ে যাবেন ব'লে। তাঁর 'স্ট্যাটলার হোটেলে' আসতে কয়েক মিনিট দেরী হয়েছিল। সুয়ার সাহেব এ'কদিন বেশ ভাবনায় আছেন। কেননা তাঁদের ওখানে কর্মীদের ধর্মঘট শুরু হবে। কেমন করে এই ধর্মঘট

রোধ করা যায়? এর জন্ত নানা বিবৃতি তৈরী করতে হচ্ছে। রেডিও মারফৎ প্রচার করতে হচ্ছে। খবরের কাগজ-ওলাদের ডেকে পৌরপ্রতিষ্ঠানের বক্তব্য প্রচার করা প্রভৃতি কাজ চলেছে।

নিউইয়র্ক রাজ্যের জলসংক্রান্ত সম্মেলন:

পূর্বকর্মসূচী অনুযায়ী বৈকালে নিউইয়র্ক রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত The Fresh Water of New York State: its conservation & use এর উপর একটী পাঁচদিনব্যাপী Symposium হচ্ছে সেখানে আমায় নিয়ে যাবেন। সম্মেলনে যোগদানের জন্য লস্ এনজেলিস্ ও স্যানফ্রানসিসকো থেকেও লোক এসেছে। বহু স্থানীয় লোক তো আছেই। এখানে অধ্যাপক এল্, বি, হিচকক্ হ'লেন এই জল সম্বন্ধে আলোচনার নির্দেশক। রবিবার বিকালে (১২.৬.৬৭) সদস্যদের শুভাগমন জ্ঞাপনের ব্যবস্থা। সোমবার মধ্যাহ্নভোজের সময় নিউইয়র্ক রাজ্যের রাজ্যপাল, নেলসন, এ, রকীফেলার উদ্বোধনী ভাষণ দেন। তারপর বেলা দুটো থেকেই সম্মিলনের আসল কাজ শুরু। বিভিন্ন দিনে জল সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয়ে বিবৃতি, প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা চলে—

প্রথম অধিবেশনে—Our water Resources—A Panoramic View.

দ্বিতীয় অধিবেশনে—Water Polution: Problems & Opportunities.

তৃতীয় অধিবেশনে—Water, Energy and Conservation

চতুর্থ অধিবেশনে—The grand Canal Concept

বুধবার ১৫ই জুন সকাল ৯টায়—

পঞ্চম অধিবেশনে—The Great Lakes—A joint Resources.

ঐ দিন বেলা ১টার সময় তিন রকম পরিদর্শন ব্যবস্থা রয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিদর্শনে বাসে ক'রে বাফেলো বিমান বন্দরে যাওয়া। সেখান থেকে বিমানে অন্তরীক্ষ থেকে পরিদর্শন সেরে নায়েগ্রা ফলস্ এর আন্তর্জাতিক বিমান ক্ষেত্রে অবতরণ ও সেখান থেকে বাসে আবার বাফেলোয় ফিরে আসা। তৃতীয় পরিদর্শন সবটাই বাসে ক'রে নায়েগ্রায় যাওয়া ও আসা। আমার প্রথম পরিদর্শনে যাবার টিকিট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন হিচকক্ সাহেব। সকালে জলকল পরিদর্শন ও তাদের পাইপ বসানো ইত্যাদির কাজ দেখানো হ'ল। বৈকালের পরিদর্শনপর্বে নায়েগ্রা নদীতে কত ভীষণ যে জল দূষণ চলেছে তা 'মোহক' কোম্পানীর বিমানে খুব নীচে দিয়ে উড়ে যাবার সময় নিজের চোখে দেখা যাবে। প্রথমে বৃহত্তর বাফেলো মহানগরীর আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে ছোট্ট একটা 'মোহক' বিমান জন কুড়ি সদস্য নিয়ে উড়ে প্রথমে পশ্চিমে পরে পূর্বে ইরি হ্রদের উপর দিয়ে বাফেলো সহরের প্রান্ত ঘেঁসে চলতে লাগলো। বিমানটী খুব নীচু দিয়ে চলায় দেখা গেল বাফেলো নদীর ময়লা কালো জল ইরি হ্রদের পরিষ্কার জলের ভেতর কতখানি দূর পর্যন্ত আক্রমণ করেছে। তারপর উত্তরে নায়েগ্রা নদী ধ'রে বিশ্ববিখ্যাত জলপ্রপাতের, ছাগদ্বীপ ও জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির উপর দিয়ে উড়ে আমাদের বিমান 'নায়েগ্রা ফলসে'র আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ করল। সেখানে আমাদের বাসটী বাফেলো বিমান বন্দর থেকে খালি এসে অপেক্ষা করছিল। আমাদের নিয়ে বাস চললো যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নায়েগ্রা জলপ্রপাতের জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটীতে। সেখানে পরিদর্শন পর্ব সেরে আমাদের কিন্তু বৈকাল সাড়ে পাঁচটায় বাফেলোয় ফিরতে হবে। এর মধ্যেই যা কিছু দর্শনীয় দেখে নিতে হবে।

নায়েগ্রা জলপ্রপাত ও জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র:

নায়েগ্রা জলপ্রপাতে পড়ে সেকেণ্ডে ২০২,০০০ ঘন ফুট জল ইরি হ্রদ থেকে নায়েগ্রা নদী বেয়ে খানিকটা নায়েগ্রা জলপ্রপাত হ'য়ে অন্টারিও হ্রদে পড়ে। এর মধ্য দিয়ে রয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সীমারেখা। নায়েগ্রার নৈসর্গিক রূপকে অক্ষুণ্ণ রেখে, লক্ষ লক্ষ দর্শকদের পতনশীল বিরাট জলধারার অপরূপ শোভাবলোকন ব্যাহত না ক'রে কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে এক আন্তর্জাতিক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। যাতে সর্ত লেখা আছে যে সেকেণ্ডে ১০০,০০০ ঘন ফুট জল এপ্রিল থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত জলপ্রপাতের উপর দিয়ে প্রবাহিত হ'তে হবে। এটী কমিয়ে সেকেণ্ডে ৫০.০০০ ঘনফুট পর্যন্ত করা যেতে পারে যখন

শীতকালে বরফ জমায় জলপ্রপাতের আকর্ষণীয়তা তেমন তীব্র থাকে না। উদ্বৃত্ত জল দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সমান সমানভাগে ভাগ ক'রে জলবিদ্যুৎ নিষ্কাশণে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ছেড়ে জলধারা যখন সেন্ট লরেন্স নদী বেয়ে সমুদ্রের দিকে চলে সেখানেOntario Hydro ৯৪০,০০০ K.W.Quebec Hydro ১,৮০০,০০০ K.W. ও Power Anthority of the State of New York ৯৪০,০০০ K.W বিদ্যুৎশক্তি
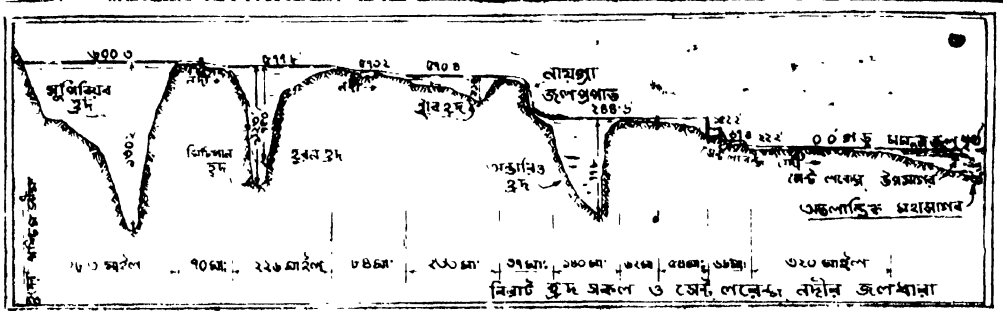
নায়েগ্রা জলপ্রপাত

নায়েগ্রায় দুটী জলপ্রপাত। একটী কানাডা রাজ্যের অন্তর্গত ঘোড়ার খুরের মত জলপ্রপাত। এটীর উপর দিয়ে বেশী জল ব'য়ে যায় ও লক্ষ লক্ষ দর্শকের উৎসুক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অপরটী মার্কিন রাজ্যের মধ্যে, সেখানে খাড়া সরল রেখা ধ'রে জল ঝ'রে যায়। যদিও নায়েগ্রা নদীর 'ইরি হ্রদ' থেকে 'অন্টারিও হ্রদে' যেতে লেভেলের তারতম্য মাত্র ৩২৬ ফিট কিন্তু নায়েগ্রা জলপ্রপাতের পতন-দৈর্ঘ্য মাত্র ১৭৬ ফিট। বাকী উচ্চতা নায়েগ্রা নদীর উপল খণ্ডে ব্যাহত খরস্রোতা অংশে ব্যয়িত হয়। তাই জলবিদ্যুৎ প্রস্তুত প্রতিষ্ঠান নায়েগ্রা জলপ্রপাতের আরও কয়েক মাইল উজানে জল ধ'রে সেই জল টার্বিনের মধ্য দিয়ে চালিয়ে বিদ্যুৎ নিষ্কাশন ক'রে নায়েগ্রা প্রপাতের আরও নীচে ফেলে দেয় যাতে অধিক পতন দৈর্ঘ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন কাজে লাগান যায়। 'এই নায়েগ্রা পাওয়ার প্রজেক্ট সংস্থা' যুক্তরাষ্ট্রের প্রাপ্য জলের পূর্ণ ব্যবহার ক'রে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। নায়েগ্রা নদী থেকে জল ছটী ৬৬ ফুট × ৪৬ ফুট সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে এসে Robert Moses Niagra Power Plant-এর মধ্য দিয়ে জলবিদ্যুতের জন্য দিয়ে আবার নদীতে প'ড়ে ব'য়ে যায়। ওখানে ২৫টী বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র আছে, সেগুলির মোট উৎপাদন ক্ষমতা হ'ল ১,৯৫০,০০০ K. W.। এই নায়েগ্রার কাছে কানাডার পারে 'ক্যানাডিয়ান হাইড্রো' ২,২৫০,০০০ K.W. বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করে। কুইবেকের কাছে অন্টারিও হ্রদ

উৎপাদন করে। অর্থাৎ ইরি হ্রদ থেকে জল অন্টারিও হ্রদ থেকে বেরিয়ে আসার সময় তার লেভেলের তারতম্যের জন্য সঞ্চিত উদশক্তি বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হ'য়ে সেন্ট লরেন্স নদী বেয়ে চলে যায়। এর সংযুক্ত বিদ্যুৎশক্তির পরিমাণ হ'ল:—

১,৮০০,০০০ K.W. (কানাডা)
৯৪০,০০০ K.W. (কানাডা)
৯৪০, ০০ K W. (যুক্তরাষ্ট্র)
২,২৫০,০০০ K.W. (কানাডা)
২,১৯০,১০০ K.W. (যুক্তরাষ্ট্র)

মোট ৮,১২০,০০০ K.W.

এই নব পরিকল্পনায় উদবিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্রগুলি খোলা জায়গায় রাখা হয়েছে। যন্ত্রগুলির উপরে বিরাট অট্টালিকা তুলতে হয়নি যাতে খরচ কিছু কমেছে। আমরা ঢুকতেই বিরাট একটি নায়েগ্রা অঞ্চলের মডেল। তারপরই রঙিন সবাক চিত্রে বিভিন্ন সময়ের প্রস্তুত প্রণালীর একটী জীবন্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে রূপালি পর্দায়। সেখান থেকে আমরা ছোট ছোট কয়েকটী দলে বিভক্ত হ'য়ে লিফ্‌টে করে নীচে নেমে গেলাম। সেখানে বিরাট আকৃতির ঘূর্ণায়মান (Shaft) শাফ্‌ট যার একদিকে জল টারবিন ও ওপরে বিদ্যুৎ উৎপাদক 'অলটারনেটার' (alternator)। সেই বিদ্যুৎ ১৩,৮০০ ভোল্টে উৎপন্ন হয়। কিন্তু বিরাট শক্তি পাঠাতে অতি মোটা ধাতব

তারের প্রয়োজন। সেটা না করে উৎপন্নশক্তিকে ১১৫,০০০; ২৩০,০০০ ও ৩৪৫,০০০ ভোল্টে রূপান্তরিত করা হয় ও বিরাট দৈত্যের মত ইস্পাতের কাঠামোর থাম দিয়ে সারা নিউইয়র্ক রাষ্ট্র ও নিউইয়র্ক সহরে পাঠানো হয়। এদের 'মাসেনার' কাছে যে উদবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র আছে সেটা থেকে এরা উটীকার (Utica) কাছে নায়েগ্রা থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ প্রেরক তারের সঙ্গে সংযোগ রাখা হয়েছে যাতে একের অসুবিধায় অন্যটি বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে।

বাফেলোর সেতু

এই পরিদর্শন পর্ব সেরে আমরা বাসে চ'ড়ে 'বাফেলোয়' ফিরে এলাম। 'স্থয়ার সাহেব' আমার সঙ্গে তাঁর এক সহকর্মীকে পাঠিয়েছিলেন। নিজে কর্মীদের ধর্মঘটের হুমকিতে ব্যতিব্যস্ত। তাই তিনি নিজে যেতে পারেন নি। আমরা স্টাটলার হোটেলে ফিরে এলাম।

বৃহস্পতিবার (৬৬৬৮) ষষ্ঠ অধিবেশনে Water Resources Planning-এর উপর আলোচনা হবে সকাল ৯টা থেকে ১২টা পর্যন্ত। এর পর লাঞ্চ।

আবার সম্মেলনে :

লাঞ্চে আমার নিমন্ত্রণ ছিল। তাই সকালে এখানকার ময়লা জল দেখে দুপুর বারোটায় বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। সেখানে নিরামিষ খাবার ভাগ্যে জুটল যদিও নিরামিষ ডিম ছিল তবে ফলমূলই বেশী। বেলা দেড়টার সময় সপ্তম অধিবেশন। আলোচনার বিষয়বস্তু হ'ল Management of Water Resources। এখানে আজ বক্তা আমার চেনা দুজন; একজন—লস্ এনজেলিসের Franklin D. Dryden (লস এনজেলিসে তাকে জিগ্যেস করেছিলাম ইংরেজ কবি Dryden-এর তুমি কেউ হও কিনা?) ও জর্জ, ই, সাইমনস্। ইনি বর্তমানে 'Water works and Water Engineering ব'লে পত্রিকায় সম্পাদক। বিশ বছর আগে টোরণ্টো (Toronto) বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ ষ্টেশনে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় ও Amcrican water works Convention, এ পরে আলাপ হয়। যাই হ'ক, তাঁদের বক্তৃতা শুনে আমরা ফিরলাম হোটেলে। 'স্থয়ার সাহেব' আজ রাতে, ডিনারে নিয়ে যাবেন। যথা সময়ে তিনি হোটেলে এসে আমায় নিয়ে গেলেন। আমাদের হোটেল থেকে স্থানটা বেশী দূর নয়। তবে পরিবেশটা একটু প্রাচীন, মিটমিটে আলো, আহারের পদও প্রাচীন ধরণের।

শুক্রবার Life under water ও Regional Problem Situation-এর উপর আলোচনা হয়। সময়াভাবে আমি যেতে পারিনি। আজকে আমার সকালে পরিদর্শন পর্ব সেরে 'মিঃ স্থয়ারের সহকর্মীকে' বললাম—

—আজ আর স্থয়ার সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে না। তিনি ধর্মঘট নিয়ে ব্যস্ত। তুমি কি আমায় বিমান বন্দরে পৌঁছে দেবে? পথে যেতে নিকটের একটি জলকল দেখে গেলে কেমন হয়?

—আপনি বলবেন কেন? এই রকমই তো ব্যবস্থা তিনি করেছেন।

—তাঁর দূরদর্শিতায় তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবে।

গ্রেটার বাফেলোর আন্তর্জাতিক বিমানক্ষেত্র প্রায় দশ মাইল দূরে। আমরা টবাস, ই ডিউয় থওয়ে ধ'রে নিউইয়র্ক ষ্টেট থ্রুয়ে ধ'রে বিমান বন্দরের দিকে চললাম।

বাফেলোয় নিউইয়র্ক রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় :

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের সামান্য একটি মেডিক্যাল স্কুল থেকে বর্তমানে এটা নিউইয়র্ক রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবর্তিত হয়েছে। এখানে ২টি বিভাগ আছে যার মধ্যে দন্ত চিকিৎসা, ঔষধবিদ্যা, আইন, সামাজিক কাজ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এটি রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নবতম ও বৃহত্তম অংশ যেখানে ১৩,০০০ছাত্রকে পূর্ণ শিক্ষা এবং ৬০০০ছাত্রকে

[বৈকালে আংশিক শিক্ষা দেওয়ার রীতি প্রচলিত। এই রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৯৪৮ সালে স্থাপিত হয় ও ৫৮টি বিভাগে বিভক্ত। ১৯৬২ সালে স্থানীয় 'বাফেলো'র উপকণ্ঠে 'বাফেলো বিশ্ববিদ্যালয়', 'নিউইয়র্ক রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের' সঙ্গে মিলিত হয়। তিন হাজার বিঘে জমির উপর এটী প্রতিষ্ঠিত। Main Street এর উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অংশটি আছে সেটি স্বাস্থ্যবিদ্যার অনুশীলনে উৎসর্গীকৃত। সেখানে Medicine, Dentistry, Pharmacy, Nursing ও অন্যান্য বিষয়ে গবেষণার জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত। এর সঙ্গে ৩৫০ শয্যার হাসপাতালও যুক্ত আছে, যেখানে শিক্ষা পুঁথিগত না হ'য়ে কার্য করী হয়ে উঠতে পারে। বাফেলো নিউইয়র্ক রাজ্যের দ্বিতীয় শহর এবং একটি কর্মচঞ্চল বন্দর : (Bulfalo) বাফেলো একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রও বটে। এখানে Albright Krox Art Gallery, Museum of Science এবং Buffalo Phil Harmonic Orchestra প্রসিদ্ধ। কিন্তু এখানে ধোঁওয়ের প্রাদুর্ভাবে ধনী লোকেরা শহরের উপকণ্ঠে খোলামেলা জায়গায় থাকতে চাওয়ায় গত দশকে এর লোক সংখ্যার বৃদ্ধি অনুভূত হয়নি। দেখা যাচ্ছে এই ধোঁওয়ে নির্মাণে যে সব ঘরবাড়ী ভাঙ্গা পড়েছে সেখানের অধিবাসীরা তার দাম পেয়ে শহর ছেড়ে বাইরে চ'লে গেছে বাসা বাঁধতে নতুন পরিপ্রেক্ষিতে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন্ন নবকলেবর তেরো কোটী ডলার ব্যয়ে নির্মিত হবে তাতে যদি কিছু জন আকর্ষণ হয়।
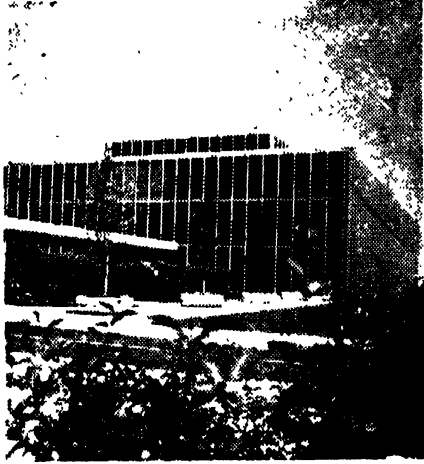
বাফেলোর রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশ

ইতিহাস :

এই বাফেলো ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে গ্রাম ব'লে পরিচিত ছিল। কিন্তু এই গ্রামেই ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বাষ্পীয় পোত 'Walk-on the water' নির্মিত হয়। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ইরিখাল' নির্মাণের পর এর উন্নতি কিছু ত্বরান্বিত হয়। ১২,০০০ জনসংখ্যা নিয়ে এটী নগরী ব'লে আখ্যাত হয় ১৮৩২ সালে। এই বাফেলো মহানগরীর মেয়র 'গ্রোভার ক্লীভল্যাণ্ড (Grover Cleveland) একদিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টের পদ অলংকৃত করেন। বাফেলোর উন্নতির মূলসূত্র হ'ল শিল্পের, বাণিজ্যের ও পরিবহনের উন্নতি। এখানে ১৪০০ শিল্প সংস্থা আছে, যেখানে দু' লক্ষ লোক শিল্প ও সংশ্লিষ্ট কাজে নিযুক্ত। এখানে বছরে পঞ্চাশ কোটী (৫০০,০০০,০০০) ডলার মূল্যের সামগ্রী উৎপাদিত হয়। বিশটী লৌহ উৎপাদন কারখানায় ৩০ লক্ষ টন পিগ আয়রণ' উৎপন্ন হয়। ময়দার তেল পেষার বৃহত্তম কারখানা এখানে গ'ড়ে উঠেছে। রবারজাত দ্রব্যের বৃহৎ কারখানা এখানে স্থাপিত হয়েছে।

এটী আবার রেলরাস্তারও সঙ্গমস্থল। এখানে এগারটী রেল লাইন, পাঁচটী যাত্রী ষ্টেশন ও চৌদ্দটী মাল ওঠানামার ষ্টেশন আছে। তিনশো (৩০০) যাত্রীবাহী গাড়ী দিনে ওখানে যাতায়াত করে ও দিনে তিন হাজার (৩০০০) মালগাড়ী খালাস-বোঝাই হয়। বর্তমানে এটী দ্বিতীয় বৃহত্তম রেলরাস্তার কেন্দ্রস্থল ব'লে আখ্যাত।*

* ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে এই Buffalo-তে যুক্তরাষ্ট্রের President 'মেকিনলেন' কে (Mac Kenly) আততায়ীর গুলির আঘাতে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। এদিক দিয়ে 'ডালাসে'র মত এর কুখ্যাতি রয়েছে। নায়েগ্রা স্কোয়ারে তাঁর স্মৃতিতে এক স্তম্ভ তোলা হয়েছে।

[ক্রমশঃ

বিচিত্র বিশ্ব

বিশ্ববন্ধু

অবিশ্বাস্য অন্তর্ধান

রাতের অন্ধকারে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটতে শুনেছি, কিন্তু একেবারে প্রকাশ্য দিবালোকে জনসমক্ষে একটা গোটা মানুষের হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি যেমনি রহস্যময় তেমনি অবিশ্বাস্য। ঘটনাটি ঘ.ট ১৮৮০ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর দিনের বেলায়। ইংলণ্ডের টেনেসির গ্যালাটিন থেকে কয়েক মাইল দূরে মিঃ ডেভিড ল্যাং নামে এক ভদ্রলোকের খামারবাড়ী। সুন্দর পরিপাটি করে লতাপাতায় সাজান বাড়ীটি। ছোট পরিবার, সুন্দরী স্ত্রী এবং সুন্দর ফুটফুটে দুটি ছেলেমেয়ে জর্জ এবং সারা। বাড়ীর সামনে বিরাট মাঠ। গৃহপালিত পশুদের সুন্দর চরবার জায়গা। মিং ল্যাংএর গাড়ী টানবার ঘোড়াটিও প্রতিদিনকার মত সেদিনও সেই মাঠে চরে ঘাস খাচ্ছে। ছেলেমেয়ে দুটি নতুন কেনা একটি খেলনা নিয়ে আপন মনে বাড়ীর সামনে খেলছে। এখুনি মিঃ ল্যাং স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের নিয়ে শহরের দিকে যাবেন কিছু জিনিষপত্র কেনাকাটা করতে। স্বামী স্ত্রী দুজনেই বাড়ীর ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন হাত ধরাধরি করে। বাড়ীর সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা ঘোড়ার গাড়ীটার সামনে এসে মিসেস্ ল্যাং দাঁড়িয়ে পড়লেন। মিঃ ল্যাং এগিয়ে গেলেন সামনের মাঠে, ঘোড়াটিকে নিয়ে আসবার জন্য—গাড়ীতে এখুনি যুততে হবে। এমন সময় পাশের গলি থেকে ঘোড়ার গাড়ী ছুটিয়ে এগিয়ে গেলেন বিচারপতি অগাষ্ট পেক ও তাঁর শ্যালক। মিসেস ল্যাং হাত নেড়ে অভিবাদন জানালেন। মাঠের উপর দিয়ে ফিরে আসতে আসতে মিঃ ল্যাংও মিঃ পেককে দেখতে পেয়ে হাত নাড়লেন। ঠিক এই রকম একটা চোখে চোখ রাখা অবস্থাতেই ঘটে গেল পৃথিবীর একটি আশ্চর্য্যতম ঘটনা। সবার চোখের সামনেই হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন মিঃ ল্যাং পৃথিবীর বুক থেকে চিরদিনের মত। আতঙ্কে বিস্ময়ে মিসেস ল্যাং চীৎকার করে উঠলেন। সবাই ছুটে গেলেন মাঠের উপর ঠিক যে স্থানটিতে মিঃ ল্যাংএর রক্তমাংসে গড়া দেহটা হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে সেই স্থানটিতে। শেষে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল মিঃ ল্যাংকে সারা মাঠ জুড়ে—যদিও কোথাও কোন মৃত্যুর কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু সব বৃথা। গ্রামবাসী, পুলিশ ও বৈজ্ঞানিকদের হার মানতে হল। এর ঠিক সাত মাস পর ছোট্ট একটি ঘটনার ভেতর দিয়ে এই আশ্চর্য্য অলৌকিক ঘটনাটির উপর যবনিকাপাত হয়। সেটা ১৮৮১ সালের এপ্রিল মাস। মিঃ ল্যাং-এর ছেলেমেয়ে জর্জ্জ ও সারা সেই মাঠেই একদিন খেলছিল। হঠাৎ নজরে পড়লো বাবাকে তারা শেষবারের মত যেখানে দেখেছিল, সে জায়গায় ঘাসগুলো মরে হলদে হয়ে গেছে বৃত্তাকারে। বৃত্তের ব্যাস প্রায় ১৫ ফুট হবে। বাবার কথা মনে পড়াতে ভীষণ মন খারাপ লাগতে লাগলো ছেলেমেয়ে দুটির। ১১ বছরের মেয়ে সারা কাঁদতে কাঁদতে বাবাকে ডাকতে লাগলো।......হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল ওদের কানে। চিনতে পারলো এ কণ্ঠস্বর তাদের বাবার। চতুর্দিকে তাকিয়ে বাবাকে দেখতে না পেয়ে দুই ভাইবোনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। চুপ করে শুনতে লাগলো বাবা ক্ষীণকণ্ঠে আর্তস্বরে সাহায্য চাইছে। ভাইবোনে কি করবে ভেবে পেল না। শুধু অঝোরে কাঁদতে লাগলো। শেষে এক সময় ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে মিঃ ডেভিড ল্যাং এর কণ্ঠস্বর তাঁর জলজ্যান্ত দেহের মত হাওয়ায় মিলিয়ে গেল চিরকালের মত। এরকম অবিশ্বাস্য অন্তর্ধানের মতন অঘটন জগতে সত্যই বিরল।

শিল্পীর শেষ

খ্যাতির প্রথম সারিতে যদি অষ্ট্রিয়ার সঙ্গীত শিল্পী

মোজার্টের নামটি থাকে তাহলে আশাকরি কারো কোন আপত্তি হওয়ার কারণ নেই। খ্যাতনামা এই সঙ্গীত রচয়িতার জন্মস্থান অষ্ট্রিয়ায় সালজবার্গে। ১৭৫৬ সালের ২৭শে জানুয়ারী তার জন্ম। অত্যন্ত শিশুকালেই তার প্রতিভার বিকাশ হয়। মাত্র ৭ বছর বয়সেই তিনি মাইনুয়েট এবং সোনাটা রচনা করলেন। প্রথম সিম্ফনী রচনা করলেন আট বছর বয়সে। অল্প বয়সে চতুর্দিকে মোজার্টের নাম ছড়িয়ে পড়লো। লণ্ডন এবং প্যারিতে তার রচিত ভায়োলীন সোনাটা এবং সিম্ফনী প্রকাশিত হল। তার বাজনার খ্যাতি ভিয়েনার সম্রাটের কানে গেল। তিনিও তাকে আমন্ত্রণ জানালেন অপেরা রচনা করার জন্য। এই সময় মোজার্টের সঙ্গে পরিচয় হল মেরিয়া থেরেসার। মোজার্টের বাজনায় তিনিও মুগ্ধ হলেন। কিন্তু এরপর যতই বয়স বাড়তে লাগলো, ততই মোজার্টের খ্যাতি কমতে লাগলো। প্রচণ্ড দুর্ভাগ্যও অভিশপ্ত জীবনের সম্মুখীন হলেন মোজার্ট। ২২ বছর বয়সের বিখ্যাত শিল্পী মোজার্ট আর কারুকে মুগ্ধ করতে পারেন না। এই সময় তাঁর মাও দেহ রাখলেন। কঠোর এবং নির্মম বাস্তব জীবনের সঙ্গে লড়াই শুরু হল মোজার্টের। কান্নায় বুক ভরে উঠলো, তবু তিনি ভেঙ্গে পড়লেন না। সামান্য মাইনের বিনিময়ে ভিয়েনার রাজদরবারে যোগ দিলেন হলের চেম্বার মিউজিশিয়ান হিসেবে। কিন্তু তাতেও অর্থাভাব ঘুচলো না। কারণ বাড়ীভাড়া মেটানোর পর পেটের ক্ষুধা মেটানোর আর পয়সা থাকতো না। স্বামী-স্ত্রী মাত্র দুটি পেট ভরাতে পারেন না মোজার্ট রোজগার করে। জীবন ধারণের জন্য প্রচণ্ড খাটতে আরম্ভ করলেন মোজার্ট। পিয়ানোর কনসার্ট রচনা করেন। নাচের বিভিন্ন গান লেখেন। কিন্তু দিনরাত্রি খেটে পেট ভরেনা। কে যেন আরো চরম দুঃখও অপমানের জীবনের দিকে এগিয়ে দিলেন মোজার্টকে। কোথাও কোন আশার আলো দেখতে পেলেন না। শেষে বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পীকে গুরু হয়ে ছাত্রদের কাছে অর্থ ধার করতে হল পেটের জন্য। অবশেষে এমন একটা চরমতম দারিদ্র্যের দিন এল মোজার্টের জীবনে যে ধার আর পাওয়া যায় না। কাজেই যে হাতে সঙ্গীত রচনা করতেন সেই হাত পেতে ছাত্রদের কাছে ভিক্ষা করতেন। রুটির রোজগারে স্বামী-স্ত্রী—দুজনের স্বাস্থ্যই ভেঙ্গে গেল। অর্থের অভাবে চিকিৎসা করাতে পারলেন না। এত অভাব দুঃখের মধ্যেও তিনি ১৭৯০ সালে সৃষ্টি করলেন তাঁর পৃথিবী বিখ্যাত রচনা—"ম্যাজিক ফ্লুট"। শেষে দারিদ্র্যেরই জয় হল। ১৭৯১ সালের এক বৃষ্টিঝরা দিনে সেন্ট ষ্টিফেন গির্জার প্রাঙ্গণে কয়েকজন শববাহক নীরবে বহন করে নিয়ে এল পৃথিবীর বিখ্যাত সঙ্গীত স্রষ্টার মৃতদেহ। ঘরে তখনও তাঁর সংজ্ঞাহীন স্ত্রী পড়ে রয়েছেন। কপর্দকশূন্য নিঃস্ব শিল্পী মোজার্টকে সমাহিত করা হল নিঃস্ব-ভিখিরীদের কবরখানায়। মোজার্ট তাঁর পৃথিবীবাসীদের জন্য রেখে গেছেন সুললিত সঙ্গীত সম্ভার, কিন্তু মানুষ তার বিনিময়ে তাঁকে কি দিয়েছে সেটা উচ্চারণ করতে লজ্জায় মাথা কাটা যাবে সবার।

ছলা কলা প্রিয় নারী

নারী যখন ছলাকলার আশ্রয় দেয়, তার ফল যে কত সুদূরপ্রসারী এবং মারাত্মক হয়, তার এক বৃত্তান্ত পাওয়া যায় রোমের পুরনো ইতিহাস ঘাঁটিঘাঁটি করে। লিডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক ফরাসী ভাষায় ১৭৩৬ সালে এক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর বর্ণনা থেকে পাওয়া যায় মহামান্য পোপের সিংহাসন কি ভাবে কলঙ্কিত করেছিল এক নারী। যদিও এর সত্য-মিথ্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিতব্যক্তির বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। তবে ঘটনাটি এই রকম। একটি কিশোরী মেয়ে নাম তার জোয়ান। জোয়ান অল্পবয়সেই এক সুন্দর স্বাস্থ্যবান যুবক সন্ন্যাসীর প্রেমে পড়ে। কিন্তু সন্ন্যাসী যুবক মঠবাসী, কাজেই তাকে সব সময় কাছে পাওয়ার আশা জোয়ানের কাছে এক দুরাশার মত। তখন জোয়ান এক মতলব ভাঁজে—কেমন করে সেই যুবক সন্ন্যাসীর সঙ্গ পাওয়া যায়। তাই গোপনে সুরু হয় তার পুরুষ সন্ন্যাসী সাজার সাধনা। নারীত্বের লক্ষণগুলিকে শক্তকাপড়ের আচ্ছাদনে ঢেকে, বেশবাসে নিঃখুত ভাবে সেজে পুরুষের চলাফেরা আচার ব্যবহার নকল করে একদিন সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে ঢুকে পড়ে মঠে। ঠিকমত অভিনয় করাতে কেউ তাকে সন্দেহ করেনি। কিছুদিনের মধ্যেই সে মঠে থাকবার অধিকার পায়। পড়াশুনা এইসঙ্গে সমান ভাবে চলে। কিছুদিন মধ্যেই তাকে লেখাপড়ায়

বিশেষ উন্নতি করতে দেখা গেল। এমন কি কিছুদিনের জন্যে তাকে রোমের কোন এক কলেজে গ্রীক ভাষার অধ্যাপক হয়ে কাজ করতে দেখা গেল। এর পর ক্রমশঃ তার ধাপে ধাপে উন্নতি ঘটতে লাগলো, প্রথমে পেল কার্ডিনালের পদ। পরে চতুর্থ লিও দেহ রাখলে, ৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তাকে মহামান্য পোপের পদে বরণ করা হয়। জোয়ান পোপ তখন অষ্টম জন নামে পরিচিত হয় জন সমাজে। বিরাট সম্মান—একেবারে রাজকীয় ক্ষমতার অধিকারিণী তখন জোয়ান। নিঃখুত ছলাকলা, বেশবাস আর অভিনয়ে কোথাও জোয়ানকে সন্দেহ করবার কোন অবকাশ রইল না কারুর। মহামান্য পোপকে সন্দেহ করবার মত পাপ চিন্তা কারুর মনেই তখন স্থান পায়নি। সেই যুগে পোপেরা ছিলেন ধর্ম্ম, রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে এক বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। বিশপ, অ্যাবট, যাজক ও জনসাধারণ আসেন মহামান্য পোপের কৃপাভিক্ষার জন্য। এমনকি দেশবিদেশের রাষ্ট্রদূতরাও আসতেন নানান পরামর্শের জন্য। মহামান্য পোপ প্রথানুসারে পা বাড়িয়ে দেন তাদের দিকে—পদচুম্বন করে তারা ধন্য হবেন। তবুও কেউ সন্দেহ করেন নি জোয়ানকে নারী বলে। কিন্তু এর পরেই ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়লো। সবাইকে ফাঁকি দিতে পারলেও নিজের যৌবনকে ফাঁকি দিতে পারলোনা জোয়ান। সে তার পাওনা—কড়ায়গণ্ডায় বুঝে নিল। জোয়ানের সর্ব্বাঙ্গে জ্বলতে লাগলো বাসনা কামনার আগুন। সে আগুনে পুড়লো এক প্রেমিক-পতঙ্গ। নিভৃত প্রাসাদের নির্জন কক্ষে চললো নব প্রেমিকের প্রেমাভিসার। সুসজ্জিত কক্ষ হল প্রেমকুঞ্জ! বিজনে কুজনে চললো জোয়ানের পাপাচার।

কিছুদিন পর রোমে সুরু হল লিটানি উৎসব। সারা রোমবাসী উৎসবে মেতে উঠলো। আনন্দে অধীর সবাই। শুধু মহামান্য পোপকেই যেন কিছুটা নিরানন্দ মনে হল। রাস্তায় মিছিল বেরিয়েছে। মহামান্য পোপ সুসজ্জিত ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন। গায়ে বিচিত্র এবং মূল্যবান পোষাক, মাথার শোভা বর্ধন করেছে ত্রি-মুকুট। বিরাট শোভাযাত্রা চলেছে আনন্দধারার মত সেণ্ট জন গির্জার দিকে। চতুর্দিকের এই আনন্দ-উদ্দীপনার মধ্যে মহামান্য পোপের শরীর বার বার কেঁপে উঠতে লাগলো। শরীরের ভেতরে দারুণ অস্বস্তি। দেহের ভেতরে লুকিয়ে থাকা একটা জীবন্ত মাংসপিণ্ড যেন বাইরে আসার উন্মাদনা সৃষ্টি করেছে। তাইতো! এই জনাকীর্ণ পথের মাঝে কেমন করে এই নবাগতের আসন পাতা যায়! চিন্তায়, ভাবনায় সুতীব্র বেদনায় সারা শরীরটা বার বার কুঁকড়ে উঠতে লাগলো মহামান্য পোপের। শেষে সেই পথের ধারেই মহামান্য পোপের ছদ্মবেশ খসে পড়লো। ধরা পড়লো পোপ পুরুষ নন - রমণী। এক মৃত সন্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মাতাও বিদায় নিলেন চিরদিনের মত ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে। হতবাক, বিস্মিত রোমবাসীরা ধিক্কার দিতে লাগলো চতুর্দিক থেকে। উপস্থিত কার্ডিনেল, বিশপ, অ্যাবট, মঠবাসীরা লজ্জায়, ঘৃণায়, রাগে গর্জে উঠলেন। সেই পথের পাশের অতি অনাদরে সমাধি দেওয়া হল মাতা ও পুত্রের। এই ভাবেই জোয়ানের জীবননাট্যের পরিসমাপ্তি ঘটলো। তাই ভাবছিলাম ছলা কলা প্রিয় নারীর মন বোঝা নর নামক জাতির চতুর্দ্দশ পুরুষের পক্ষে অসাধ্য!

পৃথিবীর মৃত্যুদিন

খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকরা অনেক হিসাব-নিকাশ করার পর পৃথিবীবাসীকে জানিয়েছেন যে তারা যেন তৈরি হন কারণ পৃথিবীর মৃত্যুদিনটী ক্রমশঃই ঘনিয়ে আসছে—মাত্র পাঁচ হাজার সৌর বৎসর পরের কোন সকালে দেখা যাবে আমাদের সূর্য্যিমামা হঠাৎ বিস্ফোরণে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। তাতে কি রকম আওয়াজ হবে, তাতেকি কি রং খেলবে—আকাশের কতটা সীমানা অবধি টুকরোগুলি ছড়িয়ে পড়বে—এসব তথ্য কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা কিছু জানান নি! তবে ঠিক বোমা ফাটবার কিছুদিন আগেই এসব টের পাওয়া যাবে। অবিশ্যি ত ন পর্য্যন্ত যদি পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব আদৌ থাকে। কারণ ঠিক বিস্ফোরণের পূর্বে বর্ত্তমানের তুলনায় সূর্য্যিমামা আকারে বেড়ে ৪০০ গুণ বড় হবে, কাজেই সেই সময় পৃথিবীতে তাপমাত্রার অঙ্ক কোথায় উঠবে সেই হিসেব কষতে গেলে ব্রহ্মতালু এখুনি গরম হয়ে যাবে।...কাজেই সেই সময়ে কেউ যদি পৃথিবীর সঙ্গে সহমরণে যেতে না চান তো আগে থেকেই মহাকাশের শেষ গ্রহ প্লুটোকে ছাড়িয়ে অন্য কোন

সৌর গ্রহের কোন গৃহ অভ্যন্তরের ঠিকানা খুঁজে দরখাস্ত করে রাখুন। যাতে বিস্ফোরণের কিছুকাল আগেই রকেটে করে সেই পথে পাড়ি জমাতে পারেন।

পৃথিবীর সব চাইতে লম্বা ইদুর

ইতালীর এক খবরে প্রকাশ যে সেখানকার কোন এক শহরে একটি তিনফুট লম্বা ইদুরকে পথের লোকজনকে তাড়া করতে দেখা যায়। অতবড় ইদুর এর আগে কেউ কোনদিন দেখেনি। বিরাট মাথাওয়ালা ঐ জানোয়ার দেখে ভয়ে ত্রাসে পথের লোকজন চতুর্দিকে দিশাহীনভাবে দৌড়তে থাকে; শেষে পুলিস এসে রিভলবার দিয়ে ঠিক মাথায় গুলি করে তাকে হত্যা করে পথের শান্তি ফিরিয়ে আনে। ইদুরের দেহটি ফেরারা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যানাটমি বিভাগকে দেওয়া হয়েছে।

গণেশ বাহনের বাহনটির চেহারাই যদি তিন ফুট লম্বা হয়—তাহলে স্বয়ং সিদ্ধিদাতা গণেশজীর চেহারা কতবড় হবে ভাবতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি।

বার্দ্ধক্যের লীলা

শ্রীসুধীর গুপ্ত

১

যৌবনের রূপ-রস
এতকাল পান ক'রে ক'রে,
এবার কি শ্রান্তি-সুখে
জরা-শুভ্র-সাজে সখি, মোরে
সাজায়ে সযত্নে শেষে
চাও নব-লীলা করিবারে!
তব দন্ত বৃদ্ধ বেশে
বক্ষে ল'বে আহ্লাদে আমারে
অপরাহ্ণ-সূর্য্য-ম্লান
ছায়াচ্ছন্ন এ মর্ত্ত্য-সংসারে।

২

বার্দ্ধক্যের লীলা-রূপ
পরিপক্ব—অনুগ্র—সুন্দর;
নম্র, পূর্ণ ধীরতায়
শান্ত শুদ্ধ হয় যে অন্তর।
শুভ্র কেশে—লোল চর্ম্মে
সাজালে যে, এ-ও লীলা বুঝি!
প্রণয় থাকে—না থাকে
দেখিতে কি চাও তা-ও খুঁজি'?

৩

তব শিল্পী কালে দিয়া
বদল যে কর অনিবার;
দেহ-গেহ ভেঙে চুরে
নব সৃষ্টি করে রূপকার
গাঢ়—গূঢ় প্রেরণায়
তোমারে কি তুষিতে নিয়ত?
অভীপ্সার অন্ত নাই,—
আয়ু বাড়ে—রসও বাড়ে তত।

৪

প্রেমের পরীক্ষা ভালো;
বৈচিত্র্যেরও তাই প্রয়োজন।
অভিরুচি মত তাই
চুপে চুপে যোগাও ইন্ধন!
জানো বুঝি ঘনীভূত
প্রগাঢ়তা প্রাচীনত্বে আসে?
অবশেষে সখি, তাই
মাতিলে কি বার্দ্ধক্য-বিলাসে?

৫

লীলার দোসর তুমি,
তুমি মোর চির-লীলাময়ী;
তব সাধ পূর্ণ করি'
এ নির্ভীকও প্রেমে হয় জয়ী।
যা' করার তা-ই করো,
তব কার্য্যে মোরও থাকে সায়;
বৃদ্ধ হই—জীর্ণ হই
তবু প্রেম আমারে মাতায়।

৬

কী খেলায় মাতিলাম!
সে মাতনে সর্ব্বদাই জয়।
মোর শুধু লক্ষ্য এক,—
তৃপ্তি পাক্ তোমার হৃদয়।
বাকি নাই বেশী দিন
মৃত্যু-লগ্নে ঘুচিবে সংশয়;
তখনও দেখিবে প্রিয়া
চিরন্তনী, আমি তোমাময়।
অফুরন্ত প্রীতি-লীলা
এর কভু সমাপ্তি কি হয়?

অসংসারী [উপন্যাস] শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* * * * * * *

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ষোল

পুরা পাঁচদিন অপেক্ষা করার পর ভুবনেশ্বরী তাঁর কাশীর বাড়ীতে বসে একখানি পোষ্টকার্ড পেলেন। পিসিমার লিখিত পত্রের উত্তরে সদাশিবের স্ত্রী গৌরী দেবী লিখেছে, পিসিমা, আমি ও সব ব্যাপারের কিছুই জানি না, জানতেও চাই না, আপনি দয়া করে সমীরবাবুর কোন ব্যাপারে আমায় আর জড়াবেন না। যা জানতুম আপনাকে লিখেছিলুম, যা হওয়ার তা হয়েছে এ বিষয়ে আমার স্বামীকেও কিছু বলি নি, আশা করি আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার প্রণাম জানবেন। ইতি

—গৌরী

ভুবনেশ্বরী দেবীর গুরুভাই চিঠিখানা পড়ে গুরুভগ্নীকে শুনিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বল্লেন, কেমন হোল ত, বলেছিলুম অত বাড়াবাড়ি ভালো নয়। বয়সওয়ালা রোজগারী ভাইপো, এতকাল ধরে এত কষ্ট পাওয়ার পর এখন যা হ'ক ভগবানের কৃপায় মতিগতি ভালো হয়ে উপায়পত্র করছিল, পিসিমা বলে যত্ন করে প্রতি মাসে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকাও পাঠাচ্ছিল, এখন হোল ত! এখন বোঝো ঠেলা।

ভুবনেশ্বরীর চোখে জল এসে গিয়েছিল। বল্লো দাদা, আমি ত আপনাদের প্রত্যেককেই সেই রাত্রে বলেছিলুম যে রাত্তিরটা না হয় থাক, পরের দিন সকালে যা হয় হবে, তা আপনারা সকলেই—

বেতো রুগী মহিলাটি সমস্ত শুনে বল্লে, তোমার মা সব তাতেই বাড়াবাড়ি। দেখ্‌ছো যখন মন পড়েছে, তখন কি আর তাড়াহুড়ো করলেই চলে! একটু রয়ে সয়ে—

রুপোর চশমাপরা বৃদ্ধারও ঐ এক কথা। মালা জপ করা বুড়ো বল্লে, তোমরা ঘরের কথায় পাঁচজনকে নিয়ে এমন করে জড়াও কেন? এখন টাকা বন্ধ করলে কি হবে তোমার?

কি যে হবে তা পিসিমার খুবই জানা আছে। নিজে নিঃসন্তান, বিধবা হয়েছেন প্রায় দশবৎসর পূর্ব্বে। পিসিমার শ্বশুরের ভিটা ছিল কলকাতায়, সেই বাড়ীতেই পিসিমার যাবজ্জীবন থাকবার অধিকারে ছিল। পিসিমা সেই অধিকারটুকু তাঁর দেওরপোকে লেখাপড়া করে দিয়েছিলেন এই সর্ত্তে যে, দেওরপো তাঁকে এককালীন দেবে একশ' টাকা, আর তিনি যতদিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন তাঁকে কাশীর ঠিকানায় মনিঅর্ডার করে প্রতিমাসে পাঠাবে আঠারো টাকা হিসেবে তাঁরা সেই ঘরের ভাড়াস্বরূপ মাসোহারা। ঐ মাসিক আঠারো টাকার ওপোর নির্ভর করেই পিসিমা কাশীবাস করছিলেন। প্রথম প্রথম দিন তাঁর মন্দ কাটেনি, কিন্তু জিনিষপত্তরের দাম চড়ার পর নিতান্ত দুঃখেই তাঁর দিন কাট্‌তো। এ বাড়ীর নীচে যে ঘরে এখন ঐ বেতো বুড়ী থাকে সেই ঘরেই পিসিমা থাকতেন মাসিক চার টাকা ভাড়া দিয়ে, বাকী চোদ্দ টাকায় যুদ্ধের বাজারে কোনরকমে চল্‌তো, মধ্যে মধ্যে আট আনা এক টাকা ধারও হোত। চাকরী পাওয়ার পর এই মাত্র ক'মাস আগে সমীর এখানে এসে এই বাড়ীর দোতলার ভালো ঘরে পিসিমাকে বসিয়েছে। বর্ত্তমান এই ঘরের ভাড়া মাসিক ষোল টাকা। সমীর অন্য এক বাড়ীতে এর চেয়েও ভালো ইলেকট্রিক দেওয়া একটা ঘর ঠিক করেছিল মাসিক বাইশ টাকা ভাড়ায়, কিন্তু পিসিমা রাজী হন নি, এ-বাড়ীর পরিচিত বন্ধুদের ছেড়ে অন্যত্র উঠে যেতে। এ-

বাড়ীর সকলেই দীর্ঘদিনের ভাড়াটিয়া, কেবল পিসিমা নীচে থেকে ওপরে যাওয়ার দু'দিন পরেই ঐ বেতো বুড়ী পিসিমার নীচের পরিত্যক্ত ঘরখানি ভাড়া করে; তবে বাড়ীওয়ালা নানা অজুহাতে ঐ ঘরের ভাড়া বাড়িয়ে করে দিয়েছেন সাত টাকা। বর্তমানে পিসিমার আয় হয়েছিল মাসিক আঠারো টাকা আর পঞ্চাশ টাকা, মোট আটষট্টি টাকা। অত টাকা এ বাড়ীর কোন বুড়ীই পায় না। এমন কি পিসিমার বিপত্নীক গুরুভাই পর্যন্ত মাসিক বাষট্টি টাকা সাত আনা মাত্র পেন্সন পান, তাতে তাঁরা দুটি প্রাণী, অর্থাৎ তিনি নিজে ও তাঁর একটি সেবাদাসী। সে অনেক ইতিহাস, গুরুভাইয়ের কাছেই শোনা যায় যে, তার ছেলে মেয়ে জামাই সমস্তই আছে, কিন্তু তারা সব এমনই বদ্ যে বৃদ্ধকে কেউই দেখে না, অতএব—

ইংরাজি মাস কাবার হওয়ার পর প্রায় এক সপ্তাহ কেটে গেল, কিন্তু তবুও সমীরের কাছ থেকে কোন চিঠি বা মণি অর্ডার না পেয়ে পিসিমা বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। চিঠি অবশ্য সমীর এর আগেও বড় একটা লিখতো না, তবে টাকা সে পাঠাতো মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই কিন্তু এবারে এল না। তাই নানা দিক চিন্তা করে তিনি অগত্যা গৌরীকেই লিখলেন এক চিঠি, এখনকার সমস্ত ঘটনা জানিয়ে, এমন কি রেণুকে নিয়ে সমীরের চলে যাওয়া পর্য্যন্ত। লেখক ছিলেন গুরুভাই, একটি স্ত্রীলোকের কাছে চিঠি যাচ্ছে, অতএব তিনি ভাষাটা যতদূর সম্ভব সংযত করার চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু হয়ত ঠিকমত পারেন নি। গৌরী সেই চিঠি পেয়েছিল তার পরের দিন দুপুরে, স্বামীর অনুপস্থিতি কালে। প্রথম পাঠে সে আকাশ থেকে পড়েছিল, কারণ সমীরের শেষদিনের বলা গল্পটা গৌরী প্রায় সবটাই বিশ্বাস করেছিল, সদাশিবকেও সে আনুপূর্ব্বিক সমস্তটাই বলেছিল। পুলিশের এবং বিশেষ করে সমীরের উপর কমিউনিষ্ট সন্দেহের কথা শুনে সদাশিব মনে মনে রীতিমত ভয়ই পেয়ে গিয়েছিল। সমীরের জন্য তার দুঃখও হয়েছিল খুব। সমীরকে সে ভালোও বাসতো, কিন্তু অফিসে বা অন্য কোথাও সে ঘুণাক্ষরেও আর সমীরের নাম উচ্চারণ করে নি, এমন কি সমীর অফিসে যায় কি না, সে সংবাদটুকু নেওয়ার কথা পর্য্যন্ত সে ভাবেনি। কি জানি, যদি কেউ বলে, সদাশিবের বন্ধু সমীর কমিউনিষ্ট হয়ে গেছে, আবার সেই সমীর সদাশিবের বাড়ীতে থাকতো, অতএব—কৃপণ সদাশিব মনে মনে দিল্লী কালীবাড়ীতে পাঁচসিকের ভোগ পর্য্যন্ত মানসিক করে ফেলেছে। দোহাই মা, যেন কোনরকম বিপদে না পড়ি। কংগ্রেস সরকারের চাকরী করে খাই, বুড়ো বয়সে যদি চাকরী যায়! মোটের ওপোর সবশুদ্ধ জড়িয়ে গৌরীর এতদিনে স্থির বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, সমীর কমিউনিষ্ট হয়ে পুনরায় নিরুদ্দেশ হয়েছে এবং পিসিমার কাছে কাশীর ঠিকানায় চিঠি লেখার জন্য গৌরী রীতিমত অনুতপ্তও হয়েছিল। কিন্তু এতদিন পরে ভুবনেশ্বরীর চিঠি পেয়ে গৌরীর প্রথম হোল রাগ, তারপর ঘৃণা, তারপর সে একেবারেই কেঁদে ফেলেছিল। চিঠিখানা দু' তিনবার আদ্যোপান্ত পাঠ করে বিকাল নাগাত সে স্থির করেছিল যে সদাশিবকে এ সম্বন্ধে কিছুই বলা হবেনা, কারণ প্রথমতঃ এই চিঠি দেখালেই স্বামী টের পাবেন যে গৌরী প্রথমে এক চিঠি লিখেছিল, দ্বিতীয়তঃ কৃপণ স্বভাবের স্বামী সমীরের সকল অপরাধ মার্জনা করে তাকে আবার টাকার লোভে এ বাড়ীতে আনার চেষ্টাও করতে পারে। অবশ্য সমীর যদি একা থাকে আগের মতো, তাহলে মন্দ হয় না, কিন্তু নাঃ! যে গৌরীকে এমন নির্মমভাবে বর্জন করে, বঞ্চনা করে শুধু একটা কানী ঝিয়ের জন্য। গৌরীর আপাদমস্তক জ্বলে গেল। সমীরের ছায়া পর্য্যন্ত সে আর মাড়াবে না, তার কথা পর্য্যন্ত সে আর চিন্তা করবে না। কিন্তু পরের দিন দুপুরে গৌরী আবার পিসিমার চিঠিখানাবার করে পড়তে বসলো। দু পাতার চিঠি, পড়তে পড়তে বিকেল হয়ে গেল। এমনি ভাবে আরও একদিন কেটে গেল। শেষে মনে হোল যদি পিসিমা আবার কোন চিঠি লেখেন এবং সেই চিঠি যদি ডাকপিওন সদাশিবের হাতেই দিয়ে যায়, তাহলে—সেই দিনেই গৌরী আর একবার নীরোদবাবুর পুত্রবধূকে দিয়ে ওদের চাকরের মারফৎ একখানা পোষ্টকার্ড আনিয়ে পিসিমাকে জবাব দিয়ে দিলে। পিসিমা সেই চিঠি পেয়ে গুরুভাইকে দিয়ে চিঠিখানা পড়িয়ে প্রমাদ গনলেন। পিসিমার যে সব বন্ধুরা সমীরকে তাড়াবার জন্য অগ্রণী হয়ে তাকে উস্কানী দিয়েছে,

তারা ক্রমশঃ সকলেই পিসিমার বোকামীতে তাঁকেই ধিক্কার দিতে লাগ্‌লেন, আর পিসিমা তাঁর সাম্‌নে দেখ্‌লেন প্রকাণ্ড এক অন্ধকার। দিনকাল খারাপ, জিনিষপত্তরের দর অসম্ভব। চার টাকায় আর কোন ঘর মিলবে না, মাসিক আঠারো টাকা সম্বল নিয়ে কোনো মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব বলে কেবলই পিসিমার মনে হতে লাগলো। পিসিমা বার বার নিজেকে ধিক্কার দিয়েছিল। কেন ভাইপোর সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করেছিল। সেই ভাইপো, যার পুলিশ কেসে পিসিমার নিজের শেষ গয়নাখানিও বিক্রী করতে হয়েছিল। নিজের মনে ঠাকুরের সামনে বসে পিসিমা আপনমনেই হু হু করে কেঁদেছিলেন। দেওরপো সামান্য মাইনের চাকরী করে, অনেকগুলি কাচ্চাবাচ্চা, তার ওপোর তার শাশুড়ীও আবার তার ঘাড়ে এসে পড়েছে, শাশুড়ীর জন্যই সে পিসিমার অংশটা লীজ নিয়েছিল। দেওরপোর কথার মূল্য আছে। পিসিমা বিধবা হয়েছেন দশ বৎসর, কাশীবাস করছেন আজআট বৎসর। এই দীর্ঘ আটবৎসরকাল ভুবনেশ্বরী ঠিক নিয়মিতভাবেই আঠারো টাকা মনিঅর্ডার পাচ্ছেন। দুঃখকষ্টে যা করে হোক তার চলছিল, কিন্তু মাঝে থেকে ক'মাসের জন্য সমীর এসে হঠাৎ খরচা বাড়িয়ে দিয়ে কি যে এক কাণ্ড করলো! অবশ্য এই কমাসে পিসিমা প্রায় একশ-টাকার ওপোর জমিয়েও ফেলেছেন। তার ওপোর গুরু-ভাই গেল মাসে কান্নাকাটি করে বারো টাকা ধার নিয়েছে, দেবে কিনা জানি না। কিন্তু সমীর যদি আর কোন পাত্তাই না দেয়! পঞ্চাশ না হয় পঁচিশ দিক কিন্তু যে রাক্ষুসীর পাল্লায় সে পড়েছে!

মালা জপকরা বুড়ী তার হাতে ঝোলা মালা নিয়ে এ-ঘরে এসে দরজা ঠেলে বল্লে, এত বেলা হোল ভুবনদি আজ এখনও রান্না চড়ালে না যে!

চোখমুখ মুছে পূজোর আসনে বসেই ভুবনেশ্বরী বললেন না ভাই মতির মা, আজ আমার শরীর তেমন ভালো নয়, যাহয় কিছু শুকশাক্‌না খেয়ে নেব।

মতির মা দরজার পাশে চেপে বসে বললে, ভাইপোর কোন খবর-টবর পেলে?

না ভাই, যে রাক্ষসীর পাল্লায় সে পড়েছে, তার কি আর পিসিমা বলে মনে আছে। কি করবো বল ভাই আমার বরাৎ। একটু থেমে বললে, ঐ সমীরকে তিন বছরেরটি রেখে ওর মা গেল মরে, ওর বাপ এসে আমার কাছে দিয়ে বললে দিদি, তুমি যদি এটাকে না দেখ, তাহলে ত আর এ বাঁচে না। কর্ত্তাটি ছিলেন মাটীর মানুষ, তিনি বললেন, মনে করো, ও তোমারই ছেলে, ওকেই তুমি নিজের করে নাও। আর ছেলেটাও তাই এমন ন্যাওটা হোল যে, উঠ্‌তে বস্‌তে নাইতে খেতে দিত না আমাকে। তারপর আমার ভাই গেল মারা। মানে ওর বাবা ছিল ঠিক আমার চেয়ে দুবছরের ছোট, আমরা ছিলুম পিঠাপিঠি ভাইবোন। আমাদের চা বাগানে সে কাজ করতো, সেবার সব কুলী ক্ষেপে গিয়ে ইত্যাদি।

মতির মা অন্যমনস্ক হয়েই গল্পগুলো শুন্‌তে লাগলো। সে আর ভুবনেশ্বরী এ বাড়ীতে দীর্ঘকাল একসঙ্গে বাস করছে, এ সব গল্প এর আগেও সে বহুবার শুনেছে কিন্তু তবুও সে মাঝে মাঝে সায় দিয়ে সেই পুরাতন বহুশ্রুত কাহিনীটি আর একবার শুনে শেষে ঝোলা সমেত হাতটা মাথায় ঠেকিয়ে বললে, তা ভাই ভুবনদি, তুমি কি একে-বারেই ভাইপোকে ছেড়ে দেবে, একবার শেষ চেষ্টা করেও দেখবে না?

কি করে দেখি বল? আমার আর কে আছে যে, এ সম্বন্ধ সন্ধান নেবে। ওর বন্ধুর বউ, যে সেই চিঠিটা লিখেছিল, তার চিঠির উত্তর ত শুনলে। আর বাস্তবিকই ত, পরের জন্য কে আর কি করে? বিশেষ করে এই সব নোংরা ব্যাপার—

প্রতিবারে কথা বলার পূর্ব্বে ঝোলা সমেত হাতটা মাথায় ঠেকানো বোধ হয় মতির মার মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে গেছে। হয়তো অপরের কথা শোনার সময় সে ঝোলার ভেতর সঙ্গোপনেই মালা জপ করতে থাকে, এবং উত্তর দেওয়ার পালা এলে মালা জপ সাময়িকভাবে সে মুলতুবী রাখে এবং তারই পরিচয় হোল এই কপালে হাত ঠেকানো। যাই হোক ঝোলা সমেত হাতখানা কপালে ঠেকিয়ে মতির মা বললে, আমার কদিন ধরেই মনে হচ্ছে, তুমি কেন একবার চল না দিল্লীতে, মানে আজ শুনলুম, আমাদের বাবাজী মশাই আসছে সোমবার বিন্দাবন যাবেন। ওঁর ত সেখানে মস্ত আখড়া আছে কি না। তা উনি বলছিলেন, উনি কয়েক জনকে নিয়ে যেতে পারেন।

তা আমাকেও ওরা সব বললে, একবার বিন্দাবন যেতে। তাই আমি বল্‌ছিলুম কি যে, তুমিও যদি যাও, তাহলে একসঙ্গে বিন্দাবন সেরে ওখান থেকে দিল্লীতে আমার জামাইয়ের বাড়ীতে গিয়ে উঠে দুদিন থেকে তোমার ভাই-পোর সন্ধান করে নিতে পারো। আর সেই সঙ্গে আমারও একটা কাজ হয়ে যায়। মানে আমার ছোট নাতিটার অন্নপ্রাশন এই মাসেই হবে বলে মেয়ে চিঠি লিখেছে, সেটাও দেখে আসতে পারি। আহা, তিন মেয়ের পর টুনির এই প্রথম ছেলে, বড় দেখতে ইচ্ছে করে ভুবনদি।

ভুবনেশ্বরী বললেন, তা ত করবেই মতির মা, তা ত করবেই, নাড়ীর টান যে। কিন্তু আমি বল্‌ছিলুম কি, তুমি কেন ওর ঠিকানা-পত্তর নিয়ে গিয়ে তোমার জামাইকে বলে দেখবে, যদি ঐ ছোঁড়াটার কোনো সন্ধান করতে পারো। নইলে যেতে গেলেই ত আবার খরচ পত্তর আছে, আর টাকারই এখন টানাটানি। ও যদি টাকাটা বন্ধই করে দেয়, তাহলে দেখছি লোকের বাড়ী রান্না করে খেতে হবে।

ছিঃ ভাই ভুবনদি, ওরকম করে কি বলতে আছে, ওতে যে ওদের অকল্যাণ হবে। বেঁচে থাক তোমার ভাই-পো, বেঁচেথাক তোমার দেওরপো, লোকের বাড়ী রাঁধুনী খাট্‌তে যাবে কেন? তবে দেখ, একটা চোখের নেশা পড়েছে, আর তোমারও আছে গ্রহের ফের তাই এই কষ্টটা পেতে হচ্ছে। একটু থেমে মতির মা বললে, আমার ত ভাই মনে হয়-যে, তুমি যদি গিয়ে তার সামনে পড়তে পারো, তাহলে সে তোমায় ফেল্‌তে পারবে না।

ভুবনেশ্বরী একটু থেমে বললে, তোমার জামাইকে দিয়ে খবরটা নিয়ে তারপর গেলেই ভালো হোত না? যদি সে, মনে কর, দিল্লীতে না থাকে।

হ্যাঁঃ, তাও কি আবার হয় নাকি? চাকরী চলে যাবে, এমন উন্মাদ সে হবে না।

না ভাই, তাকে আমি বরাবর ধরেই ত দেখে আসছি। সারা জীবনটাই সে এমনি করে বেড়ায়, কখনও হয় নিরুদ্দেশ, কখনও থাকে জেলে। ছোঁড়াকে নিয়ে আমি সারা জীবন জ্বলে পুড়ে মরছি। ওরই জন্যে ত আজ আমার দুর্গতি, না হলে আমার গায়েও ত যাহ'ক দুখানা সোনারূপো ছিল। সেগুলো আজ থাকলেও—

মতির মা বুদ্ধি করে বল্লে, দেখ ভুবনদি, এক কাজ কর। তুমি চল আমার সঙ্গে; গিয়ে তোমার ভাইপোর খোঁজ করে তাকে বার করে আমার জামাইয়ের সঙ্গে আলাপ সালাপ করিয়ে দাও। আমার জামাইরা হচ্ছে বাড়ুজ্জে, ওর খুড়তুতো জাঠতুতো অনেকগুলো বোন আছে। যদি সুবিধে হয় তাহলে কথাবার্ত্তা কয়ে আস্‌ছে অগ্রহায়ণ মাসে একটা লাগিয়ে দিতে পারলে--

এমন বরাত কি আর আমি করেছি মতির মা, ভুবনেশ্বরী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লেন। তার চেয়ে বরং আমার এইটুকু উপকার কর ভাই, তোমার জামাইকে দিয়ে ওর খোঁজটা করাও, তারপর না হয় দরকার বুঝলে আমি যাবো, নইলে এতগুলো টাকা শুধু শুধু—

এবার যেন মতির মা অসন্তুষ্ট হয়ে পড়লেন। বল্লে সে ভাই মুস্কিল হবে; জামাই পরের ছেলে, তাকে দিয়ে কি এত সব কাজ করানো যায়? আর তাছাড়া তুমি না গেলে আমি একা একাই বা বিন্দাবন থেকে দিল্লী যাবো কি করে? আর তারপর যখন তোমার দরকার হবে দিল্লী যাওয়ার, তখন তুমিই বা কার সঙ্গে যাবে? এখন হলে বাবাজী মশাইয়ের সঙ্গে যাবো, আবার তাঁর সঙ্গেই ফিরে আসবো, কতো সুবিধে। তার ওপোর দিল্লীর মতো জায়গায় থাওয়া থাকারও কোন অসুবিধে হবে না তোমার। ওখানে শুনেছি কে না কি বিল্লারা খুব বড় একটা লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির করেছে, তাও দেখবে, আর যদি সুবিধে হয় তাহলে কুরুক্ষেত্র তীর্থটাও দেখে আসতে পারবে।

আমার আর তীর্থ! যে তীর্থে পড়েছি,—ভুবনেশ্বরী সখেদে যেন আপনমনেই কথাগুলো উচ্চারণ করলেন।

প্রায় হতাশ হয়ে মতির মা উঠে দাঁড়ালো। বললে, দেখ ভাই ভেবে, আমার যা বুদ্ধিতে হয়, তা ত তোমাকে বললুম, এখন তোমার যা মনে হয় কর। মতির মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিকেলে মতির মা এসে পুনরায় ডাক্‌লে, ভুবনদি।

ভুবনেশ্বরী ঘরে বসে পুরাতন ন্যাকড়া দিয়ে সলতে পাকাচ্ছিলেন। শোবার ঘরে তিনি এখনও প্রদীপ জ্বালেন, কেরোসিনের আলো তাঁর সহ্য হয় না। সেই অবস্থায় বসেই সাড়া দিলেন, বললেন, এসো।

মতির মা ঘরে ঢুকে বললে, কেমন আছ আজ, সকালে যে শরীর খারাপ বললে, কেমন আছ ?

আছি অমনি এক রকম। মতির মার দিকে চেয়ে তার গায়ে চাদর দেখে ভুবনেশ্বরী বললেন, চল্‌লে কোথায় ?

মতির মা বললে, তুমিও চল না ভাই, ঘরে বসে কি করবে ? তার চেয়ে বরং বাবাজী মশাইয়ের কীর্ত্তন শুনবে চল।

ভুবনেশ্বরী একটু চিন্তা করে বললেন, আচ্ছা ভাই মতির মা, দিল্লী যেতে কত খরচ পড়বে বল্‌তে পারো ?

মতির মা মনে মনে উৎসাহিত হয়ে বললে, তাই ত বল্‌ছিলুম, বাবাজী মশায়ের কাছে চল, খরচ খরচা কি পড়বে সমস্তই জেনে আসা যাবে।

তাই চল, ভুবনেশ্বরী সল্‌তে পাকানো বন্ধ করে উঠে দাঁড়িয়ে কলসী থেকে এক ঘটি জল গড়িয়ে আল-গোছে খেয়ে নিয়ে একখানা আধময়লা চাদর ঘরের ঝোলানো দড়ি থেকে টেনে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে পড়লেন। চাদরটা তুলতেই একরাশ মশা ভন্ ভন্ করে উড়তে লাগলো।

বাবাজী মশাইয়ের আখ্‌ড়ায় এসে কীর্ত্তন শুনে রাত্রি প্রায় আটটার সময় কীর্ত্তন ভাঙ্গার পর বাবাজী মশাই নিজেই তাঁর সমস্ত শ্রোতার কাছে বৃন্দাবন যাত্রার বিষয় জ্ঞাপন করলেন। বললেন, এ রকম সুবর্ণসুযোগ নাকি জীবনে খুব কমই আসে। এমনই একটা তিথিনক্ষত্রের যোগাযোগ এসেছে যে, সেই বিশেষ তিথিতে দয়াল হরি বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দিরে সশরীরে এসে আবির্ভূত হবেন এবং বাবাজী মশাই তাঁর সকল সঙ্গীকে মেয়ের মত যত্ন করে বৃন্দাবনে তাঁর নিজের আখ্‌ড়ায় রাখবেন, রোজ দুবেলাই পেট ভরে প্রসাদ দেবেন, এবং খরচ পড়বে সবশুদ্ধ মোট মাথা পিছু চৌষট্টি টাকা।

সেদিন রাত্রে ভুবনেশ্বরী ও মতির মা দুজনে পরামর্শ করলে যে, চৌষট্টির ওপোর দশটা করে টাকা ধরলেই দিল্লীর খরচ হয়ে যাবে, কারণ বাড়তি শুধু বিন্দাবন থেকে দিল্লী যাওয়া-আসার খরচ আর নাতি নাত্নীদের জন্য সামান্য কিছু খাবার কিনে নেওয়া। অর্থাৎ পঁচাত্তর টাকার ওপোর আর এক পয়সাও বেশী লাগ্‌বে না। এতে তীর্থও হবে—আর একজনের হবে নাতির অন্নপ্রাশন দেখা, অন্যজনের হবে ভাইপোর সন্ধান করা, চাই কি তার বিয়ের ব্যবস্থাও হয়ে যেতে পারে।

কথাটা শুনে গুরুভাই মাথা নেড়ে বললেন, সেকি কথা! চৌষট্টি টাকা লাগবে বিন্দাবন যাওয়া আসার খরচ ? এত কি করে হয় শুনি ? চৌষট্টি টাকা কি কম। এতে একজন কেন দুজনের যাওয়া আসা স্বচ্ছন্দে হবে যাবে। এমন কি যদি ভুবনেশ্বরী আর মতির মা দুজনে ষাটটি করে টাকা তাকে দেয়, তাহলে তিনিই তাদের রাজার হালে বৃন্দাবন ঘুরিয়ে এমনকি দিল্লী পর্য্যন্ত দেখিয়ে আনতে পারেন। কারণ তিনি ত আর বাবাজীর মত মবলগ কিছু লাভ করতে চান না।

ভুবনেশ্বরীর নেহাৎ অমত ছিল না, কিন্তু মতির মা ঐ কেশোরুগী বুড়োকে দু'চক্ষে দেখতে পারতো না, বিশেষ করে বাবাজী মশাইয়ের সঙ্গ ছেড়ে ওর সঙ্গে যাওয়ায় মতির মা আদৌ রাজী হল না। কাজেই ভুবনেশ্বরী গুরুভাইকে ক্ষান্ত করলেন, কারণ তাঁর যাওয়া প্রধানতঃ দিল্লীর জন্যই, এবং দিল্লীর মুরুব্বি যে মতির মায়েরই জামাই তাকে ত আর অসন্তুষ্ট করা চলে না।

যাত্রার তিনদিন পূর্ব্বে মতির মা ও ভুবনেশ্বরী প্রত্যেকে চৌষট্টি টাকা করে বাবাজী মশাইয়ের হাতে অর্পণ করলেন। বাবাজী মশাই ওদের আশীর্ব্বাদ করলেন, কৃষ্ণে মতি হোক বলে, এবং অন্য ভক্তদের বার বার করে টাকা গুলো দেখিয়ে উৎসাহ দিয়ে বললেন, একেই বলে ভক্তি সেই সঙ্গে একথাও বললেন যে তার অপর এক ভক্ত আ[illegible] সকালে তার একমাত্র শেষ সম্বল তিন ভরি সোনার এক ছড়া হার বাবাজী মহাশয়েরই কাছে বাঁধা রেখে সোত্ত[illegible] টাকা ধার করে তাই থেকে চৌষট্টি টাকা তাঁরই হাতে দিয়ে গেছে এবং বলে গেছে যে টাকা অনেক ছিল, অনে[illegible] হবে, কিন্তু গোবিন্দজীর মন্দিরে তিথি নক্ষত্রের ঐ বিশে[illegible] যোগাযোগ হয়ত ইহ জীবনে আর হবে না। ভুবনেশ্ব[illegible] খবর নিয়ে শুনলেন, তাঁদের দুজনকে নিয়ে বাবাজী মশা[illegible]য়ের মোট যাত্রীসংখ্যা হয়েছে এগার জন।

বৃন্দাবনে দুদিন কাটিয়ে ওরা দুজনে বাসে করে বৃন্দা[illegible]

থেকে মথুরায় এসে সেখানে বাস বদলী করে দিল্লী ষ্টেশনে এসে পৌছাল এক শুক্রবার বিকেলে। তারপর সে এক প্রচণ্ড অভিযান। মতির মায়ের জামাইয়ের ঠিকানা নিয়ে এখানকার রিক্সাওয়ালাদের দিয়ে অনেক চেষ্টায় অনেক দুঃখে এবং ভয় ও ভাবনায় শরীরের অর্দ্ধেক রক্ত জল করে সন্ধ্যের পর ওরা তাদের বাঞ্ছিত বাড়ী খুঁজে বার করলেন। সন্ধ্যার পরে হাত মুখ ধুয়ে ওরা মতির মায়ের মেয়ের কাছে বসে নাতীকে কোলে নিয়ে নানাবিধ সুখ দুঃখের গল্প করে যখন পুরোদস্তুর এ বাড়ীর লোক হয়ে উঠেছে, তখন জামাই অফিস থেকে বাড়ী ফিরে এলো। শাশুড়ী এবং তাঁর বন্ধু ভুবনেশ্বরীকে দেখে ভদ্রলোক ঠিক খুশী হলেন কি না বুঝা গেল না, কিন্তু মুখে তিনি কোন রকম অসন্তোষ প্রকাশ করলেন না। সেই অসন্তোষ রাত্তিরে প্রকাশ পেল। শাশুড়ীকে আলাদা ডেকে নিয়ে তিনি বললেন সমীর বাবু কে, কোন্ অফিসে চাকরী করে, এখানকার ঠিকানা কি, সমস্ত খবর না পেলে দিল্লীর মত বিরাট জায়গায় তাকে খুঁজে বার করবো কি করে? আপনি কি যে করেন, মিছামিছি আশা দিয়ে ভদ্রমহিলাকে কেনই বা নিয়ে এসেছেন, উনিই বা খরচ-পত্র করে এতদূর কেন এলেন কিছুই বুঝি না।

মতির মা চুপ করে গেল। শুধু একবার বলেছিল, তুমি বাবা গভর্ণমেণ্টের অফিসে চাকরী কর, সেও তাই, বিদেশে বাঙ্গালীতে বাঙ্গালীতে খুব চেনা থকে, তাই ভেবেছিলুম—

জামাই বললেন এখানে পাঁচ হাজার বাঙ্গালী গভর্ণমেণ্ট অফিসে চাকরী করে, আমি কি আর সক্কে চিনে রেখেছি?

কথা শুনে ভুবনেশ্বরী মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। তাহলে যে বন্ধুর বাড়ীতে ও থাকতো সেই ঠিকানায় যদি খোঁজ করা যায়।

জামাই বললেন, ঠিকানাটা দিন খুঁজে দেখতে পারি।

ভুবনেশ্বরী প্রমাদ গণলেন। বললেন, সে চিঠি ত কাশীতে পড়ে আছে। সেখানা যে দরকার হবে তা ত মনে করি নি, তাই আনিও নি।

তাহলে?

রাত্রে ভুবনেশ্বরী ও মতির মা পাশাপাশি বিছানা করে শুয়ে পড়লো। পনর মিনিটের মধ্যেই মতির মার নাক ডাকতে শুরু হোল, কিন্তু ভুবনেশ্বরী জামাইয়ের ঘরের ক্লক ঘড়িটার সবকটা বাজাই শুনতে লাগলেন সারারাত ধরে। উঃ, কি ভুলই সে করেছে? হাতের টাকা নষ্ট করে পরের কথায় বিদেশে এসে—

সকালে উঠে হাত মুখ ধুয়ে পুজো সেরে উদাস মন নিয়ে ভুবনেশ্বরী বাড়ীর রোয়াকে এসে দাঁড়ালেন। মতির মায়ের ফ্রক-পরা বড় নাত্নী বাড়ীর সামনের অংশে পাতা খাটিয়ার ওপোর বসে পাশের কোয়টার্সের বারান্দা থেকে ত্রিগুনালের সঙ্গে পরিষ্কার হিন্দীতে গল্প করছিল, এমন সময় মাদ্রাজীদের একটা মেয়ে এসে জুটলো, তার নাম ইলট্স্মি। ভুবনেশ্বরী পরে বুঝে ছিলেন যে লক্ষ্মী নামটাকেই ওরা উচ্চারণ করে ঐ রকম অদ্ভুতভাবে।

উদাস ভাবে বসে বসে ভুবনেশ্বরীর মন্দ লাগলো না। বিভিন্ন দেশের বাচ্ছারা সব কেমন হিন্দী শিখেছে, পরস্পরের সঙ্গে কেমন মিলেমিশে রয়েছে। দেশ দেশ করেই সমীর তার অমূল্য জীবন নষ্ট করেছিল। কতদিন সে পিসিমাকে বলেছে, পিসিমা, শুধু বাংলাদেশ আর বাঙ্গালী জাতি নিয়েই এই বিরাট ভারতবর্ষ গড়ে ওঠে নি। এর বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন ভাষাভাষীদের সুখদুঃখ এবং স্বার্থকে একসঙ্গে করেই এই দেশ। কিন্তু এই বিভিন্ন ভাষাভাষীকে এভাবে একত্র দেখার সুযোগ পিসিমার কোনদিনও হয় নি। যে বাড়ীর বউ হয়ে তিনি তাঁর জীবন কাটিয়েছেন, সে বাড়ীর লোকেরা কারুর সঙ্গে মেলামেশা বড় তেমন পছন্দ করতো না। কেউ উড়ে, কেউ নেড়ে, কেউ খোট্টা কেউ মেড়ো, কেউ বাঙ্গাল, কেউ টাঁস্, কেউ বেমো, কেউ খৃষ্টান, এইভাবে চিন্তা করে নিজেদের সঙ্গে সকলেরই এক কাল্পনিক পার্থক্য সৃষ্টি করে সকলকেই অহেতুক ঘৃণা করে তারা তাদের দিন কাটিয়ে গেছে। পিসিমা নিজে একবার মাত্র স্বামীর সঙ্গে রাঁচীতে গিয়েছিলেন হাওয়া বদলাতে। সেখানেও তিনি ছিলেন বাঙ্গালীদের মধ্যে; তারপর কাশীতেও তিনি বাঙ্গালীটোলায় বাস করেন। বাঙ্গালী ছাড়া অন্য কারুর সঙ্গে যে মেশা যায়, তা তিনি ঠিক মত বুঝতেনই না। মতির মায়ের আট বছরের নাত্নীটার বন্ধুদের দেখতে দেখতে উদাস মনে তাঁর যেন কেমন একটা সার্ব্বজনীনতা আপনা হতেই জেগে উঠছিল।

বেলা আন্দাজ সাড়ে সাতটা। এর মধ্যেই সূর্য্যের তেজ বেশ প্রখর হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে হাতে লোহার বালা পরা মাথায় পাগড়ী বাঁধা একটা শিখের ছেলে এই সব বাচ্ছাদের দলে এসে ভিড়ে গেল। মতির মায়ের নাত্নীর পিঠে এক চড় মেরে তার গলা জড়িয়ে ধরে সে যেন কত কি বল্‌তে লাগলো আর মেয়েটাও তার কোমর জড়িয়ে ধরে কত কি কথা যে হড়বড় করে বলতে লাগ্‌লো, তার বিন্দুবিসর্গও ভুবনেশ্বরীর জ্ঞানগে চর হোল না।

হঠাৎ রাস্তা দিয়ে কে একজন সাইকেল চড়ে চলে গেল। ভুবনেশ্বরীর মনে হোল, বোধ হয় যেন সমীরই যাচ্ছে। ভালো করে দেখে নিয়ে সে তাড়াতাড়ি মতির মায়ের নাতনীকে বললে, ঐ সাইকেল চালককে ডেকে দিতে। মেয়েটির কথায় ঐ শিখ ছেলেটা চীৎকার করে ডাক্‌তে ডাক্‌তে সাইকেল আরোহীর পেছন পেছন ছুট্‌লো। সাইকেল আরোহী গাড়ীর গতিবেগ কমিয়ে পেছন ফিরে দেখলে। ভুবনেশ্বরী স্পষ্ট দেখলেন সমীরই ত বটে।

শিখ ছেলেটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে বাড়ীর দিকে, পরিষ্কার উর্দ্দুতে বললে, ওরা আপনাকে ডাকছে।

সমীর বাইক থেকে নেমে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে পেছিয়ে এসেই পিসিমাকে দেখতে পেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি কাছে এসেই একমুখ বিস্ময় নিয়ে বললে পিসিমা যে, হঠাৎ এখানে? তারপর গাড়ীটা বারাণ্ডার থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে হেঁট হয়ে পিসিমার পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, এ বাড়ীতে তোমার কে থাকে? হঠাৎ দিল্লীতেই বা এলে কেন?

মুহূর্তেই পিসিমার চোখে জল এসে গেল। বললেন কেন এলুম জিজ্ঞাসা করছো বাবা, এলুম তোমারই জন্য। সেই যে তুমি সেদিন চলে এলে, তারপর কি পিসিমা বলে একখানা চিঠি দিয়েও খবর নিয়েছ? পিসিমা মোলো কি বাঁচলো সেটা জানবারও কি তোমার ইচ্ছে হয়নি বাবা? ছি ছি, তোমার মত এমন উপযুক্ত ছেলে যার— পিসিমা আর কিছু বল্‌তে পারলেন, ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললেন।

ছেলের দল অবাক হয়ে দেখতে লাগলো, এত বড় একটা ডাগর লোক কাঁদছে। ওরা জানে, বাচ্ছারাই কাঁদে, কিন্তু দিদিমার বন্ধু যে কাল রাত্রে এসেছে, সে আজ সকালে হঠাৎ একটা রাস্তার লোক ডেকে তারই সামনে এমন ভেউ ভেউ করে কাঁদতে থাকে—

ব্যস্ত হয়ে সমীর বললে, ছি পিসিমা, ওরকম করছো কেন? কি হয়েছে বল না। আচ্ছা চলো চলো, ঘরে চলো—

পিসিমা আত্মসংবরণ করে বললেন, ঢের হয়েছে বাবা, থাক। সেই যে তুমি চলে এলে, তারপর কি পিসিমা বলে একবারও মনে করেছ। মাস কাবার হয়ে গেল, অথচ একটা পয়সা দেওয়ার নাম নেই। এদিকে যত্ন করে পিসিমার খরচ পাঠিয়েছ রাজার মতো, কিন্তু এখন যে পিসিমা কি খাবে, তার কোন সন্ধান নিয়েছ কি?

এদের কথাবার্ত্তায় আকৃষ্ট হয়ে মতির মায়ের জামাই বাইরের বারান্দায় এসে হাজির হোল, সেই সঙ্গে মতির মাও দরজায় এসে দাঁড়ালো। উনান থেকে চট্ করে কড়াটা নামিয়ে দরজার ভেতরে এসে দাঁড়ালো টুনি অর্থাৎ মতির মায়ের মেয়ে, এবং সকলেই অবাক হয়ে সমীর ও তার পিসিমাকে দেখতে লাগলো।

সমীর প্রথমটায় একটু হতভম্ব হয়ে, পাছে এই সমস্ত ব্যাপারটা একটা বিশ্রী পরিস্থিতিতে পরিণত হয়, সেই ভয়ে বললে, পিসিমা আমার ভয়ানক অপরাধ হয়ে গেছে স্বীকার করছি, কিন্তু এরপর থেকে আর কোন ত্রুটি হবে না। আমি এখন অফিসের খুব জরুরী কাজে যাচ্ছি, বেলা বারোটা নাগাদ ফিরবো। দুপুরে তুমি আছ ত এখানে, দুপুরে এসে আমি তোমার কাছে বসবো। এখন আর রাগারাগি কোরো না, আমি চলি। বলেই তাড়াতাড়ি পিসিমাকে আর একটা নমস্কার করে সাইকেলে চড়ে রওনা দিলে।

মতির মায়ের মুখের দিকে চেয়ে ভুবনেশ্বরী বললেন, দেখলে দেখলে দিদি। একমিনিট দাঁড়ালো না, আর এই ছেলেরই খোঁজ করে হাতের সম্বল শেষ করে বৃন্দাবনচন্দ্রকে ঠেলে দিয়ে আমি কিনা মরতে এলুম দিল্লীতে! মুখে আগুন, মুখে আগুন আমার।

মতির মায়ের জামাই নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। টুনি তাকে আস্তে আস্তে বললে, ঐ

বুঝি ওঁর গুণধর ভাইপো ?

তাই হবে, জামাই সংক্ষেপে উত্তর দিল।

সমীরের গল্প ওরা সবাই শুনেছে। মতির মা কাল রাত্রে মেয়েকে একবার মাত্র আড়ালে গিয়েই সমীর ও তার কানী ঝিয়ের গল্প করেছে সবিস্তারে, টুনীও রাত্রে তার স্বামীকে সমস্ত কাহিনী শুনিয়েছে সামান্য একটু রঙ চড়িয়ে। সমীরকে চাক্ষুষ দেখার পূর্বেই, ওরা সমীরকে রীতিমত ঘৃণা করতে সুরু করে দিয়েছিল।

জামাই টুনীকে বললে, ওঁরা কতদিন থাকবেন এখানে ?

টুনী বললে, তা ত জানি না।

জামাই বিরক্ত হয়ে বললে, তা জানবে কেন ? একটু থেমে বললে, যাই বল, ঐ ছোকরা যেন এ বাড়ীতে আর না আসে। সকালে ওর অফিসের জরুরী কাজ আর দুপুরে বারোটার সময় উনি আসবেন গল্প করতে, অর্থাৎ যখন আমি বাড়ী থাকবো না। যত সব বদমায়সী, এ যেন কেউ বোঝে না।

টুনী চুপ করে রইলো। জামাই চাপা গলায় বললে তোমার মাকে বলে দিও, উনি যদ্দিন ইচ্ছে হয় থাকুন, কিন্তু ওঁর বন্ধুটিকে যেন অন্য কোথাও থাকার জন্যে বলে দেন। আমার বাড়ীটা ধর্ম্মশালাও নয়, হোটেলও নয়। যত সব বাজে ঝামেলা জড়িয়ে—

বেলা আন্দাজ সাড়ে নটার সময় জামাই অফিসে যাওয়ার পর মতির মা ভুবনেশ্বরীকে আলাদা ডেকে বললে, ভুবনদি, কিছু মনে কোরো না ভাই, আগেও জামাই বলছিল যে ঐ লোকটি, মানে তোমার ঐ ভাইপোকে জামাই বোধ হয় চেনে, কিম্বা কিছু হবে; বলছিল যে লোকটি তেমন সুবিধের নয়, আজকে দুপুরে ও আসে আসুক, কিন্তু এর পরে যেন ও' আর এ বাড়ীতে না আসে, মানে, যে কি না নিজের পিসিমাকে দেখে না, সে লোক—

ভুবনেশ্বরী মতির মায়ের মুখের দিকে পূর্ণভাবে দৃষ্টিপাত করে বললে, তুমি বোধ হয় সমস্ত কথা ওদের বলেছ ?

না, না দিদি, ছিঃ, তুমি যে কি বল ? আমি কি আর পাগল যে ঐ সব কথা জামাইকে বলবো।

তবে টুনুকে বলেছ বোধ হয় ?

মতির মা একটু থেমে বললে, না, টুনুকে ঠিক বলিনি, তবে টুনু কাল রাত্তিরে সব জিজ্ঞাসা করছিল কি না। সে যাই হোক, টুনু আমার তেমন মেয়ে নয় যে, সব কথা জামাইকে লাগাবে। মোটের ওপোর তোমার ভাইপোকে জামাই নিশ্চয়ই চেনে। আর ওও ত তেমন সুবিধের নয়, তা সে যাই হ'ক কথা, তোমার ভাইপো হলে কি হয়, যা সত্যি, তা ত বলতেই হবে, তা তুমি কিছু মনে কোরো না ভাই। তোমার ভাইপো এলে তুমি কেন ওর সঙ্গে ওর বাসায় গিয়ে সব কথাবার্ত্তা বোলো না। ওরা যখন পছন্দই করছে না যে, তোমার ভাইপো এ বাড়ীতে আসে, তখন আমি বলি যে দরকারটাই বা কি ?

লজ্জায় দুঃখে মাটীর সঙ্গে মিশে গিয়ে ভুবনেশ্বরী বললেন, আচ্ছা।

ঘড়িতে বারোটা বেজে গেল, বেলা দেড়টা নাগাধ মতির মা ভুবনেশ্বরীকে বললে, কই ভাই, তোমার ভাইপো ত এলো না।

কি জানি বল, ভাইপোর মতিগতি ভাইপোই জানে, হতাশভাবে ভুবনেশ্বরী উত্তর দিলেন।

কিন্তু ভাই, আজ শনিবার। জামাই অফিস থেকে ফিরবে বেলা আড়াইটা নাগাদ, তারপর আমাদের সকলকে নিয়ে যাবে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দিরে। তুমি যাবে ত ?

ভুবনেশ্বরী হতাশ হয়ে বললেন, নিয়ে গেলেই যাবো। একটু থেমে বললেন, আমার ভাই দিল্লীতে আর ভালো লাগছে না, ইচ্ছে হচ্ছে আজই কাশী চলে যাই।

সে ত যেতেই হবে ভুবনদি, বাবাজী মশাই তার দলবল নিয়ে বিন্দাবন থেকে বেরুবেন মঙ্গলবার বিকেলে, সোমবারদিন আমাদের অবশ্যই এখান থেকে যেয়ে বিন্দাবনে বাবাজীমশাইয়ের আখড়ায় ফিরতে হবে, নইলে আবার ওদের দলও চলে যাবে।

যা ভালো বোঝো কর ভাই, উদাসীনের ন্যায় ভুবনেশ্বরী উত্তর দিলেন।

বেলা দুটো নাগাদ বাইরে সাইকেলের ঘণ্টা বেজে উঠলো। রোয়াকে দাঁড়িয়ে সসংকোচে সমীর ডাকলে,

পিসিমা, পিসিমা আছ ?

বাইরের ঘরেই পিসিমা বসে ছিলেন। নিঃশব্দে উঠে দরজা খুলেই বললেন, এখানে কোন কথাবার্ত্তা হবে না সমীর, তোমার বাসায় চল, যা কিছু কথা সব সেখানেই হবে।

সমীর ওঁর মুখের দিকে চেয়ে বললেন, ও, তবে তাই চল। একটু থেমে বললে, এই ঝনঝনে রোদ্দুর, আর আমার বাসাটাও ত অনেক দূরে, তার চেয়ে—

তাহলে ঐ বড়গাছতলাটায় চল, এখানে দাঁড়িয়ে আমার যা বলার আছে বলে নিই।

সমীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পিসিমার মুখের দিকে চেয়ে বললে, বুঝেছি, আচ্ছা চল, আমার বাসাতেই নিয়ে যাই। একটু থেমে বললে, কিন্তু সেখানেও ত তোমার ভালো লাগ্‌বে না পিসিমা, সেখানে যে—

জানি। সেইজন্যেই ত বল্‌ছি, ঐ গাছতলাই আমার ভালো, এস ঐ গাছতলায় যাই, বলেই দ্বিধামাত্র না করে পিসিমা কট্‌মটে রোদ্দুর মাথায় করে রাস্তায় নেমে অদূরবর্ত্তী গাছতলার দিকে অগ্রসর হলেন। অগত্যা সমীরও তার বাইকটা ঠেলে ঠেলে পিসিমার পেছন পেছন চললো।

গাছতলায় এসেই পিসিমা কেঁদে ফেল্লেন, বল্লেন, সমীর তুমি বাবা এমনই কী কাজ করে বসেছ যে কোন ভদ্রলোক তোমাকে বাড়ীতে বস্‌তে দিতে সাহস পায় না। তিন-বছর বয়স থেকে তোমাকে মানুষ করে শেষকালে কি না আমাকে এসে দাঁড়াতে হোল গাছতলায়! পিসিমা ঘাড় হেট করে অঝোর ধারে কাঁদতে সুরু করে দিলেন।

সমীর মনে মনে রীতিমত চটে উঠ্‌লো। একটু ভেবে নিয়ে বল্লে, এ সবের জন্য দায়ী কে পিসিমা? রেণুকে নিয়ে ব্যাপার! আমি ত তাকে তোমারই কাছে রেখে আস্‌তে গিস্‌লুম। সে খারাপ নয়, আমিও খারাপ নই কিন্তু তোমরা ব্যাপারটাকে এমন ঘোরালো করে তুল্লে কেন?

সমীরের মুখের দিকে তীক্ষ্ণভাবে দৃষ্টিপাত করে পিসিমা বল্লেন; বাঃ বেশ, একটা সোমত্ত মাগিকে পিসিমার ঘাড়ে চড়িয়ে দিয়ে পালাবে, তারপর তার খরচ আছে, ঝক্কি আছে, সে সব কে পোয়ায় বাবা সমীর? উপযুক্ত ছেলে হয়ে তুমি কি ন'—

বাধা দিয়ে সমীর বল্লে, খরচ আমিই দিতুম, পঞ্চাশে না হয়ে পঁচাত্তর দিতুম একশ দিতুম, কিন্তু সে কথা কি তুমি আমায় বলেছিলে? আর ঝক্কি আবার কি? সে গিয়েছিল তোমার কাছে চির জীবন তোমার কাজ করবে বলে। সে ত নবাব নয়, লোকের বাড়ী রাঁধুনীর কাজ করতো, তোমার কাছেও সেই কাজই সে করতো।

চটে উঠে পিসিমা বল্লেন, কি, আমি সেই ভ্রষ্টা মাগীর হাতে খাব? শিক্ষিত ছেলে হয়ে এমন কথাই তুমি আমাকে বল্লে, বল্‌তে সাহস হোল তোমার?

গম্ভীর হয়ে সমীর বল্লে, দেখ পিসিমা, তুমি তাকে চেন না কিন্তু আমি চিনি। অনেক ভদ্রলোকের বাড়ীর বউয়ের তুলনায় সে দেবী। এটা মনে রেখো যে অন্য কোন মেয়ে হলে আমি এদিকে তোমরা যাকে বল খারাপ সেই খারাপই হয়ে যেতুম, কিন্তু সেই নিরক্ষর পাড়াগাঁয়ের কানী ঝিটাই আমাকে কোনরকম অসৎ হতে দেয় নি। মনে রেখো সে অনেকেই চাইতেই অনেক ওপোরওয়ালা।

সমীরের মুখের দিকে হতাশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পিসিমা বল্লেন, উঃ এতদূর! মুখ ফুটে পিসিমার কাছে এ সব কথা বল্‌তে তোমার একটুও বাধল না? এমন করেসে মাগী তোমার শেষ করে দিয়েছে! তা যাক্, আমি আর তোমার এক পয়সাও চাই না, রাস্তায় মরে পড়ে, থাক্‌বো, তবু বল্‌বো না যে আমার উপযুক্ত ভাইপো আছে, গভর্ণমেণ্টের অফিসে মোটা মাইনের চাকরী করে। বল্‌তে বল্‌তেই পিসিমা গাছতলা থেকে টুনুদের বাড়ীর দিকে এগিয়ে পড়লেন।

সমীর বল্লে পিসিমা, পিসিমা দাঁড়াও পিসিমা,—বল্‌তে বল্‌তে সে সাইকেল হাতে পিসিমার পেছন পেছন চল্‌তে লাগ্‌লো।

রোদ্দুরের মধ্যে থমকে দাঁড়িয়ে পিসিমা বল্লেন, রক্ষা কর বাবা, তুমি আর ও বাড়ীতে এসো না। ও বাড়ীর মালিক চায় না যে, তোমার মত লোক ও বাড়ীর ছায়াতে পর্য্যন্ত দাঁড়ায়।

সে তোমাদেরই দয়ায় পিসিমা। তোমরা এমন করে লাগিয়েছ যে, তিনি আমার সম্বন্ধে অদ্ভুত কিছু ধারণা করে বসে আছেন।

না, আমরা লাগাতে যাই নি। পিসিমা জোরের সঙ্গে কথাগুলো উচ্চারণ করলেন। তিনি তোমায় চেনেন এবং তিনি তোমায় মানুষ বলেই মনে করেন না।

তিনি আমায় চিনতে পারেন না, এমন কি আমার চেহারা পর্য্যন্ত তিনি আজ সকালের আগে কখনও দেখেন নি, সমীরও সমান জোরে উত্তর দিলে।

সে আমি জানি না জানতেও চাই না, কিন্তু তুমি বাবা আমাকে রেহাই দাও। আজ থেকে আমি মনে করবো, আমার ভাই নেই, ভাইপোও নেই। পিসিমা দ্রুতপদে রাস্তা পার হয়ে টুনুদের কোয়াটার্সের দিকে এগিয়ে চলে গেলেন।

সাইকেলটি হাতে করে সমীর স্থির হয়ে রোদ্দুরের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইলো। তার চোখমুখে রক্তের চাপ ঘন হয়ে জমে উঠছিল, হাত পা অল্প অল্প কাঁপছিল।

পিসিমা সবেগে রোয়াকের ওপোর উঠে পরদা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে সজোরে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আশ্চর্য্য এই যে, মতির মা বা টুনু কেউই এ সময় বারাণ্ডায় থাকে নি, তবে সকলেই কিন্তু জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখছিল।

মতির মা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কি হোল ভুবনদি, অত—

হাঁউমাঁউ করে ভুবনেশ্বরী উত্তর দিয়ে বল্লেন, আমার ভাইও নেই, ভাইপোও নেই। হাজার হোক, পরের ছেলে, পেটের পুত ত নয়। টুনুর দিকে চেয়ে বল্লেন, টুনু মা তোমার বাড়ীতে রান্নার লোক রাখবে? আমাকে লোকের বাড়ী রান্না করেই খেতে হবে, আমার বরাতে এই ছিল!

টুনু বল্লে, আপনি স্থির হোন মাসিমা, অনর্থক রাগারাগি করে শরীর খারাপ করবেন না।

গম্ভীর ভাবে ভুবনেশ্বরী বাড়ীর ভেতরে রোয়াকে এসে ধুলার ওপোর বসে পড়লেন। বাইরে সমীর খানিকটা ইতস্ততঃ করে সাইকেলটা ঠেলতে ঠেলতেই অফিসের দিকে এগিয়ে চললো। গাড়ীটায় চড়ে বসতে পর্য্যন্ত তার খেয়াল হোল না। [ক্রমশঃ]

সংকলন

বিলিতি কুকুর :

সম্প্রতি পাশ্চাত্যের পণ্ডিতেরা চীনের পশ্চিম বিমুখী মন নিয়ে অনেক চিন্তা ও গবেষণা করছেন। তাদের মধ্যে দু'জনের নাম করতে হয় সর্বাগ্রে। একজন জারমান অধ্যাপক ওলফেন্স ফ্রাঙ্কে। অপরজন অবজার্ভার পত্রিকার ইংরেজ সংবাদদাতা মিঃ ডেনিস ব্লাডওয়ার্থ। তাঁরা দুজনেই অভিমত প্রকাশ করেছেন—চীনাদের পাশ্চাত্য-বিদ্বেষ দূর করতে হলে চীনা ও পাশ্চাত্যদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে এই দু'জন বৈজ্ঞানিকই চীনা মহিলা বিয়ে করেছেন। মিঃ ডেনিস্ ব্লাডওয়ার্থের স্ত্রী অবশ্য বলেছেন—চীনাদের কাছে পশ্চিমীদের গায়ের গন্ধ খুব সহনযোগ্য নয়, যদিও তিনি তাঁর স্বামীর গায়ের গন্ধ সহ্য করতে পারেন, কারণ তা এল্‌সেশিয়ান কুকুরের চেয়ে খারাপ নয়।

পশ্চিমীদের গায়ের গন্ধ যে কুকুরের চেয়ে খারাপ নয় একথা জেনে পশ্চিমের লোকেরা নিশ্চয়ই আনন্দিত হবেন!

—শুভময় চট্টোপাধ্যায়

নারীদেহের সৌন্দর্য ও স্তন্যদান :—

স্ত্রী স্বাধীনতা আন্দোলনের নেত্রীদল তথা সৌন্দর্য রক্ষার জন্যে ব্যস্ত প্রগতিশালিনীরা স্তন্যদানকে ভয়ঙ্কর অবহেলা এমন কি ঘৃণাও করে এসেছেন। কিন্তু, এ দ্বারা যেমন জননীদের ক্ষতি হয়েছে, তেমনই ক্ষতি হয়েছে সন্তানদের। মাতৃদুগ্ধই শিশুর পক্ষে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং পানীয়। শুধু তাই নয় স্তন্যদান নারীদেহের একটী প্রয়োজনীয় ক্রিয়া বলে আধুনিক চিকিৎসকদের দ্বারা বিবেচিত হয়েছে। তাঁদের মতে স্তন্যদান নারীদেহের স্বাস্থ্যই শুধু রক্ষা করে না, তার জরায়ুকে সঙ্কুচিত করে যথাস্থানে ফিরে যেতে সাহায্য করে,—স্তন্যে কর্কটরোগ নিবারণ করে। তাই প্রায় বার বছর আগে চিকাগো সহরে 'স্তন্যদান প্রথায়' ফিরে চলো আন্দোলন সুরু হয়েছে।—La Leche League International' নামে একটি প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হয়েছে। ৬৩৫টি তার শাখা—প্রায় ২০,০০০ তার সভ্যা।

ভারতের প্রগতিশালিনীরা তাঁদের দলে ভর্তি হলে ভারত সন্তানেরা দুগ্ধকৃচ্ছ্রতা থেকে কিছুটা রেহাই পেত।

—শ্রীমতী মালতী রায়

নিরাপদ সময় কত নিরাপদ ?

দাম্পত্য জীবনে যাঁরা জন্ম নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে নিরাপদ সময় মেনে চলেন তাঁরা কতটা নিরাপদ তা' বলা শক্ত। একজন ইতালিয় ও একজন আইরিশ স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ বলেছেন—নিরাপদ সময় মেনে চলেন যে সব দম্পতি তাঁদের নিরাপত্তা তো মোটেই নেই—বরং তাঁরা যে সন্তানের জন্ম দেন তারাও সঙ্কটাপন্ন হতে পারে। ডাঃ রেমণ্ড ক্রস লক্ষ্য করেছেন, নিরাপদ সময় মেনে চলে অনেক দম্পতি পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, বিকল মস্তিষ্ক শিশুর জন্ম দিয়েছেন। তাঁর মতে যে ক্ষেত্রে বাসি ডিম্বকোষের সঙ্গে তাজা শুক্রকীট, বা তাজা ডিম্বকোষের সঙ্গে বাসী শুক্রকীট মিলিত হয়, সেখানে দোষযুক্ত সন্তানের জন্ম খুবই স্বাভাবিক। সংযমী দম্পতির পক্ষেও এই কারণে রুগ্‌ণ, রুগ্ন, মস্তিষ্কহীন শিশুর জন্মদান অস্বাভাবিক নয়।

—শ্রীনিবারণ চক্রবর্তী

বড়দিনের আঙিনায় আমরাও খৃষ্ট

শ্রীরঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিষয় বাসনা শূন্য বৈরাগীর বেশে সরলতার মূর্ত প্রতীক রূপে প্রভু যীশু খৃষ্ট সারা জীবন ধরে বলে গেছেন: শুধু মাত্র একটি দেশের জন্যে নয়, সারা বিশ্বের সর্ব মানবের কল্যাণের পথই আমি বাৎলে দিতে এসেছি। ঈশ্বর কারো একার নয়, বা কোনও একটি ধর্ম সম্প্রদায়েরও নয়, আমি এই কথাই বলতে এসেছি।

সারা বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যুগে যুগে যেখানে যে দেশে যে ধর্মের মধ্যে মানব জাতির প্রেম ধর্ম আত্মত্যাগ ও মনুষ্যত্বের উন্মোচন করতে যে মহাপুরুষই জন্মগ্রহণ করে থাকুন না কেন, লোকত্রাতা যীশুখৃষ্টও সেই একাসনে প্রতিষ্ঠিত। একথা অখৃষ্টান আমরাও স্বীকার করি। প্রতিটি বড়দিনে তাই, আমরাও মাথানত করে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি ভক্তি প্রণাম জানাই।

আজকের পৃথিবীতে অন্যায় শক্তিমত্ততা, শোষণ, পীড়ন, হিংসা, দৈন্য, জড়তা, অজ্ঞতা, আত্মচেতনাহীনতা, ক্লৈব্য একাধারে এ সবই জগা খিচুড়ি ভাবে মানুষকে মনুষ্যত্বের শিখরে উঠবার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সত্য-পথ-ভ্রষ্ট আজ সারা পৃথিবীর সকলস্তরের মানুষ।

এ হেন সংকট মুহূর্তে যাঁদের পুণ্যময় জীবনাদর্শ আমাদের তথা সারা দুনিয়ার মানুষকে বাঁচাতে পারে, মহান জীবন ও বাণীময় প্রভু যীশু খৃষ্টই তাঁদের অন্যতম একজন। শুধু অন্যতম একজন বললে বোধ হয় সব বলা হয় না। বলতে হবে অন্যতম বিশেষ একজন।

মহাপ্রভু যীশু খ্রীষ্ট একদিকে যেমন ছিলেন পরম-করুণাময় লোকত্রাতা ও বিপ্লবী, আর একদিকে তেমনি ছিলেন সুদৃঢ় সংগঠক, পরম যোগী, ঈশ্বরের উপাসনায় ধ্যানী বৈরাগী। তাই যীশুখ্রীষ্টের আদর্শপূত বিচিত্রতর বৈরাগী জীবন বিশ্বের সকলস্তরের মানুষকেই অনুপ্রাণিত করে।

এই সংকটময় যুগে, এই হিংসামত্ত পৃথিবীতে সর্বকালের পরম আশ্বাসবাণীদাতা যীশুর আজ একান্তভাবে প্রয়োজন। প্রয়োজন আছে নতুনভাবে তাঁকে উপলব্ধি করার। তাই আজ সকল মানুষই বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে এই মহান যুগত্রাতা যীশু খ্রীষ্টকে আমরা যেন সীমাবদ্ধ গীর্জার মধ্যে আটকে তাঁকে হত্যা না করি। কারণ, তা হলে মানব জীবনে তাঁর সাধনা, শিক্ষা, কর্মচেতনা, সর্বপ্রকার মনুষ্যত্বের কল্যাণের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে।

মানুষের কাজ যত সংকটই উপস্থিত হোক না কেন, আমরা যেন ভুলে না যাই—মহান করুণাময় যীশু খ্রীষ্ট কত অন্ধকারে আর কত সংকট মুহূর্তে এই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছিলেন।

মহাপ্রভু যীশুর জন্মস্থান জুদিয়া তখন ঘোর শক্তিমদমত্ত রোমান রাজার অধীনে। শক্তিমদমত্ত এই রোমান রাজাকে তার খামখেয়ালের পুরোমাত্রায় ইন্ধন যোগাতো তখনকার ধনী মানী আর পুরোহিতরাই। তাই সোনায় সোহাগার মত অসীম ক্ষমতাদৃপ্ত রোমান রাজার অত্যাচার চলতো নির্বিচারে সাধারণ মানুষ, চাষী, শ্রমজীবী, ভূমিদাস, ক্রীতদাসদের উপর।

এ হেন সমাজের অন্ধকারে সংকটপূর্ণ দিনে মেরীর কোলে জন্ম নিলেন যীশু খ্রীষ্ট। অত্যাচারী হেরদের ভয়ে গর্ভবতী মাতা মেরীকে নিয়ে পিতা জোসেফ ডিসেম্বরের দারুণ শীতকে উপেক্ষা করে পালিয়ে যাবার পথে বেথলেহেমের এক গোয়াল ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এবং সেখানেই একটি জাবপাত্রের মধ্যে জগৎত্রাতা যীশু খ্রীষ্টের জন্ম হয়।

পবিত্র বাইবেল গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায় যে পরম করুণাময় ভগবানের পুত্র রূপে ইমানুয়েল হিংসা, কলুষ, পাপ পূর্ণ মানুষকে উদ্ধারের জন্যেই সাধারণ মানব রূপে জন্ম নেন এই পৃথিবীর মাটিতে নির্মল হৃদয়া কুমারীকে

মাতা রূপে আর গরীব শ্রমজীবী জোসেফকে পিতা রূপে স্বীকৃতি দিয়ে।

এই প্রকার পিতা ও মাতা নির্বাচনের ভেতর দিয়েই আমরা বুঝতে পারি যে, ক্ষমতার দম্ভ সেখানে, ঐশ্বর্যের আড়ম্বর যেখানে, পাপের অহমিকা যেখানে, যেখানে ন্যায়ের আর সত্যের পথ নেই, সেখানেঈশ্বরের আবির্ভাব হয় না। ঈশ্বরের আবির্ভাব হয়, সরল, সহজ, পবিত্র, ন্যায়, নীতি, আর সত্যনিষ্ঠ নিঃস্ব গরীব মানুষের ঘরেই।

লোকত্রাতা যীশুর জন্মবার্তা আকাশে বাতাসে ভর করে ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। দলে দলে ভাগ্যহত, নিপীড়িত, ক্রীতদাস, গরীব শিল্পী, গরীব শ্রমজীবী, গরীব কৃষক প্রভৃতি বঞ্চিত মানুষের স্রোত এসে দেবশিশুকে দর্শন করে ধন্য হল।

তারপর যথাসময়ে দেবশিশু বড় হয়ে দেখা দিয়েছিলেন লোকত্রাতা যীশুরূপে। তিনি বলেছিলেন সবাইকে ডেকে: ছোটতে বড়তে কোন ব্যবধান নেই। ব্যবধান নেই কোন মালিকে ও কর্মীতে। হুজুর মজুর সবাই এখানে এক। কোনও ভেদাভেদ নেই মনুষ্যত্বের অধিকারে। পদগৌরব, আর ধন, জন, ঐশ্বর্য, সম্পদ এ সব মানুষের জীবনে অতি তুচ্ছ জিনিষ। সকল ধর্মের, সকল সাধনার সার, কামনার জিনিষ হচ্ছে—জীবে প্রেম, সত্য পথ, আর মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ লাভ। মানব জীবনের আসল বস্তুই হচ্ছে এই।

সমাজের নিম্নস্তরের ভাগ্যহত মানুষের দল যীশুর এই মহান সাম্য পতাকাতলে নব মন্ত্রে ফিরে পেল প্রাণ। সমাজের শীর্ষচূড়ামণি রোমান রাজা আর তাঁর সাকরেদের দল ধর্মান্ধ পুরোহিতরা চমকে উঠলেন। শিউরে উঠলেন সবাই! সামান্য একজন মিস্ত্রির নিঃস্ব সহায় সম্বলহীন সন্তানের এত বড় স্পর্দ্ধা! জন সাধারণের রাজার আসনে সে বসেছে! লোকে তাকে পূজো করছে!

সমাজদ্রোহী আখ্যা দিয়ে করুণাময় প্রভুকে তারা বন্দী করলো। কারণ সমাজ বিপ্লবের ভয়ে রোমান রাজা মনে মনে প্রমাদ গণলেন। যথাসময়েই রাজদ্বারে বিচারের প্রহসন চললো!

পরম করুণাময় যীশুকে রোমান রাজার হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল জুদাস ইসকেরিয়েট নামে যীশুরই একজন শিষ্য, মাত্র কয়েক গিনির বিনিময়ে।

দস্যু সর্দার বারাব্বাসকে যেদিন ক্রুশবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিতে হল, রোমান রাজপ্রতিনিধি পান্টিয়াস পাইলেটের বিচারে যীশুকেও সেইদিন ক্রুশবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিতে হল! মহান ত্রাতার পার্থিব দেহেরই শুধু অবলুপ্তি ঘটলো, কিন্তু তিনি যে দীপশিখা প্রজ্বালিত করে গেলেন তা তো নিভলোই না, বরং সারা এশিয়া হতে সারা ইউরোপ হয়ে অবশেষে সারা পৃথিবীতে সেই অনির্বাণ দীপশিখা ছড়িয়ে পড়লো।

নিজের জীবন দিয়ে যীশু তাঁর অন্তরের প্রদীপ্ত আলোক রশ্মি ও জীবন দর্শনকে সকল যুগের মানুষের জন্যে রেখে গেলেন।

তারপর দিন যায়, রাত আসে; রাত যায়, দিন আসে। ক্যাটাকুম্বের নিভৃত আঁধারের মাঝে চলে যীশু খ্রীষ্টের তপস্যা, সাধনা ও বাণীকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রয়াস। পিটার পল প্রভৃতি যীশু খৃষ্টের একান্ত ভক্ত শিষ্যরা এই প্রয়াসে নিমগ্ন থাকেন।

মানব সভ্যতার চরম দুর্দিন আবার ঘনিয়ে আসে। ক্ষমতাগর্বী সম্রাট ক্যালিগুলা, ক্ষমতাগর্বী সম্রাট নীরো, এমনি আরোও দুর্দান্ত সম্রাটরা কত খ্রীষ্ট ভক্তদের হত্যা করেছিলেন তার কথা "কুয়োভাদিস" গ্রন্থে সবাই পড়েছেন। শেষ পর্যন্ত মাদালিনের চোখের জলই জয়লাভ করেছিল। জয়লাভ করেছিল পিটার ও পলের নিভৃত খৃষ্ট সাধনা।

তারপর খ্রীষ্ট সম্প্রদায় অনেক দলে ভারী হয়ে উঠলো। হঠাৎ একদিন ইউরোপের সম্রাট কনষ্টানটাইন খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা নিলেন। প্রকৃত পক্ষে ইউরোপ মহাদেশে সেই দিন হল খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রকৃত প্রথম পদক্ষেপ এবং জয় যাত্রাও বলা যেতে পারে অন্য অর্থে। কিন্তু নিরন্ন হতভাগ্য মানুষের অন্ধকার ঘরে মুক্তির আলোদান মন্ত্রনিয়ে যে ধর্ম্মের প্রচারের জন্য মহানত্রাতা যীশু এসেছিলেন ধূলার ধরণীতে—সেই মহান ধর্ম্ম রূপান্তরিত হল সাম্রাজ্যলোলুপ, ঐশ্বর্য্য আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ রাজধর্ম্ম রূপে। স্বার্থদুষ্ট মানুষ ভোগের লালসায় প্রকৃত ধর্ম্ম ভুলে গেল। দিনে দিনে এই তথাকথিত খ্রীষ্ট ভক্তের মুখোস আঁটার দল শক্তিশালী হয়ে উঠলো। আর চললো পশ্চিম এশিয়ার মুস্লিম সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে একটার পর একটা রাজ্যলিপ্সার যুদ্ধ। এই

যুদ্ধের নাম "ক্রুসেড্" যুদ্ধ। এই যুদ্ধে খৃষ্টান সম্প্রদায়রাই জয়ী হলেন। তারপরের ইতিহাস কেবলমাত্র খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের ক্ষমতা বিস্তারের ইতিহাস। দুনিয়ার নানা স্থানেই তাঁদের সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করলো।

এই রাস্তা দিয়ে অর্থাৎ খ্রীষ্ট ধর্মের ধ্বজা ধরে এশিয়া, আফ্রিকা তাঁদের পায়ের তলায় এসে গেল। প্রথমে ধর্ম-যাজকদের আনাগোনা ধর্ম প্রচারের নামে। পরে অস্ত্রধারী সৈন্যের আগমন!

খৃষ্ট সম্প্রদায় ব'লে নিজেদের পরিচিতির লেবেল আঁটলেও প্রকৃত খৃষ্টবাণী এই পররাজ্য লোলুপ সম্প্রদায় বাইবেলের মধ্যেই উপেক্ষায় ধূলি মলিন করে রাখলো। নানান দিকে তুললো শুধু বড় বড় গীর্জা, বড় বড় ঘণ্টা। শক্তি মদমত্ততায় চললো তথাকথিত ইউরোপীয় খ্রীষ্ট উপাসনা।

*　　*　　*

আজ এই পুণ্য বড়দিনের দ্বারে এসে এ কথাটাই বার বার মনে হচ্ছে যে, পরম করুণা ঘন যীশুভক্তরা যীশুর বাণীকেই অবহেলা করছেন। অন্যায় আর অহমিকা দ্বারা প্রভাবিত ইউরোপের একটা বিরাট অংশে হিংসা শক্তি ঈশ্বরবিরোধীর কাজে লাগানো হচ্ছে। এটা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়। বস্তুবাদের চরমতম চরিতার্থতায় লিপ্ত প্রবল শক্তি সম্প্রদায়। আজ আমরা উপলব্ধি করতে পারছি—একমাত্র মহান ভারতবর্ষেই বোধহয় এই খৃষ্টধর্ম যথাযথ পালিত হচ্ছে। দরিদ্র দেশে অসাম্য আছে, কিন্তু তারই মধ্যে মহামিলনের সুর ধ্বনিত হচ্ছে।

তাই আজকের দিনে কায়মনোবাক্যে স্মরণ করি খৃষ্টান অ-খৃষ্টান সকলেই আমরা সেই পরম যোগী, পরম ত্যাগী মহামানবকে। নিকোলাস নাটাভিচের ভাব সিদ্ধান্ত হতে জানতে পারা যায় যে, যীশুর পঞ্চদশ বৎসরের কোন প্রমাণ্য হদিশ পাওয়া যায়নি। কেন? আমাদের মনে হয়—প্রবাদ আছে, কিশোর বয়সে যীশু ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন, হয়ত সেই অজ্ঞাত বৎসর ক'টিই প্রবাদ অনুযায়ী লাদাক, তিব্বত এবং বারাণসী ধামে বেদ, পুরাণ ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞদের সংগে আলোচনায় কাটিয়ে-ছিলেন। সব থেকে বড় কথা—এই সব প্রবাদ কাহিনী সত্যই হোক, মিথ্যেই হোক—যীশুর আদেশ ও বাণীর মধ্যে ভারতীয় বৈরাগ্যের এই একাত্মতার মিলন এলো কোথা থেকে? রোমান ক্যাথলিকদের তো পূজো পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভাবে বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরই প্রতিধ্বনি সহ ভাবধারায় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

আমাদের মনে হয় এই জন্যেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, রাজা রামমোহন রায়, রবীন্দ্র-নাথ, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ হিন্দুরাও মানবত্রাতা যীশুকে অন্তরের প্রণাম ও ভক্তি জানিয়েছিলেন।

তাই আজ আমরা সবাই বড়দিনের এই পুণ্য প্রভাতে সকল খৃষ্টান ভাইবোনদের সংগে আমরাও একাত্ম হয়ে খৃষ্টচরণে প্রণাম নিবেদন করে কামনা করি, আজও যদি সারা বিশ্বের খৃষ্ট ভক্তরা করুণাময় যীশুর বাণী ও জীবন উপলব্ধি করে চলেন কথায় ও কর্মে, তবে অচিরেই বিংশ শতাব্দীর আণবিক শক্তিকে অন্য পথে চালিত করা যায়। বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে হয় তা হলে নির্মল মানব কল্যাণ সাধন।

মানব কল্যাণের পথ সুগম হোক, জয়ী হোক যীশুর, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের, বিবেকানন্দের জীবন সাধনা। আজ বড়দিনের আঙিনায় এই আমাদের সকলের ঐকান্তিক কামনা।

———

পথের বাঁকে

মদন চক্রবর্তী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সওদাগর লেনের একটা ছোট্ট একতলা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল সুহাস আর রুণু। বাড়ীটা ছোট হলেও বেশ মানানসই ভাবে সাজানো। বাড়ীর সামনে হাত দু'য়েক চওড়া আর বাড়ীর সমান লম্বা ফালি জায়গাটাকে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে নানা জাতের ফুল-গাছ বসানো হয়েছে।

বাড়ীর মাঝামাঝি জায়গায় সরু লাল রোয়াকের পাশ দিয়ে মাধবীলতা মাথা নুইয়ে থোকা থোকা ফুলের ভারে দুলে উঠছে থেকে থেকে। গ্রীলের জানলার মধ্য দিয়ে 'মনি-প্ল্যান্টে'র লতাগুলো উঁকি মেরে তাকিয়ে আছে।

সামনের ছোট্ট গেটের সরু থামটা একটা ঝাউগাছকে পেছনে রেখে পাথর বসানো 'মঞ্জুশ্রী-লজ' নামটাকে যেন আকর্ষণ করবার অধিকতর আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সামনের সদর দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

সুহাস দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাড়ীর নম্বরটা মনে মনে আবৃত্তি করে নিয়ে রুণুকে প্রশ্ন করল, নম্বরটা ভুল করিস্ নি তো?

রুণু মাথা নেড়ে জানাল, না।

অগত্যা সুহাস একটু সাহস সঞ্চয় করে ছোট্ট গেটের লোহার ছিট্‌কিনি নেড়ে খট্‌খট্ করে আওয়াজ তুললো।

সদর দরজা খুলে এক বৃদ্ধা বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করল কাকে চাই?

সুহাস বলল, মনীষা নামে কোন ভদ্রমহিলা থাকেন এখানে?

বৃদ্ধা একটু চুপ করে থেকে প্রশ্ন করল, আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

—নন্দনপুর থেকে।

—তা আমাদের মঞ্জু নন্দনপুরের মেয়েই বটে কিন্তু তার নাম তো মনীষা নয়।

বলে, বৃদ্ধা বলল, আপনারা একটু দাঁড়ান, আমি ভেতর থেকে আসছি।

বৃদ্ধা ভেতরে চলে যেতে, তার ফিরে আসার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলো এরা।

একটু পরেই দেখা মিলল একটা নারী মূর্তির সে বৃদ্ধাও নয়, মঞ্জুও নয়, সে স্বয়ং মনীষা।

মনীষাকে দেখতে পেয়েই রুণু বলে উঠল, দাদা ঐ তো মনীষা দি?

মনীষা এসে দাঁড়াল দরজার সামনে।

সুহাস আর মনীষা দুজনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকটা। সুহাস চিনতে পেরেছে মনীষাকে ভাল ভাবেই। এ যেন সেই আগেরই মনীষা। বরং দীর্ঘ কয়েক বছরে তার শ্রী বেড়েছে অনেক, বয়েসটাও যেন মনে হয় কমে গেছে।

দু'জনকে এই ভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে রুণু ভাবল, এরা বোধহয় কেউ কাউকে চিনতে পারছে না। তাই রুণু মনীষার উদ্দেশ্যে বলে উঠল, জানো মনীষাদি, এ হচ্ছে আমার নদান দা। তুমি দেখা করতে বলেছিলে তাই

একেবারে ধরে এনেছি। চিনতে পারছো না তো?

মনীষা একটু স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে, মুখে একটু হাসি এনে, ওদের ডেকে নিল ভেতরে। তারপর বলল, বাস্তবিকই তোমার এমন চেহারা হয়েছে যে চেনবার উপায় নেই সুহাস।

সুহাস কোন কথার জবাব না দিয়ে, মনীষার সঙ্গে এসে ঢুকলো একটা ঘরের ভেতরে। তাপসীর ঘরের সঙ্গে এ ঘরের যেন একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। খুব পরিপাটি না হলেও সহজ ভাবে সাজানোর মধ্যে এ ঘরে রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

সুহাসের আসার উদ্দেশ্য জেনে খুবই আনন্দ পেল মনীষা। বলল, তবু ভাল বোনের জন্যে মনে পড়েছে এই হতভাগী ক।

সুহাস একথারও কোন জবাব দিল না, চুপ করে বসে রইল।

সুহাসকে নিরুত্তর দেখে, রুণু আর সুহাসের উদ্দেশ্যে মনীষা বলল, ইস্ কথায় কথায় কতটা দেরী করে ফেললুম। সন্ধ্যে প্রায় হয়ে এল। না'ও, মুখ-হাত-পা ধুয়ে একটু চা-জল খাবার খেয়ে বিশ্রাম করো তোমরা। তারপর রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে গল্প-গুজবে মন দিলে চলবে।

মনীষা বসে থেকে এদের চা-জল খাবার খাওয়ালো। তারপর বলল, আমি রান্না-বান্নার দিকে একটু নজর দিই গে। বুড়িয়া আবার রাতে ভাল দেখতে পায়না। এমনি রান্না-বান্না যে খারাপ তা নয়, তবে আমি না দেখলে হয়ত তরকারীতে নুনের জায়গায় চিনি দিয়ে বসবে আর চিনির জায়গায় নুন দিয়ে বসবে।

বলে, মনীষা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মনীষা চলে যেতে সুহাস রুণুকে বলল, কিরে এখানে থেকে লেখাপড়া করতে পারবি তো, ছাখ্? মনীষা তো তোর থাকার কথা শুনে খুব খুশি।

রুণু ততোধিক খুশি হয়ে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

সুহাস রুণুকে বলল, তুই ভেতরে যা। রান্না-বান্নার ব্যাপারে মনীষাকে কোন সাহায্য করতে পারিস্ কি না ছাখ্। অবশ্য মনীষা তা করতে দেবেনা। তাহলেও তোকে যখন এখানে থাকতে হবে, মনীষার সুখ সুবিধের দিকে একটু দেখতে হবে তো?

রুণু বেরিয়ে গেল রান্নাঘর খোঁজার উদ্দেশ্যে।

রুণু বেরিয়ে যেতে মনীষা এসে ঢুকল ঘরে।

সুহাসের উদ্দেশ্যে সে বলল, আমার কষ্ট না হয় ভেবে রুণুকে পাঠিয়েছো সাহায্য করতে। বুঝলাম, আমার ওপর টানটা এখনও আছে। তবে তোমার চিন্তায় অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়েও এতগুলো দিন যদি কাটিয়ে থাকতে পারি, আর ক'টা দিন ঠিকই কেটে যেতো।

সুহাস অবাক দৃষ্টিতে মনীষার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার চিন্তায়?

—হাঁ, তোমারই চিন্তায়। তুমি জানোনা, আমি কোলকাতায় আসার পরও শুধু তোমার খবর নেবার জন্যে কতবার যে দেশের বাড়ীতে গিয়েছি তার হিসেব নেই। তবু ভাল, শেষ দিকটায় রুণুর কাছে খোঁজ করতে সে যোগাযোগ করিয়ে দেবার কথা বলেছিল। তাই আজ দেখা পেলাম।

সুহাস প্রশ্ন করল, আচ্ছা মনীষা এ বাড়ীটা কার?

—আমার।

—তবে বাইরে দেখলাম 'মঞ্জুশ্রী-লজ' লেখা, ওটা কার নামে?

—সে অনেক কথা। রাতে গল্প করার সময় সবই জানাবো তোমায়।

বলে, মনীষা বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, রুণুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমরা বসে একটু গল্প করে খানিকটা সময় কাটাও, আমি তাড়াতাড়ি ওদিকের ঝঞ্ঝাটটা মিটিয়ে আসি।

বেরিয়ে গেল মনীষা।

সুহাসের মনটা কোথায় যেন তলিয়ে গেল। আগের মনীষা আর আজকের মনীষার মধ্যে যেন কোন পার্থক্য খুঁজে পেল না সে। মনীষা তেমনই আন্তরিকতার আবেগে যেন সহজ করে নেবার জন্যে এগিয়ে আসে সুহাসের কাছে। জানাতে চায়, সুহাসের সব অবস্থাতেই সে সহানুভূতির স্পর্শে সব কিছুকে সজীব করে তোলার জন্যে প্রস্তুত।

মনে পড়ল, আগের মনীষাকে। কত ব্যাকুলতা নিয়ে সে এসে দাঁড়াতো সুহাসের পাশে। যখন দুঃখ আর

ব্যথায় ভেঙ্গে পড়তো সে, মনীষা ছুটে আসতো, শক্তি আর সাহস জোগাবার চেষ্টা করতো সুহাসের মনে।

মনীষা তখন বয়সে অনেক ছোট। হয়ত তার সে সান্ত্বনা দেওয়া, সে শক্তি জোগাবার চেষ্টা করা, নিছকই ছেলে মানুষী বলে ধরে নেওয়া চলতো, তবু আকার-গেই যে মনটা শুধুমাত্র অনুভূতি নিয়ে ছোটাছুটি করে বেড়াতো, যে মনটা শুধুমাত্র একজনের মঙ্গল কামনার মধ্যে ঘোরাফেরা করে আনন্দ লাভ করতো, সে মনটার আখ্যা হোল ছেলেমানুষী—তার সার্থকতা কোথায় লুকিয়ে আছে তা বোধহয় কেবলমাত্র জানা আছে মনীষারই।

সেদিনের সবুজ পাড় শাড়ীর আঁচল চাপা মনটায় মনীষা কি জিজ্ঞাসা নিয়ে এসে ব্যর্থতার তারা ঘেরা চোখ দু'টোকে অশ্রুর আবেগে ভরিয়ে তুলেছিল, তা সুহাসের জানার কথা নয়। আর জানার কথা নয় বলেই জানার চেষ্টার মনস্তাত্ত্বিক কারণে সে দৃশ্যটা সারা জীবনের সঙ্গী হয়ে ভাবিয়ে তুলল সুহাসকে।

মনীষার সেই তাকিয়ে থাকার মনটা আজ এই সন্ধ্যার নিবিড়তায় যেন আরো গভীর, আরো প্রাণস্পর্শী বলে মনে হল সুহাসের!

রুণু এসেই দাদার হাতটা জড়িয়ে ধরে পাশে বসে পড়ে বলল, জানো দাদা, মনীষাদি কি বলল জানো?

সুহাস বোনের মুখের দিকে একবার তাকাল।

রুণু উচ্ছ্বাস প্রবণতায় বলে যেতে লাগল, মনীষাদি বলল, তোকে এখানে ভাল স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে লেখাপড়া শেখাবো। আর তোর বাড়ীর ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না। ওটা তোর দাদার আর আমার ওপর ছেড়ে দে।

হঠাৎ এ কথা শুনে চমকে উঠল সুহাস। কাকীমাকে সাহায্য করার কর্তব্যের পাশে মনীষা এসে অংশ গ্রহণ করবে, এ বরদাস্ত করতে রাজী নয় সে। এটা যেন মনীষার অনধিকার চর্চা বলে মনে হল তার। তাপসী আর শ্রীপতের সংসারের জীবনবোধ দেখে সে পালটে ফেলতে চেয়েছিল জীবনের ধারা। অপরের জীবনে আনন্দ ফুটিয়ে তুলতে যে কোন পরিশ্রমের কাছে পরাজয় স্বীকার না করে সে সার্থক করে তুলতে চেয়েছিল জীবনকে। তাই পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করার জন্যে গোবিন্দবাবুর দ্বারস্থ হতেও দ্বিধাবোধ করে নি। আর সেই জীবনের যাত্রাপথের প্রতিজ্ঞা-পাশে রুণুকে সে এনেছে, কাকীমাকে কিছু কিছু সাহায্য করেছে আর তাদেরই জীবনের আনন্দের তাগিদে সুহাস পরিশ্রম করছে, চিন্তা করছে, খুঁজে বেড়াচ্ছে এগিয়ে যাবার পথকে।

মনীষার কাছে সে এসেছিল সাহায্যের প্রত্যাশী হ'য়ে নয়। রুণুর ভাল লাগা পরিবেশে রুণু যাতে মানুষ হয়ে উঠতে পারে সেই আশা নিয়ে। সুহাস মনীষার কাছে রুণুকে ছেড়ে দিয়ে নিজেকে দায়িত্ব ও কর্তব্যমুক্ত করতে চায় না। সুহাস বুঝেছে উদ্দেশ্যহীনভাবে চলতে গেলে, তার জীবনের গতি রুদ্ধ হয়ে যাবে। হারিয়ে যাবে। হারিয়ে যাবে গতি ফিরে পাওয়া জীবনের ছন্দের সুর।

দাদাকে চুপ করে থাকতে দেখে রুণু বলল, তুমি ওখানকার কথা ভাবছো বুঝি? কে তোমায় দেখবে, কে রান্না করে দেবে? তার চাইতে একটা কাজ করো না। ওখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে এখানে থেকে অন্য একটা কাজ জোগাড় করে নাও না? কি হবে ঐ মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়িয়ে?

সুহাস এ কথার কোন জবাব দিতে পারল না। বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু ভাবল, এদের মত পরম নিশ্চিন্তে উচ্ছ্বাসের দিকে ছুটে যাওয়াটা জীবন নয়। রুণু সে কথা বোঝে না, হয়ত বোঝার মত মনের প্রকৃতি তৈরী হয়নি এখনও।

মনীষা এসে ঢুকল ঘরে। বলল, ভাই-বোনে বসে কোনো গভীর রহস্যের চিন্তা হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে যেন?

সুহাস একটু স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে বলল, না ঠিক তা নয়, তবে ভাবছি রুণুটাকে নিয়েই ফিরতে হবে আমাকে।

মনীষা মুখটা তুলে সুহাসের দিকে তাকাল।

সুহাস বলল, অন্য কিছু নয় মনীষা, তুমি যেন কিছু মনে কোর না। আমি ভাবছি, সেখানে আমার অসুবিধের কথা। কে আমাকে রান্না করে দেবে, কে দেখবে আমাকে?

মনীষা সহজ ভাবে বলে উঠল, ও চিন্তা এখন ছাড়ো। আমার এখানে যখন এসে প'ড়ছো এখন সব চিন্তা আমার। কি হবে, না হবে—কি করতে হবে, কি না করতে হবে, সে বুঝব আমি।

সুহাস অবাক বিস্ময়ে মনীষার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, এ কেমনতর কথা? মনীষা কি সুহাসের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে চায়? এমন কি তার চিন্তা-ধারাকে পর্যন্ত গ্রাস করতে চায় এখানে এসে পড়ার অপরাধে? কোন্ অধিকারের উপলব্ধিতে সে বলতে পারল, সুহাসের সমস্ত অনুভূতি, সমস্ত চিন্তার কর্তৃত্ব করার মালিক সে।

মনীষা সুহাসের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে আবার সহজভাবে বলল, নাও, ওসব ভাবনা চিন্তা এখন তুলে রাখো। এবার লক্ষ্মী ছেলের মত এসে খাওয়া দাওয়া সেরে নাও। পাশের ঘরে রুণু আর আমার বিছানা করে রেখেছি। রুণু শুয়ে পড়লে এ ঘরে এসে তোমার সঙ্গে সুখ দুঃখের একটু গল্প করে তারপর শুয়ে পড়বো।

খাওয়া শেষ হবার পর চুপসে থাকা মনটাকে জোড়া লাগাবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে সুহাস বসে বসে ভাবছিল, এতক্ষণ মনীষাকে ভালই লেগেছিল তার। চাপা আন্তরিকতার টানে চোখের অশ্রুবিন্দুগুলো যেন প্রভাতের শিশিরবিন্দুর মত মহৎ হয়ে চক্‌চক্ করে উঠতো তার জীবন পথে। আর এই মুহূর্তের মনীষা নিজেকে সহজ করে সুহাসের মনে ঢুকতে গিয়ে যেন ছোট করে ফেলল নিজেকে।

মনীষা ঘরে এসে বসল সুহাসের সামনাসামনি। তারপর সুহাসের উদ্দেশ্যে বলল, তুমি জানতে চাইছিলে আমার কথা, জানতে চাইছিলে মঞ্জুশ্রী নামের ইতিহাস? সবই জানাবো, সবই বলব তোমাকে। কিন্তু তার আগে বল তোমার কথা, বল এই দীর্ঘদিন কোথায় ছিলে, কি করতে তুমি?

এ উক্তির সঙ্গে সঙ্গে মনীষার মন থেকে যেন চাপা বেদনার একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

মনীষার অন্য একটা রূপ যেন খুলে গেল সুহাসের সামনে। সে রূপের সঙ্গে এতক্ষণ পর্যন্ত সুহাসের পরিচয় ছিলনা। একটা ব্যথার আন্তরিকতার সুর যেন দমিয়ে দিল সুহাসের চিন্তাগ্রস্ত মনকে।

সুহাস সুরু করল নিজের জীবনের কথা। গ্রাম থেকে চলে আসার পর জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করল সে। শেষে জীবনের বর্তমান পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করতেও ভুল করল না সুহাস।

বক্তব্য শেষ হতে সুহাস দেখল, মনীষার চোখ দিয়ে জল ঝড়ে পড়ছে।

একটু পরেই চোখের জল মুছে ফেলে মনীষা বলল, সুহাস তুমি এখানেই থেকে যাও, আমাকে ছেড়ে তুমি চলে যেও না।

অলস মনটাকে মনীষার দিকে একবার তুলে ধরল সুহাস।

মনীষা বলে যেতে লাগল, তুমি চলে আসার পর তোমার নাম জড়িয়ে আমার সম্বন্ধে এমন সব কথা রটাতে লাগল তোমার জ্যাঠাইমা, যে আমার বাবা সে সব শুনে শুধু শুকিয়ে শুকিয়ে মারা গেলেন কিছুদিন পরে। তখন আমার অসহায় অবস্থার কথা বুঝতেই পারো? কেউ নেই আমার পাশে যাকে অবলম্বন করে অন্ততঃ একটু দাঁড়াতে পারি। এই নিরুপায় হয়ে অনেক ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত কোলকাতায় আমার এক দূর সম্পর্কের কাকার কাছে চিঠি লিখলুম। তিনি চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে কোলকাতায় নিয়ে এলেন সঙ্গে করে।

তাঁর সংসারে খুব অভাব বলে তিনি আমাকে দিয়ে চাকরী করাবার মনস্থ করে বিভিন্ন জায়গায় আমাকে নিয়ে ঘুরতে লাগলেন। কিছুদিন পরে বুঝলাম কাকা আমাকে নিয়ে বিভিন্ন লোকের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়ে কিছু কিছু রোজগার করছেন। তারপর চাকরীর নাম করে নানা ধরণের লোকের সঙ্গে আমাকে ঘুরতে দিয়ে তিনি রোজ-গারের মাত্রা আস্তে আস্তে বাড়াতে লাগলেন।

এইভাবে চলতে চলতে একজন মাড়োয়ারীর সাক্ষাৎ পেলুম জীবনে। ভদ্রলোক বিপত্নীক। অগাধ সম্পত্তির মালিক। আমি নাকি অবিকল তার স্ত্রীর মত দেখতে। তাই সে খুব ভালবেসে ফেলল আমাকে। স্ত্রীর নাম ছিল মঞ্জুশ্রী। সেই নামে আমাকেও সে ডাকতে সুরু করল। আমার থাকার জন্যে এই বাড়ীটা তৈরী করল সে। নাম

দিল 'মঞ্জুশ্রী লজ'। তারপর কিছুদিন হল ভদ্রলোক মারা গেছেন। এখন আমি তার সমস্ত সম্পত্তির মালিক।

বলে, মনীষা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সুহাসের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার জীবনী শুনে আমার ওপর খুব ঘৃণা হচ্ছে, না সুহাস? কিন্তু বিশ্বাস কর জীবনে ভালবাসার যে খেলাই খেলে থাকি না কেন, তোমাকে একটা মুহূর্তের জন্যেও মন থেকে দূরে সরাতে পারিনি।

তারপর একটু চুপকরে থেকে সে আবার বলল, কেন সরাতে পারিনি জানো? কারণ জীবনের প্রথম চেতনায় আমার অনুভূতি তোমার অস্তিত্বকে ঘিরে থাকতো বলে। আর মনে মনে তোমাকে ভালবেসেছিলাম বলে।

সব শুনে সুহাস বলল, কিন্তু তোমার এ জীবনকে আমি মেনে নিতে পারলাম না মনীষা। এখন দেখছি তোমার আর আমার জীবনের ধারা সম্পূর্ণ আলাদা। তুমি বাঁচতে গিয়ে মরতে পারনি, তলিয়ে দিয়েছো জীবনকে। তাই ঐশ্বর্যের সুখ এসে ধরা দিয়েছে তোমার কাছে।

—দেখো সুহাস এটা হচ্ছে ভেঙ্গে যাবার যুগ। অভাব আর অসহায় অবস্থা মানুষকে যে কোথায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাচ্ছে সে ধারণা তোমার নেই। আমি যখন চাকরীর জন্যে এক অফিসারের কাছ থেকে অন্য অফিসারের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তখন আমার মত কত অসহায় মেয়ে যে এইভাবে চাকরী পাবার নামে কত অবাঞ্ছিত জীবন যাপনের বিনিময়ে সংসার চালাচ্ছে দেখেছি, তার ইয়ত্তা নেই। তাছাড়া অভাবের জন্যে কত-শত রকমের ঘটনার সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘটছে তা বলে শেষ করা যাবে না। তাই বলছিলাম এটা হচ্ছে ভেংগে যাবার যুগ। এ যুগে যে কোন উপায়ে বাঁচার জন্যে দাঁড়াতে হবে।

সুহাস বলল, এর নাম বাঁচাও নয়, এর নাম জয়লাভ করাও নয়। এটা হল জীবনযুদ্ধের সব চেয়ে বড় পরাজয়। এ জীবনকে গড়তে গিয়ে তলিয়ে না গিয়ে, মান সম্ভ্রম ইজ্জৎ নষ্ট না করে, যদি কেউ নিঃশেষে জীবন দান করতে পারতো, বলতুম সে জিতেছে। এ পথে গিয়ে কেবলমাত্র উদর পূর্তির প্রয়োজনে কেউ যদি বাঁচাকে বড় বলে মনে করে থাকে, তার মত অপমৃত্যু আর দ্বিতীয় নেই।

—কিন্তু এই পথেই আজকাল সকলে আনন্দে এগিয়ে যাচ্ছে।

—অতি সহজ পথ বলে। এ পথে যেয়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়া অতি সহজ। কিন্তু এ পথে না গিয়ে আদর্শের জন্যে অভাব, দারিদ্র্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তিলে তিলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে নেওয়া অত সহজ কাজ নয়। তাই আমিও বলছিলাম, এর মত পরাজয় আর দ্বিতীয় নেই।

এরপর মনীষা আর কোন কথা বলল না। আঁচল দিয়ে অলক্ষ্যে চোখ দু'টো মুছে নেবার চেষ্টা করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সুহাস শুয়ে পড়ল বিছানায়। তার মনে হল মনীষা সত্য কথাই বলতে পেরেছে। এ যুগ হল ধ্বংস হবার প্রস্তুতির যুগ। তাই তো এ যুগের বুকের ওপর সদম্ভে দাঁড়িয়ে গো বন্দবাবু ঐতিহাসিক গবেষণার ফলাফল গদ্‌গদ ভাবে জানাতে গিয়ে বলতে পেরেছিলেন, এটা হচ্ছে সিমেণ্টের যুগ। জ্যোতিষী সোমনাথবাবুর নীতি অনুসারে এটা হল কাচের যুগ, কুলির ভাষায় লরী জীবনের এটা হল বোসবাবুর ছাগল চুরির যুগ। মনীষার উক্তিতে মনে হল, এটা হচ্ছে অভাবের হাটে মেয়ে বিক্রীর যুগ। কিন্তু ভবনাথবাবু বা কেদারমাষ্টার বলতে পারবেননা এটা কিসের যুগ। এ যুগের উচ্চ কণ্ঠের দাপটের কাছে ম্লান হয়ে যাবে পরিবর্তনের পথের শ্রীপতের যুগ, ম্লান হয়ে যাবে সুখনা ডোমের বংশধরদের এগিয়ে চলার প্রস্তুতির যুগ।

[ক্রমশঃ]

বসন্তরোগ ঃ উচ্ছেদ পরিকল্পনা

ডাঃ রমেশচন্দ্র আচার্য্য

সহঃ স্বাস্থ্য অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ

স্মরণাতীত কাল থেকে বসন্ত রোগ সমস্ত বিশ্ব-মানবের জীবনে বিভীষিকার সৃষ্টি করে আসছে। নানা ভাবে মানুষ এই মারাত্মক রোগের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য পথ খুঁজেছে। কাজে লাগিয়েছে নিজেদের অভিজ্ঞতাকে। তাই ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাই,… এই রোগের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য মানুষের বিচিত্র পন্থার উদ্ভাবন।

স্বেচ্ছায় সন্তানকে বসন্তরোগীর সান্নিধ্য এনে তাকে ছেলেবেলায় বসন্তরোগাক্রান্ত করা, যাতে বেশী বয়সে না এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। কারণ বসন্ত সম্বন্ধে তারা এ' অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন যে,…বেশী বয়সে বসন্তরোগ হলে অত্যন্ত মারাত্মক হয়, এবং আরও উপলব্ধি করেছিলেন যে, একবার বসন্ত হ'লে তার দ্বিতীয়বার হবার সম্ভাবনা থাকে না। থাইল্যাণ্ড ও চীনের অধিবাসীরা প্রত্যক্ষ করেছিল যে,…বসন্তরোগীর রক্ত, পুঁজ ও মামড়ী নাকে লাগলে, যে বসন্ত রোগ দেখা দেয় তা স্থানীয় অসুখ,…সারা শরীরে ছড়িয়ে পরে না। মহামারীর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ঐ সব দেশে এই প্রথারও প্রচলন ছিল শরীরে গো' বসন্ত দেখা দিলে আসল বসন্তের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়,…এ' অন্ধ ধারণা মানুষের মধ্যে ছিল।

ইংলণ্ডে ডাঃ জেনার এই অন্ধ ধারণাকেও কাজে লাগিয়েছিলেন। ১৭৭৮ সালে যে সত্য ডাঃ জেনার আবিষ্কার করেছিলেন,…তার প্রায় একশ বছর পরে ডাক্তার লুই পাস্তর এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে কাজে লাগিয়ে বসন্তরোগের একমাত্র প্রতিষেধক টিকার প্রচলন করলেন।

বসন্তরোগের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক টিকা পাশ্চাত্য দেশের জনসাধারণের নিকট অভিনন্দিত হলো। ব্যাপক টিকা নেবার ফলে, বর্তমানে ঐ সব দেশে এই রোগ নেই বল্লেই চলে। আমাদের দেশেও টিকার প্রচলন করা হলো। কিন্তু জনসাধারণ একে প্রথমে সহজভাবে গ্রহণ করতেই পারল না, তাঁদের ধারণা বসন্ত রোগ ভগবানের অভিশাপ, এর জন্য মানুষের কিছু করার নেই। সাহায্য নেওয়া হলো আইনের।

১৮৮০ সালে প্রণয়ন করা হলো 'বেঙ্গল ভ্যাক্সিনেশান অ্যাক্ট'।…এই আইনে শিশুকে ৬ মাসের মধ্যে বসন্তের টিকা দেবারব্যবস্থা হলো, ১৮৮৫ সালে আর একটি আইনে পুনর্বার টিকারও প্রচলন করা হলো। ১৮৯৭ সালে "ইণ্ডিয়ান এপিডেমিক ডিজিস Disease) আইনও প্রণয়নও করা হলো। কিন্তু তাতেও মহামারীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেলো না। প্রতিবছরই বহুলোক এই মারাত্মক রোগে প্রাণ হারাতেন। তাই স্বাধীনতার পর ১৯৫` এবং ১৯৫৮ সালে যখন দুই দু'বার বসন্ত মহামারী রূপে দেখা দিল, তখন ভারত সরকার এই মারাত্মক রোগকে চির-দিনের তরে নির্মূল করার জন্য 'জাতীয়' বসন্ত নির্মূলকরণ পরিকল্পনা' গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হলো, একযোগে সমস্ত প্রদেশগুলিতে বসন্ত রোগের প্রতিষেধক প্রাথমিক ও পুনর্বার টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা। অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত জনগণকে টিকা দিতে পারলে, বসন্তের বীজ অরক্ষিত লোকের অভাবে নিজেই মরে যাবে। এই পরিকল্পনা বাংলাদেশে চালু হয়েছে ১৯৬২ সালে নভেম্বর মাসে। আমাদের দেশেও টিকা নেবার ফলে পূর্বের চাইতে বর্তমানে এই রোগে মৃত্যুহার অনেক হ্রাস পেয়েছে,… কিন্তু অন্যান্য দেশের ন্যায় বসন্তরোগ উচ্ছেদ করতে এখনও আমরা সক্ষম হইনি। তাই, প্রতিবছর জনগণকে টিকা নেওয়ার ব্যাপারে সচেতন করার জন্য আমরা ৬ই নভেম্বর থেকে একটি সপ্তাহ 'বসন্তরোগ উচ্ছেদ সপ্তাহ' হিসেবে পালন করে থাকি। ঐ সপ্তাহ পালনের উদ্দেশ্য হ'লো

জনগণকে, বসন্তরোগের ভয়াবহতা সম্বন্ধে সজাগ করা, অরক্ষিতদের টিকা নেওয়ার জন্য সচেতন করা এবং এই উচ্ছেদ পরিকল্পনাকে সার্থক করার জন্য সরকারের যে কর্ম প্রচেষ্টা চলেছে, তাতে জনগণকে সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানানো।

আমাদের দেশে বর্তমানে বসন্তরোগ মহামারীরূপে দেখা না দিলেও, প্রতিবছর এখনও বহুলোক এই রোগে প্রাণ হারান। এই রোগে আক্রান্ত হয়েও যাঁদের জীবন রক্ষা পায়, তাদের কারও ঘটে আঙ্গিক বিকৃতি কারো বা অন্ধত্ব। তারা হারান ভবিষ্যতের সমস্ত আশা ভরসা, হয়ে পড়েন অকর্মণ্য, অক্ষম ও পরমুখাপেক্ষী,...পরিবার ও সমাজের ভারস্বরূপ।

মনে রাখা দরকার, কোন ব্যক্তিই বসন্তরোগের আক্রমণের সম্ভাবনা থেকে মুক্ত নয়। যে কোন বয়সের যে কোন লোকেরই এই রোগ হতে পারে। এই মারাত্মক রোগের হাত থেকে রেহাই পাবার একমাত্র উপায় হলো প্রতি তিন বছর অন্তর নিয়মিত টিকা নেওয়া। এবং নবজাত শিশুকে জন্মের পরই টিকা দেওয়া। প্রাথমিক টিকা দেবার পর শিশুর জ্বর হতে পারে, কিন্তু তাতে ভয় পাবার কিছু নেই।

প্রাথমিক টিকার পর প্রতি তিনবছর অন্তর টিকা নিলেই চলে।

কোন রোগ উচ্ছেদ পরিকল্পনাই জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া সফল হতে পারে না। প্রতি তিনবছর অন্তর টিকা নেওয়া, প্রাথমিক টিকা দেওয়ার সাতদিন পরে জনস্বাস্থ্য কর্মীরা টিকার সফলতা পরীক্ষা করার জন্য বাড়ীতে বাড়ীতে যান, তাদের টিকা পরীক্ষা করতে দেওয়াও আমাদের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত। আইনের শক্তির চেয়ে সামাজিক অনুশাসন অনেক বড়। অরক্ষিতদের এই কথাই বোঝাতে হবে যে, তারা টিকা না নিয়ে শুধু নিজের নয়, অন্য সকলেরও বিপদ ডেকে আনছেন। আর কারো যদি বসন্ত হয় তবে তা গোপন না করে, জনস্বাস্থ্য কর্মী, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, জনস্বাস্থ্য অফিস প্রভৃতি যে কোন জায়গায় খবর দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি আমাদের জীবনে এনেছে দুর্বার গতি। ছ' সপ্তাহের পথ আজ আমরা ছ' ঘণ্টায় যেতে পারছি। পৃথিবীর কোন প্রান্তই আজ আর নাগালের বাইরে নয়। কাজেই কোন রোগকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করতে হলে সমস্ত দেশ থেকে তাকে উচ্ছেদ করতে হবে।

তাই আজকের দিনে ব্যক্তিগত ও সংগে সংগে জাতীয় স্বার্থরক্ষার জন্য আমরা সংকল্প গ্রহণ করবো,...নিয়মমত এবং সময়মত টিকা নিয়ে প্রতিটী নবজাত শিশুকে প্রাথমিক টিকা দিয়ে, আর অন্যকে টিকা নেওয়া সম্বন্ধে সচেতন করে এই মারাত্মক রোগকে চিরদিনের মত দেশ থেকে নির্মূল করবো। এবং এই ভাবেই আমাদের দেশকে জগতের অন্যান্য দেশের সমপর্যায়ে আনবো। তা' হলেই আমাদের এই সপ্তাহ পালনের সার্থকতা সম্পূর্ণ হবে।

———
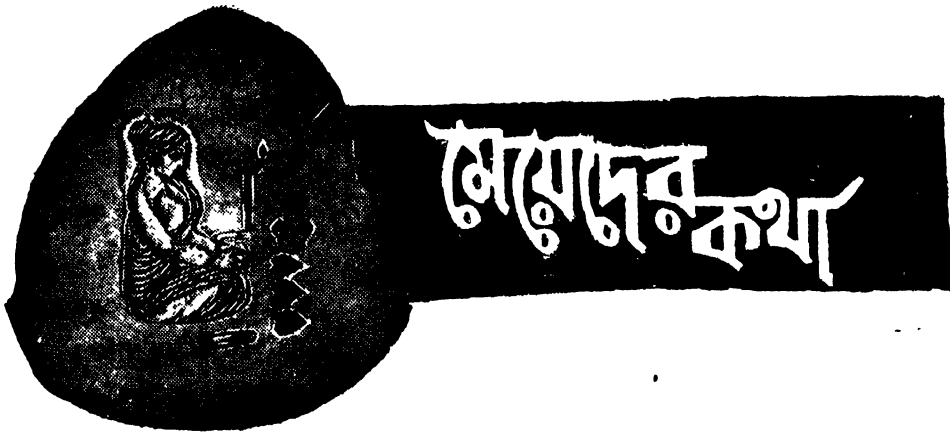
রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী

লীলা বিদ্যান্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

'রাজা ও রাণী' বইতে কবি মহীয়সী নারী ও কামনা-উন্মত্ত পুরুষের দ্বন্দ্বের কথা বলেছেন। অনেক সময় পুরুষের চিত্ত নারীর সৌন্দর্য্যে এমন অভিভূত হয়ে পড়ে যে সে তখন প্রচণ্ড প্রেমের উন্মত্ত আবেগে জগৎ সংসারকে ভুলে যায় কিন্তু মহীয়সী নারী তার প্রেমের মধ্যে সংসারের কল্যাণ কামনা করে। একজনকে ভালোবেসে সে তার চারপাশের সংসারের মানুষকে ভালোবাসতে আরম্ভ করে। কিন্তু পুরুষ যদি মহীয়সী নারীর এই ভালবাসার ব্যাপ্তিকে প্রতিহত করে, তাকে একমাত্র নিজের বিলাসের মধ্যে টেনে আনতে চায়, তাহলে নারীর প্রেম ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। দুজনার মধ্যে জেগে ওঠে দ্বন্দ্ব। রাণী সুমিত্রা রাজা বিক্রমকে ভালোবাসে, কিন্তু এই ভালোবাসার মধ্যে মিশে আছে প্রজাদের জন্যে মঙ্গল কামনা। সে তার প্রেমের গৌরব তখনি উপলব্ধি করবে যখন তার প্রেমের অনুরোধে রাজা প্রজাদের দুঃখের প্রতিকার করবে। চারদিকের দুঃখ দুর্দশার প্রতি উদাসীন থেকে শুধু প্রেমের বিলাস নিয়ে তৃপ্ত থাকতে সে পারে না। কিন্তু রাজার কামনা, আসক্ত, উন্মত্ত, উদ্‌ভ্রান্ত, উদগ্র। রাজার চোখে সংসারের অন্য সবার সুখ দুঃখ তুচ্ছ হয়ে গেছে। রাজা চায় রাণীর ওই পরমাশ্চর্য্য রূপের অতলে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হতে, সমস্ত দায়, সমস্ত কর্ত্তব্য ভুলে যেতে। রাণীর আত্মীয়দের এনে সে বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত করে, মনে করে এমনি করে রাণীকে গৌরব দেওয়া হল। সেই নির্মম অত্যাচারে প্রজারা যখন কাঁদে, তখন রাণীর মন তাদের জন্য আকুল হয়ে ওঠে। রাণী যখন প্রজাদের দুঃখের আবেদন নিয়ে রাজার কাছে যায় রাজা তখন রাণীকে আহ্বান করে প্রেমের উৎসবের জন্যে তার বিলাস উদ্যানে। সে আহ্বানে রাণী সাড়া দিতে পারে না। প্রেম যেখানে কল্যাণের মধ্যে সার্থক হয়নি সে প্রেমে মহীয়সী নারীর তৃপ্তি নেই। সংসারের পাওনা মিটিয়ে সংসারের কল্যাণে নিয়োজিত করে তারপর প্রেমের বিলাসে রাণী আত্মদান করতে পারত। সংসারের কান্নাকে দূরে ঠেকিয়ে রেখে রাজ-উদ্যানের বিলাসে গা ভাসিয়ে দেবার যে অমঙ্গল তার থেকে রাণী রাজাকে বাঁচাতে চায়।

অবশেষে রাজার এই তীব্র আসক্তির অকল্যাণ থেকে তাকে উদ্ধার করবার জন্যই রাণী সুমিত্রা আগুনে আত্মাহুতি দিল। কখনো বা নারীরও প্রেমের আবেগে ধর্ম ভুলে যায়। তখন তার জীবনে আসে অভিশাপ। রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের সমালোচনা করে বলেছেন, কণ্বমুনি আশ্রমের অতিথি সেবার ভার

শকুন্তলাকে দিয়ে তীর্থে গেছেন, তখন দুষ্মন্তের চিন্তায় বিভোর আত্মবিস্মৃতা শকুন্তলা অতিথির আগমন জানতেই পেল না। সখীরা বলল, ও এখন নিজেকেই জানে না, তো অতিথির আগমন কি করে জানবে! প্রেম যেখানে কর্ত্তব্যের বিচ্যুতি ঘটায় তখন সে চারিদিকের প্রতি-কূলতাকে জাগিয়ে তোলে। কবি রাত্রে ও প্রভাতে নারীর দুইরূপ দেখেছেন। রাত্রে যে ছিল প্রেয়সী প্রভাতে সেই দেবী হয়ে দেখা দেয়। যে নারী রাত্রে পুরুষের সমস্ত বিলাসে আত্মসমর্পণ করেছিল প্রভাতে সে পূজার ডালি নিয়ে চলেছে দেব-মন্দিরের পথে। তখন তার এই সদ্যঃস্নাত পবিত্র রূপ দেখে পুরুষ আর তাকে বিলাসের সঙ্গিনী বলে ভাবতে পারে না—তাকে মনে হয় দেবী। তখন পুরুষ দূর থেকে ভক্তি নিয়ে তাকে দেখে। কবি লিখেছেন—

কালি মধুযামিনীতে
জ্যোৎস্না নিশীথে
কুঞ্জ কাননে সুখে
ফেনিলোচ্ছল যৌবন সুরা
ধরেছি তোমার মুখে।
তুমি চেয়ে মোর মুখ পরে
ধীরে পাত্র লয়েছ করে
হেসে করিয়াছ পান
চুম্বন ভরা সরস বিম্বাধরে।
আমি শিথিল করিয়া পাশ
খুলে দিয়েছিনু কেশরাশ
তব আনমিত মুখখানি
সুখে থুয়েছিনু বুকে আনি
তুমি সকল সোহাগ সয়েছিলে সখী,
হাসি মুকুলিত মুখে।
কালি মধুযামিনীতে
জ্যোৎস্না নিশীথে
কুঞ্জ কাননে সুখে।

... ...

রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরী
প্রাতে কখন দেবীর বেশে
তুমি সমুখে উদিলে হেসে
আমি সম্ভ্রম ভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে
দূরে অবনত শিরে।
এই নির্ম্মল বায়ে শান্ত উষায়
জাহ্নবী নদী তীরে।
তুমি বাম করে লয়ে সাজি
কত তুলিছ পুষ্পরাজি
দূরে দেবালয়-তলে মধুর রাগিণী
বাঁশিতে উঠিছে বাজি।

যৌবনের কুঞ্জবনে যে দিন রাত্রে প্রেয়সী, জাহ্নবী তীরে প্রভাতের পুণ্য বাতাসে সেই দেখা দিল দেবী হয়ে। রাত্রে যে পান করেছিল যৌবন মদিরার উচ্ছল পাত্র পুরুষের হাত থেকে, প্রভাতে সে যে চলেছে দেব মন্দিরের পানে ডালি ভরে পূজার ফুল তুলে নিয়ে। এই দেব মন্দির, এই পূজা হ'ল নারীর সংসারের কল্যাণ কাজ সকাল হতে নারী আরম্ভ করে সংসারের কাজ। তা লক্ষ্য সংসারের সবার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান। কবি এক জায়গায় লিখেছেন—ভোরবেলা ঘরের দুয়ার প্রথম খোলে নারী, সংসারের সেবা দিয়েই তার দিন আরম্ভ হয়। কবি ভোর বেলায় সংসারের সেবায় নিয়োজিত নারীকে দেবী রূপে দেখেছেন। তখন সে আর পুরুষের বিলাসে সঙ্গিনী নয়। তখন সে সংসারের কাজে মানুষের কল্যাণে আপনাকে উৎসর্গ করে দিয়েছে। সেই উৎসর্গীকৃ পবিত্রতাকে তখন আর কেউ নিজের ভোগের জিনিষ বলে ভাবতেই পারে না। প্রভাতে নারীর এই রূপকে কবি দূর থেকে সম্ভ্রম জানিয়েছেন। আবার এই পূজারিণী পুরুষকেও তার সুখ থেকে বঞ্চিত করেনি। জ্যোৎস্না রাতের মোহময় আলো অন্ধকারের স্বপ্ন-সায়রে সে পুরুষের সঙ্গে আনন্দে অবগাহন করেছে পুরুষের যৌবনাবেগের সমস্ত চপলতা সে হাসি মুখে সহ্য করেছে। কবি নারী মধ্যে একাধারে প্রেয়সীকে ও দেবীকে দেখেছেন। প্রেয়সী রূপে যে পুরুষকে ধন্য করেছে, দেবীরূপে, কল্যাণীরূপে সে সংসারকে ধন্য করেছে। আর এই দুই রূপেই সে মু করেছে কবিকে।

পুরুষ যখন সংসারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, শত্রুতা এসবের মধ্যে যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন সে ঘরে ফিরে এ

সান্ত্বনা পায় নারীর কাছে। তার যত মনের গ্লানি তা দূর হয়ে যায় কল্যাণী নারীর শুশ্রূষায়। নারী যেন তার গা থেকে মল্লভূমির যত ধুলো সব ধুয়ে মুছে দেয়। বাইরের পৃথিবী মানুষকে যে আঘাত করে তার সমস্ত গ্লানি পুরুষ ভুলে যায় অন্তঃপুরের কল্যাণী নারীর সান্নিধ্যে। আশা-নিরাশা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতা, প্রতিপক্ষের হাতে পরাজয় এই সব দিয়ে যখন জীবন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন নারী আপন হৃদয়ে ভালোবাসার সুধা দিয়ে যেন সেই সব ছিন্ন জীবনের মাঝে জোড়া লাগিয়ে দেয়। পুরুষের জীবনে অনেক বোঝাবুঝি, অনেক খোঁজাখুঁজি, তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। তার কেবলই দুরাশায় পেছনে ছোটা, তার কেবলই ঐশ্বর্য্যের সন্ধান, কেবলই আয়োজন নাম খ্যাতি কীর্তি পুঞ্জিত করে তোলা। কিন্তু এই সব-কিছু আয়োজন যা পুরুষ জোগাড় করে আনে তা সবই ব্যর্থ হত যদি না তার গৃহের কল্যাণী নারীর হাতে এ সমস্ত আয়োজন কল্যাণরূপে দেখা দিত। পুরুষ খ্যাতি, কীর্তি, ঐশ্বর্য্য সংগ্রহ করে আনে নারী পুরুষের ঐশ্বর্য্য তার খ্যাতি থেকে অহংকারের দাহ দূর করে দিয়ে তাকে মানুষের কল্যাণে স্নিগ্ধ করে আনে। তাই নারীর হাতে পুরুষের ঐশ্বর্য্য তার খ্যাতি ও কীর্তি সার্থক ও সুন্দর হয়ে ওঠে। নারী না থাকলে পুরুষের ঐশ্বর্য্য, খ্যাতি ও কীর্তি শুধুই—আয়োজনের জঞ্জাল হয়ে থাকত। তাতে কারো কোন লাভ হ'ত না। সে সংসারের কল্যাণে লাগত না। পুরুষ যখন খ্যাতি ও অখ্যাতির হাটের মাঝে থেকে তার নির্জন ঘরে ফেরে তখন নারী তার সান্ত্বনার তীর্থ-জল দিয়ে তাকে স্নিগ্ধ করে দেয়। বাইরের সংসার যেন হাট, যেন মেলা, সেখানে নানা লোকের নানা রকম ভীড়। সেই হাটের ভীড়ে দেহ মন ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সারাদিনের ক্লান্তির পরে ঘাটের স্নিগ্ধজলে স্নানের যে আনন্দ ঘরে ফিরে এসে নারীর স্নিগ্ধ হৃদয় মানুষকে সেই তীর্থস্নানের আনন্দ ও স্নিগ্ধতা দান করে। এই রকম কথাই বলেছেন কবি মধুসূদন তার 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে, যেখানে তিনি লিখেছেন মেঘনাদ ও প্রমীলার কথা। মেঘনাদ যেন মদমত্ত হাতী। বিধাতা যেন জগৎকে তার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে প্রমীলাকে সৃষ্টি করেছেন, সে যেন মেঘনাদকে বাঁধবার শেকল। মেঘনাদ যেন বিষধর কালো সাপ, প্রমীলা যেন স্নিগ্ধ সুগন্ধি যমুনার জল। সেই যমুনার জলে নিমগ্ন রয়েছে বলেই, কালসাপের হাত থেকে সংসার নিরাপদে বাস করছে। পুরুষের প্রকৃতির মাঝে আছে হিংস্রতা, আছে উগ্রতা, আছে আঘাত করবার ইচ্ছা। নারী এই উগ্রতাকে স্নিগ্ধ করে আনে। পুরুষের যে বীর্য্য সংসারের ক্ষতি করতে পারত, নারী সেই বীর্য্যকে সংসারের কল্যাণে নিয়োজিত করে।

কল্যাণী গৃহিণী নারীর সিঁথির সিঁদুর, তার স্নিগ্ধ হাসিমাখা চাঁদের মত সুন্দর মুখ, মানুষের নির্জন ঘরের নিরালাকে সার্থক করে, সুন্দর করে তোলে।

যে মানুষের আপনার ঘর নেই, সে সংসারের মাঝে প্রবাসীর মত, পথে পথে ফেরে, জীবনের শ্রান্তি যাকে খিন্ন করে তুলেছে, যার জন্যে ঘরের স্নেহ-ছায়া নেই, যার মাথার ওপরে সংসারের নিষ্করুণতা যেন প্রখর সূর্য্য তাপের মতই বর্ষিত হচ্ছে, তাকে নারী আপন ঘরের সান্ত্বনার মধ্যে ডেকে আনে। নারী যেন মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়ে প্রবাসী, গৃহহারা পথিককে আপনার ঘরের মধ্যে বরণ করে আনে। আনন্দহীন, গৃহহীন প্রবাসীকে নারী আপন গৃহে আনন্দের মধ্যে ডেকে আনে। আনন্দময়ী নারী নিরানন্দ নিরাশ জীবনে আনন্দ ও আশার সঞ্চার করে।

যে দিন এই সংসার থেকে বিদায় নেবার দিন আসে, সে দিনও নারীর অশ্রুই মানুষের শেষ পথের পাথেয় জোগান দেয়। মানুষের শেষ বিদায়ের পথকে নারীর অশ্রুকাতর সজল দৃষ্টি স্নিগ্ধ করে রাখে। নারী বিদায় পথের যাত্রীকে তার ব্যাকুল বাহু বন্ধনে বেঁধে বিলাপ করতে থাকে। বিষাদময়ী নারীর সেই বাহুর স্পর্শ—মানুষের জীবনের শেষ মুহূর্তটিকে ধন্য করে দেয়। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত নারীর ভালোবাসা মানুষের জীবনকে স্পর্শ করে তাকে ধন্য করে। তারপরে, মৃত্যুর পরেও পুরুষের যে তর্পণের জল তাও দেয় নারী। সে দিন নারীর ঘর নির্জন, তার শয্যা সঙ্গহীন, শূন্য। সে তখন যে চলে গেল তারি স্মৃতিকে পূজার বেদীতে বসিয়ে তার জন্যে তার অন্তরের পূজার প্রদীপ জ্বালিয়ে বসে থাকে। একদিনের প্রেম সে দিন পূজার প্রদীপ হ'য়ে জ্বলতে থাকে। সেদিন নির্জন গভীর রাতে নারী তার নির্জন কক্ষে প্রাণের বেদনাকে উন্মুক্ত করে দেয়। সেদিন তার

প্রসাধন নেই, সে চুল বাঁধেনি, খোলা এলোচুলে, নিরাভরণ দেহে, সাদা কাপড় পরে সে হারিয়ে-যাওয়া প্রিয়জনের স্মৃতি নিয়ে মনে মনে পূজা করতে থাকে। সেদিন নারী তপস্বিনীর মতই সমস্ত সাজ সজ্জা, সমস্ত ভোগসুখ বিসর্জন দিয়ে জীবন-যাপন করে। যে চলে গেছে তার স্মৃতিপূজাই তার একমাত্র ধ্যানের বিষয় হয়ে থাকে। তাই মৃত্যুর পরেও পুরুষের আত্মা নারীর প্রেমে তৃপ্তি লাভ করে। মৃত্যুর পরেও নারীর পূজা যেন পুরুষের আত্মাকে অন্নজল যোগান দেয়। তাই আত্মার তর্পণের জল নারীই দেয় পুরুষকে। সংসারে আর সবাই মৃতের জন্যে শোক ভুলে যায়, একমাত্র নারীই তার স্মৃতিকে পূজার বেদীতে বসিয়ে চিরদিন ধরে পূজা করে। নারী তার জন্যে সংসার ত্যাগিনী ও তপস্বিনী হ'য়ে দিন কাটায়। (উৎসর্গ—৪৩, ১০ সঃ)

[ক্রমশঃ]

সুপর্ণা দেবী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গত সংখ্যায় বলেছি—মেয়েদের পেটের গঠন-সৌষ্ঠব যাতে সুন্দর থাকে, তলপেটে অযথা মেদ-বাহুল্যের ফলে, কুশ্রী কদর্য না দেখায়, পাকস্থলীর সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখা যায় এবং দেহের সুঠাম-ছাঁদ ও লাবণ্য-শ্রী দীর্ঘস্থায়ী করে তোলা সম্ভব হয়, তারই উপযোগী বিশেষ ধরণের কয়েকটি সহজ-সরল ঘরোয়া ব্যায়াম-বিধির কথা। এবারে আলোচনা করছি তেমনি-ধরণেরই কয়েকটি পিঠের ব্যায়াম-বিধির প্রসঙ্গ।

পাশ্চাত্য-জগতের অভিজ্ঞ-বিচক্ষণ আধুনিক রূপচর্চ্চা-বিশারদ এবং চিকিৎসকেরা অভিমত প্রকাশ করেন যে "Women are the backbone of the nation"... অর্থাৎ, মেয়েরা মায়ের জাত—বংশের মা, সমাজের মাতা, জাতির জননী। মায়ের স্বাস্থ্যে সন্তানের স্বাস্থ্য, সমাজের স্বাস্থ্য, জাতির ও দেশের স্বাস্থ্য। কাজেই নারীর দেহ সুস্থ-সৌন্দর্য্যে গড়ে ওঠা চাই সর্ব্বতোভাবে। কারণ, তার উপর সমাজ-দেহের সুস্থতা, জাতির ও দেশের ভবিষ্যৎ-উন্নতি নির্ভর করে বিশেষভাবে। অথচ, এ বিষয়ে আমরা নিতান্তই উদাসীন ও অচেতন। তাই বাঙলার অন্তঃপুর আজ অস্বাস্থ্যের হাওয়ায় ভরে গেছে...নারীর রূপে কালিমা-রেখা, দেহে নাই সুঠাম-সৌন্দর্য্যের লালিত্য মাধুরী ·বাঙালার নারী আজ আর—"লক্ষ্মীরিয়ং অমৃতবর্ত্তির্নয়নয়োঃ" হয়ে সংসারে বিরাজিতা নন্!

এই কারণেই বাঙলার নারী-সমাজকে রূপচর্চ্চা এবং স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলার আশায় আমাদের এত সব প্রসঙ্গালোচনার প্রয়াস। নারীর দেহ চর্চ্চা সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যে সব হদিশ দিয়েছি, তারই সূত্র টেনে এবারে বলছি—পিঠের ব্যায়াম বিধির কথা কারণ, মেয়েদের বুক ও পিঠ অসুন্দর বাঁকা আর বেয়াড়া ছাঁদের হলে, রূপ লাবণ্য এবং স্বাস্থ্য রক্ষা করা চলে না। পিঠের সু-ছাঁদের উপর শুধু বুকের গঠন নির্ভর করে না, পিঠের সুছাঁদের উপর নির্ভর করে শরীরের স্বাস্থ্য। তাই নিত্য নিয়মিতভাবে পিঠের গঠন সৌষ্ঠব ও স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী বিশেষ ধরণের কয়েকটি ব্যায়াম চর্চ্চার প্রয়োজন আছে।

পিঠ যদি সুছাঁদে গড়ে ওঠে, তাহলে যে বেশভূষাই করা যাক না, রমণীয়তার আর অন্ত থাকবে না, অমনোযোগিতা, উদাসীনতা এবং অবহেলার ফলে আমাদের দেশের মেয়েদের অনেকেরই পিঠ এমন বিশ্রী ছাঁদে গড়ে ওঠে যে পিঠকে কুঁজো আর পুঁটলির মতো বেয়াড়া কুৎসিত মনে হয়। সেলাই করতে, লিখতে-পড়তে, এমন কি ঘর-সংসারের কাজকর্ম সারতে অনেকে কুঁজো হয়ে বসেন...এ বদভ্যাসের ফলে, পিঠের হাড় যায় বেঁকে, দেহের শ্রী বিনষ্ট হয় এবং অকালেই জীর্ণ হয়ে ওঠে দৈহিক স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য। কাজেই লেখাপড়া, সেলাই রন্ধনাদি গৃহকর্ম্ম করবার সময় পিঠ, বুক, ঘাড় ও মাথা যথাসম্ভব খাড়া সিধা সটান রাখা কর্ত্তব্য—দেহের

এ সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন কদাচ অযথা বাঁকাচোরা কিম্বা ঝুঁকে না থাকে—সেদিকে সজাগ নজর রাখা চাই। সচরাচর উৎসাহের অভাব, অবসাদ, শ্রান্তি, দুর্ব্বলতা—এই কয়েকটি কারণে পিঠ ঝুঁকে পড়ে। তাই অবসাদ, শ্রান্তি যাতে না ঘটে, সেদিকে সতর্ক সচেতন থাকা দরকার। এ কারণে কর্ম্মতৎপরতা, মানসিক উদ্দীপনা বজায় রাখা, প্রয়োজনমতো বিশ্রাম নিদ্রা ও আহারাদি নিয়ন্ত্রণ যেমন আবশ্যক, নিত্যনিয়মিত ব্যায়ামের প্রয়োজন ও ঠিক ততখানি। তাছাড়া দেহ গঠনের পক্ষে প্রাথমিক কয়েকটি বিধি পালন করাও একান্ত আবশ্যক। যেমন—এক পায়ে দেহের ভর রেখে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানো অনুচিত……তার ফলে, অঙ্গ-গঠন ক্রমশঃ কদর্য এবং পিঠের গড়নও বাঁকা ছাঁদের হয়ে ওঠে। খুব সরু কিম্বা উঁচু গোড়ালি আঁটা (Pin pointed or high-heeled shoes) জুতো ব্যবহার করা সমীচীন নয়। কারণ এ-ধরণের জুতো ব্যবহারের ফলে, অস্বাভাবিক ভঙ্গীতে দৈহিক ভারসাম্যতার রক্ষার প্রচেষ্টায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পেশী সমূহে অযথা টান ধরে ক্রমে পায়ের, কোমরের, বুক-পিঠের, ঘাড়ের এমন কি, মুখ চোখের গড়ন পর্য্যন্ত রীতিমত কুশ্রী, জীর্ণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ওঠে… মুখ-চোখের লাবণ্য শোভাও অন্তর্হিত হয়।

আধুনিক রূপচর্চ্চা-বিশারদ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকেরা অভিমত প্রকাশ করেন যে আমাদের মেরুদণ্ড (Spinal Column) যতখানি 'সাবলীল' (Flexible) বা স্বাভাবিকভাবে ইচ্ছামতো যতখানি বাঁকানো কিম্বা হেলানো যায়, ততই মঙ্গল। দেহের এই Flexibility' বা 'সাবলীলতা' মিলবে পিঠ-বাঁকানোর ব্যায়াম-ভঙ্গিমায়। পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞ বিচক্ষণ রূপচর্চ্চাবিশারদ ও চিকিৎসকেরা বহু গবেষণার পর অধুনা পিঠের স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য রক্ষার উপযোগী যে সব ব্যায়াম বিধি অনুশীলনের সুপরামর্শ দিয়ে থাকেন, সেগুলি প্রধানতঃ দেহের এই 'Flexibility' বা 'সাবলীলতা' আয়ত্ত করারই সহজ সরল উপায়। আপাততঃ পিঠের স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য লাভের উপযোগী সেই সব বিশেষ ধরণের ব্যায়াম-বিধির কয়েকটি ভঙ্গীর মোটামুটি হদিশ দিই।

পিঠের ব্যায়াম-বিধির প্রথম ভঙ্গীটি হলো—সমতল মেঝের উপর দেহটীকে সটান সিধাভাবে খাড়া রেখে দাঁড়ান। তারপর ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কোমরের দুই পাশে দুই হাতে ভর রেখে পায়ের হাঁটু দুটিকে বাঁকিয়ে পিছন দিকে মাথা হেলিয়ে দেহটিকে যথাসম্ভব নীচে হেলিয়ে দিন। শরীরকে এভাবে হেলানোর ফলে, সারা অঙ্গের পেশীগুলিতে টান পড়বে এবং স্নায়ুতে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়াও সজীব হয়ে উঠবে। কিছুক্ষণ শরীরটাকে পিছন দিকে হেলিয়ে রাখার পর, ধীরে ধীরে নিশ্বাস-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় দেহটিকে নীচে থেকে উপরে তুলে আগের মতো সিধা-সটান অবস্থায় আনবেন। প্রথম ব্যায়াম-ভঙ্গীটির এই হলো মোটামুটি বিধি। নিত্য নিয়মিতভাবে এ ব্যায়াম-ভঙ্গীটি অন্ততঃপক্ষে দশ-পনেরো বার অভ্যাস করলে দৈহিক স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য ও সাবলীলতা অটুট থাকবে সুদীর্ঘকাল।

স্থানাভাবের কারণে, এবারে এই হদিশটুকু দেওয়া হলো। আগামী সংখ্যায় পিঠের স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য বজায় রাখার উপযোগী আরো কয়েকটি সহজ-সরল ঘরোয়া ব্যায়াম-ভঙ্গীর পরিচয় জানাবো।

সূচীশিল্পের নক্সা-নমুনা

নিরুপমা দেবী

ঘর-সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক দৈনন্দিন-কর্ম্মের অবসরে যে সব মহিলা সচরাচর নিজেদের হাতে নানা রকম সৌখিন-সুন্দর সূচীশিল্প-সামগ্রী রচনা করেন, বিভিন্ন ধরণের বিচিত্র-অভিনব সেলাইয়ের ফোঁড় তোলার সম্বন্ধে তাঁদের বিশেষ আগ্রহ থাকে। বিদেশী সূচীশিল্পে সাধারণতঃ 'হেম্ ষ্টিচ্' (Hem Stitch), 'বটন্‌হোল্ ষ্টিচ্' (Buttonhole

Stitch), সাটিন্ ষ্টিচ্' (Satin Stitch), 'হেরিংবোন্ ষ্টিচ্' (Herring bone Stitch) 'রুমানিয়ান্ ষ্টিচ্' (Roumanian Stitch), 'উক্রাইনিয়ান্ ষ্টিচ্' (Ukrainian Stitch প্রভৃতি যে সব বিভিন্ন ধরণের সেলাইয়ের ফোঁড় তোলার রীতি আছে সে সম্বন্ধে তাঁদের অনেকেরই যথেষ্ট জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকলেও আমাদের দেশী সূচীশিল্পের কাশ্মিরী, কাথিয়াওয়াড়ী, গুজরাটী, লক্ষ্ণৌই, অসমিয়া, হায়দ্রাবাদী, ওড়িয়া, সাঁওতালী…এমন কি বাঙলা দেশের সনাতন কাঁথা-সেলাইয়ের অপরূপ-মনোরম সরল-সৌখিন ছুঁচ-সুতোর ফোঁড় তোলার কলা-কৌশল আয়ত্ত করার দিকে তেমন বিশেষ অনুরাগ বড় একটা নজরে পড়ে না। তাই আজ তাঁদের কাছে আমাদের দেশীয় সূচী শিল্প-রীতির উল্লেখযোগ্য একটি অপরূপ-নিদর্শন—"লক্ষ্ণৌই সেলাইয়ের" (Lucknow stitch) কাজের কয়েকটি সহজ-সুন্দর নমুনার মোটামুটি পরিচয় দিচ্ছি।

'লক্ষ্ণৌই সেলাইয়ের' কাজ করার পদ্ধতি, 'কাশ্মিরী' সূচীশিল্প-রীতিরই অনুরূপ—সহজ-সরল উপায়ে সুতী, রেশম বা পশমী কাপড়ের উপর ছুঁচ-সুতোর ফোঁড় তুলে নানা রকমের সৌখিন-সুন্দর 'আলঙ্কারিক-নক্সার' (Decorative Motifs) বিচিত্র অভিনব প্রতিলিপি রচনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সূচীশিল্পানুরাগিণী মহিলাদের মধ্যে যাঁদের 'কাশ্মিরী' সেলাইয়ের ফোঁড় তোলার সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরা অনায়াসেই 'লক্ষ্ণৌই' সেলাই-রীতিতে বিবিধ 'আলঙ্কারিক-নক্সা' রচনা করতে পারবেন। তাছাড়া যে সব মেয়ে এ-ধরণের সেলাইয়ের ফোঁড় তোলা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞা কয়েক-দিন সযত্নে সামান্য চেষ্টা করলেই 'লক্ষ্ণৌই' পদ্ধতির বিশিষ্ট কলা-কৌশল তাঁরা সহজেই সুষ্ঠুভাবে শিখে নিতে পারবেন বলেই ধারণা হয়।

'লক্ষ্ণৌই' সেলাইয়ের রীতি অনুসারে সহজ-সরল উপায়ে ছুঁচ সুতোর ফোঁড় তুলে নানা রকমের সুন্দর-সুন্দর নক্সার কাজ করে সূচীশিল্পানুরাগিণীরা অনায়াসেই পুরুষদের পরিধানোপযোগী পাঞ্জাবীর কাঁধের ও বোতামের পটির দুই-পাশের কিনারায়, ছোট ছেলেমেয়েদের ফ্রক, স্কার্ট, হাওয়াই-শার্ট (Howaian Shirts) 'রম্পার' (Romper), 'স্কার্ফ' (Scorf), মহিলাদের পরিধানের ব্লাউশ (Blouse), চোলী প্রভৃতি পোষাক-পরিচ্ছদ 'অলঙ্করণের' কাজ করতে পারবেন।

প্রসঙ্গক্রমে, এবারে 'লক্ষ্ণৌই' সেলাইয়ের কাজের উপযোগী যে দুইটি 'আলঙ্কারিক-নক্সার' নমুনা-চিত্রটি প্রকাশ করা হলো, সেগুলি 'পাড়' বা 'Running Brorders' হিসাবে ব্যবহারের পক্ষে কাজে লাগানো যেতে পারে।
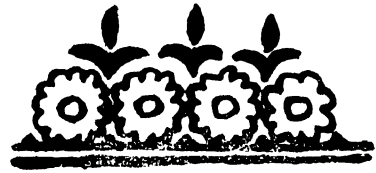
উপরের 'নক্সার' ফুলগুলি সোনালী-হলদে রঙের রেশমী বা পশমী সুতোর সাহায্যে রচনা করলে মনোরম-সুন্দর দেখাবে। ফুলের পাপড়ির ভিতরকার 'বৃত্তাকার' অংশটি রচনা করবেন ফিকে-বাদামী (Light Brown) কিম্বা, হাল্কা লাল রঙের সুতো দিয়ে সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে। 'পাড়ের' কিনারার 'ত্রিভুজাকার' (Triangular motifs) অংশগুলি এবং লম্বা রেখা রচনা করবেন গাঢ় বাদামী (Dark Brown) রঙের সুতোর সাহায্যে। ফুলের শিয়রের পাতাগুলি রচনার জন্য ব্যবহার করবেন মানানসই ধরনের ফিকে অথবা গাঢ় সবুজ রঙের রেশমী কিম্বা পশমী সুতো এবং 'পাড়ের' নীচেকার লম্বা 'রেখাটি' সেলাই করবেন মানানসই রঙের গাঢ়-লাল (Crimson Red or Scarlet) সুতো দিয়ে। বলা বাহুল্য, 'লক্ষ্ণৌই' সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে উপরের 'নকসা' রচনাকালে, পশমী সুতো পশমী-কাপড়ে এবং রেশমী-সুতো রেশমী বা সুতী কাপড়ে ব্যবহার করবেন।

আপাততঃ, এই পর্য্যন্তই বলে রাখলুম। বারান্তরে এ বিষয়ে সূচীশিল্পের উপযোগী আরো কয়েকটি বিচিত্র অভিনব 'আলঙ্কারিক' নক্সা-নমুনার হদিশ দেবার বাসনা রইলো।

শ্রীবিমলকুমার সুর

পৌষ মাস কেমন যাবে

পৌষ মাসের গ্রহসংস্থান অগ্রহায়ণ মাস অপেক্ষা অনেকাংশে ভাল। কাজেই আতঙ্ক, উদ্বেগ, ঝামেলা যা দেখা দিয়েছিল তা ক্রমশঃ সরে যেতে থাকবে এবং নানান দেশের রাজশক্তিগুলি উত্তরোত্তর অধিক সুষ্ঠুভার সহিত শাসনভার চালাতে পারবে। তবে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ততার আবহাওয়া পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ ২৪শে ডিসেম্বর থেকে ২৬শে ডিসেম্বর নাগাদ্ অর্থাৎ ঠিক X'mass সময়ে দেখা যাচ্ছে হঠাৎ অনেক গণ্ডগোল ও ঝঞ্ঝাট। যাঁরা ঐ সময়ে অত্যধিক আমোদ আহ্লাদে লিপ্ত হবেন তাঁদের কতকটা সাবধান থাকলেই ভাল হয়।

এখন ব্যক্তিগত জীবনে আসা যাক্। কাজেই যাঁর যে মাসে জন্ম সেই হিসাবে পৌষ মাসের ফল লিখিত হইল।

বৈশাখ—আপনার কাজকর্ম এবং অর্থোপার্জ্জনের জন্য পৌষমাসটা ভাল। ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে থাকলে প্রসার করার চেষ্টা করুন। আপনি বেশী অর্ডার পাবেন। আপনি বিবাহিত হলে আপনার স্ত্রীর প্রাধান্য বাড়বে শুধু আপনার উপর নয়, সাধারণ ভাবে। কাজেই তাঁর যোগ্য প্রয়োজন আবেদন মেটাবার চেষ্টা করবেন। আপনি স্ত্রী হলে, স্বামীকে সাহায্য করুন। যাতে তাঁর অগ্রগতি দ্রুততর হয়। সন্তান বিষয়ক কিছু উদ্বেগ অশান্তি ভোগ না করে উপায় নাই। ধর্ম্মকার্য্যেও কিছু কিছু বাধা এসে পড়বে। অবশ্য আপনি সাধক হলে আরো সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও গভীর অধ্যবসায়ের সহিত কাজ করে যান, পরের মাসে বেশী ফল পাবার কথা। আপনার রবিরাশ্যাধিপতি শনির সহিত সাক্ষাৎ সময়ে দেখা করছেন। কাজেই জেনে রাখুন, বাধা বিঘ্ন যথেষ্টই থাকবে এবং হঠাৎ য কোন প্রকার accidental ব্যাপারের সম্মুখীন হতে হবে। তবে চিন্তার কারণ নাই—কারণ মঙ্গল নিগৃহ দেখছেন এবং বুধ ও বৃহস্পতি গ্রহদ্বয়েও কিছু সাহায্য পাচ্ছেন।

জ্যৈষ্ঠ—আপনার পারিবারিক সুখশান্তি পৌষ মাসে বিশেষ দেখছিনা। বরং অনর্থ ঝঞ্ঝাট উদ্বেগ এই সব নিয়ে কাটাতে হবে। সন্তানাদির স্থান ভাল নয়, এবং যাঁরা ছাত্র তাঁদের বিদ্যায় বিঘ্নবাধা কিছু আসছে। কাজেই বিদ্যায় কোন প্রকার অবহেলা বাঞ্ছনীয় নয়। ব্যবসাদার হলে speculation বেশী করবেন না। কারণ chance নিতে গেলে tranced হয়ে যাবেন। নিত্যনৈমিত্তিক সাধারণ routine কাজের বা ব্যবসার মধ্য দিয়ে গেলে অর্থোপার্জ্জন ভাল হবে। আপনি কাজকর্ম্মে নিজেকে গুটোবার চেষ্টা করবেন না। আপনার শনি রাহু বলছে, কাজ বাড়লেই ভাল হয়। সন্তান স্থানটা আপনার বিশেষ troublesome দেখছি। তাদের স্বাস্থ্য, তাদের বিদ্যা সব দিকেই আপনার কড়া নজর রাখা দরকার। আপনার স্ত্রীর, স্ত্রীলোক হলে পতির, mood ঠিক মোলায়েম পাবেন না। কারণ বেচারীর মাথায় ঝঞ্ঝাট অনেক। কাজেই তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করুন। আপনি সাধক হলে পৌষ মাসে সাধনার গভীরতায় ঢোকবার চেষ্টা করুন।

আষাঢ়—ব্যবসা বাণিজ্য, গমনাগমন পৌষ মাসে বেশী যোগাযোগ। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গেও যোগাযোগ ঘটবে

বেশী। তাঁদের সঙ্গে একযোগে কাজ করলেই ভাল হয়। অর্থভাগ্য খারাপ দেখিনা। কাজকর্মের দায়িত্ব যেমন চলছে চলবে। পারিবারিক ঝঞ্ঝাট মাঝে মাঝে হঠাৎ এসে পড়বে, এর জন্য সংর্ক হবার উপায় কোথায়? স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ ততই মধুর হবে যতটা exchange of ideas and thoughts করতে পারবেন।

শ্রাবণ—আপনার পৌষ মাসটা কতকটা ভোগ আরামে কাটবে। পারিবারিক সাংসারিক ব্যাপারে বেশী জড়িয়ে থাকবেন। মাতৃসেবায় যদি রুচি থাকে মাতৃসেবায় আত্ম-নিয়োগ করুন। দুজনেই দুজনের সুখবর্দ্ধক হবেন। টাকাকড়ি ধরে রাখতে পারবেন। খরচ হবে বেশী, উপায় নেই। গৃহ বাটি নির্ম্মাণ বা সংস্কার যাঁর পক্ষে যা সম্ভব তা করবার পক্ষে পৌষমাসই ভাল। ভ্রাতা ভগ্নী ও জ্ঞাতি-আত্মীয় সংক্রান্ত সুখ দেখিনা। বরং মধ্যে মধ্যে ঝঞ্ঝাট পোহাতে হবে বেশী।

ভাদ্র—আপনার বুদ্ধি প্রতিভার বৃদ্ধি হবে। কাজেই বিদ্যায় মন্ত্রণায় উপদেশে যোগ্যতা দেখাতে পারবেন বেশী। আপনার জ্ঞাতি-আত্মীয়ের চিন্তাই অধিক থাকবে। খরচ আপনি সামলে উঠতে পারবেন না। বন্যার মত অর্থপ্লাবন হয়ে যাবে। গৃহের আবহাওয়া এখনও নিশ্চিন্ত-কর নয়। আতঙ্ক উদ্বেগ আরো কিছুদিন থাকবে। মাতার স্বাস্থ্য সন্তোষজনক থাকার কথা নয়। বন্ধুবান্ধবের সাহায্য বা সাহচর্য্য ভরসাযোগ্য থাকবে না। নিজের বুদ্ধিবল তীক্ষ্ণ থাকায়, নিজের বিচারে নির্ভর করা বাঞ্ছনীয়। বিবাহিত হলে পত্নীর স্বাস্থ্য, স্ত্রীলোক হলে পতির স্বাস্থ্য, ভাল থাকবেনা। বচসা মনোমালিন্যের উদয়ও হতে পারে।

আশ্বিন—আপনার ঝঞ্ঝাট ত কম নয়। মস্তকে অগ্নিকুণ্ড নিয়ে বহে বেড়াচ্ছেন। এবার আস্তে আস্তে কমের দিকে যাবে; চিন্তা করবেন না। চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি সুখানি চ"। কাজেই আপনার আজ যে বেকায়দা, তা চিরকালের নয়। বন্ধুস্থান ভাল দেখি। বিলম্ব হলেও বন্ধুর মারফৎ সুযোগ সুবিধালাভের সম্ভাবনা দেখি। জমিজমা গৃহবাটী সংক্রান্ত কাজ করলে তার কিছু সুফল আশা করা যায়, যদিও সহজে কিছুই হবেনা। লোকের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি avoid করতে পারলেই ভাল হয়। অর্থ ও ধর্ম্ম ব্যাপারে পৌষমাসটা মন্দ নয়।

কার্ত্তিক—কর্ম্মের যোগাযোগ ভাল। বেকার হলে চাকরী পেয়ে যেতে পারেন। বন্ধু বান্ধবের সাহায্য আশা করতে পারেন। অর্থব্যয় একটু বেশী দেখি। Govt. সংক্রান্ত দায়দায়িত্ব থাকলে আপনার ঠিক লোকসান হবেনা। গৃহে আমোদ আহ্লাদ বা কোন প্রকার উৎসব লাগতে পারে। পতি বা পত্নীর জন্য ব্যয় বেশী, উদ্বেগও হবে কিছু বৈকি। তেজস্বিতা বজায় রাখুন, মাথা নত করবেন না। বিক্রমেই লাভ, তবে বৃথা আস্ফালন কোন সময়েই সমর্থন যোগ্য নয়।

অগ্রহায়ণ:—আপনি একটু সচকিত থাকেন দেখছি। ভয়ের কোন কারণ নাই। লাভ আপনার ভালই হবে। চাকুরী করুন কিংবা ব্যবসায় করুন আপনি এগিয়ে যেতে পারবেন। আপনার প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ থাকবে। বেশী Speculation করার দিকে এগোবেন না। সন্তানদের স্বাস্থ্য ও বিদ্যা বিষয়ে যত্ন নেবেন। খাওয়া-দাওয়ায় মাপের বাইরে বেশী না যাওয়াই ভাল। বিদ্যায় বিঘ্ন বাধা দেখি তবে চেষ্টা করলে উহা আয়ত্বে এসে পড়বে।

পৌষ—: আপনার ত ভাল যোগাযোগ। অর্থ বিষয়ক ভাল বই খারাপ কই? কাজে নাম-ডাক পাবেন, তবে দায়িত্বটা কম নয়। পারিবারিক আবহাওয়া অনুকূল পাওয়া শক্ত। একটা না একটা ঝঞ্ঝাট এসে পড়ে আপনাকে ব্যতিব্যস্ত রাখবে। বাড়ীর বা গাড়ীর ব্যাপারে কিছু সুরাহা করতে হলে মার্চ মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন পিতামাতার শরীর, স্বাস্থ্য উদ্বেগজনক হবে।

মাঘ:—চাকুরী বা ব্যবসাক্ষেত্রে ভালই দেখি বিদ্যায় সুফল আশা করতে পারেন। ভোগ আরাম বাদ দিয়ে কাজের প্রসারে মন দিলে লাভবান হবেন। রোজগার ভাল হবে। ব্যয় অবশ্য যথেষ্টই চলবে উপায় নাই জ্ঞাতি-আত্মীয় সংক্রান্ত সুখকর আবহাওয়া পাবেন না অবশ্য আপনার তরফের কর্ত্তব্যের অভাব হবেনা। বিদেশ ভ্রমণে বাধা বিপত্তি এসে পড়তে পারে।

ফাল্গুন:—আপনার ব্যবসা সংক্রান্ত লাভ দেখি বিদ্যায়ও কৃতকার্য্য হতে পারবেন। ধর্ম্মসংক্রান্ত উন্নতি করতে পারবেন, অবশ্য যদি ঐ পথের পথিক হন আপনার ব্যয় সঙ্কুচিত হবে। সদ্‌ব্যয় হবে এবং কিছু টাকা জমে যাবার মত হলেও রাঘববোয়াল শনি-রাহু সব উদরসাৎ করে নেবে। কর্ম্মে যে ঝঞ্ঝাট চলছে তা আস্তে আস্তে কমে যাবে। শারীরিক সাবধানতা অবলম্বন করবেন, বিবাহিত না হলে, বিবাহের যোগাযোগ ঘটবে।

চৈত্র:—আপনার আয় ভাল দেখি। কর্ম্মের উচ্চ প্রসারতাও হবে। শত্রু একটু আধটু থাকবে, উপায় কি অনেক সময় প্রত্যক্ষ বিবাদও হতে পারে। ধৈর্য ছাড়বেন না। সেখান থেকেই লাভ উঠবে সন্দেহ নাই সন্তান বিষয়ক কিছু উদ্বেগ হবে, তবে সাময়িক। পত্নীকে উচ্চ আসন দেবেন তাঁর ভাগ্যেই আপনার ভাগ্যে উদয়। স্ত্রীলোক হলে, পতির সমাদরে অবহেলা করবেন না।

কিশোর জগৎ

'শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন'—

শ্রীজ্ঞান

শীত সুরু হয়ে গেছে। শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের মনেও নিশ্চয়ই উৎসাহ, উদ্দীপনার বান ডেকেছে আর মাতন লেগেছে মনে। শীতকালের এই ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় মানুষের, বিশেষ করে তোমাদের মতন কিশোর-কিশোরীদের মন বেশ স্ফূর্তিতেই থাকে; কারণ এই সময় নানারকম খেলাধূলা, 'পিক্‌নিক্‌' বা বনভোজন, পর্য্যটন প্রভৃতি করবার যথেষ্ট সুযোগ থাকে এবং তোমরা অল্প বিস্তর সকলেই কিছু না কিছু এই সব করে আনন্দলাভ করে থাক।—তাই না? এর ওপর যারা আবার খেলা-ধূলাতে বেশী আসক্ত তাদের তো এই শীতকালটা বেশ আনন্দেই কাটে। শহরাঞ্চলে বিশেষ করে কলিকাতায় তো এই সময় খেলা-ধূলার আসর বেশ সরগরমই থাকে। ক্রিকেট, টেনিস, ব্যাড্‌মিণ্টন্‌, বাস্কেট্‌বল, ভলিবল প্রভৃতি খেলা তো আছেই তাছাড়া থাকে নানা ক্লাবের বা সংস্থার "স্পোর্টস্‌" যাতে নানান দূরত্বের দৌড়, নানারকমের লম্ফন, বর্শা নিক্ষেপ, 'ডিস্‌কাস্‌' নিক্ষেপ, পোল ভল্ট, প্রভৃতি কত রকম বিষয়ের প্রতিযোগিতাই না হয়ে থাকে! এই সব খেলার মধ্যে কিছু কিছু খেলা যেমন টেনিস, ব্যাড্‌মিণ্টন্‌, বাস্কেট্‌বল, ভলিবল প্রভৃতি সারা বছর ধরে অর্থাৎ গরমীকালেও হয়ে থাকলেও, এই শীতকালেই এই সব খেলার ব্যাপক অনুশীলন হতে দেখা যায়। আর খেলার রাজা ক্রিকেট এবং "স্পোর্টস্‌" শুধু শীতের সময়ই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া দিতে আরম্ভ করলেই মনে পড়ে ক্রিকেটের কথা—মনে জেগে ওঠে একটি ছবি—সবুজ মাঠের বুকে শুভ্র পোষাকের খেলোয়াড়দের সঞ্চরণ, হাল্কা হলুদ রঙের ব্যাটের সঞ্চালন, আর টক্‌টকে লাল বলের দুরন্ত গতি। যারা ক্রিকেট খেলায় খুবই আসক্ত তারা তো এই শীতকাল ভোর ক্রিকেট খেলে

এবং দেখে কাটিয়ে দেয়। সপ্তাহ ভোর 'নেট্ প্রাক্‌টিস্' বা অনুশীলন আর ছুটির দিনে ম্যাচ্ খেলা। তার ওপর যদি বিদেশাগত কোনও দলের সঙ্গে 'টেষ্ট ম্যাচ' খেলা হয় তাহলে তো আর কথাই নেই! সিজন্ টিকিট জোগাড় করা, লাইন দিয়ে মাঠে ঢোকা, আর সারাদিন ধরে রোদে পুড়ে খেলা দেখে ক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফেরা—পাঁচ দিন ধরে তো এই চলে! তারপর প্রথম শ্রেণীর খেলা, যেমন, রঞ্জী ট্রফী, দিলীপ ট্রফী প্রভৃতির খেলা তো আছেই। আর তার সঙ্গে রয়েছে নিজেদের স্কুল, কলেজ ও ক্লাবের খেলাগুলি। সুতরাং শীতকালটা ক্রিকেট খেলোয়াড়দের বেশ আনন্দেই কেটে যায়। আর দেখা যাচ্ছে এই খেলার আকর্ষণও যেন ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ক্রিকেট খেলার খুঁটিনাটি নিয়ম কানুন এখন মেয়েরাও বুঝতে শিখছে! তবে এ খেলাকে ভাল রকম বুঝতে হলে হাতে-নাতে খেলা যে দরকার তা যারা খেলে থাক তারা নিশ্চয়ই বোঝ। শুধু খেলা দেখেই এই খেলার সব কিছু শেখা যায় না। এ অত্যন্ত দুরূহ এবং বিপজ্জনক খেলা এবং খুবই অনুশীলন সাপেক্ষ। ক্রিকেটের পরই লন্‌টেনিসের নাম করতে হয়। এই খেলাটিও খুবই দুরূহ এবং অনুশীলন সাপেক্ষ। শীতের সময় এই খেলাটিও বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। লন-টেনিস্ সবুজ তৃণাচ্ছাদিত কোর্টের ওপর খেলা হয়ে থাকে, আর হার্ডকোর্ট টেনিস খেলাটা গ্রাভেল্ কোর্টের ওপর খেলা হয়ে থাকে। বৃষ্টি হলেও এই কোর্টের ক্ষতি হয় না বলে হার্ডকোর্ট টেনিস সারা বছরই খেলা হয়ে থাকে এবং টেনিস অনুরাগী খেলোয়াড়েরা সারা বছরই এই খেলার অনুশীলন করে থাকেন। কিন্তু লনটেনিস সাধারণতঃ শীতকালেই চলে। ব্যাডমিণ্টন খেলাটিও শীতকালে খুবই জমে ওঠে। পার্কে, উঠানে, অলিতে, গলিতে সর্ব্বত্রই এই খেলাটি অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। শীতের সময় হাওয়া কম থাকে বলেই এই খেলাটি মুক্ত অঙ্গনে খেলা চলে। কিন্তু হার্ডকোর্ট টেনিসের মতন ব্যাডমিণ্টনও ইন-ডোর কোর্টে বা আচ্ছাদিত অঙ্গনে সারা বছরই খেলা চলে। এ সব ছাড়া শীতের সময় আরও নানা রকমের খেলার আসর জমে মাঠে-ময়দানে।

এই তো গেল খেলার কথা। এ ছাড়া শীতের সময় নানা রকমের শাক-সব্জী, ফল-মূলেরও ফলন হয় এবং এই সব আহার্য্যের আকর্ষণও তোমাদের কাছে নিশ্চয়ই খুব বেশী। শীতকালের সবচেয়ে ভাল ফল বোধ হয় কমলা লেবু এবং এর উপকারিতাও খুব বেশী। তোমরা শীতকাল ভোর এই কমলা লেবু খাওয়ার চেষ্টা কর। এ ছাড়া টম্যাটো, কড়াইশুঁটি প্রভৃতি সব্জীও যথেষ্ট পরিমাণে যদি খেতে পার তাহলে শক্তিবৃদ্ধি হবে এবং স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হবে এবং সেই সঙ্গে খেলাধুলাতেও কৃতিত্ব দেখাতে পারবে। তবে শীতকালের প্রধান অসুবিধা হচ্ছে হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে যাবার সম্ভাবনা থাকে। ঠাণ্ডা লেগে গেলে সর্দ্দি জ্বর ইত্যাদিতে কাবু করে ফেলে এবং শরীরকে দুর্ব্বল করে দেয়। তাই এই সময় ঠাণ্ডা হাওয়া না লাগান, গরম জামা কাপড় ব্যবহার করা এবং সাবধানে থাকা উচিত।

সারা শীতকালটা যদি তোমরা ভাল রকম খাওয়া-দাওয়া করে, নিয়মিত ব্যায়াম অভ্যাস করে এবং সাবধানে থেকে শরীর গঠন করতে পার তাহলে বৎসরের বাকি সময়টাও তোমরা সুস্থ শরীর নিয়ে কাটাতে পারবে। এই শীতকালে নানা রকম মরসুমী ফুলও ফুটে থাকে। আর ফুল ভালবাসে না কে? তাই দেখা যায় ফুলে-ফলে, আমোদে-প্রমোদে অভিষিক্ত এই শীতকালটা তরুণদের কাছে খুবই লোভনীয় এবং এই শীতের হাওয়ায় তাদের মনেই মাতন লাগে সবচেয়ে বেশী। নেচে ওঠে আনন্দে উৎসাহে।

মণির খনি

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এগারো

চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। জনহীন অজ্ঞাত পথ দেবেশ ভীষণ বেগে সেই পথে মোটর সাইকেল নিয়ে ছুটছে। প্রায় আধ ঘণ্টা চলে গেল, সে তখনো দস্যুদের মোটর গাড়ি দেখতে পেল না, গাড়ির কোন শব্দ শুনতে পেল না। এক একবার তার মনে হ'তে লাগলো সে বোধহয় পথ হারিয়েছে। দেবেশ তবুও তার মোটর সাইকেলের গতিবেগ কমাল না, সাইকেল ঘণ্টায় তি[illegible] মাইল বেগে ছুটে চলল।

বিরাট এক জঙ্গল সম্মুখে জমাট অন্ধকারের মত দেখা দিল। দেবেশ ভাবল একটু ধীরে ধীরে যাওয়াই উচিত। এমন সময়ে সে দেখতে পেল যে, জঙ্গলের পাশ দিয়ে মোটর গাড়ী ছুট্‌ছে। গাড়ির আলোকে সম্মুখে ও পাশে আলোকিত হয়ে উঠেছে। দেবেশ আনন্দে চীৎকার করে উঠলো—'পেয়েছি—পেয়েছি—ডাকাতদের দেখা পেয়েছি!' তার দুঃখ হ'তে লাগলো যে মোটর সাইকেলখানা ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইলের বেশী বেগে চল্‌তে পারে না। পাছে সে ধরা পড়ে এই ভয়ে আলোটা নিভিয়ে নিয়ে উল্কার বেগে ছুটতে আরম্ভ করলো। অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে অত বেগে গেলে যে প্রতি মুহূর্ত্তেই বিপদের আশঙ্কা তা সে জান্‌তো। কিন্তু কর্ত্তব্য পালনের উৎসাহে দেবেশ কোন বিপদকেই বিপদ বলে মনে করল না।

সেইভাবে যেতে যেতে দেবেশ যে কতবার গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেতে খেতে বেঁচে গেল তার ঠিক নাই। সে যে কিরূপে বাঁচল তা নিজেই বুঝতে পারল না। কিছুক্ষণ পরে আলোটা জ্বেলে দেবেশ দেখলো যে মোটরগাড়ি-খানা অনেকটা কাছে এসে পড়েছে। সে ভাবল, যদি কোনো রকমে গড়িখানার আগে যাওয়া যেত, তবে তখন পথ বন্ধ করে মোটরখানা থামাতে পারে। এক-বার যদি থামে, তবে আর ওদের ধর্‌তে কতক্ষণ!

দেবেশ প্রাণপণে মোটরসাইকেল চালালো। ৩৫ মাইল—৪০ মাইল—ক্রমে ৪৫ মাইল বেগে চলল। মোটরগাড়ির ধুলা উড়ে এসে দেবেশের শ্বাসরোধ করতে লাগলো। দেবেশ সাইকেলের হর্ণ বাজালো,—একবার—দু'বার—তিনবার। মোটরের সাফার গ্রাহ্য ক'রল না। দেবেশ দেখল যে, অত বেগে মোটর গাড়ির পাশ দিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলে মৃত্যু অনিবার্য্য। সে তখন অনবরত হর্ণ বাজাতে লাগলো। হর্ণের তীব্র শব্দ শুনে রঘু একবার গাড়ি থেকে মুখ বের ক'রে দেখল; তার পরক্ষণেই মোটরগাড়িখানা রাস্তার এক পাশ দিয়ে চলতে সুরু করল। মাঝপথ ফাঁকা পেয়ে দেবেশ তখনি সাইকেলের বেগ বাড়িয়ে দিল এবং চক্ষের নিমিষে মোটরগাড়ির পাশ দিয়ে সম্মুখে এগিয়ে গেল। অপ্রশস্ত পথ—তাতে আবার সকল স্থানে সমতল নয়—অল্পের জন্য মোটরগাড়ির মার্ডগার্ডের সঙ্গে মোটর সাইকেলের ধাক্কা লাগলো না।

দেবেশের ইচ্ছা পূর্ণ হলো। আগে গিয়েও মিনিট দশেক পঞ্চাশ মাইল বেগে সাইকেল চালিয়ে দেবেশ ধীরে ধীরে সাইকেলের গতিবেগ কমাতে আরম্ভ করল। ৪৫-৪০-৩৫ মাইল বেগে মোটর সাইকেল চল্‌তে লাগল। পিছন থেকে মোটরগাড়ির হর্ন বেজে উঠ্‌লো। দেবেন মৃদু হেসে গতিবেগ আরও কমিয়ে ফেলল,—৩০-২৫-২০ মাইল। পিছন থেকে রঘু চীৎকার করে উঠ্‌লো—"সরে যাও—সরে যাও—পথ দাও।" কে কার কথা শোনে? মোটর সাইকেলের গতি ক্রমেই কমে এল। সর্ব্বনাশ! দেবেশ দেখ্‌ল, মোটর গাড়িখানা হঠাৎ বেগ বাড়ালো। মনে হ'ল গাড়িখানা দেবেশের ঘাড়ের উপর দিয়েই চলে যাবে। মুহূর্ত্তের জন্য দেবেশের মাথা ঘুরে উঠলো। সে দেখল, বিপদের উপর বিপদ। সেখানে যেন কোথা থেকে জল এসে পথটা পিছল হয়ে গেছে,—তার সাইকেলের চাকা একবার পিছলে গেল। দেবেশ কোনমতে সেবার সামলে নিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার সেরকম হ'ল। তারপরেই দেবেশের মনে হ'ল পৃথিবীটাই বুঝি তার সাইকেলের তলা দিয়ে সরে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে পিছনের মোটর গাড়ীখানা ঝড়ের বেগে চলে গেল। গাড়ির বাতাসে পাশের গাছগুলি এমনভাবে নড়ে উঠলো যেন ওদের উপর দিয়ে একটা ঝড় ব'য়ে গেল।

দেবেশ একটা ঝোপের ভিতর আছাড় খেয়ে পড়েছিল জন্য গুরুতর ভাবে আঘাত পেল না। সে তাড়াতাড়ি সাইকেলের কাছে গেল;—দেখল সাইকেলের সামনের চাকাটা তখনও ঘুরছে। দেবেশের কপাল ও হাত কেটে রক্ত ঝরছিল। সেদিকে মোটেই লক্ষ্য না করে সাইকেল পরীক্ষা করে দেখল যে হ্যাণ্ডেলটা বেঁকে গেছে—একটা ব্রেক ভেঙ্গে গেছে এবং পাদানটা ভেঙ্গে গিয়ে ঝুলছে।

দেবেশ লাথি দিয়ে পাদানটা একেবারেই খুলে ফেলল এবং যন্ত্র বের ক'রে হ্যাণ্ডেলটা যথাসম্ভব সোজা ক'রে নিল। পরীক্ষা ক'রে দেখল যে, গ্যাসের নলটাও ফেটে গিয়েছে। এ অবস্থায় মোটরগাড়ির অনুসরণ করার চেষ্টা বৃথা। তবুও

দেবেশ হতাশ হ'ল না। যন্ত্রের বাক্স থেকে খানিকটা রবারের নল ও লোহার তার নিয়ে অনেক চেষ্টা ক'রে ফাটা গ্যাসের নলটা রবারের নল দিয়ে তারের সাহায্যে কোনরূপে জুড়ে নিল। মোটর সাইকেল চলবার মত হ'ল; কিন্তু দেবেশ বুঝল যে, এই খোঁড়া সাইকেল নিয়ে ২০।২৫ মাইলের বেশী বেগ দেওয়া সম্ভব নয়। নিরুপায় হ'য়ে তাকে সেই ভাবেই চলতে হ'ল। তখন তার অনুতাপ হতে লাগলো, কেন মোটরগাড়িখানা আটকাতে চেষ্টা করেছিল—শুধু অনুসরণ করলেই তো হ'ত। এই যে আধঘণ্টা সময় নষ্ট হল এর মধ্যে মোটর গাড়িখানা যে কোথায় কতদূরে চলে গেল কে জানে!

আর কিছুদূর চলবার পর দেবেশ দেখ্‌ল যে পূবের আকাশ ফর্সা হ'য়ে এসেছে। আরও কিছুক্ষণ গেল—প্রভাতের মৃদু আলোকে পথঘাট আলোকিত হয়ে উঠল। দেবেশ দেখল তার সম্মুখে পথটি দুইভাগ হয়ে দুই মুখে গিয়েছে। একদিকে কাঠের ফলকের উপর লেখা ডায়মণ্ডহারবার—২৫ মাইল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি দেবেশ তখনই বুঝল যে দস্যুরা নিশ্চয়ই ডায়মণ্ডহারবার বন্দরেই গিয়েছে। সেখানে কোনো জাহাজে তুলে দিয়ে রাজকুমারকে দূরে কোথাও পাঠিয়ে দেবে। দেবেশ সেই দিকেই ছুটল।

পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যেই দেবেশ বন্দরের কাছে এসে পৌঁছিল। দেখল একজন গোয়ালা দুধ নিয়ে শহরের দিকে যাচ্ছে। দেবেশের রক্তাক্ত দেহ ও ভাঙ্গা-গাড়ী দেখে গোয়ালা একটু অবাক হ'য়ে রইল—এবং তারপরই ব্যঙ্গ ক'রে বলল—"তোমরা বুঝি লড়াই থেকে ফিরছ? এই তোমার আগেই একখানা মোটরগাড়িতে একজন আহত লোককে নিয়ে দু'জনে গেল,—পেছন পেছনেই রক্ত মেখে তুমি আসছ। লড়াইটা কোথায় হ'ল?"

গোয়ালার কথা শুনে দেবেশের মন আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল;—সে ঠিক পথেই এসেছে। মনের উত্তেজনা গোপন ক'রে দেবেশ ধীরস্বরে জিজ্ঞাসা করল—"তারা কতক্ষণ এসেছে?"

"এই আধঘণ্টা আগে। তোমরা বুঝি ষ্টীমার ধরবে। তা' বর্মায় যাবার জাহাজ "পাইরেট" ষ্টীমার এখনো জেটিতে লেগে আছে। ছাড়তে আর দেরী বেশী নেই।"

গোয়ালাকে ধন্যবাদ দিয়ে দেবেশ বন্দরের দিকে ছুটল এবং জেটী থেকে অল্প দূরে মোটরসাইকেলখানা ফেলে রেখে ঘাটের দিকে দৌড়লো। ঘাটে পৌঁছিয়েই দেখল আগেকার মোটরগাড়িখানা সেখানে দাঁড়িয়ে আছে এবং "পাইরেট" ধীরে ধীরে জেটী ছাড়ছে।

ষ্টীমারে জেটীতে যে সিঁড়ি বাঁধা থাকে, তার একখানাও আর ছিল না। খালাসীরা তুলে নিয়েছিল। "পাইরেট" তখন জেটি থেকে প্রায় পাঁচ হাত দূরে সরেও গেছে। দেবেশ কোনদিকে না চেয়ে ষ্টীমার লক্ষ্য করে জোরে লাফ দিল। সে ভেবেছিল "পাইরেটের" ডেকের উপর লাফিয়ে পড়বে। কিন্তু জেটি থেকে ডেক্‌টা কিছু উঁচু ছিল জন্য দেবেশের পক্ষে ডেকে ওঠা সম্ভব হলো না। তার সৌভাগ্যক্রমে সে ডেকের কোণাটা ধরে ফেলল—অল্পের জন্য জলে পড়ল না। দু'জন খালাসি সেখানে জাহাজের দড়িদড়া গুছিয়ে রাখছিল। ব্যাপার দেখে তারা প্রথমে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। শেষে দেবেশকে হাত ধরে জাহাজের উপর টেনে তুলল।

—বারো—

দেবেশ যখন "পাইরেট" জাহাজে উঠবার জন্য লাফ দিয়েছিল, তখন সে খুবই পরিশ্রান্ত। খালাসিরা যখন তাকে টেনে তুলল্‌ তখন সে এতই হাঁফাচ্ছিল যে কথা বলার-ক্ষমতা তার ছিল না। তার মনে হচ্ছিল যেন দম বন্ধ হ'য়ে মারা যাবে।

ডেকে তুলেই খালাসিরা তাকে জিজ্ঞেস করল—"কে তুমি? কি জন্য এভাবে লাফিয়ে জাহাজে এসেছ?"

দেবেশ কোন রকমে বলল—"জল—আগে একটু জল খাব।"

সামান্য প্রকৃতিস্থ হ'য়ে দেবেশ বলল—"আগে আমাকে কাপ্তানের সঙ্গে দেখা ক'রতে হবে। জরুরী খবর আছে।"

একজন খালাসি ঠাট্টা ক'রে বলল—"আগে আমাদের কাছেই হুকুম পাও—তারপর সেখানে যেও।"

"সে খুব গোপন কথা—তোমাদের কর্ত্তাকে ছাড়া আর কাউকে বলতে পারিনে। পথ ছাড়—আমি উপরে যাব।"

খালাসি দেবেশকে একটা ঠেলা দিয়ে বলল—বাবে সোনার চাঁদ! ষ্টীমারখানা বুঝি তোমার পৈতৃক সম্পত্তি! তুমি কি মনে ক'রছ—যে কেউ একটা পথের ভিখারী এলেই বুঝি তাকে আমরা 'আসুন'—'আসুন'ক'রে সেলুনে নিয়ে গিয়ে বসাবো!"

দেবেশের সঙ্গে যখন খালাসিদের এইরূপ কথা কাটা-কাটি হচ্ছিল, তখন "পাইরেট" ষ্টীমারের বিশালকায় কাপ্তান সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। খালাসিরা তাঁকে বলল—

"এই লোকটা জেটি থেকে ষ্টীমারে লাফিয়ে পড়েছে। ব'লছে, আপনার কাছে জরুরী খবর আছে।"

পরুষকণ্ঠে কাপ্তান বললেন—"কি চাও তুমি?"

তখনো ষ্টীমার থেকে জেটি দেখা যাচ্ছিল;—তখনো জেটির পাশে দস্যুদের মোটরগাড়িখানা দাঁড়িয়ে ছিল। সেই দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবেশ বলল—"ওই গাড়িখানায় একজন আহত যুবককে আজই এই ষ্টীমারে আনা হ'য়েছে। যারা এনেছে তারা তাঁকে জুলুম ক'রে তুলে এনেছে। আমি তাঁকে নামিয়ে নিয়ে যেতে চাই।"

কাপ্তান বললেন—"যদি এসেই থাকে, তাই ব'লে কি আমি ষ্টীমারখানা ঘাটে ভিড়িয়ে নিয়ে যাবো নাকি? একি খেয়ার নৌকো পেয়েছ যে যেখানেই বলবে, সেই ঘাটেই থামবে? তাছাড়া, তুমি সত্যি কথা বলনি। তাতে কোন আহত যুবককে তো কেউ এখানে আনেনি। একজন অসুস্থ-লোক অবশ্য ঐ গাড়িতে চেপে ষ্টীমারে এসেছ বটে।"

দেবেশ বলল—"আহত-ই হোক, আর অসুস্থই হোক —একই কথা। আমি যাঁর কথা বলছি তিনি ঐ লোক। আপনি বোধহয়—জানেন না যে তাঁকে গুণ্ডারা নিয়ে এসেছে, তিনি একজন রাজকুমার—রাজকুমার বিমল চক্রবর্ত্তী। তাঁকে এমন করে নিয়ে যাওয়ার খবর প্রকাশ হ'লে আপনার কোম্পানীর সুনাম বাড়বে কি?"

"সে খবরে তোমার কাজ কি হে ছোকড়া! আমি জানিনে, আর তুমি জানো আমার ষ্টীমারে কে এসেছে? কোন রাজকুমার আমার ষ্টীমারে আসেননি। আমার ষ্টীমারে এসেছে প্রশান্ত চক্রবর্ত্তী নামে এক ভদ্রলোক। তিনি হাওয়া বদলাবার জন্যে যাচ্ছেন। যারা তাঁকে এখানে রেখে গেছেন তাঁরা যথেষ্ট টাকাকড়ি দিয়ে গেছেন। প্রশান্তবাবুর যাতে কোন অসুবিধা না হয় তা' আমি দেখবো। তবে তাঁর একজন চাকর দরকার—তাঁকে সেবা শুশ্রূষা করবার জন্য। ইচ্ছা করলে সে চাকুরিটা তুমি নিতে পার।

"আমি প্রস্তুত।"

কাপ্তান বললেন—"ভালই। তোমার টিকিট কেটেছ?"

"না। সে সময় ত ছিল না।"

"তবে ভাড়ার টাকা দাও। বিনা পয়সায় আমি কাউকে ষ্টীমারে তুলিনে।"

পকেটে হাত দিয়ে দেবেশ বলল—"আমার সঙ্গে তো কাণাকড়িও নাই। আমি গায়ে খেটে ভাড়া শোধ ক'রে দেব।"

কাপ্তান বিরক্ত হয়ে বললেন—"তোমার ত খুবই আব্দার দেখছি হে ছোকড়া।"

"আজ্ঞে অবস্থা বিশেষে একটু আবদার জানাতে হয় বৈকি! প্রশান্তবাবুর চাকুরী নিলেই ত আমি কিছু পাব। আপনি না হয় আমার সেই মাইনে থেকে ভাড়ার টাকা কেটে নেবেন। তাঁর সব টাকাইত এখন আপনার কাছে।"

"বেশ তাই হবে। কিন্তু খাওয়ার খরচটা?"

মৃদু হেসে দেবেশ বলল—"আমার মনিব পীড়িত। তিনি ত আর বেশী কিছু খেতে পারবেন না। তাঁর খাবারের ভাগটা তো আমিই পেতে পারি। তিনি খান আর না খান, দামটা তো আপনি আর ছাড়বেন না।"

কাপ্তান দেবেশের দিকে বজ্রমুষ্টি তুললেন—তবেরে ফাজিল ছোকরা?"

দেবেশ একলাফে দূরে সরে গেল এবং ধীরে ধীরে উপরতলায় উঠতে লাগল। কাপ্তান তার সঙ্গে সঙ্গে এসে কেবিন দেখিয়ে বললেন—"এই ঘরে প্রশান্ত বাবু আছেন। তোমাকে এঁরই কাজ ক'রতে হবে।"

কেবিনে প্রবেশ করেই দেবেশ চমকে উঠলো—"একে দেখছি রাজকুমার বিমল চক্রবর্ত্তী!"

বিমল ধীরে ধীরে চোখ খুললো দেখে দেবেশ বলল—

"আপনার দেখছি জ্ঞান হয়েছে। কেমন বোধ করছেন? কিছু খেতে দি—নইলে শরীরে বল পাবেন কেন?"

পরক্ষণেই দেবেশের মনে এক মৎলব এলো। সে শয্যাশায়ী ব্যক্তির কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল—"আপনার নাম কি?"

"—চক্রবর্ত্তী।"

দেবেশ বলল—"চক্রবর্ত্তী, তাতো আমিই জানি। তারপর? কোন্ চক্রবর্ত্তী?—বিমল না প্রশান্ত?"

দেবেশের কথা শুনে শয্যাশায়ী ব্যক্তির জ্যোতিহীন নয়ন একটু উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। তিনি একটু বিড় বিড় ক'রে বললেন—

"প্রশান্ত—প্রশান্ত—আমি তা—" তিনি আর কথা বল্‌তে পারলেন না। পরক্ষণেই অবসন্ন হ'য়ে চোখ বুঁজলেন।

দেবেশ স্তম্ভিত হয়ে গেল। "এরই নাম প্রশান্ত? তা' হলে দেখছি বিমল আর প্রশান্ত ঠিক যেন জোড়া মটর—চেনা দায়। এ যদি প্রশান্ত—তবে বিমলের কি হলো?"

দেবেশ প্রশান্তের সেবা শুশ্রূষা আরম্ভ ক'রে দিল। সারা দিন অল্পে অল্পে আহার দেওয়াতেই প্রশান্ত অনেকটা সবল হয়ে উঠল। সন্ধ্যার দিকে দেবেশের কাঁধে হাত দিয়ে সে ডেকে বেড়াতে-ও গেল। কিন্তু তখনও সে এত দুর্ব্বল যে তার পা দু'খানা থর থর ক'রে কাঁপছিল।

সমস্ত সন্ধ্যা'টা দেবেশ নানাভাবে প্রশ্ন ক'রল—নানা কৌশলে জানবার চেষ্টা করল—ব্যাপারটা কি। কিন্তু তার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হ'ল। দেবেশ বুঝতে পারল যে, যে কোনো কারণেই হোক, প্রশান্তর স্মৃতিবিভ্রম ঘটেছে। অতীতের কোন ঘটনাই আর সে মনে করতে পারছে না। তার জীবনের উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে তার কোন স্মৃতি-ই তার আর নাই।

দেবেশ একবার জিজ্ঞাসা করল—"আপনার নাম কি প্রশান্ত চক্রবর্ত্তী?"

"হাঁ।"

দেবেশ আবার জিজ্ঞাসা করল—"আপনি কি বিমল চক্রবর্ত্তী?"

সেবারেও উত্তর পেল—"হাঁ।"

দেবেশ হতভম্ব হ'য়ে ডেকের উপর দাঁড়িয়ে রইল। এ কি অদ্ভুত ব্যাপার? সামান্য কয়দিনে মানুষের মন থেকে অতীতের স্মৃতি এমনভাবে লোপ পেতে পারে?

সহসা দেবেশ দেখল, একটা ওভারকোট গায়ে দিয়ে দস্যু রঘু ডেকের অন্য দিকে দাঁড়িয়ে আছে।

[ক্রমশঃ]

———

চিত্রগুপ্ত

এবারে তোমাদের আরেকটি মজার খেলার কথা বলছি। এ খেলাটি থেকে তোমরা তাপমাত্রার সাহায্যে বিশেষ একটি রাসায়নিক পদার্থের রূপান্তর ঘটিয়ে তোলার আজব কারসাজির প্রত্যক্ষ পরিচয় পাবে। তাছাড়া এ খেলার সহজ-সরল কলা-কৌশলটুকু ঠিকমতো রপ্ত করে নিয়ে তোমরা অনায়াসেই ছুটির দিনে তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের আসরে আজব-মজার এই কারসাজিটি দেখিয়ে তাঁদের রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দিতে পারবে।

খেলাটি দেখাতে হলে টুকিটাকি যে সব সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন, সেগুলি যোগাড় করা খুব একটুও দুঃসাধ্য কঠিন বা ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার নয়। অর্থাৎ এ কারসাজি দেখাতে হলে, চাই—অল্প খানিকটা তামা (Copper) আর 'পটাস্ সালফেট্' (Sulphate of Potass), বড় একটি চামচ (Table-spoon), একটি 'স্পিরিট-ল্যাম্প' (Spirit Lamp) এবং এক বাক্স দেশলাই।

এসব সাজ-সরঞ্জাম জোগাড় হবার পর, খেলা দেখানোর সময় গোড়াতেই দেশলাই-কাঠির সাহায্যে স্পিরিট-ল্যাম্পটিকে জ্বেলে নাও। তারপর বড় চামচটাতে খানিকটা তামা আর 'পটাশ সালফেট' স্পিরিট ল্যাম্পের

জ্বলন্ত-শিখার আঁচের উপরে সন্তর্পণে চামচ-সমেত ঐ রাসায়নিক-পদার্থ দুটিকে কিছুক্ষণ ধরে রেখে বেশ সু-তপ্ত করে নাও। আগুনের আঁচে এভাবে সু-তপ্ত করার ফলে, রাসায়নিক-পদার্থ দুটি ক্রমেই গলে যাবে (Liquid ofrm) এবং মিলে-মিশে একত্রিত হয়ে বিচিত্র গাঢ় সবুজ রঙের 'তরল-মিশ্রণের' রূপধারণ করবে।

এই রূপান্তর ঘটবার সঙ্গে সঙ্গেই গাঢ় সবুজ 'তরল-মিশ্রণ' ভরা চামচটিকে আগুনের শিখার আঁচ থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে আসরের দর্শকদের উৎসুক-দৃষ্টির সুমুখে মেলে ধরো। তাহলেই তাঁরা বিস্ময়াভিভূত-নয়নে দেখতে পাবেন যে বিজ্ঞানের আজব রহস্যময় প্রক্রিয়ার ফলে, চামচের সেই গাঢ়-সবুজ (Dark Green) রঙের উত্তপ্ত, 'তরল-মিশ্রণটি' উন্মুক্ত-বাতাসের স্পর্শে জুড়িয়ে আসার সংগে সংগেই ক্রমশঃ পান্নার মতো ফিকে-সবুজ (Emeral-Green) রঙের 'জমাট-ডেলা' বা 'Solid' উপাদানে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে। এমনটি ঘটবার আরো কিছুক্ষণ বাদে, জমাট-ডেলাটির উত্তাপ যখন ক্রমে আরেকটু জুড়িয়ে গিয়ে প্রায় ফুটন্ত গরম-জলের সমান হবে, আসরের দর্শকেরা তখন অবাক-বিস্ময়ে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবেন যে চামচের জমাট-ডেলাটির অভ্যন্তরে সহসা কি যেন অদ্ভুত আলোড়ন সুরু হয়েছে অর্থাৎ ঐ জড়-পদার্থটি যেন তাপমাত্রার তারতম্যে কোন রহস্যময় যাদু-মন্ত্রে নিমিষের মধ্যেই হঠাৎ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে এবং তার অঙ্গের প্রতিটি অণু-কণাও ক্রমশঃ সচঞ্চল ও সক্রিয় অবস্থা ধারণ করে ধীরে ধীরে কয়েক মুহূর্তের ভিতরেই ধুলো-বালির মতো সূক্ষ্ম-দানায় পর্য্যবসিত হয়ে যাচ্ছে।

এটিই হলো—এবারের মজার খেলাটার আসল রহস্য। এমন আজব কাণ্ড কেন ঘটে জানো? ঘটে—তাপমাত্রার অল্প-বিস্তর তারতম্যের ফলে, পদার্থেরও রূপান্তর হয় বলে।

আগামীবারে এমনি ধরণের আরেকটি নতুন খেলার পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

[ক্রমশঃ

মনোহর মৈত্র

১। অক্ষর সাজানোর আজব হেঁয়ালী :

নীচের পংক্তিগুলিতে এলোমেলো উল্টোপাল্টাভাবে ছড়ানো রয়েছে এমন কয়েকটি অক্ষর, যেগুলিকে ঠিক-মতো সাজিয়ে বসাতে পারলে, সহজেই সন্ধান পাবে বাঙলা সাহিত্যের নামজাদা লেখক-লেখিকার লেখা নানান্ বিখ্যাত নাটক, উপন্যাস, গল্প-কাহিনী আর কাব্য-গ্রন্থের নাম। ছাখো তো চেষ্টা করে—তোমরা সেগুলির সঠিক সন্ধান খুঁজে পাও কিনা!

১। হিরাকানীজ
২। নকামানয়াংনাতীবময়
৩। রচন্দয়ালিৎচা
৪। পেজরলাত্নী
৫। শনীফাজাহুপা
৬। গুপাদাগলা
৭। থলাগুনাভোশি
৮। গুনীকৃকারেহিরনিট
৯। লঞ্চুলাপ
১০। পেল্লবাগপুর
১১। কডুমাড়ুমটামডু
১২। ছোণদেয়রাটবমা

২। 'কিশোর জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা :

রক্ত-মাংসে গড়া দেহ
নাচি হেলে-দুলে,
ঝুটার বদলে মোরে
দেখায় সকলে।

সম-শ্রেণী মাঝে মোর
মাথা সর্ব্ব নীচে,
বয়সেতে বড়…কিন্তু
গোণা হয় পিছে !

রচনা : কল্যাণী মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)

গত মাসের ধাঁধা আর হেঁয়ালির' উত্তর :

১।
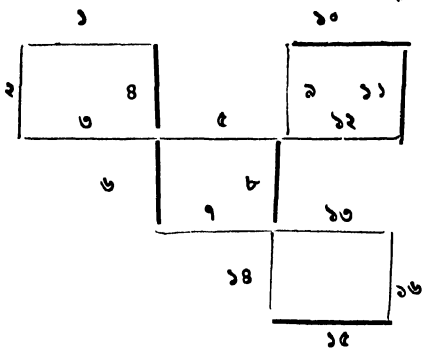
—১৭
—১৮
—১৯
—২০

উপরের নক্সার ছাঁদে দেশলাই-কাঠি চারটিকে সরিয়ে নিলেই সঠিক উপায় মিলবে।

২। চিরুণী

গতমাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

বিপাশা, চন্দ্রা, সুমিত্রা, সৌমিত্র, তাপস, মানস ও পল্টু সেন (কলিকাতা), বুবুন, ছোট্টু, খুকু, লিনটু, শোভা, পুঁটু, সান্টু, গৌরী ও সুতপা রায়চৌধুরী (বোলপুর), শুভাশীষ ও অরিন্দম বসু (কলিকাতা), অলক, তিলক, অমিয় রায় (কৃষ্ণনগর), হরিদাস, রামদাস, চৈতন্যদাস, শ্যামাদাস ও চিত্রেশ্বরী পাল (বর্দ্ধমান), রেণু, পানু, ছানু, সবু, নবু ও লতা সেন রায় (কলিকাতা), ব্রজেন্দ্র; রমেন্দ্র, সত্যেন্দ্র, নবেন্দু, দিব্যেন্দু, ও পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (রাঁচী), পুতুল, সুষমা, হাবলু, টাবলু, নিপু ও সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় (হাওড়া), ফণীন্দ্র, রোচনা ও লোচনা সাহা (কলিকাতা), নিখিলেশ, বাদল, কাজল, চন্দ্রিমা, পুলকেশ ও ছোটকু চৌধুরী (কলিকাতা), টোডা, বটুক, টিটু, লাটু, ও নানকু (বারুইপুর), কোয়েলী, কুহেলী, চামেলী, নূপুর, মিঠু, বুবু, সঙ্ঘমিত্রা, খুকু ও চন্দ্রনাথ ঘোষ (কলিকাতা)।

গতমাসের একটি ধাঁধার উত্তর সঠিক দিয়েছে :

মনোবীণা, তপোলীনা, সুমোহন, বাসুদেব ও মনোভিরাম গঙ্গোপাধ্যায় (কলিকাতা), চন্দ্রনাথ, দেবনাথ, সতীনাথ, কালীনাথ, মহেন্দ্র, বরেন্দ্র, শ্যামসুন্দর, কাকলী, সুনন্দা, মাধবী, চিত্রলেখা, চন্দ্রপ্রভা, শ্রাবণী ও লাবণী মিত্র (কাণপুর), বিস্কু, পিস্কু, সন্তু, পটল, অঘোর ও নিবারণ নন্দী (কলিকাতা), শিবানী, শান্তনু, বিভা, জাহ্নবী, ছবি ও মঞ্জুলা সিংহ (বিলাসপুর), বিশ্বনাথ ও দেবকীনন্দন সিংহ (গয়া), আশুতোষ, শিবতোষ, মনতোষ, প্রাণতোষ, ভবানীতোষ, হিমানী, প্রিয়ম্বদা, সংযুক্তা, লালী, ছকু ও লোকু রাহা (কলিকাতা), দীপঙ্কর, শঙ্কর, অভয়াঙ্কর ও নন্দিতা চট্টোপাধ্যায় (বাঙ্গালোর), কপিলদেব, মদনমোহন, প্রভাকর, অভিজিৎ, কুণাল, লিপি, রাজেন্দ্র, দেবেন্দ্র, নরেন্দ্র, ও সীমা মুখোপাধ্যায় (নিউ দিল্লী), লক্ষ্মীকান্ত, চন্দ্রকান্ত, শ্রীকান্ত, শ্যামলী, চামেলী ও নবীনচন্দ্র মণ্ডল (বাঁকুড়া)।

বর্ষ বিদায়

শ্রী'শ'—

১৯৬৮ সাল শেষ হতে চলল। এই পুরা একটা বছরে বাংলা ও ভারতের চলচ্চিত্র জগতে অনেক চিত্রই নির্মিত হল ও মুক্তি পেল, অনেক নাটকই লেখা হল ও মঞ্চস্থ হল। এর মধ্যে কয়েকটি চিত্র পুরস্কৃত হল—বাংলার চিত্র শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করল, 'বাঙ্গালী অভিনেতা শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মানে ভূষিত হলেন। সিনেমা ধর্মঘটে বন্ধ রইল কতকাল বাংলার প্রেক্ষাগৃহগুলি, আবার খুলল নতুন নতুন চিত্র উপহার নিয়ে। এ রকম বাঞ্ছিত,অবাঞ্ছিত কত কিছুই ঘটে গেল গোটা বছরে—কত হাসি-অশ্রুর কাহিনী সংঘটিত হল প্রকাশ্যে ও অন্তরালে। এর মধ্যে মৃত্যুর মমতাহীন নিয়মে কয়েকটি বিশিষ্ট অভিনেতার জীবন রঙ্গমঞ্চের ওপরও শেষ যবনিকা নেমে এল! আবার অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয়ের অন্তরালে সত্যকার শুভ-পরিণয়ও সম্ভব হল! মানুষ আসছে, যাচ্ছে—অভিনয় চলেছে রঙ্গমঞ্চে, চলচ্চিত্রে—যবনিকা পড়ছে, উঠছে—সমাপ্তির পর আবার শুরু, আবার সমাপ্তি—এই নিয়মেই চলেছে চলমান জগৎ বাস্তবে ও রঙ্গমঞ্চে! এ চিরকালই চলেছে, চিরকালই চলবে; তবু যখন বিশিষ্ট জন, আপনজন কারুর জীবনের ওপর শেষ যবনিকা নেমে আসে, তখন গুণমুগ্ধ জনসাধারণ ও আত্মীয় স্বজনের কাছে সে প্রয়াণ মহাপ্রয়াণের পর্য্যায়ে পড়ে, শোক-সন্তপ্ত চিত্ত শ্রদ্ধায় স্মরণ করে তাঁদের গুণপণাকে!

নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্র কয়েকমাস আগে ৭৯ বছর বয়সে পরলোকে প্রস্থান করলেন। অভিনেতা নরেশ মিত্রের নাম বাংলার দর্শক সাধারণের প্রায় প্রত্যেকেরই জানা। বিগত এক যুগ ধরে বাঙ্গালী দর্শক তাঁর অভিনয় দেখে আসছে প্রশংসমান দৃষ্টিতে। নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ীর সমসাময়িক এই প্রতিভাধর নট সেই শিশির-যুগ থেকে বাংলা রঙ্গমঞ্চের এক দিক্‌পাল

রূপে এই পরিণত বয়স পর্য্যন্ত অভিনয় করে গেলেন। বৃদ্ধ হয়েছেন বলে তিনি অভিনয় জগৎ থেকে অবসর গ্রহণ করেন নি—অভিনেতা রূপেই তিনি চিরবিদায় নিয়েছেন দর্শকদের কাঁদিয়ে। প্রতিভাধর নট নরেশচন্দ্রের মৃত্যু এই বৎসরের অভিনয় জগতের এক বিষাদপূর্ণ ঘটনা।

এরপর মাত্র কয়েকদিন আগেই অভিনয় করতে করতেই প্রায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন যাত্রা রঙ্গমঞ্চের অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ প্রতিভা ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ। অভিনয় করতে করতেই এই মহানটের জীবনে নেমে এল শেষ যবনিকা—চিরজীবনের মত বিদায় নিলেন দর্শকদের কাছ থেকে! যাত্রা পালা রচনায় ও পরিচালনায় তাঁর দান চিরকাল লোকে স্মরণ করবে, আর অভিনেতা-রূপে বাঙ্গালী দর্শকের মনে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদ্যাবিনোদের বিদায় এক মহা অঘটন!

এর মধ্যে আর একটী নাট্য প্রতিভার মহাপ্রয়াণ ঘটেছে। মাসখানেক আগে অপেশাদার রঙ্গমঞ্চের এক স্বনামধন্য অভিনেতার পরলোকে প্রয়াণ ঘটেছে। বাংলার বিদগ্ধ সমাজ এই সুশিক্ষিত, ব্যাক্তিত্বসম্পন্ন, প্রতিভাধর অভিনেতা কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। শিশিরকুমার ভাদুড়ী, নরেশ মিত্র প্রভৃতি দিক্‌পাল অভিনেতাদের সমসাময়িক কান্তি মুখোপাধ্যায় ছাত্রাবস্থায় কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট্-এর রঙ্গমঞ্চে একই সঙ্গে অভিনয় আরম্ভ করেন। প্রথম জীবনে কান্তিবাবু স্ত্রী-চরিত্রে অপূর্ব্ব অভিনয় করে দর্শক-মন জয় করতেন। তিনি বাংলা ও ইংরাজী, বিশেষ করে শেক্সপীয়রের নাটকের অভিনয়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এই সব নাটকে তিনি স্ত্রী ও পুরুষ উভয় চরিত্রে অভিনয় করেই যশস্বী হন। চন্দ্রগুপ্ত নাটকে চাণক্য-চরিত্রে তিনি অপূর্ব্ব অভিনয় করতেন এবং শেক্সপীয়রের "মার্চেন্ট অফ ভেনিস্" নাটকের 'সাইলক্' চরিত্রে তাঁর অভিনয়ের খ্যাতি সাগরপারেও পৌছেছিল। অদ্ভুত ছিল তাঁর স্মরণশক্তি ও পাঠাভ্যাস। শেক্সপীয়রের সমগ্র রচনাবলী তিনি প্রায় মুখস্থ বলতে পারতেন। অনেক নাট্যবিশেষজ্ঞের মতে কান্তিবাবু পেশাদার রঙ্গমঞ্চে যোগদান করলে শিশির ভাদুড়ী, নরেশ মিত্র প্রভৃতির চেয়ে কম পারদর্শিতা দেখাতেন না। কিন্তু কলিকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট অ্যাটর্ণী কান্তিবাবু তাঁর আইন ব্যবসায় ত্যাগ করে অভিনয়কে পেশা বলে গ্রহণ করেন নি। পরিণত বয়সে এই পরিণত প্রতিভার প্রয়াণে বাংলার অপেশাদার রঙ্গমঞ্চের ও বিশেষ করে শেক্সপীয়র নাটক অভিনয়ের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হল!

এর পর দু'টি উল্লেখযোগ্য বিবাহ বাসরের উল্লেখ করছি। বাংলা চলচ্চিত্র জগতের দুই উজ্জ্বল তারকা শ্রীমতী সন্ধ্যা রায় ও শ্রীমতী মাধবী মুখোপাধ্যায় পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। শ্রীমতী সন্ধ্যা পরিচালক শ্রীতরুণ মজুমদারকে তাঁর জীবনের পরিচালকরূপে গ্রহণ করেছেন এবং শ্রীমতী মাধবী অভিনেতা নির্ম্মলকুমারকে তাঁর চিরদিনের নায়করূপে মনোনীত করেছেন। আমরা বাংলা চিত্রের এই দুই নায়িকার সুমধুর দাম্পত্যজীবন কামনা করছি এবং আশা করি পরিচালক ও অভিনেতা স্বামীদের সাহচর্য্যে তাঁদের অভিনয় প্রতিভার আরও বিকাশ ঘটবে এবং তাঁরা আরও বহুকাল নায়িকারূপে বাঙ্গালী দর্শকদের মন হরণ করে চলবেন।

১৯৬৮ সাল বিদায় নিল—এই সব অশ্রু ও আনন্দের কাহিনী নিয়ে। ১৯৬৯-এর দিকে আমরা সাগ্রহে চেয়ে আছি, সেটি যেন আসে শুধুই আনন্দ নিয়ে।

———

* * * * * *

সাগরপারের ধ্রুপদী চলচ্চিত্র

শ্রীনরেশচন্দ্র বসু

জার্মানী ১৯২৪

জার্মানীর "দি লাষ্ট লাফ" (The last laugh) বিষয় বৈচিত্র্যে শুধুমাত্র যে তৎকালীন দিনে দেশে সাড়া জাগিয়েছিল তা নয়, তার আবেদন আজও আমাদের কাছে ফুরিয়ে গেছে বলে মনে হয় না। প্রত্যেক মানুষেই একদিন কৈশোর যৌবন পার হয়ে বার্দ্ধক্যে উপনীত হবে, জরায় আক্রান্ত হবে—এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম, এর ব্যতিক্রম নেই। বৃদ্ধকালে যখন পরিবার, পুত্র, কন্যা কেউই কাছে থাকে না, মানুষের সেই নিঃসঙ্গ দিনের অবস্থা অকল্পনীয়। এর ওপর যদি আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকে তবে তো কথাই নেই। আমাদের ভারতবর্ষে এই সমস্যা আছে কিন্তু ইউরোপের মত এত ব্যাপক নয়। সেখানে পুত্র বিবাহের পরই পৃথক হয়ে যায়। ফলে বৃদ্ধ বয়সে অকর্ম্মণ্য দেহভার নিয়ে সামান্য একটু আলাপের জন্য মানুষ চাতকের ন্যায় প্রতীক্ষায় থাকে। যদিও সরকার থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য আলাদা বাসস্থানের, খাদ্যের, পুস্তকের সমস্ত ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু সাংসারিক পরিবেশ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা সব কিছুরই সেখানে অনুপস্থিতি জীবনকে শূন্যময় করে তোলে। এরই পটভূমিতে "দি লাষ্ট লাফ" নির্মিত হয়েছিল।

"দি ক্যাবিনেট অব ডাঃ ক্যালিগরী" চিত্রটি তার নিজস্ব ভঙ্গিমা ও প্রয়োগ নৈপুণ্যের জন্য বিশ্বের সর্বত্রই বিশেষভাবে আদৃত হয়েছিল। এই গ্রন্থের যুগ্ম লেখকদের মধ্যে কার্ল মায়ার চিত্রনাট্য রচনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি প্রতিভাসম্পন্ন পরিচালক এফ্ ডব্লু মারনৌর সঙ্গে যোগদান করে দর্শকসাধারণকে উপহার দিলেন "দি লাষ্ট লাফ"। ডাঃ ক্যালীগরীর ফ্যানটাসি অপেক্ষা এই চিত্রটি আরও বাস্তব, আরও সজীব। যুদ্ধোত্তর ইউরোপ আস্তে আস্তে তার শিল্পকলা ব্যবসা বাণিজ্য সবই পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করছিল এবং নূতন নূতন জিনিষের উদ্ভাবন সর্বক্ষেত্রেই একটা অগ্রগতির সূচনা করেছিল। সর্বপ্রথম নতুন গতিশীল ক্যামেরার দ্বারা আলোকচিত্র গ্রহণ, এমিল জেনিংসের অসাধারণ চরিত্র চিত্রণ; বহিরঙ্গে ও অন্তঃসৌন্দর্য্যে অপূর্ব শিল্প মণ্ডিত, বিষয় বৈচিত্র্যে অনাস্বাদিত "দি লাষ্ট লাফ" জার্মানী ও পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যসমূহে এবং আমেরিকায় অভূতপূর্ব ভাবে জনগণের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হয়েছিল। এই চিত্র বিংশ শতাব্দীর অভিব্যক্তিবাদী ও কিউবিষ্ট শ্রেণীর চিত্রকরদের উপযোগী করেই যেন নির্মিত হয়েছিল।

মারনৌর ন্যায় এমিল জেনিংসকেও হলিউডে আনা হয়েছিল "দি লাষ্ট লাফ" এর দ্বিতীয় আমেরিকান সংস্করণের জন্য। আমেরিকায় তখন বিদেশী তারকা একমাত্র গ্রীটা গার্বো যিনি তখনও খ্যাতির সর্বোচ্চ চূড়ায় এবং স্বেচ্ছা নির্বাসন না নেওয়া পর্য্যন্ত সে আসন থেকে বিচ্যুত হননি। জেনিংস এক গ্রামীন, সহানুভূতিশীল দ্বাররক্ষকের ভূমিকায় রূপদান করলেন—যাকে সকলেই কটূক্তি করে, যে সকলের ঘৃণার, করুণার ও অবহেলার পাত্র। এই চরিত্র সৃষ্টি এক কথায় অনন্য। যদিও এক বৎসর পর "ভ্যারাইটি" নামক চিত্রে তাঁর অভিনয় আরও সজীব, আরও সংবেদনশীল।

জেনিংসের অভিনীত চরিত্রটি হচ্ছে হোটেলের দ্বাররক্ষকের। একদিন হোটেলের ম্যানেজার দেখলেন যে উত্তম পোষাকে সজ্জিত দ্বাররক্ষক একপ্রস্থ বাক্স পেটরার বোঝা মাথায় নিয়ে টলমল্ করছে। বলা বাহুল্য দ্বাররক্ষকের সঙ্গে মালবাহকের কাজও তাকে করতে হোত। তার এই অবস্থা দেখে ম্যানেজার দয়াপরবশ হয়ে তাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত না করে স্নানাগারের পরিচর্য্যাকর হিসাবে পুনঃনিয়োগ করলেন। ফলে সামাজিক সত্য হিসাবে অমানবিক এক প্রশ্ন এসে দাঁড়াল যেটা বিশেষভাবে জর্মানদেশে খুবই পরিচিত।—সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে পুরোহিত তন্ত্র বা যাজকগণ কর্ত্তৃক শাসন ব্যবস্থা। একদিন মূল্যবান পোষাকে সজ্জিত ঘূর্ণায়মান দরজায় প্রহরারত অবস্থা, নিজ সহকর্মীদের মধ্যে রাজার ন্যায় অবস্থান, সেইরূপ যশ, সম্মান, প্রতিপত্তি ও দাপট; অপরদিকে প্রতিপত্তিহানির সঙ্গে সঙ্গে বর্ণহীন পোষাক, সঙ্গী ভাড়াটেদের নিকট এমনকি আত্মীয়স্বজনদের নিকট থেকেও অবজ্ঞা ও ভ্রূকুটি, আদিম উক্তি ও উপহাস—

এই হৃদয়বিদারক অবস্থার আত্মঘাতী ফলাফল সহজেই অনুমেয়। যুগ ব্যবস্থার প্রতি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানুষের জীবনকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে এই চিত্রটি শিল্পগুণসমৃদ্ধ হয়ে তা প্রকাশ করায় সহজেই দর্শকমনে গভীর রেখাপাত করতে সমর্থ হয়েছিল।

এই চিত্রটির কাহিনীগত বৈশিষ্ট্য ছাড়া এর শিল্পগত গুণ জার্মানী ও রাশিয়ার নির্বাক চিত্র নির্মাণের পরবর্তী স্তরে উত্তীর্ণ হতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছিল। মারণো ও পরবর্তী যুগে ফ্রিজল্যাণ্ড, চলচ্চিত্র গ্রহণে ক্যামেরার যে কলাকৌশল দেখিয়েছিলেন তা চিত্র গ্রহণের ক্ষেত্রের দিগন্ত বিস্তৃত করে দিয়েছিল। কাহিনীকে গতিশীল, ব্যঞ্জনাময় করে তুলতে ক্যামেরা যে কিরূপ অংশ গ্রহণ করতে পারে অন্ততঃ একটি দৃশ্যের কথা উল্লেখ করলে সেটি পরিষ্কার হবে—যেখানে নেশাগ্রস্ত দ্বাররক্ষক উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তার কর্মক্ষেত্রে অবনতির কথা শুনছে, তার ক্লোজ আপ।

পরিশেষে চিত্রটী দর্শক সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য ঐ অথর্ব বৃদ্ধটির উপর কিছু করুণা প্রকাশ করা হয়েছে। বৃদ্ধটি হঠাৎ বহু টাকার মালিক হয়ে গিয়ে নিজের আর্থিক দুর্গতি কাটিয়ে উঠলেন। এক ভদ্রলোক তাঁর উইলে এইরূপ ব্যবস্থা করেছিলেন যে তিনি মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে যাকে দেখবেন সেই তাঁর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে। মৃত্যুকালে স্নানাগারের এই পরিচর্য্যাকারীটি ব্যতীত তার কেহই ছিল না। সুতরাং সেই সমস্ত সম্পত্তির মালিক দ্বাররক্ষকে তার পার্থিব ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা সমস্তই পূর্ণ করতে পেরেছিল। তার এক বিশ্বস্ত বন্ধু রাত্রের প্রহরীকে নিয়ে জুড়ি গাড়ী চেপে মনের বাসনা কামনাকে পূর্ণ করতে সে জনারণ্যে মিলিয়ে গেল। মুখে তার হাসি, শেষ হাসি কি না কে জানে?

* * * * *

প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন—নীপা চৌধুরী

রবীন চট্টোপাধ্যায়—যশোর রোড, দমদম

ডাঃ হরগোবিন্দ খোরানাকে দেশে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে না কেন?

০ কি লাভ? যে দেশে গরুর গাড়ি ও জেট প্লেন সহাবস্থান করে সে দেশে ডাঃ খোরানার মত লোকের কিছু করবার থাকতে পারে না। বরঞ্চ এই হবু রাজার গবু মন্ত্রীর দেশ থেকে বাইরে থাকলে উনি শান্তিতে কাজ করতে পারবেন।

* * *

পুলক দাশগুপ্ত—গোপালনগর রোড, কলিকাতা

হৃদয়ের একুল ওকুল দুকুল ভেসে যায় হায় সজনী……

০ বুঝেছি বুঝেছি, Bankএর পাস বইটি পাঠিয়ে দিন, কি রকম Bank Balance আছে আগে দেখি, পরে অন্য কথা ভাবা যাবে।

* * *

শ্যামল গাঙ্গুলী—বিধান সরণী, কলিকাতা

খুব সাবধান, আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভারতবর্ষ চূড়ান্তভাবে মাদক বর্জন নীতি গ্রহণ করবে। তারপর?

০ তারপরেই আমরা চূড়ান্তভাবে রামরাজ্যের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাব। ভণ্ডামীরও একটা সীমা থাকা উচিত।

* * *

শ্রাবনী মুখার্জী—নিউ আলিপুর, কলিকাতা

পুরস্কার পাওয়াতে সত্যজিৎ রায় বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি, কারণ পুরস্কার তিনি প্রায়ই পেয়ে থাকেন, উত্তমকুমার প্রথমে বিশ্বাসই করেন নি, পরে ব্যাপারটা সত্যি জেনে মায়ের কাছে দৌড়ে গেলেন, তপন সিংহ বারো বছর আগে একবার পেয়েছিলেন, বারো বছর পরে আর একবার পেলেন, মাঝের সময়টা তাকে নির্বিকার করে তুলেছে। "যো আপসে আতা হায় উসে আনে

দো" গোছের ভাব করে তিনিও আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন, এইসব কাণ্ড কারখানা দেখে কি মনে হয় আপনার ?

০ মনে হয় যে একমাত্র উত্তমকুমারই এখনও পর্য্যন্ত ইনটেলেকচুয়াল হতে পারেন'নি তার কারণ বোধহয় এই যে তার মাথা থেকে পা অংধি শতকরা ১০০% ভাগই তিনি বাঙালী। তার এই মনটা দীর্ঘজীবী হোক আমি এইটুকুই কামনা করব।

*　　*　　*

মিলন ব্যানার্জি—হিদারাম ব্যানার্জি লেন, কলিকাতা

বিক্ষোভ জানাবার সহজ উপায় কি ?

০ ট্রাম বাস পোড়ান, ওইটেই লেটেষ্ট পদ্ধতি।

*　　*　　*

তারাপদ বাগচী—শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট-কলিকাতা

আজকালকার ছেলেমেয়েরা এত উচ্ছৃঙ্খল হয়েছে কেন বলতো ? পৃথিবীর কোন নিয়ম কানুনই তারা মানতে চায় না। কি চায় ওরা ?

০ ওরা কি চায় সেটুকু তো কোনদিনই আপনারা জানতে চান নি। একতরফা উচ্ছৃঙ্খল বলে অপবাদ দিচ্ছেন কেন, ওদের তরফেরও তো অনেক কিছু বক্তব্য থাকতে পারে। নিয়ম কানুন ঠিকমত আছে কোথায় যে মানবে ওরা! পৃথিবীতে চোখ মেলার পর হতে ওরা শুধুই দেখছে যে অপরকে ভাল হবার উপদেশ দিয়ে লোকে নানা অসৎ পথের চোরাগলিতে নিজের আখের গোছাচ্ছে। এক্ষেত্রে বিদ্রোহ করাটাই স্বাভাবিক, কারণ যৌবনের ধর্মই হচ্ছে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা।

*　　*　　*

মালবিকা দত্ত—মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আমার দাদা রোজ দাড়ী কামাবার সময় রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রেকর্ড বাজায়। জিজ্ঞেস করাতে একদিন বললে রবীন্দ্রসঙ্গীত না শুনলে ওর দাড়ী কামাবার মেজাজ আসে না। রবীন্দ্রনাথ যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে এ অবস্থায় কি করতেন ?

০ বোধহয় দাড়ি কামিয়ে ফেলে রবীন্দ্রসঙ্গীত লেখা বন্ধ করে দিয়ে দাড়ি রাখার উপকারিতা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতেন।

*　　*　　*

মহুয়া বসু—কুইনস রোড, বম্বে

পুরস্কার পাবার খবর পেয়ে উত্তমকুমার প্রথমেই তার মায়ের কাছে দৌড়ে গেলেন কেন ?

০ উত্তমকুমার অনেক বড় শিল্পী হতে পারেন কিন্তু এই পৃথিবীর আলো দেখবার পাসপোর্ট তিনি তার মায়ের কাছ হতেই পেয়েছেন এটুকু তিনি ভুলে যাননি বোধহয় সেই কারণেই। মানুষ কোন শুভসংবাদ পেলে ভগবানকে শ্রদ্ধা জানায়, সে কারণে। উত্তরটা বোধহয় প্রাচীনপন্থীদের মত হয়ে গেল, তাই না!

*　　*

রমলা ভাদুড়ী—মারলিন পার্ক, কলিকাতা

কোন্ জিনিষের উপর এখনও ট্যাক্স বসেনি ?

০ কেন! (অভি) নেতাদের বক্তৃতার বহর দেখে কি এখনও বুঝতে পারছেন না যে কথা বলার উপর এখনও কোন ট্যাক্স বসেনি। ও জিনিষ যত ইচ্ছে কেনা বেচা করুন, ট্যাক্স ফ্রী।

*　　*　　*

পিনাকী দত্ত—গৌর লাহা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উত্তরবঙ্গ যখন বন্যায় ভাসছে তখন কলকাতায় দেওয়ালীর বাজী পোড়ান হচ্ছে! আমরা মানুষ না বনমানুষ ?

০ নিজেদের সঙ্গে তুলনা করে বনমানুষদের অপমান করবেন না।

*　　*　　*

জনসাধারন যখন গুলি খায় নেতারা তখন কি করেন ?

০ বন্দুকের আওতার বাইরে দাঁড়িয়ে বুলি দেন।

*　　*　　*

সহদেব ঘটক—ইন্দ্র রায় রোড—কলিকাতা

আমার এক আত্মীয় আছেন যিনি তাঁর নিজের স্ত্রীকে কখনও একলা বাড়ির বাইরে কোথাও যেতে দেন না, কিন্তু অফিসে, রেষ্টুরেন্টে ও অন্যান্য জায়গায় সব সময়েই স্ত্রীস্বাধীনতার সমর্থনে লেকচার দিয়ে বেড়ান। আসলে উনি কোন দলের লোক বলতে পারেন ?

০ সুবিধাবাদী দলের। কিন্তু শুধু ওনাকেই বা একলা দোষ দিয়ে কি হবে, সব স্বামীদের মতন উনিও নিজের বাড়ী ছাড়া আর সব জায়গাতেই গণতন্ত্রে বিশ্বাসী।

* * *

মণীশ দাস—প্রতাপাদিত্য রোড, কলিকাতা

দিলীও শেষ পর্য্যন্ত আমার গুরুর (উত্তমকুমার) কাছে হার মানতে বাধ্য হল। দেখলেন তো?

০ না মেনে উপায় আছে! চেলাদের (দাবী) মানতে হবে এইটেই হল এ যুগের মহাপুরুষদের বাণী।

* * *

উদয় মাইতি—পাঁশকুড়া, মেদিনীপুর।

আমি মৌসুমী চ্যাটার্জির প্রেমে পড়েছি। কি করা যায় বলুন তো?

০ কিছু করা যায় না! বন্ধুদের দিয়ে অভিভাবকদের বলান তাড়াতাড়ি আপনাকে একটি বালিকা বধু যোগাড় করে দিতে।

* * *

বিপ্রদাস চৌধুরী—চক্রবেড়িয়া রোড, নর্থ—কলিকাতা।

শেষ অবধি মাধবী মুখার্জী নির্মলকুমারকে বিয়ে করছেন! কেন?

০ মানুষের সমাজ হতে বিয়ে করার নিয়মটা এখনও উঠে যায়নি বলে।

• • •

উৎপল মুখার্জী—গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা

ট্রামের গায়ে বিজ্ঞাপন লটকে কি লাভ হল?

০ মস্ত লাভ হল। পকেটে দুটো পয়সাও এল জনসাধারণকেও বোঝানো হল যে ট্রামকোম্পানীর দারুণ অর্থাভাব। অপরদিকে ভাড়া বাড়ানোর কথা বলবারও সুবিধে হল।

শুনছি লোক্যাল ট্রেনগুলোর গায়েও বিজ্ঞাপন লটকান হবে!

* এবং তারপরেই ভাড়া বাড়ান হবে।

* * *

করুণা মুখার্জী—ট্রাফিক কোয়াটার্স, পাটনা

বাঙলা ছবিতে আজ অবধি কোন গীতিনাট্য হয়েছে কি?

০ মাত্র একটিই হয়েছে। মধু বোস পরিচালিত "আলিবাবা"।

দিলীপকুমার ও সায়রা বানু বাঙলা ছবিতে অভিনয় করলে বাঙলা ছবির কি উপকার হবে?

০ বাঙলা ছবির কোনই উপকার হবে না। তবে প্রযোজকের পকেটে হয়ত বেশ মোটারকম কিছু টাকা আসলেও আসতে পারে।

একে একে নিভছে দেউটি……নরেশ মিত্রও চলে গেলেন!

০ যেতে তো একদিন সবাইকেই হবে। পুরোনো যুগ একদিন শেষ হয়ে যাবে নতুন যুগ তার প্রয়োজনমত নতুন শিল্পী গড়ে নেবে এইটেই তো চিরন্তন নিয়ম।

• • •

কমল চক্রবর্ত্তী—সোনারপুর, ২৪পরগণা।

নির্বাচনে কি অবস্থা দাঁড়াবে বলুন তো?

০ দাঁড়াবার মত অবস্থা আর কোথায় আছে বলুন! যাই ঘটুক না কেন একই জিনিষের এপিঠ আর ওপিঠ। বাঙালী জাতটাকেই নির্বাসনে পাঠাবার রাজনৈতিক ব্যবসাদাররা বেশ ভালবাবেই করে চলেছেন।

• • •

সুধীর মিত্র—নফর কুণ্ডু রোড, কলিকাতা

পত্রিকার গ্রাহক না হলে কি আপনারা উত্তর দেন না?

০ দিই কি না সেটা তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন।

———

* * * * *

চিত্রলেখা

লিখতে বসে প্রথমেই মনে এল কথাটা। কখনো ও দিকটা ভেবে দেখিনি, কিন্তু ইদানীং ব্যাপারটা বেশ একটু ভাবিয়ে তুলেছে। কি লিখব? সাংবাদিকতাটা আমার বেশী। কিন্তু নেশা বলেই যে কল্পনার পাখায় ভর করে আমাকে উড়তে হবে এমন কোন কথা নেই। সংবাদ পরিবেশন করাটাই ছিল আমার কাজ। দায়িত্ব নেওয়ার পর হতে আজ অবধি আমার সাধ্যানুযায়ী কর্ত্তব্য পালন করেছি। পৌঁছে দিয়েছি চলচ্চিত্রলোকের সুখ দুঃখের হাসি কান্নার খবর পাঠক পাঠিকাদের কাছে। কাউকে খুসী করতে পেরিছি কাউকে পারিনি। সংখ্যা কেবল বেড়েছে শত্রুর তেমনি বন্ধুর। মাঝে মাঝে ক্লান্তি এসেছে কিন্তু কখনও ঘুমিয়ে পড়তে দিইনি মনটাকে। তবুও আজ চিন্তা করতে হচ্ছে—কি লিখব? উত্তরের আশায় অনেক সাধ্য সাধনা করলাম মনকে কিন্তু মন আজ নির্বাক হয়েই রইল। শেষে যখন হতাশ হয়ে প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছি তখন উত্তর দেওয়াই যার কাজ সেই নীপাদেবী হঠাৎ প্রশ্ন করলেন "ব্যাপারটা কি? নেশার ঘোর হঠাৎ কেটে গেল নাকি? না কলমের কালি ফুরিয়ে গেল, কোনটা?"

কোনটাই নয় নীপাদেবী, নেশার ঘোর কেটেও যায়নি, মনের আবেগও শেষ হয়ে যায়নি। কলমের কালিও ফুরিয়ে যায়নি। তবে আকাশ এত মেঘলা কেন? আমারও ঐ একই প্রশ্ন। কিন্তু কি করব আমি নিরুপায়। রাজনীতি হতে দূরে সরে থাকাটাই আমার নীতি, কেননা সুদীর্ঘ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে পরিষ্কার দেখেছি যে মানুষকে অমানুষ করে তুলতে বর্ত্তমান যুগে এর মত নোংরা জিনিষ আর নেই।

কিন্তু কি লিখব এই কথাটাই বা আজ আমায় ভাবিয়ে তুলেছে কেন? কারণ অবশ্যই আছে। ইদানীং চলচ্চিত্রলোকের সর্বত্রই ঘুরে দেখেছি কেমন যেন একটা অস্থির অশান্তির ভাব। কিছুদিন আগেও প্রায় সবাই এক সঙ্গে এগিয়ে এসেছিলেন, পরস্পর পরস্পরের দিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন সহানুভূতি ও বন্ধুত্বভরা হাত। কিন্তু আজ সবাই যেন দূরে সরে গেছেন, ভাগ হয়ে গেছেন সব দলে দলে, কেউ যেন আর কাউকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না। সর্বত্রই একটা এলোমেলো ছন্নছাড়া রূপ। কলাকুশলীদের সঙ্গেও কথা বলেও দেখেছি তাদের মধ্যে একটা হতাশার ভাব নেবে এসেছে। কিন্তু কেন? কেন এমন হবে?

এই কেনর উত্তর কোথাও পাইনি। অবশ্য এটুকু স্বীকার করতেই হবে যে পুরোনো নিয়ম ভেঙ্গে ফেলে নতুন নিয়ম চালু করবার সময়ে একটা অনিশ্চতার ভাব আসে, আসাটাই স্বাভাবিক, তবুও চলচ্চিত্র মহলের সবাইকে করযোড়ে নিবেদন করছি যে এটা বাঙলাদেশের শিল্প ও সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান এটুকু যেন তারা ভুলে না যান। রাজনীতির কুটিল অদৃশ্য হাত আজ প্রত্যেকটি বাঙালীর জীবনকে ছন্নছাড়া করে দিয়েছে, কিন্তু দয়া করে শিল্পের পীঠস্থানে এই নোংরা জিনিষটার প্রশ্রয় আর দেবেন না। এই লাইনের বড় প্রযোজক, বড় পরিচালক, শিল্পী, এদের যেমন বাঁচবার অধিকার আছে ঠিক তেমনিই বাঁচবার অধিকার আছে ছোট প্রযোজক, ছোট পরিচালক ও ছোট শিল্পীদের। প্রত্যেকেরই প্রয়োজন প্রত্যেককে, কারণ ছবি তৈরীর ব্যাপারটা সমষ্টিগতভাবেই হয়, এককভাবে এখানে কোন কিছু হওয়া সম্ভব নয়।

কল্পনার আশ্রয় নিয়ে চিত্রলেখার পাতা যে ভরান যায় না তা নয় কিন্তু সেটা করবার বাসনা আমার নেই। নেই এই কারণে, সৃষ্টি করবার নেশায় যারা নিজেদের জীবনের ব্যক্তিগত সব আনন্দকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন শিল্পলোকের এই দুঃসময়ে কলমের আঁচড় কেটে তাদের নিয়ে কৌতুক করবার কোন অধিকার আমার নেই।

এটা যেমন একদিকের কথা তেমনি অপরদিকের প্রশ্নটাও আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। পাঠক পাঠিকাদের প্রশ্ন। যেহেতু আমার হাতে কলম আছে, ছাপবার জন্যে "ভারতবর্ষে"র পাতা আছে, সেইহেতু যা প্রাণে আসে লিখে পাঠক পাঠিকাদের হজম করতে বাধ্য করব এ নিয়ম আমি মানতে রাজী নই। তাতে নিজেরও যেমন রুচিবিকার ঘটে তেমনি রুচিবিকার ঘটে পাঠক পাঠিকারও। সেটা কোন সময়েই কাম্য হতে পারে না। তার চাইতে

কলম নামিয়ে রেখে হারিয়ে যাওয়া ভাল। ইতিহাসে নাম রেখে যাবার জন্যে আমরা কেহই জন্মাই নি।

অনেকদিন ধরে মনের মধ্যে একটা বাসনা ছিল। বাস্তবে কোনদিন পরিণত করা সম্ভব হবে কি না জানতাম না। চেষ্টাও করিনি, কারণটা অবশ্য আর কিছুই নয়, স্রেফ কুঁড়েমি। এবারে নিজের মনের কাছেই বিরাট একটা ধমক খেলাম। "চেষ্টা করেই দেখ না বাপু।" অগত্যা উঠতেই হল।

সাদর সম্ভাষণ জানালেন ভূপেন্দ্র কুমার সান্যাল মশাই। চার দেয়ালের মাঝে নিজের সিংহাসনে উপবিষ্ট। হাতে গীতা। ভাবলাম বোধহয় ঠিক সময়েই এসে পড়েছি। খালি হাতে ফিরতে হয়ত নাও হতে পারে।

একথা-সেকথার পর খানিক পরে নিজের বক্তব্য পেশ করলাম। শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। পরে ধীরে ধীরে বললেন "তা হয়না।" এই রকম উত্তর পাওয়ার সম্ভাবনা যে আছে তা জানতাম এবং জেনেই গিয়েছিলাম। প্রশ্ন করলাম "কেন?" আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন "লোকে এটাকে Publicity বলে ভাববে।"

একটু মরীয়া হয়ে বলে ফেললাম "ভাবুক, অনেকেই অনেক রকম ভাববে কিন্তু সেই দ্বিধা নিয়ে বসে থাকলে সংসারে তো কোন কাজ করতে কেউই ভরসা পাবে না।"

"কিন্তু প্রত্যেক জিনিষেরই তো একটা নিয়ম আছে!"

"হয়ত আছে, কিন্তু আমি তর্কযোগীশ নই। যে জিনিষের জন্যে আমি এসেছি আপনি তার স্রষ্টা একথা জানি, কিন্তু স্রষ্টা বলেই সবাইকে বঞ্চিত করে একটা ভাল জিনিষকে নিজের সিন্দুকে বন্ধ করে রাখবার অধিকার আপনার আছে এটাও কিন্তু আমি মানতে রাজী নই।"

একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সান্যাল মশাই।

শ্রীকান্ত

San Francisco International Film Festival
172 Golden Gate Avenue, Prospect 6 3220, San Francisco 2, California, Cable Adress-Filmfest.

Harold Zellerbach, President.
Irving M Levin, Director.

September 21, 1962.

Mr. B. K. Sanyal,
Renaissance Films,
Motion picture producers.
55, Gariahaat Road.
Calcutta-19.

Dear Mr. Sanyal,

It is with a great deal of pleasnre that I, on behalf of the committee accept your film, "Waves after waves" for presentation on the 1962 festival programme.The film shouldbe in our hands no later then October 27th (this is a specia extention for you).

We cordially invite the director, leading actor, and actress to participate in the Festival. During their stay at the festival, they will be our honoured guests.

With warm feelings,
International Film festival,
Irving M. Levin.
Director.

লর্ড টেনিসনের এনক আর্ডেন কবিতার ছায়াবলম্বনে
রেনেসাঁস ফিল্মস প্রযোজিত
"ঢেউ এর পরে ঢেউ"

ব্যবস্থাপনা—সুকুমার গুহ। রূপসজ্জা—শম্ভু দাস, মুক্তিরাম। তড়িৎ নিয়ন্ত্রণ—সুকুমার সরকার। চিত্রনাট্য ও সংলাপ—ভূপেন্দ্র কুমার সান্যাল, সুভীশ গুহঠাকুরতা, শৈলেন দে। প্রধান কর্মসচিব—ভাইডু সান্যাল, উমাপ্রসন্ন বসু। শব্দানুলেখন—সত্যেন চ্যাটার্জি, শ্যামসুন্দর ঘোষ, জ্যোতি চ্যাটার্জি। আলোকচিত্র—ভূপেন্দ্র কুমার সান্যাল। সম্পাদনা—গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়। "এ উষা এলো আজিকার" কথা, কণ্ঠ ও সুর—দেবব্রত বিশ্বাস। সুর সৃষ্টি—রবিশঙ্কর। আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিজ-এ পরিস্ফুটিত।

পরিচালনা- ভূপেন্দ্রকুমার সান্যাল, সুধীশ গুহঠাকুরতা।

শিল্পী		চরিত্র
শম্পা	—	পদ্ম
শঙ্কর	—	নিতাই
বাদল	—	লোটন
তারা ভাদুড়ী	—	ভামিনী পিসি
শৈলেন দে	—	মোড়ল
অনিল দত্ত	—	পদ্মর মামা
ধীরাজ দাস	--	ডাক্তার
গাঙ্গুলী মশাই	—	চরণদাস
সুকুমার	—	পঞ্চা
আরতি দাস	—	মাসী
স্বপ্না মিত্র	—	মোড়ল গিন্নী
সঙ্গীতা কর	—	ময়না
গোপাল সান্যাল	—	দাদু
সুহৃদ রায়	—	নকুল সাইঁদার
বিদেশ	—	গ্রাম্য যুবক
গোপা	—	পদ্ম (ছোট)
শান্তনু	—	নিতাই (ছোট)
স্বপন	—	লোটন (ছোট)

*　　　　*

নীল সমুদ্র। দূরে কোথায় যে এর দিগন্ত বোঝা যায় না।

মাছের আশায় এক ঝাঁক পাখী সমুদ্রের পাড় ঘেঁষে উড়ে বেড়ায়।

ঢেউএর পরে ঢেউ এসে সমুদ্রপারের বেলাভূমি ভাসিয়ে দিচ্ছে।

সমুদ্রপারের একটু ওপরে ঝাউয়ের বন। Camera pan করে সেখানে ঝাউয়ের বন দুভাগ হয়ে গ্রামে যাওয়ার পথ করে দিয়েছে সেখানে এসে Camera থেমে যায়।

গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় কয়েকজন জেলে জাল কাঁধে নিয়ে সমুদ্রে যাওয়ার পথে চলেছে।

দূরে জেলেরা মাছ ধরছে।

বালিয়াড়ির ওপরে নকুল সাঁইদারের আড়তের চালা।

নকুল সাঁইদার জেলেদের বকছে।

নকুল—এই কটা মাছ নিয়ে আমাকে উদ্ধার করতে এসেছিস ? আর আমি বসে বসে তোদের রোজ গুনবো।

একজন জেলে—মাছ আর পড়লো কই সাঁইদার—

নকুল—অত শত বুঝিনে বাপু—

বিরক্ত হয়ে সাঁইদার দূরে সমুদ্রে যেখানে জেলেরা মাছ ধরছিল সেদিকে তাকায়।

ঝাউবনের নিচে এসে নিতাই একটা গাছের গুঁড়ি ধরে দাঁড়ায়। অদূরে যেখানে ছেলেরা মাছ ধরায় রত ছিল ও বাচ্চা ছেলেরা খেলা করছিল সেদিকে একটু চেয়ে থেকে নিতাইয়ের দৃষ্টি পড়ে তার খেলার সাথী লোটন ও পদ্মর ওপর। ওরা জেলেদের জালের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছিল জাল থেকে ছিটকে-আসা দু একটা মাছ ধরার আশায়।

জাল টেনে প্রায় পাড়ের ওপর তুলেছে জেলেরা। বাচ্চারা কেউ কেউ জালের ফাঁকে হাত গলিয়ে দিয়ে ছোট ছোট মাছ ধরায় ব্যাপৃত হয়।

সাঁইদার বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে ধমকে ওঠে—

সাঁইদার—এই, এই হতচ্ছাড়ারা—

রেগে ওদের দিকে এগিয়ে যায় সাঁইদার।

হাসতে হাসতে লোটন ও পদ্ম দৌড়ে একদিকে পালিয়ে যায়।

নিতাই তার দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করে লোটন ও পদ্মর গতিপথ ;—একটু হেসে ওদের দিকে ছুটে চলে যায়।

খাঁড়ীর কাছে বালিয়াড়ীতে ওরা তিনজন। লোটন, পদ্ম ও নিতাই। বালি দিয়ে খেলাঘর তৈরী করতে ব্যস্ত।

নিতাই লোটনকে বলে—

নিতাই—এই লোটন, কিছুই হোচ্ছে না তোর। ও

খানটা আমি করছি, তুই যা বালি নিয়ে আয়।

অদূরে পদ্ম বালি তুলছিল দুহাতে, নিতাইয়ের কথা শুনে দৌড়ে ওদের কাছে এসে বলে—

পদ্ম—এই নে লোটন, এই বালি দিয়ে তুই এইদিকের দেয়াল তোল।

পদ্ম ওদের পাশে বসে, একটু ঝুঁকে নিতাইকে বলে—

পদ্ম—এ মা, এখানটায় জানালা করলি না?

বালির ঘরের একদিকে চাপড়াতে চাপড়াতে নিতাই বলে—

নিতাই—যা যা, ঠিক আছে—

নিতাই, লোটন, পদ্ম। সামনে বালির খেলাঘর। সকলেই খুসি। নিতাই কোমরে হাত দিয়ে খুসির দৃষ্টিতে বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে আছে। লোটন বলে—

লোটন—কি সুন্দর!

পদ্ম—জানিস, যেন সত্যি!

নিতাই কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল একটু জোরের সঙ্গেই যেন পদ্মকে বলে—

নিতাই—এ বাড়ির কর্ত্তা কে জানিস? আমি, আর তুই আমার বৌ।

লোটন—বাঃ আমি! আচ্ছা বেশ, কাল আমি কর্ত্তা আর তুই বৌ।

নিতাই—যাঃ যাঃ, সাতদিন ও আমার বৌ হবে

লোটন—(অভিমানে প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি) বাঃ, আমার বুঝি একদিনও হবে না?

পদ্ম—আচ্ছা আচ্ছা। আমি দুজনেরই বৌ হবো।

বেলা পড়ে গেছে। সূর্য্য অস্তগামী, প্রায় দিগন্তের কাছে নেমে পড়েছে।

বালির বাড়ি। নিতাই লোটন পদ্ম। সূর্যের শেষ রশ্মির একটুকরো ওদের মুখে আর বালির বাড়িতে এসে পড়েছে। লোটনের চোখে ভয়। লোটন বলে—

লোটন—এই যাঃ, বেলা পড়ে গেল—বাবা বকবে—চল্ চল্ বাড়ী যাই।

তিনজনেই পড়ন্ত সূর্যের দিকে তাকিয়ে ছুট দিল যেদিকে ঝাউবনের সারি দুভাগ হয়ে গ্রামে যাবার পথ করে দিয়েছে। দূরে তিনজনেই ঝাউবনের ফাঁকে মিলিয়ে যায়।

রাত্রি। ঝাউবন। চারিদিকে ঝিঁঝিঁর ডাক। কয়েকটা নিশাচর পাখী ডেকে ওঠে।

সমুদ্রে ঢেউয়ের পর ঢেউ পড়ছে।

দূরে একটি জীর্ণ কুঁড়েঘর দেখা যাচ্ছে। ঝিঁঝিঁরা অনবরত ডেকেই চলেছে। দূরে কোথাও শিয়াল ডেকে ওঠে।

সকাল। গুরুচরণের বাড়ি। লোটনের মা (গুরুচরণের স্ত্রী) উঠোনে গোবর ছড়া দিচ্ছে। গোয়ালঘর থেকে বাছুরদের হাম্বারব ও গলার ঘন্টির টুংটাং আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

গোয়ালঘর থেকে বিষ্টু একটি গরুর পিঠে হাত দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে বাইরে নিয়ে এসে জাবের চারির কাছে খুঁটিতে বেঁধে দিল। তারপরে অন্য একটি গরুকে বাইরে নিয়ে যায়। নেপথ্যে গুরুচরণ ডেকে বলে।

নেপথ্যে—লোটন, এই লোটন, ওঠ, উঠলি, মুখ হাত ধুয়ে পড়তে বোস।

দেয়ালে টাঙানো লক্ষ্মীর পট প্রণাম করে গুরুচরণ ছাতা বগলে করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

দাওয়ায় দাঁড়িয়ে গুরুচরণ দেখে লোটন পড়া আয়োজন করছে। ওকে দেখে গুরুচরণ বেরিয়ে যায়।

বিষ্টু চারিতে খড় খোল দিয়ে মিশিয়ে দিচ্ছে। পাশে পথ দিয়ে দুজন জেলে জাল কাঁধে বেরিয়ে যায়।

চরণদাসের জীর্ণ কুটীর। চরণদাস দাওয়ায় বসে তামা টানছে আর কাশছে। কয়েকজন জেলে উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে নিতাই ঘর থেকে

বেরিয়ে আসে। হঠাৎ কি একটা দেখে সে লাফিয়ে বেরিয়ে যায়।

উঠোনে রাখা একজন জেলের জালের ভিতর কিছু দেখে নিতাই জালটা ধরে টানাটানি করতে থাকে।

একজন জেলে নিতাইকে ধমক দেয়।

জেলে—এই :—

চরণদাস বিরক্তভাবে নিতাইয়ের দিকে তাকিয়ে হাতের হুঁকো অন্য একজন জেলেকে দিতে দিতে বলে

চরণদাস—আরে: ! এই ছেলেটা, এটা আমায় জ্বালিয়ে খেলে, খালি পরের জিনিসে হাত ; (মুখ ফিরিয়ে জেলেদের দিকে) ওর বাপটা যতকাল বেঁচেছিল জ্বালিয়েছে, ছেলেটাও—

হুঁকো হাতে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে একজন বলে

জেলে—হাঁ, মাতব্বর, ওর বাপ মহেশ তো তোমাকে দিনরাত জ্বালাতো, যা বলতে তার উল্টোটা করত। তাগড়াই জোয়ান ছিল। মাঝ দরিয়ায় যেতে অত সাহস কারোর ছিল না।

আর একজন জেলে মাথা নেড়ে সমর্থন করে।

অন্য জেলে—তা ঠিক, এ তল্লাটে মুনিষ বলতে ঐ একটাই ছিল। মহেশ।

অপর একজন জেলে—ঠিক ঠিক।

হুঁকো হাতে জেলেটি দাওয়ার এক কোণে কল্কে রেখে হুঁকোটি বেড়ার গায়ে ঝুলিয়ে রাখে। চরণদাস গামছা তুলে নিয়ে কাঁধে রাখতে রাখতে দাওয়ায় বেরিয়ে আসে। সবাই জাল কাঁধে নিয়ে সমুদ্রে যাওয়ার জন্যে তৈরী হয়।

চরণদাস—চল চল সব পা চালিয়ে চল।

সমুদ্রে যাওয়ার বেলে পথ। দুধারে ঝাউবন। চরণদাস ও অন্যান্য জেলেরা জাল কাঁধে এগিয়ে আসছে। ওদের পিছনে পিছনে কঞ্চি হাতে নিতাই। মাঝে মাঝে অকারণে সে হাতের কঞ্চি দিয়ে আশপাশের জংলা গাছগুলাকে আঘাত করছে।

পদ্মর বাড়ীর পিছন দিকের বেলেপথ দিয়ে চলেছে চরণদাস ও জেলেরা। পিছনে নিতাই। পদ্মর বাড়ীর কাছে আসতেই নিতাই একটু সরে এসে পা উঁচু করে গাছপালা ঢাকা উঁচু বেড়ার ওপর দিয়ে ভিতরে তাকায়।

ভিতরের দাওয়ায় পদ্ম বসে আছে।

হাতের কঞ্চি দিয়ে বেড়ার গায়ে এক ঘা মেরে নিতাই বলে—

নিতাই—এই পদ্ম, খেলতে যাবিনা ?

পদ্ম বেড়ার দিকে তাকায়।

রান্নাঘর থেকে পদ্মর মামী বকে ওঠে—

মামী—এই ভরসকালেই আবার !

চরণদাস মুখ ফিরিয়ে বিরক্তভাবে বলে—

চরণদাস—এটাকে নিয়ে আর পারিনে—এদিকে আয়।

চরণদাস ও অন্যান্য জেলেরা সমুদ্র-সৈকতে নেমে গেল। নিতাই পাড়ের ঝাউগাছের কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। ওর অবিন্যস্ত চুল হাওয়ায় আরো এলোমেলো হয়ে যায়। আকাশ যেখানে সমুদ্রে এসে মিশেছে সেইখানেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ।

মামী রান্নাঘর নিকিয়ে বাইরে এসে পদ্মকে বলে—

মামী—কখন থেকে বলছি বাসনগুলো ঘাটে রেখে আয়।

পদ্ম বাসনপত্তর তুলে নিয়ে চলে যায়।

বাসনপত্তর ঘাটে রেখে হাত ধুয়ে আবার দাওয়ায় এসে পদ্ম মুখ ভার করে বসে থাকে।

বইপত্তর গুটিয়ে রেখে লোটন উঠে পড়ে।

পদ্মর বাড়ীর পিছনে বেড়ার কাছে এসে দেখে লোটন পদ্ম ঘরের দাওয়ায় মুখ ভার করে বসে আছে।

লোটন ডাকে

লোটন—এই পদ্ম

মামী রান্নাঘরের কোণে হাত ধুয়ে এসে লোটনকে দেখতে পায়। একটু হেসে মামী বলে—

মামী—ওঁই, আর একজন এলো

মামী হাত ধুয়ে ঘরে চলে যায়।

লোটন পাশের ঝাঁপ তুলে ভেতরে ঢুকে পদ্মর পাশে এসে দাঁড়ায়। বলে

লোটন—কি হয়েছে রে?

পদ্ম কিছু বলল না, গম্ভীর হয়ে থাকে।

উঠোনে টাঙানো একটা বড় জাল গুটোতে গুটোতে মামা বলে

মামা—কিরে মামী বকেছে?

পদ্ম কোন উত্তর দেয় না। লোটন মামার দিকে তাকায়।

মামা বলে

মামা—খেলতে যাবি বুঝি? আচ্ছা যা, খেলতে যা।

পদ্মর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। ওরা দুজনে হাসতে হাসতে ঝাপ তুলে বেরিয়ে যায়।

ঝাউবনের ভিতর দিয়ে বেলেরাস্তা। লোটন ও পদ্ম আনন্দে মসগুল হয়ে পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। পদ্ম বলে

পদ্ম—নিতাই এসেছিলো, মামী কি রকম বকে দিল!

লোটন—কোথায় গেলরে ও?

পদ্ম—চরণ দাদুর সঙ্গে সমুদ্রে গেছে

লোটন—(একটু ভাবে) আচ্ছা, তুই যা, আমি এক্ষুণি বাড়ী থেকে আসছি।

লোটন ফিরে যায়। পদ্ম অন্যদিকে ধীরে ধীরে চলতে থাকে।

দূরে দেখা যায় পদ্ম সমুদ্রের দিকে চলেছে।

নিতাই ঝিমিয়ে আছে অন্যমনস্ক হয়ে। দূরে জেলেরা মাছ ধরায় ব্যস্ত। পদ্ম ধীরে ধীরে পা ফেলে এসে নিতাইয়ের পিঠে অ'চমকা একটা ছোট ধাক্কা দিয়ে বলে

পদ্ম—এই :—

অন্যমনস্ক নিতাই চমকে ওঠে। পিছন ফিরে দেখে পদ্ম। নিতাইয়ের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। পদ্মর একটা হাত ধরে বলে

নিতাই—চল।

নিতাই পদ্মকে নিয়ে দৌড়তে থাকে।

পদ্ম নিতাইয়ের সঙ্গে দৌড়ে পারেনা। হাত ছেড়ে দিয়ে নিতাই এগিয়ে যায়। পদ্ম তার পিছু পিছু দৌড়তে থাকে।

দূরে দেখা যায় নিতাই ঝাউবনে অদৃশ্য হয়ে যায়। কিছু দূরে পদ্মও ওকে অনুসরণ করে।

ঝাউবন। নুয়েপড়া গাছ ও ঝোপের ভিতর দিয়ে দেখা যায় নিতাই দৌড়ে একদিকে চলে যাচ্ছে।

ঝাউবন। একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে পদ্ম এদিক ওদিক দেখে—কোথাও নিতাইকে খুঁজে পায়না। পাশের ঢালু দিকটা দিয়ে সন্তর্পণে নামতে থাকে। নেপথ্যে লোটনের কণ্ঠ ভেসে আসে।

(নেপথ্যে) এই

পদ্ম চমকে ফিরে তাকায়; আনন্দে বলে ওঠে

পদ্ম—ও: তুই

লোটন কয়েক পা এগিয়ে পদ্মর কাছে এসে দাঁড়ায়। কোঁচড়ের কাপড়ের ভিতর হতে কয়েকটা নাড়ু বের করে দেখিয়ে বলে

লোটন—দ্যাখ, দ্যাখ।

পদ্ম নাড়ু দেখে উল্লসিত হয়ে চীৎকার করে।

পদ্ম—নিতাই, দ্যাখ লোটন কি এনেছে।

লোটনের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে

পদ্ম—এতগুলো কোথায় পেলি?

লোটন—বাবা বাড়ী নেই, আমি হাঁড়ি থেকে তুলে নিয়ে এসেছি।

একটা ঝোপের ভিতর থেকে নিতাই বেরিয়ে কাছে এসে পদ্মকে সরিয়ে দিয়ে লোটনকে বলে

নিতাই—এই দে।

নিতাই মহানন্দে নাড়ু চিবোতে থাকে।

নিতাই, পদ্ম, লোটন। সবাই মহানন্দে নাড়ু চিবোচ্ছে। কথা বলার অবকাশ নেই। হঠাৎ ওরা ঢালু পথ দিয়ে সমুদ্রের দিকে দৌড়তে থাকে।

ঝাউবন। লোটনের হাত থেকে নাড়ু পড়ে যায়। লোটন ঝুঁকে নীচু হয়ে নাড়ু তোলে। নিতাই ও পদ্ম দূরে সমুদ্রের দিকে চলে যায়।

সমুদ্রের পাড়। নিতাই ও পদ্ম দৌড়তে দৌড়তে এগিয়ে চলেছে। নেপথ্যে লোটন ডাকে

লোটন—এই নিতাই।

নিতাই ও পদ্ম থেমে যায়। পাড়ের উপর লোটন দাঁড়িয়ে। দুজনে লোটনের কাছে যাওয়ার জন্যে পাড়ের উপর দিকে উঠতে থাকে। লোটন একটু নেমে এসে হাত বাড়িয়ে দেয়—

নেপথ্যে আচমকা সাঁইদারের চীৎকার ভেসে আসে—

সাঁইদার—এই, এই হতছাড়ারা—

নিতাই, পদ্ম ও লোটন চমকে বালির ওপর পড়ে যায়। পরক্ষণেই ওরা তিনজনেই হাসিতে ভেঙে পড়ে।

নিতাই পদ্ম লোটন বালির ঢালুপাড় হতে গড়িয়ে পড়তে পড়তে হাসতে থাকে।

পদ্ম হাসছে।

নিতাই হাসছে।

লোটন বালিতে গড়িয়ে নামতে নামতে হাসতে থাকে।

সমুদ্রের ভিজে বালির ওপর মধ্যাহ্ন সূর্যের ছায়া। সময়ের গতির সাথে সাথে সেও এগোতে থাকে। এগিয়ে আসে সমুদ্রের ঢেউ। বালি থেকে কেড়ে নেয় প্রতিবিম্বকে।

পাড়ে ভামিনী পিসির চায়ের দোকান। ভামিনী পিসি চা তৈরী করছে। জেলেরা বসে বসে চা খাচ্ছে।

সমুদ্রতট থেকে সাঁইদার এগিয়ে আসে দোকানের দিকে। জেলেদের বলে সাঁইদার—

সাঁইদার—তোরা এখনও বসে বসে চা গিলছিস? এঁ্যা, বলি কখন জাল ফেলা হবে আর কখন মাছ ধরা হবে?

বলে দোকানে গিয়ে বসে। আবার বলে—

সাইঁদার—নেতাই কোথায়, সে নবাব আসেনি?

পদ্মর বাড়ী। বেড়ার ধারে রাস্তার দিকে দাঁড়িয়ে নিতাই, ভিতরে পদ্ম। দুজনেই এখন পূর্ণবয়স্ক যুবক-যুবতী। দেহের পাত্রে দুজনেরই যৌবন-জোয়ারের জল কানায় কানায় টলমল করছে।

নিতাই—এই যাঃ, বেলা হয়ে গেল, সাঁইদার বকাবকি করবে, যাইরে পদ্ম।

নিতাই চলে যায়।

বেড়ার ওপর ভর দিয়ে নিতাইয়ের যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলে পদ্ম—যাও, সারাদিন সাঁইদারের তামুক সাজোগে।

ভামিনীর চায়ের দোকান। জেলেরা উঠে পড়ে। সাঁইদার ভামিনীকে বলে

সাইঁদার—নে ভামিনী, ভালকরে এক কাপ চা খাওয়া দেখি!

দোকানের সামনের পথ দিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে নিতাই সমুদ্রের দিকে চলে যায়।

একজন জেলে বলে

জেলে—এত দেরী করলি, সাঁইদাঁর চটেছে।

সেও এগিয়ে যায় সমুদ্রের দিকে।

দোকানের ভিতরে সাঁইদার চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলে

সাইঁদার—নে নে তোরা এবার বেরিয়ে পড়।

ঢেউ এর পরে ঢেউ ছবিখানা দেখে ভালো লাগলো। এর মধ্যে একটি স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হয়েছে। এক সরল কবিত্ব এবং উত্তেজনাহীন প্রবাহের প্রাণস্বরূপ। টেনিসনের কাহিনীটি ব্যবহার করতে গিয়ে তার শোকাবহ সমাপ্তি যে বর্জন করা হয়নি, এর জন্যেও ছবিটি প্রশংসনীয়।

বুদ্ধদেব বসু।

ঢেউ এর পরে ঢেউ ছবিটি দেখলাম।

পরিচ্ছন্ন ছবি। কাহিনী নির্বাচনে ও চিত্রনাট্য সংগঠনে শুধু যে রুচিরই পরিচয় আছে তা নয়; রীতিমত সাহসেরও পরিচয় আছে। দুটি ছেলে একটি মেয়ের গল্প গতানুগতিক প্রেমোচ্ছল ছক পরিত্যাগ করে মানবিকতার আবেদন-সমৃদ্ধ যে হৃদয়ধর্মী ছবিটি দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছেন তা সাধারণ ছবির ক্ষেত্রে প্রায় দুর্লভ।

আশাপূর্ণা দেবী।

সম্পাদক—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্)
কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রথম খণ্ড

পঞ্চম সংখ্যা

ষট্‌পঞ্চাশত্তম বর্ষ

শূন্যবাদ

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

নাসদাসান্নো সদাসীত্তদানীম্ নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরোষৎ।
কিম্ আকরীবঃ কুহকস্য শর্মন্নভঃ কিম্ আসীদ্ গহনং
গভীরম্ ॥
ন মৃত্যুরাসীদ্ অমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্নে আসীৎ
প্রকেতঃ।
যা নীদ্ মবাতং স্বধয়াতদ একং তস্মা-দ্রান্যন্ ন বারঃ
কিংনাম ॥ ঋগ্বেদ।

—তখন না ছিল অসৎ না ছিল সং, তখন না ছিল মৃত্যু-না ছিল অমৃত, তাঁহা ছাড়া কিছুই আর ছিল না, সৃষ্টির পূর্ব্বে তখন অন্ধকার দিয়া আবৃত ছিল অন্ধকার, কেইবা ইহার রহস্য যথার্থভাবে জানে কেইবা ইহা পারে বর্ণিতে কোথা হতে জন্ম এই সব, কোথা হইতে আসিল এই বহুধা বিচিত্র সৃষ্টি। স্বরূপ-ধামে বিরাজমান যিনি ইহার অধ্যক্ষ, তিনিই হয়তো এই রহস্য জানেন, হয়তো তিনিও ইহা নাও জানিতে পারেন।'
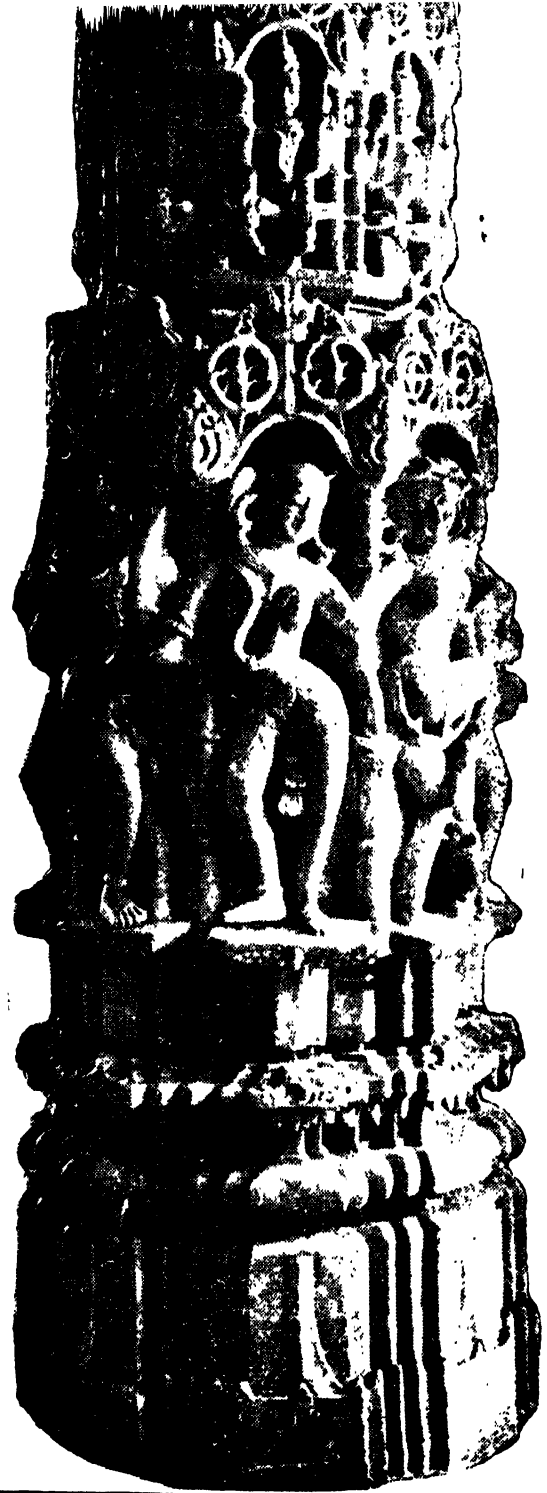
শ্রীক্ষিতিমোহন সেন।

ঠিক বেদের এই কথারই প্রতিধ্বনি পাই বৌদ্ধ গ্রন্থ "গুণ কারণ্ডব্যূহে" "যখন কিছুই ছিলনা, শম্ভু ছিলেন, শম্ভু স্বয়ম্ভু। তিনি সকলের পূর্ব্বে, অপর নাম আদিবুদ্ধ। তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন, সেই ইচ্ছাই প্রজ্ঞা নামে অভিহিত। ব্রহ্ম ও প্রজ্ঞা মিলিত হইয়া প্রজ্ঞা উপায় হইলেন, শিব ও শক্তি বা ব্রহ্ম ও মায়া।" ঋগ্বেদের এই বিখ্যাত নাসদীয় সূক্তে আমরা পাই অস্তি নাস্তির অতীত সেই অদ্বৈত পরম পুরুষের কথা। এখানে শূন্য বা ব্রহ্ম কথাটার উল্লেখ নেই কিন্তু তত্ত্বত তা একই তত্ত্ব। উপনিষদেও শূন্যভাব সাধনের কথা আছে—"শূন্যভাবেন যুঞ্জীয়াৎ (অমৃত); "শুদ্ধঃ পূতঃ শূন্যঃ শান্ত" (মৈত্রী) স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয় গানেও আমরা পাই ঐ একই শূন্যভাবের কথা "শূন্যে শূন্যে মিলাইল; মানস গোচর বোঝে প্রাণ বোঝে যার।" কাজেই একথা জোর করে বলা চলেনা শূন্যবাদ একমাত্র বৌদ্ধদেরই তত্ত্ব, এটা হিন্দুদেরও, সম্ভবতঃ হিন্দুদের কাছ থেকেই নেওয়া, বুদ্ধদেব তাঁর গুরু অরাড়ের কাছে উপনিষদের "আত্মা" সম্বন্ধে শিক্ষা পেয়েছিলেন। তাই ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলেছেন "যৎ শূন্যবাদিনাং শূন্যং ব্রহ্মবিদাং চ যৎ" ব্রহ্ম বাদীর ব্রহ্ম এবং শূন্যবাদীর শূন্য একই তত্ত্ব, প্রভেদ শুধু নামে, তত্ত্বে নয়, কারণ সৃষ্টির অতীত সবার উপর মাত্র দুটি তত্ত্বই আছে নির্গুণ ব্রহ্ম বা নির্ব্বাণ বা শূন্যতা আর তাঁর উপর চরম ও পরম সর্ব্বাতীত একমাত্র তত্ত্ব পর ব্রহ্ম বা পুরুষোত্তম, এর বেশী বা অতীত আর কোন তত্ত্ব নেই। নির্ব্বাণ বা নির্গুণ ব্রহ্ম পরব্রহ্ম বা পুরুষোত্তমের এক রূপ বা অংশ মাত্র, তার অতীত নয়, পরব্রহ্ম বা পুরুষোত্তমই সমস্ত সৃষ্টির আধার বা তাঁর মধ্যেই সব—"বাসুদেবঃ সর্ব্বম্ ইতি"। এই প্রসঙ্গে বলতে চাই নির্গুণ ব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম একই তত্ত্ব নয়, পরাৎপর পর ব্রহ্ম বা পুরুষোত্তমই সর্ব শেষ ও সর্ব শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব এবং তা নির্গুণ ব্রহ্মের অতীত বা নির্গুণ ব্রহ্ম পরব্রহ্মের এক অংশ মাত্র। সেখানে পৌছান খুব সহজ নয়, মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ, সে তত্ত্বের খবর খুব কম সাধকই রাখেন।

এ গুলি আমি নিজে উপলব্ধি করেই বলেছি, শুধু শাস্ত্র পড়ে নয়, নির্ব্বাণ বা নির্গুণ ব্রহ্মের খবর আমি খুব ভালো করেই জানি তবে পুরুষোত্তমের তত্ত্ব জানিনে কিন্তু তাঁর স্পর্শ বা আশীষ আমার মাথায় আমি পেয়েছি, তাঁর স্বধামে আমি আজও পৌছাতে পারিনি বা আমাকে তা করতে দেওয়া হয়নি। এ তত্ত্ব যে 'নির্গুণ ব্রহ্ম হতে পৃথক তার প্রমাণ আমি পেয়েছি।

এখন দেখা যাক শূন্য বলতে কে কি বলতে চেয়েছেন। লুইপাদ (মৎস্যেন্দ্রনাথ) বলেন—"শূন্যতা করুণা ভিন্নম্ বোধিচিত্তম্"—"জগৎ সংসারের শূন্যতা জ্ঞান ও বিশ্বব্যাপী করুণায় বোধিসত্ত্ব বা মহাসুখ। জগতের কোন বস্তুরই নিজের কোন অস্তিত্ব নেই, নিজের বর্ত্তমান স্বরূপের জন্য প্রত্যেকেরই অন্য কোন স্বরূপ ধর্ম্মে নির্ভরশীল; সুতরাং প্রত্যেক বস্তুই অস্তিত্ব বিহীন, এই বোধই শূন্যতা জ্ঞান। এই শূন্যতা জ্ঞানে জাগতিক তথাকথিত সব সুখ মায়া বা মিথ্যা বলে মনে হয়। সেইজন্য লুইপাদ বলেন শূন্যতাকে গ্রহণ কর।' এই তত্ত্বের সঙ্গে গৌড়পাদের অজাতবাদ বা শঙ্করাচার্য্যের বিবর্ত্তবাদের মূলতঃ কোন পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। একেই গৌড়পাদ বলেছেন অন্যত্র অস্পর্শ যোগ, অন্যত্র একেই আবার বলেছেন সকৃজ্জ্যোতি সমাধি। অচল, অভয় ও সুপ্রশান্ত সমাধি যার অন্য নাম নির্বিকল্প সমাধি, বৌদ্ধরা একেই অন্যত্র বলেছেন "অস্পর্শ বিহার", "ব্রহ্ম বিহার" ইহাই বৌদ্ধ সহজিয়াদের অস্পর্শা ডোম্বী বা নৈরাত্মাদেবী, সহজ সুন্দরী।

বৌদ্ধ চীনা ধর্ম্মগ্রন্থ "তাও তে চিঙ্ বা কিঙ্ শূন্যবাদ সম্বন্ধে বলেন—"আকাশ, নীচ (পৃথিবী) মাতা। আমি না জানি ইহার নাম (ভুওপুঅৎ ত্যি এ বা ত্যাঘী ম্যাহঙ্) অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবী এই দৃশ্যমান সব কিছুর মাতা বা আদি কারণ, ইহার নামরূপ বা বর্ণনা কাহারও জানা নাই। অবাঙমনোগোচর। যদি ইহার বর্ণনা করিতে হয় তাহা হইলে বলিতে হয় যে ইহা হইতেছে "পথ" (ৎসঃ চ্যঃ যু তাও দপি চ্যা থিবৎ ধাউ) অর্থাৎ যাহার মধ্য দিয়া সব কিছু চলিয়াছে, ইহাই "ঋত" অর্থাৎ শাশ্বত সত্তা (ব্রহ্ম বা সত্য বা ধর্ম)।"

শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়

মহাযোগী কপিল শূন্য সম্বন্ধে বলেন—"শূন্যং তত্ত্বং ভাবো বিনশ্যতি বস্তু ধর্ম্মত্বাদি নাশস্য"—"শূন্যই একমাত্র পদার্থ। শূন্য ভিন্ন আর কিছুই নেই, কারণ যা আছে বলিয়া অনুভূত হয় তাহারও শেষ ফল অভাব বা বিনাশ। শূন্যই একমাত্র পদার্থ সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল ও এই শূন্যই অন্তে থাকিবে।" দার্শনিক মাধবাচার্য্য বলেন—"অস্তি, নাস্তি উভয় অনুভব ইতি চতুষ্কোটি বিনির্মুক্তং শূন্যম্।" সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ। "অস্তি, নাস্তি, উভয় এবং অনুভয় এই চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত পদার্থই শূন্যতা।" রবীন্দ্রনাথ শূন্যতা সম্বন্ধে বলেন—"শীল সাধনার পরিণাম হচ্ছে সর্ব্বত্র মৈত্রীকে, দয়াকে বাধাহীন করে বিস্তার। মৈত্রী ভাবনার দ্বারা আত্মাকে বিশ্বব্যাপ্ত করাকেই ব্রহ্ম বিহার বলে।" বৌদ্ধধর্ম্ম ও দর্শনের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ শূন্যতাবোধকে (Nihilist) বৌদ্ধ দর্শনের চরম কথা বলে স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে সর্ব্বভূতের প্রতি প্রেম জিনিসটা কখনো শূন্য পদার্থ হতে পারে না। "বুদ্ধদেব কেবল বাসনা ত্যাগ করতে বলেন নি, তিনি প্রেমকে বিস্তার করতে বলেছেন। এই প্রেমের বিস্তারের দ্বারাই আত্মা আপন স্বরূপ পায়। বুদ্ধদেব শূন্যতা মানতেন কি পূর্ণকে মানতেন সে তর্কের মধ্যে যেতে চাইনে কিন্তু তিনি মঙ্গল সাধনার দ্বারা প্রেমকে বিশ্ব চরাচরে মুক্ত করতে উপদেশ দিয়েছিলেন, এই প্রেম যা যেখানে আছে কিছুই ত্যাগ করে না, সমস্তকেই সত্যময় পূর্ণতম করে উপলব্ধি করে। নিজেকে পূর্ণের মধ্যে সমর্পণ করবার কোনো বাধাই মানে না। বৌদ্ধ ধর্ম্ম মাত্র কেবল ত্যাগের ধর্ম্ম নহে। মৈত্রী ভাবনার দ্বারা আত্মাকে প্রসারিত করা, এ তো শূন্যতার পন্থা নয়।" বৌদ্ধধর্ম্মে মুক্তির পথ অতি দুর্গম। এ পথে দুঃখ, কষ্ট ও ত্যাগের কঠোরতার সীমা নাই। কর্ম্মের সহিত ভক্তির সামঞ্জস্য স্থাপন করে সমস্ত কর্ম্মকে নিষ্কৃতির অভিমুখীন করে দেওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

শ্রীমন্তকুমার জানা।

চীনা বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ আই চিন (I Chin) শূন্য সম্বন্ধে বলেন—"তাও" It is the Individed one. It is that which has nothing above it (যস্মাৎ পরং নাপরং অস্তি কিঞ্চিৎ) অজ আত্মা মহান ধ্রুবঃ Primordial Spirit (পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ) It is that land that is nowhere, which is our true home তদ্ধাম পরমং মম তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ব্রহ্মের মতন 'তাও'ও দেশ কালের অতীত overcomes time and space, ইহাই প্রকৃত শূন্যতা সাধন, ইহাই বুদ্ধদেবের "সুঞ্ঞতো অনিমিত্তো চ বিমোক্ যেসং না গোচরো" ধম্মপদ।

শূন্যতা সম্বন্ধে ধর্ম্মপাল—"আপনারা" 'আত্মা' 'আত্মা' করেন আমি কিন্তু এসব বুঝিনা। তখন তিনি অতি সহজে আমাকে, তাদের 'অনাত্মবাদ' বুঝিয়ে দিলেন। আমাকে বললেন—"আপনি এক থেকে দশ পর্য্যন্ত সংখ্যা লিখে, একটা লাইন টেনে সবটা কেটে দেন, তাহলে ডিটেলস্ কিছুই থাকবেনা। কিন্তু যা থাকবে, তা বলা যায় না, সে হ'ল শূন্য। অথচ সেই শূন্যের ভেতরই আছে সবই। তার ভিতর থেকে বাদ পড়েনা কিছুই। সবাই থাকে শূন্যের মধ্যে। আর যা থাকে তারই নাম হ'ল "অনাত্ম" অর্থাৎ Consolidated something."

—ডাঃ পঞ্চানন মণ্ডল।

শ্রীঅরবিন্দ—"এমন একটা ভূমি আছে যেখানে কিছুই নাই। এই নাস্তিত্বের নাম অসৎ শূন্য, অসম্ভূতি, অব্যাকৃত—আর তার অনুভবের নাম নির্ব্বাণ। নির্ব্বাণ লোকোত্তর। লোকোত্তরে কিছুই নাই, শূন্য নৈর্ব্যক্তিক (impersonal)।"—অনির্ব্বাণ। "মানুষ যখন তাহার অন্তরে এক পরম শান্তি এবং নিষ্ক্রিয়তার সাক্ষাৎ পায় অথচ ইহাও বুঝিতে পারে যে ভিতরের সেই নৈঃশব্দ হইতে তাহারই দিব্য আনন্দ ও অনুমোদনে তাহার নিজের ও বিশ্বের অকুণ্ঠ ও অফুরন্ত কর্ম্মধারা প্রবাহিত হইতেছে তখনই সে পূর্ণতা লাভ করে। অতএব নৈঃশব্দের প্রকৃতি যে বিশ্বকর্ম্মের নিরোধ একথা সত্য নহে। অসৎ হতে সতের জন্ম, অনন্ত নিষ্ক্রিয় স্বরূপের মধ্যে ক্রিয়াশীল বহুত্বের প্রকাশ সম্ভাবনা আছে স্বীকার করিলেও এই অসৎ, যাহা সকল অবস্থার আদিভূত এবং একমাত্র শাশ্বত সত্য, বিশ্বের সকল সম্ভাবনাকে কি প্রকৃতই নিরাকৃত করিতেছে না? কোন কোন বৌদ্ধ দর্শনে আমরা যে শূন্যবাদের দেখা পাই, তাহাই যে এ যুক্তিতে সমর্থিত হয়। এমতে অহংএর মত আত্মা ও প্রকাশে যা ক্ষণস্থায়ী চিত্ত প্রকৃতি প্রবাহে একটা

বোধ মাত্র, স্বরূপে সত্য নয়।... ...অসৎ কেবলমাত্র একান্ত অবাস্তব শূন্যতা নহে। আমরা যাহা জানি বা সচেতন ভাবে আমরা নিজদিগকে যাহা মনে করি সেই অনুভবের ও সেই বিশিষ্ট চেতনার সকল সীমা পার হইয়া যাওয়ার ফলে শূন্যবাদের একটা কল্পনাকে অসৎ নাম দিয়া খাড়া করা হইয়াছে। বাস্তবিক দার্শনিকের শূন্যবাদ গভীর ভাবে পরীক্ষা করিলে আমরা বুঝিব যে শূন্য আসলে সর্ব্বেরই নামান্তর। মন শুধু সান্তের ধারণায় অভ্যস্ত। তাই অনির্দ্দেশ্য এই অনন্ত মনের ফাঁকা বা শূন্য বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বস্তুতঃ এই অসতই একমাত্র সত্যিকার সৎ।"

পূর্ণ যোগ— শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু।

বজ্রযানীরা শূন্য সম্বন্ধে বলেন—"দৃঢ়ং সারমসৌশীর্ষমচ্ছেদ্যাভেদ্য লক্ষণম্। অদাহি অবিনাশি চ শূন্যতা মূচ্যতে॥ অদ্বয় বজ্র সংগ্রহ।—"অভেদ্য, অদাহ্য অচ্ছেদ্য এবং অবিনাশী লক্ষণ যুক্ত বলিয়া শূন্যতা "বজ্র" নামে অভিহিত।" বজ্রযান মতে জগতের অণুপরমাণু অবধি সবই শূন্য। শূন্যের এই জ্ঞানই হ'ল বোধি এই বোধি লাভ হলে পর নির্ব্বাণ লাভ হয়। তবে বজ্রযানীরা নির্ব্বাণ না বলে এর নাম দিলেন নিরাত্মা। বোধিচিত্ত নিরাত্মাতে লীন হয়। নিরাত্মাতে লীন হলে মহা সুখের উদয়, এই মহাসুখ অবাঙমানসগোচর, কায়-বাক্-মনের অতীত।"

—শ্রীযোগীলাল হালদার।

নাগার্জ্জুন শূন্যতা সম্বন্ধে—অনক্ষরস্য ধর্ম্মস্য শ্রুতিঃ কা দেশনা চ কা। শ্রূয়তে যস্য তচ্চাপি সমারোপদনক্ষরঃ॥"—যে পদার্থ কোন অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, সেই দুর্জ্ঞেয় পদার্থের সম্বন্ধে কি বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে? এই এই শূন্যতা পদার্থ অতি দুর্ব্বোধ। ইহা ভাব পদার্থ নহে অভাব পদার্থও নহে। শূন্যতা নামক এমন কোন দ্রব্য নাই যাহা আমরা নির্ব্বাণ কালে লাভ করিয়া থাকি এবং সংসার ও আমিত্বের ধ্বংস বা অভাবও শূন্যতা নহে। যদি শূন্যতা নামক কোন দ্রব্য বা ভাব পদার্থ থাকিত, তাহা হইলে তাহা অবশ্যই ধ্বংসশীল হইত, সুতরাং সেই শূন্যতার অধিগমে নিত্য নির্ব্বাণ লাভ হইত না। সংসার ও আমিত্বের অভাবকেই বা কিরূপে শূন্যতা বলা যায়? সংসার ও আমি উভয়েই মিথ্যাপদার্থ। যেহেতু ইহাদের পরমার্থিক অস্তিত্ব কখনও ছিল না, সুতরাং শিরঃ শূন্য পদার্থের শিরঃ পীড়ার ন্যায় ইহাদের অভাব কিরূপে হইবে? নির্ব্বাণ বা শূন্যতা ভাবপদার্থও নহে অভাব পদার্থও নহে। এই নির্ব্বাণ বা শূন্যতা অনির্ব্বচনীয় পদার্থ। যাঁহারা নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ভাব ও অভাব পদার্থের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের অতীত হইয়াছেন। তাঁহাদের অবস্থা কোন ক্রমেই বর্ণনা করা যায় না।"

শ্রীশঙ্কর রায়।

"শূন্যতার উপলব্ধি এবং স্বরূপ পূর্ণতা হইতেই প্রজ্ঞা-পারমিতা লাভ হয়। শূন্যবাদ বা মাধ্যমিক দর্শনের প্রধান আচার্য নাগার্জ্জুন তার মাধ্যমিক কারিকার প্রথম দুই শ্লোকে শূন্যতার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁর মতে শাশ্বত ও উচ্ছেদ, উৎপত্তি ও নিরোধ, আগম ও অনাগম, একার্থও অনেকার্থ এই আটটিবিশেষণের কোনটিই মানবের অনুভূতি ও চিন্তা নিরপেক্ষ শূন্যতার পক্ষে প্রযোজ্য নহে। এই শূন্যতার অপর নাম প্রতীত্য সমুৎপাদ, তাহা লইয়াই মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম্মে ধর্ম্মকায় ও আদিবুদ্ধের পরিকল্পনা। যেমন করুনার উপর মহাকরুণা, তেমনি স্তর ভেদে শূন্যতার উপর মহাশূন্যতা। যোগ, ধ্যান বা সমাধির গভীরতা লইয়াই শূন্যতার ও করুণার ক্রম কল্পনা।... বুদ্ধ, স্কন্দ, শিব, যক্ষ রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, পিশাচাদির মূর্ত্তিও সেই শূন্যতার বিভিন্ন ধ্যান রূপ মাত্র।"

শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া।

শূন্যতা সম্বন্ধে কাহ্নুপাদ (কৃষ্ণাচার্য্য)—"সহজ নিদ্রা (সহজ সমাধিতে—"সন্তো, সহজ সমাধি ভলী,...হুঁঅ ব্রহ্ম সমান" কবীর। সহজ সমাধিইব্রহ্মজ্ঞান) আকুল কাহ্ন আত্মপরভেদ পাননা (সহজ নিদ্রালু...কাহ্নিলা লাঙ্গা) তার চৈতন্য বা বেদনা কিছুই নাই (চে অনভর নিদ গেলা সকল সুধল করি সুহে সুতেলা॥) সমস্ত থেকে মুক্ত হয়ে তিনি সুখে প্রসুপ্ত। এই পথে মহাসুখ লাভ করেছে নিরাত্মা যোগিনীর সাহচর্যে। চিত্তরূপ সফলের সঙ্গে শূন্যতারূপ বজ্রের মিলনে এই অদ্বয় সত্য মহাসুখ লাভ দেহ যোগাশ্রিত তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতির ইঙ্গিত এতে, পদ কর্তা যোগিনীর মিলনের রহস্য প্রহেলিকাময় ভাষা প্রকাশ করেছেন, পদকর্তা সার্থক যোগী, সুকঠোর সংযম সাধনায় যে শক্তি তিনি লাভ করেছেন তিনি নৈরাত্ম যোগিনী। বস্তু জগৎ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কায়া সাধনা

সুপ্ত কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করে সহস্রারে গেলে যে শক্তি লাভ হয়, তা নৈরাত্মা যোগিনী। এই যোগিনী সাধকের সাধন সঙ্গিনী রূপে কল্পিত সুষুম্না পথে সহস্রারে গেলেই এই অদ্বয় সত্য বা মহাসুখ। এই মহাসুখের অনুভূতিতে ইন্দ্রিয়গুলি ঘুমিয়ে পড়ে, মন প্রবেশ করে, অভ্যন্তরে জাগতিক সমস্ত চেষ্টা নষ্ট হয়। মায়িক জগতের বোধ আর থাকেনা, আত্মপর ভেদ অবলুপ্ত ও ভবমোহ ধ্বংস হওয়ায় শূন্যতা জ্ঞান লাভ হয়।" ডাঃ দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহাই—"এতম্ যো পরমম্ জ্ঞানম্ এতম্ সুখমনুত্তরম্ অশোকম্ বিরজম্ ক্ষেমম্"—"এসেছে পরম জ্ঞান, অনুত্তর সুখ, শোক নেই, ধূলি নেই, মলিনতা নেই, এসেছে ক্ষেমঙ্কর পরমা শান্তি।"

শূন্যতা সম্বন্ধে চর্যাপদ কর্তা কুকুরীপাদ—"সহজযানীরা যে ভাবে অতীন্দ্রিয় আনন্দ লাভ করতে চান বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্য কুকুরীপাদ বলেন (আঙ্গন ঘর পর সুন···) ইন্দ্রিয় দ্বারা নিরাত্মা দেবীকে (শূন্যতা) উপলব্ধি করা যায় না, অতীন্দ্রিয় লোকে থাকেন বলে গুপ্তিকী বা অস্পৃশ্য নারী রূপে কল্পনা, এর সঙ্গ লাভে সহজ আনন্দ, অতীন্দ্রিয় আনন্দ। সিদ্ধাচার্য্য বিরুব ঠিক তন্ত্রোক্ত অতীন্দ্রিয় লাভের কথাই বলেছেন। তান্ত্রিক যোগী সহস্রারে মহাশক্তিসহ মিলিত হন, ইহাই তান্ত্রিকের অতীন্দ্রিয় আনন্দ লাভ, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার মিলন বা যোগীর ব্রহ্মানন্দ লাভ। এই অবস্থার নাম নির্ব্বিকল্প সমাধি। হিন্দুশাস্ত্রে যা ব্রহ্মানন্দ, বৌদ্ধশাস্ত্রে তা মহাসুখ বা সহজ সুখ বা সহজ আনন্দ, এই অতীন্দ্রিয় আনন্দ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অতীত, ইহা অন্তরে অনুভব করা যায় কিন্তু অপরকে বোঝানো যায় না। ধম্মকায় (তথতা বা শূন্যতা) হতে বোধিচিত্তের উদ্ভব, সদা পরিশুদ্ধ তবে অবিদ্যার মোহে আচ্ছন্ন থাকে। মোহাচ্ছন্ন হলেও ইহার বিশুদ্ধি নষ্ট হয়না, মোহজাল ছিন্ন হলেই আবার অমলিন বজ্রশম্ভের মত ধর্ম্মকায় (হিন্দুদর্শনের পরমাত্মা) প্রকটিত হয়। বোধিচিত্তের মোহজাল ছিন্ন হলেই নিরাত্মা দেবীকে (নির্ব্বাণবা শূন্যতা) আলিঙ্গন ক'রে ধর্মকায়ে লীন হয়। বোধিচিত্তের ধর্মকায়ে লীন অবস্থাটি অতীন্দ্রিয়বাদের চরম কথা।

নিরাত্মা দেবীকে লাভ করে ধর্ম্মকায় হওয়ার জন্য জীবাত্মার আকাজ্ক্ষা, ঠিক তেমনি পরমাত্মাকে লাভ করবার জন্য জীবাত্মার আকাজ্ক্ষা থাকে। নিরাত্মা দেবীর বাসস্থল সহজযানীদের মতে মস্তকের মহাসুখ চক্রে (তান্ত্রিকের সহস্রার) বোধিচিত্তের বাসস্থান মণি কুলে।" শ্রীযোগীলাল হালদার।

শূন্যতা সম্বন্ধে সিদ্ধাচার্য্য গুন্ডরীপাদ—"সাধক নির্ব্বাণ (তথতা বা শূন্যতা) লাভের প্রয়াসী। নিরাত্মা দেবীর মুখ সুধা পান করে তবে মহাসুখ বা মহা আনন্দ অর্থাৎ নির্ব্বাণ লাভ করতে পারেন। জোইনি বা নিরাত্মাকে না দেখে ক্ষণকাল বাঁচতে পারে না (জাইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবসি)। (চণ্ডীদাস—"দুহু কোরে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া। আধ তিল না দেখিলে যায় সে মরিয়া) চণ্ডীদাসের সঙ্গে আশ্চর্য মিল গুন্ডরীপাদের লেখায়। জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব। জীবাত্মা পরমাত্মার এক খণ্ডাংশ এইটুকুমাত্র প্রভেদ। কায়া ও ছায়া যেমন পৃথক থাকতে পারে না তেমনি জীবাত্মা ও পরমাত্মা পৃথক থাকতে পারে না। সুতরাং জীবাত্মা ও পরমাত্মা দ্বৈত হলেও অদ্বৈত। জীবাত্মা মায়াধীন আর পরমাত্মা সব কিছুর অতীত। তাই পরমাত্মা নির্গুণ, নিরাকার, নির্ব্বিকার। কৃষ্ণাচার্য্যের মতে নিরাত্মা দেবীই নির্ব্বাণ দেবী, নিরাত্মা দেবী ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয় এজন্য নিরাত্মাকে ডোম্বী—("অস্পর্শ ভবতি যস্মাৎ তস্মাৎ ডোম্বী প্রকীর্তিতা"। ইন্দ্রিয়াদি মনের দ্বারা তাহাকে স্পর্শ করা যায় না, এই জন্য "অস্পর্শা" বলিয়া তাহাকে ডোম্বী বলা হয়") অর্থাৎ ডুমনী বলা হয়।" একেই অন্যত্র অস্পর্শ শবরী বলা হয়েছে সহস্রারে বাস (উঁচা উঁচা পাবত তাহিঁ বসই ; টালত মোর ঘর)। নির্ব্বাণ লাভই মহাসুখ বা মহা আনন্দ উপনিষদের ব্রহ্মানন্দ, বৈষ্ণব দর্শনের মহাভাব ও শাক্ত তান্ত্রিকের মতে সহস্রার পথে আত্মারাম লাভ। এ সব গুলিই এক কল্পনার ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আত্মোপলব্ধি, এ বিষয়ে তাঁরা উপনিষদ ও গীতার তত্ত্বই অনুসরণ করেছেন। শূন্যবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদে পার্থক্য নেই, পরমাত্মা ও জীবাত্মা, পুরুষ ও প্রকৃতি, কৃষ্ণ ও রাধা, শিব ও শক্তি এরা দুই হলেও এক। নির্ব্বিকারের বিকার মাত্র। এই বিকারই লীলা; এই শিব শক্তি বৌদ্ধদের প্রজ্ঞা ও উপায়। প্রজ্ঞা ও

উপায়ের অন্য নাম শূন্যতা ও করুণা, এই প্রজ্ঞা করুণার মিলনে সহজ আনন্দ লাভ হয়।"

শ্রীযোগীলাল হালদার।

"বিলসই দারিক গঅনত পারিম কুলে"—দারিকপাদ গগনের অর্থাৎ শূন্যতার শেষ কূলে গিয়া বিলাস করিতেছে। এই শূন্যতার শেষ কূল চতুর্থ শূন্য। নাগার্জ্জুন, তার তান্ত্রিক বৌদ্ধ গ্রন্থ "পঞ্চক্রমে" চারপ্রকার শূন্যের কথা বলেছেন, শূন্য, অতিশূন্য, মহাশূন্য ও সর্বশূন্য, এই শূন্যের পথই "সহজ পথ"। বৌদ্ধ সহজিয়ারা ত্রিকায়ের উর্দ্ধে আর একটি চতুর্থকায়ের আবিষ্কার করেছেন, তা বজ্রকায় বা সহজকায় বা সর্ব্বশূন্যের দেশ।" "গঅনে উঠি করঅ অমিয় পান।" এই গগনে বা সর্ব্বশূন্যের দেশে উঠেই অমৃত পান করতে হয়। ইহাই সহজ শূন্যের কূলে। আমার মনে হয় মাধ্যমিক আচার্য্য নাগার্জ্জুন যে চার শূন্যের কথা বলেছেন তার প্রথম হ'ল নির্ম্মাণ-কায় বা শূন্য এবং তা অনাহত বা হৃৎকেন্দ্রে মণিপুরে নয় কারণ শাস্ত্রে বলা হয়েছে মূলাধার ও মণিপুর এ দুটি হ'ল প্রকৃতিমার্গ আর বাদ বাকী উর্দ্ধে আর সব চক্র হ'ল নিবৃত্তিমার্গ। প্রবৃত্তিমার্গে নিম্নতর কামনা বাসনার কেন্দ্রস্থল কাজেই সেখানে শূন্যতার (মুক্তির) উপলব্ধি হতে পারে না, এখানে মহাসুখের স্বাদ পাবার কোন সম্ভাবনাই নেই, এই দুই চক্রে মন রেখে সাধনা করতে গিয়েই বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিকের চরম অধঃপতন ঘটেছে, এ পথে সদ্‌গুরুর বা দৈব কৃপা ভিন্ন এ চক্র অতিক্রম করা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার, এ চক্র দুটি সাধকের পক্ষে চরম বিপজ্জনক স্থান তাই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন আগে উপরের চক্রে সাধনা করতে, সেখানে একবার সিদ্ধি লাভ করতে পারলে সেই শক্তিই কাম ক্রোধ জয় করে দেবে, সাধকের আর অযথা কষ্ট করতে হয় না, এ যারা না করেন তারা কামেই আটকা পড়ে যান তাদের উদ্ধার বা মুক্তি বড় হয় না। এ জন্যই সিদ্ধাচার্য্যেরা, তান্ত্রিক বা বৌদ্ধতান্ত্রিক, ত্রাটকের প্রভূত প্রশংসা করেই তারই সাধনার বিধান দিয়ে গেছেন; ত্রাটক ভ্রূ মধ্যে বা আজ্ঞাচক্রে মন রেখে সাধনা করতে হয়, তা একবার করতে পারলেই সিদ্ধি সাধকের করায়ত্ব হয়, অযথা তাকে কামনা বাসনার জয় করার চেষ্টা করতে হয় না; আমার মতে এটাই সব চেয়ে নিরাপদ, সহজ ও আশু-ফলদায়ী পন্থা। ভাগবতের ভাষায় বলা যায় এপথে কখনও পতন হয় না, চোখবুঁজে এ পথে চল্লেও সিদ্ধি তার সত্বর বিনা বাধা ও বিনা কষ্টে আসবেই। ত্রাটকে কিছু ফল পেলেই অর্থাৎ (চেতনাকে সেখানে একবার স্থায়ী করতে পারলেই) আজ্ঞাচক্র থেকে ঐ চেতনাকে অতি সহজেই সহস্রার ভেদ করা যায়। আমি এ পথেই প্রায় দশমাসে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করি, কারো কৃপা বা সাহায্য না নিয়েই, এটাই মুক্তি বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবার সহজ ও শ্রেষ্ঠ উপায় এবং তা অতি অল্পকালের মধ্যেই সম্ভব। আমার মতে প্রথম শূন্য হ'ল অনাহত বা হৃৎপদ্ম এটাই নির্ম্মাণকায়, এ চক্রও খুব নিরাপদ নয়, এ চক্রে সিদ্ধিলাভ করা প্রায় অসম্ভব। প্রায় সকলেরই পতন হয় কদাচিৎ কেউ সিদ্ধি লাভ করেন কারণ এখানেও কামের কিছুটা প্রভাব আছে। এটা মণিপুরের কাছে; কণ্ঠে বা বিশুদ্ধ চক্র হ'ল অতি শূন্য বা সম্ভোগ কায়া, তৃতীয় শূন্য বা মহাশূন্য হল ভ্রূ মধ্যে আজ্ঞাচক্রে, তাই-ই ধর্ম্মকায় আর চতুর্থ শূন্য বা সর্ব্বশূন্যের দেশ হল সহস্রার বা বজ্রকায় বা সহজকায় এই গগনে বা সর্ব্বশূন্যের দেশে এসেই দারিকপাদ গাইলেন—

"বিলসই দারিক গঅণত পারিম কুলে।"

"অশরির কোই সরীরহী লুক্কো। জো তহি জানই সো তহি মুক্কো॥"—দোহা। অশরীরী কেউ এই শরীরের ভিতর লুকাইয়া আছেন, যে তাকে জানতে পারে সে মুক্ত হয়। এই অশরীরীই বৌদ্ধদের মতে শূন্যতা বা নির্ব্বাণ (অপ্পে অপ্পা ঝায়ই নিব্বাণং পউ দেহ—পাহুড়-দোহা—"সেই আপনার মধ্যে আপনাকে পাওয়াই হ'ল নির্ব্বাণ লাভ।"—ব্রহ্মজ্ঞান) যাকে উপনিষদ বলেছেন আত্মা বা ব্রহ্ম, এ আত্মা সর্ব্বব্যাপী শুদ্ধ চেতনা, এ আত্মা জীবাত্মা, ব্যষ্টিখণ্ড চেতনা বা চৈত্যপুরুষ (Psychic) নয়; বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্য বা বেদান্তিকগণ চৈত্য পুরুষকে মোটেই আমল দেননি কারণ তা মায়ামুক্ত হলেও খণ্ডিত সীমিত চেতনা এবং লীলাই তার কাম্য,—মুক্তি নয়। লীলার সুখ সমস্ত মহাপুরুষরাই, তা বৌদ্ধ মায়াবাদী বা লীলাবাদী যিনিই হোন না কেন, বেশ ভাল করেই জানেন, তাই

একবার মুক্ত হতে পারলে তাঁরা আর সহজে জন্ম নিতে চান না। তাই চৈত্যপুরুষ কারোরই লক্ষ্য নয়, এমনকি লীলাবাদীদেরও নয় (চৈত্য পুরুষের বাণী আমি শুনেছি তার উপলব্ধি আমার নেই, তবে যিনি একে দেখেছেনতার মুখেই আমিশুনেছি প্রদীপশিখার ন্যায় দেখতে, তাই শাস্ত্রে একে বলেছেন অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ) চৈত্য পুরুষ বিশ্বব্যাপী বা বিশ্বাত্মা নয় তা খণ্ডিত পরমাত্মার অংশ মাত্র তার বেশী নয়, এ তত্ত্ব সাংখ্যের পুরুষ নয়, সাংখ্যের পুরুষ আত্মা বা ব্রহ্ম একই তত্ত্ব নয়। এসব তত্ত্ব সাধারণে নয় শুধু বহু লোকের পক্ষেই, এমনকি বড় বড় সাধকদের পক্ষেও, যাদের এব্যাপারে অভিজ্ঞতা নেই, তাদের পক্ষেই এগুলি ধরা বা বোঝা কঠিন তাই সিদ্ধ মহাপুরুষরা এসব গোপন করে রাখবার কথা বলে গেছেন—"অইসন চর্য্যা কুক্কুরী পাএঁ গাইড়। কোড়ি মাঝে একু হি অহিঁ সমাইড়॥" "এইরূপ চর্য্যা কুক্কুরীপাদে গাইল, কোটি মাঝে একজনের চিত্তে ইহা প্রবেশ করিল।"

"সুন্নং না হোই সুন্নং দীসই সুন্নং চ তিহু বনে সুন্নং।" দোহা। "শূন্য বলে মনে হলেও ত্রিভুবনে শূন্য বলে কিছু নেই। চর্ম চক্ষে দেখায় বটে শূন্য কিন্তু অন্তর দিয়ে দেখলে দেখা যায় শূন্য ও শূন্য নয়।" শ্রীক্ষিতিমোহন শাস্ত্রী। আমাদের জড় চক্ষু দিয়ে মাত্র জড় বস্তুই দেখা সম্ভব তাই আমরা অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব দেখতে বা বুঝতে পারিনে, সাধনার দ্বারা আমাদের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলন হলে তবেই আমরা অতীন্দ্রিয় তত্ত্বকে উপলব্ধি করতে পারি, তার আগে নয়। অতীন্দ্রিয় তত্ত্বকে জড় বস্তুর মতন প্রমাণ করা যায় না বা দেখান যায় না। মহাশূন্যতা বা পর ব্রহ্ম হতে অচিতি (Inconscient) পর্য্যন্ত সমস্তই ঐ একই অদ্বৈত চেতনার লীলা, অজ্ঞানী বলেই আমরা মনে করি তা খণ্ডিত (সেদেশে এদেশে অনেক অন্তর জানয়ে সকল লোকে। সে দেশে এ দেশে মিশামিশি আছে একথা কোয়না কাকে॥" চণ্ডীদাস), চেতনার এই অবতরণ আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে অজ্ঞানতায় নেমে এসে শেষে জড় নিশ্চেতনায় মিশে গিয়েছে, তারও একটা সুছন্দ ধারা বা নিয়ম আছে, সে নিয়মের বিচ্যুতি কোথাও নেই, সমস্ত লীলাই ভগবানের অমোঘ নিয়মে সুশৃঙ্খলে চলছে, আমরা তা দেখতে পাইনে তাই বিশৃঙ্খলতা দেখলেই চঞ্চল হই, যোগীরা তা জানতে পারেন তাই তাঁরা চঞ্চল হন না. কারণ তাঁরা জানেন তার পশ্চাতে কি আছে। নির্গুণ ব্রহ্ম, অধিমানস জগৎ, প্রাণময় জগৎ বা অচিতির সঙ্গে আমার পরিচয় আছে বা তার উপলব্ধি ভালো করেই আছে তাই বলতে পারি চেতনাহীন স্থান কোথাও নেই, এমন কি নিশ্চেতনা বা অচিতিও নয়, সেখানেও চেতনা আছে তা না হলে সে চেতনার সঙ্গে আমি বা অন্য কেউই একীভূত হতে পারতাম না। এ কথা সত্য, প্রত্যেক জগতের চেতনাই বিভিন্ন, একই চেতনা দুটি লোকে নেই, কিন্তু বিভিন্ন চেতনা হলেও মূলতঃ তা একই চেতনার বা ব্রহ্মের বিভিন্ন রূপ মাত্র। ব্রহ্ম, অচিতি বা বুদ্ধদেবের সঙ্গে একীভূত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল সুতরাং ব্যষ্টি চেতনার অভিজ্ঞতা আমার নেই। ভগবানের দুয়ার সকলেরই জন্যই উন্মুক্ত এবং তাঁকে এই জীবনেই পাবার অধিকারও ভগবান দিয়েছেন, ইচ্ছে ও চেষ্টা করলেই তাঁকে আমরা লাভ করতে পারি। "ক্রতুময়ঃ অয়ং পুরুষঃ—ছান্দোগ্য। পুরুষ ইচ্ছাময়, যিনি যাহা কামনা করেন সংকল্প হইতেই তাহা পূর্ণ হয়। শুধু যা তা ইচ্ছা ও কামনা করিলেই কাম্য লাভ হয় না। ঘনীভূত ইচ্ছা ও কামনার নামই সংকল্প, এবং এই সঙ্কল্প হইল কাম্য লাভের উপায়।"

"যোগ'গ্যেতদক্ষর মমৃত মানন্দ মবিদিত্বা অস্মাল্লোকাৎ প্রৈতী সকৃপণঃ—"যাজ্ঞবল্ক্য।—"হে গার্গী! যাহারা অধ্যাত্ম জগতের অপূর্ব্ব এই আনন্দ যাহা অক্ষর ও অমৃত স্বরূপ তাহাকে বিদিত না হইয়াই এই লোক হইতে চলিয়া যান তাহারা বড় দুঃখী।"—শ্রীঅরবিন্দ।*

* কয়েকটি উদ্ধৃতি আমি নিয়েছি, দুঃখের বিষয় নামগুলি আমি ভুলে গিয়েছি।

অঘটনের সাধক সাধিকা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দেড় বৎসর পরে

ললিতা দিদিমণি!

প্রেমলকে পরে লিখব, প্রণবকেও। আজ তোমায় লিখি দু একটা কথা যা শুনে তোমাদের ভালো লাগবে মনে হয়।

প্রথম কথা: আমি যে হরিদ্বারে সব ছেড়ে এককথায় গুরুচরণে শরণ নিতে পেরেছি এর পিছনে ছিল তিনটি প্রেরণা।

(এক) প্রেমলের গুরুভক্তি—যার আলোয় গুরুবাদ সম্বন্ধে আমার অনেক ভুল ধারণার কুয়াশা কেটে গিয়েছিল সেই সময়েই।

(দুই) তোমার মতন বেপরোয়া মেয়েকে গুরুবরণ ক'রে ফুলের মতন ফুটে উঠতে দেখা। আমার কেমন যেন বরাবরই গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ বড় গুরুগম্ভীর নীরস মনে হ'ত। তুমি প্রেমলকে ভক্তি করেও দূরে রাখো নি, আরো কাছেই টেনে এনেছ তোমার সেই গল্প বাগ্বিতণ্ডার মধ্যে দিয়ে—এ ছবিটি দেখে আমি ভরসা পেয়েছিলাম কম নয়।

(তিন) মা-র স্নেহ ও আশ্বাস: যে, গুরুর অধীন হওয়া মানে স্বাধীনতা হারানো নয়। এখানে গুরুদেবকে যতই ভালোবাসতে শিখছি ততই হাসি পাচ্ছে কী সব ভুল ধারণাই না আমার ছিল এক সময়ে! আমি সত্যিই ভাবতাম—গুরু "ভাত দেবার ভর্তা নন, কিল মারবার গোঁসাই।" কিন্তু গুরুদেবের উদারতায় যতই মুগ্ধ হচ্ছি ততই যেন চোখের ধুলি খ'সে পড়ছে।

সব চেয়ে বড় লাভ হয়েছে তা বলব? শোনো বলি একটু ফলিয়েই।

ছেলেবেলায়ই মহাভারত পড়তে পড়তে কৃষ্ণকথায় আমার মন দুলে উঠেছিল। মনে হয়েছিল তাঁকে সত্যি ভক্তি করতে পারলে মুক্তি পাবই সংসারের হাজারো দুরন্ত বাঁধন থেকে। কিন্তু ক্রমশঃ সংশয় আমাকে ক্ষত বিক্ষত ক'রে তুলেছিল কেন না দেখলাম যাকে দেখি নি, চিনি নি, শুধু শোনা কথার জোরে আপন মনে করা সম্ভব নয়। শাস্ত্রচর্চায় কিছুই লাভ হয় না বলি না কিন্তু পুঁথির দীক্ষায় ভক্তি পাঠে হাতে খড়ি হ'লেও ভক্তি কাব্যে প্রবেশ করা যায় না। চাই এমন কোনো মানুষকে শুধু চোখে দেখা নয়—ভালোবাসা, যে তার প্রত্যক্ষ প্রেমের আলোতে পথ দেখাতে পারে। তাকে বরণ করলে তবেই কৃষ্ণকে বরণ করা সহজ হ'য়ে আসে। গুরুদেবকে ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমার ভক্তির জবুস্থবু ভাব (Slaquancy) কেটে গেছে। আমি এগুচ্ছি নিঃস্রোতেও দীক্ষার স্রোতে গুরুসেবার বাতাসে পাল তুলে।

এর একটি কারণ কী শোনো।

আমাদের আশ্রমে খরচ অনেক। এখানে সাধক সাধিকা একশোরও উপরে। গুরুদেবের কাছে নানা ভক্তরা প্রণামী পাঠান—যারা এখানে আসে তারা তাদের সর্বস্ব নিবেদনও করে। তবু সব জড়িয়ে খরচ তো বাড়েই, তাই প্রত্যেকেই চেষ্টা করে আশ্রমের আয় বাড়াতে।

মানুষ সর্বত্রই তো উপায় করতে চায় আরো আরো আরো। ফলে সংসারযাত্রার নিশ্চয়ই সুবিধে হয়, কিন্তু পারমার্থিক পথে আয় বাড়ানোর ফলে প্রেমের কোনো প্রেরণাই জোটে না। এই জন্যেই আমি গান গেয়ে উপায় করতে চাই নি। অর্থলোভ আমার কোনোদিনই

ছিল না একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে না। কিন্তু যশস্বী হব, গানে সাহিত্যে কাব্যে উপাখ্যানে সৃষ্টি ক'রে কীর্তিমান্ হব এ-উচ্চাশা ছিল দুর্দম। প্রেমল এজন্যে আমাকে ধমকাত। কিন্তু আমার মন স্বীকার করতে চাইত না যে কীর্তিমান্ হতে চাওয়ার মধ্যে অন্যায় কিছু থাকতে পারে।

কিন্তু ক্রমশঃ দেখলাম কীর্তির দীপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কারের দৃপ্তিও বেড়ে উঠেই উঠে, আর অহঙ্কারের সঙ্গে ভক্তির অহিনকুল সম্বন্ধ।

গুরুদেবের কাছে এসে তবে এ-সমস্যার সমাধান পেলাম। তিনি বললেন: "উচ্চাশা খুব ভালো—যদি আশা হয় অসীম। অর্থাৎ, ছোট খাটো কীর্তির স্পৃহা বন্ধন হ'য়ে দাঁড়ায় বটে কিন্তু সর্বোচ্চ কীর্তির দুরাশা মুক্তিদা, বলদা,ভক্তিদাত্রী, জ্ঞানধাত্রী। কী এ-কীর্তি? না, আত্মাভিমানের লোভ বর্জন। কেমন ক'রে? না, ভালেবেসে। কাকে? না, ইষ্টকে। কিন্তু ইষ্টকে তো দেখতে পাচ্ছি না? বেশ, তাঁর প্রতিনিধিকে অর্থাৎ গুরুকে—ভালোবাসো, তাহ'লেই ইষ্টকে ভালোবেসে দেখতে পাবে ভক্তির দিব্যনেত্রে। গুরুকে ভালোবাসার উপায় কি? গুরুসেবা—গুরুর আজ্ঞাবাহী হয়ে। অর্থাৎ তিনি যা বলেন অকুণ্ঠে মেনে নিতে যদি নাও পারি মেনে নিয়ে পরীক্ষা করা সুফল ফলল না কুফল।

একথায় আমার সংশয়ী মন সায় দিল। আমি গুরু-সেবাব্রতী হলাম। আশ্রমে নানা অতিথি আসেন তাঁদের দেখাশোনা, নানা জ্ঞানার্থীর কাছে গুরুবাণীর প্রচার, সবার উপর আশ্রমের আয় বাড়ানো গান গেয়ে। কিছু-দিন আগে লাহোরে ও দিল্লীতে গান গেয়ে কয়েক হাজার টাকা আনি। ফলে কীর্তিও হ'ল অর্থও এল কিন্তু ভক্তি মন্দা হ'য়ে এল না—প্রত্যক্ষ জোয়ারই এল ভাঁটিয়ে যাওয়া উৎসাহে। তাই আমি ঠিক করেছি প্রতি বৎসর দু তিন মাস বাইরে যাব ও গান গেয়ে যা পাই গুরু-দেবকে প্রণামী দেব—গুরুদেবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে। আশা করি প্রেমল এতে আপত্তি করবে না। মাকেও জিজ্ঞাসা কোরো। কারণ আমার মন এ-বিষয়ে একে-বারে নিঃসংশয় হ'তে পারছে না। এই ছলে আমি হাততালি কুড়োতে যাচ্ছি না তো নানা সভায়? পরমহংস-দেব বলতেন—ভাবের ঘরে চুরি করলে বস্তু লাভ হয় না। তাই ভয় হয়। কারণ অহমিকা আসে নানা ছদ্মবেশে। প্রেমলের জ্ঞান তো আমার নেই যে মুখোষকে মুখোষ ব'লে সনাক্ত করতে পারব সব ক্ষেত্রে। কে জানে—হয়ত খুব সূক্ষ্ম মুখোষ হ'লে ধরতে পারব না। আর তখন ফের পড়ে যাব মায়ার গর্তে। প্রেমলের তীক্ষ্নদৃষ্টিতে আমার আস্থা আছে ব'লেই আরো এ-প্রশ্ন করছি।

মা কেমন আছেন? তাঁকে বোলো আমাকে আশীর্বাদ করতে যেন ভাবের ঘরে চুরি না করি। ঠাকুরের নৈবেদ্য যেন অহং পুরুত চুরি করতে না পারে।

আজ আর সময় নেই ভাই। শ্রীনগরে গান গাইবার নিমন্ত্রণ এসেছে। মোটা দক্ষিণাও পাব মনে হয়।

কিন্তু এ-দক্ষিণা পেতে যাচ্ছি শুধু গুরুসেবা করবেই তো? বাহবা কুড়োতে নয় তো? ভয় হয় বৈ কি। তাই আগে দরবার করছি মা ও প্রেমলের কাছে।

ইতি। তোমার

স্নেহাধীন দাদু

(দশদিন বাদে)

ভাই অসিত,

ললিতাকে যে চিঠি লিখেছ প'ড়ে সত্যিই আমার মন খুশী হ'য়ে উঠেছে। মাও খুব প্রসন্ন হয়েছেন—ওঁর অসুখ একটু বেড়েছে ব'লে তোমাকে লিখতে পারলেন না। তিনি নিজে, তবে বললেন লিখে দিতে যে গুরুকে ভালবাসলে ইষ্টকে ভালোবাসা সহজ হয় ব'লেই সদ্‌গুরু সে ভালোবাসার অর্ঘ গ্রহণ করেন। সত্যিকার গুরু কখনই নিজের জন্যে কিছু চান না। তিনি তো নিজের ব'লে কিছুই আগলে রাখেন'নি। তাই তাঁকে যা দেবে তিনি সোজা পাঠিয়ে দেবেনই দেবেন ইষ্টকে—প্রণামী। গুরু আর ইষ্ট এক বলতে অনেকে এই বিকল্পবাদই বোঝেন। কিন্তু এ নিয়ে তুমি মাথা ঘামিও না—এ-বাদ মানে হ'ল একটা cult; সব cultই সত্য সাধকের কাছে বর্জনীয়। তাই আমি গুরুবাদ অবতারবাদ বর্গীয় পরিভাষার বিরোধী তোমাকে বলেছি বহুবার তোমার মনে থাকতে পারে হয়ত। আসল কথা তুমি ঠিকই ধরেছ—ভালোবাসো। যদি দেখ গুরুর প্রতি ভালোবাসা বাড়ছে তবে আর কার পরোয়া? চলো পাল তুলে এ ভালোবাসার—কোনো

আবর্ত তুফান ঝড় ঝাপটা তোমার নৌকোকে বানচাল করতে পারবে না।

তবে বাইরে গিয়ে গান গেয়ে গুরুসেবার্থে প্রণামী সংগ্রহ করবার সম্বন্ধে একটি কথা শুধু বলব—কিছু মনে কোরো না। আমার মনে হয় যে, তোমার মন ভুল বলে নি—এখানে একটু "কিন্তু" (snag) আছে। তবে আসলে এ-সংশয়ের কথা নয়—আন্তরিকতার sincerityর—কথা। তুমি মনে প্রাণে আন্তরিক সরল, তাই তোমার জন্যে আমার দুর্ভাবনা নেই। তবু সাধনার সময়ে বাইরে গিয়ে হৈ চৈ যত কম করা যায় ততই ভালো। তবে নিছক গুরুসেবার জন্যেই যদি তুমি যাও—(ষোলো আনা গুরুসেবা কিন্তু, মনে রেখো) তাহ'লে ভয় নেই, থাকতে পারে না। তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই ভাগবতে সান্দীপনি মুনির অভয়বাণী, যে মনেপ্রাণে যে শিষ্য গুরুসেবা (গুরুনিষ্কৃতম্) করবে তার ইষ্টলাভ হবেই হবে। কিন্তু যেহেতু তুমি এ বিষয়ে পূর্ণ সচেতন; সেহেতু এনিয়ে আর বেশি বলা বাহুল্য হবে—বিশেষ যখন তোমার গুরুদেব রয়েছেন স্বয়ং তোমাকে রুখতে। যেই একটু বেচাল হবে তিনি লাগাম কষবেনই কষবেন।

এ নিয়ে আরো কিছু লিখতাম। কিন্তু মা-র স্বাস্থ্য ক্রমেই খারাপ হচ্ছে তাই আমাদের সবারই আনন্দের আলোয় আশঙ্কার মেঘের ছায়া পড়েছে। জানি অবশ্য—মা-রআপন বলতে কিছুই নেই আজ—সবই তাঁর ঠাকুরের পায়ে সঁপে দিয়ে জীবন্মুক্তের অবস্থা লাভ করেছেন। তবু তিনি থাকবেন না এ ভাবতেও—কিন্তু যাক এ প্রসঙ্গ। আমরা প্রার্থনা করবই করব—তুমিও কোরবে ভাই—যেন মা আরো কিছুদিন থাকেন তাঁর ভক্তির আলো ও প্রসাদ আমাদের সবাইকে বিতরণ করতে। এ জগতে নাস্তিক্যের অন্ধকার ঘনায়মান—চারদিকেই রণরোল উঠেছে চাপা বা অ র্ধ-প্র ক ট। অজ্ঞান নাস্তিক মানুষ নানা ইসমের নাম দিয়ে বরণ করতে চলেছে নানা আত্মঘাতী বৃত্তিকে। চাইছে বাইরের প্রতিষ্ঠানের ধুমধড়াক্কায় মর্ত্যে স্বর্গরাজ্যের পত্তন করতে। কিন্তু সে-আশা দুরাশা! তোমাকে অনেকবার বলেছি, আবার বলি—ভগবানকে বাদ দিয়ে জীবনে বা রাষ্ট্রে শান্তি ও সৌভ্রাত্রের রামরাজ্য আসতেই পারে না। "ধর্মো ধারয়তি প্রজাঃ"—চিরদিন এইই হয়ে এসেছে, আজ হঠাৎ ধর্মকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্র বা কোনো আধুনিক "ইসম্"-কে বাহাল কর'ল সবই তছনছ হয়ে যাবে। হচ্ছেও তো—দেখছেই তো পাচ্ছ। প্রথম যুদ্ধে আমি বোমা ফেলতাম শত্রুকে দুষমন নাম দিয়ে। কিন্তু জগতে একটি মাত্র দৈত্যরাজ আছে যার চেয়ে বড় দুষমন আর নেই সে হ'ল নাস্তিক দম্ভ—যে বলে গীতার ভাষায় "কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া"—আমার মতন এমন অপরূপ মহাত্মা আর কে আছে এজগতে? এ অজ্ঞানান্ধ জগতে একমাত্র দিশারি—হ'লেন সাধুসন্ত মুনি ঋষি গুরু মহাজনদের দৃষ্টি দীপ। তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই মহাভারতের গল্প: কালকেয় দৈত্যরা জগৎকে উচ্ছন্ন করতে চেয়েছিল জগতের সাধু মহাত্মা জ্ঞানী ভক্তদের উৎসাদন ক'রে। কারণ তারা ঠিকই ধরেছিল (যা আজকের নাস্তিক বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিমানরা ধরতে পারেন নি) যে "লোকা হি সর্বে তপসা ধ্রিয়ন্তে"—মানুষকে ধারণ ক'রে আছে তপস্বীদের তপস্যা—তাই তারা সিদ্ধান্ত করেছিল (লজিকের দুই আর দুয়ে চার) যে "তেষু প্রনষ্টেষু জগৎ প্রনষ্টম্"—তপস্বীদের নির্বংশ করলে জগৎ-ও ধ্বংস হবেই হবে।

আমাদের তাই একটি মাত্র করণীয় আছে—তপস্যা ক'রে গুরু ও ইষ্টের পায়ে আত্মসমর্পণের সাধনায় সিদ্ধ হওয়া। এ যদি পারি তবে আমাদের দিয়ে ঠাকুর করাবেনই করাবেন যা তিনি চান বিশ্বমঙ্গলের জন্যে—'জগদ্ধিতায়'। আর এ যদি না পারি তবে কোনো ইসম্ কোন পঞ্চবার্ষিকী দশবার্ষিকী বা শতবার্ষিকী প্ল্যানেই মানুষ বাঁচবে না। দেখছ না কি স্বচক্ষেই—মানুষ কী মহোল্লাসে উদ্দাম চলেছে উন্মত্ত মরণযজ্ঞের যাজ্ঞিক হ'তে বিশ্বহত্যার আগুন জ্বালাতে বিজ্ঞানের নামে, জাতীয়তার নামে, রাষ্ট্রের নামে, সৌভ্রাত্রের নামে? আজ এই বাহিরের দানবিক টঙ্কার তো আমাদের প্রত্যেকের অন্তরের আসুরিক হুঙ্কারেরই প্রতিধ্বনি। বাইরের বৈষম্য অবিচার অত্যাচার সবই তো আমাদের প্রত্যেকের অন্তরের অশান্তি ও দুষ্প্রবৃত্তির প্রতিচ্ছায়া বটে এ-দুষ্প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ না ক'রে ভগবৎ-দ্রোহী পারে কখনো যথার্থ মানব প্রেমিক হ'তে। সন্ধিপত্রে নাম সই ক'রে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা আর আইনের জোরে মানুষকে

দেবতা ক'রে তুলতে চাওয়া—এ-দুইই কি এক জাতের মূঢ়তা নয়? কিন্তু আর না। য়ুরোপে দ্বিতীয় যুদ্ধ বাধল ব'লে—হিটলারের রেডিও ভাষণ সেদিন শুনতে বাধ্য হয়েছিলাম হঠাৎ সুরথদার ওখানে। তাই এ খেদের পুনরাবৃত্ত। ত্রুটি মার্জনীয়। যাই। মার হঠাৎ অসুখ বেড়েছে এ 'চঠি শেষ করব কাল। প্রণব ডাকছে।

(দুদিন পরে)

ভাই, দুঃখের কথা। কিন্তু দুঃখ করব না। কারণ মার বারণ।

হঠাৎ তাঁর অবস্থা খারাপ হয় বিকেলের দিকে ঠিক যখন তোমাকে চিঠিলিখছিলাম। কাল সন্ধ্যাবেলা আমাদের ডাকলেন সবাইকে। বললেন স্নিগ্ধ হেসে—(সে যে কী সুন্দর হাসি আসত, আহা দেখতে পেলে না! যে সত্যিই তাঁর ডাক এসেছে। বললেন মা শান্ত সুরেই:

"তোমরা দুঃখ কোরো না বাবা! আমি চ'লে যাচ্ছি না তো। শুধু এ ঘর থেকে ও ঘরে যাওয়া। ডাকলেই আমাকে কাছে পাবে তোমরা। ঠাকুর বললেন: তাঁর কাজ চলবে তেমনিই তোমাদের মধ্যে দিয়ে। আমাকে দিয়েও করিয়ে নেবেন যা আমি পারি।" ব'লে ললিতাকে বললেন "গাও মামণি—কিন্তু দুঃখের গান নয়—শুধু ঠাকুরের বাঁশের গান···আনন্দের গান আনন্দ আনন্দ আনন্দ···"

ল'ল·া ধরল তোমারই শেখানো একটি গান:

শ্যামলমুরলী উঠিল উছলি 'বিরহ উজলি' বিজলি তায়।
কে গো প্রিয়তম নীল নিরুপম ঝরিলে হে মম যুগতৃষায়!
দেখেছি স্বপনে করুণা যাহার,
যে-অরুণ বিনা ভুবন আঁধার,
সেই তুমি আজি সুরে সুরে বাজি' এলে কি হে সাজি' রূপমালায়!

যার বাঁশি তরে রজনীবিহান
পথ চেয়ে রয় পথিক পরাণ,
সে-তুমি মোহন এলে কি শরণ শিখাতে চরণ-মুরছনায়!
যার দীপবরে ফুলে চায় পাখী,
ধরি নীল যার পাখা পায় পাখী,
সে-তুমি সুদূর এলে কি নূপুর রণিয়া মরুর বিফলতায়!

আমি জানি ভাই, মা কাছেই আছেন। আরো জানি—সত্যি বলছি তোমায়—অন্তরে তাঁর আরো নিকটতর স্নেহস্পর্শ পেয়েছি। এও নিশ্চয় জানি—তাঁর কাজ তিনি করিয়া নেবেনই নেবেন। তাঁর কৃপার অঘটনী এ-ও কি দেখি নি বারবারই? তবু যতই বলি না কেন ভাই, বাইরের জগতে যতদিন চলাফেরা করছি তখন সে-জগতকে পূর্ণই দেখতে চাই—শূন্য নয়। মা ছিলেন শুধু তো আমাদের অন্তর্জগতে তাঁর প্রেমের আলো জ্বালিয়েই নয়, ছিলেন বাইরের জগতেও তাঁর স্নেহ, বাণী, হাসি চাহনি সুর সেধে—সা বেসুর বেতাল কুরূপকে ঢেকে দিয়ে। সকালে উঠেই ধরতাম মাথায় তাঁর মধুর স্পর্শ—স্নেহের আশীর্বাদ। পাব না আর। ঘুরতে ফিরতে শুনতাম তাঁর ডাক—"দুলাল!" শুনব না আর। ভাগবত পড়ার সময় দেখতাম তাঁর ভাব সমাধি। দেখব না আর। সবার উপর কথায় কথায় শুনব না তাঁর স্নিগ্ধ হাসি···অকারণ হাসি যার ছোঁওয়ায় আমাদের চোখের জলে রঙিয়ে উঠত ইন্দ্রধনু···আসত! কে এসেছিল আমার শূন্য জীবন পূর্ণ করতে···আজো কি জানি ভাই?

ই'ত। তোমার প্রেমল।

পুনশ্চ। তাঁর শ্রাদ্ধবাসরের জন্যে তুমি কিছু তাঁর স্মৃতিতর্পণে লিখে পাঠালে সুখী হব—ললিতা ও প্রণবের অনুরোধ। ললিতা সে তর্পণটি গাইবে সেদিন।

পরদিন অসিত লিখল:

প্রেমল,

কী বলব? তোমরা তাঁকে পাচ্ছ অন্তরে। কিন্তু আমার তো নেই তেমন অনুভূতি। আমার কাছে তাই এ ক্ষতি অপূরণীয়। তাঁকে আমি মনে মনে বরণ করি কি নাম দিয়ে জানো?—গুরুর চারণী। সেই ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েই লিখেছি এ তর্পণটি তাঁর পুণ্য আত্মার স্তবগানে:

শান্তি মা মহীয়সী!
তোমার হাসির তোমার বাঁশির আলোয় পথের ক্লান্তি, মাগো,
কতবার মুছে গেছে মনে পড়ে—যেমনি তুমি এ হৃদয়ে জাগো।
কোনদিনই তুমি সম্পদে ভুলে যাও নি তো তাঁরে—যাঁর কৃপায়

প্রতি পদে সুখ পেয়ে তবু মনে রাখি না আমরা
তাঁরে ধরায়।
বিপদেও ছিলে তেমনি অটল ; করেছিলে যাঁরে
গুরুবরণ
অন্তরে বরি' তাঁর আলোমণি কান্তি জিনিলে
কালো মরণ।
প্রতি তৃণে তুমি দেখেছিলে তাঁর চিন্ময় রূপ
প্রেমের ধ্যানে,
শুনেছিলে প্রতি মর্মরে তাঁর মোহন মুরলী গহন
প্রাণে।
যারে দেখে মুখ ফিরাই আমরা 'হীন প্রাণী' বলি
দিনরজনী
তুমি তারো মাঝে দেখেছিলে বাল গোপালে তোমার
হে সুনয়নী!

যত ভাবি তব বিকাশের কথা, ওগো অপরূপা
অতুলনীয়া!
রোমে রোমে জাগে পুলকশিহর, অন্তরে প্রেম
উচ্ছুসিয়া।
দুদিনে আপন ক'রে যারে তুমি নিয়েছিলে টেনে
স্নেহে অপার,
দিব্য নয়ন দিতে, সে গুরুরে চিনেছিল মাগো,
বরে তোমার ;
তোমায় প্রণাম করি তাই, থাকো যেখানেই দেবী,
আশিস দিও ;
রাখি যেন মনে—কৃষ্ণময়ীর প্রসাদে গরলও হয় অমিয়।
স্নেহাশ্রিত অসিত—

[ক্রমশঃ

বিষকন্যা

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

কোন্ বিষকন্যা এক এসেছিল মায়াবিনী-বেশে
কী কুক্ষণে জীবনে আমার! হায়, তারি দুর্বিষহ
নিদারুণ জ্বালাময় বহ্নি ঝরা প্রতপ্ত নিঃশ্বাসে
ভস্মীভূত মোর জৈব অস্তিত্বের উদ্গত কোরক।
কালকূট—অবলিপ্ত সুচপল অপাঙ্গ তাহার
শান্ত শ্যাম সরসীর ছল-ভরা তরল সোহাগ
অবিরল ; সুশীতল বাহুযুগে সর্পিল আশ্লেষ
সুনিবিড় সুখসেব্য লোভনীয় ভীষণ-মধুর!
এত দীপ্তি রূপে তা'র—তবু তা'য় কী দুঃসহ দাহ!

অন্ধ কুহুযামিনীর ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মতো
এ জীবনে কী অশুভ অবাঞ্ছিত আবির্ভাব তা'র
আকস্মিক। উগারিয়া গেছে চলি' কাল ভুজঙ্গিনী
হলাহল নীলদ্যুতি প্রাণঘাতী প্রেমের চুম্বনে
তৃপ্তিহীন। সুধাপাত্র দেখি' আজ উঠি শিহরিয়া,
কণ্টকবেদনাভীতি বহি' আনে সুরভি কুসুম
কল্পনায় ;—বিষকন্যা তীব্র বিষে করেছে জর্জর
নহে শুধু দেহমন—জীবনের প্রতিটি প্রহর!

কঠোপনিষদের সাধন পথ

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপা ায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

প্রথম অধ্যায়—দ্বিতীয় বল্লী।

আত্মতত্ত্ব।

ভূমিকা—কর্ত্তব্যপরায়ণ বালক নচিকেতার জীবনে যে প্রকার ধর্ম্ম আচরণ আরম্ভ হইল তাহা আমরা পূর্ব বল্লীতে দেখিলাম। বিরাট বংশের ছেলে নিঃসহায় অবস্থায় যমের বাড়ী অতিথি হইয়া পূর্ণ শিষ্যত্ব লাভ করিলেন। তাঁহার সকল শিক্ষা ও দীক্ষা সেখানে মানব হিতার্থে কেমন করিয়া নিষ্পন্ন হইল তাহা মনে করিলেও চমৎকৃত হইতে হয়।

ঠিক সাধারণ মনুষ্যের মনোবৃত্তি যাহা চাহে তিনি তাহাই চাহিলেন। জীবনের সংস্কার বশত, মরণের পরে যে প্রিয়জনের মঙ্গল ও সান্নিধ্য প্রার্থনা মানুষের অভিপ্রেত তাহা তাঁহার প্রার্থিত প্রথম বরে অনুভূত হয়। যমরাজ তাহা মঞ্জুর করিয়া অলক্ষ্যে জানাইলেন যে আমাদের জীবনেও তাঁহার অনুগ্রহ সেই ভাবে হইতে পারে।

মনুষ্যজীবনে কিভাবে ধর্মাচরণ করিলে মরণের পর, এমনকি পূর্ব্বে হইতেও অনন্ত স্বর্গপ্রাপ্তির উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে তাহা জানিবার জন্য নচিকেতার দ্বিতীয় বর চাওয়া ও আনুসঙ্গিক আলোচনা বিবৃত হইল। তখন মানুষ স্বীয় সংস্কারচ্যুত হইতে চাহিতেছে, অথচ সেইমত ভবিষ্যতের কামনা ছাড়িতে পারিতেছে না। কাজেই এখনও নোঙর খুলে, পাল তুলে, অনন্ত সাগরে, সানন্দে ভেসে যাবার পথনির্দ্দেশ পাওয়া যায় নাই।

তৃতীয়বরে নচিকেতা একেবারে পূর্ণ ও সদ্য মুক্তি, যাহাকে মোক্ষ বলা হয়, তাহারই হাওয়ায় আত্মজ্ঞানের টানে, আত্মার কৃপায়, "অহং" ত্যাগ দিয়া "সোঽহং" অবস্থার দিকে ধাবমান্ হইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ইহাই চরিতার্থ করিবার দিক্‌দর্শন এই দ্বিতীয় বল্লীতে কিছুটা হইবার কথা।

ইহার আচার্য্য ও দেবতা স্বয়ং যম। তাঁহার সাথে একজোট হইয়া অর্থাৎ "সংযম" পালনেই এই পথের আবিষ্কার হয়। কয়েকটি উপনিষদে দেখি, দেবতারা নামিয়া আসেন ও গুরুর কার্য্য সমাধা করেন। ইহাতে গুরুর কৃতিত্ব বাড়ে ও শিষ্যের পরম লাভ হয় এবং উভয়ের আধ্যাত্মিক ভূমির একত্ব প্রমাণিত হয়। ঈশোপনিষদে তৃতীয় মন্ত্র হইতেই সূর্য্যের আবির্ভাব ও ষোড়শ মন্ত্রে তাঁর সঙ্গে একাত্মবোধ। অবশ্য শেষের দুইটি মন্ত্রে বায়ু ও অগ্নির সাক্ষাৎ পাই, তাহাদের সাহায্য পাঠাইবার জন্য; যদি সূর্য্যের সঙ্গে একাত্মবোধ সার্থকভাবে উপলব্ধ না হয় ও আবার "ঈশাবাস্যম্" মন্ত্র হইতে পুনরাবৃত্তি ও সাধন করিতে হয়। সেইরূপ কেনোপনিষদের অধিপতি "ইন্দ্র" হইলেও সেখানেও দেখি অগ্নি ও বায়ু সহায়তা করেন। কঠোপনিষদে "যম" একচ্ছত্র রাজা, গোড়া হইতে শেষ অবধি। অন্যান্য দেবগণ গৌণভাবে বর্ত্তমান। পরলোক সাধনে এইরূপ হওয়াই সঙ্গত। যমকে আচার্য্য ও বন্ধু জানিয়া তাঁহার কাছেই শরণ লওয়া যুক্তিযুক্ত। যমের নেতৃত্ব অনুসরণ করিয়া নচিকেতা যেভাবে আত্মতত্ত্ব এই বল্লীতে (১।২ প্রাপ্ত হইলেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দিতে চাই। প্রথমে প্রস্তুতি স্বরূপ "প্রেয় ও শ্রেয়" সম্বন্ধে বিচার লইয়া নচিকেতাকে শ্রেয়ের পথ অবলম্বন করার জন্য আত্মতত্ত্বের অধিকারী বলিয়া ধার্য্য করা হইল (১-৬ মন্ত্র)। শ্রেয়ের পথে (অব্যক্ত) আত্মাকে (এই অব্যক্ত আত্মার স্থান ১।৩।১১ মন্ত্রে পরে নির্দ্দেশ করা হইবে) কি ভাবে শোনা যায় তখন তাহা বর্ণিত হইল (৭ মন্ত্র)। সেই মন্ত্রেই আচার্য্য ও শিষ্যের আশা পূর্ণ প্রচেষ্টা ও সাধন কুশলতার উপক্রম লক্ষ্য করিয়া, পরের দুই মন্ত্রে (৮—৯) আদর্শ আচার্য্য ও শিষ্যের গুন-কীর্ত্তন পূর্ব্বক, যম ও নচিকেতা উভয়ে কি প্রকার সাধনের দ্বারা পরস্পরের জন্য

প্রস্তুত হ'ন (১০-১১) তাহা বিবৃত হয়। গুরু শিষ্যের সম্মিলিত প্রেরণায় "অণু" (জীবাত্মা) "আধ্যাত্মযোগ" দ্বারা "দেবম্" (মহৎ আত্মার) সহিত মিলিত হন (১২) ও হর্ষযুক্ত হন (১৩)। মুমুক্ষুর জীবনে মুক্তির সোপান-গুলি জানাইয়া (১৪) প্রণব-সাধনার সার্থকতা ও ওঁকার-রূপ ব্রহ্মের প্রভাব বুঝাইয়া (১৫-১৭), আত্মার স্বরূপ বর্ণিত হইল (১৮-১৯), "অণু" ও মহৎ আত্মার মিলন-ভূমির প্রসার (২০) ও মহৎ আত্মার মহিমা (২১-২২) উল্লেখ করিয়া,উভয়ের যুগলমিলন (২৩) পরমাত্মার "তনুতে" লক্ষ্য করিবার বিষয়। নচিকেতার প্রার্থিত আত্মতত্ত্ব আর অদৃষ্ট, অশ্রুত ও অপরিচিত রহিল না। তবে যাহাতে সাধনের তার না ছিড়ে যায় ও জীবনের সুর না থামিয়া যায়, তাহার জন্য "প্রজ্ঞা"র সম্বন্ধে ধারণাকে জাগ্রত রাখা হইল (২৪-২৫ মন্ত্র)। এই বল্লীর বক্তব্যগুলি এই-খানেই শেষ হইল। এখন আমাদের অনুসরণের পথে যম নচিকেতা উভয়ের করুণা ও সাহায্য ভিক্ষা করি।

প্রথম মন্ত্র (১।২।১)

মন্ত্র—

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়
স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি
হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে॥

অর্থ:—শ্রেয় মার্গ ও প্রেয় মার্গ ভিন্ন ভিন্ন দিকে যায়। তাহারা উভয়ে মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন সম্পাদনের জন্য মানুষকে জড়িত করে। যিনি শ্রেয়মার্গ অবলম্বন করেন, তাঁহার মঙ্গল হয়। আর যিনি প্রেয়মার্গ বরণ করেন, তাঁহার নিজের গতিবিধির উপর আর নিজের নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

ব্যাখ্যা:—আমার এষণা যাহা চায় তাহাই আমার প্রেয়। মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে আমি যে কখন কি চাই তাহা আমার বুঝিতে ভুল হয়না। যখন নিজের মনো-বিজ্ঞান বুঝিতে থাকি, সঙ্গে সঙ্গে অপরের মনোবিজ্ঞানও বুঝিতে পারদর্শিতা জন্মে। তখন অপরের প্রেয় কি তাহা ধরিতে পারি। উভয় দিকের প্রেয় যদি সামঞ্জস্য করিতে পারি, তাহাতে বিপদ কম ও শ্রীবৃদ্ধি হয়। তাই তখন তাহাকে শ্রেয় বলিয়া মনে হয়। এইরূপে সামাজিক মনুষ্য নিজ প্রেয় ছাড়িয়া যাহা সকলের পক্ষে অর্থাৎ সমাজের পক্ষে শ্রেয় তাহা নিজেদেরও শ্রেয় বলিয়া গণ্য করিতে অভ্যস্ত হয়।

তখন প্রেয় ও শ্রেয় সম্বন্ধে বিচার অন্তরে স্থিরীকৃত হয়। আমি যাহা করিতে চাই, তাহা আমার প্রেয়, আর আমার যাহা করা উচিত, তাহাই আমার শ্রেয়। মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে প্রেয়কে জানি, আমার নৈতিকজ্ঞান আমার শ্রেয় যে কি তাহা জানাইয়া দেয়। এইরূপ নৈতিক জ্ঞান প্রথম অবস্থায় আমাকে অপরের অধিকার ও দাবী সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে দেয় না; কিন্তু ক্রমশঃ ব্যাপারটা এতই স্বাভাবিক ও সহজ হয় যে মনে হয় নিজের ভিতরে একটা সৎবুদ্ধি আমাকে শ্রেয়ের পথে চালিত করিলেও তাহা আমার এতই নিজস্ব সম্পত্তি যে তাহা হইতে চ্যুত হইতে আমি আর পারি না। তখন পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনের দ্বারা আর বিচলিত হই না, নিশ্চিত ও স্থির দৃষ্টিতে অন্তরের নির্দেশ পালন করি। ইহাকেই তখন বলা হয় "পুরুষার্থ"। অপরদিকে যাঁহারা প্রেয় লইয়া থাকেন, তাঁহারা পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেরা ঘুরিতে থাকেন, একবার এদিক, একবার ওদিক করিয়া, জীবনের সময় ও সামর্থ্য ক্ষয় করিতে থাকেন। শেষে হয়ত যাহা প্রেয়, তাহাও আর লাভ হয় না।

যাঁহারা শ্রেয় লইয়া থাকেন, তাঁহারা স্বীয় উন্নতির পথে পুরুষার্থের শক্তিতে চলিতে থাকেন। অন্যদিকে যাঁহারা প্রেয়, নিছক প্রেয় ধরিয়া চলেন তাঁহারা খড়কুটার মত কালস্রোতে ভাসিয়া যান এবং ফলে তাঁহাদের ভাগ্যে যেমন আছে তাহাই হইতে থাকে। শ্রেয়মার্গের সাধককে ভাগ্য নিজ অধীনতার পাশে বন্ধন করতে পারে না। তাঁহার পুরুষার্থ তাঁহাকে রক্ষা করতে থাকেন। তিনি ভয় পান না।

এই মন্ত্রে প্রেয়কে ছাড়িয়া শ্রেয়কে অনুধাবন করিতে বলা হইয়াছে। আমাদের মনে হয় শ্রেয়ের পথে বিধাতার করুণা যথার্থভাবে সকল মানুষকে সাহায্য করে। তাই শ্রেয়ের পথে পুরুষার্থ লাভ হইলে মনে করিতে ভাল লাগে যে ইহা পরমপুরুষের দান, তাঁর কাছ থেকে পাওয়া অর্থ, যাহা আমি গরীব হইলেও আমাকে অসীম ধনে ধনী করিয়া থাকে ও জীবনের চরম পথে যাইবার জন্য উৎসাহ দেয়। [ক্রমশঃ

আর্য্য সঙ্গীতে শ্রুতি

শ্রীতুলসীচরণ ঘোষ

(পুর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে সঙ্গীতের স্বর নির্গত হইবার একটী ক্রমিক রীতি আছে। হৃদয়ে মন্দ্র কণ্ঠে মধ্য ও মস্তকে তার এবং তাহারা পরস্পরের দ্বিগুণিত হয়। মন্দ্রের দ্বিগুণ মধ্য ও মধ্যের দ্বিগুণ তার। স্থান ভেদে এই যে অতিমন্দ্রাদি নাদ ভেদ ইহারা উত্তরোত্তর দ্বিগুণ। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে এই "গুণ" শব্দের অর্থ কি? শাস্ত্রকারগণ কি সঙ্গীতের ধ্বনির স্পন্দনের তারতম্য বলিতেছেন? তাহা যদি না হইবে তাহা হইলে সর্ব্বশাস্ত্রকার গ্রাহ্য এই সূত্রের কোন অর্থই নিশ্চিতরূপে অবধারিত হয় না। কারণ এই সকলই শ্রুতি স্বর সপ্তক গ্রাম মূর্চ্ছনা ইত্যাদির বিজ্ঞানের উপর এই স্বর সমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত। "গুণ" অর্থে যাহা গুণিত, অভ্যস্ত হইয়া থাকে তাহাই গুণ। কোন বস্তু-আশ্রিত গুণ নহে। "গুণৈরিতি গুণ্যতে অভ্যস্যন্তে ইতি গুণাঃ" অর্থাৎ যাহা গুণিত হয় তাহাকে গুণ কহে। অভ্যাস শব্দের অর্থ হইতেছে পুনঃ পুনঃ ক্রিয়া করণ। অতএব দেখা যায় এখানে গুণ অর্থে ধ্বনির প্রকৃতিভুত কম্পন, স্পন্দন বা রণনের সংখ্যা জ্ঞাপক।

নাভি দেশে ধ্বনিত অতিমন্দ্র যে নাদ তাহাই দ্বিগুণিত হইয়া হৃদয়কন্দরে অনুমন্দ্র স্থানে ধ্বনিত হইয়া থাকে। এইরূপ কণ্ঠে, শীর্ষে উত্তরোত্তর দ্বিগুণিত হইয়া যথাক্রমে মন্দ্র, মধ্য, তার, অতিতার এবং তারতীব্র ধ্বনি আবির্ভূত হইয়া থাকে। অতএব সাধারণ সঙ্গীতেও মন্দ্রের দ্বিগুণ মধ্য ও মধ্যের দ্বিগুণ তার হইবে। এই রূপ উত্তরোত্তর দ্বিগুণ স্পন্দনক্রমে যে নাদসকলের আবির্ভাব হইয়া থাকে তাহাদের মধ্যে কোন তাত্ত্বিক ভেদ নাই। নিম্ন ভূমিতে বা স্থানে গ্রহীত যে স্থায়ী স্বর তাহাই দ্বিগুণিত হইয়া উচ্চভূমিতে আবির্ভূত হইয়া থাকে। এই ধ্বনি সকল বায়ুর ক্রিয়া। শাস্ত্র যথা—সঙ্গীত দর্পণ বলেন—

"ন-কারং প্রাণনামানাং দ-কারং অনলং বিদুঃ।
জাতঃ প্রাণাগ্নিসংযোগাত্তেন নাদোঽভিধীয়তে॥"

অর্থাৎ নকার হইল প্রাণবায়ুর প্রতীক এবং দকার হইল অগ্নির প্রতীক। যখন প্রাণবায়ু সংযম হেতু তেজযুক্ত হইয়া নির্গত হইবার কালে প্রাণ ও অগ্নির সংযোগ ঘটে তখন তাহাকে নাদ নামে অভিহিত করা হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে অগ্নিদৈবত কৃত্তিকা নক্ষত্রের উদয় কালে বায়ুস্বরূপ কুম্ভ রাশিস্থ ধনিষ্ঠা নক্ষত্র মস্তকোপরি অবস্থান করে এবং কৃত্তিকা নক্ষত্রের সপ্তমে রবের প্রতীক রবির জন্মনক্ষত্র বিশাখা যাহার দেবতা ইন্দ্রাগ্নি অর্থাৎ ইন্দ্র ও অগ্নি।

কালচক্রে তুলা রাশির অধিপতি হইল স্বাতী নক্ষত্র। তুলারাশি বস্তি প্রদেশ, নিম্নদেশ, ইত্যাদি স্থান নির্দ্দেশ করে। স্বাতী নক্ষত্র হইল "স্বয়মেব আচরতি"। স্বাতীনক্ষত্রের দেবতা বায়ু এবং তাহার সংখ্যা হইল ১৫। অর্থাৎ মুলাধারে অবস্থিত অপান বায়ুর রণন সংখ্যা হইল ১৫। সেই বায়ু যখন দেহস্থ অনল হেতু উত্তপ্ত হয় তখন তাহার ঊর্দ্ধগতি হয়। এবং তাহা যখন স্বাধিষ্ঠান চক্রে আসিয়া পৌছায় তখন তাহার রণন সংখ্যা ৩০ (কারণ "দ্বিগুণ পূর্ব্বা পূর্ব্বাস্মদয়ঃ"।)। এবং তাহা যখন মণিপুর চক্রে উপস্থিত হয় তাহার রণন সংখ্যা ৬০। যখন অনাহত স্থানে আসিয়া পৌছায় তখন রণনসংখ্যা ১২০ এবং বিশুদ্ধ স্থানে ঐ রণন সংখ্যা ২৪০ এবং আজ্ঞা চক্রে তাহার রণন সংখ্য ৪৮০ ইত্যাদি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সপ্তস্বরের প্রথম স্বরটার অনুরণন সংখ্যা ২৪০ নির্দ্দেশ করেন।

সঙ্গীত শাস্ত্র বলেন "দ্বিগুণঃ অষ্টমঃ" অর্থাৎ যে ধ্বনিটী যাহার দ্বিগুণ সেইটী তাহার অষ্টম (Octave)। মন্দ্রের অষ্টম মধ্য ও মধ্যের অষ্টম তার। স্থায়ীরূপে গৃহীত ধ্বনি

বিশেষ হইতে দ্বিগুণিত অষ্টমটীর যে "দূরত্ব" বা "অন্তর" বা "ব্যবধান" তাহাই যথাক্রমে ষড়জাদি নিষাদান্ত স্বর সপ্তকের আবির্ভাব স্থান। সপ্তক বিশেষের অন্ত বা সপ্তমটী তন্নিম্নভূমির অন্তিম স্বরের উর্দ্ধ। অর্থাৎ পুনরাবৃত্তি (repetition)। ষড়জাদির এই আবাস ভূমিকে স্থান বলা হয়। অতিমন্দ্রাদি নামে প্রত্যেক বিভিন্ন স্থানে এই স্বর সপ্তকের আবির্ভাব হেতু আর্য্য সঙ্গীতে এই স্থানকে সপ্তক বলা হয়।

স্থায়ী বা গ্রহ স্বরের এই যে অষ্টম ইহা সেই স্থানীয় স্বর সমূহের বলিয়া সপ্তক বিশেষের উত্তর প্রান্তটী নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। উত্তর প্রান্তীয় এই অষ্টম হইতে অধস্তন যে তুরীয় (অর্থাৎ চতুর্থ) ধ্বনি তাহাই "দ্ব্যর্দ্ধস্বর"। অর্থাৎ দ্বি-অর্দ্ধ স্বর। এই স্বরটীকে দ্ব্যর্দ্ধস্বর বলিবার হেতু এই ইহা গ্রাহ্য সপ্তকটীকে বাম বা দক্ষিণ ভেদে দুইটী অর্দ্ধের সমান অঙ্গের মধ্যবর্ত্তীরূপে বিরাজ করে। এই জন্যই এই দ্ব্যর্দ্ধস্বরের নাম হইল "মধ্যম"। সপ্তককে দুইটী সমান অংশে বিভাজক "মধ্যম" নামীয় এই দ্ব্যর্দ্ধস্বরের বামার্দ্ধে ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার এবং দক্ষিণার্দ্ধে পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ অবস্থিত।

বাদ্যযন্ত্রে শ্রুতি সমূহের নাম যথা—
"নন্দনা নিষ্কলা গূঢ়া সকলা মধুরাতথা।
ললিতে কাঙ্করা ভ্রগজাতিশ্চ হ্রস্ব গীতিকা॥
রঞ্জিকা চাপলা পূর্ণা তথা অলঙ্কারিণীমতা।
বৈণিকা ললিতা চৈব ত্রিস্থানা সুস্বরা তথা॥
সৌখ্যা ভাষাদিকা চথহ বস্তিকা।
ব্যাপকা ততঃ সুসন্না সুভগা ইতি—
যন্ত্রজা শ্রুতয়ে মতাঃ॥"
অনুপ সঙ্গীত বিলাস।

শ্রুতি কি এক কথায় বলিতে গেলে বলা যায় যে স্বর সপ্তক মিলিত সঙ্গীতের একটী গ্রামের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি যোগ্য মাত্র ২২টী শ্রুতি অধিষ্ঠান করে এবং তাহাদের বিশেষ বণ্টন লইয়াই আর্য্যসঙ্গীত। এই কারণে আর্য্যসঙ্গীতের গ্রাম অধুনা প্রচলিত tempered scale সহিত বিশেষ বিভিন্ন। বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে হইলে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে—The definite pitch within the octaveisSruti and contindiuty f sound based on a definite pitch with all its harmonies is Swar.

এই কারণেই আর্য্য সঙ্গীতে স্বরের ক্রমবিকাশ খণ্ডিত করা চলে না। Contineuity of notes is a specialit in Indian music.

এই শ্রুতি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিতে হইলে ধ্বনি কিভাবে উৎপন্ন হয় তাহার জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন বলিয়া মনে হয়। ইহা সকলেরই জানা আছে যে ধ্বনির উৎপত্তি স্থিতি ও গতির মিলনে। এই স্থিতি ও গতি সম্বন্ধে "সঙ্গীতের উৎপত্তি" নামক প্রবন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। বায়বীয় অণুর স্পন্দনের কারণ হইল স্থিতি ও গতির মিলন। এই স্পন্দন হইতে শব্দের উৎপত্তি। শব্দ হইতে বাক্ যাহা বৃহস্পতি নির্দ্দেশ করে।

ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে ভৌতিক অণুর গতি ভিন্ন শ্রবণগ্রাহ্য ধ্বনি নাই। বায়ুর অণুগুলি ধ্বনিকে বহন করে এবং সেই অণুগুলির গন্তব্যস্থানের দিকে সদাই আগু ও পিছু স্পন্দন হয়, যাহার কারণে বায়ুমণ্ডলে ক্ষণিক ও দৈশিক গুরুত্বের বিভিন্নতা ঘটে। এই ক্ষণিক ও দৈশিক গুরুত্বের বিভিন্নতা হইতে বাক্যের উৎপত্তি।

বাচস্পতি বৃহস্পতি হইল বৈখরী শক্তি এবং বিষ্ণু হইল প্রাণশক্তি। বিষ্ণু—বিষ্ (ব্যাপ্ত)+নক্ ক। অর্থাৎ যিনি ব্যাপ্ত হয়েন প্রাণেরই ব্যাপ্তি হয়। আত্মা তাহার আধার রূপ দেহতে প্রাণশক্তি ব্যাপ্ত করিয়া বায়ুমণ্ডলে শ্রবণগ্রাহ্য ধ্বনির উৎপত্তি করে। প্রাণশক্তিই বাক্-শক্তিকে পরিচালন করে। গতিরূপ মকর রাশি ও স্থিতি-রূপ কুম্ভ রাশির সন্ধিস্থলে বায়ু নক্ষত্র ধ্বনিষ্ঠা অবস্থিত। এই মকর ও কুম্ভরাশি শনি গ্রহের আবাস। ধনু ও মীন রাশি তাহার দুই পার্শ্বে অবস্থিত। তাহারা হইল বাচস্পতি বৃহস্পতির কক্ষ। শনির গৃহে শ্রবণ কার্য্যের অধিপতি শ্রবণা নক্ষত্র। ইহার দেবতা বিষ্ণু যিনি প্রাণশক্তির দ্বারা অগ্নিরূপী আত্মার শক্তি আহরণ করেন। কাজেই উচ্চারিত বাক্য হইল হরিহরের মিলন স্বরূপ। ইহাই সৃষ্টি কর্ম্মে আদান প্রদানের মূল তত্ত্ব। বৃহস্পতি হইল বাচস্পতি অর্থাৎ বৈখরী শক্তি। আত্মচেষ্টা হেতু কণ্ঠ নালীতে মৃদু আলোড়ন সুরু হয়। এই আলোড়ন হেতু যে মৃদু ধ্বনি নির্গত হয় তাহা কেবল মাত্র ধ্বনি বিশেষ

এই যে ধ্বনি যাহা শ্রবণে শ্রুত হইতে পারে তাহাই হইল শ্রুতি। অর্থাৎ স্বরাবয়ব। সূক্ষ্ম স্বর বিশেষ শ্রূয়তে যা শ্রুতিঃ। স্বরো·পত্তির প্রথমাবস্থায় যে বিশুদ্ধ তরঙ্গ হেতু ধ্বনি নির্গত হয় তাহাই হইল শ্রুতি। "স্বরারম্ভকারকত্ব শব্দবিশেষঃ॥" আরও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে অনুরণন রহিত শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্যমন্দ্র তীব্রতার পরিচায়ক শ্রবণযোগ্য যে ধ্বনি উৎপাদিত হয় তাহাই শ্রুতি। এবং স্নিগ্ধ অনুরণন যুক্ত যে মিশ্রধ্বনি যাহা শ্রোতৃযুগলকে স্বতই মুগ্ধ করে তাহাকে স্বর আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়।

সঙ্গীতের স্বর কালিক নিয়মানুবর্ত্তিতার সহিত বায়ুর স্থায়ী স্পন্দনের দ্বারা ঘটিত। এই স্পন্দন আমাদের কর্ণ-রন্ধ্রে বায়ুকে কম্পন করিলে আমরা স্বর অনুভব করি। এই কম্পনের সংখ্যা অধিক হইলে স্বর তারস্বর হয় এবং মন্দ্র হইলে মন্দ্র হয়। ইহা সকলেই অবগত যে দুইটী বিভিন্ন স্বরের মিশ্রণে সুখানুভব বা দুঃখানুভব ঘটিয়া থাকে। কোন এক স্বরের কম্পনসংখ্যা যখন অপর কোন স্বরের দ্বিগুণিত হয় তখন স্বর দুইটী সুখানুভবতার সহিত একেবারে এক হইয়া মিশিয়া যায়। এই অবস্থায় দুইটি স্বরের মধ্যে পার্থক্য অনুভব যোগ্য মাত্র ২২টী শ্রুতি অবস্থিত।

এই শ্রুতির বিষয় আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাষায় আর একটু বিশদভাবে আলোচনা প্রয়োজন। কারণ শ্রুতির সম্যক জ্ঞান না হইলে আর্য্য সঙ্গীত বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করা যায় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বায়ু তরঙ্গ হইতে শব্দের উৎপত্তি। শব্দ উৎপাদক বায়ু তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য হইল যে বায়ুর অণুগুলি স্পন্দন নিমিত্ত কোথাও বায়ুর ঘনত্বের বৃদ্ধি করে কোথাও বা তাহার হ্রাস করে। একটী ঘনত্ব প্রদেশ হইতে পরবর্ত্তী ঘনত্ব প্রদেশের যে ব্যবধান বা আন্তর তাহাই শব্দ তরঙ্গের পরিমাণ অর্থাৎ wave length। এবং ইহাই কম্পনের পরিচায়ক। এই ঘনত্বের বিভিন্নতা যখন একই কালানুবর্ত্তী হইয়া নিয়মিত হয় তখনই মনোরঞ্জন সঙ্গীতের ধ্বনি উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ যাহাকে reguler and priodic বলে। এতদ্ব্যতীত উহারা কেবল কর্কশ শব্দ মাত্র। ফলে নিয়মিত ঘনত্বের দেশ প্রভেদ হইল সঙ্গীতের ধ্বনি তরঙ্গ অর্থাৎ sound wave। যখন এই তরঙ্গ অধিক সংখ্যায় এককালে কর্ণরন্ধ্রে আঘাত করে তখনই আমরা ধ্বনিকে তীব্র বলি।

এই হিসাবে সংখ্যা লঘু হইলে ধ্বনিমন্দ্রসংখ্যা সুরু হইলএবং ধ্বনি তীব্র হয়। এই সংখ্যা যদি অত্যধিক সুরু হয় তাহা হইলে ধ্বনি কর্ণ গ্রাহ্য হয় না। সংখ্যা ১৬র কম হইলে ধ্বনি শ্রবণগোচর হয় না। এবং ১৬০০০ এর অধিক হইলে ধ্বনি শ্রবণ গোচর হয় না। তাহার কারণ আমাদের কর্ণচ্ছদ ইন্দ্রিয় রূপে মধ্যভাগে কার্য্যকরী হয়। এক সেকেণ্ড সময়ে কর্ণচ্ছদে যতগুলি তরঙ্গ আঘাত করে বিজ্ঞানের ভাষায় তাহাকেই (pitch) পিচ্ বলে। ইহা বলা বাহুল্য যে কালচক্রে রবি হইতে রবের উৎপত্তি এবং তাহার জন্ম নক্ষত্রের সংখ্যা হইল ১৬। দুইটী সঙ্গীত ধ্বনির তরঙ্গ সংখ্যা যখন একটী আর একটীর দ্বিগুণিত হয় তখন উহা একই ধ্বনি বলিয়া শ্রুত। হয় সঙ্গীত শাস্ত্র বলেন যে এই রূপ দুইটী ধ্বনির মধ্যে মন্দ্র ও তীব্রতা জ্ঞাপক পার্থক্য উপলব্ধি যোগ্য মাত্র দ্বাবিংশ ধ্বনি বর্ত্তমান এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা পার্থক্য উপলব্ধি হেতু এই দ্বাবিংশ ধ্বনিকে আর্য্যশাস্ত্রে শ্রুতি বলে।

যখন সঙ্গীতের কোন ধ্বনিতে বিশুদ্ধ তরঙ্গ সংখ্যা ও তাহার গুণিত তরঙ্গ সংখ্যা একই সঙ্গে বর্ত্তমান থাকে তখন উহা অতিশয় মনোরঞ্জনকারী হয় এবং সঙ্গীত শাস্ত্রে তাহাকেই স্বর বলে। আর্য্যশাস্ত্রে শ্রুতি ও স্বরের ইহাই প্রভেদ। এই কারণে কোন এক বিশেষ শ্রুতি অবলম্বন করিয়া স্বরের উৎপত্তি।

বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে হইলে এই বলিতে হয় যে—On y 22 different pitches are disinguishable by the human ear between a note and its octave.These definite pitchesarc calledSruties. A defininte pitch with all its harmanies produces a musical tone which is called Swar. when a particular tone is related by bicey placed on the scale it is called a note.

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে শ্রুতি সকলের সংখ্যা হইল দ্বাবিংশ। কাল চক্রে মকর রাশিস্থ শ্রবণা নক্ষত্রের সংখ্যা হইল ২২, এই খানে রবি থাকিলে বাক্‌দেবীর পূজা।

সুর সপ্তকে বাঁধিয়া বীণা
বাণী শুভ্র কমলাসীনা।

এই শ্রুতি সকলের বণ্টন হইতেছে—

১৩২৪৪৩২।

আদি শ্রুতি হইতে চতুর্থ শ্রুতিতে ষড়জ, সপ্তম শ্রুতিতে ঋষভ, নবম শ্রুতিতে গান্ধার। ত্রয়োদশ শ্রুতিতে মধ্যম, সপ্তদশ শ্রুতিতে পঞ্চম, বিংশ শ্রুতিতে ধৈবত এবং দ্বাবিংশ শ্রুতিতে নিষাদ। এইরূপ ভাবে মন্দ্র, মধ্য ও তার স্থানে স্বরসপ্তক বিন্যস্ত হইবে।

আর্য্য সঙ্গীতে ভাব ও রসের বিকাশ এই শ্রুতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। কাজেই ইহার জ্ঞান না থাকিলে আসল জিনিষ হইতে বিচ্যুতি ঘটে। প্রচলিত সঙ্গীতে ইহার অভাব হেতুই রসাভাব পরিলক্ষিত হয়।

ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ

পুষ্পদেবী, সরস্বতী, শ্রুতিভারতী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

২।১।১৪

তদনন্যত্ব মারম্ভনশব্দাদিভ্যঃ

তা হতে অভেদ আরম্ভ হতে ইহা জেন জানা যায়
মাটিকে জানিলে হাড়ি সরা খুরি সবেরই সৃষ্টি তায়
তেমনি জানিও ব্রহ্ম সত্য
জানিলে শুধুই এই সে তথ্য
ব্রহ্মই জেন আত্মা রূপেতে সকলের মাঝে রয়
জগৎ মিথ্যা এই কথা জেনো এই অর্থেতে কয়।
সৃষ্টির আগে জগতের নাম রূপ যথা কোন নাই
অসৎ বলিয়া বলার অর্থ শুধুই জানিও তাই
ব্রহ্ম হেথায় মূর্ত্ত য ন
তারি নানা রূপ নানা ভাবে রণ
জেনো ব্রহ্মই মৃত্তিকা সম ত হতে সকল হয়
ব্রহ্মই রহে নানা রূপ ধরে ব্রহ্ম ছাড়া ত নয়।

২।১।১৫

ভাবে চ উপলব্ধিঃ

কারণ থাকিলে তবেই কাজের উপলব্ধি যে হয়
কারণের অস্তিত্ব জানিও যাবে সেথা নিশ্চয়
মাটি নাহি হলে ঘট নাহি হয়
সুতা না হইলে বস্ত্র না হয়
সোনা না থাকিলে স্বর্ণ বলয় কি রূপেতে বলো হয়
কার্য্য কারণ দুইই এক জেন মনমাঝে নিশ্চয়।

২।১।১৬

সত্ত্বা চ অবরস্য

সৃষ্টির মাঝে জগৎ ব্রহ্মে আছিল বিদ্যমান
জগৎ ব্রহ্ম দুই অভিন্ন ব্রহ্ম সবের প্রাণ
শ্রুতিতেও জেনো এই কথা কয়
"সৎ এব সোম্য" ইহাই বোঝায়
ইদম অগ্র আসীৎ অর্থে পূর্ব্বেও সৎ ছিল
জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন একথা মনে না নিলো।

২।১।১৭

অসদ্ব্যপদেশাৎ ন ইতি চেৎ ধর্ম্ম স্তরেণ বাক্যবোধাৎ

শঙ্কর কন শ্রুতিতে বলেছে জগৎ অসৎ ছিল
নাম রূপ আর ধর্ম্ম হইয়া সৎ রূপ সেই নিলো
তৎ অর্থেতে জগৎ যে হয়
শ্রুতির অর্থ সেই ত বুঝায়
সৎ অর্থেতে ব্রহ্মই শুধু সে ছাড়া সৎ ত নয়
জগৎ সৃষ্টি হয়নি যখন শুধু সৎ এই রয়।

[ক্রমশঃ

অসংসারী [উপন্যাস] শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* * * * * * *

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সাতাশ

অফিসে পৌঁছে সাইকেলটা গ্যারেজে তালা দিয়ে ...ড়র সামনে আসতেই সমীর দেখতে পেলে ওর পূর্ব্ব পরিচিত মিঃ বিশ্বানীকে। বিশ্বানী সিঁড়ি থেকে নেমেই খুব ...ভাবে ওর কাঁধের ওপর হাত দিয়ে হিন্দিতে বললে, ...: মুখ জী, এবার কিন্তু আমায় খাইয়ে দিতে হবে।

সমীরও কৃত্রিম আনন্দ প্রকাশ করে বললে, সানন্দে,—...চই এবং এখনই—কিন্তু উপলক্ষ্যটা কি শুনতে ...ই না?

নিশ্চয়—নিশ্চয়। উপলক্ষ্য খুবই ভালো। কালই ...কটা কোয়ার্টার খালি হয়েছে, আর আমিই সেটা ...পনার নামে বিলি করে দিয়েছি। চুণকাম করা হয়ে ...লেই সেটা আপনি পেয়ে যাবেন, কিন্তু গৃহপ্রবেশের ...ন ভালো করে খাওয়াতে হবে, মনে থাকে যেন।

মিঃ বিশ্বানী হচ্ছেন এখানকার বাসস্থান নির্দ্ধারণকারী ...ফিসের হেড্ এ্যাসিস্ট্যাণ্ট এর কাছে অন্ততঃ দশদিন ...মীর ঘোরাঘুরি করেছিল কোয়ার্টাসের জন্য। কাজেই ...ই সংবাদে এর সামনে খুব খানিকটে আনন্দ দেখাতে সমীর ...ধ্য হোল। শেষে বললে, আচ্ছা মিঃ বিশ্বানী, এটা ...ন ব্লকে হোল?

তিনি বললেন, কোন ভয় নেই, আপনার অফিসের ...ছেই হবে, এবং আশে পাশে সমস্তই বাঙ্গালী আছেন, ...পনি জল ছাড়া মাছের অবস্থায় পড়বেন না। কিন্তু ...ন্ ব্লক তা তিনি পরিষ্কার করে বললেন না।

বাঙ্গালীপাড়ায় শুনেই সমীর বেশ একটু মুষড়ে গেল, ...ন্তু মুখে সে কোনরকম প্রতিবাদ করতে সাহস পেলে না। দু'চারটে বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ বিনিময়ের পরে সমীর ওপোরে উঠে গেল ওর অফিসে, মিঃ বিশ্বানী, প্রসান্ন বাড়ীর দিকে রওনা দিলে। শনিবার সকাল সকাল ছুটী, তবে সমীরের অফিসে সবই উল্টো বন্দোবস্ত, তাই তার কাজ শুরু হ'ল এই অবেলায়।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মনের কথা গোপন রেখে ফিরে এসে সমীর সমস্ত কথাই রেণুকে আনুপূর্ব্বিক বললে। এই প্রায় একমাসের মধ্যেই রেণু ওর পরম বন্ধু হয়ে গেছে, কিন্তু একমাত্র রেণুরই ঐকান্তিক আগ্রহ ওদের মধ্যে দূরত্ব আছে এখনও শতযোজনের।

পিসিমার কথা এবং কোয়ার্টার্স পাওয়ার সংবাদে রেণু পরম নির্ভরে সমীরকে বললে, দাদা, ভগবান্ যা করেন ভালোর জন্যই। পিসিমা যে আপনার ওপর বিরক্ত হয়েছেন, সে এমন কিছু নয়, ও ভুল আপনিই ভাঙ্গতে পারবেন আপনি কালই সকালে পিসিমার কাছে যান, তাঁর হাতে পায়ে ধরে তাঁকে আপনার কোয়ার্টার্সে থাকতে বলুন। আমিও থাকবো, কাজ কর্ম্ম সব করে দেব। তারপর আপনি একটা বিয়ে করে সুখী হোন, আর আমিও আপনাদের বাড়ীতে থেকে আপনাদের সমস্ত কাজ করে দিই। যেটুকু গোলমাল হয়েছে, সে সমস্তই মিটে যাবে।

এমনই একটা প্রগাঢ় বিশ্বাস ও সারল্য নিয়ে রেণু কথাগুলো বলে গেল যে, এর মধ্যে যে কোনরকম 'কিন্তু' আছে তা বক্তা এবং শ্রোতা কারুরই মনে এলো না। রাত্রে হোষ্টেলের পাতা বিছানার ওপোর শুয়ে সমীর ভবিষ্যতের বেশ একটি উজ্জ্বল চিত্র মনে মনে আঁকতে

লাগ্লো, এমন সময় রেণু রান্নাঘরের সমস্ত কাজ সেরে এঘরে এসে ঢুকে সমীরের মাথার কাছে জলের গ্লাসটা ঠিক করে রেখে নিজের বিছানাটা পেতে আলো নিবিয়ে দরজা বন্ধ করলে। রেণু ভেবেছিল, সমীর ঘুমিয়েছে, সেই জন্য কোন কথাই সে কইলে না।

সমীর নড়ে চড়ে শুলো। রেণু বললে, দাদা কি জেগে আছেন না কি?

সমীর বললে, হ্যাঁ। ভাবছি, কোয়াটার্সটা কবে দেবে।

রেণু নিজের বিছানায় বসে গামছা দিয়ে পায়ের তলাটা মুছতে মুছতে বললে, কাল পরশুর মধ্যেই পাবেন না? আপনি ত বললেন, হয়ে গেছে।

সমীর বললে, অত সহজে হয় নাকি? মনে রেখ, এটা স্বাধীন রাজ্য। হঠাৎ আবার কার কোন্ আত্মীয় এসে জুটবে, তখন আর আমার কথা কেউ মনেও রাখবে না।

গামছাটা মাথার কাছে রেখে রেণু বললে, সে কি দাদা, আপনার নামে বাড়ী দিয়ে আবার সে বাড়ী ফিরিয়ে নেবে!

সবই হতে পারে বোন, কিছুই আশ্চর্য্য নয়। তবে একবার গিয়ে ঢুকতে পারলে—

তবে কালই চলুন না, ঢোকা যাক্।

আগে দাঁড়াও, চূণকাম হোক, চিঠি দিক, তবে ত।

জেদ ধরে রেণু বললে, আপনি এক কাজ করুন দাদা। ও বাড়ীতে গিয়ে ঢুকে চূণকাম করিয়ে নেবেন। হাতের জিনিষ ছাড়বেন না। তারপর পিসিমা এখন দিল্লীতেই রয়েছেন, ওঁকে এখনই নিয়ে আসুন।

সমীর বললে, হ্যাঁ, আমি কাল সকালেই পিসিমার কাছে যাবো। কাল ত রবিবার, একবার বেলা তিনটের সময় আমাকে অফিসের কাজে একটু বেরুতে হবে, তা ছাড়া সারাদিনই আমার ছুটি।

এর পর শিশুর মত সারল্য নিয়ে দাদার বিয়ে এবং পিসিমা ও বৌদির সংসারে সে কিভাবে সমস্ত কাজ একাই করে দেবে এবং তারপর ছোট ছোট ভাইপো-ভাইঝিদের নিয়ে কত আনন্দে সে সংসার করবে এই সব কল্পনা দাদাকে শুনিয়ে শুনিয়ে সে যেন আপন মনেই বল্তে লাগলো। সমীর কিছুকাল ধরেই লক্ষ্য করেছে যে, যে-রেণু আগে নিতান্ত দরকারী দু'একটা কথা ছাড়া আর কিছুই বলতো না, এমন কি নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যে নিজেই এর পূর্ব্বে অনুভব করতো কি না সন্দেহ, সেই রেণুই কিছুকাল যাবৎ বেশ মুখর হয়ে উঠেছে। সামান্য একটু ভালবাসা, অল্প একটু নির্ভরতা, যৎকিঞ্চিৎ আত্মবিকাশের সুযোগ পেয়ে চিরদিনের রিক্ত রেণু-তরু যেন পত্রপুষ্পে পল্লবিত হয়ে উঠেছে। ওর অন্তরে অন্তরে সঙ্গোপনে সঞ্চারক হাওয়া বইছে, তবে হাওয়াটা বোধ হয় শরতের, বসন্তের হাওয়া যে নয়, সে বিষয়ে সমীর নিঃসন্দেহ।

রবিবার সকালে ঘুম ভাঙ্গতে বেশ একটু দেরী হয়ে গেল। বেলা সাতটার পর উঠে সমীর চট্ করে প্রাত-রাশ সমাপন করে ধুতি পরে সাইকেল নিয়ে যখন বেরুলো তখন প্রায় পৌনে আটটা হবে। মতির মায়ের জামাই-এর বাড়ীতে পৌঁছে সে দেখলে, বাইরে থেকে তালা বন্ধ। পাশে ব্রিজলালদের কোয়াটার্সে খোঁজ করতে একটা ছোকরা বেরিয়ে এসে যা বললে, তার মর্ম্মার্থ হচ্ছে এই যে সে হচ্ছে ও-বাড়ীর চাকর, একমাত্র তাকে বাড়ীতে রেখে ব্রিজলালের বাড়ীর সকলে এবং মতির মায়ের মেয়ে জামাই এবং 'দো বুড়ী' সবাই মিলে একত্র হয়ে আজ ভোরবেলা বৃন্দাবনে চলে গিয়েছে, কারণ এদের কারুরই বৃন্দাবনে যাওয়া হয় নি। মতির মা ও ভুবনে-শ্বরীকে হাতের কাছে পেয়ে এরা সকলেই একদিনের জন্য তীর্থ করতে বেরিয়েছে, আজ রাত্তিরে কিম্বা কাল সকালেই এরা সব ফিরে আসবে, কারণ কাল আবার অফিস আছে।

হতাশ হয়ে সমীর বললে, বুড়ী মায়ীরা কি এদের সঙ্গে ফিরবে?

ছোক্রাটি ঘাড় নেড়ে বললে, ও সব কথা সে জানে না।

সমীরের একবার মনে হোল, সে বৃন্দাবনেই যায়, কিন্তু সাহস হোল না। প্রথমতঃ, সেখানে গেলে পিসিমা কি বল্বে তার ঠিক নেই। দ্বিতীয়তঃ, সেখানে গিয়ে খুঁজে বার করা শক্ত এবং সর্ব্বোপরি বেলা তিনটার সময় তাকে তার অফিসারের কাজে হাজিরা দিতে হবেই, খুব জরুরী

কাজ আছে বলে রবিবারেই তাকে যেতে বলেছেন তার কর্ত্তা। মনের দুঃখ মনে চেপে সমীর হতাশ হয়ে বাসায় ফিরে এলো।

সব কথা শুনে রেণু বললে, ভাববেন না দা'দা, আপনি কোয়ার্টার্স ঠিক করুন, তারপর না হয় কাশী থেকেই পিসিমাকে আনিয়ে নেবেন। কিছু অসুবিধা হবে না।

পরের দিন সকালে সমীর অফিসারের বাড়ীতে যাওয়ার সময় এ বাড়ীর দরজায় সাইকেল থেকে একবার নেমেছিল। মতির মায়ের জামাই খালি গায়ে পাজামা পরে দাঁত মাজছিলেন, নিতান্ত অনাসক্তভাবে উত্তর দিলেন যে, ওরা আর ফেরেন নি, কাশী চলে গেছেন।

বৃন্দাবন থেকে রওনা হয়ে গেছেন কি? সমীর প্রশ্ন করলে।

রোয়াকের ধারে এসে মাজন মিশ্রিত একমুখ লালা ফেলে ভদ্রলোক বললেন, আজই যাবেন।

বৃন্দাবনের ঠিকানাটা কি? সমীর পুনরায় প্রশ্ন করলে।

ভদ্রলোক মুখভঙ্গীতে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি জানেন না, তারপর কোন ভনিতা না করে তিনি ভেতরে চলে গেলেন। ভদ্রলোকের ব্যবহারে সমীর মর্ম্মাহত হয়ে চলে এলো, অপর কোনো প্রশ্ন করার ইচ্ছা তার রইলো না।

কয়েকদিনের মধ্যেই সমীর চিঠি পেলে যে, তাকে কোয়ার্টার্স দেওয়া হয়েছে এবং সে যেন ঐ স্থান অবিলম্বে দখল করে। কিন্তু কোয়ার্টার্সের নম্বর দেখে সে বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করলে। সদাশিবের বাংলোর সামনের দিকের একটি বাংলোই সমীরকে দেওয়া হয়েছে।

রেণু বল্লে দাদা, ও বাড়ী না নিলে সরকার থেকে অন্য বাড়ী কি আপনাকে দেবে না?

সমীর বল্লে, ও বাড়ী নেব না বলে আমি কি করে আপত্তি করবো বল? অফিসের কাছে এবং বাঙ্গালী পল্লীতে। আমার কোন আপত্তিই ত টি'কবে না। আর আমাদের যে কারণে সত্যিকার আপত্তি, তা ত আর মুখ-ফুটে বল্‌তে পারি না।

কিন্তু দাদা, নীরোদ বাবু এবং আরও কয়েকজন চেনা-শোনা লোকের সাথে ত অনবরতই মুখোমুখি হবে। রেণু চিন্তিতভাবে সমস্যাটা প্রকাশ করলে।

হোক গে যাক্, যা হয় হবে,—সমীরের কেমন যেন মরিয়া গোছের ভাব। কারণ মাদ্রাজীদের এই হোটেল ছাড়তেই হবে। এখানে কষ্টের অবধি নেই, এবং খরচও অনেক। এখানে বাস করে দুজনের সংসার চালিয়ে পিসিমাকে মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা পাঠানো বড়ই কষ্টকর হয়ে পড়ে।

নূতন কোয়ার্টার্সে এসেই সমীর পিসিমাকে বাড়ীর ঠিকানায় চিঠি লিখলে। সে ভেবেছিল যে একসপ্তাহের মধ্যে পিসিমা নিশ্চয়ই কাশীর বাড়ীতে গিয়ে পৌছুবেন। হোলও তাই, কিন্তু চিঠির জবাব দিলেন গুরুভাই নিজে। এতদিন পর্যন্ত গুরুভাইই চিঠি লিখতেন বটে কিন্তু পিসিমার জবানীতে, এবার কিন্তু গুরুভাই নিজের জবানীতেই লিখেছেন। পিসিমার পক্ষ হয়ে তিনি সমীরের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করে তাকে আশীর্ব্বাদ করে লিখেছেন যে তোমার পিসিমা বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, এবং দেখাশোনার সুবিধার জন্য ও-বাড়ীর ঘর ছেড়ে গুরুভাইয়ের বাড়ীতেই একটা ঘর নিয়েছেন এবং গুরুভাইই তাঁর যাবতীয় তত্ত্বাবধান করছেন। অর্থকষ্ট খুব, অতএব সমীর যেন পত্রপাঠ মাত্র গতমাসের এবং এমাসের এই দুই মাসের পঞ্চাশ টাকা হিসাবে একশটি টাকা পাঠিয়ে পিসিমার উপকার করে; কারণ বৃন্দাবন যাতায়াত এবং ফিরে এসে চিকিৎসা বাবদ তার বেশ কিছু টাকা ধার হয়ে গেছে এবং টাকাটা যদি টেলিগ্রাম কোরে গুরুভাইয়ের নামে পাঠানো হয়, তাহলে পিসিমার পক্ষে সেটা পেতে খুব সুবিধে হবে।

চিঠি পড়ে সমীরের তেমন ভালো মনে হোল না। টাকার জন্য চিঠিতে আগ্রহ যেন খুব বেশী। ব্যাপারটা কি? রেণু চিঠির মর্ম্মটা শুনেই বল্লে, না দাদা, টাকাটা পাঠিয়ে দিন। হবেই ত, বৃন্দাবন থেকে খরচপত্র করে কাশী ফিরে অসুস্থ হয়ে ধার দেনা নিশ্চয়ই হয়ে পড়েছে। তারপর সামনের বাড়ীর গুরুভাই, তিনি আর কতদিন নিজের পয়সায় দেখতে পারেন।

সমীর এখন রেণুর কথা রীতিমত বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, ওর কথার ওপর নির্ভরই সে করে। এমন কি সমীরের ঘরে যে টাকাকড়ি থাকে, রেণুই এখন তার তত্ত্বাবধান করে। রেণু বল্লে, দাদা, আমার কাছে আ

একশ' বিয়াল্লিশ টাকা, এ থেকে একশ টাকা পাঠিয়ে দিন, বাকী বিয়াল্লিশ টাকাতেই এ মাসটা কোন মতে চলে যাবে।

নিরক্ষর রেণুর হিসাবপত্র ও সংসারের ব্যবস্থাপনা দেখে সমীরমধ্যেমধ্যে অবাক্ হয়ে যায়। বাইশচব্বিশ বছর বয়সটা মেয়েদের এমনই যে, একটু ভালোবাসা পেলে এরা ভেঙেচুরে একেবারে নতুন মানুষ হয়ে উঠতে পারে, অপর পক্ষে কোথাও কোন তন্ত্রীতে একটা প্রায় অজানা ঘা খেলেই এরা এদের সমস্ত ভবিষ্যৎকে ডুবিয়ে দিয়ে আত্মহত্যা করার জন্য প্রস্তুত হতেও পিছপা হয় না। এই রেণুই একদিন আত্মহত্যা করার উপযুক্ত স্থান খুঁজতে একা গান্ধীঘাটে গিয়েছিল। এই রেণুই সমীরকে বলেছিল, তাকে একা দশাশ্বমেধ মাঠে বসিয়ে রেখে চলে যাওয়ার জন্য। কিন্তু একটা ভাব দেখে সমীর মধ্যে মধ্যে অবাক হয়ে যায়; যে-পিসিমা রেণুকে দূর দূর করে তাড়িয়েছে, রেণু তার জন্য এত টানে কেন?

নিজের দারুণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও টেলিগ্রামে একশ' নয়, মাত্র পঞ্চাশ টাকা পিসিমার গুরুভাইয়ের নামে পাঠিয়ে দিয়ে দুপুরে সমীর নিজের বাসায় ফিরে এসে দরজায় ঘা দিলে। নতুন কোয়ার্টার্সে সে এসে পৌঁছেছে আজ মাত্র পাঁচদিন। এই পাঁচদিনের মধ্যে এ পাড়ায় এখনও কারুর সাম্‌নাসাম্‌নি হয় নি। মুখ চেনা অনেকের সঙ্গেই আছে, সদাশিবের বাড়ীতে থাকার সময় সে অনেকের সঙ্গেই পরিচিত হয়েছিল, কিন্তু এবারে এসে সে কারুর সঙ্গেই দেখা করে নি। কেমন যেন সঙ্কোচ সে বোধ করে। মাঝে মাঝে সমীর নিজেই বিস্মিত হয় এই ভেবে যে, কোন অপরাধ না করেও সে যেন কেমন অপরাধী সেজে বসেছে। রেণুও সব সময় বাড়ীর দরজা বন্ধ করে বসে থাকে, একবারের জন্যেও বাইরে বেরোয় না। সমীর সকাল সকাল বাড়ী থেকে বেরোয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সকালে সে সাইকেলে চড়ে দ্রুত এগিয়ে পড়ে এবং দুপুরে সে যখন ফেরে তখন এই কেরাণীপাড়ায় নিশুতি রাত্রের আবহাওয়া। আবার সন্ধ্যার সময় যখন এ-পাড়ার অধিবাসীরা বাংলোর সামনে চেয়ার বা খাটিয়া পেতে গল্প গুজব করে, তখন সমীর থাকে বাইরে নিজের কাজে। কাজ শেষ করে বাজার করে, ধীরে সুস্থে সাড়ে নটা নাগাদ বাংলোয় ফেরে। মুখ ফুটে না বললেও, রেণু বুঝতে পারে যে, সে যেমন দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে অজ্ঞাতবাস করে, তার দাদাও তেমনি হয়ত বা বিনা প্রয়োজনেই এ বাড়ীতে বাস করেও পাড়ার বাইরে বাইরেই অজ্ঞাতবাস করে বেড়ায়।

দরজায় পরিচিত আঘাত শোনা মাত্রই রেণু এসে খুলে দিলে। সমীর পেছন ফিরে সাইকেলটা তুলতে গিয়ে হঠাৎ তার নজর পড়ে গেল সদাশিবের কোয়ার্টার্সের দিকে। সমীরের বোয়াক থেকে সদাশিবের সেই পুরাতন পরিচিত ঘরটির দূরত্ব হবে প্রায় পঞ্চাশ গজ কি আরও একটু কমও হতে পারে, ঠিক সামনাসামনি নয়, একটু টেরছাভাবে। এ বাড়ীর হাতা পার হয়ে চওড়া সরকারী রাস্তা, রাস্তার অপর পারে সদাশিবের বাড়ীর হাতা পার হয়ে তার ঘরের দরজা ঐ রকমই হবে। যে ঘরে সমীর থাকতো, সেই ঘরের দরজা খোলা, দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে আছে গৌরী, এবং এই বাড়ীর দিকেই সে চেয়ে আছে। বোধ হয় যেন সে ওৎ পেতে দাঁড়িয়েছিল, সমীর কখন আসে তাই দেখার জন্য। সমীর এবং রেণু দুজনেই গৌরীকে দেখলে। রেণু চট করে ঘরের মধ্যে সরে গেল, সমীর তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে কোনরকমে সাইকেলখানা তুলে নিয়ে ঘরে ঢুকেই সে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলে।

অফিসের পোষাক ছেড়ে স্নানাদি চুকিয়ে সমীর খেতে বসে সামনে বসে-থাকা রেণুকে বললে, আজ তোমার দিদিমণিকে দেখলে?

হ্যাঁ, দেখলুম।

এর আগে দেখা হয়েছিল?

না, রেণু সংক্ষেপে উত্তর দিলে। একটু থেমে বললে, কাল বিকালে নীরোদবাবুর বাড়ীর সেই চাকরটা আমায় দেখে ফেলেছিল। কোন কথা অবশ্য হয় নি, কারণ সে এ বাড়ীর দিকে আসতেই আমি দরজা বন্ধ করে দিয়ে ভেতরে চলে এসেছিলুম, কিন্তু সেই বোধ হয় ও বাড়ীতে কিছু বলে থাকবে, কারণ আজ সকাল থেকে আমি যতবারই জানলার কাছে এসেছি, ততবারই দেখেছি দিদিমণি হয় দরজায় না হয় জানলায় সব সময়ই এ বাড়ীর

দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ও, সমীর খেতে খেতেই ছোট্ট উত্তরটি দিলে।

আহারাদি শেষ করে সমীর উঠে নিজের ঘরে চলে গেল, রেণু রান্নাঘরে ভাতের থালা নিয়ে বসলো। ও বাড়ীতে থাকার সময় প্রায়শঃই দুপুরে সমীর ও গৌরী একসঙ্গে বারান্দায় খেতে বসতো, আর রেণু বসত রান্নাঘরে, কিন্তু একা হওয়ার পর রেণু কোনদিনই সমীরের সঙ্গে এক সময়ে খেত না। অনেক অনুনয় বিনয় করে সে সমীরের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছে সমীরের'পরে আহার করার। সমীরও বুঝে নিয়েছিল যে, রেণুর ধর্ম রেণুকে যে পথ দিয়ে নিয়ে যায়, সে পথের তিলমাত্র পরিবর্ত্তন করানোর ক্ষমতা সমীরের নেই, তা সমীর যত বড়ই হোক, এবং যত চেষ্টাই করুক।

আহারাদি শেষ করে রেণু এসে সমীরের ঘরে ঢুকলো। সদাশিবের বাড়ীর মতো এ বাড়ীতেও দুটো ঘর আছে। একটাতে সমীর থাকে, অপরটা রেণুকে দিয়েছে। রেণু প্রথমে খুবই আপত্তি করেছিল, বলেছিল যে এ ঘরটা পিসিমার জন্য স্বতন্ত্র রেখে সে রান্নাঘরে থাকবে, কিন্তু সে-কথা সমীর শোনে নি। দুটো ঘরেই দুখানা নেওয়ারের খাট আছে। দুটো খাটে একই রকমের বিছানা। রেণু প্রথমে আপত্তি করেছিল, সমীর বলে, বোন হয়ে থাকতে গেলে ভাইয়ের সঙ্গে সমানে থাক্‌তে হবে। খাট, টেবিল ও চেয়ার সমস্তই সরকারী সম্পত্তি, এ ছাড়া সমীর নতুন কিছুই কিনে উঠতে পারে নি, হয়ত বা কেনে নি। নতুনের মধ্যে রেণু এখন সমীরের সামনে মেঝের ধুলোর ওপোর বসার অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছে, চেয়ারেই বসে, কারণ তা না হলে সমীর ভয়ানক রাগ করে। উপস্থিত সমীর ধরেছে, বাড়ীতে চটী জুতো পরে থাকতে হবে, কারণ সে নিজে কখনও খালি পায়ে থাকে না, কিন্তু রেণু এখনও পর্য্যন্ত সমীরের এই আদেশ পালন করতে প্রস্তুত হয় নি।

নেওয়ারের খাটে কাৎ হয়ে শুয়ে সিগারেট শেষ করে ছাইদানের মধ্যে গুঁজে ফেলতে ফেলতেই রেণু আহার শেষ করে এ ঘরে এসে ঢুকলো। সমীর বললে, আয়, বোস।

চেয়ারখানা টেনে নিয়ে রেণু বললে, কবে যাবেন দাদা পিসিমাকে আনতে?

সমীর আর একটা সিগারেট ধরিয়ে একটু চিন্তিত-স্বরে বললে, টাকাটা ত আজ পাঠিয়ে দিলুম, এবার একটা চিঠি লিখে দেখি, পিসিমা কি বলে। একটু থেমে বললে, আসবে কি? কাশী ছেড়ে হয়ত আসতেই চাইবে না।

রেণু জেদ ধরে বললে, আপনি জোর করলে নিশ্চয়ই আসবেন, আমি বলছি, তিনি না এসে পারবেন না।

বালিশে মাথা দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে সমীর বললে, আচ্ছা রেণু, তিনি এলে কি আমরা আরো বেশী সুখে থাক্‌বো, না বেশী অশান্তিতে পড়বো? কি হবে বল্ দেখি?

রেণু বললে, অশান্তি কিসের দাদা। পৃথিবীতে তিনি ছাড়া আপনার বলতে আর কে আছে আমাদের, তিনি এলে অশান্তি?

পাশ ফিরে রেণুর দিকে মুখ করে শুয়ে সমীর বললে, অশান্তি অনেক, তুই এখন কিছুই বুঝছিস না রেণু। পিসিমা এলে তোর এত সুখ আর থাকবে না, তা জানিস ত?

সুখ আর কি, আমি রান্নাঘরে চলে যাবো, যেমন দাদাবাবুর বাড়ীতে থাকতুম।

টাকাকড়ির খরচ আর তোমার হাতে থাকবে না, সমীর উত্তর দিলে।

নাই বা রইলো। যার সংসার তিনি এসে সবটা হাতে তুলে নিলে আমারই ত ভালো।

অযত্ন করবেন, চাই কি তলে তলে তাড়াতেই চেষ্টা করবেন।

এবার রেণু হেসে ফেললে। বললে, দাদা তাতে আর আমার কি হবে? সে জন্য আমি কিছু মনে করি না। যিনি আপনাকে মানুষ করেছেন তিনি কাঁদবেন, দুঃখ করবেন, আর আমি আপনার সংসার আঁকড়ে আরাম করবো, এ আমি চাই না দাদা।

কিন্তু তোমার অযত্ন হলে যে আমার অশান্তি হয়, সেটা বোঝবার শক্তিও কি তোমার নেই? সমীর যেন একটু রাগতভাবে প্রশ্ন করে বসলো।

রেণু বললে, দাদা, এভাবে আর কতদিন চলবে। একলা এভাবে থাকলে যে বদনাম হবে।

সে ভয় আমি করি না, বদনাম ও হয়েইছে, না হয় আরও ভালো করেই হবে।

ঘাড় হেঁট করে নিজের হাতের আঙুলগুলি দেখতে দেখতে রেণু বললে, বেশীদিন একলা থাকা যে ভালো নয় দাদা, মানুষ ত। দিদিমা বলতো, মন না মতি, মনের নাম মস্ত হাতি।

ও, তাহলে তোমার মনেও ভয় হয়? সমীর রেণুর মুখের দিকে সতৃষ্ণভাবে চেয়ে রইলো?

একটু থেমে রেণু বললে, কবে যাচ্ছেন দাদা কাশীতে?

ঠিক নেই, আগে ছুটি পাই।

আচ্ছা দাদা, আজ থেকে আমি রান্নাঘরে শোবো? অনুমতি দেবেন?

কেন বল্ত, রান্না ঘরে শোয়ার জন্য তোর অত আগ্রহ কেন বল্ দেখি। রাত্রে নিরিবিলিতে হাঁড়ী খাওয়ার মৎলব আছে বুঝি?

নিরিবিলিতে আছে হাঁড়ী খেয়ে ফেলি সেই ভয়েই ত রান্নাঘরে যেতে চাইছি, বলেই রেণু লজ্জিত হয়ে ঘাড় হেঁট করে নিলে।

সিলিংএর দিকে চেয়ে সমীর বললে, যা খুসি।

এর পর কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রেণু ঘর থেকে উঠে গেল।

আঠারো

নতুন কোয়াটার্সে আসার পরের দ্বিতীয় রবিবার। বেলা সাড়টার সময় মিঃ বিয়ানী এবং মিঃ বেলভেলকার চা খাওয়ার জন্য সমীরের বাসায় এসে হাজির হোল। কর্ম্মচারীদের কোয়াটার্স দেওয়ার তত্ত্বাবধানে থাকতে থাকতে এটা একটা তাদের অবশ্য প্রাপ্য জিনিষ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা না হলে ঠিক সোরগোল করে নেমন্তন্ন করার মতো মনের অবস্থা সমীরের নয়।

বেলা পাঁচটা পর্যন্ত চা-পর্ব্ব চললো। তার পর ঘরের আসর শেষ করে ওরা দু'জনেই সমীরকে ধরে বসলো যে, ওদের একটু এগিয়ে দিতে হবে, কাজেই সমীরকে ওদের সঙ্গে এগিয়ে দিতে যেতে হোল, নইলে এ সময় সমীর বড় একটা পায়ে-হেঁটে এ পাড়ায় বেরুতো না।

রাস্তায় পড়ে খানিকটা যেতে-না-যেতেই একেবারে সামনা-সামনি হয়ে গেল সদাশিব ও নীরোদবাবুর সঙ্গে। ওরা দু'জনে যেন কোথা থেকে একসঙ্গে ফিরছিল।

নীরোদবাবুই প্রথমে কথা কইলেন, কি খবর সমীরবাবু, অনেকদিন পরে আবার দেখ্ছি যে! বলি আছেন কোথায়?

এর পর সদাশিব এবং নীরোদবাবু দুজনেই মিঃ বিয়ানী ও বেলভেলকারকে শুভসন্ধ্যা জ্ঞাপন করলেন, কারণ এ অঞ্চলের কোয়াটার্স বাড়ীতে যারা থাকেন তাদের সকলকেই মিঃ বিয়ানীদের মন রেখে চল্তে হয়।

মিঃ বিয়ানী প্রত্যভিবাদন করে বললে, সমীরবাবুকে আপনাদেরই প্রতিবেশী ক'রে দিয়েছি, সেজন্য আমাকে ধন্যবাদ দিন, কিন্তু সমীর হঠাৎ এত অস্বস্তি বোধ করতে লাগ্লো যে, বেলভেলকার খপ্ করে সমীরের হাতটা ধরে জিজ্ঞাসা করলে, ক্যা হুয়া মিঃ মুখার্জী? তখন সকলেরই নজর পড়লো সমীরের দিকে।

প্রকৃতিস্থ হয়ে সমীর বললে, কিছু নয়। সদাশিব সমীরের সঙ্গে কোন কথাই কইলে না, কেবল দু'একবার অপাঙ্গে তার দিকে দৃষ্টিপাত করলে মাত্র।

পাঁচজনেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সমীর প্রকৃতিস্থ হওয়ার পর মিঃ বিয়ানী সমীরের সঙ্গে করমর্দ্দন করে বললেন, আচ্ছা সমীরবাবু, আজ আর আপনাকে বেশী টান্বো না, আপনার শরীরটা তেমন ভাল নয় বলে মনে হচ্ছে এবং তারপর সমীর কোন কথা বলার পূর্ব্বেই ওরা সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এগিয়ে পড়লো এবং বেচারী সমীর উপায়ান্তর না পেয়ে সদাশিব ও নীরোদবাবুর সঙ্গে এক সঙ্গেই ফিরতে বাধ্য হোল।

দু'পা চলে নীরোদবাবু কেমন সন্দিগ্ধভাবে সদাশিব ও সমীরের দিকে দেখতে লাগলো; মুখে বললেন, ব্যাপার কি বলুন ত, আপনারা এভাবে চুপচাপ চলেছেন, কিছু বুঝতে পারছি না যে।

সদাশিব বললে, না চুপচাপ আর কি? সমীরের দিকে চেয়ে বললেন, তারপর সমীর, খবর কি?

শুষ্কমুখে সমীর বললে, চলছে একরকম।

সদাশিব স্বর নীচু করে বললে, তোমার সে ব্যাপারের কি হোল?

কোন ব্যাপার, সমীর ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলে। তার বুকের ভেতরটা ছাৎ করে উঠলো।

সদাশিব নীরব। কমিউনিষ্ট হওয়ার কথা সে নীরোদ বাবুর সামনে কেমন করে বলে!

নীরোদবাবু বললেন, আচ্ছা, আপনি কি আমাদের এই লাইনেই কোয়াটার্স পেয়েছেন।

জড়িতকণ্ঠে সমীর বললে, না, সামনের লাইনে।

সদাশিব সভয়ে প্রশ্ন করলে, কোথায়? কোন্ কোয়াটার্স?

ঐ যে সাম্‌নে, সমীর অনির্দ্দিষ্টভাবে মুখ ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিলে।

কতদিন এসেছেন, নীরোদ বাবু প্রশ্ন করলেন।

দিন পনর হবে; ফ্যাকাসেভাব সমীর উত্তর দিলে।

আশ্চর্য্য! আচ্ছা সমীর বাবু, আপনার কি হয়েছে বলুন তো? আপনি যেন কেমন বদ্‌লে গেছেন। পনর দিন হোল পাড়ায় এসেছেন, একবার দেখা নেই, কিছু নেই, এমন কি আপনার এতকালের বন্ধু শিববাবু পর্য্যন্ত জানেন না যে আপনি এখানে এসেছেন! ভাগ্যিস্ আজ হঠাৎ দেখা হোল, নইলে—

এতগুলো কথার উত্তরে সবাই নীরব। নীরোদ বাবু নিজেই আগ্রহ করে বল্লেন তবে চলুন, আপনার কোয়াটার্সটা ঘুরেই যাই। কোন্‌টা, কোন্ বাড়ীটা। চলুন শিববাবু, আজ সমীরবাবুর বাড়ীতেই চা খাওয়া যাক্।

সদাশিব ইতস্তত করে বল্লে, আজ আমার একটু কাজ ছিল—

কিসের কাজ? প্রৌঢ় নীরোদবরণ সদাশিবের হাত ধরে বল্লে, কি হয়েছে বলুন ত আপনাদের? দুই বন্ধুতে কোন ঝগ্‌ড়া-ঝাটি হয়েছে না কি? তবে চলুন আজই তার মীমাংসা হয়ে যাক্। মধ্যস্থতার ভার নিচ্ছি আমি।

না-না-ঝগড়া হবে কেন, ঝগড়া হবে কেন, সদাশিব ত্রস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি উত্তর দিতে লাগ্‌লে।

উপায়ন্তরহীন সমীর সদাশিব ও নীরোদবাবুকে নিয়ে নিজের বাসার সামনে এসে দরজায় ঘা দিলে। রেণু এ বাড়ীতে সব সময় ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করেই রাখে। সে ভেবেছিল সমীর দেরী করে ফিরবে, কিন্তু এখনই দরজায় আঘাত পেয়ে সন্দিগ্ধভাবে জানলা খুলে উঁকি দিয়ে দেখ্‌তে গিয়েই নীরোদবাবুর সঙ্গে একেবারে চোখাচুখি হয়ে গেল। সমীর দরজার বাইরে দরজায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তার পাশেই সদাশিব, আর জানলার ঠিক বাইরেটাতেই ছিলেন নীরোদবাবু। নীরোদবাবু রেণুর মুখের দিকে চেয়ে অবাক্ হয়ে গেলেন।

পরক্ষণেই দরজাটা ভেতর থেকে খুলে গেল, কিন্তু কোন লোক দেখা গেল না। অতি দ্রুতবেগে রেণু ভেতরের দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ওরা তিনজনেই ঘরে এসে ঢুকলো। মিঃ বিয়ানীদের উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলো তখনও টেবিলের ওপোরেই ছিল. রেণু বোধ হয় ভেবেছিল যে অন্য সব কাজ শেষ করে কাপড় কাচার পূর্ব্বে ঐ এঁটো বাসনগুলো সে নিয়ে যাবে, কারণ কি জাতের লোক ওরা কে জানে? কিন্তু এর মধ্যেই দাদা যে আবার অন্য লোক সঙ্গে নিয়ে ফিরে আস্‌বে, তা সে কল্পনাও করে নি। অথচ এখন ঐ চেনা লোকদের সাম্‌নে সে কি করে যায়! এদিকে দাদা কি যে মনে করবে, কে জানে! রেণু ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে একেবারে ঘেমে উঠলো। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করতে লাগলো, আর কখনও এরকম বাইরের ঘরে সে এঁটো ফেলে রাখবে না।

সমীর ঘরে ঢোকবার আগেই একবার সদাশিবের বাড়ীর দিকে দেখে নিয়েই চোখ ফিরিয়েছে। জানলা দিয়ে গৌরীর মুখ সে স্পষ্ট দেখেছে।

ঘরে ঢুকেই সমীর অবস্থাটা বুঝে নিজের সমস্ত জড়ত্ব একেবারে ঝেড়ে ফেলে দুখানা চেয়ার টেনে ওদের দিকে সরিয়ে দিয়ে বললে, বসুন, তারপর নিজেই চায়ের এঁটো বাসন ও প্লেটগুলো তুলে নিয়ে বাড়ীর ভেতরে ঢুকে গেল।

নীরোদবাবু সদাশিবের দিকে চেয়ে বললে, ব্যাপার কি বলুন ত, সমীরবাবু কি ফ্যামিলি এনেছেন নাকি? উনি ত ব্যাচিলর ছিলেন শুনেছি না?

সদাশিব অত কিছু ভাবে নি। সমীর যে কমিউনিষ্ট এবং পুলিশ যে তার পেছু নিয়েছে, সেই বিশ্বাসই সদাশিবের মনে এখনও প্রবলভাবে রয়ে গেছে। কমিউনিষ্টের ঘরে এসে সে বসেছে, সেই ভয়টাই তাকে তখনও পর্য্যন্ত পেয়ে রয়েছে। নীরোদবাবুর প্রশ্নের উত্তরে সে অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলে হ্যাঁ, ও ব্যাচিলর।

নীরোদবাবু ইতস্ততঃ করে বললেন, আচ্ছা শিববাবু,

আপনাদের সেই রেণুই কি এখন এ বাড়ীতে কাজ করেছে বুঝি ?

রেণু? না ত। রেণুর নামে সদাশিব একটু সজাগ হয়ে উঠলো, কারণ রেণুর ওপোর সদাশিবের প্রচণ্ড অভিযোগ। কিছুকাল হোল তাকে বাধ্য হয়ে একটা এদেশী ঠাকুর রাখতে হয়েছে, সেটা একেবারে অকেজো, তার খোরাক রাশীকৃত এবং মাহিনা বাইশ টাকা, অথচ সকাল বিকাল দরকারের সময় সে প্রায়ই থাকে অনুপস্থিত। এর ওপোর আবার ভয় আছে, পাছে চুরি করে।

নীরোদবাবু জোর করে বললেন, না ? আমি যে দেখলুম, আপনাদের সেই রেণুকে ? তবে চুলগুলো ঝম্‌ঝম্ করছে, বোধ হয় কেটেছে, কিন্তু একচোখ কাণা এবং মুখে বসন্তের দাগ বলে আমি নিশ্চিৎ চিনেছি, এ আপনাদেরই সেই রেণু।

গৌরীর প্রথম বলা কথাগুলো সদাশিবের মনে পড়ে গেল। এ-কথাও সে শুনেছিল বটে কিন্তু পরে সমীরের কমিউনিষ্ট হওয়ার কথায় সে সব জিনিষ চাপা পড়ে গিয়েছিল। সন্দিগ্ধভাবে সদা বললে, কি জানি!

এতক্ষণে সমীর ফিরে এলো। ঘরে ঢুকেই সিগারেট কেসটা নিরোদবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে ব'লে, ততক্ষণ ধুমপান করুন, আমি চা করতে বলে এসেছি।

নীরোদবাবু পকেট থেকে আধপোড়া বার্ম্মা চুরোট বার করে বললেন, না সমীরবাবু, ওসব ছোটখাটো জিনিষে আমার সানায় না, বরঞ্চ আপনার দেশলাইটা দিন, আমার বাক্সটা এই কিছুক্ষণ হোল শেষ হয়ে গেছে।

তাকে দেশলাই এগিয়ে দিয়ে সমীর বসলো খাটের ওপোর কারণ ঘরে দুখানা মাত্র চেয়ারই ছিল। সরকারী আসবাব বলতে দুখানা চেয়ার, একটা টেবিল ও দুটো নেওয়ারের খাট। এ ছাড়া সমীরের নিজস্ব অন্য কিছু এখনও কেনা হয় নি।

নীরোদবাবুই কথাটা তুললেন, বললেন, সমীরবাবু বিয়ে-থাওয়া করেছেন বুঝি ?

কই, না ত, সমীর উত্তর দিলে।

তা'হলে ফ্যামিলি কোয়ার্টার্স পেলেন ?

পেয়েছি, আমার এক সম্পর্কে ভগ্নি আছেন।

সমীরের মুখের দিকে চেয়ে সদাশিব প্রশ্ন করলে, ভগ্নি, কে ভগ্নি ?

সে আছে, তুই জানিস না। তারপর—একটু সহজ হয়ে সমীর বললে, বাস্তবিক, নতুন কোয়ার্টার্সে এসে অনেক ঝক্কি পোয়াতে এত ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয় যে, এত কাছে এসেও আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে পারি নি! রোজই মনে করি যে যাবো, কিন্তু—

সেটা ঠিক। নীরোদবাবু উত্তর দিলেন। বললেন, সংসারের ঝামেলা যে কত, তা আমাদের এই শিববাবু হাড়ে হাড়ে বুঝছেন, আবার স্ত্রী রুগ্‌ণ হলে আরও বিপদ, কি বলেন শিববাবু! বিপত্নীক নীরোদবাবু পুত্র ও পুত্রবধূর হাতে সংসারের সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে এখন বেশ একটু হাল্কা হয়ে বসে আছেন।

ওঃ, তা আর বলতে। সদাশিব ভেতরের আধ-ভেজানো দরজা দিয়ে বাড়ীর উঠানের দিকে দেখছিল; হঠাৎ বললে, আচ্ছা, এই কোয়ার্টার্সগুলো ঠিক আমাদেরই মত, নয় ?

হ্যাঁ, সমীর উত্তর দিলে। ঐ দুটো ঘর, একটা রান্নাঘর; রেণু ভেতরের বারান্দা দিয়ে এধার থেকে ওধারে চলে গেল। সমীর তার নিজের কথার রেশ ধরেই বললে, তফাতের মধ্যে এই যে, দুটো বেডরুমের মাঝখানে একটা দরজা আছে, যা তোদের ঐ কোয়ার্টার্সগুলোয় নেই।

সদাশিব উঠে দাঁড়িয়ে নীরোদবাবুকে বললে, নীরোদবাবুর যদি কিছু মনে না করেন, এক মিনিটের জন্যে সমীরের সঙ্গে একটা কথা বলবো।

হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন না, আমি বাইরে যাবো ?

না না, বাইরে কেন? আমরা এই পাশের ঘরে যাচ্ছি, বলেই অকস্মাৎ অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা দেখিয়ে সদাশিব সমীরকে নিয়ে দরজা ঠেলে পাশের ঘরে ঢুকলো। রেণু তখন ঘরের মধ্যে কি একটা নিতে এসেছিল, সদাশিবকে ঘরে ঢুকতে দেখেই সবেগে ঘর থেকে ওধারের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সদাশিব ঘরে ঢুকেই সমীরকে বললে, আচ্ছা সমীর রেণু কি তোমার কাছে রয়েছে ?

সমীর আম্‌তা আম্‌তা করে বললে, হ্যাঁ।

এ ঘরে কে থাকে ?

ওই থাকে, তখন সমীরের সাহস বেড়ে গেছে, মরিয়া হওয়ার সাহস।

নেওয়ারের খাটের ওপোর পরিষ্কার বিছানা, টান্ টান্ করে পাতা ফর্সা চাদর, আলনায় ঝুলছে ফর্সা কাপড়, টেবিলের ওপোর একটা মাঝারী গোছের আর্সি এবং অন্যান্য টুকিটাকী জিনিষ, ঘরটিতে লক্ষ্মীশ্রী এবং নারী হস্তচিহ্ন স্পষ্টভাবে বিদ্যমান।

এ বাড়ীতে আর কে আছে?

আর—আর, আমার পিসিমা আসবেন।

কাশী থেকে?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সদাশিব ও ঘর থেকে এ ঘরে এসে বললে, আপনি বসুন নীরোদবাবু, আমি একটু ব্যস্ত আছি, এখুনি যেতে হবে। বলতে বলতেই সদাশিব দরজার দিকে এগিয়েছে।

কেন কি হোল, চা-টা খেয়ে যান, নীরোদবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

না মশাই, আমার কাজ আছে। সদাশিব চৌকাঠে পা দিয়েছে। সমীর পেছনে পেছনে এসে অনুরোধ করতেই সদাশিব বললে, মাফ কর ভাই, ভ্রষ্টার ছোঁয়া জল আমি খাই না। নীরোদবাবু ঘরে বসে কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পেলেন। এ কথাটা সদাশিব যখন উচ্চারণ করলে, তখন সে বাইরের বারাণ্ডায় গিয়ে পৌঁছেছিল।

সদাশিবের কাছ থেকে সমীর তার জীবনে এই প্রথম রূঢ় বাক্য শুনলে। জীবনে এই প্রথমবারই সদাশিব সমীরকে প্রত্যাখ্যান করলে। সমীর স্তম্ভিত হয়ে গেল। সদাশিব এ বাড়ীর বারাণ্ডা থেকে নেমে একাই চলে গেল। নীরোদবাবু তখনও এই ঘরে বসে, উঠবেন কি বসবেন ঠিক করতে পারছিলেন না।

একটু পরেই মড়ার মত ফ্যাকাশে মুখ নিয়ে সমীর ঘরে ঢুকলো। নীরোদবাবু অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করলেন, কি হোল ওঁর, উনি যে হঠাৎ চলে গেলেন।

উনিই জানেন এ সংক্ষেপে উত্তর দিলে সমীর। তারপর হতাশ হয়ে সদাশিবের পরিত্যক্ত চেয়ারে সমীর বসে পড়লো।

নীরোদবাবু একটু থেমে বললেন, ব্যাপার কি বলুন ত সমীরবাবু, আপনারা এমন বন্ধু ছিলেন, হঠাৎ—

জানি না, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সমীর উত্তর দিলে।

বার্ম্মাটা ফের নিবে গিয়েছিল। টেবিল থেকে দেশলাইটা নিয়ে তাকে পুনরায় ধরিয়ে নীরোদবাবু বললেন, আচ্ছা সমীরবাবু, আজ তা হলে উঠি; কেমন?

আপনিও কি আমার বাড়ী চা খাবেন না, হতাশ-কণ্ঠে সমীর প্রশ্ন করলে।

না খাব না কেন, তবে আজ থাক, অন্য একদিন হবে'খন।

আচ্ছা, সমীরের মুখে আর কোন কথাই এলো না। নীরোদবাবু আস্তে আস্তে দেরী করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বোধ হয় আর একবার অনুরোধ করলেই তিনি বসতে পারতেন, কিন্তু সমীর হতাশ হয়ে নীরবেই রয়ে গেল।

একটু পরে নিজের দুই হাঁটুতে দুই হাতের চাপড় দিয়ে সমীর সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো, বাইরের দরজাটা বন্ধ করে ভেতরের দরজাটা দিয়ে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে দেখে রেণু উবু হয়ে বসে ফুলে ফুলে কাঁদছে। রান্না ঘরের মধ্যে প্লাষ্টিকের প্লেটের ওপোর সাজানো কেক্ বিস্কুট বেড়ালে খাচ্ছিল। সমীরকে দেখেই বিড়ালটা ছুটে পালিয়ে গেল। টিপটের চা তখনও ছাঁকা হয় নি।

রেণু, সমীর সস্নেহে ডাক দিলে।

রেণু মুখ তুললে, অশ্রুভারাক্রান্ত সেই মুখ।

কাঁদছিস কেন?

দাদাবাবু চলে গেলেন। আমার ছোঁয়া চা খাবেন না।

তুই শুনেছিস নাকি?

হ্যাঁ।

যাক রেণু, তুই আর দুঃখু করিস নি। নতুন রাস্তায় হাঁটতে গেলে অনেক রকম ঠোক্কর খেতে হয় তা ত জানিস্। ভগবানের কাছে ত আমরা নিরপরাধ।

রেণু উঠে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে বললে, শুধু ভগবান নিয়ে কি দিন কাটে দাদা, সমাজের চোখেও ত নিরপরাধ থাকতে হয়, নইলে—

কি করবো বল রেণু, মানুষ মানুষ, তাই তারা পরকে সন্দেহ করে। তারা যদি সবাই রেণু হত, তা'হলে—

অনুনয়ের স্বরে রেণু বললে, দাদা, আপনি আজই পিসিমাকে আনার ব্যবস্থা করুন, নইলে এ ভাবে আর পারি না। চার পাশেই বাঙ্গালীরা সব রয়েছেন, আমি যে মুখ দেখাতে পারি না।

আর পিসিমা এলে?

তখন যা হয় হবে, এই অপমানের হাত থেকে ত রেহাই পাবো।

আচ্ছা। ভাবতে ভাবতে সমীর নিজের ঘরে এসে ঢুকলো। একটু বসেই ডাক দিলে, রেণু।

যাই দাদা, বাইরে থেকে উত্তর দিয়েই রেণু এসে ঘরে ঢুকলো।

সমীর বললে, দেখ না, চা-টা কি একেবারেই অখাদ্য হয়ে গেল?

দেখছি, রেণু আবার ভেতরে চলে গেল?

[ক্রমশঃ

———

বিশ্বভাষা পরিক্রমা

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

১৯৪৭ সালের ১৩ই আগস্ট পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীনে অর্থাৎ দিল্লি সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল আসাম, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, মধ্য প্রদেশ ও বেরার, সংযুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—এই ১১টি গভর্ণরশাসিত প্রদেশ যারা বর্তমান অঙ্গরাজ্য গুলির পূর্বপুরুষ ; দিল্লি, আজমির ও মাড়োয়ার, কুর্গ, আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ, বালুচিস্তান এবং পন্থ পিপ্‌লোডা—এই ৬টি চিফ কমিশনারশাসিত প্রদেশ যারা বর্তমান কেন্দ্রশাসিত রাজ্যগুলির পূর্বপুরুষ ; বহু উপজাতি এলাকা, সংরক্ষিত এলাকা আংশিক ও পূর্ণ শাসনবহির্ভূত এলাকা যেগুলি গভর্নর-জেনারেল ও তাঁর প্রতিনিধি বা অধস্তন কর্মচারীরূপে গভর্নরসমূহের দ্বারা শাসিত ছিল ; প্রায় ৬০০ দেশীয় করদ ও মিত্র রাজ্য।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসনবিধিতে এই বিপুলসংখ্যক শাসনতান্ত্রিক বিভাগগুলিকে একটা সুসংবদ্ধ রূপ দেবার যে-চেষ্টা করা হয়েছিল, তা সফল হল না ক্রিপ্‌স্‌, ওয়েভেল এবং মন্ত্রীত্রয়ের সব চেষ্টা সত্ত্বেও। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট এই ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্য থেকে পূর্ববঙ্গ, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ—এই ৪টি গভর্নরশাসিত প্রদেশ, চিফ্‌ কমিশনারশাসিত ব্রিটিশ বালুচিস্তান প্রদেশ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশসংলগ্ন যাবতীয় উপজাতি এলাকা বিচ্ছিন্ন হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হল। পরে পাকিস্তান-সংলগ্ন দেশীয় রাজ্যগুলি পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গেল মুসলিমগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে। একমাত্র কাশ্মীর এর ব্যতিক্রম হয়ে রইল।

নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্র ভৌগোলিক দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ড ও আলাস্কার মতো সংযোগ বিহীন হয়ে রইল। পূর্ববঙ্গ পূর্ব পাকিস্তান এবং অন্য সব এলাকা একত্র পশ্চিম পাকিস্তান নামে পরিচিত হল। পশ্চিম পাকিস্তানে বালুচিস্তান গভর্নরশাসিত প্রদেশের মর্যাদা পেল। প্রথমে পশ্চিম পাকিস্তান সিন্ধু, পশ্চিম পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ এবং বালুচিস্তান—এই চারটি প্রদেশ নিয়ে গঠিত হয় এবং সংলগ্ন মুসলিমগরিষ্ঠ দেশীয় রাজ্যগুলি পরে এই সব প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। কাশ্মীর রাজ্যের এক তৃতীয়াংশেরও বেশি এলাকা যখন "আজাদ কাশ্মীর" নামে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হল, তখন তার বারো লক্ষ অধিবাসীকে নিয়ে প্রথমে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করা হয়। কিন্তু পাকিস্তানে মুসলিম লিগের পতনের পর সেখানে প্রশাসনিক বিভাগের দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হল। মুসলিম লিগ যে একটি অন্তঃসারশূন্য প্রতিষ্ঠান, তা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সহজে প্রমাণিত হল। ভারতের মুসলমানদের কাছে মুসলিম লিগের যে-মূল্যই থাক, পাকিস্তানে তার অস্তিত্ব লুপ্তপ্রায় হল। নির্বাচনে জয়লাভের উদ্দেশ্যে সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানকে একটিমাত্র উর্দুভাষী প্রদেশে পরিণত করা সত্ত্বেও আবদুল গফুর খানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডক্টর খান সাহেবের নেতৃত্বে রিপাবলিকান দল পশ্চিম পাকিস্তানে মুসলিম লিগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। পূর্ব পাকিস্তানেও হক-সুরাবর্দি-ভাসানির মিলিত প্রয়াসে মুসলিম লিগ বিধ্বস্ত হয়। এর পর পাকিস্তানে গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করা হয় এক দিকে ফজলুল হক প্রভৃতিকে কারারুদ্ধ ক'রে, অন্য দিকে খান সাহেবকে ছুরিকাঘাতে হত্যা ক'রে।

আয়ুব খানের নেতৃত্বে সামরিক একনায়কতার ছায়া পাকিস্তানের প্রকৃত ধারক ও বাহক পশ্চিম পাঞ্জাবিরা কার্যত উর্দুভাষী সাম্রাজ্যিক বা ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা চালিয়ে যাচ্ছে। উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও দ্বিতীয় রাষ্ট্র-ভাষারূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হলেও কার্যত পাকিস্তান

রাষ্ট্রে উর্দু ভাষার মর্যাদা বেশ কিছু বেশি। পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রাদেশিক সত্তা লুপ্ত ক'রে দেওয়ার উদ্দেশ্য সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানকে একটি একভাষী অর্থাৎ কেবল উর্দুভাষী রাষ্ট্রে পরিণত করা। পশ্চিম পাকিস্তানে পাঞ্জাবি মুসলমানরা বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ; সিন্ধি, পাঠান, বালুচ ও কাশ্মীরিরা একত্র সংখ্যায় তাদের প্রায় অর্ধেক; তার ওপর উর্দুভাষী পাঞ্জাবিদের সঙ্গে ভারত থেকে আগত উর্দুভাষী উদ্বাস্তরা যোগ দেওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দুভাষার চাপে পশ্‌তো, বালুচ, সিন্ধি আর কাশ্মীরি ভাষাচারটি শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় মৃতপ্রায়।

উর্দু সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্ত হতে হলে পাকিস্তানের ভিন্নভাষীদের স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু এই মুক্তিলাভ আয়াস সাধ্য। পশ্চিম পাঞ্জাবের সামরিক জাতির কবল থেকে নিষ্কৃতি লাভ মাত্র বাইরের চাপে বা সামরিক উপায়ে এবং সামরিক কারণে সম্ভবপর হতে পারে। পূর্ববঙ্গ, পাঠানিস্তান, বালুচিস্তান, সিন্ধু এবং তথাকথিত আজাদ কাশ্মীর যখন ভাষার ভিত্তিতে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, তখন পাকিস্তানের যে-অংশ বাকি থাকবে তা হল সিন্ধু নদের পূর্বতীরবর্তী হিন্দকি বা লানঢা বা পশ্চিম পাঞ্জাবি ভাষাভাষী এলাকা; এই এলাকা ভবিষ্যতেও "পাকিস্তান" নামে গণ্য হতে পারে। কারণ, পাকিস্তান আসলে উর্দুস্তান। এ-অঞ্চলের লোকেরা ঘরে পশ্চিম পাঞ্জাবি উপভাষাগুলি ব্যবহার করলেও সাহিত্যে ও দরবারি কাজে উর্দু ব্যবহার করে। এখানকার লোকেরাই পাকিস্তানি ভাবাদর্শের কেন্দ্রস্থ শক্তি। এরা ভাষায় ভারতীয়-আর্য গোষ্ঠীর লোক হলেও এদের শোণিতে তুর্কজাতীয় উপাদান খুব বেশি থাকায় এরা উৎকট ভারতবিদ্বেষী; শুধু হিন্দু নয়, ভারতীয় সংস্কৃতির সকল অঙ্গের প্রতিই এরা বিদ্বিষ্ট। বহুকাল আগে পিয়ের লোতি বলেছিলেন: যেদিন ইংরেজ শাসন শেষ হবে, সেদিনই এরা হিন্দুদের ধ্বংসসাধনে প্রবৃত্ত হবে। এখানে তুর্ক-ইরানীয় মিশ্র শোণিত বিশিষ্ট উর্দুভাষীদের নিয়ে একটি ক্ষুদ্র পাকিস্তান রাষ্ট্র দীর্ঘকাল থাকার সম্ভাবনা আছে।

পূর্ব বঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তান বা "বাঙ্গালীস্থান" প্রথমে বিচ্ছিন্ন হবে। তার কারণ, এক ধর্ম ছাড়া পূর্ববঙ্গের সঙ্গে অবশিষ্ট পাকিস্তানের কোন বিষয়ে মিল নেই। কেবল পাঞ্জাবি সৈন্যদের গায়ের জোরে পূর্ব বঙ্গ এখনও পাকিস্তানে আছে।

পাঠানদের মুক্তি-আন্দোলনের প্রধান সমর্থক আফগানিস্তান। স্বাধীন পাঠানিস্তান দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের দেহ-ব্যবচ্ছেদ সুরু হবে। পাঠানদের বেশির ভাগ লোক আফগানিস্তানে বাস করে। ডুরাণ্ড সীমারেখার পূর্বদিকে অবস্থিত পাকিস্তানের পাঠান এলাকায় ওপর লোভ থাকলেও আফগানদের ক্ষমতা নেই যে, যুদ্ধে পশ্চিম পাঞ্জাবিদের হারিয়ে পাঠানদের মুক্ত করে। তবে পাঠান ও বালুচরাও ভালো যোদ্ধা; সুতরাং সামরিক প্রয়োজনে তাদের খুশি করবার উদ্দেশ্যে এক সময়ে স্বাধীন পাঠানিস্তান ও বালুচ রাষ্ট্র গ'ড়ে উঠবে; তখন আফগানিস্তানের সঙ্গে বালুচিস্তানের সীমানা এমনভাবে সংশোধিত হবে যাতে অখণ্ড পাঠান ও বালুচ রাষ্ট্রদুটি গ'ড়ে উঠবে।

ইরান এখন পাকিস্তানের মিত্র রাজ্য; বালুচদের স্বাধীনতালাভের আন্দোলনে ইচ্ছা থাকলেও তার সাহায্য করার উপায় নেই।

সিন্ধি বণিকরা অর্থশালী এবং করাচি বন্দরের গুরুত্ব অপরিসীম। স্বাধীন সিন্ধু বা সিন্ধ্ রাষ্ট্র গঠন নিয়ে সিন্ধি বণিক ও পাঞ্জাবি সৈনিকের মধ্যে দীর্ঘ কাল সংঘাত চলবে তবু শেষ পর্যন্ত সিন্ধুও স্বাধীন হবে। পাকিস্তান বিশ্লিষ্ট হলে আজাদ কাশ্মীরের কাশ্মীরিভাষী এলাকা অবশিষ্ট কাশ্মীরের সঙ্গে যুক্ত হবে।

খণ্ডিত হিন্দুগরিষ্ঠ ভারত বা হিন্দুস্থান বা হিন্দিস্থান বাদে ভৌগোলিক ভারতবর্ষে বর্তমানের সাতটি রাষ্ট্রের পরিবর্তে পাকিস্তান বিকেন্দ্রীকৃত হলে এগারোটি রাষ্ট্র গ'ড়ে উঠবে। নেপালের নেওয়ারিভাষীরা দূর ভবিষ্যতে নেওয়ারি রাষ্ট্র গঠন করলে ঐ সংখ্যা বারো-য় দাঁড়াবে। সিংহলের উত্তরাংশ তামিলভাষী; এই এলাকা নিয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন খুব প্রবল; ভবিষ্যতে উত্তর সিংহল তামিলনাড়ুর সঙ্গে যুক্ত হবে। সুতরাং ভারত বাদে অবশিষ্ট ভৌগোলিক ভারতবর্ষে ভাষার ভিত্তিতে এই ১২টি রাষ্ট্র দেখা যেতে পারে:—

(১) আফগানিস্তান (২) পাঠানিস্তান (৩) বালুচিস্তান (৪) সিন্ধু (৫) পাকিস্তান (৬) নেপাল (৭) নেওয়ারি

রাষ্ট্র (৮) সিকিম (৯) ভুটান (১০) পূর্ববঙ্গ বা বাঙালিস্থান (১১) সিংহল (১২) মাল দ্বীপপুঞ্জ।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট অবশিষ্ট ব্রিটিশ ভারত পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাঞ্জাব সমেত ৯টি গভর্নরশাসিত ও ৫টি চিফ্‌ কমিশনার শাসিত প্রদেশ নিয়ে ভৌগোলিক ভারতের খণ্ডাংশ হলেও "ভারত" নামে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে পুনর্গঠিত হল। সমস্ত অ-মুসলিমগরিষ্ঠ করদ রাজ্য একে একে "ভারত" রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হল। হায়দ্রাবাদ, জুনাগড় প্রভৃতি দু একটি রাজ্য সামান্য বাধা দিলেও ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে করদ রাজ্যগুলি সবই ভারতের অন্তর্ভুক্ত হল। সমস্যার সৃষ্টি হল কাশ্মীরকে নিয়ে। এখন বিশুদ্ধ ভাষাগত দিক দিয়ে যুক্তি সঙ্গত পন্থায় কাশ্মীর সমস্যাটি আলোচ্য।

ভারতের মুসলিমগরিষ্ঠ এলাকার লোকেরা যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন করতে চাইল, তখন কোন গণতান্ত্রিক নীতি অনুসারে তাদের বাধা দেওয়া যায় না ব'লে নেহরু এবং কংগ্রেস যে গণতান্ত্রিক নীতি অনুসারে পাকিস্তান গঠন মেনে নিয়েছিলেন, সেই নীতি অনুসারে ভারতের যে কোন অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হতে চাইলে তাতে গণতান্ত্রিক দিক দিয়ে বাধা দেবার অধিকার বর্তমান নেতাদের নেই। ভারতবর্ষ বিভাগ শুধু ইংরেজ বা জিন্নার ইচ্ছায় হয় নি, নেহরুর সম্মতিক্রমেই হয়েছিল, একথা আমরা যেন ভুলে না যাই।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে যে গণভোট নেওয়া হয়, তাতে দেখা যায় পাঠানরা স্বাধীন পাঠানিস্তান পছন্দ করলেও তারা অন্তত দিল্লী থেকে শাসিত ভারতের অন্তর্ভুক্তি চায় নি। সুতরাং তারা স্বাধীন হোক বা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হোক, তা নিয়ে "ভারত" রাষ্ট্রের চিন্তার কারণ নেই, এই ছিল জওহরলালেরও অভিমত। সুতরাং সীমান্ত গান্ধির মতো জনপ্রিয় নেতার দেশকেও তিনি বিনা বাধায় পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে দিয়েছিলেন। একই পন্থায় সামাদ খানের বালুচিস্থানকেও পাকিস্তানে যেতে দেওয়া হয় একই কারণে। পাঠানভূমি বা বালুচভূমি স্বাধীনতা চায় কি না, সে-প্রশ্ন নিয়ে নেহরু মাথা ঘামান নি। তিনি শুধু দেখতে চেয়েছিলেন, পাঠান ও বালুচরা ভারত অথবা পাকিস্তান—কার অন্তর্ভুক্ত হতে চায়। সীমান্ত প্রদেশের খোদাই খিদমদগার দল স্বাধীন পাঠানিস্তান চেয়েছিল, অখণ্ড ভারতের অন্তর্গত থাকতে চায়নি। বালুচ গান্ধিসামাদ খানও স্বাধীন বালুচিস্তান চেয়েছিলেন, ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে থাকতে চান নি। সুতরাং নেহরু বুঝেছিলেন—এবং ঠিকই বুঝেছিলেন—পাঠান ও বালুচরা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র না পেলে সন্তুষ্ট হবে না। অতএব তিনি পাঠান ও বালুচদের সঙ্গে মনোমালিন্যের দায়িত্বটা পাকিস্তানের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাঁর কূটনীতিজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে সীমান্ত প্রদেশ যদি ভারতের অন্তর্ভুক্ত থাকত, তা হলে আজ বাদশা খানকে দেখা যেত স্বাধীন পাঠানভূমির জন্যে ভারতের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে। তার পরিবর্তে তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত। অবশ্য সীমান্ত প্রদেশ যদি তখনই পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করত, তা হলে ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের পক্ষেই আরো ভালো হত। কংগ্রেস সেই প্রশ্নেই গণভোট নিতে চেয়েছিল; কিন্তু ইংরেজরা পাকিস্তান দুর্বল হয়ে পড়ার ভয়ে সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হওয়া অথবা স্বাধীন পাঠানিস্তান গঠন করা, এই প্রশ্নে গণভোট গ্রহণে সম্মত হয় নি। তার প্রতিবাদে সীমান্ত কংগ্রেস বা আবদুল গফুর খানের খোদাই খিদমদগার দল গণভোট বয়কট করে। ফলে সীমান্ত প্রদেশ ভারত বা হিন্দুস্তান এবং পাকিস্তান—কার অন্তর্ভুক্ত হতে চায়, এই অসঙ্গত প্রশ্নে গণভোট গৃহীত হলে শতকরা ৫০° ৪৯´ জন পাকিস্তানের পক্ষে রায় দেয়।

সীমান্ত প্রদেশের ঐ গণভোটের ব্যাপারে এই সত্যটা প্রমাণিত হল যে, পাঠানরা প্রথমতঃ চায় স্বাধীন পাঠানিস্তান; তা না পেলে ধর্মান্ধ নিরক্ষরপ্রায় পাঠান মুসলমানদের কাছে এটা আশা করা অসঙ্গত যে, তারা সেই ভয়ানক সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার দিনগুলিতে পাকিস্তানের পরিবর্তে হিন্দুস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে চাইবে।

একই গণভোট গ্রহণের নীতি কাশ্মীরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত। এ-সম্বন্ধে শ্রীরাজাগোপালাচারীর অভিমত সব চেয়ে যুক্তি সঙ্গত। কাশ্মীরের মহারাজা কাশ্মীরের ভারতভুক্তিতে বিলম্বে সম্মতি দিয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর

সম্মতির কোন মূল্য নেই। তাঁর মতের মূল্য স্বীকৃত হলে একই যুক্তিতে হায়দ্রাবাদকে স্বাধীনতা দিতে হয়, জুনাগড় প্রভৃতি কয়েকটা রাজ্যকে পাকিস্তানভুক্ত করতে হয়। গণতন্ত্রে জনমতের মূল্য সর্বাধিক ; সে-দিক থেকে হায়দ্রাবাদ, জুনাগড় প্রভৃতি ভারতের অন্তর্ভুক্ত সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এ-দিক থেকে কাশ্মীর সমস্যার মীমাংসা বাঞ্ছনীয়।

ব্যক্তিবিশেষের অভিমতকেও গণতন্ত্রে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া চলে না, সে-ব্যক্তি যত প্রভাবশালীই হোন। সুতরাং কাশ্মীরের ন্যাশন্যাল কনফারেন্সের নেতা যখন ভারতে যেতে চান, তখন সমগ্র কাশ্মীরবাসী তাই চায়, এ ধারণা যে কত বড় ভুল, শেখ আবদুল্লা ও গোলাম বক্সি মহম্মদের ক্ষেত্রে তা পর পর দু বার দেখা গেছে। কাশ্মীরের ভারতে যোগদানের ব্যাপারে যে-শেখ সাহেবকে প্রথমে কাশ্মীরের প্রকৃত প্রতিনিধি ব'লে ভারত সরকার ধরতেন, আজ তাঁর গুরুত্ব স্বীকার করলে কাশ্মীর-প্রশ্নে ভারতের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মুখ দেখানো চলে না। শেখ আবদুল্লার পর যে গোলাম সাহেবকে ভারত কাশ্মীরের নেতা ব'লে ঘোষণা করল, পরে তাঁকেও অপসারিত করতে হল। সুতরাং কাশ্মীরের জনমত নির্ধারণের শ্রেষ্ঠ উপায় হল কাশ্মীর স্বাধীনতা চায়, না পাকিস্তানে যেতে চায়, না ভারতে থাকতে চায়—এই ত্রিমুখ প্রশ্নে গণভোট গ্রহণ। কাশ্মীর ভারত বা পাকিস্তান, কার অন্তর্ভুক্ত হতে চায়, এই দ্বিমুখ প্রশ্নে গণভোট গ্রহণ ভারতের পক্ষে ঠিক সীমান্ত প্রদেশের মতোই হতাশব্যঞ্জক হতে বাধ্য, এ-কথা সব বাস্তববাদীই স্বীকার করেন। মুখে না মানলেও ভারত সরকারও মনে মনে তা বোঝেন ব'লেই আজ পর্যন্ত ভারত কাশ্মীরে দ্বিমুখ প্রশ্নে গণভোট গ্রহণে সম্মত হয় হয় নি। ত্রিমুখ প্রশ্নের প্রস্তাব এক রাজাগোপাল ছাড়া আর কোন ভারতীয় নেতা তোলেন নি।

ইংরেজরা ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগের আগে নিজেদের তত্ত্বাবধানে সীমান্ত প্রদেশে যেভাবে গণভোট নেবার ব্যবস্থা করেছিল, কাশ্মীরে তেমন করার সুযোগ পায় নি। সমগ্র কাশ্মীরে ভোট নেবার ব্যবস্থা করার সুযোগ ভারত সরকারও কখনও পান নি। কারণ, ১৯৪৭ সালের আয়ত্তে আসে নি। ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে যখন কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হল, তখনই তার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পাকিস্তানের হানাদারদের দখলে চ'লে গিয়েছিল। ১৯৪৯ সালের ১লা জানুআরি থেকে যুদ্ধবিরতি-চুক্তি সীমারেখারূপে কাশ্মীরের যে বিভাগ হয়, তদনুযায়ী কাশ্মীরের প্রায় ত্রিশ হাজার বর্গমাইল এলাকা পাকিস্তানের আয়ত্তে চলে যায়। গত বিশ বছর এই অবস্থা বজায় আছে এবং এই বিভাগ প্রায় স্থায়ী হতে চলেছে। বিনা যুদ্ধে ভারত কখনও এই এলাকা উদ্ধার করতে পারবে না।

কাশ্মীরের ভারতভুক্তি কিসের জোরে সাব্যস্ত হচ্ছে, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজলে বুঝতে দেরি হয় না কেন কাশ্মীর প্রশ্নে প্রায় সমস্ত বহির্বিশ্ব ভারতের প্রতি বিরক্ত এবং পাকিস্তানের প্রতি অনুকূল। ভারত কোন্ অধিকারে কাশ্মীর দখল ক'রে শাসন করছে, সে-প্রশ্নের উত্তরে ভারতের বক্তব্য, কাশ্মীরের জনমত তার অনুকূলে। কিন্তু তার কোন প্রমাণ কখনও গণভোটের দ্বারা গৃহীত হয় নি। এর উত্তরে ভারতের বক্তব্য, কাশ্মীরের পঞ্চবার্ষিক নির্বাচনই তার প্রমাণ! এমন অসঙ্গত সিদ্ধান্ত বহির্জগৎ যদি ঘৃণার সঙ্গে উপেক্ষা করে, তা হলে আমাদের রাগ করা সাজে না। কারণ, কাশ্মীরে কখনও এই প্রশ্নে নির্বাচন হয় না যে, কাশ্মীর কোন রাষ্ট্রে যোগ দিতে চায় ; কোন্ নির্বাচন কেন্দ্র থেকে কোন্ প্রার্থী বিধান সভায় যাবে, মাত্র সেটা ঐ পঞ্চবার্ষিক নির্বাচনে স্থির হয়।

১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে যখন কাশ্মীর ভারতে যোগ দেয়, তখন কাশ্মীরের প্রধান রাজনৈতিক দল ন্যাশন্যাল কনফারেন্স ও তার নেতা শেখ আবদুল্লার তাতে পূর্ণ সমর্থন ছিল ; কিন্তু পরে আর সে-কথা বলার উপায় নেই ; শেখ আবদুল্লার কখনও বিচার হয় নি ; সুতরাং বিনা বিচারে বিনা প্রমাণে তাঁকে দেশদ্রোহী বলাও ব্যক্তিগত কুৎসা রটনা মাত্র। ভারত সরকার যে দীর্ঘ পনেরো বছরের মধ্যে ১৯৫৩-৬৮ সালে একবারও প্রকাশ্যে তাঁর বিচার না ক'রে মাঝে মাঝে তাঁকে আটক রেখে আবার ছেড়ে দিয়েছেন, এর জন্যেও বহির্জগতে ভারতের

যদি শেখ আবদুল্লা কাশ্মীরের ভারতভুক্তি এখনও সমর্থন করেন, তা হলেও গণভোটের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। আবদুল গফুর খান সীমান্ত গান্ধি বা বাদশা খান নামে পাঠানমুল্লুকের অবিসংবাদী নেতা এবং কংগ্রেসের সর্বজনমান্য নেতাও বটেন। মাত্র এই কারণে বিনা গণভোটে ভারত সীমান্ত প্রদেশ অধিকার করতে পারে কি? বস্তুত সীমান্ত প্রদেশের ক্ষেত্রে গণভোটের জোরে যখন ঐ এলাকা গফুরখানের ব্যক্তিগত মতামত উপেক্ষা ক'রে পাকিস্তানকে দেওয়া হয়েছে এবং সেই সর্তেই নেহরু ও প্যাটেল ভারত বিভাগ মেনে নিয়েছিলেন, তখন কাশ্মীরের ক্ষেত্রে সদা-চঞ্চল শেখ সাহেবের মতামত গ্রহণ না ক'রে আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে গণভোট গ্রহণ ক'রে সমস্যাটির চূড়ান্ত মীমাংসা কর্তব্য।

যখন সমগ্র কাশ্মীরে গণভোট নেওয়া ভারত সরকারের পক্ষে সম্ভবপর নয়, তখন শ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে সমস্ত কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করা। যুদ্ধবিরতিরেখার দুই দিকে পাকিস্তান ও ভারতের কর্তৃত্ব যথাযথভাবে বজায় রেখে এই গণভোট গৃহীত হতে পারে। তার জন্যে পাকিস্তানের "আজাদ কাশ্মীর" ছেড়ে চলে যাবার দরকার নেই। গণভোট যদি নিরপেক্ষভাবে সততার সঙ্গে গৃহীত হয়, তা হলে ভারতের দিক থেকে আপত্তির কোন কারণ নেই। কিন্তু ভারত গত বিশ বছর যাবৎ কখনও গণভোটে সম্মতি না দিয়ে সমগ্র আন্তর্জাতিক মহলের বিস্ময় ও বিরক্তি অর্জন করেছে। একমাত্র রুশিয়ার ভারতকে সমর্থনও ভারতের প্রতিকূলে বিশ্বজনমত সৃষ্টিতে সাহায্য করছে।

এখন পর্যন্ত এ-প্রসঙ্গে ভারত সরকারের শেষ কথা এই যে; গণভোট গ্রহণ তাঁরা করতে দেবেন, কিন্তু আগে পাকিস্তানকে অধিকৃত কাশ্মীর ছেড়ে দিতে হবে। হানাদার রাষ্ট্রের সঙ্গে সম-অধিকারের ভিত্তিতে গণভোট গ্রহণের প্রস্তাবে তাঁরা অসম্মত। অথচ ঐ হানাদার রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধবিরতিচুক্তি সম্পাদন করতে এবং নানা রকম সুখ-সুবিধা দিয়ে কূটনৈতিক সম্পর্ক অব্যাহত রাখতে তাঁদের কোন আপত্তি নেই। আমরা বিশ্বকে আমাদের সম্বন্ধে যা ভাবাতে চাই তা যদি বিশ্ব না ভাবে তাহলে বিশ্বের প্রত্যাশার অনুরূপভাবে আমাদের গ'ড়ে উঠতে হবে অথবা বিশ্বের বিরাগভাজন হয়ে একঘরে থাকতে হবে। এই কারণেই ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত সংঘর্ষের সময়ে ভারতের কোন প্রকৃত বন্ধু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেখা যায় নি।

বিশুদ্ধ ভাষাগত বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে অখণ্ড কাশ্মীর একটি বহুভাষী রাষ্ট্ররূপে বিদ্যমান; কাশ্মীরি, ডোগরি, পশ্চিম পাঞ্জাবি, পশ্‌তো বোড়ো ভাষাসমূহ এবং কাশ্মীরি ছাড়া আরো কয়েকটি স্বগোত্রীয় ভাষা, যেগুলিকে গ্রিয়ার্সন ও সুনীতিকুমার দরদ-আর্য বা দার্দিক ভাষাসমূহ ব'লে উল্লেখ করেছেন, অজ্ঞাতমূল বুরুশাস্কি ভাষা—এতগুলি ভাষা কাশ্মীরের প্রচলিত; তা ছাড়া, সমস্ত রাজ্যটাই কাশ্মীর নয়, প্রকৃতপক্ষে রাজ্যটির নাম কাশ্মীর ও জম্মু; "জম্মু" শব্দটি জম্বু বা জম্বুদ্বীপ শব্দ থেকে এসেছে; কাশ্মীর ও জম্মুর অধিবাসীরা কোন দিক দিয়েই এক জাতি ব'লে গণ্য হতে পারে না; ধর্ম, ভাষা, নৃতাত্ত্বিক উৎপত্তি, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গ—সব ব্যাপারেই ঐ এলাকার লোকেরা একে অপর থেকে পৃথক্। ডোগরাবংশীয় রাজপুত বীর গোলাব সিংহের বাহুবলে এই বৃহৎ রাজ্যটি গ'ড়ে উঠেছিল।

হায়দ্রাবাদ যেমন একভাষী রাজ্য ছিল না, কাশ্মীরও তেমনি; কিন্তু ভারতের ভাষাভিত্তিক পুনর্বিন্যাসে হায়দ্রাবাদ রাজ্যটি লুপ্ত হয়েছে, কাশ্মীরের তেমন হবার কথা নয়। অ-কাশ্মীরিভাষী সমস্ত এলাকা বিচ্ছিন্ন ক'রে নিলেও একটি ক্ষুদ্রায়তন এলাকা শ্রীনগরকে রাজধানীরূপে নিয়ে তার চারপাশে কাশ্মীরিভাষী রাষ্ট্ররূপে গ'ড়ে উঠবে। এটিই প্রকৃত কাশ্মীর। অবশিষ্ট এলাকাকে "কাশ্মীর" আখ্যা দেওয়া ঠিক নয়। এই প্রকৃত কাশ্মীর হল একটি উপত্যকা অঞ্চল—একে কাশ্মীর ও জম্মু নামক বৃহৎকায় রাজ্যটির অন্তর্গত কাশ্মীর উপত্যকা প্রদেশ বলা হয়। জম্মু আর একটি প্রদেশ—এখানে ডোগরি ভাষা প্রচলিত; এখানকার লোকেরা সম্প্রতি আলাদা ভাষাভিত্তিক প্রদেশ "ডোগরাস্থান" গঠনের আন্দোলন করছে। কাশ্মীরিভাষীরা প্রায় সবাই ধর্মে মুসলমান এবং আর্য ভাষাগোষ্ঠীর দরদ উপশাখার লোক; ডোগরিভাষীরা প্রায় সবাই ধর্মে হিন্দু এবং ভারতীয়-আর্য ভাষাগোষ্ঠীর লোক, উৎপত্তির দিক থেকে এরা "রাজপুত" ব'লে পরিচয় দেয়; ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে এরা বরং পাঞ্জাবি বা পূর্ব পাঞ্জাবি

ভাষার জ্ঞাতি ভাষা ব্যবহার করে। লাদাখ কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্যের আর একটি প্রদেশ—এখানে বোড়ো ভাষাগুলি প্রচলিত; এখানকার লোকেরা ধর্মে প্রায় সবাই বৌদ্ধ এবং উৎপত্তির বিচারে তিব্বতিদের জ্ঞাতি। আর দুটি প্রদেশ বালতিস্তান ও গিলগিট এখন "আজাদ কাশ্মীর" নামে পাকিস্তানের অধিকারে; ঐ দুই প্রদেশে দার্দিক ও বুরুশাস্কি ভাষাগুলি প্রচলিত; আজাদ কাশ্মীরের সকলেই ধর্মে মুসলমান এবং কিছু কিছু লোক পশ্চিম পাঞ্জাবি ও পশতো ভাষা ব্যবহার করে। আজাদ কাশ্মীর একটি ভুল নাম—কারণ, ঐ এলাকায় কাশ্মীরিভাষীরা সংখ্যায় খুব কম। কাশ্মীরিভাষী অঞ্চল বা প্রকৃত ক্ষুদ্র কাশ্মীর বা কাশ্মীর উপত্যকার বেশির ভাগ ভারতের অধিকারেই আছে।

আজাদ কাশ্মীর ও ভারতীয় কাশ্মীর—দুই এলাকারই এক এক অংশ চীন অধিকার ক'রে নিয়েছে। এ কথা বুঝতে হবে যে, সহজে বা বিনা যুদ্ধজয়ে ঐ দুটি অংশ পাকিস্তান ও ভারত পুনরুদ্ধার করতে পারবে না। আরো লক্ষ্য করতে হবে যে, কাশ্মীর ও সিনকিয়াং-এর মধ্যবর্তী সীমারেখা ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখ পর্যন্ত অনির্দিষ্ট ছিল।

এই অখণ্ড কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্য তা হ'লে বর্তমানে তিনটি রাষ্ট্রের অধিকারে বিভক্ত হয়ে আছে—ভারত, পাকিস্তান ও চীন। আজাদ কাশ্মীরের পশ্চিম পাঞ্জাবি ও পশতোভাষী এলাকা গণভোট নিলে পাকিস্তানে ও পাখ্‌তুনিস্তানে যেতে চাইবে; আর যে-কাশ্মীরিভাষা এলাকাটুকু পাকিস্তানের আয়ত্তে আছে তা গণভোট নিলে অবশিষ্ট কাশ্মীরে সংযুক্ত হতে চাইবে। জম্মু ও লাদাখ অ-কাশ্মীরি ভাষাভাষী এলাকা; সেখানে গণভোটের ফল কাশ্মীর বা পাকিস্তানের অনুকূলে যাবে না। চীন-অধিকৃত এলাকা বাদে অবশিষ্ট কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্যে গণভোট গৃহীত হলে ভারতের ভয় পাবার বা ক্ষতিগ্রস্ত হবার কিছু নেই। কারণ, গণভোটের ফলে এ-রাজ্যে আপন হতেই ভাষাভিত্তিক রাজ্যগুলিতে বিভক্ত হয়ে পড়বে। ক্ষুদ্র এক খণ্ড কাশ্মীর উপত্যকা রক্ষার জন্যে ভারতকে প্রভূত অর্থ অপচয় করতে হচ্ছে। তার চেয়ে গণভোট নেবার পর কাশ্মীর উপত্যকা অঞ্চলকে অর্থাৎ জম্মু ও লাদাখকে ভারতের একটি পূর্ণাঙ্গ অঙ্গরাজ্যে পরিণত ক'রে ক্ষুদ্রায়তন কাশ্মীর উপত্যকাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান ক'রে আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে একটি নিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ব্যবধান বা বাফার স্টেট হিসেবে রাখার ঝুঁকি নিলে কাশ্মীর-সমস্যার অত্যন্ত লাভজনক মীমাংসা হতে পারে। যদি ভারত গণভোটে জয়লাভ করে, তা হলে তো কথাই নেই, কিন্তু যদি ভারত পরাজিত হয়, তা হলেও বর্তমানে তার হাতে যা আছে তা থেকে ক্ষুদ্র কাশ্মীর উপত্যকা স্বাধীন হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন ক্ষতি হবে না। শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে যদি কেবল কাশ্মীরি মুসলমান গরিষ্ঠ এলাকা নেপাল বা ভুটানের মতো একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করে, তা হলে নানা দিক থেকে ভারতের লাভ ও পাকিস্তানের ক্ষতি অনিবার্য।

গণভোটে যদি স্বাধীন কাশ্মীর গঠন করা স্থির হয় তা হলে যে আজাদ কাশ্মীরের কাশ্মীরিভাষী এলাকা তার অন্তর্ভুক্ত হবে, সে কথা বলা বাহুল্য। পাকিস্তান তাতে সম্মত না হলে পাকিস্তানের কূটনৈতিক পরাজয় অনিবার্য। সে-ক্ষেত্রে ভারতকেও তার অধিকৃত এলাকা ছাড়তে হবে না। যদি স্বাধীন কাশ্মীর গঠিত হয় তা হলে যাতে পাকিস্তান সেখানে সৈন্য প্রবেশ করাতে না পারে তার দায়িত্ব রাষ্ট্রসংঘের ওপর থাকবে; যদি পাকিস্তান স্বাধীন কাশ্মীরে সৈন্য প্রবেশ করায়, তা হলে ভারতেরও সে-অধিকার থাকবে। বিনা রক্তপাতে সমস্ত কাশ্মীর-সমস্যাটির একটি সুষ্ঠু মীমাংসা কেবল গণভোটের দ্বারা হতে পারে।

অর্থনৈতিক কারণে স্বাধীন কাশ্মীর ভারতের মিত্র হতে বাধ্য। শেখ আবদুল্লা যে পাকিস্তানে যাবার জন্যে ব্যগ্র নন, স্বাধীন কাশ্মীর প্রতিষ্ঠাই তাঁর লক্ষ্য, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভারত সরকার ইচ্ছা করলে তাঁকে সদ্ব্যবহারে লাগাতে পারতেন। স্বাধীন কাশ্মীর প্রতিষ্ঠিত হলে স্বাধীন পাঠানিস্তান গঠনের কাজ অনেক এগিয়ে যেত। তার দ্বারা পশ্চিম পাকিস্তানকে বিশ্লিষ্ট করার কাজ সাফল্য লাভ করত।

"ভারত" রাষ্ট্রের প্রশাসনিক বিভাগগুলির পুনর্বিন্যাস নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়, ভারতের প্রশাসনিক

গভর্ণরশাসিত প্রদেশ, ৫টি চিফ কমিশনার শাসিত প্রদেশ, সমস্ত আংশিক ও পূর্ণ শাসনবহির্ভূত এলাকা, সংরক্ষিত ও উপজাতি এলাকা সমূহ, ফরাসি ভারতের ৫টি এলাকা, পোর্তুগিস ভারতের ৩টি এলাকা, প্রায় ৬০০ দেশীয় রাজ্য—এতগুলি প্রশাসনিক বিভাগকে মাত্র বিশ বছর সময়ের মধ্যে ১৭টি অঙ্গরাজ্য আর ১০টি কেন্দ্রশাসিত রাজ্য—মোট ২৭টি এলাকায় পরিণত করা ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের অভিমুখে বৈপ্লবিক অগ্রগতির পরিচায়ক। ভারতের জনতা সৌভাগ্যক্রমে জাগ্রত থাকায় বহু আন্দোলন স্বীকার করতে হলেও শেষ পর্যন্ত ভারতের ভাষাভিত্তিক পুনর্বিন্যাস ১৯৫৬-৬৮ সালে কার্যকর হয়েছে। অবশ্য এখনও ভারতের ভাষাভিত্তিক পুনর্বিন্যাস সম্পূর্ণ হয় নি; কিন্তু তা যে হবেই তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভারতের বর্তমান ২৭টি প্রশাসনিক বিভাগ ভাষার ভিত্তিতে আরো কমসংখ্যক করা যায়।

কেন্দ্রশাসিত ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি প্রশাসনিক সংগঠনে অপূর্ণতার দৃষ্টান্ত। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এই এলাকাগুলি ভারতের সংহতির অভাব বৃদ্ধি করছে। এই রাজ্যগুলির মধ্যে পণ্ডিচেরী, গোয়া এবং দাদরা ও নগর হাবেলি রাজ্য তিনটির টুকরো টুকরো এলাকাগুলিকে সন্নিহিত অঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জকে পশ্চিমবঙ্গের এবং লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জকে কেরালার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে. হিন্দি প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার এই দুটি দ্বীপরাজ্যকে খাস কেন্দ্রীয় শাসনে রেখেছেন; কিন্তু এর ফলে মুসলিমগরিষ্ঠ লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ অচিরে মাল দ্বীপপুঞ্জের মতো স্বতন্ত্র রাষ্ট্রত্ব দাবি করবে, তার সঙ্গে কেরালার মালাবারি মুসলমানদের মোপলাস্তানের দাবি তো আছেই। নেফা-কে নাগাল্যাণ্ডের এবং দিল্লীকে হরিয়ানা বা উত্তর প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা সঙ্গত। বাকি তিনটি রাজ্য মণিপুর, হিমাচল ও ত্রিপুরা বহুদিন থেকে পূর্ণকায় অঙ্গরাজ্যরূপে পরিগণিত হতে চায়। এই তিনটিকে সে মর্যাদা দিলে ভারতে বর্তমানের ২৭টি বিভাগের বদলে মোট ২০টি অঙ্গরাজ্য দেখা যাবে। এই বিশটি অঙ্গরাজ্যের পারস্পরিক সীমানা ভাষার ভিত্তিতে সংশোধন করলে আমরা ভারতের সুবিন্যস্ত প্রশাসনিক রূপ দেখতে পাবো।

অনসমিয়া সমস্ত এলাকা ত্রিপুরার সঙ্গে যুক্ত ক'রে পূর্বাচল প্রদেশ গঠনের যে দাবি বহুদিন থেকে চ'লে আসছে তা আসামের ভাষা সমস্যা সমাধানের শ্রেষ্ঠ উপায়। কামরূপ, শিবসাগর, নওগাঁ, দরং, লখিমপুর এই পাঁচটি জেলা ও বড় জোর গোয়ালপাড়া জেলার পূর্বাংশ হল প্রকৃত অসমিয়াভাষী এলাকা। এই ক্ষুদ্র আসাম বাদে বাকি সব এলাকা ত্রিপুরাসমেত পূর্বাচল রাজ্য রূপে গণ্য করা উচিত। তা হলে আর গারো পাহাড়, খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়, মিকির পাহাড় ও উত্তর কাছাড় জেলা তিনটিকে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র মেঘালয় রাজ্য গঠন করতে হয় না। যদি মেঘালয় শেষ পর্যন্ত গঠন করা হয়, তা হলে কাছাড় ত্রিপুরার সঙ্গে এবং গোয়ালপাড়া জেলার পশ্চিমাংশ পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। মিজোরাম পূর্বাচল গঠিত হলে তার অন্তর্ভুক্ত থাকবে, নইলে স্বতন্ত্র হবে।

কচ্ছকে ভারতের সিন্ধিভাষী অঙ্গরাজ্যরূপে গঠন করতে হবে গুজরাত থেকে বিযুক্ত ক'রে। ভারতবর্ষ বিভাগের সময়ে বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের মতো সিন্ধু প্রদেশকেও উত্তর বা মুসলিমগরিষ্ঠ সিন্ধু এবং দক্ষিণ বা অ-মুসলিম গরিষ্ঠ সিন্ধু, এই দুই ভাগে ভাগ করা উচিত ছিল। তা হলে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট তারিখে ১৩ লক্ষ সিন্ধি অ-মুসলিম পাকিস্তানের গ্রাস থেকে অব্যাহতি লাভ করত এবং সিন্ধু-কচ্ছ সীমান্ত অঞ্চল ভারতের অন্তর্ভুক্ত হত ব'লে আজ যে কচ্ছ সীমান্ত সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তার উৎপত্তি হত না। বৃহৎকায় অমরকোট অঞ্চলটি সিন্ধু সিন্ধুর অন্তর্ভুক্ত হত। সিন্ধু বিভক্ত না হওয়ার জন্যে পরলোকগত জয়রামদাস দৌলতরাম, চৈৎরাম গিদোয়ানি প্রভৃতি হিন্দু সিন্ধি নেতারাই দায়ী। সিন্ধু প্রদেশ বিভক্ত না হলেও সিন্ধিভাষী এলাকা বিভক্ত হয়ে কচ্ছের সিন্ধিভাষী এলাকা ভারতে করদ বা দেশীয় রাজ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। সম্প্রতি ভারতের সিন্ধিরা অর্থাৎ সিন্ধি অ-মুসলিমরা সিন্ধি ভাষাকে ভারতের জাতীয় ভাষাসমূহের তালিকা বা তপসিলের অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছে। খণ্ডিত ভারতের জাতীয় ভাষা সমূহের অর্থাৎ সংবিধান স্বীকৃত ভাষাসমূহের মোট সংখ্যা এখন ষোলটি।

কচ্ছ ভারতের অন্যতম অঙ্গরাজ্যরূপে গঠিত হলে ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলির সংখ্যা একুশে দাঁড়াবে। কিন্তু হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ তিনটিকে একত্র ক'রে একটি পশ্চিমা হিন্দি বা হিন্দুস্থানিভাষী রাজ্য গঠন করলে ঐ সংখ্যা ক'মে যাবে। এই বৃহৎ প্রদেশ থেকে কোশলি বা পূর্বী হিন্দিভাষী এলাকাকে স্বতন্ত্র ক'রে কোশল বা মহাকোশল রাজ্য গঠন করতে হবে। অবশিষ্ট এলাকার নাম হরিয়ানা বা উত্তরপ্রদেশ বা হিন্দ বা হিন্দুস্থান বা উত্তরাপথ বা আর্যাবর্ত যা ইচ্ছা হতে পারে। উর্দুভাষীরা যদি এই প্রদেশের কোথাও সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে থাকে তা হলে আঞ্চলিকভাবে অসাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে উর্দু অঙ্গরাজ্যগঠনে কারো আপত্তি থাকা উচিত নয়। কিন্তু সেটা প্রমাণ সাপেক্ষ।

বিহার প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যকে ভাষার ভিত্তিতে মিথিলা, মগধ ও ভোজপুর বা কাশী রাজ্যে বিভক্ত করা উচিত। তা হলে ভারতে মোট ভাষাভিত্তিক রাজ্যের সংখ্যা হবে মাত্র বাইশটি। যদি পূর্বাচল রাজ্য গঠিত না হয় এবং মিজোরাম রাজ্য গঠিত হয় আর লক্ষ্ণৌকে কেন্দ্র ক'রে একটি উর্দুভাষী রাজ্যও গ'ড়ে ওঠে, তা হলে ঐ সংখ্যা হবে বড় জোর চব্বিশটি।

পাঠকদের সুবিধার জন্যে এবার তিনটি তালিকা দেওয়া হচ্ছে য ভালো ক'রে দেখলে বোঝা যাবে, ভারতের ভাষাভিত্তিক পুনর্বিন্যাস অবাঞ্ছনীয় কিছু নয় এবং তা ভারতের সংহতি বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।

ভারতীয় সংবিধানে মর্যাদাপ্রাপ্ত ভাষা ষোলটি :—

(১) অসমিয়া, (২) বাংলা, (৩) উড়িয়া, (৪) তেলেগু, (৫) তামিল, (৬) মালয়ালম্, (৭) কানাড়ি, (৮) মারঠি, (৯) গুজরাতি, (১০ হিন্দি, (১১) কাশ্মীরি, (১২) পাঞ্জাবি, (১৩) সিন্ধি, (১৪) উর্দু, (১৫) সংস্কৃত, (১৬) ইংরেজি। এদের মধ্যে ইংরেজি বিদেশি ভাষা, সংস্কৃত প্রাচীন ভাষা, উর্দু খুব সম্ভব সাম্প্রদায়িক ভাষা; অর্থাৎ এই তিনটি আঞ্চলিক ভাষা নয়। এদের তালিকাভুক্ত করা হাস্যকর ব্যাপার। অথচ রাজস্থানি, ভোজপুরি, ডোগরি, মণিপুরি, নাগা, কোশলি, মৈথিল ও মগহি—এই আটটি আঞ্চলিক ভাষাকে তালিকাভুক্ত করা হয়নি।

বর্তমান ভারতের প্রশাসনিক বিভাগ সাতাশটি :—

(ক) অঙ্গরাজ্য সতেরটি :—

(১) নাগাল্যাণ্ড (২) আসাম (৩) পশ্চিমবঙ্গ (৪) উড়িষ্যা (৫) অন্ধ্র (৬) তামিলনাড়ু (৭) কেরালা, (৮) মহীশূর বা কর্ণাটক (৯) মহারাষ্ট্র (১০) গুজরাত (১১) রাজস্থান (১২) মধ্য প্রদেশ (১৩) বিহার (১৪) উত্তর প্রদেশ (১৫) হরিয়ানা (১৬) পাঞ্জাব (১৭) কাশ্মীর।

(খ) কেন্দ্রশাসিত রাজ্য দশটি :—

(১) হিমাচল (২) মণিপুর (৩) ত্রিপুরা (৪) নেফা (৫) আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ (৬) লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ আমিন ও মিনিবার দ্বীপ (৭) দিল্লি (৮) পণ্ডিচেরি ( ) গোয়া (১০) দাদরা ও নগর হাবেলি।

আমাদের প্রস্তাবিত ভাষাভিত্তিক রাজ্য বাইশটি :—

(১) নাগাল্যাণ্ড (২) মণিপুর (৩) আসাম (৪) পূর্বাচল (৫) পশ্চিমবঙ্গ (৬) ওড়িশা (৭) অন্ধ্র (৮) তামিলনাড়ু (৯) কর্ণাটক (১০) কেরালা (১১) মহারাষ্ট্র (১২) গুজরাত (১৩) রাজস্থান (১৪) কচ্ছ (১৫) কোশল (১৬) ভোজপুর বা কাশী (১৭) মিথিলা (১৮) মগধ (১৯) হরিয়ানা বা হিন্দিস্থান (২০) জম্মু (২১) পাঞ্জাব (২২) কাশ্মীর।

কাশ্মীরিভাষী এলাকাটুকু বাদে কাশ্মীর ও জম্মু রাজ্যের অবশিষ্ট সমস্তটা ও হিমাচল মিলে জম্মু রাজ্য গঠিত হবে। মেঘালয় ও মিজোরাম পূর্বাচলের মধ্যে থাকবে। যদি উর্দুভাষী অযোধ্যা, লুশেইভাষী মিজোরাম আর মিশ্র পাহাড়ি রাজ্য মেঘালয় গঠিত হয়, তা হলে এই সংখ্যা পঁচিশে দাঁড়াবে। এই ভাষাভিত্তিক রাজ্যগুলি বর্তমান প্রশাসনিক বিভাগ-সমূহের চেয়ে অনেক বেশি সংহত ও সুগঠিত হবে।

[ক্রমশঃ]

মনের নাগাল

পঞ্চানন ঘোষ

টেলিফোনটা হঠাৎ ঝন ঝন করে বেজে ওঠে। পাউডারের পাফটা ড্রেসিং টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে শবরী। রিসিভারটা তুলে নেয়।

হ্যালো—

ওধার থেকে বেশ একটু রাগত কণ্ঠ শোনা যায়।

কে শবরী—

হ্যাঁ—আপনি কে ?—

আমি নিখিল—

কি ব্যাপার—

এত দেরী করছো কেন—তোমার জন্যে আমি প্রায় আধঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছি মহাজাতি সদনের সামনে—

প্লিজ আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁচোচ্ছি তুমি আর একটু অপেক্ষা করো -

না শবরী—তুমি পনের মিনিটের মধ্যে এসো—অত দেরী করো না—

লক্ষীটি—অত তাড়া দিও না—আমার জন্যে আর পনের মিনিট বাড়িয়ে দাও—

বেশ আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করবো—তারপর না এলে চলে যাবো— আর কখনও তোমায় নিয়ে বেরুবো না—

ঠিক আছে—কিন্তু আমার ওপর অত রাগ কোরো না নিখিল—

বলে শবরী থামে, ওধার থেকে উত্তর না পাওয়ায় ও আবার বলে,

তাহলে ছেড়ে দিচ্ছি এখন—

—কিন্তু মনে থাকে যেন আধ ঘণ্টা—

আচ্ছা,—আচ্ছা—

রিসিভার নামিয়ে শবরী পাশের ঘরে চলে যায়। ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, প্রতিবিম্বটার চোখে চোখ রেখে মুচকে একবার হাসে, দেওয়ালে চুণকাম করার মত পাউডারের পাফ দিয়ে গাল দু'টো একবার ভাল করে ঘষে। সুরমা-টানা চোখের চটুল চাহনিকে পরীক্ষা করে। গুণগুনিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের দু'এক কলি গেয়ে ওঠে। পাশের টেবিল থেকে ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। বারান্দা দিয়ে যাবার সময় একবার নীচের উঠানের দিকে তাকায়, এগিয়ে গিয়ে ড্রয়িং রুমের পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকে বলে, মা আমি বেরুচ্ছি—

ঘরের একধারে আরাম কেদারায় শুয়ে আছেন শবরীর দাদু নলিনাক্ষবাবু। একখানা মাসিক পত্রিকায় ওঁর মুখ ঢাকা, ওর মা বাসন্তী আলমারির কাছে দাঁড়িয়ে কি যেন বার করছে। শবরীর গলার স্বর শুনে বাসন্তী মুখখানা ঘুরিয়ে বলে ওঠে,

এত সকালে কোথায় চল্লি—ক্লাসে যাবি না—

না আজ ইউনিভার্সিটিতে যাব না—আমাদের রি-ইউনিয়নের ফ্যাংসান্ আছে—তাই চাঁদা আদায় করতে যাচ্ছি—

কখন ফিরবি তাহলে—

একটু বেলা হবে—আমি চলি, দেরী হয়ে যাবে—

হ্যাঁ হ্যাঁ দিদি—বেশী দেরী করো না—তোমার জন্যে হয়তো কেউ অপেক্ষা করছে—

মুখের ওপর থেকে পত্রিকা খানা সরিয়ে হাসতে হাসতে বলে ওঠেন নলিনাক্ষবাবু।

হ্যাঁ দাঁড়িয়ে তো আছেই—তোমার কি হিংসে হচ্ছে ঘাড়টা বেঁকিয়ে দাদুর দিকে তাকিয়ে বলে শবরী। নলিনাক্ষবাবু সেইভাবে বলেন,

ঘরের জিনিস যদি পরে নিয়ে যায় হিংসে কার না হয় বলো—ওদের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বাসন্তী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। নলিনাক্ষবাবু একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ

শবরীরদিকে তাকিয়ে থাকেন। পরে বলেন,

বাঃ দিদি—তোমায় বেশ মানিয়েছে—ঐ দুধে আলতা রঙের ওপর গোলাপী রঙের সাড়ী—অপূর্ব—যদি শিল্পী হতাম, একখানা ছবি এঁকে ফেলতাম—কিন্তু দিদি তোমার সেই লাল পাড় সাদা খোলের সাড়ীখানা কি হলো—যার মন ভোলাতে যাচ্ছো, সে বুঝি সাদা সাড়ী পছন্দ করে না—

না করে না—সে গোলাপী রঙ পছন্দ করে—

রসিকতা করে বলে শবরী। নলিনাক্ষবাবু বলেন,

তাইতো বলি—আজ আবার এই নতুন অভিনেত্রীর বেশ কেন—

তুমি কি কেবল গ্যাখো আমরা অভিনয় করে পুরুষদের মন ভোলাই—

দিদি—মেয়েরা হলো জন্ম অভিনেত্রী—

বলে একটু থামেন নলিনাক্ষবাবু। পরে হাতের আঙুল গুণতে গুণতে বলেন,

এই গ্যাখো না—বাপের বাড়ী যতদিন থাকে ততদিন এক অভিনয়—শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে স্বামীর সঙ্গে একরকম, শ্বশুর শাশুরীর সঙ্গে এক রকম, আবার যদি দেওর-ননদ থাকে—তাদের সঙ্গে আর একরকম—শেষকালে মা হয়ে আবার একরকম অভিনয়—

আর পুরুষেরা বুঝি ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না—

আরে ছোঃ—পুরুষেরা তো মেয়েদের সাড়ীর আঁচলের একটু বাতাস পেলে জ্ঞানহারা হয়ে যায়—অভিনয় করবে কেমন করে—

কিন্তু আমি তো শুনেছি—দিদিমার আঁচলের বাতাস খাওয়া তো দূরের কথা—তাঁকে নিয়ে তুমি ঘর-সংসারও বেশীদিন করতে পারো নি—আজ দিদিমা নেই বলে বুঝি আমার প্রতি তোমার এত লোভ—

স্ত্রীর কথা মনে করিয়ে দেওয়ায় নলিনাক্ষবাবু একটু ব্যথা পান। শবরীও বিব্রত বোধ করে। একে তার দেরী হয়ে যাচ্ছে, তার ওপর ওর কথায় দাদু আঘাত পাওয়ায় আরও অসোয়াস্তি লাগে। দুজনেই কিছুক্ষণের জন্যে অবাক হয়ে যায়।

একটু পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে পোড়া চুরুটটা ছাইদানি থেকে তুলে নিয়ে দাঁতে চেপে ধরেন। দেশলাই জ্বেলে চুরুট ধরিয়ে পোড়া কাঠি ছাইদানিতে ফেলেন। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলেন,

একটা কথা মনে রেখো দিদি—যে পুরুষ নিজেকে সাড়ীর আঁচলের তলায় আবদ্ধ রাখে এবং যে নারী সেই-ভাবে পুরুষকে বেঁধে আনন্দ পায়—তারা হলো প্রবৃত্তির ক্রীতদাস—একেবারে সাধারণ মানুষ—আর যে নারী মুক্ত বিহঙ্গের মত ছেড়ে দেয় পুরুষকে মহত্তর সৃষ্টির জন্য বৃহত্তর মানব সমাজের মাঝে এবং যে পুরুষ উন্মুক্ত পাখনা মেলে আত্মবলিদানে এগিয়ে যায়—তারা হলো অসাধারণ মানুষ—তাই তো দেখা যায় ঘরের মানুষটির নিঃস্বার্থ আত্ম-ত্যাগে মহৎ স্রষ্টাদের চাওয়া পাওয়ার অপূর্ণতা দূর হয়—মানব কল্যাণের জন্য তারা অনিশ্চয়তার মাঝে ঝাঁপ দেয়—

কিন্তু দাদু—তোমার সঙ্গে এত কথা বলতে গিয়ে আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে—আমি তার কাছে মাত্র আধ ঘণ্টা সময় চেয়েছি—

কিন্তু দিদি—এটি কি সেই আসল মানুষ—না অন্য কোন নকল—

শবরী একটু আনমনা হয়ে যায়। পরে একটা দীর্ঘ-শ্বাস ফেলে বলে,—

দাদু—আসল মানুষ হলে কি পথে গিয়ে দেখা করতাম—ঘরেতেই নিয়ে আসতাম—

একটু থেমে ও আবার বলে,

রামায়ণে পড়েছিলাম রামচন্দ্রের জন্য শবরীর কৈশোর গেল, যৌবন গেল, অবশেষে বার্দ্ধক্যে যখন পৌঁছলো, তখন রামচন্দ্রের দেখা পেলো—আমারও দেখছি সেই-রকম হবে দাদু—

কেন দীপেন্দুর কোন খবর পাও নি—

তোমাদের মত পুরুষগুলো ঐ রকমই হয়—তুমি যেমন দিদিমাকে জ্বালিয়েছিলে—আমাকে তেমনি ও জ্বালাচ্ছে—

কেন সেও কি আমার মত—

কি করে বলি বলো—নিজের কথা কোনদিন আমায় বলেনি—শুধু আমার কথা শুনে গেছে—কেবল যেদিন শেষ দেখা হয়—সেদিন বলেছিল, একবার কনটিনেণ্টটা ঘুরে আসা দরকার—ভাবছি সুবিধে মত চলে যাব—তারপর দু'বছর হয়ে গেল আর কোন খবর নেই—

একটু থামে শবরী। দীপ্তেন্দুর কথা মনে হওয়ায় ও ভুলে যায় নিখিলের সঙ্গে দেখা করার কথা, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বলে,

দাদু—নদ-নদী, খাল-বিল যার এপার-ওপার আছে, তাকে জয় করা যায়—তাই তার সম্বন্ধে মানুষের অজানা থাকে না—কিন্তু মহাসাগরের তো এপার-ওপার নেই—তাকে জয় করার প্রশ্ন যেমন অবান্তর, তেমনি তার গভীর তলদেশ সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করাও বাতুলতা—

ঠিক বলেছিস দিদি—এই তো চাই—এইবার তুই যোগ্য পুরুষের জীবনসঙ্গিনী হবার উপযুক্ত হয়েছিস—

কিন্তু দাদু—আমি যে সাধারণ মেয়ে—নদীর জল খেয়ে যার তৃষ্ণা এতকাল মিটেছে—সে কি সাগরের নোনা জলের স্বাদ বুঝবে—

তাই যদি হবে—পেরেছিল কি দীপ্তেন্দুর জায়গায় নকল মানুটিকে বসাতে—

দাদু তুমি বড় চালাক—

হাসতে হাসতে বলে শবরী। পরে হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বলে—

না দাদু—আর নয়—এবার চলি—নকল মানুষটি তাহলে চলে যাবে - তখন মুস্কিলে পড়বো—

শবরী বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। নলিনাক্ষবাবু জানলার দিকে তাকিয়ে আপন মনে হাসতে থাকেন।

কিছুক্ষণ কেটে যায়। বাসন্তী গরম দুধের গ্লাস হাতে করে নলিনাক্ষ বাবুর সামনেএসে দাঁড়ায়। চামচ দিয়ে দুধ নাড়তে নাড়তে বলে,

শবরী চলে গেছে বাবা—

হ্যাঁ—এইমাত্র গেল—

মুখখানা ওর দিকে ঘুরিয়ে ব লন নলিনাক্ষবাবু। দুধের গ্লাস প শের টিপয়ের ওপর রেখে বাসন্তী বলে,

দুধটা খেয়ে নাও বাবা—

রাখ—খাচ্ছি

জবাব দেন নলিনাক্ষবাবু। একটু পরে আবার বলেন,

জানিস্ বাসুমা—তোর মেয়ের মধ্যে অসাধারণ কিছু পাবার জন্যে আকুলতা আছে কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছে না—তোর ঐ বনেদী শ্বশুর বাড়ীর বস্তাপচা কুসংস্কার কিছু ওর মনের ওপর চেপে বসে আছে

সেই জন্যেই তো বাবা আমি ওকে নিয়ে দূরে চলে এসেছি—

কিন্তু জামাইবাবাজী অসন্তুষ্ট হয় নি তো

সে ওসব খেয়ালই করে না—আর ক'দিন বা বাড়ী থাকে—এমন চাকরী নিয়েছে, কেবল এদেশ-ওদেশ ঘুরে বেড়াতে হয়—

ভালই হয়েছে—ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে হলে মায়ের তীক্ষ্ণ নজর থাকা চাই -মা যদি সুসংস্কৃত, মানসিকতা-সম্পন্না না হয়, তাহলে ছেলে-মেয়ের যথার্থ মানুষ হওয়া শক্ত। বাইরের দরজায় কলিংবেল বেজে ওঠে। বাসন্তী তাড়াতাড়ি নীচেয় গিয়ে দরজা খোলে। ডাক্-পিয়ন ওর হাতে একটা চিঠি দেয়। খাম-খানা ছিঁড়তে ছিঁড়তে ও ওপরে আসে। ঘরে ঢুকতে নলিনাক্ষবাবু একবার ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন,

কার চিঠি বাসু

তোমার জামাইয়ের—

বলে ও কৌচের ওপর বসে চিঠির ভেতর নিজেকে ডুবিয়ে দেয়।

এক রকম ছুটতে ছুটতে শবরী মহাজাতিসদনের সামনে হাজির হয়। নিখিল রাগে বিরক্তিতে আপন মনে মাথা হেঁট করে পায়চারি করতে থাকে। শবরী ওর সামনে গিয়ে বলে,

আই এ্যাম্ সো সরি নিখিল—জানোতো আমার বাড়ীতে এক বুড়ো দাদু আছে—ইদানীং সে আবার আমার প্রেমে পড়েছে—

অত অজুহাত দেওয়ার দরকার নেই—আমরা মানুষ নই—যেন রামছাগল যেদিকে কান মলবে, সেই দিকেই ঘাড় কাত্ করে আছি—

ক্ষুব্ধভাবে বলে নিখিল। শবরী আন্তরিকতার অভিনয় করে মোলায়েম সুরে বলে,

বুঝতে পারছি, তুমি খুব রেগে গিয়েছো—কিন্তু তুমি তো জানো না, বুড়োর প্রেম কত গাঢ়!

থাক্ তোমাকে আর রসিকতা করতে হবে না—এখন চলো—দ্যাখো আবার মিঃ চ্যাটার্জির দেখা পাবে কি না—

কিন্তু তুমি এরকম রাগ করে কথা বললে, আমি কেমন করে তোমার সঙ্গে যাই বলো—

না যাবে তো বাড়ী চলে যাও—আমিও চলে যাচ্ছি—

প্লিজ নিখিল—তুমি একটু শান্ত হও—

কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ শবরী নিখিলের হাতখানা চেপে ধরতে যায়। পরক্ষণে নিজেকে সংযত করে পিছিয়ে আসে। হয়তো দীপেন্দুর কথা ওর মনে পড়ে।

নিখিল এবার প্রচণ্ড বিরক্তিতে বলে,

পথের মাঝে ছেলে মানুষী না করে চলো, বাস আসছে। শবরী আর তর্ক না করে বলে,

চলো—

নিখিল এগোয়। শবরী ওর পিছনে পিছনে চলে।

বালিগঞ্জ পোষ্টাফিসের সামনে বাস থেকে ওরা নামে। দক্ষিণ দিকে এগোয়। এপাড়া হলো সহরের অতি আধুনিক পাড়া, এককালে এলাকাটা ছিল ইংরেজ অফিসারদের। ফুটপাতগুলো জনবিরল।

ওরা দু'জনে নিঃশব্দে এগোয়। নিস্তব্ধতা ভেঙে শবরী প্রথমে বলে,

রাগ কমেছে তো এবার—

রাগ করবার কি আছে বলো—আর রাগ করবো কার ওপর—

কেন আমি কি তোমার রাগ করার উপযুক্ত পাত্রী নই—একটু হেসে শবরী আড় চোখে নিখিলের দিকে তাকায়। পরে বলে,

বেশ নমিতাকে বলবো কাল থেকে সে যেন তোমার সঙ্গে চাঁদা আদায় করতে আসে—

দোহাই তোমার তুমি আর এভাবে আমাকে আঘাত কোরো না—হঠাৎ আবেগের স্বরে বলে ওঠে নিখিল। শবরী একটু অভিমানের ভঙ্গীতে বলে,

একদিন তো ওর প্রতি তোমার দুর্বলতা ছিল—

তা ছিল - কিন্তু সব দুর্বলতা কি এক—

পার্থক্যটা কি রকম—

ওর চোখের সঙ্গে আমার মায়ের চোখের মিল আছে তাহলে তো উচিত সেই দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়ে ওর যোগ্য মর্যাদা দেওয়া উচিত বলেই তো সে দুর্বলতাকে দমন করে, নতুন দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি—

কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন, পুরুষের শৈশবে থাকে মায়ের প্রতি দুর্বলতা—আর পরিণত বয়সে স্ত্রী বা অপর কোন নারীর প্রতি—সেক্ষেত্রে মায়ের সঙ্গে যদি কোন নারীর মিল থাকে, তাহলে সেই নারীর প্রতি দুর্বলতা কালে গভীর হবার সম্ভাবনা থাকে—

দ্যাখো—তোমার মত আমি দর্শন নিয়ে আলোচনা করি না—অত যুক্তি তর্কও বুঝি না—আমি শিল্পী—হৃদয় দিয়ে যা কিছু বুঝবার চেষ্টা করি—

কিন্তু হৃদয় বস্তুটা মেয়েদের—আর পুরুষদের হলো বুদ্ধি

শবরী, থামাও তোমার তর্কশাস্ত্র

তা না হয় থামাচ্ছি কিন্তু নিখিল, আমাকে পেয়ে যেমন তুমি নমিতাকে ভুলতে বসেছো তেমনি আবার আর একজনকে পেয়ে আমার কথাও তো ভুলে যাবে

নমিতাকে যে ভুলেছি এবং তোমাকে যে ভবিষ্যতে ভুলে যেতে পারি—তা তুমি কেমন করে জানলে -

দ্যাখো—পুরুষদের ভাল লাগার মৌলিকতাকে জানার যোগ্যতা মেয়েরা জন্ম থেকে নিয়ে আসে—সেইজন্যে একটা প্রবাদ আছে—

'পুরুষের ভালবাসা', আর মোল্লার মুরগী পোষা—দুই-ই এক।'

তুমি কি তাহলে আমায় অবিশ্বাস করো শবরী ?

ছিঃ—অবিশ্বাস করবো কেন—মেয়েদের প্রকৃতি য সেইটাই বললাম—

মেয়েদের যে এটাই প্রকৃতি, তা তুমি জোর গলা বলছো কেমন করে ?—

কেমন করে—?

বলে একটু হাসে শবরী। ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে রুমাল খানা বার করে মুখের ঘাম আলতো করে মোছে পরে বলে,

আসলে কি জানো—পুরুষেরা ভালবাসতে জানে না—তার মানে—

তুমি রাগ করো না নিখিল—এটা মনস্তত্ত্বের কথা—কিন্তু কেন জানো—

কেন—

পুরুষ কেবল সত্ত্ব ভোগ করে খালাস—যা কিছু ঝামেলা বা দায়িত্ব মেয়েদের ওপর—যেন তারা ঝামেলা সহ্য করার জন্যেই জন্মেছে—

তার জন্যে পুরুষেরা ভালবাসতে জানে না—এ অভিযোগ করছো কেন—

দাঁড়াও বলছি—অত ব্যস্ত হচ্ছো কেন—

বলে শবরী হাসে। পরে বলে,

মেয়েরা এমন এক পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায়—যে তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে—কোনদিন সে অবিশ্বাসের কাজ করবে না—এই কারণে সমস্ত মেয়েই মনে মনে এমন এক কল্পিত আদর্শ পুরুষের স্বপ্ন ছাখে, যে সাধারণ পুরুষ অপেক্ষা উন্নত। তাই ভালবাসা কি সে শুধু মেয়েরাই জানে—কিন্তু পুরুষেরা কেবলমাত্র মেয়েদের বাইরের চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে পতঙ্গের মত এগিয়ে আসে—সে কারণ তাদের ভালবাসায় ভোগের লিপ্সাই থাকে—

ভোগের লিপ্সা কি একা পুরুষদের—

এ প্রশ্নের উত্তর বিশেষ মানুষের কাছে দেওয়া চলে সকলের কাছে নয়—বরং Psycho-Sex-এর কিছু বই পড়ে নিও জানতে পারবে—

একটু থেমে শবরী আবার বলে চলে,

তবে এটা ঠিক ভালবাসতে পুরুষেরাও জানে এবং সে ভালবাসা মেয়েদের চেয়ে অনেক মহৎ তবে তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য, কারণ কেন জানো—

কেন—

যে পুরুষেরা সমাজের কল্যাণের জন্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করার কাজে লিপ্ত থাকে—তাদের বাসনা চরিতার্থ হয় নারীকে ভালবাসার মাধ্যমে—সেজন্য নারী তাদের কাছে প্রেরণার গঙ্গোত্রী ভোগের সামগ্রী, নয়—কিন্তু তারা তোমার আমার মত সাধারণ স্তরের মানুষ নয়—

থামে শবরী। একবার পথের দু'পাশের বাড়ীগুলোর দিকে তাকিয়ে বলে,

কিন্তু নিখিল আমরা ঠিক পথ দিয়ে চলেছি তো? মার্লিন পার্ক আর কতদূর—

আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না শবরী—

উদাসভাবে জবাব দেয় নিখিল। শবরীর আলোচনা শুনে ও যেন নিজেকে দুর্বল মনে করে। ওকে আনমনা দেখে শবরী বলে,

তুমি শহরের পথগুলো চেনো না যখন আমাকে তাহলে নিয়ে এলে কেন—

বেশ কাল থেকে আমি আসবো না—রমেনকে পাঠিয়ে দেবো ও পথঘাট ভাল চেনে—

না-না ও কাজ করো না—

কেন—

সহপাঠী হিসেবে একজনের সঙ্গে পরিচিত হওয়াই ভাল বেশী ছাত্রের সঙ্গে পরিচিত হলে আমার হাঁফ ধরবে

একটু থেমে ও একজন পথচারীকে দেখিয়ে বলে,

ওসব কথা না বলে—লোকটিকে একবার জিজ্ঞেস করো, মার্লিন পার্কটা কোথায়—

নিখিল লোকটিকে ডেকে ব'লে,

মশায় শুনছেন—

লোকটি দাঁড়িয়ে ওদের দিকে তাকায়। নিখিল ওর কাছে গিয়ে বলে,

আচ্ছা মার্লিন পার্কটা কোন্‌দিকে বলতে পারেন—

সে আপনারা ছাড়িয়ে এসেছেন—

বলে শবরীর দিকে লোকটি তাকায়। নিখিল বিস্মিত হয়ে বলে,

ছাড়িয়ে এসেছি—

হাঁা—

বলে লোকটি আবার শবরীর দিকে তাকায়। শবরী মুখখানা ঘুরিয়ে নেয়। লোকটি নিখিলের দিকে ফিরে আবার বলে,

হাজরা রোড ও গড়িয়াহাট রোডের জংশনের কাছাকাছি গেলেই পাবেন।

আচ্ছা ধন্যবাদ—

বলে নিখিল শবরীর কাছে আসে। লোকটি একবার ওদের দিকে তাকিয়ে চলে যায়। চলতে চলতে পিছন ফিরে শবরীকে শেষবারের মত একবার দেখে। নিখিল শবরীকে বলে,

আমরা ছাড়িয়ে এসেছি—

তা আমি শুনতে পেয়েছি—চলো আবার পিছু হাঁটি সারা দুপুর এই করি—

বলে শবরী পিছন ফিরে এগোতে থাকে। নিখিল ওর পাশাপাশি চলে। মাঝে মাঝে ও অজানিতভাবে শবরীর কাছাকাছি হবার চেষ্টা করে। অসতর্ক মুহূর্তে নারীদেহের একটু পরশ পাবার জন্যে হয়তো ওর অবচেতন মন ব্যগ্র হয়। হয়তো বা শবরীর দেহ থেকে ভেসে আসা আর মাথার চুলের মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে মিশে যাওয়া ঘামের তীব্র গন্ধে ওর দেহের গ্রন্থিগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে ও শবরীর দিকে তাকায়। সজাগ দৃষ্টিতে শবরী লক্ষ্য করে। একটু দূরে দূরে চলার ও চেষ্টা করে।

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ওরা মার্লিন পার্ক পায়। দেওয়ালের গায়ে আঁটা রাস্তার নেম প্লেটের দিকে তাকিয়ে শবরী বলে,

কত নম্বর নিখিল—

চার নম্বর।

বলে নিখিল। শবরী আবার বলে,

তুমি বাঁ দিকে নজর রাখো—আমি ডান দিকে দেখছি। শান্ত পথ। মাঝে মাঝে দু' একখানা প্রাইভেট গাড়ী হুস্ করে চলে যায়। দু' একজন পথচারী ধীর মন্থর গতিতে ফুটপাত দিয়ে চলে। দু'পাশে উঁচু পাঁচিল ঘেরা বাড়ী। বাড়ীর সামনে খোলা জায়গায় বড় বড় ঝাউ আর তমাল গাছ। ফুটপাতের ধারে কৃষ্ণচূড়ার গাছগুলো রক্তরাঙা ফুলে ঢাকা। মাঝে মাঝে বাতাসে ঝরে পড়ে পাঁপড়িগুলো। ঝাউ আর তমালের পাতাগুলোর মর্ মর্ শব্দে শবরীর মন আবেশে জড়িয়ে ধরে। আঁচলটা এলোমেলো উড়ে চলে। চপলা বালিকার মত কপালের ওপর বার বার উড়ে পড়ে কোঁকড়ানো চুলের গুচ্ছটা। শবরী চুলগুলো হাত দিয়ে সরিয়ে বলে ওঠে,

আচ্ছা নিখিল—তোমাদের ঐ সাহিত্যিক বন্ধুটির কি ব্যাপার বলোতো—

কোন্ সাহিত্যিক বন্ধু—

বারে—যার সঙ্গে দু'বছর ধ'রে ক্লাস করছো—

ও—ভাই বলো—কিন্তু তার সম্বন্ধে তুমি যতটা জানো—আমিও ততটা জানি—

কেন ওকি তোমাদের সঙ্গে কথা বলে না—

বলে—যদি কিছু প্রশ্ন করি—নিজের কথা একটাও বলে না—

একটা মিষ্টি!—

হ্যাঁ মিষ্টিই বটে—

ওরা এক অদ্ভুত জাতের মানুষ নিখিল—গুটিপোকার মত নিজেদের মনের চারপাশে শুধু নির্মোক তৈরী করে চলে যতক্ষণ না নিজেরা সেই আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসে ততক্ষণ কারুর পক্ষেই বোঝা সম্ভব নয়—এমনকি সারাজীবন ওদের সঙ্গে ঘর করলেও না—

তুমি কি করে জানলে—

নিখিলের কথায় শবরী চম্‌কে ওঠে। মনে পড়ে ওর দীপেন্দুর কথা। নিজেকে সংযত করে বলে,

আমার এক আত্মীয় আছে—ঠিক এই জাতের মানুষ—কতদিন তার সঙ্গে কেটেছে—কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি,

থামে শবরী। পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে,

নিজের থেকে একটা কথাও বলতো না—অথচ যে কোন বিষয়ে আলোচনা সুরু করো—দেখবে অনর্গল বকছে—কিন্তু একটাও অপ্রয়োজনীয় কথা বলে না—জীবনটাকে জ্যামিতির ছকে বেঁধে ফেলেছে—এক ডিগ্রী এদিক ওদিক হবে না—

ওরা মানুষ নয়—পাথর—

একটু হাল্কাভাবে বলে নিখিল। শবরী শান্তভাবে জবাব দেয়,

আমারও তাই মনে হয়, ওরা বোধ হয় পাথরের দেবতা—একদিন সেই আত্মীয়টির কাছে প্রশ্নও করেছিলাম কিন্তু যে উত্তর সে দিয়েছিল—তাতে বুঝেছিলাম ওদের বুকে এক জলন্ত অগ্নিপিণ্ড আছে—পাছে সে উত্তাপে আমাদের মত দুর্বল প্রকৃতির মানুষেরা পুড়ে ছাই হয়ে যায়—তাই ওরা পাথরের আড়ালে নিজেদের ঢাকা দিয়ে রেখেছে—

তাই নাকি—

হ্যাঁ নিখিল—কোথাও ভুল নেই—

থামে শবরী। মাথার ওপরে ঝরে-পড়া কৃষ্ণচূড়ার পাঁপড়িটা হাত দিয়ে ফেলে দেয়। একটু পরে ও আবার বলে,

জানো নিখিল—আমার প্রশ্নের জবাবে সে কি বলেছিল—

কি—

বলে, 'নিস্তব্ধ রাতের অন্ধকারে সারা পৃথিবীর মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন শুনতে পাই রাতের বোবা কান্না—সে কান্নায় কত অসংখ্য মানুষের কাতর আবেদন ভেসে আসে—বাঁচার জন্য তাদের কি আকুলতা—তবু তারা পথ পাচ্ছে না—সেই কান্না যেন আমাকে পাগল করে তোলে—মনে হয় এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে যাক্ এই আসুরিক সভ্যতা—নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক্ শয়তানরূপী মানুষেরা—নতুন করে গড়ে উঠুক মনুষ্যবাসের উপযুক্ত সমাজ-সংসার, রচনা করুক মানুষ আবার নতুন সভ্যতা'—বলতে বলতে তার চোখ দু'টো দিয়ে যেন জলন্ত আগুন বেরিয়ে আসতো—সেই রূপ দেখে আমি শিউরে উঠেছিলাম—আর কখনও কোন প্রশ্ন করিনি—

ঠিক বলেছো শবরী—ওরা হলো স্রষ্টা—ওদের বুকের আগুনেই তো আবর্জনা পু'ড় ছাই হয়ে যায়—এগিয়ে চলে ইতিহাস—কিন্তু দুঃখের কথা কি জানো—

কি—

সামাজিক জীবনে ওদের কোন মূল্য নেই—

কে বললে নিখিল—ওদের মূল্য নেই—

তোমার আমার মত প্রগতিশীল মানুষদের কাছে হয়ত থাকতে পারে কিন্তু বৃহত্তর সমাজে কোথাও মূল্য নেই—যতক্ষণ না তারা নিজেদের সৃষ্টিকে সার্থকভাবে রূপায়িত করতে পারছে -

তা বটে অথচ দেখ লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য কি অসাধারণ যন্ত্রণা তাদের ভোগ করতে হয়—

তা তো হবেই—

এইজন্যে বোধহয় ওরা নিজেদের জীবন সম্পর্কে এত নির্লিপ্ত, এত উদাসীন—সামান্যতম চাওয়া-পাওয়ার জন্যও যেন ওরা ব্যাকুল নয়—

রবীন্দ্রনাথের কথা মনে নেই শবরী—'শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক' ওদের কাছেও সেই এক সত্য—ইতিহাসের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে—

শবরী কোন উত্তর দেয় না। মনের বোঝা যেন হাল্কা হয়। নিখিলের কাছে দীপ্তেন্দুর কথা পরোক্ষে শুনিয়ে, হৃদয়ের গুমরে মরা ব্যথার খানিকটা যেন লাঘব হয়। ওকে কাছে না পাওয়ার জ্বালা থেকে যেন অব্যাহতি পায়। মনে মনে ভাবে, কাছে পেলেই বা এমনকি হবে! যদি সে মরে যেতো, তাহলে তো পেতাম না! তবু নিজের রাজত্বে থেকে যদি সে সুখী হয়, হোক্ না! ওর সুখই তো আমার সুখ। কিন্তু তবু যেন মাঝে মাঝে কাছে পেতে ইচ্ছে হয়। আর কিছু না পাই—মানুষটির সেবা করেও তো তৃপ্তি পেতে পারি। কিন্তু সে সুযোগও পেলাম না!

শবরীকে চুপচাপ দেখে নিখিল বলে,

কি হলো—এত গম্ভীর কেন -

না, কিছু নয়—এই রোদ্দুরে হেঁটে আর বক্ বক্ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—

নিজেকে সহজ করে বলে শবরী। নিখিল বলে,

চলো ঐ সামনের দোকান থেকে একটা করে ভিমটো খাই—

চলো—

দু'জনে দু'টো ভিমটো নেয়। পাইপে মুখ দিয়ে শবরী ব'লে,

বাড়ীর নম্বরের দিকে খেয়াল আছে কি—না শুধু গল্প করেই পথ কাটালাম—

আমি অবশ্য মাঝে মাঝে নজর রেখেছি দাঁড়াও দোকানদারকে জিজ্ঞেস করছি—

বলে নিখিল দোকানের মালিকের কাছে যায়। হাত দিয়ে সে বিপরীত ফুটপাতের বাড়ীখানা দেখিয়ে দেয়। শবরীর কাছে এসে বলে,

ওই সামনের বাড়ী—

নাও তবে তাড়াতাড়ি, অনেক বেলা হয়ে গেল—

বলে শবরী বোতলের মিষ্টি জলটুকু এক নিঃশ্বাসে শেষ করে। পরে বোতলটা নিখিলের হাতে দিয়ে বলে,

যাও তাড়াতাড়ি রেখে এসো—

শবরীর হাত থেকে নিখিল বোতলটা নেয়। পরে নিজের জলটুকু শেষ করে বোতল দুটো দোকানের মালিকের কাছে ফেরৎ দেয়। দাম মিটিয়ে দিয়ে শবরীর কাছে এসে বলে,

চলো—

দু'জনে রাস্তা পার হয়ে ৪নং বাড়ীর সামনে হাজির

হয়। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে নিখিল একবার এদিক-ওদিক তাকায়। কোন লোক দেখতে পায় না। অবশেষে বিরাট এক এ্যালসেসিয়ান্ বাইরে এসে ডাকতে থাকে। সে ডাক অভ্যর্থনার না বিতাড়নের সম্ভাষণ সে ব্যাখ্যা কুকুর-প্রিয়রাই শুধু করতে পারে। তবে নিখিল সেই ডাক শুনে ভেতরে যাওয়া থেকে বিরত হয়। কিছুক্ষণ পরে একটা চাকর বাইরে আসে। নিখিল বাড়ীর মালিকের উপস্থিতির কথা জানতে চাইলে, চাকরটি বাড়ী নেই একথা বলে ভেতরে চলে যায়। চাকরের উত্তর শুনে শবরী যেন বেলুনের মত চুপ্‌সে যায়। হতাশার সুরে বলে,

আসাটা আমাদের পণ্ড হলো -

একটু থেমে আঁচলের খুঁট ঘুরিয়ে বাতাস খেতে খেতে বলে,

ভিখিরীদের এই অবস্থাই হয়—

ছিঃ—তুমি একথা বলছো কেন--

একটু চড়া গলায় বলে নিখিল। শবরী বলে,

এতে তোমার রাগ হবার কি আছে—ভিখিরী ছাড়া আর কি বলতে পারো—

তার মানে—

বাড়ীর দরজার গোড়ায় ভিখিরী গিয়ে যখন দাঁড়ায় তখন বাড়ীর লোকেরা বলে, এখন হবে না বাছা—হাত জোড়া আছে' অথবা 'এখন খেতে বসেছি ঘুরে এসো বাছা—

আমরা কি ভিক্ষে চাইতে এসেছি—

চাঁদা চাওয়া আর ভিক্ষে চাওয়ার মধ্যে তফাৎ কি বলো? ভিক্ষে করে ভিখিরীরা পেট ভরিয়ে আমোদ বোধ করে আর আমরা চাঁদার টাকায় গান-বাজনা, হৈ হুল্লোড় করে আমোদ করি—

তাহলে তুমি এলে কেন—

'পড়েছি যবনের হাতে খানা খেতে হবে সাথে'—

একটু থেমে একটা কটাক্ষ হেনে হালকাভাবে বলে—

হবে ভিক্ষে—থুড়, চাঁদা আদায়কে উপলক্ষ করে যদি তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করা যায় সেটার মূল্যই বা কি কম!

নিখিল শান্ত হয়ে বলে,

চলো এখন ফেরা যাক—

কিন্তু আমি আর হাঁটতে পারছি না ট্যাক্সি করতে হবে—

ভাড়া দেবে কে—অনুষ্ঠানের ফাণ্ড থেকে পাবে না—

আমিই দেবো—তুমি ট্যাক্সি ডাকো—

হাঁটতে হাঁটতে ওরা ট্রাম রাস্তায় এসে পড়ে। চলন্ত খালি ট্যাক্সিকে হাত দেখিয়ে নিখিল দাঁড় করায়, ওরা দু'জনে ওঠে। নিখিল ড্রাইভারকে বলে,

শ্যামবাজার—

মিটার ডাউন করে সর্দারজী ট্যাক্সি ছেড়ে দেয়।

অনুষ্ঠান শেষ হলো। শবরীর সঙ্গে আর একটু ঘনিষ্ঠ হবার জন্যে নিখিল সক্রিয় হলো। ধীরে ধীরে মন থেকে মুছে দিতে লাগলো নমিতার ছবিখানা।

কাজে-অকাজে নিখিল এখন শবরীর সঙ্গে ঘোরা-ফেরা করে। ছাত্রমহলে জোর গুজব রটেছে ওদের নিয়ে। কেউ কেউ নিখিলের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। মাঝে মাঝে তাদের বাঁকা কথায় ও একটু অসোয়স্তি বোধ করে। এমন কি ও তাদের এড়িয়ে চলবারও চেষ্টা করে।

পড়াশুনার সঙ্গে সঙ্গে গান-বাজনা নিয়েও আজকাল শবরীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে। কখনও বা সঙ্গীতের আসরে নিয়ে যায়। শবরীও খুসী হয়ে নিখিলের গান শুনে আসে। ছাপার অক্ষরে খ্যাতিমান শিল্পীদের পাশে প্রোগ্রামে ওর নাম দেখে শবরী প্রশংসা করে।

নিখিলের হৃদয়ে মধ্যযুগীয় সিভালরি জেগে ওঠে। শবরীকে কিভাবে খুশী করবে, তা যেন ঠিক করতে পারে না। বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে কার্ডে একখানা ছবি এঁকে দু'লাইন কবিতা লিখে শবরীকে উপহার দেয়।

শবরী নিজের ভূমিকায় ঠিক অভিনয় করে চলে। নিজের মূল্য বাড়াবার জন্যে প্রথমে প্রত্যাখান করে। পরে আবার আন্তরিকতার ভাণ করে নিখিলের অজানিতভাবে পোর্টফোলিও থেকে কার্ডখানা বার করে নেয়। ভাবে ও আর কদিনই বা ছাত্রীজীবন আছে। এই কটা মাস না হয় একটু করুণা ওদের করে গেলাম!

নিখিলের মনে জোয়ার এসেছে। সারা দেহে বসন্তের পুলক জেগেছে। পড়াশুনোয় নতুন করে প্রেরণা পেয়েছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইব্রেরীতে বসে নোট করে চলেছে। শবরী ওকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছে, প্রয়োজনীয় কয়েকটি বিষয়ের নোট তৈরী করতে। ইতিহাসে আছে নারীকে খুসী করার জন্যে ইংলণ্ডের নাইটরা একদিন গায়ের কোট খুলে মেঝেয় পেতে দিতেন—যাতে নারীর কোমল পায়ে আঘাত না লাগে। নিখিলও তেমনি শবরীর নির্দ্দেশ পালন করবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে।

শবরী অবশ্য মাঝে মাঝে নিখিলের হুকুম মত চলবার চেষ্টা করে। ভাবে হয়তো, তা না হলে অভিনয় ধরা পড়ে যাবে। নিখিল অত সূক্ষ্ম বিচার করে না। সে শুধু ছাত্র জীবনের মুহূর্তগুলো শবরীর পাশাপাশি থেকে কাটাতে চায়। সেই সঙ্গে তার আশা এইভাবে শবরীকে একদিন সারা জীবনের সঙ্গী করে নেবে। এমনি করে গড়িয়ে চলে অলসপথে নিখিল ও শবরীর দিনগুলো। গ্রীষ্মের ছুটি এসে যায়। ক্লাস বন্ধ হয়। শবরী ছুটিতে কিছুদিনের জন্যে বাইরে যাবে বলে ঠিক করে। ইচ্ছে করেই আগে থেকে নিখিলকে জানায় না।

দিন ঠিক হয়ে গেছে। মালপত্র বাঁধা হচ্ছে। বাসন্তী ঝি-চাকরকে নিয়ে কাজে ব্যস্ত। দোতলায় ঘরে খাটের ওপর শুয়ে আছে শবরী। বুকের ওপর সঞ্চয়িতা নিয়ে পড়ছে। দূরের চেয়ারে বসে নলিনাক্ষবাবু দিনের খবরের কাগজখানায় চোখ বোলাচ্ছেন। হঠাৎ টেলিফোন বেজে ওঠে। নলিনাক্ষবাবু বলে ওঠেন,

দিদি ফোন বাজছে—

শবরী বইখানা পাশে রেখে ওঠে। স্খলিত আঁচলটা কাঁধের ওপর তুলে দেয়। খাট থেকে নেমে রিসিভার তুলে নেয়।

হ্যালো—

ওধার থেকে নিখিল বলে—

কে? শবরী—

হ্যাঁ—তোমাকে খুঁজেছিলাম নিখিল—

থাক্ আমায় তাহলে মাঝে মাঝে মনে পড়ে—

ভুলে যাবো এত শিগ্‌গির এ ধারণা হলো কেমন করে—

ভুলবে না এ নিশ্চয়তাই বা কোথায়—

মরে যে যাবো না একথা কি নিশ্চয় করে বলতে পারো—

সে কথা কেউই বলতে পারে না—

তেমনি ভুলবো না একথা কেউ বলতে পারে না তবে এই মুহূর্তে ভুলিনি এটুকু বলতে পারি—কিন্তু ওসব কথা থাক্ শোনো আমি দিনদশেকের জন্যে বাইরে যাচ্ছি—

কোথায়—

দার্জিলিঙ—

নিখিল কোন উত্তর দেয় না। শবরী আঁচলটা মুখে চাপা দিয়ে হাসির শব্দ বন্ধ করবার চেষ্টা করে। নলিনাক্ষবাবু শবরীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। দাদুর দিকে তাকাতে শবরীর হাসি আরও বেড়ে যায়। জোর করে মুখের ভেতর কাপড় গুঁজে দেয়। একটু পরে সহজ হয়ে আচলের খুঁটটা মুখ থেকে নামিয়ে দেয়। রিসিভারে মুখ রেখে বলে,

কি হলো কথা বলছো না যে—

না কিছু হয়নি। কবে যাচ্ছ—

আজ—

যাওয়ার আগে কি একবার দেখা হবে—

হবে—

কখন—

দুপুরে লাইব্রেরীতে যাব—

কটা নাগাদ—

সাধারণতঃ যে সময় যাই—এই বেলা বারটা-সাড়ে বারটা—

ঠিক তো—

হ্যাঁ, ছেড়ে দিই এবার—

আচ্ছা—

রিসিভার নামিয়ে শবরী আবার খাটের ওপর গিয়ে বসে। নলিনাক্ষবাবু হাতের কাগজ থেকে মুখখানা তুলে বলেন,

আচ্ছা দিদি তুই যখন তোর সেই পলাতক মানুষটাকে ভুলতে পারছিস না—তখন একে নিয়ে আবার খেলা করছিস কেন—

দাদু তুমি হলে সেকেলে মানুষ—এসব বুঝবে না—

এলো চুলের মাথাটা ঘুরিয়ে হেসে বলে শবরী। নলিনাক্ষবাবু সেইভাবেই বলেন,

কিন্তু দিদি পুরোনো চাল যে ভাতে বাড়ে—

ওটা কথার কথা—

তুই বাদুকে জিজ্ঞেস করিস্—

বলে থামেন নলিনাক্ষবাবু। শবরী পাশের জানলার দিকে তাকিয়ে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ আকাশের উড়ন্ত পাখীটাকে দেখে। পরে নলিনাক্ষবাবুর দিকে তাকিয়ে বলে,

কি করি বলো তো দাদু—আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এদের সঙ্গে অভিনয় না করে যে উপায় নেই—

কেন—

এরা জানে না মানুষের সঙ্গে প্রথম সম্পর্ক হলো—মানবিক সম্পর্ক, পড়তে এসেছি বলেই তো পরস্পরের সঙ্গে দেখা—পড়া শেষ হলে আবার যে যার নিজের জীবনের পথে পরিক্রমণ করবো কিন্তু এরা বস্তুকেন্দ্রিক মন নিয়ে কেবল চাওয়া-পাওয়াকে দেখতে চায়। এক্ষেত্রে অভিনয় করা ছাড়া আমার আর কি উপায়—

কোন কথা না বলে নলিনাক্ষবাবু চুপ করে থাকেন। দাদুকে নীরব থাকতে দেখে শবরীও সঞ্চয়িতাখানার পাতা উল্টাতে থাকে।

দশ দিন কেটে গেল। শবরী ফেরে নি। নিখিল প্রতিদিন ওদের বাড়ীতে টেলিফোন করে। আর চাকর একই জবাব দেয়, 'দিদিমণি এখনও ফেরে নি।' দেখতে দেখতে পনের দিন পার হয়ে গেল। তখনও শবরী আসে নি। এমন কি একখানা চিঠিও নিখিলকে দেয় নি। নিখিল ক্রমশঃ অধৈর্য্য হয়ে ওঠে।

যাবার দিন শবরী ওকে বলেছিল, সমস্ত পেপারের নোট ফিরে এসে ছুটির মধ্যে কমপ্লিট করবে। এমন কি নিখিলকে বার বার অনুরোধ করেছিল, সিক্সথ পেপারের ইম্পর্টান্ট নোটগুলো শেষ করে রাখতে। ওর কথামত নিখিল প্রায় পনেরটা নোট তৈরী করেছে। কিন্তু শবরী ভদ্রতা করে একখানা চিঠি পর্য্যন্ত আজও দিলো না। রাগে ক্ষোভে নিখিল যেন অসহায় হয়ে পড়ে। ভাবে, তবে কি শবরী আমাকে কোনদিন ভালবাসবে না? এবার দেখা হলে এ সম্পর্কে একটা খোলাখুলি আলোচনা করা দরকার। ষোল দিনের দিন ও আবার শবরীদের বাড়ীতে টেলিফোন করে। চাকর জানায়, 'দিদিমণি এসেছে। দাদুকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গেছে এবং নিখিলকে বিকেল পাঁচটার সময় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে থাকতে বলেছে।' খবর শুনে ক্ষোভে ও ফেটে পড়ে। ইচ্ছে হয় ওর তখনই যেন শবরীর সঙ্গে দেখা করে বোঝাপড়া করে আসে।

নিখিল আগেই উপস্থিত হয়েছে। ভিক্টোরিয়ার মাঠে না গিয়ে বিড়লা প্লানেটোরিয়ামের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বাস থেকে নেমে রাস্তা পার হয়ে শবরী ফুটপাতের ওপর ওঠে। বাঁদিকে ঘুরতে দেখতে পায় ও নিখিলকে। কাছে এসে হাসতে হাসতে বলে,

খুব রেগে গ্যাছো তো—

নিখিল সে কথার জবাব না দিয়ে বলে,

চলো এগোই—

বাতাসে উড়ে যাওয়া দুটি বৃন্তচ্যুত ফুলের মত ওরা ধীরে ধীরে চলতে থাকে। শবরী প্রথমে বলে,

ওখানে গিয়ে দাদুর শরীর খারাপ হয়েছিল—তাই এত দেরী হয়ে গেল—

নিখিল জবাব দেয় না। কিছুক্ষণ দু'জনে নিস্তব্ধ হয়ে চলে। পরে গম্ভীর স্বরে নিখিল বলে,

আচ্ছা শবরী, তুমি যে এতদিন বাইরে রইলে—সত্যিই কি একবারও আমার কথা মনে পড়েনি তোমার—

কেন পড়বে না—কতবার ভেবেছি তাড়াতাড়ি ক'লকাতা গিয়ে নোটগুলো দু'জনে মিলে কম্প্লিট করবো—

কেবল পড়ার সঙ্গেই তোমার আমার সম্পর্ক—তাই বুঝি চিঠি লেখার প্রয়োজন মনে করোনি—

প্লিজ নিখিল—তুমি ওভাবে কথা বোলো না—বিশ্বাস করো দাদুর অসুখ নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম—বেড়ানোটা মাটী হয়ে গেল—

একটু থেমে শবরী ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে,

কিন্তু নিখিল—তুমি বোধ হয় ভুলে গ্যাছো—আমাদের

দুজনের পরিচয় পড়াকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে এবং সেই সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানবিক সম্পর্ক—

এছাড়া আর কি কিছুই নেই শবরী ?

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ফুটপাত থেকে নেমে শবরী বলে,

দেখে রাস্তা পার হও—অন্যমনস্ক হয়ো না—

রাস্তা পার হয়ে দু'জনে ফুটপাতে ওঠে। ভিক্টোরিয়ার পাচিলের ধার ঘেঁষে ওরা চলে। শবরী বলে,

চলো ভেতরে কোথাও বসে কথা বলা যাবে—

দু'জনে বাগানের ভেতর যায়। একটা বড় গাছ দেখে সেদিকে এগোয়। জায়গাটাতে গিয়ে নিখিল ব্যাগটা মাটীতে ছুড়ে ফেলে দেয়। পরে ফুল প্যান্টের ভাঁজটা দু'হাতে ধরে আড় হয়ে বসে পড়ে। শবরী জুতো খুলে ঘাসের পরশ প্রথমে পা দিয়ে অনুভব করে। চারদিক একবার ভাল করে দেখে নেয়। ছড়ানো বাদামের খোসা-গুলো পা দিয়ে সরিয়ে বসে।

কিছুক্ষণ কেটে যায়। পা' দুটো ছড়িয়ে শবরী বলে,

বেশ লাগছে, না নিখিল—মাথার ওপর নীল আকাশ নীচের শান্ত পৃথিবী—পাশে রঙ বেরঙের কত ফুল—অদ্ভুত পরিবেশ—

নিখিল মনে মনে গুমরছিল। কিন্তু বাইরে সে কিছুই প্রকাশ করে না। আজ তাকে একটা বোঝা-পড়া করতেই হবে। তাই মনের আসল রূপকে গোপন করে, সে শবরীর কথায় সায় দিয়ে বলে,

সত্যিই খুব সুন্দর—সুন্দরকে আরও রমণীয় করে তুলেছে তোমার অস্তিত্ব—বিশেষ করে কতদিন পরে আবার আমাদের দেখা—শবরী হাসে, কিন্তু মনে মনে ভাবে নিখিলের রাগ হঠাৎ কমে গেল কেন! কৌতুহলী মন নিয়ে সে নিখিলের দিকে তাকায়। নিখিল বলে,

আচ্ছা শবরী—আমরা এতদিন ধরে পরিচিত হয়েও যেন কতদূরে—

কতদূরে কেন—আমি তো তোমার পাশেই বসে আছি—

তা আছো—কিন্তু এই বন্ধুত্বকে কি আরও দৃঢ় করা যায় না শবরী—

কেন যাবে না—মন থাকলে সমস্ত অনুভূতিকেই দৃঢ় করা যায়—

কিন্তু মাঝে মাঝে যে ভয় হয়—হয়তো একদিন আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো—

এটা তোমার অহেতুক আশঙ্কা—

একটু থেমে দূ'রের সোনালী ফুলে ঢাকা গাছটাকে দেখিয়ে শবরী আবার বলে,

দেখেছো কি সুন্দর ফুল ফুটেছে—

হ্যাঁ—

কিন্তু দু'মাস পরে এসে দেখবে—ঐ ফুল ঝরে গেছে কঙ্কালের মত বেরিয়ে পড়েছে মোটা আস্তিন ঢাকা গাছের দেহটা—

তাতো হবেই—

উদাস ভাবে জবাব দেয় নিখিল। একটু থেমে শবরী বলে চলে

তবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা ভেবে এখন থেকেই শঙ্কিত হচ্ছো কেন ? ফুলতো একদিন ঝরে পড়বেই তা বলে যতক্ষণ সে ফুটে থাকে ততক্ষণ তো সে মিথ্যে নয় ? এই রঙের মেলা দেখে আজ আমরা যে আনন্দ পেলাম দু'মাস পরে ফুলহীন গাছ দেখে সে আনন্দতো নাও পেতে পারি, কিন্তু আজকের আনন্দ কি মিথ্যে ?

কিন্তু শবরী মানুষের জীবন কি এত ক্ষণস্থায়ী বস্তু নিয়ে চলে—

কেন চলবে না নিখিল ? সুদখোরের মত জীবনকে এত নিঙড়ে উপভোগ করতে চাও কেন ? যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকু নিয়েই তো তৃপ্তি পেতে হয়

তা ঠিক কিন্তু তবু তোমাকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে পেতে চাই শবরী—

ঘনিষ্ঠভাবে ?

বলে শবরী হাসে, সে হাসি নিখিলকে যেন আরও চঞ্চল করে তোলে। সে হাত বাড়িয়ে শবরীর হাত দুটো ধরে বলে,

হ্যাঁ শবরী—আরও নিবিড়ভাবে একেবারে একান্তভাবে সারাজীবনের মত—

এই রকম একটা সময়ের মুখোমুখি একদিন যে হতে হবে এটুকু শবরী আগেই জানতো। হাতদুটো আস্তে আস্তে গুটিয়ে নিয়ে খুব শান্তভাবে বলে ও

কিন্তু নিখিল আমি যে engaged

engaged ?

নিখিলের মাথায় কে যেন একটা বিরাট হাতুড়ী দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করে। মনে হয় ওর চারপাশ যেন লাটুর মত বনবন করে ঘুরছে!

শবরী সান্ত্বনার সুরে বলে

এত কাতর হয়ে পড়লে কেন নিখিল—আমার সে কনটিনেণ্টে গেছে—বোধহয় অষ্ট্রেলিয়ায় এখন—

বলে একটু থামে, নিখিলের কোন ভাবান্তর না দেখে ও আবার বলে,

জানো নিখিল ও যদি লণ্ডন থেকে বিয়ে করে ফিরে আসে তাহলে বেশ ভাল হয় তাই না—

নিখিল নিশ্চল পাথরের মত বসে থাকে। শবরীর কথা শুনছে কি না বোঝারও উপায়ও নেই। শবরী তাকিয়ে থাকে সিঁদুর-গোলা পশ্চিম আকাশের দিকে, যেখানে অস্তগামী সূর্য্য তার বিদায় বেলার শেষ স্বাক্ষরটুকু রেখে যাচ্ছে।

পুঞ্জীভূত—

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

বিকেলের রোদে আর আল্তো বাতাসে
মনের জমিনে হবে মায়াবী আসর—
চায়ের পেয়ালা তোলে ধূসর আকাশে
বাসনার পুঞ্জীভূত আকাঙ্ক্ষা বিভোর।
ছেঁড়া মেঘে ফাল্গুনের আকাশ সজীব
হৃদয়ের ধারভাঙ্গা নদীর বিস্তার,
একটু পরেতে জ্বলে তারার প্রদীপ—
নিরস্ত উজ্জ্বলা দেখি আগামী সম্ভব।
বাসনার বীজ ধান বোনা হয় ভোরে
শীতের হিমেল হাত ছুঁয়েছে যেখানে,
ফসলের উর্বরতা আসন্ন সম্ভব।
শুরু থেকে ক্রমে ক্রমে হয়েছে বিভোরে
জীবনের পাল তুলে নদীর মোহানে
সফল সজীব জানি আনন্দ-উদ্ভব।

রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী

লীলা বিদ্যান্ত
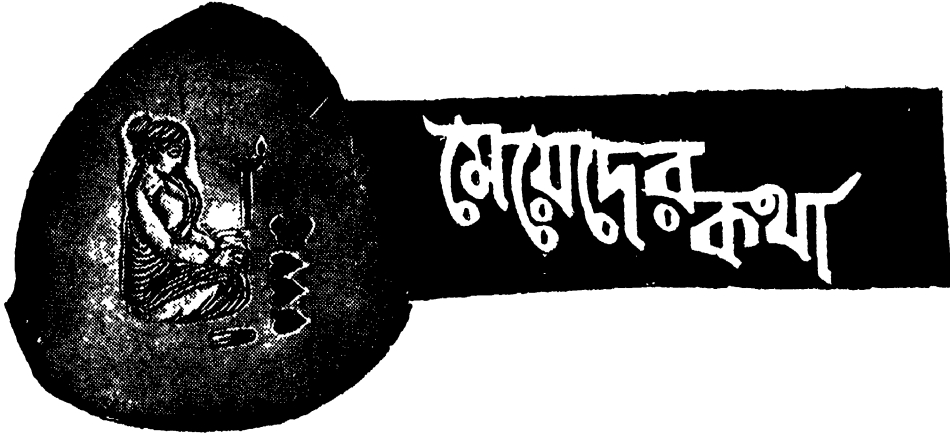
(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

স্মরণ কবির মৃত পত্নীর স্মৃতি নিয়ে লেখা। তাতে কবি লিখেছেন—যতদিন তুমি ছিলে ততদিন নিজেকে গোপন করে সংসারের অন্তরালে আড়াল করে রেখেছিলে। তুমি নম্র হয়ে, নত হয়ে, সংসারের কাজের মধ্যে সংসারকেই প্রকাশ করেছ, নিজেকে প্রকাশ করনি। আজ যখন তুমি চলে গেলে তোমার সমস্ত কর্মের আড়াল চলে গেল। তখনি তোমার পরিপূর্ণ রূপ আমার নিমেষহীন চোখে ধরা দিল।

(স্মরণ—৭, ৮ সং)

নারী যে দিন সংসার থেকে চলে যায় সেদিনই মানুষ বোঝে যে সে কতখানি ছিল। তাকে হারিয়েই তার মূল্য বোঝা যায়। যতদিন সে থাকে ততদিন সে আপন কল্যাণ কাজের অন্তরালে নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে রাখে, এমনি তার নম্রতা।

লিপিকায় "পরীর পরিচয়" কাহিনীতে কবি এই কথাই বলেছেন। নারীর ধর্মই হ'ল এই যে সে যেদিন চলে যায়, সে দিনই সে নিজের পরিচয় রেখে যায়। তার আগে তাকে চেনা যায় না।

রাজপুত্র গেছে শিকারে বনের ধারে। সেখানে তার করেছিল পরী ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না। এই কালো মেয়েকে এ বনের ধারে দেখে সে ভাবল এ নিশ্চয় ছদ্মবেশিনী পরী। রাজপুরীতে তাকে এনে রাজপুত্র রোজ রাতে তাকে বলে তার আপন রূপে দেখা দিতে। কালো মেয়ে ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে থাকে, কেমন করে সে আপন পরীর পরিচয় দেবে তা ভেবে পায় না। অবশেষে যেদিন রাজপুত্র তার মধ্যে পরীকে দেখতে না পেয়ে রাগ করে তাকে বলল যে আজ রাতে তাকে নিজ রূপে দেখা দিতেই হবে, সেদিন সে রাজপুরী থেকে চলে গেল। তখন রাজপুত্র সবাইকে বলল, ও যে পরী ছিল, তাই চলে গিয়ে আপন পরিচয় দিয়ে গেল।

মানুষ নারীর মধ্যে যে পরীকে খোঁজে ঘরের মধ্যে তাকে না পেয়ে অনেক সময় তার অনাদর করে। কিন্তু যেদিন সে চলে যায় সে দিন পুরুষ নারীর সত্য মূল্য বুঝতে পারে।

কবি প্রিয়তমাকে মিনতি করছেন যেন আজ মৃত্যুর মধ্য থেকেও সে তার জন্য তার প্রাণের একটি প্রান্তে, একটি প্রদীপ, একটু খানি স্মৃতির আলোক শিখা জ্বেলে রেখে দেয়। পুরুষের সমস্ত কর্মজাল, তার বহু কীর্তি ও

থাকে যদি না এ সবের অন্তে অন্তঃপুরে একখানি প্রীতি স্নিগ্ধ হাসি তাকে সমস্ত কর্মের ও কীর্তির ক্লান্তি থেকে ছুটি দেয়। পুরুষের নানা দর্প নানা চেষ্টা তার জীবনকে উদ্ধত, অশান্ত করে রাখে। ঘরে ফিরে এসে যখন সে নম্র নত শিরে একখানি প্রেমের পায়ে প্রণতি জানায় তখনই তার জীবনের ঔদ্ধত্য চলে গিয়ে তার জীবন প্রশান্ত স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। নারী পুরুষের চিত্তের বিক্ষোভ, তার ঔদ্ধত্যের উত্তেজনা থামিয়ে দিয়ে তাকে স্নিগ্ধ প্রশান্তির মধ্যে বিরাম দান করে। প্রিয়তমাকে হারিয়ে এই কথা আজ কবি বুঝতে পেরেছেন।

(স্মরণ—৮ সঃ)

প্রিয়তমা কবির জীবনকে পবিত্র করে তুলবার জন্যে যেন আহ্বান জানিয়ে গেছে। প্রিয়ার স্মৃতি মনে করে কবিকে তার জীবন, তার হৃদয়কে পবিত্র করে রাখতে হবে। ঘরের গৃহিণী রূপে যে একদিন কবির গৃহকে মার্জনা করে পবিত্র করে রেখে ছিল, সেখানকার সব আবর্জনা যে জল দিয়ে ধুয়ে নির্মল করে রেখে ছিল, আজও সে-ই চলে গিয়ে কবির হৃদয়কে তেমনি পবিত্র তীর্থ-জলে ধুয়ে দিয়ে পবিত্র করে রাখবে। কবির ঘরের কোণে কোণে যেখানে যত অশোভন আবর্জনা আছে প্রিয়া আজ তা সেখান থেকে তুলে এনে বাইরে ফেলে দেবে। তারপরে পবিত্র নির্মল মন নিয়ে প্রিয়ার সঙ্গে একসঙ্গে বসে দেবতার পূজা করবেন কবি।

নারীর বিরহ এমনি করে কবির চিত্তকে নির্মল করে তুলে তাকে দেবতার সামনে পুজোয় বসবার যোগ্য করে তুলবে, কবি এমনি অনুভব করেছেন।

(স্মরণ—৮ সঃ)

যে প্রিয়া চলে গেছে সেই যেন কবির অন্তরকে শোভন করে, সুন্দর করে, পবিত্র করে রাখতে বলে গেছে। সেই যেন কবিকে পূর্ণতার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকতে বলে গেছে। ঠিক যেমন করে ফুলের কাঁটা বেছে বেছে সেই ফুল দিয়ে সুন্দর মালা গাঁথা হয়, তেমনি কবিকেও আপন জীবনের সমস্ত ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা দূর করে দিয়ে জীবনকে পূর্ণ করে সুন্দর করে তুলতে হবে, প্রিয়তমার এই বাণী যেন কবির কাছে এসে পৌছেচে। জীবন সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতে হবে। সেখানে আর কোন অপবিত্র ভাবনাকে ঠাঁই দেওয়া চলবে না। এমনি করে কবি হারানো প্রিয়ার পবিত্র প্রভাব আপন মনের মধ্যে অনুভব করেছেন। কবি প্রিয়াকে বলছেন—

আমার লাগি তোমারে আর
হবে না কভু সাজিতে
তোমার লাগি আমি
এখন হ'তে হৃদয় খানি
সাজায়ে ফুল রাজিতে
রাখিব দিন যামী।

(স্মরণ)

যে নারী কবিকে জীবনের স্বাদ জানিয়ে গেছে সেই তাকে মরণের মাধুর্য্য জানিয়ে গেছে। প্রিয়তমা যখন মরণের মধ্যে চলে গেছে, তখন মরণ কবির কাছে জীবনের মতই সহজ ও সুন্দর বলে প্রতিভাত হয়েছে। কবি প্রিয়তমাকে বলছেন—

তুমি মোর জীবনের মাঝে,
মিশায়েছ মৃত্যুর মাধুরী।"

... ...

"তুমি মোর জীবন মরণ
বাঁধিয়াছ দুটি বাহু দিয়া।"

প্রিয়াই কবিকে মরণের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে কল্যাণী প্রিয়া যেন কবির কাছে মরণের মঙ্গল রূপ ফুটিয়ে তুলেছে। মরণকে আর কবির ভয় নেই। যে মরণের মধ্যে প্রিয়া মিশে গেছে; সে মরণ আজ কবির কাছেও প্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রিয়া যেন কবির জীবন ও মরণের মধ্যে এক প্রণয় বন্ধন বেঁধে দিয়েছে। মরণের অজানা রূপ, তার বিভীষিকা আজ আর কবিকে ভয় দেখাতে পারে না। কবির প্রিয়া যেন সেই অজানা জগতে যবনিকা তুলে ধরে জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। মরণের নিভৃত মন্দিরে যেন প্রিয়া তার জানালায় প্রদীপখানি জ্বলে বসে আছে কবে কবি সেখানে এসে তার সঙ্গে মিলিত হবেন, এই প্রতীক্ষায়। এমনি করে মরণ কবির কাছে আশার বিষয় হয়ে উঠেছে। মরণ যেন কবিকে তার প্রিয়ার সঙ্গে মধুর মিলনে মিলিত করে দেবে।

নারী তাকে মৃত্যুর পথে আশ্বাস দিয়েছে। কবি নারীর কাছে জীবনে ও মরণে সমান ঋণী। (স্মরণ)।

হারিয়ে যাওয়া প্রিয়া শুধুই যে কবির চোখে মৃত্যুকে মধুর করে তুলেছে তাই নয়, সে তার চোখে জগতের সৌন্দর্য্যকেও সুন্দরতর করে তুলেছে। একদিন বসন্ত দিনের যে সৌন্দর্য্য কবি অন্যমনে খেয়াল করে দেখেন নি আজ প্রিয়া চলে যাবার পরে কবির চোখে তার সমস্ত সৌন্দর্য্য ধরা দিয়েছে। কবির উদাসীন চিত্তকে আজ প্রিয়ার স্মৃতি সজাগ করে তুলেছে। আজ বিরহী কবি-চিত্তের কাছে বসন্তের সৌন্দর্য্যের মাঝে প্রিয়ার দৃষ্টি, তার না বলা কথা, তার মনের প্রণয় ব্যাকুলতা, যেন পুষ্পিত, মুখরিত হয়ে উঠেছে। কবিকে নারী বিরহে ও মিলনে সমান অনুপ্রেরণা দান করেছে। (স্মরণ)

প্রণয়িনী নারী যেদিন অর্দ্ধেক রাতে আবেগের আন্দোলনে শয্যা ত্যাগ করে কবির কাছে এসে তাকে বলেছে যে তুমি চলে গেলে আমার জীবন শূন্য মরুভূমি হয়ে যাবে, কবি তার প্রত্যুত্তরে বলেছেন - তুমি দূরে চলে গেলে তোমার আমার মধ্যকার বিরহের আকাশ আমার বেদনার গানে ভরে উঠবে। কবির কাছে নারী কোন রূপেই রিক্ততা বা শূন্যতা বহন করে আনে না। যেমন মিলনে তেমন বিরহে নারী তার গানের পসরা ভরে ভরে তোলে। (ক্রমশঃ)

সুপর্ণা দেবী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গত সংখ্যায় পিঠের স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য, মেরুদণ্ডের সুঠাম-গঠন ও কোমরের সাবলীলতা (Flexibility) বজায় রাখার উপযোগী যে সব সহজ-সরল 'ঘরোয়া' ব্যায়াম-পদ্ধতি নিত্য-নিয়মিতভাবে অনুশীলনের প্রসঙ্গালোচনা করেছি, এবারেও সে সম্বন্ধে আরো কয়েকটি মোটামুটি হদিশ দিচ্ছি।

আধুনিক রূপচর্চ্চা-বিশারদ ও অভিজ্ঞ-চিকিৎসকেরা পিঠের মেদ-বাহুল্য কমানো, মেরুদণ্ড দৃঢ়-সুঠাম ও দৈহিক-সাবলীলতা বজায় রাখা এবং রক্ত-চলাচল প্রক্রিয়া সুস্থভাবে সম্পাদনার জন্য সহজসাধ্য যে সব বিশেষ-ধরণের ব্যায়াম-ভঙ্গী অনুশীলনের নির্দ্দেশ দিয়েছেন, আপাততঃ তারই উল্লেখ করছি।

পিঠের চর্ব্বি কমানো এবং রক্ত-চলাচল সুস্থভাবে সম্পাদনার জন্য যে ব্যায়াম-ভঙ্গীটি অভ্যাস করা প্রয়োজন, সেটি হলো—সমতল মেঝে কিম্বা খাট-তক্তাপোষের উপর দেহটিকে সটান-সিধা রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে, মাথার পাশ দিয়ে দুই হাত যথাসম্ভব প্রসারিত করে দিন। তারপর ধীরে ধীরে নিশ্বাস-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে শয্যা থেকে কোমর অবধি দেহাংশ উর্দ্ধে উঠিয়ে বসুন। এভাবে উঠে-বসবার সময়, লক্ষ্য রাখবেন—দুই পায়ের হাঁটু যেন শক্ত (Stiff) এবং দুই পায়ের গোড়ালি যেন মেঝে বা শয্যার সঙ্গে দৃঢ়-নিবদ্ধ থাকে। এমনি ভঙ্গীতে উঠে-বসে, কোমর পর্য্যন্ত দেহাংশকে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে, দুই হাতের আঙুলের ডগার সাহায্যে দুই পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করুন। তারপর পুনরায় ধীরে ধীরে নিশ্বাস-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কোমর-পর্য্যন্ত দেহাংশকে সুমুখ-দিক থেকে পিছন-দিকে হেলিয়ে আবার শয্যা বা মেঝের উপর (ব্যায়াম-ভঙ্গীর প্রথমাবস্থায় যেমনভাবে প্রসারিত করে রেখেছিলেন) ন্যস্ত করে রাখুন। উপরোক্ত এই ব্যায়াম-ভঙ্গীটি প্রত্যহ নিয়মিতভাবে অন্ততঃপক্ষে ১০ ১২ বার অনুশীলন করলে, অচিরেই যথেষ্ট উপকার পেতে পারেন।

মেরুদণ্ডের 'সাবলীলতা' বজায় রাখার উপযোগী বিশেষ-ধরণের ব্যায়াম-ভঙ্গীর সাধন-রীতি হলো—উপরোক্ত ব্যায়াম ভঙ্গীর মতোই সমতল শয্যা বা ঘরের মেঝের উপর সটান-সিধাভাবে চিৎ হয়ে শুয়ে হাত দুখানিকে মাথার দুই পাশে সুপ্রসারিত করে দিয়ে, কোমর-পর্য্যন্ত দেহাংশকে শয্যায় ন্যস্ত এবং একত্রে জোড়া দুই পা সিধা-সমানভাবে উর্দ্ধে উঠিয়ে ধীরে ধীরে নিশ্বাস-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মাথার

শিয়রের দিকে নামিয়ে দিন। এভাবে নামানোর সময়, লক্ষ্য রাখবেন—একত্রে জোড়া-লাগানো দুটি পায়ের আঙুল যেন মাথার দুই পাশে প্রসারিত দুই হাতের আঙুলের ডগা স্পর্শ করে। এমনিভাবে পায়ের আঙুলের সঙ্গে হাতের আঙুলের স্পর্শ ঘটিয়েই ধীরে ধীরে নিশ্বাস-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দুই পা পুনরায় উর্দ্ধে উঠিয়ে ব্যায়াম-ভঙ্গীটির পূর্ব্বাবস্থায় (অর্থাৎ, শয্যার উপরে আগের মতোই দুই পা ন্যস্ত ও প্রসারিত করে) ফিরিয়ে আনুন। এই হলো—এ ব্যায়াম-ভঙ্গীটির মোটামুটি অনুশীলন-বিধি। আধুনিক রূপচর্চ্চা-বিশারদ ও অভিজ্ঞ-চিকিৎসকদের মতে, মেরুদণ্ডের সাবলীলতা ও রক্ত-চলাচল ক্রিয়া অব্যাহত রাখার উপযোগী, বিশেষ-ধরণের এই ব্যায়াম-ভঙ্গীটি প্রত্যহ নিয়মিতভাবে অন্ততঃপক্ষে ১০।১৫ বার অভ্যাস করা প্রয়োজন। তাঁদের অভিমত হলো—নিত্যনিয়মিত উপরোক্ত ব্যায়াম-ভঙ্গী দুটি অনুশীলনের ফলে, দেহের গঠন ও স্বাস্থ্য শরীরের মেদ-বাহুল্য ও মেরুদণ্ডের 'সাবলীলতা' উত্তরোত্তর সুঠাম-সুন্দর হয়ে উঠবে। দেহের কোমলতা, লাবণ্য শ্রী অটুট-অক্ষুণ্ণ থাকবে সুদীর্ঘকাল এবং রূপ-মাধুর্য্যে মোহনীয়তাও বাড়িয়ে তুলবে অনেকখানি।

স্থানাভাবের কারণে এবারে এইটুকুই হদিশ দিয়ে রাখছি। আগামী সংখ্যায় সুন্দর স্বাস্থ্য ও দেহ-গঠনের উপযোগী আরো কয়েকটি সহজ-সরল বিশেষ-ধরণের ব্যায়াম-ভঙ্গী সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করার বাসনা রইলো। [ক্রমশঃ]

শিশুদের পশমী কোট

শোভনা দেবী

শীতের মরশুমে পশমী পোষাক পরিচ্ছদের বিশেষ প্রয়োজন—বিশেষভাবে ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য। অথচ ইদানীং পশমী পোষাকের দাম বাজারে এত বেশী, যে সাধারণ গৃহস্থের সংসারে অর্থাৎ, যেখানে দু-চারটি সন্তান আছে, সেক্ষেত্রে প্রচুর অর্থব্যয় করে দোকান থেকে খরিদ করে প্রত্যেকের প্রয়োজন মেটানো প্রায়-অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে যে সব বাড়ীতে মহিলারা নিজের হাতে অল্প-বিস্তর পশমী পোষাক-পরিচ্ছদ বোনার কাজ করেন, তাঁদের অবশ্য অনেকখানি সুবিধা হয়—এ ব্যাপারে। তাই যে সব মহিলা ঘর-সংসারের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ কর্ম্মের অবসরে নিজের হাতে পশমী-পোষাক-পরিচ্ছদ বোনার অনুশীলন করেন, তাঁদের সুবিধার্থে এবারে ছোট ছেলেমেয়েদের ব্যবহারোপযোগী বিশেষ এক-ধরণের পশমী-সোয়েটার বুননের নমুনা-পদ্ধতির হদিশ দিচ্ছি। এ ধরণের সোয়েটার, দেখতে কেমন ছাঁদের হবে, নীচের ছবিতে তার মোটামুটি নমুনা পাবেন।
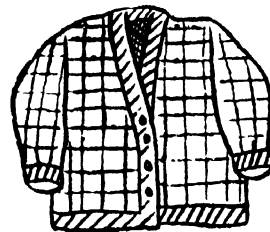
ফর্দ্দ দিই অর্থাৎ এ ধরণের পশমী-সোয়েটার বুনতে উপকরণ চাই—

২ আউন্স পছন্দমতো ও প্রয়োজনানুযায়ী রঙের ৩-প্লাই (3-ply baby wool) "বেবী-উল", একজোড়া ভালো এবং মজবুত-ধরণের ৯-নম্বর সাইজের পশম-বোনার কাঁটা। এগুলি ছাড়া পশমীপরিচ্ছদ সেলাই করে বসানোর উপযোগী মানানসই এবং পছন্দমতো রঙের ও আকারের গোটা চারেক সৌখিন-সুন্দর বোতাম।

এ সব সরঞ্জাম সংগ্রহ হবার পর, বোনবার পালা সুরু করতে হবে।

আলোচনার সুবিধার্থে ধরে নেওয়া যাক্ পরিকল্পিত পশমী-পোষাকটির নীচের কিনারা থেকে কাঁধ পর্য্যন্ত অংশের মাপ হলো—১১" ইঞ্চি এবং জামার হাতের (হাতের পটি-সহ) মাপ ১০" ইঞ্চি। এই মাপ-হিসাবে পশমী-পোষাকটিকে আগাগোড়া নিম্নোল্লিখিত বিধিতে বুনে যেতে হবে।

গোড়াতেই জামার পিছন-দিকের অংশ রচনার জন্য বোনার কাঁটায় ৭৮ ঘর তুলুন। এই ঘরগুলি তোলার পদ্ধতি হলো—

প্রথম লাইন—* ২টি সোজা, ২টি উল্টো ;
*-চিহ্নিত অংশ থেকে এভাবে আবার বুনে যেতে হবে। কাঁটার শেষে ২টি ঘর থাকবে। ২টি সোজা।

দ্বিতীয় লাইন—* ২টি উল্টো, ২টি সোজা ; *-চিহ্নিত অংশ থেকে আবার বুনে যেতে হবে। কাঁটার শেষে ২টি ঘর থাকবে। ২টি উল্টো।

তৃতীয় লাইন—দ্বিতীয় লাইনের অনুরূপ বুনতে হবে।

চতুর্থ লাইন—প্রথম লাইনের অনুরূপ বুনবেন।

পঞ্চম লাইন—প্রথম লাইনের অনুরূপ।

ষষ্ঠ লাইন—দ্বিতীয় লাইনের অনুরূপ।

অতঃপর 'ষ্টকিং ষ্টিচের' (stocking stitch) রীতিতে ১ কাঁটা সোজা, ১ কাঁটা উল্টো হিসাবে নীচের দিক থেকে ৯" ইঞ্চি অংশ বুনতে হবে।

তারপর জামার বগলের অংশের উভয়-দিকে ২ লাইনে বোনার আরম্ভে ৪টি করে ঘর বন্ধ করে দেবেন। এবারে কাঁটার আরম্ভ ও শেষে ৪ বার ১-কাঁটা অন্তর ঘর কমিয়ে দিতে হবে। কাঁটায় তাহলে দেখবেন—৬২ ঘর রয়েছে। এখন কোনো ছাঁট না দিয়ে 'ষ্টকিং-ষ্টিচ' (stocking stiteh) রীতিতে জামার বগলের গোড়া (সুরু) থেকে ৩" ইঞ্চি অংশ বুনে যাবেন। উল্টো-দিকে বোনা শেষ করবেন।

এবারে বুনতে সুরু করুন—জামার কাঁধের অংশ। এ কাজটুকু করতে হবে নিম্নলিখিত রীতিতে :

সব সোজা ঘর তুলুন ; কাটার শেষে ৭ ঘর থাকবে। কাঁটা ঘুরিয়ে নিয়ে উল্টো বুনে যাবেন ; কাঁটার শেষে ৭ ঘর রাখবেন এবং ঘুরিয়ে বোনবার সময়, প্রথম ঘর না বুনে কাটায় তুলে নেবেন। তারপর কাঁটা ঘুরিয়ে নিয়ে সোজা বুনবেন ; কাঁটার শেষে ৪ ঘর থাকবে। এবারে কাঁটা ঘুরিয়ে নিয়ে সোজা বুনুন, কাঁটার শেষে ২১ ঘর রাখবেন। পুনরায় কাঁটা ঘুরিয়ে নিয়ে সব ঘর সোজা বুনে যাবেন এবং পরের লাইনটি বুনবেন উল্টো। তারপর সব ঘর বন্ধ করবেন কিম্বা ২১ ঘর সোজা, ২০ ঘর বন্ধ করে দেবেন।

এমনিভাবে বুনে গেলেই পশমী-পোষাকের পিছন অংশ বানানোর কাজ শেষ হবে।

অতঃপর, পশমী পোষাকের সামনের অংশ বোনার কাজ সুরু করতে হবে। সে কাজ কি উপায়ে করবেন, স্থানাভাবের কারণে, এবারে সে আলোচনা মুলতুবী রাখতে হলো। আগামী সংখ্যায় এ সম্বন্ধে যথা প্রয়োজন হদিশ দেবো।

[ক্রমশঃ

চলার পথে

শ্রীতাপস বন্দ্যোপাধ্যায়

ছিঃ।

ছিঃ, ছিঃ, তুই এতো নীচ, এতো ছোট। সর্বগ্রাসী মনে তোর এক বিন্দু বাচ-বিচার নেই। শেষে তুই কিনা আমারই ঘরের দিকে হাত বাড়ালি? দু'হাত দিয়ে গ্রাস করে নিলি আমারই একমাত্র চোখের মণি বাবুইকে। তোর এক বিন্দু লজ্জা করল না আমার সামনে তুলে ধরতে বাবুই এর ফ্যাকাশে নিষ্প্রাণ দেহটাকে। যে দেহ আজ চার বছরে ক্ষণকালের জন্যেও স্থির থাকে নি, সেই দেহকে তুই গলা টিপে আধ ঘন্টাতেই তিন দিনের বাসি মাছের স্পর্শ ছোঁয়ালি।

এক মুহূর্ত্ত ভাবলি না, এতদিন আমি তোর কত উপকার করে এসেছি। রামবাবুর ছোট ছেলেটা যখন দুপুরে তোকে লক্ষ্য করে ইট ছুঁড়তো, খান খান করে দিতো তোর কোমল দেহটাকে, তখন আমি তাকে শাসন করে বাধা দিয়ে তোকে রক্ষা করিনি? এত সহজে ভুলে গেলি সেবারের দোল যাত্রার কথা? পাড়ার সব বকাটে ছেলেরা যখন রঙ মেখে তোকে জড়িয়ে ধরে রঙে রঙে রাঙ্গা করতে বসেছিল, তখন আমিই ছুটে গিয়ে তাদের তাড়িয়ে দিয়ে তোকে রক্ষা করিনি?

এ সব ঋণ আজ তুই ভুলে গেলি? সত্যই কত বেইমান, কত নিষ্ঠুর তুই!

বেশ, অতীতের মালা শুকিয়ে যাওয়াতে তুই তা ফেলে দিতে পারিস, কিন্তু ওপারের ঐ সর্বদ্রষ্টা মানুষটা? কিছুই ফেলে না, কিছুই ফেলেনি। সব কিছু গলায় পরে এখনও বসে আছে। স্মৃতির মালা গুণে গুণে সে তোকে তোর হিসাবের পাওনা কড়ায় গণ্ডায় একদিন চুকিয়ে দেবেই। বুঝিয়ে দেবে পাপের শাস্তি কি? সন্তান হারানোর জ্বালা মায়ের বুকের কোথায় কি বাজে।

সরমা আর নিজেকে সামলাতে পারল না। অর্দ্ধ-বিবস্ত্র দেহটাকে কোন রকমে হেঁচড়ে টেনে এনে ফেলল বাবুয়ের দেহটার ওপরে। সন্তানের স্পর্শে তার সব দপদপানি শেষ হয়ে গেল মুহূর্ত্ত মধ্যে। সরমা জ্ঞান হারাল।

তার চোখের জল গড়িয়ে এসে ভিজিয়ে দিল বাবুয়ের ফ্যাকাশে মুখটাকে। ঠোঁটে বসা রঙচঙা ভান-ভানে মাছিটা উড়ে গেল জলের স্পর্শে। টানা টানা চোখ জোড়া কিন্তু তেমনিভাবেই পলকহীন নয়নে তাকিয়ে রইল পবিত্র আকাশের পানে। হয়তো আকাশের মানুষটার কাছে চাইল তার এই অপঘাত মৃত্যুর বিচার। খুনী নর্মদার কিন্তু সেদিকে এতটুকু ভ্রুক্ষেপ নেই। দেহের কোথাও জেগে নেই বিন্দুখানেকও লজ্জা। আগের মতই সে দেহকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ভরা যৌবনবতীর সাজ সেজে গুন গুন সুর ভেজে এগিয়ে চলল দূর থেকে দূরান্তরের পথে।

যাবার সময় তার গুনগুননির সংলাপ কিছুই শোনা গেল না। শুধু তার চলার ভঙ্গি দেখে ঠাওর হল সে বোধহয় ব্যঙ্গ করে বলে গেল 'আমি তো শুধু ক্রিয়ার ফল কর্ম, আসল কর্ত্তা তো তিনি। বিচার যদি করতে চাও তবে তারই কর। শুধু শুধু কেন আমাকে শাপ-শাপান্ত দাও?'

তেমনি ভাবেই সে আবার ফিরে আসে অজানা দূর থেকে চেনা কাছে। এবারেও তার দেহ-মনে সেই একই অভিব্যক্তি। এবারেও ভাষার কলি কিছুই কানে যায় না।

যাবে কি করে?

নদী কি কথা বলতে পারে?

সে যে বোবা!

———
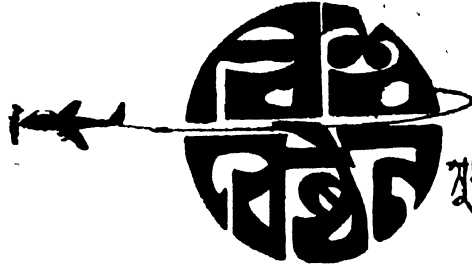
(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

টোরণ্টো

(১৪)

শুক্রবার সকালে Buffalo Evening Newsএর Metropolitan page এ আমার এখানে আগমনকে কেন্দ্র ক'রে সংবাদ প্রকাশিত হ'য়েছিল।

"Calcutta Aide
Studies Buffalo
Sanitary System

The Chief Engineer of the Calcutta Metropolitan Planning Organisation today concluded a three-day visit of Buffalo area water distribution and sewage collection and treatment facilities.

Sudhananda Chatterjee said the Indian city is planning such new facilities to serve a 6 million population in a 470 square miles metropolitan area. He inspected the facilities of the Buffalo Sewer Authority, City Water Division, Erie Country Water Authority and other cerenty agencies."

সেই শুক্রবারেই সন্ধ্যার 'মোহক' কোম্পানীর পাখা-ঘোরা ছোট বিমানে চ'ড়ে রাত্রি আটটার সময় টোরণ্টোর বিমান বন্দরে পৌছলাম। বিমানটি ছাড়তে দেরী ও ফলে পৌছতে কিছু বিলম্ব হয়েছিল। আমি উৎসুক নয়নে শুল্ক-গণ্ডির বাইরে বন্ধুবর 'কেন শার্প'কে খুঁজছিলাম। এখানে কানাডার শুল্ক বিভাগের লোক আমাদের মালপত্র পরীক্ষা করবে। কেননা আমি যুক্তরাষ্ট্র থেকে স্বাধীন কানাডা রাজ্যে এসে গেছি। আমার নজর দু'দিকেই ছিল—একদিকে কেন শার্পের সন্ধান, অপরদিকে আমার ব্যাগটী এসে পৌছল কিনা দেখা। বিরাট একটী বড় ঘূর্ণায়মান থেবড়া মোচকের মত যন্ত্রটীর উপর মাল রাখা হচ্ছে। ঐ মোচকটী ঘিরে যাত্রীরা দাঁড়িয়ে আছে। যেমনি যার ব্যাগ ঘুরে তার কাছে আসছে, সে তখনই সেটী ঘূর্ণায়মান যন্ত্রটির উপর থেকে টেনে বের ক'রে নিয়ে বাইরে চলে আসছে।

যাই হ'ক, প্রায় একই সময়ে মালপত্রের ব্যাগ ও বন্ধুবরকে বেড়ার বাইরে দেখতে পেলাম ও দুজনেই হাত নাড়লাম।

সে তার বিরাট নতুন গাড়ী বিমান বন্দরের সামনের গাড়ী-বারান্দায় নিয়ে এল; মাল তার গাড়ীতে চড়িয়ে সহরের উপকণ্ঠে তার নতুন বাড়ীতে এলাম। সেও প্রায় মাইল পনেরো।

বন্ধু স্ত্রী শ্রীমতী ফিলী আমায় প্রীতি-চুম্বন দিলেন।

তাকে বললাম—'কচ ও দেবযানী'র মত বিয়ের আগে তোমাদের গাছের ডাল নুইয়ে চেরী ফুল তোলার ছবি এখনও আমাদের এলবামে আছে। তোমাদের এককপি পাঠিয়েছিলাম, নিশ্চয় মনে আছে। চুলগুলো সব 'কেনে'র জন্য ভাবনায় ভাবনায় তুমি পাকিয়ে ফেলেছ দেখছি। একথা ব'লে আমি যুগপৎ দুঃখিত ও লজ্জিত। শুনেছি মেয়েদের বয়স হয়েছে বলতে নেই নাকি!

হেসে বল্‌ল—'তুমি বলতে পার'।

—'আমি বলব না। কেন আমি বিদেশে এসে অজান্তে আমার অতি প্রিয় নারী হৃদয়ে অহেতুক বেদনা দিতে যাব?

—এ বেদনা নয়। এ যে সত্য কথা এবং নিছক সত্য কথা। মনে যে পূর্ণ শান্তি আছে একথা শপথ ক'রে বলতে পারব না।

ভাই ব'লে কেউ ছিল না। হ্রদের ধারের সেই বাড়ী বিক্রী হ'য়ে গিয়েছে। এই যে আমাদের বাড়ী দেখছো তাও দু'বার কেনা-বিক্রী ও বাড়ী বদল হ'বার পর। এটা আমাদের কয়েক বছর হ'ল নতুন বাড়ী হয়েছে। তোমার ছেলে কত বড় হ'ল? তারও তোমার নামে নাম নয়?

—আদ্য অক্ষর এক বটে তবে নিশ্চয় বিভিন্ন নাম। বর্তমানে সে তো gentleman at large।

—কেন 'কেনে'র সঙ্গে তোমার ঝগড়া-ঝাঁটি হচ্ছে নাকি? প্রেমের প্রথম পর্বে এর বিন্দুবাষ্পও আমি দেখিনি। আজ থেকে আঠারো বছর আগে তোমরা নিয়ে গেছো আমার বিদেশে অধ্যয়ন জীবনের নিঃসঙ্গ অবসরে সঙ্গ দিতে নায়েগ্রা অঞ্চলে চেরী ও আপেল ফুল ফোটা দেখাতে। নিয়ে গেছো নায়েগ্রার জলপ্রপাতের ধারে, নিয়ে গেছো তোমার বাবার অন্টারিও হ্রদের ধারে মনোরম বাড়ীতে। সে কথা আজও আমার সদ্যফোটা ফুলের মত স্মরণে আছে। সে স্মৃতির রোমন্থনে অতীতের কাহিনী আজ যেন অমলিন। তোমার বাবা কেমন আছেন?

—বাবা আর নেই। তিনি মারা গেছেন। তুমি

ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ ক'রে সরকারী সংস্থায় কাজ করছে। আমাদের দেশে যাকে বলে Gazetted Officer আর তোমাদের দেশে থাকে বলে 'সিভিল সার্ভেন্ট'। মে'গুস্‌ সাহেব তার জন্য কত পুতুল দিয়েছিল—

গেজেটেড্‌ অফিসারের ব্যাপারটা কি রকম?

আমি বললাম—এদের চাকরি, বদলি, ও ছুটি সরকারী গেজেটে ছেপে বেরোয়। আর কোন কোন সরকারী কাজে এদের সইয়ের নাকি খুবই মূল্য। বাড়ীর ছেলেপুলে দেখছি না ব্যাপার কি?

—নেই ব'লে।

—ওঃ।

বুঝলাম, তার মনে শান্তি নেই কেন। তার ব্যথার কারণটা বুঝতে আর বাকী রইল না। তারা প্রতি বছর আমার কার্ড দেবার অপেক্ষা না রেখে আমায় অতি দামী 'ক্রীসমাস্ কার্ড' পাঠিয়ে গেছে ও যাচ্ছে। আমরাও এখান থেকে মাঝে মাঝে পাঠিয়েছি। কোন দিন মনে হয়নি এ সব সাংসারিক খবর নেবার কথা। 'কেন' আমার টোরণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের সহাধ্যায়ী, অতি সহানুভূতিশীল ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমাদের মনের গোপন কথা পরস্পরের কাছে অপ্রকাশ রাখতাম না। বাগদত্তা অবস্থায় ফিলীকেও আমি চিনতাম। তার বিয়ে যখন হয় তখন আমি নভস্কোশিয়া প্রদেশের হ্যালিফ্যাক্স সহরে। সেখান থেকে ব্যক্তিগত উপস্থিতি দিতে পারিনি সত্য কিন্তু প্রীতি উপহার আমার স্ত্রী কলকাতা থেকে পাঠিয়েছিলেন। সেই বিবাহের উপহারের ফুলদানিটী সে আজও আঠারো বছর বাদে যত্ন ক'রে রেখেছে তাদের টেবিলে সাজিয়ে। সেটী আমায় দেখালো। সেটা দেখার সৌভাগ্য এর আগে আমার হয়নি। গৃহিণীকে বিবাহের কিছু উপহার পাঠাবার কথা ব'লেই নিশ্চিন্ত ছিলাম। তিনি কলকাতা থেকে তাদের ঠিকানায় পাঠিয়েছিলেন, তখন আমি কানাডায় নেই। প্রাপ্তি স্বীকারের চিঠি লণ্ডনে পেয়েছিলাম। আমরা গল্প ক'রে চলেছি এখানের বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও 'কেণের' কর্মজীবনের বহু বিবর্তনের কাহিনী ও কথা শুনে। রাত সাড়ে বারোটা বেজে যেতে দেখলাম 'ফিলী'র চোখে ঘুম নেমে এসেছে। বললাম, 'আমাদের এই সব কর্মজীবনের শুষ্ক কাহিনী তোমার ভাল না লাগতেও পারে এবং দেখছি তোমার চোখে ঘুমের ঢুল। অতএব তোমাকে আমাদের দুজনের মাঝে অনিচ্ছুক নীরব শ্রোতা ক'রে বসিয়ে রেখে শাস্তি দেওয়াতে আমি রাজী নই। অতএব আমি অনুরোধ করব, তুমি উঠে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়, যাতে কাল সকাল সকাল উঠতে পার। কাল সকালেই আবার প্রাতরাশ সেরেই বেরুতে হবে। তোমরা যাবে নায়েগ্রা ফলস্-এ এক সম্মিলনে যোগ দিতে আর আমি যাব টোরণ্টোর নানা জায়গায় নানান জনের সঙ্গে দেখাশোনা করতে। সেও তো জানো 'কেণ' সমস্ত বিশদ বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছে।'

—অসংখ্য ধন্যবাদ তোমার নিত্য সহানুভূতিময় মনের জন্য। আমি শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিলাম। কাল সকালে আবার দেখা হবে। আমাদের কথা চলল। আমার ইংরিজির 'সেতু' সম্বন্ধে চিত্রসম্বলিত বইখানি উপহার দিলাম। রাত প্রায় ৯টা বেজে যাবার পর 'কেণ'কে আমি বললাম' এবার বিছানায় আশ্রয় নেওয়া যাক্, কি বল?

পরের দিন অভ্যাসমত ভোরের বেলা ঘুম ভেঙ্গে গেল অতরাত্রে শোওয়া সত্ত্বেও। বাইরে অন্ধকার। ঘরে আলো জেলে বাড়ীতে চিঠি লেখা চলল; অক্সের লেখা চিঠির জবাবগুলো সময়মত লিখে ফেললাম। প্রাতঃকৃত্য সেরে নিয়ে জানালা দিয়ে বাড়ীর বাগানের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলাম দূরের আকাশ, কাছের পৃথিবী, বাতাসের সৌরভময় শীতল আমেজ। বাগানে কতরকমের গাছ। নানারকমের ফুল ফুটেছে। সবুজ 'ল'নের পাশে ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রাচীন দিনের লম্বা একটা ঝোঁকা ওক গাছ আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে ভোরের আহ্বান জানাচ্ছে। বেলা আটটা নাগাদ ফিলী উঠে দরজায় টোকা মেরে আমায় সুপ্রভাত জানিয়ে গেছে। 'কেণ' ও উঠেছে এই খবরও দিয়ে গেল ও বলে গেল যে কেণ আমার প্রাতরাশ তৈরি করতে সুরু করেছে। আমরা তিন-জনেই বেরিয়ে যাব শহরে।

সকালে সাড়ে দশটা নাগাদ Y. M. C. A.-এর সামনে Eatons (ঈটনের) বহুতল সব রকম সামগ্রী বিক্রী করার দোকানের (Departmental Store) চারতলার খাবার ঘরের লাউঞ্জে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য ডঃ বেরী অপেক্ষা করবেন। আজ 'নায়েগ্রা ফলস্' এর সম্মিলনে কেণেরও যোগ দেবার কথা। তাই দুজনকেই দুপুরে সেখানে পৌঁছতে হবে। সে ব্যবস্থা করেছে শনিবার সকালে ডঃ বেরী (আমার টোরণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, প্রাক্তন American Water Works Association, American Sewage Works Association-এর সভাপতি ও বহুদিন কানাডীয় শাখার সচিব ও কোষাধ্যক্ষ ছিলেন) সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। তিনি আমায় লাঞ্চের জন্য আমন্ত্রণ করেছেন। রবিবার সারাদিন অধ্যাপক ম্যাক্ ওয়াকিন্‌স'র (Mac Walkinshaw) বাড়ীতে আমার সারাদিনের প্রোগ্রাম। রবিবার

সকালে 'প্রোফেসর ম্যাকিননে'র সঙ্গে দেখা করার কথা। আমার সহপাঠী 'টম্ ওয়ানে'র সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা কেণ' করতে পারেনি। কেণ' আমার Eatons এর বাড়ীর সামনে Y M C A তে একটা ঘর বন্দোবস্ত ক'রে মালপত্র উঠিয়ে দিতে যখন ব্যস্ত তখন ফিলী চ'লে গেল ডঃ বেরী এসেছেন কিনা সন্ধান নিয়ে আসতে। আমরা দুজনে মালপত্র তুলে ঘরে চাবি দিয়ে ফিরে এসে নীচের লাউঞ্জে ব'সে আছি তবুও ফিলীর দেখা নেই। কিছুক্ষণ বাদে ফিলী এসে বলল ডঃ বেরী এসে অপেক্ষা করছেন। ফিলীও প্রাক্ বৈবাহিক যুগে ডঃ বেরীর অফিসে কাজ করতো। তাই তার সঙ্গে খুবই চেনা। অপেক্ষমাণ ডঃ বেরীর সংবাদ শুনে তাদের বিদায় দিয়ে বললাম

—তোমরা যাও। আমি যাচ্ছি ডঃ এ, ঈ, বেরীর সঙ্গে দেখা করতে।

চার তলায় লিফটে উঠে দেখি অদূরে এক চেয়ারে ডঃ বেরী ব'সে আছেন। আমাদের মধ্যে মাঝে মাঝে পত্র বিনিময় হয়েছে কিন্তু গত আঠারো বছরে দেখা সাক্ষাৎ সম্ভব হয়নি। তিনিও আমায় দেখে উঠে এসে করমর্দন করলেন ও আমরা দুজনে একটা টেবিলের সামনে বসলাম। উনি বললেন উনি এখন অবসর নিয়েছেন তাঁর Ontario Water Resources Commission থেকে। তাঁর বদলে তাঁর সহকারীকে বসিয়ে দিয়ে গেছেন। 'কেণ সার্প' হ'ল সেখানে দু নম্বর কর্তা। প্রায় আঠারো বছর আগে সহকারী ক্যাম্ভার্ট আসতেন ডঃ বেরীর বিকল্পে ক্লাস নিতে। ডঃ বেরীর অন্যান্য কর্ম চাঞ্চল্যে কোন ভাটা পড়েনি। তিনিও যাবেন আজ সন্ধ্যাবেলায় 'নায়েগ্রা ফলস্'এর সম্মিলনে যোগ দিতে। তাঁর প্রৌঢ় দশায় তাঁকে ঘণ্টায় সত্তর মাইল বেগের কমে গাড়ী চালাতে দেখিনি।

আমি বললাম—'মুখ্য কাজ থেকে অবকাশ যখন নিয়েছেন তো চলুন না আমাদের দেশ দিয়ে ঘুরে আসবেন।' আমাদের বৃহত্তর কলকাতার (Master Plan) মাষ্টার প্লানের কথা তাঁকে বললাম। টোরণ্টোর একটী Consulting Engineering ফর্ম পৃথিবীর নানা জায়গায় কাজ করছে। তাঁরা বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে কাজ করছেন। তাঁদের বলুন না। যদি আপনার বাইরে যেতে আপত্তি না থাকে, তো সেই সূত্রেই চলে আসুন এদিকে।'

তিনি তখন আরও বিশদ বিবরণ আমার কাছে জেনে নিলেন। এইরকম কথাবার্তা চলতে লাগলো পৌনে বারোটা নাগাদ; আমরা পরিচারিকাকে লাঞ্চ দিতে বললাম।

লাঞ্চ খেতে খেতে বহু গল্প গুজব, উভয়ের বহু পরিচিত জনার কথা আলোচনা হ'ল। তাঁকে মার্কিন মুলুকে ও কানাডায় সবাই চেনে। এমন কি বোম্বাইয়ের প্রাক্তন মুখ্য বাস্তুকার 'এন, ভী, মোদক' (N. V. Modak) সাহেবও চেনেন।

প্রায় একটা বেজে গেল, আহারে ও কথাবার্তায়। আমরা দুজনে উঠে পড়লাম। তিনি চলে গেলেন নায়েগ্রা ফলসে। আজ শনিবার বলে সকাল সকাল দোকান বন্ধ হবে। তাই ঈটনের দোকানে জিনিষপত্র দেখাশোনা করতে লাগলাম। আমার একটা স্যুট কেনার ইচ্ছে ছিল কিন্তু মনোমত না হওয়ায় সে আকাঙ্ক্ষায় জলাঞ্জলি দিলাম। আমার ছোট্ট টেপ রেকর্ডারের গোটা দুই 'টেপ' কিনে নিলাম। প্রতিটী রিলের দাম ৩০/৩৫ সেণ্ট মাত্র। এর পর ফিরে চললাম আমার বাসস্থানের দিকে।

ক্রমশঃ

———

পথের বাঁকে

মদন চক্রবর্তী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পরের দিন সকালেই রুণুকে নিয়ে সুহাস ফিরে এল মাঠের কুটিরে। আসার সময় কোন বাধা সৃষ্টি করেনি মণীষা। কেবলমাত্র সুহাসকে অনুরোধ করেছিল, বেঁচে থাকতে থাকতে অন্ততঃ আর একবার যেন সে সুহাসের দেখা পায়। অবশ্য সে অনুরোধ রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে সুহাস।

রুণু ফিরে আসতে সব চেয়ে বেশী আনন্দ পেয়েছেন অমিয়বাবু। রুক্ষ মাঠটা আবার যেন আনন্দের কণ্ঠধ্বনিতে ভরে উঠল। কিন্তু 'ওয়াইফ-ইন-ল' আবার চলে গেল 'কুকিং' লাইন থেকে 'কুলি' লাইনে। সে আনন্দ পেল, কি দুঃখ পেল, তা টেরও পাওয়া গেল না।

আরো দু'টো শুকনো মন বাসা বাঁধলো মাঠের ওপরে।

খালটার অনেকখানি বুজে এসেছে। মাটির অনেকখানি রস শুষে নিয়েছে আর এক জাতের মাটি। আর কিছুদিন পরে সম্পূর্ণ খালটা বুজে যাবে। তারপর শুকনো মনটা নিয়ে সুহাস যাবে অন্য কাজে।

রুণুরও শুকনো মনটা উচ্ছ্বাস ভুলে দাদার শুকনো মনে বাসা বেঁধে রইল ভাত তরকারী বানাবার প্রয়োজনে। রুণু হাসবে, পড়বে, খেলবে, সে মনটার দিকে কোন মন যেন আর তাকাতে পারছে না। খালটা যতই ভরাট হয়ে চলেছে, রুণুর উচ্ছ্বাস যেন ততই শুষ্কতার অভাবে জমাট বেঁধে উঠছে ধীরে ধীরে। শেষে খালটা ভরাট হবার আগেই রুণুর মনের আর্দ্রতার ওপর কঠিন প্রলেপের আস্তরণ পড়ে পড়ে সে হয়ে উঠল ভিন্ন প্রকৃতির। দাদার মত সেও জগতকে যাচাই করতে শিখলো, বিচার করতে শিখলো, ছেলে মানুষীর সরলতা দিয়ে সব জিনিষকে সে আর গ্রহণ করতে পারলো না।

ইতমধ্যে কাকীমার চিঠি এসেছে সুহাসের নামে। তাতে এসেছে জ্যাঠাইমার মৃত্যু সংবাদ আর এসেছে রুণুকে বসিয়ে না রেখে চাকরীতে লাগিয়ে দেবার তাগিদ।

জ্যোঠাইমার মৃত্যু সংবাদ রুণুর মনে কোন রেখাপাত করতে পারেনি। দাদার কাছে সে দাবী করেছে যে কোন একটা চাকরী করে কিছু উপার্জন করার ব্যবস্থা করে দেবার জন্যে।

সুহাসও বুঝেছে এ দাবী রুণুর অত্যন্ত স্বাভাবিক দাবী। জীবনকে তৈরী করার আর কোন পথ যখন সে সামনে দেখতে পাচ্ছে না তখন চাকরী করতে চাওয়া ছাড়া অন্য উপায়ই বা কি? তাছাড়া কাকীমার সংসারের চাহিদার দাবীতেও রুণু মাঝে মাঝে বিচলিত হচ্ছে বৈ কি।

কিন্তু জ্যোঠাইমার মৃত্যু সংবাদ সুহাসের কাছে যেন জগতের অন্য একটা রূপ খুলে দিল। সুহাস ভাবল, জ্যোঠাইমার মৃত্যু মানে জগতের একটা মন্দের মৃত্যু। আগামী কালে এই শূন্যতার স্থান পূরণ করবে তাপসী রুণুর দল। মন্দের মৃত্যুর পাশে এসে দাঁড়াবে ভালোর এগিয়ে চলার দল। তারা নিজেদের বলতে পারবে সুখী, আর সেই সুখানুভূতির মধ্যে দিয়ে নিজেদের পরিবেশে আনতে পারবে সত্যকারের সুখ।

খাল ভরাট হবার আগেই সুহাসের ডাক পড়ল অন্য কাজে। কুমুদবাবু বললেন, দেখুন সুহাসবাবু, এবার আমাদের আসল কাজ আরম্ভ হচ্ছে। তার মানে লরী

ভর্তি ভর্তি সিমেণ্ট দিনরাত শুধু এখানে ওখানে যাতায়াত করবে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন যে লরীর সঙ্গে আমার খুব বিশ্বাসী একজন লোক চাই। আমি আপনার কথাই ভেবে রেখেছি। যতই হোক আপনি রাধাগোবিন্দবাবুরও বিশ্বাসী লোক।

লরীর সঙ্গে ঘুরে বেড়াবার কাজের কথা শুনে সুহাস একটু বিচলিত হয়ে উঠল। তার মনে পড়ল বোসবাবুর কথা। এখানকারই সিমেণ্টের বস্তা লোপাট করতে গিয়ে তার চাকরী চলে গেছে।

সুহাসকে চুপ করে থাকতে দেখে কুমুদবাবু বললেন, এ ব্যাপারে চিন্তা বা ভয়ের কিছুই নেই। আপনি নিজে খাঁটি থাকলেই হবে। সরকারী গুদাম থেকে বস্তা গুণে লরীতে তুলবেন আর মাঠ এনে এই অফিসের ধারে গুণে নামিয়ে দেবেন। মাঝে মধ্যে এখান থেকে কিছু বস্তা পৌঁছে দিতে হবে রাধাগোবিন্দবাবুর বাড়ীতে।

শেষ পর্যন্ত সুহাস রাজী হল বটে কিন্তু কুমুদবাবুকে জানিয়ে রাখল যে, কোন রকম অসুবিধে বোধ হলে আবার লরী থেকে সরে গিয়ে অন্য কাজে সে বহাল হবে।

সুহাস বেরিয়ে যাচ্ছিল। কুমুদবাবু দাঁড়াতে বললেন তাকে। তারপর বললেন, আপনার বোন তো দিনরাতই বসে থাকে। তার চাইতে আমাদের এখানে দিয়ে দিন না। কিছু কিছু কাজ কর্ম করে মাস গেলে কিছু টাকা তো পায়। আপনারও তো কিছু সুবিধে হয় তাতে। আজকাল এতে দোষের কিছু তো নেই। অমন কত মেয়েই চাকরী করে সংসার চালাচ্ছে।

এ ব্যাপারে সুহাস কোনদিনই রাজী হতে পারেনি। তাই আজ এ প্রস্তাবে সায় দিতে না পেরে সে বলল, এত তাড়াতাড়ি বোনকে চাকরী করতে দিতে আমি ঠিক রাজী নই। ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে ভাল করে মানুষ করার ইচ্ছে আছে আমার।

অগত্যা কুমুদবাবু আর কোন কথা বললেন না এ ব্যাপারে। শুধু ভদ্রতার খাতিরে বলে উঠলেন, সে তো ভাল কথা।

সুহাস বেরিয়ে এল কুমুদবাবুর ঘর থেকে।

সর্দারজীর মত দুর্দান্ত প্রকৃতির সঙ্গী না থাকলেও কয়েকদিন পরেই সুহাসের মন লরী জীবনের পরিবর্তন চাইল। প্রথমতঃ এতে দায়িত্ব অনেক। বিপদের ঝুঁকিও কম নয়। ইতিমধ্যেই কুমুদবাবু কয়েক লরী সিমেণ্ট পাঠিয়েছেন নানান জায়গায়। সুহাস অনুমান করেছে অমিয়বাবুর ভাষায় ওগুলো গোপন কোন কারবারের ব্যাপার। দ্বিতীয়তঃ রত্ন সারাদিনটাই থাকে চোখের আড়ালে। তাকে এভাবে ফেলে রাখাটা বোধহয় যুক্তি-যুক্ত নয়।

কয়েকদিন পরেই সুহাস এসে দাঁড়াল কুমুদবাবুর সামনে।

কুমুদবাবু সুহাসের প্রস্তাব শুনে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করলেন, এবং বললেন, এ রকম রোজ রোজ লোক বদল করলে তো আমাদের কাজ চলে না।

বলে, একটু থেমে আবার তিনি বললেন, বোনকে একা ফেলে রেখে কাজ করার অসুবিধে বুঝেই তো বলে-ছিলাম, আমাদের এখানে লাগিয়ে দিতে। চাকরী করাও হবে, রোজগারও হবে, আবার আমাদের নজরেও থাকবে। তাছাড়া এখানে অনেক মেয়ে তো কাজ করছে, সে সঙ্গীও তো পেতো দু'চারজন।

সুহাস বিনীত সুরে কুমুদবাবুকে বোঝাবার চেষ্টায় বলল, চাকরী করতে দিতে আমার যে খুব আপত্তি ছিল তা তো নয়। আর একবার চাকরীর নেশায় পেয়ে বসলে পড়াশুনা করার চেষ্টাটা একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে।

—কেন, চাকরী করে কি কেউ পড়াশুনা করে না? তাছাড়া আপনি যা মাইনে পান তাতে বোনকে যে 'মিশ-নারী স্পিরিটে' মানুষ করতে পারবেন বলে তো আমার মনে হয় না।

এর পর আর কোন কথা চলে না। তাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সুহাস।

সুহাসকে চুপ করে থাকতে দেখে, কুমুদবাবু বললেন, না সুহাসবাবু, আপনি আমার কাছ থেকে শুধু শুধু কোন সাহায্য পাবেন না। আপনি লরী ছেড়ে যদি অন্য কোন কাজে যেতে চান তাহলে রাধাগোবিন্দবাবুর কাছ থেকে চিঠি লিখিয়ে আনুন। আমি আপনাকে লরী থেকে অন্য কোন কাজে পাঠাবো না।

এ কথারও কোন জবাব হয় না। জবাব দিতে গেলে

অন্য কোন কাজের প্রত্যাশা না করেই কাজ ছেড়ে দিতে হয়। কুমুদবাবু বললেও তাঁকে বাদ দিয়ে রাধাগোবিন্দবাবুর কাছে যাওয়া চলেনা। যেতে গেলে কুমুদবাবুর সঙ্গে চ্যালেঞ্জ নিয়ে বাস করতে হয়। সুতরাং চাকরী করতে হলে কোনটাই করা চলে না। তা সত্ত্বেও সুহাস মনে মনে ভাবল, কুমুদবাবুর এতবড় অন্যায়ও সহ্য করা মানুষের উচিত কাজ নয়। সে স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে যে রুণুকে চাকরীর নাম করে এদের কাছে না দেবার জন্যে বা দিতে বাধ্য করার জন্যে কুমুদবাবুর এই নতুন অত্যাচার। সুতরাং এর প্রতিবাদ হওয়া দরকার।

সুহাস মাত্র একদিনের ছুটি নিয়ে রাধাগোবিন্দবাবুর সঙ্গে দেখা করার মনস্থ করল।

কুমুদবাবুর কাছ থেকে ছুটি চাইতে তিনি সাগ্রহে তা মঞ্জুর করলেন।

পরের দিনই সুহাস রওনা হল রাধাগোবিন্দবাবুর বাড়ীর উদ্দেশ্যে। মাঠ থেকে রাধা গোবিন্দবাবুর বাড়ী ছ'ঘণ্টার পথ। তাই সুহাস রুণুকে অমিয়বাবুর জিম্মায় রেখে রুণুকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে চলে এল রাধাগোবিন্দবাবুর বাড়ীতে।

রাধাগোবিন্দবাবু ধৈর্য সহকারে সুহাসের সব কথা শুনে বললেন, কিন্তু আসল ব্যাপার তো তা নয়। আসল ব্যাপারটাকে চাপা দেবার উদ্দেশ্যে আপনি সম্ভাব্য একটা ঘটনা তৈরী করে আমার কাছে এসেছেন নির্দোষী সাজার ভান করতে। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে এই যে আপনি মাত্র কয়েক দিন লরীতে কাজ করার মধ্যেই প্রায় চারশ বস্তা সিমেণ্ট সরিয়ে ফেলেছেন। অন্য কোন কোম্পানী হলে আপনাকে পুলিশের হাতে দিতো, আমি অতটা নির্দয় নই বলে আপনাকে কাজ থেকে বরখাস্ত করলাম।

নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করার জন্যে সুহাসের বলার মত অনেক কথাই ছিল। হয়ত বলার জন্যে মনে মনে সে প্রস্তুতও হচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ সে নিজেকে সংযত করে নিল।

তার মনে হল, কুমুদবাবুর প্রতিটি কাজের পেছনে যেন রাধাগোবিন্দবাবুর গোপন সহযোগিতা প্রচ্ছন্নভাবে লুকিয়ে রয়েছে। রাধাগোবিন্দবাবুর আর কুমুদবাবুর মধ্যের গোপন কারবার ব পাপ ব্যবসা সম্বন্ধে অমিয়বাবুর আবছা ইঙ্গিত যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল সুহাসের কাছে। তাই কোন কথা না বলে ঘৃণায় অবজ্ঞায় সুহাস উঠে দাঁড়াল বেরিয়ে আসার জন্যে।

রাধাগোবিন্দবাবু বললেন, আপনার এক'টা দিনের যা পাওনা হয় ওখানে গিয়ে কুমুদবাবুর কাছ থেকে নিয়ে নেবেন।

বলে, রাধাগোবিন্দবাবু বাড়ীর ভেতরে ঢুকে গেলেন।

সুহাস আবার নামল পথে।　　　[ক্রমশঃ]

কিশোর জগৎ

ক্রিকেটের কথা

শ্রীজ্ঞান

শীত ফুরিয়ে এল। সেই সঙ্গে যেন ফুরিয়ে এল খেলাধুলার পালাও। খেলাধুলা অবশ্য গরম কালেও হয়; কিন্তু ঠাণ্ডার সময় খেলাধুলায় যে উদ্যম ও শক্তি পাওয়া যায়, গরমের সময় তা ঠিক থাকে না। অবশ্য বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা, ফুটবল খেলা, গরমের সময়ই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কারণ বোধ হয় শীতকালে খেলার রাজা "ক্রিকেট"-ই খেলাধুলার আসর অধিকার করে থাকে বলে।

এই ক্রিকেট খেলা একদা রাজারাজড়ার খেলা রূপেই চলিত ছিল, কিন্তু একালে এই খেলাটি প্রায় জনতার খেলায় পরিগণিত হতে চলেছে। বোম্বাই ও মহারাষ্ট্র প্রদেশে এ খেলা খুবই জনপ্রিয়, কিন্তু বাংলাদেশে দুই বা তিন দশক আগে এ খেলা বিশেষ জনপ্রিয় ছিল না। কিন্তু ক্রমশঃ এই খেলা এ দেশেও অভূতপূর্ব্ব জনপ্রিয়তা লাভ করতে আরম্ভ করেছে।

ফুটবল প্রভৃতি অন্যান্য খেলাগুলির মতন 'ক্রিকেট' খেলাও বিদেশ থেকেই ভারতে আমদানি করা হয়েছে। তবে ফুটবল, হকি, টেনিস, টেবিলটেনিস, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল, বাস্কেটবল, প্রভৃতি খেলা যেমন সম্পূর্ণরূপে আন্তর্জাতিক খেলা, অর্থাৎ পৃথিবীর সব দেশেই এই সব খেলা হয়ে থাকে, 'ক্রিকেট' কিন্তু তা নয়। ক্রিকেট খেলা একান্ত ভাবেই ইংরাজদের খেলা এবং বৃটিশ শাসন যে সব দেশে একদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই সব দেশেই শুধু ক্রিকেট খেলা প্রচলিত আছে এবং কোথাও কোথাও যেমন ভারতে, এই খেলা ক্রমশই জনপ্রিয়তার উচ্চ শিখরে আরোহণ করছে। ইংলণ্ড সমেত পৃথিবীর মাত্র আটটি দেশে এই

খেলা যথোচিতভাবে খেলা হয়ে থাকে। এই দেশগুলি হচ্ছে ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, সাউথ আফ্রিকা, ভারত, পাকিস্তান, নিউজিল্যাণ্ড ও সিংহল। এদের মধ্যে সিংহল দ্বীপ এখনও "টেষ্ট" পর্য্যায়ে উন্নীত হতে পারে নি। ইংলণ্ডের পাশের দ্বীপ আয়ারল্যাণ্ডেও ক্রিকেট খেলা প্রচলিত আছে, কিন্তু "টেষ্ট" পর্যায়ের নয়। এ ছাড়া হংকং, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দূর প্রাচ্যের দেশগুলিতে এবং এমন কি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কতকগুলি জায়গাতেও ক্রিকেট খেলার প্রচলন আছে।

বিশ্বের খেলাধুলার আসরে ক্রিকেট খেলা সম্পূর্ণরূপে আন্তর্জাতিক খেলা রূপে পরিগণিত না হলেও এ খেলার বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য্য। খেলাটি শুধুই কষ্টসাধ্য অনুশীলন সাপেক্ষ নয়, বিশেষ বিপদজ্জনকও বটে। কারণ আঘাত লাগবার সম্ভাবনা এই খেলাটিতে প্রচুর রয়েছে, তাছাড়া এই খেলাটির সূক্ষ্ম ক্রীড়াশৈলীও অনুধাবন যোগ্য। এই খেলাটিতে দক্ষতা লাভ করতে হলে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়, এবং মনের সাহস ও দেহের স্বাস্থ্যও অটুট হওয়া চাই। যাঁরা হাতে-নাতে কখনও ক্রিকেট খেলেন নি তাঁদের পক্ষে কিন্তু এই খেলাটির সূক্ষ্ম ক্রীড়াশৈলীর সম্পূর্ণ অনুধাবন সম্ভব হবে না। এ খেলাটির ঐশ্বর্য ও বিপদ বুঝতে হলে খেলে দেখতে হবে।

তোমাদের মধ্যে সকলেই প্রায় ক্রিকেট খেলা দেখে থাক এবং অনেকে খেলেও থাক। যারা খেলে থাক তারা যদি এই খেলায় ব্যুৎপত্তি লাভ করতে চাও, বড় খেলোয়াড় রূপে পরিগণিত হতে চাও, তাহলে একান্তভাবে অনুশীলন কর এবং তার সঙ্গে শরীর গঠন কর। ক্রিকেট খেলা নিয়ে শুধুই হৈ চৈ করলে চলবে না, সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশে ক্রিকেট জন-প্রিয়তা লাভ করলেও অতি অল্প কয়েকজন ক্রিকেট খেলোয়াড় এ পর্য্যন্ত এ প্রদেশ থেকে সর্ব্বভারতীয় "টেষ্ট" দলে খেলবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। সে তুলনায় বোম্বাই, মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভারতের খেলোয়াড়েরা অনেক এগিয়ে রয়েছে। বাঙ্গালী ক্রিকেট খেলোয়াড়দের এই উদাহরণ মোটেই উৎসাহব্যঞ্জক নয়! তাই তোমাদের কাছে আমার প্রশ্ন বাঙ্গালী ক্রিকেট খেলোয়াড়দের এ অযোগ্যতা তোমরা দূর করতে পারবে না কি? তোমরা, বাংলার এই কিশোর ক্রিকেটিয়াররা এগিয়ে এস সুনিশ্চিত প্রতিজ্ঞা নিয়ে যে বাঙ্গালী ক্রিকেট খেলোয়াড়দের অযোগ্যতাকে অপ্রমাণিত করে আমরা জনে জনে যোগ্যতা দেখিয়ে সর্ব্বভারতীয় "টেষ্ট" দলে অন্তর্ভুক্ত হব সুটে ব্যানার্জী, প্রবীর সেন, পুটু চৌধুরী, মন্টু ব্যানার্জি পঙ্কজ রায় ও সুব্রত গুহর মতন। তোমাদের সামনে আদর্শ থাক কার্ত্তিক বসু, কমল ভট্টাচার্য্য, নির্মল চ্যাটার্জির আর তোমরা অনুপ্রাণিত হও তরুণ খেলোয়াড় অম্বর রায় ও কিশোর খেলোয়াড় দীপঙ্কর সরকার ও রাজা মুখার্জীর কৃতিত্বে।

বাঙ্গালী কিশোরদের ক্রীড়া নৈপুণ্যে বাংলার তথা ভারতীয় ক্রিকেট অনুপ্রাণিত হয়ে উঠুক এই আশাই করছি।

মণির খনি

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তেরো

গভীর আঁধার রাত। দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হয়েছে। আকাশের সমস্ত অন্ধকার যেন সাগরের বুকে ঢেলে পড়েছে। সেই কালিমাখা জল কেটে 'পাইরেট' নির্ব্বিঘ্নে যাচ্ছিল। জাহাজখানা ছিল বর্ম্মাগামী মালবোঝাই ষ্টীমার। জাহাজখানা প্রায় কূলে কূলেই যেত—দূর সমুদ্রে যেত না। কিন্তু সেদিন কাপ্তেন জাহাজখানা দূর সমুদ্রের দিকে চালিয়ে দিল।

প্রশান্তর কেবিনে মেঝের উপর দেবেশ ঘুমিয়েছিল। সহসা এক প্রবল ধাক্কায় তার ঘুম ভেঙ্গে গেল;—তার মনে হ'ল বুঝি একটা বোমা ফেটে ষ্টীমার উড়ে যাচ্ছে দেবেশের কানে—বোমা ফাটার শব্দ এসেছিল।

পর মুহূর্ত্তেই ষ্টীমারখানা কাত হয়ে গেল এবং প্রশান্ত ধড়াস্ করে দেবেশের ঘাড়ের উপর পড়ল। প্রশান্তর হাত ধরে টানতে টানতে দেবেশ উঠে দাঁড়ালো। ব্যস্ত হয়ে বলল—"আসুন—আসুন—বাইরে আসুন। ষ্টীমার বুঝি ডুবে যাচ্ছে!"

দেবেশ তার সকল শক্তি দিয়ে কেবিনের দরজা ধরে টানলো, কিন্তু দরজা খুলল না। ষ্টীমারখানা আরও একটু কাত হ'ল। খালাসিদের চীৎকারে চারদিক চঞ্চল হয়ে উঠল। দেবেশ শুনল কাপ্তেন খালাসিদের জালিবোটগুলি নামাতে হুকুম দিলেন।

দেবেশ আবার দরজা ধরে টান্‌লো। দরজায় সজোরে লাথি দিল, পিঠ দিয়ে ঠেল্‌ল। কিন্তু সে দরজা ভাঙ্গল-ও না, খুল্‌লও না। দেবেশ শুনতে পেল কাপ্তেন খালাসিদের বল্‌ছেন—"ওঠো-ওঠো— নৌকায় ওঠো – ষ্টীমার আর বেশীক্ষণ থাকবে না। তলা ফেঁসে গেছে।"

প্রশান্ত তখন বুদ্ধিহারা বোকাটির মত—এমন ভাবে দেবেশের মুখের দিকে তাকালো যে কি ঘটেছে তা' যেন সে বুঝতেই পারে নি। দেবেশ ব'লল—

"ষ্টীমারের তলা ফেঁসে ডুবে যাচ্ছে। খালাসিরা আমাদের ফেলেই নৌকো নিয়ে পালাচ্ছে! ওরা মনে করেছে আমাদের ডুবিয়ে মারবে।"

"তবে চল আমরাও বাইরে যাই।"

"কেমন করে যাব? দরজাটা হয় কেউ বন্ধ ক'রে রেখেছে, না হয় এমন ভাবে চাপা পড়েছে যে কিছুতেই খোলে না।"

সহসা প্রশান্তর চোখ ভীষণ ভাবে জ্বলে উঠলো। সে বলল—"বটে! আচ্ছা, আমি একবার দেখি"! পরক্ষণেই প্রশান্ত হাতলটা ধরে এমন ভাবে টান্‌তে লাগল যে কাঠ ভেঙ্গে দরজাটা খুলে একেবারে তার ঘাড়ের উপর এসে প'ড়ল।

প্রশান্তকে টেনে তুলে দেবেশ বলল—"এত অসুখ আপনার, এখন ত দেখছি গায়ে হাতির বল এসেছে।" প্রশান্ত সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল—"এখন কি ক'রতে হবে? ডেকে যেতে হবে বুঝি? চল—চল"।

বাইরে এসেই দেবেশ দেখল যা আশঙ্কা করেছিল, ঠিক তাই ঘটেছে। খালাসিরা সবকয়খানা নৌকা নিয়ে পালিয়েছে। এমন কি যাবার সময় "বয়া"গুলি পর্য্যন্ত সরিয়ে নিয়েছে! দূরে তাদের গলার অস্ফুটস্বর শোনা যাচ্ছে।

দেবেশ ও প্রশান্ত প্রাণপণে চীৎকার ক'রে উঠলো. আকাশে মেঘ ছিল না, উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি চক্ চক্ ক'রে জলছিল। দেবেশের আর বুঝতে বাকী রইল না যে ষ্টীমারখানা ডুবিয়ে দিয়ে রঘু সকলকে নিয়ে পালাচ্ছে। নইলে তাদের চীৎকার শুনে ওরা ফিরে এলো না কেন?

দেবেশ জিজ্ঞাসা করল— "প্রশান্তবাবু, আপনি সাঁতার জানেন?"

"কী বল্লে? সাঁতার? তাইত! জানি কিনা—।" দেবেশ অবাক্ হ'য়ে প্রশান্তর মুখের দিকে চাইল। আবার বল্‌ল— ষ্টীমার যে ডুবছে—সাঁতার—সাঁতার—।"

প্রশান্ত এতক্ষণে মাথা নাড়ল। গম্ভীর দৃষ্টিতে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল "হাঁ, জানি বৈকি—এসো সাঁতার দি।"

প্রশান্ত জলে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে দেখে দেবেশ তাকে টেনে ধরল। বলল—না—না—এখন না। একটু দাঁড়ান। আসুন তাড়াতাড়ি একখানা ভেলা বেঁধে ফেলি।"

সম্মুখে যা' পেল—কাট পাট দড়ি দড়া—তা' দিয়েই দেবেশ ও প্রশান্ত একখানা ছোট্ট ভেলা বাঁধল। ভেলাটা এতই ছোট্ট যে কোনমতে সেটা দু'জন লোকের ভার সইতে পারবে।

দেবেশ বলল—"ষ্টীমারখানা একেবারে ডুবে যাবার আগেই জলে পড়তে হবে—বুঝলেন।" প্রশান্ত বোকার মত দেবেশের মুখের দিকে চেয়ে রইল। তাকে একটা জোরে ঝাঁকানি দিয়ে দেবেশ বলল— "ষ্টীমার যখন ডুববে তখন জলের টানে আমাদেরও টেনে নেবে। তার আগেই লাফিয়ে পড়তে হবে। পারবেন?"

প্রশান্ত স্বপ্নাবিষ্টের মত বলল— "লাফিয়ে পড়তে—তা' আমি পারবো। এসো তবে।"

প্রশান্তের হাত চেপে ধরে দেবেশ বলল "আর একটু অপেক্ষা করুন—আর খানিকটা ডুবুক্। তখন ভেলা নিয়ে ঝাঁপ দেওয়া সহজ হবে।"

পরক্ষণেই ষ্টীমার একবার সজোরে কেঁপে উঠলো। জাহাজটার পিছন দিক জলের ভিতর ডুবে গেল, মাথাটা ধীরে ধীরে জলের উপর উঠতে লাগলো।

দেবেশ বলল— "ধরুন, ধরুন, হাত চালান। ভেলাটা জলে ফেলুন। এইবার—এইবার—দিন ঝাঁপ।"

ঝাঁপ দিল। কিন্তু জলে পড়তেই দেবেশ বুঝল যে ভাসমান একখানা কাঠে তার দেহে দারুণ আঘাত লেগেছে। তার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গেল—মাথাটা ঘুরে উঠলো। প্রশান্ত তখন ভেলায় উঠে ওটাকে ডুবন্ত ষ্টীমারের কাছ থেকে সরিয়ে নিচ্ছিল,—দেবেশের দিকে তাকায় নি। হঠাৎ তার দৃষ্টি ষ্টীমারের উপর পড়ল। ষ্টীমারের মাথাটা শেষবার খাড়া হ'য়ে আকাশে উঠেছে—এই ভাবে আর কি!

দেবেশ তখনো ষ্টীমারের নিকট থেকে ২০।২৫ হাতও স'রে আসতে পারেনি দেখে প্রশান্ত ভেলা ছেড়ে সাঁতার দিল এবং অবিলম্বে গিয়ে দেবেশকে ধরল। পরক্ষণেই বিপুল একটা শব্দ ক'রে ষ্টীমারের বয়লারটা ফেটে গেল এবং আশে পাশের যা কিছু সবই শোঁ শোঁ শব্দে টনে নিয়ে "পাইরেট" অতল সাগরে ডুবে গেল।

তখনও দেবেশকে অচেতন দেখে প্রশান্ত একহাতে তার জামা ধরে আর এক হাতে সাতার দিতে আরম্ভ করল। কি প্রচণ্ড ঢেউ সেখানে—কি ভীষণ জলের টান! প্রশান্ত বুঝল যে দেবেশকে না ছেড়ে দিলে তার নিজের জীবনও বিপন্ন হবে। কিন্তু তবুও দেবেশকে সে ছাড়ল না। প্রাণপণে সাঁতার দিতে লাগলো।

ভেলাটা বেশীদূর ছিল না, প্রশান্ত হাঁপাতে হাঁপাতে যখন ভেলাটা ধরল তখন দেবেশের জ্ঞান হ'য়েছে। দেবেশকে ভেলায় তুলে নিয়ে প্রশান্ত দেখল যে দেবেশের গলায় একখানা হাড় ভেঙ্গে গেছে! দেবেশের কাতর আর্ত্তনাদ অগ্রাহ্য করে প্রশান্ত এমন কৌশলে হাড়টা ঠিক ক'রে বসিয়ে দিল যে দেবেশের মনে হ'ল যে আগে নিশ্চয়ই সে এ সব কাজ ক'রেছে।

দেবেশ ভেলার উপর চিৎ হয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলো—"কে এ লোক? এত ভাল সাঁতারু, এমন ভাল ভাঙ্গা হাড় জুড়ে দিতে পারে—এ রকম তো সুপটু খেলোয়াড় ভিন্ন হতে পারে না। প্রশান্ত কি খেলা জানে? এ কি প্রশান্ত না বিমল? এ প্রশ্নের উত্তর কবে পাওয়া যাবে?"

[ক্রমশঃ
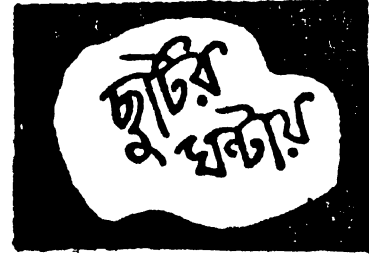
———

চিত্রগুপ্ত

এবারে যে আজব-মজার খেলাটির কথা বলছি—সেটিও ঘটে বিজ্ঞানের বিচিত্র রহস্যময় কারসাজির দৌলতে। দুনিয়াতে মানুষের সমাজে নিত্যই যেমন সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, রাগ-ভালবাসা—এ সবের একত্র সমাবেশ বা পাশা-পাশি সহাবস্থান নজরে পড়ে, এবারের মজার খেলাটির ধরণও অনেকটা ঠিক তেমনি। অর্থাৎ, বিজ্ঞানের এই বিচিত্র কৌতূহলোদ্দীপক কারসাজিটির আসল রহস্য হ'লো—একই পাত্রের ভিতরে-রাখা জলে 'উষ্ণ' (Heat) আর 'শীতল' (Cold) তাপমাত্রার সমাবেশ বা সহাবস্থান।

কথাটা শুনে তোমরা হয়তো অনেকেই অবিশ্বাসের হাসি হাসছো...কিন্তু বাস্তবিকই এমন অসম্ভব কাণ্ড খুব সহজেই ঘটিয়ে তোলা যায় এবং বিজ্ঞানের এই আজব-কৌতুক-লীলা পরখ করে দেখবার জন্য বিশেষ কোনো ব্যয়বহুল সাজ-সরঞ্জাম, রাসায়নিক পদার্থ যোগাড় বা কলা-কৌশল আয়ত্ত করার প্রয়োজন নেই এতটুকু—টুকটাকি দুয়েকটা নিতান্ত 'ঘরোয়া' সামগ্রী সংগ্রহ করলেই তোমরা অনায়াসেই ছুটির ঘণ্টায় তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের আসরে বিচিত্র কৌতূহলোদ্দীপক এই কারসাজিটি দেখিয়ে প্রচুর আনন্দ আর রীতিমত তারিফ লাভ করতে পারো।

কি উপায়ে?—শোনো তাহলে...এবারে তারই মোটা-মুটি পরিচয় দিই।

আজব-মজার এই কারসাজি দেখাতে হলে, গোড়াতেই জোগাড় করো—বড় একটি টিনের কৌটা (Empty Tin-Can), এক কেটলী ফুটন্ত গরম জল,

একটি থার্মোমিটার, টিনের কৌটাটিতে প্রলেপ দেবার উপযোগী এক কৌটা শাদা (white) এবং এক কৌটা (কালো Black) তেল-রঙ (Oil Colour) আর একটি রঙ-লাগানোর তুলি (Paint Brush)। এ সব সরঞ্জাম সংগ্রহ হবার পর, আসরে দর্শকদের সামনে কারসাজি দেখানোর আগেই গরম জল রাখার টিনের কৌটাটির অন্দর ভাগে সযত্নে তুলির পোঁচ টেনে নীচের অর্দ্ধাংশে (Lower half of the interior portion of the tin-can) প্রলেপ লাগাও কালো তেল-রঙের…এবং উপরের অর্দ্ধাংশে লাগিয়ে নাও শাদা তেল রঙের ছোপ। টিনের কৌটাতে এমনি ধরণে শাদা আর কালো রঙের প্রলেপ লাগানোর পর কিছুক্ষণ রোদে-বাতাসে রেখে কাঁচা তেল-রঙটুকু আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে শুকিয়ে নাও।

তারপর আসরে দর্শকদের সামনে খেলা দেখানোর সময় সমতল টেবিলের উপর সযত্নে শাদা কালো রঙ লাগানো টিনের কৌটাটিকে সাজিয়ে রেখে, সেই কৌটার ভিতরটি ভরে দাও কেটলীর ফুটন্ত গরম জলে (Boiling Water)।

এবারে আসরের দর্শকদের চোখের সুমুখে ফুটন্ত জল-ভরা ঐ টিনের পাত্রের মধ্যে ধীরে ধীরে চুবিয়ে দাও তাপমাত্রা নির্দ্ধারণের যন্ত্র থার্মোমিটারটিকে। তারপর মিনিট দুয়েক বাদেই গরম জল ভর্তি টিনের কৌটার ভিতর থেকে থার্মোমিটার যন্ত্রটিকে তুলে নিয়ে দর্শকদের চোখের সামনে মেলে ধরলেই তাঁরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করবেন যে থার্মোমিটারের যে অংশটুকু টিনের উপরদেশে অর্থাৎ শাদা মাখানো জায়গায় ছিল সেখানকার তাপমাত্রা, টিনের তলদেশ অর্থাৎ, কালো রঙ মাখানো অংশে রাখা জলের তাপমাত্রার চেয়ে অনেকখানি বেশী।

এই হলো—এবারকার মজার খেলাটির আসল রহস্য। আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণের আরেকটি আজব-মজার খেলার পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

মনোহর মৈত্র

১। অঙ্কের আজব হেঁয়ালী ঃ

'আজব-মজার যে অঙ্কের হেঁয়ালিটি তোমাদের এবারে বলছি, মগজের বুদ্ধি খাটিয়ে সেটির যথাযথ সমাধান যদি করতে পারো তো বুঝবো—সত্যিই প্রতিভাধর হয়ে উঠছো তোমরা। হেঁয়ালিটি হলো—ধরো, যদি তোমরা ৬ থেকে ৯ আর ৯ থেকে ১০ বাদ দাও...এবং ৫০ থেকে যদি ৪০ বিয়োগ করো, তাহলে অঙ্কের ফল দাঁড়াবে মাত্র ৬। কাগজে কালি-কলমের আঁচড় টেনে লিখে দেখাতে পারো—কি উপায়ে এই আজব অঙ্কের হেঁয়ালির সমাধান করা যাবে?

রাজা মুখোপাধ্যায়

২। 'কিশোর জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা :

দেহাতী এক মেষপালকের ছিল বিরাট একটি খোঁয়াড়। সেই খোঁয়াড়ে মোট ৫৭টি খোঁটা-পোঁতা খুপরী-বেড়ার কোঠার ভিতরে সযত্নে সে রাখতো মোট ১০০টি ভেড়া। সেবার কোনও এক পার্বণের মেলায় হাট থেকে দেহাতী মেষপালক হঠাৎ সখ করে কিনে আনলো আরো১০০টিনতুন ভেড়া। কিন্তুসেগুলিকে খোঁয়াড়ে রাখতে গিয়ে দেখে নানান অসুবিধা ঘটছে। অর্থাৎ পুরোনো ভেড়ার পালের পাশাপাশি সদ্য কেনা নতুন ভেড়াগুলিকে সযত্নে রাখা…সত্যিই এক সমস্যা! কাজেই সে বুদ্ধি খাটিয়ে পুরোনো খোঁয়াড়ের জমিতেই আরো কয়েকটি নতুন খোঁটা পুঁতে বাড়তি খুপরী-কোঠা বানিয়ে ফেললো।—সদ্য কিনেআনা ১০০টি ভেড়াকে সযত্নে রাখার উদ্দেশ্যে বলতে পারো, সেই মেষপালক মোট কয়টি বাড়তি খুপরী কোঠা বানিয়েছিল?

সুপর্ণা রায়

গতমাসের ধাঁধা আর হেঁয়ালির উত্তর :

১। রাজকাহিনী (৺অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
২। ময়নাবতীর মায়াকানন (৺হেমেন্দ্রকুমার রায়)
৩। চালিয়াৎ চন্দর (৺সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়)
৪। জলার পেত্নী (৺প্রেম স্কুর আতর্থী)
৫। জাপানী ফানুশ (৺মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়)
৬। পাগলা দাশু (৺সুকুমার রায়)
৭। শিশু ভোলানাথ (৺রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
৮। নিরেট গুরুর কাহিনী (শ্রীযুক্তা সীতা দেবী)
৯। পঞ্চুলাল (৺প্রিয়ম্বদা দেবী)
১০। পুরাণের গল্প (৺কুলদারঞ্জন রায়)
১১। টাকডুমাডুম ডুম (৺জ্ঞানদানন্দিনী দেবী)
১২। ছোটদের রামায়ণ (৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী)

২। হাতের বুড়ো আঙুল

গতমাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

অরূপ, অশোক, বসুন্ধরা, বাসবী, নন্দা, মাধুরী ও লোটন বসু (কলিকাতা), চন্দ্রিমা, চম্পক, কাবেরী, মধুছন্দা, ঋতেন্দ্র, হিমাংশু ও নন্দলাল সেন (জামসেদপুর), ছোটকু, নানটু, মিন্টু, গোপা, মালা, ছায়া ও শোভা বৌদি (গয়া), দ্বিজোত্তম, পুরুষোত্তম, নরোত্তম ও শিবানী সাহা (বর্দ্ধমান), কাঞ্চন, বাদল দোলন, কুমকুম, চামেলী, কানু, পটল ও গোবিন্দ রায়চৌধুরী (কলকাতা), মনীশ, সুধীশ, রাজেশ, প্রাণেশ, মণীতোষ, উমাপদ, কালিদাস, মোহনলাল, আশালতা, প্রেমলতা, তরু, চারু ও হারু ঘোষ (নিউ দিল্লী), নিখিলেশ, প্রিয়তোষ, বিশ্বনাথ, হেমেন্দ্র লাল, ব্রজনাথ, দেবু, চঁদু, ছোকু, বাকু ও রাজেন্দ্রশঙ্কর (বসিরহাট), সুনন্দ, কল্পনা, চন্দ্রাবতী, কেয়া, কাকলী, মণিমালা, হৈমন্তী, রাজীব, বাসুদেব, আলোক, দীপালী, মণিদীপা, বন্দনা ও মহাদেব বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা), আশীষ, লোপামুদ্রা, মেনকা, চিত্রা, সুশোভন, বৃন্দাবন ও ললিতকুমার সেন (কটক), কেতকী, কুসুম, সুভদ্রা, ছায়া, মল্লিকা, রেবতীরঞ্জন, নলিনীরঞ্জন, সুখময়, প্রকৃতীশ, হৃষিকেশ ও পল্লব চৌধুরী (কলিকাতা), টুলটুল, লিন্টু, জ্যাকি, কালু, রাজেন, পরেশ ও সোমনাথ মল্লিক (দিল্লি), প্রভাকর, শিশির, ভবানীচরণ, নন্দিতা, জাহ্নবী, চিত্রলেখা, সাধন, কালিন্দী, নটবর ও বিভা (কলিকাতা), চন্দ্রনাথ, লক্ষ্মীকান্ত, কুণাল, দেবু, লালু, অভিজিৎ, পলাশ শঙ্করলাল, নরেন্দ্র, তীর্থনাথ, মদনমোহন ও সতীনাথ (জামালপুর), শ্রাবণী, শেখর, শুভ্রেন্দু, হিমানী, তাপস, বিশাখা ও টুসু (কলিকাতা), পাটু, কামাখ্যাচরণ, মোহিনীমোহন, চিত্তরঞ্জন ও বাসবী হাজরা (লক্ষ্ণৌ), ছায়া, মায়া, মহেন্দ্র, ভূষণ, চন্দ্রকুমার, রেবতী ও লীলা ভট্টাচার্য্য (গড়িয়া), কুমার, কলাবতী, পানু, ছানু ও গঙ্গা (কলিকাতা)।

গতমাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

সানু, গৌরী, সুতপা, বুবুন, ছোটকু, বঁটু, টাবু, খকু, লিন্টু, পুঁটু, কাজল, শ্যামল, শোভেন, পলটু ও সুমিত্রা (কানপুর), নগেন্দ্র ও শিপ্রা রায় (কলিকাতা), টুটুল, মিতুল, রেখা, শিখা, বাকানাথ, আশানাথ, উষানাথ ও নিশানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (কলিকাতা), সমীরণ, সাহানা, মহাশ্বেতা, সঙ্ঘমিত্রা, রত্নাবলী, পুষ্পকেশ, অলকেশ ও অনিমেষ চক্রবর্ত্তী (বোম্বাই), আশু, যোগেন্দ্র, শ্যামাচরণ, গোপেশ্বর, গানু, দানু, রাণু ও পানু (বারাসত), শ্যামসুন্দর, রীণা, টুনটুন, বুকবুল, পুলিন ও চন্দ্রকান্ত পালিত (কলিকাতা), হিমাদ্রি, তমাশ, অরিন্দম, আশুতোষ, ব্রজকিশোর ও লেখা বসু-মল্লিক (জলপাইগুড়ি), হেমেন্দ্র, নন্দন, নিখিলেশ, কমলেশ ও কৃষ্ণা গুহ (রাঁচী), কুহেলিকা, তন্দ্রা, অনাবিল, কৃষ্ণলাল, বাণী, গোপাল, চারু, অভিলাষ ও নৃত্যলাল ঘোষাল (কলকাতা), বিনয়, বিজয়, অজয়, শম্পা, রাতুল ও ছোটমামা (হাজারীবাগ)।

আশ্রয়

প্রণবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

রেবার একখানা চিঠি কদিন হ'ল এসেছে। তিন পাতার বড় চিঠি। নীরেন এসট্রের তলায় চাপা দিয়ে রেখেছে, ফ্যানের হাওয়ায় উড়ে যেতে পারে। চিঠিখানির উপর এক অদ্ভুত মমত্ব। অথচ কয়েক লাইন পড়ার পর আর পড়তে পারে না। আর পড়তে গেলেই ও অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে, সব কেবল ঘুলিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়।

বেশ কিছুদিন হ'ল নীরেনের অফিস বদলি হয়েছে। আজকাল যেতে হচ্ছে অনেক দূর। সকাল নটায় খেয়েই প্রথম প্রথম বাসের কথা ভাবলেই সব কিছু যেন গোলমাল হয়ে যেত। আর এখন বাস না থাকলেই মনে হয় সব ফাঁকা, কি রকম এক অস্বস্তি। ক্রমশঃ বুঝতে পারছে বাসের ধাক্কা অনেক ভাল, বিশ্রাম অনেক পীড়াদায়ক। স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে খেতে শেষ টানটা দিয়ে একলাফে নিশ্চিন্তভঙ্গীতে কেমন করে বাস চাপতে হয় তা ও রপ্ত করে ফেলেছে। লোকগুলো গাদাগাদি করে চলেছে; তার মধ্যে ও নিজেকে ছেড়ে দেয়। ধাক্কা আর ধাক্কা বলে মনে হয় না। অথচ প্রথম যেদিন ভীড়ের মধ্যে বাস চাপতে চেষ্টা করেছিল, কি ভয়ই না হচ্ছিল। যেতে হবে অনেক দূর। কোন রকমে মরিয়া হয়ে উঠে, হ্যাণ্ডেলটা ধরে প্রতিমুহূর্তে ও উদগ্রীব হয়ে লক্ষ্য করছে যদি কেউ নামবার চেষ্টা করে। সীটের যাত্রীদের উপর তীক্ষ্ণ নজর তার। বাইরের জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকা কোন যাত্রী যদি দরজার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাহ'লে ও আশাবাদী হয়ে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণেই সারা শরীর মন বিরক্তিতে ভরে ওঠে, মনে হয় ঐ নিশ্চিন্ত বসে-থাকা বাসযাত্রীদের এক এক ঘুষিতে শেষ করে দেয়। ওদের নিশ্চিন্ত ভঙ্গী ওর ভাল লাগেনা। সব স্বার্থপর, সবাই নিজের কথা ভাবে। যেমন রেবা শুধু নিজের ভাবনা নিয়েই ব্যস্ত।

হাতে আজ বেশ কিছু সময় আছে। নীরেন সিগারেট ধরিয়ে চিঠিখানা আজ শেষ করবে ঠিক করলো। সিগারেট খেলে ওর জিব জ্বলে, তবু সিগারেট না খেয়ে পারে না। শূন্য মনে একটু ধূমপান করলে ওর মনে হয় ও আর একলা নয়। রেবা লিখেছে—নীরুদা, তোমার কাছে কিছু চাওয়ার নেই, শুধু একটি কথার আজ জবাব দেবে? তুমি বারবার আমাকে লোভ দেখিয়েছ কেন? আমিতো বাঁচতে চাইনি। তোমার ঘরে যেদিন বাক্স প্যাটরা রেখে আমি বাসের তলায় মাথা দেবো বলেছিলাম, সেদিন তুমি আঁতকে উঠেছিলে। প্রচণ্ড রেগেও গেছিলে আমার উপর। ভিক্টোরিয়ার গাছতলায় বসে তুমি অবশ্য আমায় প্রেম নিবেদন করোনি। শুধু তোমার জীবনবোধের কথা বলেছিলে। আচ্ছা, নীরুদা, কিছু বুঝবার মত সামান্য লেখাপড়াতো আমার আছে। জীবনে ঘা খেয়ে বড় হয়েছি। তুমি যখন উদাস উদাস ভাব করে তোমার সব কথা এক অদ্ভুত নিস্পৃহ ভঙ্গীতে বললে, আমার চোখ তখন জলে ভিজে উঠেছে। মাঝে মাঝে তোমার উপর শ্রদ্ধায় মাথাটা নুয়ে আসছিল, মাঝে মাঝে ভীষণ কান্না পাচ্ছিল। আর আমার কান্না পেলেই মনে হয় আমি বোধহয় কাউকে ভালবেসে ফেলেছি। এমন এক পুরুষকে আমি বহুদিন ধরে যেন চেয়ে আসছিলাম। তোমার জীবনবোধের মধ্যে আমার পুরুষের রূপটা ফুটে উঠল। তাই নীরুদা, নিতান্ত স্বার্থপরের মত তোমার ঘরে মাত্র কয়েকদিনের জন্য আশ্রয় চেয়েছিলাম। অথচ তুমি কিছুই বুঝলে না। আমার তাজা দেহটাকে তাচ্ছিল্য করে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করলে। আমার আত্মহত্যার কথা শুনে মনে হ'ল তুমি যেন এক ডাকিনীর ফাঁদে পড়ে গেছ। ভয়ে তোমাকে সত্যি কথাটা বলতে পারিনি। অনেক কিছু বলবো বলে গেছলাম, কিন্তু বলতে পারিনি। তার আগেই তোমার টেবিলে মাথা রেখে আমার কান্না দেখে

তুমি কোথায় চলে গেলে। অনেকক্ষণ পর তুমি যখন ফিরলে তখন তোমার গোয়েন্দাগিরির সব শেষ। বাক্স-প্যাটরা নিজে বয়ে নিয়ে গিয়ে এক রকম জোর করে ট্যাক্সির মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে।

নীরেন অনেক পড়ে ফেলেছে। উঠে গিয়ে কুঁজো উল্টে ঢক্ ঢক্ করে বেশ কিছুটা জল খেয়ে বসল। সামনের ঘাস বাঁধানো রাস্তায় চটিজুতোর আওয়াজ। মনে হোল কে যেন ওর ঘরে আসতে চাইছে। একলা ঘরে ও অনেক দিন। চেহারা আছে, যৌবন আছে। ও চায় ওর ঘরে কেউ আসুক, এমন একজন আসুক যাকে ও ভালবাসতে পারে।

রেবাকে যখন শুভ্রপোষাকে ডিউটি দিতে দেখেছিল তখন নীরেন ভেবেছিল— একেইতো সে খুঁজছে, একেইতো সে বরাবর চেয়ে এসেছে। এমনি একটি মেয়ে তার ঘরে আসবে, তার বিছানায় বসবে, আর সে তাকে আদরে আদরে ভরিয়ে তুলবে— আর। খুব কেরাত্তরস্ত ভাব নিয়ে মুগ্ধদৃষ্টিতে নীরেন সরাসরি তাকে ঠিকানা দিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। প্রত্যাখ্যাত হয়নি, কারণ সে প্রত্যাখ্যানের কথা ভাবতেই পারে না।

নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে নীরেন তার অভ্যস্তভঙ্গীতে বিছানায় এলিয়ে পড়ে একটি সিগারেট ধরিয়ে চোখবুঁজে ভাবছে। দরজায় খুটখুট আওয়াজ। এ আওয়াজ সে অনেকদিন শুনেছে। আর ঘন আনন্দের ঘামে অনেকবার ভিজেছে। 'আসতে পারি' বলেই রেবা এসে খাটে বসেছিল। নীরেন সিগারেটে জোর টান দিয়ে, মুগ্ধ-দৃষ্টিতে রেবার দিকে চেয়েছিল। ভরা দুপুরে লাজুক মেয়ের মত বেণী মাথা নামাচ্ছিল আর তুলছিল। নীরেনের প্রচণ্ড ইচ্ছা হচ্ছিল ওকে ভীষণভাবে আদর করে, আদরে আদরে ভরিয়ে তোলে। মাঝে মাঝে ও ঠোঁট চাটছিল। গলা যেন শুকিয়ে আসছে। সে নিজেকে সংযত করে নিল। এই দিন, এই মুহূর্ত সে অনেকদিন ধরে কামনা করে এসেছে। অথচ রেবার সামনে তার চিরকালের জীবনবোধ সাড়া দিয়ে উঠল। নিজের কাহিনী বলতে গিয়ে ব্যক্তিত্ব আরোপ ক'রে নিজেকে অনেক ছোট করে অনেক উঁচুতে নিয়ে গেল, যেখানে মেয়েরা তার নাগাল নিতে সাহস করে না, ভয় করে তাদের যেন। তারপর —তারপর সেদিন সময়টা কেটে গেল—আসলে সময় কেটে যেতই। সন্ধ্যায় ডিউটি। রেবাকে চলে যেতে হ'ল। হয়তো কিছু বলতে নীরেন চেষ্টা করেছিল,—কিন্তু বলতে পারল না।

অনেক ভাবছে। একলা ঘরে চেহারা আর পৌরুষ নিয়ে সে চায় কেউ আসুক, বড় মধুরভাবে ভাবে সে। তার ঘরে কে যেন আসতে চাইছে—কার পায়ের আওয়াজ সে যেন শুনতে পাচ্ছে। রেবা লিখেছে—নীরুদা, আমি তিনবার ফেল করেছি। তোমায় প্রথমদিন বলবো বলে-ছিলাম। কিন্তু বলতে পারিনি। তারপর সেবাপ্রতিষ্ঠানথেকে যে দিন তাড়িয়ে দিল সেদিন কোথায় যাব ভাবতে ভাবতে মনে হল তোমার আশ্রয় আমার কাছে সব থেকে নিরাপদ। সোজা কথা বলতে পারিনি। শুধু বাক্সপ্যাটরার ঠাঁই চেয়েছিলাম। তারপর নিরাপদ হয়ে কেঁদেছিলাম তোমার ঘরে রাত কাটাবার জন্য। তোমার পৌরুষের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে বড় ইচ্ছা করছিল। কিন্তু তুমি তো নীরুদা কিছুই বুঝলে না। তুমি আমাকে আশ্রয় দিতে সাহস করলে না।

নীরেন আর পড়তে পারে না। সে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। সামনের বস্তি দিয়ে থেকে ভ্যাপসা গন্ধ আসছে। কিছুক্ষণ দম বন্ধ করে আবার একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাবে চিঠি শেষ না হওয়াই বোধহয় ভাল। আজ থাক —আজ আর পড়বে না। হয়তো কোনদিন ও পড়তে পারবে না—ও বুঝতে পারে। ভাবতে ভাবতে সব যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। মনে পড়ছে—খড়্গপুরের সেই পুরানো বস্তী, কুচবিহারের সেই পুরানো পথ, যে পথ দিয়ে চলতে গেলে ও পায়েসের মিষ্টি গন্ধ পেত। তারপর ব্যক্তিত্ব —পৌরুষ—জীবনবোধ! সব ছাপিয়ে যেন সামনের বস্তীর ভ্যাপসা দুর্গন্ধ ওর দিকে ছুটে আসছে। ও যেন দেখতে পাচ্ছে—কি একটা বিন্দু ওর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য সামনের দিকে ছুটে চলেছে—অনেক দূরে। বিন্দুটাকে ধরবার জন্য ও ছটফট করে উঠল। বিন্দুটা একদিন তারই দিকে ছুটে এসেছিল। আজ যেন অনেক দূর থেকে ব্যঙ্গ করছে। নীরেন আর পারলে না—হঠাৎ ওর যেন ইচ্ছা হ'ল চীৎকার করে বলে—তোমরা মেয়েরা, আমার কথা শোন, তোমরা যারা আমার ঘরে এতদিন আসতে চেয়ে-ছিলে এক নিরাপদ আশ্রয়ের আশায়, তারা জেনে যাও আমি নিরাপত্তাহীন বিপন্ন এক পঙ্গু প্রাণী।' আরো জেনে যাও—রেবাকে আশ্রয় দিতে পারিনি—আসলে আমিই যে আশ্রয় খুঁজছিলাম।

বিচিত্র বিশ্ব

বিশ্ববন্ধু

অভিনব শোকযাত্রা।

এই সেদিন রাজকোটের কোন এক শহরে এক বানরের অপঘাত মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিরাট এক শোভাযাত্রা পথ পরিক্রমা করে। বৈদ্যুতিক তারের কবলে পড়ে অকালে বানরটী মৃত্যুবরণ করে কিন্তু স্থানীয় লোকের হঠাৎ বিশ্বাস জন্মায় যে এটা হনুমানজীর সাক্ষাৎ অবতার। উৎসাহী জনতা চোখে জল নিয়ে মৃতদেহের পাশে ভীড় করে। একটি গাড়ীতে মৃতদেহ সাজিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে তাকে নিকটস্থ নদীতীরে নিয়ে যাওয়া যায় এবং সেখানেই অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। শেষে প্রস্তাব নেওয়া হয় যে সেখানে যথাসময়ে একটি হনুমানজীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হবে—এজন্যে চাঁদাও সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেছে তারা। জয় বাবা হনুমানজীকি জয়!

সংস্কার মুক্তি

ব্যক্তিগত জীবনে ভলতেয়ার অত্যন্ত জেদী, সাহসী এবং স্পষ্টবাদী ছিলেন। এর জীবন্ত প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর মৃত্যুর পূর্বে ঘটে-যাওয়া একটি ঘটনা থেকে। মৃত্যু আসন্ন জেনে ভলতেয়ার স্থানীয় গীর্জা থেকে একজন পাদ্রীকে ডেকে আনালেন শেষ প্রার্থনা করবার জন্য। পাদ্রীমশাই ঘরে ঢুকতেই ভলতেয়ার খুব নাটকীয়ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কার প্রতিভূ হয়ে এসেছেন। পাদ্রীমশাই মৃদু হেসে মৃত্যুপথযাত্রীকে সান্ত্বনার বাণী শোনালেন—স্বয়ং ঈশ্বরের প্রেরিত হয়ে আমি এসেছি। ভলতেয়ারও দমবার পাত্র নন। তিনিও তৎক্ষণাৎ জানতে চাইলেন—বেশ, শুনে খুবই সুখী হলাম। কিন্তু আপনার পরিচয়-পত্রটি কোথায়? এই রকম জবাব শুনে পাদ্রীমশাই আর রাগ সামলাতে পারলেন না। তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করলেন। এরপর ভলতেয়ার আর একজন পাদ্রীকে ডেকে পাঠালেন তার মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাবার জন্য। কিন্তু পাদ্রীমশাই এসে প্রথমে ভলতেয়ারকে আদেশ করলেন যে ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি তার যদি কিছুমাত্র বিশ্বাস এবং আনুগত্য থাকে, তাহলে তাকে লিখিতভাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। নইলে তিনি প্রার্থনায় যোগ দেবেন না। কথাটা শুনে ভলতেয়ার তৎক্ষণাৎ পাদ্রীমশাইকে ঘর থেকে বিদায় করলেন। একটু পরে সেক্রেটারীকে ডেকে কাগজ কলম আনতে বললেন। সেক্রেটারী তৈরি হয়ে তার পাশে এসে দাঁড়াল। ভলতেয়ার বললেন—লেখ—ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, বন্ধুদের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা, শত্রুদের প্রতি আন্তরিক ক্ষমা এবং কুসংস্কারের প্রতি নিদারুণ ঘৃণা নিয়ে আমি এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছি। নীচে ভলতেয়ার স্বাক্ষর করলেন।

অলৌকিক কৃপা

কিছুদিন আগে ম্যানিলায় এক প্রচণ্ড রকমের ভূমিকম্প হয়ে যায়, যার ফলে বহু লোকজন হতাহত হয়েছে, বহু বাড়ীঘর পড়ে গিয়েছে। সেখানকার একটি খবরে প্রকাশ অতি আশ্চর্যজনকভাবেই দুটি চীনা বালিকার জীবন রক্ষা পেয়েছে। ভূমিকম্পের ১২৫ ঘণ্টা পরেও শিশু দুটি বেঁচে ছিল এবং উদ্ধার করার পরে যখন তাদের জিজ্ঞাসা করা হল, এ কদিন তারা কি খেয়েছে এবং কেমনভাবে সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দিনরাত্রি কাটিয়েছে। তার উত্তরে বালিকা দুটি অতি রোমাঞ্চকর এবং অবিশ্বাস্য ঘটনার বিবৃতি দেয়। তারা বলে এ কদিন রোজ দু'বেলা একজন সুন্দরী ভদ্রমহিলা তাদের খাবার খেতে দিয়েছে। ঘরে আলো জেলে দিয়েছে। ভয় পেলে কাছে এসে সাহস

দিয়েছে, এমন কি ঘুম না এলে নানান রূপকথার গল্প বলে তাদের ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে গেছে।···শুধু বাছারা অ মার ঘর থেকে বেরোবার সময় সোনার কাঠিটা আনতে ভুলে গিয়েছে।

পৃথিবীর বৃহত্তম ছবি

জন বানভার্ড নামে একজন চিত্রশিল্পীর মাথায় হঠাৎ এক উদ্ভট কল্পনা আসে। বেশ লম্বা ধরণের একখানা ছবি আঁকলে কেমন হয়। সঙ্গে সঙ্গে কাজ সুরু হয়ে গেল। ছবিখানি ১২ ফুট উঁচু এবং প্রায় ৩ মাইল লম্বা। ১৮৪৯ সালে রাণী ভিক্টোরিয়া কিন্তু এই ছবিখানি অত্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে দেড়ঘণ্টা ধরে দেখেছিলেন। ছবিটির নাম প্যানোরামা অফ্ দি মিসিসিপি। সবচেয়ে বড় ক্যানভাসে যে শিল্পী ছবি এঁকেছেন তার নাম ড্যানসন। ছবিটির নাম ওল্ড লণ্ডন, এবং ক্যানভাসের মাপ হচ্ছে তিন লক্ষ স্কোয়ার ফুট।

প্রাকৃতিক আলো

আজও মানুষের কাছে দক্ষিণ মেরু এবং উত্তর মেরু একটি বিচিত্র বিস্ময়ের রাজ্য। বিজ্ঞানের নানারকম খেলা চলে সেখানে। দক্ষিণ মেরুতে চতুর্দিকে আকাশজোড়া বরফের রাজ্য—অর্থাৎ শুধু সাদা আর সাদা। বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকলে প্রায়ই দৃষ্টিভ্রম ঘটে। কিছু দূরে দেখা কোন জিনিষকে বেশীক্ষণ লক্ষ্য করে থাকলে কিছুক্ষণ পর আর সেটা চোখে পড়ে না। আবার মাঝে মাঝে আর একটি অদ্ভুত জিনিষ দেখতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ মেরুতে যখন তুষার ঝড় সুরু হয়—তখন সেখানে সে'সব তুষারকণার মধ্যে সাময়িকভাবে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। সেই সময় প্রায়ই দেখা যায় যে মেরুবাসীদের হাত ও পায়ের আঙুলের ডগায় বা তামাক খাওয়ার পাইপে এক প্রকার নীলাভ হাল্কা আলোর দীপ্তি ঝিক্‌মিক করছে।

সব চাইতে মূল্যবান্ বই

উচ্চ মূল্যে বই বিক্রয়ের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত যতদূর খবর সংগ্রহ করা গিয়েছে, তাতে জানা যায়। সেটা ছিল ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে ভেনিসের ইহুদীরা দ্বিতীয় পোপ জুলিয়াসের কাছ থেকে হিব্রু বাইবেলটা কিনতে চেয়েছিল, দর ঠিক হয় যে ঐ বিশাল আকারের বাইবেলটার যা ওজন হবে, সেই ওজনের সমান সমান সোনা দিতে হবে মূল্য হিসেবে। শেষ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় পোপ রাজী হলেন বাইবেলটি বেচতে। দুজন মিঃ ইউনিভার্স-মার্কা চেহারা নিয়ে বাইবেলটাকে দাঁড়িপাল্লার একদিকে চাপাল। আর একদিকে চাপান সুরু হল তাল তাল সোনা। শেষে মাত্র চার মণ সোনা চাপিয়ে পাল্লার দু'দিক সমান হল। চার-জন মল্লবীরকে নিয়োজিত করা হল সেই সোনার তাল বইবার জন্য।

হরি ঘোষের গোয়াল

উপরোক্ত প্রবাদটি কবে প্রথম চালু হয়েছিল, তা এখন আর জানা যায় না। তবে প্রবাদটি প্রথমদিন যে অর্থে উচ্চারিত হয়েছিল এখন আর সে অর্থে ব্যবহার হয় না। হরি ঘোষ মশাইয়ের বাস ছিল নবদ্বীপ অঞ্চলে এবং তিনি অত্যন্ত অর্থশালী লোক ছিলেন। তৎকালীন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি মশাই যখন নবদ্বীপে একটি চতুষ্পাঠী খোলার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তখন হরি ঘোষ মশাইয়ের কানে সেই কথাটি যায়। তিনি নিজেই বিশেষ উদ্যোগী হয়ে নিজ অর্থব্যয়ে চতুষ্পাঠীর জন্য গৃহ তৈরি করিয়ে দেন। সেই চতুষ্পাঠীর ঘরে বসে যখন ছাত্ররা একস্বরে অধ্যয়ন করতো তখন সেই ছাত্রদের মিলিত কণ্ঠস্বর গ্রামবাসীদের কানে যেত। সেই স্মৃতিকে মনে রাখার জন্য লোকে বলত হরি ঘোষের গোয়াল।

লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন

আজকাল অর্থের অপচয় বোঝাতে উপরোক্ত প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আসল অর্থ ছিল অন্যরকম। বহুদিন আগে প্রাচীন হুগলী জেলায় একজন অতি দয়ালু এবং মহানুভব ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। যিনি স্বীয় বুদ্ধিবলে ব্যবসা দ্বারা পরিণত বয়সে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তাঁরই নাম ছিল গৌরী সেন। প্রকৃতই তিনি ছিলেন দরিদ্রের মা-বাপ। এমন অনেক ভদ্র এবং পণ্ডিতলোক তখন সমাজে ছিলেন যাঁরা অর্থাভাবে পড়েও লজ্জায় কারুর কাছে হাত পাততে পারতেন না। তাদের লজ্জার হাত থেকে গোপনে রেহাই

দেবার জন্য গৌরীসেনবাবু দোকানে দোকানে সব বলে রাখতেন, তাঁর নাম করে কেউ কোন জিনিষ চাইলে যেন দিয়ে দেওয়া হয় এবং খাতায় লিখে রাখা হয়। তিনি যথাসময়ে সেইসব ঋণ পরিশোধ করতেন। ভাগ্যিস মহানুভব লোকেরা বেশীদিন বাঁচেন না, নইলে এমন ভদ্রলোক আজ বেঁচে থাকলে কি হেনস্তাই না ভোগ করতেন।

মেয়েত নয় যেন রায়বাঘিনী

উপরোক্ত উপাধিটি সম্রাট আকবর দিয়েছিলেন রাজা রুদ্রনারায়ণের পত্নী—রানী ভবশঙ্করীকে। কারণ রানী ভবশঙ্করী পাঠানদের সঙ্গে অসমসাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেছিলেন। সেই জয়লাভের স্বীকৃতি স্বরূপ আকবর বাদশাহ তাঁকে এই রায়বাঘিনী উপাধি দিয়েছিলেন।

পার্সেলযোগে খুন

মানুষ-খুন করার নানান বিচিত্র রোমাঞ্চকর এবং ভয়াবহ পন্থার কথা সবারই কিছু না কিছু জানা আছে। ডাকযোগে খুনের চেষ্টা দেশ'বদেশের অনেক জায়গায় ঘটেছে বলে শোনা যায়। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের একখানি বড় এবং মজবুত খাম এসে হাজির। খোলা হল সমারোহ করে, না জানি কত উপহার আছে। চিঠির সঙ্গে বের হল কয়েকটা ট্যাবলেট, যেগুলোকে পরীক্ষা করে দেখা গেল, ডিনামাইট ছাড়া এগুলো আর অন্য কিছু নয়। এর পর বিখ্যাত সুয়েজখাল খননকারী ফার্ডিনাণ্ড ডি লেসেপস এবং তার একজন সহকর্মীর নামে বড় বড় দুটি পার্সেল এল, খুলে দেখা গেল দুটি তাজা বোমা, সেটা ছিল ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। অবিশ্যি তারা ফাটেনি তাই রক্ষে।

এরপরের ঘটনাটা ঘটে জাপানের এক মন্দিরে। সেটা ১৮৮৯ সাল। পুরনো একটি মন্দিরকে সম্পূর্ণরূপে নতুনভাবে সংস্কার করে তার শুভ উদ্বোধন করা হবে। আয়োজন সম্পূর্ণ। এমন সময় মন্দিরের পুরোহিতের নামে একটি বড় পার্সেল এল, খুলে দেখা গেল প্রায় শ পাঁচেক মোমবাতি। ভালই হল। মন্দিরের আলোক সজ্জা একটি। সঙ্গে সঙ্গে বিরাট শব্দ করে বিস্ফোরণ। শেষে দেখা গেল প্রত্যেকটা মোমবাতির ভেতর একটি করে ডিনামাইট।

১৮৯২ সন, প্যারিস। শ্রমিক ধর্মঘট চলেছে একটি খনি কোম্পানীতে। হঠাৎ একদিন দেখা গেল কোম্পানীর কর্মকর্তাদের নামে একটি মোটা এবং বড় আকারের পার্সেল এসেছে। মালিকপক্ষের হঠাৎ কেমন যেন সন্দেহ হল। পুলিসকে ডেকে পার্সেলটা তাদের জিম্মায় খুলতে বললেন। পুলিস কর্তৃপক্ষ সেটাকে থানায় নিয়ে এসে খোলবার সঙ্গে সঙ্গেই বিরাট বিস্ফোরণ হল, এবং উপস্থিত ছ'জন পুলিস অফিসারের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হল।

এরপর ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ উটারস্ নামে এক শ্রমিক ভদ্রলোক ভীষণ ভাবে ঋণপাশে জড়িয়ে পড়েন। কঠোর পরিশ্রম করেও কিছুতেই আর ঋণের টাকা পরিশোধ করে উঠতে পারেন না। শেষে বাঁচার আর কোন পথ না পেয়ে সে তার পাওনাদারদের একে একে মারবার মতলবে এক ফন্দী আঁটলো মনে মনে। প্রত্যেক পাওনাদারের নামেই সে একটি করে খুনে পার্সেল পাঠাতে আরম্ভ করলো। প্রথম পার্সেলটা যিনি পেলেন, তিনি সপরিবারে ভীষণ আহত হলেন। দ্বিতীয় পার্সেলটাও যিনি খুললেন তাঁরও ঐ একই দশা ঘটলো। তখন পুলিসের টনক নড়লো। পার্সেল বিলিকারীদের পিছু নিল পুলিস, এবং কিছুটা চেষ্টার পর লোকটিকে হাতেনাতে ধরে ফেললো। এবার জোর তল্লাসী চালিয়ে অনেকগুলি পার্সেল জোগাড় হল। শেষে সবকটি পার্সেল খুলেই দেখা গেল তাতে বারুদ এবং আগুন ধরাবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা। এদিকে আসল আসামী উটারস তখন প্রাণভয়ে পালিয়ে গিয়ে প্রথমে এক মহিলাকে খুন করলো এবং শেষে নিজে আত্মহত্যা করে এই কাহিনীর উপর যবনিকা পাত করলো।

জুরীর আসনে জানোয়ার

আদালতে জুরীর কাজ চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে মানুষকেই করতে হয়। জানোয়ারকে দিয়েও যে অন্ততঃ একবারও এ কাজ করান হয়েছিল, সে খবরটা আশ্চর্য

হবে। একটি ভাল্লুকই কৃতিত্বের সঙ্গে এই কাজ করে নিজ বংশের মুখ উজ্জ্বল করে। ঘটনাটী ঘটে ইউরোপের কোন একটি শহরে—পঞ্চদশ শতাব্দীর সুরুতে। গ্রামের প্রান্তে জঙ্গলের মধ্যে বাস করে একটি ভাল্লুক। সে প্রায়ই সময়ে অসময়ে গ্রামবাসীদের বিরক্ত করত এমনকি মাঝে মাঝে আক্রমণও করত। শেষে গ্রামবাসীরা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে আদালতের শরণাপন্ন হল। আদালতের হুকুম হল তাকে তৎক্ষনাৎ গ্রেপ্তার করে আনার জন্য। আসামী অনেক চেষ্টা করেও গ্রেপ্তার এড়াতে পারলো না। যথা সময়ে তাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করান হল। নামজাদা একজন সরকারী উকিল নামলেন আসামীর পক্ষ সমর্থন করতে। প্রথম দিন আসরে নেমেই আসামী পক্ষের উকিল আইনগত এমন একটি জটিল প্রশ্ন তুললেন যে তা বিচারককে রীতিমত ভাবিয়ে তুললো। তিনি বললেন যে আমার মক্কেল এই ভল্লুকটির বিচার যদি সম্পূর্ণ আইন সঙ্গত ভাবে করতে হয়, তাহলে এই জাতীয় আর একটি ভাল্লুককে জুরী পদে নিয়োগ করতে হবে তার স্বাধীন মতামত জানবার জন্য। আইনতঃ কথাটা সত্য। বিচারক ও অন্যান্য সবাইকে কথাটা স্বীকার করতে হল। এরপর সুরু হল জুরী পদে নিয়োগের জন্য একটি উপযুক্ত ভাল্লুকের খোঁজ। ঘন ঘন মামলার দিন পাল্টাতে লাগলো। কিছুতেই আর জুরী জোগাড় হয় না, শেষে অতিকষ্টে এক ভদ্রলোকের একটি পোষা ভাল্লুককে রাজি করিয়ে জুরী পদে বরণ করা হল। মামলার দিন আদালত প্রাঙ্গণে লোক আর ধরে না। সুরু হল বিচার। জুরী ভাল্লুকটিকে পাশে বসিয়ে খুব সাবধানে বিচারক তার নিজের আসনে বসলেন। সভয়ে আলাপ জমাবার জন্য বিচারক ঘন ঘন জুরীর দিকে চাইতে লাগলেন। আইনের নিয়ম অনুযায়ী জুরীকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল—আসামী কি দোষী? ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই অদ্ভুত এক মজার ঘটনা ঘটলো। জুরী ভাল্লুকটীর প্রশ্ন শুনেই হঠাৎ ক্ষেপে রীতিমত গর্জ্জন করে তীব্র প্রতিবাদ জানালো সে কথার। আদালত জুরীর রায় শুনে মুগ্ধ। বিচারক অত্যন্ত খুসী হয়ে আসামীকে বেকসুর খালাস দিলেন!

———

বিচার

জগদীশচন্দ্র দাস

তোমায় যবে মন্দ বলি
তখন, ধূপের বাড়ে গন্ধ,
মাতিয়ে রাখে কৃষ্ণ-কলি
তখন, মনেতে বাড়ে দ্বন্দ্ব।
বাতাস থেকে আসে যে সুবাস
তাহাতে খুঁজে পাই না প্রকাশ
ভুল করি হে পদে পদে
ভাবি, তুমিই নিরানন্দ।
প্রীতির-মালা গলায় লাগে
তখন রূপের বাড়ে গর্ব্ব
আঁধার ভরে রাখে আকাশ—
তখন দেখি না কারা খর্ব্ব
দেখি যে তার চোখের কাজল
মোহের দোরে দিয়েছে আগল
অবোধ ক'রে রেখেছে, তবু,
তখন ভুলেছি তব ছন্দ,
তোমায় তখন মন্দ বলি—
তাই ধূপের বাড়ে গন্ধ।

———

বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য

শ্রী'প'—

বিগত বছরের দিকে তাকিয়ে দেখছি—দেখছি অনেক চিত্রই নির্ম্মিত হয়েছে, মুক্তি পেয়েছে এবং কয়েকটি বক্স-অফিসের দিক দিয়ে বেশ সাফল্যও লাভ করেছে। কিন্তু একটি চিত্রকেও ঠিক "আউটষ্ট্যাণ্ডিং" বা অপূর্ব্ব বা অভিনব এরকম কোনও পর্য্যায়ে ফেলা চলে না। বেশীর ভাগ চিত্রই সাধারণ পর্য্যায়ে পড়ে, তবে তার মধ্যে কিছু কিছু চিত্রে বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়, অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য না থাকলেও বৈচিত্র্য আছে বলা চলে।

বাংলা চিত্রের মধ্যে "চিড়িয়াখানা", "চৌরঙ্গী", "আপনজন" প্রভৃতি কয়েকটি চিত্রের মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে বলা চলে এবং "আপনজন" চিত্রটি কিছুটা বৈশিষ্ট্যেরও দাবী করতে পারে। অন্যান্য চিত্রগুলির মধ্যে বৈশিষ্ট্য তো নেইই এমন কি বেশির ভাগ চিত্রগুলির মধ্যে বৈচিত্র্যেরও অভাব লক্ষ্য করা যায়। পরিচালনা, অভিনয়, চিত্রগ্রহণ, আলোকসম্পাত, শব্দগ্রহণ, সম্পাদনা প্রভৃতি মোটামুটি ভাল হলেও গল্পাংশ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় গতানুগতিক ধারার অনুসরণ করে চলেছে। তাছাড়া চিত্রগুলির বেশিরভাগই বড় মন্থর গতির। এ ছাড়া সব বিভাগেই বাংলা চিত্রের আরও উন্নতি করার দরকার আছে বলেই মনে করি।

হিন্দী চিত্রও অনেকগুলি মুক্তি পেয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়েছে, তাছাড়া রং ও ব্যয়-বহুল সেট্-এর জন্যে এবং বিশেষ করে 'আউট্‌ডোর' ফটোগ্রাফীর সৌন্দর্য্যে সহজেই দর্শকমনকে আকৃষ্ট করে। "আঁখে", "ঝুক গিয়া আসমান্", "নাইট ইন্ লণ্ডন" প্রভৃতি চিত্র এই দিক দিয়ে বেশ সাফল্য লাভ করেছে। "সংঘর্ষ" চিত্রটির মধ্যে বৈচিত্র্যের সঙ্গে বৈশিষ্ট্যেরও সন্ধান মেলে। চিত্রটির গল্পাংশ ভাল বলে এবং অভিনয় প্রভৃতি সব কিছুই সাধারণের তুলনায় ভাল হওয়ায় চিত্রটি বিশেষ প্রশংসার দাবী করতে পারে। তবে হিন্দী চিত্রের স্বভাব-সুলভ মাত্রাতিরিক্ত সঙ্গীত-নৃত্য চিত্রের গতিকে ব্যাহত করে ও সৌন্দর্য্যকেও কিছুটা নষ্ট করে।

মুক্তি প্রাপ্ত ইংরেজী চিত্রগুলির সম্বন্ধেও বলা চলে যে 'আউট্‌ষ্ট্যাণ্ডিং' না হলেও "স্পেক্ট কুলার" চিত্র কয়েকটি দেখা গেছে। "গ্রাণ্ড প্রিক্স" "ব্লু ম্যাক্স" প্রভৃতি কয়েকটি চিত্র এই পর্য্যায়ে পড়ে। "দি ট্রেন্", "লর্ডজিম্", "কমিডিয়ান্" প্রভৃতি চিত্রকে অসাধারণ না হলেও সাধারণ চিত্রের চেয়ে উচ্চ পর্য্যায়ের হয়েছে বলা চলে।

অন্য ভাষী চিত্র সাধারণতঃ বাংলাদেশে বিশেষ দেখান হয় না। তাই তাদের সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য করা চলে না। তবে সাধারণ ভাবে বলা চলে গত বৎসরের নির্ম্মিত চিত্র-গুলির মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবী বোধহয় কোনটিও করতে পারবে না। তবে আগেই বলেছি বৈশিষ্ট্য না থাকলেও বৈচিত্র্যের সন্ধান অনেক চিত্রের মধ্যেই দর্শকরা পেয়েছেন।

———

অপূর্ব্ব.

অনবদ্য,

অভিনব!

"স্বর্গীয় সাহিত্য সমাবেশ" নাটকে বামদিক থেকে দেখা যাচ্ছে—বিদ্যাসাগর রূপে স্বপনবুড়ো, বঙ্কিমচন্দ্র রূপে শৈলেন চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্রের ভূমিকায় মন্মথ রায় এবং স্বর্ণকুমারী রূপিণী কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়

উঠতি কবিদ্বয় তাঁদের আধুনিক কবিতা পাঠ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে দীনবন্ধু মিত্র বলে উঠলেন—"অপূর্ব্ব, অনবদ্য, অভিনব" এবং বলেই চেয়ার থেকে ভূপতিত হলেন বোধ হয় কবিতার ধাক্কায়! হ্যাঁ, দীনবন্ধু মিত্র—"নীল-দর্পণ" নাটকের লেখক সেই দীনবন্ধু মিত্রই এবং ভূপতিত তাঁকে তুলে ধরলেন বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর!—ঘটনাটা অবশ্যই কাল্পনিক, তবে ঘটল এটা "মহাজাতি সদন"-এর ষ্টেজে, ১লা জানুয়ারীর সন্ধ্যায়!

ঐ দিন "সব পেয়েছির আসর"-এর বার্ষিক উৎসবে সাহিত্যিকবৃন্দ কর্ত্তৃক অভিনীত হল স্বপন বুড়ো রচিত ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত অভিনব নাটক "স্বর্গীয় সাহিত্য সমাবেশ"। এই স্বর্গীয় সাহিত্য সমাবেশে একে একে মঞ্চের ওপর উপস্থিত হলেন—বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেল মধুসূদন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বর্ণকুমারী, রবীন্দ্রনাথ, স্যার আশুতোষ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, শরৎচন্দ্র প্রভৃত স্বর্গত মনীষীগণ স্ব স্ব রূপসজ্জায়। এঁদের ভূমিকায় যথাক্রমে অভিনয় করলেন শৈলেন চট্টোপাধ্যায় (বঙ্কিম), মন্মথ রায় (দীনবন্ধু), আবু আতাহার (মাইকেল), স্বপনবুড়ো (বিদ্যাসাগর), কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায় (স্বর্ণকুমারী), বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য (রবীন্দ্রনাথ), কুমারেশ ঘোষ (আশুতোষ), রবীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় (প্রফুল্লচন্দ্র), রমেন মল্লিক (কালীপ্রসন্ন) ও সঞ্জীব সরকার (শরৎচন্দ্র) এবং সর্ব্বশেষে উপস্থিত হন সর্ব্বহারা সেনের ভূমিকায় শৈলজানন্দ। এ ছাড়া প্রথমেই দেখা যায় মঞ্চের ওপর দুই ভৃত্যের ভূমিকায় ধীরেন বল ও দিলীপ দাশগুপ্তকে এবং আরও নানা ভূমিকায় ছিলেন—রেবতীভূষণ, শৈলেন সরকার, অতীন মজুমদার, নগেন্দ্র মিত্রমজুমদার, বিমল রায়, গৌর আদক, হরেন ঘটক, রমেন চট্টোপাধ্যায়, ও স্বপ্না চট্টোপাধ্যায়।

লেখক-শিল্পী শ্রীধীরেন বল অভিনেতাদের রূপসজ্জার ভার নিয়েছলেন এবং তাঁর নিপুণ হাতের কাজে অভিনেতাদের রূপসজ্জা প্রায় নিখুঁত হওয়ায় মনে হচ্ছিল স্বর্গত সাহিত্যিক-মনীষীগণ যেন স্বশরীরে মঞ্চে আবির্ভূত হয়েছেন!

এই অভিনব অভিনয় যে কতটা উপভোগ্য হয়েছিল দর্শকদের কাছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় মহাজাতি সদনের বিরাট প্রেক্ষাগৃহ বিশাল দর্শক সমাবেশ থেকে এবং নাটক শেষে দর্শকদের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনের মধ্যে দিয়ে দীনবন্ধুর উক্তিই যেন প্রতিধ্বনি ধ্বনিত হল "অপূর্ব্ব, অনবদ্য, অভিনব!"

সাগরপারের ধ্রুপদী চলচ্চিত্র

শ্রীনরেশচন্দ্র বসু

ফ্রান্স
১৯২৫

Abel Ganceএর "নেপোলিয়ান" ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হলেও তার প্রভাব বহুদূর বিস্তৃত হয়ে আজকের সিসিল বি ডি মেলি বা ঐ প্রকার জাঁকজমকপূর্ণ চিত্রাদির নির্মাতাদের প্রথম পথ প্রদর্শন করেছিল। বহু অর্থব্যয় করে এই চিত্রটি নির্মিত হলেও ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করতে পারেনি। কিন্তু তৎকালীন যুগে চলচ্চিত্রের শৈশবাবস্থায় দর্শনের পর্দার স্বল্প দৈর্ঘ্যতা, ফিল্মের মন্থর গতি এবং আজিকার যুগের মত ক্যামেরার কারচুপির অনুপস্থিতি সত্ত্বেও এই প্রকার চিত্র কি ভাবে তোলা সম্ভবপর হোল ভাবতেও অবাক লাগে। Abel Gance, Erich Von Stroheimএর ন্যায় ক্লাসিকাল চিত্র তোলায় বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। ইটালীয়ান উত্তরাধিকারীদের ন্যায় তিনি Vittorio-de-Sicaর মত প্রথম একজন অভিনেতা হিসাবে এবং Michelangelo Antonioniর ন্যায় চিত্র-নাট্যকার হিসাবে পরিচালকের পদে উন্নীত হন। ১৯৬৩খৃঃ ফরাসীদেশে একটি চিত্রগৃহের তাঁর নামে নামকরণ হয়। চিত্রগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসবে Abel Gance সশরীরে উপস্থিত ছিলেন এবং ফরাসী দেশের সাংস্কৃতিক মন্ত্রী Andre Malraux পৌরহিত্য করেন। ইহা হইতেই তাঁর খ্যাতির পরিমাপ করা যায়, যদিও ইতিমধ্যে ফরাসী ইতিহাসের একটি গৌরবময় অধ্যায় সেলুলয়েডের ফিতার বুকে তাঁকে অঙ্কন করবার ভার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় চিত্রটি মুক্তি পায় নাই।

চলচ্চিত্র সুন্দর, জাঁকজমকপূর্ণ ও সুবিন্যস্ত হলে প্রদর্শনীর উপযুক্ত হয়—এই অর্থে বিচার করলে নেপোলিয়ানকে অনায়াসেই ক্লাসিকাল পর্য্যায়ে ধরা যায়। বহু সমালোচক Ganceএর এই বল্গাহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য মেলোড্রামা তৈয়ারী করতে পরামর্শ দিয়াছেন। কিন্তু D. W. Griffith অথবা অন্য কেহই Ganceএর ন্যায় ... তারা যেটা নিয়ে এত পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান নি। Sergei M Eisenstein ক্যামেরা স্থাপনের পদ্ধতি ও বিভিন্ন কোণের মাপজোপ সম্বন্ধে বেশী ওয়াকিবহাল হলেও Ganceএর ন্যায় তাঁর প্রচুর প্রাণপ্রাচুর্য্য ছিল না। ক্যামরার প্যানেল যেখানে কোনদিন পদক্ষেপ করেনি Ganceসেখানেও পদক্ষেপ করবার চেষ্টা করেছেন। মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনা বা অভিনেতার মুখাবয়বের অভিব্যক্তির ক্লোজআপ নিয়েই তিনি ক্ষান্ত হন নি, ক্যামেরাকে নিয়ে তিনি দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা করেছেন। দুই একটি দৃশ্যের কথাই দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যাক। নেপোলিয়ান যখন বরফের বল নিয়ে (snow ball) যুদ্ধ করছেন এই দৃশ্যটি গ্রহণের জন্য তিনি ঘোড়ার পিঠে ক্যামেরা বেঁধে ঘোড়াকে দৌড় করিয়ে দৃশ্যটি গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। এই সময় একটি বরফের টুকরো ক্যামেরার লেন্সে এসে আঘাত করলেও তিনি বিচলিত হননি। গায়কের বুকে ক্যামেরা বেঁধে দিয়ে তিনি রঙ্গমঞ্চের দর্শকদের মনোভাব কি ভাবে দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে চোখ-মুখের অভিব্যক্তিতে প্রকাশিত হচ্ছে দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন Marsei aise চিত্রে। "নেপোলিয়ান"-এর যখন সবাক চিত্র গ্রহণ করেন তখন সভাকক্ষের চতুর্দ্দিকে মাইক্রোফোন বসিয়ে, সভার চতুর্দিক থেকে যাতে শব্দটা আসে তার ব্যবস্থা করেছিলেন।

Napoleon চিত্রের সামরিক দৃশ্য সমূহে Tolstoiএর ভাবধারাকে তিনি অনুকরণ বা অনুসরণ করেননি। Bardeche এবং Brasillach বলেন যে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বে নেপোলিয়ানই একমাত্র চিত্র যেখানে ইতিহাসকে স্থবির ও প্রাণ-হীন দেখানো হয় নি। ফরাসী সৈন্যবাহিনীকে নেপোলিয়ান ইটালী আক্রমণ করবার জন্য উত্তেজিত করছেন—এই দৃশ্যটি এক কথায় অবিস্মরণীয়। Ganceও মহাকাব্যের মত একটি চিত্র দর্শক-সাধারণকে উপহার দিতে পেরে পরম পরিতুষ্ট।

The cabinet of Dr. Ca igari চিত্রের চা্র বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে Gance ম হুষ যে, মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের চিন্তাধারা অপেক্ষা চিত্রজগৎ সম্বন্ধীয় ও বিজ্ঞান ভিত্তিক বিষয় সমূহের উপর বেশী আগ্রহী সেটা লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর La Folie de Docteur Tabe চিত্র একজন আবিষ্কারকের সম্বন্ধে যিনি আলোর তরঙ্গ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। এই চিত্রে Gance নানা প্রকার distortive লেন্সের এবং out-of-facus ফটোগ্রাফীর ব্যবহার করেছিলেন। এই চিত্রটিকে 'tric shot' বা 'tric film'-এর জনক বলা যায়। এই ট্রিক ফিল্মের উপর ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি La Roue উপহার দিলেন। এর বিষয় বস্তু জড় ও সজীব বস্তু নিয়ে। Triptych effect বা তিনটি চিত্রকে reverse print দ্বারা পাশাপাশি জুড়ে বিরাট দৃশ্যের অবতারণা নপোলিয়ান চিত্রেই প্রথম দেখা যায়।

নেপোলিয়ান চিত্রে কল্পনা যেন তার মুক্ত পক্ষ দিগন্তে বিস্তার করে দিয়েছে। আজকের দিনের চোখ নিয়ে নেপোলিয়ান চিত্রকে বিচার করলে তার বহু ত্রুটী চোখে পড়বে। কিন্তু চলচ্চিত্রের শৈশবাবস্থায় আজ থেকে ৪৪।৪৫ বৎসর পূর্বের মন নিয়ে, সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করলে তাকে সহজেই কি বাতিলের কোঠায় ফেলা যাবে? যুগ এসে হারিয়ে যাবে যুগান্তে, কিন্তু একদিনের বলিষ্ঠ প্রাণস্পন্দন সাড়া জাগাবে পরবর্ত্তী যুগেও।... ...

———

* * * * *

প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন—নীপা চৌধুরী

দীপা চাটার্জি—বেলভেডিয়ার রোড কলিকাতা—

আজকের পৃথিবীতে কোথাও নির্ভেজাল মানুষ আছে কি?

০ আছে, পাগলা গারদে। আজকের পৃথিবীতে সুস্থ মানুষ হচ্ছে একমাত্র পাগলরাই, কারণ পাগলামীর দিক দিয়ে ওরাই একমাত্র নির্ভেজাল।

* * *

অণিমা ঘোষ—বিবেকানন্দ রোড-কলিকাতা—

গ্রাম বাংলার যাত্রাকে শহরের মঞ্চে টেনে আনা হয়েছে। একে কি ধরনের যাত্রা বলে?

০ গঙ্গাযাত্রা।

* * *

কল্যাণ গাঙ্গুলী—সোনারপুরা-বেনারস-১

পট ও পীঠ বিভাগে "ঢেউয়ের পরে ঢেউ" চিত্রনাট্যটায় যেন Details-এর অভাব দেখলাম। ঋত্বিক ঘটক বা সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্যে যেমন খুঁটিয়ে প্রতিটি জিনিষের বিবরণ দেওয়া থাকে, ক্যামেরার পোজিসান দেওয়া থাকে এখানে সেগুলোর অভাব দেখলাম। তবুও আন্তর্জাতিক খ্যাত একটি চিত্রের চিত্রনাট্য উপহারের জন্য ধন্যবাদ।

০ ধন্যবাদটা আমার প্রাপ্য নয়। ভূপেন্দ্রকুমার সান্যাল মশাই ও শ্রীকান্ত এই দুজনেরই প্রাপ্য ওটা। আপনার চিঠিখানা শ্রীকান্তকে দেখান হয়েছিল। ঋত্বিক ঘটক ও সত্যজিৎ রায়ের পুরো কোন ছবির চিত্রনাট্য আপনি কোথায় দেখেছেন? ক্যামেরার পোজিসান বা অন্যান্য Details-এর ভাষা একমাত্র চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িত কলাকুশলীরাই বুঝতে পারেন, সাধারণের বোধগম্য নয়। সেই কারণেই যখন কোন ছবির চিত্রনাট্য ছাপা হয় তখন ওগুলো বাদ দেওয়া হয়। এই হচ্ছে শ্রীকান্তর অভিমত। এবং শ্রীকান্তর সঙ্গে আমিও একমত কারণ ইংগমার বার্গম্যান, গদার, ফেদরিকো ফেলিনি, এবং মাইকেল এঞ্জেলো এানটনিওনি, এদের পুস্তকাকারে প্রকাশিত বেশ কিছু চিত্রনাট্য দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। শুধুমাত্র মূল চিত্রনাট্যটি ছাপা হয়েছে, ক্যামেরার পোজিসান

বা অন্য Datalis-র কোন বিবরণ এইসব পরিচালকদের কোন চিত্রনাট্যের মধ্যে নেই।

* * *

জ্যোতিষ দাসগুপ্ত—নাগেরবাজার-দমদম—

মাধবী মুখার্জি ও নির্মলকুমারের বিয়ের একটা টপ সিক্রেট রঙ্গরস ও কিছু ফটো ছাপতে পারেন না?

০ যে সব রঙ্গরস টপ সিক্রেট তা ছাপা যায় না, কারণ তা ছাপলে পুলিশ ধরবে। অন্য লোকের বিয়ের ছবি দেখে আপনার কি লাভ হবে? তার চাইতে নিজের বিয়ের ছবিটা যত তাড়াতাড়ি পারেন তোলাবার ব্যবস্থা করুন।

* * *

কালীপদ হাজরা—ঘাটশীলা

ক্রপদী চলচ্চিত্র যে ক্রপদী গানেরই মত অবোধ্য থেকে যাচ্ছে।

০ খুবই স্বাভাবিক। ক্রপদী মেজাজ না হলে সমস্ত ক্রপদী জিনিষই চিরকাল আপনাদের কাছে অবোধ্য থেকে যাবে।

* * *

কুণাল সর্বাধিকারী—রাজা বসন্ত রায় রোড্-কলিঃ

বালিকা বধু মৌসুমীর সঙ্গে কার বিয়ে হচ্ছে? হেমন্ত মুখার্জির ছেলে জয়ন্তর সঙ্গে হচ্ছে না বলে হেমন্তবাবুর এক পত্র দেখলাম। ফিল্ম জগতের নায়ক ছাড়া অন্য কাউকে কি মৌসুমী বিয়ে করবে?

০ বাঙলা চলচ্চিত্রের নায়কেরা মোটামুটি সবাই বিবাহিত বলেই তো আমার মনে হয়। একমাত্র বিশ্বজিতের এখনও পর্যাপ্ত বিয়ের কোন খবর পাওয়া যায় নি। দেখা যাক যদি প্রসেনজিৎ ওকে বিয়ে করতে রাজী হয়!

* * *

লিপিকা ব্যানার্জি—কংগ্রেস একজিবিসান রোড কলিকাতা

বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করাই দেশপ্রেমিকের লক্ষণ? আপনার কি মনে হয়?

০ এ প্রশ্নের উত্তর একমাত্র দেশপ্রেমিকই দিতে পারে।

চণ্ডীপদ বসু—ফার্ণ প্লেশ—কলিকাতা

শর্মিলার বিয়েতে ফোর্ট উইলিয়াম কেল্লা নাকি ভাড়া দেওয়া হয়েছে? আমি গড়ের মাঠ শুদ্ধ কেল্লা ভাড়া নিতে চাই। কার কাছে আবেদন করতে হবে এবং কত টাকা খরচা পড়বে জানতে চাই।

০ উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু তার আগে কোন্ চিত্রাভিনেত্রী অথবা কোন্ নবাবনন্দিনীকে আপনি বিয়ে করছেন সেটি জানাতে হবে।

* * *

নরেন দত্ত—আনন্দ পালিত রোড-কলিকাতা—

একটি সংবাদপত্রে "আমাদের যাবতীয় মিলিটারী সিক্রেট আমেরিকা ও রাশিয়ার সেফ্‌টি ভল্‌টে জমা দেওয়া আছে" বলে মন্তব্য করা হয়েছে। এ কথার অর্থ কি?

০ আমাদের নিজস্ব কোন সেফটি ভল্ট নেই বলেই এই রকম ব্যবস্থা করতে হয়েছে। কেবলমাত্র একজনের ভলটে রাখলে অপরজন রাগ করতে পারে তাই ওটা ভাগাভাগি করে দুজনেরই ভলটে জমা দেওয়া হয়েছে। বিশ্বপ্রেমিকের দেশ ভারতবর্ষ। তার মিলিটারী সিক্রেট কোথায় কার ভলটে জমা আছে না আছে এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানর অর্থই হচ্ছে নিজের মনের সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দেওয়া।

* * *

সুনীল চ্যাটার্জি—বেনিয়াপুকুর লেন-কলিকাতা—

"Little learning is very dengerous" একথাটা কি আপনি বিশ্বাস করেন?

০ না। "Little earning is very dengerous" আজকের দিনে এইটাই সত্যি।

০ ০ •

মহম্মদ হোসেন—ঝাউতলা রোড-কলিকাতা

এতটাকা খরচা করে চাঁদে গিয়ে কি লাভ হোল? মানুষ তো যে অন্ধকার সেই অন্ধকারেই থেকে যাচ্ছে।

০ আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। পৃথিবীর মঙ্গলকামনায় যাদের ঘুম হচ্ছে না তাঁরা বোধহয় উত্তর দিতে পারেন।

মদন সেন—বদ্রীদাস টেম্পল রোড-কলিকাতা

হেমন্তবাবু স্যুট পরেন না কেন? বাঙালীত্ব বজায় রাখতে চান কি?

০ ভারতবর্ষের বাইরে গেলে পরেন শুনেছি। এ ব্যাপারে উনি নেহেরুপন্থী।

• • •

বেনুদাস লাহিড়ি—রাজা লেন-কলিকাতা

মাধবীর বাড়ির ঠিকানাটা একটু জানাবেন?

০ একজন নববিবাহিতা মহিলার বাড়ির ঠিকানা জানাতে গেলে তার স্বামীর অনুমতিটা আগে নিতে হয়। কথা দিচ্ছি নির্ম্মলকুমারের অনুমতি পেলেই আপনাকে জানাব। ততদিন আপনি একটু ধৈর্য্য ধরে থাকুন।

• • •

জ্যোতি ভট্টাচার্য্য—বিধান সরণী-কলিকাতা

উত্তমপুত্র গৌতম নাকি সিনেমায় নামছে?

০ অতটা বোকা গৌতমকে নাই বা ভাবলেন। গৌতম খুব ভাল করেই জানে সে আগামী বিশ বছর উত্তমকুমার নায়ক হিসেবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী থাকবেই। খামোখা বাপের সঙ্গে কমপিটিশানে নামতে যাবে কেন সে?

• • •

তপন সিংহ—বেলতলা রোড-কলিকাতা

আমি কিন্তু বিখ্যাত পরিচালক নই, একটা প্রশ্ন করলে উত্তর পাব?

০ বিখ্যাত নন, কিন্তু স্বখ্যাত সেটুকু বুঝতেই পারছি। আপনার প্রশ্নটা কোথায়?

• • •

গায়ত্রী দাসগুপ্ত—নাগের বাজার-দমদম

'চৌরঙ্গী'র হোটেলের দৃশ্যগুলি ষ্টুডিওর মধ্যে তোলা না কোন হোটেলের মধ্যে স্যুটিং করা হয়েছিল?

০ কিছু কিছু অংশ গ্র্যাণ্ড হোটেলে স্যুটিং করা হয়েছিল।

• • •

দিলীপ মিত্র—নাকতলা-কলিকাতা

সজারুর কাঁটা কি বাংলা চিত্রজগতের বুকে কাঁটা হয়েই থাকবে না মুক্তি পাবে?

০ রহস্যভেদী হলেও ব্যোমকেশের একটু সময় লাগবে মনে হচ্ছে। এবারের কেসটা বেশ একটু জটিল বোধহয়।

৮• • •

অঞ্জলি রায়—হিন্দুস্থান রোড-কলিকাতা

শর্ম্মিলার বিশেষ পোজে কয়েকটি ছবি দেখতে চাই

০ অশ্লীলতার অভিযোগে ইদানিং কোর্টে যে পারছে সেই মামলা ঠুকে দিচ্ছে। খেসারৎ দেবে কে?

• • •

অভিজিৎ লাহিড়ি—পাটওয়ার বাগান লেন কলিকাতা

শান্তি গোপালের "হিটলারে"র ভূমিকায় অভিনয় চার্লির "The great Dictatorএর মতই উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয় কি? হিটলারকে লোকচক্ষে হেয় করাই যেন নাটকটির মূল উদ্দেশ্য। আপনার কি মনে হয়?

০ শান্তি গোপালের হিটলার আমি দেখিনি। চার্লির Great Dictator-ও না। Great Dictator ছবি তৈরী হয়েছিল যুদ্ধের সময়ে, সেই সময়ে ওই ধরণের ছবি তৈরী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল। আজকের দিনে হিটলারের জীবনী নিয়ে নাটক, যাত্রা, ছায়াছবি যাই হোক না কেন তার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তাছাড়া নাটকের চরিত্রানুযায়ী যিনি ঠিকমত রূপদান করতে পারবেন তিনিই তো যথার্থ অভিনেতা।

• • • • •

চিত্রলেখা

ঢেউয়ের পর ঢেউ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সমুদ্র

নিতাই কয়েকটি জেলের সঙ্গে জাল টানছে।

জেলেরা জাল টেনে টেনে পাড়ে তুলছে। সাঁইদারের লোকেরা ঝুড়ি নিয়ে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছে। ছোট ছোট ছেলেরা তাদের স্বভাবমত এটা ওটা নিয়ে দুষ্টুমি করে চলেছে।

নিতাই ও কয়েকজন জেলে জালে আটকে-পড়া মাছ ধরে ধরে ঝুড়ি বোঝাই করে চলেছে। দূরে অন্যান্য জেলেরা ঝুড়িতে মাছ বোঝাই করছে।

কয়েকটা মাছ বোঝাই ঝুড়ি

নিতাই ও অন্য একজন জেলে দুটি ঝুড়ি নিয়ে চলে যায়।

গ্রামের পথ। ছোট জলা। কারুর বাড়ীর পাশ দিয়ে কারুর উঠানের ওপর দিয়ে নিতাই হেঁটে চলেছে।

নিতাইয়ের কুঁড়েঘর। চারিদিকে ফাঁকা। কোথাও কোন জনমানুষ নেই। মাঝে মাঝে কাক ডাকচে ঝোপের আড়ালে। নিতাই এসে বাড়িতে ঢোকে।

লোটনের বাড়ি। লোটনের বাবা গুরুচরণ এখন গ্রামের মহাজন। খাতা পত্র নিয়ে বসে হিসেব নিকেশ করছেন। সামনে বসে আছে সাঁইদার ও গোকুল।

লোটন বাড়িতে ঢুকে অন্যদিকে চলে যাচ্ছিল। নেপথ্যে

(নেপথ্যে) গুরুচরণ—এই লোটন এইদিকে আয়।

লোটন ঘরে প্রবেশ করে। গুরুচরণ বলে

গুরুচরণ—কোথায় থাকিস সারাদিন? আয়, এখানে বোস—

লোটন এগিয়ে এসে গুরুচরণের পাশে চৌকিতে বসে। সাঁইদার বলে—

সাঁইদার—হ্যাঁ, এইবেলা বাবার কাছ থেকে সব দেখে শুনে নে—

খাতা থেকে মুখ তুলে গুরুচরণ গোকুলকে বলে—

গুরুচরণ—দে গোকুল, তোর টাকাটা দে—

গোকুল হাত বাড়িয়ে টাকাটা দেয়। গুরুচরণ ক্যাশ বাক্সের উপর টাকাটা রেখে লোটনকে বলেন—

গুরুচরণ—নে এটা গোকুলের নামে জমা কর—

গোকুলকে বলেন—

গুরুচরণ—জনার্দনের কি হলরে? ওর তো বিস্তর টাকা বাকি পড়েছে—

মুখ ফিরিয়ে আবার লোটনকে বলেন গুরুচরণ—

গুরুচরণ—ন পাড়ায় কালকে সকাল সকাল যাবি, টাকা না দিলে জনার্দনকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবি।

সাঁইদার গুরুচরণের দিকে হুঁকোটা এগিয়ে দেয়—

সাঁইদারের কাছ হতে হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নিয়ে গুরুচরণ ওকে বলেন

গুরুচরণ—নকুল, তুই কাল আসিস, তোরটা বন্দোবস্ত

নকুল সাঁইদার উঠে প্রণাম করে বেরিয়ে যায়।

সকাল। সমুদ্রের পাড়ে সারি সারি জাল শুকোতে দেওয়া হয়েছে। নিতাই আরও একটা ভারি জাল এনে মেলে দেয়।

একজন জেলেকে লোটন জিজ্ঞেস করে

লোটন—নিতাই কোথায় রে ?

জেলেটি—ওই তো, ওই হোথায়

জালের সারির ভিতর দিয়ে নিতাইকে দেখিয়ে দেয় জেলেটি

লোটনকে দেখে এগিয়ে আসে নিতাই। বলে—

নিতাই—কিরে—এই সাতসকালে ; কি ব্যাপার ?

লোটন—আছে ব্যাপার, চল্ আমার সাথে

নিতাই—চল্, আমারও এখানে সব কাজ শেষ হয়ে গেছে

হাত ধরাধরি করে নিতাই আর লোটন গ্রামের দিকে এগিয়ে যায়

লোটনের বাড়ী। দাওয়ায় বসে লোটনের মা পান সাজছেন। নিতাই ও লোটন এসে দাওয়ার উল্টোদিকে লোটনের ঘরে চলে যায়।

ঘরে ঢুকে লোটন তাক থেকে একটা সুন্দর কাটারী তুলে এনে নিতাইকে দেয়।

নিতাই কাটারিখানা নেড়েচেড়ে দেখে বলে—

নিতাই—বাঃ ভারী সুন্দর, কোথায় পেলি ?

লোটন—বাসুদেবপুরের মেলা থেকে এনেছি তোর জন্যে

হাসিমুখে নিতায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে লোটন

নিতাই খুসীমনে কাটারীর ধার পরীক্ষা করতে থাকে। লোটন তাক থেকে একটা মোড়ক তুলে এনে নিতাইকে বলে—

লোটন—দ্যাখ পদ্মর জন্যে এনেছি

নিতাই মোড়কের দিকে তাকায়

লোটন মোড়কটা খুলে ফেলে। কতকগুলি কাঁচের ও গালার চুড়ি ঝকমকিয়ে ওঠে। নিতাই খুসী হয়ে বলে—

নিতাই—বাঃ, পদ্মকে ভারি সুন্দর মানাবে—

নেপথ্যে লোটনের মা বলেন

লোটনের মা—এসো এসো বৌ, আয় পদ্ম

নিতাই জানালা দিয়ে দেখতে পায় পদ্ম ও পদ্মর মামী উঠোন পেরিয়ে দাওয়ার দিকে এগোচ্ছেন। নিতাই একটু এগিয়ে পদ্মকে ডাকে

নিতাই—পদ্ম

পদ্ম ফিরে তাকায়। নেপথ্যে নিতায়ের ডাক

নিতাই—এদিকে আয়

পদ্ম এগিয়ে যায়

মামী দাওয়ায় উঠে বসে। লোটনের মা একটা পান সেজে মামীকে দিয়ে বলেন—

লোটনের মা—তা কিগো এত সকাল সকাল বেরিয়েছ যে ? কর্ত্তা বুঝি সমুদ্দুরে গেছেন ?

মুখে পান দিয়ে মামী বলেন—

মামী—সময় কি আর পাই দিদি, আজ ভোর রাতে পদ্মর মামা পাশের গাঁয়ে গেলেন তাই—নাগলে সংসারের ঠেলাতো বোঝ দিদি।

লোটনের মা মুখে খানিকটা দোক্তা ও পানের ডগা থেকে খানিকটা চুন জিভে ঠেকিয়ে বলেন—

লোটনের মা—তা আর বুঝিনা! সংসার সামলাতে সামলাতেই তো পাগল হয়ে গেলাম। ওনার তো সেই এগাঁ আর সেগাঁ। শরীরটা ভেঙে গেল, অসুখ বিসুখ তো লেগেই আছে—

মামী—কেন লোটনা তো এখন দেখাশোনা করছে ? ওনার এখন বেশী ঘোরাঘুরি না করাই ভাল—

লোটনের মা—আমিও তো তাই বলি, ছেলে এখন

কাজকর্ম দেখছে তুমি একটু বিশ্রাম কর। তা সে কথা শুনছে কে?

মামী—তা যা বলেছ দিদি—পদ্মর মামাকেও তো দেখছি, এত করে বলি মেয়েটা ডাগর হয়েছে, একটা পাত্তর দেখ—তা কে কার কথা শোনে।

লোটনের মা সাগ্রহে বলেন—

লোটনের মা—ওর জন্তে তোমায় চিন্তা করতে হবেনা। পদ্ম তোমার সোনার টুকরো মেয়ে, সবাই ওকে ঘরে নিতে চাইবে। বুঝলে ভাই ও যে ঘরে যাবে সেই ঘর আলো করবে—

পদ্ম লোটন নিতাই তিনজনেই ঘর থেকে উঠোনে নেমে আসে। লোটনের মার শেষ কথাগুলি ওরা সকলেই শুনতে পেয়েছিল। পদ্মর হাতভরা চুড়ি ঝকমকিয়ে ওঠে আর লজ্জায় মুখ রাঙা হয়ে যায়। লোটনও খুসিতে উজ্জল, কিন্তু নিতাই একটু বিমনা হয়ে গেল।

রাত্রি। বাইরে ঝিঁঝিঁ ডেকে চলে। ঘরে পদ্ম শুয়ে আছে। মামী একটা কাপড় কুঁচিয়ে দেয়ালে টাঙানো দড়িতে ঝুলিয়ে রাখছেন। নেপথ্যে পদ্মর মামার ডাক শোনা যায়—

—নেপথ্যে পদ্মর মামা—ও বৌ শোনো।

পদ্মর মামা বাইরের দাওয়ায় বসে জাল মেরামত করছে। পিছনের দরজার কাছে মামী এসে দাঁড়িয়ে বলে—

মামী—কি?

মামা—বোস্, কথা আছে।

মামী দরজা থেকে কাছে এসে মামার পাশে বসে। বলে—

মামী—কি কথা?

মামা—শোননা, পাঁচঘরার সেই সম্বন্ধটা। ছেলেটা মন্দ নয়, পদ্মর সঙ্গে ভারী মানাবে।

মামী—তা ওরা মেয়ে দেখবে না?

মামা—দেখবে, এই পূজার পরেই আসবে।

ঘরে বিছানায় শুয়ে পদ্ম মামা মামীর সব কথাই শুনতে পায়। স্বল্প একটু লাজুক হাসি ওর মুখে খেলে যায়। পাশ ফিরে শোয় পদ্ম। সমুদ্রের ঢেউয়ের আওয়াজ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।

সকাল। নির্জন সমুদ্র সৈকত।

খাঁড়ীর ঘাটে কয়েকটি নৌকা নোঙর করা রয়েছে। সারারাত জেলেরা মাছ ধরে। শেষ রাতে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে খাঁড়িতে নৌকা নোঙর করে যে যার জায়গায় গলুই বা পাটাতনে শুয়ে পড়ে। সকালে উঠে নিজেদের ধরা মাছ নিয়ে যাবে নকুল সাঁইদারের মাছের আড়তে হিসেব-নিকেশ করতে।

খাঁড়ীর ঘাটে পদ্ম ও ওর বন্ধু ময়না স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে উঠে আসছে। পদ্ম হঠাৎ চাপাগলায় ময়নাকে ডাকে—

পদ্ম—এই ময়না,

ইসারায় পাশের নৌকোর গলুইএর দিকে ময়নার দৃষ্টি আকর্ষণ করে পদ্ম।

নৌকোর গলুইয়ের ওপর নিতাই পাশ ফিরে হাতের উপর মাথা রেখে গভীর নিদ্রামগ্ন।

ময়না পদ্মর ইসারা বুঝতে পারেনা। বিরক্ত মুখে কাপড় জামা সামলাতে থাকে সে। জল থেকে উঠতে উঠতে বলে

ময়না—আবার কী হোল? দিনরাত খালি ময়না ময়না

জল থেকে উঠে পদ্মর দিকে না তাকিয়েই এগিয়ে চলে যায় ময়না।

পদ্ম দুষ্টুমীভরা চোখে একবার ময়নার যাওয়ার দিকে চেয়ে ছাখে, একটু ফিরে এক আঁজলা জল নিয়ে ঘুমন্ত নিতায়ের গায়ে ছিটিয়ে দেয়।

গায়ে জল পড়তেই নিতাইয়ের ঘুম ভেঙে যায়। ধড়-

মড়িয়ে উঠে বসে সে। নজরে পড়ে সামনেই জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে পদ্ম।

পদ্ম নিতাইয়ের দিকে চেয়ে থাকে। মুখে দুষ্টুমীভরা হাসি

পদ্মকে একটুখানি দেখে নিতাই আবার শুয়ে পড়ে গলুইয়ের ওপর। হাতে চিবুক রেখে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে পদ্মর দিকে। নিতাইয়ের দৃষ্টির মধ্যে ঈষৎ চাপা হাসি খেলে যায়।

ভিজে কাপড়ে নিতাইয়ের দৃষ্টির সামনে পদ্ম ভীষণ লজ্জা পায়।

নিতাই মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

জল ভেঙে পাড়ের দিকে এগোতে থাকে পদ্ম। মাঝে মাঝে ফিরে নিতাইকে দেখে। নিতাই একই ভাবে তাকিয়ে আছে। আরো দ্রুত এগিয়ে যায় পদ্ম।

খানিক দূরে গিয়ে ফিরে দেখে পদ্ম, নিতাই তখনও তার দিকে তাকিয়ে আছে আগেকার মতই। হেসে ফেলে পদ্ম। ঘুরে বাড়ীর দিকে চলে যায়।

সমুদ্রপাড়ে ভামিনীপিসির চায়ের দোকান। দূরে বাখারির বেঞ্চে কয়েকটি জেলে বসে আছে। ওরা নিজেদের মধ্যে হাসি গল্প করছে। কারো হাতে বিড়ি, কারো হাতে চায়ের গেলাস। ভামিনী কয়েকটা গেলাস ধুতে ধুতে সাঁইদারকে বলে—

ভামিনী -বলি হ্যাগো সাঁইদার; নেতাইকে কি পয়সা কড়ি কিছু দাওনা নাকি? পানটা বিড়িটা সবাই খায় দেখি কিন্তু ওতো দেখি কিছুই খায়না—

সাঁইদার—ভামিনী, নিতাই বড় মহাজন ছেলে। আজে বাজে খরচা করে এদের মত টাকা ওড়াবার ছেলে নিতাই নয়—

একটু ঝুঁকে ঘনিষ্ট হয়ে গলার স্বর নামিয়ে বলে, সাঁইদার—

সাঁইদার—ওর টাকাতো আমার কাছেই থাকে। এর মধ্যেই তা প্রায় সাত কুড়ি টাকা জমিয়ে ফেলেছে—বুঝলি?

ভামিনী চোখ বড় বড় করে বলে—

ভামিনী—তাই নাকি?

সাঁইদার নিঃশব্দে মাথা নাড়ে। সহজ হয়ে বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে আরাম করে বসে। বলে—

সাঁইদার—নে ভামিনী, ভাল করে এক কাপ চা খাওয়া দেখি।

নিতাইএর বাড়ী। অনেক সাধের বাড়ী তার। খড়ের ছাউনি উঠেছে নিতাইয়ের ঘরে। একজন সঙ্গিকে নিয়ে ঘরের বেড়া লাগাতে ব্যস্ত সে। দা দিয়ে ঠুকে ঠুকে সামনের বেড়াটা পাশের বেড়ার সঙ্গে মিলিয়ে দিচ্ছে দুজনে।

বেড়া বাঁধা হয়ে গেলে নিতাই মাথা থেকে গামছা খুলে মুখ মোছে। নতুন ঘরের দিকে তাকিয়ে ওর মন খুসিতে ভরে ওঠে। কি একটু ভেবে ওর সঙ্গিকে বলে—

নিতাই—পাঁচু, আমি একটু ঘুরে আসছি, তুই ততক্ষণ রান্নাঘরের বেড়াটা বেঁধে ফ্যাল—

গামছাটা কাঁধে ফেলে নিতাই বেরিয়ে যায়।

পদ্মর বাড়ী। দাওয়ায় বসে কুলোয় ধান ঝাড়ছে পদ্মর মামী। ঘরের পাশদিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায় পদ্ম ও ময়না। দাওয়া থেকে মামী বলেন—

মামী—কোথায় যাচ্ছিস তোরা?

দরজার ঝাঁপ তুলতে তুলতে ময়না বলে—

ময়না—আমাদের বাড়ি

বাইরে বেরিয়ে এসে দুজনে কোমর জড়াজড়ি করে চলে। হাসতে হাসতে ময়না বলে—

ময়না—কোথায় রে?

পদ্ম—(অস্ফুটস্বরে) পাঁচঘরায়

দুজনে হাসতে হাসতে ঝাউবনে মিলিয়ে যায়।

ঝাউবন। লম্বা পা ফেলে নিতাই এগিয়ে আসে ঝাউবনের ভিতর দিয়ে। পদ্মর বাড়ির দরজার ঝাঁপ তুলে ভিতরে ঢুকে দাওয়ার দিকে এগিয়ে যায়।

মামী দাওয়ায় বসে ধান ঝাড়ছে। নিতাইকে একবার দেখে আবার মাথা নীচু করে ধান থেকে কুটো বাছতে থাকেন। নিতাই বলে—

নিতাই—মামী, পদ্ম কোথায় ?

একটু বিরক্তভাবে মামী বলেন—

মামী—কোথায় আবার—ময়নাদের বাড়ী, এত বড় মেয়ে, সংসারের কুটোটা যদি একটু নাড়তো।—

বিরক্ত মামী হাতের উল্টো দিকে মুখ মুছে আবার নিজের কাজে মন দেন। অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে নিতাই বলে—

নিতাই—যাই মামী

দরজার দিকে এগোবার সময় নিতাই দেখতে পায় ভামিনী আসছেন। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দরজার ঝাঁপ তুলে ধরে। ভামিনী নিতাইকে বলেন

ভামিনী—কিরে নিতাই, আজ কাজে যাসনি ?

নিতাই—না পিসি, ঘরটা ছাইছিলাম আজ, তাই—

ভামিনী—ও:

মামীর দিকে এগিয়ে যান ভামিনী। যেতে যেতে মামীকে উদ্দেশ্য করে বলেন

ভামিনী—হ্যাঁ বৌ, তুই নাকি পাঁচঘরায় পদ্মর সম্বন্ধ ঠিক করেছিস ?

কথাটা কানে যেতেই নিতাই স্তম্ভিত হয়ে যায়। ধীরে ধীরে ঝাঁপ তুলে বেরিয়ে যায়।

ঝাউবন। দূরে দেখা যায় ঝাউবনের ভিতরে একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে পদ্ম ও ময়না মশগুল হয়ে গল্প করছে।

নিতাই একটা উঁচু ঢিপির ওপর দিয়ে যেতে যেতে ওদের দেখে থমকে দাঁড়িয়ে যায়।

আচমকা ঝাউবনে এইভাবে নিতাইকে দেখে ওরা দুজনেই ঘাবড়ে যায়। পদ্ম বলে ওঠে

পদ্ম—ওরে বাবা—

ঢিপি হতে দ্রুতপায়ে নেমে এসে ওদের কাছে দাঁড়িয়ে তীব্রস্বরে নিতাই বলে

নিতাই—তোরা এখানে কি করছিস ?

একটু সামলে নিয়ে গম্ভীর হয়ে ময়না বলে

ময়না—ঝাউবনটা দেখছিলাম। কিছুদিন পরে আরতো দেখতে পাবনা

ময়নার গম্ভীরভাব আর কথা শুনে পদ্ম খিল খিল করে হেসে ময়নার পিঠে গড়িয়ে পড়ে।

নিতাই বলে

নিতাই—এই অবেলায় ঝাউবন না দেখে বাড়িতে থাকলে তো কাজ হয়

পদ্ম ও ময়না হাসতে হাসতে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে

ওদের এই রকম হাসি দেখে নিতাই আরও রেগে যায়। পদ্মকে উদ্দেশ্য করে বলে

নিতাই— এখানে বসে হিঃ হিঃ করতে লজ্জা করেনা তোর ?

নিতাইয়ের রাগ দেখে পদ্ম একেবারে চুপ হয়ে যায়।

নিতাই বলে

নিতাই—একেবারে সরম নেই। ধিঙ্গি কোথাকার

ক্রুদ্ধভাবে স্থানত্যাগ করে নিতাই

পদ্ম হাত তুলে খোঁপা ঠিক করতে করতে অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকে নিতাইয়ের গতিপথে

ঝাউবনের ভিতর দিয়ে লোটন এগিয়ে যায় পদ্মর বাড়ির দিকে।

ঝাপ তুলে কলসীকাঁখে পদ্ম বেরিয়ে আসে। মুখ ভার। ও এগিয়ে যায় পথ ধরে। লোটনের কাছে এসে একটু থেমেই ও আবার চলতে শুরু করে

লোটন ফিরে ওকে জিজ্ঞেস করে

লোটন—এই পদ্ম, কি হয়েছেরে ?

পদ্ম থেমে যায়

ফিরে একটু উষ্মার সঙ্গেই বলে পদ্ম

পদ্ম—দ্যাখনা, কাল আমি আর ময়না ঝাউবনে গল্প করছিলাম—নিতাই এসে শুধু শুধু বকলে—

লোটন—ওঃ এই ব্যাপার, তা ওকে তো তুই জানিস!

পদ্ম—তাই বলে ময়নার সামনে বকবে ?

রাগ করে হনহন করে পদ্ম বেরিয়ে যায়। লোটন চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

ঝাউবন। ঝাউবনের ফাঁকে সমুদ্র দেখা যায়। সমুদ্র পাড়ে গালে হাত দিয়ে নিতাই বসে আছে। অন্যমনস্ক তার দৃষ্টি।

ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে বেলাভূমি ভাসিয়ে দিয়ে যায়। একসময়ে নিতাই উঠে পড়ে।

ঝাউবন। ঝাউয়ের পর ঝাউয়ের সারি। আলো ও ছায়ার লুকোচুরি। দূরে দেখা যায় নিতাই চিন্তিত মুখে ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে। একটা ঝাউয়ের সারি পেরোতেই নেপথ্যে সাঁইদারের গলা শোনা যায়—

(নেপথ্যে) সাঁইদার—নিতাই—এই নিতাই

নিতাই মুখ ফিরিয়ে ওই দিকে তাকায়

সাঁইদারের পাশে এসে দাঁড়ায় নিতাই। সাঁইদার বলে—

সাঁইদার—এই যে নিতাই তোর কাছেই যাচ্ছিলাম। শুনেছিস তো, মুকুন্দপুরের যাত্রাদল আসছে। এখানকার সব ব্যবস্থা তোকেই করতে হবে, বুঝলি ?

নিতাই মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। সাঁইদার আবার বলে—

সাঁইদার—দেখিস, পাঁচগাঁয়ের লোকের কাছে যেন মান ইজ্জত বজায় থাকে!

নিতাইয়ের পিঠ চাপড়ে চলে যায় সাঁইদার। নিতাই ফেরে।

যাত্রাগানের জায়গা। জমির চৌহদ্দী মেপে খুঁটির জায়গাগুলিতে দাগ দিচ্ছে নিতাই। কয়েকটি ছেলে ওকে সাহায্য করছে।

জায়গামত বাঁশের খুঁটিগুলো পুঁতে নিতাই একবার দেখে নেয়।

কয়েকজন ছেলে সামিয়ানা টাঙাবার ব্যবস্থা করছে। নিতাই নির্দেশ দিচ্ছে—

নিতাই—নে নে টান করে ধর, মাপটা দেখেনিস ঠিক করে—

একটা মইয়ের উপর দাঁড়িয়ে নিতাই বাঁশের খুঁটির সঙ্গে আড়াআড়িভাবে অন্য একটা বাঁশ বাঁধছে।

সামিয়ানা টাঙানো হয়ে গেছে। কোথাও কোন ঝুল বা ট্যারাবাঁকা নেই। চারদিকে একেবার টান টান। নিতাই হাসিমুখে তাকিয়ে দেখে চারদিকে। কোমর হতে গামছা খুলে মাথা মুখ হাত মুছে ধীরে ধীরে অন্যদিকে চলে যায়।

যাত্রার আসর। সাঁইদার এদিক ওদিক ঘুরে তদারক করছে। একপাশে তেরপল ঘেরা একজায়গায় যাত্রা-পার্টির কয়েকজন লোক সাজ পোষাক পরতে ব্যস্ত। ভীম-বেশী একজন গদা ঘুরিয়ে সামনে-রাখা আয়নায় নানারকম মুখভঙ্গি করে নিজেকে দেখছে। দ্রৌপদীর বেশ পরা একজন মুখে বিড়ি গুঁজে দিয়াশলাই দিয়ে

ধরাবার চেষ্টা করছে। দেশলাই না জলাতে অত্যন্ত বিরক্ত মুখে ম্যাচবাক্স ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বৃদ্ধ ভীমের কাছে গিয়ে দেশলাই চেয়ে নেয়।

বাচ্চা ছেলেরা তেরপল উঠিয়ে উঁকি দিয়ে এইসব দেখছে।

বাচ্চাদের দৌরাত্ম্যে আয়না নড়ে যাওয়ায় বিরক্ত ভীম ওদের দিকে তাক করে গদা তোলে। ভয় পেয়ে বাচ্চারা সব তেরপল ফেলে দেয়।

সাঁইদার ওদের দেখতে পেয়ে চীৎকার করে ওঠে—

সাঁইদার—এই, এই হতচ্ছাড়ারা—

বাচ্চারা যে যেদিকে পারে ছুটে পালিয়ে যায়।

ঝাউবনের ফাঁক দিয়ে হ্যাজাকের আলো দেখা যায় সামিয়ানার নীচে। আসরে তখন বাজনা শুরু হয়েছে। লোকজন এসে ধীরে ধীরে জমায়েত হচ্ছে।

ঝাউবনের পথ দিয়ে কয়েকজন ছেলে মেয়ে বৌ যাত্রার আসরের দিকে চলেছে। পদ্ম ও মামী তাদের পিছু পিছু চলেছে।

লোটনের বাড়ি। লোটনের মা লোটনকে একটা চাদর দেন যাত্রার আসরে গায়ে দিয়ে যাবার জন্যে।

লোটন—আর একটা চাদর দাও না মা

মা—কেনরে? আর একটা কি হবে?

লোটন—সারারাত যাত্রা শুনবো। নিতাইও তো থাকবে।

একটু হেসে মা আর একখানা চাদর লোটনের দিকে এগিয়ে দেন।

ঝাউবনে মামীর পিছু পিছু যেতে যেতে পদ্ম দেখতে পায় দূরে একটা ঢালু জায়গায় নিতাই চুপ করে বসে আছে। যেন কিছু ভাবছে। পদ্ম থমকে দাঁড়ায়। আশপাশের কত জায়গা থেকে লোকজন আসছে যাত্রা দেখতে। নিতাইকে এভাবে একা বসে থাকতে দেখে ও একটু বিস্মিত হয়। মামীর দিকে তাকিয়ে দেখে পদ্ম। মামী অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। ঢালু রাস্তায় নেমে পড়ে পদ্ম।

ধীর পায়ে নিতাইয়ের পাশে এসে দাঁড়ায় পদ্ম। নিতাই অন্যমনস্ক। চুপচাপ একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে পদ্ম বলে—

পদ্ম—চুপ করে বসে আছ যে!

নিতাই একই ভাবে বসে থাকে। বলে—

নিতাই—আয় পদ্ম, বোস

পদ্ম এসে পাশে বসে। দুজনেই নির্বাক। কিছুক্ষণ সময় কেটে যায়। একটু পরে পদ্ম ডাকে নিতাইকে—

পদ্ম—এই—

নিতাই মুখ ফেরায় পদ্মর দিকে। বলে—

নিতাই—আমি নতুন করে ঘর ছেয়েছি পদ্ম। (একটু থেমে) ও ঘর আমি ছেয়েছি তোর জন্যে—ও ঘরে থাকতে হবে তোকে—ও ঘরের লক্ষ্মী তুই ছাড়া আর কেউ নয়রে পদ্ম।

পদ্ম অন্যমনস্ক আবেশে তাকিয়ে থাকে। নিতাই ডাকে

নিতাই—পদ্ম—

পদ্ম—উঁ—

নিতাই—তুই আমার,—সেই ছেলেবেলা থেকে তুই আমার পদ্ম—

ঝাউঝাড়ির পাশে লোটন থমকে দাঁড়ায়। দু হাতে চাদর দুটি বুকে চেপে ধরে। চোখে আহতের দৃষ্টি। সব কিছু তার কাছে শূন্য হয়ে যায়। সমস্ত বেদনা বুকে চেপে ঘুরে দাঁড়ায় সে:

ঝাউবনের গাছগুলিও সব যেন স্থির হয়ে গেছে ওর দুঃখে। বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে। নিস্তব্ধ পরিবেশে ধীরে ধীরে লোটন দূরে মিলিয়ে যায়। পিছনে পড়ে থাকে শুধু নিস্তব্ধ বনানী

একটা নির্জন গাছের নিচে লোটন এসে চুপ করে বসে

চোখে ফাঁকা দৃষ্টি। দূরে যাত্রার আসর থেকে ক্ল্যারিওনেটের করুণ সুর ভেসে আসে। নেপথ্যে মাঙলিক শঙ্খ ও উলুধ্বনি শোনা যায়।

বর ও কনে বেশে নিতাই ও পদ্ম হাতে হাত রেখে বসে আছে। সামনে বসে পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করছেন। আশে পাশে এয়ো ও মেয়েরা শঙ্খ ও উলুধ্বনি দিতে থাকে।

[ক্রমশঃ]

"Dheuer pare dheu" one of the recent films, carries in any opinion definite tidings of a new day break.

In this pricture one feels that the human material has been used almost as punciuation only to compose a pure ballad of panoramic landscape throngh the seasons.

I am a most tempted to say that the seldom have the strands of a human story been so delicately and significantly wovlen into the vast and moving texture of nature.

Premendra Mitra

'ঢেউএর পরে ঢেউ' একটি অতি পরিচ্ছন্ন অতিসরল কাব্যচিত্র।

রাধারানী দেবী

একটি বিশাল, মহন্ ও উদার সৌন্দর্য্যের জগৎকে দেখলাম। চলচ্চিত্র কাব্যধর্মী হলে মানুষের নিভৃত অনুভূতিতে কতটা দাগ রাখে, 'ঢেউ এর পরে ঢেউ' ছবিটি তারই স্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

সত্যি কথা বলতে কি "পথের পাঁচালীর" পর মানুষ ও প্রকৃতির এমন একাত্ম রূপ আর কোন চলচ্চিত্রে দেখিনি।

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য্য

— — —

আগামী সংখ্যা থেকে শ্রীদিলীপকুমার রায়ের নতুন ধরণের উপন্যাস "পতিতা ও পতিতপাবন" ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রথম খণ্ড

ষষ্ঠ সংখ্যা

ষট্‌পঞ্চাশত্তম বর্ষ

বৈষ্ণবধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য

ডঃ নবেন্দু দত্ত-মজুমদার

ভারতের দিব্যদর্শী ঋষি গৌতম, কণাদ, কপিল, পতঞ্জলি, জৈমিনি ও বেদব্যাস যে সুপ্রাচীন ষড়্‌দর্শন সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারা যথাক্রমে ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা নামে পরিচিত। ঋষিপ্রণীত এই ছয় আস্তিক দর্শনশাস্ত্রের মতে জীবের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি রূপ মুক্তিই পরমপুরুষার্থ। মোক্ষ, নিঃশ্রেয়স, কৈবল্য ও নির্ব্বাণ মুক্তিরই পর্য্যায়বাচী শব্দ। বৌদ্ধদর্শনে নির্ব্বাণশব্দের ভূরি প্রয়োগ দেখা যায়। যদিও মুক্তির প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন দর্শনে মতভেদ আছে তবু সকল দর্শনের লক্ষ্য যে মুক্তি ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। শঙ্কর মতানুযায়ী অদ্বৈতবাদিগণও কৈবল্যরূপ মুক্তি স্বীকার করিয়া থাকেন।

জীবেশ্বরে ভেদবাদী রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব, ও বল্লভ প্রভৃতি চতুঃসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতেও মুক্তিই
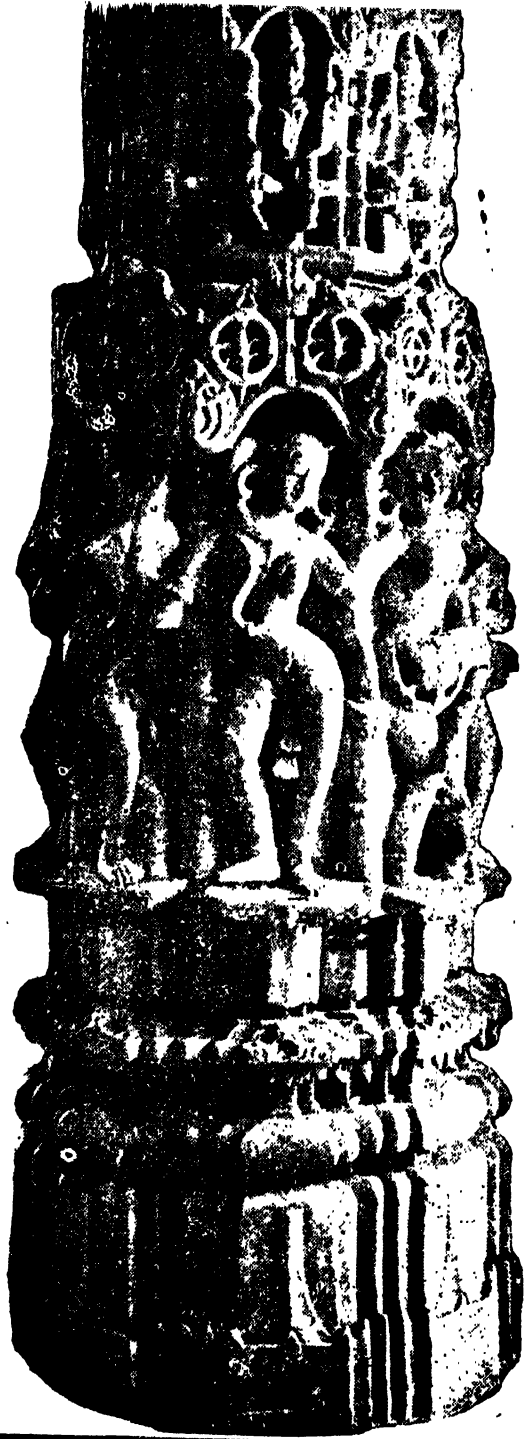
পরমপুরুষার্থ। মুক্তি শব্দে তাঁহারা সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য বোঝেন। তাঁহাদের নিকট ভক্তি এই মুক্তি লাভের উপায় বা সাধন। অবশ্য মুক্তি ও ভক্তির স্বরূপ বিশ্লেষণে এই চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে শ্রীরামানুজ মতে বৈকুণ্ঠে নৈষ্কর্ম্য-লাভই মুখ্য।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁহার অনুগত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ আধ্যাত্মিক জগতে এক অভুত-পূর্ব্ব সম্পূর্ণ নূতন আদর্শ দান করিয়া গিয়াছেন। ইহা প্রেমভক্তি প্রেম বা প্রীতি নামে অভিহিত। ইহা মুক্তির অতীত ও উপরের অবস্থা। মুক্তির জন্য ভক্তি নহে, কিন্তু ভক্তির জন্যই মুক্তি। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ বা চার পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষ তুরীয় বা পরম-পুরুষার্থ নামে খ্যাত। সুতরাং শ্রীরূপ গোস্বামী প্রেমভক্তিকে তুর্য্যাতীত পঞ্চমী প্রেমময়ী অবস্থা বলিয়াছেন—

[উজ্জ্বলনীলকান্তমণি:—শৃঙ্গার—ভেদপ্রকরণম্, ২১৯ শ্লোক।]

শ্রীজীব গোস্বামী ইহাকে পঞ্চম পুরুষার্থ বা পরমতম পুরুষার্থ বলিয়াছেন (ভাগবতম্—১২।১৬—২১ শ্লোকের টীকা ও প্রীতি সন্দর্ভ :—১৬ অনুচ্ছেদ)। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন "পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন। কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন॥" [চৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা ৭ম পরিচ্ছেদ]

প্রেমভক্তি, প্রেম বা ভাগবতী প্রীতি কি বস্তু তাহা বুঝিতে হইলে সাধনভক্তি বা ভাবভক্তি নামক প্রেমের পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি স্তরের একটু আলোচনা প্রয়োজন। সাধন ভক্তির সামান্য লক্ষণ শ্রীভগবান সম্বন্ধে বা তাঁহার প্রীত্যর্থে অনুকূল মনোবৃত্তিসহ কায়িক, বাচিক ও মানসিক অনুশীলন। এই অনুশীলন করিতে হইবে অন্যাভিলাষিতাশূন্য হইয়া (অর্থাৎ শ্রীভগবান্ ব্যতিরিক্ত সর্ব্ববিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া) এবং নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞান ও স্মৃত্যুক্ত নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মদ্বারা অনাবৃত হইয়া। অন্যাভিলাষ বলিতে যে শুধু বিষয়ভোগেচ্ছা বুঝায় তাহা নয় মোক্ষাভিলাষও ইহার অন্তর্ভুক্ত। তাই শ্রীরূপ বলিয়াছেন, হৃদয়ে যতক্ষণ ভুক্তিমুক্তি স্পৃহারূপ গ্রহের আবির্ভাব হইতে পারে না। দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ দ্বারা উক্তরূপ ভগবদনুশীলনের অভ্যাস করিতে করিতে সাধকের চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সেই শুদ্ধচিত্তে অপ্রাকৃত ভাবভক্তির উদয় হয়।

এই ভাব বা রতির আত্মা বা স্বরূপ শুদ্ধসত্ত্ববিশেষ, অর্থাৎ শ্রীভগবানের স্বপ্রকাশিকা স্বরূপ শক্তির সাম্বিৎ ও হ্লাদিনীনাম্নী বৃত্তিদ্বয়ের সারাংশতত্ত্ব। ইহা মায়াতীত, গুণাতীত ও অপ্রাকৃত। ভাবকে প্রেমাঙ্কুর, প্রীত্যঙ্কুর বা উদীয়মান প্রেমরূপ সূর্য্যের প্রথমচ্ছবি বলা হয়। ভাবের উদয়ে ভগবৎ প্রাপ্তি ও সেবার অভিলাষ এমন প্রবলতা লাভ করে যে, সাধকভক্তের চিত্ত মসৃণ ও আর্দ্র হইয়া অশ্রুপ্রবাহে প্রকাশ পায় এবং অপার আনন্দের হিল্লোলে উন্মজ্জিত, নিমজ্জিত হয়। এরূপ অবস্থায় বিষয় ভোগেচ্ছা দূরে থাকুক, মোক্ষ পর্য্যন্ত তুচ্ছ বোধ হয়। তাই বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—ভক্তিই নিষ্কাম ভক্তির অনুসংহিত ফল, আর মোক্ষ অননুসংহিত ফল, অর্থাৎ বিনা অনুসন্ধানেই আসে। সুস্থ জীবের জঠরানল যেমন অজ্ঞাতসারে ভুক্ত অন্নের অসারাংশ ধ্বংসপূর্ব্বক সারাংশদ্বারা দেহ পুষ্ট করে, ভক্তিও তেমনি পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর হেতুভূত লিঙ্গশরীর ধ্বংস করিয়া মোক্ষ আনয়ন করে; কিন্তু কখন কি ভাবে সেই কার্য্য হয় ভক্তের সে সম্বন্ধে কোন সন্ধানই থাকেনা [ভাগবতম্—৩।২৫।২৯—৩০ শ্লোকের চক্রবর্ত্তিকৃত টীকা

ভাবই পরিপক্ক অবস্থায় সান্দ্রত্ব লাভ করিয়া প্রেমে পরিণত হয়। শ্রীরূপ বলিয়াছেন—"সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ। ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥" [ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ—১।৪।১] ভাবের সান্দ্রত্ব বা নিবিড়রূপত্বই প্রেমের স্বরূপ। প্রেমোদয়ে চিত্ত সম্যক্‌রূপে মসৃণিত বা অতিশয়ার্দ্র হইয়া পরমানন্দোৎকর্ষ লাভ করে, ও ইষ্ট ভগবানে অতিশয় মমত্ববুদ্ধিসম্পন্ন হয়। তিনি আমার প্রভু, আমার সখা, আমার লাল্য-পাল্য বা আমার কান্ত এইরূপ অভিমান বিশেষ জাগ্রত হয়। অন্তরে বাহিরে, আনন্দকন্দ, চিরসুন্দর, অসমোর্দ্ধমধুর ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভে প্রেমিক ভক্ত কৃতকৃত্য। এই প্রেম বা ভাগবতী প্রীতিকে শ্রীজীব হ্লাদিনী-সারবৃত্তি বিশেষস্বরূপা, অপূর্ব্ব আস্বাদময়ী বিষয়ান্তরদ্বারা অনবচ্ছেদ্য

দাসীতুল্য প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করিয়াছেন। [প্রীতি সন্দর্ভ—৭৮ অঙ্ক] কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী সরল ভাষায় বলিয়াছেন, "সেই ভাব গাঢ় হইলে ধরে প্রেম-নাম। সেই প্রেম প্রয়োজন—সর্ব্বানন্দ ধাম।"

[চৈতন্যচরিতমৃত মধ্য লীলা—২৩।১৩]

সাধন ভক্তি হইতে বিলক্ষণ ভাব বা রতি ও প্রেমকে সাধ্যভক্তি বলা হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে এই সাধ্যভক্তি অপ্রাকৃত ও শুদ্ধচিত্তে স্বয়ম্প্রকাশিত। প্রেমের ক্রমিক সান্দ্রত্ব অনুসারে, স্নেহ, মান, প্রণয় প্রভৃতি আরো সাতটি স্তরের বিশ্লেষণ গৌড়ীয় গোস্বামিগ্রন্থে দেখা যায়। কিন্তু সাধকদেহে প্রেম পর্য্যন্তই লাভ হইতে পারে। অন্যান্য স্তর প্রেমসিদ্ধ ভক্তের পক্ষে দেহান্তে নূতন চিন্ময় সিদ্ধ দেহে লাভ সম্ভব। ভক্তির বিভিন্ন স্তরগুলির বর্ণনা করিতে যাইয়া কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন :

"সাধন ভক্তি হইতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হইলে তার প্রেম নাম কয়॥
প্রেমবৃদ্ধিক্রমে নাম—স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়॥
যৈছে বীজ, ইক্ষু, রস, গুড় খণ্ডসার।
শর্করা, সিতা, মিশ্রি, উত্তমমিশ্রি আর॥

[চৈতন্যচরিতামৃত—১।১৯।১৫১—৫৩]

এখন প্রশ্ন হইতে পারে,—শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপ অপ্রাকৃত ভক্তি কি প্রকারে সাধকের সত্ত্বরজ—তমোগুণাক্রান্ত মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত হয়। ইহার উত্তর এই যে, অন্তঃকরণের সঙ্গে শ্রবণকীর্ত্তনাদি রূপ ভক্তির পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে কাম্যাদিমনোবৃত্তি কালক্রমে স্বরূপশক্তির তাদাত্ম্য লাভ করিয়া রূপান্তরিত হয়। দৃষ্টান্ত যেমন গন্ধকচূর্ণের সঙ্গে পারদের পুনঃ পুনঃ সম্মর্দ্দনের ফলে গন্ধকের ক্রমে নিজের আকার অপগম ও রূপান্তর ঘটে, অন্তঃকরণেরও তেমনি ক্রমে প্রাকৃতত্ব ধ্বংস ও চিন্ময়ত্ব-প্রাপ্তি হয়। পারদ-গন্ধকের ঐকরূপ্যকে বলা হয় কজ্জলীভাব। আর ভক্তি ও অন্তঃকরণের ঐক্যরূপ্যের নাম প্রেম। [উজ্জ্বলনীলমণিঃ হরিবল্লভা প্রকরণম্, ৪.নং শ্লোকের বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত টীকা]

এই প্রেম আবার দুই প্রকার,—শ্রীভগবানের মাহাত্ম্য-জ্ঞান-যুক্ত ও মাধুর্য্যমাত্র-জ্ঞানযুক্ত বা কেবল। এই প্রকারভেদ ভগবত্তত্ত্বের বিভিন্নরূপতার উপর প্রতিষ্ঠিত। ভগবান্ বলিতে অসাধারণ স্বরূপ—ঐশ্বর্য্য—মাধুর্য্য তত্ত্ব-বিশেষ বুঝায়। ভগবত্তত্ত্বের এই তিনটি প্রধান দিকের মধ্যে স্বরূপ হইল নির্ব্বিশেষানন্দ বিভুবস্তু, ঐশ্বর্য্য অস্যমার্দ্ধ—অনন্ত স্বাভাবিক প্রভুতা, এবং মাধুর্য্য সর্ব্ব মনোহরত্ব ও স্বাভাবিক রূপগুণ—লীলাদির সৌষ্ঠব বা রোচকত্ব। ভগবানের স্বরূপানুভবে (অর্থাৎ স্বরূপ সাক্ষাৎকারে) স্বরূপানন্দ প্রাপ্তি, ঐশ্বর্য্যানুভবে ভয়-সম্ভ্রম গৌরবাদিবুদ্ধি, ঐশ্বর্য্যমিশ্র মাধুর্য্যানুভবে ভক্ত্যাখ্যা—গৌরবমিশ্র প্রীতি ও মাধুর্য্যানুভবে শুদ্ধপ্রীতি বা কেবল প্রেম হয়। [ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ—৩।৩।১৯ (মুকুন্দদাস গোস্বামিকৃত টীকা ; ৪.৪।১৫ জীব গোস্বামিকৃত টীকা]। মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত প্রেম আর ভক্ত্যাখ্যা গৌরবমিশ্রপ্রীতি একই বস্তু। ঐশ্বর্য্যমিশ্র মাধুর্য্য কিম্বা মাধুর্য্যমিশ্র ঐশ্বর্য্যের অনুভব ইহারই অন্তর্ভুক্ত।

পরমতত্ত্ব শ্রীভগবানের চিন্মাত্রসত্ত্বা, সর্ব্বব্যাপকত্ব, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি স্বরূপধর্ম্মান্তরবৃন্দের সাক্ষাৎকার অপেক্ষা তাঁহার প্রিয়ত্ব-লক্ষণ ধর্ম্মবিশেষের অর্থাৎ মাধুর্য্যের সাক্ষাৎকারেরই সমধিক উৎকর্ষ। কারণ মাধুর্য্যই ভগবত্তাসার। তাই শ্রীজীব বলিয়াছেন,—নিরুপাধি প্রীত্যাস্পদ শ্রীভগবানের প্রিয়ত্বধর্ম্মানুভব বিনা যে সাক্ষাৎ-কার তাহা অসাক্ষাৎকার তুল্য ; যেমন পিত্ত-দুষ্ট-জিহ্বায় মিছরী-খণ্ডের মধুরতার অনাস্বাদ। [ভক্তি সন্দর্ভঃ—১৮৭ অনুচ্ছেদ] শ্রুতিও বলিয়াছেন,—"রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।"

উক্ত উভয় প্রকার প্রেমই মুক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু মুক্তিতে নিজের দুঃখনিবৃত্তি ও সুখ-প্রাপ্তির অভিলাষ থাকে, আর প্রেম স্বসুখবাসনালেশহীন, ও কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়। কৃষ্ণশব্দ এখানে সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর অর্থে গ্রহণীয়। সেইজন্য মাধুর্য্যমাত্রজ্ঞানযুক্ত প্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও পরমতম পুরুষার্থ।

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলাকালে গোপ-গোপীবৃন্দ, বিশেষতঃ শ্রীরাধা, মাধুর্য্যময়, মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে প্রেমের প্লাবন দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা মাধুর্য্যমাত্র জ্ঞানযুক্ত কেবল প্রেমের চরমতম আদর্শ। এই আদর্শের প্রতি জগতের দৃষ্টি আকর্ষণের নিমিত্তই অন্তঃকৃষ্ণ-বহি গৌর,

রাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিত . শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয় পার্ষদ রূপ-সনাতনকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়নের ভার অর্পণ করিয়া। লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের তাৎপর্য্য বৃন্দাবনীয় কেবল প্রেম-লীলার উদ্দীপনাময় পার্থিব প্রতীকোদ্ধার, আর ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্য মাধুর্য্যময় পরমতত্ত্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ ও তদনুভবহেতু কেবল প্রেমের পরমতম পুরুষার্থত্ব স্থাপন। শ্রীরূপ সনাতন, শ্রীজীব ও পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ এই কার্য্য অতি কৃতিত্বের সহিত সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন।

পরমতত্ত্ব, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যতত্ত্বের প্রতি জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ, মুক্তির বহু উর্দ্ধে অবস্থিত মাধুর্য্যমাত্র জ্ঞান-যুক্ত কেবল প্রেমেরপরমতম-পুরুষার্থত্ব প্রতিষ্ঠা এবংতদ্-মধুরতা স্ফূর্ত্তিময় প্রেম সাধনার সম্পূর্ণ নূতন মার্গ প্রবর্ত্তনই ভারতের তথা বিশ্বের দার্শনিক চিন্তা ও আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁহার অনুগত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অদ্বিতীয়, অমর অবদান। ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য।

শিশুর সরল চোখ তুলে

নচিকেতা ভরদ্বাজ

শিশুর সরল চোখ তুলে আমি পৃথিবীকে দেখতে চেয়েছি—
আমার বুকের মধ্যে আজো সেই সহজ বিস্ময় ,
রূপরাগ, অব্যক্ত আকৃতি ব্যথা, হিরণ্ময় স্বাদ।
তবুও সোপানাবলী উত্তীর্ণ হতে গিয়ে নিহত হয়েছি
বার বার : আমাকে পিছনে ফেলে নিষ্ঠুর সময়
বহু দূর চলে গেছে। কৈশোরের প্রথম প্রভাত—
সেখানে কখনো জানি আর ফিরে যেতে পারব না।
লোভী নিভাসের সবে ফুলগুলি আজ সব সোনা।

তবুও পাতালে একটি সুরক্ষিত স্বপ্ন-ঘর আছে
সেইখানে ফিরে আসি মাঝে মাঝে নতুন বিশ্বাসে!
আমার আঁধার কক্ষ আলোকিত হয়েছে যে গানে
তারই অন্বেষণ করি : গোধূলিরমুগ্ধ অনুরাগে
মার হাত ধরে ধরে আবার ফিরিতে চাই ঘরে।
বাঁধে তবু বয়সের আত্মসম্মানে।
ফিরিতে পারি না ঘরে শৈশবের শান্ত অনুরাগে।
এক শিশুর মুখ অশ্রুনত প্রহরে প্রহরে
সচকিত হয়ে ওঠে অন্য এক দূরশ্রুত গানে॥

পতিতা ও পতিতপাবন

শ্রীদিলীপকুমার রায়

এক

ভোজনবিলাসী নয় কোন্ শিশু? মাত্র ছমাসের শিশুও সব কিছুই হাতিয়ে মুখে পোরে সাগ্রহে, আঙুল চোষে সানন্দে। তবু বলা চলে—এ সর্বগ্রাসী বৃত্তিরও কমবেশি আছে। ভীমসেন পড়ে 'বেশি'দের দলে। অদ্ভুত তার ভোজনপ্রতিভা! তিন বৎসর বয়সেও সে কতগুলি কলা খেয়ে হজম করত যারা গুণত তাদের মধ্যে কেউ বলত পাঁচটি, কেউ—সাতটি, কেউ বা—আটটি। এ সব জনশ্রুতির অতিরঞ্জন বাতিল করলেও ভীমসেনকে বলা চলে—'ডাকসাইটে খাইয়ে'—বলতেন ওর কাকা শ্রীবঙ্কিম ভাদুড়ি, যিনি ওর আজব নামকরণ করেন—ভীমসেন। ভীমসেন ভাদুড়ি! শুনে কার না হাসি পাবে? সেন-এর পরে ভাদুড়ি! ভীম নাগ বঙ্গবিখ্যাত, কিন্তু মনে বিস্ময় জাগায় না। বরং নাগ ভীম হ'তে পারে—বটেই তো। কিন্তু 'ভীমসেন' ডাক নাম! হয় কখনো? ভীম ছেলেবেলায়ই সকলের হাসিঠাট্টায় কাঁদো কাঁদো হ'য়ে বলত—আত্মরক্ষার্থে—যে, তার ডাক নাম শুধু 'ভীম'। কিন্তু বঙ্কিমবাবু উকিল তো—অকাট্য যুক্তি পেশ করলেন যে, ভীম ভাদুড়ি শ্রুতিকটু—তাই সেনকে মঞ্জুর করা হোক উভয়ের মধ্যে 'বাফার-স্টেট'-এর মতন। "তবে"—বলেছিলেন তিনি ভীমসেনের মাতৃদেবীকে—"যদি ভীমসেন নাম তাঁর অসহ্য হয় তবে নাম হোক বৃকোদর।" কিন্তু মাতৃদেবী দুহাত তুলে সন্ত্রস্ত হ'য়ে বললেন: বাবাই! তার চেয়ে ভীমসেন ভালো।' অথ, ভীমসেন নামই চালু হ'য়ে গেল দেখতে দেখতে।

অসিত 'ভীমদা'-কে ভালোবেসেছিল প্রথম দর্শনেই—'লভ অ্যাট্ ফার্স্ট সাইট' যাকে বলে একেবারে অক্ষরে অক্ষরে। ভীমদাও অসিতকে সমান ভালোবেসে তুই-তোকারি সুরু করেছিল প্রথম দিন থেকেই। অসিতের চেয়ে সে ছিল বছর তিনেক বড়। কিন্তু কাঁধে মিলত ব'লে আরো ওদের সৌহার্দ্যে কোথাও চিড় খায় নি। তাছাড়া কৈশোরে দুতিন বৎসরের ব্যবধান ফাঁক আনে কবে, কোন্ দেশে? আরো, অসিত ছেলেবেলায়ই গঙ্গাস্নানে সাঁতারের দীক্ষা পেয়েছিল ভীমদার নিপুণ পরিচালনায়—ভাগলপুরের শান্ত সুরধুনীতে। ভীমদাও সানন্দে অসিতকে ছোটভাই ব'লে বরণমালা দিয়েছিল তার মুরুব্বি হ'য়ে বসতে। অসিতের এতে আপত্তি ছিল না একটুও। এমন বলিষ্ঠ ভোজনবিলাসী, সাঁতারবিলাসী—সর্বোপরি, সঙ্গীতবিলাসী সুজনকে দাদা ব'লে মান নিতে বাধবে কেনই বা? ভীমদার সঙ্গে সে যতই মিশত ততই তার মনে হ'ত মামুলি উপমা—এক বৃন্তে দুটি ফুল, কেবল একটি বড়, অন্যটি ঈষৎ ছোট। রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন: "মা বলিতে প্রাণ করে আনচান চোখে আসে জল ভ'রে।" অসিত মা-র জায়গায় ভীমদা বসিয়ে গাইত—ছন্দপতন ঢেকে যেত অসিতের সুরপ্রতিভার জৌলুষে।

ভীমদা তো এমন গাইয়ে ভাই পেয়ে আহ্লাদে আটখানা। ওকে শিখাত হারমোনিয়ম, তবলা, মৈজুদ্দিন খাঁর ঠুংরি, শোরীর টপ্পা। ভোজনের বহর বাড়াবার উপায়ও বাৎলাতো প্রায়ই নানা হজমিগুলির ব্যবস্থা ক'রে, কিন্তু এইখানেই অসিত পেরে উঠত না কিছুতেই: একটু অত্যাচার হ'তে না হ'তে শয্যাশায়ী। বলত সখেদে: "স্পিরিট একান্ত উইলিং দাদা, কেবল ফ্লেশ নিতান্ত উইক, হায় হায়!" ভীম ধমকাত: লজ্জা করে না হার মানতে? ফ্লেশকেও শায়েস্তা করা চাই জীবনসংগ্রামে, নৈলে শুধু গাইয়ে হ'য়েই নিভে যাবি, খাইয়ে নাম কিনতে পারবি না পারবি না পারবি না।" ব'লে ছড়া কাটত, বিষণ্ণকে উৎসাহ দিতে:

গাইয়ে হ'য়েই তুষ্ট? ছি ছি! খাইয়ে হ'তেও
হবেই হবে।
গাইয়ে গুণী-নাম কিনে তুই খাইয়ে নামও
কিনবি কবে।

অসিত ভীমের কাছে ছড়াকাটারও তালিম নিয়েছিল, তাই পিঠ পিঠ জবাব দিত:

শিখিয়ে সাঁতার গাঙ্ কোরো পার, খাইয়ে হ'তে চাই
না ভবে।
ঠুংরি শিখে দ্বিগ্বিদিকে গাইয়ে নামই কিনতে হবে।

দুই

ভীমও ফি বছর আসত অসিতের কাছে কলকাতায়। অসিতের পিতৃদেব তাকে স্নেহ করতেন আরো তার রসিকতার জন্যে। এমন রসিক অসিত জীবনে বেশি দেখে নি। তার কথাবার্তায় ভীম যেন রসের ফুলঝুরি কেটে চলত—উঠতে বসতে। আর শুধু উত্তর প্রত্যুত্তরেই নয়, কত যে মজার মজার গল্প বলত তার অপরূপ অনন্যতন্ত্র ঢঙে! অপিচ ভীম ছিল স্বভাবে ভবঘুরে। শুধু তাই না—মানুষ অসঙ্গতিতে ভরা তো—ভীম বিষম ভালোবাসত থেকে থেকে তীর্থে তীর্থে মুসাফের হ'য়ে ঘুরতে। কখনো হিমালয়ে, কখনো বিন্ধ্যাচলে, কখনো দক্ষিণে—এমনকি পশ্চিমে মরুতীর্থ হিংলাজেও সে গিয়েছিল—যৌবনে। অসিতকে সাথী নিতে চেয়েছিল প্রতিবারই কিন্তু অসিত সাহস পায় নি অনিকেত হ'য়ে যত্র যত্র রাত কাটানো—"সবাই কি সব পারে ভীমদা?" বলত অসিত সলজ্জে। "চিরদিন সুখে কাটিয়ে এসে কেউ কি হঠাৎ আরব বেদুইন বনতে পারে রাতারাতি?" ভীম ওর সৎসাহসের অভাব দেখে ক্ষুণ্ণ হ'ত। কিন্তু অসিত বলত আত্মরক্ষার্থে "এর নাম সৎসাহস নয় দাদা—দুঃসাহস।" গান শিখতে অসিতের ক্লান্তি ছিল না—কী ধ্রুপদ, কী খেয়াল, কী টপ্পা ঠুংরি। কিন্তু গাছতলায়, শ্মশানে মশানে, বনে জঙ্গলে, পাহাড় পর্বতে রাত কাটানো? বাপ্‌রে! রেগে ভীম অসিতকে উঠতে বসতে ছড়া কেটে ধমকাত:

দূর থেকে হয় ভীষণ মনে, কারণ সেটা অচিন-যে!
কাছে গিয়ে বাসলে ভালো—দেখবি রে: নয় কঠিন সে।

অসিতও পিঠ পিঠ জবাব দিত:

"ভাই, যতই দেখাও লোভ তুমি স্বধর্মে থাকাই
গীতার মত
তাই পরধর্ম ভয়ালকে দূর হ'তেই করি দণ্ডবৎ।

"তাছাড়া কোথায় কিনি কী অসাধ্য সাধন করেছিলেন, কোন পর্বতের চূড়ায় অনাহারে থেকে পাখা পেয়ে আকাশ-চারী হয়েছিলেন—বশিষ্ঠ অগস্ত্য অষ্টাবক্র দুশ্চর তপ ক'রে অষ্টসিদ্ধির উল্লাসে সবাইকে কী ভাবে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন সে-সব জনশ্রুতিকে ইতিহাস নাম দিয়ে আমি গদ্‌গদ্ হ'য়ে উঠতে অক্ষম।"

কিন্তু মানুষ অসঙ্গতিতে ভরা তো, তাই অসিত এর ওর তার মুখে অণিমা লঘিমা প্রাপ্তি প্রাকাম্য-বর্গীয় সিদ্ধাইয়ের স্তবগানে দোয়ার দিতে না পারলেও ভীমের কাছে হিমালয়ের নানা কিম্বদন্তী শুনে খুশী হ'ত বৈ কি। শুধু খুশী নয়, তার সংস জল্পনা কল্পনায় ওর মন রসিয়ে উঠত। কিন্তু তবু সে সত্যি ভালোবাসত এ-সব অলৌকিক ইতিহাস নয়—মানুষের সঙ্গই তার কাছে সব চেয়ে কাম্য মনে হ'ত। যোগী ঋষি মুনি যতিদের নানা স্তর-বিভাগের তথা অদ্ভুত শক্তির খবর পেতে কখনো কখনো ভালো লাগত বটে—কেমন? যেমন আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের রূপকথা ভালো লাগে—ঘরোয়া একঘেয়েমি থেকে ছাড় পাওয়া যায় গো কিছুক্ষণের জন্যে—মন্দ কি? কিন্তু তা ব'লে যোগবিভূতির খবর পেতে ছোটাছুটি করতে ওর মন চাইত না আদৌ। অসিত চাইত—প্রার্থনা ক'রে ভগবানের কৃপা পেতে, শ্যামাসঙ্গীত গেয়ে জগন্মাতাকে মা ব'লে চিনে মুক্তি পেতে, তাঁর কোলে ঘুম যেতে। কিন্তু সাধুদের হাজারো খবর জড়ো ক'রে কেউ কি কখনো সাধু বনেছে? ভীমদাকেই দেখ না"—বলত ও মনে মনে—"এত সাধুসঙ্গ ক'রেও র'য়ে গেল যে-বৃকোদর সেই বৃকোদর—পরম ভাগবত হ'ল কই? তাই সাধু সন্তকে মনে মনে আন্তরিক শ্রদ্ধা করলেও দিগ্বিদিকে তাঁদের খুঁজে খুঁজে হায়রান হ'তে ওর মন চাইত না। কারণ ও বিশ্বাস করতনা যে, সহজে খাঁটি সাধুর দেখা পাওয়া যায়। যায় না, যেতে পারে না—কেন না মহাশয়, মহাজন সদাশয় সজ্জনের ম'তই বিরল—লাখে না মিলয় এক। ওর প্রিয় কবি দ্বিজেন্দ্রলালের একটি গানে ওর মন সাড়া দিত পুরোপুরিই:

সত্যের চাইতে মিথ্যা বেশি, ধর্মের চাইতে তন্ত্র,
ভক্তির চাইতে কীর্তন বেশি, পূজার চাইতে মন্ত্র।

তিন

তবু ছোঁয়াচের প্রভাব যে ব্যাপক তথা স্থায়ী একথা মনস্তত্ত্ববিদেরা সবাই আবহমানকাল এক বাক্যে স্বীকার ক'রে এসেছেন। তার উপর অসিত ভীমকে ভালোবেসেছিল ছেলেবেলায়ই—যখন স্নেহপ্রীতির সম্বন্ধ সহজেই নিবিড় হ'য়ে ওঠে সংসারের হাজার অবান্তর বাধা কাটিয়ে। তাই ভীমের সাধুসন্তপ্রীতি অসিতের অন্তরে একটু একটু ক'রে সংক্রমিত হ'ল তার কৈশোরেই। ফলে সে-ও এখানে ওখানে একটু আধটু সাধু খোঁজা সুরু করল, কয়েকটি ক্ষেত্রে সাধুর দেখাও পেল। কিন্তু সে অন্য কথা। এ কাহিনীর বিষয়বস্তু ভীম ও ভীমের অভিজ্ঞতালব্ধ নানা চমকপ্রদ ঘটনা ও অঘটন।

ভীমের রসিকতার কথা বলা হয়েছে। তার অফুরন্ত রসিকতায় অসিতের মন নিরন্তরই রসিয়ে উঠত। তাই সে আরো ভীমকে উস্কে দিত—মধুর চাকে খোঁচা দিয়ে মধু পেতে। যথা, একদা অসিত হেসে ভীমকে শুধালো—সাধুদের কেন শুধু যে টাক পড়ে না তাই নয় দেখতে দেখতে জাঁদরেল জটা গ'ড়ে ওঠে? ভীম পিঠ পিঠ জবাব দিল: "এ-ও বুঝলি নে রে অর্বাচীন? সাধুদের চুল উঠে যাবে কোথায় শুনি? ওরা স্নান ক'রে তো মাথা মোছে না, কাজেই সে সব উঠে-আসা চুলও জটার সঙ্গে জড়িয়ে গ'ড়ে তোলে জটার কটাহ—ঠিক যেমন ঝরা পাতায় গ'ড়ে ওঠে ঝোপের জঙ্গল, হা হা হা।"

কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা দিতে না দিতে ভীমকে তার বিধবা মা ধরলেন একটি "টুকটুকে বৌ"ঘরে এনে দিতে হবে। শুনবামাত্র অসিত ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে ভীমকে লিখল: "অমন কর্ম কোরো না ভীমদা। সাধুদের উঠে যাওয়া চুল জটার সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়ার মতন তুমি টুকটুকে বৌ-এর পাল্লায় প'ড়ে ফি-বছরে-পাওয়া একগাদা কাচ্চা-বাচ্চার সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে। ভীম উত্তরে লিখল: "এক গাদা কাচ্চাবাচ্চা হওয়া-না-হওয়া তো আমারি হাতে রে অর্বাচীন। হ'তে না দিলেই হ'ল—নিরাকার সাকার হবার পথ বন্ধ।"

কিন্তু অসিতের ভবিষ্যদ্বাণী ফলল: "বিবাহের পর পাঁচ বৎসরের মধ্যেই ভীমের ঘরে অভ্যুদিত হ'ল তিন তিনটি নধরকান্তি নন্দিনী। জড়িয়ে পড়া আর কার নাম?

এই সময়ে ভীমের নিঃসন্তান অভিভাবক মামা প্রয়াণ করলেন লোকান্তরে—তারপরেই মামিমা। উইলে তিনি ভীমকেই দিয়ে গেলেন সব: দুটি আটচালা তথা হাজার দশেক নগদ কোম্পানির কাগজ। ভীম বি-এ-তে ইংরেজী 'অনার্স' প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হ'য়ে কলিকাতায় এম-এ পড়ছিল, কিন্তু মামার মৃত্যুর পরে তাকে কতকটা বাধ্য হ'য়েই চাকরি নিতে হ'ল এক বিহারী জমিদারের তাঁবে। মাইনে সাড়ে তিনশো। একটি আটচালা ভাড়া দিয়ে অন্যটিতে—যেটিতে ওর মামা মামিমার সঙ্গে ভীম ছিল ওর বিধবা মাকে নিয়ে—কন্যাত্রীকে নিয়ে অসংসারী ভীম নতুন সংসার পাতল। মুস্কিল হ'ল এই—আগে দহরম মহরমের খর্চা দিতেন স্নেহময় মামা, এখন জোগাতে হ'ল ভীম ও তার টুকটুকে বৌ বাসন্তীকে। ভীমের মা থাকতেন নিজের জপতপ নিয়ে একটু আলাদা মতন হ'য়েই।

ফলে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে দিনের পর দিন খাওয়া দাওয়া তথা ওস্তাদদের দক্ষিণা দিয়ে গান শোনা ও শেখা —এই সবে ভীমের কোম্পানির কাগজ উড়ে গেল দু-তিন বৎসরের মধ্যেই। শুধু তাই নয়—বিপদ একা আসে না—অতিভোজনের ফলে ভীমের হ'ল অগ্নিমান্দ্য। ওকে অসিত পইপই করে মানা করত "গোগ্রাসে" খেতে। কিন্তু শোনে কে? ভীম একটা চলতি ছড়া আওড়াত সঘনে।

"এই বর দাও ওহে দয়াময় হরি
পাঁঠা খেতে খেতে যেন গৌরবে মরি।"

ব'লেই জুড়ে দিত—অকাল মৃত্যুর বিভীষিকাকে নস্যাৎ ক'রে দিয়ে:

"না খেয়ে মরেছে কত জন—যবে স্মরি,
চোখে জল আসে মরি, হৃদয়ে শ্রীহরি।
ফলাফল তাঁরি হাতে—গীতাবাণী ব'রি'
লব রসনায়—যার বরে প্রাণ ধরি।"

কিন্তু ছড়া কেটে তো আর কর্মফল ঠেকানো যায় না। তাই প্রৌঢ় বয়সে পা পৌছবার আগেই ভীমের

উদরাময় স্বরু হ'ল। যখন তখন হজমের গোলমাল—যাকে সাহেব পুরাণে বসে "ডিস্পেপশিয়া"। অসিত বলে: "বলেছিলাম তো ভীমদা—তবে গরীবের কথায় কান দেবে কেন বলো ?"

ভীম পিঠ পিঠ জবাব দেয় হেসে: 'ক করি ভাই বল্ ?

মন মানে তো, প্রাণ মানে না। এমন কেন হোলো ?"

মিছেই শুধাই, মিছেই শাসাই উদরকে:

'আ মোলো !

বেইমান! এত জোগাই রসদ করতে খুশী যাকে—
প্রতিদানে সে-ই কি-না হায়, ধমকায় আমায় রাগে !"

ব'লেই একগাল হেসে: ব্যাপার কি জানিস অসিত! আমার পেট হয়েছে হিন্দু আর জিত মুসলমান। তাই আমার দেহের কুরুক্ষেত্রে কম্যুনাল দাঙ্গা লেগেই আছে—হা হা হা !"

অসিত রাগ ক'রে ভীমদাকে বকতে গিয়েও হেসে ফেলত, তার তহবিলে ঘাটতি হ'লে সাহায্য না ক'রে পারত না জেনেও যে, সে ফের অত্যাচারে শয্যা নিল ব'লে। স্বভাবে নাস্তিবিচ্যুতে—ভাইরে! বলত ভীম বেইমান উদরাময়ের কর্মফলে ধুঁকতে ধুঁকতেও।

চার

"ভীমদা কী যে বেহিসেবি!" বলত একবাক্যে তার স্তাবকবৃন্দ ওরফে 'ফ্যান-রা সবাই। ভীম সময়ে সময়ে রাগ করত। বলত: "বেহিসেবি কিসে? মাইনে যার সাড়ে তিনশো, পোষ্য যার পাঁচ পাঁচটি—সবার উপর বাঘা দোস্ত্ যার অগুন্তি যারা কেবল খেতেই আছে—ধার না ক'রে তার চলবে কেমন করে শুনি?" ওর রাগ দেখলেই স্ত্রী বাসন্তী ভয় পেয়ে বলত: "রাগ কোরো না গো, ফের তোমার পেটের অসুখ করবে।" এ কথায় ভীম জেলেবেগুনে জ্ব'লে উঠত: "পেটের অসুখ? ফুঃ! আমি থোড়াই কেয়ার করি।"

বাস্তবিক পেটের অসুখ ওর যেন নেওটো হয়ে উঠেছিল। পেট ভ'রে খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কষ্ট—আর ওর শ্লীলা ব্যথা নয়—অশ্লীল উৎপাতও তাকে যেন ছেঁকে ধরত—যার সলজ্জ উল্লেখও সভ্য সমাজে করা চলে না—বলত ভীম নিজেই একগাল হেসে। বাসন্তী মুখে কাপড় দিয়ে হেসে বলত "চুপ করো—একঘর লোকের সামনে…" ভীম রুখে উঠে বলত: "একঘর লোক তাতে কি? শরীরের উৎপাত ওদের কারুর নেই বুঝি। না পেটের আর্তনাদ কেবল আমারি একচেটে?"

কিন্তু তবু স্বভাব যায় না ম'লে তো: ভীম শুধু খেতে নয় খাওয়াতেও ভালবাসত বিষম। আওড়াত চার্বাক: "যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ—হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা, খোদ ঋষির আপ্ত বাক্য কাটাবার জো নেই। আর ঋণ মানে কি? শোধও দিই তো থেকে থেকে।"

কথাটা মিথ্যে নয়। থেকে থেকে ভীম এখানে ওখানে ঠুংরি শিখিয়ে কিছু পেলেই ধার শোধ দিত—যদিও ফের ধার করতে। কখনো বা টবে নানারকম রঙিন ছবি আঁকত—এক পটুয়া দোকানদার সেগুলি সাগ্রহেই নিত আর বিক্রি ক'রে অধিক টাকা দিত ওকে। কিন্তু দিলে হবে কি? ধার শোধ ক'রে কিছু হাতে জমতে না জমতে ভীম ফের পড়াপড়শি তথা "ফ্যান"দের ডেকে ফের খাওয়াত ও খেত সমানই "গোগ্রাসে"—যার ফল ভুগতে হ'ত বিশেষ ক'রে বাসন্তীকে?

পাঁচ

অসিত মাঝে মাঝে ভাগলপুর যেত প্রধানতঃ ভীমেরই টানে যদিও ভাগলপুরে ওর আরো বন্ধু তথা আত্মীয় ছিল। মানুষ যায় সেখানেই যেখানে আনন্দের হরির লুট মেলে—যেমন মিলত অঢেল ভীমের জনমুখর আটচালায়। সদানন্দ ঔদরিক গায়ক আলাপী রসিক অতিথিবৎসল এই মানুষটিকে ভালোবাসত সবাই। বিশেষ ক'রে ওর নানা সরস টীকাটিপ্পনী ও গল্প বলার ঢং-এর গুণে। শুধু গল্পই নয়—তার উপরে ভীম ছিল যেন স্বভাব-কথক, গল্পের সঙ্গে সঙ্গে মুখে মুখে অ্যান্টনি ফিরিঙ্গীর মতন ছড়া কাটত আর শুনে সবাই হেসে গড়িয়ে পড়ত। অসিত থেকে থেকে পাল্লাদিতে উজিয়ে উঠত, কিন্তু এঁটে উঠতে পারবে কেন? মুশায়েরার শেষ ছড়াসম্রাটের পায়ের ধুলো নিয়ে বলত কাঁদো কাঁদো সুরে!

"ছড়াকাটার তোমায় আমার গুরু ব'লেই
জেনেছি,
তাই খেদ নেই করতে কবুল—মেনেছি হার
মেনেছি।"

ছয়

কখনো কখনো ভীম ওকে ডাক দিত—যখন কোথাও যেত গান শিখতে। অসিত দূর তীর্থযাত্রায় বা হিমালয়-ভ্রমণে ভীমদার সঙ্গী হ'তে রাজী না হলেও গান শেখার নিমন্ত্রণে সাড়া দিত সর্বান্তঃকরণেই।

একদা ওরা গিয়েছিল লক্ষ্ণৌয়ে কদর পিয়ার এক নাতি নবাব মুরুদ্ধের মির্জা সাহেবের কাছে কদর পিয়ার বিখ্যাত ঠুংরিতে তালিম নিতে। সেখানে একটি ঠুংরি শিখতে গিয়ে অসিত তো হেসে কুটি কুটি! ভীমও সে হাসিতে দোয়ার দিয়ে বলত: বলেছিস ভাই, এরকম গান কি ওরা ছাড়া আর কেউ বাঁধতে পারে?" ব'লেই ধরত প্রশংসমান ভক্তদের সামনে মজাদার ঠুংরির "ভাও" বাৎলিয়ে।

পিয়া! অবতক মোরি সিজিয়া নহি আয়ে!
কহো তো গুঁইয়া, অব কা কিয়া জায়ে?*

অসিত এর বাংলায় দোয়ার দিত—অনুবাদে:

আজো যে এলো না খাট আমার গো হায়!
বলো না এখন বঁধু, কী করা যায়?

গানের আসরের পর ভীম তার আমুদে ভক্তবৃন্দকে খাওয়াত ষোড়শোপচারে। বাসন্তীও লোক খাওয়াতে ভালোবাসত, কিন্তু এত ঘন ঘন নয়। কারণ শেষকালে ম্যাও ধরতে হ'ত তো তাকেই—বেচারী! কিন্তু স্বামীর ক্রমাগত ধার ক'রে লোক খাওয়ানোর ধকল স'য়েও তার সদাস্নিগ্ধ হাসিটি কখনো মিইয়ে যেতে দেখে নি কেউ। বরঞ্চ প্রায়ই সে বলত অসিতকে ভর্তার ওকালতি ক'রে: "দাদা, ধার ক'রে লোক খাওয়ানো যে ঠিক নয় কে না মানবে বলুন! কিন্তু ওঁর সদানন্দ চিত্তাকাশে তো দুশ্চিন্তার কালো মেঘ টেঁকে না—কেটে যায় আপনাদের সবাইকার হাসির দমকা হাওয়ায়।"

হাসি বলে হাসি! কথক গায়কের উপমার জৌলুষেরই বা কী বাহার! ভাগলপুরে একটি প্রদর্শনী হয়েছিল। তাতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল লিপ্‌টন কোম্পানীর এক বিঘৎ বহরের বেগুন—Lipton's brinjal এক হাত লম্বা শশা—Lipton's cucumber, ভীম একদা রান্নাঘর থেকে লাফিয়ে এসে "ফ্যান"দের সামনে চোখ কপালে তুলে (ভীম ভঙ্গিতেই) চেঁচিয়ে ব'লে উঠল "বৌ! Lipton's rat!

কখনো বা তর্ক উঠত মাছ মাংস খাওয়া ভালো না মন্দ। ভীমদা বলত: "কি যে বলিস তোরা! ভেড়ার মাংস খাবো না? জানিস—এক ভেড়া একদা গিয়েছিল ব্রহ্মার কাছে নালিশ ঠুকতে: 'প্রভু, মানুষ আমাকে দেখলেই রেঁধে খায়, এর একটা বিহিত করতেই হবে আপনাকে।' ব্রহ্মা ঠাকুর হেসে বললেন:

পালা বেকুফ! নধরকান্তি দেখলে তোর ঐ—
জিভে জল,
আমারি যে আসে—দুষি মানুষকে কোন্ মুখে বল?

[ক্রমশ:

* এ-গানটি সত্যিই কদর পিয়ার একটি বিখ্যাত কানাংড়া ঠুংরি—যার অনুভাবে অতুলপ্রসাদ বেঁধেছিলেন তাঁর জনপ্রিয় বাংলা ঠুংরি কানাংড়ায়:

বঁধু, ধরো ধরো মালা পরো গলে
ফিরে দিও না বনকুসুম ব'লে।

পদ্মভোজীর দেশ

শ্রীসুধীর গুপ্ত

ভাসিতে ভাসিতে ভিড়িল আসিয়া বহর তাহার শেষে
আবার কাহার নিঠুর নিদেশে পাহাড়-পারের দেশে।
সাগর ঊর্মি খাঁড়িতে সেথায় শীকড় ছড়ায় সুখে,
ফুল্ল ফেনার মালার বাহার দুলিছে তাহার বুকে,
বিষাদ-বিধুর বিকাল-বেলার ছায়ার মায়ায় ধীরে
কী-এক বিবশ অলস মাধুরী সেথায় সাগর-তীরে
ঘনায়ে তুলিছে আবেশ-মাখানো কী যেন নেশার ঘোর!
বহিছে বাতাস উদাস-উদাস—বুঝি বা নেশার ভোর!

যতই গোধূলি নামিতে লাগিল, জাগিল সকল ঠাঁই
কোমল করুণ সুরের মিনতি, —"দূরে গিয়ে কাজ নাই;
থামাও—থামাও—থামাও তরণী নামাতে বুকের ভার;
এমন মধুর মমতা-মাখানো প্রদেশ পাবে না আর।
ঝঞ্ঝা-মথিত সাগরে সাগরে ঘাঁটিয়া লবণ-জল
শ্রান্ত ক্লান্ত হ'য়েছে পান্থ, রুক্ষ বক্ষস্থল।
জীর্ণ দীর্ণ দিলের শান্তি সিন্ধু-সলিলে নাই;
আরাম বিরাম লাভের লোভেরে কেহ কি হারাতে চাই।"

থামিল তরণী; নামিল নাবিক আনত নম্র সাঁঝে
পদ্ম-গন্ধে মদির অধীর পদ্ম-বীথির মাঝে।
মোহন মৃণালে দুলিছে পদ্ম ছড়ায়ে কোমল দল;
গন্ধে ভুলিয়া বুলিছে বাতাস ফুলে ফুলে অবিরল।
ম্লানিমা-মাখানো আধেক আঁধারে শুভ্র হাসির বেশ
স্বপ্ন-বিছানো স্বর্গ সমান করিল সকল দেশ।
রোমাঞ্চময় হ'তেছে হৃদয় পদ্ম-মদিরা-পানে;
নাবিকেরা কয়, "আর চলা নয়, থামিলাম এই থানে।"

"আর চলিবো না, কল্পনা বোনা চলিবে হেথায় থাকি';
দূর ইথাকার স্মৃতি-সম্ভার মন-গড়া যত ফাঁকি।
প্রীতি-পরিচয়—পুরানো প্রণয় কালে কালে তা'কি থাকে?
পিছনে যা'দের ফেলিয়া এসেছি, তাহারা কি মনে রাখে?
শুধু লোনা জল ঘাঁটা অবিরল সাগরে যে হয় সার;
হাহাকার ভরা বাতাসে হারায় বুক-ফাটা হাহাকার।
নয়নের নীর ঝরাতে ঝরাতে নিয়তি আনিলো যবে,
আর ঘোরা নয়, জীবন ভরিয়া ঘুরে ঘুরে কিবা হবে?"

স্বভাব-দত্ত ঠুলি-পরা চোখে অন্য নাবিকদল
সাগরে ঢুঁড়িতে বাধ্য হ'য়েছে; তাই নিতলের তল
হেরিতে পারে নি; লোনা জলশুধু ভরিলো আঁখির কোল
চাহিছে বিরাম পেয়ে অবিরাম মহাঝঞ্ঝার দোল।
ইউলিসিসের অবাধ নয়ন, দ্বিতীয় নিয়তি প্রায়,
জানে যে জীবন থামে না কখনো, নিয়তিই নিয়ে যায়
পথ ঘুরে ঘুরে দূর হ'তে দূরে মরণোত্তর দেশে;
ভিড়িবে তরণী—মোহিবে ধরণী—আবার চলিবে ভেসে

সঙ্গী-সাথীরা পদ্ম-মধুর স্বাদ নিতে হয় নিবে,
নিয়তির টানে আবার তারাই সাগরেও পাড়ি দিবে।
অডিসিয়ুসের উদ্দাম গতি রোধিতে কি কেহ পারে!
সর্ব নরের শোণিত-তরণই উদ্দাম করে তা'রে।
পদ্মভুকেরা—পলিফিমাসেরা—সার্সি—সাইরেণেরা
লুব্ধ—জব্দ—মুগ্ধ করিবে; তবু ওই পথিকেরা
চির-যাযাবর সাগর-পদ্ম কাঁদিয়া হাসিয়া হায়,
পাড়ি দিয়ে শুধু স্তম্ভিত করি' স্বর্গেরও দেবতায়।

কঠোপনিষদের সাধন পথ

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মন্ত্র— শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়োহি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয় মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে ॥

অর্থ :—শ্রেয় ও প্রেয় মার্গ মানুষের প্রথম জীবনে এমনিই মিলিয়া মিশিয়া থাকে যে ধীমান্ ব্যক্তিকে তাহাদের সম্যকভাবে পরীক্ষা করিয়া পৃথক করিয়া লইতে হয়। যিনি ধীর তিনি প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়কে উত্তম জানিয়া তাহাকেই গ্রহণ করেন। কিন্তু যিনি অল্প বুদ্ধি তিনি যোগক্ষেম রক্ষার জন্য প্রেয়কে বরণ করেন।

ব্যাখ্যা :—রেলের ষ্টেশন হইতে গাড়ী একই প্লাটফরম্ হইতে যাত্রা করিলেও ভিন্ন ভিন্ন দিকে যাত্রা করিতে পারে। সেইরূপ জীবনের প্রথম বেলায় প্রেয় এবং শ্রেয় রূপ রেলগাড়ীর যাত্রাপথের পার্থক্য প্রথমে বুঝা কঠিন হয়। কোন্ গাড়ী আমাকে কোন্ দিকে লইয়া যাইবে কে বলিয়া দিবে? কোন্ চাকরীটা লইব, স্ত্রীর সঙ্গে কিরূপ সম্বন্ধ রাখিব ইত্যাদি জীবনের বিচারগুলি প্রথম জীবনে যেমন সম্পন্ন করিব তাহাই ত আমার সারাজীবনের মূলধন হইবে। অথচ, এ সকল কথা অপরের পরামর্শ লইয়া স্থির করা যায়না। আর লইলেও নিজের বুদ্ধিতে যেমন হয় তাহাই করা হয়। বুদ্ধি দ্বারা কয়েকবার পরীক্ষা করিয়া কোন্‌টা আমার পক্ষে প্রেয়, কোন্‌টা আমার পক্ষে শ্রেয় তাহা জানিতে হয়। যিনি স্থির বুদ্ধি, যাঁহাকে ধীর বলা চলে, তিনি নিজের অন্তরকে পরীক্ষা করিলে সফল হইতে পারেন, হঠাৎ কিছু করিয়া বসেননা, অথচ, জীবনের ধারা যেদিকে লইয়া যাইতেছে তাহাও স্বীকার করিয়া লন না। কোন্‌টা আপাততঃ মধুর ও কোনটা ভবিষ্যতে মঙ্গলজনক তাহা স্বীয় অন্তরে বিচার ও আলোচনা করেন। যাহা তখনই ভাল লাগে, তাহা প্রেয় হইতে পারে। কিন্তু যাহা অন্তে মঙ্গলজনক তাহাই শ্রেয় বলিয়া জানা কঠিন হয় না। কিন্তু তাহাকে নিশ্চিতরূপে গ্রহণ করিতে অনেক সামর্থ্য প্রয়োজন হয়। সেই সামর্থ্য ধীর ব্যক্তির থাকে বলিয়া তিনিই পুরুষার্থ ক্রমে অধিক মাত্রায় প্রাপ্ত হন। অপরদিকে যিনি হয়ত বা বিচার করিয়া প্রেয় ও শ্রেয়ের ভেদ বুঝিতে পারেন, কিন্তু তাহা গ্রহণ করিতে সাহসী হ'ন না, তিনি যে সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা কোনমতেই হাতছাড়া হইতে দিতে চান না এবং যে সুযোগ প্রাপ্ত হ'ন নাই, তাহার জন্যও বেশী যত্নবান হইতে শ্রমকাতর হ'ন। তিনি "মন্দযোগক্ষেম" বলিয়া এখানে উক্ত হইয়াছেন। অর্থাৎ "আমার আর না পেলেও হয়, এক্ষণে যাহা আমার আছে তাহা যেন আমার না হারায়" এইরূপ মনোবৃত্তি তাঁহাকে উন্নতির পথে বাধা দিতে থাকে। নিজেকে বাজি রাখিয়া জীবনের সঙ্কটের সম্মুখে বীরের মত অগ্রসর হইয়া জীবন-যুদ্ধে সংযুক্ত হইতে হইবে, তাহা কয়জন পারে? কিন্তু তাহাই মানুষের সাধ, তাহাই মানুষের ধর্ম্ম। সাহস করিয়া সদ্‌বুদ্ধির চালনায় চলিতে পারিলে শ্রেয় লাভ হইবেই, একথা কে আমাদের বলিয়া দিবেন? যদি কথা শুনিয়া চলি, যিনি অন্তরে বসিয়া আছেন, তিনিই নীরবে হুকুম জারি করেন ও তাহা শুনিয়া চলিলে পর (৭ মন্ত্র দেখুন) ক্রমশঃ শোনা যায় যে তিনিই গুরু হইয়া বলেন, "আমিই তোর যোগক্ষেম বহন করিব।" অর্থাৎ যাহা পাস নাই, তাহাই মিলাইয়া দিব, যাহা পেয়েছিস, তাহা ক্ষয় হইতে দিব না (গীতা ৯।১২)। "যোগক্ষেম" বাক্যটি এইরূপে আমাদের মধ্যে যে অদৃশ্য শক্তি (যাহাকে অব্যক্ত আত্মা বলিয়া পরে জানিব) জীবনের নিয়ন্তারূপে সাথী হইয়া চলিয়াছেন তাঁহারই শরণে লইয়া যায়। তাহার

শরণ ছাড়া এক্ষণে আশ্রয় কোথায় ? সেই আশ্রয়ই শ্রেয়।

তৃতীয় মন্ত্র (১।২।৩)

মন্ত্র— স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাংশ্চ কামা
নভিধ্যায়ন্নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ।
নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো
যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ ॥

অর্থ—হে নচিকেতা, আমি তোমাকে বার বার প্রলোভন দেখাইলেও তুমি প্রিয়বস্তু ও সুখোৎপাদক ভোগ্য বিষয় সমূহকে পরীক্ষা করিয়া ত্যাগ করিয়াছ। যে ধনবহুল মার্গে অনেক মনুষ্য নিমগ্ন হয় তাহা তুমি গ্রহণ কর নাই।

ব্যাখ্যা—এইবার এই মন্ত্রটি আমাদের কাছে বড় অদ্ভুত শোনায়। যম বলিতেছেন, তিনি পূর্ব্বেই নচিকেতার বারবার পরীক্ষা ল'ন, ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে সকল মনুষ্যের জীবনেই দেবতাগণ নানাপ্রকার সুবিধা ও সুযোগ দিয়া তাহাদের শ্রেয় মার্গ হইতে ভুলাইয়া প্রেয় মার্গে চালিত করিবার প্রয়াসী হ'ন। মানুষের সাধ্য কি দেবতাদের প্রতিকূল আচরণ করেন। সে সময়ে দেবতার অনুগ্রহ বজায় রাখিয়া, তাঁহার প্রদত্ত সুযোগ ও সুবিধার প্রত্যাখ্যান করিবার যে সামর্থ্য ও দুঃসাহস প্রয়োজন হয় তাহা ত প্রথম বল্লীর শেষ ভাগে নচিকেতার যমের সহিত কথোপকথনে সুস্পষ্ট হয়। তাহা আমাদের বারবার অনুধাবন যোগ্য। দেবতারা আমাদের গুরুজন, তাঁহাদের অসুখী না করিয়া তাঁহাদের প্রস্তাবিত পথে না চলা খুবই কঠিনসাধ্য হইলেও তাহাই বরণীয়। প্রেয়ের দিকে যদি সারা বিশ্ব ঝুঁকিয়া পড়ে তথাপি শ্রেয় মার্গে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আধিদৈব ক্ষেত্র উত্তীর্ণ হইয়া জীবনযজ্ঞে নিজেকে আহুতি দিবার সঙ্কল্প ছাড়িলে চলিবে না। যমরাজ যখন নচিকেতাকে প্রলুব্ধ করিয়াছিলেন তখন এত কথা আমরা বুঝি নাই। এক্ষণে তিনি নিজে যখন নচিকেতার দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে সেই পথ অনুসরণ করিতে বলিতেছেন, তখন দেবতারা বাহিরে যাহা বলুন বা করিতে চান, তাঁহাদের অন্তর যে কিরূপ পথের সাড়া দেয়, তাহা বুঝা যায়। অন্তর দিয়া অন্তর বুঝা, বিশেষ গুরুর অন্তর বুঝা, শ্রেয় মার্গের যথার্থ চিহ্ন। (সে কথা স্পষ্ট ভাবেই ৭ম মন্ত্রে আসিবে) ভুল হইলেই দেবতাদের ফাঁদে মানুষকে পড়িতে হয় ও জীবনের কর্দ্দম-ভূমিতে একবার পড়িলে আর তাহা হইতে রক্ষা নাই। শ্রেয় ত গেলই, প্রেয়-ও আর সম্ভোগ হয় না। এ জীবন ব্যর্থ হইয়া যায় ও পুনর্জ্জন্মের আশায় প্রতীক্ষা করিতে হয়।

[ক্রমশঃ]
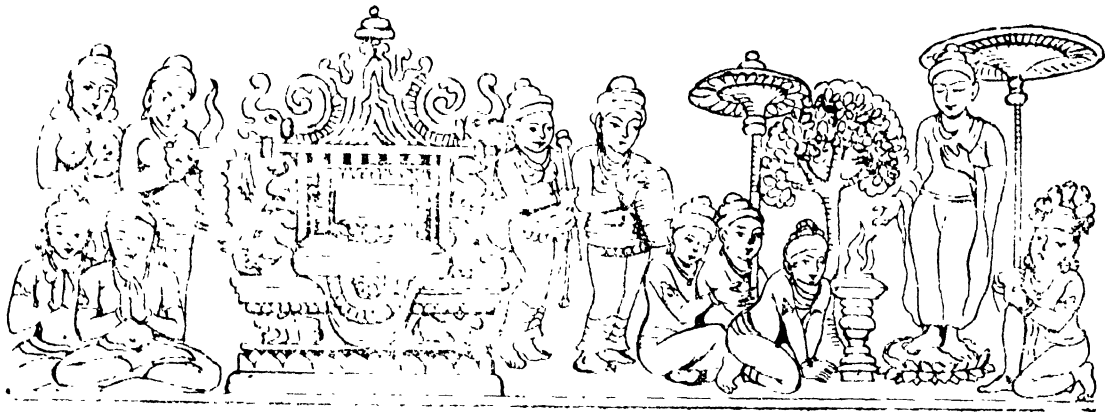
বিশ্বভাষা পরিক্রমা

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ভারতে বাস্তবিক যখন একজাতীয়তা নেই তখন একটা বিশৃঙ্খল ঐক্যবিহীন রাষ্ট্রীয় সংহতি গায়ের জোরে কায়েম করার ব্যর্থ চেষ্টা না ক'রে স্বাভাবিকভাবে ভাষার ভিত্তিতে যে-সব জাতি বহু শত বছর ধ'রে বর্তমান আছে এবং নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় সংহতভাবে একত্র বাস করছে, তাদেরই রাষ্ট্রীয় ঐক্য দিলে ভৌগোলিক ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংহতি সাধিত হবে। এর ফলে ভৌগোলিক ভারতে ত্রিশটি ভাষার ভিত্তিতে মোট ৩৪টি রাষ্ট্র গ'ড়ে উঠবে। বাংলাভাষী এলাকা তিনটি রাষ্ট্রে বিভক্ত থাকবে ভৌগোলিক ও ধর্মীয় ব্যবধানের জন্যে। সিংহলিভাষী এলাকাও ঐ দুই কারণে দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত থাকবে। সিন্ধিভাষী এলাকা ধর্মীয় কারণে দুই ভাগে বিভক্ত থাকবে। এর জন্যে রাষ্ট্রের সংখ্যা ত্রিশ না হয়ে চৌত্রিশ হবে। পাঞ্জাবিভাষী এলাকাও তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছে বটে, কিন্তু পশ্চিম পাঞ্জাব অন্তত এখনও স্থানীয় ভাষা লান্‌ডার বদলে উর্দুর বেশি অনুরাগী হওয়ায় এবং পাঞ্জাবি হিন্দুরা হিন্দিকে বরণ ক'রে নেওয়ায় পাঞ্জাবি ভাষাভাষী রাষ্ট্র মাত্র একটি হবে।

বর্তমান ভারতে বাইশটি আর তার বাইরে ভৌগোলিক ভারতবর্ষের অবশিষ্ট এলাকায় বারোটি—মোট চৌত্রিশটি রাষ্ট্র নিয়ে সবশুদ্ধ ৮৭টি রাষ্ট্র গঠিত হলে বিশ্বের ভাষাভিত্তিক প্রশাসনিক গঠন সম্পূর্ণ হবে। এই রাষ্ট্রগুলি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যরূপে পরস্পরের সঙ্গে মিলন ও সহযোগিতার পূর্ণ সুযোগ পাবে। সুতরাং বিশ্বের ভাষাভিত্তিক বিভাগে আশঙ্কার কোন কারণ নেই। তবে এর ফলে ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদ লুপ্ত হওয়ায় অনেকের অশ্রুপাতের সম্ভাবনা আছে।

ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য গঠনের ব্যাপারে ভারতীয় প্রজাতন্ত্র যে ঠিক পশ্চিম ইউরোপ ও সোভিয়েট ইউনিয়নের পথে এগিয়ে চলেছে তাতে কোন ভুল নেই। বস্তুত এ-ব্যাপারে সোভিয়েট এলাকা সমেত সমগ্র ইউরোপের সঙ্গে ভারতের অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে। আমরা ঐক্য চাই নি, স্বাধীনতাই চেয়েছি এবং তাই চাওয়া উচিত। সেইজন্যে ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্য ভেঙে একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে। বিবেকানন্দও বাল্‌কান্‌ উপদ্বীপ-প্রসঙ্গে ঐক্যের পরিবর্তে স্বাধীনতাকেই বরণ করতে ব'লে গেছেন।

ভারতে অনেকে নাকে কেঁদে বলেন, ভারতকে বাল্‌কান্‌ করা চলবে না। অথচ ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ করার সময়ে ভারতকে বাল্‌কান্‌ বানানো হয়ে গেছে। ঐক্য বা অখণ্ডতা চাইলে ইংরেজ-শাসনের চেয়ে হিন্দুস্থানি শাসন সর্বতোভাবে হীন। আর যদি স্বাধীনতাই কাম্য হয়, তা হলে মধ্যপথে থামলে চলবে না, পুরোপুরি বাল্‌কান্‌ হতে হবে। অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যিক নাগপাশ ও অটোমান তুর্কদের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব ইউরোপের বাল্‌কান্‌ উপদ্বীপের লোকেরা যা করেছিল, ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিতে ভারত উপদ্বীপের লোকদেরও ঠিক তাই করতে হবে। বাল্‌কানীভবনের নামে ভয় পাবার কিছু নেই। বাল্‌কান্‌ উপদ্বীপ রুমানিয়া, বুলগারিয়া, আলবানিয়া ইত্যাদি স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত না হয়ে কোন এক ভাষাসাম্রাজ্যের অধীনে অখণ্ড হয়ে থাকলে ভালো হত, এ-কথা কোন সুস্থমস্তিষ্ক বিবেচক লোক বলে না। কারণ, তা হলে অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য বা

অটোমান তুর্কি প্রভুত্বের অবসান ঘটাবার দরকার ছিল না। বাল্কান্ উপদ্বীপের ক্ষেত্রে অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য ও অটোমান প্রভুত্ব যা, ভারতবর্ষ নামক ভৌগোলিক উপদ্বীপের ক্ষেত্রে হিন্দি ভাষা সাম্রাজ্যবাদ ও পাকিস্তানি ধর্মান্ধতাও তাই।

এ-সম্বন্ধে বিবেকানন্দ যা বলে গেছেন, যুক্তির দিক দিয়ে তা অপ্রতিপাদ্য। অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যের পতনের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে স্বামীজি যা বলেছেন তা পড়লে অখণ্ড ভারতবাদীরা উপকৃত হবেন :—

"ভিয়েনা শহরে জর্মান পাণ্ডিত্য, বুদ্ধিবল আছে। কিন্তু যে-কারণে তুর্কি ধীরে ধীরে অবসন্ন হয়ে গেল, সেই কারণ এথায়ও বর্তমান—অর্থাৎ নানা বিভিন্ন জাতি ও ভাষার সমাবেশ। সকল ভিন্ন সম্প্রদায়কে একীভূত করণের শক্তি অষ্ট্রিয়ার নেই। কাজেই অষ্ট্রিয়ার অধঃপতন। বর্তমান কালে ইউরোপখণ্ডে জাতীয়তার এক মহাতরঙ্গের প্রাদুর্ভাব। এক ভাষা, এক ধর্ম, এক জাতীয় সমস্ত লোকের একত্র সমাবেশ। যেথায় ঐ প্রকার একত্র সমাবেশ সুসিদ্ধ হচ্ছে, সেথায়ই মহাবলের প্রাদুর্ভাব হচ্ছে; যেথায় তা অসম্ভব, সেথায়ই নাশ। এখন এই যে সার্বিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি বেচারাম দেশসব তুর্কিকে ভেঙে ইয়ুরোপীরা বানাচ্ছে, তাদের জন্ম না হতে হতেই আধুনিক সুশিক্ষিত সুসজ্জ ফৌজ, তোপ প্রভৃতি চাই। কিন্তু আখেরে সে-পয়সা যোগায় কে? তবু স্বাধীনতা আর এক জিনিস, গোলামি আর এক; পরে যদি জোর ক'রে করায় তো অতি ভালো কাজও করতে ইচ্ছা যায় না। নিজের দায়িত্ব না থাকলে কেউ কোন বড় কাজ করতে পারে না। স্বর্ণ-শৃঙ্খলযুক্ত গোলামির চেয়ে একপেটা ছেঁড়া ন্যাকড়াপরা স্বাধীনতা লক্ষগুণে শ্রেয়। গোলামের ইহলোকেও নরক, পরলোকেও তাই।" (পরিব্রাজক—পৃষ্ঠা ১৪১-৪২।)

বিবেকানন্দের বক্তব্যের মধ্যে অষ্ট্রিয়ার জায়গায় ভারত এবং সর্বিয়া, বুলগেরিয়ার বদলে কাশ্মীর, তামিলনাড়ু নামগুলি ব'সয়ে দিলে সুপ্রযুক্ত হয়। আশা করি, যুক্তির দিক থেকে বিবেকানন্দের কথার সত্যতা কেউ অস্বীকার করবেন না।

বাল্কানীভবনের পর আজ বাল্কান্ উপদ্বীপের কোন কোন ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ভারতকে নানা ভাবে সাহায্য করছে এ-কথা বাস্তব তথ্য ও প্রমাণের দ্বারা অনুমোদিত। ক্ষুদ্র সর্বিয়া বা ইউগোস্লাভিয়া, রুমানিয়া, হুঙ্গারি, বুলগারিয়া—প্রত্যেকে ভারতকে সাহায্য করেছে। অথচ বৃহৎকায় ভারত এমন কোন অর্থনৈতিক উন্নতি করতে পারে নি যাতে তার ক্ষুদ্র প্রতিবেশী সিংহল, নেপাল, ব্রহ্ম, পাকিস্তান প্রভৃতি রাষ্ট্র ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিতে প্রলুব্ধ হতে পারে। ভারতের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ নানা ভাবে গবেষণা ক'রে দেখিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষ বিভক্ত হলে পাকিস্তান কোনমতেই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু আজ ইতিহাস ভিন্ন সাক্ষ্য দিচ্ছে। বরং ঋণভার জর্জরিত ভারত প্রায় সম্পূর্ণরূপে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল।

ইংরেজ শাসন তথা ইংরেজি রাষ্ট্রভাষাকে বিদায় করার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ঐক্যের তাসের প্রাসাদ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। সেই ধ্বংসস্তূপে হিন্দি ভাষাসাম্রাজ্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা হচ্ছে বটে, কিন্তু যারা ইংরেজি ভাষার দাসত্ব করেনি সেই ভারতীয় জনতা হিন্দি ভাষার দাসত্ব কখনও স্থায়ী ভাবে মেনে নেবে না। সুতরাং ঐ উ পাতে ভারত বাইশ থেকে পঁচিশটি টুকরো রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে এই শতাব্দীর মধ্যে যে কোন সময়ে। তা হওয়া অবাঞ্ছনীয় নিঃসন্দেহ; কিন্তু ইতিহাসের অপ্রতিরোধ্য গতিকে চোখ রাঙিয়ে নিবারণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং সময় থাকতে বাংলাভাষীদের সজাগ হয়ে ঘর সামলানো দরকার।

ভারত যদি অনেকগুলি স্বাধীন কিন্তু সংহত, ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হয়, তা হলে ভয়ের কিছু নেই। আমরা ঐক্য চাই নি, যে-ঐক্য এসেছিল ভগবানের পরম করুণার মতো, আমরা তাকে ধ্বংস করেছি অকৃতজ্ঞের মতো। আমরা ঐক্যের বদলে স্বাধীনতা চেয়েছি এবং তার জন্যে নাকের বদলে নরুন পেয়ে ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করেছি। এখন আমাদের ভাষাভিত্তিক স্বাধীন রাষ্ট্রের নামে ভয় পেলে চলবে না। স্বাধীনতার পথে আমাদের শেষ পর্যন্ত এগোতে হবে।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাভাষী এলাকা তথা পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা কি হবে, তা বোঝার জন্যে এখন বঙ্গদেশের ভাষাপরিক্রমা প্রয়োজন।

বাংলাভাষী জনগোষ্ঠী এখন দুটি রাষ্ট্রে বিক্ষিপ্তভাবে

বাস করছে। ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়ে মাউণ্টব্যাটেন প্রদেশ অনুসারে ক্ষমতা অর্পণের একটা প্রস্তাব করেছিলেন যা ভারতীয় নেতৃবৃন্দ অগ্রাহ্য করেছিলেন। সেই প্রস্তাব গৃহীত হলে সিন্ধু, পাঞ্জাব ও বাংলাদেশের ভাগ্য আজ অন্য রকম হত। অনেকে মনে করেন অখণ্ড বাংলা ও পাঞ্জাব পাকিস্তানে গেলেও কোন ক্ষতি হত না। সে ধারণাও মারাত্মক ভুল। যদি বাংলা, পাঞ্জাব ও সিন্ধু আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে জন্মলাভ কর্‌ত, তাহলে তাদের পরিণাম ভালো হতে পার্‌ত। কিন্তু পাকিস্তানে অখণ্ড বাংলা, পাঞ্জাব ও সিন্ধু থাকলে আতঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হত। এখন যা হয়ে গেছে তার ভিত্তিতে আলোচনায় অগ্রসর হতে হবে।

ভৌগোলিক ভারতবর্ষে পাঠানভূমি ও বালুভূমিও অখণ্ড নয়; কিন্তু ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠনে অন্য কোন রাজ্যের কোন অসুবিধা হবে না কেবল বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও সিংহলের ছাড়া। পাঞ্জাব আর কোন দিন অখণ্ড হবে না। অন্য এলাকা তিনটির মধ্যে সিন্ধু ও সিংহল বিভক্ত হয়ে থাকবে বটে, কিন্তু তাতে সিন্ধি মুসলমান ও সিন্ধি হিন্দু, সিংহলি বৌদ্ধ ও মালদ্বীপী মুসলমানদের কোন ভাষাগত বা ভৌগোলিক অসুবিধা হবে না। সব চেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে বাঙালিদের যার প্রতিকার করতে গেলে অনেক সুভাষচন্দ্র ও ফজলুল হকের প্রয়োজন হবে কিম্বা আরো অনেক বড় নেতার। বাঙালি শুধু দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়নি, সে ত্রিধাবিভক্ত হয়ে এমন ভাবে ছড়িয়ে আছে যে, ভারতীয় ইউনিঅনের মধ্যেও তার একত্র হবার উপায় নেই। এ সমস্যা জার্মান-সমস্যা, কোরিয়া-সমস্যা, ভিএত্‌নাম-সমস্যা, পাঞ্জাব-বিভাগ বা সিন্ধু-কচ্ছ কি সিংহল-মালদ্বীপ ব্যবধানের চেয়ে নানা দিক চেয়ে ঢের বেশি জটিল। ডুরাণ্ড রেখা পাঠানদের দেহ আলাদা করলেও মনে তারা জার্মানদের মতো এক। পাঞ্জাবিরা বিভাগের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করেছে লোক বিনিময় ক'রে। কিন্তু বাঙালির অবস্থা অত্যন্ত অনিশ্চিত।

বাঙালির সমস্যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের আশায় এবার বঙ্গভাষা পরিক্রমা আরম্ভ করা যাক। বাংলা দেশ ও বাঙালি জাতির স্বরূপ বোঝার জন্যে কেবল বাংলা ভাষা নয়, ভৌগোলিক ভারতবর্ষ ও তার অন্তর্গত বিভিন্ন ভাষার প্রসঙ্গ মধ্যে মধ্যে উল্লেখ করতে হবে।

[ক্রমশঃ]

অসংসারী [উপন্যাস] শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

*　*　*　*　*　*　*

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

উনিশ

সমীরের ঘর থেকে বেরিয়ে সদাশিব আপনমনে গোঁ-ভরে চলে গেল কালীবাড়ীর দিকে। ওদের কোয়াটার্স থেকে কালীবাড়ীর দূরত্ব কম নয়, কিন্তু কি এক অভূত-পূর্ব খেয়ালে সদাশিব অতটা পথ বিনা প্রয়োজনে হাঁটতে হাঁটতে চলে এল।

দিল্লীর কালীবাড়ী বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান, বাঙ্গালীদের ক্লাব বলাও চলে। প্রত্যহ সন্ধ্যা থেকে রাত্রি সাড়ে আটটা ন'টা পর্য্যন্ত পাঠ, কথকতা এমন কি বৈষ্ণবমতে কীর্ত্তন পর্য্যন্ত হয়ে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রবাসী বাঙ্গালী চাকুরিয়ারা দিল্লী, সিমলা, মিরাট, লাহোর এমন কি রাওয়ালপিণ্ডি পর্য্যন্ত বরাবর কালীবাড়ী স্থাপন করে নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠ করে গিয়েছিলেন এবং সেই সব প্রতিষ্ঠানগুলো আজও পর্য্যন্ত বাঙ্গালীরাই বাঁচিয়ে রেখেছেন কেবল পাকিস্তান হওয়ার পর লাহোর আর রাওয়াল-পিণ্ডির কালীবাড়ীর কি অবস্থা হয়েছে কে জানে?

কালীবাড়ীতে তখনও পাঠ আরম্ভ হয়নি। সদাশিবকে দেখে দু'একজন প্রৌঢ় নিতান্ত মামুলীভাবে স্বাগত জানালে, সদাশিবও তেমনি প্রাণহীনভাবে তাঁদের প্রত্যভিবাদন জানিয়ে ঢালা সতরঞ্চির একপাশে বসলো! কিন্তু কোনদিকেই সে আজ তেমন মন দিতে পারছিল না। কেবলই তার মনে হচ্ছিল, এ্যাঁ, সমীরের এই কাজ। শেষে কিনা একটা ঝি নিয়ে—

পাঠ আরম্ভ হতে তখনও কিছুটা দেরী ছিল। রসিক-বাবু নামে সদাশিবের অফিসের একজন টাইপিষ্ট এসে ওর পাশে বসে বল্লে, কি দাদা, কেমন আছেন?

সদাশিব তার দিকে চেয়ে বললে, ভালো, আপনার খবর ভালো?

সে বললে, ভালো আর কই দাদা? আপনাকে একটা কথা বলবো বলে দুপুর থেকেই ভাবছি। আজ অফিসে এমন একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেছে—

সাগ্রহে ঘুরে বসে সদাশিব বললে, কি ব্যাপার?

রসিকবাবু বললে, আপনি হয়ত জিনিষটা আজই শুনেছেন, কিম্বা হয়ত কাল আপনার কানে ব্যাপারটা উঠতে পারে। মানে আমাদের নির্ম্মলবাবু আজ একটা পাঁচ পাতার প্রাইভেট ম্যাটার আমাকে দিয়ে খুব অনুনয় করে বললেন, তিন কপি টাইপ করে দিতে,—আর জানেন ত, তিনি ভালো হোমিওপ্যাথী ওষুধ দেন, আমার মেয়েটাকে সেবার তিনি একেবারে যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। তা আমি আমার অবসর সময়ে, অবিশ্যি অফিসের কাজ শেষ করে ওঁর কাজটা করে দিচ্ছিলুম, কিন্তু আমাদের সেকসনের মিঃ খোসলেকর ব্যাটা এত পাজী, আজ প্রায় তিনমাস ধরে কি জানি কেন আমার পেছনে লেগেই আছে. সে গিয়ে আমাদের এ, এসকে চুপি চুপি জানিয়ে এসেছে! দোষের মধ্যে আমি সরকারী ষ্টেশনারী দিয়ে ঐ কাজটা করছিলুম, তা দেখুন না কেন, তিন কপি করে পাঁচপাতা, মোটের ওপোর পনরখানা কাগজ, তা গভর্ণমেন্টের কতদিক থেকে কত জিনিষ নষ্ট হচ্ছে, আর এই সামান্য পনরখানা কাগজ—

সদাশিব বিরক্ত হয়ে বললে, যাক্ গে, সে কাল দেখবো'খন। যদি রিপোর্ট হয়, তখন যা হয় করা যাবে। আর আপনিই বা কেন মশাই অফিসে বসে—

ইত্যবসরে পাশে এসে বসলেন নরুবাবু, বল্লেন, কেমন আছেন শিব বাবু, খবর ভালো ত?

দু'পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সদাশিব উঠে পড়লো, যাই ভাই, আজ আবার একটু কাজ আছে। এর পর নতুন কোন ভনিতা না করে সদাশিব ঐ লোক সমাগমের হাত থেকে পালিয়ে যেন নিশ্চিন্ত হোল। কালীবাড়ী থেকে বেরিয়েই তার প্রথম কথা মনে হোল ছিঃ, সেই সমীর, যাকে ছেলে-বলা থেকে দেখছি, সে কিনা একটা ঝি নিয়ে এই কর্মস্থলে—

তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়-হয়। সদাশিব আর কোথাও না গিয়ে অতখানি পথ হেঁটে নিজের বাসায় ফিরে এল।

বাইরের ঘরের দরজাটা ভেজানো ছিল। দরজাটি খুলে সেই পুরাতন ডেক চেয়ারে বসে সদাশিব এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লে। ঘরটা অন্ধকার ছিল, আলো জ্বালবার কথা পর্য্যন্ত তার মনে পড়লো না।

এঘরে লোক ঢোকার শব্দ পেয়েই হোক্ কিম্বা অন্য কোন কারণেই গৌরী এসে ভিতরের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো। কট্ করে সুইচটা টেনে দিয়ে সদাশিবের ক্লান্ত চেহারার দিকে তীব্র কটাক্ষপাত করে বললে কি গো, বন্ধুর বাড়ীতে পাত পেড়ে ভরপেট খাওয়া হোল'ত?

তার মানে? সদাশিব রুক্ষস্বরে প্রশ্ন করলে।

মানে আবার কি, আমি কি দেখিনি কিছু? তুমি আর নীরোদবাবু দুজনে মিলে পরম বন্ধুর গায়ে গা দিয়ে তার নতুন সংসারে প্রবেশ করে আর বেরোবার নামই নেই, ভাবলুম না জানি কত সব কি পোলাও মাংস, কানী ঝীর হাতের রান্না দু'জনে মিলে গিলছো—আমি ত ঠাকুরকে বলেই দিয়েছি, বাবু আজ রাত্তিরে কিছু খাবেন না, বরং একটা সোডা কি লেমোনেড্ আনিয়ে রাখবো কি না, তাই ভাবছিলুম, বলতে বলতে গৌরীদেবী শ্লেষ ও ব্যঙ্গের হাসি হেসে উঠলেন।

সোজা হয়ে চেয়ারে উঠে বসে সদাশিব বললে তুমি সব জানো না কি? কই আমাকে ত কিছু বল নি?

বলবো কেন? বন্ধুর নামে কিছু বলতে গেলে তুমি কি আর কোন কথা কানে তোল? বন্ধু বলতে যে একেবারে অজ্ঞান! এবার বোঝো, কি কালসাপকে দুধকলা দিয়ে ঘরে পুষেছিলে? ছি ছি, বন্ধুর বাড়ীর একটা কানী ঝিকে নিয়ে কি ঢলানটাই না ঢলালে! ওরা আবার দেশের কাজ করেছে, ছিঃ!

না না বাস্তবিক তুমি সব জানো, সত্যি বলো তুমি ঘরে বসে এত কথা কবে টের পেলে? সদাশিব সাগ্রহে প্রশ্ন করলে।

দুটো চোখ আর দুটো কান একটু খুলে রাখলে অনেক জিনিষই টের পাওয়া যায়। আমি ত আর তোমার মত অফিসের ফাইলে ডুবে যাই নি যে, দুনিয়া আমার কাছে মিথ্যা হয়ে যাবে। আর একথা এক তুমিই দেখি জানো না, বাকী ত সবাই জানে, বাঙ্গালী পাড়ায় একেবারে ঢি ঢি হয়ে গেছে। বলি আগুন কি আর কখনও ছাই চাপা থাকে গো?

বাজে কথা, নীরোদবাবু ত জানতেন না, তিনি এখনও এ সব কথা কিছুই জানেন না।

তিনি বুড়ো মানুষ, তিনি আর এ সব কথা কোথা থেকে শুনবেন? কিন্তু তাঁর বাড়ীর চাকর জানে, তাঁর বউমা জানে, তাঁর ছেলে জানে, তবে হয়ত তাঁকে এ সব ব্যাপার কেউ বলেনি। যে খাটটায় সমীর শুতো, সেইটের ওপোর গৌরী বসে পড়লো।

ছিঃ সমীর যে এমনটা করবে, তা আমার কল্পনারও অতীত ছিল, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সদাশিব যেন আপন মনেই কথাগুলো উচ্চারণ করলে।

বুঝে দেখ পুরুষ জাতটা কত উঞ্ছ আর কত নেমক-হারাম! হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে গৌরী যেন মন্তব্যটা প্রকাশ করলে।

এর পর দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। খানিক পরে সদাশিব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

গৌরী বললে উঠ্‌ছো যে?

সদাশিব বললে, যাই, পুজো আহ্নিক সেরে নিই গে।

পৈতেগুলো ডাষ্টবিনে ফেলে দাওগে, তোমরা আর বামুন বলে পরিচয় দিও না।

হুঁ, গম্ভীরভাবে শব্দটা উচ্চারণ করে সদাশিব বাড়ীর ভেতর চলে গেল। খোলা জানলা দিয়ে গৌরী উদাস ভাবে সমীরের কোয়াটার্সের দিকে চেয়ে চেয়ে একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেললে। তার ভেতরটা যেন প্রতিহিংসায় জ্বলে

পুড়ে যাচ্ছে। তারই বাড়ীর ঝি,—কুৎসিত, বিকলাঙ্গ, নিরক্ষর, নিরাশ্রয়, প্রেমের প্রতিযোগিতায় সেই ঝিয়ের কাছেই পরাজয়! এর উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। যেমন করেই হোক, এর উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

রামরূপ ভেতরের দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বল্লে, মাইজী, এবার কি বাবুর রুটী সেঁকবো?

অন্যমনস্কভাবে গৌরী বল্লে, স্যাঁকো।

সে চলে গেল। এক মিনিট পরে গৌরীও উঠে দাঁড়ালো। গৌরী আর একবার সমীরের কোয়ার্টাসের দিকে দৃষ্টিপাত করে বাইরের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলে। সমীরের বাইরের ঘরে তখন আলো জ্বলছিল। কিন্তু ঘরে কোন লোক আছে কি না বুঝা গেল না। তীব্র, হিংস্র মুখখানা ঘুরিয়ে নিয়ে গৌরী নিজের বাড়ীর ভেতরে চলে গেল।

পরের দিন দুপুরে গৌরী যথারীতি আধখোলা জান্লার ধারে চেয়ার টেনে বসেছিল, দৃষ্টি ছিল সমীরের বাড়ীর দিকে। যেদিন থেকে গৌরী টের পেয়েছে, সমীর এ বাড়ীতে বাসা বেঁধেছে, সেদিন থেকেই তাকে যেন ভূতে পেয়ে আছে। সেই ভূত তাকে সময়ে অসময়ে সর্ব্বক্ষণই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খোলা জানলা বা দরজার কাছে টেনে এনে এই দিকে মুখ করে দাঁড় করিয়ে দেয়। বিশেষ করে দুপুরের এই সময়টায় সে কিছুতেই নিজেকে সংযত করতে পারে না। সমীর এসে দরজায় ঘা দেবে, ভেতর থেকে দরজাটা খুলে যাবে। তারপর সে তার সাইকেলখানা টেনে রোয়াকে তুলে ঘরের ভেতর ঢুকে যাবে, হয়ত একবার এ বাড়ীর দিকে মুখ তুলে চেয়ে দেখবে তারপর ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ হয়ে যাবে, এই নিয়মিত রুটীন বাঁধা স্থূল ব্যাপারটা প্রত্যহ চাক্ষুষ না করলে গৌরী যেন পাগল হয়ে যাবে। শরীর তার যতই খারাপ হোক না কেন, এই জিনিষটায় তার যেন বিরক্তি নেই, অবসাদ নেই, এটা বোধহয় এ জীবনে কখনও একঘেয়ে হয়ে যাবে না, যেতে পারে না। দুপুরের ঝন্‌ঝনে রোদ পাথুরে রাস্তায় এমন চক্‌চক্ করে, ইটকাঠের প্রাণহীন সরকারী বাসা-বাড়ীগুলো দুপুরের রোদে এমনই অগ্নিবর্ণ বিকীরণ করে, যে, কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে গৌরী চোখের সামনে অন্ধকার দেখে কিন্তু তবুও তার দেখার বিরাম নেই, বিরক্তি নেই, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে সেই দিকেই চেয়ে থাকে, মাঝে মাঝে টাইমপিস্ ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখে। মনে হয় এতক্ষণে সমীরের স্নান শেষ হোল, অতক্ষণে তার খাওয়া দাওয়া শেষ হোল। হয়ত রেণু এখন সমীরের পাসেই খেতে বসে, কত রকম গল্প করে এখন ওরা একসঙ্গে দু'জনে বসে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপ্ত করে। এতক্ষণে হয়ত সমীর খাটের ওপোর কাৎ হয়ে শুয়ে সিগারেট টান্‌ছে আর রেণু বোধ হয় মাথার কাছে বসে পা দুলিয়ে দুলিয়ে কত সব কথা কইছে। পোড়ারমুখী কানী, মর্-মর্-মর্, কি কাল সাপিনীই যে গৌরীর বাড়ীতে এসে ঢুকেছিল! ঐ পোড়া-কাঠ চেহারা যেন শেওড়া গাছের পেত্নী বসন্তের দাগে দাগে শিলকাটানো মুখ, একটা চোখ ছোট হয়ে বুঁজে আছে, ওর মনেও এত ছিল, ওর বরাতেও এত সুখ ছিল। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে গৌরী উঠে দাঁড়ালো, আনমনে ক্যালেণ্ডারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। সরকারী ক্যালেণ্ডার, এক বছরের তিনশ পঁয়ষট্টি দিন একখানি পাতার ওপোর ছাপা রয়েছে। বিগত দিনগুলোর ওপোর গৌরীর যেন হাত বুলোতে ইচ্ছে হয়। বেশী নয়, মাত্র সাত আট মাস আগে এমন একদিন ছিল, যেদিন কত গল্প, কত আনন্দ, কত পূর্ণতা নিয়ে গৌরীর মধ্যাহ্নগুলো কাট্‌তো আর আজ—আজ সে আবার তার পুরাতন অভ্যস্ত বিরলতা বিরসতার মধ্যে নিতান্ত রিক্তহস্তে এসে দাঁড়িয়েছে। একজনের তাসখেলা ফুরিয়েছে, আর এক-জনের সর্ব্বস্ব ফুরিয়েছে। সে যেন পুতুল, নিতান্তই দু'পয়সার মাটীর পুতুল। পুতুল খেলা শেষ করে খেলোয়াড় এখন নতুন পুতুল নিয়ে খেলায় মেতেছে, আর পুরান পুতুল ভাঙ্গা হাত পা নিয়ে উঠানে নর্দামার ধারে ঊর্দ্ধে মহাশূন্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পড়ে আছে। ধাঙড় যখন আস্‌বে, তখন যাবতীয় আবর্জ্জনার সঙ্গে একই ঝাটার টানে সেই ভাঙ্গা পুতুলকে তুলে নিয়ে যেখানে সব জঞ্জালের সমাধি হয় সেইখানে নিয়ে গিয়ে ঐ একসময়ের অতিআদরের পুতুলকে বিসর্জ্জন দিয়ে আস্‌বে। গৌরীর জীবনের সব কাজই শেষ হয়ে গেছে, শুধু বাকী আছে ধুলোমাটীর পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে—

মাইজী।

কে? পাচক রামরূপের আহ্বানে গৌরী চম্‌কে

উঠলো এবং পরক্ষণেই লজ্জিত হয়ে খুব মিষ্টি করে জিজ্ঞাসা করলে, কি রে ?

রামরূপ হিন্দীতে উত্তর দিয়ে বললে যে, তার সব কাজ শেষ হয়ে গেছে, এবার সে একটু বেরুবে।

হঠাৎ গৌরীর সমস্ত মনটা এলোমেলো হয়ে গেল। হাঁটুর ওপোর তোলা কাপড় মালকোঁচা মেরে পরা, মোটা গেঞ্জী গায়ে, তার মধ্য দিয়ে ধপধপে সাদা পৈতের একটু খানি দেখা যাচ্ছে, ডান কাঁধে লাল ফরসা গামছাখানা, শ্যামবর্ণ, স্বাস্থ্যবান, ভরাট যৌবনশ্রী, ডাগর দু'টো চোখে ভরপেট ভোজনের পূর্ণ তৃপ্তি, গৌরী রামরূপকে ডেকে এক দুষ্টুমিভরা রহস্যের চাউনি চেয়ে হিন্দিতে বল্লে, রামরূপ, রোজ দুপুরে কোথায় যাও তুমি ?

গৌরীর প্রশ্ন এবং প্রশ্ন করার ভঙ্গীতে রামরূপ অকারণেই দৃষ্টি আনত করে সবিনয়ে বল্লে, কোথাও যাই না মা, দেশোয়ালী ভাইরা সব ওপাড়ায় একটা পানের দোকানের পেছনের বড় একটা চাতালে বসে তাস খেলে, আমিও সেইখানে তাদের সঙ্গে দুপুরে তাস খেলতে যাই।

রামরূপও তাস খেলে, সমীরও তাস খেলে, কেবল গৌরীই তাস খেলতে জানে না, সে জুয়া খেলেছে, সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে, মরেছে।

নেওয়ারের খাটের ওপোরে বসে গৌরী বল্লে, রামরূপ, মসলার কৌটোটা আনো ত ওঘর থেকে।

রামরূপ চলে গেল, এবং পরক্ষণেই ও ঘরের টেবিলের ওপোর থেকে মসলাভর্ত্তি রেমিংটন টাইপরাইটারের ফিতের কৌটোটা হাতে নিয়ে এ ঘরে এসে ঢুকলো। গৌরীর বুকটা তখন ধ্বক ধ্বক করে কাঁপছিল, সমীরের ওপোর নিষ্ফল আক্রোশের অগ্নিশিখাও বোধ হয় সেই সময় গৌরীর বুকের ভেতর লক্ লক্ করে জ্বলছিল।

রামরূপ কৌটোটা এনে দরজার কাছে থমকে দাঁড়ালো। নেওয়ারের খাটের ওপোর আধশোয়া অবস্থায় বসে গৌরী হাত বাড়িয়ে বল্লে, দাও, এখানে দিয়ে যাও। রামরূপ খুব সমীহ করে ঘরে এসে ঢুকে হাত বাড়িয়ে কৌটোটা এগিয়ে দিলে। হঠাৎ গৌরী তার ডান হাতের মনিবন্ধের কাছে একটা কালো তিল দেখে যেন বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে, এটা তোমার কি রামরূপ ?

প্রশ্নের মধ্যে রামরূপ তেমন কোন উদ্দেশ্য বুঝতে পারলে না, হিন্দিতে বল্লে, ও একটা তিল।

থপ্ করে তিলটার ওপোরে আঙুল দিয়ে গৌরী বল্লে ওটার জন্য কোন কষ্ট হয় ? যেন তিল নামক জিনিষটা গৌরী এ জীবনে কখনও দেখেনি!

রামরূপ বিস্মিত হ'ল', একটু যেন শিউরেও উঠলো, বল্লে না ত।

রামরূপের গলার কাছেও একটা তিল ছিল। গৌরী আধা-জোর দিয়ে এবং আধা-ইঙ্গিত করে রামরূপকে নেওয়ারের খাটের একপাশে বসিয়ে ঝুঁকে পড়ে তার গলার তিলটা দেখতে লাগলো, যেন একটা অভূতপূর্ব্ব জিনিষ! যেন এমনধারা অপূর্ব্ব বস্তু জীবনে কেউ কখনও দেখে নি। একমাত্র গৌরীদেবীই পৃথিবীতে তিল নামক বস্তু প্রথম আবিষ্কার করেছে। রামরূপ বস্তির নওজোয়ান, নানা রকম কুসঙ্গে পড়ে অনেক রকম অভিজ্ঞতা সে ইতিপূর্ব্বেই পেয়েছে, তবুও গিন্নিমা, মনিব, সে বেশ একটু আড়ষ্ট হয়ে চুপ করে খোলা দরজা দিয়ে ভেতর বাড়ীর উঠোনের দিকে চেয়ে রইলো।

গৌরী বল্লে, আচ্ছা রামরূপ তোমার সাদি হয়েছে ?

সলজ্জভাবে সে বল্লে হাঁ।

জরু কোথায় ? গৌরী প্রশ্ন করলে।

বানারস।

দেশে ? তা দেশে মানে তোমার বাড়ীতে, না তার বাবার কাছে ?

আমার বাড়ীতে, আমার মায়ির কাছে, রামরূপ উত্তর দিলে।

এক মুখ হেসে গৌরী বল্লে জরুর জন্যে মন কেমন করে না ?

রামরূপ বল্লে, না, সে এখনও একদম লেড়কী আছে, তার উমর হবে সাত কি আট সাল।

ও মা, গৌরী যেন হতাশ হয়ে শিউরে উঠলো।

একটু অপেক্ষা করে রামরূপ বল্লে এবার উঠি মায়িজী।

গৌরীর গালে যেন কে ঠাস করে চড় মারলে। সামলে নিয়ে সে বল্লে, দেখ রামরূপ! তুমি আমাকে মায়িজী বল কেন, দিদিসাব বলতে পারো না, কি মেমসাব,—

বলেই গৌরী যেন নিজের কাছে নিজে লজ্জিত হয়ে পড়লো।

মনে মনে হেসে রামরূপ বল্‌লে, মেমসাবই বল্‌বো জী। এর আগে আমি যে বাড়ীতে কাজ করতুম, সে বাড়ীর বহুকেও আমি মেমসাব বলতুম। কিন্তু এখন অনেকে ঠিক মেমসাব বলাটা পছন্দ করে না, বিশেষতঃ বাঙ্গালী মায়েরা—

গৌরী বল্‌লে, না তুমি মেমসাব বল্‌বে। বাবু যদি হাসে কি মেমসাব বল্‌তে বারণ করে, তাহলে তুমি বাবুর সামনে কিছু বোলোনা, কিন্তু বাবুর আড়ালে আমাকে মেমসাব বলেই ডাক্‌বে।

রামরূপ গৌরীর মুখের দিকে চেয়ে মনে মনে খুসি হয়ে গেল, বল্‌লে জী মেমসাব।

গৌরী রামরূপের পিঠে হাত দিয়ে বল্‌লে, তুমি খুব ভালো ছেলে রামরূপ, তোমার যখন যা দরকার হবে আমাকে বল্‌বে বুঝ্‌লে।

রামরূপ পুলকিত হয়ে বল্‌লে, মেমসাব, হাত পা দলাই মলাই করে দেব? আমি আগে রেল ষ্টেশনে প্লাটফরমের ওপোর মাথা গা টিপে দিতুম, দু আনা করে পয়সা পেতুম।

একটু হেসে একটু ইতস্ততঃ করে গৌরী বল্‌লে, দাও; বলে, তার সুন্দর সুগোল নরম হাতখানা রামরূপের কোলের ওপোর তুলে দিলে। রামরূপ অত্যন্ত যত্নসহকারে ধীরে ধীরে হাতখানা টিপে দিতে লাগ্‌লো।

কিন্তু গৌরীর যেন কেমন লজ্জা করে। সে আর চোখ চেয়ে থাক্‌তে পারলে না, রামরূপের কাছে নিজের দেহ-খানা শিথিল করে দিয়ে চোখ বুঁজে শুয়ে শুয়ে কেবলই মনে করতে লাগ্‌লো, মেয়েরাও তাস খেলতে জানে, মেয়েরাও নাচিয়ে দিয়ে সরে পড়তে পারে, তবে মেয়েরা সভ্য, মেয়েরা ভদ্র, এতদিন এসব কাজ করতো না, এবার করবে, করবে, করবে।

হাত এবং মাথা টিপে রামরূপ ইচ্ছে করেই গৌরীর পায়ের কাছে বসে তার পা দুটি নিজের কোলের ওপোর তুলে কাপড়টা পাশে সরিয়ে দিয়ে অতি আগ্রহে, অতি যত্ন সহকারে সেই নরম সুগোল পা' দুটি টিপে দিতে লাগ্‌লো। বাঁধোনা চাতালে বসে দেশওয়ালী ভাইদের সঙ্গে একসঙ্গে তাস খেলার কথা সেই হতভাগ্য রামরূপের সেদিন আর মনেও রইলো না। আর গৌরীও চুপ করে চোখ বুঁজে শুয়েই ছিল, কেবল তার ডান হাতখানা আল্‌তোভাবে রামরূপের বাম পাঁজরের ওপোরে ঠেকে ছিল। তার যেন দেহের কোন সাড়ই ছিল না, একটা বিষকে সে যেন আর একটা বিষ দিয়ে ক্ষয় করতে চাইছিল।

হঠাৎ যেন রামরূপকে সাপে কামড়েছে, সে গৌরীর পা দুটো নিজের কোল থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এক লাফে দাঁড়িয়ে উঠে ঘরের অপর কোণে গিয়ে চুপ করে কাঁপতে লাগলো। গৌরী তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়েই দেখে ভেতরের দরজার চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে নীরোদ বাবুর পুত্রবধূ ও অপর একটি অপরিচিত মেয়ে। তারাও যেন কেমন অপ্রস্তুত হয়ে চলে যাওয়ার উপক্রম করছে।

মুহূর্ত্তেই গৌরী নিজেকে সামলে নিলে। গায়ের কাপড়টা ভালো করে টেনে নিয়ে যেন কিছুই হয় নি, এমনি ভাবে নীরোদবাবুর পুত্রবধূকে বল্‌লে, এই যে ভাই এসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? তারপর একটু হাঁপিয়ে নিয়ে খুব সহজ হতে চেষ্টা করে অপরিচিত মেয়েটির দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বল্লে, এটি কে? আর একটু হাঁপিয়ে ঘরের অন্য কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে-থাকা রামরূপের দিকে চেয়ে বললে, কি রে রামরূপ, তুই ওখানে কি করছিস্, কি চাস্, কিছু বলবি নাকি আমাকে?

কেউ কোন কথা বলার আগেই নীরোদবাবুর পুত্রবধূ অপরিচিত মেয়েটির হাত ধরে উঠানের ওধারের যে খোলা দরজা দিয়ে তারা এসেছিল, সেই পথ দিয়েই রওনা দেওয়ার উদ্যোগ করলে। গৌরী তাড়াতাড়ি উঠে ভেতরের দরজা দিয়ে ভেতর বাড়ীর রোয়াকে এসে আর একবার ডাক্‌তেই সেই বউটি মুখ ঘুরিয়ে বল্‌লে, আইবুড়ো বোনকে নিয়ে এসেছিলুম, অপরাধ হয়েছে, কিছু মনে কোরো না; এ জীবনে আর আমি এ-বাড়ীতে আসবো না, বলেই বিন্দুমাত্র কালবিলম্ব না করে নতমুখে এ-বাড়ীর সীমানা পার হয়ে নিজেদের বেড়ার মধ্যে গিয়ে পড়লো।

ঘরে ঢুকেই রাগতস্বরে গৌরী ডাক্‌লে, রামরূপ।

রামরূপ নীরবে কাঁপতে লাগলো।

উঠানের ধারের দরজা খুলে রেখেছিলি কেন?

কসুর হয়ে গেছে, মেমসাব।

কসুর হয়ে গেছে, কসুর! যা বেটা যা, তুই যেখানে যাচ্ছিলি সেইখানেই যা।

নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় রামরূপ ঘর ছেড়ে, বাড়ী ছেড়ে বোধহয় সেই তাসের আড্ডাতেই চলে গেল।

টাইমপিস ঘড়িটায় চারটে বাজলো।

ওঃ চারটে! গৌরী আপনমনেই চমকে উঠলো। আজ দুপুরটা কোথা দিয়ে যে কাটলো, টেরই পেলুম না। কিন্তু যতই সে অন্যমনস্ক হতে চেষ্টা করতে লাগলো, যতই নানাভাবে মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলো ততই যেন কেমন একটা চাপা ভয় তার মনটাকে চেপে ধরতে লাগলো। সেটা যেন কিছুতেই যেতে চায় না। শেষে নিজের শোবার ঘরে এসে এক গেলাস জল খেয়ে আরসীর সামনে দাঁড়ি চেপে চেপে মাথা আঁচড়াতে লাগলো। কিন্তু মনের মধ্যে কতরকম দুশ্চিন্তা যে নিজের অজ্ঞাতসারেই দল বেঁধে আসতে লাগলো এবং নিজের অজ্ঞাতসারেই সে যে কতবার আধখোলা জানলা দিয়ে সমীরের বাসার দিকে দেখে নিলে, তা সে নিজেই জানে না।

চুল বাঁধা শেষ হয়ে গেল, কিন্তু কিছুতেই মানসিক শান্তি ফিরে এলো না। শেষে জোর করেই নিজের মনে নিজে বলতে লাগলো, দূর হোক গে ছাই, যা হওয়ার তাই হোক, আর পারি না। তারপর আপনমনেই খানিকটা দড়ি জোগাড় করে ভেতরের দিকের বেড়ার দরজাটার কড়ায় আষ্টেপিষ্টে বেঁধে কলঘরে গিয়ে সাবান নিয়ে হাত মুখ ধুতে বসলো।

সাড়ে পাঁচটার পরেই সদাশিব যথারীতি অফিস থেকে ফিরে এলো। ঘরে এসে অফিসের জামা ছেড়ে কলঘরে গিয়ে ঢুকতেই গৌরী রান্নাঘরে ঢুকে স্বহস্তে উনান ধরাতে বসে গেল, চা করতে হবে। হাতমুখ ধুয়ে সদাশিব তৈরী হয়ে এসে বললে, কি হোল? আজ আবার রামরূপ ভাগল নাকি?

অবজ্ঞার সুরে গৌরী বললে, কে জানে, সে বেটা সেই যে বেলা বারোটার সময় পালিয়েছে, এখনও ত আসে নি। অনুযোগের কণ্ঠে স্বামীকে বললে, ওটাকে দিয়ে আর কাজ চলে না, খালি কাঁড়ি কাঁড়ি গিলবে আর গোছা গোছা টাকা নেবে। ওটাকে বিদেয় করে একটা ভাল লোক নিয়ে এসো, নইলে ওরকম লোক রেখে কোনো লাভ নেই।

লোকের কথা বললেই রেণুর কথা মনে পড়ে। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে সদাশিব বললে, ওঃ, কানী মাগীটা যে এত পাজী, তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি।

কি জানি কেন আজকে যেন রেণুর ওপর গৌরীর আক্রোশটা কম। বললে, কানী আর একা কি করবে বল? দুনিয়ায় যার কেউ নেই, তার আর ভয়টাই বা কিসের? বরং দোষ হোল তোমার ঐ বন্ধুর। সে ঐ কানীকে লোভ দেখিয়ে নিয়ে পালালো কেন? নইলে রেণু ত এতদিন এ বাড়ীতে ছিল, কই কোনদিন ত কোনরকম বেচাল তার দেখিনি।

তা বটে, সদাশিব এই ছোট্ট কথার ভেতর দিয়ে গৌরীর উক্তিটা স্বীকার করে নিলে। কিছুক্ষণ পরে বাইরের রোয়াক থেকে নীরোদবাবুর কণ্ঠস্বর পাওয়া গেল, শিববাবু আছেন নাকি?

গৌরী তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, কিন্তু আজ যেন কেমন তার বুকের ভেতর কয়েদীতে পাথর ভাঙ্গতে সুরু করে দিলে। সে সময়ে তার সামনে কেউ থাকলে সে নিশ্চয়ই বুঝতে পারতো যে, গৌরী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। গৌরী পাঁচশ' বার নিজের মনে কেবলই বলতে লাগলো, নীরোদবাবু এইমাত্র অফিস থেকে এসেছে, এবং পুত্রবধু কখনই শ্বশুরের কাছে এ সব কথা বলতে যাবে না তবে ঐ অচেনা মেয়েটা, ওটা কে? বার বার মনে হতে লাগলো, যেই হোক্, সে কি বৃদ্ধ নীরোদবাবুর কাছে এসব কথা এখুনি লাগাতে যাবে, কিন্তু তবুও গৌরী আপন মনেই কাঠ হয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগ্‌লো, বৃদ্ধ নীরোদবাবু তার স্বামীর সঙ্গে কি কথা কন।

ছ'টা নাগাদ রামরূপ এসে ঘরে ঢুকতেই সদাশিব তাকে একটা ছোট ধমক দিয়ে বল্লে, দেখ রামরূপ, তুমি যদি বারোটার সময় বাইরে গিয়ে ছ'টার পর ফের, তাহলে দুপুরে তোমার বাইরে যাওয়া একেবারে বন্ধ করে দেব। কোথায় যাস্ তুই? এতক্ষণ ধরে কোথায় থাকিস্?

গৌরীর অঙ্গ হিম হয়ে গেল, কি জানি, বোকা রামরূপ এর কি উত্তর দেয়! কিন্তু রামরূপ চালাক ছেলে, সে কোন জবাব স্পষ্ট করে না দিয়ে আম্‌তা আম্‌তা করে

াড়ীর ভেতর এসে ঢুক্‌লো। ঢোকা মাত্রই গৌরীর সামনে ়ড়ে গেল। গৌরী বোধ হয় যেন বাইরের ঘরের লোক-দের শুনিয়েই কৃত্রিম ক্রোধভরে রামরূপকে বল্‌লে, হ্যাঁরে, বেলা বারোটা থেকে ছটা সাড়ে ছটা পর্য্যন্ত কোথায় থাকিস্‌, বাড়ীর কাজ কর্ম্মগুলো কি আমি করে নেব?

রামরূপ নীরবে গৌরীর মুখের দিকে হাসি হাসি মুখে দৃষ্টিপাত করে চোখের ইশারায় বুঝিয়ে দিলে যে সে বারো-টার সময়ই এ বাড়ী থেকে বেরিয়েছে এবং একথাটা বার বার করে বলার কোনো প্রয়োজন নেই।

পরের দিন সকালে সদাশিব যখন দাঁতন করে মুখ ধুচ্ছে তখন গৌরী যেন সদাশিবকে শুনিয়ে শুনিয়ে রামরূপকে বল্‌লে দেখ্‌ রামরূপ, মাঝে মাঝে ঐ ভেতরের দরজার বাঁধা দড়িটা দেখিস ত! ওটা যেন পরে-টরে গিয়ে দরজাটা আবার খোলা পড়ে না থাকে।

সদাশিব দরজায় বাঁধা দড়িটার দিকে চেয়ে বল্‌লে, কেন, ওটা আবার দড়ি বেঁধে রেখেছ কেন?

গৌরী বল্‌লে না বেঁধে উপায় আছে। কানী চলে যাওয়ার পরেই আমি ওকে ঐভাবে বেঁধে রেখেছি, নইলে দুপুরে বাড়ীর ভেতর কেউ থাকে না, সেদিন দেখি কি না, দুটো কুকুর এসে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করছে।

রামরূপ এর আগেও কিছুকাল বাঙ্গালীবাড়ী কাজ করেছে, বাংলাটা সে ভালো রকমই বোঝে। মুখটা গম্ভীর রেখে মনে মনে সে বেশ খানিকটা হেসে নিলে। কোন্‌ দরজা বন্ধ হবে আর কোন্‌ দরজা খোলা থাকবে, সদাশিব এ নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না। দরজায় দড়ি বাঁধার কথা তার এক কান দিয়ে ঢুকে অপর কান দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সেই দিনেই দুপুরবেলা আহারাদির পর সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করে রান্না ঘরে রামরূপ যেখানে খেতে বসেছে, সেইখানে গৌরী এসে অকারণে এদিক ওদিক করতে লাগলো। আজ আর দুপুরে আধ-খোলা জানালার ধারে সমীরের প্রতীক্ষায় বসে থাকতে গৌরীর ঠিক মত মনেই পড়লো না। অপর পক্ষে খোট্টা রামরূপ সম্বন্ধে গৌরীর মনে মনে একটা ঘৃণার ভাব থাকা সত্ত্বেও গৌরী যেন কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছিল না। কেবলই মনে হতে লাগলো, আহা লোকটা আমার বাড়ী কাজ করে, আমি যদি তার খাওয়া-দাওয়া না দেখি, তাহলে আর কে দেখবে? পাপ হবে যে!

আহারাদি শেষ করে রামরূপ তার থালা গেলাস নিয়ে হাসি হাসি মুখে কলতলায় উঠে গেল। রামরূপই এ বাড়ীতে রান্না করে এবং এরাও ব্রাহ্মণ অতএব সে বাসনও মাজে এবং অল্প কাজ বলে মাত্র বাইশ টাকাতেই সে রাজী হয়েছে। লোকটা কুঁড়ে, ফাঁকিবাজ এবং একটু বাবু গোছের। বেশী কাজ সে করতে পারেনা বলেই এ বাড়ীতে মাত্র দু'জনের রান্নার ভার সে নিয়েছিল। কাল থেকে লোকটা একটু খুসিই আছে। সে বোধ হয় ভেবেছে, এ বাড়ীতে তার আহার ওষুধ দুই-ই হবে।

গৌরীর একবার মনে হোল, সে বলে বাসন মাজা এখন থাক, বিকেলে মাজিস্‌, কিন্তু কথাটা বল্‌তে গিয়ে কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকলো। ইতস্ততঃ করে গৌরী বল্‌লে, রামরূপ, আজ যেন আর কাজ সেরেই পালাস্‌ নি।

সহাস্যমুখে সে বল্‌লে নেহি মেমসাব, ম্যঁয় আব্‌হি আতাহুঁ। গৌরী বাইরের ঘরে সমীরের ব্যবহার করা নেওয়ারের খাটের ওপোরে এসে চাদরখানা গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়লো।

পনর মিনিটের মধ্যেই রামরূপ বাসনমাজা সেরে ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। আজ তার অনেকখানি উন্নতি হয়েছে। বোধ হয় সে আগে থেকেই পান কিনে এনেছিল, খুব সম্ভব নিজের পয়সায়, নইলে বাজার করে সদাশিব স্বহস্তে এবং পান সে কোন কালেই কেনে না। এক খিলি পান মুখে দিয়ে একটা গোলাপী বিড়ি ধরিয়ে আর এক খিলি মশলা-দেওয়া মিঠে পান হাতে নিয়ে রামরূপ এসে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আধো-আলো, আধো অন্ধকারে ঘরের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে সহর্ষ-ভীতকণ্ঠে অস্ফুট-স্বরে ডাক দিলে, মেমসাব।

গৌরী যেমন মড়ার মত পড়েছিল ততোধিক অস্ফুটকণ্ঠে চোখ বুঁজেই উত্তর দিলে, অন্দর আও।

সে এসে আস্তে আস্তে খাটের ধারে দাঁড়ালো। গৌরী চোখ চেয়ে দেখে বললে, বৈঠো।

রামরূপ জলন্ত বিড়িটা বাঁ হাতের মুঠোর মধ্যে রেখে হাতশুদ্ধ পেছনে লুকিয়েছিল, ডান হাত দিয়ে শালপাতা

মোড়া মিঠে পানটা গৌরীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, মেমসাব।

কি?

পান।

পানটা দেখে গৌরী মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠলো, বেটার স্পর্দ্ধা দেখেছ? মুখে বললে, ও আমি খাই না, তুমি খাও।

রামরূপ একটু ক্ষুণ্ণ হোল, কিন্তু ভয়ে ভয়ে একটু আড়ষ্ট হয়ে খাটের এক কোণায় বসেও পড়লো।

এতক্ষণে ধোঁয়ার গন্ধে গৌরী বুঝতে পারলে যে রামরূপের হাতে একটা জ্বলন্ত বিড়ি রয়েছে। ডাকলে রামরূপ। আহ্বানে গৌরীর বিরক্তিটা স্পষ্ট ফুটে উঠলো।

মেমসাব।

হাতে কি?

কুছ্ নেই।

গৌরী বললে, যাও, ঐ পানটা খেয়ে বিড়িটা শেষ করে হাত ধুয়ে ঘরে এসো, তোমার বড্ড বাড় হয়েছে।

ভয়ে ভয়ে রামরূপ বিড়িটা হাতের মুঠোর মধ্যে লুকিয়ে নিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বাইরে এসে শালপাতা সমেত পানটা রান্নাঘরের এক জায়গায় লুকিয়ে রেখে চোঁ চোঁ করে বিড়িতে টান দিতে দিতে রামরূপের সমস্ত মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে গেল। কেবলই তার মনে হতে লাগ্‌লো, মেমসাব তাকে ভালোবাসে, না ছাই, সে চাকর, সে ছোট, এর চেয়ে একটাকা খরচ করলে বাতাসীর ঘরে গিয়ে কত ফুর্ত্তি, কত আনন্দ করা যেত; কিন্তু তখুনি মনে হোল, বাতাসী আর মেমসাব, আকাশ আর পাতাল! নিজের হাত দুটো সে ভালো করে আর একবার অনুভব করে নিলে। কালকের পরশ যেন আজ এখনও হাতের মধ্যে লেগে আছে। বাম পাঁজরের কাছে মেমসাহেবের মোমের মত আঙুল যেন এখনও ঠেকে রয়েছে। কিন্তু মেমসাব বড় রুক্ষ; সে আর কি-ই বা এমন অপরাধ করেছে ঐ একখিলি পান এনে—

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দেখলে মেমসাব ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দরজার হ্যাণ্ডেল টেনে সেটাকে বন্ধ করে কোন দিকে না চেয়ে নিজের শোবার ঘরে প্রবেশ করে ভেতর থেকে ছিটকানী বন্ধ করে দিলে। এ কি? রামরূপ আশ্চর্য্য হয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি বিড়ি ফেলে দিয়ে হাত ধুয়ে নিজের কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে দরজার কাছে এসে আস্তে আস্তে ডাকলে, মেমসাব, মেমসাব!

ভেতর থেকে কোনো উত্তর নেই। একি, এর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লো নাকি? বাপ রে, এত গোঁসা! আবার ডাকলে, মেমসাব!

গৌরী চাপা গলায় ভেতর থেকে বললে, বিরক্ত কোরো না, আমি ঘুমুবো।

শুনিয়ে মেমসাব, গোঁসা মাৎ কিজীয়ে—

ভেতর থেকে সাড়া এলো, চুপ রও, মঁয় নিদ্ যাউঙ্গা।

হতাশ হয়ে রামরূপ দরজার চৌকাঠে মাথা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে ফের ডাকলে, মেমসাব!

ভেতর থেকে ধমক এলো চোপ্।

বেচারী দরজার সামনে বসে পড়লো। তার চোখ ফেটে জল এসে গেছে।

ঘরের ভেতর গৌরীও ছটফট করছে। সমীরের বাসার দিকের জানলাটা একবার খুলে আবার জোর করে বন্ধ করে দিলে। বহুবার পড়া একখানা বাংলা নভেল নিয়ে জোর করে পড়তে চেষ্টা করলে। নভেলখানার নাম ক্লিওপেট্রা। হঠাৎ বইটার মাঝখানের একটা পাতায় মন লেগে গেল, কিন্তু তবুও সে আনমনা। এক-একবার বন্ধ দরজার দিকে চেয়ে দেখছে, রামরূপ কি এখনও ওখানে আছে! গৌরী কি নিজে ক্লিওপেট্রা না কি? রামরূপ কি তার ক্রীতদাস? আর সমীর কি এণ্টনী, না সিজার? কিন্তু এই চিন্তার মধ্যে সদাশিবের কথা গৌরীর মনেও পড়লো না। বেচারী সদাশিব তখন অফিসে বসে কলম পিষছে, মাসকাবারী মাইনে তার চাই, সংসার চলাতে হবে, গৌরীর জন্য ওষুধ কিনতে হবে।

ছিটকানী খুলে গৌরী দরজার একখানা কপাট অল্প খুলেই দেখতে পেলে রামরূপ চৌকাঠের পাশে বসে আছে। খুব গম্ভীরভাবে রাণীর মত হুকুমের ভঙ্গিতে সে বললে, ভিতর আও।

রামরূপ বসে বসেই করুণ নেত্রে গৌরীর মুখের দিকে

দেখতে লাগলো। তার ওঠবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

আও, গৌরী জোর করে ডাক দিলে।

রামরূপ নীরব।

গৌরী হেঁট হয়ে অনেকটা যত্নে ও কিছুটা ক্রোধভরে রামরূপের হাত ধরে টানলে। রামরূপ নীরবে উঠে দাঁড়ালো ও গৌরীর পিছু পিছু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে। সঙ্গে সঙ্গে দরজার ছিট্‌কানীতে খুট করে বন্ধ করার শব্দ হোল।

এর পর পাঁচ মিনিটকাল পার হয়েছে কিনা ঠিক নেই, হঠাৎ বাইরের দরজায় কে যেন ধীরে ধীরে ঘা দিলে। গৌরী উৎকর্ণ হয়ে শুনলে, তারপর সাড়া দিলে, কে ?

রামরূপ নিঃশব্দে ঘরের ছিটকানী খুলে বাইরের উঠানে এসে দাঁড়ালো। গৌরী ঘর থেকেই জানলা খুলে দেখবার চেষ্টা করবে কি না ভেবে জানলার ছিটকানীতে হাত দিয়েই আবার দৌড়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে খুব শোরগোল করে রামরূপকে ডাকতে সুরু করে দিলে।

ডাক শুনে রামরূপ বাইরে থেকে চীৎকার করে সাড়া দিলে, কেয়া মাইজী।

ভয় পেয়ে সেও বোধহয় মেমসাব বলতে ভুলে গিয়ে মাইজী বলে ফেলল।

গৌরী তাকে দরজা খুলে কে এসেছে দেখবার জন্য ফরমাস করলে, যেন রামরূপ জানেই না, দরজায় কেউ ঘা দিচ্ছে কি না ?

রামরূপ ও ঘরের দরজা খুলে বাইরে এসে দেখে তারই তাসখেলার বন্ধু হর্ষলাল এই পথ দিয়ে তাদের আড্ডায় যাওয়ার সময় দরজায় ঘা দিয়ে খবর নিচ্ছে, রামরূপের যেতে কত দেরী, কারণ গতকাল রামরূপের অন্যায়রকম দেরী হওয়ার জন্য তাদের মধ্যাহ্নিক খেলার নিতান্তই রসভঙ্গ হয়েছিল।

রামরূপ হর্ষলালকে কি যেন বলে তাড়িয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে নিতান্ত অপরাধীর মত ধীরে ধীরে আবার মেমসাবের ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো।

গৌরী আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে শুয়ে কিছুটা অনুমান করেই বুঝতে পেরেছিল। এখন রামরূপের কাছ থেকে সবটা শুনে একটু রাগতস্বরে বললে, খবরদার, তাদের বারণ করে দিও, যেন ওরা এভাবে যখন তখন এসে বিরক্ত না করে, বুঝলে ?

রামরূপ বললে, জী—মেমসাব। এরও প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে যেন মনে হোল জুতোপরা কে একজন এদের রোয়াক থেকে লাফিয়ে পড়ে দ্রুতবেগে নীরোদবাবুদের বাড়ীর উল্টোদিকে চলে গেল। ভীত বিরক্ত গৌরী একটু অপেক্ষা করে এবার নিজে গিয়ে ও-দিকের ঘরের দরজা খুলে নেপথ্যগামী ব্যক্তির গতিপথের দিকে চেয়ে কাউকেই দেখতে পেল না, নীরোদবাবুদের বাড়ীর দিকে চেয়ে দেখতে পেলে, নীরোদবাবুর পুত্রবধূ মুখ কালো করে এদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাশে আছে তার চাকর। গৌরী বিরক্ত হয়ে দরজা বন্ধ করে ঘরে এসে ঢুকলো।

[ক্রমশঃ

বিশ্ব বীক্ষণ

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আমার নিজের ঘরে বসে আমি ভাবছিলাম—

প্রায় দীর্ঘ দুই দশকের ব্যবধানে কি বিশাল উন্নতি হয়েছে এই টোরন্টোর। ১৯৪৮ সালে সহরের মধ্য দিয়ে সুড়ঙ্গ ছিল না। মহানগরীর আধুনিকতার মানদণ্ডে এটা যে অতি প্রয়োজনীয় এ কথা অনস্বীকার্য্য। তাই তাঁরা মাটীর তলায় ট্রাম যাতায়াতের সুড়ঙ্গ নির্মাণ সুরু করেন বিংশশতাব্দীর পঞ্চম দশকে। এঁরা এক্সপ্রেস-ওয়ে নির্মাণে লেগে গেছেন। কানাডার বৃহত্তম নগরী হ'ল মন্ট্রিয়ান কিন্তু আধুনিকতার মানদণ্ডে টোরন্টো। এটা অন্টারিও হ্রদের তটে অবস্থিত। এটা সেন্ট লরেন্স শী-ওয়ের সঙ্গে যুক্ত এবং মন্ট্রিয়লও।

আমি ঘর থেকে নেমে এসে টেলিফোন বুথ থেকে ডিরেক্টরী দেখে 'টম ওয়াং'-এর বাড়ীতে টেলিফোন করলাম। কেন না শনিবারে আজ অফিস বন্ধ থাকার কথা।

টেলিফোন ধরলেন এক ভদ্রমহিলা।

আমি বললাম আমি মিঃ চ্যাটার্জ্জি ভারতবর্ষ থেকে আসছি। টম আমার সহধ্যায়ী ছিল। তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।

—তিনি তো বাড়ী নেই। অফিসে গেছেন।

—সে কি? আজ তো এখানে ছুটির দিন।

—তিনি বিশেষ কাজে মিনিট দশেক হ'ল বেরিয়েছেন আপনি মিনিট দশেক পরে তাঁকে অফিসে পাবেন।

—আমি কি জানতে পারি আমি কার সাথে কথা কইছি।

—আমি মিসেস ওয়াং।

—শুভ অপরাহ্ন। বড় আনন্দিত হ'লাম আপনার সঙ্গে কথা ক'য়ে।

—আমিও টমের কাছে আপনার কথা আগে শুনেছি।

—হয়তো দেখা হবে হয় এখানে, নয় আমাদের দেশেও হতে পারে।

টম ওয়াং একটী জাপানী কেনেডিয়ান। মাথায় ছোট। ওর একটী বোন প্রায় বিশ বছর আগে টোরন্টোয় পড়াশুনা করত। থাকতো দুজনে দু'জায়গায়। টমের থিসিস্ টাইপ ক'রে দিয়েছিল, আগের কয়েক বৎসরের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কারবণ দিয়ে, অনেকগুলে কপি টাইপ ক'রে তার এককপি আমাকেও টম্ দিয়েছিল। টমের মতই বেঁটে খাটো চেহারা মেয়েটার। লাজুক লাজুক স্বভাব কিন্তু অতি নম্র ও মিষ্টি।

যাই হ'ক আমি টমকে তার অফিসে টেলিফোন করলাম। সেই-ই টেলিফোন ধরেছিল। যেহেতু তার নিজের Consulting Engineering অফিস, তাই শনিবার তাকে পেলাম। সে গলা থেকে আশ্চর্য চিনতে পেরেছিল। আমারও তার পরিচিত গলা চিনতে অসুবিধে হয়নি। আমি বললাম—নিশ্চয় টম্ কথা কইছ। গতকাল রাতে কেণ শার্পের বাড়ীতে এসেছিলাম। আজ এখন YMCA-তে আছি। সকালে ডাঃ বেরীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হ'ল। তোমার সঙ্গে কোন সংযোগ স্থাপন করতে পারেনি 'কেণ', তাই আমিই

টেলিফোন ডাইরেক্টরী দেখে তোমার নাম খুঁজে বের করলাম। আগেই শ্রীমতীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। তুমি বিয়ে করলে কবে?

—হ্যালো মিঃ চ্যাটার্জ্জি, তোমার গলা শুনেই চিনেছি। কদিন থাকবে? কি জন্যে এসেছ? বিয়ের কথা বলছিলে সে তো অনেকদিন হ'ল—তিনটী ছেলেমেয়ে এখন।

—এমনি, পরিদর্শন ব্যাপারে। মঙ্গলবার ভোরের প্লেনে বষ্টনে চলে যাব।

—আজকের প্রোগ্রাম কি?

—বিশেষ কিছু নয়, শুধু ব'সে থাকা—নয় বেড়ানো। বিশ্ববিদ্যালয় তো বন্ধ।

—আমার কাজ সেরে যদি আমি যাই তুমি তো থাকবে? তোমায় আমার সাথে রাতের ডিনারে যেতে হবে।

—আমি তোমাদেরই উপর নির্ভর করে আছি। অতি সুবোধের মত কাজ ক'রে যাব। তোমার আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ।

—এ তোমার দয়া মিঃ চ্যাটার্জ্জী।

—দয়া নয়, এ ভালবাসা।

ঠিক বলেছ। আমি ছ'টা নাগাদ আসছি।

—আমি লাউঞ্জে তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

সে এল তখন বিকেল ছ'টা। উভয়ে করমর্দন ও দুজনে হাস্যবিনিময় ক'রে আমরা একটা সোফায় বসলাম। টম শুরু করলে—তোমায় দেখে বেশ ফিট্ মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে বছর দশেক বয়স কমিয়ে ফেলেছ।

—প্রায় বিশ বছর বাদে দেখা। অর্থাৎ আমার মোটমাট দশ বছর বয়স বেড়েছে। কুড়ি বছর বেড়েছিল তার থেকে দশ বছর তোমার মতে কমেছে। মোট বিয়োগফল দাঁড়াল দশ বছর। কিন্তু আশ্চর্য, তোমার কোন পরিবর্তন একেবারেই লক্ষ্য করছি না। প্লাঙ্কের ধ্রুবাঙ্কের (Planck's coastant) মত বয়সটাকে থামিয়ে রেখেছ সময়ের স্রোতের বেগের বিরুদ্ধে। পেনিলোপী বা উর্ব্বশীর মত।

—দেখ, দু'একটা চুল পেকেছে মাত্র।

—আগে ছিল কিনা তার প্রমাণ দিতে পার?

এখানে আসার উদ্দেশ্য তাকে বললাম আর জিগ্যেস্ করলাম—

জীবনের এতদিন কি করলে?

—কিছুদিন চাকরী করেছিলাম এখন চাকরী ছেড়ে দিয়ে নিজে ব্যাবসা করছি। পরের জন্য খেটে কি হবে?

—কিসের ব্যবসা?

—ঠিকেদারী ও কনসালটিং প্রাকটিস্।

খুবই ভাল। চাকরীতে সীমিত আয়। তার উপর বাজার ভালমন্দ আছে। এখানে পরিশ্রম ও সুযোগ পেলে তোমার ব্যবসায় প্রচুর আয় করার সম্ভাবনা রয়েছে।

—আমার ইচ্ছে আগামী বছর আমি ম্যানিলা ও সিঙ্গাপুরে যাব। সেই সময় তোমাদের দেশ ঘুরে আসব।

—এলে অত্যন্ত আনন্দিত হব। সে কদিন তুমি আমার অতিথি হবে, বুঝলে। তোমার স্ত্রীকে একদিন নিয়ে এস। কাল আমি 'ওয়াকিন্‌স'র, (walkinshaw) বাড়ীতে যাব। ওদের ওখানে সারাদিনের প্রোগ্রাম। সোমবার টোরণ্টো মেট্রোসংস্থার সঙ্গে আলাপ আলোচনা ও সারাদিনব্যাপী পরিদর্শন। মঙ্গলবার ভোরে বষ্টনের বিমান ধ'রে রওনা। প্রোফেসর ম্যাকিননের সঙ্গে রবিবার সকালেই দেখা করতে যাবো। আর ওয়াকিন্‌স (Walkinshaw) আসবে আমায় নিয়ে যেতে তাদের বাড়ী। সোমবার তোমায় খবর দেখো। আমরা দুজনে উঠলাম একটা চীনে হোটেলের সন্ধানে। আমরা এশীয়বাসী। জিবের তারের উপর আমাদের ঝোঁক বেশী। এক জায়গায় গাড়ী রেখে চললাম হেঁটে একটা হোটেলে। সেখানে চীনে ধরণে রান্না 'চপস্টীক কাঠী' দিয়ে খাবার চেষ্টা করে বিফল মনোরথ হলাম। বিলিতি কায়দায় বিদেশে চীনা রান্নার স্বাদ গ্রহণে বাধ্য হলাম।

নৈশ ভোজ শেষ ক'রে আমরা Yতে ফিরে এলাম। তারপর স্মৃতির রোমন্থন চলল। কবে ওয়াং বিয়ে করল। কোথায় বিয়ে করল। ওরা তো জাপানী কেনেডিয়ান ও'র বোনের কোথা বিয়ে হ'ল, ওর বাবা মা কেমন আছেন? তার কনসালটিং ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ফার্ম কেমন চল্‌ছে? নতুন মহাদেশের বাইরে সে যেতে চায় কিনা? এমনি কথায় কথায় রাত দশটা পেরিয়ে গেল। সে তখন বিদায় নিয়ে গেল। আর বলে গেল সে সন্ধ্যায় সস্ত্রীক

আসতে চেষ্টা করবে। আমাদের কথাবার্তা টেপ রেকর্ড করা হ'ল।

রবিবার ভোরবেলা নীচে নেমে দেখি ওয়াকিনশ আমার একটা টেলিফোনে সংবাদ দিয়েছে যে সকাল সাড়ে ন'টার সময় নিতে আসবে। সংবাদটি নীচে জানবার আগে আমি অধ্যাপক ম্যাক্কিনন-কে টেলিফোন করলাম। মতলব ছিল ওয়াকিনশ'র সঙ্গে যাবার সময় তাঁকে তাঁর বাড়ীতে দেখে যাব। তিনি শুনে বলেন আমিই এখুনি আসছি, তোমার আসতে হবে না। 'ওয়াকিনশ'র বাড়ীতে টেলিফোন করতে ওয়াকিনশ'র মেয়ে বলল যে ড্যাডি বেরিয়ে গেছে।

তার মানে সে এখানে এল ব'লে। মিনিট দশেক বাদে দেখি ওয়াকিনশ এসে হাজির। একটু রোগা হ'য়ে গেছে সে। চুলে একটু পাক ধরেছে। দুজনে হাসিমুখে করমর্দন ক'রে বসলাম। ওয়াকিনশও আমার স্নাতকোত্তর ক্লাসের সহপাঠী কিন্তু স্নাতক ক্লাসের সে ছিল অধ্যাপকও। আমাদের আলাপ শুরু হয়েছে এমন সময় অধ্যাপক ম্যাক্কিনন এসে হাজির। আমি কত যে খুশী হয়েছিলাম তা' ভাষায় ব্যক্ত করা যাবে না। ইনি হলেন সেই প্রাচীন যুগের আদর্শ অধ্যাপক। ছাত্রদের কত নিবিড় স্নেহ ও কত গভীর প্রীতি দিয়ে মুগ্ধ করতেন সেকথা স্মরণ করলে বিস্ময়ে অবাক হ'তে হয়। প্রায় বিশ বছর আগে আমার একজামিনের খাতায় ভাবের বশে কী যে লিখেছিলাম তা আজ দীর্ঘ দিনের ব্যবধানেও বিস্মৃত হ'ন নি তিনি। তিনি বাড়ীর খবরাখবর নিলেন ও তাঁর খবরাখবর দিলেন। তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন। এখন তিনি কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তিনি আর কারুর সঙ্গে চিঠিপত্র লেখেন না। একটি মেয়ে ডাক্তার হয়েছে; তারই সঙ্গে বৃদ্ধ বাবা থাকেন। তার আজও বিয়ে হয়নি বা সে বিয়ে করেনি। তাই হয়তো বাপকে রাখে।

আমায় বললেন তুমি লিখেছিলে Sickness is the murderer of meriment in human life।' সত্যিই তাই আজও সে কথা আমার মনে আছে। তুমি বলেছিলে যে তুমি Dr. Snowর লেখা বইটা অনুবাদ করবে বাংলা ভাষায়। সেটার কতদূর কি হল? আমি বললাম, খানিকটা অনুবাদ ক'রে ছাপানোও হয়েছে। তবে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। এই সব আলোচনায় আমাদের বেলা গড়িয়ে প্রায় ১১৷৹ হ'ল, তখন তিনি বললেন, 'তুমি walkinshaw এর পরিবারের মধ্যে যাচ্ছ, সেখানে তুমি নিশ্চয় খাবে। আমি আর তোমাদের দেরী করিয়ে দেবো না।'

—সেখানে গিয়েও তো গল্প করা। আপনার সঙ্গে কথা ক'য়ে বহু জ্ঞান পাওয়া যায় ও বড় ভাল লাগে।

—ডাঃ চ্যাটার্জি, 'ওয়াকিনশ' পরিবারে গেলেও তুমি এখানের বহু কথা জানতে পারবে, যা আমি জানিনা।

স্যার, সেটা মুখ্য কথা নয়।

শ্রীমতী ওয়াকিনকে আমি দেখে গিয়েছিলাম। তখন ছেলের প্রায়ই ইনজেকশন চলতো। এখন সবাই তারা কে কেমন আছেন? কত বড় হ'ল ছেলে মেয়েরা?

—আমি আর তোমাদের দেরী করিয়ে দেবো না। আমি এখন আসি। ম্যাক্ ওয়াকিনশ ও আমি অধ্যাপক ম্যাক্কিননকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে ফিরে এসে সামান্য সময় ব'সে ওয়াকিনশ'র গাড়ীতে তাদের বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। পথে এক জায়গায় দেখি যে একটা রেলের সেতু রাস্তার উপর দিয়ে চলেছে। সেটা সুড়ঙ্গের মত। আমাদের ধারণা সুড়ঙ্গ হয় মাটীর তলায়, নয় জলের তলায়। হাওয়ার ভেতরেও যে সুড়ঙ্গ হয় এটা জানা ছিল না। ঐটা দেখিয়ে তাকে জিগেস করলাম—'ব্যাপারখানা কি?'

—সামনেই দেখছ বহুতল বাসভবন। রেল এখান দিয়ে পরে গেছে। তাই অধিবাসীরা দাবী জানালো যে লোহার ব্রীজের উপর দিয়ে গাড়ী গেলে যে আওয়াজ হবে, তা' তারা সইবে না। অতএব সেতুর উপর দিয়ে যাবার সময় যাতে আওয়াজ না হয় তারই জন্য এই সুড়ঙ্গের ব্যবস্থা।

—যাই হ'ক জিনিষটা কিন্তু নতুন ধরণের ও ভালই দেখতে হয়েছে।

সহরের প্রায় উপকণ্ঠে প্রাকৃতিক বৃক্ষলতা গুল্মের শ্যামল পরিবেশে তার এই নতুন বাড়ী। শ্রীমতী ওয়াকিনশ'র সঙ্গে আলাপ হ'ল। তাঁর স্মৃতি প্রায় দীর্ঘ দু'দশকের ব্যবধানেও আমি ভুলিনি। একদিন কেণ শার্পের মেয়ে-বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণে এসে শ্রীমতী উপরে চ'লে গেলেন মেয়েটীর রুগ্ন মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। যখন ফিরে

এলেন, তখন ঘন ঘন সিগারেট খচ্ছেন। যখনই নিভে যাচ্ছে, তখনই ম্যাক্ দেশলাই জেলে সিগারেট ধরিয়ে দিচ্ছে। মেয়েদের নিত্য প্রশ্ন সংসারের খুঁটিনাটি সব জিগ্যেস ক'রে নেওয়া।

আমি প্রশ্ন করলাম—ম্যাক তুমি তো টোরন্টোর রয়েছ বহুদিন ধ'রে। আমায় একটু বুঝিয়ে বলবে এখানের কী রকম উন্নতি হয়েছে।

—নিশ্চয়ই। উন্নতি যে বিশাল হয়েছে তার প্রমাণ আমরা নিজের চোখেই দেখে এলাম। মেট্রোপলিটান টোরন্টোর বর্তমান জনসংখ্যা ষোল লক্ষ। প্রধান দুঃসাহসিক ব্যাপারটা ঘটেছে নগরীর কেন্দ্রে সেটাকে বস্তি অঞ্চল বলা চলে। সেটীকে পুনর্বাসন (Redevelopment) করা হয়েছে। সেটা হ'ল কুইন ষ্ট্রীট ও জেরাড ষ্ট্রীট, ওদিকে ব্লু ষ্ট্রীট ও পার্লামেণ্ট ষ্ট্রীট দিয়ে ঘেরা অঞ্চল।

স্থপতি ম্যাকলরেণ নতুন এক ডিজাইন দিয়েছিলেন বহুতল বসত বাড়ী বিন্যাসের। সেটাকে 'রিজেণ্ট পার্ক' বলা হয়। সুড়ঙ্গ পথ তৈরি ক'রে পরিবহন পর্ব সহজ করা হয়েছে নতুন পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ রাস্তা দিয়ে, যাকে এখানে East West Link বলা হয়।

—তুমি যে আমায় নিয়ে গেলে ঐ সব বহুতল বাড়ীতে যার একটায় তোমার ছেলে ও বৌ থাকে সেগুলো কি সরকারী প্রচেষ্টায়, না ইনসিওরেন্স কোম্পানী, না কোন প্রতিষ্ঠান, না কোন বাড়ীর ব্যবসায়ী কোম্পানী ওগুলো তৈরী করেছে?

—রিজেণ্ট পার্কে যা গৃহনির্মাণের বিপুল সমারোহ দেখলে সেটা হ'ল Federal Provincial যৌথ প্রচেষ্টা। এখানে বাড়ীগুলো ভাড়া দেওয়া হয়। ভাড়া আদায় করার সরকারী ব্যবস্থা আছে। তেমনি লিফট্ চালানোর ব্যবস্থা, জল সরবরাহের (যদিও সহরের জলকল থেকে) ব্যবস্থা, সামনের প্রাঙ্গণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা প্রভৃতি যৌথ ব্যবস্থা তারা করবে।

'মেট্রোপলিটান টোরন্টো'র ভেতর দিয়ে কয়েকটা ছোট নদী ব'য়ে গিয়ে পড়েছে অন্টারিও হ্রদে। নদীর খাতের নিকটে দুপাশের জমি বাসের অনুপযোগী। তাই ডন উপত্যকার বেশ খানিকটা অঞ্চল নিয়ে 'এডওয়ার্ডস্ গার্ডেন, সিরিণা গুণ্ডী পার্ক, উইলকেট ক্রীক্ পার্ক, ডেণ্টোনিয়া পার্ক, টেলার ক্রীক পার্ক, ডন ভ্যালী গল্ফ কোর্স' গ'ড়ে উঠেছে। তেমনি মুখ্য হাম্বার নদীর অকরেখার দুধারে 'হাম্বার ভ্যালী গল্ফ কোর্স', জেমস্ গার্ডেন,
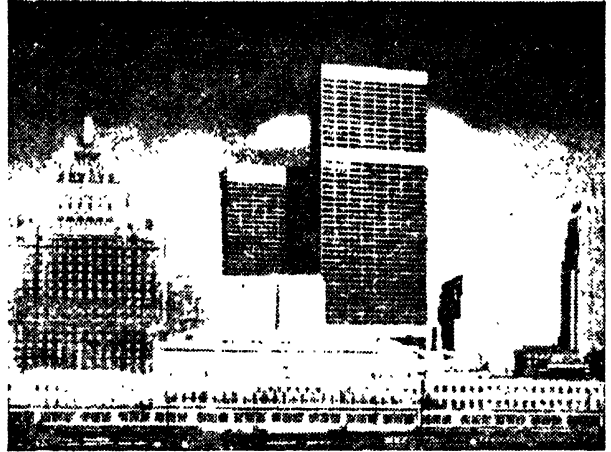
ডোমিনিয়ান্ সেণ্টার, টোরন্টো

ইটনী ব্রুক পার্ক প্রভৃতি গড়ে উঠেছে। এই নাবাল জমির একটু উঁচুতে মানব বসতি অঞ্চল। তারও মাঝে মাঝে রেল লাইনের ধার ঘেঁসে শিল্পাঞ্চলের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

এই 'ডন উপত্যকা' উন্নয়ন প্রকল্পের স্থপতি ও পরিকল্পনিক হ'লেন ই, জি, ফলুটী। এখানের সবচেয়ে দুঃসাহসিক স্থাপত্যের বিকাশ সার্থক হয়েছে মেট্রোপলিটান টোরন্টো সিটি (city hall) হলে। কাল সকালে তুমি যখন ওখানে যাবে, দেখতে পাবে যেন দুটী ঝিনুক জোড়া হ'য়ে মুখামুখি দাঁড়িয়ে। এই পরিকল্পনার বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। সন্দেহ হয় যে প্রবল ঝড়ের সময় এই গঠনের উপর কি প্রভাব হবে সেটা বায়ুসুড়ঙ্গের ভেতর এই মডেল রেখে নানা বেগে ঝড়ের তুফান তোলা হয় ও দেখা হয় এটা নিরাপদ গঠন কি না। আমার বিশ্বাস কাল যখন তুমি ওদের ওখানে যাবে তখন দেখে মুগ্ধ হবে একথা বলতে পারি। তবে এতে কিছু অসুবিধাও আছে। যেহেতু এটার বাইরের দিক ঝিনুকের খোলার মত বাঁকা, তাই ঘরগুলি সব চতুষ্কোণ না হ'য়ে কোণাচে। ফলে সমস্ত মেঝেটা কাজে লাগানো যায় না।

—ঠিক আছে, কাল সকালে দেখাই যাবে ঐ জোড়া

ঝিনুকের খোলার আকৃতির বিরাট অট্টালিকা, তার মধ্যে সন্ধান ক'রে দেখব, ভেতরে কোন মুক্তা মেলে কি না? ১৯৬৫ সালের শরৎকালে এটার দ্বার উদ্ঘাটন করা হয়।

"টোরেন্টো সিটি হল"

এটা চারটী উপাংশে বিভক্ত।

১। নাথান ফিলিপস্ স্কোয়ার। দি পোডিয়াম (The Podium), কাউন্সিল চেম্বার ও টাওয়ার। এটা তৈরী করতে সাড়ে চব্বিশ লক্ষ ঘন ফুট কংক্রীট, ৯,০০০ টন ইস্পাত, ৯৪,০০০ বর্গ ফুট কাঁচের প্লেট, ১০০ মাইল পাইপ ও ১০ লক্ষ ফুট ইলেকট্রিকের তার লেগেছে।

এখানে ব্যবহার করার উপযোগী ৮,১৬,৯০০ বর্গ ফুট স্থান আছে। এখানেই ২৬৮০ জন পৌরকর্মী কাজ করে। এর নির্মাণ কার্য্য শুরু হয় ৭ই নভেম্বর ১৯৬০ ও শেষ হয় ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে।

'নাথান ফিলিপস্ স্কোয়ারে'র নাম হয়েছে দীর্ঘ দিন টোরন্টোর বিশিষ্ট মেয়র নাথান্ ফিলিপসের নামে। তাঁর সময়ে টোরন্টোর বহু উন্নতি দেখা গিয়েছিল। এটী ১২৩ একর জমির উপর বিন্যস্ত। এর মধ্যে 'প্রতিফলন দীঘি'র (৮২ ফুট লম্বা ও ৯০ ফুট চওড়া) জলে টাওয়ারের লম্বা লম্বা থামগুলো প্রতিফলিত হ'য়ে মায়াময় রূপ সৃষ্টি ক'রে দর্শককে আনন্দ দেয়। এই উদ্যানের ফোয়ারা দিয়ে মিনিটে ১১,০০০ গেলন জল উপরে উর্দ্ধধারায় উৎক্ষিপ্ত হয়।

টোরন্টোর পৌরভবন ও মেট্রোপলিটন আদালত।

তলায় তিন তলা মোটর পার্ক করার ব্যবস্থা আছে যেখানে আড়াই হাজার মোটর গাড়ি রাখা যায়।

দুই ঝিনুকের খোলার মত গঠনের কেন্দ্রে রয়েছে গোল ১৫৫ ফুট ব্যাসের কাউন্সিল চেম্বার। সেটা ২০ ফুট ব্যাসের থামের উপর বসানো। সেই কেন্দ্রের ২০ ফুট ব্যাসের থামটী ১৭ইঞ্চি মোটা সিমেন্ট কংক্রীটের ঢালাইয়ের দেওয়াল দিয়ে তৈরি, যার উপর ৪০ ফুট উঁচুতে একটী গম্বুজাকৃতি ছাদ। দেখতে মনে হবে যেন বৃহৎ পদ্ম ডাঁটার উপর পাপড়িফেলা পদ্মবীজের আধ'বটীর মত। এখানে ৩০০জন লোক বসতে পারে পৌরসভার আলোচনায় যোগ দিতে। পুরু কার্পেট দিয়ে মোড়া এই 'হল'।

দুটী ঝিনুকের খোলার মত চেহারার পূর্বদিকের গঠনটী ৩২৬ ফুট ৬'' ইঞ্চি উঁচু। এটী ২৭ তলা বাড়ী আর পশ্চিমের ২০ তলা বাড়ীটী ২৬০ফুট ৬ ইঞ্চি উঁচু। এই বাড়ীটার স্থপতি হ'লেন হেলসিঙ্কির স্বর্গত প্রখ্যাত স্থপতি ভিলো রেভেল (Viljo Revell ও তাঁর সহকর্মীরা। এই পরিকল্পনাটী বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে। এটা নির্মাণের ব্যয় পড়েছে দু'কোটী সত্তর লক্ষ ডলারের কিছু বেশী।

এই 'সিটি হলে'র উদ্বোধনী উপলক্ষে মেয়রের ভাষণ সত্যিই প্রণিধানযোগ্য।

"The completion of the New City Hall and Nathan Phillips Square in the fall of the year 1965 is an epoch-making event in city's history.

The design is inspiring and imaginative and represents a contemporaay architechture in its best form.

Viljo Revell unknowingly designed his own memorial to the world, a lasting tribute to his genins and Visions.

এই গঠনটীকে উন্নয়নশীল নগরীর এক নাটকীয় অভিব্যক্তি ব'লে উল্লেখ করা যেতে পারে।

টোরন্টোর কথা একটু বিশেষভাবে বলার আমার কিছু দুর্বলতা আছে। কেন না বিশ বছর আগে ওখানে আমি স্নাতকোত্তর শিক্ষা লাভ করি। কবি কালিদাসের

উজ্জয়িনীর বর্ণনার সুযোগ পেলে যে ন সে বর্ণনা শেষ হ'তে চায় না যার উদাহরণ আমরা 'মেঘদূতম্'-এ পাই।

ইতিহাস।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজনৈতিক কারণে ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ইয়র্ক নগর স্থাপিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র থেকে রাজভক্তেরা চ'লে আসতে সুরু করেন। ইংলণ্ড ও ইউরোপ থেকে লোক উপনিবেশ স্থাপন করতে আসেন। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মার্চ টোরণ্টো নগরী আইন অনুসারে স্থাপিত হয়। ১৮৩৪ থেকে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নগরীর সীমানা অপরিবর্তিত থাকে। ১৮৮৩ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত সংলগ্ন অঞ্চলগুলির কিছু এর সঙ্গে সংযুক্ত হ'তে থাকে।

নানা ছোট ছোট উপনগরীগুলিতে জনসংখ্যার চাপ বাড়াতে উপযুক্ত নাগরিক সেবাক্রম প্রসারিত করায় মহা অসুবিধা দেখা যায়। কিছু উন্নতি করার জন্য এদের উপায় ধার করার ক্ষমতা কম অন্টারিও হ্রদের সঙ্গে সংযোগ না থাকায় পানীয় জল নলকূপ থেকে সংগ্রহ করতে হয়; ময়লা পরিশোধন 'সেপটিক ট্যাঙ্ক' বা ছোট নদীতে ফেলে দেওয়া, আরও বিদ্যালয়ের দাবী মেটানো ও অন্যান্য নাগরিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া অসম্ভব হওয়ায় এক নবতম পরিকল্পনা নেওয়া হয়, যাতে অন্টারিও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের সভাপতি লর্ণ, আর, কামিং Q. C. টোরণ্টোর সংলগ্ন পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলির একীকরণের প্রতিবাদ ও আপত্তি শোনার পর সংযুক্ত মেট্রোপলিটান পৌর সরকার স্থাপনের সুপারিশ করেন (Establishment of a Federated Metropolitan Government) এটা ১৯৫৩ সালের ১৫ই এপ্রিল অন্তর্ভুক্ত হয়। মেট্রোপলিট্যান কাউন্সিল্ ১৯১৪ সালের ১লা জানুয়ারী, প্রথম অধিবেশনে বসেন।

প্রগতির কি ধারায় এই পৌর সরকার শতবর্ষের ব্যবধানে গড়ে উঠেছিল তারই একটা সচিত্র তালিকা দেওয়া হ'ল।

স্থাপনের কাল

1867	1	Original Townsite (1793)
	2	City of Toronto (1834)
	3	Township York (1850)
	4	Township Etobicoke (1850)
	5	Township Scarborough (1850)
	6	Village of York Ville (1853)
1914	1	City of Toronto
	2	Township of York
	3	Township of Etobicoke
	4	Township of Scarborough
	5	Village of Weston (1881)
	6	Village Mimico (1911)
	7	Village of New Torronto (1913)
	8	Town of Leaside (1913)
1953	1	City of Toronto
	2	Township of York
	3	Township of Etobicoke
	4	Township of Scarborough
	5	Township of Weston
	6	Township of Mimico
	7	Township of New Toronto
	8	Township of Leaside
	9	Township of North York (1922)
	10	Village of Forest Hill (1923)
	11	Township of East York (1924)
	12	Village of Swansea (1925)
	13	Village Long Branch (1930)
1967	1	City of Toronto
	2	Borough of York
	3	Borough of Etobicoke
	4	Borough of Scarborough
	5	Borough of North York
	6	Borough of East York

এই সংস্থাটীতে মেট্রোপলিটান টোরণ্টো পৌর সরকার অন্যতম।

মেট্রোপলিটান কাউন্সিল্ এক্সিকিউটীভ কমিটি ছাড়াও আরও পাঁচটি কমিটি এঁদের আছে। যেমন—

(১) Parks and Recreation Committee
(২) Legislation and Planning Committee
(৩) Transportation Committee
(৪) Welfare and Housing Committee
(৫) Works Committee

মহানগরী উন্নয়ন সংস্থা পৌরসংস্থার করণীয় কাজের বৃহত্তম অংশ ও কয়েকটী সম্পূর্ণ পৃথক কাজের ভার নিয়েছেন। বর্তমানে মহানগরী সংস্থার করণীয় কাজ হ'ল নিম্নলিখিত বিষয়ে। যথা—

১। অর্থ ও কর
২। পরিকল্পনা
৩। আমোদ-প্রমোদ ও জনসেবা
৪। রাস্তা প্রস্তুত ও মেরামত
৫। যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ
৬। গণ পরিবহন
৭। পানীয় জল সরবরাহ
৮। ময়লা জল নিষ্কাশন
৯। আবর্জনা তোলা ও নিষ্পত্তি
১০। বায়ুদূষণ
১১। জনগণের শিক্ষা
১২। গৃহনির্মাণ
১৩। মঙ্গল বিধান
১৪। স্বাস্থ্য
১৫। পুলিশ ও দমকল
১৬। ন্যায়করণ পরিচালনা (সম্পূর্ণ দায়িত্ব)
১৭। লাইসেন্স দেওয়া ও নিরীক্ষা
১৮। অসামরিক প্রতিরক্ষা (সম্পূর্ণ দায়িত্ব)
১৯। অন্যান্য পৌরকার্য

উপরোক্ত দুটী পূর্ণদায়িত্বভার নেওয়ার বিষয় ছাড়া মহানগরী সংস্থা ও পৌরপ্রতিষ্ঠান দুদলেই কাজ করেন যেমন পানীয় জল সরবরাহের বেলা জল আহরণ, পরিশোধন, পাম্প করা ও বৃহৎ নলে পাঠানো মহানগরীর করণীয় কাজ। তারপর মুখ্য নল থেকে ছোট রাস্তার বেলা এক্সপ্রেস ওয়ে ও মুখ্য রাস্তা (Arterial Road) প্রস্তুত ও মেরামত মহানগরীর দায়িত্ব, স্থানীয় রাস্তা নয়। সেতু নির্মাণ, তুষার অপসারণ, রাস্তা পরিষ্কারের কাজের দায়িত্ব, পৌর প্রতিষ্ঠানের। ফুটপাথ তৈরি একক পৌর প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব। পুলিশের কাজের পূর্ণ দায়িত্ব মহানগরী সংস্থার কিন্তু অগ্নিনির্বাপণ ব্যাপারটী সম্পূর্ণ পৌরসভার।

জনসংখ্যা :

মহানগরী টোরণ্টোর বিস্তৃতি ১৯৫৮ সালে ছিল ৮০'৭ বর্গমাইল, বর্তমানে (১৯৬৬) তা' বেড়ে হয়েছে ১০১'৭ বর্গমাইল। সেখানে লোকসংখ্যা ১৪'৮ লক্ষ থেকে বেড়ে বর্তমানে ১৮'৭লক্ষে উঠেছে। সেখানে প্রতিবর্গমাইলভূমিতে জনগণের চাপ ১৮,৩০০ থেকে কমে ১৭,৪০০ দাঁড়িয়েছে। এর কারণ প্রায় বিশ বর্গমাইল অর্ধপৌর ও গ্রামীন অঞ্চল নাগরিক অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় ভূমির উপর গড় চাপ কিছু কমেছে। কিন্তু আসলে যেখানে যে লোক ছিল সেখানে চাপ কিছুই কমেনি। এখানে পৌরকর নির্ণয়ের (assessinent) পরিমাণ ১৯৫৪ সালে ২৬৬'২ কোটী ডলার থেকে বেড়ে ১৯৬৬ সালে ৫১০'৮ কোটী ডলার হয়েছে।

পরিবহন :

পরিবহন ব্যাপারে মহানগরী সংস্থা বিশেষ উন্নতি দেখিয়েছে। ১৯৫৩সালের ২৪৪ মাইল মুখ্যরাস্তা বেড়ে ৫৩০ মাইল হয়েছে তার মধ্যে ১৫ মাইল হ'ল সুড়ঙ্গপথ যেখানে বৎসরে 'যান-মাইল' (vehicle mile) ৪'১ কোটী থেকে বেড়ে ৬'৩ কোটীতে দাঁড়িয়েছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে যখন

টোরণ্টোর অফিস পাড়া ও পার্কিংস্থান।

আমি টোরন্টোতে স্নাতকোত্তর ছাত্র, তখন টোরন্টোতে সুড়ঙ্গপথ ছিলনা। কেনেডিয়ানবরা মনে করতো ওরা পৌর উন্নয়ন ব্যাপারে আমেরিকানদের চেয়ে কিছু পশ্চাতে। সে দুর্বলতা আজ তারা কাটিয়ে উঠেছে। এখানে আকাশচুম্বী বাড়ী উঠেছে; একস্‌প্রেস-ওয়ে হয়েছে। বর্তমানে এখানে সাত লক্ষেরও বেশী গাড়ী আছে যাতে গাড়ী পিছু ২'৭ জন লোক দাঁড়ায়। এখানে এখন লাল, কমলা ও সবুজ আলো ৫০০ ছেদ-রাস্তায় দেওয়া হয়েছে। তার সংখ্যা আরও বেড়েই চলেছে। আগে কয়েকটা রাস্তায় মাত্র ছিল।

জলসরবরাহ :

জল সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় চারিটী জল শোধনাগার আছে তার মধ্যে প্রাচীনটী অন্টারিও হ্রদের একটী দ্বীপে অবস্থিত। যেহেতু নগরীর দূষিত জল এই হ্রদেই ফেলতে হবে তাই পানীয় জল সংগ্রহাগারটী একটু দূরে নিকটবর্ত্তী দ্বীপে স্থাপন করলে দূষণের মাত্রা নিশ্চয়ই কিছু কমবে। কিন্তু ক্লোরিণ আবিষ্কার ও জীবাণুনাশনে এর ব্যবহারের পদ্ধতি প্রচুর প্রচলিত হওয়ায় সেদিক থেকে হ্রদকূলে নতুন জলকল স্থাপনের কোন বাধা দেখা যায়নি। এখানে ৩০ কোটী গেলন এমনকি খুব গরমের দিনে ৩৩.৬ কোটী গেলন জল দৈনিক সরবরাহ করা হয়। কলকাতায় সে অনুপাতে মাত্র ১০ কোটী গেলন জল পায়। বর্তমানে (অর্থাৎ জুলাই ১৯৬৭ সাল থেকে) প্রতি হাজার গেলন জলের জন্য ২৫ সেন্ট (অর্থাৎ প্রায় দু'টাকা) মূল্য নির্ধারিত হয়েছে।

ময়লা পরিশোধন :

ময়লা পরিশোধনের মান পূর্বে খুবই নূন ছিল। বর্তমানে এখানের চারিটি ময়লা শোধনাগারের কলেবর বৃদ্ধি ও উন্নয়ন ও নতুন দুটী ময়লাকল স্থাপন করা হয়েছে। আর সেই সঙ্গে ১০০ মাইল মুখ্য ময়লা নলও স্থাপন করা হয়েছে। বায়ু দূষণ নিবারণের জন্য ধোঁয়া সৃষ্টিকারী শিল্পকে লাইসেন্স দেওয়ার ব্যাপারে পরীক্ষা ও নিরীক্ষা ক'রে দেখা হয় যাতে সেখানে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার ক'রে ধোঁয়া উৎপন্ন [illegible] এবং প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় ক্ষতিকর আবহাওয়া সৃষ্টি না করে। তবেই সেই সব ধূম্রোদগারী শিল্পকে লাইসেন্স নেওয়া হয়। বায়ু-দূষণ পরীক্ষার জন্য ৬৮টী স্থায়ী ও ১৩টী অস্থায়ী পরীক্ষাগার স্থাপিত হয়েছে সারা মহানগরীতে।

শিক্ষা :

শিক্ষা ব্যাপারে এঁরা বিশেষ দৃষ্টিবান। ১৯৫৪ সালে ২৩৬টী elementary school থেকে ১৯৬৬ সালে ৩৭৪টী স্কুলে, ৬টী intermediate বিদ্যালয় থেকে ৫১টী বিদ্যালয় ও ৩৫টী secondary বিদ্যালয় থেকে ৮০টী বিদ্যালয় এই বারো বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে। ছাত্রসংখ্যা ১,৮০,০০০ থেকে বারো বছরে ৩,৬১,০০০ হাজারে দাঁড়িয়েছে।

বাসভবন নির্মাণ :

গৃহনির্মাণ ব্যাপারে মুখ্য দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের Ontario Housing Corporation এর উপর ন্যস্ত। এঁরা প্রাদেশিক সরকারের অর্থে যে পরিচালনা পর্ব চালান তার মধ্যে ৯০ ভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে। বাড়ী ভাড়া যে পরিমাণ সস্তা করা হয়েছে তার ব্যয়ভারের শতকরা ৫০ ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার শতকরা ৪২॥ ভাগ প্রাদেশিক সরকার ও শতকরা ৭॥ ভাগ মহানগরী সংস্থা বহন করেন।

মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য Ontario Housing Corporation নামে নতুন সংস্থা স্থাপিত হয়েছে। বৃদ্ধদের জন্য অবসর-ভবন নির্মাণের দায়িত্ব Metropolitan Toronto Housing Corporationকে দেওয়া হয়েছে।

'রীজেন্ট পার্ক নর্থে' প্রথম গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা বস্তি উচ্ছেদের প্রকল্পের অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করা হয়। মেট্রোপলিটন টোরন্টোতে বর্তমানে ৯১,০০৪ সম্পূর্ণ গৃহের সঙ্গে ৬০১৭টী গৃহের নির্মাণ পর্ব চলেছে।

রোগীর সেবাক্রম :

বর্তমানে মহানগরীতে ১৩,০৬৮টী শয্যার হাসপাতাল আছে, সেটী বাড়িয়ে ১৪,৮৭৯ শয্যা করার প্রস্তাব হয়েছে। টোরন্টো বিশ্ববিদ্যালয় ও তার দুটী নতুন কলেজ scarbarough এবং Ermdle অঞ্চলে স্থাপনা করা ছাড়াও

North York নগরীতে ৫০০ একর জমির উপর York বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এ সংবাদ ডঃ বেরী আমায় আগেই দিয়েছিলেন। টোরণ্টো বিশ্ববিদ্যালয় Connught Research Laboratoryতে 'ব্যাণ্টিং' ও 'বেষ্ট' সাহেবের যৌথ প্রচেষ্টায় যুগান্তকারী বহুমূত্রের ঔষধ Insulin আবিষ্কৃত হয়। এই Research Instituteএর সঙ্গে School of Hygieneও যুক্ত। দুটিই একই বাড়ীতে স্থাপিত।

টোরণ্টো বন্দর :

টোরন্টো বন্দরে St. Lawrence Seaway খুলে যাওয়ায় সমুদ্রগামী জাহাজের যাতায়াত সুরু হয়েছে। এখানের আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে মাসে ৫৭০০ বিমান চলাচল করে ও বছরে ১৩৫ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করে। এই বিমান বন্দরে চারটী 'বিমান দৌড়ে'র ফালি আছে। তার মধ্যে দুটীর দৈর্ঘ্য ১০,০০০ ফুট ক'রে। বিমান বন্দরটী নগরীর কেন্দ্র থেকে প্রায় ১৭ মাইল দূরে।

এখানের জনসংখ্যা সমগ্র কানাডার জনসংখ্যার ৯'৪%। শুধু অন্টারিও প্রদেশে সারা কানাডার ৩৪'৮% লোক বসবাস করে। তবে মহানগরীতে মেয়েদের সংখ্যা একটু বেশী। যদিও ভারতীয় শিল্পপ্রধান নগরীতে মেয়েদের সংখ্যা পুরুষের অনুপাতে বিশেষ কম। কেন না ভারতবর্ষে মেহনতী মানুষদের মেয়েরা দেশের গ্রামাঞ্চলেই থাকেন। এখানে ৮২০,০০০ মেয়ে যেখানে পুরুষের সংখ্যা ৭৯৮,৭০০। ফলে মেয়েদের বর জোটানো বিশেষ কঠিন সমস্যার ব্যাপার!

সোমবার সকালে ঘর থেকে নীচে নেমে লাউঞ্জে একটী পাকিস্তানী ছেলের সঙ্গে দেখা। সে এখানে কাজের সন্ধানে এসেছে। কোন লোকজনের সঙ্গে তার চেনা-পরিচয় নেই। ওয়াশিংটন থেকে সে নতুন কাজ পাবার আশায় এখানে হাজির। তার সঙ্গে সামান্য কথাবার্তা বলে প্রাতরাশ সেরে নিলাম। মহানগরী প্রতিষ্ঠানের নবনির্মিত বাড়ী YMCA থেকে মাত্র মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথ, তাই হেঁটেই চ'লে এলাম। এঁরা আমার জন্য একটা বিশদ কর্মসূচী তৈরী করেছেন। এঁদের কাছে 'মেটকাফ এণ্ড এভী' থেকেও পরিচয়পত্র চ'লে গেছে। আমার বন্ধু 'কেণ শার্প' ও রস ক্লার্কের (Ross L, Clark) কাছে যোগাযোগ ক'রে আমার সোমবার অতি বিস্তৃত কার্যসূচী প্রস্তুত করিয়েছেন। সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ পৌরসংস্থার কেন্দ্রীয় অফিসে পৌছে Commissioner of works, Municipality of Metropolitan Toranto সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়। টোরণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিও প্রাক্তন ছাত্র। ডঃ বেরীর কাছে তিনিও পড়েছেন। যাই হ'ক, প্রাথমিক আলোচনা ব্যক্তিগত আলাপ ঘণ্টাখানেক ধ'রে হ'ল। সংবাদপত্রের লোক এসে গিয়েছিল। তারাও আমার কথাবার্তা টেপ-রেকর্ড ক'রে নিল। আমরা মধ্যাহ্ন ভোজের আগে পর্যন্ত টরণ্টোর পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থার বিষয় নানা কার্যক্রম পরিদর্শন করলাম। লাঞ্চে কারা কারা আমার সাথে যাবেন তাও কর্মসূচীতে লেখা। লাঞ্চের পর নতুন ময়লা পরিশোধনাগারের নির্মাণপর্ব ও বর্তমানে যে কয়টী ময়লাকল চলেছে সেগুলিরও পরিদর্শনপর্ব চলবে এই রকম ব্যবস্থা ছিল। আমি বললাম, শহরের পূর্বাঞ্চলের পানীয় জল পরিশোধন কারখানা ও ময়লা পরিশোধনাগারের পরিদর্শন চলুক ও বৈকালে পশ্চিমাঞ্চলে চলুক, যাতে আমাদের গাড়ীতে বেশী না চড়তে হয় ও সেই মূল্যবান সময়টী এই পরিদর্শনে বেশী ব্যয়িত হ'তে পারে। বৈকাল চারটে নাগাদ আমাদের চলন্ত গাড়ীতে সংবাদ এল রস্ ক্লার্ক টেলিফোন করেছেন ও আমার কাছে জানতে চাইছেন যে ডঃ ম্যাকিনন্ সাহেব আমাকে আজ সন্ধ্যায় ডিনারে নিয়ে যেতে চান যদি আমি দয়া ক'রে রাজী হই। যদি রাজী হই তাহ'লে তিনি YMCAর কাছে এক বিশেষ জায়গায় আমার জন্য অপেক্ষা করবেন। আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেই প্রস্তাবে রাজী হলাম। পরিদর্শন পর্ব থেকে আমরা নতুন পৌরসংস্থার বাড়ীতে এলাম। এখানে পরিকল্পনার দপ্তরে কিছু সময় ব্যয় করব জানিয়েছিলাম। অফিসে এসে টম্ ওয়াণকে বললাম যে সে যেন আমার সঙ্গে ম্যাক্‌কিনন সাহেবের বাড়ীতে এসে তুলে নিয়ে যায় তাতে আমার ফেরাও সহজ হবে ও তার সঙ্গে আমার সঙ্গ দেওয়াও চলবে। সে রাজী হ'ল।

পরিকল্পনা ব্যাপারে এদের ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বরে

প্রকাশিত Official Plan of the Metropolitan Toronto Area ব'লে দু'খণ্ড পুস্তক আমায় দিল। তাতে প্রথম ভাগে (Principles & Policies; দ্বিতীয় ভাগে Administration of the plan ও তৃতীয় খণ্ডে মানচিত্র দেওয়া আছে। প্রথমভাগে সাধারণ উন্নয়নের মূল তত্ত্বের বিশ্লেষণ, জমির বিভিন্ন ব্যবহার (land use), পরিবহন, পানীয় জল সরবরাহ ও বৃষ্টি বারি ও বাতাস দূষণ নিয়ন্ত্রণ, আমোদ প্রমোদের স্থান ও মুক্ত জায়গার বিষয় বিশদ আলোচনা আছে। সেগুলো বাড়ী গিয়ে দেখবো বললাম।

মহাপৌরপ্রতিষ্ঠানের গাড়ীতে ক'রে আমায় ম্যাকিনন্ সাহেবের নির্দেশিত স্থানে নামিয়ে দিয়ে গেল। আমরা দুজনে সামান্য হেঁটে একটি হোটেলে রাতের আহার সেরে নিলাম।

তারপর আমরা দুজনে বাসে ক'রে তাঁর মেয়ের বাড়ীতে এসে হাজির হ'লাম। তিনি তাঁর গাড়ী নিয়ে আসেননি আজ। আমার কাজের বিশেষ বিবরণ এবং আমার টোরণ্টোর প্রতি আকর্ষণ বিশেষ ক'রে আপনার কথা আমায় এখানে নিয়ে এসেছে বললাম। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রাথমিক কর্মসূচীতে 'সিকাগো', 'টোরণ্টোর' নামের উল্লেখ ছিল না। আমি লস-এনজেলিসে এসে ঢুকিয়ে নিয়েছি। ম্যাকিনন সাহেবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজী অনুবাদের উপর কিছু আলোচনা হ'ল। তারপর তিনি আমায় দুখানা বই দিলেন। একটী হ'ল Thoughts for the Time by Dr. Macneile Dixon ও অপরটি কেমব্রিজের কিংস কলেজের প্রোভোষ্ট J. T. Sheppardএর Music at Belmont। আমি সামান্য প'ড়ে সেটী রেখেদিয়াছিলাম তাঁর টেবিলে বইখানি না নেবার উদ্দেশ্যে ও আমার মালের ভার লাঘব করার জন্যও। কিন্তু তাঁর উৎসুক দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি বই দু'খানি নিয়ে আমার পোর্টফোলিও ব্যাগের মধ্যে পুরে দিলেন। নিরুপায় হ'য়ে ধন্যবাদ দিয়ে গ্রহণ করা ছাড়া আমার আর গতি ছিল না।

আমাদের গল্পের মাঝে তার মেয়ে কাজ থেকে বাড়ী ফিরলেন এবং পরে কলিং বেল টিপে এল টম ওয়াণ্। টমকে ডঃ ম্যাকিনন্ তেমনভাবে চিনতে পারেননি। যাই হ'ক পরিচয় দিতে বুঝলেন। সামান্য কিছুক্ষণ ব'সে আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। YMCAএর কাছে আমরা দুজনে কফি ও আইসক্রীম খাবার জন্য একটা দোকানে ঢুকলাম। আমি বললাম, 'কোথায় তোমার শ্রীমতী ?'—সে বলে, 'ছোটটার শরীর খারাপ ব'লে তিনি আসতে পারলেন না। তবে আমি যখন ভারতবর্ষে যাব, তখন তাঁকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করব। জানিনা সফল হব কিনা।'

কফি পান করার পর আমরা উঠলাম আবার YMCA-এর ঘরে এসে। তার ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্তা চল্ল। সে শুভরাত্রি জানিয়ে যখন বেরিয়ে গেল, তখন রাত সাড়ে এগারটা।

দরজা বন্ধ ক'রে ব্যাগ গুছিয়ে রেখে বিছানায় শুয়ে পড়লাম যাতে সকালে প্রাতঃকৃত্য সেরেই বিমান বন্দরের দিকে বেরিয়ে পড়তে পারি।

পথের বাঁকে

মদন চক্রবর্তী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

আবার সেই একফালি আকাশের নীচে ক্ষুদ্রতম কর্ম পদক্ষেপের পালা। আজ নিজেকে বড় অসহায় বোধ করল সুহাস। আজ এ পদক্ষেপের মধ্যে সে মুক্তির স্বাদ খুঁজে পেল না। পেল না অবসাদ দূর করার মত প্রকৃতির মিষ্টি হাওয়া। আজ তার ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে রুণুর ভাগ্য। আজ তার পদক্ষেপের সঙ্গে রুণুর অনুগমনই ভাবিয়ে তুলল তাকে।

তবু ভেঙ্গে পড়ল না সুহাস। সে মরদ। রুণুর মত এক আওরাৎ-এর চিন্তায় যদি সে মুষড়ে পড়ে তাহলে রুণু দাঁড়াবে কার ভরসায় ?

ফেরার পথে সুহাস চিন্তা করতে থাকল রুণুকে সে কিছু দিন তাপসীর কাছে রাখবে। তারপর আবার নতুন উদ্যমে সুরু করবে তার কাজ, রুণুকে মানুষ করবে, রুণুর বিয়ে দেবে, ভরিয়ে তুলবে কাকীমার সংসার।

ভবনাথবাবুর কথা মনে পড়ল সুহাসের। গরীবের ছেলে। চাকরী করতে করতে আইন পড়ে ওকালতি পেশা নিলেন জীবনে। নিজের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সংসারটাকে এনে ফেললেন বিপদের ঝুঁকির মধ্যে। ওকালতি করতে এসে স্ত্রীর সব গহনা খোয়ালেন, সমস্ত সম্পত্তি হারালেন, এমনকি নিজের মনুষ্যত্বটুকুও উজাড় করে বিলিয়ে দিলেন মানব মন্দিরের ঘাটে ঘাটে। কিন্তু কই, কোন দিনও অন্যায়ের সঙ্গে তো আপোষ করলেন না তিনি।

ভবনাথবাবুর সঙ্গে বৈষয়িক কোন আলোচনার সময় তিনি বলতেন, গরীবের ছেলের ওকালতি পেশায় আসা উচিত নয় মানি, তা'বলে গরীব কি চেষ্টা করবেনা তার সামনের বন্ধ দরজা খুলে এগিয়ে চলার রাস্তা খোঁজার ? বার বার চেষ্টা করতে হবে, ধাক্কা দিতে হবে। তাতে পরাজয় হলেও দুঃখের কিছু নেই। একটা জীবন যাবে আর একটা জীবন আসবে। এমনি করতে করতে একদিন দেখা যাবে বন্ধ দুয়ারটা সত্যি সত্যিই খুলে গেছে।

সত্যি কথা, সে চেষ্টায় পরাজয় বরণ করে নিয়েই ভবনাথবাবু শেষ বয়সে সমস্ত সংসারের দায়-দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে আবার নতুন জীবনের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সাংসারিক দৃষ্টি ভঙ্গীতে ভবনাথবাবু বিরূপ সমালোচনার বিষয়বস্তু হলেও, এমনি শত সহস্র পরাজয়ের মৃত ধ্বংস স্তূপের ওপরে জয়ের সেতু তৈরী করে পৃথিবী এগিয়ে এসেছে ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে।

মাঠের অফিস ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল সুহাস। কুমুদবাবু তখন একজন মহিলা টাইপিষ্টের সঙ্গে গল্পে ব্যস্ত ছিলেন। দরজার ফাঁক দিয়ে সুহাসকে দেখতে পেয়ে তিনি ভেতরে ডাকলেন তাকে।

সুহাস ভেতরে ঢুকতে কুমুদবাবু প্রশ্ন করলেন, রাধা গোবিন্দবাবু কি বললেন ?

উত্তরে সুহাস বলল, তিনি বললেন, আমার যে ক'দিনের মাইনে পাওনা হয় আপনার কাছ থেকে নিয়ে নিতে।

একথা শুনে কুমুদবাবু নানা ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলেন সুহাসকে। স্পষ্ট না বললেও ভাবখানা এই, যে

রুণুকে কাজে লাগিয়ে দিলে তার কাজটাও বোধ হয় থেকে যায় এ যাত্রায়।

সুহাস বেশ বুঝল যে এরা তার অভাবের সুযোগ নিয়ে চাপ দিয়ে কাজ হাঁসিল করতে চায়। এ ব্যাপারে রাধা গোবিন্দবাবু আর কুমুদবাবু দু'জনেই সমান অপরাধী। কিন্তু সুহাস সিমেণ্টের যুগের সঙ্গে আপোষ করতে রাজী নয়। তাই সে কুমুদবাবুকে স্পষ্ট জানিয়ে দিল যে সে পাওনা টাকা নিয়ে চলে যেতে চায় এখান থেকে।

কুমুদবাবু যখন দেখলেন যে সুহাসকে কায়দার মধ্যে আনা গেলনা তখন অগত্যা তিনি বললেন, এখন তো অফিস এক রকম বন্ধই হয়ে গেছে, আপনি বরং কাল সকালে অফিস খুললে টাকা নিয়ে নেবেন। আজকের দিনটা এখানে থেকেই যান।

সুহাস ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মাঠের ওপর দিয়ে চলতে সুরু করল কুটিরের বাসস্থানের দিকে।

আজ সমস্ত মাঠটাকে যেন ভাল করে দেখতে পেল সুহাস। সমস্ত মাটির স্তুপগুলো উধাও হয়েছে মাঠের ওপর থেকে। অমিয়বাবুর ফিতের মাপের ভিতগুলো কোনটা 'এল' শেপের কোনটা 'আই' শেপের কোনটা বা 'ভি' শেপের আকৃতি নিয়ে মাথা উঁচু করে আছে মাঠের ওপরে। সিমেণ্টের যুগের সভ্যতার অবদান স্বরূপ ঐতিহাসিক নমুনা।

কুটিরের ঘরে ঢুকে সুহাস দেখতে পেলনা কাউকে। সামনে পড়ে আছে একটা চিঠি। কাকীমার চিঠি। সেটা খুলে সুহাস পড়ল। তাতে লেখা আছে জানবার মত অনেকগুলো খবর। জ্যেঠাইমার বড় ছেলে খাদ্য দপ্তরের সম্পর্কযুক্ত দোকানের কপাল জোরে কোলকাতার মত সহরে নিজের বাড়ী তৈরী করিয়ে স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে চলে গেছে সেখানে। বিজন ঠিকাদারের কাছে কাজ করতে করতে কি একটা বিরাট মামলায় জড়িয়ে পড়েছে। শেষে আছে রুণুকে চাকরীতে লাগিয়ে দেবার অনুরোধ আর তাড়াতাড়ি খুকুকে পার করবার ব্যবস্থার নির্দেশ।

অমিয়বাবু আর রুণুকে দেখতে পাওয়া গেলনা আশ-পাশে। সুহাস এগিয়ে এল খালের দিকে। গোধূলির আলো অন্ধকারে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু ধূ ধূ করছে ফাঁকা মাঠ। খালটা বুজে গেছে ইতিমধ্যেই। সিমেণ্টের যুগের রাজপথ প্রস্তুতির প্রথম পর্বে মাটির ওপর চলছে ভারী ভারী ষ্টিম রোলার। টাউন প্লানিং-এর নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর কল্যাণে পুরোনো একেবারেই হারিয়ে গেছে। নতুন লোকালয় সুরু হবে নতুন পরিবেশে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর মানুষ নিয়ে।

বাস্তবের মুখোমুখি মন ঘুরতেই সুহাস দেখতে পেল 'ওয়াইফ-ইন-ল'কে। সে দৌড়ে আসছে এদিকেই।

ওয়াইফ ইন-ল সুহাসের হাতে একটা চিঠি দিয়ে বলল, অমিয়বাবু আপ্‌কা হাতমে দেনে বোলা।

বলে, ওয়াইফ-ইন-ল সাদা ঝকঝকে দাঁতের হাসি তুলে এক দৌড়ে আবছা অন্ধকার মাঠের বুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুহাস চোখকে পীড়া দিয়েই চিঠিটা পড়ল। তারপর বসে পড়ল মাঠের সেখানেই।

অবিশ্বাস্য মনেই বিশ্বাস করে নিতে হল রুণু নেই। সে চলে গেছে অমিয়বাবুর সঙ্গে।

সমস্ত খোলা মাঠটায় কিসের অভাব বোধ যেন অট্ট-হাস্য করে উঠল সুহাসের চতুর্দ্দিক ঘিরে। এই সকল মাঠের ওপরে অসহায় সুহাসের চাকুরী নেই, বোন নেই।

এক অভাববোধ সর্বপ্রকারের অভাবকে অস্বীকার করে অমিয়বাবুকে আকৃষ্ট করাল রুণুর প্রতি। তাই সে চাকরীকেও অগ্রাহ্য করে রুণুর সারা জীবনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার স্পর্দ্ধা দেখাতে পারলো কোন নৈতিক বিবেচনার অধীন না হয়ে।

চিঠিতে অমিয়বাবু লিখেছেন, আপনার লরীতে কাজ হবার পর থেকেই রুণু লুকিয়ে যেতো কুমুদবাবুর কাছে চাকুরীর উমেদারীর জন্যে। কুমুদবাবু তাকে চাকরী দিতেও চেয়েছিলেন কিন্তু আপনার জন্যে রুণু সাহস পায়নি। তবু নিঃসঙ্গ জীবন রুণুর এ চাহিদা নেহাৎ অস্বাভাবিকও নয়। কিন্তু আমি বুঝলাম রুণু চায় সময় কাটাতে, মন ভরাতে। আর চায় নারীর স্বাভাবিক কামনার একটা অবলম্বন। কুমুদবাবুর কাছে চাকরী নিলে, ওর জীবনের কি পরিণতি ঘটতো আপনার কাছে তা অজানা নয়। তাই যেদিন আমি শুনলাম ও লুকিয়ে ওখানে গেছে চাকরীর নামে সেইদিন থেকেই আমি প্রশ্রয় দিয়ে ওর মনটাকে টেনে নিলাম আমার কাছে। আর উভয়েই উভয়কে আরো নিকটতম করে

নেবার আশায় আমরা চলে যাচ্ছি……ইত্যাদি।

সুহাসের মনে পড়ল অমিয়বাবুর আগেকার কথা। বাঙলাদেশের মত জায়গায় একটা মেয়েকে জীবনসঙ্গিনী করে আনতে পারলুম না আর ওরা সব জলজ্যান্ত একটা করে স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও, নিত্য নতুন মেয়েদের সঙ্গে স্ফূর্তি করে কত পয়সা উড়িয়ে দিচ্ছে।

রুণু পড়াশুনা করতে পেল না। নিঃসঙ্গ মনটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে দেখতে পেল কুমুদবাবুদের পরিবেশ। আর সেই মনের পাশে পেল অমিয়বাবুকে।

সুহাসের মনে হল এই মাঠটা অভাববোধকে দূর করে প্রাণ প্রাচুর্য ভরিয়ে তোলার প্রস্তুতি পর্বে সৃষ্টি করল কত জাতের অভাব আর সেই অভাবের আওতায় কতশত সুস্থ জীবনযাত্রাকে মাটি চাপা দিয়ে শেষ করে দিল, ব্যাহত করল সমাজের এগিয়ে চলার পথকে।

মাঠ ছেড়ে সুহাস এল ঘরে। কাকীমার চিঠিটা পড়ে আছে বিছানার ওপরে। আর এক জাতের অভাব আশা নিয়ে জেগে আছে রুণুর চাকরী হবে, ঝুনুর বিয়ের ব্যবস্থা করবে সুহাস।

ব্যথায় মুষড়ে পড়ল সুহাসের মন। ফাঁকা মাঠের নিঃসঙ্গ মনটা যেন ককিয়ে উঠল কিছুক্ষণের জন্যে। কি কৈফিয়ৎ দেবে সে কাকীমার কাছে? কোন সান্ত্বনার বাণীতে রুণু-হারা কাকীমার মনকে জাগিয়ে তুলবে সে? আজও কাকীমা আশা পথের দিকে তাকিয়ে দিন গুনছেন, রুণুর চাকরী হলে বেশী টাকা আসবে তাঁর হাতে, তাকিয়ে দেখতে না পারা ঝুনু মেয়েটার দিকে ভাল করে একবার তাকিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবেন তিনি।

রুণু যেন দাদাকে দেউলিয়া করে চলে গেল। যাবার আগে কেন সে জানালো না তার দাদাকে। সময় মত সুহাস সব জানতে পারলে আজ সকলকেই কৈফিয়ৎ দেবার একটা পথ তৈরী করতে পারতো।

অভিমানে ফেটে পড়ল সুহাসের স্নেহভরা মনটা। আনন্দের উচ্ছ্বাসভরা মনটাকে দেখবার জন্যে সে এত চেষ্টা করল, যাকে ঘিরে সুহাস তার মনটাকে জীবন থেকে একরকম কেটে বের করে ছেড়ে ছিল এই মাঠের নিধনযজ্ঞের শুকনো হাওয়ায়, সেই বোন আজ সব কিছু অস্বীকার করে, দাদাকে সর্বপ্রকারে রিক্ত করে হাত মেলালো মাঠের পাশে গজিয়ে ওঠা সাময়িক আনন্দের সঙ্গে।

ঘরের ভেতরেই অনিদ্রায় কেটে গেল মাঠের রাত।

কুমুদবাবুর আফিস ঘর থেকে পাওনা টাকা নিয়ে সুহাস বেরিয়ে এল পথে।

উদার আকাশের নীচে সীমাহীন প্রান্তর।

একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে নিল সুহাস। তার ফেলে আসা বাসস্থানের কুটিটা দেখা গেল না। কয়েকদিনের মধ্যে ভাঙ্গা পড়বে ঘরগুলো। চোখের সামনে ভেসে উঠল কিছু কিছু মেহনতী মানুষের দল। আর কয়েকটি মিস্ত্রী তখনও ভিতের ওপর গেঁথে চলেছে ইটের সারি সভ্যতায় মাথাকে আরো উঁচু করে তোলার প্রয়াসে।

সুহাসের জীবনের পরিবেশ থেকে অনেকেই সরে গেল এক এক করে নিজেদের মনগড় বিভিন্ন জাতের যুগের সঙ্গে আপোষ করে। শেষ পর্যন্ত রুণুও চলে গেল তামসীর নামের পাশ থেকে কাটা চিহ্ন নিয়ে।

তবুও দমবে না সুহাস। মনে সুহাস দেখেছে ভবনাথবাবু ন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করে ভেঙ্গে গেছে, প্রাণের চাইতেও শ্রেষ্ঠ সংগ্রহশালাকে বিলিয়ে দিতে গেছে তবুও বিরাট সংসারের দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে বিচলিত হয়েছে অপরের জন্যে। নতুন পথ সন্ধানের জন্যে আবার নতুন উদ্যমে হয়ত আজও করে চলেছে সংগ্রাম। কিন্তু বর্তমানের ঐতিহাসিক গবেষণার কোন যুগ সৃষ্টি করে হাত মিলিয়ে চলার কোন পথ তৈরী করা সম্ভব হয়নি তার পক্ষে।

আবার একফালি আকাশের নীচে একফালি অনুদার মন। জ্যোতিষী সোমনাথবাবুর ভাষায় যার পরিচয় দেওয়া যায় না পরিচিত জনের কাছে।

সেই অনুদার মনটা চলমান জগতের একফালি আকাশের নীচের সহরটাকে পিছনে ফেলে গ্রামের ষ্টেশনের দিকে ধাবমান একটা ট্রেনে বসল।

শেষ আশা নিয়ে গ্রামের ষ্টেশনে এসে থামল সুহাস। ষ্টেশনটার পরিবর্তন হয়েছে অনেক। অনেকগুলো নতুন

টফরম বেড়ে যেন চিনতে দেয়না পুরোন নামটাকে। ান থেকে নেমে অনেকগুলো নতুন বাড়ী নজরে পড়ল র। তার মধ্যে স্টেশনের ধারের পদ্মপুকুরটাকে বুঁজিয়ে র ওপর গড়ে তোলা হচ্ছে বিরাট এক মাখন তৈয়ারীর রখানা।

বিদ্রোহী হয়ে উঠল সুহাসের মন। সিমেন্টের যুগের ত থেকে তার গ্রামকে বাঁচাবার একটা চ্যালেঞ্জ জেগে ঠল মনে।

মনে পড়ল কেদার মাষ্টারের কথা। পিছিয়ে যেতে যেতে পরাজয় বরণ করে নিয়েও জয়লাভ করার পথ তৈরী চ্ছে তার ডাঁটি ভাঙ্গা চশমার অন্তরালের আপোষ বিহীন দৃঢ়সংকল্প থেকে।

দশটা বছর সময় নিয়েছে কেদার মাষ্টার। সুহাসদের রে যাবার প্রশ্রয়ে যে ফাঁকিটা জমে উঠেছে ফিরে এসে কেদার মাষ্টারের পাশে গিয়ে সেই ফাঁকিটা বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর হল সুহাসের মন। কেদার মাষ্টারের দশটা বছরের সঙ্গে আর দশটা বছরের যোগ সাধনের জন্যে দ্রুত-পদে এগিয়ে চলল সুহাস।

অস্তিত্ব বিহীন হরিমোহন পাঠশালার ওপর দম্ভ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা 'এল' শেপের স্কুল বাড়ীটার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল সুহাস।

অল্পসংখ্যক মানুষের ছোট্ট একটা দল, এ জীবনের মায়া কাটিয়ে চলে যাওয়া এক মৃত মানুষকে নিয়ে চলেছে সৎ-কারের উদ্দেশ্যে।

পাশ কাটিয়ে চলে আসা একটা মানুষের কাছ থেকে সুহাস জানতে পারল মৃত দেহটি কেদার মাষ্টারের।

পাশে একটা মাটির ঢিপির ওপর বসে পড়ল সে। তার চোখের কোণে ফুটে উঠল কয়েক ফোঁটা জল।

কেদার মাষ্টারের দশ বছরের প্রতিশ্রুতির বাকী নটা বছরের সমাধিরচিত হল ডোম পাড়ার সেই শুয়োর ঢুকে পড়া গলির এঁদো ঘরটার মধ্যে।

গোটা দেশ জোড়া অভাব বোধের কাছে ম্লান হয়ে গেল কেদার মাষ্টারের চ্যালেঞ্জের অভাববোধ।

এখানে বসে এক এক করে সকলের কথাই মনে পড়ল সুহাসের। প্রথম গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবতেই মনীষা জেগে উঠল দৃষ্টিপথে। এই সেদিনও মনীষা বলেছিল, 'সুহাস তুমি এখানেই থেকে যাও, আমাকে ছেড়ে তুমি চলে যেয়োনা।

স্কুল বাড়ীটার দিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে নিল সুহাস।

তার মনে হল, হরিমোহন পাঠশালায় বসে আছে সে। কুঁজো নটবর যেন গরু বেঁধে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল শেওড়া গাছের জঙ্গলের পাশ দিয়ে।

থোকা থোকা ফুলের সমারোহে দুলে উঠল করবী চারাটা। লাল মাটির পথের বাঁকে সবুজ পাড় সাড়ীর পাকে পাকে জড়ানো মনীষার দেহটা যেন অধীর আগ্রহে মুখ তুলে তাকালো সুহাসের দিকে।

মাটির ঢিবি ছেড়ে সুহাস আস্তে আস্তে স্টেশনের দিকে ফিরতে সুরু করল।

তার মনে হল মনীষা যেন কালো তারাভরা চোখের আর্দ্রতায় বলছে, সুহাস 'আমাকে ছেড়ে তুমি যেওনা।

ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ

পুষ্পদেবী, সরস্বতী, শ্রুতিভারতী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

যুক্তে শব্দান্তরাচ্চ (২।১।১৮)

শঙ্কর কন যুক্তির দ্বারা বুঝিতে পারা যে যায়
কার্য্যের আগে কারণ যে থাকে কারণ ছাড়া ত নয়
কারণ কার্য্য যুক্ত যে থাকে
দুধে দধি যথা ঘৃত রূপে থাকে
ক্রিয়ার কর্তা দুধ নিশ্চয় দধিও মিথ্যা নয়
পরিবর্ত্তন হইলেও জেনো দুধ সেথা নিশ্চয়।
ব্রহ্ম তেমনি সকলের মাঝে রহেন বর্ত্তমান
অভিন্ন রূপে সব জীবে শিব আপনি সে ভগবান্
ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি সবার
স্রষ্টা রূপে সে সবার আধার
নানা রূপে সেই সবাকার মাঝে কত শত লীলা করে
অরূপের কিবা রূপের মাধুরি অতুলন হয়ে ঝরে।

পটবচ্চ ২।১।১৯

বস্ত্রকে যবে রাখি পাট করে বোঝা কভু নাহি যায়
দৈর্ঘ্যে প্রস্থে কত বড় সে যে বুঝিবারে নাহি পায়
সুতাকে তাঁতেতে সাজায় যেমন
শাড়ী ধুতি হয় তাহাতে তেমন
কার্য্য কারণ এক হলে দুই রূপেতে প্রভেদ হয়
তেমনি জানিও ব্রহ্ম স্বরূপ সবেতেই নিশ্চয়।

যথা চ প্রাণাদি ২।১।২০

আমাদের দেহে প্রাণ ও অপান ব্যান পাঁচ রূপে থাকে
প্রানায়ামে তাহা থাকে সংযত তবু একই তারা থাকে
কার্য্য কারণে রূপ যে ভিন্ন
তবু সে যে জেন রহে অভিন্ন
তেমনি ব্রহ্ম সবের মাঝেতে আপনি গোপনে রয়
কার্য্য কারণে ঘটিলে প্রভেদ তবুও ব্রহ্ম হয়।

২।১।২১

ইতরব্যপদেশাৎ হিতাকারণাদি দোষপ্রসক্তিঃ
শ্রুতির মাঝেতে বহুস্থানেতে জীবেরে ব্রহ্ম কন
"তৎ ত্বম অসি" তুমি হও ব্রহ্ম অর্থ সে নিশ্চয়
ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়া
জীবরূপে সেথা প্রবেশ করিয়া
নাম রূপ ধরি করেন বিভাগ ক্ষণেক লীলার তরে
তরঙ্গ সম মূরতি ধরিয়া ব্রহ্মে মিশাল পরে।
ইতর অথবা হিতাকরণের সহজ অর্থ জেন
জন্মমৃত্যু রোগ শোক জরা দুঃখ বলে না যেন
ব্রহ্মর দ্বারা সৃষ্ট যে হয়
ক্ষণপরে তাহা ব্রহ্মে মিলয়
সৃষ্টি হেরিয়া ভুলোনা কখন স্রষ্টারে তার চেন
তুমিই ব্রহ্ম এই কথাটিকে অন্তর দিয়ে মেনো।

২।১ ২২

অধিকং তু ভেদনির্দ্দেশাৎ
শঙ্কর কন ব্রহ্ম যে হন জীবের অধিক জেনো
তিনিই জগৎ করেন সৃষ্টি জীব নহে সেই জন
সেই আত্মাকে কর দরশন
ব্রহ্মই সেই পরশ রতন
সুষুপ্তি মাঝে ব্রহ্মের সাথে জীবের মিলন হয়
দুই এক তবু দোঁহের সাথেতে এ মিলন মধুময়।
ঘটাকাশ মাঝে মহাকাশ যথা ভেদ ও অভেদ হয়
তেমনি জানিও স্থূল দৃষ্টিতে দোঁহে দুই জন হয়
ব্রহ্ম সত্য মিথ্যা যা হয়
মন বুদ্ধিতে যাহা নির্ণয়
আকার প্রকারে প্রভেদ দেখিলে জেন তাহা ঠিক নয়
সবের আধার সব মূলাধার ব্রহ্ম সে নিশ্চয়।

———

[ক্রমশঃ

ধূসর সন্ধ্যা
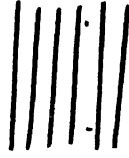
ছায়া দেবী

টিন-দেওয়া কালিঝুলি মাখা রান্নাঘরের দেওয়ালে হেলানদিয়ে বসে থাকে সবিতা। পরণে তার লালপেড়ে আধময়লা শাড়ী, দু'চোখের কোণে গভীর কালি, চোখের উদাস দৃষ্টি মেলে আকাশের দিকে চেয়ে রয়েছে। দেখলে বুঝতে অসুবিধা হয়না গত কয়েক দিনের অর্দ্ধাহার ও দুশ্চিন্তার কালিমা তার মুখে গভীর ছায়া ফেলেছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সবিতা একটু সরে বসলো, এমনি করেই কি তার সারা জীবন কাটবে? কত আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল মনে, সবই কি এভাবেই শেষ হয়ে যাবে? ছেলে মেয়েরা? তারা উপযুক্ত হলে কি মায়ের দুঃখ দূর হবেনা? ঠিক মত মানুষ করতে পারলে হয়তো হবে, কিন্তু ঠিক মত মানুষ করতে পারলে তবেইতো? টাকা পয়সা নেই এটা ঠিক কথা, কিন্তু স্বামীর স্বভাব যদি ভালো হতো, বড় হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকতো তাহলে এর মধ্যেও অনেক কিছু হতে পারতো, কিন্তু যা হবার নয়……।

পাশে ফেলে-রাখা সেলাইটা আবার হাতে তুলে নিলো সবিতা, আজ কিন্তু সেলাই করতে ইচ্ছে করছে না তার। নিজের ভাবনায় আবার ডুব গেল সবিতা, বসে সে কোন দিন খায়নি, এখনো খাচ্ছেনা। বিশেষ করে পারিবারিক ভাগ্য বিপর্য্যয়ের পর থেকে এক এক করে কত দায়িত্ব তো সেই-ই তুলে নিয়েছে, অবশ্য না নিয়ে উপায়ই বা কি ছিলো? আজ সে মাখন মিস্ত্রির বউ, এই তার পরিচয়, কিন্তু চিরদিন তার এই পরিচয় ছিলোনা বা এমন জায়গায় সে বাসও করে'ন, কিন্তু এখন?

আধা ভদ্র আধা বস্তী এই রকম জায়গায় সে বাস করে। এক কালে যেটা স্বপ্নেও অকল্পনীয় ছিল!

খুব-ছোটতেই তার মা বাবা সাধ করে বিয়ে দিয়েছিলেন, পরপর চার ভাই-এর পরে দুই বোন, সেইই ছোট। বাবার অবস্থা খারাপ ছিলোনা। টাউনের মধ্যে বড় কাপড়ের দোকান ছিল। এছাড়া ধান চালের কারবারও কিছু কিছু করতেন। বড় তিন ভাইও রোজগার করতেন বেশ ভালোই। বড় আর সেজো বাবার কারবার' দেখাশুনো করতেন আর মেজদা ছিলেন রেলওয়ে বড় অফিসার। বড়দির বিয়েও বাবা ভালোই দিয়েছিলেন, জামাইবাবু ছিলেন জাঁদরেল পুলিস দারোগা।

দিদির বিয়ের পর প্রথম প্রথম নতুন জামাইবাবু এসে তাকে নিয়ে কতরকম রঙ্গ রসিকতা, হাসি ইয়ারকি করতেন, মনে করে এতদিন পরেও সবিতার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। জামাইবাবুর জাঁদরেল গোঁফ জোড়া কী রঙ্গ রসিকতার বস্তুই না ছিল? মনে পড়লো শুভদৃষ্টির সময় পিঁড়িতে বসে জামাইবাবুর গোঁফ জোড়ার দিকে চেয়ে দিদির সে কী হি হি হাসি, সে হাসি আর থামে না!

বাড়ী শুদ্ধ লোক অস্থির হয়ে গিয়ছিলো নতুন বিয়ের কনেকে থামাতে। সেই হাসি সংক্রামক হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল সবার মধ্যে।

পরে সে কথার উল্লেখ করলে দিদি বেচারা লজ্জায় লাল হয়ে উঠতো। আর জামাইবাবুও অনেক সময় দিদির দিকে চেয়ে গম্ভীর সুরে বলতেন, "তোমার দিদির বাতিকের জ্বালায় তো গেলাম। "এটা খাবোনা সেটা ছোবনা—আরে ভাই ফাউল কারি বাদ দিলে কি দারোগার চলে?" এই বলে একবার নধর ভুঁড়িটায় আর একবার ঝুলন্ত গোঁফের জঙ্গলে হাত বুলিয়ে বলতেন, "টুসকি সুন্দরী তুমি আমার দ্বিতীয় পক্ষ হও। আমার নিত্যি নতুন রকমারি পদ বেঁধে দেবে।"

"ধ্যেৎ আমার দায় পড়েছে অমন যার গোঁফ তাকে বিয়ে করতে। বলেই ত্রয়োদশী বালিকা ছুটে পালাতো।

যেতে যেতেই শুনতে পেতো জামাইবাবুর খেদোক্তি আহা আমার এমন পুরুষ্টু গোঁফ জোড়ার ওপর দুজনেরই নজর! এক সুন্দরীকে নিয়ে আমার গোঁফ জোড়া অর্দ্ধেক উড়ে গেছে আর এক সুন্দরীকে ঘরে আনলে বাকি টুকু কি আর থাকবে?"

দিদির তর্জন শোনা যেতো, "কালই নাপিত ডাকিয়ে পাঠাচ্ছি, সব সময় ওইটুকু মেয়েকে নিয়ে ইয়ারকি, দাঁড়াও"—বাকিটুকু শুনতে আর দাঁড়াতো না সবিতা।

কি জানি কেন এই বিয়েটা ঠিক বাবার পছন্দ ছিলোনা। মামার বাড়ীর সূত্র ধরে মার অনুরোধেই দিদির বিয়েটা হয়। সবিতার বিয়ে অনেক খুঁজে পেতে বাবা চরকডাঙ্গার জমিদার বাড়ীতেই ঠিক করে-ছিলেন। পাশের গ্রামের বিপিন কাকা এবং আরো দু'একজন আত্মীয় আপত্তি করেছিলেন। ওরা বলে-ছিলেন, ওখানে বিয়ে দিওনা হে প্রকাশ ও বংশের আর আছেই বা কি মামলা মোকদ্দমায় সবই তো ঝাঁঝরা! আর ছেলেই বা কি এমন? বাপ সর্বস্ব মাকাল ফল বৈ তো নয়। বলা বাহুল্য সে সব কথায় বাবা কর্ণপাতও করেন নি তিনি মেয়েকে রাজরাণী করতে যাচ্ছেন এখন অনেকেরই তো হিংসে বিদ্বেষ হবে একথা কি তিনি জানেন না?

মাও একবার বলেছিলেন, টুস্কির বিয়েটা তো একরকম শেষ কাজ, অরুণের বিয়েটা যে কবে দেবো তার ঠিক নেই, আর এখানে তুমি ভালো করে একবার খোঁজটাও নিলে না? মুখ থেকে গড়গড়ার নলটা নামিয়ে বাবা বলেলেন—"শেষ কাজ সেটা আমিও জানি, তাই মেয়ে যাতে সুখে থাকে সেই ব্যবস্থাই করেছি, এমন ঘর বর আর কোথায় পাবো? তাছাড়া চরকডাঙ্গার জমিদারদের এখনো যা আছে, মেয়ে তোমার ছড়িয়ে কুড়িয়ে দিয়ে থুয়ে খেতে পারবে দু'পুরুষ ধরে। তাছাড়া আজকালকার দিনে এতবড় কুলীন বংশ আর কটাই বা আছে? বলো, সেটাও তো দেখতে হবে নাকি?

মা তার উত্তরে শুধু বলেছিলেন, "সেজ বৌমার কাছেই শুনেছি ওরা লোক তেমন ভাল নয়, দিবারাত্রি ঝগড়া অশান্তি জ্ঞাতি বিরোধ লেগেই আছে, বৌমার বাপের সঙ্গে কি একটা দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা আছে, তাতেই ওরা অনেক কিছু জানে, আমি কি শুধুই বংশ মর্যাদা নিয়ে ধুয়ে জল খাবো? আর কিছু কি দেখবার দরকার নেই?"

এই কথা শুনে বাবা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, কী জানো জ্ঞানেন্দ্রবাবুরাও আর এক জ্ঞাতি কিনা ওরা তো বলবেই, না বলে যায় কোথায়?

শুনে তো মা নির্বাক। প্রথমে কোন কিছু বলার ভাষা আর খুঁজে পেলেন না। পরে একটু থেমে থেমে বললেন, "আচ্ছা সব দিকে না হয় ভালোই হলো, কিন্তু ছেলে তো তেমন কিছু লেখা পড়া জানেনা; আজকালকার দিনে একটা মাত্র পাশকে কি আর পাশ বলে? একটা পাশ তো সামনের বার টুস্কিও করবে।

অতি মাত্রায় ক্রুদ্ধ হয়ে বাবা বলেছিলেন, "হ্যাঁ এই না হলে স্ত্রীবুদ্ধি, হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে চাও বুঝি? প্রমথেশের মতো আধবুড়ো গুঁফো-বর না হলে তোমাদের মন উঠবেনা বুঝি?" এই কথার পরও বড়দা দু'একবার আপত্তি করতে গিয়েছিলেন কিন্তু বাবা কি বুঝিয়ে দিলেন জানিনা কিন্তু তার পরে আর এনিয়ে বিশেষ কিছু উচ্চবাচ্য হলোনা। আর ভাগ্যে মন্দ নানা রকম মতামত শুনতে পেলেও সবিতার পক্ষে তখনকার দিনে বাড়ীর পুরোনো আবহাওয়ার মধ্যে আপত্তি বা অনাপত্তি কিছুই জানাবার উপায় বা শিক্ষা কোনটাই তো ছিল না।

তবু দু'একবার বৌদিদের মারফৎ নিজের মতামত জানাতে গিয়ে তিরস্কৃত হয়েছিল সবিতা বোধহয় কিছুটা ব্যঙ্গ বিদ্রূপও বর্ষণ হয়েছিল তারওপর। সেই থেকে ক্ষোভে সে আর কোন রকম উচ্চবাচ্যই করেনি, অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে এই ভেবে চুপ করেই ছিল। এক মাত্র সেজ-দাই তার ক্ষোভ মেটাবার ব্যবস্থা করেছিল ফটো একখানা এনে দিয়ে। বোধ হয় ভেবেছিলেন চেহারাটা ভালো হলেই মেয়েদের সব দুঃখ দূর হয়ে যায়। যাই হোক সেই ফটোর চেহারাটা লক্কা মার্কা জমিদার নন্দনের মতোই এছাড়া আর বিশেষ কিছু বোঝা যায়নি, অন্ততঃ সবিতা বোঝেনি। তার পক্ষে চেহারাটা মোটামুটি সুশ্রী বলেই মনে হয়েছিল তখন।

যাই হোক অনেকের মতামত উপেক্ষা করে একদিন খুব ধুমধামের ও জাঁক জমকের সঙ্গে সবিতার বিয়েটা

মাখনকৃষ্ণের সঙ্গে হয়ে গেলো। এটাই প্রায় শেষ কাজ বলে প্রকাশবাবু সাধ্যমত আড়ম্বর উৎসবের ত্রুটি করেন নি, তাঁর অবস্থা অনুসারে বস্ত্রালঙ্কারের বাহুল্য কিছু অধিক মাত্রাতেই হয়েছিল, যেন জমিদার বাড়ীতে তাঁর কন্যা আদরণীয় হয়। শ্বশুর বাড়ীতেও ধুমধাম, উৎসব সমারোহ মন্দ হয়নি, আলো, বাজী, ফুল সুগন্ধ, নূতন বৌয়ের আদর অভ্যর্থনা, তদুপরি মাখনকৃষ্ণের সুশ্রী চেহারা সব মিলিয়ে প্রথম প্রথম মনে একটা মোহ, নূতন আবেশের সৃষ্টি করেছিল।

তার পর কোথায় কি ? তিন মাস যেতে না যেতেই সুখ স্বপ্নের মতই সব মিলিয়ে গেলো! কি করে যে কী হচ্ছে বুঝতে সময় লেগেছিলো, প্রথম প্রথম বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যেতো। কারণ অল্প বয়সের স্বপ্নাঞ্জন তখনো চোখ থেকে মুছে যায়নি!

কিছুদিন যেতে না যেতেই একে একে ঘরোয়া গৃহ বিবাদগুলি আত্মপ্রকাশ করলো, কুশ্রী মনোভাবগুলিও বেশি দিন চাপা রইলোনা, মায়ের আদরিণী কন্যা হিসাবে তার বাপের বাড়ীতে যেগুলো প্রায় অজানাই ছিলো। সব চেয়ে অসহ্য বোধ হতে লাগলো মাখনকৃষ্ণের চাল চলন আচার ব্যবহারগুলো।

কোনও উপার্জ্জনের চেষ্টা নেই অথচ বাবুয়ানিগুলো পুরোমাত্রায় আছে। কোনও বিষয়ে ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটলে, এতটুকু আরাম আয়েসের অসুবিধে হলে মায়ের সঙ্গে, বৌদিদের সঙ্গে দারুণ কেলেঙ্কারি, সবিতাও সব সময় বাদ যেতোনা। কোন কোন দিন এই সমস্ত নিয়ে খরিকানি সব ভাইদের সঙ্গে মারামারি হবার উপক্রম হতো। দরজার ফাঁক দিয়ে এই সব দেখে দেখে সবিতা ভয়ে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে যেতো! অবশ্য মাখনকৃষ্ণের ব্যবহারের শোধ তুলতো পরিজনেরা সবিতার সঙ্গে নানা ভাবে দুর্ব্যবহার করে অকারণে রুক্ষ অপমানসূচক কথা বলে।

এই ভাবেই বছর তিনেক গেলো, ততদিনে জমিদার বাড়ীরও অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। শ্বশুর মারা গিয়েছেন, দেনায় জর্জর ভিটে বাড়ী আর বিঘে কয়েক ধান জমি ছাড়া আর বিশেষ কিছু রইলোনা। আর যাও-বা কিছু ছিলো খরিকানি মারামারি কাড়াকাড়িতে সে সব কোথায় তলিয়ে গেল!

শাশুড়ি বিধবা মানুষ, বৈষয়িক ব্যাপারগুলো দেখবার সাধ বা সামর্থ্য কোনটাই আর তখন ছিলোনা। তিনি কিছুটা ভগবানের উপর আর কিছুটা অপয়া বৌয়ের ওপর দোষ চাপিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। ততদিনে দুই বছরের শোভন ও ছয় মাসের গোপাকে নিয়ে জটিল পরিস্থিতির মাঝখানে পড়ে দুইচোখে অন্ধকার দেখলো সবিতা।

প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলো স্বামীর মন এদিকে ফেরাবার জন্যে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হবার নয়। ভ্রূক্ষেপ শূন্য, লজ্জাশূন্য মন নিয়ে কতকগুলো ইতরশ্রেণী ইয়ারবক্সী নিয়ে দিব্যি সে অবাধে বিচরণ করতে লাগলো। সংসার থাক্ কি যাক্ সে বিষয়ে দৃকপাতও করলোনা। বাড়ীতে যখন খুসি আসা এবং যখন খুসি খাওয়া এবং যা-ইচ্ছে করা। সবিতার অর্দ্ধেক গয়নাই তখন বিক্রমপুরে চলে গেছে। অলঙ্কার না দিয়ে কোন উপায় ছিলনা। কারণ দৈনন্দিন অভাব অভিযোগ শুধু নয়, সেতো ছিলই, কিন্তু মাখনকৃষ্ণের বলপ্রয়োগের কাছে হার মানতে হতে, অন্য উপায় ছিলনা।

শাশুড়ির তখন গুরুতর অসুখ, প্রায় মৃত্যুশয্যায়, এমন দিনে এক কাণ্ড ঘটলো যার ফলে ঘটনার গতি ঘুরে গেলো। এই রকম দিনে এক বর্ষার রাত্রে রক্তাক্ত আহত দেহ নিয়ে মাখনকৃষ্ণের বন্ধুরা মাখনকৃষ্ণকে বাড়ী নিয়ে এলো।

কি ব্যাপার! না এতদিনকার মন কসাকসির ব্যাপারটা সাংঘাতিক রূপ নিয়েছে। একেইতো টাকাকড়ি খরচ-পত্রের ব্যাপারে টানাটানি হওয়ায় উভয়পক্ষে কটূক্তি লেগেই থাকতো। তারপর আবার বড় সরিকের বাগান বাড়ীতে গিয়ে মাখনকৃষ্ণ নানারকম গালিগালাজ আর মাতলামি করে এসেছে, শুধু তাই নয় এরও পরে আবার জলসার মাঝখানে মুন্নী বাইজীর আঁচল ধরে টানাটানির এই হলো ফল! সবিতা বজ্রাহত হয়ে বসে থাকলো!

এর পরে আর ২।৩ মাস ওরা ঐ বাড়ীতে ছিলো। এর মধ্যে শাশুড়ীও মারা গেলেন এবং মারা যাবার আগে সবিতাকে ডেকে গোপনে তাঁর কষ্ট সঞ্চিত কিছু টাকা আর আর খান দুই তিন সেকেলে গহনা শোভন ও গোপার নাম করে দিয়ে গেলেন।

মাখনকৃষ্ণ সেরে ওঠার পর তখনো ওদের নামে যেটুকু

যা ছিল তাই বিক্রী করে দিয়ে যা পেলো তাই নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। অবশ্য সবিতাদের নিয়েই গেলো। না নিয়েও কোন উপায় ছিলনা, কারণ এখানে কোন সবিকের বাড়ীতে থাকবার প্রশ্নই আসেনা, অধিকাংশই দুশ্চরিত্র মদ্যপ—কাজেই প্রতিপালনের প্রশ্ন ছাড়াও অন্য প্রশ্নও ছিলো।

ভাইয়েরা অবশ্য নিয়ে যেতে চেয়েছিল সম্মানের সঙ্গেই, তবুও এক্ষেত্রে সবিতা রাজি হয়নি, তার সূক্ষ্ম আত্মসম্মানে বেধেছিল। এর আগে কিছুদিনের জন্য একবার বাপের বাড়ীতে থেকে এসেছিল সবিতা, তখন থেকেই মনে হয়েছিল পূর্ব স্নেহ-সম্বন্ধগুলোয় যেন চিড় ধরেছে, তাই মাখনকৃষ্ণের সঙ্গেই বেরিয়ে পড়লো।

তারপর এই বারো চৌদ্দ বছর ধরে কোথায় না ঘুরলো ওরা? কিন্তু স্বভাব যাবে কোথায়? মাখনকৃষ্ণ না পারলো কোথাও স্থির ভাবে থাকতে আর ভদ্রভাবে কাজ কর্মকরতে। যেখানেই যায় প্রথম কিছুদিন ভালোভাবে কাজ কর্ম করে তার পরেই স্বভাব প্রকাশিত হয়ে যায়। শুধু মাত্র মাতলামি অসভ্যতাই নয়, বড় বড় কথা বলা, কাজে অমনোযোগিতা—আরো সব কুৎসিত নোংরা অভ্যাস।

ব্যাপার দেখে সবিতা প্রমাদ গুনলো, মনকেও ধীরে ধীরে শক্ত করলো। অনেক ভেবে চিন্তে স্বামীকে একদিন বললো" দেখো চাকরী করা তোমার কাজ নয় ওসব তোমার দ্বারা হবেনা। তার চেয়ে তুমি স্বাধীনভাবে কোন ব্যবসা বা ছোটখাটো কোন দোকান কর—সেটাই তোমার পক্ষে ভালো হবে। আর সম্ভব হলে তাতে আমিও কিছু কিছু সাহায্য করতে পারবো, তুমি কাজ আরম্ভ করে দাও কিছু ভেবোনা আমিতো আছি যাহোক করে সংসারটা চালিয়ে নেবো।"

সবিতার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে এই প্রথম বোধ হয় একটু অবাক হলো মাখনকৃষ্ণ! তখনো তার সারা গা' নীল কালশিরার দাগে পরিপূর্ণ, পায়ের কাছে লাঠির ক্ষত তখনো ভালো করে শুকোয়নি, শুকনো রক্ত জমাট বেঁধে আছে। বিশেষকরে শীর্ণ গৌরবর্ণ মুখে বড় বড় আয়ত চোখের পাশে কাজল টানার মতোই নীল দাগ জ্বল জ্বল করছে।

সেইদিকে তাকিয়ে—এই বোধ হয় প্রথম মন বিচলিত হলো মাখনকৃষ্ণের। ধীরে ধীরে বললো, "কিছু যে করবো কিন্তু টাকা কই?"

"সত্যি বলছি শোভনের মা, স্বাধীন ভাবে থাকতে না পেয়ে আমার এই দশা! নাহলে আমায় যতো মন্দ ভাবছো আমি তত মন্দ নই। বুঝলে কিনা আমার আর চাকরী পোষায়না, নাহলে কি আর তোমাদের সুখে রাখতে চেষ্টা করিনা?"

সবিতা আর কিছু না বলে ম্লান হেসে, গোপার হার আর বালা দুগাছা এবং শাশুড়ির দেওয়া লুকোনো টাকা থেকে কিছু বার করে দিলো, সেই হলো গোড়া পত্তন।

সবিতা বিয়ের পর প্রথম যখন শ্বশুর বাড়ীতে যায় তখন জমিদার বংশের শেষ ঐশ্বর্য্যের প্রতীক ঝর্ঝরে লক্করে মোটর গাড়ী ছিল, তার জন্যেই হোক আর যে ভাবেই হোক মাখনকৃষ্ণ গাড়ী ড্রাইভিং ও মোটর মেকানিকটা ভালো ভাবেই শিখেছিল। সেই বিদ্যাটা এখন কাজে লেগে গেলো। আর একজন মিস্ত্রীকে রেখে একটা ছোট্ট মত গ্যারাজ খুলে বসলো মাখনকৃষ্ণ।

প্রথম প্রথম এতে খুবই পরিশ্রম করতে লাগলো মাখনকৃষ্ণ, ক্রমে ক্রমে দু'পয়সা আয়ও হতে লাগলো এবং মিস্ত্রীর সংখ্যা বেড়ে বেড়ে চারজন হলো। আর এদিকেও সবিতা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলো না, সেও কিছু কিছু কাজ কর্মের চেষ্টা করতে লাগলো। সেও প্রাইমারী ইস্কুলে পড়িয়ে পার্টটাইম সেলাই মিস্ট্রেসের কাজ করে এবং সেলাই-এর অর্ডার সংগ্রহ করে কিছু কিছু উপার্জন করতে লাগলো।

না করেও কোন উপায় ছিলোনা সবিতার, কারণটা ভাবতে ভাবতে মুখটা কুঞ্চিত ও কঠিন হয়ে ওঠে, শ্বশুরবাড়ী ছাড়বার পরেও তার সংসারে একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আরো দুজন অতিথি এসে উপস্থিত হয়েছিল। প্রমত্ত তাণ্ডবতাকে রোধ করবার মতো বাহুবল সবিতারছিলোনা, আপ্রাণ প্রতিরোধ করেও প্রত্যেকবার পশুশক্তিকে পরাস্ত করা অসম্ভব ছিলো। তাই এখনো স্বামীর স্বভাবকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেনি সবিতা।

তবুও বড় ছেলে-মেয়ে দুটির কথা মনে পড়তে মুখ একটু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সবিতার, ক্লাসে বৃত্তি পাওয়া ছেলে-মেয়ে ওরা, মায়ের দুঃখ ওরা অনেকটা অনুভব করে, বড় হবার জন্যে তাই ওদেরও চেষ্টার অন্ত নেই। শোভন

সামনের বার পরীক্ষা দেবে, সকাল বিকেল দুটো টিউসনী সে করে এতো কাজের মধ্যেও। আর গোপা সেওতো আজ কিছু দিন হলো স্থানীয় মেয়েস্কুলের হেড মিস্ট্রেসের বোনের ছোট মেয়ে দুটিকে পড়ায়, তিনি টাকা ১০।১৫ দেন।

এমনকি গোপার পরে ১১।১২ বছরের শিউলি সেও পর্য্যন্ত সামনের বাড়ীর রায়বাহাদুরের বড় বৌমার কোলের বাচ্চাদুটিকে বিকেলের দিকে দেখে, পার্কে বেড়াতে নিয়ে যায়। তাতে তাঁরাও দয়াপরবশ হয়ে এটা সেটা, জামা কাপড় ছাড়াও হাতখরচও সামান্য কিছু দেন।

নিজের মনেই একটু হাসলো সবিতা, স্বামীর রোজগারের ওপর ভরসা করে থাকলে তাদের আজ বেঁচে থাকতে হতোনা। এই সংসারটাকে ভদ্র করবার জন্য সারাজীবন ধরে আপ্রাণ চেষ্টা করছে সবিতা, ভ্রূ কুঞ্চিত করে ভাববার চেষ্টা করতে লাগলো কিন্তু তাতে কতটা সফল হয়েছে? কিছুই কি হয়নি, পরিবর্ত্তন কি একেবারেই আসেনি—কে জানে? আশা নিয়েই তো মানুষ বেঁচে থাকে!

এবারে একটু নড়েচড়ে বসলো সবিতা, কিন্তু প্রায় তিনমাস হতে গেলো নিজের হাতে গড়া প্রায়-প্রতিষ্ঠিত কারবারটা ফেলে গেলো কোথায় মানুষটা?

আজ চার বছরের বেশি হয়ে গেলো তারা এখানেই আছে। মাখন মিস্ত্রীর মোটর কারখানায় ইদানিং খরচ খরচা বাদ দিয়ে রোজগার নেহাৎ মন্দ হতোনা।

যদিও সেই রোজগারের অতি অল্পভাগই সবিতার হাতে এসে পৌছতো, কারণ নিজের স্বভাবকে কেউ অতিক্রম করতে পারেনা, মাঝে মাঝে হৈ হল্লা, তর্জন গর্জন, রক্ত চক্ষু দর্শন, এ হতোই—ছেলে মেয়েরাও অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। তবু যা পাওয়া যায় তাইই লাভ আগের চেয়েতো ভালো এই ভেবে সবিতাও চুপ করে থাকতো। তাছাড়া মনের কোণায় একটা প্রচ্ছন্ন অবজ্ঞা ও সুতীব্র ঘৃণা লুকিয়ে ছিলো! হয়তো নীরব থাকবার এও একটা কারণ।

তার স্বামী পাশে থাকলে, আছে এই পরিচয়টুকু মাত্র থাকায় এইসব আধা বস্তী জায়গায় অনেক সময় অনেক রকম বাইরের আপদ বিপদ থেকে তো রক্ষা পাওয়া যায়।

সারা জীবন ধরে এত দুঃখ কষ্ট, নিদারুণ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেও ম্লান কৌমুদীর মতো সৌন্দর্য্য যেন যাই যাই করেও এখনো যায়নি, প্রতিপদের চাঁদের মতো কিছু কোমল আভা এখনো যেন রয়ে গেছে। তাছাড়া নানা কাজে সবিতাকে বার হতে হয়,কাজেই স্বামী নামের কবচ-কুণ্ডল ধারণ না করলে রাতবিরেতে বিপদ হবার সম্ভাবনা আছে।

কিন্তু ভেবে আশ্চর্য্য লাগে স্বাধীন ভাবে কাজ করতে করতে মাখন মিস্ত্রীর কিছুটা নেশাও জমে গিয়েছিলো কাজের ওপর, পাল পার্বণে কাজ পড়লে দৈনিক রোজ দিয়ে ২।৪ জন মিস্ত্রী নিয়ে এসে কাজ করাতো মাখন মিস্ত্রী, সেই মানুষটা হঠাৎ যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

সবিতার দৃষ্টি ঘুরে যায়—সামনেই একটা লোহার রডে টাঙানো তেলকালিঝুলি মাখা, গোটা দুই তিন খাঁকি ট্রাউজার্স ও বুশ্ সার্ট ঝুলছে। মন মেজাজ ভালো থাকলে মাখনকৃষ্ণ হেসে হেসে বলতো, "জানো সবিতা এগুলো আমার অফিসিয়াল্ পোষাক, বুঝলে মাখন মিস্ত্রীর মতো মিস্ত্রী আর এ তল্লাটে মিলবেনা তা বলে দিচ্ছি কিন্তু। কতদিন কত রঙের কত ঢংয়ের রকম রকম গাড়ী পরীক্ষা করার আনন্দই অন্য রকম।"

আবার কোন কোন দিন দাঁত বার করে বলতো, "নিত্যি নূতন বউ পরীক্ষাতো আর সম্ভব হয়না, তার চেয়ে গাড়ী পরীক্ষাই ভালো—তাইই বা কম কি, কি বল?" বলতে বলতে মনের আনন্দে হেসে ফেলতো হো হো করে, কখনো সবিতার চিবুকটা তুলে ধরে দু'চার কলি ফিল্ম গানের সুর ভাঁজতো!

এই রকম লঘু অভব্য রসিকতায় সবিতার মুখ লাল হয়ে উঠতো। তবুও সেই গাড়ী আর গ্যারাজ ছেড়ে গেলোইবা কোথায়! ভেবে ভেবে একটা দীর্ঘ শ্বাস পড়ে সবিতার।

এই দারুণদুর্দ্দিনের বাজারে এতগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে কি করে যে সংসার চালাচ্ছে, সেকথা সবিতাই জানে। এখনো যে গ্যারাজটা উঠে যায়নি তার কারণ পুরোনো বুড়ো রতন মিস্ত্রীর গুণে, ওরই সততা ও পরিশ্রমের ফলে। ওই কোন রকম করে ২।১ জন মিস্ত্রী নিয়ে চালিয়ে দিচ্ছে, যাহোক্ কিছু টাকা পয়সা যে ওরই জন্যে ঘরে আসে, সে কথা ভেবে কৃতজ্ঞ না হয়ে পারেনা সবিতা, নিশ্চিত অনা-

হারে মৃত্যুর হাত থেকে এক রকম ওই রক্ষা করছে বলতে গেলে। অথচ ধরতে গেলে সেতো কেউ নয়।

মনে পড়লো কয়েকদিন আগে সেই বলেছে, "মা সামনের বারে শোভন দাদা পাশ করলে ওকে এই কাজে লাগিয়ে দিও দু'পয়সা ঘরে আনবে।"

কে জানে ভাগ্যে শেষ পর্য্যন্ত কী আছে। শেষ পর্য্যন্ত ওরা মানুষ হবে কিনা কে জানে?

ওরা উচ্চশিক্ষিত হবে, দেশের দশের একজন হবে··· মায়ের মনের সব আশাই নৈরাশ্যে পরিণত হবে? কত স্বপ্ন কত কল্পনাই যে জাগে ওদের নিয়ে কিন্তু······আবার একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে।

হঠাৎ হৈহৈ কলরোল শুনে চমক ভাঙ্গে সবিতার, ছেলে মেয়েরা সব এসে পড়েছে, এইবার উঠে খেতে দিতে হবে, নাঃ আজ আর সেলাই হবেনা। ভালোও লাগছেনা কিছু। উঠবো উঠবো করেও উঠতে ভুলে যায় সবিতা, রুক্ষ এলো-মেলো চুলগুলো সরিয়ে দিতে মনে থাকেনা তার।

মা! মা! কেন অমন করে বসে আছো, অসুখ করেছে নাকি তোমার?

না না কিছুই হয়নি আমার, কোথায় ছিলি বাবা এতক্ষণ?

সুদর্শন, দীর্ঘ দেহী, স্কাউটের পোষাক পরা ছেলের দিকে চেয়ে আবার বলে, রতনের কাছে কি একবার গিয়েছিলি, খোঁজ খবর কিছু পেলো সে?

মায়ের দিকে চেয়ে হাসিমুখে শোভন বললো "জানো মা আমাদের ইস্কুলে আজ বন্দুক ছোঁড়া আর প্যারেড প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে কি পেয়েছি দেখ।"

এই বলে ছোট্ট রিষ্টওয়াচ্ একটা সুন্দর লাল রঙের কেস্ থেকে বার করে দেখাতেই সবিতা আনন্দে বিহ্বল হয়ে গেলো!

শোভন আবার বললো, "জানো মা দেশের এখন যে রকম অবস্থা,তাতে তো এই সব না শিখলে চলবেনা, দেশের তরুণরা যদি অলসতা করে অবহেলা দেখায় সব ব্যাপারে, তাহলে কি করে কী হয়.বলতো মা? আজ হেমেন স্যারও তাই বললেন কিন্তু।

এমন সময়ে মণিকে কোলে নিয়ে এসে গোপা বললো, "আমরা যাওয়ার পর থেকে মণিকে কিছু খেতে দাওনি মা? তোমার শরীর কি খারাপ? রাতের রান্না কি করে রেখে যাবো মা?" এমন সময় ঝড়ের মতো বেগে ছুটে এসে শিউলি আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগলো। সে কী আকুল কান্না।

"কী হয়েছে রে ও শিউলি কি হয়েছে তোর? বল্ কেন অমন করে কাঁদছিস্?" "জানো মা ও বাড়ীর বৌদি মণিবাবার সম্বন্ধে নানা রকম যা তা বলেছে, আমি কিছুতেই আর ও বাড়ীতে যাবোনা—কিছুতেই না।"

সব ছেলে মেয়ের মধ্যে শিউলিই পিতৃভক্ত কন্যা সেটা সবাই জানে। শুধু ও শোভন একটু বিরক্ত কণ্ঠে বললো, "অমনি প্যান প্যান করে না কেঁদে কী হয়েছে খুলে বলবি তো?"

গোপাও একটু স্নেহের স্বরে বললো, "কি হয়েছে বলনা ভাই, দরকার হলে না হয় বৌদির কাছে যাবো শুধু শুধু অপমান সহ্য করবো কেন?"

সস্নেহে শিউলির মুখটা মুছিয়ে দিতে দিতে বলে, কাঁদিসনা বোনটি, কি হয়েছে খুলে বলতো কি ব্যাপার?

অবরুদ্ধস্বরে শিউলি বললো, "অন্য কিছু নয় দিদি, ওবাড়ীর বড়দাদা অনেকগুলো দামী দামী খেলনাপাতি টুকু মুকুর জন্যে এনেছিলেন, আমায় দেখে বললেন, আহা মেয়েটি বড় লক্ষ্মী ওকেও একটা খেলনা দিও। আহা এমন সব ফুটফুটে ছেলে মেয়ে রেখে.বাপ যে কি করে চলে যায় তা বুঝতে পারিনা।"

তাতে কিনা বড় বৌদিমণি বলে উঠলেন, "সে আর তোমায় বলতে হবেনা আমরা না দিলে পাবেই বা কোথায়? ঐতো বাপের ছিরি, সব রকম গুণেরতো ঘাট নেই, দায় দায়িত্ব কিছু থাকলে তো? নিরুদ্দেশ না আর কিছু, কাকে নিয়ে কোথায় যে পালিয়েছেন তার কিছু ঠিক আছে? শিউলির মা খুব শক্ত মেয়ে তাই যাহোক করে অত বড় সংসারটা একা হাতে চালাচ্ছে তো?"

বুঝলে দিদি ঐসব শুনে আমি খুব রেগে গিয়েছিলাম, "তাই শুধু বলেছিলাম যে, বাবা কক্ষনো ইচ্ছে করে ফেলে পালায়নি নিশ্চয় ফরেনে গিয়েছে গাড়ী সারাবার আর গ্যারেজ বাড়াবার যন্ত্রপাতি কিনতে।" জানলে দিদি তাই শুনে বৌদির সে কী খিল্‌খিল্ করে হাসি' এমনকি বড়দা পর্য্যন্ত হাসতে লাগলো।

বৌদি আমায় বললো, "খুব যে বাপের টেনে কথা বলতে শিখেছিস দেখছি! ফরেনে গিয়েছে? হ্যাঁ ফরেনেই গিয়েছে বটে! মোদো মাতাল কোন্ খানা খন্দ-এ পড়ে মরে আছে তার ঠিক কি? আর বাড়ীর ছেলেরাও সব যেমন, মাখন মিস্ত্রীর কারখানা নাহলে গাড়ী সারানোই হয়না? সে গিয়েছে, গিয়েছে, কিন্তু এক মড়াখেকো শকুনিকে পাহারা বসিয়ে গিয়েছে, সে আবার ডবল মজুরী ছাড়া কথাই কয়না!

শিউলীর কথা শুনে সবাই কিছুক্ষণ শুব্ধ হয়ে বসে রইলো। এই ফরেনে যাবার কথাটা মাখনকৃষ্ণের মুখে শোনা যেতো, মাঝে মাঝে বলতো, বিশেষ করে যেন শিউলিকেই বলতো, "দেখবিরে শিউলি ফরেন থেকে এমন সব জিনিষ আনবো যে অল্ ইণ্ডিয়ার মধ্যে সেরা কারখানা হবে, এমন হবে যে দেশ দুনিয়ার লোক দেখতে ছুটে আসবে, এসে সবাই চেয়ে চেয়ে দেখবে বুঝলি।"

সবিতাও নির্বাক হয়ে এতক্ষণ সব কিছু শুনছিল, এইবার উঠে এসে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, কেন রাগ করছিস মা তুইনা টুকু আর মুকুকে খুব ভালো-বাসিস? আর ওরাও তোকে দেখতে না পেলে কাঁদবেনা?

মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ঝাঁপালো কণ্ঠে গোপা বলে ওঠে, "দাদা তুইকি রতন খুড়োর কাছে খবর নিতে যাসনি? না গিয়ে থাকিস বল আমিই যাচ্ছি।"

কতদিন থেকে বলছি কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দে। সেদিন যে থানার থেকে বললো, ভালো মন্দ যাই হোক ওরা অল্পদিনের মধ্যেই অনুসন্ধানের ফলাফল জানাবে, কিন্তু তারই বা হলো কি? পরের কাছ থেকে এই সব কথা সহ্য করাও কঠিন সেটাকি বুঝিসনা? রতন খুড়োর কাছে একবারতো খোঁজ নিলে হতো?"

একবার মায়ের শান্ত গম্ভীর মুখের দিকে আর একবার গোপার ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ মুখের দিকে চেয়ে শোভন এক মিনিট চুপ করে রইলো, তার পর মুখ তুলে বললো, তোরা কি ভাবিস খোঁজ নিইনা? রোজইতো একবার করে যাই, আজোতো গিয়েছিলাম কিন্তু কিন্তু......ঢোঁক গিললো শোভন।

কিন্তু কিরে? বলেই সবিতা মুখ ফেরাতেই শুনতে পেলো সাইকেলের টিং টিং ঘণ্টা ধ্বনি। সেই সময় শোভন বোধ হয় কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু কিছু বলার আগেই শোনা গেলো,—টেলিগেরাম আছে!

কাঁপতে কাঁপতে সবিতা টেলিগ্রামটা সই করে নিলো। প্রথমটা সে যেন কিছুতেই পড়তে পারলো না, ছায়া বাজির মতো অক্ষরগুলো সব সরে সরে গেলো! তার পর একটু স্থির হয়ে আর একবার পড়লো—

সরকার বাহাদুর জানাচ্ছেন—

"লংজু ও নেফা সীমান্তে বিদ্রোহীদের দমন এবং দস্যু হানাদারদের বিতাড়নে অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করে মাখনকৃষ্ণ বসু শহীদ হয়েছেন। তাঁর অমর আত্মার উদ্দেশ্যে সরকার বাহাদুর এবং দেশের জনসাধারণ সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাচ্ছেন। কৃতজ্ঞতার কিছু নিদর্শন স্বরূপ পরবর্তী ইনসি-ওরেন্সে মাখনকৃষ্ণ বসুর বিধবা ও ছেলেমেয়েকে অতুলনীয় বীরত্ব-সূচক পদকটি এবং আপাততঃ চার হাজার টাকা পাঠানো হলো।"

সবিতার হাত থেকে খামখানা পড়ে গেলো! ধূসর সন্ধ্যাকাশে একটি দুটি তারা ফুটে উঠেছে, বেলী ফুলের সুগন্ধে চারদিক ভরপুর।

দীপহীন দাওয়াতে তারা নির্বাক্ বসে থাকলো! কেউ কারো দিকে তাকালোনা!

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীতম্ মহাভারতম্ শান্তিপর্ব্ব

বঙ্গানুবাদ ঃ স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

তানুবাচ সুরান্ সর্বান্ স্বয়ম্ভুর্ভগবাংস্ততঃ
শ্রেয়োঽহং চিন্তয়িষ্যামি ব্যেতু বো ভীঃ সুরর্ষভাঃ ॥ ২৮

এক্ষণে ভগবান্ ব্রহ্মা সে সকল দেবতাদের বললেন—সুরশ্রেষ্ঠগণ, তোমাদের ভয় দূর হয়ে যাওয়া উচিত। আমি তোমাদের কল্যাণের উপায় চিন্তা করব।

ততোঽধ্যায়সহস্রাণাং শতং চক্রে স্ববুদ্ধিজম্।
যত্র ধর্মস্তথৈবার্থঃ কামশ্চৈবাভিবর্ণিতঃ ॥২৯
ত্রিবর্গ ইতি বিখ্যাতো গণ এষ স্বয়ম্ভুবা।
চতুর্থো মোক্ষ ইত্যেব পৃথগর্থঃ পৃথগ্ গুণঃ ॥৩০

তারপর ব্রহ্মা আপনার বুদ্ধিদ্বারা একলক্ষ অধ্যায়ের এক এমন নীতিশাস্ত্র রচনা করলেন যাতে ধর্ম, অর্থ ও কামের বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। যাতে এই তিনটি বর্গের ব্যাখ্যা হ'ল তা' ত্রিবর্গ নামে খ্যাত হল। চতুর্থ বর্গ মোক্ষ—ইহার অর্থও পৃথক্, গুণও পৃথক্।

মোক্ষস্যাস্তি ত্রিবর্গোঽন্যঃ প্রোক্তঃ সত্ত্বং রজস্তমঃ।
স্থানং বৃদ্ধিঃ ক্ষয়শ্চৈব ত্রিবর্গশ্চৈবদণ্ডজঃ ॥৩১

মোক্ষের ত্রিবর্গ পৃথক্ বলা হয়েছে। ইহাতে রয়েছে সত্ত্ব, রজ ও তমের গণনা। দণ্ডজনিত ত্রিবর্গ ইহা হইতে ভিন্ন। স্থান, বৃদ্ধি ও ক্ষয়—এই তিনটিই দণ্ডজ বর্গ। (দণ্ডদ্বারাই ধনবানদের স্থিতি, ধর্ম আদের বৃদ্ধি আর দুষ্টের বিনাশ হইয়া থাকে)।

আত্মা দেশশ্চ কালশ্চাপ্যুপায়াঃ কৃত্যমেব চ।
সহায়াঃ কারণং চৈব ষড়বর্গো নীতিজঃ স্মৃতঃ ॥৩২

ব্রহ্মার নীতিশাস্ত্রে আত্মা, দেশ, কাল, উপচয়, বীর্য এবং সহায়ক এই ছয় বর্গের বর্ণন আছে। এই ছয় নীতি দ্বারা সঞ্চালিত হলে উন্নতি সম্ভব হয়ে থাকে।

ত্রয়ী চান্বীক্ষিকী চৈব বার্তা চ ভরতর্ষভ।
দণ্ডনীতিশ্চ বিপুলা বিদ্যাস্তত্র নিদর্শিতাঃ ॥ ৩৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই গ্রন্থে দেবত্রয়ী (কর্মকাণ্ড) আন্বীক্ষিকী (জ্ঞানকাণ্ড), বার্তা (কৃষি, গো-রক্ষা ও বাণিজ্য) আর দণ্ডনীতি এই বিপুল বিদ্যার নিরূপণ করা হয়েছে।

আমাত্যরক্ষা প্রণিধী রাজপুত্রস্য লক্ষণম্।
চারশ্চ বিবিধোপায়ঃ প্রণিধেয়ঃ পৃথগ্বিধঃ ॥৩৪
সাম ভেদঃ প্রদানং চ ততো দণ্ডশ্চ পার্থিব ॥
উপেক্ষা পঞ্চমী চাত্র কাৎস্নেন সমুদাহৃতা ॥৩৫

ব্রহ্মা সেই নীতিশাস্ত্রে মন্ত্রীদের রক্ষা, প্রণিধি (রাজদূত) রাজপুত্রের লক্ষণ, গুপ্তচরদের বিচরণ করবার বিবিধ উপায়, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের গুপ্তচরদের নিযুক্তি, সাম, দান, ভেদ, দণ্ড ও উপেক্ষা—এই পাঁচ উপায়ের পূর্ণরূপে প্রতিপাদিত করেছেন।

মন্ত্রশ্চ বর্ণিতঃ কৃৎস্নস্তথা ভেদার্থ এব চ।
বিভ্রমশ্চৈব মন্ত্রস্য সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোশ্চ যৎ ফলম্ ॥৩৬

সকল প্রকারের মন্ত্রণা, ভেদনীতি প্রয়োগের প্রয়োজন, মন্ত্রণাতে যে ভ্রম হতে পারে, বা তার প্রকাশ হয়ে পড়ার ভয়, তথ মন্ত্রণায় সিদ্ধি ও অসিদ্ধির যা ফল,—তার বর্ণনা আছে এই শাস্ত্রে।

সন্ধিশ্চ ত্রিবিধাভিখ্যো হীনো মধ্যস্তথোত্তমঃ।
ভয়সৎকারবিত্তাখ্যং কাৎস্ন্যেন পরিবর্ণিতম্ ॥৩৭

সন্ধির তিন ভেদ—যথা উত্তম, মধ্যম ও অধম। তার মধ্যে আবার বিত্তসন্ধি, সৎকার সন্ধি ও ভয় সন্ধি এই তিন প্রকার ভেদ রয়েছে। গ্রন্থে এ সকল বিচারপূর্ব্বক বর্ণিত হয়েছে।

যাত্রাকালাশ্চ চত্বারস্ত্রিবর্গস্য চ বিস্তরঃ।
বিজয়ো ধর্মযুক্তশ্চ তথার্থ বিজয়শ্চ হ ॥৩৮
আসুরশ্চৈ বিজয়স্তথা কার্ৎস্নেন বর্ণিতঃ।
লক্ষণং পঞ্চবর্গস্য ত্রিবিধং চাত্রবর্ণিতম্ ॥৩৯

শত্রুর উপর আক্রমণ করার চার অবসর, ত্রিবর্গের বিস্তার, ধর্মবিজয়, অর্থবিজয়, তথা আসুর বিজয় এরও পূর্ণ রূপে বর্ণনা রয়েছে এই গ্রন্থে। মন্ত্রী, রাষ্ট্র, দুর্গ, সেনা এবং ধনভাণ্ডার এই পাঁচ বর্গের উত্তম, মধ্যম এবং অধম এই তিন প্রকারের লক্ষণও প্রতিপাদিত হয়েছে।

(ক্রমশঃ)

নীল খাম

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

বিদায় নেয়ার আগে চোখে চোখ রেখে বলেছিলে :
যা দিলাম এই হৃদয়ের আঁলো জ্বেলে-জ্বেলে,
—এই ব'লে দিয়েছিলে দুই হাত দু' মুঠিতে ঢেলে।

যে-পাখি পাখনা মেলে আকাশের অবারিত নীলে
সবুজ পাতায় ডালে রকমারি ফুলে গাঙে ঝিলে
স্বগত স্বভাবে ভেসে যেতে চায় তৃণ মাটি ফেলে,
সে কী করে নেমে এল কয়মুচা দুই ঠোঁট মেলে
বুঝতে পারিনি, আছে কুয়াশাও আলোর নিখিলে!

বুঝতে পারিনি, নাকি পৃথিবীর এই-ই নিয়ম
সব কিছু মাটি চাপা পড়ে যায় মমীর মতন
তা' না হলে স্মৃতি মুখ মুছে যায়?—চটুল নয়ন
যে-নয়নে উপচায় একতাল হাসির পশম?

পুরোনো বইয়ের ভাঁজে আজ দেখি শুধু এক নাম
টিকে আছে দু' ছত্রের লেখা চিঠি ছেঁড়া নীল খাম॥

শ্রীবিমলকুমার সুর

ফাল্গুন মাস কেমন যাবে ?

ফাল্গুন মাসের গ্রহ সন্নিবেশ আনন্দপ্রদ নয়। প্রথমতঃ গ্রহরাজ রবি মঙ্গল ও বরুণগ্রহদ্বয়ের সহিত বৈর দৃষ্টিতে আবদ্ধ। রবি সকল দেশের রাজ সরকার, উচ্চ প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদিগের কারক কাজেই এঁদের নানা বিঘ্ন বাধা ঝঞ্ঝাট ও গুপ্ত শত্রুতা ভোগ করতে হবে। কোন কোন মানী লোকের রাজনৈতিক পতন, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা কোন কোন স্থানে দুরূহ হয়ে পড়তে পারে। এখন কোন সরকারের পক্ষেই stiff line না গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয় কারণ তাতে ঝগড়া-ঝঞ্ঝাট বাড়বে বেশী, কমবে না।

যাই হোক্ এবার ব্যক্তিগত মাস ফল দেখা যাক্।

বৈশাখ—বৈশাখ মাসে যাঁদের জন্ম তাঁদের কর্ম-তৎপরতা বাড়বে। প্রতিষ্ঠার দিকেও খারাপ নয়, তবে বেশ খানিকটা লড়ে নিজের অধিকার ঠিক রাখতে হবে। মধ্যে মধ্যে ঝঞ্ঝাট দুশ্চিন্তা ভোগ করতেই হবে এমন কি নিজের জেদবশতঃ কতকগুলি ঝামেলা না নিয়ে বসেন এই কথাই ভাবছি। ব্যয় আপনার বেশ চলছে, চলবে। এ থেকে এত তাড়াতাড়ি রেহাই নেই। কাজেই কিছু জমাবার কথা ভুলে যান। স্ত্রীর বা স্বামীর শরীর তত ভাল থাকার কথা নয়। তিনি অন্যান্য কারণে মানসিক বিব্রত থাকবেন। সন্তান সংক্রান্ত হঠাৎ কিছু ঝঞ্ঝাট অসম্ভব নয়। যাঁরা পড়াশোনা করছেন, তাদের কোন প্রকার অবহেলা বাঞ্ছনীয় নয়। বরং বেশী চাপ এসে পড়ার কথা। বেশী গরম জিনিস খেয়ে উদরের গরম বৃদ্ধি করবেন না। যাঁরা ব্যবসায়ী তাঁরা আয়ের চেয়ে ব্যয় সঙ্কোচের কথা বেশী ভাবুন।

জ্যৈষ্ঠমাস—যাঁদের জ্যৈষ্ঠমাসে জন্ম তাঁদের ফাল্গুন মাস কেমন যাবে শুনুন। আয় ভাল রকম বৃদ্ধি পাবে। কর্মে প্রতিষ্ঠা পাবেন। আত্মীয়-স্বজন বা প্রতিবেশী নিয়ে ঝঞ্ঝাট এসে পড়তে পারে। পড়াশোনার পক্ষে ভালই। যাঁদের সন্তান সন্ততি আছে তাঁরা তাঁদের সম্বন্ধে ভাল ব্যবস্থা করতে পারবেন। পতি বা পত্নীর মেজাজ খুব ভাল থাকবে না। তাঁকে কতটা প্রাধান্য দিতেই হবে। যাঁরা ব্যবসা বাণিজ্য করেন, তাঁদের উৎসাহ নিয়ে কাজে লেগে যাওয়া উচিত। যেটুকু অসুবিধাই আসুক দূর হয়ে যাবে।

আষাঢ় মাস—যাদের আষাঢ় মাসে জন্ম, তাঁদের ফাল্গুন মাসের গ্রহফল মন্দ নয়। কর্ম ব্যাপারে অসুবিধা ঝঞ্ঝাট যা চলছিল, তা থেকে অনেকটা রেহাই পাবেন। এবং কতকটা লাভ ওঠাতেও পারবেন। বিদ্যা ব্যাপারেও কতকটা অসুবিধা সত্ত্বেও সুফল লাভ করবেন। সাংসারিক বিশৃঙ্খলা কিছু এসে যেতে পারে, তবে ঘাবড়াবার মত কিছু নয়। আপনার বিক্রম, তেজ বজায় থাকবে। কেহ শত্রুতা করতে এলে, ইচ্ছে করলে তাকে কতকটা রগড়ে দিতে পারেন, অবশ্য তার জন্য কতকটা দুশ্চিন্তা স্বীকার না করে উপায় নাই। সন্তানদের জন্য সুব্যবস্থা করবার ইচ্ছা থাকলে অগ্রসর হোন্।

শ্রাবণ—শ্রাবণ মাসে যাঁদের জন্ম তাঁদের ফাল্গুন মাস খারাপ কি? অর্থ সংক্রান্ত নিরাপত্তা, বিদ্যা বুদ্ধির পক্ষে সুবিধা, সন্তানদের তৎপরতা, ভক্তিমার্গে উন্নতি আশা করতে পারেন। ব্যবসায়ী ব্যবসা প্রসারের চেষ্টা করতে পারেন। সাংসারিক কতক ঝঞ্ঝাট বা দায়িত্ব এসে পড়লেও, শেষ পর্য্যন্ত ভাল ব্যবস্থা করতে পারবেন। মায়ের শরীর উদ্বেগজনক হতে পারে, কিন্তু বিপদ ঠিক্ দেখছি না, কর্ম্ম ব্যাপারে পড়াশোনা করলে ভাল ফল পাবেন।

ভাদ্র—ভাদ্র মাসে যাঁদের জন্ম তাঁরা ফাল্গুন মাস ঠিক আনন্দে কাটাতে পারবেন না। জ্ঞাতি, আত্মীয় স্বজন বা প্রতিবেশী নিয়ে ঝঞ্ঝাট ভোগ করতে হতে পারে। অর্থোপায় করতে ক্লেশ স্বীকার বেশী করতে হবে। নিজের আত্মম্ভরিকা নিয়ে বসে থাকলে কাজ হবে না। বরং পরের সঙ্গে যতটা মিশিয়ে যেতে পারবেন, ততটা কাজ হবে। সাংসারিক বিষয়ে চিন্তার কোন কারণ নাই। কর্ম দায়িত্ব ও ঝঞ্ঝাট ভোগ করতেই হবে। পিতার উদ্বেগ ঝঞ্ঝাট কিছুটা আসা অসম্ভব নয়। তিনি নানাভাবে ব্যস্ত থাকতে পারেন। নিজের কাজেরও যেন শেষ নাই।

আশ্বিন—যাঁদের আশ্বিন মাসে জন্ম তাঁদের ফাল্গুন মাসটা মন্দ যাবে না। ব্যবসা সংক্রান্ত সুবিধা বা লাভ আশা করতে পারেন। যে চাপ এতদিন থাচ্ছিলেন তা অনেকটা কম হবার কথা। বুদ্ধি হিসাবও আপনার ভাল কাজ করবে। আপনার প্রতিষ্ঠা ত বজায় থাকবেই প্রয়োজন হলে শত্রুদমনে এগিয়ে যান। বাড়ীঘর সম্বন্ধে যদি কোন উন্নয়ন বা সুখ সুবিধা বা কোন ভাল ব্যবস্থা মনস্থ করে থাকেন তা'হলে কাজে এগিয়ে যান। সন্তানদের সম্বন্ধেও কিছু সুব্যবস্থা সম্ভবপর হবে। বিবাহ বা প্রীতি বিনিময় সুবিধাজনক। ব্যবসায়ী হলে লোককে কিসে খুসি করা যায় সেই দিকটা ভাবুন, তাতে কাজ বেশী হবে।

কার্ত্তিক—আপনার ফাল্গুনমাসের গ্রহবার্ত্তা শুনুন। অর্থ রোজগার ভাল হবে। ব্যবসায়ী হলে, ব্যবসা ভাল চলবে। অবশ্য অর্থসঞ্চয় বেশী করতে পারবেন না। জ্ঞাতি আত্মীয় নিয়ে একটু বেশী জড়িয়ে যেতে পারেন। গৃহে সদালোচনা, পূজা পার্ব্বণের পক্ষে ভাল। বিদ্যায় শুভ ফল পাবেন অবশ্য একটু বেশী খাটলে। এ মাসে কর্ম্মব্যস্ততা বেশী। নানান কাজে ছড়িয়ে পড়ে আসল লাভ পিছিয়ে ফেলতে পারেন। ধর্ম্মচর্চার পক্ষে ভালই। যদি কোন শত্রুতা থাকে আপোষে মিটিয়ে নিলেই শান্তি পাবেন বেশী। ঝগড়া ধরে না রাখাই ভাল।

অগ্রহায়ণ—অগ্রহায়ণ মাসে যাঁদের জন্ম তাঁরা ফাল্গুন মাস মোটামুটি ভালই কাটাবেন। মনের জোর বা তেজের অভাব হবে না। স্বাধীন আবহাওয়া পাবেন। তবে তামসিক ভাবে আচ্ছন্ন যাতে না হন সেই দিকটা লক্ষ্য রাখবেন। কারণ সব জিনিষ হাতের কাছে আপনি আসেনা। কতকটা নিজের কক্ষ থেকে বেরিয়ে পড়ে পরের সাহায্য কামনা করলে ঠিক মান যায়না, বরং লাভ হয় বেশী। অর্থ রোজগার বেশ ভাল দেখি। তবে বেশী টাকা-টাকা করবেন না, এবং মেজাজটা সব সময় কড়ার উপর না রাখলেই ভাল। আপনার পক্ষে উত্তপ্ত আবহাওয়ায় থেকে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। নচেৎ গোলমালের আবর্ত্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন।

পৌষ—আপনি ফাল্গুন মাসে ব্যবসায় বা অন্যপ্রকার কর্ম্ম থেকে ভাল অর্থ পেতে পারেন। কিন্তু আপনার খরচও কিছু তোলা আছে। কাজেই যতটা পারেন ব্যয় সঙ্কোচ করুন। যাঁরা দালালি করেন তাঁদের মুখের তোড় উঠবে তুবড়ীর মত। কাজেই ব্যবসা বিস্তারের চেষ্টা করতে পারেন নিজে নিজে, পরের উপর নির্ভর করে নয়। ঘর দোর সম্বন্ধে কোন বিলিব্যবস্থা করতে পারেন এই মাসে। ঠকবেন না। বিদেশ যাবার ইচ্ছা থাকলে তোড়জোড় করুন। ধর্ম্ম ব্যাপারে অগ্রসর হতে পারবেন।

মাঘ—মাঘ মাস যাঁদের জন্মমাস তাঁরা ফাল্গুন মাস ভালোই কাটাবেন। বুদ্ধিটা খুলবে ভাল। মনটা সজাগ ও বিনয়ী থাকবে। নানাভাবে অর্থাগম হবে। নিজের প্রতিষ্ঠা ভালই থাকবে। উৎসাহ নিয়ে যতটা কাজে লাগতে পারবেন ততই লাভজনক। পড়াশোনার ব্যাপারেও ভাল দেখি। কর্ম্ম দায়িত্ব এসে পড়লেও আপনি সুশৃঙ্খলে সব চালাতে পারবেন। আত্মোন্নতির পক্ষে ফাল্গুন মাস ভালই যাবে।

ফাল্গুন—আপনাদের জন্মমাসের ফল মন্দ নয়। ব্যবসায় ভাল চলবে। সন্তানদের জন্য বেশ কিছুটা ব্যয় করতে হবে। ধর্ম্মব্যাপারে উন্নতিলাভ করতে পারবেন। যাঁরা

বিবাহ করেন নি, তাঁদের পক্ষে বিবাহের যোগাযোগ ভালই। অন্যান্যদের পক্ষে প্রণয়াদি ঘটার যোগাযোগ দেখা যাচ্ছে। শঙ্কা করবেন না। Loveএ লাভ আছে, লোকসান হবেনা। এ মাসে সাংসারিক দায়-দায়িত্বে বেশী জড়িয়ে থাকতে পারেন। বন্ধু বান্ধব সমাগম বা মিলনও বেশী আশা করি। গৃহবাটী সংস্কারের প্রয়োজন বোধ করলে আরম্ভ করুন। মাতা যাঁদের জীবিত, তাঁদের মাতৃবিষয়ক দায়-দায়িত্ব বা উদ্বেগ হতে পারে। কর্মময় মাস বলে ধরে নিতে পারেন। Police বা Military বৃত্তির পক্ষে ভাল।

চৈত্র—চৈত্র যাঁদের জন্মমাস তাঁদের ফাল্গুন মাস মোটামুটি ভালই। বিবাহের ভাল যোগাযোগ আছে। প্রেম প্রীতি ব্যাপারেও লাভ ছাড়া লোকসান নাই। যোগ, ধ্যান, ধর্মচর্চ্চায় পক্ষে শুভ। আত্মীয়-স্বজন নিয়ে বিভ্রাট আসতে পারে। বেশ কিছুটা ব্যয়ও এড়াতে পারবেন না। তবে আয় ত খারাপ দেখি না। গৃহবাটী, বন্ধুবান্ধব, মাতা বা ব্যবসা থেকে লাভ দেখা যায়। যাঁরা আইন ব্যবসায়ী বা চিকিৎসক তাঁদের সময় ভালই যাবে। যাঁরা দালালি করেন তাঁদেরও মরশুম খারাপ যাবে না।

দেবী ও মানসী

দিলীপ দাশগুপ্ত

রূপরস শব্দগন্ধবর্ণস্পর্শ সবার অতীত
তবুও সকলি আছে।
স্থূলদেহে সূক্ষ্ম মন তবু একবার
অলৌকিক কী ঝংকারে বেজে বেজে ওঠে!

তিমির-বিদীর্ণ সেই আলোকের পথে
তখন প্রত্যক্ষ-কৃপা পাই অকৃপণ!
চন্দ্রসূর্যনক্ষত্রের, পর্বতসমুদ্রমৃত্তিকার,
সব শক্তি নিঃশেষিত :

বিজ্ঞান, বিস্ময়-ব্যূহ ভেদ ক'রে সেই
আশ্চর্য সুন্দর লগ্নে মহা আবির্ভাব!!
যুক্তি নেই, ব্যাখ্যা নেই, শুধু অনুভূতি,
শুধু সেই প্রত্যক্ষের অপার্থিব দান,
সব কিছু ব্যর্থ করা অব্যর্থ প্রকাশ
বিস্ময়ের, লাবণ্যের প্রেমের প্রতীক!
দেবী ও মানসী হ'য়ে ওঠে একাকার
শতধা আমিত্ব যেন এক হয়ে ওঠে।
সেই লগ্নে আমি হই দ্বিতীয় ঈশ্বর।

পরমায়ু বৃদ্ধির পথ :

পঞ্চদশ শতকের ভেনিশিয় ভদ্রলোক স্বর্গত কর্ণারো দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন অর্থাৎ একশত বৎসরের বেশী বেঁচেছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি অনেক রোগে ভুগেছেন—বিশেষ করে পেটের পীড়ায়। অনেক চিকিৎসা করিয়েছিলেন, কিন্তু কোন ফল হয় নি। শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই নিজের চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। তাতে শুধু আরোগ্য লাভ করেন নি—তিনি উত্তম স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ আয়ু লাভ করলেন। তিনি সে সব বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন, তা বড় চমৎকার ও মূল্যবান্।

তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে বিষণ্ন মন, রুক্ষ মেজাজ, ক্রুদ্ধ স্বভাব পেটের স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে—পেটের স্বাস্থ্য এই সকল মনের ভাবে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দেয়। তাই তিনি নিজের মনটাকে প্রসন্ন রাখার দিকে বিশেষ নজর দিলেন। তারপর স্থির করলেন আহারে সংযত হবেন। ক্ষিধে পেলেই খেতে বসতেন, কিন্তু ক্ষিধে নিবৃত্ত হবার আগেই খাবার টেবিল ছেড়ে উঠে পড়তেন। এই দুইটি নিয়ম পালনই তাঁকে শতবর্ষাধিক সুস্থ জীবন দান করেছিল।

সত্যজিৎ বসু
কলিকাতা।

প্রাচীন শস্ত্র ও বর্তমান জগৎ :

মহাভারতের শান্তি পর্বে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরের প্রতি উপদেশের সময়ে ব্রহ্মা বিরচিত একলক্ষ অধ্যায় বিশিষ্ট এক নীতিশাস্ত্রের উল্লেখ করেছেন। সেখানে যে সকল দণ্ড-নীতি, রাজনীতির সামান্য উল্লেখ আছে তাতেই বুঝতে পারা যায়—কতদূর গভীর ও বিস্তৃত ছিল প্রাচীন ভারতীয়-দের রাজনৈতিক বুদ্ধি। বিজয়ের পন্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ভীষ্ম বলেছেন :—

বিজয় তিন প্রকার, যথা—

> বিজয়ো ধর্মযুক্তশ্চ তথার্থে বিজয়শ্চ হ।
> আসুরশ্চৈব বিজয়স্তথা কাৎর্স্ন্যেন বর্ণিতঃ॥

অর্থাৎ ধর্মবিজয়, অর্থ বিজয়, আসুর বিজয়। এই তিন প্রণালীতেই বিজয়ের চেষ্টা আমরা বর্তমান বিশ্বেও দেখতে পাই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রসকল যে কিভাবে অর্থদ্বারা বা আসুরিক শক্তিদ্বারা দেশ জয়ের চেষ্টায় আছেন তা সকলেই দেখতে পাচ্ছেন। সম্প্রতি কালে ধর্ম বিজয়ের ঘটনা বড় দেখতে পাওয়া যায় না। শুধু প্রাচীন কালের ভারতই সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, যাভা, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ ধর্ম দ্বারা জয় করেছিলেন জানা যায়।

কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনায় আবার আমেরিকার ধর্মজয় ও অর্থজয়ের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। জানা যায় সুকর্ণের রাজত্বকালে ইন্দোনেশিয়াতে কম্যুনিষ্ট ও মুসলমান সন্ত্রাসবাদীদের উৎপাতে খৃষ্টানগণ উৎসন্নে গিয়েছিল। কিন্তু সুকর্ণবিরোধী কুড়ি মাসের আন্দোলনের সময়ে রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেষ্ট্যান্ট চার্চ ২,৫০,০০০ ইন্দোনেশিয় লোককে ধর্মান্তরিত করেছে। জাকার্তায় পঞ্চাশটি নূতন বাইবল্ স্টাডি গ্রুপ রচিত হয়েছে। বাইবলের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে সর্বত্র। ইউ, এস ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব চার্চেস্ তিন লক্ষ ডলার

ব্যয়ে নব দীক্ষিতদের সাহায্যদানের পরিকল্পনা রচনা করেছেন। ইহা যে বর্তমান যুগের ধর্মবিজয় ও অর্থবিজয়ের এক অভ্রান্ত দৃষ্টান্ত তা বলাই বাহুল্য। আর এই দুই পন্থা যে আসুরবিজয় পন্থার চেয়ে শ্রেষ্ঠ তা উত্তর ভিয়েতনামেই অ্যামেরিকা হাতে নাতে প্রমাণ পেয়েছে।

সুকোমল সেন
কলিকাতা

রূপ বদল

একদল দুর্বুদ্ধি লোক চীৎকার করছে ভারত এখনও স্বাধীন হয়নি। কিন্তু ইংরেজ চলে যাবার পর যে আমরা কত দিক থেকে মুক্তি লাভ করেছি তা তারা চোখ খুলে দেখতে রাজী নয়। এখন যে কোন লোক তিন টাকা খরচ করে বিজ্ঞাপন দিয়ে তার জাতি বদল করতে পারে, নাম বদল করতে পারে। বরিশালের নমঃশূদ্র লোচন দাস এফিডেবিট ও বিজ্ঞাপনের বলে অতি সহজেই ত্রিলোচন চট্টোপাধ্যায় হতে পারেন, জন্মগত বন্ধনও ভারতের স্বাধীন নাগরিকের কাছে আর কোন বাঁধন নয়।

সম্প্রতি মেদিনীপুর কোর্টে এক এফিডেবিটের বলে নীলমণি দাসের পুত্র নরসিংহ দাস, মোহিনী মহান্তির পুত্র পীতবাস মহান্তিতে রূপান্তরিত হয়েছেন। লক্ষ্য করুন ভারতীয় নাগরিকের স্বাধীনতা কতদূর ব্যাপ্ত। প্রকৃতিগত বন্ধন যা থেকে মুক্ত হবার অধিকার কোন মানুষের নেই—ভারতের নাগরিক অনায়াসে সেই বন্ধন ছিন্ন করে বাপ পর্যন্ত বদল করতে পারে। এমন নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা আর কোথায় আছে?

শ্রীরুদ্রাক্ষ দাস
খড়গপুর।

কলিকাতা—বনাম দিল্লী

নানা রকমের উদ্ভট ঘটনার খবর সৃষ্টিতে কলিকাতার নাম আছে। কলিকাতাতেই পুলিশ ধরা পড়ে ছিন্‌তাইয়ের অপরাধে। কিন্তু দিল্লীও আজকাল কম যায় না। সম্প্রতি রাজকুমার দেওয়ান বর বেশে বরযাত্রী দলের মিছিলে নেতৃত্ব করার সময় তাঁর পকেট থেকে দুই হাজার টাকা "পিক্‌পকেট" তুলে নিয়েছে। কিছুদিন আগে কেরলের এক ধনী যুবক নব পরিণীতা সালঙ্কারা বধূ সহ দিল্লীতে বেড়াতে বেড়াতে এক ট্যাক্‌সী ভাড়া করেন। ট্যাক্‌সী চালক ভান করল ট্যাক্‌সী না ঠেলে দিলে চলবেনা। বলল—বাবুজী, গাড়ী থেকে নেবে একটু ঠেলুন। বাবুজী অনুরোধ রক্ষা করলেন,—নেবে প্রাণপণে গায়ের জোরে ঠেললেন গাড়ী। গাড়ী তীরবেগে সালঙ্কারা সুন্দরী নববধূকে নিয়ে ছুটে চলে গেল। বাবুজী আর তার সন্ধান পেলেন না। তার চেয়েও অধিক অপরূপ ঘটনা ঘটেছিল অষ্টগ্রহের মিলন দিনে দিল্লীর রাজপথে। কলিকাতাথেকে গিয়েছিলেন সেখানে কার্য ব্যপদেশে মান্দ্রাজের নারায়ণ মূর্ত্তি। সঙ্গে তাঁর ছেলের বয়সী অফিস বস্ এক নম্বর সাহেব মিঃ চ্যাটার্জ্জি। তিনি অবাক হয়ে থমকে দাঁড়ালেন দিল্লীর রাজপথে। সামনে তাঁর এক নাগা সন্ন্যাসীর মিছিল। সন্ন্যাসীরা সকলেই সম্পূর্ণ নগ্ন। তাঁদের পশ্চাতে বিরাট মিছিল সুন্দরী রূপসীদের—দিল্লীর অসংখ্য ধনশালীর বণিতা ও দুহিতার। সকলেই অষ্টগ্রহের মিলনের সমস্ত অশুভ ফল নিরসনের চেষ্টায় উদ্বিগ্ন। সেই উদ্বেগে তাঁরা এমন সাজ করেছেন যে তরুণ অফিসার তাঁদের দিক থেকে চোখ ফিরাতে পারছিলেন না। প্রৌঢ় নারায়ণমূর্ত্তি লজ্জাবশতঃ কোন দিকে তাকাতে পারলেন না, শুধু বললেন—দিল্লীই ভারতের রাজধানী হবার যোগ্য!

বিবেকানন্দ চক্রবর্ত্তী
কলিকাতা।

কিসে পাপ কিসে পুণ্য:

পুণ্যকার্য্যে মানুষ স্বর্গে যায়, পাপ কর্মে যায় নরকে এ মানুষের অতি প্রাচীন কালের ধারণা। কিন্তু পাপ ও পুণ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন স্থানের ও বিভিন্ন সময়ের মানুষের ধারণা বড়ই বিচিত্র। গোহত্যা কোন কোন জাতির মানুষের কাছে পুণ্য—কোন কোন সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে পাপ। বহুবিবাহ কোন কোন সম্প্রদায়ের লোকের কাছে পাপ। নানা দেশের আদিম উপজাতীয় মানবগোষ্ঠীর পাপ পুণ্যের ধারণা আরও বেশী বিচিত্র, আরও বেশী অদ্ভুত। সোমারভিল (এনথ্ পোলজিকেল ইনষ্টিটিউটের পত্রিকায়) লিখেছেন এক আদিম উপজাতির কথা, যাদের কাছে অপর কর্তৃক পুরুষাঙ্গ দর্শনের মত বড় পাপ আর নেই। তারা তাই অনেক যত্ন করে এই বিশেষ অঙ্গটিকে বেঁধে রাখে যাতে কেউ না দেখতে পায়। শরীরের অন্য সব অঙ্গ এমন কি

মুষ্কদ্বয় পর্য্যন্তও অনাবৃত রাখা চলে। তাতে কোন পাপ নেই!

পতিতপাবন মিত্র।
দিনাজপুর

কয়েদীর মুখে বিবেকের বাণী :

অ্যামেরিকার কোলোরেডো রাজ্যের কয়েদীরা দু-বছর ধরে জনসাধারণের মধ্যে ঘুরে ঘুরে ধর্মকথা, বিবেকের বাণী প্রচার করার সুযোগ পাচ্ছে। তাদের দল বেঁধে মাত্র একটি অস্ত্রবিহীন প্রহরীর সঙ্গে সারা দেশে ঘুরে বেড়াতে দেওয়া হচ্ছে। তাদের মধ্যে ব্যাঙ্ক ডাকাত, নরঘাতক প্রভৃতি রয়েছে। তাদের দল দুই বছরে দুই লক্ষ মাইল ঘুরে প্রায় সাতলক্ষ পঞ্চাশ হাজার লোককে ভাষণ দিয়েছে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে—আমার কোন গন্তব্য স্থান নেই—আমাকে অনুসরণ করো না।" তারা জেল জীবনের বেদনাও লোকের সামনে তুলে ধরছে। তারা যে তাদের কাজের জন্য কত অনুতপ্ত তা' প্রত্যেকটি কথায় প্রকাশ করছে।

বক্তা কয়েদীরা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। রেষ্টোরাঁয় তাদের বিনামূল্যে আহার পানীয় দেওয়া হচ্ছে। ডেনবার এলাকায় ওদের জন্যে সম্প্রতি চার হাজার ডলার চাঁদা আদায় করা হয়েছে। নানা স্থানে বক্তৃতা করার জন্যে তারা নিমন্ত্রণ পাচ্ছে।

কয়েদীদের পুনর্বাসনেরও যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হচ্ছে এই রাজ্যে। বন্দী পুরুষদের বিবেকের বাণী শুনে যদি মুক্ত পুরুষদের চেতনা জাগে তবে সত্যি একটা কাজের মত কাজ হল বৈকি?

কাবেরী মিত্র
বিলাসপুর।

শরতের ছড়া

বিশ্বনাথ সান্তারা

রূপ ঝলমল শরত ভোর :
রঙীন আলোর খুললো দোর,
নীল আকাশে আজকে তাই-
মেঘ কালিমার লেশটি নাই।
শিশির ধোয়া শিউলী-রাশ :
হাসলো কেমন মধুর হাস।
তাই না দেখে বনের ছায়-
দোয়েল এসে গান শোনায়।

ছুটলো বাতাস : কাশের বন
চমকে ওঠে ওই কেমন।
তাই না আজ বকের সার-
ধানক্ষেত আর আকাশ পার,
দেখতে দেখতে হল যেই—
শরত ব'লে-"এলাম এই" ॥

আর্য্য সঙ্গীতে শ্রুতি ও স্বর

শ্রীতুলসীচরণ ঘোষ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

"আর্য্য সঙ্গীতে শ্রুতি"—নামক প্রবন্ধে শ্রুতি কি ও কাহাকে বলে ও তাহাদের বণ্টন কিভাবে হইবে এবং আর্য্যশাস্ত্রের সহিত কালচক্রের কি সম্বন্ধ তাহা বিশদ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। শ্রুতির সহিত স্বরের কি সম্বন্ধ ও স্বর কাহাকে বলে তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। এই স্বর সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে স্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যদিও তাহা "সঙ্গীতের উৎপত্তি" নামক প্রবন্ধে সামান্যভাবে দর্শিত হইয়াছে তথাপি এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা একান্ত প্রয়োজনীয়।

সঙ্গীতের এই সপ্ত স্বর প্রকৃতিতে অবস্থিত। মহাভারতের শান্তিপর্বে উল্লেখ আছে যে মহর্ষি ভরদ্বাজ প্রশ্ন করিলে ভৃগু কহিলেন—আকাশের একমাত্র গুণ শব্দ। শব্দ সাত প্রকার। ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। এই সপ্তবিধ শব্দ পটহাদিতে বিদ্যমান দেখা যায় বটে, কিন্তু উহারা আকাশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই নিমিত্ত শব্দ আকাশজ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। বায়ু লোকের শব্দ জ্ঞানের কারণ। লোকে বায়ুর অনুকূলতা বশতই শব্দ অবধারণে সমর্থ ও উহার প্রতিকূলতা নিবন্ধনই শব্দজ্ঞানে অসমর্থ হয়।

এই শব্দই ব্রহ্ম। এই শব্দ ব্রহ্ম হইতে সমস্ত জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। মহাভারতে শান্তি পর্ব্ব উপাখ্যানে উল্লিখিত আছে যে রাজা জনমেজয় কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া বৈশম্পায়ন কহিলেন—ব্রহ্মা সৃষ্টি মানসে বিষ্ণুর নাভিপদ্মে অধিষ্ঠিত হইয়া বেদ সৃজন করিতেছিলেন। এমন সময় বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে মধু ও কৈটভ দৈত্যদ্বয় উদ্ভূত হইয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে বেদ অপহরণ করিয়া পাতালে প্রবিষ্ট হইল। ব্রহ্মার স্তবে নারায়ণ জাগরিত হইয়া হয়গ্রীব মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক পাতালে প্রবিষ্ট হইয়া উদাত্তাদি স্বর সমুদায় অবলম্বন করিয়া সামগান করিতে আরম্ভ করিলে সমগ্র রসাতল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। অসুরদ্বয় সেই শব্দ শ্রবণমাত্র বেদ নিক্ষেপ পূর্ব্বক শব্দানুসারে ধাবমান হইল। নারায়ণ সেই বেদ লইয়া ব্রহ্মার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

এই শব্দ আবরণী ও বিক্ষেপণী অর্থাৎ সংকল্প ও বিকল্পময়ী মায়া প্রভাবে আবৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রাণশক্তি প্রভাবে যখন এই মায়া অপসৃত হয় তখন তাহার প্রকাশ হয় ধ্বনিতে। স্থূল ধ্বনিরূপ শব্দের অপেক্ষা সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম শব্দও আছে এবং অবশেষে শব্দের এইরূপ আকার আছে যাহা প্রতীতিগম্য নহে। শব্দ যতই সূক্ষ্ম হয় ততই তাহার অনিত্যতা, অনেকরূপতা ও কার্যরূপতার খোলস পৃথক হইয়া যায় এবং পরিশেষে তাহা তাহার নিজস্ব একরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। শব্দের যাহা নিজস্ব রূপ তাহাই স্ফোট নামে অভিহিত হয়। যাহা হইতে প্রত্যেক শব্দ স্ফুটিত অর্থাৎ বিকশিত হয় তাহাই স্ফোট। প্রত্যেক দ্রব্যের অতি সূক্ষ্ম অবয়ব পরমাণু যেমন আধার রূপে দ্রব্যেই অবস্থিত আছে কিন্তু দৃষ্টিগোচর বা ইন্দ্রিয়গোচর হয় না সেইরূপ শব্দের সূক্ষ্মরূপ স্ফোটক প্রত্যেক বস্তুতে অবস্থিত থাকিলেও প্রতীতির বিষয় হয় না। এই সূক্ষ্ম শব্দ বা স্ফোট সমস্ত দৃশ্য বা অদৃশ্য প্রপঞ্চের উপাদান। প্রত্যেক উপাদানেরই স্বভাব এই যে তাহা কার্য্যের সহিত মিলিত থাকে। যেমন মৃত্তিকা ঘটের উপাদান, উহা ঘটের সহিত অন্বিত থাকে। মৃত্তিকা বাদ দিলে ঘটের অস্তিত্ব থাকে না। সেইরূপ সমস্ত প্রপঞ্চের উপাদান স্ফোটও সমস্ত বস্তুতে অন্বিত। এই স্ফোট অথবা শব্দব্রহ্মে নিখিল জগৎ বিবর্তিত হইয়াছে। ইহা সকলেরই জানা আছে যে এই তত্ত্ব অনুসরণে ব্রাহ্মীশক্তি সরস্বতীর পূজায় শব্দকে স্ফুট করিবার নিমিত্ত ফুট কড়াই অর্পণের বিধি আছে। বিবর্ত্ত অবস্থায়

যে বস্তু যাহার বিবর্ত্ত তাহারও অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। রজ্জুতে সর্পের আভাসকালেও রজ্জুর স্বরূপ অবস্থার কোনরূপ বিকার ঘটে না। পরিণামে স্বরূপ হইতে প্রচ্যুতি ঘটে। কিন্তু বিবর্ত্তে স্বরূপ হইতে প্রচ্যুতি ঘটে না। শব্দব্রহ্ম হইতে সমস্ত জগৎ বিবর্ত্তিত হওয়া হেতু শব্দব্রহ্ম অথবা স্ফোট সমস্ত জগতের উপাদান। উপাদান অর্থে অধিষ্ঠান। জাগতিক বস্তুর কোন অস্তিত্ব নাই; কেবল অনাদিকাল হইতে যে সূক্ষ্ম বাসনা ব্রহ্মে লীয়মান থাকে সেই বাসনাই অবিদ্যা। যেই অবিদ্যা প্রভাবে স্ফোট বা শব্দব্রহ্মই নানারূপে ভাসমান হয়। আদি ও অন্তে এই ব্রহ্ম একই রূপে থাকে কেবল মধ্যে অন্যরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

ব্রহ্ম যখন নিস্পন্দ থাকেন তখন সৃষ্টি নাই। সৃষ্টিকালে ব্রহ্মে স্বাভাবিক অতি সূক্ষ্ম যে স্পন্দন উঠে সেই স্পন্দনই ওঁকার আকারে প্রকাশ পায়। ব্রহ্মের সংকল্প বিকল্পময়ী এই স্পন্দনশক্তিই মায়া। এই মায়া ব্রহ্মকে যতরূপে বিবর্তিত করে, ততপ্রকার শব্দ উৎপন্ন হয়। এই শব্দরাশি অনন্ত। পরব্যোমে ব্রহ্মের আদি ক্রীড়াই ওঁকার। এই ওঁকার হইল ব্রহ্ম সাগরে অতি সূক্ষ্ম তরঙ্গ মাত্র। নিস্পন্দ অবস্থায় উহা অব্যক্ত। শক্তির অভিব্যক্তিকালে প্রথমে যে প্রকার কুণ্ডলাকারে স্পন্দনের গতি হয় শক্তির পরবর্তী গতিও ঠিক সেইরূপ। কুণ্ডলিনী এইভাবে কার্য্য করে। অর্থাৎ পরব্রহ্মে যেভাবে ক্রিয়া করে অতি সূক্ষ্ম পরমাণুতেও সেইভাবে ক্রিয়া করে। এই স্পন্দশক্তি অর্থাৎ কুণ্ডলিনী ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। এই কুণ্ডলিনী শক্তি মূলাধারে অবস্থিত। এই শব্দ ব্রহ্মময়ী মহামায়ারই সমস্ত জগৎ বিবর্ত্ত। সারদা তিলকে আছে—

আনন্দময়ীং দেবীং শব্দব্রহ্মস্বরূপিণীম্।
ঈড়ে সকল সম্পত্ত্যৈ, জগৎ কারণমম্বিকাম্॥

গুহ্যদেশ হইতে দুই অঙ্গুলি উর্দ্ধে, লিঙ্গমূল হইতে দুই অঙ্গুলি অধোদিকে চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত মূলাধার পদ্ম অবস্থিত। এইস্থানে ইড়া ও পিঙ্গলা নামক দুই সূক্ষ্ম নাড়ী সংযুক্ত অবস্থায় অবস্থিত। মূলাধারে অবস্থিত এই কুণ্ডলিনী শক্তিকে কুম্ভকের দ্বারা সহস্রারে উপনীত করিতে হয়। ব্যক্ত স্পন্দশক্তি বা কুণ্ডলিনীই মা কালী। সহস্রারে উপনীত হইবার সময় তাহার যাহা গতি তাহাই মা কালীর নৃত্য। সাধক নীলকণ্ঠ ইহারই অনুভূতি করিয়া গাহিয়াছিলেন—

"শ্যামা মা আমার নয় সামান্য মেয়ে—
সে যে মূলাধারে সহস্রারে উঠছে ধেয়ে ধেয়ে।"

যেমন ব্যক্ত স্পন্দশক্তি মা কালীর রূপ সেইরূপ অব্যক্ত স্পন্দশক্তি দুর্গার রূপ। শক্তি যখন অব্যক্ত তখন তাহা অবধারণ করা কঠিন বলিয়াই তিনি দুর্গা—"দুঃখেন গম্যতে প্রাপ্যতে যস্যাং সা দুর্গা।

অতএব দেখা যায় যে এই ওঁকারই স্ফোট, শব্দব্রহ্ম বা স্পন্দময়ী কুণ্ডলিনী শক্তি। সমস্ত বিশ্বই এই শব্দব্রহ্মের বিবর্ত্ত।

সঙ্গীত বিলাস বলেন—

আত্মা বিবক্ষমাণোঽয়ং মনঃ প্রেরয়তে মনঃ।
দেহস্থং বহ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতম্॥
ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিতং সোঽথ ক্রমাদূর্দ্ধপথে চরন্।
নাভিহৃৎকণ্ঠমূর্দ্ধস্বাবির্ভাবয়তি ধ্বনিম্॥
নাদোঽতিসূক্ষ্মঃ সূক্ষ্মশ্চ পুষ্টোঽপুষ্টশ্চ কৃত্রিমঃ।
ইতি পঞ্চবিধা ধত্তে পঞ্চ স্থানস্থিতঃ ক্রমাৎ॥"

আত্মা নিজেকে ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে প্রকাশ করিবার মানসে চিত্তকে প্রেরণ করে। চিত্ত দেহস্থ বহ্নিকে জাগ্রত করিবার জন্য বায়ুকে প্রেরণ করে। ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিত সেই বায়ু ক্রমে উর্দ্ধদিকে উঠিতে থাকে। নাভি হৃদয়, কণ্ঠ, মূর্দ্ধি ও শীর্ষস্থানে ধ্বনি আবির্ভূত হয় সেই অতি সূক্ষ্মধ্বনি ক্রমে পুষ্টি লাভ করিয়া কণ্ঠ দিয়া নাদ রূপে প্রকাশ পায়। এই পঞ্চ স্থানে পঞ্চপ্রকার ক্রিয়া দ্বারা স্বর নির্গত হয়।

ইহা একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে দেহস্থ অনল দেহস্থ অনিলকে বিক্ষোভিত করা হেতু তাহা উর্দ্ধদিকে গমন করে। অর্থাৎ দেহস্থ অগ্নি মূলাধারস্থ অপান বায়ুকে বিক্ষোভিতকরা হেতু ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তি, যাহাতে সপ্তস্বর অবস্থিত তাহা জাগরিত হইয়া ধীরে ধীরে উর্দ্ধপথে আরোহণ করে। প্রশ্ন হইতে পারে এই ব্রহ্মগ্রন্থি কোথায় অবস্থিত?

সঙ্গীত দর্পণ বলেন—

"আধারাৎ দ্ব্যঙ্গুলাদূর্দ্ধং মেহনাৎ দ্ব্যঙ্গুলাদধঃ।
একাঙ্গুলং দেহমধ্যে তপ্তজাম্বূনদপ্রভম্॥

তত্রান্তে অগ্নিশিখা তন্বী চক্রাৎ তস্মাৎ নবাঙ্গুলাৎ।
দেহস্ত কন্দোৎ উৎশ্যোধাস্নামাভ্যাং চতুরঙ্গুলং ॥
ব্রহ্মগ্রন্থিরিতি প্রোক্তা তস্য নাম পুরাতনৈঃ ॥

গুহ্যদেশ হইতে দুই অঙ্গুলি উর্দ্ধে, লিঙ্গমূল হইতে দুই অঙ্গুলি অধোদিকে এবং একাঙ্গুল দেহ মধ্যে তপ্তস্বর্ণের ন্যায় বর্ণ। সেখানে নবঅঙ্গুলি প্রমাণ চক্র অবস্থিত এবং সেই চক্রে অগ্নিশিখার ন্যায় সূক্ষ্ম নাড়ী অবস্থিত। দেহ মূলে উচ্চতায় চতুরঙ্গুলি প্রমাণ ব্রহ্মগ্রন্থি অবস্থিত।

এই ব্রহ্ম গ্রন্থিতে অবস্থিত নাদরূপী কুণ্ডলিনী শক্তি উত্তপ্ত অপান বায়ু কর্ত্তৃক বিক্ষোভিত হইয়া চক্র হইতে চক্রে উঠিতে থাকে এবং অবশেষে কণ্ঠ দিয়া স্বর রূপে প্রকাশ পায়। এই প্রকাশের একটা ক্রমিক রীতি আছে।

সঙ্গীত বিলাস বলেন

"ব্যবহারে ত্বসৌ ত্রেধা হৃদিমন্দ্রোভিধীয়তে।
কণ্ঠমধ্যে মূৰ্দ্ধি তার দ্বিগুণশ্চোত্তরোত্তরঃ ॥"

ব্যবহারে তিন প্রকার—যথা হৃদয়ে মন্দ্র কণ্ঠে মধ্য ও মূর্দ্ধি তার এবং তাহারা পরস্পরের দ্বিগুণ। মন্দ্রের দ্বিগুণ মধ্য এবং মধ্যের দ্বিগুণ তার। আবার প্রত্যেক স্থানে সেই দ্বাবিংশ শ্রুতিও বর্ত্তমান। শাস্ত্র যথা—

"প্রত্যেকং ততঃ পুনঃ স্থানং দ্বাবিংশতিবিধং ভবেৎ।
তস্য দ্বাবিংশতির্ভেদা শ্রবণাৎ শ্রুতয়ো মতাঃ ॥"

অর্থাৎ প্রত্যেক স্থানেই তাহারা দ্বাবিংশ এবং তাহাদের দ্বাবিংশ ধ্বনি পার্থক্য উপলব্ধি শ্রবণযোগ্য বলিয়া তাহারা দ্বাবিংশ শ্রুতি। এই শ্রুতি সকল হৃদয়ের উর্দ্ধ দ্বাবিংশ নাড়ী সকলে অবস্থিত। শাস্ত্র যথা—

"হৃদূর্দ্ধনাড়ী সংলগ্না নাড়্যো দ্বাবিংশতির্মতাঃ।"

এই শ্রুতিসকলের বিভাগ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে স্বর সমূহ শ্রুতিতে বণ্টন কিরূপ ভাবে তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে স্বর কাহাকে বলে ও তাহাদের কি কি লক্ষণ সেই সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন।

সঙ্গীত রত্নাকর বলেন

শ্রুত্যনন্তরভাবী যঃ স্নিগ্ধঃ অনুরণনাত্মকঃ।
স্বতো রঞ্জয়তি শ্রোতৃচিত্তং স স্বর উচ্যতে ॥"

অর্থাৎ শ্রুতি সকলের অন্তে স্নিগ্ধ অনুরণনসংযুক্ত মধুর ধ্বনি যাহা শ্রোতৃযুগলকে আপনা হইতেই মোহিত করে তাহাই স্বর।

শৃঙ্গাহার বলেন

"স্বয়ং যো রাজতে নাদঃ সঃ স্বর পরিকীর্ত্তিতঃ।
সোঽপি সপ্ত ষড়জাদি ভেদতঃ ॥"

অর্থাৎ যাহা নিজে ধ্বনিকে রঞ্জিত করে তাহাই স্বর। তাহারা ষড়জাদি ভেদে সপ্ত।

অতএব দেখা যাইতেছে শ্রুত্যন্তর যে স্নিগ্ধ অনুরণনযুক্ত ধ্বনি তাহাই স্বর। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে এইমাত্র বলা যায় যে pure tone with all its Harmiones is স্বর"। এবং এই শ্রুত্যন্তর যে প্রথম অনুরণনাত্মক ধ্বনি কণ্ঠ দিয়া নির্গত হয় তাহাই সঙ্গীতের প্রথম স্বর ষড়জ। এই ষড়জাদি স্বর সমূহের লক্ষণাদি পরে আলোচনা করিব।

[ক্রমশঃ]

———

মৃগতৃষ্ণিকা

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

গোরডাঙ্গার কেনা ঢালি বিশাল ঢাকটার ভারে কুঁজো হ'য়ে প্রাণপণে কাঠি মারছে :

ড্যাং ডাডাং ড্যাং ড্যাঃড়্ড়্ ড্যাং

কার্ত্তিক ঢুলি সংগত করছে, তাকুড়ুমাড়ুম্ কুড়্ড়্ তাং কুড়্ড়্ তাং··

বাচ্ছা একটা ছেলে কাঁসর বাজাচ্ছে :— ট্যাং-ট্যাং— ট্যাং ট্যাং···

মহাষ্টমী ! মায়ের পূজা।

আমাদের নার্সিংহোম থেকে সব দেখা যায়। সঞ্জীব রায় ডাক্তারের রমণী কম্পাউণ্ডার আমি। মায়ের পূজা দেখছি আর ভাবছি সামনের বারে যেন ডাক্তার হ'য়ে জন্মাই মাগো !

তাই ভাবছি এবার উঠে স্নান করে অঞ্জলি দেব চতুর্বর্গ দায়িনী মাকে, জগজ্জননীকে।

কিন্তু উঠা হ'লোনা। একটা জরুরী "কল" এলো। দশ মিনিটের মধ্যে রুগীর বাড়ী পৌঁছ গেলাম। মাকে মানসাঞ্জলি দিয়ে দিলাম।

বিশাল সাজানো গোছান বাড়ী। খোদ মালিক মণিমোহন চৌধুরী অসুস্থ। কিন্তু পথপ্রদর্শক ছেলেটি যে ঘরে আমাদের নিয়ে এলো, তাতে বিস্ময়ের উদ্রেক হওয়ারই কথা—বিশেষ করে বাড়ীতে মালিকের অসুখ।

ছোট আট ফুট বাই ছফুট একটা ঘর। একটা তক্তপোষ পাতা। তারই নীচে ঝাঁটা বালতি—কোদাল ঝুড়ি থেকে সুরু করে কি যে নেই, তা ভালো করে না দেখে বলা শক্ত। এক কোণে টুলের উপর একরাশ ছেঁড়া পুঁথিপত্র। দুটো কমলা লেবু। শিয়রের একপাশে একটা বাটিতে কফ ও তাজা রক্ত। প্রৌঢ়ের শিয়রের পাশে একটা বাঁধানো ফটো—মুরলীধর কদম্বতলায় মহাকৌতুকে হাসছেন।

ডাক্তারবাবুও অবাক হয়েছিলেন।

মুখ তুলে তাকাতেই এক প্রৌঢ়া কৈফিয়তের সুরে বললেন,—খুব ছোঁয়াচে রোগ কিনা ভাই !

বেশীক্ষণ পরীক্ষা করতে হ'লোনা ডাক্তারবাবুর। ক্ষ রোগ। বহুদিনের এবং চিকিৎসার অভাবে দুরারোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে ভদ্রলো রোগবীজাণুর বিষে অচৈতন্য হয়ে নিমীলিত নয়নে অস্ফু স্বরে যা বলছেন, তার না হয় মাথা, না হয় মুণ্ডু।

মণিমোহন বলছেন,—তাপসী, আমার মূর্ত্তি ফিরি দাও। বুড়ো বলেছিল চাতক পাখী হ'বি। টাকার পাহাড় কিন্তু কেন দেরী করছ! তোমায় কিছু বলব না, ফিরি দাও বলছি !"

ডাক্তার সঞ্জীব রায় মুখ তুলে চাইলেন। দরজার পা একগাদা ছেলে, বৌ, মাঝবয়সী লোক জড় হয়েছিল।

ডাক্তার বললেন,—তাপসী কে ?

সবাই নিশ্চুপ। শুধু আগেকার সেই প্রৌঢ়া বললে —কি জানি ডাক্তারবাবু ওই নামেতো কাউকে চিনিন মানুষটা সারা জীবন ঠাকুর পুজো করল না, এখন ঠা ঠাকুর করে পাগল হয়েছেন। তাই ওই ফটো মা কাছে রেখেছি ! শেষ সময় বলেই বোধ হয়···

সঞ্জীব ডাক্তার প্রেসক্রিপসন করে চলে গে আমি ইন্‌জেকসন কিনতে পাঠিয়ে দিলুম।

এই অবসরে ভালো করে চারদিকে তাকা দীর্ঘ ছয় ফুট দেহ। মোটা মোটা হাড়। চা কোঁচকানো। চোখের নিমীলিত পাতা টানলাম, অবাক হয়ে গেলাম।

সাদা বৃত্তের মধ্যে আশ্চর্য্য নীলমণি ! গহন সমু মত নীল—শরীর শিউরে উঠে।

মণিমোহন আবার উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছেন,—তা দাও ফিরিয়ে আমার ঠাকুর। দাও, দাও, শিগগীর।

কোন রকমে ইন্‌জেকশন দিয়ে যখন চলে আ

তখনও মণিমোহন বিড় বিড় করছেন,—দাও, দাও তোমার পায়ে ধরছি আমার সব সম্পদ নিয়ে ফিরিয়ে দাও ইষ্ট দেবীকে।

আমি নিঃশব্দে চলে এলাম।

মণিমোহন হয়ত সেই রাত্রিতে মারা যেতেন। কিন্তু সঞ্জীবরায়ের হাতযশের গুণেই হোক, আর মণিমোহনের ভবিতব্যের অদৃষ্ট লিখলেই হোক সে রাত্রির "রিস্ক" কেটে গেল।

কিন্তু পরদিন জ্ঞান হ'তেই অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। হাতের কাছে যাকে পেলেন তাকেই কিল চড় ঘুষিতে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। চরম হ'লো যখন দুধের বাটী ছুঁড়ে স্ত্রী কাদম্বিনীর কপাল ফাটিয়ে দিলেন।

কোন রকমে ইনজেকশন দিয়ে বাড়ী ফিরলাম কিন্তু পর দিনই এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল।

মণিমোহন ইনজেকসন কিছুতেই নেবেন না। কিল-চড় খেয়েও একটাকা ফিএর লোভে অনুনয় করে চলেছি। হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে গেল,—এমনি করে চিকিৎসা যদি না করতে দেন, তাপসীকে কি করে খুঁজে আনবেন।

পলকে প্রলয় হয়ে গেল।

মণিমোহনের নীল চক্ষু অকস্মাৎ ধ্বক করে উঠল। সমস্ত শিরা উপশিরা মাংসপেশী ঋজু শক্ত হয়ে বিশ-বৎসরের মণিমোহন আত্মপ্রকাশ করল।

সিরিঞ্জটা মাটিতে পড়ে ভেঙে গেল. আমি আর্ত-নাদ করে উঠলুম। সত্তর বছরের বৃদ্ধের বজ্রমুষ্টিতে আমার হাতের হাড়গোড় ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে।

সিংহের গর্জন শোনা গেল,—বল, ওই নাম কি করে জানলে?

কাতর কণ্ঠে বললুম,—শুনুন, হাত ছাড়ুন, হাত আমার ভেঙে গেল যে। অসুখের সময়ে আপনার প্রলাপের মধ্যে এই নাম আপনার মুখে অনেকবার শুনেছি।

ধপ্ করে একটা শব্দ করে মণিমোহন কাৎ হয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়লেন।

বিশ বছরের যুবা আবার সত্তর বছরের বৃদ্ধ হ'য়ে গেল!

ইনজেকসন দিয়ে নিঃশব্দে চলে আসছিলাম পিছনে হঠাৎ জলদ স্বরে শুনলাম—শোনো—

নিঃশব্দে ফিরে গিয়ে মাথার কাছে টুলটায় বসলাম।

—আমায় কিছু বলবেন।

—তুমি কে?

—আমি রমণী কম্পাউণ্ডার।

—তোমরা আমায় বাঁচাতে পারবে?

যদিও আমার প্রচুর সন্দেহ ছিল; তথাপি যথেষ্ট উৎসাহ কণ্ঠে এনে বললাম,—

—নিশ্চয়, আপনি শীঘ্রই ভাল হয়ে উঠবেন।

—তুমি আমায় ধোঁকা দিচ্ছ কম্পাউণ্ডার! আমি জানি, আমার হয়ে আসছে। কিন্তু কিন্তু, তুমি আমার একটা কাজ করে দিতে পারবে? আমার হাত তখন বৃদ্ধের বেতসপত্রের মত কম্পিত দুই হাতের মধ্যে ঘামে ভিজে উঠেছে। অর্দ্ধে খিত বৃদ্ধের দগ্ধ ম্যালেরিয়া রোগীর মত থর থর করছে। চোখের নীল সমুদ্র উপচে পড়ছে।

অনুরোধ নয়, মিনতি করছি, বৃদ্ধের শেষ মিনতি—

যদিও সঞ্জীব ডাক্তারের সঙ্গে আমিও একমত ছিলাম যে, টি, বি, রোগীর জীবাণু সম্ভবতঃ এই বৃদ্ধের মস্তিষ্ককেও আক্রমণ করেছে, এবং তাপসী, মূর্ত্তি ইত্যাদি, বিকৃত অবচেতনার প্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়, তবু এমন করুণ মিনতিতে সম্মতি না দিয়ে পারলাম না। আস্তে আস্তে তাঁকে শুইয়ে দিলাম।

আবার প্রশ্ন হোল—ভৈরবী পীঠ তুমি চেন যদিও এই প্রথম ওই নাম শুনলাম, তবুও আমাকে ঘাড় নাড়তে হল।

—প্রতি বৎসর অক্ষয় তৃতীয়াতে, সেখানে বিরাট মেলা হয়। ভারতের বহু তান্ত্রিক, কৌলের, সন্ন্যাসীর সেখানে আগমন হয়।

—আমার শেষ মিনতি প্রতি বৎসর ওই তিথিতে সেখানে তুমি যাবে। প্রয়োজনীয় অর্থ, আমার নায়েব মনিব, রামদাস আগরওয়ালার কাছ থেকে, আমার শেষ ইচ্ছা বলে চেয়ে নেবে।

আমি আশ্চর্য্য হচ্ছিলাম। কথাগুলো ঠিক প্রলাপ মনে হচ্ছে না। নিজের ছেলেদের বিশ্বাস না করতে

পারেন, কিন্তু আমাকে দিয়ে ওই প্রতিশ্রুতি নেবার ভরসা কোথায় পেলেন জানি না। তবু মনে হলো, বৃদ্ধ বোধ হয় ডুবতে ডুবতে শেষবারের মত অতি শীর্ণ তৃণখণ্ডকে আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করছেন।

চুপ করে রইলাম।

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন,—সেখানে যদি স্বর্ণবর্ণা পিঙ্গলকেশী যোগিনীর সাক্ষাৎ পাও জিজ্ঞাসা করবে, তার নাম তাপসী কি না।

যদি হ্যাঁ বলে, তবে তাকে বলো, মণিমোহন জীবনের শেষ ক্ষণ অবধি তাকে খুঁজেছে শুধু এই কথাটুকু বলতে যে সে ভ্রষ্ট হতে পারে কিন্তু মন্দ ছিলনা। যদি আর একটা সুযোগ পেত জীবনকে সার্থক করতে পারত। জীবনের উদ্দেশ্য তার পূর্ণ হত।

মণিমোহন রুদ্ধ আবেগে দুলছিলেন, চোখের কোণ বেয়ে অজস্র ধারায় অশ্রু ঝরছিল।

আমি তাঁর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে শুধু বলেছিলাম,—আপনি খুব কষ্ট পাচ্ছেন, আমায় সব বলুন।

মণিমোহন আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় সায়াহ্নবেলায় রক্ত পুঁজ সমাকীর্ণ মলিন শয্যায় শায়িত লক্ষপতি মণিমোহন প্রায় অকেজো বুকটা ফুটো হাপরের মত অতিক্রুত উঠানামা করতে করতে নীলচোখে উজ্জ্বল নক্ষত্র বিন্দুর জ্যোতিঃ ফুটিয়ে কখনো উত্তেজিত ভাবে কখনো বা শুকিয়ে-যাওয়া লতার মত নেতিয়ে, তার আত্মসমীক্ষার কাহিনী বলেছিলেন; আর আমি স্তব্ধ হয়ে স্থাণুর মত বসেছিলাম।

মণিমোহনের বিশ্লেষণ ও বর্ণনা শক্তির একটা অদ্ভুত ঋজু অথচ বর্ণাঢ্য ভঙ্গী ছিল, যা একান্ত কবিসুলভ আবেগে থর থর।

তিনি আরম্ভ করেছিলেন এই ভাবে—কম্পাউণ্ডার, ওই কোণের ঘড়িটা দেখছো? মনে করো এর কাঁটা এ্যান্টি-ক্লক ওয়াইজ ঘুরছে, আর, তুমি আমি এর সঙ্গে কালের সীমানা পার হয়ে অনেক পিছিয়ে গেলুম।

ভৈরবী পীঠ। মহা জাগ্রত মহাপীঠ।

দ্বারকা নদীর তীরে তিন বর্গমাইল আয়তনের মহাশ্মশান। পূবআকাশের সোনার জীবনদেবতাকে শেষ প্রণাম জানিয়ে নিঃশব্দে উষসী বিদায় নিয়েছে।

শ্মশানের ভিতরের জাম জারুল শ্যাওড়া যজ্ঞিডুমুর গাছের সস্নেহ আশ্রয় থেকে অন্ধকার তখনও বিদায় নেয়নি। রাত্রিতে কুকুর শেয়ালের টানাটানিতে বিক্ষিপ্ত অর্দ্ধভুক্ত শবদেহ গাছের জটলার মধ্যে পড়ে আছে। এখানে ওখানে শেয়ালে খোঁড়া গর্ত্ত আর নরকপাল। ঊর্দ্ধাঙ্গ ও নিম্নাঙ্গের লম্বা হাড়গুলি ইতস্তত: ছড়ানো। দেখে মনে হয়, গভীর নিশায় অতৃপ্ত কামনায় উন্মাদ আত্মাগুলির কলহের হাতিয়ার ও-গুলি।

প্রশ্ন করতে পার, আমি ওখানে এলাম কি করে? সে সব কথা অপ্রাসঙ্গিক হবে। মনে কর আমি একজন আত্মীয় স্বজনহীন মুমুক্ষু আর্ত্ত মানুষ। ভৈরবী পীঠে একমাস গুরুসঙ্গ করার পর দীক্ষার বাসনা হয়েছে। গুরুদেব আমায় কৃপা করেছেন।

দীক্ষার সময় হ'য়েছে। একপাশে বাঁধানো চিতার আগুন প্রায় নিভে এসেছে। কিন্তু নিভবে না। এর আগেই আরেক মড়া এসে যাবে। এখানে চিতা কখনো অগ্নিহীন হয় না।

শ্মশানের পাশে নদীর ধারে শুভ্র জটাজুটধারী এক সৌম্যমূর্ত্তি বসে আছেন। তাঁরই অপর পাশে, বিশ বছরের স্বাস্থ্যবান্ যুবা পুরুষ আমি এবং অপর এক কিশোরী। মাঝখানে হোমের আগুন জ্বলছে। পাশেই পঞ্চপল্লবে সজ্জিত সিঁদুর রঞ্জিত একটী পূর্ণকুম্ভ।

আমার দীক্ষা সমাপ্ত হ'লে আমি গুরুদেবকে ভক্তিভরে প্রণাম করলাম।

বৃদ্ধ আশীর্ব্বাদ করে বললেন,—বৎস মণিমোহন, এই মুহূর্ত্তে তুমি মহাসিদ্ধ শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হ'লে। তুমি আদর্শ শিষ্য হবে।

তোমাকে হ'তে হবে,

শান্তো বিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান ধারণাক্ষমঃ।
সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞো সচ্চরিতো যতিঃ॥

মায়ের কাছে প্রার্থনা করি তোমার মধ্যে মহাশক্তির স্ফুরণ হোক। তোমার চোখের ওই নীল তারা মহামায়া নীল সরস্বতীর বর্ণে বর্ণে এক হয়ে যাক।

গুরুদেবের উদাত্ত গম্ভীর স্বর চতুর্দ্দিকে ধ্বনিত হতে লাগল।

আমি আবেগভরে গুরুর পায়ে লুটিয়ে পড়লাম।

ওঁ গুরু ব্রহ্ম গুরু বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।

গুরুঃ সাক্ষাৎ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

পূব আকাশ তখন সোনার দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

এরপর অতি দ্রুত আমি আর তাপসী ঘনিষ্ট হয়ে গেলাম।

কম্পাউণ্ডার, এতে তুমি আশ্চর্য্য হয়ো না। সংসার ত্যাগী মুমুক্ষু মানুষগুলোর মধ্যে রয়েছে আশ্চর্য্য এক বন্ধনহীন বন্ধন—যা ঈশ্বরানুরক্তির কেন্দ্রাভিমুখী শক্তিতে কেন্দ্রবিন্দুর চারপাশে ঘুরছে। তুমি ওই কেন্দ্র-বিন্দুর ইষ্টমূর্ত্তিকে বিস্মৃত হও, সঙ্গে সঙ্গে কক্ষচ্যুত হবে।

তাপসীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় আর গুরুদেবের আশীর্বাদে আমি সাধনপথে অগ্রসর হতে লাগলাম। কিন্তু ওই পথের কৃচ্ছ্রতা সাধন আর দৈহিক নিগ্রহ একএকসময় আমার অসহ্য লাগত। এই পরম বন্ধুর পথের শেষে কোন পরম প্রাপ্তি আছে কিনা এই সম্পর্কে সংশয়ান্বিত হয়ে অনেক বারই চলে আসার চেষ্টা করেছি; কিন্তু পারিনি ওই তাপসীর জন্য।

তার তপস্যাক্লিষ্ট সমস্ত দেহে প্রচণ্ড জ্বালা অনুভব করতে দেখেছি। যার জন্য মাঝে মাঝে সারা গায়ে চন্দন লেপে রাখত; এবং এই জ্বালা যৌবন জ্বালা কিনা সে সম্পর্কে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, যদিও গুরুদেব বলতেন ওটা সাধনার অগ্রগতির লক্ষণ। তার সমস্ত দেহে অত্যন্ত প্রখর কাঠিন্য থাকা সত্ত্বেও, দুই চোখে ঘন বনানীর এমন একটা রহস্যময় নীল ছায়া ছিল, যা আমার মনমৃগকে একটা অদৃশ্য আকর্ষণে টানত।

তবু হয়ত সংসারেই ফিরে আসতাম; কিন্তু সহসা চোখের সামনে আলো দেখতে পেলাম।

একদিন বিকালের দিকে নদীর ধারে ঠিক শ্মশানের নীচে একটা শ্বেতকরবী গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে গৈরিক বসনা তাপসী বসে আছে। বড় বড় চোখ দুটি তার কিসের আবেশে ঢুলু ঢুলু। একরাশ চুল মুখে কাঁধে ছড়িয়ে পড়েছে। সর্বদেহে অস্তায়মান আবীর দীপ্তি।

একটু নীচেই বালিতে পা ডুবিয়ে আমি বসে রয়েছি। দূর দিগন্তে মেঘের খেলা দেখছি। একসময় বললাম,—না: তাপসী, আমার কিছুই হবে না। দু'মাস হতে চলল, না কিছু দর্শন, না কিছু অনুভূতি।

তাপসী একটু হেসে জবাব দিল—ওরকম বলনা মণি, একদিনেই কি সব হয়? চেষ্টা করতে হবেই। কবে জপ কর। কলৌ জপাৎ সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ।

—তুমি অত বলছ, তোমার কিছু হয়েছে? তাপসী হাসল, বড় মধুর হাসি।

—এসব কি বলা উচিত? তবে তোমাকে দেখছি, তুমি আমার গুরুভাই। আমি বেশ কিছুদিন ধরেই কপালের মধ্যবিন্দুতে জ্যোতির্বিন্দু দেখতে পাচ্ছি। প্রথমে লাল ছিল, এখন নীল হয়েছে। আস্তে আস্তে দূরদর্শন হবে, দূরশ্রবণ হ'বে। ইষ্টদেবী স্পর্শে আসবেন, শব্দে আসবেন। তেমন ভাগ্য করে থাকলে, একদিন হয়ত এই চর্মচক্ষুতে ইষ্টদর্শনও হতে পারে। তোমারও হবে। গুরুদেবের কাছে যা অমূল্য রত্ন আছে তার প্রভাবেই হবে। কোন চিন্তা করো না। আর তা ছাড়া অল্প সময়ে মন্ত্রসিদ্ধি পাওয়ার আরও উপায় আছে। তুমি মন্ত্রের জনন-জীবন-তাড়ন-বোধন-অভিষেক-বিমলীকরণ-আপ্যায়ন-তর্পণ-দীপন-গুপ্তি—এই দশবিধ সংস্কার করতে পার। অথবা মন্ত্রকে মারণ-স্তম্ভন-বশীকরণ ইত্যাদি করতে পার। সর্বপ্রকার তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপে গুরু-দেবের সাহায্য পাবে।

সেসব অত্যন্ত কষ্টসাধ্য তাপসী। তুমি গুরুদেবের কি অমূল্য রত্নের কথা বলছিলে?

—ও, তুমি সেসব কিছুই জাননা দেখছি!

আচ্ছা মণি, আমার সম্বন্ধে তুমি কিছু জান? কোন কৌতূহল নেই?

—তুমি তো গুরুদেবের পালিতা কন্যা ঈশ্বরদর্শন পণ করে জীবন উৎসর্গ করেছ।

তাপসী হাসল, বলল,—তুমি কিছুই জাননা আমার সম্বন্ধে। আমার পিতামাতা কারা তাও জানিনা। আমাদের পরমগুরু গুরুদেবকে কামাক্ষ্যাতীর্থে আশীর্বাদ করে দুটি জিনিষ দান করেন। এর একটী হ'চ্ছি আমি আর একটি আমাদের ইষ্টদেবীর প্রতিমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি সম্বন্ধে তিনি নাকি বলেছিলেন এঁকে সামনে রেখে মানুষ যদি কোন জাগতিক বাসনা করে তা পূর্ণ হবে অনিবার্য্য।

কিন্তু তা শুধু একটীবার। আর তার ঈশ্বর পথে অগ্রসর হওয়া হবেনা। কিন্তু যদি ভক্তিভরে এঁকে পূজা অর্চনা করা যায় তবে ঈশ্বর দর্শনের পথ অত্যন্ত সুগম হবে। অন্ততঃ অধম অথবা মধ্যম মন্ত্রসিদ্ধি তো হবেই।

আমি অবাক হ'য়ে বললাম,—বলো কি? মন্ত্রসিদ্ধি হলে তো লোক দুদিনেই প্রভূত ধন ঐশ্বর্য্যের মালিক হ'তে পারে। এই পৃথিবীতে কিছুই তার অপ্রাপ্য থাকবে না।

তাপসী বিমর্ষ হয়ে জবাব দিল,—তা হয়তো থাকবেনা, কিন্তু ক্রমাগত ক্ষয়ে সিদ্ধি সে হারাবে। কিন্তু ওকি! তোমার আঁখির তারা নীলমণির মত জলছে! এতো ঠিক নয়! সংসারী লোকের অর্থ বৈভবের রাস্তা থেকে আমরা পরমার্থের ঘরে এসেছি। মনঃসংযম কর। দেখ, আমি শুধু গুরুদেবের সেবা করেই কিছু কিছু পাচ্ছি। আর তুমিতো চেষ্টা করলেই অনেক পাবে।

আমি বললাম,—তাপসী, দেবী যদি ধর্ম—অর্থ—কাম—মোক্ষদাত্রী হন তবে অর্থ অস্পৃশ্য হবে কেন? তুমিতো সংসার দেখ'নি তাপসী! জন্মাবধি সন্ন্যাসীর পিছনে পিছনে ঘুরছো। অর্থের, সম্পদের কি অমোঘ শক্তি তা জানবার সুযোগ তোমার হয়নি।

তাপসী কাতর কণ্ঠে জবাব দিল,—মণি, আমি মূর্খ মেয়ে মানুষ, অত শত জানিনা। তবে আমার মনে হয়, অর্থ চাইলে চতুর্বর্গ লাভ হয়না। দেবীকে চাইলেই ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এক সঙ্গেই পাওয়া যায়। কিন্তু আজ আর নয়। চল এখন উঠি। তোমাদের সাধনার জায়গা পরিষ্কার করে দিতে হবে। গুরুদেব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন বোধ হয়। ঐ শোন মায়ের মন্দিরের সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বাজছে। তুমি ধ্যানে বসবে না?

—তুমি যাও, আমি যাচ্ছি পরে।

আমি বসে রইলাম বালির পাড়ে।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে শ্মশানভূমির গাছের জটলা ও স্বল্প পরিসর উন্মুক্ত স্থান ঘন কালির পোঁচে একাকার করে দিয়েছিলাম। একটু দূরেই একপাল শেয়াল ডেকে উঠল—হুক্কা হুয়া,—হুয়া-হুয়া-হুয়া···

আর একদল তার প্রতিধ্বনি তুলল,—হুয়া···হুয়া···হুয়া···

জোনাকীরা রাতের উজ্জল পোষাক পরে প্রেতিনীর উৎসবভূমিতে নাচের আসরে নেমে পড়ল। অদূরে এক পাল কুকুর ডেকে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল,—বল হরি—হরিবোল!

আশ্চর্য্য! অনিত্য জগতের পরম সত্য এই শ্মশানভূমির চেহারা, আমার মনে আজ আর বৈরাগ্যের ছায়া ফেলতে পারল না। মন আমার নানা সর্পিল পথে আবর্ত্ত খেতে লাগল।

তিন চার দিন কাটল আমার অসহ্য জ্বালার মধ্যে। কৃমি কীটের মত নোংরা চিন্তা মাথায় কিলবিল করতে লাগল। এদের ক্রমাগত দংশনে আমি কাহিল হয়ে পড়লুম।

একটি বিনিদ্র রাত্রির অন্ধকার দূর হতে না হতে আমি ও তাপসী যখন মালিনীতলায় ফুল ও বেলপাতা সংগ্রহ করতে গেলুম তাপসী এই নিয়ে প্রথম কথা বলে উঠল।

সাজি ভরা জবা, ঝুমকো, করবী ফুল তুলে আমরা একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসেছিলুম। দ্বারকা নদীর শীতল এলোমেলো হাওয়া তাপসীর ছোট্ট কপালের উপরের চূর্ণকুন্তলকে নিয়ে কৌতুক করছিল।

আমার মাথায় আবার পোকাটা সঙ্কল্প সিদ্ধির অস্থির-তার বেদনায় ছুটাছুটি সুরু করে দিয়েছিল আমি চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম।

সহসা তাপসী আমার একটা হাত জড়িয়ে ধরল। চমকে তাকালাম। গৈরিক ভূমির দুটি কৃষ্ণ হ্রদ জলে উপছে পড়ছে।

—মণি, বল তোমার কি হয়েছে? আমি ক'দিন থেকে লক্ষ্য করছি, তুমি তোমার ঘরে সারারাত ছটফট কর। ধ্যানে একটুও বসনা। তোমার কী হয়েছে আমায় বলবে না?

তাপসীর হাত জ্বরো রুগীর মত গরম। হাতের শিরা দপ্ দপ্ করছে। তপস্বিনী তাপসীর মধ্যে সাধারণ একটী নারী আবিষ্কার করলাম।

—তাপসী, তুমি সাধারণ সংসারী মানুষের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার কথা জান?

—কী জানি, তবে গুরুদেবের কাছে এ সমস্ত কথা শুনেছি।

—নরনারীর প্রেম, মিলন, সম্ভোগ—এ সমস্ত শুনেছ?

—তাও শুনেছি। শাস্ত্রে পাঠ করেছি ; নল-দময়ন্তী, কচ-দেবযানী, রামায়ণ মহাভারতের অনেক উপন্যাস শুনেছি।

—তার মানে তুমি কিছুই জাননা। নিজেকে যদি সুখী করতে চাও তার ব্যবস্থা করতে পারি।

তাপসী হাসল, ম্লান বিশীর্ণ হাসি।

—তার সঙ্গে ঈশ্বর দর্শন করাতে পারো।

—ঠিক বলতে পারি না, চেষ্টা করতে পারি।

—হায়রে! আকণ্ঠ তৃষ্ণার্ত মুমূর্ষু দেবে অঞ্জলিভরা পানীয়! তোমার জন্য দুঃখ হয় মণি, কষে জপ কর, মায়া মোহ সব দূর হয়ে যাবে। আমার উপর রাগ করো না, চল গুরুদেব পূজোয় বসবেন।

তাপসী চলে গেল ; আমি বসে রইলাম। ভেতরে গুম গুম শব্দে বাজতে লাগল, মন স্থির কর, সঙ্কল্প সিদ্ধ কর।

ভৈরবী পীঠের মহাশ্মশান।

ভয়ঙ্করী রূপে সেজেছে তমসা নদীর শ্যামা পাটনী।

শিবাভি র্বহুমাংসাস্থিমোদমানাভিরন্ততঃ।
চতুর্দ্দিক্ষু শবমুণ্ডচিতাঙ্গারাস্থিভূষিতম্॥

ঘোর তামসী রাত্রি। আম, শ্যাওড়া, আকুল গাছের ফাঁকে ফাঁকে তরল অন্ধকার। জলে-ভেজা নদীতীরের বাতাস নিশিথিনীর জোনাকীর বুটীদার ওড়নাকে সরিয়ে উড়িয়ে দিয়ে নিরাবরণ করে দিচ্ছে। পাতায় পাতায় মৃদু শির শির শন্ শন্ শব্দ। অশরীরী প্রেতাত্মার অতৃপ্ত কামনার শীতল দীর্ঘশ্বাস, পাতার উপর সরীসৃপের সরসর্ শব্দ, গাছের মগডালে শকুনশিশুর কান্না, ওঁয়াও ওঁয়াও···আর হঠাৎ ডেকে উঠা একপাল শেয়ালের হুক্কাহুয়া হুয়াহুয়া হুয়া-ঐক্যতান।

—নিঃসঙ্গ অন্ধকারের সমুদ্রে এই শুধু মৃদু তরঙ্গের উচ্ছলতা। তার পর সব চুপ, নিথর, নীরব, বুঝি কালের পদধ্বনিও শোনা যাবে কান পাতলে।

দূরে একটা চিতা প্রায় নিভে এসেছে। এরই মৃদু আলোকে দেখা যায় মড়ার খুলি, হাড়গোড় সরিয়ে একটা স্থান একটু পরিষ্কার করা হয়েছে। একটু হোমের দুই পাশে তিনটি প্রাণী—আমি, তাপসী আর গুরুদেব। মেরুদণ্ড সোজা করে মৃগচর্মাসনে নিমীলিত নয়নে বসে আছি পদ্মাসন করে। এরই একটু পূর্বে সামান্য পূজা শেষ হয়েছে।

দিক্‌বন্ধন, আসনবন্ধন, দেহবন্ধন, করা শেষ হওয়ার পর বাহ্যমাতৃকন্যাস সুরু হ'ল। অন্তর্মাতৃকান্যাস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হাতের সঞ্চালন থেমে গিয়েছে গুরুদেবের। শুধু অতি দ্রুতগতিতে অঙ্গুষ্ঠ করাঙ্গুলীর পর্বের উপর দিয়ে, সঞ্চালিত হচ্ছে। মৃদু শ্বাসপ্রশ্বাস ঠিক নাসিকাগ্রের প্রান্ত ছুঁয়ে আসছে। গুরুদেব আজ একাসনে বসে তিনলক্ষ জপ সমাধা করবেনই।

আমি অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছি। মনের উদ্বিগ্ন কামনা কিছুতেই চেপে রাখতে পারছিনা। প্রক্রিয়ায় অনেক ভুলভ্রান্তি হয়েছে। মন কিছুতেই বসছেনা।

হঠাৎ হাঁটুর উপর শীতল স্পর্শ। সাপ! আমি একটুও নড়লাম না। আস্তে আস্তে ওটা চলে গেল।

আবার মনে হ'লো ঘাড়ের উপর কার উষ্ণ নিঃশ্বাস। তৎক্ষণাৎ চোখ খুলে দেখলাম জমাট অন্ধকার, বাতাসের দীর্ঘশ্বাস, জোনাকীর জ্বলা আর নেভা।

একসময় আমি উঠে পড়লুম। নিঃশব্দে সরীসৃপের মত গড়িয়ে গেলুম। গুরুদেবের পঞ্চমুণ্ডী আসনের পাশে বেদীর উপর দেবীমূর্ত্তি।

অতি নিঃশব্দে মূর্ত্তিটি ঝোলায় ভরে নিলুম। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে, কখনও বা মার্জ্জারের মত পা ফেলে নদীর কিনারায় নেমে গেলাম।

হঠাৎ পদশব্দে চমকে পিছনে ফিরে দেখলাম তাপসী। মাথায় বজ্রাঘাত হলো। কিন্তু আশ্চর্য্য! তাপসী একবারও চীৎকার করল না। আমার হাতধরে নিঃশব্দে নদীগর্ভে নেমে গেল।

সব নিঃস্তব্ধ। শুধু দূরে একঝাঁকে শেয়াল আবার ডেকে উঠল, হুক্কা-হুয়া হুয়া···উয়া···উয়া! গাছের মাথায় একটা শকুন ছানা ককিয়ে উঠল ওঁয়াও ওঁয়াও। আমরা মাঠের আল ভেঙে দ্রুতপদে এগিয়ে চললাম।

কম্পাউণ্ডার, তুমি চঞ্চল হয়ে উঠছো! জানি তোমার সময়ের দাম, তবু বৃদ্ধের শেষ অনুনয় মনে করে আর একটু বস আমি সংক্ষেপে শেষ করব।

তাপসীকে নিয়ে কলকাতার একটা বস্তী অঞ্চলে উঠলাম। পথে খানিকটা সিন্দুর ওর সিঁথের লেপে

দিয়ে ছিলাম, আপত্তি করেনি। বস্তীতে ওকে স্ত্রী বলে পরিচয় দিলাম। কিন্তু পরদিন রাত পার না হতে হতেই আমার সব আশা এক দমকা হাওয়ায় নিভে গেল।

পরদিন মধ্যরাত্রিতে তাপসী আর আমার মধ্যে কথা হচ্ছে।

তাপসি, তুমি আমার প্রস্তাবে রাজী হও। আমাদের পূর্ণকাম ইষ্টমূর্ত্তি আয়ত্তে আছে। আমরা ভৈরবী সাধনা করব। মন্ত্রসিদ্ধি অনিবার্য্য। তারপর, তারপর বিত্ত সম্পদ আর মোক্ষ পায়ের কাছে গড়াগড়ি যাবে।

—তুমি ভুল করছ মণিমোহন, তুমি আমার গুরুভাই। ভৈরবী সাধনা আমি করতে পারব না। আর তোমার চিত্তশুদ্ধিও নেই ঐ সাধনার উপযুক্ত।

—তাহলে তোমায় আমি শাস্ত্রসম্মত ভাবে বিবাহ করব। দেখব আমাদের যুগ্ম সাধনায় দেবী দেখা দেন কিনা।

—মণিমোহন, তোমার বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন হয়েছে, তোমার হৃদয়ে আর দেবীর আসনের স্থান নেই। তোমার বৈরাগ্য গিয়েছে, মুমুক্ষা গিয়েছে, একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণ বিনষ্ট হয়েছে। সেখানে স্থান লাভ করেছে লোভ আর সম্ভোগেচ্ছা। আমাকে ছেড়ে দাও, আমি চলে যাচ্ছি।

—তাপসী, তোমায় আমি বুঝতে পারিনা। তুমি যদি আমায় ভাল না বাসতে তাহলে ঐ নিঃস্তব্ধ রাত্রিতে আমায় না ধরিয়ে দিয়ে হাত ধরে কোন ভরসায় এলে ?

—ভুল করছ, মণিমোহন, আমার দেহমন ঈশ্বরকে উৎসর্গ করেছি। কাজেই ওকথা আর মনেও এনোনা। তাঁর কৃপা পেতেই হবে। তোমার সঙ্গে আমি এসেছি, গুরুদেবের নির্দেশেই। তিনি দুদিন আগেই বলেছিলেন, মণিমোহন বিত্তসম্পদের লোভে ইষ্টদেবীকে অপহরণ করবে। অর্থ সে নিশ্চয় পাবে, কিন্তু ঈশ্বরের পথে আর এগুনো সম্ভব হবে না। প্রয়োজন বোধে তুমি তার সঙ্গে সঙ্গে যাবে। তার চাওয়া শেষ হলে, তুমি দেবীমূর্ত্তিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।

দুর্নিবার ক্রোধে আমি পাগল হয়ে গেলাম।

—ও, তাই তুমি এসেছো এখানে আমার সঙ্গে ? বিত্তসম্পদ আমি যাচ্ঞা করেছি, দেবীর কাছে, হয়ত পাব। কিন্তু মোক্ষও আমার চাই। যতদিন মন্ত্রসিদ্ধি না পাই তোমাকে এখানে থাকতে হবে। তোমার অন্নবস্ত্রের ভাবনা আমি ভাবব।

—মণিমোহন, তুমি অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে যাচ্ছ। তুমি বিত্তসম্পদ যখন চেয়েছ, মন্ত্রসিদ্ধি তোমার হবে না। ভালো চাও, দেবীমূর্ত্তি আমায় ফিরিয়ে দাও।

আমি চীৎকার করে উঠলাম। একটা ক্রুদ্ধ সিংহ আমার কণ্ঠে গর্জন করে উঠল।

—না, না, না, মূর্ত্তি আমি ফিরিয়ে দেবনা। মন্ত্রসিদ্ধি আমার চাই, তোমাকেও এখানে থাকতে হবে।

রাত তখন বারোটা হবে। তাপসীকে সেই ঘরেই বন্ধ করে শিকল তুলে দিলাম। ঠিক পাশের একটা ঘরে ইষ্টমূর্ত্তিকে কাষ্ঠাসনে বসিয়ে মেরুদণ্ড সোজা করে পদ্মাসনে বসলাম। সঙ্কল্প সিদ্ধির উত্তেজনায় মাথা দপ্ দপ্ করতে লাগল। রোজ দশলক্ষ করে জপ করলে মন্ত্রসিদ্ধি কতদূরে থাকবে ? আসতেই হবে।

কিন্তু জপে বসতেই আমার মস্তিষ্কের ভয়ানক যন্ত্রণা সুরু হল। যত উদ্ভট আজগুবি এলোমেলো চিন্তার ঝড়ে মূল ধ্যান ব্যাহত হলো। বহু চেষ্টা করেও দেবীমূর্ত্তিক ভাবনা করতে পারলাম না। এই প্রাণান্তকর চেষ্টা করতে করতে আমি কখন আসনের পাশে ঢলে পড়ে ঘুমিয়ে পড়লাম, জানতেই পারলাম না।

পরদিন প্রভাতে ধড়মড় করে উঠে দেখলাম, ইষ্টমূর্ত্তি অন্তর্হিত হয়েছে, তাপসীও নেই।

তারপর দীর্ঘ দশ বৎসরে আহত সিংহের বিক্রমে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছি, তাপসী আর গুরুদেবের খোঁজে। কিন্তু কোথায় তাঁরা ? যেন ভোজবাজীর মত অন্তর্হিত হয়েছেন।

অবশ্য এই দীর্ঘ পর্য্যটনের সঙ্গে ব্যবসায়িক একটা সম্পর্ক ছিল। কলকাতার বস্তীর বাসা অর্থাভাবে উঠে যাওয়ার পর প্রাণ ধারণের উপায় ছিল ভিক্ষা বৃত্তি। একদিন এক মাড়োয়ারীর গদিতে ভিক্ষা করতে গিয়ে হিসাব লেখার কাজে মাসিক চল্লিশ টাকা মাহিনা—তার পর সেলিং এজেন্ট, তারপর সেলস্ ম্যানেজার হয়ে একেবারে ওয়ার্কিং পার্টনার—এ সমস্ত ধাপ কি করে লাফিয়ে পার হলুম নিজেও ভালো করে জানি না। বোধ হয় এতে ওই দেবীমূর্ত্তির কিছুটা করুণা ছিল।

মোট কথা দশ বছরে ভারতের প্রতিটি তীর্থস্থানে বার দুই তিন করে তাপসী আর গুরুদেবের খোঁজ করেছি, আর হঠাৎ এক দিন আবিষ্কার করেছি ব্যবসার মুনাফা হিসাবে কয়েক লক্ষ টাকা আমার পাওনা হয়েছে।

আমার পাটনার সত্যিই সাধু লোক ছিলেন ; অন্ততঃ আমার প্রতি কখনো অবিচার দেখিনি। দশ বছরের শেষে যখন আমার জন্য পৃথক ব্যবসার ব্যবস্থা করে দিয়ে পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন,—'বাচ্ছা, এইসা শেয়রকা মাফিক বঙ্গালী কভি নাহি দেখা, জীতা রহো', তখন সত্যই মনে হয়েছিল, এই প্রশংসার কণামাত্রও আমার প্রাপ্য নয়।

কিন্তু বিশ্বাস করো কম্পাউণ্ডার, মনে আমি এতটুকু শান্তি পাইনি। কোথায় গেল তাপসী আর গুরুদেব। আমার নিঃসঙ্গতা কাটছে না কেন ?

জপ তপ পূজা আরাধনা সাধ্যমত করতম কিন্তু চোখ বুঁজলেই দেখতে পেতাম, হিন্দুস্থানী, ভাটীয়া— আর মাড়োয়ারীর মুখ।

আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম একটা প্রবল স্রোতে ভেসে যাচ্ছি। লোকে ভাবছে আমি লক্ষ্মীর বরপুত্র ; কিন্তু একটা দেহহীন সত্ত্বা ক্ষীণকণ্ঠে বারবার বোঝাচ্ছিল এই স্রোতের শেষে একটা নিষ্ঠুর দহে আমি ডুবে যাব !

মরীয়া হ'য়ে বাতাস আঁকড়ে ধরার মত বিবাহ করলাম, মনে ইচ্ছা ছিল পরিণীতাকে তাপসীর মত গ'ড়ে তুলব। আর সমস্ত অর্থ দিয়ে আশ্রম বানিয়ে, যুগ্মভাবে ইষ্টদেবীর আরাধনা করব এবং দেখব শ্মশানবাসিনীর কৃপা হয় কি না।

তারপর বাসরঘরে যখন শ্রীকাদম্বিনীকে কাছে টেনে আদর করে বললাম,—কাদু, তোমায় বিবাহ করেছি শুধু সংসার ধর্মের জন্য নয়,ঈশ্বর লাভ জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। প্রকৃত সহধর্মিণীর মত আমায় সাহায্য করবে না ?

কাদম্বিনী চুপ করে একপাশে পড়ে রইল। তার সম্মতি ভেবে পরমানন্দে চোখ বুঁজলাম। চোখের উপর তাপসী একবার উঁকি দিতেই তাকে ভ্রুকুটী করলাম।

কিন্তু পরক্ষণেই যখন শুনলাম আমার সহধর্মিণী বলছে, হঁ্যাগা, তোমারতো অনেক টাকা, আমার ভাইকে কিছু একটা ব্যবসা করে দেবেতো ?" হৃদয় আমার হাহাকার করে ভেঙ্গে পড়ল।

বাসর ছেড়ে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়লাম। শ্মশানবাসিনী তোমার ছলনা। ঠিক আছে আমি একলাই লড়ব, দেখি কতদূর ঠেলতে পারিস্।

কিন্তু, না, কম্পাউণ্ডার, দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর সংগ্রাম করেও শুদ্ধ মাত্র আত্মবিশ্বাসের ভেলায় চেপে ওই স্বর্ণ দ্বীপ ছেড়ে চলে আসতে পারলুম না।

অর্থ-বিত্ত-পুত্র-কন্যা-স্ত্রী এদের ফাঁদে পড়ে কি করে যে দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পার হয়ে গেল বুঝতেও পারলুম না।

হঠাৎ একদিন কাশির সঙ্গে রক্ত উঠল, শরীরটাও ভেঙ্গে আসছিল, ডাক্তারের কাছে গেলুম কিন্তু চিকিৎসার খরচের বহর দেখে পিছিয়ে এলুম।

তারপর এক বছর পর হঠাৎ একেবারে বিছানায় পড়ে গেলুম। প্রবল জ্বর আর রক্ত বমন, হঠাৎ একদিন অনুভব করলুম বাক্ আমার রুদ্ধ হয়ে গেছে। প্রবল কষ্টে চোখ দিয়ে আমার জল গড়াতে লাগল অথচ সব বুঝতে পারতুম।

আর পরমাশ্চর্য্য এই, যেদিন আমার বাক্‌রুদ্ধ হ'ল, চোখের দৃষ্টি ব্যঞ্জনাহীন হ'ল, সেই দিনেই বাড়ীর পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ফেটে পড়ল।

তিন ছেলে অত্যন্ত দ্রুত দুটো কারখানা তিনবার ঘুরে এসে তিনরকম হিসেব দিলে। শুনে বৌমাদের চোখ উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হলো।

অথচ বিছানার কাছে একটু বসার অনুরোধ করলে মাকে ছেলেরা বলত,—ক্ষেপেছ মা, ওই রোগ দেহে পাপ না থাকলে কখনো হয় ? ওই ঘরে গিয়ে ওই রোগ, আমরা নিতে যাই আর কি !

সঙ্গে সঙ্গে বৌমারা তাঁদের স্বামীদের আড়াল করে দাঁড়াত।

খবর পেয়ে কারখানার ম্যানেজার আর কর্মচারীরা তাদের নূতন মনিবদের প্রতি আনুগত্য আর দৈহিক কুশল সম্পর্কে তাদের দুশ্চিন্তার কথা জানিয়ে গেলেন,. কিন্তু দু'টাকা ভিজিটের ডাক্তার আর লালজল ছাড়া আমার কোন ব্যবস্থা হলোনা।

এদিকে আমার মাথার যন্ত্রণা বেড়ে যাচ্ছিল ; বুঝতে পারছিলাম, এইবার চেতনাও আচ্ছন্ন হবে। এরই মধ্যে একদিন অস্পষ্ট অনুভব করলাম, আমার আগেকার বৃদ্ধ মাড়োয়ারী মনিব আমার শিয়রের কাছে ছলছল চক্ষে বসে চিকিৎসার কথা জিজ্ঞাসা করছেন, আর অন্য ডাক্তার দেখাবার কথা বলছেন।

তারপর আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান হওয়ার পর অনুভব করলাম, একটা কিছু হচ্ছে। দেখলাম তুমি ইন্‌জেকশন দিচ্ছ।

কিন্তু জান কম্পাউণ্ডার, আমার চেতনার ঘোর এখনও কাটেনি। মাথায় প্রবল যাতনা। সর্বক্ষণ তাপসী গুরুদেব —শ্মশান—এর অস্পষ্ট অনুভূতি।

বিশ্বাস কর জীবনে এই প্রথম আমার ভয় করছে। বিষম ভয়। প্রাণপণে কাতর হয়ে ডাকছি,—

ওঁ প্রত্যালীঢ়াং পদাং ঘোরাং
মুণ্ডমালা বিভূষিতাম্
খর্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্মাবৃতাং কটৌ

খক্ খক্ খক্...

স্থাণুর মত বসেছিলাম চমকে উঠলাম।

প্রবল কাশির তোড়ে, মণিমোহনের গলা দিয়ে আবার গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে। বুকটা অত্যন্ত দ্রুত উঠানামা করছে। স্ফীত নাসিকা দিয়ে নিশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছেন।

কাশির পাত্রটা এগিয়ে ধরলাম। মাথার বালিশ ঠিক করে দিলাম।

মণিমোহনের স্বর প্রায় রুদ্ধ। ঠোঁট নড়ছে, হাত কাঁপছে। আমার মনে হলো তিনি বলছেন—তাপসী কোথায় তুমি, দাও আমার ইষ্টদেবীকে ফিরিয়ে। বড় অন্ধকার কিছু দেখতে পাচ্ছিনা।

ওঁ প্রত্যালীঢ়াং পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং—

চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

কিন্তু সত্যই ঘর তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। চাকরেরা আলো দিতে কি ভুলে গেল নাকি ?

হঠাৎ একটা আলোর ঝলক। জানালা দিয়ে দেখলুম, কার্ত্তিক ঢুলি প্রাণপণে চামড়ায় কাঠি মারছে। ঢাকী দুলে দুলে, নেচে নেচে ঢাক বাজাচ্ছে আর পাক খাচ্ছে। ছোট ছেলেটা কাঁসর বাজাচ্ছে। ধুপ দীপ সহকারে দেবী বাহিতা হচ্ছেন।

বিজয়া দশমী !

বিশ্ব কুষ্ঠ দিবস

ডাঃ রমেশচন্দ্র আচার্য

সহ স্বাস্থ্য অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ

কুষ্ঠরুগীরা আজও আমাদের সমাজে ঘৃণার পাত্র। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীজী এই সব কুষ্ঠ রুগীদের আরোগ্য লাভের পর সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। সমাজে জন্মগ্রহণ করেও যাঁরা সমাজে পরিত্যক্ত, জীবনের রূপ-রস উপভোগে বঞ্চিত —সেই অগণিত হতভাগ্যদের প্রতি ছিল তাঁর গভীর সহানুভূতি। তাই তাঁর তিরোধান দিবসটিকে গত কয়েক

লেখক

বৎসর যাবৎ বিশ্বের জনগণ "বিশ্ব কুষ্ঠ দিবস" রূপে পালন করে আসছেন।

বিশ্বে প্রায় ১ কোটী দশ লক্ষ লোক এই রোগে ভুগছেন। আমাদের ভারতবর্ষেই এই রোগীর সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ। আর আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এই রোগে ভুগছেন প্রায় ৩ লক্ষ ৬০ হাজার লোক। আমাদের অজ্ঞতা, গোপনতা, কুসংস্কার এবং প্রথম অবস্থায় চিকিৎসায় অবহেলা এই রোগ বিস্তারের কারণ। কয়েক শতবর্ষ কাল পূর্বে ইউরোপে এই মহাব্যাধি বিদ্যমান ছিল। কিন্তু জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ ও সুসংযত চেষ্টায় সমাজের মধ্যে থেকে সব অবস্থায় কুষ্ঠরোগীদের সন্ধান করে বার করে নিয়মিত এবং উপযুক্ত চিকিৎসা করার দরুন আজ আর সেখানে এই রোগ একরকম দেখা যায় না।

অনেকেই মনে করেন কুষ্ঠরোগ ভগবানের অভিসম্পাত, দুরারোগ্য এবং বংশানুক্রমিক। কিন্তু বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে ইহার কোনটিই সত্য নয়। ১৮৭৪ সালে ডাঃ হ্যানসেন প্রমাণ করেন যে সূক্ষ্ম জীবাণু Leprosy bacillus এই রোগের কারণ। কুষ্ঠরোগ দুই প্রকার— সংক্রামক ও অসংক্রামক। যত কুষ্ঠ রোগী আছে তার প্রায় এক চতুর্থাংশ সংক্রামক। সংক্রামক কুষ্ঠ রোগীদের নাক, গলা এবং চামড়ার নিঃসৃত রসে এই রোগের জীবাণু থাকে। সম্ভবতঃ এই Leprosy bacillus চামড়া অথবা নাক ও গলার ভেতর দিয়েই অন্য দেহে প্রবেশ করে। এই রোগ পূর্ব্ব-পুরুষ হইতে উত্তরাধিকারী হিসাবে জন্মায় না। কেবল সংস্পর্শ দ্বারাই রুগ্ন দেহ হইতে সুস্থ দেহে গমনাগমন করে। বহুকালের ঘনিষ্ঠ (contact) যেমন একই বিছানায় শয়ন, রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্র পরিধান, একত্রে বেড়ান, আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি দ্বারাই জীবাণু সুস্থ শরীরে সংক্রমিত হয়।

বহুদিন কুষ্ঠ রোগীর সংস্পর্শে থাকার ফলে এই রোগের আক্রমণ ঘটতে পারে। বড়দের চেয়ে শিশুরাই সহজে এই রোগে আক্রান্ত হয়। তবে রোগ জীবাণু সংক্রমণের

সঙ্গে সঙ্গেই রোগ প্রকাশ পায় না। রোগ প্রকাশ পেতে সাধারণতঃ ৯ মাস থেকে সাত বৎসর সময় লাগে।

প্রথমে শরীরের চামড়ার স্বাভাবিক রঙ্ বিবর্ণ হয়। শরীরের যে কোন অংশে আধ ইঞ্চিরও কম পরিমিত চামড়ার ওপর দাগ। (Patch) দেখা যায় এবং তাতে অনুভূতি থাকে না।

সংক্রামক জাতীয় কুষ্ঠের বিশেষ লক্ষণ এই যে রোগীর কানের ও মুখের চামড়া ফুলে ওঠে ও রঙ্ রক্তাভ বা তামাটে হয় এবং মসৃণ ও চক্‌চকে দেখায়। চোখের ওপর ভ্রূগুলি ফুলে ওঠে ও চুল শূন্য হয় এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই কানে, মুখে ও শরীরের অন্যান্য অংশে বিক্ষিপ্ত-ভাবে ছড়িয়ে পড়ে ফুলে ওঠে। কোন কোন ক্ষেত্রে নাকের বিকৃতি ঘটে। চোখ আক্রান্ত হলে অন্ধ হবার সম্ভাবনা থাকে। সংক্রামক জাতীয় কুষ্ঠ রোগীর সংস্পর্শ (contact) অত্যন্ত বিপজ্জনক।

অসংক্রামক জাতীয় কুষ্ঠে কখন কখন হাতের এবং পায়ের আঙ্গুলগুলি প্রথমে অসাড় হয়, তারপর ক্ষত হয়। এই অবস্থায় চিকিৎসা না করলে হাতের বা পায়ের আঙ্গুলগুলি পচে দেহ থেকে খসে পড়ে। এই সমস্ত অসংক্রামক রুগী কিন্তু কুষ্ঠের জীবাণু ছড়ায় না। সুতরাং এই জাতীয় কুষ্ঠরোগীর সংস্পর্শ (contact) মোটেই বিপজ্জনক নয়।

প্রথম অবস্থায় ছুলি, দাদ বা কোন চর্মরোগ মনে করে সময় নষ্ট না করে যদি কুষ্ঠ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট পরীক্ষা করান হয় তবে অতি সহজেই সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য লাভ করা যায়। অনেক রুগী সমাজ থেকে পরিত্যক্তের ভয়ে ও কুসংস্কার বশতঃ প্রথমে রোগ গোপন করেন। ফলে শুধু রোগ সারানই যে কঠিন হয় তাই নয়, সংক্রামক জাতীয় হলে রোগ ততদিনে বহুলোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। পরে যখন রোগ ভালভাবে প্রকাশ পায় তখন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রোগ জটিল হয়ে পড়ে, চিকিৎসাতে অনেক সময় লাগে, আবার অনেক সময় অঙ্গ বিকৃতিও রোধ করা যায় না। এই রোগ প্রথম অবস্থা থেকে পূর্ণ অবস্থায় পৌছুতে প্রায় ৫।৭ বৎসর সময় লাগে। পূর্ণত্ব প্রাপ্ত কুষ্ঠব্যাধির চিকিৎসা করতে বহু সময়ের দরকার হয়। চিকিৎসা নিয়মিতভাবে এই রোগ সারাবার পক্ষে উপযুক্ত এবং সময়মত চিকিৎসা করলে কুষ্ঠ ব্যাধিও অন্যান্য রোগের মত সম্পূর্ণ নিরাময় হয়। সংক্রামক ও অসংক্রামক উভয়প্রকার রোগীরই চিকিৎসার প্রয়োজন।

অসংক্রামক রুগী স্বাভাবিক জীবন যাপনের সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্তরূপে চিকিৎসা করাতে পারেন। কিন্তু সংক্রামক রুগীকে চিকিৎসার দ্বারা অসংক্রামক না হওয়া পর্য্যন্ত আলাদা রাখতে হবে। চিকিৎসকের নির্দেশমত অবশ্যই চিকিৎসা করাতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রথম বহুদিন চিকিৎসা করার পর রুগী কিছুটা ভাল বোধ করলে আর চিকিৎসা করাতে চান না। ইহা রোগীর পক্ষে এবং রোগীর সংস্পর্শে যাঁরা আসবেন তাঁদের পক্ষে বিপজ্জনক। রোগ সম্পূর্ণ না সারা পর্য্যন্ত অবশ্য অবশ্য চিকিৎসা করাতে হবে।

আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে কুষ্ঠ নিবারণ প্রকল্পের কাজ সুরু হয় প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষাংশে—কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায়, উদ্দেশ্য হলো—কুষ্ঠ অধ্যুষিত অঞ্চলে কুষ্ঠ কেন্দ্র সংস্থাপন করা, জনশিক্ষা, চিকিৎসা ও ব্যাপকভাবে নিরীক্ষণের কাজ করা। এই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের কুষ্ঠ অধ্যুষিত অঞ্চলে এ পর্য্যন্ত ২৭ লক্ষ অধি-বাসীর জন্য ২৫টি কুষ্ঠ কেন্দ্র সংস্থাপন করা হয়েছে। রাজ্য সরকার এবং অন্যান্য সংস্থা পরিচালিত কয়েকটি প্রতি-ষ্ঠানের, আবাসিক চিকিৎসার জন্য ২৪৪৭টি শয্যা আছে এবং ১৭টি আবাসিক কুষ্ঠ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ ছাড়া ১০৪টি বহির্বিভাগ চিকিৎসা কেন্দ্র সরকার, জেলা-বোর্ড ও অন্যান্য সমসংস্থার পরিচালনাধীনে কাজ করছে।

একদিন ছিল যখন মানুষ অজ্ঞতা বশতঃ কুষ্ঠরোগীকে মনে করতো সমাজের জঞ্জাল। এ রোগ সারতে পারে তা কেউ ধারণা করতে পারেনি। কিন্তু উন্নত চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে এবং ব্যাপক রোগ নিরোধ প্রচেষ্টার কাছে এই রোগকেও আজ পরাজয় মানতে হয়েছে। কিন্তু রোগ সেরে গেলেও রোগীর প্রতি আগেকার মত সামাজিক অবিচার এখনও রয়েছে। সমস্যা দাঁড়িয়েছে সেইখানে। এতে রুগী রোগ গোপন করছেন—তাতে একদিকে রোগ সারার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠছে, অন্যদিকে তাঁদেরই দ্বারাই রোগ বেশী ছড়িয়ে পড়ছে। আজ আমাদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এ সমস্যার সমাধান করতে

সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। বুঝতে হবে যে অসংক্রামক রুগী রোগ ছড়ায় না। অন্যান্য রোগের মত তাঁরা সমাজে বাস করেই চিকিৎসা করাতে পারেন। তাতে ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নেই। আবার সংক্রামক রোগীকে পৃথক্ করে রেখে (segregation) উপযুক্ত চিকিৎসার দ্বারা অসংক্রামক হয়ে যাওয়ার পর সমাজে সাধারণ মানুষের মতই বাস করে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে পারেন। তাতে কারো কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নেই। এই উভয় প্রকার রোগীদের আমরা সময়মত আমাদের মধ্যে সন্ধান দিতে পারি। এতে রোগী রোগ গোপন করবে না। রোগ তাড়াতাড়ি ধরা পড়বে, উপযুক্ত এবং সময়মত চিকিৎসায় তাড়াতাড়ি সেরে যাবে এবং রোগ ছড়াবার সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে। সরকারের এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের "কুষ্ঠ রোগ নিরোধের" এই ব্যাপক অভিযান সফল করতে হলে সর্বাগ্রে চাই জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ ও সুসংযত সহানুভূতি, একাগ্রতা ও চেষ্টা।

দুপুর

শ্রীশক্তি মুখোপাধ্যায়

এখন দুপুর ক্লান্ত, স্ফীত বনস্থলী···
সবুজ পাতারা কাঁপে; উলঙ্গ আকাশে
সমবেত পাখি ওড়ে, মেঘেরা বাতাসে।

শেকল নড়ার শব্দে পাশের বাড়ি
জেগে উঠছে পরিচিত সজল আহ্বানে;
বাড়ির উঠোনে রোদ নিরপেক্ষ···একা।

ফেরিওলা হাঁক দিচ্ছে, 'আলতা-সিন্দুর'
গৃহিণীর মন কি বেদনা বিধুর?

এখন চেতনা শান্ত, হৃদয় সুস্থির;
রমণীর রাঙা ওষ্ঠে আয়ত দু'চোখে.
প্রণয় প্রস্তুতি হয় রাত্রির।

রাস্তার পরিপার্শ্বে আবর্জনাস্তূপে
শীর্ণ কুকুরগুলো ঘুরছে এখন।
রিক্সা চালক চলে ঘর্মাক্ত দেহে···
স্থূলকায় আরোহিণী রেশমী রুমালে
মসৃণ মুখ মোছে যত্ন সহকারে।

এখন দুপুর ক্লান্ত, স্ফীত বনস্থলী
সবুজ পাতারা কাঁপে; সজল স্মৃতিতে
পরিচিত মুখগুলি আজো ছায়া ফেলে।

কোথায় যে আছে সব! বয়সে কিশোর
এখনো রয়েছে তারা! ওড়ায় কি ঘুড়ি?
বর্ষার জল ছুঁয়ে কাগজের নৌকাগুলি রোজ
ঘূর্ণীতে ওঠে নামে·· দুরন্ত নাবিক
হবার স্বপ্ন ছিল সকলেরই মনে।

এখন নৌকাগুলি ভিজে স্যাঁৎসেতে···
কাদায় আটকে গেছে মুখ নিচু করে;
বিচ্ছিন্ন নাবিকেরা আজ
পড়ে আছে বিভিন্ন দ্বীপে।

এখন দুপুর ক্লান্ত, স্ফীত বনস্থলী···
সবুজ পাতারা কাঁপে; সজল স্মৃতিতে
পরিচিত মুখগুলি আজো ছায়া ফেলে।

কিশোর জগৎ

দুঃসাহসী

শ্রীজ্ঞান

অসীম নীল -চারিদিকে শুধু নীল আর নীল, তার মধ্যে অতি ছোট্ট একটি ফোঁটার মত এক বিন্দু একটি নীল "কানোজী আংগ্রে"। বঙ্গোপসাগরের বিশাল বিস্তারের মধ্যে মোচার খোলার মত ভেসে চলেছে ঐ ছোট্ট নীল নৌকা "কানোজী আংগ্রে", আর তাকে চালিয়ে নিয়ে চলেছে দুই দুঃসাহসী তরুণের দুই জোড়া শক্ত হাত! গন্তব্যস্থল তাদের সুদূর আন্দামান দ্বীপ, প্রায় হাজার মাইল দূরে!

"এক্সপ্লোরারস্ ক্লাব"এর উদ্যোগে এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা তোমরা সকলেই জান। আরও তোমরা জানই শুধু নয়, ঐ দুই দুঃসাহসী তরুণ জর্জ এলবার্ট ডিউক্ ও পিনাকী চট্টোপাধ্যায়ের নাম আজ তোমাদের মুখে মুখে। ডিউক ও পিনাকী আজ বাংলার তথা সারা ভারতের যুবশক্তির যেন প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে! তাদের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা আজ আসমুদ্র ভারত গভীর আগ্রহে লক্ষ্য করে চলেছে।

তারা কি সফল হতে পারবে? এই দুস্তর জলরাশি দাঁড় টেনে পার হ'তে পারবে? বাহুবলে জয় করতে পারবে এই দুরতিক্রম সাগরকে?—এ প্রশ্ন, এ জিজ্ঞাসা আজ প্রায় ছোট বড় সকলের মনে, মুখে। কিন্তু ডিউক ও পিনাকীর মনে নেই কোনও সন্দেহ, নেই কোনও দ্বিধা। তাদের মনে কোনও শঙ্কা জাগছে না জীবন মৃত্যু তাদের কাছে তুচ্ছ মনে হচ্ছে, ভাবনাহীন চিত্তে তারা শক্ত হাতে দাঁড় টেনে এগিয়ে চলেছে সমুদ্রের বুক চিরে! ইতিহাস প্রসিদ্ধ মারাঠা নৌ-সেনাপতি কানোজী আংগ্রের নামে নামকরণ করা তাদের নীল নৌকা সমুদ্রকে শাসন করে বীরদর্পে হেলে দুলে এগিয়ে চলেছে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের দিকে।

এই অভিযানের আগে আর কখনও কেউ শুধু দাঁড়-টানা ছোট্ট নৌকায় চড়ে তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে এই বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করবার দুঃসাহস দেখায়নি! এক্সপ্লোরারস্ ক্লাবের এই অভিযান সেদিক থেকে সত্যই অভিনব! এই অভিনব অভিযানের কৃতিত্ব ডিউক, পিনাকী ও বিশেষ করে ক্লাবের চেয়ারম্যান্ বিশ্ববিখ্যাত সাঁতারু শ্রীমিহির সেনের। তাঁদের মিলিত প্রচেষ্টায় যে অভিযান চলেছে তা আজ সারা ভারতের তরুণদের মনে এক বিশেষ আগ্রহ ও উত্তেজনা জাগিয়ে তুলেছে—যুবশক্তিকে পথ দেখাচ্ছে কি ভাবে সে শক্তিকে নিয়োজিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে হবে—বিঘ্ন বিপদকে তুচ্ছ করে অজানাকে জানার কাজে, দুর্গম পথে, অসাধ্য সাধনের ব্রতে দীক্ষিত হতে হবে! শুধু সস্তা রাজনীতিতে মেতে স্কুল-কলেজে হট্টগোল করে আর দল পাকানোর ব্যস্ত না থেকে যুবশক্তিকে গঠনমূলক কাজে লাগাতে হবে। সাহস দেখাতে চাও, বীরত্ব দেখাতে চাও তার জন্যে তো কত রকম পথ রয়েছে। যে কোনও একটা বেছে নাও। এক্সপ্লোরারস্ ক্লাব সেই পথেরই সন্ধান দিচ্ছে। ডিউক ও পিনাকী একটা পথে এগিয়ে চলেছে। তোমরাও এগিয়ে এস আরও পথের সন্ধানে; পরিচয় দাও সাহস, বল ও শক্তির; দেখিয়ে দাও বিশ্বকে বাঙ্গালীরা, ভারতীয়রা কারও থেকে পিছিয়ে নেই। "চল্ রে চল্ রে চল্" বলে অরুণ প্রাতের তরুণ দল তোমরা এগিয়ে চল তারুণ্যের জয়গান গেয়ে। আর তোমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হোক কবিগুরুর সঙ্গীত—

"বিঘ্ন, বিপদ, দুঃখ, দহন তুচ্ছ করিল যারা,
মৃত্যু গহন পার হইল টুটিল মোহ কারা।"

মণির খনি

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

চৌদ্দ

মৃদু তরঙ্গে সাগরের বুকে ভেলা ভাসতে লাগলো। দেবেশ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রশান্তকে বলল—"আর এখন কিছু করবার নেই—আসুন বিশ্রাম করা যাক। যদি কোনো জাহাজ টাহাজ এপথে যায় তখন যা'হয় করাযাবে। আপনাকে লুকিয়ে লুকিয়ে খাওয়াবো ব'লে ভাগ্যে সন্ধ্যার সময় ষ্টীমারের ভাঁড়ার থেকে কিছু বিস্কুট এনে দুই পকেট বোঝাই ক'রে রেখেছিলাম। তাই-ই খাওয়া যাক।"

প্রশান্ত আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে দেবেশের দিকে হাত বাড়ালো এবং কয়েকখানা বিস্কুট নিয়ে অনশনক্লিষ্টের মত খেতে খেতে বলল—"ক্ষিদে যে কেমন তা কি তুমি জানো? এমন দিন কি তোমার কখনো গেছে যে একটা দানাও মুখে যায়নি?"

প্রশান্ত বিস্কুটে আর এক কামড় দিয়ে আবার বলল—"আমার কিন্তু মনে হয় যে সে কতদিন—যেন আমার সমস্ত জীবনটা ধরেই আমি অনাহারে আছি। কিছুই খাইনি।"

প্রশান্ত নীরব হ'য়ে খেতে লাগলো। ভাঙ্গা হাড়ের বেদনায় দেবেশ তখন এতই কাতর হয়েছিল যে দাঁতে দাঁত লাগিয়ে জোর ক'রে নিজেকে নিজে সামলাচ্ছিল। প্রশান্তর কথা শুনে তার দুঃখও হ'ল যেমন, বিস্ময়ও হ'ল তেমনি। সে দেখল যে বেশী নয় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই প্রশান্তর শরীরে বল ফিরে এসেছে। চব্বিশ ঘণ্টার শুশ্রূষাই তাকে আবার নূতন মানুষ ক'রে তুলেছে।

বিস্কুটের শেষ টুকরাটুকু মুখে দিয়ে প্রশান্ত বলল—"তোমার কি দৃঢ় বিশ্বাস যে আমিই প্রশান্ত চক্রবর্ত্তী?"

দেবেশ অবাক হয়ে গেল এই অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে। কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—"আপনিতো নিজেই আমাকে তাই বলেছিলেন।"

"বলেছিলাম নাকি ? তা' দেখ, যখনই ওই নামটা আমি বলি, আর আগেকার কথা স্মরণ করতে যাই, তখনই রাগে আমার শরীরটা জ্বলে ওঠে। শুধু এইটুকু মনে পড়ে যে, কিছু একটার জন্য আমায় বড় বেশী ভুগতে হ'য়েছে।' বলতে পার, আমি কেমন ধরণের লোক ? যখন আমার স্মৃতি ফিরে আসে, তখন কি মনে হয় যে আমি একজন ভদ্রলোক ?"

প্রশান্তর কথা শুনে দেবেশ মনে মনে বলল—"উঃ, কি ধড়িবাজ এই প্রশান্ত চক্রবর্ত্তী ! এমন অভিনয় ত আগে কখনো দেখিনি। নিশ্চয়ই প্রশান্ত এমন একটা কিছু ক'রেছে যা লুকিয়ে রাখতে ওকে কখনো সাজতে হচ্ছে বোকা—কখনো সাজতে হ'চ্ছে আলাভোলা সরল মানুষ—কখনো দেখাতে হচ্ছে মনটা কত উঁচু। থাক্, এখন আর কিছু বলছিনে ;—একবার নৃপেনদার হাতে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিতে পারলে হয় ! কিন্তু এ কথাতো ভুলতে পারবো না যে প্রশান্ত চক্রবর্ত্তী যা-ই হোক্—আজ আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে সেই।

মনের ভাব গোপন ক'রে দেবেশ বলল—"আমি অত শত কিছু বুঝিনে। আমার মনে হয় আপনি বোধহয় খুব একটা বিপদে পড়েছিলেন। ওকথা এখন থাক্। আগে আমরা একটা হিল্লের লাগি। তারপর ওসব দেখা যাবে। অতীত বিপদের চেয়ে এখনকার বিপদটাও বড় কম মনে করবেন না।"

প্রশান্ত মোটেই একথা শুনতে চাইল না। সে বার-বার বলতে লাগলো—"যদি আমার সম্বন্ধে তোমার কোনো কিছু জানা থাকে তবে বল না ! দেখি তোমার কথা শুনলে আগেকার কথা আমার মনে পড়ে কি না ?"

দেবেশ বড়ই মুস্কিলে পড়ল। প্রশান্ত যত বড়ই অসৎ লোক হোক্ না কেন কিন্তু তার জীবনদাতা সে। অথচ নৃপেনের সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্য্যন্ত সে প্রশান্তকে সকল কথা খুলে বলেই বা কিরূপে ?

যা'হোক, এমনি সময়ে প্রশান্ত দেখল যে দূরে এক-খানা জাহাজের আলো দেখা যাচ্ছে। জাহাজখানা আমের দিকে আসছিল। প্রশান্ত তড়াক করে লাফিয়ে উঠে প্রাণপণে চীৎকার করতে লাগল। দেবেশও যতটা পারল উচ্চকণ্ঠে চীৎকার সুরু ক'রে দিল। কিছুক্ষণ পরেই তারা দেখল জাহাজ থেকে একটা হাউই উঠে আকাশটা আলো করে দিল।

আনন্দে দেবেশ বলল—"প্রশান্তবাবু, আমরা বেঁচে গেছি—বেঁচে গেছি। ওরা আমাদের ডাক শুনতে পেয়েছে। ভাগ্যে বাতাসটা ওই দিকে বয়ে চ'লছে !"

আধঘণ্টার মধ্যে দেবেশ ও প্রশান্তকে তুলে নিয়ে ডাক জাহাজ "কাইট" কলকাতার দিকে চলতে লাগলো।

জাহাজের কাপ্তেন যখন দেবেশের কাছে শুনলেন যে দেবেশ কলকাতার বিখ্যাত খেলোয়াড় নৃপেন ভৌমিকের বন্ধু এবং নিজেও একজন খেলোয়াড়, তখন তিনি আনন্দের সঙ্গে বললেন—"আমার দ্বারা তোমাদের কাজের যতটুকু সুবিধা হ'তে পারে, তা আমি নিশ্চয়ই করবো। তোমার এই সঙ্গীটি কে ?"

দেবেশ কাপ্তানের কাছে আনুপূর্ব্বিক সকল কথা বর্ণনা ক'রে বলল—"প্রশান্ত যখন জানতে পারবে যে তার সব চালাকি ধরা পড়ে গেছে, তখন যে উনি কি করবেন তাই ভাবছি। তবে যতদূর দেখছি, লোকটার মন খুব উঁচু। কুসঙ্গে প'ড়ে এমন দশা হ'য়েছে।"

কাপ্তান বললেন—"কি ভয়ানক ষড়যন্ত্র। তুমি নিশ্চিত থাকো। এসব কথা প্রকাশ পাবে না।"

কাপ্তানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দেবেশ ডাক্তারের কাছে গেল। এর আগেই ডাক্তার তার ভাঙ্গা হাড় বেঁধে দিয়েছিলেন। দেবেশকে দেখে সমাদরে বসতে বললেন। ডাক্তারেরসঙ্গে কথা বলতে বলতে দেবেশ প্রশান্তর অবস্থাটা জানিয়ে বলল—"আগে প্রশান্তবাবু যতই কেন দুর্ব্বলনা থাকুন, এরই মধ্যে কিন্তু তিনি খুব সবল হ'য়েছেন। আর খাচ্ছেনও যেন দামোদর ! দেখলেন না, জাহাজে উঠেই একেবারে বাটলারের ঘরে গিয়ে হাজির। টেবিলের উপর যা কিছু ছিল, সব খেয়ে এখন নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছেন।"

ডাক্তার বললেন—"আপনার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে যে প্রশান্তবাবু কয়েকদিন কিছু খেতে পাননি। তাই মড়ার মত হয়েছিলেন। এর উপর এমন কিছু একটা হয়ত ঘটেছে যে তাঁর মনে দারুণ আঘাত লেগেছে। শরীরে আর মনে দু'দিক থেকে আঘাত পেলেই মানুষের অমন স্মৃতি বিভ্রম, অমন দুর্ব্বলতা আসে। অল্পে অল্পে

বার বার খাওয়াতে পারলেই দেখ্‌বেন দু'দিনেই লুপ্ত স্মৃতি ফিরে আস্‌বে।"

দেবেশ সন্দেহের সুরে বলল—"তবে আপনি কি বল্‌তে চান যে এসব ভাড়ামি নয় ?"

ডাক্তার বল্‌লেন—"তা আমি কেমন ক'রে জানবো ? আপনি যে সব লক্ষণের কথা বল্‌লেন তা' শুনে ত মনে হয় না যে ভাঁড়ামি। আপনার বুঝি মনে হচ্ছে, যে লোকটা না খেতে পেয়ে একদিন আগেই মড়ার মত ছিল—এক-দিনেই তার শরীরের এতটা উন্নতি হয় কি করে ?"

দেবেশ বলল—"আপনি ঠিকই ধরেছেন। আমি শুধু সেই কথাই ভাব্‌ছিলাম।"

ডাক্তার বললেন—"সে সন্দেহের কোন কারণ দেখি নে। কে কতটা সৈতে পারে, সবই নির্ভর করে তার উপর।"

পরদিন দুপুরে যখন জাহাজ এসে ডায়মণ্ড হারবারে পৌছাল, তখন প্রশান্তকে কাপ্তানের জিম্মায় রেখে দেবেশ তীরে নেমে গেল এবং নৃপেনের কাছে টেলিগ্রাম পাঠালো—

"প্রশান্তকে জীবিত পেয়েছি। তার সম্পূর্ণ স্মৃতিভ্রম ঘটেছে। এ ছাড়া আর কোনো অসুখ নেই, কি করতে হবে জানাও।"

একঘণ্টার মধ্যে উত্তর এসে গেল—"প্রশান্তকে নিয়ে এখনই চলে এসো। যেমন ক'রে হোক, পাঁচটার মধ্যে খেলার মাঠে এসে পৌছানো চাই।"

টেলিগ্রাম পেয়ে দেবেশ কাল বিলম্ব না ক'রে প্রশান্তকে নিয়ে ট্রেনে রওনা হ'ল।

পনের

সেদিন শক্তিসংঘের সাথে কেল্লার সৈন্যদলের ফুটবল ম্যাচ্ ছিল। ফুটবল খেলায় সেনাদলের নাম সে সময়ে খুব প্রসিদ্ধ হয়েছিল। বারটা বাজতে না বাজতেই দলে দলে লোক এসে টিকিট কিনতে আরম্ভ করলো। খেলায় হারজিত সম্বন্ধে সেদিনের সংবাদপত্রে নানারকম আলোচনা প্রকাশিত হয়ে ক্রীড়ামোদী মহলে বিষম একটা হৈ চৈ তুলে দিল। সকলের মুখে এক কথা শ্যামল চক্রবর্ত্তীর অদ্ভুত ক্রীড়াকৌশল দেখা যাবে।

শ্যামল চক্রবর্ত্তী নিজেদের ক্লাবের সেক্রেটারী যতীন ব্যানার্জ্জিকে ডেকে বললেন যে সে খেল্‌তে পারবে না। যতীনবাবুর মুখ একেবারে সাদা হ'য়ে গেল। তিনি বললেন—"তুমি না খেল্‌লে যে শক্তিসঙ্ঘের নাম ডুবে যাবে! তাছাড়া তোমার নাম ক'রে যে হাজার হাজার টিকিট বিক্রী করা হ'য়েছে তাদেরই বা কি বলা যাবে ?"

শ্যামল কিছুতেই খেল্‌তে রাজী হ'লো না। বলল—তার শরীর অসুস্থ। ঠিক মত খেল্‌তে না পারলে না খেলাই ভাল। অনেক অনুরোধ উপরোধের পর নৃপেন ভৌমিক ও অমলের চাপে সে খেলতে রাজি হল বটে কিন্তু বলল—"আজ আর সেদিনের মত খেলা হবে না, তা' আগেই বলছি।"

যতীন ব্যানার্জ্জি একটু মৃদু হেসে বল্‌লেন—"আচ্ছা সে অপরাধটা তোমার নাই বা ধরা গেল। তুমি একটু মন দিয়ে খেল্‌লেই যথেষ্ট। এ দেশে তো এমন খেলোয়াড় দেখি না, যে তোমার সামনে দাঁড়াতে পারে। খেলায় হারজিত আছেই। এবার না হয় আমাদের হার হবে; কিন্তু লোকে একটা ভালো খেলা তো দেখতে পাবে।"

শ্যামল বলল—"তারা যা দেখ্‌তে আস্‌বে তেমনটি তো পাবে না। বল্‌বে, খেলাই হ'ল না।"

যতীনবাবু গম্ভীর হয়ে বল্‌লেন—"তুমি নাম খারাপ হবার ভয় করছ ? তার ব্যবস্থা আমি করছি। সকলেই যাতে জান্‌তে পারে যে আজ ভালো খেল্‌বার মত শক্তি তোমার নাই সে রকম প্রচার আমি এখনই ক'রে দিচ্ছি। তুমি মাঠে নেমে শুধু ক্লাবের নামটা রাখো।"

শ্যামলের পক্ষে আর এর পরে আপত্তি করা সম্ভব হলো না কিন্তু শ্যামলের খেলতে এত আপত্তি দেখে নৃপেন মনে মনে ভাবলেন যে এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন গোলমাল আছে। পাঁচটা বাজতে তখনো কয়েক মিনিট বাকী ছিল। ঠিক পাঁচটায় দেবেশের এসে পৌছবার কথা। নৃপেনবাবু ক্লাবের সেক্রেটারীকে বলে কয়েক ঘণ্টার জন্য তাঁর একখানা ঘর চেয়ে নিয়ে একা দেবেশের অপেক্ষায় বসে রইলেন।

পাঁচটা বাজতে যখন পাঁচ মিনিট বাকী তখনো দেবেশ এসে পৌছাল না জেনে নৃপেন খুব ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লেন। রেফারীর বাঁশী ঠিক পাঁচটায় বাজল এবং

পরক্ষণেই শক্তিসংঘের সঙ্গে সেনাদলের খেলা আরম্ভ হয়ে গেল।

খেলা আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই মাঠের হাজার হাজার দর্শক শ্যামলের দিকে তাকিয়ে রইল। তারা সকলেই জানতো যে শ্যামল অসুস্থ—তার খেলা সেদিন খুব ভাল হবে না। কিন্তু 'মরা হাতি লাখ টাকা!' শ্যামলের খেলা যে সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ্য হবে এ বিষয়ে তাদের কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই দর্শকদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। এ কি খেলা! শ্যামলের পায়ের কাছ দিয়ে বার বার বল চলে যেতে লাগলো, আর সে তা' ধরতে পারলো না!

চঞ্চল দর্শকমণ্ডলী ক্রমেই উত্তেজিত হ'য়ে উঠতে লাগলো এবং শ্যামলকে ভালো খেলার জন্য করতালি দিয়ে উৎসাহিত করতে লাগলো। কিন্তু তাদের আশা পূর্ণ হলো না। শ্যামলের খেলা অসম্ভব খারাপ হচ্ছিল দেখে তার দলের অন্য খেলোয়াড়দের খেলাও সেদিন মোটেই জমল না। সকলেই মনমরা হয়ে গেল এবং 'হাফ্ টাইমে'র আগেই শক্তিসংঘ দু'টো গোল খেল।

লজ্জায়, ক্ষোভে এবং দর্শকদের ছাতাছড়ির ভয়ে যতীন ব্যানার্জ্জি ঘরের বাইরে আসতে সাহস করলেন না। খেলার মাঠে একটা ভীষণ গণ্ডগোলের মধ্যে রেফারীর বাঁশী বেজে উঠলো;—প্রথম অর্দ্ধের খেলা শেষ হ'ল।

যতক্ষণ খেলা চলছিল, নৃপেনকে ততক্ষণ কেউ দেখতে পায়নি। তিনি তখন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। কারণ প্রশান্তকে নিয়ে দেবেশ পাঁচটা বাজবার পর পরই খেলার মাঠে উপস্থিত হয়েছিল। রেফারীর বাঁশী বাজতেই তিনি ওদের রেখে বাইরে এলেন এবং মাঝপথে শ্যামলের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁকে দেখেই শ্যামল কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল—"নৃপেনবাবু, আর না—আর আমি খেলব না। দেখছেন না লোকে আমাকে কি রকম টিট্কারী দিচ্ছে। আমি—আমি—আপনাকে—।" নৃপেন ভাবলেন—তাঁর একটা সুযোগ উপস্থিত হ'য়েছে। বললেন—"আর তোমায় খেলতে হবেনা। আমি সবই জানি, সবই বুঝেছি। তুমি যে আমাকে কি বলতে চাও, অথচ ভয়ে বলতে পারছ না তাও আমি জানি। তুমি এখন গিয়ে জামা জুতো ছেড়ে বিশ্রাম করগে। আজকে আর তোমায় খেলতে হবে না।"

শ্যামল কোন দিকে না চেয়ে হাজার হাজার লোকের অজস্র গালাগালি শুনতে শুনতে বিশ্রামকক্ষে চলে গেল। নৃপেন তখন এক দৌড়ে নিজের ঘরে এসে তাঁর ব্যাগের ভিতর থেকে শক্তিসংঘের একপ্রস্ত প্যাণ্ট ও জার্সি বের ক'রে নিজ হাতে প্রশান্তকে পরাতে আরম্ভ করলেন।

নৃপেনের কাণ্ড দেখে দেবেশ একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। প্রশান্তও ফ্যাল ফ্যাল ক'রে নৃপেনের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো।

নৃপেন বললেন—"এখন আর কথা বলবার সময় নেই। যা বলি তাই কর। তুমি নিশ্চয়ই ফুটবল খেলতে পার? তাই না?"

প্রশান্ত চোখ দুটো বড় বড় করে বলল—"কি বল্লেন? ফুটবল? ফুটবল? হাঁ-হাঁ—খেলতে পারি বৈকি!"

প্রশান্তর ইউনিফর্ম্মের ফিতা বেঁধে দিতে দিতে নৃপেন বললেন—"বাঃ! পোষাকটায় ত তোমায় বেশ মানিয়েছে। ঠিক যেন শক্তিসংঘের শ্যামল চক্রবর্ত্তী।"

প্রশান্ত অতি ধীরে থেমে থেমে উচ্চারণ করল—"শ্যামল চক্রবর্ত্তী। শ্যামল! আরে আমি তার মত দেখতে হব কেন? আমিই তো শ্যামল চক্রবর্ত্তী!"

প্রশান্তর কাঁধে হাত রেখে তার মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে নৃপেন বললেন—"ঠিক—ঠিক তুমিই ত শ্যামল। যদি আজ খেলতে চাও, তবে দু'তিন মিনিটের মধ্যে মাঠে নামতে হবে, পারবে?

দুইচোখ ক্ষণকাল কুঞ্চিত ক'রে প্রশান্ত আবার আপন মনে বলল—"শ্যামল! শ্যামল চক্রবর্ত্তী!" তার-পর ডান হাত দিয়ে ধীরে ধীরে নিজের কপাল টিপে ধরল। মনে হ'ল সে যেন কিছু একটা স্মরণ ক'রতে চেষ্টা করছে। কিন্তু পারছে না। তারপরেই সে একটা উচ্চ-স্বরে চীৎকার করে উঠ্লো; তার সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগলো। নৃপেন মনে করলেন প্রশান্ত বুঝি মূর্চ্ছা যাবে। কিন্তু প্রশান্ত তীরের মত আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। নৃপেন তখনই তার হাত ধরে খেলার মাঠের দিকে চললেন। বল্লেন—"মনে আছে কি, এই সেই শক্তিসংঘের খেলার মাঠ। একদিন তুমি এখানেই 'যুবক সংঘ'কে হারিয়ে দিয়েছিলে?"

প্রশান্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নৃপেনের মুখের দিকে তাকালো।

নৃপেন বল্‌তে লাগ্‌লেন—"ওই শোন, রেফারীর বাঁশী বাজছে। খেলার পর সব কথা তোমায় বলব। আজ ভয়ানক একটা জেদের খেলা হচ্ছে সেনাদলের সঙ্গে। তারা তোমার ক্লাবকে দু' গোল দিয়েছে। কিন্তু তোমাকে আজ জিতে আস্‌তে হবে। একটা খবর শুনে যাও; দস্যু-দলের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে। আরও শুনে যাও, তা'হলে পায়ে বল পাবে—রেডিয়ামের খনির মালিক এখনওতুমি—তুমি রাজকুমার বিমল চক্রবর্ত্তী।"

আবার খেলা আরম্ভ হল।

একি এ! যেখানে বল সেইখানে যে শ্যামল। দর্শকগণ অবাক হ'য়ে গেল। তাদের ঘন ঘন করতালির শব্দ শুনে যতীন ব্যানার্জ্জি তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে এলেন। শক্তি-সংঘের খেলোয়াড়রা যেন নূতন জীবন পেয়ে মন্ত্রবলে চালিত হয়ে খেলতে আরম্ভ করল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে শ্যামল নিজেই দুইটী গোল শোধ দিয়ে সেনাদলের ঘাড়ে—আর একটা গোল চাপালো।

অবাক বিস্ময়ে দেবেশ বলল—"নৃপেনদা, এ ব্যাপার খানা কি?"

হাস্‌তে হাস্‌তে নৃপেন বললেন—"দেবেশ, আজ তোমার জন্যই সকল সমস্যা সমাধান হ'লো। তুমি যাকে সঙ্গে ক'রে এনেছ, সেই-ই হলো সত্যিকারের রাজকুমার বিমল চক্র-বর্ত্তী—খেলার মাঠে শ্যামল।"

বাধা দিয়ে দেবেশ বলল—"কিন্তু আমি যখন জিজ্ঞাসা করছিলাম আপনার নাম কি—তখন উনি নিজেই বলে-ছিলেন—প্রশান্ত।"

"তা হতে পারে দেবেশ, শয়তানেরা রাজকুমারকে ধ'রে বন্দী ক'রে রেখেছিল। কয়েকদিন কিছুই খেতে দেয় নি। মনে ক'রেছিল অনাহারে রেখে দলিল খানায় সই করিয়ে নেবে। যখন তারা দেখ্‌ল যে তা' হলো না, আর প্রশান্ত রাজকুমারের নামটা জাল করতে শিখেছে, তখন তারা মনে করল রাজকুমারকে সংসার থেকে সরিয়ে ফেলাই দরকার। তারই ফলে তোমাদের ষ্টীমারখানা ডুবেছে। ওরা বোমা মেরে ষ্টীমারখানা ডুবিয়ে দিয়ে সেই সঙ্গে তোমাদেরও ডুবিয়ে মারতে চেয়েছিল।"

গর্ব্বিত দৃষ্টিতে নৃপেনের মুখের দিকে তাকিয়ে দেবেশ বলল—"শ্যামলের নষ্টস্মৃতি কেমন ক'রে আবার ফিরে এলো?"

সমস্ত ঘটনাটা ধীরে ধীরে আলোচনা ক'রে নৃপেন বললেন—"যাদের স্মৃতিভ্রম ঘটেছে পরিচিত অবস্থার মধ্যে যদি তাদের এনে ফেলা যায়, তা' হলে অনেক সময় তাদের নষ্টস্মৃতি ফিরে আসে; তারা যা' বেশী ভালবাস্‌তো যদি তা' এনে দেওয়া যায় বা সেই কাজে লাগানো যায়, তা' হলে মুহূর্ত্তে ভ্রমের জাল কাটে। শ্যামলের একমাত্র ব্যসনই ছিল ফুটবল খেলা। ফুটবল খেলা ভিন্ন পৃথিবীতে তার আর কিছু কাম্য ছিল না। সেই খেলায় জয়কেই মনে করতো সব চেয়ে বড় মান। আজ আবার সেই খেলায় মেতে শ্যামলের পূর্ব্বস্মৃতি ফিরে এসেছে। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। প্রকৃতির নিয়মই এই।"

"একটা কথা বুঝতে পারছি না নৃপেনদা। প্রশান্ত যখন দেখল যে তার সকল জারি জুরি শেষ হ'য়েছে, তখনো তবে কেন সে শ্যামপুকুরের রাজকুমারের নামটা আঁকড়ে ধ'রে বসেছিল? সে কি বুঝতে পারেনি যে তুমি সব জান্‌তে পেরেছ?"

নৃপেন হেসে বল্‌লেন—"বুঝ্‌তে পারে নি? খুবই পেরেছিল। সেই জন্যই ত সেদিন ডেস্ক আঙুলে ফেলে ইচ্ছা ক'রে আঙুলটা ছেঁচে দিয়েছিল। কিন্তু বুঝলে কি হবে? ভূত যে তাকে ছেড়েছে, সে কথা ত তখন সে জান্‌তো না। সেই ভূতের ভয়ে সে কিছুতেই সত্যি কথা প্রকাশ করতে সাহস করেনি।"

দেবেশ গম্ভীর হ'য়ে বলল—"উঃ কী ভয়ানক ষড়যন্ত্র! তবে দুঃখ এই যে ভূতরা স'রে পড়েছে।"

পকেট থেকে একখানি টেলিগ্রাম বের ক'রে নৃপেন বললেন—"এই দেখ পাপের ভরা যখন পূর্ণ হয়, তখন দণ্ড নিতেই হবে। পালাবার যো কি দেবেশ? ভগবানের রাজ্যে নিস্তার কারো নেই।"

দেবেশ দেখ্‌ল—ফরাক্কা ষ্টেশনে বিশুরা সদলে ধরা পড়েছে। তারা ডুয়াসে' পালাবার জন্য ফরাক্কায় ষ্টীমারে উঠেছিল। নৃপেনের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে পুলিশ তাদের ষ্টীমারে ধ'রে আটক করেছে।

চারদিকে তখন একটা বিপুল হলহলা রব উঠ্‌লো। নৃপেনও তার সঙ্গে যোগ দিলেন এবং আনন্দে করতালি দিয়ে বল্‌লেন—

"বেবেশ,—দেখ,—দেখ—সেনাদলের ঘাড়ে আর একটা গোল চাপল্;—আর ও-ই দেখ সেই গৌরবের মালিক সত্যকার শ্যামল চক্রবর্ত্তী ওরফে রাজকুমার বিমল চক্রবর্ত্তী। সত্যিকারের প্রতিভা এমনি জিনিষ; তার ক্ষয় নেই।"

———
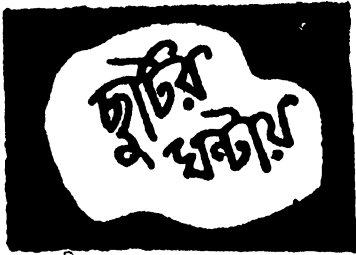
চিত্রগুপ্ত

এবারে বলছি—রাসায়নিক প্রক্রিয়ার আরেকটিআজব-মজার খেলার কথা।

তোমরা সবাই জানো যে কোথাও যদি আগুন জ্বলে ওঠে তো সে আগুন নেভানো হয় সচরাচর জলের সাহায্যে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা এমন অনেক বিচিত্র-রহস্যময় রাসায়নিক-প্রক্রিয়ার কায়দা-কানুন জানেন, যার দৌলতে নিতান্ত সহজ উপায়ে নিমেষেই শীতল-জলের বুকেও জ্বলন্ত-আগুনের দাব-দাহ সৃষ্টি করে তোলা যায়।

কথাটা শুনে তোমরা হয়তো অনেকেই বিশ্বাস করবে না…ভাববে—এমন অসম্ভব কাণ্ড ঘটিয়ে তোলা যায় নাকি কখনো…শুধু রূপকথার কাহিনীতেই এ-ধরণের আজগুবী ঘটনার উল্লেখ মেলে…আর মাঝে মাঝে নজরে পড়ে যাদুকর-ম্যাজিকওয়ালাদের ভেল্কী-ভোজবাজীর আসরে তাঁদের হাত-সাফাইয়ের নিপুণ কায়দা-কারসাজি দেখলে।

আসলে কিন্তু, এমন আজব-ঘটনা ঘটিয়ে তোলা মোটেই দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। বিজ্ঞানের বিচিত্র-রহস্যময় রাসায়নিক-প্রক্রিয়ার দৌলতে টুকিটাকি সামান্য কয়েকটি সাজ-সরঞ্জামের সাহায্যে তোমরা নিজেরাই ছুটির দিনে বাড়ীতে বসে খুব সহজ উপায়ে "শীতল-জলের বুকে আগুন জ্বালিয়ে তোলার" এই-আজব মজার কারসাজিটি পরখ করে দেখতে পারো। শুধু তাই নয়…উপরন্তু, আত্মীয়-বন্ধুদের ঘরোয়া আসরে অভিনব-কৌতূহলোদ্দীপক এই খেলাটি দেখিয়ে অনায়াসেই তাঁদেরও প্রচুর আনন্দ দান করতে আর রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দিতে পারবে।

কি উপায়ে?…শোনো তাহলে—আপাততঃ তারই মোটামুটি পরিচয় দিই।

"শীতল জলের বুকে আগুন জ্বালিয়ে তোলার" এই আজব-মজার কারসাজি দেখাতে হলে, গোড়াতেই জোগাড় করে নাও—ঠাণ্ডা-জল ভর্ত্তি একটি কাঁচের গেলাস এবং সেই সঙ্গে এক বাক্স দেশলাই, এক টুকরো কাগজ আর এক শিশি "ঈথার" (Ether)। "ঈথার" হলো বিশেষ ধরনের একটি তরল-রাসায়নিক পদার্থ…অল্প খরচে এবং অনায়াসেই বাজারের যে কোনো ভালো এবং বড় ডাক্তার-খানায় কিনতে পাবে।

ফর্দ্দমত উপকরণগুলি সংগ্রহ করে, সমতল একটি টেবিলের উপর ঠাণ্ডা-জল ভর্ত্তি কাঁচের গেলাসটিকে সযত্নে সাজিয়ে রেখে, গেলাসের জলের বুকে ছড়িয়ে দাও খানিকটা ঐ শিশির "তরল-ঈথার" (Liquid Ether)। গেলাসের জলের বুকে "তরল-ঈথারটুকু" ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সন্তর্পণে দেশলাই জ্বেলে পলিতার মতো ছাঁদে-বানানো কাগজের টুকরোটিতে আগুন ধরিয়ে ঈথার-মেশানো-জলটুকু স্পর্শ করাও। জ্বলন্ত-কাগজের স্পর্শ পাবামাত্রই দেখবে কাঁচের গেলাসের ভিতরকার সদ্য ঈথার-মেশানো শীতল-জলের বুকে দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠবে আগুনের লেলিহান-শিখা…এবং সে-শিখা সতেজে প্রজ্জ্বলিতও থাকবে—যতক্ষণ পর্য্যন্ত না গেলাসের জলের বুকের ঈথারটুকু পুড়ে বাষ্পাকারে সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়।

এই হলো—এবারকার মজার খেলাটির আসল রহস্য।

আগামী সংখ্যায় এমনি ধরনের আরেকটি আজব-মজার খেলার পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

———

প্রেম

শেখর সেনগুপ্ত

সেই প্রকাণ্ড বাড়ীটাকে দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখলে মনে হবে, মহেঞ্জদড়োর ছোটখাটো একটা সংস্করণ। এক কালে ওটার জলুস ছিল; ঐতিহ্য ও বিক্রম ছিল। আজ সময়ের বিবর্তনে 'ফসিলে' মাত্র রূপান্তরিত হয়েছে।

বাড়ীর মালিক বক্রেশ্বর রায়চৌধুরী গত হয়েছেন প্রায় এক দশক আগে। তিনকুলে কেউ ছিল না। তাই এতদিনে সরকার বেওয়ারিশ সম্পত্তি হিসাবে গথিকরীতির বাড়ীটা নিলামে চড়িয়ে দিয়েছেন।

পাড়ার তরুণ হোমিওপ্যাথ ত্রিদিবেন্দুর বড় সখ ছিল, সে নিলামে বাড়িটা কিনে নেয়। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশ খুঁজে পাবে ওখানে। কিন্তু অত টাকা পাবে সে কোথায়? বাবা তো ছিলেন সেনাবাহিনীর সামান্য হাবিলদার। গত পাক-ভারত যুদ্ধে পুঞ্চ রণক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছেন।

তাই বাড়ীটা যেদিন বিক্রী হয়ে গেলো, সেদিন ত্রিদিবেন্দুর বুক ভেঙ্গে অনেকগুলো দীর্ঘশ্বাস কেঁপে কেঁপে বেরিয়ে আসে! চোখের সামনে যেন একখানা কালো পর্দা নেমে এসেছিল তার।

কিন্তু নিলামে যাঁরা বাড়ীখানা কিনলেন, তাঁদের দেখে ত্রিদিবেন্দুর বিস্ময়ের অন্ত থাকে না।

দু'জন অবিবাহিতা ভদ্রমহিলা এখন এ বাড়ীর মালিক। সম্ভবতঃ এঁরা দু' বোন। নিশ্চয় সম্ভ্রান্ত বংশীয়া। শরীরে যৌবনের বান ডেকেছে। দুটি বোনই সুন্দরী; তার মধ্যে ছোট বোনটির চোখদুটিকে যেন আর ভোলা যায় না।

ত্রিদিবেন্দু তার ডাক্তারির ছলে সেই বাড়ীতে যাতায়াত শুরু করে দেয়। মেয়ে দুটিও সাগ্রহে গ্রহণ করলো তাকে। ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে ত্রিদিবেন্দু সোজা ওদের বাড়ীতে যায়, অনেকক্ষণ ধরে কলহাস্যে মুখর হয়ে ওঠে, খানাপিনাও চলে মন্দ নয়।

রাত গভীরে বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে থাকে ত্রিদিবেন্দু। দুটি বোন,—কেয়া আর বেলা। কেয়া বড় বেলা ছোট। কিন্তু এই দু'জনের মধ্যে কার প্রেমে পড়েছে সে?

অনেক ভেবে স্থির হয়, তার ভালোবাসার পাত্রী বেলা। বেলার দীঘল চোখের ইশারা তাকে বিদ্ধ করে ফেলেছে।...

সেদিন ডাক্তারখানায় বসে বসে সিগারেট টানছিল ত্রিদিবেন্দু। পাশে বসে ছিল তার বন্ধু রমেশ।

রমেশ—শেষ পর্যন্ত প্রেম সাগরে ডুব দিলি?

ত্রিদিব—কেন? আমি কি ভালোবাসতে পারি না?

রমেশ—পারবি না কেন? তবে কি জানিস, ওরা বনেদী ঘরের মেয়ে। শুনেছি, হাজার হাজার টাকা ব্যাঙ্কে ব্যালেন্স আছে দু' বোনের নামে। তোর কি আছে?

ত্রিদিবেন্দু চমকে উঠলো রমেশের কথা শুনে।—"ওরা এত টাকার লোক।"

রমেশ বাঁকা হাসি হাসে, "ন্যাকামি করছিস কেন? তুই তো ঐ টাকার লোভেই ও বাড়ীতে অমন আসর জাঁকিয়ে বসেছিস।"

—"না, না, তা নয়। আমি টাকার লোভে ওখানে যাই না।"

—প্রায় আর্তনাদ ক'রে ওঠে ত্রিদিবেন্দু। তার মাথাটা ঘুরতে থাকে। তাই তো! এমন ধনাঢ্য নারীকে সে সত্যই ভালোবাসতে পারে না! সে অধিকার তার নেই! এই ভাঙ্গা ডিস্পেনসারী, নোংরা ট্রাউজার, দাঁত বের করা

খান চারেক চেয়ার ও একখানা টেবিল, টালীর ঘর—সমস্তই তাকে যেন বিদ্রূপের হাসি হাসছে।···

ত্রিদিবেন্দু আর ঘন ঘন বেলার সাথে দেখা করতে যায় না। গেলেও চোরের মত পা টিপে ফিরে আসে। খাবার টেবিলে মাথ নীচু ক'রে বসে থাকে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে। যেন এক ধরনের অপরাধবোধ তার স্নায়ুগুলোকে ক্ষীণ ক'রে এনেছে।

বেলা ওর এই পরিবর্তন দেখে অবাক হয়। বড় স্বল্পবাক হ'য়ে যা'চ্ছে ত্রিদিবেন্দু। কী যেন ভাবছে! সময় সময় চমকে ওঠে।

বেলার পর্যবেক্ষণী দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর হ'য়ে আসে। সমস্তই বুঝতে পারে সে।

"এই, আমাদের বাড়ীর ছাদে যাবে একটু?"

বেলা মিষ্টি হেসে ত্রিদিবেন্দুকে বলে।

ত্রিদিবেন্দুর বুক কেঁপে ওঠে, "আমার শরীরটা আজ ভালো নয়। আর একদিন যাবো!"

বেলা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকে। তারপর স্মিত হেসে প্রসঙ্গ পাল্টায় "তোমার প্যাণ্টটা চমৎকার মানিয়েছে।"

ত্রিদিবেন্দু যেন আরও কুঁকড়ে আসে, "না, আমার প্যাণ্টটা বড্ড নোংরা। কাচতে দিতে হবে।"···

এ কথা বলেই হন্ হন্ ক'রে বেলাদের ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে পড়ে ত্রিদিবেন্দু। হাঁটতে হাঁটতে পৌছে যায় নিজের ঘরে। পরিত্যক্ত বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ছোটছেলের মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠে।

কতক্ষণ ও ভাবে শুয়ে ছিল খেয়াল নেই ত্রিদিবেন্দুর। হঠাৎ মনে হলো, কে যেন তার মাথার চুলে আঙ্গুল দিয়ে বিলি কাটছে।

"কে?"

"বেলা।"

"তুমি!"

"আমি সব বুঝতে পেরেছি!···আমার টাকাই বুঝি আমাদের দু' জনের মধ্যে বাধার প্রাচীর তুলে দাঁড়িয়েছে? তুমি তো জানো, টাকার গর্ব আমি করি না। বরং, আমি চাই আমার পিতৃদত্ত সেই সম্পত্তিকে সৎকাজে লাগাতে। আর তুমি আমার জীবনে এলে, তবেই তা সম্ভব হবে।"

একটানা বলে হাঁপাতে থাকে বেলা। ত্রিদিবেন্দু দেখে, বেলার চোখে দু' বিন্দু জল চিক চিক করছে। প্রাণ-চঞ্চল আবেগে বেলাকে সে জড়িয়ে ধরে। শত চুম্বনে রাঙা ক'রে তোলে বেলার মোমের মতো মসৃণ মুখাবয়ব।

দূরের কোন মন্দিরে শঙ্খধ্বনি হলো সেই ক্ষণে।

বহুদূরে এক গির্জ্জার ঘণ্টাধ্বনি শ্রুত হয়।*

[ঊনবিংশ শতকের ফরাসী লেখক লুডোভিক (Ludovic Halbevy) ১৮৩৪—১৯০৪, এর উপন্যাস Abbe Constantin-এর ছায়া অবলম্বনে রচিত। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয় লুডোভিকের রচনায় কোন বদচরিত্রের সমাবেশ ঘটে নাই। তাঁর আঁকা সমস্ত চরিত্রই সৎ, সরল ও সুন্দর।]

নির্বাচনের ফলাফল

১৯৬৯ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের সহিত পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অন্তর্বর্ত্তী সদস্য নির্বাচন হইয়া গিয়াছে। নির্বাচনে কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয় হইয়াছে। ২৮০টি আসনের মধ্যে '৬৭ সালে কংগ্রেস ১২৭টি আসন পাইয়াছিল। কিন্তু '৬৯ সালে মাত্র ৫৫টি আসন পাইয়াছে। ইহার কারণ একটি নহে, অনেক। ২০ বৎসর কংগ্রেসী শাসনে দেশের কিছু কিছু উন্নতি হইলেও জনগণের বিশেষ লাভ হয় নাই। ধনী অধিকতর ধনী হইয়াছে, নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজ লোপ পাইয়াছে, দরিদ্র অধিকতর দরিদ্র হইয়াছে। বাহির হইতে দেখিলে শ্রমিক ও কৃষক সমাজের লাভ হইয়াছে মনে হইলেও আসলে কিন্তু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে কৃষক বা শ্রমিক কাহারও সুখ-সুবিধা বাড়ে নাই। এ অবস্থায় কংগ্রেসের পরাজয় অপ্রত্যাশিত হইলেও বিস্ময়কর নয়।

অবশ্য সাধারণ মানুষ একই দল বা একই লোককে বার বার ভোট দিতে চায় না ; তাহাও পরাজয়ের অন্যতম কারণ। কয়েকটি ব্যক্তিগত অবস্থা দেখা যাক : পরাজিতের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। ৫০ বৎসরের সুদীর্ঘ দেশসেবা, ত্যাগ ও দুঃখ বরণ, দু'বার স্বাধীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী লাভ, ৮০ বৎসরের বৃদ্ধ প্রার্থী ভোটারদিগের বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

দ্বিতীয় ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ। উচ্চশিক্ষিত, স্বভাবনম্র, মধ্য-কলিকাতার সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ডঃ চন্দ্র শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়াছেন।

তৃতীয় শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দে। তিনিও সম্ভ্রান্ত বংশের ও ধনী গৃহের মানুষ। দীর্ঘ দিন দেশসেবা করিয়াছেন। বাংলার শ্রেষ্ঠ সম্মান কলিকাতার মেয়র পদে অধিষ্ঠিত তথাপি তাঁহাকে পরাজিত হইতে হইয়াছে।

দক্ষিণ কলিকাতার বিরাট ধনী, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের দৌহিত্র ও আজীবন দেশসেবক, ব্যারিষ্টার যোগেশ চৌধুরীর পুত্র, ব্যারিষ্টার রণদেব চৌধুরী এবং খ্যাতিমান ব্যবসায়ী চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় উভয়েই কংগ্রেস পক্ষে পরাজিত হইয়াছেন।

প্রবীণ ও বর্ষীয়ান নেতা পঞ্চাশ বৎসর দেশ সেবার পর প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তও এবার পরাজিত হইয়াছেন। শ্রীনিশীথনাথ কুণ্ডুও ৫০ বৎসরের দেশসেবক। তিনি এবার পি,এস,পির পক্ষে পশ্চিম দিনাজপুরের রায়গঞ্জ হইতে প্রার্থী হইয়াছিলেন,তাহাতেও জয়লাভ করিতে পারেন নাই। মালদহের পুরাতম কর্মী ও প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র, বীরভূমের সুপরিচিত দেশসেবক শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঁকুড়ার ২০ বৎসরের মন্ত্রী শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়, মেদিনীপুর পাঁশকুড়ার সুপণ্ডিত অধ্যাপক ও প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য, বারাসাত কেন্দ্রের প্রার্থী কলিকাতার অন্যতম ধনী ও সম্ভ্রান্ত বংশের শ্রীঅশোককৃষ্ণ দত্ত, বীজপুর (কাঁচড়াপাড়া ও হালিশহর) কেন্দ্রের দীর্ঘ দিনের দেশসেবক ধনে ও মানে উচ্চস্থানীয় শ্রীবীজেশ চন্দ্র সেন প্রভৃতি সকলেই পরাজিত হইয়াছেন।

তবে কংগ্রেস সব প্রাক্তন মন্ত্রীই পরাজিত হন নাই। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, শ্রীবিজয় সিংহ নাহার, শ্রীসিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ, ডঃ নলিনাক্ষ সান্যাল, শ্রীফজলুল রহমান, শ্রীআভা মাইতি, নির্বাচনে জয়লাভ করিয়াছেন।

ধনীদের মধ্যে হাওড়ার সুবিখ্যাত ধনীবংশের শ্রীনির্ম্মল কুমার মুখোপাধ্যায়ের মত লোকও কংগ্রেস প্রার্থী হইয়া জয়লাভ করিয়াছেন। কিন্তু বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় কংগ্রেস পক্ষের কেহই জয়লাভ করিতে পারে নাই। বারাকপুর মহকুমায় দশটি কেন্দ্রেই কংগ্রেস পরাজিত

হইয়াছেন। বীরেশ বাবুর কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। টিটাগড়ের প্রার্থী শ্রীকৃষ্ণ কুমার শুক্লা গত চারটি সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভের পর এবার পরাজিত হইয়াছেন। পানিহাটি কেন্দ্রে সুপণ্ডিত অধ্যাপকের পরাজয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে শ্যামসুন্দর বাবুর সহিত তাঁহার বিরুদ্ধ প্রার্থী শ্রীগোপাল কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য-এর ভোটের ব্যবধান সর্বাপেক্ষা অধিক—৩১ হাজার।

২৪ পরগণা জেলার কংগ্রেস নেতা দরিদ্র শ্রীহংসধ্বজ ধাড়ার কাকদ্বীপ কেন্দ্রে জয়লাভ দেশ সেবার পুরস্কার বলা যায়।

যাঁহারা কংগ্রেসকে পরাজিত করিয়া জয়ী হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান উল্লেখযোগ্য বাম কম্যুনিষ্ট নেতা ও সুবিখ্যাত রাজনীতিবিদ্ শ্রীজ্যোতি বসু, আজীবন দেশসেবী ও ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় হুগলী আরামবাগকেন্দ্রে প্রফুল্লচন্দ্র সেনের নিকট পরাজিত হইলেও তাঁহার জন্মস্থানও কর্ম্মস্থান মেদিনীপুর তমলুক কেন্দ্রে প্রবীণ দেশসেবক শ্রীকুমার জানাকে পরাজিত করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন। কলিকাতা শ্যামপুকুর কেন্দ্রে ৫০ বৎসরের দেশসেবক বৃদ্ধ শ্রীহেমন্তকুমার বসু প্রবল বিপক্ষকে হারাইয়া জয়ী হইয়াছেন। দক্ষিণ কলিকাতার যুক্তফ্রণ্টের মন্ত্রী শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী ও অধ্যাপক শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য্য উভয়েই জোরাল বিপক্ষকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যুক্তফ্রণ্টের উল্লেখযোগ্য যে সকল মন্ত্রীই বিধান সভায় ফিরিয়া আসিয়াছেন।

পুরুলিয়ার শ্রীবিভূতি ভূষণ দাশগুপ্ত, জলপাইগুড়ির শ্রীননী ভট্টাচার্য্য, নদীয়ার শ্রীচারুমিহির সরকার, বর্দ্ধমানের শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার, কৃষ্ণনগরের শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র, প্রভৃতি সকল মন্ত্রীই বিধান সভায় ফিরিয়া আসায় যুক্তফ্রণ্টকে আর নূতন মন্ত্রী খুঁজিতে হইবে না।

কলিকাতা রাসবিহারী কেন্দ্রে হাজরা রোডের সুবিখ্যাত শিক্ষিত ও ধনী শ্রীবিজয় কুমার বন্দোপাধ্যায় কয়েকমাস পূর্বে বিধান সভার সভাপতি রূপে যে অসাধারণ সাহস ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা তাঁহাকে নির্বাচনে জয়ী করিয়াছে। ইহাই গত নির্বাচনের হিসাবনিকাশ। ২৮০ জনের মধ্যে ৫৫ জন কংগ্রেসীকে বাদ দিলে বিধান সভার বাকী সকল সভাই এখন যুক্তফ্রণ্টের অধীন। তাঁহাদের সংখ্যা ২১৪।

তন্মধ্যে বাম কম্যুনিষ্টদল একক সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাঁহাদের সদস্য সংখ্যা ৮০। শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যুক্তফ্রণ্ট দল গঠিত হইয়াছিল এবং আজ আবার সেই সংযুক্ত দল বিধান সভায় প্রধান হইয়াছে। যে যাহাই বলুক না কেন এজন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব অজয়বাবুর। অজয়বাবু ৫০ বৎসর ধরিয়া অসাধারণ ত্যাগ ও সেবার দ্বারা দেশবাসীকে সেবা করিতেছেন। ১৯৪২ সালে মহাত্মা গান্ধীর 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে তাঁহারই নেতৃত্বে বাংলা দেশে মেদিনীপুর জেলা সর্বাপেক্ষা অধিক কাজ দেখাইয়াছিল এবং তাহার অল্পদিন পরেই মেদিনীপুর জেলায় জলোচ্ছ্বাস ও বন্যায় মহামারী উপস্থিত হইলে অজয়বাবুই অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সহিত দেশবাসীকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

কংগ্রেস আমলেও তিনি প্রায় ১৮ বৎসর পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রীত্ব করিয়াছেন। হুগলী উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায় বংশের মুখ উজ্জ্বলকারী সন্তান চিরকুমার অজয়বাবু অবশ্যই দেশবাসীর দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন এ বিশ্বাস সকলেরই আছে।

গত নির্বাচনে পুরাতন মন্ত্রী শ্রীআশুতোষ ঘোষ একটি দল গঠন করিয়া নিজে নেতা হইয়া প্রায় ৫০টি কেন্দ্রে ঐ দলের প্রার্থী দাঁড় করাইয়াছিলেন। এবং নিজে তিনটি কেন্দ্রে দাঁড়াইয়াছিলেন। জলপাইগুড়ির একটি কেন্দ্র ছাড়া আর কোথাও তিনি নিজে বা তাঁহার দলের কেহই নির্বাচনে জয়ী হতে পারেন নাই। শুধু সর্বত্র অযথা অর্থের অপব্যয় হইয়াছে। দিল্লীর পুরাতন মন্ত্রী সুপণ্ডিত অধ্যাপক হুমায়ুন কবির এম, পি, বাংলাদেশের কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটি নূতন দল নির্বাচন করিয়া প্রায় ৪০টি কেন্দ্রে প্রার্থী হইয়াছিলেন। তাঁহার দলের কোন প্রার্থীই জয়ী হইতে পারেন নাই।

এবারে একটি মুশ্লিম দল গঠন করিয়া মুসলমান প্রধান কেন্দ্রে প্রার্থী দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে মাত্র তিনজন প্রার্থী জয়ী হইয়াছেন। অন্যান্য পরাজিতদের মধ্যে আছেন নদীয়া জেলার ভূতপূর্ব মন্ত্রী ব্যারিষ্টার শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (এবার কংগ্রেস বিরোধী) ও মন্ত্রী শ্রীস্মরজিৎ বন্দোপাধ্যায়, একজন সুপণ্ডিত ও সুবক্তা অধ্যাপক শ্রীহরিপদ ভারতীর নির্বাচনে পরাজয় ঘটিয়াছে। তিনি জনসঙ্ঘ দলের লোক। প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার বসিরহাট, হাসনাবাদ এবং পুরাতন মন্ত্রী দাশরথি তা কংগ্রেস পক্ষে দাঁড়াইয়া পরাজিত হইয়াছেন

নির্বাচনের ফলাফল যাহাই হউক যুক্তফ্রণ্ট সরকার যে যোগ্যতা দেখাইয়া দেশবাসীর দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিতে সমর্থ হইবেন, সেই আশাই সকলে করিতেছে। আমরাও এই সরকারকে স্বাগত জানাইতেছি।

———

রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী

লীলা বিদ্যান্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কবির জীবনে নারীর দান যে কতখানি সে কথা কবি বার বার করে বলেছেন। শেষ সপ্তক এর প্রথম কবিতায় কবি লিখেছেন—নারী যখন পাশে ছিল তখন কবি উদাসীন অন্য মনে তার সেবা গ্রহণ করেছেন। নারী নিজেও ভেবেছে সে যা দিল তাতে রাজার রাজকর পুরো করে দেওয়া হল না। বুঝ আরও দেবার ছিল। কিন্তু তার যে আর কিছুই নেই। সে ভেবেছে নিজেকে নিঃশেষে উজাড় করে দিয়েও বুঝি প্রিয়তমের সমস্ত পাওনা পুরো করে দেওয়া হল না। তারপরে যেদিন সেই নারী চলে গেল সে দিন কবি খুলে দেখেন আপন অন্তরের ভাণ্ডার, সেখানে জীবনের যা কিছু মূল্যবান সেই রত্নগুলো একত্রে রাখা আছে। দিনের পর দিন যে রত্ন নারী তাকে দান করেছে, তার বিরহের দিনে সেই রত্নমালিকার দাম কবি বুঝলেন, তাকে বুকে তুলে নিলেন। এতদিন যে কবি গর্বের উদাসীনতা ভরে নারীর সেবা নিয়েছেন আজ তার সেই গর্ব যেন লুটিয়ে পড়ল, প্রেয়সীর দুখানি পা যে মাটিতে চিহ্ন রেখে গেছে সেই মাটির 'পরে। তাই কবি ভাবছেন—বেঁচে থাকতে যার মূল্য তিনি বোঝেননি আজ মরণের মধ্যে তার সম্পূর্ণ মূল্য তিনি বুঝতে পেরেছেন। আজকের এই যে গভীর বিচ্ছেদ বেদনা এতে প্রিয়তমার প্রেমের মূল্য কবি দিতে পেরেছেন, তাই কবি প্রিয়াকে হারিয়েই তাকে সম্পূর্ণ করে পেয়েছেন। যতদিন দাম দেওয়া হয়নি, ততদিন যা দামী তাকে সম্পূর্ণ রূপে পাওয়া যায় না। (১৮ সঃ)

কবি নারীকে দেখেছেন বিশ্ব জননীর প্রতিনিধি রূপে। এই সৃষ্টির অন্তরালে যে মা বসে আছেন, যিনি কোলে করে এই সৃষ্টি পালন করছেন, বিসর্জন নাটকে রাজা গোবিন্দ মাণিক্য ছোট মেয়ে অর্পণার মধ্যে তাকেই দেখতে পেলেন। তাই রাজা যখন অর্পণার কথায় বলি বন্ধ করে দিলেন, তখন রাণী তাকে বিদ্রূপ করে বললেন যে,দেবী বুঝি তোমার কাছে এসে আবেদন জানিয়ে গেছেন যে তাঁর আর রক্ত সহ্য হয় না। তখন রাজা বললেন—মা আমাকে তাঁর বেদনা জানিয়েছেন, আবেদন নয়। ছাগ শিশুর জন্যে অর্পণার বেদনার মধ্যে রাজা মাতৃ হৃদয়ের বেদনার প্রত্যক্ষ রূপ দেখতে পেয়েছেন। যে বেদনা অর্পণার বুকে বেজেছে সেই ব্যথাই তো বাজে এই সৃষ্টির অন্তরালবর্তিনী জীব পালিনী মায়ের প্রাণে।

নারীর এই মাতৃ প্রকৃতি অতি শিশুকাল থেকেই তার মধ্যে ফুটে ওঠে। বালিকার এই মাতৃ-রূপের ছবি মুগ্ধ কবির চোখে বারবার পড়েছে। শেষ

সপ্তকের একটি কবিতায় কবি লিখেছেন—এক জোড়া রাজহাঁস নিয়ে এসেছে একটি ছোট মেয়ে, পিঠে তার দুলছে বেণী, রাজহাঁসগুলোর সঙ্গে অনেকগুলো বাচ্চা। রাজহাঁস দুটো গম্ভীর চালে চলেছে, যেন সন্তানদের দায়িত্ব বহন করছে বলেই তাদের এই গাম্ভীর্য্য। কিন্তু সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হল ওই মেয়েটির। এই সমস্ত প্রাণগুলোর রক্ষার দায়িত্ব তাদের ওপরে। প্রাণের দাবী রয়েছে ওই ছোট মেয়েটিরও মাতৃমনের ওপরে, সংসারের প্রতি প্রাণের প্রতি মমতা হল মেয়েদের। সবচেয়ে ছোট যে মেয়েটি সেও ওই মাতৃমনের অধিকারিণী, তারও ওপরে রয়েছে জীবন পালনের দায়িত্ব।

"জীব প্রাণের দাবী স্পন্দমান
ছোট ঐ মাতৃমনের স্নেহরসে।"

কখনও বা কবি নারীকে দেখেছেন অধরার রূপে। তাকে বিচিত্র সাজে সাজিয়ে তার রূপের মধ্যে মানুষ তাকে খুঁজতে যায় কিন্তু কোন দুর্লভ মুহূর্তে দেখা যায়—ওই রূপের মায়া লুপ্ত করে দিয়ে নারী অসীমের সঙ্গে বিলীন হয়ে গেছে। নারীর রূপ যেন তার খাঁচা। পাখী যেন খাঁচার মধ্যে ধরা দিয়েছে। কিন্তু ধরা দিলে কি হবে, পাখীর পাখার মধ্যে রয়েছে তার দূর দিগন্তে উড়ে অদৃশ্য হয়ে যাবার বাণী। তেমনি নারীর মধ্যেও রয়েছে সেই দূরের বাণী, তার মনে রয়েছে এক অধরা। নারীর রূপকে তুলনা করা যেতে পারে একটি একতারার সঙ্গে। একতারাটি যে একটি যন্ত্র, তার তারটি যে একটি তার এটা তখনি চোখে পড়ে যখন সে বাজে না। একতারার তারটি যেমনি বেজে ওঠে তেমনি সে যায় অদৃশ্য হয়ে, দ্রুত কম্পনের মধ্যে। তেমনি বেজে ওঠা দুর্লভ মুহূর্তে নারীকে কবি যখন দেখেন তখন বুঝতে পারেন যে সেও তার রূপের সীমানা ছাড়িয়ে অসীমের সঙ্গে মিলিয়ে গেছে। তাকে যতটুকু দেখা যায় সে ততটুকুই নয়। সে তা ছাপিয়ে আরো অনেকখানি। সীমার বাইরে অসীমের সঙ্গে তার মিতালী। নারীর এই অধরা রূপ কোন কোন দুর্লভ মুহূর্তেই কবির চোখে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। অন্য সময়ে মনে হয়েছে যে বুঝি সে তার ওই রূপের সীমার মধ্যেই বাঁধা। নারী সীমার মধ্যে অসীমের বাণী, রূপের মধ্যে অরূপের বাণী, খাঁচার মধ্যে দূরদিগন্তের বাণী যেন রুদ্ধ করে রেখেছে। ঠিক যেমন খাঁচার পাখীর পাখায় তার না ওড়ার মধ্যে মিলিয়ে থাকে অদৃশ্য দূরদিগন্তের বাণী, দুর্লভ মুহূর্তে কবির মনে হয়েছে নারী যেন চেনার মধ্যে অচেনার বাণী লুকিয়ে রেখেছে। তাই বাউল যখন গান গায়—

"অচিন পাখী উড়ে আসে খাঁচায়
দেখে অবুঝ মন বলে, অধরাকে ধরেছি।"

সে গানে রয়েছে যেন নারীরই কথা।

কবি লিখেছেন,—

"তুমি যখন স্নানের পরে এলোচুলে
দাঁড়িয়ে ছিলে জানালায়
অধরা ছিল তোমার, দূরে চাওয়া চোখে পল্লবে
অধরা ছিল তোমার কাঁকন পরা
নিটোল হাতের মধুরিমায়।

নারীর সৌন্দর্য্যে কবি অসীমের ছায়া দেখতে পেয়েছেন।

কবি বলেছেন—মানুষের যখন বয়স বাড়ে, তখন সে সংসারী মানুষ হয়ে ওঠে, তখন সে নারীর মধ্যে অধরাকে আর দেখতে পায় না। কিন্তু কিশোর বয়েসে নারীকে তার সত্যরূপে মানুষ উপলব্ধি করে। তখন সে জানে তার প্রিয়া যেন দূর দেশের রাজকন্যা। সে যেন কার মায়ামন্ত্রে ঘুমিয়ে আছে। সোনার কাঠি ছুঁইয়ে তাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। নারীর মধ্যে আছে এক দূর দেশের ঘুমন্ত রাজকন্যা। প্রেমের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে তার ঘুম ভাঙিয়ে নিতে হয়। কিন্তু বিষয়ী মানুষের এই দৃষ্টি চলে যায়। তার কাছে নারী সংসারের অন্য পাঁচটা প্রয়োজনীয় জিনিষের মতই নিতান্ত জানা, নিতান্ত সাধারণ বলে মনে হয়। নারীর মধ্যে আছে সে দূরত্ব যাকে অতিক্রম করে তবে তার মন পেতে হয়, সেই সুদূর মনোলোকের কথা বিষয়ীমানুষ ভুলে যায়। তাই নারীর প্রতি কিশোর প্রেমের যে মনোভাব তাই হ'ল সত্য।

"ভুলেছ প্রিয়ার মধ্যে আছে সেই নারী
যে থাকে সাতসমুদ্রের পারে
সেই নারী আছে বুঝি মায়ায় ঘুমে
যার জন্যে খুঁজতে হবে সোনার কাঠি"।

পুরুষ যখন এই সোনার কাঠি খুঁজে পায় না, তখন

নারীও থাকে ঘুমে অচেতন। কবি যৌবনের ফাল্গুনের ঋতুতে যাদের দেখা পেয়েছিলেন তাদের বলেছেন বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীর দূতী। কবির যৌবনের দিনগুলো তাদেরই নানা স্মৃতিতে ভরা। তাদের কথা বলতে গিয়ে কবি লিখেছেন—

তরুণ যৌবনের বাউল
সুর বেঁধে নিল আপন একতারাতে
ডেকে বেড়াল
নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে
অনির্দেশ্য বেদনার ক্ষ্যাপা সুরে
সেই শুনে কোন কোন দিন বা
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীর আসন টলেছিল
তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন
তার কোন কোন দূতীকে।
পলাশ বনের রং মাতাল ছায়াপথে
কাজ ভোলানো সকাল বিকেলে।
তখন কানে কানে মৃদু গলায়
তাদের কথা শুনেছি
কিছু বুঝেছি, কিছু বুঝিনি
দেখেছি কালো চোখের পক্ষ্ম রেখায়
জলের আভাস
দেখেছি কম্পিত অধরে
নিমীলিত বাণীর বেদনা।
শুনেছি ধ্বনিত কঙ্কণে
চঞ্চল আগ্রহের চকিত ঝংকার।
তারা রেখে গেছে আমার অজানিতে
পঁচিশে বৈশাখের—
প্রথম ঘুম ভাঙ্গার প্রভাতে
নতুন ফোটা বেল ফুলের মালা।
ভোরের স্বপ্ন তারি গানে ছিল বিহ্বল।
সেদিন কার জন্ম দিনের কিশোর জগৎ
ছিল রূপ কথার পাড়ার গায়ে গায়ে
জানা না জানার সংশয়ে।
সেখানে রাজকন্যা আপন এলোচুলের আবরণে
কখনো বা ছিল ঘুমিয়ে—
কখনো বা জেগে ছিল, চমকে উঠে,
সোনার কাঠির পরশ লেগে।

তারপরে যৌবনের সেই ছায়া-বীথি পার হ'য়ে প্রৌঢ় কবির পথ এসে পৌছল পাথর বাঁধানো রাজপথে। সেখানকার চারিদিকে নির্মমতার মাঝখানে যারা তাকে সান্ত্বনার সুধা দান করেছে কবি তাকে বলেছেন—"অমরাবতীর মর্ত্যপ্রতিমা।" তাদের কথা কবি লিখেছেন—

কখনো দিন এসেছে ম্লান হয়ে—
সাধনায় এসেছে নৈরাশ্য
গ্লানিভারে নত হয়েছে মন
এমন সময়ে অবসাদের অপরাহ্নে
অপ্রত্যাশিত পথে এসেছে
অমরাবতীর মর্ত্য প্রতিমা—
সেবাকে তারা সুন্দর করে
তপঃক্লান্তের জন্য তারা
আনে সুধার পাত্র।
ভয়কে তারা অপমানিত করে
উল্লোল হাস্যের কলোচ্ছ্বাসে।
তারা জাগিয়ে তোলে দুঃসাহসের শিখা
ভস্মে ঢাকা অঙ্গার থেকে
তারা আকাশ বাণীকে ডেকে আনে
প্রকাশের তপস্যায়।
তারা আমার নিভে আসা দীপে
জ্বালিয়ে গেছে শিখা
শিথিল হওয়া তারে
বেঁধে দিয়েছে সুর।
পঁচিশে বৈশাখে বরণমাল্য পরিয়েছে
আপন হাতে গেঁথে।
তাদের পরশ মণির ছোঁয়া
আজো আছে
আমার গানে, আমার বাণীতে।

এই কবিতা পড়ে বুঝতে পারি কবির জীবনে পঁচিশে বৈশাখগুলোর মালা যে স্মৃতিমণিকায় গাঁথা, তার সব মণিকণাগুলোই তিনি পেয়েছেন কোন না কোন নারীর হাত থেকে। এরা কে কবে এসেছিল, কার কথা কবি বলেছেন ফাল্গুনের রংএ মাতাল দিনে, আর কার আবির্ভাবের কথা বলেছেন নৈরাশ্যের গ্লানি ভরা দিনে—সে

ইতিহাস খোঁজা নিষ্ফল। কিন্তু তারা যে সবাই নারী, এটাই সবচেয়ে বড় কথা। তাই সমস্ত নারীর সঙ্গে নারীর এই গৌরবে আমাদের সবারই আছে অধিকার। কবিকে তাঁর জন্মদিনে যত বরণমালা তা আমরাই পরিয়েছি। তাই নারীর কাছে ঋণী কবির কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠেছে তাঁর অজস্র রচনায়। [ক্রমশঃ]

———

রূপচর্চা

সুপর্ণা দেবী

নারীর সুগঠিত দৈহিক-সৌন্দর্য্য ও রূপ-লাবণ্যের স্তুতি-ছন্দে কোনো এক কবি বলেছেন—

"রমণীর সুঠাম দেহ
যেন স্বচ্ছন্দে গাঁথা কবিতা অনুপম!"

এ কথাটা আদৌ অত্যুক্তি নয়। আজকাল ঘরে-বাইরে চটকদার-কৃত্রিম রুজ-লিপষ্টিক্—মাস্কারা প্রভৃতি ব্যবহার করে শস্তা ধরণে নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তোলার জন্য আধুনিকা-মহিলাদের যে সব উৎকট কশরৎ সচরাচর চোখে পড়ে, তাই দেখে বাস্তবিকই মনে হয়—জাল-নকলিয়ানার উদ্দেশ্যে অসার এ প্রয়াস কেন? তার চেয়ে বরং এঁরা যদি দেহের সুছাঁদ রক্ষা বা দৈহিক রূপ-লালিত্যকে স্বচ্ছন্দে বাঁধবার জন্য সামান্য একটু কষ্ট করেন, তাহলে সুদীর্ঘকাল যাবৎ শুধু যে দেহের লালিত্য-মাধুর্য্যই অম্লান-অটুট থাকবে তাই নয়, নীরোগ-সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারিণী হয়ে সহজেই সুখে-শান্তিতে জীবনের দিন-গুলিও পরম আনন্দে অতিবাহিত করতে সক্ষম হয়ে উঠবেন। দেহের এই লালিত্য-সম্পাদনের জন্য সর্ব্বাঙ্গের ব্যায়াম প্রয়োজন। সে ব্যায়াম-সাধনে সকল-অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুছাঁদে গড়ে উঠবে। ঘাড়, গলা, বুক, হাত, পা, কোমর জঘনদেশ প্রভৃতি দেহের প্রত্যেকটি অংশই সুঠাম-সৌন্দর্য্যে ভরে তুলবে। এ সব ব্যায়াম প্রথমে একটু কষ্টসাধ্য বোধ হলেও, নিয়মিত অভ্যাসের ফলে অবশ্য অচিরেই অনায়াস ও সহজসাধ্য হয়ে উঠবে।

নারীর দৈহিক গঠনের লালিত্য-সৌষ্ঠব বিশেষভাবে নির্ভর করে মুখ, হাত, পা, ঘাড়, গলা, বুক, কোমর, জঘনদেশ এবং তলপেটের সুঠাম ছাঁদ ও সুস্থ-স্বাভাবিক অবস্থার উপর। এ সম্বন্ধে প্রয়োজনানুরূপ সচেতনার অভাবে এবং অযত্ন-অবহেলার ফলে, প্রায়শঃ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে আমাদের দেশের মহিলাদিগের মধ্যে অনেকেরই তলপেট বিশ্রী-বেয়াড়া ধরণের পিণ্ডের মতো ঠেলে ওঠে এবং সেজন্য যে কদর্য্যতা ঘটে, দামী শাড়ী সেমিজ-করসেট (corset) প্রভৃতিতে তা ঢাকা পড়ে না। দৈহিক-গঠনের এ ত্রুটি সম্পূর্ণভাবে সারানোর সব চেয়ে ভাল উপায় হলো—প্রত্যহ নিয়মিতভাবে বিশেষ ধরণের কয়েকটি সহজ-সরল 'ঘরোয়া' ব্যায়ামভঙ্গী অভ্যাস করা। এসব ব্যায়াম-ভঙ্গী অনুশীলন সম্পর্কে আধুনিক রূপচর্চাবিশারদ এবং অভিজ্ঞ-বিচক্ষণ ধাত্রী-চিকিৎসকেরা সচরাচর যে বিধি-ব্যবস্থা অনুসরণের পরামর্শ দিয়েছেন প্রসঙ্গক্রমে আপাততঃ তারই কয়েকটির মোটামুটি হদিশ দিই।

মেয়েদের তলপেটের স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য বজায় রাখার উপযোগী প্রথম ব্যায়াম-ভঙ্গীটির পদ্ধতি হলো—সমতল মেঝে কিম্বা খাট তক্তাপোষের উপর দেহের উর্দ্ধাঙ্গ সিধা-সটান ও খাড়াভাবে রেখে দুই পা সামনে প্রসারিত করে দিন। পা দুটিকে এভাবে প্রসারিত করার সময় খাটের শিয়র-দিকের পাটা অথবা ঘরের দেয়ালের সঙ্গে বেশ দৃঢ়ভাবে ঠেশ্ দিয়ে রাখবেন। এইভাবে আসন-গ্রহণের সময় দেয়ালে বা খাটের পাটার গায়ে পায়ের ঠেশ দিয়ে পিঠ ও মেরুদণ্ড সিধা-খাড়া রেখে বসবেন এবং ধীরে ধীরে নিশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দুই হাত দেহের দুই পাশে রেখে উর্দ্ধে মাথার দিকে তুলে শরীরের উর্দ্ধাঙ্গভাগ পিছনদিকে হেলিয়ে দেবেন—যেন শুয়ে পড়বেন, এমনি-ধরণের ভঙ্গীতে। অর্থাৎ সম্ভবমতো যতখানি পারেন, দেহের উর্দ্ধাংশকে পিছনদিকে হেলিয়ে, তারপর আবার ধীরে ধীরে পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনবেন। এমনিভাবে খাড়া-

পিঠে উপবেশন আর ধীরে ধীরে পিছনদিকে দেহ হেলানো এবং পরক্ষণেই আবার খাড়াভাবে বসা—এ ব্যায়াম-ভঙ্গীটি প্রত্যহ নিয়মিতভাবে অন্ততঃপক্ষে দশ-বারোবার অভ্যাস করবেন। নিত্য নিয়মিতভাবে এ ব্যায়াম-ভঙ্গীটি অনুশীলনের ফলে, তলপেটের কোনো অংশ কদর্য্য-কুৎসিত হয়ে উঠবে না···আভ্যন্তরিক-ব্যবস্থাও সুস্থ থাকবে এবং গঠন-সৌন্দর্য্যও অক্ষুণ্ণ থাকবে সুদীর্ঘকাল।

মেয়েদের তলপেটের গঠন-সৌষ্ঠব বজায় রাখায় উপযোগী দ্বিতীয় ব্যায়াম-ভঙ্গীটি হলো—সমতল মেঝে অথবা শয্যার উপর দেহটিকে সুপ্রসারিত করে সটান চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ুন। এভাবে শোয়ার সময় হাত দুটিকে দেহের দুই পাশে প্রসারিত করে রাখবেন। তারপর ধীরে ধীরে নিশ্বাশ-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ডান-প উর্দ্ধে তুলে তলপেটের ও বুকের উপরদিকে গুটিয়ে তুলুন। এবারে জঘনদেশের উপর দেহের ভর রেখে এবং জঘনদেশ স্থির অবিচল রেখে বাঁ-পা'খানি চক্রাকারে ঘোরান। তবে খেয়াল রাখবেন—ডান-পা যেন এ-সময় মেঝে বা শয্যা স্পর্শ করে থাকে—একটুও এদিকে-ওদিকে নড়ে না যায়। এমনিভাবে ডান-পায়ের মতোই বাঁ-পা'খানিকেও প্রলম্বিত করে এ ব্যায়াম-ভঙ্গীটি প্রত্যহ নিয়মিতভাবে অন্ততঃপক্ষে দশ-বারো বার অনুশীলন করবেন। এ ব্যায়ামের ফলে, শুধু তলপেটেরই নয়, জানু, জঘনদেশ এবং জঙ্ঘার পেশীগুলি সুস্থ-সুঠাম ও সুন্দর হয়ে উঠবে।

আপাততঃ, এই পর্য্যন্তই···আগামী সংখ্যায় এ সম্বন্ধে আরো কিছু হদিশ দেবার ইচ্ছা রইলো।

(ক্রমশঃ)

শিশুদের পশমী কোট

শোভনা দেবী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গতবারের আলোচনার রেশ টেনে শিশুদের পশমী কোট বোনার বাকী হদিশটুকু দিচ্ছি।
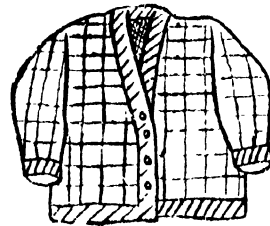
অর্থাৎ, উপরের ছবিতে দেখানো নমুনামতো শিশুদের পশমী-কোট রচনায় সামনের দিকের অংশ বোনবার পদ্ধতি হলো—

গোড়াতেই ৪০টি ঘর তুলবেন। ৬ লাইন পিছন-দিকের অংশ-বোনার ধরনে বুনুন।

৭ম লাইনে সব সোজা বুনবেন।

৮ম লাইন রচনা করুন—সোজা ১ * উল্টো ১, সোজা ১১। * থেকে বোনা সুরু করুন। কাঁটায় ৩ ঘর থাকবে। উল্টো ১ জোড়া—কাঁটায় ৩৯টি ঘর থাকবে।

৯ম লাইন—সব উল্টো।

১০ম লাইন বুনবেন—সোজা ১ * উল্টো ১, সোজা ১১। এবারে * থেকে বুনুন। কাঁটার শেষে ২ ঘর। ১ উল্টো ১ সোজা।

১১শ লাইন—সব উল্টো। ১০ম ও ১১শ লাইন পুনরায় বুনবেন—১২শ এবং ১৩শ লাইন হিসাবে।

১৪শ লাইন বুনবেন—সোজা ১ * উল্টো ১, সোজা সোজা ৫, সামনে সুতো ১ জোড়া, সোজা ৪। * থেকে বুনুন। কাঁটায় ২ ঘর থাকবে। ১ উল্টো ১ সোজা।

১৫শ লাইন—সব উল্টো।

তারপর ১৬শ থেকে ১৯শ লাইন রচনার জন্য ১০ম ও ১১শ লাইন ২ বার বুনুন।

২০শ লাইন—১০ম লাইনের মত বুনুন।

২১শ লাইন—সব সোজা।

২২শ লাইন—সোজা ৭, উল্টে ১, সোজা ১১ উল্টো ১, সোজা ৭।

২৩শ লাইন—সব উল্টো।

২৪শ থেকে ২৭শ লাইন রচনার জন্য—২২শ এবং ২৩শ লাইন ২ বার বুনবেন।

২৮শ লাইন—সোজা ৭ * উল্টো ১, সোজা ৫, সামনে সুতো ১ জোড়া, সোজা ৪, * থেকে বুনবেন। ১ উল্টো, ১ সোজা।

২৯শ লাইন—সব উল্টো।

৩০শ থেকে ৩৩ লাইন বুনবেন—২২ ও ২৩ লাইনের মতো—২ বার বুনতে হবে। তারপর আবার ২২ লাইনের মতো বুনবেন।

৩৫শ লাইন—(কাঁটার পিছন থেকে বুনতে হবে) উল্টো ৭, সোজা ২৫, উল্টো ৭।

৩৬শ লাইন—সোজা ১৩, উল্টো ১, সোজা ১১, উল্টো ১ সোজা ১৩।

৩৭শ লাইন সব উল্টো।

৩৮শ থেকে ৪১ লাইন—৩৬ ও ৩৭ লাইনের মতো ২—বার বুনবেন।

৪২শ লাইন বুনবেন সোজা ৫, সামনে সুতো জোড়া ১, সোজা ৪, উল্টো ১, সোজা ১৩।

৪৩শ লাইন - সব উল্টো।

৪৪শ, ৪৫শ, ৪৬শ এবং ৪৭ লাইন বুনবেন ৩৬শ আর ৩৭শ লাইনের মতো ২ বার। তারপর ৪৮শ লাইন রচনার জন্য আবার বুনবেন ৩৬শ লাইনের ছাঁদে।

অতঃপর, ৪৯শ লাইন বুনবেন—উল্টো ১৪, সোজা ১১, উল্টো ১৪।

স্থানাভাবের কারণে, এবারে প্রসঙ্গালোচনা শেষ করা সম্ভব হলো না। বাকী হদিশটুকু আগামী সংখ্যায় জানাবো। (ক্রমশঃ)

বিচিত্র বিশ্ব

বিশ্ববন্ধু

একজোড়া নির্মম হত্যা

ঘটনাটি ঘটে ইংলণ্ডের নিউক্যাসেল সহরে। খুব বেশী দিনের ঘটনা নয়। আদালতে বিচারের রায় এখনও বেরোয়নি। আসামী দুটি ১১ এবং ১৩ বছরের বালিকা। নাম যথাক্রমে মেরি বেল ও নরমা জয়েস। দুটি কচি শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করার অভিযোগ আনা হয়েছে এদের বিরুদ্ধে আদালতে। নিহত শিশু দুটির বয়স ৩ ও ৪, দু'ভাই। নাম মারকিন ও ব্রায়ান। হত্যার আসল উদ্দেশ্য ছিল কৌতুহল নিবৃত্তি করা। মরে যাওয়ার পর মৃতদেহকে কেমন দেখায়—তাই, এবং মৃতদেহকে কফিনে ভরে আত্মীয় স্বজনেরা কেমন সুন্দরভাবে নিয়ে গিয়ে সমাহিত করবে—সেই দৃশ্য উপভোগ করা। ঘটনার দিন চারজনে মিলেই এই চরম নির্মম দৃশ্যটি ঘটাবার জন্য একটা পোড়ো বাড়ীর দোতলা বেছে নিয়েছিল খেলার স্থল হিসেবে। বাবা-মায়ের বিন্দুমাত্র সন্দেহ করার অবকাশ ছিলনা এই ব্যাপারে। কারণ প্রতিদিনের মত এদিনও তারা একসঙ্গে খেলা করছিল। প্রথমে নানান আজগুবি গল্প বলে শিশুদুটিকে বোঝান হয় যে পৃথিবীতে অনেক সুন্দর সুন্দর পরী আছে, যারা মৃত্যুর পর মৃতদেহকে ভাল ভাল মিষ্টি খাবার খেতে দেয় এবং সুন্দর এক স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে যায়। ছেলে দুটি সরল মনে সে কথা বিশ্বাস করে। তখন নরমা জয়েস তাদের দুজনকে মাটিতে শুয়ে পড়তে বলে। দুই ভাই মিলে মহানন্দে শুয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে গলার উপর চাপ পড়তে থাকে। নরম থেকে শক্ত হাতে। যখন শিশু দুটি চোখে ধাঁধা দেখতে থাকে এবং জ্ঞান হারাতে থাকে তখন হাসিমুখে শুধু একবার অনুরোধ করে—বড্ড লাগছে যে ভাই—একটু আস্তে--। গলার উপর হাতের চাপ বাড়তে থাকে। ক্রমশঃ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে দুটি নিষ্পাপ শিশু—নির্মম হত্যার শিকার হয়ে।

যথারীতি সন্ধ্যার পরও যখন দুই ছেলে বাড়ী ফিরলো না তখন বাবা ও মায়ের দুশ্চিন্তা হল, ছেলেরা কোথায় গেল। প্রতিবেশীদের ছেলেমেয়েদের ডেকে ডেকে খোঁজাখুঁজি সুরু হল। মেরির সঙ্গে দেখা হতেই সে বললো—আমি জানি তারা কোথায়—দেখগে যাও এতক্ষণে তারা বসে পরীদের হাত থেকে কত মিষ্টি খাচ্ছে। মা নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। মেরিকে সঙ্গে করে এগোলেন সেই পোড়ো-ভাঙ্গা বাড়ীর দিকে। কোন রকমে পিছন দিকের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলেন তারা দুজনে। ঘরে পা দিয়েই মা আর্তনাদ করে উঠলেন। দেখলেন তার পায়ের কাছে তারি সন্তানের মৃতদেহ পাশাপাশি শুয়ে, যেন সদ্যতোলা দুটি গোলাপের কুঁড়ি। মুখে পরীদের দেওয়া মিষ্টি হাসি। মেরি পিছন থেকে চীৎকার করে বলে উঠলো—কি আমি ঠিক বলিনি যে ওরা পরীদের দেওয়া মিষ্টি খাচ্ছে?

বিচার এখনও শেষ হয়নি। মেরি সব দোষ নরমার উপর চাপিয়েছে। সে বলেছে, আমি একটাও খুন করিনি ঐ নরমাই ওদের দুজনের গলা টিপে ধরেছিল। নরমাও কিন্তু নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ বলেছে। নিচের আদালত কি রায় দেবে জানলে আপনাদের জানাব। কিন্তু উপরের আদালত কি রায় দেবে তা জানিনা তাই আপনাদের জানাতে পারবো না।

বিজলী পোষাক

মস্কোর এক খবরে প্রকাশ যে সেখানকার বস্ত্রশিল্পের উন্নতিকল্পে বৈজ্ঞানিকরা প্রচণ্ড ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচবার জন্য বহু গবেষণার পর বার করেছেন বিজলী পোষাক।

ওভারঅল জুতা, দস্তানা এবং নরম কাপড় ইত্যাদি নানান জিনিষ মিশিয়ে এই পোষাক তৈরী হয়েছে। সঙ্গে থাকে ১২ ভল্টের বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহকারী সাজ সরঞ্জাম। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চলে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ে। বিশেষ করে মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি এলাকাগুলিতে শীতের সময় তাপ হিমাংকের বেশ নিচে নেমে যায়। তখন মানুষের নিত্য নৈমিত্তিক কাজকর্ম একরকম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়।

এই অসহ্য ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচবার জন্য এই বিজলী পোষাকের সৃষ্টি। এই যন্ত্রের সাহায্যে শূন্যাংকের উপর ৩০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত তাপ সৃষ্টি করা সম্ভব।

এই বিজলীপোষাক গায়ে চড়িয়ে মানুষ ৬০ ডিগ্রি সেঃ তাপাংকের মধ্যেও দিব্যি আরামে কাজ করতে পারবে—মানে স্বর্গসুখ।

অন্তঃসার শূন্য।

সম্প্রতি ভারতের ৫টী প্রদেশে অন্তর্বর্ত্তীকালীন ভোট পর্ব শেষ হল। শেষ হল প্রচুর উৎসাহ এবং সমারোহের সঙ্গে। নানারকম শ্লোগান, পোষ্টার, দলাদলি, মন কষাকষি, বিচিত্র প্রচার, উত্তেজনা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ভারতবাসী মাত্রেই এ কটা দিন কাটিয়েছেন। ফলাফল যাই হোক, আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। তবে এর মধ্যে একটি ভোট বাক্সের ফলাফল নাকি বিশেষ বৈচিত্র্যময়। ঘটনাটি ঘটেছে বিহারের সাহাবাদ জেলার রাজপুর ও ইমদাপুর গ্রামের একটি বুথে। এখানকার ভোটগ্রহণকারী কর্মচারীবৃন্দ সারাদিন বাক্স সাজিয়ে বসে থাকেন—কিন্তু কোন ভোটারের দেখা পান নি। বাক্সটি রয়ে গেল একেবারে শূন্য, যাকে বলে অন্তঃসারশূন্য!

লাল পিঁপড়ের আক্রমণে মৃত্যুবরণ।

কত অসহায় অবস্থার মধ্যেও মানুষের করুণভাবে মৃত্যু হতে পারে, তার একটি মর্মান্তিক ঘটনা সম্প্রতি জানা গিয়েছে। মন্টিভিডিও সহর থেকে প্রায় পৌনে দু'শ মাইল দূরে একটি গ্রামের প্রান্তে বিরাট একটি লাল পিঁপড়ের ঢিপি ছিল। এক ভদ্রলোক, বছর ৩৮ বয়স, গ্রাম পেরিয়ে মাঠের উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় এক দুর্ঘটনা ঘটে, ভদ্রলোক হঠাৎ ঘোড়া থেকে পড়ে যান এবং পাথরের আঘাতে মাথায় ভীষণ চোট পান। যার ফলে ভদ্রলোক কোন রকমে টলতে টলতে গিয়ে সেই লাল পিঁপড়ের স্তুপের উপরে মুখ থুবড়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাছে এমন শিকার পেয়ে লাল পিঁপড়ের দলেরা মহানন্দে ভদ্রলোকের দেহ ঘিরে ফেলে এবং মাংস খেতে আরম্ভ করে। অচৈতন্য অবস্থায় তবুও ভদ্রলোকটি দু'চারবার নড়াচড়া করে নিজেকে ঐ রাক্ষুসে পিঁপড়েদের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না। আক্রমণকারীরা নতুন উৎসাহে মহোৎসব চালাল। ভদ্রলোক অসহায়ভাবে ক্রমে ক্রমে মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়তে লাগলেন। গ্রাম থেকে লোকজন ছুটে আসবার আগেই দেখা গেল, ভদ্রলোক অর্দ্ধমৃত, জ্ঞান নেই। অমন তাজা দেহটা প্রায় রক্ত এবং মাংসহীন হয়ে জায়গায় জায়গায় সাদা হাড় বেরিয়ে পড়েছে। গ্রামবাসীরা তৎক্ষণাৎ সেই বিকৃত দেহটাতে কোন রকমে পিঁপড়েমুক্ত করে হাসপাতালে পাঠাল। কিন্তু সব চেষ্টাই নিষ্ফল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভদ্রলোক ইহলোক ত্যাগ করেন।

আমাদের দেশ হলে হয়তো কারু কারু মতে নিজদেহ পিঁপড়েকে ভক্ষণ করিয়ে এটা একটা চরম আত্মত্যাগের নজীর হয়ে থাকতো—তবে আপনার কি মত আমার জানা নেই।

নেশাত্যাগের কোর্স

ধূমপান ত্যাগেচ্ছুদের কাছে এটা খুবই সুখবর যে বার্মিংহামের সিটি হেল্থ ডিপার্টমেন্টের এক ক্লিনিক নতুন উৎসাহে একটি কোর্স চালু করেছেন। যার মুখ্য উদ্দেশ্য হল ধূমপায়ীদের নেশা ছাড়ান। সংস্থাটি এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বছর দুই আগেই তাদের কাজ সুরু করেছিল কিন্তু যে কোন কারণেই হোক এটা তখন তেমন জনপ্রিয়তা লাভ করেনি, কিন্তু এখন নাকি রোগীদের কাছ থেকে আশাতীত উৎসাহ এবং সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। কাজেই ক্লিনিকের সংখ্যা পাঁচ করা হয়েছে। সেখানে ৪০০ জন অবিরাম ধূমপায়ীদের নেশা তাড়ানোর কাজ সুরু হবে। কর্তৃপক্ষের এক মুখপাত্রের বিবৃতিতে প্রকাশ যে যারা ধূমপান করেন না তাদের তুলনায় ধূমপায়ীদের অকাল মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণেরও বেশী। বিশেষ করে যাদের

বয়স ৩৫ থেকে ৪৫ মধ্যে তাদের মধ্যে করোনারী থ্রম্বো-সিস আক্রমণের সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল। সিগারে বা পাইপে যারা ধূমপান করেন তাদের চাইতে যারা সিগারেট খান তাদের এই অকাল মৃত্যুর হার বেশী।

কিন্তু না খেয়ে মরার চেয়ে, খেয়ে মরাই ভাল নয় কি?

রঙ্গ মাঝে সাঙ্গ লীলা

তামিলনাড়ুর মানাপারের নিকটে এক গ্রামে কিছু-দিন আগে এক সঙ্গে তিনজন যুবকের নৃশংসভাবের ষাঁড়ের গুতোয় মৃত্যু হয়। কোন এক পরব উপলক্ষে স্থানীয় লোকেরা আনন্দ অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে ষাঁড়ের লড়াই-য়ের আয়োজন করেন। এজন্য ষাঁড়গুলোকে আগে বিশেষ কায়দায় জয়ী হওয়ার প্যাঁচগুলি অতি যত্ন সহকারে শেখান হয়। প্রতিপক্ষ যুবকেরাও রীতিমত তৈরি হয়েই আসরে নামেন। চতুর্দিকে দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকেন হাজার হাজার লোক। অনেকে বহু দূর দুরান্ত থেকে এসেছেন এই তামাসা দেখবার জন্য। দু'পক্ষই সমানভাবেই পরস্পরকে হারাবার অপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো। স্থানীয় লোকেরা চীৎকারে, হাততালিতে, নানা অঙ্গভঙ্গি সংকারে উত্তেজনার খোরাক জোগাতে লাগলেন। এর ফলে ষাঁড়েরা ভীষণভাবে ক্ষেপে গিয়ে শিক্ষাগুরুর কঠিন কঠিন প্যাঁচগুলি প্রয়োগ করে তৎক্ষণাৎ তিনজন যুবককে রীতিমত ক্ষতবিক্ষত ও ধরাশায়ী করে জয়ী হল। উপস্থিত লোকদের যখন কাণ্ডজ্ঞান ফিরলো ততক্ষণে যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। হাঁকডাক, ওষুধ-পত্র করেও তাদের জ্ঞান আর ফিরে এল না।

ভগবান জানেন ষাঁড়দের এই বীরত্বপূর্ণ জয় কাদের মুখ বেশী করে উজ্জ্বল করলো!

দু'পয়সার হরতাল

মাস কয়েক আগে চুঁচড়ার পড়ুয়াবাজারে দু'পয়সার হরতাল হয়ে গেল। হরতাল আহ্বান করেছিলেন বিক্রেতারা। উদ্দেশ্য ক্রেতাদের অন্যায় ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে এক ভদ্রলোক কিছু জিনিষ কিনে চলে যাওয়ার সময় মাত্র দুটি পয়সা কম দিয়ে যান। এতে বিক্রেতা জোর প্রতিবাদ করে এবং ন্যায্যমূল্য দেবার জন্য পীড়াপীড়ি করে। দু' পক্ষের হয়েই কিছু কিছু লোক দাঁড়িয়ে যায়। প্রথমে নরমে-গরমে কথা কাটাকাটি সুরু হয়। কিন্তু তাতেও কোন পক্ষই মীমাংসায় আসতে পারে না। শেষে সুরু হল রাগারাগি, চেঁচামেচি এবং সর্বশেষে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড, হাতাহাতি। পুলিশ এসে কোন রকমে অবস্থা আয়ত্তে আনে। নাটকের শেষ এখানেই হল না। বিক্রেতারা একজোট হয়ে ক্রেতাদের বিরুদ্ধে হরতাল পালন করলেন সম্পূর্ণ একদিন। বাজার, হাট, দোকান-পাট সবই বন্ধ ছিল। দোষী ব্যক্তির শাস্তি হওয়াও ছিল তাদের দাবীর মধ্যে একটি।

দেখা যাচ্ছে কালে কালে তালে তাল দেওয়ার ধরণই পাল্টে যাচ্ছে।

আগামী সংখ্যা থেকে সাগর পারের পটভূমিকায় লেখা ডাঃ অরুণকুমার দত্তর নতুন ধরণের উপন্যাস বন্দরের বন্ধন ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হবে।

সংখ্যায় নয়, সম্পদে

শ্রী'শ'—

বাংলা চলচ্চিত্রের সুমহান ঐতিহ্যের জন্য বাঙালী মাত্রেই গর্ব্ব বোধ করে থাকেন। ভারতীয় চিত্রের মধ্যে বাংলা চিত্রই সব চেয়ে বেশী আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করেছে। সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ প্রভৃতি পরিচালকদের দক্ষতা এবং বাঙালী লেখকদের নৈপুণ্যই এই সকল সম্মানলাভ সম্ভব করে তুলেছে। এই জন্য এঁরা সকলেই বাঙালী-মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু ইদানিং মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবিগুলোর দিকে চেয়ে একটা হতাশার ভাব মনে জাগছে—মনে হচ্ছে বাংলা চিত্র তার ঐশ্বর্য্য, তার ঐতিহ্য যেন ক্রমশই হারিয়ে ফেলছে, চলচ্চিত্র জগতের রাজপট্ট ছেড়ে সে যেন সরে আসছে! কিন্তু কেন এমন হচ্ছে? এর উত্তর হয়ত কেউই সঠিক বলতে পারব না।

বাংলা চিত্র নানা দুর্বিপাকের মধ্য দিয়ে চলছে একথা ঠিক। অর্থের অনটন তো রয়েইছে। তার ওপর প্রায়ই দেখা যাচ্ছে অপটু পরিচালনা ও দুর্ব্বল গল্পাংশ বা চিত্র-নাট্যর জন্য ছবি মার খাচ্ছে। প্রথম দিকটায় বিজ্ঞাপনে ভুলে দর্শকেরা ভিড় জমালেও বেশীদিন সে ছবি কিন্তু চলছেনা। সাধারণ গল্পও পরিচালনা ও অভিনয় গুণে সুন্দর চিত্রের রূপ নেয়, আবার শুধু গল্প বা চিত্র-নাট্যের জোরে চলনসই পরিচালকের ছবিও বেশ চলে যায়। কিন্তু চিত্র-নাট্য ও পরিচালনা দুটোই যখন সাধারণ মানের নীচে পড়ে, তখন শুধু অভিনয়ের জোরে বা নামকরা তারকাদের নাম ভাঙিয়ে বেশীদিন ছবি বাজারে চালান যায় না। দেশ বিদেশের অনেক সফল চিত্রের দৃষ্টান্ত তুলে দেখান চলে যে অপূর্ব্ব পরিচালনায় বা অপরূপ চিত্র-নাট্যের গুণে

অখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনীত চিত্রও সাফল্য ও শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভে সমর্থ হয়েছে।

বাংলার চিত্র-নির্মাতারা এই দিকে সজাগ দৃষ্টি দিলে লাভবান হবেন। আজে বাজে চিত্র নির্মাণ করে ও মুক্তি দিয়ে অর্থের অপব্যয়ই শুধু হয়। এরূপ চিত্র না পারে বক্স-অফিসের দিক দিয়ে সাফল্য আনতে, না পায় দর্শকদের প্রশংসা ও পৃষ্ঠপোষকতা। এই অর্থ নৈতিক সঙ্কটের দিনে শুধু বেশী চিত্র-নির্মাণের দিকে ঝোঁক না দিয়ে উন্নত মানের বৈশিষ্ট্য পূর্ণ চিত্র যাতে নির্মিত হয় সেই দিকেই চিত্র-নির্মাতাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত বলে মনে করি। বাংলার চিত্রের মান উন্নত হয়ে সম্মান যাতে বাড়ে তাই আমরা দেখতে চাই, কতগুলি চিত্র নির্মিত হল তা গুনে দেখতে চাই না।

*   *   *   *   *

সাগরপারের ধ্রুপদী চলচ্চিত্র

শ্রীনরেশচন্দ্র বসু

সোভিয়েট রাশিয়া ১৯২৫

চলচ্চিত্রের ইতিহাসে বিদ্রোহকে অবলম্বন করে খুব বেশী চিত্র তোলা হয়নি এবং তার মধ্যে নৌ বিদ্রোহ বা নৌ যুদ্ধের পটভূমিকায় চিত্র অতি সামান্য। এই পর্য্যায়ে 'মিউটিনি অন্ দি বাউন্টি' ছাড়া ঠিক এই মুহূর্ত্তে তেমন কোন চিত্রের নামও স্মরণ করতে পারছি না। কিছুদিন পূর্বে কোলকাতার মিনার্ভা মঞ্চে লিটল্ থিয়েটার গ্রুপ "কল্লোল" বলে একটি নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন। ভারতীয় নৌ বিদ্রোহের পটভূমিকার নাটকটি গড়ে উঠেছিল। যদিও বিকৃত ইতিহাস ও মতবাদের প্রাবল্যে নাটকটি সুধীবৃন্দের মনে সাড়া জাগাতে পারেনি তথাপি মঞ্চ-কৌশলের জন্য অর্থকরী সাফল্য লাভ হয়েছিল। কিন্তু প্রায় চুয়াল্লিশ বৎসর আগে রাশিয়ার সারজেয়ি আইসেনষ্টাইনের (Sergei Eisenstein) তোলা 'দি ব্যাটেলসিপ পটেমকিন' এই সকল নৌ বিদ্রোহের ওপর চিত্র বা নাটকের পথিকৃৎ বলে দাবী করতে পারে। এখানেও ইতিহাস অবিকৃত ছিল না তথাপি প্রয়োগ নৈপুণ্যের জন্য চিত্রটি আপামর দর্শক সাধারণ ও সমালোচকদের মনে সাড়া জাগাতে পেরেছিল।

প্রকৃত ঘটনা ১৯০৫ সালে রাশিয়ার জারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে অবলম্বন করে। এই বিদ্রোহের অন্যতম অংশীদার ছিল শ্রেষ্ঠ যুদ্ধ জাহাজ পটেমকিন। তার দূর পাল্লার কামান, অভিজ্ঞ নৌ সেনানীবৃন্দ 'পটেমকিনকে' অজেয় করে তুলেছিল। পটেমকিন ও তার সঙ্গী চারটি যুদ্ধ জাহাজে কয়েকজন বিদ্রোহী নাবিক ছিল সত্য, কিন্তু তাদের প্রতিটি গতিবিধির ওপর গুপ্তচরেরা প্রখর দৃষ্টি রাখতো এবং উর্দ্ধতন অফিসারদের সে বিষয়ে অবহিত করতো। বিদ্রোহীরা এই যুদ্ধ জাহাজগুলিকে অধিকার করে বন্দরগুলি অবরোধ করবার এবং তাঁদের বিদ্রোহীদের সাহায্য করবার পরিকল্পনা করেছিল।

খারাপ খাদ্য বিশেষ করে দুর্গন্ধযুক্ত বাসি মাংস দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর নাবিকদের খেতে বাধ্য করা হয়েছিল এবং শেষকালে তারা অনন্যোপায় হয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। ৫ই জুলাই ডেকের একজন সাধারণ নাবিক উর্দ্ধতন অফিসারের নিকট এই মাংসের ব্যাপারে অভিযোগ করে। অফিসারটি, একজন ইঞ্জিনিয়ারের ভাষায় "a polish aristocrat and a tyrant" সঙ্গে সঙ্গে তাকে গুলি করেন। এতদিনকার চাপা অসন্তোষ যেন বারুদে দেশলাই পড়ার মত ফেটে পড়লো। বিদ্রোহী নাবিকেরা তৎক্ষণাৎ তাকেও গুলি করে সমুদ্রের জলে ফেলে দেয়।

অস্ত্রাগারের রক্ষীরা উর্দ্ধতন অফিসারদের গুলি করে হত্যা করতে অস্বীকৃত হলে Matyushenko নামে একজন নাবিক বিদ্রোহীদের দলনেতা হয়ে অস্ত্রাগার অধিকার করে। পাঁচ ছয়জন উর্দ্ধতন অফিসারকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ক্যাপ্টেন গুলির মুখে প্রাণ বিসর্জন দিলেন এবং অন্যান্য অফিসারেরা অন্য জাহাজে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেওয়ায় প্রাণে বেঁচে যান।

পটেমকিনকে অধিকার করে বিদ্রোহীরা "ওডেসা"র দিকে যাত্রা করলেন। জাহাজে খাদ্য, কয়লা ইত্যাদির দারুন অভাবে একদল তীরে নামলেন ঐগুলি জোগাড়ের আশায়। তীরের সৈন্যরা তাদের বন্দী করবার চেষ্টা করলে, বিদ্রোহীরা কামান দিয়ে সহর উড়িয়ে দেবার ভয় দেখালেন। তীরের বিদ্রোহীরা খাদ্য ও কয়লা দিয়ে সাহায্য করলে পটেমকিন নিজ গন্তব্যাভিমুখে যাত্রা করে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় কৃষ্ণসাগরের অন্যান্য যুদ্ধ জাহাজ পটেমকিনের পথ অনুসরণ করতে দ্বিধাবোধ করলো। শীঘ্রই বিদ্রোহীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল এবং যুদ্ধ জাহাজটি রুমেনিয়ার সরকারের হাতে অর্পণ করা হলে, সরকার বিদ্রোহীদের মুক্তি দিয়ে তাদের গন্তব্যাভিমুখে প্রেরণ করেন।

ইতিহাসের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আইনসেনষ্টাইন যে চলচ্চিত্র নির্ম্মাণ করলেন তার সঙ্গে ইতিহাসের যোগা-যোগ অতি ক্ষীণ। কল্পিত 'ওডেসার' হত্যাকাণ্ড চলচ্চিত্রের কাহিনীকে গতিময় করে তুললেও ইতিহাসের সঙ্গে তার কোন যোগ নেই। কিন্তু প্রচার ও শিল্পকলা এই দুই দিকে দৃষ্টি ফেরালে দেখা যায় রাশিয়ার বিদ্রোহ এবং বিদ্রোহীদের প্রতি এমন সমবেদনাপূর্ণ ও উত্তেজনাময় চলচ্চিত্র অদ্যাবধি প্রস্তুত হয় নি।

"দি ক্যাবিনেট অফ ডাঃ ক্যালিগরি"র সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম্মী চিত্র "Potemkin or The battleship Potemkin" প্রথমোক্ত চিত্রের ন্যায় এই চিত্রও সবাক নয়—নির্ব্বাক। বিদ্রোহী রাশিয়ার পৃথিবীর নিকট তাদের লোকপ্রিয় দর্শন—মানুষের সমষ্টিগত কাজ, এককের নয়—এই চিত্রে প্রস্ফুটিত। পটেমকিন ১৯২৫ খৃঃ মুক্তি-লাভ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলের বিশেষ ভাবে পত্র পত্রিকার সমালোচকদের দৃষ্টি আর্কষণ করে। যদিও এ কথা অনস্বীকার্য যে রাজনৈতিক মতবাদ ও সহসা মনের আবেগকে আক্রমণ করায় (আইনসেনষ্টাইনের ভাষায় "shock attraction") এই চিত্র এত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।

চলচ্চিত্রে ইতিপূর্বে অনুপস্থিত মণ্টাজ্ সট বা প্যারালাল এ্যাকশন এই চিত্রেই প্রথম দেখা গেল। অন্য কথায়—

"Eisenstein was not the first film artist, but the first to be so pure, the first to use photography like painting in movement, photography like verbal imagery."

পটেমকিন জাহাজের বিদ্রোহ তাদের কৃতকার্য্যতা, ওডেসার জনসাধারণের সহানুভূতি লাভ, সহর বাসীদের ছোট ছোট ডিঙি নৌকায় খাদ্য প্রেরণ; ওডেসার জন-সাধারণ যখন পটেমকিনকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে সেই সময় জারের সৈন্যদের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড এবং সর্বশেষে সমস্ত যুদ্ধ জাহাজের পটেমকিনকে আক্রমণের প্রস্তুতি এক কথায় অনবদ্য। ডাঃ ক্যালিগরীর ফ্যাণ্টাসী এখানে অনুপস্থিত, মন এখানে প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তবতার সম্মুখীন।

চিত্রনাট্যটিকে পাঁচটি অঙ্কে ভাগ করা যায়—(১) Men and Maggots (২) Drama on the quarter deck (৩) The dead man cries for vengeance (৪) The Odessa steps (৫) Meeting the squadron.

এর মধ্যে The Odessa stepsএর চিত্রনাট্যের একটু অংশ উদ্ধৃত করবার লোভ সামলাতে পারছি না।

……কসাক সৈন্যরা জনতার ওপর সোজা আক্রমণ করছে। জনতা ঘোড়ার পায়ের তলায় পদদলিত হচ্ছে। ঘোড়সওয়ারদের চাবুক তাদের ওপর অবিরাম পড়েছে।

…একদল সৈন্য সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে।

.. জনতার ওপর গুলি পড়ছে।

…একদল স্ত্রীলোক ও বৃদ্ধ থামের আড়ালে নিজেদের গোপন করবার চেষ্টা করছে। কেউ ওপরের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে।

...সৈন্যদল জনতার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বর্ষণ করে যাচ্ছে।

...স্ত্রীলোক ও বৃদ্ধরা সিঁড়ির ওপর পড়ে যাচ্ছে।

...সৈন্যরা এদিক ওদিক ছুটে যাচ্ছে। (পা পর্য্যন্ত শুধু দৃশ্যমান)

...একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক একটি প্র্যামকে (Perambulator) এই ধাবমান জনতার মধ্য থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। তার মধ্যে একটি শিশু শুয়ে রয়েছে।

...অবিশ্রান্ত, মেসিনের মত সৈন্যদল সিঁড়ির ধাপ দিয়ে নেমে আসছে।

...সুন্দরী স্ত্রীলোকটি ভয়ে চীৎকার করে উঠলেন। প্র্যামটিকে জড়িয়ে ধরলেন।

...নিজের শরীর দিয়ে শিশুটিকে আড়াল করবার চেষ্টা করছেন; এবং ধাবমান লোকদের মধ্য থেকে প্র্যানটিকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন।

...সৈন্যদল সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে।

.. গুলি করছে।

.. যন্ত্রণায় তরুণী মা তার মুখ পেছন দিকে ফেরালেন।

...সিঁড়ির ধাপে গড়াতে গড়াতে এসে প্র্যামটি নিশ্চল হোল।

...তরুণী মা যন্ত্রণায় মুখ হাঁ করলেন।

...হাত দিয়ে নিজের গাউনের শেষ অংশটুকু তুলে ধরলেন।

...ধাবমান জনতা ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হচ্ছে আর কসাক সৈন্যদের চাবুক তাদের ওপর পড়ছে।

...তরুণী মার বুকে রক্ত।

...তরুণী মার মুখ বিদীর্ণ!

...পড়ে যাচ্ছেন।

...শিশুসহ প্র্যামটি সিঁড়ির প্রায় শেষ ধাপে এসে দাঁড়াল।

...রাইফেল উঁচিয়ে সৈন্যরা নেমে আসছে।

...সিঁড়ি দিয়ে নামছে।

...তরুণী মা সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে পড়ছেন।

...ধাক্কা দিলেন।

...শিশুসহ প্র্যামটি।

...একজন কসাক সৈন্য চাবুক দিয়ে একজনকে মারছে।

...ধাবমান জনতা ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট হচ্ছে আর কসাক সৈন্যদের চাবুক তাদের ওপর পড়ছে।

...তরুণী মা সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

·শিশুসহ প্র্যামটি ঝাঁকুনি দিতে দিতে চল্‌ছে।

.. সিঁড়ির শেষ কিনারায়।

—ডাঁটিবিহীন চশমা পরিহিত বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ভয়ে বিবর্ণ।

...শিশুসহ প্র্যামটি।

...জমি স্পর্শে পুনরায় লাফিয়ে উঠ্‌লো।

...গড়াচ্ছে।

...তরুণী মা সিঁড়িতে পড়ে গিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

...গাড়ী যাবার পথে কসাক সৈন্যরা যাকে সামনে পাচ্ছে চাবুক মারছে।

...সিঁড়ির ধাপ।

...একদল সৈন্য জনতার ওপর এলোপাথাড়ি গুলি চালাচ্ছে।

.. সিঁড়ির ধাপে লাফিয়ে লাফিয়ে প্র্যামটি নামছে।

...বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ভয়ে বিস্ফারিত চোখে দাঁড়িয়ে।

...সিঁড়ির ধাপে লাফিয়ে লাফিয়ে প্র্যামটি নামছে।

...ভয়ে বিবর্ণ একটি ছাত্র একটি বাড়ির কোণে নিজেকে লুকাবার চেষ্টা করছে।

...সিঁড়ির ওপর থেকে সৈন্যরা জনতার ওপর অবিশ্রাম গুলি বর্ষণ করে যাচ্ছে।

...শিশুসহ প্র্যামটি লাফাতে লাফাতে সিঁড়িগুলি অতিক্রম করে গেল।

...ভয়ে বিবর্ণ একটি ছাত্র একটি বাড়ীর কোনে লুকাবার চেষ্টা করছে।

...সিঁড়ির ধাপ।

...মৃতদেহ পড়ে আছে।

...উন্মত্তের মত শিশুসহ প্র্যামটি মৃতদেহের ওপর দিয়ে নেমে আসছে।

...ভয়ে বিবর্ণ ছাত্রটি বাড়ীর কোণ থেকে আর্ত চীৎকার করে উঠ্‌লো।

...শিশু সহ প্র্যামটি উল্টে গেল।

...একজন কসাক সৈন্য তার তরবারি শূন্যে আন্দোলিত করলো।

একটি perambulator যে চিত্রনাট্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারে এই চিত্রে তাহা পরিস্ফুট। জনতার ওপর অত্যাচারের চেয়ে প্র্যামটির জন্য দর্শক সাধারণ যেন বেশী উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত চিত্তে পরবর্ত্তী দৃশ্যের জন্য উন্মুখ। প্র্যামটি যেন ফ্লবেয়ার, টলষ্টয় বা ভিক্টর হিউগোর রচিত কোন উপন্যাসের সার্থক চরিত্র। আইসেনষ্টাইন এর পরেও ইতিহাসের বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি করেছেন যেমন The tendaysthat shook the world, TheGeneral line, Alexander Nevsky, Ivan the Terrible এবং শেষোক্ত চিত্র দুটি শিল্পকর্ম হিসাবে যদিও অনন্য কিন্তু The battleship Potemkin ক্ল্যাসিকাল বিয়োগান্ত নাটক হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। রুশ বিদ্রোহ যেমন ইতিহাসে নবযুগের সূচনা করেছে সেই রকম এই চিত্রটি তার সোনা ঝরানো মুহূর্ত্তের জন্য চলচ্চিত্রের ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করেছে।

———

* * * *

প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন—নীপা চৌধুরী

সুপ্রভা সামন্ত—নরেন্দ্রপুর—২৪পরগণা

সুচিত্রা সেনকে বাংলা ছবিতে আর দেখা যাচ্ছে না কেন?

০ দেখতে পাবেন। তবে কবে দেখতে পাবেন সেটা এখনও কিছু বলা যাচ্ছে না। কারণ "কমলল"তার সুটিং এখনও শেষ হয়নি।

* * *

অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত—রাসবিহারী এভিনিউ—কলিকাতা

সাগরপারের ধ্রুপদী চলচ্চিত্রের চিত্রগুলিকে কি ভাবে আপনারা বাছাই করছেন?

০ ধ্রুপদী ব্যাপার-ট্যাপারগুলো নরেশবাবুই ভাল বোঝেন। কিভাবে বাছাই করছেন সে একমাত্র উনিই বলতে পারেন।

* * *

পার্থসুধীর সিংহ—রমণী চ্যাটার্জি রোড—কলিকাতা

ইডেন গার্ডেনের প্যাগেডা নিলামে বিক্রি করে দেওয়া হল নতুন করে হবে বলে। নতুন প্যাগেডার আজ অবধি কোন চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না। কেন?

০ বর্মা থেকে ধার পেতে দেরী হচ্ছে বলে।

° ° °

সমীর ঘোষ—ঘাটশীলা

"রাহগীর" কবে মুক্তি পাবে?

০ সময় হলেই।

° ° °

যতীন চক্রবর্ত্তী—বাঘমারী রোড—কলিকাতা

শ্যামবাজারের মোড়ে নেতাজীর ষ্ট্যাচু নিয়ে যে ভাবে দর্শক বনাম করপোরেশনের টাগ অব ওয়ার চলছে তার ফলে নেতাজীকে আরও অসম্মান করা হোল না কি?

০ সত্যিকারের সম্মানটাই বা আমরা কবে নেতাজীকে দিয়েছিলাম?

° ° °

মুরারিমোহন গোস্বামী—হায়াৎ লেন, কলিকাতা

১৯৩৬ সালে যখন প্রথম "অন্নপূর্ণার" মন্দির মুক্তি পায় তার সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন নীরেন লাহিড়ী। বর্ত্তমানের পরিচালক নীরেন লাহিড়ী ও ঐ ছবির সঙ্গীত পরিচালক কি একই ব্যক্তি না ভিন্ন ব্যক্তি?

০ এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। সঙ্গীত পরিচালক হিসেবেই শ্রীনীরেন লাহিড়ীর চলচ্চিত্রলোকে প্রথম পদার্পণ।

প্রশান্ত জোয়ারদার—যোধপুর পার্ক—কলিকাতা

উত্তমকুমারকে বাংলাদেশের মুখ্যমন্ত্রী করলে কেমন হয়?

○ অভিনেতা হিসেবে আজকের দিনে উত্তমকুমার কারুর প্রশংসার অপেক্ষা রাখেন না, কিন্তু রাজনৈতিক অভিনেতা হিসেবে উত্তমকুমারের অভিনয় ভাল হবে বলে আমার মনে হয় না।

• • •

সামসুদ্দিন আমেদ—সামশুল হুদা রোড—কলিকাতা

নিউ থিয়েটার্সের মত বাঙলা ও হিন্দি সংস্করণ আজকাল একই সঙ্গে তোলা হয় না কেন?

○ একটা সংস্করণ করতেই প্রযোজককে খাবি খেতে হয় একশ আটবার তায় দুটো সংস্করণ একসঙ্গে? কোন্ দেশে আপনি বাস করছেন মশাই তা কি আপনি নিজে জানেন না?

• • •

স্বপ্না মৌলিক—রথতলা—কসবা

"এন্টনী ফিরিঙ্গি"র হিন্দি সংস্করণ একই নায়ক নায়িকা নিয়ে আমাদের প্রযোজকদের করতে বলুন না।

○ সুযোগ যদি পাই তবে প্রযোজকদের কাছে আপনার প্রস্তাব পৌছে দেব, নতুবা পরিচালক সুনীল ব্যানার্জিকে আপনার প্রস্তাব জানাব কথা দিলাম।

• • •

বিনতা ভট্টাচার্য—গিরিশ বসু রোড—কলিকাতা

তীর্থভূমি ছায়াপথ, ভানু গোয়েন্দা, জহর এ্যাসিট্যান্ট আরোগ্য নিকেতন এই ছবিগুলির খবর কি?

○ একমাত্র "আরোগ্য নিকেতন"ই শেষ হয়ে মুক্তির প্রতীক্ষায় দিন গুণছে। অন্য ছবিগুলির সুটিংপর্ব এখনও শেষ হয়নি।

• • •

জ্যোতি রায়—মনোহরপুকুর রোড—কলিকাতা

আচ্ছা, ভোটের বাজার গরম হওয়াতে ষ্টুডিওর বাজার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। ষ্টুডিওর কোন খবর দিচ্ছেন না কেন?

ষ্টুডিওর বাজার এত বেশী গরম যে সেখানকার কোন খবর এখন ছাপা সম্ভব নয়। কাউকেই অসন্তুষ্ট করা আমাদের নীতি নয়, সেই কারণেই বর্তমানে নিরপেক্ষতার নীতি আমাদের গ্রহণ করতে হয়েছে।

* * *

মাখনলাল বসু—একবালপুর রোড, কলিকাতা

বরিস কার্লফের অভিনীত চরিত্র কটি?

○ অভিনীত চরিত্রের সংখ্যা অনেক। তার মধ্যে একটি মাত্র চরিত্রই তাকে অমর করে রেখেছে তা হল ফ্রাঙ্কেষ্টাইন।

* * *

সন্তোষ লাহিড়ী—নিউ আলিপুর—কলিকাতা

সিনে টেকনিসিয়ান্স এ্যাসোসিয়েসান থেকে সংরক্ষণ সমিতি পর্য্যন্ত চিত্র জগতের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস জানতে চাই।

○ অসাফল্য ও ব্যর্থতার ইতিহাস ছাড়া আর কোন ইতিহাসই এখানে তৈরী হয়নি। এক একটা করে সমিতি বা এ্যাসোসিয়েশন তৈরী হয়েছে এবং টেকনিসিয়ানদের দুরবস্থা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ষ্টুডিওর চত্বরে দু-চারজন টেকনিসিয়ানকে ভিক্ষে করতেও দেখা যায়। না খেতে পেয়ে অনাহারে মারা যাওয়ার ঘটনাও টেকনিসিয়ানদের মধ্যে যে একেবারে বিরল তাও নয়। কেন এমন হয়? হয় এই কারণে যে এই লাইনের প্রত্যেকটি লোক ব্যক্তিগত স্বার্থের বাইরে কোন কিছু ভাবতে পারেন না এবং ভাবতে চানও না। সমষ্টিগতভাবে কোন কিছু এখানে কোনদিনই হওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র সেইদিনই কিছু হওয়া সম্ভব হবে যেদিন প্রত্যেকটি টেকনিসিয়ান "আমার কি হবে?" এই কথাটি ভুলে গিয়ে "আমাদের কি হবে?" এই কথাটা ভাবতে পারবেন। এবং আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রশিল্পের কোন টেকনিসিয়ানই ব্যক্তিগত স্বার্থের গণ্ডী ছাড়িয়ে একপাও এগুতে পারবেন না।

* * *

কিশোর মুখার্জি শরৎ বসু রোড—কলিকাতা

লাইট হাউস, নিউ এম্পায়ার, টাইগার ও মিনার্ভা, এই সিনেমগুলির বন্ধের কারণ কি?

০ মিনার্ভা সিনেমা শিগগিরই আবার খুলবে বলে জানা গেছে। বাকিগুলি বন্ধের কারণ হচ্ছে সনাতন শ্রমিক মালিক বিরোধ।

* * *

ভোলানাথ বসাক—বুন্দ্র ওস্তাগর লেন—কলিকাতা

বহুদিন আগে "ভোট ভণ্ডুল" নামে একটি চিত্র নির্ম্মিত হয়েছিল। তার পরিচালক কে ছিলেন এবং উক্ত চিত্রটি কোন্ সালে নির্ম্মিত হয়েছিল?

০ মেগাফোনের জে এন ঘোষের তত্ত্বাবধানে ও কালী ফিল্মসের প্রযোজনায় ১৯৩৬ সালে "ভোট ভণ্ডুল" নির্ম্মিত হয়েছিল। পরিচালক ছিলেন জ্যোতিষ মুখার্জি। এটি একটি দু রীলের ছোট কমিক ছবি।

* * *

গৌরাঙ্গ দেবনাথ—নির্ম্মলচন্দ্র ষ্ট্রীট—কলিকাতা

তনুজা সমর্থ প্রযোজিকারূপে দেখা দেবেন বলে যে খবর বেরিয়েছিল তার কি হোল?

০ ওটা এখনও অব্দি খবরের কাগজেই আটকে আছে।

* * *

কালিদাস চক্রবর্ত্তী—রাজা লেন—কলিকাতা

এণ্টালী মার্কেটের কাছে "আনন্দম্" নামে যে নতুন চিত্রগৃহটি নির্মিত হচ্ছে শোনা যাচ্ছে তার মালিক নাকি উত্তমকুমার? সত্যি নাকি?

০ ঠিক বলতে পারলাম না।

* * *

অমলা সরকার—ঝামাপুকুর লেন—কলিকাতা

প্রমথেশ বাড়ুয়ার চিত্রগুলি যথা—রূপলেখা, দেবদাস, মুক্তি ইত্যাদির কোন প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যায় না?

০ কি লাভ? অতীত যুগকে বিচার করতে গেলে যে হৃদয়, বুদ্ধি ও চোখ থাকা দরকার তা বর্ত্তমান যুগের নেই। বর্ত্তমান যুগের বাঙালা ছবির দর্শকরা সবাই ইনটেলেকচুয়াল হয়ে গেছেন, তাদের কাছে বড়ুয়া সাহেবকে আর নাইবা হাস্যাস্পদ করলেন। ভদ্রলোক মারা গেছেন যখন, তখন তাকে একটু শান্তিতে থাকতে দিন।

অশোক বসু—হিন্দুস্থান পার্ক—কলিকাতা

আমাদের পাড়ায় ভোটের মিটিং হচ্ছিল। পাড়ার এক মাতব্বর রুমুদাকে জিজ্ঞাসা করলাম 'কি হোল?' বললেন—ওরা বলল—"যো বলদ হো ওহ বলদকো ভোট দো"—আপনার মন্তব্য?

০ নিষ্প্রয়োজন!

* * *

জয়া ভাদুড়ী—নাকতলা লেন—কলিকাতা

"সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ।
রাতে নকশালবাড়ী, সকালে কংগ্রেস॥
পরের দু লাইন কি হবে বলুন তো?

০ জোড় বেঁধেছে বলদ ও ঘুঘু
মানুষ আমরা নহি তো মেষ?॥

* * ০

চিত্রলেখা

ঢেউয়ের পরে ঢেউ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নিতাইয়ের বাড়ি। বাড়ির উঠোনে ও দাওয়ায় দেখা যায় কয়েকটা ভিয়েন বসেছে। কয়েকজন রান্নার জোগাড় করে দিচ্ছে। দু তিনজন মেয়ে ও বৌ ঘোমটা দিয়ে একদিকের একটা ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোন পার হয়ে অন্যদিকে চলে যায়।

উঠোনে সামিয়ানা টাঙানো। এখানে ওখানে জেলে-পাড়ার মেয়ে ও বৌরা নানা কাজে ব্যস্ত। একটি লোক ঝাঁকা মাথায় আনাজ নিয়ে আসে। লোটন

দাওয়ায় আনাজ নামিয়ে নিয়ে অন্য একজনকে নির্দেশ দেয়—

লোটন—এই বিন্থ, পাতাগুলো ধুয়ে ফেল

বলে অন্যদিকে লোটন চলে যায়।

কয়েকটি ছেলেমেয়ে ভিয়েনের পাশে ঘুরঘুর করতে থাকে। জায়গাটা কাঠের ধোয়ায় ধোঁয়াকার হয়ে যায়।

কয়েকটা হ্যাজাক বাতির সামনে লোটন। একটা বাতিকে পাম্প করতে করতে চেয়ে থাকে অন্যমনস্ক ভাবে। হ্যাজাকের জ্বলন্ত ম্যাণ্টেলটা ধীরে ধীরে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। সেই আলোয় লোটনের চিন্তাক্লিষ্ট মুখ আরও উজ্জ্বল দেখায়।

নিতাইয়ের বাড়ি উৎসব মুখর। বহুদিনের স্বপ্ন আজ মূর্ত্ত, বাস্তব। পদ্ম আজ নিতাইয়ের ঘরণী। গ্রামের সকলেই এসেছে নিতাইয়ের বাড়ীতে এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে। সামিয়ানার তলায়, দাওয়ায়, এখানে ওখানে দলে দলে সকলে আনন্দ কলরবে মুখর। ঝাউবনের একান্তে এই জনহীন প্রান্তে এ এক ব্যতিক্রম।

ভামিনী পিসী উঠোন পেরিয়ে ঘরে প্রবেশ করে

উৎসবের সাজে সজ্জিত নিতাইয়ের ঘরের অভ্যন্তর। ময়না ও আরো চার পাঁচটী মেয়ে পদ্মকে ঘিরে আছে। ময়না পদ্মকে সাজায় ও অন্য সকলে চেয়ে থাকে খুসি-মুখে ওর দিকে। একটি মেয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে

মেয়ে—এই যে পিসী এসেছো ?

ভামিনী—আসবো না! আমাদের নিতাই পদ্মর বিয়ে—আর আমি আসবো না ?

ভামিনী এগিয়ে এসে মেয়েদের সরিয়ে দিয়ে পদ্মর পাশে বসেন। পদ্মর চিবুক ধরে অল্পকাল দেখেন, তার-পরে চুমু খেয়ে বলেন—

ভামিনী—আহা! কি মোহিনী রূপ গো—সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! সাধে কি ছোঁড়াটা মজেছে—

মুখ ফিরিয়ে মেয়েদের জিজ্ঞেস করেন—

ভামিনী—গেল কোথায় নিতাই ? (চোখের একটু ভঙ্গী করে) নিশ্চয়ই আশপাশে কোথাও ঘুরঘুর করছে—(হাসতে থাকেন) যাই দেখে আসি—

উঠে বেরিয়ে যান ভামিনী।

মেয়েরা এতক্ষণ হাসি চেপে রেখেছিল এবারে এক-সঙ্গে ফেটে পড়ল। ময়না একটা আয়না পদ্মর মুখের সামনে ধরে বলে ওঠে—

ময়না—ত্থাখলো ত্থাখ—

আয়নায় পদ্মর প্রতিবিম্ব। সলজ্জ, স্বপ্নিল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে নিজের মুখপানে। নেপথ্যে ময়নার কণ্ঠ—

নেপথ্যে ময়না—কি মোহিনী রূপ গো—

আয়নায় পদ্ম সলজ্জে চোখ নামিয়ে নেয়।

বাইরে উঠোনের পাশে দাওয়ার খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করছে কয়েকজন যুবতী মেয়ে। তাদের সামনে দিয়ে যাতায়াত করতে থাকে অভ্যাগত ছেলে ছোকরারা।

নপাড়ার ফোগলা দাদু সামিয়ানার তলে চাটাইয়ের ওপর বসে আছে। একটি ছেলে একটু হেসে প্রশ্ন করে—

ছেলে—ও ফোগলা দাদু, তোমার বিয়ের কি হোল ?

বৃদ্ধ ফোগলা দাদু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে এদিকে তাকান

দাওয়ায় দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েগুলিকে দেখিয়ে ছেলেটি আবার বলে—

ছেলেটি—বল না, কাকে তোমার পছন্দ হয়!

মেয়েগুলো ছেলেটির কথা শুনে হেসে ওঠে।

ফোগলাদাদু একবার মেয়েদের দিকে চেয়ে দেখেন তারপরে হাসতে হাসতে বলেন—

ফোগলাদাদু—আহা হা, কাকে ফেলে কাকে রাখি বল দিকি ; সবাই ত মনের মত—

সকলেই হেসে ওঠে। ফোগলাদাদুও হাসতে থাকেন। মেয়েরা হাসতে হাসতে পরস্পরের গায়ে ঢলে পড়ে।

অভ্যাগতদের কয়েকজন হাত মুখ ধুচ্ছে। পাশে দাঁড়িয়ে কয়েকজন ওদের হাতে জল দিচ্ছে। তিন চারটি গ্রাম্য কুকুর অদূরে নিক্ষিপ্ত পাতা ও এঁটো খাবারের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। রেকাবীতে পান ও মশলা নিয়ে লোটন পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। হাত মুখ মুচতে মুচতে অভ্যাগতরা লোটনের হাতে ধরা রেকাবী হতে কেউ পান, কেউ মশলা নিয়ে চলে যায়। একজন মাতব্বর বলে

মাতব্বর—চমৎকার বন্দোবস্ত করেছিস লোটনা, বাঃ, বাঃ।

লোটন পান এগিয়ে দেয় মাতব্বরের দিকে। মাতব্বর পান নিয়ে খুশি মুখে প্রস্থান করেন।

নিতাইয়ের বাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সাঁইদার ও পদ্মর মামা। পিছনে লোকজনের যাতায়াত চলছে। সাঁইদার বলে—

সাঁইদার—এ বেশ ভালই হোল, কি বল এ্যাঁ, গাঁয়ের মেয়ে গাঁয়েই রইল।

পদ্মর মামা—সবই গোবিন্দের ইচ্ছে আর তোমার আশীর্ব্বাদ।

সাঁইদার—হ্যাঁ, ছেলেটার ওপর একটা মুরুব্বীও হলো এতদিনে।

পদ্মর মামা—(ব্যস্তভাবে) না না, আর আমাকে জড়িয়োনা—শেষ কটাদিন যেন গোবিন্দের পায়ে কাটিয়ে যেতে পারি—

দূরে একজনকে দেখতে পেয়ে সাঁইদার ডেকে ওঠে—

সাঁইদার—আরে ও নিবারণ—

নিবারণকে ডাকতে ডাকতে সাঁইদার সেদিকে চলে যায়।

বৃদ্ধ—বেশ মানিয়েছে দুটিকে—যেন লক্ষ্মী নারায়ণ।

রাত্রি। নিতাইয়ের বাড়ী। উঠানের সামিয়ানার চত্বরে কেউ নেই। সব ফাঁকা। চারিদিক নিস্তব্ধ।

রাত্রি। নিতাইয়ের ঘর। ফুলশয্যার রাত। ঘোমটা পরা পদ্মর দিকে তাকিয়ে থাকে নিতাই। হাত দিয়ে পদ্মর মুখের পাশ দিয়ে ঘোমটা সরিয়ে দেয় নিতাই। নিতাইয়ের দিকে একবার তাকিয়েই দৃষ্টি সরিয়ে নেয় পদ্ম। আবেশে, লজ্জায় চোখের পাতা বুঁজে আসে।

রাত্রি।

সমুদ্রপাড়ের ঝাউবন। বেলাভূমিতে বসে লোটন চেয়ে থাকে সমুদ্রের দিকে। ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে ভেঙে ভেঙে পড়ে পাড়ের বুকে বারে বারে। সমুদ্রের উত্তাল হাওয়ায় ঝাউবন উদ্দাম হয়ে ওঠে।

সমুদ্রপাড়ে সাঁইদারের আড়ত। হুঁকো হাতে নিয়ে সাঁইদার আড়তে দাঁড়িয়ে দূর সমুদ্রে যেখানে জেলেরা মাছ ধরছিল চোখ কুঁচকে সেদিকে চেয়ে থাকে। হঠাৎ নিতাইকে আসতে দেখে সাঁইদার হুকো হাতেই বেরিয়ে আসে।

মাছের ঝুড়ি কাঁধে নিয়ে নিতাই সাঁইদারের কাছে এসে দাঁড়ায়। সাঁইদার বলে—

সাঁইদার— কিরে নিতাই, এরই মধ্যে চলে এলি যে ?

নিতাই—শরীর ভালো লাগছে নাগো, ছুটি দাও।

সাঁইদার—তোকে আজকাল ছুটি দিতে দিতে হদ্দ হয়ে গেলাম যে (হুকোয় একটু টান দিয়ে আবার বলে আচ্ছা যা, বিয়ে করেছিস, খেজ্জালত তো সইতে হবেই।

ঝুড়ি কাঁধে নিয়ে নিতাই হাসিমুখে সাঁইদারের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

ঝাউবন। নিতাইয়ের বাড়ীর সামনে সঙ্কীর্ণ রাস্তা নিতাই এসে উঠানের বেড়ার সামনে দাঁড়িয়ে একবার দেখে নেয়। তারপরে সন্তর্পণে এগিয়ে যায় ঘরের দিকে

উঠোন পেরিয়ে দাওয়ায় উঠে ঘরের দরজায় হাত দিয়েও থেমে যায় নিতাই। মুখে তার চাপা হাসি।

দাওয়া থেকে নেমে এসে নিতাই পাশের উঁচু জানালার কাছে গিয়ে একটু ভেবে নিয়ে ভেতরের দিকে উঁকি দিয়ে দেখে।

ঘরের ভিতর জানালার বিপরীত দিকে ফিরে শুয়ে আছে পদ্ম।

জানালায় হাত রেখে আরো কাছে সরে আসে। মুখ নামিয়ে আনে গরাদের আরো কাছে। চোখে বিহ্বলতা। অস্ফুটস্বরে ডাকে নিতাই—

নিতাই—এই পদ্ম, পদ্ম

ঘরের ভিতর শায়িত পদ্ম একটু নড়ে ওঠে।

নিতাই জানলা থেকে মুহূর্তে সরে আসে।

পদ্ম ফিরে তাকায়। জানালায় কেউ নেই। পদ্ম আবার ফিরে শোয়। নিতাইয়ের গলার আওয়াজ চিনতে পেরেছে সে। মুখে তার দুষ্টুমীর হাসি।

একটু পরে নিতাই আবার উঁকি দেয়।

পদ্মও ফিরে তাকায়। চোখাচোখী হয়ে যায়। দুজনেই হেসে ফেলে। নিতাই বলে

নিতাই—খোল, দরজা খোল

পদ্ম—না, (ফিরে শোয়)

নিতাই—কেন? খোল্ না পদ্ম! পদ্ম।

মুখে দুষ্টুমীর হাসি। পদ্ম বলে—

পদ্ম—না

(নেপথ্যে নিতাই) নিতাই—বেশ

অল্পক্ষণ কেটে যায়। পদ্ম ফিরে তাকায়।

নিতাই হেসে ফেলে। বলে—

নিতাই—পদ্ম, খোল

নিতাইয়ের কথার উত্তর দেয় না পদ্ম। কেবল পাশ ফিরে শোয়।

নেপথ্যে নিতাই বলে

নিতাই—(নেপথ্যে)—বেশ তাহলে চল্লাম

দুষ্টুমীভরা চোখে পদ্ম খানিকক্ষণ উৎকীর্ণ হয়ে থাকে। একটু পরে পাশ ফিরে দেখে নিতাই নেই। উঠে পড়ে পদ্ম।

জানালার কাছে মুখ এনে একবার এদিক ওদিক দেখে নেয় পদ্ম। কাউকেই দেখা যায় না বাইরে। পদ্ম দাঁড়িয়ে কি ভাবে। তারপরে দরজার কাছে যায়। দরজার খিলে হাত দিতেই নিতাই জানালায় এসে দাড়ায়। ঘরের আলো অবরুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় পদ্ম জানালার দিকে ফিরে তাকায়। দুজনেই হেসে ফেলে।

ঝাউবন। ঝাউবনের কি বিচিত্ররূপ। ছায়ায় আলোয় এ এক অপরূপ শোভা যৌবনোচ্ছল নিতাই ও পদ্ম দূর থেকে সামনে দিয়ে উত্তাল গতিতে বেরিয়ে যায়। দুটি প্রজাপতি তাদের বিচিত্রবর্ণের ডানা মেলে যেন উড়ে চলে যায়।

ঝাউবন। গীতিময় কবিতার চিত্রকল্প। প্রাণের উচ্ছ্বাসে ছন্দোবদ্ধ পদ্মও নিতাই একদিক থেকে অন্যদিকে দূরে মিলিয়ে যায়।

ঝাউবন। ঝোপের আড়াল হতে পদ্ম বেরিয়ে আসে। এদিক ওদিক দেখে একবার। কোথায় নিতাই। নিতাইকে খুঁজে পায়না পদ্ম। বাতাসের অশান্ত শব্দে ঝাউবন মেতে ওঠে। পদ্ম কিছুদূর এগিয়ে যায়। একটা উঁচু জায়গায় উঠতেই দেখতে পায় দূরে দাঁড়িয়ে আছে নিতাই একটা গাছতলায়। পদ্ম ছুটে চলে যায় নিতাইয়ের দিকে।

ঝাউবন। দূর থেকে দেখা যায় পদ্ম ছুটে গিয়ে নিতাইয়ের হাত ধরে। পদ্মর হাত ধরে নিতাই এগিয়ে যায় আরো দূরে। মিলিয়ে যায় ঝাউবনে।

রাত্রির আকাশে পূর্ণিমার আলো। মৃদু বাতাসে ঝাউ-এর ডগা এদিক ওদিক দোলে। ঝাউগাছের নিচে শুয়ে আছে পদ্ম ও নিতাই। দুজনেই ওরা তাকিয়ে থাকে ওপরদিকে ঝাউগাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখতে পাওয়া আকাশের দিকে। অস্ফুটস্বরে ডাকে নিতাই—

নিতাই—পদ্ম

পদ্ম—উঁ

নিতাই—কি ভাবছিস

পদ্ম—কিছুনা

নিতাই—(একটুপরে)—আচ্ছা পদ্ম, আমাকে ছাড়া তুই একেবারে থাকতে পারিসনা, না?

পদ্ম—তুমিওতো পার না (মুখ ফিরিয়ে নিতাইয়ের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকায় পদ্ম, তারপরে বলে) বড় একা মনে হয়।

একটু পরে ধীরে ধীরে দৃষ্টি নামিয়ে নেয়। অস্ফুটস্বরে বলে—

পদ্ম—সারাটা বেলা একা একা তোমার জন্য বসে থাকি—

নিতাই পদ্মর দিকে চায়। পদ্ম চোখ তুলে দেখে নিতাইকে। নিতাই বলে

নিতাই—কি দেখছিস ?

পদ্ম—(অস্ফুটস্বরে)—তোমাকে

নিতাই মুগ্ধ বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়েই থাকে পদ্মর দিকে। পদ্ম বলে—

পদ্ম—কি দেখছ অমন করে ?

নিতাই—তোকে—

একটু কাত হয়ে নিতাই নিজের মুখটা নামিয়ে নিয়ে আসে পদ্মর মুখের উপরে। ঠোঁটের কাছাকাছি।

বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ। ঝাউবনের মাতামাতি—কত না-বলা কথা যেন বারে বারে বলে যায়।

ঢেউএর পর ঢেউ আসে—ভেঙে ভেঙে পড়ে। আবার ফিরে যায় সাগরের জলে। চাঁদের প্রতিবিম্ব দেখা যায় ভেজা বালীর ওপর—আবার ঢেউএর পর ঢেউ এসে ঢেকে দেয় বারে বারে।

সুদূর বেলাভূমির পাড় ঘেঁসে যেখানে ঢেউ এসে খেলা করে সেখান দিয়ে হেঁটে চলেছে ওরা দুজনে। পাশাপাশি চলেছে কখনো ওরা, কখনো পদ্ম পিছিয়ে পড়ে। আবার কখনো বা দৌড়ে সামনে এসে পাশাপাশি চলতে থাকে। উচ্ছল, উদ্দাম প্রকৃতির মাঝে জীবনের দুটি বিন্দু যৌবনের উচ্ছ্বাসে হিল্লোলিত হয়ে চলে।

এই অশান্ত মনোরম প্রকৃতির মাঝে যেন মিশে যায় ওরা দুজনে। নিতাই বলে—

নিতাই—ওই সমুদ্র কি সুন্দর! এই বালি কি সুন্দর! কি সুন্দর দ্যাখ, দ্যাখ এই আকাশ, এই চাঁদের আলো—এই ঝাউবন—দ্যাখ ওরা যেন কথা বলছে—

ফিরে দেখে নিতাই পাশে পদ্ম নেই।

পদ্ম একটা ঝিনুক কুড়িয়ে ঢেউএর জলে ধুয়ে নেয়। তারপরে নিতায়ের পাশে এসে চলতে থাকে। নিতাই ওর হতে থেকে ঝিনুকটা নেয়। বলে নিতাই

নিতাই—এটাও কি সুন্দর ; দ্যাখ দ্যাখ। সব সুন্দর। তুই সুন্দর—তোর গলার এই মালাটা সুন্দর—সব সব সুন্দর— !

ওরা দুজন এগিয়ে চলেছে ঝাউবনের পথের দিকে। নিতাই পদ্মর কাঁধে হাত দিয়ে আর পদ্ম নিতায়ের কোমর জড়িয়ে। ঝাউবনের ভিতর দিকে ওরা এগিয়ে যায়। ঝাউবনের শোঁ শোঁ শব্দ আর বাইরে অশান্ত সমুদ্রের গর্জন। ঢেউএর পরে ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে বারে বারে।

সকাল। পূবের আকাশ সবে পরিষ্কার হতে সুরু হয়েছে। সমুদ্র। দূরে সমান্তরাল ভাবে একটি জেলে ডিঙি ঢেউয়ের তালে তালে একদিক থেকে আর একদিকে চলে যাচ্ছে। দিগবলয়রেখায় নবারুণ প্রকাশ পায়। নেপথ্যে গান শোনা যায়। যেন নবারুণের প্রতীক নবজীবনের সুর ও আহ্বান—

নেপথ্যে গান :—

এ উষা, এলো আজিকার
শুভ লগনে পরমক্ষণে
এ নবপ্রভাত, এলো আজিকার
শুভ লগনে পরমক্ষণে।
সাগরের ঢেউ, ছুটে এসে বারে বার
ডাক দিয়ে যায়
কাহারে কে জানে
এ উষা, এলো আজিকার
শুভ লগনে পরমক্ষণে ॥

কথা ও সুর আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে

ঝাউধন। ঝাউবনের পথ দিয়ে নিতাই এগিয়ে আসে। পাশে একদিকে ফিরে বেড়া ঠেলে নিতাই বাড়ীর উঠোনে এসে পড়ে।

উঠোনের কোণে রাখা মাটির জালা থেকে জল তুলে নিয়ে নিতাই হাত মুখ ধোয়। তারপরে দাওয়ায় এসে বসে। ছেলে বীরুকে কোলে করে পদ্ম ঘর থেকে বেরিয়ে

রান্নাঘরে চলে যায়। নিতাই হাত বাড়িয়ে দাওয়ার খুঁটিতে বাঁধা দড়ি থেকে গামছা নিয়ে হাত মুখ মুছতে থাকে।

বেতের কাঠায় করে মুড়ি ও গুড় নিয়ে এসে পদ্ম নিতাইকে দেয়। মুড়ি খেতে খেতে নিতাই দু-একটা মুড়ি তুলে বীরুর মুখেও গুঁজে দেয়। ঘটি থেকে জল গড়িয়ে এক গেলাস জল এনে পদ্ম দাওয়ায় রাখে। কোন কথা বলে না পদ্ম। মুখ থমথমে। পদ্মর দিকে তাকিয়ে নিতাই বলে—

নিতাই—কিরে মুখভার কেন?

পদ্ম রান্নাঘরে গিয়ে বীরুকে কোল থেকে নামিয়ে উনোনের পাশে বসে। বলে—

পদ্ম—বাপমায়ের মুখ তো দেখিনি, যাদের পেয়েছিলাম এই পোড়াকপালে তাও সইল না।

দাওয়ায় বসে নিতাই বলে—

নিতাই—ত্যাখ পদ্ম, মামা মামী বৃন্দাবনে গেলেন এতে মামা কি আমারই মনটা ভাল? তোর মামা তো আমারও

রান্নাঘরে হাঁড়ি নাড়াচাড়া করতে করতে পদ্ম বলে—

পদ্ম—নিজেদের তো ছেলেপুলে ছিল না, আমাকে নিয়েই তাদের কত আনন্দ। মামা যে আমায় কত ভালবাসতো—

বাইরে নিতাই বলে—

নিতাই—আমি তো এত করে বললাম এখানে থাকতে, তাঁরা কিছুতেই রাজী হলেন না—

বলতে বলতে উঠে দাওয়ায় নামে নিতাই। দড়িতে ঝোলানো গামছাটা টেনে নিয়ে কোমরে বাঁধে। রান্নাঘরের কোণে রাখা একটা ঝুড়ি তুলে নিয়ে সমুদ্রের দিকে চলে যায়।

মধ্যাহ্নের সূর্য্য প্রায় ঢলে পড়েছে পশ্চিম দিকে। সমুদ্রের পাড়ে ঝাউবনের নিচে বীরুকে কোলে নিয়ে খাবার ও জলের ঘটি হাতে দাঁড়িয়ে আছে পদ্ম। দূরে কয়েকজন জেলে মাছ ধরছে। দূর থেকে পদ্মকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিতাই এগিয়ে আসে ওর দিকে।

পদ্মর কাছে এসে নিতাই একটু আদর করে বীরুকে, তারপরে পদ্মর হাত থেকে ঘটি নিয়ে একটু দূরে গিয়ে মুখে হাতে জল দিয়ে ঝাউবনের ছায়ায় গিয়ে বসে।

পদ্ম বীরুকে কোলে করে নিতাইয়ের পাশে এসে বসে। খাবারের থালাটা সামনে রেখে দেয়।

নিতাই ঢাকনাটা খুলতে খুলতে বলে—

নিতাই—কতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছিস—আজ অনেক দেরী হয়ে গেল, না?

পদ্ম—কাজ করতে আরম্ভ করলে তোমার তো জ্ঞানগম্যি থাকে না—

বাঁ হাত দিয়ে পদ্মর কোলে বীরুকে আদর করতে করতে নিতাই বলে—

নিতাই—আমার এই বাবাকে মানুষ করতে হবে না, না খাটলে চলবে কেন?

স্নেহভরা দৃষ্টিতে পদ্ম তাকিয়ে থাকে বীরুর দিকে।

খাওয়া হয়ে যায় নিতাইয়ের। ঘটি নিয়ে ও উঠে যায়। পদ্ম থালায় ঢাকা দিয়ে একটা কাপড় দিয়ে বেঁধে একটু দূরে রেখে দেয়।

হাত মুখ ধুয়ে নিতাই এসে পদ্মর পাশে বসে। বীরুকে একটু আদর করতে করতে বলে—

নিতাই—দেখিস পদ্ম, এই ছেলের আমার কেমন বুদ্ধি হয়—

শুয়ে পড়ে নিতাই। মাথার ওপর দুহাত টান করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে

বীরুকে কোলে শুইয়ে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে পদ্ম বলে—

পদ্ম—বাপের মত বুদ্ধি হলেই তো গেছি—

পাস ফিরে নিতাই হাসতে হাসতে বলে—

নিতাই—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, বাপের আবার বুদ্ধি কোথায় রে—একটা মুখ্যু লেখাপড়া জানে না

আর আমার বীরু ইস্কুলে যাবে, লেখাপড়া শিখবে—দেখিস—

পদ্ম—দেখার আগে মরে না যাই—

নিতাই হাত বাড়িয়ে বীরুর গাল টিপে একটু আদর করে বলে—

নিতাই—দ্যাখ বীরু, তোর মা কি বলছে—

পদ্ম হেসে ফেলে। নিতাইও হাসে। শিয়রে বসে পদ্ম বীরুকে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করে। নিতাই তাকিয়ে থাকে তন্দ্রালু চোখে নীল আকাশের দিকে।

আপন মনেই বলে নিতাই—

নিতাই—আজ বাড়ী ফিরতে ভোর হ'য়ে যাবেরে পদ্ম

পদ্ম নিতাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলে—

পদ্ম—রাত ভোর করে ফিরবে? বারে; আমার বুঝি ভয় করে না।

নিতাই—তুই একেবারে ছেলেমানুষ পদ্ম! ভয় কিরে? আর দু-একদিন খেটে একটু রোজগার বাড়ালে আমাদেরই তো ভাল। অবুঝ হোসনে পদ্ম

মুখ ফিরিয়ে বীরুর দিকে তাকিয়ে পদ্ম বলে—

পদ্ম—না

নিতাই—কি?

পদ্ম—আমি একা থাকতে পারব না।

নিতাই পাস ফিরে একটু ঘুরে হাত বাড়িয়ে পদ্মর থুতনি নেড়ে দিয়ে বলে—

নিতাই—দেখি মুখটা দেখি ওঃ খালি রাগ রাগ আর রাগ

লজ্জিতভাবে পদ্ম হেসে ফেলে। নিতাইও হাসে।

সকাল। অশান্ত সমুদ্র। ঢেউএর পর ঢেউ এসে পাড়ে আছড়ে আছড়ে পড়ছে। খাঁড়ীর ঘাটে অতিকষ্টে নৌকা নোঙর করে মাছের ঝাঁকা কাঁধে নিতাই এগিয়ে যায় সাঁইদারের আড়তের দিকে।

একজন বৃদ্ধ জেলে হিমসিম খেয়ে যায় তার নৌকো নোঙর করবার চেষ্টায়। একের পর এক বড় বড় ঢেউ এসে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। অসহায় হয়ে পড়ে জেলেটি। দূরে নিতাই-কে দেখতে পেয়ে ডেকে বলে—

বৃদ্ধ জেলে—ও বাবা নিতাই, আমার নোঙরটা একটু

নিতাই কাঁধ থেকে ঝাঁকাটা নামিয়ে রেখে বৃদ্ধের নৌকোর দিকে এগিয়ে যায়।

বৃদ্ধের নৌকা। অসহায় ভাবে বৃদ্ধ নোঙর হাতে দাঁড়িয়ে আছে। পাটাতন কর্দমাক্ত, পিচ্ছিল। পাটাতনে উঠে নিতাই নোঙর নামাতে যায়। একটা বড় ঢেউ এসে নৌকাটাকে ধাক্কা দেয়। নোঙর স... ...কোচুরি পাটাতনে পড়ে যায়। পরমুহূর্তে আরও এক... ধাক্কায় আহতাবস্থায় জলে ছিটকে পড়ে য...

নরেন্দ্র দেব

জাল কাঁধে একটি জেলে দেখতে পেয়ে ... ওঠে

জেলে—আরে আরে পড়ে গেল পড়ে

সাঁইদারের আড়ৎ থেকে সাঁইদার... জনকে দৌড়ে আসতে দেখা যায়।

কয়েকজন জেলে ধরাধরি করে ... ডাঙায় তুলে আনে।

সমুদ্রপাড়ে ভামিনী পিসির চায়ের দোকান... জেলে দূর থেকে চীৎকার করে ডাকে

জেলে—এই তোরা শিগগির আয় শিগ... নিতাইয়ের হাত ভেঙে গেছে-পা কেটে ...।

ভামিনীর চায়ের দোকান থেকে ... উঠে চলে যায় খাঁড়ীর দিকে।

অনেক লোক জমে গিয়েছে নিতাইকে ঘিরে। একটা হৈ চৈ কাণ্ড। নানা জনে নানা কথা বলছে। কয়েক জনকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে সাঁইদার চীৎকার করে বলে—

সাঁইদার—ভীড় করছিস কেন তোরা—... সরে যা, এই ভুলু দৌড়ে গাঁয়ে ...য়ে ড... খবর দে—

রাত্রি। নিতাইয়ের শয়নঘর। চারিদিকে একটা দারিদ্র্যের ছাপ। বিছানায় শুয়ে নিতাই বীরু ও পদ্ম। বীরু ঘুমিয়ে আছে ওদের মাঝখানে। নিতাই ও পদ্মর চোখে ঘুম নেই। গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলে নিতাই বলে—

নিতাই—কি করে যে দিন চলছে—ধার দেনাতে জড়িয়ে গেলাম একেবারে—

পদ্ম—এর জন্যে চিন্তার কি আছে! তুমিতো ভালই হয়ে গেছ—কাজে লাগলেই সব শোধ হয়ে যাবে।

নিতাই—সাঁইদারের ওখানে আমার জায়গায় নাকি লোক নিয়েছে। কাজ পেলে হয়—

দৃষ্টিতে নিতাইয়ের দিকে তাকিয়ে ধীর

পাবে। সাইদার তোমাকে ভালবাসে

...নের পুরানো লোক—

...ই বলে—

...চষ্টা করে—

...ইয়ের বাড়ী। জানালা দিয়ে দেখা

মিট মিট করে জোনাকী জ্বলে।

...ঘর। নিতাই বীরু ও পদ্ম ঘুমিয়ে

ঝিঁঝির ডাক আর ঘরের ভিতর

...য়াজ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না।

দূরে ...টা শিয়াল ডেকে ওঠে। ঘুমোলে

...ত দুঃ... মনে হয়। অকস্মাৎ বীরু চেঁচিয়ে

আঁ আঁ—

স্রোত ... ভেঙে যায়। পদ্ম ফিরে হাত বাড়িয়ে ...কে ঘুম পা... তারপরে চেয়ে দ্যাখে পদ্মর ঘুমন্ত অসহায় মুখটা। ...ক যেন ভাবে নিতাই। তারপরে একসময়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

...হর, বন্দ... জানালা দিয়ে যেন দেখা যায় গ্রামের বর্তমানে ...পাত্র ...তে দাঁড়িয়ে আছে পদ্ম। কোলে সন্তান ... ধরে ... কেঁদে চলে।

...তাইয়ের ঘরের ... দিয়ে যেন দেখা যায় বাজারের এক অংশে একটা মি... দোকান। থরে থরে জিলিপি ও মিঠাই সাজানো। পদ্মর কোলে বীরু হাত বাড়িয়ে মিষ্টিগুলি দেখায়। পদ্ম নতমুখে দাঁড়িয়ে। অবিরত জল গড়িয়ে পড়ে তার চোখ দিয়ে।

নিতাইয়ের ঘরের আর একটা ভাঙা জানালা দিয়ে যেন দেখা যায় বাইরেটা সব মরুভূমি হয়ে গেছে। রৌদ্রতপ্ত শুকনো বালিতে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। দূরে বালির ওপর বসে আছে পদ্ম। দৃষ্টি উর্দ্ধে-স্থির। ক্ষুধার্ত্ত বীরু পদ্মকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে।

রাত্রি। নিতাইয়ের ঘর। নিতাইয়ের স্বপ্ন ভেঙে যায়। চীৎকার করে উঠে বসে—

নিতাই—না না না!!!

দুহাতে মুখ ঢেকে নিতাই উবু হয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ে

পদ্ম ধড়মড়িয়ে উঠে বসে নিতাইকে জড়িয়ে ধরে

বীরু চীৎকার করে কেঁদে ওঠে

দুহাতে মুখ ঢেকে নিতাই কাঁদতে থাকে।

নিতাই—আমার মত দুঃখে এদের মানুষ কোরোনা ভগবান। আমার জীবনে যা সত্যি ছিল ওদের জীবনে তা যেন মিথ্যে হয়ে যায়।

ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে থাকে নিতাই। পদ্ম নিতাইকে আঁকড়ে জড়িয়ে ধরে ঘুম জড়ানো চোখে তাকিয়ে থাকে। কয়েক ফোঁটা জল পদ্মর চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে।

সকাল। ঘুম থেকে উঠেছে।

নেপথ্যে কলশি ভাঙার আওয়াজ।

কোমরে হাত চেপে ধরে পদ্ম দাঁড়িয়ে আছে উঠানে। একটা মাটির কলশি ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে নিচে। অনেকখানি জায়গা ভিজে গেছে জলে। পদ্মর শাড়ীর কয়েক জায়গায় ও বাঁ হাতে ধরা ভেজা শাড়ী ও কাঁথায়ও কাদা লেগেছে জায়গায় জায়গায়। পদ্মর মুখেও ব্যাথার বিকৃতি।

ঘর থেকে বেড়িয়ে দাওয়া দিয়ে নেমে আসে নিতাই। পদ্মর সামনে দাঁড়িয়ে ব্যস্তভাবে বলে—

নিতাই—একি! লাগেনি তো?

পদ্ম—(মাথা নীচু করে, ধীরে)—না

নিতাই—দ্যাখ বুঝে দ্যাখ, সাঁইদারের ওখানে যাচ্ছি—তাহলে ডাক্তারবাবুকে একটা খবর দেবার ব্যবস্থা করি—

পদ্ম—না, কোন দরকার নেই। সবে তো দু'-মাস

নীচু হয়ে কলশির ভাঙা টুকরোগুলো তুলতে থাকে পদ্ম।

(ক্রমশঃ)

•

'ঢেউএর পরে ঢেউ' ছবিখানি দেখলুম নির্মল ছবি। বিশেষতঃ চিত্র গগনের কোনও উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বা বিশ্ব বিজয়িনী কোন চিত্র তারকা নেই এর মধ্যে। তবু এর নায়ক নায়িকা দর্শকের অন্তর স্পর্শ করতে পারবে। সাগর কূলের অতি সাধারণ এক মৎসজীবী পল্লীর তিনটি প্রতিবেশী ছেলে মেয়ের চিত্তাকর্ষক জীবন কাহিনী। ছবিখানির প্রধান ঐশ্বর্য্য হল এর অপূর্ব প্রাকৃতিক সম্পদ। দিগন্ত বিস্তৃত উর্মি-উদ্বেল সিন্ধুর অবিরাম কলকল্লোল, সুবিস্তীর্ণ ধুসর বালুকাবেলা, তরঙ্গসিক্ত সাগরসৈকত, তীরভূমির নিবিড় ঘন ঝাউবন, মেঘমেদুর আকাশের আশ্চর্য্য সুন্দর রূপ, তরুবীথির তলে তলে আলোছায়ার মোহময় লুকোচুরি সকল মানুষকেই মুগ্ধ করবে।

নরেন্দ্র দেব

আগামী পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যা একত্রে "বিশেষ সংখ্যা" রূপে বর্দ্ধিতাকারে উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীফণীন্দ্রনাথমুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় সংখ্যা

ষট্‌পঞ্চাশত্তম বর্ষ

হিন্দু জাতি ও ধর্ম

স্বামী সদানন্দ

স্রোত বিদ্যমান হেতু নদীর অপর নাম স্রোতস্বিনী। যে নদীতে স্রোত নাই তাকে স্রোতস্বিনী বললে উক্ত নামের অপব্যবহার করা হয়। স্রোতস্বিনীর স্রোতে পঙ্কিলতা সৃষ্টি হবার আগে তার সংস্কার সাধন না করলে, স্রোতস্বিনী ধীরে ধীরে মজে গিয়ে অরণ্যে পরিণত হয়, বন্যপশুর আবাসস্থল হয়ে পড়ে। তখন স্রোতস্বিনীর বর্তমানরূপ দেখে তার শতবর্ষ পূর্বের রূপ কল্পনা করা সম্ভব হয় না। আমাদের সনাতন হিন্দুধর্মের বর্তমান রূপ দেখে—তার অতীত গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলি মানসনেত্রে কল্পনা করা সম্ভব হয় না। প্রচার প্রসারের অভাবে যে কোন সমাজ মৃতসমাজে পরিণত হয়। আমাদের সনাতন হিন্দুধর্মের বহুদিন পর্যন্ত উপযুক্ত প্রচার প্রসার না থাকাতে পঙ্কিল আবহাওয়া সৃষ্টি হয়ে আজ মৃতসমাজে পরিণত হবার উপক্রম হয়েছে।

স্মরণাতীত কাল থেকে হিন্দুজাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি পৃথিবীর যাবতীয় সভ্য সমাজকে জ্ঞানালোক বিতরণ করে জ্যোতিষ্কের ন্যায় বিদ্যমান ছিল। হিন্দুজাতি যখন শিক্ষাদীক্ষা জ্ঞানবিজ্ঞানের চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয়েছিল তখন পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যজাতির জীবনে সবেমাত্র অরুণোদয়, তাও ভারতীয় শিক্ষাসভ্যতার আলোকে। সেই কথা মনু মহারাজ বলেছেন—

এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ॥

সর্বশ্রেণীর ভারতীয়ের নিকট পৃথিবীর মানবসমাজ স্বীয় চরিত্রনীতি লাভ করেছে। বিদ্যাচর্চায় ও শিক্ষাদীক্ষায় সুপ্রাচীনকাল থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয়—হিন্দুজাতিই জগদ্‌গুরুর আসন অলঙ্কৃত করেছিল। ভারতে শুধু অধ্যাত্মবিদ্যারই অনুশীলন হত না, জাগতিক বিদ্যাও প্রভূত উৎকর্ষ লাভ করেছিল। ছান্দোগ্য উপনিষদে নারদঋষি তদীয় ব্রহ্মজ্ঞ গুরু সনৎকুমারের নিকট স্বীয় অধীত বিদ্যাগুলির পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন যে তিনি —চারিবেদ, ইতিহাস, পুরাণ, পঞ্চমবেদ ব্যাকরণ, পিতৃলোক সম্পর্কিত বিদ্যা, গণিত, ফলিতজ্যোতিষ, খনিজবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদা, নৃত্যবিদ্যা, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যা শিক্ষা করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে প্রাচীনতম কাল থেকে ভারতে সর্ববিদ্যার অনুশীলন হত।

সন্দীপনি মুনির অন্তেবাসী হয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ছয়-বেদাঙ্গসহ চতুর্বেদ, মন্ত্র, দেবতা ও জ্ঞানের সহিত ধনুর্বেদ, মন্বাদি ধর্মশাস্ত্র এবং মীমাংসাদি দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন।

পৃথিবীর সমৃদ্ধ জাতিসমূহের ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, স্বাধীনতাই তাদের জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি। সেই ভিত্তিকে অবলম্বন করে তাদের শিক্ষা-দীক্ষা-সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছে। পরাধীন জাতির ধর্ম ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশ প্রকাশ প্রচার প্রসার সম্ভব হয়না। ভারতীয় হিন্দুজাতি যতদিন পর্যন্ত স্বাধীন ছিল ততদিন পৃথিবীর অধিকাংশস্থলে তাদের ধর্ম, শিক্ষা ও সভ্যতা প্রসার লাভ করেছিল। ছলে বলে কলে কৌশলে নয়, ভারতীয় হিন্দুজাতি প্রেম, প্রীতি, করুণা, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের উদার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে জগৎবাসীর হৃদয় জয় করতে সক্ষম হয়েছিল। ভারতীয় হিন্দুজাতির ধর্ম ও সংস্কৃতির উদারতা ও মহত্ত্বে আকৃষ্ট হয়ে বহু বিদেশীজাতি হিন্দুধর্মের ছত্রছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। তখন বহির্ভারতে বেলুচিস্তান, চীন, পারস্য, সুমাত্রা, জাভা, বালী বোর্নিও প্রভৃতি দেশ, দ্বীপ ও দ্বীপান্তরে ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির প্রচার প্রসার ঘটেছিল।

ভারতে এখনও যেসমস্ত বড় বড় মন্দির আছে পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তত বড় মন্দির দৃষ্টিগোচর হয়না।

কম্বোজের লোকেরা এখনও হিন্দুভাবাপন্ন। তারা নিজেদের 'Indian' বলে। তাদের দেশে হিন্দুসংস্কৃতির নিদর্শন স্বরূপ অনেক বড় বড় মন্দির আছে। এর একটি মন্দিরগাত্রে সমুদ্রমন্থনের কারুকার্যপূর্ণ একটি চিত্র আছে। তার একদিকে দেব, অপরদিকে দানব। বাসুকি নাগকে রজ্জু করে মন্দর পর্বত দ্বারা সমুদ্রমন্থন করা হচ্ছে।

আমাদের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হওয়ার সংগে সংগে বহির্ভারতে ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতির প্রচার প্রসার একরূপ বন্ধ হয়ে যায়।

ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, স্বার্থপরতা ও কলহপ্রবণতা হেতু আমরা আমাদের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলি। আমাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিধর্মী শক্তিধর জাতিসমূহ আমাদের রাজ-সিংহাসন অধিকার করে, আমাদের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। ফলে আমাদের ধর্মসংস্কৃতির প্রচার প্রসার বন্ধ হয়ে যায়।

প্রায় সাতশ বছর পূর্বে মুসলমান জাতি আমাদের দেশের শাসনভার গ্রহণ করে। তারা ভারতীয় হিন্দু-ধর্মসংস্কৃতির ওপর নিদারুণ কুঠারাঘাত করে। ছলে বলে কলে কৌশলে তারা বহু হিন্দু ভাই ভগ্নীকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করে। ঔরঙ্গজেব এক হাতে কোরাণ আর এক হাতে কোরান নিয়ে ধর্মপ্রচার করিয়েছিলেন।

উত্তরবঙ্গের রাজা গণেশ স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দুরাজা ছিলেন। অপকৌশলে তাদের পানীয় জলের ইন্দারাতে গোমাংস নিক্ষেপ করে উক্ত ইন্দারার জল পানকারী সকলকে মুসলমান করা হয়েছিল। 'ঘ্রাণে অর্ধভোজন' এই প্রবাদ-

বাক্যের অছিলায় আমাদের দেশের বহু গণ্যমান্য হিন্দুকে মুসলমানধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হয়। রাজশক্তি পেছনে থাকলে ধর্মের প্রচার এইভাবে প্রসার লাভ করে। আকবরের রাজত্বকালে মুসলমানগণ নানাভাবে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করতে থাকে। সেসময় মধুসূদন সরস্বতী নামে একজন বৈদান্তিক সন্ন্যাসী (পূর্ববংগের ফরিদপুর জেলার উনসিয়া গ্রামনিবাসী) হিন্দুদের এই বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য আকবরের নিকট হিন্দুদের দুর্দশার কথা জ্ঞাপন করেন। তদুত্তরে আকবর বলেছিলেন —'আমার নিকট সকল ধর্মসম্প্রদায়ই সমান। আপনারা স্বধর্মরক্ষায় সচেষ্ট হোন।—এতে আমার কোন আপত্তি নাই।' তখন মধুসূদন সরস্বতী নাগাসন্ন্যাসী সম্প্রদায় গঠন করেন। তারা হিন্দুদের মানসম্ভ্রম রক্ষার জন্য নিজেদের জীবন বিপন্ন করে সেবা করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি।

মুসলমান রাজত্বের অবসানে ইংরেজজাতি আমাদের দেশের শাসনভার লাভ করেন। প্রথম প্রথম তারা আমাদের দেশের শিক্ষিত লোককে নানাপ্রকার প্রলোভন দ্বারা খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে থাকে। হিন্দুধর্মকে এই ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য—রাজা রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহামানবগণ দৃঢ়সঙ্কল্প হন। তাঁদের প্রচেষ্টায় মিশনারীদের ধর্মান্তরীকরণ অনেকটা শিথিলভাব ধারণ করে। তখন পাদ্রীগণ তাদের প্রচারের পন্থা পরিবর্তন করে। নানাপ্রকার সেবার কৌশল অবলম্বন করে তারা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগকে ধর্মান্তরিত করতে থাকে। বর্তমানকালে তারা এদেশের শাসনকর্তা নেই সত্য, কিন্তু তাদের ধর্মান্তরীকরণ চেষ্টা জোরেই চলছে।

এভাবে একাধিক শক্তিশালীজাতির কবলস্থ হয়ে আমরা আমাদের নিজস্ব ধর্মসংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়েছি।

স্বাধীনতার আকুল আকাঙ্ক্ষা বহুদিন পর্যন্ত আমাদের অন্তরে ধূমায়িত বহ্নির ন্যায় বিরাজমান ছিল। বহু দেশপ্রেমিকের-আত্মদানের ফলে আজ আমরা সেই স্বাধীনতা লাভ করেছি সত্য কিন্তু আমাদের অভিপ্রেত লাভ হয়নি। রাজনীতির কূটনৈতিক আবর্তে পড়ে আমরা ভারতমাতাকে দুইখণ্ডে বিভক্ত করে স্বাধীনতা লাভ করেছি। এই স্বাধীনতা তার কৈশোর জীবন অতিক্রম করতে না করতে আমাদের দৃষ্টি নানাপ্রকার ভেদ-বৈষম্য, অনৈক্য পার্থক্যের গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে বর্তমানে আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েছি। এই পঙ্কিল আবহাওয়া হতে আমাদের দেশ ও সমাজকে রক্ষা করতে হলে আমাদের শাস্ত্রের বাণীকে অনুসরণ করে চলতে হবে।

ত্যজেদেকং পুরঃস্বার্থে
গ্রামং স্বার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্বার্থে
আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ।।

সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতারূপ মহাপাপে আমরা বিশেষভাবে জড়িত হয়ে পড়েছি। আমরা নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষা করতে অন্ধ। দেশ, জাতি, সমাজ রক্ষার দিকে আমাদের কোন দৃষ্টি নেই।

আমরা মহা মহা ঋষিগণের বংশধর হয়েও আজ ন্যায়নীতিকে চিরতরে বিসর্জন দিতে বসেছি। এর চেয়ে দুর্দিন আর কি হতে পারে?

শীতঋতুর আগমনে মানুষ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত জীবজন্তু শীতের প্রকোপ অল্পবিস্তর অনুভব করে। তদ্রূপ দুর্নীতি সকলস্তরের মানুষের মধ্যে বিস্তার লাভ করে।

যারা সমষ্টিগতভাবে সমাজজীবন যাপন করে তাদের মধ্যে কেউ সৎভাবে জীবন যাপন করতে চাইলে তাকে পদে পদে বিপদগ্রস্ত হতে হয়। মানুষ রোগগ্রস্ত হলে সেই রোগীকে রোগমুক্ত করা এবং অন্যান্য সুস্থলোক যাতে রোগাক্রান্ত না হয় তার ব্যবস্থা করা বুদ্ধিমানের কাজ। এই আসন্ন বিপদ থেকে আমাদের সমাজকে রক্ষা করতে গেলে, আমাদের দেশের বৈষ্ণব প্রবচনকে অনুসরণ করতে হবে—'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।' এক্ষেত্রে আমাদের সকলকে নীতিপরায়ণ হতে হবে। শাস্ত্রগ্রন্থে অমূল্য উপদেশাবলী লেখা থাকলে তার দ্বারা জনগণের জীবনে কি উপকার সাধিত হয়? নিজের হিত, নিজের মঙ্গল—কে না চায়? এ হল সকলের আন্তরিক কামনার বস্তু। তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পড়ে মানুষ তা' ঠিক ঠিক ভাবে লাভ করতে পারে না। লক্ষ্য যদি ঠিক থাকে

তবে শত বিপর্যয়ে পড়েও মানুষ তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

পুরাকালে আমাদের দেশে একশ্রেণীর সাধু মহাত্মা ছিলেন, তাঁরা আত্মচিন্তায় বিভোর থাকতেন। আর একশ্রেণীর মহামানবগণ আত্মকল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ কল্যাণকর্মে ব্যাপৃত থাকতেন। তাঁরা নিজেদের সুখসুবিধার কথা চিন্তাই করতেন না। ভারতসেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ তাঁর এক বাণীতে বলেছেন—"মানুষ কাঠের মালায় জপ করে, আমি চিরকাল জাতিগঠনের মালায় জপ করে এসেছি।" বর্তমানে তাঁর অনুগামী শিষ্য ও ভক্তগণ ধর্মকর্মের সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার জনহিতকর কর্মে ব্যাপৃত আছেন। জনগণের সাহায্য ও সহানুভূতির ওপর এদের কর্মহিতৈষণা নির্ভর করছে।

মানুষের জীবনকে সুষমা মণ্ডিত করে তুলতে হলে সৎসঙ্গে বাস, সৎগ্রন্থ পাঠ প্রভৃতি একান্ত প্রয়োজন। অকাজ—কুকাজ না করে সৎচিন্তা, সদনুষ্ঠানের মাধ্যমে জীবনকে পরিচালিত করলে ভারতের জাতীয় জীবনে আবার সুসময় ফিরে আসবে।

বারাঙ্গণা—তবু

রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আনত আঁখিতে তার আকাশের শান্ত সুর খুঁজি
অনেক দূরের মরু ধরা দেয় মরূদ্যান নিয়ে
ওখানে আতপ-মায়া গভীরে 'বারিশ' তার পুঁজি
জলে জলে চিত্তাকাশ রামধনু আঁকে রং দিয়ে।

তবুও আশারা শান্ত এলোচুলে শান্তির ইসারা
বেদনার মুখ হাসে চুপে চুপে অন্তরে অন্তরে
মনের কোণায় জ্যোতি জ্যোতিষ্কের ক্ষীণ দ্যুতি ভরা
তাতেই চরম তৃপ্তি মোহ আঁকে প্রতিটি অক্ষরে।

আজকে তারেই চাই বাঙ্গা মনে, সন্ধ্যার সমীরে
সারা অঙ্গ ছেয়ে দেবে আবেশের শ্বেত বস্ত্র দিয়ে
ফুলের সৌরভ যথা টানে যত মধুপ পাস্থরে
বিশ্রামের শান্তি আর রসে দেয় মনকে ভিজিয়ে।

পতিতা ও পতিতপাবন

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সাত

হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাত: বাসন্তী মাত্র দশ দিনের নিউমোনিয়ায় অন্তর্জলী হ'য়ে পাড়ি দিল মরপারে। অসিত সে সময়ে পুরীতে। খবর পেয়েই ভীমকে তার করল। ভীম উত্তরে শুধু লিখল—"তুই আসতে চেয়েছিস অসিত, কিন্তু এখন না ভাই। আমি কিছুদিন একাই ঘুরব হিমালয়ে। পায়ের নীচে মাটি খুঁজে পাচ্ছি না।—ভীমদা"

দিন দশেক বাদে ভীমের তার এল ঋষিকেশ থেকে, "যাচ্ছি বদরীনারায়ণ—চ'লে আয়।" অসিত লিখল: "তুমি তো জানো দাদা, আমি সুখী মানুষ—মাউণ্টেনিয়ারিং-এর নামেও হৃৎকম্প হয়। তাছাড়া মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। হরিদ্বারে বা ঋষিকেশে তুমি যখন নামবে, তার কোরো আমি যাব সেখানে। কিন্তু তার উপরে নয়—এমন কি রুদ্রপ্রয়াগ বা দেবপ্রয়াগও নয়—কেদার বদরী কা কথা!"

ভীম ওকে পাল্টা লিখল ধমকে: "হৃৎকম্প! কাওয়ার্ড কোথাকার! কাছে পেলে এক চড়ে হাবাতে হৃৎকে ঠাণ্ডা ক'রে দিতাম। না, সত্যি, এ কি একটা কথা হ'ল? তাছাড়া মোল্লারা কি মক্কা মদিনা যায় না বলতে চাস?"

অসিত লিখল রুদ্রপ্রয়াগের পোষ্টাফিসের ঠিকানায়: "ভীমদা, রাগ করো না। সবাই কি সব পারে? তোমার মুখেই সে শুনেছি। বিশ্বাস কোরো তোমার সঙ্গ পেতে আমি কন্যাকুমারী যেতেও রাজি আছি। কিন্তু পাহাড়ে ঠাণ্ডা—তাছাড়া দারুন চড়াই উৎরাই ভেঙে মুমূর্ষু অবস্থায় গোয়ালঘরের মত চটিতে সার সার কৌপীনবন্ত-র সঙ্গে পিশু-অধ্যুষিত কম্বলে শুয়ে অনিদ্রায় হাহুতাশ—না ভাই, কেদার বদরী আমার মাথায় থাক—তবে যদি সত্যিকার সাধুসন্ত কাউকে পাকড়ে আনতে পারো ঋষিকেশ বা হরিদ্বারে—হরিদ্বারে হ'লেই সবচেয়ে ভাল হয়—তাহ'লে শপথ করছি:

বাতাসেরো আগে উড়ে আমি লব ঠাঁই তব রাঙা পায়।
বিশ্বাস কোরো—সংশয়ীরাও সাধুর প্রসাদ চায়।

"কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা না ক'রে থাকতে পারছি না ভীমদা ভাই, অপরাধ নিও না; তোমার তিন মেয়ে শুনছি তোমার কাকাবাবুর কাছে আছে। কিন্তু মাসীমা? তাঁকে নিয়েই তীর্থ করতে ছুটেছ না কি?"

উত্তরে রুদ্রপ্রয়াগ থেকে ভীম লিখল: "মাকে না নিয়ে আসি কেমন ক'রে বল? তিনি কী নাছোড়বান্দা তুই তো জানিস ভুক্তভোগী! (তোকে ধরে নিয়ে তিনি গয়ায় যান তাঁর এক দিদিমা না ঠাকুরমার পিণ্ডি দিতে?) তবু বৃদ্ধবয়সে তিনি পাহাড়ে শীত সইতে পারবেন কি না শুধাতে তিনি বললেন কেঁদে: "না পারি—আমাকে অলকানন্দায় নামিয়ে দিয়ে আসিস বাবা, তাহ'লে পিণ্ডি দেওয়ার খরচও বাঁচবে—শ্রাদ্ধও করতে হবে না।"

"দেখ তো ভাই, এমন অলুক্ষুণে কথা বলে? কিন্তু মাকে বোঝাবে কে বল্? তিনি একবার না বললে তাকে হাঁ করে কার সাধ্যি? বললেন—তিনি সংসারে আর তে-রাত্তিরও থাকবেন না, তাঁকে ভাগলপুরে ফেলে এলে তিনি গঙ্গায় ডুবে মরবেনই মরবেন। তাছাড়া আমার তিন মেয়ের ভার যখন কাকাবাবু নিতে রাজী, তখন এত সাত সতেরো দুর্ভাবনা কিসের? উপরন্তু মাতৃঋণ এখানে আমার ডবল হয়েছে। তুই জানিস ছেলেবেলা থেকে তিনি পণ্ডিত রেখে সংস্কৃত পড়েছেন—আমাকেও সংস্কৃত শিখিয়েছেন মা-ই। স্তবপাঠ করা, পৈতে দেওয়া,

হিন্দুয়ানি চালে চলা সব কিছুর দীক্ষাদাত্রী তো তিনিই ...ইত্যাদি ইত্যাদি।

"কিন্তু রে কাপুরুষ! কী যে ভুল করলি আমাদের সঙ্গে না এসে—পরে পস্তাবি। এখানে আমরা রাজার হালে আছি এক রইসের অট্টালিকায়। ঠুংরি গেয়ে তাঁকে মজিয়েছি, তিন দিন ধ'রে রোজ মন্দাকিনীতে স্নান, তারপরই কেবল গান আর গান! তারপর এখানে আর এক কাণ্ড! তুই তো জানিস আমি অন্ততঃ আজ পর্যন্ত ভজনকে তেমন ভালবাসতে পারি নি। তবু এখানে বিখ্যাত সাধু তুকড়াদাসের কাছে একটি ভজন শিখেছি। শেখা মানে কি? ভজন তো শোনবামাত্র শেখা হয়ে যায়। কিন্তু শিখলাম কেন শুনবি? ভজনটি সত্যিই ভালো—মানে ভাব। বলতে কি, ভজনটির বন্দেশ এত চমৎকার যে, তুকড়াদাসকে ঠিক গায়ক নাম দেওয়া না গেলেও তাঁর মুখে গানটি মন্দ লাগে না। নাঃ—কবুল করছি ভালোই লাগে। তুই শুনলে বোধহয় 'আহা আহা' ক'রে উঠতিস —সেন্টিমেন্টাল কোথাকার! কিন্তু গানটি আমি ফিরে গিয়ে তোকে শেখাব না কক্ষনো। তবে অস্থায়ী দুটি চরণ তোকে পাঠাচ্ছি—তোকে সাজা দিতে হায় হায় করাতে চেয়ে। তাই শোন:

অজব তমাসা তেরা শামল অজব তমাসা তেরা
তু দুনিয়ামে ছত্তিয়া তুঝমে উলটপালটকা তেরা

এ গানটির বাংলা করতে হ'ল মাকে শোনাতে—তিনি কী দারুন প্রভিন্‌শিয়া জানিস তো—হিন্দি গান আদৌ শুনতে চান না, বলেন—'ও সৈঁয়ে মৈয়ের-তে আমি নেই বাবা! তাই আমি গাই তাঁর কাছে:

অপরূপ লীলা তোমার শ্রীহরি, অপরূপ লীলা এ কী!
জগত তোমাতে তুমিও জগতে—ওলট পালট দেখি!

আট

ভীমের মাকে অসিত মাসীমা বলে ডাকত প্রথম থেকেই। তিনি অসিতের মুখে বাংলা কীর্তন শুনতে অত্যন্ত ভালবাসতেন। ছেলেকে বলতেন উঠতে বসতে: "তোদের খেয়াল ঠুংরি আমার মাথায় থাক—ননদিনী পান খেয়ে মুখ লাল, নৈনা কটারী, সৈঁয়া ওঁইয়ার নাম ক'রে, যত সব বেলেল্লামি। গানে যদি ঠাকুরের নাম না থাকে তবে তাতে কি প্রাণ জুড়োয়?" ...ইত্যাদি

ভীমদা উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলত: "মা, গানের সব চেয়ে বড় দৌলত হ'ল রস—ভক্তির ভজনও একটু আধটু ভালো লাগে কেবল যখন সে সুরে তালে ভাবে রসাল হ'য়ে ওঠে। বেসুরো কীর্তনে প্রাণ জুড়োয় কেবল তোমাদের—যেমন মহাপ্রভুর জুড়োতো ক নাম শুনতে না শুনতে কেষ্টকে পেয়ে।"

কিন্তু এ হেন "এস্থেটিক" রসিকেরও মন মেজাজ বদলে গেল রাতারাতি স্ত্রীবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে। অবশ্য আগেও ভীম যেত হিমালয়—কিন্তু ঠিক তীর্থ করতে নয়। সাধুদের সঙ্গ ভালো লাগত বৈ কি, কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। দুদিন বাদেই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসর জমাত আগেকার মতনই। বাসন্তীই ছিল ওর উড়নচণ্ডী বৃত্তির একমাত্র পিছুটান—তাকে ও ভালোবেসেছিল মনে প্রাণেই। "রোমান্সের আমেজ অবশ্য কেটে গিয়েছিল বছর না ঘুরতেই"—বলত ও অসিতকে প্রায়ই—"কিন্তু ঘরোয়া ভালবাসা, সন্তানকেন্দ্র সংসার, গানবাজনা, খাওয়াদাওয়া, সেবাশুশ্রূষা এসবেরই মধ্যমণি ছিল ঐ সতীলক্ষ্মী। কখনো একটি চড়া কথা কেউ শোনে নি ওর মুখে। আবার 'ফ্যান-রাও সবাই বৌদি বলতে অজ্ঞান। এইরকম কত কথাই যে ও বলত বাসন্তীর সম্বন্ধে! অসিত মাঝে মাঝে ছড়ায় টিপ্পনি কাটত: "পঞ্চশরের মধ্যবাণ বিঁধল তোমায় ভাগ্যবান্! কে না দেবে তোমায় মান?" ইত্যাদি

সেই মানুষ কি না আজ ভজন শিখছে—তা আবার এমন রচয়িতার কাছে যাকে ঠিক গায়ক বলা চলে না! ঠাকুর কত চালই যে চালেন—ওস্তাদের মার শেষে রাত্রে, বলে না? অসিত ভাবে এই সব কথা। কত স্মৃতিই যে ফিরে ফিরে আসে—যেসব স্মৃতি বাসন্তী বৌদির জীবদ্দশায় উবে গিয়েছিল আজ উজান বেয়ে ফিরে এসে নব সুরে নবরস ঝরিয়ে চলে। আহা! এমন সদাশয় সরল মানুষের ভাগ্যে এমন শোক! লক্ষ্মীপ্রতিমাকে চিনে ও মেনে শেষটায় কি না বিসর্জন দিতে হ'ল অকালে!

কিন্তু ঠাকুরকে নিষ্ঠুর বলেই বা কোন মুখে! অতুলপ্রসাদের একটি বাউল ওর মনে গুনগুনিয়ে ওঠে বিশেষ ক'রে ভীমের মাকে নিয়ে বদরীনারায়ণ যাত্রার খবর পেয়ে:

তোমায় ঠাকুর বলব নিঠুর কোন্ মুখে ?
ভবের পথে শূন্য থালি
বেড়াই ঘুরে দীন কাঙালি,
দৈন্য আমার ঘুচবে যবে পাব দীনবন্ধুকে।

তিনিও গভীর দুঃখ পেয়েই এ বাউলটি লিখেছিলেন। মহানুভব কবি দ্বিজেন্দ্রলালেরও মন স্থায়ী ভক্তির দিকে মোড় নেয় স্ত্রীবিয়োগের পরে। তার আগে সে ভক্তি তাঁর মন ছুঁয়ে যেতে মাত্র, প্রাণের মন্দিরে স্থায়ী আসন পেত না।

কিন্তু ভীমদা কী করবে—কী নিয়ে থাকবে তীর্থ থেকে ফিরে?—ভাবে অসিত। সবল মজলিশি বন্ধু-বৎসল মানুষটি লোক খাওয়াবে কেমন করে? বাসন্তীই ছিল ওর সব উৎসবের প্রধান খুঁটি। তাকে হারিয়ে ওর অন্তর কাকে ধ'রে দাঁড়াবে? মাসিমা আছেন এই ভরসা। কিন্তু তাঁর মন তো ঠিক বাসন্তীর মতন সংসারী নয়। বহুদিন থেকেই খানিকটা দূরে দূরে আছেন তাঁর মনগড়ামন্দিরেনিজের পূজো-অর্চা নিয়ে। গুরু-বরণও করেছিলেন,—যদিও কুলগুরু। কিন্তু তাতে কী? অসিতকে তিনি প্রায়ই বলতেন চোখ বড় বড় ক'রে: "কুলগুরু কি ফ্যালনা বাবা? দীক্ষাগুরুর পথ কাটেন তো তিনিই।" অসিতকে বহুদিন আগে একবার ভীম বলেছিল তামাশা ক'রে: "মা স্বপ্নে পেয়েছেন দৈববাণী যে তাঁর দীক্ষাগুরু হিমালয়ে তাঁর পথ চেয়ে ঠায় ব'সে আছেন।" অসিত ভাবে "কিন্তু স্বপ্ন নিয়ে ভীমদা হাসাহাসি করলেও স্বপ্ন তো অনেক সময়ে সত্যিও হয়। ধরো, যদি এক্ষেত্রে স্বপ্ন ফলে—মাসিমা যদি গুরুর কাছেই থেকে যান, তাহ'লে? ভীমদার ভাগলপুরের সংসার চালাবে কে? শ্যামলী চামেলীর বিয়ের দিন আসন্ন হ'লেও শেফালির বিয়ে দেবেনই বা কি নিয়ে? তার দেখাশুনোই বা করবে কে? ভীমদার কর্ম নয়। এইসব ভাবতে ভাবতে অসিতের মন উঠত ব্যথিয়ে।

এই সময়ে অসিতকে যেতে হ'ল বিলেত।

নয়

অসিত বিলেত থেকে ফিরে কলম্বো হ'য়ে ওয়ালটেয়ারে এক গানের সভায় গিয়ে অজস্র গান ক'রে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল ভীমদাকে। পরদিন ভাগলপুরে লিখল চিঠি ওর এক আত্মীয়কে ভীমদার খবর চেয়ে। উত্তরে আত্মীয়টি লিখলেন যে, সে দেবপ্রয়াগে এক আশ্রমে আছে মা-র সঙ্গে, মায়ে পোয়ে একই গুরুর কাছে সন্ন্যাসদীক্ষা নিয়ে। যে-মেয়ে তিনটিকে রেখে গিয়েছিল কাকা বঙ্কিম বাবুর তদারকে তিনি বড় দুটির বিবাহ দিয়েছেন ভাইপোর দুটি আটচালাই শুলের দরে কিনে নিয়ে। ছোটটি—শেফালি—সম্ভবতঃ আছে তার বড়দি-র কাছে। তার কী ব্যবস্থ হবে—কেউ জানে না। ভীম ফিরবে কি না তাও কেউ বলতে পারে না, কারণ সে কাউকেই চিঠিপত্র লেখে না। একেবারে 'মৌনী বাবা' যাকে বলে।

এ তো সোজা কথা নয়—চমকানো খবর। —ভাবে অসিত। দেবপ্রয়াগের মতন বন্ধুহীন অবাঙালীর দেশে ভীমদা একটানা দুতিন বৎসর আছে! এ কী ব্যাপার!! আর এক আশ্চর্য: মাসিমার মতন শীতকাতুরে বৃদ্ধা—ষাট পেরিয়ে গেছে—হিমালয়ের পাহাড়ে শীত স'য়ে আছেন কেমন করে? সেখানকার খরচপত্রের ব্যবস্থাই বা করবে কে? ভীমদা তো আজ নিঃস্ব! ...এই সব আথাল-পাথাল চিন্তায় অসিতের মন খারাপ হ'য়ে যায়। সেই সদানন্দ দিলদরিয়া গল্পামোদী ভীমদা কি আজ সত্যিই ভিখিরি—সন্ন্যাসী? দূর! হয় কখনো? এ বাজে গুজব। সন্ন্যাসী বৈরিগির ছাঁচে ভীমদাকে বিধাতাপুরুষ ভোল ই করেন নি—অসিত প্রায়ই আওড়াত ভাগলপুরে:

ভীমদা থাকলেই আসর জমজম
দহরম মহরম দহরম মহরম!

ভীম উত্তর দিত অসিতের কাঁধে চাঁটি মেরে:

বেরসিক! জুড়েদে—ভীমদার অনুপম
ঠুংরির খোঁচে হয় স্থাবর-ও জঙ্গম।

অসিতের কী যে ইচ্ছে হয় দেবপ্রয়াগে ছুটে যেতে সঠিক খবরের জন্যে! হয়ত ভীমদা কোনো পাকে পড়েছে—কে বলতে পারে? পাকে পড়াই যার স্বভাব...কিন্তু—মাথা নাড়ে অসিত সখেদে—এ পার্বত্য শীতে দেবপ্রয়াগ যেতে ভরসা পায় না। তার উপর ঠিক কি এই সময়েই তার নিমন্ত্রণ এল ত্রিবেন্দ্রমে এক সঙ্গীত সভায় পৌরোহিত্য করার! একবার নিমন্ত্রণ নিয়ে ফেলার পরে তো আর না করা যায় না। এখন উপায়? সত্যিই ভীমদার জন্যে

ওর মন কেমন ক'রে ওঠে। রাতে অনেকক্ষণ প্রার্থনা করে একমনে। হঠাৎ মন হাল্কা হ'য়ে যায়। কে যেন বলে—ভীমদার খবর মিলবে কয়েক দিনের মধ্যেই। এ রকম স্বর ও মাঝে মাঝে শোনে। আর যা শোনে ঠিক কি তাইই ঘটে! এবারও ভুল শোনেনি ঠিক চারদিন বাদে ভীমদার চিঠি:

ভাই অসিত,

হঠাৎ স্বপ্নে দেখলাম তোকে। তুই যেন আমার জন্যে প্রার্থনা করছিস। তাই মনের তারে বেজে উঠল ফের মধুর কণ্ঠস্বরে ভীমদা ডাক। কদিন থেকেই মনে হচ্ছিল তোকে অন্ততঃ আমার একটু খবর দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু জানিস্ তো তোর ভীমদাকে—গড়িমসি করতে যার জুড়ি মেলা ভার! হ্যাঁ, গুরুদেব বললেন—আমার স্বপ্ন আদৌ কল্পনা নয়। তিনি মহাযোগী, তাঁর কথা তো আর ভুল হ'তে পারে না। তাই লিখছি, তোকে—তাঁর অনুমতি নিয়ে—যে আমাকে আগামী গুরু-পূর্ণিমার দুএকদিন আগে ঋষিকেশে নামতে হচ্ছে—গুরুদেবেরই কোনো কাজে। তুই যদি সেই সময় নাগাদ হরিদ্বারে আসিস তো দেখা হয়। চ'লে আয় না ভাই, দুর্গা ব'লে—লক্ষ্মীটি! তোকে কত কথাই যে বলবার আছে—অঢেল, রোমহর্ষক, ড্রামাটিক—উঃ! বলবার জন্যে প্রাণ ছটফট করছে। কিন্তু তোকে পাই কোথায়—হ্যামলেটের ভাষায়—"এইই হয় প্রশ্ন: "that is the question"!

এ-সমস্যার একটিমাত্র সমাধান আছে: মহম্মদ যখন পর্বতের কাছে যেতে অক্ষম তখন পর্বতের মহম্মদের কাছে আগমন। না, ঠাট্টা নয়—তুই তো এখনো ঝাড়া-হাত-পা, না আছে গৃহ, না গৃহিণী, না গুরু, না গুরুদাসী সেবার দায়িত্ব—তাই তুই, কেন আসতে পারবি না সোজা হরিদ্বার—বিশেষ যখন হরিদ্বার তুই এত ভালোবাসিস? ভালো কথা: গুরুদেব আমাকে বলেছেন তিনি চান তোর মুখে খাস বাংলা কীর্তন শুনতে—যা আমি জানি না। কাজেই বলা চলে—তুই গুরুদেবের কৃপা পেয়েছিস। না না, ভড়কাস নে—আমি গুরু-বাসরের দালাল নই, তোকে 'কনভার্ট' করতে চাই না। তবে তোকে বলতে চাই গুরুদেবের কথা—আর এমন সব আশ্চর্য কথা যে, শুনলে তুই গালে হাত দিয়ে ভাববিই ভাববি: "তাই তো! সদ্‌গুরু তাহলে আজও বেঁচে ব'র্তে আছে এ বদ-যুগে!"

ঠাট্টা না, তুই চ'লে আয় সোজা হরিদ্বারে—আমাকে তার করিস মোদিভবনের ঠিকানায়। এ-ধর্মশালায় তুই তো দুবার উঠেছিলি। তুই তার করলে আমি স্টেশনে যাব তোকে মোদিভবনে এনে খাওয়াতে।

মা আনন্দেই আছেন। বলেন আমাকে ধমকে প্রায়ই: "বলি নি তোকে যে, সময় হ'লেই গুরুর দেখা মেলে মেলে মেলে? মা দেখেছিলেন গুরুদেবকে স্বপ্নে—কিন্তু সেকথা বলব তুই এলে তবে।

একটা কথা: শ্যামলী এখন কলকাতায়। তার স্বামী প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক। সে আমাকে লিখেছে ...দুটো তিব্বতী কম্বল পাঠাতে চায়। তুই যদি নিয়ে আসিস তো আমরা তো খুসী হবই, শ্যামলীও খুসী হবে তোর দর্শন পেয়ে। তবে সে তোকে ধরবেই ধরবে তার ওখানে একদিন কীর্তন গাইতে—বলে রাখছি।

ইতি। তোর ভীমদা

দশ

অসিত মুস্কিলে পড়ল। ত্রিবন্দ্রমে সঙ্গীত সভায় পৌরোহিত্য—অথচ ভীমদা নিজে লিখেছে দুবৎসর বাদে... ...ভেবেচিন্তে প্রার্থনা করল সত্যিই যাতে হরিদ্বারে যাওয়া হয়। একে ভীমদা, তার ওপর হরিদ্বার—প্রার্থনা না ক'রে পারে? প্রার্থনায় অসম্ভবও সম্ভব হয়—দেখে নি কি বারবারই? সদ্‌গুরু থাকুন বা না থাকুন, ঠাকুর তো আজও তেমনি করুণাময়ই আছেন—"পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থার" অন্তে "মঙ্গলদাতা চিরসারথি!"

ফের অঘটন ঘটল! সংশয় ফের উঁকি মারে: সত্যিই কি প্রার্থনায়ই ঘটল—না কাকতালীয়। তবে দু দুটো অঘটন ওকে ভাবিয়ে দিল বৈ কি। এক: ত্রিবন্দ্রমে হঠাৎ কী এক গোলমালে তহবিল-তছরুপের দরুণ সঙ্গীত-সভার অধিবেশন দুমাস পেছিয়ে গেল। দুই: প্রয়াগ থেকে এল নিমন্ত্রণ—গুরু পূর্ণিমার ঠিক দশ দিন পরেই এক সঙ্গীত কনফারেন্স: অসিত নিমন্ত্রিত হ'ল ভজন গাইতে।

অসিত আনন্দে ভীমকে তার করে দিয়ে ওয়াল্টেয়ার থেকে রওনা হ'ল কলকাতা। শ্যামলীর কাছে এসে সব

শুনল। এর আগে শুনেছিল গুজবে। এবার শুনল ইতিহাস সবিস্তারে।

সেই সনাতন কাহিনী: সরলকে ঠকিয়ে কুটিলের বোলবোলা—স্ত্রী বিয়োগে মুহ্যমান বৈরাগীকে ঠকিয়ে চতুর সংসারীর শ্রীবৃদ্ধি: বঙ্কিমবাবু ভীমের অছি হ'য়ে শ্যামলী চামেলীর বিয়ের অজুহাতে ওর দুটি আটচালা কিনে নিলেন এক বন্ধুর নামে—মাত্র সাত হাজার টাকায়। অপিচ, মেয়ে দুটির বিবাহের পর শেফালিকে পাঠিয়ে দিলেন দিদিদের তদারকে—সে থাকত কখনো শ্যামলী কখনো চামেলীর কাছে। শ্যামলী কেঁদে বলল: "ওদিকে ঠাকুমা গুরু পেয়ে গদ্‌গদ, আর ফিরতে চাইলেন না—এদিকে আমাদেরও কিছুই রইল না—বাবা ও 'গুরুদাস' নাম নিয়ে বিবাগী হওয়ার ফলে। আমাদের কালেভদ্রে লেখেন এক আধটা চিঠি—তা-ও পোষ্টকার্ড···" বলতে বলতে শেফালির সে কী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না! পলাতক পিতাকে ঘরে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে কথা দিয়ে অসিত কম্বল দুটি নিয়ে চলল হরিদ্বার।

এগারো

হরিদ্বার ষ্টেশনে অসিত শ্মশ্রুল যোগীকে প্রণাম করতে হেঁট হতেই ভীম হৈ হৈ ক'রে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

"প্রণাম? সে আবার কী রে সদাসন্দিহান বুদ্ধিবাদী!" বলল ভীম প্রসন্ন পরিহাসে। "সাতজন্মেও যাকে নমস্কার পর্যন্ত করিস নি!"

অসিত হেসে বলে: "কিন্তু তোমার যে নবজন্ম হয়েছে দাদা! 'খোকা আমার সে খোকা তো নেই?' একেবারে যাকে বলে হাণ্ডেডপাসেণ্ট সাধু, তার উপরে গুরুদাস—তার উপরে এমন জমকালো দাড়ি! সত্যি ভীমদা, দাড়িতে তোমাকে কী যে মানিয়েছে!"

স্তুতিপ্রিয় ভীম মহাখুশী হ'য়ে অসিতের পিঠে সোল্লাসে চাপড় দিয়ে মুটের মাথায় তার সুটকেশ ও হোল্ডল চাপিয়ে পথ চলতে চলতে ছড়া কাটে: "হা হা হা! ওরে অসিত,

"দাড়ি গোঁফ বিনা হয় না যোগীর গম্ভীর যোগযাগে সুমতি
কেশ বিনা শুধু শিবপূজা ক'রে সতীর যেমন মেলে না পতি!"

অসিত হেসে বলে: সর্ব রক্ষে! তোমার প্রাণ খোলা হাসি আর ছড়াকাটার দৌলতে নিজেকে আর অসহায় মনে হচ্ছে না। তোমার গুরুগম্ভীর স্বামীজি মূর্তি দেখে বুকের মধ্যে ধক ক'রে উঠেছিল। কিন্তু এখন দেখছি -

ভীম ফের অট্টহাসিতে রাস্তার পথিকদের চমকে দিয়ে পাদপূরণ করে

"—ছড়া কেটে তথা অট্টহাস্যে মরুতে ঝর্ণা বহায় যে—
মাভৈঃ রে! গালপাট্টা দাড়িতে মজবে না দ'-য়ে ধরায় সে।"

অসিতই এবার ভীমের কাঁধে চাপড় মারে, বলে: "সত্যিই ভয় কেটে গেছে ভীমদা! বাইরে খোল বদলালেই বা—অন্তরে যখন সেই ভীমদাই আছ—"

ভীম বাধা দিয়ে বলে: "ধীরে রজনী, ধীরে! অতটা অভয় দেওয়া চলবে না—বেশী কম্‌প্লিমেণ্টে তাহ'লে ফের বদহজম হবে। অনেক কষ্টে 'গোগ্রাসে' খাওয়ার বদভ্যাস কাটিয়ে উঠেছি—নামও বদলে ফেলেছি: ভীমসেনের অভ্রভেদী শির গুরুদাস নাম নিয়ে শুধু যে গুরুচরণে নত হয়েছি তা-ই নয়, তাঁর চরণামৃত সেবন ক'রে—কী বলব?—মহিমান্বিত হয়েছি ভাই, সত্যি বলছি।"

অসিত টোকে "কিন্তু পান জর্দা তো তেমনি চলেছে সমানে—"

ভীম ফের বাধা দিয়ে বলে—এবার হাতজোড় ক'রে "নবাবী আমলের শুধু ঐটুকুই আছে দাদা! বলব কী—সিগারেট, তামাক, সিগার, পাইপ—সব বাতিল—বেঁচে আছে কেবল এই পানটুকু—তাও জর্দা সুর্তি বাদ। না, এ ঠাট্টা নয় ভাই! গুরুদেবের কৃপা পরশমণি, নৈলে মহাহারী কি মাত্র দুবছরে মিতাহারী হ'য়ে মা-র নয়নানন্দ হ'তে পারত? না তার মুসলমান জিভ জঠরও আচারী নিরামিষাশী হিন্দু সাধক বলতে পারত—হা হা হা!"

অসিত এবার সত্যিই আশ্চর্য হয়: "বটে তুমি এমন নিরামিষাশী?—তাদের বলতে আগে 'ঘাস খায় ওরা —ঘেসুড়ে' মনে আছে?"

ভীম খোলা হেসে বলে: "তাই তো বলেছি—গুরুদেবের কৃপা জাদু জানে, নয়কে হয় করতে পারে।"

"আর তোমার ক্রনিক ডিস্পেপ্‌সিয়া ?"

"হা হা হা! সে তো অলীক দেহের ব্যাধি—সেরে গেছে কবে! আরো কত ভবব্যাধি কেটেছে যে—চল্‌ বলব তোকে খ ক'রে দিতে। এই যে 'মোদিভবন' এসে গেছে। আয় আগে তোকে চা-যোগে চাঙ্গা করি—তারপরে—উঃ! কত কথাই যে বলবার আছে, চল্‌।"

[ক্রমশঃ

ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ

পুষ্পদেবী, সরস্বতী, শ্রুতিভারতী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ

(২।১।২৩)

শঙ্কর কন অশ্ম অর্থে প্রস্তরে জেনো কয়
পাথরের মাঝে পার্থিবত্ব কঠিনত্ব যে রয়
আবার কেহবা মলিন যে হয়
কেহ উজ্জ্বল উজলিয়া রয়
আত্মার মাঝে চৈতন্যের তেমনি প্রকাশ জেনো
জীবের অল্প জ্ঞান ব্রহ্মের সর্ব্ব জ্ঞানতা মেনো।

উপসংহারদর্শনাৎ ইতি চেৎ ন ক্ষীরবৎ হি

(২।১।২৪)

কন শঙ্কর ব্রহ্ম জানিও জগৎ স্রষ্টাই নয়
জগতের উপকরণ জানিও ব্রহ্ম হতেই হয়
ক্ষীর হতে যথা দধি পুনঃ হয়
তেমনি ব্রহ্মে জগৎ উদয়
সকল শক্তি আধার সেজন অপূর্ব্ব পরকাশ
তাঁরি ইচ্ছায় পূর্ণ জগৎ সবে জেনো তাঁর দাস।
দীন সে কুম্ভকারের যেমন সামান্য ঘট ওরে
শুধু মাটি নয় জল ও চক্র কত লয় পরে পরে
ব্রহ্ম শুধু যে নিজ ইচ্ছায়
এই সৃষ্টির স্রষ্টা যে হয়
তাঁহারি ভেতর সব শক্তির সব উপাদান রয়

(২।১।২৫)

শঙ্কর কন কেহ পুনঃ বলে দুধ অচেতন হয়
উপকরণের দ্বারা তাহা হতে দধি পরিণত হয়
আধার ভেদেতে নানা রূপ ধরে
ব্রহ্ম অতুল শকতি যে ধরে
দৈব ঘটনা প্রাসাদ বা রথ নিমেষে মূর্ত্ত হয়
মাকড়সা যথা নিজ দেহ হতে জাল যথা নির্ম্মায়।

কৃৎস্নপ্রসক্তি র্নিরবয়বত্বশব্দ কোপোবা

(২।১।২৬)

শঙ্কর কন প্রতিপক্ষতে নানা রূপ কথা কয়
ব্রহ্মই যদি জগৎ হনতো ব্রহ্ম কোথায় রয় ?
জগৎ হইলে ব্রহ্ম কি নাই
ব্রহ্ম বলিতে শ্রুতিতে বুঝাই
নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং
ক্রিয়াহীন সেই রূপহীন জন কি ভাবে এখানে রন
বায়ু যথা রয় শ্বাস প্রশ্বাসে দেখা কভু নাহি যায়
গাছ নড়ে দেখি পাতা ঝরে পড়ে বায়ুর প্রকাশ পায়
তেমনি মূর্ত্ত অমূর্ত্ত মাঝে
ব্রহ্ম জগতে সেভাবে বিরাজে
ব্রহ্ম ব্যতীত কোন কিছু নয় জেনো মনে নিশ্চয়
ব্রহ্মের মাঝে বিরাজে জগৎ নিজে সে ব্রহ্মময়।

কঠোপনিষদের সাধন পথ

শ্রীঅরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্থ মন্ত্র (১। ২। ৪)

মন্ত্র :—দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী
অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা।
বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে
নত্বা কামা বহবোঽলোলুপন্ত ॥

অর্থ :—যাহা বিদ্যা ও অবিদ্যা বলিয়া খ্যাত, ইহারা সম্পূর্ণ বিপরীত ও ভিন্নগতি। নচিকেতা তোমাকে বিদ্যার্থী মনে করি। বহু কাম্যবস্তুও তোমাকে প্রলুব্ধ করে নাই।

ব্যাখ্যা :—অবিদ্যা ও বিদ্যার প্রভেদ যমরাজ কেন উল্লেখ করিতেছেন? ইহা দ্বারা আমরা প্রেয় মার্গে যাইতেছি কি শ্রেয় মার্গে অগ্রসর হইতেছি তাহা বুঝিবার সাহায্য হয়। আমরা যাহা কিছু করি বা কিছু আমাদের দ্বারা হয় তাহাদের গতি আমাদের শরীরেই দুই প্রকারে ব্যক্ত হয়। যে কাজ বা যে ঘটনায় আমাদের শরীরের নিম্নস্তরে টান পড়ে তাহা প্রেয় বলিয়া জানিবে। যে কাজ বা যে ঘটনা আমাদের দেহের মধ্যে ঊর্দ্ধ দিকে আকর্ষণ করে তাহা শ্রেয় বলিয়া বিবেচ্য। স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর ও দেহে একই সঙ্গে মানব জীবনে অবরোহণ বা আরোহণ চলে তাহা জানিবে। একটায় হইলে অপরটায় বোধ করা যায় না। তাহারা যেন মানুষের দুইটি পা এক পথেই চলিতে সক্ষম। যখন শরীরের সকল রসের ধারা নিম্নগামী হয়, তখন প্রেয়ের দিকে ধাবমান হইতেছি। যখন আগুনের পরশমণি অন্তরে জ্বলিতে থাকে, তখন সারা সত্তা তাহারই উত্তাপে ঊর্দ্ধগামী হইয়া থাকে। রসধারা মনের স্রোত জানায়। অগ্নির বহ্নি বুদ্ধির নির্দেশ। মন নিচু দিকে টানিতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি উপরদিকে লইয়া যায়। মন অবিদ্যাকে বরণ করিতে চায়, বুদ্ধি বিদ্যাকে ধরিয়া থাকে। যে মানুষ ভাবের বশে, উত্তেজিত হয়ে কাজ করে, সে মনের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া অবরোহণ করে কারণ শারীরিক রসের স্বাভাবিক ধর্ম্মই হইল তাহা নিম্নগামী হয়, ইহাই জীবনে অবিদ্যার প্রাধান্য জানিতে হয়। আর যে সাধক বুদ্ধিকে কাণ্ডারী করিয়া সেইমত সাধনপথে নিত্য তপস্যাপরায়ণ হয় তাহার শ্রেয় মার্গে উন্নতির গতি অপ্রতিহতভাবে চলিতে থাকে, সে আধ্যাত্মিক দিকে আরোহণ করিতে থাকে এবং তাহার জীবনে বিদ্যা মহিমান্বিত হয়। তবে কি মনকে বুদ্ধির চেয়ে ছোট করা হইল? কঠোপনিষদেই পরে বুঝা যাইবে, মনকে বুদ্ধির সহিত সংযুক্ত করিয়া চালিত করিলে মন বাষ্প প্রায় হইয়া আকাশ মার্গে মুক্তি পাইতে থাকে। তাহাই আবার আকাশের করুণায় নিমন্ত্রিত বস্তু বা জীবসমূহের উপর পরে বর্ষিত হইলে তাহাতে বিশ্বের কল্যাণ হয়। কিন্তু এক্ষণে আধ্যাত্মিক অভিযানের গোড়ার কথা হইল, কি করিয়া শ্রেয়পথে অবিচলিত থাকিয়া অগ্রসর হইতে পারি। তাহারই জন্য অবিদ্যা ও বিদ্যার প্রভেদ নিজসত্তা হইতে দৃষ্টিপাত করিয়া স্পষ্ট করিয়া জানিতে বলা হইল। আমরা যেন নচিকেতাকে আদর্শ মানিয়া কামনাবিদ্ধ না হইয়া ধীরভাবে জীবন-যাপন করিতে প্রয়াসী হই। শ্রেয়মার্গ ক্রমশঃ নিজের পরিচয় নিজেই দিবে।

পঞ্চম মন্ত্র (১।২।৫)

মন্ত্র— অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ ॥

অর্থ :—অবিদ্যার মধ্যে বর্ত্তমান, নিজের বিচারে ধীর এবং নিজের বিচারের মত্ততায় পণ্ডিত, অতি কুটিল

পথগামী মূঢ়গণ, অন্ধের দ্বারা পরিচালিত অন্ধের ন্যায়, পরিভ্রমণ করে।

ব্যাখ্যা—মানুষের জীবনে সে কি করিয়া থাকে বা তাহার দ্বারা কিরূপ ক্রিয়া হইয়া থাকে, তাহারই প্রতি-পত্তি তাহার নিজ চিন্তা ধারার চেয়ে অধিক প্রভাবশালী হয়।

যদি জীবনের সব কাজের মধ্যে কোন মনুষ্যের জীবনে অবিদ্যাই প্রচারিত হয়, সে অবিদ্যা তাহাকে ঘিরিয়া তাহার সর্বনাশ করে। কারণ অবিদ্যার প্রতিক্রিয়া তাহার জীবনে শীঘ্রই দেখা দেয়। সে মানুষ নিজেকে যতই প্রজ্ঞাবান্ ও শাস্ত্রকুশল বলিয়া গণ্য করুক বা অভিমান করুক, তাহার বিদ্যার কোনই শক্তি প্রয়োগ না হওয়ায় হ্রাস পাইতে থাকে ও লোপ পাইতে পারে। শ্রেয়কে অন্তরে পোষণ করিয়া জীবনের ব্যাপারে প্রেয়র দ্বারা পরিচালিত হইলে এইরূপই হয়। ইহাকেই আধুনিক ভাষায় ভণ্ডামি বলা হয়। এইরূপ কপটাচারীর জীবন দুর্গতিপূর্ণ হয়, রোগ, জরা, মরণ ও আনুসঙ্গিক দুঃখ তাহাকে শীর্ণ ও জীর্ণ করিয়া তাহার শেষ করিয়া থাকে, তাহার মধ্যে জীবনের আর চিহ্ন থাকে না, পুনর্জন্মের শীকার হইয়া সে প্রেতলোক ঘুরিয়া আসে। আবার সুযোগ পায়, যদি সংশোধন মার্গ লয়। তাই এই মন্ত্রে বলা হইতেছে যে শ্রেয়মার্গ লইতে হইলে চিন্তায়, বাক্যে ও কর্ম্মে সর্ব-প্রকারে লইলে আশু ফলপ্রদ হয়। নচেৎ তাহার বাস্তব জীবন যেমন অন্ধকারময় হয়, তাহার অন্তর জীবন ততোধিক অন্ধের মত হইয়া যায় ও কোনদিক হইতে কোন আলোর আশা করা যায় না।

ষষ্ঠ মন্ত্র - (১।২।৬)

মন্ত্র — ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
প্রমাদ্যন্তম্ বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী
পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে ॥

অর্থ:—চঞ্চলমতি সাধন প্রয়াসীর নিকট সাম্পরায় সাধন প্রতিভাত হয় না। সে প্রমাদগ্রস্ত ও বিত্তমোহে বিমূঢ় হইয়া পড়ে। "ইহলোকই আছে, পরলোক নাই" এইরূপ মননকারী পুনঃ পুনঃ আমার (যমের) বশ্যতা প্রাপ্ত হয়।

ব্যাখ্যা—"মহতী সাম্পরায়" বাক্যের নিগূঢ় অর্থ এই উপনিষদের ১।১।২৯ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আবার সে কথার উল্লেখ প্রয়োজন নাই।

সেখানে "মহতী সাম্পরায়" মানবজীবনে যেভাবে দেখা দেয় তাহা জানা গিয়াছে। এক্ষণে সেই অবস্থার মূলে যে সাম্পরায় শক্তি সাধনজীবনে মানুষের সহকারী হয় তাহার কথা বলা হইতেছে। পূর্ব্বে তাহার পরিচয় পাইয়াছি। এক্ষণে সাধনজীবনে তাহার প্রতিপত্তি জানিয়া তাহার দ্বারা সকল বিঘ্ননাশন করিতে বলা হইতেছে। শ্রেয়ের পথে সাম্পরায় শক্তির মত বন্ধু আর নাই।

এইবার পূর্ব্ব মন্ত্রের সহিত সুর মিলাইয়া এই মন্ত্রের যে সোজা অর্থ পাই তাহা হইতে আরম্ভ করি। পূর্ব্ব মন্ত্রে পথের ধূলায় অন্ধ হইয়া, যিনি ধীর তিনিও যে ধর্ম্মজীবনের পারাপারের খেয়া বন্ধ দেখিয়া কিরূপে হাহাকার করেন তাহা দেখিলাম। এইরূপে তিনি শ্রেয় পথ চ্যুত হইয়া যা'ন। বর্ত্তমানে মন্ত্রে আর এক প্রকার লোকের কথা বলা হইতেছে, যাঁহারা স্থিরমতি নহেন, তাঁহাদের চঞ্চল বালক স্বভাব বলিয়া পরিগণিত করা হইতেছে, তাঁহাদের চঞ্চলতা কিভাবে শ্রেয়পথের অন্তরায় হয় তাহা বলা হইতেছে।

তাঁহাদের অন্তরে সমতার একান্তই অভাব হয়। গীতায় দেখা যায়, সমতার বিন্যাস কি প্রকারে সাধক জীবনে মনে প্রাণে ও ব্যবহারে চলিতে থাকে। সমত্বকেই সেখানে "যোগ" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে (২।৪৮)।

তারপর ধ্যানযোগে আরূঢ় হইলে "শম" লাভ হয় (গীতা ৬।৩)। গীতা অনুযায়ক, সমতা হইতে শমতায় পৌঁছানো জৈবধর্ম্মের পথ। উপনিষদে শমতা হইতে সমতায় নামিয়া সেখানে স্থির হওয়াই মোক্ষের চিহ্ন। এই দ্বিতীয় প্রকার সমতাকে মহাসমতা বলিলে উভয়ের প্রভেদ বুঝা সহজ হয়। সমতা যুক্ত করে (process of addition) বলিয়া ইহা যোগ। মহাসমতা বিযুক্ত করে (process of subtraction) বলিয়া ইহাকে মহাযোগ বলে।

সমতা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যাহা অর্জ্জুনকে গীতায় শিক্ষা দেওয়া হইল। মহাসমতা ব্রাহ্মণের জীবনে মোক্ষপথের সহায়, যাহা নচিকেতার চির পাথেয়। ধর্ম হিসাবে সমতা ব্যক্তির জীবনে কার্য্যকরী হইয়া গেলে অন্তরে

ক্রমশঃ স্থান পায়। মোক্ষপথে মহাসমতা অন্তর জীবন হইতে বিস্তৃত হইয়া সমগ্র জীবন গ্রাস করিয়া আত্মায় বিলীন হয়। দ্বিতীয়টি সাম্পরায় শক্তির নিজস্ব কার্য্য। সমতাকে আকর্ষণ করিয়া মুমুক্ষুর জীবনে যখন পরাশক্তি বলবতী হ'ন তখন তাঁহাকে বলা হয় "মহতী সাম্পরায়" অর্থাৎ যে পরাশক্তি মহাসমতা করান। ধর্মক্ষেত্রে সাধককে সচেষ্ট হইয়া, সাম্পরায় দেবীর আনুকুল্যে সমতার দিকে অগ্রসর হইতে হয়। মোক্ষ মার্গে সাধক চেষ্টাহীন (বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে, কঠ-উপ, ২।৩।৯) তাই স্বয়ং দেবী সাম্পরায় তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া মোক্ষের পথে লইয়া যান। তখন সাধকের গত্যন্তর নাই। সেই জন্য উপনিষদ সেই দেবীর শরণ লন। তিনিই শ্রেয় মার্গে অপেক্ষায় থাকেন; সাধকের মঙ্গলবিধানের জন্য।

চঞ্চলস্বভাব বালকের পক্ষে ইহা সহজে প্রতিভাত হয় না। ভিতরের আলো যে বাহিরে আসিয়া পড়িতেছে তাহা চঞ্চলচিত্ত হইলে বুঝা যায় না। যদি কেবলই অন্তরের দরজা খুলি ও বন্ধ করি তাহা হইলে সে আলোও ত জীবনে স্থির হইতে পায় না। সে আলো ভিতরে "ভাতি" তাহা আর সেইমত বাহিরে "প্রতিভাত" হয় না। তাই প্রথম পংক্তিতে বলা হইল "ন সাম্পরায় প্রতিভাতি বালং।"

দ্বিতীয় পংক্তি হিসাবে চঞ্চল স্বভাব সাধকদের পদে পদে ভুল হয়। কবি গাহিয়াছেন, "তুফানায় মিলে, পথ দেখায় বলে, পদে পদে পথ ভুলি হে।" যবে মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে যখন অন্তরের শমতা আকর্ষণ করিয়া বাহিরেও স্থির রাখে তখন আর ভুল হয় না। একথাও গীতার ১।১৭ শ্লোকে পাই। তাই শমতাই যে ব্রাহ্মণস্বভাবের প্রথম মূলধন তাহাও গীতায় স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে (১৮।৪২)। কিন্তু এক্ষণে চঞ্চলমতির সাধন মার্গের আলোচনা হইতেছে। এপথে সম্পরায়কে সাধন সহায়-রূপে দেখা বা পাওয়া যায়না; বাহিরের চাওয়া ও পাওয়া বড় হয়, তখন চিত্তের চেয়ে বিত্ত প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। মানুষ নিজ স্বার্থ জড়িত বিদ্যা, বুদ্ধি ও বৈভবকে বড় করিয়া দেখিতে থাকে। তখন অহংকারে মত্ত হইয়া আর ঠিক ঠিক কিছু দেখে না। শ্রেয় এবং প্রেয়'র পার্থক্য আর ধরিতে মানুষ সক্ষম হয় না। "বিমূঢ়া নানু-পশ্যন্তি, পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ" (গীতা, ১৫।১০)। যে জ্ঞান চক্ষুর এই বল্লীর প্রথম চারটি মন্ত্রে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে আর ত তাহা প্রতীত হয় না। মানুষ হাহাকার করিয়া অনুভব করে, "বাহির পানে চোখ মেলেছি, হৃদয় পানে চাহি নাই।" কাজেই আধ্যাত্মিক দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইয়াছি; সাম্পরায় দূরে বহুদূরে, দৃষ্টির অন্তরালে, অদেখার মধ্যে অদৃশ্য রহিয়া যা'ন। প্রথম বল্লীর শেষ মন্ত্রে (১।১।২৯) মানবজীবনের উচ্চতম অভিব্যক্তি যে মহতী সাম্পরায় সম্বন্ধে প্রতীক্ষার আশ্বাস যাহা বুদ্ধিযোগের প্রথম উল্লাসে পাওয়া গিয়াছিল, তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না। কেন এমন হইল? নিজের চঞ্চল স্বভাব, আর একবার, হয়ত শেষবার, নিজেকে বড় করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিল। এখনও যদি যমের শিক্ষা অনুযায়ী নিজকে চালিত করিতে না পারি, যদি নচিকেত-অগ্নি নিষ্পন্ন করিয়া, শ্রেয় জ্ঞানের আলোয়, সাম্পরায় দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিতে না পারি, তাহা হইলে ইহলোক ও পরলোকের মহাসমতার পটভূমিতে অসীম, অনন্ত আত্মার বিস্তৃতি আর ত অন্তরে অবধারিত হয় না। ইহলোককে সর্ব্বস্ব বলিয়া মানিতে থাকি ও বারবার এখানকার টানে যমের বশীভূত হইয়া পুনরাবর্ত্তন করি।

অতএব চঞ্চলমতি বালক হইলে চলিবে না। নচি-কেতার মত বালক স্বভাব হইতে হইবে। তাঁহার মধ্যে সত্য ধরা দেয়, তিনি সত্যকে ধারণ করিবার জন্য ইতস্ততঃ বুদ্ধি চারণ করেন না। তাঁহার ধারণার মধ্যে সত্য নিজের বন্ধন খুঁজে, তাঁহার ধ্যানের মধ্যে সত্য নিজের মুক্তি পায়। তাঁহার সমাধিতে সাম্পরায় ডানা মেলিয়া স্থির থাকেন। তাঁহার ধারণা ধ্যান ও সমাধির সমন্বিত সংযমের ভিতর দিয়া তিনি যমের কাছে, স্বীয় গুরুচরণে সংযমের উৎসস্থানে আত্মবিক্রয় করিয়া চিরদাস হইয়া থাকেন। কাজেই নিজের সর্ব্বস্বকে দিয়াছিল বলিয়া তাঁহার ইহলোক, পরলোক তাঁহার কর্ম্মভার ও যজ্ঞফল হাল্কা হইয়া দিশাহারা হইয়া যায়। সেইখানেই "সাম্পরায়" তাহার সকল প্রকার ঐশ্বর্য্য লইয়া স্বীয় মহিমায় "প্রতিভাতি" বা আত্মপ্রকাশ করেন। শ্রেয়মার্গের অনু-গমন চরমভাবে সার্থক হয়। তখন শুধু পথ দেখা সার্থক হয় না; যাহা অন্তরের গভীরে শুনিতে পাওয়া যায় তাহা পরের মন্ত্রে শোনা যাইবে, ও তখন বারবার মনে হইবে, তবে কি সাম্পরায় দেবী শেষে অব্যক্ত আত্মায় নিরুদ্দেশ হইলেন?

[ক্রমশঃ]

জীবন জিজ্ঞাসা

শ্রীঅশোককুমার মিত্র

নির্নিমেষ নয়নে দেখিতেছিলাম।

দেখিতেছিলাম, মস্ত ফ্রেমে দেওয়ালে ঝোলানো সাদা কাগজের ওপর কাল চাইনিজ কালিতে সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা আমার বংশ পরিচয়ের বিরাট বৃক্ষটি নানা ডালপালা নিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিলাম।

আমি কে, কোথা হইতে, কেমন করিয়া, কবে এই সুন্দর পৃথিবীতে মানবের মাঝে আমি আসিয়া হাজির হইলাম?

পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ... এঁদের নামের কোলের কাছে ছোট করিয়া বন্ধনীতে তাঁদের স্ত্রীদের নাম লেখা রহিয়াছে। এঁদের মিলনেই বংশ বৃক্ষের কোন শাখা ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে, আবার কোন শাখার তেজ এবং প্রসার তেমন উল্লেখযোগ্য হয় নাই!

অবাক হইয়া দেখিতেছিলাম, আগেকার মেয়েদের নামগুলো কেমন যেন বেখাপ্পা লাগে আজ কাল। পরে ভাবিলাম, হ'বেই তো—সেকালের মেয়েদের "সেকেলে" নাম—হরিদাসী, রত্নমণি, স্বর্ণময়ী, গঙ্গামণি...!

গঙ্গামণি। শিবপ্রসাদের স্ত্রী গঙ্গামণি।

মন কল্পনা স্রোতে ভাসিতে লাগিল।

মনে হইল, শিবপ্রসাদ—গঙ্গামণি মিলন যেন রাজ-যোটক হইয়াছিল। না হইলে, ডালপালা নিয়া এদিককার বিরাট বংশবৃক্ষটি এমন আলো করিয়া থাকিত না।

কিন্তু এই মিলনের কাহিনীটি বড়ই করুণ!

শিবপ্রসাদের সঙ্গে গঙ্গামণির বিবাহ—সে তো একটা দৈব। বিবাহ নাও তো হইতে পারিত—না হইবারই তো কথা। কোষ্ঠীর মিলন হয় নাই। কিন্তু কোথা হইতে কি হইয়া গেল। শিবপ্রসাদকে বাল্যসাথী গঙ্গামণির গলায়ই শেষ পর্যন্ত মালা দিতে হইল। বিবাহকালে তাঁহারা কৈশোর ছাড়াইয়া যৌবনেও পদার্পণ করেন নাই।

নববিবাহিত শিবপ্রসাদ আদর করিয়া গঙ্গামণিকে খেলার সাথী "গঙ্গা" নামেই ডাকিতেন। এই ডাকা অবশ্য ছিল নিরালা, নিভৃত, নিশীথে, অতি চুপেচুপে। দেড়শ বছর আগেকার কথা কিনা।

(২)

আমার বাড়ীর সামনে যে বিরাট বোগেনভিলা লতাটি ছাদে উঠিয়া গিয়া ফুলে ফুলে বাড়ীর সামনেটা আলো করিয়া আছে, ওটির একটু জন্ম ইতিহাস আছে। এই বোগেনভিলা লতাটিকে দেখি আর আশ্চর্য হইয়া ভাবি, এই জীবন জিজ্ঞাসার কথা। কাঁহার ইঙ্গিতে, কোথা হইতে কি হইতেছে, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারি না!

ভাল ভায়লেট রংয়ের ফুল দেখিয়া এক বন্ধুর বাড়ী হইতে এই বোগেনভিলার একটি মোটা ডাল কাটিয়া নিজের বাগানে বড় গর্ত্ত করিয়া পুঁতিয়া দিয়াছিলাম। যত্নের ত্রুটি হয় নাই, কিন্তু দিন দিন সব পাতাগুলি শুকাইয়া গেল! ডালটিও! ডালটি তুলিয়া ফেলিয়া দিবার কথা। কিন্তু ফেলিয়া দিব দিব করিয়া শেষ পর্য্যন্ত ফেলিয়া দেওয়া হয় নাই। একদিন বাগান পরিষ্কার করিতেছিলাম। ডালটি তুলিয়া ফেলিতে গিয়া হঠাৎ নজরে পড়িল—ডালটির গায়ে ছোট্ট একটি পাতা বাহির হইয়াছে! তারপর দিনেদিনে গাছটি সতেজ হইতেলাগিল। বর্ত্তমানে সেই বোগেনভিলা লতা ফুলে ফুলে আমার বাড়ীর বাগান আলো করিয়া আছে!

৩

চিন্তা করিতেছিলাম।

দশ বছর-বয়সে-বিয়ে-হওয়া গঙ্গামণির এই বংশবৃক্ষ যে কী অমূল্য দান তা কি তিনি জানিতেন?

জানিতেন না। কেহই জানে না। ঠিকমত জানিতে পারিলে জগতে বিরাট এক জিজ্ঞাসার উত্তর মিলিত

শিবপ্রসাদ ও গঙ্গামণির দুই পুত্র। কনিষ্ঠ পুত্রই আমার প্রপিতামহের পিতামহ।

গঙ্গামণি অতি অল্প বয়সেই অতি অল্প সময়ের ব্যবধানেই এই দুই পুত্রের জন্ম দেন।

কনিষ্ঠ পুত্রের জন্মকালে গঙ্গামণির জীবন আশঙ্কা হয়। তিনি এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। জীবন উৎসর্গ করিয়া কনিষ্ঠ পুত্রের জীবন দান করেন। ধাইমাতা নাকি বলিয়াছিল—"একজনকে মরতেই হবে। হয় মা নয় সন্তান!"

ছেলে বাঁচাইতে গিয়া মায়ের মৃত্যু হয়।

শিবপ্রসাদ নাকি তাঁর আদরের "গঙ্গা"র মৃত্যুর জন্য সন্তানকেই দায়ী করেন এবং ছয় মাস ছেলেকে কোলে পর্য্যন্ত করেন নাই!

অন্নপ্রাশনের দিন ছেলেকে প্রথম কোলে নিয়া আদর করিয়াছিলেন এবং আনন্দ উৎসবে সকলের সামনে অঝোর ঝরে কাঁদিয়াছিলেন! এই ছেলে নাকি দেবশিশুর মত সুন্দর দেখিতে হইয়াছিল। শিবপ্রসাদকে এমনভাবে কাঁদিতে দেখিয়া বোধ হয় ভয়ে শিশুটিও কাঁদিয়া উঠিয়াছিল এবং শিবপ্রসাদের গলা জড়াইয়া ধরিয়াছিল। পরে শিবপ্রসাদ এই মা-হারা পুত্রের জন্য সব কিছু স্বার্থত্যাগ করিয়া প্রাণ দিয়া এই ছেলেকে বড় করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেই সময় সবাই যাহা করিতেন, শিবপ্রসাদ তাহাও করেন নাই—দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহও করেন নাই অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও!

শিবপ্রসাদ ও গঙ্গামণির এই দ্বিতীয়পুত্র ঈশানচন্দ্রই পরে এই বংশবৃক্ষের বিরাট শাখাপ্রশাখা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

মনে মনে প্রশ্ন করিতেছিলাম।

গঙ্গামণি যদি না জন্মাইত, তাঁর সঙ্গে শিবপ্রসাদের বিবাহ যদি না হইত, তাঁহাদের মিলনে পুত্রসন্তান যদি না জন্ম ইত (না জন্মানরই তো কথা কারণ বর্ত্তমান সভ্যতার মাপকাঠিতে গঙ্গামণি যখন মারা যান তখনও তাঁর বয়স বিবাহ উপযোগাই হয় নাই)। কনিষ্ঠ পুত্রের জন্ম দিবার সময় গঙ্গামণি না মরিয়া সন্তানটি যদি মারা যাইত, তাহা হইলে এই বিরাট বংশবৃক্ষ কখনই সম্ভব হইত না।

———

মহাকাব্য

* * *

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

রামায়ণ ও মহাভারত যে কবে রচিত হইয়াছিল তাহার নির্দিষ্ট কোন সন তারিখ জানা যায় না। এই মহাকাব্য দুইটি আকারে বিশাল, উদ্দেশ্যে বিশাল, চরিত্রেও বিশাল। আর এই কাব্য দুখানিতে আমাদের কাহিনী, প্রভুভক্তি,সতীত্ব, স্নেহ, ভ্রাতৃভক্তি, নীতি, ধর্মজ্ঞান, গার্হস্থ্য নীতি, রাষ্ট্রনীতি, চরিত্র, রসসৃষ্টি, ধর্মতত্ত্ব কবিদ্বয়ের তুলিতে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের জীবনের তিন স্তরের প্রভাবও এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। শৈশবে দেখায় স্বপ্ন, যৌবনে দেয় উৎসাহ—আর বার্ধক্যে দেয় শান্তি।

রামায়ণ কেবল দুটো জাতির সংঘাতই নয়, আর্য-অনার্যের বিবরণই নয়, বীররসের কাব্যও নয়, রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি ও পত্নী প্রেম, সুগ্রীব ও বিভীষণের বন্ধু প্রীতি, হনুমানের প্রভুভক্তি, লক্ষ্মণ-ভরতের সৌভ্রাত্র, দশরথের পুত্রস্নেহ, সীতার পাতিব্রত্য এই সব ভারতীয় গার্হস্থ্য চিত্র বড় করিয়া দেখান হইয়াছে, তাই গ্রন্থটি আমাদের এত আদরণীয়।

অপর পক্ষে মহাভারতও কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ নয়, রাজসিক আস্ফালন ও যুদ্ধের জয়োল্লাস বর্ণনাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য নয়—যুধিষ্ঠিরের রাজ্য লাভের সমস্ত উৎসব-আড়ম্বরকে ম্লান করিয়া মহাপ্রস্থানের সুরেই ইহার পরিসমাপ্তি। তাই আমাদের এত প্রিয়।

সংস্কৃত পণ্ডিতেরা কাব্যকে ভাগ করিয়া তাহাদের অলঙ্কারও নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কথা হইল এখন এই গ্রন্থদ্বয় কাব্য না মহাকাব্য? আলঙ্কারিকদের মতে কাব্যকে ভাগ করিলে দাঁড়ায়—

```
                         কাব্য
                           |
( অভিনয়োপযোগী ) দৃশ্য।  শ্রব্য (অভিনয়োপযোগী নয়)।
                                |
            ------------------------------------
            |                   |              |
         পদ্যময়,            গদ্যময়,        মিশ্রকাব্য
            |
   ---------------------------
   |                         |
মহাকাব্য।                খণ্ডকাব্য।
```
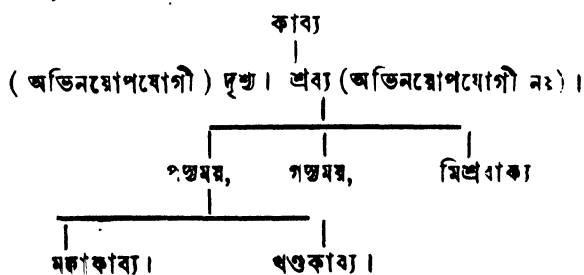
তাহলে কাব্যের দুটি ভাগ দৃশ্য, শ্রব্য। আবার শ্রব্যের তিনটি ভাগ পদ্যময়, গদ্যময় ও মিশ্রকাব্য। পরিশেষে পদ্যময় কাব্যের দুইটি ভাগ মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্য। রামায়ণ ও মহাভারত এই মহাকাব্য শ্রেণী ভুক্ত। আলংকারিকদের মতে কতদূর এই গ্রন্থদ্বয় মহাকাব্য নামে সার্থক তা বিচার করিয়া দেখা যাউক।

প্রথমতঃ আলংকারিকেরা বলিয়াছেন—মহাকাব্যের নায়ক ধীর ও উদার, দেবতা কিম্বা সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয় হইবে।

দ্বিতীয়তঃ মহাকাব্য হয় আশীর্বাণী বা দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণতিজ্ঞাপক শ্লোক দিয়া আরম্ভ হইবে।

তৃতীয়তঃ আলংকারিকেরা কতকগুলি বিষয়ও নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে মহাকাব্য—নগর, পর্বত, সমুদ্র, ঋতু, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, চন্দ্রোদয়, চন্দ্রাস্ত, জলকেলি, উদ্যান, মদ্যপান, সম্ভোগ, বিবাহবিচ্ছেদ, কুমারোৎপত্তি, মন্ত্রণা, দূতপ্রেরণ, যুদ্ধ যাত্রা, বীরত্ব, নায়কের উন্নতি এবং আরো অনেক কিছু।

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় নিয়ম অনুসারে রামায়ণ ও মহাভারতকে মহাকাব্য না বলিলে উপায় নাই। গ্রন্থদ্বয় যথার্থই মহাকাব্য।

রামায়ণ ও মহাভারত ছাড়া আরও কতকগুলি কাব্য আছে যাহাদের রচনার মহত্ত্ব ও চমৎকারিত্বের জন্য মহাকাব্য বলা হইয়া থাকে কিন্তু ইহা কতদূর ন্যায়সঙ্গত তাহাই বিচার সাপেক্ষ।

বুদ্ধচরিত, কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, কিরাতার্জুনীয়কে যদি মহাকাব্য বলিতে হয় তাহা হইলে রামায়ণ, মহাভারতের গৌরবহানি হয়, কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই গৌরব হানি করিয়াই এখনও উপরোক্ত গ্রন্থগুলিকে স্থানে স্থানে মহাকাব্য বলা হইয়া থাকে।

বুদ্ধ চরিত অশ্বঘোষ রচিত। বৈরাগ্য সঞ্চারের দ্বারা সংসারের অসারত্ব প্রমাণই ইহার লক্ষ্য। ইহাতে ২২টি সর্গ। কাব্যরস থাকিলেও, আলংকারিকদের নির্দেশিত

নিয়মাবলি মানিলেও ইহাকে মহাকাব্যের স্থলাভিষিক্ত করা চলে না। রামায়ণ মহাভারত যে স্তরের কাব্য ইহা সে স্তরের নয়।

যাহা চিরকালের সত্য, শাশ্বত, তাহাই কুমার সম্ভব। অতুল রূপ লাবণ্য লইয়া নারী তাহার প্রিয় জনের চিত্তজয় করিতে পারে নাই অর্থাৎ প্রিয় জনের মন একমাত্র তপস্যা ও ত্যাগের দ্বারাই জয় করা যায়। মহৎ ঐতিহ্য, আদর্শ-বাহী হইলেও, কাব্য রসের জারক রসে মিশ্রিত হইলেও আলংকারিকদের নির্দ্দেশমত হিমালয়, পর্ব্বত, ঋতু বর্ণনা, বিবাহ থাকিলেও ইহাকে রামায়ণ মহাভারতের পার্শ্বে বসান হয় না।

রঘুবংশ কাব্যে রঘুরাজাদের শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য সম্পর্কে আলোচিত হইলেও, রাজাদের গুন প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা থাকিলেও অর্থদানের জন্য অর্থ সংগ্রহ, ফললাভের জন্য রাজ্যজয়, সন্তানলাভের জন্য বিবাহ, প্রভৃতি থাকিলেও ইহাকে মহাকাব্যের শ্রেণীভুক্ত করা হয় না। এই কাব্য পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের বন্দনা দিয়া আরম্ভ। যুদ্ধযাত্রা, সন্তানজন্ম ইহাতে দৃষ্ট হয়।

'কিরাতার্জুনীয়' কবি ভারবি কর্ত্তৃক রচিত। ইহা মহাভারতের বনপর্ব হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাই আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

নরনারীর জীবনের হাসি-অশ্রু, প্রেম-করুণা প্রভৃতি মনুষ্যচিত্তের সনাতন চিত্তপ্রবৃত্তিগুলিকে আশ্রয় করিয়া ইহাদের বর্ণনা চলিয়াছে, আর স্তরে স্তরে সমুজ্জল হইয়া উঠিয়াছে মনুষ্যত্বের নারীত্বের বিচিত্র মহিমা। মানব কল্পনায় যাহা কিছু মহান ও পবিত্র, তাহাই দেখি রামায়ণ ও মহাভারতে। একখানি ক্ষমা, শান্তি, প্রেম, ত্যাগ ও সত্যের মহিমায় সার্থক; আর একখানি বীরত্ব, কর্ম ও বৈরাগ্যের প্রভায় সমুজ্জল।

সতী-সাবিত্রী-দময়ন্তীর কাহিনী আমাদের মহিলা-সমাজের সম্মুখে প্রেম ও ত্যাগের আদর্শ ধরিয়াছে। হনুমানের প্রভুভক্তি, যুধিষ্ঠিরের ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যবাদিতা আমাদের নীতি শিক্ষা দান করে। শৈব্যার স্বামীর মান রক্ষার্থে নিজকে বিক্রয়, হরিশ্চন্দ্রের দান করিতে করিতে পুত্র বিক্রয়, কর্ণের সত্যরক্ষার জন্য নিজহস্তে পুত্রের শিরশ্চেদনের উপক্রম, ভীষ্মের পিতৃ সুখের জন্য চির-কৌমার্যব্রত গ্রহণ, রামচন্দ্রের পিতৃসত্য পালনার্থে হাসিমুখে রাজ্যত্যাগ ও বনে গমন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুপস্থিতিতে তাঁহার পাদুকা সিংহাসনে স্থাপন ও প্রতিনিধি স্বরূপ ভরতের রাজ্য শাসন আমাদের শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত সমাজের গার্হস্থ্য জীবনের চিরশিক্ষার বস্তু।

অপরদিকে দ্রৌপদীর শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ, কুন্তীর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, গান্ধারীর ন্যায়পরায়ণতা, অহল্যার পাষাণী জীবনের নীরব সাধনা আমাদের সমাজকে উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত করে। ভীমের শারীরিক বল, আমাদের শরীর চর্চার উৎসাহ দেয়। বিদুরের ধর্মপ্রাণতা প্রশান্তি ও সৌম্য, দানে শান্ত জীবনের পথ দেখায়। এক-লব্যের গুরুভক্তি আমাদের বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করে। শকুনি মামা শেখায় আমাদের কূটনীতি।

ঠিক তেমনি বিপরীত দিকে 'বিভীষণ,' 'কুম্ভকর্ণ,' 'কীচক' প্রভৃতি আমাদের জাতি শত্রু, অধিক আহার, অধিক নিদ্রা, ও অতি দুষ্ট লোকের কথাই মনে করাইয়া দিয়া জীবনের চলার পথে সুনির্দ্দিষ্ট মান বজায় রাখিতে সতর্ক করিয়া দেয়।

তাই রামায়ণ মহাভরতকে ভারতের জাহ্নবী ও যমুনার ধারার সহিত তুলনা করা হয়। যুগ যুগ ধরিয়া এই দুই ধারা বহিয়া আসিতেছে। সুদূরে কোন্ অভ্রভেদী হিমা-লয় হইতে যেন নির্গত হইয়া অচঞ্চল আনন্দের ধ্যান-ধারণা তপস্যার মহাসমুদ্রে এই দুই ধারার মিলন হইয়াছে। ইহাদের তরঙ্গে তরঙ্গে কত বৈচিত্র্য কত কর্ম উদ্দীপনা, কত প্রশান্তি ও ভাবের অপূর্ব বিলাস। তাই কাব্য জগতের প্রথম অরুণোদয়ে এই দুই মহাকাব্য মহারাগিণীর তান ধরিয়া মানুষের অন্তরজগতে, ভারতবর্ষের হৃৎপিণ্ডে যুগ যুগ ধরিয়া স্পন্দিত হইতেছে ও হইবে।

ঝড়ের রাতে [নাটক]

* * * *

সুখেন্দু চক্রবর্তী

প্রথম দৃশ্য

[ছোট্ট একটি ঘর। ঘরের মাঝখানে একটি টেবিল। তার পাশে দু'খানা চেয়ার। টেবিলের উপর এলোমেলো ভাবে কিছু বই পত্র ছড়ানো। কল্যাণ রায় একজন নাট্যকার, টেবিলল্যাম্পের আলোয় চেয়ারে বসে টেবিলে একমনে কাগজের উপর কি যেন লিখছে। রাত গভীর]

কল্যাণ। কে? কে ডাকছে? (তারপর অডিটরিয়ামের দিকে তাকিয়ে শ্রোতাদের উদ্দেশ্য করে) ওঃ আপনারা! আপনারা সবাই এখানে উপস্থিত হয়েছেন— নাটক শুনবেন বলে, দেখবেন বলে—কিন্তু আমার হাতে তো ভাল নাটক নেই। সত্যিকারের নাটক, যে নাটক দেখলে এবং শুনলে আমরা পরস্পরকে চিনতে পারবো, জানতে পারবো। মানুষকে ভালবাসতে পারবো সে নাটক আমার কাছে নেই। পৃথিবীর পথে ক্লান্ত—রক্তাক্ত মানুষের হৃদয় আমার কলমের রেখায় ফুটিয়ে তুলতে পারিনি, মানুষের বাঁচবার সংগ্রামের কথা, মানুষের জেহাদ এবং ফরিয়াদের কথা, মনুষ্যত্বের অবমাননার কথা, পাপ, ক্লেদ, ঘৃণা পৃথিবীর উদ্ধত অহংকারী মানুষের পাশবিক বর্বরতার কথা;—আমি লিখতে পারিনি।

মানুষ যেখানে জিঘাংসার পৈশাচিক উল্লাসে নিপীড়িত অসহায় মানুষের রক্ত নিয়ে হোলি খেলে সে ছবি আমি সত্যিসত্যিই কখনও আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারিনি। পারিনি দরিদ্র, বুভুক্ষায় তিলে তিলে ক্ষয়ে-যাওয়া মানুষের জমাট বাঁধা কান্না, শুদ্ধ যন্ত্রণা, আপনাদের সকলের বুকের কাছে তুলে দিতে। আমি কল্যাণ রায় আপনাদের সাথে কথা বলছি।

দেখুন অনেকদিন ধরে ভেবে আসছি—কিছু লিখবো। মানুষের সুখ দুঃখের কথা, হাসি কান্নার কথা, অশ্রু বেদনার ঢেউ মানুষের মনের দ্বারে পৌছে দেবো; মনেও যেমন রয়েছে আমার মনেও বহুদিন ধরে জমায়েত হয়ে আছে। আমার অক্ষমতা রয়েছে, আমি স্বীকার করছি। কিন্তু আমি তো সত্যিকারের নাটক লিখতে চাই। সত্যিকারের নাটক আজও খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপনাদের বুকের ভিতর ঘুমিয়ে রয়েছে যে নাটক, আপনার আমার সকলের জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে লুকিয়ে রয়েছে যে নাটক; সেই নাটকই আমি লিখতে চাই। আমি জানি—আজ প্রত্যেকটি মানুষের বুকের ভিতর এক একটি শক্তি শেল বিদ্ধ হয়ে আছে, তাই বিশল্যকরণী আমি খুঁজেই চলেছি, কিন্তু তা এখনও আমার হাতের মুঠোয় আমি পাইনি। আপনারাই বলুন—বলুন। আমার হাতে বিশল্যকরণী না থাকলে আমি কি করে সবার কাছে যাই? কি করে সবার কাছে যাই? কি করে নাটক লিখি? সত্যিকারের নাটক!

(এমন সময় ষ্টেজের বাইরে অডিটরিয়ামের এককোণে একটি জটলার সৃষ্টি হয়। অর্ধবিকৃত মস্তিষ্ক একটি লোক এবং আরেকটি মত্তপের মধ্যে তুমুল কথা কাটাকাটি এবং ঝগড়া শুরু হয়। একজন বলতে থাকে—না, আমার কথাই শোনাবো। উনি আমার কথাই লিখবেন। আরেকজন বলতে থাকে—না, না, আমার জীবনের কথাই আজ কল্যাণবাবুকে শোনাবো। আপনি আরেকদিন শোনাবেন। প্রথমজন বলে—না—না, সে হয় না আমার জীবনের কথাটা শোনানো ভীষণ প্রয়োজন। দু'জনে ঝগড়া করতে করতে ক্রমে ডায়াসের কাছে এগিয়ে আসে লিখুন, আমার কথা লিখুন—না, না, সে হয়না। আমার জীবনের কথাই লিখুন কল্যাণবাবু। একসময় হাতাহাতি করতে করতে দুজনেই ষ্টেজের উপর উঠে পড়ে।)

শংকর (মত্তপটি)। আমি আজ সাত বছর ধরে একটা কান্নাকে বুকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কিন্তু সে [illegible] চাইনি আজও কাউকে

শোনাতে পারিনি। আমার বুকের ভেতরটা জলে পুড়ে খাক্ হয়ে গেছে। আজ আমাকে বলতে দিন—

কমলেশ। (কিছুটা মস্তিষ্ক বিকৃত) কান্না নেই, অশ্রু নেই,—No tears. Blood হ্যাঁ, হ্যাঁ, রক্ত। চোখ ফেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। আমি তৃষ্ণার্ত। I mean thirsty, কিন্তু একফোঁটা, একফোঁটা, জল নেই কোথাও। মেঘ নেই। No—ওয়েসিস, No, হাঃ হাঃ হাঃ—I'ts a clean desert সাহারা,—বুকের ভেতরটা সাহারা। হাঃ হাঃ হাঃ—

কল্যাণ। আপনাদের আমি চিনি না, জানিনা, আপনারা কি বলতে চাইছেন তা'ও বুঝতে পারছিনা। আমার ঘরের ভিতর ঢুকে এ আপনারা কি করছেন?

শংকর। কি করছি? অ্যাঁ, হাঃ হাঃ হাঃ। ওই যে আপনি বললেন লিখবেন—নাটক লিখবেন, সত্যিকারের নাটক। তাই আমার কথা লিখুন, কাজলের কথা, আমার কাজলের কথা। আমার আশা, আকাঙ্ক্ষা, আমার স্বপ্ন কেমন করে গুড়িয়ে গেল? কেমন করে আমার ঘর ভেসে গেল। কেমন করে আমার কাজল হারিয়ে গেল (কান্নায় ভেঙে পড়ে) সেকথা লিখুন—লিখুন।

কমলেশ। কাজল! হ্যাঁ-হ্যাঁ, কাজল—আমিও তো তার কথাই বলতাম। আমি তো আর কিছুই তার কাছে চাইনি। শুধু একটু ভালবাসা চেয়েছিলাম। ভালবাসা? হাঃ হাঃ হাঃ—Tears! No. Not a single drop. সমস্ত আকাশে এক ফোঁটা জল নেই। হাঃ হাঃ হাঃ এক-দুই-তিন-চার; চোখের কোণ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। টস্, টস্, টস্—

(শঙ্কর হঠাৎ চমকে উঠে কমলেশকে নিরীক্ষণ করে)

শঙ্কর। কমলেশকে আপনি চেনেন?—জানেন? কোথায় দেখেছেন?—কবে?

(খপ্ করে কমলেশের হাতটা ধরে ফেলে কিন্তু কমলেশ এক ঝটকায় তা ছাড়িয়ে নেয়)

কমলেশ, তুমি!—শয়তান—Traitor. হাঃ হাঃ হাঃ সাতবছর,—সাতবছর ধরে আমি পথে পথে তোমার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছি। পালাবার চেষ্টা করোনা। You Traitor—শয়তান।

(শঙ্কর হঠাৎ কোমর থেকে একটা ছোরা বার করে দ্রুত ছুটে গিয়ে কমলেশের পেটে বসিয়ে দেয়, কল্যাণ বাধা দিয়েও শঙ্করকে থামাতে পারে না। কমলেশ রক্তাক্ত অবস্থায় ছট্‌ফট করতে থাকে—উঃ—আঃ—কল্যাণ কখনও স্তম্ভিত কখনও বা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, আবার ফিরে আসে আবার কখনও হাটু গেড়ে কমলেশকে লক্ষ্য করে।)

কল্যাণ। কি করলেন? এখন আমি কি করি? কোথায় যাই? কি করি? (ভীষণ ব্যস্ত)

শঙ্কর। প্রতিশোধ! I mean revenge. হাঃ হাঃ হাঃ (একসময় রক্ত মাখা ছোরাটা কমলেশের পেট থেকে তুলে নেয় শঙ্কর) রক্ত! রক্ত—I mean blood লাল কতটা লাল। এর থেকে অনেক বেশি তাজা, অনেক বেশি লাল ছিল কাজলের রক্ত। হাঃ হাঃ হাঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, পাখি। কোমল রঙীন একটি পাখিই বলবো কাজলকে। —একটা ঝড়ে উড়ে আসা পাখি কিন্তু কেমন করে—একদিন তার বুকের স্পন্দন চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কেন পৃথিবীর আলো তার চোখ থেকে জোর করে ছিনিয়ে নেওয়া হলো?

কে তাকে চিরদিনের জন্য এই পৃথিবীর হাসি, গান, আনন্দ থেকে বঞ্চিত করেছিল? আপনারা তাকে চেনেন না। জানেন না। আমি না বললে কোনদিন জানতে পারবেন না (একসময়ে রক্তমাখা ছোরাটা ঘরের মেঝেতে শঙ্কর ছুড়ে ফেলে দেয়)

কল্যাণ। What am I to do?—am I to do? কি করলেন? কি করি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। (ভীষণ ব্যস্ততা)

শঙ্কর। বুঝতে আপনাকে কিছুই হবে না। হাঃ হাঃ হাঃ লিখুন—লিখুন। সময় বেশী নাই। আমাকে এক্ষুনি থানায় গিয়ে "সারেণ্ডার" করতে হবে। আর একটু বাদেই ভোর হবে, পাখি ডাকবে, পাখি?

দিনের আলোয় সবকিছু ফ্যাকাশে হয়ে যাবে। কমলেশ ব্যানার্জীর বুকের রক্ত এক্ষুনি জমাট বেঁধে যাবে। তাজা লাল, তাজা খুন—কালো হয়ে যাবে? মাছি উড়ে এসে বসবে; Don't delay. Don't wast your time.

আপনারা সবাই দেখছেন একটা লোক—অর্থাৎ আমি

শঙ্কর মুখার্জি—এই মুহূর্তে নিজে হাতে কমলেশ ব্যানার্জীকে খুন করলাম।

হ্যাঁ আমি খুনী। জীবনে এইটাই আমার প্রথম এবং শেষ খুন। আর কাউকে খুন করার আমার প্রয়োজন নেই। সাত বছর ধরে একটা ধারালো অস্ত্র নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম শুধু—শুধু একটি মানুষের জন্য।

আমার সাজানো ঘর কেমন করে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিলো আমার বুক থেকে কেমন করে কাজল হারিয়ে গিয়েছিলো! সে কথা আপনাদের শোনাবো—আপনারা আসুন আমার সাথে, ভয় নেই। আপনাদের সব দেখাবো।

আমি হ্যাঁ, হ্যাঁ, শঙ্কর মুখার্জী তখন কলকাতার কোন এক বস্তিতে ছোট্ট একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকি। আর University-তে M. A. পড়ি টিউশনি করে সব খরচ চালাতে হয়।

(কথা বলতে বলতে পিছু হাটতে থাকে শঙ্কর আর কল্যাণ এসে চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর কাগজে খস্ খস্ করে লিখতে থাকে)

কমলেশ আমার সহপাঠী ছিল। পরিচয় University-র ক্লাশেই। বন্ধুত্ব!—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বন্ধুত্ব, প্রগাঢ় ভালবাসা দুজনার মধ্যে ছিল। সেখানে কোন ফঁাক ছিল না, সংশয় ছিল না, দ্বিধা ছিল না। তবুও কেন? But for what? আমার সাজানো ঘর ভেঙে গুড়িয়ে গেল। আমার কাজললতা; আমার কাজল; আমার বুক থেকে অকালে চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেল (কান্নায় ভেঙে পড়ে) সেকথা আপনাদের শোনাবো; আসুন—ভয় নেই —ধীরে—ধীরে—পা ফেলে আমার পেছন পেছন আসুন,—

[ষ্টেজে অন্ধকার নেমে আসে এবং ধীরে ধীরে পর্দা নামে]

—: দ্বিতীয় দৃশ্য :—

[বস্তীর জীর্ণ একখানি ঘর। ঘরের একপাশে একটি আপনাদে... তার ওপর কম্বল দিয়ে একপাশে অপরিচ্ছন্ন দেখুন অ...লিশ জড়ানো রয়েছে। পেছনে একটি লিখবো। মানু...নো সেখানে কিছু জামা কাপড়, ছাতা অশ্রু বেদনার ঢেউ এককোণে একটি কুঁজো, তারওপর একটি কাঁচের গ্লাশ। ঘরের আরেকপাশে একটি টেবিল। তার ওপর স্তূপীকৃত বইয়ের সম্ভার। হ্যারিকেনের মৃদু আলোয় শঙ্কর একটি চেয়ারে বসে মনোযোগ সহকারে গ্রন্থে কিছু লিখছিল। তারপর জোর গলায় পড়তে থাকে। রাত গভীর]

শঙ্কর: (পড়তে থাকে) কবিতার মুক্তি অলৌকিকে, রহস্যে স্বপ্নের মত আপাত যুক্তিহীনতায়। সুররিয়ালিস্টরা এইজন্য আক্রমণ করেছিলেন ধর্মকে (খৃষ্টধর্ম)—নিৎসের ঈশ্বরের মৃত্যুও ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিলেন—কারণ ঈশ্বরের মৃত্যু মানতে হলে ঈশ্বরের অস্তিত্বও মানতে হয়, নচেৎ যা ছিল না তার মৃত্যু হয় কি করে, খৃষ্টধর্মে অলৌকিক বা রহস্যের স্থান নেই, যেমন অডেন "হোমেজ টু ক্লিয়ো" কবিতায় লিখেছেন:

A Christian ought to write in prose for poetry is Magic......

(যন্ত্রসংগীতের সাহায্যে ঝড়ের আভাস ফুটিয়ে তুলতে হবে এবং আলোর সাহায্যে বিদ্যুৎ চমক দেখাতে পারলে ভাল হয়)

(স্বগতোক্তি) ঝড় উঠলো দেখছি, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসি, কে? কে এখানে? এইভাবে এতরাত্রে অন্ধকারে এখানে বসে আছেন কে?

কাজল। আমি একটু আশ্রয় চাই। আজ রাত্রের মতো শুধু আমায় একটু থাকতে দিন। আমায় একটু আশ্রয় দিন।

শঙ্কর। আপনি কে? কোথা থেকে এসেছেন? কিছুই তো আমি জানি না! কি করে আপনাকে থাকতে দিই। অ্যাঁ—বড় মুশকিলে ফেললেন দেখছি, কি করি? ঝড় উঠেছে, ভীষণ ঝড়। যান, যান ভেতরে যান। আর বাইরে দাঁড়াবেন না, ঘরের ভেতরে যান।

কাজল। উঃ কি ভীষণ ঝড় উঠেছে।

(শঙ্কর ঘরের নরবড়ে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। কাজল, ভীত, ত্রস্ত, শঙ্কিত দৃষ্টি নিয়ে তার প্যাটরা স্যুটকেসটা ঘরের এককোণে রেখে দিয়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। শঙ্কর নিজের পড়ার টেবিলে যায়। বইয়ের পাতায় দু'একটা লাইনে চোখ বুলিয়ে নিয়ে

আবার উঠে পড়ে)

শঙ্কর। কি নাম আপনার ?

(কাজল প্রথমে কোন উত্তর দেয় না। শুধু একদৃষ্টে শঙ্করকে দেখতে থাকে।)

নামটা কি বলুন ? চুপ করে রইলেন কেন ?

কাজল। কাজললতা দাশ।

শঙ্কর। হুঁ—তা থাকা হয় কোথায় ? এখানে এই অবস্থায় এতরাত্রে বসেই বা ছিলেন কেন ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। দয়া করে সব কিছু খুলে যদি একটু বলেন তবে এই হতভাগ্য ধন্য হয়।

কাজল। সে অনেক কথা। আপনি শুনবেন ? শুনেই বা কি লাভ ? একটি সাধারণ, অতি সাধারণ—একটি মেয়ের দুঃখের কথা, তার সব স্বপ্ন হারিয়ে যাওয়ার কথা শুনেই বা কি লাভ ?

শঙ্কর। লাভ লোকসান কিছু বুঝি না। হয়তো আপনার জন্য কিছু করতে পারবো কিনা তাও জানি না।

তবে এটা আন্দাজ করতে পারছি—আপনি কোন একটা—ভীষণ বিপদে পড়েছেন, তা না হ'লে এতরাত্রে অচেনা জায়গায় অপরিচিত একটা লোকের ঘরে কেউ আশ্রয় চায় ?

(ঝড়ের শন্‌শন শব্দ শোনা যায়। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকায়।)

কাজল। হ্যাঁ, আশ্রয়ই চেয়েছিলাম একটু। কিন্তু এতবড় পৃথিবীতে আমার এতটুকু থাকবার জায়গা মিললো না। মানুষের গড়া পৃথিবী এত রুক্ষ, এত হৃদয়হীন তা আমার জানা ছিল না। আমার জন্য কোথাও একটু স্নেহ, মায়া, ভালবাসা নেই। আমাকে করুণা করছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ অনেকে আমাকে করুণা করতে চেয়েছে। কিন্তু মানুষের করুণা নিয়ে বুকে ঘৃণা নিয়ে আমি বাঁচতে চাইনি। যখন ছোট ছিলাম পৃথিবীকে কত সুন্দর মনে হতো; আশ্চর্য মনে হতো। কিন্তু হাসি গান আহ্লাদ একে একে কেমন করে যেন আমার জীবন থেকে নিঃশেষ গেল। কেমন যেন আমার ধীরে ধীরে কেবলই মনে হতে লাগলো আমার দু'পাশে শুধু অন্ধকার। যেন একটা রুক্ষ ধূসর মরুভূমির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছি একেবারে অসহায় একা। তবুও বাঁচতে হবে। সংগ্রাম করে বাঁচতে হবে। সংগ্রাম আমি করতে চেয়েছিলাম কিন্তু প্রবঞ্চনা, শঠতা, মিথ্যে অভিনয়। শুধু একটি মানুষ, যাকে আমি শ্রদ্ধা করতাম, বিশ্বাস করতাম, হ্যাঁ সুকেশ রায় আমার জীবনকে ভেঙে দিয়েছে, গুড়িয়ে দিয়েছে।

কাজল। আমার পায়ের তলায় আজ আর কোন মাটি নেই। মিথ্যে, মিথ্যে, সব মিথ্যে হয়ে গেছে,—

শঙ্কর। থামবেন না বলুন,—কে এই সুকেশ যার জন্য গোটা পৃথিবী আজ আপনার কাছে মিথ্যে হয়ে গেছে ? কোথাও সত্যি বলে কিছু নেই, বিশ্বাস বলে কিছু নেই ?

কাজল। আমার বাড়ী ছিল ফরাসডাঙ্গায়। সংসারে থাকবার মধ্যে আমি আর বাবা। মাকে খুব ছোটবেলায় দেখেছি। তার মুখটা আবছায়া হয়ে এসেছে ঠিক মনে পড়ে না। বাবার মুখেই শুনেছি আমি যখন খুব ছোট তখন গ্রামে একবার ভীষণ কলেরা লাগলো। মা কলেরা রোগেই সেবার মারা গেলেন। বাবা শতচেষ্টা করেও তাকে বাঁচাতে পারেননি: গ্রামে আমাদের ছোট্ট গরীবের সংসার। সামান্য কিছু জমি ছিল। বাড়ীর সামনে একটা ছোট পুকুরও ছিল। বাবা জমিতে লাঙল দিয়ে নিজেই ফসল ফলাতেন। তাই অতিকষ্টে দুটো পেট আর সংসারের অন্যান্য খরচা কোনমতে চলে যেত। বাবার আশাটা চিরদিনই খুব বড় ছিল। বলতেন, কাজল আমি তোকে ইস্কুলে ভর্তি করে দেবো, মন দিয়ে পড়াশোনা কর। তোকে বড় হতে হবে। এত কষ্ট অভাবের ভেতর দিয়ে আমি পড়াশুনা করেছি। মাইনর স্কুলের পড়াশুনা শেষ করেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে যে কি হয়ে গেল ! সব ওলট পালট হয়ে গেল।

আমার আশা, আকাঙ্ক্ষা একরাত্রে সবভেসে গেল, হারিয়ে গেল।

শঙ্কর। (স্বগতোক্তি) আশা আকাঙ্ক্ষা সব ভেসে গেল, কেন ? (প্রকাশ্যে)কেমন করে ভেসে গেল ? আপনার বাবা—

কাজল। না, বাবা আজ আর বেঁচে নেই। সেদিন সন্ধ্যের আগে এমনি এক ঝড় উঠেছিল। ঝড়—আর তার সাথে ভীষণ বৃষ্টি। চাষের মরশুম ছিল, বাবা ক্ষেতে কাজ করছিলেন।

শঙ্কর। তারপর ?

কাজল। একটু ঝড়জলকে যেমন চাষীরা গ্রাহ্য করে না, বাবাও সেদিন আন্দাজ করতে পারেননি যে ফরাসডাঙ্গার উপর দিয়ে সেদিন এতবড় একটা ঝড় বয়ে যাবে। বাবা সেদিন বাড়ী ফিরে আসতে পারেন নি। বজ্রাঘাতে চকের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়েছিলো। ক্ষেত থেকে ছুটতে ছুটতে একটা চক পেরিয়ে বাবা বাড়ীর দিকে আসছিলেন। কিন্তু ঝড় তাকে আমার কাছ থেকে চিরদিনের জন্য ছিনিয়ে নিয়ে গেল। তারপর একটা বিরাট প্লাবনে যেন একটা কুটোর মত ভেসে চললাম।

শঙ্কর। আপনাকে বড় ক্লান্ত লাগছে। আপনি বরং এই চেয়ারটায় বসুন। আর খাওয়া দাওয়া কিছু হয়েছে ? না বোধহয়। কি'ইবা আপনাকে খেতে দি ! (স্বগতোক্তি) রাত প্রায় দুটো বাজে। ঝড় বাদলায় এতরাত্রে কোন দোকানও তো খোলা নেই। দেখি টিনের কৌটোটায় সামান্য কিছু মুড়ি থাকে যদি—(শঙ্কর একটা টিনের কৌটো খুলে খানিকটা দেখে নিয়ে কাজলের সামনে এগিয়ে যায়।)

এই নিন্ ধরুন। অল্প কিছু মুড়ি আছে। এটা খেয়ে জল খেয়ে নিন। আমার ঘরে তো আর কোন খাবার নেই। তাছাড়া আমি নিজেই হোটেলে খাওয়াদাওয়া করি। আর এতরাত্রে কোন দোকানও তো খোলা নেই—

(শঙ্কর একটা গ্লাসে কুঁজো থেকে জল ঢেলে কাজলের কাছে রাখে।) ক্ষুধার্ত কাজল মুড়িগুলো খেয়ে ঢক্ ঢক্ করে খানিকটা জলপান করে। আর মাঝে মাঝে শঙ্করকে লক্ষ্য করতে থাকে।)

কাজল। আমার এক কাকা ছিলেন, আপন কাকা। আমাদের সাথে তার সম্পর্কটা খুব ভাল ছিল না। নিজে বড়লোক বলে আমাদের তাচ্ছিল্য করতেন। বাবার মৃত্যুর পর কাকা এসে আমার পেছনে দাঁড়ালেন। অনেক আশা ভরসা দিলেন। তাই গাঁয়ের লোকেরা অর্থাৎ যারা আমাকে ভালবাসতো তারাও কিছুটা নিশ্চিন্ত হলো। আমাদের জমিতে কাকার অংশ ছিল সেটা জানতাম। কিন্তু তখন আমার বয়সই বা কত ? বেশ কিছুদিন ভালভাবেই কেটে গেল কাকার ছায়াতে। তারপর একদিন কি সব কাগজ পত্রে আমাকে সই করিয়ে নিলেন। তখন কিন্তু কাকা আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহারই করতেন। হঠাৎ একদিন শুনলাম কাকা আমাদের জমি, বাড়ী, পুকুর, সব অন্য একটি লোকের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। সেদিন তিনি একবারও ভাবলেন না আমার মতো একটা অল্প বয়সের মেয়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, কি করে বেঁচে থাকবে। এই প্রথম একটা আঘাতে মানুষের ওপর বিশ্বাস আমার ভেঙ্গে গেল।

শঙ্কর। আশ্চর্য! তারপর আপনি কি কাকার আশ্রয়ে গিয়ে উঠেছিলেন ?

কাজল। হ্যাঁ, কাকার পায়ে ধরে কেঁদে বলেছিলাম —এ কি করলেন কাকা ? আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো ? কি করে বাঁচবো ? বাবা বেঁচে নেই আপনিই তো এখন আমার সবকিছু। সেদিন কাকার মনে এতটুকুও করুণার উদ্রেক হলো না। মনে হলো তিনি একটা নিষ্ঠুর পাষাণ। কাকা হেসে বললেন—আমি যা ঠিক বুঝেছি তাই করেছি। শরীর আছে মেহনত করে খাও। ঝিগিরি কর গিয়ে। হিল্লে তোমার হয়ে যাবে—বলে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন।

আর বললেন যাও যাও আর ঢঙ করো না। আর এবাড়ীর মুখো হলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। যেদিকে চোখ যায়—চলে যাও।

শঙ্কর। (স্বগতোক্তি) বারে সংসার! চলে যাও, যেদিকে খুশি চলে যাও! অসহায় মানুষকে বঞ্চনা! বাঃ চমৎকার !

আপনাকে তো চলে যেতে বললো, পথ দেখতে বললো ; আপনি তখন কোথায় গেলেন ?

কাজল। কোথায় আর যাবো ? মাসখানেকের ভেতর বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে নতুন মালিকের কাছ থেকে পরোয়ানা এসেছে। শূন্যকে অবলম্বন করে কোথায় যাবো ? কোথায় দাঁড়াবো ?

তখন আমার চারদিকে শুধু অন্ধকার আর হতাশা। এরই মধ্যে গ্রামের একমাসিমা বহুদিন পর কোলকাতা থেকে ফরাসডাঙ্গায় এসেছেন। আমি তাকে ছোটবেলায় বিনুমাসি বলে ডাকতাম। তিনি হঠাৎ এসে আমার খোঁজখবর নিলেন। খানিকটা চোখের জল

ফেললেন আমার দুঃখ দেখে। তারপর বললেন তুই চল কাজলা আমার সাথে কোলকাতায় চল। গ্রামে থেকে তোর আর কি লাভ? আমার ওখানে একটা কাজকর্মের বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। বিনুমাসী কোলকাতায় কোথায় থাকে; কেমন তার অবস্থা কিছুই জানিনা। কারণ সে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে অনেক বছর হলো। সেই—প্রথম বিনুমাসির হাত ধরে গ্রাম ছেড়ে কোলকাতায় চলে এলাম। অন্ধকার—চারদিকে শুধু অন্ধকার আর হতাশা। সেদিন স্থির হয়ে আর কিছু ভাবতে পারিনি। চোখের সামনে কোন আলো নেই, আশা নেই, নিজের জীবনের ওপর কেমন যেন একটা ঘেন্না ধরে গিয়েছিল।

শঙ্কর। কেন? বিনুমাসিও কি আপনাকে নিরাশ করেছিল? না, আপনাকে মিথ্যে আশ্বাস দিয়েছিল?

কাজল। আমাকে কোলকাতায় নিয়ে আসার পেছনে তার অন্য একটা উদ্দেশ্য ছিল। সেদিন অবশ্য গ্রাম ছেড়ে চলে আসবার সময় আমি সেটা বুঝিনি। অর্থাৎ তিনি বুঝতে দেননি আমাকে। তিনি স্নেহ, ভালবাসা, আদরের নিখুঁত অভিনয় করেছিলেন সেদিন। পৃথিবীতে যে এত মেকি মানুষের ভীড় তা আমার জানা ছিল না। মাঝে মাঝে মনে হতো আমার জীবনটাই হয়তো অভিশপ্ত। সেখানে সৌন্দর্য্য নেই, প্রেম, প্রীতি স্নেহ ভালবাসা কিছুই নেই।

(শঙ্কর টেবিল ঘড়ির দিকে তাকায়)

শঙ্কর। রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ঝড়ের বেগও দেখছি কমেছে। আপনার শরীরও খুব ক্লান্ত। তাই যদি আপত্তি না থাকে আমার খাটটার ওপর শুয়ে একটু বিশ্রাম করতে পারেন। আমি ভেতরে ছোট্ট বারান্দাটায় এখনকার মতো আশ্রয় করে নি।

(শঙ্কর নিজের বিছানাটা ভালোকরে পেতে দেয় তারপর একটা সতরঞ্চি হাতে নেয়।)

নিন্, বিছানা পেতে দিয়েছি শুয়ে পড়ুন। ভয় নেই আমি ভেতরের দিকে বারান্দায় আছি।

কাজল। সেকি? আমি ঘরে শোবো আর আপনি বারান্দায় শুয়ে থাকবেন; সে কখনও হয়?

শঙ্কর। হয়, হয়,—খুব হয়। যা বলছি তাই করুন,

(শংকরের প্রস্থান)

(কাজল দ্বিধা সংকোচের সাথে শেষ পর্যন্ত গিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। এবং ঘুমিয়ে পড়ে। বেশ কয়েক মুহূর্ত পরে ষ্টেজে ভোরের আলো ফুটে ওঠে। কাজল নিদ্রামগ্ন।)

(শংকরের পরনে ধুতি সামনে কোঁচা ঝোলানো। খালি গা, গামছা দিয়ে হাতমুখ মুছতে মুছতে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে। ষ্টেজের বাইরে থেকেই তার কণ্ঠ থেকে সংস্কৃত উচ্চারণ শোনা যাচ্ছিল। ঘরের ভেতর ঢুকেও তার কিছুটা শংকর বলবে)

শংকর। যো দেবো অগ্নৌ যো অপ্সু যো
বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত—
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

(তারপর একটা জামাগায়ে দিয়ে চেয়ারে বসে শংকর পড়তে থাকে। এবং কি যেন লেখে।)

কাজল। ওঃ ভীষণ বেলা হয়ে গেছে তো? আমাকে এক্ষুনি রওনা হতে হবে।

শংকর। তার আগে ভেতরে বারান্দার দিকে চলে যান, দেখবেন, একপাশে বালতিতে জল আছে। হাতমুখটা ধুয়ে নিন্।

(কাজল শংকরের কথামত বারান্দায় গিয়ে হাতমুখটা ধুয়ে ফিরে আসে।

কাজল। (প্যাটরা সুটকেশটা হাতে নিয়ে শংকরের কাছে এসে দাঁড়ায়।) তাহ'লে এখন চলি। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। অবশ্য আরও সকালেই আমার চলে যাওয়া উচিত ছিল।

শংকর। উচিত ছিল। যান,—চলে যান। (শংকর চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে) দাঁড়ান। কোথায় যাবেন এখন ঠিক করেছেন? মানে গিয়ে ওঠবার মতো কোন জায়গা আছে?

কাছে। কিন্তু সে আশ্রয়ের আশাও গতকাল রাত্রে তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে গেছে। না, পৃথিবীতে আর কোন আশ্রয় আমার এখন নেই। কিন্তু আমি আপনাকে কেমন করে বোঝাবো আমি নিজের জন্য আর কোন আশ্রয় চাই না।

নিজের এই ঘৃণিত জীবন, অভিশপ্ত জীবন আমি আর টিকিয়ে রাখতে চাই না। কিন্তু যে নতুন শিশু পৃথিবীর আলোতে চোখ মেলতে চায়, বুকভরে নিঃশ্বাস নিতে চায়, খেলা করতে চায়, হাসতে চায় পৃথিবীর মাটিতে; তার সে দাবী আমি নিজে হাতে কেমন করে ছিনিয়ে নেবো, অস্বীকার করবো। তাই কাল রাত্রে আমার শেষ বিশ্বাস, শেষ আশা গুড়িয়ে যাবার পরও আমি আত্মহত্যা করতে পারিনি—পারিনি—

(কাজল কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে)

শঙ্কর। আপনি ভুল করছেন; হয় তো আরও কিছু আছে। এটাই শেষ নয়—শেষ হতে পারে না।

(বাইরে দরজার কড়ানাড়ার আওয়াজ শোনা যায়)

কমলেশ। (ষ্টেজের বাইরে থেকে) শংকর, শংকর—বাড়ী আছিস্? শংকর—

শংকর। আপনি তাড়াতাড়ি স্যুটকেস্টা ওই পাশে রেখে দিন। নিন্—মাথায় ঘোমটা টানুন; তাড়াতাড়ি—আমার বন্ধু এসেছে কমলেশ বুঝলেন। আপনি যেন আমার বিবাহিতা স্ত্রী এই পরিচয়ই ওর কাছে দেবো।

(কমলেশ প্রবেশ করতে করতে।)

কমলেশ। ওঃ এতক্ষণ ঘরের মধ্যে বসে কার ধ্যান করছিস বলতো। না তোকে নিয়ে আর পারা গেল না।

(ঘরে ঢুকেই কাজলের দিকে তাকিয়েই যেন কমলেশ চমকে ওঠে) বা বাব্বা! সে কিরে? অ্যা—

শংকর। এই-এই-দেখ কমলেশ, মানে তোর সাথে প্রায় সাতদিন হলো দেখা নেই। তা হঠাৎ বিয়েটা করে ফেলেছি। মানে সবাইকে ঠিক খোঁজ খবর করে নেমন্তন্ন করতে পারিনি; আর কাউকে জানাতেও পারিনি। হঠাৎ ঘটে গেল আর কি?

কমলেশ। এ যে তাজ্জব ব্যাপার! আমায় তুই—অবাক করলি শংকর। তোর মত ছেলেও শেষ পর্যন্ত

শংকর। এতে হাসবার কি আছে? আমি তো আর ভীষ্ম নই যে পণ ভঙ্গ হবে না।

কমলেশ। না,-তবে অনেকটা তাই ছিল। বুকে টোকা মেরে কথা কথাইতো বলেছো; এমন কি আমার মায়ের কাছেও জোর গলায় বলে এসেছো—না মাসিমা, বিয়ে আমি করবো না, তার পরিণতি নাকি এই? আচ্ছা—শংকর, আমাকে পর্যন্ত তুই এর বিন্দু বিসর্গ জানালি না।

শংকর। ওইতো—বলছি না, এত তাড়াহুড়োর মধ্যে জিনিষটা ঘটে গেল। তুই আমায় ক্ষমা কর কমলেশ,—আমি তোকে আর খবর দিয়ে উঠতে পারিনি।

কমলেশ। ভালো, ভালো,—খুব ভালো। যাক এখন মেজাজে ঘরে বসেই আড্ডা জমানো যাবে। আর বধূ-ঠাকুরানীর হাতের চা,—অর্থাৎ অমৃত সেবন করা যাবে। —হাঃ হাঃ হাঃ

শংকর। কি যে বলিস,-তুই একটু বোস কমলেশ। দোকান থেকে ঘুরে আসি।

কমলেশ। ভালো-খুব ভালো। তোর বউয়ের সাথে পরিচয়টা পর্য্যন্ত করিয়ে দিলি না। দূরে কলাবউ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বলি-আমি কি এখন বসে বসে মাছি তাড়াবো?

শংকর। আমি, এক্ষুণি আসছি। যাবো আর আসবো তুই নিজেই আলাপ করে নিতে পারিস, খুব স্মার্ট বুঝেছিস্!

(শংকরের প্রস্থান)

কমলেশ। তা বুঝলাম, আবার কিছুটা বুঝলামও না। তুমি আমায় অবাক করলে বন্ধু—অবাক করলে

(কাজল এতক্ষণ মুখে ঘোমটা টেনে অন্যদিকে তাকিয়েছিল। কমলেশ প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করে তাতে অগ্নি সংযোগ করে)।

কমলেশ। ভাবছি এখন আপনাকে কি বলে ডাকবো? বউমা—? না নাম ধরে ডাকবো—

কাজল। কেন? নাম ধরেই ডাকবেন—সেটাইতো খুব আধুনিক।

কমলেশ। আধুনিক, আধুনিক খুব কথাতো বলছেন, বলি—শাহাজাদীর মুখখানা পর্য্যন্ত এখনও দেখতে পেলাম

(হঠাৎ কাজল ঘোমটা ফেলে কমলেশের মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়ায়, কমলেশ খুব ভাল করে লক্ষ্য করে যেন চমকে ওঠে)

এ অধম বান্দা হয়ে থাকবে। কিন্তু আপনাকে যে বড় চেনা—চেনা মনে হচ্ছে। মনে হয় যেন কোথাও দেখেছি। আমার খুব কাছাকাছিও যেন একবার আপনি এসেছিলেন, I beg your pardon মানে আমি কোন খারাপ ইঙ্গিত করতে চাইছি না। তবে আমার যতদুর বিশ্বাস আপনাকে আমি দেখেছি কোথাও, কারণ এ অপদার্থের চোখদুটো সবল না হলেও বড় নিরেট, হাঃ হাঃ হাঃ।

কাজল। (প্রথম একটু হকচকিয়ে যায় এবং মুখে কোন কথা ফোটে না)।

আমি আর কোথাও আপনাকে দেখেছি বলে তো মনে হয় না। কোলকাতা শহরে তো আর মেয়ের অভাব নেই। হয়তো আপনার কোন জানাশোনা মেয়ের মুখের সাথে আমার মুখের আদলটা মিলে গেছে। এরকম ঘটনা তো সচরাচর ঘটে।

কমলেশ। তাই নাকি ? না, না, তা নয় Madam তা নয়, স্কাউণ্ড্রেল সুকেশ রায়ের সাথে আপনাকে আমি দেখেছি।

কাজল। না—না। মিথ্যে কথা, সুকেশ রায়কে আমি জানি না, চিনি না, তার সাথে কোনদিন আমার পরিচয় ছিল না।

কমলেশ। এটাও কি মিথ্যে কথা, কোলকাতার কোন একটা নামজাদা হোটেলে সুকেশ রায় একদিন আপনার সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল ?

খুব ভেবে দেখলে আরও কি কি অকেশনে আপনার সাথে আমার দেখা হয়েছিলো—সেটা হয়তো বলা যায়। কি বলুন ? অ্যা হাঃ হাঃ—Madam sorry extremely sorry. আপনার নামটাই জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি—

কাজল। (ভীষণ ভীত ; ত্রস্ত, শঙ্কিত) নাম—আমার নাম। শ্রীমতী কাজললতা দা—

(হঠাৎ দাঁত দিয়ে জিভ্ কামড়ে ধরে)

কমলেশ। মুখোপাধ্যায়—হাঃ হাঃ হাঃ, ঘরের বউ তো লক্ষ্মী, তা কপালে সিঁদুর ছোঁয়াননি দেখছি, এটাও কি একটা আধুনিকতা ! I mean fasion, হাঃ হাঃ হাঃ !

(শংকরের প্রবেশ, হাতে একটা খাবারের ঠোঙা তার ওপর তিনটে মাটির ভাঁড় এবং একটা বড় গ্লাসে বেশ খানিকটা চা।)

শংকর। বাইরে থেকেই তোমাদের হাসাহাসির শব্দ কিছুটা শুনতে পাচ্ছিলাম, কমলেশ—এরই মধ্যে বেশ জমিয়ে নিয়েছ দেখছি। তা কি রসিকতা হচ্ছিল ?

(কথা বলতে বলতে শঙ্কর শালপাতার ওপর খাবার ভাগ করতে থাকে।)

তা কাজলকে কি রকম লাগলো ? নে খাবারটা খেয়ে নে। কাজল আমাদের চা দাও তো—

কমলেশ। তুই আবার এতসব খাবার নিয়ে এলি কেন বলতো ?

শংকর। কেন ? তুই কি ভেবেছিস্ শুধু তোর জন্যই খাবার নিয়ে এলাম। তোর কাছে আবার formality কিরে ? আমি, কাজল সবাই তো খাবো।

কমলেশ। আচ্ছা,—শঙ্কর বিয়ে না হয় করেছিস আমাকে জানাস নি, কাউকে জানাসনি ; মানে জানাতে মোটেই সময় পাসনি। কিন্তু একটা সংসার তো সাজাবি ? না, এখনও সেই ছন্নছাড়ার মতো হোটেলায় নমঃ করবি। বলি—চাটুকু পর্য্যন্ত করার বন্দোবস্ত নেই ! আপনি বলুন বউমা—ওর তো একটা আক্কেল থাকা উচিত—

কাজল। তা ঠিক, তবে সব সময় ওই পড়াশুনা নিয়েই ডুবে আছে। আর একহাতে কদিক সামলাবে বলুন ?

শংকর। Correct, তা কি রকম জবাবটা হলো !

কমলেশ। জবাবটা ভালই হয়েছে। তবে—

(কমলেশ শংকরকে কিছু একটা ইঙ্গিত করতে চায়)

শংকর। তুই একটা হতচ্ছাড়া—

কমলেশ। যা হোক্ শোন—শংকর ; পরীক্ষায় তো খুব বেশী দেরী নেই। দেখ যদি আমায় ঠেলেঠুলে পাশ করিয়ে দিতে পারিস।

শংকর। তার মানে ?

কমলেশ। মানেটা খুব সোজা। তোরা University-র jewell পরীক্ষায় রেকর্ড মার্ক পাবি।

সেদিন ডক্টর মৈত্র তোর সম্বন্ধে খুব

উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিলেন, তাছাড়া ডক্টর দাস, ডক্টর রহমান প্রত্যেকেরই তোর ওপর Expectation ভালো।

শংকর। তোরা যতটা ভাবছিস্, কার্য্যক্ষেত্রে ততটা হবে কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, তবে হ্যাঁ—M. A. degree হয়তো একটা পেয়ে যাবো।

কমলেশ। সে দেখা যাবে। ফলেন পরিচীয়তে—তা বাংলাসাহিত্যের ক্রমবিকাশের ওপর তোর যে নোটটা আছে ওটা আমায় একটু দে, আর বলাকা মানসীর কতকগুলো জায়গায় আমি বড় confused হয়ে যাচ্ছি। মানে রবীন্দ্রনাথকে ঠিক ঠিক বুঝতে পারছি না। তা তুই যদি গাধা পিটিয়ে একটু ঘোড়া করে দিস্ তোর কাছে চিরকাল ঋণী হয়ে থাকবো।

শংকর। দেখ কমলেশ, formality আমি ভালবাসি না। আর ওসব অন্যজায়গায় maintian করিস্। আমার কাছে আসিস্,যতটুকু বুঝি তোকে বোঝাবার চেষ্টা করবো। কিন্তু তুই না Prof. Bhattcharya-র কোচিং নিচ্ছিলি?

কমলেশ। গাদা গাদা টাকা খরচ করে কোচিং তো অনেকের কাছেই নিয়েছি, আজও নিচ্ছি। কিন্তু তারাও এসে দিব্বি লেকচার দিয়ে যায়; আর আমিও শুনে যাই। ব্যাপার কি জানিস্, আমার ওই Deficiency-টা ঠিক তাদের গুছিয়ে বলতে পারি না; মানে সংকোচ রয়েছে কিছুটা; অবশ্য দোষটা আমারই—

শংকর। ঠিক আছে ভাই, যথেষ্ট হয়েছে। আমার কাছে তোর নতুন করে কোন মুখবন্ধের দরকার নেই। তুই মাঝে মাঝে বেশ সময় হাতে নিয়ে আমার কাছে আয় না? আর University-তে আমাদের বিশেষ কোন ক্লাশ হবে বলে তো মনে হয় না। তুই বরং পরশু দুপুরের দিকে এখানে চলে আয়। পরীক্ষাতো এসে পড়লো, কি যে হবে কে জানে?

কমলেশ। হাসালে Brother, হাসালে!—যাহোক চলি—চলি বউমা, আর কোন কথা বললেন না তো?

কাজল। কেন? জমা রইলো, আবার তো আসছেনই।

কমলেশ। তা'তো আসবোই। একদিকে আপনার আমন্ত্রণ, অপরদিকে নিজেরও একটা—

শংকর। তুই একটা ইডিয়ট—

কমলেশ। আজ তাহ'লে চলি Be happy—wish you best luck. Good bye।

(কমলেশের প্রস্থান)

(শংকর এবং কাজল কারুরই মুখে কথা নেই ক্ষণিক নিস্তব্ধতার মধ্যে কেটে যায়।)

কাজল। এ আপনি কি করলেন? এ মিথ্যে অভিনয়ের কি দরকার ছিল?

শংকর। অভিনয়? মিথ্যে অভিনয়? না, জীবনে অভিনয় কোনদিন আমি করিনি। আর যতদিন এই পৃথিবীতে টিঁকে থাকবো মানুষের সাথে মিথ্যে অভিনয় কোনদিন করবো না। মানুষের কাছে বিশ্বাসের ছবি তুলে ধরতে না পারলে মানুষের মন থেকে কোন বিশ্বাসকে ভেঙ্গে দেবার, গুড়িয়ে দেবার অধিকার কারুর নেই। মানুষের জীবনে রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজও আদিম হিংস্রতা, শঠতা, ক্রুরতা দানা বেঁধে রয়েছে, বাসা বেঁধে রয়েছে। প্রেম-প্রীতি ভালবাসা স্নেহমমতাকে আজও মানুষ গলা টিপে মেরে ফেলতে চায়, তাকে নিয়ে জুয়া খেলে, তারপর মিথ্যে অভিনয়ের রঙ ছড়িয়ে দিয়ে সুন্দর স্বার্থপর হয় মানুষ—সুন্দর!

কাজল। জীবনে বার বার আঘাত পেয়ে আজ হতাশা অন্ধকার চরম অবিশ্বাসের মধ্যে আমি ডুবে গেছি। তাই চোখের সামনে আমার সবকিছু মিথ্যে মনে হয়, সব মিথ্যে। আমায় ক্ষমা করুন, আমি না বুঝে আপনাকে আঘাত দিয়েছি।

শংকর। স্বার্থপর মানুষেরা একটা অসহায় নিরীহ মানুষের জীবনে বার বার তাদের লোলুপ হিংস্র ছোবল মেরেছে, ছড়িয়ে দিয়েছে তার গোটা জীবনটায় শুধু বিষ। সেই বিষ,—তার মনের গভীর অবিশ্বাসবোধকে, কণামাত্র যদি শোধন করে দিতে পারতাম, তাহ'লে মনে হ'তো হ্যাঁ সত্যিই বেঁচে আছি—

(ক্ষণিক বিরতি দিয়ে)

আপনি—আপনি আমায় কথা দিন আমাকে ছেড়ে কোনদিন কোথাও চলে যাবেন না?

কাজল। না,—না, তা হয় না, ঘৃণিত উচ্ছিষ্ট আমার জীবন। আমার অভিশপ্ত জীবনের বিষ আপনার

সুন্দর জীবনের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাই না, চাই না।

শংকর। কে বলে আপনার জীবন অভিশপ্ত? কে বলে আপনি ঘৃণিত? স্বার্থপর লোভী হিংস্র মানুষের দেওয়া ঘৃণা আপনার জীবনকে বিষিয়ে তুলেছে, আপনাকে অবিশ্বাসী করে তুলেছে। আপনি অভিশপ্ত নন, হতে পারেন না। জোর করে একদল হিংস্রমানুষ আপনার জীবনের ওপর অভিশাপ চাপিয়ে দিয়েছে!

কাজল। আপনার সুন্দর, সহজ, ছন্দোময় জীবনে ঝড় আসুক, সংঘাত আসুক, সে আমি চাই না। আপনি মহৎ। তাই হয়ত সবকিছু পবিত্র দেখেন, বিষে অমৃতের সন্ধান করেন। কিন্তু আমি কেমন করে বোঝাবো আমি কত মূল্যহীন, কত নগণ্য, কত ছোট—কত ঘৃণ্য—

(কাজল চেয়ারে বসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। শংকর ধীরে ধীরে কাজলের কাছে এগিয়ে যায় এবং তার মাথার ওপর হাত রাখে। কাজল অবাক বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে শংকরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।)

শংকর। ছিঃ কাঁদে না কাজল। পৃথিবীতে চোখের জল ফেললে তা বাষ্প হয়ে চিরদিন হাহাকার করে বেড়াবে, মহত্ব দিয়ে বড় করে আমাকে দূরে ঠেলে দিও না কাজল। বল আমরা বাঁচতে চাই। হাসি গান আনন্দ নিয়ে সুন্দর পৃথিবীতে আমরা বাঁচবো, বিশ্বাস নিয়ে বাঁচবো, সত্য নিয়ে, সংগ্রাম করে বাঁচবো।

কাজল। আপনি মানুষ নন্। আপনি—

(কাজল আবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, শংকর তার মাথায় হাত রাখে।)

[ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে।]

তৃতীয় দৃশ্য

[শংকরের বাড়ীর সেই ঘর। কাজল ঘর গোছাতে ব্যস্ত। সময় দুপুর।]

কমলেশ। (বাইরে থেকে।) শংকর! শংকর বাড়ী আছিস্?

(কাজল ঘরের দরজা খুলে দেয়)

কাজল। আসুন, কমলেশবাবু! ভেতরে আসুন—

কমলেশ। শংকর কোথায়? ঘরে নেই?

কাজল। না, সেই সকালে বেরিয়েছে, এখনও ফেরেনি। অথচ আমায় তো বলে গেছে 'টিউশনি' দুটো সেরে বেলা দশটার মধ্যে ফিরে আসবে। কিন্তু কই এখনও তো এলোনা?

কমলেশ। আজকাল যে ও কোথায় যায়, কি করে, কিছুই জানিনা। মুখ ফুটে কিছু বলবেও না। চাকরী-বাকরীর জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে নাকি? কিছুই বুঝতে পারছি না। মহারাজের দেখা পাওয়াটা পর্য্যন্ত মুশকিল হয়ে উঠেছে। পরীক্ষা কাছে এসে পড়েছে—ওর মত একটা Brilliant student অথচ; সকলেরই একটা বিরাট আশা রয়েছে ওর ওপরে।

কাজল। আপনি বসুন, চা তৈরী করে নিয়ে আসছি।

কমলেশ। না, এতবেলায় আবার চা। থাক,—দরকার নেই।

কাজল। তাতে আর কি হয়েছে? আমার কোন অসুবিধে হবে না, আপনিই না একদিন বলেছিলেন চা সবসময়ে পান করা যায়। আমি উনুনে জলটা চাপিয়ে দিয়ে এক্ষুণি আসছি—

কমলেশ। (অর্ধস্বগতোক্তি) টাকা-টাকা করে শংকরটা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। না, ওকে নিয়ে আর পারা গেল না। আমার দেওয়া টাকা না হয় নিতে ওর আত্ম-সম্মানে বাধে। কিন্তু কত করে ওকে বললাম আমাদের ফার্ম-এ একটা পার্ট টাইম জব নিয়ে নে, তাতে তোর পড়াশুনোরও কোন অসুবিধা হবে না; আর সংসারটা কোনমতে চলে যাবে। কিন্তু কে কার কথা শোনে?

(কাজলের প্রবেশ)

কাজল। দিব্বি ঠোঁট নেড়ে নেড়ে কার সাথে কথা বলছেন! আপনি ভারি মজার লোক তো? হাঃ হাঃ হাঃ

কমলেশ। মজার লোক তা ঠিক, তবে হাসলে তো আপনাকে ভারি সুন্দর দেখায় কাজল দেবী। আর সত্যি তেমনি মিষ্টি আপনার হাসি!

কাজল। কবিতা লেখেন না কেন? বেশ কবিতা করে কথা বলেন তো?

কমলেশ। এককালে লিখেছি, হ্যাঁ, হ্যাঁ লিখেছি। শংকর জানে, প্রেমের কবিতা, বিরহের কবিতা, দুঃখের, আনন্দের কবিতা, হাঃ হাঃ হাঃ। না, আপনার সাথে

পরিচয় হওয়ার পর থেকে কবিতা লেখা আমি ছেড়েই দিয়েছি। অর্থাৎ আর কবিতা লিখি না। মানে লেখারও আর প্রয়োজন নেই। আপনাকে দু'চোখ ভরে দেখি প্রাণ-খুলে কথা বলি, কারণ আপনি নিজেই একটি জ্যান্ত কবিতা—

কাজল। হাঃ হাঃ হাঃ—ধ্যেৎ—

(কাজলের প্রস্থান)

কমলেশ। শুনুন—শুনুন—

কাজল। চা তৈরী করে নিয়ে এক্ষুণি আসছি—

[কমলেশ টেবিল থেকে একটা বই তুলে নিয়ে তার পাতা ওলটায়]

[একটুক্ষণ পর ডিসের ওপর এককাপ চা নিয়ে কাজলের প্রবেশ]

কাজল। নিন্—ধরুন, চা-টা খেয়ে নিন্।

[কমলেশ ডিসের তলায় কাজলের হাতের ঠিক তলায় হাত রাখে। আর একদৃষ্টে কাজলের দিকে তাকিয়ে থাকে। লজ্জায় কাজলের মুখ নত হয়।]

কমলেশ। কাজল! (একসময় কাজলের হাত থেকে চায়ের কাপটা কমলেশ তুলে নেয়।)

কাজল। এরকম করলে কিন্তু ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। কেবল তুমি! আপনার বন্ধুকে বলে দেবো।

কমলেশ। না, কাজল, আমার চোখের দিকে তুমি একটিবার তাকিয়ে দেখো, তাহলেই সব বুঝতে পারবে। এ বুকের ভেতর কত জ্বালা, কত যন্ত্রণা জমাট বেঁধে আছে। আমি একটু আশ্রয় চাই, শান্তির আশ্রয়। আমি, তোমার কাছে একটু ভালবাসা ভিক্ষে চাইছি কাজল। ভিক্ষে আমি তো তোমায় দু'হাত ভরে আমার হৃদয়ের সব কিছু দিতে চেয়েছি। কিন্তু তুমি কেন বোঝনা আমার বুকের ভেতরটায় কি ভীষণ তোলপাড় চলছে। আমি পাগল হয়ে যাবো কাজল, পাগল হয়ে যাবো। আমি কেন তোমাকে বোঝাতে পারছি না যে আমি তোমায় কত ভালবাসি।

কাজল। না, কমলেশবাবু, এত ছেলেমানুষি করবেন না। আপনাদের টাকা আছে, বাড়ী আছে, গাড়ী আছে, আপনাদের সব কিছুই মানিয়ে যায়। ইচ্ছে করলেই আপনারা সম্পদ প্রাচুর্য্য, ভোগবিলাস, সুখের স্বপ্ন চোখের সামনে তুলে ধরে অনেক অনেক নামী, দামী, রূপসী, মেয়েদের ভালবাসা কিনে নিতে পারেন।

কমলেশ। কাজল! এ তুমি কি বলছো? আমাদের এই সহজ মেলামেশার মধ্য দিয়েও কি তুমি এটা বুঝতে পারনি যে আমি তোমার কাছে ভালবাসা কিনতে আসিনি, ভালবাসার অভিনয় করে তোমাকে ভোলাতে আসিনি আমি,—আমি রাজাবাহাদুর খেতাব পাওয়া বংশের ছেলে, যাদের অনেক অনেক টাকা সম্পদ ঐশ্বর্য্য প্রতিপত্তি, আমি কমলেশ ব্যানার্জি, যার রূপ আছে, যৌবন আছে সে হাত বাড়ালে মেয়ে পাবে না সেটা ঠিক নয়। কিন্তু অভিনয়, রঙ, পালিশ, ঢঙ, ন্যাকামি দেখে দেখে আমার চোখ পচে গেছে কাজল। কমলেশ ব্যানার্জি জীবনে কারুর কাছে কোনদিন কিছু ভিক্ষে করেনি এই প্রথম, হয়তো এই শেষ। তুমি আমাকে যা'ই ভাবনা কেন আমি তোমায় ভালবাসি কাজল;—সত্যি ভালবাসি।

কাজল। না,-না। আপনি বার বার ওই একই কথা উচ্চারণ করবেন না। নিজেকে আর অপমান করবেন না কমলেশবাবু। যা' হতে পারে না, যা হবে না, সে কথা কেন বার বার বলছেন? (গলার স্বর কান্নায় ভেজা, ক্ষণিক বিরতি দিয়ে।) এই আপনার বন্ধুপ্রীতি, এরজন্যই কি আপনি শঙ্কর মুখার্জীকে বিপদে আপদে আগলে রাখতে চান? কেন আপনি তার ঘর ভেঙ্গে তার কাজলকে নিয়ে যেতে চাইছেন? একবারও কি ভেবে দেখেছেন তার কথা যে মানুষটা কাজলকে মৃত্যুর মুখ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে। নিজের উদারতায় তার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছে; প্রতি মুহূর্ত্ত সংগ্রাম করে, কলঙ্কের বিষ পান করে, কাজলকে ভালবাসা দিয়ে, বুকে জড়িয়ে রেখেছে;—ভেবেছেন তার কথা?

কমলেশ। শঙ্করের কথা নতুন করে আমায় ভাবতে বলো না কাজল, তুমি,—শঙ্কর আর কমলেশের হৃদয়ের গভীর ভালবাসা উপলব্ধি করতে পারনি, সেটা অবশ্য তোমার দোষ নয়। কিন্তু এটা তুমি কি করে ভাবলে আমি শঙ্করের ঘর ভেঙ্গে তার কাজলকে চুরি করে নিয়ে যাবো? আমি ভাসিয়ে দেবো, তাকে ক্ষতবিক্ষত করে? তুমি এটা বোঝ না কাজল, শঙ্করের ঘর ভাঙ্গা আর আমার নিজের ঘর ভাঙ্গা একই কথা।

কাজল। বাঃ চমৎকার! সুন্দর, বানিয়ে, গুছিয়ে সাজিয়ে আপনি কথা বলতে পারেন তো?

কমলেশ। না,—না। সাজিয়ে, বানিয়ে আমি কথা বলি না, তাহ'লে আপনি আমাকে চেনেন না, জানেন না।

কাজল। জানি,—নিশ্চয়ই জানি। আপনার মনের ভেতর একটা খারাপ উদ্দেশ্য লুকিয়ে রয়েছে!

কমলেশ। stop! stop! অন্য কোন মেয়ে হলে আমি আপনার জিভটা উপড়ে ফেলে দিতাম। But here I can't—

কাজল। তা হয়তো পারেন কিন্তু আপনি কি অস্বীকার করতে পারেন—আমার প্রতি আপনার কোন লোভ নেই?

কমলেশ। No—No. আপনি আমায় ভুল বুঝেছেন। আপনি আমায় মিছেমিছি অপমান করেছেন কাজল দেবী। আপনি আমায় আর অপমান করবেন না, তাহ'লে সব জলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে। শঙ্কর —আমি—আপনি কেউ রেহাই পাবো না, কেউ না,—

কাজল। কেউ না—?

কমলেশ। ওঃ Stop! Stop! Please stop—

(এমন সময় শঙ্করের প্রবেশ এবং কমলেশ দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।)

শঙ্কর। কি হয়েছে? কমলেশ এভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কেন? (দরজার বাইরে গিয়ে শঙ্কর ডাকতে থাকে কমলেশ, কমলেশ,—কিন্তু তার সাড়া না পেয়ে নিরাশ হয়ে ঘরে ফিরে আসে।) তা ব্যাপার কি? এক-কাপ চা পড়ে রয়েচে টেবিলের ওপর! কমলেশ কি চা না খেয়েই চলে গেল?

কাজল। হ্যাঁ, চা টার ওপর একটা মাছি উড়ে এসে পড়েছিল। তাই ওনার খাওয়া হয়নি। আমি বললাম আরেকবার চা করে দিচ্ছি। বললেন—একটা ভীষণ দরকার আছে এখন যাচ্ছি, পরে এসে চা খাওয়া যাবে।

শঙ্কর। কিন্তু কমলেশ আমার পাশ দিয়ে এমনভাবে বেরিয়ে গেল তাতে আমি ভাবলাম কিনা জানি হয়েছে।

কাজল। হাত পা ধুয়ে নাও তাড়াতাড়ি, বেলা হয়েছে অনেক। খেতে দেওয়ার বন্দোবস্ত করি—

শঙ্কর। হ্যাঁ—তুমি গিয়ে সব রেডি কর আমি আসছি—

(কাজলের প্রস্থান। শঙ্কর খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। কতক-গুলি চিঠিপত্র পড়তে থাকে। কয়েক মুহূর্তপর শঙ্করও ধীরে ধীরে ষ্টেজের বাইরে চলে যায়।)

(আহার সমাপনান্তে একখানি গামছায় মুখ মুছতে মুছতে শঙ্কর এবং কাজলের একত্রে ষ্টেজে প্রবেশ এবং শঙ্কর খাটের ওপর গা এলিয়ে দেয়।)

শঙ্কর। আরও নতুন দুটো টিউশ্যানি পেয়ে গেলাম, বুঝলে কাজল। চাকুরীর জন্যে তো চেষ্টা করে যাচ্ছি। পরীক্ষাটা হ'য়ে গেলে যেন বাঁচা যায়। তখন উঠে পড়ে লাগবো। মাথার ওপর বাবা নেই। ওদিকে মা দেশে, —মানে নিজেদের গ্রামে, আমার ছোট্ট দু'টো ভাইবোনকে নিয়ে সংসার চালাতে হিম্‌সিম্ খেয়ে যাচ্ছেন। তা'ওপর যা দিনকাল পড়েছে! সামান্য কিছু জমিজমা আছে। মামা দেখাশোনা করছেন তাই কোনমতে সংসারটা গড়িয়ে চলে যাচ্ছে। তা না হ'লে কবে এখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে গ্রামে গিয়ে লাঙল ধরতে হ'তো—

কাজল। মায়ের চিঠি পেয়েছ?

শঙ্কর। হ্যাঁ—আজই চিঠি পেয়েছি—

কাজল। বাড়ীর সবাই ভাল আছে তো?

শঙ্কর। টেবিলের ওপর চিঠিটা রয়েছে পড়ে দেখ। মায়ের শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। তারওপর মাথায় সংসারের একগাদা চিন্তা। এমাসে আরও কিছু টাকা পাঠাতে লিখেছেন। কি যে করি, কোথায় এত টাকা পাই?

কাজল। তারওপর আমি আবার নতুন করে তোমার ঝামেলা বাড়িয়েছি।

শঙ্কর। আবার ওসব কথা শুরু করলে? তুমি বোঝনা কাজল—আমায় তুমি কতটা সংগ্রামী করে তুলেছ। আমার উপলব্ধির ভেতর, বোধের ভেতর যে অস্পষ্টতা ছিল; তোমার ভালবাসার যাদুস্পর্শে সে কুয়াশা সরে গেছে। তোমার জন্যই আজ জীবনকে আমি কঠিন সত্যের ওপর যাচাই করে নিতে পেরেছি। নিজেকে চিনতে পেরেছি কাজল—

কাজল। কিন্তু আমার যে বড় ভয় করছে। আমার

কেবলই মনে হচ্ছে আবার বুঝি ঝড় আসবে।

শঙ্কর। ঝড়! তাতে আমরা কে কোথায় ছিটকে পরবো কে জানে? হয়তো আমাদের সবকিছু ভেঙ্গে গুড়িয়ে চুরমার হয়ে যাবে, সবকিছু হারিয়ে যাবে।

কাজল। আমায় তুমি কেন আশ্রয় দিলে? কেন আমাকে নিয়ে ঘর বাঁধলে? আমার বড় ভয় করছে, ভীষণ ভয় করছে—

(কাজল কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।)

(শঙ্কর ধীরে ধীরে কাজলের কাছে এগিয়ে যায়)

শঙ্কর। ঝড় আসবে, হয়তো সব তোলপাড় হবে; সে আমি জানি কাজল। কিন্তু নিজের ওপর আস্থা রেখে গভীর বিশ্বাসের ওপর ভর করেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। নতুনদিনের স্বপ্ন দেখতে হবে, আশায় ঘর বাঁধতে হবে। সংগ্রাম করতে হবে। সত্যের জন্য যে কোন কঠিনমূল্য আমাদের দিতে হবে কাজল। শুধু,—শুধু—তুমি আমার ওপর বিশ্বাস রেখো।

[ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে।]

চতুর্থ দৃশ্য

[শঙ্করের বস্তির সেই ঘর। কাজল আপন গৃহকর্মে ব্যস্ত। বেলা দ্বিপ্রহর]

অরুণ। (বস্তির মালিকের ছেলে, অশিক্ষিত লম্পট, টৈজের বাহির থেকে) শঙ্করবাবু! ও শঙ্করবাবু! বা বাব্বাঃ কোন আওয়াজ নেই দেখচি। দুপুর বেলাই দিব্যি দরজা সেটে ঘুমুচ্ছে দেখচি—শঙ্করবাবু ও শঙ্করবাবু—

কাজল। (একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে ধীরে ধীরে দরজার কাছে এগিয়ে যায়) আপনি কে? কোথা থেকে আসছেন?

অরুণ। আরে! দরজাটা খুলেই কথা বলুন একেবারে লজ্জাবতী যে—(অরুণ ঘরে ঢুকে পড়ে) ঘরগুলো না হয় ভাড়া দিয়ে আল্লার খেসারত দিইচি কিন্তু তাই বলে কি ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলতে হবে না কি? হিঃ হিঃ হিঃ

(অরুণ ঘরের ভেতর আরাম করে বসে পড়ে)

কাজল। ওনার ফিরতে তো দেরী হবে। তাই যদি দরকারটা খুলে বলেন তো—ভাল হয়। উনি এলে সব বলবো।

অরুণ। সে তে বলবেনই। বসুন না? বসুন, বসে একটু গল্প করা যাক। ঘরভাড়া তো আজ তিন—মাস হলো বাকী পড়ে আছে। উনিতো একটি পয়সাও ঠেকাননি। বসে একটু গল্প সল্প করবো তাও—হিঃ হিঃ হিঃ

কাজল। দেখুন, আমার হাতে প্রচুর কাজ রয়েছে। রান্নাবান্না এখনও শেষ হয়নি। তাই যদি কিছু মনে না করেন—

অরুণ। না,—না, এতে মনে করার কি আছে। আমি বসচি,—আপনি রান্নাঘরের কাজ সেরে আসুন। আমার এত তাড়া নেই। মানে আপনার সাথে একটু গল্পসল্প করবো আর কি? যান, যান—ঘুরে আসুন।

(কাজলের প্রস্থান)

(স্বগতোক্তি) খাসা চিজ্ শঙ্করবাবু জোগাড় করেচে। ভালো। আগে কানাঘুষা লোকের মুখে শুনেছিলাম কিছুটা,—দেখে পরান জুড়িয়ে যাচ্ছে।—হিঃ হিঃ হিঃ...

(কাজলের প্রবেশ)

কাজল। আপনি আর কতক্ষণ ওনার জন্য একা একা—

অরুণ। না হয় একটু বসেই রইলাম। সত্যি আপনি নমস্য।

কাজল। তার মানে?

অরুণ। আপনার সম্বন্ধে, শঙ্করবাবুর সম্বন্ধে বস্তির আশে পাশের লোকের মুখ থেকে কিছুটা শুনেছি। সত্যি আপনার জোড়া নেই। হিঃ হিঃ হিঃ

কাজল। আপনি কি বলতে চাইছেন? কিছু তো বুঝতে পারছি না। বস্তির লোকের মুখ থেকেই বা আপনি কি শুনেছেন?

অরুণ। না, মানে শঙ্করবাবু সম্বন্ধে এখানকার কিছু লোক একটা "কোমপে-লে-ন" করছিলো আর কি? আমি অবশ্য ওদের কথার মদত্ দিইনি।—তা ছাড়া এখন আপনাকে নিজে চোখে দেখে গেলাম।

সত্যি ভারি ভাললাগছে আপনাকে। তা মাঝে মাঝে আমি ফুরসুৎ করে আপনার কাছে আসবো, কি বলুন?

কাজল। (হাত জোড় করে) আপনি এখন দয়া করে আসুন। আর আপনার নামটা জানতে পারি কি? ওনার সাথে আপনার দরকারটা খোলাখুলি ভাবে বলেন

তো ভাল হয়। আমার হাতে একদম সময় নেই।

অরুণ। ও বাব্বা! আবার ঝাঁঝ্‌ও রয়েছে দেখছি, —যাই হোক শংকরবাবুকে বলবেন ঘরের মালিক এসেছিলো। ঘর ভাড়ার অনেকগুলো টাকা বাকি পড়ে আছে তাই। মানে তাগাদা দিতে এসেছিলাম। অবশ্য —আপনি একটু হাসিখুশি হলে—একটু মদত্‌ দিলে,—শংকরবাবুর অনেকগুলো টাকা বেঁচে যায় আর কি? হিঃ হিঃ হিঃ আর ভাবচি সামনে বর্ষা আসার আগেই আপনার ঘরটা পুরো রিপেয়ার করে দেবো। বস্তির আর সবার মতো তো আপনাকে রাখা যায় না কি বলুন? অ্যাঁ হিঃ হিঃ হিঃ তা হলে এখন আসি দেবী। আবার আসবো নিশ্চয় আসবো। তা হলে—আজ উঠি—অ্যাঁ হিঃ হিঃ হিঃ

(অরুণ প্রস্থানোদ্যত এবং শংকরের প্রবেশ)

শংকর। আরে! অরুণবাবু যে—মানে দেখুন দিনকাল যা পড়েছে, তাতে শুধু টিউশ্যানি করে চারদিক ঠিক সামলে উঠতে পারছি না।

অরুণ। তা ঠিক, শংকরবাবু তা ঠিক। তবে একসাথে অনেকগুলো টাকা বাকী পড়ে গেছে তাই—

শংকর। তারওপর পরীক্ষার ঝামেলা। আমায় একটু সময় দিন। আমি সব শোধ করে দেবো।

অরুণ। সময় না হয় দিলাম, অ্যাঁ কি বলুন? হিঃ হিঃ হিঃ তা ভাবচি—ঘরটা একটু রিপেয়ার করে দেবো, তা না হ'লে আপনাদের এই—মধুমিলন জমবে কি করে? —কি বলুন? অ্যাঁ হিঃ হিঃ হিঃ—

পেটভরে নেমন্তন্নটা খেয়ে যাবো—হিঃ হিঃ হিঃ

চলি,—চলি, আবার আসবো।

(অরুণের প্রস্থান)

শংকর। এক গ্লাস জল দাও তো—

(শংকর চিন্তামগ্ন, কাজল এক গ্লাস জল নিয়ে শংকরের কাছে এগিয়ে আসে)

কাজল। কি হলো? শরীর খারাপ হয়নি তো? কোন কথা বলছো না যে—

শংকর। না, শরীর ঠিক আছে। একটা টিউশ্যানি আজ হাতছাড়া হয়ে গেল। আভাস ইঙ্গিতে ছাত্রীর Gurdian কি যেন একটা বোঝাতে চেয়েছিলেন। আমার তখন মনে মনে খুব হাসি পাচ্ছিল।

মানুষের সাজানো দুনিয়াটা ভীষণ ঠুনকো কাজল। নিষ্ঠুর সত্যের সামান্য একটু আঘাতে তা গুড়ো হয়ে ঝরে পড়ে। আজ আর সাধারণ মানুষের মনে কোন গভীরতা নেই। অথচ গোটা পৃথিবীটাতে সাধারণ মানুষের ভীড়ই বেশী। তারা কোন ঘটনাকেই তলিয়ে দেখতে চায় না। কোন জিনিষকে নিয়ে গভীর ভাবে ভাবতে চায় না। মানুষের প্রতি মানুষ যদি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে তবে ভবিষ্যতে মানুষ কি নিয়ে বাঁচবে? কি করে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করবে? কি করে সে সত্যের জন্য মাথা তুলে দাঁড়াবে?

কাজল। সেই কখন ঘর থেকে বেরিয়েছ এখনও পেটে কিছু পড়েনি। আর বেলাও গড়িয়ে গেল। চল, তোমাকে খেতে দি। এখন আর বইপত্র নিয়ে বসো না। আগে যা হোক দুটো মুখে দিয়ে নাও—

শংকর। চল,—যাচ্ছি—(কাজলের প্রস্থান)

(শংকর পকেট থেকে কতগুলো কাগজপত্র বার করে মনোযোগ সহকারে প্রথম কিছুক্ষণ তার ওপর চোখ বোলায় তারপর ধীরে ধীরে গায়ের জামা খুলে হাতে একটা গামছা নিয়ে ষ্টেজ থেকে বেরিয়ে যায়)

(কয়েক মুহূর্ত্ত পর শংকর এবং কাজল উভয়েই কথা বলতে বলতে মঞ্চে প্রবেশ করে।)

শংকর। তারপর?

কাজল। পার্কসার্কাসের কোন একটা ফ্লাটে বিনুমাসির সাথে এসে উঠলাম। সাজানো-গোছানো ঘর, সৌখিন সব আসবাব। আমি তো প্রথম সব কিছুটা দেখেশুনে হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। তারওপর সবে পাড়াগাঁ থেকে এসেছি, শহরের হালচাল কিছু জানি না। আমার সমবয়সী বিনুমাসির আরও দুটো মেয়ে ছিল। তারাতো দেখতাম সব সময়ই পরীর মত সেজেগুজে আছে। স্কুলে পড়াশুনা করে সেটা অবশ্য নামমাত্র, ফড়িং-এর মতো কেবলই তিরিং বিরিং করে ঘুরে বেড়ায়। কোথায় যায়, কি করে? কিছুই বোঝা যায় না।

(শংকর মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসে)

কাজল। হাসছো যে—

শংকর। হাসছি মানে তোমার বলার ভঙ্গি দেখে।

তুমি বেশ গুছিয়ে সুন্দর করে বলতে পারো।

কাজল। ও রকম করলে কিন্তু আমি আর কিছুই বলবো না।

শংকর। আরে না, না, তুমি বলো। আমি Seriously শুনছি—

কাজল। কোথা থেকে টাকা আসে, বিনুমাসির এত বড় সংসার চলে। কিছুই বুঝতে পারি না। বাড়ীর ভেতর হৈ,হুল্লোড়, নানা ধরনের লোক যাতায়াত করে কিছুই যেন ঠাহর করে উঠতে পারছিলাম না।

আমাকে তো বিনুমাসি দুএকদিনের ভেতর হেঁসেলে চালান করে দিলেন। রাতদিন শুধু কাজ আর কাজ। আর দুবেলা সংসারের হাড়ি ঠেলা। মনে মনে ভাবতাম ভালো চাকুরী পেয়েছি! চারদিকের সব ব্যাপার দেখে আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইলো।

আজ এই পর্য্যন্তই থাক কি বলো? তুমি শুয়ে একটু বিশ্রাম কর—

শংকর। Its a fine story. বল—বলো কাজল আজ সবটা শোনা যাক—

কাজল। একদিন কোথা থেকে কি হয়ে গেল, কিছুই বুঝলাম না। বেড়ালের ভাগ্যে ছিকে ছিড়লো, কি না কে জানে? বিনুমাসি এসে আমাকে আদর করে ডেকে বললেন—কাজলা তোকে আর রান্নাবান্না করতে হবে না বুঝেছিস্। তোকে স্কুলে ভর্ত্তি করে দেবো, সামনের মাস থেকে। পড়াশুনোই করবি। আর দেখ ইংরেজিটা ভালো করে রপ্ত কর। আমি ভাবলাম সেকিরে বাবা! বিনুমাসি হঠাৎ আমার ওপর এত প্রসন্ন হলেন?

শংকর। Interesting মজার তো? বলো—তারপর?

কাজল। যাহোক, পড়াশুনোর ওপর সবসময়ই একটা আমার ভীষণ ঝোঁক ছিল। তাই সুযোগ পেয়ে দিব্বি পড়াশুনো করতে লাগলাম। ইস্কুল আর বইপত্র নিয়েই বেশদিন কাটছিল।

একদিন দেখলাম বিনুমাসি এক এংলোইণ্ডিয়ান Lady Teacher আমার জন্য নিযুক্ত করলেন। আর বললেন—দেখ কাজল English language-টা ভালো করে আয়ত্ব করা দরকার। বুঝিসতো তা নাহ'লে Society-তে ঠিক মেলামেশা করা যায় না। ভাল করে মন দিয়ে কোচিং-টা নিস্। সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে কি রকম যেন গোলমেলে ঠেকছিল।

শংকর। আচ্ছা! তারপর?—

(বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল)

রবীন। শঙ্কর—শঙ্কর!

শঙ্কর। কে! কে ডাকছে? (দরজা খুলে দেয়।)

আরে! রবীনদা, আপনি? আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন। তারপর এখন কোথায় আছেন?

(রবীনের প্রবেশ)

রবীন। আমি এখন আসানসোলেই আছি। এই কোলকাতায় এসেছিলাম, আমাদের Organisation-এর একটা Meeting ছিল। তা ভাবলাম তোমার সাথে অনেকদিন দেখা হয় না। দেখাটা করে যাই।

শঙ্কর। খুব ভাল করেছেন। আপনি যে এসেছেন তাতে আমার খুব আনন্দ হয়েছে। কতদিন পরে আপনাকে সামনাসামনি দেখলাম। কাগজপত্রে আপনার ফটো দেখি, বিবৃতি পড়ি, আর আপনার সংগ্রামকে মনে মনে ধন্যবাদ জানাই। হাঁ—পরিচয় করিয়ে দিই, কাজল, রবীনদাকে প্রণাম কর। উনি একদিকে আমার জীবনের গোড়ার শিক্ষাগুরু। আর দীক্ষা! ওনার কাছ থেকে নিতে পারলাম কোথায়? ত্যাগ করতে শিখলাম কোথায়? যা হোক রবীনদা ও আমার স্ত্রী কাজল।

রবীন। তুমি বিয়ে করেছ—বেশ, বেশ,—ভালো—সুখী হও বউমা, তোমরা সুখী হও।

(কাজলের প্রস্থান)

রবীন। তারপর শঙ্কর তোমার পরীক্ষা তো এসে গেল, বাড়ীর খবর সব ভালো? মা ভাল আছেন? আমাদের গ্রাম কৈলাসপুর ছেড়েছি—সে যেন এক যুগ হয়ে গেল। তা তুমি মাঝে মাঝে গ্রামে যাচ্ছ তো? গ্রামের অন্যান্য খবর সব ভাল?

শঙ্কর। না, ভাল আর কোথায় রবীনদা। চাষবাসের উন্নতি নেই। অন্যদিকে জিনিষপত্রের দাম হু-হু করে বেড়ে চলেছে, Irregation system ভালো না হলে গ্রামের চেহারা পালটাবে বলে আমার তো মনে হয়না। তার ওপর রয়েছে জোতদারদের ফ্যাসাকল, চোরাকারবারি—অসহায়

বঞ্চিত মানুষেরা পরস্পরের সাথে হাত মেলাতে না পারলে ; সত্যের জন্য কোন সংগ্রাম টেঁকে না—ইতিহাস সেই কথাই বলে রবীনদা—

রবীন। আমি তো রাতদিন আকাশ পাতাল সেই-কথাই ভাবছি। কেন মানুষকে একসাথে মেলানো যাচ্ছে না? কোথায় যেন একটা ফাঁক আছে। আর কি যেন একটা সুতো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, যা দিয়ে সমস্ত মানুষের হৃদয়কে একত্রে গাঁথা যায়।

শঙ্কর। কিন্তু ফাঁকটা কোথায়? where is the flaw? সে কি শুধু অভাবের জন্যে, টাকার জন্যে, ক্ষুধার জন্যে, না আর কিছু?

বিমল। (বাইরে থেকে) শঙ্কর, শঙ্কর—বাড়ী আছিস্

শঙ্কর। কে? বিমল? ভেতরে আয়। দরজা খোলা আছে।

বিমলের প্রবেশ

বিমল। আমি তোর কাছে একটা খুব দরকারে এসেছি। আমাদের Student Fedaration-এর secretary তোকে একবার জরুরী তলব করেছে। তুই কাল একবার রাত নটার মধ্যে আমাদের অফিসে যাস্ বুঝেছিস্।

শঙ্কর। তা তো বুঝলাম, বোস। কবে দিল্লী থেকে ফিরেছিস! Teachers এবং Student-দের দাবী নিয়ে তোর ডেপুটেশন কেমন হলো?

বিমল। সে অনেক কথা। বসে সব কিছু গুছিয়ে বলবার মতো এখন সময় নেই ভাই। তাছাড়া কাগজের মারফৎ খবর তো একটা পেয়েছিস্। আমি আজ চলি।

(কাজলের প্রবেশ, হাতে দু কাপ চা)

শঙ্কর। আরে বোস, বোস, অন্ততঃ চা টা খেয়ে যা—

(কাজল, রবীন এবং বিমলের হাতে দুকাপ চা তুলে দেয়।)

তা পরীক্ষায় বসবি তো। না—

বিমল। Course-এর পড়াশুনো তো কিছুই হয়নি। দেখা যাক কি করি—

শঙ্কর। (বিমলকে উদ্দেশ্য করে) পরিচয়টা করিয়ে দি। এই হচ্ছে কাজল, আমার স্ত্রী। আর উনি হচ্ছেন আমার শিক্ষাগুরু শ্রীরবীন্দ্রনাথ আচার্য্য। বর্ত্তমানে কোলকাতার বাইরে আছেন। একজন Trade union Leader, আর রবীনদা, এ হচ্ছে আমার সহপাঠী university union-এর একজন পাণ্ডা।

বিমল। থাক্—থাক্; খুব হয়েছে—

(তাড়াতাড়ি চা-টা শেষ করে বিমল উঠে পড়ে)

তাহলে এখন চলি—নমস্কার। নমস্কার।

(বিমলের প্রস্থান)

শঙ্কর। চেষ্টা, আন্তরিকতা এখনও আছে। সত্যের জন্য লড়াই আজও চলছে—

খালি কাপ দুটো নিয়ে কাজলের প্রস্থান।

রবীন। জানো শংকর, গত একমাস ধরে একটা কারখানায় আমি strike চালাচ্ছিলাম। প্রথমে আমার শ্রমিকদের ভেতর কত উদ্দীপনা ছিল, দৃঢ়তা ছিল, তাদের গভীর বিশ্বাস ছিল, সেদিন এক অদ্ভুত সাড়া পেয়েছিলাম, সে এক অপূর্ব আলোড়ন। কিন্তু—

শঙ্কর। কিন্তু কি? রবীনদা—

রবীন। আজ—আজ ওরা বলছে strike ভেঙে দেবো। অথচ ওরাই আমার হাতের একমাত্র সম্বল, একমাত্র হাতিয়ার, আজ ওরা বলছে আমরা আর strike করতে চাই না। আমরা মালিকের কথাই শুনবো, তার কথাই ঠিক। আমরা কাজে যোগ দেবো। তুমি leader ধাপ্পাবাজ। তুমি মিথ্যে করে সাজিয়ে সব বল—সব মিথ্যে। আমি ওদের বোঝাতে চাইলাম আমার সংগ্রাম কাদের জন্য? তোমাদের দাবীর জন্যই তো? কথাটা কেউ কান পেতে শুনলো না পর্য্যন্ত, অনেকে অদ্ভুতভাবে হেসে উড়িয়ে দিল। এমনকি কয়েকজন আমার একান্ত জানা, একান্ত আপন স্নেহভাজন কর্মি বিশ্বাসী! আমার গায়ে হাত পর্য্যন্ত তুলেছিল!

শঙ্কর। আন্তরিকতা রয়েছে, ত্যাগ রয়েছে, ভালবাসা রয়েছে। তবুও কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে!

রবীন। আজ তাহ'লে উঠি শঙ্কর। আমাকে আজই আসানসোল রওনা হতে হবে। ট্রেনের টাইমও তো হয়ে এলো। আজ তাহ'লে চলি—

শঙ্কর। আপনি এত কষ্ট স্বীকার করে যে আমার বাসায় এসেছেন, এতে সত্যিই আমি খুব আনন্দিত

হয়েছি ; কিন্তু আপনি আমার ঠিকানা জোগাড় করলেন কোথা থেকে ?

রবীন ॥ ঠিকানা Universityতে আমার একটি চেনা ছেলের কাছ থেকে জোগাড় করে নিয়েছি। তাছাড়া তুমি হচ্ছ Uuiversity-র Jewell. ওখানে একটু খোঁজখবর নিলে তোমাদের ঠিকানা পাওয়া কি খুব কঠিন ? আচ্ছা চলি—

(রবীনের প্রস্থান)

(শঙ্কর দরজা পর্য্যন্ত রবীনদাকে এগিয়ে দিয়ে পুনরায় ঘরে প্রবেশ করে। কাজলও আসে।)

শঙ্কর। আমায় তো চা দিলে না কাজল ?

কাজল ॥ আর কোন খালি কাপ ছিলনা তাই। চাটা বোধহয় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। দেখি সামান্য একটু গরম করে নিয়ে আসি—

[শঙ্কর বইয়ের একটা পাতা ওলটাতে থাকে এবং কাজল কয়েক মুহূর্ত পরে দুকাপ চা নিয়ে ষ্টেজে প্রবেশ করে। দুজনে চা পান করতে করতে কথা বলে ।]

শঙ্কর ॥ তারপর কি হলো কাজল ? তোমার কথাটা তো শোনা হলো না।

কাজল ॥ সে আরেকদিন হবে—আজ সব কথা বলা যাবে না। তাছাড়া এখন তুমি টিউশনীতে বেরোবে না ?

শঙ্কর ॥ না, ভাবছি—আজকের সন্ধ্যেটা ডুব মেরে দি, কি বলো ? তার থেকে বরং তোমার কথাটাই আজ শোনা যাক।

কাজল ॥ আমার কথা কি শুনবে। তবু যখন শুনতে চাইছো, তাহ'লে বলি—

তারপর পড়াশুনোতো আমার চুলোয় গেল।

বিনুমাসি আমাকে মেজে ঘষে পুরোদস্তুর Society girl করে তুলতে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বিভিন্ন function-এ, পার্টিতে, বড় বড় লোকের বাড়ীতে আমাকে নিয়ে বিনুমাসি রীতিমত যাতায়াত শুরু করলেন। শেষের-দিকে অবশ্য বিনুমাসির উদ্দেশ্যটা আমি কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছিলাম। কিন্তু এই গোলক ধাঁধাঁ থেকে বেরিয়েই বা আসবো কি করে ? কাকে অবলম্বন করবো ? কিসের ওপর ভরসা করবো ? এমনি এক দুর্দিনে কোন একটা অকেশনে সুকেশ রায়ের সাথে আমার হঠাৎ পরিচয় হয়ে গেল। মানুষটাকে আমি একদম চিনতে পারিনি। লোকটা যে একটা পাকা অভিনেতা সেটা বুঝলাম একেবারে শেষের দিকে। কিন্তু তখনও নিজেকে তার কাছ থেকে সরিয়ে নিলেও আর কোন লাভ ছিলনা। তাদের টাকা ছিল অনেক, অনেক বাড়ী, গাড়ী, প্রতিপত্তি সব ছিল। আমার চোখের সামনে সে সুখের স্বপ্ন, ঘর-বাঁধার স্বপ্ন তুলে ধরেছিল। আমি ভেসে গিয়েছিলাম শঙ্কর। ভোগবিলাসের স্রোতে, আকাঙ্খার মোহে আমি সেদিন ভেসে গিয়েছিলাম। আমি মানুষটাকে বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু—কিন্তু সেই বিশ্বাসের মর্য্যাদা সে দিতে পারেনি। একটা অসহায় মানুষের সাথে অভিনয় করে, তাকে অনেক অনেক স্বপ্ন দেখিয়ে তাকে অস্বীকার করেছে। পায়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

(হঠাৎ বাইরে থেকে তিনচারটি কণ্ঠ শোনা যায়)

শংকরবাবু ! ও শংকরবাবু। বাড়ী আছেন ?

শংকর। কে ? কারা ডাকছে ?

(শংকর ঘরের দরজা খুলে বাইরে যায়)

কি ব্যাপার ? আপনাদেরতো চিনতে পারছি না ? কোথা থেকে আসছেন ?

শেখর। সেকি মশাই ! আমাদের চিনতে পারছেন না ? আমরাতো এই বস্তিতেই থাকি। ওই পাশের চায়ের দোকানটাতেই তো আমাদের আড্ডা। সকাল সন্ধ্যেয় হামেশাইতো ওখান দিয়ে যাতায়াত করছেন মশাই। সে যাই হোক, আপনারা আবার শিক্ষিতলোক মশাই। তা একটা ভীষণ দরকারে আপনার কাছে এসেছি—

শংকর। তা আসুন না ? ঘরের ভেতরে আসুন,— আপনাদের কি দরকার সেটা শোনা যাক।

(অন্য দুজন বলতে থাকে যানা শেখর ভেতরে যা। সব গুছিয়ে বলবি। মওকা বেহাত করিস নি বে)

[শেখরের প্রবেশ, কাজলের প্রস্থান।]

শংকর। বসুন ওই চেয়ারটায়—তারপরে বলুন ?

শেখর। মানে দেখুন, মতিপিসির ঘরের ওপাশে যে একটা ছোটপার্ক আছে না ? সেখানে আমরা সবাই

মিলে একটা function করছি। মানে জলসা করবো আর কি ?

শংকর। তা আমায় কি করতে হবে ?

শেখর। না, আপনাকে কিছু করতে হবে না। মানে টিকিট সেলটা পুরোপুরি করে উঠতে পারিনি। তাছাড়া, জাদরেল Artist-দের বায়না করতে হচ্ছে তো —মানে Advance বুক করছি। তাই হাতে কিছু টাকা সর্ট পড়ে যাচ্ছে। যদি কিছু আমাদের এই অসময়ে help করেনতো Group-টার একটা হিল্লে হয়ে যায়। গোটা তিরিশেক টাকা যদি—

শংকর। টাকা দেওয়ার ক্ষমতা আমার সত্যিই নেই। তাছাড়া আমার নিজের সংসারই অতি কষ্টে চলে। বস্তির আর পাঁচজনের মতই আমারও একই অবস্থা। আমায় মাপ করুন, এখন আমি টাকা দিতে পারবো না।

শেখর। সেকি মশাই! আমরা যে অনেক আশা ভরসা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি। মাল না খসালে চলবে কি করে ? হেঁ হেঁ হেঁ বস্তিতে থেকে কেচ্ছা করছেন—ভালো, আমরাই তো সামলাবো কি বলুন মশাই ? হেঁ, হেঁ, হেঁ। ভালো খুব ভালো—বড়লোকের বাচ্চারা দুবেলা ঘরে এসে ন্যালা দিচ্ছে। জমেছে, বেশ জমেছে মশাই।—অ্যাঁ হেঁ হেঁ—

শংকর। দেখুন কথাবার্তা একটু ভদ্রভাবে সামলে বলুন। আপনি এখন দয়া করে আসতে পারেন।

শেখর। সেতো আসবোই। আপনারা শিক্ষিত, হেঁ হেঁ ভদ্রতা আর শিখলাম কোথায় ? তবে বলে দিচ্ছি এসব লট্‌পট্‌ বেশিদিন এখানে চলবে না হেঁ হেঁ—একটু সামলে চলুন! চারদিকে সব ৰি ৰি করছে যে—চলি হেঁ হেঁ চলি—

[শেখরের প্রস্থান এবং কমলেশের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে শেখর এবং তার সঙ্গীদের হাসাহাসির আওয়াজ শোনা যায়।]

কমলেশ। কি ব্যাপার শঙ্কর ? বাইরে এত লোক কেন ?

শঙ্কর। ও কিছু নয়। Function করবে তার চাঁদা।

কমলেশ। ও—

(কাজলের প্রবেশ)

কাজল। আরে! কমলেশবাবু যে ? আপনি কতক্ষণ ?

কমলেশ। এই তো এলাম।

কাজল। তা—চা খাবেন তো ?

কমলেশ। আরে না, বিকেল থেকে পাঁচ কাপ already হয়ে গেছে। এখন আর ওসব ঝামেলা করবেন না, দরকার নেই—

কাজল। সে কি ? আপনি হাসালেন দেখছি। একেবারে ভূতের মুখে রাম নাম ?

কমলেশ। হাসছেন যে ? যাহোক, শঙ্কর তোর সাথে কাজের কথাটা সেরে নি।

শঙ্কর। তোমার, আমার সাথে আর কোন কাজের কথা নেই। তা এতদিন আসিসনি কেন ? বলি—ডুবটা মেরেছিলি কোথায় ? এই কত কথা—তোমার কাছে এসে কোচিং নেবো। পরীক্ষা এসে গেছে। কতকগুলো জিনিষ আমায় বুঝিয়ে দিন শঙ্কর—

কমলেশ। মানে দেখ হঠাৎ একটু অন্যকাজে Engaged হয়ে পড়েছিলাম। পড়াশুনা অবশ্য করেছি—

শঙ্কর। পড়াশুনো অবশ্য করেছি। তোর যত সব হাম্বিতাম্বি।

কমলেশ। (কাজলকে উদ্দেশ্য করে।) আপনি আমাদের দিকে তাকিয়ে কি দেখছেন ?

কাজল। না,—কিছু না।)

(এমন সময় ঘরের দরজার কাছে "টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাম শ্রীশঙ্কর মুখার্জ্জি, বাড়ীতে কে আছেন ?" বলে পিওন বাইরের থেকে চীৎকার করে।)

(শঙ্কর তাড়াতাড়ি দরজার কাছে এগিয়ে যায় এবং টেলিগ্রামটা পড়তে পড়তে ঘরে ফিরে আসে। কোন কথা না বলে কমলেশের হাতে টেলিগ্রামটা তুলে দিয়ে একটা ঝোলানো ব্যাগের মধ্যে একটা জামা আর একটা কাপড় আর সামান্য টুকিটাকি জিনিস ভরতে থাকে।)

কাজল। কি হয়েছে ? কার টেলিগ্রাম ?

কমলেশ। শঙ্করকে এক্ষুণি দেশে রওনা হতে হবে। ওর মা ভীষণ অসুস্থ—

(সকলের মুখে একটা বিষাদের ছায়া নেমে আসে।)

শঙ্কর। (Money bag খুলে কাজলের হাতে কিছু

টাকা দেয়।) আমার হয় তো দেশ থেকে ফিরতে গোটা পনের দিন লাগতে পারে। কেজানে মাকে গিয়ে শেষবারের মতো দেখতে পাবো কিনা ? কোন ভয় নেই কাজল ; সাবধানে থেকো। তাছাড়া কমলেশ রইলো। ও এসে দেখাশুনো করবে। আমি যত শীঘ্র সম্ভব চলে আসবো।

কমলেশ। তোকে ওসব ভাবতে হবে না। আমার গাড়ী রয়েছে। চল, তোকে ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসি।

কাজল। তাড়াহুড়ো করো না। সাবধানে যেও। (তারপর কাজল শঙ্করের কাছে এগিয়ে যায়।) আমার যে বড় ভয় করছে। (কাজল কেঁদে ফেলে)

কমলেশ। কি ছেলেমানুষি করছেন ? চল, চল—

আর দেরী করিসনি শঙ্কর—আরে আমি তো রয়েছি !

শঙ্কর। কমলেশ। (কমলেশের হাত ধরে। নয়ন অশ্রুপূর্ণ। কমলেশ শঙ্করকে নিয়ে তাড়াতাড়ি ষ্টেজ থেকে বেরিয়ে যায়।)

[ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে।]

পঞ্চম দৃশ্য

[শঙ্করের বস্তির সেই ঘর। সময় দুপুর। বাইরে দরজার কড়া নাড়ার আওয়াজ শোনা যায়। কাজল খাটের ওপর শুয়ে বিশ্রাম করছিল। শব্দ শুনে দরজা খুলে দেয়।]

কাজল। কে কমলেশবাবু ; আসুন, আসুন ; ভেতরে আসুন। তা হঠাৎ এই ভর দুপুরে ?

কমলেশ। আপনার কাছে আসবো, শঙ্করের ঘরে আসবো তার আবার সময় অসময় কি ? যা হোক আপনার কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো ?

কাজল। অসুবিধা আর হতে দিচ্ছেন কোথায় ? রোজ দু'বেলা এসে যেভাবে তদ্বির তদারকি করছেন তাতে আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেও ঋণ শোধ হবে বলে আমার মনে হয় না।

কমলেশ। ঋণী হয়ে থাকবার মতো বড় ধরণের কোন কাজ ; অথবা মহৎ কোন ত্যাগ স্বীকার আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কারুর জন্য করতে পেরেছি বলে তো মনে হয়না, অযথা ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্যে স্তুতি থাকতে পারে কিন্তু তাতে ভালবাসার স্পর্শ থাকে না কাজল দেবী, কাউকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার মধ্যে উদারতা নেই। আপনকরে কাছে টেনে নেওয়ার মধ্যেই হয় তো আসলে জীবনের জয় সূচিত হয়।

কাজল। তা ঠিক। তবে আপন করে নেওয়ার মধ্যে একদিকে প্রচ্ছন্নভাবে লুকিয়ে রয়েছে অধিকার, অন্যদিকে দাবী।

কমলেশ। এই দাবী আর অধিকার নিয়ে মানুষের মনের ভেতর জটিলতা ; কি বলেন ? আমাদের মনের ভেতর স্নেহপ্রীতি, প্রেম ভালবাসার মূল্যবোধ সম্বন্ধে আজও একটা অদ্ভুত গোঁড়ামি লুকিয়ে রয়েছে।

কাজল। ব্যাপারটাতো ঠিক পরিষ্কার হচ্ছে না। মানে ঠিক আমি বুঝতে পারছি না।

কমলেশ। খুলে সবটা না বললে না বোঝাই স্বাভাবিক কাজল দেবী। কারণ জলের ভেতর বাস করে মাছ যেমন বুঝতে পারে না জলের চাপ আছে ; তেমনি একটা সংস্কারের ভেতর ডুবে থাকলে তার বাইরে এসে নিজের কোন বোধকে যাচাই করা সত্যিই কঠিন।

কাজল। মানুষের জীবনে সীমিত গণ্ডীর ভেতর, তার বোধের ভেতর সংস্কারকিছুটা থাকবেই তাতে আর আশ্চর্য্য হওয়ার কি আছে ?

কমলেশ। মানুষ যদি উপলব্ধি করতে পারে যে তার বোধের ভেতর কোন সংস্কার রয়েছে তবে সে তা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা নিশ্চয় করবে ; একদিন বেরিয়ে আসবেও। তাহ'লে আপনি নিজেই বলুন কাজল দেবী আপনি সংস্কারটা বোঝেন কিন্তু তা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছেন না।

কাজল। হয়তো তাই। উপলব্ধির গভীরতায় বোধের স্বচ্ছতায় হয়তো আমি ততটা সংগ্রামী, ততটা ধারালো হয়ে উঠতে পারিনি। তাছাড়া হয়তো আমার সংশয় আছে, দ্বিধা আছে, মনের ভেতর দ্বন্দ্ব আছে।

কমলেশ। অখণ্ড সত্য, অখণ্ড বিশ্বাসের যুগ শেষ হয়েছে। খণ্ডবিখণ্ডিত সত্য, বিশ্বাস গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। মানুষের জীবনে অপূর্ণতা যেমন আছে, তেমনি অসম্পূর্ণতা রয়েছে তার চিন্তার ভিতর, উপলব্ধির ভেতর। অসংখ্য বিচিত্র খণ্ডসত্যকে স্বীকার

করার ভেতর মানুষের কোন গোঁড়ামি থাকা উচিত নয় এবং তা স্বীকার করলে মানুষ অশুচি হয়ে যায় না; ছোট হয়ে যায় না।

কাজল। কিন্তু মানুষের বাসনা, লালসা, প্রবৃত্তি মানুষকে ধীরে ধীরে অক্টোপাশের মতো গ্রাস করবে না, সেকথা আপনি জোর দিয়ে বলতে পারেন?

কমলেশ। দাবীর অনেক রূপ আছে রং আছে কাজল দেবী। আমার দাবীকে আপনি ঘৃণা দিয়ে অপমান করেছেন কিন্তু মন দিয়ে শোধন করে পবিত্র করে দেখতে পারেন নি।

কাজল। অমৃত তুলতে গেলে বিষ উঠবেই কিন্তু সে বিষ লেহন করবে কে? শঙ্কর!

কমলেশ। কাজললতা দেবী! শঙ্করকে মাপতে যাবেন না।

কাজল। না মাপতে আমি তাকে চাইনি। শঙ্করের উদারতা, মহত্ব, এবং সারল্যকে মাপা আমার পক্ষে কোন-দিনই সম্ভব নয়।

কমলেশ। আর এটাও কোন দিন মাপতে পারেন নি কমলেশ ব্যানার্জ্জির বুকের ভেতর কত জ্বালা, কত যন্ত্রণা, কত কান্না, হাহাকার করে বেড়াচ্ছে, কত কথা মাথা কুটে দিনরাত তার মনের দরজায় আছড়ে মরছে। সে কত তৃষ্ণার্ত্ত—কত ক্লান্ত সে।

কাজল। যৌবন, দেহ, ভোগলালসা অক্টোপাশের মতো জীবনকে ঘিরে ধরবে। না—না সে হয় না কমলেশ বাবু, এত বিষ পান করতে পারবো না আমি। শঙ্কর, আপনি, আমি, তার জটিল আবর্ত্তে সব ভেসে যাবো, কেউ রক্ষে পাবো না, কেউ না।

কমলেশ। দেহ, যৌবন, ভোগের লালসা, আপনি এগুলোর ওপর খুব বেশী মূল্য আরোপ করে ফেলছেন। একটা পবিত্র সত্যকে পা দিয়ে দলে দিতে চাইছেন, পিষে দিতে চাইছেন—অথচ দেহের পবিত্রতা বলে আপনি যেটা বোঝাতে চাইছেন, সেটা আপনার নেই।

কাজল। কমলেশ বাবু, শঙ্করের উদারতার, ভালবাসার অমর্য্যাদা করবেন না।

কমলেশ। তার ভালবাসার মর্য্যাদাটা আপনি ঠিক ঠিক দিতে পারলেই সুখী হবো কাজললতা দেবী, তবে শঙ্করকে শ্রদ্ধা করুন, ভক্তি করুন আমি সেটাই চাই। কিন্তু আমাকে অপমান করার অধিকার বোধহয় আপনার নেই। যদিও আমার ভালবাসাকে বুকের ঘৃণা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন কিন্তু সে ভালবাসাকে অপবিত্র করবার চেষ্টা করবেন না।

কাজল। পবিত্রকে চেষ্টা করলেই অপবিত্র করা যায় না। আমার দেহ এবং যৌবন আপনার মোহ সৃষ্টি করেছে। ভালবাসার কথাটা বাষ্প ছাড়া আর কিছুই নয়।

কমলেশ। আপনার কাছে হয়তো সেটাকে বাষ্প মনে হওয়া খুব অসম্ভব নয়। কিন্তু দেহের বড়াই, যৌবনের বড়াই, পবিত্রতার দোহাই কমলেশ ব্যানার্জ্জির চোখের সামনে তুলে ধরবেন না। তার বুকে আঁচড় কাটলে, রক্ত বেরুলে,—হয়তো—হয়তো তার হিংস্র থাবা বেরিয়ে আসবে। By request কাজললতা দেবী আপনি তা করবেন না—করবেন না। আপনি আমাকে বুঝতে পারেন নি, আপনি আমাকে চেনেন না,—জানেন না।

(দ্রুত ঘর থেকে প্রস্থান)

[কাজল শঙ্কিত, বিহ্বল, চিন্তামগ্ন, একসময় আবার বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়।]

একটি লোক। (ষ্টেজের বাইরে থেকে) চিঠি আছে, চিঠি,—বাড়ীতে কে আছেন? (কাজল দরজার কাছে এগিয়ে যায় এবং একটা খাম হাতে করে ফিরে আসে)

কাজল। (স্বগতোক্তি) চিঠি তো ডেলিভারি দেওয়ার কথা সেই দুপুরে। অথচ এত সময় বাদে কে যেন চিঠিটা দিয়ে গেল, আশ্চর্য্য! পিয়নরাও দেখছি দরকার অদরকার নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় না। ভাবে, বস্তির লোকতো? যেখানে সেখানে একজনের চিঠি অন্যলোকের হাতে দিয়ে চলে যায়।

[প্রথমে কাজল ঠিকানাটা পড়ে, তারপর সাবধানে খামটা ছিঁড়ে চিঠিটা পড়তে থাকে)

কাজল,

আশা করি তুমি ভাল আছো। তোমার পূর্ব্বের চিঠি পেয়ে যুগপৎ আনন্দিত এবং নিশ্চিন্ত হয়েছি। ওখানে তোমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না জেনে আমার দুশ্চিন্তার কিছুটা লাঘব হয়েছে। আমি জানতাম আমার আপদে

বিপদে কমলেশ ছাড়া আমার পেছনে এসে দাঁড়াবার মতো আর কেউ নাই। ও এত যত্ন নিয়ে যে তোমার দেখা-শুনা করছে তাতে আমি খুব খুশী হয়েছি।

মা ইহলোক ত্যাগ করেছেন। আমার মাথার ওপর আজ এক বিরাট গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত। নিজের মনের ওপর বিশ্বাস রেখো। আরও তীব্রতর সংগ্রামের জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। যাহোক মায়ের পারলৌকিক কাজ গত বুধবার দিন সম্পন্ন হয়েছে। এদিকে যাবতীয় বন্দোবস্ত করে আমি আগামী শনিবার কৈলাসপুর থেকে কোলকাতায় এসে পৌছাবো। ওইদিন রাত দশটার মধ্যে যদি না গিয়ে উপস্থিত হতে পারি তাহ'লে কিন্তু কোন চিন্তা করো না লক্ষীটি, ভেবে নিও আমি অন্য কোন জরুরী কাজে আটকে গেছি। আজ এখানেই শেষ করছি কাজল—

ইতি

তোমার শংকর।

কাজল। (স্বগতোক্তি) তাহলে আজই আসছে, আজই তো শনিবার।

[সময় রাত্রি। যন্ত্রসংগীতের সাহায্যে ঝড়ের আভাস ফুটিয়ে তুলতে হবে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।]

কাজল। (স্বগতোক্তি) ভীষণ ঝড় উঠলো যে! উঃ কি ভীষণ ঝড়!

(তারপরে ঘরের নরবড়ে দরজাটা ভালোকরে বন্ধ করে দেয় এবং চিন্তামগ্ন)

[এমন সময় দরজার কড়ানাড়ার আওয়াজ শোনা যায়। কাজল খুব ব্যস্তভাবে দরজা খুলে দেয়।]

কাজল। কে?

[কমলেশের প্রবেশ, তাকে দেখে ভীষণ ভয়ে কাজল যেন আঁৎকে ওঠে এবং ছুটে ঘরের অপর কোণে চলে যায়।]

অ্যা—

[কমলেশের আগোছালো বেশ, মদ্যপান করেছে বোঝা যাচ্ছে, শরীরেরভারসাম্য তাই বজায় রাখতে পারছে না। পা কিছুটা টলছে—বৃষ্টির জলে পোশাক ভেজা।)

কমলেশ। আমায় ঠিক ঠিক চিনতে পারছেন না কাজললতা দেবী। (তারপর একসময় টলতে টলতে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দেয়) ঝড় উঠেছে, বাইরে ভীষণ ঝড়—অ্যা—কি বলুন কাজললতা দেবী। অ্যাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ আমার বুকের ভেতরটায়ও ভীষণ তোলপাড় চলছে। Storm—No No cyclone, ভিসুভিয়াস্, I mean volcanic eruption হাঃ হাঃ হাঃ—

কাজল। কমলেশবাবু! আপনি এইসব ছাইপাঁশ গিলে কেন এখানে এসেছেন? আপনি কি চান?

কমলেশ। কি চাই? হাঃ হাঃ হাঃ, কিচ্ছু নয়। Nothing—আমায় তো আপনি বসতে বললেন না, আদর করে চা খাওয়ার কথা বললেন না! এরকম একটা ঝড়ের রাত বিফল হয়ে যায় কাজললতা দেবী!—না—না। তা হয় না। কি বলুন? অ্যাঁ হাঃ হাঃ হাঃ—

কাজল। আপনার কোন অপমান বোধ নেই, লজ্জা নেই? বন্ধুর অসহায়তার সুযোগ নিয়ে—

কমলেশ। No—No—No. I beg your pardon. খারাপ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এখানে আসিনি—শঙ্করের সাথে দেখা করবো বলে এসেছি। কারণ সে আমায়—আমায় চিঠি দিয়েছে সে আসবে। তারসাথে একটু জরুরী দরকার আছে—

কাজল। "শংকরের সাথে দেখা করতে এসেছি। তারসাথে আমার দরকার আছে"—যত সব মিথ্যে কথা।

কমলেশ। সেই—এক কথা—হাঃ হাঃ হাঃ—ছোবল মেরে লাভ হবে না

কাজল। বুঝেছি—আপনি এখন এই অবস্থায় কেন এসেছেন। You are too mean, আপনি অতি নীচ। —আমি এতদিন যা ভেবে এসেছিলাম সেইটাই তবে ঠিক —আপনি ঘৃণারও অযোগ্য। ঘর থেকে বেরিয়ে যান বলে দিচ্ছি। বেরিয়ে যান।

কমলেশ। বাইরে ভীষণ ঝড়, ভীষণ বৃষ্টি—I mean cyclone বুকের ভেতরটায়—অ্যাঁ—কোথায় যাবো? আপনার কাছে এসেছি কাজললতা দেবী। শংকরের সাথে দেখা আমায় করে যেতেই হবে। না—না আপনি আমায় যা ভাবছেন সেজন্য আমি এখানে আসিনি। অন্ততঃ কমলেশ ব্যানার্জ্জি, শংকরের বন্ধু, সেজন্য এখানে আসবে না।

কাজল। হ্যাঁ, আপনি সেইজন্যই এসেছেন। শঙ্করকে নিরীহ পেয়ে, আমার মতো একটা অসহায় মেয়েকে আপনি

হাতের মুঠোর পেয়ে আপনি যা ইচ্ছে তাই করতে চাইছেন। আপনার লজ্জা নেই, অপমানজ্ঞান নেই, ঘেন্না নেই। আপনি ছোটলোক, ইতর, অতি নীচ—

কমলেশ। কাজললতা দেবী! আপনি কাকে কি বলছেন জানেন?

কাজল। জানি—জানি। আমার দেহটাই আপনার কাছে সবকিছু। আপনার মান, সম্ভ্রম, ইজ্জত, আপনার কাছে কিছু নয়—কিছু নয়। আপনার বন্ধুত্ব, প্রেম, ভালবাসা—সব আপনার একটা ভাঁওতা—

কমলেশ। তাই নাকি? হাঃ হাঃ হাঃ—আমি রাজা বাহাদুর খেতাব পাওয়া বংশের ছেলে শ্রীকমলেশ ব্যানার্জি। তবে তাই হোক—হাঃ হাঃ হাঃ এসো—এসো কাজল; আমার বুকের কাছে এসো ভয় কি? না—না লজ্জা করোনা, It's a fine cyclone, we can enjoy.

(কমলেশ ধীরে ধীরে একপা দু'পা করে কাজলের দিকে এগিয়ে যায়। কাজল আবার আঁৎকে ওঠে।)

কাজল। অ্যাঁ—

(তারপর মুহূর্তে কাজলের মুখচোখের ভীষণ পরিবর্তন হয়)

কমলেশ। এসো—এসো—কাছে এস। (কমলেশ ধীরে ধীরে কাজলের গলার কাছে আদরের ভঙ্গীতে হাত নিয়ে যায় কিন্তু হঠাৎ তার গলা নিজের দুহাতে সজোরে টিপে ধরে।) হাঃ হাঃ হাঃ—

কাজল। (ক্রমে তার দম বন্ধ হয়ে আসে) উঃ আঃ ছাড়ুন, কমলেশবাবু। কি করছেন? কমলেশ—উঃ আঃ শ—ঙ্ক—র—উঃ-(ভীষণ ঝটপট্ করার পর কাজলের দেহ ক্রমে শিথিল হয়ে আসে। বাইরে ঝড়ের শব্দ শোনা যায়।)

(ভীষণ ভাবে দরজার কড়ানাড়ার আওয়াজ শোনা যায়)

শংকর। (বাইরে থেকে) কাজল! কাজল, দরজা খোল, কাজল? তাড়াতাড়ি দরজা খোল। কাজল! কাজল—(দরজা ভেঙে ফেলে শংকর ঘরে প্রবেশ করে এবং আঁৎকে ওঠে।)

শংকর। কমলেশ! কমলেশ—

কাজল! কাজল—কি হয়েছে তোমার? কথা বলছো না কেন! কথা বলো লক্ষ্মীটি, কথা বলো—

কমলেশ। (নিজের হাত নিরীক্ষণ করে) হাঃ হাঃ হাঃ সব শেষ। Blood হ্যাঁ—হ্যাঁ—No Tears—হাঃ হাঃ হাঃ—

শংকর। নেই—নেই। একি? কাজল নেই? কমলেশ? কমলেশ?

(শংকর খপ্ করে কমলেশের হাতটা ধরে ফেলে কিন্তু কমলেশ একঝটকায় সেটা ছাড়িয়ে নিয়ে ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে যায়।)

শংকর। তুমি কথা বলো কাজল—কথা বলো? আমি এসেছি—কমলেশ কোথায় পালাবে? আমি তাকে খুঁজে বার করবো, করবো, করবো—

[যবনিকা নেমে আসে]

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীতম্ মহাভারতম্ শান্তিপর্ব

বঙ্গানুবাদ : স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ দণ্ডোহথ পরিশব্দিতঃ।
প্রকাশোহষ্টবিধস্তত্র গুহ্যশ্চ বহুবিস্তরঃ ॥৪০

প্রকাশ্য ও গোপনীয় এই দুই প্রকারের দণ্ডের (সেনার) কথা বর্ণন করা হয়েছে সেই শাস্ত্রে। এরমধ্যে প্রকট সেনা আট প্রকারের, আর গুপ্ত সেনা বহু প্রকারের বর্ণিত হয়েছে।

রথা নাগা হয়াশ্চৈব পাদাতশ্চৈব পাণ্ডব।
বিষ্টির্নাবশ্চরাশ্চৈব দেশিকা ইতি চাষ্টমম্ ॥৪১
অঙ্গান্যেতানি কৌরব্য প্রকাশানি বলস্য তু।
জঙ্গমাজঙ্গমাশ্চোক্তাশ্চূর্ণযোগা বিষাদয়ঃ ॥ ॥৪২

হে কুরুবংশী পাণ্ডুনন্দন, রথ, হাতী, ঘোড়া, পদাতিক, বুদ্ধি দেবার লোক, নৌকারোহী, গুপ্তচর তথা কর্তব্যো-পদেশকারী গুরু—এ সকল সেনানীর আট প্রকট ভাগ। সেনার গুপ্ত অঙ্গ হচ্ছে—জঙ্গম, অর্থাৎ সর্পাদি ও অজঙ্গম, অর্থাৎ বিষাক্ত ঔষধি সকল।

স্পর্শে চাভ্যবহার্যে চাপ্যুপাংশুবিবিধঃ স্মৃতঃ।
অরির্মিত্র উদাসীন ইত্যেতেহপ্যনুবর্ণিতাঃ ॥৪৩

এই গোপনীয় দণ্ডসাধন বিষ আদি শত্রুপক্ষের লোকের বস্ত্র প্রভৃতির সঙ্গে স্পর্শ করিয়ে অথবা তাদের ভোজ্য দ্রব্যের সঙ্গে মিশিয়ে দেবার জন্য ব্যবহৃত হত। বিভিন্ন মন্ত্রজপের প্রয়োগের কথাও নীতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে। এ ছাড়া এ গ্রন্থে শত্রু মিত্রতে উদাসীনের কথা বার বার বর্ণন করা হয়েছে।

কৃৎস্না মার্গগুণাশ্চৈব তথা ভূমিগুণাশ্চ হ।
আত্মরক্ষণমাশ্বাসঃ সর্গাণাং চান্ববেক্ষণম্ ॥৪৪

পথের সমস্ত গুণ, ভূমির গুণ, আত্মরক্ষার উপায়, আশ্বাসন ও রথ আদির নির্মাণ, আর নিরীক্ষণ আদির বর্ণনা রয়েছে।

কল্পনা বিবিধাশ্চাপি নৃনাগরথবাজিনাম্।
ব্যূহাশ্চ বিবিধাভিখ্যা বিচিত্রং যুদ্ধকৌশলম্ ॥৪৫

উৎপাতাশ্চ নিপাতাশ্চসুযুদ্ধং সুপলায়িতম্।
শস্ত্রাণাং পালনং জ্ঞানং তথৈব ভরর্ষভ ॥৪৬

সেনাবাহিনীকে পুষ্ট করণার্থে অনেক প্রকারের যোগ, হাতী, ঘোড়া, রথ, আর মনুষ্য সেনা দিয়ে কত রকমের ব্যূহ রচনা, নানাপ্রকারের যুদ্ধ কৌশল, উর্দ্ধগমন, নিম্নগমন, কুশলতাপূর্বক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন, এই সকল উপায়ের বর্ণন এই গ্রন্থে আছে। হে ভরতর্ষভ, শস্ত্র সকল রক্ষারও প্রয়োগের উপায়ও উল্লিখিত হয়েছে।

বলব্যসনমুক্তং চ তথৈব বলহর্ষণম্।
পীড়া চাপদকালশ্চ পত্তিজ্ঞানং চ পাণ্ডব ॥৪৭

পাণ্ডুনন্দন, বিপদ থেকে সেনাদের উদ্ধার করা, সৈনিকদের হর্ষ ও উৎসাহ বাড়ানো, পীড়া ও আপদের সময়ে পদাতিক সৈনিকদের প্রভুভক্তি পরীক্ষা করা,—এই সকলের কথাই এই শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে।

তথা খাতবিধানং চ যোগঃ সংসার এব চ।
চোরৈরাটবিকৈশ্চোগ্রৈঃ পররাষ্ট্রস্য পীড়নম্ ॥৪৮
অগ্নিদৈর্গরদৈশ্চৈব প্রতিরূপককারকৈঃ।
শ্রেণিমুখ্যোপজাপেন বীরুধশ্ছেদনেন চ ॥৪৯
দূষণেন চ নাগানামাতঙ্কজননেন চ।
আরাধনেন ভক্তস্য প্রত্যয়োপার্জনেন চ ॥৫০

দুর্গের চারিধারে খাতখনন, যুদ্ধের জন্যে সেনাকে সজ্জিত করা, যুদ্ধযাত্রা করা, চোর বা ভয়ানক জঙ্গল দস্যু দ্বারা শত্রুরাষ্ট্রকে পীড়া দেওয়া, আগুন লাগিয়ে, বিষ-প্রয়োগ করে, ছদ্মবেশধারী লোকের দ্বারা শত্রুর ক্ষতি করা, তারপর, শত্রুদলের প্রধান প্রধান কর্তাদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করা, ফসল ও গাছ কেটে নেওয়া, হস্তী সকলকে ভড়কে দেওয়া, লোকদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা, শত্রুদের মধ্যে অনুরক্ত পুরুষকে অনুনয়-আদি দ্বারা ভাঙ্গিয়ে নেওয়া, শত্রুপক্ষীয় লোকদের মধ্যে নিজের প্রতি বিশ্বাস সৃষ্টি করা, ইত্যাদি উপায়ে শত্রুর রাষ্ট্রকে পীড়া দেওয়া ফলাও ব্রহ্মার উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

সপ্তাঙ্গস্য চ রাজ্যস্য হ্রাসবৃদ্ধিসমঞ্জসম্।
দূত সামর্থ্য সংযোগাৎ রাষ্ট্রস্য চ বিবর্ধনম্ ॥৫১

অরিমধ্যস্থ মিত্রাণাং সম্যক্ চোক্তং প্রপঞ্চনম্।
অবমর্দঃ প্রতীঘাতস্তথৈব চ বলীয়সাম্ ॥৫২

সাত অঙ্গযুক্ত রাজ্যের হ্রাস বৃদ্ধি, সাম্যভাবে স্থিতি, দূতের সামর্থ্য দ্বারা নিজের ও নিজের রাষ্ট্রের বৃদ্ধি, শত্রু, মিত্র ও মধ্যস্থদের বিস্তারপূর্বক সম্যক্ বিবেচন, বলবান্ শত্রুকে দমন ও বাধা দেওয়া প্রভৃতির বিধিও এই গ্রন্থের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্যবহারঃ সুসূক্ষ্মশ্চ তথা কণ্টকশোধনম্।
শ্রমো ব্যায়াম যোগশ্চ ত্যাগঃ দ্রব্যস্য সংগ্রহঃ ॥ ৫৩

বিচারকদের দ্বারা সূক্ষ্ম বিচার, ক্ষুদ্র শত্রু নিরসন, শ্রম, ব্যায়াম, ধনের সঞ্চয় ও ব্যয় সম্বন্ধে তাতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

অভৃতানাঞ্চ ভরণং ভৃতানাং চান্বেক্ষণম্
অর্থস্যকালে দানঞ্চ ব্যসনে চাপ্রমদিতা ॥৫৩

দরিদ্রের ভরণপোষণ, যাদের ভরণপোষণ চলে তাদের সংরক্ষণ, ঠিক সময়ে অর্থদান, ব্যসনে অনাসক্তির কথাও বলা হয়েছে।

তথা রাজগুণাশ্চৈব সেনাপতি গুণাশ্চ হ।
কারণঞ্চ ত্রিবর্গস্য গুণদোষাস্তথৈব চ ॥৫৫

নরপতির গুণ, সেনাপতির গুণ, ধর্ম, অর্থ ও কামের হেতু গুণ এবং দোষ সেই শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে।

দুশ্চেষ্টিতঞ্চ বিবিধং বৃত্তিশ্চৈবানুবর্তিনাম্।
শঙ্কিতঞ্চ সর্বস্য প্রমাদস্য চ বর্জনম্ ॥৫৫

দুর্জনের নানাবিধ দুশ্চেষ্টা, অনুবর্তী লোকের ব্যবহার, সকলের উপর রাজার শঙ্কা ও অসাবধানতা পরিহার করা —এ-বিষয়েও সেই শাস্ত্রে উপদেশ রয়েছে।

অলব্ধলাভো লব্ধস্য তথৈব চ বিবর্দ্ধনম্।
প্রদানঞ্চ বিবৃদ্ধস্য পাত্রেভ্যো বিধিবত্ততঃ ॥৫৭

অলব্ধ অর্থের লাভ, লব্ধ অর্থের বৃদ্ধিসাধন ও যথাযথ ভাবে সৎপাত্রে সেই বর্দ্ধিত অর্থের প্রদান, সে বিষয়েও এই গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

বিসর্গোঽর্থস্য ধর্মার্থং কামহেতুকমুচ্যতে।
চতুর্থং ব্যসনাঘাতে তথৈবাত্রানুবর্ণিতম্ ॥৫৮

প্রথমতঃ ধর্মের জন্য, দ্বিতীয়তঃ কামের জন্য, তৃতীয়তঃ রোগনিবারণার্থে ব্যয়, তারপর চতুর্থতঃ বিপৎপ্রতীকারে ব্যয়ের নির্দেশও সেই শাস্ত্রে আছে।

ক্রোধজানি তথোগ্রাণি কামজানি তথৈব চ।
দশোক্তানি কুরুশ্রেষ্ঠ! ব্যসনান্যত্র চৈব হ ॥৫৯

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! সেই শাস্ত্রে ক্রোধজ ছয় প্রকার উগ্র ব্যসন ও কামজ চারি প্রকার কোমল ব্যসন বর্ণিত হয়েছে।

মৃগয়াক্ষাস্তথা পানং স্ত্রিয়শ্চ ভারতর্ষভ।
কামজান্যাহুরাচার্যাঃ প্রোক্তানীহ স্বয়ম্ভুবা ॥৬০

হে ভারতবর্ষ! মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, সুরাপান ও স্ত্রী-বিলাস এই চারি প্রকার ব্যসনকে আচার্যগণ কোমল ব্যসন বলেন। এ সকলও ব্রহ্মারচিত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

[ক্রমশঃ

বিশ্বভাষা পরিক্রমা

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বাংলা ভাষা ও তার ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের গুরুতর প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করার জন্যে বাংলা ভাষার বাসভূমির চতুঃসীমা একবার মাপা দরকার। উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা, নেপাল, সিকিম ও ভুটান রাজ্য, পূর্বে পাতকোই পর্বতশ্রেণী, আসামের সমতলভূমি, গারো-খাসিয়া-জয়ন্তিয়া-মিকির-লুসাই পাহাড়, মণিপুর রাজ্য ও ব্রহ্মদেশের জঙ্গল, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে ওড়িশা বা উৎকল, ছোটনাগপুরের জঙ্গল, সাঁওতাল পরগণা ও রাজমহল পাহাড়—এই হল বর্তমান বাংলাভাষী এলাকার চৌহদ্দি বা বাংলা দেশ।

বাংলা দেশের পাহাড়-পর্বত-জঙ্গল-সাগরঘেরা প্রশস্ত সমতল রূপটির ভৌগোলিক ঐক্য ও অখণ্ডতা নিয়ে তর্ক বা সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐক্য জাতিপরিচয় স্মরণাতীত কাল থেকে স্বীকৃত ও স্বকীয়তা মণ্ডিত। নিতান্ত সাম্প্রতিক কালের কথা বাদ দিলে এই অঞ্চলে ধর্মীয় কারণে একরাষ্ট্র গঠনে আগে কোন বাধা ছিল না। বর্তমানে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থায় বাংলা দেশ নামক একভাষী একজাতি ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক এককটির রাষ্ট্রীয় গঠন কেমন হতে পারে, তাই আলোচ্য।

সমস্ত বাংলাভাষী এলাকাটা একত্র ক'রে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ার প্রয়াস ঐতিহাসিক কালে প্রথম আরম্ভ হয় অষ্টম শতাব্দীতে প্রধানত পাল বংশের দ্বারা। তার আগেও বাংলা দেশের বা গৌড়-রাঢ়-সুহ্ম-বরেন্দ্র-পুণ্ড্রবর্ধন-বঙ্গ-সমতট এলাকার অস্তিত্ব ছিল। সভ্য জনগোষ্ঠীরূপেই ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলগুলির অস্তিত্ব ইতিহাসে ও পুরাণে স্বীকৃত ছিল অষ্টম শতাব্দীর অনেক আগে থেকে। কিন্তু এখন বাংলার ইতিহাসের বদলে বাঙালির ইতিহাস আমাদের আলোচ্য হওয়ায় যখন থেকে ভৌগোলিক বাংলাদেশে বাংলাভাষী জাতির উদ্ভব হল, মাত্র তখন থেকে বাঙালির রাষ্ট্রীয় বিবর্তনের ধারাটুকু আমাদের বিবেচ্য।

কেবল বাংলাভাষী সমস্ত এলাকাটা একত্র ক'রে কোন অন্যভাষানিরপেক্ষ মাত্র একভাষী ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা ঐতিহাসিক কালে কখনও হয় নি। মাত্র বর্তমানে কয়েকটি ছোট রাজনৈতিক দলকে ইউরোপীয় আদর্শে এ-ব্যাপারে উৎসাহী দেখা যাচ্ছে। ভবিষ্যতে অবশ্য এই রকম কোন দলই বাংলা দেশে রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তার করবে। কোন তথাকথিত সর্বভারতীয় দল বর্তমান জগতের ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলনের সঙ্গে সমতালে চলতে শেষ পর্যন্ত সমর্থ হতে পারে না। কিন্তু যত দিন একটি শক্তিশালী বাঙালি জাতীয় দল গ'ড়ে না ওঠে, তত দিন এ-কথা মেনে নেওয়া উচিত যে, আধুনিক অর্থে সংহত স্বাধীন জাতি বলতে যা বোঝায়, বাঙালি তা কখনও ছিল না এবং আজও নয়।

পৃথিবীতে এমন রাষ্ট্রীয় সংহতিহীনতার দৃষ্টান্ত অজস্র ছিল এবং আছে। জার্মানি ও ইতালির রাষ্ট্রীয় সংহতি ও স্বাধীনতা মাত্র এক শতাব্দী কালের; এখনও তারা পূর্ণ সংহতি লাভ করে নি, সুতরাং বাঙালির হতাশ বা নিরুদ্যম হবার কোন কারণ নেই।

বাঙালির ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবময় যুগ পাল রাজত্বেও রাষ্ট্রভাষা ছিল সংস্কৃত। বাংলা ভাষা বাঙালির রাষ্ট্রভাষা কোন কালেই হয় নি। পাল রাজাদের আমলে আর হোসেন শাহের সময়ে বাংলা ভাষা কতকটা উৎসাহ পেয়েছিল, এই মাত্র। মোগল যুগে যে বাংলা সুবা গঠিত হয়েছিল, তাও শুধু সমস্ত বাংলাভাষী এলাকাটা নিয়ে নয়, তাতে বাংলাভাষী এলাকার সঙ্গে অন্য অনেকভাষী অঞ্চল সংযুক্ত ছিল। পাল রাজারা সম্রাট হ'য়ে উঠেছিলেন;

বাংলাভাষী এলাকার সঙ্গে তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিভিন্নভাষী অঞ্চল একত্র শাসন করতেন। সেন রাজত্বের সম্বন্ধেও এ-কথা প্রযোজ্য। তুর্কি আমলে, স্বাধীন সুলতানদের আমলে, মোগল যুগে বা তার শেষ দিকে স্বাধীন নবাবদের আমলে কোন সময়ে এমন অবস্থা আসেনি যখন শুধু সমস্ত বাংলাভাষী এলাকাটা নিয়ে একটি অখণ্ড বঙ্গ রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল। বর্তমানে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির আনুকূল্যে বাঙালি এই রকম একটি রাষ্ট্র গড়্‌বার সুযোগ পেয়েছে। পাল বা সেন রাজারা সমস্ত বাংলাভাষী এলাকাটা কোন সময়ে একত্র শাসন করার সুযোগ পেয়েছিল কিনা সন্দেহ, যদিও তাঁরা আরো অনেক ভিন্নভাষী এলাকা তাঁদের সাম্রাজ্যে সংযুক্ত করতে পেরেছিলেন। মোগল অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হলে সর্বপ্রথম বাংলা সুবার ভেতরে সম্ভবত সমস্ত বাংলাভাষী এলাকাটা একত্র হয়, যদিও কাছাড়সহ প্রায় সমগ্র আসামকে তখন বাংলাভাষী এলাকা ব'লে ধরলে এমন কি মোগল রাজত্বেও সব বাংলাভাষী একত্র হবার সুযোগ পায় নি। কিন্তু তখনও কেবল বাংলাভাষী কোন সুবা বা প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্য গঠিত হয় নি, স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন দেখা তো দূরের কথা। মাত্র ইংরেজ রাজত্বে সমস্ত বাঙালী এক সার্বভৌম শাসনাধীনে একত্র হবার সুযোগ পেয়েছিল, তার আগে বা পরে আর কখনও নয়। ইংরেজ গঠিত বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতেও বাঙালীকে ভিন্নভাষী এলাকার সঙ্গে থাকতে হয়েছে, শুধু বাঙালীদের নিয়ে একটি প্রদেশ ইংরেজরাও কখনও গঠন করে নি। মোট কথা, সুইডেন বা পোর্তুগালের মতো একটি একভাষী সংহত অখণ্ড রাষ্ট্র বা প্রদেশরূপে বাংলাদেশের অস্তিত্ব কখনও কোন রাজত্বে এযাবৎ সম্ভব হয় নি।

বাঙালির উদ্ভব যবেই হয়ে থাক, ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগে রাষ্ট্রীয় প্রশ্নে ধর্মের ভূমিকা গুরুতর কিছু ছিল না। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে মুসলিম শক্তির হিসেব নিকেশ ক'রে বাঙালির রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় পরিবর্তন ও অগ্রগতির বিচার করতে হবে। এ-কাজ করতে যিনি পারবেন না, তিনি বর্তমানে বাংলাদেশে বাঙালির যুগসঙ্কটে তার পথনির্দেশ করতে পারবেন না। বাঙালির যুগসমস্যা সমাধানের জন্যে বিভিন্ন সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, অরবিন্দ, বিনয়কুমার, মোহিতলাল, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি নেতা ও মনীষীরা প্রাণপণে চিন্তাশক্তির অনুশীলন করেছেন। চিত্তরঞ্জন সমস্যার স্বরূপ বুঝলেও সমাধান নির্ণয়ে ভুল করেছিলেন; আর অরবিন্দ পরে শ্রীঅরবিন্দ হয়ে ভুল সংশোধন করলেও প্রথমে বাঙালির জাতীয় আন্দোলনের অকালবোধন ক'রে বাঙালির গুরুতর অনিষ্টের কারণ হয়েছিলেন। বাঙালি বনাম মুসলিম শক্তি—এই জটিল জাতীয় প্রশ্নে বঙ্কিমচন্দ্র, বিনয়কুমার ও সুভাষচন্দ্রের সমাধান উৎকৃষ্ট হলেও মনে হয়, সমস্যাটির সর্বোত্তম উপলব্ধি বিবৃত হয়েছিল কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের অনুপম রচনায়।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, জন চার-পাঁচ বাঙালি মনীষী ও নেতা ছাড়া প্রায় সমস্ত বাঙালি রাজনীতিক এ-ব্যাপারটা বুঝতে পারেন নি বা বুঝতে চান নি যে, যত দিন সম্প্রদায়নির্বিশেষে বাঙালি নিজেকে আগে বাঙালি পরে হিন্দু, মুসলমান, ভারতীয় বা পাকিস্তানি ভাবতে না শিখছে, ততদিন বাঙালির তথাকথিত স্বদেশি আন্দোলন একটা মাত্রাতিরিক্ত আত্মঘাতী উচ্ছ্বাসের ব্যাপারমাত্র হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বাঙালি যদি নিজেকে আগে ভারতীয় বা পাকিস্তানি পরে বাঙালি, কিম্বা আগে হিন্দু বা মুসলমান পরে বাঙালি, কিম্বা আগে বাঙালি মুসলমান বা বাঙালি হিন্দু পরে বাঙালি ভাবতে থাকে—যা এখনও পর্যন্ত প্রায় সব বাঙালির চিন্তার বিষয়—তা হলে বাঙালি কখনও জার্মান, জাপানি, ফরাসি বা ইতালীয় মাপের তো দূরের কথা, নেপালি, থাই বা কাম্বোজ মাপের রাষ্ট্রও গড়তে পারবে না।

শ্রীঅরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব, মানবেন্দ্রনাথ, সূর্য সেন প্রভৃতি সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের বীরত্বের সুখ্যাতি ক'রেও বলতে হবে যে, তাঁরা স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময়ে নিজেদের সর্বাগ্রে বাঙালি ব'লে ভাবতে শেখেন নি। পরে শ্রীঅরবিন্দ ও মানবেন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন একেবারে বদলে গেলেও ১৯০৫ সালের আন্দোলনের যুগে বিপ্লবীরা প্রায় সবাই ছিলেন মাতৃমন্ত্রের উপাসক। ভারতমাতা কি জয়, জয় মা কালী ইত্যাদি ধ্বনিতে স্বাধীনতাপ্রিয় হয়ে উঠলেও বাঙালি মুসলমানদের চিত্ত কেন সাড়া দেবে, সে-প্রশ্নের উত্তর তাঁরা চিন্তাও করেন নি। এ-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :—

"তোমরা দেশকে দেবতা বানিয়ে বর পাবার জন্যে

হাত পেতে ব'সে রয়েছ। মুসলমান-শাসনে বর্গি বল, শিখ বল, নিজের হাতে অস্ত্র নিয়ে ফল চেয়েছিল, বাঙালি তার দেবীমূর্তির হাতে অস্ত্র দিয়ে মন্ত্র প'ড়ে ফল কামনা করেছিল। কিন্তু দেশ দেবী নয়। তাই ফলের মধ্যে কেবল ছাগ-মহিষের মুণ্ডপাত হল।" (ঘরে-বাইরে, ১৭৬-৭৭ পৃষ্ঠা।)

অবশ্য সত্যের খাতিরে আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, ভবানী, দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী মাতাদের উপাসকদের হাতে কিছু কিছু সাহেব মেমেরও মুণ্ডপাত হয়েছিল। কিন্তু স্বদেশি আন্দোলনের ধর্মীয় প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম ধর্মান্ধতা জেগে উঠতে দেরি হল না। বাঙালি হিন্দু নেতাদের মতোই তখনকার বাঙালি মুসলমান নেতারাও নিজেদের ধর্মের কথা আগে, ভাষা ও জাতির কথা পরে না ভাবলে ভাগ-বাঁটোয়ারার মামলা সহজে জমে উঠ্‌ত না। ফলে এক দিকে পাওয়া গেল মুকুন্দ দাসের শ্যামাসঙ্গীত ধরণের দেশগীতিকা অন্যদিকে আরবের মরুভূমির মরীচিকার স্বপ্নে মশ্‌গুল গায়কের কণ্ঠ শোনা গেল। বাঙালির ঘরোয়া গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনার পাশাপাশি শাতিল আরবের জলধারা কেবল ধর্মোন্মাদনার জন্যেই বয়ে যাওয়া সম্ভবপর।

ধর্মের জঞ্জাল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ধর্মের চেয়ে দেশ, জাতি ও ভাষাকে বড় স্থান দেওয়ার প্রবণতা বাঙালি হিন্দু মুসলমান রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে দীর্ঘকাল দেখা যায় নি। এখনও বাঙালি হিন্দুর সর্বজনীন পূজায় জাতীয় তিনরঙা পতাকার মালা যে-ভাবে ঝোলানো বা টাঙানো হয়, তা কেন সরকার থেকে নিষিদ্ধ করা হয় না, ভাবলে বিস্ময় বোধ হয়। জাতীয় পতাকা কোন বিশেষ ধর্মের অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হলে জাতীয় পতাকা তার ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় মহিমা থেকে বিচ্যুত হয় ব'লে মনে করা সঙ্গত।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাংলাদেশে বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে ধর্মোন্মাদনার ভাবটা ক্রমশ ক'মে গেলেও মুসলমানদের মধ্যে কখনও ধর্মচেতনার চেয়ে জাতীয় বোধের প্রাবল্য দেখা যায় নি। চিত্তরঞ্জন ব্যাপারটা বুঝলেও ভাগ-বাঁটোয়ারায় মুসলমানকে কিছু বেশি দিয়ে আপোষের চেষ্টা করেন। এ-প্রয়াসের ব্যর্থ পরিণাম এখন সকলের জানা। কিন্তু তখন রজাতিরিক্ত ভারতে হিন্দু জাতীয় চেতনার প্রাবল্যের যুগে চিত্তরঞ্জনের ঐ প্রয়াসে কোন কোন নেতা এক কূটনৈতিক সাফল্যের ইঙ্গিত খুঁজে পেলেন। এ-কৌশল আরও বেশি প্রয়োগ ক'রে ভারত-বিভাগ পর্যন্ত হয়েছে। বাংলাদেশে বাঙালি রাজনীতিবিদেরা এ-প্রয়াসের ব্যর্থতা উপলব্ধি ক'রে শেষ পর্যন্ত দুটি স্বতন্ত্র জাতির উদ্ভবের গোড়াপত্তন করলেন: বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি মুসলমান। অর্থাৎ ভারত-বিভাগের দ্বারা এ-সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল যে, আর কখনও হিন্দু-মুসলমান মিলিত ভাবে একটিমাত্র জাতি গঠন করতে পারবে না; আগে যে তারা তা পেরেছিল, তা নয়; কিন্তু তখন সে-আশা ছিল। বৃটিশ ভারত-বিভাগের পরে সে-আশা চিরতরে লুপ্ত হয়েছে। এর জন্যে বাঙালিকে দোষ দেওয়া এই জন্যে ঠিক হবে না যে, ধর্মের ভিত্তিতে হিন্দু ও মুসলমান জাতি গঠনের পরিকল্পনা বাঙালির মাথায় প্রথম আসে নি। মহারাষ্ট্র থেকে এক হিন্দু জাতীয়তার বন্ধনে সারা ভারতবর্ষকে বাঁধবার পরিকল্পনা দীর্ঘকাল থেকে—অন্তত সপ্তদশ শতাব্দী থেকে—সক্রিয় ছিল। তার প্রত্যুত্তরে অতি ধর্ম-সচেতন মুসলিম সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে সারা ভারতের মুসলমানদের জন্যে একটি মুসলিম বাসভূমি বা রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনাও প্রচলিত হয়। এটিও পশ্চিম ভারত থেকে অবাঙালি মুসলমানের উদ্যমে রচিত। ভারত-বিভাগের পরিকল্পনার জন্যে বাঙালি হিন্দু-মুসলমানদের খুব বেশি দায়ী করা যায় না। কিন্তু ভারত-বিভাগ যখন কার্যকর হল, তখন আর সব বাঙলাভাষীর এক জাতি হবার উপায় রইল না। দুটি নতুন জাতির গোড়াপত্তন হল ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে: বাঙালি হিন্দু জাতি যার রাষ্ট্র হল পশ্চিমবঙ্গ, আর বাঙালি মুসলমান জাতি যার রাষ্ট্র হল পূর্ব বঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তান বা সম্ভাব্য বাঙালিস্থান।

অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন প্রথম দেখেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর স্বপ্ন ও সাধনার মর্ম কিছুমাত্র বুঝতে না পেরে একদিকে হিন্দু রাজনৈতিক নেতারা ভবানী মন্দির, গুপ্তবিপ্লবী মঠপ্রভৃতি স্থাপন ক'রে হিন্দুধর্মভাবাপ্লুত বৈপ্লবিক সাধনায় মনোনিবেশ করলেন, অন্যদিকে প্রচার হতে লাগল যে বঙ্কিমচন্দ্র সাম্প্রদায়িক হিন্দু এবং "বন্দে মাতরম্‌" দুর্গানামক পুতুলপূজার মন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। দেশ ছাড়া অন্য প্রতিমা যে উপাস্য নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের এমন

বিস্ময়কর বৈপ্লবিক প্রগতিশীল মতবাদের এই অপব্যাখ্যা করা হল যে, বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতীর বন্দনামন্ত্র রচনা করেছেন! এই ব্যাখ্যা দেওয়া আধুনিক বাঙালি হিন্দুর কাছেও একটা মহা উদারতা ও প্রগতির পরিচয়। বঙ্কিমচন্দ্রকে "সাম্প্রদায়িক" বদনাম দিতে পারলে এই শ্রেণীর সাধারণ বাঙালি পাঠক একটা চিত্তপ্রকর্ষজাত গৌরব অনুভব করে। "পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার।"

বিবেকানন্দ অনলঙ্কৃত এক কথায় পথনির্দেশ দিয়েছিলেন: আগামী পঞ্চাশ বছর দেশই তোমাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা হোক। বিনয়কুমার বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ্য ও আদর্শ সহজবোধ্য চোয়াড়ে ভাষায় বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যা হবার নয়, তা হল না। দেশ, জাতি ও ভাষার মতো ভৌগোলিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়কে আধ্যাত্মিকতা ও ধর্মসাধনা মিশিয়ে এমন অপরূপ রাজনৈতিক খিচুড়িভোগ পরিবেশিত হল যে, বাঙালি তার শ্রেষ্ঠ মনীষীদের কথায় কান না দিয়ে অবাঙালি রাজনীতিজ্ঞ দিশারীদের ইঙ্গিতে পরিচালিত হতে লাগ্‌ল। এর পরিণামে বাঙালি জনগোষ্ঠী অর্থাৎ বাংলাভাষীরা দুটি জাতিতে পরিণত হল। একটা কথা মনে রাখতে হবে: ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে পরবর্তী কোন সময়ে বাঙালীরা এক জাতি ছিল না। কিন্তু অন্তত এই আশা ছিল যে, একদিন বিভেদ ভুলে সব বাংলাভাষী এক জাতি হয়ে উঠবে। সেই আশায় অতি ভয়ানক বাধা এনে দিয়েছে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট। যে-জনগোষ্ঠী প্রায় অচেতন হয়ে পড়েছিল, সে-জনগোষ্ঠী হঠাৎ রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়ে অনুভব করতে লাগ্‌ল যে, তারা দুটি জাতিতে পরিণত।

১৮৭৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্র স্বাধীন বাংলার স্বপ্নরূপ রচনা করলেন:—

"কোথায় কমলাকান্তপ্রসূতি বঙ্গভূমি! দূরপ্রান্তে দেখিলাম—চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি। এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্ন ভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। এ-মূর্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু এক দিন দেখিব। আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা। এসো মা, গৃহে এসো। যাঁহার ছয় কোটি সন্তান—তাঁহার ভাবনা কি? উঠ মা হিরণ্ময়ি বঙ্গভূমি! এবার সুসন্তান হইব। এসো ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এসো, আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া ছয় কোটি মাথায় বহিয়া ঘরে আনি। কত পুরাবৃত্তকার ঢাকী ঢাক ঘাড়ে করিয়া বঙ্গের বাজনা বাজাইয়া আকাশ ফাটাইবে, কত দেশি বিদেশি ভদ্রাভদ্র আসিয়া মায়ের চরণে প্রণামি দিবে।"

মায়ের সন্তানসংখ্যা এখন ছয় কোটির পরিবর্তে বারো কোটিতে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু প্রায় এক লক্ষ বর্গমাইল জায়গায় বারো কোটি লোকের এক রাষ্ট্র যে স্বয়ংনির্ভর হতে পারে, সে-কথা ভাবতে দু'চার জন ছাড়া আর সব বাঙালি এখনও ভয় পাচ্ছে। কিন্তু এ-ভয় বেশিদিন থাকবে না। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন: "এসো, অন্ধকারে ভয় কি? না হয় ডুবিব, মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?"

মোহিতলালের মতো বঙ্কিমভক্ত তীক্ষ্ণধী সমালোচকও স্বীকার করেছেন, যে, বাঙালির ভ্রান্তমতি রাজনৈতিক জীবনে বঙ্কিম-মন্ত্র সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়ে গেল। তাঁর সম্পর্কে সাম্প্রদায়িকতার মিথ্যা নিন্দা লক্ষ্য ক'রে বিনয়কুমার দ্ব্যর্থবিহীন ভাষায় পথের দিশা দিলেন এই ভাবে:—

"অব্রাহ্ম হিন্দু আর অহিন্দু মুসলমান এবং হিন্দু মুসলমানের বহির্ভূত খ্রীস্টিয়ানের দানও 'বঙ্গ-বিপ্লবের ভেতর দেখতে পাই। গোটা কয়েক পাকা মাথাওয়ালা বাঙালি হিন্দু বাংলা দেশটাকে বর্তমান জগতের উপযোগী ক'রে তুলবার জন্য উঠে-প'ড়ে লেগেছে। এই ধরণের দরদশীল স্বদেশনিষ্ঠ লোকের নাম বাঙালি ব্রাহ্ম। আমার পরিভাষায় ব্রাহ্ম=বর্তমাননিষ্ঠ হিন্দু বাঙালি। লোকটার আগে বাঙালি হওয়া চাই। তার পর হিন্দু হওয়া চাই। তার পর বর্তমাননিষ্ঠ হওয়া চাই। তা হলেই সে হয়ে গেল ব্রাহ্ম। ব্রাহ্মরা সনাতনী হিন্দুদের পঞ্চাশ-পঁচাত্তর-শ বছর আগে আগে চলেছে। কামাল পাশা তুর্কিতে কি ক'রে গেছেন জানিস্? নিত্যনৈমিত্তিক তুর্ক-জীবন ইসলামহীন হয়ে পড়েছে। তা ব'লে ব্যক্তিগত জীবনের যেখানে যেখানে যতটুকু ধর্মের দরকার ততটুকু ধর্মের জন্য ইসলাম আজও তুর্কিতে বজায় আছে।

"ব্রাহ্মদের বিবাহ অথবা শ্রাদ্ধসম্পর্কিত উৎসব দেখেছিস্? এই সবে ঢাকঢোল নেই, হৈ-চৈ নেই, ফুল-বেলপাত. নেই, নোংরামি নেই। অথচ হিন্দুর আসল হিন্দুয়ানি আছে—উপনিষদের আসল মন্ত্র আওড়ানো আছে, সেকাল-একালের বৈদিক গান আছে, উপনিষদ-বেদান্ত-গীতামাফিক বাংলা বক্তৃতা আছে। আর বাঙালির অতি প্রিয় চর্ব-চোষ্য লেহ্য-পেয় সবই আছে। মুসলমান জনসাধারণ মূর্তিপূজা করে না; ভবিষ্যতেও করবে না। কিন্তু জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ, আত্মার উন্নতি, সামাজিক উৎসব ইত্যাদি বিষয়ে মুসলমান জনসাধারণ হিন্দু জনসাধারণের যমজ ভাই। দুয়ে আজও কোনো তফাৎ নেই। উচ্চশিক্ষিত হিন্দু নর-নারীর ধর্ম হবে ব্রাহ্মধর্ম। তাতে উপনিষদ-বেদান্ত-গীতার চরম বাণীই ধরা পড়বে। উচ্চশিক্ষিত মুসলমানের সঙ্গে উচ্চশিক্ষিত হিন্দুর আত্মিক সমঝোতা—অনিবার্য।

"ভারতীয় ঐক্যের জন্য দরদ আমার বেশি নয়। আমার কাম্য স্বাধীন বঙ্গ—বাঙালি জাতের স্বতন্ত্রতা। স্বাধীন বাংলার সঙ্গে ভারতবর্ষের অন্যান্য জনপদের যোগাযোগ গৌণ কথা।"

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে বিনয়কুমার ও মোহিতলাল স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রের কথা বিশেষভাবে চিন্তা করার প্রবণতা জাগিয়ে তোলেন। ১৯৪৭ সালে শরৎচন্দ্র বসু ও হাসান শহিদ সুরাবর্দি প্রথম রাজনৈতিক স্তরে ভারতীয় ইউনিঅনের বহির্ভূত এক স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা প্রকাশ করেন; সেই অখণ্ড বঙ্গ-পরিকল্পনা অবাঙালি সর্বভারতীয় বণিকগোষ্ঠীর স্বার্থবিরোধী ব'লে গান্ধি ও জিন্না বাতিল ক'রে দেন। বেশি বিশ্লেষণ না ক'রেও এ-কথা বললে ভুল হবে না যে, ১৯৪৭ সালের বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান বসু-সুরাবর্দি পরিকল্পনায় সাড়া দেয় নি। গান্ধি ও জিন্নার মনস্তত্ত্ব বর্তমানে আলোচনার অযোগ্য। কিন্তু বসু-সুরাবর্দি পরিকল্পনা কেন বাঙালির কাছে গ্রহণ-যোগ্য বিবেচিত হয় নি, তা বোঝা দরকার। বাংলাভাষী এলাকার রাষ্ট্রীয় পরিণতির স্বরূপ বুঝতে হলে তা প্রত্যেক বাঙালির জানা চাই।

বিনয়কুমার তাঁর উদার ও মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয় দিয়ে হিন্দু-মুসলমান ধর্মমিলন অবশ্যম্ভাবী ব'লে ভবিষ্যদ্বাণী করলেও বস্তুনিষ্ঠভাবে গত সিকি শতাব্দীর পর্যালোচনা করলে যে কোন যুক্তিবাদীকে মানতে হবে যে, বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান ভাষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গে মোটামুটি এক হলেও ধর্মবোধে তারা আলাদা হয়ে আছে এবং দীর্ঘকাল থাকবে। জার্মানরা যেমন ধর্মের চেয়ে ভাষা ও জাতিকে বড় ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, সুশিক্ষিত হয়েও ইউরোপের ডাচ, ফ্লেমিশ ও লেতসেবুর্গেশরা তা পারে নি ব'লে এক-ভাষী একধর্মী ডাচ, বেলজীয় ও লুক্সেমবুর্গবাসীরা আজও এক রাষ্ট্র গঠন করতে পারেনি—অবশ্য, তা করার চেষ্টা চলছে। প্রোটেস্টাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিকদের মতবিরোধ কোন পূর্ণাঙ্গ ধর্মপার্থক্য নয়, সাম্প্রদায়িক ব্যবধানমাত্র। তা সত্ত্বেও শতকরা প্রায় ১০০ জন শিক্ষিতের দেশ তিনটি এক রাষ্ট্র হতে পারে নি আজও। সে-ক্ষেত্রে শতকরা প্রায় আশি জন নিরক্ষরের দেশ বাংলায় পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব পাকিস্তান আর ত্রিপুরা-কাছাড় সম্মিলিত এলাকা বা প্রস্তাবিত বঙ্গ-ভাষী পূর্বাঞ্চল প্রদেশ তিনটি যদি ভারতে আর পাকিস্তানের কবল থেকে মুক্তি পাবার পরও দীর্ঘকাল তিনটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে বর্তমান থাকে, তা হলে অসঙ্গত কিছু হবে না। তাতে হতাশা বা বিস্ময়ের কিছু নেই।

নিরপেক্ষ খোলা মনে বিচার করলে বোঝা যায়, পশ্চিম বঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনের এই আতঙ্ক একেবারে ভিত্তিহীন নয় যে, অখণ্ড বাংলাভাষী এলাকায় গঠিত রাষ্ট্রে তারা স্থায়ী ভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত হবে। তখন স্থায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগে পূর্ব বঙ্গের মুসলমানরা যদি পশ্চিম বঙ্গের ওপর নিজেদের খেয়ালখুশিমাফিক অত্যাচার চালায়, তাহলে আজ যারা পশ্চিম বঙ্গে নিশ্চিন্ত, নিরাপদ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ, তখন অখণ্ড বঙ্গে তাদের রক্ষা করার কেউ নেই। গান্ধি ঠিক এই সমস্যা শরৎচন্দ্র বসুর সামনে তুলে ধরায় তিনি কোন উত্তর দিতে পারেন নি। শরৎচন্দ্রের পরিকল্পনার দুর্বলতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, তিনি নিজেই ১৯৫০ সালে মৃত্যুর আগে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, পূর্ব বঙ্গ যদি পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতীয় ইউনিঅনের আওতায় একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে থাকে, তা হলেই সবচেয়ে ভালো হয়।

উচ্চশিক্ষিত মুসলমান অতি উদার হলেও ধর্মান্ধ নিরক্ষরদের সব সময়ে সামলে চলা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। পক্ষান্তরে হিন্দুদের আচরণ সবসময়ে গঙ্গাজলে ধোয়া তুলসি

পাতার মতো নিষ্কলুষ নয়। পূর্ব বঙ্গের গ্রামবাসী হিন্দুদের মধ্যে রকমারি প্রতিমাপূজার প্রবলতা লক্ষ্য করা যায়। সেই সঙ্গে কলিকাতাবাসী হিন্দুদের পূজা উপলক্ষে মাইক-প্রীতি যীশু খ্রীষ্টকে চেঙ্গিস খান ক'রে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। অবশ্য কমিউনিসমের কল্যাণে হিন্দুরা দ্রুত মোটামুটি ধর্ম বিশ্বাসমুক্ত হয়ে উঠছে। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে ধর্মোন্মাদ এখনও বেশ কিছু দিন থাকতে পারে। কালী বা কৃষ্ণকে কটূক্তি করলে শিক্ষিত হিন্দু গায়ে মাখে না। কিন্তু একটি বিরূপ মন্তব্য করলে মুসলিম জনতা ক্ষেপে ওঠে। সুতরাং অকারণ ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত না হয়ে ধর্মবিশ্বাসের কুপ্রভাব মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম ও লুকসেমবুর্গের দৃষ্টান্ত গ্রহণ ক'রে পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ ও ত্রিপুরা-কাছাড়ের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রে চলা সকল সম্প্রদায়ের মঙ্গলের কারণ হবে।

প্রসঙ্গত ব'লে রাখা ভালো যে, ত্রিপুরার পশ্চিমবঙ্গ-ভুক্তিতে যিনি সবচেয়ে বেশি বাধা দিয়েছিলেন, তিনি কোন বাঙালি মুসলমান নন—তিনি একজন বাঙালি হিন্দু। আজ যে একদা বাংলা-সরকারি-ভাষা-থাকা-রাজ্য ত্রিপুরা কেন্দ্রশাসিত এলাকারূপে হিন্দি সরকারি ভাষা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে তার জন্য তাঁর পশ্চিমবঙ্গ বিরোধিতা দায়ী। বঙ্গ-বিভাগের সময়ে পশ্চিম বঙ্গের ভাগে যাতে কম এলাকা পড়ে, তার জন্যে চেষ্টা করেছিলেন আর এক বাঙালি হিন্দু যিনি সীমানির্ধারণ সমিতির সদস্য হাইকোর্টের বিচারকদের কাছে কংগ্রেসের বক্তব্য উপস্থাপিত ক'রে সওয়াল করার সময়ে সদর্পে বলেছিলেন—বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্রায়তন পশ্চিমবঙ্গ স্বনির্ভর হতে না পেরে যাতে শীঘ্রই পূর্ব বঙ্গের সঙ্গে মিলিত হতে বাধ্য হয়, তার জন্যে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে বেশি এলাকা তিনি দাবী করবেন না। বিচারপতিরা ঐ দুর্বুদ্ধির জন্য তাঁদের অনুমোদনে দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন। সিরিল র‍্যাডক্লিফ ঐ দুর্বুদ্ধির সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যরূপে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে। পূর্বাচল প্রদেশ গঠিত হলে তারও স্বনির্ভর হওয়া সম্ভবপর। কংগ্রেসের ভারতপ্রেমিক দুরভিসন্ধিপরায়ণ রাজনীতিকদের অপপ্রয়াস ব্যর্থ ক'রে বাংলাভাষী সমস্ত এলাকার একীকরণের জন্য কোন্ পথ গ্রহণীয় সেটা বিচার্য। পূর্ববঙ্গ পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হলে ভারতের অধীন বাংলাভাষী এলাকার কর্তব্য-নির্ধারণ সহজসাধ্য হবে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বিদ্বেষী বাঙালি হিন্দুরা কোন্ মানসিকতার বশবর্তী হয়ে ভারতের অধীন এলাকায় বঙ্গভাষী এলাকাকে বৃহত্তর ও অখণ্ড হতে বাধা দিয়েছিলেন, সেটাও নিজেদের স্বার্থে পশ্চিমবঙ্গবাসী হিন্দু নির্বিশেষে সব বাঙালির উপলব্ধি করা কর্তব্য। বাংলা-দেশের একীকরণের পথে হিন্দুমুসলমানসমস্যা প্রবল বিঘ্ন বটে; কিন্তু অনুরূপ আর একটি বিঘ্ন মুখ্যত অর্থনৈতিক কারণে সৃষ্ট "ঘটি-বাঙাল" সমস্যা, যার জন্যে পূর্ববঙ্গের অতি প্রাদেশিক বাঙালি হিন্দু নেতারা বেশ একটু দায়ী। পরে এই সমস্যার স্বরূপ নিয়ে আরো আলোচনা করা যাবে।

ভাষা ও জাতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করার দ্বারা জন-গোষ্ঠীর রাষ্ট্রীয় পরিণতি সম্বন্ধে যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ। সুতরাং প্রথমে ব্যাপকভাবে বঙ্গভাষাপরিক্রমা প্রয়োজন। তা করলে হিন্দু-বৌদ্ধ তথা হিন্দু-মুসলমান ধর্মবিরোধ, পূর্ব-পশ্চিমবঙ্গের প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা বা "ঘটি বাঙাল" বিরোধ, বঙ্গাল-খেদা আন্দোলন বা অবাঙালি ভারতীয়ের বাঙালিবিদ্বেষের বিভিন্ন রূপ প্রভৃতি বিতর্ক-সঙ্কুল বিষয়গুলির পর্যালোচনা সহজসাধ্য হয়ে আসবে।

ঐতিহাসিক, নরতাত্ত্বিক, পুরাতাত্ত্বিক ও ভাষাতত্ত্ব-বিদ্‌গণের মতে, বাংলা দেশে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বিভিন্ন বিসদৃশ নরগোষ্ঠীর আগমন, বসবাস ও শোণিত-মিশ্রণ সাধিত। বাঙালি জাতির উদ্ভব ও প্রসার উপলব্ধির জন্যে এইসব মতের সারনির্যাসটুকু আমাদের প্রয়োজন। বাঙালি নিঃসন্দেহে একটি ভারতীয় এবং ভারতীয়-আর্য-ভাষী জাতি; সেই সঙ্গে অন্যান্য ভারতীয়দের থেকে সে নিশ্চিতভাবে পৃথক্ একটি জাতিও বটে। এই সত্য স্বীকার না ক'রে অগ্রসর হলে যে কোন দলের রাজনীতিবিদের পরিণামে অনুতাপ করতে হবে। এই জাতির উৎপত্তি-রহস্য যা জানা যায়, তা অতি সংক্ষেপে আলোচ্য।

(ক্রমশঃ)

বন্দরের বন্ধন

অরুণকুমার দত্ত

সরু ইংলিশ চ্যানেলটা পেরোতে সময় লাগলো মাত্র পঞ্চাশ মিনিট। কতটাই বা রাস্তা। ক্যালে থেকে ডোভার। ফ্রান্স আর ইংল্যাণ্ডের মুখোমুখি দুটো বন্দর। মাঝখানের ইংলিশ চ্যানেল দুটো দেশকে আলাদা করে রেখেছে।

ডোভারে নেমে পাশপোর্ট চেকিং হল। তারপর ট্রেনে করে লণ্ডন। আরও মিনিট চল্লিশের রাস্তা।

শঙ্কর মিত্রর মনে অনেক দিন থেকেই উচ্চাশা ছিল উচ্চশিক্ষার জন্যে বিলেত যাবার। এম, বি, বি, এস, পাশ করার দেড় বছরের মধ্যে হাউস ফিজিশিয়ানসিপ শেষ করে সে তাই বিলেতের পথে পা বাড়িয়েছে, তার বয়স মাত্র পঁচিশ বছর।

ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে এসে ট্রেনটা থেমে গেল। টার্মিনাস লণ্ডন সহর।

আগেকার ব্যবস্থামত শঙ্কর 'ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেন্স হোষ্টেলে যাবার উদ্যোগ করল।

ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে তখন অগুনতি ভারতীয়ের ভীড়। দেশ থেকে জাহাজে পরিচিত আত্মীয় বন্ধুবান্ধবরা এসেছে। তাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাবার জন্যে ছোট্ট জনতা।

শঙ্করের পরিচিত কেউই ছিলনা। কাজেই সে ভারতীয়দের ভিড়টা কাটিয়ে যখন ষ্টেশনের বাইরে পা বাড়াল তখন চারিদিকের চোখ ধাঁধানো যানবাহন আর সুশৃঙ্খল নরনারীর কিউ দেখে তার মনে হল অকূল সমুদ্র।

ম্যাট্রিক পাশ করে যখন সে বাংলাদেশের মফঃস্বলে একটা ছোট গ্রাম থেকে কলকাতায় প্রথম পড়তে এসেছিল তখনও তার এরকম একটা অনুভূতি এসেছিল।

ক্যান আই হেলপ ইউ প্লিজ।

চমকে উঠে পেছনে তাকাতেই শঙ্কর দেখে একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার গাড়ীর ভেতর থেকে মুখ বার করে তাকে প্রশ্ন করছে।

ট্যাক্সিড্রাইভার যে এরকম মিষ্টি করে কথা বলতে পারে শঙ্করের আগে তা জানা ছিল না।

ট্যাক্সিতে উঠে আরেক বিপত্তি। শঙ্কর বলল ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্টস হোষ্টেল উননব্বই নং গিল্ডফোর্ড ষ্ট্রীটে যাবে। কিন্তু লণ্ডন কত ?—আর শঙ্কর বলতে পারে না।

শেষকালে ইণ্ডিয়ান হাউসের লেখা চিঠিটা দেখাতে ড্রাইভার বলে উঠল—ওই রাসেল স্কোয়ারে, আচ্ছা এক্ষুণি নিয়ে যাচ্ছি।

শঙ্কর অবাক হয়ে দেখতে লাগল কেমন ভাবে ড্রাইভার বেতারে ট্যাক্সিষ্টেশনের সঙ্গে বলতে বলতে তাকে ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্টস হোষ্টেলে নিয়ে এল।

গিল্ডফোর্ড ষ্ট্রীটের ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্টস হোষ্টেলে এসে শঙ্কর একটা বড় রকমের ধাক্কা খেল। চারিদিক অপরিচ্ছন্ন। ঘরের মেঝের কার্পেট শতছিন্ন। টয়লেটের অবস্থাও শোচনীয়। যে বিলেতের ছবি তার মনে গাঁথা রয়েছে, তার সঙ্গে এ যেন খাপ খায় না।

তখন হেমন্তের শেষ। ঘড়িতে সাড়ে ছটা বাজলেও রাস্তায় বেশ আলো আছে। শঙ্কর ভাবলো একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসে।

এক ঘণ্টা ধরে একলা একলা রাস্তায় এলোমেলো ঘুরলো সে। ছটার সময় সব দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। সোকেশের ভেতর মনিহারী জিনিষ সাজানো। তার চারপাশে আলো। বার বার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে।

সব জিনিষের গায়ে দাম লেখা আছে। কোন দর দস্তুর নেই। কেউ ঠকাতে চায় না। ঠকতেও চায় না।

ঘুরতে ঘুরতে শঙ্কর একসময় আবিষ্কার করল সে রাস্তা হারিয়েফেলেছে। কি করে !

অদূরে একজন পুলিশ কনষ্টেবল দেখে শঙ্কর তাকে

জ্ঞেস করল গিলফোর্ড স্ট্রীটটা কোনদিকে পড়বে বলতে রেন? আমি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি।

ছ'ফিট লম্বা পুলিশ কনষ্টেবল মুচকি হেসে বললে—পনি গিল্ডফোর্ড স্ট্রীটের খুব কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন।

তার মানে?

—মানে খুব পরিষ্কার। এই রাস্তাটার নাম গিল্ড-র্ড স্ট্রীট।

পরে শঙ্কর বুঝেছিল সে ঘুরতে ঘুরতে গিল্ডফোর্ড স্ট্রীটের র একপ্রান্তে সেদিন পৌঁছেছিল। তাই এ প্রান্তের ণ্ডিয়ান ষ্টুডেন্টস হোষ্টেল সে সেদিন হদিস করতে রেনি।

গিল্ডফোর্ড স্ট্রীট ধরে হাঁটতে হাঁটতে সে রাসেল স্কোয়ার উব ষ্টেশনের সামনে এসে পৌঁছল।

তখন শঙ্কর অনুভব করল তার খুব খিদে পেয়েছে। ই ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন ছাড়ার পর থেকে সে আর কিছু য়নি।

সামনে তাজমহল রেস্তোরাঁর সাইনবোর্ড দেখতে পেয়ে তার ভিতর ঢুকল।

সরু করিডোরের মত একটা লম্বা ঘর। দুপাশে বিল। টেবিলের দুদিকে চেয়ার। মাঝখান দিয়ে তায়াত করার একফালি রাস্তা।

একটা চেয়ার টেনে শঙ্কর টেবিলের একধারে বসল।

ঘরটার একদিকে ঢোকার দরজা। আর একদিকে ভারকোট রাখার হ্যাঙ্গার। তার আর এক পাশে সেলস উন্টার। কাউন্টারে বসে টাক-মাথা এক ভদ্রলোক লেটিটানে বাংলায় বললেন,—ইউসুফ, দেখ খদ্দের সেছে।

কাউন্টারের গা বেয়ে সরু একটা রাস্তা চলে গেছে চেনের দিকে। কিচেনের ভেতরটা আর চোখে পড়ে : সেদিক দিয়ে কুচকুচে কাল ইউসুফ বেরিয়ে এসে কঝকে সাদা দাঁত বের করে ইংরেজীতে বলল—ইয়েস র। হোয়াট ওয়াণ্ট স্যার? বলে মেনুটা এগিয়ে ল।

শঙ্কর দেখল মেনুটা ইণ্ডিয়ান খাদ্য তালিকায় ভর্তি। দুটো পরোটা আর রোগান জুসের অর্ডার দিল। রাগান জুসের সঙ্গে সে কলকাতার পাঞ্জাবী হোটেল-গুলোয় খেয়ে আগে থেকেই পরিচিত ছিল। সে জানত ওটা মাটন কারিরই নামান্তর। গো মাংস অন্ততঃ নয়।

কাঁটা চামচ দিয়ে পরোটা ছোট ছোট টুকরো করে কেটে শঙ্কর সবে মুখে দিয়েছে, এমন সময় গোলমাল শ্যাম-বর্ণের, নাতিদীর্ঘ চেহারার এক ভদ্রলোক এসে ঠিক তার সামনেং চেয়ারে ধুপ করে বসে পড়লেন।

তারপর একগাল হেসে বললেন—কি দাদু, নতুন আইচেন নাকি?

শঙ্কর সলজ্জ হেসে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু নতুন এসেছি কি করে বুঝলেন।

—আরে ত্যাশের প্যাটের কাট ত্যাখেই বোজছি। ওকি আর জানান দিতে হয় নাকি?…তা, কোই ওঠচেন? নমা সেনের বাড়ীতে? না বেনারসীর বাড়ীতে।

একটু ইতস্ততঃ করে শঙ্কর বলে, আজ্ঞে না আমি ইণ্ডিয়ান স্টুডেন্টস হোষ্টেলে উঠেছি।

—আরে রামচন্দর! ওখানে উঠেছেন! তা নমা সেনের, বেনারসীর বাড়ীতেও তাই। লণ্ডনে এসে ছেলেরা প্রথমে ওসব জায়গাতেই ওঠে। হাত দিয়ে এক এক টাকার মত এক এক পাউণ্ডের নোটগুলো খরচ করে। তারপর সব আস্তে আস্তে চালাক হয়।

মনে মনে নিজের পকেট লঘু হবার সম্ভাবনায় একটু শঙ্কিত হল শঙ্কর।

মুখে বলল, আজ্ঞে না—দিন কয়েকের জন্যে লণ্ডনে থাকব। তারপরে এডিনবরায় চলে যাব।

হে, হে, করে হাসতে হাসতে ভদ্রলোক বললেন—শিখতে হবে, শিখতে হবে। নোতন বিলাইতে আইচেন। আপনার কাঁটা-চামচ ধরবার ক্যায়দা ত্যাখেই ধরছি। ঠেকে শিখতে হবে আপনাকে। ঠোক্কর খাইতে খাইতে শ্যাখবেন। তখন বোঝবেন বিলাইত কি জিনিষ।

আমার নাম গণেশ গায়েন। অনেকদিন আগে আমি লণ্ডনে আইছিলাম। আর দ্যাশে ফিরি নাই। এখানেই বিয়ে কইর‍্যা বেশ সুখে আচি। খালি যখন আপনাগো দেখি তখন মনে হয় বিলাইতি চালচলন এখন আপনা-গোর অনেক রপ্ত করতে হইব।…হে…হে। চলি তাহলে—বলে সে কিছু না খেয়েই চলে গেল।

* * চ

লণ্ডন থেকে এডিনবরা সাড়ে তিনশ মাইল। ট্রেনে বেশ কয়েক ঘণ্টার জার্নি।

করিডোর ট্রেন। কামরার বাইরে করিডোর। ট্রেনের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্য্যন্ত চলে গেছে। মাঝখানে ডাইনিং কোচ্। সব গদী দেওয়া সীট। ফার্ষ্ট আর সেকেণ্ড ক্লাশের মধ্যে ভাড়ার তফাৎ ছাড়া আর কোনও তফাৎ নেই। কামরার ভেতর হীটার চালিয়ে দিলে ভেতরটা বেশ গরমই হয়ে ওঠে। ঠাণ্ডায় কষ্ট হয় না।

হাত পা ছড়িয়ে বসল শঙ্কর। যাত্রীর সংখ্যাও কম। কামরাতে আর দুজন ইংরেজ ভদ্রলোক বসেছিলেন গোমড়া মুখে। ঠিক যেন শ্রাবণের জলভরা মেঘ। দুজনের হাতেই খবরের কাগজ। সারা ট্রেনে কোন কথা হল না। তারাও কিছু জিজ্ঞেস করলে না। শঙ্করও কিছু বলল না।

ইয়র্ক ষ্টেশনটা পেরিয়ে যেতেই রেস্তোরাঁর বয় প্রত্যেক কামরায় এসে জানিয়ে দিতে লাগল, ডিনারের টাইম হয়ে গেছে। কেউ যেতে রাজী আছে কিনা? সম্মতি জানাতে সে শঙ্করের হাতে এক টুকরো কাগজ গুঁজে দিল।

সকলকে উঠতে দেখে শঙ্করও উঠল। ডাইনিং হলে এসে দেখে চারপাশে সব সাহেব আর মেম সাহেব।

তখনও শঙ্কর শ্বেতসান্নিধ্যে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। একটা অস্বস্তিকর আড়ষ্টতা তার সর্ব্বাঙ্গ জড়িয়ে আছে। কোথায় কি ভুল হল। 'ম্যানার্স' আর 'কার্টিসি'র গোলযোগ।

তাই সে কালোমুখ খুঁজতে লাগল। বেশী দেরী হলনা। বিরাট পাগড়ী মাথায় এক শিখ ভদ্রলোকের দর্শন মিলে গেল। তারই সঙ্গে এক টেবিলে বসল শংকর।

নাম সুদর্শন সিং। বাড়ী চণ্ডীগড়ে। ব্রিটেনে বছর কয়েক হল আছেন। গ্লাসগোতে ফরেষ্ট্রি পড়ছেন।

চার কোর্সের খাওয়া। সুপটা শেষ করে যখন হাড়-হীন মশলাহীন সেদ্ধ মাটনের টুকরোটা কামড় বসিয়েছে তখন হঠাৎ জলতেষ্টা পেয়ে গেল শঙ্করের।

বয়কে ডেকে বলল, এক গ্লাস জল দিতে।

জল চাওয়াতে সে ভীষণ হকচকিয়ে গেল। তারপর শঙ্করকে আরও ঘাবড়ে দিয়ে বলল, জল কি করবেন?

কেন খাব! তেষ্টা পেয়েছে যে। শুকনো গলায় শঙ্কর বললো।

ওহো! আচ্ছা দাঁড়ান! আনছি। বলে সে চলে গেল।

সুদর্শন সিং শুধু শুধু মুচকে মুচকে হাসতে লাগল। যেন ব্যাপারটা সে বেশ উপভোগ করছে।

কি ব্যাপার। জল চাওয়াতে বয়টা অত আশ্চর্য্য হয়ে গেল কেন? শঙ্কর জিজ্ঞেস করে।

একই ভঙ্গীতে হাসতে হাসতে সুদর্শন সিং বললে খাবার সময় জল এরা খায়ই না প্রায়।

কি করে গলা ভেজায় তাহলে? শুকনোতর গলায় শঙ্কর বলে।

চারপাশে চেয়ে দেখুন।

এতক্ষণে শঙ্করের নজরে আসে, চারপাশের টেবিলের ওপর পান পাত্রগুলো লাল লাল তরল পানীয়তে ভরা।

—হ্যা ঠিক তাই। সুদর্শন সিং পুরোনো ভঙ্গীতেই ঘাড় নাড়ে।

—জলের বদলে এরা মদ খায়। বেশীর ভাগই বিয়ার জাতীয় পানীয়। আপনার জল চাওয়াতে বয়টা তাই ভড়কে গিয়েছিল।

বয়টা এতক্ষণে জল আনে। একচুমুকেই সে গ্লাসটা শেষ করে শঙ্কর। গলাটা তখন আরও শুকিয়ে গেছে কিছুটা তেষ্টায় আর কিছুটা উত্তেজনায়। তারপরেই চায় আর এক গ্লাস জল।

এবারে বয়টা জলভর্ত্তি কাঁচের জাগটাই নিয়ে আসে পুরো জাগটাই শেষ করে শঙ্কর আশেপাশের বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিগুলোকে উপেক্ষা করেই।

সুদর্শন সিংয়ের পুরোনো ভঙ্গিতে হাসাটা কিন্তু এতটুকুও বদলায় না।

দুই

এডিনবরার ওয়েভারলি ষ্টেশনে এসে ট্রেনটা থামল ভোরবেলায়। চারদিক তখনও অন্ধকার।

কলকাতার ব্রিটিশ কাউনসিলের মারফত এডিনবরায় এক ল্যাণ্ডলেডির বাসায় পেয়িংগেষ্ট হয়ে থাকার ব্যবস্থা করেছিল শঙ্কর।

এবার সে একটু চালাক হয়ে গেছে। তাই ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বলে দিল পঁয়তাল্লিশ নম্বর পোলওয়ার্থ গার্ডেনে যেতে হবে।

প্রিন্সেস স্ট্রীট ধরে ট্যাক্সি ছুটল পোলওয়ার্থ গার্ডেনের দিকে। চারদিক কুয়াশায় জড়ান। পথঘাট গাছপালা প্রাসাদের মতন বাড়ীগুলো সিলুয়েটের ছবির মত মনে হচ্ছে। ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছেনা।

সামনের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে ট্যাক্সিড্রাইভার বললে ঐ দেখুন—এডিনবরা ক্যাসল।

ভাল করে বুঝতে পারলনা শংকর। প্রিন্সেস স্ট্রীটের সমতল জমি থেকে একটা রাস্তা উপরের চড়াইয়ে উঠে গেছে। বোঝা যায় সেটা একটা ছোট পাহাড়। তার ওপর ক্যাসল। বহু ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত এডিনবরা ক্যাসল।

পোলওয়ার্থ গার্ডেনে পৌঁছে দিয়ে ট্যাক্সি চলে গেল।

পাঁচতলা বাড়ী, ফ্লাটে ভাগ করা। দরজার দুপাশে নেমপ্লেট ও কলিংবেল। কিন্তু অনেক খুঁজেও ল্যাণ্ডলেডি মিস ডেভলিনের নাম বার করতে পারল না শঙ্কর।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভাবতে লাগল শঙ্কর কি করা যায়। চারপাশের কনকনে হাওয়া বেতের চাবুকের মত মুখে, পিঠে, পায়ে আঘাত হানছে। জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। সব ঘুমাচ্ছে। ভোরের আলো আশপাশ দিয়ে ফুটে উঠছে।

ঘড়িতে দেখল সাতটা বেজে পনেরো মিনিট।

শঙ্কর লণ্ডনে যতদিন ছিল ততদিন তার মনে হত যেন ভারতবর্ষেরই এক কোণায় রয়েছে। চারদিকে দেশীয় লোকদের ভীড় ও ভাষা শুনে সে বিদেশে আছে বুঝতেই পারতনা। রাস্তা চলবার সময় মনে হত যেন সে কলকাতার পার্ক স্ট্রীট বা চৌরঙ্গী দিয়ে চলছে। সেইরকম কাল সাদা মুখের ভীড়। দোকানপাটের সরঞ্জাম, আলোর বাহার —একই রকম প্রায়। অবস্থা বিশেষে একটু হেরফের, এই যা তফাৎ। শীতও মনে হত কলকাতার না হলেও বাংলাদেশের মফঃস্বলেরই কাছাকাছি। কিন্তু এডিনবরায় এসে স্কটল্যাণ্ডের দুর্জ্জয় শীতে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে মনে হল—না এবার সত্যিই এক অচেনা দেশে সে এসে পৌঁছেছে। নিজেকে হঠাৎ বড় অসহায় মনে হল শঙ্করের।

এমন সময় লাফাতে লাফাতে সেখানে তের চোদ্দ বছর বয়সের এক কিশোরী এসে হাজির হল। তার বগলে একতাড়া খবরের কাগজ।

শংকর বুঝল সে হকার। কাগজ বিলি করে।

মেয়েটাও অবাক হয়ে শংকরের মুখের দিকে তাকিয়ে সুপ্রভাত জানাল। তারপর একটু ইতস্ততঃ করে বলল —আমি কি আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারি ?

শংকর বলল, এই বাড়ীতে মিস ডেভলিন থাকেন। কোন নেমপ্লেট না থাকায় বুঝতে পারছি না। তার সঙ্গেই আমার দরকার।

সপ্রতিভ ভাবে মেয়েটি বলে আমিও তাকে চিনিনা। তারপর শঙ্করের মুখের বিপন্নভাব দেখে বলল, আচ্ছা দাঁড়ান বলেই ছুটে বাড়ীর ভিতর ঢুকে গেল।

একটুবাদে সঙ্গে করে এক বুড়ীকে নিয়ে এসে বলল, এই হচ্ছে মিসেস হিচিনস্। দোতলায়থাকেন। এ কেই বলুন আপনার যা দরকার।

সব শুনে মিসেস হিচিনস্ বললেন—আরে আসুন, মিস ডেভলিন একেবারে টপফ্লোরে থাকেন।

অন্ধকার সিঁড়ি ভেঙ্গে ভারী ভারী স্যুটকেসগুলো বয়ে তুলতে তুলতে শঙ্করের মনে হল মানুষের দাম ভারতবর্ষে কত সস্তা। এখানে রাস্তার মোড়ে মোড়ে কুলি পাওয়া যায়না যে চার আনা দিলে মাল বইবে। বিলিতি জীবনের স্বাদ হল সুরু !

মিস ডেভলিন উত্তর চল্লিশ এক প্রৌঢ়া। চারতলায় আর পাঁচতলায় দু'টা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে তিনি পেয়িংগেষ্টের ব্যবসা করছেন। সর্ব্বসমেত গোটা পাঁচেক রুম তাঁর হেফাজতে।

শঙ্করের স্থান হল একেবারে ওপরের তলার ঘরে। ঘরে ঢুকে শঙ্কর অবাক। দামী কার্পেট মেঝেয় বিছানো। কোণে এক বড় আলমারি। মাঝখানে একটা সার্সিআঁটা জানলা। তার পাশে জলের বেসিন। ঘরের মাঝখানে পালঙ্কের ওপর সুসজ্জিত বিছানা। খাসা ব্যবস্থা। লণ্ডনের ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেন্টস হষ্টেল দেখে তার মনে হয়েছিল এদেশের সব জায়গাই বুঝি এরকম।

হঠাৎ খাটের ঠিক ওপরকার ছাদের দিকে শঙ্করের দৃষ্টি

আটকে গেল।—আরে একি। একটা স্কাইলাইট জানালা, সিলিংয়ে। জানালার আংটায় একটা দড়ি বাঁধা রয়েছে। সেটা ধরে টানতেই জানালাটা খুলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে একরাশ রক্তজমানো ঠাণ্ডা হাওয়া তার ভেতর দিয়ে ঘরে ঢুকে গেল। শঙ্কর তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ করে দিল।

মিস ডেভলিনের ডিগসে * গেষ্টএর সংখ্যা শঙ্করকে নিয়ে হল মোট দুজন। যদিও থাকবার ব্যবস্থা সাতজনের।

প্রাতরাশ টেবিলে অপর গেষ্ট ডাঃ শেলভারাজের সঙ্গে আলাপ হল। তাঁর বাড়ী উটকামণ্ডে। বেশ হাসিখুশি ছেলেটা। প্রাইমারী এফ, আর, সি, এস কোর্স পড়তে এসেছে। বয়স তিরিশের নীচেই।

সে শঙ্করের অভিজ্ঞতার কথা শুনে মুখ টিপে হেসে বলল—আরে স্কটিশ ল্যাণ্ডলেডিরা হচ্ছে মহা কিপটে। পয়সা খরচ হবার ভয়ে মিস ডেভলিন নেমপ্লেট, কলিংবেল কিছুই বাইরে লাগাননি। অথচ হপ্তায় হপ্তায় যখন চার পাউণ্ড করে নেয় তখন মুখটা কেমন বিমল আনন্দে ভরে যায় দেখবেন।

খেতে খেতে স্কটিশদের কৃপণতা সম্বন্ধে একটা গল্প বললে ডাঃ শেলভারাজ। একটা একসিডেণ্টের গল্প। কিজন্য একসিডেণ্ট হল তার কাহিনী।

চার মাথার মোড়ে একটা স্কটিশ ট্রাফিক পুলিশ কনষ্টবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রন করছে। একটা প্রাইভেট মোটরকার তার নির্দেশ উপেক্ষা করে চলে যাচ্ছিল। ট্রাফিক কনষ্টেবল ড্রাইভারকে পাকড়াও করল। কি করে বেচারী ড্রাইভার।

সে চিরন্তন পদ্ধতি অবলম্বন করল। মানে কনষ্টেবলকে এক পাউণ্ড ঘুষ দিল। বাঁহাতে ঘুষ নিল কনেষ্টবল। কারণ তার ডান হাতটা গাড়ী নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ দেবার জন্য ব্যস্ত ছিল।

এ পর্য্যন্ত ব্যাপারটা মসৃণভাবেই চলছিল। কিন্তু তারপরেই বাধল গণ্ডগোল।

গাড়ীর ড্রাইভার ছিল মহাকৃপণ স্কচ। গাড়ী ষ্টার্ট দিতেই সে কনষ্টেবলের কাছে ঘুষের টাকাটা ফেরৎ চাইল। বোধহয় অতগুলো টাকা ফোকটে বেরিয়ে যাওয়াতে তার বুকের ভেতরটা করকর করছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে হল একসিডেণ্ট। কনষ্টেবলটা বেসামাল হয়ে গিয়ে ভুল হস্ত নির্দ্দেশ দেওয়াতে।

দুপুরবেলা শঙ্কর লাঞ্চ খেতে বেরোল। শহরের মধ্যস্থলে ইউনিভার্সিটির চত্বরের কাছে রয়াল ইনফরমারি। এডিনবরার সবচেয়ে বড় হাসপাতাল। দেশবিদেশ থেকে বিদ্যার্থীরা এখানে আসেন চিকিৎসাশাস্ত্র শিখতে।

রয়াল ইনফরমারির বিপরীত কোণে একটা অর্দ্ধবৃত্তাকার ইটালীয়ান রেস্তোরাঁ শঙ্করের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ওপরে টিউব লাইটে লেখা—'বারবিকিউ'। দেওয়ালের পাশে সাজান ফিক্সড টেবিল ও বসবার আসন। মাঝখানের চুল্লীতে রান্না হচ্ছে। চুল্লীর চারপাশে ঘিরে অর্ধবৃত্তাকার ডেস্ক কাউণ্টার। তার নীচে বসবার চেয়ার।

দরজার মুখোমুখি সেলস কাউণ্টার। সেখানে হাসিমুখে বসে রয়েছেন সুশ্রী এক তরুণী।

রেস্তোরাঁটা শঙ্করের ভালই লাগল। বেশ ছিমছাম, পরিষ্কার। যাদের তাড়াতাড়ি আছে তারা ডেস্ক কাউণ্টারে বসছে। যারা দেরী করে রয়ে সয়ে খাবে তারা নীচের কাঁচের দেওয়ালের ধারের টেবিলে বসেছে।

তলায় বসলে স্বচ্ছ দেওয়ালের ভেতর দিয়ে চারিদিকের রাস্তা, পথচারী বেশ ভালভাবেই পর্য্যবেক্ষণ করা চলে।

শঙ্কর বসে বসে দেখতে লাগল দোকানের খদ্দেরদের বেশীর ভাগই ছাত্র। আফ্রো-এশিয়ান মুখ অনেক চোখে পড়ল। মাথায় চোঙওয়ালা টুপি লাগিয়ে চেক রাঁধছে। গোঁফওয়ালা, বিরাট চেহারার থলথলে এক ইটালীয়ান ম্যানেজার সব তদারক করছেন আর অকারণে হাঁকডাক করছেন।

'ফিস এণ্ড পটাটো চিপস'—শঙ্করের খাবারের অর্ডার নিয়ে বিনুনী ঝুলিয়ে একটা মেয়ে ওয়েট্রেস চেক্ এর উদ্দেশ্যে বলল। চেক্ অর্ডার পেয়ে তার সাকরেদদের বলল।

কাঁচা আলু আগে থেকেই কাটা ছিল। সেগুলো লার্ডের তেলে ফেলে ছাঁকনিতে ভাজা হতে লাগল। হালকা নীলরংয়ের গাউনপরা অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়েরা সপ্রতিভ ভাবে খদ্দেরদের টেবিলে টেবিলে পরিবেশন করে চলছে।

* যেখানে বেড, ব্রেকফাষ্ট ডিনারের খরচ দিয়ে থাকা যায়।

প্লেট উঠিয়ে কাঁটা-চামচ সাজিয়ে রেখেছে। কেউ-কেউ তাদের মধ্যে আবার প্রগলভা হাসির উচ্ছ্বাসে ভেঙ্গে পড়ছে।

—ওহ নো! আমি তোমার সঙ্গে আর আজকে বেরোতে পারবনা। আজ আমার টমের সঙ্গে নাচে যাবার কথা আছে। সে বেচারা অনেকদিন থেকে ঘুরছে আমার পেছনে। হা—হা—হা করে বাদামী চুলের সুন্দরী ওয়েট্রেসটা হেসে উঠল।

শঙ্কর ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে লাগল ওয়েট্রেসগুলোকে দোকানের খদ্দেরগুলোর কেউ কেউ কি ভাবে আপ্যায়িত করছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় অন্য কেউই কিন্তু এসব গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছে না। যেন অতি সাধারণ ব্যাপার

—প্লিজ ঘাড় ঘোরাবেন না। যেমন খাচ্ছেন খেয়ে যান। কানের পাশে পরিষ্কার বাংলায় একজন ফিসফিস করে বলে উঠল। ঘাড় সোজা করে দেখল খর্ব্বকায়, উজ্জ্বল, শ্যাম-বর্ণের এক ভদ্রলোক স্মিতহাস্যে তাকে লক্ষ্য করে কথা-গুলো বলছেন।

ভদ্রলোকের চোখে মোটা ফ্রেমের পোর্ট ওয়াইন রংয়ের চশমা। গালে খোঁচাখোঁচা দাড়ি। গায়ে একটা ওভার-কোট। গলায় মাফলার। হাতে চামড়ার দস্তানা। মাথায় খাকি রংয়ের ফেল্ট ক্যাপ। পায়ে গামবুট। —শরীরে ঠাণ্ডা কিছুতেই লাগতে দেবেন না যেন এইরকম একটা পণ।

ভদ্রলোক টুপিটা মাথা থেকে নামিয়ে নিলেন, ওভার-কোটের বোতামগুলো খুলে ফেললেন। তারপর শঙ্করের পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ে শান্ত গম্ভীর স্বরে বললেন—মাপ করবেন, আলাপ হবার আগেই উপদেশ দিলাম। আপনাকে দেখেই বুঝতে পারলাম আপনি এদেশে নতুন এসেছেন। ওভাবে ঘাড় ঘুরিয়ে ওপাশে তাকানোটা অভদ্রতা। বিলেতে এলে পদে পদে এদের নিয়ম মেনে চলতে হবে। আর অদ্ভুত এসব আদব কায়দা। একটু বেতাল হলেই আপনাকে আনকালচারড্ বলবে।

আপনি কাঁটাচামচের খাবেন, টুং টাং শব্দ হবে, কোন দোষ নেই। কিন্তু খেতে খেতে মুখ থেকে যদি একটুকুও শব্দ বেরোয় তাহলেই আপনি আন্‌কাল্‌চারড্। সেজন্যই বলছিলাম, সাবধান।

—তা, আপনি বাঘের ল্যাজে হাত দিয়ে ফেলেছেন কি?

তার মানে? ভদ্রলোকের প্রশ্নের জটিলতায় আর পূর্ব্বাপর ঘটনার আকাস্মিকতায় শঙ্কর বেশ ঘাবড়ে গিয়ে বলে।

বুঝতে পারলেন না ত, দাঁতের ভেতর দিয়ে চুক চুক করে হাসতে হাসতে বললেন আগন্তুক ভদ্রলোক। আরে মানে আর কি? মেম্বারসিপ না ফেলোসিপ কোনটে ধরবার জন্যে এসেছেন?

—ওহো-হো, মেম্বাপসিশ; কিন্তু তার সঙ্গে বাঘের ল্যাজে হাত দেওয়ার কি সম্পর্ক।

হা হা হা করে হাসলেন ভদ্রলোক। একটু থেমে বল-লেন,—বর্ম্মীভাষায় একটা কথা আছে যদি বাঘের ল্যাজে জ্ঞানত: কিম্বা অজ্ঞানত: কখনও হাত দিয়ে চেপে ধরেন, তাহলেই মরেছেন। মানে ল্যাজ ধরে ছেড়ে দিলেই বাঘ ঘু'রে মেরে ফেলবে। আর ধরবার মত শক্তি না থাকলে ল্যাজ ধরে বাঘের পেছন পেছন ছুটতে হবে।

এই মেম্বারসিপ ফেলোসিপ পরীক্ষাও হচ্ছে সেই বাঘের ল্যাজের মত। তাই বলছিলাম একবার ধরলে আর ছাড়বার উপায় নেই।

ওই যাঃ! আমার পরিচয়ই আপনাকে এতক্ষণ দেওয়া হয়নি। এডিনবরায় আমাকে সবাই চক্কোত্তি মশায় বলেই জানে। আমার এই শোষাক দেখে অবাক হচ্ছেন, কিন্তু এ আমার বারমেসে পোষাক।

আমিও আপনার মত মেম্বারসিশ করতে একদিন এসে-ছিলাম। কিন্তু বাঘ দেখেই ভয় পেয়ে গেলাম। ল্যাজ আর ধরলাম না। পাশ কাটিয়ে পি, এচ, ডি করছি এখন 'টকসিকোলজি'তে। আমাদের আড্ডার কেন্দ্রস্থল হচ্ছে এই বারবিকিউ। যদিও আমাকে রিসার্চের কাজের জন্য প্রায়ই যেতে হত কিংস্ বিল্ডিংয়ে, এডিনবরার আর এক প্রান্তে। আমি থাকি আর্ডেন হোটেলে। নয় নম্বর রয়াল টেরাসে। আপনার যদি কখনও দরকার হয় চলে আসবেন সেখানে। অনেক ভারতীয় ছেলেমেয়ে আছেন সেখানে।

বারবিকিউ থেকে বেরিয়ে শঙ্কর সার্জনস হলের উদ্দেশ্যে পা বাড়াল। অল্প কিছু দূরে নিকলসন ষ্ট্রীটে সেটা।

সার্জনস হল একটা ঐতিহ্যমণ্ডিত অফিস। পৃথিবীর চিকিৎসার ইতিহাসের বহু স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় এই বাড়ীতে তৈরী হয়েছে।

শঙ্কর এম, আর, সি, পি দেবার আগে মেডিসিনের জন্য ক্লিনিকাল এটাচমেন্টের চেষ্টা করেছিল। সার্জনস হলের অফিসে গিয়ে খোঁজ পেল তাকে ইষ্টার্ণ জেনারেল হসপিটালে ডাঃ বার্ণসের ওয়ার্ডে দেওয়া হয়েছে। শঙ্কর খবরটা নিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হল।

রাস্তায় দেখা হলো বিনয় ব্যানার্জ্জীর সঙ্গে। তাদের থেকে কয়েক বছরের সিনিয়ার ছিলেন। বছর দুই এদেশে রয়েছেন। লিভারপুল থেকে ডি, টি, এম 'অ্যাণ্ড এচ করে এম, আর, সি, পির চাকায় ঘুরছেন।

শঙ্ক'কে দেখে একগাল হেসে বললেন দেশের খবর বল। নতুন এলে দেশ থেকে। আমিও সেদ্ধ মাংস আর স্যুপ খেয়ে হাঁপিয়ে উঠেছি।

পরে একদিন সব কথা বলব বিনয়দা। আজ তাড়াতাড়ি আছে, চলি। আপনার কাছ থেকে এম, আর, সি, পি, কোর্সের পড়াশুনো করার সাজেসনগুলো সব নেব একদিন।

পোলওয়ার্থ গার্ডেনে এসে যখন শঙ্কর পৌছাল তখন ছটা বেজে গেছে। চারদিক অন্ধকার।

ডিনারের টাইম হয়ে গেছে। গম্ভীর মুখে মিস ডেভলিন বললেন—আশা করি কাল থেকে মিঃ মিটার পাঁচ্ধালি ছটায় আসবেন ডিনার খেতে।

রাত্তিরে খেয়ে দেয়ে শঙ্কর যখন তার ঘরে ঢুকল তখন সে হঠাৎ বড় একা একা, বড় অসহায় বোধ করতে লাগল।

চারপাশে কেউ নেই। দেশে সন্ধ্যাবেলায় আত্মীয়স্বজনের বাড়ী যেত। স্কুলে পড়ার সময় খেলার মাঠে বসে সন্ধ্যোবলায় আড্ডা মারত। কলেজে পড়ার সময় বন্ধুদের সঙ্গে দল বেঁধে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় কি পার্কে বেড়াতে বেরোত।

এখানে একা। বাইরে কোথায় বেরোবে; সাতটা বাজে ঘড়িতে। জানলার পর্দ্দা সরিয়ে সার্সির ভেতর দিয়ে বাইরে তাকাল।

'বিদিশার নিশা' সম্বন্ধে সঙ্গরের সম্যক কোন ধারণা ছিলই না কিন্তু কজ্জলীনিন্দিত এডিনবরার কাল রাত্রিগুলা শঙ্করের মনে দাগ কেটে রাখল। জানলার কাঁচে কান পেতে শুনতে লাগল সোঁ সোঁ করে বাইরে বয়ে চলেছে অশান্ত হাওয়ার অবিশ্রান্ত ক্রন্দনধ্বনি।

স্লিপিং স্যুট গায়ে চাপিয়ে বিছানায় শুয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে ছাদের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল সিলিংয়ের জানলাটা খোলা। এই রকম ঘরকে 'এটিক' বলে। আজ ডিনার খাবার সময় ডাঃ শেলভ্যরাজ বলছিলেন।

এমন সময় দরজায় ঠক্‌টক্ ঠোক্কর পড়তেই শঙ্কর চমকে উঠল। তাই ত কে তার দরজায় এমন সময় নক করছে।

…মিত্রা, ডাঃ মিত্রা দরজা খুলুন। চাপা স্বরে শেলভারাজ ডাকছে।

সচকিত হয়ে দরজা খুলে দেয় শঙ্কর।

—কি ব্যাপার!

—মিত্রা, এই হচ্ছে আমার গার্লফ্রেণ্ড ডরোথী ম্যাকফারসন, স্কেল্যাণ্ড থেকে এসেছে। সেখানকার হসপিটালের নার্স। এখান থেকে পনের মাইল দূরে স্কেল্যাণ্ড, গ্লাসগোর পথে। একসময় আমি সেই হাসপাতালে কাজ করতাম। সেই থেকে বন্ধুত্ব।

এখন মুস্কিল হয়েছে মিস ডেভলিন ঘরেতে গার্লফ্রেণ্ড আনা একেবারে পছন্দ করেননা। আর তিনি সন্দেহ করছেন যে আমি কোন মেয়েছেলেকে নিয়ে এসেছি। ঐ শুনুন সিড়িতে পায়ের শব্দ। এক্ষুনি আমার ঘর মার্চ করবেন।

আপনি নতুন এসেছেন ভালমানুষ। আপনাকে একদম সন্দেহ করবেন না, আপনি কাইণ্ডলি একটু ফেভার করুন। ডরোথীকে আপনি আপনার ঘরে কিছুক্ষণ রেখে দিন। যতক্ষণ না মিস ডেভলিন এ ফ্লোট ছেড়ে নীচে যান। বলে একরকম জোর করেই সে ডরোথীকে শঙ্করের ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে চলে গেল।

শংকর রীতিমত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। বিলেত সম্বন্ধে সে অনেক গল্প শুনেছে। তা বলে আসতে না আসতেই একি!

আগন্তুকার মুখের দিকে ভাল করে তাকাতে সে পারল না। তবে তার শঙ্খশুভ্র পায়ের দিকে তাকিয়েই

সে বুঝতে পারল বয়স কুড়ি একুশের বেশী নয়।

…হামস্—সী ইজ কামিং। ডরোথী ফিসফিসিয়ে বলে।

মিস ডেভলিনের ভারী পায়ের শব্দগুলো ক্রমশঃ নিকটতর হতে থাকে। তারপরে টপফ্লোরে এসে থামে। রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে তারা অপেক্ষা করতে থাকে।

শেলভারাজের দরজার দিকে মিস ডেভলিন প্রথমে গিয়ে নক করেন।

—কাম ইন প্লিজ, বসে গভীর পড়াশুনোয় রত শেলভারাজ উত্তর দেয়। দরজার পাল্লাটা ফাঁক করে মাথা গলিয়ে মিস ডেভলিন ঘরের চারদিকটায় চোখ বুলিয়ে নেন। খালি বই, খাতা, ষ্টেথোস্কোপ, হ্যামার চারদিকে ছড়ান। আর তার মধ্যে পড়ায় ডুবে আছে ডাঃ শেলভারাজ

—আমি কি আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারি মিস ডেভলিন?

নো ডক্, থ্যাঙ্ক ইউ। আমি জানতে এসেছিলাম তোমার ঠাণ্ডায় কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা? নীচে থেকে এককাপ গরম চা পাঠিয়ে দেব নাকি? আমতা আমতা করে কাষ্ঠ হাসি হেসে মিস ডেভলিন বলেন।

মেনি থ্যাঙ্কস। কিন্তু দশটার সময় সাপার। তখনই না হয় চা খাব মিস ডেভলিন।

গুডনাইট…গুডনাইট। স্লিপ ওয়েল।

থপথপে পায়ের ভারী শব্দটা এবার শঙ্করের দরজার দিকে এগিয়ে আসে।

…প্লিজ, সুইচ অফ দি লাইট। ডরোথী মৃদু অথচ তীক্ষ্ণ স্বরে বলে ওঠে। বলেই সুইচটা অফ করতে যায়।

শঙ্কর বাধা দিতে চেষ্টা করে।…হেভেনস্। বাধা দিও না। সবাই তাহলে জড়িয়ে পড়ব। বলে ডরোথী সুইচ অফ করতে ঝুঁকে পড়ে; শঙ্করকে পেরিয়ে। বিছানার ওপাশে সুইচ, বাধা দিতে যাবার ফলে দুজনেই গড়িয়ে বিছানায় পড়ে যায়। আলোটা কিন্তু নিভে যায়।

নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ঘরের ভেতর। অন্ধকারে ঘরের নিস্তব্ধতা যেন আরও বেড়ে গেল।

মিস ডেভলিনের পায়ের শব্দ শঙ্করের দরজার সামনে এসে থেমে যায়। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবেন মিস ডেভলিন। নক্ করতে গিয়েও হাতটা নামিয়ে নেন।

দরজার চাবি গর্ত দিয়ে ভেতরে উঁকি মারেন। অন্ধকার ঘরে কোন সাড়াশব্দ নেই।

—পুয়োর বয়! হি ইজ ষ্টিল ফিলিং হোমসিক। আমাদের সমাজের সঙ্গে এখনও মানাতে পারেনি। বিড়বিড় করে বলতে বলতে ভারী পায়ের আওয়াজ তুলে মিস ডেভলিন নেমে যান।

একটু পরেই ডাঃ শেলভারাজ শঙ্করের ঘরে এসে ঢুকে ধন্যবাদ জানিয়ে ডরোথীকে নিয়ে চলে যায়।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছে শঙ্করের খেয়াল নেই। হঠাৎ তার খুব ঠাণ্ডা লাগতে লাগল। প্রথমে তার মনে হল যে বুঝি বরফের চৌবাচ্ছার মধ্যে পড়ে গেছে। তন্দ্রার ঘোরটা কেটে গেলে সে তাড়াতাড়ি উঠে আলো জ্বেলে দিল।

—আরে একি! ছাদের জানালাটা দিয়ে নরম, সাদা তুলো আঁশের মত কিসব যেন ভেসে আসছে। ঠাণ্ডা। —এ যে বরফ।

এতক্ষণে শঙ্কর বুঝতে পারল বরফ পড়তে আরম্ভ করেছে।

তাড়াতাড়ি ছাদের খোলা জানালাটা বন্ধ করে দিল।

পরের দিন শেলভারাজকে বলতে সে হো হো করে হেসে বলল আরে এদেশে ছাদের জানালা খুলে কেউ শোয় না। বরফ এখানে যে কোন সময়েই পড়তে পারে। 'ব্রিটিশ ওয়েদার এণ্ড ব্রিটিশ উইমেন আর অলওয়েজ আনসার্টেন'। এটা সব সময় মনে রেখ।

শঙ্কর তার পরদিনই সে বাসা ছেড়ে চক্রবর্তি মশায়কে ধরে আর্ডেন হোটেলে এল।

[ক্রমশঃ]

———

তালগাছের কথা

শ্রীসুধীর গুপ্ত

ওই তাল গাছ মাথা তুলে নভে
নীরবে দাঁড়ায়ে নগরোপান্তে
পাতার বাঁশীতে কি কথা কহিছে
প্রান্তরচারী লুব্ধ পান্থে।
"সম্পদ—পদ সম্ভোগময়
ক্ষমতা-দম্ভ থাকে না কিছু ;
নবীন পান্থ, হ'য়ো না ক্লান্ত
ছুটিয়া কখনো এদের পিছু ;
শত প্রলোভনে মানে-ধনে-জনে
ঘিরিয়া ধরিবে তোমারে সবে,
চলার সরল গতিরে করিবে
কুটিল ভেলকি-ভরানো ভবে ;
জটিলতা-জাল ক্রমেই ভয়াল
হবে দিনে দিনে লাভের লোভে ;
তার পরে হায়, হেরিবে হেথায়
জীবন-তপন যখন ডোবে
রোদনে-রুদ্ধ অনাদি আঁধারে
কালি মাখা পথ যায় না বোঝা ;
হাহাকার-ভরা বিলাপী বাতাসে
ব্যর্থ-বিফল পন্থা খোঁজা।"

ভুলে-ভরা ভবে সময়-সাক্ষী
নভ-নীলিমার নিম্নে একা
দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে কত কি আমার
নিত্য হেথায় হয় যে দেখা ;
কত ভাঙা-গড়া—কত ফোটা-ঝরা
ওঠা-পড়া হায় শেষ তো নাই ;
পর্দা-পটের সিনেমা-ছবির
মতই সে সব দেখিতে পাই ;
দ্রুত অনিবার ছায়া-মায়া তা'র
পটেতে পড়িয়া মিলায় দূরে ;
বর্ত্তমানের সবই ক্ষণিকের
মিশায় আঁধার অতীত-পুরে।
শত দম্ভের—অহঙ্কারের
এই পরিণাম জানিল যা'রা,
পদ—সম্পদ সম্ভোগময়
চাহিতে কখনো পারে কি তা'রা ?

নীরব সাক্ষী সরল শাখীটী
কহিছে, "পান্থ, কেবলই চলো ;
সরল তরল জলের ধারার
মতই সূর্য-কিরণে ঝলো।
দু'ধার ভরিয়া পরম-প্রীতির
প্রলেপ বুলাও সোহাগ-ভরে ;
স্নিগ্ধতা যাও ঢালিয়া-ঢালিয়া
সঙ্গীতময় পথের 'পরে ;
তা'র বেশী আর নাই কামনার ;
চির-যাযাবর পান্থ-প্রাণে
চলাই শান্তি—কাম্য—কান্তি
সাম্যতাময় পথের টানে।
মমতা-মাখানো মোহন মধুর
সুদূর যাহারে চলিতে বলে,
ভ্রান্ত থামার পুঞ্জিত-ভার
সঞ্চিত করা তা'র কি চলে' ?"

প্রাচীন ভারতে গ্রাম ও নগর পরিকল্পনা

অধ্যাপক শ্রীঅবনীকুমার দে

নগর পরিকল্পনা একটী কলাবিদ্যা যাহার উদ্দেশ্য হইতেছে মানুষের পরিবেশকে সুষ্ঠুভাবে সাজানো ও মানুষের সুখ সুবিধা, নিরাপত্তা ও আনন্দদানের ব্যবস্থা করা। প্রাচীন বিজ্ঞানগুলির মধ্যে ইহা একটি অন্যতম বিদ্যা যাহা প্রাচীন ভারতে ব্যবহার করা হইত এবং অত্যন্ত উন্নত ছিল।

নগর পরিকল্পনার ইতিহাস পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কালেই নগরপরিকল্পনাবিদ্যার সমস্ত নিয়মাবলী প্রচলিত ছিল। প্রাচীন মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ হইতে আমরা দেখিতে পাই যে ঐ স্থানগুলিতে সুপরিকল্পিত রাস্তাঘাট ও অতীব সুন্দর পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা ছিল এবং পৌর ব্যবস্থার নিয়মাবলীরও প্রচলন ছিল।

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রণীত রামরাজের প্রসিদ্ধ পুস্তক "হিন্দুদের স্থাপত্যবিদ্যা" হইতে জানা যায় যে খ্রীষ্টের জন্মের বহু পূর্ব্বে ভারতের আর্য্যদের মধ্যে গ্রাম ও নগর পরিকল্পনা খুবই সুষ্ঠুভাবে করা হইত।

কৌটিল্য তাহার অর্থশাস্ত্রে খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকে মৌর্য্য রাজত্বের সময় প্রচলিত নগর পরিকল্পনার সামাজিক ও প্রায়োগিক বিষয় সম্বন্ধে বিশদ নিয়মাবলীর বর্ণনা করিয়াছেন।

১৯১০ সালে প্রকাশিত "প্রাচীন দাক্ষিণাত্যের নগর পরিকল্পনা" পুস্তকে শ্রী সি, পি, ভি, আয়ার দুই হাজার বছর আগেকার তৈয়ারী মাদুরা ও অন্যান্য সহর পরিকল্পনার নিয়মাবলী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন: এই নগরগুলি সাধারণতঃ মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষার জন্য নগরে খোলা জায়গা, উদ্যান, পরিষ্কার জলের ব্যবস্থা, ময়লা জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও চারিদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা থাকিত। লোকেরা তাহাদের নিজ নিজ জীবিকা অনুযায়ী বিভিন্ন অংশে বাস করিত। বাজার, দোকান, বিদ্যালয়, সরকারী ভবন, পুষ্করিণী, পানীয় জলাধার ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থাপিত হইত।

আগেই বলা হইয়াছে যে ভারতবর্ষের ইতিহাসের সুবর্ণযুগে 'নগর পরিকল্পনা, বিদ্যা একটী বিজ্ঞান ও কলারূপে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। এই বিদ্যাটীকে 'স্থাপত্যম্' বলা হইত এবং ইহাকে অথর্ব্ব বেদের একটী 'উপবেদ' হিসাবে গণ্য করা হইত। কথিত আছে যে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা এই বিদ্যার প্রবর্ত্তন করেন ও কয়েকজন ঋষিকে উহা শিক্ষা দেন। তাঁহারা তাঁহাদের শিষ্যদের এই বিদ্যা শিক্ষা দেন। এই শিষ্যরাই তাঁহাদের লব্ধ জ্ঞান উত্তরকালের লোকদের সুবিধার জন্য লিপিবদ্ধ করেন।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তসাম্রাজ্যের সময়কালে প্রচুর মন্দির ও গ্রাম তৈয়ারী করা হইয়াছিল। গুপ্তসাম্রাজ্যের সময়ের পরবর্ত্তী কালে 'মানসার' হিন্দু স্থাপত্য বিদ্যা সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 'মায়ামত শিল্পশাস্ত্র' মানসারের সমসাময়িক।

মানসার, মায়ামতম্, বিশ্বকর্ম্মা বাস্তুশাস্ত্রম্, বাস্তুবিদ্যা, শিল্পবিজ্ঞান-সংগ্রহম্, বিশ্বকর্ম্মা বিদ্যাপ্রকাশ ইত্যাদি কয়েকটী প্রধান প্রধান গ্রন্থ হইতে প্রাচীন নগর পরিকল্পনার পদ্ধতি সম্বন্ধে আমরা জানিতে পারি। উপরিউক্ত গ্রন্থগুলি ছাড়াও অগ্নিপুরাণ, ব্রহ্মানন্দ পুরাণ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, দেবীপুরাণ, গরুড়পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ, মৎস্যপুরাণ, বায়ুপুরাণ, ভোজের যুক্তিকল্পতরু ইত্যাদি গ্রন্থগুলিতেও নগরপরিকল্পনা বিদ্যার সম্বন্ধে কিছু কিছু বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বিখ্যাত রামায়ণ ও মহাভারত গ্রন্থ হইতে আমরা শ্রীরামচন্দ্রের রাজধানী অযোধ্যা, রাজা জনকের রাজধানী মিথিলা, রাবণের রাজধানী লঙ্কা, শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা, কৌরবদের হাস্তিনাপুর, পাণ্ডবদের ইন্দ্রপ্রস্থ ইত্যাদি নগরের বিবরণ পাই। এই নগরগুলি শাস্ত্রমতে পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। প্রাচীন ঐতিহাসিক নগরগুলি যথা পাটলীপুত্র, তক্ষশীলা, উজ্জয়িনী, কাঞ্চী, মহাবল্লীপুরম্, তাঞ্জোর মাদুরা, বিজয়নগর ইত্যাদিও শাস্ত্রানুযায়ী পরিকল্পনা করা হইয়াছিল।

প্রাচীনকালে প্রত্যেক রাজার রাজধানীতে তাঁহার নিজস্ব স্থায়ী 'স্থপতি' ও তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারীরা থাকিতেন। স্থপতির কাজ ছিল নিখুঁতভাবে নগর পরিকল্পনা করা ও নক্সার মধ্যে রাস্তাঘাট, বিভিন্ন অংশের চতুঃসীমা নির্দ্দেশ, বৃক্ষাদি রোপণের পরিকল্পনা এবং পুষ্করিণী, উদ্যান ও প্রধান প্রধান ইমারতগুলির স্থান নির্দ্দেশ করা ইত্যাদি। স্থপতির পরেই স্থান ছিল 'সূত্রগ্রহীর'। তিনি ছিলেন জমি জরীপ ও নক্সা তৈয়ারীর কাজে বিশেষজ্ঞ। অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের মধ্যে থাকিতেন আরাম, উদ্যান ও কৃত্রিম বন পরিকল্পনা, দুর্গ পরিকল্পনা ও মার্গ বা রাস্তাঘাট তৈয়ারীর বিশেষজ্ঞেরা।

মানসার ও মায়ামতের মতে ব্যবহার অনুযায়ী নগরগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইত। যথা—

(১) **নগর**—ইহা আভ্যন্তরীন ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্রছিল। ব্যবসায়ী ও কারিগরেরা এখানে বাস করিতেন।

(২) **পত্তন**—নদী বা সমুদ্রের ধারে অবস্থিত বৈদেশিক বাণিজ্যের নিমিত্ত বন্দর। এখানে প্রধানতঃ মণিমুক্তা, রেশম, সুগন্ধি দ্রব্য ইত্যাদির ব্যবসায়ী বৈশ্যদের বাস ছিল।

(৩) **দুর্গ**—ইহা এক একটী দেশের নায়কদের শাসনকার্য্য পরিচালনা ও সৈনিককের জন্য ব্যবহৃত হইত। বৃহৎ প্রাচীর বেষ্টিত এই সকল নগর আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হইত।

(৪) **রাজধানী**—একটী রাজ্যের রাজধানী। এখানে রাজার রাজপ্রাসাদ ও তাহার চারিপার্শ্বে সৈনিকদের ঘাঁটী থাকিত।

(৫) **খেট**—নদীর তীরে অথবা বনের মধ্যে ছোট পাহাড়ের ধারে অবস্থিত ছোট নগর। এখানে প্রধানতঃ শূদ্রদের বাস ছিল।
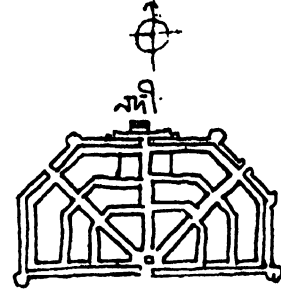
১১ নং চিত্র

খেট নগরের নক্সা

(৬) **খর্ব্বট**—একশতটী গ্রামের কেন্দ্রে অবস্থিত নগর। ঐ গ্রামগুলি হইতে আনীত দৈনিক খাদ্রদ্রব্য ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যাদি চারিপার্শ্বের নগরগুলিতে এইস্থান হইতে প্রেরণ করা হইত।

১২ নং চিত্র

খর্ব্বট নগরের নক্সা

(৭) **শিবির**—রাজা যখন রাজ্য জয়ে বাহির হইতেন তখন ইহা তাঁহার সৈন্যদের জন্য ব্যবহৃত হইত।

বিশ্বকর্ম্মা বাস্তুশাস্ত্র মতে ব্যবহার অনুযায়ী গ্রামগুলিকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা—

(১) **মন্দক গ্রাম**—প্রধানতঃ ব্রাহ্মণদের বাসের জন্য।

(২) **প্রস্তর গ্রাম**—ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যদের (ব্যবসায়ী শ্রেণী) জন্য প্রাচীর বেষ্টিত গ্রাম।

(৩) **বক্তলিক গ্রাম**—প্রস্তর গ্রামের ন্যায়। সর্ব্ব-

শ্রেণীর লোকেদের জন্য এবং বিশেষতঃ কৃষিজীবীদের জন্য এই গ্রাম ব্যবহৃত হইত।

(৪) **পরাগ গ্রাম**—প্রধানতঃ কৃষিজীবীদের জন্য। তবে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীর লোকেরাও বাস করিতে পারিতেন।

(৫) **চতুর্ম্মুখ গ্রাম**—আয়তনে আরও বড়, চতুর্দ্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত এবং সর্ব্বশ্রেণীর লোকেদের বাসের জন্য গ্রাম। ইহার চারিদিকে চারিটি দ্বার থাকিত। গ্রামের প্রধান গ্রামের মধ্যে একটী পৃথক অংশে বাস করিতেন।

(৬) **পূর্ব্বমুখ গ্রাম**—প্রধানতঃ ব্যবসায়ী ও ভূস্বামীদের বাসের জন্য বড় গ্রাম। কারিগরেরাও এখানে বাস করিতেন। পরিদর্শনকালে রাজার বাসের জন্য একটী স্থানও থাকিত।

(৭) **মঙ্গল গ্রাম**—সকল শ্রেণীর লোকদের বাসের জন্য প্রাচীর বেষ্টিত বড় গ্রাম। বহুতল বিশিষ্ট অট্টালিকা, বাজার, মণ্ডপ, পুষ্করিণী ইত্যাদিও এখানে থাকিত।

(৮) **বিশ্বকর্ম্মা গ্রাম**—সাধারণতঃ নদীরধারে অবস্থিত, প্রায় ৩০০০ লোকের বাসোপযোগী নগরেরন্যায় বড় প্রাচীর বেষ্টিত গ্রাম। প্রধানতঃ ব্যবসায়ী ও ধনী ব্যক্তিরা এখানে বাস করিতেন। রাজার রাজপ্রাসাদ ও বিচারগৃহ এখানে থাকিত।

(৯) **দেবেশ গ্রাম**—প্রধানতঃ ব্যবসায়ী ও কারিগরদের বাসের জন্য বড় গ্রাম।

(১০) **বিশ্বেশ গ্রাম**—প্রধানতঃ ব্যবসায়ী ও কারিগরদের বাসের জন্য প্রাচীর বেষ্টিত গ্রাম। এখানে অনেক ললিতকলা প্রদর্শনী গৃহ থাকিত।

(১১) **কৈলাস গ্রাম**—প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যদের বাসের জন্য সমুদ্রের ধারে বা পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত সুরক্ষিত গ্রাম। পূর্ব্বদিক হইতে গ্রামের প্রধান প্রবেশদ্বার থাকিত।

(১২) **নিত্যমঙ্গল গ্রাম**—প্রায় ৬০০০ লোকের বাসোপযোগী অতীব সুরক্ষিত গ্রাম। ইহা প্রশাসনিক ও ধর্ম্মীয় কার্য্যের কেন্দ্র ছিল। প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ, ব্যবসায়ী ও তন্তুবায়েরা এখানে বাস করিতেন। গ্রামে মন্ত্রণা-গৃহ, রাজপ্রাসাদ, বিচারগৃহ ও অনেক মন্দির থাকিত।

(১৩) **খেট গ্রাম**—বনদেশে অবস্থিত ব্যাধ ও অন্যান্য আমিষভোজীদের বাসের জন্য গ্রাম।

(১৪) **খর্ব্বট গ্রাম**—নদীর তীরে অবস্থিত ধীবরদের বাসের জন্য গ্রাম।

(১৫) **পল্লী**—বনের ধারে বা পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত ছোট গ্রাম। এখানকার অধিবাসীরা প্রধানতঃ গবাদি ও অশ্বাদি পশুর প্রজনন করাইবার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। অন্যান্য শ্রেণীর লোকেরাও এখানে বাস করিত।

(১৬) **ঘোষ গ্রাম**—বন বা পাহাড় সংলগ্ন বিস্তীর্ণ পশুচারণ ভূমির মধ্যে অবস্থিত গোপালকদের বাসের জন্য গ্রাম। প্রচুর গবাদি পশুও এখানে থাকিত।

(১৭) **অভীর গ্রাম**—ঘোষ গ্রামের ন্যায় কিন্তু আয়তনে আরও বড়।

উপরিউক্ত গ্রামগুলি ব্যতীত বিশ্বকর্ম্মা বাস্তুশাস্ত্রে নিম্নলিখিত প্রকারের নগরগুলির পরিকল্পনার বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে :—

(১) পুর, (২) দেবনগর, (৩) মানুষনগর, (৪) বৈজয়ন্তনগর, (৫) পূতবেদন নগর, (৬) অষ্টমুখ নগর, (৭) রাজধানী।

বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেদের কার্য্যের ও বসবাসের স্থানগুলিকে গ্রাম, পুরম্, পত্তনম্ এবং পুরী নামে অভিহিত করা হইত। উহাদের নকসা পরিকল্পনা করা হইত কয়েক প্রকার বিশেষ বিশেষ জ্যামিতিক আকার অনুযায়ী যাহা শুভ ও সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। গ্রাম ও নগরের নকশা পরিকল্পনার ধারা অনুযায়ী মানসার ও মায়ামত উহাদের ১৫টি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা :—

(১) দণ্ডক (২) সর্ব্বতোভদ্র (৩) নন্দ্যাবর্ত্ত (৪) পদ্মক (৫) স্বস্তিক (৬) প্রস্তর (৭) কার্ম্মুক (৮) চতুর্ম্মুখ (৯) পরাকীর্ণক (১০) পরাগ (১১) সম্পতকর (১২) শ্রীপ্রতিস্থিতি (১৩) কুম্ভক (১৪) শ্রীবস্ত ও (১৫) বৈধক।

(১) **দণ্ডক**—প্রায় ৫০ হইতে ৩০০ জন ব্রাহ্মণদের জন্য ইহা ক্ষুদ্রতম গ্রাম। গ্রামের আকার আয়তাকার। গ্রামের চারিপাশের প্রাচীরের চারিদিকে পরিখা থাকিত। সংসারত্যাগী ব্রাহ্মণদের সুবিধার জন্য ইহা পাহাড়ের উপর

অথবা বনময় উপত্যকা ভূমিতে অবস্থিত হইত।
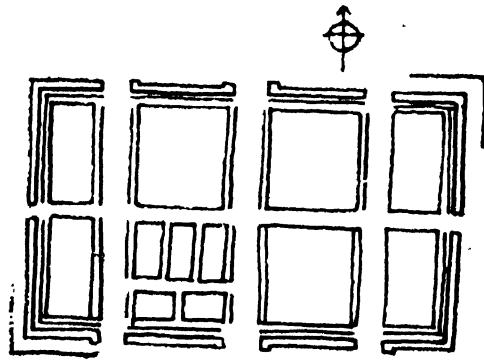
২নং চিত্র

দণ্ডক গ্রামের নক্সা

(২) **সর্ব্বতোভদ্র**—বর্গাকার গ্রাম। ব্রাহ্মণ, জৈন, বুদ্ধ ও বিভিন্ন শ্রেণীর গৃহস্থদের বাসের জন্য। গ্রামের মধ্যস্থলে ব্রহ্মা, শিব বা বিষ্ণুর মন্দির অবস্থিত।
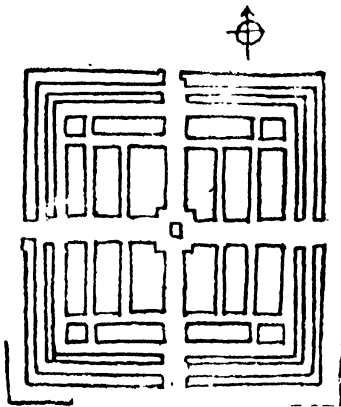
৩ নং চিত্র

সর্ব্বতোভদ্র গ্রামের নক্সা

প্রধান প্রধান রাস্তার সহিত পথচারীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট পথ থাকিত। যথারীতি গ্রামের বিভিন্ন অংশগুলিকে দৈব, মনুষ ও পৈশাচ বেষ্টনী নামে অভিহিত করা হইত। পৈশাচ স্থানের চারিটি কোণায় চারিটি অতিথি-নিবাস থাকিত। গ্রামের বাহিরে চামুণ্ডার মন্দির ও চণ্ডালদের গৃহাদি থাকিত। গ্রামের প্রাচীরের চারিদিকে চারিটি প্রধান প্রবেশ দ্বার থাকিত।

১নং চিত্র
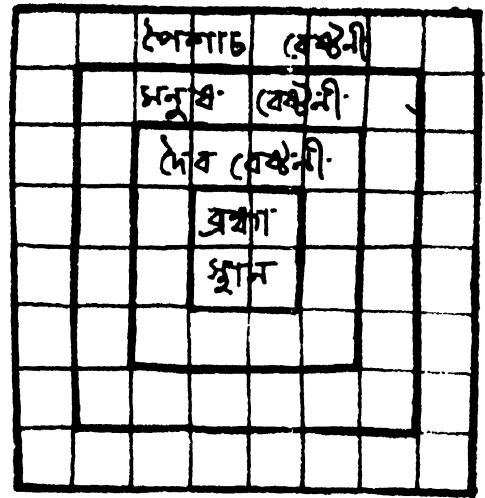
(৩ **নন্দ্যাবর্ত্ত**—বর্গাকার বা আয়তাকার গ্রাম। এখানে ১০০০ বা ততোধিক লোকের বাস ছিল। গ্রামে চার শ্রেণীর রাস্তা ছিল। 'মহামার্গ' ও 'বীথি' ৪৫ ফুট হইতে ৬০ ফুট প্রশস্ত হইত। 'বীথি'র সহিত পথচারীদের পথ থাকিত এবং মহামার্গের সহিত উহা থাকিত না। 'মার্গ'

৪ নং চিত্র
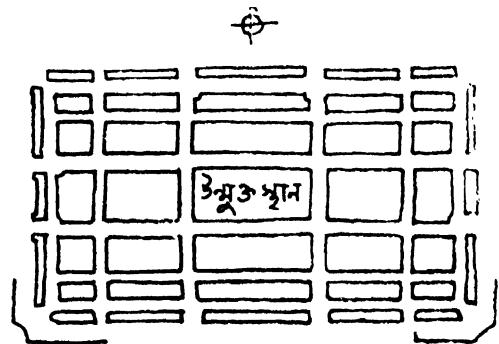
নন্দ্যাবর্ত্ত গ্রামের নক্সা

৩০ফুটপ্রশস্ত হইত এবং 'ক্ষুদ্রমার্গ' আরও কমপ্রশস্ত হইত। রাজপ্রাসাদের নিকট ক্ষত্রিয়দের ও উত্তরে ব্রাহ্মণদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইত। গ্রামের চতুঃসীমায় নিরাপত্তার নিমিত্ত দেবদেবীর মন্দির থাকিত। চারিদিকে চারিটি প্রধান

প্রবেশ দ্বার ব্যতীত গ্রামের চারি কোণায় আরও চারিটী দ্বার থাকিত। গ্রামের প্রাচীরের বাহিতে উত্তরদিকে

৫ নং চিত্র

পদ্মক গ্রামের নক্সা

কালীর মন্দির থাকিত এবং ইহা হইতে আরও দূরে চণ্ডালদের গৃহাদি থাকিত।

(৪) **পদ্মক**—বর্গাকার গ্রান। চারিপার্শ্বের প্রাচীর বৃত্তাকার বা অষ্টভুজাকৃতি এবং পদ্মের ন্যায় আকৃতির হইত। গ্রামের মধ্যস্থানে মন্দির, মণ্ডপ থাকিত।

(৫) **স্বস্তিক**—বর্গাকার আকৃতির গ্রাম। হিন্দুদের শুভ অনুষ্ঠানের শুভ প্রতীক 'স্বস্তিকার' আকারে রাস্তাঘাটের

৬ নং চিত্র

স্বস্তিক গ্রামের নক্সা

পরিকল্পনা করা হইত। গ্রামটী প্রাচীর বেষ্টিত। প্রাচীরের চারিকোণায় চারিটি পর্য্যবেক্ষণ বুরুজ থাকিত। বিভিন্ন শ্রেণীর রাজাদের জন্য এই গ্রাম ব্যবহৃত হইত। সর্ব্বপ্রকার শ্রেণীর লোক এখানে বাস করিত এবং হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদের দেবমন্দির থাকিত।

(৬) **প্রস্তর**—বর্গাকার বা আয়তাকার গ্রাম। প্রাচীর বেষ্টিত এবং ৪, ৬ বা ৮টী প্রবেশ দ্বার থাকিতে পারে।
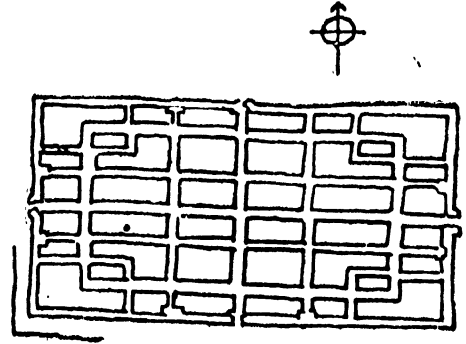
৭ নং চিত্র

প্রস্তর গ্রামের নক্সা

দৈব অথবা মনুষ স্থানে রাজার প্রাসাদ থাকিতে পারে। পৈশাচ বেষ্টনীর বাহিরের দিকে প্রধান রাস্তার ধারে বৈশ্যদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইত। নিকটে প্রধান রাস্তার পাশে দোকান, বাজার ইত্যাদি থাকিত। পৈশাচ স্থানে কারিগর, ধীবর, দর্জ্জি ও অন্যান্য ব্যবসায়ের লোকেরা বাস করিত।

(৭) **কার্ম্মুক**—প্রধানতঃ বৈশ্য বা ব্যবসায়ীদের জন্য নদীতীরে বা সমুদ্রধারে অবস্থিত গ্রাম। অন্যান্য শ্রেণীর লোকেরা যথা শূদ্র ও ক্ষত্রিয়েরাও এখানে বাস করিতে

৮ নং চিত্র

কার্ম্মুখ গ্রামের নক্সা

পারে। ঐরূপ ক্ষেত্রে গ্রামের নাম হইবে যথাক্রমে খেটক ও খর্ব্বট। গ্রামের বহিঃসীমার আকার ধনুকের ন্যায় এবং নদীর বা সমুদ্রের ধারের রাস্তা ধনুকের ন্যায় বাঁকা। প্রাচীর থাকা আবশ্যিক নহে। এই গ্রামে শিব ও বিষ্ণু মন্দির থাকিতে পারে।

(৮) **চতুর্ম্মুখ**—গ্রামের আকার আয়তাকার।

৯ নং চিত্র
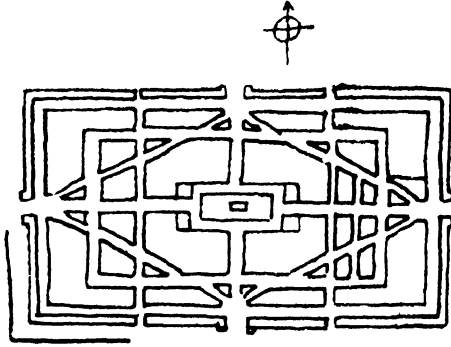
চতুর্ম্মুখ গ্রামের নক্সা

গ্রামের নক্সার বিষয়ে কয়েকটী বিশেষ নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। পরে সম্প্রসারণের জন্য গ্রামের ভিতরে ও বাহিরে স্থান ছাড়িয়া রাখিতে হইবে। গ্রামের মধ্যে কয়েকটী সুবিধাজনক স্থানে খোলা জায়গা ছাড়িয়া রাখিতে হইবে যেখানে পরে গৃহাদি নির্ম্মিত হইতে পারে। গ্রামের বাহিরে, যে দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে তাহার বিপরীত দিকে ভবিষ্যতে সম্প্রসারণের জন্য স্থান ছাড়িয়া রাখিতে হইবে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যদি উহা সম্ভব না হয় তাহা হইলে সম্প্রসারণ অন্য দিকেও হইতে পারে। প্রাচীন ইমারত, মন্দির ইত্যাদি সংরক্ষণ করিতে হইবে। ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে বর্ত্তমান কালেও নগর-পরিকল্পনা বিষয়েবিশেষজ্ঞেরাও এই নির্দ্দেশ মানিয়া চলেন। তাঁহারা নক্সা তৈয়ারী করিবার সময় ঐতিহাসিক ইমারত, মন্দির ইত্যাদির সংরক্ষণ করিয়া থাকেন।

প্রায় সকল শিল্প শাস্ত্রেই দুর্গ পরিকল্পনা ও তৈয়ারীর বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। মায়ামতম্ নিম্নলিখিত প্রকারের দুর্গের বিশদ বিবরণ দিয়াছেন।

(১) গিরিদুর্গ বা পর্ব্বতদুর্গ (২) নদী দুর্গ (৩) নিরুদক দুর্গ বা মরুভূমিতে নির্ম্মিত দুর্গ (৪) বন দুর্গ (৫) মৃৎ দুর্গ বা মাটীর নির্ম্মিত দুর্গ (৬) নর দুর্গ, সৈন্য দুর্গ (৭) মিশ্র

১৩নং চিত্র

জলদুর্গের নক্সা

(গিরি দুর্গ ও বন দুর্গের মিশ্রণ) দুর্গ (৮) দৈব দুর্গ বা দেবতাদের দুর্গ ও (৯) কৃত্রিম দুর্গ।

মন্দির—মন্দিরের জন্য সংরক্ষিত স্থানগুলি আয়তাকার হইবে কিন্তু ইহা নগরের কেন্দ্রস্থলে হইলে বর্গাকার হইবে। গর্ভগৃহ, পূর্ব্ব মণ্ডপ, ভদ্রমণ্ডপ, ধ্বজস্তম্ভ, বলিপীঠ, এবং প্রাকার লইয়া মন্দির গঠিত হইত। শিল্পশাস্ত্রগুলিতে মন্দিরের বিভিন্ন অংশের পরিকল্পনা, তৈয়ারীর রীতি, স্থাপত্যের ও ভাস্কর্য্যের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থগুলি হইতে আমরা নিম্নলিখিত প্রকারের গৃহগুলিরও বিশদ বিবরণ জানিতে পারি :—

(১) **দুর্গ**—প্রাচীর, প্রবেশদ্বার, ক্ষুদ্রগম্বুজ ইত্যাদির বিবরণ।

(২) **মন্দির**—গোপুরম্, মণ্ডপ, বিমান ইত্যাদির বিবরণ।

(৩) **রাজপ্রাসাদ**—সম্মুখের স্থান, বিচার স্থান, সিংহাসন রাখিবার স্থান, তোষাখানা, অস্ত্রশস্ত্রাগার, গ্রন্থাগার, ভোজ-ঘর, শয়ন কক্ষ, গ্রীষ্মকালীন আবাস স্থান, প্রমোদ কানন, অন্তঃপুর ইত্যাদির বিবরণ।

(৪) **সৌধ**—সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, রাজপুরুষ, রাজপুত্র, মন্ত্রী, সেনাপতি ইত্যাদির জন্য সৌধগুলির বিবরণ।

(৫) **তোরণ**—কারুকার্য্যখচিত প্রবেশ দ্বার, বিজয় তোরণ, রাজধানী ও সহরের প্রবেশ দ্বার ইত্যাদির বিবরণ।

(৬) **বাপী ও তড়াগ**—নগরের মধ্যে ও বাহিরে ছোট ও বড় পুষ্করিণী, স্নানের মণ্ডপ, পাতকুয়া ইত্যাদির বিবরণ।

(৭) **বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়**—বক্তৃতা ও পরীক্ষার নিমিত্ত হলঘর, গবেষণাগার ইত্যাদির বিবরণ।

(৮) **নাটকশালা, নাট্যশালা** ও সঙ্গীতানুষ্ঠানগৃহ ইত্যাদির বিবরণ।

(৯) **গৃহের নিরাপত্তা**র নিমিত্ত, সিঁড়ি, রেলিঙ, ছাত, থাম ইত্যাদির বিবরণ।

(১০) **গৃহের আসবাবপত্র** যথা বেঞ্চি, চেয়ার, বাতিদান ইত্যাদির বিবরণ।

(১১) **গোয়ালঘর, অশ্বশালা** ইত্যাদির বিবরণ।

(১২) **ধর্মশালা, কয়েদখানা, দোকান, গুদাম-ঘ** ইত্যাদির বিবরণ।

নগর পরিকল্পনার নিয়মাবলী

অধিবাসীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় প্রয়োজন অনুযায়ী যে প্রকারের গ্রাম, নগর বা সহর পরিকল্পনা করা প্রয়োজন সেই বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া স্থপতি নিম্নলিখিত প্রকারে কার্য্য করিতেন:—

(১) **ভূ পরীক্ষা**—জমির জরীপকার্য্য, মাটী পরীক্ষা, ও ভূগর্ভস্থ জলের উপযুক্ততা নির্ণয়।

(২) **ভূমি-সংগ্রহ**—জমির আকার, ঢাল, জল নিষ্কাশনের সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া স্থানটী নির্ব্বাচন করা।

(৩) **দিক পরীক্ষা**—স্থানটী পাহাড়, নদী, সমুদ্র, পুষ্করিণী অথবা খালের নিকটে কিনা, স্থানটীর পারিপার্শিক অবস্থা কিরূপ, বিভিন্ন দিক হইতে স্থানটীতে যাতায়াতের সুবিধা কিরূপ ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান করা।

(৪) **পদ বিন্যাস**—প্রয়োজন এবং ব্যবহার অনুযায়ী স্থানটীকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা।

(৫) **ভূমি-বিধান** জমির উন্নতিসাধন ও সংস্কার।

(৬) **আলয়-বিধান**—মন্দির ও আনুসঙ্গিক গৃহাদির স্থান নির্ণয়।

(৭) **গ্রাম বিন্যাস, পুরবিন্যাস, পত্তন বিন্যাস, নগর ও পুরী বিন্যাস** ইত্যাদি—গ্রাম, নগর ও সহরের পরিকল্পনা।

(৮) **গৃহ-বিন্যাস**—গৃহ ও সৌধগুলির পরিকল্পনা ও নক্সা তৈয়ারী করা।

(৯) **মণ্ডপ-বিধান**—জনসাধারণের নিমিত্ত হলঘর, বিচারগৃহ, চক ইত্যাদির তৈয়ার কার্য্য।

(১০) **গোপুর-বিধান**—প্রবেশ দ্বার, তোরণ দ্বার ইত্যাদির তৈয়ার কার্য্য।

(১১) **রাজবেশ্ম-বিধান**—প্রশাসনিক সৌধ, রাজপ্রাসাদ ইত্যাদির তৈয়ার কার্য্য।

পরিমাপের একক

জমি জরীপের কার্য্য নক্সা তৈয়ার, নক্সা অনুযায়ী জমিতে মাপিয়া দাগ দেওয়া এবং বিভিন্ন অংশের গভীরতা, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গৃহাদির উচ্চতা ইত্যাদি নির্ণয়ের জন্য পরিমাপের একক স্থির করা একান্ত প্রয়োজন। স্থপতি ও শিল্পীদের নিজস্ব মাপের ধারা ছিল। স্থপতিরা পরিমাপ করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত এককগুলি ব্যবহার করিতেন:—

৬ ব্রীহীতে (শালী ধান্যের)···১ অঙ্গুল (ইংরাজী ¾ ইঞ্চি)
১২ অঙ্গুলে············১ বিতস্তি বা বিঘত (৯ ইঞ্চি)
২ বিতস্তিতে······১ হস্ত (১ ফুট ৬ ইঞ্চি)
২ হস্ততে ·········১ ধনুর্মুষ্টি অথবা ১ গজ (৩ ফুট)
২ ধনুর্মুষ্টিতে······১ দণ্ড (৬ ফুট)
২ দণ্ডতে······ ···১ রাজদণ্ড (১২ ফুট)
২ রাজদণ্ডতে······১ ব্রহ্মদণ্ড (২৪ ফুট)

মাপিবার দণ্ড কাঠ, রেশমী কাপড়, ধাতু অথবা গাছের ছাল দ্বারা নির্ম্মিত হইত। গ্রামের পরিমাপ দণ্ডতে এবং সহরের পরিমাপ রাজদণ্ডতে করা হইত। মন্দিরের স্থানগুলির পরিমাপে ব্রহ্মদণ্ড ব্যবহার করা হইত।

প্রধান রাস্তাঘাট

প্রাচীন নগর পরিকল্পনায় রাস্তাঘাটগুলিকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হইত:—

(১) **দেশমার্গ ও গ্রামমার্গ**—দেশ ও জিলার প্রধান সড়ক।

(২) **রাজমার্গ**—নগর ও সহরের মধ্যের যানবাহন চলাচলের প্রধান রাস্তা।

(৩) **মার্গ**—গৃহনির্ম্মাণের জমিগুলিতে যাইবার জন্য রাস্তা। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রমতে বিভিন্ন প্রকারের রাস্তাঘাটের প্রশস্ততা নিম্নপ্রকারের হইবে।

(১) **দেশমার্গ**—১৮০ ফুট প্রশস্ত হইবে।

(২) **গ্রামমার্গ**—১২০ ফুট প্রশস্ত হইবে।

(৩) **সীমামার্গ**—(প্রধান প্রধান নগরের সংযোগকারী রাস্তা)—৬০ ফুট প্রশস্ত হইবে।

(৪) **পুরমার্গ**—(দুইটি গ্রামের সংযোগকারী রাস্তা) ৪৮ ফুট প্রশস্ত হইবে।

(৫) **মার্গ**—(গ্রামের গরুর গাড়ী চলিবার পথ) ২৪ ফুট প্রশস্ত হইবে।

নগরের ও সহরের মধ্যের রাস্তাঘাটগুলি নিম্নলিখিত প্রকার প্রশস্ত হইবে :—

(১) **প্রধান রাজমার্গ**—৮০ ফুট প্রশস্ত।

(২) **গৌণ রাজমার্গ**—প্রাধান্য অনুসারে ৪৮ ফুট হইতে ২৪ ফুট প্রশস্ত হইবে।

(৩) **সাধারণ মার্গ**—২৪ ফুট প্রশস্ত।

রাস্তার মধ্যে গাড়ী (রথ) যাইবার অংশ ১৫ ফুট প্রশস্ত হইবে, গৃহাদির সম্মুখের উন্মুক্ত স্থান ৭ ফুট ৬ ইঞ্চি প্রশস্ত হইবে, পথচারীদের জন্য সংরক্ষিত পথ ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি প্রশস্ত হইবে এবং গবাদি পশুদের জন্য সংরক্ষিত পথ ৬ ফুট প্রশস্ত হইবে।

মানসারের মতে নিম্নলিখিত প্রকারের বড় গ্রাম ও নগরের রাস্তাঘাটগুলির বিবরণ পাওয়া যায় :

(১) **মঙ্গলবীথি**—গ্রাম ও নগরের চতুর্দ্দিক বেড়িয়া (Outer ring road) রাস্তা। কমপক্ষে ৩০ ফুট প্রশস্ত হইবে।

(২) পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রসারিত রাস্তাকে বলা হইত রাজপথ।

(৩) **রাজবীথি**—যে রাস্তার দুই প্রান্তে প্রবেশ দ্বার থাকিত।

(৪) **সন্ধিবীথি**—যে রাস্তার সন্ধি বা junctions থাকিত।

(৫) উত্তর-দক্ষিণগামী রাস্তাকে বলা হইত **মহাকাল** বা **বামনবীথি**।

(৬) কেন্দ্রস্থলের ব্রহ্মাস্থানের মধ্য দিয়া যে রাস্তা যাইত তাহার নাম ছিল **ব্রহ্মাবীথি**।

সাধারণতঃ মঙ্গলবীথি ও রাজবীথি প্রস্তর দ্বারা বাঁধান থাকিত।

শুক্রনীতি শাস্ত্রে রাস্তাঘাট পরিকল্পনার বিষয়ে নিম্ন-

(১) রাজপ্রাসাদ ও মন্দিরের সম্মুখে প্রশস্ত স্থান থাকিবে।

(২) অধিবাসীদের মর্য্যাদানুসারে রাস্তার দুই পাশে গৃহগুলি বিন্যস্ত থাকিবে।

(৩) রাস্তা সংলগ্ন গৃহগুলির উচ্চতা সম্মুখের রাস্তার প্রশস্ততা অপেক্ষা উচ্চ হইবে না।

(৪) রাস্তাগুলি কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় হইবে অর্থাৎ মধ্যে উচ্চ হইবে ও দুই দিকে ঢাল থাকিবে। এবং প্রয়োজনমত স্থানে সাঁকো বা পুল থাকিবে।

(৫) জল নিষ্কাশনের জন্য রাস্তার দুই ধারে নালা থাকিবে।

(৬) গৃহগুলির সম্মুখদিক রাজমার্গ অথবা অন্যান্য রাস্তার উপর হইবে এবং উহাদের পশ্চাৎদিকের চত্বরে স্নানঘর ও পায়খানা থাকিবে।

(৭) প্রতি বৎসর রাজা রাস্তাঘাটগুলির মেরামতি করাইবেন এবং এইজন্য এই সকল রাস্তা যাঁহারা ব্যবহার করেন বা যাঁহারা এই সকল রাস্তা দ্বারা উপকৃত হন তাঁহাদের নিকট হইতে রাজা কর আদায় করিতে পারিবেন।

(৮) গ্রামে ও নগরে যত্নসহকারে বৃক্ষলতাদি রোপণ করিতে হইবে। বসত স্থানের নিকটে ভাল ভাল ফুলের গাছ বসাইতে হইবে। ভাল ভাল গাছ ৩০ ফুট অন্তর, মধ্যম শ্রেণীর গাছ ২২½ ফুট অন্তর, সাধারণ শ্রেণীর গাছ ১৫ ফুট অন্তর ও ছোট ছোট গাছগুলি ৭½ ফুট অন্তর রোপণ করিতে হইবে।

(৯) কূয়া, পুষ্করিণী ও খালের ধারে ও চারিদিকে রাস্তা বা পথচারীদের নিমিত্ত পথ থাকিবে এবং সুবিধাজনক স্থানে সিঁড়ি থাকিবে। নদীর উপর পুল নির্ম্মাণ করিতে হইবে এবং পারাপার ও যাতায়াতের জন্য নৌকা এবং অন্যান্য জলযান থাকিবে।

(৯) কূয়া, পুষ্করিনী ও খালের ধারে ও চারিদিকে রাস্তা বা পথচারীদের নিমিত্ত পথ থাকিবে এবং সুবিধাজনক স্থানে সিঁড়ি থাকিবে।

(১০) কেহই রাস্তায় অবরোধ সৃষ্টি করিবে না। এমন কি রাজাও হাটে ও বাজারে কোনপ্রকার যানবাহনে

(১১) রাস্তায় বর্ষীয়ান ব্যক্তি, অসুস্থ ব্যক্তি, রাজা, মৃতদেহ বহনকারী, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, সাধু ও শকটারোহীদের পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে। অশ্ব অথবা গবাদি পশু হইতে ৫ হস্ত ও শকটাদি হইতে ১০ হস্ত দূরে চলা বাঞ্ছনীয়।

(১২) পথচারী ও ভ্রমণকারীদের জন্য রাস্তাঘাটগুলি সংসময়ে ভালভাবে মেরামত করাইতে হইবে।

গ্রাম ও নগরাদির স্থান নির্বাচন, জমি জরীপ ও ভূ পরীক্ষা

কৌটিল্যের মতে রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে উহার রাজধানী স্থাপিত করিতে হইবে। স্থানীয় দুর্গ-নগর চারশতটী গ্রামের কেন্দ্রে এবং 'খর্ব্বট' নগর দুইশতটী গ্রামের কেন্দ্র-স্থলে স্থাপিত করিতে হইবে। নদীতীরে, সমুদ্র, হ্রদ বা পুষ্করিণীর ধারে গ্রাম, নগর বা সহরের স্থান নির্ব্বাচন করিতে হইবে।

শুক্রনীতিশাস্ত্রমতে গ্রামের নগরের বা সহরের এরূপ স্থান নির্ব্বাচন করিতে হইবে যেখানে নানা প্রকারের বৃক্ষ-লতাদি থাকিবে, গবাদি পশু, পক্ষী ও নানা প্রকারের পশু থাকিবে, মনোরম বন থাকিবে, প্রচুর খাদ্যশস্যাদি পাওয়া যাইবে ও উত্তম পানীয় জলের উৎস থাকিবে। স্থানটী পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী সুদৃশ্য সমতলক্ষেত্র হইবেএবং সেইস্থান হইতে জলপথে নৌকায় করিয়া সমুদ্রপর্য্যন্ত যাতায়াত করা যাইবে। রাজধানী পাহাড়ের ধারে বা নিম্নদেশে স্থাপিত হইবে। পাহাড়ের উপরে নিম্নস্থ রাজধানীকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত দুর্গ স্থাপিত হইবে।
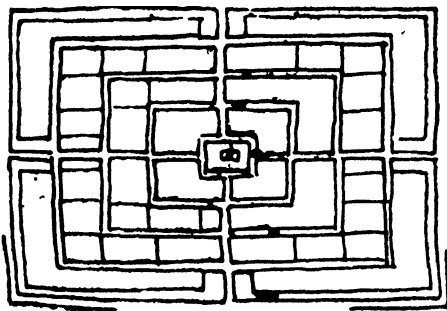
১০নং চিত্র

মানসারের মতে চক্রবর্ত্তী শ্রেণীর রাজাদের জন্য রাজধানীর নগরের নক্সা

মানসারের মতে গ্রাম, নগর বা সহরের স্থান সমতল-ক্ষেত্র হইবে, উহার মাটী শক্ত হইবে, বাম দিক হইতে ডানদিকে ছোট নদী প্রবাহিত থাকিবে, সহজেই ভূগর্ভস্থ জল পাওয়া যাইবে এবং সেইস্থানের উত্তাপ নাতিশীতোষ্ণ হইবে। সেইস্থানে প্রচুর পরিমাণে কদম্ব, নিম্ব, সপ্তপর্ণ ইত্যাদি ফুল ও ফলের বৃক্ষ থাকিবে।

গ্রাম, নগর বা সহরের স্থানটী মধ্যস্থানে উচ্চ হইবে এবং উত্তর, উত্তর-পূর্ব্ব ও পূর্ব্বদিকে ঢালু হইবে। নগরের মধ্যস্থান নীচু হইবে না। প্রভাতকালীন সূর্য্যের আলো ও উত্তাপ পাইবার সুবিধার নিমিত্ত নগরের ঢাল পূর্ব্বদিকে থাকা প্রয়োজনীয়। এই কারণে পাহাড়ের পশ্চিমদিকে নগরের স্থান নির্ব্বাচন নিষিদ্ধ আছে। ভারতবর্ষের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশের নগরের ঢাল দক্ষিণদিকে থাকিলে জমি ও গৃহাদি অত্যধিক পরিমাণে সূর্য্যের উত্তাপ পাইবে এবং ফলে মাটী অতিশয় শুষ্ক হইয়া যাইবে ও গৃহাদি অত্যন্ত উত্তপ্ত হইবে। এইদেশে বাতাস ও বৃষ্টি সাধারণতঃ দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত হয়। অতএব এইদিকগুলিতে জমির ঢাল থাকিলে গৃহগুলি সবসময়েই ঝড় বৃষ্টি পাইবে। দক্ষিণ দিকে ঢাল থাকিলে নগরের সমস্ত ময়লা জল ও ময়লা বৃষ্টির জলে দক্ষিণদিকের নালায় আনীত হইবে। শীতকালে যে কোনও জিনিষ ধীরে ধীরে পচিতে থাকে কিন্তু গ্রীষ্মকালের উত্তাপে উহা শীঘ্রই পচিতে সুরু করে। দক্ষিণদিকের ময়লা জল নিষ্কাশনের এই নালা হইতে গ্রীষ্মকালে দুর্গন্ধ দক্ষিণদিক হইতে প্রবাহিত বাতাস-দ্বারা নগরের দিকে আনীত হইবে এবং নগরে অসুখ ও মহামারী সৃষ্টি করিবে। কিন্তু জমির ঢাল উত্তর দিকে থাকিলে এই দুর্গন্ধ নগরের দিকে আসিবে না।

গ্রাম, নগর বা সহরের জন্য নির্ব্বাচিত স্থানের মাটী কত শক্ত এবং উহার উর্ব্বরতা কিরূপ তাহা নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত ভূ-পরীক্ষা করিতে হইবে। এক হস্ত দীর্ঘপ্রস্থ ও গভীর একটী গর্ত্ত খুঁড়িতে হইবে। মায়ামতম্ মতে স্থপতি এই গর্ত্তটী সন্ধ্যাকালে জলে পরিপূর্ণ করিবেন ও পরদিন প্রত্যূষে উহা পরীক্ষা করিবেন। গর্ত্তে কিছু জল থাকিলে মাটী সর্ব্বপ্রকারে উত্তম বলিয়া বিবেচিত হইবে। আর্দ্র ও পঙ্কময় মাটী মনুষ্য বসবাসের পক্ষে অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

প্রথমে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই চারিটি দিক জমিতে নির্ণয় করিতে হইবে। ইহার পর স্থপতি গ্রাম, নগর বা সহরের স্থানটী ও উহার নিকটবর্ত্তী চারিপাশের স্থানের প্রাকৃতিক অংশগুলির জরীপ কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন। একটী নক্সা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং উহাকে বর্ত্তমান রাস্তাঘাট, নদী, নালা, পথ, পাহাড়, বৃক্ষাদি, শস্যভূমি ইত্যাদি প্রাকৃতিক অংশ গুলি প্রদর্শন করিতে হইবে। ইহার পর স্থপতি 'পদবিন্যাস' করিবেন অর্থাৎ স্থানটীকে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিবেন।

গ্রাম ও নগর বিন্যাস

ক্ষুদ্রতম গ্রামের আয়তন প্রায় $\frac{১}{১০}$ বর্গ মাইল ও সর্ব্ব-বৃহৎ নগরের (রাজধানী) আয়তন প্রায় ১০০ বর্গ মাইল হইবে। গ্রাম বা নগরের দৈর্ঘ্য প্রস্থের ১, ১$\frac{১}{৮}$, ১$\frac{১}{৬}$, ১$\frac{১}{৪}$, ১$\frac{১}{২}$, ১$\frac{৩}{৪}$ বা ২গুণ পর্য্যন্ত হইবে। উহাদের আকার বর্গাকার আয়তাকার, অর্দ্ধ-বৃত্তাকার, বৃত্তাকার অথবা অষ্টভুজাকৃতি হইবে।

প্রথমে নগরের চতুঃসীমা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। রাজ্যের অন্যান্য নগরের এবং প্রধান প্রধান ব্যবসায় ও কৃষিপ্রধান কেন্দ্রগুলির সহিত, যে সকল পাহাড় হইতে খনিজ সম্পদ আনীত হইবে উহাদের সহিত, অথবা দুর্গ বা বন (যে সকল প্রধান প্রধান স্থানের সহিত নিয়মিতভাবে সংযোগ রক্ষা করিতে হইবে) প্রভৃতি স্থানের সহিত সংযোগকারী বর্ত্তমান রাস্তাঘাটগুলির সামঞ্জস্য রাখিয়া গ্রাম বা নগরের পরিকল্পনা করিতে হইবে। ইহার পর চারিদিকের প্রাচীর নির্ম্মাণ করিতে হইবে, পরিখা খনন করিতে হইবে এবং নক্সার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নগরের তোরণদ্বারগুলির সংখ্যা ও স্থান নির্ণয় করিতে হইবে। ইহার পরের কার্য্য হইবে প্রাচীর বেষ্টিত স্থানটীকে কয়েকটী অংশে বিভক্ত করা। বর্গাকার অথবা আয়তাকার নগরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থকে ৮ অথবা ৯টী সমান অংশে বিভক্ত করিতে হইবে। এইরূপে নগরটী ৬৪ অথবা ৮১টী অংশে বা এককে বিভক্ত হইবে। শিল্পশাস্ত্রমতে এই অংশগুলিকে ৪৫ জন দেবতাদের মধ্যে বণ্টন করিতে হইবে। বিশ্বকর্ম্মা বাস্তুশাস্ত্রমতে দেবতাদের সংখ্যা ২৫। প্রত্যেক দেবতার জন্য কতগুলি অংশ সংরক্ষিত করিতে হইবে সেই বিষয়ে কোন স্থিরতা নাই। সকল দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মাই প্রধান এবং এই কারণে সর্ব্বক্ষেত্রেই নগরের কেন্দ্রস্থলের কয়েকটী অংশ ব্রহ্মার নামে সংরক্ষিত হইত। যেক্ষেত্রে নগরটীকে ৬৪টী অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে সেখানে ব্রহ্মার স্থানে ৪টী অংশ থাকিবে এবং অপর ক্ষেত্রে অর্থাৎ যেস্থলে নগরটীকে ৮১টী অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে সেখানে ব্রহ্মার স্থানে ৯টী অংশ থাকিবে। সকলক্ষেত্রেই ব্রহ্মার জন্য সংরক্ষিত স্থানে কেন্দ্রীয় উন্মুক্ত স্থান থাকিত অথবা মন্দির থাকিত। বিভিন্ন অংশগুলির বিভক্তকারী রেখাগুলি রাস্তাঘাট ও গলির প্রশস্ততার মধ্যরেখা নির্দ্ধারণ করিয়া উহাদের নক্সা নির্ণয় করা হইত। এই রেখাগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর অধিবাসীদের জন্য নির্দ্ধারিত বিভিন্ন বাসস্থান, বিভিন্ন প্রকারের জিনিষপত্র নির্ম্মাণের স্থান, এবং ব্যবসা বাণিজ্য, খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ, ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান, প্রশাসন এবং অন্যান্য সাধারণ সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধাদির জন্য সংরক্ষিত স্থানগুলির পরিসীমা নির্দ্ধারণ কার্য্যেও ব্যবহৃত হইত।

ব্রহ্মাস্থান ও নগরের প্রত্যেক দিকের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে তিনটী সমান অংশে ভাগ করা হইত। প্রত্যেক অংশকে একটী বিশেষ অঞ্চলে পরিণত করা হইত এবং ইহাদের নামকরণ করা হইত যথাক্রমে দৈবস্থান, মনুষ্যস্থান ও পৈশাচ স্থান। ব্রহ্মাস্থানের পরেই থাকিত দৈবস্থান। এইখানে জনসাধারণের ও প্রশাসনিক সৌধগুলি, ব্রাহ্মণদের বাসগৃহ, রাজপ্রাসাদ ও অন্যান্য দেবতাদের মন্দির থাকিত। দৈবস্থানের পরবর্ত্তী অংশকে বলা হইত মনুষ্যস্থান। এইখানে বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়েরা বাস করিত। নগরের সীমানার নিকটবর্ত্তী ও মনুষ্যস্থানের পরবর্ত্তী অংশকে বলা হইত পৈশাচ স্থান। এইখানে শূদ্রেরাও কারিকরগণ বাসকরিতেন এবং তাঁহাদের কারখানা ও গুদামঘরও এইখানেই থাকিত। কেবলমাত্র পৈশাচস্থানেই ধর্ম্মশালা স্থাপিত হইত। এইরূপে নগরটীকে দৈব, মনুষ্য ও পৈশাচ স্থানে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন অংশ চারিটি বর্ণের অধিবাসীদের বিভিন্ন প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহারের জন্য নির্দ্ধারিত হইত।

অধিবাসীদের বর্ণ, সামাজিক, রাজনৈতিক ও জীবিকানুযায়ী প্রতিষ্ঠা অনুসারে নিজ নিজ গৃহের আকার, আয়তন, পরিকল্পনা প্রণালী ও বিভিন্ন প্রকারের গৃহ-বিন্যাসের বিশদ নিয়মাবলী প্রচলিত ছিল। শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন যে নগরে ব্যক্তিগত ভাবে কেহই জমি ও সম্পত্তির মালিক

হইতে পারিবে না। নগরে নাগরিকদের কেবলমাত্র জীবনস্বত্ব হিসাবে জমি দেওয়া হইত যেখানে তাঁহারা গৃহ নির্ম্মাণ ও উদ্যান তৈয়ারী করিবেন। জমি ও সম্পত্তির চিরস্বত্ব মালিকানার বন্দোবস্ত ছিল না। আধুনিক পৌর সংস্থা ও উন্নয়ন সংস্থাগুলির ন্যায় স্থপতি নগরপরিকল্পনা ও গৃহনির্ম্মাণের সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করিতেন।

বাসভূমির পরিকল্পনা ও গৃহ নির্ম্মাণের নিয়মাবলী

গ্রাম, নগর ও সহরের সম্পূর্ণ সত্ত্বা ও বিন্যাসের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বিভিন্ন সৌধ ও গৃহগুলি নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

সকল শিল্পশাস্ত্রগুলিতেই উল্লিখিত বিষয়গুলির বিশদ নিয়মাবলী আলোচিত হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষের নগরপরিকল্পনা বিষয়ে বর্ণিত বাসভূমি পরিকল্পনা ও বাসগৃহ নির্ম্মাণের বিভিন্ন নিয়মাবলীর মধ্যে কয়েকটী নিম্নে লিখিত হইল :—

(১) বিশ্বকর্ম্মা প্রকাশিকাতে লিখিত আছে যে প্রথমে গ্রাম, নগর বা সহর পরিকল্পনা ও পত্তন করিয়া পরে গৃহাদির নক্সা তৈয়ারী করিতে হইবে। এই নিয়ম লঙ্ঘন করিলে অমঙ্গল হইবে।

(২) মানসারের মতে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র বাসগৃহের জমির পরিমাণ হইবে ২৪০০ বর্গ ফুট অর্থাৎ ৩⅓ কাঠা। নাগরিকের মর্য্যাদা অনুযায়ী ঐ জমির পরিমাণ ঐ ক্ষুদ্রতম জমির ২, ৩ বা ৪ গুণ হইবে অর্থাৎ ৬⅔, ১০ বা ১৩⅓ কাঠা হইবে।

(৩) শুক্রনীতি শাস্ত্রে লিখিত আছে যে রাজা নিম্নলিখিত ভাবে জমি নির্দ্দিষ্ট করিবেন :—

গ্রাম, নগর ও সহরে দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও ধনী সকল শ্রেণীর লোকেদের জন্য জমি নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। ক্ষুদ্রতম জমির পরিমাপ হইবে ২৪ × ৪৮ ফুট অর্থাৎ ১·৬ কাঠা, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেদের জন্য জমির পরিমাপ হইবে ক্ষুদ্রতম জমির মাপের ১½ গুণ অর্থাৎ ৩৬ ফুট × ৭২ ফুট বা ৩·৬ কাঠা এবং ধনীদের জন্য জমির পরিমাপ হইবে ক্ষুদ্রতম জমির মাপের ২ গুণ অর্থাৎ ৪৮ ফুট × ৯৬ ফুট বা ৬·৪ কাঠা। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জমির পরিমাণ হইবে পরিবারবর্গের সকলের [illegible] জন্য যেটুকু প্রয়োজন ততটুকু। কম বা বেশী নয়।

(৪) মানসারের মতে জমির মাপের অর্দ্ধেকের বেশী পরিমাণ স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করা যাইবে না। অর্দ্ধেক জমি উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।

(৫) বিশ্বকর্ম্মা প্রকাশিকা মতে প্রথমে বৃক্ষ রোপণ ও পরে গৃহনির্ম্মাণ করিতে হইবে। অন্যথায় গৃহ দেখিতে সুদৃশ্য হইবে না।

ব্রাহ্মণ ও সমাজের উচ্চস্তরের ব্যক্তিদের গৃহ চতুঃশালা অর্থাৎ চারিটি অংশ বিশিষ্ট হইবে, ক্ষত্রিয়দের গৃহ ত্রিশালা, বৈশ্যদের দ্বিশালা ও শূদ্রদের গৃহ একশালা হইবে।

একই রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী গৃহগুলির উচ্চতা যথাসম্ভব এক হইবে।

(৬) মায়ামত অনুযায়ী রাজপ্রাসাদ এগারোতলা পর্য্যন্ত, ব্রাহ্মণদের গৃহ নয়তলা পর্য্যন্ত, সাধারণ রাজাদের গৃহ সাততলা পর্য্যন্ত, সামন্তদের গৃহ পাঁচতলা পর্য্যন্ত, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়দের গৃহ চারিতলা পর্য্যন্ত এবং শূদ্রদের গৃহ এক হইতে তিনতলা পর্য্যন্ত হইতে পারে। ১৫০ ফুটের অধিক কোন সৌধের উচ্চতা হইবে না এবং কোন গৃহই নগরের মন্দির অপেক্ষা উচ্চতায় অধিক হইবে না।

(৭) বৃহৎ সংহিতায় লিখিত আছে যে বিভিন্ন প্রকারের গৃহের ধার্য্য দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা কখনই অন্যরূপ করিবে না।

(৮) শুক্রনীতি শাস্ত্রমতে গৃহে ৩, ৫ বা ৭টী ঘর থাকিবে। ঘরগুলি দেওয়াল বা অন্যপ্রকার প্রাচীর বা বিভাগ দ্বারা পৃথক করা থাকিবে। গৃহের মোট ৮টী দরজা থাকিবে। গৃহের প্রত্যেক দিকে দুইটী করিয়া দরজা থাকিবে। নির্দ্ধারিত স্থানগুলিতে দরজা রাখিতে হইবে, অন্য কোন স্থান নহে। কিন্তু প্রত্যেক ঘরের জানালাগুলি নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী বসান যাইতে পারে।

প্রত্যেক গৃহের সম্মুখভাগ প্রধান রাস্তার দিকে রাখিতে হইবে। গৃহের দুই পাশে বা পশ্চাৎদিকে গৃহের ময়লা, জঞ্জাল বা পায়খানা পরিষ্কার করিয়া লইয়া যাইবার জন্য গৃহের পিছনের উঠানে যাইবার জন্য পথ রাখিতে হইবে।

(৯) মানসার ও বৃহৎসংহিতা মতে প্রত্যেক গৃহের সম্মুখে গৃহের প্রস্থের এক তৃতীয়াংশ চওড়া খোলা জায়গা থাকিবে।

(১০) মানসারের মতে প্রত্যেক গৃহের সম্মুখে বারান্দা ও গৃহ সম্মুখস্থ চত্বর হইতে উঁচু বারান্দায় যাইবার জন্য প্রশস্ত সোপান থাকিবে। গৃহের অন্যান্য তিন দিকেও বারান্দা থাকিলে ভাল হয়।

গৃহের সম্মুখ দিকের দরজা ঠিক মধ্যবর্ত্তী স্থানে বসান হইবে না, এক দিকে অল্প পাশে রাখিতে হইবে।

(১১) গৃহের দরজা বা জানালা অপর গৃহের দরজা বা জানালার সামনা সামনি হইবে না।

(১২) বৃষ্টির জল সহজেই গড়াইয়া যাইবার জন্য টালির ছাদ বিশিষ্ট গৃহের ছাদ মধ্যে উঁচু হইবে (উচ্চতা এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের দৈর্ঘ্যের অর্দ্ধেক হইবে)।

(১৩) একতলা বিশিষ্ট গৃহের ঘরের দেওয়ালের উচ্চতা উহার প্রস্থ অপেক্ষা কমপক্ষে $\frac{1}{5}$ অংশ বেশী হইবে। এবং দেওয়াল ঘরের প্রস্থের $\frac{1}{5}$ অংশ চওড়া হইবে। দুইতলা বিশিষ্ট ও আরও উচ্চ গৃহের ক্ষেত্রে উল্লিখিত মাপগুলি প্রয়োজনমত বেশী হইবে।

নগরপরিকল্পনার বিষয়ে রোমক স্থপতি Vitruvius (ভিট্রুভিয়াস) যাহা লিখিয়াছেন তাহার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

Vitruvius এর স্থাপত্যবিষয়ক নিবন্ধ প্রায় দুইহাজার বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। তাঁহার পাণ্ডুলিপি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে St. Gall-এর Convent-এ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। উহা হইতে দেখা যায় যে মানসার ও Vitruvius-এর মূলনীতিগুলির মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

Vitruvius-এর মতে প্রথমে নগরের স্থান নির্ণয় করিতে হইবে। স্থানটী উত্তর ও পূর্ব্বদিকে হইলে ভাল হয়। সেইস্থলে বৃষ্টি বা কুয়াসার প্রাচুর্য্য থাকিবে না। স্থানটীতে অন্যান্য স্থান হইতে স্থলপথে, নদীপথে বা সমুদ্রপথে সহজেই যাওয়া যাইবে। নগরটীর চতুঃসীমার আকার বর্গাকার হইবে না, বহুবাহুবিশিষ্ট হইবে। এইরূপ হইলে নগর হইতে শত্রুপক্ষকে ভালভাবে পর্য্যবেক্ষণ করা যাইবে। শত্রুপক্ষের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত নগরের চারিদিকে প্রাচীর, পরিখা ও প্রহরীদের পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত বুরুজ ইত্যাদি থাকিবে। প্রাচীর যথেষ্ট সশস্ত্র প্রহরী পাশাপাশি যাইতে পারে। একটী বুরুজ হইতে নিকটবর্ত্তী বুরুজটীর দূরত্ব এরূপ হইবে যাহাতে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইলে উহার নিকটবর্ত্তী বাম বা ডান দিকের বুরুজ হইতে ঐ আক্রমণ প্রতিহত করা যাইবে। এই নিমিত্ত উহাদের পরস্পরের দূরত্ব এরূপ হইবে যাহাতে তীর নিক্ষেপ করিলে তীর উহাতে পৌঁছিতে পারে। বুরুজগুলি গোলাকার বা বহুভুজবিশিষ্ট হইবে।

ঠাণ্ডা বাতাস অপ্রীতিকর। উষ্ণ ও আর্দ্র বাতাস ক্ষতিকর। রাস্তাঘাট ও গৃহগুলিকে সকলপ্রকার অপ্রীতিকর বাতাস হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে। এইজন্য সহরের কেন্দ্রস্থল হইতে রাস্তাগুলি ব্যাসার্দ্ধের ন্যায় বিন্যস্ত হইবে।

বিভিন্ন দেবদেবীর স্থান সহরের বিভিন্ন অংশে নির্দ্দিষ্ট হইবে। যুদ্ধদেবতা Mars সহরের বাহিরে স্থান পাইবেন। তিনি সহরকে বহিঃশত্রু হইতে রক্ষা করিবেন। Venus সহরের তোরণদ্বারের নিকট থাকিবেন। সহরের সর্ব্বোচ্চ স্থানে Jupiter, Juno ও Minerva স্থানলাভ করিবেন। সহরের Forum-এ Mercury স্থান পাইবেন। Isis ও Serapis ব্যবসাবাণিজ্যের স্থানে, Apollo ও Father Bacchus নাট্যশালার কাছে এবং Hercules, Ampitheatre, Gymnasium ও Circus এর নিকটে স্থান পাইবেন।

আধুনিক নগরপরিকল্পনা পদ্ধতি :

আধুনিক নগরপরিকল্পনার তিনটী মূলনীতি হইতেছে—নগরবাসীদের জন্য স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করা ও তাহাদের সুখসুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বন্দোবস্ত করা।

আধুনিক নগর পরিকল্পনা পদ্ধতিতে এখন সাধারণভাবে স্বীকৃত হইয়াছে যে বসবাসের অঞ্চলগুলিকে 'প্রতিবেশিত্ব মতে' (Neighbourhood Planning dea) পরিকল্পনা করিতে হইবে। এই অঞ্চলগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্প্রদায় রূপে পরিকল্পিত হইবে এবং উহাদের নিজস্ব প্রাকৃতিক ও সামাজিক অস্তিত্ব থাকিবে। উহাদের নির্দ্দিষ্ট চতুঃসীমা থাকিবে এবং সম্প্রদায়গুলির জন্য বিদ্যালয়, দোকান, বাজার, খেলাধূলার মাঠ ইত্যাদি অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলির সংস্থান করিতে হইবে।

প্রাচীন ভারতে গ্রাম ও নগর পরিকল্পনার রীতি সম্বন্ধে

যে আধুনিক নগর পরিকল্পনার নিয়মাবলীর সহিত প্রাচীন ভারতের এই রীতিগুলির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। যথা:—নগর পরিকল্পনায় স্থপতির স্থান ছিল সর্ব্বাগ্রে। ব্যবহার অনুসারে নগরগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হইত। পরবর্ত্তীকালে নগর সম্প্রসারণের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া উন্মুক্ত স্থান ছাড়িয়া রাখা হইত। যে দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হয় তাহার অপর দিকে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করা হইত। প্রাচীন ও ঐতিহাসিক ইমারতগুলি সংরক্ষণ করা হইত। নগর নির্ম্মাণের জন্য নির্ব্বাচিত স্থানটিতে নিকটবর্ত্তী বিভিন্ন স্থান হইতে যাতায়াতের সুযোগসুবিধা থাকিত। স্থানটিতে জল নিষ্কাশনের সুবিধা থাকা প্রয়োজনীয় ছিল। জমির উন্নতিসাধন ও সংস্কার করা হইত। প্রথমে জমি জরীপ ও মাটির যোগ্যতা পরীক্ষা করা হইত। বর্ত্তমান প্রাকৃতিক দ্রব্যাদি প্রদর্শন করিয়া স্থানটীর বিভিন্ন প্রকারের ব্যবহারের নক্সা (Existing Land use Survey Map) তৈয়ার করা হইত। প্রথমে নগর পরিকল্পনার নক্সা ও পরে গৃহাদির নক্সা তৈয়ার করা হইত। নগরে সুপরিকল্পিত রাস্তাঘাট, রাস্তার সহিত পথচারীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট পথ, পরিষ্কার পানীয় জলের ব্যবস্থা, পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা, খোলা জায়গা, দোকান, বাজার, বিদ্যালয়, সরকারী ভবন, মন্দির, বৃক্ষাদি রোপণ ইত্যাদির বন্দোবস্ত থাকিত। গৃহের চারিদিকে উন্মুক্ত স্থান ছাড়িয়া রাখা হইত। পৌর ব্যবস্থার নিয়মাবলীও প্রচলিত ছিল। জীবন স্বত্ব হিসাবে বাসস্থানের জমি বণ্টন করা হইত যাহা দ্বারা নগর পরিকল্পনা ও গৃহ নির্ম্মাণের সকল নিয়মাবলী নিয়ন্ত্রণ করা যাইত।

উপসংহারে—ইহা বলা যাইতে পারে যে এই দেশের লোকেরা কেবলমাত্র আধিবিদ্যক দার্শনিক ছিলেন না। তাঁহারা জীবনের মূল্যও বুঝিতেন। শিল্পশাস্ত্র, বাস্তুশাস্ত্র ও বিবিধ পুরাণে বর্ণিত উপরিউক্ত বিবরণ হইতে প্রমাণিত হয় যে তাঁহারা কি প্রকারে জীবনকে ভোগ করা যায় ও উপযুক্তভাবে বাঁচিয়া থাকা যায় তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি ও নিয়মাবলীর প্রচলন করিয়াছিলেন। তাঁহারা আধ্যাত্মিক অপেক্ষা পার্থিব বিষয়ে কোন অংশেই কম উন্নত ছিলেন না। প্রাচীনকালে গ্রামের একক (Village Unit) হিসাবে ও উদ্যান-গ্রাম (Garden Village) মতে নগর ও সহর পরিকল্পনার রীতি অত্যধিক সাফল্যলাভ করিয়াছিল। পরিশেষে ইহাই বলা যায় যে প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ উপরিউক্ত আদর্শগুলিকে চরম উৎকর্ষতা লাভ করাইয়া নগর পরিকল্পনা বিদ্যায় সকল দেশের পুরোভাগে ছিল।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

এই প্রবন্ধ লিখিতে নিম্নলিখিত পুস্তক, পুস্তিকা ও প্রবন্ধ হইতে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য লাভ করিয়াছি :

(1) Town Planning In Ancient India—
Sri B. B. Dutt.

(2) Town Planning In Ancient India—
Sri G. Venkatarandmd Reddy.

(3) Early Chapters In Indian Town
Planning—Sri S, C, Mukherjee

অসংসারী [উপন্যাস] শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* * * * * * *

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কুড়ি

প্রথম যিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে মেয়েরাই মেয়েদের সবচেয়ে বড় শত্রু তিনি ঋষি কিনা জানি না, কিন্তু এটা যে শাশ্বত সত্য সেকথা স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ সমস্ত লোকই স্বীকার করতে বাধ্য। না হলে নীরোদবাবু পুত্রবধু রাত্রে স্বামীকে নিরিবিলি পেয়েই সর্বপ্রথম গৌরীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করতো না। গৌরীর সঙ্গে ঐ বউটির খুব একটা বন্ধুত্ব না থাকলেও ঘনিষ্ঠভাব কম ছিল না সে কথা বলাইবাহুল্য,কারণ একেবারেপাশাপাশি বাড়ীতেওরা দুজনে বাস করছে আজ প্রায় পাঁচবছর, এবং বাড়ীর ভেতর এবং বার দুদিক দিয়েই ওদের মধ্যে যাতায়াতের পথ রয়েছে এবং প্রায়শ না হলেও মধ্যে মধ্যে ওরা এবাড়ী ওবাড়ী আনাগোনা করতে অভ্যস্ত। সেই বউ বধূজাতির নিন্দা প্রকাশ করার এই চমৎকার সুযোগটা পাওয়ামাত্রই সমস্ত ব্যাপারটা সবিস্তারে ও সালঙ্কারে সেই রাত্রে স্বামীর কর্ণ গোচর করলে। সেই সঙ্গে আর একবার করে কথা উঠ্‌লো সমীর ও রেণুর এবং সামনের কোয়ার্টার্সে ঐ দুটি ঘৃণিত প্রাণী বাসা বেঁধে যে কি বেলেল্লাপনা করছে, সে কথা আর একবার করে স্বামীর কানে সে দিয়ে দিলে।

রেণু ও সমীরের কথায় নীরোদবাবুর ছেলে প্রবোধ বিশেষ আমোল দেয় না, তার কেবলই মনে হয় পরের কথায় তার কি দরকার! আজও সে এবিষয়ে তেমন আমোল দিল না কিন্তু গৌরীর পাচক ঘটিত ব্যাপারে তার রীতিমত চমক লাগলো। মনে মনে এমনও হোল যে তার বাড়ীতেও সে এবং তার বাবা দুপুরে বাড়ীতে থাকে না এবং এখনই না হয় তার শ্যালক শাশুড়ী এবং শ্যালিকা দিন কয়েকের জন্য দিল্লীতে এসে তার বাড়ীতে রয়েছে অন্যথায় তার বউও ত দুপুরে একাই থাকে এবং তার বাড়ীতেও ত একটা ছোঁড়া চাকর রয়েছে, অতএব, তাকেও ত রীতিমত সাবধান হতে হবে। ভাবতে ভাবতে সে বেচারী গম্ভীর হয়ে গেল।

বউটি দুএকবার স্বামীকে ঠেলা মেরে কোন উত্তর না পেয়ে ভাবলে স্বামী বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে, অগত্যা হতাশ ও বিরক্ত হয়ে পাশ ফিরে ঘুমাবার চেষ্টা করতে লাগ্‌লো, ঘুমের ভান করে স্বামী কিন্তু সারারাত ধরে কেবলই ভাবতে লাগ্‌লো, এসবের প্রতিকার কি করা যায়! শেষে সেই তরুণ স্বামীর কেবলই মনে হতে লাগ্‌লো, পাড়ার মধ্যে এই সব অনাচার বন্ধ করতে না পারলে সংক্রামক ব্যাধির মত এই দূষিত জীবাণু তাদের সুখী পরিবারকেও ধ্বংস করে একেবারে ধূলিসাৎ করে ফেল্‌বে। অতএব স্বামী যখন সকালে শয্যাত্যাগ করলে তখন তার চোখদুটি লাল হয়ে আছে। দুশ্চিন্তায় রাত্রি জাগরণের যে সমস্ত ছাপ চোখে মুখে থাকে, সেগুলো সমস্তই তার মুখে স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। স্নানাদির পরে কিছুটা প্রকৃতিস্থ হলেও, কোন মতেই সে সুস্থ হতে পারলে না। পাশের বাড়ীতে আগুন লাগ্‌লে এ বাড়ীর গৃহস্থের যে আতঙ্ক হয়, হতভাগ্য স্বামী সেই আতঙ্ক ভোগ করতে লাগলো অহোরাত্র, এখন এর প্রথম প্রতিকার যে চাকরটাকে ছাড়িয়ে দেওয়া, সে প্রস্তাব সে নীরোদবাবুর কাছে করেই বা কেমন করে। কারণ লোক ত একটা চাই আর এ লোকটা ভালোই, অন্ততঃ যতদিন সে কাজ করছে, তার মধ্যে তার কোন দোষ পাওয়া যায় নি। এ দিকে আসল কথাটাই বা বাবার কাছে কি

করে বলা যায়! অনেক চিন্তার পর শেষে ঠিক করলে, যাক, যতদিন শাশুড়ীরা এ বাড়ীতে থাকেন, তত দিন ত চলুক তারপর দেখা যাবে।

কিন্তু অফিসে গিয়েও কিছুতেই মনে শান্তি আসে না। বেলা একটার সময় সেই আতঙ্কগ্রস্ত হতভাগ্য স্বামী তার সহকর্ম্মীকে বলে ঘণ্টাখানেকের জন্য চুরি করে ছুটী নিয়ে নিজেরবাড়ীর দিকে রওনা দিলে,কিন্তু পাড়ায় এসে নিজের বাড়ীতে না ঢুকে সোজা এসে উঠ্লো সদাশিবের বাড়ীর বারাণ্ডায়। রাস্তায় বা ধারে কাছে কোন লোকই নেই, তবুও বুকের ভেতর কেমন যেন দুরু দুরু করে। ভয়ে ভয়ে সে সদাশিবের শোবার ঘরের জানলার কাছে এসে বন্ধ জানলার ফাঁক দিয়ে ভেতরের কোন শব্দ বা কোন দৃশ্যের অংশমাত্র দেখার জন্য বোধ হয় দু'একমিনিটের যৎসামান্য প্রয়াস পেয়েছে এমন সময় হঠাৎ তার নজর পড়লো সামনের কোয়াটার্সের সমীরের বাসার দিকে। সমীর এই সময় বাসায় ফেরে। আজ সে এই মাত্র ফিরে তার সাইকল থেকে নেমে নিজের বাড়ীর দরজায় কোন রকম আঘাত না করে পূর্ণদৃষ্টিতে এ বাড়ীর চুরি-করে-দেখার চেষ্টায় রত নীরোদবাবুর ছেলের দিকে অবাক্ বিস্ময়ে চেয়েছিল।

এতেই ঘাবড়ে গিয়ে নীরোদবাবুর ছেলে প্রবোধ ঘোষ এক লাফে রোয়াক থেকে লাফিয়ে পড়ে নিতান্ত অপরাধীর মত নিজের বাড়ীর উল্টো দিকে লম্বা লম্বা পা চালিয়ে রওনা দিলে। কিন্তু তাতেই কি বিপদ কম! সমীরের কোয়াটার্সের পাশের ছুটো কোয়াটার্সের মাঝামাঝি একটা গাছ ঢাকা সরু গলিপথের মত জায়গায় একটা ছোট বেঞ্চি পেতে তার ওপোর বসে দু'তিনটে বাড়ীর চাকর মধ্যাহ্নের নিরিবিলিতে একসঙ্গে একটু জটলা করে বিড়ি খাচ্ছিল, ওদের মধ্যে প্রবোধদের চাকরটাও ছিল। সে তার বাবুকে এই রকম সশঙ্কচিত্তে শিববাবুর বাড়ীর রোয়াক থেকে লাফিয়ে পড়ে প্রায় ছুটে পালিয়ে যেতে দেখে নিতান্ত কৌতুহলী হয়ে বিড়ির মায়া কাটিয়ে বেরিয়ে এলো এবং বাবুকে অনেক দূরে এগিয়ে যেতে দেখে কেমন একটা রোমাণ্টিক গন্ধ আবিষ্কার করে নিজের বাড়ীতে এসে সোজাসুজি প্রবোধের স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে, বাবু দুপুরে এসেছিলেন কেন? এদিকে গৌরীও কান খাড়া করে ছিল তার ঘরের দিকে কেউ আড়ি পাতে কি না, তাই দেখার জন্য। একটা লোকের রোয়াক থেকে লাফিয়ে পড়ার শব্দ শুনে গৌরী নিজেই এদিকের ঘরে এসে খুব সন্তর্পণে দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে এদিক ওদিক দেখে কাউকেই দেখ্তে না পেয়ে আবার যখন নীরোদবাবুদের বাড়ীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে, তখন দেখলে প্রবোধের স্ত্রী এবং তার চাকর দুজনেই এদিকে চেয়ে আছে। এবং আরও মনে হোল যে, প্রবোধের স্ত্রীর চোখে যেন কাল বোশেখীর ঝড়। চাকরের কথা শুনে প্রবোধের বউ নিশ্চিত বুঝেছে যে, তার স্বামী দুপুরের নির্জ্জনতায় গৌরীর ঘর থেকে বেরিয়ে আবার অফিসের দিকে রওনা দিয়েছে এবং গৌরী দরজা খুলে প্রবোধকে বিদায় দিয়ে এতক্ষণ ধরে তারই গতিপথের দিকে দৃষ্টি রেখে এবার তার বাড়ীর দিকে চেয়ে চেয়ে বোধ হয় যেন সগর্ব্বে এই কথাই চিন্তা করছে যে তোমার স্বামীকে আমি জয় করে নিয়েছি, এখন আর তুমি আমার করবেটা কি?

বেচারী বউ বড্ড হতাশ হয়ে নিজের ঘরে গিয়ে একেবারে ভেঙ্গে পড়লো। তার ভাই, বোন ও মা ওরা এই কতক্ষণ আগে ওদের এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়ীতে গিয়েছিল দেখা করার অজুহাতে এবং সেই সঙ্গে সেই আত্মীয়ের স্ত্রীর মারফৎ তার স্বামীকে দিয়ে ছেলের একটা চাকরীর তদ্বির করানোর উদ্দেশ্যে, কাজেই নীরোদবাবুদের বাড়ীতে অন্য এমন কেউই ছিল না যে কি না ঐ বউটিকে তার সন্দেহজনক চিন্তা থেকে অব্যাহতি দেওয়াতে পারে। বউটি আপন মনেই বিছানায় পড়ে পড়ে অনেকক্ষণ ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। চাকরটা একটু ইতস্ততঃ করে আবার তার পূর্ব্বের আড্ডায় ফিরে এলো, এবং ফিরে এসে নিজেদের দলে বারন্দার বাবুদের কেলেঙ্কারীর কথাই আলোচনা করতে লাগ্লো। সেই আলোচনায় রেণু ও গৌরী থেকে সুরু করে ধীরে ধীরে অন্য অনেক বাবুর কথাই চল্তে লাগ্লো, এবং শেষ পর্য্যন্ত এইটেই স্থির হয়ে গেল যে, প্রবোধ প্রায়ই গৌরীর ঘরে দুপুরে যায় এবং ইত্যাদি।

এক দৌড়ে অফিসের দরজায় পৌঁছে প্রবোধ হাঁপাতে হাঁপাতে নিজের ঘরে এসে হাজির হোল এবং এক গেলাস জল এক নিশ্বাসে গলাধঃকরণ করে প্রায় আধঘণ্টা ধরে

মাথা টিপে চুপ করে বসে থেকে শেষে কতকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে আবার ফাইল নিয়ে বস্‌লো। তার সহকর্মীটি কয়েকবার ওকে লক্ষ্য করলে, কি দুর্ঘটনা ঘটেছে সে সম্বন্ধে প্রশ্নও করলে, শেষে সন্দিগ্ধভাবে ও প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে নিজের কাজে মনোনিবেশ করলে। বেলা তিনটে নাগাদ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্টের চাপরাসী এসে প্রবোধকে সেলাম জানালে, অর্থাৎ সেক্‌সনের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট মানে নীরোদবাবু স্বয়ং প্রবোধকে ডাক দিয়েছেন। শান্তশিষ্ট বালকের ন্যায় প্রবোধ পাশের ঘরে এসে পিতার টেবিলের পাশে দাঁড়ালো।

নীরোদবাবু নিতান্ত সহজভাবেই প্রশ্ন করলেন, প্রবোধ, তুমি দুপুরে কোথায় গিয়েছিলে?

প্রবোধ ঘাবড়ে গেল, হঠাৎ সে বলে ফেল্লে না ত, কোথাও ত যাইনি।

নীরোদবাবু বল্লেন, সে কি, আমার চাপরাসীকে আমি দু'বার পাঠাইয়াছি, সে দুবারই তোমাকে পেলে না ব্যাপার কি? বলেই তিনি ঘণ্টা বাজিয়ে চাপরাসীকে ডাক্‌লেন।

চাপরাসী এসে হাজির হোল, প্রবোধ একেবারে প্রমাদ গণ্‌লে।

নীরোদবাবু চাপরাসীকে ধমক দিয়ে বল্লেন, চাপরাসী, বাবু ত কোথাও যায় নি, অথচ তুমি দু' দুবার করে বল্লে যে—

চাপরাসী বল্‌লে, নেহি সাব। আমি দাদাবাবুকে চেয়ারে না দেখে সেক্‌শনের চাপরাসীকে জিজ্ঞাসা করে শুনলুম বাবু বাহার চলা গিয়া। একবার এক বাজে, ফিন্ দেড় বাজে আমি খবর নিয়েচি সাব, আপনি ঐ সেকসনের চাপরাসীকে ডেকে—

আচ্ছা যাও। নীরোদবাবু তাঁর চাপরাসীকে কাজে অবহেলা করার জন্যে ডেকে ধমক দিতে গিয়ে হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে তাকে ছেড়ে দিতে পথ পেলেন না। এদিকে প্রবোধের চেহারা একেবারে পাণ্ডুর হয়ে গেছে।

একটু পরে প্রবোধ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আমায় ডেকেছিলেন কেন?

নীরোদবাবু হাতের কলমটা নাড়তে নাড়তে বল্‌লেন, তখন দরকার ছিল, এখন কোন দরকার নেই, তবে খবর নিচ্ছিলুম, তুমি ফিরেছ কি না।

প্রবোধ ফিরে যাওয়ার উপক্রম করতেই নীরোদবাবু বল্‌লেন সেদিন দুপুরেও তোমাকে খোঁজ করে পাই নি। দুপুরে তুমি যাও কোথায়?

প্রবোধের মনে হোল, সত্যিই ত। আরও একদিন দুপুরে সে বেরিয়েছিল আধঘণ্টার জন্য তার এক বন্ধুর সঙ্গে সামান্য একটা ব্যক্তিগত কাজে। কথাটা সে সহজেই স্বীকার করে নিয়ে উপযুক্ত কৈফিয়ৎ দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল, কিন্তু আজকের এই অনুপস্থিতির অস্বীকৃতিতে নীরোদবাবু মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট হলেন।

রাত্রে স্ত্রীর সঙ্গে প্রবোধের বেশ এক হাত হয়ে গেল। স্ত্রীটি প্রথমেই প্রশ্ন করলে তুমি আজ দুপুরে এ পাড়ায় এসেছিলে?

প্রবোধ বললে, কই না ত, কে বললে? অস্বাভাবিক জোর দিয়ে সে কথাটা অস্বীকার করলে।

আমি বলছি, আমি জানি, স্ত্রী জোর দিয়ে উত্তর দিলে।

হতেই পারে না, এলে আর তুমি দেখতে পেতে না?

দেখ্‌তে পেয়েছি, তুমি শিববাবুদের বাড়ীতে দুপুরে শিববাবুর বউয়ের কাছে এসেছিলে?

তুমি দেখেছ? সক্রোধে প্রবোধ প্রশ্ন করলে। একেই তার মনটা কাল থেকে খুব বিচলিত, তার ওপোর এই সত্যি মিথ্যায় মিশ্রিত এক কুৎসিত সন্দেহের নগ্ন অভিযোগ।

দেখেছি এবং আরও অনেকে দেখেছে।

নিমেষেই প্রবোধ এতটুকু হয়ে গেল, একেবারে কেঁচো। তবে কি বাবাও দেখেছেন? সত্যিই ত পরের বাড়ীর বউয়ের জানালায় সে দুপুরে উঁকি মেরে দেখ্‌ছিল। তবেকি সমীরের সঙ্গে, না—না রেণুর সঙ্গে তার স্ত্রীর কোন কথা হয়েছে? ভয়ে ভয়ে প্রবোধ প্রশ্ন করলে, আর কে দেখেছে শুনি।

কেন? আমাদের লক্ষ্মণ! সেই ত আমাকে দেখালে।

প্রবোধ একেবারে আগুনের মত জ্বলে উঠ্‌লো। তীক্ষ্ন স্বরে বল্লে লক্ষ্মণের সঙ্গে তোমার ঐ সব বিষয় নিয়ে কথা হয় কেন? বাড়ীর বউয়ের সঙ্গে চাকরের অত দহরম মহরম কিসের? হুঁঃ, তুমি আবার পাশের বাড়ীর

বউয়ের দোষ দিতে এসেছিলে? আগে নিজে সাম্‌লে থাকো, তারপর অপরের কথা নিয়ে চর্চ্চা কোরো।

বউ এবার রীতিমত চটে উঠলো, বল্লো, দেখ স্বামী বলে ওরকম যা তা বিশ্রী কথা আমায় কক্‌খনও বল্‌বে না বলে দিচ্ছি। পুরুষ জাতটা দেখছি এই রকমই হয়!

কোন রকম চিন্তা না করেই প্রবোধ বল্লে, হাঁ হাঁ, খুব জানি। পাশের বাড়ীর বউয়ের খবর খুব ফলাও করে রটানো হচ্চে, আর তুমি যে চাকরের সঙ্গে একসঙ্গে হয়ে দিনদুপুরে পরের জানলায় আড়ি পেতে দেখ্‌ছো, কে আসে কে যায়, তাতে কোন দোষ হয় না, কেমন? খবর্দ্দার, এবার থেকে তুমি ঐ চাকরের সঙ্গে কোনো রকম কথা পর্য্যন্ত কইতে পাবে না?

ও:, তাই নাকি? নিজের দোষ ঢাক্‌তে গিয়ে এবার আমার ওপোর উল্টো চাপ! বেশ, আমি আর তোমার বাড়ীতে থাকতেই চাই না। তুমি যখন ঐ শয়তানীর পাল্লায় পড়েছ, তখন পড়, আমি আমার মা ভাইয়ের সঙ্গে চলে যাবো, বলেই নিজের উদ্গতঅশ্রু দমন করতে না না পেরে বউটি হাপুস নয়নে কেঁদে উঠ্‌লো।

প্রবোধ ঘোষ ব্যস্ত হয়ে পড়লো। বারান্দায় খাটিয়া পেতে বাবা এবং শ্যালক নিদ্রিত, পাশে বাবার ঘরে শুয়েছে শাশুড়ী এবং শ্যালিকা। নিস্তব্ধ রাত, যদি কান্নার শব্দ বাইরে পর্য্যন্ত যায়, তাহলে এক মহা কেলেঙ্কারী হবে। নিরুপায় হয়ে প্রবোধ হঠাৎ স্ত্রীর পাদুটো অন্ধকারেই আন্দাজ করে ধরে ফেল্‌লে, বল্লো দয়া করে চুপ কর, আর কেলেঙ্কারী বাড়িও না।

কিন্তু স্ত্রী চরিত্র চিরদিনই অদ্ভুত। স্বামীর চরিত্রদোষ প্রমাণ করার সুযোগ পেলে কোন স্ত্রীই সে সুযোগ সহজে ছাড়তে পারে না। এই নিরীহ বউটিও সাধারণ নারী-চরিত্রের ব্যতিক্রম নয়। বোধ হয় যেন সেই কারণেই সে কান্নার মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিলে, এবং আরও বিপদ হোল' এই যে কান্নার সঙ্গে সঙ্গে সে তার দুঃখের কাহিনী বেশ ইনিয়ে বিনিয়ে বর্ণনা করতে সুরু করলে।

এই বিপজ্জনক অবস্থায় অসহায় প্রবোধকে বাঁচিয়ে দিলে তার আটমাসের ছেলে। ছোট্ট বাচ্চাটা হঠাৎ এমন চেঁচিয়ে উঠ্‌লো যে প্রবোধের স্ত্রী আর উপায়ান্তর না দেখে সেই ছেলেকে নিয়ে আসতে বাধ্য হোল, এবং প্রবোধ কোন মতে এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে যেন এইমাত্র তার ঘুম ভেঙেছে এইভাবে অভিনয় করে ছেলের কান্নার বিরক্তিটা বেশ চীৎকার করে স্বগতোক্তির দ্বারা প্রকাশ করে বিছানা ছেড়ে উঠে দরজা খুলে বাইরে এসে বাইরের পরিস্থিতিটা ভাল করে দেখে নিয়ে বিনা প্রয়োজনে হয়ত বা বাইরে আসার কৈফিয়ৎ দেওয়ার জন্যই বাথরুমের দিকে চলে গেল। সেখান থেকে ফিরে একটু দাঁড়িয়ে আপন মনেই বল্‌তে লাগ্‌লো, উঃ, ছেলেটার কি হোল, সারা রাত ধরেই কান্নাকাটি, আর ভালো লাগে না। এর পর ইতস্ততঃ করে ছেলেটার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার অজুহাতে সে তার নিজের খাটিয়াটা টেনে ঘর থেকে বার করে বারাণ্ডায় শ্যালকের খাটিয়ার পাশে রেখে যখন শয়ন করার উদ্যোগ করেছে, তখন নীরোদবাবু চিৎ হয়ে শুয়ে বললেন, প্রবোধ না কি?

হাঁ বাবা, ছেলেটার কি হয়েছে, ভারী কাঁদ্‌ছে, তাই বাইরে এলুম।

কেন, খোকার কি অসুখ বিসুখ কিছু করল? প্রবোধ বল্‌লে, না তা কিছু নয়, এমনই যেন ক্ষেপে গেছে। উত্তরে নীরোদবাবু আর কিছুই বল্‌লেন না।

প্রবোধ হঠাৎ শঙ্কিত হয়ে উঠলো। বাবা কিছু বলেন না কেন? ছেলেটাও ত আর কাঁদ্‌ছে না। তবে কি বাবা সব শুনেছেন?

প্রবোধ ভয়ে কাঠ হয়ে রইলো। বাবা তাকে কখনও কোন ধমক দিয়েছেন বলে প্রবোধের মনেই পড়ে না, কিন্তু তবুও সে বাবাকে ভীষণ সমীহ করে চলে। বাবা কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে ওপাশ ফিরে হয়ত বা ঘুমিয়েই পড়লেন। প্রবোধ স্থির হয়ে শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগল।

কিন্তু প্রবোধের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে ঘরের মধ্যে উল্টো বুঝিলি রাম হয়ে দাঁড়ালো, যেমন দাঁড়ায় প্রত্যেক স্ত্রীর সঙ্গে তাদের স্বামীদের কলহবিবাদের সময়। প্রবোধের বাইরে শুতে আসার কারণ এই যে, ভেতরে শুলেই হয়ত আবার নতুন নতুন কথা উঠবে এবং এই অহেতুক কেলেঙ্কারী ক্রমে বেড়েই চলবে, কম্‌বে না; কিন্তু একথা প্রবোধের মোটেই মনে হোল না' যে তার বাইরে শোয়ার ফলে তার স্ত্রী এ কথাই মনে করতে পারে যে, প্রবোধ আর তাকে

চায় না। সে রোগা, সে কালো। অন্য পক্ষে বয়স বেশী হলে কি হয়, রুগ্ন হলে কি হয়, ঐ পাশের বাড়ীর গৌরী যে তার চেয়ে এখনও বহু গুণে অধিক সুন্দরী সে কথা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করবে; কাজেই গৌরীকে লাভ করে প্রবোধ আর তাকে চায় না বলেই সে তার ঘর ছেড়ে বাইরে খাটিয়া টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেল একথা ঐ বউটির মন থেকে কে নিরাকরণ করবে? মেয়েদের মনে একবার এই জাতীয় চিন্তা ঢুকলে আর রক্ষা নেই। কোমাকৃতি বীজাণু যেমন একরাত্রের মধ্যেই রোগীর শরীরের সমস্ত রক্ত জল করে তাকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়, নারী মনের এই সর্ব্বনাশা সন্দেহ ঠিক সেইভাবেই এক রাত্রের মধ্যেই স্বামীস্ত্রীর সমস্ত প্রাক্তন প্রণয়কে গলিয়ে জল করে একেবারে নিঃশেষ করে ফেললে। কাজেই পরদিন সকালে দিনের আলোয় যখন স্বামীস্ত্রী আবার মুখোমুখি দাঁড়ালো তখন স্বামীর মনে হোল, ওঃ স্ত্রীজাতি কি সাংঘাতিক, অযথা চীৎকার করে নিরীহ পুরুষকে কি নিদারুণ ভাবেই না হতমান করতে চেষ্টা করে, আর স্ত্রীর মনে হোল, স্বামীরা কি বিশ্বাসঘাতক! দুপুরে অফিস পালিয়ে পরস্ত্রী ভোগ করে রাত্রে নিজের স্ত্রীকে বর্জ্জন করে বাড়ীর ভাল ছেলে সেজে বাবার পাশে শুয়ে রাত কাটায়! ওরা দুজনেই স্পষ্ট অনুভব করলে যে পাশের বাড়ীর ঐ সুন্দরী শয়তানীটা ওদের মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড পাঁচিল গেঁথে তুলেছে।

সকালে ওদের মধ্যে আর কোন কথাই হয় নি। প্রাতঃকৃত্য সেরে নিয়ে প্রবোধ যথারীতি লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে গোল বাজারে বাজার করতে গেল, কেবল যাওয়ার সময় বোধ হয় যেন বিনা কারণেই একবার শিববাবুদের বাড়ীর দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখেছিল, কিন্তু সেই সময় সে জানতেও পারে নি যে, তারই উপেক্ষিতা সহধর্ম্মিণী নিজের ঘর থেকে তার পতিটিকে লক্ষ্য করছিল; শুধু তাই নয়, সহধর্ম্মিণীর মনে এ কথাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, তার স্বামীদেবতা পাশের বাড়ীর খোলা জানালা দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হয়ত বা ইঙ্গিতে তার মধ্যাহ্ন আগমনের সময়টা জ্ঞাপন করেছিল ঐ কালামুখীকে এবং এইভাবেই বোধ হয় ওদের ঘৃণিত অভিসার বহুদিন থেকেই ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে।

বেলা নটার সময় পিতাপুত্রে আহারে বসেছে। প্রবোধের শ্যালক দিল্লীতে এসেছে বেড়াতে, সেই সঙ্গে চাকরীর সন্ধানেও বটে, তাই তার কোন তাড়া নেই এবং দুটো তরকারী বাকী আছে বলে সে এদের সঙ্গে খেতে বসে নি। প্রবোধের শাশুড়ী বেয়াই-এর কাছে একবার মাত্র বসে কোথায় যেন উঠে গেলেন। পরিবেশন করছে প্রবোধের শ্যালিকা, এবং প্রবোধের বউ পাশের রান্নাঘরে। একথা সেকথার মধ্যে প্রবোধের বউ স্পষ্ট শুনতে পেলে নীরোদবাবু ছেলেকে গম্ভীরভাবে বলছেন: দেখ, প্রবোধ, দুপুরে তুমি ওরকম করে অফিস থেকে দু'এক ঘণ্টার জন্য বেরিও না, বিশেষ করে আমার ছেলে হয়ে তুমি যদি এইভাবে ডুব মারো, তাহলে আমার শুদ্ধ বদ্‌নাম হয়ে যাবে, বুঝলে।

প্রবোধ নতমুখে স্বীকার করলে যে সে আর দুপুরে বেরুবে না।

প্রবোধের স্ত্রীর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। সে স্পষ্ট বুঝলে যে তার স্বামী বহুদিন ধরেই এই খেলা খেলে আসছে। ছোট বোন এদিক ওদিক করে দি'দির মুখের দিকে চেয়ে বললে, দিদি তুই কাঁদ্‌ছিস্ কেন, কি হয়েছে দিদি?

দিদি নির্ব্বাক। ছোট বোন বিস্মিত হয়ে পুনর্ব্বার সেই একই প্রশ্ন করেছিল।

দিদি বল্‌লে, কই না ত, বলেই আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছবার ভঙ্গীতে চোখ মুখ মুছে নিলে।

অফিসে বেরোবার সময় অন্যদিনের ন্যায় প্রবোধের পান নিয়ে স্ত্রী আর তার কাছে এল না পরিবর্ত্তে এল তার শ্যালিকা। খাবারের কৌটোটা কাপড়ে জড়িয়ে অন্যদিনের মত প্রবোধের হাতে এসে পৌঁছাল বটে কিন্তু সেটাও শ্যালিকার মারফৎ। এদিক ওদিক চেয়ে প্রবোধ তার স্ত্রীকে ধারে কাছে কোথাও দেখ্‌তে পেলে না। জামা কাপড় পরে তৈরী হয়ে প্রবোধ তার বাবার ঘরে এসে দেখে বাবাও তৈরী হয়েছেন। অন্যদিনের মতো আজকেও পিতাপুত্রে একই সঙ্গে দুর্গা শ্রীহরি স্মরণ করে বেরুলেন বটে, কিন্তু প্রবোধের মনের মধ্যে এক গুরুভার যেন কে চাপিয়ে দিয়েছে। তার মনে আজ বিন্দুমাত্র শান্তি নেই। বিকালে বাড়ী ফেরার পর থেকে রাত্রে খাওয়ার সময় পর্য্যন্ত প্রবোধ তার স্ত্রীর দেখা পেলে না, সেও প্রায় অভিমান

করেই বাইরে শ্যালক ও পিতার পাশেই তার খাটিয়া পেতে শয়ন করলে এবং এমনিভাবে নির্ব্বাক হয়ে পর পর দুদিন এবং দুরাত্ত কেটে গেল। শালা, শালী, শাশুড়ী এবং হয়ত বা পিতাও মনে মনে বুঝলেন যে স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে বোধ হয় যেন কি একটা মান অভিমানের ব্যাপার চল্‌ছে। প্রবোধ একবার ক্ষীণভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল যে, রাত্রে কুটুম্বরা বাইরে থাকবে, আর সে কেমন করে ঘরে শোয়, কিন্তু যুক্তিটা কেউ বিশ্বাস করলেকি না,বুঝা গেল না। অন্ততঃ এটা ঠিক যে, শ্যালিকা তার এই মহতী আত্মত্যাগ আদৌ বিশ্বাস করে নি, এবং সে এর মর্ম্মোদ্ঘাটনের চেষ্টাও কিছু করেছিল, কিন্তু কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারে নি। অন্যেরা সকলেই নির্ব্বাক ছিল, কারণ বিবাহিত ব্যক্তিমাত্রেই জানে যে পৃথিবীতে একমাত্র যোগীরাই মৌনী হয়ে থাকে না, দম্পতিরাও মধ্যে মধ্যে মৌনী হতে পারে এবং হয়ও।

দুদিন চুপচাপ থাকার ফলে প্রবোধ বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়লো,তার কেবলই মনেহতে লাগ্‌লো যেন কতকাল,কত দীর্ঘ যুগ ধরে সে একাকী মরুভূমির ওপোর দিয়ে কেবলই দৈনন্দিন শুষ্ক কর্ত্তব্য পালন করে চলেছে। এ মৌনতা যে কবে ভাঙ্গবে, কে ভাঙ্গবে,কি রকম করে নিজের মানসম্মান বজায় রেখে স্ত্রীর সঙ্গে আবার পূর্ব্বের ন্যায় মেলামেশা সুরু হবে,তার কোন সহজ পন্থাই সে আবিষ্কার করতে পারছিল না। এর পূর্ব্বে এই পাঁচ বৎসর বিবাহিত জীবনের মধ্যে যে এমন দুর্ঘটনা ঘটে নি,ত নয়, কিন্তু এবারকার মৌনতার গুরুত্ব যেন সর্ব্বাধিক ; অন্যান্যবারের মত একবার ডাকলেই সমস্ত ক্রোধের অবসান হবে বলে মনে হয় না। অপর পক্ষে স্ত্রীর কেবলই মনে হতে লাগ্‌লো যে, এ রকম মৌনতা ত এর আগেও হয়েছে, কিন্তু তখন স্বামী একদিন পরেই আদর করে ডেকে নিয়েছে কিন্তু এবার যে অন্য ব্যাপার। আরও ভালো এবং উপযুক্ত মনের মানুষ মিলে গেছে, তাই পুরো দুটি দিন, দীর্ঘ আটচল্লিশটি ঘণ্টা একে একে পার হয়ে গেছে, কিন্তু স্বামীদেবতা তাকে ডাকার কোন প্রয়োজনই আর বোধ করেন নি। রাত্রে একাকী নিজের ঘরে দ্বার রুদ্ধ করে আট মাসের ছোট্ট ছেলেটিকে বুকের ওপোর চেপে ধরে হাপুস নয়নে নীরবে কাঁদে ঐ বউ, মনে মনে বলে তুইই আমার সব, তোকে বড় করবো, মানুষ করবো তোকে দিয়েই আবার নতুন করে গড়ে উঠ্‌বে আমার বুড়ো বয়সের সংসার কারণ যৌবনের সংসার আমার শেষ হয়ে গেছে! স্বামী আমার পর হয়ে গেছে, চোখের সাম্‌নে স্বামীর এই রকম অনাদর আর সহ্য করতে পারি না। এক একবার বলে ভগবান, আর আমার কিছুই চাই না এবার আমায় তুলে নাও, তোমার চরণে ঠাঁই দাও। বাংলা দেশের নিতান্ত রক্ষণ-শীল হিন্দু পরিবারে মেয়ে, এর চেয়ে বড় চিন্তা বা অন্য সমাধান আর কোথায় পাবে ?

প্রবোধের শালা তার মা ও বোনকে নিয়ে হরিদ্বারে যাবে তীর্থ করতে। প্রবোধের স্ত্রী তার দাদা এবং শ্বশুরকে ধরে বস্‌লো সেও যেতে চায়। নীরোদবাবু বল্লেন বেশ যেতে পারো, আমার কোন আপত্তি নেই, তবে প্রবোধের মত নিয়েছ ?

বউমা নীরব। নীরোদবাবু বল্লেন, সেবার আপত্তি না থাক্‌লে যেতে পারো, রান্না খাওয়ার ব্যবস্থা যা হয় করা যাবে' খন।

প্রবোধকে জিজ্ঞাসা করলে তার শালী। বল্লে জামাইদা, দিদি আমাদের সঙ্গে হরিদ্বার যেতে চায়, আপনি দিদিকে ছুটি দেবেন কি ?

প্রবোধের অন্তরাত্মা একেবারে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠ্‌লো। তবে কি প্রবোধ এখনই ঘৃণিত, এমনই অকথ্য যে যাওয়ার ছুটীটা পর্য্যন্ত সামাজিক ভাবে নিতে হবে, তাই কোন রকমে অন্যের মারফৎ নেওয়া হচ্ছে। আচ্ছা, এর প্রতিফল সে দেবে। এ অপমানের শাস্তি ঐ চণ্ডভাগা বউকে নিশ্চয়ই পেতে হবে।

তাকে নিরুত্তর দেখে শ্যালিকা আর একবার অনুরোধ জানাতেই প্রবোধ বল্লে, স্বচ্ছন্দে, আমার কোনই আপত্তি নেই।

আড়াল থেকে প্রবোধের উচ্চারিত শব্দগুলো স্বকর্ণে শুনে তার স্ত্রীর চোখ ফেটে জল এল। মনে হোল, বটেই ত, আমাকে আর কি দরকার !

শালী বলে, রান্না বাড়ার জন্যে—

কথা শেষ করতে না দিয়েই প্রবোধ বললে, সে ব্যবস্থা হবে'খন। আশেপাশের অনেক বাড়ীতেই রাঁধুনী আছে, দু'চারদিনের জন্য কিছু পয়সা দিলে ঢের পাওয়া যাবে।

কথাটা যেন প্রবোধ খুব জোর দিয়েই ব'লে, কাউকে আঘাত দেওয়ার উদ্দেশ্যে। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হোল। অন্তরালে বউটির বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে এল, সে এ বাড়ীর বিনা মাইনের রাঁধুনী! পরক্ষণেই মনে হোল, হয়ত এই উপলক্ষ্যে প্রবোধ নিশ্চয়ই শিববাবুর বাড়ীর ঠাকুরকে, সেই হতভাগা ছোকরাটাকে বোধহয় নিযুক্ত করে ওদের সঙ্গে বেশী করে মেলামেশার সুযোগ করে নেবে; বা যে, তবে ত প্রবোধের সুবিধেই হবে।

দুপুরে প্রবোধের স্ত্রী বেঁকে বসলো। না, আমি আর হরিদ্বার-টরিদ্বার কোথাও যাবো না, আমি এইখানেই থাকবো।

ওর মা কদিন ধরেই বুঝতে পেরেছিল যে কোথাও যেন বেশ বড় রকমের বেসুরো বাজছে। তিনি মেয়েকে অনেক করে বুঝিয়ে শেষে বললেন, অনেকদিন এক জায়গায় আছিস্, কদিনের জন্য একটু ঘুরে আস্‌বি চল, শরীর মন দুইই ভালো হবে। বোন বললে, দিদি দিন কতক সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়, জামাইদা বুঝুক, কত ধানে কত চাল, তখন আবার তোর নতুন করে আদর বাড়বে। ছোট মেয়েকে ধমক দিয়ে মা বললেন, হ্যাঁ হাঁ, বেয়াই মশাই যখন মত দিয়ে দিয়েছেন—

দুঃখে ও ক্ষোভে ম্রিয়মাণ বউটি চুলটুল ভালো করে না বেঁধে দু'খানা আধময়লা কাপড় এবং ছেলের দুটো কাঁথা নিয়ে দাদা মা ও ছোট বোনের সঙ্গে হরিদ্বার চলে গেল সেইদিন সন্ধ্যের ট্রেনে। কথা হোল যে দু'দিন পরে অর্থাৎ রবিবার সকালে ফিরে আসবে।

এদিকে প্রবোধের কালরাত্রি আর কাটতে চয় না। প্রবোধ ছেলেটি নিতান্ত নিরীহ গোছের লোক। জীবনে তাকে কোনদিন কোথাও মাথা তুলে দাঁড়াতে হয় নি, অর্থাৎ দাঁড়াবার কোন প্রয়োজন সে বোধ করে নি। মা বাপের এক ছেলে, চার বছর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তার মা জীবিত ছিলেন, এখনও যা কিছু মতামতের ব্যাপার সমস্তই বাবার কাছে। কোনদিন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মাথা দেওয়ার দরকার সে বোধ করে নি, কোন রকম ঘাত প্রতিঘাতের সম্মুখীন সে হয় নি, এমন কি চাকরী পর্য্যন্ত তাকে খুঁজে বার করতে হয় নি। নিতান্ত গোবেচারীভাবেই সে-বি-এ পাস করে বিনা ইণ্টারভিউতে সে আজ থেকে পাঁচ বছর পূর্ব্বে এই সরকারী চাকুরীতে বহাল হয়েছে এবং অফিসেও বাবার ছায়ায় নীরবে নিজের কাজটুকু চালিয়ে যায়। এখনও পর্য্যন্ত একলা সে ট্রেণজার্ণিও করে নি। বয়স তার বেড়েছে বটে কিন্তু মনে প্রাণে সে এখনও শিশু। তার এই সমূহ বিপদে তার এমন একটা বন্ধুও নেই যাকে কি না এই সব ব্যাপার সে প্রাণ খুলে বলতে পারে। বেচারী দিনরাত ভেবে ভেবে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়লো।

শনিবার সকালে যখন তার বিনিদ্র রজনীর অবসান হোল, তখন তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো ঐ পাশের বাড়ীর বউয়ের ওপোর। সে মনে মনে ঠিক করলে, সে সমস্ত কথাই শিববাবুকে বলবে। কিন্তু মুস্কিল এই যে, রাত্রে যে সমস্ত কথা সে গুছিয়ে ভেবে ঠিক করে, সকালে দিনের আলোয় সেই কাজ করতে সে কিছুতেই পারে না। কারুর সঙ্গে কোন কথা বলতে গেলে সে যেমন করে ভেবে নিয়ে প্রস্তুত হয়, সে-সব কোথায় কেমন যেন গুলিয়ে গিয়ে এমন কিম্ভূতকিমাকার হয়ে যায় যে কিছুই বলা হয় না এবং নিজে নিতান্ত বোকা হয়ে পড়ে। কারুর সঙ্গে কোন কথা শেষ করে বলে আসার পর তার কেবলই মনে হয় যে, এই সব কথাগুলো আরও বলা যেত, এইভাবে ব্যাপারটাকে আরও স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলা যে' এবং এইরূপে চিন্তা করতে করতে সে প্রতিবারেই ক্রমে ক্রমে আবিষ্কার করে যে অন্ততঃ একশো একটা জিনিষ তার বলা হয় নি, এবং সে যা বলেছে সেটা বলার চেয়ে কোন কিছু না বলাই ছিল ভালো, এমন কি সেই ব্যাপারে তার মাথা দেওয়াই উচিত হয় নি। তার নিজের এই দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে বহুবার বহু তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তার এই জ্ঞানই হয়েছে যে, সে গুছিয়ে কথা বলতে পারে না, কাজেই সে ঠিক করলে যে, সমস্ত কথা সে শিববাবুকে চিঠি লিখে জানাবে। সেই ভালো, শিববাবু তার নিজের ঘর সামলান, না হয়ত এখান থেকে উঠে অন্য কোথাও চলে যান।

ভোরবেলা অন্য সমস্ত কাজ বাদ দিয়ে নিজের ঘরে বসে প্রবোধ শিববাবুর নামে চিঠি লিখতে সুরু করলো সেই কলমে, যে কলমে গৌরী কাশীর ঠিকানা লিখেছিল। সেই কলম হাতে নিয়ে প্রবোধ ঠিক করলে, সমস্ত শোনা

কাহিনী, রেণুর কথা, সমীরের কথা, রামরূপের কথা সমস্ত কথাই সে লিখে শেষ পর্যন্ত শিববাবুকে ভয় দেখাবে যে, যদি তিনি তাঁর স্ত্রীকে শোধরাতে না পারেন, বা এ পাড়া থেকে উঠে অন্যত্র চলে না যান, তা'হলে তার ওপোর অত্যাচার করা হবে। এই সব লিখে সে তলায় নাম দিলে 'আপনার বন্ধু' বলে। চিঠিখানা আগাগোড়া ইংরাজীতে লেখা গেল, কারণ ইংরাজী ছাড়া বাংলায় এ-ভাবে লেখার মত আত্মবিশ্বাস প্রবোধের ছিল না। লিখতে লিখতে বেলা সাড়ে সাতটা বেজে গেল। নীরোদবাবু ছেলের সংবাদ নিলেন দুবার, দ্বিতীয় বারে বললেন, কি লিখছিস রে এত?

প্রবোধ তার চিঠিখানা অল্প আড়াল করে বল্লে, একটা চিঠি একজনকে লিখ্‌ছি।

নীরোদবাবুর মনে কৌতুহল হলেও আর কোন প্রশ্ন করলেন না।

এর পর প্রবোধের মনে হোল' হাতের লেখা দেখে যদি শিববাবু টের পান যে এসব প্রবোধের কাণ্ড, তা'হলে?

প্রবোধ ভাবলে, ঠিক আছে, টাইপ করে দিতে হবে। কিন্তু কে টাইপ করবে? তার নিজের ত মেশিন নেই এবং সে নিজে টাইপ করতে জানেও না। ভাবতে ভাবতে উঠে প্রবোধ মুখ ধুয়ে দৌড়ে বাজারে গেল। বাজারে গিয়ে সে যে কি কিন্‌লে, তা নিজেও বুঝতে পারলে না। ঐ একমাত্র চিন্তার বোঝা নিয়ে সে বাজার থেকে বেরিয়েই একেবারে শিববাবুর মুখোমুখি হয়ে গেল। অন্য দিনের মত একবার মাত্র মুখ তুলে ভালো আছেন কথাটা উচ্চারণ করেই সে বাড়ীর দিকে এগুচ্ছিল, হঠাৎ শিববাবুই ওকে ডেকে বল্লেন, আচ্ছা প্রবোধ, তোমাদের বাড়ীর লাইট কি সব নিবে গেছে?

প্রবোধের মনে পড়ে গেল, সে ভোর রাত্তিরে আলো জেলে বসে বসে শিববাবুকেই চিঠি লিখ্‌ছিল। মুখ তুলে বললে, না ত।

শিববাবু বললেন, তা হলেই হয়েছে। নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ীতে ফিউজ হয়েছে শেষ রাত্রে। আমি ভেবেছিলুম আমাদের দিকের সব লাইটই বোধ হয় গিয়েছে, তা নয়। যাক্ তা হলে আমাকেই দেখছি খবর দিতে হবে।

এর পর দুজনেই একসঙ্গে বাড়ীর দিকে রওনা দিলে। দুজনেরই বাজার শেষ হয়ে গেছে। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে প্রবোধের মনে অল্প অল্প সাহস আসতে লাগলো। ভোর থেকে বসে বসে দু'তিনবার করে গুছিয়ে গুছিয়ে সে চিঠি লিখেছে, চিঠির ভাষাটা তার প্রায় মুখস্থ হয়েই আছে, তাহলে ভয়টাই বা কিসের? বলুক না সে, কি আর হবে। সত্য কথা, জোর করে বললে, কার সাধ্য আছে সে কথার নড়চড় করে। একটু ভেবে চিন্তে সে রেণুর কথা দিয়ে ব্যাপারটা সুরু করলে। ধারে-পাশে আর ত কেউ নেই। লক্ষ্মণ বাজার নিয়ে এগিয়ে গেছে, আর শিববাবুর বাজার তার নিজেরই হাতে।

রেণুর কথাটা উঠ তেই সদাশিব ঘৃণাভরে বললে, ও সব ভ্রষ্টার কথা আর তুলো না, ওসব আলোচনাতেও পাপ।

এই সুযোগ, প্রবোধ বললে, শিববাবু, একটা কথা বলবো, কিছু মনে করবেন না। আমি—মানে নানা লোকের কাছ থেকেনানা রকম কথা শুনতে পাই—আপনি মাঝে মাঝে দুপুরে বে-টাইমে এক একবার নিজের বাড়ীতে এসে নিজের বাড়ী সম্বন্ধে পরীক্ষা করে দেখবেন। কথা-গুলোর শেষের দিকে বেশ একটু ঝাঁজ আছে।

তার মানে? সদাশিব থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

ভয়ে এতটুকু হয়ে প্রবোধ বললে, না, মানে অনেক রকম শুনতে পাই কি না—

রাস্তার মাঝখানে সদাশিব প্রবোধের সামনা সামনি দাঁড়িয়ে স্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপার কি, ভদ্র-লোকের বাড়ীর সম্বন্ধে এ রকম কথা যে তুমি বলছো, এর কোন প্রমাণ আছে?

প্রবোধ প্রমাদ গনলে। মুখের ডগায় সকালের লেখা চিঠির ভাষাটা এসে গেল, সেই চিঠির লিখিত ইংরাজী ভাষাতেই সে বললে, মাঝে মাঝে বাড়ীতে এসে দুপুরবেলা নিজের ঘরের জানালা দিয়ে দেখবেন তাহলে প্রমাণ আপনিই মিলে যাবে। এইটুকু বলেই সে হন্‌হন্ করে এগিয়ে পড়লে, যেন ছুটে পালিয়ে যেতে চায়।

শিববাবু রাস্তার মাঝখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়লো। একটুখানি স্থির থাকার পর তার সমস্ত বুকটা খালি করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এলো। তারপর সে ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে এগিয়ে চল্‌ল।

বাড়ী ফিরে সদাশিব ভালো করে গৌরীর সঙ্গে কথা কইতে পারলে না, কোনরকমে স্নানাহার শেষ করে গৌরীকে বললে, আজ শনিবার বটে কিন্তু আমার বাড়ী ফিরতে চারটে সাড়ে চারটে হবে।

গৌরী বললে কেন?

কাজ আছে।

সদাশিব গৌরীর মুখের দিকে লক্ষ্য করে আপন মনেই বুঝে নিলে, এই সংবাদে বেশ কিছু খুসিই হয়েছে। আর কোন বাক্যব্যয় না করে সদাশিব সোজা অফিসের দিকে রওনা দিলে।

বেলা সাড়ে বারোটার মধ্যে সদাশিব তার সমস্ত হাতের কাজ শেষ করে ওপরওয়ালার সঙ্গে দেখা করে অনেক অনুনয় বিনয় করে সকাল সকাল যাওয়ার জন্য ছুটী চাইল। অনুনয়ের বিশেষ দরকার ছিল না, কারণ সদাশিবের বরাবরই রেকর্ড ভালো, কাজেই সঙ্গে সঙ্গে ছুটী পেয়ে গেল।

এক বুক ভয় ও আশঙ্কা নিয়ে, একরাশ সন্দেহ এবং ক্রোধ পুষে সদাশিব দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে রওনা দিলে। একটা বেজে দু'চার মিনিট হয়েছে, এমন সময় সে তার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হোল। নিঃশব্দপদে দুরু দুরু বক্ষে হতভাগ্য সদাশিব নিজের বাড়ীর দিকে দেখে একটু চিন্তিত হোল, সমস্ত দরজা জানালা ভেতর থেকে চেপে বন্ধ। বিকালে সে যখন অফিস থেকে ফেরে তখন ত এ রকম বন্ধ থাকে না। যাই হোক, সদাশিব আগে বাইরের ঘরের দরজায় কান পেতে শোনবার চেষ্টা করলে, ভেতর থেকে কোন সাড়া শব্দ কিছু পাওয়া যায় কি না কিন্তু কিছুই পাত্তা পেলে না, তারপর এলো নিজের ঘরের জানলায়। বিশেষ কিছুই শ্রুতিগোচর হোল না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, পাশের জানলায় একটা সামান্য ফাঁক আছে, সেখান দিয়ে আজ সকালেও সূর্য্যের প্রথম আলো ঘরে এসে ওদের সূর্য্যোদয়ের সংবাদ জানিয়ে দিয়েছে। নিঃশব্দ পদে সদাশিব গেল পাশের জানলায়। সেই ফাটা জায়গাটা আবার নিচে থেকে দাঁড়িয়ে ঠিক নাগাল পাওয়া যায় না। জানলা ধরে দেওয়ালের খাঁজে পা দিয়ে উচু হয়ে অনেক চেষ্টায় ঐ মোটাসোটা ছিদ্রান্বেষী সদাশিব যখন সেই ছিদ্রপথে দৃষ্টিসংযোগ করলে,তখন ভেতরের অন্ধকারে ঘরের কোন কিছুই সে দেখতে পেলে না। অথচ বেশীক্ষণ সেই ফাটায় চোখ রেখে দাঁড়িয়ে অন্ধকারটা নিজের দৃষ্টিতে রপ্ত করে নেওয়া এতই পরিশ্রম সাপেক্ষ যে সেই দুষ্কার্য্য সদাশিবের শক্তিতে প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হোল।

হতাশ হয়ে সে জানালা থেকে নেমে এলো, এবং নেমে এদিকে দরজার কাছে এসে সমস্ত রাগ ঐ দরজার ওপোর ঝাড়লে। দুম্ দুম্ করে দ্বারে বারম্বার করাঘাত করে অসহায়ের মতো সে এদিক ওদিকে চাইতে গিয়ে দেখ্‌লে, সামনের কোয়ার্টার্সে সমীর সাইকেল হাতে হাঁ করে ওর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিস্মিত সমীর সদাশিবকে ঐ উল্টো দিকের জানলায় গিয়ে দাঁড়াতে দেখেছিল, এবং ওটা সদাশিবের পক্ষে এমনই একটা অসম্ভব ব্যাপার যে, সমীর এতে রীতিমত ভয় পেয়ে গেছে এই ভেবে যে, বাড়ীতে বোধহয় কিছু একটা বিপদ হয়ত হয়েছে এবং সদাশিব হয়ত ঘণ্টার পর ঘণ্টা দরজায় ধাক্কা দিয়ে কোন সাড়া পায় নি বলেই নিরুপায় হয়ে ওদিকে গিয়েছিল।

সদাশিব নিমেষে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে দরজার ওপোর পুনরায় সজোরে আঘাত করলে। এর পর গৌরীর সাড়া পাওয়া গেল! নিতান্ত বিরক্ত এবং ভীত হয়ে সে প্রশ্ন করলে, কে, কে, কে দরজা নাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে তার ঘরের জানলা খুলে গেল?

গম্ভীর মুখে সদাশিব বললে, দরজা খোল।

গৌরী আর কোন কথার উত্তর দিলে না, মনে হোল যেন নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এ ঘরে এসে এ ঘরের দরজা খুলে কি জানি কেন দরজা চেপে দাঁড়িয়ে বললে, এ কি, আজ যে এর মধ্যে এসে গেলে, এই না বলে গেলে চারটে সাড়ে চারটের সময় আসবে।

হুঁ, দরকার আছে তাই এসেছি, এইটুকু বলেই সদাশিব যেন জোর করে গৌরীকে ঠেলে বাড়ীর ভেতরে ঢুকতে গেল।

গৌরী ওকে এই ঘরেই আটকাতে চায়, কিন্তু চেষ্টা করেও পারলে না, সদাশিব অস্বাভাবিক জোর দেখিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

ঘরে ঢুকেই সে চারদিক তন্ন তন্ন করে দেখতে লাগলো। ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই কেমন একটা সিগা-

রেটের গন্ধ তার নাকে এলো। এদিক ওদিক দেখতে গিয়ে দরজার পাশে সে একটা সিগারেটের পোড়া টুকরো দেখতে পেয়েই সক্রোধে গৌরীকে বললে, আমার ঘরে সিগারেট খেয়েছে কে?

গৌরী একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে। সিগারেট, কই? কে, কি জানি? জানি না ত।

সমীর এসেছিল? সদাশিব প্রশ্ন করলে।

সমীর? অবাক করলে! তুমি কি মনে কর এ বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙ্গোবার মুখ তার আছে? তারপর যেন নিজের মনেই গৌরী বললে, ওঃ, কি নোংরা মন তোমার, এত নীচ, এত ছোট তুমি?

সদাশিব ভয়ে কেঁচো হয়ে গেল। একমাত্র সমীরকেই সে সিগারেট খেতে জানে। তবে কি সমীর তাকে আসতে দেখে ওর বাড়ী থেকে বেরিয়ে অন্যপথে নিজের দরজায় গিয়ে হাজির হয়েছিল? নাঃ, সে একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু সিগারেটের টুকরোটা এলো কোথা থেকে?

গৌরী সদাশিবের কাছে এগিয়ে এসে হঠাৎ খুব মিষ্টি করে তার মাথায় হাত দিয়ে বললে, হ্যাঁ গা, তুমি কি পাগল হয়ে গেছ? এই বুড়ো বয়সে তুমি আমায় এতকাল পরে সন্দেহ করতে সুরু করলে?

সদাশিব একেবারেই সদাশিব। গলে জল হয়ে বললে, তবে সব পাড়ার লোকে তোমার নামে যা তা বলে কেন?

অবাক হয়ে গৌরী বললে, আমার নামে? আমার নামে আবার কে কি বললে? ঐ কানী মাগীটাকে নিয়ে তোমার বন্ধু সব যা তা কাণ্ড করবে, তার কোন দোষ নেই, আর আমি রোগে ভুগে মরছি, বাড়ীতে একলা পড়ে থাকি, আমার নামে যা তা অপবাদ কে রটাচ্ছে বল দেখি?

সদাশিব ঘাড় হেঁট করে রইলো, কোন কথাই বললে না।

একটু পরে যেন আঁচল দিয়ে চোখ মুছে গৌরী সদাশিবের মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে বললে, স্থির হও, ঠাণ্ডা হও, বুড়ো বয়সে এরকম পাগলামি কোরো না। নাও, জামাটামা খোল। এঃ, সারা সপ্তাহে জামাটা ধুলোয় ময়লায় চিরকুট হয়ে গেছে, বলতে বলতে গৌরী সযত্নে সদাশিবের কোটের বোতাম খুলে দিতে লাগল।

জামা খুলে জল খেয়ে সদাশিব নিজের বিছানায় অনেকক্ষণ ধরে শুয়ে রইলো। বেলা তিনটার সময় উঠে দেখে গৌরী চুল বেঁধে গা ধুয়ে ফিটফাট হয়ে রান্নাঘরে কি যেন করছে। সদাশিবকে দেখে গৌরী বললে, চা করে দেব?

সদাশিব মিষ্ট ব্যবহারে গলে গিয়ে বললে, কর, তা রামরূপ কোথায়?

কে জানে? সে ত সেই খেয়েই বেরিয়েছে।

ও ব্যাটাকে দিয়ে আর চলবে না, সদাশিব আপন মনেই কথাগুলো বলে কলঘরে গিয়ে ঢুকলো।

পাঁচটা নাগাদ নীরোদবাবু এসে ডাক দিলেন, শিববাবু।

সদাশিবের মনটা তেতো হয়ে উঠলো। তারই ছেলের জন্য ত আজ এত বিপদ। ছোকরা দুম করে কি একটা কথা বলে কোথা থেকে কি যে করে দিলে! যাই হোক্ মানুষ সভ্য জাতি, সদাশিব নীরোদবাবুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েও এলো এবং তারপর যথারীতি শনিবারের অপরাহ্ণ ভ্রমণে বেরিয়ে দু'জনে এসে ঢুকলেন বিড়লা মন্দিরে। সেখান থেকে সন্ধ্যার সময় কালীমন্দিরে মাঠের আসরে এসে বসলোও দু'জনে এবং আটটা নাগাদ নিজের বাড়ীতে এসে দরজায় ঘা দিলে। রামরূপের রান্নাবাড়া শেষ হয়েছে অতএব আহারাদি শেষ করে সদাশিব নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশও করলে। কিন্তু দরজার কাছে ঢুকতেই সেই সিগারেটের টুকরোটা যে জায়গায় পড়ে ছিল, সেই জায়গাটা সদাশিবের মনের ভিতর কেমন যেন খচ্ খচ্ করতে লাগলো। তখন অবশ্য টুকরোটা আর ছিল না। না থাকারই কথা, কারণ সন্ধ্যেবেলা ঘর দোর ঝাঁট দেওয়ার সময় সমস্ত আবর্জ্জনার সঙ্গে সেটারও অন্তর্হিত হওয়াই উচিত। (ক্রমশঃ)

———
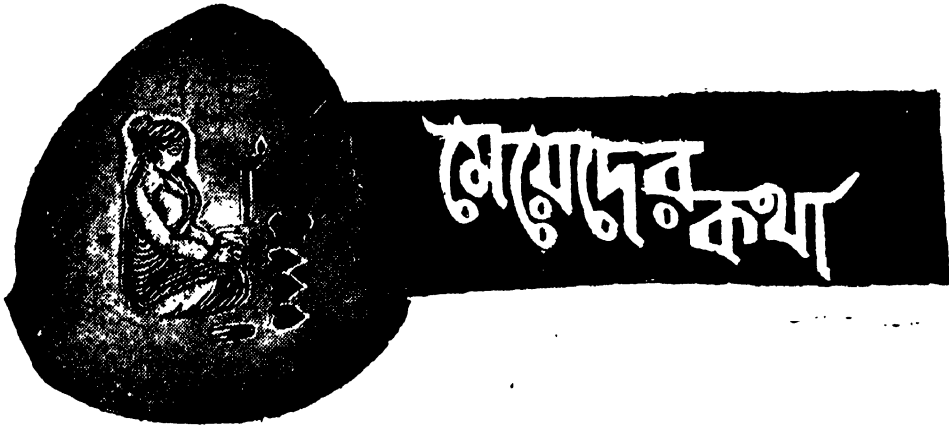
রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী

লীলা বিদ্যান্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বাঙ্গালী মেয়ের শ্যামল রূপ কবিকে মুগ্ধ করেছে। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ কবির ভাল লাগেনি, যতক্ষণ না তার ওপরে পড়েছে শ্যামলের ছায়া।

"আমি ভালোবেসেছি বাংলা দেশের মেয়েকে
যে দেখায় সে আমার 'চোখ ভুলিয়েছে
তাতে আছে যেন ওই মাটির শ্যামল অঞ্জন।
ওর কচি ধানের চিকণ আভা।
তাদের কালো চোখের করুণ মাধুরীর উপমা দেখেছি
ওই মাটির দিগন্তে।
নীল বনসীমায়, গোধূলির শেষ আলোটির নিমীলনে।"

কবি কেন যে তার শেষ বেলাকার ঘরখানি মাটির বুকে বেঁধেছেন, কবির সেই ঘর, যার নাম শ্যামলী, তার কথা বলতে গিয়ে কবি বাংলাদেশের মেয়ের ওই অপূর্ব বর্ণনা দিয়েছেন। কবির কাছে মাটির সব কিছুই ভালো লেগেছে। তাই ওই মাটির রংয়ের সংগে মিল আছে যাদের সেই শ্যামলা বাঙ্গালী মেয়েদের কবির এত ভালো লেগেছে। তাদের গায়ের রং যেন মাটির বুকে ফলে ওঠা কচি ধানের রংয়ের মত। বাঙ্গালী মেয়েদের করুণ কালো চোখের যে মাধুরী কবি তার উপমা খুঁজে পেয়েছেন গোধূলি বেলায় ম্লান হয়ে আসা আলোর মধ্যে। যে আলোতে মিশে আছে আসন্ন রাতের ছায়া যা কবি দেখেছেন দূর দিগন্তে নীল বনান্তের শিয়রে।

কালো চোখ দেখে শুধুই যে কালো রংয়ে অভ্যস্ত বাঙ্গালী কবি মুগ্ধ হয়েছেন, তিনি নিজে বাঙ্গালী বলেই তা নয়। ইউরোপের এ যুগে সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক বার্ণাড শও কালো চোখের রূপে মুগ্ধ হয়েছেন। কটা চোখ ও নীল চোখকে তিনি বলেছেন যেন দুটো পাথরের টুকরো বসানো। কালোর মধ্যে রয়েছে অতল গভীরের ছায়া। সেই তো গভীর মানস সায়রের ছায়া।

কবি বলেছেন মেয়েরা যখন সংসারের মধ্যে সেবা করবার, ত্যাগ করবার অবসর পায় তখনি তাদের জীবন সার্থক হয়, সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যদি কোন মেয়ে স্বামী এবং সংসারের কাছ থেকে কেবল সেবা পেতেই থাকে, তা হ'লে তার জীবন ব্যর্থ হয়।

গল্পগুচ্ছের মধ্যবর্তিনী গল্পে কবি শৈলবালার চরিত্রের মধ্যে এই কথাই ফুটিয়ে তুলেছেন। শৈলবালাকেনিবারণ দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করেছে। সংসারের সমস্ত দায় গ্রহণ করেছে তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী হরসুন্দরী। শৈলবালা তার স্বামী

এবং সংস্ত্রীর কাছে কেবল সেবা যত্ন আর সোহাগ গয়না এই সব পাচ্ছে। এমনি করে তারও যে কোন প্রতিদান দেবার দায় আছে এটা সে শিখতেই পেল না। তাই স্বামীর বিপদের দিনে যখন হরসুন্দরী স্বামীকে নিয়ে শৈলবালার কাছে গয়নাগুলো চাইতে গেল, তখন সে সমস্ত তার উত্তরে কেবলি বলল—"সে আমি কি জানি?" কবি লিখেছেন—সংসারের কোন চিন্তা যে তাহাকে কখনো ...ত হইবে এমন কথা কি তাহার সহিত ছিল? সকলে আপনার ভাবনা ভাবিবে এবং সকলে মিলিয়া শৈলবালার আরাম চিন্তা করিবে, অকস্মাৎ ইহার ব্যতিক্রম হইল একী ভয়ানক অন্যায়! কবি দেখিয়াছেন কেবলি পাবার মধ্যে কেবলি চাওয়া বেড়ে ওঠে। তাই কেবলি অসন্তোষ বড়ে উঠতে থাকে। কবি লিখেছেন স্বামীর অবস্থা খারাপ হয়ে যাবার পরে "ছোট বৌয়ের অসন্তোষ এবং অসুখের আর শেষ নাই। সে কিছুতেই বুঝিতে চায় না, তার স্বামীর ক্ষমতা নাই, ক্ষমতা নাই যদি তো বিবাহ করিল কেন?" কবি লিখেছেন—শৈলবালা বাঁচিল না। সংসারের সমস্ত সোহাগ আদর লইয়া পরম অসুখ ও অসন্তোষে বালিকার ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণ ব্যর্থ জীবন নষ্ট হইয়া গেল।"

কবি দেখিয়েছেন এই রকম মেয়েমানুষের সংসারে মূল্য নেই। সে শুধুই পেয়েছে, কিছু দিতে শেখেনি, সে সংসারের বুকের ওপরে যেন একটা ভারের মত চেপে থাকে। যে মুগ্ধ স্বামী শৈলকে নিয়ে আদর সোহাগে মত্ত হয়ে উঠেছিল, শৈলর মৃত্যুর পরে হঠাৎ সে একটা আঘাত পেল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই একটা মুক্তির আরাম পেল। আর যে মেয়ে তার ত্যাগ দিয়ে সেবা দিয়ে সংসারকে ভরে রেখেছে স্বামীর মনে তারি জন্যে চিরদিনের স্থান। নিবারণের মনে হ'ল শৈলবালা যেন তার জীবনে একটা দুঃস্বপ্ন। আর হরসুন্দরী—"সেই তো তাহার সমস্ত সংসার একাকিনী অধিকার করিয়া তাহার জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখের স্মৃতি-মন্দিরের মাঝখানে বসিয়া আছে।"

ত্যাগেই মেয়েমানুষের সবচেয়ে বড় অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়। সেবা দিয়েই সে সংসারের মাঝখানে আপনার স্থায়ী আসন পাতে। দুর্ভাগ্যক্রমে যে মেয়ের জীবনে ত্যাগ ও ...র অবসর না আসে সংসারের মধ্যে তার জন্যে কোন ...নেই কোন স্থায়ী আসন পাতা হতেই পারে না। সে চলে গেলে সংসার হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

শৈলবালা, এই সৌখিন নাম আর হরসুন্দরীর মোটা নাম দিয়ে কবি নারীর দুই রূপেরই বর্ণনা করেছেন। পুরুষের কাছে কার মূল্য বেশী তাই কবি এই গল্পে দেখিয়েছেন। সুখের দিনে উন্মত্ত পুরুষ যৌবনের মায়া-মন্ত্রে মুগ্ধ হয়ে, সেবারতা নারীকে ভুলে আবেগময়ী তরুণীকে নিয়ে সুখে থাকে। কিন্তু দুর্দিন যেই আসে তখনি সে বোঝে ওই বিলাসিনী তার কোন কাজেই লাগবে না। তখনি তার মনে পড়ে সেবা নিষ্ঠা নারীকে। বিপদের দিনে তাই নিবারণ শৈলবালার কাছে যেতে ভয় পায়, কারণ সে শুধুই তার বিলাস সঙ্গিনী। সে দিন সে হরসুন্দরীরই শরণাপন্ন হয়। এর থেকে বুঝি নিবারণের শৈলবালার প্রতি যে মনোভাব, তাকে পুরুষের নারীর প্রতি ভালোবাসাই বলা চলে না। সে শুধু একটা ক্ষণিকের বিলাস চঞ্চলতা মাত্র। মানুষ দুঃখের দিনে যার কাছে যেতে পারে সেই তো তার জীবন সঙ্গিনী। সেখানেই তো মানুষের আসল ভালোবাসা। কিন্তু মোহমুগ্ধ পুরুষ অনেক সময়েই বিলাসের ফাঁদে পা দেয়। সত্যকে ভুলে সে মায়াকে নিয়ে খুশী থাকে। অবশেষে এক দুর্দিনে তার চেতনা ফিরে আসে।

মানুষের ভালোবাসার প্রমাণ কোন্‌খানে এ কথা বলতে গিয়ে শরৎচন্দ্রও এই রকম কথাই বলেছেন। দর্পচূর্ণ গল্পে ধনীর মেয়ে তার স্বামীকে ছেড়ে চলে গেল তার বাপের বাড়ী। অবশেষে স্বামীর কাছে যে দিন সে ফিরে এল সে দিন সে তার ননদ-এর কাছে গেল। ইতিমধ্যে তার স্বামী দেনার দায়ে জেলে গিয়েছিল। অনেক দুঃখ দুর্দিন তার ওপরে এসেছিল কিন্তু স্ত্রীকে সে কোন কথা জানায় নি। ননদ যখন শুনল যে তার দাদার খবর কিছু জানে না, দাদা তাকে কিছু জানায়নি, তখন সে বৌকে বলল—দাদা যখন এমন বিপদের দিনেও তোমাকে খবর দেন নি, তখন তোমার আর সেখানে যাওয়া বৃথা। শরৎচন্দ্র বলতে চান, দুঃখের দিনে মানুষ যাকে ত্যাগ করে তার সঙ্গে তার আর মিলনের আশা দুরাশা। তাই শৈলবালার মত মেয়েরা পুরুষের জীবনে ক্ষণিকের দুঃস্বপ্ন মাত্র। হরসুন্দরীরাই আছে পুরুষের জীবন এবং সংসারের আসন সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে। এ গল্পে কবি উন্মত্ত পুরুষ

আর সেবাহীনা ভোগ সর্বস্ব নারী দুজনকেই সাবধান করেছেন। মনেহয় হরসুন্দরী শৈলকে সেবা করেই তার প্রতি সপত্নী জনোচিত প্রতিশোধ নিয়েছেন। তাকে সংসারের দায় সংসারের সেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেই তার জীবনকে ব্যর্থ করেছেন।

নারী প্রকৃতির নিদারুণ অভিমানের কথা কবি বলেছেন গল্পগুচ্ছের "শাস্তি" গল্পে। যেখানে তার ভালবাসা সেখানে তার অভিমান দারুণতম। দুখিরাম সারাদিনের ক্লান্তি, অপমান ও ক্ষুধার জ্বালায় ঘরে ফিরে এসে স্ত্রীর মুখে কটু কথা শুনে তাকে খুন করে ফেলল। ছোট ভাই ছিদাম ভাইকে বাঁচাবার জন্যে নিজের স্ত্রীকে বলল যে সে যেন বলে যে ঝগড়ার ফলে সেই খুন করেছে। সে ভরসা দিল মেয়ে মানুষ বলে সে ছাড়া পেয়ে যাবে। ছিদামের যুবতী স্ত্রী চন্দরা স্বামীর কথা শুনে বজ্রাহত হয়ে রইল। এই খুনের শাস্তি গ্রহণ করে সে আর একজনকে নিদারুণ অভিমানে, নিদারুণ শাস্তি দিতে দৃঢ় নিশ্চয় হল। তাকে উকিল, তার স্বামী ও ভাসুর যত রকমে বাঁচাবার চেষ্টা করল সে তাদের সব চেষ্টা প্রাণপণে ব্যর্থ করে দিল। ছিদাম চন্দরাকে ভালোবাসত, চন্দরাও তাকে ভালোবাসত। সেই ভালোবাসার প্রতি ছিদাম যে অপরাধ করেছে চন্দরা তার জন্যে তাকে নিষ্ঠুরতম শাস্তি দিল। পরে যখন চন্দরার ভাসুর ও ও তার স্বামী খুনের দায় নিজেদের ওপরে নিতে চাইল, তখনো চন্দরার সেই একই কথা যে খুন সেই করেছে। এই গল্পে কবি বর্ণনা দিয়েছেন চন্দরা আর ছিদামের মধ্যে ছিল একটা সদা শঙ্কিত ভালোবাসা। দুজনেরই মনে হত যেন "কখন হারাই"। চন্দরা যদি জানত যে ছিদাম তাকে ভালোবাসে না তাহলে এমন করে সে প্রাণ দিতে পারত না। কিন্তু সে জানে এই অন্যায় শাস্তি তার প্রাণে কতখানি বাজবে। তাই প্রণয়াস্পদকে সেই আঘাত হানতেই অভিমানিনী নারীর আনন্দ। ভালোবাসার এই অপরাধ সে কিছুতেই ক্ষমা করবে না এই তার দৃঢ় সঙ্কল্প। ফাঁসির আগে যখন কে এসে তাকে বলল যে তার স্বামী তাকে দেখতে চায় তখন সে "মরণ" বলে মুখ ফিরিয়ে নিল। শুধু বলল সে একবার তার মাকে দেখতে চায়। অনুতপ্ত স্বামীকে ক্ষমা চাইবার সুযোগও সে দেবে না এমনি ... নিদারুণ ... দিয়ে সে তার প্রাণে দাগা দিয়ে যাবে এই সে ঠিক করেছে।

কবি বলেছেন বীরের জন্যেই নারীর প্রতীক্ষা বীরের সঙ্গিনী হতে পেলেই তার জীবন সার্থক। নারীর প্রেম বীরেরই জন্যে। ইংরাজীতে আছে বীর ছাড়া আর কেউ নারীর যোগ্য নয়। সেইজন্যেই সব দেশেই প্রথা ছিল যে নারীর বরমাল্য পেতে হলে পুরুষকে বীর্য্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। হরধনু ভঙ্গ করতে পারলেই মিলবে সীতা, এই ছিল নিয়ম।

কবি লিখেছেন—

> কুমার তোমার প্রতীক্ষা করে নারী
> অভিষেক তরে এনেছে তীর্থবারি
> ... ...
> চাহে নারী তব রথ সঙ্গিনী হ'বে
> তোমার ধনুর তূণ চিহ্নিয়া লবে
> অবারিত পথে আছে আগ্রহভরে
> তব যাত্রায় আত্মদানের তরে
> গ্রহণ করিয়ো সম্মানে সমাদরে
> জাগ্রত করি রাখিয়ো শঙ্খ রবে।
>
> (কুমার—১৮ সঃ)

যদিও মনুর শাস্ত্রে আছে প্রজনার্থম্ মহাভাগা, অর্থাৎ সন্তানের জন্ম দেয় বলেই নারী মহীয়সী, কবি এখানে মনুর সঙ্গে একমত নন। কবি বলেছেন মাতৃত্বেই নারীর চরম সার্থকতা এটা ঠিক নয়। মেয়েরা মায়ের জাত এ কথা বলে গৌরব করবার কিছু নেই। মা তো পশুর মধ্যেও আছে।

[ক্রমশঃ]

শ্রেণীভুক্ত 'অপরাধী' ভূমিকায় বর্তমান সমাজ চিত্র

জয়শ্রী চক্রবর্তী

'Crime Does not Pay' একথা একজন অপরাধী জেনেও সে অপরাধ করে থাকে। সে মনে করে, এটা না করলে, এই পাশবিক প্রবৃত্তির তাড়না থেকে মুক্তি পেত না।

মানুষের বিভিন্ন রিপুর মত—পাপও একটি রিপু। বিভিন্ন ক্ষুধার মত—পাপও একটি বিশেষ ক্ষুধা। শারীরিক গ্রন্থির জটিল সংস্থাগুলি বা কেন্দ্রস্থলগুলি—(Main centre) একটি বিশেষ 'জান্তব' বিক্ষুব্ধ পিপাসায় পাশবিক সত্ত্বায়—পরিপূর্ণতা পায়। যার একমাত্র নিবৃত্তি আনে যে কোন অপরাধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

হিউম্যান সাইকোলজি বিশ্লেষণ করলে প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানের সূত্র পেতে পারি। মানসিক স্তরে প্রধানতঃ দুটি ভাগ পরিলক্ষিত হয়, অবচেতন ও চেতন। একটি অন্ধকার ও অপরটি আলো। নেপথ্য ও রঙ্গমঞ্চ। 'চেতন' মার্গে শুভবুদ্ধির শক্তিশালী রিপুগুলি অধিক পরিমাণে অবস্থিত। অবচেতন মার্গে—অশুভ সত্ত্বাগুলি ঘুমন্ত পর্য্যায়ে অবস্থান করে। এই অন্ধকার স্তরে= পাশবিক প্রবৃত্তি পরায়ণতা অজাগ্রত থাকার ফলে—এর প্রত্যক্ষ ভূমিকাও দুর্লভ!

কোন ভয়ঙ্কর বিপরীত ভুলের—পরিবেশের তীব্র সংঘাতে—তার মূর্ত প্রকাশ লাভ করে জঘন্য দৃশ্যের মাধ্যমে: এবং যে কোন ঘৃণ্য ঘটনার মাধ্যমেই—সেই প্রবৃত্তি তাড়নার মুক্তি লাভ ঘটে। পরে তার অনুশোচনীয় হৃদয় ধিক্কৃত হয়ে উঠলেও সে মনে করে—এই কাজের অনুষ্ঠানের মধ্যেই—তার একমাত্র নিবৃত্তি ঘটেছে, এবং শান্তি লাভ।

বর্তমান আধুনিক অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীরা—অপরাধী শ্রেণীকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম—জন্ম অপরাধী (Born Criminal) দ্বিতীয়—অভ্যাস অপরাধী (Habitual criminal) তৃতীয়—দৈব অপরাধী (Accidental Criminal)—যদিও বর্তমান বিজ্ঞান সমীক্ষকেরা—কেউ কেউ Born Criminal দের অস্তিত্বকে বিশ্বাস করেন না। তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বলতে চেয়েছেন অসুস্থ পরিবেশই দায়ী এসব ক্ষেত্রে। যে মানুষ কখনো অপরাধ করেনি—বা তার দ্বারা কোন জঘন্য অপরাধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হতে পারে, এটা যেমন তার কল্পনাতীত—ঠিক সেই রকম মানুষই—সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিকে এমন একটি ঘৃণ্য অপরাধ করে ফেলতে পারে—যার কোন বিশ্লেষণ হয়না।

অবশ্য এই শ্রেণীর অপরাধীরা 'দৈব অপরাধীদের' মধ্যে পড়ে। এবং এর সংখ্যাও অতি বিরল। বর্তমান সমাজে—আমরা যে শ্রেণীর অপরাধীদের 'হার' দেখতে পাচ্ছি—তারা দৈবও নয়—অভ্যাস অপরাধীও নয়—জন্ম অপরাধীও নয়।

বিশ শতকের ভয়াবহ দারিদ্র্য ও ক্ষুধার তাড়নায়—এক শ্রেণীর উন্মাদ অপরাধীদের আধিক্য আমরা প্রবল পরিমাণে দেখতে পাচ্ছি। যে কোন উপায়ে রক্তপাত ঘটানোই তাদের একমাত্র আনন্দ। যদিও এরা শোণিতাক্ত অপরাধী শ্রেণীভুক্ত নয় তবু এক রক্তাক্ত উন্মাদনা নিয়ে এদের আত্মোল্লাস করতে দেখা যাচ্ছে।

'জীবন যন্ত্রণার' তীব্র লাঞ্ছনায়—এরা আত্মনাশা এক ধরণেরবিপ্লবী। সমস্ত সমাজকে ধ্বংস ও মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাবার তাড়নায় এরা বিক্ষুব্ধ। এরা সব কিছুকে নিশ্চিহ্ন করে—আর একটা পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে। যদিও এই ধরনের অপরাধী শ্রেণীরা রাজনীতির নেপথ্যে সৃষ্টি হচ্ছে—তথাপি আজ এর বিস্তৃত ব্যাপকতা—শুধু মাত্র কোন কক্ষ ভুক্ত নয়। সর্বশ্রেণীর মধ্যে—সর্বস্তরে—এর—সমৃদ্ধি সাধন চলেছে।

আজ শিশু-নারী আবাল বৃদ্ধ বনিতা সর্বস্তরে—আজ এক ভয়াবহ অপরাধের আগুনে জ্বলছে। বর্তমান সমস্যা ক্লিষ্ট সমাজ জীবনের—ভয়াবহ ভাঙনের স্রোত—সমস্ত মানুষকে যেন ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে—দুর্নীতির দিকে, আজকের জীবন যাত্রার স্বাভাবিকত্ব নষ্ট হয়েছে। সকলের সামনে বাঁচার প্রশ্নটাও মিথ্যার রূপ নিয়েছে।

অস্বাভাবিক এক জীবন যন্ত্রণার তাড়না কতকটা 'ক্ষ্যাপাপাগলের' মত করে তুলছে—বর্তমান অপরাধী মানুষদের। আজকের অপরাধ পর্ব চলেছে—অধিকাংশ শিক্ষিত সম্প্রদায়ে। বর্তমান যুগের শিক্ষিত বেকার 'যুব সম্প্রদায়' কি ধরনের অপরাধ করে চলেছে—সে সব ভাবলে আমাদের শিহরিত হতে হয়। চুরি ছিনতাই—খুন ডাকাতী নারী. অপহরণ থেকে সুরু করে—কোন কাজই তারা অসাধ্য বলে ভাবেনা।

এরা এখন অভ্যাস অপরাধীদের—পর্যায়ে পড়ে গেছে। প্রাত্যাহিক জীবনের সব কাজের মত এই অপরাধ কর্মও তাদের দৈনন্দিন তালিকাভুক্ত। সমস্ত দেশটা এই ধরণের ব্যাধিগ্রস্ত অপরাধ তাড়নায় ভরে গেছে। কাজেই বর্তমান যুগে-- বিশেষ শ্রেণীর কোন অপরাধী কুল নেই।

সমস্ত সমাজের প্রকৃত চরিত্রটাই—আজ আমূল পরিবর্তিত হওয়ার প্রয়োজন। জানিনা, এই প্রত্যহের নিষ্ঠুর ধ্বংস—রক্তপাত—মৃত্যু—'নতুন সমাজের' জন্ম দেবে কিনা। সমাজের সর্বস্তরের অপরাধীকে কোন পুলিশী জুলুম দিয়ে বা আইনের অনুশাসন দিয়ে প্রতিরোধ করা যাবে না।

প্রথম চাই অর্থনৈতিক সবলতা—বেকার যুব সম্প্রদায়কে 'অলস শয়তানী' জীবন থেকে মুক্তি দেওয়া, তাদের যে কোন উপায়ে কর্মে নিয়োগ করা। যুব সম্প্রদায় চায়—হয় সৃষ্টি নয় ধ্বংস। তাদের এই যুব শক্তির গতি-চঞ্চল মানসিকতার বিকৃতি থেকে—মুক্তি দিয়ে—সৃষ্টির কাজে মাতিয়ে তোলা হোক—এই কামনা করি—বর্তমান রাষ্ট্রাধিনায়কদের কাছে।

———
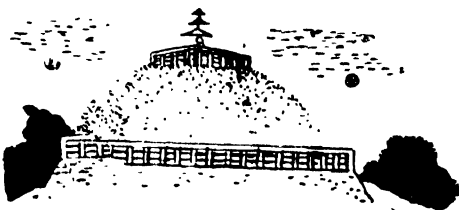
সুপর্ণা দেবী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গতবারের আলোচনার জের টেনে এবারেও হদিশ দিই, মেয়েদের দৈহিক-গঠন, রূপ-লাবণ্য এবং তলপেটের স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য বজায় রাখার উপযোগী তৃতীয় ব্যায়াম-ভঙ্গীর বিষয়ে।

৩। ব্যায়াম-ভঙ্গী অনুশীলনের মোটামুটি পদ্ধতি হলো—সমতল মেঝে অথবা শয্যায় দেহটিকে সটান ও সুপ্রসারিত করে শুয়ে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করে তলপেটের ওপর রাখবেন। এবারে হাঁটু না মুড়ে ডান-পা সরাসরি-ভাবে ঊর্দ্ধে তুলে বাঁ-দিকের কাঁধ লক্ষ্য করে লাথি-মারার ভঙ্গীতে দ্রুততালে ডানদিকে ছুড়বেন। তবে খেয়াল রাখবেন—এভাবে ডান-পা ছুঁড়বার সময়, বাঁ-পা যেন মেঝে অথবা শয্যার উপর সিধা-সটানভাবে ছুঁয়ে থাকে।

এমনিভাবে পাঁচ-ছয়বার ডান-পা ছুঁড়বার পর, ডান-পা মেঝেতে নামিয়ে রেখে অনুরূপ-পদ্ধতিতে বাঁ-পা ঊর্দ্ধে তুলে ডান-কাঁধ লক্ষ্য করে দ্রুততালে লাথি-মারার ভঙ্গী অভ্যাস করবেন। এভাবে ব্যায়াম-অভ্যাসকালে ডান-পা যেন সটান সিধাভাবে মেঝে অথবা শয্যায় সুপ্রসারিত থাকে, সেদিকে নজর রাখবেন। ডান-পায়ের মতোই বাঁ-পায়ের ক্রিয়া-কলাপটুকুও নিত্যনিয়মিত ভাবে অন্ততঃ-পক্ষে পাঁচ-ছয়বার অভ্যাস করবেন। এই ব্যায়াম-ভঙ্গীটি অভ্যাসকালে আরেকটি দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। সেটি হলো—লাথি-মারার ভঙ্গীতে লাথি ছোড়বার সময়, পা যতখানি ঊর্দ্ধে তুলতে পারেন, চেষ্টা করবেন।

মেয়েদের তলপেটের গঠন সৌষ্ঠব সুস্থ ও দীর্ঘস্থায়ী

রাখার উপযোগী চতুর্থ ব্যায়াম-ভঙ্গীটি হলো—উপরোক্ত তৃতীয়-প্রণালীরই অনুরূপ। তবে এ ভঙ্গীটিকে তৃতীয়-প্রণালীর মতো দুই হাত তলপেটের উপর মুষ্টিবদ্ধ করে না রেখে, দেহের দুই পাশে প্রসারিত রাখবেন। উপরের তৃতীয় ব্যায়াম-ভঙ্গীর মতো চতুর্থ-ভঙ্গীটিও নিত্য নিয়মিত-ভাবে অন্ততঃপক্ষে দশ-পনেরোবার অভ্যাস করতে হবে।

পঞ্চম ব্যায়াম-ভঙ্গী অনুশীলনের মোটামুটি পদ্ধতি হলো—সমতল মেঝে অথবা শয্যায় চিৎ হয়ে শুয়ে, কোমরের দুই পাশে 'বস্তীদেশে' (Buttocks) দুই হাত রেখে, কেবলমাত্র মাথা ও কাঁধের উপর দেহভার ন্যস্ত করে, বুক থেকে পায়ের ডগা পর্য্যন্ত অংশ ঊর্দ্ধে তুলে সাইকেলের পাদানী বা Paddle চালানোর ভঙ্গীতে কিছুক্ষণ ক্রমান্বয়ে দ্রুতগতিতে দুইপা নাড়িয়ে যাবেন। নিত্যনিয়মিত ভাবে এ ব্যায়াম-রীতি অনুশীলনের ফলে, তলপেটের পেশী, অন্ত্রনালী ও রক্ত-চলাচল ব্যবস্থা সুস্থ-সজীব থাকবে দীর্ঘকাল। এ ব্যায়াম ভঙ্গীটি প্রত্যহ অন্ততঃপক্ষে পাঁচ-সাত মিনিটকাল নিয়মিত ভাবে অভ্যাস করা চাই।

মেয়েদের তলপেটের গঠন-শোভা সুন্দর ও সুস্থ-স্বাভাবিক রাখার উপযোগী ষষ্ঠ ব্যায়াম-ভঙ্গী হলো—সমতল মেঝে কিম্বা শয্যার উপরে নতজানুভাবে ভূমিষ্ঠ-প্রণামের মতো দেহাবস্থান করে ধীরে ধীরে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে—কয়েকবার 'ডন্' ফেলবেন। এভাবে 'ডন' ফেলবার সময় বুক ঠেকবে হাতে এবং চিবুক ঠেকবে মেঝে অথবা শয্যায়—এদিক লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এই ব্যায়াম-ভঙ্গীটিও নিত্য নিয়মিতভাবে অন্ততঃপক্ষে আট-দশবার অভ্যাস করলে অচিরেই যথেষ্ট উপকার পাবেন।

সপ্তম ব্যায়াম-ভঙ্গী অনুশীলনের রীতি হলো—সমতল মেঝে কিম্বা শয্যায় সটান সিধাভাবে দেহ ন্যস্ত করে, দুই পা উর্দ্ধে তুলে ঘরের দেয়ালের গায়ে পায়ের পাতায় ভর রেখে যেন দেয়াল বহে উপরে উঠছেন—এমনভাবে দুই পদতল উপর-নীচে চালনা করতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখবেন—দুই পদতল যখন দেয়াল বহে উপরের দিকে ওঠাবেন, তখন জঘনদেশও সমতল মেঝে বা শয্যার স্পর্শ ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে যেন উত্তোলিত হয় এবং কোমর থেকে মাথা পর্য্যন্ত দেহভাগ যেন সুদৃঢ়-সিধাভাবে রাখা থাকে। এ ব্যায়াম-ভঙ্গী অভ্যাসকালে দুই হাত দেহের দুইপাশে সটান-সিধাভাবে প্রসারিত করে রাখবেন। অন্য ব্যায়াম-ভঙ্গীগুলির মতো, এ ব্যায়াম ভঙ্গীটিও প্রত্যহ নিয়মিতভাবে অন্ততঃপক্ষে পাঁচ-সাত মিনিট অভ্যাস করা দরকার।

এই সব ব্যায়াম-ভঙ্গী নিয়মিত-অনুশীলনের ফলে, দেহ সুঠাম এবং তলপেটের স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য দীর্ঘস্থায়ী হবে।

আগামী সংখ্যায় দৈহিক স্বাস্থ্যোন্নতির উপযোগী অন্যান্য প্রসঙ্গের আলোচনা করবার বাসনা রইলো।

[ক্রমশঃ]

শিশুদের পশমী কোট

শোভনা দেবী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গত সংখ্যায় প্রকাশিত আলোচনার রেশ টেনে শিশুদের পশমী কোট বোনার বাকী হদিশটুকু দেওয়া হলো।
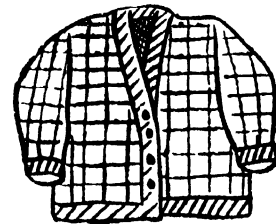
উপরের ছবিতে দেখানো নমুনাতে শিশুদের পশমী-কোট রচনায় সামনের দিকের বাকী অংশটুকু বোনবার পদ্ধতি হলো—

৪৯ লাইন বোনবার পর, এবারে ২" ইঞ্চি বুনবেন ১কাঁটা সোজা, ১ কাঁটা উল্টো ধরণে। কিম্বা আরেক ধরণেও বুনতে পারেন। সে ধরণটি হলো—নীচের দিক থেকে ৬½" ইঞ্চি বুনে সোজা কাঁটায় শেষ করবেন। বোনার সুরুতেই ১ জোড়া। পশমী কোটের সামনের, অর্থাৎ, বুকের দিক বোনা যাবে এই উপায়ে এবং প্রত্যেক পঞ্চম লাইনে ১ জোড়া বুনে যাবার পর ঘর কমাবেন। এমনি-ভাবে নীচের দিক থেকে ৮" ইঞ্চি অংশ বোনা হলে, কোটের বগলের ছাঁট সুরু করবেন। সোজা কাঁটায় বোন-বার গোড়াতেই ৪ ঘর বন্ধ করতে হবে। তারপর সোজা বোনার প্রত্যেক ২য় লাইনে ৪ বার একটি করে ঘর বন্ধ করবেন।

এবারে পশমী কোটের বুকের দিকে ঘর কমিয়ে কাঁটায় ২১ ঘর থাকা পর্য্যন্ত ১ কাঁটা সোজা, ১ কাঁটা উল্টো বুনে যাবেন এবং জামার বগলের অংশ ৩" ইঞ্চি হয়ে গেলে, সোজা কাঁটায় বোনা শেষ করে কোটের বাঁ দিকের কাঁধের অংশ বুনবেন নিম্নোল্লিখিত পদ্ধতিতে।

প্রথম লাইন—উল্টো ৭, ঘুরিয়ে নিয়ে সোজা ১৪। ঘুরিয়ে নিয়ে বোনার কাজ করবেন কাঁটায় প্রথম ঘর তুলে।

দ্বিতীয় লাইন—উল্টো ৭, সোজা ৭।

তৃতীয় লাইন—সব উল্টো। অতঃপর সোজা কাঁটায় সব ঘর বন্ধ করবেন।

এবারে ডানদিকের কাঁধের অংশ বোনবার পালা।

ডান কাঁধের অংশ রচনা করবেন বাঁ দিকে যেমন বুনেছেন, ঠিক তেমনি পদ্ধতিতে। কেবল খেয়াল রাখবেন যে সোজা কাঁটায় বুকের দিক এবং উল্টো কাঁটায় বগলের দিক রচনা করতে হবে।

এবারে সুরু করবেন—কোটের হাতা রচনার কাজ। একাজের সময়—কাঁটায় ২৬ ঘর তুলতে হবে। সোজা ১ লাইন বুনে, ১ কাঁটা সোজা, ১ কাঁটা উল্টো বুনবেন। প্রত্যেক কাঁটায় ২টি করে ঘর বাড়াবেন। কাঁটায় মোট ৫০ ঘর হবে।

৯৩ লাইন বুনবেন। এবারে প্রত্যেক ১৪ লাইনে কাঁটার দুই পাশে ২টি করে ঘর কমাবেন, কাঁটায় ৪৪ ঘর হবে। অতঃপর, কোন ছাঁট না দিয়ে গোড়া থেকে ৮" ইঞ্চি বুনবেন এবং উল্টো কাঁটায় শেষ করবেন।

পরবর্ত্তী লাইন বুনবেন—* সোজা ৩, জোড়া ১। * চিহ্নিত থেকে বুনে যাবেন। কাঁটার শেষে ৪ ঘর রাখবেন। সোজা ৪।

এবারে কাঁটায় ৩৬ ঘর বুনবেন। ২ সোজা, ২ উল্টো এমনিভাবে ১½" ইঞ্চি অংশ বুনবেন। উল্টো কাঁটায় সুরু করে ১ কাঁটা সোজা ১" ইঞ্চি বুনতে হবে।

তারপর পিছনের দিকে নীচের অংশে বোনা ৬ লাইন 'প্যাটার্ণ' বুনবেন এবং ঢিলাভাবে ঘর বন্ধ করবেন।

এ কাজের পর, বোতামের পটি রচনার পালা।

বোতামের পটি রচনাকালে—১০ ঘর কাঁটায় তুলতে হবে। পিছনের দিকে নীচের অংশের মতোই 'প্যাটার্ণ' তুলবেন। তারপর কোন ছাঁট না দিয়ে ১¾" ইঞ্চি বুনবেন। এবারে বোতামের ঘর তুলুন নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে:

৪ ঘর বুনে, ২ ঘর বন্ধ করুন এবং পরের ৪ ঘর বুনুন।

৪ ঘর বুনে, ২ ঘর কাঁটায় তুলুন এবং পরের ৪ ঘর বুনুন।

* * তারপর ১½" ইঞ্চি প্যাটার্ণ বুনবেন ও দ্বিতীয় বোতামের ঘরটি রচনা করবেন। * পশমী কোটের চারটি বোতামের ঘর রচনা না হওয়া পর্য্যন্ত * * চিহ্নিত অংশ থেকে বুনে যাবেন। তারপর পশমী-কোটের গলা এবং বাঁ দিকের সমান অংশ পর্যন্ত বাকী সবটুকু অংশেই একই ধরণে বুনে যাবেন। তাহলেই জামার বোতামের পটি রচনার কাজ শেষ হবে।

এবারে সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে পশমী কোটের সঙ্গে বোতামের পটির অংশটিকে জোড়া লাগিয়ে দিন এবং সূচ-সুতোর সাহায্যে মানানসই-ছাঁদের ৪টি বোতাম টেঁকে দিন যথাস্থানে।

তাহলেই পরিপাটি ছাঁদে শিশুদের পশমী-কোট রচনার কাজ সমাপ্ত হবে।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বষ্টন

অতি ভোরে ওয়াই এম সি এ থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি ধরে টোরণ্টোর বিমান বন্দরের দিকে চললাম। প্রথমেই নবনির্মিত গার্ডিনার এক্সপ্রেসওয়ে ও কুইন এলিজাবেথওয়ে ধ'রে পশ্চিম মুখে গিয়ে ২৭নং জাতীয় সরণিতে পাক দিয়ে উঠে মাইল চারেক উত্তর'দিকে যাবার 'পর ম্যাকডোনল্ড কার্টার এক্সপ্রেসওয়ের সংগমে বাঁ দিকে ঘুরে টোরণ্টোর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এলাম। এটাকে মলটন (Malton) বিমান বন্দরও বলা হয়। এখানে রয়াল ক্যানেডিয়ান বিমান বহরের জন্য ডাউনস্ ভিউ (Downs View) বিমান বন্দর ব'লে আর একটী বিমান বন্দর প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে তৈরী হয়েছে। 'মোহক বিমানের' ১৮২ নং ফ্লাইটে আমার যাত্রা সুরু হ'ল। তখন বেলা ন'টা। বষ্টনে পৌছবে পোনে একটা নাগাদ। এ বিমান-গুলি ধুম্রপুচ্ছ নয়, পাখা ঘোরা। ফলে এর গতি কিছু মন্থর। আবার বোষ্টন যেতে আরও তিন জায়গায় থামবে। এই বিমানগুলিকে রেলের প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। টোরণ্টো থেকে ছেড়ে প্রথমে রচেষ্টার, পরে সিরাকিউজ ও আলবাণীতে এসে থামলো। আলবাণী হ'ল নিউইয়র্ক রাষ্ট্রের রাজধানী। এখানের বাসিন্দাদের পেসা হ'ল, সরকারী কাজ। রাষ্ট্রের শাসনকার্য্য এখান থেকেই পরিচালনা করা হয়। এবার এখানে নামার সুযোগ ছিল না। তাই বিমানে ক'রে ওঠা ও নামার সময় সহরের বহিরাবরণ শুধু শ্যেন দৃষ্টি দিয়ে চকিতের জন্য দেখতে পেলাম। ওঠা ও নামায় যথেষ্ট সময় নষ্ট, মালপত্র ও যাত্রী ওঠা নামাতেতো আছেই, বেলা প্রায় পোনে একটা নাগাদ নৌ বন্দরের সংলগ্ন বষ্টনের আন্তর্জাতিক 'লোগান' বিমান বন্দরে নামলাম।

আমায় নেবার জন্য 'মেটকাফ্ এণ্ড এডী'র 'জন পজার' ও আমার দুজন তরুণ সহকর্মী 'অজিত ভুঁইয়া' ও 'গৌরাঙ্গ আগরওয়ালা' (যাঁরা W.H.O. বৃত্তি নিয়ে বষ্টনে কাজ করছেন) অপেক্ষা করছিলেন। ভুঁইয়া মাথায় অত ছোট হ'লে কি হয় অসীম শক্তি ধরে সে। আমার ভারী ব্যাগটা অনায়াসে ব'য়ে নিয়ে গাড়ীতে চললো। আমায় ওরা হ'তে কিছু বইতে দেবে না। পজারের গাড়ীতে চ'ড়ে আমায় বষ্টনের YMCA তে নিয়ে যাবে কেননা স্ট্যাটলার হোটেলে ভিড়ের জন্য জায়গা হ'য়নি। স্ট্যাটলার হোটেলে হ'লে ভাল হ'ত কেননা এ বাড়ীটাতেই কয়েকটী তলা নিয়ে 'মেটকাফ এণ্ড এডী'র অফিস। যাই হ'ক গাড়ীতে 'পজার' বল্ল যে আমাদের অবসর প্রাপ্ত ডিরেক্টর 'শারমাণ চেস্' আমায় দুপুরে সর্ব্বোচ্চতল 'প্রুডেনসিয়াল বীমা' কোম্পানীর বাড়ীর এঞ্জিনিয়ারস্ ক্লাবে মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য নিয়ে যাবেন। বয়স আশী হ'লে কি হয় কর্মিষ্ঠতা কিছু কমে নি। তাই আমরা আমার মালপত্র নিয়ে প্রথমে 'মেটকাফ এণ্ড এডী'র অফিসে উঠলাম। এই বাড়ীতেই আঠারো বছর আগে প্রৌঢ় শারমাণ চেজের সঙ্গে আলাপ হ'য়েছিল। আবার সে আলাপের পুনরভ্যুত্থান হ'ল। চেস্ সাহেব এখন কচিৎ কদাচিৎ অফিসে আসেন। পজার, আমি ও শারমাণ চেস্ একখানি ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে আহারের জন্য প্রুডেনসিয়াল জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানের বাড়ীর দিকে এগিয়ে চললাম। এর গঠনপর্ব শেষ হলে এটী

বষ্টনের দীর্ঘতম ও বৃহত্তম বাড়ী হবে। এ বাড়ীর উপর থেকে সারা বষ্টনের বৈমানিক দৃশ্য দেখা যায়। দূরে বষ্টন বন্দরে 'চার্লস্', 'চেলসী' ও 'মিষ্টিক' (Mystic) নদী এসে পড়েছে, উত্তরপূর্ব দিকে 'বষ্টন কমন' (Boston Common) এর উদ্যান। তার আরও একটু তফাতে পৌরসংস্থার ও কমনওয়েলথ অব ম্যাসাচুসেটের সোনালি গম্বুজ দেওয়া বাড়ী। আরও দূরে 'বষ্টন বন্দর' ও 'লোগান বিমান বন্দর'। উত্তর পশ্চিমে M. I. T এর বহু বাড়ী।

আহারের পর বষ্টনের দৃশ্য দেখলা দেখে নেমে এলাম মাটিতে। চেস্ সাহেব চলে গেলেন আপন বাড়ীতে। 'পজার' আমায় ফিরিয়ে নিয়ে এল অফিসে। ছুটীর পর অফিসের গাড়ীতে আমার মাল বষ্টনের YMCAতে পৌঁছে দিয়ে ষ্টেশনে গেলাম। ষ্টেশন থেকে ট্রেণে প্রায় তিন কোয়াটার ঘণ্টা যাবার পর এলাম তার বাড়ী যাবার রেলষ্টেশনে। এখানে মোটরের চেয়ে ট্রেণ বেশী চলা-ফেরা করে। পজারের স্ত্রী, আইরিণের গাড়ী নিয়ে ষ্টেশনে আসার কথা ছিল। সে কিন্তু আসেনি বিশেষ কারণে আটকা পড়ে। ষ্টেশনে ট্যাক্সি পাওয়া দুর্লভ কেননা সবায়েরই তো মোটর আছে। অতএব পদব্রজেই আমরা দুজনে যাত্রা করলাম। হাতে আমার বেশ ভারী ব্রীফকেস্। পায়ে ব্যথার জন্য হাঁটতে আমার সামান্য অসুবিধে হ'চ্ছিল। পথে এক বন্ধু লিফ্‌ট্ দিলেন। অবশেষে অল্প সময়ের মধ্যেই পজারের বাড়ীতে পৌঁছে গেলাম। গৃহিণী আইরিণ ও চার কন্যাকে আবার দেখতে পেলাম। দেশে ফেরার আগে এরা সবাই এসেছিল আমাদের বাড়ীতে বিদায়-ভোজে। সারা সন্ধ্যাবেলা ওদের বাড়ীতে কাটিয়ে ফিরলাম হোটেলে। শ্রীভূঁইয়াকে বলেছিলাম দেখা করতে। রাত সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত সে বেচারী আমার জন্য অকারণ অপেক্ষা ক'রে ফিরে গিয়েছে তার বাসায়।

পরের দিন সকালে অফিস যাবার আগে (দুজনই) এসে হাজির। আমায় নিয়ে যাবে অফিসে। অফিসে সময়ের কয়েক মিনিট আগে এলাম। এদের সওয়া আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত অফিস্। রাতের বেলা পজার নেমন্তন্ন করেছে। ওদের বাড়ী থেকে ৪ নম্বর জাহাজ বাঁধার Pier উপরকার হোটেলে নেমন্তন্নয় নিয়ে যাবে। সারা Pier গাড়ীতে ভ'রে গেছে। কর্মকর্তারা বললেন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আরও দেড় ঘণ্টা। আর অপেক্ষা করতে আমি খাওয়ার সময় রাজী নই। অতএব যাওয়া যাক্ অন্য জায়গায়, যেখানে Seafood ভাল পাওয়া যায়। কাছেই Yankee fisher's inn' এ রাতের আহার করতে গেলাম। বিরাট রাজ কাঁকড়ার ঠ্যাং (King Crab) নিয়ে জানলার ধারে বন্দরের জলের ওপর ব'সে রাতের আহার সারলাম। রাজ কাঁকড়া আলাস্কা অঞ্চলে প্রচুর পাওয়া যায়। দেহের ব্যাস প্রায় এক হাত।

বুধবার সকালে ঠিক ছিল যে Metca f and Eddy এর বয়োবৃদ্ধ মালিক H. P. Eddy এর সঙ্গে দেখা করব। সময়মত পজার (Podger) আমায় নিয়ে গেল তাঁর ঘরে। কোথায় কত রকম কাজ এঁরা করছেন জানতে চাওয়ায় তার একটা নাতিদীর্ঘ বৃত্তান্ত ভদ্রলোক ব'লে গেলেন। ওঁদের অফিসে নাকি শ' পাঁচেক লোক কাজ করে। কথায় কথায় বললাম যে বিদেশে ওদের প্রসিদ্ধির মূল কারণ মুখ্যত: তিনখণ্ড'American Seawerage Practice বই রচনার জন্য। সাধারণতঃ পাঠ্যপুস্তকের আয়ু দীর্ঘস্থায়ী হয়না। এদের বইখানার আয়ু পঞ্চাশ বছর পার হ'য়ে গিয়েছে তবু আজও তার ব্যবহারিকতা ব্যাহত হয়নি। জিগ্যেস করলাম 'এটা পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত করছেন না কেন ?'

"—চেষ্টার ত্রুটিকরিনি মিঃ চ্যাটার্জি। তবে সম্পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ছে না। প্রথমে M, I, T, এর একজন অধ্যাপককে বলা হয়েছিল যে তিনি এটিকে বর্তমান যুগোপযোগী করে দিন। তিনি ছুটীতে কাগজ পত্র নিয়ে গেলেন নিজেদের কটেজ হাউসে। কিন্তু পর্বতের বদলে মূষিক প্রসব করলে। অর্থাৎ একটা অধ্যায় কোনগতিকে লিখলেন তিনি।"

তারপর কি হ'ল ?—"আমাদের একজন কর্মী মোটর accident এ আহাত হ'য়ে পড়লেন। পা খোঁড়া হ'য়ে হাঁসপাতালে থাকলেন। অতএব অবসর প্রচুর। এই অবকাশে তাঁকে এ ভার দেওয়া হ'ল। কোন বিশেষ তেমন ফল হ'ল না। বিপদ এই যে এমন একখানা বই হওয়া উচিত সংশোধনের পর যা' বর্তমানে চালু বই এর

চেয়ে উন্নত মানের হবে। এই দেখছ আমার পেছনে থামে থামে ভরা মাল ঐ তাকে রাখা রয়েছে। শীঘ্রই আমাদের এক মিটিং হবে, যাতে অধ্যায়ের পর অধ্যায় নিয়ে আলোচনা হ'য়ে বই ছাপাবার বন্দোবস্ত হবে। আমাদের তিন খণ্ডের বইটার এটা নতুন সংস্করণ নয় আমাদের Condensed বইখানার নতুন সংস্করণ তৈরি হচ্ছে।

আমি বললাম—তা'হ'লে কাজ বেশ এগু'চ্ছে? বলুন তো প্রথমে বইখানা লিখেছিলেন কে? তখন কোম্পানীতে ক'জন লোক ছিল?

—আমার বাবা। ছ'জন মাত্র লোক নিয়ে কাজ শুরু করেন। Metcalf সাহেবও ছিলেন তবে Eddy কেই বিশেষ অংশে রচনার কাজ করতে হয়েছিল। লিওনার্ড মেটকাফ ছিলেন Structural Engineer, আর বাবা ছিলেন রসায়নবিদ্। আসলে ১৮৯৭ সালে সুরু তবে ১৯০৭ সালে বাবা যোগ দেন তখন নাম হয় মেটকাফ এণ্ড এডী।

—১৯১১-১২ সালের প্রথমে ছাপা হ'লে নিশ্চয়ই দু'তিন বছর লেগেছিল লিখে তৈয়ারী করতে?

এডি সাহেব বললেন—'১৯০৭ সালে এটীর লেখা শুরু হয়—

—তার মানে যত সব নক্সা এতে সন্নিবিষ্ট আছে তখন সে সব কাজ M and E করেনি। অর্থাৎ অন্য যেখানে কাজ হয়েছিল সেইখান থেকে সংগ্রহ করতে হয়েছিল নিশ্চয়—

—তা'তো বটেই—

এইরকম আলাপ আলোচনা চলেছে।

ওদের কতগুলো Company আছে জানতে চাওয়ায় তিনি বললেন—Metcalf & Eddy

Boston, Newyork, Paloalto ও

• San Fransisco

Metcalf & Eddy, Inc,

Boston,

Metcalf and Eddy, Ltd,

Boston, Trinidad,

Teheran Boston Engineers,

27, Vessal Shirazi Ave, Tehran (Iran)

বোম্বাইয়েও একটা উপ অফিস আছে।

আমরা ইরাকেও এক ভদ্রলোকের সাথে অংশীদার হিসাবে কাজ করছি। তাঁর নামে তিনি আমায় একটা চিঠি দিলেন, আমি ইরাকে যাব শুনে। বষ্টনের অফিসে নানা বিভাগ—সবচেয়ে বেশী লোক কাজ করে সিভিল ডিপার্ট-মেণ্টে। এ ছাড়া রয়েছে মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল ষ্ট্রাক্চারাল, আর্কিটেকচার, ইনষ্ট্রুমেনটেশন প্রভৃতি। এঁরা একদিকে পানীয় জল বিশুদ্ধিকরণ, ময়লা জল পরিশোধন, শিল্পের পরিত্যক্ত পদার্থ শোধন, আবর্জনা দাহন। অন্য-দিকে সমীক্ষা, সম্ভবতার প্রতিবেদ, মাষ্টার প্ল্যান প্রস্তুত, নক্সা প্রস্তুত, প্রতি বন্ধ তৈরি, গভীর ভিত্তি সুড়ঙ্গ, সামরিক আবাস, সেতু নির্মাণ, বন্যা প্রতিরোধ ব্যবস্থা, বিমানক্ষেত্র, রাস্তা নির্মাণ, বন্দর নির্মাণ বিষয় পরিকল্পনা প্রস্তুত ও পরিদর্শন প্রভৃতি কাজ করেন। এঁদের আদি কর্মক্ষেত্র থেকে এঁরা আরও নিজেদের সম্প্রসারিত করেছেন।

আমি জিগ্যেস করলাম ওতো টেক্নিক্যাল কথা হ'ল এখন এমন একটা আপনার জীবনের সবিশেষ ঘটনা বলুন যেটা আজও আপনি ভুলতে পারেননি।

তখন "এডি" সাহেব বললেন—আমায় ভাবিয়েছ তুমি। আমি এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। একটু সময় আমায় দিতে হবে।

—নিশ্চয়ই। বিশেষ ব্যস্ততাই বা কি আছে? এডী সাহেব সুরু করলেন "তবে বলি শোন—একদিন মহা-যুদ্ধের সদ্য পরেই U S Army (Corps of Engineers) এর Engineer in-chief টেলিফোন করছেন আমাদের অফিসে এই বলে যে খুব শীঘ্রই এমন একরকম বাড়ীর design করে দিতে হবে যার গর্ভ ও অংশ একজন লোক সহজে ব'য়ে নিজে নিয়ে যেতে পারে এবং যা উত্তর মেরুর শীত প্রতিরোধও করতে পারে। চেস্ সাহেব টেলিফোন ধরেছিলেন, তিনি বলেছিলেন Engineer in chief কে—

—আমরা ত এসব করি না।

—আপনাদের মধ্যে অন্য যাঁরা করেন তাঁদের বলুন।

তবু নাছোড়বান্দা তিনি।

অনুরোধ ক'রে বলেন 'চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই তোমরা পারবে'। তবুও চেস্ সাহেব জিনিসটা এড়াবার জন্য কাজ

নিতে রাজী হচ্ছিলেন না।

তারপর Engineer-in-chiefকে বললেন তুমি একটু ধর। আমি আমাদের এডি সাহেবের সাথে তোমায় কথা বলতে দিই, সে কি বলে দেখা যাক।'

এডি সাহেব 'শারমান চেসে'র সাথে Engineer-in-Chiefএর যে কি কথা হয়েছে তা জানতেন না। তাই তিনি Engineer-in-Chief-এর বিশেষ অনুরোধ এড়াতে পারলেন না এবং কাজ যে করে দেবেন তাও বললেন।

সেই কাজে আমরা লেগে গেলাম Greenland-এর উত্তরে—৭০ ° C temp। অর্থাৎ বরফ জমার তাপমানের ৭০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড নীচে। সেখানে নিয়ে যেতে হবে ঘরের অংশ কেন না সেখানে কাঠ, লোহা, সিমেন্ট বা কোন গঠন উপাদান পাওয়া যায় না। হাত চামড়ার দস্তানার মধ্যে থাকবে। শীতে হাত বের করা যাবে না—নাক, কান শীতে জমে যায়। সেখানে গিয়ে panel এর বাড়ী তৈয়ারী করে দিয়ে এলাম। panel আঁটার সময় এমন এক দমকা হাওয়া এল যে সেই হাওয়াতে একজন কর্মীকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে বরফের উপর ফেলে দিলে। তুষার (Snow) বলেই সে যাত্রায় সে রক্ষা পেয়ে গেল—নাহ'লে বেজায় বিপদ হোত। ঐ Greenland-এ আমি বারকয়েক গিয়েছিলেন। নূতন কাজ হ'লে আমার উদ্যম বেড়ে যায়। মাঝে মাঝে এখানে ঘণ্টায় ১৫০ মাইল বেগে হাওয়া বয়। শীতকালে ঘন অন্ধকার। এখানে আমরা ১৯৫০ সালের ডিসেম্বরে অর্ডার পাই ও ১৯৫১ সালের অক্টোবরে কাজ শেষ ক'রেছি। এটা গ্রীনল্যাণ্ডের Thule বোমারু বিমানক্ষেত্রে।

বষ্টনের কথায় প্রথম মনে পড়ে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা করবার কয়েক বছর আগে বষ্টন বন্দরে ভারতীয় চা বন্দরের জলে ডুবিয়ে দেবার কাহিনী। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে 'টাউনসেণ্ড শুল্ক আইন' অনুসারে কাঁচ, কাগজ, রং ও চায়ের উপর যে শুল্ক ধরা ছিল তা শুধু চা বাদ দিয়ে বাকীগুলোর উপর থেকে তুলে নেওয়া হ'ল। এতে সারা দেশে এক বিক্ষোভের ভাব প্রকট হয়ে উঠল। এই সময় বৃটিশ সৈন্যের সঙ্গে সংঘর্ষ যেখানে স্থানীয় লোকের রক্তপাত হয় সেটাকে 'বষ্টন ম্যাসাকার স্ট্রীট' বলা হয়। এই হ'ল স্বাধীনতার জন্য প্রথম রুধির পাত, ১৭৭৩সালের মে মাসে ভারতীয় ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী যে চায়ের জাহাজ আমেরিকায় পাঠায় তা' বষ্টন, ফিলাডেলফিয়া, নিউইয়র্ক বন্দর ঘুরে এনাপলিসে আসতে চা শুদ্ধ চা এর জাহাজ পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ঐ বছরই ১৬ই ডিসেম্বর আর একটি জাহাজ বষ্টনে আসে ও সেটার সমস্ত চায়ের পেটী জলে ফেলে দেয়। ক্ষুব্ধ হ'য়ে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট থেকে হুকুম নামা বেরুল—"বষ্টন বন্দর বন্ধ কর, যতক্ষণ না চায়ের পুরোদাম মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে।" এ ছাড়া বষ্টনে জনসভা বন্ধ ও জনগণের প্রতিনিধিদের উপর দমননীতি চলতে লাগল। বৃটিশ সৈন্যের চারটী দল বষ্টনে পাঠানো হ'ল। এই নির্যাতনের বিরুদ্ধে মার্কিন অধিবাসী আমেরিকায় এক বিদ্রোহ ঘোষণা করল। তারপর নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর এক বৃহত্তম অর্থবান রাষ্ট্রে পরিণত হবার ইতিহাস কারও আজ অজানা নেই। বৃটিশ লোকসভায় এই স্বাধীনতার স্বপক্ষে মহামতি বার্কের বক্তৃতা শুধু এক রাজনৈতিক কীর্তি নয়, এক সাহিত্যিক সম্পদও।

আমার কাছে এর পরের স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা হ'ল স্বামী বিবেকানন্দকে কেন্দ্র ক'রে। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শত জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে কলিকাতায় যে ধর্ম মহাসম্মেলন বসে সেখানে বিশ্বের নানা ধর্ম সম্প্রদায় ও ধর্ম-পন্থীদের সঙ্গে যোগ দিতে এসেছিলেন বষ্টনের রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী পরমানন্দ। সেই সভায় সুললিত কণ্ঠে তাঁর স্বরচিত কবিতা পাঠ আজও যেন কানে লেগে আছে।

প্রায় বিশ বছর আগে আমি রাত্রিবাসের স্থান সংগ্রহে বিফল মনোরথ হ'য়ে অবশেষে হার্ভার্ডে 'ইন্টারন্যাশনাল ষ্টুডেণ্ট সেণ্টারে' এসেছিলাম। শ্রীমতী মীডস্ এই প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়িকা ছিলেন। কয়েক রাতের জন্য আমার থাকার জায়গা ক'রে দিলেন তিনি। লাউঞ্জে আমায় একা ব'সে থাকতে দেখে শ্রীমতী মীডস্ আমায় এক বাণ্ডিল ফটোগ্রাফ এনে দেখালেন। অতি পুরাতন কালের হলদে ছোপধরা পুরাতন ছবি। এই ছবিগুলি কে-যেন মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে উপহার দিয়েছিলেন। ছবিগুলির অধিকাংশই ভারতের প্রাকৃতিকদৃশ্যের এবং ভারতের বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের নরনারীর। ছবির তলায় তর্জমা-

গুলি অতি মনোজ্ঞ। তাতে আছে নেংটা সন্ন্যাসী থেকে তিলক-চন্দন কাপা ভুঁড়ি বের করা চিমটেধারী সাধু; মাদ্রাজী, মারাঠী গুজরাটী মেয়ে-পুরুষের ছবি, নাচ-ওয়ালীদের ছবি। প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে তাজমহল ও নানা দুর্গ প্রাসাদের ছবি। তখনকার দিনের ছবি দেখলে ও বর্ত্তমান বেশভূষার সঙ্গে তুলনা করলে একটা ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। অনেক ছবি অতি মনোরম আবার অনেকগুলো দেখলে হাসি পায়………মনে হয় যেন ভারতীয়দের খেলো করার উদ্দেশ্যে তোলা। এখানে নানা দেশ থেকে ছেলেমেয়েরা জড়ো হচ্ছে মহামিলনের প্রাঙ্গন-তলে। এইরূপ নেই পৃথিবীর নানাদেশ থেকে ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন জ্ঞান লাভের জন্য সম্মিলিত হয়। এখানে 'হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়' ও 'ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি' বিশেষ প্রসিদ্ধ। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় বষ্টনের উপনগরী কেম্ব্রিজে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণকে বলে Yard। পরিচ্ছন্নতায় এটি অতি সুন্দর। এখানে বড় পাতার আইভিলতা হার্ভার্ডের শূন্য মৃত্তিকা ছাড়া নাকি জন্মায় না। এইখানের লাইব্রেরীতে নাকি পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী বই আছে। ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকালটীর (Engineering Faculty) ডিন্ ও বিখ্যাত অধ্যাপক গর্ডন ফেয়ারের (Gordon Fair) সঙ্গে দেখা হয়েছিল। নানা আলাপ আলোচনার পর তখন তিনি অযাচিত উপদেশ দিয়েছিলেন "যেন এখানকার নকল না করি। তোমাদের সমস্যা আমাদের থেকে পৃথক্। প্রয়োজন মত বুদ্ধি প্রয়োগ ক'রে দেশের প্রকৃত পরিবেশে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা উচিত। এখনও এখানকার পল্লীতে টাইফয়েড (Typhoid) রোগ শহরের অনুপাতে পাঁচগুণ। জনগণেরই জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। বিশ্ব স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের (World Health Organisation) একজন ভারতীয় প্রতিনিধি নাকি তাঁকে বলেছিলেন 'যক্ষ্মা নিরোধ করলেই ভারতের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় সমস্যার সমাধান হ'তে পারে'। গর্ডন ফেয়ার বলেন "প্রথমতঃ বিশুদ্ধ পানীয় জল, পরে ময়লা শোধনের প্রাথমিক ব্যবস্থা করার প্রয়োজন।"

আমি বললাম—"সেই সংগে খাদ্য সমস্যার সমাধানের প্রয়োজন। খাদ্যের ... [illegible]"

"নিশ্চয়ই! সেইটেই আগে এবং খাদ্যের পোকা বিনাশ ক'রে খাদ্যসংরক্ষণ করতে হবে ও উপযুক্ত খাদ্য শরীরে লাগাতে হবে। সেই সংগে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় লোকশিক্ষারও প্রয়োজন।" আলাপ আলোচনার পর আমরা পরীক্ষাগারে নানা নিরীক্ষা পরীক্ষার পর্য্যালোচনা করলাম।

বষ্টন সহরটি বেশ প্রাচীন। ফলে এর নগর পরিকল্পনা আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধরণের নয়। আঁকাবাঁকা রাস্তা, নানা সরু গলিঘুঁজি রয়েছে। সহরের মধ্যে দিয়ে তিনটি নদী—চার্লস, মিষ্টিক ও নেপন্সী এসে পড়েছে বষ্টন বন্দরে। চার্লস ও মিষ্টিক নদীর তলা দিয়ে অনেকগুলি সুড়ঙ্গপথ ও ওপর দিয়ে সেতু। সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে রেল চলাচলও করে। এটী মার্কিন সরকারের একটি নৌঘাটী। বষ্টনের মাটীর তলার পথ সহরের কেন্দ্র থেকে পাঁচদিকে চলে গেছে। উত্তর দিকে শেষ হয়েছে এভারেট-এ (Everett), পশ্চিমদিকে হার্ভার্ডে, পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে ফরেষ্ট হিলে (Forest hill), দক্ষিণে Ashmont এর উত্তরপূর্ব mareniac এ। এই অংশটিকে আরও বাড়াবার পরিকল্পনা আছে।

হার্ভার্ড সাবওয়ে (Harvard Subway) দিয়ে বষ্টন সহরের কেন্দ্রে যাওয়া যায়। দূরে দেখা যায় সহরের মাঝে সোনালী গম্বুজ। এটী হ'ল কমনওয়েলথ (common-wealth of Massachusetts) অব ম্যাসাচুসেটের সরকারী দপ্তর। নানা সহর ও নগরীতে জল সরবরাহ এই সরকারী সংস্থার দায়িত্ব। এখানে ১০ লক্ষ গ্যালন জলের দাম ১২০ ডলার মাত্র। বিভিন্ন পৌর প্রতিষ্ঠানগুলি এই জল মেট্রোপলিটন ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনের কাছ থেকে নিয়ে তাদের নিজেদের পাইপে ক'রে বাড়ী-বাড়ীতে ও কলে কারখানায় পাঠায়। বর্তমানে শুধু এই জল প্রস্তুতেরই খরচ ৭০ থেকে ৮০ ডলার পড়ে। আগের সর্ত থাকায় লোকসান দিয়েই ম্যাসাচুসেট সরকারকে অল্পমূল্যে নানা পৌরপ্রতিষ্ঠানকে জল বিক্রয় করতে হচ্ছে। এরা মাত্র জলের মধ্যে ক্লোরিণ সংযোগ করেই খালাস্। কেম্ব্রিজে যেখানে বিশ্ববিখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, তাঁরা নিজেদের জলকলে জল পরিস্রুত করেন। মুখ্য সরকারী বাস্তুকার ওয়েষ্টন (Weston) সাহেব নানা আলোচনার পর বললেন—

" [illegible]

সংগে তোমার সমস্যা সমাধানের জন্য যা' চাও তাই পাঠিয়ে দেবো।"

তাঁকে আমার অন্তরের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলাম। বষ্টন থেকে প্রায় মাইল ত্রিশ দূরে লরেন্স (Lawrence) সহর। সেইখানেই বিশ্ববিখ্যাত সরকারী Lawrence Experimental Station। তিনি সরকারী গাড়ী করে তাঁর একজন ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আমায় লরেন্স পরীক্ষাগারে পাঠালেন। এইখানেই যান্ত্রিক বা দ্রুতবালুকা পদ্ধতিতে বারি পরিশ্রুত করার পদ্ধতি সম্বন্ধে গবেষণার ফলে যে সফলতা লাভ করা হয়েছিল, বর্তমানে সেই প্রণালীতেই জল ফিল্টার করা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র চালু হয়েছে। এখানে নিয়ম মত পানীয়জল শোধনের ঝিনুক, গেঁড়ি, গুগলি (shell fish) সম্বন্ধে নানা পরীক্ষা হয়। তাছাড়া মল শোধনী সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা চলেছে। Supersonic তরঙ্গের আঘাতে বীজাণু ও ক্ষুদ্র আলজী ধ্বংস করার ক্ষমতা এবং তঞ্চনের (Coagulation) উপর এর কি প্রভাব ইত্যাদি বিষয়েও বহু গবেষণা হচ্ছে।

বষ্টনের ক্রীশ্চান সায়েন্স নামে একটী বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের বিরাট কেন্দ্রীয় অফিসটীর নাম Little Building। আসলে কিন্তু এটী একটী বিশাল অট্টালিকা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠের মত এদের প্রতিষ্ঠান বিশ্বব্যাপী। কলকাতায় পার্ক ষ্ট্রীট ও চৌরঙ্গীর মোড়ে এদের একটী শাখা অফিস আছে। এঁরা Christian Science Monitor ব'লে একটী পত্রিকা প্রকাশ করেন। এঁদের বহু জলপড়া ডাক্তার রোগীর পাশে ফুঁ-ফাঁ দিয়ে, ও প্রার্থনা ক'রে রোগ ভাল করেন।

এখানের বিখ্যাত Boston Symphony Orchestra শীতে দিনে পাঁচশ হাজার পর্যন্ত শ্রোতা আকর্ষণ করে। মে ও জুন মাসে 'Pops' অর্কেষ্ট্রা' তাঁদের অধিবেশন চালায়। মুক্ত প্রাঙ্গণে জুলাই-আগষ্ট মাসে বিনামূল্যে Esplanade কনসার্টের শোদেওয়াহয়। কখনটোস্কানিনির জোহানস্ 'ব্রামারে'র অমর সুর অর্কেষ্ট্রার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়।

বষ্টনে এম্বুলেন্সের ভার পুলিসের উপর। পথে কোন বিপদ আপদ হ'লে আহতকে হাঁসপাতালে পৌঁছে দেবার ভিড়ে ভর্তি রাস্তা ফাঁকা ক'রে দ্রুত রোগী নিয়ে হাঁসপাতালে পৌঁছে দেয়। পুলিশকে তার আরক্ষ কর্মকুশলতার সঙ্গে first aid (প্রাথমিক চিকিৎসা) ও কিছু শিখে নিতে হয়। এখানে আরক্ষবাহিনীর ধরণ-ধারণ লণ্ডনের কর্মকুশলতারই কিছু অনুকরণ।

প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়:

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে আমেরিকার বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে হার্ভড়, ইয়েল, কলম্বিয়া প্রভৃতির নাম সুপ্রচলিত ছিল। তার মধ্যে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় সব চেয়ে বেশী প্রাচীন। এর প্রতিষ্ঠাকাল ১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দ; আর 'ইয়েল' বিশ্ববিদ্যালয় ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে। বর্তমান ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কলকাতার আয়ু একশো বছরের কিছু বেশী। প্রাচীন ভারতের তক্ষশিলা, নালন্দা, বিক্রমশিলা, কাশী, জগদ্দল, বল্লভী, অজন্তা প্রভৃতির বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা এখানে উল্লেখ ও আলোচনা করতে চাই না। সে তো আরও কত প্রাচীন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে নতুন মহাদেশে কম ক'রে ষাটটী বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপিত হয়।

গ্রন্থাগার:

পুস্তকাগারে কম ক'রে পাঁচ লক্ষ বই আছে এবং তাতে আরও পাঁচ লক্ষ যোগ করা যেতে পারে। বছরে যোল শ' পত্র-পত্রিকা এই লাইব্রেরীতে নেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারটির নাম 'চার্লস হেডেন স্মৃতি লাইব্রেরি' এটী কলেজের বাড়ীর ছ' তলায়। হেডেন তহবিলের বাইশ লক্ষ ডলার ব্যয়ে এটী নির্মিত। প্রতি বিভাগের সঙ্গেও পৃথক পৃথক গ্রন্থাগার আছে, সেগুলি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্ত। প্রতি সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ন'টা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়:

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা দূরাগত দর্শকদের পথপ্রদর্শক ও উপদেষ্টা হিসেবে অবৈতনিক কাজ করেন। পরিদর্শনের শেষে ঠিকানা লেখা একটি পোষ্টকার্ড হাতে ধরিয়ে দেন যাতে দর্শকগণ আপন আপন মতামত লিপিবদ্ধ করে ডাক বাক্সে ফেলে দিতে পারেন। তাতে ডাক টীকিট লাগে না।

কেম্ব্রিজ সহরের মধ্যে সীমিত নয়। এর কলেবর বৃদ্ধি পেতে পেতে এখন এর নতুন নতুন বিভাগ কেম্ব্রিজের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। কেম্ব্রিজের হার্ভার্ড অঙ্গনের মধ্যে যে প্রতিমূর্তিটী হার্ভার্ডের নামে প্রচলিত, সেটী নাকি তাঁর আসল প্রতিমূর্তিনয়। এই আবিষ্কার নাকি সুনা কূট গবেষণার ফলে জানা গেছে। তবে যে মূর্তিতেই তিনি বিরাজিত থাকুক না কেন তিনি একজন হার্ভার্ডযিনি নতুন মহাদেশে প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। মূর্তিতে কী আসে যায়। গোলাপকে যে নামেই ডাকি না কেন, সে গোলাপই থাকে।

সংগ্রহশালা :

কেম্ব্রিজের কাচের তৈরি রঙিন ফুলফলের বিখ্যাত সংগ্রহাগারটী বিশেষ আকর্ষণীয়। ফুলের আসলরংটী সংরক্ষণ করা অসম্ভব। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটী বিবর্ণ হয়েযায়। তাই শিল্পী রঙীন কাচের সাহায্যে ফুলফলের রংয়ের যথার্থ অনুকরণে ঐগুলি তৈরি করেছেন। মৌমাছি ও ভ্রমর পর্যন্ত সৃষ্টি ক'রে সুন্দরভাবে কাচেরই আলমারিতে সযত্নে রেখেছেন। প্রতিদিন বহু লোক এই সংগ্রহশালাটী দেখতে আসেন। এটী পৃথিবীর অন্যতম কাচের ফুলফলের প্রাচীনতম যাদুঘর। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আরও চারটী যাদুঘর আছে তন্মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাদুঘরটী অন্যতম। এখানে প্রাণীতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা, মানিক-বিদ্যা, নৃকুলবিদ্যার বহু সংগ্রহ সামগ্রী সযত্নে সঞ্চিত আছে। সহরে আরও চারটী সংগ্রহশালা আছে। কলকাতার জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ বষ্টন নগরীর লোক-সংখ্যা। সেখানে আটটী যাদুঘর। আর কলকাতায়? এখানের শিশুদের সংগ্রহশালা (Children's Museum) প্রৌঢ়জনেরও বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ।

আমার তরুণ বন্ধুরা আমায় বারবার তাদের ওখানে আঁহারের কথা বলছিলেন। ওঁরা দুজনে একটী ঘরওলা বাসা ভাড়া করেছেন। আমি বললাম 'দেখ, আমি এদের এখানে এসেছি। ওরা আমাকে যেখানে যখন নিয়ে যাবে সেটী আমায় মুখ্যত: করতে হবে। কেন না ভবিষ্যতে এদের দিয়ে আমাদের কাজ নিতে হবে। অবাধ্য হ'য়ে লাভ নেই। আমি নিষ্কামকর্মী (desireless worker) নিজেরে ওদের ওপর নির্ভরশীল।

কর্মসূচী অনুযায়ী বুধবার এণ্ডী সাহেব নিয়ে গেলেন লাঞ্চে। বৃহস্পতিবার সকালে আমরা বষ্টনের পৌর-প্রতিষ্ঠানে যাই। ওদের সঙ্গে আমরা ওদের নতুন ময়লা পরিশোধনাগার পরিদর্শনে কীনসেল, পজার ও আমি ওদের ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে গিয়েছিলাম। পথে আহারাদি আমরা সেরে নি। রাতে পজার এসে আমার আস্তানা থেকে তুলে নিয়ে যাবে বলেছিলে। যথাসময়ে আইরিণকে সঙ্গে নিয়ে হাজির। আগেই সে কাহিনী বলা হয়েছে। একদিন ওদের অফিসের কর্মধারা নিরীক্ষণ ও অনুধাবন করছিলাম। যাবার দিনে ন্যাথানিয়েল ক্ল্যাপকে জিগ্যেস করলাম 'আমাদেরই ছেলেরা কেমন কাজ করছে?'

—খুব ভাল।

—এটা বড় মামুলী কথা হ'ল। আমায় গোপনে এদের সম্বন্ধে আপনার ব্যক্তিগত ধারণার কথা কিছু বলুন।

—এরা তো খুব ভালই শিখছে। আমরাও এদের কাছে অনেক কিছু শিখেছি এ কথা আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করব।

—ধন্যবাদ।

ফেরার সময় ভুঁইয়া ও আগরওয়ালাকে ব'লে এলাম —'তোমাদের বষ্টনে বিশেষ কোন বাহ্যিক আকর্ষণ নেই ও থাকার কথাও নয়। এতে অযথা তোমাদের অর্থব্যয় হবে। অতএব অফিসে যেতে দেরী করবে না। ছুটীর সময়ের দশ পনেরো মিনিট বাদে অফিস থেকে বেরুবে। তাতে আমাদের উপর একটা ভাল ধারণা জন্মাবে। কাজ তো যা দিচ্ছে, তা' তো করবেই। তা ছাড়া নিয়মানুবর্তিতা ও সদাচার থেকে যেন পরাঙ্মুখ না হও।'

শুক্রবার সরকারী কাজের কোন কিছু রাখা হয়নি। পজার ব'লেছিল অফিসে না এসে তুমি অপেক্ষা কর তোমার হোটেলের আস্তানায় আমি গিয়ে তোমায় তুলে নিয়ে যাব স্থানীয় পরিক্রমায়। বেলা দশটায় ভুঁইয়া টেলিফোন করল, পজার সাহেব এখনই আসছেন। তরুণ বন্ধুরা আমায় একদিন খাওয়াবার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু ওদের আমি বলেছিলাম 'অফিসের কর্তারা যেদিন কেউ না বলবেন, তখন তোমাদের ওখানে যাব।' গত বৃহস্পতি-বার রাত্রে কীনসেল সাহেব (Kinsel) ও তাঁর স্ত্রী আমায় নিয়ে গিয়েছিলেন— The wayside Innএ ডিনারে।

এখানে নাকি H. W. Longfellow আড্ডাবাজি করতেন ও তাঁরই কবিতায় এর বিবরণী লেখা আছে Food, Drink, Lodging for man and beast। এটী নূতন মহাদেশের প্রাচীনতম থাকার একটা পান্থশালা। প্রাচীন 'বষ্টন পোষ্ট' রাস্তার ধারে সাডবেরীর হাউইস্ বংশীয়রা এটি স্থাপনা করেন। আট পুরুষ ধরে এখানে খানাপিনা ও রাতের বাসা দেওয়া হয়ে থাকে। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে 'Howes Tavern' নামে এর লাইসেন্স নেওয়া হয়। তারপর এর নাম হয় লাল ঘোড়ার চিহ্ন অনুযায়ী 'The Red Horse'। কর্ণেল এজকিন, হাউয়ী সাডবেরীর কৃষকদের দল নিয়ে 'কনকর্ড' (Concord) অভিযানে যান। তাঁর স্ত্রী ও পরিবারবর্গ বিপ্লবীদের এই সরাইয়ে খাওয়া দাওয়া করাতেন।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে লংফেলোর Tales of a Wayside Inn কবিতাটী প্রকাশের পর এর নাম বদল হয় 'The Wayside Inn' বলে। এই পান্থশালা সারা বিশ্বের ভ্রাম্যমাণ পথিকদের আজও আহার ও পানীয় সরবরাহ ক'রে চলেছে। সেই প্রাচীন দিনের আতিথেয়তায় ও প্রাচীন কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় মৃদু রঙিন মোমবাতি জ্বালিয়ে। এটী বষ্টন থেকে প্রায় বিশ মাইল পশ্চিমে। ওখান দিয়ে জর্জ ওয়াশিংটন তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামের সেনা নিয়ে গিয়েছিলেন। কোনদিনই রাতে আগরওয়ালাদের ওখানে খাওয়া হ'ল না। এতে আমি বড় মর্মাহত। তাই বললাম—"তোমরা বুঝে দেখো, ওরা খরচা ক'রে খাওয়াচ্ছে তখন তোমাদের ওখানে গিয়ে খরচা করিয়ে লাভ কি? শুক্রবার সকালে নিশ্চয়ই তোমাদের ওখানে ব্রেকফাষ্টে যাব। ভুঁইয়া যেন নিতে আসে।' সেইমত ভুঁইয়া এল। আমার লেখা সকালে কিছু কপি ক'রে দিল। এরা দুজন দুটী নক্সা কপি করে দিয়েছিল, তা হ'ল "মায়াসভ্যতার দেশে"র। সেগুলি 'কথা সাহিত্যে' সাহিত্যে ছাপা হয়েছে দু' কিস্তিতে। ওদের জন্য আমার অন্তরের স্নেহ ও প্রীতি রইল। ওরা বেশ ভালই কাজ করছে। Nathaniel Clapp এর অধীনে এরা কাজ করছে। বললাম আমেরিকান চরিত্রের গুণ ও বৈশিষ্ট্য হ'ল অনুভূত সত্য প্রকাশ করা যেখানে ইংরেজের মত মাতব্বরির মাত্রাটা নেই বললেই চলে।

বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ 'পস্তার' এল। আমরা তাড়াতাড়ি বেরুলাম। আমার অর্ধমনী ব্যাগটা ওই ব'য়ে নিয়ে চলল। গাড়ীতে তুলে হোটেল ছেড়ে দিলাম। আমরা চললাম গ্লষ্টারের সুন্দর সমুদ্র সৈকতে। পথে Lexington সহর, যেখানে প্রথম স্বাধীনতার আগুন জ্বলে ওঠে। এখানের বহু বাড়ী বিখ্যাত স্থপতি P. C. Wrenএর পরিকল্পনায় তৈরি। লণ্ডনে এরই পরিকল্পনায় সেন্ট পল্‌স্ কেথিড্র্যাল নির্মিত হয়। সমুদ্র কিনারায় এক হোটেলে আমরা সামান্য মধ্যাহ্নভোজ সেরে নিলাম। পথে Massachusett. I. T ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে এলাম। তখন সব বন্ধ—বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটী, পস্তারকে বললাম চল কেম্ব্রিজে A. W. Longfellowএর বাড়ীটা দেখে আসি। দোতলা বাড়ী। পাশে কাঠের Ionic ধরণের থাম। প্রাচীন নিউ ইংলণ্ড ষ্টাইলের এই বাড়ীটা। অফিসে 'এডি'র সঙ্গে দেখা ক'রে বিদায় নিয়ে বললাম—ভেবে দেখো। একই বাড়ীতে দুই ভাইত থাকতে পারে। তেমনিভাবে থাকার কথা ভেবে দেখতে পার না, দুই কোম্পানীতে যখন মিল হচ্ছে না?"

—"নিশ্চয়ই! শান্ত মুহূর্তে এ কথা ভেবে দেখবো।" এডিকে বিদায় জানিয়ে Kinsel ও Nathaniel clapp এর সঙ্গে করমর্দন করলাম। Clapp পায়ে আঘাত পেয়ে বর্তমানে পঙ্গু কিন্তু কাজের বেলায় ওস্তাদ। টেলিফোনে আইরিণকেও বিদায় জানালাম—

—আবার এস ফিরে।

—আমি তো এখন এলাম। এবার তোমাদের আমাদের ওখানে যাবার পালা।

রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজিদের সঙ্গে আমার যে অবচেতন মনের টান আমি সেটা গোপন করতে চাইলেও প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে। তাই আগরওয়ালাকে বুধবার ব লেছিলাম বষ্টনের স্বামীজির সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ ক'রে দেখতে, আজ কি কাল সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে দেখা হ'তে পারে কি না? টেলিফোনে কথা ক'য়ে জানা গেল 'তিনি আজ রাত্রে বাইরে যাচ্ছেন। ফিরতে কয়েকদিন দেরী হবে।' অতএব এই ধর্মীয় মিলনাকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিলাম। আমার ওয়াশিংটন থেকে শিশুদের কাজে ব্যবহারের জন্য ব্যাগটী ও রঙীন ফিল্মগুলো পস্তারকে [illegible]

বললাম। অতি সুন্দর ছাপা হ'য়ে মাস দুয়েক বাদে এসেছিল সেগুলো।

বেসরকারী পরিদর্শন পর্ব সেরে আমায় বিমান বন্দরে তুলে দিলেই পঙ্কারের মুখ্য দায়িত্ব কাটে। তবে নিউইয়র্কে থাকারও সে একটা বিকল্প ব্যবস্থায় আমার অনুমোদন আছে জেনে নিয়ে নিউইয়র্কে টেলিফোন ক'রেও দিয়েছিল। এখান থেকেই আমার নতুন মহাদেশে বন্ধু-বিদায়ের পালা সুরু।

কিছুদিন বাদে পঙ্কার সাহেব Boston Globe পত্রিকায় ৮ই আগষ্টে প্রকাশিত একটী প্রবন্ধের কাটিং পাঠান। ঐ পত্রিকার Financial Reporter, Daniel, J, Corcoran সাহেব Hub Based Company plays big role in India. শীর্ষক প্রবন্ধে লেখেন—'The largest city and the biggest port in India,it is the country's most highly industrialised area serving as the economic centre of an area of a quarter of a millian square miles inhabited by 110 million people.

Boston based Metcaff and Eddy, founded in 1897, is one of the world's major engineering firms in the fielid of water suppy and treatment, sewage treatment, drianage ete.

The firm has over 400 engineers in its offices here, in Newyork, Palo Alts, San Francisco and at its field offices on projects scattered arround the world from Viet Num to Saudi Arabia, Greenland, Tehran and scores of other localities.　　[ক্রমশঃ

জাতিস্মর

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

মেহেদীর বেড়া-ঘেরা একখানি তৃণের কুটীর
বিল্ব বক পুষ্প আর বাতাপীর ছায়ায় শয়ান ;
মাঝে মাঝে কুরুবক-রঙ্গনের রক্তিম বিথার ;
সস্নেহে জড়ায়ে আছে সুচিক্কণ লাউডগাগুলি
শতক্ষুদ্র বাহু দিয়া ক্ষণস্থায়ী কাঞ্চির মাচাটি !
কলসা-হিল্লোল কাঁপা কাকচক্ষু স্বচ্ছ জল-ভরা
ছলকিছে একপ্রান্তে বিগলিত আহ্লাদের মতো
কুমুদ-কহ্লার-ফোটা হাঁস-ডাকা খিড়কীপুকুর !
ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে বায়সের হোথা কুম্ভমেলা
আঙিনার নিম্বশাখে ; অভ্রচুম্বি কৃষ্ণচূড়া তরু
আকীর্ণ করিয়া তোলে আঁকা বাঁকা পল্লীপথখানি
লালে লাল পুষ্পপুঞ্জ ; করতালে গানে ভ লীবন !
রৌদ্রছায়া-ঝাঁকামিকি ঘুঘু ডাকা বাঁশবন দিয়া
হেলে দুলে জলে চলে গরবিনী কোন্ গ্রামবধূ
ফুটাইয়া স্থলপদ্ম অবিরল ধরণীর বুকে
প্রতি পদক্ষেপে !

হায়, পূর্বজন্মে ছিনু বুঝি হোথা
এমনি প্রচ্ছায়স্নিগ্ধ কোনো এক পল্লীর ভবনে
তাই বুঝি রাত্রিদিন আসি আর যাই যতোবার
নেবুর ফুলের গন্ধে উল্লসিত এ নির্জন পথে,—
মনে হয় কতো-চেনা তৃণ-ছাওয়া মাটির এ গৃহ ;
মনে হয় পোষা ওই চন্দনার কলকণ্ঠস্বর।
কতো দ্বিপ্রহর মোর তুলিয়াছে করি' উন্মুখর !
মায়াময় কতো শুভ্র সায়াহ্ন কোমল আঁধারে
হেথায় তুলসীমঞ্চে শুনিয়াছি গম্ভীর-মধুর
শঙ্খনাদ—ঝিল্লী রবে দূর মধুবন মাঝে
নবীন অম্বুদশ্যাম সমোজ্জ্বল পক্বফল ভারে
অবনত ; তাই বুঝি হেথা মোর পিয়াসী শ্রবণ
শুনিবারে চায় কার রিনি ঝিনি কাঁকন-শিঞ্জন !

দ্বিতীয় দাহ

তাপস বন্দোপাধ্যায়

লেডিস্ সীটের সামনে যে একজন দাবীদার এসে দাঁড়িয়েছেন তা ঠাওর করতে পারেনি মলয়। আনমনা ভাবে কি এক গভীর চিন্তার সাগরে সে ভেসে চলেছিল। দুষ্টু ছেলের হাতে ছোঁড়া ঢিলের মতন সেটা চলকে উঠল কণ্ডাক্টরের ডাকে, 'লেডিস সীটটা ছেড়ে দিন।'

চিন্তা আর লজ্জার সমন্বয়ে কেমন যেন থতমত খেয়ে গিয়েছিল মলয়। কোন রকমে নিজেকে তাই তালগোল পাকানো অবস্থাতেই তুলে নিল সীট থেকে। জায়গা করে দেবার জন্য সরে আসার মুখেই সে পেল বাধা। কথার বাধায় সে আবার বসে পড়ল লেডিস সীটটার ওপরে। সীটে বসতে বসতে তার মনে হল ভদ্র মহিলার গলাটা চেনা চেনা। মাত্র চারটে কথায় বলা, 'ঠিক আছে আপনি বসুন,' যেন মলয়কে বলে দিল এ গলার সঙ্গে তার পরিচয় বহুদিনের, সত্যতা যাচাই করার জন্য ঘাড় ফিরিয়ে মহিলার চোখে চোখ রাখতেই এক মুঠো অবাক যেন ঝলকে ঝলকে গড়িয়ে পড়ল মলয়ের হৃদয় থেকে।

মলয় তাকাবার অনেক আগেই তার চোখের ওপরে চোখ রেখে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ললিতা।

এক বছর বাদে এমন ভাবে এমন পরিস্থিতির মাঝে ললিতার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে যাবে তা' ভেবে উঠতে পারেনি মলয়। তাই আজ এই এক বছরের বিরাট ব্যবধানটা তার চোখে ছোট হয়ে এক দিনের স্বল্প অদেখার দূরত্ব নিয়ে মনের দরজার কড়া নাড়ল। মলয় ভাবল, যাই বলুক না কেন, ললিতাই তো প্রথম কথা বলল, সুতরাং এবার তার কিছু কথা বলার পালা। কেমন আছেন?

শীতে ফাটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে এক চিলতে বাসি হাসি হাসল ললিতা। এমন হাসির সাথে এক বিন্দুও পরিচয় ছিল না মলয়ের, এ হাসি দেখে তার মনে হ'ল কেউ যেন দু দিনের এক বাসি মাছের বুকে ছুরি চালিয়ে তার দেহটা চিরে কিছু পচা মাংস তুলে ধরেছে চোখের সামনে, আনন্দের অট্ট হাসিতে মাতাল হয়েছে মনের কঙ্কালটা। ভয়ে আঁতকে উঠল মলয়। ঝপঝপ করে চোখে পাতা ফেলে দিল, মলয়ের মনের সব ছবিটাই সম্পূর্ণ ভাবে আঁকল ললিতার বুদ্ধির দর্পণে। তাই একই ভঙ্গিতে হাসিটা কিছুক্ষণ জিইয়ে রেখে সে কি যেন ভেবে নিল। হিসাবের কড়ি গুনে গুনে সাজিয়ে রাখলো মনের ঘরে। এবার হাসিটা ফিরিয়ে নিয়ে গেল অতীতের অন্দরে। হালকা সুরে মলয়ের কথার জবাব দিল, ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন?

অকাল পক্কতায় গজিয়ে ওঠা রূপোলী চুলের মধ্যে আঙ্গুল ডুবিয়ে বিলি কাটতে কাটতে মলয় ভাবছিল এ কথার জবাব কেমন ভাবে দেবে।

জবাব তাকে দিতে হ'ল না। জবাব দেবার আগেই তাকে আবার প্রশ্ন করা হ'ল। প্রশ্ন করল কণ্ডাকটার, চাইলো বাসের ভাড়াটা।

লেডিস ব্যাগের টিপকল খোলার আগেই মলয় বুক পকেট থেকে এক টাকার একটা নোট বার করে কণ্ডাকটরের হাতে দিয়ে বলল, দু খানা......'। মাঝ পথে কথা থামিয়ে ললিতার দিকে তাকিয়ে চোখের ভাষায় জানতে চাইল কোথাকার টিকিট কাটবে? কোথায় চলেছে ললিতা?

'না, না, আপনি টিকিট কাটবেন কেন? আমার টিকিট আমিই কাটছি,' ব্যাগ থেকে কিছু খুচরা পয়সা বার করে ললিতা।

'কাটলে কি হয়েছে? কিছুদিন আগেও তো এক সঙ্গে বাসে চললে আমিই টিকিট কাটতাম, তাই না?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু তখন আমি মিসেস ললিতা বসু ছিলাম। নিশ্চয়ই আজকের মত মিস্ ললিতা রায় নয়?'

'ও তাই বুঝি? শুধু একটা সই, পদবীর ওলট-পালটেই বুঝি সারা মনটা উল্টে যায়। তুমি হয়ে যায় আপনি।'

তা যায় না। তবে আজ:কের এ মনটা সে'দিন কোথায় কোন চোরা বালিতে ডুবে গিয়েছিল? ভয় হয়, যদি কালকের সেই চোরা বালিতেই বা বসে যায়।' অপমানের জ্বালা ঢাকবার জন্য ললিতা মুখ ঘুরিয়েনিতেই চোখটা পড়ল কণ্ডাকটারের দিকে। মলয়ের টাকাটা হাতে নিয়ে বিরক্তির চোখে বারবার সে তাকিয়ে দেখছে তাদের দু'জনকে।

এ চাহনি অসহ্য, যেন সাপের দংশন। এ জ্বালা থেকে রক্ষা পাবার জন্য ললিতা তাড়াতাড়ি বলে দিল, 'দুটো শ্যামবাজারের টিকিট দিন।'

মেঘলা মনে আলোর চাঁদ দেখতে পেল মলয়। তাই দ্বিগুণ উৎসাহে ফস করে বলে ফেলল, 'আমি মানছি আমার ভুল হয়েছে। কিন্তু ললিতা সে ভুলকে তুমি ক্ষমা করে আবার সেই পুরানো দিনেতে দু'জনকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারো না?'

মলয়ের কথায় চমকে ঘাড় ফেরাল ললিতা। ধীরে ধীরে তার চোখে আবেশের ঢল নামছে। যেন আনন্দাশ্রুর গায়ে আবীরের স্পর্শ লেগেছে।

ললিতার মনের ছবি পড়ে ফেলেই মলয় কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে সেই বাসশুদ্ধ লোকের মাঝেই ললিতার হাতটা খপ করে চেপে ধরল।

গেল গেল করেও ঠিক সময়ে বাসটার ব্রেক কষা গেল না। বেশ কয়েক গজ দূরে এগিয়ে যাওয়ার পর এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে বাসটা থামল।

বাস থামলেও দেহটা থেকে রক্ত বার হওয়া থামতে চায় না। সদ্য সদ্য চাকায় পেশা দেহটা দিয়ে ঝলকে ঝলকে গড়িয়ে পড়ছে তাজা রক্ত। মুহূর্তে স্নান করিয়ে দিয়েছে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোডের ফর্সা রাস্তাটা।

এক লাফে বাস থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে জনারণ্যে মিশে গেল বাস ড্রাইভারটা। তাকে হাত ফসকে জনতার রাগ দ্বিগুণ ভাবে গিয়ে পড়েছে বাসটার ওপরে। পাথর আর ইটের টুকরোয় ঝন্ ঝন্ বাদ্য বাজতে সুরু করেছে বাসের গা দিয়ে। ভয়ে পিল পিল করে যাত্রীরা বাস থেকে নেমে পড়েছে। কিছু যাত্রী অন্য বাসের সন্ধানে ছুটছে, অন্য বাসের পথ ধরেছে, আর হুজুক যাত্রীরা পথে দাঁড়িয়ে দেখছে সৌখিন ডবল ডেকার বাসটায় কেমনভাবে আগুন ধরানো হচ্ছে।

সবে আগুনের স্পর্শ পেয়েছে বাসটা। ঠিক সেই মুহূর্তে কোথা থেকে তেড়ে এলো পুলিশের ভ্যান।

কাঁদুনে গ্যাস আর লাঠির দাপটে রণক্ষেত্র ছত্রভঙ্গ করে দিল। দর্শকদের পায়ে জোগান এল প্রাণ বাঁচানোর আপ্রাণ দৌড়।

গেটের ফাঁক দিয়ে জগু বাজারের ভেতরে ঢুকে পড়ে ললিতা। বাজারে ঢুকেও তার ভয় যায়নি। ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে সে সিঁড়ি বেয়ে উঠে চলে ওপরে। ওপরে উঠে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে অস্বস্তির প্রশ্বাস ছেড়ে ভাবে মলয় কোথায় গেল?

ছুটতে ছুটতে দেবেন্দ্র ঘোষ রোড পার হয়ে মলয় এসে দাঁড়িয়েছে হরিশ মুখার্জী রোডের মোড়ে। সেখানে তখন শত জনতার ভীড়। সেই ভীড়ের মধ্যেই মলয় আঁকু পাঁকু করে খুঁজে চলে ললিতাকে। মলয় দেখে ভীড়ের মধ্যে অনেক লতাই আছে, নেই শুধু তার স্ত্রী ললিতা।

হাতের কথা

স্বরাচার্য্য

হাত দেখা সম্বন্ধে শারদীয়া সংখ্যায় একটা মোটামুটি আলোচনা করেছি। হাতের রেখাগুলির যে একটা বিশেষ তাৎপর্য্য আছে, এইটাই ছিল তাতে প্রতিপাদ্য বিষয়। এখন ব্যক্তিগত জীবনে এই হাতের রেখা কতটা বাস্তব হতে পারে এবং ব্যক্তিগত জীবন প্রতিফলিত করে তার কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি। মনে রাখবেন, কাল্পনিক গল্প করছিনা বাস্তবিক জীবনে যা ঘটেছে এবং ঘটতে দেখেছি সেই কথাই বলতে বসেছি!

এক ভদ্রলোক অত্যন্ত বাবু ছিলেন, ভোগবিলাসেই ছিল তাঁর অত্যন্ত রুচি। অবস্থা ভালই ছিল, গাড়ী জুড়ি ঘোরগোড়ায় বাঁধা থাকতো। সিনেমা দেখার, খেলা দেখার অত্যন্ত সখ। বেশ-ভূষায় জাঁকজমক, ভালমন্দ খাওয়াতে মজবুত। পৈতৃক কাজ যেটা দেখাশুনা করতেন সে বিষয়ে ধ্যান্ দিতেন না, কাজেই আসল তা নয়। এক একজনের এক একটি গুরুতর দুর্বলতা ঐরকম ধরণের পরিণতির কারক। কেহ দোষ দেবেন হাতের বা ভাগ্যের, কেহ দোষ দেবেন মানুষের। কার যে কতখানি দোষ তার সত্যতা এখনও জানা যায়নি।

> হাতের রেখায় লেখা থাকে মানবের জীবন ইতিহাস। সে লেখার রহস্য ভেদ যাঁরা করতে পারেন, তাঁরা মানুষের ভবিষ্যতের কথা বলে তাঁদের সতর্ক করতে পারেন, মানুষের নৈরাশ্যকে কাটিয়ে তাঁদের মনে আশার আলোও জ্বালতে পারেন।
>
> হস্ত রেখার এই সব অনুচ্চারিত কাহিনী ও ইতিহাস এবার থেকে স্বরাচার্য্য তাঁর অভিজ্ঞতার সঞ্চয় থেকে কিছু কিছু বলবেন পাঠকদের কাছে।

মানুষের দোষ ত আমরা খুবই দিই এবং দেবোও। কিন্তু মানুষই কি সবটা দোষী? তার শিক্ষা, সংস্কার, পালন, পারিপার্শ্বিক অনেকটা দায়ী নয়? 'লোভ প্রলোভন সংবরণ কর' বললেই সংযম এসে গেল? ভিতরে যে কতটা লড়াই চলে তা কি প্রত্যেক মানুষ জানে না? এবং সেই লড়াইয়ে কত লোক হারছে জিতছে তার সংবাদ কে রাখে? নিতান্ত bad case যে গুলো, সেগুলোরই খবর পাওয়া যায় বাস্তব জগতে। অনেকেরই ত মানের সহিত নিতান্ত ভদ্রতার জ্ঞান হয়নি। তারই মত রুচি সম্পন্ন কয়েকটি বন্ধু জুটল, কাজেই 'কাজ' ডকে উঠল। বন্ধু বান্ধব নানান্ ভাবে ফাঁকি দিল, নিজেও অনেক কিছু উড়িয়ে পুড়িয়ে দিলেন। ঘরবাড়ী বিক্রী হোল, সংসার ভেসে গেল। এতদূর যে ক্ষতি হোল তার কোন অবস্থাতেই

তার জ্ঞানোদয় হল না! একটি স্ত্রীলোকের মোহে পড়ে এক কথায় সর্ব্বস্বান্ত হলেন। পরে অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় স্বজনের কাছে হাত পেতেই দিন কাটাতে লাগলেন। এই রকম ঘটনা খুব একটা নূতন নয়, অনেকে এই ধরণের ঘটনা দেখে থাকতে পারেন। কিন্তু কেউ কি কখন ভাবেন যে হাতের মধ্যেই এইরূপ অধঃপাতে যাবার দুর্বলতা স্পষ্ট কথা কয়।

আমি যে উদাহরণ দেখেছিলাম সেই রকম অনেকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, পরিচিতি নিয়ে ভদ্র সমাজে বেশ প্রতিষ্ঠার সহিত জাঁকিয়ে বসেছেন। এমন অনেকের অন্তরে যে পৈশাচিক তাণ্ডব চলছে তার খবর কেউ রাখেন কি? কাজেই কে ভাল বা মন্দ তার মাপকাঠি ঠিক্ জগতের প্রতিষ্ঠায় নয়। ভিতরের আসল কি চিত্র তার প্রকাশ হয় হাতের দর্পণে।

আমি যে ভদ্রলোকের পতন দেখেছিলুম তাঁর শুক্রগ্রহ ছিল অত্যন্ত প্রবল এবং এত প্রবল যে অন্য গ্রহস্থানগুলি তার কাছে নগণ্য ছিল। কাজেই ভোগ, বিলাস, আলস্য মিথ্যাবাদিতা তার সর্ব্বস্ব হয়ে দাঁড়লো। মস্তিষ্ক রেখা যা থেকে বুদ্ধির বিচার হয় সে ছিল অল্প এবং কল্পনা প্রবণের দিকে। পুনরায় দুঃসাহস ও একগুঁয়েমি সেই রেখাতে যুক্ত ছিল। কাজেই বিচার, বিশ্লেষণ, বাস্তবতা যা মানুষকে দুর্ব্বলতা থেকে উদ্ধার করে তা তাঁর হাতে ছিল না। এই বুদ্ধির অল্পতার উপর হৃদয়াবেগ অত্যন্ত বেশী ছিল। কাজেই হৃদয় দিয়ে যে স্ত্রীলোকটিকে তিনি গ্রহণ করলেন, তার জন্য সংসার ত্যাগ করতে তাঁর অসুবিধা হলোনা। সাংসারিক দায় দায়িত্ব যা ছিল সে সব অগ্রাহ্য বা প্রত্যাখ্যান করে একটা মোহের আবর্ত্তে অবোধের মত ঘুরতে লাগলেন। কোন উপদেশেই তিনি কর্ণপাত করলেন না। দৈহিক ভোগই চরম জ্ঞান করে সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিলেন। তাঁর বুড়ো আঙুলে ছিল একগুঁয়েমি, সমগ্র করতলে ছিল ভোগের লালসা। প্রতিষেধক, মান, জ্ঞান, বুদ্ধি, ছিল সব নগণ্য। কাজেই ষড়রিপুর দুইটি রিপু কাম ও মোহ তাঁকে ধূলিসাৎ করে দিল।
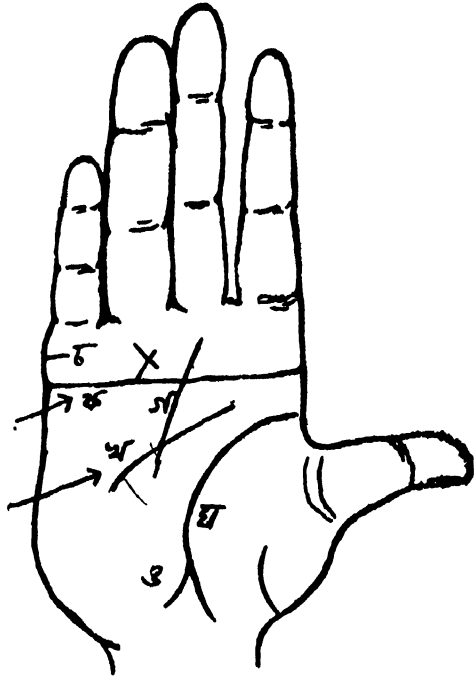
এর জন্য দায়ী কে? সবটাই কি ওই ভদ্রলোকটি? তাঁর বংশের ধারা, পারিবারিক ও বিদ্যালয়ের শিক্ষা কর্ম্মের পঙ্কিল আবহাওয়া, হীনরুচিযুক্ত বন্ধুবান্ধবের পরিবেশ কি এই অধঃপতনে সাহায্য করেনি? অবশ্য তাঁর যে যথেষ্ট দোষ ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। এখন যার দোষ যতটাই যে দিক হাত কিন্তু সংবাদ দিয়েছিল—ভদ্রলোকের বিপদ্ কোথায় কেন এবং কি করণীয় ছিল। আজকালকার সভ্যতার দিনে হাতের কথা মানে রূপ

ক—হৃদয় রেখা

গ—ভাগ্য রেখা

খ—মস্তিষ্ক রেখা

ঘ—জীবনী রেখা

ঙ—ভ্রমণ রেখা

চ—বিবাহ রেখা

(১) কনিষ্ঠাঙ্গুলী ছোট—বুদ্ধি চর্চা, মস্তিষ্ক চর্চা কম।

(২) অনামিকা অধিকপুষ্ট—বাহ্যাড়ম্বর অধিক। আমোদ আহ্লাদে অধিক রুচি।

(৩) বৃদ্ধাঙ্গুলী দৃঢ় এবং অঙ্গুলী সকল হইতে সমকোণে অবস্থিত—স্বাধীন ও জেদী স্বভাব, স্বমতপ্রধান।

(৪) ঙ রেখা—চাঞ্চল্যকারক, উচ্চ চন্দ্রক্ষেত্র সহ—কল্পনা প্রবণতা।

(৫) ক রেখা—অত্যধিক স্নেহান্ধকারক

(৬) খ রেখা—অবিবেচনা, হঠকারিতা, সুবিধাবাদিতা, অগ্রপশ্চাৎ চিন্তাহীনতা।

(৭) গ রেখা—জীবনে সংঘর্ষ।

কথা। কাজেই হাতের মান নাই, হাতের বার্ত্তা শোনবার কারই বা আগ্রহ আছে ?

এই ভদ্রলোকের হৃদয় রেখা উভয় হাতেই সোজা শক্ত রেখায় করতলের শেষ দুই প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই হৃদয় রেখায় কোন ঢেউ না থাকায় স্নেহান্ধ অবস্থা ঘটে ছিল। এবং নিজের প্রিয়জনকে নিজের সান্নিধ্যে রাখার জন্য অপরিসীম মোহ ছিল। মস্তিষ্ক রেখার অপরিপক্বতা হেতু নিজের ভুল কোন দিনই নিজের কাছে ধরা পড়লোনা। পরের বুদ্ধি শোনার মত Adaptability তাঁর ছিল না। কারণ বুড়ো আঙুলে ছিল এক রোখা ভাব, বৃহৎ ললাটে করতলে ছিল আত্মকেন্দ্রিক ভাব, মাংসল হাতে ছিল ভোগের ঝোঁক। অত্যুচ্চ শুক্র ভোগকে অতৃপ্ত লালসায় শেষ করল। অন্যান্য গ্রহস্থানগুলি অনুন্নত থাকায় উচ্চ প্রশংসনীয় চিন্তা বা চেষ্টা দেখা গেল না। পাশবিক মনোভাবই তাকে ঘিরে রাখল। Rationalityর বিকাশ তাঁর হোল না। ছোট ছোট মোটা আঙুলগুলি আলস্য ও ভোগচিন্তার গণ্ডীর মধ্যেই তাকে আবদ্ধ করে রাখল। কাজেই তার জীবনের উৎকর্ষ আসবে কোথা থেকে ? তাঁর জীবনের এই গতি, ধারা ও পরিণতি নানান্ রেখা, চিহ্ন, হস্তের গঠন ইত্যাদিতে হস্ত-আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত লেখা ছিল। প্রশ্ন আসে—কে পড়ে ? কে বোঝে ? কে শোনে ? কে মানে ?

(চলবে)

চৈত্র মাস কেমন যাবে ?

চৈত্রমাসের গ্রহসংস্থান শুভাশুভ দেখা যায়। গ্রহরাজ রবি, চন্দ্র ও বরুণের সহিত শুভ সম্বন্ধ করলেও প্রজাপতি ও বৃহস্পতি গ্রহদ্বয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিকে ধাবমান হচ্ছেন। কেবল তাহাই নয়, রাহুর ছায়ায় ঢাকা পড়তে চলেছেন। রবি যাঁর গৃহে অবস্থান করছেন, তাঁর অধিপতি বৃহস্পতি গ্রহ পরম শত্রু বুধের গৃহে অবস্থান করছেন। কাজেই মাসাধিপতি রবি যখন বে-কায়দায়, চৈত্র মাসের সাধারণ ফল কী করে প্রশংসা করা যায় বলুন।

রবি রাজসরকারের কারক। কাজেই বিভিন্ন রাজসরকারকে এখনও অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। উপযুক্ত অর্থের টান বোধ হবে এবং হঠাৎ ঝঞ্ঝাটের সম্মুখীন হতে হবে। কর্ম্মপ্রসারের খুব আগ্রহ থাকলেও প্রচুর বাধা এসে পড়বে। অবশ্য চন্দ্র ও বরুণের সহিত রবির ভাল সম্বন্ধ থাকাতে ভাব ও কল্পনার দিক দিয়ে অনেকখানি এগোন যেতে পারে। কাজেই এখন nice plan-এর সময়, execute না হয় পরেই করা যেতে পারে।

চন্দ্র শনির ক্ষেত্রে শনি দৃষ্ট। শুক্রও তাঁকে বৈর দৃষ্টি দিচ্ছেন। কাজেই মানসিক ভীতি, শুষ্কতা এবং বহু মূল্যবান দ্রব্যাদি নাশ এই মাসে কিছু হবে বৈ কি। অবশ্য এটা কাটিয়ে উঠে শুভের মুখ দেখা যাবে। কারণ চন্দ্র ঠিক দুর্ব্বল বা পীড়িত বলা যায় না। মনোবল ধরে অগ্রসর হলে শুভফল সুনিশ্চিত।

মঙ্গলগ্রহ বলবান্ থাকায় যতটা সাহস অবলম্বন করা যায় ততটাই শুভপ্রদ।

শুক্রগ্রহ মেষের আগুনে পুড়ছেন, শনির সান্নিধ্যে আবার ঠাণ্ডাও হচ্ছেন, চন্দ্র বৈরদৃষ্টি দিয়ে ভাবের জ্বালা বাড়িয়ে তুলছেন। কাজেই ভোগ, বিলাস, স্বাচ্ছন্দ্য এ মাসে শিকেয় তোলা থাকা ভাল। শুক্রগ্রহ বৃষ ও তুলা রাশির অধিপতি কাজেই যাদের বৃষ বা তুলা লগ্ন, অথবা চন্দ্র বা রবি এই দুই গৃহের কোনটীতে অবস্থিত তাঁদের কিছু দুর্ভোগ হবেই। অবশ্য বৃষ রাশি থেকে গ্রহ সন্নিবেশ ভাল থাকায়, বৃষের লোকেরা ততটা বেগ পাবেন না।

এবার ব্যক্তিগত মাসফল বিচার করা যাক্।

বৈশাখ—যাঁদের বৈশাখ মাসে জন্ম তাঁদের চৈত্র মাসে কাজকর্ম্মের যোগাযোগ অনেক। মাথায় গুরু দায়িত্ব এসে পড়েছে, দেখা যাচ্ছে। এই চাপ থাকবেও অনেকদিন কারণ দায়িত্ব পরিশ্রম ও চিন্তাকারক শনি সবে আপনার রবি রাশিতে পদার্পণ করেছেন। আপনার যা ঔজ্জ্বল্য তা ঢাকা পড়তে চলেছে নানান্ অমোঘ অসুবিধায়। আপনার চাই ধৈর্য্য, স্থিরতা। তাহ'লেই আপনার ভবিষ্যৎ দিনগুলি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করতে পারবেন। এ ত গেল বৎসর দুই আড়াইয়ের সাধারণ কথা। এ

মাসের ফল হিসাবে, কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করলে ভাল করবেন। ভ্রমণের যোগাযোগ এলে গ্রহণ করতে পারেন, বুদ্ধি, বিচার, বিশ্লেষণ, শিল্প চর্চা ইত্যাদি ব্যাপারে তৎপর হউন।

আরামকে বিলাস বা আলস্যে দাঁড় করাবেন না। কেবল relax করে নেবেন, পুনরায় কর্ম্মে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে।

কাজ থেকে বা পৈতৃক সূত্রে টাকা কড়ি হাতে এসে পড়বে, চিন্তার কারণ নাই। তবে খরচও আপনার তোলা আছে। ধর্ম্মচর্চ্চায় বাধা অনেক, বুদ্ধির চাঞ্চল্যও থাকবে। মধ্যে মধ্যে দুঃসাহসিক কর্ম্মে এগিয়ে যাবার প্রেরণা পেতে পারেন।

জ্যৈষ্ঠ মাস—যাঁদের জ্যৈষ্ঠ মাসে জন্ম তাদের আয় ভালই হবে। গৃহবাটী সংক্রান্ত লাভও আশা করা যায়। কর্ম্মে যোগ্যতা দেখাতে পারবেন। মাথা গরম করবেন না। একটু সংযত হয়ে কাজ করলে মোটামুটি ভাল ফলই পাবেন। সন্তান যাঁদের আছে তাঁদের অনেকদিন উদ্বেগ চ'লছে, সত্যি। কিন্তু এ মাসে তাদের সম্বন্ধে যদি কিছু শুভ plan থাকে এগিয়ে যান। আপনি বিবাহিত হলে আপনার স্ত্রী বা স্বামীর মেজাজটা একটু কড়া থাকবে। উপায় নাই। শত্রুকে যদি দমন করতে চান, এইটাই আপনার সময়। কিন্তু জানেন ত এসব কাজে নিজের অশান্তি কিছুটা এসে পড়ে। এ মাসে আপনার ব্যয় যথেষ্টই হবে। বন্ধুবান্ধব বাড়বে কিছু ঘোরাঘুরিও হতে পারে। ঘরের ঠিক আরাম কোণটিতে বসে মৌজ করবেন, সে সুযোগ বোধ হয় এ মাসে পাচ্ছেন না।

আষাঢ়-যাঁদের আষাঢ় মাসে জন্ম তাঁদের চৈত্রমাস ভালই দেখি। গৃহসুখের অভাব তো অনেকদিন থেকেই চলেছে। সে দিকে কতকটা সুবিধে হলেও হতে পারে। পিতামাতার স্বাস্থ্য ভাল দেখিনা। কর্ম্মে অনেক ঝঞ্ঝাট আছে সত্য, কিন্তু প্রসারের পক্ষে শুভ। আয় ভাল হবে, শত্রু দমিত থাকবে। পড়াশোনায় চেষ্টা করে মন দিন, খাটলে ফল খারাপ হবে না। যদি ভেবে থাকেন বুদ্ধির জোরে পরীক্ষার মঞ্চে উঠে বিনা মহড়ায় মেরে দেবেন, তাহলে আমাকে বলতে হচ্ছে 'sorry'. মনটা উচ্চ চিন্তায় থাকলেও কঠোর বাস্তবতা আপনাকে প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন কাজের মধ্যেই ঘাড় গুঁজিয়ে দেবে। আপনি Cinema জগতের লোক হলে আপনার ভাল তারিফ হবে বলে মনে করছি। জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসে জন্ম এমন উকীল বাবুরাও ভাল নাম ও কাজ করবেন।

যাঁদের সন্তান আছে, তাঁরা সন্তানদের নানাবিধ দুর্ব্বলতা অপনোদন করার জন্য সচেষ্ট হলে ভাল করবেন। তাদের ব্যাপারটা ভাগ্যের উপর ছেড়ে রাখলে ভাল হবে না।

যাঁরা বিবাহিত তাদের পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য ও মেজাজ সুবিধের নয়। কিছুটা ধৈর্য্য ধরুন, এই উদ্বেগ চলে যাবে। উত্তরাধিকার সূত্রে যাঁদের কিছু পাবার যোগাযোগ আছে, তাঁরা এই বিষয়ে তদ্বির সুরু করে দিন, সবটা তকদীরের উপর ছাড়বেন না।

শ্রাবণ—যাঁদের শ্রাবণ মাসে জন্ম, তাঁদের মাথায় দায়িত্ব এসে পড়ছে। সাংসারিক বিশৃঙ্খলা এ দুশ্চিন্তার সম্মুখীন হতে হবে মধ্যে মধ্যে। মাতার স্বাস্থ্য, জীবিত থাকলে, বিশেষ ভাল থাকবে না। একটা না একটা শারীরিক দুর্বলতা লেগেই থাকবে। এখন গৃহ সংসার ইত্যাদি ব্যাপারে যতটা সম্ভব যত্ন নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। বন্ধু-বান্ধব নিয়েও কিছুটা বিব্রত বোধ করতে হবে। এ সব ফল কেবল চৈত্র মাসের জন্য নয়, অন্ততঃ বৎসর দুয়েক এই ধারাতেই এগোবে। কাজেই কোন প্রকার অবহেলা চলবে না। আয় খারাপ দেখি না, কিন্তু ব্যয়াধিক্যই বেশী। কাজেই আর্থিক অসন্তোষ কিছু থাকার কথা এই মাসে। যদি বিবাহ না করে থাকেন এ মাসে বিবাহের কথাবার্ত্তা বা যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। আপনার অমত না করাই বাঞ্ছনীয়। ব্যবসায়ী হলে, ব্যবসা প্রসারের চেষ্টা করুন। লোকের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি করুন। বিদ্যার ফল খারাপ নয়, অবশ্য পরিশ্রম এড়িয়ে হবে না। সহোদরাদি বা আত্মীয় জ্ঞাতি সংক্রান্ত যে উদ্বেগ চলছে, এ মাসে তার কম দেখি না।

ভাদ্র—যাঁদের ভাদ্র মাসে জন্ম তাঁদের ঘোরাঘুরি কিছু করতে হতে পারে। পারিপার্শ্বিক অবস্থাও সুখপ্রদ থাকবে না। অনেক সময় দুঃসাহসের কাজ করতে হতে পারে বা কোন বিপদের সম্মুখীন হওয়াও অসম্ভব নয়। অবশ্য ভাল বন্ধুর সাহায্য পেতে পারেন। অর্থ ব্যাপারে আপনার উদ্বেগ রয়েছে। আয় অবশ্য ভালই হবে। যাঁদের জমি-

জমা আছে তাঁরা সেই সবের উন্নতির জন্য তৎপর হতে পারেন।

যাঁরা অবিবাহিত তাঁদের বিবাহের বাধা অনেকটা অপসারিত হোল। আগামী নভেম্বরের পর থেকে বিবাহের যোগাযোগ বাড়বে অনেক বেশী।

যাঁরা ব্যবসায়ী তাঁদের ব্যবসার রাস্তা এবার খুলতে থাকবে। সহোদরাদি বা জ্ঞাতি-আত্মীয় সংক্রান্ত উদ্বেগ এসে পড়ছে।

আশ্বিন—যাঁদের আশ্বিন মাসে জন্ম তাঁদের ব্যবসা বাণিজ্যের বাধা অনেকটা অপসারিত হোল সত্য, কিন্তু এখনও অনেক ধৈর্য্য নিয়ে এগোতে হবে। বিবাহিত হলে পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল চলবে না। নিয়মিত তার যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। সন্তান স্থান ভালই, অবশ্য মধ্যে মধ্যে উদ্বেগ এসে পড়তে পারে। রোজগার ভাল হবে। নিজের প্রতিষ্ঠা ঠিক থাকবে। আপনার উদ্বেগ একটা রয়েছে অনেকদিন। সেটা আস্তে আস্তে সরে যাবে। আপনার আবহাওয়া এমন যে বিপদ কিছু না থাকলেও হঠাৎ ঝঞ্ঝাট বা দায়-দায়িত্ব এসে পড়তে পারে। কাজেই আপনাকে সব সময় alert থাকতেই হবে। অবশ্য বেশী উত্তেজিত হয়ে [illegible]বেন না। আপনি ব্যবসায়ী হলে যতটা লোকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন ততটাই ভাল, আপনার কায়িক পরি[illegible] এ মাসে বেশ খানিকটা করতে হবে।

কার্ত্তিক—যাঁদের কার্ত্তিক মাসে জন্ম তাঁদের সংসারের দিকে দৃষ্টি এবার থেকে অধিক পড়বে। বন্ধুবান্ধবও Selected হবে। বন্ধুস্থান মোটামুটি ভালই। বাড়ী-ঘরের দিকে যত্ন নিলে কতকগুলি অভীষ্ট সিদ্ধি হতে পারে। এটা অবশ্য কেবল চৈত্র মাসের কথা নয়। প্রায় দুই বৎসর রয়েছে এই ব্যাপারে উন্নতি করার। লেখাপড়াও এই সময় মধ্যে ভাল। বিদ্যার পক্ষে এই মাসটা শুভই। অগ্রজের পক্ষে এই মাসে একটা পরিবর্ত্তন হতে পারে। অনুজের পক্ষে সময়টা ভাল চলছে না। নভেম্বরের পর থেকে ভাল আশা করা যায়। নিজের খরচ বেড়ে যাবে। হাতে টাকা রাখাই শক্ত হবে। বিবাহের কথাবার্ত্তা বা যোগাযোগ আসবে। এটা নভেম্বরের পর অধিক বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসায়ীর পক্ষে ব্যবসা খারাপ নয়। তবে long-term Scheme নিতে পারলেই ভাল। যাঁরা ডাক্তারী বা ওকালতী করেন তাঁদের মস্তিষ্ক ভাল চলবে। তাঁদের নিজেদের বিষয়ের গভীরে যেতে পারবেন।

অগ্রহায়ণ—যাঁদের অগ্রহায়ণ মাসে জন্ম তাঁদের রবি রাশ্যাধিপতি মঙ্গল স্বক্ষেত্রস্থ। কাজেই নিজ শক্তিতেই স্বপ্রতিষ্ঠ। অনেকদিন ধরে বরুণগ্রহ রবিরাশিতে থাকায় কখনও কখনও মনে দোলা ও সন্দেহ আসবে এবং ভয়ও হতে পারে "সব ঠিক থাকবে ত।" কিন্তু চিন্তার কোন কারণ নাই, প্রতিষ্ঠার কোন হানি হবে না। জ্ঞাতি-আত্মীয় চিন্তা বেশী বাড়তে পারে এবং প্রয়োজন মত তাদের জন্য কিছু sacrificeও করতে হবে। ধর্ম্ম ব্যাপারে ঝোঁক থাকলে, সাধনা বাড়াতে পারেন। স্থানান্তর গমনাগমন সম্ভব। আয় ভাল দেখি, কিন্তু নূতন ব্যয়ের রাস্তা খুলছে যা আপনার সঞ্চয়কে কুরে কুরে খাবার চেষ্টা করবে। বিদ্যার ব্যাপারে মনোনিবেশ বেশী করতে পারবেন কি? খানিকটা চেষ্টা করে দেখুন।

পৌষ—যাঁদের পৌষ মাসে জন্ম তাঁদের ভাগ্যের শুভ পরিবর্ত্তন সম্ভব। কর্ম্ম বা চাকুরী ব্যাপারে যে দায় দায়িত্ব ছিল তার অনেকটা কমলেও এখনও সম্পূর্ণ উদ্বেগ যায় নি। আরো কয়েকমাস লাগবে উদ্বেগ যেতে। আয় চৈত্রমাসে ভাল হবে, তবে খুব মনঃপূত হবে না। ব্যয়াধিক্য দেখা যায়। যদি উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু পাবার বা আদায় করবার কথা থাকে সে বিষয়ে চেষ্টা করুন এই মাসে। আপনার কোন সহোদরের উন্নতি বা কোন প্রকার সুখ সুবিধা হতে পারে। মা'র স্বাস্থ্য ভাল থাকবে না। কোন বন্ধু-বান্ধব থেকে সুযোগ সুবিধা আসতে পারে। যদি বিদেশে পড়ার ঝোঁক থাকে, চেষ্টা করুন। সন্তানদের ব্যাপারে দায় দায়িত্ব এসে পড়ছে। তাদের সম্বন্ধে নিয়মিত সজাগ দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়।

মাঘ—যাঁদের মাঘ মাসে জন্ম তাঁদের বিবাহের যোগাযোগ বেশী আসছে। বিবাহ ভালই হওয়ার কথা। অযথা দেরী করবেন না। আয়ের জন্য কোন চিন্তা নাই। খাটুন, উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাবেন। নিজের বিক্রম, প্রতিষ্ঠা সব ভাল দেখি। বাক্‌বিতণ্ডা বা বিবাদের সম্মুখীন হতে হলে মুখে কথার তোড় এসে পড়বে। সংসারের চিন্তা মাথায় ঢুকতে আরম্ভ করেছে, বৎসর দুয়েক এ থেকে নিস্তার নাই। যতটাই পারিবারিক ব্যাপারে নজর রাখতে পারবেন,

ততটাই বন্দে শক্ত করতে পারবেন। পিতার স্বাস্থ্য ভাল চলবে না, বাত-শ্লেষ্মায় তিনি পীড়িত বোধ করতে পারেন। মা'ও দেখবেন তাঁর কর্ম্মসীমানায় একটা limitation এসে পড়েছে। বিদ্যার ব্যাপারে ফল খারাপ নয়। কাজের ঝঞ্ঝাট কিছু এসে পড়ছে। একদিনে যাবে না। চাই ধৈর্য্য ও সতর্কতা, নচেৎ যোগ্যতার উপর নিন্দা এসে পড়তে পারে।

ফাল্গুন—যাঁদের ফাল্গুন মাসে জন্ম তাঁদের বুদ্ধি তীক্ষ্ণ থাকবে। তৎপরতা ও যোগ্যতার সহিত কাজ করতে পারবেন। খাটুনি ভালই থাকবে, উপায় নাই। বদলীর যোগাযোগ এসে পড়তে পারে। স্বাস্থ্য খারাপ দেখি না, তবে অযথা চিন্তা বাড়াবেন না। নিজের বিক্রম প্রতিষ্ঠা অটুট থাকবে। ব্যবসায়ে অর্থলাভ দেখি, তবে খরচ হয়ে যাবে। স্থানান্তর গমনাগমন সম্ভব। ধর্ম্মসাধনায় ভাল অগ্রসর হতে পারবেন। মেজাজ শান্ত রাখুন, ভোগের দিকে নজর কম দিন। বিবাহের কথাবার্ত্তা এলেও যোগাযোগ পিছিয়ে যেতে পারে। সঞ্চয় করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। বিনা চেষ্টায় জমান শক্ত হবে। সন্তান স্থান ভাল। তাদের দায়দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যবোধ বাড়তে চলেছে।

চৈত্র—যাঁদের চৈত্র মাসে জন্ম তাদের চৈত্র মাসে নূতন বৎসর সুরু হচ্ছে। কাজেই চৈত্র মাসের গ্রহসংস্থানে কেবল চৈত্র মাসের ফল প্রকাশিত হবে না, মোটামুটি ভাবে সারা বৎসরের ফল ঐ গ্রহসংস্থানই দেখাচ্ছে।

রবিরাশিতে রাহু থাকায় চৈত্র মাসের জাতকদের সারা বৎসরই দৌড়-ঝাঁপ করতে হবে। স্থির হয়ে বসে থাকা চলবে না। অনেক সময় হঠাৎ ঝঞ্ঝাট এসে বিব্রত করে তুলতে পারে। তবে সাহসে ভর করে এগোলে দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্পাদন করে উঠতে পারবেন। অর্থের ব্যাপারে কৃপণতা এসে পড়তে পারে, কিন্তু খুব ব্যয়সংকোচ করে উঠতে পারবেন না। ব্যবসায়ে উদ্বেগ চলবে এবং অনেক হঠাৎ emergency অবস্থার সম্মুখীন হয়ে উঠতে পারে। partnership ব্যাপারে মন কষাক ষ বা চুক্তি-ভঙ্গ ইত্যাদি হতে পারে। তবুও চাকরী অপেক্ষা স্বাধীন ব্যবসা বাঞ্ছনীয়। পতি বা পত্নীর জন্য উদ্বেগ চলবে। তাঁর মেজাজও মাঝে মাঝে বোঝা ভার হবে। শত্রুর কথায় নাচবেন না। আপনাকে অযথা উত্তেজিত করে দেওয়াই তার উদ্দেশ্য।

সাংসারিক ব্যয় কিছু এসে পড়েছে। ঘর বাড়ীর দিকে নজর না রাখলে সে সব ক্রমশঃ অগোছাল হয়ে পড়বে। আয় ভালই, চিন্তার কারণ নাই। ধর্ম্মব্যাপারে উৎসাহী হতে পারেন, তীর্থপর্য্যটনও সম্ভব হতে পারে।

বৈশাখ মাস কেমন যাবে

বৈশাখ মাসের গ্রহ সংস্থান ভাল নয়। বিশেষ করে অনেকগুলি গ্রহ ষষ্ঠাষ্টম সম্বন্ধ করেছে। রবি উচ্চস্থ হলেও নীচ শনি দ্বারা আক্রান্ত এবং ৫।৬ বৈশাখের মধ্যে অর্থাৎ ১৮।১৯ এপ্রিলের মধ্যে শুক্র ও বরুণের সঙ্গে ষষ্ঠাষ্টম সম্বন্ধ পূর্ণ করছে। কাজেই বহু বাধা বিঘ্ন অবশ্যম্ভাবী। কোন রাজ সরকারের পক্ষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা সম্ভব নয়। রুশ-চীন সম্বন্ধ অধিকতর তিক্ত হবার আশঙ্কা করা যায়। কেবল রুশ চীন কেন আরব ইস্রাইল ব্যাপারটা মীমাংসার উল্টে দিকে যাবার সম্ভাবনা। এক কথায় যে সব দেশের মধ্যে পরস্পর বিরোধী ভাব রয়েছে এবং যে সব সরকার বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রেশারেশি আছে তাদের মধ্যে গড়মিলের আধিক্যই দেখা যায়, কেহই কাহারও ভাষা বুঝবেন বলে মনে হয় না। মোট কথা গঠন মূলক কিছু আশা দেখা যায় না, সবেতেই প্রতিবন্ধকতা। এমন কি তাপ আক্রোশ আক্রমণই অধিক। সমগ্র পৃথিবীর যখন এইরূপ গ্রহফল তখন ব্যক্তিগত সুখ সুবিধা কতটা পাওয়া যেতে পারে অনুমান করে নিন। যাই হোক ব্যক্তিগত মাসফল নীচে জানাচ্ছি।

বৈশাখ—যাঁরা বৈশাখ মাসে জন্মেছেন তাঁরা নূতন বর্ষে পা দিচ্ছেন। কাজেই তাঁদের পক্ষে এই গ্রহ সংস্থান শুধু বৈশাখ মাসের ফল জানাবে না, সমগ্র বৎসরটার কেমন ফল আশা করা যায় তার আভাস দিচ্ছে। যাঁদের ৫ই।৬ই বৈশাখে জন্ম তাঁদের পক্ষে বৈশাখ মাসটা এবং এই নূতন বৎসরটা মোটেই ভাল না, বহু দিকদারী তাদের পেতে হবে। মোটামুটি ভাবে ১লা থেকে ১০ই বৈশাখের জাতকের পক্ষে অর্থাৎ ১২ই এপ্রিলে থেকে ২২শে এপ্রিলের জাতকের অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হবে।

যাই হোক বৈশাখ মাসের মোটামুটি ফল এই।

আপনাদের ঘাড়ে দায়-দায়িত্ব এসে পড়েছে, বহু ঝঞ্ঝাট, অশান্তি ও তিক্ততার মধ্যে দিয়ে যেতেই হবে। কিছু ভুল হিসাব করে ফেলতেও পারেন। অবশ্য বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা থাকবে। জেদ অহংকার বা অগ্রাহ্য ভাব নিয়ে ভুল করে বসবেন না যেন। যদি বিচার করে কাজ করেন, বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ও দিতে পারবেন। যদি পড়াশোনা করেন, গভীর ভাবে ডুবে যান। নচেৎ আশাহত হতে হবে। অর্থ ব্যাপারে খারাপ নয়। প্রয়োজনীয় অর্থ ঠিক জুটে যাবে। জ্ঞাতি আত্মীয় ভাইবোন সংক্রান্ত শান্তি দেখিনা। উভয়েরই জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। হয়ত আপনাকে তাঁদের জন্য অনেক দায়-দায়িত্ব পালন করতে হবে। আপনি নিজে থেকেই অনেক বিপদে লাফিয়ে পড়বেন। গৃহাদি ব্যাপারে বা বন্ধুবান্ধব মারফৎ কিছু লাভ হবে। যাঁদের বাড়ী বা গাড়ী কেনার ক্ষমতা এবং আগ্রহ আছে তাঁরা বাড়ী গাড়ী লাভের জন্য চেষ্টা করুন। যাঁদের বাড়ী বদল বা কোন প্রকার সংস্কারের দরকার তাঁরাও এই সব কাজে আগ্রহান্বিত হতে পারেন। মোটামুটি ভাবে মাতৃগত, বন্ধুগত, ও সম্পত্তিগত লাভ সম্ভব।

যাঁরা বিবাহিত তাদের পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল দেখিনা। যাঁরা অবিবাহিত তাঁদের পক্ষে বিবাহে কোন প্রকার বাধা আসতে পারে। আমার মতে যাঁদের বৈশাখ মাসে জন্ম তাঁদের এই বৈশাখে বিবাহ না করাই বাঞ্ছনীয়।

যাঁদের সন্তানাদি আছে, তাঁদের সন্তান সংক্রান্ত উদ্বেগ অশান্তি এসে পড়বে।

জ্যৈষ্ঠ—যাঁদের জ্যৈষ্ঠ মাসে জন্ম, তাঁদের আয় ভালই দেখি এবং মোটামুটি ভালই থাকবেন, কতকটা আনন্দে কিন্তু ব্যয় হবে জলের মত, কাজেই আয় যাই করুন ভাঁড় খালি হয়ে যাবে। না চাইলেও অপরের সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা এসে পড়বে। ধর্ম্ম চর্চ্চা ঘরে বসে হবেনা, যদি তীর্থ ভ্রমণ করেন সে দিকে সুবিধে আছে। কর্ম্ম ব্যাপারে বদলী হবার আশঙ্কা দেখি। যদি জনসেবা করেন, এগিয়ে যান, যোগ্যতা দেখাতে পারবেন। উকীল, ডাক্তার, শিল্পী, শিক্ষক, ছাত্র, জ্যোতিষীর পক্ষে মাসটা মোটেই ভাল নয়, কারণ বুধের অবস্থা বিপর্য্যস্ত। বিশেষ করে জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ ও চৈত্র মাসে যাঁদের জন্ম তাদের পক্ষে ঐ সব কর্ম্মজীবীর বাধা বিঘ্ন অনেক বেশী।

অপরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বিবাদ বর্জ্জন করবেন, কারণ প্রত্যক্ষ ও গুপ্ত শত্রুতা দুই দেখা যায়। পিতৃব্যদের সময়টা মোটেই ভাল নয়। আত্মীয় চিন্তা প্রাধান্য লাভ করতে পারে। চিঠি পত্রের আদান প্রদান বাড়তে পারে।

আষাঢ়—যাঁদের আষাঢ় মাসে জন্ম তাঁদের ঝঞ্ঝাট কিছু থাকলেও তেজ বিক্রম, প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাবে। স্বপ্রতিষ্ঠা বজায় রাখার জন্য বহু ঝামেলা ভোগ অবশ্যম্ভাবী। বেশী জেদ বশতঃ কাজ করে শরীরের দিকে দৃষ্টি আলগা করবেন না। উদরপীড়ার ভোগ দেখা যায়। বিদ্যায় শুভাশুভ, কতক বিষয়ে ভাল হলেও, কতক বিষয়ে অত্যন্ত অসন্তোষ জনক হতে পারে। কর্ম্মজগতে মান খাতির ইত্যাদি পেতে পারেন। কর্ম্ম স্থানের আবহাওয়াও মোটামুটি ভাল থাকবে। আয় ভাল দেখি। প্রয়োজন হলে ধারও করতে হবে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তি যোগ দেখা যায়। পারিবারিক দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে। বিবাহের ভাল যোগাযোগ দেখা যায়। যাঁদের সন্তানাদি আছে তাঁদের সন্তান সংক্রান্ত ঝঞ্ঝাট চলবে। পতি বা পত্নী সুখ আশা করা যায়।

শ্রাবণ—যাঁদের শ্রাবণ মাসে জন্ম তাঁদের অর্থোপায়ে যে বাধাই আসুক শেষ পর্য্যন্ত লাভ দিয়ে যেতে হবে। কতক বিষয়ে পারিবারিক সুখ থাকলেও কতক বিষয়ে বহু অশান্তি হতে পারে, নিজেই হয়ত হঠকারিতা করে বসবেন। আত্মীয় স্বজনগত দায় দায়িত্ব যাই থাক্ তাঁদের মারফৎ বা তাঁদের সংক্রান্ত লাভ, সুবিধা দেখা যায়। আমার মতে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখাই বাঞ্ছনীয়। বৈশাখ মাসে contract, agreement কিছু হতে পারে, এবং হলে খারাপ হবে না। ১৮।১৯ এপ্রিল নাগাদ টাকার চাপ খেতে পারেন। সন্তান স্থান ভাল। শিল্পাদি চর্চ্চায় এবং চলচ্চিত্র অভিনয় ব্যাপারে সুবিধা হবে। কর্ম্মব্যাপারে ঘোরাঘুরি যথেষ্ট করতে হতে পারে। আয় ভাল হবে। তবে ব্যয় ঠেকাতে পারবেন না।

ভাদ্র—যাঁদের ভাদ্র মাসে জন্ম তাঁদের বিবাহের যোগাযোগ বেশী। বিবাহিত যাঁরা, তাঁদের পত্নীসুখ বা পতিসুখ আশা করা যায়। অর্থের অভাব হবে না। অবশ্য অর্থ-

প্রাপ্তি ব্যাপারে কিছুটা উদ্বেগ অশান্তি না ভোগ করে উপায় নাই। ব্যবসায়ীর পক্ষে সময়টা মন্দ কি! ভাল বন্ধুর সাহায্য পেতে পারেন। যাঁদের কলকারখানা আছে, তাঁদের অযথা চিন্তার কোন প্রয়োজন নাই। আপনার মাথায় নূতন দায়িত্ব এসে পড়ছে, তবে চিন্তার কারণ নাই। জ্ঞাতি-আত্মীয়ের পক্ষে সময়টা তত ভাল নয়। রোজগার মন্দ হবে না। কাজে নাম করতে পারবেন। বহু লোকের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি পেতে পারে। ব্যবসা প্রসার করার চেষ্টা করুন।

আশ্বিন—যাঁদের আশ্বিন মাসে জন্ম তাঁদের অনেক বিপদ আপদ এসে পড়লেও, শেষরক্ষা হয়ে যাবে। পিতার বিপদ্ দেখা যায়। নিজেও অবিবেচনা করে বিপদের মুখে এগিয়ে যেতে পারেন। এক এক সময় ভুল বিচার বুদ্ধির দ্বারা নিজের ক্ষতি করে ফেলতে পারেন। কোন প্রকার হঠকারিতা বাঞ্ছনীয় নয়। বিবাহের ভাল যোগাযোগ উপস্থিত হতে পারে। বিবাহিত যাঁরা তাঁদের পতি বা পত্নীর অর্থ ও স্বাস্থ্য ভাল থাকবে না। সন্তান সংক্রান্ত অনেক উদ্বেগ অশান্তি ভোগ করতে হবে। লোভ করে বেশী ভোজন করলে উদরের অবস্থা ভাল থাকবে না। শত্রু চিন্তা বা রোগচিন্তা দেখা দিতে পারে। কোন কোন জাতকের মাতুল সংক্রান্ত চিন্তা আসতে পারে। সহোদর স্থান ভালই, তাদের প্রাধান্য বাড়তে পারে। মাতৃস্থান শুভ। কর্ম্মের উদ্বেগ, দায়িত্ব ও ঝামেলা থাকবে।

কার্ত্তিক—কর্ম্ম ও বিদ্যাসংক্রান্ত শুভফল, অবশ্য বিদ্যায় খুব উৎকর্ষ দেখা যায় না। ভ্রমণাদি ঘটবে, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মেলামেশা বাড়তে পারে। শত্রু কাছে কাছেই থাকবে, নিন্দা বা কোন প্রকার গুপ্ত শত্রুতা করার জন্য সব সময় তৈরী থাকবে। উপায় নাই। যতটা সম্ভব শত্রুদের neutralise করার চেষ্টা করা উচিত। বেশী আগ্রহ, বেশী initiative, বেশী স্পষ্টবাদিতা, বেশী চাঞ্চল্য অনেকের পছন্দ হবে না, বরং হিংসার উদ্রেক করবে। বিবাহের যোগাযোগ পিছিয়ে যেতে পারে। প্রীতি বা প্রণয়ে বিচ্ছেদ ঘটতে পারে। বিদ্যায় মনোনিবেশ করার চেষ্টা করুন। ফল ভালই হবে। কাজের পরিসীমা বাড়িয়ে ফেলতে পারেন। খারাপ হবে না। বরং plan ভালই হতে পারে :

বেশী করবেন না।

অগ্রহায়ণ—এই মাসে যাঁদের জন্ম তাঁদের বৈশাখ মাস ভালই কাটবে। পারিবারিক চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে। সাংসারিক কিছু করতে হলে কাঠখড় পোড়াতে হবে দুস্তর। আয় ভাল হবে, তবুও মনের তৃপ্তি হবে না। পত্নী বা পতির প্রাধান্য বাড়বে। ভ্রাতা-ভগ্নী এবং আত্মীয় সংক্রান্ত শুভ ফল দেখা যায় না। তাঁদের নানাবিধ অসুবিধা, ক্লেশ হতে পারে। বিদ্যা ব্যাপারে বেশ কিছুকাল ধরে আপনার মনোনিবেশ করাই শক্ত হচ্ছে। তবুও ভোগ বিলাস আলস্য ত্যাগ করে যদি পড়ার দিকে ধাওয়া করেন সূক্ষ্ম উপলব্ধি পর্য্যন্ত করতে পারেন। প্রণয়-প্রীতি ব্যাপারে যোগাযোগ দেখা যায়। সন্তান সংক্রান্ত আপেক্ষিকভাবে শুভফল বিবেচিত হয়। শত্রুবৃদ্ধি হলেও শত্রুকে দাবাতে পারবেন। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল থাকবে না। দাম্পত্য সুখেরও কতকটা অভাব দেখা যায়। উত্তরাধিকারসূত্রে যদি কিছু পাবার কথা থাকে, সে আশা বৈশাখে ছেড়ে দিন। গৃহে সদনুষ্ঠান করতে পারেন। বাধা থাকলেও কৃতকার্য্য হতে পারবেন। পিতার স্বাস্থ্য ভাল দেখি না। কর্ম্মে তেমন সুখ পাবেন না। পিতৃব্যদের পক্ষে সময়টা মোটেই ভাল নয়। আপনার নানাবিধ ব্যয় দেখা যায়।

পৌষ—আপনার আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশী নিয়ে উদ্বেগ থাকবে। অনেক সময় বিষাদযুক্ত বা উদ্বেগকারক পত্রাদি পেতে পারেন। উদর পীড়া হতে সাবধান থাকবেন। আহারে নিয়ম ও পরিমাপ বজায় রাখার চেষ্টা করুন। সন্তানাদির স্বাস্থ্য মোটেই ভাল দেখি না। তাদের ব্যাপারে যথেষ্ট যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। গৃহে আমোদ-আহ্লাদ বা উৎসবাদি হতে পারে। কর্ম্মে উদ্বেগ যাই থাক্ বৈশাখ মাসে কোন বিপদ নাই। বিবাহ ব্যাপারে বিলম্ব দেখা যায়। প্রণয় প্রীতি ব্যাপারে ব্যস্ত হলে মনঃক্ষুণ্ণ হতে হবে। বুদ্ধি অনেক রকম মাথায় আসবে, ভাল চিন্তা করে কাজ করবেন। যাঁরা ছেলে বা মেয়ের বিবাহ দেবেন তাঁরা বৈশাখ মাসে চেষ্টা করুন।

মাঘ—যাঁদের মাঘ মাসে জন্ম, তাঁদের অনেক সাংসারিক পারিবারিক জ্বালা ভোগ করতে হবে। সুখের কথা ছেড়ে

অর্থাগম দেখা যায়, তবে Steady থাকবে না। ভাই-বোন সংক্রান্ত কিছু লাভ সুবিধা দেখি। তাঁদের বিবাহ, কর্ম বা অন্যপ্রকার শুভফল হবে। বন্ধু বান্ধব নিয়ে বেশী জড়িয়ে যেতে পারেন। মাতার স্বাস্থ্য ভাল দেখি না। যাদের সন্তান আছে, তারা সন্তান সংক্রান্ত শুভ ব্যবস্থাদিতে এগিয়ে যান। গৃহে শত্রুতা পেতে পারেন। পারিবারিক অশান্তি অনেকের স্বাস্থ্যের জন্য হতে পারে। উত্তরাধিকার সূত্রে যাঁদের প্রাপ্তি যোগ আছে তাঁদের অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হবে। যাঁদের বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করতে হয়, তাঁদের দিক্দারী খিলক্ষণ। যাঁদের Heart দুর্বল তাঁদের অধিক পরিশ্রম বর্জ্জনীয়। কর্মে বহু ঝঞ্ঝাট ভোগের পর তবে কিছু সুবিধা পাবেন।

ফাল্গুন—যাঁদের ফাল্গুন মাসে জন্ম তাঁদের আবেগ বৃদ্ধি পেতে পারে। আয়ও বৃদ্ধি পেতে পাবে। গৃহাদি ব্যাপারে সংস্কার করতে পারেন। কাঁহারও গাড়ী বদল বা বাড়ী বদল সম্ভব। যাঁরা অবিবাহিত তাঁদের বিবাহ যোগ দেখা যায়। যাঁরা বিবাহিত তাঁরা পারিবারিক ব্যাপারে অনেকটা ডুবে যাবেন, অসন্তোষ অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও একটা পাকা ব্যবস্থায় উপনীত হতে পারবেন। ভ্রাতা ভগ্নীর সময়টা ভাল নয়। তাঁদের নানাবিধ অশান্তি হতে পারে। তাঁদের জন্য আপনাকেও অনেকটা Sacrifice করতে হবে। কর্মে খাটুনি সমানে চলবে। তাতেই আপনার প্রতিষ্ঠা ঠিক থাকবে। উদ্যম ছাড়বেন না। পারেন ত জন সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়ে ফেলুন। সন্তান বিষয়ক উদ্বেগ দেখা যায়। তাঁদের Constructive কাজে সাহায্য করুন, কোন প্রকার বাধা দেবেন না। তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনার এখন ভাবার প্রয়োজন।

চৈত্র—যদি আপনার চৈত্র মাসে জন্ম হয় এই বৈশাখে ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার অভাব হবে না। বিবাহ বা প্রণয়াদি ব্যাপারে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। অর্থক্ষয় প্রচুর দেখা যায়। আয় করবেন কি? ব্যয় তার আগেই মুখ হাঁ করেই দাঁড়িয়ে আছে। যাঁরা বিবাহিত তাঁদের দাম্পত্য সুখ কতকটা খর্ব্ব হবে; পতি পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল না থাকাই সম্ভব। কর্ম্ম ব্যাপারে কিছু অধিক facilities পেতে পারেন। আত্মীয়-স্বজনের কোন শুভ পরিবর্ত্তন সম্ভব। যাঁরা সঙ্গীত সাধনায় আছেন তাঁরা উৎসাহ করে এগিয়ে যান। নাট্যজগতেও উন্নতি করতে পারেন। রূঢ় বাক্য প্রয়োগে সংযম প্রয়োজন, নচেৎ অযথা শত্রু বৃদ্ধি হবে।

একটি মৃত্যু

শান্তশীল দাস

কোনো মতে কায়ক্লেশে দিনগুলো কাটছিল তার,
কাটছিল কোনো মতে টেনে টেনে বাধা পেয়ে পেয়ে;
তবুও দু'চোখে তার স্বপ্ন ছিল কিছু আলোকের,
কিছু আশা সুদিনের বুক ভরা ছিল সে তখনো।

সেই আশা শেষ হ'ল, সব স্বপ্ন মুছে গেল তার,
এখন নেইক আর কোনো দায় কোনও ভাবনা;
চলে গেল একেবারে সব দায় দায়িত্বের পারে,
সকাল বিকাল সন্ধ্যা নেই আর তার কাছে নেই।

ওদের দু'চোখ ভরা জল, বুকে কত হাহাকার,
ওরা আজ কেন্দ্রহারা, কী ভীষণ আঁধারের মাঝে,
একটি প্রদীপ শিখা কোনোমতে জ্বলছিল, তাও
নিভে গেল, অন্ধকার, চারিদিকে শুধু অন্ধকার।

এই অন্ধকার সে তো দেখবে না একটুও ফিরে,
তার পথ আলো-ঝরা, তার পথ নিঃশব্দ নিঝুম।

———

বিজয়ী বসন্ত

শ্রীসমীরণ রুদ্র

ছোট্ট ষ্টেশন। সেদিন নদী পেরিয়ে ষ্টেশনে পৌছানর আগেই রাত দশটার সেই ডাউন ট্রেনটা ছেড়ে দিয়েছিল। কি করি। অগত্যা রাত তিনটের কোলকাতাগামী ট্রেনখানার জন্য অপেক্ষা করতে হল। তখন বসন্তকাল, ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। সুটকেশ ও বেডিংটা ওয়েটিংরুমে রেখে প্লাটফর্মের একটা বেঞ্চিতে এসে বসলুম। আবছা চাঁদের আলোয় একজন যুবতীকে দেখলুম প্ল্যাটফর্মের ওধারে দাঁড়িয়ে আছে। না, সঙ্গে কেউ নেই। মনে হচ্ছে একাই, অথচ পরনে বেশ দামী শাড়ী, ভদ্রঘরেরই মনে হল। সেই মহার্ঘ বসন ও ভূষণকে ছাপিয়ে কিন্তু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে তার দেহের যৌবন, যেন একটি সংহত প্লাবন। রূপ ও লাবণ্যের এমন পরিপূর্ণ বিকাশ আমি এর আগে কখনো দেখিনি। একটু দূর থেকেই আমি এ সব দেখেছিলুম।

আমার মনে কেমন সন্দেহ হল। মেয়েটা বাড়ী থেকে পালাচ্ছে না তো? কিংবা ওর আত্মহত্যা বা আত্মগোপনের কোন গূঢ় বাসনা নেই তো? এমনও হতে পারে হয়তো যে প্রেমিকের ভালবাসার মধ্যে ওর মন হারিয়ে যেতে চেয়েছিল সেই পুরুষটি ওকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ওদিকে দেখি আপ লাইনে সিগন্যাল দিয়েছে। আপ গাড়ী একটা কোলকাতা থেকে আসছে। আমি জানি এই মেল গাড়ীটা এই ছোট্ট ষ্টেশনে ধরবে না। মেয়েটাও দেখি প্ল্যাটফরম থেকে কখন সুরুৎ করে নেমে গেছে। লাইনের আশে পাশে উদভ্রান্তভাবে হাঁটছে। সর্বনাশ, তাহলে যা ভেবেছি তাই। আর বসে থাকা তো যায় না। মেয়েটা এবারে দেখলুম আপ লাইনেই উঠেছে এবং লাইনের উপর দিয়ে হাঁটছে। কালবিলম্ব না করে আমি দৌড় দিলুম। ততক্ষণে গাড়ীর হেডলাইটের আলো দেখা যাচ্ছে। আমি দৌড়ে যেতে যেতে রেল লাইনের ওই ছড়ানো নুড়ি ও পাথরগুলোতে হঠাৎ টোক্কর খেয়ে পড়ে গেলুম। বিস্ময়ে বিমূঢ় ও হতবাক হয়ে গেছি। আমার হাতের তালু, হাঁটু দুটো ও কপালে ভীষণ চোট লেগেছে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে যথাশক্তি তাড়াতাড়ি উঠে আবার দৌড় দিলুম, মুখে চীৎকার করে বললুম "সাবধান, সরে যান, মেল আসছে।" দেখি সেই যুবতী লাইনের ওপর দিয়ে এবার দৌড়তে শুরু করেছে। আমিও ওর পিছু পিছু দৌড়াচ্ছি। পিছনে গাড়ীর তীব্র তীক্ষ্ণ হুইসেল শোনা গেল। আমাদের ধরি ধরি ছুঁই ছুঁই অবস্থা—আমি ওকে ধরেও ধরতে পারছিনে। প্রচণ্ডভাবে চেঁচিয়ে বললুম "আরে আরে—ওকি করছেন? লাইন থেকে নেমে পড়ুন। এখুনি কাটা পড়বেন। গাড়ি এসে গেল যে।" সম্ভবতঃ ইঞ্জিনের ড্রাইভার আমাদের দুজনকে দৌড়তে দেখেছে। গাড়ীর গতিও দেখি অনেকটা কমেছে। আবার কান ফেটে গেল হুইসেলের শব্দে। ভীষণ অবস্থা তখন। আমি ওর একটা হাত এই সময়ে কোন রকমে ধরে ফেললুম এবং সঙ্গে সঙ্গে ওকে টেনে লাইন থেকে নীচে লাফিয়ে পড়লুম। গাড়ি না থেমে এবার ধীরে ধীরে আমাদের পাশ দিয়ে সশব্দে বেরিয়ে গেল। মাথার ওপর চৈত্র মাসের তারায় ভরা আকাশ। চারিদিকে হু হু করছে শস্য সবুজে ভরা প্রান্তর। নদী থেকে আসছে নোনা জলের হাওয়া। সেই মেয়েটির ফর্সা কোমল হাত তখনো আমি বজ্রমুষ্টিতে ধরে রেখেছি। উত্তেজনায়

আমি তখনো কাঁপছিলুম। দেখলুম চেয়ে হ্যাঁ অল্প বয়সের মন্ত্র আছে ওর যৌবনে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছিল তীব্রস্বরে। সেই নিস্তব্ধ, নিশীথিনীর শুব্ধ সভায় তারার মহোৎসবে আমরা দুজনে শুধু নীরবে বসেছিলুম পাশাপাশি। হাঁ আমরা শুকনো ঘাসের ওপরই বসে পড়েছিলুম। তখন আর কে অত বাছাবাছি করে। আমি হাঁফিয়ে পড়েছিলুম। কতক্ষণ কেটে গেল। মনে হল কতকাল, কতযুগ। ও হঠাৎ কেঁদে উঠলো, কেঁদেই বলল আমায় আপনি বাঁচালেন কেন কেন বাঁচালেন বলুন। আমি কি অপরাধ করেছি আপনার কাছে?"

আমিও পাল্টা প্রশ্ন করলুম "মরতে গেছলেন কেন? এই জীবনকে নষ্ট করবার অধিকার আপনার নেই। কারুরই নেই।" এবার মিষ্ট কণ্ঠে সে বলল "আপনার এই ঔৎসুক্য ও কৌতূহল সাধারণ সৌজন্য ও শালীনতাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে না কি? আপনি কে তা আমি জানি না। আপনার পরিচয় জানি না। তবে কেন আপনার এ কৌতূহল? তবে একথা ঠিক আপনি আমার আপনজন কেউ নন। তবু স্বীকার করবো আজ আপনিই আমায় বাঁচিয়েছেন। আমি কৃতজ্ঞ। আমি চির ঋণী। আমার চরম দুঃখের মধ্যে আপনি আজ এসেছেন আমার প্রাণদাতারূপে, বন্ধুরূপে, আকাশপারের মুক্তির বাণী নিয়ে। জীবনের বাণী নিয়ে। মনে করেছিলুম আমি রোহিণী নক্ষত্রের মতন থাকবো ঐ চন্দ্রের পায়ের কাছে কাছে। কিন্তু সেই বিশ্বাসঘাতক চন্দ্র আমার হৃদয়ে বহ্নিশিখা জ্বেলে দিয়ে অন্য লীলা সঙ্গিনী ধরেছে। তাই ভাবছি প্রস্তরে কি কখনও শ্যামলের স্বাক্ষর ফোটে? দুঃসাধ্যের দেশে সুলভের আতিথ্য? আমি ভুল করেছিলুম। তাই কাঁদছি। তাই মরতে গেছলুম।" এবার আমি মেয়েটির হাত ছেড়ে দিয়েছিলুম। সুনীতি বজায় রেখে আমরা পাশাপাশি তেমনি বসে রইলুম। সব খুলে-না-বলা কোন্ গোপন কথার মায়া আমার মনকেও ভারাক্রান্ত করে তুলল। ওর জীবনের একটা করুণ ইতিহাস নিশ্চয়ই আছে। হয়তো আমি অচেনা অজানা মানুষ বলে বলতে চাইছে না। দুঃখ যদি নাই থাকবে তবে ঐ মেয়েটা এভাবে মরতে গেছল কেন এই যৌবন নিয়ে? অনুকূল মনের উৎসুক স্পর্শ পেলে হয়তো ও সবকথা বলবে। তাই আবার ওকে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলুম, "আপনার নাম কি? অবশ্য ক্ষমা করবেন জিজ্ঞাসা করছি বলে। কারণ এ ক্ষেত্রে আমার জিজ্ঞাসা না করে উপায় নেই।" স্নিগ্ধ কণ্ঠে সে বলল—"মোহনা। ডাক নাম ময়না।"

"আপনি পড়াশোনা করেছেন কতদূর?"

"আমি বি এ পার্ট টু এবার দিয়েছি।"

"কোলকাতাতেই থাকেন?"

"হ্যাঁ। ওখানে আমার মাসীমার বাড়িতে আমি থাকি। এখানে আমার কাকা ও কাকীমা আছেন। তাই এসেছিলুম। এখানে প্রায় প্রত্যেক ছুটিতে এসে থাকি। বাসন্তী পূজার ছুটিতে এসেছিলাম। ওখানে কোলকাতাতে আমি চাকরী করি।"

"কি চাকরী করেন?"

"সরকারী অফিসে ষ্টেনো-টাইপিষ্টের কাজ।"

"আপনার বাবা ও মা আছেন কি? ভাই বোন কেউ?"

"না ওঁরা কেউ নেই। এখানে আমার কাকাই আমার অভিভাবক, তাঁর এখানে ধান কল আছে। ওখানে আমার মেসোমশাই আমার অভিভাবক। তাঁর ওখানে তেল কল আছে। মাকে বাবাকে হারিয়েছি কোন্ ছেলেবেলায় তা আমার মনেও নেই।" মেয়েটির চোখে আবার জল এল। সে বলতে লাগল "আপন কাকা তো তাই কাকা আমাকে খুব ভালবাসেন। তিনি অপুত্রক। মেসোমশাইও নিজের মেয়ের মত ভালবাসেন। তাঁরও কোন মেয়ে নেই। দুঃখ ছিল না কোথাও। রাত্রে নিজের পড়াশোনা নিয়ে থাকি, এরপর এম এ পড়ার ইচ্ছাও আছে। কাজের মধ্যে আনন্দ পাই। সারাদিন কাজ নিয়েই থাকি। দশটা-পাঁচটা অফিস করি। এরই মধ্যে মানে আমাদের অফিসেরই একজন সুন্দর, বুদ্ধিমান ও প্রতিভাদীপ্ত যুবকের মন ছুঁয়েছিল আমার এই কাঁচা বয়সের মায়া। আমি প্রথমে অত বুঝি নি। সেই যুবক অফিসার যে শয়তান, লম্পট, শঠ ও বিশ্বাসঘাতক আমি ওর সুন্দর মুখ দেখে প্রথমে অত শত বুঝতে পারিনি। আমার বস্ তো, প্রায়ই ডেকে পাঠাতো ওর চেম্বারে। ছুটির পরে ওর গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে বেড়াতে যেত। সত্যি কথা বলতে কি ও কাছে থাকলে, কথা বললে, ভাল লাগতো। পুলক জাগতো

আমার দেহে। আমার হৃদয়ে লতা প তার অন্তরালে বেরিয়েছিল একটি কুঁড়ি। তারপর একদিন রাঙা পাপড়ি মেলে সেই কুঁড়ি যে মধুর রসে প্রেমের ফুল হয়ে ফুটে উঠবে তাও আমি তখন বুঝতে পারিনি। একটা বছর এমনি ভাবেই কাটল। তারপরই বুঝলাম ওর প্রতারণা। সব ছলনা, চাতুরী ওর ধরা পড়ল। সেই সুন্দর প্রেমিক ভ্রমর আমার, তখন আশা মিটে যেতে অন্য ফুলে মধু খেতে একদিন উড়ে গেল। রোহিণী নক্ষত্রের মত চিরদিন থাকবো চন্দ্রের পায়ের কাছে কাছে সেই স্বপ্ন আমি দেখেছিলুম, তা সেই স্বপ্ন আমার হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। এখন আত্মহত্যা ছাড়া আর পথ নেই।"

আমার মনে হল এই হতভাগ্য নারীকে আশার বাণী কিছু শোনানো উচিত। শান্ত প্রসন্ন কণ্ঠে আমি তাই বললুম— "আমার নিজের বিশ্বাস মানুষের কল্যাণেই মানুষকে মাঝে মাঝে চরম দুঃখ ভগবান দিয়ে থাকেন। এতে ভেঙ্গে পড়বার মত কিছু নেই। আপনি অনেক কিছু ঠকে শিখলেন। এই ঠকে শেখা জ্ঞান মানুষকে অমৃতের পথে নিয়ে যায়। তবে একথাও ঠিক তাই বলে সব পুরুষই খারাপ হয় না। সব পুরুষই লম্পট নয়। এ সংসারে ভালবাসাই ভগবান। পৃথিবীতে একটি মাত্র বিশ্বধর্ম আছে বা রয়েছে তা হল ভালবাসার ধর্ম। ভগবানে বিশ্বাস রেখে কায়মনোবাক্যে সমস্ত শক্তি দিয়ে সেই ভগবানকে ও তাঁর সন্তানদের ভালবাসতে হবে। তা না হলে মনে শান্তি ও শক্তি পাবেন না। ভুলে যান আপনার ক্লেদাক্ত অতীতকে। আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করুন। আমি বিশ্বাস করি নারীর আত্মা পৃথিবীর মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাবে ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বে। জানি আজ দেশের মধ্যে পাপের আবর্জনা স্তূপীকৃত হয়ে উঠছে। কিন্তু আপনি সেই অমিততেজা নারী। আপনি হতাশ হবেন কেন? আপনার তো ভেঙে পড়লে চলবে না। আপনাকে যা বলছি এ সবই আমার বিশ্বাসের কথা। আমি বিশ্বাস করি নারী ভগবানের সুন্দরতম সৃষ্টি। ভগবান্ আগে পুরুষ সৃষ্টি করেছেন, তারপরে সৃষ্টি করেছেন নারী। আমাদের মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন "নারী মাত্রেই পবিত্র, কারণ নারী সুন্দর।" মহাভারতকার বলেছেন 'নারী, আর রত্ন, আরজল আর ধর্ম দূষিত হয় না।' তাই আপনি হৃদয় থেকে ক্ষোভ দূর করে ফেলুন। আপনি অপবিত্র হন নি। আমায় দেখুন না, আমার বয়স পঁয়ত্রিশ। এই পঁয়ত্রিশ বছর কাল এক রকম ভীষণ সংঘর্ষে কেটেছে। আমি জানি আরও ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর অন্ততঃ দুঃখে কষ্টে আমার জীবন কেটে যাবে। এও জানি মানুষ সুখের লোভে ও বাঁচার লোভে ছটফটায়। কিন্তু আমি ভাবি সে সব আমার জীবনে এলে ভালই, না এলেই বা ক্ষতি কি? যদি সুখ না পাই, কপালে যদি শান্তি না থাকে তাই বলে আমি আত্মহত্যা করবো?

আমি যে মেয়েটিকে, মানে সোমাকে ভালবাসতুম সে একটি তন্বী, সুন্দরী, যুবতী মেয়ে, মুখে সবসময় সলজ্জ স্নিগ্ধ হাসি লেগে থাকতো। তার প্রেমে আমি ডুবে গেছলুম। সেও আমায় ভালবাসতো। তবু শেষ পর্যন্ত সে আমাকে বোকা বানিয়ে অন্য এক দিব্যকান্তি ধনী পুরুষকে বিয়ে করেছে। এতে আমি মনে মনে খুব দুঃখ পেয়েছি। কিন্তু তাই বলে আমি আত্মহত্যা করবো! কেন? কিসের জন্য?"

আমি চুপ করলুম। আবছা চাঁদের আলোয় ওর দুহাতের সোনার বালা দুটি চিকচিক করছিল। ওর কানের মুক্তোটাও ঝক ঝক করছিল। ওর পায়ের কাপড় অনেকটা তোলা ছিল। দেখলুম ওর পা, পায়ের গোছ বেশ ভারী, ভরন্ত ও সুন্দর। ওর ঠোঁট দুটি পাতলা, দাঁতের পাটি সুন্দর গোছানো, নাক লম্বা। চোখ দুটি টানা। ওর দৃষ্টি খুব সজীব ও চঞ্চল। আমরা যেখানটায় শুকনো ঘাসের ওপর বসেছিলুম তার এপাশে ওপাশে বন তুলসীর জঙ্গল ছিল। মাথার ওপর একটা রাধাচূড়োর গাছ ছিল, তার পাতায় বসন্তকালের হাল্কা বাতাসের শব্দ হচ্ছিল। মোহনা এবার আমায় জিজ্ঞাসা করল"কিন্তুআপনার নাম ও পরিচয় আমি এখনো কিছুই জানতে পারিনি। এবার বলুন আপনার পরিচয়। আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন এখন আর আপনাকে পর ভাবতে পারছিনে।"

হেসে বললুম "আমার নাম বিমল। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে এম, এস-সি তে আমি প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করেছিলুম। এখন কেন্দ্রীয় সরকারী চাকুরীতে অধিষ্ঠিত। মাইনে ন'শ পঞ্চাশ। আর আমার সম্বন্ধে, কি জানতে চান বলুন। হ্যাঁ, কনে আমার আজও জোটেনি তাই এখনো অবিবাহিতই আছি। সত্যি বলতে কি আমি উদ্ভিদ সম্বন্ধে গবেষণা করি, তাই হয়তো মেয়েরা আমাকে

অপছন্দ করে। অথবা আমিই হয়তো মেয়েদের সম্বন্ধে, এতোদিন ভাবতে ফুরসৎ পাইনি। কোলকাতায় এক-খানা নিজস্ব পৈতৃক বাড়ি আছে। বাবা মা কেউ বেঁচে নেই। আমি একা। অবশ্য অন্যান্য আত্মীয় স্বজন অনেকেই আছেন। বাড়িতে এক বিধবা পিসীমা আছেন। কোন-রকমে দিন চলে যায়। চাকর ও ঠাকুর আমার সংসার চালায়।"

মোহনা বলল "বিমলবাবু। কিরকম আশ্চর্য দেখুন, এই পৃথিবীতে শয়তানের চেহারাও ঠিক মানুষের মতই হয়। আমি মানুষই ভেবেছিলাম সুমথ নামের সেই শয়তানকে। সে ক্ষুধিত পশুর মত আমার এই দেহটাকে পাঁকের মধ্যে টেনে নিয়ে তাকে কামড়ে ছিঁড়ে হত্যা করতে চেয়েছিল।"

বললুম "হয়তো এই নিয়ম। শয়তানকে নানা গুণে ভূষিত হতে হয়। তা না হলে স্বর্গকে বিধ্বস্ত করবে সে কোন্ হাতিয়ারে? ক্ষুধিত পশুর সঙ্গেই আপনার পরিচয় হয়েছে। পরিপূর্ণ মানুষের সঙ্গে হয় নি। তাই আত্ম-হত্যার পথ বেছে নিয়েছিলেন।"

মোহনা বলল "সুমথ একদিন আমার হাত ধরে প্রতি-শ্রুতি দিয়ে বলল তার সর্বস্ব উপহারের। হ্যাঁ সে তাই বলেছিল। আর তার সেই প্রতিশ্রুতিতে আমি বিশ্বাস করেছিলুম। আমি এর আগে কখনও শয়তান দেখিনি। তাই সেই সর্বস্বের প্রতিশ্রুতিতে আমি কম্পিত হয়েছিলুম, স্পন্দিত হয়েছিলুম, আর মাটির পৃথিবীটাকে আলোয় গড়া অমরাবতী ভেবেছিলুম। কিন্তু শয়তানের ছদ্মবেশ একদিন হঠাৎ খুলে গেল। তার বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। সুর কেটে গেল। তাল ভেঙে গেল। সুমথর কপটতা ধরা পড়ল। আমি ওকে তখন স্বেচ্ছায় মুক্তি দিলুম। না দিয়েও উপায় ছিল না। জোর করে কি ভালবাসা আদায় করা যায়! সে পালিয়ে বাঁচল। একি ভালবাসা? নারীর হৃদয় নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। সে নির্মম, নৃশংস। সুমথর মতো এম্নি মুখোশ পরা ভালো-মানুষ সেজে থাকা শয়তানরা সারা দেশে অনেক আছে। তারা ছড়িয়ে আছে মানুষের মধ্যে মানুষের মূর্তি ধরে।"

বললুম "শুধু শয়তানই নেই, মানুষও আছে। মানুষই হয় দেবতা। তবে সেই দেবত্ব সাধনা দিয়ে অর্জন করতে হয়।"

গাঙের মিষ্টি হাওয়া এধারে বয়ে আসছিল। সেই বাতাসে মাঝে মাঝে ভেসে আসছিল বনৌষধির তীব্র সুগন্ধ। সে গন্ধ, সুরার মত মাদকতা পূর্ণ। নিশুতি রাত, সামনে জনহীন, নিস্তব্ধ, নিবিড় বনভূমি ও প্রান্তর। আমরা দুজন শুধু পাশাপাশি বসেছিলুম রেল লাইনের ধারে ঘাসের চাপড়ার ওপর। চারিধারে ঝিল্লির নিরবিচ্ছিন্ন ঝংকার। নৈতিক সংযম ও স্বভাব শুচিতার অহঙ্কার ছিল আমার। অতিশয় সচেতন মন নিয়ে আমি জীবনের সর্বক্ষেত্রে চলা-ফেরা করি। কিন্তু সেই আমার প্রবল সচেতন মন আজ রাতে মোহনার সর্বনাশা দেহবল্লরীর আশেপাশে এখন যেন ছিনিমিনি খেলতে লাগল। আমার শরীরের কোষে কোষে যেন নতুন প্রাণ সঞ্চার করে দিল। আশ্চর্য অনুভূতিতে মন আমার ভরে উঠল। আমি বললুম "এই শয়তান যেমন পুরুষের রূপ নিয়ে আছে, তেমনি এ জগতে সেই শয়তান মেয়ের রূপেও আছে। তখন সে হল শয়তানী মেয়ে। আমরা দুজনেই হৃদয়ের একজায়গাতে বড় ঘা খেয়েছি। তাই আমরা এখন একে অন্যের ক্ষতে প্রলেপ লাগাতে পারি। পারি নাকি? আমি তো আগেই বলেছি আমাকে যা আঘাত করেছে তা ব্যর্থ প্রেম নয়, কোন নারীর প্রত্যা-খ্যানের বেদনা নয়। আমার সত্ত্বাকে, আমার প্রত্যেকটি স্নায়ুকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে একটি শয়তানী নারীর নীচতা খলতা ও কাপট্য। যাকে আমি পৃথিবীর সমস্ত কোমলতা, লালিত্য ও লাবণ্য দিয়ে আর পৃথিবীর সমস্ত কাব্য ও সঙ্গীত দিয়ে গড়ে তুলেছিলুম তার ক্রুদ্ধতা ও ক্রুরতা আমার মাথার মধ্যে বিষাক্ত কীটের মতই দিনরাত কামড়াচ্ছে। আমি সোমার কথাই বলছি। মিথ্যা করে সে আমায় চরিত্রহীন বদনাম দিয়ে সরে পড়ল। থাক এখন একথা। আপনিও এক অনিন্দ্যসুন্দরী মহিলা কিন্তু হতভাগিনী, আমার বেদনার্দ্র জীবনের একটি অধ্যায় আজ রাতে তাই আপনার কাছে আমি উদ্‌ঘাটিত করলুম। করলুম এই আশায় যে আবার আমাদের ঘর বাঁধা যায়, নতুন দিন ডেকে আনা যায়। দুঃস্বপ্নের রাত্রি প্রভাত হোক। কলঙ্ক আপনার গায়ে কিছু লাগেনি। আর যদি লেগেও থাকে আমি তা গ্রাহ্য করি না। আমি তা মুছে দেবো। আমার উপর আপনি নির্ভর করতে পারেন।

কারণ এজগতে ভর্তৃহীনা সুরূপা নারীর বিপদ আছে প্রচুর। নতুন জীবনের পথে আপনি আমার হাত ধরুন। আজ রাতে এক স্বপ্নাতুর আকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয়ে খেলা করছে। চেয়ে দেখুন হাজার হাজার তারা জ্বলছে ঐমস্ত বড় আকাশে। ঐ তারার পানে চেয়ে চেয়ে আপনার বিপুল যৌবন ভার বক্ষে ধারণ করার তৃষ্ণা আমার বুকে জেগেছে। আপনি কি আমাকে বিয়ে করতে রাজী হবেন?" সে বলল "আপনি একজন জবরদস্ত দুর্দান্ত অফিসর, শুধু শক্তিমত্তায় নয় কর্মনৈপুণ্যে। এমনকি বিদ্যায়, বৈদগ্ধ্যে। তাছাড়া আপনার মহৎ অন্তঃকরণ, আপনি দয়ালু। নির্মম, নৃশংস নয় আপনার ভদ্র মন। আপনার এমন সুন্দর পৌরুষভরা চেহারা, আপনি নারীর নয়ন-রঞ্জন তো বটেই, মনোরঞ্জনকারীও। আমি আজ খুশিতে দিশেহারা। কি রকম আশ্চর্য দেখুন এক মুহূর্তেই জগতে কতো অঘটন ঘটে যায়। এক মুহূর্তেই প্রলয়, এক মুহূর্তেই প্রেম। আপনি আজ সঙ্গে আছেন বলে এই নিরালায় নিশুতি রাত্রে আমার আদৌ কোনো কিছুতে ভয় করছে না। উপরন্তু সমস্ত নতুন, সমস্ত অপরূপ মনে হচ্ছে। তাই ভাবছি ভালোবাসাই সমস্ত। ভালোবাসাই আনে, ভালো-বাসাই দেয়, ভালোবাসাই ভরে রাখে। আপনি মৃত্যুর থেকে আমাকে অমৃতের পথে নিয়ে এসেছেন। আবার বলি আমার নয়নের স্বপ্নকে আজ আবার আপনি জ্যোৎস্নান্বিত করেছেন, আমার মনে হচ্ছে আমার অন্তর বেদনার ভাষা শুনতে পেয়ে অন্তরীক্ষ হতে এক অনিন্দ্যসুন্দর প্রেমিকের হৃদয় ছুটে এসে বুঝি দাঁড়িয়েছে এবং বসেছে আজ আমার সম্মুখে। এ হল সেই প্রেমিক পুরুষ। সেই আপনি। এ সেই আপনারই মূর্তি। আপনি আমার অতীতের কলঙ্ক-ময় জীবনের কথা জেনেও আমাকে গ্রহণ করতে চাইছেন। এ আমার আশাতীত সৌভাগ্য। আপনার সেই উদার ও মহান্ হৃদয়ের স্পর্শে আবার জেগে উঠেছে আমার প্রাণের কামনা, আমার আবার সুস্থ মানুষের মত বাঁচতে সাধ হয়েছে।"

সে রাত আমরা সেইভাবেই চৈত্র মাসের তারায় ভরা আকাশের নীচে বসে কাটিয়ে দিলুম। অপরি-সীম আনন্দে সময় কোথা দিয়ে যে কেটে গেল তা বুঝতে পারলুম না। দুজনেরই কোলকাতা যাবার কথা ছিল। কিন্তু কেউই আমরা কোলকাতায় ফিরলুম না। উষার নবারুণ কিরণের আভাস দেখা গেল পূর্ব দিগন্তে। মোহনার একটি হাত ধরে আমি বললুম "চলো তবে এখন তোমার কাকাবাবু ও কাকীমার অনুমতি নিতে যাই। তাঁদের অনুমতি আমরা পাবো তো? তাহলেই প্রতীক্ষার পর্যাপ্তি। একঘর আরাম। এক বিছানা ঘুম। আর সুখের অনুভূতির পূর্ণিমা।"

মোহনা হেসে বলল "আমি জানি আমার কাকা ও কাকীমা এতে খুব খুশী হয়ে মত দেবেন। আমি এতো-দিন বিয়ে করতে চাইনি বলে ওঁদের মনে খুব কষ্ট ছিল। এখন ওঁরা খুশী হয়ে আমাদের আশীর্বাদ করবেন। আর তুমি যখন আমাদেরই স্বজাত, আর পালটি ঘর, আর এম-এস-সিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। বড় চাকুরে। তখনতো আর কথাই নেই। কিন্তু তুমি এখানে কোথায় এসেছিলে তাতো বললে না। ছিলে অচেনা, হলে কতই চেনা। পূজার নৈবেদ্যের মত আমার এই দেহ ও মন আজ আমি তোমারই হাতে তুলে দিতে চাই।"

আমি হেসে বললুম "এখানের মনীশবাবু হলেন আমার পিসেমশাই। তিনি আমায় এক জরুরী টেলি-গ্রাম করেছিলেন। তাতে জানিয়েছিলেন যে পিসীমার খুব অসুখ। তাই এখানে ছুটে এসেছিলুম। এসে জানলুম যে পিসিমার অসুখ বটে তবে তেমন কিছু বেশী নয়। আসলে তিনি মানে পিসীমা একটি লেখাপড়া জানা সুন্দরী মেয়েকে পছন্দ করেছেন আমার জন্য। তাঁর খুব ইচ্ছা যে সেই মেয়েটির সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে তিনি আমায় সংসারী করে যাবেন। মেয়েটি নাকি খুব সুন্দরী এবং কোলকাতায় চাকরী করে। মেয়েটির বাবা ও মা নেই, কাকাই নাকি অভিভাবক।"

রুদ্ধশ্বাসে মোহনা বলল "তারপর কি হল? সেই মেয়েটিকে তুমি দেখলে?"

হেসে বললুম "না, দেখা আর হল না। কারণ ক্ষিতি-মোহন বাবু অর্থাৎ মেয়েটির কাকা আমার পিসেমশাই-এর কাছে এসে সেদিন হঠাৎ অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানালেন যে সেই মেয়ে নাকি এখন বিয়ে করতে কিছুতেই রাজী হচ্ছে না। তাই দুঃখিত মনে ফিরে যাচ্ছিলুম। ভাবছিলুম কপালে হয়তো বিয়ে নেই।"

মোহনা হেসে বলল "আরে ক্ষিতিমোহন বাবু তো আমারই কাকার নাম! আর সেই মেয়েটিই হলুম এই হত-ভাগিনী, আমি। ছিঃছিঃ তোমাকে আমিপ্রত্যাখ্যান করে ছিলুম? কি লজ্জা! আর এখন এখন সকালের রং পাল্‌টেছে। আকাশ নীল। আমি এক ডানা ভাঙ্গা পাখী। মনে হচ্ছে তোমাকে জন্ম জন্ম ধরে চিনি।"

বললুম "এখন আর দুঃখ কোথায়? তুমি তো এখন মত করেছ। এই বিয়েতে রাজী হয়েছ। বিধাতার ইচ্ছাই বোধকরি এইরকম ছিল। তাই কিভাবে কতো বিপত্তির মধ্যে তোমাকে পেলুম। এখন আর কোন দুঃখ নয়, এখন শুধু আনন্দ। এখন চলো যাই দুজনে মিলে তোমার কাকার কাছে আর আমার পিসেমশায়ের কাছে। ওঁরা দুজনেই আমাদের বিয়েতে খুব খুশী হবেন। কারণ ওঁরা তো এই সম্বন্ধই করেছিলেন। ওঁদের আশীর্বাদ আমাদের এই প্রেমকে অজর অমর করুক। চিরস্থায়ী করুক।"

তখন বলাকার সারি আকাশে উড়ে চলছে। প্রভাতের চঞ্চলতা গাছের পাতায় পাতায়। আর উচ্ছ্বসিত উৎসবের মেলা বন হতে বনান্তরে ছুটে চলেছে পাখিদের গানের মধ্য দিয়ে।

অশরীরী

সন্তোষকুমার অধিকারী

—শব্দ না? কে কড়া নাড়ে?
—আমি, যার অপরূপ রূপ
অনন্তস্বপ্নের মত ছিল আভাসিত:
ঘুমের অতল থেকে—সেই আমি এসেছি নিশ্চুপ—
দ্বার ধরে' নাড়া দিতে,—হোয়োনা বিস্মিত।
—কার কণ্ঠ?
—আমারই গো। যার মৃদু কণ্ঠস্বর শুনে
মুগ্ধ হ'তে, দিতে শুধু পাখির তুলনা।
নদীর হৃদয়ে যেতো—সেই শব্দ প্রতিধ্বনি বুনে'
আমিই ডেকেছি,—তুমি বোঝনি? বলোনা!
—কি নিবিড় অন্ধকার? অন্ধকারে আকাশ নিদ্রিত
কি নির্জন চারিদিক?
—আমি কাছে আছি
আঁধার আড়াল দিক; দুটি ওষ্ঠ স্পর্শে রোমাঞ্চিত
বিস্মৃত সে জীবনের মাধুর্যকে যাচি।
স্তব্ধ রাত। বারান্দার অন্ধকার নিঃশব্দ বিজন
তারকার উজ্জ্বলতা ছায়ায় আবৃত:
স্পর্শময় অনুভবে খোঁজে কোন্ আশাভীরু মন?
কড়া ধরে' নাড়া দেয় অশরীরী মৃত।

* Walter De La Mare—The Ghost

পরিমল ভট্টাচার্য্য

অবিশ্বাস্য ও অলৌকিক কাহিনী

> এই আধুনিক যুগেও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নানা ধরণের অবিশ্বাস্য ও অলৌকিক ঘটনা ঘটে থাকে। সেই সব বিচিত্র কাহিনী এবার থেকে এই "বিচিত্র বিশ্ব" বিভাগে পরিবেশন করবেন শ্রীপরিমল ভট্টাচার্য্য।
>
> —সম্পাদক

বিচিত্র বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে কত বিস্ময়কর ঘটনাই যে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে,তার হিসাব কে রাখে ? তবুও তার কিছু কিছু ছিটে ফোঁটা অংশ যখন লোক মুখে বা ছাপার অক্ষরে জনসমাজে প্রকাশ হয়ে পড়ে তখন একদল লোক নির্বিচারে হেসে উড়িয়ে দেন, বলেন ওটা আর কিছু নয় বিশেষ এক ধরণের নেশার ফল। আরেকদল অত্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে ঘটনাগুলির পর্য্যালোচনা করে স্থির সিদ্ধান্তে আসেন, বলেন, হ্যাঁ এও সম্ভব, নিত্য সত্য বিজ্ঞান সম্মত ঘটনা। আমি স্বচক্ষে দেখিনি বলে এমন সব বিস্ময়কর ঘটনাগুলিকে অবিশ্বাস করবার কোন যুক্তি নেই। এমনই কিছু অবিশ্বাস্য ও বিস্ময়কর ঘটনা আপনাদের উপহার দেব। জানবেন প্রত্যেকটি ঘটনাই সত্য, শুধু সামাজিক কারণে কোন কোন ঘটনার স্থান, কাল ও পাত্র-পাত্রীর আসল পরিচয় গোপন রাখতে হল।

প্রেতের শ্মশানে আগমন

মহানগরের বিখ্যাত মহাশ্মশান কেওড়াতলায় ঘটনাটি ঘটে। খুব বেশীদিন হয়নি, মাত্র বছর পাঁচেক আগে। অগ্রহায়ণ মাসের শেষদিক। প্রতিবেশী এক বৃদ্ধভদ্রলোকের মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানে আমরা যখন পৌছলাম তখন রাত প্রায় ১২টা। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। তেমন লোকজন নেই। মাত্র দুটো চিতায় আগুন জ্বলছে। উত্তরদিকের কোণে দু'তিন জন লোক এক সাধুকে ঘিরে বসে গঞ্জিকা সেবনে মত্ত। বিশ্রাম ঘরের রোয়াকে জনা ১২।১৩ শব-দাহকারী বসে আছেন। সামনে চিতা জ্বলছে, তারি উত্তাপে শরীর গরম রাখছেন তাঁরা। সংকারের ব্যবস্থা করে ছেলে-ছোকরার দল বাইরে চলে গেল চা-সিগারেট খাওয়ার জন্য। আমি এদিক-ওদিক কিছুক্ষণ চলাফেরা করে এক সময় গঙ্গার ঘাটে গিয়ে দাঁড়ালাম। দু'একজন নিম্নশ্রেণীর লোককে দেখলাম ছেঁড়া ও ময়লা কাঁথা গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকতে। স্থানটী বেশ নির্জন, সামনে আদি গঙ্গার ঘোলা স্রোত বয়ে চলেছে। বেশ শীত শীত করছিল। ফিরে আসবার উদ্যোগ করতেই হঠাৎ নজরে পড়লো একটু তফাতে যেখানে ঘাটের সিঁড়ি শেষ হয়ে গঙ্গার মাটি দেখা যাচ্ছে,সেখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে একটা অর্দ্ধগলিত মৃতদেহকে ঘিরে। পচা-দুর্গন্ধ নাকে যেতেই শরীর যেন কেঁপে উঠলো। নাকে রুমাল চাপা দিয়ে একটু এগিয়ে গেলাম মৃতদেহটীর কাছে অসীম কৌতুহল নিয়ে। ঘাটের ক্ষীণ আলোকে দেখলাম, মৃতদেহটী কোন একটি পথের ভিখারীর। গায়ে বস্ত্র বলতে কিছু নেই, শুধু কোমরে একখানি ময়লা কাপড়

জড়ানো। পাশে একখানি লাঠি ও একটি ভিক্ষাপাত্র। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে দেখে মনে হল সেও বোধ হয় ঐ একই ভিখারী সম্প্রদায়ের লোক। তফাৎ মাত্র এই লোকটির গায়ে একখানি ছেঁড়া পাঞ্জাবী আছে ও গলায় একখানি ময়লা চাদর জড়ানো। মুখে সাদা খোঁচা খোঁচা দাড়ি গোঁফ। মাথায় একমাথা সাদা ঝাঁকড়া চুল। মৃতদেহটীর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখছে। একটু কাছে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলাম, মৃতদেহটির মুখখানা দেখবার জন্য, কিন্তু বিশেষ সুবিধা হলনা, একেত আলো কম—ভরসা মাত্র একটি বিজলী বাতির আলো। তাতে আবার ঐ ভীষণ পচা গন্ধ বের হচ্ছে। কাছে ঘেঁসা যায় না। তবুও মনে হল মড়ার মুখেও ঐ রকম সাদা সাদা দাড়ি-গোঁফ, মাথায় সাদা চুল।

দূর থেকে একা একা দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম কাণ্ডটা। দাঁড়িয়ে থাকা লোকটী এবারে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল মড়াটির মাথার দিকে। পাশে রাখা ঠাণ্ডা ডান হাতখানা নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে ভিখারীটি ভাল করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো। মনে হল লোকটা যেন মৃত ভিখারীটির হাতের ভাষা পড়বার চেষ্টা করছে। ভীষণ কৌতূহল হল আমার, ঐ রকম ঠাণ্ডায় নির্জনে দাঁড়িয়ে আমার খুব মজা লাগলো, যেন একটা ভৌতিক ঘটনার একমাত্র সাক্ষী হওয়ার অপেক্ষায় আমি দাঁড়িয়ে আছি এখানে। এবার হাত দেখা শেষ করে লোকটি মড়াটির কপালে একবার হাত রেখে আপন মনে কি যেন বিড়্‌বিড়্‌ করে বললো, দূর থেকে সামান্য একটু শব্দের আকারে তা আমার কানে এল। এবার সে মড়াটাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করলো ধীরে ধীরে। পায়ের কাছে এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালো। ঠিক এমনি সময়ে আমার কানে এল এক সম্মিলিত হরিধ্বনি। নতুন শব এল শ্মশানে। পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, হ্যাঁ, লোক জন ঢুকছে মড়া কাঁধে নিয়ে।

আবার মুখ ফেরালাম ঘাটের মড়ার দিকে। চমকে উঠলাম, আগন্তুক ভিখারী লোকটি আর সেখানে নেই! সতর্ক দৃষ্টিতে চতুর্দিকে তাকে খুঁজলাম। কিন্তু কোথাও দেখতে পেলাম না।

কেমন একটু ভয় ভয় করতে লাগলো। আমি ভুল দেখিনি তো? না, কারণ ঘাটের মড়াটা তখনও সেখানে পড়ে আছে। পচা দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। ধীরে ধীরে ঘাট ছেড়ে শ্মশানে ঢুকলাম। নতুন মড়াটাকে একপাশে নামান হয়েছে। ভাবলাম এক কাপ চা খেয়ে আসি। উত্তর দিকের গেট দিয়ে বের হবার সময় হঠাৎ খাটিয়ার উপর শায়িত নতুন মড়াটার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। দেখলাম ঘাটে যে বৃদ্ধ ভিখারীটী এতক্ষণ আরেকটা মড়াকে প্রণাম করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছিল, সেই বুড়োটাই এই খাটিয়ার উপর শুয়ে আছে। কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। একখানা শতছিন্ন ময়লা চাদরে সারা শরীর আবৃত।

এমন অবিশ্বাস্য ঘটনা দেখে আমি কিছুটা বিহ্বল হয়ে পড়লাম। কেমন যেন বিশ্বাস হতে লাগলো যে ঘাটে আমি যাকে দেখে এলাম সে এই লোকটারই প্রেতদেহ। সারা শরীরটা আমার কাঁটা দিয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে শ্মশান ছেড়ে বাইরের একটা চায়ের দোকানে এসে বসলাম। গরম চায়ে চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে তাকিয়ে রইলাম সামনের অন্ধকার আকাশটার দিকে। কিছুক্ষণ পরেই একদল সমবয়সী ছেলে দোকানে এসে ঢুকলো। এরাই ঐ বুড়ো ভিখারীটার মৃতদেহটা এনেছে। আমি ভিখারী বললাম কারণ তার প্রকৃত পরিচয় আমার এখনও জানা হয় নি। কিছুটা কৌতূহল নিয়েই পাশের একটি ছেলেকে সভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনারাই তো ঐ বৃদ্ধ লোকটিকে নিয়ে এসেছেন—না? ছেলেটি আলুর দম খেতে খেতে উত্তর দিল—হ্যাঁ, কসবা থেকে এসেছি। ও আমাদের কেউ হয় না। পাড়ার ক্লাবের বারান্দায় এক কোণে থাকবার জায়গা দিয়েছিলাম। ভিখারীই বলতে পারেন। উত্তর শুনে আবার আর এক বিস্ময়ের জগতে গিয়ে পড়লাম। আগ্রহ দেখাতেই নিজে থেকেই ছেলেটী বলে চললো—ভাল নাম ডাঃ কৃপাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। আমরা অবিশ্যি প্রথম প্রথম বলতাম ক্ষ্যাপা শঙ্কর। পরে ঘনিষ্ঠতা হতে ডাকতাম ক্ষ্যাপাদা বলে। উনি ভিখারী ছিলেন না। জন্মেছিলেন হুগলী জেলার কোন এক গণ্ড গ্রামের ধনী বংশে। ক্ষ্যাপাদার মুখে তাঁর জীবনের কিছু কিছু খণ্ড ইতিহাস শোনা ছিল। ভদ্রলোক কি ছিলেন—কি হলেন! আজ থেকে বহু বছর আগে দু'টি যমজ

সন্তানের জন্ম দিয়ে মা চিরবিদায় নিলেন পৃথিবী থেকে। তার পরে সৎমা এলেন সংসারে—জ্ঞান হবার পর দুই ভাই বুঝলেন সংসারে থাকা অসম্ভব। সৎমা অসতী ছিলেন একথা বোঝার মত যখন বয়স হল, তখন আর সৎমায়ের বিরুদ্ধে লড়বার মত সাহস তাদের রইল না। বাবাও অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে ভেদবমি হয়ে অকালে প্রাণ হারালেন, অন্তিম সময়ে ছেলেদুটিকে কাছে ডেকে শুধু বললেন—আমি অধম বাপ, ক্ষমা করিস বাবা, কাল-নাগিনীর হাত থেকে যদি প্রাণে বাঁচতে চাস, এক্ষুনি দু'জনে পালা। বলে নগদ কিছু টাকারও ব্যবস্থা করে দিলেন। এর পর বাপের দেওয়া আদরের নাম দয়াশঙ্কর আর কৃপাশঙ্কর—এই সম্বল করে এবং নগদ কিছু অর্থ নিয়ে ১৭ বছরের দুটি ছেলে রাতের অন্ধকারে সবার অলক্ষ্যে পৃথিবীর জনারণ্যে হারিয়ে গেল।

ক্ষ্যাপাদার মুখেই শুনেছি ৭ মিনিটের বড়ভাই দয়াশঙ্করবাবু দেরাদুনে কাঠের গোলায় কাজ করতেন। আর কৃপাশঙ্করবাবু হোমিওপ্যাথি পাশ করে ডাক্তারী করতেন কলকাতায় এক কুখ্যাত পল্লীর নিকটে।

এরপর বহু বছর কেটে গেছে। ক্ষ্যাপাদা হঠাৎ একদিন দেরাদুন থেকে যমজভাই দয়াশঙ্করবাবুর চিঠি পেলেন। কাঠের গোলায় আগুন লেগে মালিক সর্বস্বান্ত হয়ে গেছেন। অতএব চাকরী গেল। তিনি এক সপ্তাহের মধ্যেই ভাইয়ের কাছে আসছেন। কিন্তু ঘটনা ঘটলো অন্যরকম। একদিন রাত্রে সেই কুখ্যাত পল্লীর এক গৃহে রোগী দেখতে গিয়ে সামনে দেখলেন সেই কালনাগিনী সৎমাকে। ভয়ে, আতঙ্কে, বিহ্বল হয়ে রাতারাতি গৃহত্যাগ করলেন ডাঃ কৃপাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। মনে হয় সামান্য কিছু মাথার দোষ হয়েছিল তাঁর। পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন ডাক্তারবাবু। দয়াশঙ্করবাবুও এসে ভাইয়ের খোঁজ পেলেন না। সেও বোধহয় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ভিক্ষে করছে কিনা কে জানে? তবে ক্ষ্যাপাদা ইদানীং প্রায়ই বলতেন, একদিন না একদিন তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হবেই।

আমার সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগলো। মনে হল যেন বহুকালের হারিয়ে যাওয়া সূত্র খুঁজে পেয়েছি। টেবিলের উপর খাবার পড়ে রইল। ছেলেটার হাত ধরে দোকান থেকে টেনে আনতে আনতে বললাম—আসুন আমার সঙ্গে। দেখুনত তাঁর যমজ ভাইকে চিনতে পারেন কিনা? দুজনে একরকম ছুটতে ছুটতে গঙ্গার ঘাটে এসে পৌঁছলাম—কি আশ্চর্য্য, মৃতদেহটা সেখানে নেই। শুধু রাখা আছে একটি ফুলের তোড়া আর একটি ধূপকাঠি, তখনও জ্বলছে। নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম শ্মশানে। চতুর্দিকে তাকিয়ে খুঁজছিলাম। নাঃ, নিরাশ হতে হয়নি এবার। পাশের ছেলেটিও ছুটে গেল ক্ষ্যাপাদার লাসটার কাছে। কর্তৃপক্ষের হুকুম অনুসারে দুটি বেওয়ারিশ মৃতদেহ একসঙ্গে একই চিতায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগুন সবে ধরানো হয়েছে। কি আশ্চর্য্য মিল দুটি মুখের! অনেক আশা নিয়ে দুটি ভাই একদিন এই পৃথিবীতে হাত ধরাধরি করে এসেছিল, চলেও গেল ঠিক সেইভাবে তবে সঙ্গে করে কি অভিজ্ঞতা নিয়ে গেল জানি না।

প্রেতের প্রতিহিংসা

ঘটনাটি ঘটে গতবছর মে মাসে। হিমালয়ের কোলে এক শৈলসহর—গুপ্তকাশীতে। আজই কিছুক্ষণ আগে আমরা কেদারনাথ দর্শন করে গুপ্তকাশীতে ফিরে এসেছি। এখানে আজকের রাতটা কাটিয়ে কাল সকালেই বাস ধরে রুদ্রপ্রয়াগ হয়ে বদরীনারায়ণ চলে যাব। পূর্ব পরিচিত চটিতেই উঠেছি। সন্ধ্যে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। আমাদের কুলী ও পথ প্রদর্শক উত্তরপ্রদেশীয় লোকটার নাম কুন্নীলাল। সে বাইরের বারান্দার এককোণে বসে রাত্রের খাবার তৈরি করছে। যাত্রী আমরা চারজন। আমি, আমার ছোটভাই ও তার দুই বন্ধু। ওরা তিনজনে ঘরে বসে গল্প করছে। আমি বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কুন্নীলালের কাজকর্মের তদারক ও সাহায্য করছি, যাতে খাওয়া-দাওয়ার পাট তাড়াতাড়ি সেরে শুয়ে পড়া যায়। কান পেতে শুনি ওরা ঘরের মধ্যে একটি অসমাপ্ত ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছে। যে ঘটনাটি মাত্র ৭ দিন আগে এই চটির এই ঘরেই ঘটে গিয়েছিল। আমাদের সঙ্গে কেদারনাথ দর্শনার্থী আরও যাত্রী ছিল। ঠিক ৭ দিন আগে আমরা সবাই এখানে এমনি ভাবেই রাত কাটিয়েছি। এক স্বামীজির তত্ত্বাবধানে একদল স্ত্রীপুরুষ যাত্রী চলেছিল

প্রায় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। সেই দলে দুই সমবয়সী বন্ধুও ছিল, কিন্তু আশ্চর্য্য, একজনের সঙ্গে একজনের কোন ভাবেরই মিল ছিল না। একজন বাঙালী, নাম বরেন দত্ত। আর একজন অবাঙালী, নাম জয়কিষণ। দু'জনের বয়স ৪৫ থেকে ৫০-এরমধ্যে। ঋষিকেশ থেকেই আমরা সব একসঙ্গে গল্প করতে করতে আসছিলাম। আলাপ পরিচয়ে জানলাম দুজনে নাকি একই কোম্পানীর অংশীদার। ব্যবসা ও বাড়ী দুইই কাশীতে। বেনারসী শাড়ীর বিরাট ফলাও কারবার। অবস্থা দুজনেরই মোটামুটি ভাল। বরেনবাবুর দুটি সন্তান। একটি পুত্র এবং একটি কন্যা। জয়কিষণবাবু অবিবাহিত। এসব সাংসারিক কথা ওঁদের মুখ থেকেই শোনা।

গুপ্তকাশী থেকে কেদারনাথ রওনা হওয়ার আগের দিন দ্বিপ্রহরে খাওয়া-দাওয়ার পর দুজনের মধ্যে হঠাৎ তুমুল ঝগড়া সুরু হয়ে গেল। আজকে রাতে আমরা যে ঘরে বাস করছি ঠিক সেই ঘরেই। সেদিনও আমরা আজকের মত চারজনই ছিলাম। দুজনের কথা কাটাকাটির মধ্যে বুঝলাম যে অংশীদারদের বিশ্বাসে বিরাট ফাটল ধরেছে। এখন আর কেউ কাউকে ঠিকমত বিশ্বাস করতে পারছে না। বরেনবাবুর বক্তব্য, সে আর ব্যবসায়ে জড়িয়ে থাকতে চায় না। তাঁর হিসেব তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হোক, নইলে তাঁকে ঠকাবার চেষ্টা করলে তার ফল খুব ভাল হবে না। যাইহোক, মোট কথা দুজন মুখোমুখি থেকে শেষে প্রায় হাতাহাতি হওয়ার জোগাড়। ভদ্রতার সীমা ছাড়ায় দেখে আমরা অন্যান্য যাত্রীরা ছুটে এসে বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে এ ভাবে এমন মন নিয়ে তীর্থের পথে এগোন যায় না। ব্যবসায়িক ফয়শাল দেশে ফিরেগিয়েইকরাভাল। কথা শুনে বরেনবাবু ঘৃণায়, লজ্জায়, অপমানে একেবারে দিশেহারা হয়ে গেলেন।

তৎক্ষণাৎ মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে নিজের আলাদা কুলিকে ডেকে নিয়ে ঝড়ের বেগে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় উপস্থিত যাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলে গেলেন, না, প্রাণ থাকতে আর এমন অধার্মিকের সঙ্গে পথ চলবো না। ঘরে ফিরে যাই তারপর বড় আদালতে ব্যাটাকে ঘানি ঘোরাবো। বোঝাবো কত ধানে কত চাল। পিছন থেকে জয়কিষণবাবু এমন একটা অশ্লীল মন্তব্য করলেন, যা শুনে তৎক্ষণাৎ কানে আঙুল দিতে হল। হা, ভগবান, এমন মন নিয়েও লোকে এ পথে পা বাড়াতে সাহস করে!

বরেনবাবু রেগেমেগে চলে যাওয়ার পরেই জয়কিষণবাবুও মালপত্র নিয়ে তৈরি হলেন। দেখলাম একটু পরেই তিনিও বেরিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় স্বামীজিকে বলে গেলেন—আপনাকে যে টাকা পয়সা জমা দিয়েছি, সে সব আর ফেরত দিতে হবে না। এবার থেকে আমরা দুজনেই আলাদা হয়ে পথ চলবো। স্বামীজি হতবাক্ হয়ে রইলেন। দূরে জয়কিষণের সবল দেহটা পাহাড়ী পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল। এরপর জয়কিষণের সঙ্গে আমাদের দলের মাত্র একবার দেখা হয়েছিল গৌরীকুণ্ডের চটিতে। দেখলাম উনি আর সামান্যমাত্র পথও অতিক্রম করতে পারেন নি। কেদারনাথ দর্শন আর হলনা। গৌরীকুণ্ড থেকে অসুস্থ শরীরে নিচে ফিরছেন। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। বরেনবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করতে সংক্ষিপ্ত উত্তরে উনি শুধু বললেন—তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমাকেই তার মালপত্র কুলি দিয়ে নীচে নামিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে। মনে হয় কাশী ফিরে গেছে। এই ঘটনার এইখানেই সমাপ্তি।

এবার আমরা ফিরে আসি আগের গল্পে। এই অসমাপ্ত ঘটনাটি নিয়েই আমার ছোট ভাই ও তার বন্ধুরা তখন আলোচনা করছিল। রাত তখন প্রায় টা। বাইরে ভীষণ ঠাণ্ডা। অন্ধকারের মধ্যে পাহাড়ের উঁচু উঁচু ঢেউগুলো যেন দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় দুটো পাহাড়ী কুলী মালপত্র নিয়ে এসে আমাদের বারান্দার এককোণে রেখে হাঁপাতে লাগলো। মুখে টর্চ ফেলেই চিনতে পারলাম এরা সেই বরেনবাবু আর জয়কিষণবাবুর কুলী। হঠাৎ এমন অসময়ে এদের এখানে দেখে একটু বিস্মিত হলাম। কারণ ওরাতো প্রায় তিনদিন আগে ফিরতি পথে রওনা হয়েছিল। অথচ আমাদের পিছনে রয়ে গেল কি করে? একটু পরেই দেখি জয়কিষণবাবু আসছে। শরীর বেশ রুগ্ণ মনে হল। আমার মুখের উপর টর্চের আলো ফেলে চিনতে পেরে খুব যেন খুসী হলেন। একটু অনুনয়ের সুরেই বললেন, ভালই হল আজকের রাতটার মত একটু স্থান দিন। তিনদিন পরে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছি। শরীর আর বইছেনা।

লোকটার প্রতি যতই ঘৃণা থাক, এমন অসময়ে এমন নির্বান্ধব স্থানে অনুনয় করতে মন নরম হল। বললাম ঠিক আছে, ভেতরে আসুন। বাইরে কথাবার্তার শব্দ পেয়ে ভেতরের অসমাপ্ত গল্প শেষ হয়ে গিয়েছিল। ভাইকে ডেকে বিছানা সরিয়ে ঘরের এককোণে জয়কিষণবাবুর জন্যে শোও য়র জায়গা করে দিতে বললাম। কুলি দু'জন এগিয়ে এসে সে ব্যবস্থা করে দিয়ে সে রাতের মত বিদায় নিয়ে চলে গেল। কথা হল কাল সকালে এসে বাসে তুলে দিয়ে ছুটি।

এর মধ্যে আমাদের খাবার তৈরি হয়ে গিয়েছিল। জয়কিষণবাবুকে নিমন্ত্রণ করলাম। উনি জানালেন ফ্লাস্কে গরম দুধ আছে, আর সঙ্গে আছে বিস্কুট। ওই খেয়েই রাতটা কাটিয়ে দেবেন। অসুস্থ শরীরে শক্ত কিছু খাওয়া ভাল হবে না। এরপর কথাবার্তা বেশীদূর এগোল না। বরেনবাবুর খোঁজ-খবর নেওয়ার চেষ্টা করতেই উনি এড়াবার চেষ্টা করলেন, বললেন, "কাশীতেই ফিরে গেছে। ভালই হয়েছে, এ রাস্তা বড় দুর্গম, বুকে হাঁফ ধরে যায়, যাই ফিরেই যাই। দত্তকেই সব অংশ লিখে দিয়ে আমি ছুটি নেব। ওরি বরং ছেলেপুলে আছে, সম্পত্তি ভোগ করতে পারবে। আমি যখন বিয়েই করিনি, তখন আর"— কিছুক্ষণ পরেই শুনি জয়কিষণবাবু নাক ডাকাচ্ছেন। এক হাত তফাতেই আমার শোওয়ার বেডিং পাতা। ছোট ভাইয়ের দল ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি টর্চ জ্বালিয়ে রেখে নিজের নিত্যকার ডাইরী লিখলাম। কয়েকখানি চিঠিও লিখলাম আত্মীয়-স্বজনের উদ্দেশ্যে। শুতে প্রায় রাত ১১টা হল। টর্চ নিভিয়ে একসময় শুয়ে পড়লাম। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানিনা। মাঝরাতে হঠাৎ মনে হল কে যেন দরজা খোলবার চেষ্ট করছে। ঘরের ভিতরে জমাটবাঁধা অন্ধকার। কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগলো। ভাই বা তার বন্ধুদের ডাকা ঠিক হবেনা। শেষে অন্ধকারে কিছু একটা দেখে ভয় পেলে উল্টো বিপত্তি হতে পারে বরং জয়কিষণবাবুকেই ডাকা যাক্। ধীরে ধীরে মৃদু গলায় ডাকলাম। দেখলাম সাড়া নেই। চুপ করে পড়ে রইলাম হাতের কাছে টর্চটা বাগিয়ে ধরে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। একটু পরেই মনে হল কে যেন ঘরের মধ্যে চলে বেড়াচ্ছে। মনে হল জয়কিষণ বাবুর মাথার কাছে কে যেন দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে কি দেখছে। তৎক্ষণাৎ টর্চের আলো ফেললাম। জয়কিষণবাবু মুখের উপর থেকে কম্বল সরিয়ে লাফিয়ে উঠে বসলেন। মুখে ভীষণ ভয় পাওয়ার চিহ্ন—কেমন যেন রক্তশূন্য চেহারা তাঁর। কিন্তু ঘরে আর কেউ নেই। আমার বাঁ পাশে ভাইয়েরা ঘুমুচ্ছে। জয়কিষণবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—আমার ভীষণ ভয় করছে বাবুজী। একটুও ঘুমুতে পারছিনা। দত্ত আমার ক্ষতি করবার চেষ্টা করছে। ভয় দেখাচ্ছে।

আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—সে কি বলছেন, বরেন'ত কাশীতে, এখানে আসবে কি করে! নিশ্চয়ই কোন চোরের কীর্তি, আমাদের যথাসর্বস্ব ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। বাকি রাতটা জেগেই কাটাতে হবে। কোন ভয় নেই—আপনি ঘুমোন। আমি জেগে আছি। বলে টর্চ নিভিয়ে দিয়ে সতর্ক হয়ে জেগে রইলাম। অন্ধকারে জয়কিষণবাবু জেগেই বসে রইলেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ। প্রায় মিনিট দশেক হবে, ফের দরজা ঠেলার শব্দ। এবার আমি বিছানায় উঠে বসলাম। জয়কিষণও তখন বসে। মনে হল সে ভীষণ ভয় পেয়ে কাঁপছে। আমি আলো ফেললাম দরজার উপর। দেখলাম দরজাটা একটু নড়ে উঠলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম—কে—কে—? দরজা খুলতে এগিয়ে যেতেই জয়কিষণ আমার হাত চেপে ধরে বললো—বাবুজী, আমার ভীষণ ভয় লাগছে, বোধহয় দত্ত এসেছে। এমন অবিশ্বাস্য কথাটা শুনেই আমার মাথায় যেন খুন চেপে গেল, দেখতে হবে কেমন ভাবে কাশী থেকে দত্ত এখানে এসে তাকে ভয় দেখায়। জয়কিষণকে আর সুযোগ না দিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম দরজার দিকে। শুধু তার আগে আমার মাথার কাছে রাখা মোমবাতিটা জেলে দিলাম। দু'এক পা এগোতেই দরজাটা দরাম করে খুলে গেল। আমি বিমূঢ় অবস্থায় দু'পা পিছিয়ে এলাম। ফিরে তাকালাম জয়কিষণের দিকে। চমকে উঠলাম দেখে—ঠিক জয়কিষণের পিছনে হাত চারেক দূরে বরেন দত্ত দাঁড়িয়ে। আবছা অন্ধকারে তাকে চিনতে আমার একটুও ভুল হয়নি। ভাল করে তাকিয়ে দেখে শিউরে উঠলাম। সারা দেহে ক্ষতের চিহ্ন, জামাকাপড় রক্তমাখা। সমস্ত শরীরটা যেন মাটির দিকে

কিসের ভারে নুয়ে পড়েছে। ম্লানমুখে একটা জলন্ত প্রতিহিংসার ভাব। চেঁচিয়ে ডাকলাম—বরেনবাবু! আমার দৃষ্টি অনুসরণ করে জয়কিষণবাবু বরেন দত্তকে দেখতে পেয়ে একলাফে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলির পাঁঠার মত কাঁপতে লাগলেন। মনে হল বরেন দত্ত ধীরে ধীরে জয়কিষণবাবুর দিকে এগিয়ে আসছেন। তাঁর ডানহাতখানা কিছুটা তুলে খোলা দরজার দিকে ইসারা করছেন, জয়কিষণবাবুর অমন সবল দেহটা ভয়ে আতঙ্কে কুঁকড়ে গিয়েছে। কঁদতে কাঁদতে বললেন—বিশ্বাস কর দত্ত, আমি তোমায় মারতে চাইনি। ধাক্কাধাক্কিতে তুমি খাদের মধ্যে পড়ে গিয়েছ। আমার সম্পত্তি, টাকা কড়ি, জমি বাড়ী যা আছে সব তোমার ছেলেমেয়েদের দিয়ে দেব। প্রাণে মেরো না। আমায় দয়া কর দত্ত। বলে জয়কিষণবাবু ক্রমশঃ দত্তের নির্দেশমত বাইরের দরজার দিকে পিছন ফিরে এগোতে লাগলেন। দত্তর মুখ চোখ আর অঙ্গভঙ্গি দেখে মনে হল, জয়কিষণকে সে বাইরের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। দরজার দিকে দুজনেই এগিয়ে যেতে লাগলো। একটু এগিয়ে জয়কিষণবাবুর হাত ধরবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু বৃথা। জয়কিষণবাবু হঠাৎ একটা ভয়ার্ত্ত চীৎকার করে খোলা দরজা দিয়ে বাইরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন। মুখ ঘুরিয়ে দত্তের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখলাম— সব ফঁাকা, দত্ত নেই। ঠিক সেই সময় আমার ভাই ও তার বন্ধু। তিনজনে একসঙ্গে চীৎকার করে আমার কাছে ছুটে এল। বুঝলাম এতক্ষণ ওরা কম্বলের তলা থেকে সমস্ত ঘটনাটা ঘটতে দেখেছে। শুধু প্রাণের ভয়ে চুপ করে ছিল। সমস্ত শরীর তখনও কাঁপছিল। বললাম, আর কোন ভয় নেই বরেনবাবু আমাদের কোন ক্ষতি করবেন না।

খোলা দরজা দিয়ে শেষ রাতের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা আসছিল। দরজাটায় ভাল করে খিল এঁটে দিলাম। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, রাত প্রায় আড়াইটে। ওদের বললাম তোরা স্থির হয়ে বস্। ভোর হতে আর বেশী বাকি নেই। আমি ষ্টোভ জেলে চা করি। ঘুম আর আসবে না।

এমন একটা মর্মান্তিক ঘটনা সহসা চোখের সামনে স্বপ্নের মত ঘটে গেল। চোখ বুজলেই যেন সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

নানান চিন্তায় রাতটা কেটে গিয়ে একসময় ভোর হল। মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে রওনা হলাম বাস ষ্ট্যাণ্ডের দিকে। কিছুদূর এগিয়েই লক্ষ্য করলাম একদল পাহাড়ী পথের উপর কোন কিছু একটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। বুকের মধ্যে আমার হাতুড়ি পিটতে লাগলো। কোন একটা অমঙ্গলের আশঙ্কা করে ভাইদের দাঁড়াতে বলে ছুটে গেলাম সেদিকে। গিয়ে দেখলাম জয়কিষণের হিমশীতল দেহটা নিস্পন্দভাবে পথের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। এমন একটা বিয়োগান্ত কাহিনীর শেষ দৃশ্যটি দেখে চোখের পাতা ভিজে উঠলো। ভাবলাম, জানিনা এমন অংশিদারী ব্যবসায় শেষ পর্য্যন্ত কার জয় হল! আর দাঁড়ালাম না, কারণ আমাদের প্রথম বাস ছাড়বে সকাল ৭ টায়।

পয়মন্ত পরচুলা

আজ সারা পৃথিবীতেই পরচুলার ব্যবসার খুবই শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে চলেছে। পরচুলার কদর এত বেড়ে গিয়েছে যে পথে ঘাটে তেমন সুন্দর মাথা দেখলে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। প্রথমে সন্দেহ হয় এমন তেল কুচকুচে চুলগুলো তার নিজের কিনা। যদি সৌভাগ্যক্রমে দেখা যায় যে সত্যি' তার মাথায় এমন সুন্দর কেশদাম গজিয়েছে তাহলে শুধোতে হয়—দাদা কি দামে বিকোবেন, মুড়িয়ে ফেলুন না, না হয় কিছু বেশী দামই দেব—তবুও চুলের অমন তাইচুনের মত গোছাটি আমার চাই-ই চাই। কাজেই বুঝতে পারছেন, চালের সঙ্গে চুলের চাষটা ফলাও করে করতে পারলে বিশ্ব বাজারে চাল চুলো দুটোরই একটা মনোমত ফয়দালা হয়। গোটা ইতালীতে নাকি চুলের কারবার খুব ফলাও করে করা হচ্ছে। প্রায় গোটা চল্লিশেক পরচুলা তৈরির নামজাদা কারখানা গজিয়েছে সেখানে। বড় বড় ব্যবসাদারেরা সারা পৃথিবী থেকেই এই ছাটাই চুল সংগ্রহ করে ইতালীকে তাই সরবরাহ করছে। শুনলে খুবই আনন্দিত হবেন যে সেখানে নাকি ভারতীয় ছাঁটাই চুলের কদর খুব বেশী, বিশেষ করে তা যদি ভারতীয় রমণীর হয় তো কথাই নেই। গত ১৯৬৩ সালে ইতালী পরচুলা বিদেশে রপ্তানী করে প্রায় বত্রিশ হাজার ডলার কামিয়েছে। আর বর্ত্তমানে এই রপ্তানীর পরিমাণ নাকি আট কোটী টাকা।

কিন্তু ভারতের কোটী কোটী লোক যদি শেষে এই ব্যবসার সুযোগ নিয়ে মাথা মুড়োতে আরম্ভ করে তাহলে সমস্ত ভারতটাই অচিরে গয়া ক্ষেত্র হয়ে যাবে।

জন্মান্তরবাদ

রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যারাসাইকোলজি বিভাগের অধিকর্তা ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী মহাশয়, আজ প্রায় ১৭।১৮ বছর ধরে এই জন্মান্তর রহস্য ভেদের চেষ্টা করছেন। অনেক গবেষণার পর তিনি এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে পুনর্জন্ম বা জন্মান্তরবাদ একটি সম্পূর্ণ সত্য ও নিত্য বিষয়। কম করে হলেও প্রায় আটশো জাতিস্মরের বিস্ময়কর সব ঘটনা তিনি যত্ন সহকারে সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং এর স্বপক্ষে রায় দিয়ে বলেছেন যে মানুষ কখন কখন তার পূর্বজন্মের নানান ঘটনা ও ইতিহাস বলতে পারে যা যাচাই করলে দেখা যায় আশ্চর্য্যরকমভাবে তা বর্ণে বর্ণে মিলে যায়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কেমন করে মানুষ তার পূর্ব স্মৃতিকে এ জন্মেই জাগিয়ে তুলতে পারে সে বিষয়ে তিনি নতুনভাবে গবেষণা শুরু করেছেন।

যাক্ একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল যে আমাদের দেশের প্রাচীন মুনি ঋষিরা ডিগ্রিধারী না হলেও তেমন মূর্খ ছিলেন না!

আশ্চর্য্য প্রাণরক্ষা

দুর্ঘটনা যেখানে নিশ্চিতভাবে ঘটতে যাচ্ছে এবং মৃত্যুকে যেখানে সামনাসামনি আলিঙ্গন করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মানুষ যদি দেখে যে, না সে মরেনি, বেঁচে আছে সশরীরে অক্ষত অবস্থায়—তেমন বিস্ময়কর আনন্দ বোধকরি পৃথিবীর আর কোন কিছুতেই মেলে না। ঠিক এমনি একটি রুদ্ধশ্বাস ঘটনা ঘটে গেল দমদম এয়ারপোর্টে। ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের একখানি ভাই কাউন্ট বিমান গৌহাটীর উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে, তার সব আয়োজন সম্পূর্ণ। যথারীতি 'সার্ভিসিং' হয়ে গেল। গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াররা বিমানটির যান্ত্রিক সুস্থতা এবং সক্ষমতা সম্পর্কে 'ফিটনেস সার্টিফিকেট' দিয়ে দিলেন। ৪৬ জন যাত্রী উৎসাহ সহকারে বিমানে উঠে বসলেন, বেশীর ভাগই নারী ও শিশু। আর জনা চারেক উঠলেন বিমানের কর্ম্মচারী। সিনিয়র পাইলট ক্যাপ্টেন কুপার বিমানটির কম্যাণ্ড নিয়ে নির্দ্দিষ্ট সময়ে টেক্-অফ্ করলেন গন্তব্যস্থল অভিমুখে। প্রথমে ঘণ্টা খানেক বিমান দিব্যি উড়ে চললো। গণ্ডগোলের সুরু তার পরেই। ঢাকার কাছাকাছি পৌঁছেই দেখা গেল ইঞ্জিনে রীতিমত গণ্ডগোল। বিমানসেবিকাদের ডেকে বিপদের আশঙ্কা জানিয়ে যাত্রীদের লাঞ্চ দিতে বলা হল তাড়াতাড়ি। ভীষণ ব্যস্ততা সুরু হয়ে গেল মুহূর্ত্তের মধ্যে। বিমানসেবিকাদের সন্ত্রস্তভাবে চলাফেরার ভাবভঙ্গিতে যাত্রীদের মনে সন্দেহ হল। জিজ্ঞাসাবাদ করতেই জানা গেল বিমানের চারটি ইঞ্জিনই বন্ধ। বিমানটি ক্রমশঃ নিচের দিকে নামছে। মুহূর্ত্তে যাত্রীদের চোখেমুখে আতঙ্কের ছায়া নামলো। সামনে অবধারিত মৃত্যু, বাঁচার কোন পথ নেই। তবু ক্যাপ্টেন কুপার জানালেন ভয়ের কোন কারণ নেই। সামনে ঢাকা এয়ারপোর্ট, তিনি সেখানে নামবার জন্য যোগাযোগ করছেন, কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। ঢাকা কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। বিমান তখনও নামছে। ক্যাপ্টেন কুপার বাঁচার আর কোন পথ না পেয়ে দমদমে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে বিমানের মুখ ঘোরালেন। নিশ্চিত মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে করতে ৫০ জন যাত্রী ও বিমান কর্ম্মচারীরা এগোতে লাগলেন দমদমের দিকে। দমদমের কন্ট্রোল টাওয়ারে যখন এই দুঃসংবাদ এসে পৌঁছল যে চারটি ইঞ্জিন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তারা শুধু হাওয়ায় ভেসে কোন এক অদৃশ্য শক্তির ক্রীড়নক হয়ে দমদমে নামবার চেষ্টা করছে। তখন দমদমে সাজ সাজ পড়ে গেল। সর্বনাশ কি হয় কে জানে। দুর্ঘটনা প্রতিরোধের সব রকম আয়োজন মুহূর্ত্তের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে গেল। রানওয়ের কাছ থেকে অপ্রয়োজনীয় সব কিছু সরিয়ে ফেলে ডাক্তার, নার্স, মানে একটা গোটা মেডিক্যাল স্কোয়াড, এ্যামবুলেন্স, পুলিশ, অন্যান্য বড় বড় অফিসার সবাই রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলেন এই মর্মান্তিক দুর্ঘনার নীরব সাক্ষী হতে। দৃঢ় মানসিক শক্তি সম্পন্ন ক্যাপ্টেন কুপার লক্ষ্য স্থির রেখে এগিয়ে আসতে লাগলেন দমদমের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দমদমের আকাশে ভেসে উঠলো ভাইকাউন্ট বিমানের সুদৃশ্য চেহারা। রুদ্ধনিঃশ্বাসে সময় বয়ে

যাচ্ছে। সব কিছু মেশিনের মত ঘটে গেল। ধীরে ধীরে মাটির বুকে নেমে এল ভাইকাউন্ট। একটুও ঝাঁকুনি নেই। কিন্তু, ইঞ্জিনগুলো সব বন্ধ। কোন রকমে সিঁড়ি লাগাবার সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রীরা নেমে এলেন রুদ্ধশ্বাসে। কেউ কেউ বাইরের মাটিতে পা রেখেই জ্ঞান হারালেন। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেল ৫০টি প্রাণ। কে বাঁচাল, কেমন করে কোন শক্তির বলে বিমানটি ডানা মেলে ফিরে এল, এ বিস্ময়ের ঘোর আজও কাটেনি বিমান বিজ্ঞানীদের কাছে। তাঁরা শুধু ভাবছেন—এ অসম্ভব—চারটি ইঞ্জিনই বন্ধ—তবুও বিমানের ফিরে আসা অসম্ভব!

বিস্মৃতি

শৈলেনকুমার দত্ত

সবে ডানা পাওয়া পাখিটা উড়ে এল :
ভয়েতে ভীষণ কেঁপে জলে ভিজে ভিজে
আমার ঘরের মাঝে কি যে দেখা পেল
বসল টেবিল-'পরে ভর করে নিজে!
মুখ তুলে তাকাব কি বললে সে রবে—
আমি এক অনাথা গো চাই শুধু ঠাঁই :
তোমার এ ঘর মাঝে এটুকু কি হবে
এত বড় পৃথিবীতে কোথাও না পাই!
ক্ষীণ হাসি হেসে মুখে ফেলে দেই তারে
ছাল ওঠা দেহটাকে ভাঙা চেরি-মাঝে,
অথচ ক্ষণেক পরে দেখি একেবারে
শেষ হয়ে গেছে ঠাঁই শোকে-ভরা সাঁঝে!
এটুকু থাকার নেশা সব জানি চিতে
তবুও ভোলাই নিজে ফাঁকা পৃথিবীতে!

স্বপ্ন বাসর

মীরারায়

ডাষ্টবিনের পাশে পড়ে থাকা এঁটো কলাপাতা আর খুরী গেলাসের মাঝে নাক ডুবিয়ে জৈবিক তাড়নায় তার আদিম প্রবৃত্তিকে মেটাতে ব্যস্ত কতকগুলো নেড়ী কুকুর, তাদের পাশে কতকগুলো শীর্ণকায় ভিখিরীর ছেলেও জুটেছে কুকুরগুলোর সহকর্মী হয়ে। এই আদিম প্রবৃত্তির তাড়নায় এখানে মানুষে পশুতে আর কোন তফাৎ নেই, মহাক্ষুধা ঘুচিয়ে দিয়েছে এই বিভেদ। আকৃতিতে পার্থক্য থাকলেও প্রকৃতিতে ঐ জীবগুলো সবাই এক হয়ে গিয়েছে। ঐ দূরের বার নম্বরের বড় বাড়ীটা থেকে সানাইএর সুর ভেসে আসছে, জনসমাগমে, আলোবাতির চাকচিক্যে বিয়েবাড়ীটা পথচারীদের কাছে স্বীয় বৈশিষ্ট্যের কথা সগর্বে জানিয়ে দিচ্ছে। রাস্তার ওপরেই ওদের একতলা টিনের ঘরের নড়বড়ে দরজাটা খুলে মুখ বাড়িয়ে একবার বিয়ে বাড়ীটার দিকে তাকাল টেঁপী। বাড়ীটার তিনতলার একটা বিশিষ্ট ঘরের দিকে নজর দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। ঐ ঘরটা নীলার ঘর, তারই আজ বিয়ে। ঐ উজ্জ্বল আলোর নীচেই হয়ত দামী কার্পেটের ওপর গয়না-কাপড়ের দোকান সাজিয়ে নীলা নবজীবনের অভিসার লগ্নের প্রত্যাশায় মুহূর্তগুলো গুণছে। কল্পনায় টেঁপী যেন সব দেখতে পেল। নীলার সেই ঐশ্বর্যময়ী রাজরাণী মূর্তিটা চাক্ষুষ দেখবার জন্য ওর মনটা খুব ব্যস্ত হয়ে উঠল।

এইতো বছর কতক আগেও ওরা দুজনে একই সঙ্গে পড়ত। ফ্রকের ঘাগরা তখনো শাড়ীর আঁচল বিছিয়ে আগামী যৌবনকে নিমন্ত্রণ জানায়নি। কাঁচা বয়স তাদের দুটি কচি মনকে সামাজিক উঁচুনীচুর পার্থক্যবোধ শেখাতে পারেনি। বড় বাড়ীর মেয়ে নীলা মনের কপাট খুলে অবাধ নিমন্ত্রণ জানিয়েছিল এই একতলার টিনের ঘরের টেঁপীকে। একটু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টেঁপীকে স্কুল ছাড়িয়ে এনে সংসারের কর্মচক্রে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। অভাবের সংসারে স্কুলকলেজে গিয়ে বিলাসিতা করবার মত অর্থসঙ্গতি টেঁপীর বাবার ছিলনা। সে সময়টা সংসারের কাজে মেয়েকে লাগালে সংসারের উপকার হয়, মা'এর কাজে সহায়তা হয়, ভাইবোনগুলোরও দেখাশোনার সুরাহা হয়।

ছোট ভাইটার স্কুলের বাড়তি খরচটা মা সকালবেলায় অন্য বাড়ীতে রান্না করে পুষিয়ে দিচ্ছে এবং সকালে বাবার অফিসের, ভাইএর স্কুলের ভাত যোগানোর দায়িত্বটা পড়েছে টেঁপীর ওপর। তার ঐ নীলার মত নিত্যনূতন সাড়ীর চলন্ত বিজ্ঞাপন হয়ে বেণী দুলিয়ে স্কুলে পড়তে যাবার ফুরসৎ কোথায়?

জালাকরা চোখের ঝাপসা দৃষ্টির সামনে তার ও নীলার বন্ধুজীবনের বিগতস্মৃতি একটা মধুর আমেজ এনে দেয়। নীলা স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকেছে, এবং তার কলেজের পড়াও কবে শেষ হয়ে গিয়েছে তা টেঁপীর জীবনে ক্লান্তবিধুর পলাতকা মুহূর্তগুলোর মধ্যে আর ধরা পড়েনি। শুধু আজ সকাল থেকে নীলার বিয়ের সানাইএর সুরে বারে বারে ও বেশ আনমনা হয়ে উঠছে। কেবলি মনে জাগছে স্কুল জীবনের স্বল্পায়ু স্মৃতি। একদিন ওরা দুজনে পরস্পরের কত নিকটে ছিল আর আজ সভ্য সমাজ তাদের কোথায় সরিয়ে দিয়েছে। দুটি ফুটনোন্মুখ কিশোর হৃদয় ফুটে উঠেছিল স্বাভাবিক নারীহৃদয়ের পরিণতির সম্ভাবনা নিয়ে, একজন বিকশিত হয়েছে পরিপূর্ণ দল মেলে নিজের মাঝে নূতন সৃষ্টির আহ্বানে আজ সে তার বিশেষ ভ্রমর পথিককে জীবনে বরণ করে নিতে সমারোহের সঙ্গে প্রস্তুত। আর সে নিজে? দারিদ্র্যের যে ভীষণ কালো কীটটা তার ফুটে ওঠার মুখে সমস্ত কুরে খেয়ে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে, এই

কুঁকড়ে যাওয়া কীটদষ্ট দেহমনে কোথায় সে তার নতুন জীবনকে অভ্যর্থনা জানাবে? ওসব টেঁপীর কাছে স্বপ্ন-বিলাস। তবুও নীলার বিয়ের কথা শুনে পর্যন্ত এক একবার ভাবতেও তার ভালো লাগছে বৈ কি।

রাস্তায় একটা বড় গাড়ী হর্ণ দিয়ে চলে গেল। তার তীব্র শব্দে টেঁপীর চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল, এসব কি এলোমেলো চিন্তা সে আজ সকাল থেকে করছে, ঘরে এখনো কত কাজ বাকী রয়েছে। নড়বড়ে দরজাটা বন্ধ করে ও ভেতরে ঢুকে এল। সমস্ত সংসারটায় এক অসীম তৃষ্ণার যেন চাপা আর্তনাদ গুমরচ্ছে, ঢোকবার দরজাটাও তৈলতৃষার একটা কর্কশ আর্তনাদ তুলে যেন সমস্ত বাড়ীটার প্রবল তৃষ্ণার সঙ্গে একসুরে সুর মেলাল। ঘরে এসেও চিন্তার হাত থেকে মুক্তি নেই। নীলা হয়ত আরও সুন্দর দেখতে হয়েছে কনের সাজে, কত আদর, অভ্যর্থনা আনন্দ, সবই ঐ মেয়েকে কেন্দ্র করে—নীলার সবই আছে রূপ, যৌবন, ঐশ্বর্য, মর্যাদা আজ এগুলোর প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ রাত্রি! নিজের অজান্তেই টেঁপী একবার নিজের দেউলে হওয়া শরীরটাকে দেখে নিল। অভাব অনটন যৌবনের দুর্নিবারযাত্রাকে রোধ করতে পারেনি, তবে তার কশাঘাতে সে দুর্বল কৃশ, যৌবন ভীরু পদক্ষেপে সরে পড়তে উদ্যত। দেহের যৌবন পালাতে চাইলেও মনের যৌবন তার দাবী জানাতে ছাড়েনা।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে, রাতের রান্না সারা হয়ে গেছে। ঘন ঘন শাঁখের আওয়াজ ভেসে আসছে, বোধ হয় বর এসে পড়েছে। ভীড়ের ফাঁকে একবার টুক করে গিয়ে নতুন বরকে আর নীলার সেই রাণীর মত সাজ-সজ্জাটা দেখে আসবার তার প্রবল লোভ হল। পরণের মলিন সাড়ীটা খুলে বাক্স থেকে মাএর তুলে রাখা বহুদিনের পুরানো জরীপাড় সাড়ীটা বার করে পরল টেঁপী। বাবা নিয়মমত দাবার আসরে গেছেন, মাও এখনো কাজ সেরে ফেরেননি, ভাইবোন দুটোকে জোর করে লণ্ঠনের আলোর দুপাশে পড়তে বসিয়ে টেঁপী রাস্তায় বেরিয়ে এল।

গেট দিয়ে ঢুকে সামনেই বরাসনের সুসজ্জিত মঞ্চ, বহুলোকের ভীড়, আলোর রোশনাই ফুলের সুবাসে জায়গাটা যেন স্বর্গরাজ্য বলে ভ্রম হয়। পৃথিবীর কোন গ্লানি যেন এখানে আসতে পারছে না। ভীড়ের মধ্য থেকে মাথা তুলে টেঁপী কোনরকমে বরকে দেখে নিল। ছোটবেলায় ঠাকুরমার কোলের কাছে শুয়ে নিজের বিয়ের কাল্পনিক গল্প সে অনেক শুনেছে। তিনি বলতেন 'আমাদের টেঁপী-রাণীর যে বর আসবে সে রাজপুত্রের মত দেখতে হবে, রাজার সিংহাসনে তাকে বসান হবে। আর টেঁপীরাণী সাজবে রাণীর মত, নৈলে রাজপুত্তুর বিয়ে করবে কেন!'

বড় হয়ে এই গল্পের কথা মনে পড়ায় তার হাসি পেত, হায়রে স্নেহান্ধ মানুষের কল্পনা আর আশায় অন্ধ ভবিষ্যৎ! কিন্তু সেই কল্পনারই যে বাস্তব রূপ আজ সে চোখের সামনে দেখছে। রাজসিংহাসনের মত বরাসন আলো করেই তো রাজপুত্রের মত নতুন বর বসে আছে, তাহলে ঠাকুরমার গল্পকথাটা নেহাৎ মিথ্যা নয়, কারোর ভাগ্যে সত্যিও হয়। ভীড় ঠেলে বাড়ীর ভেতরে টেঁপী এগিয়ে গেল। এবাড়ীর প্রতিটি অলিগলি তার চেনা, ছোটবেলায় অনেকবার এসেছে। সিঁড়ি বেয়ে ও তিনতলায় উঠে এল, নীলার সজ্জাটা একবার দেখতেই হবে, এত লোকের মাঝে কেউ তাকে লক্ষ্যই করবেনা স্বচ্ছন্দে গিয়ে দেখে আসতে পারবে। কিন্তু সঙ্কোচের উত্তেজনায় ওর বুকটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগল, পা-এর গতি শ্লথ হয়ে এল, ধীর গতিতে টেঁপী তিনতলায় নীলার ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। উজ্জ্বল নীলাভ আলোয় কনের সাজে সত্যিই নীলাকে অপরূপ দেখাচ্ছে। নিজেকে গোপন করে ও দাঁড়িয়ে রইল, নীলাও তাকে আজ চিনবে না সেও নিজেকে চেনাতে চায় না, রবাহুত হয়ে সে শুধু তার রাজসিক কল্পনার একটি বাস্তব রূপ দেখতে এসেছে। ঘরের ঐ স্বপ্ন-রাজ্যের সঙ্গে টেঁপীর বাস্তবক্ষেত্রে কোন পরিচয় নেই। নিছক কল্পনার তুষ্টি সাধনে তার এখানে আসা।

তন্ময় হয়ে দেখতে দেখতে সে প্রায় সবই ভুলে গিয়েছিল। ঐশ্বর্যের কী মনোমোহিনী রূপ! হঠাৎ মিলিত নারীকণ্ঠের উচ্চনাদে তার চমক ভাঙ্গল। সাড়ী গয়নার চলন্ত মিছিল সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে, তাদেরই মিলিত উচ্চকণ্ঠ শোনা গেল, 'সরে যাও, সব সরে যাও, বরকে ছাদনাতলায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।' বিয়ের শুভ মুহূর্তের আগে কোন কুৎসিত অশুভ নীচ জাতীয়ের মুখদর্শন নিষিদ্ধ এই নাকি এ বাড়ীর নীতি, তাই বরকে মাঝখানে রেখে মহিলাযথ

অশুভকে দূর করতে করতে সৌভাগ্যকে বরের সঙ্গে কড়া প্রহরায় আগলে নিয়ে সন্তর্পণে উঠে আসছে। বরের চোখের সামনে কাপড়ের পর্দা ধরে আছেন একদল পাছে দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে অশুভ কিছু প্রবেশ করে। সৌভাগ্যকে আটঘাটে বেঁধে রাখবার এই অদ্ভুত প্রচেষ্টায় টেঁপীর হাসি পেল। টেঁপীর শ্রীহীন মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে এক মহিলা চেঁচিয়ে উঠলেন, সরে যাওনা বর উঠছে দেখতে পাচ্ছ না? কোত্থেকে যে এইসব আজেবাজে মেয়েগুলো এসে কাজের জায়গায় ভীড়করে দাঁড়াচ্ছে, সব যেন রঙ্গ দেখতেজুটেছে!" একটা দারুণ তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি ছুঁড়ে মেরে তিনি হেলেদুলে উঠে গেলেন।

টেঁপীর নিজেকে বড় অপরাধী মনে হল, নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও নেমে আসতে আসতে নারীরক্ষীবাহিনীর মধ্যমণি বরকে একপলকে দেখে নিল। সত্যিই অনাহুতহয়ে নিছক কৌতুহলবশেতার এখানে আসা অনুচিত হয়েছে কিন্তু উপবাসী মনটা যে সবসময়েসংসারের নিয়মরীতির যূপকাষ্ঠে বলি হতে চায় না। ঐতো রুবি-ঘোষ, কেতকী দত্ত সকলেই তো তার আর নীলার সঙ্গে পড়েছে তারা তো আজ সমাজের বিশিষ্ট ঘরের ছাড়পত্রের জোরে এই বিয়ের আসরে নিমন্ত্রিত হয়েছে, কিন্তু তার টিনের ঘরে বসবাস আর জীর্ণ দীন বেশবাস তাকে ওদের থেকে অনেক নীচে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। ভাগ্যদেবতা মূক ও বধির, অভিযোগ জানাবে কার কাছে? কিন্তু ভাগ্যদেবতা এক বিষয়ে কোন পার্থক্য করেনি নারী-হৃদয়ের, প্রাথমিক বৃত্তিগুলো ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সব নারীর মনে সমানভাবে জাগিয়ে দিয়েছেন, নইলে নীলার এই নতুন রূপের মধ্যে তার নিজের মনের ইচ্ছার প্রতিচ্ছবি-টাই কি সে দেখার জন্য ছুটে আসেনি?

একতলায় নেমে শূন্য বরাসনের প্রতি ওর নজর পড়ল। বরাসনটা খালি তবু তার চারপাশে লোকজনের সমারোহ এতটুকু কমেনি। টেঁপী নিজের মনের অন্তর্নিহিত ছবিটাই এখানে আবার দেখতে পেল। তার মনের রাজ-সিক ভোগবৃত্তিগুলো ঠিক অমনি সমারোহে তার জীবনের নতুন অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। কিন্তু তারও বরাসনও যে ঐরকমই শূন্য সে অতিথিটি যে আজও এসে পৌছোয়নি।

নীলার ঐশ্বর্যমণ্ডিত রূপটি চিন্তা করে সে নিজের সঙ্গে তুলনা করল, বাহ্যিকরূপে নীলার সঙ্গে তার তুলনা হয় না সত্যি কিন্তু নিজের মনের রাজত্বে সে নিজেই রাজরাণী। তার এই রাণীগিরি তো আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না! নীলার বিয়ে, নীলার বিয়ে, সকাল থেকে মনটা তার ভয়ানক উন্মনা হয়েছিল। দেখে যাবার পরও তো মনটা শান্ত হচ্ছে না? এসব ভাববিলাসগুলো জোর করে দমন করে টেঁপী বাড়ির দিকে এগোল।

বাড়ী ঢোকবার টিনের দরজাটা খোলা ছিল বোধহয় মা কাজ থেকে ফিরে এসেছেন। ভাইবোনদুটো তার অনু-পস্থিতির সুযোগে লণ্ঠনের দুপাশে শুয়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে। মা বোধহয় রান্নাঘরের দিকে গেছেন এখনি ডাক পড়বে ভাইবোনদের ঘুম থেকে তুলে খাওয়াবার জন্য। হঠাৎ নিত্যনৈমিত্তিক সংসারের এই ঘানিটানার বিপক্ষে টেঁপীর মনটা বিদ্রোহ করে উঠল। সংসারেও চব্বিশঘণ্টাই নিজেকে দিয়ে রেখেছে, আজ অন্ততঃ কয়েকটাঘণ্টা ও নিজস্ব একান্ত করে ভোগ করবে। এসময়টুকু ও নিজের পৃথিবীতে সম্রাজ্ঞী হয়ে থাকবে, কারোর হস্তক্ষেপ সহ্য করবে না। রান্নাঘরে গিয়ে মাকে জানিয়ে এল কিছু খাবেনা, শরীরটা ভালো লাগছেনা। সে শুতে যাচ্ছে তাকে যেন আর না ডাকা হয়। মা দুএকবার ডাকাডাকি করেও যখন অন্ধ-কারে পড়ে থাকা নিশ্চুপ মূর্ত্তিটার কাছ থেকে কোন সাড়া শব্দ পেলেনা তখন আপন মনে বকতে বকতে টেঁপীর নিত্যকর্ম্মগুলো কোনমতে শেষ করতে লাগলেন।

বার নম্বরের বড় বাড়ীটায় বরাসনে আবার বর এসে বসেছে। কিন্তু যে বরকে টেঁপী দেখে এসেছিল এ সে লোক নয় এ একজন নতুন বর, কিন্তু একে দেখতে টেঁপীর আরও ভালো লাগছে। ওর মনের কল্পনার মূর্ত্তির সঙ্গে এ নতুনবরের আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে! বরকে উঁকি মেরে দেখেই টেঁপী সেই তিনতলার ঘরে উজ্জ্বল আলোর নীচে গিয়ে বসল। কি আশ্চর্য আজতো তারই বিয়ে সে সব ভুলে গিয়েছিল কেন? কিন্তু এত সাড়ী গয়না তার গায়ে কি করে এল বা টিনের ঘর ফেলে সে নীলাদের বাড়ীতেই বা কি করে এল? নীলার চেয়েও এখন তাকে কম সুন্দর দেখাচ্ছে না! নীলার বাবাই হয়ত তার বাবাকে বিয়ে দেবার জন্য এ বাড়ীতে ডেকে এনেছেন। বড় বাড়ী

না হলে সমারোহে বিয়ে হবে কি করে? এত সুন্দর বর, এত গয়না সাড়ী কোনোদিন তার হবে একথা সে ভাবতেই পারেনি।

শুভদৃষ্টির সময়ে বরের দৃষ্টির মাঝে ও যেন নতুন করে নিজেকে দেখতে পেল। তার সমস্ত অভীপ্সাগুলো যেন ঐ বরের বেশে এসে হাজির হয়েছে। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে টেঁপী যেন সৌভাগ্যের এই দান গ্রহণ করছিল, নীলাই শুধু রাজরাণী হয়নি, এবার সেও হতে চলেছে। ধনী সমাজে যাতায়াতের ছাড়পত্র তারও করতলগত। আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠেছে তার দেহমন, সবপাওয়ার উল্লাসে যেন ও ফেটে পড়তে চাইছে। বাসরে ওদের শুইয়ে দিয়ে মেয়েরা সব একে একে বিদায় নিয়েছে। টেপী এইটাই চাইছিল। নিরালা বাসর শয়নে ও তার পরম লগ্নের অভ্যাগত অতিথিটিকে একান্ত আপনার করে কাছে পেতে চায়। ও তার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে শুষে নিতে চায় এই রমণীয় মুহূর্ত্তগুলোকে। যক্ষের ধনের মত আগলাতে হবে এই রাতটাকে। এর পলাতকা পলদণ্ডগুলোকে কল্পনার বেড়াজাল দিয়েও অন্তত: ধরে রাখতে হবে।

নতুন বর ওর গায়ে আলোতোভাবে হাত রাখল।

'শুনছ আজকের রাতটা বড় সুন্দর, নয়? কিন্তু এর রূপটা বড় ছলনাময় এতে আত্মহারা হয়োনা তাতে ঠকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।'

টেঁপী অবাক বিস্ময়ে বরের দিকে তাকাল। নতুন বরের মুখে এ কি ধরণের কথা!

'জানো, দুঃখের কঠিন ভুমিতেই এ রাতের প্রকৃত মূল গাঁথা। বেদনার কঠিন পথের ওপর দিয়েই জীবনের যাত্রা সম্পূর্ণ হয়। দুঃখকে আমি ভালো করে চিনেছি, সেইটাই জীবনের সত্যকারের রূপ, তাকে ভয় পেয়ে এড়িয়ে যেতে গেলে পদে পদে ঠকতে হয়, আর এই ঠকাবার জন্যই সুখের মোহময় রূপ ছলন করতে আজকের মত বিশেষ বিশেষ রাতের সৃষ্টি করে।'

টেঁপীর বিস্ময়ের সীমা নেই, এতো নতুন বরের কথা নয়! এতো জীবন দর্শনের মহাতাত্বিক কথা শোনাচ্ছে কোন দার্শনিক, এতো তারই জীবনদর্শনের শেষ কথাগুলো এই পরম অতিথিটির মাধ্যমে তার ভাগ্যদেবতা শুনিয়ে দিচ্ছে।

অস্ফুটস্বরে টেঁপী বলতে চাইল। 'ওগো জীবনভোর দুঃখের ভারে আমি ক্লান্ত জর্জরিত হয়ে আজকের এই রাতটি কামনা করেছি, আজকের রাতে এ আনন্দটুকু পাথেয় হিসাবে সঞ্চয় করতে দাও, নাহলে সারা জীবন কিসের পুঁজি ভাঙ্গিয়ে চলব? আমার অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্ত রূপ তুমি, তোমার কাছে এ তাত্বিক কথা শুনতে আমার ভালো লাগবে না। হোক ক্ষণিক, হোক সুখ ছলনাময়, তবু এ রাতে তুমি আমার স্বপ্ন সম্ভব করে তোল, আমার সারা জীবনের চলবার পাথেয়তে ভরিয়ে দাও।'

কিন্তু ওর সমস্ত গলাটা যেন বুঁজে বন্ধ হয়ে এল, সমস্ত চেতনা দয়িতের প্রেমের আলিঙ্গনের মাঝে এক পরম সুখাবেশে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। এইই তো সে চেয়েছিল, নারী জীবনের চিরন্তন কামনার এই তো স্বাভাবিক পরিণতি, তার চাওয়া পাওয়ার মাঝে আজ সম্পূর্ণ।

টেঁপীর হাত ধরে সে আবার বল্লে, 'এসো সারাজীবন তুমি আমার পাশে আমার অভিজ্ঞতার সঙ্গী হয়ে এসে দাঁড়াও, দুঃখকে ভয় না পেয়ে আমরা যেন জীবনকে ঠিকমত চিনতে পারি।' টেঁপীর হাত ধরে সত্যিই কে যেন টানছে। চমকে স্বপ্নবাসর থেকে ছিটকে টেঁপী নিজের ছেঁড়া বিছানাটায় চলে এল। হাত ধরে টানছে মা আর সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার পাথেয়গুলো একটু একটু করে বেরিয়ে আসছে, "সকাল আটটা বাজল, কাল সন্ধ্যে থেকে সেই যে লাট রাণী মেয়ে ঘুমোচ্ছে এখনও ঘুম ভাঙ্গবার সময় হল না? বলি আমায় তো পরের বাড়ী পিণ্ডি রাঁধতে যেতে হবে। এ সংসারের গুষ্টিবর্গের মুখে ভাতটা জোগাবে কখন? বাপ ভাই কি না খেয়ে আপিস ইস্কুল যাবে?"

চোখ কচলে তাড়াতাড়ি টেঁপী উঠে দাঁড়ায়, রাতের স্বপ্নটার কথা মনে পড়ে গেল, এইই কি জীবনের সত্যিকারের রূপ? এর মধ্যে ভেজাল কিছু নেই? আর যে মরীচিকার পেছনে মনটা নিয়ত ছুটে চলেছে সেটা কি আলেয়ার ইঙ্গিত? জীবনে চলবার পাথেয় থলি সবে তো উজাড় করা হচ্ছে, আরও কি কি বেরোবে তার জন্য আর তার মাথাব্যথা নেই। খুব সহজভাবেই ও দৈনন্দিন কাজের জন্য পা বাড়ায়।

করুণাময়ী কালী বাড়ী

শ্রীবিমলকুমার ভট্ট চার্য্য

আজ পর্য্যন্ত যেখানে যত মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে খোঁজ করলে দেখা যাবে প্রত্যেকটি মন্দির প্রতিষ্ঠার পিছনে কিছু না কিছু ধর্ম্মীয় অনুজ্ঞা বা অলৌকিক ঘটনার ইতিহাস জড়িয়ে আছে। বিশেষ করে সে মন্দির যদি প্রাচীন হয়, তাহলেত কথাই নেই। যুগে যুগে, বারে বারে কত ভাবেই না ঈশ্বরের লীলাকমল প্রস্ফুটিত হয়েছে পৃথিবীর বুকে। কত ভক্তজনকেই না মা তার মাতৃনামে হৃদয় ভরিয়ে দিয়েছেন। প্রাচীন এক জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠিত "শ্রীশ্রীকরুণাময়ী কালী মন্দির" দেখে সে কথাই বার বার মনে পড়েছিল। মন্দিরটি বহু পুরাতন। মায়ের শিলাময়ী মূর্ত্তিটী প্রায় চারশত বৎসরের পুরাতন হবে। মধ্যস্থলে সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ। মায়ের মূর্ত্তিটী অপূর্ব ঐতিহ্য মণ্ডিত। মায়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মন আনন্দে ভরে উঠবে। পদতলে রক্তজবার দল যেন মায়ের চরণ ঘিরে হাসছে। এ যেন সার্থক জীবনের হাসি। এমন একখানি মাতৃমূর্ত্তি না দেখতে পেলে জীবন যেন অসার্থক হয়ে যেত। অথচ কলকাতার কত কাছে। আদি গঙ্গার তীরে এই দ্বাদশ শিবমন্দির যুক্ত মায়ের মন্দিরটী অবস্থিত। টালীগঞ্জের ৪নং সরকারী বাস ষ্টাণ্ডে নেমে সামান্য পথ হেঁটে গেলেই মন্দিরে পৌছান যায়। অথবা বেসরকারী ৪০নং রুটের একেবারে শেষ প্রান্তে নামলেও দেখা যাবে সামনেই মন্দির। বর্ত্তমান পুরোহিত শ্রীঅসিতরায় চৌধুরীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল মন্দির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস নিয়ে। সহজ, সরল যুবক। সদা হাস্য-ময়, মায়ের উপযুক্ত পূজারীই বটে। তাঁর কাছেই গল্প শুনছিলাম।

আজ থেকে প্রায় চারশো বছর আগেকার কথা। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বড়িষার বিখ্যাত জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীরা প্রভূত ভূসম্পত্তি এবং ধন সম্পত্তির মালিক ছিলেন। এই জমিদার বংশের গোড়াপত্তনের সময় এদেরই বংশে একজন মহান সাধক জন্মগ্রহণ করেন। সেই সাধকের একসময় একটি কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। রূপেগুণে অতি অতুলনীয়া ছিল সেই কন্যাটি। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে সেই কন্যা অকস্মাৎ মারা গেলেন। কিন্তু কন্যার সাধক পিতা কন্যার এই শোচনীয় মৃত্যুতে ভীষণভাবে মর্মাহত হলেন। কন্যার এই করুণ বিয়োগ ব্যথাকে ভোলবার কোন সান্ত্বনা সেদিন তিনি খুঁজে পেলেন না। তিনি পাগল-প্রায় হয়ে বিভিন্ন স্থানে একাকী ঘুরে ঘুরে জীবন কাটাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় একদিন গভীর রাত্রে তিনি একটি অপ্রত্যাশিত স্বপ্ন দেখেন। তিনি দেখলেন,—তাঁর সদ্যমৃতা কন্যা স্বয়ং এসে বলছেন, বাবা তোমায় আমি ছেড়ে চলে এসেছি তুমি দিন দিন এই ভেবে কেন মিছে মনে দুঃখ করছ? আমি তোমায় ছাড়া কি কখন একদণ্ড থাকতে পারি, না পেরেছি কোনদিন? শোন, তুমি আমায় তোমার স্বকন্যা রূপেই আবার ফিরে পাবে। আজ হতে পুনরায় আমি তোমার কাছে তোমার কন্যা রূপেই চির দিন বাঁধা হয়ে থাকব। আজ এই রজনী অবসান হবার পর তুমি সোজা চলে যেও আদি গঙ্গার কূলে। সেখানে কূলবর্ত্তী একটি বৃক্ষের তলায় দেখতে পাবে একটি কষ্টি পাথর। পরম ভক্তি ভরে সেই পাথর দিয়ে তুমি সেখানেই নির্মাণ করো তোমার ইষ্ট দেবীর প্রতি-মূর্ত্তি। :জেনো তোমার গড়া সেই প্রস্তর মুর্ত্তির মধ্যেই আমি চিন্ময়ী হয়ে চিরদিন বিরাজ করব। এই কথা কটী বলেই তাঁর সেই মৃতা কন্যা সহসা

অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সাধকের এই অলৌকিক স্বপ্ন দর্শনে তৎক্ষণাৎ নিদ্রা ভঙ্গ হয়ে গেল এবং আনন্দে তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। স্বপ্নে এই আনন্দ সংবাদ পেয়ে সাধক অত্যন্ত অধীর চিত্তে রাত্রি প্রভাত হতেই ছুটে এলেন ভীম স্রোতা আদি গঙ্গার তীরে। এসে তিনি সত্য সত্যই দেখলেন, গঙ্গার তীরে পড়ে রয়েছে তাঁর সেই স্বপ্ন নির্দ্দিষ্ট কৃষ্ণশিলা। আনন্দে সাধকের দু'নয়ন দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল অবিরল আনন্দ অশ্রু। মা-মা বলে পাগলের মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন সাধক সেই পবিত্র শিলার উপর। সেই জাগ্রত শিলা দিয়ে সেই দিনই সাধক মায়ের আদিষ্ট মূর্ত্তি নির্মাণের শুভ সঙ্কল্প করলেন। পরে অতি অলৌকিক উপায়ে সফল হয়েছিল তাঁর সেই শুভ সঙ্কল্প। শোনা যায়, সাধকের প্রতি মায়ের স্বপ্নাদেশ হবার পর মা তাঁর মূর্ত্তি গঠনের জন্য জনৈক ভক্তকে পুনরায় স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। সেই ভক্ত শিল্পীই নির্মাণ করেছিলেন মায়ের এই করুণাময়ী মূর্ত্তি। এক শুভ সন্ধিক্ষণে সাধক মা করুণাময়ীর সেই শিলাময়ী মূর্ত্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে মাকে জাগিয়ে তুললেন। চিরদিনের তরে হারিয়ে যাওয়া সেই আদরিণী কন্যাকে এইভাবে পুনরায় মায়ের মধ্যে ফিরে পেয়ে সাধক যেন আনন্দে অত্যন্ত মাতোয়ারা হয়ে উঠলেন। প্রতিদিন তিনি তাঁর অন্তরের ভক্তি অর্ঘ্য দিয়ে প্রাণভরে পূজা করতে লাগলেন মা করুণাময়ীর। এইভাবে কিছুদিন আনন্দের মধ্যে দিয়ে গত হবার পর, হঠাৎ একদিন ওপার থেকে মায়ের ডাক এসে পৌঁছল সেই সাধকের কাছে। বংশের প্রাণ পুরুষ সেদিন চির বিদায় নিয়ে গেলেন সত্য, কিন্তু তিনি আমাদের এই দেশ ও দশের জন্যে রেখে গেলেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অমর কীর্তি। সাবর্ণ বংশের এই আদি প্রত্যক্ষিতা জননী মা করুণাময়ী পরম জাগ্রত হয়ে আজও স্বমহিমায় বিরাজিত হয়ে আছেন। মায়ের এই শুভ আবির্ভাবে সমগ্র সাবর্ণ বংশ আজ ধন্য ও পবিত্র। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরে বাংলা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিদিন অসংখ্য ভক্ত সন্তানের দল আসতে লাগল। তারা মায়ের কাছে তাদের মনের বাসনাকে পূর্ণ করার বিনীত প্রার্থনা জানিয়ে যেতে লাগলেন। মা তাঁর সন্তানগণের মনের বাসনাকে পূর্ণ করলেন। মা যে আমাদের করুণার কল্পতরু। গঙ্গার পশ্চিম কূলবর্ত্তী সাবর্ণদের এই মন্দিরের চারিপাশ একদা গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। বিশেষ কোন প্রয়োজন না থাকলে গ্রামবাসীরা কেহ সচরাচর এই শ্বাপদসঙ্কুল স্থানে বড় একটা আসত না। মায়ের এই মন্দিরকে নিয়ে এ অঞ্চলে অনেক অলৌকিক কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়।

নিত্য নির্দ্ধারিত সময়ে মায়ের পূজা যথারীতি সমাপন হয়ে যাওয়ার পর, মন্দির যখন গভীর অন্ধকারের মধ্যে ডুবে যেত, তখন অকস্মাৎ মধ্য রাত্রির দিকে এই মন্দিরের দুপাশ এক অদ্ভুত আলোর জ্যোতিতে আলোকিত হয়ে উঠত। আর সেই উজ্জ্বল আলোময় মন্দিরের বন্ধ কপাটের অন্তরাল থেকে কাসর ঘণ্টা ও শঙ্খ বেজে উঠত। এমন কি পবিত্র ধূপ-ধুনার সুগন্ধ পাওয়া যেত বলে শোনা যায়। সেই মনোরম অলৌকিক পরিবেশ দেখে গ্রামবাসীদের মনে হত, যেন মায়ের কোন একনিষ্ঠ ভক্ত বুঝি সেই নিশুতি রাতে একাগ্র মনে মন্দিরে বসে পূজা করে চলেছেন। কিন্তু কেউ যদি কখন কৌতূহল বশতঃ সেই উজ্জ্বল আলোকে লক্ষ্য করে মন্দিরের দিকে এগিয়ে যেত, তাহলে তৎক্ষণাৎ সেই আলোকরশ্মিকে পুনরায় সেই গভীর অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যেতে দেখা যেত। আর সেই কাঁসর ঘণ্টাধ্বনিও সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে যেত। মন্দির প্রাঙ্গণে এই ভৌতিক ঘটনাকে হামেশাই ঘটতে দেখে গ্রামবাসীদের মনে ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি হলো। আবার কেহ কেহ মায়ের প্রত্যক্ষ লীলার কথা স্মরণ করে একান্ত ভক্তি সহকারে দূর থেকে মায়ের উদ্দেশ্যে গড় হয়ে প্রণাম করত। এই সব ঘটনাগুলি খুব একটা বেশী দিনের কথা নয়। আজ থেকে মাত্র পঁচিশ ত্রিশ বছর আগের কথা। সে সময় এই গ্রামের আশে পাশের লোকেরা মায়ের মন্দিরের ধারে শৌচাদি করে দিন দিন মায়ের এই স্থানকে ভয়ানক অপবিত্র করে তুলেছিল। শোনা যায় তারাও নাকি সময় সময় মায়ের এই পবিত্র স্থানে বিভিন্ন ভৌতিক ছায়াকে প্রত্যক্ষ চলতে ফিরতে দেখত। তাদের মনে হত, কোন অদৃশ্য মহাপুরুষ যেন এই নির্জ্জন মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে নীরবে পদচারণা করে চলে-

ছেন। যেদিন থেকে তারা এই ভৌতিক অঘটন গুলিকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছিল, ঠিক সেই দিন থেকে তারা মায়ের এই স্থান মাহাত্ম্যের কথা স্মরণ করে সেখানে সর্বপ্রকার শৌচাদি কার্য্য বন্ধ করেছিল। এর পরেও আরো কতকগুলি অলৌকিক ঘটনাকে সেখানে ঘটতে দেখা গিয়েছিল। সে ঘটনাগুলি ছিল খুবই চমকপ্রদ। তখন এখানকার গ্রামবাসীরা মায়ের এই মন্দির চত্বরে নানা যাত্রাগানের আসর বসাত। মন্দির প্রাঙ্গণে তাদের মিলিত এই আনন্দ উৎসব দীর্ঘ দিন ধরেই চলে আসছিল। একবার তাদের সেই যাত্রা উৎসবের দিনে বিরাট একটি অলৌকিক কাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছিল। শোনা যায়, সেই অলৌকিক কাণ্ডের পর থেকে নাকি কেউ আর কোনদিন মায়ের সেই জাগ্রত স্থানের শান্ত নীরবতাকে ভঙ্গ করে কোন রকম নিছক আনন্দ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেনি।

সেদিনের ঘটনাটি হলো এই :—কোন একটি বিশেষ দিনে গ্রামবাসীরা একত্র হয়ে মায়ের মন্দির প্রাঙ্গণে একটি বিরাট যাত্রাগানের আয়োজন করেছিলেন। পালা গান সেদিন যথারীতি ভালই জমে উঠেছিল। কিন্তু মধ্যরাত্রির দিকে হঠাৎ দেখা গেল, অসংখ্য বিষাক্ত সাপের দল অকস্মাৎ কোথা থেকে এসে ক্রমে সেই আসরের মধ্যে প্রবেশ করতে সুরু করে দিয়েছে।

আর একবারও ঠিক অনুরূপ যাত্রাগানের অনুষ্ঠানের দিনে দেখা গেল হাজার হাজার মৌমাছির ঝাঁক হঠাৎ কোথা থেকে উড়ে এসে আসরের সকল নিরীহ শ্রোতাদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ সুরু করে দিয়েছে। বারংবার এই অপ্রত্যাশিত ভয়াবহ পরিবেশের সৃষ্টি হওয়ায়, শ্রোতাদের পক্ষে যাত্রাগান শোনা অত্যন্ত ভীতিজনক হয়ে উঠল। তাঁরা সত্বর এই অভাবনীয় বিঘ্নের উপায় উদ্‌ঘাটনের জন্য বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শোনা যায়, ঘটনার দিন কয়েক পরেই নাকি গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেকেই একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন। মা যেন তাদের স্বয়ং ডেকে বলছেন, ওরে আমার এই স্থান ভক্ত সন্তানদের জন্যে রক্ষিত। আমি যে আমার ভক্ত সন্তানদের জন্যে যুগ যুগ ধরে এই পুণ্যস্থানে বিরাজ করছি। কাজেই তোরা আর কোনদিন এই পবিত্র স্থানে শৌচাদি করে আমার এই স্থানকে কলুষিত করিসনি। আর আমার ভক্ত সন্তানদের সাধনায় বিঘ্ন ঘটিয়ে এই স্থানে কখন কোন রকম আমোদ অনুষ্ঠানও করিস নি। মায়ের এই স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পর গ্রামবাসীদের মধ্যে এক মহা সোরগোল পড়ে গেল। সেই দিন থেকে তারা সকলে মায়ের এই প্রত্যাদেশ অনুযায়ী সেখানে সর্বরকম শৌচাদি কার্য্য বন্ধ করে দিল এবং সদলবলে তারা একদিন মায়ের কাছে এসে মাকে ধুমধাম সহকারে যোড়শোপচারে পূজা দিল। শোনা যায় তাদের আয়োজিত সেই বিরাট পূজা মহোৎসবের পর থেকেই নাকি অতি আশ্চর্য্যভাবে সেই গ্রামের সকল অশান্তি চিরতরে দূর হয়ে গিয়েছিল। এই সুরম্য মন্দিরটি আজ বাংলা দেশের একটি বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্ররূপে গড়ে উঠেছে।

———

জলপাইগুড়ি

চিত্রিতা দেবী

মধ্যরাত্রে অকস্মাৎ

ঝাঁপদিয়ে পড়ে বজ্র,—

নির্বাপিত গৃহাঙ্গণ মাঝে।

রুদ্রের ডম্বরু বাজে।

সুপ্ত শিশু বক্ষে ধরি—

কাঁদে নারী,—অসহায়!

বিহ্বল পুরুষ চায়,—

প্রলয় গর্জনে ধায়।

হাহাকার আসে বন্যার রূপে,—

মত্ত মৃত্যু ধায়,—

ক্ষুধার্ত রসনায়।—

ঘরে ঘরে যত শান্তির ঘুম

মুহূর্তে ছুটে যায়।—

জীবন নদীতে মরণের বান দিকে দিকে গর্জায়,—

সহসা বালিকা জাগিয়া উঠিয়া সহস্র বলি চায়।—

কি হোল হঠাৎ?

কেন এ আঘাত?

বলো কার পাপে,—হেন অভিশাপ?

নিঠুর নিয়তি,—নিষ্ঠুরতর করুণার ভগবান!

নিজের সৃষ্টি নিজেই ধ্বংস করিছে অনির্বাণ।

না না,—শুধু নয় বিধাতার শাপ,—

আছে আছে আছে, মানুষেরো পাপ,—

তোমার এবং আমার, এবং আরো আরো আরো,—

সবার সবার।—

ক্ষুব্ধ স্বার্থ গর্জন করে

অতৃপ্ত কামনায়।—

কেন এ কামনা?

কেন নিষ্ঠুর প্রকৃতি অন্ধপ্রায়।

আপন সত্ত্বা আপনি ছিঁড়িয়া

দুই হাতে আছড়ায়

[illegible] প্রাণ।

না না, তুমি সব নিষ্ঠা তোমার হারিও না

একেবারে।

তাকিয়ো না শুধু সন্দেহ ভরে,

তোমার বিধাতা পরে।

শুধু মৃত্যুই নাই এ ধরায়,—

আছে আছে প্রাণ আজো হেথায়,—

দিকে দিকে দ্যাখো, ঐ দ্যাখা যায়,—

আবার শান্তি, আবার সুপ্তি,—

আবার নতুন আশা।

শান্ত তটিনী আবার কহিছে

নবজীবনের ভাষা।

নিঠুর নিয়তি, প্রকৃতি অন্ধ,

তবু অনন্তে আছে আনন্দ।—

মানুষের প্রাণে আজো আছে প্রেম,

অমৃত গন্ধে ভরা।

এস এস এস যে আছো যেথায়,—

যার যা সাধ্য আনো গো হেথায়,

নবীন জীবন গড়ে তোল ফের,—

নিত্যের করুণায়।

ক্ষতি যা হয়েছে নাই তার শেষ,—

জীবনের ক্ষত তবু হবে শেষ,

তোমার, তোমার এবং সবার,—হৃদয় হইতে স্নেহসুধাধার,

নদীর মতন যাক বয়ে যাক,

নব কল্লোল বহি।

নব আগ্রহে প্রাণ পণ করি,—

এস গো সকলে,—এস তুলি গড়ি।—

নব উদ্যমে নূতন নগরী।—

নব জলপাইগুড়ি॥

———
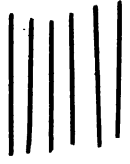
কুয়াশার স্বাদ

কুমারবসু

টাকার ধান্দায় ঢাকুরিয়াতে গিয়েছিলাম। সুবিধে হল না। কি আর করা যাবে! আমার প্রয়োজন ও অপরের প্রয়োজন নিশ্চয়ই এক হতে পারে না। ফিরবার সময় লেভেল ক্রসিংএর কাছে এসে দেখলাম মাংসের দোকানে খুব ভীড়। ছাগলে ঘাস খায়, মানুষে মাংস খায়। আচ্ছা, ব্যাপারটা যদি উল্টো হত, অর্থাৎ আমরা যদি মাংস না খেয়ে ঘাস খেতাম ও ছাগলরা ঘাস পাতা না খেয়ে আমাদের মাংস খেত তাহলে ব্যাপারটা কি রকমের দাঁড়াত? তখন বোধ হয় পোষ্য ছাগলদের খাওয়াবার জন্য ছাল ছাড়ান মানুষ দোকানে লটকান থাকত!

ট্রেন লাইন ধরে হেঁটে আসছিলাম বালীগঞ্জের দিকে। একটা নতুন পাঁচীল হয়েছে লাইনের ধারে। অবশ্য এর মধ্যেই ঘুঁটে দেওয়াও সুরু হয়ে গেছে পাঁচীলের গায়ে। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কোনটার প্রয়োজন বেশী। এটাও বোধহয় হতে পারে যে একটা প্রয়োজনের সঙ্গে আরও একটা প্রয়োজন জড়িয়ে রয়েছে। যেমন ধর গরু ছাগলের বা তোমার আমার নিরাপত্তার জন্যে ট্রেন লাইনের ধারে পাঁচীল দেওয়াটা প্রয়োজন, আবার পাঁচীলের গায়ে যে ঘুঁটে দেওয়া হয়েছে সেটারও নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে, নিছক পাঁচীলের শোভাবর্দ্ধন করবার জন্যে নিশ্চয়ই ঘুটে-গুলো দেওয়া হয়নি ওখানে, যারা ঘুটে দিয়েছে তারা ওগুলো বিক্রি করবার জন্যেই দিয়েছে কারণ ওদের টাকার প্রয়োজন, যারা ঘুঁটেগুলো কিনবে তাদেরও ওগুলোর প্রয়োজন আছে, সস্তায় উনুন ধরাবার জ্বালানী পাওয়া যাবে।

ট্রেনলাইন ধরে হাঁটতে মন্দ লাগে না। ছোটবেলায় দমদম জংশন থেকে দমদম ক্যান্টনমেন্টে ট্রেনলাইন ধরে প্রায়ই হেঁটে যেতাম। ওখানে আমাদের একটা বাগান ছিল। ষ্টেশনের কাছাকাছি একটা কালভার্ট ছিল। এখানেও রয়েছে; এটাকে অবশ্য কালভার্ট না বলে নর্দ্দমাই বলা উচিত।

কালো মতন একটা মোটাসোটা মেয়ে আমার আগে আগে ট্রেনলাইন ধরে হেঁটে চলেছে হাতে একটা গীটার নিয়ে। বোধ করি কোন স্কুলে যাচ্ছে শিখতে। ছোট-বেলায় অরুণাও ছুটির দিনে গানের স্কুলে সেতার শিখতে যেত। মোটামুটি তখন বেশ ভালই বাজাত অরুণা। মেয়েটার বোধহয় খুব লম্বা চুল। বেণীটা এসে প্রায় নিতম্বের ওপর পড়েছে। বেণীটা অবশ্য আসল চুলের না false কে জানে? বেণীর শেষে হলদে রঙের একটা ফিতে প্রজাপতির মতন করে বাঁধা রয়েছে। মেয়েটা হঠাৎ বেশ একটু দ্রুত লয়ে চলতে সুরু করল। বোধহয় স্কুলের দেরী হয়ে যাচ্ছে। চুলের তালে তালে ফিতের প্রজাপতিটাও নিতম্বের ওপর লাফালাফি করতে শুরু করে দিল ভয়ানক ভাবে।

ট্রামে উঠলাম। কণ্ডাকটার সঙ্গে সঙ্গে টিকিট চাইল। মান্থলীটা দেখালাম। বিরক্ত মুখে কণ্ডাকটার অন্যদিকে চলে গেল। ফুলসার্টের ওপর নামাবলী জড়ান, বগলে ছাতা, পায়ে বুটজুতো একজন বুড়োমতন লোক উঠল। লাল গেঞ্জি হাফ প্যান্ট পরা একটা ছোকরা সঙ্গে রয়েছে। ওরা দুজনে লেডিস্‌সীটে বসল। বুড়ো লোকটি আগে বোধহয় পুরুতের কাজ করতেন এখন রিটায়ার করেছেন। কোন পুরানো যজমান বাড়ী হতে Call এলে এখনও মাঝে মধ্যে attend হয়তো করেন। পয়সার দরকারটাই যখন সকলেরই তখন কি আর করা যাবে!

ফার্নরোড ষ্টপেজ হতে একজোড়া স্বামী স্ত্রী উঠল। হাতে গোলাপের বড় একটা তোড়া। স্বামী কাগজ দিয়ে তোড়াটাকে মুড়ে ধরল স্ত্রী সুতো দিয়ে বাঁধতে লাগল। বউটাকে কেমন যেন মিয়ানো মুড়ির মতন মনে হল।

স্বামী কাবলীওয়ালাদের মত লম্বা চওড়া। একটা জঁদরেল গোঁফ আছে। বোধ হয় কোন অফিসারের জন্মদিনে গোলাপফুল উপহার দিয়ে কাজ বাগাবার মতলব আছে। বউটাকে নিয়ে যাচ্ছে তোষামোদ করতে যাতে আরও সুবিধে হয়। পকেটের অবস্থা বোধ হয় আমারই মত। কনডাকটার ওদের কাছে গিয়ে টিকিট চাইল না। অন্যমনস্ক হয়ে গোলাপ ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। অরুণাও খুব ফুল ভালবাসত। অবশ্য রজনীগন্ধটাই ও বেশী লাইক করত। ও এখন আমেরিকাতে রয়েছে, হয়ত এই বছরের শেষের দিকে ফিরলেও ফিরতে পারে। পরশুদিন ওর একটা চিঠি পেয়েছি। . 'তোমাকে ভালবাসি কি না জানিনা, যেমন জানিনা আমি নিজেকে ভালবাসি কি না। আমরা সকলেই তো আসলে নার্সিসাসধর্মী। আজকে এখানে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম রঙটা খুব নীল, কিন্তু ভালবাসার রঙটা কি? বেগুনে? সবুজ? লাল? হলদে? ....'

ট্রাম লাইনের ধারে একটা ক্যাকটাস উপড়ে কে ফেলে দিয়ে গেছে। ক্যাকটাসটার গায়ে মাছি বসছে। দীপ্তেন সান্যাল মারা গেছে। একটা মোটা লোক রিকসা করে যাচ্ছে। খুব হাসিখুশী। সঙ্গের বাজারের থলেটাও খুব মোটা। লোকটা বোধ হয় দোলগোবিন্দবাবুর মতই খুব ভোজনপ্রিয়।

মেজদার দোকান বন্ধ। বাড়ি ফিরে এলাম। পঙ্কজ মল্লিক রেডিওতে রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখাচ্ছিলেন। ছোকরা জমাদারটা কাজ করতে করতে কিছুক্ষণ শুনল, পরে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। কাল অফিসে একটা জোর মিটিং হয়ে গেছে। বার তারিখ হতে strike হবে কি না ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। অবশ্য কোন কিছুতেই কিছু যায় আসে না। লীডারগুলো তো শেষ অবধি তলে তলে মালিকপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ডোবাবেই। রাজনীতির ব্যাবসাটা আজকাল বেশ ভালই চলছে। গরম গরম লেকচার ঝেড়ে লোককে বোকা বানাও। যা হয় একটা আন্দোলন বা strike বাধাও। ভেতরে ভেতরে মালিকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজের আখের গুছিয়ে নাও। পরে মওকা মাফিক কায়দা করে আন্দোলনটা বানচাল করে হাতে তোমার একফোঁটা জলও লাগল না, মাছও ধরা হল। তোমার সতীপনায় কেউ সন্দেহ করবে না। দলের অন্য মাতব্বররা তোমার লাভের ভাগ চাইলে বেরিয়ে এসে একটা নতুন দল তৈরী করে নাও। ব্যাপারটা ঠিক অনেকটা বাজারে মেয়েছেলের মতই। বোধ হয় তার চাইতেও খারাপ। আসল ব্যাপারটা ওদের কাছে দিনের আলোর মতই পরিষ্কার তাই ওরা সতীপনাও দেখায় না ছেনালীও করে না।

কদিন ধরে খুব গুমোট চলছে। আকাশে মেঘ জমে রয়েছে বৃষ্টি হবে কি না কে জানে! না হলেই ভাল। কলকাতা শহরে একটু আধটু সৌখিন বৃষ্টি চলতে পারে, বেশী বৃষ্টি হলেই গঙ্গা ঠাকরুন ঘরের মধ্যেই অধিষ্ঠিত হয়ে বিরাজ করতে থাকবেন।

পাড়াটা মন্দ নয়। চওড়া রাস্তাটা খানিকটা সোজা গিয়ে ঘুরে পার্কের দিকে চলে গেছে। টকটকে লাল শাড়ী পরা একটা মেয়ে কাল রঙের একটা ব্যাগ ফূর্তিতে দোলাতে দোলাতে এদিক পানে আসছে। আরও কাছে এগিয়ে এল মেয়েটা। পাশের বাড়ীর দরজায় এসে বেল বাজাতে সুরু করল। ওপরে বারান্দার দিকে তাকাল একবার। চোখটা নামিয়ে মুখটা ঘুরিয়ে নিল। পাশের বাড়ির মুখুজ্যেদের বড় মেয়ে অনীতা। সপ্তাখানেক হল বিয়ে হয়েছে। বিয়ের আগে অবশ্য নিয়মমাফিক প্রেমটেম-গুলো সেরে নিয়েছে। এখন মাথায় চওড়া করে একরাশ সিঁদুর। একটা পুরুষের সঙ্গে permanantly ওর ব্যবস্থা হয়ে গেছে তারই বিজ্ঞাপন। বিয়ের আগে খুব ডাঁটিয়াল ছিল। আড়চোখে মাঝে মাঝে তাকাত। এখন আর তাকাবে না। আচ্ছা, ব্যাপারটার মানেটা কি? একজোড়া ছেলেমেয়ে একসঙ্গে থাকবে তার জন্য অত ঝামেলা করবার দরকারটা কোথায়? গুষ্টিশুদ্ধ লোককে নেমন্তন্ন করে ডেকে আন বাড়িতে, একরাশ টাকা খরচা করে বাঁশি শানাই ঘণ্টা বাজাও, পুরুত এসে খোদায় মালুম কি মন্ত্র পড়ে; "যদেতদ হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম, যদিদং হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব।" ব্যাপারটা হল যে দুজনে একসঙ্গে থাকবে তাদের নিজস্ব। দুটো ছেলেমেয়েকে অন্য একজন লোক খানিকটা ফুল বিল্লিপত্তর ছিটিয়ে সার

পাশাপাশি Registerও তার খাতাপত্তর বগলদাবা করে দরবারে হাজির। দুরকম ব্যাপার একসাথেই চলবে। কারবারটা মন্দ নয়। যেমন ধর মুরগীর মাংস বেঁধে উহুনে গোবর নিকিয়ে নেওয়া হল তারপর তাতে স্বচ্ছন্দে বিধবার হবিষ্যি রাঁধা যায়। কোন অসুবিধেই নেই। আসল ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে গিয়ে গোবর। তোমার সুবিধেমত কাজে লাগাতে পারলেই হল।

বিছানার চাদরের ওপর অত বড় বড় নক্সা করে কি লাভ? লাল হলদে সবুজ নীল কোন রঙের কমতি নেই। এত বড় চাদরটা কিনেছিলাম কেন? এটা তো ডবল বেডের চাদর; অমিত বোস কাল বলছিল ভাল একটা চাকরী পেলে অরুণা আমেরিকাতেই হয়ত থেকে যেতে পারে। চিঠিতে সেইরকমই লিখেছে ওকে। I am begining to forget you like you forget me ....মন্দ গায়না জীম রীভস। অরুণার একটা Mini Radio ছিল। ক্লাবে ছাতের এক কোণে বসে বাজত। টেকো ব্যাচেলার বুড়োটা সব সময়ে ওর কাছে মাছির মত বসে থাকত।

সন্ধেবেলা ভবানীপুরে তারাদাসের বাড়িতে গিয়েছিলাম। তারাদাস বাড়ি ছিলনা। ওর বউ বলল জনাকয়েক বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়েছে। বোধহয় কোন Bar-এ গেছে মাল খেতে। drink করলে বউ তারাদাসকে কাছে শুতে দেয়না সেই দুঃখেই তারাদাস আরও বেশী করে মাল খায়।

ট্রামে বাসে বেজায় ভীড়। খানিকটা হাঁটলে মন্দ হয় না। আশুতোষ কলেজের দেওয়ালে একগাদা পোষ্টার মারা রয়েছে। লাল আগুন দিকে দিকে ছড়িয়ে দাও। এ্যান ইভনিং ইন ভেনিস। অর্ধনগ্না উর্মিলা ঠাকুর। অবাঙালীরা বলে ওরমিলা ঠোগোর। কিসের আগুন, কেনই বা আগুন, কোথায় বা ছড়িয়ে দেওয়া হবে? সকালবেলার কাগজে পড়ছিলাম কোথাকার ইউনিভার্সিটিতে ছাত্ররা নাকি ঘেরাও করে প্রফেসারদের বেধড়ক ঠেঙিয়েছে ও টেবিল চেয়ার ভেঙে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে। বিয়ের পর উর্মিলা নাকি কোথাকার মহারাণী হয়ে গেছে। কে জানে? সেবাসদনের দেয়ালে দেয়ালে লাল ত্রিকোণের মহিমা প্রচার করা হচ্ছে। পনের পয়সা। মাত্র পনের পয়সায় জন-সংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করবার ক্ষমতা হাতের মুঠোয় ভেতরে এনে দেওয়া হয়েছে।

হাজরা রোডের কাছাকাছি আসতেই বৃষ্টি নামল। দাঁড়ান যাক খানিকক্ষণ। বনলতা বিপনীর সামনে একটা ফুচকাওলাকে ঘিরে কতকগুলো মেয়ে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে হৈ চৈ করছে। ফুচকা খাচ্ছে। একটা বেওয়ারিশ ষাঁড় ওদের কাছে দাঁড়িয়ে জাবর কাটছে। চোখের দৃষ্টি দার্শনিকের মত উদাস। পেটটা বোধহয় ভালরকম ভর্ত্তি আছে। গরম গরম তেলেভাজা ভাজছে একজন। পিঁয়াজী আলুর চপ, বেগুনি। লোকটার মুখে একগাদা ব্রণ হয়েছে। মাঝে মাঝে এক আধবার ব্রণগুলো চুলকে নিচ্ছে। কাঁচাপাকা বাবরি চুলওলা একজন লোক গোটাকয়েক বেগুনি কিনল। পরণে আধময়লা পাঞ্জাবী। বেগুনি খেতে খেতে ঘোলাটে চশমার ভেতর দিয়ে যেখানে মেয়েগুলো ফুচকা খাচ্ছে সেদিক পানে তাকিয়ে রইল।

জল থামবার কোন নাম নেই। মনে হচ্ছে সারারাত চলবে। ট্রাম বাস সব বন্ধ হয়ে গেছে। দুজন ট্যাক্সিওয়ালাকে পাকড়ালুম। একজন যাবে না বলে ভাগিয়ে দিল। অপরজন গড়িয়াহাট যেতে আটটাকা হাঁকল। বনলতা বিপনী হতে একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে ট্যাক্সিওলাকে খুব অনুনয় করতে শুরু করলেন তাকে খিদিরপুর পৌঁছে দেবার জন্যে। ট্যাক্সিওলা পনের টাকা বলল। ভদ্রলোক আবার অনুনয় করতে লাগলেন ভাড়াটা কিছু কমাবার জন্যে। ভদ্রলোক অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে ডাক্তারখানায় এসেছিলেন, বৃষ্টিতে ভিজলে ছেলেটির হয়ত নিমোনিয়াও হতে পারে। পাঞ্জাবী ড্রাইভারটি খুব কুৎসিত ভাবে হাসতে হাসতে মাথা নাড়তে লাগল। পাঞ্জাব থেকে কোলকাতায় এসেছে পয়সা রোজগার করতে, তোমার ছেলে নিমোনিয়া হয়ে মরল কি ওর গাড়ি চাপা পড়ে মরল তাতে ওর ভারি বয়ে গেল!

এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কোন লাভ নেই। এগোন যাক। জল ভেঙে খানিকক্ষণ হাঁটলাম। মন্দ লাগছে না। খানিক পরেই অবশ্য বিরক্তি ধরে গেল। লেক মার্কেটের কাছে এসে একটা রিক্সাওলাকে পাকড়ালুম। ও গড়িয়াহাট পৌঁছে দিতে রাজী হল। চার টাকা

লাগবে। আমার হয়ে রিক্সাওলা জল ভেঙে ভিজতে ভিজতে চলল।

চারদিকে এককোমর জল। গাড়িগুলো সব মরা জানোয়ারের মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে এদিকে ওদিকে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে এক আধটা ডবল ডেকার বাস যাচ্ছে আর প্রবল ঢেউ উঠছে। সোমনাথ মন্দির দেখতে গিয়েছিলাম যখন, তখন Arabian Sea-র ঢেউ দেখেছিলাম। Lansdowne-এর মোড়ে দেখি Trafic Control করবার আলোগুলো আপন মনেই জ্বলছে নিভছে। জলের তোড়ে সব আইনকানুন ভেসে গেছে। রাস্তার জলের ঢেউতে লাল নীল হলদে আলোগুলোর Reflexion দেখতে বেশ ভালই লাগছে। অদ্ভুত অদ্ভুত নানা রকমের Shape তৈরী হচ্ছে আবার পরমুহূর্ত্তেই ভেঙে যাচ্ছে।

লোকেরা সব কোমর অবধি কাপড় গুটিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলেছে। মেয়েরাও কাপড় গুটিয়ে জল ভেঙে চলেছে। ওদের দেহের ফর্সা জায়গাগুলো একটু আধটু দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ওরা কাপড় টেনেটুনে এদিক ওদিক ঢাকবার চেষ্টা করছে। অবশ্য সব মেয়েই ফর্সা নয়। একটা ডবল ডেকার বাস চলে গেল। প্রবল ঢেউ উঠল। ঢেউগুলো এসে মেয়েদের ফর্সা উরুতে ধাক্কা দিতে লাগল। একজন যুবতী মেয়ে তার সঙ্গীর কাঁধে হাত দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে Balance করতে লাগল। সোমার উরুর গড়নও খুব সুন্দর। ওর শরীরটা খুব Proportionate, দারুন Sexy figure ওর। কবে আবার ওর সঙ্গে দেখা হবে কে জানে? গতকাল সোমার আসার কথা ছিল। আসেনি। চন্দননগর থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে ও। ওর বুকের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে শুয়ে থাকতে ভাল লাগে। আমার ফাঁকা পিঠের ওপর সুন্দর হাতদুটো দিয়ে জড়িয়ে রাখে ও। মনে হয় Arbian Sea-র ঢেউগুলো আমাকে নিয়ে লোফালুফী খেলছে।

I am not a queen, I am a woman ইদানীং বাপের চাইতেও বেশী নাম করে ফেলেছে ন্যান্সী সিনাত্রা। আমেরিকাতে ওর রেকর্ডের দারুণ sale...

অরুণার আরও গোটাকয়েক ডিগ্রি দরকার। সেইজন্যেই ও আমেরিকার গেছে বিদেশ থেকে ডিগ্রি আনতে পারলে ও বোধহয় আরও অনেক টাকা রোজগার করতে পারবে। এখানে ডাক্তারী করে ও যা রোজগার করছিল তাতে বোধহয় ওর মন ভরছিল না। আসলে কোনকিছুতেই কারুর কোনদিন বোধহয় মন ভরে না।

একরাশ মেঘ জমে রয়েছে অন্ধকার আকাশে। কতবড় বিরাট আকাশ। তারাগুলো সব মেঘের আড়ালে কোথায় হারিয়ে গেছে কে জানে? কত কোটি বছর আগে ওই তারাগুলো বেঁচে ছিল যাদের আলো আজ পৃথিবীর মানুষের চোখে প্রতিফলিত হচ্ছে। আচ্ছা, ধ্রুবতারা বয়স কত?

কোথায় যেন পড়েছিলাম সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কৃত্রিম আবরণগুলো জীর্ণ হয়ে জীবন থেকে একদিন ঝরে যায় কিন্তু সত্যিকারের আবেগ জিনিষটা কোনদিনই মরে না। হতেও পারে হ্যাঁ। সব কিছুই তো এই রকমই আবর্ত্তনশীল—একে দেখা বা বোঝা অসম্ভব। ঝড় ও অরণ্যের সময়হিসেব এক নয় নিশ্চয়ই। মানুষের দেহ নিয়ে কাটাছেঁড়া করে অরুণা, সোমার সুন্দর দেহটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ভাল লাগে আমার। আবেগটাই বা কি মনটাই বা কোথায়? এক ধরনের গাছ আছে যা মাঠ থেকে মাঠে ভেসে ভেসে বেড়ায়। জলের বুকে লাল নীল হলদে আলোগুলো চিন্ময় চৌধুরীর Abstract ছবিগুলোর মতই নানারকম Shape হচ্ছে। পরমুহূর্ত্তেই সব ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

যন্ত্রযানগুলো চারদিকে সব অচল হয়ে পড়ে রয়েছে। আমি কাঠের তৈরি জীর্ণ এক ভেলায় চেপে বৈতরণী পার হচ্ছি। আচ্ছা, বৈতরণীটা কোথায়; ওপারে কি আছে; নাকি সবটাই গাঁজাখুরী ব্যাপার? সিগারেট ধরলাম। কাল রাত্রে অদ্ভুত একটা মজার স্বপ্ন দেখেছি। আমরা চারজন লোক মিলে একটা মরুভূমির ওপর দিয়ে দৌড়ে চলেছি। একটা মড়া নিয়ে চলেছি পোড়াবার জন্যে। মড়াটা কার কে জানে? অনেক দূর হতে খুব জোরে একটা টিকটিক আওয়াজ ভেসে আসছে। কোথাও বোধহয় একটা মস্তবড় টাইমপিস ঘড়ি আছে! হতে পারে। কটা বাজল দেখবার জন্যে বাঁহাতটা তুলে রিষ্টওয়াচটার দিকে তাকালাম। আচ্ছা মুস্কিল, ঘড়িটার একটাও কাঁটা নেই। হতাশ হয়ে অন্যদের দিকে তাকা

দাম কটা বাজল জানবার জন্যে। কি আশ্চর্য্য! আমাদের সবাইয়ের চেহারাই একই রকমের। কোন তফাৎ নেই। আমি একাই চারজন লোক কখন হলাম? ইতিমধ্যে আমরা সমুদ্রের ধারে পৌঁছে গেলাম। খাটিয়াটা নামিয়ে রাখলাম। একটা সাদা চাদর দিয়ে মড়াটার পা হতে মাথা অবধি ঢাকা রয়েছে। আমরা পরস্পরের দিকে তাকালাম। চারজনেই একসঙ্গে চীৎকার করে বললাম King Save the God·········আমি আমার বাকি তিনজনকে বললাম কাঠ যোগাড় করে আনতে। ওরা সমুদ্রের দিকে নেমে চলে গেল। আমি একাই মড়াটার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। অনেকক্ষণ। সময়টা রাত না দিন ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ওরা আর কেউ ফিরে এল না। আমি ঠিক করলাম খাটিয়াতে আগুন লাগিয়ে দিলেই হবে। খাটিয়ার আগুনেই মড়াটাকে পোড়ান যাবে। একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরলাম। পকেট হতে লাইটার বের করে ধরলাম সিগারেটটা। লাইটারটা নেভালাম না। এইটা দিয়েই মুখাগ্নিটা সেরে নেওয়া যাক। এগিয়ে এসে মড়ার মুখ হতে চাদরটা খুলে ফেললাম। কি আশ্চর্য্য! এ যে আমি! কখন মারা গিয়েছিলাম জানতেই পারিনি। মড়াটাও আমার দিকে তাকাল। হাত বাড়িয়ে আমার মুখ হতে সিগারেটটা কেড়ে নিল। খুব আরাম করে আমার সিগারেটটা টানতে লাগল ও। আমার খুব রাগ হতে লাগল। সকালবেলায় অতিকষ্টে বিহারী পানওলাটার কাছ থেকে এক প্যাকেট পেয়েছিলাম। তাও প্রায় ডবল দাম দিতে হয়েছিল। বাজেটের সময় প্রত্যেক বছরেই পানওলারা সিগারেট লুকিয়ে রেখে ব্ল্যাকে বিক্রি করে। আমার মড়াটাকে আমি ঘাড় ধরে টেনে তুললাম। ও আমাকে চেপে ধরে আমার পকেট হতে সব সিগারেট-গুলো নিয়ে নিল। টানতে টানতে আমাকে সমুদ্রের ধারে নিয়ে এসে এক ধাক্কা মেরে জলে ফেলে দিল। সমুদ্রের জলটা ভয়ানক ঠাণ্ডা। এত ঠাণ্ডা জলে বেশীক্ষণ থাকলে আমার নিমোনিয়া হতে পারে। হাত পা ছুঁড়তে লাগলাম ওপরে উঠবার জন্যে। তলিয়ে যেতে লাগলাম; অনেক নিচে, নিচে, আরও নিচে···········ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আমার কিরকম ভাবে চলা উচিত? সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন গোলমেলে ও অর্থহীন। মেজদা বলে বেঁচে থাকাটা নাকি একটা মজার ব্যাপার। আমার তো উল্টো মনে হয়। মরে যাওয়াটাই সবচাইতে মজার ব্যাপার।

মরুকগে যাক, মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ নেই। আমরা নিজেরাই জানি না কোনটা সাদা কোনটা কালো। পাইকিরি হারে সব Colour Blind হয়ে গেছি আমরা বোধহয়!

নূতন মন্ত্রীসভা

বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর যুক্তফ্রন্ট প্রায় ৫ ভাগের ৪ ভাগ আসন দখল করিলেও কে মুখ্যমন্ত্রী হইবেন তাহা লইয়া সদস্যগণের মধ্যে ৮ দিন ধরিয়া কথা কাটাকাটি হইয়াছে। যুক্তফ্রন্টের মোট সদস্য-এর মধ্যে ৮০ জন বাম কম্যুনিষ্ট দলভুক্ত। সেজন্য বামকম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রীর পদ পাইবার দাবী করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত অধিকাংশ সদস্যের মতানুসারে পূর্ব্ববারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়কেই মুখ্যমন্ত্রীর পদ দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য শ্রীজ্যোতি বসু উপ মুখ্যমন্ত্রী হইয়াছেন। নিম্ন মন্ত্রীদিগের নাম প্রদান করা হইল। আরও কয়েকজনকে মন্ত্রী করা হইবে তাহাদের নাম এখনও স্থির হয় নাই। নাম ঠিক হইলে মুখ্যমন্ত্রী তাহাদের দপ্তর ঠিক করিয়া দিবেন। মন্ত্রীদের নাম—

(১) শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়—মুখ্যমন্ত্রী, অর্থ, স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষা), পঞ্চপালন এবং সমাজ শিক্ষা।

(২) শ্রীজ্যোতি বসু—সহকারী মুখ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র (সংবিধান, নির্বাচন, স্পেশাল, প্রশাসন, পুলিশ এবং প্রেস)।

(৩) শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার—ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব।

(৪) শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত—উদ্বাস্তু পুনর্বাসন এবং জেল।

(৫) শ্রীসত্যপ্রিয় রায়—শিক্ষা। (৬) জনাব আবদুল্লা রসুল- স্বরাষ্ট্র (যানবাহন)। (৭) শ্রীপ্রভাস চন্দ্র রায়—মৎস্য। (৮) জনাব গোলাম ইয়াজদানি—স্বরাষ্ট্র (পাসপোর্ট এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা)। (৯ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হালদার—আবাসিক। (১০) শ্রীচারু-মিহির সরকার—সমাজ-উন্নয়ন। (১১) শ্রীভবতোষ সরেন—বন। (১২) শ্রীসুশীল ধাড়া—বাণিজ্য ও শিল্প, অ্যাগ্রো-ইনডাষ্ট্রি কর্পোরেশন সহ। (১৩) শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী—স্বায়ত্তশাসন, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন এবং গৃহ। (১৪) বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়—সেচ ও জলপথ এবং কৃষি বিভাগের পুকুর, কূয়া, টিউবওয়েল ও পাম্প ইরিগেশন (১৫) শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী—সমবায় ও সমাজ কল্যাণ। (১৬) জনাব আবদুল রেজ্জাক খান্—ত্রাণ। (১৭) ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য্য—কৃষি। (১৮) শ্রীশম্ভু ঘোষ—কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প। (১৯) শ্রীভক্তিভূষণ মণ্ডল—আইন ও আইন প্রণয়ন। (২০) শ্রীকৃষ্ণপদ ঘোষ—শ্রম, (২১) শ্রীযতীন চক্রবর্ত্তী—সংসদীয় বিষয় ও চীফ হুইপ। (২২) শ্রীননী ভট্টাচার্য্য—স্বাস্থ্য। (২৩) শ্রীসুবোধ ব্যানার্জী—পূর্ত্ত। (২৪) শ্রীমতী প্রতিভা মুখার্জী—সড়ক ও সড়ক উন্নয়নের রাষ্ট্রমন্ত্রী। (২৫) শ্রীবিভূতি দাশগুপ্ত—পঞ্চায়েৎ। (২৬) শ্রীদেওপ্রকাশ রাই—তপশীলী ও উপজাতি উন্নয়ন। (২৭) শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য্য—তথ্য ও জনসংযোগ। (২৮) শ্রীসুধীন কুমার—খাদ্য। (২৯) শ্রীরাম চ্যাটার্জী—ক্রীড়া (রাষ্ট্রমন্ত্রী)। (৩০) শ্রীবরদা মুকুটমণি—পর্য্যটন (রাষ্ট্রমন্ত্রী)।

বিধান পরিষদে নূতন নজীর—

পশ্চিমবঙ্গের আইন তৈয়ারীর জন্য দুইটি সভা আছে। (১) প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত ২৮০জন সদস্য দ্বারা গঠিত বিধান সভা এবং (২) বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত ৭১জন সদস্য লইয়া গঠিত বিধান পরিষদ। এবার বিধান সভায় যুক্তফ্রন্টের সদস্য সংখ্যা অধিক। আর বিধান পরিষদে কংগ্রেসীদের সংখ্যা অধিক। এবার বিধান সভায় রাজ্যপালের ভাষণ সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল বিধান পরিষদ তাহা পুরাপুরি গ্রহণ না করিয়া যে অংশে রাজ্যপালের ভাষণের নিন্দা ছিল সেই অংশটি বর্জ্জন করিয়া বাকী অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

স্বাধীনতা লাভের পর নূতন সংবিধান প্রচলিত হইলে এইরূপ ঘটনা পূর্বে আর হয় নাই। কাজেই যুক্তফ্রন্ট দল ইতিহাসে নূতন নজীর সৃষ্টি করিয়াছে।

বিশৃঙ্খলা—

কলিকাতা মহানগরীর জনজীবন প্রায়ই নানা রকম গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলায় বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িতেছে।

গত ৫ই এপ্রিল রবিবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলিকাতার রবীন্দ্রসরোবর ষ্টেডিয়ামে একটি "জলসা" উপলক্ষ্য করিয়া বিরাট হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। পুলিশকে কাঁদানে গ্যাস্ ও গুলি চালাইতে হইয়াছে এবং প্রাণহানিও হইয়াছে।

এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় নানারকম ত্রুটী বিচ্যুতি থাকাতেই নাকি সমবেত জনতা মারমুখী হইয়া উঠে। ইট-পাটকেল নিক্ষিপ্ত হয়, চেয়ার প্রভৃতি ভাঙ্গা হয় এবং অগ্নি সংযোগও করা হয়। রাস্তায় একটি সরকারী বাস ভস্মীভূত হয় এবং কয়েকটি প্রাইভেট্ মোটর গাড়ীও বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পলায়নপর মহিলারাও দুষ্ট-লোকের দ্বারা নানাভাবে লাঞ্ছিতা হন।

সঙ্গীতের জলসা উপলক্ষ্যে এরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। জলসা উপলক্ষ্যে বিশৃঙ্খলা এরূপ ভয়ানক না হইলেও, আরো কয়েকস্থানেও ঘটিয়াছে।

এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও পুলিশ বিভাগকে আমাদের অনুরোধ তাঁরা যেন মুক্তস্থানে এই ধরণের জলসা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি দেন। এ ধরণের অনুষ্ঠান কলিকাতায় এখন আর না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

গত ৮ই এপ্রিল, কাশীপুর "গান্ এণ্ড সেল্ ফ্যাক্টরী"তে আর একটি শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে। এখানে ফ্যাক্টরীর লোকের গুলিতে কিছু কর্ম্মী হতাহত হইয়াছে। এর প্রতিবাদে ১০ই এপ্রিল সারা বাংলায় ধর্ম্মঘট পালিত হয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে দুর্গাপুর ষ্টীল্ ফ্যাক্টরীতেও গুলি বর্ষণের জন্য কিছু লোক অযথা হতাহত হইয়াছিল।

এইসব শোচনীয় ঘটনার তদন্ত হওয়া উচিত এবং কর্তৃপক্ষ, পুলিশ ও সরকারেও উচিত সর্ব্বরকম ব্যবস্থা অবলম্বন করে এইরূপ শোচনীয় ঘটনা যাতে আর না ঘটে তার ব্যবস্থা করা।

এর ওপর ছাত্র-অশান্তিতো লাগিয়াই রহিয়াছে।

বেশ কয়েক মাস ধরিয়া কলিকাতা শহরে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্রদের নানা অভাব অভিযোগ লইয়া শৃঙ্খলা-ভঙ্গ করিতে দেখা যাইতেছে। কয়েকমাস পূর্বে একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্যকে ছাত্ররা ঘরে ঘেরাও করিলে নূতন উপাচার্য্য শ্রীসত্যেন সেন পুলিশ ডাকিতে বাধ্য হন। তখন জনসাধারণ পুলিশের অনাচারের জন্য পুলিশের ওপর দোষারোপ করে। গত ১৩ই মার্চ উপাচার্য্য আবার এক-দল ছাত্র কর্তৃক নিজের ঘরে ৮ ঘণ্টা ঘেরাও হন। তাঁহার সঙ্গে কয়েকজন অধ্যাপকও ছিলেন। অন্যপক্ষের অধিক সংখ্যক ছাত্র উপাচার্য্যকে উদ্ধার করিতে আসিলে দুইপক্ষে ভীষণ দাঙ্গা হয়। উপাচার্য্য ও অধ্যাপকেরা ছাত্রদের হাতে প্রহৃত হইয়া মুক্তিলাভ করেন বটে, কিন্তু সংঘর্ষের সময় কৃষ্ণ রায় নামক একজন যুবক পথে নিহত হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা দামের সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়।

এবারে পুলিশ কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে নাই—দূরে দাঁড়াইয়া সব দেখিয়াছে মাত্র। পরদিন ১৪ই মার্চ একদল ছাত্র নিকটস্থ কফি হাউসে যাইয়া কফি হাউসের মধ্যস্থিত কয়েক হাজার টাকার সম্পত্তি নষ্ট করিয়াছে এবং কর্ম্মচারী-দের মারধোর করিয়াছে। সকলেই জানে কফি হাউস একটি খাবারের দোকান। ছাত্ররাই তথায় বেশী সংখ্যায় যাইয়া থাকে। দোকানটি একটি সমবায় সমিতি কর্তৃক পরিচালিত। দোকানের কর্ম্মচারীরা সকলেই সমবায়ের সদস্য।

যাহাই হউক না কেন দোকানটি তছনচ করার কোন কারণ দেখা যায় না। নিহত কৃষ্ণ রায়ের শব লইয়া ১৪ই তারিখে কলিকাতার রাজপথে মিছিল করা হয়। কলি-কাতার প্রায় সকল স্কুল, কলেজ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং বি, এস, সি প্রথম অংশের পরীক্ষার পাঁচটি কেন্দ্রের পরীক্ষা ভণ্ডুল হইয়া গিয়াছে।

শুনা যায় ছাত্ররা এখন কয়েকটি রাজনৈতিক দলে

বিভক্ত এবং তাহাদের দলাদলিই এই সকল গণ্ডগোলের কারণ বলিয়া অনেকে মনে করেন। গণ্ডগোলের ফলে একদিকে নিরীহ ছাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং অপর দিকে 'কফি হাউস' দোকানের দরিদ্র কর্মচারীদের আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে। যুক্তফ্রণ্টের নূতন মন্ত্রীসভা গঠনের পর শহরে এই ছাত্র-চাঞ্চল্য অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও একদল ছাত্রের গণ্ডগোলের ফলে সেখানকার কাজকর্ম বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। উপাচার্য্য প্রবীণ শিক্ষাব্রতী শ্রীহেমচন্দ্র গুহ পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ ডাকা বাঞ্ছনীয় নহে। একদিকে একথা যেমন সত্য, অন্যদিকে ছাত্রদের এমন কিছু করা উচিত নহে যাহাতে কর্ত্তৃপক্ষ পুলিশ ডাকিতে বাধ্য হন। এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে কলেজগুলি পরিচালনা করা বর্ত্তমানে একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে।

নূতন এডভোকেট জেনারেল—

খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার ও রাজনৈতিক নেতা শ্রীস্নেহাংশু কান্ত আচার্য্য কলিকাতা হাইকোর্টের নূতন এড্‌ভোকেট জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন। পুরাতন এডভোকেট জেনারেল শ্রীরবীন্দ্রচন্দ্র দেব পদত্যাগ করায় ঐ পদ খালি হইয়াছিল। স্নেহাংশুকান্ত ময়মনসিংহের মহারাজ শশীকান্ত আচার্য্য মহাশয়ের অন্যতম পুত্র।

ডিঙি নৌকায় সাগর পাড়ি—

বিজয় সিংহ কবে ও কি ভাবে নৌকায় চড়িয়া সমুদ্রে পাড়ি দিয়া 'হেলায় লঙ্কা জয়' করিয়াছিলেন তাহার ইতিহাস মানুষ আজ ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি ভারতবর্ষের দুই সাহসী যুবক জর্জ্জ এলবার্ট ডিউক ও পিনাকী চট্টোপাধ্যায় গত ১লা ফেব্রুয়ারী কলিকাতা হইতে একখানি ডিঙি নৌকায় যাত্রা করিয়া বিশাল সমুদ্রে দাঁড় বাহিয়া তেত্রিশ দিনে ৫ই মার্চ বুধবার সন্ধ্যায় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের 'লাণ্ডফল' দ্বীপে নামিয়া পতাকা উত্তোলন করিয়াছেন।

দুইজনেই সাধারণ ঘরের ডানপিটে ছেলে, তাঁহাদের এই দুঃসাহসিক অভিযান ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় রচনা করিল। এদেশের ছেলেরা বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী ছেলেরা জানে যে বহুব্যাপারে অসীম সাহসিকতার, বিপুল বীর্য্যও অসাধারণ ধৈর্য্যের পরিচয় দিতেছে তাহা পিনাকীর জীবনে সার্থকতার সৃষ্টি করিল। আমরা এই তরুণদ্বয়কে অভিনন্দন জানাই এবং প্রার্থনা করি ভারতীয় তরুণের দল জীবনের সকল ক্ষেত্রে এইভাবে সাফল্য অর্জ্জন করিয়া ডিউক ও পিনাকীর মত নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করিবে।

পূর্ব পাকিস্থান কি পৃথক হইবে—

শেখ মুজিবর রহমান বর্ত্তমানে পূর্বপাকিস্থানের নেতা। সম্প্রতি পূর্বপাকিস্থানের সহিত পশ্চিম পাকিস্থানের যে বিরোধ চলিতেছিল ভাষা লইয়া, পূর্বপাকিস্থানের অধিবাসীরা বাংলা ভাষাকে তাহাদের মাতৃভাষা বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য করিয়াছে। পশ্চিম পাকিস্থানের লাহোর, করাচি, রাওলপিণ্ডি প্রভৃতি চারটি, উপপ্রদেশে বিভক্ত করার প্রস্তাব হইয়াছে। এইসঙ্গে পূর্বপাকিস্থানের নেতা মুজিবর রহমান সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন যে, পূর্ব পাকিস্থানকে পশ্চিম পাকিস্থান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একটি স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে গঠন করা হউক। ইহার বহু কারণ বর্ত্তমান।

পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম হইতে বহু লোক পূর্বপাকিস্থানে আনিয়া চাকরী, ব্যবসা প্রভৃতির সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। আবার পূর্বপাকিস্থানের সহিত পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম প্রভৃতি রাষ্ট্রের ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারে কেন্দ্র হইতে কড়া আইন তৈরী হওয়ায় পূর্বপাকিস্থানের দরিদ্র জনসাধারণ নানারূপ অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করিতেছে। একই কারণে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরাও নানা সুখ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত আছে। কাজেই পূর্বপাকিস্থানের অধিবাসীরা রহমান সাহেবের প্রস্তাবটি সাগ্রহে সমর্থন করিবে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক—

গত ৩রা সোমবার বর্দ্ধমান জেলার কোগ্রামে কবি শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ৮৭ বৎসর বয়সে পদার্পণ করায় দেশের বহু সুধী তাঁহার গৃহে যাইয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জানাইয়া আসিয়াছেন। কোগ্রাম বর্দ্ধমান শহর হইতে ২৫ মাইল দূরে অজয় ও কুনার নদীর সংযোগ স্থলে অবস্থিত। কুমুদরঞ্জন কখন শহরে বাস করেন নাই। সারা জীবন চৈতন্যমঙ্গল প্রণেতা কবি লোচন দাসের

স্মৃতি বিজড়িত নিজ পৈতৃক বাড়ীতে বাস করিতেছেন। পথ দুর্গম হইলেও জন্ম দিনের উৎসবে তাঁহার গৃহে বিশেষ লোক সমাগম হইয়াছিল। সমাগত অতিথিবৃন্দ যেমন কবিকে নানা উপহারে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন কবিও তেমনি সকলকে ভূরিভোজে আপ্যায়িত করিয়াছেন। কবির জন্মদিনে আমরাও কবির সুদীর্ঘ শান্তিময় জীবন কামনা করি।

নলিনীরঞ্জন ঘোষ

জলপাইগুড়ির ধনী ব্যবসায়ী এবং দিল্লীর লোক সভার প্রাক্তন সদস্য নলিনীরঞ্জন ঘোষ মহাশয় গত ১২ই মার্চ ৭৬ বৎসর বয়সে দিল্লীতে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র শ্রীপরিমল ঘোষ বর্তমানে সংসদ সদস্য এবং রেল বিভাগের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। ঘোষ পরিবার উত্তর বঙ্গের নানা সদনুষ্ঠানের সহিত যুক্ত থাকিয়া দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন।

কেমনে ভুলিব তারে ?

শ্রীহৃদয়রঞ্জন ভট্টাচার্য্য

(১)

আচম্বিতে অলক্ষ্যেতে নিষ্ঠুর শমন,
করিল হরণ মোর জীবন রতন।
সুন্দর মানস তরী, ছিল আশা ভর করি,
কাল সিন্ধু জলে হায় হইল মগন,
ভেঙ্গে দিল বিধি মোর সুখের স্বপন।
তবু,
না মানে প্রবোধ মোর এ অবোধ মন,
পাইবারে দরশন হারানো রতন।
তাই আমি খুঁজি তারে, পথে পথে দ্বারে দ্বারে,
ফণী যেন করে তার মণি অন্বেষণ,
যেতে চাই যেথা মোর বিদেহী নন্দন।

(২)

শরত নিশীথে যেমন পূর্ণ শশধর,
হীরকের মত শোভে নীলাম্বর গায় ;
তেমনি এ অভাগার অন্তরেতে অ'নিবার,
শোভিত কামনা যেন শরদিন্দু প্রায়,
কিন্তু—আজ শূন্য মোর মানস অম্বর।

দিবানিশি যার স্মৃতি জাগিছে মনে,
সম্মুখে বিরাজিত যে ধ্রুবতারা সম,
বিস্মৃতির অন্ধকারে কেমনে লুকাই তারে,
কেমনে ভুলিব তার স্মৃতি অনুপম ?
জুড়াব কেমনে জ্বালা বিনা সে রতনে ?

কিশোর

পরীক্ষা প্রসঙ্গে

শ্রীজ্ঞান

প্রতি বৎসরই নানা রকম পরীক্ষা নেওয়া হয়। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকেই প্রতি বৎসরই কোনও না কোনও পরীক্ষা দিতেও হয়। পরীক্ষা দিয়ে 'পাশ' করলে বা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাসে "প্রমোশন" পায় বা স্কুল থেকে কলেজে প্রবেশের অনুমতি পায় বা আরও উচ্চস্তরের পরীক্ষা দিয়ে 'ডিগ্রী' লাভ করে। এই সকল পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য সকল ছাত্র-ছাত্রীই জানে। সারা বৎসরে ছাত্র-ছাত্রীরা কি রকম পড়াশুনা করেছে তারই পরীক্ষা বা "টেষ্ট"।—তাই নয় কি? এই পরীক্ষা গ্রহণের রীতি বা ব্যবস্থা না থাকলে কি করে বোঝা যাবে যে ছাত্র-ছাত্রীরা কতটা পড়াশুনা করেছে এবং ঠিক মত করছে কি না। তাই সকল দেশেই শিক্ষার সকল স্তরেই এই পরীক্ষা গ্রহণের রীতি চলে আসছে, তবে পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতির হেরফের থাকতে পারে। কিন্তু পরীক্ষা সকল দেশের ছাত্র-ছাত্রীকেই দিতে হয়—তা নইলে তো তাদের বুদ্ধি, বিবেচনা, স্মরণশক্তি ও পাঠ্যপুস্তক কি রকম পাঠ করেছে, তার কোনও মান বা standard ঠিক করা যাবে না, এবং ঠিক করতে না পারলে তাদের উচু ক্লাশে ওঠান বা 'ডিগ্রী' দেওয়াও কি সম্ভব হবে? তোমরাই বল ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা না করলে কি করে বোঝা যাবে যে তারা ঠিকমত পড়াশুনা করেছে? তাই সকল দেশেই ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম চলে আসছে প্রাচীন কাল থেকেই। আমাদের দেশেও এই পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম চলে আসছে বহুকাল ধরে।

কিন্তু ইদানীং এই পরীক্ষা দেওয়াটা এক শ্রেণীর ছাত্রদের যেন ঠিক মনোমত হচ্ছে না বলেই মনে হচ্ছে। কারণ প্রায়ই দেখা যাচ্ছে ছাত্রেরা পরীক্ষা গ্রহণের সময় নানা রকম অসদুপায় অবলম্বন করছে তো বটেই তা ছাড়াও পরীক্ষার 'হল'-এ উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে চেয়ার টেবিল ভাঙছে, পরীক্ষা ভণ্ডুল করে দিচ্ছে, এমন কি গার্ডদের উপরও হামলা করছে। অজুহাতরূপে অবশ্য বলা হয় পরীক্ষার প্রশ্ন নাকি 'কঠিন' হয়েছে! কিন্তু পরীক্ষার প্রশ্ন কি সব সময় খুব সহজ করতে হবে যাতে পরীক্ষার্থীরা অনায়াসে, অক্লেশে সামান্য মাত্র পড়াশুনা করেও উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারে? তা যদি হয় তাহলে পরীক্ষা গ্রহণেরই বা দরকার কি, আর ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া করবারই বা দরকার কি? উপযুক্ত মান বা standard অনুযায়ী পড়াশুনা না করেই যদি পরীক্ষা পাশের কৃতিত্ব অর্জ্জন করা চলে বা 'ডিগ্রী' লাভের সম্মান লাভ করা যায়, তাহলে তো সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী কেউই লেখাপড়া করতে চাইবে না, শুধু টাকা দিয়ে "সার্টিফিকেট" কিনে নেবে!—তাই না? আর যে সব বিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই রকম ব্যবস্থা চলবে সে সব শিক্ষায়তন থেকে যে সব ছাত্র-ছাত্রী 'পাশ' করে বেরিয়ে আসবে তাদের সম্বন্ধে জনসাধারণের এবং অন্যান্য প্রদেশের বা বহির্বিশ্বের লোকের কি ধারণা হবে? —তোমরাই বল। লোকেরা কি এই সব ছাত্রদের বাহবা দেবে, না ধিক্কার দেবে!

পুলিশ দিয়ে বা শুধু শাস্তি দিয়ে এই সব দুঃখজনক ও লজ্জাকর আচরণ নিবারণ করা সম্ভব নয়। একমাত্র তোমরাই,—যাদের শুভবুদ্ধি আছে, বিবেচনা শক্তি আছে —সেই রকম সৎ ও সাধু প্রকৃতির সত্যকার ছাত্ররাই তাদের বিপথগামী সহপাঠীদের বুঝিয়ে, উপদেশ দিয়ে এই সব আচরণ থেকে নিবৃত্ত করতে পার। তা যদি তোমরা পার তাহলে জানবে তোমরা দেশের এবং বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রের এক বিরাট দুঃস্বপ্নকে দূর করতে পারলে এবং জাতিও তোমাদের কাছে এর জন্য চির ঋণী থাকবে। আশাকরি এ বিষয়ে তোমরা নিশ্চয়ই সচেষ্ট হয়ে ছাত্র-সমাজের এই দুরপনেয় কলঙ্ক দূর করবে।

——

অচিন পথের যাত্রী

নির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

এক

চির তুষারে ঢাকা জন মানবহীন অজ্ঞাত দেশ মেরু প্রদেশ যে কেমন—উত্তর মেরু বা দক্ষিণ মেরু—পৃথিবীর সেই অচেনা দেশে কি আছে; কেমন সে দেশের আকাশ বাতাস—কেমন পশুপক্ষী বাস করে সে দেশে একথা জানবার জন্য কত দুঃসাহসী দিগ্বিজয়ী বীর বার বার গিয়েছেন সেই দেশে। তাঁদের কেউ গেছেন হারিয়ে, কেউ অনাহারে প্রাণ দিয়েছেন সেই সীমাহীন তুষারের দেশে। তবুও মানুষের জ্ঞানের পিপাসা কমে নি। দেশের মায়া তাঁদের মন বাঁধতে পারে নি, কচি ছেলের মমতামাখা হাসিও তাঁদের ঘরে রাখতে পারে নি, মৃত্যুর ভয়ও তাঁদের পথ রোধ করতে পারে নি; আবিষ্কারের উন্মাদনায় কত দুঃসাহসী বীর প্রাণ বলি দিয়ে আজও অমর হয়ে আছেন পৃথিবীর নানা দেশে।

এই সকল দুঃসাহসিক বীরযাত্রী পৃথিবীর দুই প্রান্ত সুমেরু আর কুমেরুতে কত বিপদ মাথায় করে যে গিয়েছেন আজাকের বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগে কল্পনাও করা যায় না সেকথা। পায়ে হাঁটা পথ, আর জাহাজই ছিল তখনকার যাত্রীদলের সম্বল। এদের কেউ বা চিরদিনের মত হারিয়ে গেছেন সেই সীমাশূন্য বরফের দেশে, কারো বা জাহাজ চারিদিকের বরফের চাপে চূর্ণ হয়ে গেছে! তখন একমাত্র যান কুকুরটানা স্লেজ গাড়ীকে সম্বল করে —একহাতে জীবন আর একহাতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে করতে মেরু যাত্রী বেরিয়ে পড়েছেন পথের সন্ধানে। শেষে পথ যখন আর মেলেনি, স্লেজগাড়ী যখন অচল হয়েছে, তখন শীতল বরফ দিয়ে ঘর তৈরী করে তারই মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন তাঁরা। মাসের পর মাস কাটিয়ে দিয়েছেন তাঁরা সেই বরফের ঘরের মধ্যেই —যদি কখনো কোনো জাহাজ মাছ ধরতে সেদিকে আসে এই আশায়! যে সেনাপতি কোনো একটি

যুদ্ধে হাজার হাজার মানুষ মেরে বীর বলে প্রশংসা পেয়েছেন, এই নির্ভীক তীর্থযাত্রীর দল—সেই ডেভিস্, ব্যাফিল্, রস্—সেই প্যারী, ফ্রাঙ্কলিন, ন্যানসেন—সেই কুক্, পিয়ারি, আমুণ্ডসেন—তাঁদের চেয়ে বীরত্বে অনেক বড়, শৌর্য্যে-ধৈর্য্যে অনেক মহৎ।

এই বীর অভিযাত্রীদল বার বার প্রমাণ করেছেন, অস্ত্রের বল বল নয়, দেহের বলও বল নয়;—মনের বলই সত্যিকারের বল। সেই বলে বলী যাঁরা, তাঁরা মেরুদেশটা জয় করতে মাঝে মাঝেই যাত্রা করেন। সারা দেশে জেগে ওঠে অপূর্ব্ব সাড়া—চারিদিক থেকে আসতে থাকে কত রকম সাহায্য—টাকা, পয়সা, জামা-কাপড়-খাদ্যদ্রব্য, আরও কত কি। যাত্রার পরে যদি কারও খবর না পাওয়া যায়,—যদি কেউ হন নিরুদ্দেশ—অমনি তাঁকে উদ্ধার ক'রতে দেশের লোক বেরিয়ে পড়েন নানা পথে। অর্থব্যয়, কষ্ট বা মৃত্যু—কিছুই তাঁদের পথ আটকায় না।

এমনি একজন বীর অভিযাত্রী ছিলেন সুইডেনের এণ্ড্রি। বেলুন চালনায় তাঁর মত বিখ্যাত কেউ ছিলেন না তখন। বেলুনই তখন আকাশ পথে ভেসে চলার একমাত্র যান ছিল; কারণ এরোপ্লেনের আবিষ্কার হয় নি তখনও। দেশের এ প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে উড়ে বেড়ান এণ্ড্রি তাঁর বেলুনে চেপে। ভাবেন মনে কত দুর্জ্জয় আবিষ্কারের কাহিনী; আশা জাগে তাঁর মনে—আমিও কি হ'তে পারবো না ওদের মত মৃত্যুঞ্জয়। ক্রমে দৃঢ় হতে থাকে তাঁর মনের বাসনা।

সেদিন শীতের সন্ধ্যা। অন্ধকার তখন ধীরে, অতি ধীরে পৃথিবীতে নেমে আসছিল। চারিদিক তুষারে ছেয়ে গেছে—প্রবল বাতাসে তুষারকণাগুলি তুলার মত উড়ছে। সেইদিন সুইডেনের বিজ্ঞানসভা ভবনে এণ্ড্রি ঘোষণা করলেন—"আমি বেলুনে উড়তে উড়তে অল্প সময়ে মেরুদেশে যাবো!"

কানের কাছে একটা বোমা ফাটলে মানুষের যেমন অবস্থা হয়, এণ্ড্রির কথাটাও উপস্থিত সভাবৃন্দের কানে তেমনি শোনালো। "বেলুনে চেপে সুমেরু যাত্রা! এ কি পাগল, না ক্ষ্যাপা!"

বিজ্ঞান সভায় পণ্ডিতদের মধ্যে এণ্ড্রির ঘোষণায় হুলু- আকাশেই না হয় ওড়া গেল; কিন্তু সুমেরুর দিকে যাবে কি ক'রে? বেলুনের গতিবিধি ত আর যাত্রীর হাতে নয়—যাত্রীই থাকবে বেলুনের অধীনে। বাতাসের বেগে বেলুন যে দিকে যাবে, যাত্রীকেও তো সেইদিকেই যেতে হবে। নিজের ইচ্ছেমত স্বাধীনভাবে বেলুনে চেপে এণ্ড্রি সুমেরুর দিকে যাবে কি করে?"

এণ্ড্রি বল্লেন—"তা হোক্ না বেলুন বাতাসের গতিবিধির অধীন, আমি বাতাসকে সম্বল ক'রেই যাবো।"

একজন প্রশ্ন তুললেন—"কেমন ক'রে তা হবে? বাতাস ত সব সময় একদিকে ব'য়ে যায় না। যখন বেলুনের যাওয়া দরকার উত্তর দিকে, তখন হয়ত বাতাস বইবে দক্ষিণ দিকে। সে অবস্থায় বেলুন ঠিকমত চলবে কি ক'রে?"

এণ্ড্রি বল্লেন—"তাতে ক্ষতিটা কি হ'চ্ছে? আমি ঝড়ের মুখে বেলুন ছাড়বো সুমেরুর দিকে। আমার পথ আমি জেনে নেবো—আপনারা শুধু একটা বড় বেলুন আমাকে তৈরী ক'রে দিন।"

একজন বল্লেন—'দু'তিন পরল রেশমের কাপড়ের বড় একটা থলির মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস ভরলেই তো বেলুন তৈরী হলো। কিন্তু সে গ্যাস আর বেলুনের মধ্যে ক'দিন বন্ধ থাকবে? অবশ্য, যাতে গ্যাস তাড়াতাড়ি বেরিয়ে না যায়, সে জন্য নাহয় বেলুনের গায়ে বার্নিসই লাগানো হ'ল। কিন্তু তাতে আর কতটা সুবিধা হবে?'

সভায় নানারকম তর্ক হলো। মীমাংসা হলো না কোন কথারই। অনেকেই সন্দেহ ক'রতে লাগলো প্রস্তাবটাকে। কেউ কেউ তো স্পষ্টই বলল—"এ আর কিছুই নয়, হুজুগ তুলে টাকা মারবার ফন্দী।" একথার প্রতিবাদ করল আর একদল:—তারা সুস্পষ্টভাষায় বললো,—"এণ্ড্রি তো তাঁর সারা জীবনটাই কাটিয়েছেন বেলুনে ওড়ার পরীক্ষা ক'রে। তিনি তো কতবারই বেলুনে উড়ে এক সহর থেকে আর এক সহরে যাতায়াত ক'রেছেন। তাঁর পক্ষে বেলুনে উড়ে সুমেরু যাওয়া এমন কি অসম্ভব প্রস্তাব।"

বিজ্ঞান সভায় বৈঠকে কোন সিদ্ধান্ত হলো না বটে; কিন্তু এণ্ড্রির প্রস্তাব দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। ক্রমে

দেশেও ছড়িয়ে পড়লো। ইউরোপের নানাদেশ নানা প্রবন্ধে সন্দেহ করতে লাগ্‌লো প্রস্তাবটাকে। তাঁরা তুলে ধরলেন এক নূতন প্রশ্ন; "ভীষণ শীতের দেশ সুমেরু! বেলুনে উড়ে না হয় এণ্ড্রি সুমেরু গেলেন। কিন্তু তখনকার ঠাণ্ডায় বেলুনের গ্যাস পর্য্যন্ত জমে যাবে সেখানে। তখন বেলুন উড়বে কি ক'রে? গ্যাস জমে গিয়ে বেলুন তো তখন আছাড় খেয়ে পড়্‌বে। তখন মান তো যাবেই, প্রাণটাও যাবে এণ্ড্রির।"

এণ্ড্রি খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখে কি উপায়ে বেলুনে চেপে সুমেরু যেতে চান তা সকলকে বুঝিয়ে বল্‌লেন। একদল তাঁর কথা মেনে নিল;—আর একদল বল্‌লো—অসম্ভব। এতো পাগলের কথা!

আর একদল নূতন একটা তর্ক তুল্‌লো—"এণ্ড্রি তো বল্‌ছেন, বেলুনে যাত্রী যাবেন তিনজন। তাদের শীত-মানানো জামা কাপড়, তেমনি মানানসৈ সাজ সজ্জা—অন্ততঃ তিন চার মাসের খাবার জিনিষ, বেলুনে শোয়া-বসার স্থান, শ্লেজ গাড়ী, ক্যানভাসের নৌকা, দড়িদড়া নোঙর—পাল, আর নানারকমের যন্ত্র আর অস্ত্রশস্ত্র—এত লটবহর কি একটা বেলুনে বইতে পারবে, না বেলুনের গণ্ডোলাতেই এত জিনিষের স্থান সংকুলান হয়?"

এণ্ড্রি উত্তর দিলেন—"সে জন্য আপনাদের চিন্তার কোন কারণ নেই। মেরু অভিযানের জন্য এমন বেলুনই তৈরী হবে যা' এত জিনিষ নিয়েও অনায়াসে আকাশে উড়ে যাবে। আমার সঙ্গে যাঁরা যাবেন, তাঁদের দু'জনকে আমিই বেছে নেবো,— তাঁদের থাকবে বিজ্ঞানে আর ফটোগ্রাফীতে দখল; আর হ'তে হ'বে তাঁদের দক্ষ শিকারী —যাতে মেরু অঞ্চলে যদি কোন হিংস্র জন্তু আক্রমণ করে তখন যেন আত্মরক্ষা করা যায়। এখন আমার দরকার শুধু টাকার। বেশী নয়,—মাত্র একলক্ষ টাকা হ'লেই আমি বেলুন তৈরী ক'রে সুমেরু অভিযানে অগ্রসর হ'তে পারি। সুইডেন থেকে সুমেরু কত-ই বা দূর? কয়েক হাজার মাইল মাত্র—বল্‌তে গেলে আমাদের প্রতিবেশী। কাজেই সুমেরু অভিযানের গৌরব সুইডেন অধিবাসীদেরই নিতে হবে; ইউরোপের অন্য কোন দেশকে এই গৌরবের দাবী-দার হ'তে দেওয়া হবে না। সকলের আগে যাব আমরা। সুইডেনের জয় হোক্।

এণ্ড্রির দাবী—এক লক্ষ টাকা; টাকার অঙ্কটা কম নয়। কিন্তু টাকার অভাব হলোনা। চারিদিক থেকে অজস্র টাকা এলো অল্পদিনের মধ্যে। সুইডেনের রাজা পর্য্যন্ত টাকা দিয়ে সাহায্য করলেন। নানা দেশ থেকে চিঠি এলো এণ্ড্রির নামে—"আমাকে সঙ্গে নিয়ে নিন, আমি মেরু অভিযানে আপনার সঙ্গী হতে চাই।"

আবেদনকারীদের ভেতর থেকে এণ্ড্রি বেছে বেছে দু'জন সঙ্গী নিলেন। একজন ষ্ট্রীণ্ডবার্গ, অন্যজন ফ্রেন্‌কেন ষ্ট্রীণ্ডবার্গ ছিলেন বিজ্ঞানী—ওস্তাদ ছিলেন ফটোগ্রাফীতে। মেরুপ্রদেশের আবহাওয়ার গতি-প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করার এবং মেরু অঞ্চলের নৈসর্গিক দৃশ্যের ছবি তোলার জন্য আগ্রহী ছিলেন তিনি। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি দিয়ে মেরু অঞ্চলকে পরীক্ষা করবেন তিনি। আর ফ্রেন্‌কেন? তখনকার সুইডেনের একজন নামকরা এঞ্জিনিয়ার ছিলেন তিনি। তা ছাড়া দক্ষ শিকারী এবং পালোয়ান হিসেবেও সুনাম ছিল তাঁর সুইডেনে। লোকে বল্‌তো—ফ্রেন্‌কেনের বন্দুকের গুলি কখনও ফস্কায় না।

ষ্ট্রীণ্ডবার্গ আর ফ্রেন্‌কেন নির্ব্বাচিত হওয়া মাত্রই এণ্ড্রির কাছে এসে বেলুনে ওঠা নামার এবং বেলুন চালনার কল-কৌশল শিখতে আরম্ভ করলেন আর ওদিকে ফ্রান্স দেশের প্যারী সহরের এক কারখানায় এণ্ড্রির বিশেষ নির্দ্দেশে তৈরী হ'তে আরম্ভ হ'লো অতিকায় বেলুন—"ঈগল"। দেখেশুনে সুইডেনে সাড়া জেগে উঠলো—"এণ্ড্রির জয় হোক।"

এণ্ড্রি স্থির করলেন সুইডেনের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত গটেনবার্গ বন্দর থেকে বেলুন নিয়ে জাহাজে তাঁরা যাবেন স্পিজ্‌বার্জেস্ দ্বীপে; সেখান থেকে বেলুনে উঠে যাত্রা করবেন সুমেরুর দিকে। স্পিজবার্জেস থেকে সুমেরুর দূরত্ব অনেকটা কমই হবে।

১৮৯৬ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে হাজার হাজার দর্শকের জয়ধ্বনির মধ্যে সুইডিস জাহাজ "ভির্গো" যখন এণ্ড্রি ও তাঁর দুই সহযাত্রী আর "ঈগল" বেলুন নিয়ে গটেনবার্গ বন্দর থেকে রওনা হ'লেন তখন সারা সুইডেন জুড়ে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। শত সহস্র সুইডিস নরনারী গর্জ্জে উঠলো—"জয় সুইডেনের জয়! জয় এণ্ড্রির জয়!"

(ক্রমশঃ)

অয়োডিন

গৌর আদক

আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগের কথা। ফরাসীর এক বৈজ্ঞানিক মিঃ বার্ণার্ড কোটিস নানা রকম সামুদ্রিক উদ্ভিদ্ নিয়ে গবেষণা করছিলেন যে তা থেকে গোলা-বারুদ তৈরির জন্য সোরা আবিষ্কার করা যায় কি না। এই নিয়ে গবেষণা করতে করতে হঠাৎ আবিষ্কার করে বসলেন এক মূল্যবান পদার্থ আয়োডিন।

আয়োডিন মানুষের দেহের এক অপরিহার্য্য পদার্থ। কাটা বা ছেঁড়ায় আগে মানুষ প্রতিষেধক হিসাবে আয়োডিন ব্যবহার করে থাকতো। কিন্তু আজকাল বাজারে প্রতিষেধক হিসাবে আয়োডিনের বিকল্প প্রচুর ওষুধ বের হবার ফলে আজকাল প্রতিষেধক হিসাবে আয়োডিনের সে রকম কদর নেই, কিন্তু মানুষের শরীরে নিত্য প্রয়োজনীয়তা হিসাবে আয়োডিন যে এক অপরিহার্য্য এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কারণ মানুষের শরীরে নিত্য প্রয়োজনীয়তা হিসাবে যতগুলি উপাদান দরকার তার মধ্যে আয়োডিন একটি এবং আয়োডিন নিত্য প্রয়োজনীয়তা হিসাবে ছোট বড় সকলের শরীরে এক মিলিগ্রামের দশ ভাগের এক ভাগ প্রত্যহ প্রয়োজন। এবং শরীরে আয়োডিন পূরণের জন্য সকলকেই যে সমস্ত জমিতে আয়োডিন আছে সেই সমস্ত জমির শাক-সব্জী আহার করলে প্রচুর পরিমাণে আয়োডিন পাওয়া যায়। তবে নিত্য প্রয়োজনীয় আয়োডিন সংগ্রহের সব চেয়ে সহজতম উপায় হলো নুন। নুনের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আয়োডিন আছে এবং তার দ্বারাই আমাদের শরীরের প্রয়োজনীয় আয়োডিন পূরণ করা যায়।

শরীরে আয়োডিনের অভাব হলেই গলগণ্ড হয়ে থাকে। কারণ গলার মধ্যে যে থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড আছে, সেখানে থাইরয়েড হর্মোন নামক এক প্রকার রস উৎপন্ন হয়, সেই রসই শরীরের কর্মক্ষমতা রক্ষা করে থাকে। সেই রস উৎপন্ন করার প্রধান উপাদান হচ্ছে আয়োডিন। আয়োডিনের অভাবেই শরীরের কোষগুলি ক্ষীণ হয়ে পড়ে এবং এই ক্ষীণ কোষগুলিতে প্রয়োজনীয় থাইরয়েড হর্মোন রস সংগ্রহ করতে গিয়েই গলগণ্ড হয়। গলগণ্ড সাধারণতঃ গলার বাহিরেই হয় এবং অনেক সময় ভীষণাকার ধারণ করে গলার ভিতরকার শ্বাসনালী বন্ধ করে দেয়। এই অবস্থাকে গলগণ্ড বলা হয়।

শরীরে আয়োডিনের অভাবে যে গলগণ্ড হয়, তা মার্কিন বৈজ্ঞানিক মিঃ ডেভিড মেরিন প্রত্যক্ষ প্রমাণ করেছেন।

শিশু সাহিত্যের সম্মেলন

গত ৫ই ও ৬ই এপ্রিল বিহারের ঘাটশিলায় নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। বিভিন্ন রাজ্যের পঁচাত্তর জন শিশু সাহিত্যিক প্রতিনিধি হিসাবে এই সম্মেলনে যোগদান করেন। বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বাণী পাঠান। ৫ই এপ্রিল সকাল বেলা প্রতিনিধি সম্মেলনে সংগঠন বিধির পরিবর্তন, পরিবর্ধনগুলি গৃহীত হয় এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে ১৯৬৯-সালের জন্য কার্যকরী পরিষদ গঠিত হয়ঃ—

সভাপতিঃ—শ্রীমন্মথ রায়। সহ সভাপতিবৃন্দঃ—সর্বশ্রী অখিল নিয়োগী, কুমারেশ ঘোষ, ধীরেন্দ্রলাল ধর, রমণলাল, পি, সোনী, গুরুদয়ালসিং ফুল সুমতী পাইগোয়ানকর ও ডঃ গোপাল চন্দ্র মিশ্র। সাধারণ সম্পাদকঃ—শ্রীউৎপল হোম রায়। যুগ্ম-সম্পাদকঃ—সর্বশ্রী শান্তি ঠাকুর ও প্রভাংশুশেখর কালী। কোষাধ্যক্ষঃ—ডঃ বিমলেন্দু নারায়ণ রায়। সভ্যবৃন্দঃ—সর্বশ্রী ডঃ অসীম বর্ধন, শৈলেন ঘোষ, রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ধূর্জটি দত্ত, বিনয় সরকার, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ও দিলীপ কুমার বাগ।

মূল অধিবেশনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ দান করেন ইণ্ডিয়ানকপার কর্পোরেশনের চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার শ্রীএম, সি দত্ত। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন কপার কর্পোরেশনের ওয়ার্কস্ ম্যানেজার শ্রী এম, এম, রায় ও প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন শ্রীঅখিল নিয়োগী। বিভিন্ন ভাষার শিশু পত্র-পত্রিকার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মিসেস্ সুব্রাহ্মানিয়ম্। বিভিন্ন অধিবেশনগুলিতে সভাপতি ও উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত থাকেন ডঃ অসীম বর্ধন, ডঃ যাদব ডঃ এস, কে বিশ্বাস, অখিল নিয়োগী, মিঃ সুব্রাহ্মানিয়ম্, মিঃ এম, সি, দত্ত প্রভৃতি। একটি ভাব-গম্ভীর অনুষ্ঠানে সাফল্যের সঙ্গে কর্মজীবনের সমাপ্তি ঘটানোর জন্য স্বপনবুড়োকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ক্ষুদেদের 'ঋতুরঙ্গ' গীতি আলেখ্য ও সাধুবাবা অভিনয় এবং শিশু সাহিত্যিকদের বনফুলের 'কবয়' ও মন্মথ রায়ের 'মরাহাতী লাখ টাকা' সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'সাধুবাবা' অভিনয়ে সর্বশ্রী শিখা দাস, কুশল হোম রায়, লোপামুদ্রা মুৎসুদ্দি, চন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ও বন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এবং শিশু-সাহিত্যিকদের অভিনয়ে সর্বশ্রী মন্মথ রায়, অখিল নিয়োগী, তৃপ্তি কুমার মিত্র, কল্যাণী রায়, ধূর্জটি দত্ত, উৎপল হোম রায়, শান্তি ঠাকুর, প্রভাংশু শেখর কালী, রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, ভারতী দত্ত, লোকেশ হোম রায় ও বাদল মজুমদার সকলের প্রশংসা ভাজন হন। মৌভাণ্ডার ইভিনিং ক্লাব ও ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনায় দুই দিনের নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সম্মেলন অভূতপূর্ব সাফল্যমণ্ডিত হয়।

মহাত্মা গান্ধী ও বিশ্বশান্তি ঃ

১৯৫০ সালের ১৬ই জুন ইউ, এন্ রেডিও জগদ্‌বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার প্রচার করেছিল। বিশ্বশান্তি রক্ষার কল্পে নানা প্রকারের পরামর্শ দিলেন আইনষ্টাইন। যুদ্ধের বিরুদ্ধে পৃথিবীবাসীরা জনমত তৈরী একটা—অতি-জাতীয় সংস্থার হাতে সব দেশের সব মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র তুলে দিয়ে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে। ইউ, এন, রেডিও পক্ষে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার্থে কি করা উচিত এই প্রশ্নে মহামনীষী আইনষ্টাইন বললেন—মহাত্মাগান্ধী প্রদর্শিত শান্তির পথই জগতে প্রচার করা উচিত। তিনি বললেন :—

Taken on the whole, I would beleive that Gandhiji's views were the most enlightened of all the political men in our time. We should strive tó do things in his spirit·· ...... not to use violence in fighting for our causes, but by non-participasion in what we believe is evil."

(Ideas and openions
by Albert Einstein)

কিন্তু গান্ধীজীর প্রদর্শিত পথ সম্বন্ধে তাঁর দেশের লোকের কতটা আগ্রহ আছে দেখা যায় ?

সুকুমার গুহরায়, কলিকাতা—৭
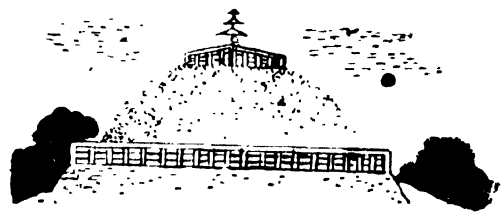
চিত্রগুপ্ত

এবারে তোমাদের বিজ্ঞানের যে খেলাটির কথা বলছি সেটিও খুব আজব-মজার। কাজেই এ খেলার কলা-কৌশলটুকু রপ্ত করে নিয়ে ছুটির দিনে তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের আসরে যদি ঠিকমতো দেখাতে পারো, তাহলে শুধু আনন্দ-পরিবেষণই নয়, তাঁদের রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দিতে পারবে।

তোমাদের সকলেরই ধারণা আছে—জলন্ত আগুনের তাপ কতখানি প্রচণ্ড··একটু ছোঁয়াচ লাগলেই ফোস্কা পড়ে···পুড়ে যায়। কিন্তু বিজ্ঞানের বিচিত্র-রহস্যময় রাসায়নিক-প্রক্রিয়ার দৌলতে এমন আজব উপায়ে আগুন জ্বালানো সম্ভব যে সে-আগুনে কেবল আলোর রোশনাই ফুটবে অথচ কোনো কিছুই সহজে জ্বলে-পুড়ে যাবে না। অর্থাৎ, সোজা-কথায় যাকে বলে—"ঠাণ্ডা আগুন"বা 'Cold fire'। ব্যাপারটা শুনে হয়তো তোমাদের তাজ্জব মনে হচ্ছে, তাহলে বলি শোনো—এই আজব কারসাজির আসল রহস্য।

গোড়াতেই বলে রাখি—এ কারসাজি দেখানোর জন্য যে সব সাজ-সরঞ্জাম দরকার—তারই কথা। অর্থাৎ, এ খেলা দেখানোর জন্য চাই—কর্কের ছিপি আঁটা একটি' 'কাঁচ-কুপী' বা Glass Flask—সাধারণতঃ, স্কুল-কলেজের 'ল্যাবরেটারী' (Science Laboratory) বা 'বিজ্ঞানাগারে' যেমন জিনিষ ব্যবহার করা হয়। এছাড়া প্রয়োজন—কাঁচের তৈরী একটি ফাপা-নল, একটি পেন্সিল-কাটার ছুরি, একটি স্পিরিট-ল্যাম্প (Spirit-Lamp), কয়েক টুকরো 'ফস্‌ফরাস্' (Phosphorous) রাসায়নিক-পদার্থ। এই রাসায়নিক-পদার্থটি তোমরা একটু চেষ্টা করলেই যে কোনো ভালো ওষুধের দোকান থেকে কিনে আনতে পারবে। তবে খেয়াল রেখো—'ফস্‌ফরাস্' ব্যবহার করবার সময় কিন্তু খুব হুঁশিয়ার থাকতে হবে—না হলে বিপদ ঘটতে পারে সামান্য একটু অসাবধান হলেই।

উপরের ফর্দ্দমতো সাজ-সরঞ্জামগুলি সংগ্রহ হবার পর, খেলার কলা-কৌশলের পালা সুরু করো।

খেলা দেখানোর সময়, প্রথমেই ঐ কাঁচ-কুপীর ভিতরে ভরে নাও খানিকটা ঠাণ্ডা-জল··তারপর সেই জলে মিশিয়ে দাও কয়েকটা 'ফস্‌ফরাসের' টুকরো। এবারে কাঁচ-কুপীর মুখ বন্ধ করে দাও কর্কের ছিপি এঁটে। তারপর ছুরির সাহায্যে বেশ পরিপাটিভাবে ছিপির মধ্য-ভাগ এ-ফোঁড়-ওফোঁড় উপর থেকে নীচে পর্য্যন্ত ফুটো করে, সেই ফুটোর ভিতরে এমনভাবে বসিয়ে দাও ঐ কাঁচের ফাপা-নলটিকে যেন নলের প্রান্তভাগ যেন ছিপির বাইরে উঁচু হয়ে থাকে।

এবারে দেশলাই-কাঠির সাহায্যে স্পিরিট-ল্যাম্পটিকে জ্বালিয়ে নাও এবং খুব সাবধানে সেই জলন্ত-ল্যাম্পটি সাজিয়ে রাখো কাঁচ-কুপীর তলায়—কাঁচকুপী থেকে অন্ততঃ পক্ষে এক-আধ বিঘত তফাতে। তাহলেই জ্বলন্ত-ল্যাম্পের আগুনের আঁচে কাঁচ-কুপীর ভিতরকার ফস্‌ফরাস্-মেশানো জলটুকু দিব্যি ফুটতে সুরু করে দেবে।

এভাবে জলটুকু ফুটতে সুরু করবার কিছুক্ষণ বাদেই দেখবে—কাঁচ-কুপীর মুখে-আঁটা ছিপির ফুটোর মাঝে বসানো কাঁচের ফাঁপা-নলের প্রান্তে 'ঠাণ্ডা-আগুনের' লেলিহান-শিখা সতেজে জ্বলতে সুরু করেছে।

এমনটি ঘটবার কারণ—জলীয় বাষ্পের সঙ্গে ফস্‌ফরাসের খুব সূক্ষ্ম-কণা বেরুতে থাকে এবং বাইরের বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে বিজ্ঞানের বিচিত্র বিধানে রহস্যময় রাসায়নিক-প্রক্রিয়ার ফলে আগুনের শিখার মতো উজ্জ্বল রোশনি-আভায় জ্বলতে থাকে।

এই হলো—এবারের বিজ্ঞানের খেলাটির আসল মজা।

আগামী সংখ্যায় এমনি-ধরণের আরেকটি মজার

মনোহর মৈত্র

১। জমি-ভাগের হেঁয়ালী :
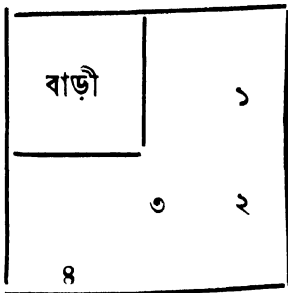
উপরে যে নক্সাটি দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনি-ধরণের জমি আর বাড়ী ছিল রামবাবুর। রামবাবুর চারটি ছেলে আর একটি মেয়ে। বৃদ্ধ বয়সে রামবাবুর দুশ্চিন্তা হলো—তিনি মারা গেলে হয়তো এই বাড়ী আর জমির ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে তাঁর ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বিবাদ-কলহের সৃষ্টি হবে। তাই তিনি উইল লিখে বাড়ী আর জমি ভাগ করে দিলেন নিজের ছেলে-মেয়েদের হাতে। বাড়ীটি দিলেন মেয়েকে এবং চারটি আমগাছ-সহ জমিটুকু সমান-অংশে ভাগ করে দিলেন চার ছেলের হাতে। জমিটুকু রামবাবু এমন কায়দায় ভাগ করে দিলেন যে প্রত্যেকটি ছেলের ভাগে পড়লো—একটি করে আমগাছ এবং সমান-অংশের জমি। বলতে পারো, রামবাবু কি ভাবে জমিটুকু ভাগ করেছিলেন ?

২। 'কিশোর জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা :

ঝুড়ি কাঁধে দু'জন চাষা হাটে চলেছিল বাঁধাকপি বেচতে। পথে দেখা হতেই প্রথম চাষা দ্বিতীয় চাষাকে বললে,—ওহে ভাই, তোমার ঝুড়ি থেকে একটা বাঁধাকপি যদি আমাকে দাও তো আমার ঝুড়িতে ঠিক তোমার

এ কথার জবাবে দ্বিতীয় চাষা বললে,—তার চেয়ে বরং তোমার ঝুড়ি থেকে যদি একটা বাঁধাকপি আমাকে দাও, তাহলে আমার ঝুড়িতে যতগুলি থাকবে, তার সংখ্যা হবে তোমার ঝুড়ির বাঁধাকপিগুলির সমান-সমান !

তোমরা হিসাব কষে বলো তো—প্রথম চাষা আর দ্বিতীয় চাষার ঝুড়িতে মোট কতগুলি করে বাঁধাকপি ছিল ?

[রচনা : পার্ব্বতীচরণ মুখোপাধ্যায় (ইছাপুর)

গত মাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালির'

উত্তর ঃ

(ক) জোড়-সংখ্যা
(খ) বিজোড়-সংখ্যা
(গ) যোগফল এবং বিয়োগফল উভয়কেই সেই বিশেষ-সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যাবে।
(ঘ) জোড়-সংখ্যা

২।
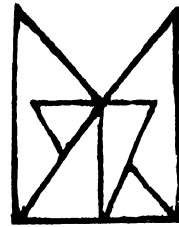
উপরের নক্সামতো ছঁদে রেখা টানলেই চারটি সমান-মাপের অংশ মিলবে।

গত মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

সুলোচনা, দীপঙ্কর, বুচা ও বানি (কলিকাতা), শাস্তনু, কল্পনা, মীরা, চন্দ্রনাথ, নীলকণ্ঠ, মধুমতী ও কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় (কা-পুর), কাকলী, চম্পা, নমিতা সুশোভন, গুরুদাস, বাসুদেব, বিশ্বদেব ও ভূদেব সিংহ (কলিকাতা), লাল্টু ছোটন, বিশু, কান্ট, কণা, মৃদুলা ও চামেলী ঘোষ (বিলাসপুর), কুণাল মিত্র (কলিকাতা), অলক, তিলক, সুপর্ণা ও অমিয়নাথ রায় (কলিকাতা), দোলন, রোচনা ও ফণীন্দ্র সাহা (কলিকাতা), হিমাংশু, সুধাংশু, শীতাংশু. হারানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও সুষমা রায় (শিলিগুড়ি), জাহানারা, রোশেনারা, জিনৎউন্নেশা

আচার্য্য (কলিকাতা), হাবলু, টাবলু, পুতুল, সুমা, নীপু ও সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় (হাওড়া), জয়ন্ত ও সুলতা দেবশর্মা (কলিকাতা), অলকা, অমল, পুলক, রেবতী, শীলা ও ছোটকু (ভিলাই), বিষ্ণু, মাখন, মদন, নীলু ও বাবলু দাস (দমদম টিকাপাড়া, কলিকাত)।

গত মাসের একটি ধাঁধাঁর উত্তর দিয়েছে :

বিশ্বনাথ ও দেবকীনন্দন সিংহ (গয়া), ভাস্কর, কৃষ্ণলাল, অমৃত, প্রশান্ত, ভুবনমোহন, নির্ম্মল, বিশ্বদেব, সুধীশ, মানস ও নন্দলাল (কলিকাতা), সীতা, সুমিত্রা, সুদেষ্ণা, কাবেরী, রামকৃষ্ণ, ভারতচন্দ্র, সুকুমার ও নৃপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (নিউ দিল্লী), সুশান্ত, মালবিকা, কাঞ্চন, চন্দন ও গোপা রায় (কলিকাতা), বিলটু, পলটু, মহিম, সুরেশ ও সুনন্দা সেন (লক্ষ্ণৌ), চন্দ্রিমা, পুলকেশ, অনিমেষ, লিপিকা ও গৌরী চৌধুরী (কলিকাতা), অরিন্দম, অভিজিৎ, রণজিৎ, কাননিকা, শম্পা ও খোকন বসু (বোম্বাই), বিজয়েন্দ্র, বিনয়েন্দ্র, অজয়েন্দ্র, সবিতা, পদ্মা, শোভনা ও মালতী চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা), নীহার, পবিত্র, অতনু, গোবিন্দ, মাণিক, বিমল, ছায়া, মায়া, সুমিতা, শ্রীলেখা ও বিক্রমজিৎ হালদার (কানপুর), নিখিল, শোভা, বারীন, অনিল, শ্যামসুন্দর ও কুন্দনন্দিনী গুহ (কলিকাতা)।

সংকলন

পোপ পল দি সিক্সথ

এক ভাষণে বাইবেল উদ্ধৃত করে তিনি বলেছেন —"যদি কোন পার্থিবধনে ধনী ব্যক্তি নিজের ভ্রাতাকে দারিদ্র্যের মধ্যে দেখে হৃদয়দ্বার বন্ধ করে রাখে; তার মধ্যে ঈশ্বরের প্রেম কি করে খেলা করবে ?"

"(If some one who has true riches of this world sees his brother in need and closes his heart to him, how does the love of God abide to him ?)"

এক ভাষণে বাইবেল থেকে উদ্ধৃত করে এই কথা বলেছেন খৃষ্টান জগতের ধর্ম গুরু পোপ পল দি সিক্সথ্।......পোপ পল নানা দেশ ভ্রমণ করে ভাষণ দিচ্ছেন। তিনি ভারতে এসেছেন, যুক্ত রাষ্ট্রে গিয়েছেন—গিয়েছেন ল্যাটিন অ্যামেরিকায়।

তিনি সমৃদ্ধ দেশ গুলির উদ্দেশ্যে এই উপদেশ বর্ষণ করেছেন। ভূমি সংক্রান্ত নিয়মকানুন পরিবর্তনের জন্য উপদেশ দিয়েছেন—নিন্দা করেছেন দরিদ্র দেশগুলি থেকে অর্থ লুণ্ঠনের। যে সব উপনিবেশবাদী দেশ দারিদ্র্যের মধ্যে, উপনিবেশ গুলিকে ফেলে রেখে চলে যায় তাদেরও তিনি নিন্দা করেছেন। তারা ভাবী কালের পৃথিবীর জন্যে কি সমস্য রেখে যায় তাও বোঝাতে চেয়েছেন।

পোপ পলের বাণী দুনিয়ার সমৃদ্ধ দেশের নায়কদের কানে পৌছেচে জানি, কিন্তু মর্মে কবে পৌছবে কে বলতে পারে ?

ধীরেশ মিত্র। পার্ক সার্কাস

সঙ্গীত রচনায় যন্ত্রের কৃতিত্ব :—

যাঁরা সুর সৃষ্টি করেন, সঙ্গীত রচনা করেন, তাঁদের সকলের সামনে একটা কঠিন সমস্যা এসে দাঁড়িয়েছে। জানিনা সে সমস্যা সম্পর্কে তাঁরা নিজেরা ততটা সজাগ ও সচেতন কি না। সমস্যাটি হচ্ছে—সঙ্গীত জগতে কম্পিউটারের আবির্ভাব। কম্পিউটার ইতিপূর্বে চিকিৎসার ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় করে, ও ক্রীড়াজগতে দাবা খেলায় আশ্চর্য জনক কৃতিত্ব দেখিয়েছে। বর্তমান কালে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা কম্পিউটারের সাহায্যে সঙ্গীত-রচনা সম্ভব করে তুলেছেন। বস্তুতঃ তাঁদের প্রস্তুত কম্পিউটার উরাল-২ সঙ্গীত রচনা করে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে।

সম্প্রতি আরও একটা মজার ব্যাপারও ঘটেছে। উরাল-২ রচিত ৮টি সঙ্গীত আর রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত বিশেষজ্ঞদের রচিত ৮টি সঙ্গীত নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। কুড়িজন চিত্র নির্মাণে সংশ্লিষ্ট সঙ্গীত বিশেষজ্ঞের কাছে সেই ১৬টি সুর বাজিয়ে শোনান হয়েছে। তাঁদের জানান হয়নি কোন্ সুরটি মানুষের তৈরী, কোনটি যন্ত্রের। যন্ত্র রচিত সুর পেল ৭টি মাত্র খারাপ নম্বর। আর মানুষ রচিত সুর পেল ১৬টি খারাপ নম্বর, অন্যদিকে যন্ত্রের সুর পেল ২২টি 'চমৎকার' নম্বর। আর মানুষের সুর পেল মাত্র নয়টি।

যন্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় শৈলেন বাবুর সম্প্রদায় কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন তা দেখবার জন্যে অবশ্যই আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে।

শ্রীকমলেশ আঢ্য, বরাহনগর

গীতা পাঠের মাহাত্ম্য ঃ—

সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়েছে গীতা কাবুলের বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্য পাঠ্য বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। গীতা যে একটি অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ তা বলাই বাহুল্য। জার্মান দার্শনিক নিৎশে গীতা ও মনুসংহিতাকে খুব উচ্চে স্থান দিয়েছিলেন। শুনেছি প্রথম মহাযুদ্ধে কোন কোন দেশ সৈন্যদের মধ্যে গীতার বাণী প্রচার করেছিল।—সৈন্যরা যাতে উৎসাহ পায়,—ভীরুর মত যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে না আসে। শুধু গীতা কেন সমগ্র মহাভারতই মানব জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় প্রেরণার উৎসস্থল। গীতা ও গীতাসহ মহাভারত যে শুধু যুদ্ধের প্রেরণাই দেয় তা নয়—শান্তির সময়েও তা অবশ্য পঠিতব্য। কিন্তু জড়বিজ্ঞানে আবিষ্ট ভারতীয়গণ গীতা কিংবা মহাভারতের দিকে মনঃসংযোগ করবার সময় পাচ্ছেন না। ভারতীয় শাস্ত্র-সমূহে তাদের ঘোরতর বিতৃষ্ণা। তার ফল যে কত খারাপ তা বলার প্রয়োজন নেই। এ অবস্থা চলতে থাকলে দেশে এমন দুর্দিন আসবে যখন লোকেরা কাবুলীদের কাছ থেকে শুধু টাকা ধারই নেবেনা, গীতার শিক্ষাও নিতে বাধ্য হবে। সাবধান! সেদিন বেশী দূরে নয়।

চিন্ময় আচার্য্য, বর্দ্ধমান

প্রশ্ন

শ্রীসুশীলকুমার বসু

স্বার্থোদ্ধত অবিচার
কাড়িতেছে জীবনের যত ক্ষুদ্র তুচ্ছ অধিকার।
অবনত মুখে
জগদ্দল পাষাণের বোঝা নীরবে বাহিয়া বুকে।
রিক্ত সর্ব্বহারা
দুর্গম পথের যাত্রী পথ খুঁজে ভ্রান্ত দিশেহারা।

... .

জীবনের প্রতি স্তরে স্তরে
ধূমায়িত অসন্তোষ একদিন যবে ফেটে পড়ে,
শোষন বেদীর মূলে
দলে দলে উৎসর্গিত মহাপ্রাণ যূপকাষ্ঠ তলে
প্রদত্ত বলির আগে
বাঁচিবার তাগিদের কঠিন প্রয়াসে যবে জাগে'
দেখেছি তখন—
উদ্ধত কৃপাণ হস্তে বধ্যভূমে ঘাতক যেমন
শাসন ছুটিয়া আসে
মিশাতে ধূলার তলে বাঁচিবার সে কঠিন প্রয়াসে।
প্রশ্ন জাগে শুধু
সমাজ-শৃঙ্খল-আইন নির্ব্বাচিত মোদের প্রতিভূ।
বিচারের ক্ষণে
দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আগু পিছু সংশয় বিস্ময় জাগেনা স্মরণে।
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ যত
সজাগ সতর্ক দৃষ্টি কার তরে রয়েছে উদ্ধত?
মুখোস খসিয়া পড়ে বিচারের প্রহসন যত।
ঐক্যবদ্ধ জনতার সংগ্রামী চেতনা করে পদাহত।
দুর্ব্বিষহ শাসনের শোষণ শৃঙ্খলা যত
অপ্রমেয় পশু শক্তি বলে চলে অব্যাহত।
তাই বারে বারে
প্রশ্ন জাগে, শতাব্দীর অগণিত লোক কে কার শিবিরে?

বোম্বে বনাম বাংলা

শ্রী'শ'—

বাংলা দেশে বাংলা চিত্র ও বোম্বাই চিত্র বা হিন্দী চিত্র দুই চলে আসছে বহুকাল থেকে। বিশেষ করে কলিকাতা শহরে তো অবাঙ্গালীর সংখ্যা কম নয়, তাই বোম্বাইয়ের হিন্দী চিত্রের চাহিদাও রয়েছে যথেষ্ট। তা ছাড়া বাঙ্গালীরাও তো কম হিন্দী ছবি দেখেন না! শুধু মাত্র বাংলা ছবি দেখবার জন্য যতই আবেদন নিবেদন করা হোক, হিন্দী ছবিকে সম্পূর্ণ বর্জন করে খুব কম বাঙালী দর্শকই শুধু মাত্র বাংলা ছবি দেখতে মনঃস্থির করবেন। অবশ্য চলচ্চিত্র অনুরাগী বাঙ্গালী দর্শক বাংলা ছবি দেখতে বিমুখ নন, কিন্তু হিন্দী চিত্রও তাঁরা যথেষ্ট দেখে থাকেন। এর কারণ আর কিছুই নয়, হিন্দী চিত্রের যথেষ্ট আকর্ষণ আছে বাঙ্গালী দর্শকের কাছে। বাংলা চিত্রে যা পাওয়া যায় না, বোম্বাই হিন্দী চিত্রে দর্শকেরা তা পান বলেই তাঁদের একাংশ হিন্দী চিত্রের এত অনুরাগী। এখন বাংলা চিত্রে যদি হিন্দী চিত্রের যা কিছু আকর্ষণীয় তা পরিবেশন করা যায়, তা হলে হয়ত বাঙ্গালী দর্শক শুধু বাংলা ছবি দেখতেই চাইবেন। কিন্তু বাংলা ছবিকে সম্পূর্ণভাবে হিন্দী চিত্রের মত করা সম্ভব কি? মোটেই নয়! কারণ বাংলা চিত্র-নির্মাতাদের পক্ষে বিরাট ব্যয়সাধ্য বোম্বাই চিত্রের অনুরূপ চিত্র নির্মাণ করা সম্ভব নয়। বোম্বাই হিন্দী চিত্রের ব্যয়বাহুল্যই ঐ ছবিগুলির প্রধান আকর্ষণ। সম্পূর্ণ রঙীন চিত্র তোলাই বিরাট ব্যয়সাধ্য, তার ওপর নৃত্যদৃশ্য, মারামারির দৃশ্য, গাড়ী, ঘোড়া, ট্রেন, এমন কি এরোপ্লেন, হেলিকপটারের দৃশ্য প্রভৃতি প্রচুর খরচা করে তোলা হয়। সঙ্গীত-নৃত্যেও খরচা হয় খুব। তারপর কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানের বহির্দৃশ্য

তো আছেই। এই সব মিলিয়ে বোম্বাই চিত্রের খরচা হয় খুবই। কিন্তু সর্বভারতীয় বাজার থেকে এবং এমন কি মধ্য-প্রাচ্য ও দূর-প্রাচ্যের বহু স্থানেই হিন্দী চিত্রের চাহিদা থাকায় সে সব জায়গা থেকেও অর্থাগম হয়। তাই বোম্বের চিত্রনির্মাতারা যে বিরাট খরচা করেন তা উঠে এসেও তাঁদের লাভের অংক বর্দ্ধিতই হয়। কিন্তু বাংলা চিত্রের ক্ষেত্রে অবস্থাটা হয় অন্যরকম। সর্বভারতীয় বাজার বা বহির্ভারতের বাজার তো দূরের কথা, শুধু বাংলা দেশ ছাড়া আশে পাশের মাত্র কয়েকটি প্রদেশে বাংলা চিত্রের চাহিদা আছে। তাই অর্থ আহরণে বাংলা চিত্র বোম্বাই চিত্রের সমকক্ষ তো নয়ই, তুলনায় অনেক পিছনে পড়ে আছে। অথচ বাংলা চিত্র গুণের দিক থেকে রয়েছে একেবারে শীর্ষে! শুধু ভারতেই নয়, বিশ্ব-বাজারে বাংলা চিত্রকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসনে বসান হয়েছে! কিন্তু দুর্ভাগ্য যে বাংলার গৌরব, ভারতশ্রেষ্ঠ এই বাংলা চিত্র-ব্যবসায় আজ অর্থকষ্টে জর্জর!

শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পরিচালনা, উচ্চপর্য্যায়ের অভিনয়, উত্তম গল্প বা চিত্র-নাট্য—এই সকলের একত্র সমাবেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলা চিত্র আজ ব্যবসার ক্ষেত্রে মার খাচ্ছে! সমালোচকের,চিত্র রসিক দর্শকের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও জাতীয় পুরস্কার লাভ করেও বাংলা চিত্র লক্ষ্মীর কৃপা থেকে আজও বঞ্চিত! অথচ বোম্বাই চিত্র জগাখিচুড়ী গল্প, এবং সাধারণ স্তরের পরিচালনা ও অভিনয় দ্বারাই বাজার মাৎ করে চলেছে! এর কারণ কি? কারণ আর কিছুই নয় বোম্বাই চিত্রের প্রধান আকর্ষণ তার আমোদের অংশ। সাধারণ দর্শকদের আমোদিত করাটাই হচ্ছে বোম্বাই চিত্রের প্রধান উদ্দেশ্য এবং এই আমোদ (entertainment) দেওয়াটার ওপরই বোম্বের চিত্র-নির্মাতারা সব চেয়ে বেশী ঝোঁক দেন। তাই তাঁদের বেশীর ভাগ চিত্রই আমোদ-জনক নৃত্য, গীত, হাস্যবহুল হয়ে থাকে। এর ওপর আজ-কাল আবার সন্দেহ, সংশয়, উৎকণ্ঠা, উত্তেজনা, রোমাঞ্চ প্রভৃতি ভাবেরও সন্নিবেশ করে দর্শক মনকে আকর্ষণ করা হচ্ছে। ব্যয়-বহুল নৃত্য-গীত সমৃদ্ধ, মনোরম বহির্দৃশ্য সম্বলিত এবং হাস্য-কৌতুক, রোমান্স-রোমাঞ্চ, বীর-বীভৎস প্রভৃতি রস-রঞ্জিত বোম্বাই চিত্রের আকর্ষণ তাই হয়ে পড়েছে প্রায় সর্বজনীন! সাধারণ দর্শক বিবেচনা-বিবেক, যুক্তি-তর্ক এসব বিশেষ বোঝে না। কি হওয়া উচিত ছিল, আর কি হওয়া উচিত হয় নি তা নিয়ে তাদের মাথা ব্যথা নেই। তারা চায় ছবি দেখে আমোদ পেতে, আনন্দ লাভ করতে—আর তার সঙ্গে কিছু শিক্ষা কিছু আদর্শ ও দেশাত্মবোধ যদি থাকে তো আরও ভাল।

অপর পক্ষে বাংলা চিত্রের নানা গুণ থাকলেও এবং রসিকজনের প্রশংসা পেলেও বলব আমোদ-প্রমোদের (entertainment) দিকটা বাংলা চিত্রে একটু অবহেলিত। সেটা অবশ্য অনেক সময় রুচিবান দর্শকদের প্রশংসাই আনে। যাই হোক, বাংলা চিত্রে আমোদের অংশ কম থাকায় বেশীর ভাগ দর্শক, এমন কি বাঙ্গালীরাও, হিন্দী চিত্রেই ভীড় জমায়। দর্শকদের এই রুচিকে বদলাতে পারলে ভাল হত, কিন্তু এই আধুনিক হুল্লোড়ের যুগে তা বোধ হয় অসম্ভব! আর বদলানো তো দূরের কথা রুচি যে আরও ক্রমনিম্নগামী তা বোধহয় সকলেই বুঝতে পারছেন।

এ হেন পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা চিত্রের ভবিষ্যৎ কি? সে কি বোম্বাই এর মতন হতে পারবে? কিন্তু আগেই বলেছি তা হওয়া বাংলা চিত্রের পক্ষে সম্ভব নয়। যেমন উচিত নয় ঐ রকম জগাখিচুড়ী চিত্রনাট্য লেখা, তেমনি সম্ভব নয় ঐরকম উচ্চস্তরের রঙ্গীন ফটোগ্রাফীর, উচ্চ টেক্‌নিকের। তাই বাংলা চিত্র বোম্বাই চিত্রের সমকক্ষ হতে পারবে না টেক্‌নিকের দিক দিয়ে। আর শুধু সাদা-কালো ফটোগ্রাফ আর ঘরোয়া গল্প দিয়েও বাজার মাৎ করে রাখা যাবে না। তাই বাংলা চিত্রকে অন্য পথ ভেবে দেখতে হবে এবং আশা করি তা বাংলা চিত্র-নির্মাতারা ভাবছেনও।

বোম্বাই বনাম বাংলার এই চিত্র-প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরি-প্রেক্ষিতে তাঁদের আরও ভাবতে হবে এবং নতুন পথের সন্ধান করতে হবে।

খবর বলছি :

সৌমিত্র-তনুজা অভিনীত "পরিণীতা" চিত্রটি মুক্তি প্রতীক্ষায় রয়েছে। "তীরভূমি" ও "কলঙ্কিত নায়ক"-এর কাজও এগিয়ে চলেছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্য-জীবন অবলম্বনে রচিত "তীর্থভারতী"-র "বালক গদাধর" চিত্রটির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। চিত্রটি পরিচালনা করছেন হিরণ্ময় সেন এবং চিত্র-নাট্যও লিখেছেন তিনি।

সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে বাংলা চিত্র "পিতাপুত্র"। নায়ক নায়িকার চরিত্রে রূপদান করেছেন স্বরূপ দত্ত ও তনুজা।

হিন্দী চিত্র মুক্তি পেয়েছে তিনটী। প্রমোদ চক্রবর্ত্তী পরিচালিত "তুম সে কৌন আচ্ছা হ্যায়" প্রমোদ চিত্রটিতে নায়ক-নায়িকার চরিত্রে আছেন সাম্মি কাপুর ও ববিতা।

জয় মুখার্জি পরিচালিত ও প্রযোজিত "মহামায়া" নামক 'থি্লার' চিত্রটির নায়ক জয় মুখার্জি নিজেই এবং তাঁর নায়িকা বলা চলে দু'জন। এ দু'জন হচ্ছেন মালা সিন্হা ও শর্মিলা ঠাকুর।

শারদ প্রডাক্সন্স-এর ভক্তিমূলক চিত্র "মাতা মহাকালী" পরিচালনা করেছেন ধীরুভাই দেশাই।

* * *

বিদেশী ছবিগুলি কলিকাতায় এখন চলছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে "নিউ এম্পায়ার" চিত্রগৃহে প্রদর্শিত "Bonnie and Clyde" এবং মিনার্ভা চিত্রগৃহের "The Night of the Generals".

Warner Brothers'এর "Bonnie and Clyde" চিত্রটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিরিশ দশকে যে সব ব্যাঙ্ক ডাকাতি, রাহাজানি প্রভৃতি হত, সেই সব ঘটনা অবলম্বনে এই রোমাঞ্চকর চিত্রটি নির্ম্মিত হয়েছে। Warren Beatty এবং Faye Dunaway দু'জনে Clyde Barrow ও Bonnie J. Parker নামক নায়ক-নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তবে এ নায়ক-নায়িকা ডাকাত দলের এবং রাহাজানিই তাদের কাজ। অভিনয় তাঁদের চরিত্রানুযায়ী তো হয়েছেই, উপরন্তু বলব ঐ দু'টি ডাকাত চরিত্রকে তাঁরা অভিনয় গুণে জীবন্ত করে তুলেছেন। Michael J. Pollard-এর অভিনয়ও প্রশংসনীয় হয়েছে। এই শিশুসুলভ মুখের অধিকারী অভিনেতাকে দর্শকেরা চটকরেই ঘৃণা করতে আরম্ভ করবে তাঁর রক্ত-হিমকরা অভিনয়ের গুণে।

'Bonnie and Clyde' একটি দৃশ্যে চিত্রের Warren Beatty ও Faye Dunnaway.

"Bonnie and Clyde" চিত্রটি পরিচালনা করেছেন Arthur Penn এবং অভিনেতা Warren Beatty হচ্ছেন প্রযোজক। চিত্রনাট্য লিখেছেন David Newman এবং Robert Benton.

"The Night of the Generals" চিত্রটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় নির্মিত। একজন মানসিক রোগগ্রস্ত জার্মান জেনারেল, যিনি বেশ ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে দু'জন পতিতা নারীকে যুদ্ধের সময় হত্যা করেছিলেন, তাঁর দোষ প্রমাণের জন্য জার্মান সৈন্যদলের একজন মেজরের চেষ্টা নিয়েই এই চিত্রটি রচিত হয়েছে। জার্মান সৈন্যাধ্যক্ষের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বিখ্যাত অভিনেতা Peter O' Toole এবং তাঁর বিপক্ষে মেজরের ভূমিকায় আছেন খ্যাতনামা অভিনেতা Omar Shariff. এই চিত্রটিতে ঐ জার্মান জেনারেলের ভূমিকায় Poter O' Toole যে অভিনয় করেছেন তা মনে রাখবার মতন—এক কথায় বলা চলে অনবদ্য!

* * *

গ্রাণ্ড হোটেলের স্যুইটে বসে আলোচনার ফাঁকে পরিচালক প্রমোদ চক্রবর্তী বললেন—আমরা চাই দর্শকদের আনন্দ দিতে এবং সেই ভাবেই ছবি তৈরী করি। হেসে বললাম—আপনার নতুন ছবিটি "তুম সে কৌন অ'চ্ছা হ্যায়" আপনার নাম (প্রমোদ) অনুযায়ীই হয়েছে, বক্স-অফিসের সাফল্য অনিবার্য্য।

* * *

ডিনারের শেষে চলে আসবার সময় জয় মুখার্জ্জিকে বললাম —"আপনাকে পর্দায় যতটা ভাল দেখায় তার চেয়ে আপনি অনেক 'সুইট' দেখতে।" জয় হেসে বললেন—"আপনার এ কম্প্লিমেন্টস্ মনে রাখব।"

* * *

সাংস্কৃতিক সংস্থা :

বাংলার সাহিত্যিক ও শিল্পীরা মিলে গঠন করেছেন একটি নতুন সাংস্কৃতিক সংস্থা। সংস্থাটির নাম হয়েছে "মঞ্চলেখা"। এর সভাপতিরপদে আছেন প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং সহ-সভাপতিবৃন্দ হচ্ছেন : কবি শ্রীনরেন্দ্র দেব, নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়, শিশু-সাহিত্যিক শ্রীঅখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো), রবীন্দ্র-ভারতীর উপাচার্য্য ডঃ রমা চৌধুরী এবং সাহিত্য-শিল্প-পৃষ্ঠপোষক ও শিল্পী কুমার বিশ্বনাথ রায়। সম্পাদক নির্ব্বাচিত হয়েছেন "ভারতবর্ষ" সম্পাদক শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং সহ-সম্পাদকদ্বয় হয়েছেন "সাহিত্যতীর্থ" সম্পাদক শ্রীরমেন্দ্র নাথ মল্লিক ও শিল্পী শ্রীধীরেন বল। কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হয়েছেন অধ্যাপক শ্রীবিবেকানন্দ ভট্টাচার্য।

"মঞ্চলেখা"-র প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সাহিত্যিক ও শিল্পীদের দ্বারা নাটক মঞ্চস্থ করা। এঁদের প্রথম প্রয়াস-রূপে শ্রীঅখিল নিয়োগী রচিত একাঙ্ক নাটক "স্বর্গীয় সাহিত্য সমাবেশ" প্রদর্শিত হল গত ২রা বৈশাখ গোল পার্ক-এর "রামকৃষ্ণ মিশন্ ইন্সটিটিউট্ অব কালচার" ভবনের বিবেকানন্দ হল-এ। নাটকটি পরিচালনা করলেন শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং এতে অংশ গ্রহণ করলেন : সর্ব্বশ্রী শৈলজানন্দ, মন্মথ রায়, অখিল নিয়োগী, কুমারেশ ঘোষ, শৈলেন চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন বল, রেবতীভূষণ, রমেন্দ্র নাথ মল্লিক, বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য, রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, আবু আতাহার, সঞ্জীব সরকার, শৈলেন সরকার, রবীন ভট্টাচার্য (হরবোলা), গৌর আদক, রমেন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্যিক ও শিল্পীগণ। অভিনেতাদের রূপসজ্জার ভার নিয়েছিলেন শ্রীধীরেন বল। প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত বিদগ্ধ জনমণ্ডলী অভিনয়ের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন। জানা যায় "মঞ্চলেখা" এই নাটকটি এবং অন্যান্য আরও নাটক বিভিন্ন স্থানে মঞ্চস্থ করবেন। আমরা এই রকম একটি সাংস্কৃতিক সংস্থার সাফল্য কামনা করি।

* * * * *

সাগরপারের ধ্রুপদী চলচ্চিত্র

শ্রীনরেশচন্দ্র বসু

জার্মানী ১৯২৫

"দি ক্যাবিনেট অব ডাঃ ক্যালিগরী"র প্রযোজক এরিক পমারকে জার্মানীর চিত্রশিল্পের অগ্রগতির প্রধান বাহক বললেও অত্যুক্তি হয় না। তিনিই ই. এ. ডুপণ্টকে (E. A. Dupont) রাশিয়ার পটেমকিনের চেয়ে উন্নততর চিত্র নির্মাণের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। ডুপণ্টের চিত্রশিল্পের প্রতি একটা জন্মগত আকর্ষণ ও নৈপুণ্য ছিল। ডুপণ্টের "ভ্যারাইটি" (variety) ও পটেমকিনের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করলে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে "ভ্যারাইটি" যদি পূর্ব হয়, "পটেমকিন" তবে পশ্চিম। দুটি চিত্রের গল্প, তাদের প্রকৃতি ও বক্তব্যের মধ্যে কোন মিল নেই। তবুও আলোকচিত্রের মুন্সিয়ানা, ষ্টাইল ও বক্তব্যপ্রকাশের স্বকীয়তার জন্য রাশিয়ার "পটেমকিনের ন্যায় জার্মানীর "ভ্যারাইটি"ও দেশ বিদেশে যশ এবং সম্মান লাভ করেছিল। ডুপণ্টের চিত্রকাহিনী আইনষ্টাইনের পটেমকিন অপেক্ষা বাস্তব জীবন থেকে আহরণ করা হয়েছিল এবং সরাসরি বক্তব্য প্রকাশে, স্ত্রী পুরুষের প্রণয়, বিশ্বাসঘাতকতা, শ্রেণীবদ্ধভাবে তার প্রতিক্রিয়া, অপরাধের মধ্যে তার পরিসমাপ্তি ও শূন্যে দড়ির খেলার ন্যায় চিত্রাদি—কাহিনীর সুষ্ঠু রূপায়ণে, নয়নমনোহর দৃশ্য ও উত্তেজনায় দর্শকবৃন্দকে অভিভূত করেছিল। যদিও ডাঃ ক্যালিগরীর ফ্যাণ্টাসী বা "লাষ্ট লাফের" মানসিক জ্বালা যন্ত্রণা এখানে অনুপস্থিত ছিল তথাপি মানুষের নীচতার জন্য এই কাহিনী পাঠক মনে সাড়া জাগিয়েছিল। এই ধরণের অপরাধপ্রবণ মানুষ ও তাদের মানসিক যন্ত্রণার প্রতি কেহ কেহ অনুকম্পা দেখাতে পারেন, কিন্তু একই দূরত্ব হ'তে কেহ কেহ এই লীলাকে শূন্যে দড়ির খেলার সঙ্গে তুলনা করেন।

"ভ্যারাইটি"র গতি ছবির ন্যায় মসৃন, নাটকীয়ভাবে সোজাসুজি বক্তব্যে সক্ষম, এবং আজও দর্শকবৃন্দ এর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিন সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয় এবং পাশব প্রকৃতি মানুষের উপর কেন্দ্রীভূত নাট্যাবেগের স্রোতে অবগাহন করে তৃপ্তি লাভ করে। এ্যাক্রোব্যাটদের চলচ্চিত্রে ব্যবহার, তাদের সাদা পোষাকে সজ্জিত মূর্ত্তি—অন্ধকারে স্বাভাবিক পোষাকে পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভাব—প্রথমটি মঞ্চের উপযোগী, শেষোক্তটির আবছা অন্ধকারে ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে মিলিয়ে যাওয়া ও ত্রিকোণ প্রণয়ের এক সম্পূর্ণরূপে অভিনিবিষ্ট বিপরীত ধর্মী চাক্ষুষ সুর এই চিত্রে ফুটে উঠেছে।

চিত্রটির চরিত্র কর্তাব্যক্তি—হুলার, বার্থা—তার স্ত্রী সঙ্গী,—যার জন্য হুলার নিজের স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছেন এবং আর্টিনেলি। বার্লিনে শীতকালীন উদ্যানের উৎসবে বিখ্যাত ট্রাপিজ আর্টিষ্ট আর্টিনেলি তাঁর সঙ্গী হবার জন্য হুলার ও বার্থাকে আমন্ত্রণ জানালেন। একজন আমেরিকার সমালোচক 'চিত্রটিকে "অলিম্পিয়ান" বলে সম্বর্দ্ধনা জানিয়ে একস্থানে বলেছেন—"

In one scen, the three appear like monoliths against a dark, receding background; shrouded by robes carcealing their perfor. ming tights (with black death's-head on their chests), they have the monumental presence of figures in a painted mural—one reason, undoubtedly why the film was termed Olympian." Murman যিনি "দি লাষ্ট লাফ" পরিচালনা করেছিলেন তাঁর ওপরই "ভ্যারাইটি"র পরিচালন ভার ন্যস্ত

ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এরিক পমার চিত্রের যৌন আবেদনের পূর্ণ প্রয়োগের যোগ্যতম ব্যক্তি হিসেবে মারণৌর চেয়ে ডুপণ্টকেই উপযুক্ত ব্যক্তি হিসেবে নির্বাচন করেন এবং তার ওপরই পরিচালনার ভার দেন। বিষয় বস্তুতে যৌন প্রধান এই চিত্রে স্ত্রী ক্রিড়াবিদ বার্টার চরিত্রে Lysa de Puti অভিনয় করেন যার প্রতি ট্রাপিজ খেলোয়াড় হুলারের একটা সুপ্ত কামনা ছিল। এমিল জেনিংসের ভাবলেশহীন পাশবমূর্ত্তি "বস" হুলারকে জীবন্ত করে তুলেছিল। ব্রিটিশ অভিনেতা Warwick Ward আর্টিনেলির চরিত্রে রূপ দেন। চিত্র জগং বা মঞ্চের উপযোগী সত্যকার দৈহিক সৌন্দর্য ও মানসিক গঠনের জন্ম মিস্ পুটিকে স্বর্গের উর্বশী আখ্যা দেওয়া যায়। যৌনজীবনের খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি "ভ্যারাইটি"তে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল এবং আমেরিকার সেন্সর বোর্ড এই বিষয়ে অত্যন্ত গোঁড়া ছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ভালো-ভাবেই জানতেন এক্ষেত্রে কর্ত্তব্য কি এবং তাঁরা ভালো-ভাবেই সেটা পালন করেছিলেন।

বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানতে পেরে হুলার তার প্রতিদ্বন্দীকে হত্যা করে জেলে যায়। ফ্লাস ব্যাক পদ্ধতিতে কাহিনী আরম্ভ হয় যখন হুলার কারাবাসের শেষে মুক্তি পাচ্ছে। কয়েদীর পোষাক পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ার সময় একজন করুণাময় ওয়ার্ডেনের অনুরোধে সমস্ত কাহিনীটি হুলার বিবৃত করেছে।.........আজকের ফ্লাস ব্যাক পদ্ধতির সঙ্গে আমরা খুবই পরিচিত কিন্তু আজ থেকে চুয়াল্লিশ বছর আগে? চিত্রটি শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও তার শঙ্কাকুল মুহূর্ত্তগুলি মনের তন্ত্রীতে অনুরণিত হতে থাকে।

* * * * * o

ফ্রাসোঁয়া ক্রুফোর সঙ্গে কিছুক্ষণ

শ্রীমতী চয়নিকা সেন

প্রঃ। ন্যায়তঃ বা অন্যায় করে যে সমস্ত চিত্র প্রদর্শনী হতে বাদ দেওয়া হয় তাদের সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

"The New Wave" বলে পশ্চিমে চিত্র-শিল্পের যে নতুন ধারা চলেছে তার খবর অনেকেই হয়ত রাখেন। এই নতুন ধারার অন্যতম নেতা বোধ হয় ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো (Francois Truffaut), তাঁকে নিয়ে বিতর্কের ঝড় আজও শেষ হয় নি। বর্ত্তমান সাক্ষাৎকারে ত্রুফো যে সব প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন তা সকল দেশে হয়ত বা সকল কালে বিদগ্ধসমাজ ও চিত্রশিল্পে সংশ্লিষ্ট অনেকেই তার মুখোমুখি হয়েছেন।

সম্পাদক—পট ও পীঠ

উঃ। একটি চিত্র সর্বতোভাবে অসাধারণ বা অভূতপূর্ব হবে, ইহা আশা করা দুরাশারই সামিল। নতুন পরিচালকের কোন ছবি যখন দর্শক মনো রঞ্জনে সক্ষম হয় তখন তার মধ্যে অনেকগুলি কারণ থাকতে পারে, যথা খুবই সাধারণ জীবনের কাহিনী অথবা কোন বলিষ্ঠ কাহিনীর চিত্ররূপ বা কোন বিখ্যাত তারকার উপস্থিতি। অনেকের ধারণা যে বহু চিত্র পরিচালকই কোনরূপ চিন্তা না করে কাহিনীর চিত্ররূপ দেন এবং দর্শক মনোরঞ্জনে ব্যর্থ চিত্রগুলি তারই পরিণতি। কিন্তু পরিচালকের কল্পনা এবং তাহার বাস্তব রূপের মধ্যে আকাশ ছোঁয়া পার্থক্য থাকে। দৃষ্টান্ত হিসাবে ন্যুভেল ভাগের কয়েকটি চিত্ররূপের আলোচনা করা যেতে পারে। এই চিত্রগুলির মধ্যে কিছু ছবি খুবই সুন্দর কিন্তু দর্শকদের বুদ্ধির অগম্য, কিছু ছবি চিত্তাকর্ষক এবং কিছু ছবি একেবারেই ব্যর্থ।

চিত্রনাট্য বলতে দর্শকরা যা বোঝেন, পরিচালকের নিকট তার ভিন্ন অর্থ। ছবির ব্যবসায়িক অসাফল্যের পেছনে থাকে পরিচালকের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস অথবা তিনি যে বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন তা আন্তরিকতা ছাড়া আরও

কিছুর অপেক্ষা রাখে। কয়েকটি বিষয় আছে যা মানুষ হৃদয় দিয়ে অনুভব করে এবং তা যে ভাবেই পরিবেশিত হউক না কেন মানুষের হৃদয়ের তন্ত্রীতে তা অনুরণিত হবেই। এখানে কোন সমস্যা নেই। সমস্যা সেখানে—যেখানে কোন গঠনমূলক কিছু করা হচ্ছে। যার সমাধান চিন্তার বিষয়। সে ক্ষেত্রে ক্যামেরা এক চরিত্র হতে অপর এক চরিত্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পরিচালক মনে করতে পারেন যে একটু আগে দেখা চিত্রটি দর্শকদের চিনতে অসুবিধা হবে না, কিন্তু বাস্তবে হয়ত দর্শকদের অসুবিধা হয়। তর্কের খাতিরে চিত্রগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যাক্। প্রথমতঃ যে চিত্রগুলি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত এবং চিত্র গ্রহণকালে পরিচালকের শিল্প মনোভাব প্রকাশ করে। উদাহরণ স্বরূপ A Bout de Souffle এর কথা ধরা যেতে পারে। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের চিত্র যেগুলির বিষয়বস্তু খুবই চিন্তা ও বিচার বিবেচনার পর গৃহীত হয়। উদাহরণস্বরূপ গোয়েন্দা কাহিনী বা রহস্যঘন কাহিনীর কথা বলা যেতে পারে। Paviot এর Portrait Robot, Doniol-Valcroze এর La Denonciation এবং Chabrol এর L' Oeil du Malin চিত্রগুলি খুবই উচ্চাঙ্গের হয়েছিল কারণ চিত্র গ্রহণের পূর্বে এই চিত্রগুলির খুঁটিনাটি সম্বন্ধে Kast এর ন্যায় অভিজ্ঞ ও বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন লোক অথবা Moussy র ন্যায় অভিজ্ঞ চিত্রনাট্যকারের সঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছিল। ইহা সত্য যে ঐ তিনটি চিত্র আকর্ষণমূলক হলেও দর্শকবৃন্দ পরিচালকদের বক্তব্য ঠিকমত গ্রহণ করতে পারেনি। যাহা হউক আমার মনে হয় না যে সকল চিত্রের ভাগ্যই এইরূপ মন্দ। আমার একটিমাত্র ছবি Tirez Sur le Pianiste দর্শক মনোরঞ্জনে ব্যর্থ হয় এবং এর জন্য আমি নিজেকেই দায়ী বলে মনে করি।

প্রঃ। আপনি বর্ত্তমানে সমালোচক, আজকের দৃষ্টি নিয়ে আপনার পূর্বতন পরিচালকের ভূমিকাকে কি ভাবে বিচার করবেন?

উঃ। বরাবরই আমি কিছু পরিমাণে সমালোচক ছিলাম। তখন Art পত্রিকায় লিখতাম। তারপর যখন পরিচালক হলাম আমি সমালোচকের ভাষায় কথা না বলে আমার প্রবন্ধগুলিতে পরিচালকের ভাষায় কথা বলেছি এবং প্রথমদিকে সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখায় আমার পক্ষে সহায়ক হয়েছে। এখনও সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী আমায় সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেনি। আমি যখন একটি চিত্রনাট্য তৈরী শেষ করি, আমি তার দোষগুণ বুঝতে পারি না কিন্তু তার দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ থাকি। এই অনুভূতি আমাকে চিত্র গ্রহণকালে গতানুগতিকতার কবলে পতিত হবার বিপদ থেকে রক্ষা করে। এক একটি চিত্রের ক্ষেত্রে বিপদের সম্ভাবনা এক এক রকম। ছবিটি কাব্যানুগন্ধী না হয়ে পড়ে অথবা চরিত্রটি অতিমাত্রায় ভাবালু না হয়ে পড়ে সে বিষয়ে সতর্ক হতে গিয়ে ছবিটি দোষযুক্ত হয়ে পড়ে। যেমন আমার Jules et Jim নামক ছবিটি। এই চিত্রে Jeanne Moreau যে ভূমিকায় অভিনয় করেছে তাকে আমি খুব সহানুভূতি আকর্ষণকারী রূপে প্রতীয়মান হোক তা চাইনি; ফলে তার ভূমিকায় তাকে খুব নিষ্ঠুর বলে মনে হয়েছে।

প্রশ্ন। আপনি এখন তো আর সমালোচক নন, চিত্রপরিচালক। এখন কি আপনি সবকিছু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখছেন?

উঃ। নিশ্চয়ই। এখন আমি যে ভাবে বিচার করছি তা সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের। এখন যদি আমি আবার চিত্র সমালোচকের কাজে ফিরে যাই, আমি সম্পূর্ণ অন্য জিনিষ তৈরী করবার কথা চিন্তা করব। তার কারণ কিন্তু অন্য। যে ধরণের চিত্রের কথা আমি সোৎসাহে সমর্থন করতাম তা এখন আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি এবং তার ত্রুটীও স্পষ্ট বুঝতে পারছি। পূর্বে আমি যে সকল কথা বলেছি তা এখন কেউ উদ্ধৃত করলে আমি বড়ই বিব্রত বোধকরি। Arts পত্রিকায় আমি লিখিয়ে এখন থেকে ফিল্মের গল্প বলার প্রয়োজন নেই, প্রেমের ঘটনা বহু বার বলা হয়েছে, সমুদ্রতীরে চিত্রগ্রহণও হয়েছে এবং ঐ ধরণের ঘটনার পুনরুল্লেখ না করাই ভালো। অপর পক্ষে চিত্রনাট্য রচনায় তৎকালীন সময় থেকেই একটা অপকৃষ্টতা দেখা দিয়েছে এবং খুব বলিষ্ঠ একটা কাহিনী কোন চিত্রের সাফল্যের জন্য অপরিহার্য্য বলে এখন মনে করি না। এইসকল দুর্বল চিত্রনাট্যের প্রতিবাদেই আমি Jules et Jim ছবিটি তৈরী করি। অনেকে আমাকে পরামর্শ দান করেছিলেন যে বইটির ঘটনা তৎকালীন সময় থেকে বর্ত্তমানে নিয়ে আসার জন্য। সবকিছুই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় বেশ ভালোভাবেই প্রয়োগ করাও সম্ভবপর

ছিল। কিন্তু যেহেতু নারী ও প্রেম নিয়েই চিত্রটি, আমি বর্তমানের ধারায় একটি স্পোর্টস্কার, হুইস্কি ও গ্রামাফোন আমদানী করতে পারি নি। আমি প্রকৃত অর্থে একটি নতুন চিত্র উপহার দিতে পারতাম। কিন্তু আমি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলাম তাতে আমার নিজের স্থির বিশ্বাস ছিল যে কুড়ি পঁচিশ বছর পূর্বে মেট্রো গোল্ডেন মায়ার মিসেস্ পারকিনটন্, দি গ্রীন ইয়াস্ প্রভৃতি চিত্রে যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন আমিও মূল গ্রন্থের প্রতি আনুগত্যের দ্বারা তা করতে সক্ষম হব। ঐ চিত্রগুলির একমাত্র ত্রুটী যে তারা প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ছিল। কিন্তু দিন এসে হারিয়ে যাবে দিগন্তে তবুও ঐ চিত্রগুলি একটি ৮০০ পৃষ্ঠা পুস্তক পাঠের আনন্দ দেবে। Kast-এর চিত্রের ফ্যাসান যা আমার বিশেষ মনোমত ছিল তা সত্বেও আমি কোন ফ্যাসানের দাস হই নি এবং হতেও চাই নি।

প্রঃ। আপনার মতে বর্তমানে ন্যুয়েল ভাগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি?

উঃ। মানুষের চিন্তাধারা নিত্য নূতন পথে ধাবিত হয়। এই মুহূর্তে পথটি কুসুমাস্তীর্ণ বলে মনে না হলেও একথা সত্য যে যখন সব কিছু ঠিক পথে চলে তখন মানুষের আকাঙ্ক্ষাকেও তা অতিক্রম করে যায়। ১৯৫৯ সালের শেষ দিকে প্রযোজনা ক্ষেত্রে যে সহজগতি দেখা দিয়েছিল, তা কয়েক বৎসর আগে স্বপ্নেও অগোচর ছিল। মার্গারেট ডুরাস এর একটি প্রবন্ধে তিনি Hiroshima, Mon Amour-এ Resuais-এর সঙ্গে কাজ করার এক বিবরণ দিয়েছিলেন। Resuais তাঁকে বলেছিলেন যে তাঁরা এই আদর্শে বিশ্বাস নিয়ে কাজ করবেন যে যাতে বইটি ব্যবসায়িক মুক্তি পায়। সুরুতে এই মনোভাব এবং পরবর্তী কালে "হিরোসিমা"র অসাধারণ জনপ্রিয়তা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ও লক্ষণীয় বলে মনে করি। আমাদের প্রত্যেকেরই প্রায় একই ধরণের অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমি যখন Les Quatre Cents Coups-এর স্যুটিং করছিলাম তখন আমার বাজেট ছিল কুড়ি হাজার পাউণ্ড। কিন্তু খরচ বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় পঁচিশ হাজার পাউণ্ড। আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম এবং ব্যবসায়িক সাফল্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দিহান হয়েছিলাম। কিন্তু ছবিটি শেষ হবার পর ক্যানে ফিল্ম উৎসবে ও বাজারে দেখিয়েই এর চেয়ে বেশী অর্থ পেয়েছিলাম এবং একমাত্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেই পঁয়ত্রিশ হাজার পাউণ্ডে ছবিটি বিক্রী হয়েছিল।

কিছু সংখ্যক প্রযোজক বিশ্বাস করেন যে চিত্রের ব্যবসায়িক সাফল্য নির্ভর করে যৌবন, নতুনত্ব ইত্যাদির উপর এবং এই জন্য তাঁরা নতুন মুখের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ান। এ কথা স্মরণীয় যে প্রথম ব্যর্থতা আপোষের মধ্যেই নিহিত। মনে করুন একজন প্রযোজক একজন পরিচালককে নিয়োগ করলেন যিনি ইতিপূর্বে কোন ছবি পরিচালনা করেন নি। প্রযোজক মনে করেন যে এই পরিচালকের একমাত্র প্রয়োজন একজন ভাল আলোকচিত্র শিল্পী বা ক্যামেরাম্যান। এইখানেই তিনি মস্ত বড় ভুল করেন কারণ যে ক্যামেরাম্যানের আলোক চিত্র গ্রহণের পদ্ধতি ক্লাসিক্যাল তিনি আনকোরা নতুনকে নিয়ে কাজ করতে পারেন না। ফলে আকৃতিবিহীন বর্ণসঙ্কর এক ছবি প্রস্তুত হয়। Decae বা Coutard-এর ন্যায় এই আলোকচিত্র শিল্পীরা নবীন পরিচালকদের সাহায্য করতে পারেন না। উপরন্তু এঁরা না পারেন ক্ল্যাসিকাল পরিচালক তৈরী করতে, না পারেন ছবি তৈরী করতে।

দর্শক সাধারণও একই ভুল করেন। মান্ধাতার আমলের চিত্রনাট্যকার বা তারকার ওপর দায়িত্ব অর্পণ করেন যা তাঁদের আয়ত্তাধীন নহে। আমরাও নানারকম ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পথে চালিত হয়েছি। আমরা যখন ছবি তৈরী করবার মনস্থ করলাম Rivette-ই আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কর্মক্ষম ও দক্ষ ছিল। সেইসময়ে প্রকৃত পক্ষে Astruc-ই নিজেকে পরিচালক বলে জাহির করতে পারতো এবং আমরা অবশিষ্ট কয়েকজন নিজেদের ধ্যান ধারণাকে ঠিকমত বাস্তবে রূপায়িত করবার সাহস পাচ্ছিলাম না। Rivette-ই প্রকৃতপক্ষে বাস্তব রূপায়ণের পথটি নির্দেশ করলেন। তিনি আমাদের একত্রে ডাকলেন, তাঁর অভিমত দিলেন এবং কয়েকজন পরিচালক একত্রে ছবি করবেন বা ঐ ধরণের তাঁর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন। আমার স্মরণে আছে যে আমরা Resnaisএর কাছে আমাদের দলভুক্ত হবার আবেদন নিয়ে গিয়েছিলাম। কাগজে কলমে এটা খুবই সাধারণ ব্যাপার ছিল। Astrue, Resnais-কে সহকারী হিসেবে গ্রহণ করবেন; Resnai সহকারী হিসেবে পাবেন Rivetteকে, Rivette আমাকে

সহকারী হিসেবে গ্রহণ করবেন ইত্যাদি। বাজেট ইত্যাদি নিয়েও আলোচনা হয়েছিল এবং আমরা আঠারো হাজার পাউণ্ডের মধ্যে ছবি তৈরী করতে পারবো বলে স্থির নিশ্চয় হয়েছিলাম। আমরা প্রযোজকদের কাছে এই বলে ধর্ণা দিয়েছিলাম যে তুমি একটা ছবিতে পঁচাত্তর হাজার পাউণ্ড খরচ করো, আমরা ঐ টাকার মধ্যে চারটি ছবি তৈরী করে দেবো তার মধ্যে একটির ব্যবসায়িক সাফল্য নিশ্চিত। Resuais, Astrue এঁরা সকলেই আমাদের প্রস্তাবে আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন কিন্তু তাঁরা তখন পেশাদারী হয়ে গেছেন এবং তাঁদের নিকট বহু চিত্রনাট্য ও অন্যত্র চুক্তি থাকায় আমাদের অন্য পথ অবলম্বন করতে হয়েছিল। আমরা Dorfmanu এবং Beard এর কাছে Rivette, Chabrol, Bitsch এবং আমার লেখা এক চিত্রনাট্য নিয়ে গিয়ে হাজির হলাম। এই চিত্রনাট্য অবলম্বনেই Les Quatre Jeudis নামে চিত্রটি তোলা হয় ও Rivette পরিচালনা করবে। আমার ব্যক্তিগত ধারণা যে Alain Cavalier এর পরিচালিত Le Combat Daus L'ile-র সব দোষ ত্রুটী ও গুণাবলী ঐ চিত্রনাট্যে বর্তমান ছিল। কিন্তু কোন প্রযোজকই আমাদের প্রস্তাবে এগিয়ে আসেন নি। সুতরাং আমাদের ধারণা হোল যে কোন প্রযোজকই কম খরচে ছবি করতে চান না। কিন্তু তখনও আমাদের জানতে বাকি ছিল যে প্রযোজক নিজের অর্থ ব্যয় করে ছবি করেন না, তিনি প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় করেন এবং শতকরা একটা অংশ তাঁর পকেটস্থ হয়। যত বেশী খরচে বই হবে ততই তাঁর লাভ বেশী হবে। সুতরাং আমাদের প্রস্তাবে যে কেউ সাড়া দেবেন না এটাই স্বাভাবিক। [ক্রমশঃ]

* * * *

প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন—নীপা চৌধুরী

সমীর চ্যাটার্জি—ছকু খানসামা লেন, কলিকাতা

বাংলার জাতীয় ক্রীড়া কি ?

০ বোমা মারা, ছুরি মারা ও ইস্কুল কলেজের টেবিল চেয়ার ভাঙা। ওয়াগন ভাঙাটা এর সঙ্গে ধরা যেতে পারে কিনা ঠিক বলতে পারলাম না।

* * *

মদন বড়ুয়া—কাটিহার

০ এই ধরণের অশ্লীল প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয় না।

* * *

ভক্তিময় দাসগুপ্ত—কেয়াতলা রোড, কলিকাতা

অর্পণা সেন, কাবেরী বসু, শ্রাবণী বসু, আরতি গাঙ্গুলীর (নতুন পাতা খ্যাত) জীবনী জানতে চাই।

দীনেন গুপ্তর পরবর্তী ছবি কি ?

০ জীবনী জানবার জন্যে বাজারে আরো অনেক পত্রিকাই তো আছে। ও ব্যাপারে আমাদের নাইবা টানলেন। মেমসাহেব (চিত্রশিল্পী হিসেবে)

* * *

দীনেশ বসু—বোসপুকুর রোড, কসবা

নটী বিনোদিনীর বিষয়ে কিছু জানতে চাই।

০ বিনোদিনী নটী ছাড়া একজন সুলেখিকাও ছিলেন তদানীন্তন কালে। বাসনা ও কনকনলিনী নামে দুইখানি কাব্যগ্রন্থ এবং আত্মকথা নামে পুস্তকও তিনি রচনা করেছিলেন। সেকালের প্রবীণা অভিনেত্রী শ্রীমতী জগত্তারিণী ব্যতীত আর কোনও অভিনেত্রী তখনকার দিনে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে জানা যায় না।

অভিনয় নৈপুণ্যেও বিনোদিনীই প্রথম মহাপুরুষের কৃপা লাভ করে ধন্যা হয়েছিলেন। তখনকার দিনে চৈতন্যলীলায় বিনোদিনীর চৈতন্যের ভূমিকাভিনয় দর্শনে তৎকালীন সমস্ত বাংলাদেশ ভক্তি রসে ডুবে গিয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বিনোদিনীর চৈতন্যের অভিনয় দেখবার

জন্যেই প্রথম নাট্যশালায় পদধূলি দেন। অভিনয় দর্শনে ভাবাবিষ্ট হয়ে "তোমার চৈতন্য হোক" বলে বিনোদিনীকে তিনি আশীর্বাদ করেন। রঙ্গালয়ে এইরকম সৌভাগ্য আর কারুর হয়েছে বলে মনে হয় না। গিরীশচন্দ্রের মায়াতরু ও মোহিনীপ্রতিমা গীতিনাট্যে ফুলহাসি ও সাহানা, আনন্দ রহো নাটকে লহনা, রাবণবধ ও সীতাহরণে সীতা, রামের বনবাসে কৈকেয়ী, দক্ষযজ্ঞে সতী, ধ্রুবচরিত্রে সুরুচি, নলদময়ন্তীতে দময়ন্তী, চৈতন্যলীলা ও নিমাইসন্ন্যাসে চৈতন্য, বুদ্ধদেবে গোপা, বিল্বমঙ্গলে চিন্তামণি, প্রভৃতি বহু নাটকে বহু ভূমিকায় অভিনয় করে শ্রীমতী বিনোদিনী সে সময়ে বঙ্গনাট্যশালায় যুগান্তর এনেছিলেন। এছাড়াও সধবার একাদশীতে কাঞ্চন, দুর্গেশনন্দিনীতে তিলোত্তমা ও আয়েষা, মৃণালিনীতে মনোরমা, কপালকুণ্ডলায় কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষে কুন্দ, বিবাহবিভ্রাটে বিলাসিনী কারফরমা প্রভৃতি চরিত্রাভিনয় তৎকালীন বাংলা দেশের রঙ্গমঞ্চে তাকে স্থায়ী আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। স্বয়ং গিরীশচন্দ্র বলতেন যে কল্পনা-চিত্রিত চরিত্রাভিনয়ে বিনোদিনী অদ্বিতীয়া ছিলেন। ভূমিকা উপযোগী কেশবিন্যাস, পোষাক ও মেক আপ করবার ক্ষমতা অতুলনীয় ছিল বিনোদিনীর। পরবর্ত্তী যুগের অনেক অভিনেত্রীই বিনোদিনীর অনুকরণে সাজ পোষাক তৈরী করতেন।

* * *

শিবানী ভৌমিক—ষষ্ঠীতলা রোড, নারকেলডাঙ্গা

হাটে বাজারে ছবির আউটডোর সুটিং কোথায় হয়েছিল।

○ গ্যাংটকের কাছে।

* * *

রতন দাস—মনোহর পুকুর রোড, কলিকাতা

তিন ভুবনের পারে—তেরোনদী, না তেরোনদীর পারে—তিন ভুবন?

○ আগে বলুন পাত্রাধার তৈল না তৈলাধার পাত্র।

রমেন ঘোষ দস্তিদার—সুরেশ সরকার রোড, ইন্টালী

"গুপী গাইন বাঘা বাইন" ছবিটি নাকি সত্যজিৎ বাবুর শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের নিদর্শন বহন করছে? আপনার কি অভিমত?

○ সত্যজিৎ রায়ের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের নিদর্শন? এখনও অবধি জীবনের শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম কি সৃষ্টি করতে পেরেছেন সত্যজিৎ রায়?

* * *

আলোক বসু—হলদিয়া প্রোজেক্ট

নতুন পাতায় আরতি গাঙ্গুলীর চমৎকার অভিনয়ের জন্য ধন্যবাদ জানাবেন।

○ কথা দিলাম জানাব।

* * *

? এম, এম, রোড, কলিকাতা

○ পুরো নাম ঠিকানা না থাকলে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় না।

* * *

তপন রায়—মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা

ইস্কান্দর মির্জাকে হটিয়ে দিয়ে আয়ুব খাঁ প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন, আয়ুব খাঁকে হটিয়ে দিয়ে ইয়াহিয়া খাঁ প্রেসিডেণ্ট হলেন। এর দ্বারা কি প্রমাণিত হল?

○ প্রমাণিত হল যে ইতিহাসের বিচার অত্যন্ত নির্ভুল এবং নির্মম।

* * *

খোদেজা খাতুন—রমনা, ঢাকা, পূর্ব পাকিস্তান

আমাদের এখানে পশ্চিম বাংলার কোন ছবি মুক্তি পায় না। পশ্চিম বাংলার ছবি পৃথিবীর দরবারে যথেষ্ট উচ্চমানের শিল্পস্বীকৃতি পেয়েছে তবু ঐসব ছবির সঙ্গে আজ অবধি আমাদের কোন জ্ঞান পরিচয় হল না এটা খুবই দুঃখের বিষয়। আপনারা এখানে ঐসব ছবির মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারেন না?

○ রাজনৈতিক আবর্ত্তে পড়ে আজ বাঙালী জাতটারই অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবার মুখে। আপনার আমার দুঃখে রাজনৈতিক (অভি) নেতাদের কি যায় আসে বলুন। বিশ্বাস করুন এ ব্যাপারে আমাদের কিছু করবার ক্ষমতা নেই। দুই বাংলার মধ্যেকার সম্পর্কটা যতদিন না সহজ হচ্ছে ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের ধৈর্য্য ধরে থাকতেই হবে। তবে মনে হয় সেদিন আর খুব বেশী দূরে নেই।

* * *

অনিল ঘোষ—কাটোয়া

বাণীন সাহা এর আগে কি কোন পরিচালকের সঙ্গে বা চিত্রশিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ?

০ শিক্ষানবীশ হিসেবে চিত্রশিল্পের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তবে এদেশে নয়, ইটালীতে ও প্যারীসে।

* * *

গণেশপ্রসাদ তেওয়ারী—পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা

শেষ থেকে সুরু কে পরিচালনা করেছেন ?

০ চিত্রসাথী নামে এক পরিচালক গোষ্ঠী।

* * *

অরুণ দত্ত—সাউথ সিঁথি রোড-কলিকাতা

Crane Shot ও Freeze shot কাকে বলে ? অসুবিধে না হলে একটু বুঝিয়ে দেবেন ?

০ ধরা যাক কোন একটি নাচের দৃশ্য গৃহীত হচ্ছে। আটজন ছেলেমেয়ে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে নাচছে ও বৃত্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে গান গাইছে। একটি শটে হয়ত প্রয়োজন পড়ল প্রথমে বৃত্তের চারধারে আটজন শিল্পী ও মাঝের শিল্পীকে নিয়ে ছবির frameটি Compose করবার, পরে Camera আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে অন্যান্য শিল্পীদের বাদ দিয়ে বৃত্তের মাঝখানে যে মেয়েটি গান গাইছে শুধুমাত্র তাকে Frameএ Compose করবে, কেননা তার অভিব্যক্তির ছবিটারই শুধুমাত্র প্রয়োজন এক্ষেত্রে। এখন সাধারণ Eye level হতে Cameraকে বেশ একটু উঁচুতে রাখতে হবে কেননা একসঙ্গে ন'জন শিল্পীকে তার ছবির Frameএ প্রয়োজন, এবং একটি বিশেষ মুহূর্তে Camera আটজন শিল্পীকে বাদ দিয়ে মাত্র একজন শিল্পীর মুখের কাছাকাছি এগিয়ে আসবে। তখন Cameraকে ক্রেনে বসিয়ে চোদ্দ পনের ফুট উঁচু হতে প্রথমে শট নিতে শুরু করবে এবং প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ধীরে ধীরে নেমে এসে একজন শিল্পীর মুখের তিন চার ফুটের মধ্যে দাঁড়াবে। সাধারণতঃ হিন্দী ছবিতে নাচগানের দৃশ্যে এই ধরণের ক্রেন শট দেখতে পাওয়া যায়। ক্রেনশট আবার অন্যরকম ভাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন ধরুন "সাত পাকে বাঁধা"র একটি দৃশ্যের কথা। বিয়েবাড়ি। নায়িকা তিনতলা হতে একতলায় সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে। কোনদিকে তার ভ্রুক্ষেপ নেই, আপন চিন্তাতেই সে বিভোর। এক্ষেত্রে Cameraকে ক্রেনে বসিয়ে তিনতলা হতে একতলা পর্যন্ত শুধুমাত্র নায়িকার অভিব্যক্তির ছবিটুকুই গ্রহণ করা হয়েছিল। ছবির Frame Compose করা হয়েছিল নায়িকার মাথা হতে কাঁধ পর্যন্ত, কাঁধের দু পাশ দিয়ে দেখা যাচ্ছিল বিয়েবাড়ির লোকজনের ব্যস্ত আনাগোনা।

Freeze shot হচ্ছে একেবারে অন্য ধরনের। চলচ্চিত্রে একটি গতি সব সময়েই আছে, কথা বলা, হাঁটা, দৌড়ান, নাচ, গান, ইত্যাদি নানা ধরনের গতি সেখানে থাকেই কিন্তু স্থিরচিত্র এর সম্পূর্ণ বিপরীত। স্থিরচিত্রে সবকিছু অচল অনড়। চলচ্চিত্রে নাটকের প্রয়োজনে অনেক সময়ে গতিকে একেবারে থামিয়ে দিতে হয়। ধরা যাক একজন লোক চিৎপুর রোড দিয়ে দৌড়ছে। তার আশ পাশ দিয়ে ট্রাম বাস যাচ্ছে, অন্যান্য লোকজনও হেঁটে যাচ্ছে। হঠাৎ দেখা গেল সবকিছুর গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে। যে লোকটি দৌড়ুচ্ছিল সে দৌড়নর ভঙ্গিতেই দাঁড়িয়ে আছে। চলন্ত ট্রাম বাস যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে গেছে। রাস্তার লোকজনও হাঁটবার ভঙ্গিতেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। এমন কি একটা ষাঁড় ট্রামের সামনে দিয়ে লেজ তুলে দৌড়ুচ্ছিল। সেও ট্রামের সামনে লেজ তুলে দৌড়নর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েই আছে। অর্থাৎ এক কথায় বলা যেতে পারে সমস্ত ছবিটাই স্থিরচিত্রে পরিণত হয়ে গেছে। এই ধরনের শটকেই সাধারণতঃ Freeze shot বলা হয়ে থাকে। নাটকের বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই এই ধরনের শট ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

*—এই দুটি প্রশ্নের উত্তর Society of Cinematographers India'র সৌজন্যে প্রাপ্ত।

* * *

শোভা সিকদার—শিবতলা ষ্ট্রীট-কলিকাতা

ঢেউএর পরে ঢেউএর চিত্রনাট্যটি খুব ভাল লাগছে। এই পরিচালকের আর কোন ছবি নেই ?

● আপাততঃ নেই। ঢেউয়ের পরে ঢেউই হচ্ছে ভূপেন্দ্রকুমার সান্যাল মশায়ের জীবনের প্রথম প্রেম। দ্বিতীয় ছবি ছায়াপথের সুটিং পর্ব এখনও শেষ হয়নি।

* * *

প্রসাদ চক্রবর্ত্তী—মোহন ব্যানার্জি লেন-কলিকাতা

কলকাতায় বর্ত্তমানে কটি চিত্রগৃহ চালু আছে ?

০ যে কটি চিত্রগৃহ আগে চালু ছিল, সব কটিই ।

* * *

গোলাম মহীউদ্দিন—পানবাগান লেন-কলিকাতা

দিলীপকুমার ও উত্তমকুমারকে জুড়ি করে একটা ছবি করা যায় না ?

০ কোন্ ভাষায় ?

জ্যোতি ভট্টাচার্য্য—বাদুড় বাগান রো-কলিকাতা

শর্মিলা তথা অন্বেষা দেবী আবার ফিল্ম জগতে নাকি ফিরে এসেছেন ? কোন্ ছবিতে এখন অভিনয় করছেন ?

০ সত্যজিৎ রায় পরিচালিত অরণ্যের দিনরাত্রি ছবিতে। কিন্তু শর্মিলা ঠাকুর অভিনয়ের জগৎ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন কবে তাতো জানতে পারলুম না ?

* * * * * * *

চিত্রলেখা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সকাল। সাঁইদারের অড্ডা।

সাঁইদার একজন জেলের সাথে কথা বলছে। দূরে একটা বাঁশের বাখারির বেঞ্চে নিতাই বসে আছে। সাঁইদার জেলেটিকে বলে।

সাঁইদার—তোর তিন দিনের রোজ পাওয়া হল, বুঝেছিস ?

জেলেটি মাথা নেড়ে চলে যায়। সাঁইদার নিতাইয়ের দিকে তাকায়, বলে—

সাঁইদার—শোন নিতাই, এদিকে আয়

নিতাই সাঁইদারের সামনে এসে নিচে বসে। সাঁইদার বলে—

সাঁইদার—একটা কাজের খোঁজ আমি তোকে দিতে পারি—গয়নার নৌকোয়—

নিতাই—গয়নার নৌকোয় ?

সাঁইদার—হ্যাঁ। তোকে ভালবাসি বলেই বলছি। তোর মত জোয়ান ছেলের এখানে এই গাঁয়ে এই সব ছোট-খাট কাজ কি মানায় ? শোন, বড় বড় নৌকো নিয়ে ওরা সমুদ্র দুর পাড়ি দেয়। দু-তিন মাস বাইরে বাণিজ্য করে আবার সব ফিরে আসে। মাইনে ভাল, খোরাকি দেবে। করবি এ কাজ ?

ব্যগ্র হয়ে নিতাই বলে—

নিতাই—তুমি সব ব্যবস্থা কর—আমি করব সাঁইদার

সাইদার—বেশ। রোববার দিন সকালে ওদের নৌকো আসবে। তুই তোয়ের থাকিস। এতে তোর ভাল হবেরে নিতাই—আমি বলছি তোর মঙ্গল হবে।

রাত্রি। নিতাইয়ের শোবার ঘর। মাটির প্রদীপের

সামনে বসে পদ্ম কাঁথা সেলাই করছে। চোখভরে আছে জলে। পিছনে চৌকীর ওপর ঘুমন্ত বীরুর পাশে বসে নিতাই সান্ত্বনা দেয় পদ্মকে—

নিতাই—কোন ভয় করিসনা পদ্ম। কেঁদে মনকে দুর্বল করিসনা। আর কাঁদবার কি আছে? আমিতো দুমাস পরেই ফিরে আসছি—

মাথা নত করে পদ্ম একমনে কাঁথা সেলাই করতে থাকে

ঘুমন্ত বীরুর গায়ে হাত বুলিয়ে নিতাই বলে—

নিতাই—আমার বীরুকে মানুষ করতে হবে।··· আর একজন আসছে তাকেওতো মানুষ করতে হবে। (একটু থেমে) ফিরে এসে তোকে কত দেশ বিদেশের গল্প বলবো—

মুখ তুলে পদ্মর দিকে তাকায় নিতাই।

পদ্ম একইভাবে সেলাই করে চলে

নিতাই পদ্মকে বলে—

নিতাই—আরে মুখ ফিরিয়ে রইলি কেন? আমার দিকে তাকা লক্ষ্মীটি। একটু আনন্দ করে হাস—আমি যে নতুন কাজে যাচ্ছি—

চৌকী থেকে নিতাই পদ্মর পাশে এসে বসে। ওর অশ্রুঝরা মুখটা দুহাতে তুলে ধরে বলে—

নিতাই—ছিঃ পদ্ম! তুই এত দুর্বল! সমুদ্রে ভয় কিরে? ভগবানের ওপর ভরসা রাখ। সমস্ত জগৎ তাঁর। আমি যেখানে যাচ্ছি তা যেমন ভগবানের—যে সমুদ্র পাড়ি দেবো তাওতো সেই ভগবানের। সব তাঁর তৈরী, তাঁরই রাজত্ব। কাঁদিস না—

পদ্ম আঁচল দিয়ে দুহাতে চোখ চেপে ধরে। বাঁধ ভেঙ্গে যায়।

সকাল। নিতাইএর শোবার ঘর। চৌকি থেকে একটা কাপড়ে বাঁধা পুঁটুলী তুলে নেয় নিতাই, তারপরে পদ্মর কোলে বীরুকে একটু আদর করে ধীরে ধীরে বলে—

নিতাই—দুষ্টুমী কোর না বাবা, কেমন?

মুখ তুলে পদ্মর দিকে স্থিরভাবে তাকায় নিতাই। বিদায়ের মুহূর্তে নিতাইকেও একটু দুর্বল করে দেয়। ধীরে পদ্মকে বলে—

নিতাই—আসি

পদ্ম গলায় আঁচল জড়িয়ে নিতাইকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ায়। বীরুকে একটু আদর করে কপালে সস্নেহে চুমু দেয় নিতাই। চোখে জল এসে যায় নিতাইয়ের। পদ্মকে লুকিয়ে পাস ফিরে চোখের জল মুছে দরজার দিকে এগোয় নিতাই।

পিছন ফিরে পদ্ম অস্ফুটস্বরে বলে—

পদ্ম—দাঁড়াও

নিতাই দাঁড়িয়ে পড়ে। মুখ ফিরিয়ে তাকায়।

কুলুঙ্গিতে রাখা ঠাকুরের পটের কাছ থেকে একটা ছোট কৌটো এনে নিতাইয়ের হাতে দেয় পদ্ম। কৌটোটা হাতে নিয়ে নিতাই বলে—

নিতাই—কি আছে এতে!

পদ্ম—চণ্ডীতলার ফুল ও বেলপাতা। সঙ্গে রেখো।

কৌটো মাথায় ঠেকিয়ে নিতাই জামার ভিতরের পকেটে রাখে। ধীরে মাথা নেড়ে বিদায় নিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। পদ্ম বীরুকে কোলে নিয়ে পিছু পিছু যায়।

বেড়ার ঝাঁপ তুলে নিতাই বেরিয়ে এসে পিছন ফিরে তাকায়। পদ্ম বীরুকে কোলে করে বেড়ার এপাশে এসে দাঁড়ায়। দুজনে চেয়ে থাকে দুজনের দিকে। কিছুক্ষণ। অপলক বিষাদমুগ্ধ দৃষ্টি। সামলে নিয়ে কোন রকমে নিতাই বলে—

নিতাই—সাবধানে থাকিস

ফিরে দ্রুতপায়ে এগিয়ে যায় নিতাই।

পদ্ম তাকিয়ে থাকে নিতায়ের গতিপথে। দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে আসে চোখের জলে—

গয়নার নৌকার পাল।

নানারঙের কাপড়ের তালি দেওয়া পাল বাতাসে ফুলে উঠে দুলে দুলে চলতে থাকে।

দিগন্তের দিকে এগিয়ে যায় গয়নার নৌকা। সূর্য্যের আলোয় ঝিকমিক করে ওঠে সাগরের জল

পট জুড়ে ভেসে ওঠে অশ্রুসজল একখানা মুখ—

দূরে নিবদ্ধ পদ্মর দৃষ্টি চোখের জলে ঝাপসা হয়ে যায়। পট থেকে মিলিয়ে যায় ময়নার নৌকো—ভেসে ওঠে দূরে সমুদ্রপারের ঝাউতলায়, বীরুকে কোলে করে দাঁড়িয়ে আছে পদ্ম। অশান্ত সমুদ্র গর্জন করতে থাকে—মিলিয়ে যায় পদ্মর মুখ। ঢেউএর পরে ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে সমুদ্রের পাড়ে। আঁচলে চোখ মুছে পদ্ম ফেরে গ্রামের পথ ধরে। বীরুকে কোলে তুলে নেয় পদ্ম। দুচোখে তার জলের ধারা।

খাঁড়ির রুক্ষ বালুচর। নীল আকাশে দলে দলে মেঘ ভেসে যায় বাতাসে এদিক থেকে ওদিক। তপ্ত বালুর ওপর ছায়া পড়ে মেঘের—সরে সরে যায়,—মিলিয়ে যায় দূরে।

নিতাইয়ের বাড়ী। পদ্ম জাল মেরামত করছে। সমস্ত শরীর তার ঘামে ভিজে গিয়েছে। আর যেন পারছে না সে। ময়না আসে। নতুন বিয়ে হয়েছে ময়নার। শ্বশুরবাড়ী থেকে ফিরেই পদ্মর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে সে। ওকে দেখে পদ্ম একটু বিবর্ণ হাসি হাসে। ময়না দাওয়ায় উঠে বসে। বলে—

ময়না—একি শরীর করেছিসরে!

পদ্ম নীরবে চেয়ে থাকে। ময়না বলে—

ময়না—সত্যি, নিতাইদাটা কী—ছ মাস ধরে তোকে এ অবস্থায় রেখে কি যে করছো ভাল লাগে না বাপু—

কোন কথা না বলে পদ্ম আবার জাল মেরামত করতে থাকে। ময়না আবার বলে—

ময়না—পদ্ম, এত যে খাটছিস—এ সময়ে এরকম কি ভাল?

মুখ তুলে পদ্ম বলে—

পদ্ম—কি করবো বল,—খেতেতো হবে। (একটু থেমে) আমি না হয় নাই খেলাম—কিন্তু ও—(পদ্ম উঠোনের দিকে তাকায়)

উঠোনের এক কোণে বীরু একটা ভাঙ পুতুল নিয়ে খেলা করে।

পদ্ম কেঁদে ফেলে অঝোরে। আর কিছু বলতে পারে না সে।

নিতাই, পদ্ম, বীরু ও লোটন

নিতাইয়ের বাড়ি। দাওয়ায় বসে একটা ছেঁড়া জাল মেরামত করে চলেছে পদ্ম। ঘর থেকে ছোট বীরু কাঁদতে কাঁদতে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে দুহাতে। জাল রেখে

সন্ধ্যা। সমুদ্রের বেলাভূমির উপরে বীরুকে কোলে করে পদ্ম দাঁড়িয়ে থাকে। সুদূর দিগন্তে ওর দৃষ্টি। সূর্য্যের শেষ রশ্মি অপেক্ষমাণ পদ্মর ওপর পড়ে। অত্যন্ত শোকাতুর দেখায় পদ্মকে। আনত নয়নে ধীরে গ্রামের পথে ফেরে পদ্ম।

নিতাইয়ের বাড়ী। বীরু উঠোনে খেলা করছে। বেড়া সরিয়ে সাঁইদার উঠোনে প্রবেশ করে। বীরুকে আদর করে কোলে তুলে নিয়ে পদ্মকে ডাকে—

সাঁইদার—পদ্ম, পদ্ম আছিস!

ঘর থেকে বেরিয়ে দাওয়ায় এসে দাঁড়ায় পদ্ম। সাঁইদার বলে—

সাঁইদার—শরীর ভাল তো?

মাথা হেলিয়ে পদ্ম জানায় ভাল আছে।

বীরুকে পদ্মর কোল দিয়ে সাইদার ফতুয়ার পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বের করে পদ্মকে বলে—

সাঁইদার—এই নে টাকাটা রাখ। পরে আরও কটা জাল পাঠিয়ে দেব।

টাকা হাতে নিয়ে পদ্ম দাঁড়িয়ে থাকে। সাঁইদার চলে যায়। সেই দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতায় চোখ নামিয়ে নেয় পদ্ম।

রাত্রি। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছে পদ্ম। দূরে সমুদ্রের গর্জন শোনা যায়। একসময়ে জানালা থেকে সরে এসে বীরুকে কোলের কাছে নিয়ে শুয়ে পড়ে।

পদ্ম স্বপ্ন দেখে।

অশান্ত সমুদ্রে একটা কাঠের মাস্তুল আশ্রয় করে নিতাই ভাসছে!

ঘুম ভেঙে যায় পদ্মর। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। ঘর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ায়। ঝাউবন সাঁই সাঁই শব্দে মেতে উঠেছে। দূরে সমুদ্র গর্জন করে চলে।

ঝাউবনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছে লোটন ও সাঁইদার। লোটন বলে—

লোটন—নানা কাজের ঝামেলায় এ কটা মাস গাঁয়ের বাইরেই তো কেটে গেল সাঁইদার। তা এদিকের খবর কি? বছর ঘুরতে চলল নিতাইয়ের কি কোন খবরই পেলে না?

সাঁইদার—কি ভাবলাম—আর কি হোল! গহনার নৌকোয় কাজ দিলাম, দুমাসের মধ্যে ফেরার কথা। এতদিন হবে তা কে জানতো? (একটু থেমে) এদিকে পদ্ম জালটাল মেরামত করে কোনরকমে দিন চালাচ্ছিল—কিন্তু ওর ওই মরা ছেলেটা হবার পর থেকে বেচারী একেবারে ভেঙে পড়েছে।

লোটন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। চিন্তাক্লিষ্ট মুখে সাঁইদারের দিকে তাকিয়ে কোন কিছু না বলে ধীরে ধীরে অন্য দিকে চলে যায়। বিমর্ষভাবে সাঁইদার তাকিয়ে থাকে লোটনের দিকে।

রাত্রি। নিতাইয়ের বাড়ি। চারদিক নিস্তব্ধ। বাড়িতে যেন কেউ নেই মনে হয়। উঠোন পার হয়ে লোটন দাওয়ায় এসে ওঠে।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে লোটন একটু ভাবে তারপরে ধীরস্বরে ডাকে—

লোটন—পদ্ম; পদ্ম!

ঘরের হোগলার পাটিতে বসে আছে পদ্ম। পিছনের চৌকীতে বীরু নিদ্রামগ্ন। লোটনের ডাক শুনে পদ্ম ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

বাইরে লোটন পদ্মর কান্নার শব্দ শুনতে পায়। একটুক্ষণ অপেক্ষা করে দরজা ঠেলে লোটন ভিতরে প্রবেশ করে।

ভিতরে এসে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে লোটন তারপর ধীরে ধীরে পদ্মর পাশে এসে বসে। পদ্ম নীরবে কাঁদতে থাকে। লোটন বলে—

লোটন—পদ্ম

পদ্ম কিছু বলে না। লোটন আবার বলে

লোটন—তোর কাছে 'আমি একটা ভিক্ষে চাইতে এসেছি পদ্ম—

পদ্ম লোটনের দিকে ফিরে তাকায়। তার দৃষ্টিতে যে কারুণ্য ফুটে ওঠে তাতে বোঝা যায়; একজন নিঃস্ব দরিদ্রের কাছে সে কি ভিক্ষা পেতে পারে।

লোটন বলে—

লোটন—আমি তোকে বলতে এসেছি নিতাইয়ের কথা।

পদ্মর চোখে জিজ্ঞাসা, ব্যগ্রভাবে বলে সে

পদ্ম—কোথায় সে ?

মাথা নীচু করে লোটন বলে—

লোটন—সে কোথায় তা আমি জানিনা পদ্ম। (একটু থেমে) আমি বলতে এসেছি তার ইচ্ছার কথা। নিতাইকে আমি জানি তুইও ভালভাবে চিনিস। তার মত সাহসী, শক্ত দুনিয়ায় কমই আছে—

হাঁটুর ওপর মুখ রেখে পদ্ম নীরবে কাঁদতে থাকে

লোটন বলে—

লোটন—অযথা ঘুরে বেড়াবার মত লোক সে নয়। তোদের ছেলে মানুষ হয়ে উঠুক এই ছিল ওর ইচ্ছে। ফিরে এসে তোদের এ অবস্থায় দেখলে নিতাই দুঃখ পাবে।

লোটন পদ্মর দিকে তাকায়। পদ্ম নীরবে কেঁদে চলে।

লোটন বলে—

লোটন—পদ্ম, ভগবান আমায় অর্থ দিয়েছেন। বীরুর লেখাপড়ার ভার তুই আমার ওপর দে। শুধু এই ভিক্ষে-টুকুর জন্যেই তোর কাছে এসেছি—

একটু থেমে লোটন আবার বলে—

লোটন—হয়ত ভাববি, তোর এত দুঃখের মধ্যেও আমি কেন এতদিন আসিনি—তোদের খোঁজ নিইনি? আমি কেবল ভাবতাম সমাজের কথা, গাঁয়ের লোকদের কথা—

পদ্মর ক্রন্দনরত মুখটা দুঃখে ও কৃতজ্ঞতায় আরো নীচু হয়ে যায়। সেই মুখের ওপর ভেসে আসে বালুর ঝড়। পদ্মর অশ্রুভেজা মুখ যায় মিলিয়ে। দ্রুতগামী বালুর ঝড় ছুটে যায় দিগন্তের দিকে। একসময়ে ঝড় থেমে যায়। পড়ে থাকে তরঙ্গসিক্ত শান্ত স্নিগ্ধ বেলাভূমি।

নিতাইয়ের বাড়ি। দাওয়ায় বসে লোটন বীরুকে পড়ায়। এখন বীরুর বয়স আট বছর। একটা শ্লেটের ওপর কয়েকটা অঙ্ক লিখে বীরুকে দিয়ে লোটন বলে—

লোটন—নে, এগুলো করে ফ্যাল।

বীরু শ্লেটটা নিয়ে কর গুণে আঁক কষতে সুরু করে দেয়। লোটন অন্যমনস্ক ভাবে চেয়ে থাকে ঝাউবনের দিকে। পদ্ম কিছু ঝাউকঞ্চি ও শুকনো পাতা নিয়ে রান্না-ঘরের ভিতরে চলে যায়।

বাইরের পথ দিয়ে একজন লাউএর ঝাঁকা মাথায় নিয়ে যায়। লোটন দাওয়া থেকে দেখে ওকে ডাকে—

লোটন—ও হারু, দেখি তোর লাউ—

হারু উঠোনে আসে। লোটন নেমে কাছে যায়। লোটন দুটো লাউ তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করে—

লোটন—এ দুটো কতরে ?

হারু—আট আনা পড়বে

লোটন—কি আট আনা! ছ আনা। যা—বিকেল বেলা বাড়ি থেকে পয়সা নিয়ে যাস।

হারু - যে আজ্ঞে

লোটন লাউদুটো নিয়ে দাওয়ার নিচে রেখে নিজের জায়গায় গিয়ে বসে। হারু লাউএর ঝাঁকা মাথায় তুলে নিয়ে চলে যায়। বীরু শ্লেট এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করে—

বীরু—এটা কি হবে ?

অন্যমনস্ক লোটন চমকে বীরুর দিকে তাকায়। শ্লেট হাতে নিয়ে ভুল সংশোধন করে দেয়। তার পরে বলে—

লোটন—যা বীরু—ইস্কুলের বেলা হয়েছে—স্নান করে নে এবার --

দাওয়ার নীচে নেমে লোটন চলে যায়। বীরু বই শ্লেট গুছিয়ে নিয়ে উঠে পড়ে। উঠোনে দড়িতে ঝোলান গামছাটা টেনে নেয়। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে পদ্ম বলে—

পদ্ম—কিরে কাকু চলে গেল ?

বীরু—হ্যাঁ

পদ্ম—আরে, লাউ দুটো পড়ে রইল যে, যা যা দিয়ে আয়—

বীরু লাউ দুটো নিয়ে দৌড়ে চলে যায়। পদ্ম মালসায় গোবর জল নিয়ে উঠোন নিকোতে থাকে।

লাউ দুটো বীরু ফিরিয়ে নিয়ে আসে। পদ্ম জিজ্ঞেস করে—

পদ্ম—কিরে ফিরিয়ে নিয়ে এলি যে ?

বীরু—কাকু আমায় খেতে দিলে যে

সমুদ্রপাড়ে ভামিনী পিসির চায়ের দোকান। একজন বৃদ্ধ বসে চা খাচ্ছে। গেলাস ধুতে ধুতে ভামিনী পিসী বলে—

ভামিনী—ওদের দুজনকে ছোটবেলা থেকে দেখছি

যেন যমজ ভাই। লোটনের মত অমন ছেলে আছে কজনা—?

বৃদ্ধ জেলে—তা ঠিক

গুরুচরণের বাড়ী। গুরুচরণ মারা গেছে। লোটন সেরেস্তার হাতবাক্সের সামনে বসে জাবেদা খাতার পাতা উলটিয়ে দেখে। সামনে একটা ছোট টুলে বসে একজন কৃষক বলে—

কৃষক—এবারের কিস্তির টাকাটা দিতে পারলাম না। বড়ই টানাটানিতে আছি—

লোটন—ছ্যাখ, এতে তোরই অসুবিধে হবে, একেবারে দু কিস্তির টাকা—

কৃষক—ছোটকর্ত্তা ফসল ভাল হলে একেবারেই দিয়ে দেব

লোটন—আচ্ছা যা।

সেরেস্তা থেকে উঠে লোটন বাইরে আসে। পঞ্চাকে ডেকে বলে—

লোটন—এই পঞ্চা, আমি আজ বসন্তপুর যাচ্ছি, তুই ন পাড়ার হাটে গিয়ে গরুর ভুষি এনে রাখবি।

পঞ্চা মাথা নেড়ে কতকগুলো বাখারি হাতে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

রাত্রি। ঝাউবনের ভিতর ঘন অন্ধকার। ঝিঁঝিঁ ডেকে চলেছে সমানে। মাঝে মাঝে নানা ধরনের বুনো পাখি ডেকে ওঠে। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে বীরু প্রাণপণে দৌড়ে একদিকে চলে যায়।

বীরু লোটনের বাড়ির কাছে আসতেই পঞ্চা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। হাঁপাতে হাঁপাতে বীরু বলে—

বীরু—পঞ্চাদা, পঞ্চাদা, কাকু ফিরেছে?

এত রাত্রে বীরুকে দেখে পঞ্চা অবাক হয়ে যায়। দ্রুত এসে বীরুকে ধরে, বলে—

পঞ্চা—কীরে বীরু, এত রাতে?

বীরু—কাকু ফিরেছে পঞ্চাদা?

পঞ্চা—ছোটকর্ত্তা এখুনী ফিরলো, জামা কাপড়ও—(নেপথ্যে লোটনের গলা)

নেপথ্যে লোটন—কেরে?

লোটন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে, বীরুকে দেখে বলে—

লোটন—কীরে?

বীরু লোটনকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে। কাঁদতে কাঁদতেই বলে—

বীরু—কাকু, মা যেন কেমন করছে—

লোটন বীরুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে—

লোটন—ছিঃ বাবা কাঁদেনা—

লোটন পঞ্চাকে বলে—

লোটন—পঞ্চা, বীরুকে বাড়ি পৌঁছে দে। লণ্ঠনটা সঙ্গে নিয়ে যা। ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে নিয়ে আমি এখুনী আসছি।

বীরুকে পঞ্চার দিকে এগিয়ে দিয়ে লোটন সেই বেশেই বেরিয়ে যায়।

নিতাইয়ের বাড়ী। পদ্ম জ্বরে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে বিছানায়। মাথার কাছে চুপ করে বসে আছে বীরু। দরজার বাইরে দাওয়ায় বসে পঞ্চা ঘুমে ঢুলছে। নেপথ্যে লোটনের গলা—

(নেপথ্যে) লোটন—এদিকে আসুন ডাক্তারবাবু—এদিকে

বীরু দরজার দিকে তাকায়।

লোটন ডাক্তারবাবুকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে। পদ্মর বিছানার পাশে ডাক্তারবাবু এসে বসেন। লোটন ডাক্তারবাবুর ব্যাগ বিছানার ওপর রাখে।

পকেট হতে চসমা বের করে পরেন ডাক্তারবাবু। পদ্মর নাড়ী ও চোখ পরীক্ষা করেন। তারপর লোটনের দিকে তাকিয়ে বলেন—

ডাক্তারবাবু—ভয়ের কোন কারণ নেই। পঞ্চাকে নিয়ে যাচ্ছি ওষুধটা পাঠিয়ে দেব, এখুনী এক দাগ খাইয়ে দিবি।

ডাক্তারবাবু উঠে দরজার কাছে গিয়ে বলেন—

ডাক্তারবাবু—কাল সকালে একবার খবর দিস কেমন থাকে—

ডাক্তার পঞ্চাকে নিয়ে চলে যান। লোটন ও বীরু চেয়ে থাকে পদ্মর দিকে।

গভীর রাত্রি। পদ্ম অসাড় হয়ে পড়ে আছে বিছানায়। বীরু ঘুমিয়ে আছে তার পাশে। জেগে আছে শুধু লোটন। সজাগ প্রহরীর মত লোটন বসে আছে পদ্মর পাশে। পাশে রাখা ছোট টুলের ওপর জলের বাটিটা থেকে এক টুকরা কাপড় ভিজিয়ে নিয়ে পদ্মর কপালে লাগিয়ে দেয়।

চিন্তিত মুখে লোটন একবার বীরুর দিকে তাকায়। মায়ের গায়ে হাত রেখে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে আছে বীরু। ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে নেয় লোটন পদ্মর দিকে।

পদ্ম একইভাবে বেহুঁস অবস্থায় পড়ে আছে। খুবই অসহায় দেখায় পদ্মকে।

লোটন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। গালে হাত দিয়ে লোটন চুপ করে ভাবতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে বাইরে পায়ের আওয়াজ হয়। লোটন দরজার দিকে তাকায়।

দরজা দিয়ে পঞ্চা প্রবেশ করে। হাতের ওষুধের শিশিটা লোটনের দিকে এগিয়ে দেয়। বলে

পঞ্চা—ছোট কত্তা, এখুনী এক দাগ খাইয়ে দাও—

সকাল। ডাক্তারখানা। দু একজন রোগি একটা বেঞ্চে বসে আছে। লোটনকে ডাক্তারবাবু বলেন—

ডাক্তারবাবু—চিন্তার কিছু নেই, ভাল হয়ে যাবে।

ডাক্তার ঘরের কোণে রাখা টেবিলের কাছে গিয়ে একটা খলে ওষুধ পিষতে পিষতে বলেন—

ডাক্তারবাবু—আহা, একা যুঝতে যুঝতে মেয়েটা একেবারেই ভেঙে পড়েছেরে, (একটু থেমে) এ অসুখতো দেহের নয়রে লোটন, এ অসুখ মনের—

লোটন চিন্তিতমুখে অন্য আর একদিকে তাকিয়ে থাকে।

সমুদ্র। সূর্য্যাস্তের বর্ণচ্ছটা ঢেউএর মাথায় মাথায় চিক-মিক করে। পাড়ের ঝাউবনে বসে বীরু তাকিয়ে থাকে এই দিগন্তবিস্তৃত উর্মিমালার দিকে। বিমর্ষভাবে বীরু কি চিন্তা করে। এক সময়ে উঠে গ্রামের পথ ধরে।

খাড়ীর ঘাটে অনেকগুলো নৌকো বালীতে আটকে আছে। নানা রঙের নিশানে সাজানো নৌকোগুলো। গলুই থেকে মাস্তুলের মাথা পর্য্যন্ত নিশানের বাহারে ছেয়ে আছে। দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ নৌকাগুলো দেখে বীরু। ধীর-ভাবে পাশ দিয়ে চলে যায়।

নিতায়ের বাড়ি। দাওয়ায় বসে আছে পদ্ম আনমনে। বীরু এসে পাশে দাঁড়ায়। বলে—

বীরু—মা, কাল গঙ্গাপূজো, সমুদ্দুরে অনেক নৌকো ভাসবে; তোমায় যেতে হবে, যাবে তো?

পদ্ম শান্ত চোখে বীরুকে একবার দেখে। ওকে কাছে টেনে নেয়। বীরু মাকে জড়িয়ে ধরে। অনেক দিনের না-বলা দুঃখে চোখের পাতা ভিজে আসে পদ্মর। বীরুর চোখও ছলছল করে ওঠে।

গঙ্গা পূজো। সাগরে আজ অনেক নৌকো ভেসেছে। গলুইয়ে ফুল দিয়ে সাজিয়ে, নিশান উড়িয়ে, নানা রঙের পাল তুলে, সারি সারি চলে কত নৌকো। সমুদ্রবেলায় সমাগম কত ছেলে মেয়ে,বুড়ো বুড়ি,যুবক যুবতীর। আজ জেলেদের গঙ্গাপূজো, উৎসব।

দরজায় শিকল তুলে দিয়ে পদ্ম বীরুকে সঙ্গে নিয়ে উঠোন পেরিয়ে ঝাউবনের দিকে এগিয়ে যায়।

পদ্ম ও বীরু দূরে ঝাউবনে মিলিয়ে যায়।

একটা বাঁক ফিরতে ওরা দেখতে পায় লোটনকে। লোটন এদিকেই আসছে। বীরু ও পদ্ম দাঁড়িয়ে পড়ে। লোটন জিজ্ঞাসা করে—

লোটন—কিরে বীরু, এ অবেলায় কোথায় যাচ্ছিস্?

বীরু লোটনের কাছে এসে ওর হাত ধরে বলে—

বীরু—গঙ্গাপূজো দেখতে যাচ্ছি যে। তুমিও চলনা কাকু!

লোটন--নারে আমার কাজ আছে—

বীরু—চলনা কাকু

পদ্মর দিকে ফিরে বীরু বলে—

বীরু—মা ত্থাখোনা কাকু যাচ্ছে না—তুমি বল মা।

লোটন পদ্মর দিকে চায়

পদ্ম ওর দিকে চেয়ে আছে। পদ্মর দৃষ্টিতে একটা অনুরোধ দেখতে পায় লোটন। একটু থেমে বলে—

লোটন—আচ্ছা চল।

ওরা তিনজনে ঝাউবনের ভিতর দিয়ে চলেছে সমুদ্রের দিকে।

দূরে সমুদ্রের গর্জন শোনা যায়। ঝাউবন দিয়ে যেতে যেতে পরিশ্রান্তা পদ্ম একসময়ে বলে—

পদ্ম—একটু বসি, আর পারছি না—

একটা ঝাউগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে পড়ে পদ্ম।

কিছুদূর এগিয়ে গিয়েছিল বীরু। ফিরে এসে মাকে বলে—

বীরু—মা বসলে যে, চলনা!

পদ্ম—পা ধরে গেছে বাবা, একটু বসি।

বীরু—তাহলে আমি চললাম—

লাফাতে লাফাতে বীরু চলে যায়। লোটন এসে পদ্মর পাশে বসে।

পরিশ্রান্তা পদ্ম বসে আছে। লোটন চেয়ে থাকে অন্য-দিকে, অন্যমনস্ক সে। একটু পরে ধীরভাবে বলে সে—

লোটন—মনে আছে পদ্ম, একদিন এইখানে আমরা খেলতাম—

পদ্ম উত্তর দেয় না। দূরে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সমুদ্রে ঢেউএর পর ঢেউ এগিয়ে আসে

একসময়ে লোটন বলে—

লোটন—পদ্ম, তুই বড় ক্লান্ত!

পদ্ম কোন কথা বলেনা। হাতের ওপর মাথা রেখে দৃষ্টি নত করে।

লোটন ওর দিকে চেয়ে থাকে। অনেকক্ষণ। হঠাৎ বলে—

লোটন—ওদের নৌকো হারিয়ে গেছে, ডুবে গেছে সমুদ্রে—

পদ্ম একবার লোটনের দিকে চায়। এটা যেন তার অজানা নয়। আবার আগের মতই চেয়ে থাকে মাথা নত করে।

লোটন বলে—পদ্ম, নিতাই নেই, সে আর ফিরবে না। কিন্তু তাই বলে তুই এভাবে নিজেকে মেরে ফেলতে চাচ্ছিস্ কেন? কেন বীরুকে অনাথ করে যাবি—

বিমর্ষ লোটন উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে থাকে পদ্মর দিকে। পদ্ম নীরব।

ঢেউএর পর ঢেউ এসে সমস্ত বেলাভূমি ভাসিয়ে দেয়।

এই সমবেদনা—মানবিক অনুযোগ, এতদিন মুখবুঁজে যা সয়ে এসেছে পদ্ম, কোনোদিনের তরে একবারও প্রকাশ পায়নি, এই মুহূর্তের সহানুভূতি সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ধীরভাবে পদ্ম বলে—

পদ্ম—আমি নিজের কথা ভাবিনি কখনো, কিন্তু, কিন্তু আমি কি করবো!—নিজেকে একা মনে হয়, বড় একা—দশ বছর—দশ বছর—

হু হু করে কেঁদে ফেলে পদ্ম।

লোটন ওর দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। কি করবে বুঝে উঠতে পারেনা। পদ্মর দুঃখ তাকে আকুল করে তোলে।

সমুদ্রের ঢেউগুলো ভেঙে ভেঙে পড়ে একের পর এক।

পদ্ম হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতেই থাকে।

লোটন একসময়ে আবেগে বলে ফেলে হঠাৎ—

লোটন—তুই আমাকে বিয়ে কর পদ্ম—সব ঠিক হয়ে যাবে—

পদ্ম কেঁদেই চলে। ভীষণ কাঁদে। সমস্ত শরীরটা কেঁপে কেঁপে ওঠে তার।

লোটন নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকে

ঝাউবনের শোঁ শোঁ শব্দ শোনা যায়। দূরে সমুদ্রের অবিরাম গর্জন। ঝাউতলায় আলোছায়ার মোহময় লুকোচুরি।

নিতাইএর বাড়ী। উঠোনের বেড়ার কাছে এসে পদ্ম ও লোটন থামে। বীরু লাফাতে লাফাতে ভিতরে চলে যায়। অন্যদিকে তাকিয়ে ধীরস্বরে লোটন বলে—

লোটন—পদ্ম দুর্বল মুহূর্তে তোকে যে কথা বলেছি—ওটা ঠিক নয়। তুই ভেবে দেখিস—

পদ্ম স্থির দৃষ্টিতে একবার লোটনের দিকে তাকিয়ে চোখ নত করে। লোটন মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে চলে যায়। অপস্রিয়মাণ লোটনের দিকে চেয়ে পদ্ম আঁচল দিয়ে চোখ মোছে।

একটা বিরাট সামুদ্রিক ঝড়। এ জাতীয় ঝড় প্রতি বছর আসে না। অনেক যুগ পরে আসে। তিন দিন ধরে সমানে বৃষ্টি আর ঝড় চলতেই থাকে। শেষ নেই যেন এ ঝোড়ো হাওয়ার।

(আগামীবারে সমাপ্য)
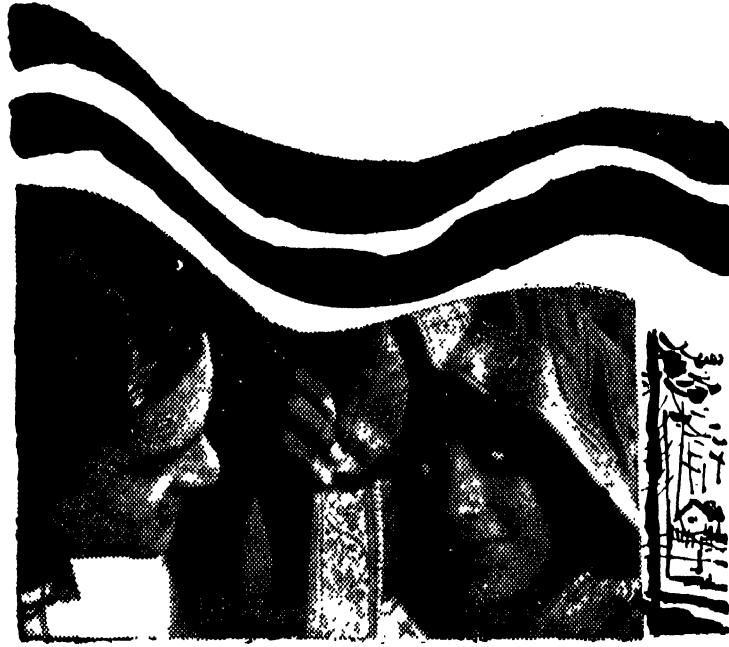
নিতাই ও পদ্ম

অঘটনের পূর্বরাগ : শ্রীদিলীপকুমার রায়

ইংরেজ কবি লিখেছিলেন : Rarely, rarely, comest thou, Spirit of Delight! দিলীপকুমারের নবপ্রকাশিত উপন্যাস "অঘটনের পূর্বরাগ" পড়্‌তে পড়্‌তে যে কোন পাঠক মুগ্ধ চিত্তে শেলির ঐ উক্তি স্মরণ করবেন। ভারতবর্ষ-সম্পাদক রূপে আমার অবশ্য রচনাটির সঙ্গে পরিচয় কিছু দিন আগের : ১৩৭২-৭৩ সালে যখন এটি ধারাবাহিকরূপে প্রথমে "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই রোমান্স বা রমন্যাসবর্গীয় উপন্যাসটি পড়তে পড়তে বহু সুখস্মৃতি জেগে উঠছিল। কেন, তাই বলি।

দিলীপকুমারের নিয়মিত পাঠক ও অনুরাগিবৃন্দ নিশ্চয় জানেন যে, তাঁর সব উপন্যাসের অন্তরালে আত্মকাহিনীর বনেদ আছে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'মনের পরশ'-ও "ভারতবর্ষ"-তে প্রথম প্রকাশিত হয় বর্ত্তমানে যার নাম : "ভাবি এক, হয় আর।" এই উপন্যাসে বাংলাদেশের এই অসামান্য লোককান্ত গায়কের ইউরোপীয় রোমান্সের সূত্রপাত হয় তাঁর পাশ্চাত্যদেশস্থ ছাত্রজীবনের বিবরণ দিয়ে। তারপর দ্বিধা বা 'দু-ধারা', 'বহুবল্লভ', 'রঙের পরশ', 'দোলা', 'তরঙ্গ রোধিবে কে'—বিভিন্ন উপন্যাসে তাঁর ইউরোপ পর্য্যটন ও কাসানোভা আর ডন জুয়ানের উপযুক্ত রোমান্টিক প্রণয় কাহিনী বর্ণিত হয়। পাঠকমহলে বিশেষতঃ বিদগ্ধসমাজে তাঁর ঔপন্যাসিক খ্যাতি আজ থেকে ত্রিশ বছর আগেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯১৯-২২ সালে ইউরোপ-প্রবাসের সময়ে যে-রোমান্টিক ঘটনা লেখকের অভিজ্ঞতায় এসেছিল, সেগুলি নিয়ে ছ'খানি উপন্যাস লেখার পর দিলীপ কুমার অকস্মাৎ তাঁর যাত্রাপথ পরিবর্তিত ক'রে প্রথমে "আশ্চর্য্য" পরে "অঘটন" বর্গীয় উপনাসগুলির অবতারণা করেন। "অঘটন আজো ঘটে" তাঁকে এনে দিল অদ্ভুত জনপ্রিয়তা। কিন্তু আমরা রোমান্টিক পাঠকের দল উৎসুক হয়ে ছিলাম তাঁর ভারতীয় রোমান্টিক প্রণয় কাহিনীগুলির জন্য। ১৯২২-২৮ সালে তাঁর যে সাঙ্গীতিক অভিজ্ঞতা তাও প্রথম ভারতবর্ষের পাতায় ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জিকারূপে প্রকাশিত হয়। সেই সঙ্গে প্রাক্‌-সন্ন্যাস জীবনে রোমান্টিক বৈরাগী দিলীপকুমারের কিছু বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল যার ঔপন্যাসিক বিবরণলাভের আশায় যাঁরা তৃষিত ছিলেন, দিলীপকুমার "অঘটনের পূর্বরাগ" উপন্যাসে তাঁদের প্রত্যাশা পূর্ণ করেছেন।

অধুনালুপ্ত "উত্তরা" পত্রিকায় "গল্প কিন্তু গল্প নয়" নামে আশ্চর্য-সিরিজের যে দ্বিতীয় উপন্যাসটি প্রকাশিত হচ্ছিল কিন্তু কোন দিন গ্রন্থাকারে পূর্ণায়ত রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়নি, তাই এখন "অঘটনের পূর্বরাগ" নাম নিয়ে আত্ম প্রকাশ করেছে, অবশ্য বহু পরিবর্তনের পর। এই উপন্যাসের মতো উঁচু দরের কোন রোমান্স গত কয়েক বছরের মধ্যে বাংলা কথা সাহিত্যে প্রকাশিত হয় নি। তরুণ রূপবান্ সুগায়ক কিন্তু উদাসী গৃহবৈরাগী নায়কের আবির্ভাবে বাসন্তীপুরের ঘুমন্ত রাজ্যে যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় তা এই কাহিনীর উপজীব্য।

এই উপন্যাসের নায়ক অসিত ও তার অন্যতম সঙ্গীত গুরু পীতবাস নিঃসংশয়ে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক চরিত্র; পীতবাস সম্বন্ধে আরও জানার ইচ্ছা

পাঠকের মনে থেকে যায়। পীতবাস ও তাঁর গুরু-তুল্য শ্রীমন্ত গোস্বামীর বিবরণ আমাদের মনে স্মৃতির অতল থেকে একটি অবিস্মরণীয় নাম জাগিয়ে তোলে: রেবতীমোহন সেন!—যাঁকে লক্ষ্য ক'রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'তুমি কেমন ক'রে গান করো হে গুণী'।—ঠিক সেই কথাই দিলীপকুমারের উদ্দেশে উচ্চারণ ক'রে এই সাঙ্গীতিক উপন্যাসের সমালোচনা শেষ করি যাতে শমিতা ব'লে এমন একটি মেয়ের কথা ছড়িয়ে আছে বসন্ত বাতাসে সঞ্চারিত ফুলের গন্ধের মতো যে দিলীপকুমারের জীবনসঙ্গিনী হলেও হতে পারত।

[প্রকাশক—মণ্ডল বুক হাউস, মহাত্মা গান্ধি রোড, কলিকাতা। মূল্য ৯৲]।

—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

জপজী (অনুবাদ কাব্য): শ্রীসুধীর গুপ্ত

এই বিশ্ব-রহস্যকে বুঝিবার জন্য মানুষের আকুলতার অন্ত নাই। সেই আকুলতাটি ধর্ম্মপ্রাণ ভারতে আরও অধিক। এইজন্যই জ্ঞানমূলক ও ভক্তিমূলক শাস্ত্র ও সাহিত্যের প্রসার ও প্রচার এখানে বৈদিগযুগ হইতেই বরাবর দৃষ্ট হয়। যাহা জানা যায় না—বুঝা যায় না তাহাকে জানিবার ও বুঝিবার জন্য ভারতীয় সাধু সন্তগণ প্রাণপণ করিয়াছেন, সর্ব্ব-সমর্পণের ভাবে প্রবুদ্ধ হইয়া আত্মতত্ত্ব ও বিশ্ব-রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিতে চাহিয়াছেন। গুরু নানকও এই প্রকার সমর্পিত-প্রাণ একজন অসাধারণ মহাপুরুষ। তিনি শিখধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। আবার তিনি একজন ভক্ত-কবি ও সিদ্ধপুরুষ। তাঁহার রচিত পদাবলী শিখজাতির পঞ্চমগুরু অর্জ্জন সংগ্রহ করিয়া এবং নিজেও অনেক দোহা বা ভক্তিমূলক পদাবলী রচনা করিয়া 'শ্রীশ্রীগ্রন্থ-সাহেব' সঙ্কলন করেন। এই মহাগ্রন্থে গুরু নানক, গুরু অঙ্গদ, গুরু অমরদাস, গুরু রামদাস, গুরু অর্জ্জন, গুরু তেগবাহাদুর কর্ত্তৃক রচিত পদাবলী ব্যতীত আরও উনিশজন সাধক কবির এবং সতরজন ভাটকবির রচনা বিধৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থকে [illegible]

শ্রীশ্রীগ্রন্থসাহেবের সর্ব্ব প্রথম, সর্ব্ব প্রধান, ও সর্ব্বাধিক পরিচিত অংশের নাম 'শ্রীশ্রীজপজী' এই 'জপজী' গুরুনানকের রচনা এবং ইহাতে নিরাকার পরমেশ্বরের প্রতি অহৈতুকী ভক্তি ও আত্মনিবেদনের ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলার শ্রীচৈতন্যদেবের অবির্ভাবের সামান্য পূর্ব্বে গুরু নানক আবির্ভূত হন এবং সহজ, সরল, সার্থক, সুন্দর ভক্তিধারায় মধ্যযুগের ভারতবর্ষকে পরিপ্লুত করেন। এই ভক্তি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি প্রকাশক যে পদাবলী তিনি রচনা করেন উহাই 'জপজী' নামে অভিহিত। নিরাকার ভগবান জপময়—জপের দ্বারাই লব্ধ হন সুতরাং যে ভক্ত জপময় হইবে সে-ই তাঁহাকে লাভ করিতে সক্ষম হইবে—এইজন্য 'জপজী' নামটি সার্থক ও সুন্দর। গ্রন্থখানি গুরুমুখী ভাষায় বিরচিত।

বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত সুযোগ্য কবি অধ্যাপক শ্রীসুধীর গুপ্ত মূল পাঞ্জাবী হইতে বাংলা কবিতায় গ্রন্থখানিকে যথাযথ অনুবাদ করিয়া সকলেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। তিনি নানা ভাষাবিদ্ বলিয়া তাঁহার এই অনুবাদ গ্রন্থখানি মূলানুগ হইয়াছে। এই 'জপজী'র বাংলা অনুবাদ সহজ, সরল, মাধুর্য্যমণ্ডিত, সুস্পষ্ট এবং রসোত্তীর্ণ হওয়ায় বাংলা কাব্যের রসপিপাসু মাত্রেই এই গ্রন্থ পাঠে পরম তৃপ্তি লাভ করিবেন। গ্রন্থের আদিতে যে গদ্য ভূমিকা সংযোজিত হইয়াছে এবং যে তিনটি সার্থক পেত্রার্কীয় সনেটে কবি শ্রীসুধীর গুপ্ত তাঁহার ভক্তি শাস্ত্র জ্ঞানের ও গভীর উপলব্ধির পরিচয় দিয়াছেন উহা মনোজ্ঞ ও মধুর হইয়াছে। অনুবাদ গ্রন্থ মূলগ্রন্থের স্বাদ বহন করিয়া সকলকেই তৃপ্ত করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়াছে। এই 'জপজী' গ্রন্থের শেষে বাংলা অক্ষরে মূল 'জপজী' গ্রন্থের গুরুমুখী পাঠ সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থমূল্য বিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান ভারতবর্ষকে একীভূত ও এক আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে হইলে উহা বক্তৃতায় হইবে না; ভারতীয় ভাষায় বিরচিত শ্রেষ্ঠ পুস্তক সমূহের অনুবাদ ও এই সমস্ত ভাষাগোষ্ঠীর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ভাব-রত্নরাজীর আহরণের ও আদরের তাহাই সম্ভব হইবে। এই দিক হইতে বিচার

করিলে বর্ত্তমান ভারতের ভাষাবিরোধের উচাটনতার মধ্যে এই শ্রেণীর 'জপজী' গ্রন্থ অনুবাদের আবশ্যকতা ও উপযোগিতা আরও অধিক।

আগামী কার্ত্তিক পূর্ণিমায় গুরু নানকের পাঁচশত-তম জন্মদিবস একবৎসর ধরিয়া ভারতে উদ্‌যাপিত হইবে, সুতরাং এই সময়ে বাংলার কবি বাংলা ও পাঞ্জাবের সংযোগ-সেতু রচনা করিয়া সকলেরই অভিনন্দন যোগ্য হইয়াছেন। গ্রন্থখানির ছাপা, বাঁধাই সুরুচি সম্মত।

[প্রকাশক :—পুথিঘর, ২২ বিধান সরণি, কলিকাতা-৬]

মূল্য :—২০০

—স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

আগামী তিনটি সংখ্যা একত্রে
"রবীন্দ্র সংখ্যা" রূপে বর্দ্ধিত
কলেবরে প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীফণীন্দ্রনাথমুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্ত্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দ্বিতীয় খণ্ড

চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ সংখ্যা

ষট্‌পঞ্চাশত্তম বর্ষ

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মজীবন

শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি কর্ত্তৃক আহূত রবীন্দ্রজয়ন্তী সভায় কবিশেখর কালিদাস রায়কে বলিতে শোনা গিয়াছিল—"শত বৎসর ধরিয়া রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা এবং তাঁহার বিচিত্র রচনাবলীর সম্যক আলোচনা করিলেও সমগ্র রবীন্দ্রনাথকে বুঝা যাইবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।" কবিশেখরের এই বাক্যের মধ্যে যে সত্যের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা এখন আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। বহু মনীষী বহু ভাবে ও ভঙ্গিতে এবং বিবিধ দৃষ্টিকোণ হইতে রবীন্দ্রনাথের জীবনের নানা দিক আলোচনা করিয়াছেন সত্য,—তাঁহার অধ্যাত্ম জীবনের পূর্ণালোচনা কিন্তু অদ্যাবধি হয় নাই। কখনও হইবে কি না বলা যায় না। কারণ তাঁহার সমপর্য্যায় ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও পক্ষে উহা সাধ্যাতীত। তথাপি রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মজীবন সম্বন্ধে তাঁহার বাণী ও রচনা হইতে যতটুকু পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে তাহারই সাধ্যমত আলোচনার চেষ্টা করিব।

কোন ব্যক্তির অধ্যাত্ম জীবন আলোচনা করিবার পূর্ব্বে প্রথমেই দেখা দরকার ধর্ম্ম বলিতে সেই ব্যক্তি কি বুঝেন এবং ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার ধারণাই বা কিরূপ? ১৩৩৩ সালের ১০ই মাঘ শ্রীমতী নির্ম্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত একখানি পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"ব্রাহ্ম বলতে বিশেষ কোন ধর্ম্মকে যদি স্বীকার করতে হয় তবে সেই দলের ধর্ম্মকে আমি মানি নে—আমার ধর্ম্ম আমার একান্ত নিজেরই সে ধর্ম্মের ঘাটে এসে এখনও আমার জীবন তরণী পৌঁছায় নি—আশা করি মরবার আগে কোন একদিন পৌঁছাবে।" রবীন্দ্রনাথের এই কয়টি কথা হইতে বেশ বুঝা যায়—ধর্ম্মের ধারা ব্যক্তিগত, উহা জাতিগত বা সম্প্রদায়গত নহে, তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন ; আশা করিতেন ধর্ম্মসাধনায় তিনি একদিন সিদ্ধি লাভ করিবেন।

"মানুষের ধর্ম্ম" শীর্ষক বক্তৃতার পরিশিষ্টে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"আমার জন্ম যে পরিবারে, সে পরিবারের ধর্ম্মসাধনা একটি বিশেষ ভাবের। উপনিষদ্ ও পিতৃদেবের অভিজ্ঞতা, রামমোহন রায় ও আর আর সাধকদের সাধনাই আমাদের পারিবারিক সাধনা। আমি পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। জাতকর্ম্ম থেকে আরম্ভ করে, আমার সব সংস্কারই বৈদিক মন্ত্রদ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।" ইহাতে প্রমাণ হয়—প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্মকে তিনি অস্বীকার করেন নাই। তাঁহার অন্তরের এই স্বীকৃতির ফলেই বোধ হয় স্বর্গীয় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন দেশনেতার আন্তরিক চেষ্টায় বিপুল বাধা সত্ত্বেও কবির ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া সনাতন বৈদিক ধর্ম্মানুশাসনেই সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ আর এক স্থানে উক্ত বক্তৃতাবলীর মধ্যেই বলিয়াছেন—"বাল্যে উপনিষদের অনেক অংশ বারবার আবৃত্তির দ্বারা কণ্ঠস্থ ছিল। সব কিছু গ্রহণ করতে পারি নি সকল মন দিয়ে। শ্রদ্ধা ছিল, শক্তি ছিল না হয় তো। এমন সময় উপনয়ন হল। উপনয়নের সময় গায়ত্রীমন্ত্র দেওয়া হয়েছিল, কেবল মন্ত্র মুখস্তভাবে নয়। বারংবার সুস্পষ্ট উচ্চারণ ক'রে আবৃত্তি করেছি, এবং পিতার কাছে গায়ত্রীমন্ত্রের ধ্যানের অর্থ পেয়েছি। তখন আমার বয়স বার বৎসর হবে। এই মন্ত্র চিন্তা করতে করতে মনে হত বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব ও আমার অস্তিত্ব একাত্মক। ভূর্ভুবঃ স্বঃ—এই ভূলোক, অন্তরীক্ষ, আমি তারই সঙ্গে অখণ্ড। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি অন্তে যিনি আছেন তিনিই আমাদের মনে চৈতন্য প্রেরণ করছেন। চৈতন্য ও বিশ্ব বাহিরে ও অন্তরে সৃষ্টির এই দুই ধারা মিলেছে। এমনি করে ধ্যানের দ্বারা যাঁকে উপলব্ধি করছি তিনি বিশ্বাত্মা, আমার আত্মাতে চৈতন্যের যোগে যুক্ত। এই রকম চিন্তার আনন্দে আমার মনের মধ্যে একটা জ্যোতি এনেছিল। এ আমার সুস্পষ্ট মনে আছে।" ইহাতে প্রতীতি হয় যে উপনয়নের পর হইতেই তাঁহার অধ্যাত্ম জীবনের আরম্ভ। তাঁহার পিতার উপদেশ ও নির্দ্দেশক্রমে তিনি গায়ত্রী মন্ত্রের সাধনা সুরু করেন। সেই সাধনায় তাঁহার গভীর নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা ছিল, উহাতে তিনি সিদ্ধির সন্ধানও পাইয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতেও এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়।

উপনয়নের পর সাত বৎসরের পরের ঘটনা। "মানুষের ধর্ম্ম" বক্তৃতাবলীর আর এক স্থানে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"তখন প্রত্যুষে ওঠা প্রথা ছিল। মনে আছে সেই ভোরে উঠে একদিন চৌরঙ্গীর বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। তখন ওখানে ফ্রি ইস্কুল বলে একটা ইস্কুল ছিল। রাস্তাটা পেরিয়েই ইস্কুলের হাতা দেখা যেত। সে দিকে চেয়ে দেখলুম গাছের আড়ালে সূর্য্য উঠছে। যেমনি সূর্য্যের আবির্ভাব হল গাছের অন্তরাল থেকে, অমনি মনের পরদা খুলে গেল। মনে হল মানুষ আমরণ একটা আবরণ নিয়ে থাকে। সেইটাতেই তার স্বাতন্ত্র্য। স্বাতন্ত্র্যের বেড়া লুপ্ত হলে সাংসারিক প্রয়োজনে অনেক অসুবিধা কিন্তু সেদিন সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার আবরণ খসে পড়ল। মনে হল সত্যকে মুক্তদৃষ্টিতে দেখলুম। দুজন মুটে কাঁধে হাত দিয়ে হাসতে হাসতে চলেছে। তাদের দেখে মনে হল কি অনির্বচনীয় সুন্দর। মনে হল না তারা মুটে। সে দিন তাদের অন্তরাত্মাকে দেখলুম যেখানে আছে চিরকালের মানুষ, সে দিন আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। দেখলুম সমস্ত সৃষ্টি অপরূপ। আমার এক বন্ধু ছিল। সে সুবুদ্ধির জন্য বিশেষ বিখ্যাত ছিল না। সে এলে ভাবতুম বিরক্ত করতে এসেছে। সে দিন তাকেও ভাল লাগল। তাকে নিজেই ডাকলুম! সে দিন মনে হল তার নির্ব্বুদ্ধিতা আকস্মিক, সেটা তার চরম সত্য নয়। তখন মনে হল এই সত্যি।"

কবির এই মুক্তির উপলব্ধির পিছনে যে তপস্যার ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাহা সামান্য নহে। প্রতি জীবে ব্রহ্মোপলব্ধি ব্যতীত এইরূপ মুক্তির আস্বাদ ও আনন্দের অনুভূতি লাভ অসম্ভব। ঐকান্তিক চিত্তে গায়ত্রী মন্ত্রের সাধনারই ইহা মধুময় ফল।

১৯২৯ সালে ১৮ই সেপ্টেম্বর শ্রীমতীমহলানবিশকে আরেকখানি পত্রে কবিগুরু লিখিয়াছিলেন—"খণ্ডেরমধ্যেই যত কিছু দ্বন্দ্ব। সেইখানেই পাওয়া হারানোর বিরোধ,—অখণ্ডের মধ্যে চিরপর্য্যাপ্তি, সেইখানে সমস্ত মনকে স্তব্ধ করা যায়, তখন তার সমস্ত তুচ্ছ আংদোরের কলরোল থেমে গিয়ে সে অনির্ব্বচনীয় বিশ্বসত্যের সাড়া পায়।··· সমুদ্রে মেলবার আবেগ নদীর যেমন কোন দিনই শেষ হয়না—এই পরমলোকে পৌছাবার প্রার্থনাও মানুষের কোন দিন থামবে না।······অমৃত মানেই হচ্ছে নিখিল প্রাণের সঙ্গে প্রাণকে যোগের দ্বারা সম্মিলিত করা। বিশ্বসত্যের মধ্যে নিজেকে সত্যরূপে উপলব্ধি হচ্ছে অসত্য থেকে সত্যে উত্তীর্ণ হওয়া—তারই মধ্যে সুগভীর শান্তি।" "অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যো র্মা অমৃতম্ গময়"—ভারতের ঋষি অরণ্যে বসিয়া যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা আজ ঋষিকবি মানুষের সামনে উপস্থিত করিলেন। শুধু মুখের কথায় নয়। জীবনে যে সত্য উপলব্ধি করিয়া খণ্ড অখণ্ডের দ্বন্দ্ব হইতে মুক্তি-লাভ করিয়াছিলেন সে সত্যটুকুও প্রকাশ করিয়া গেলেন। প্রত্যেক মানুষই এরূপ প্রার্থনা করিলে পরমা শান্তি লাভ করিতে পারে।

কেবল মানুষের অন্তরের রূপের সন্ধান পাইয়াই সাধক-কবি ক্ষান্ত হন নাই। তিনি প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থের অন্তরের সত্যরূপের পরিচয়ও পাইয়াছিলেন। ক্যালি-ম্পঙ-এ দার্শনিক মহেন্দ্রনাথ সরকারকে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন—" এ বিশ্বের প্রত্যেকের একটা আন্তররূপ আছে, যা দেখতে পারলে সুন্দর বিশ্বের পরিচয় পাই। আমি যখন বিশ্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর দিকে তাকাই, দেখি তারা কত রূপ ও ভাব নিয়ে এসে দাঁড়ায় আমার সামনে।" অহম্ বোধের নাশ হইলেই মানুষ প্রত্যেক বস্তুর চিরন্তন সত্ত্বাকে দেখিয়া তাহার অন্তরের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারে। বাহিরের বিচিত্র রূপ দেখিয়া সে বিস্মিত হয় না। "জীবো ব্রহ্ম নাপরঃ" বেদান্তের এই অভিজ্ঞতা সে মনে প্রাণে তখন উপলব্ধি করিতে পারে। বিশ্বকবির জীবনে সে উপলব্ধি স্বতঃই আসিয়াছিল তাঁহার লেখনীমুখেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

"মানুষের ধর্ম্ম" বক্তৃতাবলীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন—"বর্ষার সময় খালটা থাকত জলে পূর্ণ। শুকনোর দিনে লোক চলত তার উপর দিয়ে। এপারে ছিল একটা হাট, সেখানে বিচিত্র জনতা। দোতলার ঘর থেকে লোকালয়ের লীলা দেখতে ভাল লাগত। পদ্মায় আমার জীবনযাত্রা ছিল জনতা থেকে দূরে। সেই সময়কার একদিনের কথা মনে আছে। দোতলার জানালায় দাঁড়িয়ে সে দিন দেখছিলুম সামনের আকাশে নববর্ষার জলভারানত মেঘ, নিচে ছেলেদের মধ্য দিয়ে প্রাণের তরঙ্গিত হিল্লোল। আমার মন সহসা আগল খোলা দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে গেল বাহিরে, সুদূরে। অত্যন্ত নিবিড়ভাবে আমার অন্তরে একটা অনুভূতি এল, সামনে দেখতে পেলুম নিত্যকালব্যাপী একটি সর্ব্বানুভূতির অনবিচ্ছিন্ন ধারা নানা প্রাণের বিচিত্র লীলাকে মিলিয়ে নিয়ে একটি অখণ্ড লীলা। নিজের জীবনে যা বোধ করছি, যা ভোগ করছি, চারিদিকে ঘরে ঘরে জনে জনে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যা কিছুর উপলব্ধি চলেছে সমস্ত এক হয়েছে একটি বিরাট অভিজ্ঞতার মধ্যে, অভিনয় চলেছে নানা নাটক নিয়ে, সুখ দুঃখের নানা খণ্ড প্রকাশ চলেছে তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জীবন যাত্রায়, কিন্তু সমস্তটার ভিতর দিয়ে একটি নাট্যরস প্রকাশ পাচ্ছে এক পরম দ্রষ্টার মধ্যে যিনি সর্ব্বানুভূঃ, এতকাল নিজের জীবনে সুখ দুঃখের যে সকল অনুভূতি একান্তভাবে আমাকে বিচলিত করেছে, তাকে দেখতে পেলুম এক নিত্য-সাক্ষীর পাশে দাঁড়িয়ে।"

অনুরূপ অনুভূতি একদিন রবীন্দ্রনাথের রোগশয্যায় হইয়াছিল। দার্শনিক মহেন্দ্রনাথ সরকার কবির সহিত ক্যালিম্পংএ একবার দেখা করেন। নানা কথা প্রসঙ্গে কবি মহেন্দ্রনাথকে বলেন—"এবার আমার অসুখের মধ্যে একটা অনুভূতি হয়েছিল। একদিন রাতে আমার অঙ্গে সহসা একটা যন্ত্রণা অনুভব করলুম। কাউকে আর বিরক্ত করতে ইচ্ছা হল না। সহসা আমি যেন আমার মধ্যে

দ্বিধা বিভক্ত হয়ে আমাকে দেখতে লাগলুম। মনে হল রবি ঠাকুর ও তার লেখা, গান গাওয়া, সবই যেন আমার সামনে আমা হতে ভিন্ন হয়ে পড়েছে। আমি যেন আলাদা কিছু। যেমন এরূপ দেখা, কোথায় যেন বেদনা চলে গেল। আমি কিছুই অনুভব করলুম না। বেদনাটি যেন আমা হতে দূরে গেল, আমার সত্যকার সত্তার ভিতর তার যেন স্থান আর থাকল না?" রানী চন্দের "গুরুদেব" নামক পুস্তকেও এই ঘটনাটির উল্লেখ আছে। অনেক সাধু মহাপুরুষের জীবনেও এরূপ ঘটনা ঘটিতে দেখা গিয়াছে।

এইরূপ অনুভূতিকে বৈদান্তিক ভাষায় "সাক্ষী-অবস্থা" বলে। তখন মানুষের দেহ থাকিলেও, সেই দেহের বোধ থাকে না। সে তখন সাক্ষীস্বরূপ সকল জিনিস দেখে বটে, কিন্তু ভোগ করে না। সে দ্রষ্টা হয়, ভোক্তা থাকে না। বেদান্ত অধ্যয়ন ও উহার নিষ্ঠাপূর্ণ সাধনার ফলেই সাক্ষী অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

উপনিষদ রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয় গ্রন্থ ছিল। তিনি বলিতেন—"উপনিষদ বা বেদান্ত ব্রহ্ম-বিদ্যার বনস্পতি।" শান্তিনিকেতন বক্তৃতামালার মধ্যে তাঁহার বেদান্ত চর্চ্চার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। উপনিষদ সমূহের সম্যক আলোচনা এবং তন্নির্দ্দিষ্ট সত্যের উপলব্ধি চেষ্টাকে বেদান্তী-সাধনা বা ব্রহ্মবিদ্যা সাধন বলে। রবীন্দ্রনাথ ঐকান্তিকভাবে সেই সাধনায় রত থাকায় সাক্ষী অবস্থার অনুভূতি তাঁহার অনায়াসলভ্য হইয়াছিল এ কথা বলিলে কিছু ভুল বলা হইবে না।

"বনবাণীর" ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"ওই গাছগুলি বিশ্ববাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরলসুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় এক-তালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়েপ্রাণ দিয়ে শুনি তাহলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই বিরাট প্রাণ সমুদ্রের কূলে, যে সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত, তার গভীর তলে শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্।" বৃক্ষলতাদির মধ্যেও কবির এই যে শাশ্বত সৎ, চিৎওআনন্দ উপলব্ধিহৃদয়ে অনুভব করিয়াছিলেন শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্—ইহা কেবল কবিকল্পনা নহে, ইহা জীবন ব্যাপী তপস্যার অমৃতময় ফল। সেই তপস্যার বলেই তিনি ক্যালিম্পং এ সাক্ষাৎকার সময়ে অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ সরকারকে বলিতে পারিয়াছিলেন—"ভাষার চেয়ে সুর সূক্ষ্ম জিনিস। ভাষার যেখানে গতি নেই সুরের ধ্বনির গতিসেখানে আছে। সুরের স্বর তরঙ্গ আমাদের মনকে উপরে নিয়ে গিয়ে অপরিমেয় সত্তার ভিতর আমাদের প্রকাশ করিয়ে দেয়। এখানে অপরিচিতের সঙ্গে হয় আমাদের পরিচয়।" তিনি আর এক স্থানে বলিয়াছেন—"দুই এর মধ্যে এককে লাভ আমাদের প্রয়াস।" অদ্বৈতানুভূতির এই প্রয়াস ছিল বলিয়াই তিনি তাঁহার জীবনদেবতার সর্ব্বত্র প্রকাশ দেখিয়াছিলেন।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অন্তরের সাধনা বাহিরে প্রতিফলিত হয়। মানুষ ধরা পড়ে তার প্রতিদিনের জীবনযাত্রায়। চিঠি পত্রের ভিতর দিয়াও মানুষের অকপট পরিচয় পাওয়া যায়। সে পরিচয়ে মানুষের অন্তরের কথাই প্রকাশ পায়। উহাতে সাজান গুছান কিছুই থাকে না। যেটুকু প্রকাশিত হয় সেটুকু নিছক সত্য। মিথ্যার আভাস মাত্র সেখানে থাকে না। যাঁকে পত্র লেখা যায় তিনি যদি আবার বিশেষ অন্তরঙ্গ হন। সেই সকল কারণে শ্রীমতী মহলানবিশকে লিখিত পত্রাবলীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মসাধনা ও তাহার সম্ভাব্য ফলের কথা বিনা আয়াসেই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার যৎকিঞ্চিৎ এই স্থানে পাঠকবর্গকে পরিবেশন করা হইল।

"আমার জীবনে নিরন্তর ভিতরে ভিতরে একটি সাধনা ধরে রাখতে হয়েচে। সে সাধনা হচ্চে আবরণ মোচনের সাধনা, আমাকে আমি থেকে ছাড়িয়ে নেবার সাধনা।"

এই কয়টি কথায় পরিষ্কার বুঝা যায় রবীন্দ্রনাথের সকল সময় চেষ্টা ছিল দেহাতিরিক্ত আত্মার সম্যক উপলব্ধি করা। দেহসর্ব্বস্ব মানুষের এ সকল কথা মনেই আসে না।

"আমার নিজের মধ্যেই বড়ো আছে যে দ্রষ্টা, আমার নিজের মধ্যেই ছোট হচ্চে, যে ভোক্তা। এই দুটোকে এক করে ফেল্লে দৃষ্টির আনন্দ নষ্ট হয়, ভোগের আনন্দ দুষ্ট হয়।"

জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রভেদ জানিতে কবির জীবনে বিশেষ বিলম্ব ঘটে নাই।

"জীবনের এই মিলনটিই তো খুঁজি করার চিরবহমান নদীধারায়, আর হওয়ার চিরগম্ভীর মহাসমুদ্রে মিলন।"

জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় সাধনেই কবির জীবনে সার্থকতা আনিবার চেষ্টা হইয়াছিল, এবং সে চেষ্টা যে ফলবতী হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

"পরম দুঃখ বেদনার সময়েই আমি চোখের জলের ভিতর দিয়ে আরো স্পষ্ট করে দেখতে পাই সে দুঃখকে অতিক্রম করে যে চিরালোকিত মুক্তির দিগন্ত রয়েছে।"

দুঃখ বেদনার ভিতর দিয়াই যে শ্রীভগবানের অসীম করুণা উপচিয়া পড়ে তাহা সাধক কবি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

"যখন বাইরে থেকে আমরা খালি হাতে অন্তর্যামীর কাছে যাই তখনই ভিতর থেকে সেই হাত ভরে দেওয়া তাঁর পক্ষে সহজ হয়।"

সব ত্যাগ না করিলে শ্রীভগবানকে পাওয়া যায় না এ কথা কবি অন্তরে বুঝিয়াছিলেন। উপনিষদের বাণী "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" তাঁহার হৃদয়ে গভীর দাগ কাটিয়া দিয়াছিল।

"আত্মপ্রকাশের দুষ্কর পালা এখন শেষ করলেই হয়— এখন আত্ম সমর্পণের সময় এল।"

নিজেকে জাহির করিলে সুখ্যাতি মেলে, কিন্তু শান্তি মেলে না। নিজেকে নিঃশেষ করিলে তবে শান্তি পাওয়া যায়—এ কথা কবির বুঝিতে দেরী হয় নাই।

"বয়স যথেষ্ট হয়েছে, একথা পাছে অহঙ্কারবশতঃ ভুলে যাই এই জন্যে মধুসূদন আমার শরীরটাকে ঝাঁকানি দিয়ে রাখেন। মোটের উপর ওটাতে উপকারই হয়—প্রস্তুত হয়ে থাকি।"

মায়া প্রপঞ্চে মানুষ ভুলে থাকে। শ্রীভগবানের দিকে ফিরেও তাকায় না। আঘাত দিয়ে তিনি মানুষের ভ্রান্তি দূর করেন, তার মুখ ফিরিয়ে দেন। আস্তিক কবি এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন।

"করা" ও "হওয়ার" মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিলেই সাধক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। দুঃখকে এড়িয়ে না গিয়া দুঃখের ভিতর দিয়া উহার পারে পৌঁছান সাধক জীবনের উদ্দেশ্য। অনাসক্ত মানুষই শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করে। আত্মোপলব্ধির জন্য পুরুষকারের কাজ যেখানে শেষ হয়, আত্মসমর্পণের পালা সেইখানে আরম্ভ। দ্বৈত সাধনার মধ্য দিয়া মানুষ যখন অদ্বৈততত্ত্বে উপনীত হয় তখনই তাহার সাধনার সিদ্ধি; খণ্ডের ঘর থেকে অখণ্ডের ঘরে প্রবেশ। প্রবর্ত্তকের জীবন শেষ করিয়া মানুষ সাধকের জীবন সুরু করে, তখনই তাহার সত্যানুভূতি আরম্ভ হয়, এবং সে বুঝিতে পারে "নিজ নিকেতনে" যাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। সে প্রস্তুতি দুঃখের নহে, আনন্দের। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই সকল অবস্থাই উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহার উক্ত বাক্যগুলিতেই প্রকাশ।

সত্য ও সুন্দরের পূজারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি একদিন ক্যালিম্পঙে দার্শনিকপ্রবর মহেন্দ্রনাথ সরকারকে বলিয়াছিলেন—"আমি সত্যকে জীবনের ভিতর দিয়ে বুঝতে চাইছি, এবং তাকে আনন্দরূপেই বুঝেছি। এই আনন্দ কোন ভাবের উদ্বেলতা নয়, এ শান্ত আনন্দ, শান্তির প্রতিষ্ঠা হলেই এর সঞ্চার হয় হৃদয়ে।" ঐ সময় তিনি আরও বলেন—"সত্যের ভিতর দিয়ে আনন্দের অনুভূতি কেবল সাধক হৃদয়েই হয়ে থাকে। ....সৃষ্টি আনন্দেরই বিকাশ, এর মধ্যে তিনি নিজেকে এত জড়িয়ে দিয়েছেন যে সেইটুকুই উপলব্ধি হলে আমাদের অন্তরে আর দৈন্য থাকে না। আমরা আনন্দে নিমজ্জিত হই। এর ভিতর দিয়েই তাঁর অপরিমেয়ত্বের আস্বাদ করি।"

সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার আনন্দরূপে প্রকাশ রবীন্দ্রনাথ নিজ হৃদয়ে সর্ব্বদা অনুভব করিতেন। তাঁহার কবিতার মধ্যে ইহার প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি নিজেই এক স্থানে বলিয়াছেন—"স্রষ্টার অপরিমেয়ত্ব একটা "নেগেটিভ" কিছু নয়। উহা পরিপূর্ণতা জ্ঞাপক। নেতি নেতি নয়— অন্ত হীন ইতি।" রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই শূন্যবাদী ছিলেন না। তিনি কায়মনোবাক্যে ছিলেন পূর্ণতার উপাসক। কি ব্যক্তিজীবনে, কি সমাজজীবনে, কি অধ্যাত্মজীবনে তিনি ইতিবাদেরই অনুশীলন করিয়া গিয়াছেন, নেতিবাদের পক্ষপাতী কখনই ছিলেন না। প্রথম স্বদেশী আন্দোলনে অন্তরের সহিত যোগ দিয়াও, মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ বোধ হয় নেতিবাদে বিতৃষ্ণা।

সত্যের স্থান নির্ণয় করিতে গিয়া কবি একস্থানে বলিয়াছেন—"জ্ঞান যেখানে কর্ম্মকে প্রেমের পথে উদ্বোধিত করে সত্য সেইখানেই।" শুধু কথায় নহে, কার্য্যেও তিনি

আজীবন সত্যানুসন্ধান ও সত্যোপলব্ধির চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। সত্যের জন্যই তাঁহার জ্ঞান ও প্রেমের সাধনা।

"কৈশোরকে" কবির মনে প্রেমের উন্মেষ হইয়া যে প্রশ্ন জাগে—

"সখি ভালবাসা কারে কয়?
সে কি কেবলি যাতনা ময়?
তাহে কেবলি চোখের জল?
তাহে কেবলি দুঃখের শ্বাস?
লোকে তবে করে কি সুখের তরে
এমন দুঃখের আশ?

"নৈবেদ্যতে" গিয়া এই প্রশ্নের সমাধান হয়:—

"যত বিশ্বাস ভেঙে ভেঙে যায় স্বামী,
এক বিশ্বাস রহে যেন চিতে লাগিয়া,
যে অনল তাপ যখনি সহিব আমি
দেয় যেন তাহে তব নাম বুকে দাগিয়া।"

"গীতাঞ্জলি"তে সেই প্রেমের যখন পূর্ণতা লাভ হয় তখন কবি গাহিয়া উঠেন:—

"যা দেখেছি যা পেয়েছি
তুলনা তার নাই।"
এবং
"বিশ্বরূপের খেলাঘরে
কতই গেলেম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলেম
দু'টি নয়ন মেলে।
পরশ যাঁরে যায় না করা
সকল দেহে দিলেন ধরা।"

এই ভাবে জ্ঞান ও প্রেমের সাধনায় অগ্রসর হওয়ায় নববধূর মুক্তিহীন প্রাণের যাতনা হইতে অত্যাচারিতের মূক বেদনা পর্য্যন্ত তাঁহার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া নব নব ছন্দে প্রকাশ পাইয়াছে। সকল রকমের দুঃখ যন্ত্রণা, হর্ষ বেদনা তাঁহার কবিতা, নাটক ও উপন্যাসগুলিতে মূর্ত্ত হইয়াছে। এ কথা তিনি নিজেও বলিয়াছেন—"মানুষের বেদনাবোধ তীব্র হলে এ জগতের অন্তরালে রূপ রস শব্দের কত কত না প্রকাশ দেখতে পায়।" "জ্ঞান ও প্রেমে আমিত্বের প্রসার"—তাঁহারই কথা।

অধ্যাত্মচেতনার চরম ফল একাত্মতাবোধ। কবির সেই একাত্মতাবোধ জন্মিয়াছিল বলিয়াই কাহারও কোনরূপ কষ্ট দেখিলে তিনি অস্থির হইয়া উঠিতেন। সমগ্র মানবসমাজকে তিনি আত্মীয় জ্ঞান করিতেন। কোন দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার দেখিলে তাঁহার লেখনী গর্জ্জন করিয়া উঠিত। স্ব-জাতির প্রতি মিথ্যা অপবাদের তীব্র প্রতিবাদ করিতেও তিনি পশ্চাৎপদ হইতেন না। তিনি অনেক সময়ই বলিতেন—"সৃষ্টির শাশ্বত বাণী ভালোবাসি।" এই ভালোবাসার মধ্যে কিন্তু তাঁহার কোন মোহ ছিল না। তাই অতি প্রিয়জনের মৃত্যুতেও কেহ কখনও তাঁহাকে কাতর দেখে নাই। অন্তরে তিনি বৈরাগীই ছিলেন। দার্শনিক মহেন্দ্রনাথ সরকার কবির সম্বন্ধে এক স্থানে বলিয়াছেন—"কবির সঙ্গে আলাপে দেখলাম তিনি পরিমেয়ের ভিতর অপরিমেয়কে দেখতে পেয়েছেন, এবং পরিমেয়ের অতীত হয়েও তাঁর নিজের ভিতর উদাসীনতার স্বরূপ ধরা পড়েছে।"

ঋষি কবির জ্ঞান সাধনার আভাস পাওয়া যায় তাঁহার বক্তৃতা, প্রবন্ধ এবং বিবিধ গদ্য রচনার মধ্যে। মানুষ যে এত বিষয়ে এত রকম জ্ঞান আহরণ করিতে পারে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। রবীন্দ্রনাথ যখন যে বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন তাহা সাহিত্যই হউক, দর্শনই হউক, ভাষাতত্ত্ব বা বিজ্ঞানই হউক; ইতিহাস, রাজনীতি বা সমাজনীতিই হউক তাহাতেই তাঁহার বিশ্লেষণ শক্তির পরমোৎকর্ষ, অতীব সূক্ষ্ম দৃষ্টি, এবং মনের অবাধ বিচরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার চিন্তার বৈশিষ্ট্য সকল স্থলেই পরিস্ফুট। সর্ব্বত্রই তাঁহার ব্যক্তব্যের সহিত ব্যক্তিত্বের অপূর্ব্ব সংযোগ। সেইখানেই তাঁহার জ্ঞান-সাধনার সিদ্ধি।

রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম সাধনার পরিবেশেই মানুষ হইয়াছিলেন। ব্রহ্ম সাধনাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। তাই এই সাধনায় প্রণবের অপরিমেয় শক্তি অনুভব করিয়া অধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ সরকারকে বলিয়াছিলেন—"প্রণবের এরূপ শক্তি আছে। এজন্য ঋষিরা একে ব্রহ্ম প্রতীক বলেছেন। ব্রহ্ম-সাধন রূপে প্রণবের অসীম শক্তি। যদি মনকে এর সঙ্গে যোগ করিয়ে দেওয়া যায় তবে খুব সহজেই মন অনুভূতির উচ্চ গ্রামে অধিরোহণ করে। আমাদের মধ্যে স্বাভাবিক একটা প্রেরণা ও বেগ আছে ঊর্দ্ধচেতনার দিকে অগ্রসর

হবার, প্রণব সেই ঠিক পথে চালিত করে নিয়ে যায়। শ্রুতি বলেছেন—প্রণব হল ব্রহ্মকে বিদ্ধ করার ধনু।"

রবীন্দ্রনাথ এ ধনুর সম্যক ব্যবহার করিয়াছিলেন এ অনুমান অসঙ্গত নহে। কারণ তাঁহার জীবনের ব্রহ্মোপলব্ধির অমৃতময় ফল দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার লেখনীর মুখেও সে কথা অনেকবার প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—"ব্রহ্মজ্ঞান ও সংসার—দুয়ের সমাধানে আত্মার স্থিতি। এই পূর্ণতার স্বীকার ওঁ।" শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে প্রণবকে "ব্রহ্মোডুপ" বা ব্রহ্ম লাভের ভেলা" বলা হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রও বলেন—ওঁকার সহায়ে পরম ব্রহ্মের ধ্যানকারিগণ ক্রমমুক্তি লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনে সে মুক্তির নিদর্শন দেখা গিয়াছে। কবি তাঁহার জীবনে যত শোক পাইয়াছেন, যত আর্থিক ক্লেশ ও দৈহিক বা মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, তাহার বাহিক প্রকাশ কখনও দেখে নাই। "যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে" গীতার একথা সত্য হইলে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মোস্থিতিও সত্য।

অধ্যাত্ম জীবন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিতেন—"অধ্যাত্ম জীবনের স্থিতি জ্ঞান ও আনন্দে। জ্ঞান যেখানে নিরঙ্কুশ, আনন্দ যেখানে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, অধ্যাত্ম জীবনের সেই হচ্ছে সুষ্ঠু প্রকাশ। অপরিমেয় সত্তার মধ্যে অনুদ্বেল আনন্দ তখন আমাদের পূর্ণ করে। এরূপ স্থিতিই ব্রাহ্মী স্থিতি। ব্রহ্মবিদের আনন্দ এই অসীমকে প্রকাশ করা, এই অনন্তের সুরে মিলিয়ে নেওয়া ব্রহ্মচর্য্য। জ্ঞানে, প্রেমে, কর্ম্মে ভূমার প্রতিষ্ঠা ইহার লক্ষ্য।"

রবীন্দ্রনাথের জীবনধারা বহুমুখী প্রতিভাত হইলেও তাঁহার লক্ষ্য ছিল স্থির। তাই তিনি জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্ম্মে ভূমার প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অনুদ্বেল আনন্দেই সর্ব্বদা তিনি মগ্ন থাকিতেন। যাঁহারা তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন কবির কথার মধ্যে রস ঝরিয়া পড়িত। অমন অনাবিল রসিকতা কদাচি দেখা যায়। কবির মনের মধ্যে যে আনন্দের উৎস ছিল তাহা তাঁহার গানে, কবিতায় ও কথোপকথনে সর্ব্বদা প্রকাশ পাইত। অধিকন্তু তাঁহার মনের কোণে কোন অতৃপ্তি বাসা বাঁধে নাই। পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে তাঁহার হৃদয় ভরা ছিল। কালিম্পঙে সাক্ষাৎকার সময়ে মনস্বী মহেন্দ্রনাথ সরকারকে তিনি বলিয়াছিলেন—"দেখ, ডাক তো পড়েছে, এবার যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁকে গিয়ে বলব, খুব সুখী হয়ে এসেছি যেখানে পাঠিয়েছিলে, অন্তর ভরে গেছে, হৃদয় তৃপ্ত হয়েছে, কিছু নালিশ করবার নেই।" সেই সময় শ্রীমতী সরকারকেও তিনি বলিয়াছিলেন—"ডাক এসেছে, সর্ব্বস্ব দিয়ে রিক্ত হয়ে পথের প্রতীক্ষায় থাকব।" সাধক না হইলে এ কথা কে বলিতে পারে? এমন পরিতৃপ্তি আর কাহার অন্তরে দেখা যায়? যিনি সর্ব্বস্ব শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়াছেন, নিজের বলিতে কিছু আর রাখেন নাই, তিনিই শুধু একথা বলিতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথ বলিতেন—"আধ্যাত্মিকতা আমাদের অসাড়তা ঘুচিয়ে দেয়।" কবির জীবনেও অসাড়তা কোন দিনই দেখা যায় নাই। প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে তিনি উঠিতেন। পূর্ব্বাস্য হইয়া খোলা জানালার ধারে স্থিরভাবে বেশ কিছুকাল বসিয়া থাকাই ছিল তাঁহার প্রাত্যহিক অভ্যাস। অসুস্থ অবস্থাতেও অনেক সময় তাঁহাকে এইভাবে বসাইয়া দিতে হইত। এই অভ্যাস অব্যাহত রাখিবার জন্যই মংপুতে তাঁহার বাসের ঘর বদল করিতে হইয়াছিল। সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত তিনি ধ্যানস্থ হইয়া একই ভাবে স্থিরাসনে বসিয়া থাকিতেন। তিনি নিজেই এক স্থানে বলিয়াছেন—"ভোরবেলা উঠে বসে থাকি, অপেক্ষা করে থাকি কখন আমার আকাশের মিতা আসবে, আমায় আলোর ধারায় স্নান করিয়ে দেবে। কি করে এ নামের ঐক্য হল জানি নে, আমি যে আলোর পূজারী, সূর্য্যোপাসক।"

এইরূপ অবস্থানের প্রতিচ্ছবি মৈত্রেয়ী দেবী একস্থানে দিয়াছেন—"আজ মনে পড়ে তাঁর সেই ভোরবেলাকার শান্ত সমাহিত মূর্ত্তি। দুই হাত কোলের কাছে জড়ো করা ভোরবেলাকার আলো গায়ে এসে পড়েছে। সামনের সমস্ত দৃশ্যপট ছাড়িয়ে অদৃশ্যে নিবদ্ধদৃষ্টি।" ভারতীয় যোগীদিগের খেচরী মুদ্রার ইহা একটি নিখুঁত চিত্র।

কবি শুধু ধ্যানমগ্ন ঋষিই ছিলেন না, ছিলেন অদ্ভুত কর্ম্মী পুরুষও। তাঁহার জমিদারিতে কৃষকদিগের জন্য ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা তিনিই সর্ব্বপ্রথম করেন। তাঁহার কৃষক প্রজারা যাহাতে অল্প ব্যয়ে অধিক লাভ করিয়া স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করিতে পারে [illegible]

আলু চাষের প্রবর্তন করেন। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তাঁহার কর্ম্মজীবনের আর এক দিক। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা তাঁহার অতুল কীর্ত্তি। বিশ্বের সকল জাতিকে জ্ঞান ও সংস্কৃতির বন্ধনে বাঁধিবার প্রয়াস তাঁহার অতুলনীয়। ইহার জন্য ভিক্ষাপাত্র হস্তে সকল দেশের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেও তাঁহার কোন কুণ্ঠা বোধ হয় নাই। ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়াও বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে দূরদূরান্তে যাইতেও তাঁহাকে দেখা গিয়াছিল। যাহা কর্ত্তব্য মনে করিতেন, শত বাধা সত্ত্বেও তাহা সম্পন্ন করিতে কোনও দিন পশ্চাৎপদ হইতেন না। পরিশ্রমে তিনি কখনও কাতর ছিলেন না। শ্রীমতী মহলানবিশকে লিখিত ৪।৮।৩৮ তারিখের পত্রে কবি লিখিয়াছিলেন—"আমার কর্ম্মধারা সকালে আরম্ভ হয়, শেষ হয় অপরাহ্ণ পাঁচটায়। আমার বিধাতা বছরে বছরে আমার বয়স বাড়াবার কাজে একদিনেও কসুর করেন নি, কিন্তু কাজ কমাবার দিকে অন্যমনস্ক।" বিশ্রাম সুখ কাহাকে বলে তিনি জানিতেন না। কিছু না করিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকিতে জীবনে তিনি অনেকবারই চাহিয়াছিলেন। ছুটির আনন্দ উপভোগ করিবার আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁহার প্রবল। সে কথা তিনি অনেকবারই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে ছুটি মেলে নাই। অসুস্থ হইয়া পড়ার আশঙ্কায় তাঁহার আত্মীয় স্বজন যদি কোন কাজে কখনও বাধা দিত তিনি বিশেষ বিরক্ত হইতেন। তাঁহার সেই বিরক্তি প্রকাশ পাইত মৌনী হইয়া কাজে মগ্ন থাকায়। কর্ম্মে তাঁহার ঈদৃশী নিষ্ঠা ছিল। নামযশে আসক্তি ছিল না বলিয়াই তিনি এত কাজ করিতে পারিয়াছিলেন। লেখাও তাঁহার একটা কম কাজ ছিল না। পৃথিবীতে আর একজনও লেখক দেখিতে পাওয়া যায় না যিনি রবীন্দ্রনাথের মত একাধারে কবি, প্রবন্ধ লেখক, সঙ্গীত রচক ও চিত্রশিল্পী, ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্প লেখক। এত বিভিন্ন বিষয়ে এরূপ বিপুল সংখ্যক পুস্তক আর কেহ লিখিয়া গিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই, অনুবাদ কার্য্যেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কর্ম্মযোগী ব্যতীত এরূপ কাজ আর কে করিতে পারে?

অধ্যাত্ম শিক্ষাই মানুষের চরম শিক্ষা। ভারতের প্রাচীন ঋষিদিগের এই সত্যবাণী রবীন্দ্রনাথ মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন। তাই একস্থানে তিনি বলিয়াছেন—"অগ্নি, বায়ু, জল, স্থল, ও বিশ্বকে বিশ্বাত্মা দ্বারা পূর্ণ করিয়া দেখিতে শেখাই যথার্থ শেখা।" তাঁহার সে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়াই জীবনে তাঁহার জ্ঞান, ভক্তি, ও কর্ম্মের সমন্বয় সাধন করিয়া অমৃতের অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন—

চৈতন্যের পুণ্যস্রোতে
আমার হয়েছে অভিষেক
অমৃতের আমি অধিকারী।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—রবীন্দ্ররচনাবলী, দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীমতী নির্ম্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত পত্রাবলী, আনন্দবাজার পত্রিকা (পূজাসংখ্যা), মাসিক বসুমতী, উদ্বোধন প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা এবং যে সকল পুস্তক হইতে এই প্রবন্ধের উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে তাঁহাদের লেখক ও প্রকাশকদিগের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীমহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পতিতা ও পতিতপাবন

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বারো

প্রখ্যাত ধর্মশালা মোদিভবনে এসে পৌছতেই রক্ষক রামলাল অসিতকে প্রণাম ক'রে সসম্ভ্রমে নিয়ে গিয়ে তিনতলায় পৌছে দিয়ে চা আনছি ব'লেই প্রস্থান। ভীম মুটেকে অসিতের সুটকেশ ও বিছানা ঘরে রাখতে হুকুম দিয়ে অসিতকে বলে: "একটু বোস ভাই, আমি তাকিয়া এ দোসাই নিয়ে এলাম ব'লে।"

অসিত একটি আরাম কেদারা টেনে নিয়ে জানলারকাছে বসে। নিচে অশ্রান্তকল্লোলিনী নীলাঞ্চলা গঙ্গা চলেছেন তেমনিই গান গেয়ে। অসিত ইতিপূর্বে দুবার মোদিভবনে এসে ছিল এই ঘরটিতেই—প্রথমবার তিনদিন, দ্বিতীয়বার সাতদিন। রামলাল অসিতের গানের বিষম ভক্ত ব'লেই অসিতের পক্ষে এ ঘরটি পাওয়া এত সহজ হয়েছিল। এ ঘরটিতে বসবামাত্র ওর মন নিটোল শান্তিতে ভরপুর হয়ে উঠত—লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, আগ্রা সর্বত্রই গান গেয়ে ক্লান্তির পরে বিষাদবৈরাগ্য ওর মনকে যেন চেপে ধরত। কেবল হরিদ্বারে গঙ্গাতীরে এই ঘরটিতে বসতে না বসতে ওর মনের প্রাণের যেন পটপরিবর্তন হ'ত।

অসিত মুগ্ধনেত্রে চেয়ে চেয়ে দেখে···কী অপরূপ! গঙ্গা তাপহারিণী, পাপনাশিনী একথা ওর মন ছেলেবেলায়ই মেনে নিয়েছিল স্বভাবে সংশয়ী হওয়া সত্ত্বেও। হিমালয়ের দৃশ্য ওর ভালো লাগত বৈ কি, কিন্তু হিমালয়ে অনেক যোগী ঋষি তপস্বী মুক্তিস্বাদ পেয়েছেন একথা আশৈশব শুনে এলেও ও মুক্তিস্বাদ পেত কেবল গঙ্গাতীরে এসে বসলে···কানপুরের গঙ্গা, ভাগলপুরের গঙ্গা, পাটনার গঙ্গা, শ্রীরামপুরের গঙ্গা—সর্বোপরি দক্ষিণেশ্বরের ও হরিদ্বারের গঙ্গা—"নীলধারা"! গঙ্গার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে কেবলই মনে হয় যেমন বরাবরই মনে হ'ত—যেন গঙ্গাতীরেই ওর ইহলীলা সাঙ্গ হয়—আর কোথাও না। তীর্থস্থানে ওর মন খুসি হ'ত, কিন্তু নির্ভেজাল শান্তি পেত কেবল গঙ্গাতীরে—হরিদ্বারে আর দক্ষিণেশ্বরে, আর কোথাও না।

আথালি পাথালি কত চিন্তাই যে ভিড় ক'রে আসে··· বিশেষ ক'রে মনে হয় আজ ভীমদার কথা। সত্যিই ভীমদা বদ্‌লে গেছে ভাবতে কেমন যেন একটু মন ব্যথিয়ে ওঠে, অথচ আশ্চর্য—সেই সঙ্গে আনন্দেরও মিশাল আছে! ভীমদা গুরুবরণ ক'রে সত্যি কিছু যে পেয়েছে তাহাতে আনন্দ···আবার সংসার থেকে দূরে স'রে গেছে ভাবতে ব্যথা। মৃদু হেসে নিজেকে ধমকায় 'You can't both eat your cake and have it my boy!—সংসারী হ'য়ে বাজে কাজে কাজে কথায় বাজে হর্টু সাথীদের সঙ্গে বাজে অট্টরব ক'রে চলব অথচ শান্তিসিদ্ধও হব—এ কেমন আবদার?" বলতে বলতে একটি স্বরচিত গান ওর মনে গুনগুনিয়ে ওঠে:

মিছে কাজে রেখে জড়ায়ে
কেন করো এ-ছলনা বন্ধু, বলোনা—মায়ার খেলায় ভুলায়ে?

সত্যি, এদিকে কর্ম না ক'রে নাকটিপে ব'সে আসন প্রাণায়াম ধ্যান ধারণায় মন বসাতেও পারে না, ওদিকে কর্মের মধ্যে সাময়িক খুশখেয়ালী ছুটি পেলেও অচলা শান্তিরসে রসিয়ে উঠতেও পারে না! ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ। মন সময়ে সময়ে তৃষিত হ'য়ে ওঠে শান্তি সমুদ্রে ডুব দিয়ে ভক্তি মাণিকের বর পেতে। ভক্তি? না মুক্তি? নাঃ, ভক্তিই পরমধন—বস্তুলাভের পথ। কিন্তু হায় রে,

শুদ্ধা ভক্তি, স্থায়ী ভগবৎপ্রেম কি চাট্টিখানি কথা? পরমহংসদেবের একটি প্রিয় গান মনে পড়ে:

আমি ভক্তি দিতে কাতর নই, শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই।
আমার ভক্তি যেবা পায়, তারে কেবা পায়?
সে যে সেবা পায় হ'য়ে ত্রিলোকজয়ী!

তাই তো ও জ্ঞানদীপ না চেয়ে ভক্তিপ্রার্থী। কিন্তু প্রার্থনা করলেই কি সব কিছু পাওয়া যায়? কখনো কখনো ঠাকুর সাড়া দেন বটে, কিন্তু প্রায়ই হাত গুটিয়ে মুখ ফিরিয়ে থাকেন না কি? এই নিয়ে ভাগলপুরে ভীমদা ও মাসিমার সঙ্গে কতবারই আলোচনা হয়েছে। মাসিমা বলতেন: "ভক্তি পেতে হ'লে সব আগে চাই চিত্তশুদ্ধি, আর চিত্তশুদ্ধি হয় না কিছুতেই যদি গুরুকরণ না হয়।" ভীমদা মানত না একথা—স্বভাবে স্বাবলম্বী বেপরোয়া বীরপুরুষ চাইত নিজের পায়ে দাঁড়াতে। সেই ভীমদার আজ এ কী অবস্থা! শ্যামলী বলেছিল কেঁদে: "বাবা গুরু পেয়ে শুধু যে আমাদের ভুলে গেছেন তাই না, মাকেও ভুলে গেছেন—ঠাকুমা লিখেছেন।"

একথা যদি সত্যি হয় তবে গুরুশক্তিকে না মেনে উপায় কি? ভীমদা—যে ছিল বৌ-অন্ত-প্রাণ—কেমন ক'রে দুতিন বৎসরের মধ্যেই ভুলে গেল "আদরিনী গৃহলক্ষ্মীকে"? ওর মুখে সত্যিই তো বিষাদের চিহ্নও নেই আর। অসিতের সাধ জাগে ভীমদার গুরুদেবকে দেখবার। অথচ ভয় ভয়ও করে আবার: যদি ধরো, মন একেবারে বদ্‌লে যায়? অমনি হাসি আসে: হায় রে হায়! যে-অশান্ত মন নিয়ে ঘর করল এতদিন, তার এমনই কী মহামহিমা যে, তার বদল হবে ভাবতে এত ভয়? সব আগে স্থায়ী শান্তি, নিটোল ভক্তি—তার পরে তো আর সব। যদি গুরুকৃপায় মনে ভক্তি জাগে, প্রাণে শান্তি নামে তবে আর চাই কি? কিন্তু ভীমদা কি সত্যি শান্তি ভক্তি পেয়েছে?

এমনি সময়ে ভীমের প্রবেশ, পিছনে রামলাল উভয়ের হাতে চা দোসাই তাকিয়া… ‥

ভীম দিলখোলা তারস্বরে বলে…ছেলেবেলায় পড়েছিলাম—

অ—অজগর আসছে তেড়ে,
বা—জাপানি জাপি খাব পেড়ো

অথ ভীমসেনস্য ভাষ্যম্—

চ—চা-য়ে হই চাঙ্গা বেড়ে!…হা হা হা!

তেরো

ভীম চা খেতে খেতে সুরু করে: "বৌ যখন আমাদের মায়া কাটিয়ে চ'লে গেল 'to that undiscovered country from whose bourne no traveller returns'—তখন—" বলতে বলতে চোখ মুছে: "কিন্তু থাক সে কথা—কারণ তোকে কেমন ক'রে বোঝাব সে কী যন্ত্রণা—তুই বুঝবিই বা কেমন ক'রে, গৃহলক্ষ্মী কী বস্তু না জেনে? কোনো দুঃখেরই তল পাওয়া যায় না শুধু কল্পনার লগি দিয়ে। তাই শুধু এইটুকু ব'লেই থামি—আমার চোখে সোনার আলোও হ'য়ে গেল যেন মিশ কালো। উঠতে বসতে চলতে ফিরতে কেবলই তার স্মৃতি পিছু নেয় দৌড়ে-চলা ছায়ার মতন।" কণ্ঠস্বর পরিষ্কার ক'রে: "শেষে স্থির করলাম গঙ্গায় ডুবে মরাই ভালো—তাহ'লে আত্মহত্যার পাপ কেটে যাবে মা-র কোলের স্পর্শে। এক মস্ত কলসী নিয়ে মাঝদরিয়ায় গিয়ে গলায় ক'ষে বেঁধে ডিঙি থেকে ঝাঁপ দিলাম জলে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে কী আতঙ্ক রে ভাই! চেঁচিয়ে উঠলাম ডুবতে ডুবতেই: 'বাঁচাও বাঁচাও ঠাকুর।' তারপর আর কিছু মনে নেই। পরে শুনলাম আমার চীৎকার শুনে পাশের এক মোটর বোট থেকে এক বৃদ্ধ সাধু জলে ঝাঁপ দিয়ে আমার লম্বা চুল ধ'রে টেনে তুলেছিলেন। কিন্তু আমি তখন অজ্ঞান। যম ঘেঁষে বেঁচে যাওয়া যাকে বলে।

"জ্ঞান হ'লে দেখি—আমার ত্রাতা বন্ধু হাসিমুখে আমার মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে মালা জপ ক'রে চলেছেন। অপরূপ কান্তি! আর মুখে সে কী আলো! ভাগলপুরে তাঁর এক প্রিয় শিষ্যের সংকট অসুখ শুনে এসেছিলেন তাঁর হিমালয়ের আশ্রম থেকে। শিষ্যটির ফাঁড়া কাটলে পর তাকে নিয়ে রোজ সাঁঝসকালে গঙ্গায় তার মোটর বোটে বেরুতেন।

তার মুখে শুনলাম মহাত্মাজির নাম স্বামী দীনদয়াল। মুঙেরে জন্ম। বাপ বিহারী, মা বাঙালী। কাজেই মাতৃভাষা বাংলা আর পিতৃভাষা হিন্দি দুইয়েই সব্যসাচী—যাকে বলে। তার উপর কবি—হিন্দি ভজন ও বাংলা কীর্তন দুই-এই সমান কৃতী—অন্ততঃ জনশ্রুতির এজাহারে।

শিষ্যরা তাঁকে ডাকে গুরুজি বা গুরুদেব, বাকি সবাই—"দয়াল মহারাজ।' ভাগলপুরে তাঁর যে শিষ্যটিকে বাঁচাতে তিনি দেবপ্রয়াগ থেকে এসেছিলেন তার মুখে শুনলাম তাঁর অপার করুণার কথা—আরো কত কী……

"যাহোক আমাকে তিনি তুললেন আমার আটচালায়। মা তাঁকে দেখেই চম্‌কে চীৎকার ক'রে উঠলেন: তাঁকেই তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন তুদিন আগে। ব'লেই চোখের জলে নদী বইয়ে দিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। বললেন 'আপনি আমাকে মন্ত্রও দিয়েছিলেন গুরুদেব!"

"আমার মনে হঠাৎ সংশয়কীট ঢুকল কোত্থেকে যে! আমি একেবারে মুখফোঁড় হ'য়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম মার স্বপ্ন সত্য, না মনগড়া। দয়াল মহারাজ মৃদু হেসে বললেন: "কৃপা অনেকেই পায় স্বপ্নে—মনগড়া হবে কেন?" ব'লেই আমাকে থামিয়ে মাকে আশীর্বাদ ক'রে বললেন: তুমি ভুল দেখনি মা। আর আমি তোমাকে তোমার স্বপ্নে কী মন্ত্র দিয়েছিলাম—বোসো—ব'লেই একটা কাগজে খস খস করে কী লিখলেন। তার পরে সেটি মুড়ে আমার হাতে দিয়ে মা-কে বললেন: এবার বলো।' মা বললেন মন্ত্রটি, বারো অক্ষরের। দয়াল মহারাজ আমাকে কাগজের মোড়কটি খুলতে বললেন। খুলেই আমার চক্ষুস্থির, অবিকল সেই মন্ত্র! ভেউ ভেউ করে কেঁদে ক্ষমা চাইলাম। তিনি বললেন হেসে: 'এ যুগই সংশয়ীর যুগ বাবা, তোমার অপরাধ কি?' বলে মাকে দীক্ষা দিলেন বিধিম'ত—তুদিন পরে। আমি দীক্ষা নিয়েছিলাম পরে—দেবপ্রয়াগে। দীক্ষা নেওয়ার পরে শুনলাম তাঁর শ্রীমুখে যে আমাদের দীক্ষা নেওয়া ছিল ভবিতব্য। বলে না—কপালং কপালং কপালং মূলম্? আমি এ ক্ষেত্রে শুধু জুড়ে দিতে চাই—'জোর কপাল।' কেন 'জোর' বিশেষণটিকে তলব করলাম পরে বুঝবি—তোকে না বুঝিয়ে ছাড়ব ভেবেছিস নাকি?"

অসিত বলল, "বোসনা ভীমদা। আগে বুঝি তোমার তিন মেয়ের কী ব্যবস্থা হ'ল? মানে, তাদের বিয়ের খরচপত্র জোগাড় হ'ল কেমন ক'রে? লোক মুখে অবিশ্যি শুনেছি কিছু, কিন্তু খোদ তোমার শ্রীমুখে না শুনলে ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"এতে বোঝাবুঝির কী আছে? বৌ থাকতেই শ্যামলী ও চামেলীর বিয়ের পাকা কথা হয়ে গিয়েছিল। বৌ-এর গহনাও ছিল দশ-বারো হাজার টাকার, তার উপর আমার বিচক্ষণ কাকা আমার অছি হ'য়ে ব'সে আমার তুটি আটচালাই কিনে নিলেন সাত হাজার টাকায়—হ্যাঁ হ্যাঁ জলের দরেই বৈ কি। আমার বন্ধুরা সবাই আমাকে পই পই ক'রে মানা করেছিল ধুরন্ধর কাকাটিকে বিশ্বাস না করতে। কিন্তু সে সময়ে আমার অশান্ত মন কোনমতে ছাড়া পেতে চাইছিল—যেখানে হোক গিয়ে একটু জুড়োবে। তার ওপর গুরুদেবের টান। তখনো—মানে ভাগলপুরে—জানতাম না অবিশ্যি যে পুরোপুরি বৈরিগি হতে চলেছি। আমার প্রাণ ছটফট করছিল শুধু বৌ-এর স্মৃতির যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে। ভাগলপুরে উঠতে বসতে নাইতে খেতে সব কিছুর সঙ্গেই চোখে ভেসে উঠত তার মুখ, কানে বেজে উঠত তার কণ্ঠ—আর দেহের প্রতি তন্তু যেন চাইত তার স্নেহের ছোঁওয়া। এককথায় তার জীবদ্দশায় যা কিছু ছিল অফুরন্ত আনন্দের রসদ, তার দেহান্তের পর তারি স্মৃতি হ'য়ে উঠল তুঃসহ তুর্ভিক্ষ—শাস্তির চাবুক। সত্যিই আর সইতে পারছিলাম না। তাছাড়া কাকা শ্যামলী ও চামেলীর বিবাহের ভার নিতে রাজী হবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল—এইতো সুযোগ—আর কেন জড়িয়ে থাকা সংসারে? অথ,কাকুর কথায় কান না দিয়ে সোজা চ'লে গেলাম দেবপ্রয়াগে মা-কে নিয়ে। সেখানে পৌঁছবার পরেই যথাবিধি ভাগীরথীতে স্নান করে নিলাম দীক্ষা। বলেছি, মা দীক্ষা আগেই নিয়েছিলেন—মাস খানেক আগে। এখন আমি দীক্ষা নিতে মা ও ছেলে হ'য়ে দাঁড়ালো গুরুভাইবোন। মন্দ মজা নয়, কী বলিস্?

বলে ভুলে-যাওয়া চায়ের পিয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে ভীম ফে'র ধরে গল্পের হারানো খেই:

চোদ্দ

"গুরুদেবের কথা এখন তোকে বলব না কিছুতেই। সইয়ে সইয়ে রে ভাই—তুই যে দারুণ অবিশ্বাসী—ফলিয়ে বললে ভাববিই ভাববি—দি ওল্‌ড্ ওল্‌ড্ স্টোরি—ভীমদা বেচারা সরল তো—তাই রাতারাতি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে সেই সনাতন অতিভক্তির পাণ্ডা। তাই বলি এখন—যা শুনলে তোর সংশয়ী মন শিরপা তুলবে না—তোর মতিগতি

জানি তো হাড়ে হাড়ে। অথ, জেরা রেখে শুধু শুনে যা রে লম্বকর্ণ!

"হরিদ্বার থেকে দেবপ্রয়াগ প্রায় ষাট মাইল। শীত হরিদ্বারে হৃষিকেশের চেয়ে বেশি কিন্তু মারাত্মক নয়। দুটি বিখ্যাত নদীর সঙ্গমে দেবপ্রয়াগ দাঁড়িয়ে: বাঁদিকে ভাগীরথী গঙ্গা–সে পথ ধ'রে চললে পৌছবি উত্তরকাশী হ'য়ে গঙ্গোত্তরী—তারপর উত্তরকাশী থেকে ফের বাঁ দিকে মোড় নিলে পৌছবি যমুনোত্তরী। এ দুটি তীর্থের যাত্রী কম—কারণ পথ দুর্গম। বেশির ভাগ যাত্রী ডানদিকে অলকনন্দা নদীর ধার দিয়ে ধার দিয়ে চ'লে শেষে বিখ্যাত যোশী ওরফে জ্যোতির্মঠ হ'য়ে পৌছয় বদরীনারায়ণ। আজকা'ল বদরীনারায়ণ যাওয়া সহজ হ'য়ে পড়েছে মোটর বাসের দৌলতে—এত সহজ যে তুই-যে-তুই—শীতকাতুরে পথকাতুরে, ভয়কাতুরে—তুইও অনায়াসে পৌছতে পারবি। কিন্তু তীর্থের ইতিহাস থাক—কাহিনীতেই ফিরে আসি।

"গুরুদেব আমাকে ও মা'কে দীক্ষা দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন বদরীনারায়ণ তাঁর এক জোয়ান বিহারী শিষ্য প্রসাদের সঙ্গে। সে আমাদের পরে অনেক দুঃখ দিয়েছিল কিন্তু বদরীর পথে তাকে মুরুব্বি না পেলে হয়ত আমাদের মাঝ-পথ থেকেই ফিরে আসতে হ'ত—বিশেষ করে আমার নিজের আলসেমির জন্যে। মা এজন্যে আমাকে প্রায়ই খোঁটা দেন। তাঁর উৎসাহ দেখে আমি যেমন অবাক হতাম, ধমক খেয়ে হতাম তেম্‌নি লজ্জিত। সত্যি, বদরিনারায়ণে চতুর্ভুজ মহাবিগ্রহের দর্শন পাবেন বলতে না বলতে মা-র চোখে জল ভ'রে আসত। সে ভক্তিকে উচ্ছ্বাস ব'লে নাকচ করা চলে না যে ভক্তি ভাবাবেগে পদে পদে অসাধ্য সাধন করে। শীতে যতই কাঁপুনি আসুক না কেন, মা অলকানন্দায় স্নান করবেনই করবেন। হাজার ক্লান্তি হ'লেও ডাণ্ডি চড়বেন না—প্রতি চটিতে হয় স্বপাক খাওয়া নয় ফলমূলে ক্ষুন্নিবৃত্তি। পথের ক্লান্তি, চড়াই উৎরাই, মশা, পিশু, মাছি কোন উৎপাতই তাঁকে দমিয়ে দিতে পারে নি। কিন্তু এ প্রসঙ্গ এখন থাক—মার মুখেই শুনিস তাঁর আশ্চর্য দর্শনের কথা। এখন ফিরে আসি দেবপ্রয়াগের কাহিনীতে।

"বদরীতে মার অপূর্ব দর্শন লাভের পরে আমরা ফিরলাম প্রসাদজির হুকুমে। মার আরো কিছুদিন বদরীতে থাকার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু হাকিমের হুকুম বরদার না হ'য়ে উপায় ছিল না ব'লেই ফিরতে হ'ল।

"দেবপ্রয়াগে ফিরে গুরুদেবের আশ্রমে বছর দুই কাটতে না কাটতে মন আমার একেবারে বদলে গেল ভাই, সত্যি বলছি। অবিশ্যি একটু একটু করে যে আমি বদলাচ্ছিলাম টের পেতাম সময়ে সময়ে, কিন্তু তবু একটু পিছুটান ছিল —মনে হ'ত মেয়েদের কথা—বিশেষ করে শেফালীর, যাকে মা বলতেন অরক্ষণীয়া—আর মন কেমন করত। কিন্তু আশ্চর্য, মা-র একতিলও ভাবান্তর হ'ত না! সেই যে দীক্ষা নিয়ে কৃষ্ণময়ী নাম নিলেন, তার পর থেকে তিনি পিছুডাকে একটিবারও কান দেন নি। স্বভাবে সাংসারিক না হ'লেও তাঁর ছিল নাত্‌নি—অন্ত প্রাণ, তাই আরো অবাক লাগত। মানুষ বদলায় না কে বলে?" ব'লে হেসে: "দাড়ি গজিয়ে বদলালাম আমি, আর মেমের মতন চুল ছেঁটে বদলালেন মা। একেবারে ষোলআনা বৈরাগিণী। সময়ে সময়ে আমি তাঁকে ঠাট্টা ক'রে 'নেড়ী মা' ব'লে ডাকতাম, পাল্‌টে তিনি আমাকে 'দেড়ে খোকা' নাম দিয়ে শোধ তুলতেন।

"শ্যামলী ও চামেলী মাঝে মাঝে চিঠি লিখে জানাত কাকার নানা শয়তানির কথা। আমার দুঃখ হবে বৈকি, কিন্তু মার কাছে এক ফোঁটাও সহানুভূতি পেতাম না। তিনি উঠতে বসতে আমাকে ধম্‌কাতেন: 'গুরুচরণে শরণ নেওয়ার পরে আর ভুলেও সংসারের পানে ফিরে চাস নে রে অবুঝ—কূলে এসে ভরাডুবি হ'লে আপশোষের অন্ত থাকবে না মনে রাখিস। মনে নেই সেই ভজনটি, আহা কী চমৎকার!' ব'লেই ভীম ধ'রে দেয়:

"তেরে চরণে আয়কে ফির আশ কিসকী
কীজিয়ে?
বৈঠ গঙ্গা কিনারে কৃ্যঁ কুপকা জল পীজিয়ে?

"গুরুদেব এর বাংলা তর্জমা করেছিলেন মার জন্যে:
তোমার শ্রীচরণে শরণ পেয়ে আর দুয়ারে বলো
কার পাতিব হাত?
গঙ্গাতীরে বেঁধে কুটির কোন্ কূপের জলে তৃষা
মিটাব নাথ?"

অসিত মুগ্ধ হ'য়ে বলে: চমৎকার তর্জমা, দাদা! আমি এটি শিখবই শিখব তোমার কাছে। কিন্তু এ কী

ব্যাপার বলো তো? সদ্‌গুরুও কবি হন তাহলে? কেবল একটা প্রশ্ন না ক'রে পারছি না: চিরতৃষ্ণা মেটাতে হ'লে কি একটিমাত্র গুরুকে বরণ না করলেই নয়? ভাগবতে নেই কি—অবধূতের দু'ডজন গুরু ছিল?"

ভীম সভ্রূভঙ্গে বলে: "ফের সুরু হ'ল সেই জেরা, জেরা, জেরা, 'ইনকরিজিবল্‌' কোথাকার!"

অসিত করুণ হেসে বলে: 'দাদা গো! জানোই তো অঙ্গার: শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি * আরো একটা উপমা আছে—কুকুরের লেজের বাঁকা ল সোজা হয় না কিছুতেই।

ভীম ওর কাঁধে চাপড় মেরে বলে: "মা ভৈঃ রে ভাই, গুরুকৃপা যদি একবার তোকে চেপে ধরে তো মারতে মারতে সোজা ক'রে দেবে -সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নের ফেনা বুদ্‌বুদ কাটিয়ে পাবি তৃষ্ণার জল—নির্মল মধুর সুবাসিত?

অসিত হাসে: "ঘাট হয়েছে দাদা, আর জেরা করব না। তবে বিশ্বাস কোরো, পুরী থেকে ছুটে এসেছি তোমাকে অনর্থক জেরা করতে নয়, শুধু দেখতে—গুরুর চরণগঙ্গায় তোমার চিরতৃষ্ণা ঠিক কীভাবে মিটল, কেমন ক'রে। কেবল একটা কথা, রাগ কোরো না ভাই: শ্যামলী, চামেলী, শেফালির জন্যে কি তোমার আর একটুও মন কেমন করে না? না, এমন কোনো দৈবী ছিপি হাতিয়েছ যা কানে আঁটলে পিছু ডাক আর মরমে পশবার পথ পায় না—বাইরেই হাহাকার ক'রে মরে?"

ভীম ভ্রূকুটি ক'রে বলে: "এর নাম বুঝি জেরা নয়? তোকে নিয়ে স'ত্য পেরে ওঠা গেল না। না, তোর এ প্রশ্নের উত্তর এখন দেব না, গল্পটা আর একটু এগুলেই তোর 'সংশয়গ্রন্থি ছিন্ন তথা হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন' হবে—গুরুদেবের ভাষায়।

অসিত হাসল: "সংশয়ীর সংশয় কি অত সহজে কাটে ভীমদা?"

ভীম বলে: "সাধুর কৃপাশক্তি নয়কে হয় করতে পারে রে ভাই, তাই কঠিনও হ'য়ে ওঠে সহজ। অন্ততঃ"—ব'লে হেসে—"আর একটু শুনলে তোকে মানতেই হবে যে শ্রীল শ্রীমন্ত গুরুদাসকে দুঃশীল দুরন্ত সন্দেহবাবু উপহাস ক'রে কাবু করতে পারেন না, পারেন না, পারেন না।"

"আমি হলপ ক'রে বলছি ভীমদা, যে, তোমার মতন সরল বিশ্বাসীর এজাহারকে উপহাস করার মতন সন্দেহ-বাবু আমি নই নই নই। কারণ এটুকু অন্ততঃ আমি মানি মনেপ্রাণেই যে, সরল বিশ্বাসের বৈকুণ্ঠে একান্তী সাধকদের যেসব বিচিত্র অনুভূতি উপলব্ধি হয় তাতে তারা ধন্য হ'তে পারে। 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্' গীতার এ মহাবাক্যকেও আমি বরাবরই গড় ক'রে এসেছি—বিশ্বাস কোরো।"

ভীম আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে বলে: "করি রে ভাই করি। আর তুই নিজেকে যতটা চিনিস আমি তোকে তার চেয়ে অনেক বেশি চিনি ব'লেই তোকে ডাক দিয়েছি, কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস—তোর পথের বেয়াড়া কুয়াশার সবটা না হোক অনেকখানিই কেটে যাবে গুরুদেবের চাহনির সূর্যোদয়ে। দেখ্, কী চমৎকার উপমা এসে গেছে গুরুদেবের ইন্‌স্পিরেশনে! একটা গান শুনবি? গুরুদেবই বেঁধেছিলেন তাঁর গুরুদেবের তর্পণে—"ব'লেই ধরে দেয় ভাবাবেগে:

"এসেছি তোমার দুয়ারে হে গুরু, এসেছি দ্বারে তোমার
আমরা অবোধ শিশু, পিতা তুমি আমাদের সবাকার।

আমরা অন্ধ অজ্ঞান, পড়ি বার বার পথে প্রভু,
বারবার হাত ধরিয়া উঠাও, ফিরে ফিরে পড়ি তবু।
ভক্তের লাজ ভকতবৎসল রাখো তুমি বার বার।

কেমন হরির লীলা জানি না তো—কেমনে লভিব তাঁরে;
"গুরু চায় যে—সে পায় পরমেশে"—গাই সুখঝঙ্কারে।
সব যায় যাক, শুধু গুরু থাক চরণে ঠাঁই তোমার॥
হরি বিমুখিলে শ্রীগুরু মিলায়,
গুরু বিমুখিলে গতি নাই হায়!
এমনি হরির বিধান—গাইল মুনি ঋষি কৃপাধার।"

গাইতে গাইতে ভীমের চোখে জল! অসিত অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকে: একি সেই ভীমদা যে কদর পিয়ার ঠুংরি

গেয়ে বাজি মাৎ করত, জানকী বাইয়ের "রসীলী তোরি অঁাখিয়াঁরে জিয়া লনচায়" টপ্পা গেয়ে আসর জমাত ; শুধু তাই নয়, ওর মুখে কী এক অনামা আভাও যেন চকচক করছে—মাত্র এই তিন বৎসরের সাধনায় ! তবে কি যোগ-শক্তিতে বা গুরুর কৃপায় মানুষের এমন অচিন্তনীয় বদল সত্যিই হয়—জনশ্রুতির সবটাই অতিভক্তির ফেনা নয় ?

গান শেষ হলে অসিত তার সন্তোজাত আবেগকে দাবিয়ে বলল : "ভীমদা ভাই, আমাকে মাফ কোরো যে, আমি শ্যামলীর দুঃখে সায় দি যছি তুমি বৈরাগ্যের ভাব-বিলাসে গা ভাসিয়ে মেয়েদের ছেড়ে বৈরিগি বনেছ ব'লে, ভাই, গুরুবরণ আমার হয় নি আজো, তাই গুরুশক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ আজো কাটে নি, কবুল করছি। কিন্তু আমার এই অঙ্গীকারটি তুমি অবিশ্বাস কোরো না যে তোমার এ 'কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি'-র ছোঁয়াচে আমার শুকনো বুকের বলুচরেরও আজ ঠিক ভক্তি না হ'লেও সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার জোয়ার বইয়ে দিলে তুমি। মাসিমার রূপান্তরের কথা শোনার পরেও আমার মনে একটু কিন্তু কিন্তু ভাবছিল—কিন্তু তোমার এ অভাবনীয় রূপান্তর দেখে আজ আমার আর বিশ্বাস করতে তেমন বাধবে না যে, গুরুর মধ্য দিয়ে এমন কোনো অঘটনী শক্তি নামতেও পারে যে··যে—"

ভীম বাধা দিয়ে সোল্লাসে বলে : "যে নয়কে হয় করবার শক্তি ধরে এই না ? জয় গুরু জয় ! এম্‌নি করেই সংশয়গ্রন্থি কাটবেরে ভাই, কুড়ুলের ঘায়ে যেমন বিরাট গাছের গুঁড়িও হয় ধূলিসাৎ। তাই বলি এমন আসল খবরটা (সুর ক'রে) খবরের মত খবর, রসাল এবং জবর।"

অসিত সকৌতুহলে বলে : "বটে ! ব্যাপার কী ?"

"আর কি, গাল বাজা ভাই, গাল বাজা। গুরুদেব আর দু'তিন দিনের মধ্যেই হরিদ্বারে নামছেন। আমি এখানে একটি কুটির কিনেছি সাড়ে ন' হাজার টাকায়। এটি হবে আমাদের মূল আশ্রমের একটি শাখা মতন।"

"বলো কী, ভীমদা ?"

"বলি আর কী—তোর জোর বরাৎ। এই শাখা-ডেরাটির ব্যবস্থা করতেই আমি দিন দুই আগে উচ্চভূমি থেকে নিম্নভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছি। ব্যাপার কী, বলি শোন্—যাকে বলে রীতিম'ত নাটক, হা হা হা !"

[ক্রমশঃ

দুঃখজীবিপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যের একটি ধারা

অধ্যাপক গৌরীদাস মল্লিক

রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ পরিচয়, তিনি কবি। কাব্যের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর অন্তরের কথা প্রকাশ করেছেন ভাবাবেগ সমৃদ্ধ ছন্দায়িত ভাষায়। প্রকৃতি জগতের সৌন্দর্য নিয়ে, মানবজীবনের কল্যাণ নিয়ে, অধ্যাত্মবাদের মহিমা নিয়ে তাঁর কাব্য ত্রিধারায় বয়ে চলেছে। প্রকৃতিজগতের যা কিছু বাস্তব, মানবজীবনের যা কিছু সত্য তা তিনি কবির চোখ দিয়েই দেখেছেন, আর কবির মন নিয়ে সেই সব উপলব্ধি করেছেন। তারপর তাঁর মনের মাধুরী মিশিয়ে সৃষ্টি করেছেন কাব্যের ত্রিধারা। তিনি নিজেই বলে গেছেন—

"আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশীর সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা ভিন্ন ভিন্ন দিকে বিচিত্র পথে প্রবাহিত হলেও সর্বত্রগামী হয়নি, তাঁর কাব্যসাধনায় অনেকের কথা ছিল অমুক্ত, অমুল্লিখিত। এ কথা স্বীকার করে কবি বলেছেন,

"এই স্বর সাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক
রয়ে গেছে ফাঁক।"

কবির কাব্য সাধনায় এই অপূর্ণতার জন্যে তাঁকে একসময়ে বহু সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সমালোচকদের অভিযোগ ছিল যে কবি তাঁর কাব্যসাহিত্যে অবহেলিত দুঃখজীবীদের —মর্মবাণী ফুটিয়ে তোলেন নাই। কাব্যকুঞ্জে তিনি বিভিন্ন সুরে যে বাঁশী বাজিয়ে কাব্যরসিকদের মোহিত করেছেন, সে বাঁশীতে বাজেনি এক বিশেষ সুর যে সুরে ঝরে পড়ে দুঃখীদের মর্মব্যথা। কবি অসংকোচে তাঁর এই অক্ষমতার কথা স্বীকার করে গেয়েছেন এই কথা—

"তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্রপথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।"

কবি অভিজাত বংশে জন্মেছিলেন, সেই বংশের ঐশ্বর্য, অভিজাত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি কবিকে আশৈশব ঘিরে রেখেছিল, তাই তাঁর জীবনযাত্রার রীতিনীতি চাষী তাঁতি প্রভৃতি দুঃস্থ শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে মেশবার বাধা স্বরূপ হয়েছিল। অন্তরের সঙ্গে মিশে তাদের অন্তরের পরিচয় সম্যক জানবার সুযোগ না ঘটলেও তাদের সঙ্গে তিনি কার্যব্যপদেশে যে মেলামেশা করেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। কারণ শিলাইদহ প্রভৃতি স্থানে জমিদারী পরিচালনাকালে ও শ্রীনিকেতনে পল্লীউন্নয়ন কাজে তাঁকে ঐসব শ্রেণীর বহুলোকের সহিত মেলামেশা করতে হয়েছিল। কিন্তু তাদের শরিক হয়ে অন্তরঙ্গভাবে মেশবার সুযোগ হয়নি তাই তাদের করুণ জীবনকথা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠতে পারেনি তাঁর কাব্যসাহিত্যে। এই প্রসঙ্গে কবি যেন কৈফিয়ৎ দিয়ে বলছেন—

"অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।
পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার,
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।
চাষি খেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল—
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।

মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে,
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।
জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।"

কবি প্রকাশ করলেন তাঁর অক্ষমতার কারণ, আর তার জন্যে যে তিনি মর্মাহত তাও তিনি জানালেন। তিনি যে শ্রমিকদরদী ও তাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন তাও, বেশ বোঝা যায় তাঁর কথায়। তিনি তাদের দুঃখময় জীবনের করুণ গান গাইতে পারেন নাই, কিন্তু সেই গান শোনবার জন্যে উন্মুখ হয়ে ছিলেন আগামীকালের সেই সব গুণীর কাছ থেকে যাঁরা "কবি অখ্যাত-জনের নির্বাকমনের।" তাদেরই সম্বোধন করে কবি বললেন—

"মূক যারা দুঃখে সুখে,
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে
ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।"

কবি নিজে যা স্বীকার করেছেন, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তবে একথাও সত্য যে, সমাজে অবহেলিত দুঃখজীবীদের উপর তাঁর সহানুভূতি অজস্রধারায় ঝরে পড়েছে। তাঁর বহু কাব্যে গানে তাদের প্রতি তাঁর দরদীমনের আবেগ উচ্ছল হয়ে উঠেছে।

সাহিত্যিক জীবনের প্রথম অধ্যায়ে কবি শুধু ছিলেন কাব্যরসিক, প্রকৃতির পূজারী, ভাবজগতের পথচারী। তখন তাঁর কাব্যে ছিল যৌবনের ভাবোচ্ছ্বাস, দেশপ্রেম, মানবপ্রেম ও ভগবৎ-প্রেমের ত্রিধারার প্রবাহ, প্রকৃতির অন্তরবাহিরের সৌন্দর্যের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। তখন চোখে ছিল তাঁর স্বপ্নাবেশ, মনোজগতে ছিল কল্পনার উৎস, হৃদয়ে ছিল নানা ভাবরসের ঝরণাধারা। কবি শোনালেন তাঁর সেই জীবনের গান—

"সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টিমাঝে বহুকাল করিয়াছি বাস
সঙ্গিহীন রাত্রিদিন; তাই মোর অপরূপ বেশ,
আচার নূতনতর, তাই মোর চক্ষে স্বপ্নাবেশ।"

কেটে যায় তাঁর সেই স্বপ্নাবেশ, সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি-মাঝে আর তাঁর ভাববিলাসী মন আবদ্ধ হয়ে থাকতে চায় না। তখন তাঁর দৃষ্টি পড়ে যায় দুঃখের সংসারের দিকে। সেই দিকে চাইতেই তিনি দেখলেন—

"—ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে—ম্লানমুখে লেখা শুধু শতশতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী;......"

সেইসময় কবির মুখ দিয়ে নিঃসৃত হয়েছিল—

"এবার ফিরাও মোরে লয়ে যাও সংসারের তীরে,
হে কল্পনে, রঙ্গময়ি। দুলায়োনা সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়োনা মোহিনী মায়ায়।
বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জ ছায়ায়
রেখোনা বসায়ে আর।..."

কবির কাব্যপ্রেরণায় এক অভূতপূর্ব বিস্ফোরণ ঘটলো। যখন জমিদারীর কাজে এলেন শিলাইদহে তখন তার ভাববিলাসী নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গে সংঘাত ঘটলো দুঃখ-দৈন্য-ভরা মানব জীবনের।

দরদমাখা দৃষ্টি দিয়ে তখন কবি কষ্টের সংসারের দিকে চাইলেন, দেখলেন যে করুণ দৃশ্য, তিনি দিলেন তার এক মর্মস্পর্শী বিবরণ। যারা 'শত-শতাব্দীর বেদনার করুণকাহিনী'র 'পাত্রপাত্রী' তিনি বললেন তাদের করুণকাহিনী—

"...স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি, যতক্ষণ প্রাণ থাকে তার—
নাহি ভর্ৎসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনমতে কষ্ট ক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,—
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে।......"

দুঃখের সংসারে 'ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির মূক সবে'—তাদের দুঃখকষ্টে কবির হৃদয় ভরে যায় সমবেদনায়। তখন তাঁর মন বিচলিত হয়ে পড়ে,

কবির লেখনীর মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়ে পড়ে সেই বাণী—

"কবি, তবে উঠে এসো—যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহ সাথে, তবে তাই করো আজি দান।
বড়ো দুঃখ বড়ো ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার,
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য মাঝারে কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।"

কবি এই সব দুঃখকাতর দরিদ্রের মঙ্গলের জন্য তাদের প্রাণধারণোপযোগী শুধু অন্নবস্ত্রের কামনাই করেননি তিনি চেয়েছেন তারা হবে সকল দিক হতেই প্রকৃত মানুষ। তিনি প্রয়োজন বোধ করেছিলেন, তাদের চাই দেহবল, মনোবল, চরিত্রবল ও মার্জিত আনন্দময় পরিবেশ। কিন্তু এ সবের জন্যে কবি কি করতে পারেন? বাস্তবাগীশ নেতাদের মত নেতৃত্ব করবার আগ্রহ তাঁর নাই। তিনি চেয়েছিলেন তাদের অন্তরকে জাগাতে যাতে তাদের মনে জন্মায় আত্মবিশ্বাস।

কবি জানতেন কেন, এরা 'বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র,' কেন যে এরা 'শুধু দুটি অন্ন খুঁটি' কোনমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ রেখে দেয় বাঁচাইয়া।' কারণ তাদের 'প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে।' এই 'নিষ্ঠুর অত্যাচার' কিরূপ, সে সম্বন্ধে পল্লীসেবা সংক্রান্ত এক সভায় অভিভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন,—"এখানে চালের কল আছে। সেই কল-দানবের চাকা সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা। ধনী তাদের কি মানুষ মনে করে? তাদের সুখদুঃখের কি হিসাব আছে? প্রতিদিন পাওনা গুণে দিয়ে তার কাছে কষে রক্ত শুষে কাজ আদায় করে নিচ্ছে।······কে দেখে তাদের ঘরে কি হয়েছে, না হয়েছে।"

পল্লীবাসী দুঃখী শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশার হেতু ধনীর নিষ্ঠুর অত্যাচার, তার অমানুষিক প্রবঞ্চনা, —এ কথা সত্য কিন্তু তাদেরও আছে মূঢ়তা, দুর্বলতা, জড়তা যার মূলে আছে অশিক্ষা। এ জড়তাপ্রাপ্ত মন নিয়ে তারা পদে পদে কিরকম প্রবঞ্চিত ও পীড়িত হয়ে থাকে তার প্রমাণ বার বার পেয়েছি।"

কিন্তু এর প্রতিকার কি? কবির কথায়, চাই 'সাহসবিস্তৃত বক্ষপট।' আর যা দরকার, তা কবিই প্রকাশ করে বলেছেন,—

"···এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা,—এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্নবুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা"···

কবি মনে করতেন, এইভাবে তাদের পরিচালনা করলে তাদের মনে আত্মবিশ্বাসের ছবি ফুটে উঠবে, উন্নত জীবন যাপনের আশার আলো দেখা দেবে। তবেই তো তারা অসংকোচে নিজেদের মনের কথা স্পষ্ট করে বলতে পারবে, দৃঢ় ভাষায় নিজেদের ন্যায্য দাবী জানাতে পারবে, অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করতে পারবে। তাই কবি তাদের মনে আশা সঞ্চারের জন্য তাদের উৎসাহ দিয়ে বললেন—

"মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্রে দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখন জাগিবে তুমি, তখনি সে পলাইবে ধেয়ে;
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার, তখনি সে,
পথকুক্কুরের মত সংকোচে সত্রাসে যাবে মিশে;
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার,
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার।"

এইভাবে কবি অসহায় দুর্বল দুঃখীদের সহানুভূতি দেখিয়ে দিলেন উৎসাহ, অন্যদিকে উদ্ধত শক্তিমানদের হেয়জ্ঞানে তাদের উপরও বর্ষণ করলেন ক্রোধানল।

দুঃখীজনের মরমী বন্ধু হয়ে কবি তাদের যেমন সান্ত্বনা দিচ্ছেন, তেমনি তাদের অনুপ্রেরণাও দিচ্ছেন। এইভাবে তিনি এক সময়ে তাদের বললেন—

"নিচে বসে আছিস্ কে রে কাঁদিস কেন।
লজ্জাডোরে আপনাকেরে বাঁধিস কেন।
ধনী যে তুই দুঃখধনে, সেই কথাটি রাখিস মনে,
ধূলার 'পরে স্বর্গ তোমায় গড়তে হবে।

অজ্ঞান-তিমিরে সমাজের নিম্নস্তরে যে সব হতভাগ্য জনসাধারণ অবহেলিত নিপীড়িত হয়ে পড়ে আছে, কবি তাদের মানুষ বলে মর্যাদা দিয়েছেন। তাই তাদের তিনি অবহেলার পাত্র বলে মনে করেন নাই বরং তারা সব রকমের মানবিক অধিকার পাবার যোগ্য বলে মনে করতেন। কবি যেমন নিজে তাদের অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, তেমনি তাদের প্রকৃত মানুষ করে তোলবার জন্য তিনি একসময়ে রাষ্ট্রীয় নেতাদের চাপ দেবারও চেষ্টা করেছিলেন। এই সম্বন্ধে তাঁর নিম্নোক্ত উক্তিগুলি উল্লেখযোগ্য—

"আমি জানি তাদের মতো নিঃসহায় জীব অতি অল্পই আছে; ওরা সমাজের যে তলায় তলিয়ে আছে সেখানে জ্ঞানের আলো অল্পই পৌঁছয়, প্রাণের হাওয়া বয় না বললেই হয়।......আমার মনে আছে পাবনা কন্‌ফারেন্সের সময় আমি তখনকার খুব বড় একজন রাষ্ট্রীয় নেতাকে বলেছিলাম 'আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় উন্নতিকে যদি আমরা সত্য করতে চাই, তা হলে সব আগে আমাদের এই তলার লোককে মানুষ করতে হবে।"

তারপর কবি অতি দুঃখের সঙ্গে জানালেন তাঁর "সেই কথাটিকে এতই তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিলেন যে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম যে আমাদের দেশাত্মবোধীরা দেশ বলে একটা তত্ত্বকে বিদেশের পাঠশালা থেকে সংগ্রহ করে এনেছেন, দেশের মানুষকে তাঁরা অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করেন না।"

রাষ্ট্রনায়কদের এইরূপ প্রবৃত্তিতে কবি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এক প্রসঙ্গে তিনি ক্ষোভের সঙ্গে একটা কথা বলে ফেলেছিলেন "যাদের আমরা ছোট করে রেখেছি মানবস্বভাবের কৃপণতা বশতঃ তাদের আমরা অবিচার করে থাকি। তাদের দোহাই দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে অর্থ সংগ্রহ করি; কিন্তু তাদের ভাগে পড়ে বাক্য, অর্থ অবশেষে আমাদের দলের লোকের ভাগেই এসে জোটে।"

কবির এই মন্তব্য যে স্বার্থপর দেশাত্মবোধীদের সম্বন্ধে—তা বলাই বাহুল্য। কবি একদিকে দেখলেন দেশের একশ্রেণীর লোকদের (কবির উক্তিতে)—

"...[illegible]

গৌরবে মৃগতৃষ্ণিকায়; সিদ্ধির স্পর্ধার তরে
দীনের সর্বস্ব সার্থকতা দলি দেয় ধূলি-'পরে"

ঐরূপ যাদের প্রবৃত্তি তাদের পরিণাম সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়ে কবি তাদের বলেছেন—

"যারে তুমি নীচে ফেলো সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছো যারে সে তোমায় পশ্চাতে টানিছে।

অজ্ঞানের অন্ধকারে
আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।"

কবির এই সতর্কবাণী বহুকাল আগে উচ্চারিত হয়েছে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কবির সেই বাণী আজ বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে।

কবি সাহিত্য-সংগীত-কাব্যচর্চা নিয়েই নিজেকে সংসারের বাইরে আবদ্ধ করে রাখেন নি। দেশ-সমাজের অবাঞ্ছিত পরিবেশের দিকেও তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। তাই তাঁর অনেক কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এক প্রসঙ্গে তিনি তাঁর এক অভিজ্ঞতা প্রকাশ করলেন—

"যারা শক্তিমান তারা উদ্ধত। দুঃখীদের মধ্যে আজ যে শক্তির প্রেরণা সঞ্চারিত হয়ে তাদের অস্থির করে তুলছে, তাকে বলশালীরা বাইরে থেকে ঠেকাবার চেষ্টা করছে, তার দূতদের ঘরে ঢুকতে দিচ্ছে না, তাদের কণ্ঠ দিচ্ছে রুদ্ধ করে। কিন্তু আসল যাকে সবচেয়ে ওদের ভয় করা উচিত ছিল, সে হচ্ছে দুঃখীর দুঃখ। কিন্তু তাকেই এরা চিরকাল সব চেয়ে অবজ্ঞা করতে অভ্যস্ত। নিজের মুনাফার খাতিরে সেই দুঃখকে এরা বাড়িয়ে চলতে ভয় পায় না, হতভাগ্য চাষীকে দুর্ভিক্ষের কবলের মধ্যে ঠেসে ধরে শতকরা দুশো তিনশো হারে মুনাফা ভোগ করতে এদের হৃৎকম্প হয় না। কেননা সেই মুনাফাকেই এরা শক্তি বলে জানে।"

শক্তিমানদের ঔদ্ধত্যের জন্যে দুঃখীরা যে চিরকাল ধরে নতশিরে দুঃখভোগ করে যাবে তা কবি মনে করেন নাই। এদের দুঃখের অন্তরালে ে

অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন। সেই কথাই তিনি এক প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, "যারা নিরন্তর দুঃখ পেয়ে চলেছে, সেই হতভাগ্যরাই দুঃখ-বিধাতার প্রেরিত দূতদের প্রধান সহায়; তাদের উপবাসের মধ্যে প্রলয়ের আগুন সঞ্চিত হচ্ছে।"

কবি নিশ্চিত বুঝেছিলেন যে সেই সঞ্চিত প্রলয়ের আগুনে বলশালীদের দাম্ভিকতা, জাত্যভিমান সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, দুঃখজীবীদের কোপে উদ্ধত ধনী শক্তিশালী সম্প্রদায় মানবসমাজ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এই সত্য তিনি উদ্ধত শক্তিমানদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন,—

"দেখিতে পাওনা তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহংকারে।

সবারে যদি না ডাকো, এখনো সরিয়া থাকো
আপনারে বেঁধে রাখো চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান—
মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান।"

মানবদরদী কবি দুঃখজীবীদের পক্ষ নিয়ে জাত্যভিমানী শক্তিশালী সম্প্রদায়ের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করলেন তাদের অমানুষিকতার জন্য। এর সঙ্গে তিনি তাদের জানালেন তাদের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। কারণ তিনি বুঝেছিলেন দুঃখীর দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের নিজেদের মানবিক অধিকার নিজেরাই অর্জন করবে। তিনিই তো একসময়ে তাদের উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন—

'ধূলার 'পরে স্বর্গ তোমায় গড়তে হবে,
বিনা অস্ত্র, বিনা সহায় লড়তে হবে।"

মানবিক অধিকার অর্জনের জন্য লড়তে গিয়ে তাদের উদ্ধত প্রকৃতির শক্তিমানদের অমানুষিক বাধার সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা আছে মনে করেই কবি সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন—

"বাধা দিলে বাধবে লড়াই মরতে হবে।
পথ জুড়ে কী করবি বড়াই সরতে হবে।
লুঠ করা ধন করে জড়ো
কে হতে চাস সবার বড়ো
এক নিমেষে পথের ধূলায় পড়তে হবে।
নাড়া দিতে গিয়ে তোমায় নড়তে হবে।"

কবি এক প্রসঙ্গে লিখেছিলেন "তাদের সঞ্চিত হচ্ছে।" সেই আগুন জ্বলার আভাস লক্ষ্য করেছিলেন বলেই তিনি এক মন্তব্য করে লিখে গেছেন—"দুঃখী আজ সমস্ত মানুষের রঙ্গ-ভূমিতে নিজেকে বিরাট করে দেখতে পাচ্ছে, এইটে মস্ত কথা। আগেকার দিনে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে দেখেছে বলেই কোনোমতে নিজের শক্তিরূপ দেখতে পায়নি—অদৃষ্টের উপর ভর করে সব সহ্য করেছে। আজ অত্যন্ত নিরুপায়ও অন্তত সেই স্বর্গরাজ্য কল্পনা করতে পারছে যে রাজ্যে পীড়িতের পীড়া যায়, অপমানিতের অপমান ঘোচে। এই কারণেই সমস্ত পৃথিবীতেই আজ দুঃখজীবীরা নড়ে উঠেছে।"

সত্যই দুঃখজীবীরা আজ নিজেদের বিরাটত্ব উপলব্ধি করে একত্রে সব নড়ে উঠেছে। কবিও তাদের আরও উৎসাহিত করবার জন্যে বলেছেন—

"মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,"

কবি মানব-প্রেমিক। মানবতাবোধই তাঁকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে অবহেলিত নির্যাতিত দীন দরিদ্র দুঃখীদের কর্মজীবনে আত্মবিশ্বাসও আত্মশক্তি জাগ্রত করার জন্যে। কবি সেই উদ্দেশ্যে ছন্দোবদ্ধ কবিতার মাধ্যমে তাদের শুনিয়েছেন কত দরদ-ভরা আশা-সান্ত্বনা-উৎসাহবাণী আর মনুষ্যত্বহীন ক্ষমতা-শালী উদ্ধত ব্যক্তিদের শুনিয়েছেন সতর্কবাণী, দিয়েছেন ধিক্কার ও করেছেন তিরস্কার।

কবি যাদের মানুষ বিবেচনা করে দুঃখকষ্টের জন্যে সহানুভূতি দেখিয়েছেন তাদের প্রতি ভগবানেরও যে করুণা আছে তা কবি বিশ্বাস করতেন। কবির এই বিশ্বাসের কথা তাঁর অনেক কবিতায় ও গানে ব্যক্ত হয়েছে। এই বিশ্বাস বশে তিনি তাঁর মনের এক ভাবাবস্থায় লিখলেন—

"অন্নহারা গৃহহারা চায় ঊর্ধ্বপানে, ডাকে ভগবানে।

যে দেশে সে ভগবান মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে
সাড়া দেন বীর্যরূপে দুঃখে কষ্টে ভয়ে,
সে দেশের দৈন্য হবে ক্ষয়, হবে তার জয়।"

এককালে কবির এইরূপই বিশ্বাস ছিল, তাই তিনি ঐ কথা প্রকাশ করেছেন। এই ভাবে

মঙ্গল কামনা মিশিয়ে দিয়ে কাব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন এক মর্যাদাসম্পন্ন ভগবদ্-কৃপাধন্য অবহেলিত দুঃখজীবীদের সমাজ। এই সম্পর্কে দুঃখজীবীদের উপর তাঁর পক্ষপাতিত্ব যে কত গভীর ছিল তা সুস্পষ্ট হয়েছে তাঁর এই উক্তিতে—

"কাহারে তুই পূজিস্ সংগোপনে,
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে, দেবতা নাই ঘরে।
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙ্গে করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে বারো মাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে, ধূলো তাঁহার লেগেছে দুই হাতে।
তাঁরি মত শুচিবসন ছাড়ি আয়রে ধূলার' পরে।"

চাষা কুলি প্রভৃতি দুঃখজীবীরা কর্মযোগী। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ধূলায় মাটিতে কাজ করে যায়। কিন্তু তারা সমাজে অবহেলিত পতিত হয়ে দীন হীন হয়ে আছে। তারা কবির ভাষায় "নাহি জানে অভিমান,।
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনোমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ।
রেখে দেয় বাঁচাইয়া।"

কবির বিশ্বাস, এদের কর্মজীবনের সারথি হয়ে (কবিরই কথায়)
"নেমেছে ধূলারতলে হীন পতিতের ভগবান।"

কাব্যে কবি ভগবানের এক বিশেষ রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন, সে রূপ হীনপতিতের ভগবান। অনেক মহাপুরুষ ভগবানকে উপলব্ধি করেছেন মানুষের মধ্যে, তাই মানুষ মাত্রেই নরনারায়ণ। কবিও এককালে ব্যক্তিগত উপলব্ধির দ্বারা সিদ্ধান্ত করেছিলেন, ভগবানের সত্তা মানুষের অন্তরে লীলা করছে। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে হয়তো এই সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য হতে পারে, কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত অচলপ্রায় মানবসমাজের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, যেখানে (কবির উক্তিতে)

"কামনায় কামনায় দেশে দেশে যুগে যুগান্তরে
নিরন্তর নিদারুণ দ্বন্দ্ব যবে দেখি ঘরে ঘরে
প্রহরে প্রহরে; দেখি অন্ধ মোহ দুরন্ত প্রয়াসে
বুভুক্ষার বহ্নি দিয়ে ভস্মীভূত করে অনায়াসে
জীবনের সকল সম্বল; দুঃখীর আশ্রয়বাসা
নিশ্চিন্তে ভাঙিয়া আনে দুর্দাম দুরাশাহোমানলে
আহুতি-ইন্ধন জোগাইতে;·· ············"

কবি দেশে দেশে এইরূপ নিদারুণ অনাচার অত্যাচার দেখে তাঁর উক্ত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সন্দিহান হয়েছিলেন। তাঁর মনে সৃষ্টি হলো আর এক বিশ্বাস ভগবান সহায় হীন পতিতদের, তাদের উপর যারা অবহেলা করে, অত্যাচার করে তাদের নয়। শেষোক্ত মানুষদের সম্বন্ধে তিনি স্পষ্ট করে বললেন, "দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার।" আর তাদের শাসিয়ে বললেন—

"ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্ররোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।"

এখানে কবির সিদ্ধান্ত—মানুষকে যারা ঘৃণা করে, অপমান করে তাদের উপর বর্ষণ হয় ভগবানের রুদ্ররোষ। আর অপরপক্ষে কবির মনে সৃষ্টি হয় যে বিশ্বাস সে বিশ্বাসের কথা গান গেয়ে গেয়ে তিনি শোনালেন—

"যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে তোমার চরণ রাজে,
সবার পিছে সবার নিচে
সবহারাদের মাঝে।"

দুঃখীদের প্রতি কবি সহানুভূতি-সম্পন্ন, তাই তাদের তিনি মঙ্গল দেখতে চান। কিন্তু দুঃখের সংসারে তাদের তো দুঃখ ঘোচে না, মঙ্গলও তো সাধিত হয় না। তারা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই পড়ে আছে। ভগবান যাদের সহায় তাদের অমঙ্গল কেন? আর তিনি যাদের প্রতি বিরূপ, তাদের মন কলুষিত হলেও তারা সমুন্নত কেন? জীবনসায়াহ্নে কবির মনে সংশয় জাগে ভগবানের মঙ্গলকরতা সম্বন্ধে।

দুঃখ-অপমানে যারা জর্জরিত হয়ে আছে তা থেকে তাদের নিষ্কৃতি পাবার উপায় কি? জীবনের প্রান্তভাগে এসে কবি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন এই কথা ভেবে। এই চিন্তায় কবি কত যে ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন, তা বোঝা যায় তাঁর ছন্দায়িত কথায়—

নিষ্কৃতি সন্ধানে ফিরে পিঞ্জরিত বিহঙ্গমসম,
মুহূর্তে মুহূর্তে বাজে শৃঙ্খল-বন্ধন-অপমান
সংসারের :— — — — — — — — —”

কবির নিষ্কৃতিসন্ধানের যে কোন ফল হয়নি, তা বলাই বাহুল্য। নৈরাশ্য তাঁর মনে এসেছিল। কিন্তু তিনিআশাবাদী। এক সময়ে তাঁর ধ্যানমননে মূর্ত হলো মৈত্রী করুণার আধার ভগবান বুদ্ধ, অন্তরে ধ্বনিত হলো “অমেয়:প্রেমের মন্ত্র ‘বুদ্ধের শরণ লইলাম’।” কবি তাঁর উদ্দেশ্যে আকূতি জানিয়ে বললেন—

“————————ভগবান বুদ্ধ তুমি,
নির্দয় এ লোকালয়, এ ক্ষেত্রেই তব জন্মভূমি।
ভরসা হারালো যারা, যাহাদের ভেঙ্গেছে বিশ্বাস,
তোমারি করুণা বিত্তে ভরুক তাদের সর্বনাশ,—
আপনারে ভুলে তারা ভুলুক দুর্গতি। ——”

অত্যাচারিত পীড়িত সর্বস্বহারাদের বিক্ষুব্ধ মনকে শান্ত করতে ও করুণায় ভরে তুলতে কবির এই নিবেদন। কিন্তু এই নিবেদনের কথাতে আগের মত আর সে উত্তাপ নেই, আর আবেগের সে গভীরতাও নেই। এর কারণ হয়তো কবির নৈরাশ্য।

দুঃখীদের দুঃখ অপমান থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায় সন্ধানে ব্যর্থতায় কবির মনে নৈরাশ্য এলেও, তিনি তাদের ভোলেননি। তিনি কাব্যের ছন্দে তাদের কথা লিখেছেন, তাদের দুঃখের গান গেয়েছেন, সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছেন, অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। মনে প্রাণে তাদের দুঃখ অনুভব করেছিলেন। তাই তাঁর লেখনী দিয়ে নিঃসৃত হতে পেরেছিল ছন্দায়িত আবেগভরা বাণী—

“বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার,
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার।
অন্নচাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্তবায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট। ————————”

——

॥ আত্মপ্রকাশ ॥

শ্রীইন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী

প্রাণের আবেগে হায়! কত কী যে বলি—
যেন আধফোটা কলি
আপনারে করিতে প্রকাশ
পায় শুধু নিষ্ফল প্রয়াস!
শীতের বাতাস
দেয় না ফুটিতে তারে,
তাই সে যে বারে বারে
বসন্তের রহে প্রতীক্ষায়
বাসন্তীর ন্যায়।
স্বপ্নে হেরে শাপ মুক্তি—
মুক্তা যেন ভেঙে শুক্তি
কভু হাসি, কভু অশ্রুজল,
চির সমুজ্জ্বল ॥
হে শবরী,
দিবস শর্বরী
চলেছ বাহিয়া পথ লয়ে অর্ঘ্যডথালি,
কোথা তব রাম
নয়নাভিরাম?
অশ্রুতে মিশায়ে হাসি,
পত্রপুষ্পফলরাশি
ডালি দিতে পায়ে তার
শুধু একবার! ॥
ওই যে মেঘের পারে তারকার রেখা-
শত অস্পষ্টতা মাঝে স্পষ্টতম লেখা-
দূর হতে বাঁশীপ্রায়
আলোকের ঝরণায়
আসিছে নামিয়া হিম আবরণ দলি
ফুটাইতে কলি! ॥
হে উর্বশী,
লতাকুঞ্জে পশি'
রবে কত দিন
পুরুরবা হীন?

একই হৃদয়

অরুণ দে

বারান্দার অন্ধকার পেরিয়ে পা টিপে টিপে ঘরের মধ্যে ঢুকল ভেলু। দরজার কাছে থমকে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। উত্তেজনায় তার বুকের কাছটা থরথর করে কাঁপছে।

সুমিতা তখন জানালার কাছে মাথায় হাত দিয়ে বসে আকাশপাতাল ভাবছিল। দুশ্চিন্তায় ক' রাত্রি তার ঘুম হয় নি। চোখের কোণায় কালি পড়েছে। কি করবে সে কিছুই ভেবে পাচ্ছিল না। একটা চিঠি লিখবে কিনা তা কিছুতেই সে স্থির করতে পারছিল না।

ভেলু চারিদিকে দেখে নিয়ে কি মনে করে এক পা এক পা করে সুমিতার কাছে এসে বসল। মুখ তুলে কিছুক্ষণ সুমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ডাকল—"ঘেউ···ঘেউ, ঘেউ।"

ডাক শুনে সুমিতার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল। ভুরু কুঁচকে সে ভেলুর দিকে তাকাল। ভেলু তার বড় আদরের কুকুর। তার আজন্মের সাথী। কিন্তু আজ এই ভেলুর জন্যই তার সর্বনাশ হতে বসেছে। ভেলুই যত নষ্টের মূল।

"দূর হ। যা এখান থেকে।"—হঠাৎ রেগে গেল সুমিতা।

ভেলু কোন উত্তর দিল না; অন্যদিনের মত ধমক শুনে চলে যাবার জন্য পা বাড়াল না। সে তার মুখ সুমিতার মুখের কাছে নিয়ে ল্যাজ নাড়তে লাগিল।

'কি চাই—আদর?"—বলল সুমিতা।

গলা এগিয়ে দিয়ে মাথা নাড়ল ভেলু।

'তুই আমায় একজনের আদর থেকে বঞ্চিত করেছিস-তা জানিস?"

"কিউ·· ঘ-র-র-র"—ভেলু সুমিতার হাতের উপর চাপ দিল।

"উঃ কামড়বি নাকি? যা এখান থেকে।"

সামনের পা দুটো সুমিতার হাঁটুর উপর তুলে দাঁড়াল ভেলু।

"হতচ্ছাড়া পাজী কোথাকার,"—বলে অন্যজায়গায় উঠে গেল সুমিতা।

দূর থেকে দেখল ভেলু চোখ পিট পিট করে তার দিকে তাকিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছে।

সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সুমিতা স্বামী রথীনকে চিঠি লিখতে বসল। কি লিখবে প্রথমে কিছুই স্থির করতে পারল না। কয়েকটা কাগজ নষ্ট হল। তারপর অনেক কষ্টে মাত্র একটা লাইন লিখল—

"ওগো নিষ্ঠুর, আমাকে না নিতে এলে আমি যাব না।"

লাইনটা লিখেই তার বুক কাঁপতে লাগল। একবার ভাবল সে শ্বশুরবাড়ীতে ফিরে গিয়া রথীনের কাছে ক্ষমা চাহিবে। পরেক্ষণে মনে হল না, সে তো কোন অন্যায় করে নি। একটা অসহায় প্রাণী বিনা চিকিৎসায় মরতে বসেছিল তাকে বাঁচাবার জন্য যেটুকু দরকার সেটুকুই করেছে। ওখানে থাকলে ভেলু বাঁচত না। সামান্য অপরাধের জন্য ভেলুকে ওরা কম শাস্তি দেয় নি। ওরা তো ভেলুকে ভাল করে খেতেও দিত না। শাশুড়ী তো কথায় কথায় ভেলুকে মুখ ঝামটা দিতেন। এমন ভাব দেখাতেন যেন একটা নোংরা জীব তার বৈধব্যের পবিত্রতা নষ্ট করে দিচ্ছে। রথীনও কম যেত না। প্রথম থেকেই সে ভেলুকে খারাপ চোখে দেখেছে। ভেলু যেন তার শত্রু, সংসারের এক অবাঞ্ছিত আপদ, গলগ্রহ। নেহাৎ সুমিতার আপনজন বলেই সে ভেলুকে সহ্য করত। তাও সবসময় নয়। বিয়ের পর সুমিতা যখন তার চিরকালের সাথী ভেলুকে সঙ্গে নিয়ে শ্বশুর-বাড়ী গেল তখন থেকেই রথীনের বিরক্তি।

সেই অলক্ষুণে দিনটার কথা মনে পড়ল সুস্মিতার। সেদিন ভেলু সুস্মিতার শাশুড়ীর পুজোর ঘরে চুপি চুপি ঢুকে চুড়ো-করা ঠাকুরের নৈবেদ্য খেয়ে ফেলেছিল। না খেতে পেলে সবাই অমন অপরাধ করতে পারে। অথচ তাতেই বাড়ীতে আগুন জ্বলে উঠল। শাশুড়ী দেয়ালে কপাল ঠুকে কান্নাকাটি আরম্ভ করলেন। আর রথীন কোথা থেকে একটা লাঠি নিয়ে এসে রাগে ভেলুকে মারতে মারতে আধমরা করে ফেলল। তার পরদিন ভেলুর জ্বর এল। অনেক অনুরোধ করেও সুস্মিতা রথীনকে কোন পশু চিকিৎসালয়ে ভেলুকে নিয়ে যাবার জন্য রাজী করতে পারল না। জ্বরে ভেলু মরে যাচ্চে দেখেও রথীন একবারও ডাক্তারের কাছে গেল না। বরং সুস্মিতার উৎকণ্ঠা দেখে তাকে ঠাট্টা করল "ভেলু নিশ্চয় আগের জন্মে তোমার স্বামী ছিল"—বলে হো হো করে হাসল।

শেষ পর্যন্ত সুস্মিতা রাগ করে বাপের বাড়ী চলে এসেছে। ভেলুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। এখানে এসে ভেলুকে ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খাইয়ে সুস্থ করে তুলেছে।

সুস্মিতা ভেবে পেল না সেই চলে আসার পর থেকে রথীন একবারও তার খোঁজ নিল না কেন? রথীন কি তবে তাকে ভালবাসে না? না হঠাৎ রাগ করে না বলে কয়ে সে চলেই এসেছে তা বলে নিজের স্ত্রীর একটা খোঁজপর্যন্ত নিতে নেই! তাদের বিয়ে তো বেশিদিন হয় নি এরই মধ্যেই কি ভালবাসা ফুরিয়ে গেল! যে ভালবাসা কোন অন্যায় ক্ষমা করতে পারে না সে আবার কেমন ভালবাসা! আজ ক'দিন ধরে সুস্মিতার মন যে কেমন-কেমন করছে, বুকের ভেতর যে মরুভূমির হাওয়া বইছে তা কি রথীন একটুও বোঝে না?

চিঠিটা খামে পুরে উঠে দাঁড়াল সুস্মিতা।

বাবার হাতে না দিয়ে চিঠিটা সে নিজেই পোষ্ট করবে স্থির করল। শাড়ীটা পাল্টে ঘর থেকে বেরুল।

মেয়ের পায়ের শব্দ শুনে রান্নাঘর থেকে সুস্মিতার মা উঁকি দিয়ে বললেন, "কোথায় যাচ্ছিস?" সুস্মিতা তাড়াতাড়ি চিঠিটা আঁচলের তলায় চাপা দিয়ে বলল, "একটু ঘুরে আসি। পাশের বাড়ী বেড়াতে যাচ্ছি।"

মা মচকি হেসে বললেন, "তাড়াতাড়ি আসিস। রাস্তা হয়ে গেছে। ক'দিন ধরে তো ভাল করে কিছু খাচ্ছিস না।"

রাস্তায় পা বাড়াল সুস্মিতা। তার মনে হল মা বোধ হয় সব বুঝতে পেরেছেন। অথচ সে মাকে কিছুই বলে নি। হঠাৎ সে বাপের বাড়ী চলে আসায় মার প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন সে একা কেন এসেছে! জামাই কোথায়? সে প্রশ্ন সুস্মিতা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, "ভয় নেই মা, তোমার জামাই ক'দিন পরেই আসবে! তোমাদের খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল তাই হঠাৎ চলে এলাম। অনুমতি নিয়েই এসেছি।"

স্রেফ মিথ্যে কথা। তবু কথাটা মিথ্যে হবে না বলেই সুস্মিতার মনে হয়েছিল। সে ভেবেছিল রথীন তার অভাব সহ্য করতে না পেরে কদিন বাদে নিশ্চয় ছুটে আসবে—তখন সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু কোথায় রথীন! তার কোন সাড়াই নেই। সব আশা বুঝি বৃথা হয়ে গেল।

রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে সুস্মিতা কি একটা শব্দ শুনে ফিরে দেখল ভেলু তার পেছন পেছন আসছে। ওর মুখটা কেমন শুকনো শুকনো। দৃষ্টি উন্মনা। অপরাধীর মত চলার ভঙ্গি।

...চিঠিটা পাঠাবার পর অধীর উন্মাদনায় অপেক্ষা করতে লাগল সুস্মিতা। কিন্তু দিন কয়েক পরেও যখন কোন উত্তর এল না তখন সে মনমরা হয়ে পড়ল। সে ভাবে নি যে তার রাগ করে চলে আসার পরিণতি এত ভয়ঙ্কর হবে। কি যে করবে কিছুই ভেবে পেল না।

* * *

সে দিন বুধবার।

সুস্মিতা সুদূর আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁত দিয়ে নখ কাটতে কাটতে কি যেন ভাবছিল। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। পৃথিবীর সঙ্গে আসন্ন বিচ্ছেদ ব্যথায় সূর্যের চোখ লাল। পাখীরা ডানায় আবীর মেখে নীড়ে ফিরে চলেছে।

এমন সময় "ঘেউ...ঘেউ" করতে করতে ছুটে এল ভেলু। বার বার সে চীৎকার করতে লাগল। বিরক্ত হয়ে তার দিকে তাকাল সুস্মিতা।

ভেলু তার কাপড় ধরে টানতে লাগল।

"ছাড়। হতভাগা ছাড় বলছি।"—কাপড়টা টেনে নিল সুমিতা।

ভেলু আবার বাইরে গিয়ে কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে আবার সুমিতার কাপড় ধরে টানতে লাগল।

"কি হয়েছে?"

"ঘেউ"

ভেলুর আচরণ দেখে সুমিতার সন্দেহ হল কিছু একটা হয়েছে। কিন্তু কি হয়েছে কিছুই বুঝতে পারল না।

বাইরের দিকে তাকিয়ে ভেলু বার বার চীৎকার করতে লাগল।

উঠে পড়ল সুমিতা। ভেলুর সঙ্গে বাইরে গেল। তার পরে সবিস্ময়ে দেখল—রথীন দাঁড়িয়ে আছে। তার ঠোঁটে মৃদু হাসি খেলা করছে। গৃহপালিত স্ত্রীলালিত স্বামীর মতই তাকাচ্ছে।

সুমিতার চোখে অভিমান ভেসে উঠল। সে কি একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই তার মা কোথা থেকে এসে পড়ে বললেন," ওমা রথী! তুমি কখন এলে বাবা! বাইরে দাঁড়িয়ে আছ কেন? ঘরে যাও।"

শাশুড়ীকে প্রণাম করে সুমিতার ঘরে ঢুকল রথীন।…

পরদিন রাতে এক অঘটন ঘটল।

সকাল থেকেই রথীনের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ীতে ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল সুমিতা। সারাদিন জিনিষপত্র গোছাচ্ছিল। ভেলু সবসময় তার পেছন পেছন ঘুরে সব কিছু নীরবে লক্ষ্য করল।

রাত্রে ক্লান্ত হয়ে বিছানায় শুল সুমিতা। ঘরের সংলগ্ন বারান্দায় ভেলুকে থাকতে দিল। রথীন স্ত্রীকে বাড়ী নিয়ে যেতে পারার আনন্দে মশগুল ছিল।

রাত্রিটা ঘুমিয়ে কাটাতে সে কিছুতেই রাজী হল না। স্বামী-স্ত্রী এক বিছানায় অস্থির আনন্দে জেগে রইল। ঘর অন্ধকার। বাইরে শুধু ভেলুর চোখদুটো জ্বলছিল। বার বার নানা রকম শব্দে সে সচকিত হয়ে উঠছিল।

কি একটা প্রয়োজনে সুমিতা বলল, "এই দুষ্টু ছাড়। আমি এখনই একবার নিচের থেকে আসছি।"

রথীন উত্তর দিল, "না ছাড়ব না। চিরকাল তোমায় এমন করেই বুকের মধ্যে ধরে রাখব।"

বাইরে বেরিয়ে গেল সুমিতা।

রথীন অন্ধকার ঘরে একা উঠে দাঁড়াল।

হঠাৎ ভেলু সবেগে ঘরে ঢুকে রথীনের উপর ঝাপিয়ে পড়ল। দাঁত দিয়ে তার টুটি চেপে ধরার চেষ্টা করল।

আর্ত চীৎকার করে ছিটকে পড়ল রথীন। কিন্তু সে কেবল অল্পক্ষণের জন্য। তারপর উঠে হাতের কাছে যা পেল তাই ভেলুর দিকে ছুড়তে লাগল।

একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ করে হঠাৎ ভেলু মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

ভেলুর গলার আওয়াজ শুনে সুমিতা তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এসে আলো জ্বালাল। দেখল—ভেলু ধুঁকছে। তার চোখের ভেতর কি যেন ঢুকে গেছে। রক্ত পড়ছে। মাথায়ও আঘাত লেগেছে।

ভেলুকে বুকে তুলে নিয়ে সুমিতা রথীনকে বলল, "তুমি একি সর্ব্বনাশ করলে। আমার ভেলু…ও ভেলু…কি হয়েছে? খুব কষ্ট হচ্ছে?

ভেলু সুমিতার কোলের উপর মাথা রাখল।

একটু পরে ভেলুকে মাটিতে শুইয়ে রথীনের কাছে এগিয়ে গেল সুমিতা। রথীনের বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নি। ভেলুর চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। রথীনের গায়ে কয়েকটা আঁচড় লেগেছে। লক্ষ্য ব্যর্থ হওয়ায় ভেলু রথীনের জামা কামড়ে ধরেছিল। জামা ছিড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

পরদিন সকালেই একজন পশুর ডাক্তারের কাছে ভেলুকে নিয়ে গেল সুমিতা। সঙ্গে রথীনও গেল। পশুর ডাক্তার জানালেন যে ভেলু সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গেছে। মাথায়ও আঘাত লেগেছে। তাকে পশুদের হাসপাতালে রাখা দরকার।

সেদিন সন্ধ্যায় শ্বশুরবাড়ী যাবার জন্য সুমিতা রথীনের সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠে বসল।

অন্ধ ভেলুকে তখন পশু-হাসপাতালের গাড়ী নিতে এসেছে। সে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল।

সুমিতা আর রথীনকে নিয়ে তাদের গাড়ী ষ্টার্ট দিতেই অন্ধ ভেলু চীৎকার করে উঠল, "ঘেউ—ঘে-উ-উ-উ।"

তীক্ষ্ণ আর্তনাদের মত সে চীৎকার চারিদিক পরিব্যাপ্ত করে তুলল।

আহ্বান

শ্রীসুধীর গুপ্ত

আয় না রে-আয়, আয় না রে-আয়,
আয় না রে-আয় পাশে !
শিশির শেষের সোনার আকাশ
নিবিড় হ'য়ে আসে ;
সবুজ—সবুজ টাট্‌কা সবুজ
ধরলো কোমল ঘাসে।
চপল নদী ছিটিয়ে সলিল
উপল-পথে ধায় ;
দুষ্টু মাছের পাথ্‌না 'পরে
সূর্য চুমা খায় ;
জলের তলের গাছের ছায়ায়
নাচায় কেবল বায় ;
আয় না রে-আয়, আয় না রে-আয়,
আয় না রে-আয়, আয় !

পথ গিয়েছে সুরকি-রঙিন্
খিড়কি-দুয়ার দিয়ে ;
আজ সবুজের অবুঝ ডাকে
যায় ছিনিয়ে নিয়ে
মনটারে মোর ; কেম্‌নে বুঝাই
আবেগ-তুফান কী এ !

এগিয়ে গিয়ে দেখ্‌তে হবে ;
চল্‌ এগিয়ে যাই।
নতুন আবার ডাক দিতেছে,—
বক্ষে যে টের পাই।
ডাক্‌ দিয়েছে, হাঁক দিয়েছে
থামার সময় নাই।
আয় না রে-আয়, আয় না রে-আয়—
আয় না পথে ধাই !

পথ অফুরান হয় না পুরাণ,—
কেবল শুধু ধায়।
পথকে পেলে পথেই পরান
কেবল যেতে চায়।
ধন্য তা'রা গণ্য তা'রা
পথকে যা'রা পায়।
আয় না রে-আয়, আয় না রে-আয়,
আয় না-রে আয়-আয় !

পথ চলাতে ঋতুর খেলা
দেখ্‌তে সবই পাবো ;
হারিয়ে যদি যাই সে-পথে,
হারিয়ে না হয় যাবো।
পথের পথিক পথ না চেয়ে
কী আর হেথায় চা'বো।
জীবন্‌টা যে পথের সামিল,—
চল্‌ না পথে ধা'বো !

পথ অজানা,—কি আসে তায় !
অজানা পথ থাকে ;
চমক দিয়ে চলায়—চালায়
কেবল বাঁকে বাঁকে।
ঘর কি তাহার সাজে রে আর
পথ যাহারে ডাকে !
আয় না রে-আয়, আকাশ ডাকে
ওই তো গাছের ফাঁকে ;
চপল বায়ে চপল আলো
দুল্‌'ছ শাখে শাখে ;
ডাক্‌ছে পথে তুখড় মুখর
বিহগ লাখে লাখে ;
আয় না রে-আয়, আয় না রে-আয়,
পথের জীবনটাকে
মাতাই কেবল সচল সবল
পথের পাকে পাকে।

রবীন্দ্রনাথ ও পূর্ববঙ্গ

অধ্যাপক নীরদবিহারী রায়

শৈশব কৈশোর থেকেই প্রকৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক। শিশু কবির সঙ্গে প্রকৃতি বোধহয় খুব ঘনিষ্ঠ হতে চায়নি। কিশোর কবির সঙ্গে প্রকৃতির দেখা হত ফাঁকফুকর দিয়ে—আড়াল আবডালে। দুপুর বেলা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে লোহার শিকগুলোর ভিতর দিয়ে উভয়ের সহজ মিলন সম্ভব হত। এ সব কথা কবি জীবনস্মৃতিতে বলেছেন।

আধাছুটির কয়েকটা দিন তখন কেটে গেছে। একদিন পুরো ছুটির আনন্দলাভ ঘটল। পিতার সঙ্গে কবি হিমালয় ভ্রমণে বের হলেন। কবি ভাবলেন, বাড়ীর কাছের গুগলি তোলা, পালক সাফকরা হাঁসগুলোর অকারণ আনন্দের ভিতর, মাথায় প্রচণ্ড জট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বটগাছটার যে প্রকৃতির অংশমাত্র দেখেছেন—তাকে প্রাণ ভরে দেখলেন হিমালয়ে। প্রকৃতির অবারিত স্ফূর্তি মুক্তি কবি প্রাণ ভরে পান করবেন। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখলেন শৈলরাজ বড় আত্মকেন্দ্রিক, বড় অনুদার। কবি আহত হলেন অতিথিপরায়ণতার ত্রুটিতে। নগাধিরাজ তার অতুলবৈভব ও মহিমা সত্ত্বেও দুহাত ভরে কবিকে কিছুই দিতে পারল না।

তারপর কবিজীবনের এক আধটা পালা সাঙ্গ হয়ে গেছে। সুখদুঃখ জীবনমরণে 'তুফানতোলা ব্যাকুল বিহঙ্গ' জীবনের নানা ঘটনা ও অভিজ্ঞতার সোপান অতিক্রম করেছে। কবি এলেন পূর্ববঙ্গে। শিলাইদহ, সাজাদপুর, পতিসরে। অতিথি হিসেবে নয় পরিবারের একজন হয়ে। ঘরছাড়া প্রবাসী ঘরের টানে সাড়া দিল। কবিজীবনে এ অবস্থাটা পূর্ববঙ্গের সঙ্গে পারিবারিক সম্বন্ধ স্থাপনের কাল। গৃহজীবনের হাসিকান্না বিরহ মিলনের স্রোত উচ্ছলিত হয়ে উঠছে। শুধু বহুদূর প্রসারিত নদনদী, ধানের ক্ষেত, পদ্মার খেয়ালী কিশোরী মূর্তি নয়—সমস্ত বঙ্গপ্রকৃতির কাছে কবি পরমাত্মীয় হয়ে উঠলেন। গুণ্ঠন তুলে বঙ্গ-প্রকৃতির কবির সঙ্গে কথাবার্তা। অন্দরমহলের গোপনতম প্রকোষ্ঠে কবির নিমন্ত্রণ। অল্পদিনের ভিতর কবি খুব নিজের হয়ে উঠলেন। কবিরও অন্তরের পর্দা উঠে গেল। স্নানাহার ভুলে গেলেন। দিনরাত শুধু মধুর আলাপ—গভীর আনন্দের এক একটি সুর মূর্ছনা প্রীতির আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠছে রবীন্দ্র সৌন্দর্য চেতন স্বাভাবিক গতি রূপ লাভ করল।

পূর্ববঙ্গে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যথার্থ বাংলা দেশের পরিচয় পেলেন। কোমলে মধুরে কুমীরে শ্বাপদে সরীসৃপে ভরা বাংলাদেশ। মাধুর্যের সঙ্গে আদিম হিংস্রতার প্লাবন তার অঙ্গে অঙ্গে। কবি সব কিছু দেখলেন। গ্রাম, হাটবাজার, গঞ্জ, টিনের ছাদ-ওয়ালা বাড়ী, খড়োচাল সবই তাঁর চোখের সামনে। প্রতিদিনের কাজকরা মানুষ, চাষী, জেলে, মাঝি, মুটে মজুর সকলেই কবির সামনে উপস্থিত। কবির একান্ত কাছাকাছি হয়ে তারা দেখা দিল। আবার অঘ্রানের সন্ধ্যা সতীলক্ষ্মী গৃহবধূর মূর্তি ধরে এলো। কখনও

পৌষের হরিৎ শস্য সম্ভার বোঝাই করে কৃষকের সোনার তরী এগিয়ে চলেছে। পদ্মার একটানা স্রোত জীবনের নানা কথা মনে আনে। যতদূর চোখ যায় শুধু মাঠ আর মাঠ—কখনো গৈরিকে কখনও সবুজে ভরা। বাঁধান জলের রেখায় রেখায় বক, সারস, বেলেহাঁস যত দেখা যায়—নারকেল সুপুরির পাতায় পাতায় বিকেলের সূর্যের আলো। কিসের আবেশে প্রাণ ভরে ওঠে।

পূর্ববঙ্গ বাসের অনেকগুলি দিন কবি বোটে কাটিয়েছেন। ভেসে চলার আনন্দ অনুভব করেছেন। অথৈ জলে কার আহ্বান বাজে। য পথের দেবতা কবিকে ঘর ছাড়িয়ে এনেছেন, তিনি কত তাঁকে ঘুরিয়ে দেখাবেন। কবি সেই পথ চলার আশ্বাসে বিভোর। বসে বসে ছবি দেখছেন, অনুভব করছেন—দেশ বিদেশের নানা ছবির কথা মনে আসে। নিজের অনুভব এবং উপলব্ধি কবি ছড়িয়ে দিচ্ছেন আত্মীয় স্বজনদের কাছে লেখা নানা চিঠিপত্রে। এ অনুভব যেন ধরে রাখা যাচ্ছে না। কাছের মানুষকে ডেকে দেখাতে ইচ্ছে হচ্ছে।

রূপময়ী বাংলাকে দেখে কবি তন্ময় হয়েছেন। তার অতুল ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার থেকে কত মণিমাণিক্য তিনি তাঁর পাঠক পরিচিতদের উপহার দিয়েছেন তার অবধি নেই। দরিদ্রমায়ের ঘর আড়িকরে ভালোবেসেছেন। আরও বেশি করে ভালোবেসেছেন। কবি নিজে বলেছেন—তাঁর দেশের প্রতিবেশীদের কাছাকাছি তিনি যেতে পারেননি। কবির পূর্ববঙ্গবাসের অভিজ্ঞতা এ মন্তব্যের ঐতিহাসিক সত্য স্বীকার করেনা। নিরীহ, নির্দ্বন্দ্বসাধারণ মানুষেরা তখন কবির প্রিয় প্রকৃতির পাশাপাশি এসে মলিনমুখে দাঁড়িয়েছে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে—পূর্ববঙ্গের গাছ পালা, তৃণ তরুলতা তারা কাকলি তুলল—তারা কথাবলে উঠলো; তাদের সঙ্গে মিলেমিশে যে মানুষেরা এলো—তারা কবির স্মৃতিসমুজ্জ্বল হয়ে উঠল না। তারা হারিয়ে গেল অজানার কোন্ 'অগমতীরে'। জরা-জীর্ণ, রোগগ্রস্ত, প্রতিদিনের আঘাতে অভিহত কিংবা নিরুপদ্রব পারিবারিক জীবনের হাস্যোদ্দীপ্ত মানুষেরা ক্রমশঃ দূরে সরে গেল। কবির সমানুভূতির পরিধিতে তারা রেখাপাত করল না।

রবীন্দ্রকাব্যের সুবৃহৎ পরিসরে কত বর্ণের চিত্রচরিত্রের মালা গাঁথা চলেছে। পূর্ববঙ্গে বাস-কালে কবি উভয়ের নিকটতম সাহচর্যে এসেছেন। প্রকৃতির কবি গভীর অনুধ্যানে অরণ্যজগতকে কথা বলতে শুনেছেন। কত নিতান্ত সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের হাওয়া এসে কবির গায়ে লাগছে। তাদের মূক মুখ মুখর হয়েছে। কবির নৈকট্য লাভে তারা ধন্য। কাছারি বাড়ীর পরিত্যক্ত প্রাসাদকক্ষে কান পাতলে দূর কালের কবি-জমিদার আর দরিদ্র প্রজার দুঃখবেদনা রস-রহস্যের কথোপকথনের ধ্বনি শোনা যায়।

পূর্ববঙ্গ কবি জীবনের বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিত। কতকগুলি লেখায় সমসাময়িক অভিজ্ঞতার ছাপ পড়েছে। পরবর্তী কতকগুলিতে তারা স্মৃতি হয়ে দেখা দিয়েছে। অথচ এর প্রায় সবগুলিতেই কবির প্রকৃতি ভাবুকতার 'প্রাধান্য। শুধু চিত্র আর চিত্র। চরিত্রগুলি না আসছে সমসাময়িক-তায়—না আসছে স্মৃতিতে। প্রথমশ্রেণীর রচনায় যে দু' একটি চরিত্র এসেছে—তারাও যেন চিত্রের ভিড়ে হারিয়ে যেতে চায়। লেখা পড়লে মনে হয় এখানকার চরিত্রেরা কথা বলেনা। মানুষগুলি এক একটি ছবি। তাদের জীবনযাত্রার কলগুঞ্জন, মধুর কূজন কানে আসেনা। কবিও

পর্যটকের। কৌতূহল আছে—কিন্তু চলমান তরণীর দুইপারের মানুষ. মানুষের বেদনার জন্য কবির সহানুভূতি ঝরে পড়ছেনা। লেখায় তাদের সুখ-দুঃখ আন্দোলিত হয়ে উঠ্‌ছেনা।

কবি তাঁর. চিত্রচরিত্রের কুসুম স্তবকে চিত্রগুলি নিয়েছেন পূর্ববঙ্গ বাসের অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি থেকে। চরিত্রগুলি নিয়েছেন কলকাতা বাস ও তার স্মৃতি থেকে। মনে হয়, উভয়ের গ্রহণবর্জন, গ্রন্থন ও বিন্যাস বিষয়েও কবি স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করেছেন।

রবীন্দ্র চরিত্র শালায় দু'একটি আছে—যারা পূর্ববঙ্গ থেকে আহূত। এরা অল্প হলেও কথা বলে। এরা প্রায়ই অপরিণত বয়স্ক। পূর্ববঙ্গ জীবন পরিবেশের বৃহত্তর সমাজের কথা রবীন্দ্র শিল্পে প্রায় উপেক্ষিত অথবা স্বল্প উল্লিখিত। অথচ চিত্রের ক্ষেত্রে কত সুন্দর এবং বিস্তীর্ণ পরিধি। কবির দরদ সহানুভূতি ও স্বানুভবের মণিকাঞ্চন যোগে তারা কত জীবন্ত।

আমাদের মনে হয়—চরিত্র রূপায়ণে কবির বাল্য অভিজ্ঞতা সুদূর এবং দীর্ঘ ছায়া সম্পাতী। তারা কবির মনে দুর্মর স্মৃতি হয়ে গেছে। বাল্যের প্রকৃতি ও চরিত্রগুলিও অবচেতনায় পূর্ণতা লাভ করে ছিল। প্রথম অভিজ্ঞতার কিছুই যেন মুছে যায়নি। পূর্ববঙ্গ পরিবেশে কবি সন্ধ্যার সৌন্দর্য-পুরীতে, রূপকথার স্বপ্নরাজ্যে ভ্রমণ করেছেন। কবি নিজে রাজকুমার। সেখানে সৌন্দর্যের মদিরবিহ্বল লীলার প্রাধান্য। নিষ্ঠুর বস্তুজগতের কিছু যেন কিছুতেই কবিকে ভোলাতে পারছেনা।

রবীন্দ্র কাব্যের সুধীপাঠক কবির প্রকৃতি-তন্ময়-তায় মুগ্ধ হন। রসতীর্থ পথের পথিক রোমান্টিক কবির কল্পনা ও ধ্যানের বিশাল পরিধির দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন। উগ্র দেশপ্রেমিকরা উষ্মা প্রকাশ করেন। নিন্দুকেরা কবিকে নানা অপবাদ দেন—কবির বিরুদ্ধে নানা ন্যায় অন্যায় অভিযোগ তোলেন। রবীন্দ্রকাব্যের প্রতিপত্রে মাঝে মাঝে বাংলাদেশের রবীন্দ্রমানসের অবহেলিত মানুষদের দীর্ঘনিঃশ্বাস মর্মরিত হয়ে ওঠে। আমরা, রবীন্দ্রানুরাগীরা আহত হই। কিন্তু কবির স্বপক্ষে বলার জন্যে রবীন্দ্রনাথের দু' একটি গল্প, ও এক আধখানা চিঠিপত্র ছাড়া সামান্য উপদান আমাদের হাতে আছে।

———

রবীন্দ্রদৃষ্টিতে মহাসম্রাট অশোক

ডঃ সুধাংশুবিমল বড়ুয়া, এম, এ, ডি, ফিল,

বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে মৌর্যসম্রাট অশোকের নাম অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। বৌদ্ধধর্মের মাহাত্ম্যকেও তিনি দেশ দেশান্তরে পরিব্যাপ্ত করেছেন। বস্তুত বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে একমাত্র বুদ্ধদেবকে বাদ দিলে দেবপ্রিয় অশোকের গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশি। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকে জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। আর ভগবান বুদ্ধের বাণীকে জীবনে গ্রহণ করে যিনি তাঁর রাজশক্তিকে মঙ্গলের দাসত্বে নিযুক্ত করেছেন, ভারত—ইতিহাসের সেই মহান নায়ক অশোককে তিনি জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট বলে অভিহিত করেছেন। কাজেই রবীন্দ্রসাহিত্যে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে বৌদ্ধসম্রাট অশোকের আলোচনা অপরিহার্য।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য নাটক প্রবন্ধ ও সংগীতধারায় বুদ্ধদেবের চরিত্রমহিমা উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, একমাত্র প্রবন্ধসাহিত্য ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের কাব্য নাটক ও গানে কোথাও অশোকের উল্লেখ পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ 'কথা' (১৯০০) কাব্যখানি ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিভিন্ন উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত। এখানে উপনিষদের যুগ থেকে আরম্ভ করে শিখ-মারাঠার যুগ পর্যন্ত বিভিন্নকালের হৃদ্-ওস্পন্দন ধ্বনিত হয়েছে। ভারতবর্ষের শৌর্য-বীর্য, ত্যাগ ও মহত্বের আদর্শ এর অন্তর্গত গাথাকবিতাগুলির মধ্য দিয়ে এক অপরূপ সৌন্দর্যে প্রকাশিত। ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার বিশ্বপ্রেমমূলক বৌদ্ধধর্ম। 'কথা' কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ সুনিপুণ মালাকারের পুষ্পচয়নের ন্যায় বৌদ্ধযুগের উপাখ্যান থেকেও কয়েকটি গাথাকবিতার উপাদান সংগ্রহ করেছেন। এর অন্তর্গত শ্রেষ্ঠভিক্ষা, 'নগরলক্ষ্মী, পূজারিণী, অভিসার প্রভৃতি কবিতায় বৌদ্ধযুগের ত্যাগ, মৈত্রী ও মানবতার বাণী অতি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। দুয়েকটি কবিতায় স্বয়ং বুদ্ধদেবের চরিত্রমহিমা উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত। আর যে রাজভিক্ষু অশোক ভগবান বুদ্ধের 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় লোকানুকম্পায়' বাণীকে জীবনের মূল ব্রত হিসাবেগ্রহণ করেছেন,যিনি বুদ্ধদেবের বিশ্বপ্রেমের বাণীকে পৃথিবীর দূর দূরান্তে প্রেরণ করেছেন, বুদ্ধদেবের সেই শ্রেষ্ঠতম উত্তরসাধক সম্বন্ধে 'কথা' কাব্যগ্রন্থে উল্লেখমাত্র পাওয়া যায় না। 'কথা' কাব্যের পরেও রবীন্দ্রনাথ যে সকল কাব্য নাটকাদি রচনা করেছেন সেখানেও অশোকের উল্লেখ নেই। একদিক থেকে দেখতে গেলে আমাদের দেশে বৌদ্ধকাহিনী ও বৌদ্ধ ভাবাদর্শের পরিচয়সাধনে রবীন্দ্রনাথের কাব্য নাটকাদির প্রভাব অপরিসীম। এ প্রসঙ্গে মালিনী, নটীরপূজা, চণ্ডালিকা ও শ্যামা বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। অশোকের জীবনের কাহিনী নিয়েও রবীন্দ্রনাথ নাটকাদি রচনা করতে পারতেন। অন্তত অশোকের জীবনে নাটকীয় উপাদানের অভাব নেই। ইতিপূর্বে ক্ষীরোদপ্রসাদ ও গিরিশচন্দ্র—প্রমুখ নাট্যকারগণ অশোকচরিত্র অবলম্বন করে নাটক রচনা করেছেন। 'বিসর্জন' নাটকে দেখা যায়, ক্ষুদ্র ছাগশিশুর কাতরক্রন্দন রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে উদ্রিক্ত করে নাটক রচনায় প্রবৃত্ত করেছে। আর কলিঙ্গযুদ্ধে নৃশংস চণ্ডাশোক রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়ে একদিন যে মর্মান্তিক অনুশোচনায় এই অস্ত্রবিজয়ের পথ পরিহার করে ধর্মবিজয়ের আদর্শ অবলম্বন করেছিলেন, এই ভাবধারাও রবীন্দ্রনাথকে নাটক রচনায় প্রেরণা দান করেনি। হয়তো এমনও হতে পারে যে, অশোকচরিত অবলম্বন করে ইতিপূর্বে নাটক রচিত

১ D. R, Bhandarkar, Asok (3rd ed.), P, 217

হয়েছে বলে তিনি আর নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন নি। সে যাই হক না কেন, আসল কথা হল রবীন্দ্রনাথ অশোকের জীবন নিয়ে কোন নাটক কিংবা কবিতা রচনা করেন নি। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় যথার্থই লক্ষ্য করেছেন,—

> রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই ঐতিহাসিক উপকথা অবলম্বনেই গাথানাটকাদি রচনা করেছেন, ইতিহাসের প্রধান চরিত্র বা মূল আখ্যানকে কখনও অবলম্বন করেন নি।… …ইতিহাসের মূলধারা বা প্রধান চরিত্র তাঁর চিন্তাকে উদ্রিক্ত করেছে এবং সময়বিশেষে প্রবন্ধ—রচনার উপাদান জুগিয়েছে, কিন্তু কাব্য নাট্যাদি রচনায় প্রবৃত্ত করে নি। (১)

অশোক সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ এই নীতি অনুসরণ করেছেন। তিনি ঐতিহাসিক প্রজ্ঞার আলোকেই অশোক চরিত্রের মূল্যায়নে প্রয়াসী হয়েছেন। এখানে কবিকল্পনার চেয়ে ঐতিহাসিক চেতনা অধিক সক্রিয়।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে অশোকচরিতের প্রতি ঐতিহাসিকদের আগ্রহ সর্বাপেক্ষা বেশি। কিন্তু অনেক কাল ধরে অশোকের ঐতিহাসিক পরিচয় গল্প ও কিংবদন্তী কুহেলিকায় আচ্ছন্ন ছিল। প্রাচীন ভারতীয় ও সিংহলী সাহিত্যে অশোকের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা অনেকক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত। বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধনৃপতি অশোককে গৌরবদান করার অভিপ্রায়ে বৌদ্ধসমাজ অশোকের সম্বন্ধে কতগুলি অবাস্তব কাহিনী সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যে একটি বহুপ্রচলিত কাহিনী হল প্রথম জীবনে অশোক অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন এবং নিরানব্বইজন ভাইকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করেন। তারপর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পর এই 'চণ্ডাশোক' হলেন 'ধর্মাশোক'। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এ সকল কাহিনীর সত্যতা স্বীকার করেন না।( ) তবে আমাদের দেশে মহাপুরুষদের সম্বন্ধে এরকম অলীক কাহিনীর অভাব নেই। এ সকল অপ্রাকৃত কাহিনী আদিকবি বাল্মীকিকে দস্যুতে পরিণত করেছে, মহাকবি কালিদাসকে মহামূর্খ সাজিয়েছে। শুধু আমাদের দেশে কেন, সকল দেশেই মহাপুরুষদের সম্বন্ধে এরকম কাহিনী অল্পবিস্তর প্রচলিত আছে। এর শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত মনে হয় খ্রীষ্টের জীবনকাহিনী। খ্রীষ্টকে অত্যধিক মাহাত্ম্য দান করতে গিয়ে খ্রীষ্টসমাজ তাঁর উপর অনেক অলৌকিক কাহিনী আরোপ করেছেন।

একদিক থেকে বাল্মীকি, কালিদাস ও খ্রীষ্টের চেয়ে অশোক বেশি ভাগ্যবান। কেননা তিনি নিজের পরিচয়কে অক্ষয় পাথরের গায়ে লিখে রেখে গেছেন। অশোকের উৎকীর্ণ এই শিলালিপিগুলি ঐতিহাসিকদের পক্ষে অশোকচরিতের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান দলিল। কিন্তু অশোক-লিপির ভাষা বহুকাল ধরে মানুষের আয়ত্তের বাইরে ছিল। সেজন্য অশোকের বাণী শত শত বৎসর ধরে মানবহৃদয়কে কেবল বোবার মত ইশারায় আহ্বান করেছে। অশোকলিপি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

> জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট্ অশোক আপনার যে কথাগুলিকে চিরকালের শ্রুতিগোচর করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাদিগকে তিনি পাহাড়ের গায়ে খুদিয়া দিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, পাহাড় কোনকালে মরিবে না, সরিবে না, অনন্তকালের পথের ধারে অচল হইয়া দাঁড়াইয়া নব নব যুগের পথিকদের কাছে এক কথা চিরদিন ধরিয়া আবৃত্তি করিতে থাকিবে। পাহাড়কে তিনি কথা কহিবার ভার দিয়াছিলেন।
>
> পাহাড় কালাকালের কোনো বিচার না করিয়া তাঁহার ভাষা বহন করিয়া আসিয়াছে। কোথায় অশোক, কোথায় পাটলিপুত্র, কোথায় ধর্মজাগ্রত ভারতবর্ষের সেই গৌরবের দিন! কিন্তু পাহাড় সেদিনকার সেই কথা-কটি বিস্মৃত অক্ষরে অপ্রচলিত ভাষায় আজও উচ্চারণ করিতেছে। কতদিন অরণ্যে রোদন করিয়াছে! অশোকের সেই মহাবাণীও কত শত বৎসর মানবহৃদয়কে বোবার মতো কেবল ইশারায় আহ্বান করিয়াছে! পথ দিয়া রাজপুত গেল, পাঠান গেল, মোগল গেল, বর্গির তরবারি বিদ্যুতের মতো ক্ষিপ্রবেগে দিগ্‌দিগন্তে প্রলয়ের কশাঘাত করিয়া গেল—কেহ তাহার ইশারায় সাড়া দিল না। সমুদ্রপারের যে ক্ষুদ্র দ্বীপের কথা অশোক কখনো কল্পনাও করেন নাই তাঁহার শিল্পীরা [illegible]

---

(১) ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ, পৃ ৭০-৭১

(২) V. A. Smith, Asoka, the Bnddhist Emperor of India (2nd ed.) p. 23

অনুশাসন উৎকীর্ণ করিতেছিল তখন যে দ্বীপের অরণ্যচারী 'দ্রুয়িদ'গণ আপনাদের পূজার আবেগ ভাষাহীন প্রস্তরস্তূপে স্তম্ভিত করিয়া তুলিতেছিল, বহু সহস্র বৎসর পরে সেই দ্বীপ হইতে একটি বিদেশী আসিয়া কালান্তরের সেই মূক ইঙ্গিতপাশ হইতে তাহার ভাষাকে উদ্ধার করিয়া লইলেন। রাজচক্রবর্তী অশোকের ইচ্ছা এত শতাব্দী-পরে একটি বিদেশীর সাহায্যে সার্থকতা লাভ করিল। সে ইচ্ছা আর কিছুই নহে, তিনি যত বড়ো সম্রাটই হউন, তিনি কী চান কী না চান, তাঁহার কাছে কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ, তাহা পথের পথিককেও জানাইতে হইবে। তাঁহার মনের ভাব এত যুগ ধরিয়া সকল মানুষের মনের আশ্রয় চাহিয়া পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে। রাজচক্রবর্তীর সেই একাগ্র আকাঙ্ক্ষার দিকে পথের লোক কেহ চাহিতেছে, কেহ বা না চাহিয়া চলিয়া যাইতেছে।(১)

অশোকলিপি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির মধ্যে কাব্যের ব্যঞ্জনা ও ইতিহাসের সত্য একসঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে। এই অংশটুকু পড়বার পর রবীন্দ্রনাথ অশোকের উপর কবিতা রচনা করেন নি বলে আর আক্ষেপ থাকে না। আর রবীন্দ্রনাথ অশোক-ইতিহাসের মূল উপাদান অশোকের শিলালিপির পাঠোদ্ধারের বিবরণ সম্বন্ধেও যে আগ্রহ পোষণ করতেন তা এখানে সুস্পষ্ট।

সমুদ্রপারের ক্ষুদ্র দ্বীপের যে একজন বিদেশী এসে কালান্তরের মূক ইঙ্গিতপাশ হতে অশোকলিপির ভাষাকে উদ্ধার করেছেন, তিনি হলেন ইংরেজ মনীষী জেমস্ প্রিনসেপ্ (১৭৯৯-১৮৪০)। অশোকলিপি প্রসঙ্গে এই মনীষীর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি ১৮৩৪ সাল থেকে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত বিশেষ পরিশ্রম করে এই প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপির পাঠোদ্ধারে সফলকাম হয়েছেন।২ এর পর থেকে অশোকলিপিকে অবলম্বন করে বহু মনীষী অশোকের জীবনের উপর নানা দিক্ থেকে আলোকপাত করেছেন। বস্তুত ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে অশোক সম্বন্ধে দেশবিদেশের সুধীবৃন্দ কর্তৃক দীর্ঘকাল ধরে যে আলোচনা ও গবেষণা হয়েছে এমন আর কিছু সম্বন্ধে হয় নি। বাংলাভাষাতে অশোক সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়েছে তা পরিমাণে কম হলেও একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। কৃষ্ণবিহারী সেনের 'অশোকচরিত' (১৮৯২) বাংলা ভাষায় রচিত অশোক সম্বন্ধে প্রথম ঐতিহাসিক গ্রন্থ। এছাড়া চারুচন্দ্র বসুর 'অশোক বা প্রিয়দর্শী' (১৯১১), সুরেন্দ্রনাথ সেনের 'অশোক' (১৯৪০) এবং প্রবোধচন্দ্র সেনের 'ধর্মবিজয়ী অশোক' (১৯৪১) গ্রন্থের নাম করা যেতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থের শেষভাগেও অশোক সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ ঐতিহাসিক আলোচনা দেখা যায়।

২

রবীন্দ্রসাহিত্যে অশোকের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় 'ব্যঙ্গকৌতুক' গ্রন্থের 'সারবান সাহিত্য' (১৮৯১) নামক প্রবন্ধে। বাংলাসাহিত্যে সারবান পদার্থের অভাব প্রসঙ্গে কবি এখানে পরিহাস করে বলেছেন,—

> কফ পিত্ত ও বায়ু-বৃদ্ধির পক্ষে দিশি কুমড়া ও বিলাতি কুমড়ার মধ্যে কোনো প্রভেদ আছে কিনা, অশোক এবং হর্ষবর্ধনের মধ্যে কে আগে কে পরে—আমাদের অগণ্য কাব্যনাটকের মধ্যে এ—সকল সারগর্ভ বিশ্বহিতকর প্রসঙ্গের কোনো মীমাংসা পাওয়া যায় না।

বলা বাহুল্য, এই উক্তি থেকে অশোক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব কিছুই বুঝতে পারা যায় না। অশোক সম্বন্ধে তাঁর সুস্পষ্ট মনোভাব প্রকাশ পায় আরো অনেককাল পরে বিংশ শতকের একেবারে গোড়ার দিক থেকে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, এই সময়ে ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ এবং রিস্ ডেভিড্‌সের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ দুখানিও প্রকাশিত হয়। এই সময় থেকে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রসঙ্গে অশোকের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধদেব ব্যতীত আর কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিই অশোকের মত রবীন্দ্রনাথের এমন অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও প্রশস্তি লাভ করতে পারেন নি।

কোন সময়ে দেশে এমন দিন আসে যখন একজন মহাপুরুষের মধ্য দিয়ে সমগ্রদেশ প্রকাশলাভ করে। রাজচক্রবর্তী অশোকের মধ্য দিয়ে তেমনি একবার ভারত-

১ সাহিত্যের সামগ্রী, সাহিত্য

২ প্রবোধচন্দ্র সেন, ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ, পৃ, ৭৪

বর্ষের ধর্ম ও সমাজ জীবনের সংহত প্রকাশ হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

দেশে এক একটা বড়োদিন আসে, সেই দিন বড়ো লোকের তলবে দেশের সমস্ত সালতামামি নিকাশ বড়ো খাতায় প্রস্তুত হইয়া দেখা দেয়। রাজচক্রবর্তী অশোকের সময়ে একবার বৌদ্ধসমাজের হিসাব তৈরি হইয়াছিল।১

রাজচক্রবর্তী অশোকের সময়ে ভারতবর্ষে সত্যই একটা 'বড়োদিন' এসেছিল। আর 'বড়োখাতায়' তার হিসাবও তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সে হিসাব শুধু বৌদ্ধসমাজের নয়, সমগ্র ভারতীয় সমাজের। কেননা রাজ্যের মধ্যে তিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রতিভূপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সম্প্রদায় নির্বিশেষে রাজ্যের সকল মানুষের মঙ্গলসাধনই ছিল তাঁর ব্রত। অশোকের দ্বাদশ শিলানুশাসনে উক্ত হয়েছে,—

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা প্রব্রজিত ও গৃহস্থ সর্বসম্প্রদায়কেই পূজা করেন, দানের দ্বারা ও অন্য বিবিধ উপায়েই পূজা করেন। কিন্তু দান বা পূজাকে দেবগণের প্রিয় সেরূপ মনে করেন না যেরূপ মনে করেন সর্বসম্প্রদায়ের সারবৃদ্ধিসাধনকে।২

অশোকের অনুসৃত সক্রিয় উদার ধর্মনীতিতে এই শিলানুশাসন মানুষের ধর্মীয় ইতিহাসে এক মহামূল্যবান দলিল।৩ আর অশোকের এই ধর্মীয় নীতির মধ্যেই বর্তমান ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার বীজ নিহিত।

মহাসম্রাট অশোক তাঁর রাজশক্তিকে পররাজগ্রাসে কিংবা আপন স্বার্থবিস্তারে নিয়োজিত করেন নি, সকল মানুষের কল্যাণসাধনেই নিযুক্ত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, পশুদের কল্যাণের জন্যও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। রাজচক্রবর্তীর মধ্যে এই মঙ্গলশক্তির প্রকাশ দেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অন্তরের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছেন,—

এই ভারতবর্ষে একদিন মহাসম্রাট অশোক তাঁহার রাজশক্তিকে ধর্মবিস্তারকার্যে মঙ্গল সাধনকার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজশক্তির মাদকতা যে কী সুতীব্র তাহা আমরা সকলেই জানি; সেই শক্তি ক্ষুধিত অগ্নির মতো গৃহ হইতে গৃহান্তরে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে আপনার জ্বালাময়ী লোলুপ রসনাকে প্রেরণ করিবার জন্য ব্যগ্র। সেই বিশ্বলুব্ধ রাজশক্তিকে মহারাজ অশোক মঙ্গলের দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তৃপ্তিহীন ভোগকে বিসর্জন দিয়া তিনি শ্রান্তিহীন সেবাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজত্বের পক্ষে ইহা প্রয়োজন ছিল না—ইহা যুদ্ধসজ্জা নহে, দেশজয় নহে, বাণিজ্যবিস্তার নহে; ইহা মঙ্গল শক্তির অপর্যাপ্ত প্রাচুর্য, ইহা সহসা চক্রবর্তী রাজাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার সমস্ত রাজাড়ম্বরকে এক মুহূর্তে হীনপ্রভ করিয়া দিয়া সমস্ত মনুষ্যত্বকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কত বড়ো বড়ো রাজার বড়ো বড়ো সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত বিস্মৃত ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অশোকের মধ্যে এই মঙ্গলশক্তির মহান আবির্ভাব, ইহা আমাদের গৌরবের ধন হইয়া আজও আমাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিতেছে। মানুষের মধ্যে যাহা কিছু সত্য হইয়া উঠিয়াছে তাহার গৌরব হইতে, তাহার সহায়তা হইতে, মানুষ আর কোনোদিন বঞ্চিত হইবে না। আজ মানুষের মধ্যে সমস্ত-স্বার্থজয়ী এই অদ্ভুত মঙ্গলশক্তির মহিমা স্মরণ করিয়া আমরা পরিচিত অপরিচিত সকলে মিলিয়া উৎসব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।(১)

যে রাজশক্তির জ্বালাময়ী লোলুপ রসনা সম্রাট অশোককে রাজ্যজয়ে প্রবর্তনা দান করেছিল তা কলিঙ্গবিজয়ের পর সহসা একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়। নয়তো তিনি পিতামহ চন্দ্রগুপ্তের মত দিগ্‌বিজয়ী বীররূপেই পরিচিত হতে পারতেন। কিন্তু কলিঙ্গ যুদ্ধের পর অশোক পরম বেদনায় বুঝতে পারলেন যে, এই অস্ত্রবিজয় শ্রেয়ের পথ নয়। তখন থেকে মহারাজ অশোক তাঁর রাজশক্তিকে সেবার ব্রতে মঙ্গলের দাসত্বে নিযুক্ত করলেন। সম্রাটের মধ্যে এই মঙ্গলশক্তির আবির্ভাবে তাঁকে আর ক্ষুদ্র সিংহাসনটুকুর মধ্যে ধরে রাখতে পারল না, মনুষ্যত্বের অম্লান মহিমায়

---

১ স্বদেশী সমাজ (১৯০৪), আত্মশক্তি

২ অমূল্যচন্দ্র সেন, অশোকলিপি, পৃ ৮১

৩ B. M. Barua, Asoka and his Inscrih-

মনুষ্যত্বের এই সমুজ্জ্বল প্রকাশকে রবীন্দ্রনাথ আমাদের গৌরবের ধন বলে অভিহিত করেছেন।

রাজচক্রবর্তী অশোকের মধ্যে যে মহান শক্তির আবির্ভাব হয়েছিল তা একদিকে যেমন তাঁর রাজশক্তিকে মঙ্গলের দাসত্বে নিযুক্ত করে শ্রান্তিহীন সেবার ব্রতকে বরণ করে নিয়েছে আবার অন্যদিকে এই মঙ্গলশক্তি তাঁকে সৌন্দর্যসৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করেছে। বুদ্ধগয়ার শিল্প-সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ যে উক্তি করেছেন তার মধ্যে প্রিয়দর্শী অশোকের জীবনের একটি বিশিষ্ট দিক্ উজ্জ্বল মহিমায় প্রকাশ পেয়েছে।—

> সৌন্দর্য যেখানেই পরিণতি লাভ করিয়াছে সেখানেই সে আপনার প্রগল্ভতা দূর করিয়া দিয়াছে। সেখানেই ফুল আপনার বর্ণ-গন্ধের বাহুল্যকে ফলের গূঢ়তর মাধুর্যে পরিণত করিয়াছে; সেই পরিণতিতেই সৌন্দর্যের সহিত মঙ্গল একান্ত হইয়া উঠিয়াছে।
>
> সৌন্দর্য ও মঙ্গলের এই সম্মিলন যে দেখিয়াছে সে ভোগবিলাসের সঙ্গে সৌন্দর্যকে কখনোই জড়াইয়া রাখিতে পারে না। তাহার জীবনযাত্রার উপকরণ সাদাসিধা হইয়া থাকে; সেটা সৌন্দর্য-বোধের অভাব হইতে হয় না, প্রকর্ষ হইতেই হয়। অশোকের প্রমোদ-উদ্যান কোথায় ছিল? তাঁহার রাজবাটির ভিতের কোনো চিহ্নও তো দেখিতে পাই না। কিন্তু অশোকের রচিত স্তূপ ও স্তম্ভ বুদ্ধগয়ায় বোধিবট-মূলের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার শিল্পকলাও সামান্য নহে। যে পুণ্যস্থানে ভগবান্ বুদ্ধ মানবের দুঃখনিবৃত্তির পথ আবিষ্কার করিয়াছেন রাজচক্রবর্তী অশোক সেইখানেই, সেই পরমমঙ্গলের স্মরণক্ষেত্রেই, কলাসৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। নিজের ভোগকে এই পূজার অর্ঘ্য তিনি এমন করিয়া দেন নাই। ১

বলা বাহুল্য, অশোক শুধু বুদ্ধগয়ায় নয়, বুদ্ধদেবের স্মৃতিপূত প্রতিটি স্থানেই কলাসৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা করেছেন। এভাবেই তিনি পরমমঙ্গলের স্মরণক্ষেত্রে আপনার প্রণাম রেখে গেছেন। আর ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যে ভোগ-বিলাসকে বর্জন করে অনাড়ম্বর জীবনযাত্রাকে বরণ করে নিয়েছিলেন, সেকথা বলবার অপেক্ষা রাখে না। এদিক্ থেকে তিনি প্রকৃত রাজর্ষি। রবীন্দ্রসাহিত্যে যে ভারতীয় আদর্শ নৃপতির মহিমা বর্ণিত হয়েছে তা'তেও দেখা যায় মানবকল্যাণে নিয়োজিত সর্বত্যাগী রাজসন্ন্যাসীর চিত্র।—

> হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
> ত্যজিতে মুকুট দণ্ড সিংহাসন ভূমি,
> ধরিতে দরিদ্রবেশ;……
>
> … … …
>
> ভোগেরে বেঁধেছে তুমি সংযমের সাথে,
> নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল,
> সম্পদেরে পুণ্যকর্মে করেছ নির্মল।২

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্যের আদর্শ নৃপতি হিসাবে গোবিন্দ-মাণিক্য, বিক্রমাদিত্য, কোশলরাজ ও শিবাজির উল্লেখ করা যেতে পারে। বস্তুত 'রাজর্ষি' উপন্যাসে গোবিন্দ-মাণিক্যের উক্তির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের অন্তরতম সত্যই ব্যক্ত হয়েছে।—

> রাজা পাইতে চাও তো সহস্র লোকের দুঃখকে আপনার দুঃখ বলিয়া গ্রহণ করো, সহস্র লোকের বিপদকে আপনার বিপদ বলিয়া বরণ করো, সহস্র লোকের দারিদ্র্যকে আপনার দারিদ্র্য বলিয়া স্কন্ধে বহন করো—এ যে করে সে'ই রাজা, সে পর্ণকুটিরেই থাক্ আর প্রাসাদেই থাক্। যে ব্যক্তি সকল লোককে আপনার বলিয়া মনে করিতে পারে, সকল লোক তো তাহারই। পৃথিবীর দুঃখহরণ যে করে সেই পৃথিবীর রাজা। পৃথিবীর রক্ত ও অর্থ শোষণ যে করে সে তো দস্যু।

এদিক্ থেকে বিচার করতে গেলে ভারতবর্ষের ইতিহাসে অশোকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ রাজর্ষি আর কে আছে! তিনি যথার্থই সহস্র সহস্র লোকের দুঃখকে আপনার করে নিয়েছেন, মানুষের কল্যাণসাধনের দুঃসাধ্য ব্রতকেই জীবন দিয়ে গ্রহণ করেছেন। 'রাজর্ষি' উপন্যাস রচনার সময় রবীন্দ্রনাথের মনে অশোকের আদর্শ জাগ্রত থাকা অসম্ভব নয়।

৩

১৯১২ সালে ইউরোপ যাত্রার প্রাক্‌কালে রবীন্দ্রনাথ 'যাত্রার পূর্বপত্র' প্রবন্ধে ইউরোপের দুঃখপ্রদীপ্ত সেবাপরায়ণ প্রেমের কথা বলতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে ভারতবর্ষের বৌদ্ধ-যুগের উল্লেখ করে বলেছেন,—

> বৌদ্ধযুগে ভারতবর্ষ যখন প্রেমের সেই ত্যাগধর্মকে বরণ করিয়া লইয়াছিল তখনি সমাজে তাহার এমন একটি বিকাশ ঘটিয়াছিল যাহা য়ুরোপে সম্প্রতি দেখিতেছি। রোগীদের জন্ম ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা, এমন-কি পশুদের জন্যও চিকিৎসালয় এখানে স্থাপিত হইয়াছিল এবং জীবের দুঃখনিবারণের চেষ্টা নানা আকার ধারণ করিয়া দেখা দিয়াছিল; তখন নিজের প্রাণ ও আরাম তুচ্ছ করিয়া ধর্মাচার্যগণ দুর্গম পথ উত্তীর্ণ হইয়া পরদেশীয় ও বর্বরজাতীয়দের সদ্গতির জন্য দলে দলে এবং অকাতরে দুঃখ বহন করিয়াছেন। ভারতবর্ষে সেদিন প্রেম আপনার দুঃখরূপকে বিকাশ করিয়াই ভক্তগণকে বীর্যবান মহৎ মনুষ্যত্বের দীক্ষা দান করিয়াছিল। সেইজন্যই ভারতবর্ষ সেদিন ধর্মের দ্বারা কেবল আপনার আত্মা নহে, পৃথিবীকে জয় করিতেপারিয়াছিল এবং আধ্যাত্মিকতার তেজে ঐহিক পারত্রিক উন্নতিকে একত্র সম্মিলিত করিয়াছিল। তখন য়ুরোপের খৃষ্টান সভ্যতা স্বপ্নের অতীত ছিল। ভারত-বর্ষের সেই দুঃখব্রত আত্মত্যাগপরায়ণ প্রেমের উজ্জ্বল দীপ্তি কৃত্রিমতা ও ভাবরসাবেশের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছে, কিন্তু তাহা কি নির্বাপিত হইয়াছে? (১)

এখানে অশোকের নাম উল্লেখ করা না হলেও ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগ বলতে যে অশোকের রাজত্বকালকেই বলা হয়েছে তাতে আর সন্দেহ নেই। উদ্ধৃত অংশটুকু পড়লে মনে হয় যেন রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে অশোকলিপির বাণীই নবরূপে প্রকাশলাভ করেছে। অশোকের দ্বিতীয় শিলানুশাসনে বলা হয়েছে,—

> দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার রাজ্যে সর্বত্র এবং প্রত্যন্ত দেশে যেখানে চোলগণ পাণ্ড্যগণ সত্যপুত্রগণ কেরলপুত্রগণ, তাম্রপর্ণী পর্যন্ত, অন্তিয়ক যোন রাজা এবং অন্তিয়কের সমীপস্থ যে রাজারা আছেন—সর্বত্র মানুষ ও পশুর জন্য দ্বিবিধ চিকিৎসা ব্যবস্থা করা হয়েছে। মানুষ ও পশুর উপযোগী ওষধি যেখানে যেখানে নেই, সেখানে তা আহরণ ও রোপণ করা হয়েছে। পশু ও মানুষের পরিভোগের জন্য পথিমধ্যে কূপ খনন ও বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। (১)

সর্বমানবের ঐহিক ও পারত্রিক উন্নতিসাধনকে যে তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন সে কথাও তাঁর একাধিক শিলালিপিতে স্পষ্ট উল্লিখিত হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পৃথক কলিঙ্গ শিলানুশাসনে তিনি বলেছেন,—

> সর্ব মনুষ্যগণ আমার সন্তান। যেমন সন্তান সম্বন্ধে আমি ইচ্ছা করি যে তারা আমার দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব হিতসুখে যুক্ত হউক, সকল মানুষ সম্বন্ধেও আমার সেইরূপই ইচ্ছা। (২)

দেবপ্রিয় অশোক ধর্মবিজয়কে যে শ্রেষ্ঠ বিজয় মনে করতেন সে কথাও তাঁর শিলালিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে। (৩) তাঁর প্রেরিত ধর্মাচার্যগণ একদিন দূরবাসী অনাত্মীয়জনকেও 'আত্মার অমৃত-অন্ন' দান করার জন্য দিকে দিকে অভিযান করেছিলেন। আর এঁদের আত্ম-ত্যাগ ও দুঃখবহনের ফলে বর্বর জাতীয়দেরও যে সদ্গতি সাধিত হয়েছিল সেকথা ইংরেজ ঐতিহাসিক এল, জে, সণ্ডার্স্‌-এর উক্তি থেকেও সমর্থিত হবে।—

> The mission of king Asoka are amongst the greatest civilizing influences in the world's history; far they entered countries for the most part barbarons and full of superstitions and amongst these animistic peoples Buddhism spread as a wholesome leaven.৪

অর্থাৎ, পৃথিবীর ইতিহাসে মানবসভ্যতার অগ্রগতির

(১) নৈবেদ্য, ৯৪ সংখ্যক কবিতা

(১) অমূল্যচন্দ্র সেন, অশোকলিপি, পৃ ৫৮-৫৯

(২) অশোকলিপি, পৃ ৯৩, ৯৯

(৩) ত্রয়োদশ শিলানুশাসন, অশোকলিপি, পৃ ৮৫

(৪) The Story of Bnddhism (1916), P. 76; প্রবোধ চন্দ্র সেন মহাশয়ের 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ'

মূলে অশোকের ধর্মপ্রচার অন্যতম প্রধান কীর্তি। তাঁর প্রেরিত ধর্মদূতগণ যেসকল দেশে অভিযান করেছিলেন তার অধিকাংশই ছিল বর্বর ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এসকল মানুষের জীবনে বৌদ্ধধর্ম বিশেষ কল্যাণপ্রদ হয়েছিল।

আর অশোকের সময়ে ভারতবর্ষ প্রেমের ত্যাগধর্মকে বরণ করে নেওয়ার ফলে যে সামাজিক বিকাশ হয়েছিল তা সম্প্রতি ইউরোপের খ্রীষ্টীয় বদান্যতা ও সেবাপরায়ণতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু এখানে আর একটা কথা বলবার অপেক্ষা রাখে। খ্রীষ্টীয় ধর্মাচার্যদের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর অনেক স্থানে ইউরোপীয় সাম্রাজ্য-শক্তি ও বাণিজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষাও সক্রিয় ছিল। বৌদ্ধধর্ম ও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের মূলে এই পার্থক্য সামান্য নয়। রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন—

> ভারতবর্ষ বৌদ্ধ-রাজাদের অধীনে বিদেশে আপন ধর্ম প্রেরণ করিয়াছে, আপন স্বার্থ বিস্তার করে নাই। ভারতবর্ষীয় সভ্যতায় বিনাশপ্লাবনের বেগ কোনোকালে ছিল না। ক্ষমতা ও স্বার্থবিস্তার ভারতবর্ষীয় সভ্যতার ভিত্তি নহে। ১

এখানেও বৌদ্ধরাজা বলতে প্রধানত অশোকের কথাই বলা হয়েছে।

বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে অর্থাৎ সম্রাট অশোকের সময় ও তৎপরবর্তীযুগে ভারতবর্ষ প্রেমের ত্যাগধর্মকে গ্রহণ করে মানবকল্যাণের জন্য অকাতরে যে দুঃখবহন করেছে, সেই বীর্যবান প্রেমের আবেগে জীবনের সকলক্ষেত্র পরিপূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করেছিল। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন.—

> বৌদ্ধধর্ম বিষয়াসক্তির ধর্ম নহে, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে এবং তৎপরবর্তী যুগে সেই বৌদ্ধসভ্যতার প্রভাবে এদেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্য-শক্তির যেমন বিস্তার হইয়াছিল এমন আর কোনোকালে হয় নাই।
>
> তাহার কারণ এই, মানুষের আত্মা যখন জড়ত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত হয় তখনই আনন্দে তাহার সকল শক্তিই পূর্ণ বিকাশের দিকে উদ্যম লাভ করে। আধ্যাত্মিকতাই মানুষের সকল শক্তির কেন্দ্রগত, কেননা তাহা আত্মারই শক্তি। পরিপূর্ণতাই তাহার স্বভাব। তাহা অন্তর বাহির কোনোদিকেই মানুষকে খর্ব করিয়া আপনাকে আঘাত করিতে চাহে না। ১

এর অনেককাল পরে ১৯৩৫ সালে কলকাতায় শ্রীধর্মরাজিক চৈত্যবিহারে বৈশাখীপূর্ণিমা উপলক্ষে তিনি যে ভাষণ দান করেন, তাতেও বুদ্ধদেব ও অশোকের ধর্মপ্রেরণার প্রভাব সম্বন্ধে কবির এই মনোভাব আরো উজ্জ্বলদীপ্তিতে প্রকাশ পেয়েছে।—

> ভগবান বুদ্ধ তপস্যার আসন থেকে উঠে আপনাকে প্রকাশিত করলেন। তাঁর সেই প্রকাশের আলোকে সত্যদীপ্তিতে প্রকাশ হল ভারতবর্ষের। মানব-ইতিহাসে তাঁর চিরন্তন আবির্ভাব ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে ব্যাপ্ত হল দেশে দেশান্তরে। ভারতবর্ষ তীর্থ হয়ে উঠল, অর্থাৎ স্বীকৃত হল সকল দেশের দ্বারা, কেননা বুদ্ধের বাণীতে ভারতবর্ষ সেদিন স্বীকার করেছে সকল মানুষকে। ...তিনি এসেছিলেন সকল মানুষের জন্যে, সকল কালের জন্যে। তিনি মানুষের কাছে সেই প্রকাশ চেয়েছিলেন, যা দুঃসাধ্য, যা চিরজাগরূক, যা সংগ্রামজয়ী, যা বন্ধন-চ্ছেদী। তাই সেদিন পূর্ব মহাদেশের দুর্গমে দুস্তরে বীর্যবান পূজার আকারে প্রতিষ্ঠিত হল তাঁর জয়ধ্বনি, শৈলশিখরে, মরুপ্রান্তরে, নির্জন গুহায়। এর চেয়ে মহত্তর অর্ঘ্য এল ভগবান বুদ্ধের পদমূলে যেদিন রাজাধিরাজ অশোক শিলালিপিতে প্রকাশ করলেন তাঁর পাপ, অহিংস্র ধর্মের মহিমা ঘোষণা করলেন, তাঁর প্রণামকে চিরকালের প্রাঙ্গণে রেখে গেলেন শিলাস্তম্ভে। এত বড়ো রাজা কি জগতে আর কোনো দিন দেখা দিয়েছে। ২

ভগবান বুদ্ধের বাণীকে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে যিনি দেশ দেশান্তরে ব্যাপ্ত করেছিলেন তিনি তো রাজাধিরাজ অশোক। আর বুদ্ধদেবের বাণীতে ভারতবর্ষ যে সকল মানুষকে স্বীকার করেছে তাকেও তিনি বাস্তবে রূপায়িত করেছেন। বস্তুত নিজের সর্বস্ব ত্যাগ

১ [illegible]

১ যাত্রার পূর্বপত্র (১৯১২), পথের সঞ্চয়

২ 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থে সংকলিত বুদ্ধদেব (১৯৩৫)

করে সম্রাট অশোক যে দুঃসাধ্য কল্যাণব্রতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, হিংসার পরিবর্তে যে অহিংসা ও মৈত্রীর আদর্শকে বরণ করে নিয়েছিলেন, এর দ্বারাই তিনি ভগবান বুদ্ধের পদমূলে শ্রেষ্ঠতম অর্ঘ্য দান করেছেন। শৈলশিখরে মরুপ্রান্তরে ও নির্জন গুহায় বুদ্ধদেবের উদ্দেশে পূজা নিবেদন করে যে কর্মকীর্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছে তার চেয়ে সর্বলোকের কল্যাণচিন্তায় নিয়োজিত অশোকের নিষ্কাম সেবার আদর্শ ও চিত্তমার্জনার ব্রত আরো দুঃসাধ্য ও মহত্তর। মহত্তের পূজারী রবীন্দ্রনাথ তাই অশোককে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নৃপতি বলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। বাস্তবিক জগতে এত বড় রাজা আর কোন দিন দেখা যায় নি। পৃথিবীর ইতিহাসে অশোকের স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এইচ, জি, ওয়েলস্ বলেছেন,—

> Amidst the tens of thousands of names of monarchs that crowd the columns of history, the name of Asoka shines, and shines almost alone, a star. From the Valga to Japan his name is still honoured. China, Tibet ··preserve the tradition of his greatness. More living men cherish his memory to-day than have ever heard the names of Constantine or charle-magne. (১)

অর্থাৎ, যে সহস্র সহস্র নৃপতিবৃন্দের নাম পৃথিবীর ইতিহাসের পৃষ্ঠা ভারাক্রান্ত করেছে, তাঁদের মধ্যে অশোকের নাম প্রায় একক মহিমায় উজ্জ্বল এক জ্যোতিষ্কের ন্যায় দীপ্তিমান। ভলগা থেকে জাপান পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডের সংখ্যাতীত নরনারী অশোকের নাম আজও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করে। চীন, তিব্বত প্রভৃতি দেশে তাঁর মহান ঐতিহ্যের নিদর্শন এখনো বিরাজিত। তাঁর পুণ্যময় নাম অদ্যাপি যত লোকের মুখে কীর্তিত হয়ে থাকে, ততলোক কন্স্ট্যানটাইন্ বা সার্লামেনের নামও শোনে নি।

৪

ধর্মীয় উদারতা ও সুশাসনের জন্য ভারতবর্ষের ইতিহাসে মোগলসম্রাট আকবরের একটি বিশেষ স্থান আছে। রবীন্দ্রনাথ সেজন্য আকবরের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। অশোক ও আকবরকে একত্রে উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

> বৌদ্ধযুগের অশোকের মতো মোগলসম্রাট্ আকবরও কেবল রাষ্ট্রসাম্রাজ্য নয়, একটি ধর্মসাম্রাজ্যের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। এইজন্যই সে সময়ে পরে পরে কত হিন্দু সাধু ও মুসলমান সুফির অভ্যুদয় হইয়াছিল যাঁরা হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের অন্তরতম মিলনক্ষেত্রে এক মহেশ্বরের পূজা বহন করিয়াছিলেন। এবং এমনি করিয়াই বাহিরের সংসারের দিকে যেখানে অনৈক্য ছিল, অন্তরাত্মার দিকে পরম সত্যের আলোকে সেখানে সত্য অধিষ্ঠান আবিষ্কৃত হইতেছিল (১)

আকবরের প্রসঙ্গে এখানে রবীন্দ্রনাথের মনে অশোকের ধর্মবিজয়ের কথাই উদিত হয়েছে। বস্তুত এদিক থেকে অশোক ও আকবরের মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। ধর্মীয় উদারতার ক্ষেত্রে এই দুই মহান নৃপতির মধ্য দিয়ে যেন ভারতবর্ষের চিরন্তন সত্যস্বরূপ অভিব্যক্ত হয়েছে।(২) প্রিয়দর্শী অশোক যেমন রাজ্যের মধ্যে সকল সম্প্রদায়ের সারবৃদ্ধি কামনা করতেন আকবরও তেমনি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখতেন। পূর্বে হিন্দুদের উপর যে জিজিয়া কর আরোপ করা হয়েছিল আকবরই তা উঠিয়ে দেন। তা ছাড়া তিনি হিন্দুদের উচ্চ রাজকার্যেও নিযুক্ত করেন। তিনি যে ইবাদতখানা বা উপাসনা গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন তা ছিল সকল সম্প্রদায়ের এক উদার ও প্রশস্ত মিলনক্ষেত্র। সর্বধর্মের সার অবলম্বনে রচিত আকবরের দীন ইলাহি ধর্মের আদর্শও তাঁর ধর্মীয় উদারতা ও সমন্বয় সাধনার পরিচায়ক। এর ফলে দেখা যায়, আমাদের দেশে তখন বহু হিন্দু সাধক ও মুসলমান সুফির আবির্ভাব হয়েছে যাদের সমন্বয় সাধনার মধ্য দিয়ে আমাদের জাতীয় চিত্তে এক পরম ঐক্যের সঞ্চার হয়েছিল। কিন্তু আকবর যে ধর্মসাম্রাজ্যের কথা চিন্তা করেছিলেন সে

১ H. G. Wells, The Outline of History

(১) স্বাধিকারপ্রমত্তঃ (১৯১৮), কালান্তর

(২) Jawaharlal Nehru, Glimpses of World

তাঁর রাষ্ট্রসাম্রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আর অশোকের ধর্মসাম্রাজ্য তাঁর রাষ্ট্রসাম্রাজ্যের সীমা অতিক্রম করে এক দিকে তাম্রপর্ণী এবং অন্যদিকে এপিরাস—সাইবিনি পর্যন্ত পৃথিবীর বিশাল ভূখণ্ডে বিস্তারলাভ করে। বস্তুত পৃথিবীর ইতিহাসে এই ধর্মবিজয়ের দৃষ্টান্ত বিরল। পৃথিবীতে সিজার, চেঙ্গিস, আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ন ও হিটলারের মত দুর্দান্ত প্রতাপশালী অস্ত্রবিজয়ী বীরের অভাব নেই, কিন্তু ধর্মবিজয়ী বীর একমাত্র অশোক। অশোকের এই ধর্মবিজয় ভারতবর্ষের চিরন্তন গৌরবের সামগ্রী (১)

ধর্মীয় উদারতার দিক্ থেকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে অশোক ও আকবরের সঙ্গে শিবাজীর নামও উল্লেখযোগ্য। অশোক ও আকবরের মত শিবাজীও এক ধর্মসাম্রাজ্যের কথা চিন্তা করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,--

> আমাদের দেশে মোগল শাসনকালে শিবাজীকে আশ্রয় করিয়া যখন রাষ্ট্রচেষ্টা মাথা তুলিয়াছিল তখন সে চেষ্টা ধর্মকে লক্ষ্য করিতে ভুলে নাই। শিবাজীর ধর্মগুরু রামদাস এই চেষ্টার প্রধান অবলম্বন ছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রচেষ্টা ভারতবর্ষে আপনাকে ধর্মের অঙ্গীভূত করিয়াছিল। ২

আর ধর্মগত উদার ঐক্যই ছিল শিবাজীর ধর্মসম্রাজ্যের মূল ভিত্তি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু হলেও রাজা হিসাবে হিন্দু-মুসলমান উভয় প্রজাকেই সমদৃষ্টিতে দেখতেন। সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ উদার ধর্মীয় নীতির জন্য শিবাজী রবীন্দ্রনাথের এমন শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ হয়েছেন।

অশোক ও আকবরকে রবীন্দ্রনাথ আরো একবার একসঙ্গে উল্লেখ করেছেন।—

> বিধাতার রচা ইতিহাস আর মানুষের রচা কাহিনী এই দুই কথায় মিলে মানুষের সংসার। মানুষের পক্ষে কেবল যে অশোকের গল্প, আকবরের গল্পই সত্য তা নয়, যে রাজপুত্র সাত-সমুদ্রপারে সাত রাজার ধন মাণিকের সন্ধানে চলে সেও সত্য।৩

'স্বাধিকারপ্রমত্তঃ' (১৯১৮) প্রবন্ধ রচনার অল্পকালের মধ্যেই এই গল্পটি রচিত। বিধাতার রচা ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণরূপে রবীন্দ্রনাথ এখানে ভারতবর্ষের দুই মহান সম্রাট অশোক ও আকবরের নাম উল্লেখ করেছেন। অশোক ও আকবরকে এভাবে একাধিকবার এক সঙ্গে উল্লেখ করার মূলে রয়েছে তাঁদের আদর্শগত ঐক্য। এই আদর্শ হল সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ উদার ধর্মীয় দৃষ্টি। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ আজীবন এই আদর্শের পূজারী।

৫

জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও রবীন্দ্রনাথের অন্তরে অশোকের মহিমা উজ্জ্বলভাবে জাগ্রত ছিল। ১৯৪০ সালে শ্রীমতী হিল্ডা সেলিগম্যান মৌর্যবংশের কাহিনী নিয়ে When Peacocks Called নামক এক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখে দেন। এই ভূমিকাতে তিনি বলেছেন,—

> In an age of fratricide, aided by intellectual dehumanization in the large areas of the world, it is difficult to restore the calm air so necessary for the realization of great human ideals. Hilda Seligman has chosen in her book to reveal the organization side of a great humanism which came with king Asoka of India. My good thoughts go with the author in her venture to present ancient India through its message which has a perennially modern significance. ১

অর্থাৎ, মানুষের বুদ্ধিগত অমানুষীকরণের ফলে পৃথিবীর বৃহৎ অংশ জুড়ে অধুনা এক ভ্রাতৃঘাতী নীতির যুগ চলেছে। উচ্চতর মানবীয় আদর্শ উপলব্ধির জন্য যে শান্ত স্বাভাবিক অবস্থা বিশেষ প্রয়োজন এমতাবস্থায় তা ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত কঠিন। ভারতবর্ষে সম্রাট অশোকের সময়ে যে মানবিকতার বিকাশ হয়েছিল, এই

---

১ প্রবোধ চন্দ্র সেন, ধর্মবিজয়ী অশোক, পৃ, ১৫

২ ধম্মপদং (১৯০৫), প্রাচীন সাহিত্য

৩ গল্প (১৯২০), লিপিকা

১ Foreword (1940), when Peacocks called; প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ৯৯

গ্রন্থে হিল্‌ডা সেলিগম্যান তার গঠনমূলক দিকটির উপর আলোকপাত করেছেন। প্রাচীন ভারতের সর্বকালীন আধুনিক আদর্শটি তুলে ধরার জন্য লেখিকা যে দুঃসাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন তার সঙ্গে যুক্ত করি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

অশোক যে মহৎ মানবীয় আদর্শের প্রতিষ্ঠা করে-ছিলেন তা আজকের দিনের দ্বন্দ্বকোলাহলের মধ্যেও স্মরণ করার বিশেষ সার্থকতা আছে। অশোকের সেই মানবীয় আদর্শ মানুষকে চিরদিন ত্যাগে, প্রেমে ও মানবসেবার দুঃখবরণের মহৎ সংকল্পে প্রেরণা জোগাবে। এদিক্‌ থেকে অশোকের আদর্শ চিরকালের আধুনিক বা সর্বকালীন। তাই মহৎ আদর্শের পূজারী রবীন্দ্রনাথ অশোককে এমন আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে একমাত্র বুদ্ধদেব ব্যতীত আর কেউ রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে এমন শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভ করতে পারেন নি।

গ্রামের মেয়ে

শ্রীবংশীধর মণ্ডল

যদিও সে ছিল সেই মেয়ে
এই দেশে—
কোনো দিন দেখি নাই চেয়ে
ছিল সেতো এ গ্রামের মেয়ে
অনেক দিনের কথা।

শুধু আজ মনে হয়
সেই দিন পথে যেতে যেতে
শাল বনে আঙুরের ক্ষেতে
দেখা হোত তবু কতবার
আর আজ শুধালেতো লোকে বলে
জানিনা'ক নামটী যে তার।'

বেলা শেষ হয়ে গেলে পর
গো'ধূলির ছায়া নামে
পাখিরাও চলে যায় ঘর
আশ্বিনের চাঁদ ওঠে মাঝ রাতে
মাথার উপর।

সেতো এসে বলেছিলো কি যে
ডাকি নাই তাকে আমি
[illegible]

তার পর কত গিছে দিন
পার হয়ে গিয়েছে তো
বসন্ত চলেও গেছে
শুষ্ক হয়ে গেছে ফুলবন
বুঝি নাই ওগো মেয়ে
বুঝি নাই সে তোমার মন।
সোনার কপালে তার সুরভি সিন্দুর
মুছে গেছে অগোচরে
তার সোনার ধান মরে গেছে
আকাশ বিধুর
হয়েছে তো বারে বারে
আর কিছু বাকী তার আছে?

এখন অনেক রাত ঘুম নাই চোখে
চাঁদ জেগে আছে
ঘুম ভেঙ্গে চেয়ে দেখি স্বপ্নের আলোকে
সেতো বুঝি দাঁড়িয়ে যে রয়েছে
কাজল মেঘের মত চুল তার
দুটি চোখে নিভু নিভু আলো
সে মেয়েকে একদিন
স্বপ্নে আমি
বেসেছিনু ভালো।

অরুণকুমার দত্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

তিন

আর্ডেন হোটেল। নয় নম্বর রয়েল টেরাস। চারদিকে একটা আভিজাত্যের ছোঁয়াচ। প্রিন্সেস ষ্ট্রীটের ইষ্ট-এণ্ড এর খুব কাছেই জায়গাটা।

সমতল ভূমি থেকে একটা মসৃণ পিচ বাঁধান রাস্তা ওপরের পাহাড়ের খাড়াইয়ে উঠে গেছে। পাহাড়টার নাম কার্লটন হিল। তার গা বেয়ে বেয়ে সাপের মত পাক খেয়ে খেয়ে রাস্তা ওপরে চলে গেছে। ঢালু ছিমছাম রাস্তাটার একদিকে বড় বড় বাড়ী। বেশীর ভাগই হোটেল। আর একদিকে প্রায় পঞ্চাশ ফুট নীচ দিয়ে আবার সমতলের রাস্তা।

সেখানে আবার একসার সুশৃঙ্খল ভাবে সাজান বাড়ীর সারি। আর্ডেন হোটেলে বসে দেখা যায় একদিকের উৎরাইয়ের রাস্তায় সবুজ, লাল রঙের বাস চলছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পথচারীর দল। আর একদিকের চড়াইয়ে কার্লটন হিলের ঘন সন্নিবিষ্ট গাছের সার, সগর্বে মাথা তুলে রয়েছে।

আর্ডেন হোটেলটা সামারে পুরোপুরি হোটেল হয়ে যায়। তখন এখানকার ভাড়া বেশী। সামারে তাই এখানে নিয়মিত আবাসিকদের রাখা হয়না। সকলকে চলে যেতে অনুরোধ করা হয়। তখন আসে বাইরে থেকে টুরিষ্টদের দল। একঝাঁক প্রজাপতির মত। চারিদিকে বসন্তের মেলা বসে যায়।

ব্রিটেনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই খালি যে ছেলেমেয়েরা আসে তা নয়। আসে ফ্রান্স, সুইটজারল্যাণ্ড, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া সুদূর আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া থেকে। অকৃপণভাবে তারা পয়সা খরচ করে। দুদিন থেকে চলে যায়।

আকর্ষণ করে তাদের; এডিনবরার 'ট্যাটু' হাতছানি দেয় অনেককে। ক্যাসলে তখন সুরু হয় জলসা, গান, নাচ, কুচকাওয়াজের মহড়া; তার নাম ট্যাটু। তাই আর্ডেন হোটেলের মনোরম পরিবেশের জন্যে সামারে তার দাম চড়া।

শীতকালে কিন্তু উল্টো। নিষ্ঠুর শীতের নিরানন্দ পরিবেশ বিকর্ষণ করে সবাইকে। কার্লটন হিল থেকে তখন নেমে আসে হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা হাওয়া। সামনের উৎরাইয়ের সবুজ গাছগুলো তখন পাতা ঝরে বিবর্ণ হয়ে যায়। গানগাওয়া রবিন, নাইটেংগল পাখীরাও তখন হয়ে যায় নিরুদ্দেশ।

শীতের সুরু থেকে আর্ডেন হোটেলের মালিক কামরোভস্কির মুখের হাসি মিলোতে থাকে। তার দামী খদ্দেরদের কেউ আসেনা তখন। তাই হোটেলের দরজা তখন খুলে যায় ছাত্রদের জন্যে। যাদের বেশীর ভাগই ইনডিয়ান কি পাকিস্থানী।

কামরোভস্কি জাতে পোলিশ। হিটলারের সৈন্য-বাহিনী যখন লোলুপ আগ্রহে পোল্যাণ্ডের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তখন অনেক পোলিশ দেশ ছেড়ে ব্রিটেনে পালিয়ে আসে। কামরোভস্কি তাদের একজন। তাঁর কিন্তু মনে মনে আশা একদিন তারা আবার ফিরে যাবে মুক্ত পোল্যাণ্ডে। তাদের দেশে স্বাধীন সরকার হবে প্রতিষ্ঠিত।

কামরোভস্কির বয়স পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। সে বিয়ে করে এক স্কটিশ ভদ্রমহিলাকে। তাদের তিন ছেলে। তারাও কামরোভস্কিকে সাহায্য করে হোটেল পরিচালনার ব্যাপারে।

সামারে স্কটল্যাণ্ডের লেকঅঞ্চলের নয়নাভিরাম দৃশ্য

আর্ডেন হোটেল—চারতলার পাশাপাশি দুটো বাড়ী

দিয়ে তৈরী। বাড়ী দুটো ভেতরের দরজা দিয়ে সংযুক্ত।

চারতলা না বলে, তিনতলাই একে বলা উচিত। মাটির নীচের ঘরগুলোকে বলে বেসমেণ্ট। সেখানে সপরিবারে কামরোভস্কি থাকেন ও ভাঁড়ারের জিনিষপত্তর থাকে।

শঙ্কর এসে জায়গা পেল দোতলার একটা ডবল সীটের রুমে। ঘরের অন্য রুমমেট না আসাতে একটু হাত পা ছড়িয়ে শঙ্কর সোফা টেনে বসল।

পাশাপাশি দুটো বিছানা। বিছানার পাশে ছোট টেবিল। তার ওপর টেবল-ল্যাম্প। ঘরের কোণে গ্যাস হীটার। একটা শিলিং ফেললে প্রায় ঘণ্টাখানেক চলে।

এককোণে সার্সী আঁটা একটা বড় জানালা। ভারী পরদা দিয়ে সেটা ঢাকা। পরদার কাপড়ে হাত দিলেই বোঝা যায় সেটা বেশ দামী। দড়ি টেনে পর্দাটা সরালে কার্লটন হিল চোখে পড়ে।

ঘরের আর এক কোণে একটা ছোট এন্টিরুম। জামা-কাপড় ছাড়ার জন্যে সেটা ব্যবহার করা হয়। তার দরজার পাল্লাটা আসল ঘরের দিকে ভেজান।

মেজেতে পুরু কার্পেট বিছানো। ঘরের দেওয়ালে রঙীন কাগজ আঁটা। তাতে রকমারী সব নক্সা কাটা।

শঙ্কর ভাল করে সব লক্ষ্য করতে লাগল। মিস ডেভলিনের ঘরের প্রায় আড়াইগুণ বড় হবে এই ঘরটা, আয়তনে। বড় আলমারীর পাল্লা খুলে শঙ্কর তার জ্যাকেট ও ট্রাউজার হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখল। ম্যাকিনটশটা রাখল দরজার হুকে। সন্ধ্যে সাতটা বেজেছে। ড্রেসিং-গাউন গায়ে চাপিয়ে সোফার উপর বসল শঙ্কর।

চক্রোত্তিমশায়ের ঘরটা পাশের বাড়ীটার তিনতলায়। সেখানে আবার এখন যেতে ইচ্ছে করল না।

একটু বাদেই দরজা নক্ করে ঘরে ঢুকলেন তার অন্য রুমমেট ডাঃ গ্রেভাল।

—হ্যালো, আপনি এসে গেছেন। আপনার কথা আমাকে মিঃ কামরোভস্কি বলছিলেন আজ সকালে। বলে হাত বাড়িয়ে দিলেন ডাঃ গ্রেভাল। করমর্দ্দন করে যথা-রীতি পরিচয়ের পালা শেষ হল।

ডাঃ গ্রেভাল এম আর সি পি পরীক্ষার জন্যে এদেশে কোর্স করবেন এডিনবরা রয়াল ইনফরমারিতে, তারপর লণ্ডন চলে যাবেন।

গ্রেভালের বাড়ী দিল্লীতে। নিখুঁতভাবে গোঁফ-দাড়ী কামানো স্যুট পরিহিত গ্রেভালকে দেখে শঙ্করের ইউ, পির লোক বলে মনে হল। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হবে।

ডাক্তারির বইগুলো কোলে নিয়ে ডাঃ গ্রেভাল বলে উঠলেন—ডাঃ মিত্রা, আমাদের এখন পড়তে হবে। এই সব মোটা মোটা বইগুলো তিন মাসের মধ্যে শেষ করে পরীক্ষায় বসতে হবে। ডাক্তারদের জীবন 'বেড্ অব রোজেজ' নয়। আমাদের এখন মেসিনের মত হতে হবে। রিড্, রিড্ এণ্ড রিড।

শুনতে শুনতে শঙ্করের মুখভাব একটু বিকৃত হয়ে গেল।

—জানেন আমি এই হোটেল কালকে ছেড়ে দিচ্ছি। বইটা হঠাৎ বন্ধ করে ডাঃ গ্রেভাল বলে ওঠে। সেকি!

হ্যাঁ, ঠিক তাই। এর ল্যাণ্ডলর্ড কামরোভস্কি হচ্ছে মহা হারামজাদা লোক। আমাকে বলেছিলো একটা প্যারা-ফিনের হীটার দেবে, কিছুই দিলেনা। ঠাণ্ডায় মারা যাচ্ছি। এই গ্যাস হীটারের স্লটারে একটা শিলিং ফেললে তিনঘণ্টা চলা উচিত। একঘণ্টাতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। কি রকম চিটিংবাজী চালাচ্ছে দেখেছেন।

পড়াশুনা আর হলনা। গল্পই চলতে লাগল। একথা সেকথা হতে হতে শিখেদের কথা উঠল। শঙ্কর ফস করে বলে বসল—জানেন শিখেদের সম্বন্ধে অনেক হাসির গল্প প্রচলিত আছে। বলে কলকাতার পাইয়াজীদের গল্প বলতে লাগল।

হঠাৎ শঙ্কর লক্ষ্য করল ডাঃ গ্রেভাল গম্ভীর হয়ে উঠে পড়ার বইটা খুলে ফের পড়তে সুরু করেছেন। তারপর একসময় উঠে পড়লেন। অস্থির হয়ে ঘরের মধ্যে পাইচারি করলেন। তারপর চামড়ার বড় সুটকেসটা খুললেন। একটা হালকা নীল রংয়ের তোয়ালে বার করে সেটা পাগড়ীর মত মাথায় জড়ালেন। তারপর একটা বই বার করে পড়তে সুরু করলেন। মনে হল কোন ধর্মগ্রন্থ। বইটার ভাষা কিন্তু ইংরাজী নয়।

শঙ্করও বেশ চকচকিয়ে গেল।

[ড]াইনিং হলে জড় হল। সেখানে চক্কোত্তিমশায়ের সঙ্গে [দে]খা হল।

সব শুনে হাসতে হাসতে চক্কোত্তিমশায় বললেন—আরে [ডা]: গ্রেভাল যে শিখ। ওর ব্যাপার জানেন না।

জাহাজে করে যখন ইংল্যাণ্ডে আসছেন তখন সবাই [ব]লল এত দাড়ি, গোঁফ, পাগড়ি থাকলে আপনার কপালে [আ]র ইংলিশ গার্ল-ফ্রেণ্ড জুটবে না।

তাই শুনে ডা: গ্রেভাল জাহাজেই চুল, গোঁফ, দাড়ি [সব] কামিয়ে ফেললেন। জাহাজ থেকে যখন নামেন তখন [এ]ক বিপত্তি। পাশপোর্টের চেহারার সঙ্গে ওঁর গোঁফ, [দা]ড়ি কামান চেহারার কোন সাদৃশ্য নেই। চেকিংপোষ্টের [লো]কেরা ছাড়েনা। শেষকালে জাহাজের ক্যাপ্টেন নিজে [এ]সে সনাক্ত করাতে ওকে ইংল্যাণ্ডে ঢুকতে দেওয়া হয়।

সাপার টেবিলে আলাপ হল আরও জনকয়েকের সঙ্গে। [তা]র মধ্যে আসামের হেম দত্ত—এসেছে সোস্যাল সায়েন্স [পড়]তে। হেম দত্ত কিন্তু পুরোপুরি অসমীয়া। বাঙ্গালী [নয়]।

আর আলাপ হল শরৎ চৌধুরীর সঙ্গে। পাটনা থেকে [ভে]টেরনারী পাশ করে পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট ষ্টাডির জন্য [এ]সেছে। তার বাবা পাটনা হাইকোর্টের জজ।

শঙ্কর লক্ষ্য করল শুধু যে একগাদা ইণ্ডিয়ান, পাকিস্থানী [ছা]ত্রই সেখানে রয়েছে তা নয় বেশ কিছু শ্বেতাঙ্গ যুবক-[যুব]তীও সেখানে রয়েছেন।

শঙ্কর আরও অনুভব করতে লাগল অনেকে তাকে [বা]ঁকা চোখে পর্য্যবেক্ষণ করছে।

কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। কিন্তু সেটা যে কি শঙ্কর বুঝতে পারল না। একটু নার্ভাস হয়ে চক্কোত্তি [মশা]য়কে জিজ্ঞেস করল—কি ব্যাপার, আমার দিকে সকলে [এভা]বে তাকাচ্ছে কেন?

—মিত্তির, এখনও অনেক শিখতে হবে আপনাকে। [ড্রে]সিং গাউন গায়ে দিয়ে কখনও পাবলিকের মধ্যে [আ]সবেন না।

এর পর থেকে ডাইনিং হলে যখনই আসবেন একেবারে টিপটাপ হয়ে স্যুট, বুট পরে আসবেন।

পরদিন সকালে ব্রেকফাষ্ট টেবলে গুডমর্ণিং জানিয়ে শঙ্কর যখন খেতে বসল, তখন দেখতে পেল সোনালী চুলওয়ালা একজন মেয়ে কোণের টেবলে বসে তাকে থেকে থেকে লক্ষ্য করছে।

শঙ্করের অস্বস্তি লাগলেও সে কিন্তু আর মুখ তুলল না। কে জানে কোথায় কি গণ্ডগোল হবে? পান থেকে চুন খসলেইত মুস্কিল। অভদ্র, রুড, আনকালচারড ইত্যাদি বলে দেবে।

শঙ্করের সেদিন সার্জেনস হলে যাবার দরকার ছিল। রয়াল টেরাসের ঢালু রাস্তাটা দিয়ে নেমে নীচের বাসষ্টপেজে এসে দাঁড়াল।

সে যখন নির্দিষ্ট বাসে উঠল তখন দেখে তার সঙ্গে সেই সোনালী চুলের মেয়েটিও বাসে উঠল।

বাসের সামনের সীট-দুটো খালি ছিল। শঙ্কর ও সেই মেয়েটি, দুজনে সেখানে বসল।

লণ্ডনে থাকতেই শঙ্কর জেনেছিল এখানে মেয়েদের কোন আলাদা সীট থাকেনা।

বাসের কণ্ডাকটাররা বেশীর ভাগই মেয়েমানুষ। স্ত্রী স্বাধীনতার দেশ এটা।

মেয়েটিই প্রথম আলাপ করল, আপনি নিশ্চয়ই ছাত্র ও ইণ্ডিয়ান? কিন্তু কি পড়তে এসেছেন? মেয়েটির পরিচয়ও শঙ্কর পেল। নাম শার্লি ম্যাকডোনালড। তার বাড়ী এখান থেকে তিরিশ মাইল দূরে গ্যালামিন বলে এক জায়গায়। সে ডেন্টিষ্ট হতে চায়। এইবার ইউনিভার্সিটিতে ঢুকেছে।

শার্লিও এই দিনকয়েক হল রয়াল টেরাসে এসেছে।

সার্জেনস হলের সামনে বাস দাঁড়াতেই নেমে পড়ল শঙ্কর। শার্লিও সেখানেই নেমে গেল। বিপরীত দিকে কিছুদূরেই ডেন্টাল কলেজ।

(ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে বিদেশী কবিদের তুলনা

শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য্য

জীবনের প্রান্তসীমায় উপনীত ৮৩ বছরের বৃদ্ধ কবি গেটে তাঁর 'ফাউষ্ট' (Faust) কাব্যের শেষ খণ্ডে ঘড়ি ঘরের ওয়ার্ডার Lyncacus এর মুখে নীচের কথাগুলি বসিয়েছেন। দিগন্তব্যাপী অন্ধকারের মাঝে ঘড়ি ঘরের মধ্যে বসে রক্ষী আপন মনে গেয়েছিলো :

"Zum schen geboren,
Zum schauen bestellt···

জার্মানীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবির এই কথাগুলি কি আর একটি জীবনকে মনে করিয়ে দেয়না যে, জীবন সম্পুর্ণভাবে সৌন্দর্যের সৃষ্টিধর্মী চিন্তায় উৎসর্গীকৃত হয়েছিলো : সেই জীবন হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের : Zum schen geboren, যিনি বিশ্বপ্রেমিক ঋষি ; তিনি যেখানে ঐক্য, জ্যোতি এবং অনন্ত আনন্দ আবিষ্কার করেছেন, সেখানে আমরা সাধারণতঃ বিশৃঙ্খলা, রাত্রির অন্ধকার ও দৈনন্দিন জীবনের বীভৎসতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাইনে। যিনি অক্লান্তভাবে সুদূরের চিন্তা করেছেন এবং তাঁর চতুষ্পার্শ্বে সব কিছুই অনন্ত ঐশ্বর্যের দৃষ্টি নিয়ে দেখেছেন। "Es war doch so schon" : কী সুন্দর এই পৃথিবী। তিনি যা দেখেছিলেন ও তাঁর নিজস্ব আদর্শ এক হয়ে তাঁর জীবনব্যাপী চিন্তার অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিলো।

বুদ্ধিজীবীদের অখণ্ড মনোযোগ এবং আনন্দ অকস্মাৎ রবীন্দ্র সাহিত্যের ছোঁয়াচ লেগে স্বপ্ন ও সৌন্দর্যের এক বিচিত্র পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মহৎ ফরাসী রোমান্টিক কবিদের তুলনা করতে চাই। যথা Musset, Lamartine বা Hugo 'কড়ি ও কোমল' এবং 'মানসীতে' আমি দেখি musset-এর সেই অন্তরের সুক্ষ্মতম আবেগ, ও সৌন্দর্য ও জীবনানন্দ ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে ইন্দ্রিয়াতীত স্তরে পেঁাছেচে যা এক আদর্শ নৈর্ব্যক্তিক ও সুদূরপ্রসারী সৌন্দর্যা সুভূতির পূজায় নিবেদিত। যেন Namouna-এর musset আদর্শ হয়ে প্রেমের দিকে অগ্রসর হয়েছেন আবার কখন কখন Nights-এর musset-এর মতো চিন্তামগ্ন দুঃখবোধের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছেন। কিন্তু musset-এর যা শ্রেষ্ঠ তা একটি পর্যায়মাত্র আর তা রবীন্দ্রনাথের কাব্য-বিবর্তনের ভগ্নাংশই। 'সোনার তরী,' 'চিত্রা' এবং 'জীবন-দেবতা' শীর্ষক কবিতাগুলি, 'খেয়া' ও গীতাঞ্জলিতে Lamartine-এর কথাই মনে পড়ে যেন। সেখানে রহস্যবোধ Be lae-এর স্বপ্নালু মোহাচ্ছন্নতা সমস্ত পরিমণ্ডলে ব্যাপ্ত হয়েছে।

সাধারণ দৃষ্টিতে শুধু জীবনের উপরিভাগ হাল্কাভাবে দেখার যে ক্ষণস্থায়ী দৃষ্টি তাকে অতিক্রম কয়ে আরো গভীর দর্শনের মধ্যে প্রকাশ করেছেন। সেই গভীর দার্শনিক মতবাদ অন্তহীন মানবিক অভীপ্সাকে গভীরতম আত্মার রহস্যবোধকে উন্মোচিত করেছে। কিন্তু Lamartine-এর সমগ্র কবিকীর্তিতে একটি মাত্র রাগ বর্তমান, অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ এমনই এক সঙ্গীতকার যিনি সমগ্র ভারতীয় সঙ্গীতের ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীকে করেছেন ব্যবহার। তার ওপর তাঁর নিজস্ব সঙ্গীত তো আছেই। আর একজন হলেন হুগো। হুগো ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কবি। তিনি শব্দের যাদুকর, তাঁর কাব্য অনন্ত গীতিময়তায় মুখর। হুগো সমস্ত জাতির অস্পষ্ট হৃদয়াবেগকে অত্যদ্ভুত

দক্ষতায় রূপায়িত করতে পারতেন। তিনি অসংখ্য ধ্বনি ও কাব্য সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছেন রবীন্দ্রনাথের মতোই। তাঁর কল্পনা ছিলো অনন্ত, অভাব ছিলো 'স্বপ্নের'। তাঁর চরিত্রসৃষ্টি ছিল সংকীর্ণ তাঁর দর্শন ছিল আবেগপ্রধান বয়ঃসন্ধির। তাঁর যা অভাব ছিল তা পুরোমাত্রায় বর্তমান রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অর্থাৎ রুচি ও সুমিতিবোধ।

শেলীর প্রভাব যুবক রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ে ছায়া ফেলেছে। যৌবনে কীটসের কাব্য থেকে তিনি সৌন্দর্যানুভূতির আদর্শ গ্রহণ করেছেন। 'চিত্রা'তে সুইনবার্নের মতোই ইন্দ্রিয় সচেতনধ্বনির বিস্তার দেখা যায়। এছাড়া ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতি-পূজারী দার্শনিক কবিতাবলী, টেনিশনের Ballads ও Idvlk-এর পরিপূর্ণ ছন্দচাতুর্য 'কথা ও কাহিনী'র মধ্যেও দেখতে পাই। তাঁর রচনা যতখানি বৈদেশিক প্রভাবযুক্ত তারচেয়েও বেশি বাংলা ও সংস্কৃত ঐতিহ্যের অনুগামী। তাঁর রচনা তাঁর নিজস্ব প্রতিভার স্বতন্ত্রসৃষ্টি। যা হোক এই সমস্ত তুলনা কেবল সুদূর-সহধর্মিতা মাত্র, রবীন্দ্রনাথের বিশেষ দিকের ওপর আলোকপাত করে, তার বেশি কিছু নয়। তাঁর কাব্য-পরিমণ্ডলের সমগ্র পরিধি বোঝাতে 'The Faiery Queen' টি এস এলিয়ট্ ইয়েট্স্, আইরিশ সিম্বলিষ্ট এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর দার্শনিক কবিদের তুলনা করা প্রয়োজন।

"Frend voli und bidvoll
Gedon kenvoli sein…"

(অর্থাৎ আনন্দ, দুঃখ আর চিন্তার সমন্বয়)। এই কথাকটির মাধ্যমেই জার্মানীর শ্রেষ্ঠ গীতিকবি গেটে নিজেকে বর্ণনা করেছেন। আনন্দের প্রাচুর্য, গভীরতা ও বহুমুখিতা, চিন্তার মহত্ব—এই ছিলো তাঁর কাব্যের মূলসূত্র। এ ছাড়া তিনি নাট্যকার, বিরাট ঔপন্যাসিক ও কথাশিল্পী। গীতিকাব্যে যতপ্রকার ছন্দ সম্ভব তার সব কটাতেই তাঁর সমান দক্ষতা ছিলো। তিনি ছিলেন চিন্তাধর্মী, সঙ্গে সঙ্গে দার্শনিক কবি। তাঁর কাব্য শুধু বিদগ্ধ সমাজের জন্যেই নয়, সমগ্র জার্মানীর তিনি জাতীয় কবি। তিনি ছিলেন ধর্মবোধ দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত। নিজেকে তিনি বিশ্বপ্রেমিক বলে বর্ণনা করেছেন। আমরা তাঁর রচনার সেই 'Ding frendi Kait'-এর সাক্ষাৎ পাই যা হলো সৃষ্টি দর্শনে সেই আনন্দবোধ জীবনের সরলতম বাস্তবতার পরিবর্তিত রূপ ও তারই সঙ্গে গভীর প্রশস্তি :

"Usber allen gipfeln
Ist Ruh…

(অর্থাৎ সমস্ত পর্বতচূড়ায় নেমেছে প্রশান্তি, বৃক্ষশীর্ষে শান্ত ছায়া, পক্ষীকুল নিদ্রাচ্ছন্ন। অপেক্ষা করো, তুমিও এদের মতো শান্তিলাভ করবে।) আমি বিশ্বাস করি যে সমস্ত কথা গেটে সম্বন্ধে এতক্ষণ আলোচনা করলাম তা রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্য সম্পর্কেও প্রযোজ্য। আমার মনে হয় এই দুইকবির মধ্যে একটি গভীর ঐক্য বিদ্যমান রয়েছে। এই দুই মহাকবির জীবন ও ব্যক্তিত্বও সমপর্যায়ের। বিদেশীরা জানেন গেটেকে ফাউষ্টের ও রবীন্দ্রনাথকে গীতাঞ্জলির কবি হিসাবেই।

গীতাঞ্জলি রবীন্দ্র কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রতীক। রবীন্দ্রনাথ মিষ্টিক কবি, তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা গীতাঞ্জলিতে লিপিবদ্ধ করেছেন। 'সেণ্ট জন অব দি ক্রুশো' এক বিরাট স্পানিশ কবি। গীতাঞ্জলিতে প্রায়ই John of the crossএর spiritual conticleএর সঙ্গে তুলনা করা হয়।

রবীন্দ্রনাথ ও সাধারণ মানুষ

সমীরণ চক্রবর্ত্তী

জীবনের সহিত সাহিত্যের যোগ অপরিচ্ছেদ্য। যেসকল সাহিত্যিক বাণীর অর্চনাতে নিজ জীবন ও দেশকে ধন্য করিয়াছেন তাঁহাদের বাণীর উপজীব্য মানুষের জীবন ও নানা বিচিত্র দিক্। মানুষের জীবনপ্রবাহ তাঁহাদের প্রাণে যে স্পন্দন জাগাইয়াছে লেখনীর মুখে তাহারই ঘটিয়াছে বহিঃপ্রকাশ।

প্রাচীনকালের সাহিত্যে কিন্তু সর্বশ্রেণীর মানুষের স্থান ছিল না। সমাজের উচ্চস্তরের মানুষকে আশ্রয় করিয়াই তৎকালীন সাহিত্যিকগণ সাহিত্য-রচনাতে ব্রতী ছিলেন। সাধারণ মানুষের সহিত প্রকৃত যোগ তাঁহাদের ছিল খুব কম। একথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মহাকবি কালিদাস ও সেক্সপীয়রের কাব্যে সাধারণ মানুষের জীবন, তাহাদের আশা আকাঙ্ক্ষা, তাই বাণীমূর্ত্তি লাভ করিতে পারে নাই। সেক্ষেত্রে স্বভাবতই এই প্রশ্ন উঠিতে পারে রবীন্দ্রনাথও কি এই দলের কবি? সাধারণ মানুষের সহিত বিশ্বকবির যোগ সত্যই ছিল কিনা এই বিতর্কের সমাধান করিতে পারে তাঁহার অমর রচনাবলী। কেহ কেহ অদ্যাপি এই ধারণা পোষণ করেন যে ধনীর নন্দন রবীন্দ্রনাথেরও সাধারণের মধ্যে প্রকৃত কোন যোগসূত্র ছিল না এবং রবীন্দ্রনাথ দ্বিতল হইতে নামেন নাই।—এই প্রকার অভিযোগও বিরল নহে। কিন্তু এই অভিযোগ ভিত্তিহীন। সাধারণ মানুষদের সহিত সম্পর্ক তাঁহার নানা রচনার মধ্যে সুপ্রকট;—তাই বিশেষ বিশেষ স্থান উল্লেখ করিয়া তাঁহার সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাবের আলোচনা করা যাইতে পারে।

সাধারণ মানুষের সহিত ধনিকসমাজের যোগ যে অল্প ইহা অনস্বীকার্য্য। তাই বাল্যকালে কবিরও সাধারণের সহিত যোগ বিশেষ ঘটে নাই। তখন-তিনি থাকিতেন গৃহকোণে অবরুদ্ধ। জোড়াসাঁকোর বাড়ীর বাহিরের জগৎকে চিনিবার সুযোগ ছিল না। তাঁহার নিজের কথায়—

'বাড়ীর বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমনকি বাড়ীর ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমনখুশি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। (জীবনস্মৃতি)

তার পর স্কুলের জীবনেও এই বাধা অপসারিত হয় নাই। কলিকাতায় একবার ডেঙ্গুজ্বরের উপদ্রবে কবিপরিবারের একাংশ পেনেটিতে ছাতুবাবুদের বাগানে আশ্রয় নেন। রবীন্দ্রনাথ সেই দলে ছিলেন। সেই প্রথম বাড়ীর বাহির হইলেন। তখন সাধারণ গ্রাম্য জীবনের সহিত পরিচিত হইবার জন্য কবির উৎসাহ ছিল প্রচুর—

"—বাংলাদেশের পাড়াগাঁটাকে ভালো করিয়া দেখিবার জন্য অনেকদিন হইতে মনে আমার ঔৎসুক্য ছিল। গ্রামের ঘর বস্তি চণ্ডীমণ্ডপ রাস্তাঘাট খেলাধুলা হাটমাঠ জীবনযাত্রার কল্পনা আমার হৃদয়কে অত্যন্ত টানিত।" (জীবনস্মৃতি)

কিন্তু তাহার সহিত পরিচয়ের সুবিধা না পাইয়া আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—

'সেই পাড়াগাঁ এই গঙ্গাতীরের বাগানের ঠিক একেবারে পশ্চাতেই ছিল-কিন্তু সেখানে আমাদের যাওয়া নিষেধ। আমরা বাহিরে আসিয়াছি কিন্তু স্বাধীনতা পাই নাই। ছিলাম খাঁচায়, এখন বসিয়াছি দাঁড়ে—পায়ের শিকল কাটিল না।"

(জীবনস্মৃতি)

পরবর্ত্তী জীবনে কবি স্বাধীনতা পাইয়া সাধারণের সহিত যথাসাধ্য সংযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সাধারণ জীবনের বহু ঘটনাকে তাঁহার কাব্যে রূপ দিয়েছেন। তাঁহাকে পলায়নী মনোবৃত্তির কবি বলা অন্যায়। এককালে তিনি বিচ্ছিন্ন

থাকিলেও পরবর্ত্তী কালে সাধারণের দিকে ফিরিয়াছেন এবং এই পরিবর্ত্তন স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—

সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্মে রত,
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মত
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে
দূরবনগন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ততপ্ত বায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি !—ওরে তুই ওঠ্ আজি।"
…এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ি ! ছলায়োনা সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়োনা মোহিনী মায়ায়…,"

(এবার ফিরাও মোরে)

দরিদ্র নিপীড়িত সাধারণ মানুষের দুঃখের আর্ত্তনাদ তাঁহার হৃদয় কন্দরে আঘাত করিয়াছে, অপরিসীম সহানুভূতির সহিত উৎসারিত হইয়াছে—

"এই সব মূঢ়ম্লানমূকমুখে
দিতে হবে ভাষা ; এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ; ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্ত্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে …।" ঐ

তাঁহার কাব্যে সাধারণ ও অভিজাত উভয়-শ্রেণীই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সেখানেই তাঁহার বিশ্বকবিত্ব। শেষ জীবনে তিনি নিজেও বলিয়াছেন—

'আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত ওঠে ধ্বনি
আমার বাঁশীর সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি—'

কিন্তু নিজেই আবার অনুভব করিয়াছেন যে

'এই সুরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক
রয়ে গেছে ফাঁক (জন্মদিনে-ঐকতান)

এই ফাঁকের জন্য দায়ী কে তাহাও দেখিতে হইবে। উচ্চকুলে জন্ম ও সামাজিক বাধার গণ্ডী কবির প্রকৃতির গতিকে ব্যাহত করিয়াছিল। তাই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সাধারণ জীবনের সহিত একান্ত নিকট সম্পর্ক তিনি স্থাপন করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ হন নাই। তাই জীবনের অপরাহ্নে বলিয়াছেন—

"পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার,
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবন
যাত্রার।
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার,
তারি' পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ওপাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে,
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।

(ঐকতান)

ইহা ছাড়া স্বভাবতই কবি ছিলেন কর্মব্যস্ত। অনলস ভাবে তিনি নিত্য তাঁহার সাহিত্যচর্চাতে ব্যাপৃত থাকিতেন। ফলতঃ কর্মহীন বা স্বল্পকর্মা মানুষের মত আড্ডা জমাইয়া সময় কাটাইবার অবকাশ তাঁহার ছিল না। আমরা সাধারণ মানুষের সহিত যতটা সময় কাটাইতে পারি তাহা কবির পক্ষে সম্ভবও নহে, অভিপ্রেতও নহে। সেইরূপ জনপ্রিয়তার জন্য কবিকে মোটারকম দাম দিতে হইত, অর্থাৎ সাহিত্যসৃষ্টি ব্যাহত হইত। তাঁহার পক্ষে যতটা সম্ভব, ততটুকু যোগাযোগ রাখিতে তিনি ক্রটী করেন নাই। জমিদারী পরিদর্শন কালে এই সমাজের সহিত তাঁহার বেশ পরিচয়ও ঘটিয়াছে। পরিচয়ের স্বল্পতা কোথাও তাঁহার সহানুভূতিকে প্রভাবিত করে নাই। সাধারণের জীবনের অতিসাধারণ সুখদুঃখের কথা কবির লেখনীতে যেভাবে বাণীমূর্ত্তি লাভ করিয়াছে তাহাতে এই সমাজের সহিতকবির গভীর যোগই সুচিত হয়।

প্রথম যৌবনে প্রভাতসংগীতের যুগেই কবির হৃদয় সকলের জন্য উন্মুক্ত হইয়াছিল—

'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি।
জগত আসি যেথা করিছে কোলাকুলি।

(প্রভাতউৎসব)

কবি কেবল আভিজাত্যের গণ্ডীতে নিজেকে না বাঁধিয়া রাখিয়া সকলের মধ্যেই বাঁচিতে চাহিয়াছেন।—

'মানবের সুখেদুঃখে গাঁথিয়া সঙ্গীত
যেন গো রচিতে পারি অমর আলয়।…
…তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই।"

(প্রাণ)

আনন্দময়ীর আগমনে দেশের আনন্দোচ্ছাস তাঁহার হৃদয়ে যে সাড়া জাগাইয়াছে, তাহার চেয়ে বেশী আবেদন আনিয়াছে দ্বারে দণ্ডায়মানা কাঙালিনী

গ্রাম্যবধূর শ্বশুরগৃহের কারাতুল্য জীবনের দুঃখও তাঁহার হাতে 'বধূ' কবিতাতে রূপ লাভ করিয়াছে।

'হায় রে রাজধানী পাষাণ কায়া!
বিরাট মুঠিতলে চাপিছে দৃঢ় বলে,
ব্যাকুল বালিকারে নাহিকো মায়া।' (বধূ)

'সোনার তরীর' ভূমিকায় কবির উক্তি এবিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ।—

"এইখানে নির্জন-সজনের নিত্যসংগম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ সুখদুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবন ধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁচছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্য চিন্তা করেছি, কাজ করেছি, কর্ত্তব্যের নানা সঙ্কল্প বেঁধে তুলেছি, সেই সংকল্পের সূত্র আজও বিছিন্ন হয়নি আমার চিন্তায়। সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হ'ল আমার জীবনে।"

পল্লীগ্রামে—সামান্য মাটিকাটা মজুরদের কথাও তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই—

"নদীতীরে মাটি কাটে সাজাইতে পাঁজা
পশ্চিমিমজুর। তাহাদেরি ছোটো মেয়ে
ঘাটে করে আনাগোনা...(চৈতালি)

আবার পসারিনীর ক্লেশে ব্যথিত হইয়াবলিয়াছেন—

"ওগো পসারিনী,
মধ্যদিনে রুদ্ধঘরে সবাই বিশ্রাম করে
দগ্ধ পথে উড়ে তপ্ত বালি—
দাঁড়াও, যেয়ো না আর, নামাও পসরাভার
মোর হাতে দাও তব ডালি।"
(পসারিনী)

দেবীর পূজামণ্ডপ হইতে অপমানিত হইয়া যে সাধারণ মানুষ ফিরিয়া আসিয়াছে—তাহাদের অপমানে ক্ষুব্ধ হইয়া বলিয়াছেন—

"না না, এরা সবে ফিরিছে নীরবে
দীন প্রতিবেশীবৃন্দে
সাহেব-সমাজ আসিবেন আজ,
এরা এলে হবে নিন্দে॥"
(উন্নতিলক্ষণ)

কবির রচনার প্রকৃত স্থান কোথায়?—অভিজাত-

'ভৃত্য নিত্য ধুলা ঝাড়ে
যত্ন পুরা মাত্রা—
ওরে আমার ছন্দোময়ী,
সেথায় করবি যাত্রা?
গান তা শুনি কর্ণমূলে
মর্মরিয়া কহে—
নহে, নহে, নহে,।'
(যথাস্থান)

তাঁহার প্রকৃত দরদী সাধারণের জন্যই রচনা। গৃহের অন্তরালে যে কল্যাণী গৃহকর্মে ব্যাপৃতা, তাহার প্রতিও কবির সহানুভূতির অভাব নাই—

'বিরল তোমার ভবন খানি
পুষ্প কানন মাঝে
হে কল্যাণী, নিত্য আছ
আপন গৃহ কাজে।
বাইরে তোমার আম্রশাখে
স্নিগ্ধ রবে কোকিল ডাকে,
ঘরেশিশুর কলধ্বনি আকুল হর্ষ ভরে।
সর্বশেষের গানটি আমার আছে তোমার তরে।'
(কল্যাণী)

শ্রমিকসমাজের প্রতি ধনিকোচিত বিদ্বেষ তাঁহার মধ্যে কখনো ছিল না। যে শ্রমিকবৃন্দ জলে-ভিজিয়া রৌদ্রে পুড়িয়া কাজ করিতেছে, তাহাদের মধ্যে তিনি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—

'তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙ্গে
করচে চাষা চাষ,—
পাথর ভেঙে কাট্‌চে যেথায় পথ,
খাট্‌চে বারো মাস, ...
(ধূলামন্দির)

'ওরা কাজ করে' কবিতাতেও এই সমাজের প্রতি তিনি অর্ঘ্যরচনা করিয়াছেন এবং দেশগঠনে ইহাদের অতুলনীয় অবদানকে সসম্মানে স্বীকার করিয়াছেন। সাধারণের উপর অত্যাচর ও অবিচারের বিরুদ্ধেও কবিকণ্ঠ বহুবার নিনাদিত হইয়াছে। হে মোর দুর্ভাগা দেশ'—ইত্যাদি কবিতাতে দ্রষ্টব্য।

ছোট গল্পগুলির মধ্যে এই সাধারণের সহিত যোগের প্রভাব অনেক বেশী পাওয়া যায়। ছোট-গল্প রচনার পর্যায়ে কবি পল্লীবাংলার নিকট-সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। প্রমথনাথ বিশির ভাষায়

সাহিত্যে এই প্রথম পাইলাম রবীন্দ্রনাথের ছোট-গল্পে—'। কবি নিজেও বলিয়াছেন—

'আমি বলবো আমার গল্পে বাস্তবের অভাব ঘটেনি। যাকিছু লিখেছি, নিজে দেখেছি, মর্মে অনুভব করেছি, সে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। গল্পে যা লিখেছি, তার মূলে আছে আমার অভিজ্ঞতা, আমার নিজের দেখা।......ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে, আমি যে ছোট গল্পগুলো লিখেছি, বাঙালী সমাজের বাস্তব জীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে।'

(রবীন্দ্র রচনাবলী-১৪শ খণ্ড-গ্রন্থপরিচয়)

অতি সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের বিচিত্র অনুভূতি—পণপ্রথাপীড়িত কন্যাকর্তা ও বালিকাবধূ, স্নেহার্ত্ত কাবুলিওয়ালা, সাথীহারা রতন, ইত্যাদির কথা এইগুলির মধ্যে স্থানলাভ করিয়াছে। ইহাদের সকলের আশা আনন্দের সমভাগীরূপেই এখানে কবি পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলিয়াছেন—

মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক্
আমি তোমাদেরি লোক
অন্য কিছু নয়—
এই মোর শেষ পরিচয়।

—এই পরিচয় মানুষ পাইয়াছে কি না সে প্রশ্নও কবির মনে কখনো কখনো উদিত হইয়াছে।

কর্মজীবনেও কবি সাধারণ মানুষের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করিয়াছেন। জালিয়ান-ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে যে সাধারণ মানুষ প্রাণ দিয়াছিল তাহাদের ব্যথায় ব্যথিত কবি 'নাইট' উপাধি বর্জন করিয়া আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছেন। হিজলীর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধেও কবি-কণ্ঠ নিনাদিত হইয়াছে। কৃষিজীবীদের উন্নতির জন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে শ্রীনিকেতনে কৃষিবিদ্যালয় স্থাপন করেন।

বাহির হইতে যাঁহারা কবিকে দেখিয়াছেন তাঁহারা কেহ কেহ কবির স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য্যের জন্য তাঁহাকে দাম্ভিক ও অন্তর্মুখ মনে করিতেন। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সান্নিধ্যের সুযোগ পাইয়াছেন তাহাদের মধ্যে সাধারণ মানুষও অনেক রহিয়াছে। তাহাদের স্বীকৃতিতেই প্রকাশ যে কবি তাহাদের সহিত যথেষ্ট হৃদ্যতার সহিত ব্যবহার করিতেন। কবির কথাতেই বলা যায়—

'বাহির আমার শুক্তি যেন
কঠিন আবরণ ;
অন্তরে মোর তোমার লাগি'
একটি কান্নাধন।'

অতএব রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হইয়া থাকে তাহার নির্মূলত্ব তাঁহার জীবন ও বাণী হইতেই প্রতিপাদিত হইল। কিন্তু কবি নিজে সাধারণের সহিত সর্বাত্মক যোগের একটু অভাব বোধ করিতেন। সাধারণের হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করাই ছিল তাঁর কামনা। কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব হয় নাই। ইদানীন্তন কালে অনেক কবি সাধারণ মানুষের কবি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন—কিন্তু তাঁহারাও কি সকলে মানুষের হৃদয়ের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করিতে পারিয়াছেন ? তাহা না পারিয়াও যাঁহারা পারিবার ভাণ করেন, তাঁহারা নিন্দার্হ। সাহিত্যক্ষেত্রে এইরূপ প্রতারণার আশ্রয় নিতে রবীন্দ্রনাথ রাজী ছিলেন না। তিনি জানিতেন—

হৃদয়ে হৃদয় যোগ করা
না হ'লে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।...
...তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা
আমার সুরের অপূর্ণতা—'—ইত্যাদি।

কবি নিজে যেটুকু বলিয়াছেন তাহা অনুভব করিয়া বলিয়াছেন. তাই জাতিধর্ম-উচ্চনীচ-নির্বিশেষে সকলের নিকটই তাঁহার রচনার আবেদন রহিয়াছে। সাধারণ মানুষও যে তাঁহার কাব্যকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার কারণ, তাঁহার কাব্যে কবির দরদী মনের সন্ধান লাভ করিয়াছে, পাইয়াছে নিজেদেরই জীবনের বিশ্বস্ত আলেখ্য।

———

ইংরাজি কাব্যকার মনোমোহন ঘোষ

শ্রীমলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য বরাবরই নিজ নিজ পার্থক্য বজায় রেখে চলবে, মিলনের কোনো সীমানা-বিন্দুতে এসে কোনোদিনই মুখোমুখি আলিঙ্গনে আবদ্ধ হবে না—এই মর্মে যে আপ্তবাক্যটি প্রচলিত, তা হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অনুভূতি ও মননের সুদূরবিসারিত জগৎপারাবারের উদার-গম্ভীর উপকূলে দাঁড়িয়ে দিগন্তনিলীন দিক্‌চক্রবাল রেখার মতো প্রাচ্য-প্রতীচ্যের একাধিক সঙ্গম-রেখা দেখতে পাওয়া কখনো কখনো অসম্ভব নয়। তেমনি একটি রেখার প্রকাশ-আধার রবীন্দ্রনাথ; আরেকটি লক্ষ্য করা যেতে পারে কবি মনোমোহনের মধ্যে।

জাত-কবি আমরা গড়ে-পিটে তৈরি করতে পারিনে, সে ক্ষমতা মানুষের নেই; উত্তরজীবনে যিনি প্রকৃত কবি হবেন তিনি সেই বিশেষ ক্ষমতাটি সঙ্গে নিয়েই ধরাধামে অবতীর্ণ হন। মনোমোহন ঘোষ এমনই একজন জাত-কবি, একথা বললে বোধহয় ভুল হয় না। এবং জাত-কবি ব'লেই উৎসে প্রাচীর মানুষ হয়েও প্রতীচীর ভাষায় নিদর্শন রেখে গিয়েছেন উজ্জ্বল সাহিত্যকৃতির। ফুলের চারাটিকে দশবছর বয়সে মূলসমেত ভারতবর্ষ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে রোপণ করা হয়েছিল সুদূর বিলেতের মাটিতে; সেখানকার আকাশের নীচে বহুদল মেলে দিল যে কুসুমকলিকা, ধাত্রীভূমির মাতৃরসেই সে পরিপুষ্ট ও বিকশিত সন্দেহ নেই, কিন্তু রসাহরণের মাধ্যম তার যে মূলটি, সেটি আদি ও অকৃত্রিম ভারতীয়। এই দুইয়ের ফলশ্রুতি যে কাব্যসম্ভার, তা' ভারতীয় কমনীয়তায় ও ইয়োরোপীয় রমণীয়তায় অনুপম।

১৯শে জানুয়ারী ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের জাতক মনোমোহন অগ্রজ বিনয়ভূষণ ও অনুজ অরবিন্দ (উত্তরজীবনে সত্যদ্রষ্টা সাধক শ্রীঅরবিন্দ-রূপে প্রখ্যাত) সমভিব্যাহারে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে যখন ইংলণ্ডে পদার্পণ করলেন তখন সেখানকার সাহিত্য-যুগেতিহাসে ভিক্টোরিয়ান পর্ব বৃদ্ধত্বে উপনীত। তিন শতকেরও অধিক কালের সুবিশাল ঐতিহ্যের বাহক ঐ বৃদ্ধের আত্মিক অনুপ্রবেশ যে শিশু মনোমোহনের মানসলোকের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কোষে কোষে ঘটবে, সেটা বুঝি আগে থেকেই অবধারিত ছিল। তাই একাত্মতা সহজেই সংস্থাপিত হয়েছিল ওই সন্ধিকালের ওয়াল্টার ডি লা মেয়ারলরেন্স বিনীয়ন-ষ্টিফেন ফিলিপ্‌স্—আর্থার কৃপ্‌স্ প্রমুখ সমসাময়িকদের সঙ্গে।

ইংলণ্ড পালিকা জননীর স্থান অধিকার করলে। দশ বছরের ছেলে ভর্তি হল ম্যাঞ্চেস্টারের গ্রামার স্কুলে। পালয়িত্রীর মুখের ভাষাই পালিতের মুখের ভাষা হতে সুরু করল। শুধু মুখের ভাষা নয়, কালক্রমে দাঁড়াল মনের ও প্রাণের ভাষায়। ইতোমধ্যে লণ্ডনের সেণ্ট পল্‌স্ স্কুলে ভর্তি হলেন মনোমোহন। তারপর যথাক্রমে অক্সফোর্ড ক্রাইস্ট চার্চ কলেজে। প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে লাভ করলেন ক্লাসিক্যাল স্কলারশিপ। রসপিপাসু একাগ্র মন অবিশ্রান্ত হানা দিতে লাগল প্রাচীন ও অর্বাচীন ইংরেজি, গ্রীক ও রোমান সাহিত্যভাণ্ডারে। সর্বাপেক্ষা মোহময় হাতছানি পেলেন কাব্যলক্ষ্মীর কাছ থেকে। সাড়াও দিলেন তৎক্ষণাৎ—কলম ধরলেন ইংরেজিতে। ইংরেজিই যে তাঁর সহজ পরিবেশ গড়ে তুলেছে, মানসলোকে দিয়েছে অনুপ্রেরণা, দখল দিয়েছে ভাষায়—এক্ষেত্রে, উপলব্ধির সংহতি যদিচ ভারতীয়-বিশেষত্ব-সম্ভূত, অভিব্যক্তি আসবে ইংরেজির হাত ধ'রে, এটা কিছু অস্বাভাবিক নয়।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দ। অক্সফোর্ডের চার কবি-বন্ধু কৃপ্‌স্, বিনীয়ন, ফিলিপ্‌স্ ও মনোমোহন প্রকাশ করলেন একখানি যৌথ কবিতাসংকলন গ্রন্থ—

"প্রাইমা ভেরা"। সংকলনে মোট কবিতাসংখ্যা ষোল, তার মধ্যে মনোমোহনের অবদান পাঁচটি। সেই পাঁচটি কবিতাই যেন পঞ্চবাণের মত লক্ষ্যবেধ করলে। তদানীন্তন ইংলণ্ডীয় বিদগ্ধসমাজ বিস্মিত, চমকিত ও আনন্দিত: এই নতুন কবি ভারতের মানুষ? একে একে ভেসে এল নানামুখী প্রশংসা। বহু সাহিত্য-পত্রিকা জানালেন স্বাগত। অস্কার ওয়াইল্ড ঐ বছরেই 'পল্‌মল্‌ গেজেটে' মন্তব্য রাখলেন—

"প্রাচ্যমানসের সূক্ষ্ম সংবেদন, ত্বরিৎগ্রাহিতা এবং সমমর্মিতার উজ্জ্বল নিদর্শন তাঁর এই কবিতাগুলি। ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের আত্মার আত্মীয়তা কত ঘনিষ্ঠ, তার অভিজ্ঞানও এগুলি। ইংরেজি সাহিত্যে শ্রীযুক্ত ঘোষ একটি উল্লেখযোগ্য নাম হয়ে থাকবেন, এমনটাই আশা করি।" এসময়ে মনোমোহনের বয়স একুশ বছর মাত্র।

লরেন্স বিনীয়ন ছিলেন বিদেশী বন্ধুটির প্রতিভার সম্যক্ গুণগ্রাহী, মনোমোহনের বিকাশপর্বে তিনি ছিলেন নিত্যসঙ্গী। মনোমোহনের "সঙস অব লভ য়্যাণ্ড ডেথ" (এই গ্রন্থের কথায় আমরা পরে আসছি)-এর ভূমিকাপ্রসঙ্গে তিনি বলছেন: "ইতঃপূর্বে অন্য কোন ভারতবাসী আমাদের মাতৃভাষাকে কাব্যসুষমায় মণ্ডিত ক'রে ব্যবহার করেননি ··· আমার মতে, ইংরেজ কবিবর্গের অন্যতম হিসাবে এঁকে চিহ্নিত করা উচিত।" বিনীয়ন আরো বলেছেন: এলিজাবেথান ও তৎপূর্ববর্তী যুগের ইংরেজি কাব্যধারায় সঙ্গে এঁর পরিচয় আমার চাইতেও বেশি বৈ কম নয়। কিন্তু যে জিনিষটি সবচাইতে আমাকে আকৃষ্ট করেছে তা হল এই যে, গ্রীক কাব্যসাহিত্যে মনোমোহন প্রগাঢ় অনুরাগী ও রসবেত্তা।···থিয়োক্রিটাস, মেলিয়্যাগার, বিশেষত: সাইমোনাইডিস, তাঁর সমধিক প্রিয় লেখক। আমার আগে ধারণা ছিল, প্রাচ্যের মানুষরা সাধারণভাবে পাশ্চাত্ত্যের পুষ্পিত ও সালঙ্কার রচনাগুলির প্রতিই আকর্ষণশীল, পরে দেখে আশ্চর্য হয়েছি, শ্রীঘোষের মত লোকও আছেন যারা কঠিনতর সাহিত্যেরও প্রেমিক।"

দেশে ফিরে এলেন দেশের ছেলে, ধাত্রীভূমির কোল ছেড়ে জন্মভূমির আঁচলে। প্রবেশ করলেন কলেজে তাঁকে দেখল অধ্যাপকের ভূমিকায়, শুনল তাঁর প্রাণময় পাঠন। ইউরোপীয় সাহিত্য যাঁর করতলে, কবিতা যাঁর রক্তধারায়, অধ্যাপনা যাঁর তন্ময় সাধনাবিশেষ, তাঁর জনপ্রিয়তা কি অন্তর থাকে? সাহিত্যসুষমার অন্তরানুভূত বহুমুখী বিশ্লেষণ তাঁর ক্লাসগুলিকে মধুচক্রে পরিণত করত, বক্তৃতাগুলি হয়ে উঠত অবিস্মরণীয় অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার বস্তু। কী এক অদৃশ্য অথচ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মধুসুরভি যেন ভেসে বেড়াত বাতাসে, বয়ে যেত আনন্দের লহরী, যার মোহনমায়ায় নির্বাক্ নিস্পন্দ হয়ে থাকতেন শ্রোতার দল। আলোচ্য বিষয় এবং শ্রোতৃমণ্ডলী—উভয়ের মর্মমূলে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে যাবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর: অধ্যাপনা তো নয়, সে যেন উচ্চাঙ্গ পুনঃসৃজন।

ওদিকে অধ্যাপনার ফাঁকে ফাঁকে চলে নব নব সৃষ্টি। সেই সৃষ্টি নিচয়ের মধ্য দিয়ে সংবেদনশীল কবিসত্তার বিচিত্র প্রতিভাস। কখনো তা আত্মমগ্ন স্বপ্নমদির, কখনো সোচ্চার চিত্রকলা, কোথাও অনিনীত বিষাদ-বেদনা, কোথাও নৈর্ব্যক্তিক মহাবিশ্বজনীনতা "দি গারল্যাণ্ড" নামীয় এক কবিতাসংকলনের অন্তর্গত হয়ে তাঁর কিছু কবিতা দীর্ঘদিন পরে আত্মপ্রকাশ করল। তারপর দেখা দিল "লভ সঙস য়্যাণ্ড এলিজীজ" পুরোপুরি তাঁরই কবিতাবলী নিয়ে। বাকি রচনাগুলি—অধিকাংশই গীতিকবিতা, কিছু দীর্ঘ কবিতাও আছে—তাঁর জীবদ্দশায় পুস্তকাকারে আর প্রকাশিত হয় নি কী কারণে, সে রহস্য আমাদের অজানা।

ভাগ্য সকলের ক্ষেত্রে সুখবিধান করেনা। দশ বছর বয়স থেকে বিলেতে অননুকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে চলতে হয়েছিল মনোমোহনকে। বিদেশ বিভূঁই, বিনীয়নের মতো দু'চারজন মাত্র অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছাড়া সবাই অল্পবিস্তর অপরিচিত, অনাত্মীয়। এর মধ্যে তাঁকে ঋজু ও অগ্রসরশীল রেখেছিল যা, তা নিশ্চয়ই তাঁর অদম্য কবিমানস। কবি প্রতিভার স্বীকৃতি যখন পেতে সুরু করেছেন ইংরেজ সাহিত্যিক সমাজের কাছ থেকে,—এলো স্বদেশে ফেরার পালা। কিন্তু ভারতের চেয়ে ইংলণ্ডের প্রতিই হৃদয়ের আকর্ষণটি যেন বেশি, তাই বিদায়কালে সে-দেশের উদ্দেশে তাঁর উক্তি:

হয়ত বা এই কারণেই—উত্তরজীবনে যদিও শৈশববিস্মৃত মাতৃভাষার পুনঃ চর্চা করেছিলেন—মাতৃভূমির সঙ্গে তিনি সর্বাত্মক নাড়ির যোগ অনুভব করতে পারেননি, একধরণের বিচ্ছিন্নতাবোধ তাঁর এদেশস্থ জীবনকে বিড়ম্বিত করেছিল। হয়ত বা এই মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি বিনীয়নকে পত্রে লিখেছিলেন : "ভারতবর্ষের প্রকৃতির শ্যামলিমা সত্যই অতুলনীয়, কিন্তু হরিদ্রাভ পাটল বস্তুগুলি (অর্থাৎ এখানকার মানুষ) আমার প্রতি কোনো সহমর্মিতা পোষণ করে না, অন্তত সামাজিকভাবে।"

তবু কবিমন তো—বিদেশী টিউলিপ-ড্যাফোডিল যেমন ভালবাসতেন তেমনি ভালবেসেছিলেন এদেশীয়া মালতীকে, জীবনসঙ্গিনী ক'রে বুকে তুলে নিয়েছিলেন পরম আদরে। কিন্তু চিরস্থায়ী হল না সে-সুখও : অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হলেন মালতী দেবী, হারিয়ে ফেললেন কথা কইবার এবং উঠে বসার ক্ষমতাও—সেই পঙ্গুত্বের মধ্য দিয়েই স্বামীসোহাগিনী ইহলোক থেকে নিলেন বিদায়। দয়িতাবিয়োগ কবিকে দিয়ে গেল অপরিসীম বেদনা। সেই বেদনা থেকে জন্ম নিল "ইম্মর্ট্যাল ঈভ"—যাকে ফেলা যায় চন্দ্রশেখরের "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম," অক্ষয় বড়ালের "এষা," রবীন্দ্রনাথের "স্মরণ" ও দ্বিজেন্দ্রলালের "মন্দ্র" কাব্যের সঙ্গে এক পংক্তিতে। শোক এখানে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পরিশীলিত ও উত্তীর্ণ ক'রে নিয়ে গেছে কবির প্রেমকে, প্রতিষ্ঠিত করেছে সত্য শিব সুন্দরের পূর্ণতায়।

কবির অ-সুখের আরো কারণ ছিল। রাজনৈতিক জটিলতার মধ্যে কোনোদিন পা না বাড়ালেও শাসনকর্তৃপক্ষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাঁকে এককালে বিব্রত রেখেছিল। স্বাস্থ্যও ক্রমশ ভেঙে পড়তে সুরু করেছিল—দেহে ও মনে। জীবনের শেষ অধ্যায়ে দৃষ্টিশক্তি অতিক্ষীণ হয়ে নিজে লেখনীচালনা করতে পারতেন না—সে সময়ে মুখে মুখে কাব্যরচনা ক'রে যেতেন, অন্য কেউ প্রতিলিখনে তা কাগজে ধ'রে রাখত। এ যেন দ্বিতীয় একজন অন্ধ মহাকবি মিল্টন। সাধ ছিল, অধ্যাপনান্তে অবসর নিয়ে ইংলণ্ডে ফিরে যাবেন। কিন্তু তা আর হ'ল না—১৯২৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে [illegible]

বছর বয়সে মনোমোহনের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়ে গেল।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ডের ব্ল্যাকওয়েল প্রতিষ্ঠান কবির পরিণততর অনেকগুলি কবিতার সঞ্চয়ন ক'রে সংকলনগ্রন্থ বার করলেন "সঙস অব লভ য়্যাণ্ড ডেথ"; সম্পাদনার এবং মুখবন্ধ লেখার ভার ছিল বাল্যবন্ধু বিনীয়নের ওপর। তিনটি বই নিয়ে গঠিত "লভ য়্যাণ্ড ডেথ"—"আর্ফিক মিস্টিক্স" "ইম্মর্ট্যাল ঈভ" এবং "লেটার পোয়েম্‌স্ য়্যাণ্ড লিরিক্‌স্"। "ইম্মর্ট্যাল ঈভ" এর কথা আগেই বলা হয়েছে। শেষোক্ত বইখানি একগুচ্ছ গীতিকবিতা ও কবিতার আহরণ। "আর্ফিক মিষ্ট্রিক্স"-এর কবিতাসমূহ কবির সুগভীর মনন ও আন্তর দর্শনের ফসল।

"সঙস অব লভ য়্যাণ্ড ডেথ" সম্পর্কে সুকবি ডব্লিউ, বি, য়েট্‌স্ মন্তব্য করেছেন, "পৃথিবীর অন্যতম সুচারু কাব্যসৃষ্টি।" ওয়াল্টার ডি লা মেয়ার বলেছেন," এতে আছে কল্পনার সলীলতা, উচ্চারণের লালিত্য ও গভীরতা। বিশেষ ভাবে যেটা আমায় মুগ্ধ করেছে তা হল গীতিধর্মী শব্দচয়ন, শব্দের আড়াল থেকে ধ্বনি ভেসে আসে আপনা থেকে—মাতৃভাষা যাঁর ইংরেজি নয়, তাঁর পক্ষে এ এক দুর্লভ কৃতিত্ব।" স্টার্জ মূরের উক্তি : "ইংরেজি ছন্দ শ্লোকের এবং শব্দভাণ্ডারের সাহায্যে এক অপূর্ব সৌন্দর্য রচনা করেছেন তিনি ; সেই রূপপুরীতে কবি নিজে যেন এক ধ্যানী বুদ্ধমূর্তির মতো স্থির অচঞ্চল, যাঁকে দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না অথচ যিনি রহস্যময়, দূরের বস্তু। তাঁর আন্তরিকতা যেমন নির্ভেজাল, তাঁর প্রশান্তি তেমনি আনন্দদায়ক।"

মনোমোহনের অন্যান্য রচনার মধ্যে পাই অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি আকারে এইগুলি :— (ক) "আর্লি পোয়েম্‌স্ য়্যাণ্ড লেটার্স"—প্রথম দিকে লেখা কবিতাচয় ও কিছু পত্রসাহিত্য ; (খ) "পার্সিয়ুস দি গর্গন শ্লেয়ার" (খণ্ড ১—৭) —অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা একখানি অসমাপ্ত মহাকাব্য ; (গ) "নলদময়ন্তী"—একটি কাব্য-নাট্য, এবং এটিও কবি শেষ ক'রে যেতে পারেন নি। (ঘ) "অ্যাডাম ফ্যালার্ম ড ইন প্যারাডাইস"

অসমাপ্ত কাব্যগাথা, এতে আমরা পাই কবির প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ সম্পর্কিত প্রতিক্রিয়া।

ব্যক্তিগত জীবনে মনোমোহন ছিলেন সদাশয় ও অমায়িক, সুমার্জিত, দয়াশীল, ধীর ও অনাড়ম্বর প্রকৃতির মানুষ। কোমলমধুর ছিল তাঁর মন, যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরাই তাঁর প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন না ক'রে পারেন নি। জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিস্মৃতপ্রায় এই কবির প্রতিভার সম্যক্ প্রচার করবার মাহেন্দ্রক্ষণ আজ সমাগত। রবীন্দ্রনাথের উক্তি দিয়ে মনোমোহন-স্মৃতিতর্পণ শেষ করি—

"এই কবি মনোমোহন নিগূঢ় নিকেতন থেকে যা বের করেছেন তা আজও ঢাকা রয়েছে। এ যখন প্রকাশ পাবে তখন বাংলা দেশের একটি মহিমা সর্বত্র প্রকাশিত হবে।"

ব্রহ্মসূত্র কাব্যানুবাদ

পুষ্পদেবী, সরস্বতী, শ্রুতিভারতী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ

২।১।২৭

শঙ্কর কন কিছুই না বুঝে আপত্তি যারা করে
ভালো করে যেন শ্রুতি গ্রন্থটি মনোযোগ দিয়ে পড়ে
শ্রুতির মাঝেতে লেখা দেখা যায়
অংশব্রহ্ম জগতেতে রয়
তিনভাগ তার অমৃত রূপেতে স্বরগের মাঝে আছে
স্পষ্ট করিয়া এই কথা জেনো রয়েছে শ্রুতির মাঝে।

কেহ কেহ বলে শ্রুতি বাক্যতে দুবার দু'কথা বলে
জগৎ পূর্ণ ব্রহ্মও নয় অংশও নয় বলে
দুধের বিকার দধি জেনো হয়
রজ্জুতে সাপ ভ্রম নিশ্চয়
তেমনি জানিও বিবর্ত্ত ইহা বিকার কখন নয়
জগতের মাঝে অংশ রূপেতে ব্রহ্ম মহিমা রয়।
আত্মনি চ এবং বিচিত্রাশ্চ হি

২।১।২৮

কন শঙ্কর স্বপনের মাঝে নিজের মনের থেকে
কত বিচিত্র রথ পথ নদী কত কি মানুষে দেখে
মানুষ তাহাতে লীন নাহি হয়
স্বপন ভাঙিলে তাহারাই লয়
তেমনি জানিও ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট সকলি হয়
ব্রহ্মের মাঝে উদয় হইয়া ব্রহ্মতে পায় লয়।

স্বপক্ষ দোষাচ্চ (২।১।২৯)

নিজের পক্ষে এই দোষ আছে এই কথা হেথা কয়
প্রতিবাদী তাই এই দোষ ধরে অন্য কি কথা কয়
সাংখ্য বলেন প্রধান হইতে
জগৎ সৃষ্টি হন তাহা হতে
নিরবয়ব ব্রহ্ম অংশ ইহাতে মূর্ত্ত জানিও হন
সত্ত্ব রজ ও তমোগুণ মাঝে সাম্য হইয়া রন
কেহ কেহ বলে দুটি পরমাণু হইয়া দ্বন্দ্ব হয়
পরমাণু তবু কণাদের মত প্রস্তরময় নয়।

[ক্রমশঃ

অসংসারী [উপন্যাস] শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* * * * * * *

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

একুশ

রাতে সদাশিবের পাশে শুয়ে গৌরী সদাশিবকে আদর করলে প্রচুর; এতখানি আদর, বা এতটা প্রেমাভিনয় সদাশিবের কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। এপর্যন্ত জীবনের প্রথমদিকেও সে এতখানি যত্ন গৌরীর কাছ থেকে কোন দিন পেয়েছে বলে মনে পড়ে না। নিরীহ সদাশিবের সমস্ত মানসিক গ্লানি এই আদরের স্তূপের মধ্যে কোথায় যেন চাপা পড়ে গেল, সে বেচারা অগাধে ঘুমিয়ে পড়লো।

কিন্তু গৌরীর ঘুম আজ নেই। কে যে তার এই ভ:ঙ্কর সর্বনাশ করেছে তা সে হয়ত বা একটু একটু অনুমান করতে পারছে, কিম্বা পারছে না। সদাশিবের মনকে সন্দিগ্ধ করে তুলতে পারে কে? নীরোদ বাবুর পুত্রবধূ ছাড়া আর কেউই তাকে হাতে নাতে ধরতে পারে নি। কিন্তু সেও ত আজ তিন দিন হোল দিল্লীর বাইরে চলে গেছে। যাওয়ার আগে যদি সে কারুর মারফত শিববাবুর কানে এই খবর পৌঁছে দিত তাহলে যে শিববাবু দুদিন অপেক্ষা করে শনিবার দিন এই অনুসন্ধান সুরু করতো, তা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। সদাশিব নিশ্চয়ই আজ সকালে কি দুপুরে অফিসে এই খবর পেয়েছে। নিশ্চয়ই সকালে, নচেৎ অফিসে যাওয়ার সময় কেন সে বলে গেল যে চারটে সাড়ে-চারটে নাগাদ ফিরবে। অর্থাৎ লম্বা সময় দিয়ে অপরাধীকে হাতে নাতে ধরবার জন্যই সে এই প্রতারণা করেছিল। তবে কি নীরোদবাবুর পুত্রবধূ বাইরে গিয়ে সেখান থেকে চিঠি লিখে শিববাবুকে এই সব জানিয়েছে? কিন্তু চিঠি কোথায়? কই, কোন চিঠি ত কিছুকালের মধ্যে বাড়ীতে আসে নি। তবে কি নীরোদবাবু এ সব কথা জানিয়েছে? হঠাৎ মনে হোল, তবে কি সমীরের কারসাজি! সেই যে সেদিন দুপুরবেলা কে একজন জুতো-পরা লোক আমাদের রোয়াক থেকে লাফিয়ে পড়ে চলে গিয়েছিল, সে কি সমীর? খুব সম্ভব সেই হবে। কিন্তু যেই হোক, বা যেথায় থেকেই হোক, সন্দেহ যখন একবার স্বামীর মনের মধ্যে এসেছে তখন আজকের মতো এটাকে চাপা দেওয়া সম্ভব হলেও বরাবরের জন্য চাপা দেওয়া যাবে না। আর রামরূপটাই বা কি? ধোঁয়া না খেলে কি তার চলে না! বিড়িতে আপত্তি করতে মুখপোড়া সিগরেটই কিনে আনলে। যা বাবা যা খুসি করগে যা, কিন্তু সেই সিগারেটের টুকরো ফেলেই ত যত বিপদ। তবে ওদিককার বেড়া টপ্‌কে লোকটা খুব পালিয়েছিল কিন্তু। আর গুরুবল যে ওর জামাটা আমার নজরে পড়েছিল দরজা খোলার আগেই, নইলে আমার ঘরে ওর জামাটা পড়ে থাক্‌লে আর রক্ষে ছিল না। কিন্তু রামরূপকে নিয়ে ওঁর কোনরকম সন্দেহ হয় নি, উনি সন্দেহ করেছেন সমীরকে নিয়ে। সমীর—ওঃ, সেই ত সব নষ্টের মূল। আমার মধ্যে এই অশান্তি জাগিয়ে তুল্লে কে, সে সমীর। এই অবেলায় আমাকে নতুন করে ক্ষুধার্ত্ত করে তুল্লে কে, সে সমীর। বয়স আমার পুরা পঁয়ত্রিশ, এখন, এই সময়,—কিন্তু কেন, দুনিয়ার সকলে যদি আনন্দে দিন কাটতে পারে, তাহলে কেবলমাত্র কৃত্রিম এক সামজিক বন্ধনের জন্য এই পুতুল স্বামী নিয়ে আমাকে তৃপ্ত হয়ে সংসার করতে হবে? এ অত্যাচার, এ সামাজিক

জুলুম, এ হচ্ছে কতকগুলি সুবিধাবাদী লোকের মনগড়া আইন। এর একমাত্র উদ্দেশ্য পুরুষের আত্মস্বার্থ রক্ষা করা। এর মধ্যে ধর্ম্ম নেই, ভগবান নেই, এর মধ্যে ইহ-পরকাল নেই। ইহজীবনের দেহের ক্ষুধা পরজীবন অবধি ধাওয়া করতে পারে না। আর এই বা কি সমাজ! নারীদের নির্যাতন করে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা! পুরুষ যত ইচ্ছে বিয়ে করতে পারে, নারী পারে না। নারীর বিধবা হওয়া মানে তার জীবন একেবারেই শেষ, নারীর চরিত্রে সন্দেহ হওয়া মানেই তার সমাজচ্যুতি, আর পুরুষ পরের বাড়ীর বিধবা ঝিকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে সংসার বাঁধে, সরকারী অফিস সেই ঝিকে সুখে রাখবার জন্য কোয়ার্টার্স দেয়, বড় বড় লোকেরা তার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেয়ে আসে! উৎকট উত্তেজনায় গৌরী নিজের বিছানার ওপোরে খাড়া হয়ে উঠে বসলো। তারই বাড়ীর অপ্রিয় দর্শন, কুৎসিত বিকলাঙ্গ ঝিয়ের কাছে তার পরাজয়! সমীর ওর দিকে চেয়েও দেখে না। এর শাস্তি চাই। উত্তেজিত গৌরী বিছানা থেকে নেমে ঘরের মেঝেয় পায়চারী করে বেড়াতে লাগ্‌লো, শেষে দরজা খুলে বাইরে উঠোনে বেরিয়ে এল। নিশুতি রাত। নির্ম্মল নীল আকাশে অসংখ্য তারা। তার মধ্যে একফালি বাঁকা চাঁদ। বাড়ীর পিছনে বড় গাছটার মাথায় ঝোপের ভেতর অসংখ্য জোনাকী। অল্প অল্প হাওয়া বইছে। কোথাও কোন শব্দ নেই। পৃথিবী পরম নির্ভয়ে সুষুপ্ত, কেবল ক্ষুধার্ত্ত হতভাগিনী দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে কি একটা অসম্ভব সমস্যার সমাধান করতে আকাশ পাতাল আবোল তাবোল চিন্তা করে যেন প্রায় উন্মাদ হয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে গৌরী কলঘরে গেল, ঠাণ্ডা জল গণ্ডুষ গণ্ডুষ নিয়ে মুখে মাথায় ঘাড়ে বেশ করে দিয়ে, কাপড়ের আঁচল দিয়ে মুছতে মুছতে ফের এসে সদাশিবের ঘরে ঢুকলো। এখনও ওর কান দিয়ে মাথা দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে কিন্তু বেচারা সদাশিব পরম নিশ্চিন্তে নিদ্রিত। অল্প অল্প নাসিকাধ্বনি। সেদিকে চেয়ে চেয়ে গৌরীর মনে কেমন একটা অনুকম্পা জাগ লো। আহা, উদয়াস্ত পরিশ্রম করে, হপ্তাভোর ময়লা কাপড় জামা পরে, গোড়ালী বাঁকা জুতোটা যতদিন চলে তার চেয়েও বেশী দিন চালিয়ে বিকেলের ক্ষিদে চেপে সদাশিব সংসার করছে, ঠিক যেমন আর পাঁচজন গেরস্তয় সংসার করে। ভাড়াটে গাড়ীর ঘোড়া! এর চেয়ে রাস্তার কুকুরগুলোও সুখী, তাদের খাট্‌তে হয় না, অথচ তাদের খাদ্য পথে ঘাটে নর্দামায় ডাষ্টবিনে সব সময়ই ছড়ানো আছে। তাদের বন্ধু ও বান্ধবীরা তাদেরই মত পথে ঘাটে ঘুরে বেড়ায়। দেহের যাবতীয় ক্ষুধা মিটিয়ে পূর্ণ তৃপ্তিতে পথের কুকুর সন্তানের জন্ম দেয় আর আয়ুঃশেষে পথের ধারেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। অথচ মানুষ, সভ্য মানুষ, সাংসারিক মানুষ, সমাজবন্ধনে চির আবদ্ধ মানুষ, গুটীপোকার ন্যায় নিজের নীরন্ধ্র ক্ষুদ্রকারায় আবদ্ধ হয়ে অসহায়ভাবে মরে,—যেমন মরছে গৌরী।

বিছানায় বসে বসে গৌরী কেবলই ভাবতে লাগলো, সদাশিব তাকে সন্দেহ করতে সুরু করেছে। সে ধরা পড়ে গেছে। পাড়ার লোক টের পেয়ে গেছে। সংসারের সাতে পাঁচে থাকে না যে সদাশিব, তার কানেও যখন এই কলঙ্ককাহিনী এসে পৌঁছেচে, তখন এই কলঙ্ক আর কেবলমাত্র পাশের বাড়ীর বউটির কাছেই নিবদ্ধ নেই, অতি সঙ্গোপনে এই কলঙ্ক বিস্তারলাভ করে দুই কূল প্লাবিত করে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। তবে এই জীবনে আর কি প্রয়োজন? এবার মৃত্যু। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু, কথাটা নিতান্তই পুরাতন, কিন্তু সেই পুরাতন জিনিষই নতুন করে গৌরীর জীবনে সত্য হতে চলেছে। কিন্তু মরতেই যদি হয়, কলঙ্কের বোঝাই যদি বইতে হয়, তাহলে নীরবে মরে কোন লাভ নেই। লোকে যদি মাতালই বলে, তাহলে আকণ্ঠ পান করে মাতাল আখ্যা লাভ করাই ভালো। আর সংসারে তার কিই বা আছে। একটা ছেলে নেই, একটা মেয়ে নেই, যে তাদের জীবনের মধ্য দিয়ে মায়ের কলঙ্ককাহিনী গৌরীর জীবনাবসানের পরেও চল্‌তে থাকবে। এক সদাশিব? আজ যদি গৌরী সদাশিবের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ে, তাহলে সদাশিবেরই ভালো। ওষুধের খরচ নেই, সংসারের ঝামেলা নেই। একটা মেসে গিয়ে খাটিয়া পেতে শোবে, যেমন চাকরী সে করছে, তেমনি চাকরীই সে করবে, তারপর পেন্সন নিয়ে হৃষিকেশ কি বৃন্দাবন কি নিদেন পক্ষে দেশে গিয়ে ভাইপোদের সংসারে উঠবে। দেশে হয়ত এই বলে খবর যাবে যে, গৌরী কলেরা হয়ে

একদিনের রোগে মারা গেছে। বাপের বাড়ীতেও ভাই ছাড়া গৌরীর আছে এক মাসীমা, সে হয়ত দুদিন কাঁদবে, তা কাঁদুক, গৌরী যদি যা খুসি করে, তাহলে কোথাও কোন বিপর্য্যয়ই ঘটবে না। শুধু তার নিজের জীবন! সে জীবন ত যেতেই বসেছে। চুরি সে করেছে, অবশ্যই করেছে, কিন্তু ধরা পড়ার পর চোর নাম নিয়ে বেঁচে থাকা, আর লুকিয়ে লুকিয়ে চুরি করা, এর মধ্যে যে আকাশ পাতাল তফাৎ। রেণুর একটা কথা মনে পড়ে গেল। তার দিদিমা বুঝি বল্‌তো 'ডুবেচি না ডুবতে আছি, দেখি পাতাল কত দূর।' কালামুখী কানী সেই পাতাল দেখতে বেরিয়েছে, হয়ত পাতালের কাছাকাছি পৌঁছেও গেছে।

চট্‌ করে গৌরীর মাথায় নতুন একটা বুদ্ধি এসে গেল। নভেল নাটক সে অনেক পড়েছে। সে জানে কামজ মোহের কোন এক বিশেষ পাত্রস্থিত আকাঙ্ক্ষার অবসান হয় পূর্ণ ভোগের মাধ্যমে। একথা সে পড়েছিল কোন এক কামশাস্ত্র সম্বন্ধীয় বাংলা বই থেকে এবং সেই সঙ্গে এটাও সে জানে যে কামকেলির রীতিই হচ্চে এই যে, এ জিনিষের নিরন্তর অনুশীলনে মানুষের মনের ছাগবৃত্তি উত্তরোত্তর বেড়েই চলে, কিন্তু সব সময়েই পাত্র বদ্‌লানোর জন্য মানুষের মনে একটা অত্যুগ্র চেষ্টা চলতে থাকে। সমীরকে সে তেমন করে পায় নি, অথচ সমীর রেণুকে এতদিনে নিশ্চয়ই নিংড়ে ভোগ করে নিয়েছে। এখন যদি সে একটু চেষ্টা করে, তাহলে সমীর নিশ্চয়ই ঐ নিরক্ষর, কানী এবং নিদারুণ কুৎসিত ঝিটাকে বর্জ্জন করে গৌরীর জন্যই লালায়িত হয়ে উঠবে। আর সমীর ত সদাশিব নয়। চাকরীর মায়া তাকে আটকাতে পারবে না। সামাজিক ভয় বা আইনের বাঁধন তাকে পঙ্গু করতে কখনও পারে নি আজও পারবে না। গৌরী যদি অল্পমাত্র চেষ্টা করে, তাহলে অতি সহজে সে সমীরকে নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে উদ্দাম দুর্ব্বার জীবন যাপন করতে পারবে। তারপর? তারপর আর কি? সমীরের সান্নিধ্যে তার জীবন যাপন যদি স্থায়ী নাও হয় তাহলেও দুদিনের সুখময় জীবন দুশো বছরের একঘেয়ে জীবনের চেয়ে অনেক বেশী প্রার্থনীয়। সে রুগ্ন, কিন্তু সব রোগ সেরে যাবে সমীরের সান্নিধ্যে। সে কষ্ট সহ্য করতে পারে না, কিন্তু সমীর পাশে থাকলে কোন কষ্টই তার কষ্ট বলে মনে হবে না। অতএব সমীরকে তার চাই। তিলে তিলে পলে পলে হিসেব করে ওজন মেপে বাঁধা ধরা জীবনে যে চলছিল, সেই জীবনের ওপোর আবার নতুন করে সন্দেহের বোঝা চাপিয়ে সদাশিবের মন জুগিয়ে ভালবাসার অভিনয় করে ব্যাধি এবং আধির শত রকমের অসুখ অহর্নিশ সহ্য করে গৌরী আর পারে না, পারবে না। কাল রবিবারেই এর উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে, তারপর বরাতে যা থাকে—তাই হবে।

পরদিন সকাল থেকেই গৌরী তার সর্ব্বনাশা বুদ্ধিকে কার্য্যকরী করতে সুরু করে দিলে। সত্যি কথা বলতে কি, মাঝে মাঝে বুঝতে ইচ্ছে হয়, ভগবান গৌরীকে কি ধাতু দিয়ে তৈরী করেছিলেন। বোধ হয় যেন দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত দলের সর্দ্দার কি নামকরা কূটনৈতিক রাজপুরুষ তৈরী করার মাটী দিয়েই বিধাতা গৌরীকে গঠন করেছিলেন, আবার অপরপক্ষে পণ্ডিতমশাই বল্‌তেন বুভুক্ষিতঃ কিং ন করোতি পাপম্‌। মনস্তাত্ত্বিক বল্‌বেন, এই বুভুক্ষা এবং তদুপরি সন্দেহরূপ অনলই গৌরীকে তার অভ্যস্ত বর্ত্ম থেকে বিচ্যুত করে খানার মধ্যে টেনে এনে ফেলেছে। কেউ হয়ত একথাও বল্‌তে পারে যে, গৌরীর জীবন-লাইনের ফিসপ্লেট থেকে খেলাচ্ছলে বলটু খুলে পালিয়েছে ঐ ছেলেমানুষ সমীর, কিন্তু খুলতে খুলতে যেমনই ঐ পাহারা-ওয়ালা রেণুকে সে দেখতে পেয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে খুসি করে ঘুস দিতে গিয়ে তারই সঙ্গে উধাও হয়েছে; বল্টুগুলো পুনরায় এঁটে দেওয়ার সময় সে আর পায় নি। ওর মানসিক অন্তর্লোকে কি যে অঘটন ঘটেছে তা জানিনা কিন্তু এসবের মোট ফল দাঁড়ালো এই যে, সকালে সদাশিব যখন নিয়মমত চা পান করে বাজারে গেল তখন ফাঁকা বাড়ী পেয়ে গৌরী সদর বন্ধ করে রান্নাঘরের দরজায় এসে রামরূপকে খুব মিষ্টি করে ডাক দিলে। হাসি হাসি মুখে রামরূপ কড়া নামিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল।

গৌরী বললে, রামরূপ, একটা কাজ করতে পারবে?

জরুর, রামরূপ একেবারে গৌরীর গায়ের ওপোর এসে দাঁড়িয়েছে।

রামরূপের গালটা টিপে দিয়ে গৌরী বললে, দেখ রামরূপ, আজ রবিবার, বাবু আজ সারাদিন বাড়ীতেই থাকবে। তুমি সেই অবসরে সামনে ঐ সমীর বাবুদের বাড়ীতে যাবে, বুঝলে।

সে বললে, সমীর বাবুদের বাড়ী, যে বাবু ঐ কানী ঝিকে নিয়ে থাকে ?

হ্যাঁ। ওঃ তুমি দেখছি সবই জানো !

একমুখ হেসে রামরূপ বল্লে, জান্‌বোনা মেমসাব,বাঙালী-বাবুদের কেচ্ছা কে না জানে ? খ্যাচ্‌ করে গৌরীর মনটা যেন কেমন বিগড়ে গেল। সেটা তখুনি মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে গৌরী বল্লে, হ্যাঁ ঐ বাড়ী। ওখানে গিয়ে চুপি চুপি আড়াল থেকে দেখ্‌বে ওরা কি করে। তারপর একসময় সমীরবাবুকে বল্‌বে, সে যেন কাল সোমবারে দুপুর বেলা আমার সঙ্গে দেখা করে, বুঝলে।

কাঁহে মেমসাব, রামরূপের মুখেও সন্দেহের ছায়া।

ঢোক গিলে চট্‌ করে গৌরী বল্লে, ঐ বাবু আমার কাছে টাকা ধার নিয়েছিল লুকিয়ে, এই টাকা আমার চাই। বাবুকে জানালে বাবু সেই টাকা নিজেই নিয়ে নেবে, তাই বাবুকে না জানিয়ে ওর কাছ থেকে টাকা আদায় করবো এবং ঐ টাকা আদায় হলে তাই থেকে তোমার ভালো জামা কাপড় কি তোমার বিছাপদক গড়িয়ে দেব, বুঝলে। কিন্তু দেখো, অন্যে যেন কেউ না জান্‌তে পারে যে, আমি সমীর বাবুকে ডেকেছি। মনে-রেখো, যে কোনো প্রকারেই হোক, ঐ বাবুর সঙ্গে আমার দেখা করানো অবশ্যই চাই, বুঝেছ।

বিছাপদক প্রাপ্তির আশায় রামরূপ উৎফুল্ল হয়ে বল্লে হো যায়গা মেমসাব। বাবুকে আমি জরুর আপনার কাছে পৌঁছে দেব। একটু থেমে বল্ল, কত টাকা পাওনা আছে মেমসাব ?

অনেক টাকা, এই কথা বলেই গৌরী বিজয়িনীর গর্ব্ব নিয়ে বাইরের ঘরে এসে দরজাটা খুলে রেখে সেই ঘরেই বসে বসে দেওয়ালের যেখানটায় সাইকেলের ঘষা লেগে বালির ওপোর আঁচড় পাঁচড় দাগ হয়েছিল সেই দাগগুলো আনমনে দেখতে লাগলো। ঐ দাগ কি চিরস্থায়ী ?

সেদিন দুপুরে ঘরের কাজ শেষ করে রামরূপ সমীরের বাড়ীর পাশের সেই সরু গাছ-ঢাকা গলিপথের বেঞ্চিতে অন্যান্য বাড়ীর দুতিনজন চাকরের সঙ্গে এদিক ওদিক গল্প করতে করতে বিড়ি ফুঁকতে লাগলো। গোলাপী বিড়িটাই তার ভালো লাগে, কিন্তু চাল দেখানোর জন্যে এবং মেমসাহেবকে খুসিকরার জন্যে মধ্যে মধ্যে আজকাল তাকে সিগারেট খেতে হচ্ছে, কিন্তু সিগারেটে তেমন মৌতাজ জমেনা। এই চাকরদের মধ্যে সে তার আজকের অভিযানের কথা প্রকাশ করবে কি না অনেক ভেবে শেষকালে ঠিক করলে ও বাড়ীর সংবাদ ত নেওয়া যাক তারপর যা হয় করা যাবে।

সমীরের বাড়ীর পাশের বাড়ীতেই যে বাঙালী ভদ্র-লোক থাকেন তার অনেকগুলি ছেলেমেয়ে, তার বাড়ীতে কাজ করে একটা প্রায় উড়িয়া গোছের চাকর। সেটাকে বাবু নিজের দেশ মেদিনীপুর থেকেই নিয়ে এসেছেন। লোকটা এখানে বছর দুয়েক থেকে হিন্দীটিন্দিগুলো বেশ শিখে নিয়েছে। প্রসঙ্গটা উঠ্‌তেই সে বল্লে সমীরবাবুর কথা বাদ দাও, কারও সঙ্গে মেসেনা কিছু না, একটা কানী নিয়ে ওর সংসার। কিন্তু ঝিটার কি বরাৎ, কেমন সুন্দর ঘর, কি সুন্দর জিনিষপত্তর, ওই ত সর্ব্বেসর্ব্বা। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বাবুর যা কিছু আয় সবই ঐ এক ঝিয়ের পেটেই যায়।

চাকরমহলে এপাড়াটার নাম সুপারিণ্টেডেণ্ট পাড়া, কারণ বিভিন্ন সরকারী অফিসের বিভাগীয় সুপারিন্‌-টেডেণ্ট বা সেইরূপ পদস্থ লোকদেরই এ পাড়ায় কোয়াটার্সগুলো দেওয়া হয়। অতএব চাকরদের দৃষ্টিতে এ পাড়ার বাবুরা সবাই সুপারিণ্টেডেণ্ট। উড়েটা বললে বাবুদের কথা আর কি বলবো, সব সময় ভেতর থেকে দরজা বন্ধ, এমন কি বাচ্চা ছেলেরা পর্য্যন্ত ওবাড়ীর ভেতরে ঢুকতে চায় না। রাতদিন কি যে করে, তা ওরাই জানে।

রামরূপ বল্লে, ঐ কানীটাকে বাবু খুব ভালোবাসে, না রে,

খুব। রামরূপের মনে হোল, মেমসাবও তাকে ভালবাসে, আবার বিছাপদক দেবে বলেছে। বিছাপদকে কত লাগবে ? একশ দেড়শ টাকার কম নিশ্চয়ই হবে না, কিন্তু সমীরবাবুর কাছ থেকে মেমসাহেবের টাকাটা কি করেই বা আদায় করা যায়।

বিড়িতে জোরে জোরে টান দিয়ে রামরূপ বল্লে, আমার বাবুর কাছ থেকে সমীরবাবু অনেক টাকা ধার করেছে, কি করে আদায় করা যায় বলত।

এমন সময় নীরোদ বাড়ীর চাকর লক্ষ্মণ এসে হাজির

হোল। ট্যাঁক থেকে ছোট একটা কৌটো বার করে একটা বিড়ি নিয়ে রামরূপের কাছ থেকে জ্বলন্ত বিড়িটা নিয়ে তাইতে ঠেকিয়ে সেটা ধরালে। উড়েটা বল্লে, তোঁদের বাড়ীতে কি সমীরবাবু খুব যাতায়াত করে নাকি ?

রামরূপের বদলে উত্তর দিলে লক্ষ্মণ। সে বল্লে ওমা, ঐ বাড়ীতেই ত সমীরবাবু ছিল। তারপর ওদের বাড়ীর ঐ রেণু ঝিকে নিয়ে পালিয়ে কোথায় যেন চলে গিয়েছিল, তারপর আবার এই বাড়ীতে এসে আলাদা উঠেছে। টাকা ধারের কথায় লক্ষ্মণ বল্লে, হতে পারে। ঐ বাড়ীতে যখন ছিল তখন হয়ত ধার নিয়েছে।

ওসব কথা রামরূপ জানতো না। লক্ষ্মণের কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত জেনেনিলে। লছণও সুবিধে বুঝে রামরূপকে প্রশ্ন করলে, আচ্ছা দোস্ত, আমাদের দাদাবাবু কি সেদিন দুপুরে তোদের মেমসাহেবের কাছে গিয়েছিল ? মেমসাহেব কথাটা বলে ওরা সবাই হাসিহাসি করে, কারণ এ কথাটা কদিন আগে রামরূপ বন্ধুমহলে সালঙ্কারে প্রকাশ করে ফেলেছিল।

রামরূপ অবাক্ হয়ে বললে, কই দেখিনিত। কিন্তু কথাটা শোনার পর থেকেই রামরূপের মনটা যেন কেমন বিগড়ে গেল। প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধ বিস্মৃত হয়ে রামরূপের অন্তর্নিহিত চিরন্তন পুরুষ যেন সাময়িকভাবে মাথা খাড়া করে উঠলো।

লক্ষ্মণ বল্লে, তুই জানিস্ না, আমি স্বচক্ষে দেখেছি, ঐ বাবুকে দুপুর বেলা ত বাড়ী থেকে বেরিয়ে আস্‌তে।

ডাকপিওন গলির সামনে দিয়ে কোয়ার্টার্সের নম্বর দেখতে দেখতে এগিয়ে গেল। একমিনিট পরেই সমীরের দরজায় ডাকপিওনের করাঘাত হোল। রামরূপ সুযোগ বুঝে ওখান থেকে উঠে সমীরের রোয়াকের কাছে এসে দাঁড়ালো।

ভেতর থেকে দরজা খুল্লে রেণু। ডাকপিওন চিঠিখানা দিতেই রেণু দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল। জানালাটা ঘরের খোলাই ছিল, রামরূপ হাতের বিড়িটা শেষ করে ঐ খোলা জানালার তলায় গিয়ে বস্‌লো। লক্ষ্মণ এবং উড়িয়া চাকরটা রামরূপকে ডাকতে যেতেই [illegible] বল্লে, তোরা যা আমি খানিক পরে যাব। রহস্যের গন্ধ পেয়ে তারা হাস্‌তে হাস্‌তে নিজেদের জায়গায় ফিরে এল।

স্পষ্ট বোঝা গেল সমীর ও রেণু দুজনেই ঐ ঘরে আছে। খুব সম্ভব সমীর খাটের ওপরে শুয়েছিল। বাইরে বসে রামরূপের মনে হোল যে, সমীর চিঠিখানা পড়ে রেণুকে বল্‌ছে যে, বিদেশে ওর যেন কোথায় কে থাকে, যে একটু সেরেছে এবং এবার বেশী করে টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে। রামরূপ মনে করলে দেখেছ, বাবুটা কি জোচ্চর, সকলেরই টাকা মেরে বসে আছে, কাউকেই কিছুটি দেবে না।

এবার রেণুর গলা শোনা গেল। রেণু বল্লে, দিন না দাদা, এবার বেশী করেই কিছু দিন না, আমাদের আর এখানে এমন কি খরচ—

রামরূপ এবার অবাক হয়ে গেল। বাংলা সে বেশ বুঝতে পারে, রেণু দাদা বলে সম্বোধন করছে কাকে, এই ভেবে ঘাবড়ে গেল।

সমীর বল্লে, এই দিন কুড়ি আগে পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়েছি, এর মধ্যে আবার টাকা, ব্যাপার কি, আমার কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে, এ চিঠি কে লিখছে, টাকা কে পাচ্ছে—

রেণু বল্লে, যাই বলুন দাদা, পিসিমা ত লেখাপড়া জানেন না যে, তাঁর হাতের লেখা আপনি পাবেন—

রামরূপ উঁচু হয়ে জানালা দিয়ে দেখতে চেষ্টা করলো ঘরে সমীর বাবু আছেন না অন্য কেউ। নইলে রেণু নিরিবিলি ঘরেও দাদা বলে ডাকছে কাকে, সমীরকে কি ?

রামরূপ উঁচু হতেই জানালা দিয়ে তার মাথাটা সমীরের দৃষ্টিগোচর হোল। সমীর শুয়ে শুয়েই বলে, কেরে, কে ওখানে ?

রামরূপ কোনো জবাব না দিয়ে টপ করে বসে পড়লো এবং বসে বসেই পালাবার চেষ্টা করলো

রেনু বল্লে, কে ছেলে পিলে হবে, কিন্তু সমীর অনেক সিআইডি-র কীর্ত্তিকলাপ জানে। সে বিনা বাক্যব্যয়ে উঠেই নিঃশব্দে দরজা খুলে রোয়াকে বেরিয়ে এসেই দেখে রামরূপ বসে বসে রোয়াকের প্রায় কিনারায় এসে গেছে, তার মুখে চোখে পলায়নের ছাপ।

কে হে, কে তুমি? সমীর খুব কড়াভাবে প্রশ্ন করলে।

নেই বাবু, হাম্ হিঁয়া বৈঠ্ গয়া অস্পষ্টভাবে জড়িয়ে জড়িয়ে রামরূপ কথাগুলো বল্‌তে বল্‌তে দাঁড়িয়ে উঠে রোয়াক থেকে নেমে পড়লো।

সমীর এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলে, তোমার নাম কি? কোথায় থাক তুমি? সমীর স্পষ্ট বুঝতে পেরেছে এ ছোকরা যা বল্‌ছে, তা সত্য নয়।

রামরূপ আম্‌তা আম্‌তা করে পালাবার চেষ্টা করতেই সমীর এগিয়ে এসে ওর ফতুয়ার কলারটা চেপে ধরলে, ধমক দিয়ে বল্লে, কোথায় থাকিস, কি জন্যে এখানে আমার জানালায় লুকিয়ে এসে দাঁড়িয়ে ছিলি? বল্, তোকে বল্‌তে হবে।

নিরুপায় রামরূপ সদাশিবের বাড়ীর দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লে ও বাড়ীর মেমসাব আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়েছে তাঁর কি টাকা পাওনা আছে সেইটের জন্যে তাগিদ দিতে, তাই আমি আপনার কাছে এসেছিলুম।

ওবাড়ীর মেমসাব? টাকা? সে আবার কি কথা। তা বেশ, ওবাড়ীর সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ?

আমি ঐখানে কাজ করি।

রেণু ঘর থেকে উঁকি মেরে দেখে বল্লে, যাকগে দাদা ছেড়ে দিন, ওসব নিয়ে আর কেন ঝঞ্ঝাট করেন, যাক্‌গে—

—যাক্‌গে কিসের, কক্‌খনও না, এ ব্যাটার বদ মৎলব আছে। আচ্ছা রেণু, তুই দরজাটা দিয়ে দে ত, আমি একবার সদাকে ডেকে জিগ্যেস করে দেখতে চাই, সত্য মিথ্যা কি ব্যাপার। কারুর সাতে পাঁচে আমি থাকি না, আর আমার বাড়ীতে কেবলই সব লোকে উঁকি মারতে আসে, বল্‌তে বল্‌তে সমীর চটি পায়েই রামরূপকে জোর করে ধরে নিয়ে যেন পূর্বাপর চিন্তাশূন্য হয়েই সদাশিবের বাড়ীর দিকে এগিয়ে পড়লো। রেণু দরজাটা অল্প ভেজিয়ে তার ফাঁক দিয়ে ওদের দিকে সভীতনেত্রে চেয়ে রইল। সে মনে মনে প্রমাদ গণছে।

সদাশিবের বাড়ীর বারান্দায় এসে সমীরের চৈতন্য হোল, যে, তার পক্ষে এতটা বাড়াবাড়ি করা শোভন হচ্চে না, কারণ লোকচক্ষে সে অপরাধী। কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়! দুর হোক্ গে ছাই, কিন্তু এতটা এসেত ফেরা ও যায় না। বিশেষ করে লক্ষ্মণ, ঐ উড়েটা এবং আরও দু'একটা ছোঁড়া সমীরের পাশের বাড়ীর গলিপথ থেকে বেরিয়ে এসে ওদের দিকে দেখছিল। কাজেই এখান থেকে ফিরে যাওয়া নিতান্তই অপমানজনক।

বহুদিন পরে আজ সদাশিবের দরজায় এসে সমীর ঘা দিলে। সদাশিব সপ্তাহান্তিক নিদ্রায় বিভোর ছিল। গৌরী উঠে এঘরে এসেই অবাক্। গৌরীকে দেখেই রামরূপ হাউমাউ করে প্রায় কেঁদে ফেল্লে, বল্লে, মায়িজী, আপনি বলেছিলেন বাবুকে ডাক্‌তে কিন্তু বাবুর জানালার কাছে যেতেই বাবু আমার ঘাড় পাকড়কে ইত্যাদি। বিপদে পড়ে এখন আর মেমসাব বল্‌তে ওর মনেই হোল না!

গৌরী একটু থম্‌কে দাঁড়িয়েই বল্লে, ওকে ছেড়ে দিন, ওর ওপরে জুলুম করছেন কেন! এতদিন পরে গৌরীও সমীরকে আপনি বলে ফেল্লে।

সমীর বল্লে, এ আপনার বাড়ীর লোক?

হ্যাঁ, রুক্ষভাবে গৌরী উত্তর দিলে।

একে বারণ করে দেবেন, এ যেন আমার বাড়ীর দরজায় গিয়ে চোরের মত বসে না থাকে।

চোরের ওপোর বাটপাড়ি করতে সকলেরই ইচ্ছে হয়। ও আমার বারণ শুনবে কেন? গৌরী পূর্বের ন্যায় রুক্ষস্বরেই উত্তর দিলে।

বাইরে কে, কি হয়েছে? সদাশিবের কণ্ঠস্বর নেপথ্যে থেকে শোনা গেল, এবং পরক্ষণেই সদাশিব সশরীরে এঘরে এসে হাজির। একি, সমীর যে, কি খবর? রামরূপ এখন কোথা থেকে রে, সদাশিব বিস্মিতের ন্যায় সকলকেই প্রশ্ন করতে লাগলো।

সমীর বললে, তোর বাড়ীর এই চাকর আমার দরজায় দুপুরে চুপি চুপি উঁকি মেরে দেখছে। দরজা খুলতেই দেখি, চোরের মত গুঁড়ি মেরে পালিয়ে যাচ্ছে। আবার বলে কিনা আমার কাছে এ বাড়ীর মেমসাবের টাকা পাওনা আছে, এ সব কি ব্যাপার তাই তোমার কাছে ফয়শালা করতে একে ধরে এনেছি।

সদাশিব বললে, টাকা? তা ত জানিনা—

গৌরী সক্রোধে বলে উঠলো, আমার টাকা আপনি নেন নি? সে টাকা ফেরৎ দেবেন কবে? আমার

ঝিটিকে নিয়ে পালিয়ে এই বিদেশ বিভুঁয়ে খুব ত বাঙালীর মুখ পোড়ালেন, আবার টাকাটাও কি মেরে দেবেন?

সে কি কথা, আপনার টাকা আমি কবে নিয়েছি? এক পয়সাও আমি নিই নি।

নিয়েছেন, নিশ্চয় নিয়েছেন, আমার অনেক টাকা আপনি নিয়েছেন, গৌরী সবেগে কথাগুলো বলে ফেলে আকুলভাবে হাঁপাতে লাগ্‌লো।

পাশের বাড়ী থেকে নীরোদবাবুর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, লক্ষ্মণ— লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ এবং আরও তু'তিনজনে এ বাড়ীর হাতার একটু দূরে দাঁড়িয়ে রামরূপের ব্যাপারটা দেখ্‌ছিল। বাবুর ডাক শুনে লক্ষ্মণ ওদের বাড়ীর দিকে চলে গেল। এর তু'মিনিট পরেই হয়ত বা লক্ষ্মণের কাছ থেকে কিছুটা শুনে কিম্বা এ বাড়ীর হাঁকাহাঁকিতে আকৃষ্ট হয়ে নীরোদবাবু স্বয়ং এ বাড়ীর কাছাকাছি এসে দূর থেকে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি শিববাবু, কি, হয়েছে কি? কাছাকাছি এসে সমীরকে দেখেই বললেন, বা রে, এতদিন ছিল মিত্রভেদ, আজ যে দেখছি মিত্রপ্রাপ্তি।

কিন্তু নীরোদবাবুর পরিহাসে এরা কেউই কান দিলে না। শিববাবু বললেন, টাকাকড়ির ব্যাপার ত আমি কিছুই জানি না, কিন্তু কই, এর আগে ত তুমি আমায় কিছুই বলনি।

একটু থেমে বললে, সমীর—

একদম মিথ্যে কথা, সমীর সজোরে কথাগুলো উচ্চারণ করলে। রামরূপ বললে, নেহি বাবুজী, মায়িজী আজ সকালেই আমাকে বলেছে সমীর বাবুকে ডেকে আনার জন্য। তবে মায়িজী বলেছিল সোমবার তুপুরে ডাকবার জন্য, তা বাবুই আজ আমাকে জোর করে ধরে আন্‌লে—

অন্যদিন হলে সদাশিব এই ডাকাডাকির ব্যাপারে কোন রকম কানই দিত না, কিন্তু আজ তার খ্যাঁচ করে মনে হোল, সোমবার তুপুরে দেখা করতে চেষ্টা করার কারণ কি? একটু থেমে গম্ভীর হয়ে সকলের সামনেই সদাশিব সমীরকে বললে, সমীর, তুমি মাঝে মাঝে তুপুর বেলা আমার বাড়ী আস কেন বলত?

সদাশিবের প্রশ্নে সমীর অবাক্ হয়ে গেল। সদাও এভাবে কথা কইতে জানে! কিন্তু ইতস্ততঃ না করে সমীর সজোরে উত্তর দিলে একদম্ বাজে কথা। তোমার এখান থেকে জিনিষ নিয়ে চলে যাওয়ার পর আমি আর একদিনও এ বাড়ীর হাতার মধ্যে ঢুকি নি।

তবে কে আসে? কার সিগারেটের টুক্‌রো আমি ঘরের মধ্যে দেখ্‌তে পাই? নিতান্ত বোকার মত রাগের বশে সদাশিব সকলের সামনেই এই প্রশ্নটা করে বস্‌লো।

ব্যাপারটা নিতান্ত গুরুতর আকার ধারণ করছে দেখে নীরোদবাবু শিববাবুকে ধমক দিয়ে বললেন, আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন শিববাবু, কি বলছেন একটু ভেবে বলুন। আপনার বুদ্ধি-শুদ্ধি সব লোপ পেয়ে গেছে।

গৌরী মনে মনে প্রমাদ গুনছে। হালফিল নীরোদবাবুকে দেখে সে দরজার আড়ালে চলে গেছে বটে, কিন্তু উৎকর্ণ হয়ে শুনছে, বাইরে রাগের মাথায় কে কি বলে বসে।

সদাশিব হাতমুখ নেড়ে বললে, আপনারা পাঁচজনে আমার বুদ্ধিটুদ্ধি সব লোপ পাইয়ে দিচ্ছেন, তাই লোপ পেয়ে যাচ্ছে। এইত কাল সকালে আমি বাজার করে ফেরার সময় আপনার ছেলে প্রবোধও আমাকে আমার বাড়ীর কত কুৎসা শোনালে, বললে, এ সব কথা সবাই জানে—

প্রবোধ? নীরোদবাবু গর্জ্জন করে উঠলেন, তার এতদূর স্পর্দ্ধা যে, এইটুকু বলেই নীরোদবাবু চুপ করে গেলেন। শেষে অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, ছিঃ

সমীরেরও মাথা আজ বিকৃতপ্রায়। সে বললে প্রবোধ, প্রবোধ এই কথা বলেছে তোমাকে? আর সেদিন তুপুরে আমি স্বচক্ষে দেখেছি প্রবোধকে এই বাড়ী থেকে বেরোতে।

এই বাড়ী থেকে? তুপুরে? নীরোদবাবু গর্জ্জন করে প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সমীর সবেগে উত্তর দিলে। একটু থেমে বললে, কেন আপনার চাকর লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করুন, সেও জানে। সে সময় তাকেও আমি রাস্তায় দেখেছি।

নীরোদবাবু ঘাড় হেঁট করে নিজের বাসার দিকে পা বাড়ালেন। একটু দূরেই লক্ষ্মণ দাঁড়িয়েছিল। সে এদের সমস্তই শুনছে। নীরোদবাবু তাকে কোন কিছুই জিজ্ঞাসা

না করে সবেগে পা বাড়ালেন। তাঁর কোন সন্দেহই আর নেই, প্রবোধ কেন মধ্যে মধ্যে দুপুরে অফিস কামাই করে পালায়।

হয়ত প্রবোধ এতক্ষণ নিজের জানালা থেকে সমস্তই শুনছিল। গেঞ্জি গায়ে খালি পায়ে দ্রুতগতি বেরিয়ে এসে বললে, আপনি শুনুন বাবা, আমার নাম যখন—

তোমার মুখদর্শন করতে চাই না, তুমি কুলাঙ্গার, তুমি আমার ত্যাজ্যপুত্র, তুমি এখুনি আমার বাড়ী থেকে দূর হও, নীরোদবাবু চাপা গলায় কথাগুলো উচ্চারণ করলেন। তাঁর চোখ মুখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছিল।

কিন্তু এতেও প্রবোধ ভয় পেলে না আজ সে মরিয়া হয়ে গেছে। বললে, আপনি আমায় যা ইচ্ছে শাস্তি দেবেন, কিন্তু আমার কথাটা ত শুনবেন—

যা শুনেছি তাই যথেষ্ট, এর ওপোর আর কিছু শুনতে চাই না, নীরোদবাবু পূর্ব্ববৎ বাড়ীর দিকে এগোতে লাগলেন।

প্রবোধ পিতার সঙ্গে গেল না। বরং সমীরের দিকে এগিয়ে এসে অস্বাভাবিক জোর দিয়ে প্রশ্ন করলে, আপনি কি আমায় দেখেছেন, এই বাড়ীর ভেতর থেকে বেরুতে, না বাইরে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন?

সমীর থেমে গেল, বললে, হাঁা, বাইরে জানালায় দেখেছি।

তাই বলুন, বাড়িয়ে বলবেন না। নীরোদবাবু থমকে দাঁড়ালেন। প্রবোধ বললে, পাড়ার মধ্যে একটা বাড়ীতে অনাচার ঢুকলে সব বাড়ীতেই অনাচার আসতে পারে। আপনি সমীর বাবু একটা ঝি নিয়ে ঘর করছেন। সেই দেখাদেখি এ বাড়ীর গিন্নী, মানে শিবগবাবুর স্ত্রী ঐ চাকর রামরূপকে নিয়ে প্রত্যেক দুপুরে যা কাণ্ড করে, তা আর কহতব্য নয়। বাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে প্রবোধ বললে আপনার বউমাকে জিজ্ঞাসা করুন সে আর তার ভগ্নি দুজনে এ বাড়ীতে দুপুরে বেড়াতে এসে তাদের স্বচক্ষে তারা কি দেখে গেছে তাই বলুক। তারা আজই সকালে হরিদ্বার থেকে ফিরেছে, তাদের মাথায় এখনও হরিদ্বারের জল রয়েছে, তারা নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলবে না।

নীরোদবাবু এগিয়ে এসে বললেন, পরের বাড়ীতে যার যা ইচ্ছে সে তাই করবে, তা বলে তুমি দুপুরে অফিস কামাই করে এ বাড়ীর জানালায় আড়ি পাততে আস কেন?

আমার অপরাধ হয়েছে স্বীকার করি, কিন্তু আমি আপনার বউমার কাছে সব কথা শুনে স্বচক্ষে দেখতে এসেছিলুম কথাটা কতদূর সত্য। এ ছাড়া আর কোন অসদুদ্দেশ্য আমার ছিল না।

কপাল পর্য্যন্ত ঘোমটা দিয়ে ঢেকে অত্যন্ত গম্ভীর মূর্ত্তিতে দরজার কাছে বেরিয়ে এল গৌরী। ক্ষুব্ধ বিপর্য্যস্ত হতভম্ভ সদাশিবকে ডেকে দৃপ্তকণ্ঠে গৌরী বেশ চীৎকার করেই বললে, তুমি চলে এস। তোমার বন্ধু সমীর একটা ঝি নিয়ে যে কাণ্ড করছে, সেই লজ্জা সেই অপমান চাপা দেওয়ার জন্যই সকলে মিলে দল পাকিয়ে আমাদের কুৎসা রটনা করতে এসেছে। ওরা কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ করুক, তুমি চলে এসো।

রেণু আমার বোনের মতন, ভগবান সাক্ষী, তার সঙ্গে অন্য কোন সম্বন্ধই আমার নেই, কথাগুলো সমীর সজোরে উচ্চারণ করলে।

ওসব বোনের গল্প অন্যত্র বল্‌বেন, বলে গৌরী দু'পা এগিয়ে এসে সদাশিবের হাত ধরে জোর করে টেনে নিয়ে গেল। নীরোদবাবু প্রবোধকে ডেকে নিয়ে নিজের বাড়ীর দিকে চলতে সুরু করে দিলেন। সমীর ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে গৌরীর উদ্দেশে চীৎকার করে বললে, পাতানো ভাই-বোনের সম্বন্ধ কত পবিত্র হতে পারে, তা রেণুর পায়ের তলায় বসে তোমরা শিখে আসতে পারো, এইটুকু বলেই সে হন হন করে নিজের বাসার দিকে রওনা দিলে: আর বেচারা রামরূপ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। আশ-পাশের সমস্ত বাড়ীর জানালায় অসংখ্য কৌতুহলী চোখ। রবিবারের বাজারে পাড়ার ছেলেরাও সব ধারে কাছেই ছিল, তারা এদিক ওদিকে দূরে দূরে দাঁড়িয়ে। এ অঞ্চলের প্রায় অধিকাংশ বাড়ীতেই চাকর আছে, তারা দূরে দূরে জটলা পাকাচ্ছিল। রঙ্গমঞ্চের মূল নায়করা যে যার বাড়ীতে চলে গেলে ঐ চাকরদেরই মধ্যে দু'একজন এগিয়ে এসে রামরূপকে ডেকে নিয়ে গেল। ফিস্ ফিস্ করে সবাই তার কানে কানে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো, কি হয়েছে রে, কি ব্যাপার, বাবুদের বাড়ীর সব ব্যাপার কি? ওপাশের গুজরাটী বাড়ীর গিন্নী বাংলা ভাষার বিন্দুবিসর্গ বোঝে না, সেও তার কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করলে, কি হয়েছে, ব্যাপার কি?

কর্ত্তা বললেন, ও সব বাঙ্গালী লোকদের দিল্লগী।

চাকরগুলো ততক্ষণে নিজেদের আড্ডায় বসে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে বলতে লাগলো, বাঙ্গালী লোক এইসাই হ্যায়।

(ক্রমশঃ)

বিশ্বভাষা পরিক্রমা

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

প্রাগৈতিহাসিক কালেই বাংলা দেশে পর পর সাতটি ভিন্ন ভিন্ন নরগোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়, ঐতিহাসিক কালে অন্তত আরো তিনটি নরগোষ্ঠীর আবির্ভাব তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। স্মরণাতীত কাল থেকে ভৌগোলিক বাংলা দেশে আবির্ভূত এই গোষ্ঠীগুলির সম্বন্ধে সামান্য নামোল্লেখ-মাত্র করা হবে। আমাদের বক্তব্য বিষয় সহজবোধ্য করার জন্যে এই যৎসামান্য আলোচনার প্রয়োজন হবে।

কত হাজার বছর আগে তা কেউ জানে না, সম্ভবত কোন দিন জানতে পারবেও না, বাংলা দেশে অতি প্রাচীন কালে ক্ষুদ্রকায় এক ঘোর কৃষ্ণাঙ্গ জাতির বসতি ছিল যারা একেবারে বর্বর ও অসভ্য বললে অত্যুক্তি হবে না। নৃতাত্ত্বিক পরিভাষা অনুসারে এদের ক্ষুদ্রকায় নিগ্রো বা নিগ্রোবটু অর্থাৎ বাচ্চা নিগ্রো কিম্বা নেগ্রিটো বা নেগ্রিল্লো বলা যায়। এদের নিগ্রোদের মতো ঘন কালো গায়ের রং, কোঁকড়ানো কালো চুল, খাঁদা নাক, পুরু উলটোনো ঠোঁট, সবই ছিল। এরা দল বেঁধে বন-বাদাড়ে, পাহাড়-জঙ্গলে, গিরিগুহায় কিম্বা সমতলভূমিতে মাচা বেঁধে বাস করত। গ্রামীণ বা নাগরিক সভ্যতার সঙ্গে এদের কোন রকম পরিচয় ছিল না। এই জাতি আদিম মানব গোষ্ঠীর চেয়ে অতি সামান্যভাবে উন্নত ছিল। এদের বর্তমান বংশধরেরা সিংহলে ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জে অতি অল্প সংখ্যায় আজও টিঁকে আছে ব'লে অনুমান করা হয়। কিন্তু বাংলা দেশে এদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কোন চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া যায় না। তবে অন্য জাতির সঙ্গে মিশে যাবার পর এদের মিশ্র অস্তিত্ব কোন কোন শ্রেণী বা স্তরের বাঙালীর দেহগঠনে এখনও টের পাওয়া যায়, এই পর্যন্ত। বাঙালিদের মধ্যে কুঞ্চিতকেশ লোক দেখা যায় ব'লেই যে বাঙালির দেহে নিগ্রো জাতির রক্ত আছে মনে করা হয়, তা নয়। অন্য সব দেহলক্ষণ দেখেই তা সাব্যস্ত করা হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে বাঙালি নরনারীর কুঞ্চিত সুদৃশ্য কেশরাজি আর নিগ্রোদের পশম-কুঞ্চিত কেশ মোটেই এক জাতের নয়।

নেগ্রিটোদের পরে এদেশে প্রত্ন-অস্ট্রিক জাতির আগমন ঘটে। একটি মাত্র শব্দ ছাড়া নেগ্রিটোরা তাদের ভাষার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রেখে যায় নি। নিগ্রোবটু এবং অস্ট্রিকদের পরে-আসা আর্মেনয়েড জাতিদুটির কোন ভাষাগত অস্তিত্ব আজ-আদ খুঁজে পাওয়া যায় না। কেবল বাঙালির দেহগঠন এবং সাধারণভাবে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে পরিলক্ষিত ভারতীয় জনগোষ্ঠীর সাধারণ মিশ্রণের ধারা থেকে ধ'রে নেওয়া হয় যে, এদেশে অস্ট্রিকরা আসার পরে আর্মেনয়েড জাতির লোকেরা বাস করেছিল।

প্রত্ন-অস্ট্রিক বা প্রোটো-অস্ট্রালয়েড বা প্রাচীন যে অস্ট্রিক জাতি বাংলা দেশে এসেছিল, তারা যেমন উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে এসে থাকতে পারে, তেমনি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত পার হয়েও এসে থাকা সম্ভবপর। খাসিয়াদের দেখে মনে হয়, বাংলা দেশে অস্ট্রিক বা তার শাখা অস্ট্রো-এশীয়দের উত্তরপূর্ব দিক থেকে প্রবেশ করা অসম্ভব নয়। পলিনেশিয়া থেকে মাদাগাস্কার ও রাজমহল পর্যন্ত বিস্তৃত অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর লোকেদের ভারতবর্ষে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের পথে প্রবেশ না ক'রে বরং ব্রহ্মদেশ থেকে আসা বেশি সম্ভবপর।

নেগ্রিটোরা নৌ-পথে কিম্বা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পথে ভারতবর্ষে তথা বাংলা দেশে প্রবেশ ক'রে থাকবে।

আর্মেনয়েডরাও স্থলপথে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তদ্বার দিয়ে ভারত ও বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিল।

নিগ্রোবটু বা নেগ্রয়েড জাতির লোকেরা কৃষিকার্য বা পশুপালনও জানত না। তারা শিকার ক'রে, বনজ ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করত। সম্ভবত তারা প্রত্ন-প্রস্তর যুগে বাংলা দেশে বাস করত এবং সংখ্যায় খুব কম ছিল। অস্ট্রিকরা বাংলা দেশের প্রথম সভ্য জাতি বলা যায়। এরা বাংলা দেশে প্রথম গ্রামীণ সভ্যতার পত্তন করে। এরা কুটির নির্মাণ ক'রে দলবদ্ধভাবে গ্রামে বাস করত; কৃষিকার্য ও পশুপালন, দুটোই এরা বাংলাদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। এরা আর্যদের মতো গো-পালক জাতি না হলেও মোরগ, কুকুর, হাতী ইত্যাদি জন্তু পুষতে এদের ভালো লাগত। এরা বিশ্বাস করতে যে, মানুষ মারা যাবার পর তার আত্মা কেবল নিকট আত্মীয়দের মধ্যে নয়, গৃহপালিত জীবজন্তুদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়। সুনীতিবাবুর মতে, নেগ্রিলো ভাষা থেকে একমাত্র "বাদুড়" শব্দটি বাংলা ভাষায় এসেছে। কিন্তু অস্ট্রিক ভাষার বহু শব্দ আজও বাংলা ভাষায় তো বটেই, বাংলা দেশের স্থানগুলির নামের মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে। "মুড়ুন্দি," "গলসি," "বগড়ুই," "পলিসিট," "জেন্দুর" ইত্যাদি গ্রামের নামে অস্ট্রিক ভাষার চিহ্ন এখনও বর্তমান। বাঙালি জাতির একটি বড় উপাদান যে অস্ট্রিক, একথা অস্বীকার করা যায় না। সেই উপাদান তার বহিরঙ্গে শোণিত ধারায় যতটা, সম্ভবত অন্তরঙ্গে ভাব-জীবনে তার চেয়েও বেশি প্রকট। কেবল স্থানের নামকরণে, গ্রামীণ সভ্যতার পত্তনে ও দেহগঠনে নয়, বাঙালির মানসজীবনে ভাব ও সংস্কাররূপেও অস্ট্রিকরা স্থায়ী প্রভাব রেখে গেছে।

পরবর্তী কালে অন্য নানা জাতির আক্রমণে এরা খাসিয়া-জয়ন্তিয়া পাহাড়ে পূর্ব দিকে এবং সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুরের পাহাড়-জঙ্গলে পশ্চিম দিকে স'রে গেলেও এদের প্রভাব অনেক স্তর ও শ্রেণীর বাঙালির দেহে ও মনে অক্ষয় হয়ে বর্তমান আছে। বাংলা দেশের আর্যীকরণ হবার পর এরা বর্ণাশ্রম ধর্মের সুযোগে অনেকেই বিশাল হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় বটে, কিন্তু [illegible]

অস্ট্রিক শোণিত বিদ্যমান থাকা খুব সম্ভব। অবশ্য তপসিলি হিন্দুর সকলে অনার্য, এ-রকম কল্পনা করা কেন অযৌক্তিক, সে-কথা আগে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু কিছু লোককে যে জল-অচল ক'রে তপসিলভুক্ত হতে বাধ্য করা হয়েছিল তার কারণ, তাদের দেহে পরাজিত অনার্যদের শোণিত ছিল, এমন সন্দেহ করা হত। দেহে যাই হোক, অস্ট্রিকভাষী এলাকার সন্নিহিত আর্যভাষী অঞ্চলের তথাকথিত নিম্ন বর্ণের লোকদের মনে অস্ট্রিক সংস্কারের প্রাবল্য বিস্ময়োদ্দীপক।

অস্ট্রিক ও নেগ্রিটো বা নেগ্রয়েডরা মিশে গিয়ে ঘনকৃষ্ণ-বর্ণ কিন্তু সুঠামদেহ, সাঁওতাল জাতির উদ্ভব, এমন মনে করা যায়। নেগ্রিটোদের মতো অতটা না হলেও অস্ট্রিকরা কৃষ্ণাভ ছিল, একথা ঠিক। ক্ষুদ্র নিগ্রোদের চুল ছিল ভেড়ার লোমের মতো কোঁকড়ানো, কিন্তু অস্ট্রিকদের চুল সে-রকমের কোঁকড়ানো নয়। নেগ্রিটোদের কপাল অতি সঙ্কীর্ণ ছিল; অস্ট্রিকদের কপাল দীর্ঘ, যদিও নাক চ্যাপটা; অস্ট্রিকদের ঠোঁটও পুরু নয়; মোটের ওপর অস্ট্রিকরা নিগ্রোবটুদের চেয়ে অনেক বেশি সুশ্রী ছিল।

অস্ট্রিকদের চাপে নেগ্রিটোরা বনে-পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং ক্রমশ লুপ্তির পথে অগ্রসর হয়। এর পরে আর্মেনয়েড ও দ্রাবিড়দের আগমন লক্ষ্য করা যায়। সুনীতিবাবুর মতে, ও-দুটি জাতি মিলিত হবার পর এক মিশ্র জাতিরূপে ভারতে প্রবেশ করে। আর্মেনয়েডরা পশ্চিম এশিয়া মাইনরের হ্রস্ব-কপাল জাতি; দ্রাবিড়রা ভূমধ্যসাগর-উপকূলের দীর্ঘকপাল জাতি; এই দুটি জাতিই আর্যদের মতো শুভ্রকায়, রক্তাভ বা গৌরকান্তি ছিল না, বরং কালো ছিল বলতে হয়। দ্রাবিড় বা দ্রাবিড়মিশ্র আর্মেনয়েডরা বাংলাদেশে অস্ট্রিকদের হটিয়ে দেয় বটে, কিন্তু পরে নিজেরাও বিভিন্ন আর্যদলের চাপে পশ্চিমে রাজমহল পাহাড় ও ছোটনাগপুরের জঙ্গলের দিকে সরে যায়। বাংলাদেশে রাজমহল পাহাড়সন্নিহিত এলাকার মালতো জাতি ছাড়া দ্রাবিড় জাতির কোন অস্তিত্ব নেই। এদিক থেকে অস্ট্রিকদের চেয়েও দ্রাবিড়দের অবস্থা বেশি শোচনীয়। দ্রাবিড়রা বেশির ভাগ দক্ষিণ-পশ্চিমে উড়িষ্যার পারপারের জঙ্গলে সরে যায়। এক সময়ে উড়িষ্যা ও বাংলার

ভাষা এক ছিল ; সেই এক আর্যভাষা ও আর্যভাষীদের চাপে দ্রাবিড়রা উড়িষ্যার দক্ষিণে ও পশ্চিমে সরে যায়।

দ্রাবিড়রা ভারতের অন্যত্র যেমন, বাংলাদেশেও তেমনি নাগরিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠা ক'রে থাকতে পারে। দ্রাবিড়রা অষ্ট্রিকদের চেয়েও বেশি সভ্য, মার্জিত ও সাহিত্যরসিক জাতি ছিল। ভক্তিধর্মের উদ্ভাবক এরা বাংলাদেশের জনমানসে একটা স্থায়ী প্রভাব রেখে গেছে। উত্তরকালে ঐতিহাসিক যুগেও দ্রবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল থেকে আগত কানাড়ি রাজবংশ ও তাদের সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশে শতাব্দীব্যাপী প্রভুত্ব ক'রে গেছে। বাংলা ভাষায় দ্রাবিড় প্রভাব সুস্পষ্ট।

নেগ্রিটো, অষ্ট্রিক, আর্মেনয়েড ও দ্রাবিড়দের পর বাংলা দেশে অন্ততঃ দুই দফায় অন্তত দুই শাখার ভারত-ইউরোপীয়ভাষাগোষ্ঠীর লোক বা দুই আর্য-দঙ্গলের আগমন লক্ষ্য করা যায়। দুই শ্রেণীর আর্যদের মধ্যে নর্ডিক আর্য বাংলাদেশে বেশিসংখ্যায় আসেন নি, কিন্তু একেবারেই আসেনি, তা নয়। ঐতিহাসিক কালেও বাংলাদেশে কান্যকুব্জ থেকে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ এসেছিলেন, তাঁরা নর্ডিক আর্যদের বংশোদ্ভুত হওয়া অসম্ভব নয়।

প্রাগৈতিহাসিক কালে ভারতের উত্তরাপথে নর্ডিক আর্যরা বসতি স্থাপন করলেও বাংলা দেশে তারা বেশি সংখ্যায় যায় নি তার প্রমাণ আছে। সিন্ধু নদ থেকে গণ্ডক, শোন ও গঙ্গা-ভাগীরথীর সঙ্গমস্থল পর্যন্ত এবং হিমালয় থেকে বিন্ধ্য পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় নর্ডিক আর্যরা মহাভারতে বর্ণিত যুদ্ধের আগেই প্রাধান্য স্থাপন করতে পেরেছিলেন। বর্তমানের আফগানিস্তান পাখতুনিস্তান ও বালুচিস্তানের ইরাণীয় আর্যদের কথা বাদ দিলেও কাশ্মীর, পাঞ্জাব, রাজস্থান, হিন্দ বা হিন্দিস্থান—এই অঞ্চলগুলিতে বিশেষভাবে এবং সিন্ধু, কোশল, মগধ ও মিথিলায় কিছু পরিমাণে নর্ডিক বা উত্তরদেশীয় আর্যদের বসতি স্থাপিত হয়। এই আর্যরা বরাবর বিশেষভাবে জাত্যভিমানী। বাংলাদেশে যাওয়া এরা পছন্দ করতেন না। তার কারণ ভারতের বৈদিক আর্যদের একটি শাখা সেখানে গিয়ে আর্য আচার থেকে ভ্রষ্ট হয়ে তাঁদের ধারণা অনুসারে বিপথগামী হয়ে একেবারে নষ্ট হয়ে যান। তার পর থেকে কোন কারণে বাংলা দেশে গেলে উত্তরদেশীয় আর্যদের জাতি নাশ হবার ভয় থাকত।

অন্য যে একটি আর্যদঙ্গল ভারতে আসার পর বাংলা দেশে প্রবেশ করে, তারা আল্‌পীয় আর্য ব'লে অভিহিত। এরা উত্তরদেশীয় আর্যদের আগেও ভারতে এসে থাকতে পারে। ভারতে আসার আগেই আর্মেনয়েড ও দ্রাবিড়দের মতো উত্তরদেশীয় আর্য ও আল্‌পীয় আর্য পরস্পরের সঙ্গে অল্পাধিক পরিমাণে মিশ্রিত হয়েও থাকতে পারে, উত্তরদেশীয় আর্যদের সঙ্গেএইভূমধ্যসাগরতীরবর্তী আল্‌প্‌ পর্বতীয় আর্যদের আকৃতিতে পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। ভারতে গুজরাত, মহারাষ্ট্র, বাংলা, উড়িষ্যা, আসাম ও সিংহলে বিশেষভাবে এবং সিন্ধু, কোশল, মগধ ও মিথিলায় অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে আল্‌পীয় আর্যদের বসতি বিস্তৃত হয়। প্রকৃত ব্রাহ্মণের যে-দেহলক্ষণ পতঞ্জলি তাঁর মহাভাষ্যে নির্দেশ করেছেন, তা অভ্রান্তভাবে উত্তরদেশীয় আর্যকে চিনিয়ে দেয়। দীর্ঘকায়, শ্বেতবর্ণ বা কষিত-কাঞ্চনকান্তি, স্বর্ণকেশ, নীল বা হরিদ্বর্ণ চক্ষুতারকা, ঋজু খড়্গনাশা, উচ্চ ললাটবিশিষ্ট এই আর্যদের দঙ্গল স্ক্যাণ্ডিনেভীয় আর্যগোষ্ঠী বা ইঙ্গ-জার্মান জাতিদের জ্ঞাতিভাই, তাতে সন্দেহ নেই। আল্‌প্‌স্‌ পর্বতমালার সন্নিহিত এলাকার আর্যরা মধ্যমাকৃতি, কৃষ্ণতার চক্ষুবিশিষ্ট, কৃষ্ণকেশ, হ্রস্বকপাল বা অপেক্ষাকৃত নিম্নকপাল, ঈষৎ রক্তাভ বা হালকা বাদামি রঙের জাতি ছিল। এরা মূলতঃ আর্যভাষী নয় ব'লে যাদের সন্দেহ হয়, তাদের মনে রাখা উচিত যে, আজও দক্ষিণ ইউরোপে এই আকৃতির লোকদের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অব্যাহত। উত্তর ইউরোপ ও দক্ষিণ ইউরোপে যথাক্রমে উত্তরদেশীয় ও আল্‌পীয় আর্যদের দুইটি নৃতাত্ত্বিক জাতিবিভাগ আজও স্পষ্ট চোখে পড়ে। রুচিশ্রীর বিচারে আল্‌পীয় আর্যরা নর্ডিক আর্যদের চেয়ে উন্নত বললে ভুল হবে না।

উত্তরদেশীয় আর্যদের আগে বা পরে আল্‌পীয় আর্যরা বহু সংখ্যায় বাংলাদেশে প্রবেশ করে। গ্রিয়ার্সনের প্রচারিত উপপত্তি সত্য হলে মানতে হয় যে, আগে আলপীয় আর্যরা ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর "অন্তরঙ্গ" ভারতীয়-আর্যভাষী নর্ডিক আর্যরা ভারতে এসে "বহিরঙ্গ" ভারতীয়-আর্যভাষী আলপীয় আর্যদের [illegible]

যেতে বাধা করে। গ্রিআর্সনের সিদ্ধান্ত সত্য হলে একথাও ঠিক যে, সুপ্রাচীন স্মরণাতীত কাল থেকে হিন্দিভাষীদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে অহিন্দি ভারতীয়-আর্যভাষীদের পূর্বপুরুষদের অতি উৎকট জাতিবৈর চ'লে আসছে যার ফলে অখণ্ড ভারতে একটি মাত্র জাতি গ'ড়ে ওঠার ক্ষীণতম সম্ভাবনাও নেই।

আল্পীয় আর্যদের চেষ্টায় প্রাগৈতিহাসিক পৌরাণিক কালেই বাংলাদেশে আর্যভাষী জাতি আর্যভাষাসহ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এদেশে আসার পর আলপাইন আর্যরা নিগ্রোবটু, দাক্ষিণ বা নিষাদ বা অষ্ট্রিক, আর্মান-আকৃতি বা আর্মেনয়েড, দ্রবিড় বা দাস এবং বৈদিক-আর্যভাষী স্বভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত উত্তরদেশীয় আর্যদের সঙ্গে খোলাখুলিভাবে প্রচুর পরিমাণে মিশ্রিত হয়। তারা তাদের ব্যবহার্য ভারতীয়-আর্যভাষার বৈদিক উচ্চারণ পদ্ধতি ও পদবিন্যাসপ্রকরণ আমূল বদলে ফেলে নিজস্ব রীতির উচ্চারণপদ্ধতি ও পদবিন্যাস প্রকরণ প্রচলিত করে। একথাও মনে করা চলে যে, তারা বৈদিক আচার ত্যাগ ক'রে তন্ত্রধর্ম বা তন্ত্রাচার গ্রহণ করেছিল। এর ফলে বৈদিক ঋষিরা অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং যে-সব জাতি তাঁদের কথা না শুনে চলার জন্যে আগে ভালো থাকলেও পরে নষ্ট হয়ে গেছে ব'লে মনে করতেন, তাদের তালিকায় বাঙালি আর্যদের নাম তুলে দেন।

ঐতরেয় আরণ্যকে আমরা প্রথম বাঙালি জাতির নাম উল্লিখিত দেখছি। বিদ্যানিধির মতে, এই গ্রন্থ খ্রীস্টপূর্ব ঊনবিংশ শতকের রচনা। কপিল মুনি, সগর রাজার সন্তানসমূহ এবং ভগীরথের কাহিনী থেকে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশে আর্য প্রভুত্ব না হোক, আর্য বসতি খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চবিংশ-ষড়্বিংশ শতকের দিকে নিশ্চয় ছিল। কপিল মুনি যে নাস্তিক ছিলেন, সেটাও লক্ষ্য করার বিষয়। তিনি বাঙালি আর্য এবং নাস্তিক শিরোমণি ব'লে যজ্ঞাচারী বৈদিক আর্যদের বিরাগভাজন হবেন, এটা স্বাভাবিক। বাঙালি জাতি নষ্ট হয়ে পাখিপদবাচ্য হয়ে গেছে—একথার অর্থ এই যে, আগে তারা নষ্ট ছিল না এবং একদা তারা বিশুদ্ধ আর্য ও আর্যভাষীই ছিল।

"প্রজা হ তিস্রঃ অত্যায়মীয়ুরিতি যা বৈ তা ইমাঃ প্রজাস্তিস্রঃ অত্যায়মায়ংস্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গা বগধাশ্চেরপাদাঃ।" ঐতরেয় আরণ্যকের এই আলোচ্য উক্তি থেকে আচার্যপ্রবর সুকুমার সেন এই যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করেছেন :—

(১) তিনটি জাতি—বঙ্গ, বগধ এবং চেরপাদ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল ; এর অর্থ এই যে আগে এরা আর্যসমাজের অন্তর্ভুক্ত এবং বৈদিক আচারের অনুগত আর্যজাতিতরূপে বিশুদ্ধ অস্তিত্বসম্পন্ন ছিল, কিন্তু পরে ঐ বিশুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়। এরা প্রথমাবধি অনার্য জাতি হয়ে থাকলে এদের নষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রশ্ন উঠত না এবং তা নিয়ে আর্য বৈদিক ঋষি মাথা ঘামাতেন না। "নষ্ট" হওয়া অর্থে বিলুপ্তি ধরা চলে না, কারণ, বঙ্গীয়রা বিলুপ্ত হয় নি।" "নষ্ট" অর্থে মিশ্র বা কলুষিত ধরা সঙ্গত।

(২) এই জাতি তিনটি "পক্ষী" অর্থাৎ পাখির মতো যাযাবর বা অব্যক্তভাষী বা পক্ষিবিশেষের চিহ্নধারী ; আর্যরা অনার্য বিভিন্ন জাতিকে মনুষ্যেতর জীবরূপে কল্পনা করতেন ; তাঁদের সে-প্রবণতার কথা আমরা আগে আলোচনা করেছি। বাঙালি জাতি একে তো "নষ্ট," তার ওপর আবার "পক্ষী"! এ থেকে বোঝা যায় যে, বৈদিক আর্যদের মতে এরা মিশ্র জাতি এবং পাখির মতো অব্যক্তভাষী হয়ে পড়েছিল। অর্থাৎ বাঙালি আর্যরা জাতীয় বিশুদ্ধি এবং আর্যভাষার উচ্চারণগত শৃঙ্খলা ও বিধিবিধান লঙ্ঘন করে বৈদিক আর্যদের অনুসৃত মার্গ থেকে ভিন্ন পথে চলেছিলেন। বাঙালির সংস্কৃত উচ্চারণ পদ্ধতি উত্তরাপথের পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, এটা লক্ষণীয়, উত্তরাপথের ভারতীয়-আর্যভাষীরা বাঙালির ভাষাপ্রয়োগ পদ্ধতি ও কথাবার্তা বলাকে বরাবর পাখির মতো কলকাকলি করা ব'লে উপহাসের চোখে দেখে থাকে। এটাও লক্ষ্য করা গেছে, মানসিংহ মধ্যযুগে বাঙালি ভুঁইয়কে ব্যঙ্গ ক'রে যে চরমপত্র দিয়েছিলেন তাতেও "ত্রিপুর-মগ বাঙালী"-র ভাষাকে "কাককুলিচাকালী" ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং "পক্ষী" অর্থে বৈদিক ভাষার উচ্চারণ পদ্ধতির লঙ্ঘন ক'রে বাংলাদেশের নিজস্ব উচ্চারণ পদ্ধতি অবলম্বনকারী পাখির মতো কলকাকলি করা অব্যক্তভাষী মিশ্র বাঙালি জাতিকে কটাক্ষ করার সময়ে ঐতরেয় আরণ্যকের বৈদিক ঋষি বাঙালির "টোটেম্" বা যাযাবরত্বকে ততটা লক্ষ্য করেন নি, যতটা করেছেন

তার পাখির মতো কিচির-মিচির ক'রে কথা বলাকে, এটা ধরা ন্যায়সঙ্গত। যাযাবর ছিল প্রতিটি আর্যদঙ্গলই, একা বঙ্গ বা মাত্র তিনটি নষ্ট জাতি নয়। সুতরাং পক্ষী অর্থে পাখির মতো অব্যক্তভাষী ধরাই ঠিক। অবশ্যই বঙ্গজাতি ভৌগোলিক বাংলাদেশে উপনিবিষ্ট হবার আগে পর্যন্ত যাযাবর ছিল; তারা পাখির "টোটেম্" বা আদি পুরুষরূপে কল্পিত কোন পাখির চিহ্ন ধারণ করত, এটাও সে-যুগে খুব সম্ভবপর। কিন্তু এইতিনটি নষ্ট জাতিকে মিশ্রণজাত উচ্চারণ বিকৃতির জন্যেই যে মুখ্যত "পাখি" ব'লে হেয় করা হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।

সুকুমারবাবুর মতে, যাযাবর বঙ্গ জাতি ক্রমশ হটে গিয়ে পূর্ববঙ্গে প্রবেশ করে। কিন্তু আর্যদঙ্গলদের ক্রমাগত অভিপ্রয়াণের ফলে পূর্ব ভারতের দিকে আর্যভাষীদের যে প্রসার, তাকে অগ্রগতি বলাই সঙ্গত। বাঙালি আর্যরা উৎকৃষ্ট ভূমির সন্ধানে পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে হতে ভারত-ব্রহ্ম ও ভারত-চীন সীমান্তের দুর্গম পর্বত ও জঙ্গল পর্যন্ত অগ্রগতির পর নিরস্ত হয়। এই প্রশংসনীয় বিস্তার-প্রয়াসকে "হটে-যাওয়া" মনে করা বাঙালির প্রতি সুবিচার হবে না।

জাতির নামেই জাতির বাসস্থানের নাম হয়ে থাকে, এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। বঙ্গ জাতির বাসভূমি হিসেবে বর্তমান ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগদুটির নাম হল বঙ্গ। এখন বঙ্গ অর্থে সমস্ত ভৌগোলিক বাংলাদেশকে বোঝালেও প্রাচীন ও মধ্য যুগে মাত্র পূর্ববঙ্গ বা ঐবিভাগ দুটিকে বোঝাত। বঙ্গ জাতি ঐ অঞ্চলে বসতি স্থাপনের পর বা সমসাময়িক কালে ভৌগোলিক বাংলাদেশের অন্যান্য বিভাগে অন্য সব জাতির অবস্থিতির সন্ধান পাওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে রাজশাহি বিভাগ বা বরেন্দ্র-ভূমির অধিবাসী পুণ্ড্রদের নামোল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। বিদ্যানিধির মতে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের কাল-নির্ণয় অসম্ভব; তবে, ঐ গ্রন্থ খ্রীস্টপূর্ব উনিশ শতকের হওয়া সম্ভবপর। পুণ্ড্রজাতি অনার্য ছিল অন্ধ্র-পুলিন্দ-শবরদের মতো। বর্তমানের মালদহ জেলার মাল্‌তোরা এদের বংশধর হতেও পারে। তা হয়ে থাকলে পুণ্ড্ররা দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর লোক ছিল বলতে হয়। অখণ্ড বঙ্গের বা ইংরেজ আমলের বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগে রাঢ় ও সুহ্ম জাতির বসতি ছিল। অঙ্গ বা পূর্ব বিহারে অঙ্গ নামে আর এক জাতির বাস ছিল। উড়িষ্যায় কলিঙ্গজাতির বাস ছিল। তাদের নামে বর্তমান উড়িষ্যা ও অন্ধ্রের কিয়দংশের নাম ছিল কলিঙ্গ রাজ্য যা পরে অশোকের দ্বারা বিজিত হয়। অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম, কলিঙ্গ ও রাঢ় জাতির মিলিত বাসভূমিতে প্রাচীন বাংলাভাষী জাতির উৎপত্তি হয় বহু মিশ্রণের ফলে। দ্বাদশ শতাব্দীর পর এই মিলিত বাসভূমি থেকে ওড়িশা এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর পর অসমিয়া এলাকা বিচ্ছিন্ন হলে ভৌগোলিক বাংলা দেশের বর্তমান চৌহদ্দি ব্যাপ্ত ক'রে একমাত্র বাংলাভাষী জাতির অস্তিত্ব থাকে। বরেন্দ্র বা উত্তর-বঙ্গ এলাকায় প্রথম আর্যসভ্যতা বিস্তার লাভ করে। এই এলাকাকে গৌড় বলা হত; পূর্ব বঙ্গ বাদে অবশিষ্ট সমস্ত পশ্চিম বঙ্গকে সাধারণভাবে গৌড় রাজ্য বলা হত উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত। বর্তমানের পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যকে গৌড় বলা যেতে পারে।

বাঙালি জাতির বিশুদ্ধ আর্যত্ব থেকে বিচ্যুতির সংবাদ খ্রীস্টপূর্ব উনিশ শতকে পাওয়া গেল। তা হলে তখন নেগ্রিটো, অস্ট্রিক, আর্মেনয়েড ও দ্রাবিড়, এই অনার্য জাতিচতুষ্টয়ের সঙ্গে আল্‌পাইন ও নর্ডিক দুই শ্রেণীর উপনিবিষ্ট বাঙালি আর্য মিশ্রিত হয়ে গেছে। একথা ভুললে চলবে না যে, আজকের দশ কোটি বাঙালি যখন আর্যভাষী, তখন তারা প্রভূত বর্ণসঙ্কর সত্ত্বেও মোটামুটি আর্যজাতিই বটে। প্রকৃত অনার্য জাতিগুলি আজও নিজেদের ভাষা ও শোণিতের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে পৃথক্ হয়ে আছে। পৃথিবীর কোথাও একটা প্রবল এবং বহুসংখ্যক লোকবিশিষ্ট জাতি পরভাষী হয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত নেই। স্বল্পসংখ্যক নিকোবারি, সাঁওতাল, মাল্‌তো ইত্যাদি অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতিগুলি এই বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদেও নিজেদের ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য ও শোণিতবিশুদ্ধি মোটামুটি বজায় রেখে চলেছে অথচ প্রাগৈতিহাসিক কালে অস্ট্রিক-দ্রাবিড়গরিষ্ঠ অনার্য-অধ্যুষিত বাংলা দেশ মুষ্টিমেয় বহিরাগত উত্তরদেশীয় ও আল্‌পীয় আর্যের কাছে কয়েকটা সামরিক পরাজয়ের পর নিজেদের ভাষা পরিত্যাগ ক'রে বিজয়ী শত্রুর মাতৃভাষা সদলবলে গ্রহণ ক'রে বসল, একথা দেশদ্রোহী ও স্বজাতিদ্বেষী আত্মসম্মান জ্ঞানহীন

নরাধমের সিদ্ধান্ত, এর অনুকূলে কোন যুক্তি বা প্রমাণ নেই। আমেরিকার লাল মানুষেরাও এ-কাজ করেনি, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরাও নয়। কেবল বাংলাদেশে এমন অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল, তার কোন ভাষাগত প্রমাণ নেই।

বাংলা দেশের বেশির ভাগ অধিবাসীকে আর্য মনে করা সঙ্গত; তবে তারা বিশুদ্ধ আর্য নয়। একটু মার্জিত, কয়েক পুরুষ ধ'রে ভদ্র, তথাকথিত উচ্চ শ্রেণী (ধনী নয়) বা "বড় বংশ" বা খানদানি হিন্দু-মুসলমান খ্রীস্টান বাঙালিমাত্রেই ততটা আর্য, একজন আধুনিক গ্রিক বা বুলগার যতটা। অবশ্যই এদেশে প্রভূত শোণিত-মিশ্রণ ঘটেছে। আমেরিকার মতো এখানেও অনেক মুলাত্তো, মেস্তিসো ও লাদিনো ধরনের বর্ণসঙ্কর জন্মেছে এবং বংশবৃদ্ধি করেছে। কিন্তু প্রাধান্যশালী নরগোষ্ঠী সর্বদাই আর্যবংশোদ্ভূত ছিল, একথা ভুললে বাস্তবজ্ঞানের শোচনীয় অভাবের পরিচয় দেওয়া হবে। বাংলাভাষীদের বেশির ভাগ আগে অনার্যভাষী ছিল, তারা মারের চোটে বা টাকার লোভে আর্যভাষা গ্রহণ করেছে, এমন কোন ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণ নেই। সুতরাং যদি কেউ মনে করে যে, ঐ দুই কারণের সৃষ্টি ক'রে বাঙালিকে হিন্দি বা উর্দুভাষী করা যাবে, তা হলে সেই নির্বোধের ভ্রান্তি অপনোদনে দেরি হবে না।

যিনি বাঙালী হয়ে পোলিশ মহিলা বিবাহ করেছিলেন সেই ডক্টর হিরণ্ময় ঘোষাল লিখেছেন :—

"আমার কোনো দেশ আছে কি না জানি না। ভারতীয় সংস্কৃতিকে আমি শ্রদ্ধা করি, যদিও তার কোনো বিশদ সংজ্ঞা আমার মনে এখনো রূপ গ্রহণ করে নি। বাংলা ভাষাকে আমি ভালবাসি। কারণ, তার আদর ও আন্তরিকতা আমায় আবাল্য মুগ্ধ করেছে। যদিও বঙ্গবাসীজনের জাতীয় সংমিশ্রণ এবং ব্যক্তি হতে ব্যক্তির বর্ণ ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আমার মনে অশান্তি সৃষ্টি করে। একটি জিনিস আছে যার মাহাত্ম্যে আমি বিশ্বাস করি তা এই বাংলা ভাষা। এ-ভাষা হিন্দুর না মুসলমানের, এতে কতখানি সংস্কৃত আর ক ছটাক ক কাঁচ্চা আরবি ফার্সি শব্দ মিশেল আছে তার বিশ্লেষণ আমি কোনো সূক্ষ্মতা ও শান্তি আমায় মুগ্ধ করে। আমার কাছে সমস্ত ভাষার প্রণব এই বাংলা ভাষা।"

(কুলটুরকাম্‌প্‌ফ্‌—পৃষ্ঠা—২৫৬।)

বঙ্গবাসী জনের মধ্যে একাধিকবার বৌদ্ধধর্ম ও তন্ত্রাচারের প্রভাবে বহুজাতিক সংমিশ্রণ সাধিত হয়েছে, একথা ঠিক। কিন্তু তা হয়েছে সেই অনুপাতে যে-অনুপাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নবাগত শ্বেতকায় ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে স্থানীয় আদিবাসী রক্তকায় এবং দাস-রূপেবহিরাগত কৃষ্ণকায়দের সংমিশ্রণ ঘটেছে। আমেরিকায় শ্বেতকায়দের চাপে রক্তকায়রা পাহাড়ে-জঙ্গলে যেমন ক্রমশ স'রে গেছে ও যাচ্ছে, বাংলাদেশেও ঠিক সেই ভাবে আর্যভাষীদের চাপে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতিগুলি স'রে গেছে, তার প্রমাণ এখনও পাওয়া যাচ্ছে।

বাংলাদেশে দুই শ্রেণীর আর্য-উদয়ের পরেও তথাকথিত প্রাগৈতিহাসিক কালে খ্রীষ্টপূর্ব অব্দে আর একটি নরগোষ্ঠীর আগমন দেখা যায়। এরা চীন-তিব্বতীয়ভাষাগোষ্ঠীর লোক। এই গোষ্ঠীর বোড়ো উপশাখার লোকেরা ভারতের উত্তর ও উত্তরপূর্ব অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে এবং তিব্বতি উপশাখার লোকেরা কুলু, লাহুল ও নেপালে উপনিবিষ্ট হয়, এ-কথা আগে বলা হয়েছে। নৃতত্ত্বের বিচারে এরা মঙ্গোলয়েড বা মঙ্গোলাকার মানবগোষ্ঠী, যদিও ভাষায় এরা মোটেই মঙ্গোলীয়দের জাতি নয়। এরা ভারতীয়-আর্যভাষী মহলে সুপ্রাচীন কাল থেকে কিরাত আখ্যায় অভিহিত ছিল। এদের পীতাভ বর্ণ ও খর্ব নাসা সুপরিচিত। বাংলাদেশে প্রবেশের আগে এরা ভারতের হিমালয়-সন্নিহিত পার্বত্য অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধ'রে উপনিবিষ্ট ছিল।

বাংলাদেশে বোড়োভাষী মঙ্গোলয়েডরা সমতলভূমিতে খুব বেশি প্রসার লাভ করতে পারে নি কিন্তু ভুটান থেকে উত্তর-পূর্ব বঙ্গ ও পশ্চিম আসাম সীমান্ত বরাবর একেবারে চট্টগ্রাম-ব্রহ্মসীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় অর্থাৎ ভৌগোলিক বাংলাদেশের পূর্বসীমান্তবর্তী পার্বত্য এলাকা ও তৎসন্নিহিত সমতলভূমিতে বোড়োভাষীরা খানিকটা প্রসারলাভ করেছিল। এখনও দার্জিলিং, কুচবিহার, ত্রিপুরা বা পার্বত্য ত্রিপুরা, কাছাড়, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম

জাতীয় লোকদেরও দেখা যায়। তা ছাড়া, গারো, লুশেই বা মিজো প্রভৃতি জাতিরা তো আছেই। চট্টগ্রাম-ব্রহ্মসীমান্তসন্নিহিত আরাকান এলাকা থেকে মগ্ জাতীয় যারা একদা ঐতিহাসিক কালেই দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে উপদ্রব ক'রে গেছে, সেই আরাকানিরাও চীন-তিব্বতীয় ভাষাগোষ্ঠীর বর্মী উপশাখার লোক। নানা কারণে পূর্বতম বঙ্গের জনগোষ্ঠীর দেহে বোড়ো উপশাখার সঙ্গে বর্মী উপশাখারাও কিছু শোণিত মিশ্রণ হয়েছে। কিন্তু সাধারণভাবে আর্যভাষী বাঙালি নরগোষ্ঠীর দেহে খুব বেশি মঙ্গোলয়েড শোণিত প্রবেশ করেনি। বাংলাদেশের সমতলভূমিতে বাঙালি আর্যদের প্রাধান্য বরাবর অক্ষুন্ন ছিল বসতি স্থাপন ও ভাষাবিস্তারের দিক থেকে। অসমিয়া আর্যভ যাঁরা আসামের সমতলভূমি ধ'রে পূর্ব দিকে অগ্রসর হবার সময়ে বোড়োভাষী অহোমজাতীয়দের সঙ্গে মিশে যাওয়ায় তাদের যতটা অনার্যীভবন হয়েছিল, বাঙালি আর্যদের কোন সময়ে তা হয়নি।

বাঙালি আর্যভাষীদের দেহে ও মনে বর্ণসঙ্করের প্রভাবে পশ্চিম বঙ্গে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় প্রভাব এবং পূর্ব বঙ্গে বোড়ো ও মগ প্রভাব বেশ কিছু দেখা যায়। বিশেষতঃ বাংলা দেশের চতুঃসীমার সমীপবর্তী অনার্য এলাকাগুলির পাশে যে-সব বাঙালি আর্যভাষী বাস করে, তাদের রুচিপ্রবৃত্তি ও জীবনসংস্কারে সাঁওতালি, মাল, পুঁড়, কোচ, খাসিয়া, মগ প্রভৃতি অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-বোড়ো-বর্মী প্রভাব কিছু-কিঞ্চিৎ পাওয়া যায়। কিন্তু তা থেকে এটা প্রমাণিত হয় না যে, বাঙালি আর্যভাষী দশ কোটি জনসাধারণ মুখ্যত অনার্যমূল জাতি।

পাঁচটি অনার্য ও দুটি আর্য জাতি বাংলা দেশে বসতি স্থাপন করার পর আর্যভিত্তিক অনার্যমিশ্র বাঙালি জাতি বেদাচার-বহিষ্কৃত বেদ-বিমুখ ব্রাত্য জাতি ব'লে পরিগণিত হয়। এই বাঙালি জাতির গঠন মহাভারতের যুদ্ধের আগেই হয়ে গেলেও এবং মহাভারতে সে-সম্পর্কে উল্লেখ থাকলেও বাংলা ভাষার উদ্ভব তখনও সুদূরবর্তী। কিন্তু বাংলা ভাষার পূর্বপুরুষ ভারতীয়-আর্যভাষার সেই প্রাচ্য উপভাষার আঞ্চলিক উদ্ভব তখন হয়ে গেছে যে-উপভাষা বৈদিক আর্যদের কাছে পাখির ভাষার মতো অশুদ্ধ ও মিশ্র মধ্যে কিরাত বা মঙ্গোলয়েডরাও বাংলাদেশের চৌহদ্দির মধ্যে ও ধারে-কাছে এসে গেছে ব'লে মনে করা চলে এই জন্যে যে, যজুর্বেদে ও মহাভারতে কিরাতদের স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

প্রাগৈতিহাসিক কালের ঐ সাতটি নংগোষ্ঠীকে আত্মস্থ ক'রে আর্যভাষী বাঙালি জাতির উদ্ভব হবার পর বাঙালিরা বেদের চেয়ে তন্ত্রের বেশি অনুরক্ত ছিল ব'লে মনে হয়। বেদ থেকে গীতা পর্যন্ত সর্বত্র বর্ণসংকরের নিন্দা দেখা যায়। কিন্তু বাঙালির ঝোঁক বরাবর ঐ মিশ্রণের দিকে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের রচনায় দেখা যায়: শক্তি-সাধনে সমান আসনে তুলে নিতে হয় হাড়িরও মেয়ে! কবি রূপরামের সম্বন্ধে শোনা যায়, তিনি কোন হাড়ির মেয়ের প্রতি আসক্ত ছিলেন। তাঁর নিজের রচনায় আছে:—

> পখুর পাড়েতে সদা ডোমের কুড়িয়া।
> ঘন ঘন আইসে যায় ব্রাহ্মণ বড়ুয়া॥

আর এ-সবের মূল চর্যাপদে পাওয়া যায় দুটি স্পষ্ট ইঙ্গিত: এক, নগরের বাইরে ডোম্‌নিদের কুঁড়ে ঘরে ব্রাহ্মণ ও মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হামেশা আসা-যাওয়া ছিল; দুই, বাঙালিদের স্বভাব ছিল চণ্ডালী বা শবরজাতীয়া অর্থাৎ অস্ট্রিক কন্যাদের গৃহিণীরূপে গ্রহণ করা। এর সঙ্গে আধুনিক বাঙালি কথাসাহিত্যিকদের সাঁওতাল রমণী-প্রীতির ব্যাপারটা তুলনা করা যেতে পারে। এই ভাবেই খ্রীষ্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর আগে থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে আর্যভাষী বাঙালি জাতি অনার্য উপাদান-গুলিকে আত্মস্থ করে আসছে। বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রাধা[ন্য] রক্তমিশ্রণে বাধা উৎপন্ন করলেও যখনই বাঙালি বৌদ্ধ ব[া] ইসলাম ধর্মের আশ্রয় নিয়েছে তখনই ঐ আর্য-অনার্[য] শোণিতমিশ্রণ তো হয়েছেই, যারা বর্ণাশ্রমী, তারাও ত[ন্ত্র] ও বৈষ্ণব ধর্মাচারের সুযোগে রক্তমিশ্রণ করেছে। খাঁ[টি] ব্রাহ্মণ শিবতুল্য শুভ্রকায় বাঙালি আর্যের সঙ্গে উত্তর সাধিকা কৃষ্ণাঙ্গা তান্ত্রিক ভৈরবীর মিলন, কৃষ্ণকা[য়] বৈষ্ণব মোহান্ত প্রভুর গৌরবর্ণা বৈষ্ণবীর সাহচর্যলাভ— এ-সব প্রকাশ্যে লোকসমক্ষে সংঘটিত।

উত্তরাপথের ভারতীয় আর্য জাতিগুলির সঙ্গে বাংল[া] দেশের আর্যভাষী জাতির একটা মৌলিক পার্থক্য প্রা[য়]

মধ্যে বাঙালিরা মাঝে মাঝে দিগ্বিজয়ী উত্তরাপথবাসী আর্য জাতির দ্বারা পরাজিত হয়েছে। কিন্তু কখনও বাংলাদেশ দীর্ঘকাল উত্তরাপথের আর্য অধিকারে থাকে নি। বিশেষত পূর্ববঙ্গ বা প্রকৃত বঙ্গদেশ বা পদ্মা নদীর পূর্বতীরবর্তী ভূখণ্ড বা ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগদুটি প্রায়ই আর্য অধিকারের বাইরে রয়েছে। তার ফলে সেখানে আর্যভাষার বিস্তৃতি ক্ষুণ্ণ হয় নি বটে, কিন্তু অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে তার পার্থক্য দৃঢ়ীভূত হয়েছে। যাকে উত্তর ভারতীয় আর্য সংস্কৃতি বলা হয় তা পূর্ববঙ্গে তেমন বিস্তার লাভ করে নি।

মহাভারতের যুগ থেকে ভারতীয় আর্য নৃপতিদের কয়েকবার দিগ্বিজয়কালে বঙ্গবিজয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাতে বাঙালিদের যুদ্ধসামর্থ্যের যে বিবরণ পাওয়া যায় তা অগৌরবের নয়। পক্ষান্তরে বাঙালিরাও দিগ্বিজয় করত এবং বাংলাদেশ থেকে বেরিয়ে এসে তারা কামরূপ, দক্ষিণাপথ ও উত্তরাপথের দিকে অগ্রসর হত। ঐতিহাসিক কালে বাঙালিদের উত্তরাপথ-বিজয়ের অন্তত একটি প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই সময়ে বাংলা ভাষার জন্ম হয়ে গেছে। তখন খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী, ধর্মপাল ও দেবপালের আমল। তা ছাড়াও বাঙালি রাজার পূর্বে কামরূপ থেকে পশ্চিমে কাশী পর্যন্ত অধিকার করার বিবরণ দুর্লভ নয়।

বাংলা ভাষার উদ্ভবের আগে বাংলাদেশে ভারতীয়-আর্যভাষার প্রাচীন ও মধ্যবর্তী স্তরের বিবর্তনের ইতিহাস আগে সাধারণভাবে ভারতীয়-আর্যভাষাপ্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। এখন বিশেষভাবে বাংলা ভাষার উদ্ভবের কথা বলা প্রয়োজন যাতে বাঙালি জাতির আধুনিক উদ্ভবের রহস্য বোঝা যায়।

ঐতরেয় আরণ্যকে ও মহাভারতে যে বঙ্গ জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়, সেই জাতিকে "বিপথগামী" আর্য জাতি ব'লে ধ'রে নিলেও মানতে হবে যে তাদের মাতৃভাষা ছিল প্রাচীন ভারতীয়-আর্যভাষা স্তরের একটি পূর্বাঞ্চলীয় উপভাষামাত্র—আজকের দিনের সুনির্দিষ্ট বাংলা ভাষা বা তার কোন প্রত্ন-রূপের উদ্ভব তখনও হয় নি; তার উচ্চারিত রূপ বৈদিক ভাষার উচ্চারিত রূপ থেকে পৃথক হলেও সম্ভবত তার কোন স্বতন্ত্র লিখিত রূপ ছিল না, অন্তত আজ পর্যন্ত তার কোন নিদর্শন কোথাও অণুমাত্র পাওয়া যায় নি। সুতরাং বর্তমান বাংলা ভাষার তৎকালীন পূর্বপুরুষ বলতে আমাদের বৈদিক ভাষাকেই ধরতে হবে। যখন ভারতীয়-আর্যভাষা প্রাকৃত ও অপভ্রংশ স্তর অতিক্রম ক'রে নবীনতার স্তরে উত্তীর্ণ হল, কেবল তখন থেকেই বাংলা ভাষার উদ্ভবের হিসেব-নিকেশ করা যেতে পারে। আর জাতি যেহেতু ভাষারওপর নির্ভর করে, সেহেতু মধ্য ভারতীয়-আর্যভাষার নানা উপভাষার একটি ব্যবহারকারী বঙ্গদেশীয় জনসমষ্টিকে আমরা তখনই আধুনিক অর্থে জাতি ব'লে গণনা করবো, যখন বাংলা ভাষা অপভ্রংশ-স্তর ভেদ ক'রে নিজের স্বকীয়তায় সুপ্রতিষ্ঠিত হল। এই সময়টা কখন্, আপাতত তাই নিরূপণ করা যাক।

ঐতিহাসিক কালে সম্রাট্ হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য বিশ্লিষ্ট হবার পর থেকে, গৌড়ের বাঙালি রাজা শশাঙ্কদেবের মৃত্যুর কিছু দিন পর থেকে পাল রাজাদের অভ্যুদয়ের আগে পর্যন্ত যে-যুগকে মাৎস্যন্যায়ের যুগ বলা হয়, সেই সময়ে পূর্ব ভারতের এক প্রচণ্ড আলোড়নের মধ্যে মাগধী অপভ্রংশ স্তর ভেদ ক'রে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয় এবং কামরূপ থেকে পুরীধাম পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় মগধ রাজ্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্ হয়ে বাঙালি জাতির আবির্ভাব ঘটে। এর আগে মগধ সাম্রাজ্যের যে-প্রাধান্য, তাতে বাঙালি অন্যতম উপাদানরূপে কিছু অংশ নিয়ে থাকলেও সে তখন একটি উপজাতি মাত্র ছিল এবং রাজনৈতিক তথা জাতীয় দিক থেকে তার সত্তা ছিল অবচেতন। কিন্তু অষ্টম শতক থেকে বাঙালি একটি নির্দিষ্ট জাতি এবং বাংলা একটি স্বতন্ত্র ভাষা; ত্রয়োদশ শতকে উড়িষ্যা এবং পঞ্চদশ শতকের শেষে আসাম বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতির অধিকার বাহির্ভূত হয়েছে বটে, কিন্তু আমরা যাকে ভৌগোলিক বাংলাদেশ বলেছি, সেই অঞ্চল থেকে অষ্টম শতকে প্রথম উদ্ভবের পর আর কখনও বাংলা ভাষা ও বাংলাভাষীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকার সঙ্কুচিত হয়নি। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত এই এলাকা পরাধীন হয়ে আছে বটে, কিন্তু পরাধীনতা ভৌগোলিক বাংলাদেশ থেকে বাঙালি জাতি ও তার মাতৃভাষাকে উচ্ছেদ করতে পারে নি।

বাংলা ভাষার আদি যুগ অন্যান্য আধুনিক ভারতীয়-আর্যভাষার মতো দশম শতক থেকে ধরা হয় বটে, কিন্তু

এ হিসেব খুব স্থূল এবং গতানুগতিকভাবে ব্যাপক। সূক্ষ্ম বিচার করলে মানতে হয় যে, বিশাল পদ-সাহিত্যের প্রথম উৎপত্তির সময়ে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়ে গেছে। সুতরাং চর্যাপদগুলির উৎপত্তি অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ধরলে বাংলা ভাষার উদ্ভব অন্তত অষ্টম শতাব্দী থেকে ধরা উচিত। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, ৯০০-১২০০ খ্রীস্টাব্দ বাংলা ভাষার গঠনকাল; আচার্য শহীদুল্লাহ্‌ সাহেবের অভিমতে, বাংলা ভাষার প্রথম উৎপত্তির পূর্বসীমা আনুমানিক ৬৫০ সাল হতে পারে। অর্থাৎ মাৎস্যন্যায়ের যুগের প্রবল আলোড়নের মধ্যেই বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতির বিশিষ্ট প্রকাশ।

মাৎস্যন্যায়ের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত গত প্রায় তেরো শত বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশে অভিযাত্রীরূপে তিনটি জাতির আগমন ঘটে। তা ছাড়া দ্রাবিড় জাতিগুলির ক্রমান্বয়ে অভিযান ও মাঝে মাঝে আর্য জনবসতির আগমন তো আছেই। আগেই আর্য-দ্রাবিড় সান্নিধ্য ও শোণিত-মিশ্রণ এদেশে হয়ে গেছে ব'লে আমরা ৬৩৭ সালের পরবর্তী দ্রাবিড়-অভিযান ও আর্য-সমাগমগুলিকে সচরাচর কোন গুরুত্ব দিই না। কিন্তু সেটা ঠিক নয়; অন্তত একটি দ্রাবিড়-অভিযান ও একটি আর্য-সমাগমকে গুরুত্ব দিতেই হবে। সে-বিষয়ে বিশদভাবে কিছু বলার আগে বাংলা ভাষার ইতিহাসের একটি যুগবিভাগ করা যেতে পারে :—

(১) আদিযুগ : সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক; প্রথম পর্ব : ভাষা-গঠনের যুগ—সপ্তম থেকে নবম শতাব্দী; দ্বিতীয় পর্ব : চর্যাপদ-সাহিত্যর পূর্ণ বিকাশ—নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী। সালের সংখ্যা দিতে গেলে বলতে হয়, ৬০৭-১২০৩ সাল হল এই যুগের সীমা।

(২) মধ্য যুগ : ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতক; প্রথম পর্ব : সন্ধি-যুগ—ত্রয়োদশ শতক; দ্বিতীয় পর্ব : প্রাক্-চৈতন্য যুগ—চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতক; তৃতীয় পর্ব : চৈতন্য-পরবর্তী যুগ বা মোগল-বিজয়ের যুগ—ষোড়শ-সপ্তদশ শতক; চতুর্থ পর্ব : বাংলা ভাষার আধুনিকীভবন বা দ্বিতীয় সন্ধি-যুগ—ষোড়শ-সপ্তদশ শতক; চতুর্থ পর্ব : বাংলা ভাষার আধুনিকীভবন বা দ্বিতীয় সন্ধি-যুগ বা বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য প্রভাব বিস্তারের উদ্যম—অষ্টাদশ শতক। সালের সংখ্যাবিচারে বলা যায়, ১২০৩-১৮০০ সাল।

(৩) আধুনিক যুগ : উনবিংশ-বিংশ শতক; প্রথম পর্ব : বাংলা গদ্য গঠনের যুগ—১৮০১—১৯১৪ সাল; দ্বিতীয় পর্ব : আধুনিক বাংলা কথ্যভাষার সার্বভৌম প্রভাব বিস্তারের সাল ১৯১৪ সালের পরবর্তী সময়।

বাংলা ভাষার এই ঐতিহাসিক যুগ-বিভাগের কার্য-কারণ পরম্পরা অনুধাবন করলে তার রাষ্ট্রীয় বিবর্তনের ইতিহাসও যেমন পর্যালোচিত হবে, তেমনি বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির রাষ্ট্রীয় পরিণতিও সহজে বোঝা যাবে।

প্রথমে অ-ভারতীয় অভিযাত্রী জাতি তিনটির কথা সংক্ষেপে বলা যাক। এদের মধ্যে প্রথম দুটি জাতির আগমনকে ঐতিহাসিকেরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। একটির আগমনের ফলে উড়িষ্যা, অপরটির আগমনের ফলে আসাম উপত্যকা বাংলাভাষার অধিকার থেকে বিচ্যুত হয়; তৃতীয় জাতিটি ভৌগোলিক বাংলাদেশকেও স্থায়ী ও চূড়ান্ত ভাবে দু ভাগে ভাগ করতে চেষ্টার ত্রুটি করে নি; কিন্তু অন্তত এ-যাবৎ ভাষার ক্ষেত্রে সে-চেষ্টা মোটেই সফল হয় নি।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে তুর্ক-তাতার গোষ্ঠীর উজবেক জাতির লোকেরা বঙ্গ-বিজয় সম্পন্ন করে। ১২৫৫ সালে গিআসউদ্দিন উজবেক প্রথম বিজয়ী জাতির শাসনের নিদর্শনস্বরূপ তাদের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রকাশ করেন। এই মুসলিম ধর্মাবলম্বী বিজয়ীদের এখনকার শিক্ষিত লোকে তুর্কি এবং সাধারণ লোকে ভুল ক'রে পাঠান ব'লে উল্লেখ করে। প্রকৃতপক্ষে এরা ছিল বর্তমান সোভিয়েট মধ্য এশিয়া বা তুর্কিস্তানের লোক। অবশ্য মুসলিম ধর্মবিজয় বা জেহাদের অজুহাতে এদের সঙ্গে এদের চলার পথে বহু তাজিক, আফগান বা কাবুলিওয়ালা, পাঠান বা পেশোয়ারি প্রভৃতি জাতের প্রতিনিধি হয়ে বাংলা জয় করতে আসে নি, এসেছিল মুসলিম ধর্মযোদ্ধারূপে। এরা বর্তমান তুরস্ক বা আফগানিস্তানের লোক নয় ব'লে এদের তুর্ক বা পাঠান না ব'লে উজবেক বা তুর্কিস্তানি বলা সমীচীন। এরা যে ধর্মীয় দঙ্গল নিয়ে বাংলা অভিযান করেছিল, তাতে চলার পথে সামনে-পড়া সব মুসলমান ধর্মাবলম্বীই যোগ দিয়েছিল।

বাঙালি এই অভিযাত্রীদের স্বরূপ চিনতে ভুল করে নি। 'উজবুক' শব্দটিই তার প্রমাণ; উজবেক তখন যোদ্ধ-রূপে বাঙালীদের চেয়ে উন্নত হলেও সভ্যতা ও সংস্কৃতির মাপকাঠিতে জয়দেব গোস্বামীর বাংলার চোখে উজবুক ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

মাৎস্যন্যায়ের যুগাবসানে গোপালদেবের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলার গোড়াপত্তন হয়। তখন থেকে রামপাল দেবের আমল পর্যন্ত বাঙ্গালী স্বাধীন জাতি ছিল বলা যায়। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমে কানাড়িভাষী কর্ণাটকবাসী বা কর্ণাটদেশাগত সেন বংশ ক্রমশ সমস্ত বাংলাদেশ অধিকার ক'রে নেয়। সুতরাং সেন আমলে বাঙালি স্বাধীন ছিল না। উজবেক বা তুর্কিস্তানিরা সংখ্যায় বেশি হবার কথা নয়। কিন্তু জেহাদের আহ্বানে তাদের অভিযাত্রীদঙ্গলে বহু জাতির মুসলমান সৈন্যের যোগ দেবার কথা। সুতরাং বাংলাদেশের তৎকালীন বিদেশী অধীশ্বর লক্ষ্মণসেন তাদের সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করলেও শেষ পর্যন্ত পেরে উঠতেন না।

লক্ষ্মণসেনের পরাজয় হিন্দুদের দুঃখ ও লজ্জার কারণ হলেও বাঙালিদের তাতে অগৌরবের বিশেষ কিছু ছিল না; প্রথমত, লক্ষ্মণ সেন বাঙালি ছিলেন না ব'লে তাঁর জন্যে প্রাণ দিতে উৎসাহবোধ করার কোন কারণ বাঙালিদের দিকে ছিল না; দ্বিতীয়ত, তিনি বা সেনবংশ মোটেই বাঙালী-দরদী ছিলেন না বা বাংলা ভাষার প্রতি তাঁদের কোন শ্রদ্ধাবুদ্ধি ছিল না; তৃতীয়ত, সব না হ'লেও বহুসংখ্যক, হয়ত-বা বেশি সংখ্যক, বাঙালি তখন হিন্দু ছিল না; তারা ছিল বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধ পাল রাজাদের শাসনের গৌরবব্যঞ্জক সুখস্মৃতি তাদের ভুলে যাবার কথা নয়; পাল রাজাদের উচ্ছেদকারী বিদেশি সেন রাজাদের জন্যে বাঙালি অ-হিন্দুদের খেদের কোন কারণ ছিল না; চতুর্থতঃ, বল্লাল সেন বাংলাদেশে কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্তনের দ্বারা ভেদবুদ্ধির যে-বিষবৃক্ষ রোপণ করেন, তাতে জাতীয় ঐক্যের সুফল ফলার কোন সম্ভাবনা ছিল না; পঞ্চমত এবং বিশেষত, বৃদ্ধ বয়সে লক্ষ্মণসেন দুর্বলচিত্ত স্ত্রৈণ কু-শাসকে পরিণত হয়েছিলেন ব'লে তাঁর হয়ে যুদ্ধ করার গরজ লাউসেনের বংশধরদের ছিল না। এক বিদেশি রাজবংশকে উচ্ছেদ ক'রে যদি আর এক বিদেশি রাজবংশ আসে, তবে তাতে এমন কি এসে যায়? এই ছিল বেশির ভাগ লোকের মনোভাব।

তবু এ-কথা ঠিক যে, তুর্কিস্তানবাসী উজবেকদের প্রতিরোধ না ক'রে সে-দিনের অ-মুসলমান বাঙালি হিন্দু-বৌদ্ধ-লোকায়ত সম্প্রদায়ের জনসাধারণ বিরাট ভুল করেছিল। কিন্তু সে-লজ্জা স্পেন থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত ব্যাপ্ত এলাকায় অসংখ্য জাতির, একা বাঙালির নয়; বাঙালি যদি ভালো ক'রে যুদ্ধ না ক'রে থাকে, তবে তার কারণ কাপুরুষ মনোবৃত্তি নয়, তার কারণ অনীহা, ঔদাসীন্য আর বাস্তব রাজনৈতিক জ্ঞানের অভাব। নবাগত তুর্কিস্তানিরা বাংলাদেশের গুরুতর সাংস্কৃতিক ক্ষতি সাধন করে। আগে মাৎস্য-ন্যায়ের যুগ ও পরে তুর্কি আমল, এই দুই যুগের কোন স্পষ্ট সাংস্কৃতিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে একটা কথা বোঝা যায়, শশাঙ্কদেবের মৃত্যুর পর সম্রাট্ হর্ষবর্ধন ও তাঁর পরবর্তীরা বাংলা দেশ বেশিদিন দখলে রাখতে পারেন নি। দিল্লির তুর্কিস্তানি সুলতানেরাও অল্পদিন পরে বাংলাদেশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। বাংলায় স্বাধীন সুলতান-রাজ স্থাপিত হয়।

নবাগত উজবেক ও অন্যান্য অবাঙালি মুসলমান অভি-যাত্রীরা হয় লুটপাটের পর চ'লে যায় নয় ধর্মান্তরিত বাঙালি মুসলমানদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের সূত্রে মিশে যায়। অর্থাৎ বাঙালি মুসলমানদের কারো কারো শরীরে দুএক বিন্দু উজবেক বা তুর্কি শোণিত থাকা সম্ভবপর। উজবেকদের সঙ্গে আসা আফগান-পাঠান-পাঞ্জাবি মুসলমানরা ইরানি বা ভারতীয় আর্য ছিল। সুতরাং একমাত্র তুর্কিস্তানিদের সংস্পর্শে ছাড়া অনার্য রক্ত বাঙালিদের দেহে অতঃপর প্রবেশ করার কথা নয়। নবাগত বিজয়ীরা ধর্মান্তরিত বাঙালি মুসলমানদের সমকক্ষ ভাবত, এমন কথা ভেবে বাঙালি মুসলমানের আত্মপ্রসাদ লাভের কোন অবকাশ নেই। নবাগতরা যে-স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল পরে তা "পাঠান" এই অবজ্ঞা-সূচক বিশেষণে বাঙালি মুসলমানদের কাছে পরিচিতি লাভ করে। ইংরেজ রাজত্বে বাঙালি খ্রীস্টানরাও ইংরেজের সমমর্যাদা লাভ করতে পারেন নি। আর এ্যাংলো-

ইণ্ডিআন সম্প্রদায়ের মর্যদা পাঠান বা মোগলের চেয়ে আজকের বাংলায় বেশি নয়।

বাংলা ভাষায় ও বাঙালি জাতির শোণিতে উজবেকরা বিশেষ কিছু চিহ্ন রেখে যেতে পারে নি। জাতিগত ও ভাষাগত দান কিছু না থাকলেও এবং ভালো কিছু করতে না পারলেও তারা অনেক স্থায়ী ক্ষতি ক'রে গেছে। ধর্মান্ধতাবশত পুথিপত্র ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক উপাদান নষ্ট করা ছাড়াও সব চেয়ে বড় ক্ষতি তারা যা করেছে তা এই যে, ধর্মবিরোধের ফলে আজ বাঙালি আর্যভাষী দশ-কোটি মানুষ দুটি বড় ভাগে বিভক্ত: মুসলমান আর অ-মুসলমান। এর আগে সাতটা নরগোষ্ঠী মিলে মিশে এক বাঙালি জাতি গঠন করেছিল যারা ব্রাত্য হোক, পাখি হোক, বাঙালিই বটে। কিন্তু তুর্কি-বিজয়ের পর থেকে বাংলাদেশে শোনা যেতে লাগল এক দল বাঙালিই বলছে: ঐ ওরা হল বাঙালি, আর আমরা?—আমরা মুসলমান। এদের মুখের ভাষা বাংলাই থাকল, ধর্মান্তর গ্রহণের জন্যে তুর্কি বা ফার্সি হল না। কিন্তু তারা যে আগে বাঙালি এ-বোধ লুপ্ত হয়ে তাদের কাছে অন্তত দীর্ঘ কালের মতো মুসলমান ধর্মাবলম্বী হওয়াটাই বড় হয়ে দেখা দিল।

ধর্মোন্মত্ততার চাপেও বাঙালি মুসলমান ফার্সি বা উর্দু ভাষী হয়ে ওঠে নি। সুতরাং প্রাচীনতর যুগে মাত্র কয়েক শো বছরের মধ্যে বাংলাদেশের শতকরা একশো জন অনার্য দু চারজন আর্যভাষীর সান্নিধ্যে এসে মাতৃভাষা ভুলে আর্যভাষী হয়ে গেল, এমন কথা মূঢ় ভাষাতাত্ত্বিক ছাড়া আর কেউ ভাবতে পারে না।

তুর্কিস্তানিদের বঙ্গ-বিজয়ের আগেও বাংলাদেশে ধর্ম নিয়ে অনেক রকম বিরোধ ছিল। হিন্দু-বৌদ্ধ, শাক্ত-বৈষ্ণব দ্বন্দ্ব সকলেই জানেন। কিন্তু সে-সব বিরোধের ভিত্তিতে বাঙালি জনগোষ্ঠীর রাষ্ট্রীয় দিক থেকে দুটি স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হওয়ার ভয় ছিল না। এই তুর্কি প্রভুত্বের ফলে এক মাতৃভাষা সত্ত্বেও বাঙালি স্থায়ী ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। তার জন্যে উজবেক জাতির বৈদেশিকতার চেয়ে মুসলিম ধর্মমতই বেশি দায়ী। ঐ নবাগত উজবেকরা যদি হুনদের মতো কোন অ-সেমীয় রাষ্ট্রীয় বিভাগের প্রশ্ন উঠত না। স্বাধীন বাঙালি জাতি ও বাঙালি রাষ্ট্রের স্বপ্নে স্বপনী বঙ্কিমচন্দ্র এই কারণেই সখেদে বলেছিলেন :—

"যাহা চাই, তাহা মিলাইল কই? মনুষ্যত্ব মিলিল কই? একজাতীয়ত্ব মিলিল কই? সুখের কথাতেই বাঙালির অধিকার নাই।"

১২০৩-১৯৬৯ সালের মধ্যে বাংলাদেশে বহু ক্ষেত্রে বহু প্রতিভার আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু এমন এক জনকে পাওয়া যায়নি যিনি বাঙালি জাতির এই ধর্মভিত্তিক দ্বিধাবিভক্ত ভাব দূর করতে পারেন। তার কারণ পরে ব্যাখ্যা করা হবে।

ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তুর্ক-তাতার গোষ্ঠীর তুর্কোমান জাতির লোকেরা বঙ্গবিজয় সম্পন্ন করে। এরা সাধারণ্যে মোগল নামে পরিচিত। ভাষার দিক থেকে এরা উজবেকদের নিকট প্রতিবেশী। কিন্তু উজবেকদের মতোই মোগলরাও বাংলাদেশে তুর্কিস্তানি ভাষার বদলে ফার্সি ভাষার দ্বারা শাসনকার্য পরিচালনা করেছে। তুর্কোমানরাও বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে বিজয়ী জাতি-রূপে "মোগল" নামে এক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। আজ বাঙালি মুসলমানদের চোখে তাদের অবস্থা "পাঠান" বা উজবেকদের মতোই অবজ্ঞাত।

মোগল-অধিকারে বাংলায় মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু বাংলা ভাষার অধিকারসীমা ক্ষুণ্ণ হয় নি। বাঙালি মুসলমানরা উজবেক বা তুর্কোমান, পাঠান বা মোগল, কারো মারফতে ফার্সি ভাষা দূরে থাক, উর্দু ভাষাও গ্রহণ করেনি। বাংলা দেশের রাজকার্যে প্রায় ছয় শতাব্দী ধরে ফার্সি ভাষা ব্যবহার করিয়েও তুর্কিস্তানিরা বাঙালি মুসলমানকে ভাষায় অ-বাঙালি করতে পারে নি। হিন্দুদের কথা দূরে থাক, মুসলমানদের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও ফার্সি বা উর্দু ভাষী হয়ে ওঠেনি, এটা সানন্দে লক্ষ্য করার বিষয়।

আমাদের দেওয়া যুগ-বিভাগ অনুসারে মধ্য যুগের প্রথম পর্ব যে সন্ধি যুগ, যা সুনীতিকুমারের মতে সন্ধিক্ষণ, সেই যুগে বা ত্রয়োদশ শতকে বাংলা ভাষায় ফার্সি, আরবি ও তুর্কি বা ইসলামি শব্দসমূহ প্রবেশ করে

বিদ্যাপতির মতো সংস্কৃতবিৎ সুপণ্ডিত মৈথিল ব্রাহ্মণ কবির রচনাতেও ফার্সি শব্দ প্রবেশ করেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় ফার্সি প্রভাব যখন চরমে উঠেছিল, সেই অষ্টাদশ শতাব্দীতেও আড়াই হাজারের বেশি ফার্সি শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ-অধিকার পায় নি। তুর্কি আমলের চেয়ে মোগল আমলে ফার্সি শব্দের প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু প্রথমে তুর্কি পরে মোগল অধিকারের ফলে বাঙালিদের একাংশ ও বর্তমানে বৃহত্তর অংশ মাতৃভাষায় নাম রাখার সনাতন ও স্বাভাবিক নীতি ত্যাগ ক'রে মাত্র ধর্মান্ধতার খাতিরে বিজাতীয় আরবি ভাষার নাম গ্রহণ করতে লাগল। সুতরাং উজবেক তুর্কোমান অধিকারের প্রকৃত তাৎপর্য দেখা দিল ধর্মীয় পার্থক্যের জন্যে বিজাতীয় দুর্বোধ্য নাম গ্রহণের ক্ষেত্রে। যে-সব ভোলা, কালু, শান্তনু বা শান্তশীল বাংলাদেশের লৌকিক ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ও হিন্দু ধর্ম ত্যাগ ক'রে ইসলাম কবুল করল, তারা বাংলাদেশে অসংখ্য ধর্মমতের মধ্যে আর একটা মাত্র নতুন ধর্মমতের আমদানি ক'রে ক্ষান্ত হল তা নয়, তারা স্বনাম ত্যাগ ক'রে রহিম, করিম, জলিল বা জয়নাল হয়ে গিয়ে এক ভাষাগত অপরিচয়ের বিভীষিকা সৃষ্টি করল। বস্তুত তুর্কি ও মুগল-বিজয়ের সবচেয়ে বড় ক্ষতি এখানে।

বাঙালি খ্রীষ্টানদের দ্বারা বাংলা ভাষায় নামকরণের ক্ষেত্রে এ-ক্ষতি হয় নি। তাঁরা খ্রীষ্টান নাম নিলেও মাতৃভাষায় নাম রাখা বাতিল ক'রে দেন নি। এইজন্যে ও অন্য নানা উদারতার পরিচয় পেয়ে স্বনামধন্য কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাঙালি মুসলমানদের সঙ্গে তুলনায় বাঙালি খৃষ্টানদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে-ছিলেন। বস্তুত বাঙালি মুসলমানের বাঙালীভবন বা বাঙালীকরণ তখনই সম্পূর্ণ হবে যখন তারা ধর্মে মুসলমান থেকেও মাতৃভাষার নাম গ্রহণ করবে, যেমন চীন, পারস্য, ইন্দোনেশিয়া ও আরো অনেক দেশের মুসলমান সমাজ ইসলামি নামের সঙ্গে স্থানীয় মাতৃভাষার নামও নিয়ে থাকে। বাঙালি মুসলমান সমাজও ঐ দৃষ্টান্ত নিলেন ইসলামের পবিত্রতাহানির কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না।

বাঙালি মুসলমান যে বাংলা ভাষার একান্ত অনুরাগী, তার উপযুক্ত প্রমাণের অভাব নেই। বাংলার নবাব-বাদশারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আনুকূল্য করেছেন, এমন দৃষ্টান্তও আছে। তাই আরব ভাষায় দুর্বোধ্য নাম রাখার রীতি পরিহার ক'রে আধুনিক ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের যুগে বাঙালি মুসলমান বাংলা ভাষার নাম গ্রহণ করবে, এটা আশা করলে অন্যায় দাবি করা হবে না। যদি নজরুল ইসলামের ছেলেদের নাম অনিরুদ্ধ ও সব্যসাচী হতে পারে, তা হলে কোন বাঙালি মুসলমানের বাংলা নাম নেওয়ায় আপত্তির কিছু থাকতে পারে না।

বাঙালি মুসলমান মেয়েদের মধ্যে বাংলা নাম দু একটি শোনা যায়। গ্রামে অনভিজাত মুসলমানদের মধ্যে ভোলা, কালু, মণ্টু ধরণের খাঁটি বাংলা নাম এখনও শোনা যায়। অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম বাংলা ভাষাকে কাবু করতে পারে নি। ভাষা ও ধর্মের দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত ভাষার জয় অবশ্যম্ভাবী।

বাংলাদেশে বিনয়কুমারের অভিমত অনুসারে ইসলামের আবির্ভাবের আগে মোটামুটি তিনটি প্রধান ধর্ম ছিল : বৌদ্ধধর্ম, ব্রাহ্মণ্য বা বর্ণাশ্রম ধর্ম যাকে ভুল করে হিন্দু ধর্ম বলা হয় এবং লৌকিক ধর্মাচার যা স্থানীয় আদি-বাসীরা স্মরণাতীত কাল থেকে অবলম্বন ক'রে আসছিল। বাংলাদেশে বৌদ্ধ, জৈন ও বর্ণাশ্রম প্রধান তথাকথিত হিন্দু ধর্ম ঠিক ইসলামের মতোই বহিরাগত উপাদান। ইসলামের অভ্যুদয়ের পর এখন দেখা যাচ্ছে যে, বর্ণাশ্রম প্রধান হিন্দুধর্ম এবং মুসলিমধর্ম ছাড়া বাংলাদেশে অন্য কোন ধর্ম নেই বললেই চলে। এটা অবশ্য স্থূল বা মোটামুটি হিসেবে বলা হল ; সূক্ষ্ম বিচারে দেখা যাবে, কিছু বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান, পারসিক এবং লৌকিক ধর্মাচারী এখনও ভৌগোলিক বাংলাদেশের এখানে-ওখানে ছড়িয়ে আছে, কিন্তু তারা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। সুতরাং পাল আমলের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক বৌদ্ধ কোথায় গেল, সে-প্রশ্ন ওঠে। বিনয়কুমারের মতে, অ-বৌদ্ধ অ-হিন্দু দেশাচারী বাঙালিরাই দলে দলে ইসলাম কবুল করেছিল। এই সঙ্গে সাধারণ সংস্কার এই যে, মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধরাও বহু সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণ করায়, এবং হিন্দুদের তুলনায় মুসলিম সমাজের প্রজাবৃদ্ধি বেশি হওয়ায় বাংলাদেশে এখন মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

মুসলমানেরা সংখ্যা গরিষ্ঠ হওয়াতে অ-মুসলমানের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার কোন কারণ থাকত না যদি ইসলামে অ-মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকরূপে গণ্য করার প্রস্তাব না থাকত।

অন্যতম সেমীয় ধর্মরূপে ইসলাম ধর্মে যে পরমত-অসহিষ্ণুতা দেখা যায়, তাই সর্বত্র অ-মুসলমানদের উদ্বেগের কারণ হয়ে থাকে। বিশ্বের কোন মুসলিম গরিষ্ঠ রাষ্ট্রে অ-মুসলমানদের সমান অধিকার কখনও দেওয়া হয় নি এবং অদূর ভবিষ্যতে তা দেবার কোন লক্ষণ আজ পর্যন্ত দেখা যায় নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের হিন্দু মুসলমান বা মুসলমান-অ-মুসলমান সমস্যাটির মীমাংসা করতে হবে।

বাংলাদেশের ধর্মীয় অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিজাতীয় শোণিত এখানে কোন সমস্যা সৃষ্টি করে নি। উজবেক ও তুর্কোমান বিজেতাদের সঙ্গে অন্য নানা জাতির মুসলিম এ-দেশে প্রবেশ ও বসবাস করে। হাবসি বা এথিওপীয় মুসলমানও কিছু দিন বাংলাদেশে রাজত্ব ক'রে গেছে। কিন্তু বাঙালি মুসলমানের ধমনীতে ঐ সব বিজাতীয় শোণিতের পরিমাণ শতকরা হারে প্রায় কিছুই নয়। এখানে সমস্যার কারণ, বাঙালি মুসলমানের গোঁড়া সুন্নি ধর্মমত। বাঙালি মুসলমান ধর্মসম্প্রদায়রূপে সংঘবদ্ধ ও সুগঠিত। বাঙালি খ্রীষ্টানও তাই, কিন্তু তাকে নিয়ে কোন সমস্যা নেই তার উদারতা ও সংখ্যাল্পতার জন্যে। ধর্মের ভিত্তিতে বাংলাদেশকে মুসলমান ও অ-মুসলমান, এই দুই ভাগে বিভক্ত ক'রে দেখা এই জন্যে প্রয়োজন যে, অ-মুসলমানরা নানা ছোট ছোট সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং তাদের মধ্যে মুসলমানদের মতো কোন সুসংগঠিত ধর্মপ্রতিষ্ঠান বা বিশিষ্ট এক জাতীয় মনোভাব নেই। হিন্দু সম্প্রদায় আসলে কোন একটি সম্প্রদায় নয়, বৈষ্ণব-সৌর-শৈব শাক্ত-গাণপত্য ইত্যাদি বহু ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সমাবেশ এবং কোন হিন্দু "চার্চ" আজ পর্যন্ত গ'ড়ে উঠে নি। সুতরাং বাঙালি মুসলমান সমাজ যত সহজে একটি জাতীয় ব্যষ্টি বা ইউনিটরূপে গ'ড়ে উঠতে পারে, বাঙালি হিন্দু তা পারে না এবং পারে নি। ভেবে দেখলে বুঝতে অসুবিধা নেই যে, বাঙালি মুসলমানের মুসলিমত্ব যত তীব্র এবং উগ্র বাঙালি হিন্দুর হিন্দুত্ব তেমন সচেতন ও সজীব নয়। বাংলাদেশের হিন্দুরা শতকরা হার ও জমির দখলের হিসেবে শুধু ক্ষয়িষ্ণু নয়, নিশ্চিত লুপ্তির সম্মুখীন। এই অবক্ষীণ ধ্বংসোন্মুখ নরগোষ্ঠী ক্রমশ ইসলাম গ্রহণ করবে অথবা ইসলামিদের জায়গা-জমি ছেড়ে দিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে, তাতে সন্দেহ করা চলে না। বাঙালি হিন্দুর সমাজ ব্যবস্থা যতই ত্রুটিপূর্ণ হোক, তার ধর্মমত অত্যন্ত উদার ও পরমতসহিষ্ণু; ধর্ম-সমালোচনায় বাঙালি হিন্দুর কোন গাত্র দাহ নেই। শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু প্রগতির খাতিরে ধর্ম সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন, প্রায় নাস্তিক বলা যায়। অ-বাঙালি হিন্দু, শিখ, জৈন প্রভৃতি সম্প্রদায় এখনও বেশ ধর্ম-সচেতন; তা না হলে প্রতিমাপূজার নামে চাঁদা আদায় ও অশালীন আচরণ করা ছাড়া বাঙালি হিন্দুর আর কোন হিন্দুত্ব অবশিষ্ট নেই। এমন দুর্বল চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন একটি জনগোষ্ঠী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যতই "প্রগত" হোক, ধর্মের তথা রাজনীতির ক্ষেত্রে কিছুতেই বাঙালি সুন্নি মুসলমানদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে না। যদি সমস্ত ভৌগোলিক বাংলাদেশ নিয়ে একটি অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র গঠন করা যায়, তা হলে সমস্ত অঞ্চলটা মুসলিম প্রধান স্থায়ী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এমন একটি রাষ্ট্র হবে যেখানে অ-মুসলিম অন্য সমস্ত সম্প্রদায়ের বিশেষত বাঙালি হিন্দুর নিঃশেষ অবলুপ্তি মাত্র কিছু সময়ের ব্যাপার। তার জন্যে মুসলিমদের আক্রমণাত্মক ধর্মোন্মাদ ও হিন্দুদের আত্মরক্ষায় উদাসীন প্রগতিমূলক জীবনবেদ, দুই-ই সমধিক পরিমাণে দায়ী হবে।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম থেকে ইউরোপীয় আর্যরা বাংলাদেশে আসতে সুরু করে। এদের মিশ্রিত জাতিগত দান একটি বর্ণসঙ্কর সম্প্রদায় বা ট্যাস-ফিরিঙ্গিদের গঠন। বাঙালি খ্রীস্টান সমাজেও এরা অপাংক্তেয় থেকে গেছে। "পাঠান," "মোগল" ও "ট্যাস-ফিরিঙ্গি-দের দৃষ্টান্ত থেকে প্রাচীন কালে অন্যান্য বঙ্গদেশীয় বর্ণসঙ্করদের ভাগ্যে কি হয়েছিল, তা বোঝা কঠিন নয়। ১৭৫৭-১৯৪৭ সালের ১৯০ বছরের দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইংরেজশাসনেও বাংলাদেশে বাঙালি হিন্দু-মুসলিম-খ্রীস্টানের দেহে এক বিন্দু শ্বেতাঙ্গ শোণিত প্রবেশ করেনি বা শতকরা মাত্র এক জন ইংরেজিভাষীর উদ্ভব হয়নি। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে রক্তমিশ্রণ কোথাও কোথাও হয়ে থাকলেও বাঙালি জনসাধারণকে

তা স্পর্শ করেনি।

সুতরাং নির্ভয়ে এ-সিদ্ধান্ত করা চলে যে, বর্তমান বাঙালি আর্যভাষীরা প্রাচীন আল্‌পীয় ও নর্ডিক আর্যদেরই বংশধর, তারা অনার্য জাতিদের ভাষান্তরিত সংস্করণ নয়। মুলাটো, মেস্তিসো ও লাদিনোদের মতো কিছু বর্ণসঙ্করের উদ্ভব অবশ্যই হয়ে থাকবে বৌদ্ধ ও ইসলামি অনুশাসনের অবকাশে; নাম ভাঁড়িয়ে বা অর্থমূল্যে মিথ্যা পরিচয় কিনে বা শুদ্ধি ক'রে ও দীক্ষাসূত্রে কিছু অনার্য বর্ণাশ্রমী আর্য সমাজে ঢুকে পড়া বিচিত্র নয়। কিন্তু তার পরিমাণ খুব বেশি হবার কথা নয়। বাঙালি আর্যরা তন্ত্রের প্রভাবে অনার্য কন্যাদের শক্তি রূপে গ্রহণ ক'রে অনেক বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন করেছিল। মূলত বাঙালি আর্য জাতি ও অনার্য উপাদানের সহযোগিতায় উৎপন্ন বর্ণসঙ্করদের সমাবেশে গঠিত। এই জাতি প্রথমাবধি আর্যভাষী জাতি যদিও এদের আর্যভাষা উচ্চারণের পদ্ধতি অবশিষ্ট ভারত থেকে স্বতন্ত্র। বাংলা ভাষীদের মধ্যে আর্য উপাদান যত প্রবল, বর্ণসঙ্করদের পরিমাণ তত বেশি হবার কথা নয়।

তার প্রধান কারণ, বর্ণসঙ্করদের বংশগত আয়ু নানা কারণে বেশি দিন হয় না।

ঐতিহাসিক কালে বাংলাদেশে আগত অভিযাত্রী জাতি তিনটির তেমন কিছু ভাষাগত বা জাতিগত গুরুত্ব দেখা যাচ্ছে না একমাত্র বাঙালি মুসলমানদের বৈদেশিক নাম নিয়ে ভিন্ন জাতীয় তথা ভিন্ন রাষ্ট্রীয় চেতনায় সজাগ হবার প্রবণতা ছাড়া। আগে বাঙালি, পরে মুসলমান ভাবটি বাঙালি মুসলমানের মনে দৃঢ়তা লাভ করে নি। শুধু বাংলাভাষী এলাকা নিয়ে রাষ্ট্র গঠনের উদ্যম যখন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দেখা গেল, তখনই প্রথম বোঝা গেল, এক দল বাঙালি ভাষায় বাঙালি হলেও ধর্মে মুসলমান হওয়ায় গুরুতর জাতীয় তথা রাষ্ট্রীয় ক্ষতি হয়েছে। এখন ভাষাভিত্তিক বিশ্বে এই সমস্যার কেমন মীমাংসা হ'তে পারে, হয়ে থাকে বা হওয়া কাম্য, সে-আলোচনা করা যাক।

সাধারণতঃ বিশ্বে কোথাও মুসলমান ও অ-মুসলমানেরা এক রাষ্ট্রে শান্তিতে বাস করতে পারে না; মুসলিমরা সেখানে একটি নিজস্ব রাষ্ট্র গঠন করার জন্যে আন্দোলন করে, একভাষী অঞ্চলটির সর্বত্র তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে সমস্ত এলাকাটা মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হয়, কোথাও তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়রূপে বিশেষ ধর্মীয় সুযোগ-সুবিধা দাবি করে। বিশ্বের অন্য যে কোন স্থানের তুলনায় ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এই প্রবণতাগুলি অনেক বেশি প্রকট; তার কারণ, ভারতীয়রা সাধারণভাবে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে ধর্মান্ধ হওয়ায় তাদের একাংশ যে-ভারতীয় মুসলমানসমাজ, সে-সমাজ বিশ্বের যে কোন স্থানের মুসলিমদের চেয়ে বেশি গোঁড়া। যদিও ইসলামি ভ্রাতৃত্ব আঠারোটি আরব রাজ্যকেই আজ পর্যন্ত এক করতে পারে নি তবু অনেক মুসলমানের স্বপ্ন বিশ্ব মুসলিম রাষ্ট্র একদা গড়ে উঠবে। মুসলিম রাষ্ট্রে ইহুদি ও খ্রীষ্টানদের দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং হিন্দু সমেত তাবৎ পৌত্তলিকদের তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকরূপে গণ্য করা হয়। এমন-কি গোঁড়া মুসলিম ধর্মমত থেকে সামান্যতম বিচ্যুতির জন্যে মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সুফি, বাহাই, কাদিয়ান বা আহমদিয়াদের মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করা হয়ে থাকে। সুতরাং যদি কোন একভাষী এলাকার একাংশ মুসলিমগরিষ্ঠ ও অপর অংশ অ মুসলমানগরিষ্ঠ হয়, তা হলে ভৌগোলিক অখণ্ডতা থাকলেও সেই এলাকা মুসলিম ও অ-মুসলিম দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হতে বাধ্য; অন্যথায় অ-মুসলিমদের লুপ্তি অনিবার্য।

ভৌগোলিকভাবে অখণ্ড অঞ্চল বাংলাদেশে হিন্দুরা কেন এবং কতটা ক্ষয়িষ্ণু, তা বোঝার জন্যে শশাঙ্কদেবের মৃত্যুর পর এ-দেশে আগত একটি আর্য-সমাগম ও একটি দ্রাবিড় অভিযানের তাৎপর্য বোঝা দরকার।

আনুমানিক ৭৪৬ সালে কনৌজ থেকে কয়েকজন আর্য ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ এ-দেশে আসেন। "গৌড় কাহিনী"-র লেখক শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ মহাশয় সে সম্বন্ধে লিখছেন:

"তাঁদের আগমনের ফলে রাঢ়ের সমাজ-জীবন নূতন রূপ ধারণ করে। সমগ্র গৌড়-ইতিহাসে এত বড় তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা আর কখনও ঘটে নি।" (গৌড় কাহিনী, পৃষ্ঠা ১৮৩)।

বাংলাদেশ ধীরে ধীরে কানাড়িভাষী দ্রাবিড়ভাষাগোষ্ঠীর লোক সেনবংশীয়দের দখলে চ'লে যায়। এঁদের একজন রাজা বল্লালসেন দ্বাদশ শতকে কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্তন করেন। এই দুটি ঘটনার দ্বারা বাঙালি হিন্দুর সমগ্র সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল।

বল্লালসেনের নামেই প্রমাণ যে, তিনি বাঙালি ছিলেন না। ১১৫৮-৭৯ সালের মধ্যে কোন সময়ে কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্তন ক'রে তিনি যে-অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তার কুফল সমস্ত বাঙালি হিন্দুসমাজ পুরুষানুক্রমে ভোগ করেছে। তাঁর পরিকল্পনা ছিল, প্রতি ছত্রিশ বছর অন্তর ঐ প্রথার সংস্কার করা হবে। কিন্তু তাঁর রাজত্ব ঐ প্রথা প্রবর্তনের পর ৩৬ বছর স্থায়ী হয় নি এবং তুর্কিস্থানি আক্রমণের ফলে তাঁর বংশধররাও কোন সংস্কারকার্য সম্ভব করতে পারেন নি। সুতরাং ঐ প্রথা জন্মগত হয়ে গেল।

অযৌক্তিক জন্মগত কৌলীন্যপ্রথা সমাজের উচ্চতম প্রাধান্যশালী মহলে প্রচলিত থাকায় গুণগত উৎকর্ষ নষ্ট হল; শোণিতবদ্ধতা, ব্যভিচার, পারস্পরিক ঈর্ষ্যাদ্বেষ প্রভৃতি কুফল দেখা দিল। রাষ্ট্রানুগৃহীত সম্ভ্রান্তশ্রেণী যেমন রাষ্ট্রের কাছে সম্মানিত হয় তেমনি শাসকগোষ্ঠীকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে। কিন্তু বল্লালসেন শৌর্য বা সঙ্গতির ভিত্তিতে যোদ্ধা বা ভূস্বামীদের সাহায্যে কৌলীন্যপ্রথা সৃষ্টি করেন নি। তাঁর প্রবর্তিত প্রথা মুখ্যত বিবাহবিধি নিয়ন্ত্রণে পর্যবসিত হয়ে উচ্চ বর্ণের বাঙালি হিন্দু সমাজে ব্যাপক যৌন দুর্নীতি সঞ্চারিত হয় এবং কুলীন সমাজে অগণিত জারজ সন্তানের উদ্ভব হয়। ঐ আর্য-সমাগম ও কর্নাটি রাজবংশ-প্রবর্তিত কৌলীন্যপ্রথা বাঙালির জাতীয় সংহতি কমিয়ে দেয় এবং হিন্দুর সমাজদেহ দুর্বল ক'রে দেয়।

বাঙালির জাতীয় সংহতি এখন হিন্দু বা মুসলিম ধর্মভিত্তিক নয়, একান্তভাবে ভাষাভিত্তিক। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হয়ে গেলেও বাঙালি মুসলমান এখন আগে বাঙালি পরে পাকিস্তানি; বাঙালি হিন্দুও আগে বাঙালি পরে ভারতীয়। কিন্তু বাঙালি মুসলমান যতদিন আগে বাঙালি পরে মুসলমান না হবে, ততদিন যথার্থ জাতীয় সংহতি অসম্ভব।

রমেশচন্দ্র মজুমদার বাঙালির জাতীয়তার স্বরূপ সম্বন্ধে লিখেছেন:—

"যে স্থানের অধিবাসীরা বা তাহার অধিক সংখ্যক লোক সাধারণতঃ বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলে, তাহাই বাংলাদেশ বলিয়া গ্রহণ করা সমীচীন। আপাতত আর কোনও নীতি অনুসারে বাংলাদেশের সীমা নির্দেশ করা কঠিন। যে ভূখণ্ড আজ বঙ্গদেশ বলিয়া পরিচিত, প্রাচীন যুগে তাহার বিশিষ্ট কোন একটি নাম ছিল না এবং তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইত। আজ যে ছয় কোটি বাঙালি একটি বিশিষ্ট জাতিতে পরিণত হইয়াছে, ইহার মূলে আছে ভাষার ঐক্য। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসী হইতে পৃথক্ হইয়া বাঙালি একটি বিশিষ্ট জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।" (বাংলা দেশের ইতিহাস।)

সুতরাং এখন এই ভৌগোলিক বাংলাদেশ কেমন ক'রে প্রায় দশ কোটি বাংলাভাষীকে নিয়ে সার্থক রাষ্ট্রীয় পরিণতি লাভ করতে পারে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। বাংলা দেশের স্বাভাবিক রাষ্ট্রীয় পরিণতি লাভের পথে ভাষা পরম সহায়িকা, বিঘ্ন কোনমতেই নয়। বিঘ্ন দেখা যাচ্ছে কেবল ধর্মের ক্ষেত্রে।

সিদ্ধান্ত

মোগল সাম্রাজ্যে আকবরের নির্দেশে সুবা বাংলা বা বাংলা অঙ্গরাজ্য গঠিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে গঠিত এই রাজ্যে উড়িষ্যা অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্তু আসাম ছিল না। ইংরেজ অধিকারে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি গঠিত হয়; আসাম এর অন্তর্ভুক্ত না হলেও বিহার এর অন্তর্গত ছিল, যা মোগল আমলে ছিল না। সুবা বাংলা ও বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি—দুটি সাম্রাজ্যিক প্রদেশই ছিল অ-মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। আমরা যে-এলাকাটাকে ভৌগোলিক বাংলাদেশ বলছি, সেটাও ১৮৭১ সাল পর্যন্ত অ-মুসলিম-গরিষ্ঠ অঞ্চল ছিল। কিন্তু তার পর সেটা স্থায়ী এবং সুনিশ্চিতভাবে মুসলিমপ্রধান এলাকায় পরিণত হয়েছে। অ-মুসলিমদের মধ্যে শিক্ষা এবং প্রগতির গুণে পরিবার-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হওয়ায় উক্ত ব্যবস্থা-বিরোধী মুসলিম সমাজের তুলনায় অ-মুসলিমদের সংখ্যানুপাত ক্রমশ ক'মে যেতে বাধ্য।

মোগল-গঠিত বাংলা সুবা ও বিহার সুবা ইংরেজের হাতে একত্র বাংলা প্রদেশে পরিণত হওয়ার পর বাঙালি মুসলমান ইংরেজি ভাষা ও আধুনিক শিক্ষা সম্বন্ধে বিরূপ হয়ে থাকায় রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক ক্ষেত্রে বাঙালি হিন্দুর শুভযোগ উপস্থিত হয়। সিপাহি বিদ্রোহে সহানুভূতি না দেখিয়ে বাঙালি হিন্দু সেই সুবর্ণসুযোগের সদ্ব্যবহার করে। তার পর ১৯০৫ সালে মতিচ্ছন্ন ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ করার আগে পর্যন্ত তার ভাগ্যে কি ঘটেছিল, সে-বিষয়ে শৈলেন্দ্রবাবু নিপুণভাবে লিখেছেন :—

"ভারত জয়ের পর ইংরাজগণ তাদের প্রাচ্য সম্রাজ্যের রাজধানী কলকাতায় স্থাপন করায় বাঙালি হিন্দুরা বহু দিক দিয়ে লাভবান্ হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরি গ্রহণ ক'রে তাদের অনেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে—দেশ-বিদেশে বহু বাঙালি উপনিবেশ গ'ড়ে ওঠে। আবার প্রদেশ পুনর্বিন্যাসের ফলে বাংলার সীমান্ত বহু দূর পর্যন্ত প্রসারিত হওয়ায় প্রতিবেশী অঞ্চল-গুলির উপর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ ঘটে। মুষ্টিমেয় ইংরাজ সিভিলিয়ান এসে সরকার পরিচালনা করতেন, কিন্তু সমগ্র শাসনযন্ত্র ছিল বাঙালি কর্মচারীদের করতল-গত। এই অভূতপূর্ব প্রভাবের ফলে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে পরাধীন জাতির স্বাভাবিক বিদ্রোহ প্রবণতা বহুকাল স্তিমিত থাকলেও বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে সশস্ত্র বিপ্লবের আকারে আত্মপ্রকাশ করে।" (গৌড়-কাহিনী— ভূমিকা।)

ঐ সশস্ত্র বিপ্লব অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে সুরু হয়; পরে ঐ বিপ্লব ও তার নেতার যে পরিণতি ঘটে, সে-সম্বন্ধে হেমচন্দ্র কানুনগো, মোহিতলাল মজুমদার, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল রায়, হেমন্তকুমার সরকার, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতির রচনাবলী পড়লে মোহমুক্তি হতে দেরি হয় না। কিন্তু একদিকে গান্ধিবাদের তামসিক মাদকতা অন্য দিকে ১৯৩৫ সালে নিরুদ্দিষ্ট সুভাষচন্দ্রের সহসা প্রত্যাবর্তনের আশা বাঙালি হিন্দুর রাজনৈতিক কর্মপ্রয়াসকে দীর্ঘকাল আবিষ্ট রেখেছিল। তা ছাড়া শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবনের সাধনায় সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনার অলীক স্বপ্নও শিক্ষিত সমাজের একাংশকে মোহাবিষ্ট রেখেছিল। ইতিমধ্যে ইংরেজ কূটনীতিতে ভূতপূর্ব বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ও নব-বিজিত আসাম প্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, পূর্ব পাকিস্থান ও পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ পাঁচটিতে পরিণত হয়েছে। এ-বিষয়েও শৈলেন্দ্রকুমারের বিশ্লেষণ যথোপযুক্ত :—

"প্রশাসনিক প্রয়োজনে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে বাংলা-বিচ্ছিন্ন এক স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করায় বিদ্রোহ গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। তার ফলে ইংরেজ শাসকগণ পূর্ববিভাগ রদ করেন। কিন্তু দ্বিখণ্ডিত বাংলা ত্রিখণ্ডিত হয়ে বাঙালি হিন্দুর সম্মুখে এক অভিশাপ হয়ে দেখা দেয়। সদ্যসৃষ্ট আসাম এবং বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশদুটিতে তাদের পূর্ব প্রভাব জলবুদ্বুদের মতো শূন্যে মিলিয়ে যায় এবং নিজ গৃহে তারা হয়ে পড়ে পরবাসী। সমুদ্রমন্থনের ফলে হলাহল উঠল যথেষ্ট, অমৃত বিন্দুমাত্রও নয়।"

এখন ভৌগোলিক বাংলাদেশ ভারত ও পাকিস্থান নামে দুটি স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্রের অধীনে আছে। পাকিস্থানের অধীন সমস্ত বাংলাভাষী এলাকাটা পূর্ব-পাকিস্থান নামে একটিমাত্র অঙ্গরাজ্যে সংহত হয়ে আছে। কিন্তু ভারতের মধ্যে অবস্থিত বাংলাভাষী এলাকা প্রথম থেকেই দু ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে: পূর্ব পাকিস্থানের পশ্চিমে অবস্থিত বাংলাভাষী এলাকা এবং পূর্ব পাকিস্থানের পূর্বে অবস্থিত বাংলাভাষী এলাকা। পূর্ব পাকিস্থান ভারত থেকে অ-ভৌগোলিক ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক ভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ভারতের অন্তর্ভুক্ত বাংলাভাষী এলাকাও এই ভাবে বহু খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। পূর্ব পাকিস্থানের পশ্চিমে অবস্থিত বাংলাভাষী এলাকা পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার প্রদেশদুটিতে বিক্ষিপ্ত ভাবে আছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে ভারতের প্রদেশগুলির সীমারেখা পুনর্বিন্যাসের সময়ে এই বাংলাভাষী এলাকাকে অনায়াসে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে সংহতি দেওয়া যেত। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা দেওয়া হয়নি। পূর্ব পাকিস্থানের পূর্বে অবস্থিত বাংলা-ভাষী এলাকা ত্রিপুরা ও আসাম প্রদেশদুটিতে ছড়িয়ে আছে। প্রস্তাবিত পূর্বাচল প্রদেশে এই বাঙালীভাষী এলাকাকে অনায়াসে সংহত করা যেত। কিন্তু ১৯৬৯ সালেও তা করা হয়নি। তা ছাড়া আন্দামান ও

নিকোবার দ্বীপপুঞ্জদুটি পশ্চিম বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

স্বাধীন ভারতে বাঙালি হিন্দু সব চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হল। সুতরাং ভারতীয় ইউনিঅনের অধীন সমস্ত বাংলা-ভাষী এলাকাকে দ্রুত ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করা উচিত ছিল। কেন তা করা হয় নি, সে-সম্বন্ধে পরলোকগত বিখ্যাত নেতা সাতকড়িপতি রায় লিখেছেন :—

"১৯২১ সালে যখন নূতনভাবে কংগ্রেস গঠিত হইল, তখন কংগ্রেস প্রদেশ ভাষার ভিত্তিতেহইয়াছিল। বাংলার কথাই বলি। শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা আসাম প্রদেশের অন্তর্গত হইয়া ইংরাজ শাসনাধীনে ছিল। সিংভুম, মানভুম জেলা, বিহার প্রদেশের অন্তর্গত হইয়া ইংরাজ শাসনাধীনে ছিল। কিন্তু এই জেলাগুলি বাঙালি-অধ্যুষিত বলিয়া ১৯২১সালের বাংলা কংগ্রেস প্রদেশের অন্তর্গত হইয়াছিল। ইংরাজ চাতুরী করিয়া বাংলার হিন্দুর সংখ্যা কম করিবার জন্য গোয়ালপাড়া, শ্রীহট্ট ও কাছাড় আসামে এবং মানভুম ও সিংভুম বিহারে রাখিয়াছিল। তখনকার কংগ্রেস স্বীকার করিয়াছিল দেশ স্বাধীন হইলে ঐ সব প্রদেশ বাংলার অন্তর্গত হইবে। তাই ১৯২১ সালের বাংলা কংগ্রেস প্রদেশের ঐ জেলাগুলি অন্তর্গত হইয়াছিল।" স্বাধীনতা-লাভের পরে ১৯৫৬ সালে কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড কেমনভাবে পূর্ব প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন, তার বিবরণ দিয়ে সাতকড়ি বাবু লিখেছেন :—

পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস কর্তৃপক্ষগণ তাহাদের দাবি পেশ করিয়াছিল। শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ সিংভুম, মানভুম, সাঁওতাল পরগণার খানিকটা, পূর্ণিয়া জেলার খানিকটা, গোয়ালপাড়া ও কাছাড় জেলা দাবি করিয়া যে সকল অকাট্য প্রমাণ দিয়াছিলেন, তাহা বিবেচিত হইলে ঐ সমস্ত বাঙালি দ্বারা অধ্যুষিত স্থান পশ্চিম বাংলার অন্তর্গত না হইয়া যায় না। আর সব প্রদেশ ভাষার ভিত্তিতে গঠিত হইল। কিন্তু বাঙালির দুর্ভাগ্য বাংলার অংশ বাংলার সঙ্গে সংযুক্ত হইল না। কেবল মানভুমের পুরুলিয়া লইয়া সদর মহকুমাটি আসিল এবং পূর্ণিয়া জেলার সামান্য অংশ। তা থেকেও মহারাষ্ট্র ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় জামসেদপুরের টাটার সুবিধার জন্য খানিকটা ছেড়ে দিলেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে যখনই এই সব কথা বলিয়াছি, বাঙালি-অধ্যুষিত অংশ পশ্চিম বাংলায় আনার জন্য চেষ্টা করিতে বলিয়াছি, তখনই তিনি বলিয়াছেন, "ইহা প্রাদেশিকতা"। আমি কেবল ভাবিয়াছি এই সব শিক্ষিত পুরুষের চিন্তার ধারা এমন বিকৃত কেন? ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠিত হইতেছে এবং প্রদেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য ইহা অপরিহার্য। যে-সকল স্থান বাঙালি-অধ্যুষিত, তাহা পশ্চিম বাংলার মধ্যে আনিবার চেষ্টা প্রাদেশিকতা আখ্যা দিতে এই সব শিক্ষিত ব্যক্তি দ্বিধা করেন নি। ডাক্তার রায় বলিলেন, "আমি ও-সব পারবো না"। সুতরাং নেহেরু সাহেবের খেয়াল অনুসারে কাজ হইল"। (স্মৃতির টুকরো, প্রবাসী, মাঘ, ১৩৭৫)।

বর্তমানে ভারতে অবস্থিত বাঙালিদের কর্তব্য হচ্ছে ভারতের বাংলাভাষী সমস্ত অঞ্চলকে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্বাচল প্রদেশদুটিতে সংহত করা। বাঙালি হিন্দু নেতাদের আত্মঘাতী ঔদাসীন্য ও নির্বুদ্ধিতার জন্য আজ পর্যন্ত এ-কাজ সম্পন্ন হতে পারে নি। শ্যামাপ্রসাদ ১৯৩৭ সালে প্রথম পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ গঠনের পর থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত তার আয়তন বৃদ্ধির কোন চেষ্টা করেন নি। তিনি যে 'জনসংঘ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আজ তা ভারতে হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের সব চেয়ে বড় সমর্থক দল। ভারতের বাঙালিদের এখন কোন নেতা নেই। বিশেষ ক'রে বাঙালি হিন্দুরা সম্পূর্ণ নেতৃহীন এবং রাজনৈতিক দিক থেকে চেতনাবিহীন। শৈলেন্দ্রবাবু এই অবস্থা বর্ণনা ক'রে লিখেছেন :—

"পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের চাপে তাদের জীবন যখন দুর্বিষহ হয়ে উঠছিল, নেতারা তখন অন্ধকারের মধ্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন। সাম্প্রদায়িকতার আগুনে সংযুক্ত বাংলা যখন পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল, এখানকার হিন্দু নেতারা তখন মিলনের মধুর সঙ্গীতে আকাশ-বাতাস ভরিয়ে তুলছিলেন! সেই সময়ে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত স্থান থেকে ধ্বনি ওঠে—এ-পথ মরণের পথ, এ-পথে মুক্তি আসবে না। বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করো, আগুন আপনি নিভে যাবে। নেতাদের কাছে যখন আমরা এই প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হই, তরুণের বাচালতায় তাঁরা রুষ্ট হয়ে ওঠেন; জনসাধারণ স্তম্ভিত হয়ে যায়। সংবাদপত্রগুলি বঙ্গবিভাগের অনুকূলে কোন লেখা ছাপতে অস্বীকার করে।"

আজ এই বঙ্গবিভাগকে ভিত্তি ক'রেই ভারতের বাঙালিদের অগ্রসর হতে হবে। বঙ্গবিভাগকে অস্বীকার ক'রে বা চোখ-কান বুজে মুসলিমগরিষ্ঠ অবিভক্ত বঙ্গ গঠন ক'রে বসলে সমস্যার প্রতিকার হবে না বরং পুরোনো ভুলের পুনরাবৃত্তিই করা হবে।

ভারতে পূর্ণায়ত পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ণায়ত পূর্বাচল প্রদেশ দুটি গঠিত হবার পর বাঙালিকে ঐ দুটি প্রদেশের সমস্ত সরকারি ক্ষমতা করায়ত্ত করতে হবে। আজও পশ্চিম বঙ্গে সমস্ত সরকারি কাজে বাংলাভাষা ব্যবহৃত নয়। ত্রিপুরা রাজ্যে ইংরেজ আমলে বাংলা রাজভাষা ছিল; এখন সেখানে কেন্দ্রশাসিত এলাকা ব'লে হিন্দি রাষ্ট্রভাষা। এই সব দুঃসহ অবস্থার প্রতিকারের জন্যে এখন বাঙালিকে সর্বশক্তি নিযুক্ত করতে হবে। যে সব রাজনৈতিক দল এই প্রচেষ্টার অনুপযুক্ত, বাংলাদেশে তাদের স্থান যাতে না হয়, বাঙালিকে তা দেখতে হবে। এর জন্যে চাই দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাগামের মতো খাঁটি বাঙালি সংগঠন, কোন সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল বাঙালির পক্ষে বিষবৎ হবে।

পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্বাচল অঙ্গরাজ্যদুটিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পর ভারতের বাঙালির কর্তব্য হবে পূর্ববঙ্গ স্বাধীন রাষ্ট্র না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা।

পাকিস্তানের বাঙালিদের অর্থাৎ প্রধানত বাঙালি মুসলমানদের এখন একমাত্র কর্তব্য পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বঙ্গকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে একটি স্বাধীন বাঙালি রাষ্ট্র গঠন করা যার নাম হবে বাঙালিস্থান। তারা এ-কাজ করলে ভারতের বাঙালিদের মনে জোর আসবে, স্বাধীনতাস্পৃহা বৃদ্ধি পাবে এবং সব চেয়ে বড় কথা, পূর্ব বঙ্গের বাঙালি মুসলমানদের আন্তরিকতায় ও সদিচ্ছায় ভারতের বাঙালি হিন্দুদের বিশ্বাস ফিরে আসবে। আগে পূর্ববঙ্গ একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত না হলে ভারতের বাঙালিদের স্বাধীনতা লাভের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় বাঙালি মুসলমানরা পশ্চিম পাকিস্তানের শোষকদের কবল থেকে স্বায়ত্তশাসন চাইছে, এটা নিঃসন্দেহ। কিন্তু তারা প্রতিবেশী বাঙালি হিন্দুদের সম্বন্ধে সহানুভূতিশীল হয়েছে এটা উপযুক্ত প্রমাণসাপেক্ষ। তা প্রমাণিত হবার আগে বাঙালি হিন্দুদের উল্লসিত হবার অবকাশ নেই। স্বাধীন পূর্ববঙ্গে পশ্চিমপাকিস্তানিদের কর্তৃত্ববিমুক্ত অবস্থায় বাঙালি মুসলমান ঠিক কতটা বাঙালি আর কতটা মুসলমান হয় তা দেখে তবে অগ্রসর হওয়া বাঙালি হিন্দুর পক্ষে সঙ্গত হবে।

স্বাধীন ভৌগোলিক বাংলাদেশের ভাগ্য নির্ধারিত হবে পূর্ব বঙ্গের বাঙালি মুসলমান আর পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি হিন্দুর প্রচেষ্টার দ্বারা। যদি পূর্ববঙ্গ স্বাধীন হয়, তা হলে যথাসময়ে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্বাচল স্বাধীন হবে। ভবিষ্যতে ভৌগোলিক বাংলাদেশে তিনটি রাষ্ট্র দেখা যাচ্ছে; পশ্চিম বঙ্গ, পূর্ব বঙ্গ ও পূর্বাচল।

যতদিন মানবচেতনা ও মানবজীবন থেকে সম্প্রদায়-ভিত্তিক আচারমূলক ধর্মের প্রভাব সম্পূর্ণ দূরীভূত না হচ্ছে, ততদিন বাংলাদেশের পক্ষে অন্য কোন পরিকল্পনা অবাস্তব। ইউরোপে শতকরা প্রায় একশো জন শিক্ষিত লোকের দেশ হয়েও একভাষী তিনটি রাষ্ট্র শুল্কবিভাগীয় ঐক্য সত্ত্বেও কেবল রোমান ক্যাথলিক-প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মগত-বিরোধের জন্যে আলাদা হয়ে পাশাপাশি অবস্থিত: বেলজিঅম, নেদারল্যাণ্ড ও লুক্‌সেম্বুর্গ। সেই রকম আগামীকালের বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভূগোলে দেখা যাচ্ছে তিনটি একভাষী রাষ্ট্রকে যারা পরস্পরের মধ্যে পূর্ণ মৈত্রী ও শুল্কবিভাগীয় ঐক্য স্থাপন ক'রেও স্থায়ী ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার পেষণ এড়াবার জন্যে আলাদা থাকবে।

প্রথমে তিনটি স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের নিকট ভবিতব্য হলেও দূরতর ভবিষ্যতে যখন অধিকাংশ বাঙালির স্কন্ধ থেকে মস্কো ও পিকিঙের মতো মক্কার প্রভাব চলে যাবে বাঙালিরা নিজেদের আগে, মধ্যে ও পরে বাঙালি এবং মানুষ ব'লে অনুভব করবে, তখন সম্মিলিত জাতিসংঘে একটি অখণ্ড বাঙালি রাষ্ট্র দেখা দিতে পারে।

এর পর প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, কোন্ পথে পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্বাচলের মুক্তি আসবে? উত্তর দেওয়া বর্তমান নিবন্ধের লক্ষ্য নয়। বিশ্বভাষার পরিক্রমাকালে সেই পথের ইঙ্গিত বহুভাবে দেওয়া হয়েছে। বাঙালি যদি আত্মস্থ হয়, তবে তাকে সাহায্য করার জন্যে বহির্বিশ্ব নিশ্চয় এগিয়ে আসবে।

(সমাপ্ত)

— —

ছিটকিনিটা

অমরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী

রবিবারের বাজার থলেটা এমনিতেই একটু লেট করে আসে। তার উপর গৃহকর্ত্তার টেম্পারটা টেম্পারেট জোনে অবস্থান করলে তো কথাই নেই। বঁটিটার লোহার পাদানীতে ডান পা খানা চেপে ধরে আনাজ তরকারি কুটিকাটি করবার ফাঁকে ফাঁকে বিধু ঘোষের ছোট মেয়ের কেচ্ছা থেকে অপিস সুপারিনটেণ্ডেন্ট মল্লিক সাহেবের সদ্য প্রবর্ত্তিত হাস্যজনক আইন কানুনের অসতর্কতার শাস্তি পর্যন্ত পার্শ্বে উপবিষ্ট স্বামীর মুখ থেকে শুনতে হয় কুন্তলাদেবীকে। মৌটুষকী পাখি আর কি? সুদীর্ঘ ছয়টা দিনের স্তূপীকৃত সংবাদ পরিক্রমা এই একটা দিনেই শেষ করে দিতে হয় দুজনকে। সংসার অভিজ্ঞতার তরল পাত্রদ্বয়ের উঁচুনীচু লেভেলের সামঞ্জস্য রক্ষা করা। আসর জমে ওঠে। বিরাম চিহ্নের মাত্রাধিক্য ঘটে। অধিকাংশই ভাড়াটে বাড়ীর অন্তঃপুরিকাদের সরাসরি আভিজাত্য রক্ষক সম্মুখ দরজাটার কড়াটার জন্যই। ওর বালাই না থাকলে বা কি হোত? নড়বড়ে বাইরের দরজাটার ওটুকু আবরণ না থাকলেই সমস্ত ঝামেলা চুকে যেত কুন্তলা-দেবীর। কিন্তু উপায় নেই। ওর উপরে নেকনজর হয়তো বাড়ী-মালিকানার বিবেচনায় সুড়সুড়ি দেবে। অগত্যা সে চিন্তেটা সিকেয় তুলে রেখেছেন কুন্তলাদেবী।

—প্রিয়তোষ বাবু ঘরে আছেন? বেকুব দরজার কড়াটাই যেন তারস্বরে বেলেস্তারা করে।

বাঁধাকপির খোলাকটা মেঝের উপর ছুঁড়ে রেখে তড়িৎবেগে উঠে দাড়ান কুন্তলাদেবী। যতো হাভাতের আগমন শুধু কি এ বাড়িতেই? মাথায় কাপড়ের আঁচলটা তুলে দিয়ে ছিটকিনিটা খুলে দেন কুন্তলাদেবী।

—প্রিয়বাবু কি বাজার থেকে ফিরলেন? চক্ষুলজ্জার মাথায় ঘোল ঢালেন আগন্তুক।

—কিছুক্ষণ হোল। আপনি এখানে বসুন। আমি ডেকে দিচ্ছি। দ্রুত পদধূলি ফেলে ভেতর ঘরে চলে যান কুন্তলাদেবী। পাছে ফাঁসবন্ধ মেজাজের রজ্জুবন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে।

বাজার হিসেবে তালগোল পাকান মাথাটা দুহাতের ভাঁজে এলিয়ে দিব্যি আয়েস করে শুয়েছিলেন প্রিয়তোষ বাবু। চার পয়সার মূলো আর দুপয়সার ধনে পাতার বাজার হিসেব। খাবি খেয়েও ভাসতে হচ্ছে। হোক না বিশ বছর। সহধর্মিণীর কাছ থেকে বিধর্মী অপবাদটা আজ বিশ বছর বাদে পৌরুষত্বের দোরগোড়ায় এসে কড়া নাড়বে এটা তিনি চাননা।

—কে এল কুন্ত? স্তিমিত দেহটা ক্ষণিকের জন্য জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়।

—আমি চিনিনে। এ নিয়ে চারবার হোল। দেখ কোন্ মুখপোড়া আবার এসে জুটেছে। রাগের প্রকাশটা মুখপোড়ার কর্ণ পর্যন্ত না গিয়ে সম্মুখ দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরবার মত সুমার্জিত। মুখপোড়াকে নেহাৎ উঠতে হয়নি। উঠলেন প্রিয়তোষবাবু। খাটের তলা থেকে গোটাকয়েক এনামেলের বাটি বার করে সুভাষিণী ততক্ষণে 'নান্যঃ পন্থাঃ' অবলম্বন করেছেন।

যথাসময়ে আগন্তুকের কাছ থেকে স্বল্প সময়ের বিরতি নিয়ে স্ত্রীর সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন প্রিয়তোষ-বাবু বড়বাক্সের চাবীছড়াটা কিয়ৎক্ষণের জন্য আঁচল ছাড়া হোক। ভদ্রলোক তার সহকর্মী। ওর আপিসের একটা জরুরী কাগজ···। ওতেই চলবে। অঞ্চল প্রান্ত থেকে চাবীছড়াটা খুলে মেঝের উপর ছুঁড়ে দেন কুন্তলাদেবী।

বিলম্বের অজুহাতে বে-আক্কেলে লোকটার

জুতো পায়েই রান্নাঘরে ঢুকে পড়ার প্রতিনিবৃত্তি মূলক যথাযোগ্য ব্যবস্থা।

জরুরী ব্যাপারটা সর্বোত্তম উপায়ে সেরে নিতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। চাবীছড়াটার নিরাপত্তার জন্য তাই এগিয়ে আসেন প্রিয়োতোষবাবু।

—বুঝলে কুন্ত। এ টাকাটা যে কোনদিন ফেরত আসবে না সেটা আমিও জানি আর যাকে দিলেম তিনিও ঠিক জানেন। তবুও দিতে হোল। আগন্তুকের সলজ্জ ধন্যবাদে হোক কিংবা সহস্র আশীর্বাদে হোক সমস্ত ভয়কুণ্ঠা মন থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন প্রিয়তোষবাবু। নির্ভীক পদক্ষেপে এবার এগিয়ে আসেন জীবনসংগিনীর পাশে।

—টাকা! তুমি আবার টাকা দিলে কাকে?

মৌচাকে সবে ধোঁয়া লেগেছে। মৌমাছির খবর পরে হবে।

—আরে উনি মথুরবাবু। তুমি ঠিক চিনবে না। লিন্সে কোম্পানীতে একসময়ে ওর সাথে কাজ করেছি। ভদ্রলোক শুনেছি এখন কোথায় একটা ব্রিটিশ ফার্মে কাজ করেন। পয়সা কড়ি আমার চেয়ে বেশীই পান। বদনেশা যে কিছু আছে মনে হয় না। এতগুলো টাকা মাইনে কি করেন ভগবানই জানেন। ওর বাড়ীতে সেদিন ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন। মাসের মাত্র দশ তারিখ। এখনই যা দুর্গতি দেখলাম। দিতেই হোল কুড়িটা টাকা। নাহলে ছেলেমেয়েগুলো হয়তো না খেয়েই থাকবে।

আজ্জিগুলো মনগড়া নয়। চোখে দেখা। বর্ণনাতে বিরতি চিহ্ন বসিয়ে সন্দেহ ভাজন হবার কোন প্রয়োজন হয়নি। শ্রোতার কর্ণযন্ত্রের হ্যামার এনভিল তৎক্ষণে অস্বাভাবিক তালে ঠোকাঠুকি শুরু করে দিয়েছে।

—এর চেয়ে আমাকে একটা দড়ি কিনে দিলেও পারতে। তোমার যে কি হয়েছে কিছু বুঝিনা। মাসের মাইনে তো সবই শেষ করে এনেছ। গোটা দুটো সপ্তাহের গুষ্টির পিণ্ডির চিন্তেটা এখন আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নির্ভাবনায় দাবার আড্ডায় মহড়া জমাতে পারবে। আমি পারব না, ছাইপোড়া ঘরসংসারে ঘেন্না অশ্রুকষায়িত চক্ষুর্দ্বয়ের দ্রুত শয়নঘরে প্রস্থানই অক্ষমতার চরম নিদর্শন জানিয়ে গেল। এর পরে গুমড়ে থাকা শব্দ তরংগ আতশ বাজীর ফুলকির মতই টুকরো টুকরো, অসংলগ্ন মাত্র চল্লিশটা টাকা তিনি চুপিসারে রেখেছিলেন। সবকটা দিয়ে দিলেই ভালো হোত। তিনিও নিশ্চিন্ত, ইনিও নিশ্চিন্ত। একবেলা খাবার তো ছেড়েই দিয়েছেন, দ্বিতীয় বেলাটাও না হয় জল খেয়েই কাটাবেন। ভগবান এত লোককে চোখে দেখছেন, তাকেই শুধু দেখতে পাননা। তাহলে নিশ্চিন্তে দানছত্র চালানো যেত। নীপিতার তিন মাসের কলেজের মাইনে বাকি পড়ে আছে সেদিকে এতটুকু ভ্রূক্ষেপ নেই। বড় বালতির তলাটা খেয়ে ঝাঁঝরা হয়ে আছে, দশমিনিটও জল ভরে রাখা যায় না। কোলকাতা থেকে সতীশ পত্র দিয়েছে মণিকাকে নিয়ে এ মাসের শেষাশেষি আবার এসে জুটবে। ······ইত্যাদি ইত্যাদি।

এমতাবস্থায় ঘর ছেড়ে নিঃশব্দে কেটে পড়াটাই অভ্যাস করে নিয়েছেন প্রিয়তোষবাবু। তবে পদ্ধতিটা গুষ্টির পিণ্ডি সিদ্ধ হবার পরমুহূর্ত্তেই নির্বিঘ্নে সম্ভব হতে পারে, পূর্বমুহূর্ত্তে নয়। সসেমিরা প্রাপ্ত এ অবস্থায় বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা সমুচিত হবে না। সাঁতলানো তরকারিটা দ্বিতীয়বার উনুনে চড়ান দরকার। বিবেককে শূন্যে ঝুলিয়ে রংগমঞ্চে হোঁচট খেয়ে পুনরাগমন করেন প্রিয়তোষ বাবু। বিবেকের গলার ভলুম..মঞ্চের সুরটাকে পাল্টে দিতেও পারে।

—আহা তুমি এত ক্ষেপে গেলে কেন কুন্ত। আরও তো কুড়িটা টাকা রয়েছে। চাওয়ালা বুড়োর কাছেও পনেরটা টাকা পাচ্ছ, ও কবে জানি দেবে বলেছিল?

—ও আর দিয়েছে। আমার মরণ হলে যদি দেয়।

পটাশিয়ামের টুকরো। জলের সংস্পর্শ পেয়েও জ্বলেই উঠলো।

—পরশু দেবে বলে টাকাটা নিয়ে গেছে। আমার শ্রাদ্ধের সময় না এলে ওর পরশু কোনদিন হবে না। মানুষগুলো যে এমন নিমকহারাম হতে পারে জানতাম না। টাকা তো দিয়েই গেল না।

দিয়ে যায়নি। আক্ষেপ করছিলেন কুন্তলা দেবী। দোলায়িত ঘুন্টি চেপে কান ঝালাপালা ঘন্টাশব্দ থামাতে তৎপর হলেন প্রিয়তোষবাবু। অনন্ত-কাকার মুখেশোনা সংবাদটা তার স্মরণে এল। চা-ওয়ালার শারীরিক অবনতি ঘটেছে। হসপিটালে ওকে দেখেছেন নাকি অনন্তবাবু। কুন্তলাদেবীর বিশ্বাস-দরিয়ায় এরকম বহুবারই ডুব দেবার চেষ্টা করেছেন প্রিয়তোষবাবু। এযাবৎ তল খুঁজে আর পাননি। ভেসে ওঠাটাই মজ্জাগত স্বভাবে দাঁড়িয়েছে। অত দম তাকে সৃষ্টিকর্তা দেননি। অথচ ডুব না দিয়েও উপায় নেই। হাবুডুবু খেলেও দিতে হবে।

—আচ্ছা' এভাবে আমাকে সাজিয়ে বলে যেতে তোমার মুখে এতটুকু বাধেনা? কি পাপ হয় কোনদিন ভেবে দেখেছ?

সংসার মঞ্চে কমেডির একটুকরো তির্যক দৃষ্টি-পাত। সকলেই হাসে। কুন্তলাদেবীও হাসেন। না হেসে উপায় কি? স্বচক্ষে গতকালও লোকটাকে দেখেছেন কুন্তলাদেবী। স্বগৃহে বসেই। সুড়সুড় করে বাড়ীর পাশ দিয়ে এক পলকে কোথায় অন্তর্ধান হয়ে গেল। আজ তাকেই একজনে নির্বিবাদে হসপিটালের রোগী বানিয়ে দিলে।

—আমি সাজিয়ে বলিনি কুন্ত। সুতোকাটা ঘুড়ির মত পাক খেতে খেতে হাঁপ ছাড়েন প্রিয়তোষবাবু। অনন্তকাকার কথাটা আমার ঠিক মনে পড়ছে না। বুড়োর ছেলেপিলে কারও অসুখ হতে পারে। খাবি খেয়েও শেষ চেষ্টাটা করতে হচ্ছে। বিশ্বাস সাগরের তলদেশে পৌছালেন কি না সঠিক জানা গেল না। আর সেটা জানতে দিতেও কুন্তলাদেবী নারাজ। শত হলেও পুরুষমানুষতো, হয়তো মনে দুঃখ পাবেন।

—যাক্ তোমার সাথে অগড় বগড় বকে আর গলাব্যথা করতে চাই না। কোথায় বেরোবে বলেছিলে। বেরোও। দরকারটা একটু তাড়াতাড়ি সেরেই এসো। নাহলে বেলা দুপহরের আগে দুটো গিলতে পারব না। কেঁচে গণ্ডুষ আর করতে চাইছেন না কুন্তলাদেবী। দরজার ছিট্-কিনিটা তখন হয়তো খুলে রাখা হয়নি। খোলা থাকলে লোকটা হয়তো আসতো। ছিট্কিনিটা গুষ্টির পিণ্ডির ভাবনায় আধিভৌতিক জ্বালাগুলো ভুলে যান কুন্তলাদেবী। ধাড়ি মেয়ে-টাকে দিয়ে কুটো গাছটি কাটবার উপায় নেই। আর করতে গেলেও এটা ভেঙ্গে ওটা ফেলে একাকার করে রাখবে। হারামজাদা ছেলেটা সেই সাত সকালে দুটো মুখে গুঁজে বেরিয়ে গেছে। পেটে টান পড়ার আগে আর এমুখো হবে না। যথাসময়ে খাবার তৈরী না দেখলে মুখে চিতের আগুন জ্বেলে তবে নিষ্কৃতি।

—তুই ওখানে কী করছিস? বাষ্পরুদ্ধ গলার আড়ষ্টতা কাটিয়ে নিজ মেয়েকে জিজ্ঞাসা করেন কুন্তলাদেবী।

—দেখনা একটা ভিকিরী কখন থেকে বসে আছে। পড়ার ঘরে আর টিকতে দিলে না। বিরক্তির রোদতাপ মেয়েটিরও চোখে মুখে।

—কি অলুক্ষণে মেয়ে দেখ। রেশনের চালটা সবে এনে রেখেছে, অমনি ওটাতে হাত। কেন তোদের ভাড়ারে হাঁড়িতে কী ভিক্ষের চালটুকুও অবশিষ্ট নেই। বুদ্ধিশুদ্ধি কবে যে হবে···।

গলার স্বরের বিষটুকু মেয়ের গলাতে নিশ্চয় নিক্ষিপ্ত হয়নি। হামেশাই এটাকে স্বভাবসিদ্ধ জেনে এসেছে মেয়েটি।

—Oh, extremely sorry, I was going to do a great wrong হাতের চালমুঠোকে যথাস্থানে রেখে শূন্য ডিসটা হাতে এক অপূর্ব দেহ-ভংগী করে ভাড়ার ঘরের দিকে পা বাড়ায় নৃত্য-পটীয়সী। মায়ের ব্যবহারের হরিতকী তেঁতো হলেও মুখসিদ্ধি অর্থাৎ সংসার সিদ্ধিতে নাকি ভারি পয়মন্ত। মায়ের মুখে এরকমই শুনে থাকে মেয়েটি।

—অগভীর জলে সফরী ফরফরায়তে। ভাগ্যিস কোনদিন কলেজে পড়িনি। তোদের মত নভেলিয়ানা দেখলে আমাদের শ্বশুর-ভাসুরেরা এতদিনে কবে চুলের মুঠো ধরে পাছদরজার বার-করে দিতেন।

মেয়ের গমনপথের দিকে বাক্যসুধা বর্ষণ করে নিজকাজে ফিরে আসেন কুন্তলাদেবী। নাবিকের দিগদর্শন যন্ত্রের কাঁটার মতই। দশপাক খাবার পরেও উত্তরে রান্নাঘর আর দক্ষিণে ভাড়ার ঘর।

সংসারের সর্বময় কর্ত্রী তিনি। তা হোক। তবুও পরপ্রত্যাশায় থেকে দুদণ্ড জিরিয়ে নেবার উপায় তাঁর নেই।

শীতের সকালী সূর্যদেব বেলা দশটার সময়ও ম্যাজম্যাজে শরীরে বসে থাকেন। বেলাটা সঠিক বুঝবার উপায় নেই। উনুনে ভাতটা ফুটে গেছে। হাতা দিয়ে কয়েকটা ফুটন্ত ভাত তুলে মাজ পরীক্ষা করেন কুন্তলাদেবী। নতুন চালের ভাত। একটু বেশী ফুটে গেলে কর্তার খেতে অসুবিধে হবে।

ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্। দরজার কড়াটা কে যেন আবার অবিশ্রান্ত পিটিয়ে চলেছে। আর তার চেয়েও অধিকতর উচ্চ শব্দে 'মা মা' চীৎকার। বিলম্বের ধৈর্য নেই আগন্তুকের। দিগ্বিজয় করে ফিরে এলেন কেউ। তিতি বিরক্ত হয়ে যান কুন্তলাদেবী। ভাতের মাড় গালতে গিয়ে কিছুটা সুতপ্ত মাড় হাতের উপর ছিটকে পড়ে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে।—নীপা, এই নীপা। কানের মাথা কি খেয়েছিস না কি? ওটা আবার চীৎকার ক'রে মরছে কেন দেখ। সুযোগ বুঝে একখানা মোটারকমের কেতাব খুলে বসে মেয়েটি। সীমাহীন বিরক্তি ঘটাবার কারণে বাঁদর ছোট ভাইটির পিঠে দুগার ঘা পড়ুক, এটাই বোধ হয় মনে মনে প্রার্থনা করছিল নীপিতা। পরীক্ষার অজুহাতে একেই তিনি ধোয়া তুলসী, উপরন্তু হাতে পাঁজি—হাতে পাঁজি মংগলবার। অতএব তার রেহাই সুনিশ্চিত।

কুন্তলাদেবীকেই উঠতে হোল। বিদ্যুদ্‌বেগে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে ছিটকিনিটা খুলে দেন তিনি।—মরণ হলেও বাঁচি। কী, কী হয়েছে তোর। ম্যা ম্যা করে চীৎকার তুলে মরছিস কেন পাজী কোথাকার।

—জান মা আমি না রানে ফার্ষ্ট আর হাইজাম্পে সেকেণ্ড। আর এক ইঞ্চি হলে হাইজাম্পে ঠিক মেরে দিতাম। সুদীর্ঘ সময়ের চেপে রাখা সুসংবাদটি রানের মতই সাঁই সাঁই দমে ঝেড়ে ফেলে দিগ্বিজয়ী বীর। কিন্তু বৃথা। এতবড় সুসংবাদও নিমেষে কালির ছোপ বসিয়ে দেয় শ্রোতার চোখে মুখে।

—রাখ তোর হাইজাম্প। পড়ার বই এর কি ছেলেরে বাবা। একটা ময়লা গেঞ্জি গায়ে ফেলে সেই সকাল থেকে চাষার ছেলের মত মাঠ-ঘাট চষে বেড়াচ্ছে। একটু লজ্জা-সরমের বালাই নেই।

—হুঁ গেঞ্জি পরে স্পোর্টসে গেছি বুঝি। নীল শার্টটা পরে গিয়েছি। প্রেষ্টিজের শিথিল বন্ধন দুহাতে আঁকড়ে ধরে দিগ্বিজয়ী বীর। মায়ের সন্দেহটাকে তুড়ি মেরে সগর্বে উড়িয়ে দেয়।

—শার্টটা আবার কোথায় ফেলে এসেছিস? অধৈর্য প্রশ্নে জানতে চান কুন্তলা দেবী।

ছেঁড়া জামা কেউ পরে নাকি? দিয়ে দিয়েছি। অবিচলিত সংক্ষিপ্ত জবাবে মীমাংসা করে দেয় অকৃতাপরাধ দিগ্বিজয়ী।

তপ্ত তেলে জলের ফোঁটা আর কি? একমাসও হয়নি জামাটাকে কিনে দেওয়া হয়েছে। তাকে বলে কিনা ছেঁড়া। অস্ত্রহীন যুদ্ধে আহ্বান জানানো হোল দিগ্বিজয়ী বীরকে। জেরা সুরু হোল। ছিঁড়ল কি করে? কাকে দিয়েছে? কালকে কি পরে স্কুলে যাবে?.........ইত্যাদি। সুযোগ মত অজেয় মহাস্ত্রটি নিক্ষেপ করে দিগ্বিজয়ী। কান্না জুড়ে দেয়। অব্যর্থ এই অস্ত্রটি তার দিগ্বিজয়ে প্রায়শই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।—হুঁ হাইজাম্পে দড়িতে বেঁধে জামাটা ছিঁড়ে গেল। আমি কী ইচ্ছে করে ছিঁড়েছি নাকি?

অস্ত্র সংবরণ করে নিতে বাধ্য হলেন কুন্তলাদেবী। দরজার কড়াটা আবার কে যেন বিরামহীন ঠুকে চলেছে। অপাংগ ইংগিতে ছেলের বিচারের রায় আপাততঃ স্থগিত রাখে কুন্তলাদেবী। রোষসিক্ত মুখের বহিঃপ্রকাশগুলোকে কাপড়ের আঁচলে ঢেকে ছিটকিনিটা খুলে দেন তিনি।

—আচ্ছা এটা কী মিঃ সেনগুপ্তের বাড়ী?

—হ্যাঁ, আপনার কি দরকার?

—আপনি মানে কাইণ্ডলি তাঁকে একটু ডেকে দিননা।

—তিনি বাড়ী নেই।

—বাড়ী নেই। তবে যে তিনি বললেন......।

—তাতে আর কি। আপনার কি প্রয়োজন আমাকে বলতে পারেন। ভদ্রবেশীকে আশ্বস্ত করেন কুন্তলাদেবী।

টিউশানির কথা বলেছিলেন। আতালি পাতালি করেন ভদ্রবেশী।

—টিউশানি? কোথায়? আমার বাড়ী?

না না আপনার বাড়ীতে নয়। সলজ্জ হাসেন ভদ্রবেশী। আপনার বাড়ীতে প্রাইভেট টিউটর আছেন সেটা আমি সেনগুপ্তবাবুর মুখে শুনেছি। এটা হয়তো অন্য কোথাও হবে।

টিউশানমুখোর কথাটা স্বামীশ্রদ্ধার তুলাদণ্ডে কিছু ওজন বাড়িয়ে দেয়নি বলাই বাহুল্য। 'বাইরে কোঁচার পত্তন ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন।' অসোয়াস্তি বোধ করেন কুন্তলাদেবী। স্বামী শুধু তাকেই বানিয়ে কথা বলেনা। নিজের দুর্ভাগ্য ঢাকা দেবার মিথ্যে বুলি আরও পাঁচজন বাইরের লোকের কানে নির্বিবাদে তুলে ধরেন! তবু স্ত্রী হয়ে তার অমর্যাদা করতে বিবেক বাধে কুন্তলাদেবীর। পরিবেশ-টাকে সহজেই স্বাভাবিক করে নেন। এর পর অনেক কথাই হোল! অনেক দুর্ভাগ্যের কথাই জানালেন টিউশানমুখো। বি-এস-সি ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। সম্প্রতি পিতৃহীন হওয়াতে একে-বারে নিঃসম্বল। একটা টিউশান না হোলে পড়া-শোনা ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নেই। ......ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্বামীর হাতযশের ডায়েরী তন্নতন্ন করে খুঁজে কতকগুলো জিরো ছাড়া আর কোন সংখ্যাই দেখতে পাননা কুন্তলাদেবী। টিউশানমুখো হয়ে এ লোকটা বারংবার তার দরজায় এসে কড়া নাড়বে, সেটাও বড্ড বিচ্ছিরি মনে হল। এক্ষুনি কিছু একটা ফয়সালা করে ফেলবার জন্য কৃতসংকল্প হলেন কুন্তলাদেবী। জানিয়ে দিলেন এ বাড়ীর মাষ্টার মাস দুয়েকের ছুটি মঞ্জুর করে নিয়েছেন। তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে আপাততঃ এখানেইটিউশান-মুখো তার বিদ্যে ফলাতে পারেন। বাঁদর ছেলেটা না হলে এ দুমাসে হনুমান সেজে কিস্কিন্ধ্যা কাণ্ড সমাপ্ত করে রাখবে। স্বভাবসিদ্ধ গলাতেই অনভি-প্রেত পূর্ব প্রস্তাবটার সামঞ্জস্যও রাখতে হয় কুন্তলাদেবীকে। যাই হোক, কিস্কিন্ধ্যা কাণ্ডের ফর্মুলাটা সত্বর নির্মূল করে দেবার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে বিদায় নিলেন টিউশানমুখো। অসময়ে বিরক্তি ঘটাবার জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করে গেলেন।

সেরে নিয়েছে দিগ্বিজয়ী বীর। ঘড়িটা আজকাল বড্ড স্লো যাচ্ছে, এরকম একটা মন্তব্য পেশ করে খাবার বারান্দায় আসন পেতে বসে পড়ে। থালায় পরিবেশিত খাদ্যদ্রব্যের নমুনা দেখে তার চক্ষুস্থির। কতকগুলো ছাইপাশ দিয়ে ভাত খাওয়া তার অসম্ভব। দুধ দিতে হবে। লৌকিকতার চায়ের জলের রং পাল্টাতে একপোয়া দুধ এ বাড়ীতে নিত্য আসে। মাছ নেই, তরকারি ঝাল ইত্যাদি অজুহাতে মাঝে মাঝে উক্ত একপোয়ায় বাড়ীর ছোট ছেলের দাবী জানায় দিগ্বিজয়ী বীর। ইতি-পূর্বে ড্যাবড্যাবে চোখী অনাহূত একটা চারপেয়ে প্রাণীও সেরকম কিছু একটা দাবী নিয়ে এসেছিল। মায়ের চোখকে বিশ্বাস না করলেও মেয়ের চোখকে সে বরাবরই শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছে। আজকে কেন জানি মেয়ের চোখদুটোও বিশ্বাসঘাতকতা করে বসল। একটা ভাংগা ঝাটার আঘাত খেয়ে ক্ষুন্নমনে পালিয়ে গেছে ড্যাবড্যাবে চোখী। তা হোলই বা। বেড়ালে মুখ দিয়েছে ওতে কিছু এসে যায় না। তরুর ওতে আপত্তি নেই। মা যতো অনাসৃষ্টি বাধিয়ে দিলেন। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ মারফৎ নানা তর্জন গর্জনের সমাহার ছড়াতে ছড়াতে খাবার ফেলে উঠে যায় দিগ্বিজয়ী বীর। প্রসন্নমনে ভাতের থালাটা তুলে রাখেন কুন্তলা দেবী। পেটে টান পড়লে আপনি এসে খাবে, এরকম "একটা প্রিন্সিপলের" উপর ভিত্তি করে থাকা নাকি অধিকতর নিরাপদ-জনক।

দিনমণি মাথায় এসে পৌছাবার পূর্বেই দাবার ঘুটির শেষ চালটা সেরে নেন প্রিয়তোষবাবু। বেলা বাড়লে দাবার ঘুটির সংসার আবার বিপথগামী হবে। আর তার আক্কেল সেলামী দিতে হবে চর্বতে চর্বণে কিংবা অর্ধভুক্ত অন্নপাত্র বর্জনে। বিশ বছরের ঘরসংসারে বহু বিশবার যেটা হয়ে এসেছে। ঘরে ফিরে দেখতে পান ছেলেমেয়ে-দুটোর একটিও ঘরে নেই। শীতের রবিবার। গায়ে পিঠে ভাল করে একটু সরষের তেল ঘষিয়ে নেবেন তা আর হচ্ছেনা। ছেলেটি সাধারণতঃ এসবের ধারে কাছে আসে না। 'হাত ব্যথা' কখনও 'ঘুম পাচ্ছে'। এক আধটু আবদার মেটাবার প্রতিশ্রুতিতে মেয়েটিকে দিয়ে কিছু

পুরণো রেকর্ডখানা নিত্যপ্রথামত বাজিয়ে শোনান কুন্তলাদেবী। দিনে দিনে বড্ড বেয়াড়া হয়ে উঠেছে। পাতে মাছ দেখতে না পেয়ে নবাব-পুত্তুর থালা ফেলে উঠে গেছিলেন। রেডিও-গ্রামের শেষের রেকর্ডখানা কেমন একটু বেসুরে মনে হল প্রিয়তোষবাবুর।…প্রতিবেশী নৃপেনবাবুর মেজবৌর ছেলের মুখে ভাত। নৃপেনবাবুর স্ত্রী এসেছিলেন। এবেলা ওখানেই খাবে বলে তরু আর নীপাকে নিয়ে গেছেন।

নৃপেনবাবুর দলও এসময়েই এসে থাকেন। দেয়ালে ঝোলানো ক্যালেণ্ডারের পাতায় চোখ বোলান প্রিয়তোষবাবু। না, মাসটা ফেব্রুয়ারী নয়।

স্নানপর্ব সংক্ষিপ্ত উপচারে সেরে নেন প্রিয়তোষবাবু। খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করে আষাঢ়ে গল্পের দ্বিতীয় আসরের ব্যবস্থা করছিলেন কুন্তলাদেবী। একঝলক ফিকে হাসিতে দ্বিতীয় আসরের উদ্বোধন হোল। হাসছিলেন কুন্তলাদেবী।—সারাদিন দরবার আর দরবার। মুখে মাথায় কাকের বাসা। আরও কিছুদিন ওগুলো থাকলে উকুন পড়বে। আকর্ণ-বিস্তৃত কাঁচা পাকা চুল আর খোঁচা খোঁচা দাড়িতে খড়কুটোর এলোপাতাড়ি কাকের বাসাই তৈরী করেছিলেন প্রিয়তোষবাবু। 'কাটি কাটি' করেও কাটা আর হয়নি। দাবার ঘুটির ভাবনাতেও হতে পারে। একখানা কড়কড়ে এক টাকার নোট এত শীঘ্র সেলুন মালিকের হাতে তুলে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল না।—আচ্ছা তোমাদের আপিসে সবাই কি এরকম বেশে যায়? জানতে চান কুন্তলাদেবী। সকলে যায় কিনা সঠিক জানেন না প্রিয়তোষবাবু। কেউ কেউ যায়। তবে হ্যাঁ ফিরবার পথে সকলে একই বেশে ফেরে না। উর্দিবেল্ট পরা দরজার পাশের লোকগুলো যাদের দেখতে পেলে তিন ইঞ্চি বক্ষপ্রসারণ করে দাঁড়ায়। সাহাব, সদাব্যস্ত সব সময়। সেভিংটা আপিস-রুমেই সেরে নিতে হয়। দাবার ঘুটির দরবার তাদের জন্য নয়। দাবার ঘুটির আদালতে হাবুডুবু খেতেও হয়না। এসব কথা মেয়ে মানুষকে বুঝিয়ে কিছু লাভ নেই। আত্মপ্রসাদ পেতে চেষ্টা করেন প্রিয়তোষবাবু। কোন সদুত্তর না দিতে পেরে বি-কম সেকেণ্ড ক্লাস পেয়েছে। যাহোক একটা চাকরী-বাকরী জুটিয়ে নিতে পারবে। বুড়োবাপ অখিলবাবু এবার গংগাস্নান করে নেবেন। সুব্রত-প্রসংগে অখিল হালদারের ছোট ছেলের চিন্তেটা তীব্র বিতৃষ্ণা এনে দেয় কুন্তলাদেবীকে। সুব্রতের মত ছেলের ভাই হয়েও কী রকম অসভ্য মুখরা। যাকে যা মুখে আসে বলে যায়। বিচারবুদ্ধি কিছু নেই একেবারে। মারও খায় তেমনি। বাপ যেদিন ধরবেন একেবারে আধমড়া করে ছাড়েন। কোথায় হরিদ্বার আর কোথায়…… কি জানি একটা উপমা ব্যবহার করতে চাইছিলেন কুন্তলাদেবী। স্বামীর মুখাবলোকন করে ওখানেই ইতি করলেন। প্রিয়তোষবাবুর খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। পাতে একমুঠো ভাত পড়ে রইল। ওচুটো ভাত আবার কারও বেশী হয় নাকি? আপত্তি তুলেছিলেন কুন্তলাদেবী। ভাত মুঠো স্ত্রীর পাতে তুলে দিয়ে পেটে হাত বোলান প্রিয়তোষবাবু। ঢের খাওয়া হয়ে গেছে।

ছিটেফোঁটা পলিটিকসের গন্ধও কখনো-সখনো এ আসরের বাতাসে আনাগোনা করে। দেশনেতাদের কথা। নাক সিঁটকে নেন কুন্তলাদেবী।—রাখ তোমাদের দেশনেতাদের বাহাদুরি। পেটে দুমুঠো বরাদ্দ চাল দিচ্ছে রেশনে তারও অর্দ্ধেক কাঁকড় পাথর হাবিজাবি। 'যত ছিল নড়াবুনে হল সব কেত্তুনে।' অভিযোগ তোলেন কুন্তলাদেবী। নাড়াবুনেদের গালভরা বুলির ফেনা যে কত অন্তঃসারহীন এগৃহের সর্বময় কর্ত্রীটি প্রতি পদেপদেই সেটা টের পান। গোয়ালার ল্যাক্টোমিটার ডেনসিটির দাগমাত্রা নিত্যই অদল-বদল হচ্ছে। চারপয়সায় দুদিন আগেও এই এতগুলো গরম মশলা নিয়ে আসতো তরু। এখন চারপয়সার মশলা আনতে দিলে অমনি পয়সাটা ছুঁড়ে ফেলে দেবে। দোকানীর মুখ খিঁচুনি শুনতে সে নারাজ। নয়নপুর না কোথায় ক্ষুধার তাড়নায় পেটের সন্তানকে আছড়ে মেরে ফেলছে অভাগী মা। আজকের কাগজেই তো দেখলেন মনে পড়ছে। পাশের বাড়ীর দিদিও সেদিন বলেছিলেন তারাতলায় তার বাপের বাড়ীর কাছে কোন্ একভদ্রলোকের বাড়ীতে দিনেদুপুরে ষণ্ডামার্কা

বেইজ্জুতি করে সোনাদানা ছিনতাই করে নিয়ে গেছে। এইতো দেশের অবস্থা। আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কিছু এসে যায় না। এ তথ্যটা ভালই বোঝেন কুন্তলাদেবী। তবুও অগাকান্ত এসব দেশনেতাদের মুখে পোড়া ঘুটের ছাই আর কেরোসিন তেল ঢেলে অগ্নিসংযোগ করবার সদিচ্ছাটা তিনি এরকম যে কোন আসরেই নির্ভয়ে প্রকাশ করে থাকেন। ডি আই রুলের কথাটা মনে পড়লেও।

কথায় কথায় টিউশানমুখো হাভাতে লোকটার কথাও বাদ যায় না। যার তার কাছে টিউশানি চেয়ে বেড়ায়। বি-এস্-সি পরীক্ষা দেবে না কি ছাই করবে। সে চিন্তেটা ঢেঁড়া পিটিয়ে আরও পাঁচজনের মগজে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। সেটিকে একটি স্বল্পস্থায়ী বন্দোবস্ত করে দেয়া হয়েছে। যতো আপদ আর কি। বলছিলেন কুন্তলাদেবী। কথাটা শ্রোতার বোধশক্তিতে বোধ হয় বিস্ময় চিহ্ন এঁকে দিল। দিনকয়েক পূর্বেও ভিক্ষাপ্রার্থী কোথাকার একটা জঞ্জাল মেয়েকে কি মতলবে জানি রেখে দিয়েছিলেন কুন্তলাদেবী। গতর আছে যখন ভিক্ষে না করে খেটে খেলেও পার বাছা—এরকম কি জানি সুমন্ত্রও দিয়েছিলেন। কিন্তু দিন তিনেক বাদে বাজার করতে দেয়া পয়সা কটি নিয়ে ব্যাজারমুখো আর ফিরে আসেনি। এ বাড়ীর 'মা'র যা তেতোবুলি তাতে ঘরের মেয়েই মাঝে মাঝে ঘরছাড়া হয়ে থাকে, পরের মেয়ের আর দোষ কি? প্রতিবেশী দিদিরা আড়ালে-আবডালে এরকমই কিছু বলাবলি করেছিলেন। মারেন যিনি রাখেনও তিনি অথবা চিন্তা নেই যার তিনিই চিন্তামণি। ভাবছিলেন প্রিয়তোষবাবু। সুতরাং প্রতিবাদ তার বে-এক্তিয়ারে, অবিবেচনা প্রসূত। তবু ভাবতে হয়। চার পয়সার মূলো আর দু পয়সার ধনে পাতার বাজার হিসেবের জন্যই ভাবতে হয়। পুরণো রেকর্ডগুলো না হলে এ বাড়ীতে কোনদিন পুরণো হবে না। দাতাকর্ণ ছেলেটি নূতন জামাটাকে কাকে দান করে এসেছেন। কি পরে কাল যে আবার স্কুলে যাবে ঠিক নেই। নীপিতার তিন মাসের কলেজের মাইনে বাকী। কোলকাতা থেকে ছোট ঠাকুরপো পত্র দিয়েছে এ মাসের শেষাশেষি মুখে ভাতে ওদের খেতে নিয়ে গেল। দুচার টাকার যাহোক কিছু কিনে দিতে হবে। চুল দাড়ি কেটে আর দরকার নেই। দরজার ছিট্‌কিনিটা খুলে দেবার দরকার। কে জানি আবার বেধড়কে পেটিয়ে যাচ্ছে। উঠতে হোল প্রিয়তোষবাবুকে।

ডাকপিয়ন। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে স্থান পেয়েছেন শ্রীমতী কুন্তলা সেনগুপ্তা। মণিঅর্ডার আর পোষ্ট-কার্ড। কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হস্তে পোষ্টকার্ডখানাই তুলে নেন প্রিয়তোষবাবু। দ্বিতীয় কাজটাতে ডাক-দূতের আপত্তি। হোলই বা স্বামী। যিনি পাঠাচ্ছেন তারই বিশ্বাস নেই তবে আর ডাকদূতের দোষ কি?

পূজনীয়া কুন্তলাদি,

প্রায় এগার বছর বাদে পত্রালাপ করছি। আপনারা যে শ্যামবাজার ছেড়ে কোথায় চলে গেলেন সঠিক জানতাম না। সেদিন ঠিকানা সংগ্রহ করে ৪০ টাকা মণিঅর্ডারযোগে পাঠালাম। আসলটাই শুধু। সত্যি সেদিন মৃত্যু পথযাত্রী স্বামীকে বাঁচাবার জন্য যে ঋণ আমি করেছিলাম তার সুদ হিসেব করে আজ আর লজ্জা পেতে চাই না। সময় পেলেই একবার দেখা কোরব।

রেণুকা

পুঃ—একটা কথা চিন্তা করে পত্র সমাপ্তি রেখা কাটতে হচ্ছে। ভাবছিলাম পত্রে প্রদত্ত ঠিকানাতে টাকাটা আবার ফেরৎ না আসে। আজকে আমার দুটো ছেলেই সমর্থ। অভাব বলতে হয়তো তেমন কিছু নেই। এ টাকাটা না পাঠিয়ে সোয়াস্তিও পাচ্ছিলাম না। কিছু অশোভন হলে মার্জনা করবেন।

মৌন দৃষ্টিটা পত্র থেকে তুলে দু'পা এগিয়ে আসেন প্রিয়তোষবাবু। —কুন্ত, তোমার নামে কে একটা মনি অর্ডার করেছে।

বিহ্বল চেতনায় মুহূর্ত্তকাল স্বামীকে পর্যবেক্ষণ করে অপেক্ষমাণ পত্রবাহকের কাগজে প্রাপ্তি-স্বীকার জানিয়ে টাকা কয়টি নিয়ে চলে আসেন কুন্তলাদেবী।

—এভাবে আমার কত টাকাই যে তুমি সরিয়েছ তার ঠিক আছে? ম্লান হেসে পত্রখানা স্ত্রীর হাতে এগিয়ে দেন প্রিয়তোষবাব।

হোল তো। কৃত্রিম কুপিত হস্তে টাকাগুলো স্বামীর দিকে ছুঁড়ে দেন কুন্তলাদেবী।

দিগ্‌বলয়ে অবাক করা শিশুচক্ষে তাকিয়ে ছিলেন প্রিয়তোষবাবু তার বিশবছরের জীবন-সংগিনীর দিকে। খোলা দরজাটা হঠাৎ নজরে পড়ায় কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেন।

ডাকপিয়ন চলে গেছে। ভাড়াটে বাড়ীর অন্তঃপুরিকাদের আবরু রক্ষক সম্মুখ দরজাটা সটান খোলা রয়েছে। রংচটা ছিট্‌কিনিটা চিড় ধরা ওপাশের কপাটের আড়ালে। রোষাঙ্কিত কোন রমণী হস্তের বারংবার টানা হেঁচড়াতেও অক্ষত হয়েই ঝুলছে। ছিটকিনিটা আজ আর আটকে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল না প্রিয়তোষবাবুর। পৃথিবীর কৌতূহলী দৃষ্টিগুলো এই অবগুণ্ঠনের জন্যই অন্তঃপুরবাসিনীর অন্তর প্রদেশের কোন খোঁজই রাখতে পারেনি। দরজাটা খোলাই রইল। দমকা বাতাস এপথে শুধু ধুলোবালি ছড়াতেই আসেনা, শীতার্ত দেহটিতে রোদের আমেজটুকু কখনো কখনো দিয়ে যায়। হয়তো, চার পয়সার মূলো আর দুপয়সার ধনেপাতার বাজার হিসেব বাড়াতে আসে। মেলাতেও আসে।

বাংলা ভাষা

বেলা দেবী

যেদিন-প্রথম সূর্যের আলো পড়েছিল আমার দুচোখে
বাতাস প্রথম দিল সঞ্চারি নিঃশ্বাস বায়ু বুকে
মাতৃস্তন্যে ভিজিয়ে রসনা
যে ভাষায় উচ্চারণ করেছি প্রথম শব্দ—'মা'
সে ভাষা বাংলা ভাষা, সে ভাষা আমার

বর্ণে বর্ণে মধুক্ষরা, গৌরব শ্যাম বাংলার।
আমার সমস্ত রক্তে স্পন্দন জাগায়
সমস্ত চেতনা ভরে স্নিগ্ধ স্পর্শে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়
কোন্ বাণী কোন্ সুর কোন্ সে সঙ্গীত
কোন্ ইতিহাসে ভরা মুখর অতীত
অমিয় নিমাই বাণী, কাশীদাস কবি কৃত্তিবাস
অন্নদামঙ্গল কাব্য বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস
যে ভাষার কাকলিতে তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে তোলে
অমৃত ঝঙ্কার
সে ভাষা বাংলাভাষা সে ভাষা আমার।

যখন অসহ্য সুখে কণ্ঠে জাগে পুলক উচ্ছ্বাস
কিংবা যন্ত্রণার আর্তি যখন প্রকাশ
মধুমাসে মধুরাতে অনুরাগে প্রিয়া সম্ভাষণ
গভীর মমতা দিয়ে যখনই যা করি উচ্চারণ
প্রাণের সম্পদ সে যে বর্ণে বর্ণে মধুক্ষরা ভাষা
আমার চোখের আলো, সে আমার নম্র ভালবাসা
সমস্ত সত্তা দিয়ে অহরহ যার স্পর্শ পাই
যাকে অস্বীকার করে আমার অস্তিত্ব কিছু নাই
যে ভাষায় বিশ্বকবি অঞ্জলি অঞ্জলি আলো
পৃথিবীকে দিল উপহার
সে ভাষা বাংলা ভাষা, সে ভাষা আমার॥

স্বাস্থ্য, শ্রম ও উৎপাদন

শ্রীননী ভট্টাচার্য্য

স্বাস্থ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

প্রত্যেক মানুষেরই জাতি ধর্ম নির্বিশেষে কতকগুলি সমস্যা থাকে যা, ভৌগোলিক সীমা, আবহাওয়া বা আচার-বিচারের উপর নির্ভর করে না। বিশেষকরে স্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যাগুলির রূপ প্রত্যেক দেশেই প্রায় এক প্রকার। এই উপলব্ধির উপর নির্ভর করেই ১৯৪৮ সালের ৭ই এপ্রিল জেনেভাতে বিশ্বের প্রায় সব জাতি মিলিত হয়ে 'বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এই সংস্থার উদ্যোগে প্রতিবছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই দিনটি 'বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস' রূপে উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে।

বিশ্বে সমস্ত শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আজ থেকে পঞ্চাশ বৎসর আগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতই একটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা সংস্থাপিত হয় এই বৎসর এই সংস্থার পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উৎসবের জন্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থাও তাদের এ বৎসরের আলোচ্য বিষয় নির্দিষ্ট করেছেন, "স্বাস্থ্য শ্রমিক ও উৎপাদন"। এই বিষয়ের তাৎপর্য হলো শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের উপরই নির্ভর করছে শিল্পের উৎপাদন ও দেশের সমৃদ্ধি। কোন শ্রমিক যদি শারীরিক বা মানসিক অসুস্থ হন তবে তিনি তাঁর কাজে কখনও মনোযোগী হতে পারবেন না। তাতে একদিকে যেমন উৎপাদন ও কাজের ব্যাঘাত ঘটবে তেমনি দেশের সমৃদ্ধিও ব্যাহত হবে।

শিল্পসভ্যতার বিকাশের পর থেকে পৃথিবীর সমস্ত দেশে কারখানা স্থাপিত হয়েছে অনেক, উৎপাদন বেড়েছে প্রচুর। নতুন নতুন শিল্পও প্রসারিত হয়েছে দেশময়। সেই সঙ্গে দেখা দিয়েছে কলকারখানা জনিত নানা অসুখ-বিসুখ। উন্নত দেশগুলিতে শ্রমিক স্বার্থ বজায় রাখার জন্য অনেকগুলি আইনও প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইন অনুসারে কারখানায় শ্রমিকদের ক্যান্টিন, বাথরুম, চিকিৎসার সুযোগ প্রভৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জীবন বীমা, বার্ধক্য ভাতা, স্ত্রী শ্রমিকদের প্রসবকালীন ছুটি ইত্যাদিরও সুযোগ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য আমাদের মত অনগ্রসর দেশে এই অপরিহার্য সুযোগগুলি অনেকাংশেই এখনও পর্য্যন্ত প্রতিশ্রুতির স্তরে রয়ে গেছে।

পশ্চিমবঙ্গে ৫ হাজার ২ শো-৬টি কারখানা রয়েছে, তাতে প্রতিদিন ৮ লক্ষ ৮৭ হাজার (৮,৮৭০০০) শ্রমিক কাজ করছেন। তা'ছাড়া ২৮৪টি কয়লার খনিতে কাজ করছেন ১ লক্ষ ৩২ হাজার ২শো ৬৭ (১,৩২,২৬৭), বন্দর শ্রমিক সংখ্যা হলো ৪০,৩৮১, তা' ছাড়া বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্প, হোটেল, রেষ্টুরেন্ট প্রভৃতির সংখ্যা হলো প্রায় ২,৯৫,৭২১, তাতে কাজ করছেন ৫,৪৬,৭৩৫ জন শ্রমিক। এ ছাড়া, এই রাজ্যের চা শিল্পে প্রায় আড়াই লক্ষ চা শ্রমিক নিযুক্ত। এই সংখ্যাগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় আমাদের জনসংখ্যার বেশ একটি বৃহৎ অংশই শ্রমিক হিসাবে জীবিকা অর্জন করছেন। এদের উপরই নির্ভর করছে কারখানার উৎপাদন, দেশের সমৃদ্ধি। কিন্তু দেখা যায় আমাদের শিল্পাঞ্চলগুলিতে বহু জায়গায় এখনও পর্যন্ত ঘিঞ্জি ও অস্বাস্থ্যকর বসতি রয়ে গেছে। কঠোর পরিশ্রমকারীদের জন্য উপযুক্ত খাদ্য, বিশ্রামের ব্যবস্থা ও রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা এখনও করা সম্ভব হয়নি। আমরা জানি কয়লার খনিতে চোখের রোগ, হাঁপানী, যক্ষ্মা, কেইজন্ সিক্‌নেস্ ইত্যাদি হয়। ফ্যাক্টরীগুলিতে চোখের রোগ, লিউকোমিয়া, লেড্ পয়জনিং, টিটেনাস

প্রভৃতি রোগ হয়ে থাকে। চা বাগান গুলিতে হুক্ ওয়ার্ম ও নানাবিধ চর্ম রোগ চা শ্রমিকদের নিত্য সঙ্গী।

গত বৎসর পশ্চিমবঙ্গে ২ কোটি ১৩ লক্ষ ১ হাজার পাঁচশ ৬৫ টাকা রোগ জনিত সাহায্য দেওয়া হয়েছে। মহিলা কর্মীদের ৩ লক্ষ ৮০ হাজার ৬শো ৯১ টাকা প্রসব-কালীন সাহায্য দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকদের আজকাল সব রকম চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং মৃত্যুর পর পারিবারিক ভাতা দেওয়ারও বন্দোবস্ত করা হয়েছে। একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, প্রয়োজনের তুলনায় এই সব সাহায্যের বন্দোবস্ত অপ্রতুল এবং এক বিরাট সংখ্যক শ্রমিক এখনও পর্য্যন্ত এই সব সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

সম্প্রতি গ্রেটব্রিটেনে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, শ্রম বিরোধের দরুণ যদি এক মিনিট নষ্ট হয়ে থাকে, তা' হলে নয় মিনিট নষ্ট হয়েছে বিভিন্ন ধরণের দুর্ঘটনায় এবং দু'ঘন্টারও বেশী সময় নষ্ট হয়েছে অসুস্থতার দরুণ। এ দেশেও এ' চিত্রের খুব বেশী তারতম্য হবে না। ধুলো, গরম, আওয়াজ, বিষাক্ত গ্যাস, ইত্যাদি এবং ক্লান্তি এ' গুলির প্রতিক্রিয়া হয়ত সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করা যায় না কিন্তু এই সবগুলিই শ্রমিকের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। এক হিসাবে একটা কারখানাকে একটা যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে তুলনা করা চলে। কোন্ ধরণের শিল্প পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে, তার ওপর নির্ভর করে শ্রমিক স্বাস্থ্যের ঝুঁকিগুলি অব্যাহতভাবে বাড়তে পারে। কাজেই শ্রমিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য আমাদের শুধু অসুস্থতা বা দুর্ঘটনা নিবারণের দিকে লক্ষ্য রাখলেই চলবে না, কাজের পরিবেশের উন্নতির দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। যন্ত্রপাতিকে মানুষের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হবে, মানুষকে যন্ত্রপাতির সঙ্গে নয়। মিশ্র সীসা তৈরী, শোধন ও বহন, ছাপাখানা, ইলেক্‌ট্রোলাইটিক্ প্লেটিং, ক্রোমিক এ্যাসিড উৎপাদন, ইলেকট্রিক এ্যাকু-মুলেটার তৈরী ও সারাই, কাঁচের কারখানা ও মৃৎপাত্রের কারখানা প্রভৃতি বিপজ্জনক কাজকর্মের ক্ষেত্রে সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। সমান গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত ক্যান্টিন ও অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা রাখা এবং ক্লান্তি ও একঘেয়েমী দূর করার জন্য কাজের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা। সেই যাতে দক্ষতা বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করছি এবং আমাদের শ্রমিক ভাইদেরও অনুরোধ করছি, তাঁরা যেন কার খানার ভেতরে যে সমস্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ, সীমাবদ্ধভাবে হলেও, আছে তা' যেন তাঁরা অবশ্যই গ্রহণ করেন। কারণ অনেক সময় আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা না গ্রহণের জন্যই দুর্ঘটনা ঘটে। তা' ছাড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা না গ্রহণের জন্য হয়তো বর্তমানে আপনার কোন ক্ষতি হচ্ছে না, কিন্তু দশ বৎসর পরে দেখা গেলো, সেটাই আপনার অসুস্থতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কয়লার খনি, লোহা গালাই গ্যাস প্রভৃতি কারখানায় ঢোকার সময় এবং প্রতি ১৫ দিন অন্তর শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার বন্দোবস্ত আছে। এই নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষায় কোন রোগ হলে তা' সহজেই ধরা পড়ে। আজকাল প্রত্যেক কারখানায়, খনিতে শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার ব্যবস্থা রয়েছে, তা'ছাড়া কোন অসুখ হলেই বিনামূল্যে সব রকম চিকিৎসার ব্যবস্থাও রয়েছে। কিন্তু আমাদের শ্রমিকরা সহজে চিকিৎসকের কাছে যেতে চান না। কাজের ঘন্টা নষ্ট হবে, কিম্বা রোগ ধরা পড়লে কাজ করতে দেওয়া হবে না, এই ভেবে রোগ যতক্ষণ না বেশী হয়, ততক্ষণ তাঁরা রোগ গোপনের চেষ্টাই করেন। এতে তাঁর নিজের যেমন ক্ষতি হয়, অপর আর পাঁচজন সহকর্মীও তাঁর রোগে সংক্রামিত হতে পারেন। নিজের, পরিবারের এবং আর পাঁচজনের কথা চিন্তা করে রোগ কখনও গোপন করবেন না। বসন্ত, কলেরা, টাইফয়েড্ প্রভৃতি রোগ প্রতিরোধক টিকা দেওয়ার বন্দোবস্ত রয়েছে, সেগুলোও আপনাকে অগ্রণী হয়ে গ্রহণ করতে হবে। আপনার কারখানার ক্যান্টিনে সস্তায় খাবার পাবার যে ব্যবস্থাটুকু রয়েছে, এই সব ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করার জন্য কলকারখানার মালিকদের যে দায়িত্ব রয়েছে, তাঁদের সে দায়িত্ব পালন করতে হবে। ট্রেড্ ইউনিয়ন্ সংস্থাগুলিকেও এজন্য উপযুক্ত কর্মসূচী নিতে হবে।

প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা উল্লেখ করছি। বর্তমানে কারখানগুলিতে যে পরিবার পরিকল্পনার ব্যবস্থা রয়েছে তা' গ্রহণ করুন। বহু সন্তান হলে স্ত্রীর স্বাস্থ্যহানি ঘটে,

শান্তি ব্যাহত হয়। কারখানার কাজে অমনোযোগী হওয়ার দরুণ দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে। আজ বিশ্বস্বাস্থ্য দিবসে আমি শ্রমিক ভাইদের অনুরোধ করবো তাঁরা যেন নিজেদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন হন এবং তাঁদের কর্মক্ষেত্রে সব রকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিজের পরিবারের এবং দেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেন। অসুস্থতা ও দুর্ঘটনার কারণ তাঁরা যেন এড়িয়ে চলেন। কারখানা ও শিল্প-মালিকরা যেন একথা স্মরণ রাখেন অসুস্থ ও ক্লান্ত শ্রমিক-দের অসুস্থতা ও ক্লান্তিদূর করার প্রচেষ্টার উপর উৎপাদন বৃদ্ধি এবং তা অব্যাহত রাখাও নির্ভরশীল।

তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আমাদের স্বাস্থ্য উন্নতির খরচ খাতে ব্যয় হয়েছে প্রথমটিতে ১৪,৫০ কোটী, দ্বিতীয়টিতে ১৫ কোটি এবং তৃতীয়টিতে ২২ কেটি টাকা। কিন্তু তা সত্ত্বেও শ্রমিকদের অসুস্থতার সমস্যা আজও মেটেনি। এ' ব্যাপারে পাশ্চাত্য দেশগুলি অনেক বেশী সচেতন হয়ে উঠেছে, কিন্তু তা' সত্ত্বেও সমগ্র বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় ১ কোটি 'শ্রম দিবস' শ্রমিকদের অসুস্থতার জন্য নষ্ট হচ্ছে। কাজেই উন্নতিশীল দেশ হিসাবে আমাদের কর্তৃপক্ষকে এবং শ্রমিকদেরও তাঁদের নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সজাগ হতে হবে, তা না হলে আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধি হবে না, দেশের সমৃদ্ধিও ব্যাহত হবে।

উপসংহারে, পূর্বে বলা হলেও যেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা হলো রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা, এবং তারই পাশাপাশি রোগ হবে না এমন একটি স্বাস্থ্যকর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ আমাদের মত দেশে গড়ে তুলতে হলে, বর্তমান সমাজের আমূল রূপান্তরের কথা ভাবতে হবে, নতুন সমাজ, সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যের দিকে এগুতে হবে। যে সমাজে দারিদ্র্য ও অভাব ভয়াবহ, বর্ণ ও শ্রেণী বৈষম্যের মৃগয়াক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষ যেখানে মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত নয়, সেখানে রোগ মুক্ত, স্বাস্থ্য সুষমা মণ্ডিত মানব গোষ্ঠীর কল্পনা নিছক কল্পনা-বিলাস মাত্র।

সংকলন

নব-রামরাজ্যবাদ

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বাণী দেওয়া এককালে প্রফেট বা জ্যোতিষীদেরই একচেটিয়া অধিকার ছিল। কিন্তু এ যুগে এক শ্রেণীর লোকের পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বাণী দেওয়া—কিন্তু তাঁরা কেউই প্রফেট বা জ্যোতিষী নন। তাঁরা নিজেদের ভবিষ্যৎ শাস্ত্রবিদ (futurologist) বলে আখ্যাত করেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন নব-রামরাজ্যবাদী (neo-utopians)। তাদের একজনের পরিকল্পনা অনুসারে কুড়ি বছরে অর্থ-ভিত্তিক অর্থনীতিক কাঠামো লুপ্ত হয়ে যাবে। তৃতীয় বছরের শেষে বিনামূল্যে সন্তরণ স্নানাহার ও পাঠাগারে প্রবেশ করা যাবে। অষ্টমবর্ষে সকলের জন্যে বিনামূল্যে কেন্টিনে খাদ্য সরবরাহ করা হবে। নবমবর্ষে ডাল, আলু, ফলের রস আদি বিনামূল্যে সকলকে দেওয়া হবে। কিন্তু চতুর্দশ বর্ষের আগে বিনামূল্যে বিয়ার বিতরণ ও পঞ্চদশ বর্ষের আগে তামাক সবাইকে দেওয়া সম্ভব হবে না।

নব-রামরাজ্যবাদীদের স্বপ্ন কবে সার্থক হবে সেই আশায় অপেক্ষা করছি।

— কৃষ্ণদাস সামন্ত
হুগ্‌লী

অশান্ত তরুণ

সমগ্র জগতে আজ ছাত্রসমাজে বিশৃঙ্খলভাব বর্তমান। ছাত্রসমাজ সব দেশেই সবসময়ে বিপ্লবের পুরোভাগে বর্তমান ছিল। কিন্তু বর্তমান কালের ছাত্ররা যে কোনও বিপ্লব পরিচালন করছেন তা নয়। এক এক দেশের ছাত্ররা এক এক বিষয় নিয়ে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে শিক্ষা ব্যবস্থা বানচাল করে দিয়ে বীরত্ব দেখাচ্ছেন। স্থানে স্থানে তাদের ভাষা এমন যা সভ্য জাতির মানব সন্তানের মুখে শোভা পায় না। অ্যামেরিকান ছাত্র সমাজ—নিগ্রোছাত্র সমাজ তাদের যুদ্ধে mother কথাটি প্রায়ই ব্যবহার করেছে, শোনা যাচ্ছে। সম্প্রতিকালে 'Look' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি পত্রে Leo Rosten নামক লেখক ব্যাখ্যা করেছেন এই ধরণের কুৎসিত গালি প্রযোগ করার মনস্তত্ব। তিনি বলেছেন এই ধরণের নিকৃষ্ট গালির মধ্য দিয়ে তোমরা তোমাদের নিজেদের মনের জঘন্য মাতৃ-রাগ আমার উপর প্রতিফলিত করছ। এরকম প্রতিফলনেরই বৈজ্ঞানিক নাম "প্যারা-নোইয়া।"

আমাদের দেশেও কিছু লোক এই ধরণের গালির ভাষা বিপ্লব-বিদ্রোহ ছাড়াই ব্যবহার করে থাকে। তাদেরও কি তবে "প্যারানোইয়া"র জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন আছে? চিকিৎসকগণ এবিষয়ে চিন্তা করলে সমাজ-সেবকগণ স্বস্তি পাবেন।

—মৃদুলা চট্টোপাধ্যায়
কলিকাতা

পপিরাস পাতার তৈরী দশ টনের একটি নৌকায় চড়ে নরওয়ে দেশের অভিযাত্রী Thoro Heyerdahl মরক্কো উপকূল থেকে অতলান্তিক মহাসাগর বক্ষে পাড়ি জমিয়েছেন। তাঁর গন্তব্যস্থল ৪০০০ মাইল দূরের মধ্য আমেরিকা! ৫৪ বৎসর বয়স্ক এই অভিযাত্রীর সঙ্গী হয়েছেন আরও ছয় জন নাবিক এবং একটি বানর।

মিশরে ফ্যারাওদের রাজত্বকালে, অর্থাৎ ৫০০০ বৎসর আগে উত্তর আফ্রিকার কিছু লোক তাদের ভেলা জাতীয়

নৌকায় অতলান্তিক মহাসাগর পেরিয়ে দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকায় বসতি স্থাপন করে "ইন্কা" ও "আজটেক" সভ্যতার জন্ম দিয়েছিল বলে একটি মত প্রচলিত আছে। Heyerdahl সাহেব সেই পুরাণো দিনের অনুকরণে বিশালপপিরাস পাতার নৌকায় চড়ে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সাগর পাড়ি দিয়ে পরীক্ষা করে দেখছেন ঐ মতবাদ সত্য হতে পারে কি না।

পুরাণ মতকে পরীক্ষা করার কি অভিনব প্রচেষ্টা! একেবারে হাতে নাতে করে দেখতে চান সত্য হতে পারে কি না! আমাদের পুরাণ কাব্যে আছে বীর হনুমান এক লাফে সাগর (ছোট্ট অবশ্য) পেরিয়ে লঙ্কায় গেছিলেন! এ মতটা কি কোনও রকমে পরীক্ষা করে দেখা যায় না?

—শৈলপতি চট্টরাজ
কলিকাতা

প্রেমের গান

একটি বিখ্যাত ইংরেজী পত্রিকায় নিম্নলিখিত প্রেমের গানটি প্রকাশিত হয়েছে।—

Mabel was a
Table
Lovely table
On the table
(Mabel)
Lay a flower
Named cyn'l.

গানটি যে প্রেমের তাতে সন্দেহ নেই। খুব দ্রুত এর বেগ—প্রেমের বেগ। পাঠক-পাঠিকারা এর অর্থ উপলব্ধি করতে পেরেছেন নিশ্চয়!

—প্রণব চক্রবর্ত্তী
জোরহাট, আসাম

———

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীতম্ মহাভারতম্ শান্তিপর্ব্ব

বঙ্গানুবাদ : স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বাক্‌পারুষ্যং তথোগ্রত্বং দণ্ডপারুষ্যমেব চ।
আত্মনো নিগ্রহস্ত্যাগো হ্যর্থদূষণমেব চ ॥৬১

কথার কটুতা, উগ্রতা, দণ্ডের কঠোরতা, কারাগারে নিক্ষেপ, দেশ থেকে বিতাড়ন ও অর্থদণ্ড—এই ছয়টি ক্রোধ জনিত ব্যসন।

যন্ত্রাণি বিবিধান্যেব ক্রিয়াস্তেষাং চ বর্ণিতাঃ।
অবমর্দঃ, প্রতিঘাতঃ কেতনানাং চ ভঞ্জনম্ ॥৬২

নানা প্রকার যন্ত্র ও তাদের ক্রিয়াও বর্ণিত হয়েছে। শত্রুর রাষ্ট্রকে উৎপীড়ন করা, তার সেনাবাহিনীকে আঘাত হানা ও তাদের বাসস্থান ভেঙ্গে দেওয়ার প্রণালীও বর্ণিত হয়েছে ঐ গ্রন্থে।

চৈত্য দ্রুমাবমর্দশ্চ রোধঃ কর্মানুশাসনম্।
অপস্করোঽথ বসনং তথোপায়াশ্চ বর্ণিতাঃ ॥৬৩

শত্রুর রাজধানীস্থিত চৈত্যবৃক্ষ সমূহের ধ্বংস করা, তার বাসস্থানও নগরের চারিদিক বেষ্টন করা—কৃষি ও শিল্প আদি কর্মের উপদেশ, রথের বিভিন্ন অংশ নির্মাণ, গ্রামে ও নগরে বাস করিবার নিয়ম, তারপর জীবন নির্বাহের অনেক উপায় ঐ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

পণবানকশঙ্খানাং ভেরীণাং চ যুধিষ্ঠির।
উপার্জনং চ দ্রব্যাণাং পরিমর্দশ্চ তানি ষট্ ॥৬৪

যুধিষ্ঠির! ঢোল, নাগরা, শংখ, ভেরী প্রভৃতি রণবাদ্য বাজান,—মণি, পশু, পৃথ্বী, বস্ত্র, দাসদাসী, স্বর্ণ এই ছয় প্রকার দ্রব্য নিজের জন্য উপার্জন করা—আর শত্রুপক্ষের এই ছয় দ্রব্য নষ্ট করে দেওয়ার কথাও ঐ গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

লব্ধস্য চ প্রশমনং সতাং চৈবাভিপূজনম্।
বিদ্বদ্ভিরেকীভাবশ্চ দানহোমবিধিজ্ঞতা ॥৬৫
মঙ্গলালম্ভনং চৈব শরীরস্য প্রতিক্রিয়া।
আহারাযোজনং চৈব নিত্যমাস্তিক্যমেব চ ॥৬৬

নিজ অধিকারে আগত দেশে শান্তিস্থাপন করা, সৎ-পুরুষদের সৎকার করা, বিদ্বানদের সঙ্গে মেলামেশা বাড়ানো, দান ও হোমের বিধি জানা, মাঙ্গলিক বস্তু স্পর্শ করা, শরীরকে বস্ত্র ও অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত করা, আহারের ব্যবস্থা করা, সর্বদা আস্তিক্য বুদ্ধি রাখা—এই সকলেরই বর্ণন রয়েছে ঐ গ্রন্থে।

একেন চ যথোত্থেয়ং সত্যত্বং মধুরা গিরঃ।
উৎসবানাং সমাজানাং ক্রিয়াঃ কেতনজাস্তথা ॥৬৭

মানুষ একা হয়েও কিভাবে উন্নতি করে এর বিচার, সত্যতা, উৎসব ও সমাজে মধুর ভাষার ব্যবহার,—ও গৃহসম্বন্ধীয় ক্রিয়াকর্ম—এই সকলেরই বর্ণন রয়েছে।

প্রত্যক্ষাশ্চ পরোক্ষাশ্চ সর্বাধিকরণেষ্বথ।
বৃত্তের্ভরতশার্দূল নিত্যং চৈবাবেক্ষণম্ ॥ ৮

হে ভরতবংশোদ্ভবসিংহ যুধিষ্ঠির, সমস্ত বিচারশালায় যে সকল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিচার হয়ে থাকে, সেখানের রাজপুরুষেরা কেমন হবে—তা প্রতিদিন নিরীক্ষণ করতে হবে। এরও উল্লেখ রয়েছে এই শাস্ত্রে।

অদণ্ড্যত্বং চ বিপ্রাণাং যুক্ত্যা দণ্ডনিপাতনম্।
অনুজীবিস্বজাতিভ্যো গুণেভ্যশ্চ সমুদ্ভবঃ ॥৬৯

ব্রাহ্মণদের দণ্ড না দেওয়া, অপরাধীকে দণ্ড দেওয়া, অনুজীবী, স্বজাতি ও গুণবান্ পুরুষদের উন্নতি করার উপায় এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

রক্ষণং চৈব পৌরাণাং রাষ্ট্রস্য চ বিবর্ধনম্।
মণ্ডলস্থা চ যা চিন্তা রাজন্ দ্বাদশ রাজিকা ॥৭০

রাজন্! পুরবাসীদের রক্ষা, রাজ্যের বৃদ্ধি, তথা দ্বাদশ রাজমণ্ডলের চিন্তা, তাও উল্লেখ আছে এই গ্রন্থে।

দ্বাসপ্ততিবিধা চৈব শরীরস্য প্রতিক্রিয়া।
দেশজাতিকুলানাং চ ধর্মাঃ সমনুবর্ণিতাঃ ॥৭১

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের অনুসারে বাহাত্তর প্রকার শারীরিক

চিকিৎসা তথা দেশ, জাতি ও কুলের ধর্মও ভালভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ধর্মশ্চার্থশ্চ কামশ্চ মোক্ষার্থাশ্চানুবর্ণিতাঃ।
উপায়শ্চার্থলিপ্সা চ বিবিধা ভূরিদক্ষিণ ॥৭২

প্রচুর দক্ষিণাদাতা যুধিষ্ঠির, এই গ্রন্থে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এ সকল প্রাপ্তির উপায় ও নানা প্রকার ধনলিপ্সার বর্ণনা রয়েছে।

ব্রহ্মাকৃত নীতিশাস্ত্র প্রথমে ভগবান্ উমাপতি শংকর গ্রহণ করেন। তিনি মানুষদের জীবনকাল হ্রাস পাচ্ছে দেখে এই শাস্ত্রকে সংক্ষিপ্ত করেন—তার নাম রাখা হয় 'বিশালাক্ষ'। তার পর ইন্দ্র, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য পরপর প্রত্যেকে এই শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রচার করেন।

মহাভারতের শান্তিপর্বে রাজধর্মের যে উপদেশ রয়েছে তা সর্বকালের ও সর্ব দেশের রাষ্ট্রনায়কগণের পক্ষে অবশ্য পালনীয়। কৃতকৃত্য রাষ্ট্রনায়ক হতে হলে মহাভারতের উপদেশ মেনে চলতেই হবে।

ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্মের সার উপদেশ দিয়েছেন :—

ধর্মাণামবিরোধেন সর্বেষাং প্রিয়মাচরেৎ।
মমায়মিতি রাজা যঃ স পর্বত ইবাচলঃ ॥২৫।১২০

রাজার উচিত সকলের প্রিয় কার্য করা, কিন্তু ধর্মের যাতে বাধা না আসে। যে রাজা প্রজাদের নিজের প্রিয় লোক বলে মনে করেন, তিনি পর্বতের মত অবিচল থাকেন।

এদেশের রাষ্ট্রচালকগণ মহাভারতের উপদেশ মেনে চললে দেশের মঙ্গল হোত। [ক্রমশঃ
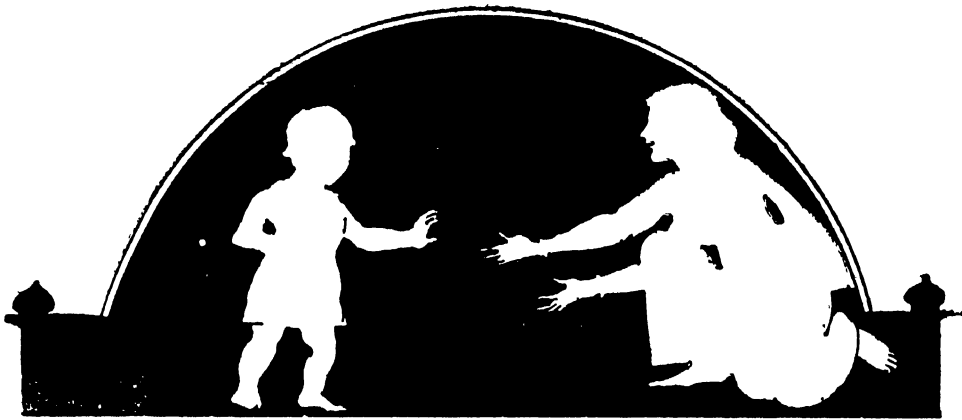
সাগর থেকে ফিরে

"নাবিক"

Engine Room :-

'অব ক্যা হোগা সাহাব !

আমিও তাই ভাবছি......কি হবে ?

সাহাব ·· !

চুপ রহো ···চেঁচিয়েই উঠেছিলাম হয়ত। ওরা চুপ করেছে !

ভাবছি আমাদের কি হবে।

চারিদিকে ঘন অন্ধকার। দশ গজ দূরেও কিছুই দেখা যাচ্ছে না, কেবল বুঝতে পারছি আমার ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে ওপরে নিচে—চারিদিকে তোলপাড় হচ্ছে —মহাপ্রলয় শুরু হয়ে গেছে, জানিনা আমরা কোথায় ? শুধু জানি এখনও বেঁচে আছি এবং যতক্ষণ বাঁচবো সংগ্রাম করতে হবে। আমাদের অন্তিম সময় সমাগত। তাই আমরা সংগ্রাম করছি। ধীর স্থির এবং অবিচলিত রয়েছি। কারণ একটু ভুলের মাশুল এতগুলো প্রাণ।

চারদিকে জল আর জল। ডেকের ওপরে জল; কেবিনে জল,···। ঢেউ আর বাতাসের নির্মম আঘাত, কান ফাটানো ভয়ঙ্কর গর্জন। মাঝে মাঝেই ঢেউগুলো গোটা জাহাজটাকে তুলে আছাড় দিচ্ছে। এখনই বোধহয় ইঞ্জিন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। বয়লারগুলোতে জল্ ঠিক রাখা যাচ্ছে না। ইঞ্জিন রুম পর্যন্ত জাল বোঝাই হয়ে গেছে।

তবু আমরা সংগ্রাম করে চলেছি, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম। এর শেষ কোথায়··· ?

*　　*　　*

কিন্তু সত্যি একসময় সে সংগ্রাম শেষ হয়েছিল। আর প্রকৃতি শেষ অবধি আমাদের কণ্ঠেই বিজয়মাল্য দিয়েছিল পরিয়ে। "টাইফুণের" মৃত্যু জঠর থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম আমরা। কিন্তু সে কথা পরে হবে। আগে 'টাইফুণের' কথা বলে ফেলি।

'টাইফুণ' সমুদ্রের ঝড়। মানুষের কাছে চিরকালই ভয়াবহ। আমাদের মত যাঁরা জলের উপর ভেসে বেড়ায়, তাঁরা সকলেই 'টাইফুণ'কে সমীহ করে চলে। কিন্তু 'টাইফুণ' নামটা সার্বজনীন নয়। এই সামুদ্রিক ঝড়কে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। যেমন বঙ্গোপসাগরের ও আরব সাগরের 'সাইক্লোন'। আমেরিকায় "হ্যারিকেন", ইয়োরোপে "গেল" আর জাপানে "টাইফুণ"।

জাপানগামী জাহাজীদের সর্বদাই 'টাইফুণের' কথা মনে রাখতে হয়। জাপানের সমুদ্রকে সবাই ভয় করে চলে কারণ প্রায় সারা বছরই জাপানের সমুদ্রে এমনি ঝড় থাকে। আর কখন যে ঝড় উঠবে তা বলা বড়ই মুস্কিল।

জাপান যাত্রার নামে জাহাজীরা পাগল হয়ে ওঠে। কিন্তু পথের কথা মনে পড়লেই অনেক অভিজ্ঞ সাহসী লোকও কেমন চুপ করে যায়।

Typhoon বেশীর ভাগ আরম্ভ হয় মার্চ এর পর থেকে, চলে প্রায় ডিসেম্বর অবধি। এ ঝড়এর বেশীর ভাগ আরম্ভ ফিলিপাইন আর মেনীলার পিছন থেকে। তারপর ধীরে ধীরে বেগ বাড়তে থাকে আর সঙ্গে সঙ্গে দিক পরিবর্তন করতে থাকে। কিছু সোজা এসে চীনের মূল ভূখণ্ডে ধাক্কা দেয়। তার পর ঘুরে যায় জাপানের পথে।

প্রতিবছর এর দাপটে যা ক্ষতি হয় তা চোখে না

দেখলে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। হাজার হাজার মানুষ, শত শত ঘরবাড়ী আর সহরের পর সহর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় চিরদিনের মত।

প্রতিবছর 'টাইফুনের' কবলে পড়ে জাপানের যা ক্ষতি হতে দেখেছি, আমরা তাতে ভয়ে নীরব হয়ে গেছি। কিন্তু কি বিচিত্র এদের কর্মশক্তি! ধ্বংসস্তূপের ওপরে আবার গড়ে তোলে নূতন সহর। এত ক্ষতিতেও এদের হাসিমুখে বিষাদের ছায়া নামতে দেখিনি। যেন এই ভাঙ্গা-গড়াই স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে এদের জীবন পথে। তাই শ্রদ্ধা আর ভক্তিতে ওদের সামনে আমাদের মাথা আপনা থেকেই নত হয়ে আসে।

সব বছরে সমান 'টাইফুণ' হয় না। তবে প্রতি বছরই অন্তত দশ থেকে বারো বার এদের আগমন হয়। সাধারণত আগষ্টএর পর থেকে বেশী 'টাইফুণ' হয়, আর এ সময়ের 'টাইফুণ'ই সব চেয়ে বেশী মারাত্মক।

'টাইফুণ'কে অনেকটা ঘূর্ণিঝড়ের বা হাওয়ার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। মাঝে মাঝে এর গতি ঘণ্টায় ১২০ মাইল অবধি হয় আর পরিধি প্রায় ৫০০-৬০০মাইল। তাই একে এড়িয়ে নির্বিঘ্নে গন্তব্যস্থলে পৌছন প্রায় অসম্ভব।

'টাইফুণ' যতই মারাত্মক হ'ক না কেন এদের নামগুলো কিন্তু বেশ সুন্দর। যেমন নান্সী, ভেরা, অলগা, মেরী ইত্যাদি। কত যে জাহাজ, মাছ ধরার নৌকো এর কবলে পড়ে চিরদিনের জন্য সলিল-সমাধি লাভ করেছে তার কোন হিসেব নেই।

যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন এই সামুদ্রিক ঝড়ও থাকবে আর আমরাও তারই মাঝে তরী বেয়ে যাবো।

* * *

এবারে আবার সেই ভয়ঙ্কর দিনের কথায় ফিরে আসা যাক। জাহাজের জানালা বা porthole থেকে বাইরে তাকিয়ে ছিলাম। সামনে বিশাল নীল সমুদ্র। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। জাহাজ এগিয়ে চলেছে সাগরের জল চিরে। কত শান্ত, কত সুন্দর, কত সুনীল!

মাঝে মাঝে 'উড়ো মাছের' ঝাঁকগুলো চোখে পড়ছে। দূরে একটা জাহাজ এগিয়ে চলেছে। আমরা চলেছি

কলকাতা ছেড়েছিলাম আগষ্টের শেষে। জানিনা কার মুখ দেখে রওনা হয়েছি। তবে তখন তো কিছু বুঝতে পারিনি। কতবার তো এই পথে যাতায়াত করেছি। এবারও বঙ্গোপসাগর ছিল মাঝারি। "সাহাজাদা" জাহাজ নিয়ে আমরা চলেছি জাপানে।

'সিংগাপুর' পার হয়ে আমরা পড়লাম জাপান সাগরে। সিংগাপুর এর পর থেকেই আকাশ মেঘে ঢাকা আর মাঝে মাঝে বৃষ্টি আরম্ভ হল। তাহলেও সমুদ্রকে মন্দ লাগছিল না। শীতের আভাস পাচ্ছিলাম।

তারপরে একদিন আমরা 'হংকং'কে বিদায় জানালাম। বহু দিন পর সূর্যের মুখ দেখছি। সূর্য তখন পাহাড়ের পরপারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে সমুদ্রের বুকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু আলোর মালা গলায় পরে 'হংকং' তখনও দূর থেকে বিদায় জানাচ্ছিল। আমাদের শুভযাত্রা জানিয়ে pilotও বিদায় নিয়েছে। রূপবতী হংকং অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরা ধীরে ধীরে প্রবেশ করলাম গভীর সমুদ্রে, গভীরতর অন্ধকারের মাঝে। বাইরে শুধু উর্ম্মিমালার অবিরাম নৃত্য আর ভেতরে ইঞ্জিনের বিরামবিহীন যন্ত্রসংগীত।

দিন চলল বয়ে, আমরা চললাম এগিয়ে। সেদিন সন্ধ্যাবেলা afterdeckএ দাঁড়িয়ে আমরা কত গল্প করছিলাম। আলোচনা হচ্ছিল জাপানে পৌছে কে কি ভাবে সময় কাটাবে, কি কি জিনিষ কেনা হবে, কোথায় কোথায় যাওয়া হবে, আরো কত আলাপ, কত আলোচনা! জাহাজ এগিয়ে চলেছে বেশ ভালো ভাবেই। মাঝে মাঝে ঝড়ের খবরাখবর পাচ্ছিলাম। কিন্তু তাতে উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ ঘটেনি।

এমন সময় 'Radio Officer' এসে জানালেন "ভেরা এবং নান্সী" নামে দুটো 'টাইফুণ' এগিয়ে আসছে। আমাদের গল্পের আসর আরও গরম হয়ে উঠলো। স্মৃতিচারণ চলল—কে কবে কিভাবে টাইফুণ-এ পড়েছিল ইত্যাদি। অবশেষে এক সময় সান্ধ্য আসর শেষ হ'ল।

রাত ১২টায় ডিউটি শেষ করে কেবিনে ফিরে এলাম। বাইরে ঘোর অন্ধকার। af erdeck খালি। কর্মরত কর্মীরা ছাড়া সবাই পড়েছে ঘুমিয়ে। জাহাজ চলছে

পাঁচদিনের একটানা পাড়ি। Yokohama আমাদের প্রথম বন্দর হবে জাপানে। আমরা কাল "ওকিনাওয়া" পার করবো। porthole দিয়ে বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছে; উঠে বন্ধ করে দিলাম। পায়ের কাছে কম্বল দিতে বাহাদুর ভুলে যায়নি দেখছি।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম খেয়াল নেই। হঠাৎ কেন জানি ঘুমটা ভেঙে গেল। রাত এখন কটা হবে ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে হ'ল জাহাজটি বেশ দুলছে। বাইরে যেন কেমন চঞ্চলতা, লোকজনের আসা যাওয়া আর ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা কানে আসছে।

Mate-এর গলা শুনলাম। ঐ সব ঠিক সে বান্ধো, আগে বহুত জোর তুফান আতা হ্যায়। Chief Engineer এবং 2nd Engineer কি যেন বলছে বুঝলাম না, তবে দুজনকেই বেশ ব্যস্ত মনে হল।

বিছানার ওপরে উঠে বসি। তাড়াতাড়ি বাইরে আসি। কাপ্তান সাহেব থেকে আরম্ভ করে সকলকেই দেখলাম। সবাই বেশ ব্যস্ত এবং চঞ্চল। আমাকে দেখে সবাই বলে উঠলেন get ready Typhoon approaching.

আমি কিন্তু মোটেই বিচলিত হলাম না। কারণ এরকম বিপদে পড়া নূতন নয়। কার্যক্ষেত্রে কিছুই করার নেই। শুনলাম 'নান্সী' আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। 'ভেরা' অন্য পথে ঘুরে গেছে। ঠিক হল জাহাজের গতিপথ পরিবর্তিত করা হবে। আবার এসে শুয়ে পড়লাম।

জাহাজ দুলেই চলেছে। হাওয়ার গতিও যেন বাড়ছে। আমরা চলেছিলাম 'উত্তরপূর্ব দিকে, 'টাইফুণ' আসছিল পূর্ব পশ্চিম থেকে। রাত তিনটের পর থেকে জাহাজ-এর গতিপথ পরিবর্তিত করা হ'ল। 'টাইফুণ' বেরিয়ে যাবার পর আমরা আবার নিজেদের পথে ফিরে আসবো। জাহাজকে ঝড়ের কবল থেকে বাঁচাবার জন্য এরকম গতিপথের অদল-বদল হামেশাই করতে হয়। কিন্তু টাইফুণের প্রধান দোষ হল সেও খুব তাড়াতাড়ি নিজের গতিপথ পালটে ফেলে। আর গতিবেগ বাড়িয়ে দেয়। এত বেশী জায়গা দিয়ে এ ঝড় চলে যে মাঝে মাঝে এর আওতার বাইরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেও বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না।

*　　*　　*

'সাত বজগিয়া সাহাব'।

বাহাদুরের ডাকে ঘুম ভাঙলো, সে চা রেখে গেছে।

জাহাজ এখনও দুলছেই। যেন একটু বেশী করেই দুলছে। তবে একভাবে দুলছে বলেই ঘুমের গোলমাল হয়নি।

বাইরে তাকালাম। ঢেউগুলো বেশ বড় হয়ে উঠেছে, হাওয়ার গতিও বেড়েছে।

ইঞ্জিনরুম-এ এসে দেখলাম সব জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদা হচ্ছে। শুনলাম "দেওয়ানী আতা হ্যায় সাহাব"।

হাসলাম, বললাম, "ক্যা, ডর লগ গিয়া"।

'সাহাব, জাপান কা দরিয়া বহুত খরাব হ্যায় অব খুদা ভরোসা। দুনম্বর সাহেবের কাছ থেকে ডিউটি বুঝে নিলাম। তিনি জানালেন আমরা অন্য পথে চলেছি। মনে হচ্ছে টাইফুণকে এড়িয়ে যেতে পারবো।

*　　*　　*

টেলিফোন বেজে উঠলো, বড় সাহেব জানালেন টাইফুণ আবার দিক পালটেছে। ফলে আমাদেরও দিক বদলাতে হল। ইঞ্জিন-এর গতি একটু কম করার নির্দেশ দিলেন।

বেলা ১০টার পর থেকে জাহাজ ভীষণ দুলতে আরম্ভ করে দিল। একজন কয়লাওয়ালা এসে জানালো "দরিয়া কা চেহরা বদল গিয়া সাহাব দেখনে সে ডর লগতা—চারো তরফ অন্ধেরা সা হো গয়া হ্যায়। Skylght-এর দিকে তাকালাম, সত্যি কেমন যেন অন্ধকার অন্ধকার মনে হচ্ছে।

ইঞ্জিনরুমে আর সোজাভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। সবাই জাহাজের সঙ্গে তাল রেখে ধরে ধরে চল'ছে। মাঝে মাঝে ইঞ্জিন ভীষণভাবে আওয়াজ করছে, মনে হচ্ছে সব চুরমার হয়ে যাবে। আমাদের খাটুনি আরো বেড়ে গেছে, সব সময় সজাগ থাকতে হচ্ছে। Crewরা বেশ একটু ভয় পেয়ে গেছে মনে হচ্ছে। আমরাও ভয় পেয়েছি কি ?

আমার কয়েক বছরের জাহাজী জীবনে ঝড় কিছু নতুন

নয়। ইতিপূর্বে আমি বহুবার ঝড়ের মুখোমুখি হয়েছি। মাঝে মাঝে একটানা নয় দশদিন ঝড়ের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে। তাই আমি আজ খুব বেশী বিচলিত বোধ করছি না।

এমন সময় আমার 'টিণ্ডল' এসে হাজির। বেশ বুড়ো হয়ে গেছে, তবে ভীষণ আমুদে লোক। চট্টগ্রামে বাড়ী। গভীর উৎকণ্ঠা'র সঙ্গে জানালো তার ২৫ বছরের সাগর জীবনে সাগরের এরূপ ভয়াবহ রূপ আর সে কখনও দেখে নি। আমি ইঞ্জিনরুমে রয়েছি বলে সাগরের প্রকৃত রূপ বুঝতে পারছি না।

হঠাৎ Skylight দিয়ে ইঞ্জিনরুমের ভেতরে একটা ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল। তারপরে আর একটি ঢেউ তারপর মাঝে মাঝেই...। বয়লার রুমেরও একই অবস্থা। আরো পাম্প চালু করা হয়েছে। বয়লার ঠিক মত চলছে না। চারদিক বিভিন্ন আওয়াজে ভরে উঠেছে। মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ জাহাজটাই কেঁপে কেঁপে উঠছে।

আমাদের Crewরা সবাই জাহাজের পিছন দিকে থাকে। কিন্তু আজ ভোর থেকেই সবাই এসে জমা হয়েছে ইঞ্জিনরুমে। আমরা Steering flatএ যাচ্ছি এবং Crewরা তাদের Cabinএ যাচ্ছে Tunnelএর ভেতর দিয়ে। কয়েকজনের ইতিমধ্যেই বমি আরম্ভ হয়ে গেছে। খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিয়েছে অনেকে। দু একজন তো একেবারে শুয়ে পড়েছে। কজন তো কান্নাকাটি আরম্ভ করেছিল, ধমক খেয়ে চুপ আছে। কে কাকে দেখবে, সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। আমার বমি না হলেও মাথা ঘুরছে, দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে, তবুও দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। যতদুর সম্ভব শান্তভাবে কাজ করে যাচ্ছি। বিপদে অধীর হলে চলবে না।

বড়সাহেবও নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। জানালেন আমাদের ভাগ্য বোধহয় খারাপ। বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও 'নান্সী'র হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল না। এখন আমাদের ঝড়ের ভেতর ঢোকা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

এখন আর আমাদের কোন ঠিক ডিউটি বলে কিছু নেই। সবাই প্রায় ইঞ্জিনরুমে। উপরেও তাই, কাপ্তান সাহেবও সব সময়ই Bridge-এ। 'মেট' চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করছেন। সবাই ব্যস্ত।

ইঞ্জিনরুম থেকে একটু ছুটি পেলাম। উপরে এসেছি। একি ব্যাপার? চারিদিক অন্ধকার। জাহাজের আগে পিছনে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ডেক-এর উপর দিয়ে শুধু জলের তোড় বয়ে চলেছে। আর বাতাসের কি ভয়ঙ্কর আওয়াজ আর ঢেউয়ের শব্দ! তাকাতে ভয় করছিল। ধরে ধরে নিজের ঘরে এসে ঢুকলাম। সব কিছু চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে। টেব্‌ল, চেয়ার, জামাকাপড়। ঘরও জলে জলাকার।

বাহাদুরের সাথে দেখা হল। জানালো, খাওয়া দাওয়া বন্ধ, কারণ রান্না করা সম্ভব নয়। কৌটোর খাবার খেয়ে থাকতে হবে। তখন অবশ্য কারুরই খাওয়ার অবস্থা নেই।

কুক এসে জানালো পাঁচ-নম্বর সাহাবের হাল খুব খারাপ। এখন আর খালিপায়ে ছাড়া ডেকের ওপর দিয়ে চলার উপায় নেই। অনেক কষ্টে পাঁচ নম্বর অর্থাৎ ফিফ্‌থ ইঞ্জিনিয়ারের ঘরে এলাম। সমস্ত কেবিনে জিনিষ পত্র ছড়ানো। বিছানার উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে নন্দী সাহেব।

"কি ব্যাপার? কি হল?" সে কাঁদছে। সারা শরীর ভয়ে নীল হয়ে উঠেছে।

কিছুক্ষণ পরে কান্না থামিয়ে বলে, 'কাল থেকে ভীষণ বমি আরম্ভ হয়েছে। কিছুই খেতে পারছি না, বড্ড ভয় করছে। কি হবে বলুন তো? জাহাজ বাঁচবে তো?'

কেমন করে তার এ প্রশ্নের উত্তর দেব। আমরা কেউ জানিনা কি হবে। তবু বলি, 'ভয় পাচ্ছেন কেন? Try to get up. কিছু খেয়ে নিন। বমি হ'ক তাতে কি? না খেলে তো এমনি মারা পড়ে যাবেন।'

পকেট থেকে কিছু বিস্কুট বের করে দিলাম। এই ওর প্রথম সাগর যাত্রা। অনেক আশা, অনেক আনন্দের সঙ্গে এ যাত্রা আরম্ভ করেছিল। ওকেই বলতে শুনেছি —"What a nice life!"

আজ ওর দিকে তাকাতেও দুঃখ হচ্ছে। এই-ই হয়। শান্ত সমুদ্রের উপর দিয়ে ভেসে যাওয়ার সময় বোঝাই যায়না সমুদ্র কত ভয়ঙ্কর হতে পারে।

আমরা বেলা ১২ নাগাদ ঠিক 'টাইফুনের' কবলে প্রবেশ করলাম। চলল লড়াই। চারিদিকে অন্ধকার। ঢেউগুলো ২০০-৩০০ ফুট উঁচু হয়ে চারদিক থেকে জাহাজের উপর এসে পড়ছে। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে আমরা শূন্যে, দুদিকে খাদ আর তার দুপাশে উঁচু ঢেউএর পাহাড় আমাদের ঘিরে ফেলছে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আমরা জানিনা আমরা কোথায়, কি ভাবে, কেমন ভাবে আছি।

হঠাৎ ভীষণ শব্দ করে জাহাজের মাস্তুল ভেঙ্গে পড়ল।

মাঝে মাঝে জাহাজের সামনের ভাগ সম্পূর্ণ জলের নিচে ডুবে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এই বোধহয় শেষ। আমাদের মতই জাহাজও তার সবরকম শক্তি দিয়ে এই ঝড়ের মুকাবিলা করে চলেছে।

চারদিকে আর্তনাদ আর করুণ কণ্ঠে ঈশ্বর বন্দনা। কেউ বা ডাকছে 'গড', কেউবা ডাকছে 'খুদা', কেউবা 'ভগবান'। অনেকেই হয়ত কোনও দিন গীর্জা মসজিদ কিম্বা মন্দিরের কাছাকাছিও যাননি। তবু আজ এই অসহায় মুহূর্তে তাঁরা সেই পরিত্যক্ত ঈশ্বরের শরণাগত হয়েছেন। শক্তিমদে মত্ত মানুষ যখন নিজের শক্তি-হীনতার পরিচয় পায় তখনই সে ঈশ্বরের প্রকৃত শক্তি উপলব্ধি করতে পারে। তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে। মানুষের প্রয়োজনেই হয়তো ঈশ্বর এমনি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সৃষ্টি করে থাকেন।

মাঝে মাঝে S. O. S. (Save Our Soul). আসছে। কিন্তু এখন কে কাকে দেখবে? সবাই নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। পরে শুনেছিলাম পাঁচ খানা জাহাজ মারা পড়েছে। কাউকেই হয়ত খুঁজে পাওয়া যায়নি।

'টাইকুণ' আবার গতি বদলালো। এবার আমাদের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে উঠলো। এতক্ষণ আমাদের জাহাজ তবু ঘাহ'ক ঘণ্টায় মাইল খানেক করে এগুচ্ছিল কোন মতে। এবার খবর পেলাম জাহাজ পেছুতে আরম্ভ করেছে। মাত্র ৭০ মাইল পিছনে পাহাড়। এবার কাপ্তান সাহেবও বেশ ঘাবড়ে গেলেন। বড় মহলে বিরাট চঞ্চলতা লক্ষ্য করছি আর বার বার [illegible]

সেটুকুও আর অবশিষ্ট রইল না। আর রক্ষা নেই।

দুটো মাস্তুলই ভেঙ্গে কাত হয়ে পড়ে গেছে। লোহার সিঁড়িগুলো ঢেউয়ের আঘাতে বেঁকে বেঁকে গেছে। 'ব্রীজ'-এর একপাশ ভেঙ্গে গেছে। চারিদিকে চলেছে ভাঙ্গার পালা। যা ভাঙ্গেনি, তা ভাঙ্গবে, যা আছে, তা থাকবেনা। আমরাও আর থাকবোনা এ জগতে। শেষের সেদিন সমাগত।

রাত তখন ৯টা, আবার বড়সাহেব নিচে নেমে এলেন। মুখ দেখেই বুঝলাম তিনিও ভয় পেয়েছেন। বললেন, আর হয়ত জাহাজ বাঁচানো যাবে না। তবে কেউ যেন এ খবর না জানে। 'Pray to God and fight upto the last', বলেই তিনি চলে গেলেন।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। কারও মুখেই কোন কথা নেই। সবাই আমারই মত ভাবছে নিজের কথা, বাড়ীর কথা, দেশের কথা। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা চিরদিনের মত এই সাগরে তলিয়ে যাবো, কেউ জানবে না কেমন করে আমরা তলিয়ে গেলাম। কেই জানবে না শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম করেছি। শুধু জানবে আমরা ছিলাম—আমরা নেই।

আর ভয় পাচ্ছি না। ভবিষ্যৎ চিন্তা করতে আর ভালো লাগছে না। কথা বলতেও ভালো লাগছে না। কেউ কথা বললেও ভালো লাগছে না। কিছুই ভালো লাগছে না। তাই আপন মনে উদ্দেশ্যহীন ভাবে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি।

আবার টেলিফোন বেজে উঠলো। আমরা জানি কি খবর হবে। সকলের মুখের দিকে একবার তাকালাম।

সেকেণ্ড ইঞ্জিনিয়ার ফোন তুলে কানে দিলেন। আমরা সবাই অপেক্ষায় তাকিয়ে আছি, কি হয়?

কিন্তু একি? ওঁর মুখ হঠাৎ হাসিতে ভরে উঠেছে। টেলিফোন রেখে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন "God Soved us, we might win. Pray more." শুনলাম 'টাইকুণ' দিক পালটেছে এবং যদি সে এ ভাবে চলে তা হলে আমরা বেঁচে যাবো। আমরা বাঁচবো। সবাই চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। Crewদের দিকে তাকিয়ে বললাম, ডরো মত, হম লোগ বচ যায়েঙ্গে। ষ্টীম উঠাও। [illegible]

জয়গান গেয়ে ওরা আবার উঠে বসল। জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ অতিবাহিত। আমরা মৃত্যুর জগৎ থেকে জীবনের ভুবনে পৌঁছে গেছি। মানুষ কত ভালোবাসে নিজেকে। কবি সত্যই বলেছেন—'মরিতে চাহিনা, আমি সুন্দর ভুবনে, মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।'

সে যে কি আনন্দ তা প্রকাশ করার ভাষা আমাদের নেই। আমরা তখন ধীরে ধীরে এগুতে আরম্ভ করেছি। তবে বাইরে তখনও ঝড় চলছেই। কিন্তু বুঝতে পারছি তার দাপট ক্রমেই কমে আসছে। তাহলে তো আমরা মরণ সাগর পাড়ি দিয়ে জীবনসৈকতে ফিরে চলেছি।

বহুক্ষণ পর ছুটি পেলাম। কেবিনে এসে শুয়ে পড়লাম, এবারে বিশ্রাম দরকার।

* * * *

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না। ঘুম ভেঙ্গে গেল। কে যেন ডাকছে, চোখ মেলে তাকাই। তা হলেকি কোন দুঃসংবাদ ? না,বাহাদুর চা নিয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। জাহাজ তো দুলছে না। দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে না। বাহাদুর হাসছে। বলছে 'বাহার দেখিয়ে।' পোর্টহোল দিয়ে বাইরে তাকালাম। সারা সমুদ্রের বুক ভরে উঠেছে ভোরের আলোয়। প্রভাত সূর্য্যের প্রথম পরশে সুনীল সাগর মায়াময় হয়ে উঠেছে। সেই মায়াবতীর উপর দিয়ে আমরা চলেছি এগিয়ে। ধারণাই করা যায় না মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগের তার সেই ভয়ঙ্করী রাক্ষসী রূপ।

বাইরে এসে দেখি after deck ভরে উঠেছে সকলের হাসি আর আনন্দ উৎসবে। সবাই আজ নূতন জীবনের আনন্দে মাতোওয়ারা, আজ সত্যই আনন্দের দিন।

জাহাজের ক্ষত-বিক্ষত চেহারা দেখে দুঃখ হল। সেও সকল ক্ষতি স্বীকার করে আমাদেরই মত যুদ্ধ করে গেছে টাইফুনের সঙ্গে। ভাবি, ভগবানের অসীম করুণা। সেই সঙ্গে সকল প্রিয়জনের আন্তরিক শুভকামনা ও শুভেচ্ছার কথা। নইলে সেদিন মৃত্যু ছিল অবধারিত।

সেদিন ভয় পাইনি, কিন্তু আজ সেই টাইফুণের কথা মনে হলে নিজের অজান্তেই শিউরে উঠে। এ শিহরণ স্থায়ী হবে চিরজীবন।

হাতের কথা

স্বরাচার্য্য

এক ভদ্রলোক অল্প বয়সে মাতৃহারা হন। কাজেই তাঁর পিতৃদেব (দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করলেও) তাঁকে অত্যন্ত ভাল বাসতেন। পিতৃদেবের অবস্থা সচ্ছল, ছেলের আদর আবদার সহ্য করার অসুবিধা হতো না। ঘুঁড়ি, লাটাই, বল ব্যাট, ফুটবল যখন যা প্রয়োজন, ছেলে বল্লেই এসে যেত। অবশ্য অন্যান্য ব্যাপারে তাঁকে অনেকে কৃপণ আখ্যা দিতেন। তিনি অবশ্য ঠিক কৃপণ ছিলেন না। কৃপণের মত কাজ করে ফেলতেন মধ্যে মধ্যে এই যা, যাইহোক্ ছেলেকে খুসী রাখতে তিনি সত্যই অকৃপণ ছিলেন।

ছেলের লেখাপড়ায় মন ছিল না, যদিও বুদ্ধি ছিল যথেষ্ট। ছোটবেলা থেকেই কিসে মোটা পয়সা পাওয়া যায় সেই দিকেই ছিল তার নজর। কাজেই স্কুলের বইয়ের ভিতর দেখা যেত ঘোড় দৌড় খেলার বই। পাড়ায় তিনি Praivate Bookie খুঁজে বের করলেন। প্রথমে আরম্ভ হোল পাঁচ আনা দশ আনা করে লাগাতে। পরে বড় হয়ে হাতে টাকা পেয়ে ঘোঁড় দৌড়ের মাঠে পাঁচশ, হাজার পর্য্যন্ত খেলেছিলেন শোনা যায়। একবার তিনি প্রথম বাজীতে ১০০ টাকার মত পান্। তখন তিনি দ্বিতীয় বাজীতে পুরো টাকাটাই খেলে ফেলেন। তাতে তিনি প্রায় ৫০০ টাকার মত পান্। কিন্তু তাঁর সন্তোষ কোথায়? তিনি সব টাকাটা অর্থাৎ লাভের ও ঘরের টাকা দুইই তৃতীয় ঘোড়ার লেজে বেঁধে দিলেন। দেখা গেল মাঝ রাস্তা পর্যন্ত ভাল ছুটে ঘোড়া উল্টোদিকে ভড়কে চম্পট দিল। কাজেই ভদ্রলোকের খুব আশা হড়কে গেল। তাঁর জনৈক বন্ধু যখন তাঁকে মূল্যবান জ্ঞান দিতে গেলেন, তিনি বললেন 'মারি ত হাতী, লুটি ত ভাণ্ডার"। অর্থাৎ তিনি অল্প লাভে হাত নষ্ট করতে রাজী নন। আসলে টাকায় তার অত্যন্ত লোভ ছিল এবং কিসে রাতারাতি বড়লোক হওয়া যায় সেদিকে ফিকির ছিল দিনরাত, কাজেই জুয়া, ঘোড় দৌড়, ফাটকা betting সব বিষয়েই তাঁর আগ্রহ ছিল বলবান্।

পিতৃদেবের জীবিত অবস্থায় পিতৃদেবের অনেক পয়সা নষ্ট করে ফেললেন পুত্ররত্ন আর বাকী যেটুকু ছিল সেও আনুমানিক তিন লক্ষ টাকা, তাও পিতৃদেবের মৃত্যুর পাঁচ বৎসরের মধ্যে "গয়া গঙ্গা গদাধর হরি" হয়ে গেল। তিনি সন্তানদের জন্য মস্তবড় ছোবড়া রেখে বেশ দয়ে মজিয়ে গেলেন। নিজে দুঃখধাম ত্যাগ করে সুখধামে চলে গেলেন। এখন এই ভদ্রলোকের হাতের রেখায় আসা যাক্। দেখা যাবে তাঁর ছোট করতলে লম্বা লম্বা আঙ্গুল। ছোট করতলে বড় বড় Ideas দেয়। আঙ্গুলগুলি

লম্বা থাকায় অনেক বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখতেন, লক্ষ্য করতেন। আঙ্গুলগুলি ছিল কতকটা উল্টোদিকে ধাবমান বা বাঁকান। এবং ফাঁক হয়ে বসে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। কাজেই তাঁর Principle-এর বালাই ছিলনা। তার মন্ত্র ছিল সুবিধাবাদিতা। অতি চালকের যা হয়, তাঁরও তাই হলো। তিনি যখন বাস্তাবিকই উড়িয়ে ফেল্লেন, তখন তাঁর ছেলেরা কুড়ুবে কি? তার গ্রহঁ যে অর্থ লালসা তার হস্তরেখায় স্পষ্ট লেখা ছিল। তাঁর হাতের রেখা ছিল এই ধরণের।
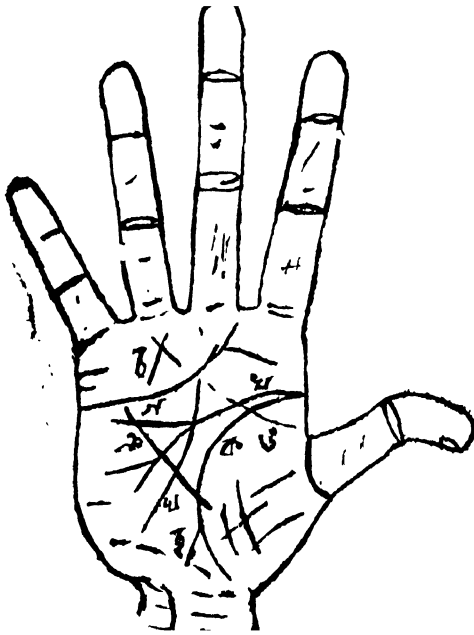
ক—জীবনী রেখা
খ—মস্তিষ্ক রেখা
গ—হৃদয় রেখা
ঘ—ভাগ্য রেখা
ঙ—রাহু রেখা
চ—রবি রেখা
কস্তিক
ছ—ভ্রমণ রেখা
ঞ—ব্যবসা রেখা

হাত মাংসল। কাজেই ভোগবিলাস ও ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধ খুব সজাগ ছিলেন। তাঁর হস্তপৃষ্ঠের এবং অঙ্গুলীর চামড়া ছিল লোমহী ও মসৃণ। কাজেই তিনি দৈহিক ধকল সামলাতে পারবেন না। সকল প্রকার সুখসুবিধাতে বিলক্ষণ আত্মকেন্দ্রিক ছিলেন। তাঁর কয়েকজন সত্যকারের বন্ধু থাকলেও তিনি নিজে ছিলেন সুবিধাবাদী বন্ধু। কাজেই কিছুদিন বাদে তাঁর বন্ধুরা তাঁর আসল পরিচয় পেয়ে একে একে বড় দিলেন। পড়ে রইল কয়েকটা খোসামুদে ক্ষোধন। তাঁদের বুদ্ধিতে আরো কিছু নষ্ট ভ্রষ্ট হোল। জীবদ্দশায় পিতৃদেব বিশেষ করে শেষের দিকে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারেননি। কিন্তু তখন আর আফসোষ করে লাভ কি? ছেলের মনে লোভের পাকা রং ধরে গেছে। কাজেই অতিলোভে তাঁতী নষ্ট হোল।

এখন তাঁর বুদ্ধিরেখা যদি দেখেন ত নজরে পড়বে যে এটি মধ্যে অস্বাভাবিক ভাবে দ্বিধাভক্ত। একটি হঠাৎ অধিক নীচে নেমে কল্পনা প্রবণতার কারক অপরটি ঊর্দ্ধদিকে ধাধিত হয়ে অর্থ লোলুপতার প্রবল কারণ। কাজেই নানান ফিকিরে অর্থ রোজগারই ছিল কাম্য। এই দুই বিপরীত গামী শাখা তাঁহার বিচারের যৌক্তিকতা ও সংযম নষ্ট করে দিয়েছিল। তার উপর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অত্যন্ত নমনীয় কাজেই Principle-এর দৃঢ়তা রইল না। দীর্ঘ হওয়ায় বাড়লো কেবল জেদ। কারুর বুদ্ধি তিনি বড় নিতেন না। তিনি ছিলেন স্বমতপ্রধান। অল্প পরিসরের করতল হওয়ার বড় বড় Ideas মাথায় ঘুরতে লাগলো। দ্বিমুখী মস্তিষ্ক রেখা তাকে বশে আনতে পারলো না। হৃদয় রেখায় high Sentiments কিছু ছিলনা। বরং ছিল স্বার্থপরতা এবং কতকটা পরশ্রীকাতরতা। অনামিকা দীর্ঘ থাকায় জীবটা lottary খেলা বলে ধরে নিয়েছিলেন। কাজেই লোভের মোহে পড়ে তিনি প্রভূত অর্থ নষ্ট করে ফেল্লেন নানান অপচেষ্টায়। পরে দুঃখে, ক্ষোভে ও চিন্তায় পীড়িত হয়ে ইহধাম থেকে বিদায় নিলেন। এর জন্যে দায়ী কে? শুধুই কি তার অর্থলোভ? বাল্যে উপযুক্ত লালন পালন হলে এই দুর্বলতা কি কেটে যেতনা? অন্ততঃ অনেকটা কমে যেত এটা বলা যায়। হাতের রেখায় স্পষ্ট বার্তা ছিল। কেউ কি সে বার্তা পড়লো না পড়তে চায়?

জ্যৈষ্ঠমাস

জ্যৈষ্ঠমাসের গ্রহসংস্থান অপেক্ষাকৃত ভাল Constrc-

tive কাজগুলি এগোতে থাকবে। অবশ্য মধ্যে মধ্যে অহেতুক প্রতিবন্ধকতা এসে পড়ে সাময়িক কতকটা Stalemate অবস্থা এনে ফেলতে পারে। এবং প্রগতির দিকে আশা থাকলেও অনেকগুলি গ্রহ বক্রী থাকায় কাজ মধ্যে মধ্যে পিছিয়ে যেতে বাধ্য। ১৭ ১৮ই মে নাগাদ কোন কোন রাজসরকারকে অস্বাভাবিক অবস্থায় পড়ে নাজেহাল হতে হবে। কোন কোন প্রতিষ্ঠিত মানী ব্যক্তি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়বেন। এ মাসে বাক্‌বিতণ্ডা বেশী। চন্দ্র শনি একত্রিত হওয়ায় জনচাঞ্চল্য কম হবে এবং তাদের মধ্যে একাগ্রতা, একমুখীতা অধিক দেখা দিতে পারে। জনগণের চাঞ্চল্য অপেক্ষা দৃঢ়তাই অধিক দেখা যায়। কাজেই যে যে দেশে তাঁরা কোন কর্ম্মসূচি নেবেন তাতে তাঁরা অপ্রতিহত ভাবে এগোতে চেষ্টা করবেন বলে মনে হয়। কিন্তু তাঁদের বাধাও কম আসবে না। এ মাসটা শিশুদের পক্ষে ভাল নয়। তাদের স্বাস্থ্যাদি, চিকিৎসা, লালন-পালন ইত্যাদি ব্যাপারে যত্ন নওয়া প্রয়োজন। কারণ এ মাসে তাদের অধিক ভোগবার কথা। তারা কোন Epedemic রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

এবার ব্যক্তিগত মাসফল বিচার করা যাক্।

বৈশাখ—

বৈশাখ মাসে যাঁদের জন্ম তাঁদের জ্যৈষ্ঠমাস কেমন যাবে শুনুন্। শনিঠাকুর রবি রাশিতে কিছুদিন হোল এসে পড়েছেন। রবি শনি পিতা পুত্র। পরস্পর পরস্পরের ঘোর শত্রু। কাজেই লড়াই প্রচণ্ড; আরম্ভ হয়ে গেছে। পিতা পুত্রের লড়াইয়ে পিতারই পরাজয় দেখা যায়। রামায়ণ, মহাভারত ও অপর দেশীয় পুরাণ গ্রন্থ কাব্যে এর ভূরি ভূরি নজীর পাওয়া যায়। রাম হারলেন লব কুশের কাছে, অর্জ্জুন হারলেন বভ্রুবাহনের কাছে, সোরাব হারলেন রুস্তমের কাছে। কাজেই রবির দীপ্তি শনির দ্বারা স্তিমিত। রবি আলো, শনি অন্ধকার। কাজেই বৈশাখ মাসের লোকের আকাশ খুব পরিষ্কার থাকে কি করে? অবশ্য এটা ধৈর্য্য শিক্ষার সময়। বৈশাখ মাসের লোক যত ত্যাগ তিতীক্ষা দেখাতে পারবেন ততই তাঁরা সংগ্রাম-লব্ধ ফলের আশা করতে পারেন। ব্যস্ত হলে চলবে না। এখন offensiveয়ের সময় নয়। এখন প্রয়োজন গঠন ও প্রতিরোধ। এই অবস্থা অনেকদিন চলবে প্রায় দুই বৎসর। যাঁদের ৭ঠা বৈশাখ হতে ১২ই বৈশাখে জন্ম, তাঁরাই উপস্থিত চাপ খাচ্ছেন বেশী।

সাংসারিক ব্যাপারে অনেক জড়িয়ে থাকতে হবে, উপায় নেই। যে সব পারিবারিক কাজ করে ফেলবেন মনস্থ করেছেন, তার সাফল্যের জন্য পথ ঠিক পরিষ্কার নয়। তবু চেষ্টা ছাড়বেন না। বাগ বিতণ্ডায় শত্রুতায় মধ্যে পড়ে যেতে পারেন। সে সব avoid করুন। টাকা পয়সা সময় মত এসে যাবে।

জ্যৈষ্ঠমাস—

জ্যৈষ্ঠমাসে যাঁদের জন্ম জ্যৈষ্ঠমাস তাদের মন্দ যাবেনা। অর্থোপায় ভালই হবে, অন্যান্য অনেক সুখসুবিধা ভোগ করবেন। বুদ্ধি বিবেচনা পরিষ্কার থাকবে। কর্ম্মে উদ্যম বাড়ালে লাভবান হবেন। টাকাকড়ি সহজেই হাতে এসে পড়বে। মাতার স্বাস্থ্য মধ্যে মধ্যে উদ্বেগের কারণ হবে।

পারিবারিক বিশৃঙ্খলাও মধ্যে মধ্যে দেখা দেবে। জ্ঞাতি আত্মীয় কারণে ব্যয় বাহুল্য, তাঁদের জন্য ঝঞ্ঝাটও পোহাতে হবে। যাঁরা লেখাপড়া করছেন, তাঁদের বিদ্যায় আগ্রহ বেশী হবে, দেখা যায়। যাঁরা বিবাহিত এবং সন্তান সন্ততি আছে, তাঁরা সন্তানদের বিষয়ে অধিক যত্নবান্ হবেন, মনে করি।

আষাঢ়—

আষাঢ় মাসে যাঁদের জন্ম তাঁদের জ্যৈষ্ঠমাস মোটের উপর ভাল যাবে। আয়বৃদ্ধি হবে, কর্ম্মে সুখ সুবিধা পাওয়া যাবে। বিদ্যায় কৃতকার্য্য হতে পারবেন। ব্যয়াধিক্য আটকাতে পারবেন না। সাংসারিক কারণে ব্যয়, মাতা ও বন্ধুর জন্য ব্যয়, নিজের অভিরুচি অনুযায়ী ব্যয়, আত্মীয়ের জন্য ব্যয়, স্থানান্তর গমনাগমনের জন্য ব্যয় ঘটবে। নিজের মেজাজটা কিছু গরম থাকবে। পেটের গোলমাল কিছু কিছু হবে। শত্রুর সম্মুখীন হতে হবে। ঋণগ্রহণ করতে হতে পারে। নিজে কী করে দাঁড়াবেন সেই চিন্তা বলবতী রয়েছে এবং দুইবৎসর কাল থাকবে। কর্ম্মপ্রসারের ভাল সময়। যাঁদের কর্ম্ম নাই, তাঁদের

কর্ম্মপ্রাপ্তি হবার সম্ভাবনা দেখা যায়। যাঁরা অবিবাহিত তাঁদের বিবাহের যোগাযোগ চলবে।

শ্রাবণ—

যাঁদের শ্রাবণ মাসে জন্ম, তাঁদের ভাল আয় হবে। কর্ম্মে ঝঞ্ঝাট চলছে সত্য, কিন্তু যোগ্যতা, জনপ্রিয়তা বাড়বে, এই মাসে কর্ম্মচিন্তাই প্রধান। অবিবাহিতদের বিবাহের যোগাযোগ ভালই যাঁরা ব্যবসায়ে নামতে চান এই মাসেই নেমে পড়ুন। সন্তানদের কারণে ব্যয় বিলক্ষণ হবে। গুরুদায়িত্ব মাথায় আছে। সেটা উদ্ধার করতে পারবেন। হঠাৎ ধনপ্রাপ্তি দেখা যায়। সন্তানদের জন্য অনেক ধনব্যয় হবে।

ভাদ্র—

কর্ম্মে উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা দুই-ই আশা করতে পারেন। অর্থ রোজগার ভালই হবে। কিন্তু অর্থচিন্তা চলবে। মধ্যে মধ্যে অধিক ব্যয়ও সামলে উঠতে পারবেন না। কর্ম্মে ঝঞ্ঝাট থাকবে, মধ্যে বদলীরও কথা উঠতে পারে। অন্তত: দৌড়ঝাঁপ না করে উপায় নাই। বাড়ী, ঘর বা বাসস্থান সম্বন্ধে কিছু করার আগ্রহ থাকলে কাজে নেমে পড়ুন। আপনি যদি বিবাহিত হন, পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য ভাল যাবেনা। কারুর সঙ্গে partnership ব্যবসায় টপ করে নেমে পড়বেন না। পরস্পর ভাল রকম বোঝাপড়া করে তবে একত্র ব্যবসা করবেন। জ্ঞাতি আত্মীয়ের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে না। তাদের জন্য ব্যয়ও মন্দ হবেনা।

আশ্বিন—

যাঁদের ৫ থেকে ১০ আশ্বিন পর্য্যন্ত জন্ম, তাঁদের ঝঞ্ঝাট একটু বেশী। সাধারণভাবে আশ্বিন মাসে জাতকের এমন এক একটা ঝঞ্ঝাট এসে যায় যে নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব নয়। কাজেই একটা তটস্থ ভাব চলছেই। বিদ্যা-স্থান ভাল নয়। বেশী খাটা দরকার এমন কি অল্প কৃতকার্য্য হতে হলেও। শত্রু যদি বেশী চালাকি করে ত বিধ্বস্ত হয়ে পড়বে। আপনার তরফ থেকে অবশ্য শত্রুতা avoid করার চেষ্টা করা দরকার। নচেৎ শত্রুকে বশে আনার প্যাঁচ কষতে গিয়ে নিজেরই খানিকটা নাজেহাল হয়ে যেতে পারে। মাতুলদের পক্ষে সময়টা ভাল নয়। অবিবাহিতদের বিবাহের যোগ দেখা যায়। যাঁরা সন্তানের পিতা বা মাতা তাঁদের সন্তান সংক্রান্ত উদ্বেগ অশান্তি এখন অনেক দিন চলবে। কাজেই ধীর স্থির হয়ে তাদের সম্বন্ধে যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।

কার্ত্তিক—

আপনাদের জ্যৈষ্ঠ মাসটা বিশেষ সুবিধাজনক নয়। অর্থব্যয় প্রচুর হবে। সঞ্চিত অর্থ হালকা হয়ে যাবে। মানসিক সুখ শান্তি তত দেখিনা। ভ্রমণের যোগ দেখা যায়। মাতুলদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটতে পারে। কর্ম্ম-চিন্তা বিদ্যাচিন্তা প্রধান হতে পারে। এই সময় ঠিক করে রাখুন ভবিষ্যৎ জীবন কেমন কাটাবেন। কারণ এই সময় Career সম্বন্ধে চিন্তা আসার কথা। অববহিতদের বিবাহের যোগ এলেও হয়ত নিজে থেকেই পিছিয়ে দিতে পারেন। আয় এবং অগ্রজ সম্বন্ধে চিন্তা আসতে পারে। ধর্ম্মভাব চাপা থাকবে। এ মাসটায় চুপ করে Plan করুন, পরে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

অগ্রহায়ণ—আপনার চিন্তার কোন কারণ নাই। জ্যৈষ্ঠমাস মোটামুটি ভালই যাবে। ব্যবসা বাণিজ্যে সুযোগ এলে ছাড়বেন না। চাকুরী কর্ম্ম করলেও চিন্তার কারণ নাই। অবশ্য খাটুনি বাড়বে, মধ্যে মধ্যে মেজাজ গরম হবে। উদ্যম করলে ভাগ্যলাভ, তাও আংশিক। কিন্তু আয় খারাপ দেখি না। অবশ্য আপনার পরিতৃপ্তি হওয়া শক্ত। আমোদ আহ্লাদে বেশী যোগ দেবেন না। কারণ সময়ের অপব্যয় হয়ে যেতে পারে। নিজের ব্যক্তিত্ব ঠিক রাখুন, কিন্তু অযথা stubborn হবেন না। গৃহ-সংসারের আবহাওয়া এখনও ঠিক অনুকূল নয়। সহোদরাদির ব্যবহার শান্তিপ্রদ না হতে পারে।

পৌষ—কাজকর্ম্ম যতই করুন এখন ঠিক স্বস্তি বা শান্তি পাবেন না। উদ্বেগ চলছে এবং আরও কিছুকাল চলবে। যাঁদের পৌষ মাসের ১০ তারিখের মধ্যে জন্ম তাঁদের বিশেষ করে কর্ম্মে হঠাৎ ঝঞ্ঝাট ঝামেলা এসে পড়ায় নাস্তা-নাবুদ হয়ে পড়তে হবে। যথেষ্ট উদ্যম উৎসাহ নিয়ে কাজ করা দরকার,তবে ভাগ্য খানিকটা ফিরবে। সন্তান বিষয়ক উদ্বেগ অশান্তি দেখা যায়। যাঁরা লেখাপড়া নিয়ে আছেন তাঁদের বিদ্যায় সুফল লাভ সহজে সম্ভব নয়। কাজেই অবহেলা করবেন না। খাওয়া দাওয়া ধারকাট রাখবেন। নচেৎ উদরপীড়া ভোগ করতে হবে। জ্যৈষ্ঠ

মাসে আপনাদের ব্যয়াধিক্য দেখা যায়, সঞ্চয় করাই শক্ত। জ্ঞাতি আত্মীয়ের স্বাস্থ্য ভাল না থাকতে পারে এবং সে কারণে আপনার দুশ্চিন্তা ভোগ হতে পারে। যানবাহন বা গৃহাদি ব্যাপারে আপনার অভীষ্ট খানিকটা সিদ্ধ হতে পারে।

মাঘ—জ্যৈষ্ঠমাস আপনার মন্দ নয়। যে ঝামেলাই আসুক আপনি অটল থাকতে পারবেন। স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখবেন, কারণ invitabilly দেখা যায়। প্রায় বছর দুয়েক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সজাগ থাকা প্রয়োজন। যাঁরা অবিবাহিত তাঁদের বিবাহ যোগ দেখা যায়। আত্মীয় স্বজন নিয়ে খানিকটা আনন্দে কাটাতে পারবেন। আয় ভালই হবে। ব্যবসা বাণিজ্যের যোগাযোগ ভাল। অবশ্য প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। সন্তানদের স্বাস্থ্য ভাল দেখি না। সর্ব্ব বিষয়ে তাদের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। কর্ম্মে দায় দায়িত্ব বাড়ছে। প্রায় বৎসর দুয়েক টানতে হবে, উপায় নাই। বুদ্ধি তীক্ষ্ণ থাকবে, তার জোরেই অনেক ঝামেলা পার হয়ে যাবেন।

ফাল্গুন—স্বাস্থ্য ও শত্রু চিন্তা জ্যৈষ্ঠমাসে থাকবে। মাথা গরম করবেন না। সতর্কতার উপর চলুন। আপনার আশে পাশে শত্রু। অধিক ব্যয় চলছে, আরো কিছুকাল চলবে। অবশ্য টাকার অভাব হবে না। জ্ঞাতি আত্মীয় নিয়েই বেশী থাকবেন। তাঁদের ব্যবহার অনেকসময় মনঃপূত হবে না। কর্ম্মে ঝঞ্ঝাট চলছে, এবং চলবে। আশঙ্কা করবেন না, সাহসে ভর করে কাজ করুন। পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। যাঁদের পিতা জীবিত, তাঁদের পিতার স্বাস্থ্য ভাল দেখি না, অনেক ধকল পিতাকে সহ্য করতে হবে। বিদ্যায় শুভফল আশা করতে পারেন।

চৈত্র—

আপনার জ্যৈষ্ঠমাস শুভাশুভ। খাটতেও হবে, আরামও পাবেন। লোকের সঙ্গে মেলামেশি রেখে যান। ব্যবসায়ের চেষ্টা করুন। কিছু প্রতিবন্ধকতা আসবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ধৈর্য্য ধরে থাকলে ফললাভ সুনিশ্চিত। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ বেশী দেখা যায়। যাঁরা বিবাহিত নন্ তাঁদের বিবাহের যোগ দেখা যায়। অবশ্য হঠাৎ প্রতিবন্ধকতার জন্য অন্য গ্রহও বসে আছে। কাজেই সবটা কপালের উপরে ছেড়ে না দিয়ে, চেষ্টা চালিয়ে যান। অর্থচিন্তা এমাসে যথেষ্ট হবে। যতই ব্যয় সঙ্কোচ করুন, টাকা জমাতে পারবেন না। যাঁরা সঙ্গীতাদি কলা বিদ্যায় উৎসাহী তাঁরা উৎসাহ বাড়ালে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করতে পারবেন।

আপনার ভবিষ্যৎ জানতে চান কি ?

আপনার যদি কোন গুরুতর প্রশ্ন থাকে, তার উত্তর দেবেন স্বরাচার্য্য আপনার জন্মসময়, তারিখ এবং জন্মস্থান জানালে। যাঁদের জন্মচক্র, গ্রহের স্ফুট, বিংশোত্তরীর দশা যা চলছে তা জানা আছে তাঁরা এগুলি লিখে পাঠালে, শীঘ্র উত্তর দেবার সুবিধা হবে। Lahiri's Ephemenis বা বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী গণনা করা থাকলেই পাঠাবেন। কারণ স্বরাচার্য্য এই দুই গণনার উপরই নির্ভর করেন। দুইটির বেশী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে না। এই উত্তর "ভারতবর্ষ"-এর পরের সংখ্যায় পাবেন অবশ্য খুব বেশী অনুরোধ এসে গেলে পত্রের প্রাপ্তি ক্রম অনুযায়ী আস্তে আস্তে পরের সংখ্যাগুলিতে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। প্রশ্নের সঙ্গে এই পাতার শেষে যে 'কুপন' আছে সেটি ছিঁড়ে পাঠাতে হবে। প্রতি কুপন'-এ দু'টি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে।

আপনি যদি প্রশ্নের উত্তর গোপনীয় ভাবে চান তাহলে ডাকটিকিট ও ঠিকানা সহ ভারতবর্ষ-এর ঠিকানায় অনুরোধ জানাবেন। সেক্ষেত্রে স্বরাচার্য্য মহাশয় সরাসরি আপনাকে উত্তর দেবেন। পত্র লেখার সময় ও তারিখ পত্রে থাকলে অনেক সময় যথার্থ উত্তর দেওয়ার সহায়তা হয়। হাতের ছাপ পাঠাতেও পারেন প্রশ্নের রহস্যোদ্ঘাটনের সহায়তা হিসাবে। দুই হাতের ছাপ প্রয়োজন। ছাপ নেবার অনেক পদ্ধতি আছে। সাধারণ কালিতে ছাপ ভাল হয়না ; Stamp padink-এ চলতে পারে, যদি Stamp pad-এর সাহায্য নেন। Press ink Cyclostyle ink অর্থাৎ ছাপার কালি সবচেয়ে ভাল। কিন্তু এই কালি হাতে লাগাতে হলে কাঠের বা রবারের রোলার প্রয়োজন। অনেকের এটা যোগাড় করা সম্ভব নাও হতে পারে। ভূষো কালি হাতে লাগিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। পরিত্যক্ত Lip stick বাড়ীতে থাকলে তা দিয়েও হাতের সুন্দর ছাপ নেওয়া যায়। নূতন ব্যবহার করলে বৃথা খরচ বৃদ্ধি হবে এই যা। মনে রাখবেন, কেবল কৌতুক বশতঃ প্রশ্ন করবেন না। তাতে আপনার ও স্বরাচার্য্যের দুজনেরই সময় নষ্ট হবে। প্রশ্ন প্রয়োজনীয় বা গুরুতর, বা জানার আগ্রহ যথেষ্ট থাকলে তবে প্রশ্নের উত্তর ভাল পাওয়া যায়। মনে মনে কল্পনা করে প্রশ্ন বার করবেন না। যে প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য মন ব্যাকুল সেই প্রশ্নই প্রশ্ন।

অনেকেই প্রশ্ন ঠিকমত করতে পারেন না। তাঁরা জানতে চান এক, কিন্তু জিজ্ঞাসা করেন আর এক! কাজেই উত্তর সন্তোষজনক পাওয়া যায় না। এজন্য প্রশ্নটা একটু ভাববেন এবং আসল জ্ঞাতব্য কি সেই কথাটাই খুব সরল, সহজ, স্পষ্ট এবং যথাসম্ভব ছোট্ট করে জানাবেন

ধরুন আপনার বাজারে কিছু দেনা আছে। আপনি ভাবছেন একটা লটারী পেলে দেনাটা শোধ করে ফেলতে পারেন। কাজেই প্রশ্ন করলেন "লটারী পাব কিনা?" লটারী পাওয়া আসলে কিন্তু প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে ঋণ শোধ, কারণ আপনি ঋণ পীড়ায় পীড়িত। কাজেই আপনার প্রশ্ন হওয়া উচিত "দেনা শুধ্‌তে পারবো কি?" "দেনা শুধ্‌তে কত সময় লাগবে?" "দেনা সময়ে পরিশোধ না করলে কি ক্ষতি হয়ে যাবে" —এই সব। কিন্তু লটারী পাবার জন্যে মন সত্যই ব্যাকুল থাকলে তখন জিজ্ঞেস করতে পারেন লটারী পাবেন কিনা। সেই টাকা তখন কী কাজে লাগাবেন সেটা প্রশ্ন নয়।

প্রশ্নের উত্তর সন্তোষজনক ভাবে মিলে গেলে স্বরাচার্য্যকে "ভারতবর্ষ"-এর ঠিকানায় জানাবেন।

॥ কুপন ॥

গ্রহ-জগৎ

জ্যোতিষ ভারতী পণ্ডিত কুমার শঙ্কর শাস্ত্রী

জয়শ্রী চক্রবর্তী

চৌষট্টি নম্বর ভুপেন্দ্র বসু এভিনিউ আজ আমার জীবন স্মৃতি পৃষ্ঠায় একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষরিত ঠিকানা।

বহুগুনের নিত্য আনাগোনার মত আমারও আগমন ঘটে - প্রত্যহের প্রহরে প্রহরে। এখানে যে মন্দির বেদী প্রতিষ্ঠিত—তা জাগ্রত—দেবী কালী মাতার। প্রতি শনিবারে—বহু ভক্ত সমাগমে—শনি পূজার একটি বিশেষ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়—প্রবল ভক্তি সহকারে।

একদা এখানে সম্ভবতঃ আমার আগমন ঘটেছিল—কতকটা দৈবাকর্ষণে। ইতিপূর্বে এ পথ দিয়ে আমার জীবনের বহু পদক্ষেপই—উদাসীনতায় এগিয়ে গেছে। কখনো জানিনা, এই—জাগ্রত অধিষ্ঠান দেবী চত্বর, আমার জীবন শক্তির একটি গভীর ইশারা নিয়ে ফিরবে।

এখানকার পরম ভক্ত - নৈষ্ঠিক সদাচারী সরল—মানুষ পণ্ডিত কুমার শঙ্কর শাস্ত্রী,—যিনি ভক্তি প্রাবল্যে আত্মহারা, সাধনায় সাত্ত্বিক, সাধারণ জীবনে—অতি সাধারণ, যিনি পরদুঃখকাতর, দরিদ্র সেবী—উদার চিত্তবৃত্তি সম্পন্ন—তাঁকে আজ কলমের কটি লিপিতে—হয়তো উজ্জ্বল আখরে আঁকতে পারব না। প্রকৃত একজন মানব সেবক—জনদরদীর হৃদয়—সীমানার অস্তিত্বকে দিয়েছে —অসীমের অনন্তে মিলিয়ে—সেখানে আমি স্তব্ধ, নির্বাক। ভাষাহীন—এক অবাক মানুষ।

এমনি অবাক মানুষের ভীড় যেন সমুদ্রের অসংখ্য উত্তরঙ্গের মত বিশাল হয়ে উঠেছে। এখানে—ভীড় জমায়—আর্ত কাতর দুঃখীজন। এখানে ভীড় হয়—কৌতুহলী জনতার। শনি পূজোর—মন্ত্রপূত—রাত্রিগুলো —যেন অবাক আকর্ষণে সবাইকে এখানে ডেকে আনে। আহ্বান জানায়, এসো—তোমরা এখানে শান্তির প্রাঙ্গণে, মুক্তির অঙ্গনে।

কি শান্তির প্রস্রবণ ধারা বয়ে যায়—সেই ধারা যেন নামে চোখের দরিয়ায়, ভাবের—অন্তরে। প্রাণের কোটরে।

এই পবিত্র কুটিরেই অবস্থান করেন কোমলপ্রাণ কুমার শঙ্কর শাস্ত্রী। ব্রাহ্ম মুহূর্ত থেকে—গাঢ় নিশীথেও —তিনি তাঁর সেবাকর্ম অটল নিষ্ঠায় পালন করেন।

ভারত বিখ্যাত জ্যোতিষ আচার্য্য শ্রীমোহিনীমোহন শাস্ত্রীর যোগ্য পুত্র ইনি। জ্যোতিষ গণনায় পণ্ডিত কুমারশঙ্কর শাস্ত্রীর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ ঘটেছে পিতৃদেব শ্রীমোহিনীমোহন শাস্ত্রীর নিকট হতে। পিতৃদেবও শুধু জ্যোতিষসাগর ছিলেন না মানবিক সেবাধর্মে যেমন তাঁর মহত্ত্ব, উদারতা ছিল, তেমনি নৈষ্ঠিক সদাচারী ব্রাহ্মণ হিসেবেও সুপরিচিত ছিলেন। শ্রীশ্রীরামঠাকুরের সান্নিধ্যলাভে আধ্যাত্মিক উপাসনায় তাঁর উৎসর্গীকৃত জীবনের পাশেই সুদীক্ষিত হয়ে উঠেছেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র শ্রীকুমারশঙ্কর শাস্ত্রী।

পিতৃধারায় মাহাত্ম্যকে অবলম্বন করেই বর্তমান কালের একজন শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ ভারতীরূপে পণ্ডিত কুমার শঙ্কর শাস্ত্রী মহাশয়ের খ্যাতি। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইনি বর্তমানে ভারতীয় জ্যোতিষ পরিষদের সহকারী সম্পাদক। খাঁটি হিন্দুধর্মে দীক্ষিত নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ কুমার শঙ্কর শাস্ত্রী মহাশয় বলেন আমাদের মাতৃপূজা ও মূর্তিপূজা যে ধর্ম উপেক্ষা করে সেই ধর্মে মোক্ষ জ্ঞান লাভ সম্ভব হয়নি। মূর্তি পূজার মধ্যেই ভেসে আসে প্রকৃত দেবভক্তি, ধ্যান, ধারণা, সেবা ধর্ম, মোক্ষ ও মুক্তি।

সৎজ্ঞানী কুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের ধর্মীয় বিশ্লেষিত আলোচনায় আমরা প্রকৃত সন্ধান পাই তাঁর ঈশ্বরাবিষ্ট হৃদয়ের। আত্ম উপলব্ধির প্রজ্ঞান সত্যটির ওপর প্রতিষ্ঠিত তাঁর দৃঢ়চিত্ত মতবাদ। আত্মিক অনুষ্ঠানের অনুপ্রেরণায়

তাঁর হৃদয়ে ভক্তিভাবের প্রাবল্যে প্রবাহিত হলেও তাঁর কোনরকম ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন গোঁড়ামী নেই।

বিভিন্ন মতবাদের উদার অভিব্যক্তিতে তিনি কঠোর সত্যবান এবং অত্যন্ত স্পষ্টবাদিতায় তাঁর হৃদয় আরো অধিকতর কঠোর। কোনরকম ভণ্ডামী মিথ্যাচার ও ছলনাকে তিনি প্রশ্রয় না দিয়ে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন। কোন ভক্ত শিষ্যের তোষামদী নীতিকেও, বিন্দুমাত্র পছন্দ করেন না। প্রকৃত পক্ষে তিনি একজন সত্যিকারের 'মানুষ' হিসেবে সকল জনের শুভ্র মানসিকতার উজ্জ্বল এক প্রতীকরূপ। আর এখানেই তিনি ধন্য! তিনি সার্থক! তিনি পবিত্র সুন্দর।

চির কর্মব্যস্ত জনদরদী পণ্ডিত কুমারশঙ্কর শাস্ত্রী মহাশয় কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বহুতর প্রতিষ্ঠানের সংগে একাত্ম ভাবে যুক্ত। যথা, রাণী রাসমণি মিশন, 'সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনী' 'সাদার্ণ ক্যাডেট্ কোর', (অরবিন্দ আশ্রম পণ্ডিচেরী) 'আরামবাগ সাধককবি রামদাস স্মৃতিরক্ষা সমিতি', 'বঙ্গীয় পণ্ডিত মণ্ডলী', 'নিখিল বঙ্গ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু পঞ্চশত বার্ষিকী জয়ন্তী কমিটি, নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন,চণ্ডীতলা ছাত্র সংঘশ্যামবাজার মিলন সমিতি, জীবন রদম, বালীগঞ্জ বিচিত্রা সঙ্গীত সম্মিলনী, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ সঙ্গীত বিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ সমাজ কর্মী পরিষৎ, ইউনাইটেড স্তোসিয়াল ওয়েল ফেয়ার,রিলিফ ওয়েল ফেয়ার কোর ইত্যাদি নানান প্রতিষ্ঠানের সংগে তাঁর একনিষ্ঠ কর্মজীবনের সম্বন্ধ!

তাঁর জীবনের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও খ্যাতি সমগ্র বাংলাময় প্রচারিত। তথাপি তাঁর যশলিপ্সার কোন মোহ-আসক্তি নেই বিন্দুমাত্র। তাঁর জীবনের কর্মবাদের সত্যই হোল সেবা ধর্ম। তিনি মনে করেন আত্ম প্রচারহীন নিষ্কাম সেবা-ধর্মের মাধ্যমেই যে কোন মানুষের চরিত্র গঠিত হয়। শুধু সাধন ভজনপূজনেই প্রকৃত ভক্ত হওয়া যায় না। সেইই সবচেয়ে বড় ভক্ত যে মানবসেবায় প্রকৃত আত্মোৎসর্গ করতে পেরেছে।

তাঁর এই বাণীধর্মের সংগে স্বীয় জীবনের যে মহত্তর সাদৃশ্য পেয়েছি তা তুলনা হীন। অতুলনীয় এই মহান চরিত্রের কথা কতটুকু প্রকাশ করতে পারলাম জানিনা। শুধু জানি ব্যর্থতা যতই মাথা কুটুক না-পাবার বেদনায় শুধু সার্থকতা আছে লুকিয়ে পরম অনুভবের মাঝারে। সেখানেই তিনি উত্তরঙ্গ!

রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী

লীলা বিদ্যান্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কবি বলেন পুরুষকে সম্মান দেবার জন্মেই বিধাতা নারীকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি মহেন্দ্র, যিনি পরম বীর, সেই পরম বীর্য্যবান দেবতা পুরুষকে বীর্য্যে দীক্ষা দেবার জন্মেই নারীকে সংসারে পাঠিয়েছেন।

"নারী সে যে মহেন্দ্রের দান
এসেছে জগত তলে পুরুষেরে
দানিতে সম্মান।"

ঠিক যেমন আমাদের দেশে সীতাকে পেতে হলে হর-ধনু ভঙ্গের বীর্য্য পরীক্ষায় জয়লাভের কথা আছে তেমনি ইউরোপেও শ্রেষ্ঠ বীর তার বীর্য্যের পুরস্কার শ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে প্রণতি জানিয়ে তার হাত থেকে গ্রহণ করত।

কবি বলেছেন পুরুষকে বীর্য্যের পথে প্রেরণা দিতেই এসেছে নারী। নারীর মোহনরূপের কাছে পুরুষ আপন বীর্য্যের পরিচয় দিয়ে তার চোখে নিজেকে মূল্যবান করে দেখাতে চায়। শ্রদ্ধার পথে সে তার প্রেম আকর্ষণ করতে চায়। নারী যদি এমন মোহন এমন লোভন না হত, তা হলে পুরুষ তার জন্য দুরূহ বীর্য্যের পরীক্ষা দেবার কষ্ট স্বীকার করত না। এই জন্মেই মহেন্দ্র নারীকে অমন মোহন সুন্দর করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বীরেরই জন্যে। রাজকন্যার বর-মাল্যের দাবী আছে রাজপুত্রের-ই।

কবি লিখেছেন—নারীকে আভরণে সাজাবার জন্য পুরুষ নেমেছে সাগরের অতলে মণিমুক্তো আহরণ করবার জন্যে, নেমেছে খনির গভীরে মণি অহরণের জন্যে, উঠেছে পাহাড়ের দুর্গম শিখরে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়ে নারীর চিত্তে সম্মানের আসন অধিকার করবে বলে। পুরুষের এই গৌরব যে সে কঠিন বীর্য্য দিয়ে মুগ্ধ করে নারীর হৃদয় জয় করেছে।

সংসারের অশোভন লোভ যখন সব কিছু অসুন্দর করে তুলেছে তখন কবি আশা করেছেন যে সুন্দরী নারীই পারে এই চারপাশের অসুন্দরকে সুন্দর করে তুলতে, অশোভন লোভকে সংযত করতে। "রক্ত করবী"তে নন্দিনীর এই ভূমিকা। ধনতান্ত্রিক সমাজে ধনিক যখন

ধনের লোভে উন্মত্ত হয়ে তার চারপাশের মানুষকে পীড়ন করে নিজের ঐশ্বর্য্য গড়ে তুলছে, মানুষকে দাবিয়ে রেখে তার কাছ থেকে নিজের কাজ আদায় করাই তার উদ্দেশ্য, তখন সে নিজেকে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আলাদা করে রাখে। সে যে সংসারের সঙ্গে কথাবার্তার আদান-প্রদান করে সে ওই জালের আড়াল থেকে। তার কথাবার্তাও শুধু প্রয়োজনের মাপে মাপা। বন্ধুত্বের, অপ্রয়োজনের কোনো বাহুল্য তার মধ্যে নেই। সে হল নিতান্তই কাজের কথা। আনন্দের আলাপন নয়।

এই জালের আড়াল থেকে তাকে মুক্তি দিতে পারে নারী। বাইরের সহজ সংসারের সঙ্গে তাকে ভালোবাসার মিলনে মিলিয়ে দিতে পারে নারী। জালের আড়াল ভেদ করে যেখানে আর কেউ প্রবেশ করতে পারে না সেখানে নারী প্রবেশের পথ পায়। নারীর মাধুরীর আকর্ষণে হয়ত একদিন এই জালের অন্তরাল সরে যাবে কবির এই আশা। এই মহৎ গৌরব কবি দিয়েছেন নারীকে। নারীর প্রতি কবি আরোপ করেছেন এক মহৎ দায়িত্ব অকরুণকে সমবেদনায় করুণ করে তোলার, অসুন্দরকে সুন্দর করে নেবার। যা ছিল শুধুই নির্মম শক্তির নিষ্ঠুর প্রকাশ, তাকে সবার কল্যাণে নিযুক্ত করে নেওয়া, নিষ্ঠুর শক্তিমানের হাতে হাত রেখে তাকে সবার সঙ্গে সমবেদনার আত্মীয়তায় মিলিয়ে নেওয়া, এই হ'ল নারীর সৌন্দর্য্যের মহৎ দায়িত্ব। যেখানে নারী এই দায়িত্ব গ্রহণ করেনি সেখানে কবি নারীকে ধিক্কার দিয়েছেন। "রক্ত করবী" বইতেই পাই—সর্দারনীদের প্রতি কবির ধিক্কার। এই সর্দারনী হ'ল ধনতান্ত্রিক সমাজের বিলাসিনী নারী। তারা ঝলমলে সাজসজ্জা পরে ধনতন্ত্রের ধ্বজাপূজো করবে বলে বাগান বাড়ীতে উৎসবে চলে। তাদের রূপ, তাদের সাজ-সজ্জা দর্শকদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। চারপাশের মানব পীড়ন আর দুঃখের প্রতি উদাসীন নারীর এই উৎসবসজ্জা কবির চোখে নিদারুণ নিষ্ঠুর বলে লেগেছে।

ধনতন্ত্র যখন একদল মানুষকে শোষণ ক'রে তাকে অমানুষের পর্য্যায়ে ফেলে নিজের ঐশ্বর্য্য বাড়িয়ে চলেছে, তখন নারী কেমন ক'রে এ ঐশ্বর্য্য এ সুখ ভোগ করে, [illegible] নারীর প্রতি কবির এই অভিযোগ।

'রক্ত করবী'র যক্ষপুরীর যখন নিয়ম হয়ে গেল যে কারিগররা তাদের সঙ্গে নিজের স্ত্রীকে আনতে পারবে না, তখন ফাগুলালের স্ত্রী চন্দ্রা প্রশ্ন করে, কেন, ওদের নিজেদের ঘরে কি স্ত্রী নেই? তাকে বিশুপাগল জবাব দেয় ওদের স্ত্রীরা যে সোনার লোভে ওদের স্বামীদেরও ছাড়িয়ে যায়।

নারী যদি লোভী, নীচ আর স্বার্থপর হয় তা হলে তার স্বার্থপরতা পুরুষের স্বার্থপরতাকেও ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু কবি প্রতীক্ষা করেছেন নন্দিনীর মত মহীয়সী নারীর। কবি আশা করেছেন জগতে এমন কোন দুর্ভেদ্য আড়াল নেই যা ভেদ করে নন্দিনী তার আনন্দের ছোঁয়া দিয়ে, তার অপূর্ব যৌবনের মায়া দিয়ে সেই আবরণ ভেদ করে অকরুণ নিষ্ঠুরকে সংসারের মধ্যে করুণা ও কল্যাণের মাধুর্য্যে টেনে আনতে না পারে। সুন্দরী, যৌবনশালিনী নারীর প্রতি পুরুষের যে আকর্ষণ, নারী সেই আকর্ষণকে সংসারের কল্যাণে নিয়োজিত করুক, তবেই একদিন সংসারের মধ্যে জীবনের, যৌবনের, সুন্দরের ও প্রেমের জয় হবে রক্ত করবীর নন্দিনী, মেয়েদের প্রতি কবির এই গভীর আবেদন বহন করছে।

এ যুগের ইউরোপের শ্রেষ্ঠ লেখক জর্জ বর্নাড শ'ও এ রকম কথা বলেছেন। ব্যাক টু মেথুমেলা বইতে তিনি মানুষের ভাবী কালের যে ছবি একেছেন সেখানে তিনি নারীর কথা বলেছেন যে যেদিন সে সন্তান পালনের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবে, সেদিন তার কাজ হবে শুধুই পুরুষকে বীর্য্যের পথে অনুপ্রেরণা দান করা। সন্তানের জন্মদানকে বর্নাড শ-ও কোন গৌরবের চোখে দেখেন নি। নারীর মাতৃত্ব কোন গৌরব করবার জিনিষ নয়, সেটা মানুষের জীবনের নিম্নস্তরেরই একটা চিহ্ন। মানুষের জীবন যেদিন আরো উচ্চস্তরে উঠবে, সেদিন নারী আর মা থাকবে না, সে হবে পুরুষের প্রেরণাদায়িনী সঙ্গিনী—এই কথাই বার্নাড শ বলতে চেয়েছেন।

কিন্তু আমাদের দেশে অনেক কাপুরুষ আছে যারা নারীর কাছ থেকে কোন অনুপ্রেরণা গ্রহণ করতে পারে না। তারা নারীর সঙ্গে আনন্দ পায় না। তারা [illegible]

জননী, তার উত্তরাধিকারীর জন্মদায়িনী বলেই মূল্য দেয়। নারীর মাধুর্য্য, তার সঙ্গ, তার আনন্দরূপের প্রতি তারা অন্ধ।

সৃষ্টি বিধানের মধ্যে সন্তানের জন্মদান করা নারীর কাজ। কিন্তু শুধু এই জন্যেই তার সমস্ত মূল্য নয়। এ ছাড়াও তার নিজের মূল্য আছে। এই বিশ্বের সৃষ্টি বিধানের মধ্যে এই নিয়ম যে সৃষ্টিবিধাতা আনন্দের পথে সৌন্দর্য্যের পথে নিজের সমস্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে নেয়। ফুলটা যদি উদ্দেশ্য নাও হয় তবু ফুল ফোটানোতে প্রকৃতির আলস্য নেই। ফুলের বর্ণ, তার পাপড়িতে বিচিত্র লেখা, মৌমাছিকে আকর্ষণ করবার জন্যই, যে মৌমাছি পরাগ-রেণু বয়ে নিয়ে গিয়ে ফল ফলানোর কাজ এগিয়ে দেবে। কিন্তু তবু ফুলের অন্য কোন মূল্য নেই, মানুষ ফুলকে শুধু ফল ফলাবার উপায় রূপেই দেখবে, প্রকৃতির মধ্যে এ কথা সত্য নয়। ঠিক তেমনি নারীরও একটা আনন্দরূপ আছে। সেই আনন্দ থেকে যে নিজেকে বঞ্চিত করে, সে নারীকে তো দুঃখ দেয়ই, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও বঞ্চিত করে।

গল্পগুচ্ছের একটি গল্পে কবি এমনি এক সন্তান-লোভী অসহিষ্ণু, আনন্দ-বিমুখ পুরুষের কাহিনী বলেছেন। বিয়ের অনতিকাল পরেই সন্তান না জন্মাবার জন্য সে অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে। তার কেবলি দুশ্চিন্তা কে তার সম্পত্তি ভোগ করবে। স্ত্রীর কিন্তু তখনো সন্তানের জন্য কোন ব্যাকুলতা নেই। সে ফুলের মত আপন যৌবন, আপন সৌন্দর্য্য নিয়ে ফুটেই সুখী। সে চায় স্বামীর সঙ্গ, তার আদর। কিন্তু সন্তান-লোভী স্বামী তার সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার করে।

কিন্তু তার নবযৌবনের সৌন্দর্য্য মুগ্ধ করল তার সখীর দেওরকে। সে যখন একদিন ওকে নির্জনে পেয়ে প্রণয় নিবেদন করতে এল, তখন সে দৃশ্য ওর স্বামীর ঘরের একদাসীর চোখেপড়ে গেল। দাসীর মুখে খবর পেয়ে স্বামী নিরপরাধ স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিল। তারপরে সে দ্বিতীয় বার বিয়ে করে সন্তানের আশায় সাধু সন্ন্যাসীদের ডেকে এনে তাদের সেবা করতে লাগল। তখন একদিন প্রাঙ্গণের একধারে একদিন এল এক ভিখারিনী একটি আশায় প্রলুব্ধ করে ওর অন্নে ভাগ বসাচ্ছিল, তখন ওর একমাত্র সন্তানকে ও তার জননীকে ওর দারোয়ান দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল।

নারীর প্রতি পুরুষের এই বিরস ফল লোভী চিত্তকে ধিক্কার দিয়ে কবি এই গল্প লিখেছেন।

এই গল্পে কবি নারীর চরিত্রের একটা দিকের কথা বলেছেন। সে হ'ল এই যে নারীর প্রকৃতি, সে নরনারীর প্রণয়লীলা দেখতে ভালোবাসে। তখন সে আর অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করতে পারে না। নীতিকথা তার মনে থাকে না। নীতি বিগর্হিত প্রণয়লীলাকেও সে উৎসাহ দিয়ে আনন্দ পায়।

ঐ গল্পে সখী নিজের দেওরের মুগ্ধ ভাব লক্ষ্য করে-ছিল। এই রকম মুগ্ধতা সহজেই নারীর চোখে পড়ে। কিন্তু সব দেখেও সে নিজের সখীকে সাবধান করেনি বা নিজের দেওরকে তিরস্কার করেনি।

কবির বর্ণনা পড়ে মনে হয় কবিও নারীকে তার এই সহজাত রঙ্গপ্রিয়তার জন্যে কঠিন বিচার করতে পারেন নি, তার এই দুর্বলতাকে প্রশ্রয়েরই চোখে দেখেছেন। আবার এর একটা বিপরীত দিকও কবি অন্যত্র দেখিয়ে-ছেন। গতযৌবনা নারী যুবতীর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে। সে তখন তার প্রেমের বেদনার প্রতি সমবেদনা ভুলে যায়। 'লিপিকা-'বইয়ের একটি কবিতায় লিখেছেন—তরুণী ছাদের কোণে বসে গোপনে তার চিঠি পড়ছিল, এমন সময়ে তার পেছনে এসে দাঁড়াল এক প্রৌঢ়া, যার হাতে মোটা কাঁকন, মোটা সিঁথিতে মোটা করে সিঁদুর লেপা। যেন কপোতীকে এসে ধরল নিষ্ঠুর শ্যেন পাখী অতর্কিতে। সে এসে ওর চিঠি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, ওর হাত থেকে। এর পরে শুরু হবে ঐ অপরাধের জন্যে ওর কঠিন শাস্তি।

বিরস-চিত্ত পুরুষের হাতে নারীর দুঃখের বর্ণনা আমরা পাই 'মুক্তির উপায়' গল্পেও। নারী সহজেই জীবন রসের রসিক। সে রঙ্গ প্রিয়, রহস্য প্রিয় ও আনন্দ প্রিয়।

যে মানুষ আনন্দ বিমুখ সে অনেক সময় ধার্মিকতার আড়ম্বর করে। সে ধর্ম-বাতিকগ্রস্ত হয়ে ওঠে। জীবনের

হৈমবতী নীরস প্রকৃতির ফকিরচাঁদের যুবতী স্ত্রী। ফকিরচাঁদের নীরস প্রকৃতির বর্ণনা করে কবি বলেছেন, অল্প বয়েসেও তাকে কখনো বুড়োদের মধ্যে বেমানান লাগত না। হৈমবতী তার নবযৌবনের উচ্ছলতা নিয়ে স্বামীর সঙ্গে যে রহস্যালাপ করতে চায়, ফকিরচাঁদের তাতে মন নেই। সে হৈমবতীকে নীরস ধর্মগ্রন্থ পড়ে শোনাতে যায়, তার কাছে সাধন প্রণালীর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে চায়।

বিরসচিত্ত পুরুষের হাতে পড়ে নারীর দুর্গতি কবির সমবেদনা জাগিয়েছে। কবি লিখেছেন—অবিশ্রান্ত আদেশ উপদেশ ধর্মনীতি এবং দণ্ডনীতির দ্বারা অবশেষে হৈমবতীর মুখের হাসি মনের সুখ এবং যৌবনের আবেগ একেবারে নিষ্কর্ষণ করিয়া ফেলিতে স্বামী-দেবতা সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন আনন্দমঠে শান্তি ও কল্যাণীর ছবি এঁকে নারীর দুই রূপ দেখিয়াছেন, এক রূপে সে আত্মবিসর্জন পরায়ণা, অন্যরূপে সে আত্মপ্রতিষ্ঠার দৃঢ়নিষ্ঠ, তেমনি রবীন্দ্রনাথও নারী-চরিত্রের এই দুটো দিকের কথা বলেছেন।

চতুরঙ্গ উপন্যাসে কবি ননীবালার আর দামিনীর বর্ণনায় নারী চরিত্রের এই দুই বিপরীত স্বভাব বেশ স্পষ্টভাবেই দেখিয়েছেন। [ক্রমশঃ]

রূপচর্চ্চা

সুপর্ণা দেবী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নারীর রূপ-সৌন্দর্য্য ও দেহ-চর্চ্চা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে ইতিপূর্ব্বেই বলেছি যে মেয়েরা মায়ের জাত—বংশের মা, সমাজের মা। কারণ, মায়ের স্বাস্থ্যই সন্তানের আধুনিক-রূপচর্চ্চাবিশারদেরাও বলেন যে—Women are the backbone of the nation. তাই তাঁরা অভিমত প্রকাশ করেন যে নারীর দেহ সুছাঁদে গড়ে ওঠা চাই সকল দিক দিয়েই। বিশেষতঃ, তার ওপরই যখন দেশের ও দশের ভবিষ্যৎ-জীবন আর সমাজ-দেহের সুস্থতা নির্ভর করে একান্তভাবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে আমরা একেবারে লক্ষ্যহীন। তারই ফলে, আমাদের অন্তঃপুর আজ অস্বাস্থ্যের গ্লানি-অশান্তিতে ভরে উঠেছে··· ব্যাধি, অকাল-জীর্ণতায় অধিকাংশ মেয়েদেরই রূপ-লাবণ্য, দেহ-মন পীড়িত-ক্ষয়িষ্ণু হয়ে উঠেছে। তাই এ বিষয়ে তাঁদের সচেতন করে তোলা এবং ঘর-সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের অবসরে নিত্য-নিয়মিতভবে নিতান্ত ঘরোয়া ছাঁদের সরল ও সহজ-সাধ্য কিছু কিছু দৈহিক-ব্যায়াম অনুশীলনে আগ্রহান্বিত করে তোলার উদ্দেশ্যেই আমাদের এই ধারাবাহিক প্রসঙ্গালোচনার সামান্য প্রয়াস।

ইতিপূর্ব্বে মেয়েদের দৈহিক স্বাস্থ্য ও রূপ-লাবণ্য সুস্থ-সুন্দর রাখার উপযোগী যে সব ব্যায়াম-চর্চ্চার হদিশ দিয়েছি, এবারেও গ্রীবা বা ঘাড়ের গঠন-সৌষ্ঠব বজায় রাখার সম্বন্ধে তেমনি ধরণের আরো কয়েকটি ব্যায়াম-পদ্ধতির মোটামুটি আলোচনা করছি।

হামেশাই নজরে পড়ে—রূপসজ্জা করতে বসে মেয়েরা মুখ, চোখ, হাত, কেশ-বিন্যাশ—এ সবেরই পরিচর্চ্চা ও প্রসাধন করেন, গ্রীবা বা ঘাড়ের সম্বন্ধে ঔদাসীন্যের সীমা নাই। তাই অনেক সময়েই দেখা যায় যে বহুমেয়েদেরই গ্রীবা বা ঘাড়ের পিছন-দিকের দেহাংশের বর্ণ থাকে মলিন, অপরিচ্ছন্ন, কুশ্রী। কারণ, স্নান বা গা-ধোয়ার সময় ঘাড়ে কোনোমতে একটু সাবান ঘষে জল ঢেলেই তাঁরা দায়মুক্ত হন। এই অযত্ন অবহেলার ফলে, গ্রীবা বা ঘাড়ের বর্ণ, মুখ বা দেহের বর্ণের পাশে যে খেঁষতে পারে না, তার আসল কারণ গ্রীবা বা ঘাড়ের স্বাস্থ্যহীনতা। তাই নিত্য নিয়মিতভাবে গ্রীবা বা ঘাড়ের ব্যায়াম প্রয়োজন। এদিকে মনোযোগী হলে, ঘাড়ের বর্ণ কদাচ মলিন বা অপরিচ্ছন্ন হবে না এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ে কদর্য্য কুশ্রী একরাশ মেদ জমে ঘাড়ে-

উঠবে সুন্দর সুঠাম মরাল গ্রীবার মতোই কুঞ্চনহীন, সুঠাম সাবলীল সুশ্রী ও বর্ণাভ।

গ্রীবা-পরিচর্য্যায় অবহেলা-ঔদাসীন্যের ফলে, কোনো কোনো নারীর ঘাড়ে থরে-থরে মেদ জমে···কারো ঘাড় হয়ে ওঠে ফাঁপালো-পুরু ছাঁদের, কারো বা অস্থি-সার (Scrawny) ক্ষীণ-দুর্ব্বল। এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্যের অভিজ্ঞ-বিচক্ষণ রূপচর্চ্চা বিশারদেরা বলেন যে—"A neck will tell your age quicker than your birth-certificate and probably add a few years!" অর্থাৎ, ঘাড়ের গঠন-সৌষ্ঠব নষ্ট হলে কম বয়সের নারীকে দেখায় অধিক বয়সী নারীর মতো। কাজেই যে সব মহিলা রূপসী হিসাবে পরিগণিত হতে অভিলাষিণী, তাঁদের পক্ষে শুধু মুখে হাতে সাবান ঘষে বা রুজ লিপষ্টিক পাউডার ব্যবহার করে কৃত্রিম রূপসজ্জার সাধনায় না মেতে, বরং নিত্য নিয়মিতভাবে কিছুক্ষণ দৈহিক ব্যায়াম চর্চ্চার দিকে নজর দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

গ্রীবা-পরিচর্য্যার সহজ উপায় হলো নিয়মিতভাবে নিত্য কয়েকটি বিশেষ ধরণের সহজ সরল ব্যায়াম পদ্ধতি অনুশীলন করা। যে সব মেয়েদের দেহ ক্ষীণ বা রোগা ধরণের নিয়মিতভাবে ব্যায়াম অনুশীলন ছাড়াও পান-ভোজন সম্বন্ধেও তাঁদের সচেতন থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ প্রতিদিন এমন খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা চাই যাতে দেহের পুষ্টি ও 'Tissues' সৃষ্টি সংসাধিত হয়। এ ব্যবস্থার ফলে, শরীর সুস্থ সবল ও ক্রমশঃ সুঠাম ছাঁদে গঠিত হয়ে উঠবে। এছাড়াও প্রত্যহ নিয়মিতভাবে যে কয়েকটি ব্যায়াম ভঙ্গী অভ্যাস করা দরকার, আপাততঃ তারই মোটামুটি আভাস দিই।

গ্রীবা পরিচর্য্যার প্রথম উপায় হলো চলা-ফেরা, বসা-দাঁড়ানোর সময় ঘাড়ে বা গলায় যেন 'কোঁচ' কিম্বা 'খাঁজ' না পড়ে সেদিকে সদা সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। খেয়াল রাখবেন—চিবুক যেন বুকের উপর ঝুঁকে বা সেঁটে না থাকে। এ অভ্যাসটি রপ্ত করবার সহজ বিধি হলো —প্রত্যহ নিয়মিতভাবে অন্ততপক্ষে পনেরো-কুড়ি মিনিট-কাল মাথার উপরে দুয়েকখানি ভারী মোটা বাঁধানো বই কিম্বা খাতা চাপিয়ে, সেগুলির 'ব্যালান্স' বা 'ভার-সাম্য' বজায় রেখে ধীরে ধীরে ঘরে পায়চারি করে বেড়ানো এবং ঘাড় সিধা-খাড়াভাবে তুলে কিছুক্ষণ চলা-ফেরা করা। এই ব্যায়াম ভঙ্গী অভ্যাসের ফলে গ্রীবার গঠন সুন্দর ও সাবলীল হয়ে উঠবে এবং ঘাড়ে বা গলায় 'কোঁচ' বা 'খাঁজ' পড়বে না।

গ্রীবা পরিচর্য্যার দ্বিতীয় বিধি হলো রাত্রে—শয্যাগ্রহণের পূর্ব্বে নিত্য-নিয়মিতভাবে মুখ ঘাড় ও গলা সাবান জলে বেশ ভালো করে ধুয়ে তোয়ালে ঘষে মুছে নেবেন। এভাবে তোয়ালে ঘষে ঘাড় ও গলা মুছে নেওয়ার ফলে রক্ত চলাচল ক্রিয়া আর পেশীগুলি সজীব-সুস্থ হয়ে ওঠে।

গ্রীবা-পরিচর্য্যা সম্বন্ধে আপাততঃ এটুকু হদিশ দেওয়া হলো। আগামী সংখ্যায় গ্রীবা-পরিচর্য্যার উপযোগী বিশেষ ধরণের কয়েকটি সহজ সরল 'ঘরোয়া' ব্যায়াম পদ্ধতির পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

শিশুদের পশমী কোট

শোভনা দেবী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ঘর-সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের অবসরে যেসব মহিলা সূচীশিল্পের চর্চ্চা করেন, নানা ধরণের নতুন-নতুন নক্সা-নমুনা আর বিভিন্ন সেলাইয়ের পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁদের আগ্রহ অনুরাগ অপরিসীম। সূচীশিল্পানুরাগিণী মহিলাদের সুবিধার্থে এবারে তাই লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের সুবিখ্যাত 'চিকণ' সেলাইয়ের সম্বন্ধে মোটামুটি ভাবে কয়েকটি প্রসঙ্গালোচনা করছি। লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের সৌখিন-সুন্দর 'চিকণ' বা 'চিকণকারি' সূচীশিল্পের প্রসঙ্গে ইতিপূর্ব্বেই এই বিভাগে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে, তাই এ সম্বন্ধে

আরো কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয় তো নিতান্ত অবান্তর হবে না।

প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁদের অনেকেরই অভিমত—সূচীশিল্পের ধারা প্রচলিত হয়েছে সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই। কারণ তাঁরা প্রমাণ পেয়েছেন যে সেকালের মানুষ লোহার ছুঁচের বদলে ব্যবহার করতেন হাড়ের তৈরী বিচিত্র অভিনব ছাঁদের সেলাইয়ের ছুঁচ। পরবর্ত্তী আমলে প্রাচীন মিশর-দেশের ধ্বংস-স্তূপ থেকে সন্ধান মিলেছে তামা আর টিনের সংমিশ্রণে ধাতু দিয়ে তৈরী আরো মজবুত ধরণের ছুঁচ। প্রাচীন রোম-রাজ্যের ইতিহাসেও প্রমাণ মেলে যে তৎকালীন সমাজে সূচীশিল্পকলা বিশিষ্ট একটি গৌরবের স্থান অধিকার করেছিল। তবে আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনেকেরই অভিমত—সূচীশিল্পের আদি সূচনা হয়েছে প্রতীচ্যে নয় প্রাচ্যদেশে···সম্ভবতঃ, সুসভ্য-প্রাচীন চীন-দেশে এবং ভারতবর্ষে। ভারতীয় সূচীশিল্পকলার প্রচুর উল্লেখ-নিদর্শন পাওয়া যায় প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে আর বিভিন্ন মহাকাব্যে। পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধযুগের ভাস্কর্য্য-শৈলীতেও ভারতীয় সূচীশিল্পকলার যথেষ্ট নিদর্শন মেলে। মুসলমান শাসকদের আমলে ভারতে পারস্যদেশের সূচী-শিল্পধারার প্রবর্ত্তন হয় এবং সেই বিদেশী ধারার সঙ্গে দেশীয় সেলাইয়ের পদ্ধতির বিচিত্র সংমিশ্রণের ফলেই সম্ভবতঃ সৌখিন সুন্দর অভিনব ছাঁদের 'চিকণ' বা 'চিকণকারি' সূচীশিল্প পদ্ধতি ক্রমশঃ সুপ্রচলিত হয়েছে আমাদের দেশে। অনেকে আবার ভিন্ন মতও প্রকাশ করেন··তাঁরা বলেন যে 'চিকণকারি' সূচীশিল্প পদ্ধতির প্রচলন সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের আমল থেকে স্বয়ং সম্রাটের সৌখিন পৃষ্ঠপোষকতা আর উৎসাহ সহানুভূতির দৌলতে। এছাড়াও লক্ষ্ণৌর কোনো কোনো কৃতবিদ্য 'চিকণকারি'-শিল্পীরও ধারণা 'চিকণ' সেলাইয়ের কাজ সৃষ্টি হয়েছে আমাদের বাংলাদেশেরই সূচীশিল্পকলার অন্যতম পীঠস্থান মুর্শিদাবাদ সহরে তৎকালীন মুসলমান নবাবদের উৎসাহ-আনুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতার ফলে।

কিন্তু এ সব তো হলো 'চিকণ' সূচীশিল্পের ঐতিহাসিক তথ্য, আপাততঃ বলি মিহি কাপড়ের উপর ছুঁচ-সুতোর ফোঁড় তুলে 'চিকণকারি' সেলাইয়ের কাজ কিভাবে করা যাবে তারই কথা।

'চিকণকারি' সূচীশিল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো নিপুণ হাতে নিখুঁত সুন্দর ছাঁদে মিহি কাপড়ের উপর সূক্ষ্ম ছুঁচ-সুতোর ফোঁড় তুলে সৌখিন অভিনব নক্সা সেলাইয়ের কাজ করা। কাজেই ছুঁচ-সুতো ব্যবহার করে সূক্ষ্ম-সুন্দর সেলাইয়ের কাজ কি উপায়ে করতে হবে সেদিকে দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন।

'চিকণকারি' বা 'চিকণ' সূচীশিল্পের কাজে সচরাচর তপকি, কাটাও, বখেরা, মুড়ি, ফান্দা এবং জালি এই ছয় রকম সেলাইয়ের ফোঁড় তোলারই রীতি প্রচলিত আছে।

তপকি সেলাইয়ের ফোঁড় তোলার কাজ সহজ-সরল। সাধারণত, চিকণের সামগ্রী বাজারে যা প্রচুর নজরে পড়ে, সে সব অধিকাংশই এই তপকি সেলাইয়ের কাজ। তপকি সেলাইয়ের ফোঁড় তোলার পদ্ধতি অনেকটা ঠিক বিলাতী কেতায় এমব্রয়ডারী সূচীশিল্পের "Stem Stitch" ধরণেরই মতো।

'বখেরা' সেলাইয়ের ফোঁড় তোলার পদ্ধতিটি হলো—বিলাতী কেতায় এমব্রয়ডারী সূচীশিল্পের "Back Stitch" আর "হেরিংবোন্-ষ্টিচের" সমন্বয়ে—'চিকণকারি' সেলাইয়ের সবচেয়ে সৌখিন-সুন্দর রীতি।

'কাটাও' সেলাইয়ের ধরণ—অনেকটা ঠিক বিলাতী সূচীশিল্প পদ্ধতির "কাট-ওয়ার্ক" বা "এ্যাপ্লিকের" পর্য্যায়ে পড়ে। এ কাজে অনেক সময় সেলাইয়ের কাপড়ের উপরে আলাদা কাপড়ের টুকরো-টি বসিয়ে বিলাতী-কেতায় "Stem-Stich" সূচী-শিল্পের ফোড় তুলে নিপুণ-ছাঁদে বেমালুমভাবে জোড়া দেওয়া হয়।

'ফান্দা' আর 'মুড়ি' সেলাইয়ের পদ্ধতি হলো—বিলাতী কেতায় এমব্রয়ডারী সূচীশিল্পে সচরাচর যেমন "ফ্রেঞ্চ-নট" সূচীশিল্পের রীতি অনুসরণ করা হয়, অনেকটা ঠিক তারই অনুরূপ।

'জালি' পদ্ধতিতে 'চিকণকারি' সেলাইয়ের রীতি হলো বিলাতী এমব্রয়ডারী-কেতায় 'Drawn-Thread' প্রথায় সুতো তুলে জালি রচনারই ধরণের। 'চিকণের কাজে সচরাচর 'সিধুড়ি', 'কলকাত্তা', 'মাদ্রাসী' প্রভৃতি কয়েকটি বিভিন্ন ছাদে 'জালি' রচনা করা হয়ে থাকে।

এবারে 'চিকণের' কাজের সম্বন্ধে মোটামুটি এই হদিশটুকুই দিয়ে রাখলুম। বারান্তরে, এ সম্বন্ধে আরো কিছু হদিশ দেবার ইচ্ছা রইলো।

মাটির ঠাকুর

কুমারেশ ঘোষ

[শিলাইদহ কুঠি বাড়ি। সুসজ্জিত একটি ঘরে টেবিলে রবীন্দ্রনাথ একমনে লিখছেন। মুখে অল্প দাড়ি-গোঁফ কাঁচা। মাঝে সিঁথি করা কোঁকড়ানো কালো চুল। অনেকটা যীশু খ্রীষ্টের মতই দেখতে। তাঁর এ ছবিও অনেক দেখা যায়।

একটু পরেই চোরের মত এদিক ওদিক দেখতে দেখতে ঢুকলো খালি গায়ে পণ্ডিত-বেশী একটি লোক—চক্রবর্তী। তার কাপড় ভিজে। রবীন্দ্রনাথের একপাশে এসে হাত জোড় করে দাঁড়ালো।]

চক্রবর্তী। (ভয়ে ভয়ে) বাবুমশায় !

রবীন্দ্রনাথ। (ঘাড় তুলে) কে ?

চক্রবর্তী। আজ্ঞে আমি এই গাঁয়েই থাকি। চকোত্তি। আমাকে সবাই চকোত্তি বলেই ডাকে।

রবীন্দ্রনাথ। তা তোমার কাপড় যে ভিজে !

চক্রবর্তী। আজ্ঞে হ্যাঁ। মানে আপনার সঙ্গে তো দেখা করা খুব শক্ত। আমলাদের বেড়া ডিঙিয়ে আসাই যায় না। একজন বললো, বাবু পদ্মার বোটে বসে লেখাপড়া করেন—সেই সময় সাঁতরে পেছন থেকে বোটে উঠে তোর কথা সব বলিস। তা বাবুমশায়, আপনাকে বোটে না পেয়ে মরিয়া হয়ে এখানেই ছুটে এসেচি। কেউ বোধহয় দেখতে পায়নি—

রবীন্দ্রনাথ। কী এমন কথা যে—

চক্রবর্তী। আমাদের আর কী কথা বাবুমশায়, দুঃখ-কষ্টেরই কথা। সংসার আর চলে না বাবুমশায়। এবার বোধহয় না খেয়ে মরতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ। তার আগেই তো দেখছি নিউমোনিয়ায় মরবে। যাও, যাও, কাপড় ছাড়ো গে বাড়ি গিয়ে। বলো, কী বলবে ? কী করো তুমি ?

চক্রবর্তী। আজ্ঞে, পুজা-আচ্চা করি।

রবীন্দ্রনাথ। মন্ত্র-টন্ত্র জানা আছে তো !

চক্রবর্তী। নিশ্চয়ই বাবুমশায়। শুনবেন ? শুনুন—পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গ পিতাহি পরমং তপ—

রবীন্দ্রনাথ। বাঃ বেশ তো !

চক্রবর্তী। (উৎসাহিত হয়ে) জবাকুসুমং সংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্—

রবীন্দ্রনাথ। চমৎকার !

চক্রবর্তী। (হড়বড় করে) আরো আছে বাবুমশায়। গণেশের স্তব : খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং—দণ্ডাঘাত বিদারিতারি—

রবীন্দ্রনাথ। তা এ সবের মানে জানো তো ?

চক্রবর্তী। তা বাবুমশায় একটু একটু জানি। অন্তত অন্য পণ্ডিতদের চাইতে ভালই জানি। কিন্তু তাতেও যে পেট চলে না।

রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু দেখছি তুমি তো যা-তা পণ্ডিত নও, একেবারে শিরোমণি মশায়।...(হাঁক দিলেন) ওরে, কে আছিস, নায়েবমশায়কে একটু ডেকে দে।

[নেপথ্যে শোনা গেল 'আজ্ঞে যাই' এবং নায়েবের প্রবেশ। ফতুয়া গায়ে। হাতে কলম।]

নায়েব। আজ্ঞে বলুন।

রবীন্দ্রনাথ। আজ থেকে এই চক্রবর্তীমশায় শিরোমণি মশায় হলেন। এঁকে পাঁচ বিঘা জমি বিনা নজরে দেবে। এবং দেখো যেন কোন অসুবিধা না হয়।

নায়েব। (অবাক হয়ে) আজ্ঞে—

রবীন্দ্রনাথ। আর আজ্ঞে নয়, যাও। (চক্রবর্তীকে) যান বাড়ি গিয়ে ভিজে কাপড় ছেড়ে ফেলুন গে।

চক্রবর্তী। বেঁচে থাকুন বাবুমশায়। আপনার জয় হোক।

[শুধু চক্রবর্তীর প্রস্থান এবং হুড়মুড় করে লালা পাগলার প্রবেশ। খালি-গা। কাপড়ের খুঁট মাথায় দেওয়া। পাগলের মত চেহারা।

লালা। এই যে বাবুমশায়। পাইছি। পেন্নাম হই।

নায়েব। এই, তুই এখানে কেন। যা পালা।

রবীন্দ্রনাথ। না না। থাকতে দাও।

লালা। ঠিক্ কয়েচেন হুজুর। (নায়েবকে) আমি কি হুজুরের পেরজা নই? (হেসে) জানেন হুজুর, আমি নাকি পাগল। যারা বলে তারা সব ছাগল। (সুর করে) "

হুজুর, আমি হচ্ছি পাগল,

আমায় দেখে গাঁয়ের লোকের মাথায় ধরে গোল।"

রবীন্দ্রনাথ। বাঃ। তুমি তো বেশ কবিতাও জানো?

লালা। জানি বৈকি হুজুর। আপনি কবি মানুষ তো—তাই আপনাকে কবিতে শোনাবের আইলাম। শোনেন—

"সত্যি কথা হুজুর

আমি আপনার মজুর।

পাকা দাড়ি ধরে

মিথ্যে কথা কবো কেমন করে?

দয়াল চিনে সবাই যেতাম মরে।"

নায়েব। (সবিনয়ে) বাবুমশায়, আপনার সময় নষ্ট করচে।

রবীন্দ্রনাথ। করুক, করুক। নানা কাজের মধ্যে একটু অকাজও তো দরকার।

লালা। (সানন্দে) ঠিক কয়েচেন বাবুমশায়। আপুনি কাজ করেন, আবার আমার সঙ্গে অকাজও করেন। আর ওরা সব সময় কুকাজ করে।

রবীন্দ্রনাথ। (হেসে) আচ্ছা, তুমি এখন যাও।

লালা। যাবো কি বাবুমশায়। আমার আসল কথাই তো বলা হলো না। এই ছাখচেন পরনের এই ময়লা কাপড়খান গায়ে দিয়েই শীত কাটাতি হয়। একটা কম্বল দিবা বাবুমশায়?

রবীন্দ্রনাথ। (নায়েবকে) একে একটা কম্বল এনে দাও।

[নায়েবের প্রস্থান]

লালা। (সানন্দে) সত্যি আমারে কম্বল দিবা? ওরে শোন তোরা, কে কোথায় আচিস! বাবুমশায় আমারে কম্বল দিবার কয়েচেন। বাবুমশায়, তবে আর একটা কথা কই?

রবীন্দ্রনাথ। বলো।

লালা। শোনেন তবে। বাড়ীর লোকেরা না— আমারে মারে, খাতি দেয় না। গালিগালাজ করে। অর্ধেক দিন প্যাটে কিছুই পড়ে না।

[এমন সময় বোটের ত্রিবেণী মাঝির প্রবেশ]

ত্রিবেণী। বাবুমশায়, কোন বোটখানা আপনের জন্যি তৈয়ের করে রাখবো? চিন্তা না, আজ্ঞেই।

রবীন্দ্রনাথ। (হেসে) নাঃ। তোকে আর শেখাতে পারলাম না ত্রিবেণী। তুই নিজেকেও 'তিবেণী' করে রাখলি আর বোটগুলোও তোর কাছে চিত্রা বা আত্রেয়ী হোল না। অথচ তুই আমার বোটের পুরোন মাঝি।

লালা। মুক্‌খুর্ জিব কিনা। এখনও জিবির আড় ভাঙেনি।

ত্রিবেণী। ছাখচেন বাবুমশায়, লালা পাগলা কী কইচে?

লালা। এই, আমাকে পাগল কইবি না। জানিস বাবুমশায় আমারে কম্বল দিবার কইচে। জানিস আমি বাবুমশায়ের ছাওয়াল। (রবীন্দ্রনাথকে) আর তুই আমার বাপ!

রবীন্দ্রনাথ। শুনলি তো ত্রিবেণী? কাজেই এখন থেকে খিদে পেলেই লালা বোটের কাছে যাবে আর তুই ওকে খেতে দিস।

লালা। (আনন্দে নেচে নেচে) কী মজা কী মজা এখন থেকে বোটে গেলেই প্যাটের ভাবনা থাকবে না মন।

রবীন্দ্রনাথ। (ত্রিবেণীকে) তুই আমার 'পদ্মা' বোটটাকে ঘাটে বেঁধে রাখ্। আমি সময় মত যাবো।

ত্রিবেণী। আচ্ছা বাবুমশায়, চলি তবে। ফুলচাঁদ তপসী ওদের বলিগে পদ্মা বোটটাকে ধুয়ে মুছে রাখতি।

[ত্রিবেণীর প্রস্থান ও কম্বল হাতে নায়েবের প্রবেশ]

লালা। ঐ যে, কম্বল আইচে।

রবীন্দ্রনাথ। (নায়েবের হাত থেকে কম্বল নিয়ে) এই নাও লালা, গায়ে দিয়ো।

লালা। আগে আপনার পায়ে তো পড়ি।

[রবীন্দ্রনাথের পায়ের কাছে ঢিপ ঢিপ করে প্রণাম করলো পরে কম্বল নিয়ে নিজের মাথায় ঠেকালো।

ছাখছেন তো নায়েবমশায়! বাবুমশায় কেমন মানীর মান দেলেন। আর আজ থেকে জেনে রাখেন, এই লালা মিঞা বড সোজা লোক নয়। আমি আগের জন্মে রুমীর বাদশা ছিলাম, মরে মানুষ হইচি। এবার মরে বাবুমশায়ের ছেলে হয়ে জন্মাবো। ফের আমারে পাগল বলি ঘেন্না করলি মারবো ঠাস করে এক চড়্।

রবীন্দ্রনাথ। ও কি কথা লালা?

লালা। ইস্। ভুল হই গেচে বাপ! ছোটলোকির মুখ তো, বাইরিয়ে পড়িচে। ঠিক আছে বাপ্। তুই দেখিস, আমি ভাল হয়ে যাবো। (কম্বল সুদ্ধ হাত তুলে গান শুরু করলো)।

'আমার দয়াল জমিদার,
(হায়) নাই তুলনা তাঁর।
তাঁর মুখখানি হয় চাঁদের নাগাল্
হাত দুটি সোনার।'

[লালার প্রস্থান]

রবীন্দ্রনাথ। বেচারী! (নায়েবকে) তোমারা ওর উপর একটু নজর রেখো।......ভাল কথা, আজ তো পুণ্যাহ হবে বিকেলে। সবাইকে খবর দিয়েচো তো!

নায়েব। আজ্ঞে হ্যাঁ।

রবীন্দ্রনাথ। আচ্ছা তুমি যাও।

[নায়েবের প্রস্থান। রবীন্দ্রনাথ আবার লেখায় মন দিলেন এবং একটু পরেই উঠে পায়চারি করতে করতে কবিতাটি জোরে পড়তে লাগলেন। হাতে কলম ধরা।]

কবিতাটির নাম কি দেওয়া যায়? (একটু ভেবে) 'ধুলা মন্দির'—

'ভজন পূজন সাধন আরাধনা, সমস্ত থাক পড়ে
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে, কেন আছিস ওরে!
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পূজিস্ সংগোপনে
নয়ন মেলে দেখ্ দেখি তুই চেয়ে দেবতা নেই ঘরে॥

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে বারোমাস।
রৌদ্র-জলে আছেন সবার সাথে
ধুলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে—
তাঁরি মত শুচি বসন ছাড়ি, আয়রে ধুলার 'পরে॥

মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে!
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন প'রে বাঁধা সবার কাছে।
রাখো রে ধ্যান, থাক্‌রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধুলাবালি—
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে॥

[রবীন্দ্রনাথ খানিকক্ষণ চোখ বুজে রইলেন। একটু পরেই পেছনে এসে দাঁড়ালো ভৃত্য উমাচরণ]

উমাচরণ। (অসংকোচে) বাবুমশায়।

রবীন্দ্রনাথ। কে? ও, উমাচরণ!

উমাচরণ। আপনার খাবার দেওয়া হয়েচে!

রবীন্দ্রনাথ। চলো যাই।

[রবীন্দ্রনাথের প্রস্থান। একটু পরেই অন্যান্য ভৃত্য বিপিন, প্রসন্ন, ভোলানাথের প্রবেশ। সব ভৃত্যদেরই গায়ে জামা। ভোলানাথের পরিপাটি গোঁফ। সকলের হাতে একখানা করে চেয়ার এবং বিপিনের হাতে সতরঞ্চি]

বিপিন। নে, নে, সব তাড়াতাড়ি কর্। তোরা চেয়ারগুলো ঘরের ধারে ধারে সাজিয়ে দে। আমি সতরঞ্চিটা মাটিতে পেতে দিই।

[সবাই চেয়ারগুলো সেইমত সাজালো। বিপিন সতরঞ্চি মাটিতে পাতলো]

ভোলানাথ। বাবুমশায়ের জন্যে এই ভাল চেয়ারটা। এইটা মাঝখানে থাকবে (নিজের হাতের চেয়ারটা সেই মত রাখলো) জানিস্ তো, আমি বাবুমশায়ের সঙ্গে ইংলণ্ডো, উরোপ, আমেরিকা, জাপান সব ঘুরে এসেছি। আরে ভাই, বাবুমশায়ের সেখানে কী মান! জার্মানীতে সাহেব মেমরা বাবুমশায়কে পেয়ে ঢিপ্ ঢিপ্ করে পেন্নাম করতে লাগলো। আর বাবুমশায়কে দেখবার জন্যে

কী ভীড়—কী ভীড়। কেউ কেউ আবার বাবুমশায়কে যীশু খ্রীষ্ট বলতো।

প্রসন্ন। কেন? কেন?

ভোলানাথ। বাবুমশায়কে নাকি ঐ রকম দেখতে!

বিপিন। সত্যি, বাবুমশায়ের রূপগুণের আর শেষ নেই। নে, নে। ঘর দরজাগুলো সব ঝেড়ে ফেল। আজ আবার পুণ্যাহ। এখানকার সব গণ্যিমান্যি ব্যক্তিরা আসবেন। তাঁদের জন্যে এই চেয়ার—আর সাধারণ পেরজাদের জন্যে ঐ সতরঞ্চি।

[এমন সময় মাথায় ক্যাপ দেওয়া পাঞ্জাবী পায়জামা পরা ফটিক শেখের প্রবেশ। মুখ খুব গম্ভীর কাঁদো-কাঁদো। এসে একপাশে দাঁড়ালো]

ভোলানাথ। কী গো ফটিক শেখ। খুড়ি, বাবুমশায়ের পেয়ারের বাবুর্চি সায়েব! মুখখানা অমন থমথমে কেন?

ফটিক। ভাই, বাবুমশায়ের কাছে কে যেন আমার নামে দশখানা করে লাগাইচে।

বিপিন। কী লাগাইচে?

ফটিক। আমি বাবুমশায়ের খাস্ বাবুর্চি তো! বড় বড় সায়েবরা এলে তো আমারই খোঁজ পরে। মা ঠাকরেন আমারে নিজে হাতে রান্না শিখাইছেন। তা বাবুমশায় আজ কি কইলেন জানো?

প্রসন্ন। কি কইলেন?

ফটিক। কইলেন, ফটিক, তোর হাতে আমি আর খাবো না। তোর হাতে খেলে আমার পাপ হবে। তুই যা, বাড়ি চলে যা—আমার সুমুখ থেকে চলে যা।...এর চাইতে বাবুমশায় যদি দু'ঘা জুতোর বাড়ি মারতেন তাও আমি সহ্য করতে পারতাম।

বিপিন। সত্যিই। মিষ্টিকথার বকুনি যেন জুতোর বাড়ির চাইতেও বেশি লাগে!

প্রসন্ন। হ্যাঁ, এটা গায়ে লাগে না তো, মনে লাগে।

ভোলানাথ। কিন্তু বাবুমশায় তো কাউকে এমন করেও বলে না? কি করেছিলি তুই?

ফটিক। মানে, জানিস তো। বাল-বাচ্চা-বিবি নিয়ে আমারও বিরাট সংসার। তাই এই কুঠি-বাড়ির ঘি-ময়দা চিনি বাড়িতে নিয়ে যেতে হয়। সে কথাটা—

বিপিন। জানো না বাবুর্চিসায়েব - পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়?

ভোলানাথ। বাবুমশায় তো ফটিক সায়েবের নিজের লোক, তাই না বলেই—কী বলো বাবুর্চি সাহেব?

[এমন সময়ে উমাচরণের পুনঃপ্রবেশ। হাতে এক-ছড়া পাকা কলা।]

কী? চুরি?

উমাচরণ। এজ্ঞে না।

বিপিন। তবে?

উমাচরণ। বাবুমশায়ের পেসাদ।

প্রসন্ন। মানে?

উমাচরণ। দুদিন আগে ঐ যে হারি বিশ্বাস—তিনি বাবুমশায়রে খাবার জন্যি তেনার বাগানের গাছের বড় এক কাঁদি সবড়ি কলা আর কচি কাঁঠাল দিয়ে গেছিলেন। তা এবার তো মা ঠাকরেন বা ছেলেপুলেরা কেউই আসেন নি। বাবুমশায় আর কত খাবেন! আজ পাকা কাঁঠালের গন্ধে সারা বাড়ি ম-ম করছিল। বাবুমশায় কইলেন—। 'হ্যাঁরে উমাচরণ, কাঁঠাল-কলাগুলো সব পচিয়ে নষ্ট করছিস কেন? তোরা কি গেরস্তালি জানিসনে। ওগুলো নিয়ে যা, তোরা সব ভাগ করে নে গে যা।'

ভোলানাথ প্রভৃতি। (সমস্বরে) তাই নাকি?

উমাচরণ। এজ্ঞে। তা এখনি দেখচি তোদের জিব দিয়ে জল গড়াচ্চে। তবু তো আসল কথাটা বলাই হয়নি।

প্রসন্ন। আবার কি কথা?

উমাচরণ। বাবুমশায় সেই সঙ্গে কুঠি-বাড়ির সুপারি-ঠনঠনকে অর্ডার দিয়ে দেচেন—ঘন দুধ আর গয়ানাথ পালের দুকান থিকে সরু চিঁড়ে আর সন্দেশও যেন কিনে দেন।

বিপিন। তুই বলিস কী রে?

উমাচরণ। এজ্ঞে। যা কইচি, সত্যি কইচি। হলপ করিয়া বলিতেছি মিথ্যা ছাড়া সত্য কহিব না; খুড়ি, সত্য ছাড়া মিথ্যা কহি নাই। আর কি কয়েচেন জানিস্?

বিপিন। কি?

উমাচরণ। ঐ যে ফটিক শেখ, ওর কথা কয়েচেন। কয়েচেন ওকেও যেন ভাগ দেওয়া হয়।

ফটিক। (সানন্দে) বাবুমশায় কয়েছেন? আমার কথা কয়েচেন? ধন্য বাবুমশায়! আপনার ছিচরণে পেন্নাম।

[রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে প্রণাম করলো। এমন সময় কুঠিবাড়ির ম্যানেজারের প্রবেশ। প্রৌঢ়। ধুতি পাঞ্জাবি পরা। কাঁধে চাদর]

ম্যানেজার। কীরে? তোদের ঘর সাজানো হলো? না, এখনও গল্প করচিস্। আর সময় নেই কিন্তু।

বিপিন। হ'য়ে গেচে বাবু। এই দ্যাখেন না—

ম্যানেজার। (সব দিক দেখে) শংখ, ফুলের মালা, ধূপ-দীপ সব কই? নিয়ে আয়।

[ম্যানেজার ছাড়া সকলে চলে গেল এবং একটু পরেই পুণ্যাহের জন্য এক এক করে প্রজারা আসতে লাগলো। তাদের মধ্যে যারা গরীব, তারা মাটিতে সত-রঞ্চিতে বসলো এবং যারা বর্দ্ধিষ্ণু ভদ্রবেশে এলেন তাঁরা বসলেন চেয়ারে। ম্যানেজার যথাযোগ্য খাতির করে সবাইকে বসালেন। বিপিন এসে শংখ ইত্যাদি টেবিলে রেখে গেল। ধূপদানীতে ধূপ জ্বালিয়ে দিল। একটু পরেই নেপথ্যে সানাই বাজতে লাগলো]

ম্যানেজার। আসুন, আসুন, বসুন। এই যে, এসে গেচো, বসো, বসো। বাবুমশায় আসবেন এখুনি…। আজ পুণ্যাহের দিন ঠাকুর এষ্টেটের বহুদিনের ব্যাপার। তাই বাবুমশায় এবার কলকাতা থেকে দু' চারদিন আগেই এসেচেন। পুণ্যাহ সভায় এই প্রথমবার আসচেন। বাবু-মশায় কলকাতায় থাকেন বটে তবে গ্রাম বাংলার কথা ভোলেন নি। পদ্মায় বজরাতে কত কবিতাই না লেখেন। বলেন, কলকাতার বদ্ধ জায়গার চাইতে পদ্মার বুকে বজরাতে থাকতেই তাঁর ভাল লাগে।…ঐ, ঐ যে বাবু-মশায় আসচেন।

[ম্যানেজার সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়ালেন এবং পোষাক বদলে সিল্কের ধুতি-পাঞ্জাবী পরে চাদর কাঁধে রবীন্দ্রনাথ ভিতরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালেন। তাঁকে ঢুকতে দেখে সমবেত সবাই উঠে দাঁড়ালো।]

রবীন্দ্রনাথ। একি ম্যানেজারবাবু? এ কী রকম ব্যবস্থা হয়েচে?

ম্যানেজার। আজ্ঞে, প্রতি বছরেই তো এইভাবেই—

রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু পুণ্যাহ সভায় এই হরেকরকমের বসবার ব্যবস্থা কেন? মানুষের বসবার জন্যে এত বিভিন্ন রকমের আয়োজন?

ম্যানেজার। এই ব্যবস্থাই মহর্ষিদেবের আমল থেকে চলে আসচে বাবুমশায়। নতুন কিছুই করা হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ। এমন একটি শুভ উৎসবেও আমাদের মিলনে এত বাধা, এত ভেদবুদ্ধি থাকবে? দেখুন, আমার অনুরোধ ঐ সব উচ্চাসন উঠিয়ে নিন। আমরা সবাই একাসনে বসবো। তবেই হবে এই শুভ উৎসবে মিলনের সার্থকতা।

ম্যানেজার। মানী, অমানী, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, মুসলমান সব একাসনে?

রবীন্দ্রনাথ। হ্যাঁ। এটা যে মিলন সভা, জমিদারী দরবার নয় তো।

ম্যানেজার। এ নিয়ম যে শুধু মহর্ষি নন, আপনার পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় থেকে—

রবীন্দ্রনাথ। বেশ, আমি তবে বসবো না। আপনারা যা ভাল মনে হয় করুন। সাধারণ প্রজারা তো এই মিলন-উৎসবে অপমানিত হতে আসেনি—

ম্যানেজার। কিন্তু জমিদারী সম্ভ্রম?

রবীন্দ্রনাথ। জমিদারী সম্ভ্রম এত ঠুনকো নয়। এতে ভেঙে পড়বার ভয় নেই। আমি যা বললাম, আপনি সেই মত ব্যবস্থা করুন।

সাধারণ প্রজা। জয় হোক, বাবুমশায়ের জয় হোক। রবীন্দ্রনাথের জয় হোক।

ম্যানেজার। তবে তাই হোক।…ওরে বিপিন, ভোলানাথ, প্রসন্ন—

[বিপিন ভোলানাথ, প্রসন্ন এসে চেয়ারগুলো সরিয়ে নিয়ে গেল। পুরো সতরঞ্চি পাতা হলো। মাঝখানে কার্পেট ও তাকিয়া দেওয়া হলো রবীন্দ্রনাথের জন্যে। রবীন্দ্রনাথ হেসে এসে বসলেন]

রবীন্দ্রনাথ। আপনারা এবার বসুন। শুরু হোক পুণ্যাহ—

[একজন বৃদ্ধ প্রজা উঠে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের সামনে-রাখা থালায় টাকা রেখে প্রণাম করলো। রবীন্দ্রনাথ তার কপালে চন্দনের টিপ ও গলায় মালা পরিয়ে দিলেন। নেপথ্যে শংখ বেজে উঠলো।]

[পর্দা ধীরে ধীরে নামলো] শ্রীশচীন্দ্র নাথ অধিকারীর 'সহজমানুষ রবীন্দ্রনাথ' থেকে ঘটনাবলী অবলম্বনে।

কথা কও কবি! কথা কও।

নরেন্দ্র দেব

এবার বন্ধু, হয়েছে সময়,
কথা কও, কবি কথা কও!
হেন নীরবতা সাজেনা তোমার
তুমি তো বন্ধু! মূক নও!
অচেতন দেশে তুমিই তো এসে
ভেঙেছো জড়তা গেয়ে গান,
সে গানের সুরে অসাড় এ পুরে
উঠেছিল জেগে শত প্রাণ।

দুরন্ত তুমি, তুমি নির্ভীক,
যৌবন মদে উদ্ধত
দুনিয়ায় কারো রক্ত আঁখিতে
করোনি কখন শির নত,
তোমার বজ্রকণ্ঠে শুনেছি
রণহুংকার ঘন বাজে,
ছুটেছিলে তুমি সমরাঙ্গনে
শত্রু নাশিতে বীর সাজে।

এসেছে আবার দুর্দিন দেশে
গরজে শত্রু চারিদিকে,
এসো বিদ্রোহী! জনগণ বুকে
বীর্যমন্ত্র দাও লিখে।
ডাক দিয়ে যত জোয়ানে শোনাও
মরণ বরণে নাহি ভয়,
কুমারিকা হতে হিমালয় শিখা
উল্লাসে দিক তব জয়!

নিষ্প্রাণ দেশে সঞ্জীবনের
মন্ত্রোচ্চারি এসো ছুটে,
ধনী ও বণিক দস্যুরা মিলে
গরীবের ধন নেয় লুটে!
স্তব্ধতা তব ঘুচাও ঘুচাও।
হে চারণ কবি! জাগো, জাগো!
অগ্নিবীণায় তোলো ঝংকার
উজ্জীবনের যজ্ঞে লাগো!

আজ যে তোমাকে বড় প্রয়োজন,
মৌনতা আর নাহি সাজে,
শোনো উত্তরে-পূর্বে-পশ্চিমে-
রণ-হুংকার ঘন বাজে!
অবিশ্বাসীরে শাসিতে নাশিতে
লহ তুলে তব হাতিয়ার,
অলস আবেশে অচেতন যারা,
ডেকে বলো সবে-হুঁসিয়ার!

তোমার শায়কে শয়েস্তা হোক্
দেশের যাহারা জনত্রাস।
যত বজ্জাতি জাল জালিয়াতি
রুদ্র আঘাতে করো নাশ।
তব যৌবনে তারুণ্য পাক
জড় যযাতিরা বাঙ্‌লায়,
হানো নজরুল্ তোমার ত্রিশূল!
অসাড় থাকা কি শোভা পায়?

পুরস্কার

[illegible]
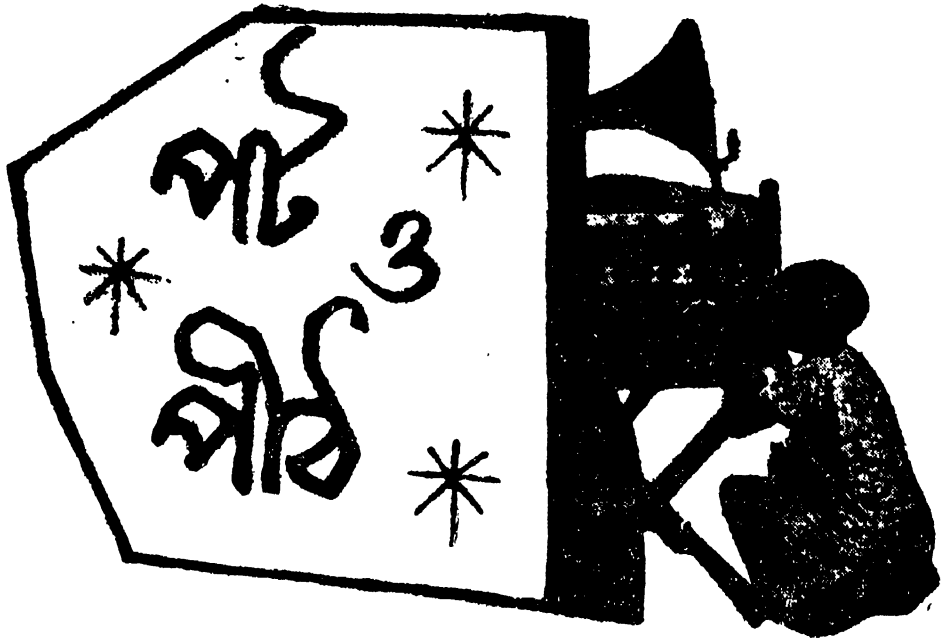
"বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিষ্ট এসোসিয়েসন্"-এর ৩২তম বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ উৎসব গত ২৮শে মে "রবীন্দ্র সদন" ভবনে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এবং প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন 'অমৃতবাজার' ও 'অমৃত'পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। "বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিষ্ট এসোসিয়েসন্" (বি, এফ, জে, এ,)-এর সভাপতি 'আনন্দবাজার' ও 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার সকলকে স্বাগত জানান। বি, এফ, জে, এ-র সম্পাদক শ্রীবাগীশ্বরী ঝা এবং পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের চেয়ারম্যান্ শ্রীসেবাব্রত গুপ্ত সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। বি, এফ, জে, এ-র সকল সদস্যের সক্রিয় সহযোগিতায় সিনেমা জগতের এই ভারত বিখ্যাত পুরস্কার বিতরণ উৎসব সাফল্য মণ্ডিত হয়ে ওঠে।

এবারের পুরস্কারজয়ীদের সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হল :

প্রথম দশটি চিত্র—

১) আপনজন
২) মর্জিনা আবদাল্লা...

বাংলা চিত্র—

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা : শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ("বাঘিনী")

শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী : শ্রীমতী সুপ্রিয়া দেবী ("তিন অধ্যায়")

শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা : সমিত ভঞ্জ ("আপন জন")

শ্রেষ্ঠা সহ-অভিনেত্রী : শ্রীমতী সন্ধ্যা রায় ("তিন অধ্যায়")

হিন্দীচিত্র—

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা : শ্রীদিলীপকুমার ("সংঘর্ষ")

শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী : শ্রীমতী ওয়াহিদা রেহমান ("নীল কমল")

শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা : শ্রীজয়ন্ত ("সংঘর্ষ")

শ্রেষ্ঠা সহ-অভিনেত্রী : শ্রীমতী মমতাজ ("ব্রহ্মচারী")

শ্রেষ্ঠ পরিচালক : বাংলা—শ্রীতপন সিংহ ("আপনজন")
হিন্দী—শ্রীহৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় ("মঝলি দিদি")
বিদেশী—ফ্রাসোঁয়া ত্রুফো ("ফারেনহাইট ৪৫১")

শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য রচনা : বাংলা—শ্রীতপন সিংহ ("আপনজন")
হিন্দী—শ্রীহৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় ("মঝলি দিদি")

শ্রেষ্ঠ নেপথ্য সঙ্গীতগায়ক : বাংলা—শ্রীশ্যামমিত্র ("আপনজন")
ও
শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ("চৌরঙ্গী")

হিন্দী—শ্রীমান্না দে ("মেরে হুজুর")
ও
শ্রীমতী লতামঙ্গেশকর ("রাজ অউর রাঙ্ক")

শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত রচনা : বাংলা—শ্রীপুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ("বালুচরী")
হিন্দী—শ্রীসাহির লুধিয়ানভি ("হামরাজ")

শ্রেষ্ঠ চিত্র গ্রহণ (কালো-শাদা) : বাংলা—শ্রীবিমল মুখোপাধ্যায় ("আপনজন")
হিন্দী—শ্রীজয়ন্ত পাথারী ("মঝলি দিদি"

এ ছাড়া বিশিষ্ট পুরস্কার লাভ করেছে শ্রীমান্ প্রসেনজিৎ "ছোট্ট জিজ্ঞাসা" চিত্রে সুন্দর অভিনয়ের জন্য।

খবর বলছি :

বাংলার বিখ্যাত নট ও চলচ্চিত্র অভিনেতা
জহর গঙ্গোপাধ্যায়

গত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ পরলোক গমন করেছেন। অভিনয় ক্ষেত্রে পুরাতন ও নতুন যুগের যোগসূত্র রূপে যে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের নাম করা যায় জহর বাবু ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। ধাপে ধাপে তিনি অভিনয় জগতের শীর্ষে আরোহন করেন।

কিছুকাল মঞ্চে অভিনয় করবার পর "মানময়ী গার্লস স্কুল" নাটকে ও চিত্রে অভিনয় করেই তিনি খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। তারপর বহু নাটকে ও চিত্রে জহর বাবু সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করে তাঁর অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। পরিণত বয়সেও তিনি "কাশীবিশ্বনাথ" মঞ্চে অভিনীত "এণ্টনী কবিয়াল" নাটকে ভোলা ময়রার ভূমিকায় নৃত্যগীত সহযোগে যে অনবদ্য অভিনয় করেন তা অনেকেরই অনেকদিন মনে থাকবে। জহরবাবুর মৃত্যুতে বাংলা দেশ একজন সত্যকার অভিনয় শিল্পীকে হারাল।

* * *

হলিউড-এর প্রখ্যাত চিত্রাভিনেতা রবার্ট টেলর-এর মৃত্যু হয়েছে। ক্যান্সার রোগই তাঁর মৃত্যুর কারণ। কয়েক বৎসর আগে বিখ্যাত অভিনেতা গ্যারি কুপারেরও এই ভয়ঙ্কর ক্যানসার রোগে মৃত্যু হয়।

রবার্ট টেলর গ্যারি কুপারের মতন 'অ্যাকশন' ছবিতে অভিনয় করেই খ্যাতি লাভ করেন। তিনি বহু চিত্রে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করে দর্শকমনরঞ্জন করে এসেছেন। ইদানিং তিনি বিশেষ অভিনয় না করলেও তাঁর মৃত্যুতে মার্কিন চিত্র জগতের বিশেষ ক্ষতি হল।

* * *

শোনা গেল (ঠিক "ঘোড়ার মুখ" থেকে না হলেও) এক বিখ্যাত চিত্রাভিনেতা গৃহযুদ্ধে (কারণটা প্রকাশ্য নয়) ক্ষতবিক্ষত হওয়ায় 'সুটিং'-এ যোগ দিতে পারেন নি, এমন কি একটি অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত হয়েও সর্বসমক্ষে আসতে চান নি। যুদ্ধটা ঘোরতর হয়েছিল মনে হয়! আমরা ঐ তারকার সর্বাঙ্গীণ কুশল ও ভবিষ্যৎ নিরপত্তা কামনা করি।

* * *

আসরের মাঝখানে এক ফাঁকে "শুক-সারী" চিত্রের নায়িকা শ্রীমতী অঞ্জনা ভৌমিককে বললাম—নায়কের পরিত্যক্ত বাঁশী তোলবার জন্যে আপনার পুকুরে ঝাঁপ দেওয়াটা চমৎকার হয়েছে। আপনি যে সন্তরণপটীয়সী তা জানতাম না। উত্তরে একগাল হেসে অঞ্জনা বললেন—কি যে বলেন! সাঁতার জানি না কি? সেই কবে ছোট বেলায় একটু হাত পা ছুঁড়তে শিখেছিলাম। আর ঐ বাঁশী তুলতে আমাকে বেশ কয়েক ঢোঁক পুকুরের জল গিলতে হয়েছে, কারণ ধাওয়া করে বাঁশীকে ধরতে হয়েছে। অভিনয়টা অত সোজা নয়, বুঝলেন। হয়ত তাই—উত্তর দিলাম, আরও বললাম—অভিনয় আপনার সত্যই সুন্দর হয়েছে, মানে কষ্ট করে কেষ্ট (উত্তমকুমার শ্রীকৃষ্ণ সেজে অভিনয় করেছেন) পেয়েছেন আর কি! উপস্থিত সকলের সাথে অঞ্জনাও সশব্দে হেসে ফেলেন।

সাগরপারের ধ্রুপদী চলচ্চিত্র

ফ্রান্স ১৯২৭

শ্রীনরেশচন্দ্র বসু

Rene Clair এর পরিচালিত চিত্রগুলিতে মঞ্চের প্রভাব বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কারণ মঞ্চের ঐতিহ্যের প্রতি Clairএর আনুগত্য এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের প্রহসনের প্রতি প্রবল আকর্ষণ। চিত্র জগতে এখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। ১৯৬২ খৃঃ Academic Francaise তাঁকে সভ্যপদে বরণ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। এই সম্মানলাভ তাঁর জীবনের এক বিশেষ ঘটনা। তিনিই প্রথম চিত্র নির্মাতা যিনি ঐ সভ্যপদ পেলেন তা নয়, কিন্তু তিনিই প্রথম যিনি প্রকৃত ফিল্ম আর্টিষ্ট রূপে বরণীয় হলেন। Jean Coctean যখন সভ্যপদ লাভ করেন তিনি তখন ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও চিত্র নির্মাতা।

Marcel Pagnol চারিটি চিত্রের নির্মাতা যখন ঔপন্যাসিক রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত, তখনই তিনি সভ্যপদ পান। Rene Clain এর চিত্র পরিচালনার জীবন কুসুমাস্তীর্ণ নয়। হলিউডে গমন এবং সেখানে প্রতিষ্ঠা লাভের পর তিনি ফ্যান্টাসী ফিল্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। অভিনেতাদের তাঁর হাতে ক্রীড়নকের অবস্থা এমন কি, Italian Straw Hat-ও এর ব্যতিক্রম নয়। অশ্বারূঢ় সৈন্য, অসতীর পতি, মেদভারাক্রান্ত মহিলা ইত্যাদি চরিত্র ব্যবসায়িক সাফল্যের চিরাচরিত পথ ধরে অগ্রসর হয় নি। অতীতের লুপ্ত গৌরব উদ্ধারকারী হিসাবে ক্লেয়ারের ব্যক্তিত্ব "তারকা"র ন্যায়ই। বাজীকরের মত তিনি পুতুল-রূপ অভিনেতাদের প্রতি স্নেহপ্রবণ হলেও জীবন মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে তিনি তাদের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন।

তাঁর অদ্ভুত একটা ক্ষমতা ছিল যার দ্বারা তিনি অভিনেতাদের দ্বারা তাঁর মনোমত রাজ্য সৃষ্টি করাতে পারতেন। একটা অবাস্তব পৃথিবী, যাহা ভাবপ্রবণ কিন্তু অলৌকিক জগৎ নয় এবং এই পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ চিত্র বোধ হয় তাঁর The Italian Straw Hat, এখানে অভি-

প্রাকৃত ঘটনাবলী বা বর্তমান শ্লেষ কোনটিই উপস্থিত নাই। চিত্রের ঘটনা কিন্তু অসংগত ভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং বর ও কনের মনের রঙিন দিনগুলিকে হত্যা করা হয়েছে। বর তীব্র অনুসন্ধানের দ্বারা একটি খড়ের টুপি যোগাড় করবে, কারণ টুপিটি বর ও কনের ঘোড়ার গাড়ীর ঘোড়াটি খেয়ে ফেলেছিল। যদি টুপি যোগাড় করতে না পারে তবে বরটি কনের প্রিয়তমের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করবে কারণ টুপিটি কনেরই গেছে। এই প্রকার ঘটনা চিত্রের সুন্দর মুহূর্তগুলিকে অযথা ভারাক্রান্ত করছে।

Rene Clair এর স্যাটায়ার (Satire) A Nans la Liberte পরবর্তীকালে নির্মিত হয়ে জন সম্বর্দ্ধনা লাভ করেছিল। সমাজের ব্যবসায়ীকুল যখন কাগজের টাকার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, সেই টাকা বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে গেল এবং অনুষ্ঠানও বন্ধ হয়ে যেতে বাধ্য হোল। মানুষের লোভের চরম পুরস্কার এই চিত্রে দেখা যায়। এবং একথা সত্য "Not Chaplin himself nad a defter hand than Ciair with sheer hilarious nonsen ce."

* * * *

ফ্রাসোঁয়া ক্রুফোঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ

শ্রীমতী চয়নিকা সেন

প্রঃ নবীন পরিচালকের অভাবই কি বর্তমান সংকটের সৃষ্টি করেছে ?

উঃ ইহা সত্য, কিন্তু পুরাতন পরিচালকেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ন্যুয়েল ভাগও শেষ হয়ে যায় নাই। প্যারিসে ন্যুয়েল ভাগের দু'জন প্রযোজক Branuberger এবং Beauregard এখনও ব্যবসা করছেন যদিও বাজার গুজব Jean-PaulGuibert,Gabin এর সব চিত্রের প্রযোজকের এখন রাহুর দশা। Guibert ১০০,০০০ পাউণ্ড অথবা তার চেয়ে বেশী Le Batean d' Emile চিত্রে ক্ষতি স্বীকার করেছেন যাহা অসফল Beauregard এর তিন-চারিখানি চিত্রের ক্ষয়-ক্ষতির সমান হইবে বলিয়া মনে হয়। অত্যন্ত দুঃখ হয় যখন ন্যাশনাল প্রেসের কয়েকটি প্রবন্ধ যাহাতে Le President, Le Batean d' Emile অথবা Un singe en Hiver প্রভৃতির ব্যর্থতার কারণ স্বরূপ যাহা বিশ্লেষণ করা হইয়াছিল তাহা পাঠকদের দৃষ্টি [illegible]

পরিচালনা করা হইয়াছিল যাহাতে মনেহয় চিত্রগুলি আর্থিক সাফল্যলাভ করিয়াছে। La Fazetteর সম্বন্ধেও একই কথা। বর্তমান সময়ের মধ্যে ঐ চিত্রের ব্যর্থতা আকাশ প্রমাণ। ইহা তার পুরা বাজেটের অর্দ্ধেক প্রায় পাঁচলক্ষ পাউণ্ড ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে।

প্রঃ ইহা হইতেই কি মনে হয়না যে দর্শকদের রুচির পরিবর্তন হয়েছে ?

উঃ La Bateau d' Emile প্রচুর ব্যয় করে তোলা সত্বেও দর্শক মনোরঞ্জনে ব্যর্থ হয়। কারণ চিত্রটি দর্শকদের এমন নতুন কোন কিছুর স্বাদ দিতে পারে নাই যা তাহারা টেলিভিসনে দেখে নাই। ফরাসী দেশের চিত্রশিল্পে বাস্তববাদের উপর নির্মিত এই চিত্রের ধারায় অন্য চিত্র টেলিভিসনে সপ্তাহে অন্ততঃ দুই তিনটি দেখা যায়। টেলিভিসনে অংশ গ্রহণকারী নায়কনায়িকারা নাম-জাদা তারকা না হইলেও তাহাদের একদল ভক্ত আছে।

ধরা যাউক ফরাসীদেশের একটি বড় সহরে দুইলক্ষ

তিনলক্ষ লোকের মধ্যে পনেরো হাজার ছাত্রছাত্রী আছে। যখন Vivre Sa vie একটি চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হইতেছিল তখন প্রায় দশহাজার ছাত্রছাত্রী ইহা দেখিতে গিয়াছিল। সমালোচকদের এই দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং তাঁহারা এই নিয়ে মন্তব্য করায় ছাত্রসমাজ বিক্ষুব্ধ হয়। কিন্তু ছাত্রসমাজের নিকট, Le Batean d' Emile দেখিতে কেন তাহারা যাইবেনা তাহা দাবী করা যায় না। এবং এখানেই আশার কথা।

প্রঃ পরিবেশন ব্যবস্থা কি অত্যন্ত খারাপ নয়? এই ব্যবস্থা মান্ধাতার আমলের চিত্রের জন্যই কি করা হয় নাই?

উঃ ইহা সত্য কথা, কিন্তু প্রকৃতিগত কারণে আমি পরিবেশন ব্যবস্থা পৃথক করার বিরোধী। এবং একটা দল বা শাখা স্থাবেল ভাগের চিত্রগুলির ওপর অথবা আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হবে, তা'ও চাই না। আমি মনে করি না কোন চিত্র মুষ্টিমেয় দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য তোলা হবে, কারণ সেটা চলচিত্রের উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধেই যাবে। আমরা যখন দর্শক আকর্ষণের জন্য বসেছি তখন যাহাতে সর্বাপেক্ষা বেশী দর্শক আকৃষ্ট হয়, সেইদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং প্রতিটি চিত্র যেন পরিবেশনের ব্যাপারে সমান সুযোগ সুবিধা পায়। তাই বলে চিত্রগৃহের ম্যানেজার তার মাথা এই ব্যাপারে ঘামাবে না একথা বলছি না। মনে করা যাক দর্শকরা পশ্চিমী চিত্রগুলির উপর খুব ঝুঁকেছে, সেইজন্য ম্যানেজার যদি হঠাৎ "Lola" চিত্রটি প্রদর্শন আরম্ভ করেন তা হলে ম্যানেজার দর্শক এবং চিত্র সব এক জায়গায় জড়িয়ে পড়বে এবং ব্যর্থ হবে। আদর্শগত ভাবে বলতে পারি যারা পশ্চিমী চিত্রসমূহ পছন্দ করে তারা নিশ্চয়ই "Lola" দেখবে এবং পশ্চিমবাসীরাও এই দেশের চিত্র সমূহ দেখবে। পরিবেশনকারীদের এইগুলি জানা উচিত। দুঃখের বিষয় তারা এইগুলি জানে না। যদি পরিবেশকের মনে হয় সমালোচকেরা কোন চিত্রকে সমালোচনার জালে ক্ষত বিক্ষত করবে তবে সেক্ষেত্রে সহরে নাকরে গ্রামে বা সহরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মুক্তি দান করাই শ্রেয়। যদি মনেহয় চিত্রটি সমালোচকদের প্রশংসা অর্জনে সমর্থ হবে তবে সেক্ষেত্রে প্যারী সহরেই সর্বপ্রথম প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা উচিত।

প্রঃ আপনি কি চিত্র দর্শকদের কথা চিন্তা না করেই আপনার মনস্তুষ্টির জন্য ছবি তৈরী করেন?

উঃ আমার নিজের তুষ্টির জন্য ছবি তৈরী করবার মত উৎসাহ কখনও পাইনি। কেউ যদি না দেখবে, তাহলে ছবি তৈরী করব এমন কথা আমি ভাবতেও পারি না। "অন্যকে আনন্দ পরিবেশন করছি"—এ অনুভূতি ছাড়া আমার পক্ষে ছবি করা কখনই সম্ভবপর ছিল না। আমি যখন কোন কাজ করি তা সকলে মিলে মিশে করতেই ভালবাসি এবং সর্বদা স্মরণে রাখি যে দর্শককুল এর বিচার করবে। আবার পূর্বাহ্ণেই যদি জানতে পারি যে এ ছবি সফল হবেই তাহলেও সে অবস্থায় আমার পক্ষে ছবি করা সম্ভবপর হোত না। আমার প্রত্যেকটি ছবি ভাগ্যের হাতে হারজিতের খেলার মত। আমার মতে একটি ছবি করা আর বাজী ধরা একই পর্য্যায়ে পড়ে। জনসাধারণ আমার নির্মিত Jules et Jim ছবির চিত্র নাট্যের ওপর গভীর বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেছে। অপর ছবি Les Quatre Cents Coups এর সম্বন্ধেও একই কথা। এই চিত্রে আমি একটি চৌর্য্যবৃত্তিপরায়ণ বালককে এমন ভাবে উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করেছি যাতে লোকের সহানুভূতি সে আদায় করতে পারে। এটাই আমার মস্ত বড় ঝুঁকি গ্রহণ ছিল। আমাদের বলা হয়েছিল, লোকে কখনও এমন চরিত্রের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে না। কিন্তু আমিও তখন বুঝিনি শিশুর শত অপরাধও সকলে ক্ষমা করে, দোষ গিয়ে পড়ে তার পিতামাতার ওপর। ছবিটিতে প্রথম থেকেই দর্শক, বালকের চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে একীকৃত করে দেখেছে এবং সেজন্য চিত্রটি দর্শক মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়। এই সময় রবার্ট মণ্টেগোমারীর "The lady in the Cave দর্শকদের অজস্র প্রশংসা কুড়োচ্ছে এই চিত্রে একটি লোকের চোখ দিয়ে সমস্ত ঘটনাটি দেখানো হয়েছিল। Les Quatre Ceuts Coups এর পরে Tirez sur le Pianiste তুলি এবং ইহা দর্শক মনোরঞ্জনে ব্যর্থ হয়। যদিও এই চিত্রটির সম্বন্ধে আমি খুব আশান্বিত ছিলাম তার কারণ Les Quatre Cents Coups এর সাফল্য। কিন্তু একটা অলিখিত নিয়ম আছে যে একজনের দ্বিতীয় চিত্র প্রথম চিত্র অপেক্ষা নিকৃষ্ট হয়।

প্রথম ছবি কেউ যখন করে তখন সে অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে তখন ভাবে হয়তঃ জীবনে আর দ্বিতীয় ছবি করতে পারবো না এবং সেই জন্যই দুঃসাহসী হয়। দ্বিতীয় ছবির বেলায় তা নয়। তখন প্রথম ছবির সাফল্যের পর দ্বিতীয় ছবির কাজ করছে, তার দৃষ্টি ভঙ্গীই বদলে গেছে। সেই জন্য দ্বিতীয় ছবি প্রথম ছবির মত একটি প্রকাশের উন্মাদনা নিয়ে সৃষ্ট হয় না। দ্বিতীয় ছবিতে উচ্চাভিলাষ ও কম। তৃতীয় ছবি আমার দ্বিতীয় ছবি অপেক্ষা ভালো হয়। কারণ তা প্রথম ও দ্বিতীয় ছবির সমবায়ে গঠিত এবং ভবিষ্যৎ গড়ার সোপান। আমার Tirez sur le Pianiste চিত্রে ফ্ল্যাসব্যাক পদ্ধতি ব্যবহার করি। এই প্রসঙ্গে Braunberzer কে বলি যে Les Manvaises Rencantres, Lola Montes, The Barefoot Contessa প্রভৃতি চিত্র এই ফ্ল্যাসব্যাক পদ্ধতির অভাবের জন্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে। একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার, জনসাধারণ একটি বাস্তব চিত্র যদি অতিনাটকীয়তায় পরিসমাপ্তি ঘটে তাকে গ্রহণ করতে দ্বিধা করে না, কিন্তু কোন চিত্রের আরম্ভে অতিনাটকীয়তা থাকে আর চিত্রটির পরিসমাপ্তি যদি অন্যভাবে হয় তাকে কখনই গ্রহণ করবে না। [ক্রমশঃ

* * * * *

প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন—নীপা চৌধুরী

সমরেশ মৈত্র—গভর্ণমেণ্ট কোয়াটার্স, এণ্টালি

সাগীনা মাহাতোর গল্পটা জানতে চাই। সায়রাবানু ও দিলীপকুমার কি কলকাতাতেই আছেন না প্লেনে যাতায়াত করছেন?

০ গৌরকিশোর ঘোষের লেখা সাগিনা মাহাতো বইখানি বাজারেই কিনতে পাবেন। কিনে পড়ে নিন। সায়রাবানু ও দিলীপকুমার সুটিং থাকলে কলকাতায় আসেন।

* * *

প্রসূন সেনগুপ্ত—সৈয়দ অমির আলি এভিনিউ—কলিকাতা

সৌমেন মুখার্জির পরিচালনায় আর কোন ছবি কেন দেখা যায় না? ডি, জি, (ধীরেন গাঙ্গুলী) যে ছবি তুলছিলেন তার কি হোল?

০ বর্তমানে সৌমেন মুখার্জি কোন ছবি পরিচালনা করছেন না বলেই দেখা যায় না। ইদানীংকালে ডি জি কোন নতুন ছবিতে হাত দিয়েছিলেন বলে জানা নেই।

বাদল বসু—রাণী রাসমণি বাজার রোড—কলিকাতা

পিনাকী ও ডিউকের ডিঙি করে আন্দামান সফরের পর বাঙলাদেশের ভবিষ্যৎ তরুণদের মনে নতুন কোন এ্যাডভেঞ্চার জাগবে কি?

০ তরুণদের এ্যাডভেঞ্চারের গুঁতোয় ইদানীং পাড়ায় টেকাই দায় হয়ে উঠেছে। এর পরে দেশ ছেড়ে পালাতে হবে কিনা কে জানে?

* * *

বিশ্বনাথ দাস—বাঘা যতীন কলোনি—যাদবপুর

সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলী বলতে কি বোঝায়?

০ ঠিক বলতে পারব না। তবে সীমান্ত নিয়ে রাশিয়া ও চীনের সংঘর্ষটা এই পর্য্যায়ে ফেলা যায় কিনা সেটা একটু চিন্তা করে বলতে হবে।

* * *

ছন্দা রায়—হাজরা লেন—কলিকাতা

"আগন্তুক" নামে যে চিত্রটি তোলা হচ্ছে তার বৈ-

০ সম্ভবতঃ তরুণ রায় করতে পারেন। তবে যতদূর জানি অগন্তক নামে কোন ছবি বর্ত্তমানে তোলা হচ্ছে না।

* * *

সন্তোষ কুমার কোঙার--বাসুদেবপুর—২৪পরগণা

সত্যজিৎ রায়ের পরবর্ত্তী ছবি কি ?

অরণ্যের দিনরাত্রি

* * * *

দীনেশ চক্রবর্ত্তী—গড়পার রোড—কলিকাতা

সংবাদে প্রকাশ ইলেকশানের পোষ্টার ও রঙ তুলতে একা হাওড়া ডিভিশানেই রেল কোম্পানীর প্রায় তিন লক্ষ টাকা খরচা হবে। নতুন করে ষ্টেশনের নাম লেখাবার খরচা এর মধ্যে ধরা হয়েছে না সেটা আলাদা পড়বে ?

০ আলাদা। শুধুমাত্র রঙ ও পোষ্টার তুলতেই তিন লাখ টাকা পড়বে। ষ্টেশনের নাম লেখাটা কি আর অত সস্তার মধ্যে হবে। কিন্তু এই সামান্য ব্যপার নিয়ে ভাববারই বা কি আছে ? খরচ যাই পড়ুক না কেন গদিতে যারা আছেন তারা ট্যাক্স বাড়িয়ে বা টিকিটের দাম বাড়িয়ে যেভাবেই হোক না কেন এ টাকাটা তুলে দেবেন। জনসাধারণের টাকায় জনসাধারণের সংস্কার করা হবে। দেশের সেবা করবার জন্তেই তো আমরা তাদের ভোট দিয়ে গদিতে বসিয়েছি। সামান্য ওই কটা টাকার জন্যে অত ভাবনা কেন ?

* * *

যোগেশচন্দ্র মান্না—নিবোদ বিহারী মল্লিক রোড—কলিকাতা

উত্তমকুমারের ছেলের সঙ্গে সুপ্রিয়া দেবীর মেয়ের একটু ইয়ে ইয়ে মতন শুনছি। খবরটা কি সত্যি ?

০ জানিনা। ওসব ইয়ে-মার্কা খবরের ইয়ে করুন না।

* * *

জয়া ভাদুড়ী—রসিক লাল ঘোষ লেন—কলিকাতা

নীতা সেন আজকাল প্লে ব্যাকে গাইছেন না কেন ?

০ খুব সম্ভবতঃ শারীরিক অসুস্থতার জন্তেই।

* * *

শিবানী ভট্টাচার্য্য—টেম্পল রোড—ঢাকুরিয়া

"শ্রেষ্ঠ শিশু অভিনেতা পুরস্কার" চালু হওয়ার পর ১৯৬৮ সালের শ্রেষ্ঠ শিশু অভিনেতা হিসাবে প্রসেনজিতের ছোট্ট জিজ্ঞাসার জন্য পুরস্কার পাওয়া উচিত নয় কি ?

০ নিশ্চয়ই উচিত।

* * *

মদন ধর—ক্যানাল সাউথ রোড—কলিকাতা

বম্বের সবিতা চ্যাটার্জি নাকি অভিনয় করা ছেড়ে দিয়েছেন ?

০ সেইরকমই শোনা যাচ্ছে। বিয়ের পর আপাততঃ উনি সংসারধর্ম নিয়েই ব্যস্ত আছেন।

* * *

দিপালী দাসগুপ্ত - কৈলাশ কবিরাজ লেন—কলিকাতা

সারা পৃথিবী জুড়ে এত সব রাজনীতিকরা রয়েছেন তবু পৃথিবীতে এত অশান্তি কেন ? কবে শান্তি আসবে বলতে পারেন ?

০ যারা রাজনীতি করেন তাদের নিজেদেরই কোন নীতির বালাই নেই, এক্ষেত্রে অশান্তি ছাড়া আর কি সৃষ্টির আশা করেন ? বর্ত্তমানে পৃথিবীর আবহাওয়া দেখে মনে হচ্ছে তৃতীয় মহাযুদ্ধের আগে শান্তি আর আসবে না।

* ও *

শোভনা বিশ্বাস—প্রভুরাম সরকার লেন—কলিকাতা

সুপ্রিয়া দেবী প্রযোজিত উত্তমকুমার পরিচালিত ছবির খবর কি ?

০ কোন খবর নেই। উত্তম-সুপ্রিয়া জুটি আগে টিকুক তারপর ওসব কথা ভাবা যাবে।

* * *

পত্রলেখা ব্যানার্জী—লেক ভিউ রোড—কলিকাতা

"শর্মিলা" নটী বিনোদিনীর "ঘরে" ঢুকতে "দ্বিধা" করছে কেন ? "সেমসাইড" হবার ভয়ে নাকি ?

০ দিশী আতরের সঙ্গে ইভনিং ইন্ প্যারিসের ইয়ার্কি কোনদিনই চলে না এটুকুও কি আপনার জানা নেই ?

* * *

নরেশ সাঁতরা—বৈষ্ণবঘাটা—যাদবপুর, কলিকাতা

অনেকদিন আগে পরেশ ব্যানার্জি নামে একজন চিত্রাভিনেতা ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি কোথায় এবং কি করছেন ?

০ শুনেছি বর্তমানে তিনি এলাহাবাদে থাকেন। করেছেন। ওখানেই নাকি তিনি দর্জির দোকান করেছেন।

* *

কমল গোস্বামী—কারবালা ট্যাঙ্ক লেন—কলিকাতা

"গুপী গায়েন বাঘা বায়েন ছবিটির মুক্তির ব্যাপারে সংরক্ষক সমিতি হেরে গেলেন কেন?

০ ভুল নেতৃত্বের জন্যে মনে হয়। তবে এক্ষেত্রে সংরক্ষণ সমিতির বিরোধীরা যে কুটরণনীতির পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসনীয়।

যে পাঁচজন বিখ্যাত পরিচালক সংরক্ষণ সমিতি পরিত্যাগ করেছেন আমি কিন্তু তাঁদের সমর্থন করি। ছবি মুক্তির ব্যাপারে আর দশজন পরিচালকদের সঙ্গে বা নতুন পরিচালকদের সঙ্গে তাঁদের একাসনে বসান উচিত নয়।

০ বিখ্যাত বলেই যে তাঁদের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নিয়ম বাতিল করে দিতে হবে এরকম কোন বিধান পৃথিবীর কোন দেশেই নেই। একই নিয়ম সবাইয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং একই সুযোগ সবাইকে সমান ভাবে দিতে হবে। আজকে যারা বিখ্যাত হয়েছেন একদিন তাঁরাও অখ্যাত ছিলেন। আজকে যাঁরা অখ্যাত আছেন আগামীদিনে তাঁরা যে কেউ বিখ্যাত হবেন না এরকম কথাই বা কে বলতে পারে?

একসময়ের বিখ্যাত পরিচালক দেবকী কুমার বসু, মধু বসু, সুকুমার দাসগুপ্ত, নীতিন বসু, নীরেন লাহিড়ী প্রভৃতি—এঁরা আজ কোথায়? থেকেও নেই। একদিন এরা বিস্মৃতির অতলে হারিয়েও যাবেন। তেমনি আজ যাঁরা বিখ্যাত পরিচালক একদিন তাঁরাও হারিয়ে যাবেন সময়ের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। শিল্পসৃষ্টির পৃথিবীতে কে এলেন বা কে গেলেন সেটা কোন বড় কথা নয়, তাঁরা কি রেখে গেলেন আগামীদিনের মানুষের জন্যে সেটাই হচ্ছে এক মাত্র কথা এবং আগামীদিনের মানুষ তাঁদের নাম কতখানি শ্রদ্ধার (?) সঙ্গে উচ্চারণ করবে সেটাও একটা চিন্তার কথা হয়ে থাকছে আজকের দিনের মানুষের কাছে।

* * *

পর্ণা বসু—হিন্দুস্থান পার্ক—কলিকাতা

আপনাদের পত্রিকায় এত বেশী ছাপার ভুল থাকে কেন? সময়ে সময়ে কথার মানে পর্য্যন্ত বদলে যায়। আপনাদের কি কোন প্রুফ রীডার নেই?

০ আছেন। তবে তাঁর ওপর মালিকপক্ষের কড়া নির্দেশ দেওয়া আছে যে সম্পাদকের নামের যেন কোন-রকম ছাপার ভুল না হয়। ওইটুকু ঠিক থাকলেই হল। বাকীটা পাঠক পাঠিকারা কষ্ট করে পড়ে নেবেন। তিনি মালিকপক্ষের নির্দ্দেশ যথাযথভাবে পালন করছেন, তাঁর কি দোষ বলুন?

* * *

মালতী সেনগুপ্ত—লেক ভিউ রোড—কলিকাতা

রবীন্দ্র সরোবরের নারী নির্য্যাতনের ঘটনার আসল রহস্যটা কি বলতে পারবেন?

০ না। আমি রহস্যভেদী ব্যোমকেশ নই। তবে একটা কথা বলতে পারি যে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হলে উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। পুরুষদের বদনামী চিরকাল মেয়েদের সহ্য করতে হয় এটা কি আপনার অজানা?

* * *

প্রসাদ রায়—মহেন্দ্র গোস্বামী লেন—কলিকাতা

ফিল্ম সোসাইটি গড়ার সার্থকতা কি?

০ জানি না। তবে আমাদের দেশে ফিল্ম সোসাইটি-গুলো হবার পর থেকেই বাংলা ছবির দর্শকরা সব ইনটেলেকচুয়াল হয়ে গেছেন এইটুকুই বলতে পারি।

* * *

শ্রাবণী সেনগুপ্ত—বেল্লতলা রোড—কলিকাতা

রবীন্দ্রনাথের 'সমাপ্তি' কি হিন্দী ভাষায় কখনও চিত্রায়িত হয়েছিল?

০ হয়েছিল। পরিচালক ছিলেন অমর মল্লিক। নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় ছিলেন তালাত মাহ্মুদ ও ভারতী দেবী।

* * * * *

ঝাতে

চিত্রলেখা —

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সন্ধ্যা। সন্ধ্যাতেই যেন রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে। ঝাউবনে অবিরাম শোঁ শোঁ আওয়াজ। গাছগুলো এক একবার দুলে দুলে প্রায় মাটিতে নুয়ে পড়ছে পরক্ষণেই আবার চাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে।

মত্ত হাতির মত সমুদ্রের ঢেউগুলো পাড়ের উপর আছড়ে আছড়ে পড়ছে।

জনহীন সমুদ্র সৈকত। বহুদূরে সমুদ্রে একটি নৌকা। লোকটি পক্ককেশধারী। একটু কুব্জ, রুগ্ণ ও অশক্ত। বিহ্বলভাবে তাকিয়ে থাকে লোকটি। দৃষ্টি তার মুগ্ধতায় ভরা। দীর্ঘ বারো বছর পরে এই গ্রামেরই একজন হতভাগ্য, যে ছ-মাসের মধ্যে ফিরে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল—সেই নিতাই ফিরে এসেছে তার জন্মভূমিতে এতদিন পরে।

অশক্ত, অকালবৃদ্ধ, রুগ্ণ নিতাই নীচু হয়ে একমুঠো বালি তুলে নেয়। বালিভরা হাতটি কপালে মাথায় চেপে ধরে সে। চোখ দিয়ে দরবিগলিত ধারায় জল গড়িয়ে পড়ে। অশক্ত পা দুটিকে কোনক্রমে টেনে নিয়ে সে চলতে থাকে।

ঝাউবন। উপরে তাকিয়ে দেখে নিতাই। এই সেই ঝাউবন; বারো বছর পরে দেখা, ছেলেবেলার কত সুখ দুঃখের এই ঝাউবন, সব কিছুই স্মরণে আসে। জল নেমে আসে নিতাইয়ের চোখ দিয়ে। একটা বালির ঢিপিতে পা লেগে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় নিতাই। কোন রকমে উঠে আবার চলতে শুরু করে।

বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায় নিতাই। কেউ নেই। কেবল শূন্য ভিটা পড়ে আছে। ভাঙা তুলসী মঞ্চ প্রায় ঢেকে গিয়েছে বালি ও আগাছায়। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তার শূন্যভিটার দিকে তাকিয়ে থাকে নিতাই।

দুঃখে, অবসাদে নিতাই বসে পড়ে তার ভাঙা ভিটার একধারে। মনে পড়ে যায় ঝাউবনে পদ্মকে সে একদিন বলেছিল—

...ষুষ করতে হবে না ? না খাটলে

ডুকরে ডুকরে কাঁদতে থাকে নিতাই। মাটিতে মাথা কপাল ঘষতে থাকে।

...ও সামনের দিকে চেয়ে থাকে নিতাই। ...বে সে ? কোথায় যাবে ?

রাত্রি। সাঁইদারের আড়ৎ। দরজার কাছে ঝুলোন কেরোসিনের আলোটা বাইরের ঝোড়ো হাওয়ায় অবিরত

নিতাই ও পদ্ম

কোথায় পদ্ম ? কোথায় বীরু ? দিশাহারা হয়ে যায় নিতাই। মনে পড়ে যাওয়ার আগে ক্রন্দনরতা পদ্মকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল—

নেপথ্যে নিতাইয়ের কণ্ঠ—

"আর এক মাণিক আসছে তাকেও তো মানুষ করতে হবে..........ফিরে এসে বীরুকে কত দেশবিদেশের গল্প বলবো—"

হাহাকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে নিতাই। দুহাতে মাটি চেপে কেঁদে ওঠে। রুদ্ধ কণ্ঠে বলে—

নিতাই। ভগবান্, এই জন্যেই কি এতদিন আমায় বাঁচিয়ে রেখেছিলে ? এই অবস্থা দেখাতেই কি আমায় এখানে নিয়ে এলে ?

দুলতে থাকে। সাঁইদার ক্যাশ বাক্সের তালা খুলে কাগজ খাতা পত্র ইত্যাদি রেখে দেয়। তারপরে হাই তুলে তুড়ি দিতে দিতে সাঁইদার বলে—গোবিন্দ, গোবিন্দ।

বাইরে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকায়। সাঁইদার শোওয়ার উদ্যোগ করে। সামনে রাখা লণ্ঠনটা নিভোবার জন্যে হাত বাড়াতেই কে যেন হুড়মুড় করে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেই পড়ে যায়। ভয় পেয়ে সাঁইদার বলে ওঠে—

সাঁইদার—কে ? কে ?

ক্লান্ত অশক্ত নিতাই মেঝেতে পড়ে থাকে।

ত্রস্তপদে সাঁইদার নিতাইয়ের সামনে এসে দাঁড়ায়। নিতাইকে চিনতে পারেনা সে।

মূর্ছাপ্রায় নিতাই পড়ে থাকে।

সাঁইদার ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে থাকে। চোখে বিস্ময়।

ধীরে ধীরে নিতাই তাকায়। বহুকষ্টে বলে—

নিতাই—জল, একটু জল—

সাঁইদার জল আনতে পাশের ঘরে যায়।

নিতাই নির্জীবের মত পড়ে থাকে।

কুঁজো থেকে একটা গেলাসে জল ঢেলে সাঁইদার নিতাইকে এনে দেয়। নিতাই দু-হাত বাড়িয়ে গেলাসটি নিয়ে চকচক করে সবটুকু জল পান করে ফেলে। কষ বেয়ে কিছুটা জল গড়িয়ে পড়ে। জল পান করে অবসন্ন হয়ে ঢলে পড়ে নিতাই।

আগন্তুক নিতাইয়ের অবস্থা দেখে বিচলিত হয় সাঁইদার। কি করবে ভেবে পায়না। লণ্ঠনের শিখাটা বাড়িয়ে ওকে আরও ভাল ভাবে দেখে।

বাইরে অশান্ত ঝাউবন। দূরে সাগরের গর্জন। লণ্ঠনের শিখা বাতাসে কাঁপতে থাকে।

সাঁইদার আগন্তুক নিতাইকে চিনতে পারে না। দীর্ঘ বারো বছর পরে এই অবস্থায় দেখে নিতাইকে কেই বা চিনতে পারবে? কাঁপতে থাকে নিতাই। সাঁইদার ওর কপালে হাত দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে—

সাঁইদার। ইস্, গা যে পুড়ে যাচ্ছে—

নিতাই ধীরে ধীরে চোখ তুলে সাঁইদারের দিকে তাকায়। সাঁইদার বলে—

সাঁইদার। তুমি আজ এখানেই থাক বাবা এই রাতে—

নিতাই অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় কম্পিতহস্তে সাঁইদারের হাত জড়িয়ে ধরে স্থির দৃষ্টিতে সাঁইদারের মুখের দিকে তাকায়। ধীরে ধীরে তার হাত আলগা হয়ে যায়। মেঝেতেই গড়িয়ে পড়ে সে।

পাশের ঘর থেকে কাঁথা ও মাদুর নিয়ে এসে মেঝেতে পেতে দেয় সাঁইদার।

কলকেতে ফুঁ দিতে দিতে লণ্ঠনের আলো একটু কমিয়ে দেয় সাঁইদার। অদূরে কাঁথা গায়ে দিয়ে মাদুরে শুয়ে আছে নিতাই। আকাশে বিদ্যুৎ ও সাগরের গর্জ্জন ক্রমাগত বেড়েই চলে। চৌকীর একধারে বসে সাঁইদার তামাক টানতে থাকে।

নিতাই চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ! লণ্ঠনের অল্প আলোয় ক্ষীণভাবে দেখা যায় সাঁইদারকে। দূরে বসে আছে। দুর্বল কণ্ঠে নিতাই বলে—

নিতাই—এখানে নিতাই বলে কেউ থাক্তো?

সাঁইদার ফিরে তাকায়। বহুদিনের পুরোনো এক স্মৃতি ভেসে ওঠে। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আপনমনেই সাঁইদার বলে—

সাঁইদার—আহা, ছেলেটা যে কোথায় হারিয়ে গেল।

অন্যমনস্ক হয়ে যায় সাঁইদার। হুঁকোয় দু-একটা টান দিয়ে আপনমনেই আবার বলতে শুরু করে—

সাঁইদার—অমন জোয়ান ছেলেটা সমুদ্রে হারিয়ে গেল......অমন সুন্দর সংসার। পদ্মর মত বৌ, বীরুর মত ছেলে......সব পড়ে রইল।

দরজার কাছে ঝুলোন আলোটা দুলতে থাকে। বাইরে দুএকবার বিদ্যুৎ চমকায়।

সাঁইদার বলে—ওই দুধের বাচ্চা বীরুটাকে নিয়ে কি কষ্টই না পদ্ম সয়েচে। জাল মেরামত করে, এটা সেটা করে কত কষ্টে দিন চালিয়েছে। ওর কষ্ট আর চোখে দেখা যেত না।

নিতাই উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে থাকে।

সাঁইদার বলে—গোষে বাঁচলো। ওই যে ওর বন্ধু লোটন, নিতাইয়ের বন্ধু, সেই ওদের বাঁচালো!

নিতাই চেয়ে থাকে। সাঁইদার বলে—

সাঁইদার—নতুন সংসার পেতেছে, বৌকটা ইস্কুলে পড়ে, মানুষ হচ্ছে।

নিতাইয়ের চোখ দুটি একটু জ্বলে উঠেই নিভে যায়। অবশ হয়ে সে পড়ে থাকে!

সাঁইদার অভিভূত হয়ে থাকে কিছুক্ষণ। হঠাৎ কি ভেবে শায়িত নিতাইয়ের কাছে এসে বসে; জিজ্ঞাসা করে—

সাঁইদার—তুমি কে বাবা? তুমি, তুমি আমাদের নিতাইকে চেন?

নিতাই নির্বাক। স্তব্ধ হয়ে পড়ে থাকে। নিঃশ্বাসের উত্থান পতন বোঝা যায় না। যেন একটা প্রাণহীন পাষাণ!

ব্যগ্র হয়ে সাঁইদার নিতাইকে নাড়া দেয়, বলে—সাঁইদার তুমি—নিতাইকে চেন?

নিতাই কোন সাড়া দেয় না। প্রবলবেগে কাশতে থাকে। কাশতে কাশতে সে বিপর্য্যস্ত হয়ে যায়। মাথাটা একদিকে হেলে পড়ে। কপালে বিন্দু বিন্দু স্বেদ দেখা দেয়। সে আবার কাশতে আরম্ভ করে। সাঁইদার তার বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করে।

কাশতে কাশতে নিতাই উপুড় হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পর কাশি থামলে নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ে নিতাই। ঘুমন্ত মুখে একটা বিরাট অবসাদের ছায়া।

সাঁইদারও ব্যথাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। স্থির করে আজ রাতে ওকে আর বিরক্ত না করে কাল সকালে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। উঠে দাঁড়ায় সে।

লণ্ঠন জ্বলছে। চিমনিতে কালি জমছে।

পাশের ঘরে শুয়ে আছে সাঁইদার। নিদ্রামগ্ন

বাইরে ঝোড়ো হাওয়া। ঝাউবন দুলে দুলে উঠছে।

নিতাই শুয়েছিল। একটু নড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে মাথা তুলে ঘরের চারদিকে দেখে সে। পাশের ঘরের খোলা দরজা দিয়ে নিদ্রামগ্ন সাঁইদারকে দেখা যায়। ধীরে ধীরে উঠে বসে নিতাই।

বাইরে বিদ্যুৎ চমকায়। নিতাই উঠে অতিকষ্টে ধীর পায়ে দরজার কাছে আসে সাঁইদারের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। পরে মাথা নত করে প্রণাম জানিয়ে ঝাঁপ তুলে বাইরে বেরিয়ে যায়।

বাইরে অন্ধকার। ঝাউবনে ঝোড়ো হাওয়ার শব্দ।

অন্ধকার ভেদ করে নিতাই এগিয়ে যায়।

চণ্ডীতলার পাশ দিয়ে যাবার সময় বুড়ো বটগাছের শিকড়ে হোঁচট খায় নিতাই। যন্ত্রণায় অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে ওঠে সে।

দূরে লোটনের বাড়ি দেখা যায়। নিতাই লোটনের বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়।

লোটনের বাড়ির একটা ঘরে আলো জ্বলছে। পাশের দিকের জানলাটা খোলা। জানালার পাশে বেড়ার কাছে এসে দাঁড়ায় নিতাই। বিহ্বলভাবে তাকিয়ে থাকে ভিতরের দিকে।

জানালার ফাঁক দিয়ে ভিতরে দেখা যায় লোটন হিসাবের খাতা নিয়ে ব্যস্ত। পিছনের একটা চৌকীতে

বীরু ঘুমিয়ে আছে। পদ্ম ঘরের কোণে বসে কাঁথা সেলাই করছে।

পদ্ম

হঠাৎ দমকা একটা কাশি আসতেই নিতাই মুখ চেপে ধরে। অতিকষ্টে সামলাবার চেষ্টা করে। সামলে নিয়ে বিহ্বল চোখে তাকিয়ে থাকে ভিতরে।

দমকা ঝড় ওঠে। ঘরে লণ্ঠনের শিখা কেঁপে কেঁপে ওঠে। লোটনের হিসেবের কাগজপত্র ফরফর করে উড়ে ঘরময় ছড়িয়ে যায়। ধীর কণ্ঠে লোটন বলে—

লোটন দেখতো, বোধহয় ঝড় উঠলো।

পদ্ম হাতের সেলাই রেখে উঠে আসে জানালার দিকে।

নিতাই একটু সরে আসে জানালা থেকে। একটা ঝোপ সামনে রেখে নিজেকে আড়াল করে।

পদ্ম জানালা বন্ধ করে দেয়।

অন্ধকার হয়ে যায়। একবার বিদ্যুৎ চমকায়। দেখা যায় মুখে হাত চাপা দিয়ে কাশি রোধ করবার চেষ্টা করছে নিতাই ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে। জানালা বন্ধ।

অন্ধকার। সমুদ্রপাড়ে ঝোড়ো হাওয়া অশান্ত হয়ে ওঠে। কালো আকাশে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকায়। দূরে কাশির আওয়াজ শোনা যায়।

অন্ধকারের মধ্যে দূরে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে এক আবেদন শোনা যায় নিতাইয়ের কণ্ঠে। আর্তকণ্ঠে আবেদন করে নিতাই—

"ভগবান্, তুমি ওদের শান্তিতে রাখো···
········লোটনা আমায় বাঁচিয়েছে—"

আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে এই আবেদন।

সকাল। সমুদ্রবেলা। মেঘে ঢেকে আছে সূর্য্য। নির্জন সমুদ্র সৈকতে দূরে একটি মাত্র নৌকো নোঙ্গর করা অবস্থায় অশান্ত ঢেউয়ের তালে তালে উঠছে আর নামছে। বীরু সুন্দর একটি ঝিনুক কুড়িয়ে পায়। সঙ্গের ছেলেটি সেটা নিতে চায়। বীরু দৌড় দেয়। সঙ্গের ছেলেটিও তার পিছনে দৌড়য়। হঠাৎ সামনে কি একটা দেখে আঁতকে উঠে দুহাত তুলে বীরু আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ে।

প্রচণ্ড ঢেউয়ের ঠেলা লেগে একটা মৃতদেহ একপাশ হতে অপরপাশে গড়িয়ে পড়ে। উল্টো ঢেউ ধাক্কা দিয়ে মৃতদেহটাকে ওদিক হতে এদিকে নিয়ে আসে। হতভাগ্য নিতাইকে নিয়ে উদ্দাম মাতনে মেতেছে এই বিক্ষুব্ধ জলরাশি। নিতাইয়ের মুষ্টিবদ্ধ হাত থেকে কি যেন একটা আচমকা বেড়িয়ে পড়ে যায়—

বিদায়ের সময় পদ্মর দেওয়া চণ্ডীতলার ফুলবেলপাতা ভরা সেই ছোট্ট কৌটোটা; ঢেউএ ঠেলে ফেলে দেয় সিক্ত বালুকাবেলায়। একটা ছোট ঢেউ এসে কৌটোটাকে ডুবিয়ে দেয়।

জেলেদের ছোট একটা ভীড় জমেছে মৃতদেহটাকে ঘিরে। দূরের নোঙর করা নৌকোটি উদ্দাম হয়ে উঠেছে। ঢেউয়ের অবিরাম আঘাতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে

লোটন, বীরু ও আরো কয়েকজন জেলে ঝুঁকে পড়ে দেখছে মৃতদেহটাকে। চিনতে চেষ্টা করছে কোন ভিনগাঁ থেকে এসেছে লোকটা।

লোটন চিনতে পারে তার বাল্যবন্ধু মিতাইকে। শক্ত হাতে বীরুকে চেপে ধরে সে। চকিতে আকাশে মুখ তোলে—দুবিন্দু জল চিকচিক করে ওঠে তার চোখে — গড়িয়ে পড়ে গাল দিয়ে।

সমুদ্রের সিক্ত বেলাভূমি, পাড় ঘেঁষে উড়ে মাছ-কাঙাল পাখীরা—দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি—বালুকাবেলা—ঝাউবন—নীল আকাশে একটা চিল চক্রাকারে উড়তে উড়তে বেলাভূমি, বালুকাবেলা, ঝাউবন ছাড়িয়ে উড়ে যায়—মিলিয়ে যায় দূর নিলীমায়———

সমাপ্ত

সম্পাদক—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।